বিচিত্রা

সচিত্র মাসিক পত্র

পঞ্চম বর্ষ, প্রথম খণ্ড

শ্রাবণ ১৩৩৮—পৌষ ১৩৩৮

সম্পাদক

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

কলিকাতা

২৭৷১, ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট ।

বার্ষিক মূল্য—৬॥০ ।

বিষয়-সূচী

(শ্রাবণ ১৩৩৮—পৌষ ১৩৩৮)

খ

রবীন্দ্র জয়ন্তী

পূর্ব্ব ও পশ্চিম

চিত্র-প্রদর্শনী—

শান্তিনিকেতন

শ্রদ্ধাঞ্জলি

চিত্র-সূচী

(কেবল পূর্ণ পৃষ্ঠ)



পদ্মার চর

বিচিত্রা
শ্রাবণ, ১৩৩৮

শিল্পী—শ্রীযুক্ত অজিতকৃষ্ণ গুপ্ত

বিচিত্রা

পঞ্চম বর্ষ, ১ম খণ্ড	শ্রাবণ, ১৩৩৮	১ম সংখ্যা

কুহু ও কেকা

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গান

এপারে মুখর হল কেকা ঐ
        ওপারে নীরব কেন কুহু হায়!
এক কহে, আরেকটি একা কই,
        শুভযোগে কবে হ'বে দুঁহু হায়।
                অধীর সমীর পুরবৈয়াঁ
                নিবিড় বিরহব্যথা বইয়া
                        নিঃশ্বাস ফেলে মুহু মুহু হায়,
                        ওপারে নীরব কেন কুহু হায়॥

আষাঢ় সজলঘন আঁধারে
        ভাবে বসি' দুরাশার ধেয়ানে
আমি কেন তিথি-ডোরে বাঁধা রে,
        ফাগুনেরে মোর পাশে কে আনে!
                ঋতুর দুধারে থাকে দুজনে,
                মেলে না যে কাকলী ও কূজনে,
                        আকাশের প্রাণ করে হুহু হায়।
                        ওপারে নীরব কেন কুহু হায়॥

দার্জ্জিলিং
১লা আষাঢ় ১৩৩৮

———

শীতের মধ্যাহ্ন

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কল্যাণীয়াসু,

বেলা একটা হ'ল। খানিক আগেই মধ্যাহ্নভোজন শেষ করেছি—এক পেয়ালা কফিও খেলুম।

কতদিনে আমাদের মাঠের হাওয়ার মধ্যে শীত এসে পৌঁছল। এখনো তার সব গাঁঠরি খোলা হয়নি। কিন্তু আকাশে তাঁবু প'ড়েছে। বাতাসে ঘাসগুলো গাছের পাতাগুলো একটু একটু সির্ সির্ করতে আরম্ভ করলো। তরুণ শীতের এই আমেজটায় কঠোরে কোমলে মিশাল আছে। সন্ধ্যাবেলায় বাইরে বসি কিন্তু ঘরের ভিতরকার নিভৃত আলোটি পিছন থেকে মৃদু স্বরে ডাক দিতে থাকে। প্রথমে গায়ের কাপড়টা একটু ভালো ক'রে জড়িয়ে নিই, তার খানিকটা পরে মনটা উঠি উঠি করে, অবশেষে ঘরে ঢুকে কেদারাটায় আরাম ক'রে ব'সে মনে হয় এটুকুর দরকার ছিল। এমন দুপুর বেলায় মেঘমুক্ত আকাশের রোদ্দুর সমস্ত মাঠে কেমন যেন তন্দ্রালসভাবে এলিয়ে রয়েছে; সামনে ঐ দুটো বেঁটে পরিপুষ্ট জামগাছ পূর্ব্ব উত্তর দিকে ঘাসের উপর এক এক পোঁচ ছায়া টেনে দিয়েছে। আজ ওখানে একটিও গোরু নেই, সমস্ত মাঠ শূন্য, সবুজ রঙের একটা প্রলেপ আছে কিন্তু তার প্রাচুর্য্য অনেক কম। ঐ আমাদের টগর-বীথিকার গাছগুলি রোদ্দুরে ঝিলিমিলি এবং হাওয়ায় দোলাদুলি ক'রছে। বাতাস এখনও তেতে উঠলো না। নিঃশব্দতার ভিতরে ঐ রাঙা রাস্তায় গোরুর গাড়ীর একটা আর্ত্তস্বর মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে—আর, কি জানি কি সব পাখীর অনির্দ্দিষ্ট ক্ষীণ আওয়াজ যেন নীরবতার সাদা খাতায় সরু সরু রেখায় ছেলেমানুষি হিজিবিজি কাটছে। জানি না, কেন আমার মনে প'ড়ছে বহুকাল আগে সেই যে হাজারিবাগে গিয়েছিলুম—ডাকবাংলার সামনের মাঠে হাতাওয়ালা কেদারায় আমি অর্দ্ধশয়ান, রোদ্দুর পরিণত হ'য়ে উঠেছে, কাজকর্ম্মের বেলা হলো—মাঝে মাঝে অনতিদূরে ঘণ্টা বাজে। সেই ঘণ্টার ধ্বনি ভারি উদাস। আজ হাটের দিনে হাট ক'রে পথিকরা রাস্তা দিয়ে ঘরে ফিরে চলেছে, কারো বা মাথায় পুঁটুলি, কারো বা কাঁধে বাঁক। আর সেই ঘণ্টার ধ্বনি যেন আকাশে নীরবে বাজছে, মূলতানে বল্‌ছে, বেলা যায়। ইতি—২৫ কার্ত্তিক ১৩৩৫

তোমাদের শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীমতী রাণী দেবীকে লিখিত

নামের পদবী

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ সেন বাঙ্গালী মেয়ের পদবী প্রসঙ্গে আমাকে যে চিঠিখানি লিখেচেন তার উত্তরে আমার যা বলবার আছে ব'লে নিই, যদিও ফলের আশা রাখিনে।

বাংলা দেশে সামাজিক ব্যবহারে পরস্পরের সম্মানের তারতম্য জাতের সঙ্গে বাঁধা ছিল। দেখা সাক্ষাৎ হলে জাতের খবরটা আগে না জানতে পারলে অভিবাদন অভ্যর্থনা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে থাকত। পাকা পরিচয় পেলে তবে একপক্ষ পায়ের ধূলো দেবে, আর একপক্ষ নেবে, আর বাকি যা'রা তারা পরস্পরকে নমস্কার করবে কিম্বা কিছুই করবে না এই ছিল বিধান। সামাজিক ব্যবহারেব বাইরে লৌকিক ব্যবহারে যে-একটা সাধারণ শিষ্টতার নিয়ম প্রায় সকল দেশেই আছে—আমাদের দেশে অনতিকাল পূর্ব্বেও তা ছিলনা। যেখানে স্বার্থের গরজ ছিল এমন কোনো কোনো স্থলে এ নিয়ে মুস্কিল ঘটত। উচ্চপদস্থ বা ধনশালী লোকের কাছে উমেদারী করবার বেলা নতি স্বীকার করে তুষ্ট করা প্রার্থীব পক্ষে অত্যাবশ্যক কিন্তু জাতে-বাঁধা রীতি ছাড়া আর কোনো রীতি না থাকাতে কিছুদিন পূর্ব্বে এই রকম সঙ্কটের স্থলে সম্মানের একটা কৃপণ প্রথা দায়ে পড়ে উদ্ভাবিত হয়েছিল। সে হচ্চে ডান হাতে মুঠো বেঁধে দ্রুতবেগে নিজের নাসাগ্র আঘাত করা, সেটা দেখতে হোত নিজেকে ধিক্কার দেওয়ার মতো। এই রকম সংশয়কুণ্ঠিত অনিচ্ছুক অশোভন বিনয়াচার এখন আর দেখতে পাইনে।

তার প্রধান কারণ, বাঙালী সমাজে পূর্ব্বকালের গ্রাম্যতা এখন নেই বল্লেই হয়, জাতের গণ্ডি পেরিয়ে লোকব্যবহারে পরস্পরের প্রতি একটা সাধারণ শিষ্টতার দাবী স্বীকার করবার দিন এসেছে। তা ছাড়া কাউকে বিশেষ সম্মান দেবার বেলায় আজ আমরা বিশেষ করে মানুষের জাত খুঁজিনে। মেয়ের বিবাহ সম্বন্ধ বেলায় কোনো কোনো পরিবারে আজো কৌলীন্যের আদর থাকতে পারে—কিন্তু বৈঠকেমজলিযে সভাসমিতিতে ইস্কুলেকলেজে আপিসেআদালতে তার কোনো চিহ্ন নেই; সে সব জায়গায় ব্রাহ্মণের চেয়ে কুলীনের চেয়ে অনেক বড়ো মান সর্ব্বদাই অন্য জাতের লোক পেয়ে থাকে।

অতএব আজকের দিনে জনসমাজে কার কোন্ আসন সেটা জাতের দ্বারা ঘের দিয়ে সুরক্ষিত নেই, ভোজের স্থানেও পংক্তিবিভাগের দাগটা কোথাও বা লুপ্ত, কোথাও বা অত্যন্ত ফিকে। মানুষের পরিচয়ে জাত-পরিচয়ের দাম এক সময়ে যত বড়ো ছিল এখন তা প্রায় নেই বলা যেতে পারে।

দাম যখন বেশি ছিল এমন কি সম্মানের বাজারে সেইটেই যখন প্রায় একান্ত ছিল তখন নামের সঙ্গে পদবী বহন করাটা বাহুল্য ছিলনা। কেন না আমাদের পদবী জাতের পদবী। ইংরেজিতে স্মিথ্ পদবী পারিবারিক, যদিও ছড়িয়ে গিয়ে এর পারিবারিক বিশেষত্ব অনেক পরিমাণে হারিয়ে গেছে। কিন্তু

ঘোষ বোস্ চাটুযো বাঁড়ুযো মূলতঃ কোনো পরিবারকে নির্দ্দেশ করে না, জাত বিশেষের বিভাগকে নির্দ্দেশ করে। পরিবারের চেয়ে এই বিভাগটা অনেক ব্যাপক। এমনতর ব্যাপক সংজ্ঞার যখন বিশেষ মূল্য ছিল তখনি নামের সঙ্গে ব্যবহারে সেটার বিশেষ সার্থকতা ছিল, এখন মূল্য যতই কমে আসচে ততই পারিবারিক পরিচয় হিসাবে ওর বিশিষ্টতা থাকচেনা, অন্য হিসাবেও নয়।

ভারতবর্ষে বাংলা দেশ ছাড়া প্রায় আর সকল প্রদেশেই পদবীহীন নাম বিনা উপদ্রবেই চলে আসচে। এতদিন তো তা নিয়ে কারো মনে কোনো খট্‌কা লাগেনি। বারাণসীর ধনামখ্যাত ভগবানদাস তাঁর ব্যক্তিগত নামটুকু নিয়েই আছেন। তাঁর ছেলের নাম শুদ্ধমাত্র শ্রীপ্রকাশ, নামের সঙ্গে কুলপরিচয় নেই। রাষ্ট্রিক উদ্যোগে খ্যতিলাভের দ্বারা তিনি আপন নিষ্পদবিক নামটিকেই জনাদৃত করে তুল্‌চেন।

প্রাচীনকালের দিকে তাকালে নল দময়ন্তী বা সাবিত্রী সত্যবানের কোনো পদবী দেখা যায়না। একান্ত আশা করি, নলকে নল দেববর্ম্মা বলে ডাকা হোত না। কুলপদবীর সমাসযোগে যুধিষ্ঠির-পাণ্ডব বা দ্রৌপদী-পাণ্ডব নাম পুরাণ ইতিহাসে চলেনি, সমাজে চল্‌তি ছিল এমন প্রমাণ নেই। বিশেষ প্রয়োজন হলে ব্যক্তিগত নামের সঙ্গে আরো কিছু বিশেষণ যোগ করা চল্‌ত। যেমন সাধারণত ভগবান মনুকে শুদ্ধ মনু নামেই আখ্যাত করা হয়েছে, তাতে অসুবিধা ঘটেনি—তবু বিশেষ প্রয়োজন স্থলেই তাঁকে বৈবস্বত মনু বলা হয়ে থাকে, সর্ব্বদা নয়।

কিন্তু এক্ষেত্রে মহাভারতের দৃষ্টান্ত পুরোপুরি ব্যবহার কর্‌তে সাহস করিনে। নামের ভার যথাসম্ভব লাঘব করারই আমি সমর্থন করি, এক মানুষের বহুসংখ্যক নামকরণ দ্বাপর-ত্রেতাযুগে শোভা পেত এখন পায় না। বাপের পরিচয়ে কৃষ্ণার নাম ছিল দ্রৌপদী, জন্মস্থানের পরিচয়ে পাঞ্চালী, জন্ম-ইতিহাসের পরিচয়ে যাজ্ঞসেনী। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলে রাখি, শ্বশুরকুলের পরিচয়ে তাঁকে পাণ্ডবী বলা হয়নি। প্রাচীন কালে কোনো স্ত্রীর নামের সঙ্গে স্বামীর পরিচয় যুক্ত আছে এমন তো মনে পড়ে না।

আমার প্রস্তাব হচ্চে, ব্যক্তিগত নামটাকে বজায় রেখে আর সমস্ত বাদ দেওয়া, বিশেষ দরকার পড়লে তখন সংবাদ নিয়ে পরিচয় পূর্ণ করা। নামটাকে অত্যন্ত মোটা না করলে নামের সাহায্যেই সম্পূর্ণ ও নিঃসংশয় পরিচয় সম্ভব হয় না। আমাদের বিখ্যাত ঔপন্যাসিককে আমি বলি শরৎচন্দ্র। তাঁর কথা আলোচনা করতে গিয়ে দেখি শরৎচন্দ্র সান্যালও লেখেন উপন্যাস। তখন গ্রন্থি ছাড়াবার জন্যে বলা গেল শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামে আরো একজন গল্প-লিখিয়ে থাকা বিপুলা পৃথ্বীতে অসম্ভব নয় তার প্রমাণ খুঁজলে পাওয়া যায়। এই দ্বন্দ্বের মীমাংসা করা যেখানে দরকার হয় সেখানে আরো একটা বিশেষণ যোগ করতে বাধ্য হই, যেমন শ্রীকান্ত-লেখক শরৎচন্দ্র। ফুলের বৃন্ত যেমন, মানুষের ব্যক্তিগত নামটি তেমনি। এই বৃন্ত থাকে প্রশাখায়, প্রশাখা থাকে শাখায়, শাখা থাকে গাছে, গাছ হয়ত আছে টবে। কিন্তু যখন ফুলটির সঙ্গেই বিশেষ ব্যবহার করতে হয়, যেমন মালা গাঁথতে, বোতামের গর্ত্তে গুঁজতে, হাতে নিয়ে তার শোভা দেখতে, গন্ধ শুঁকতে, বা দেবতাকে নিবেদন করতে, তখন গাছসুদ্ধ টবসুদ্ধ যদি টানি তবে বৈশল্যকরণীর প্রয়োজনে গন্ধমাদন নাড়ানোর দ্বিতীয় সংস্করণ হয়। অবশ্য বিশেষ দরকার হলে তখন টবসুদ্ধ নাড়াতে দেখলে সেটাকে শক্তির অপব্যয় বলব না।

৫

পত্রলেখক বাঙালী মেয়ের পদবী সম্বন্ধে আমাকে প্রশ্ন করেচেন। মেয়েরই হোক্ পুরুষেরই হোক পদবী মাত্রই বর্জ্জন করবার আমি পক্ষপাতী। ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশে তার নজীর আছে এই আমার ভরসা, কিন্তু বিলিতী নজীর আমার বিপক্ষ বলেই হতাশ হতে হয়।

আমার বয়স যখন ছিল অল্প, বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন বঙ্গসাহিত্যের রাজাসনে, তখন প্রসঙ্গক্রমে তাঁর নাম করতে হলে আমরা বলতুম বঙ্কিম বাবু, শুধু বঙ্কিমও কারো কারো কাছে শুনেছি, কিন্তু কখনও কাউকে বঙ্কিম চাটুজ্জে বল্‌তে শুনিনি। সম্প্রতি রুচির পরিবর্ত্তন হয়েচে কি? এখন শরৎচন্দ্রের পাঠকদের মুখে প্রায় শুনতে পাই শরৎ চাটুজ্জে। পরোক্ষে শুনেচি আমি রবি ঠাকুর নামে আখ্যাত। রুচি নিয়ে তর্কের সীমা নেই কিন্তু শরৎচন্দ্রই আমার কানে ভদ্র শোনায়, শরৎবাবুতেও দোষ নেই, কিন্তু শরৎ চাটুজ্জে কেমন যেন খেলো ঠেকে। যাই হোক্ এরকম প্রসঙ্গে বাদ প্রতিবাদ নিরর্থক, মোট কথা হচ্চে এই, ব্যাঙাচি পরিণত বয়সে যেমন ল্যাজ খসিয়ে দেয় বাঙালীর নামও যদি তেমনি পদবী বর্জ্জন করে আমার মতে তাতে নামের গাম্ভীর্য্য বাড়ে বই কমে না। বস্তুত নামটা পরিচয়ের জন্যে নয় ব্যক্তিনির্দ্দেশের জন্যে। পদ্মলোচন নাম নিয়ে আমরা কারো লোচন সম্পর্কীয় পরিচয় খুঁজিনে একজন বিশেষ ব্যক্তিকেই খুঁজি। বস্তুত নামের মধ্যে পরিচয়কে অতিনির্দ্দিষ্ট করার দ্বারা যদি নামমাহাত্ম্য বাড়ে তবে নিম্নলিখিত নামটাকে সেরা দাম দেওয়া যায়:—রাজেন্দ্রসূনু শশিশেখর মৈমনসৈংহিক বৈষ্ণব নিস্তারিণীপতি চাকলাদার।

সম্মানরক্ষার জন্যে পুরুষের নামের গোড়ায় বা শেষে আমরা বাবু যোগ করি। প্রশ্ন এই যে, মেয়েদের বেলা কি করা যায়। নিরলঙ্কৃত সম্ভাষণ অশিষ্ট শোনায়। মা মাসি দিদি বৌঠাকরুণ ঠানদিদি প্রভৃতি পারিবারিক সম্বোধনই আমাদের দেশে মেয়েদের সম্বন্ধে চলে এসেচে। সমাজ-ব্যবহারের যে-গণ্ডির মধ্যে এটা সুসঙ্গত ছিল তার সীমা এখন আমরা ছাড়িয়ে গেছি। আজকাল অনেকে মেয়েদের নামের সঙ্গে দেবী যোগ করাটাই ভদ্র সম্বোধন বলে গণ্য করেন। এটা নেহাৎ বাড়াবাড়ি। মা অথবা ভগিনীসূচক সম্বোধন গুজরাটে প্রচলিত, যেমন অনসূয়া বেন, কস্তুরী বাই। আমাদের পক্ষে আর্য্যা শব্দটা দেবীর চেয়ে ভালো, কিন্তু ওটা অনভ্যস্ত, অতএব প্রহসনের বাইরে চলবে না। দেবী শব্দটা যদিও প্রথামত উচ্চবর্ণেই প্রযুজ্য তবু নামের সহযোগে ওর ব্যবহার আমাদের কানে সয়ে গেছে। তাই মনে হয় তেমনি অভ্যস্ত শ্রীমতী শব্দটা নামের সঙ্গে জড়িয়ে ব্যবহার করলে কানে অদ্ভুত শোনাবেনা, যেমন শ্রীমতী সুনন্দা, শ্রীমতী শোভনা।

বিবাহিতা স্ত্রীর নামকে স্বামীর পরিচয়যুক্ত করা ভারতবর্ষে কোনো কালেই প্রচলিত ছিল না। আমাদের মেয়েদের নামের সঙ্গে তার পিতার বা স্বামীর পদবী জুড়লে প্রায়ই সেটা শ্রুতিকটু এবং অনেক স্থলেই হাস্যকর হয়। ইংরেজি নিয়মে মিসেস্ ভট্টাচার্য্য বললে তত দুঃখবোধ হয় না। কিন্তু মণিমালিনী সর্ব্বাধিকারী কানে সইয়ে নিতে অনেকদিন কঠোর সাধনার প্রয়োজন হয়। যে রকম আবহাওয়া পড়েচে তাতে য়ুরোপে বিবাহিত নারীর পদবী পরিবর্ত্তন বেশিদিন টিঁকবে বলে বোধ হয় না, তখন আবার তাড়াতাড়ি আমাদেরও সহধর্ম্মিণীদের নামের ছাঁট-কাট করতে যদি বসি তবে নিতান্ত নির্লজ্জ না হলে অন্তত কর্ণমূল লাল হয়ে উঠবে। একদা পাশ্চাত্য মহাদেশে মেয়েরা যখন নিজের নামস্বাতন্ত্র্য অবিকৃত

রাখা নিয়ে আস্ফালন করবে সেদিন যাতে আমাদের মেয়েরা গৌরব করতে পারে সেই সুযোগটুকু গায়ে পড়ে' নষ্ট করা কেন?

এসব আলোচনায় বিশেষ কিছু লাভ আছে বলে মনে হয় না। রুচির তর্কে প্রথাকে নিয়ন্ত্রিত করা যায় না। যে কারণে "বাধ্যতামূলক" "গঠনমূলক" প্রভৃতি বর্ব্বর শব্দ বাংলা অভিধানকে অধিকার করচে সেই কারণেই বাঙালীর বৈঠকে মধুমালতী মজুমদার বা বনজোৎস্না তলাপাত্রের প্রাদুর্ভাবকে নিরস্ত করা যাবে না, ইংরেজিতে প্রথার সঙ্গে যেমন তেমন করে জোড় মেলানোর ঝোঁক সামলানো দুঃসাধ্য।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ

শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ সেন রবীন্দ্রনাথকে একটি পত্র লেখেন। সেই পত্রের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ 'নামের পদবী' প্রবন্ধটি 'বিচিত্রায়' প্রকাশের জন্য পাঠাইয়া দিয়াছেন। সত্যভূষণ বাবুর লিখিত পত্রটিও আমরা পাঠকের অবগতির জন্য নিম্নে মুদ্রিত করিলাম।—বিঃ সঃ

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনি গতবার ইউরোপ যাইবার কিছুকাল পূর্ব্বে আমি নারীজাতির পদবী সংজ্ঞা সম্বন্ধে আলোচনার জন্য উৎসুক হইয়া আপনার নিকট একখানা পত্র লিখিয়াছিলাম, পত্রোত্তরে শ্রীযুক্ত অমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় আমাকে জানাইয়াছিলেন যে আপনি ইউরোপ হইয়া ফিরিয়া আসিলে এবিষয় আপনার নিকট উত্থাপিত করিলে ভাল হয়। আমি সেজন্যই এই চিঠিখানা লিখিতেছি।

নারীদের মধ্যে অনেকেই দেখিতেছি নিজ নিজ পদবীর পরিবর্ত্তে নামের শেষে "দেবী" লিখিতেছেন। ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যে "দাসী" শব্দ প্রচলিত ছিল; এখন তাঁহারাও অনেকেই "দেবী লিখিতেছেন। আমার জিজ্ঞাস্য এই যে পদবীর পরিবর্ত্তে এরূপ একটা সাধারণ শব্দের ব্যবহারের সার্থকতা কি? বরং নিজ নিজ পদবী লিখিলে সেই ব্যক্তি সম্বন্ধে পরিচয়েরও সুবিধা হয়। বিবাহের পরে নারীর পদবী পরিবর্ত্তন হইতে পারে—সেস্থলেও পরিবর্ত্তিত পদবী ব্যবহার করিলেই চলে।

কেহ কেহ "দেবী" না লিখিয়া নিজ নিজ পদবী লিখিয়া থাকেন। কিন্তু সে-সব স্থলে আর এক সমস্যা। নারীদের নামের পরে পদবীতে স্ত্রীপ্রত্যয় যোগ করা হয় যেমন গুপ্তা, সেন-গুপ্তা; কিন্তু সকল স্থলে হয় না, যেমন কেহ লেখেন না—সেনা, বা সেনানী; চক্রবর্ত্তিনী; ভট্টাচার্য্যা বা ভট্টাচার্য্যাণী। এই সমস্যার সমাধান কি? পদবীর সহিত স্ত্রীপ্রত্যয় যোগের যদি প্রয়োজন থাকে তবে সকল স্থলে সে প্রয়োজন গ্রাহ্য করা হয় না কেন।

পুরুষের বেলায় সম্বোধনে বা নামের উল্লেখে যেমন সুরেন বাবু, রমেশ বাবু ইত্যাদি ব্যবহার হয়—নারীদের নামের সহিত সেরূপ কোন্ শব্দ ব্যবহার হইতে পারে? দেবী শব্দ চলে না—যেমন—লীলা দেবী, কল্যাণী দেবী, রাণী দেবী?

অনেক ব্রাহ্মণ নিজ পদবীর পরিবর্ত্তে শুধু "শর্ম্মা" শব্দ ব্যবহার করেন, অনেকে নিজ পদবীর পরিবর্ত্তে কোন একটা উপাধি ব্যবহার করেন, যেমন—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ ইত্যাদি। এসব রীতি অন্যায় বা শিথিল নীতি বলিয়াই মনে হয়।

এ বিষয়ে আমি অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে ১৩৩৬ সালের বৈশাখ মাসের প্রবাসীতে "নারীর পদবী সংজ্ঞা" শীর্ষক প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছিলাম। এবিষয়ে আলোচনার জন্য বাংলাদেশের কয়েকজন বিশিষ্ট লোককে এবং দুই একজন মহিলাকেও ব্যক্তিগত ভাবে পত্র লিখিয়াছিলাম। প্রায় কাহারও নিকট হইতে সাড়া পাই নাই। একমাত্র অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় ১৩৩৬ সালের আষাঢ়ের প্রবাসীতে "নারী নামের পদ্ধতি" শীর্ষক প্রবন্ধে এই বিষয়ে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়াছেন।

এখন এবিষয়ে আপনার ব্যক্তিগত মতামত জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া এই পত্রখানা লিখিতেছি। পত্রখানার জবাব আপনার নিকট হইতে পাইলেই অত্যন্ত অনুগৃহীত হইব।

আপনি আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করিবেন। ইতি

শ্রীসত্যভূষণ সেন।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—শান্তিনিকেতন।

কবি ও ক্রিটিক

শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী

১

শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত কিছুদিন পূর্ব্বে রবীন্দ্র-পরিষদে রবীন্দ্রনাথের "কাব্য-বিচার" সম্বন্ধে একটি নাতিহ্রস্ব প্রবন্ধ পাঠ করেন। উক্ত প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের কাব্যের বিচার করা হয় নি; রবীন্দ্রনাথ কৃত অপরের কাব্যের বিচারের 'গুণাগুণ' বিচার করা হয়েছে। সংক্ষেপে, কবি-রবীন্দ্রনাথের বিচার করা হয় নি, করা হয়েছে ক্রিটিক-রবীন্দ্রনাথের।

প্রবন্ধলেখক মহাশয় এই বিচার সূত্রে দুটি মত প্রকাশ করেছেন, অর্থাৎ দুটি তর্কের প্রতিষ্ঠা করেছেন। এ কথা সকলেই জানেন যে জোর করে কেউ একটা কোন মত প্রকাশ করলেই তার পিঠ পিঠ তর্ক ওঠে—এ ক্ষেত্রেও উঠেছে। সুবোধবাবুর মতে

(১) সৃষ্টি করা আর বিচার করা, এ দু'টি সম্পূর্ণ বিভিন্ন শক্তি। যিনি শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন, তাঁর বিচার করবার শক্তি কম; আর যিনি বিচার করেন, তিনি প্রায়ই সৃষ্টি করতে পারেন না।

(২) রবীন্দ্রনাথ আদর্শবাদী (idealist), সুতরাং তিনি একমাত্র idealist সাহিত্যের মর্ম্ম গ্রহণ করতে পারেন, কিন্তু বস্তুতান্ত্রিক (realistic) সাহিত্য তিনি উপভোগ করতে পারেন না।

রবীন্দ্রনাথের কথা ছেড়ে দিলেও এ দুটি মত সকলে নির্ব্বিচারে যে শিরোধার্য্য করতে পারে না, সে কথা বলাই বাহুল্য। তাই রবীন্দ্র-পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত আমাদের পাঁচজনকে এই মতের বিচার করতে অনুরোধ করেছেন—আর তাঁর সে অনুরোধ আমি যথাসাধ্য রক্ষা করতে উদ্যত হয়েছি।

২

বড় কবি—ভাল ক্রিটিক হ'তে পারেন কি না,—এ তর্ক সব দেশে সব কালেই উঠেছে, এমন কি সেকেলে ভারতবর্ষেও উঠেছিল। আমি রাজশেখরের কাব্য-মীমাংসা থেকে গুটি কতক ছত্র উদ্ধৃত করে দিচ্ছি—তার থেকেই দেখতে পাবেন —যে তর্কটা পুরোনো। আলঙ্কারিকদের মতে—"সা চ দ্বিধা, কারয়িত্রী ভাবয়িত্রী চ। কবেরুপকুর্ব্বাণা কারয়িত্রী। ভাবকস্যোপকুর্ব্বাণা ভাবয়িত্রী। সা হি কবেঃ শ্রমমভিপ্রায়ং চ ভাবয়তি। তয়া খলু ফলিতঃ কবের্ব্যাপারতরুরন্যথা সোঽবকেশী স্যাৎ।

অস্যার্থ

"প্রতিভা দু-রকম,—এক সৃষ্টি-শক্তি আর এক বিচার-শক্তি। এই বিচারশক্তি কবির শ্রম ও অভিপ্রায়ের ভাবনা করে। এবং তারই দ্বারা কবির ব্যাপার-তরু সফল হয়, অন্যথা তা নিষ্ফল হয়।" অর্থাৎ গ্রহণ করবার শক্তি যদি আমাদের না থাকে ত কবির দান বৃথা। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা যে কারয়িত্রী সে বিষয়ে ত সন্দেহ নেই; কিন্তু আমাদের অর্থাৎ স্কুলে-পড়া বাঙালীদের প্রতিভা ভাবয়িত্রী কি-না সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে। এখন প্রস্তুত বিষয়ে আলঙ্কারিকদের কথা শোনা যাক্।

"কঃ পুনরনয়োর্ভেদো যত কবির্ভাবয়তি ভাবকশ্চ কবি। আচার্য্য তদাহুঃ—

প্রতিভা তারতম্যেন প্রতিষ্ঠা ভুবি ভূরিধা।
ভাবকস্তঃ কবিপ্রায়ো ন ভজত্যধমাং দশাম্॥

অস্যার্থ :—

আচ্ছা এ দুয়ের প্রভেদ কি, কারণ কবিও ভাবক আর ভাবকও কবি। পূর্ব্বাচার্য্যদের মত এই। তাই তাঁরা বলেছেন—

তারতম্য অনুসারে পৃথিবীতে প্রতিভার বহুবিধ প্রতিষ্ঠা।
ভাবকও প্রায়কবি, অতএব সে অধমদশা প্রাপ্ত হয় না।

আলঙ্কারিকরা আসলে ভাবক অর্থাৎ ক্রিটিক সুতরাং তাঁরা যে ক্রিটিকদের প্রায় কবি বলবেন, এ ত ধরা কথা।

এখন সেকেলে কবির কথা শোনা যাক

"ন ইতি কালিদাসঃ। পৃথগেব হি
কবিত্বাদ্ভাবকত্বং ভাবকত্বাচ্চ কবিত্ব। স্বরূপ ভেদাদ্বিষয়ভেদাচ্চ।
যদাহুঃ

কশ্চিদ্বাচং রচয়িতুমলং শ্রোতুমেবাপরস্তাং
কল্যাণী তে মতিরুভয়থা বিস্ময়ং নস্তনোতি।
নহ্যেকস্মিন্নতিশয়বতাং সন্নিপাতো গুণানা
মেকঃ সূতে কনকমুপলস্তৎপরীক্ষাক্ষমোঽন্যঃ॥

অস্যার্থঃ—

কালিদাস বলেন 'না'। কবিত্ব পৃথক আর ভাবকত্ব পৃথক। স্বরূপভেদ ও বিষয়ভেদের দরুণ। যেমন বলা হয়েছে "কেউ অমল বাক্য রচনা করতে পারে—অপরে তা শুনতে পারে। হে কল্যাণী, তোমার এই উভয়মতি আমাদের বিস্ময়াবিষ্ট করছে। এক ব্যক্তিতে নানা অতিশয় গুণের সন্নিপাত হয় না। একই পাত্রে কনক ও রত্ন গ্রথিত হয়, কিন্তু কোনটি কি তার পরীক্ষাক্ষম অপরে। কালিদাস এ কথা কোথায় বলেছেন জানিনে বোধ হয় কোন কল্যাণীকে Compliment হিসেবে।

সে যাই হোক কবিত্ব ও ভাবকত্ব এক দেহে থাকতে পারে কি না এ আলোচনা সেকালেও করা হয়েছে এবং তার ফলে দাঁড়িয়েছে এই যে ক্রিটিকরা বলেন তাঁরা প্রায়-কবি আর কালিদাস বলেছেন যে কাব্য সৃষ্টি ও বিচার-শক্তি এক জিনিষ নয়। দুটি কথাই সত্য। যাঁর অন্তরে কবিত্ব রস নেই তিনি কাব্যরসিক হতে পারেন না, অপর পক্ষে সৃষ্টিশক্তি ও বিচার-শক্তির একত্র সন্নিপাত হতে পারে কি না তার খোঁজ করতে হবে ইতিহাসের ক্ষেত্রে; ফিলজফির ক্ষেত্রে নয়। একাধারে ও দুই গুণের সন্নিপাত হ'তে পারে কি না, এ প্রশ্নের উত্তর দর্শন দিতে পারবে না, এমন কি Psychologyও নয়, কিন্তু পূর্ব্বে কখনও হয়েছে কি না—সে খোঁজ ইতিহাসের কাছে পাওয়া যাবে। ইউরোপে গেটে Coleridge, Mathew Arnold, Swinburneসকলেই শ্রেষ্ঠ কবি ও শ্রেষ্ঠ Critic বলেই গণ্য সুতরাং রবীন্দ্রনাথ বড় কবি বলে যে কাঁচা ক্রিটিক হতে বাধ্য, এ কথা বিচার-সহ নয়।

৪

সমালোচক মহাশয় যে দ্বিতীয় আলোচনায়, আমাদের যোগ দিতে বাধ্য করছেন—সে আলোচ্য বিষয়ের যথার্থ নাম হচ্ছে কাব্য জিজ্ঞাসা। কারণ কাব্য বস্তু যে কি, সেইটে ধরতে পারলে—আমরা idealistic কাব্যের সঙ্গে realistic প্রভেদ যে কোথায় ও কি গুণে, তার মর্ম্ম উদ্ঘাটন করতে পারব; অবশ্য এ দুয়ের যদি কোন প্রভেদ থাকে।

বলাবাহুল্য যে কাব্য জিজ্ঞাসা হচ্ছে পুরোপুরি দার্শনিক জিজ্ঞাসা। তাই এ জিজ্ঞাসার যাঁরা জগৎ বিখ্যাত মীমাংসক, তাঁরা সকলেই বড় দার্শনিক, যেমন প্রাচীন গ্রীসে আরিষ্টটেল, নবীন ইউরোপে হেগেল আর বর্ত্তমান ইউরোপে Croce। এঁদের কারও কথা আমরা উপেক্ষা করতে পারি নে, অপর পক্ষে কারও কথা আমরা বেদবাক্য বলে গ্রাহ্য করতে পারিনে।

অপর পক্ষে ভারতবর্ষেও যে সব নব্য আলঙ্কারিকরা এ প্রশ্ন তুলেছিলেন তাঁরাও ছিলেন পুরোদস্তুর নৈয়ায়িক। কিন্তু অদ্যাবধি কেউই এ সমস্যার চূড়ান্ত মীমাংসা করতে পারেন নি। কারণ মানুষের মন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে না। সুতরাং এক যুগের দর্শন আর এক যুগে লোকের মনে একছত্র প্রভুত্ব করতে পারে না। নূতন অবস্থায় আমরা অনেক বিষয়েই নূতন মীমাংসা চাই, অথবা পুরোণো মত নতুন ভাষায় ব্যক্ত করতে চাই।

ভবিষ্যতেও মানুষের মনে ফিরে ফিরতি এ জিজ্ঞাসার উদয় হবে—যেমন আজ আমাদের হয়েছে। যে মুহূর্ত্তে একটি নব-মীমাংসা পরিচ্ছিন্নরূপ ধারণ করে, তখনই মনে আবার নব-জিজ্ঞাসার উদয় হয়; কারণ তখনই তার ভুলচুক ত্রুটি সব ধরা পড়ে। অথচ যুগে যুগে আমাদের নব মীমাংসা চাইই চাই, কারণ এক একটা মীমাংসা হচ্ছে মানুষের চির-জিজ্ঞাসার এক একটা বিশ্রাম-স্থল। চিন্তা জগতেও খালি দৌড়ানো চলে না, মধ্যে মধ্যে হাঁফ জিড়তে হয়।

যিনি এ তর্ক তুলেছেন তিনি অবশ্য এ প্রশ্নের একটা উত্তর খুঁজে পেয়েছেন বিলেতি নাটককার Barnard Shawর কাছে।

সংক্ষেপে Shaw সাহেবের মত হচ্ছে এই যে, যে-কথা সমাজ-সংস্কারের কাজে লাগে তাই হচ্ছে সাহিত্য। অবশ্য সমাজ-সংস্কার কথাটা আমরা যে অর্থে বুঝি তাঁর কাম্য সমাজ-সংস্কারের সে অর্থ নয়। তিনি চান সমাজকে ঢেলে সাজতে, কারণ বর্ত্তমান অবস্থায় অসংখ্য লোকের দুঃখের আর অন্ত নেই। এ যে অতি মহৎ মনোভাব তার আর সন্দেহ নেই। আর তিনি যে নাটক লিখেছেন তার একমাত্র উদ্দেশ্য বর্ত্তমান সমাজ ব্যবস্থা যে ঘোর অব্যবস্থা সেই বিষয়ে দেশের লোককে সচেতন করা। সুতরাং Shaw সাহেবের মতে, তথাকথিত সাহিত্যের যা কিছু মূল্য আছে তা এই সমাজ সংস্কারের জোগাড়ী কাগজ হিসেবে। তবে মানুষের social consciousness কাব্য-রসের উৎস কি না এ প্রশ্ন হচ্ছে পুরো দার্শনিক প্রশ্ন। এ প্রশ্ন তাঁর মনে কখনো উদয় হয়নি, কারণ Shaw দার্শনিক নন্। ফলে তিনি idealistic কাব্য ও realistic কাব্য উভয়েই কাব্য কি না, আর যদি তা না হয় এ দুটির ভিতর কোনটি কাব্য আর কোনটি অকাব্য—সে বিষয়ে কিছু বলেন নি। এমন কি reality কথাটিরই বা মানে কি ও ideality কথাটিরই বা মানে কি, তার কোনই ব্যাখ্যা দেন নি। বলা বাহুল্য এ দু'টি কথাই দর্শন থেকে সাহিত্যে আমদানী করা হয়েছে। আর এ দু'টি কথার বিরোধের যে দিন চূড়ান্ত মীমাংসা পাওয়া যাবে সেদিন দর্শনের আদালত বন্ধ হবে। কারণ আজও দেখা যায় যে, যাঁরা এর একটি না-আরেকটির ঠিক মানে জানেন, দর্শন জিনিষটে তাঁদের কাছে হাস্যাস্পদ। পূর্ণপ্রজ্ঞ লোকের মতে সন্দেহটা মনের দুর্ব্বলতা।

এই সুযোগে আমি একটি বড় দার্শনিকের মতামতের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতে চাই। Bergson কবি কি দার্শনিক, এ বিষয়ে দার্শনিক-মহলে অনেক মতভেদ আছে। সত্যকথা এই যে তিনি একাধারে দার্শনিক ও কবি। সুতরাং কাব্য-জিজ্ঞাসার তাঁর কৃত মীমাংসা আমরা উড়িয়ে দিতে পারিনে। কবি-দার্শনিকের মত সম্ভবতঃ সত্যের কাছ ঘেঁসে যাবে।

৬

উপরন্তু, Bergson আর্ট সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করেছেন —সে মতই আমি স্বচ্ছন্দচিত্তে গ্রহণ করতে পারি। মনো-জগতে elective affinity বলে একটা জিনিষ আছে। তাই সংক্ষেপে Bergsonএর মতের পরিচয় দিচ্ছি। সকলেই দেখতে পাবেন যে, এ মত Shawর মতের ঠিক উল্টো। Shawর মন ব্যবহারিক গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ। আর Bergson আবিষ্কার করেছেন যে, মানুষের ব্যবহারিক মন কাব্যের জন্মভূমি নয়।

Bergson-এর মতে প্রকৃতিসুন্দরী পরদানশীন। তাই অধিকাংশ লোক তাঁর প্রকৃতরূপ দেখ্‌তে পায় না। যিনি তা দেখতে পান, আর আমাদের তা দেখাতে পারেন, তিনিই হচ্ছেন আর্টিষ্ট।

এ পরদা শুধু বাহ্যপ্রকৃতিকে নয় আমাদের অন্তর প্রকৃতিকেও ঢেকে রাখে আমাদের কাছ থেকে।

এখন জিজ্ঞাস্য হচ্ছে এ পরদা বুনলে কে? Bergson বলেন মানুষের কর্ম্মবুদ্ধি। তাঁর মতে জীবনের মূলে আছে কর্ম্মবাসনা। সুতরাং আমাদের ব্যবহারিক মনের সকল চিন্তা হচ্ছে কর্ম্মচিন্তা। কাজেই প্রকৃতির যে অংশকে আমরা জীবনযাত্রার কাজে খাটাতে পারি নে, সে অংশ মানুষের মনের আবডালেই পড়ে থাকে। আর আমরা যাকে সত্য ও সুন্দর বলি, তার সাক্ষাৎ অধিকাংশ লোকে চায় না বলে পায় না। আর আমরা যাকে শিব বলি, সে জিনিষ মানুষের এই ব্যবহারিক ও সামাজিক মনেরই সৃষ্টি।

যদি মানুষ মাত্রেই আর্টিষ্ট হত, অর্থাৎ প্রকৃতির সঙ্গে তাদের সকলেরই যদি সাক্ষাৎ পরিচয় থাকত, তাহলে লোকযাত্রা বিনষ্ট হত, কারণ কর্ম্মবুদ্ধি বাদ দিয়ে জীবনযাত্রা রক্ষা করা চলে না। Bergson-এর মতে—কর্ম্মবুদ্ধির অভাবে মানুষ বাঁচে না, কিন্তু ও বুদ্ধি সত্য সুন্দরের নাগাল পায় না।

৭

মানুষ একমাত্র জীবনধারণ করেই তার অন্তরের সকল প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করতে পারে না। সত্য ও সুন্দরের সঙ্গে পরিচিত হবার আকাঙ্ক্ষা মানুষ মাত্রেরই আছে। এক কথায় মানুষের পুরোমন, তার ব্যবহারিক মনের অতিরিক্ত। আমাদের দেশের সেকেলে দার্শনিকরাও আত্মাকে নিষ্ক্রিয়ই বলে গিয়েছেন।

এখন, এমন লোকও পৃথিবীতে জন্মায় যাদের মন স্বভাবতই বিষয়ে নির্লিপ্ত—আর তাদের মনের যে অংশ বিষয়-বাসনা-মুক্ত সেই অংশে তাদের মন প্রকৃতির সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যুক্ত, আর এই জাতীয় লোকরাই আর্টিষ্ট। আর এই সহজ যোগের নামই intuition।

একমাত্র social conciousness-এর বশবর্তী হয়ে মানুষে বিরাট কর্ম্মবীর হতে পারে কিন্তু কবি হতে পারে না। কারণ কবি আসলে জীবন্মুক্ত। কবির মন কোন বিশেষ সাংসারিক প্রয়োজনের অধীন নয় বলেই সে মন ব্যবহারিক মনের হাতেবোনা পরদার বাধামুক্ত। মানুষের ব্যবহারিক মন যে তার সত্যজ্ঞান ও সৌন্দর্য্য জ্ঞানের অন্তরায়, এই হচ্ছে Bergson-এর দর্শনের মূল কথা।

Bergson-এর দর্শন কবির কি দর্শন, এবিষয়ে দর্শন-ব্যবসায়ীদের মতভেদ থাকতে পারে কিন্তু আর্টিষ্টের মন যে সহজেই নির্লিপ্ত—সে বিষয়ে আমার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এই কারণে Shawর কাব্য-মীমাংসা আমার কাছে একেবারেই অগ্রাহ্য যদিও আমি তাঁর গুণ-ভক্ত। রবীন্দ্রনাথের কাব্য যদি Shawর কাব্য-মীমাংসার অন্তর্গত না হয়, তার কারণ Shawর জিজ্ঞাসা কাব্য জিজ্ঞাসা নয়, কর্ম্ম-জিজ্ঞাসা।

তবে সে কাব্য idealistic কি realistic এখন তাই বিবেচ্য। এ জাতিভেদ আমাদের অলঙ্কার-শাস্ত্রে নেই। এমন কি আমাদের ভাষায় ও দুটি শব্দের অনুবাদও করা যায় না। কিন্তু ইউরোপে যে ওদুটি কথা নিয়ে সাহিত্যক্ষেত্রে নিত্য মারামারি চলে তা কে না জানে? কাব্যজগতে এ কলহ একরকম শাক্ত-বৈষ্ণবের ঝগড়া।

৮

আর্ট বিচার করতে বসে Bergson এ দুটি চলতি কথাকে উপেক্ষা করতে পারেন নি, কারণ তিনিও ইউরোপের লোক।

প্রথমেই সন্দেহ হয় যে,—আর্টের ক্ষেত্রে, idealism ও realism কথা দুটির কি কোনও মানে আছে? Bergson বলেন নেই। আর্টের উদ্দেশ্যই হচ্ছে realityর সঙ্গে আমাদের মনের পরিচয় করিয়ে দেওয়া। কিন্তু যার দৃষ্টি বিষয়-কামনায় অন্ধ, সে অবশ্য একথা মানবে না।

আর্টিষ্টের দৃষ্টিতে জীবন অনেকটা immaterial, ভাষান্তরে মায়াময়, অথবা ছায়াময় রূপেই দেখা দেয়। এই বিশেষ দৃষ্টিরই নাম idealism। সুতরাং আর্ট realistic হতে পারে কিন্তু আর্টিষ্টের মন চিরকালই idealistic। সংক্ষেপে idealism-এর প্রসাদেই মানব-মন realityর সাক্ষাৎ পায়। বলাবাহুল্য যে এ reality মানুষের ব্যবহারিক বুদ্ধিজাত কাজ-চালানো reality নয়। Bergson-এর মতের এর চাইতে স্পষ্ট ব্যাখ্যা করতে হলে, সমগ্র Bergson-দর্শনের বিস্তৃত ভাষ্য লিখতে হয়। এ প্রবন্ধে তার অবসর নেই।

এদেশে idealism কথাটা বোধ হয় বাহ্যজ্ঞানশূন্যতা অর্থে ব্যবহৃত হয়। কবিরা যে বাহ্যজ্ঞানশূন্য—এ কথা সেকালের লোকও বলত। তার উত্তরে আলঙ্কারিকরা বলেছেন—"সুপ্তস্যাপি মহাকবেঃ শব্দার্থৌ সরস্বতী দর্শয়তি তদিতরস্য তত্র জাগ্রতোহপ্যন্ধং চক্ষুঃ। মতিদর্পণে কবীনাং বিশ্বং প্রতিফলতি।

অস্যার্থ—"কবি সুপ্ত হলেও, তাকে শব্দার্থ স্বয়ং সরস্বতীই দেখিয়ে দেন। অপরে জাগ্রত হলেও অন্ধ। কারণ কবিদের মতিদর্পনে বিশ্ব প্রতিফলিত হয়।

কথাটা কি Bergsonian নয়?

আর একটি কথা বলেই এ প্রবন্ধ শেষ করব। Bergson-এর মতে প্রবুদ্ধ Social conciousness হতে—সমাজের মহা উপকারী একজাতীয় সাহিত্য জন্মলাভ করে—সে সাহিত্যের নাম প্রহসন। Bergson বলেন, জড়ত্বের দিকে জীবনের একটি সহজ প্রবণতা আছে। আর জড়ধর্ম্মী অর্থাৎ mechanical ব্যক্তি ও সমাজ একরকম জীবন্মৃত। তবে বুদ্ধি ও চরিত্রের জড়তার মারাত্মক শত্রু হচ্ছে "হাসি"। হাসি হচ্ছে জড়তার বিরুদ্ধে চির-প্রতিবাদ। আর যে সাহিত্য মানুষকে হাসাতে পারে তারই নাম হচ্ছে প্রহসন। Shaw এই হিসেবেই একজন বড় সাহিত্যিক—কারণ তিনি অদ্যাবধি যা লিখেছেন তা সবই উঁচুদরের প্রহসন।

সত্যাসত্য

শ্রীযুক্ত লীলাময় রায়

৫৬

সুধীদার অভিযোগ বাদলের আচরণে দাগ রেখে গেল না, কিন্তু মনের ভিতর বিঁধে রইল। রাত্রে যখন সামাজিকতার উৎসাহ ও মোহ মিইয়ে আসে তখন শুয়ে শুয়ে বাদল সুধীদার কথাগুলোকে ভিতর থেকে উপরে তুলে রোমন্থন করে। দিনের বাদল ও রাত্রের বাদল যেন দু'জন মানুষ। রাত্রে বাদল একলাটি বিছানায় প'ড়ে বেশ একটু ভূতের ভয় পায়, পুরু কম্বলের তলায় মুখ গুঁজে গরম জলের চামড়া-বোতলটাকে কাঁকড়ার মতো আঁকড়ে ধরে, হাঁটু দুটোকে ক্রমে ক্রমে মাথার কাছে এনে কুকুর-কুণ্ডলী পাকায়।

রাত্রের বাদল ভারি অসহায়, বড় দুর্বল। থেকে থেকে তার পা কন কন করে, সর্দিতে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। এ সবের প্রতিক্রিয়া তার মনের উপর হয়। সে হঠাৎ খুব অনুতাপ-প্রবণ হয়ে ওঠে, দিনটা যে একেবারে নষ্ট গেছে এ বিষয়ে তার সন্দেহ থাকে না, জীবনটা মোটের উপর ব্যর্থ যাচ্ছে। এই রকম সময় সুধীদার উক্তির দাম বেড়ে যায়। সুধীদা স্বর্ণমৃগের পিছনে ছুটে আয়ু ক্ষয় করছে না, একটা লক্ষ্য স্থির ক'রে নিয়েছে, হোক না কেন স্থিতিশীল লক্ষ্য। বাদলের লক্ষ্য দিন দিন বদলাচ্ছে, দিন দিন সরে যাচ্ছে। এত ছুটাছুটি ক'রেও তো বাদলের প্রত্যয় হচ্ছে না যে বাদল কিছুমাত্র এগুচ্ছে।

বাদলের বয়সের ইংরেজ যুবক ঐ কলিন্স, কী নিখুঁৎ স্বাস্থ্য তার, কী উদ্দাম হাস্ত, কী গম্ভীর অর্গ্যান-কণ্ঠস্বর। ধরাকে সরা জ্ঞান করে, অথচ এতটুকুও অহংকার নেই তার মনে, এতটুকু হিংসা দ্বেষ পরশ্রীকাতরতা নেই তার স্বভাবে। বাদল যখন কলিন্সের বগলে হাত পুরে দিয়ে রাস্তায় চলে তখন তার এমন লজ্জা করে। সেই যে গল্পে আছে দৈত্যের সঙ্গে বামনের বন্ধুতা। কলিন্সের প্রাণোচ্ছলতার নিত্য নূতন নিদর্শন বাদলকে ঈর্ষান্বিত করে কিন্তু অক্ষমের ঈর্ষা তার অক্ষমতাই বৃদ্ধি করে। পাল্লা দিয়ে তার সঙ্গে গল্‌ফ্ খেলতে গেছ্‌ল। হাস্তাস্পদ হয়ে ফিরেছে, অবশ্য নিজের চোখে। কলিন্স তার পিঠ চাপ্‌ড়ে দিয়ে বলেছে, "হবে, হবে, অভ্যাসে কী না হয়?" এই ব'লে নিছক প্রাণোল্লাসে মুখ দিয়ে ভুর্‌র ভুর্‌র আওয়াজ করেছে। তার পরে পেট ভরে খেয়েছে ও খেয়ে উঠে বিলিয়ার্ড খেলেছে। বাদলের খাওয়া দেখে চোখের কোণে দুষ্টু হাসি হেসেছে—একটা পাখীর খাওয়া।

এই যে ইংরেজ এর মতো ইংরেজ হতে পারবে কি? এরই মতো প্রাণ-প্রস্রবণ? এমনি প্রাণপূর্ণ, অথচ মৃত্যুভয়শূন্য? একদিন কলিন্স বলেছিল, "যুদ্ধ? আবার বাধুক না? ভয় কী? সেই সুযোগে এরোপ্লেন চালানোটা শিখে নেওয়া যাবে। দেশও দেখা হয়ে যাবে বিস্তর।" বাদল বলেছিল, "মরণ ঘটবে না?" কলিন্স ভীষণ হল্লা করেছিল। বলেছিল, "রাস্তায় চল্‌তে চল্‌তে মোটর চাপা প'ড়ে ও বাড়ীতে ব'সে হার্ট ফেল হয়ে যত লোক মরে যুদ্ধে তার চাইতে এমন কী বেশী লোক মরে? যদি মরেই, তাতে কী? তুমি কি ভাবছ মরাতে কেবলি দুঃখ, মজা একেবারেই নেই?"

এর মতো ইংরেজ না হতে পারে যদি, তবে বৃথা এ সাধনা। সুধীদার সাধনায় সিদ্ধি হবে, আরো কত যুবকের সাধনায় সিদ্ধি হবে। সকলে এগিয়ে যাবে নিজ নিজ নির্ব্বাচিত পথে, বাদলকে ধাক্কা দিয়ে কত টম্ ডিক্ হ্যারী এগিয়ে যাবে বাদলের নির্ব্বাচিত পথে। ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ ক'রে কলিন্স যে start পেয়ে গেছে সেটা

কেবল তার মগজে নয়, তার স্বাস্থ্যে তার শৌর্য্যে তার জীবনীশক্তিতে। বাদলের মতো সে রাত ভোর ক'রে দেয় না ভাবনায়। ভাবে সে অতি অল্প সময়। তবু তার ভাবনাটুকু পাকা, কারণ সে ভাবনা বাদলের ভাবনার মতো দুর্ব্বল দেহ এবং ক্ষীণ জীবনীশক্তির ফল নয়, রুগ্না জননীর সন্তান নয়, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভারতীয় প্রকৃতির দ্বারা প্রভাবিত নয়। বিশুদ্ধ মননক্রিয়া ভারতবর্ষে নেই, মনের জমিতে চাষ্ করতে গেলে হাজার আগাছার সঙ্গে আপোষ করতে হয়, সেখানে সাহিত্য-সমালোচনার মধ্যে সমাজের স্বার্থ ঢোকে, সৌন্দর্য্য-বিচারের ভিতর মঙ্গলামঙ্গল বিবেচনা। সুধীদা বিজ্ঞের মতো ইন্‌টুইশনের মার্গ অবলম্বন করেছে, সে-সম্বন্ধে ইউরোপে কোনো অথরিটি নেই, কাজেই একদিন ইউরোপের লোক সুধীদাকে অথরিটি ব'লে স্বীকার ও সম্মান করবে। আর বাদলকে বল্‌বে, হাঁ ইন্টেলেক-চুয়ালদের সমাজে পাত্তা পাবার যোগ্য বটে, কিন্তু আপ্-টু-ডেট্ থাক্‌বার জন্যে প্রাণপাত করেছে, তাই জগৎকে দেবার মতো প্রাণ অবশিষ্ট নেই। পাল্লা দিয়ে সঙ্গ রাখ্‌বার জন্যে যৎপরোনাস্তি করেছে, তাই চিন্তানায়ক হবার ক্ষমতা খুইয়েছে।

হায়, হায়, সেও যদি start পেয়ে থাকৃত, সে যদি ইংরেজ হয়ে জন্মগ্রহণ ক'রে থাক্‌ত, তবে তার সঙ্গে পেরে উঠ্‌ত কোন ধৃষ্ট? তাকে চেষ্টা ক'রে ইংরেজী শিখ্‌তে হতো না, বাংলার বদলে শিখ্‌ত ফরাসী, সংস্কৃতের বদলে ল্যাটিন্। পারিবারিক জীবনে পেতো বৈজ্ঞানিক মনোভাব, ইস্কুলেও বিজ্ঞানচর্চ্চা করবার সুযোগ পেতো। কলেজে ইউরোপের ভাবী ইন্‌টেলেক্‌চুয়ালদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে জেনে রাখ্‌ত কাদের সঙ্গে তার জীবনব্যাপী প্রতিযোগিতা; এবং তাদের শক্তিরও পরিমাপ ক'রে রাখ্‌ত। ভারতীয় ছেলেদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামাটাই বোকামি, ওদের দৌড় চাক্‌রির ও বিয়ের বাজার অবধি। ওদের মধ্যে প্রথম হতে চাওয়াটা রীতিমতো misleading—তাতে ক'রে শক্তির চালনা হয় ভুল দিকে। তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য-পুস্তকগুলো বাদলের প্রয়োজনের পক্ষে অবান্তর, সুতরাং বাদলের অপাঠ্য। হায়, হায়, কী মহামূল্য চারটি বৎসর সে কলেজে নষ্ট করেছে! ইস্কুলে যা নষ্ট করেছে তার জন্যে অনুতাপ করা মিথ্যা, কেননা তখন তার জ্ঞান ছিল না সে জীবনে কী চায়, কোনখানে তার বৈশিষ্ট্য। কিন্তু কলেজে ঢুকতে তার অন্তর সায় দেয়নি, নেহাৎ তার বাবা তাকে বিলেত পাঠাতে প্রস্তুত ছিলেন না বলে চারটি বছর একটা পিঁজরাপোলে অপব্যয় কর্‌তে হলো। সুধীদা বুদ্ধিমান, ম্যাট্রিকের পর দু'বছর পায়ে হেঁটে ভারতবর্ষ বেড়িয়েছে, নন্‌কোঅপারেশনের কল্যাণে খদ্দরের ভেক ধারণ ক'রে সুধীদা যেখানেই যায় সেখানকার কংগ্রেসওয়ালাদের দলে ভিড়ে যায়, 'স্বরাজ-আশ্রমে' খায়। তারপর একদিন বাদলের সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে বাদলের আহ্বান উপেক্ষা কর্‌তে পার্‌ল না। কলেজে ভর্ত্তি হয়ে বাদলের সঙ্গী হলো বটে, কিন্তু পড়াশুনায় সেইটুকু মনোযোগ কর্‌ল যেটুকু থার্ড ডিভিসনের পক্ষে আবশ্যক। দিনের পর দিন সুধীদা ক্লাস পালিয়ে গঙ্গার ধারে শুয়ে নৌকার গুণটানা নিরীক্ষণ করেছে। ভারতবর্ষের আকাশে নানা আকারের নানা আকৃতির ও নানা বর্ণের মেঘ অভিনয়ের আসর জমায়। তাদের সেই প্রাত্যহিক আসরে সুধীদা কখনো অনুপস্থিত থাকে নি। প্রতিবেশীর যোগে শোকে তথা শুভকর্ম্মে সুধীদাকে সমান ব্যস্ত থাক্‌তে দেখা গেছে। সুধীদা বুদ্ধিমান, বাদলের মতো দ্বিধায় আন্দোলিত উৎসাহে উদ্বেলিত অবসাদে অবনত হতে হতে জীবন-প্রবাহের অপচয় করেনি। তীরের মত এক লক্ষ্যের অভিমুখীন হয়েছে।

৫৭

দিনের বাদল লাফ দিয়ে বিছানার থেকে উঠে এলার্ম দেওয়া টাইমপীস্‌টার ঘ্যানঘ্যানানি থামিয়ে দেয়। ভাবে, ঘুমিয়ে কোনো দিন তৃপ্তি আমার জীবনে আস্‌বে না, তৃপ্তিকে বাদ দিয়ে জীবন যাপনের জন্যে প্রস্তুত হতে হবে।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে মুখ হাত ধোয়া হয়ে যায়। পোষাক পরে নিতে হয় সারা দিনের মতো। এক রাশ নেকটাই-এর থেকে একটা বেছে নিতে হবে, প্রতিদিন ঐ একই সমস্যা, কোনটা ছেড়ে কোনটা নিই। সকাল বেলার এই যে পরীক্ষা এই তো সারা দিনের পরীক্ষার অগ্রদূত। কোনটা

ছেড়ে কোনটা ভাবি, কোনটা ছেড়ে কোনটা বলি, কোনটা ছেড়ে কোনটা করি। ক্যালেণ্ডারের দিকে চেয়ে ভাবে, সতেরোই ফেব্রুয়ারী ১৯২৮ জগতের ইতিহাসে মাত্র একটিবার এসেছে লক্ষ লক্ষ বৎসর পরে, মাত্র একটি দিনের জন্মে। আজ রাত্রি বারোটার পর থেকে আর এর নাগাল পাওয়া যাবে না, মাথা খুঁড়ে মরে গেলেও না। এই দিনটিকে কী-ভাবে-কাটানো ছেড়ে কী-ভাবে কাটাতে হবে সেই হচ্ছে আজকের ধাঁধা।

ধাঁধার জবাব ধাঁ করে দেওয়া যায় না, কিন্তু ধাঁ করে একটা টাই টেনে নিয়ে পোষাকের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে বেখাপ। ওটাকে ছুঁড়ে ফেলে আরেকটা নিয়ে কতক সন্তোষ পায়। এ ছাড়া উপায় নেই, এর নাম trial and error-এর মার্গ, এই মার্গ বাদলের। সুধীদার চলা বাঁধা রাস্তায়, তাকে ভাবতে হয় না। কিন্তু বাদলের চলা একশোটা পথ থেকে বেছে একটাতে। সে যতই এগোয় ততই দেখে তার সামনে একশোটা পথ একশো দিকে চলে গেছে। একবার এটাতে একবার ওটাতে কিছুদূর চলে। মনঃপূত হয় না। ফিরে এসে তৃতীয় একটা পথ নেয়। এটাতেতে কতক সন্তোষ পায়। কিন্তু বেশ খানিকটা গিয়ে দেখে যে এই পথেরও একশো শাখা। আবার সেই trial সেই error এবং অবশেষে সেই আপাত-সত্য। সুধীদার এ বালাই নেই। সুধীদার সামনে মাত্র একটি পাকা সড়ক, পাড়াগাঁয়ের সদর রাস্তা, ঐ রাস্তা ধরে একটা অন্ধও অক্লেশে আর একটা অন্ধকে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারে। সুধীদা গেঁয়ো, বাদল শহুরে।

একথা মনে হতেই সুধীদার প্রতি বাদলের করুণা সঞ্চার হলো। সে আর একবার চুলে ব্রাশ বুলিয়ে দিয়ে টাইটা-তে দুই টান মেরে তর তর করে নীচে নেমে গেল। মিসেস উইলস্ নিশ্চয়ই অনেকক্ষণ তার অপেক্ষায় আছেন। মিষ্টার তো খুব সকাল সকাল খাওয়া শেষ ক'রে বিদায় হ'ন। ডেলি প্যাসেঞ্জার কিনা, যেতে হয় সেই কোন মুলুকে—ঈষ্ট্ এণ্ডে।

বাদলকে দেখে মিসেস্ উইলস্ বল্লেন, "আজ কে একজন তোমাকে ফোনে খুঁজছিল, বার্ট।"

বাদল খপ করে তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বল্ল, "কে, কলিন্স্?"

মিসেস্ উইলস্ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ব্যঙ্গের ঢঙে বল্লেন, "হবে। বলেছে আজ সন্ধ্যাবেলা ওর সঙ্গে খেয়ে থিয়েটারে যেতে। যাচ্ছো, কেমন?"

বাদল বল্ল, "যাওয়া তো উচিত। ওকে আগে থাক্তে কথা দিয়ে রেখেছি যে যেদিন ওর সুবিধা হবে সেদিন এক সঙ্গে থিয়েটারে যাওয়া যাবে।"

"বেশ, বেশ। মিষ্টার উইল্‌সকেও তুমি হার মানালে। তিনি তো সাতটায় ফেরেন, তুমি কিছুদিন থেকে ফিরছ বারোটায়।"

বাদল আফশোষ জানিয়ে বল্ল, "কী করি মিসেস্ উইলস্। ওয়াই-এম্ সি-এতে হপ্তায় দিন ত্রয়েক না গেলে চলে না, একটু গান বাজনা হয়, বহু লোকের সঙ্গে আলাপ। Rationalist Press Association এর বুড়োদের সঙ্গেও একদিন ভাব কর্‌তে যাই। King's College এ একটা লেকচার নিচ্ছি। এ ছাড়া বন্ধুদের প্রায়ই সোহো অঞ্চলে খাওয়াতে নিয়ে যেতে হয়।"

মিসেস্ উইলস্ স্লেষের সুরে বল্লেন, "তা হলে সোহোর কাছে বাসা কর্‌লে হয়। বারোটা রাত্রে গৃহস্থবাড়ীতে কে তোমার জন্যে জেগে থাক্‌বে বলো? গরম কোকো না খেলে তোমার ঘুম আসে না ব'লে কে অত রাত্রে উনুন ধরাবে রোজ রোজ?"

বাদল ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে বল্লে, "আমার জন্যে আপনাকে এতটা কষ্ট করতে হয় আমি জানতুম না মিসেস্ উইলস্, বিশ্বাস করুন।"

মিসেস্ উইলস্ নরম হয়ে বল্লেন, "বার্ট, আমি তোমার দিদির মতো সেই অধিকারে তোমাকে যদি কিছু বলি তুমি অনধিকার চর্চ্চা মার্জ্জনা কর্‌বে তো?"

"নিশ্চয় কর্‌বো, কুইনী।" মিসেস্ উইলসকে ভাইয়ের অধিকারে "কুইনী" ব'লে সম্বোধন করা এই প্রথমবার। বাদলের বুক নূতনত্বের হর্ষে অথচ পাছে মিসেস্ উইলস্ কিছু মনে করেন সেই ভয়ে হঠাৎ ক্ষেপে উঠ্‌ল এবং অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত শান্ত হলো না। যেন নদীর উপর দিয়ে একটা ষ্টীমার চলে গেল।

মিসেস্ উইল্‌স্ কৌতুক-হাস্য চেপে বল্লেন, "তা হলে বলি। তোমার বয়সের ছেলেরা নিজের মা-বোনেরও মুরুব্বিয়ানা পছন্দ করে না আজকাল। তোমাকে অভয় দিচ্ছি যে মুরুব্বিয়ানার অভিপ্রায় নেই তোমার দিদির। তোমাকে বিবেচনা করতে বলি, এই যে তুমি রাত ক'রে বাড়ী ফিরতে সুরু করেছ এতে কি তোমার লেখাপড়ার ক্ষতি হবে না? যে উদ্দেশ্যে তোমার মা-বাবা তোমাকে এত দূর-দেশে পাঠিয়েছেন সেই উদ্দেশ্য বিফল হবে না?"

বাদল বিরক্ত হয়ে বল্ল, "আমি সাধারণ ছাত্র নই, কুইনী। আমি তোমাকে গ্যারাণ্টি দিতে পারি যে আমি বাড়ীতে বই না ছুঁয়েও অন্য সকলের চেয়ে ভালো ক'রে পাস্ হতে পারি।"

কুইনী বল্লেন, "অন্য সকলে তো ভারতীয় নয় এক্ষেত্রে। এটা ইংলণ্ড।"—তাঁর স্বজাতি-সম্বন্ধীয় গর্ব্ব আঘাত পেল। তিনি বল্লেন, "মান্‌ছি আমাদের ছাত্ররা বোকা-সোকা, তোমাদের মতো অবলীলাক্রমে একটা বিদেশী ভাষায় মনের ভাব ব্যক্ত করতে পারে না, অমন সবজান্তাও নয়। তবু, বার্ট্, খাটুনিরও একটা পুরস্কার আছে, মেধা দিয়ে খাটুনির অভাব পূরণ করতে পারো না।"

বাদলের আজ তর্ক করার ইচ্ছা ছিল না। একটি দিদি পেয়ে সে গোপন পুলকে শিউরে শিউরে উঠ্‌ছিল। বল্ল, "কুইনী, আমার জীবন অন্যরকম, আদর্শ অন্যরকম। সত্যি কথা বল্‌তে কি, আমি পাস্ করা না করা নিয়ে খুব বেশী চিন্তিত নই। মনটাকে রোজ কসরৎ করিয়ে fit রাখ্‌ছি, মনের ক্ষুধাকে অখাদ্য না দিয়ে সুখাদ্য দিচ্ছি, মনের দিক থেকে ধীরে অথচ স্থিরভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছি, এই আপাতত যথেষ্ট। তবে এইটুকুতে আমার সন্তোষ নেই, আমি পৃথিবীর সমস্ত বড় মানুষের সমস্কন্ধ হতে চাই—সাধনায়, বেদনায়, উপলব্ধিতে ও আবিষ্কারে। মনের মতো উন্নতি হচ্ছে না, আয়ু নষ্ট হচ্ছে প্রচুর, মাঝে মাঝে নিরাশায় মুষ্‌ড়ে পড়্‌ছি ও অনুশোচনায় ক্ষতির পরিমাণ বাড়িয়ে দেখ্‌ছি—না, অনুশোচনা জিনিষটা এমন খারাপ যে তাতে ক্ষতির পরিমাণ শুধু বাড়ন্ত দেখায় না, বেড়ে ওঠেও—তবু আমার মনে হয় আমি আর কিছু না হই বাদলচন্দ্র সেন তো হচ্ছি।"

কুইনী কিছুক্ষণ অবাক হয়ে রইলেন। তারপর বল্লেন, "তোমার সমস্ত কথা বুঝতে পারলুম না বার্ট্, কিন্তু তোমাকে আমার আন্তরিকতম শুভকামনা জানাই।"—হেসে বল্লেন, "তা বলে রাত ক'রে বাড়ী ফেরার সমর্থন করতে পারিনে। কোনদিন কোন স্ত্রী-জানোয়ারের কবলে পড়্‌বে, সোহো তো বড় সুবিধের জায়গা নয়। ছাত্রদের পক্ষে লণ্ডন যে ঘোর প্রলোভনসংকুল একথা কি তোমার মা-বাবা জান্‌তেন না? অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজের নাম কি তাঁদের অজানা?"

বাদল জোরে ঘাড় নেড়ে বল্ল, "হোপ্‌লেস্। অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজের ছেলেরা জীবনের কী জানে, কী বোঝে? যেখানে প্রলোভন নেই সেখানে জীবন নেই। আমি জীবনের দ্বারে বিদ্যার্থী, লণ্ডন আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের সদর দরজা।" এই বলে সে এক সেকেণ্ড থেমে বল্ল, "কুইনী।" তার ভারি মিষ্টি লাগ্‌ছিল ঐ সম্বোধনটি।

কুইনী বল্লে, "কী?"

বাদল অপ্রস্তুত হয়ে বল্ল, "না কিছু না। বাক্যটা সমাপ্ত করবার সময় সম্বোধন করতে এক সেকেণ্ড দেরি হয়ে গেল। ওটা বাক্যের শেষাংশ, কুইনী। যেমন এটা।"

বাদলের রোমাঞ্চ হচ্ছিল।

৫৮

গাওয়ার ষ্ট্রীট রাসেল স্কোয়ার ইত্যাদি অঞ্চলে বাদল পা দেয় না, যেহেতু ওসব অঞ্চলে সর্ব্বদাই দশ বিশ জন ভারতীয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় ও দেখা হতে হতে আলাপ হয়ে যায়। ভারতীয়দের চিন্‌তে পারা সহজ। কী পরস্পর সাদৃশ্য-ই যে তাদের মধ্যে আছে!—মারাঠা মান্দ্রাজী বাঙালী কাশ্মীরী হিন্দু মুসলমান পার্শী সকলেই দেখ্‌তে একরকম। ভারতবর্ষের বাইরে এসে সবাই পরেছে ইংরেজী পোষাক, তাই দিয়ে তাদের প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্য চাপা পড়েছে, অথচ তাদের আকৃতিতে এমন কিছু আছে,

যেটা কেবল ভারতবর্ষীয়ের বৈশিষ্ট্য, সেই বৈশিষ্ট্যের জোরে তারা সহজেই চিহ্নিত।

বাদল তাদের এড়িয়ে চলে। তাদের কাছ থেকে তার শেখ্‌বার কিছু নেই। জীবনের বিশটি বছর তাদের দিয়েছে, তার বেশী দিতে পারে না, দিলে অন্যদের প্রতি অবিচার করা হয়। সাম্‌নের বিশ বছর ইংলণ্ডকে ও ইউরোপকে দিয়ে তার পরে সমগ্র পৃথিবী প্রদক্ষিণ করবে, সর্ব্বত্র বক্তৃতা দেবার নিমন্ত্রণ রক্ষা করবে, বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠার অধিকারী হবে। বাদলের দায়িত্ব কি বড় কম দায়িত্ব! এত বড় মানব জাতিটার ঐক্য, প্রগতি ও শান্তি যে কজন চিন্তাশীল মানুষকে উত্ত্যক্ত করছে বাদলও তাদের একজন। বার্ণার্ড শ', বারট্রাণ্ড রাসেল্‌, বাদল সেন —এঁরা বয়সে ছোট-বড় হলে কি হয়, এঁরাই সকলের হয়ে আগ বাড়িয়ে দেখছেন, এঁরাই মানব সেনানীর স্কাউট্‌ দল, এভোলুশন-তরণীর এঁরাই পাইলট। শ', রাসেল, ক্রোচে, ডিউই (Dewey), ওয়েল্‌স্‌, রলাঁ,—এঁরা তো চিরকাল বাঁচবেন না, এঁদের স্থান পূরণ করবার জন্যে যাঁদের এগিয়ে যাবার কথা তাঁদের অনেকেই গত মহাযুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছেন, যাঁরা অবশিষ্ট আছেন তাঁরা অর্থাৎ ডি-এইচ্‌-লরেন্স, টি-এস্‌-এলিয়ট্‌, মিড্‌লটন্‌ মারী, জেম্‌স্‌ জয়েস্‌, জাঁ-রিশার ব্লখ্‌, ষ্টেফান ৎসোইগ্‌, টোমাস মান ইত্যাদিও একদিন মানবের দেশ থেকে বিদায় নেবেন। তখন বাদলের পালা।

বাদল তাই ব্রিটিশ মিউজিয়ামের উত্তর সীমানা মাড়ায় না। ভারতীয়দের মধ্যে এক সুধীদা'র সঙ্গেই তার যা-কিছু সম্বন্ধ।

কিন্তু সেদিন কার মুখ দেখে উঠেছিল, Mudieর দোকান থেকে বেরিয়ে বাস্‌ ধরতে যাচ্ছে এমন সময় পিছন থেকে কে যেন ডাকল,- "মিষ্টার সেন।" ফিরে দেখে একজন ভারতীয়। ভারতীয়টি বলছে, "চিন্‌তে পারেন?" বাদল কিছুক্ষণ চিন্তা করে। ভারতীয়টি বলে, "সেই যে বম্বের জাহাজে মিথিলেশকুমারীকে তুলে দিতে এসে দেখা হয়েছিল—"

বাদলের মনে পড়ে যায়। বাদল খুসী হয়ে বলে, "আপনি কি মিষ্টার নওলকিশোর?"—পাটনার লোক। পরিচিত। অমায়িক। ভারতীয়দের প্রতি দূর থেকে বাদলের যতটা বিতৃষ্ণা নিকট থেকে ততটা নয়, দেখা গেল। নওলকিশোরকে সঙ্গে নিয়ে ঘণ্টাখানেক পায়ে হেঁটে গল্প করে বেড়ালো। পাটনার খবর জান্‌তে তার দিব্যি ইচ্ছা করছিল। ভারতবর্ষের খবর কাগজে যা পায় তা অকিঞ্চিৎকর, পড়েও না। নওলকিশোরের মুখে শুন্‌তে মন যাচ্ছিল গান্ধী কেমন আছেন, কী তাঁর ইদানীন্তন কর্ম্মপন্থা, মডারেটরা সাইমনের উপর বিরূপ হয়ে থাকবে ক'দিন, হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা বাধ্‌ছে কিনা। খুব আশ্চর্য্য লাগ্‌ছিল এসব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে। এত কথাও তার মনে আছে! পরিত্যক্ত দেশ সম্বন্ধে এতটা কৌতূহলই বা তার এলো কোত্থেকে।

নওলকিশোর কিন্তু ছট্‌ফট্‌ করছিল তার নিজের খবর বল্‌তে। সে এক রকম পালিয়েই এসেছে, বাড়ী থেকে সাহায্য প্রত্যাশা করে না। দিন সাতেক একটা বোর্ডিং হাউসে আছে, শীঘ্রই মিথিলেশকুমারীর বাসায় জায়গা খালি হবে, বাদল যেন মাঝে মাঝে তার সঙ্গে দেখা করতে না ভোলে। মিথিলেশকুমারীর ঠিকানাটা দিল। বল্ল, "তিনি ও আপনি ছাড়া এদেশে আর তো কেউ নেই আমার!"

মিথিলেশকুমারীর কথায় বাদলের মনে পড়ল কুবের-ভাইয়ের কথা। আহা, তার সঙ্গে আবার দেখা হয় না? সেও তো এই লণ্ডনেই কোথাও আছে? তার সেই Swahili ভাষা কতদূর পড়া হলো? খাসা লোক কুবেরভাই, সে না থাকলে জাহাজের দিনগুলো মিথিলেশকুমারীর ভক্তের দলে যোগ দিয়ে আড্ডা দিতে দিতে ব্যর্থ যেতো।

কিন্তু অতীতের স্মৃতিকে প্রশ্রয় দিতে নেই। নওল-কিশোরের পাল্লায় পড়ে তার একটা ঘণ্টা নষ্ট হয়েছে। আর না। বাদল দমকা হাওয়ার মতো বিদেশে সহায়বন্ধুহীন বেচারা নওলকিশোরকে হতভম্ব করে দিয়ে বল্ল, "আচ্ছা, গুডবাই, মিষ্টার প্রসাদ আপনাকে দেখে খুব খুসী হয়েছি। আশা করি ইংলণ্ড আপনার উপভোগ্য হবে। গুড বাই।—" এই বলে একটা চলন্ত বাসে লাফ দিয়ে উঠে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

কলিন্স ও মিলফোর্ড বাদলকে দেখে একবাক্যে বল্‌লেন, "মর্ণিং, সেন।" কলিন্স কাজ করবার ফাঁকে ও মিলফোর্ড বই ঘাঁটার ফাঁকে Prayer Book Measure সম্বন্ধে মত বিনিময় করছিলেন। কলিন্স বল্ল, "সেন, তুমি কী?"

বাদল বুঝ্‌তে না পেরে বল্ল, "হাউ ডু ইয়ু মীন্?"

কলিন্স বল্ল, "ওঃ! আই বেগ্ ইওর পার্ডন্। মিলফোর্ড হচ্ছেন হাই চার্চম্যান্, আমি মডার্ণিষ্ট। তুমি কী?"

বাদল বল্ল, "তাই তো!"—একটু চিন্তিত হলো। ইংরেজ হতে যাচ্ছে, অথচ চার্চের সঙ্গে অল্পাধিক যুক্ত নয়, এ কেমন কথা? কলিন্সের মতো আধুনিকপন্থীও ওয়াই-এম্-সি-এ'তে থাকে, খৃষ্টান বলে নিজের পরিচয় দেয়। মডার্ণিষ্ট হচ্ছে চার্চ অব ইংলণ্ডের সেই সব সদস্য যারা একবারে চার্চ ছেড়ে দিতে চায় না, তাকে একালের উপযোগী ক'রে বাঁচিয়ে রাখতে চায়। খৃষ্টধর্ম্মের এরা এক বিজ্ঞানশোধিত সংস্করণে বিশ্বাসী।

বাদল বল্ল, "আমি? আমি ফ্রী থিঙ্কার।"

মিলফোর্ড বল্লেন, "ভারতবর্ষের সকলেই কি তাই? আমি শুনেছিলুম ওরা মূর্ত্তিপূজা করে।"

বাদল বিরক্ত হয়ে বল্ল, "ভারতবর্ষের ওরা যা করে আমিও যে তাই করবো এমন কোনো কথা নেই। তা ছাড়া মূর্ত্তিপূজা রোম্যান ক্যাথলিকরাও করে, মিষ্টার মিলফোর্ড।"

কলিন্স চোখ টিপে বল্ল, "এবং এ্যাংলো ক্যাথলিকরাও।"

বাদল জান্‌ত হাই চার্চম্যানরা বহু পরিমাণে রোম্যান-ক্যাথলিক ভাবাপন্ন। বস্তুত তাদের সেই রোম্যান ক্যাথলিক ভাব দেখে পার্লামেন্টের সন্দেহ হয় যে তারা রোম্যান ক্যাথলিক যুগে দেশকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায়। তাই তাদের সমর্থিত Prayer Book Measureকে পার্লামেন্ট বাতিল করে। তবু ওটার সামান্য পরিবর্ত্তন ক'রে আবার ওটাকে পার্লামেন্টে পেশ করবে ওরা। এই নিয়ে হৈ চৈ পড়ে গেছে।

বাদল বল্ল, "আচ্ছা, মিষ্টার মিলফোর্ড, কেন আপনাদের এই অধ্যবসায়? দেশ যে এগিয়ে চলেছে তা কি আপনার আর্চবিশপদের চোখে পড়ে না?"

মিলফোর্ড গম্ভীরভাবে বল্লেন, "এগিয়ে যাওয়া আপনি কাকে বলেন, মিষ্টার সেন? যে মানুষটা সমুদ্রের গর্ভে তলিয়ে যায় সেও তো এগিয়েই যায়।"

কলিন্স বল্ল, "'কেন' ছেড়ে এখন 'কেমন-করে' নিয়ে আলোচনা করা যাক্। পার্লামেন্ট যদি এবারেও বাতিল করে তা হলে কী উপায়?"

মিলফোর্ড shrug করলেন। বল্লেন, "পার্লামেন্টের সুমতির উপর আমাদের আস্থা আছে। থ্যাঙ্ক গড্, এখনো এ দেশটা সোশ্যালিষ্টদের হয় নি।"

ইংলণ্ডের চার্চ সরকারী টাকায় চলে, তার বিশপরা সরকারী চাকুরে। সোশ্যালিষ্টরা রাজ্যভার পেলে চার্চের ভাতা বন্ধ করে দিতে পারে, কারণ এ যুগে ষ্টেট্ ও চার্চ একাত্ম নয়, এ যুগের অনেক প্রজার ধর্ম্মমত চার্চের থেকে ভিন্ন, তাদের খাজনায় পরিচালিত হবার অধিকার চার্চের নেই।

বাদল বল্ল, "সোশ্যালিজম আমিও চাইনে। কিন্তু ষ্টেটের কর্ত্তব্য সকলের প্রতি ন্যায় বিচার করা। খাজানা দেবো আমি, আর তার ফলভোগ করবেন আপনি, এ যে আমার প্রতি অবিচার।"

মিলফোর্ড একবার কা'শ্‌লেন। বল্লেন, "sorry. কিন্তু খাজনার ফলভোগ করতে আপনাকেও তো বারণ করিনি, আপনাকে আমরা আহ্বান করছি। চার্চের চোখে সকলেই সমান, চার্চের কাছে সকলেই প্রিয়—যেমন রাজার চোখে, রাজার কাছে। আচ্ছা, রাজতন্ত্রেও তো অনেকের আপত্তি দেখি, তাঁদের খাজনায় রাজপরিবারকে পোষণ করা তা হলে অন্যায়?"

বাদল বল্ল, "রাজতন্ত্র কি ইংলণ্ডে আছে ভাবছেন? রাজতন্ত্রের বেনামীতে গণতন্ত্র কাজ করছে। রাজা যাঁকে বলছেন তিনি আসলে একজন আম্‌লা। তাঁকে তাঁর মাইনে দিতে হবে বৈ কি।"

মিলফোর্ডের বয়স বেশী নয়, তিনি King's Collegeএ থিয়লজীর ছাত্র। থিয়লজীর ছাত্রের সঙ্গে বচসা করা নিষ্ফল জেনে কলিন্স কাজে মন দিয়েছিল ও চুপি চুপি হাস্‌ছিল। বাদল বল্ল, "এই কলিন্স, ভারি স্বার্থপর তো, তর্কে যোগ দাও না কেন?"

কলিন্স বল্ল, "দেখছ না ওঁর কত বড় বড় দাড়ি। একেবারে মধ্যযুগের মানুষ। তর্কের গিলেট-ক্ষুর দিয়ে ওর ঐ সব মধ্যযুগীয় সংস্কার কামিয়ে সাবাড় করা কি এক আধ ঘণ্টার কাজ, মাই ডিয়ার চ্যাপ্?"

মিলফোর্ড বল্লেন, "এমন দাড়ি বহু সাধনায় মেলে। চার্চের মতো এর একটা সুদীর্ঘ ইতিহাস আছে, তোমাদের সোশ্যালিজমের মত ভুঁইফোড় নয়। চেঁছে সাফ করা তো দু মিনিটের কাজ, পনেরো ষোলো শতাব্দী ধ'রে গজিয়ে তুলতে পারো?"

কলিন্স বল্ল, "তোমার দাড়ির যে অত বয়স তা কি জানতুম, ডিয়ার ওল্ড বয়?"

মিলফোর্ড বল্ল, "ঠাট্টা নয় কলিন্স। কত বড় একটা আইডিয়া রয়েছে এর পেছনে! একটি রাজা, একটি রাষ্ট্র, একটি চার্চ—যেমন একটি ভগবান, একটি খ্রীষ্ট, একটি Holy Ghost."

কলিন্স টেবিল চাপড়ে বল্ল, "হিয়ার, হিয়ার।"

বাদল ভাবছিল, মিলফোর্ডের মতামত যে অমন হবেই তার আর আশ্চর্য্য কী! সে যে থিয়লজীর ছাত্র, পাস্ করলে চার্চের অধীনে চাকরী পাবে। যে ডালে তার বাসা সেই ডালকে সে কাটবে কোন দুরাশায়? কিন্তু পার্লামেণ্ট যখন ভর্ত্তা ও চার্চ ভার্য্যা তখন পার্লামেণ্টের সুমতির (অর্থাৎ চক্ষুলজ্জার) উপর আস্থা রাখা ছাড়া চার্চের গত্যন্তর নেই। চার্চের আত্মসম্মান থাকলে চার্চ নিজের থেকেই পৃথক হয়ে যেতো। এতগুলো বিরাট হাসপাতাল চাঁদার উপর চলছে; রোম্যান ক্যাথলিক ও নন্‌কন্‌ফর্মিষ্টরা রাষ্ট্রের বিনা সাহায্যে নিজ নিজ ধর্ম্মের ব্যবস্থা করেছে: এ্যাংলিকানরা কেন চাঁদা করে চার্চের ভার নেয় না? তা হলে তো ইংলণ্ডের লোকের কর-ভার কমে। যেমন ফ্রান্সের লোকের কর-ভার কম। "কী বলো, কলিন্স?"

কলিন্স বল্ল, "আমিও তাই বলি, সেন। পরের খাজানার চেয়ে নিজের লোকের চাঁদা নিশ্চয়ই স্বাধীনতা বাড়ায়। চাঁদার আশায় নিজের লোকের প্রতি কর্ত্তব্য করতেও চাড় হয়। কিন্তু ওরা কি একথা শোনে? প্রেষ্টিজ ওদের বড়ই প্রিয়। পিছনে রাজশক্তি থাকার প্রেষ্টিজ, অতীতকালের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখার প্রেষ্টিজ, নিছক টাকা পয়সার দিক থেকেও দিলদরিয়া ভাব—লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন!"—মিলফোর্ড ইতিমধ্যে বিদায় নিয়েছিলেন। কলিন্স ব'লে চল্ল, "তা ছাড়া আরো ফ্যাকড়া আছে। সরকারী সাহায্য না পেলে অনেকগুলো বেসরকারী endowments থেকে বঞ্চিত হবার কথা। তাতে চার্চের ভয়ানক আর্থিক ক্ষতি হয়।"

৫৯

সুধী'র দিনগুলি ঘটনাবিরলভাবে কাটছিল। মিউজিয়ামের লাইব্রেরীতে তুলনামূলক দর্শন, সমাজতত্ত্ব ও প্রাচীন সাহিত্য পড়া তার প্রাত্যহিক কাজ। সপ্তাহে দুই দিন গ্রীক ও ল্যাটিন শেখবার জন্যে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের বাসায় যায়, তিনিই তার ইংরেজ আলাপী। রবিবার জন কয়েক ভারতীয় বন্ধুর খোঁজ খবর নিতে হয়, তাদের সঙ্গে যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ মনে হয় ভারতবর্ষে আছে, তাদের কারো সঙ্গে বাংলাতে, কারো সঙ্গে হিন্দীতে কথা কয়ে আরাম পায়। আড্‌ওয়ানী নামের একটি সিন্ধী ছেলে তার বিশেষ অনুগত হয়ে পড়েছে, মিউজিয়ামে তার পাশের আসনে বসে, লাঞ্চের সময় তার সঙ্গে ঘোরে এবং সে যখন যা বলে নিজের নোট বুকে সযত্নে টুকে রাখে। বলে, "নতুন একটা আইডিয়া। আমার থিসিসের মধ্যে কোথাও এক জায়গায় ঢুকিয়ে দেওয়া যাবে।" বেশ নম্রস্বভাব ছেলেটি, মুখে বিনয়ের হাসি লেগেই আছে, সুধীকে ডাকে "চক্রবর্ত্তীজি", গোঁড়া স্বদেশী। তার গবেষণার বিষয় "ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থার ক্রম-বিকাশ।"

আড্‌ওয়ানী বলে, "চক্রবর্ত্তী জি, জাত বা caste আপনারা যাকে বলেন সিন্ধুপ্রদেশে তা নেই। আমাদের মধ্যে যারা মুসলমান তাদের কথা তো জানেনই, আমাদের মধ্যে যারা হিন্দু তাদের মধ্যে মোটামুটি দুটি শ্রেণী—যারা লেখাপড়ার কাজ করে আর যারা গতর খাটায়। অনেকটা ইংরেজদের Professional and working classes আর কি! পাঞ্জাবে ব্রাহ্মণ আছে বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণের চেয়ে কায়স্থ নাকি বড়। এমনি করে সমগ্র ভারতবর্ষের সমাজ-ব্যবস্থা কত যে বিচিত্র, স্বতোবিরুদ্ধ ও জটিল তার ইয়ত্তা হয় না। সব

ভেঙ্গে একাকার করে দেওয়া যায় না, চক্রবর্ত্তী জি? একধার থেকে কমিউনিজম—?" আডওয়ানী কথাটা শেষ না করে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায়।

সুধী হেসে বলে, "কেন? আপনার থীসিস লেখার সুবিধা হবে বলে?"

আডওয়ানী অত্যন্ত বিনয়পূর্ব্বক বলে, "না, না, তাই কি আমি বলেছি? জাতীয় ঐক্যের খাতিরে যাবতীয় বিভিন্নতা দূর হওয়া উচিত, এই আমার বিশ্বাস।"

"আপনি ও আমি বাঙ্গালী ও সিন্ধী; ব্রাহ্মণ ও 'আমিল'। তা বলে কি আমরা কোনো দু' জন ইংরেজের তুলনায় পর? দুজনের মধ্যে একটি সহজ ঐক্য-বন্ধন নেই কি?"

"সেটা—সেটা—বুঝলেন কিনা? সেটা আমরা ইংলণ্ডে আছি বলে। ভারতবর্ষে থাকলে আমরা নিজেদের অনৈক্যের কথাই আগে ভাবতুম।" —এই বলে কাতর দৃষ্টিতে তাকায়। যেন তার যুক্তির কোনো মূল্য নেই যদি সুধী না সমর্থন করে।

সুধী বলে, "ইংরেজ তার স্বদেশে থেকেও বিশ্বের অন্যান্য জাতির সঙ্গে নানা সূত্রে যুক্ত আছে, স্বদেশে থেকেও সকলের সংবাদ রাখে। তার খবরের কাগজগুলি খুলে দেখুন, আদার খবর থেকে জাহাজের খবর পর্য্যন্ত সব রকম খবর সেগুলিতে থাকে এবং সেগুলিতে সম্পাদকীয় আলোচনা হয় বিশ্ব-রাজনীতি, বিশ্ব-অর্থনীতি নিয়ে। কেমন?"

আডওয়ানী মাথাটাকে অত্যধিক নুইয়ে বলে, "ঠিক্।"

সুধী বলে, "অন্যান্য জাতিদের সঙ্গে অহর্নিশ নিজেদের জাতিটিকে তুলনা করতে পায় বলে ওরা ঐক্যের সম্বন্ধে সচেতন থাকে। তা বলে ওদের চেতনায় যে ওদের ঘরোয়া অনৈক্যের অংশ নেই তা নয়। কাউন্টি ক্রিকেট ম্যাচের সময় ওদের কাউন্টি-প্রীতি মাথা নাড়া দেয়, ভাষাগত প্রসঙ্গ উঠলে ওদের প্রাদেশিকতা গা-ঝাড়া দেয়।"

আডওয়ানী যেন কী একটা আবিষ্কার করেছে। বলে, "একেবারে ঠিক্। Devonshire-এর ভাষা, Lincolnshire-এর ভাষা, স্কটল্যাণ্ডের ভাষা এই নিয়ে কী কম তামাসা বাধে!"

সুধী ব'লে চল্ল, "আমাদের যখন বিশ্ব-চেতনা বাড়বে তখন জাতীয় ঐক্যবোধ বাড়বে, তা আমরা স্বদেশেই থাকি আর বিদেশেই থাকি। 'জাতি' 'জাতি' করলে জাতীয়তা আসে না, 'বিশ্ব' 'বিশ্ব' করলে আসে।"

আডওয়ানী চট্ পট্ টুকে নিল।

সুধী ব'লে চল্ল, "ঐক্যবোধই অনৈক্যবোধকে স্বীয় অঙ্গীভূত করবে, যেমন সাদা রং সকল রংকে আত্মসাৎ করে। সব ক'টা রংকে মুছে দিলে যা দাঁড়ায় সে হচ্ছে কালো রং। অর্থাৎ কোনো রং নয়। কিছু নয়। অনৈক্যকে বেবাক লুপ্ত করলে ঐক্যও থাকবে না, আডওয়ানীজী। সেই ভয়ে কমিউনিজম্‌ও শ্রেণীগত অনৈক্যকে বাচিয়ে রাখার উপায় করেছে শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি পক্ষপাত দেখিয়ে।"

আডওয়ানী উৎসাহের সহিত টুক্‌তে থাক্‌ল। অথ সুধী—আডওয়ানী সংবাদ।

দে সরকারের সঙ্গে রবিবার গুলোতে প্রায়ই দেখা হয়। ছোট খাট একটি আড্ডা বসে। আড্ডার সকলেই বাঙালী। আমেরিকা-ফেরৎ সেই যে ছেলেটির নাম মৃণাল চৌধুরী সেও তার হাইগেটের বাসা থেকে ব্লুমসবেরীতে আসে।

দে সরকার বলে, "আমাদের এই মিলনটিকে বলা যাক্ 'ত্র্যহস্পর্শ'। একজন মিষ্টিক, একজন বৈজ্ঞানিক, একজন ম্যান অব দি ওয়াল্‌র্ড্।"

সুধী বলে, "আমি মিষ্টিক হলুম কবে?"

মৃণাল চৌধুরী বলেন, "আর আমিই বা কিসের বৈজ্ঞানিক? আমি তো যৎসামান্য রেলওয়ে এঞ্জিনীয়ারিং।"

দে সরকার বলে, "চারজন হলে বেশ কয়েক হাত তাস খেলা যেতো। চক্রবর্ত্তী, আপনি খেলেন তো?"

সুধী বলে, "নিশ্চয়।"

দে সরকার বলে, "তবে আর আপনি ওরিয়েণ্টাল 'ইওগী' বলে বুড়ীদের মহলে পসার জমাবেন কী ক'রে? কৃষ্ণমূর্ত্তি স্মার্ট ইংরেজী পোষাক প'রে অর্দ্ধেক মক্কেল হারিয়েছে। Rudolf Steinerএর নাম শুনেছেন?"

সুধী বলে, "না?"

দে সরকার বলে, "Rudolf Steiner অবশ্য মারা গেছেন। কিন্তু তাঁর Anthroposophist সম্প্রদায় আপনার

কৃষ্ণমূর্ত্তির Theosophist সম্প্রদায়কে Back number করে তুলেছে। Eurhythmy জানেন?"

সুধী ও মৃণাল ঘাড় নেড়ে "না" জানায়।

দে সরকার তাদের অজ্ঞতায় 'শক্' পাবার ভাণ ক'রে বলে, "Well, I never"!" মনে মনে খুসী হয়ে বল্লে, "শুধু বিলেত এলেই হয় না, দুটো চোখ, দুটো কান, একটা মন সঙ্গে ক'রে আন্তে হয়। আরে মশাই আপনিই বা কেমন আমেরিকা ফেরৎ? আমেরিকায় Eurhythmy নেই? ·····জানেন না! তাই বলুন। কোনো বিষয় 'জানি নে' একথা বলার চেয়ে মরা ভালো। 'জানিনে' ব'লে একটা শব্দ আমার অভিধানে নেই।"

তারপর ঘটা ক'রে Eurhythmyর প্রিন্সিপ্ল বোঝায়। একটু নেচে দেখিয়ে দেয়ও। রসিক মানুষ, রসে টস্ টস্ করছে। চৌধুরীকে জিজ্ঞাসা করে, "আচ্ছা, কোনো ব্রিজ-খোর মহিলার নাম ঠিকানা জানা আছে আপনার?"

চৌধুরী বলেন, "কেন বলুন তো?"

"তাও বলতে হবে? তবে শুনুন। দেশ থেকে যা পাই তাতে কুলোয় না। আর এ শালারা তো আমাদের দেশে থাকতে নিজের দেশ থেকে এক পেনীও নেয় না, আমিই বা কেন গরীব দেশের টাকা এনে ধনীর দেশে ছড়াবো? সুযোগ পেলে দু'দশ শিলিং উপার্জ্জন করতে ছাড়ি নে। Public Barএ ঢুকে বিলিয়ার্ড খেলি, প্রায়ই জিতি। ব্রিজ খেলার নিমন্ত্রণ জুটিয়ে নিই। ব্রিজের বৈঠকে নৈশভোজনটা মেলে, সেই সঙ্গে খেলা জেতার দক্ষিণাটাও।"

চৌধুরী বলে, "বাস্তবিক কত টাকাই যে আমরা বিদেশে পড়তে এসে বিদেশীকে দিই! আবার সেই টাকা দেশে ফিরে শ্বশুরের কাছ থেকে, জনসাধারণের কাছ থেকে, করদাতার কাছ থেকে আদায় করি!"

দে সরকার উষ্মার সহিত বলে, "আদায় করেন, না, কাঁচকলা! আপনার নিজের দিক থেকে ওটা হয় তো একটা investment, কিন্তু দেশের দিক থেকে dead loss। বিলেতের কাছ থেকে কেউ কোনো দিন একটা পাউণ্ড ফিরে পেয়েছে?"

সুধী তাদের মধ্যে সন্ধি করিয়ে দেয়। বলে, "না, না, শুধু আর্থিক লাভ ক্ষতি খতিয়ে দেখলে চলবে না। বিদেশে এসে আমরা চড়া দাম দিয়ে যে অভিজ্ঞতা ও যে মানসিকতা কিনে নিয়ে যাচ্ছি সেটার ফল আমাদের সাহিত্যে সমাজে ও রাজনীতিক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ করছি। অপ্রত্যক্ষ ভাবে সে যে আমাদের সভ্যতাকে ও সংস্কৃতিকে পরিপূর্ণতা দিচ্ছে এবং বিশ্বের গ্রহণ-যোগ্য করছে এও আমাদের স্বীকার না ক'রে উপায় নেই। গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, জগদীশ তাঁদের বয়সে আমাদেরি মতো মূল্যদান ক'রেছিলেন।"

দে সরকার পরিহাসচ্ছলে বলে, "ওঃ! সেই জন্যে বুঝি বাদলচন্দ্র সেন মাসে মাসে পঁচিশ পাউণ্ড চালছেন! আমার কিন্তু কোনো আশা নেই, মিষ্টার চক্রবর্ত্তী, গান্ধী কি রবীন্দ্রনাথ হবার। আমি অভিজ্ঞতাও নিচ্ছি, তার সঙ্গে সঙ্গে দামও নিচ্ছি। মাছের তেলে মাছ ভেজে খাচ্ছি আর কি!"

অথ সুধী—দে সরকার সংবাদ।

ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গ না পেলে সুধীর দিন কাটে না। যে বাড়ীতে শিশু নেই সে বাড়ীতে বাদলের উল্লাস, সুধীর অসোয়াস্তি। মার্সেলকে আদর করাতে তার অনেক সময় নষ্ট হয়, কিন্তু নষ্ট করবার জন্যেই তো সময়ের সৃষ্টি, যে মানুষ সময়কে সোনার বাসনের মতো সিন্দুকে বন্ধ রাখে সে নিজেকেই বঞ্চিত করে।

"আয়, আয়, কেমন আছিস্ আজ? গল্প শোনাতে হবে? 'ধ্রুব'র গল্প শুনবি? 'ধ্রুব' ব'লে সেই যে ছেলেটি বনে গিয়ে একমনে ভগবানকে ডাকছিল আর তার চার দিকে বাঘ সিংহ গর্জ্জন ক'রে বেড়াচ্ছিল, শুনবি তার গল্প?······ বাঘ সিংহ কেমন গর্জ্জন করে শুনতে চাস্? তুই-ই শুনিয়ে দে' না? ·····দূর, ওটা কি বাঘের মতো হলো? ও তো বাঘা কুকুরের ঘেউ ঘেউ!···কখনো বাঘ দেখিস্ নি? আচ্ছা, রোস তোকে চিড়িয়াখানায় নিয়ে যাবো একদিন্। কী ক'রে যাবি তুই? তোর যে গাড়ীতে চাপলে বমি আসে।·· হাঁটতে পারবি কেন অতখানি—হেণ্ডন থেকে রিজেন্ট্স্ পার্ক! তুই বেজায় ভারি, তা' নইলে তোকে কাঁধে ক'রে নিয়ে যেতুম।"

মার্সেলকে সুধী এক নতুন ধরণে ইতিহাস শেখায়।

"তুই যখন আরো ছোট ছিলি তখনকার কথা তোর মনে পড়ে?···পড়ে?···কী মনে পড়ে?...তুই একবার বিছানার থেকে পড়ে গেছ্লি, ভারি কাঁদছিলি, তোকে তোর 'মা' এসে তুল্লেন, তুলে একটা 'টেডি' ভালুক ধরিয়ে দিলেন। কেমন, এই তো?···তোর যেমন এত কথা মনে আছে তেমনি তোর বাবারও কত কথা মনে আছে। তাঁর যে বাবা ছিলেন তাঁরও কত কথা মনে ছিল। তিনি মারা গেছেন। মানুষ মারা গেলে তার মনে-রাখা কথাগুলো যদি কেউ জান্তে চায় তবে বড় মুস্কিলে প'ড়ে। তোর ঠাকুরদাদা বেঁচে থাক্লে তোকে তাঁর গল্প বল্তেন, এখন তুই কার কাছে তাঁর গল্প শুন্‌বি?···তোর বাবার কাছে? তোর বাবা যদি আজ মারা যান তবে কার কাছে শুন্‌বি? —"

মার্সেল মাথা দুলিয়ে বলে, "না, বাবা মারা যাবে না।" তার চোখ ছল ছল করে।

সুধী বলে, "না রে, আমি কি তাই বলেছি? আচ্ছা, ধর তোর বাবা তাঁর ঠাকুরদাদার গল্প শুন্তে চা'ন। তাঁর বাবা তো বেঁচে নেই, কে তবে ও সব গল্প মনে রেখেছে যে বল্‌বে···বুঝ্‌লি? সেই জন্যে বইতে ক'রে সব কথা লিখে রেখে যেতে হয়। আগেকার লোকের গল্প বড় বড় বইতে লেখা রয়েছে। আমরা যতই বড় হই ততই বড় বড় বই পড়ি, পড়ে জান্তে পাই আমাদের ঠাকুরদাদাদের ঠাকুরদাদা, তাদের ঠাকুরদাদাদের ঠাকুরদাদা, এমনি সব বুড়ো বুড়ো মানুষদের ছেলেবেলার গল্প, বেশী বয়সের গল্প, খাওয়াপরার গল্প—কী খেতো ওরা, কোথায় পেতো ঐ সব খাবার, মাটীতে ফলাতো, না শীকার ক'রে আন্‌তো, কী পর্‌তো ওরা, কোথায় পেতো ঐ সব কাপড়, কল দিয়ে তৈরী করত, না, জীবজন্তুর চামড়া থেকে বানাতো—এই সব গল্প। আর গান গাওয়া ছবি আঁকা, সুন্দর সুন্দর বাড়ী, ঘর, আসবাব, বাসন, খেলানা তৈরী করা, এই সকলের গল্প। আর জঙ্গল কাটা পাহাড়-পর্ব্বতে চড়া, সমুদ্রে পাড়ি দেওয়া, বিদেশী মানুষদের সঙ্গে জিনিষের বেচাকেনা, ওদের সঙ্গে ঝগড়া বাধলে ঢাল তলোয়ার নিয়ে মারামারি, কাটাকাটি, হুলুস্থুলু ব্যাপার।"

মার্সেল চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে তন্ময় হয়ে শোনে। গম্ভীর ভাবে বলে, "হুলুস্থুলু ব্যাপার।"

সুধী তার গাল দুটো টিপে দিয়ে বলে, "এই সব গল্পকে বলে ইতিহাস। কোন কাল থেকে কত মানুষ তাদের গল্প তাদের ছেলেপুলে নাতি-নাৎনীদের জন্যে রেখে গেছে। কেউ বইতে লিখে রেখে গেছে কেউ পাথরের গায়ে খোদাই করে রেখে গেছে, কেউ লিখতে জান্‌ত না বলে তৈজসপত্রের মধ্যে চিহ্ন রেখে গেছে। অনেক দিনের গল্প জমেছে রে মার্সেল। সব তো এক দিনে বলা যায় না। কিছুটা আমি তোকে বল্‌ব, বাকীটা তুই বইতে পড়্‌বি।"

মার্সেল খুসী হয়ে বলে, "হুঁ।" কিন্তু তাঁর খুসী চাপল্যে ব্যক্ত হয় না। সে যেন ঝরণা নয়, দীঘি। শান্ত, সমাহিত, বিরলধ্বনি।

অথ সুধী—মার্সেল সংবাদ। অতঃপর সুধী উজ্জয়িনী।

৬০

উজ্জয়িনীর আকস্মিক "ভাগবত উপলব্ধি"র সংবাদ সুধীকে কেবলমাত্র হাসি জোগালো না, সে বাদল এবং উজ্জয়িনী উভয়ের ভবিষ্যৎ ভেবে গভীর বেদনা বোধ করল। রসিকতা ক'রে হাল্‌কা ধরণের চিঠি লিখে, উজ্জয়িনীকে কাঁহাতক সান্ত্বনা দেওয়া যায়? সে তো ছোট খুকীটি নয়।

বাদল যদি তাকে সামান্য মাত্র প্রশ্রয় দিত তাহলে উজ্জয়িনী অনেক দুঃখ সত্ত্বেও মোটের উপর সুখে থাক্‌ত, নিয়মিত স্বামীর চিঠি না পেলে ভাব্‌ত তিনি ব্যস্ত আছেন ও নিয়মিত তাঁর কুশল সংবাদ অন্য কারো চিঠিতে পেলেই নিশ্চিন্ত হতো। কিন্তু বাদলটা এমন অমানুষ, ভদ্রতার খাতিরেও তাকে এক লাইন লেখে না। বাদল কি তবে সত্যি সত্যিই তাকে ছাড়্‌বে? ছি, ছি! এমন গুণবতী সদ্বংশীয়া পাত্রী সে পেতো কোথায়? ইংরেজ বিয়ে করাই যদি তার অভিপ্রায় ছিল তবে মেসোমশাইকে সেই কথা খুলে বল্লেই হতো, তার ফলে যদি বিলেত আসা বন্ধ হতো তাও সই। বিলেত আসার নানা উপায় ছিল, অপেক্ষা করলে হয় তো ষ্টেট্ স্কলারশিপ পাওয়া যেতো, যদিও বেহারের ওরা বাঙালীকে ও জিনিষ কিছুতেই নাকি দেবে না। কয়েক বছর চাক্‌রী ক'রেও তো টাকা জমানো যেতো। বাদলের যদি এতই আগ্রহাতিশয্য তবে সুধীকে বল্লে সুধী নিজের আসা বন্ধ ক'রে বাদলকে অর্থ সাহায্য করত, অন্তত টাকা ধার দিত।

কিন্তু একটি মেয়েকে এমন ক'রে বঞ্চনা করা, শুধু একটি মেয়েকে নয় তার ও নিজের পিতাকে পাকা খেলোয়াড়ের মতো চালমাৎ করা—এ দুর্ব্বুদ্ধি বাদল পেলো কোথায় ? যার ব্যক্তিগত জীবনে এত বড় অন্যায় সে বিশ্বের অন্যায় দূর করবে, মস্ত চিন্তানায়ক হবে ? বিশ্ব কি কখনো তার এ অপরাধ ক্ষমা করতে পারবে ?

বিয়েতে বাদলের মত ছিল না, সুধী সে কথা জানত। কিন্তু বিয়ের পরে সকলেরই মত বদলায়, একথাও সুধীর অজানা ছিল না। বৌ অপছন্দ হলে কেউ কেউ ভালি চটে যায়, এও সত্য। কিন্তু তা বলে কোনো ভদ্র সন্তান বৌকে বয়কট করে না, বাদল যেমন করেছে।

বাদলকে এই বিয়েতে সুধী প্ররোচনা দিয়েছিল, দেবার সময় ভেবেছিল বিয়ের পর তার পাগলামি সেরে যাবে। এখন যে এর পরিণাম এমন হবে তা তো সে কল্পনায় আনতে পারে নি ? এই তো তার বন্ধু চিন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় বিয়ের নাম শুনলে মারতে আসত, কিন্তু যেই বিয়েটি করা অমনি তাহার চেহারা আহ্লাদি-গোছের হয়ে উঠল। ভায়া বিলেত এসে অবধি দু'বেলা দু'খানা ক'রে প্রেমপত্র লিখে এক সঙ্গে চোদ্দ খানা খাম ডাকে দিচ্ছে—একখানা লিখছে পাছে সেখানা হারিয়ে যায়, দু'খানা লিখলে পাছে দু'খানাই হারিয়ে যায়! তাই চোদ্দ খানা। সেগুলো মেল্-ডে'র দু'দিন আগে পোষ্ট করা চাইই—পাছে মেল ফেল্ হয়।

না, বাদলের শুভ বুদ্ধির উপর সুধীর আস্থা আছে। এই সাময়িক ইংরেজিয়ানা সময়ের ধোপে টিঁকবে না। বাদল দেশেও ফিরবে, উজ্জয়িনীকে গ্রহণও করবে। আর উজ্জয়িনী ? স্বামীর কাছে আদর না পেলে সব মেয়েরই ধর্ম্মে মতি যায়। বিশেষত উজ্জয়িনীর কাছে ঠাকুর দেবতা যখন খুব একটা নতুন জিনিষ। ওটাও সাময়িক। ধোপে টিঁকবে না।

তবু কী জানি কেন সুধীর অন্তর থেকে হাহাকার উঠতে লাগল। বাদল হয় তো সত্যিই ভারতবর্ষে ফিরবে না, ভারতবর্ষের প্রতি কোনো দিন তার কৌতূহল ছিল না, দেশে থাকতে সে সারাক্ষণ বিদেশী বইয়ের মধ্যে ডুবে থাকত, দেশের প্রাকৃতিক দৃশ্যের দিকে ভুলেও দৃকপাত করত না। স্কুল কলেজে তার বন্ধু ছিল না একটিও—এক সুধী ছাড়া। যারা তাকে শ্রদ্ধা করত তারাও তাকে দাম্ভিক মনে ক'রে ভয়ে তার কাছে ঘেঁষত না। যারা তাকে গ্রন্থকীট ইত্যাদি ব'লে তার প্রতিভাকে উড়িয়ে দিত তারাও তার সম্মুখীন হতে সাহস পেতো না। অধ্যাপকদের বাদল অবজ্ঞা করত, অধ্যাপকরাও বাদলকে কথাটি কইতেন না। এ হেন বাদল দেশে ফিরে বিদেশীর মতো বোধ করবে। তাই নাও ফিরতে পারে।

আর উজ্জয়িনীই কি বাদলের মতো উচ্চাকাঙ্ক্ষী যুবকের সহধর্ম্মিণী হতে পারবে ? প্রতিভাশালী ব্যক্তির সহধর্ম্মিণী হতে পারা অসীম সহিষ্ণুতা সাপেক্ষ। কেবল সহিষ্ণুতা নয়, আত্মবিলোপ সাপেক্ষ। উজ্জয়িনীর মধ্যে ব্যক্তিত্ব জ্বল্ জ্বল্ করছে। সেই বা বাদলকে সইতে রাজি হবে ক'দিন ?

এ সমস্যার একমাত্র সমাধান বিচ্ছেদ, কিন্তু বিবাহ-বিচ্ছেদের মতো কুৎসিৎ ব্যাপার অল্পই আছে। বনিবনা হলো না, অত্যন্ত খেদের বিষয়, তুমিও পৃথক থাকো, আমিও পৃথক থাকি। কিন্তু পুনর্ব্বিবাহ! ছি, ছি! জীবনে শুধু একবার মাত্র বিবাহ করা যায়, সে উৎসবের পুনরাবৃত্তি অসুন্দর।

উজ্জয়িনীর মনটাকে ধীরে ধীরে সুন্দর উদার অনুশোচনা-হীন বিচ্ছেদের জন্যে প্রস্তুত করতে হবে। সে যেন নিজেকে হতভাগিনী ভেবে জীবন্মৃত না হয়, যেন রক্তমাংসের ক্ষুধায় জর্জ্জর না হয়, যেন কঠিন আত্ম-নিপীড়নের দ্বারা জীর্ণ না হয়। অবিবাহিত থেকেও তো কত নারী মহীয়সী হয়েছেন। যেমন এলেন কেই। উজ্জয়িনীও প্রকৃতপক্ষে অবিবাহিতা।

বেশ, বেশ, সিষ্টার নিবেদিতাই হোক সে। কিম্বা মীরা বাই। দুটিই বড় মনোহর আদর্শ। কিম্বা উজ্জয়িনী নিজেই তৃতীয় একটি মনোহর আদর্শ স্থাপন করুক। তার প্রতিভাশালী স্বামীকে সে অকুণ্ঠিতচিত্তে মুক্তি দিল এবং নিজের ব্যক্তিত্বকে বিলোপ থেকে বিনষ্টি থেকে রক্ষা করল। অন্যথা তাঁকেও ক্ষতিগ্রস্ত করত, নিজেকেও। এইরূপ যে বিচ্ছেদ এ তো প্রকারান্তরে মিলন।

সুধী লিখল,

কল্যানীয়াসু,

এখন হইতে তোমাকে তুমি সম্বোধন করিব, তুমি কিছু মনে করিলেও আমি কিছু মনে করিব না।

তুমি পাটনা গিয়াছ জানিতে পারিয়া আমার এমন আহ্লাদ হইতেছে যে কি বলিব! তুমি আমাকে পাটনার খবরগুলা গুছাইয়া লিখিও তো? তোমাদের বাড়ীর সেই বুড়ী ঝি পার্ব্বতীয়া কেমন আছে? তাহাকে আমার অশেষ ভালবাসা জানাইও। আর বাদলের সেই পুরাতন ভৃত্য নাথুনিলাল বেহারা—সে ব্যাটা আমাকে চিঠি লিখিয়াছে, বাবুয়াজীর কাছে চলিয়া আসিতে চাহে; উহাকে পাসেল করিয়া ডাক যোগে অতি শীঘ্র পাঠাইয়া দিবে।

শ্রীমৎ বাদলানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম; দিন দিন একটি হনুমান বনিতেছেন। তা একটা কথা তোমার কানে কানে বলি, উজ্জয়িনী। তুমি নিজের মতো একটা পন্থা বাছিয়া লইও। উহার পন্থা তোমার পন্থা নহে। উহার মতো সুপাত্র তোমার পিতা সমগ্র দেশে খুঁজিয়া পাইতেন না, অতএব বিবাহ তোমার যাহা হইয়াছে তাহা অনিন্দ্য। অন্যান্য বালিকাদিগের অপেক্ষা পরম ভাগ্যবতী তুমি; তাই বুঝি অন্যান্যদিগের হইতে তোমার দায়িত্বও সমধিক। তোমার স্বামীকে তুমি প্রফুল্ল অন্তঃকরণে তোমার প্রতি কর্ত্তব্য হইতে মুক্তি দিও। সে বাস্তবিকই অসাধারণ পুরুষ। অসাধারণ পুরুষকে নিজের সুখ সুবিধার জন্য সাধারণ করিয়া তুলিতে নাই। উহাকে বিবাহ করিতে বাধ্য করা উহার পিতার অন্যায় হইয়াছে। আমিও তখন এতটা ভাবি নাই যে উহার অদৃষ্টে তোমার মতো অসাধারণ নারী জুটিবে। ভাবিয়াছিলাম উহার বধূ একটি ব্যক্তিত্ব-বর্জ্জিতা সুলক্ষণা বালিকা হইবেন, যিনি সর্ব্বদা উহার সন্তোষ বিধান করিবেন ও উহার দাবীর ছাঁচে নিজেকে ঢালাই করিবেন। অর্থাৎ ও যদি সাহেব হয় তবে মেম হইবেন, যদি খদ্দর ধরে তবে চরকায় সুতা কাটিবেন, যদি পাগল হইয়া যায় তবে পাগলকে আগলাইবেন।

তুমি তো উহার রুচির সঙ্গে রুচি মিলাইবার পাত্রী নহ। তুমি তো উহার ছায়ার মতো অনুগতা হইতে পারিবে না। তুমি যেমনটি হইতে চাহ তেমনটি হইয়া জগতের মঙ্গল করো, আপনাকে উহার মনের মতো করিয়া খর্ব্ব হইও না। উহাকে আপনার মনের মতো করিতে চাহিলে পারিবে না, পারিলে উহার, তথা আপনার, তথা জগতের অমঙ্গল করিবে।

দুইজন অসাধারণ স্ত্রী পুরুষের মধ্যে কি কখনো সামঞ্জস্য হইতে পারে না? স্বামী ও স্ত্রী দুইজনেই ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন হইলে কি সংসারে শান্তি থাকে না? দুইজনের মিলন কি স্বাধীনের সঙ্গে স্বাধীনার মিলন হইয়া প্রত্যেককে পূর্ণতর করিতে পারে না? পারে, উজ্জয়িনী। কিন্তু সে মিলন এমন দুর্ল্লভ যে ইতিহাসে তাহার নজির খুঁজিয়া বাহির করা শক্ত। একই পিতামাতার যমজ সন্তানও কেন পরস্পরের সমকক্ষ হয় না? দুইটা খরগোসের বাচ্চাকে পিঠ পিঠ জন্মাইতে দেখিলাম। তিন সপ্তাহ পরে দেখি উহাদের একটা অপরটার দুইগুণ বড় হইয়াছে এবং মায়ের সবটুকু দুধ কাড়িয়া খাইতেছে। দাম্পত্য জীবনেও এমনি হয়। একজনের ব্যক্তিত্ব অপরজনের ব্যক্তিত্বকে ছাড়াইয়া উঠে। কেহ যে কাহারও অপেক্ষা অধিক স্বার্থপর তাহা নহে। প্রকৃতি দুইজনকে সমান শক্তিশালী করে নাই। যেখানে করিয়াছে সেখানে সংঘর্ষ ঘটাইয়াছে। সংঘর্ষকে সৃষ্টিতৎপর করিতে পারে এক নিবিড়তম প্রেম। তেমন প্রেম স্থায়ী হয় না, হইতে পারে না। তাহার উপর আস্থা রাখিয়া জীবন-রচনার পরিকল্পনা করা যায় না। সে অতিথি হইলে তাহাকে দিবার জন্য একটা ঘর খালি রাখিতে পারা যায়। কিন্তু তাহাকে লইয়া ঘর সংসার করিতে চাওয়া মূঢ়তা।

যাক্‌, খুব এক চোট বক্তৃতা করিয়া লইলাম। বক্তৃতা না করিয়া বর্ণনা করিলে বোধ করি তুমি খুসী হইতে। "বিচিত্রা" মাসিকপত্রে বন্ধুবর অন্নদাশঙ্কর রায়ের লণ্ডন-বর্ণনা তো পড়িতেছ। উহার অধিক কি হইবে? আশা করি তোমার ভাগবত উপলব্ধির বাড়াবাড়ি হইতেছে না ও তুমি পারিবারিক স্বাচ্ছন্দ্য ও শৃঙ্খলা বিধানে ঢিল দিতেছ না। তোমার প্রতিবেশিনীকে আমি চিনি। গৃহকর্ম্মে তাঁহারই মতো মনোযোগী রহিয়াছ তো? ইতি তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী সুধীদাদা।

শ্রীলীলাময় রায়

অমর প্রেম

শ্রীযুক্ত বিনায়ক সান্যাল এম্-এ

১

চঞ্চল জীবনজল পদ্মপর্ণে নীরবিন্দু মত
করে টল'মল্ !
প্রেম সে তো অবিনাশী—স্ফুধা যার দিগন্তবিতত—
চির অচঞ্চল।
জীবনে যৌবনবনে যার সনে মনোবিনিময়,
যার প্রেমমধুপানে মোর প্রাণে সুধার সঞ্চয় ;
মরণে স্মরণে জাগে ধ্যানধন 'অধর', চিন্ময়,
অমেয়, অতল !

২

নরজনমের প্রেম বাসনার আবেশে আবিল,
বেদনায় ম্লান !
শঙ্কায় শিহরে কায়, ভোগশেষে অবশ শিথিল
শূন্য মনঃপ্রাণ !
মৃত্যুপারে লভি যারে চিত্ত দিয়া নূতন করিয়া,
দেহের অতীত গেহে ধরি যারে ধরা পাসরিয়া,
সে আমার মনোময়ী শূন্যপাত্রে দিয়াছে ভরিয়া
অমৃতের দান !

৩

জ্যোতির্ম্ময় ধ্রুবলোকে প্রেম সদা বিচ্ছেদ-বিহীন,
শাশ্বত, সুন্দর !
নন্দন-মন্দার-গন্ধে অন্ধ অলি গুঞ্জে নিশিদিন
আনন্দ-অন্তর !
মৃত্যু সে কি মানবের চিরস্থিতি চরম বিরাম ?
রাকাশেষে অমানিশা, ভানু-অস্তে সান্দ্র তমোধাম ?
অঙ্গুলি-ইঙ্গিতে যার প্রাণস্পন্দ অধীর উদ্দাম,
ধাইতেছে নর ?

৪

নহে, নহে, কভু নহে মৃত্যুপথে তিমিরশর্ব্বরী ;
দিব্যবিভা তার !
বঙ্কিম নয়নকোণে জ্যোতিঃশিখা পড়িছে ঠিকরি'
সুরললনার !
যে-ফুল মুকুলে ঝরে, অর্দ্ধপথে যে গীতি মিলায়,
যে-তরী ডুবিল বেগে ঢেউ লেগে' রূপ-দরিয়ায়
বিফল সকলি হ'ল ? শ্রান্ত পান্থে মরণ ভুলায়,
ব্যর্থ অভিসার !

সুপ্তি শেষে জাগরণ, ধ্বান্ত-অন্তে অরুণ-উদয়—
নবীন জীবন !
মোহ-অন্তে ধ্রুবপ্রেম, প্রতীক্ষান্তে বিপুল বিস্ময়,
সুধু সীধু-ধন !
তাই বুঝি পাতিয়াছ হৃদিমূলে আসন তোমার ?
তাই শুনি তব বাণী মঞ্জুকুঞ্জে, অপূর্ব্ব ঝঙ্কার !
শ্রীঅঙ্গের ঘনগন্ধে অঙ্গে মম লাগে অনিবার
স্বপ্ন-পরশন !

৬

কি যে তুমি ছিলে মোর, কিবা আছ, গেছি সে পাসরি'
তুমি মোর সব !
এ বিশ্বের প্রতিদৃশ্যে বর্ণে গন্ধে দিবা-বিভাবরী
তোমারি উৎসব !
জীবযাত্রা-অবসানে যাব যবে তোমার সকাশে
দীরঘবিরহশেষে ভালোবেসে' ল'বে মোরে পাশে !
নয়নে অমিয় ছানি' অপরূপ রভস-আভাসে
বিলাবে বিভব !

৭

জীবনে আছিলে প্রিয়া মরণে সে হ'লে প্রিয়তমা
পরম শরণ !
ভাষা দিয়ে নাহি পাই, ভাব দিয়ে তাই সৃজি তোমা ;
হে মোর নূতন !
মন্থিয়া স্বপন সিন্ধু পূর্ণ ইন্দু ল'ভেছি মরতে,
পেয়েছি পীযূষ বিন্দু আধিক্লিষ্ট প্রাণের পরতে,
মনে মনে কত কথা, কি সঙ্গীত বসন্ত শরতে ;
বিমূঢ় চেতন !

৮

পরাণের তীক্ষ্ণতম বেদনার অনুভূতি পরে
বিরাজ' চিন্ময়ি !
কল্পরথে নেমে এস রস-ঘন ভাবরূপ ধ'রে,
ধন্য কর অয়ি !
যেথায় র'য়েছ তুমি সুরলোকে সুখস্বপ্নসম
সেথায় কি কোনদিন তব সাথে দেখা হ'বে মম ?
চিনিবে কি বিরহীরে ? পুরিবে কি দুরাশা দুর্দম
দীর্ঘ দুখ সই ?

শ্রীবিনায়ক সান্যাল



শিল্পী শ্রীযুক্ত প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়

এ সংখ্যা 'বিচিত্রা'য় আমরা বিখ্যাত চিত্রকর শ্রীযুক্ত প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়ের আটখানি প্রসিদ্ধ চিত্রের প্রতিকৃতি প্রকাশিত করিলাম। প্রমোদবাবুর আরও অনেকগুলি ছবি আমাদের নিকট সঞ্চিত আছে, ভবিষ্যতে সে গুলিকেও চিত্রশালার মধ্যে প্রকাশিত করিব।

শিল্পী প্রমোদকুমার তাঁহার চিত্রাঙ্কন শক্তির অসাধারণ প্রতিভার শুধু বঙ্গদেশেই নয়, সমগ্র ভারতবর্ষে পরিচিত। শিল্পাচার্য্য শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভারতীয় চিত্রকলায় দীক্ষাপ্রাপ্ত হইলেও তিনি স্বীয় প্রতিভাবলে তাঁহার অঙ্কন প্রণালীর মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্বকীয়তা স্থাপন করিয়াছেন। এমন কি তাঁহার অঙ্কিত ছবিগুলির মধ্যে এরূপ একটি বিশেষ ঠাট গড়িয়া উঠিয়াছে যে, বহু চিত্রের মধ্য হইতে তাঁহার অঙ্কিত চিত্র বাছিয়া লইতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় না। দৃঢ়, বলিষ্ঠ পুরুষের সুগঠিত অবয়ব আঁকিতে প্রমোদকুমার সিদ্ধহস্ত। প্রমোদকুমারের সহিত যাহারা সাক্ষাৎ পরিচয়ে পরিচিত তাঁহারা নিশ্চয়ই তাঁহার মধ্যে একটি সরল অনুরাগী ভারতীয় মনের অস্তিত্ব লক্ষ্য করিয়াছেন। সেই সুস্থ আত্মপ্রত্যয়ী মনই প্রমোদকুমারের চিত্রকলার মধ্যে একটা সুস্পষ্ট সজীবতার সঞ্চার করিতে পারিয়াছে।

অথচ কলিকাতা আর্টস্কুলের পাঁচ বৎসরের শিক্ষা সমাপন করিয়া প্রমোদকুমার যখন স্বাধীনভাবে পাশ্চাত্য প্রথায় তৈলচিত্র এবং অন্যান্য চিত্র অঙ্কিত করিতে আরম্ভ করেন তখন ভারতীয় চিত্রাঙ্কন পদ্ধতিতে তাঁহার কিছুমাত্র অনুরাগ ছিল না। কিছুদিন পরে পারিবারিক দুর্ঘটনার প্রভাবে তিনি গৃহত্যাগ করিয়া প্রায় পাঁচ বৎসরকাল বহু তীর্থ, উত্তরাখণ্ডের অনেক স্থান, হিমালয়, এবং তিব্বতে ভ্রমণ করিয়া কাটান। সেই ভ্রমণকালে নানা মূর্ত্তি, এবং মন্দিরাদি দেখিয়া তাঁহার মনের মধ্যে সোনার কাঠির স্পর্শ লাভ করিয়া ভাবলোকের রাজকন্যাটি জাগিয়া উঠে এবং তিনি তাঁহার অন্তরের প্রকৃত সাধনার পথ দেখিতে পান। দেশে ফিরিয়া প্রমোদকুমার আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া "Indian Society of Oriental Art"এ ছাত্ররূপে প্রবেশ করেন—এবং তথায় ভারতীয় চিত্রকলার সাধনায় প্রবৃত্ত হন।

শিক্ষা সমাপন করিয়া ১৯২২ সালে প্রমোদকুমার মছলিপত্তন অন্ধ্র জাতীয় কলাশালার অধ্যক্ষ হইয়া যান এবং তথায় চার বৎসর অবস্থান করেন। এই চার বৎসরের নিরবসর পরিশ্রম ও সাধনার ফলে সেখানকার বিরুদ্ধ আবহাওয়ার মধ্যে প্রমোদকুমার বঙ্গীয় চিত্রকলার প্রতি অন্ধ্র সাধারণের প্রবল অনুরাগ জাগাইয়া তুলেন এবং কয়েকজন প্রতিভাবান অনুরাগী ছাত্র সৃজন করিয়া ১৯২৬ সালে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। বিদায় কালে একটি বিরাট সভায় প্রমোদকুমারকে অভিনন্দিত করা হয়। তদুপলক্ষে তদ্দেশীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সর্ব্বান্তঃকরণে প্রমোদকুমারের কৃতিত্ব স্বীকার করিয়া যাহা বলেন তাহা হইতে বুঝা যায় অন্ধ্র প্রদেশে প্রমোদকুমার অপরিমেয় প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

অন্ধ্র জাতীয় কলাশালা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পরই প্রমোদকুমার বরোদার কলাভবনের শিল্প বিভাগের প্রধান শিক্ষক হইয়া যান ও তথায় দুই বৎসর অবস্থান করেন। সেখানে শেষ পর্য্যন্ত সাতজন প্রতিভাবান ছাত্র ভারতীয় কলাপদ্ধতির প্রতি বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাদের সমুদয় শক্তি উৎসর্গ করেন। বরোদার কর্ত্তৃপক্ষের ভারতীয় শিল্পের প্রতি তেমন আস্থা না থাকায় এবং পাশ্চাত্য শিল্পের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ থাকায় প্রমোদকুমার আশঙ্কা করেন যে, সেখানে অবস্থান করিলে তাঁহার শিল্পাদর্শ ক্ষুণ্ণ হইবার সম্ভাবনা আছে সুতরাং সেখানকার কার্য্যের ভার তাঁহার এক ছাত্রের উপর অর্পিত করিয়া ১৯২৮ সালে তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন, এবং তদবধি এখানে থাকিয়া স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতেছেন।

শুধু মানস চিত্র আঁকিয়া কোনো শিল্পীর পক্ষে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করা আমাদের দেশে এখনো সম্ভবপর নহে, সেইজন্য প্রমোদকুমার আলেখ্য (Portrait) আঁকিতেছেন। কিন্তু এই আলেখ্যাঙ্কনের মধ্যেও তিনি ভারতীয় কলা পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন।—আমাদের মনে হয় এ দিকে প্রমোদকুমারের উদ্যমই সর্ব্বপ্রথম। প্রমোদকুমারের ন্যায় নিপুণ শিল্পী যে এ বিষয়ে একটা বৈশিষ্ট্য আনয়ন করিবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সম্প্রতি নিজ বাসগৃহ হইতে কিছুদূরে প্রমোদকুমার একটি শিল্পাগার (Studio) তৈয়ার করাইতেছেন। সম্পূর্ণ হইলে তথায় যাইয়া ছাত্রদের শিক্ষালাভ করিবার সুবিধা হইবে। যাহারা নিজ গৃহে চিত্রাঙ্কন শিক্ষা করিতে চান তাঁহাদের গৃহে গিয়া প্রমোদকুমার শিক্ষা দিয়া থাকেন।

আমরা আশা করি প্রমোদকুমারের ন্যায় একজন সুদক্ষ শিল্পাচার্য্যের শিক্ষকতায় শিল্পজগতের কল্যাণ সাধিত হইবে।

সম্পাদক

বিচিত্রা

শ্রীযুক্ত প্রমোদকুমার



সরস্বতী

চিত্রশালা

[illegible]



গজলক্ষ্মী



দুর্গা



বনমালী



কল্কী



ভগীরথ



নরনারী



কৃষ্ণার্জ্জুন

আগে ও পিছে

শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার মণ্ডল বি-এল

১

সহরের বিখ্যাত ব্যারিষ্টার মিঃ সেন তাঁহার পাঠগৃহের আরাম-চেয়ারে বসিয়া শূন্যমনে পাইপে টান্ দিতেছিলেন, এবং সেই উদ্গারিত ধূম রেশমের কুণ্ডলীর মত কেমন ধীরে ধীরে উপরে উঠিতেছিল, তাহাই লক্ষ্য করিতেছিলেন।

সন্ধ্যার পর এই সময়টা তাঁহার পুরাপুরি বিশ্রাম। মক্কেলের প্রশ্ন, আইনের সমস্যা এবং সম্পত্তির চৌহদ্দি-বিবরণ—দিনান্তে শুধু এই সময়টুকুর জন্য তিনি ঐ সমস্ত ব্যাপার হইতে নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন রাখিয়া একান্তভাবে বিশ্রামের কোলে ছাড়িয়া দিতেন। এ সময়ে কোন লোক তাঁহাকে বিরক্ত করিতে সাহস করিত না।......

শীতের রাত্রি। অলসভাবে এইরূপ পড়িয়া-পড়িয়া তাঁহার সামান্য একটু তন্দ্রা আসিয়াছে, এমন সময় একটি লোক ঘরে প্রবেশ করিল। আগন্তুকের শরীর বলিষ্ঠ, বর্ণ সুগৌর; কিন্তু তথাপি যেন তাহাকে অত্যন্ত শীর্ণ দেখাইতেছিল; সেই লাবণ্যময় মুখে যেন রক্তের লেশমাত্র ছিল না।

মিঃ সেন সেই মূর্ত্তি দেখিয়া রীতিমত চমকিয়া উঠিলেন।

—শচীন যে? তুমি এখানে এমন সময়ে? এ মূর্ত্তি কেন তোমার?

শচীন তাঁহার ছোট ভাই। দুইভাইয়ে কয়েক বৎসর যাবৎ দেখাসাক্ষাৎ আদৌ নাই। তার কারণও ছিল অনেক। অদৃষ্ট এবং কর্ম্মফলে দুই সহোদরের মধ্যে এতখানি ব্যবধান পড়িয়া গেছে যে, দুইজনকে সহোদর বলিয়া কল্পনা করাও আর দুঃসাধ্য মনে হয়। মিঃ সেন সহরের বিখ্যাত ব্যবহারজীবী; খ্যাতি, প্রতিপত্তি, ঐশ্বর্য্য, কিছুরই তাঁর অভাব নাই। আর শচীন্দ্র,—প্রথম যৌবনের উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতা তাহাকে গড়িয়া তুলিয়াছিল এক নিঃসম্বল ভবঘুরে,—অতীত এবং ভবিষ্যৎ দু'ই যাহার গাঢ় অন্ধকারে ঢাকিয়া গিয়াছে। মিঃ সেন ভাইকে শুধরাইতে চেষ্টা করিয়াও পারেন নাই; অবশেষে তিনি সম্পূর্ণরূপে হতাশ এবং নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়াছেন।

মিঃ সেন হঠাৎ বলিয়া ফেলিলেন, ব্যাপার কি বল দেখি? তোমার চেহারা এতবেশী খারাপ দেখাচ্ছে যে মনে হচ্ছে, এইমাত্র তুমি কাউকে খুন করে এসেচ!

শচীন্দ্র চমকিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি তাহার ডান হাতের দুইটা অঙ্গুলি তাহার দুই অধরের উপর চাপিয়া মিঃ সেনকে কথা কহিতে নিষেধ করিল।

মিঃ সেন ভ্রাতার খুব কাছে সরিয়া বসিয়া চাপা গলায় বলিলেন,—কি ব্যাপার শীগগীর বল! সত্যিই কি তুমি......

—সত্যি।...কেবল বাঁচবার আশাতে আপনার কাছে ছুটে এসেচি।

অনেকক্ষণ ধরিয়া কক্ষস্থ দুইটী প্রাণীর ভিতর কেহ কোন কথা কহিতে পারিল না। মিঃ সেন হঠাৎ উঠিয়া ঘরের সব দরজা জানালা ভাল করিয়া চাপিয়া বন্ধ করিয়া আসিলেন। তারপর পুনরায় তাঁহার চেয়ারে বসিয়া রুমালে খুব জোরে মুখচোখ মুছিয়া লইয়া বলিলেন, সব বল আমায়।...দেখি, যদি কোনো উপায় করতে পারা যায়।

শচীন্দ্র বলিল,—বল্বার জন্যেই আমি এসেচি। আগে আমায় একগ্লাস জল দিন্!

সোরাই হইতে জল ঢালিয়া মিঃ সেন ভাইকে দিলেন। নিঃশেষে তাহা পান করিয়া শচীন্দ্র যে কাহিনী বলিয়া গেল, তাহার মর্ম্মার্থ এই;—

সোফিয়া নামে একটি মেয়ে, বছর ২০।২১ বয়স তার। জন্মিয়াছিল সে হিন্দুর ঘরে কিন্তু একজন মুসলমান তাহাকে

কুলত্যাগিনী করিয়াছিল এবং পরে তাহাকেই সে বিবাহ করে। সেই হইতে তাহার হিন্দু নাম বদল হইয়া সোফিয়া নামে সে পরিচিতা ···

······হাসান্ তাহাকে স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করিবার পর দুইবৎসর তাহারা একত্রে বাস করে। ক্রমশঃ হাসান তাহার প্রতি অসদ্ব্যবহার আরম্ভ করে, সেই দুর্বৃত্ত মাতালের হাতে বেচারাকে যে কতদিন কত অত্যাচার সহ্য করিতে হইয়াছে, আজও তাহার বিবরণ দিতে-দিতে সে তাহার চোখের জল সংযত করিতে পারে না।···

দুইবৎসর পরে হঠাৎ একদিন হাসান তাহাকে অসহায় অবস্থায় ফেলিয়া নিরুদ্দেশ হইয়া পড়ে। তখন মেয়েটীর বয়স ১৭।১৮ বৎসর।

···হাসানের এক বন্ধু প্রায়ই হাসানের সহিত সেখানে আসিত, হাসানের নিরুদ্দেশের পর সে-ই সোফিয়ার তত্ত্বাবধান করিতে থাকে, এবং কয়েকমাস পরে তাহারই সহিত সোফিয়ার বিবাহ হয়।

এব্রাহিমের সহিত বিবাহের মাসছয় পরে হঠাৎ একদিন কোথা হইতে হাসান আসিয়া হাজির। এব্রাহিম এবং হাসানের সহিত রীতিমত বচসা, এমন কি হাতাহাতি পর্য্যন্ত হইয়া যায়। শেষে এব্রাহিমের নিকট অনেকগুলি টাকা আদায় করিয়া লইয়া হাসান্ খোস্ মেজাজে পুনরায় কোথায় যে চলিয়া যায় কেহ তাহা জানিতে পারে নাই।

···ঐ ঘটনার বছর খানেক পরে এব্রাহিমের মৃত্যু হয়। বেচারা সোফিয়া তখন অকূল পাথারে পড়ে।···এব্রাহিমের বাড়ীঘর কিছুই ছিল না; নিরাশ্রয়া মেয়েটীর তখন অভাবের বশে বাধ্য হইয়া গণিকাবৃত্তি অবলম্বন ছাড়া উপায়ান্তর রহিল না। ···

কিছুদিন যাবৎ শচীন্দ্রের সহিত মেয়েটীর ঘনিষ্ঠতা হইয়াছে। গণিকা হইলেও তাহার স্বভাব, তাহার কথাবার্ত্তা, তাহার ব্যবহার শচীন্দ্রকে মুগ্ধ করিয়াছে। জীবনে সে এমন মিষ্ট ব্যবহার—এমন সহৃদয়তা কাহারও নিকট পায় নাই।

··· ··· ··· গতকল্য রাত্রে সে ঐখানেই ছিল। রাত্রি তখন প্রায় ১২টা। হঠাৎ দ্বারে ঘন-ঘন করাঘাতের শব্দে তাহারা দুইজনেই চমকিয়া উঠে। মেয়েটী গিয়া দ্বার খুলিয়া দিতেই বাড়ীতে প্রবেশ করিল—স্বয়ং হাসান্, রীতিমত মাতাল অবস্থায়। তাহাকে দেখিয়া মেয়েটী ভয়ে জড়সড় হইয়া পড়ে; ছুটিয়া আসিয়া শচীন্দ্রকে বলে, আমাকে বাঁচাও, দুষমন্ আমায় মেরে ফেল্‌বে।

দুর্বৃত্ত হাসান্ শচীন্দ্র ও সোফিয়াকে ফাঁদে ফেলিবার, এমন কি খুন করিবার ভয় দেখাইতে থাকে এবং সোজাসুজি প্রস্তাব করে যে, মোটা রকমের কিছু আদায় পাইলে সে ভালোমানুষের মত কোনো-কিছু গোলযোগ না করিয়া নিজের পথে চলিয়া যাইবে।

এই সব গণ্ডগোলে রাত্রি ২টা বাজিয়া যায়। শেষে যখন দুর্বৃত্ত বুঝিল যে টাকা আদায় হইবার আদৌ কোন সম্ভাবনা নাই, তখন সে হঠাৎ সোফিয়াকে আক্রমণ করিয়া নিদারুণ ভাবে প্রহার করিতে আরম্ভ করে।···

সে দৃশ্য শচীন্দ্রের পক্ষে একেবারে অসহ্য হইয়া উঠে। সে উঠিয়া গিয়া দুইহাতে দুষমনের গলটা ধরিয়া তুলিয়া খানিকটা দূরে সরাইয়া লইয়া গিয়া মেঝের উপর বসাইয়া দেয়। কিন্তু, তাহার দুই হাতের দৃঢ় বেষ্টনীর মধ্য হইতে হাসানের কণ্ঠদেশ মুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার সংজ্ঞাহীন দেহ মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িল। তাড়াতাড়ি শচীন্দ্র তাহাকে পরীক্ষা করিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার আপাদমস্তক শিহরিয়া উঠিল।···

ক্রোধের আতিশয্যে শচীন্দ্র তাহাকে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিয়াছিল।··· ···

রুদ্ধনিঃশ্বাসে মিঃ সেন জিজ্ঞাসা করিলেন, তারপর—?

—তারপর তাকে সেই অবস্থায় তুলে নিয়ে বরাবর রাস্তায় নিয়ে এলুম।

—বল কি?···তারপর?

—রাস্তায় জনপ্রাণী ছিল না।···কাছেই একটা অনেক-দিনের পুরাণো প'ড়ো বাড়ীর প্রকাণ্ড ফটক আছে, সেখানটা গভীর অন্ধকার।...আস্তে-আস্তে সেই ফটকের ভেতর, একপাশে হেলান দিয়ে তাকে বসিয়ে দিলুম।··· ··

—নিশ্চয়ই বল্‌চো কেউ তোমায় দেখ্‌তে পায় নি?

—কেউ না। জনপ্রাণী তখন জেগে ছিল না।

—আচ্ছা। তারপর?

—তারপর আবার তার বাড়ীতে ফিরে গেলুম। সে আকুল হ'য়ে কাঁদতে লাগ্‌লো। আমি কোনরকমে তাকে আশ্বস্ত করে' ভোর হ'তে-না-হতেই সেখান থেকে বেরিয়ে পড়েচি। সমস্তদিন কারো সঙ্গে দেখা করিনি,—এই সন্ধ্যের অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে আপনার কাছে চলে এসেচি। বাঁচবার যদি কোনো উপায় থাকে তো বলে' দিন্, আর যদি না-ই কিছু থাকে, তাহলে সেটাও আমি সোজাসুজি শুন্‌তে চাই।

মিঃ সেন একান্ত স্তম্ভিতভাবে চেয়ারে বসিয়া রহিলেন। এই শীতের রাত্রেও তাঁহার প্রশস্ত ললাট ঘর্মাক্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

পরের দিন রাত্রি। প্রতিদিনের মত আজিও মিঃ সেন সন্ধ্যার সময়টা তাঁহার বিশ্রামঘরে কাটাইলেন বটে কিন্তু যে গভীর সমস্যাজালে তাঁহার মস্তিষ্ক আচ্ছন্ন হইয়াছিল, তাহাতে বিশ্রাম বলিতে কোনো কিছুরই অবসর তাঁহার ছিল না।

শচীন্দ্রকে তিনি বিশেষ করিয়া সাবধান করিয়া দিয়াছেন, যেন সে অন্ততঃ কয়েকদিন সোফিয়ার সহিত দেখা না করে। শচীন্দ্রও তাঁহার কথামত চলিবে বলিয়া শপথ করিয়াছে। একটা কথা মিঃ সেনকে অতিশয় উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছিল যে, সোফিয়া রাত্রবিলাসিনী, সোফিয়া তাঁহার ভ্রাতার অপরাধের কথা জানে এবং সে যদি কাহারও কাছে সে-কথা প্রকাশ করিয়া দেয়? অথবা, পুলিশ যদি তদন্তের তাহার কাছে কোন কথা জিজ্ঞাসা করে,—শচীন্দ্রকে বাঁচাইবার জন্য সে কি এত বড় কঠিন সত্যটাকে গোপন করিয়া রাখিবে?

মাথার উপর বড় ঘড়িটায় ঢং ঢং করিয়া দশটা বাজিয়া গেল। মিঃ সেন হঠাৎ কি ভাবিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। এবং পশমের ওভার কোটটা গায়ের উপর চাপাইয়া ছড়ি লইয়া বরাবর রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইলেন।···

······ঐ ত' সেই শচীন্দ্রের বিবৃত ভাঙ্গা ফটক! খিলানের নীচে গভীর অন্ধকার। মিঃ সেন একবার থমকিয়া দাঁড়াইয়া পরে সেই খিলানের ভিতর ঢুকিয়া পড়িলেন এবং হাতের বৈদ্যুতিক আলোটাকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া জায়গাটার চারিদিক ভাল করিয়া দেখিয়া লইলেন। শচীন্দ্র বলিয়াছিল, পশ্চিমদিকের দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়া মৃতদেহ বসাইয়া রাখিয়াছিল, তাহা হইলে সেটা ঠিক এই জায়গা!···

ওস্তাদ ব্যবহারজীবির সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্নদৃষ্টি লইয়া মিঃ সেন স্থানটা পরিদর্শন করিয়া পুনরায় রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। হঠাৎ তাঁহার নজরে পড়িল, খানিকদূরে একজন পুলিশের জমাদার তাঁহারই দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকাইয়া আছে। তবে তো লোকটা তাঁহাকে অনেকক্ষণ হইতেই লক্ষ্য করিতেছে। এবং না-জানি ঐ খুনের জায়গাটা অমন করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করার কত-না অর্থই সে তার নিজের মনে করিয়া ফেলিয়াছে!···

মিঃ সেনের মাথার ভিতর হঠাৎ যেন একটা গণ্ডগোল হইয়া গেল।·· তাইত! লোকটা তো তাঁহার দিকেই অগ্রসর হইতেছে! যদি কিছু প্রশ্ন করিয়া বসে, কি-ই বা তাঁহার বলিবার আছে?

জমাদার মিঃ সেনের কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া এক দীর্ঘ সেলাম করিল। মিঃ সেন নিজেকে কতকটা প্রকৃতিস্থ করিয়া বলিলেন,—এই জায়গামে লাস মিল্যা—নেহি?

জমাদার কহিল, হুজুর।

মিঃ সেন জিজ্ঞাসা করিলেন,—কোই আদমি পাকড় গিয়া?

—নেহি হুজুর। আভি তক্ কুছ্ পাত্তাভি নেহি মিলা!

মিঃ সেন কেবল একবার মাথা নাড়িয়া ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে পা চালাইয়া দিলেন। এবং খানিক দূরে আসিয়াই আবার দাঁড়াইলেন।

ঐ না সেই পেয়ারাগাছ-ওয়ালা লাল একতলা বাড়ী, দরজায় আলকাত্‌রা দিয়া ৫ নং লেখা? শচীন্দ্র তো ঠিক এই ঠিকানাই দিয়াছিল!

একবার একটু ইতস্ততঃ করিয়া—চারিদিক ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া মিঃ সেন এবং বাড়ীটার ভিতর ঢুকিয়া পড়িলেন।

ভিতর হইতে মিষ্ট গলায় কে সাড়া দিল—কেগা ?

মিঃ সেন কোন উত্তর দিলেন না। অন্তরের ভিতরটা একবার ঘৃণায় কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। যদি কোন লোক তাঁহাকে আজ এই গণিকালয়ে দেখিতে পায়—?

কিন্তু, সবই সহ্য করিতে হইবে সেই হতভাগ্যের জীবনরক্ষার জন্য! যেমন করিয়া হউক, তাহাকে বাঁচাইতেই হইবে!

হ্যারিকেন আলো হাতে একটি মেয়ে বাহির হইয়া আসিল।

কে—কেগা তুমি? শচী—শচীবাবু এলে কি?

মিঃ সেন ঘরের এককোণে গিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। মেয়েটা ঘরের ভিতর ঢুকিয়াই একজন অপরিচিত ভদ্রলোকের মূর্ত্তি দেখিয়া ভয়ে স্তম্ভিত হইয়া গেল।

মিঃ সেন বলিলেন, ভয় পেয়োনা। আমি শচীর আত্মীয় আমি তার বড় ভাই।

মেয়েটী আস্তে-আস্তে মেঝের উপর বসিয়া পড়িল।

মিঃ সেন বলিলেন, তাহ'লে তুমিই সোফিয়া?

—না, ও নামে আর আমায় ডাক্‌বেন না, আমার নাম শেফালি।

—তা বেশ। হ্যাঁ, কি বল্‌ছিলুম, পু-পুলিশ তোমার কাছে আসেনি?

—না, কেউ না।

—এ বাড়ীতে আর কে থাকে?

—আর কেউ না। কেবল একজন বুড়ী চাকরাণী থাকে, সে চোখে একেবারে দেখ্‌তে পায় না।

মিঃ সেন একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ছাড়িলেন।

—আচ্ছা। তোমার স্বামী—হাসান্‌কে কেউ চিন্‌তো এখানে?

—কেউ না, সে তো এখানে থাক্‌তো না।

মিঃ সেন এটুকু পূর্ব্বেই অনুমান করিয়াছিলেন, কারণ, মৃতদেহটাকে কোন লোক হাসান্ বলিয়া সনাক্ত করিতে পারে নাই। তবে সনাক্ত হইবার আশায় পুলিশ মৃতদেহের একটা ফটো তুলিয়া রাখিয়াছে।

মিঃ সেন খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে-ধীরে কহিলেন, তুমি যা'ই হও, তুমি বুদ্ধিমতী। এটুকু নিশ্চয় বুঝেছ, তোমারই কথার ওপর আমার ভাইয়ের জীবন-মরণ নির্ভর কর্‌চে। তোমার মুখের একটা কথাতে সে বাঁচবে কিম্বা তার ফাঁসি হবে।

শেফালি একবার দৃপ্তচক্ষে মিঃ সেনের মুখের পানে চাহিল। বলিল, সবই আমি বুঝি। কিন্তু সে তো শুধু আপনার ভাই নয়। আমার যে সবই এখন তাকে নিয়ে! তার বাঁচামরার সঙ্গে আমার নিজের বাঁচামরাও যে জড়িয়ে রয়েচে! শচী ধরা পড়্‌লে আমিও আর বাঁচ্‌বো না, কিছুতেই বাঁচ্‌বো না!

একটা বারবনিতার মুখে এই উক্তি মিঃ সেনের নিকট একটু বাড়াবাড়ি শোনাইল। কিন্তু, তার সেই শুষ্ক বিশীর্ণ সুন্দর মুখ, সেই বিপর্যস্ত কেশভার, সেই শঙ্কাকুল দৃষ্টি মিঃ সেনকে যেন বলিয়া দিল, শেফালি একবর্ণ মিথ্যা বলে নাই। মনে মনে তিনি বলিলেন, তা সত্যই তো! গতানুগতিক ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া সকল সময় সকল মানুষকে বিচার করা চলেও না, এবং সেটা অন্যায়। শেফালি বারবনিতা বলিয়া তাহার প্রাণের এই স্বতঃউচ্ছসিত সরল উক্তিকে তিনি একেবারেই অবিশ্বাস করিতে পারিবেন না। এই বারনারীর মুখের কথাকে বিশ্বাস করিয়া তাঁহার হৃদয়ে যে শান্তি, সে শান্তি তিনি অপর কোথায় পাইবেন?

হঠাৎ দ্বারের নিকট কাহার পদশব্দ শোনা গেল। মেয়েটী বলিল, কে গা?

মিঃ সেন লজ্জার ভয়ে কাঁপিয়া উঠিলেন। যদি কোন পরিচিত লোক এখানে আসিয়া তাঁহাকে দেখিতে পায়?…

তাড়াতাড়ি সামনের আলোটা নিবাইয়া দিলেন।

পরে দ্বারের নিকট হইতে উঁকি মারিয়া দেখিলেন, উঠানে চাঁদের আলোয় দাঁড়াইয়া পুলিশের সেই জমাদার। সে যেন এদিক-ওদিক তাকাইতেছে এবং কাহাকে খুঁজিতেছে মনে হইল।

শেফালি জিজ্ঞাসা করিল, কি চান্ আপনি?

জমাদার কহিল, কুছ না। দরোয়াজা বন্ধ করো—খুলা রাখো মাৎ! বহুৎ বদ্‌মাসকা আমদানী হোতা!…

বলিয়া জমাদারজী চলিয়া গেল। জমাদারজীর হঠাৎ

এভাবে গায়ে পড়িয়া শেফালিকে সাবধান করিয়া যাওয়ার তাৎপর্য্যটুকু মিঃ সেন বিশেষভাবে উপলব্ধি করিলেন। নিশ্চয়ই সে তাঁহাকে এখানে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছে। ছি ছি, কি লজ্জা!······

তখনি আবার মনে হইল, কিন্তু আসল ব্যাপার টের পাওয়া এই ছাতুখোর জমাদারের পক্ষে অসম্ভব! সে শুধু আজ এইটুকুই জানিয়া গেল যে, সহরের নামজাদা ব্যারিষ্টার মিঃ সেন·········জাহুক্! এতটুক সামান্য দুর্নামকে গ্রাহ্য করা সব সময়ে আদৌ চলে না।

শেফালিকে গুটিকতক অত্যাবশ্যকীয় পরামর্শ দিয়া মিঃ সেন যখন বাড়ীর বাহিরে আসিলেন, তখন আর সে জমাদারকে দেখা গেল না।

৩

দিনদুই পরে একদিন সন্ধ্যার পর মিঃ সেন তাঁহার সান্ধ্য সংবাদপত্রখানি খুলিয়া পাঠ করিতে গিয়া প্রথমেই দেখিলেন—

রহস্যময় হত্যাকাণ্ডের জের!

একজন গেপ্তার!

তাড়াতাড়ি নীচের সে সংবাদটুকু তিনি পড়িয়া ফেলিলেন, তাহা সংক্ষেপে এই—মৃতব্যক্তির ফটো দেখিয়া নসীরাম পাল নামক একজন লোক এই বলিয়া সনাক্ত করিয়াছে যে, ঘটনার দিন সন্ধ্যার সময় এই লোকটা নসীরামের দেশী মদের দোকানে মদ খাইয়া পয়সা দিতে না পারার জন্য নসীরামের সহিত তাহার বচসা হয় এবং নসীরাম তাহাকে আটক করে। পরে লোকটা তাহার একটী সোণার অঙ্গুরীয় নসীরামের নিকট বাধ্য হইয়া রাখিয়া যায় এবং ঘণ্টাখানেক পরে পুনরায় আসিয়া নসীরামের প্রাপ্য মিটাইয়া দিয়া অঙ্গুরীয় ফেরৎ লইয়া যায়। মৃতদেহ খানাতল্লাসীর সময়ে তাহার কোন অঙ্গুরীয় পাওয়া যায় নাই, কিন্তু সম্প্রতি পুলিশ সন্দেহপূর্ব্বক গোবর্দ্ধন বেরা নামক একটা ভবঘুরেকে গ্রেপ্তার করিয়াছে, তাহার নিকট একটি সোণার অঙ্গুরীয় পাওয়া গিয়াছে এবং সেই অঙ্গুরীয় উক্ত নসীরাম পাল মৃতব্যক্তির বলিয়া সনাক্ত করিয়াছে। উপরোক্ত গোবর্দ্ধন বেরাকে পুলিশ দাগী চোর বলিয়াও সন্দেহ করে। তাহারই দ্বারা উক্ত স্বর্ণাঙ্গুরীর লোভে এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। কিন্তু গোবর্দ্ধন বেরা বলে যে ঘটনার দিন শেষরাত্রে সে মৃতদেহের হাত হইতে ঐ স্বর্ণাঙ্গুরীয় খুলিয়া আত্মসাৎ করিয়াছিল মাত্র।

উপর্য্যুপরি দুই তিনবার সংবাদটা পাঠ করিয়া মিঃ সেন কাগজখানা ধীরে ধীরে টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া মুদ্রিত নয়নে সিগার টানিতে লাগিলেন। এবং কিছুক্ষণ এইরূপ থাকিবার পর তিনি হঠাৎ আপনার মনেই হাসিয়া উঠিয়া চক্ষু চাহিলেন এবং কাগজখানা তুলিয়া লইয়া পুনরায় ঐ স্থানটায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন। মনে মনে বলিলেন, চমৎকার! ভগবান্ আমার ভাইকে রক্ষা করিয়াছেন!

··কিন্তু···ঐ গোবর্দ্ধন বেরা?···ঐ নিরপরাধ—সম্পূর্ণ নিরপরাধ লোকটা?·

বিবেককে জোর করিয়া থামাইবার চেষ্টা করিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, নিরপরাধ? কখনই না। যে লোক মড়ার দেহ হইতে অলঙ্কার চুরি করিতে পারে, তার মত নীচ —তার মত ঘৃণ্য অপরাধী আর কে আছে?

ভিতরের মানুষটা অতি ক্ষীণ অথচ তীক্ষ্ণ হাসি হাসিয়া কহিল, কিন্তু, তাহার শাস্তি কি মৃত্যু?

মিঃ সেন শিহরিয়া উঠিলেন। পর মুহূর্ত্তেই বলিলেন, মৃত্যু? কে বলিল? এ মোকদ্দমায় তাহার শাস্তি হওয়াই অসম্ভব।···সে ও মুক্তি পাইবে, উপরন্তু শচীও নিরাপদ হইবে। ইহার অপেক্ষা আশাপ্রদ অবস্থা আর কি হইতে পারে?···চমৎকার!···

দরজা ঠেলিয়া কে একজন ভিতরে প্রবেশ করিল। মিঃ সেন লাফাইয়া উঠিলেন। পরক্ষণেই কিন্তু সংযত হইয়া কহিলেন, এই যে, তুমি? এস, এস, ভাল করে দরজা বন্ধ করে' দাও।

দরজা বন্ধ করিয়া শচীন্দ্র দাদার সামনে আসিয়া বসিল। মিঃ সেন একমুখ হাসিয়া বলিলেন, পড়ে দেখ। এর চেয়ে আর কি সুখবর শুনতে চাও? বলিয়া তিনি উপরোক্ত সংবাদ-স্তম্ভটা ভ্রাতার চোখের সামনে মেলিয়া ধরিলেন।

শচীন্দ্র রুদ্ধ-নিঃশ্বাসে পাঠ করিয়া যখন মিঃ সেনের সহিত চোখোচোখি চাহিল, তখন তাহার মুখের চেহারা দেখিয়া মিঃ সেনের সহাস্য দৃষ্টি অন্তর্হিত হইল। শচীন্দ্রের মুখ বিবর্ণ—তাহার দৃষ্টি ঝাপসা হইয়া উঠিয়াছিল—বুঝিবা তাহার কষ্ট-নিরুদ্ধ অশ্রুধারা এইক্ষণেই অজস্রপ্রবাহে ঝরিয়া পড়ে। কিন্তু, সে তো আনন্দাশ্রু নহে! তাহার ঐ ব্যথা-কাতর বিশীর্ণ মুখে—ঐ অর্থহীন সজল চাহনিতে যে পুলকের লেশমাত্র নাই!···

সুচতুর মিঃ সেন মুহূর্ত মধ্যে ভ্রাতার মনোভাব বুঝিয়া লইয়া গম্ভীরভাবে কহিলেন, দেখ, সংসারে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার মধ্যে সার্থকতা যে কতখানি, সেটা তোমরা বোঝো না বলেই তোমার আজ এই অবস্থা! তাই, তোমরা সংসারের কোনো কাজে ত' লাগলেই না, নিজেরও কোনো কাজে এলে না!···আমি তোমাকে অনেক দিন অনেক রকমে শোধরাবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু কোন কথা তুমি শোননি। আজ আমি যা বলি, তা তোমাকে শুন্‌তে হবে, শুন্‌বে কি?

শচী নতমস্তকে জবাব দিল, শুন্‌বে।

—তা যদি শোন, তাহ'লে আমার প্রথম কথা এই আমার অনুরোধই বল আর আদেশই বল,—যেমন করেই হোক্ তোমাকে বাঁচতে হবে। আর তার জন্যে তোমার নিজের বুদ্ধি খাটালে চল্‌বে না, হুবহু আমার কথা মত কাজ করে' যেতে হবে।

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শচী একবার চোখ তুলিয়া বলিল, কিন্তু, সেই লোকটার যে ফাঁসী হবে!

—অসম্ভব, আমি বলছি অসম্ভব। এই প্রমাণের ওপর তার সাজা হ'তেই পারে না।···তা ছাড়া, সেই হীন বদমাস্‌টার ওপর কোন লোকেরই সহানুভূতি থাকা তো উচিত নয়! দাগী চোর, না আছে খাবার সংস্থান, না আছে মাথা গোঁজবার জায়গা, মরা মানুষের দেহ থেকে জিনিষ ছিনিয়ে নিতে যে এতটুকু দ্বিধা করে না, তার ওপর দয়ামায়া কিসের?

শেষের কথাগুলা শচীন্দ্রের মনে কোন দাগ বসাইতে না পারিলেও এই একটা কথাই তাহার মনের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ধ্বনিত হইতে লাগিল, 'অসম্ভব! এই প্রমাণের ওপর সাজা তার হ'তেই পারে না!'

তাহার দাদা মিঃ সেন সহরের প্রধান ব্যারিষ্টার, তিনি যখন এতটা জোরের সহিত এই মামলার ফলাফল নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন, তখন তাহার ব্যতিক্রম হইবার আদৌ সম্ভাবনা নাই!

অম্বর-জোড়া মেঘের কোন্ ফাঁকে ফাঁকে কোথাকার একটু জ্যোৎস্নারশ্মি দেখা দিল। তাহারই অনিবার্য্য মাদকতায় শচীন্দ্র বিভোর হইয়া পড়িল।

৪

তিনচার মাস অতিবাহিত হইয়াছে।

পুলিশের অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি ভ্রান্ত পথে বহুদূর অগ্রসর হওয়ায় শচীন্দ্র নিজেকে অনেকখানি নিরাপদ অনুভব করিতেছিল।

দাদার অজ্ঞাতে পুনরায় সে কয়েকদিন শেফালির সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিল, শেফালিও তাহার পেলব বাহুলতার আবেষ্টনে তাহার বহুদিনের নিরুদ্ধ অশ্রু-প্রবাহে অভিষিক্ত করিয়া তাহাকে জানাইয়াছিল, আর অধিক দিন তাহার দেখা না পাইলে নিশ্চয়ই সে আত্মহত্যা করিত।···

দীর্ঘ দিনের পরে আবার মিলনের এই তরল অগ্নিস্রোতে নিজেকে স্নাত করাইয়া শচীন্দ্র মনে-মনে বলিয়াছিল, দাদার কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। নিজেকে বাঁচাইয়া রাখার চেয়ে বড় সার্থকতা আর মানুষের কিছু নাই—কিছু নাই!···হাঁ, আমি বাঁচিতে চাই, তা সে যেমন করিয়াই হোক্!

সেদিন সারারাত্রি শেফালির বাড়ীতে কাটাইয়া সকালে শচীন্দ্র তাহার বাসার দিকে চলিয়াছিল। বেলা প্রায় তখন ৮টা। চৌমাথায় দাঁড়াইয়া একজন কাগজওয়ালা হাঁকিতেছিল, "কালীঘাট খুনের মামলার রায়! ফাঁসীর হুকুম বেরুল বাবু!"

শচীন্দ্র মূর্ত্তির মত নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইল। পকেট হাতড়াইয়া দেখিল, মাত্র দুইটা পয়সা পড়িয়া আছে। ছুটিয়া গিয়া একখানা বাঙ্গলা কাগজ কিনিয়া এবং সন্তর্পণে তাহা বগলে চাপিয়া লইয়া দ্রুতপদে বাসার দিকে চলিল।

····সত্যই ফাঁসী !·· তাহা হইলে দাদার ভবিষ্যৎ বাণী নিষ্ফল হইয়াছে ! মূর্খ লোকগুলা বিচারের আসনে বসিয়া এমনি করিয়া নির্দ্দোষের শাস্তি বিধান করিল।···

নির্জ্জন ঘরে বসিয়া শচীন্দ্রের দুইচোখ দিয়া দর্ দর্ করিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

অনেকক্ষণ এমনি ভাবে নীরবে চোখের জল ঢালিয়া শচীন্দ্র চোখ মুছিল। বিবেককে সজোরে কশাঘাত করিয়া একবার বলিতে চাহিল, 'হতভাগা দাগী চোরের উপর আবার দয়ামায়া কিসের ? সংসারের কারও উচিত নয় এমন লোকের উপর সহানুভূতি করা !' · কিন্তু, কে যেন তাহার টুঁটি চাপিয়া ধরিল। কে যেন বজ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, তুই খুনে, আর সে সামান্য চোর বৈত নয়। অর্থাভাবে—ক্ষুধার তাড়নায় সে হয়ত চুরির সুযোগ ছাড়িতে পারে নাই—এই মাত্র ! তোর চেয়ে কিসে হীন—কিসে ঘৃণ্য সে ? কোন্ অজুহাতে তুই তাহার মাথায় নিজের অপরাধের বোঝা চাপাইয়া মারিতে বসিয়াছিস্ ?

দুই হাঁটুর উপর মুখ গুঁজিয়া সেই মুদিত চক্ষের অন্ধকারের মধ্যে শচীন্দ্র নানা রকমের বিভীষিকা দেখিতে লাগিল।···সে খুনে, তাহার অপরাধের পরিসীমা কোথায় ? সে তো শুধু হাসানকে হত্যা করে নাই ! ঐ নিরপরাধ গোবর্দ্ধন বেবাকে ফাঁসি কাঠে তুলিয়া হত্যা করিতে চলিয়াছে সে-ই, আর তো কেহই নহে। বিচারক ? তাহারা তো শুধু বিচারই করিয়াছে, ঈশ্বরের আদালতে তাহাদের তো কোন কৈফিয়তের দায়িত্ব নাই !···কিন্তু, শচীন্দ্র ! তাহার কি বলিবার আছে ? কিছু নাই, কোন দিকে কিছুই তো নাই !

এমনি করিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতিবাহিত হইয়া গেল। চাকর আসিয়া ভাত খাইবার জন্ম তাগাদা দিয়া গেল, ভিতর হইতেই সে বলিল, সে অসুস্থ, খাইবে না।···

বেলা প্রায় ৪।৫ টার সময় সে দ্বার খুলিল। তখন তার মুখের চেহারা বর্ষার ধারা বর্ষণের শেষে মেঘমুক্ত আকাশের মত নির্ম্মল, এবং তাহারই মত উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট ! তাহার মনের দৃঢ়তা তাহার মুখে-চোখে, তাহার ভঙ্গিমায়, তাহার প্রতি পাদক্ষেপে প্রকট হইয়া উঠিতেছে।

সন্ধ্যার আলো প্রজ্জ্বলিত হইবার পূর্ব্বেই সে শেফালির বাটীতে হাজির হইল এবং পকেট হইতে খবরের কাগজখানা খুলিয়া তাহাকে ঐ শোচনীয় সংবাদটুকু পড়িয়া শুনাইল। শেফালী বিবর্ণ মুখে হতবুদ্ধির মত তাহার মুখের পানে শুধু চাহিয়াই রহিল।

অনেকক্ষণ কেহ কোন কথাই কহিল না।

হঠাৎ শচীন্দ্র শেফালীর দু'খানি হাত চাপিয়া ধরিয়া তাহার চোখের উপর নিজের অবিচলিত দৃষ্টি রাখিয়া বলিল, —জীবনে অনেক পাপ করেচি, কিন্তু এতবড় পাপ করতে পারবো না।···আজ তাই তোমার কাছে আমি ছুটী চাইতে এসেছি। · এই দেখ বিষ ; সব তৈরী ! শুধু তুমি আমায় ছুটী দাও !

তাহার হাতের সেই নীল কাগজের মোড়কটার পানে চাহিয়া শেফালী আপাদমস্তক শিহরিয়া উঠিল।···

—ছুটী ?·· প্রাণ থাক্‌তে তা দিতে পারবো না। আমায় মেরে ফেলে তবে তুমি ছুটী নিতে পাবে। নইলে আমাকে তুমি কার কাছে রেখে যাবে ? · যেতেই যদি চাও, তবে আমাকেও সঙ্গে নিয়ে চল !···

শচীন্দ্রের গলা জড়াইয়া ধরিয়া সে আকুলভাবে কাঁদিতে লাগিল। তাহার সে ক্রন্দনে ছলনার লেশমাত্র ছিল না।

শচীন্দ্র লাফাইয়া উঠিল।···

—পারবে যেতে ?···হ্যাঁ, আমারও মনে হয়। তাই তোমার যাওয়া উচিত। পরে একটু নীরব থাকিয়া কহিল, তোমার আমার দুজনেরই বড়ই দুর্ভাগা জীবন শেফালি ! বুঝিবা প্রথম জীবনে তোমার আমার দেখা হয়নি ব'লেই আমরা দু'জনেই এমনি করে পাঁকের পথে ছিটকে এসে পড়েচি। কিন্তু আজ, আজ আবার এ জীবনের চাকাকে টেনে তুলে ভালো পথে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব।··· একমাত্র পথ এই। তোমার আমার দুজনেরই···

শেফালী চোখ মুছিয়া স্থির হইয়া বসিল। তাহার মুখে-চোখে তীব্র জ্যোতি ! ধীরে ধীরে বলিল,—চল, চল, আমার হাত ধরে' তুমি নিয়ে চল সেই পথেই !—

উন্মত্ত আনন্দের আতিশয্যে শচীন্দ্র তাহাকে বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া চুম্বনে চুম্বনে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিল।

গোবর্দ্ধন বেরার ফাঁসির হুকুমে আর একজন অতিমাত্রায় বিচলিত হইলেন, তিনি মিঃ সেন। ক্ষণকালের জন্য ঐ হতভাগ্য নির্দ্দোষ লোকটার শোচনীয় পরিণামের জন্য তাঁহার বুকের ভিতরটায় মোচড় দিয়া উঠিল। বিচারটা যে আগা-গোড়াই অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছে, তাহা তিনি নিজেরই মনে বারম্বার বলিলেন। আপীল করিলে যে হাইকোর্ট হইতে এ আসামী খালাস হইবে, সে সম্বন্ধে সন্দেহই নাই।

কিন্তু অতি শীঘ্রই শচীন্দ্রের কথা ভাবিয়া তিনি অপর সকল কথা বিস্মৃত হইয়া গেলেন। ভাইকে বাঁচাবার একান্ত আগ্রহের চাপে পড়িয়া গোবর্দ্ধন বেরার প্রতি সহানুভূতি কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল। ভগবান্ শচীন্দ্রকে রক্ষা করিয়াছেন,—এইটাই তাঁহার কাছে যে সব চেয়ে বড় লাভ!

···শচীন্দ্রের সহিত কিছুদিন যাবৎ সাক্ষাৎ হয় নাই; এ সংবাদ পাইয়া নিশ্চয়ই সে তাঁহার নিকট ছুটিয়া আসিবে! নিশ্চয়ই সে বেশ একটু বিচলিত হইয়া পড়িবে! কিন্তু·· উপায় কি? তিনি তাহাকে আশ্বস্ত করিবেন!

কাছারী হইতে ফিরিয়া মিঃ সেন প্রতিক্ষণেই শচীন্দ্রের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া গেল, রাত্রি গভীর হইল, শচীন্দ্রের দেখা নাই। মিঃ সেন মনে মনে বলিলেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সে নিজেই নিজেকে আশ্বস্ত করিয়াছে। আর এতদিনে তাহার মনের সে দুর্ব্বলতা আপনিই কাটিয়া গিয়াছে। হয়ত এতদিনে সে পূর্ব্বেরই ন্যায় আবার আমোদের স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়াছে!

রাত্রে কিন্তু মিঃ সেনের ভাল নিদ্রা হইল না। নানা দিক দিয়া মনকে প্রবোধ দিলেও এই একটা খট্‌কা যেন কিছুতেই সরিতে চাহিল না, কেন সে একবার আমার সহিত খা পর্য্যন্ত করিল না? এতটা নির্ব্বিকার সে কেমন ' হইল?

তারের আলো ভাল করিয়া ফুটিতে না ফুটিতেই ঠিয়া পড়িলেন। এবং তাড়াতাড়ি মুখহাত ধুইয়া বদলাইয়া একেবারে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলেন। শচীর বাসায় যে তাহার দেখা মিলিবে না, এটা তিনি নিজের মনেই স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। সুতরাং একখানি ট্যাক্সি লইয়া বরাবর কালীঘাটের দিকে অগ্রসর হইলেন।

শেফালির বাড়ীর খানিকদূরে ট্যাক্সি ছাড়িয়া দিয়া পদব্রজে শেফালির বাড়ীর সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তখনো পথে অন্য কোন লোকই নাই, পাড়ার সব বাড়ীই তখন সুখসুপ্ত।

দ্বারে করাঘাত করিতে গিয়া দেখিলেন, ভিতরে অর্গল নাই, দ্বার খুলিয়া গেল। ব্যাপারটা একটু অসাধারণ এবং বিসদৃশ বোধ হইল। ধীরে ধীরে তিনি ভিতরে ঢুকিয়া গিয়া শেফালির ঘরে প্রবেশ করিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, ঘরের দরজাও ভিতর হইতে বন্ধ ছিল না!

সামনেই—খাটের উপর মশারি টাঙ্গানো এবং মশারির ভিতর দুইটি মূর্ত্তি—কী নিশ্চিন্ত গভীর নিদ্রায় তাহারা মগ্ন!

কিছুক্ষণ স্তব্ধের মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া মিঃ সেন হাতের ছড়ি দিয়া মশারিটা তুলিয়া ফেলিলেন। শেফালি এবং শচী! এ কি সত্যই তাহারা নিদ্রিত? না, ·

ওটা কি বালিশের উপর? একখানা চিঠিই তো! ক্ষিপ্রহস্তে মিঃ সেন চিঠিখানা খুলিয়া ফেলিলেন। তাহাতে লেখা ছিল:—

"গত ১৯শে অগ্রহায়ণ রাত্রে কালীঘাটের নিকট যে একটা অজ্ঞাত লোকের মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছিল, তাহার নাম সেখ হাসান্! তাহাকে খুন করিয়াছিলাম আমি—গলা টিপিয়া মারিয়াছিলাম। গোবর্দ্ধন বেরা বা পৃথিবীর অপর কোন লোকের এই হত্যার সহিত কোনরূপ সংশ্রব ছিল না।···পৃথিবীর অপর পারে কি আছে জানি না, ভয় হয়, তাই শেফালিও আমার সঙ্গে চলিল।

· এই চিঠি প্রথম যাঁহার হাতে পড়িবে, অনুগ্রহ করিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ ইহা পুলিশের হাতে দিয়া মুমূর্ষুর এই শেষ অনুরোধ রক্ষা করিবেন।···

শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেন।"

মিঃ সেনের প্রতি শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। তাড়াতাড়ি তিনি চিঠিখানা বুক পকেটে পুরিয়া ফেলিলেন;

বারেকমাত্র এই হতভাগা যুবক যুবতীর পানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন, এবং পরে যেমন নিঃশব্দে আসিয়াছিলেন, তেমনি নিঃশব্দে সজল চোখে বরাবর বাড়ীর বাহির হইয়া গেলেন।

*　　*　　*　　*

বাড়ীতে আসিয়া পৌঁছিতেই প্রথম দেখা হইল তাঁহার বড় মেয়ে রেবার সহিত। রেবার বয়স ১৫।১৬ বৎসর, বিবাহ হয় নাই, বাপের বড় আদরের মেয়ে এই রেবা। সে তাহার পিঠের বেণী দুলাইয়া চোখ ঘুরাইয়া মৃদু ভর্ৎসনার সুরে কহিল, কোথায় গিয়েছিলেন বলুন তো ভোর হ'তে-না-হ'তেই! আমরা সব এম্‌নি ভাব্‌চি!

মিঃ সেন মেয়ের মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন, একটা ভারী জরুরী কাজ আছে মা। আমি এখন আমার পড়বার ঘরে খানিক বসবো। সকলকে বারণ করে দিস, কেউ যেন আমাকে এখন বিরক্ত না করে,—হাজার দরকারেও না।

এত বড় কাজটা যে কি, তাহা না বুঝিলেও ইহার গুরুত্বটা সম্বন্ধে রেবার সন্দেহ বা প্রশ্ন করিবার উপায় রহিল না। 'আচ্ছা' বলিয়া সে বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল।

ঘরের ভিতর একটি সোফার উপর গা ঢালিয়া দিয়া মিঃ সেন চিঠিখানা পুনরায় চোখের সাম্‌নে মেলিয়া ধরিলেন। ··যাক্‌! এত চেষ্টা করিয়াও শচীকে রক্ষা করা গেল না! সকল দুশ্চিন্তার হাত এড়াইয়া লোকনিন্দার বহুদূরে সে সরিয়া গিয়াছে!

···গোবর্দ্ধন বেরা বাঁচিয়া গেল! এই চিঠি—এই চিঠিই তাহার গলা হইতে ফাঁসির দড়ি খুলিয়া তাহাকে মুক্তি দিবে। ···কি আশ্চর্য্য! এই এক টুকরা কাগজের উপর একটা লোকের জীবন-মরণ নির্ভর করিতেছে! আর সেটা এখন তাঁহারই হাতে!

শচীর শেষ অনুরোধ, এই চিঠি যেন বিনা বিলম্বে পুলিশের হাতে দেওয়া হয়! তাহা হইলে তো আর বিলম্ব করা চলে না!

সাম্‌নের ক্লক দেখিলেন,—৮টা বাজে!···

কিন্তু একটা কথা! নিজের আমার যাওয়া উচিত কি না। পুলিশের নিকট এই চিঠি পৌঁছিবামাত্রই সহরে বিষম সোরগোল পড়িয়া যাইবে। সকলেই জানিবে, আজই সন্ধ্যার সংবাদপত্রে বড় বড় হরফে ছাপা হইবে। আমার ভাই—বিখ্যাত ব্যারিষ্টার মিঃ ডি-সেনের সহোদর শচীন্দ্র সেন একজন হত্যাকারী। শুধু তো তাই নয়, এই হত্যার পিছনে যে পঙ্কিল কাহিনী প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে, তাহাও জানিতে আর কাহারও বাকী থাকিবে না। সহরের একটা নগণ্য বেশ্যার জন্য যে খুন করিয়াছে এবং অবশেষে সেই বেশ্যাটারই গলা জড়াইয়া ধরিয়া যে আত্মহত্যা করিয়াছে, সে—সে আর কেউ নয়, মিঃ ডি-সেনের সহোদর!

জনসাধারণের নিকট ব্যাপারটা খুবই মুখরোচক লাগিবে সন্দেহ নাই, কিন্তু, মিঃ সেনের নিজের দিক দিয়া দেখিতে গেলে ইহা তাঁহার আজীবনের সুনাম, ঐশ্বর্য্য, যশ সকলকেই মলিন করিয়া তুলিবে।

তাছাড়া, পুলিশের সেই জমাদারটা যখন এই খবর পাইবে? সেদিন রাত্রে লোকটা যে তাঁহাকে শুধু ঐ শেফালির ঘরে দেখিয়াছিল, তাহা নয়, তাহার অল্পক্ষণ পূর্ব্বেই ঘটনাস্থলে ঘুরিয়া বেড়াইতেও দেখিয়াছিল। কি ভাবিবে সে? ইহার একমাত্র সিদ্ধান্ত এই হইবে যে, মিঃ সেন বরাবরই তাঁহার ভ্রাতার কীর্ত্তির কথা জানিতেন, এবং সমস্ত জানিয়া বুঝিয়া তিনি তাহাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। আর একথাটা চারিদিকে আগুনের মত ছড়াইয়া পড়িতে আদৌ বিলম্ব হইবে না। কোন-কোন কাগজওয়ালা হয়ত নানারকমে ইহার উপর টীকা-টিপ্পনী কাটিতেও ছাড়িবে না। এবং তাহার ফল যে কতদূর গড়াইতে পারে, তাহা কে বলিবে?

মিঃ সেন উত্তেজিতভাবে রুমালে ঘন ঘন মুখ চোখ রগড়াইয়া লইলেন।

··এই চিঠি—এই চিঠি একদিকে যেমন গোবর্দ্ধন বেরার পুনর্জ্জীবন আনিয়া দিবে, অপরদিকে তেমনি মিঃ সেনের ভবিষ্যৎ জীবনের চারিপাশে উদ্গার করিবে রাশি রাশি গরল বৈত নয়! দুর্নাম, কুৎসা, হয়ত বা তাহার ফলে তাঁহাকে তাঁহার ব্যারিষ্টারিতে পর্য্যন্ত ইস্তফা দিতে হইবে। হয়ত লোক-সমাজে মাথা উঁচু করিয়া চলিবার পর্য্যন্ত শক্তিটুকুও তাঁহার অবশিষ্ট থাকিবে না। এই একটা ঘটনার ফলে তাহার সমস্ত পরিবারের উপরই একটা কলঙ্কের মসী এমন

ভাবে অঙ্কিত হইয়া যাইবে যে, তাহা মুছিয়া ফেলিবার কোনো উপায়ই আর থাকিবে না।·· বেবা—ঐ আনন্দের প্রতিমূর্ত্তি স্নেহময়ী রেবা—উপযুক্ত স্থানে তাহাকে পাত্রস্থা করিবার সময় হইয়াছে, এই কলঙ্কের পর হয়ত কোন সুপাত্রই তাহাকে বিবাহ করিতে চাহিবে না।

·· ভাবিতে ভাবিতে মিঃ সেনেব সমস্ত শরীর ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিল। তিনি উঠিয়া আপন মনে পায়চারী করিতে লাগিলেন। এবং কিয়ৎক্ষণ পরে হঠাৎ কি ভাবিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার সুগঠিত দীর্ঘ দেহ ঋজু হইয়া উঠিল। কঠোর দৃঢ়ভাব স্বরে তিনি বলিয়া উঠিলেন, অসম্ভব! কোনো উপায় নাই! জানিয়া বুঝিয়া এ মরণবাণ আমি নিজের বুকে নিক্ষেপ করিতে পারিব না। সৌভাগ্য আমার যে, এ চিঠি সর্ব্বপ্রথমে আমার হাতেই পড়িয়াছে, নহিলে এতক্ষণ—

নিজেরই মনে তিনি শিহ্‌রিয়া উঠিলেন।

—না, না, যাহা অনিবার্য্য, তাহাকে ঠেকাইয়া রাখিবার ক্ষমতা কাহারও নাই! · ঐ গোবদ্ধন বেবা! একটা দুর্দ্দান্ত চোর, মড়ার দেহ হইতে অলঙ্কার আত্মসাৎ কবিতে যার একবিন্দু বাধে না, নামহীন, মর্য্যাদাহীন, ঐ একটা নীচ আবর্জ্জনার জন্য খেদ করিবারই বা কি আছে? কিছু নাই। ইহা শুধু দুর্ব্বলতার নামান্তর মাত্র!

তা ছাড়া ফাঁসির হুকুমই যে উহার রদ হইবে না, ইহারই বা নিশ্চয়তা কোথায়? আমি নিজে তাহার আপীল করিব। আপীলে তাহাকে বাঁচাইব!·· কিন্তু, এই চিঠির দ্বারা তাহার বাঁচিবার কোন উপায় নাই! · অসম্ভব!···অসম্ভব!!···

·· সামনেই একটা বাতিদান ছিল, মিঃ সেন দিয়াশলাই বাহির করিয়া বাতি জ্বালিলেন, তাহার পর সেই অগ্নিশিখার মুখে শচীন্দ্রের সেই পত্রখণ্ডটুকু জ্বালাইয়া দিলেন।

অগ্নির ক্ষুধিত শিখা পরমানন্দে সেই কাগজখানা ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিতে লাগিল, আর তাহারই পানে নিমেষহীন দৃষ্টিতে মিঃ সেন চাহিয়া রহিলেন।

ভিতর হইতে কে যেন তাঁহাকে বলিতে লাগিল, এগিয়ে চল্, ঐ আগুনেরই মত সর্ব্বগ্রাসী পূর্ণতেজে বুক বাঁধিয়া এগিয়ে চল্, ওরে এগিয়ে চল্!

* John Gulsworthy-র গল্প হইতে ভাব গৃহীত।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার মণ্ডল

বিশ্বপ্রকৃতি ও সত্যেন্দ্রনাথ

শ্রীযুক্ত কনক বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশ্বপ্রকৃতির চেয়ে পুরাতন পদার্থ জগতে আর কিছুই নেই; মানব মনও অতি পুরাতন। বিশ্বপ্রকৃতি নিত্যনিরন্তর পরিবর্ত্তনশীল, দেশ ও কালে বিচিত্র; মানবও দেশে কালে বিচিত্র; তাই মানব প্রকৃতির শোভা সন্দর্শন ক'রে চিরকাল মুগ্ধ হয়ে এসেছে এবং তার সেই মনের আনন্দ নানা ভাবে প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছে। যে লোক সেই প্রকাশ সুন্দর করে' তুলতে পেরেছে সেই কবি নামে অভিহিত হয়েছে; যিনি যত সুন্দর ক'রে বিশ্ব-শোভা বর্ণনা করেন তিনি তত বড় কবি বলে পরিচিত ও সমাদৃত হন। কিন্তু বিশ্বপ্রকৃতি অতি পুরাতন এবং মানুষের সৌন্দর্য্যসম্ভোগও তার আদিমতম প্রবৃত্তি; এই জন্যেই নূতন ভাবে সেই সৌন্দর্য্য-সম্ভোগের আনন্দ ব্যক্ত করা কবিদের একটি কঠিন সাধনার বিষয় হয়ে আছে। এই জন্তে Emerson বলেছেন যে ভাব চিরপুরাতন, তার নব নব প্রকাশ-ভঙ্গিমাই কবিত্ব, এবং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ সকল কবির হয়ে দুঃখ ক'রে বলেছেন—

"হায় কবি হায়, সে হতে প্রকৃতি হয়ে গেছে সাবধানী,—
মাথাটি ঘেরিয়া বুকের উপরে আঁচল দিয়েছে টানি'॥
যত ছলে আজ যত ঘুরে মরি জগতের পিছু পিছু
কোন দিন কোন গোপন খবর নূতন মেলে না কিছু॥

*   *   *

মনে হয় যেনো আলোতে ছায়াতে রয়েছে কি ভাব ভরা,—
হায় কবি হায় হাতে হাতে আর কিছুই পড়ে না ধরা॥"

সত্যেন্দ্রনাথ একটি সুনিপুণ সূক্ষ্ম দৃষ্টি নিয়ে প্রকৃতির অন্তঃপুরে প্রবেশলাভ করেছিলেন, এবং বিচিত্র মধুর ছন্দে প্রকৃতির অন্তঃপুরের নিগূঢ় সংবাদ প্রকাশ ক'রে রেখে গেছেন তাঁর কাব্যের পাতায় পাতায়। তিনি তাঁর কবি-মন নিয়ে প্রকৃতির ভাণ্ডারের "মণি-অতুলন" সঞ্চয় করে' করে' নিজের ভাণ্ডারের "মণি-মঞ্জুষা" পূর্ণ করেছেন—"ভাণ্ডারে মণি রেখেছি মঞ্জুষায়।" এই সব অতুলন মণি তিনি পেয়েছেন কতক বা "পথের ধারে" আর কতক বা "মিল্লি-মল্লিকা-তলে"; তুষার কণায় কবি কত সৌন্দর্য্যের বৈদূর্য্যমণি চয়ন করেছেন এবং—

"কত সে দিয়েছে রৌদ্রে তামাটে মাটি,

*   *   *

কত সঙ্গীত এসেছে বাতাস ব'য়ে।"

কবি স্বীকার করেছেন,—"কিছু কিছু এনেছি গো অঞ্চলে
লভিয়াছি সব গানের রাখালী করে,'
গানের মাণিকে দুই মুঠা গেছে ভরে'।"

অতি সাবধানী প্রকৃতির রহস্য উদ্ঘাটনের কঠিন সাধনায় প্রবৃত্ত হয়ে' কবি বলেছেন—

আঁধারে গোপন রবে চিরদিন কি এ?
চাবিটি ঘুরায়ে খুলিতে যে মন চায়।"

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথকে উদ্দেশ ক'রে বলেছিলেন,—

"এ সুন্দরী ধরণীরে ভালবেসেছিলে। তাই তারে
সাজায়েছ দিনে দিনে নিত্য নব সঙ্গীতের হারে।"

কবি সত্যেন্দ্রনাথের নব নব সঙ্গীত উথলে উঠেছিল প্রকৃতির বর্ষা বসন্তের লাস্য-লীলা দেখে আর 'কুহু ও কেকার' আনন্দ-ঝঙ্কার শুনে; কবির 'বেণু ও বীণার' ঝঙ্কারে প্রকাশ পেয়েছে 'বাতাসে যে আলয়হীনা ব্যথা' ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছিলো; যে রহস্য বনের অগাধ অতল দেশে লুকানো ছিলো, তাকেও ভাষা দিতে "বেণু সে ফুকারি বাজে।" বিশ্ব-প্রকৃতির প্রাণের সাড়া রূপ-বৈচিত্র্য ও লাস্য-লীলা কবি মনে প্রাণে অনুভব করতে পেরেই লিখেছেন—

"পরাণ আমার শুনেছে সে মধু বাণী
ধরিবারে তাই চাহে সে তাহারে গানে,

হে মানসী দেবী! হে মোর রাগিণী-রাণী!
সে কি ফুটিবে না বেণু ও বীণা'র তানে?

বিশ্বপ্রকৃতি বিচিত্র ও অপরূপ! এই বিশ্বপ্রকৃতি নানা ভাবে কবিকে কত কি যেন ইঙ্গিত করেছে আর কবিও তার সব-কিছু যেন সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে না পেরে লিখেছেন—

"সাঁঝে আজ কিসের আলো,
ভুলালো মন ভুলালো।
... .
মরি কার পরশমণি
গগনে ফলায় সোনা!
হৃদয়ে নূপুর-ধ্বনি—
অজানার আনাগোনায়!"

কিন্তু তাঁর কবিতা পড়লেই বুঝতে পারা যায় যে তাঁর মধুময়ী কবিবীণার সহস্র তারে অনুরণিত হয়েছে প্রকৃতির অন্তরতম বাণী। বিশ্বপ্রকৃতির চরম রূপমাধুর্য্য ও আনন্দধারা সত্যেন্দ্রনাথের কাব্য-সাহিত্যে বেশ অপূর্ব্ব ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে দেখা যায়। তাঁর 'ভোরাই' নামক কবিতাটিতে তিনি তাঁর কাব্য-তুলিকার কয়েকটি টানে ভোরবেলাকার বিশিষ্ট রূপটিকে কেমন সরস-সুন্দর ভাবে আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন!—

"ভোর হ'লরে ফর্সা হ'ল, দুল্‌ল উষার ফুল-দোলা!
আন্‌কো আলোয় যায় দেখা ওই পদ্মকলির হাই-তোলা!
জাগ্‌ল সাড়া নিদ্‌মহলে অথই নিথর পাথার জলে—
আলপনা দেয় আল্‌তো বাতাস, ভোরাই সুরে মন ভোলা!

শিশির কণায় মাণিক ঘনায়, দুর্ব্বাদলে দীপ জলে!
শীতল শিথিল শিউলি-বোটায় সুপ্ত শিশুর ঘুম টলে!
আলোর জোয়ার উঠ্‌ছে বেড়ে গন্ধ ফুলের স্বপন কেড়ে,
বন্ধ চোখের আগল ঠেলে রঙের ঝিলিক্ ঝল্‌মলে!

প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর যে অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ তা তাঁর বহু কবিতার মধ্য দিয়ে অপূর্ব্বভাবে ফুটে উঠেছে। তা'র মধ্যে 'আন্‌গগনের আলো' একটি। প্রকৃতি কবিকে আনন্দ ধারায় স্নান করিয়ে তন্ময়তা দেয় বলে'ই তিনি লিখেছেন—

—"আমার কুঞ্জে লতার দুয়ার নিবিড় ছিল না ভালো,
তাই ফাঁকি দিয়ে পশেছে আজিকে আন্‌গগনের আলো;
স্বজনি লো—শঙ্খ বাজা,—
আজি আসিয়াছে হৃদয়ে আমার, আমার হৃদয়-রাজা!
অরুণ চরণে শরৎ-প্রভাত,—
আজি এল যেন তারি সাথে সাথ,
তারি সাথে সাথ নিবাত সলিলে
জ্বলিয়া উঠিল আলো;
শুষ্ক হিয়ার দুকূল প্লাবিয়া কিরণে ভরিয়া গেল।"
... ...
ছিঁড়ে দিলে তুমি সব বন্ধন, তুমি কেড়ে নিলে বাসা!
শরতের আলো—ত্রিলোক জুড়িয়া—
তারি সাথে হিয়া গেল যে উড়িয়া,
বাতাসে চড়িয়া আর কত দূর
ছুটিব তোমার পাছে,
কোথা যেতে চাও, কোথা লয়ে' যাও,
হায় গো কাহার কাছে!

এ যেন রবীন্দ্রনাথের মানস-সুন্দরীর নিরুদ্দেশ-যাত্রার নূপুর শিঞ্জন! কখনো কখনো দেখি যে কবি সত্যেন্দ্রনাথ বিশ্ব-প্রকৃতির সৌন্দর্য্য ও ভাবের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে' প্রকৃতির বিভিন্ন রূপকে বিশ্লেষণ করছেন, আর মনে হয় সে যেন তার কতকালের পরিচিতা। চামেলী ফুলের সঙ্গে তাঁর যে আলাপ তা যেন কত পরিচিতার সঙ্গে—তিনি বলছেন—

"চামেলী তুই বল্,—
অধরে তোর কোন্ রূপসীর রূপের পরিমল্!
.. ..
কোন্ তরুণীর তরুণ মনে
জাগ্‌লি রে কোন পরমক্ষণে,
বাইরে এলি বল্ কেমনে
সঙ্কোচে বিহ্বল!"

সত্যেন্দ্রনাথের প্রকৃতি সম্বন্ধীয় সকল কবিতারই ভাষা মসৃণ, ও অতি সাধারণ কথার সমষ্টিকে তিনি কারুকার্য্যে

সাজিয়েছেন। প্রকৃতির বর্ণনায় তাঁর সব কবিতা রূপ ও রসে টলমল, তার কারণ তিনি শুধু কথার তুলি দিয়ে প্রকৃতির স্বচ্ছ চিত্রটিকে আঁকেন নি। প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের প্রতি কবির অশেষ অনুরাগ ও অনুভূতি ছিল ব'লেই তাঁর বর্ণনার মধ্যে তাঁর দেওয়া চিত্রের সঙ্গে সঙ্গে আমরা একটা সঙ্গীত ধ্বনি অনুভব করি। এই সঙ্গীতের ফলেই তাঁর সব কবিতা প্রাণময় হ'তে পেরেছে, কোথাও এতটুকু দীনতা প্রকাশ পায় নি। বিশ্বপ্রকৃতির মাঝে প্রাণের যে অব্যাহত গতি ও আনন্দের লীলা বয়ে' চলেছে তা কবি সত্যেন্দ্রনাথ অনুভব করেছিলেন, এবং শুধু তাই নয়, বিশ্বপ্রকৃতির সেই বৃহৎ আনন্দ-উৎসবে কবির প্রাণ সাড়া দিয়েছে বলেই তিনি লিখতে পারলেন—

—"ধানের ক্ষেতের সবুজে কে আজ সোহাগ দিয়ে ছুপিয়েছে!
সেই সোহাগের একটু পরাগ টোপর-পানায় টুপিয়েছে।
আলোয় মাঠের কোল ভরেছে   অপরাজিতায় রং ধরেছে—
নীল কাজলের কাজল লতা আস্‌মানে চোখ ডুবিয়েছে।

শুধু যে এখানেই আমরা প্রকৃতির চিত্রের সঙ্গে সঙ্গে একটা সুর অনুভব করি তা নয়, তাঁর আরও অনেক কবিতাও এমনি ধারা সুরময় হয়ে উঠেছে, যেমন—

হোথা বরষার ঘন-যবনিকা-খানি
সহসা গিয়েছে খুলি,
হোথা ঘাসের সায়র ফেনিল করেছে
কাশের মুকুলগুলি।
ওই তুলি-সমতুল সাদা কাশ-ফুল
আলো করে' আছে ধূলি,
যেন শারদ জোছনা অমল করিতে
ধরণী ধরেছে তুলি!

আবার আর এক জায়গায় বর্ষার আগমন-বার্ত্তা কেমন সুরময় হয়ে' উঠেছে—

—মেঘলা থম্‌থম্ সূর্য্য ইন্দু
ডুবল বাদ্‌লায়, দুলল সিন্ধু!
হেম কদম্বে তৃণ গুম্বে
ফুটল হর্ষের অশ্রুবিন্দু!
মৌন নৃত্যে মগ্ন খঞ্জন,
মেঘ-সমুদ্রে চল্‌ছে মন্থন!
দগ্ধ-দৃষ্টি বিশ্ব-সৃষ্টির
মুগ্ধ নেত্রে স্নিগ্ধ অঞ্জন।
গ্রীষ্ম নিঃশেষ! জাগ্‌ছে আশ্বাস!
লাগ্‌ছে গায়-কার দৈবী নিশ্বাস!
চিত্ত-নন্দন দৈবী চন্দন
ঝর্‌ছে বিশ্বের ভাস্‌ছে দিশ্‌পাশ!
ভাস্‌ছে বিলখাল ভাস্‌ছে বিলকুল!
ঝাপ্‌সা ঝাপটায় হাসছে জুঁইফুল!
... .

ভাষায় দীপ্তিতে ছন্দের মাধুর্য্যে ও দৃষ্টির স্বচ্ছতায় সত্যেন্দ্রনাথের "সবুজ পরী" কবিতাটি তাঁর সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে বেশ চমৎকার ভঙ্গীতে প্রকাশ পেয়েছে। সবুজ-শোভা বিভ্রমে ধরণীকে শ্রীমণ্ডিত ক'রে' তোলবার জন্ম কবি সবুজ পরীকে অনুরোধ করছেন।—এই কবিতাটির মধ্যে দেখ্‌তে পাই প্রকৃতি তাঁর কল্পনাকে কতখানি মহিমান্বিত করেছে।—

"সবুজ পরী! সবুজ পরী! সবুজ পাখা দুলিয়ে যাও,
এই ধরণীর ধূসর পটে সবুজ তুলি বুলিয়ে দাও।
তরুণ-করা সবুজ সুরে
সুর বাঁধ গো ফিরে ঘুরে
পাগল আঁখির পরে তোমার যুগল আঁখি ঢুলিয়ে চাও।"

এই 'সবুজ পরীর' আঁখির চাহনিতে সর্ব্বত্র তারুণ্যের সাড়া পড়্‌বে—সবুজ কুঞ্জবনের বুকভরা সোহাগ উথলে উঠ্‌বে, কারণ সর্ব্বত্র···"সবুজ ক'রে শিস্ দিয়েছে সুন্দরী।" এই "সবুজ পরী" প্রকৃতিকে সঞ্জীবতা ও আনন্দ দান করে—কবি বলেন, এই সবুজের নিত্যকর্ম্ম হচ্ছে—

"যৌবনেরে যৌবরাজ্য
দেওয়া তোমার নিত্য কার্য্য,
পান্না তোমার শ্যামল পত্র, নিশান তৃণ-মঞ্জরী।"

এই "সবুজ পরী" নূতন সুরের উদ্গাত্রী—রামধনুকের রং নিংড়ে "রাঙায় ধরার মলিন শাড়ী।" এই "সবুজ পরী"কে কবি প্রকৃতির সর্ব্বত্র বিকশিত দেখ্‌ছেন—

"সবুজ পাখীর বাবুই-ঝাঁকে
দেখ্‌তে আমি পাই তোমাকে।"
… … … …
"সবুজে তোমার দোব্‌জাখানি—আলো ছায়ার সঙ্গমে—
জলে স্থলে বিশ্বতলে লুটায় বিভোল বিভ্রমে!"

বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে তাঁর নিবিড় আত্মীয়তার ফলে কখনো কখনো প্রকৃতির ডাকে তাঁর ঘরে থাকাই দায় হয়ে উঠেছে—

"পারব না একলাটি আজ ঘরে পারব না রইতে!
চাঁদ ডাকে পাপিয়াকে ছুটো কথা কইতে!
… … … …
খিল খোলা ফর্দাতে যাব চল, সাধ জেগেছে!
রইবে কে ঘরে আজ চাঁদ ডেকেছে!

কবি রবীন্দ্রনাথও বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে এইরকম একাত্মতা অনুভব করেছেন। তিনিই সত্যেন্দ্রনাথের মতন কবিপ্রাণকে ঘরছাড়া হয়ে নিজেকে বিশ্বশোভায় নিমজ্জিত ক'রে দেবার জন্ত ডাক দিয়ে বলেছেন—

"ওরে যাব না আজ ঘরে রে ভাই, যাব না আজ ঘরে,
ওরে আকাশ ভেঙে বাহিরকে আজ নেবো রে লুঠ করে!"

পূরবীতে "মাটির ডাক" নামক কবিতায় নিজেকে সর্ব্বত্র বিলিয়ে দেবার ব্যাকুলতা বেশ প্রকাশ পেয়েছে—

"যাই ফিরে যাই মাটির বুকে
যাই চলে যাই মুক্তি সুখে
… … …
আজ্‌কে মাঠের ঘাসে ঘাসে
নিঃশ্বাসে মোর খবর আসে
কোথায় আছে বিশ্বজনের প্রাণ।"

তারপর "বসুন্ধরা" কবিতাতেও তিনি প্রকৃতির নিকট নিবেদন করেছেন—

"আমারে ফিরায়ে লহ অয়ি বসুন্ধরে,
কোলের সন্তান তব কোলের ভিতরে
বিপুল অঞ্চল-তলে।"

অতি তীক্ষ্ণ অনুভূতি ছিল বলে' কবি সত্যেন্দ্রনাথও প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিয়ে নিজেকে বিশ্বপ্রকৃতির আনন্দ-উৎসবে বিলিয়ে দিতে চেয়েছেন।

ভোরের সঙ্গে গান করে, ফুলের সঙ্গে হাস্যালাপ ক'রে, বর্ষার নৃত্যচপল চলার সুরে হৃদয়-বীণার তার ঝঙ্কৃত করে', প্রকৃতির রসধারার অনন্ত হিল্লোলে কবি-হৃদয় ভাসমান। বিশ্বপ্রকৃতিকে তিনি প্রাণ দিয়ে ভালোবাস্‌তেন; তাই প্রকৃতি সম্বন্ধে যে অনুভূতি তাঁর জেগেছে তা তীক্ষ্ণ ব'লেই, তার সকল সৌন্দর্য্য নানা বৈচিত্র্য নিয়ে ফুটে উঠেছে। বিশ্বপ্রকৃতির সকল দিকেই আমরা সহজ আনন্দের প্রকাশ দেখি—এই সহজ আনন্দ এমন কি প্রকৃতির অন্তরের সুরটি পর্য্যন্ত কবি সত্যেন্দ্রনাথের কবিতার ভাষায় ও ছন্দে বর্ত্তমান।

তারপর, ঋতুর দিক দিয়ে আমরা সত্যেন্দ্রনাথের কাছ থেকে অনেক কবিতা পাই। বর্ষা, বসন্ত, শরৎ, শীত, গ্রীষ্ম —সকল ঋতুই তাঁর কবি-কল্পনাকে প্রভাবান্বিত করেছে এবং এই সব নানা ঋতুর বৈচিত্র্যময় রূপ দেখে কবির বিমুগ্ধ মন কল্পনার জাল বুনেছে। তাঁর

"চলার পথের আগে আগে
ঋতুর ঋতুর সোহাগ জাগে!"

গ্রীষ্মের বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি গ্রীষ্ম- দিনের গম্ভীর উগ্র চিত্রটিকে হুবহু ফুটিয়ে তুলেছেন আর সঙ্গে সঙ্গে গ্রীষ্মের ভিতরকার একটা দীর্ঘশ্বাসের সুরও সেই কবিতার ভিতর থেকে পরিস্ফুট হয়েছে—

হায়!
বসন্ত ফুরায়!
মুগ্ধ মধু মাধবের গান
ফল্গু সম লুপ্ত আজি মুহ্যমান প্রাণ।
অশোক নির্ম্মাল্য-শেষ, চম্পা আজি পাণ্ডু হাসি হাসে,
ক্লান্ত কণ্ঠে কোকিলের যেন মুহুর্মুহু কুহুধ্বনি নিবে নিবে আসে!
দিবসের হৈম জ্বালা দীপ্ত দিকে দিকে, উজ্জ্বল জাজ্বল-অনিমিখ
নিঃশ্বসিছে নিঃস্ব হাওয়া, হুতাশে মূর্চ্ছিত দশদিক!
রৌদ্র আজি রুদ্র ছবি, আকাশ পিঙ্গল,
ফুকারিছে চাতক বিহ্বল,—
খিন্ন পিপাসায়;
হায়!

এর অন্তরালে কবির দীর্ঘনিশ্বাসের একটা অস্পষ্ট স্পর্শ একটা উদাস সুরের আমেজ আমরা অনুভব করি।

বর্ষার উদ্দামতার দিকটাই প্রথমে আমাদের চোখে পড়ে। বর্ষার মেঘ-গর্জ্জন ও ঝঞ্ঝার মধ্যে যথেষ্ট উগ্রতা আছে, কিন্তু কবি সত্যেন্দ্রনাথ এমন মধুরভাবে সেই উগ্রতাটুকুকে কবিতাতে ফুটিয়ে তুলেছেন, মনে হয় যে বর্ষার রুদ্রতার মধ্যে ক্রীড়াময় ভাবই বেশী। তিনি বর্ষার দিকে চেয়ে বলেছেন—

"মাঠের পারে দাঁড়িয়েছিল ঈশান কোণেতে,—
বিশাল-শাখা, পাতায় ঢাকা শালের বনেতে ;
হটাৎ হেসে দৌড়ে এসে খেয়ালের ঝোঁকে,
ভিজিয়ে দিলে ঘরমুখো ঐ পায়রা-গুলোকে !
বজ্রহাতের হাততালি সে বাজিয়ে হেসে চায়,
বুকের ভিতর রক্তধারা নাচিয়ে দিয়ে যায় ;
ভয় দেখিয়ে হাসে আবার ফিক্‌ফিকিয়ে সে !
আকাশ জুড়ে চিক্‌মিকিয়ে চিক্‌মিকিয়ে রে !"

শুধু তাই নয়, কবি জানেন যে বর্ষার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির রসের ধারা রঙীন হয়ে ওঠে। সেইজন্য বর্ষার ভিতরকার "শান্তির বারতা"কেও কবি ছন্দে প্রকাশ করেছেন—

কাঁপে তরু, পুলকে আপ্লুত পুষ্পলতা ;
বৃষ্টিধারা উঠে নাচি' বায়ুর প্রহারে,
বাতাহত—বর্ষাহত—শ্যাম সরোবরে
সু-যৌবনা শ্যামাঙ্গীর লাবণ্য-গৌরতা !

তীর-বনচ্ছায়া-নীল, শ্যামল কোমল,
বৃষ্টিপাতে সরসীর বিকাশে মাধুরী !

এই "শান্তির বারতা" বর্ষা আনে বলে'ই বিশ্বপ্রকৃতিতে হর্ষের তুফান ওঠে, বিশ্বপ্রকৃতি আবার তাপার্ত্ততা ও ক্লিষ্টতা থেকে মুক্ত হয়ে' সবুজ সতেজ হয়ে ওঠে। বর্ষার এই যে নূতন রূপ, এটিকেও কবি সুন্দরভাবে চিত্রিত করেছেন—

শ্লথ পরিণত— কদম-কেশর
ঝরিছে এ-পাশে ও-পাশে ;
মৃদু-বিকশিত কেতকীর রেণু
ফরিছে বাতাসে বাতাসে।

মেঘ আসে যায় বারেবার,
ঝরে বারিধারা, কদম-কেশর,
মিলে মিশে একাকার।
… … … …
নূতন হয়েছে পুরাণো,
চোখের উপরে বেড়ে উঠে ধান,—
দায় হ'ল আঁখি ফিরানো।

শরতের উৎফুল্লতা ও উৎসবের দিকটি সত্যেন্দ্রনাথের "শরতের হাওয়ায়" ও "চিত্র-শরৎ" কবিতার ভিতরে সঞ্চিত হয়ে রয়েছে—

—"এই নিরাকুল হাওয়া ফিরিছে নীরব ভুবনে ঢেউ তুলি'
বনে সকল যন্ত্রে একা কে যন্ত্রী বুলায় অঙ্গুলী !
তাহারি মন্তরে
সুষমা সঞ্চরে ;
তবু শেফালী তেমন হ'লনা বন্ধু যেমন বান্ধুলী !
সে কথা কই ভুলি ?
… … … …
হায় ধ্বনিয়া ওঠে না কি এক মোহন মন্তরই
শারদ দিন ভরি' !

তাল-বাকলের রেখায় রেখায় গড়িয়ে পড়ে জলের ধারা,
সুর-বাহারের পর্দ্দা দিয়ে গড়ায় তরল সুরের পারা !
দিঘির জলে কোন পোটো আজ আঁশ ফেলে কি নক্সা দেখে,
শোল-পোনাদের তরুণ পিঠে আল্‌পনা সে যাচ্ছে এঁকে !
ডাল্‌পালাতে বৃষ্টি পড়ে শব্দ বাড়ে খড়্‌কি-খড়ি,
লক্ষ্মীদেবীর সাম্‌নে কারা হাজার হাতে খেল্‌ছে কড়ি !
হঠাৎ গেল বন্ধ হ'য়ে মধ্যিখানে নৃত্য খেলা,
ফেঁসে গেল মেঘের কানাৎ, উঠ্‌লো জেগে আলোর মেলা।

শরতের চিত্রে রূপমুগ্ধ কবি সত্যেন্দ্রনাথ, শরৎ-সুন্দরীর উৎফুল্লতা ও উৎসবের দিকটি দেখেই ক্ষান্ত নেই। দরদী কবির শরৎবর্ণনার মধ্যে, শরতের হর্ষবিষাদমিশ্র সদাপরিবর্ত্তন-পরায়ণ স্বরূপটি ধরা পড়ে' গেছে, যেমন—

"এই যে ছিল সোণার আলো ছড়িয়ে হেথা ইতস্তত,—
আপনি খোলা কমলা-কোয়ায় কমলা-ফুলি রোয়ার মত,—

এক নিমেষে মিলিয়ে গেল মিশমিশে ওই মেঘের স্তরে
গড়িয়ে যেন পড়্‌ল মসি সোনায় লেখা লিপির পরে।

… … … …

কালো মেঘের কোলটি জুড়ে আলো আবার চোখ চেয়েছে!
মিশির জমী জমিয়ে ঠোঁটে শরৎ-রাণী পান খেয়েছে!
মেশামিশি কান্নাহাসি মরম তাহার বুঝ্‌বে বা কে!
এক চোখে সে কাঁদে যখন আরেকটি চোখ হাসতে থাকে!

শরতের স্বরূপ—এই যে আলো ছায়ার খেলা—এটি কবিতার মধ্যে কেমন সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হয়েছে! শরৎ ঋতু কবিকে মুগ্ধ করেছে বলে' তিনি লিখেছেন—

… … …

দাঁড়াও, তোমায় দেখি খানিক
নয় তো আমায় সঙ্গে নাও!
ডাক দিয়েছ একেবারে
সকল ঘরের দ্বারে দ্বারে,
কুবের-পুরীর সোনার রাশি
দ্বারে দ্বারেই লুটিয়ে দাও!

… … … ..

সোনার তুলি বুলিয়ে ধানে
ঢেউয়ের তানে দুলিয়ে যাও!

সকল ঋতুর মধ্যে কবির অনুরাগ বসন্তের উপরে সকলের থেকে বেশী। অন্যান্য সব ঋতুর বর্ণনা তিনি প্রাণখুলে করেছেন—সেই সব কবিতার মধ্যে কবির রূপমুগ্ধতার পরিচয়ও আমরা যথেষ্ট পাই। কিন্তু বসন্তকে কবি ছাড়্‌তে চান না—

কবি হতাশ হয়ে' বলেছেন—

"এমন ফাগুন দিন হয় বুঝি অবসান!"

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ যেমন হতাশ হয়ে একদিন গেয়ে উঠেছিলেন—

"কখন বসন্ত গেল, এবার হলো না গান!
কখন যে ফুলফোটা হয়ে গেল অবসান!"

সত্যেন্দ্রনাথ বসন্তকে আহ্বান করে' বলেছেন—

বাসন্তিকা! বাসন্তিকা!

দুখানি তোর রঙীন পাখা
দুলিয়ে দে!
হাস্‌নুহানার গন্ধেতে ভোর
প্রাণের পরে স্বপ্নেরি ঘোর
বুলিয়ে রে!

এই বসন্তের আগমনে বিশ্বপ্রকৃতি নূতন হয়ে উঠ্‌ছে আর কবিও তার আগমন-বার্ত্তা টের পেয়ে বল্‌ছেন—

কখন এলে গো ফাগুন বাতাস
ওগো চির সুমধুর!
কখন রিক্ত লতারে পরায়ে
দিলে এ রতন চূড়!
পথে প্রান্তরে ঝলমল করে
ফুলকাটা কিঙ্খাব,
আমের মুকুলে অশোক-বকুলে
তোমারি আবিভাব!

এই বসন্তের সঙ্গে বিচ্ছেদ কবির কাছে মোটেই আনন্দদায়ক নয় তাই তিনি বলেছেন—

"এবার ফাগুন ফির্‌লে পরে,—
ছাড়্‌ব নারে—রাখব ধরে'।"

এই যে বসন্তের সৌন্দর্য্যকে চিরদিন উপভোগ কর্‌বার প্রবল আগ্রহ এ জিনিষটি তার অন্যান্য ঋতুর কবিতায় পাই না।

বিশ্বপ্রকৃতির শোভা দেখে যেখানেই মানুষের আনন্দ ও তৃপ্তি পাবার কথা তার সবই কবি সত্যেন্দ্রনাথ সুন্দর ভাষায় ও ছন্দে প্রকাশ করে গেছেন। কবির অতি তীক্ষ্ণ অনুভূতি খুঁজে খুঁজে বিশ্বপ্রকৃতির নানা রহস্যকে কবিতায় ফুটিয়ে তুলেছে। বিশ্বপ্রকৃতির অনেক রহস্যের মাঝখানে তিনি বেশ একটু নূতন ভাবে দৃষ্টিপাত করেছেন। যেমন, বৈশাখের রুদ্রতাকে অস্বীকার করে' তিনি বলেছেন—

"বৈশাখ শুভ বৈশাখ তুমি
দেব-করুণায় মাখা
মর্ত্তলোকের দুয়ারে রোপিত
কল্পতরুর শাখা।

কে বলে তোমারে রিক্ত ?
... ...
চম্পকে তুমি ফুল ধরায়েছ,
রসালে রঙীন ফল,
দীপ্তি তোমার রূপের মন্ত্র
ঝঞ্ঝা তোমার ছল।"

কিন্তু যে কবি একদিন বিশ্বপ্রকৃতিকে এতখানি দরদ ও অনুভূতি নিয়ে সাজিয়েছিলেন, আজ বাংলা দেশ দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁকে হারিয়েছে। আজ 'বর্ষার নবীন মেঘের' আবির্ভাবে কবির সাড়া নেই। শরৎ উৎসব-সাজে শেফালি ফুলের সাজি নিয়ে কবির সঙ্গে মিলনের আশায় তাঁর রুদ্ধদ্বারে দেখা দেবে, কিন্তু—

"কবি, আজ হ'তে সে কি
বারে বারে আসি তব শূন্যকক্ষে, তোমারে না দেখি
উদ্দেশে ঝরায়ে যাবে শিশির-সিঞ্চিত পুষ্পগুলি
নীরব সঙ্গীত তব দ্বারে ?"

শ্রীকনক বন্দ্যোপাধ্যায়

ঋতু-রূপ

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

কাঁপ্‌ছ তুমি রুদ্ধ অধীর কোপে ;
চক্ষু দুটি জ্বলছে তোমার বদ্ধ দোষারোপে !
এমনি ব্যাপার দেখেচি রে,
গ্রীষ্মদিনে নদীর তীরে,
তপ্ত-বালির রেখা যেমন
তীক্ষ্ণ হ'য়ে কাঁপে,
তেমনি তুমি কাঁপ্‌ছ তোমার অধীর ক্রোধের তাপে !

কাঁদছ তুমি রুদ্ধ নীরব দুখে।
চক্ষু হ'তে অশ্রু ঝ'রে পড়ছে মলিন মুখে।
তমস-ঘেরা শ্রাবণ মাসে
বর্ষা যেন ঘনিয়ে আসে,
সিক্ত তরুর শাখা হ'তে
বিন্দু বারি ঝরে ;
অশ্রু তোমার গড়িয়ে প'ড়ে দুঃসহ দুখ ভরে !

হাসছ তুমি সুখে, অসীম সুখে !
চক্ষু দুটি চপল খেলা করছে সকৌতুকে !
তাই দেখে মোর পড়ছে মনে
শরৎকালের পুষ্প-বনে
প্রভাত সূর্য্য করে যেমন
পুষ্পগুলি হাসে,
তেমনি তোমার শান্তমুখে হাস্য পরকাশে !

মগ্ন তুমি গুপ্ত প্রহেলিকায় !
চক্ষু দুটি লক্ষ্যহারা খেলছে চপল শিখায়।
হেমন্তেরি কুজ্ঝটিকা
চক্ষে লাগে ঝাপ্‌সা ফিকা,
লুপ্ত ধরা, স্বপ্ন সম,
শুভ্র আবরণে ;
তেম্‌নি তুমি মগ্ন তোমার অনির্দ্দিষ্ট মনে।

মৌন তুমি নিবিড় অভিমানে।
চক্ষু তোমার নিমীলিত কি দুঃখে কে জানে !
হিম-স্নাত পুষ্প মত
সঙ্কুচিত সংজ্ঞাহত,
অসাড় তোমার নীরব হৃদয়
শতেক আকিঞ্চনে ;
রুদ্ধ যেন কঠিন কলি শিশিরমাখা বনে।

ফুল্ল তুমি মল্লিকারি সম,
চক্ষু দুটি স্নিগ্ধ-জ্যোতি শান্ত মনোরম।
স্পর্শ তোমার মলয় যেন,
হাস্য ফুটে পুষ্প হেন,
বসন্তেরি শোভা তোমার
নেত্র মাঝে ঢালা ;
দুলছে তোমার দেহ-লতা ছয়টি ঋতুর মালা।

স্বপ্ন-মোহ

শ্রীযুক্ত হরগোবিন্দ সেন

এতদিন পরে গাঝের ছোট বাড়ীটাকে যেন অকস্মাৎ বিদ্রূপ করিতেই পাশের দুই বড়-বাড়ী মাথা চাড়াইয়া উঠিল।—একতলা বাড়ী তিনতলা হইল। দুই বাড়ীর বড়-বড় কথা, তীক্ষ্ণহাসি,—ছোট-বাড়ীর মাথা ডিঙাইয়া আনাগোনা করে।—উহারাই আজ নিকট প্রতিবেশী! হয় ত এতদিন ঐ ক্ষুদ্র বাড়ীটা তাহাদের পরস্পরের দৃষ্টিরোধ করিয়া দম্ভই প্রকাশ করিতেছিল, আজ তাহারা সেই ব্যবধান-দম্ভকে দলিত করিরা, আগ্ বাড়াইয়া পরস্পর মিলিত হইল!

ছোট বাড়ীর বিজন আপন মনেই গজ্ গজ্ করিতে থাকে,—"বাড়ীটাকে অন্ধকার ক'রে ছাড়লে!—যেন ওরাই পৃথিবীর মালিক!" থাকিয়া থাকিয়া একটা অক্ষমরুদ্রতা তাহার বুকের ভিতর জাগিয়া উঠিয়া আবার আপনিই থামিয়া যায়।

মাথার উপর সহসা কে যেন কলকণ্ঠে হাসিয়া ওঠে! বিজন চাহিয়া দেখে, বড় বাড়ীরই একটা মেয়ে।—সামনের বাড়ীর জান্‌লা তো একটিও খোলা নাই!—তবে?

নিজেদের অপ্রশস্ত আঙিনাটি ততোধিক অপরিচ্ছন্নতায় ভরিয়া উঠিয়াছে। তাহারই পাশে ফালি-রোয়াকটিতে বৌদি একমনে তরকারি বলিয়া রাজ্যের জঞ্জল কুটিয়া চলিয়াছে। হয় ত তাই দেখিয়াই—

কিন্তু মেয়েটা তখন চলিয়া গিয়াছে। উঠানের মাথার ঐ অল্প ফাঁকটুকু বিজন যদি আজ এই দণ্ডে বুজাইয়া দিতে পারিত! কিন্তু কেনই বা দিবে? দীনতাকে ঢাকিয়া বেড়াইবার মত হীনতা যেন তাহার কোনদিন না আসে! গলা উঁচাইয়া বিজন বলিতে লাগিল, "বৌদি,—শাক-চচ্চড়ি অনেকেই খায়—তবে তেতলার ওপরে এর অনেক নাকি বিন্দু না বুঝিয়া হাসে।

—লোক ঠকিয়ে আজো যারা বড়লোক হ'তে পারেনি,—তাদের অপমান ভগবানের বুকে কেটে কেটে-লেখা হ'য়ে যাচ্ছে।

'চুপ চুপ,'—বলিয়া বিন্দু একবার উপরের চারিদিকে চোখ ফিরাইরা আনিল। বিজন বড়লোকের নাম পর্য্যন্ত সহিতে পারিত না। তাই কথা না ঘাঁটাইয়া বিন্দু বলিল, সবাই তো সমান হয় না ঠাকুরপো!

—ও সব সমান—সব সমান! তোমাদের সঙ্গে একটা কথা বলেছে কোন দিন? মাথা ডিঙিয়ে আলাপ হ'লো কি না—ওদের সঙ্গে! আমিও বলে রাখছি বৌদি,—তুমি দেখে নিও—

আর সে বলিতে পারে না। কি যে বলিতে গিয়া ঘুলাইয়া ফেলে, নিজেও তাহার সঙ্গতি খুঁজিয়া পায় না!—হয় ত ইহার অর্থ ই হয় না!

বিন্দু মুখ তুলিল,—ডাগর চোখ দুটি টল্ টল্ করিয়া উঠিয়াছে। বলে, তুমি রাজা হও ভাই!

বিজন 'তা কেন ধোৎ' বলিয়া উপরের চারিদিক একবার দেখিয়া লইল। দেখিল, উপরের জান্‌লাগুলি আবার কখন খুলিয়া গিয়াছে।—দুই বাড়ীর অভিজাত-আলাপন! নীচেকার এই একতলা বাড়ীটার দিকে তাহারা ভুলিয়াও চায় না!

বিজন গলা চড়াইয়া দিল,—ছাদে যাওয়া বন্ধ ক'রে দাও বৌদি, কেন যেচে আলাপ করা!—কমলি তো একটা হাবা, ও আবার ড্যাব ড্যাব ক'রে চেয়ে দেখে!

উপরের চোখ নীচে নামিল। মনে হইল, মেয়েটা যেন হাসিয়াই জান্‌লা বন্ধ করিয়া দিল।

বিজন অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তারপর বিন্দুর

অতি কাছটিতে সরিয়া আসিয়া বলিল, আচ্ছা বৌদি,—আমরা তো অন্য কোথাও উঠে গেলে পারি।

—কেন উঠতে যাব ভাই! আমরা কি কারুর চেয়ে ছোট?

বিজনের খুব ভাল লাগিল। এমন করিয়া সে নিজেদের কোনদিন বিচার করিয়া দেখে নি। বিচার আজো যে সে কিছু করিয়াছে এমন নয়, তবু কথাটি ভাল লাগিল। কম্‌লি ছুটিতে ছুটিতে আসিতেছিল—উপরে না কি কলের গান হইতেছে!

বিজন হাঁকিল, কোথায় চলেছো?

—ওপরে।

—না।

—ইস্!

কথা বাড়িয়াই চলিত, কিন্তু বিন্দু আসিয়া কম্‌লিকে বুঝাইয়া ঠাণ্ডা করিল। বলিল, হ্যাংলাপনা কর্‌তে নেই,—ওতে লোকে আঙুল দেখিয়ে হাসে।

কম্‌লি কি বুঝিল কে জানে! গজ গজ করিতে করিতে রান্না ঘরে গিয়া বসিল।

উপরের বাতাস গানের সুরে নাচিয়া নাচিয়া চলিয়াছে। পাশের ঘরে শাশুড়ী বাতের বেদনায় গোঙাইতেছেন। নিঃশ্বাস ফেলিয়া বিন্দু রান্নাঘরে আসিয়া ঢোকে।—বিজন বলে মিথ্যা নয়,—মোটর হাঁকাইয়া, মাটি কাঁপাইয়া, গলা ফাটাইয়া, নিরন্তর নিজেকেই জাহির করিবার চেষ্টা! রান্নাঘরে বিন্দুর চোখের সম্মুখে অসংখ্য মোটরের আনাগোনা চলিতে থাকে!

ছোট ভাই শোনে না—শাসনও মানে না। ছুটিয়া ছুটিয়া ঐ বড়-বাড়ীরই ছেলেদের কাছে গিয়া দাঁড়ায়। তাহারা তাহাদের খেলা-ঘরে লইয়া যায়। সেখানে কত রঙ-বেরঙের খেলানা,—ছোট্ট মোটর, ছোট্ট সাইকেল! বলে, রোজই তাহাকে চড়িতে দেয়।—

বিজন চাহিয়া দেখে, তাহাদেরই লক্ষ আত্মীয় বড়ঘরের পাশে পাশে বাসা বাঁধিয়া উল্লাস করিতেছে! এযে যুগ-যুগান্তরের পাপ! তাহার ভাই—শিশু ভাই, কতটুকুই বা বোঝে! বৌদিকে ডাকিয়া বলে, গরীব কখন বড়লোক হয় না বৌদি!—ও জাতই আলাদা।

বিন্দু কিছুই বুঝিতে পারে না। শুধু ঘাড় নাড়িয়া বলে,—বোধ হয়।

কম্‌লি ছুটিয়া-ছুটিয়া বেড়ায়। দাদাকে লুকাইয়া উপরে আসিয়া মুগ্ধনেত্রে সেই ঝক্‌ঝকে বাড়ীটার দিকে চায়। সারি-সারি বন্ধ জানালার ওধারে কি হইতেছে কে জানে! হয় ত বসিয়া বসিয়া সারাদিন তাহারা কলের-গানই শুনিতেছে! রুদ্ধ জানালা খোলে, আবার বন্ধ হয়। তাহাদের মিলিত কণ্ঠের অস্ফুট ব্যঞ্জনা ঐ কলের গানের মতই মধুর হইয়া কানে আসে। কম্‌লি যেন আর-এক পৃথিবীর স্বপ্ন দেখে!

বৌদি বলে, তুই কি করিস্ বল্‌তো ছাদে ব'সে ব'সে?

কি যে কবে,—কি বলিবে? যদি ছুটিতে পাইত, তবে একবার ছুটিয়া দেখিয়া আসিত।—কথা না বলিবার অহঙ্কার তাহাদের নিজেদেরও তো কম নয়! একজনকে তো প্রথম কথা বলিতেই হইবে!

বিন্দু হাসিয়া ছাদের দিকে তাকায়। বলে, তোর দাদাকে ব'লে কতকগুলো ফুলের টব আনিয়ে নে না ভাই!—ছাদে বেশ মানাবে!

কম্‌লি ইহার অর্থ করিতে পারে।—পয়সা অভাবে বিয়েই না হল হয় নি। বলিল, ধ্যেৎ—তা কেন, ছাদে বেশ হাওয়া।

বিন্দু টিপিয়া টিপিয়া হাসে। সে হাসিতে কম্‌লির সর্ব্বাঙ্গ জ্বালা করিতে থাকে। কথা না বলিয়া সে যাইবার জন্য পা বাড়াইয়া দেয়।

—শোন্ শোন্, ও-বাড়ীর রমেনবাবুর তিনখানা মোটর!

কম্‌লি পালাইল না,—হাসিতে চেষ্টা করিল কিন্তু চোখ দুটি জলে ভরিয়া উঠিল। এই নির্লজ্জ-রসিকতার পরে পালানো চলে না বলিয়াই এমন করিয়া তাহাকে দাঁড়াইতে হইল। বৌদি কি তাহার ছাদে যাওয়ার শেষে এই অর্থই করিল? সারা-মন তাহার ধিক্কারে পূর্ণ হইয়া ওঠে।

এতটা হইবে বিন্দু ভাবে নাই। বলিল, ঠাট্টা বোঝ না ভাই!—নইলে, কোথায় রমেনবাবু আর কোথায় আমরা!

ইহার পর কম্‌লির ছাদে-বসা আরো সহজ হইয়া আসিল। বিন্দুও তাহার সহিত মাঝে মাঝে আসিয়া বসে। বলে, আঃ—বাঁচলাম! ঘর তো নয়,—গুদামঘর!

মুক্ত নীলাকাশের মায়া-মোহ! ভুলিয়া যায়, তাহার ছোট্ট ঘরকন্নার অসংখ্য বিশৃঙ্খলা! ভুলিয়া যায়, ছাদের নীচে তাহার সেই অন্ধকার ঘরগুলি আলো করিয়া আছে তাহারই স্বামী, পুত্র, দেবর!

বিজন ডাকে বৌদি!

বিন্দু ব্যস্ত হইয়া আবার নীচে নামিয়া আসে।

সেদিন মা কম্‌লিকে ডাকিয়া বলিলেন, ছাদে-ছাদে অত ঘুরিস্‌ নে মা! বিজন বল্‌ছিলো, ওদের রমেনটা না কি চব্বিশ ঘণ্টা জান্‌লায় দাঁড়িয়ে থাকে।

রমেন?—কে রমেন?—কম্‌লি নির্ব্বোধের মত মা-র মুখের দিকে চায়।

মা বলিলেন, কাজ কি মা!—লোকে নিন্দে কর্‌লে বইতো নয়।

কিন্তু কম্‌লি ছাদে যাওয়া বন্ধ করিতে পারিল না। বৌদিকে গিয়া বলিল, সত্যি বল্‌ছি বৌদি,—আমি রমেন-বাবুকে চোখেই দেখি নি।

—রমেনবাবর তো ভারী অন্যায়! চুরি ক'রে কেবল নিজেই দেখেন!

কম্‌লি রাগিয়া-কাঁদিয়া অনর্থ করিল।

—বৌমা!—পাশের ঘর হইতে আহ্বান আসিল।

—পোড়ামুখীর যা মনে আছে করুক।

কম্‌লি সোজা ছাদের উপর উঠিয়া আসিল। কে সে রমেন,—আর কেনই বা সে জান্‌লার ধারে দাঁড়াইয়া থাকে,—আজ সে দেখিবে। কিন্তু দেখিবার বাতায়নগুলি সব বন্ধ। রুদ্ধ আক্রোশে কম্‌লি ছাদময় ঘুরিয়া-ঘুরিয়া বেড়ায়। আজ ঐ রুদ্ধ ঘরের মায়া তাহাকে ভোলাইতে পারে না! বরং চোখে তাহার অপমানের জ্বালা, মনে তাহার গুম্‌রে ওঠা কান্না!

—দিদি, কু!

কম্‌লি এদিক-ওদিক চায়। বড়-বাড়ীর জান্‌লা সশব্দে বন্ধ হইয়া যায়। আবার খোলে,—আবার বন্ধ হয়। আর প্রতিবারই তাহার পরিচিত স্বর 'কু' 'কু' করিয়া তাহাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তোলে!

সুধীনের হাসি আর থামে না;—হি হি হি হি………

কম্‌লি উপরে চাহিয়াই চোখ নামায়। তাহার ভায়ের পাশে—ঐ কি তবে রমেনবাবু? কম্‌লি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ঘামিতে লাগিল। পা ওঠে না!—মুখ ফুটাইবার কথা মনে হইতেই আপন মনে জিভ কাটিয়া বসে।

সেদিন সুধীনকে একা পাইয়া কম্‌লি সকল কথা খুঁটিয়া-খুঁটিয়া জানিয়া লইল। ওদের বাড়ীতে কে-কে আছে, রমেনবাবুরা ক'ভাই,—রমেনবাবু কি বলে —

সুধীন অনর্গল বকিয়া চলে। যেন দম দেওয়া একটি গ্রামোফোন। ও-বাড়ীর যত কথা সে এতদিন ধরিয়া জমাইয়া তুলিয়াছে, আজ প্রাণ খুলিয়া বলিতে পাইয়া তাহার খুসী আর ধরে না! বলে, তুমি চল না একদিন দিদি,—আমি রমেনবাবুকে বল্‌বো,—রমেনবাবু কিচ্ছু বল্‌বে না—খুব ভাল লোক।

— না, তোর রমেনবাবু খুব খারাপ লোক।

সুধীনের মন ভাঙ্গিয়া পড়ে। তাহার দিদি কিচ্ছু জানে না,—রমেনবাবু কখন খারাপ লোক হয়! বলে, হাঃ, তুমি তো ভারী জান!

সুধীনের আর কথা জমে না। সে ছুটিয়া আবার ও-বাড়ীতেই যাইতে চায়। কম্‌লি তাহার হাত চাপিয়া ধরে। কানের কাছে মুখ আনিয়া ফিস্‌ ফিস্‌ করিয়া বলে, তুই যেন আবার বলিস্‌নে রমেন বাবুকে।

সুধীন মজা পাইয়া নাচিয়া ওঠে। ছুটিতে ছুটিতে বলে, বল্‌বোই তো—হাঁ, বল্‌বোই তো!

—কি রে, কি সুধীন? বলিয়া বিন্দু আসিয়া দাঁড়ায়।

—ঐ রমেন বাবুর কথা,—জান, বৌদি—

কম্‌লির সমস্ত রাগ গিয়া পড়িল সুধীনের উপর। বলিল, দাঁড়া,—দাদা আসুক, তোর ও-বাড়ী যাওয়া বের করছি।

কথাটা বিন্দু স্বামীর কানে অন্যভাবে তুলিল। বলিল, ও-বাড়ীর রমেন বাবুর বোধ হয় কম্‌লিকে ভাল লেগেছে। একবার দেখো না চেষ্টা করে।—অমন জামাই পাওয়া যে ভাগ্যের কথা!

গিরীন ক্লান্ত হইয়াই আসিয়াছিল। বিন্দুর কথা শুনিয়া চোখ বুজিল।

—তুমি যে চোখ বুজ্‌লে!—ওগো শুন্‌ছো!

হাঁ, শুনছি। তবে চেষ্টা আমি কিছু কর্‌তে পার্‌বো না,—শেষটা কি অপমানিত হ'ব?

কথা মিথ্যা নয়। বিন্দু এমন আভাস সত্যই কিছু পায় নি! তবু বলে, আমরা বুঝ্‌তে পারি গো বুঝ্‌তে পারি,—তুমি দেখে নিও, রমেনবাবু শোন্‌বামাত্র লাফিয়ে উঠ্‌বে।

গিরীন হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, কম্‌লি তাহ'লে বড়-ঘরেই জন্মাতো। ওদের বিধাতা-পুরুষ কেবল ওদেরকেই সৃষ্টি করেন।

—আর আমাদের বিধাতা পুরুষ কেবল আমাদেরকে—নয়? বলিয়া বিন্দু হাসিতে হাসিতে ঢলিয়া পড়ে।

—সত্যিই তাই;—আমাদের সঙ্গে ওদের কোন মিল নেই—এমন কি চেহারাতেও নয়। এক-শিল্পীর হাতে এতখানি পার্থক্য হয় না বিন্দু! বলিতে বলিতে গিরীন অন্যমনস্ক হইয়া যায়।

বিন্দুও যে বোঝে না এমন নয়। সে তো নিয়তই দেখিতেছে, তাহাদের জন্য স্বতন্ত্র আয়োজন, স্বতন্ত্র ব্যবস্থা, স্বতন্ত্র পৃথিবী! পাশের পৃথিবী,—রঙীন্ পৃথিবী-চোখ ধাঁধাইয়া দেয়! সেখানে তাহাদের জন্য এতটুকু সম্ভাবনাও অপেক্ষা করিয়া নাই!—উহারা গরীবের বিস্ময়!

কম্‌লিকে ডাকিয়া বিন্দু অনেক কথাই জানিবার চেষ্টা করে। কিন্তু কম্‌লি না কি বড় চাপা,—কিছুই ভাঙে না! মা শুনিয়া বলিলেন, ভগবান মুখ তুলে চান—কম্‌লির কি আর সে ভাগ্য হবে!

কম্‌লি হাসে। সে সকল কথারই অর্থ তো বোঝে। কিন্তু কোন কথারই আজ যেন সঙ্গতি খুঁজিয়া পাইতেছে না! শুধু কাণাকাণির রেশটুকু তাহার মনকে দোলাইতে থাকে।

মা ডাকিয়া বলিলেন, কি ক'রে বেড়াস্ মা! কত মেয়ের কত সাধ থাকে,—কাপড়-জামার তো অভাব নেই!—চুলটা হয়েছে দেখ, যেন কাকের বাসা! আর বোস্ দেখি। বলিয়া তাঁহার রোগ-শীর্ণ দেহখানি সোজা করিয়া তুলিবার চেষ্টা করেন।

—তুমি উঠো না মা, আমি বৌদির কাছে,—বলিতে বলিতে কম্‌লি ছুটিয়া পালায়। রাজ্যের লজ্জা আসিয়া আজ তাহাকে রাঙাইয়া তুলিয়াছে! রমেন যেন তাহার স্বপ্নে-পাওয়া রাজকুমার! আজ এই মাত্র সেই রাজকুমার তাহার কানে কানে বলিয়া গেল,—তোমাকে ভালবাসি, তোমাকে ভালবাসি। তাহার সমস্ত অন্তর ব্যাপিয়া, একটি গানের সুর প্রতিনিয়তই গুন্ গুন্ করিয়া ফিরিতে লাগিল।

বিজন বলে, কম্‌লির তো আজকাল মাটিতে পা পড়ে না মা!

মা হাসেন। কম্‌লির সারা মুখখানি রাঙা হইয়া ওঠে। ইচ্ছা করে, তাহাদেরকে একবার কোমল স্বরে শোনাইয়া দেয়,—সে ওদের বাড়ীর মত হইবে না—সকলের সহিত যাচিয়া আলাপ করিবে—সকলকেই সে ভালবাসিবে। কিন্তু সেই অনুচ্চারিত কথা ব্যথার শতদল হইয়া তাহার চোখে ফুটিয়া ওঠে! মা বুঝিতে পারেন। বলেন, না, কম্‌লি আমার সেরকম হবে না। ওতো জানে গরীব হওয়ার কি দুঃখ!

কম্‌লির চোখ জলে ভরিয়া ওঠে। দুঃখে নয়,—বেদনাতেও নয়; অকারণ আশা ও অনিশ্চয়তার আশঙ্কা মিলিয়া তাহার ক্ষুদ্র বুকের মধ্যে তোলপাড় করিতে থাকে।

বিজন বলিতে ছাড়ে না। বলে, হাঁ,—ও আমার জানা আছে, বাড়ীতে মোটর বাঁধা দেখলেই—

—যা' তা বলো না বল্‌ছি, ভাল হবে না—বলিয়া কম্‌লি কাঁদিয়া ফেলে।

চির-রুগ্না মাতা রোগ-যন্ত্রণা ভুলিয়া সারাক্ষণ কম্‌লির মুখের দিকে চাহিয়া থাকেন! ঐ মুখে আজ তিনি রাণীর সকল লক্ষণই মিলাইয়া পাইতেছেন! স্বপ্নের মত তাঁহার চোখে ভাসিয়া ওঠে—কম্‌লির সর্ব্ব-অঙ্গে মণি মুক্তার ঝলমলানি! মার চোখ সজল হইয়া ওঠে। তিনি কি চোখে দেখিয়া যাইতে পারিবেন!

কম্‌লির এক-একটি দিন যেন এক-একটি বৎসরের মত দীর্ঘ হইয়া চলিয়াছে! তাহার বুক স্পন্দিত হইয়া ওঠে। ছাদে যাইতে লজ্জা করে,—হয়ত রমেনবাবুর সঙ্গে চোখোচোখিই হইয়া যাইবে! যাব না—যাব না করিতে করিতেও কম্‌লি দিনের মধ্যে চার-পাঁচবার ছাদে আসিয়া বসে!

বিন্দু কানের কাছে সুর ধরে—"যমুনাতে আর যাব না—"

কম্‌লি আর রাগে না। বরং বলে, চল না বৌদি, ছাদে ব'সে আস্তে আস্তে গাইবে।

মা-র চোখে ঘুম নাই!—গিরীনকে তাড়া দেন,—গিরীন রাগিয়া ওঠে। বলে, কোথায় কি,—তোমরা যে সবাই ক্ষেপ্‌লে!

মা-র মুখ শুকাইয়া যায়। তবে কি রমেন কিছু বলিয়াছে! ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করেন, রমেন কি বল্লে?

—রমেন আবার কি বল্‌বে?—ও-সব বড় ঘরের আশা ছেড়ে দাও মা! আমি মুখ হাসাতে পার্‌বো না।

মা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন। গিরীন তবে এখনও বলেনি! হাসিয়া বলিলেন, ওরা বড়লোক,—নিজে এসে কি বল্‌বে কিছু!

গিরীন কিছুই বুঝিতে পারে না, রমেন সম্বন্ধে ইহাদের এতখানি নিশ্চিন্ততা কিসে আসিল? জানালায় দাঁড়াইয়া কম্‌লির দিকে যদি চাহিয়াই থাকে,—তাতে কি? ভাবিতে-ভাবিতে গিরীনের মাথার মধ্যে তাল পাকাইয়া যায়। বলে, কম্‌লিকে ছাদে যেতে বারণ ক'রো মা!

কম্‌লি আড়ালে দাঁড়াইয়া শোনে। বুকটা তাহার ছাঁৎ করিয়া ওঠে! রমেনবাবু যে তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারে, এ যেন তাহার ধারণারও অতীত। কিন্তু একটা বোঝাপড়া না হইলেই বা চলিবে কেন? লোকে যে নিন্দা করিবে!—তাহারা তো অত-শত বুঝিবে না। হয়ত একটা বিশ্রী—

কম্‌লির মুখ চোখ রাঙা হইয়া ওঠে!

বিন্দু আসিয়া বলে, কিলো, আজ যে রাই ঘরের কোণে?

বিন্দুকে কম্‌লির আর লজ্জা করিবার কিছু ছিল না। বরং নিজের তোলাপাড়া মনটাকে খোলসা করিবার জন্ম বিন্দুকে সকল কথা খুলিয়া বলিল।—তাহার দাদার কথা, তাহার মা'র কথা, তাহার নিজের কথা,—

বিন্দু হাসিয়া বলে, "ফুল ফুটবে,—সখি ফুল ফুটবে।—"

আশ্চর্য্য এই বিন্দু!—হাসিটি তাহার লাগিয়াই আছে! গিরীন বলে, তুমিই এই সংসারটাকে হাল্কা ক'রে রেখেছো,—নইলে এতদিন গুম্‌রে গুম্‌রেই শেষ হ'য়ে যেতো। একদিকে যেমন অভাবের জট্ পাকাইয়া উঠিতেছে, অন্ত দিকে তেম্নি এই লঘুচ্ছন্দা নারীটি হাসি, গানে, গল্পে, কৌতুকে সকলকে মাতাইয়া রাখিয়াছে। ও যেন হাল্কা-হাওয়ার মত কাল মেঘকে সরাইয়া চলিয়াছে!

বিন্দুর হাসি আর ধরে না। ছাদে আসিয়া কম্‌লিকে হিড়্ হিড়্ করিয়া টানিতে আরম্ভ করিল। বলিল, চল্ নীচে, কে এসেছে দেখ্‌বি চল্।

কম্‌লির বুকের মধ্যে ধড়াস্ করিয়া উঠিল!—তবে কি, রমেন বাবু,—

—আঃ, ছাড় না বৌদি,—আমি যাব না বল্‌ছি—যাও। বলিয়া কম্‌লি ঠোট পাকাইয়া ঘামিয়া লাল হইয়া উঠিল।

—ইস্, দেখিস্,—

যাইতে আর হইল না। যাহাকে দেখাইবার জন্ম এতখানি কসরৎ সে নিজেই সুধীনের হাত ধরিয়া উপরে উঠিয়া আসিল।

বিন্দু বলিল, এসো ভাই এসো।

কম্‌লি একবার চাহিয়াই চোখ নামাইয়া ফেলিল। অপরিচিতা হইলেও সে যে রমেনবাবুর বাড়ীরই কেউ, ইহা বুঝিতে কম্‌লির বিলম্ব হইল না। আর এই অকস্মাৎ আগমনের অন্তরালে যে-কথা অপেক্ষা করিয়া আছে, তাহা মনে করিতেও কম্‌লির সর্ব্বশরীর ঘামিয়া উঠিল।

সুধীন অনেকক্ষণ হইতে চুপ করিয়া আছে। যাহাকে আজ টানিয়া লইয়া আসিয়াছে, সে যে তাহার বীণাদি',—এই পরিচয়টা কি করিয়া এবং কতক্ষণে ইহাদের মধ্যে প্রচার করিয়া দিবে, তাহাই ভাবিয়া সে নিজের মনে ছট্‌ফট্ করিতেছিল। কিন্তু তাহার বীণাদি' সমস্তই মাটি করিয়া দিল!—সে নিজেই বলিয়া বসিল আমি রমেনবাবুর বোন!

—জানি ভাই,—সুধীন কি বল্‌তে আর কিছু বাকী রেখেছে!—রাতদিন তোম্‌দেরই কথা!—ঐ বুঝি টান্‌তে টান্‌তে এখন নিয়ে এলো? বলিয়া বিন্দু হাসিল।

বীণা সে কথার কোন উত্তর না দিয়া বলিল, চলুন না—আজ বায়স্কোপে যাই, খুব ভাল বই আছে।

বিন্দু মহামুস্কিলে পড়িল। গিরীন এখনও বাড়ী আসে নি। অথচ, আলাপের এই সুযোগ হারাইতেও তাহার ইচ্ছা হইতেছিল না। হয়ত রমেনবাবুই কৌশল করিয়া

তাঁহার এই বোনটিকে পাঠাইয়া থাকিবেন!—বলিল, ব'সো ভাই,—আমি মাকে জিগ্‌গেস্‌ করে আসি।

মা খুসী হইয়া মত দিলেন। অমনি সাজ গোজের ধুম পড়িয়া গেল। যেখানে যাহা তাহাদের মূল্যবান সামগ্রী ছিল, সকলগুলি কম্‌লির গায়ে চাপাইয়া দিয়া তাহারা রমেনবাবুর মোটরে আসিয়া বসিল। সাজ দেখিয়া বীণা মুখ টিপিয়া হাসিল।

কম্‌লি সারাপথ আর মুখ তুলিতেই পারিল না। তাহার এত কাছে এবং একই মোটরে রমেনবাবু,—ইহাই মনে করিয়া তাহার লজ্জার আর অন্ত ছিল না!

তারপর—বায়োস্কোপের সেই দীর্ঘ দুটি ঘণ্টা! বীণা তাহার বন্ধুদের লইয়া হাসি গল্পে মাতিয়া উঠিল।—সহস্র কুতূহলী প্রশ্ন—ওরা কে? কোথায় থাকে?

বীণা কাণে কাণে কি বলে, তারপর আর তাহারা ফিরিয়াও চায় না! বীণা যেন এখানে আসিয়া, ইচ্ছা করিয়াই তাহাদিগকে পৃথক্‌ করিয়া দিল!—একি তবে অনুগ্রহ? মুহূর্ত্তে বিন্দুর মুখে কে যেন কালি মাখাইয়া দিল! আর কম্‌লি?—সে তন্ময় হইয়া ছবি দেখিতেছিল! হয়ত, পর্দ্দার নায়ক-নায়িকার সহিত তাহার ভবিষ্যৎ স্বপ্নকে কুঁদিয়া কুঁদিয়া নিজের বুকের পর্দ্দায় আঁকিয়া লইতেছিল!

ছবি শেষ হইল। বীণা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেমন?

কম্‌লি একমুখ হাসিয়া বলিল, বেশ।

বিন্দু মরমে মরিয়া গেল! তাহার যেন মনে হইল, গরীবের মুখে এই খুসীর কথাটুকু শুনিবার জন্যই ইহারা তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছে। নহিলে সঙ্গে আনিবার আর কি প্রয়োজন ছিল? কিন্তু কেন এ-সব কথা সে মনে করিতেছে?—হয়ত নাও হইতে পারে!—হয়ত, বড় মানুষের স্বভাবই এই!

বাড়ীতে বীণা নিজে আসিয়া পৌঁছিয়া দিয়া গেল। আবার আস্‌বো,—তোমরা কেন যাওনা ভাই,—ইত্যাদি অনেক কথাই বলিয়া গেল। যে কাল মেঘ বিন্দু নিজেই ঘনাইয়া তুলিতেছিল, বীণার এই শেষ ব্যবহারটুকুতে তাহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত রহিল না! বরং না বুঝিয়া—মনে মনেও যাহা বলিয়াছে, তাহারই জন্য তার লজ্জার অবধি রহিল না।

পরদিন আবার বীণা আসিল। কম্‌লিকেও একদিন লইয়া গেল। কিন্তু পরস্পরের যাওয়া আসা সহজ হইয়া আসিলেও, কোথায় যেন এক পার্থক্য রহিয়াই গেল! কম্‌লির মনে হয়, বীণা যেন তাহাকে তাহাদের ঐশ্বর্য্য দেখাইতেই লইয়া যায়। কিন্তু আজও তেমনি করিয়া রমেনবাবু তেতালার জানালা ধরিয়া দাঁড়ায়।—আজও সুধীন তেমনি করিয়া উহাদের বাড়ী ছুটিয়া যায়।—ছুতানাতায় আজও কত খেলনা, খাবার সুধীন উপহার পাইতেছে!—তবে?

আশা নিরাশার দোলায় কম্‌লির বুকের ভিতর গুরুগুরু করিতে থাকে। সুধীনকে ডাকিয়া চুপি চুপি অনেক কথাই জিজ্ঞাসা করে।—হয় ত রমেনবাবু এই বালককে দিয়া তাহার কাছে কিছু বলিয়া পাঠাইতেও পারে!—এমনও তো কত হয়!

সুধীন বলে, কিছু বলেনি দিদি! হাঁ, সেদিন বল্‌ছিলো—দিদি,—বল্‌ছিলো,—আচ্ছা দিদি, তুমি কি লেবেন্‌চুস্‌ খাও?—বল্লাম, দূর,—তা কেন, দিদি যে বড়!—সুধীন এই অসম্ভব কল্পনা স্মরণ করিয়া আপন বিজ্ঞতায় হাসিতেই লাগিল।

কম্‌লি মাত্র এইটুকু কথা—যেন সঞ্চয় করিয়াই আপন বুক ভরাইয়া তুলিল। রমেনবাবু নিশ্চয়—নইলে সুধীনকে এতখানি আদর করিবার আর কি কারণ থাকিতে পারে? কম্‌লি ডাকে, শোন্‌!—সুধীন আরও কাছে সরিয়া আসে।

—আমার কথা যেন কিছু বলিস না।

সুধীন ঘাড় নাড়িয়া চলিয়া যায়।

সেদিন বৈকালে বীণা আসিতেই বিন্দু একেবারে কথা পাড়িয়া বসিল। বলিল, কম্‌লিকে তোমরা নাও না ভাই!

বীণা প্রথমটা বুঝিতেই পারিল না। তারপর উচ্ছ্বসিত হাসিকে প্রাণপণে দমন করিয়া, ধীরে ধীরে বলিল, দাদাকে বল্‌বো।

মা সেদিন কিছুতেই ছাড়িলেন না। অগত্যা বীণাকে মিষ্টিমুখ করিয়াও যাইতে হইল।

বাড়ীতে পা দিয়াই বীণা যেন ফাটিয়া পড়িল!—কিছুতেই হাসি আর থামিতে চায় না! তারপর রমেনও এক এক

করিয়া সকল কথাই শোনে।—সেও হাসে। আর ছোট-বাড়ী—যাহারা এই হাসির খবর রাখে না, তাহারা সকলেই একটি মধুর সংবাদের আশায় দিনের পর দিন উৎকর্ণ হইয়া অপেক্ষা করে!

পরিবর্তন কিছুই হয় নি। আকাশে সূর্য ওঠে—চাঁদ ওঠে—তারা ফোটে! বড় বাড়ীর হাসি, গল্প, গান,—ছোট বাড়ীর বাতাসে ভাসিয়া বেড়ায়! আজও বড় বাড়ীর জানালায় রমেন হাসিমুখে দাঁড়ায়! সুধীন তেমনিই মুঠা করিয়া খাবার লইয়া আসে! শুধু একটি কথা কম্‌লি কিছুতেই বুঝিতে পারে না,—সেদিনকার প্রস্তাবের আজও কোন জবাব আসিল না কেন? বীণা কি তবে সেদিনকার কথা ভুলিয়াই গিয়াছে—বড়লোক, হয় ত হইতেও পারে!

মা দুঃখ করিয়া বলেন, গিরীন্ কিছু বলবে না,—ওদেরই বা কি এত গরজ! এবার সত্যই বিন্দুর রাগ হইল। বড়-লোককে উপেক্ষা করিবার মত অহঙ্কার আর যাহারই সাজুক, তাহাদের তো সাজে না! ক্ষমতার সীমা-রেখা টানিয়া টানিয়া যাহাদের পদে-পদে চলিতে হয়, তাহাদের মুখে ও-সব বড় কথা কেন? রাত্রে বিন্দু বেশ শক্ত করিয়াই গিরীনকে শোনাইয়া দিল। গিরীনের মত শক্ত লোকও আজ বিন্দুর দৃঢ়তার কাছে কেমন যেন শিথিল হইয়া গেল!—হইবেও বা, শুধু তাহারই জন্য শেষ কথাটুকু রহিয়াই গিয়াছে! বড়লোক হইলেও,—সত্যিই আর কিছু নিজে আসিয়া বিবাহের কথা পাড়িতে পারে না। গিরীনের চোখেও আজ স্বপ্ন-মোহ!—কম্‌লির রাঙা-পাড় সোনা হইয়া ঝিক্‌মিক্ করিয়া উঠিল!

আবার চোখে-চোখে দেখা। কম্‌লির যেন মনে হইল, রমেনবাবু আজ তাহাকে দেখিয়া হাসিয়াই চলিয়া গেলেন! বুকের ভিতর তাহার ছলছলাইয়া উঠিল! কিন্তু কী দুনিয়ার লজ্জা এই মেয়েমানুষের! সহজ করিয়া মুখ তুলিয়া ধরিতেও তাহাদের মরণ হয়! কম্‌লি তাহার নিজের লজ্জাকেই তিরস্কার করিতে করিতে ত্রস্তপদে নীচে নামিয়া আসিল।

পরদিনই গিরীন বড়বাড়ীর খবর আনিয়া দিল,—রমেন বিবাহ করিবে না।

কেন করিবে না? পরে করিবে কি না? কোন প্রশ্নই কেহ করিতে সাহস করিল না। গিরীন অফিস হইতে যেমন আসিয়াছিল, তেমনি এক কাপড়েই বাহির হইয়া গেল। তাহার জল খাবারের থালা লইয়া বিন্দু রান্নাঘরে কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল! প্রশ্ন করিবার আর কি-ই বা ছিল? রমেন যেটুকু বলিয়াছে, শুনিবার ও শোনাইবার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট!

মা ডাকিলেন, বৌমা!—হয় ত তিনি এখনো আশা রাখেন!

বিন্দুর কোন কথাই কানে যাইতেছিল না! তাহার কেবলই মনে হইতেছিল, তাহারাই সকলে মিলিয়া—জোর করিয়া তাহার স্বামীর মুখখানাকে পোড়াইয়া দিয়াছে!

কম্‌লিও একদিন সকল কথা বুঝিল। মুখ তাহারও তো কম পোড়ে নি! এ পোড়া মুখ লইয়া এখন বাহির হইবে কি করিয়া? তাহার নামের সহিত যে ঐ রমেনবাবুর নামটা বিশ্রীভাবে এখনো জট্ পাকাইয়া আছে! এ যেন অবাধ মেলামেশার পর বিবাহে অসম্মতির কলঙ্ক তাহার আষ্টে পৃষ্ঠে দাগিয়া দিয়া গেল!

সুধীন আস্তে আস্তে ডাকিল, দিদি!

কম্‌লির বুকটা ধড়াস্ করিয়া উঠিল!—বলিল, কি রে?

—রমেনবাবু বল্লে,—

চুপ্—বলিয়াই কম্‌লি তাহার হাত ধরিয়া নিজের ঘরে টানিয়া লইয়া গেল। বুকের ভিতরটা তাহার কিছুতেই শান্ত হইতে চায় না! রমেন তাহাকে নিশ্চয়ই তাহাদের বিবাহ সম্বন্ধে কিছু বলিয়া পাঠাইয়াছে।—আনন্দে সে যেন এখুনি কাঁদিয়া ফেলিবে। বলিল, কি বল্লে রে?

সুধীন কানের কাছে মুখ আনিয়া চুপি চুপি বল্লে, রমেনবাবু তোমাকে ভাব্‌তে বারণ করলে দিদি। বল্লে, তোমার দিদির বিয়ের টাকা—আমি সব দেব।

এক মুহূর্ত্তে কম্‌লির চোখ দুটো ধ্বক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। বলিল, আমাকে বল্‌তে বলেছে?

সুধীন ভয় পাইয়া গেল। ঢোক গিলিয়া বলিল, হাঁ।

ইহার পর আরও কিছুদিন কাটিল।—

রমেনের কথাও একদিন সকলে ভুলিয়া গেল। আবার বিন্দুর মুখে হাসি ফুটিল, মা কথা বলিলেন।—হাসি-কৌতুকে

আবার এই দুঃখীর ঘর পরিপূর্ণ খুসী লইয়া জাগিয়া উঠিল। কিন্তু কম্‌লি,—ঐ বড় বাড়ীটার পানে আর যেন সোজা করিয়া চাহিতেই পারে না।—জোর করিয়া চোখ ফিরাইয়া লয়। ঐ বাড়ীখানা কি রাতারাতি একটা বড় ভূমিকম্পে পড়িয়া যায় না।—ও কি তাহার জীবনে সাক্ষীস্বরূপ চিরকাল খাড়াই থাকিয়া যাইবে।—

একটি মধুর প্রভাতে বড় বাড়ীতে সানাই বাজিয়া উঠিল।—

ছোট বাড়ীর সকলেই একসঙ্গে চকিত হইয়া পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি করে। কমলির বুকের স্পন্দন হয় ত থামিয়াই গিয়াছে। নহিলে আজিকার লজ্জায় তাহার মুখ রক্তাভ হইয়া উঠিল না কেন? শুধু সাদা মুখখানি—এতবার করিয়া এতদিন ধরিয়া পুড়িতেছে,—তবুও তাহার বর্ণ ঘোচে না।

অনুমান সত্যি।—সুধীর লাফাইতে লাফাইতে আসিয়া খবর দিল, রমেনবাবুর বিয়ে—আমার নেমন্তন্ন মা।

রমেনবাবুর বিয়ে। কম্‌লি একবার দিগন্তের পানে শুষ্ক-চোখ দুটি মেলিয়া ধরিতে চায়;—কিন্তু চোখ তুলিতেই দীর্ঘ বড় বাড়ীটা যেন আঘাত করিতেই তাহার চোখের উপর হুড়মুড় করিয়া আসিয়া পড়ে।

হঠাৎ কমলি নিজের মধ্যেই চকিত হইয়া উঠিল।—একি বিষ চিন্তা,—তাহার হৃদয় জুড়িয়া রহিয়াছে? রমেনবাবুর বিয়ে—উৎসবের বাঁশী, তাহাতে তাহার কি? তখনি সুধীরকে ডাকিয়া হাসিতে হাসিতে কম্‌লি জিজ্ঞাসা করিল,—আমাদের নেমন্তন্ন করবে না?

—হাঁ, বীণাদি তো আসবে সন্ধ্যের সময়।

বিন্দু অবাক হইয়া কমলির মুখের দিকে চাহিল।

—বৌ দেখতে কিন্তু যেতে হবে বৌদি। বলিয়া তেমনি হাসিতে হাসিতে—আজ অনেক দিন পরে, কম্‌লি আবার ছাদে যাইবার জন্য ছুটিল।

শ্রীহরগোবিন্দ সেন



রামপুরোয়ার অশোকস্তম্ভ

শ্রীযুক্ত অম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল্, পি-আর-এস

কলিকাতা মিউজিয়মে প্রবেশ করিতে সম্মুখের দালানে রক্ষিত দুইটি প্রস্তরের স্তম্ভচূড়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে,—একটি সিংহমূর্ত্তি ও অপরটী বৃষমূর্ত্তি। চম্পারণ জেলার অন্তর্গত রামপুরোয়া গ্রাম হইতে আজ কয়েক বৎসর হইল চূড়া দুইটি এখানে আনীত হইয়াছে। স্তম্ভদ্বয়ের অবশিষ্ট খণ্ডসমূহ ঐখানেই পড়িয়া আছে। সিংহমূর্ত্তিটি অনুশাসনযুক্ত,—ইহার গাত্রে সম্রাট অশোকের সপ্তম স্তম্ভলিপির প্রথম ছয়টী অনুশাসন উৎকীর্ণ দেখা যায়। এইটিই প্রথম আবিষ্কৃত হইয়াছিল। অপরটীর গাত্রে কোন লেখা নাই। এইটি মাত্র কয়েক বৎসর হইল পাওয়া গিয়াছে।

বিহার প্রদেশের ত্রিহুত বিভাগে পাঁচটী অশোকস্তম্ভ আছে সে কথা ঐতিহাসিকের অজানা নয়। মজঃফরপুর জেলার অন্তর্গত বসাঢ় গ্রামে একটী এবং চম্পারণ জেলার অন্তর্গত লৌড়িয়া-অররাজ, লৌড়িয়া-নন্দনগড় এবং রামপুরোয়া গ্রাম সান্নিধ্যে বাকী চারিটী স্তম্ভ অবস্থিত। বর্ত্তমান প্রবন্ধে শুধু রামপুরোয়ার কথাই বলিব। কিছুকাল পূর্ব্বে আমি রামপুরোয়ায় বেড়াইতে গিয়াছিলাম।

চম্পারণ জেলার চারিটি অশোকস্তম্ভের মধ্যে রামপুরোয়ার স্তম্ভ দুইটি সর্ব্বাপেক্ষা উত্তরে, একেবারে নেপাল সীমানার সন্নিকটে অবস্থিত। ঐ জেলার শিকারপুর থানার অন্তর্গত পিপারিয়া গ্রামের প্রায় এক মাইল উত্তর-পূর্ব্বে রামপুরোয়া গ্রাম অবস্থিত। বেতিয়া হইতে ইহার দূরত্ব উত্তর-পূর্ব্বদিকে প্রায় ৩২ মাইল। রামপুরোয়ার মাত্র চার মাইল উত্তরে হিমালয় পর্ব্বতমালার সর্ব্বনিম্নস্তর সোমেশ্বর শৈলশ্রেণী আরম্ভ হইয়াছে। গ্রামের আধ মাইল পশ্চিমে স্তম্ভ দুইটি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এতদঞ্চলের অধিবাসিদিগের নিকট "পিপারিয়াকালোর" নামে অভিহিত হইলেও, পণ্ডিতগণের নিকট স্তম্ভদ্বয় অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তী গ্রাম রামপুরোয়ার নামেই পরিচিত।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে প্রথম স্তম্ভটী প্রত্নতত্ত্ববিভাগের অন্যতম কর্ম্মচারী কারলাইল সাহেব কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হয়। তিনি তখন নন্দনগড়ের প্রাচীন স্তূপসমূহ খনন কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। একদিন ঐস্থানে আগত কতকগুলি লোকের মুখে তিনি শুনিলেন যে তাহাদের বাসস্থানের অদূরেও নন্দনগড়ের লাটের উপরাংশের অনুরূপ সুবৃৎ একখণ্ড প্রস্তর মৃত্তিকামধ্যে অৰ্দ্ধপ্রোথিত অবস্থায় আছে; তাহাও "ভীমেরলাট" নামে সাধারণে পরিচিত। এ কথা শুনিবামাত্র কারলাইল বুঝিলেন উহা কোন প্রাচীন স্তম্ভের নিদর্শন-সম্ভবতঃ অশোকেরই এবং উহার গাত্রে উক্ত মৌর্য্যসম্রাটের কোন লেখা থাকিলেও থাকিতে পারে। কালবিলম্ব ব্যতিরেকে তিনি ঐ স্তম্ভ আবিষ্কার করিবার অভিপ্রায়ে অরণ্য ও জলাভূমি সমাচ্ছন্ন দুর্গম তরাই প্রদেশে প্রবেশ করিলেন।

কারলাইল রামপুরোয়ায় আসিয়া দেখিলেন যে গ্রামের প্রায় আধ মাইল উত্তরপশ্চিমে একটি শুষ্ক নদীর খাতের পূর্ব্বতটে স্তম্ভটী ভূগর্ভে প্রোথিত অবস্থায় রহিয়াছে,—উপরের ক্যাপিটাল বা চূড়াদেশের প্রায় দুই হাত পরিমাণ দীর্ঘ অংশ মাত্র তখন তির্য্যকভাবে উত্তরমুখে বাহির হইয়াছিল। কতকটা বক্রভাবে স্তম্ভটী উত্তরদিকে পড়িয়া যায় এবং কাল-ক্রমে মাটি জমিয়া উহার প্রায় সমস্তটাই আবৃত হইয়া গিয়াছিল, শুধু বক্রভাবে পড়ার ফলে উপরের অংশ কতকটা বাহিরে ছিল। অতঃপর তিনি ভূগর্ভ হইতে স্তম্ভটী বাহির করিতে সচেষ্ট হইলেন। এতদুদ্দেশ্যে তিনি উহার উভয়

পার্শ্বে উত্তরদক্ষিণে বিস্তৃত সুদীর্ঘ এক খাত কাটিলেন। ছয় হাত গভীর গর্ত্ত করিবার পর ভূগর্ভ হইতে জল উঠিতে থাকে এবং অনতিকাল মধ্যেই সমস্ত খাত জলপূর্ণ হইয়া যায়। তখন অগত্যা খননকার্য্য বন্ধ করিতে হইল। কারলাইল ৪০ ফুট দীর্ঘ স্তম্ভদণ্ড (shaft) বাহির করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তদ্ভিন্ন আরও কতকটা অংশ মাটির মধ্যে রহিয়া গিয়াছিল।

সুদীর্ঘ ৪০ বৎসরকাল এইভাবে পড়িয়া থাকিবার পর ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে প্রত্নতত্ত্ববিভাগের অন্যতম কর্ম্মচারী পণ্ডিত দয়ারাম সাহনী সমগ্র স্তম্ভটি ভূগর্ভ হইতে উত্তোলন করিলেন। তখন দেখা যায় যে চূড়াদেশবাদে স্তম্ভদণ্ড ৪৪ ফুট ৯॥০ ইঞ্চি দীর্ঘ। স্তম্ভটীর দুই পৃষ্ঠে অশোকের অনুশাসনাবলী দুই স্তবকে উৎকীর্ণ। কারলাইলের লোকজনেরা এক কোমর জলে দাঁড়াইয়া লেখাগুলির প্রতিলিপি লইয়াছিল। পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল এগুলি অশোকের সপ্তম স্তম্ভলিপির অপর এক সংস্করণমাত্র এবং সর্ব্বাংশে লৌড়িয়া স্তম্ভদ্বয়ের লিপির সহিত অভিন্ন।

স্তম্ভটীর কিছু উত্তরে দুইটি বিধ্বস্ত ইষ্টকস্তূপ দেখা যায়। উভয়ের মধ্যের ব্যবধান প্রায় ২৫০ হাত হইবে। ইহার মাঝামাঝি অংশে কারলাইল দেখিলেন প্রায় চারিহস্ত দীর্ঘ এক প্রস্তরস্তম্ভখণ্ড প্রোথিত রহিয়াছে। এই ঢিপি দুইটি এবং মধ্যের স্তম্ভখণ্ড সম্বন্ধে গ্রামবাসিগণ এক কৌতূকাবহ কাহিনীর সৃষ্টি করিয়াছে। তাহারা বলে একদা ভীমসেন বাঁকে করিয়া দুই ঝোড়া মাটি বহিয়া লইয়া যাইতেছিলেন। ঠিক এই স্থানে আসিয়া বাঁক ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় মাটি পড়িয়া গেল। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া ভীম ভগ্নদণ্ড মাটিতে পুঁতিয়া দিয়া প্রস্থান করিলেন। সেই মাটির ঝোড়াই এই দুই স্তূপ এবং মধ্যবর্ত্তী স্তম্ভদণ্ড ভীমের সেই ভাঙ্গা বাঁক! বসাঢ় বা বৈশালীর ধ্বংসাবশেষ দেখিতে গিয়া সেখানেও ঠিক এতদনুরূপ কাহিনী শুনিয়াছি। সেখানেও পাশাপাশি অবস্থিত দুইটি প্রাচীন স্তূপ এবং অশোকের সিংহস্তম্ভ সম্বন্ধে গ্রামবাসিবৃন্দ উক্ত কাহিনীর সৃষ্টি করিয়াছে। ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই, কারণ প্রাচীন বৌদ্ধযুগের কীর্ত্তিগুলি সর্ব্বত্রই রামচন্দ্র, সীতাদেবী, ভীম, শিবলিঙ্গ প্রভৃতি হিন্দুধর্ম্মের দেবদেবীর সহিত সম্পর্কিত হইয়া পড়িয়াছে। প্রাচীন স্তম্ভগুলির সব কয়টিরই অদৃষ্টে মধ্যম পাণ্ডবের যষ্টিস্বরূপ সম্মানপ্রাপ্তি (?) ঘটিয়াছে!

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে প্রত্নতত্ত্ববিভাগের অধ্যক্ষ সার আলেকজাণ্ডার কানিংহাম তাঁহার অন্যতম সহকারী গ্যারিক সাহেবকে স্তম্ভটীর ফটো লইবার জন্য রামপুরোয়ায় প্রেরণ করেন। গ্যারিক দেখিলেন স্তম্ভটীর মাত্র চূড়াদেশ উপরে জাগিয়া আছে, অবশিষ্টাংশ জল, কাদা ও পাঁকমধ্যে নিমগ্ন। ভগ্ন চূড়াদেশের ফটো লইবার জন্য গ্যারিক উহা স্তম্ভদণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন করিলেন। তখন দেখা গেল এক সুবৃহৎ তাম্রকীলকযোগে এই দুই অংশ পরস্পর দৃঢ়ভাবে সংবদ্ধ ছিল। কীলকটি গোলাকার—কতকটা বর্ম্মাচুরুটের আকারের; লম্বে ২৪॥ ইঞ্চি, মধ্যভাগের পরিধি ১৪ ইঞ্চি, দুই পার্শ্ব ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইয়া যাওয়ায় প্রান্তদ্বয়ের পরিধি ১২ ইঞ্চি। কীলকটী খুব ভারী, একজন লোক তাহা কষ্টে তুলিতে পারে। উহা বিশুদ্ধ তাম্রনির্ম্মিত, এরূপ প্রাচীন যুগে এত বৃহৎ এবং এ প্রকার বিশুদ্ধ তাম্রের কীলক নির্ম্মিত হওয়া গৌরবের কথা। গ্যারিক উক্ত কীলকটী কলিকাতা যাদুঘরে প্রদান করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে উহা সিংহমূর্ত্তির পার্শ্বেই কক্ষপ্রাচীর গাত্রে সংবদ্ধ রাখা হইয়াছে। অশোকের স্তম্ভগুলির চূড়া এইরূপে কীলকযোগে দণ্ডদেশের সহিত সংবদ্ধ হইত। উপরের পশুমূর্ত্তি পর্য্যন্ত আমূল সমগ্র স্তম্ভ এক অখণ্ড প্রস্তর হইতে নির্ম্মিত এরূপ যেন কেহ মনে না করেন। সুদীর্ঘ স্তম্ভদণ্ড একখণ্ড প্রস্তর হইতে এবং উপরের পশুমূর্ত্তি ও তাহার পীঠ অপর একখণ্ড প্রস্তর হইতে নির্ম্মিত হইত এবং এই প্রকার কীলকযোগে চূড়াদেশ মণ্ডলাকার স্তম্ভদণ্ডের উপরে দৃঢ়ভাবে সন্নিবেশিত হইত।

গ্যারিক স্তম্ভের চারিদিক ভাল করিয়া খুঁড়িয়া এবং যতখানি সম্ভব জল সেঁচিয়া ফেলিয়া অনুশাসনগুলির প্রতিলিপি লইয়াছিলেন। এপিগ্রাফিয়া-ইণ্ডিকা গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে বুলহারকৃত অশোকের স্তম্ভলিপিসমূহের পাঠোদ্ধার ও ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে এগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল

লৌড়িয়া স্তম্ভদ্বয়ের লেখার সহিত ইহার অক্ষরে অক্ষরে মিল দেখা যায় সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

কারলাইল কর্ত্তৃক আবিষ্কারকালে স্তম্ভটীর উপরের মূর্ত্তি পাওয়া যায় নাই। উপরের মণ্ডলাকার বেদীর উপরে উপবিষ্ট পশুরাজের পাদচতুষ্টয়ের কতকাংশ মাত্র অবশিষ্ট ছিল। যাহা হউক উপরের মূর্ত্তিটি যে সিংহের ছিল সে বিষয়ে কোনই সন্দেহের কারণ ছিল না। কারলাইল বা গ্যারিক সিংহমূর্ত্তির অবশিষ্টাংশ আবিষ্কার করিতে সমর্থ হন নাই। গ্রামবাসিগণ এ বিষয়ে তাঁহাদিগকে কোনই সাহায্য করিতে পারেন নাই। বজ্রাঘাতে বিধ্বস্ত হইয়া স্তম্ভটী এই ভাবে দীর্ঘকাল হইতে পড়িয়া আছে, ইহাই তাহারা বরাবর শুনিয়া ও দেখিয়া আসিতেছে; উপরে যে কোনও জন্তুমূর্ত্তি ছিল সে কথা তাহারা কখনও শুনে নাই।

গ্যারিক উত্তরে অবস্থিত অপর স্তম্ভখণ্ডটীও পরীক্ষা করিয়াছিলেন। উহার গাত্রে কোন লেখা আছে কি না দেখিবার উদ্দেশ্যে তিনি উহার চারিপার্শ্ব খনন করেন। পাঁচফুট খুঁড়িবার পর জল উঠিতে থাকে। স্তম্ভটী বালু পাথরের; মাটির উপরে প্রায় ৬ ফুট বাহির হইয়া আছে, এই অংশে পালিস দেখা যায়। উপর হইতে প্রায় ১৷৷ ফুট পরিমাণ অংশ কাটিয়া গিয়াছে। মাটির নীচে প্রোথিত অংশের পরিমাণ জল বাহির হওয়ার জন্য গ্যারিক নির্ণয় করিতে পারেন নাই। ঐ অংশে পালিস নাই। এইখানে বলিয়া রাখা ভাল এই খণ্ডটীকে গ্যারিক দ্বিতীয় এক অশোকস্তম্ভের নিদর্শন বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন।

ব্লক দ্বিতীয় স্তম্ভখণ্ডটীকে প্রথম স্তম্ভেরই সর্ব্বনিম্ন অংশমাত্র বলিয়া স্থির করেন এবং সে কথা যথেষ্ট যুক্তিসহকারে প্রমাণ করিবার প্রয়াসও পাইয়াছিলেন। জলা হইতে উত্তোলন করিয়া স্তম্ভটীকে উহার ভিত্তিদেশের উপর (অর্থাৎ উত্তরের অবস্থিত স্তম্ভখণ্ডটীর উপর) পুনরায় সংস্কার করিয়া প্রতিষ্ঠা করিবেন বলিয়া ব্লক স্থির করিয়াছিলেন। গভর্ণমেণ্টও এ প্রস্তাবে সম্মত হইয়া এ কার্য্যে কিরূপ ব্যয় হইতে পারে তাহার একটা আনুমানিক হিসাব চাহিলেন। তখন ভাল করিয়া পরীক্ষা করিতে গিয়া ব্লক দেখিলেন উভয় স্তম্ভখণ্ডের আকার ও পরিমাণগত পার্থক্য এত অধিক যে প্রথমটীকে দ্বিতীয়টীর উপরে স্থাপনা করা কোন মতেই সম্ভবপর নহে। তখনও তাঁহার একথা মনে হইল না যে উভয়খণ্ড একই স্তম্ভের অংশ নাও হইতে পারে। সুতরাং তিনি স্থির করিলেন যে, বৃহৎ স্তম্ভটীর পার্শ্বে এই খণ্ডটীকে স্বতন্ত্র স্থাপন করিতে হইবে, গ্যারিক বিচ্যুত চূড়াদেশ পুনরায় যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিতে হইবে—তজ্জন্য মিউজিয়ম হইতে তামকীলকটী লওয়া প্রয়োজন, দর্শকবৃন্দের নাম খুদিয়া অমর হইবার ইচ্ছারূপ উৎপাত হইতে স্তম্ভগাত্র রক্ষার জন্য উহার চারিপার্শ্বে একটী উচ্চ লৌহবেষ্টনি দেওয়া আবশ্যক। এই সকল কার্য্যে প্রায় ৬৩০০৲ টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া তিনি হিসাব করিয়াছিলেন। কিন্তু তহবিলে তখন টাকা না থাকায় তাঁহার ব্যবস্থামত কিছুই ঘটিয়া উঠে নাই।

ইহার পর দীর্ঘকাল রামপুরোয়ায় আর কোন অনুসন্ধান কার্য্য হয় নাই। বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে ডাঃ ব্লক এইস্থানে আগমন করেন। সুদীর্ঘকাল যাবৎ খাতের জল ও পাঁকের মধ্যে পড়িয়া থাকার ফলে স্তম্ভটীর অনেকখানিই পুনরায় মাটির মধ্যে বসিয়া গিয়াছিল। শুধু উপরের দিকে প্রায় ১৫ হাত দীর্ঘ স্তম্ভদণ্ড বাহির হইয়া ছিল। ক্যাপিটালটী গ্যারিক ২২ বৎসর পূর্ব্বে ফটো লইবার সময় যেস্থানে ফেলিয়া গিয়াছিলেন সেইস্থানেই পড়িয়া ছিল।

রামপুরোয়ার স্তম্ভটিকে রক্ষা করার জন্য কিছু ব্যবস্থা করা প্রয়োজন, ডাক্তার ব্লক সে কথা বারম্বার গভর্ণমেণ্টকে জানাইতে থাকেন। তাহার ফলে গভর্ণমেণ্ট ১৯০৬—০৭ খৃষ্টাব্দে A. H. Longhurst নামক জনৈক কর্ম্মচারীকে রামপুরোয়ায় প্রকৃতই একটি কি দুইটি অশোকস্তম্ভ আছে তাহা নির্ণয় করিবার জন্য প্রেরণ করেন। ভগ্নখণ্ডসমূহ পরীক্ষা করিয়া তিনি নিঃসন্দেহে বুঝিলেন ঐগুলি যথার্থই দুইটি বিভিন্ন স্তম্ভের নিদর্শন। অনন্তর গভর্ণমেণ্ট পণ্ডিত

দয়ারাম সাহনীকে এখানে অনুসন্ধান করিতে প্রেরণ করেন। স্তম্ভ দুইটির সম্বন্ধে সকলতথ্য অবগত হওয়া এবং সম্ভব হইলে উহাদের অপরাপর ভগ্নখণ্ডসমূহ উদ্ধার করিবার উদ্দেশ্যে তিনি এখানে আগমন করিলেন। অতি অল্পকাল মধ্যেই তিনি প্রথম স্তম্ভটীর সিংহমূর্ত্তির অবশিষ্ট অংশ ও দ্বিতীয়টীর অন্যান্য খণ্ড ও উপরের বৃষমূর্ত্তি আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইলেন।

সাহনী প্রথমে ভূপতিত স্তম্ভটীর তলদেশ খুঁড়িতে আরম্ভ করিলেন। কয়েক ফুট নিম্নেই বিশাল একটী প্রস্তরের বেদী বাহির হইল, স্তম্ভটি ইহার উপরেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। গুরুভার স্তম্ভের চাপে যাহাতে উহা স্থানভ্রষ্ট হইয়া না পড়ে এজন্য বেদীটীর চারিপার্শ্ব সুবৃহৎ শালকাষ্ঠের দণ্ড দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। খননের ফলে জরাজীর্ণ এইরূপ দুইটি কাষ্ঠদণ্ড বাহির হইয়াছিল। জল বাহির হওয়ার জন্য সাহনী বেদীটীর চারিদিক সম্পূর্ণরূপে খুঁড়িয়া দেখিতে পারেন নাই, তবে উহা যে এক সুবৃহৎ প্রস্তরখণ্ড সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। বেদীটীর দৈর্ঘ্য ৭ ফুট ৯ ইঞ্চি ও স্থূলত্ব ২১ ইঞ্চি। এস্থানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে আরও অনেক অশোকস্তম্ভের নিম্নে এরূপ প্রস্তর বেদীর সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

খননের ফলে জানা গেল ক্যাপিটাল বা চূড়াদেশবাদে স্তম্ভটী দৈর্ঘ্যে ৪৪ ফুট ৯।৹ ইঞ্চি, তন্মধ্যে পালিসযুক্ত অংশের পরিমাণ ৩৬ ফুট। চূড়াদেশ স্বতন্ত্র এক প্রস্তরখণ্ড হইতে নির্ম্মিত। পদ্মাকৃতি ক্যাপিটাল ৩ ফুট উচ্চ, তদূর্দ্ধে সিংহের মণ্ডলাকার বসিবার পীঠ ৬।৹ ইঞ্চি উচ্চ। ইহার গাত্রে দ্বাদশটী মরালচিত্র সুন্দরভাবে উৎকীর্ণ। উপরে সুন্দর ভঙ্গীতে উপবিষ্ট কেশরিমূর্ত্তি ৩ ফুট উচ্চ। সুতরাং অভগ্ন অবস্থায় স্তম্ভটী সর্ব্বসমেত ৫১ ফুট ৪ ইঞ্চি উচ্চ ছিল। সিংহমূর্ত্তির অবশিষ্টাংশ সাহনী ভগ্নস্তম্ভের অদূরে ভূগর্ভের সাত ফুট নিম্নে পাইয়াছিলেন। সিংহের এই অংশে মৌর্য্যপালিস এখনও পূর্ব্বের ন্যায় মসৃণ উজ্জ্বল রহিয়াছে। স্তম্ভদণ্ডসংলগ্ন পদচতুষ্টয়যুক্ত যে অংশ কারলাইলের আবিষ্কারকালে মাটির বাহিরে ছিল তাহার পালিস অনেকটাই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই সকল কারণে মনে হয় বহু শতাব্দীকাল পূর্ব্ব হইতেই স্তম্ভটী এইভাবে বজ্রাগ্নিধ্বস্ত অবস্থায় পড়িয়া ছিল।

অতঃপর সাহনীর দ্বিতীয় স্তম্ভটীর অপরাপর খণ্ডসমূহ উদ্ধারে সচেষ্ট হইলেন। সাতফুট খুঁড়িবার পর উহার নিম্নে একটী ইষ্টকবেদী দেখা দিল, উহা ৮ হস্ত দীর্ঘ ও ৬ হস্ত বিস্তৃত হইবে। বলা বাহুল্য, এই বেদীটীর উপরেই স্তম্ভটী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। আরও দুই ফুট খুঁড়িবার পর বেদীর নিম্নে চারিদিকে আয়ত একটী ইষ্টক চত্বরের নিদর্শন দেখা দেখা গেল। উহা কতদূর বিস্তৃত তাহা খুঁড়িয়া দেখিতে সাহনীর ইচ্ছা ছিল; কিন্তু চতুষ্পার্শ্বে অবস্থিত কৃষকগণের শস্যক্ষেত্রের জন্য তাঁহাকে সে চেষ্টা হইতে বিরত হইতে হয়।

খননের ফলে ভূগর্ভের ৯ ফুট নিম্নে উক্ত ইষ্টক-চত্বরের উপরে পতিত অবস্থায় স্তম্ভটীর অপর এক ভগ্নখণ্ড বাহির হইল। উহা ১৮ ফুট ৪ ইঞ্চি দীর্ঘ, এইটিই উপরের অংশ। ইহার প্রান্তভাগে কীলকযোগে চূড়া আঁটিবার উপযোগী এক ফুট গভীর ও ছয় ইঞ্চি ব্যাসের একটী ছিদ্র দেখা যায়। স্তম্ভটীর যে অংশ স্বস্থানে প্রোথিত ছিল তাহার নিতান্তই চরম দশা উপস্থিত হইয়াছিল। উহার উপরিদেশ বজ্রপাতের ফলে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল এবং স্তম্ভগাত্র হইতে বড় বড় চাঙ্গড় খসিয়া পড়িয়াছিল। এই খণ্ড ২১।৹ ফুট দীর্ঘ, তন্মধ্যে মৃত্তিকাগর্ভে প্রোথিত কর্কশ ও পালিসবিহীন অংশের পরিমাণ ৯ ফুট।

অতঃপর সাহনী স্তম্ভটীর চূড়াদেশ আবিষ্কারে সচেষ্ট হইলেন। এতদুদ্দেশ্যে তিনি উহার আশে পাশে নানাস্থানে খনন আরম্ভ করিলেন। কিছু অনুসন্ধানের পর ভূপতিত স্তম্ভের অদূরেই উহা পাওয়া গেল। পদ্মাকৃতি ক্যাপিটালের উপর দণ্ডায়মান বৃষমূর্ত্তি,—মৌর্য্যভাস্কর্য্যের সুন্দর নিদর্শন। উহা ৬ ফুট ৯ ইঞ্চি দীর্ঘ,—তন্মধ্যে উপরের বৃষমূর্ত্তি ৪ ফুট উচ্চ। সুতরাং অভগ্ন অবস্থায় স্তম্ভটী সর্ব্বসমেত ৪৬ ফুট ৭ ইঞ্চি দীর্ঘ ছিল। ইতিপূর্ব্বে আর কোন বৃষমূর্ত্তিশীর্ষ অশোকস্তম্ভ আবিষ্কৃত হয় নাই। সারনাথ স্তম্ভের ক্যাপিটালের গায়ে সিংহ, অশ্ব, হস্তীর সহিত বৃষচিত্র ক্ষোদিত দেখা যায় বটে। ফাহিয়ান ও হিউয়েনসঙ্গ উভয়েই শ্রাবস্তীতে

একটী বৃষমূর্ত্তিযুক্ত স্তম্ভের উল্লেখ করিলেও এ যাবৎ তাহার কোনই নিদর্শন পাওয়া যায় নাই।

সাহনী এই স্তম্ভটীর উভয় পার্শ্বে অবস্থিত বিধ্বস্ত স্তূপ দুইটি খনন করিয়া দেখিয়াছিলেন, কিন্তু উল্লেযোগ্য কিছুই বাহির হয় নাই। তাঁহার মতে এ দুইটিও নন্দনগড়ের টিপিগুলির অনুরূপ প্রাগৈতিহাসিক যুগের সমাধিস্তূপ।

সাহানী দেখিলেন যে স্তম্ভ দুইটির পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা একরূপ অসম্ভব। বজ্রাগ্নিধ্বস্ত স্তম্ভ দুইটির এরূপ চরম অবস্থা যে ভগ্ন খণ্ডসমূহ জুড়িয়া উহাদের পুনরায় স্থাপনা করা প্রভূত আয়াস ও অর্থশ্রাদ্ধ ব্যাপার। তদ্ভিন্ন রামপুরোয়ার মত দুর্গম স্থানে এতদুপযোগী বৃহৎ বৃহৎ যন্ত্রাদি আনয়ন করাও সম্ভবপর নহে। প্রথমেই তজ্জন্য উপযুক্তরূপ রেলপথ ও রাজপথ নির্ম্মাণ করা প্রয়োজন। তদ্ভিন্ন প্রথম স্তম্ভটীর গাত্রে যে লিপি আছে তাহা আরও নানাস্থানে দেখা যায়, দ্বিতীয়টীর গাত্রে কোনই লেখা নাই। সে হিসাবে স্তম্ভ দুইটির বিশেষ কোনই মূল্য নাই। এইরূপ নানা কারণে স্তম্ভদ্বয়ের অপরাপর অংশ ঐস্থানে পরিত্যাগ করিয়া সুধু চূড়া দুইটি কলিকাতা মিউজিয়মে স্থানান্তরিত করাই স্থির হইল। এই কার্য্যে প্রায় ১০০০০৲ টাকা ব্যয় হয় ও তিন বৎসর সময় লাগে। ইহা হইতেই সেই প্রাচীন যুগের শিল্পীদের কৃতিত্ব সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যাইতে পারে।

সাহনী মূর্ত্তি দুইটিকে স্থানান্তরিত করিবার পর স্তম্ভ দুইটিকেও জলাভূমি হইতে উত্তোলিত করিয়া সন্নিকটবর্ত্তী একটি গণ্ডশৈলের পৃষ্ঠে রক্ষা করিয়াছেন। লেখাগুলি যাহাতে সহজেই দেখা যায়, সেজন্য প্রথম স্তম্ভটি গুঁড়ির উপরে স্থাপিত হইয়াছে। রৌদ্র বৃষ্টি হইতে রক্ষার উদ্দেশ্যে উপরে একটি ছাদও দেওয়া হইয়াছে।

সম্প্রতি অশোকের অনুশাসনগুলির নূতন এক সংস্করণ Dr. Hultzsch কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে (১৯২৬)। তাঁহার জন্য লেখাগুলির নূতন করিয়া প্রতিলিপি ও ফটো গৃহীত হইয়াছে। Hultzsch-কৃত পাঠ ও ব্যাখ্যাই এক্ষণে প্রামাণিক। বুলহারকৃত পাঠের সহিত তাহার সামান্য সামান্য প্রভেদ দেখা যায়। স্বতন্ত্র এক প্রবন্ধে অশোকের অনুশাসনগুলির তাৎপর্য্য সম্বন্ধে বলা যাইবে।

শ্রীঅম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়



সঙ্কলন

বিশ্বভারতী

শ্রীঅমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

বিশ্বসৃষ্টিকে উল্টো দিক থেকে দেখ্‌লে কেবল তা'র বিচিত্র শক্তির দিকেই চোখ পড়ে, সেখানে সমস্তই আপেক্ষিক এবং আকস্মিক ব'লে' ভ্রম হয়, চরমের আনন্দময় উপলব্ধির অভাবে সমগ্রের রূপ আমাদের কাছে অনুদ্‌ঘাটিত থেকে যায়। এ রকম অবস্থায় কাব্যের মূলগত আনন্দে প্রবেশ না হওয়ায় মনে ভাবতে পারি বিচ্ছিন্ন শব্দের দ্বন্দ্ব সংঘর্ষেই বুঝি কাব্যের পরিচয়; অর্থাৎ কেবল উপকরণ আছে, এবং গতি আছে, হয়ত কৌশলের খেলাও থাক্‌তে পারে, কোথাও কোনো চরম মূল্য নেই। কিন্তু জ্ঞানী তাঁর উপলব্ধির যোগে কাব্যের ইচ্ছাকে গ্রহণ করতে পারেন ব'লে তাঁর কাছে বস্তুর বন্ধন আর থাকে না, পরম আলোকে তিনি অন্তরের ঐক্যটিকে বিচিত্র সম্বন্ধের অভিব্যক্তির ভিতর দিয়ে দেখ্‌তে পান। সেই অধ্যাত্মদৃষ্টিতে পূর্ব্বের মহাপটভূমিকায় রূপ পর্য্যায়ের বিচিত্র ধারা তাঁদের কাছে অন্তরের সামঞ্জস্যে ব্যঞ্জনাময় হয়ে ওঠে ব'লে তাঁরা বাধাকে নিয়মকে একান্ত করে' দেখেন না, মানুষের কাছে তাঁরা একটি পরম মিলনতত্ত্ব নিয়ে উপস্থিত হন, সৃষ্টিকে বিচ্ছিন্ন খণ্ডরূপে দেখার মরীচিকা ভ্রান্তিবশত মানুষের যে এত যন্ত্রণা, সেই দুঃখের কারণ তাঁরা ভিতর থেকে দূর করে' দেন।

যুগে যুগে মহাপুরুষ লোকালয়ে এসেছেন এই বাণী নিয়ে, কালের বিভিন্নতায় তা'র প্রকাশ এবং প্রয়োগ ভিন্নরূপ নিয়েছে, কিন্তু উপনিষদের যুগে ঋষি যখন দিব্যধামবাসী অমৃতের সন্তানকে ডেকেছিলেন, বুদ্ধদেব অপরিমেয় মানস-রক্ষার দ্বারা মানুষকে দুঃখপারের পথ দেখিয়েছিলেন, খৃষ্ট এক পিতার পুত্ররূপে সকলের প্রেমকে অনন্তের দিকে উদ্বোধিত করেছিলেন, মানুষের কাছে অস্তিত্বের এই আনন্দময় মিলনের সম্বন্ধটিই নির্ম্মল, সত্য হয়ে দেখা দিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী সেই বাণী আজ নবযুগের দ্বারে এসেছে, তাঁর সমগ্রজীবনের মধ্য দিয়ে, কাব্য সৃষ্টির ভিতর দিয়ে উজ্জ্বল স্পন্দন হয়ে সর্ব্বমানবের মিলনতত্ত্বটি পরম প্রকাশিত হয়েছে।

কালের ক্রমপরিণতিবশত সত্যকে নূতন রূপ নিয়ে দেখা দিতে হয়—তার মধ্যে বর্ত্তমানের সঙ্গে বিশেষের সঙ্গে সেই যোগ থাকা চাই যাতে মানুষ তাকে সহজে আপন ব'লে চিন্‌তে পারে, আপন করে' নিতে পারে। আজ্‌কের দিনে মানুষ যেখানে বাধা বিরুদ্ধতায় পীড়িত, যেখানে মোহাবরণে তা'র সত্যদৃষ্টি প্রচ্ছন্ন, সেই বেদনায় বিশ্বভারতী শান্তিমন্ত্র উচ্চারণ করেছে, তাকে আলো দেখিয়েছে। মানুষের শক্তি এবং তা'র প্রয়োগক্ষেত্র আজ্‌কের দিনে বহু প্রসারিত, নিবিড়তর, কিন্তু তা'র সমস্ত ইচ্ছা পূর্ণরূপে পরম অভিপ্রায়ের সঙ্গে মিলিত হচ্ছে না ব'লে তা'র চিত্ত আজ ভারগ্রস্ত, সে কিছুতেই শান্তি পাচ্ছে না, তার নিজের বিচিত্র শক্তির বেগ সৃজনলীলার আনন্দে যুক্ত হতে না পেরে প্রতিনিয়ত নিজেকেই মর্ম্মাহত করেছে। ব্যক্তিগত জীবনেও যেমন, মানব সভ্যতার ভিতরেও শক্তির জাগরণ অনন্তের উপলব্ধি নিয়ে সত্যে প্রকাশ না পাওয়া পর্য্যন্ত তার অন্তরে অন্ধ আন্দোলনের অন্ত নেই, তখন বিচিত্র শক্তির বিবিধ অপব্যয়, আত্মবিরুদ্ধতা, অকারণ উত্তেজনা, তীব্র অবসাদ। চরমের স্পর্শ পাওয়া মাত্র তা'র এই দৈন্য দশা ঘুচে যায়, তা'র জ্ঞান ও কর্ম্ম, প্রেরণা ও প্রকাশ অন্তর্নিহিত সামঞ্জস্যে বিবৃত হয়ে সুষমায় অভিব্যক্ত হতে থাকে, তার সমস্ত বেদনা পরম চেতনায় ধন্য করে' তোলে। মানব ইতিহাসে সমস্ত পৃথিবী জুড়ে এত অশান্তি, উদ্বেগ, এত বিচিত্র বহুমুখী উদ্যমের সংঘর্ষজনিত উগ্র উত্তেজনার আবর্ত্তন কখনো এমন একান্ত, সর্ব্বব্যাপী হয়ে দেখা দেয়নি—এতেই বোঝা যায় মানব সভ্যতা একটি নবজাগরণের সন্ধিস্থলে এসে দাঁড়িয়েছে, তার এতদিনকার সঞ্চিত শক্তি সত্য সমন্বয়ে মুক্তিপথ খুঁজছে, অতীতের খণ্ড বিভক্ত কর্ম্ম-প্রচেষ্টার সে কিছুতেই

তৃপ্তি পাচ্ছে না, অথচ আত্মার যে বড় আশ্রয়ের যোগে তার শক্তি সত্যে সৃজিত হয়ে উঠতে পারে তাকেও সে সম্পূর্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে দৃঢ় করে অধিকার করতে পারছে না। প্রাচ্য মহাদেশে বহু সাধকের আবির্ভাবে জনমনে চরমের ঐশী শক্তিতে বিশ্বাস জন্মেছে, কিন্তু কর্ম্মের মধ্যে দিয়ে এর সত্যতা রাখতে পারেনি ব'লে বারেবারে তার ইতিহাস কখনো আবদ্ধ চেতনাকে তীব্র ক'রে পাওয়ার চেষ্টা, আবার ঐকান্তিক সাধনার প্রতিক্রিয়ারূপে কখনো অবচ্ছিন্ন অদ্বৈতবাদের স্থানে অসংযত ভাব-বিহ্বলতা দেখা দিয়েছে—উভয়েরই মূল সত্যের সঙ্গে কর্ম্মময় যোগের অভাব। আমরা একান্তভাবে বিশ্বাস করেছি যে, পশ্চিমদেশের লোক স্বভাবতই সচল এবং ক্রিয়াশীল ব'লে তারা যন্ত্রের প্রতি আস্থাবান, তারা বিশ্ব ব্যাপারে শক্তিকে স্পষ্ট করে' উপলব্ধি করেছে এবং তাকে নিজের অনুকূল করে তোলার সাধনায় জড় জগতে জীবজগতে ওরা জয়ের পরিসর বাড়িয়ে চলেছে। কিন্তু সত্যকে প্রয়োগ করতে না পারলে যেমন তার প্রাণধর্ম্ম ক্ষীণ হয়ে আসে, তেমনি চরমকে পূর্ণকে স্বীকার না করলে কর্ম্মও সৃজনধর্ম্মী না হয়ে কেবলমাত্র স্বার্থ-সাধনতন্ত্রের ব্যগ্রতায় আপনার দুর্গতিকে ডেকে আনে। এই জন্যে বুদ্ধদেব বলেছেন রূপরাগ, অরূপরাগ দুইই পরিত্যাজ্য; যে মৈত্রীজ্ঞানে উভয়ের সমন্বয়, বিশ্বভারতীর প্রথম কথাই হচ্ছে তাই। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকে আহ্বান করেছেন কোনো উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে নয়, বিশ্বভারতীর আনন্দময় মিলন-বাণী পূর্ব্বপশ্চিমকে অভিন্ন প্রেমের সার্থকতার সন্ধান দিয়েছে, ঐ প্রেমের যুক্ত সম্বন্ধেই আত্মজ্ঞান এবং সেই কারণেই এতে অহঙ্কার-রিপুর ক্ষয়, মঙ্গলকর্ম্মের প্রতিষ্ঠা। মানুষের মধ্যে এই আলো এলেই সে পরমের ঐক্যবোধে সৃজনের বৈচিত্র্যকে উপলব্ধি করে, এবং তখনই সে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের প্রতিষ্ঠাভূমি থেকে কর্ম্মের বিভিন্নতায় আত্মপ্রকাশের শক্তি পায় কারণ মিলনের অর্থ স্বাতন্ত্র্য বিলোপ নয়, সত্য সম্বন্ধ। বিশ্বভারতীর আদর্শ মানবের ঐক্যবোধকে জাগ্রত করে' তাকে ব্যক্তিবিশিষ্টতায় আত্মপ্রকাশের পথ দেখিয়ে দেওয়া। ইউরোপে আজ আত্মার দুর্ব্বলতায় লোভকে বিরোধ করে তুলে তারই যোগে কর্ম্মকে স্থায়ীত্ব দিতে চেষ্টা করছে, কারণ তারা অস্তিত্বকে শ্রদ্ধা করে; তাই পশ্চিমদেশে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের এক প্রধান পুরোহিত তাঁর ইতিহাসে বিচিত্র প্রাকৃতিক শক্তির ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার ফলে মানব সরলতায় আত্মা নামক নূতন এক শক্তি প্রক্ষিপ্ত হওয়ার কথা লিখেছেন। এই নূতন শক্তিকে সুবিধামত প্রয়োগ করে' বিশেষ বিশেষ দেশকে একত্র বন্ধনে যুক্ত করতে তিনি যত্নবান; আমাদের দেশে ভাব সম্ভোগসাধনায় সনাতন মূর্ত্তি বিগ্রহকে ধ্যানের উপকরণ করে' তুলে শক্তির বৈচিত্র্যকে আমরা উপেক্ষা করেছি। দুঃখে অভিভূত হয়ে সমগ্রের যোগবিচ্ছিন্ন বিশেষ শক্তির প্রয়োগে আশু ফলপ্রাপ্তির আশায় দেশাত্মার পূর্ণ জাগরণের চিহ্ন নেই, মোহ আছে। কিন্তু আজকের এই যুগসন্ধির দিনে কোনো সঙ্কীর্ণ উদ্দেশ্য সাধনের আহ্বানে আত্মার অবমাননা মানুষের সইবে না, আজ তার সমস্ত শক্তি সমস্ত বেদনা চরমকে স্পর্শ করতে চায়, সব চেয়ে যা বড় তার কমে আর তার অধিকার নেই। সমস্ত উত্তেজনা সমস্ত ব্যগ্রতার মধ্যে আজ আমরা সেই মঙ্গলময় আশার বাণী শুনতে পেয়েছি। আমাদের দুঃখের তপস্যায় পথ জ্যোতি এসে পৌঁছেচে, বিশ্বভারতী আমাদের কাছে সেই আনন্দময় মুক্তির সন্ধান এনেছে—যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ং। উপনিষদে বলেছেন আত্মার মহিমা উপলব্ধি করা যায় ধাতু প্রসাদাৎ—অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের প্রসন্নাবস্থায়; চিত্তকে শান্ত ক'রে, বাধাকে বিরোধকে শুভ বুদ্ধির দ্বারা সংহত করে' আজ আমরা বিশ্বভারতীর এই অমৃত বাণীকে সহজেই গ্রহণ করতে পারব। পূর্ণের আহ্বানে মানুষের বিচিত্র শক্তি সৃজনধর্ম্মী হয়ে ওঠে, তার প্রাণ মন চৈতন্যময় কর্ম্ম-বিকাশে মুক্তির স্বরাজ সাধনায় জয়ী হয়ে চলে, আশ্রম নিকুঞ্জবনে যে সত্যের প্রেরণায় জ্ঞানী তপস্বী শিল্পী কর্ম্মী মুক্তির উৎসবে যোগ দিয়েছেন, তার আলো আজ সমস্ত বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে, শুভ জাগরণের চিহ্ন ভেদ করে' দেখা দিয়েছে। এই পূর্ণ সত্যের সাধনায় আবরণ মানুষের নানা জাতির আত্মীয়তা, নানা শক্তির সমন্বয়, কল্যাণ কর্ম্মে, ত্যাগে সাহচর্য্যে এইখানেই আমাদের চিরদিনের আশ্রয় চিরদিনের মুক্তি।

[শান্তি-নিকেতন পত্রিকা হইতে]



ভরত-মিলন

[কাঙ্গর দেওয়ালে (fresco) আঁকিবার জন্য]

শিল্পী — শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার

শ্রীযুক্ত রাজাসাহেব তিলোই [যুক্ত প্রদেশ] বাহাদুরের সৌজন্যে

দুই নারী

শ্রীযুক্ত অবিনাচন্দ্র বসু এম-এ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

মাধব এখন প্রায়ই বিকেলে নদীতে না গিয়ে দেবালয়ে যায়। সহসা কি কোরে তার দেবভক্তি বেড়ে উঠল। সে সে শুধু মন্দিরে দেব-দর্শন করেই সন্তুষ্ট হয় না। বাইরে দাঁড়িয়ে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত মন্দিরের গায়ের ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্য নিরীক্ষণ করে। ভাবে, কি সুন্দর, নৃত্যশীল প্রস্তরমূর্ত্তি মন্দিরের গায়ে বসানো হয়েচে! কি চমৎকার কারিগর ছিল তখনকার লোক! কি দৃঢ় বাঁধ সে পাথরের! দুহাজার বছর আগে এদেশ কতই না উন্নত ছিল!

হঠাৎ মাধবের মন্দির-গাত্র পর্য্যবেক্ষণ থেমে যায় কেন? বুক দুর দুর করে ওঠে কেন? শত শত মেয়েমানুষ আসে যায়, মাধব কারো দিকে তাকায় না, কিন্তু ঐ শ্যামবর্ণের ঘোমটা-পরা মেয়েটির প্রতি তার এত গভীর দৃষ্টি কেন? হঠাৎ এক মিনিটের মধ্যে ফিস্ ফিস্ করে দু'জনে ও কি কথা?

মাধব বাপের কাছে চিঠি লিখল, পরীক্ষা নিকট, এবার বড়দিনের ছুটিতে বাড়ী আস্‌বে না, সহরে থেকে পড়াশোনা করবে। এবারকার মাসিক পরীক্ষার ফল বাপকে জানাল না, কেন না, সে সংস্কৃত পরীক্ষা দেয় নি, অঙ্ক পরীক্ষাতেও ভাল ফল হয় নি!

*   *   *

সেদিন স্কুলে মেয়েদের ঘরে ইন্দু বল্‌ছিল, "কি লা কমলি! তুই মাধুর দিকে বার বার তাকাচ্ছিলি যে! ব্যাপারখানা কি?" কমলা নেহাৎ সাধুব্যক্তির মত বল্‌ল, "দূর। তোর যা খুসি তুই তাই বল্‌বি।"

কিন্তু পরদিন ইন্দু ক্লাসের মধ্যে বার বার কমলাকে চিম্‌টি কাটছিল। ক্লাসের শেষে বল্‌ল, "এবার ধরা পড়লি কি না বল্।" কমলা শুধু হাস্‌ল।

তারপরদিন বামন ক্লাসে ঘোষণা করল যে কমলা ও মাধবে "লভ" হচ্ছে! এতকাল পরীক্ষার চাপে সে নিজের 'মিলন' বিস্মৃত হয়ে ছিল। এ সব বিষয়ের গবেষণা করবার সুযোগ পায় নি। এখন হঠাৎ মেতে উঠল। খবরটা কি ইন্দুর কাছ থেকে বেরিয়েচে! হ'তে পারে।—বামন এতদিনে বুঝতে পারল, কমলার বিরুদ্ধে কিছু বললেই মাধব এতকাল কেন রুখে উঠত। সে প্রচার কর্‌ল, তাদের বইয়েতে যে রোমিও জুলিয়েটের কথা বলা হয়েচে, তারা আর কেউ নয়, মাধব আর কমলা। বামন ক্লাসকে জানাল যে, জ্বর হয়েছিল বলে যে মাধব সংস্কৃত পরীক্ষা দেয় নি, সে সব মিছে কথা। ওরকম ছেলেরও জ্বর হয়—যে রোজ জোড় বৈঠক করে, সাঁতার কাটে?

*   *   *

সেদিন স্কুলের পথে বামন ক্লাসের গুটিকতক ছেলের সঙ্গে নানা বিষয়ের আলোচনা কর্চ্ছিল। প্রথম ইন্দুর বিয়ে। পরীক্ষার পরেই তার বিয়ে হ'বে স্থির হয়েচে। বামন বল্‌ছিল, "মেয়েরা লেখাপড়া শিখতে আসে কেন? বিয়েই যখন একমাত্র উদ্দেশ্য, তখন আর ইস্কুলের বই মুখস্থ করে কি লাভ?"

তারপর বলছিল, "সে গোয়ানী মেয়ে এথেল বেচারীর কি মুস্কিল! তাদের সমাজে স্ত্রী-স্বাধীনতা, মেয়েকে নিজের বর খুঁজতে হয়।

আগলাওয়ে বল্‌ল, "হস্পিটালের ডাক্তার ডি-সুজা তার কোর্টশিপ কর্চ্ছে"! বামন প্রতিবাদ করে' বল্‌লে, "এথেল কর্‌চে ডি সুজার কোর্টশিপ। দেখ না আজকাল মুখে কত কত পাউডার মাখা হয়!"

একটু থেমে বামন হেসে বলল, "ইন্দুকে যদি কোর্টশিপ করে বিয়ে করতে হ'ত,—তবে কোথায় পেত আইন পাশ করা বর? তার সঙ্গে কেউ কথাও বলতে আসত না!"

ছেলেরা হো হো করে হেসে উঠল।

তারপর মাধব ও কমলার কথা উঠল। কমলার চরিত্র যে শুধু চঞ্চল নয়, আরো কিছু, একথাটা বামন সঙ্গীদের বোঝাতে চেষ্টা কর্চ্ছিল। মাধবের সাধুতা যে সব ভণ্ডামি তা' সে প্রথম দিন থেকেই বুঝতে পেরেচে।

এমন সময় ছেলেরা যা' দেখল, একা থাকলে তা' বিশ্বাস করে ওঠাই কঠিন হয়ে পড়ত। দেখল, মাধব আর কমলা হ্রদের দিক হ'তে পাশাপাশি আসচে!

ছেলেদের দেখে তারা হঠাৎ থমকে' দাঁড়াল, তারপর পাশ কাটিয়ে চলে গেল। ছেলেদের উত্তেজিত আলাপ অনেক দূর পর্য্যন্ত তাদের কানে পৌঁচেছিল!

পরদিন ক্লাসের বোর্ডে দেখা গেল মোটা মোটা অক্ষরে লেখা, রোমিও-জুলিয়েট! তারপর দুই লাইন কবিতা—

আমি যদি তার হাতের দস্তানা হতাম্
তবে তার কপোল স্পর্শ করতাম্।

তারপরে আবার নাটকের নায়ক-নায়িকার নাম, কিন্তু "আর"এর স্থানে "এম" আর "জে"র স্থানে "কে"।

মাষ্টার ক্লাসে এসে বোর্ডের দিকে তাকাতেই সব ছেলেরা ঘরের মেজের ওপর পা দাপিয়ে উঠল। মাষ্টার রাগ করবেন ভাবলেন, কিন্তু কি করেন, এ যে পড়ার বইয়ের কথা, তিনিই তো সেদিন পনেরো মিনিট পর্য্যন্ত তার কবিত্বের ব্যাখ্যা করেছেন।

ছুটীর পর সব ছেলেরা মাধবকে ঘিরে বলতে লাগল, "রোমিও!" মাধব আজ রাগ করে না, জামার হাতা গোটায় না, শুধু মৃদু হাসে।

কমলার বাড়ীর অর্দ্ধেক রাস্তা পর্য্যন্ত তিন চারটি ছেলে তার পেছনে পেছনে যাচ্ছিল, আর নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল। সে কথার মধ্যে বার বার "জুলিয়েট" শব্দটা উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারিত হচ্ছিল!

কিন্তু এতে কমলা ও মাধব দমল না, বরং তাদের জেদ চড়ল। ছেলেদের দৃষ্টি এড়িয়ে আরো বেশী করে দুজনে একত্র চলতে লাগল। লোককে ফাঁকি দিয়ে গোপনে দেখা করা দুজনার একটা খেলা হয়ে পড়ল। যেদিন বামন ও তার সঙ্গীরা গিয়ে নদীতীরের পথ আগলে দাঁড়াল, সেদিন মাধব ও কমলা মন্দিরে; যেদিন বামনেরা মন্দিরের তিনটী দরজাতেই পাহারা দিতে লাগল সেদিন প্রেমিক-প্রেমিকা ছুটিতে সিনেমায়; যেদিন বামন সৎমা'র বাক্স হতে টাকা চুরি করে দলে বলে সিনেমায় গিয়ে বসল, সেদিন মাধব ও কমলা পাহাড়ের ওপরের মারুতি মন্দিরে কর্পূর জ্বালাচ্চে!

* * *

এভাবে কয়েক দিন কাটল।

এক সুন্দর অপরাহ্নে হ্রদের ওপর অস্তরবির শেষ রশ্মি পড়েছিল। পশ্চিমের ধূসর পাহাড়গুলোর মধ্যে কে যেন আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল। হ্রদের জল ঢেউয়ে ঢেউয়ে নেচে উঠতে লাগল। তার ওপর বুনোহাঁসেরা দোলা খাচ্ছিল। হ্রদ সহরের বাইরে, তাই রাস্তায় লোক চলে না। শুধু মাঠ হতে মোষের দল ফিরে আসছিল।

হ্রদের এক কোণে ছোট্ট একটী মেয়ের হাত ধরে এক তরুণী তন্ময় হ'য়ে জল ও আকাশের দিকে চেয়ে ছিল। আকাশের অরুণ আভা তার মুখের ওপর পড়েছিল। তাদের কিছু দূরে মেয়েমানুষেরা পাথরের ওপর কাপড় কাচ্‌ছিল। নীল জলের পাশে তাদের লাল শাড়ী দূর হ'তে চকমক্‌ কর্চ্ছিল। ছোট বালিকাটি এক দৃষ্টে দেখছিল, ঢেউগুলি কেমন করে পারের পাথরের দেয়ালে এসে ঠেক্‌চে, আর দেয়ালের পাশে ফেনার রাশি ছড়িয়ে দিচ্চে।

পেছন হ'তে কে ডাকল, "কমলে!" কমলা ফিরে দাঁড়াল। দেখল, মাধব নয়, দানে। সাইকেল হাতে দাঁড়িয়ে। দেখলেই মনে হয়, কলেজের ছেলে। পরণে ফর্সা মিহি ধুতি—পায়ের ওপর ক্লিপ দিয়ে চাপা, সার্জ্জকোট, পশমী "মাফ্‌লার"। মাথায় মখ্‌মলের টুপী। বেশ লম্বা চোড়া চেহারা। বয়স বছর বাইশেক।

দানের দিকে চেয়ে কমলা মৃদু হাসল। ও হাসিটির যে বিশেষ একটা প্রভাব আছে তা কমলা অনেক কাল পূর্ব্বেই আবিষ্কার করেচে। চার বছর আগে ছেলেদের সঙ্গে পাল্লা

দিতে গিয়ে কত কাঁদাকাটি, মাষ্টারের কাছে কত নালিশই না করেচে। কিন্তু গত দুবছর যাবৎ দেখে আসচে, ছেলেদের সঙ্গে লড়বার দরকার হয় না, তাদের দিকে চাইলে তারা হঠাৎ কেমন থতমত খেয়ে যায়, হাসলে তারা মুখ কাঁচুমাচু করে ফেলে, আর তাদের সঙ্গে কথা বললে, তারা কেমন সতৃষ্ণ ভাবে শোনে।

দানে বলল, "কম্‌লি, তুই এখনও এখানে ?"

কমলা চোক ঘুরিয়ে বল্‌ল, "তাতে তোর কি এসে গেল ?"

দানে হাস্‌ল। বল্‌ল, "পড়ার তৈরি কি পর্যান্ত ? আগামীতে কলেজে আস্‌বি তো ?"

কমলা বল্‌ল, "তোর পড়ার কি ? তুই আগামীতে কলেজে থাক্‌বি তো, না পোষ্ট-আফিসে কেরাণী হবি ?"

এ কথাটা দানের আঁতে ঘা দিল। সে একটু গম্ভীর ভাবে বলল, "ধর, আমি কেরাণীই হ'লাম, তা'হলে তোর চক্ষে আমি খাটো হয়ে পড়্‌ব ?"

কমলা প্রগল্‌ভভাবে বল্‌ল, "নিশ্চয় ! আমি কেরাণীকে শ্রদ্ধা করি নে। তুই এবার পাশ না কর্‌লে তোর সঙ্গে কথাই বলবো না। যা, এখন পড়াশোনায় মন দে গিয়ে। বিকেলে কোথায় খেলাধুলো কোরবি, না কেবল সাইকেল চড়া ? সাইকেলে চড়ে ব্যায়াম হয় ?" বলে হাস্‌তে লাগ্‌ল।

দানে বল্‌ল, "ইস্কুলে পড়ে তুই এসব কি বুঝবি ? একবার কলেজে আয়, দেখবি জগতে কোন্ জিনিষের আদর বেশী।"

কমলা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলতে লাগ্‌ল—সে গাম্ভীর্য্যটা নেহাৎই দুষ্টুমি—"আমি ম্যাট্রিক পাশ করে দিল্লী মেয়েদের কলেজে ডাক্তারি পড়্‌তে যাব, তোদের ও-সব কলেজে আমি পড়ি না।"

দানে অপ্রস্তুত হয়ে হেসে বল্‌ল, "আচ্ছা, দেখাই যাবে কোথায় যাও। পাশ করেই নাও না। হয়ত দিল্লী যাবার আগে পিরিপনাস্তে লেগে যেতে পার।"

কমলা দৃঢ়ভাবে বল্‌ল, "আমি বিয়ে করবো না। বি এ পাশ না করে কক্ষখনো বিয়ে করবো না।"

দানে পুরুষ-সুলভ তর্কশাস্ত্রের জোরে বলল, "এই যে বললি, ডাক্তারি পড়বি, আবার বলছিস্ বি, এ, পাশ ?"

তার উত্তরে কমলার হাসি, কটাক্ষ, আর—"আমার যা ইচ্ছে আমি তাই কোরবো। তোর তা'তে কি ? তুই তোর পড়াশোনা কর।"

দানে বেশ প্রফুল্লমুখেই সাইকেলে উঠ্‌ল। কমলা তার পানে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। সাইকেলটা হ্রদের রাস্তা ছেড়ে নীচে নেমে অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

কমলা হ্রদের পারের রাস্তা ধরে চল্‌ল। হঠাৎ নীচের রাস্তা হ'তে মাধব এসে ওপরের রাস্তায় উঠ্‌ল। তার মুখখানা অস্বাভাবিক রকম গম্ভীর। কমলার পানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি করে বল্‌ল, "এতক্ষণ কার সঙ্গে কথা হচ্ছিল ?"

কমলা ভুরু কোঁচ্‌কাল। বল্‌ল, "কোথায় ? না।"

মাধবের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি কমলার চক্ষু বিদ্ধ করতে লাগল। সে কঠোর ভাবে বল্‌ল, "আমি নিজে দেখেচি।"

কমলা চেষ্টা করে হেসে বল্‌ল, "তুমি দেখ্‌লেই হল ?"

মাধব চলে গেল। কমলাও ফির্‌ল।

* * *

পরদিন ক্লাসে মাধব অসম্ভব রকম গম্ভীর হয়ে বসে রইল। কমলার সঙ্গে একটীবারও দৃষ্টিবিনিময় করল না। গোপাল জয়সিংকে বলছিল, "বামন সব মিছে কথা প্রচার করে মাধবের মন খারাপ করে দিয়েচে।"

বিকেলে বালু মাধবকে এনে চিঠি দিল। মাধব পড়ল, উত্তর দিল না।

সেদিন মাধব একাকী বেড়াতে বেরুল। নদীর ঘাটের এক কোণে একটা বড় পাথরের ওপর চুপ করে বসে রইল। কিন্তু যে একা থাকতে পারল না, কিছুক্ষণ পরে তার সমপাঠী ছেলেরা এসে জুটল। দলে গোপাল জয়সিং এরা ছিল। মাধব কোনো কথায় যোগ দিল না। কথার শেষে শুধু জয়সিংকে বলল, "একটা গান গা।" জয়সিং একটু দুষ্টু হাসি হেসে গান ধর্‌ল,—"মম প্রেমাটী সুন্দর বালিকা!" প্রথমে ছেলেরা হেসে উঠল, কিন্তু গান যতই চল্‌তে লাগল, ততই তারা গম্ভীর হয়ে পড়ল। সন্ধ্যার আবছায়াতে ঐ নদীর তীরে বসে সেই পাঁচ ছয়টী তরুণ যুবক, যেন কোন্ চিরপরিচিত, প্রাণের অন্তস্তলে লুকানো এক একটী "সুন্দরী বালিকার" ধ্যানে মগ্ন হয়ে পড়ল ! কে সে সুন্দর বালিকা ? কোথা

হ'তে তাদের হৃদয়ে এল ? কি করে তাদের ধমনীতে ধমনীতে আনন্দের স্পন্দন জাগাল ? মাধবকে জিজ্ঞাসা করলে বলত, কমলা ! কিন্তু তার হৃদয় ভাল করে খুঁজে দেখলে দেখা যেত, সে কমলা নয়, হয় ত কমলা কতকটা বা অনেকটা তার মত।······তবে কি সে সুন্দর বালিকা প্রত্যেকের বংশগত একটা জিনিষ, যা জন্ম থেকে মগজে লুকানো থাকে, জীবনের পদে পদে প্রাণশক্তি সঞ্চারিত করে ? কোনও বাস্তব নারীর মধ্যে তার সাদৃশ্য দেখে লোকে হঠাৎ চম্‌কে ওঠে, বলে— Love at first sight—দৃষ্টি মাত্রেই প্রেম ? *

সন্ধ্যার পর ঘরে ফিরে মাধব মনের আবেগ ইতিহাস পাঠের ভিতর দিয়ে ব্যক্ত করতে চেষ্টা কচ্ছিল। তার টেষ্ট পরীক্ষা নিকটে, কিন্তু গত এক মাস পড়াশোনা একেবারে করে নি বললেও চলে। মাধব অশোকের শিলালিপি কণ্ঠস্থ কচ্ছিল, হঠাৎ তার দরজাটা ঠক্ করে উঠ্‌ল। ফিরে দেখ্‌ল বালু। ভাব্‌ল, নিশ্চয়ই আর একখানা চিঠি নিয়ে এসেচে, কিন্তু আজ তা' নিতে ব্যস্ত হ'ল না। নীরবে তার অপেক্ষা করতে লাগ্‌ল। কিন্তু বালু মাধবকে দেখেই চলে গেল। মাধব একটু অবাক হয়ে দরজার দিকে চেয়ে রইল। এমন সময় দরজার চৌকাটের ওপর হাসিমুখে এসে দাঁড়াল— কমলা !

মাধব বিস্ময়ের সহিত উঠে দাঁড়াল। কমলা ভিতরে এল। বলল, "মাধব, তুমি এম্‌নি করে আমার সঙ্গে রাগ করে থাক্‌বে ? তা থাক্‌তে চাও বেশ। আমি শুধু বলতে এসেচি, আমিও রাগ করব ; তখন তোমার সঙ্গে কোনো দিনও কথা হবে না।"

মাধব বলিল, "তুমি আমার সঙ্গে রাগ করবে কেন ? আমি তোমার কেউ নই। তুমি যে দানেকে ভালবাস।"

কমলা রেগে বল্‌ল, "বামনের মুখে তা' শুনেচ নিশ্চয় ! বামন হ'ল এখন তোমার বন্ধু !"

মাধব বল্‌ল, "আমি আসার আগে থেকেই দানের সঙ্গে * তোমার ভাব, আমি তোমার কে ?" বল্‌তে বল্‌তে অভিমানে তার ঠোঁট দুটি কেঁপে উঠ্‌ল।

কমলা দ্রুত বল্‌তে লাগল, "ওসব মিছে কথা মাধু ! বামনের দুষ্টামি। তাকে তুমি বিশ্বাস কর ? আমি কোনদিন কারু সঙ্গে ভাব করিনি।"

মাধব কতকটা দমে গেল। তবু বল্‌ল, "আমি নিজে যে দেখ্‌লাম, তার সঙ্গে তুমি হেসে কথা বললে।"

কমলা ঝগড়ার সুরে বল্‌ল, "তা বল্‌ব না ? খুব বল্‌বো। তুমি 'না' বলবার কে ?" বলে রাগ করে ফিরে চল্‌ল।

মাধব আস্তে আস্তে গিয়ে তার সামনে দাঁড়ালো। কমলা তবু পাশ কাটিয়ে চল্‌ল। মাধব ধীরে ধীরে তার হাতখানি ধর্‌ল।

কমলা দাঁড়াল। মুখ ফিরালে মাধব দেখল, তার চোখে জল। সে মুষড়ে গেল। একটু ভাব-প্রবণ ভাবে বলল, "তুই * আমায় ভালবাসিস্ কমল ?"

কমলা নিজের হাতখানি মাধবের কাঁধের উপর রাখল। অশ্রুসিক্ত মুখখানি মাধবের বুকের কাছে নিল।

মাধব এক মুহূর্ত্ত চুপ করে রইল। তার পর বাঁ হাতে কমলার দেহখানা বেষ্টন করে ডান হাতে শাড়ীর আঁচলটি তুলে তার চোক মুছিয়ে দিল। মিনতির সুরে বল্‌ল, "আমার অন্যায় হয়েচে, কমল, আমায় মাপ কর্‌।" কমলা স্নেহে অভিভূত হয়ে তার মাথাটি নিয়ে মাধবের বুকে গুঁজল।

মাধব আর্দ্রকণ্ঠে বল্‌ল, "কমল, আমার কমু, আমি তোকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসি।"

কমলা তার হাসিভরা মুখখানি ওপরে তুলে ধরল। কোমল স্নিগ্ধ দৃষ্টি তার ! মাধব দু-হাতে মুখখানি ধরে—

সিনেমা দর্শক মাত্রেই এ দৃশ্যটির সঙ্গে পরিচিত। কিন্তু এর ছাপ কোনো প্রবল ক্যামেরার "লেন্সের" ওপর পড়্‌ল না, পড়ল গিয়ে জানলার ভিতর দিয়ে বারান্দায় দাঁড়ানো বাড়ীওয়ালী প্রৌঢ়া গঙ্গা বাই-র মিট্‌মিটে চোখ দুটির "রেটিনার" ওপর ! গঙ্গাবাই সিনেমাতে যায় নি, রুডলফ ভেলেন্টিনোর "ক্লোজ আপ" দেখে নি, তাই তার চোক কপালে উঠ্‌ল। সেই ছোট জানালার ভাঙ্গা সার্সির ভিতর দিয়ে পুরাণো ভারত নয়া ভারতের দিকে নিঃশ্বাস বন্ধ করে চেয়ে রইল !

* ইহা জার্মেন মনস্তত্ত্ববিৎ ইয়ুং (Jung)-এর মত।

* মারাঠীতে প্রেমিক প্রেমিকাকে তথা স্বামী স্ত্রীকে 'তুই' বলে' সম্বোধন করে।

মাধব কমলার হাত ছেড়ে ভাবাতুর কণ্ঠে বল্‌ল, "কমল, তোকে আমি একটা কথা বল্‌তে চাই।"

কমলা ফিক্‌ করে হেসে বল্‌ল, "তা' পরে হবে।" বলে ছুটে পালিয়ে গেল। মাধব অপ্রস্তুত হয়ে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। তখন কমলা অনেক দূর চলে গেচে। সে তন্ময় হয়ে রাস্তার দিকে চেয়ে রইল। বাড়ীওয়ালী যে কখন নীচে চলে গেল, তা লক্ষ্যও করল না।

* * *

সেদিন অনেক রাত পর্য্যন্ত বসে মাধব চিঠি লিখ্‌ল। লিখ্‌লে সে কমলাকে বিয়ে করবে। আজ ইংরেজীতে নয়, খাস মারাঠীতে চিঠি।

বিয়ে! কথাটা মাধবের মাথায় বারবার খেলে যেতে লাগ্‌ল। সে রাত্রিতে তার ভাল ঘুম হ'ল না। হঠাৎ কি জানি কোন্‌ স্মৃতির নিভৃত কক্ষ হ'তে একটী মুখ ভেসে উঠ্‌ল। ছোট্ট,—শিশুর মুখ। মাথায় শোলার মুকুট বাঁধা, গায়ে হল্‌দে শাড়ী, কপালে সিঁদুর। সরল, ক্লান্তিভরা অর্থহীন দৃষ্টি তার।—তারই পাশে সে এক দীর্ঘ অপরাহ্ণ কাটিয়েচে—বিয়েতে!

মাধবের শিরায় শিরায় রক্ত গরম হয়ে উঠ্‌ল। "তানী!" তারই মামাতো বোন। ছোট্ট মেয়ে। ছেলেবেলা হ'তে কত কোলে পিঠে করেচে। একবার মামার বাড়ী গেলে দিদিমা বল্‌লেন, "মাধু, তানী তোর বৌ।" মাধু অবাক হ'য়ে শুধু হেসেছিল। এর পরের বার যখন মাধু মামার বাড়ী গেল, তখন তার দিদিমা আর মামা মিলে, বাজনা ডেকে, গায়ে হলুদ দিয়ে মাধব ও তানীর বিয়ে দিয়ে দিলেন। মাধব তেরো, তানী আট। মাধবের বাপ রামচন্দ্ররাও সে বিয়েতে নিমন্ত্রিতের মত এসেছিলেন! বুড়ো শাশুড়ী, মরবার আগে নাতী নাত্‌নীতে বিয়ে দিয়ে সুখী হয়ে যেতে চান, তা'তে আপত্তি করা চলে না, বিশেষতঃ যখন তাঁর মেয়ে নেই!

...তানী! সেই আটবছরের ছোট্ট মেয়ে! বিয়ের পর মাধব একদিনও তার সঙ্গে কথা কয়নি। দু বছর পরে যখন সে আবার মামার বাড়ী (তখন শ্বশুর বাড়ী) গিয়েছিল, তখন তানীর হাতখানা ধরে কি জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিল,—তানী তো ছুটে চম্পট! মাধব দেখ্‌ত, তানী তার মামা আর মেসোদের সঙ্গে প্রাণখুলে কথা কয়, হাসে, কিন্তু সে এলে পালিয়ে যায়। সেবার হ'তে তানীর প্রতি কেমন একটা বিরক্তিতে মাধবের মন ভরে গিয়েছিল।

...তানী! ওই ছোট্ট, ছিচ্‌কাঁদুনে ঝগড়াটে মেয়েটা তার স্ত্রী! কে বলেচে? কে বলেছিল তানীতে তা'তে বিয়ে দিতে?

ভোরের আলো যেম্‌নি করে আঁধারের আবরণ সরিয়ে নির্ম্মল হয়ে ফুটে উঠ্‌ল, তেম্‌নি করে একটী আঠারো বছরের তরুণীর উজ্জ্বল সুন্দর মুখ, তার গভীর আবেগভরা বিদ্যুৎ-বর্ষী দৃষ্টি মাধবের মন হ'তে সুদূর মামার বাড়ীর একটা ছোট্ট ঝগড়াটে ছিঁচ্‌কাঁদুনে মেয়ের স্মৃতি ডুবিয়ে দিল।

* * *

পরদিন সকালে বালুকে ডেকে মাধব চিঠি পাঠাল। আগ্রহের আতিশয্যে কোনও বইয়ের ভিতর পুরে দিল না। চিঠির সঙ্গে বালুর একটী ঘুড়িও মিলেছিল। সে আনন্দে নাচ্‌তে নাচ্‌তে চিঠি নিয়ে চল্‌ল। কমলাদের বাড়ী গিয়ে সোজা কমলার ঘরে উঠ্‌ল, সেখানে তাকে পেল না। 'কমলা তাই!' ডাক্‌তে ডাক্‌তে নীচে নেমে এল।

নীচের বারান্দায় নানা কাগজপত্রের দপ্তর ছড়িয়ে কমলার পিতা বৃদ্ধ ঘাট্‌গে বসে ছিলেন। বালুর হাতে চিঠি দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, "এ কার চিঠি বালু?" বালু একটু থতমত খেয়ে বল্‌ল, "কমলা তাইর।"

বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করলেন, "কে দিয়েচে?"

বালু নীরব।

বৃদ্ধ বালুকে কাছে ডাক্‌লেন। কুটিল দৃষ্টিতে চেয়ে বল্‌লেন, "বালু, চিঠি রেখে যা, কমলি এলে দেবো।" বালু কি করবে স্থির করতে পারল না। বিশেষ কোনও বুদ্ধি মাথায় না আসাতে বল্‌ল, "আচ্ছা, কমলা তাইকে দিয়ো।" বালু অধীর হয়ে ঘুড়ি উড়াতে চলে গেল।

সেদিন স্কুলে মাধব অবাক হয়ে দেখ্‌ল, কমলা আসেনি। ক্লাসের এক ধারে তার জায়গাটা খালি পড়ে ছিল। মাধবের কল্পনা সারাদিন সেই খালি স্থানটা পূর্ণ করতে ব্যস্ত রইল।

বিকেলে মাধব ঘরে বসে রইল। কাল সন্ধ্যার পর হতে এ ঘরখানাতে এক অপূর্ব্ব সৌরভ কে এনে ঢেলে দিয়েচে? ঘরের প্রতিটি জিনিসের ওপর কে একটি মোলায়েম প্রলেপ মাখিয়ে দিয়ে গেচে? কি নেশায় মাধবের চিত্ত অমন বিভোর হয়ে পড়্‌ছিল? কার প্রত্যাশায় বার বার সে মাথা তুলে চাইছিল? আঠারো বছরের যুবক,—জান্‌ত না যে, জীবনে সব জিনিস দুবার আসে না।

মাধব রাত পর্য্যন্ত ঘরে বসে রইল, কেউ এল না।

পরদিন সকালে মাধব বই হাতে বারান্দায় হেঁটে হেঁটে পড়ছিল, এমন সময় সিঁড়ির নীচ হ'তে কাঁপা গলায় কে বল্‌ল, "মাধব রামচন্দ্র করমারকর এখানে থাকে?" মাধব চেয়ে দেখ্‌ল, স্কুলের বুড়ো দপ্তরী।

হেডমাষ্টার তাকে ডেকেছেন।

কোট ও টুপী পরে মাধব স্কুলে গেল। হেড্‌মাষ্টারের ঘরে গিয়ে দেখ্‌ল হেড্‌মাষ্টার ও কমলার বাবা বসে আছেন। উভয়ে গম্ভীর।

হেডমাষ্টার টেবিলের ওপর হতে একখানা চিঠি তুলে মাধবের হাতে দিয়ে বল্‌লেন, "এ চিঠি তোমার লেখা মাধব?"

মাধব দেখ্‌ল, এ কাল সকালের চিঠি। অবাক হ'ল। কিন্তু তার পরেই নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে গম্ভীর ভাবে বল্‌ল, "হ্যাঁ"।

মাষ্টার বল্‌লেন, "মাধব, আমি জান্‌তাম, তুমি ব্রাহ্মণ?"

মাধব ধীরে ধীরে বলল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি ব্রাহ্মণ।"

"কোন শ্রেণীর?"

"দেশস্থ।"

মাষ্টার আকাশ থেকে পড়ে বললেন, "তুমি কি করে ঘাটগে সাহেবের কন্যাকে বিয়ে করতে পার?"

মাধব মাষ্টারের চোকে চোকে চেয়ে বলল, "বাধা কি?" শ্রাবণে ঐ কৃষ্ণার তীরে দাঁড়িয়ে যদি কেউ বল্‌ত, 'আমি লাফ দিয়ে ওপারে যাব' তা'তে মাষ্টার যত না বিস্মিত হ'তেন, মাধবের কথায় তার চেয়ে বেশী বিস্মিত হ'লেন।

ঘাটগে বললেন, "ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণের কথা হচ্চে না, মাষ্টার সাহেব। আমার কথা, আমার মেয়ের বিয়ে স্থির করবার ভার আমার ওপর, মেয়ের ওপর বা অন্য কারো ওপর নয়। দ্বিতীয় কথা, আমার মেয়েকে যদি এখন বিয়ে দিতে হয়, তবে আপনার এই স্কুলের ছোক্‌রার সঙ্গে যে দেব না, সে কথা বোধ হয় আপনাকে না বললেও চলে।"

মাধব দৃঢ়কণ্ঠে বল্‌ল "সে যদি আমায় বিয়ে করতে চায়, তবে আপনি অন্যত্র বিয়ে দেবেন?"

বৃদ্ধের চক্ষু রক্তবর্ণ হয়ে উঠ্‌ল। মাষ্টারকে সম্বোধন করে বল্‌লেন, "মাষ্টার সাহেব, আপনাদের স্কুলে বিশেষ আদব আছে শুনে আমার মেয়েকে এখানে পড়তে দিয়েছিলাম। কিন্তু—" ক্রোধে তাঁর বাক্‌রোধ হ'য়ে এল। হেড্‌ মাষ্টারের তীক্ষ্ণ সূচীবেধী চক্ষু দুটি একবার ঘাটগের পানে একবার মাধবের পানে, এবং একবার টেবিলের পত্রটির ওপর ঘুরতে ফিরতে লাগ্‌ল। হঠাৎ স্থির দৃষ্টিতে ঘাটগের দিকে চেয়ে পত্রখানি তুলে তাঁর হাতে দিয়ে বল্‌লেন, "ঘাটগে সাহেব, আপনি এখন আসুন, আমি এর প্রতিকার করবো। আজ সন্ধ্যাবেলা আপনার বাড়ীতে গিয়ে দেখা করবো।"

ঘাটগে ধীরে ধীরে পত্রটি পকেটে পুরলেন, ধীরে ধীরে টেবিলের ওপর হ'তে তাঁর ছাতাটি হাতে নিলেন, তার পর দৃঢ় পদক্ষেপে বাহিরে চলে গেলেন।

হেড্‌ মাষ্টার তাঁর সঙ্গে সঙ্গে সদর দরজা পর্য্যন্ত গেলেন। দরজার কাছে গিয়ে ফিস্‌ ফিস্‌ করে বল্‌লেন, "ঘাটগে সাহেব, এসব বিষয় অত গুরুতর ভাবে নেবেন না। ওরা ছেলেমানুষ, বইয়েতে যা পড়ে শুধু তার অনুকরণ করে যায়!"

হেড্‌ মাষ্টার ফিরে এসে বেশ আত্মীয়ভাবে মাধবকে তার দেশ সম্বন্ধে নানাপ্রকার প্রশ্ন করতে লাগলেন। জানলেন, তার বাড়ী সলগাওয়ে। পিতা আছেন। বাড়ীতেই থাকেন। রেল-ষ্টেশন পাঁচ মাইল দূরে। মোটর সার্ভিস আছে। সলগাওয়েতে পোষ্ট আফিস আছে। ব্রাঞ্চ আফিস। তার নেই। পিতার নাম রামচন্দ্র ব্যাঙ্কট করমারকর।

মাষ্টার মাধবকে বিদায় দিলেন। তারপর বসে খুব ভেবে চিন্তে একখানা চিঠি লিখলেন মাধবের বাবার কাছে।

সেদিনও কমলাবাই স্কুলে অনুপস্থিত। ছেলেমহলে গুজব, সে আর আসবে না। ক্লাসে বহু রকম কানাঘুষা চলল। মাধব আসে যায়, পড়া বলে, কাকেও ভ্রূক্ষেপ করে না। তার চোখে কেমন একটা দৃঢ়তা, গতিতে কেমন একটা কঠিনতা। যেন সবাইকে বল্‌তে চায়, "তোমরা যা পার কর, আমার যা ইচ্ছে তা করবোই।"

তিনদিন পরে এক প্রভাতে মাধবের ঘরের নীচে এসে একটী টাঙ্গা দাঁড়াল। তাহ'তে নেমে এলেন, মাধবের বাবা, রামচন্দ্র রাও।

ছুজনে যখন পাশাপাশি দাঁড়াল, তখন অতি আনাড়ী লোকেও বল্‌তে পারত, এরা বাপ বেটা। উভয়ের একই রকম গায়ের রং উজ্জল গৌর; উভয়ের নাসিকা একই রকম তীক্ষ্ণ; চক্ষুতে একই রকম উজ্জ্বলতা; ওষ্ঠাধরে একই রকম দৃঢ়তা

পিতা পুত্রে অতি সামান্তই কথা হ'ল। পিতা স্নান করে বেরিয়ে গেলেন। এগারোটার পূর্ব্বেই আবার ফিরে এলেন। ছেলে স্কুলের জন্ত প্রস্তুত হচ্ছিল। পিতা ডেকে বল্‌লেন, "মাধু, তোর স্কুলে যেতে হ'বে না।"

মাধব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পিতার তীক্ষ্ণতর দৃষ্টির সম্মুখীন হয়ে বলল, "কেন?"

"এ স্কুল হ'তে তোম নাম কেটে এসেচি। তোকে সাতারা পাঠাব। আজ সন্ধ্যার গাড়ীতে আমার সঙ্গে যেতে হ'বে।"

তারপর তার টাকার হিসাব চাইলেন মাধব হিসাব দেখাল। পিতা তার হাতের পয়সা নিজের কাছে নিয়ে নিলেন। অভিমান ভরে মাধব পিতাকে শেষ পয়সাটি পর্য্যন্ত দিয়ে দিলে।

মাধব জিজ্ঞাসা করল, "আজ সন্ধ্যায় আমাকে আপনার সঙ্গে বাড়ী যেতে হ'বে?"

পিতা বল্‌লেন, "হ্যাঁ।"

মাধব বল্‌ল, "আমি যাব না।"

পিতা তীক্ষ্ণ তীব্র দৃষ্টিতে চেয়ে বল্‌লেন, "কি বল্‌লি?"

মাধব ধীর কঠোর কণ্ঠে বল্‌ল, "আমি এখানেই থাক্‌ব।"

পিতা ক্রোধ সাম্‌লিয়ে স্থিরভাবে বললেন, "আমি আজ সন্ধ্যার গাড়ীতে যাচ্ছি। তোমার ইচ্ছা হয়, আমার সঙ্গে এসো। ইচ্ছা না হয়—তোমার সঙ্গে সম্পর্ক এইখানেই শেষ। ঘরে স্ত্রী ফেলে মারাঠা মেয়ে বিয়ে-করবার জন্ত তোমাকে এখানে পাঠাই নি।" ইস্পাতের ধার তাঁর প্রত্যেকটী কথায়!

রামচন্দ্র রাও ছাতা হাতে বের হয়ে পড়্‌লেন।

মাধব নিঃস্পন্দ দৃষ্টিতে মাটির দিকে বহুক্ষণ চেয়ে রইল। তার মুখ সাংঘাতিক রকম লাল হয়ে উঠ্‌ল।

মনে মনে বল্‌ল, "আমি যাব না।"

ধমনীতে লোহিত রক্ত নেচে নেচে বলল, "যাব না! যাব না!"

সেই দশ বছর বয়স হ'তে পিতার উদ্ধত কঠোর শাসনের ভারে দিনে দিনে তার চিত্ত বিদ্রোহী হয়ে উঠেচে। এ দীর্ঘ আট বৎসর সে শুধু পরাজয় মেনেই চলেচে। আজ হঠাৎ তার সঞ্চিত বিদ্রোহ উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করল। পিতার বাধ্য পুত্র আজ পিতৃবাক্য লঙ্ঘন করতে দুরন্ত উল্লাসে মেতে উঠ্‌ল।

শূন্য ঘরে বসে বসে মাধব কমলার পুরানো চিঠিগুলো খুলে পড়তে লাগ্‌ল। কি জানি একটা অজানা ভয়, হয়ত তার বাবা সেগুলো তার কাছ থেকে কেড়ে নেবেন। মদখোর যেমন সঙ্কটে পড়ে পেয়ালার পর পেয়ালা পান করে সব ভুলতে চেষ্টা করে,—মাধবও তেমনি চিঠির পর চিঠি পড়ে উপস্থিত জঞ্জাল হতে মুক্তির চেষ্টা কর্‌ছিল।

"আমার কথা তোমার মনে হয় মাধু? নিশ্চয়ই না। আমি কিন্তু তোমাকে সব সময় মনে করি।"···

···"তোমারই চিরদিনের কমলা।"

কি মিষ্টি কথা তার! কি সুন্দর হাসি! চোকের ওই চপল মধুর দৃষ্টিটির জন্তে সে কি না করতে পারে?

সওয়া ছয়টাতে রামচন্দ্র রাও টাঙ্গা নিয়ে এলেন। তাঁর জিনিস, মাধবের ট্রাঙ্ক, টাঙ্গায় তোলা হ'ল। রামচন্দ্র রাও ছাতা হাতে দরজায় দাঁড়ালেন। ডাকলেন, "মাধব!"

মাধব কম্বলের 'ওপর বসেই রইল। বলল, "আমি যাব না।"

পিতা অতি কষ্টে আত্মসংযম কর্লেন। পুত্রের দিকে শুধু রোষদীপ্ত দৃষ্টিতে একবার চাইলেন। পুত্র তীব্রভাবে সে দৃষ্টিতে দৃষ্টি মিলাল।

পিতা টাঙ্গায় চড়ে চলে গেলেন।

*　　*　　*

মাধব ঘরে বসেই রইল।

সন্ধ্যা হ'য়ে এল।

বাড়ীওয়ালী গঙ্গাবাই ওপরে এসে বল্ল, "মাধব রাও তুমি যাও নি? তোমার বাবা চলে গেচেন শুন্‌লাম?"

মাধব নির্ব্বাক।

গঙ্গাবাই বারান্দায় বসে পড়্‌ল। কথা জমাবার চেষ্টায় বল্‌ল, "তোমার ইস্কুলে ওসব কি রকম মেয়ে পড়ে মাধব রাও? তাদের লজ্জা সম্রম নেই? সেদিন কি দেখলাম। তোমার বাপ ওকথা বিশ্বাসই কচ্ছিলেন না!" তার পর একটু থেমে বল্‌ল, "তোমাকে এখান থেকে নিতে এসেছিলেন সে তো ভালই করেছিলেন। এখন না গেচ দু চার দিন পরে যেয়ো। ভাড়া তো এ মাসের শেষ পর্য্যন্তই দেওয়া হয়েচে।"

মাধবের কোনও সাড়া না পেয়ে গঙ্গাবাই উঠে গেল। মাধব উষ্ণ হয়ে ভাব্‌ল, "বাড়ীওয়ালীও এসব ষড়যন্ত্রের ভিতরে।"

দৃঢ় হ'য়ে নিজেকে নিজে বল্‌ল, "থাক্, সবাই আমার বিরুদ্ধে থাক্!"

মাধবের ঘর আঁধার হয়ে এল। মাধব আলো জ্বালাল না। শুধু বসে ভাব্‌তে লাগ্‌ল।

কিছুক্ষণ পরে কে একজন দরজায় এসে দাঁড়াল। ডাকল "কমদারকর আছে?"

মাধব জিজ্ঞাসা করল, "কে?"

আগন্তুক তার ওপর একটা "ফ্ল্যাশ-লাইট" ধরে বল্‌ল, "ঘরেতে আলো নেই যে!"

মাধব আলো জ্বালাল। দেখ্‌ল, দানে। তার চিত্ত তিক্ত হয়ে উঠ্‌ল।

দানে বলল, "কমদারকর, মিস্ ঘাটগে এ চিঠি দিয়েছে।" বলে তার সামনে একখানা চিঠি রাখল। মাধব দেখ্‌ল কমলারই হাতের লেখা। খুলে পড়ল।

কমলা লিখেচে, মাধব অতি ছেলেমানুষ, মস্ত একটা বোকা। সে তার বাবার কাছে ও হেড্‌মাষ্টারের কাছে ওসব কথা বলতে গেল কেন? বিয়েটা কি এতই সোজা জিনিষ? মাধবের কি মাথা খারাপ হয়েচে যে, ম্যাট্রিক না পাশ করেই বিয়ে করতে যাবে?

লিখেচে, মাধব কি জানে না ওসব কথাতে সমাজে কমলার মর্য্যাদা নষ্ট হ'বে? এর জন্য কমলা কোনোদিনই তা'কে ক্ষমা করবে না। সে আর কোনোদিনই মাধবের কাছে চিঠি লিখ্‌বে না।

কমলা অষ্টাদশ বর্ষীয়া নারী, মাধব অষ্টাদশ বর্ষীয় বালক!

কমলা চিঠির নীচে লিখেচে, তার মামাতো ভাই দানেকে দিয়ে চিঠিখানা পাঠানো হ'ল।

মাধব চিঠি পড়ে হতভম্ভ হ'য়ে বসে রইল।

দানে জিজ্ঞাসা করল, সে কোনও উত্তর দেবে কিনা। মাধব মাথা নীচু করে বলল, 'না'। দানে চলে গেল। তার দৃঢ় পদক্ষেপ মাধবের বুকে অপমানের শেল রেখে গেল।

মাধব ভাব্‌তে লাগল···ভাব্‌তে ভাব্‌তে তার চোখের সাম্‌নে ভেসে উঠ্‌ল, তাদের পাড়াগাঁয়ের বাড়ীর একটী দৃশ্য। পিতা বিজয় গর্ব্বে দাঁড়িয়ে আছেন, মাধব, আর্ত্ত ভগ্ন দীনভাবে তাঁর আশ্রয় ভিক্ষা করতে ফিরে গেচে। বল্‌চে, যে-মারাঠা মেয়ের জন্যে তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক ছেড়ে দিয়েছিল, সে তাকে প্রত্যাখ্যান করে ফিরিয়ে দিয়েচে।

একটা তীব্র বিদ্রূপের বাণে মাধব নিজেক নিজে বিদ্ধ করল। সহসা নিজের প্রতি একটা দুরন্ত বিদ্বেষ জাগ্‌ল। বহুদিনের অনুশীলন করা দেহের সামান্য শক্তি নিজের প্রতি অসীম বিদ্রোহে ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠ্‌ল। সহসা তার হাত মুষ্টিবদ্ধ হ'ল, চোকদুটি অস্বাভাবিকভাবে জ্বলতে লাগ্‌ল।

মাধব উঠে ভিতর হ'তে দরজায় শিকল লাগাল। খুঁটি হ'তে সব জামা এনে জড় করল। ঘরের কোণ হ'তে কেরোসিনের বোতল আন্‌ল।

·· মাষ্টার বল্‌ছিলেন, 'এরা ছেলেমানুষ, সব অনুকরণ করে'। একি সাংঘাতিক অনুকরণ মাধব? এ কি অদ্ভুত ছেলেমানুষি?

কিছুক্ষণের মধ্যে এক বলিষ্ঠ মহারাষ্ট্রীয় যুবক এক অবোধ বাঙ্গালী বালিকার পদাঙ্ক অনুসরণ করে অযশস্কর মৃত্যুকে বরণ করতে চলল।*

* * *

* * * * * *

নরসোবার মন্দিরের পাশে আমগাছের নীচে শেষ "বাস" দুটো যাত্রার জন্ম প্রস্তুত হচ্ছিল। এঞ্জিন ষ্টার্ট করা হয়েচে, ধুপধুপ শব্দ বেরুচ্চে। হঠাৎ একটা গাড়ীর সামনের উজ্জ্বল আলো জ্বলে উঠ্ল।

সে আলোকের মধ্যে দেখা গেল, দুটি মেয়ে পাশা-পাশি দাঁড়িয়ে আছে। উভয়েই মোটরে উঠ্বে। একজন বালবিধবা, লাল শাড়ীতে তার সব শরীর ঢাকা, গায়ে জামা নাই, হাত খালি। অপরটী বয়সে কতক বড়, পরণে আস্মানী শাড়ী, পায়ের পাতা পর্য্যন্ত পড়েচে, কপালে সিঁদুরের টিপ, মাথায় ঘোমটা।

আলো পড়তেই উভয়ে উভয়ের দিকে চাইল।

তরুণী জিজ্ঞাসা করল, "তোমাদের কোন্ গাঁ?"

করুণ কণ্ঠে বাল-বিধবা বল্ল, "সজগাও।"

তরুণীর গা কাঁটা দিয়ে উঠ্ল। জিজ্ঞাসা করল, "তোমার স্বামী কবে···?"

বালিকা বল্ল, "এক বৎসর হয়েচে।" তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আস্ছিল।

তরুণী ধীরে ধীরে বল্ল, "কি হ'য়ে?"

বালিকা বল্ল, "নিজের গায়ে নিজে আগুন দিয়ে।" বলতে বলতে কেঁদে ফেলল। চোক মুছে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কোন গাঁ'র?"

তরুণী বল্ল, "কিষাণপুরের।"

"ইস্কুলে পড়?"

"হ্যাঁ।"

"ছেলেদের ইস্কুলে?"

"হাঁ।"

"তোমার নাম?"

"কমলা।"

কে যেন বালিকার ঐ রাঙা মুখখানিতে কালির ছাপ লেপে দিয়ে গেল। সে ধীরে ধীরে চোক তুলে চাইল। কম্পিত কণ্ঠে বল্ল, "তুমি!"

কমলা কি বল্তে যাচ্ছিল, এমন সময় পেছন হ'তে এক কঠোর কণ্ঠের ডাক এল, "তানী বাই!"

বাল-বিধবা শ্বশুরের সঙ্গে গিয়ে "বাসে" উঠে বস্ল। কমলা বৃদ্ধা ঠাকুরমার সঙ্গে অপর "বাসে" গেল। দেখ্তে দেখ্তে "বাস" দুখানা ছুটে চলে গেল। লাল "ব্যাক-লাইটের" নীচে দুটি ছোট সহরের সংক্ষিপ্ত নাম ভেসে উঠ্ল!

ধীরে ধীরে আমগাছের ছায়ায় সবটা জায়গা ঢেকে গেল।

মন্দিরে ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজ্ল। কে ডেকে বল্ল, "দেবতার নিদ্রা দেওয়া হচ্চে।"···

সব নীরব হ'ল। শুধু কৃষ্ণার স্বচ্ছ জল কালো পাথরের ওপর দিয়ে কুল কুল করে বয়ে যেতে লাগ্ল।

সমাপ্ত

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বসু

* সত্য ঘটনামূলক।



ডাণ্ডী

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার রায়

লাহোর কংগ্রেসের কার্য্যকারী সমিতি মুক্তি-সংগ্রামের যাবতীয় ভার মহাত্মা গান্ধীর উপর ছাড়িয়া তাঁহাকে প্রধান সেনাপতির পদে বরণ করিয়া লইলেন। তাই ১৯৩০ সনের মার্চ্চ মাসে মহাত্মাজী যখন মুক্তি-সংগ্রামের জন্য দেশকে ডাক দিলেন, সে ডাকে সমস্ত ভারতবর্ষ সাড়া দিয়া উঠিল; সে' কী সাড়া! গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, সভা সমিতি করিয়া সাজ সাজ রবে উদ্যোগ পর্ব্ব আরম্ভ করিয়া দিল। বড়লাট লর্ড আরউইনকে মহাত্মাজী চরম পত্র দিয়া দেশময় ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, ঘোর অত্যাচার-মূলক যে লবণ-আইন আছে তাহা তিনি তাঁহার দল বল লইয়া, সর্ব্বজন সমক্ষে প্রকাশ্য দিবালোকে প্রথম ভঙ্গ করিবেন। পরে যে যেখানে পারে দেশকালোপযোগী আইন-অমান্য অহিংস ভাবে আরম্ভ করিয়া দিবে। তিনি তাঁহার প্রথম সংগ্রাম-ক্ষেত্র নির্দ্দেশ করিলেন, সাবরমতী হইতে ২৫০ মাইল দূরে ভারতের পশ্চিম প্রান্তে সমুদ্রের কূলে ডাণ্ডিগ্রামে।

আশী জন মরণ-বরণকারী স্বেচ্ছা-সৈনিক লইয়া ১২ই মার্চ্চ ভোরে পুণ্য-ভূমি সাবরমতী আশ্রম হইতে মহাত্মাজী জয়যাত্রা করিলেন। তাঁহাদের মর্ম্ম-কথা হইল, "মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন"। গ্রাম নগরের ভিতর দিয়া মুক্তি-সংগ্রামের বাণী প্রচার করিতে করিতে দিনের পর দিন কুচকাওয়াজ করিয়া সংগ্রামস্থল ডাণ্ডীর দিকে তাঁহারা অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

এই মুক্তি-সংগ্রামে যোগ দিব স্থির করিয়া বিদ্যালয়ের যে-কাজের ভার আমার উপর আছে, তাহার একটা কি ব্যবস্থা করা যায় সে সম্বন্ধে দুই-এক জন বন্ধুর সঙ্গে পরামর্শ করিতেছি শুনিয়া শ্রদ্ধেয় নেপালচন্দ্র রায় মহাশয় খুব উৎসাহিত হইয়া আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "অক্ষয়, তোমার কথা তা হ'লে আমি মহাত্মাজীকে লিখে দেই—" তিনি মহাত্মাজীর একজন বহুদিনের বন্ধু।

তিনি কি লিখিয়াছিলেন জানিনা। যাহা আমি ভাবি নাই বা কল্পনাও করি নাই একদিন দেখি তাহাই বাস্তবে পরিণত হইল। মহাত্মাজী তাঁহার জয়যাত্রার পথ হইতে নেপাল বাবুর পত্রের উত্তরে আমাকে সাবরমতী যাইতে আদেশ দিয়াছেন। সেই আদেশ পাইয়া শান্তিনিকেতন হইতে ২৯শে মার্চ্চ রওয়ানা হইয়া ৩রা এপ্রিল সাবরমতী আশ্রমে পৌঁছিয়াছিলাম।

এখানে আসিয়া যেন একটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র রাজ্যের মধ্যে আসিয়া পড়িলাম। কুঁড়ির ভিতর সৌরভের মত যেন তার ভাবধারা গুমরিয়া গুমরিয়া উঠিতেছে। কে জানে, একদিন এই ভাবধারা সৌরভের মত সমস্ত জগতে ছড়াইয়া পড়িবে না! সাবরমতীতে যাহা দেখিয়াছি, বুঝিয়াছি তাহা বিস্তারিত ভাবে ভিন্ন প্রবন্ধে বলিবার বাসনা রহিল। এখানে কেবল একটা কথাই বলিব।

যে-সব দেশের উপর দিয়া যুদ্ধ বিদ্রোহ চলিয়াছে সে-সব দেশের বর্ণনা যাহা পড়িয়াছি বা শুনিয়াছি তাহা যেন এই প্রথম প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিলাম এই ক্ষুদ্র রাজ্য সাবরমতীতে।

মহাত্মাজী প্রথম দলে আশ্রমের ছাত্র শিক্ষকদের মধ্যে অনেককে লইয়া জয়যাত্রা করিয়াছেন, পর পর দল প্রস্তুত হইয়া আছে। কখন কোন্ দলের ডাক আসে। আফিস, ষ্টোর, আশ্রম-তত্ত্বাবধান প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া মহিলারা চালাইতেছেন। মেয়েদের মধ্যে একদল খুব ভোরে দেড় মাইল দুই মাইল সামরিক সুরে গান করিতে করিতে কুচকাওয়াজ করিয়া আসিতেন। মহাত্মাজীর স্ত্রীকেও এই বৃদ্ধ বয়সে কুচকাওয়াজে যোগ দিতে দেখিয়াছি। তাঁহারা সকলেই যেন ডাকের অপেক্ষায় উদ্‌গ্রীব হইয়া আছেন, এ সৌভাগ্য কখন তাঁহাদের আসিবে।

ভারতের মুক্তি-সংগ্রামে শক্তি-স্বরূপিণী নারীকে পুরুষের

পাশে এই প্রথম প্রত্যক্ষ প্রকাশ্যভাবে আসিয়া দাঁড়াইতে দেখিলাম স্বতন্ত্ররাজ্য সাবরমতীতে। এতদিন এ-সব কথা পুরানো কাহিনী ও ইতিহাসের পৃষ্ঠাতেই লেখা ছিল।

কত রাত্রি অন্ধকারে সাবরমতী নদীর তীরে বসিয়া কবির মর্ম্মান্তিক খেদ অবৃত্তি করিয়াছি—

"না জাগিলে সব ভারত ললনা
এ ভারত আর জাগেনা জাগেনা" ॥—

কে জানে অমর কবির অমর আত্মা পরলোকে এই নারী-জাগরণে তৃপ্তিলাভ করিবে না।

"পাবে তুমি আশা এই আছে আশা আর
পৌঁছে ধরণীর বার্ত্তা মৃত্যুর ওপার"—

মহাদেব দেশাই পরদিন সকালে আমাকে ডাকিয়া রণছোড় শেঠের সঙ্গে ডাণ্ডী যাবার সব বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। তিনি আমেদাবাদের এক ক্রোড়পতির পুত্র, আশ্রমেই থাকেন। তাঁহার সঙ্গে কথা হইল সন্ধ্যার পর আশ্রম হইতে রওয়ানা হইয়া আমেদাবাদ ষ্টেশনে অপেক্ষা করিব, তিনি আমাকে সেখান হইতে খুঁজিয়া লইবেন। রাত্রি ১০ টায় ট্রেণ।

শান্তিনিকেতন হইতে রওয়ানা হইবার সময় ভাবি নাই যে মহাত্মাজীর সঙ্গে দেখা হইবার কোন সম্ভাবনা আছে। কারণ ডাণ্ডী যে কোথায় এবং সাবরমতী হইতে সেখানে যাওয়ার কোন বন্দোবস্ত আছে কিনা সে সম্বন্ধে কোন সন্ধান জানা ছিল না। সুতরাং এই অপ্রত্যাশিত প্রস্তাবে আমার মন একেবারে আনন্দে ভরিয়া উঠিল। মহাত্মাজীর আদেশে পুণ্যভূমি সাবরমতীতে, সেখান হইতে তিনি মুক্তি-সংগ্রামের কর্ম্মপন্থা নির্ণয় করিয়া জয়যাত্রা করিয়াছেন, সেইস্থানে দিন কয়েক কাটাইয়া কলিকাতার কাজ আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া যোগ দিব—এই ছিল আমার সঙ্কল্প।

সেখানে মহাত্মাজীকে দেখিতে পাইব, আর দেখিতে পাইব ৬ই এপ্রিল সংগ্রাম আরম্ভের ধার্য্য দিনে সেখানে যে সকল ঘটনা ঘটিবে যাহার জন্ম সমস্ত দেশ এমন কি সমস্ত জগৎ উদ্‌গ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিতেছে। আমার সঙ্গে দুইটি মহিলাও যাইতেছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন আসিয়াছিলেন বম্বে হইতে আর একজন বেঙ্গালোর হইতে। শেষোক্ত মহিলাটির কোলে দুই বৎসরের একটি শিশু ছিল। এ আন্দোলন সম্বন্ধে পরামর্শ করিবার জন্ম তাঁহারা ডাণ্ডী যাইতেছেন।

আশ্রমে সান্ধ্য-উপাসনার পর আমরা রওয়ানা হইব, এমন সময় নারায়ণদাস গান্ধী মহাশয় প্রকাণ্ড একটি চিঠি-পত্রের তাড়া আমার হাতে দিয়া বলিলেন, "এইটি মহাত্মাজীকে দিবেন।"

৪ঠা এপ্রিল সন্ধ্যার পর সাবরমতী হইতে আমরা ডাণ্ডী রওয়ানা হইলাম। আমেদাবাদ ষ্টেশনে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিবার পর রণছোড় শেঠ তাঁহাদের বাড়ীর মেয়েছেলেদের লইয়া আসিলেন। রাত্রি ১০টায় ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। খুব ভোরে ঘুম হইতে জাগিয়াই শুনি সুরাটে আসিয়াছি। কয়েকটা ষ্টেশন পরেই নবসারী। সেখানে আমরা ছয় সাত জন নামিয়া ষ্টেশনের পাশেই এক গুজরাটী ভদ্রলোকের বাড়ীতে উঠিলাম। মনে হইল, পূর্ব্ব হইতেই সব বন্দোবস্ত ছিল। হাত মুখ ধোয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সকলের জন্ম গরম দুধ এবং চা আসিল। সেই সময় শুনিলাম, তাঁহারা দুপুরের স্নান আহার এখান হইতে সারিয়া ডাণ্ডী রওয়ানা হইবেন।

আমি রণছোড় শেঠকে বলিলাম, "যদি ইঁহার পূর্ব্বে যাওয়ার কোন বন্দোবস্ত থাকে তবে স্নান আহারের জন্ম এখানে আর আমি অপেক্ষা করিতে চাই না"। তিনি খবর লইয়া বলিলেন, "এখন এখান হইতে গাড়ী পাওয়া যাইবে"। ভদ্র-মহিলাদের গিয়া বলিলাম, আপনারা পরে আসুন,—ডাণ্ডীতে আবার দেখা হইবে। রওয়ানা হইব এমন সময় রণছোড় শেঠ বলিলেন, "এই ভদ্রলোকটী আপনার সঙ্গে যাইতেছেন। ইনি মহাত্মাজীর একজন বন্ধু সত্যাগ্রহী সৈনিকে যোগ দিতে যাইতেছেন। ইনি আপনাকে মহাত্মাজীর সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিবেন।"

ভদ্রলোকের বয়স হইবে ৭০।৭৫ বৎসর; হাঁপানির অসুখ আছে, লাঠিতে ভর দিয়া চলিতেছিলেন। গম্ভীর চিন্তামণ্ডিত মুখ, স্বল্পভাষী। আমার কেবলই মনে হইতে

জাগিল, এই বৃদ্ধ বয়সে ভগ্ন স্বাস্থ্যে সত্যাগ্রহী সৈনিককে যোগ দিতে যাইতেছেন,—প্রাণে না জানি কী সাড়া পাইয়াছেন!

লরীতে ছিল বেজায় ভিড়, গাড়ীটা যখন উঁচু-নীচুতে লাফাইয়া উঠিত, তখন তাঁহাকে চাপিয়া ধরিতাম বলিয়া তাঁহার মুখখানি যেন কৃতজ্ঞতায় একেবারে ভরিয়া উঠিত। আমি বাঙ্গালা দেশ হইতে আসিতেছি শুনিয়া ভারি খুসী। এত দিন সংগ্রামের তোড়জোড় যাহা কিছু কাগজ-পত্রে দেখিয়াছি; এইবার গুজরাট-আগমনের পরিচয় পাইতে লাগিলাম। পথে পথে কাতারে কাতারে স্বেচ্ছা সৈনিক যে যাহার কাপড়-চোপড় পিঠে লইয়া, ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্রে কুচকাওয়াজ করিয়া চলিয়াছে। স্থানে স্থানে গ্রামের নরনারী জড় হইয়া নির্ব্বাক আনন্দে ভরপুর হইয়া বীর দলের গতি-ভঙ্গী লক্ষ্য করিতেছে। সমস্ত দেশটা যেন 'রণং দেহি রণং দেহি' রবে মাতিয়া উঠিয়াছে।

"ওগো মা তোমার কি মূরতি আজি দেখিরে
যখন অনাদরে চাইনি মুখে, ভেবেছিনু দুখিনী মা"॥

নবসারী হইতে ডাণ্ডী দশ মাইল। ৫ই এপ্রিল বেলা ৯টায় লরী সমুদ্রের ধারে গিয়া পৌঁছিল। নামিয়াই শুনি বিশাল সমুদ্রের ভৈরব গর্জ্জন, আর তার হাওয়াতে দেখি মহাত্মাজীর ঘরের উপর প্রকাণ্ড জাতীয় পতাকা উন্নত শিরে উড়িতেছে, যেন—

"সব দিবি কে সব দিবি পায়
আয় আয় আয়—"

বলিয়া সকলকে ডাকিতেছে। আশে পাশে দেশ বিদেশের অসংখ্য নরনারী চলাফেরা করিতেছে। সব কিছু মিলিয়া শরীরে যেন একটা রোমাঞ্চ দিয়া উঠিল। ১২ই মার্চ্চ সাবরমতী হইতে মহাত্মাজী জয়যাত্রা করিয়া আজ ভোরে তাঁহার দলবল লইয়া এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন।

আমরা আস্তে আস্তে মহাত্মাজী যে বাড়ীতে ছিলেন সেই দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। কাছেই ছিল তাঁহার বাড়ী, প্রকাণ্ড উঠানে দেখি দেশ বিদেশের বিস্তর লোক আসা-যাওয়া চলাফেরা করিতেছে। সকলেরই ব্যস্ত সমস্ত ভাব, অথচ কোন ডাক হাঁক হৈ-চৈ নাই। প্রেস্-রিপোর্টার ফটো ও ফিলিম তোলার লোক বিস্তর ছিল। তাদের মধ্যে অনকয়েক ইয়োরোপীয়ান্ ছিল—কেহ কেহ খদ্দর পরিয়াছে।

মহাত্মাজী দোতালায় ছিলেন, আমরা উপরে উঠিতে যাইতেছি, এমন সময় দুইজন স্বেচ্ছাসেবক দ্বার-রক্ষক আমাকে বাধা দিলেন। আমার সঙ্গী বৃদ্ধ ভদ্রলোকটী যখন তাঁহাদের বলিলেন যে, আমি একজন বাঙ্গালী, সাবরমতী আশ্রম হইতে মহাত্মাজীর চিঠিপত্র সঙ্গে করিয়া আনিতেছি, তখন আমাকে উপরে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। উপরে সিঁড়ির পাশের ঘরে দেখিলাম আব্বাস তায়েবজী ও সরোজিনী নাইডু বসিয়া আছেন। পরের ঘরে মহাত্মাজী। আমরা তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র বৃদ্ধ ভদ্রলোকটীকে দেখিয়া মহাত্মাজী খুব খুসী হইয়া তাঁহাকে কাছে ডাকিয়া বসাইলেন। তাঁহাদের মধ্যে গুজরাটীতে কি সব কথা হইল। মহাত্মাজীকে প্রণাম করিয়া চিঠি পত্রের তাড়াটা হাতে দেওয়ায় আমাকে বসিতে বলিলেন। আমি বসিলাম।

ঘরটী জোড়া মাদুর পাতা, তাহাতে অন্য কোন আসবাব পত্র কিছুই নাই। মহাত্মাজী মাদুরে বসিয়া দেয়ালে ঠেস্ দিয়া চিঠিপত্রের উপর চক্ষু বুলাইয়া পাশের এক ভদ্রলোকের কাছে দিতেছিলেন। তিনি তাঁহার সেক্রেটারী। ইহার ফাঁকে ফাঁকে ঘরজোড়া লোকের সঙ্গে কাজ কর্ম্মের কথা বলিতেছেন, যাঁহার যখন কথা শেষ হয় তিনি তখন উঠিয়া চলিয়া যান। আমি নির্ব্বাক নিস্পন্দ ভাবে বসিয়া আছি—জানালা দিয়া সুদূরে সমুদ্র দেখা যাইতেছে। নদী যেমন সুদূর পথ বাহিয়া নানা আলোড়ন বিলোড়নের মধ্য দিয়া সমুদ্রে আসিয়া সব কিছু ভুলিয়া যায় আমারও যেন সেই অবস্থা।

ইহার মধ্যে এক সময়ে মহাত্মাজী আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "নেপাল বাবু কি তোমার কথা লিখেছিলেন?" আমি বলিলাম, "হঁা"। আমি এই সংগ্রামকে কি ভাবে দেখিয়াছি কথাটা একটু ঘুরাইয়া যেন জেরার ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন বলিয়া মনে হইল। তাঁহার সঙ্গে আমার হিন্দি ও ইংরাজীতে মিশাইয়া কথাবার্ত্তা হইতেছিল।

আমি বলিলাম, "এবার দেশকে যে কর্ম্মপন্থা দিয়ে ডাক দিয়েছেন, তাতে সাড়া দেওয়া কর্ত্তব্য মনে করেছি, কতদূর কি পারবো—জানি না"। তিনি বলিলেন, "অসহযোগ

আন্দোলনে ?" আমি বলিলাম, "সে আন্দোলনে মনে সাড়া পাই নাই ব'লে যোগ দিই নাই"। তিনি মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিলেন।. পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল ক'রে ভেবে দেখেছ কি ?" আমি বলিলাম, "হ্যাঁ, ভাল ক'রে ভেবেই যোগ দেওয়া স্থির করেছি।" তিনি বলিলেন, "ধর, দরকার হয় ত তোমার স্ত্রী-পুত্রের মায়াও ছাড়তে হবে"। আমি বলিলাম, "এ সব আমার কিছুই নাই।" তিনি হাসিয়া উঠিলেন। সে যেন এক ভীষণ হাসি ;—আমার বুকের ভিতরটা কাঁপিয়া উঠিল। এমন সময় একটি স্বেচ্ছা-সেবক আসিয়া কি বলিলেন। মহাত্মাজী উঠিয়া পাশের ঘরে গেলেন—সে ঘরে ষ্টোভের শব্দ শুনা যাইতেছিল।

ইহার মধ্যে একজন ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাঙ্গালার দুই দলের গোলযোগ কি মিটিবে মনে করেন ?" আমি বলিলাম, "শুনে এসেছি, দুই দলের এক-যোগে কাজ করিবার পরামর্শ চলিতেছে ; তবে সাধারণে এ গোলযোগে ভারি বিরক্ত"। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "পি, সি, রায় কি যোগ দিবেন ?" আমি বলিলাম, "তাঁহার সম্বন্ধে কিছু জানি না। সে দিন কাগজে দেখেছি, তিনি এ সম্বন্ধে ভাবছেন।" আর এক ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, "কবির কি মত ?" আমি বলিলাম, "তিনি ত এখন বিলাতের পথে; তাঁহার মতামত কিছু শুনি নাই, তবে বারদৌলির ব্যাপারে খুব মুগ্ধ হয়েছেন। যাবার পূর্ব্বে সকলকেই এ সম্বন্ধে পড়তে ও ভাবতে অনুরোধ ক'রে গেছেন।"

ইহার মধ্যে মহাত্মাজী পাশের ঘর হইতে চলিয়া আসিলেন। মনে হইল গরম জলে পা ধুইয়া আসিলেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি শান্তিনিকেতনে কত দিন আছ ?" আমি বলিলাম, "কুড়ি বৎসর।" তিনি বলিলেন, "সেখানে ত তোমাকে দেখি নাই !" আমি বলিলাম, "আমি আপনাকে দেখেছি, আপনার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ আমার ঘটে নি।" তিনি বলিলেন, "তুমি হয় ত জান, প্রথম দলে আমার আশ্রমের লোক নিয়ে আরম্ভ করব।" আমি বলিলাম, "তা জানি, আমি প্রথম দল দ্বিতীয় দল জানি না। বর্ত্তমান সংগ্রামে আমি একজন সৈনিক,—সেনাপতির আদেশ নিতে এসেছি।" তিনি কি ভাবিতে লাগিলেন। শান্তিনিকেতন হইতে রওয়ানা হইবার সময় ছোট মেয়েদের মধ্যে কেহ কেহ মহাত্মাজীকে পত্র দিয়াছিল ; তাহার কোনোটায় চরখা আঁকা, কোনোটায় ভারতবর্ষ আঁকা ছিল। ছেলেমানুষী কথায় ভরা, মহাত্মাজীকে সে পত্রগুলি দেখাইলাম, তিনি হাসিতে লাগিলেন।

মহাত্মাজীকে সময় সময় মনে হইত যেন সহজ মানুষ, আবার সময় সময় মনে হইত কি ভীষণ, কি গম্ভীর। চক্ষু দুইটি হইতে এমন একটা তেজ বাহির হইয়া আসিত—যাহাতে কোন্ সুদূর ভবিষ্যতে দৃষ্টিশক্তি চলিয়া যায়। তাঁহার ভিতরে বজ্র এবং বর্ষণ যেন একাধারে মিলিয়া রহিয়াছে।

একটি স্বেচ্ছাসেবককে ডাকিয়া কি বলিলেন, স্বেচ্ছা-সেবকটী তাঁহার সঙ্গে আমাকে আসিতে বলিলেন। মহাত্মাজীকে প্রণাম করিয়া বারান্দা হইতে বিছানা লইয়া নীচে আসা মাত্র স্বেচ্ছা-সেবকটীকে ঘিরিয়া কয়জন ভদ্রলোক গুজরাটিতে কি সব প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। মনে হইল তাঁহারা সকলেই কাগজের রিপোর্টার। তাঁহার সঙ্গে চলিবার সময় মনে হইতেছিল, মাথার বোঝাটা যেন নামাইয়া আসিলাম। কারণ, পথে একটা ভাবনা ছিল মহাত্মাজীর সঙ্গে দেখা হয় কি না হয়, আর দেখা পাইলেও আমার কথা তাঁহাকে বলিবার সময় ও সুযোগ পাই কি না পাই।.

স্বেচ্ছা-সেবকটী আমাকে সত্যাগ্রহী সৈনিকদের শিবিরে আনিয়া কেপটে ছগনলাল যোশীকে কি বলিয়া চলিয়া গেলেন। শিবিরের আশে পাশে ছোট বড় কয়েকটী তাঁবু পড়িয়াছে, এক পাশে অস্থায়ী ভাবে বিস্তর খুঁটীর উপর প্রকাণ্ড ঘর, চালাটা সমানভাবে খেজুর পাতায় ছাওয়া—রৌদ্রটুকু বারণ হয় মাত্র, অল্প বৃষ্টি হইলেই জল পড়িবে। চারি পাশে পাতলা খেজুর পাতায় ঘেরা। আলো বাতাস যথেষ্ট আসে, ঘর জোড়া চাটাই পাতা। তাহার উপর সত্যাগ্রহী সৈনিকদের বিছানা-পত্র পড়িয়াছে। এক পাশে বড় বড় জালায় জল ভরা আছে, জলের প্রতি খুব যত্ন ও দৃষ্টি রাখা হয়। শিবিরের চারিদিকে ঘন মনসা কাঁটার বেড়া, মাঝখানের জমিটুকুর মধ্যে সকলে মিলিয়া পায়চারী করা চলে। ঢুকিবার দরজায় রাত্রিদিন

দুইজন স্বেচ্ছা-সেবক প্রহরী বসিয়া আছে। যখন তখন কাহাকেও শিবিরে ঢুকিতে দেওয়া হয় না।

মুক্তি-সংগ্রামের মরণ-বরণকারী প্রথম সৈনিকবাহিনী—যাঁহাদের কথা এতদিন ধরিয়া কাগজে দেখিয়া আসিতেছিলাম, তাঁহারা ঘরটী জুড়িয়া কেহ কাগজ দেখিতেছেন, কেহ গল্প করিতেছেন, কেহ তকলীতে সূতা কাটিতেছেন, কেহ কেহ চিঠি বা ডাইরী লিখিতিছেন। ১৮ হইতে ৫০ বৎসরের মধ্যে সকলের বয়স। এতগুলি লোক এক সঙ্গে আছে কিন্তু কোন গোলমাল বা হৈ চৈ নাই। সকলেই ধীর, স্থির, নির্ভীক, নিশ্চিন্ত, বীর্য্যমণ্ডিত। যাহা কিছু হউক না কেন কোন কিছুর জন্য যেন ভ্রুক্ষেপ নাই। সন্ত তপস্যা ত্যাগ করিয়া যেন কার্য্য-ক্ষেত্রে আসিয়াছে। শিবিরের এক কোণে বসিয়া ইঁহাদের কথা ভাবিতেছি এমন সময় ছগনলাল যোশী আসিয়া আমাকে বলিয়া গেলেন, "আপনি এখানেই থাকবেন, স্নানটা সেরে আসুন, এখনই খাবার ঘণ্টা পড়বে।" আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ দলে যে একজন বাঙ্গালী আছেন তিনি কোথায়?" তিনি বলিলেন, "বোধ হয় স্নান করতে গেছেন,—এখনই আসবেন।" ভদ্রলোককে দেখিলাম বড় ব্যস্ত।

তাড়াতাড়ি পাশের কুয়া হইতে স্নান সারিয়া আসামাত্র থালা বাটির ঢং ঢং শব্দে খাওয়ার ঘণ্টা পড়িল। দুর্গেশবাবু আমার অপেক্ষায় বসিয়া ছিলেন। আমরা উভয়েই উভয়কে দেখিয়া বড় খুসী হইলাম। তিনি বলিলেন, "চলুন, খাওয়া দাওয়ার পর সব কথা হবে"। এই দুর্গেশবাবুই বাঙ্গালীর মধ্যে একমাত্র জয়যাত্রার সঙ্গে ছিলেন। বাড়ী শ্রীহট্ট। অনেকদিন ধরিয়া সাবরমতীতেই আছেন। ইঁহার কথা পূর্ব্বেই কাগজে দেখিয়াছিলাম। আলাপে জানিতে পারিলাম তাঁহার কয়জন পরিচিত লোক আমার বিশেষ বন্ধু।

শিবিরের পাশেই ছিল খাওয়ার ঘর। যে যার থালা বাটি লইয়া, কেহ কেহ পাতা লইয়া চার পংক্তিতে ঘর জুড়িয়া প্রায় ৮০ জন বসিয়া গেলাম। ইহার মধ্যে ভারতবর্ষের প্রায় সকল প্রদেশের লোকই ছিল,—পাঞ্জাব, রাজপুতনা, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, মাদ্রাজ, উড়িষ্যা মধ্যপ্রদেশ, নেপাল, বিহার, বাঙ্গলা ইত্যাদি। বাঙ্গালী ছিলাম আমরা দুইজন। ইহার মধ্যে দুইজন গুজরাটী মুসলমানও ছিলেন। জন কয়েক পরিবেশন করিতে লাগিয়া গেলেন। মাড় সমেত আতপ চালের ভাত, রুটি, ডাল, তরকারী, ঘি, ঘোল,—সকলের পাতে পরিবেশন হওয়ার পর সমস্বরে প্রার্থনার মন্ত্র পাঠ করিয়া সকলে খাইতে আরম্ভ করিয়া দিলেন।

ওঁ সহ নাববতু সহ নৌ ভুনক্তু, সহ বীর্য্যং করবাবহৈ
তেজস্বিনা বধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

যাঁরা পরিবেশন করিতেছিলেন তাঁরা ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতেছিলেন কার কি চাই। ডাল তরকারী কেবল নুন জলে সুসিদ্ধ; হলুদ, লঙ্কা বা কোন মসলা তাতে কিছু নাই। যাঁর যখন খাওয়া শেষ হয় তখনি তিনি পাত তুলিয়া চলিয়া যান। খাওয়া দাওয়ার নিয়ম পদ্ধতি দেখিলাম সাবরমতী আশ্রমের মত। এর মধ্যে দুইজন পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হইল,—বিশ্ব-ভারতীর ছাত্র রাঘবন ও অধ্যাপক চিন্তামণি শাস্ত্রী। তাঁহারা খুব আগ্রহ সহকারে শান্তিনিকেতনের সকলের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

শিবিরে আসিয়া দুর্গেশবাবু মহাত্মাজীর সঙ্গে আমার কি কথাবার্ত্তা হইল জানিতে চাহিলেন। আমি সব বলিলাম। পরে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম আমার সম্বন্ধে তিনি যে কি ব্যবস্থা করিলেন তা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। দুর্গেশ বাবু বলিলেন, "মহাত্মাজী যখন আপনাকে আমাদের সঙ্গেই থাকিবার অনুমতি দিয়াছেন, তখন আপনাকে প্রথম দলভুক্ত করিয়াই নিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে যাঁহারা কাজকর্ম্ম উপলক্ষে এখানে দেখা সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন তাঁহাদের খাওয়া দাওয়া থাকার জন্য স্বতন্ত্র স্থানে ব্যবস্থা আছে। সত্যাগ্রহী সৈনিক ছাড়া এ শিবিরে কাহাকেও থাকিবার অনুমতি দেওয়া হয় না। স্বেচ্ছা-সেবকদেরও না। পথে আসিয়া আমাদের সঙ্গে যোগ দিবার অনুমতি পাইয়াছেন নেপালী খড়্গবাহাদুর সিং, এখানে পাইলেন আপনি"।

কথাটা শুনিয়া মনের মধ্যে যেন একটা নূতন বল আসিল—শক্তি-সাহস-শূন্য মানুষের উপর যখন বিশ্বাস ও কর্ম্মভার ছাড়িয়া দেওয়া হয় তখনই তাহার অন্তর-নিহিত

শক্তির আবরণ ঘুচিয়া যায়—এই কথাটা জীবনে প্রথম উপলব্ধি হইল ডাণ্ডীতে। একলাটি সমুদ্রের ধারে চলিয়া গেলাম। বিশাল সমুদ্র পড়িয়া আছে। যতদূর চক্ষু যায় কেবল নীল জল। পাহাড় পরিমাণ ঢেউ আসিয়া তীরে সাদা সাদা ফেনা ছড়াইয়া দিয়া দোলার মত আসা যাওয়া করিতেছে। সে কী গর্জ্জন, হাওয়াও তেমনি। সমুদ্রের ধারে বসিয়া আছি,—ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলিয়া গেল; আমার মন-সমুদ্রেও কত ঢেউয়ের পর ঢেউ উঠিতেছে নামিতেছে তাহার আর বিরাম নাই।

আশে পাশে দেশ-বিদেশের বিস্তর নরনারী বিশাল সমুদ্রের দিকে বিহ্বল ভাবে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। কে জানে কত কাল পরে এই নির্জ্জন পল্লী-সমুদ্র-তটে এত লোকের এক সঙ্গে সমাবেশ হইয়াছে!

ডাণ্ডী এক সময় সমৃদ্ধিশালী বন্দর ছিল। বড় বড় লবণের কারখানা হইতে দেশ-বিদেশে বিস্তর লবণ রপ্তানী হইত। কিন্তু লবণ-আইন প্রচলন হইবার পর হইতেই সেই সব কারখানা উঠিয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে এমন সমৃদ্ধিশালী বন্দর শ্রীহীন, জনশূন্য হইয়া নির্জ্জন মুনিয়া পল্লীতে পরিণত হইল। অতীতের সাক্ষী দিবার জন্য যেন ভগ্নাবশেষ বড় বড় ইন্দারাগুলি আজিও বিদ্যমান রহিয়াছে।

সমুদ্রের ধারে পড়িয়াছে ইংরেজ শক্তি-বাহিনীর ছাউনী। একটা ভাঙ্গা বাড়ীর চারিদিকে কয়েকটা তাঁবু পড়িয়াছে,—তাহাতে ঘোড়া মটরকার। কতকগুলি হাফ্‌পেণ্ট পরা লোক নিজেদের লটবহর গোছান-গাছানোর কাজে ব্যস্ত। আসন্ন সংগ্রামের তোড়জোড় যেন উভয় পক্ষ হইতেই চলিতেছিল।

মহাত্মাজীর ঘর ও সত্যাগ্রহী সৈনিকদের শিবিরের মাঝখানের জায়গাটা ছিল সর্ব্বসাধারণের। সেখানে দোকান পসার বসিয়াছে। নবসারী হইতে মটরলরী ভরা লোক অনবরত আসা যাওয়া করিতেছে, যদিও মহাত্মাজী পূর্ব্ব হইতেই ঘোষণা করিয়া দিয়াছিলেন যে বিনা কাজে বা প্রয়োজনে কেহ যেন ডাণ্ডীতে আসিয়া ভীড় না করে। কারণ বেশী লোকের সমাবেশ হইলে পানীয় জলের অভাব হইবে। গ্রামে যে কয়টি কুয়া আছে তাহাতে বেশী লোকের পানীয় জল সরবরাহ করা অসম্ভব। অন্য বিপদের সম্ভাবনাও আছে। কিন্তু এই ঘোষণা সত্ত্বেও যাহারা নিজের কৌতূহলকে দমাইয়া রাখিতে পারে নাই এমন দেশ-বিদেশের বিস্তর নরনারী উপস্থিত ছিল। সকলেই যেন মহা উৎকণ্ঠায় অপেক্ষা করিতেছে,—"কাল কি হয়, কি হয় রণে

বেলা ৬টার সময় আমাদের রাত্রির আহারের কথা ছিল। শিবিরে যাওয়ার অল্পক্ষণ পরেই থালা বাটির ঢং ঢং শব্দ হইল। আমরা একে একে সকলে খাবার ঘরে গিয়া বসিলাম। খাওয়ার পদ্ধ-পদ্ধতি সব দুপুরের মতই ছিল। কেবল ভাতের পরিবর্ত্তে কলাই ডালের খিচুড়ী,—তাহাতেও কোন হলুদ লঙ্কা মসলা ছিল না।

সর্ব্বসাধারণের স্থানে যে সভা বসিয়াছে আমরা সকলে সেখানে গিয়া যোগ দিলাম। অনেকেই তক্‌লি হাতে করিয়া চলিলেন। রণছোড় শেঠ ও সেই ভদ্রমহিলাদের সঙ্গে সেইখানে দেখা হইল। তাঁহারা শুনিয়া সুখী হইলেন যে মহাত্মাজী আমাকে প্রথম দলে গ্রহণ করিয়াছেন।

প্রকাণ্ড সভা বসিয়াছে। দেশ বিদেশের নরনারী প্রায় সকলেই খদ্দরের সাড়ী, ধুতি, গান্ধীটুপি পরিয়া বসিয়াছে। কেবল মুনিয়া মেয়েরা মিলের কাপড় পরিয়া ভদ্র মহিলাদের সঙ্গে বসিয়াছিল। সভাটিকে যেন শুভ্র শতদলের মত মনে হইতেছিল। এমন ইউনিফরমিটি পূর্ব্বে কখনও কোন সভায় দেখি নাই। মহাত্মাজী, আব্বাস তায়েবজী ও সরোজিনীকে সঙ্গে করিয়া সভায় উপস্থিত হওয়া মাত্র সকলে দাঁড়াইয়া অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহারা আসন গ্রহণ করিবার পর সত্যাগ্রহী সৈনিক 'পণ্ডিতজী' তানপুরায় সুর দিয়া গান ধরিলেন,—"বন্দেমাতরম্ সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং মাতরম"—

বাঙ্গলার বাহিরে ভারতের পশ্চিম প্রান্তে যে এ গান শুনিতে পাইব তা ভাবি নাই। বাঙ্গালী মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রকে স্মরণ করিয়া মনে মনে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিলাম। বাঙ্গালী একদিন এই গানকে কণ্ঠে লইয়া স্বদেশ-প্রেমে অনুপ্রাণিত হইয়া সারা ভারতে বীজমন্ত্ররূপে ছড়াইয়া দিয়াছিল। মহাত্মাজী গুজরাটিতে বক্তৃতা

করিতেছিলেন। বক্তৃতা কিছু বুঝিলাম না। কিন্তু লক্ষ্য করিলাম, সকলেই মন্ত্রমুগ্ধের মত স্থির হইয়া বসিয়া বক্তৃতা শুনিতেছে।

কংগ্রেস, কনফারেন্স বড় বড় সভাসমিতি অনেক দেখিয়াছি। গগনভেদী মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতাও অনেক শুনিয়াছি ও দেখিয়াছি। কিন্তু এমন বাহুল্য-বর্জ্জিত জন কয়েক সাহসী সৈনিকের সেনাপতি হইয়া অহিংস অস্ত্রকে সম্বল করিয়া যুদ্ধ-ঘোষণার প্রাক্‌কালের সভা আর দেখি নাই। তখন ভারতের পশ্চিমপ্রান্তে সমুদ্রের তলে সূর্য্যদেব সভাটিকে করুণ চক্ষে দেখিতে দেখিতে আস্তে আস্তে অস্ত যাইতেছিলেন। কেবলই মনে হইতেছিল, কে জানে মহাত্মাজীর এই শেষ বক্তৃতা কি না। কারণ, কাল যে কি হইবে তাহা কাহারো কিছু জানা ছিল না।

তিনি ভীষ্মের মত প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, "হয় আমার কার্য্য উদ্ধার করিব, নতুবা ৬ই এপ্রিল ভোরে ডাণ্ডীর সমুদ্র-জলে আমার মৃতদেহ ভাসিবে।" বার বার করিয়া কেবল সেই কথাই মনে হইতেছিল।

সন্ধ্যা হইবার পর মহাত্মাজী, আব্বাস তায়েবজী ও সরোজিনী নাইডুকে সঙ্গে করিয়া শিবির প্রাঙ্গণে নক্ষত্র-খচিত উন্মুক্ত আকাশ তলে অস্পষ্ট চাঁদের আলোতে সত্যাগ্রহী সৈনিকদের লইয়া সান্ধ্য উপাসনায় বসিয়া গেলেন।

পণ্ডিতজী তানপুরায় ভজন ধরিলেন,—

"রঘুপতি রাঘব রাজা রাম,
পতিতপাবন সীতারাম॥"

সকলে মিলিয়া নানাসুরে বার কয়েক গাহিবার পর আলোচনা আরম্ভ হইল। আলোচনা হইতেছিল বেশীর ভাগ গুজরাটীতে। শিবিরে ব্যবস্থা প্রসঙ্গে আমি যে শান্তিনিকেতন হইতে সংগ্রামে যোগ দিতে আসিয়াছি, সে কথাও নাকি মহাত্মাজী সকলকে বলিয়াছিলেন।

লক্ষ্য করিলাম, সকলেই খোলাখুলি ভাবে আলোচনায় যোগ দিতেছিল। কাহারো কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া মহাত্মাজী সময় সময় এমন রসিকতা করিয়া উত্তর দিতেছিলেন যাহাতে সকলের মধ্যে একটা হাসির রোল উঠিতেছিল। এই দৃশ্যটি আমার বড় ভাল লাগিতেছিল।

উপাসনা আলোচনা শেষ করিয়া তাঁহারা ঘরে চলিয়া গেলেন। দুর্গেশ বাবুর কথাটাকে সঠিক ভাবে জানিবার জন্য মহাত্মাজীর ঘরে গিয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করিলাম। ঘরভরা তখন লোক ছিল। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে তোমার কেমন লাগিতেছে?" আমি বলিলাম, "এখানে আসিয়া মনে যেন নূতন বল পাইতেছি।" তিনি বলিলেন, "যাও, কালকের জন্য প্রস্তুত হও গে।" আমি প্রণাম করিয়া সংশয়ের ক্ষীণ রেখাটুকু আমার মন হইতে মুছিয়া চলিয়া আসিলাম। তাঁহার কথার মধ্যে এমন একটা প্রচণ্ড শক্তি নিহিত ছিল যাহাতে পঙ্গুকেও যেন গিরি-লঙ্ঘনের শক্তি আনিয়া দেয়।

প্রলয়ের প্রাক্‌কালে প্রকৃতি যেমন স্তব্ধভাব ধারণ করে সেইরূপ সমস্ত নরনারী যে যেখানে পারে গাছতলায়, খোলা বারান্দায় রাত্রিটুকু কাটাইয়া ভোরের অপেক্ষায় স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছে। সকলের ভাবটা যেন, "কাল কি হয় কি হয় রণে, জয়পরাজয়"।

শিবিরে আসিয়া দেখি মাটির উপর মাদুরে যে যার বিছানা বিছাইয়া শুইয়া পড়িয়াছে। কেহ কেহ চিঠি বা ডাইরী লিখিতেছে। শিবির প্রাঙ্গণে একলাটি পাইচারী করিতে করিতে কেবলি মনে হইতেছিল,—কাল ভোরে ডাণ্ডীর সমুদ্রকূল হইতে যে কালবৈশাখীর ঝড় উঠিবে, সে প্রবল ঝড় সমস্ত ভারতবর্ষ একেবারে তোলপাড় করিয়া তুলিবে।

৬ই এপ্রিল রাত্রি ৪টায় ঢং ঢং ঢং করিয়া শিবিরে ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। আমরা বিছানা ছাড়িয়া যে যার প্রাতঃকৃত্য সারিয়া লইলাম। আধ ঘণ্টা পরেই মহাত্মাজী আব্বাস তায়েবজী ও সরোজিনী নাইডুকে সঙ্গে করিয়া শিবিরে আসিয়া সত্যাগ্রহী সৈনিকদিগকে লইয়া উপাসনায় বসিয়া গেলেন।

"নত্বহং কাময়ে রাজ্যং ন স্বর্গং ন পুনর্ভবম্
কাময়ে দুঃখতপ্তানাং প্রাণীনামার্ত্তিনাশনম্।"

আকাশভরা তারা, বিশেষ করিয়া ভোরের শুক-তারা যেন প্রভাতে আলো যোগাইতেছিল।

উপাসনা শেষ করিয়া সত্যাগ্রহী সৈনিকদের লইয়া মহাত্মাজী সমুদ্রে স্নান করিতে চলিলেন। সকলে মিলিয়া ভজন ধরিয়া চলিয়াছেন,—

"রঘুপতি রাঘব রাজারাম
পতিতপাবন সীতারাম।"

যেন স্বাধীনতার তীর্থযাত্রীদল চলিয়াছে! পূর্ব্বদিকের আকাশ লাল আভায় ভরিয়া উঠিয়াছে। পিছনে পিছনে অসংখ্য নরনারী চলিয়াছে। সমুদ্রের ধারে আসিয়াই সত্যাগ্রহী সৈনিকেরা মহাত্মাজীকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। অল্প দূরে পিছনে জন-সমুদ্র স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। মহাত্মাজী একটা কৌপীন আঁটিয়া সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। সঙ্গে সঙ্গে সকলেই ঝাঁপাইয়া পড়িল। ঢেউয়ের দোলায় গা ভাসাইয়া দিয়া সকলে দোলা খাইতে লাগিল; সে কী আনন্দ!

মহাত্মাজীকে দেখিয়া মনে হইতেছিল, শিশু যেন জলের টব নিয়া বসিয়া গিয়াছে। স্নান সারিয়া উঠিয়াই মহাত্মাজী বে-আইনি এক খাবল লবণ-মাটি তুলিয়া লইয়া ঘরে চলিয়া গেলেন। আমাদিগকে আদেশ দিয়া গেলেন, "তোমরা আরম্ভ করিয়া দাও।" প্রবল বানের বাধ যেন ভাঙ্গিয়া গেল।

"এবার ভেঙ্গেছে তোর দ্বার,
এক হাতে ওর কৃপাণ আছে
আর এক হাতে হার!
মরণেরই পথ দিয়ে ঐ আস্‌ছে জীবন মাঝে,
ও যে আস্‌ছে বীরের সাজে।
আধেক নিয়ে ফিরবো নারে—না না না,
যা আছে তা একেবারে
করব অধিকার—
এবার ভেঙ্গেছে তোর দ্বার।"

আমরা শিবিরের মধ্যে স্তূপাকার লবণ-মাটি সংগ্রহ করিতে লাগিলাম। কেহ কেহ বড় বড় লোহার কড়ার মধ্যে লবণ জাল দিতে লাগিল। শিবিরের দ্বার খুলিয়া দেওয়া হইল। দলে দলে লোক আসিয়া বে-আইনি লবণ দেখিতে লাগিল। বেলা এগারটায় যে যার কাজ ছাড়িয়া শিবিরে আসিয়া উপস্থিত হইবার পর খাওয়ার ঘণ্টা পড়িল। সে দিন আমাদের এক বেলা খাওয়ার কথা ছিল। খাইতে বসিয়া দেখি ছোলা ভাজা, মুড়ী, ঘি ঘোল ও প্রত্যেকের জন্য দুইটি করিয়া কলা। সেই সময়ই আমরা আমাদের প্রস্তুত করা লবণ প্রথম খাইলাম।

মহাত্মাজী যে প্রথম এক খাবলা মাটি লইয়া সামান্য লবণ করিয়াছিলেন তার অর্দ্ধেক আছে মিউজিয়মে আর অর্দ্ধেক রণছোড় শেঠ দশ হাজার টাকা দিয়া কিনিয়া রাখিয়াছেন।

শিবিরে আসিয়া যে যাহার ভাবে বিশ্রাম করিতেছে। আমার একটু তন্দ্রা আসিয়াছে। এমন সময় ছগনলাল যোশী আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। চোখে মুখে জল দিয়া তাঁহার কাছে যাওয়ার পর কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাঙ্গালা দেশের অবস্থা কেমন দেখিলেন?" আমি বলিলাম, "গুজরাটের পরই বাঙ্গলা সাড়া দেবে ব'লে আমার মনে হয়।" তিনি বলিলেন, "বাঙ্গলা কি অহিংসায় বিশ্বাস করে?" আমি বলিলাম, "যাঁরা করেন তাঁরাই এ সংগ্রামে যোগ দিবেন।" তিনি বলিলেন, "তাঁদের সংখ্যা কি বেশী আছে?" আমি বলিলাম, "হাঁ, দিন দিন তাঁদের সংখ্যা বাড়ছে। যাঁদের একদিন অহিংসায় বিশ্বাস ছিল না, তাঁরা এখন দেখছেন এ ছাড়া আর পথ নাই।" তিনি বলিলেন, "বাঙ্গালার উপর আমরা বড় আশা করি, কিন্তু—।" আমি বলিলাম, "বাঙ্গালীর চিন্তাধারায় বহুদিন থেকে একটা বিদ্রোহ ভাব চলে এসেছে। কি ধর্ম্মে, কি সাহিত্যে, কি সমাজে।" তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি মহাত্মাজীর সব আদর্শ মানেন?" আমি বলিলাম, "সবটা বুঝতে পারি না ব'লে মানি না, তবে এ সংগ্রামে সৈনিকের যা কর্ত্তব্য তা সবই মানি।" তিনি কি ভাবিতে লাগিলেন। পরে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এর পর আপনাদের কর্ম্মপন্থা কি?" তিনি বলিলেন, "সবই অবস্থার উপর নির্ভর করে। তবে এখানে আর ৪।৫ দিন থেকে আমরা গ্রামের ভিতর কাজ করে চলব।" আমি বলিলাম, "আমি ত গুজরাটী জানি না, আমার পক্ষে বাঙ্গলা দেশে কাজের সুবিধা হবে বলে মনে হয়। তবে এ কথাটা আমি আপনাকে সৈনিক হিসাবে বল্‌ছি না। কিন্তু—"

তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন, "না, তা আমি বুঝেছি" বলিয়া ঘড়িতে সময় দেখিয়া অন্য কাজে চলিয়া গেলেন।

এদিকে খড়্গ বাহাদুর সিং একটা ডালার মধ্যে কতকগুলি লবণের পুরিয়া লইয়া সর্ব্বসাধারণের স্থানে বিক্রয় করিতে লাগিলেন। যাহার যাহা ইচ্ছা দাম দিতে লাগিলেন। এত তাহার চাহিদা, লওয়া মাত্র মুহূর্ত্তের মধ্যেই ডালা উজাড় হইয়া যাইতে লাগিল। কেহ কেহ ৫০৲ টাকা প্রতি পুরিয়ার দাম দিয়াছিল।

আমি বসিয়া লবণ জ্বাল দেওয়া দেখিতেছি,—ইহার মধ্যে একজন স্বেচ্ছাসেবক আসিয়া বলিলেন, "বাপুজী আপনাকে ডেকেছেন।" মহাত্মাজীর সঙ্গে দেখা করিতে গিয়া উপরের বারান্দায় দ্বার-রক্ষকের কাছে শুনিলাম পাঁচ মিনিট পূর্ব্বে মহাত্মাজীর মৌন অবস্থা আরম্ভ হইয়াছে। আমি আর তাঁহার ঘরে না ঢুকিয়া বারান্দায় বসিয়া আছি। পাশের ঘরে দেখি আব্বাস তায়েবজী সরোজিনী নাইডু কয়েকজন লোকের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতেছেন। আমার বড় কৌতুহল জন্মিতেছিল মহাত্মাজী মৌন অবস্থায় কি করেন দেখি। কিন্তু জানালা দিয়া দেখিতে সাহস হইতেছিল না। কারণ রীতিনীতি কিছুই আমার জানা ছিল না। অল্প পরে ছগনলাল যোশী ঘর হইতে বাহির হইয়া আমাকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন, "আসুন"। ঘরে ঢুকিয়া দেখি মহাত্মাজী মাদুরে বসিয়া দেয়ালে ঠেস্ দিয়া কি লিখিতেছেন। আমি দূর হইতে প্রণাম করিয়া বসিয়া পড়িলাম। ছগনলাল যোশী ছাড়া অন্য কোন লোক ঘরে ছিল না।

মহাত্মাজীর যে মৌন অবস্থার কথা কতদিন হইতে শুনিয়া আসিতেছি, সে সম্বন্ধে কল্পনায় কত কি ভাবিয়াছি ; আজ সে কল্পনা মূর্ত্তি ধরিয়া কাছে প্রকাশ হইয়া রহিয়াছে। মহাত্মাজী আমার হাতে একখানা কাগজ দিলেন। তাহা হিন্দিতে লেখা। আমি ভাবিলাম এ পত্রখানা বুঝি কাহাকে দিতে হইবে। ছগনলাল যোশী বোধহয় আমার ভাবটা বুঝিতে পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি হিন্দি পড়িতে জানেন কি?" আমি বলিলাম, "না।" তিনি আমার হাত হইতে পত্রখানি লইয়া পড়িয়া শুনাইলেন।

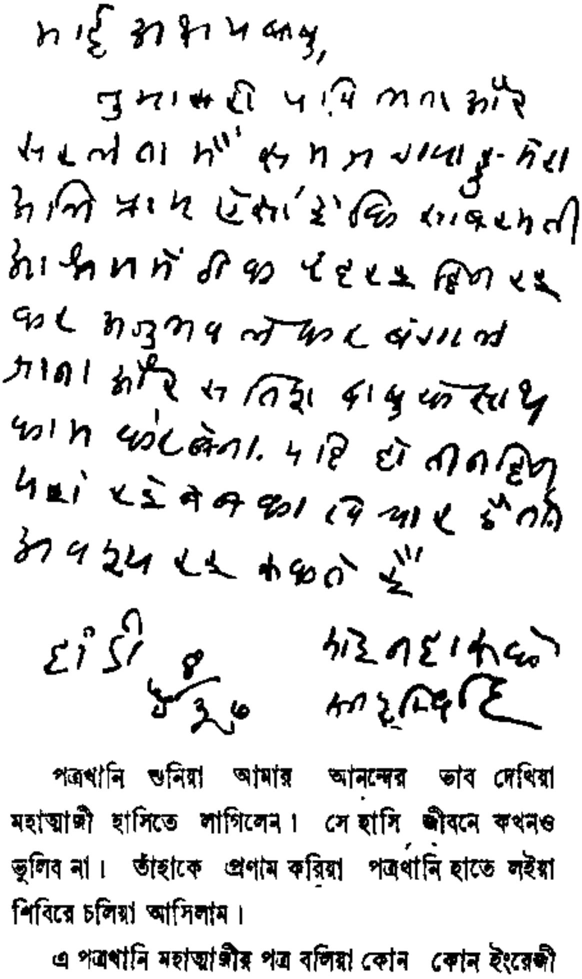
"ভাই অক্ষয় বাবু,

তোমার পবিত্রতা ও সরলতা আমি বুঝিতে পারিয়াছি। আমার ইচ্ছা এই, তুমি সাবরমতী আশ্রমে ঠিক পনের দিন থাকিয়া সেখানকার ভাবসাব বুঝিয়া বাঙ্গলায় গিয়া সতীশবাবুর সঙ্গে কাজ কর। যদি দুই তিন দিন এখানে থাকিবার ইচ্ছা হয় ত অবশ্যই থাকিতে পার।

মোহনচাঁদ গান্ধীর আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর।"

ডাণ্ডি, ৬।৪।৩০

মহাত্মাজীর স্বহস্তলিখিত পত্রের প্রতিকৃতি



পত্রখানি শুনিয়া আমার আনন্দের ভাব দেখিয়া মহাত্মাজী হাসিতে লাগিলেন। সে হাসি জীবনে কখনও ভুলিব না। তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পত্রখানি হাতে লইয়া শিবিরে চলিয়া আসিলাম।

এ পত্রখানি মহাত্মাজীর পত্র বলিয়া কোন কোন ইংরেজী ও বাঙ্গলা কাগজে বাহির হইয়াছিল।

অল্প পরেই আমরা সকলে মিলিয়া সভায় যোগ দিতে চলিয়া গেলাম। প্রকাণ্ড সভা বসিয়াছে,—মহাত্মাজী সে

সভায় উপস্থিত ছিলেন। আব্বাস তায়েবজী ও সরোজিনী নাইডু উপস্থিত ছিলেন। আব্বাস তায়েবজী লম্বা-চওড়া, গৌর-কান্তি, প্রিয়দর্শন পুরুষ। মাথাভরা বড় বড় শুভ্র কেশ, বড় বড় শুভ্র দাড়ী, মুখভরা হাসি লাগিয়াই আছে।—যেন ভোলানাথ সদাশিব। যখন তখন যার তার সঙ্গে দোকানে পসারে বসিয়া গল্প জুড়িয়া দিতেন।

আব্বাস তায়েবজী সভায় দাঁড়াইয়া দু-চারটি কথা বলিয়া সরোজিনী নাইডুর পিঠে এক চাঁটি দিয়া বলিলেন, "এখন তোমরা আমার এই বোনের কাছে বক্তৃতা শোন" বলিয়া বসিয়া পড়িলেন। সরোজিনী নাইডু দাঁড়াইয়া উর্দ্দুতে বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। কি তাঁহার বক্তৃতার ভঙ্গী! বিষয়টিকে সাধারণের কাছে সহজভাবে প্রকাশ করিবার কি অসাধারণ ক্ষমতা! সময় সময় তাঁহার বড় বড় চক্ষু দুইটী হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছিল, তাঁহার বক্তব্য-বিষয় ছিল, পাশবিক শক্তিকে আধ্যাত্মিক বলের কাছে কোন না কোন সময় বশ মানিতে হইবেই হইবে। তিনি বলিলেন, "এই দেখনা ভাই, এই যে (মহাত্মাজী) লেংটী-পরা পোকার মত পুরুষটি,···যে পাঠানের একটা চপেটাঘাতেই পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হবে, তাঁর যে এত বল সে কিসের; একবার ভেবে দেখ দেখি?" সভা ভঙ্গের অল্প পরেই ডাণ্ডীতে খবর আসিল, ভিন্ন কেন্দ্র হইতে মণিলাল কোঠারী ও রামদাস গান্ধী গেরেপ্তার হইয়াছেন। অন্য সব প্রদেশ হইতে খবর আসিতে লাগিল, একে একে নেতারা গেরেপ্তার হইতেছেন। স্থানে স্থানে পুলিসের জোর-জুলুম, মারপিট চলিয়াছে। অথচ যে ডাণ্ডী এই সংগ্রামের মূল উৎস,—যে ডাণ্ডী-নায়কের অঙ্গুলি সঙ্কেতে সমস্ত দেশ উঠিতেছে নাবিতেছে, যাহার আশে পাশে শক্তি-বাহিনী সশস্ত্রে সজ্জিত আছে, সেই ডাণ্ডীতে সত্যাগ্রহী সৈনিকেরা সমস্ত দিন ধরিয়া বে-আইনি লবণ প্রস্তুত করিয়া নির্ব্বিঘ্নে সর্ব্বসাধারণের কাছে বিক্রয় করিতে লাগিল অথচ সেইখানে একটা লালপাগড়ী পর্য্যন্ত দেখা গেল না।

মহাত্মাজীর প্রভাবে যেন যে যাহার হাতের অস্ত্র হাতে রাখিয়া হতভম্বের মত শক্তিব্যূহের মধ্যে বসিয়া পড়িল। পুরুষ-সিংহের কী ভীষণ প্রতিজ্ঞা,—"হয় আমার কার্য্য উদ্ধার করিব, নতুবা ৬ই এপ্রিল ভোরে আমার মৃতদেহ ডাণ্ডীর সমুদ্রজলে ভাসিবে"।

ভবিষ্যৎ ইতিহাসই এ সংগ্রামের জয়-পরাজয় বিচার করিবে।

৭ই এপ্রিল রাত্রি ৪টায় উঠিবার ঘণ্টা পড়িল। যে যাহার প্রাতঃকৃত্য সারিয়া লইবার পরই মহাত্মাজী শিবিরে আসিয়া সকলকে লইয়া উপাসনা করিয়া তাঁহার ঘরে চলিয়া গেলেন। সে দিন আর কোন আলোচনায় যোগ দিলেন না, কারণ তখনও তাঁর মৌন অবস্থা ছিল।

সকালে জল খাইতে বসিয়া দেখি,—গরম গুড়-জল, ছোলা-ভাজা মুড়ী। মহাত্মাজী আদেশ দিয়াছিলেন ডাণ্ডীতে সাত দিন সকলেই তিন বেলায় ছোলা-ভাজা, মুড়ী, ঘি ঘোল খাইয়া থাকিবে। পলাশ-পাতার ডোঙ্গার মধ্যে সকাল বেলায় গরম গুড়জল সিদ্ধতে চায়ের খেদটা যেন মিটিত।

সকালে জল খাইয়া দলে দলে যে যাহার কাজে চলিয়া যাইত। কোন দল লবণ-মাটি সংগ্রহ করিতেছে, কোন দল লবণ জাল দিতেছে স্থানে স্থানে পুরু বালিসের মত সাদা লবণ জমা ছিল স্বেচ্ছাসেবকদের ছোট হাত-কাটা খদ্দরের জামার উপর লাল কালিতে বড় বড় গুজরাটী অক্ষরে কি লেখা ছিল। দলে দলে সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইতে তাঁহাদের দেখিতাম। সেখানকার স্বাস্থ্য, শৃঙ্খলা, সত্যাগ্রহী সৈনিকদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা সব তাঁহারাই করিতেন।

সহর হইতে ১০ মাইল দূরে ক্ষুদ্র একটী গ্রামের মধ্যে দেশ-বিদেশের এতগুলি নরনারী একত্র হইয়াছে। তাহাতে খদ্দরপ্রচার বিভাগ, (তুলা ধুনা হইতে কাপড় বোনা পর্য্যন্ত) জাতীয় সাহিত্যপ্রচার বিভাগ, নানা প্রদেশের নেতা ও কর্ম্মীদের কাজকর্ম্মের পরামর্শে যাতায়াত, ইউরোপীয় পর্য্যটকও —কিছুরই অভাব ছিল না। তদন্ত আফিস, প্রেস রিপোর্টার প্রভৃতি নানা কাজে নানা লোক একত্র হইয়াছিল। সব কিছু মিলিয়া কি সুশৃঙ্খলা চলিতেছিল ভাবিলে অবাক হইয়া যাইতে হয়।

আমরা সকলে মিলিয়া সমুদ্রে স্নান সারিয়া খাওয়া দাওয়ার পর শিবিরে আসিয়া দেখি মহাত্মাজীর আদেশে

চার পাঁচ জন সত্যাগ্রহী সৈনিক ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্রে কাজের জন্য যাইতেছেন।

তাঁহাদের সতীর্থদের কাছ হইতে বিদায় লইবার মর্ম্মস্পর্শী দৃশ্যটী এক পাশে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলাম।

বৈকালে একলাটি সমুদ্রের ধারে হাঁটিতে হাঁটিতে লোকের ভীড় হইতে একটু দূরে বসিয়া সূর্য্য অস্ত দেখিলাম। কত কি ভাবিতেছি,—এর মধ্যে অস্পষ্ট আলোতে দূরে দেখি মহাত্মাজীর মত একজন লোক যেন আসিতেছেন। ভাবিতে পারি নাই তিনিই। কাছে আসিবার পর দেখি সত্যই মহাত্মাজী। আমি উঠিয়া দাঁড়াইলামও না, প্রণামও করিলাম না,—যেন লক্ষ্য করি নাই এমন ভাবে বসিয়া রহিলাম। তিনি পাশ দিয়া একলাটি লাঠি হাতে করিয়া চলিয়া গেলেন। আমি তাঁহার পিছনে পিছনে চলিলাম। মহাত্মাজী ২৪ ঘণ্টার পর মৌন অবস্থা ভাঙ্গিয়া শিবিরে সান্ধ্য উপাসনায় যোগ দিতে যাইতেছেন। লোকের ভীড়ের ভিতর দিয়া না গিয়া একটু ঘুরিয়া সমুদ্রের ধার দিয়া চলিয়াছেন। মহাত্মাজীকে যখন যেখানে চলিতে দেখিয়াছি, জনসমুদ্রের মধ্য দিয়া চলিতে দেখিয়াছি। বিশাল মানব বিশাল সমুদ্রের তীর দিয়া একলাটি চলিয়াছেন! এই কথাটা ভাবিতে ভাবিতে পিছন পিছন চলিয়াছি। অল্প দূর যাইতে না যাইতেই তাঁহার চলার গতি যেন ভক্তিভরা প্রণামে প্রণামে রোধ হইয়া আসিতে লাগিল। গোমুখী হইতে বাহির হইয়া স্বচ্ছসলিলা বেগবতী গঙ্গা যেন নানা আবিলতা লইয়া চলিলেন!

শিবিরে আসিয়াই সকলকে লইয়া উপাসনায় বসিয়া গেলেন। আলোচনার সময় কেহ কেহ বলিলেন খাওয়ার ব্যবস্থা পরিবর্ত্তন করিতে, এ খাওয়ায় তাঁদের অসুখ করিতে পারে। তাহার উত্তরে তিনি বলিলেন, "বেশ, তা হলে অল্প করিয়া খাও, অসুখ করিবে না, কিন্তু এ খাওয়াই সকলকে কয় দিন খাইতে হইবে।"

একটা লক্ষ্য করিলাম, খাওয়ার ব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রতিবাদ মহাত্মাজীর কাছে কেহ কেহ করিলেন বটে, কিন্তু খাওয়ার সময় সকলকেই দেখিতাম, বেশ প্রফুল্লচিত্তে খাইয়া যাইতেছেন। কোন ওজর আপত্তি সমালোচনা ছিল না। নিজের অসুবিধা হইলেও সকলের প্রসন্ন ভাব দেখিয়া ভুলিয়া গিয়াছিলাম।

৭ই হইতেই লোকের ভীড় কমিতে লাগিল। ১০ই এপ্রিল সকালে সাবরমতী রওয়ানা হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া মহাত্মাজীর সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। তিনি তখন একটা গ্রামে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। বড় ব্যস্ত দেখিলাম। কোন কথা হইল না। সিঁড়ির কাছে আসিয়া বলিলেন, আমার লাঠিটা ঘরে ফেলে এসেছি। আমি তাড়াতাড়ি গিয়া ঘর হইতে লাঠিটা আনিয়া তাঁহার হাতে দিলাম। তিনি চলিয়া গেলেন।

আমার ডাণ্ডী হইতে রওয়ানা হইবার দুই দিন পর মহাত্মাজী ডাণ্ডী হইতে তাঁহার দল বল লইয়া কড়াডী নামক স্থানে শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন। সেখানেই একদিন গভীর রাত্রে শিবিরে যখন সকলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল সেই সময় মুক্তি-সংগ্রামের প্রধান সেনাপতি মহাত্মা গান্ধী ধৃত হইয়া যারবেদা জেলে বন্দী হইলেন।

শ্রীঅক্ষয়কুমার রায়



ফস্কা গেরো

শ্রীযুক্তা আমোদিনী ঘোষ

১

পৌষের কন্‌কনে ঠাণ্ডা রাত। কুয়াশায় চারিদিক ঢাকা। পঞ্চমীর পাণ্ডুর চাঁদ বনান্তের অন্তরাল হইতে দীন নয়নে চাহিয়া আছে। জলের সঙ্গে স্থল মিশিয়াছে, স্থলের সঙ্গে আকাশ। আবছায়ায় হইয়া উঠিয়াছে সব ঘোলাটে, অস্পষ্ট, অদ্ভুত। প্রপর্ণ বনানীর ভিতর দিয়া উত্তরের বাতাস হু হু করিয়া বহিতেছে।

শীতে হি হি করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে নির্ঝরিণী সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতেছিল। হাতে তাহার দুধের বাটি, মনে বিস্তর ভাবনা।

সিঁড়ির গোড়ায় ছোট একটা দেয়ালগিরি, তাহার আলো পড়ে সিঁড়ীর আধখানা পর্য্যন্ত; বাকিটায় থাকে একটা শুধু তার আভাস। তাহার প্রান্ত ঘেঁসিয়া নির্ঝরিণীর শয়ন-কক্ষের আলোর শেষ রশ্মিটি আসিয়া পড়িয়া অন্ধকার ও আলো—এ দুইকেই অপ্রকৃত করিয়া তুলিয়াছে।

সিঁড়ির বাঁকে ঘুরিয়া এই জায়গাটির কাছাকাছি হইতেই নির্ঝরিণী সম্মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল।

যে জিনিষটা না স্পষ্ট না অস্পষ্ট—মানুষের কল্পনা তাহাকে রূপ দেয়।

সিঁড়ির মাথায় আপাদ-মস্তক ঢাকা মানুষের মত কি যেন একটা দাঁড়াইয়া—ওটা সত্যিকারের কোনো মানুষ, না তাহার চোখের ধাঁধাঁ তাহা নিঃসংশয়ে বুঝিবার জন্য নির্ঝর দুধের বাটি নামাইয়া রাখিয়া বাঁ হাত দিয়া চোখ একবার মুছিল।

সিঁড়ির ওপরকার অচল মূর্তিটা সচল হইয়া কালো মোটা ভয়াবহ একখানা হাত বাহির করিতেই নির্ঝরিণী 'মাগো' বলিয়া চীৎকার করিয়া পতনোন্মুখ হইল।

যে দাঁড়াইয়াছিল সে গায়ের কম্বল ফেলিয়া দিয়া এক লাফে নামিয়া নির্ঝরকে ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, "এই তোমার সাহস!" অনিলবরণের হাসি উচ্ছলিত হইয়া উঠিল।

নির্ঝরিণী তাহার হাত ছাড়াইয়া লইয়া কোপসহকারে বলে "এ তোমার ভারী অন্যায়!"

আবার সঙ্গে সঙ্গে হাসিতে থাকে। অনিল সিঁড়ির কোণা হাতড়াইয়া দুধের বাটিটা তুলিয়া লইয়া বলে, "শুনেছিলাম তুমি খুব বীরাঙ্গনা—তাই একটু পরখ করে দেখ্‌লুম।"

"তোমার চাইতে আমি বীরাঙ্গনা এক শ বার! বাড়ীতে মানুষ কখনও থাকে কখনও থাকে না—আমি একলাই ত বাপু, এ বাড়ী আগলাই। তা বলে বুঝি অমনি করে তুমি আমায় ভয় দেখাবে! তোমার চেয়ে আমার সাহস আছে বলি ব'লে এ ত আমি কখনো বলি নি যে, আমি অসম-সাহসিক অথবা আমার সাহসের সীমা নেই!"

"সেই সীমাটা যে কত দূরে আমি আজ তাই একটু দেখ্‌লুম।"

"বাবা বাড়ীতে নেই তাই তোমার সাহস বেড়েছে।"

"ঠিক্ সেই কারণেই তোমার সাহস জিরোতে নেমে গেছে। দেখ ভাই নির্ঝর, চাঁদের জ্যোৎস্না দেখে আমরা ত মুগ্ধ হই-ই—চাঁদ নিজেও কিছু কম মুগ্ধ হন না, কিন্তু ওর পেছনে যে সূর্য্যদেব রয়েছেন—একথা বেশীক্ষণ ভুলে থাকা যায় না অথবা চলে না।"

বলিতে বলিতে দুজনে একটা ঘর ছাড়াইয়া আরেকটা ঘরে প্রবেশ করিল।

…বিছানার কোণায় বাতি রাখিয়া নির্ঝরিণীর ছোট বোন নীরজা র‍্যাপার মুড়ি দিয়া তাহার পিতা মুরারীবাবুর নব-প্রকাশিত একখানি বই পড়িতেছিল, পায়ের শব্দে মাথা

তুলিয়া চাহিয়া বই বন্ধ করিয়া বলিল "এতক্ষণে তোমাদের দর্শন পাওয়া গেল!"

"অনুদা তা হ'লে তোমাকে দর্শন দান করবে নি!" বলিয়া নির্ঝরিণী হাসিল।

অনিল নির্ঝরিণীর দিকে চাহিয়া বলিল, "তুমি কিন্তু ঠকে যাচ্ছ নীরু।"

ঠকিয়া যাওয়াটা যে কম্প্লিমেণ্ট হিসাবে একটা উঁচু জিনিষ নয়, এবং বুদ্ধির হিসাবেও যে খুব শ্রদ্ধাজনক বস্তু নয়—নীরুর ভ্যানিটি সে সম্বন্ধে জাগ্রত হইয়া ওঠায় নীরু ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন কিসে আমি ঠকে যাচ্ছি?"

"তোমার মেজদি তোমায় যে কথাটি বল্লেন তার ভিতর যে একটি প্রচ্ছন্ন এলিউসন আছে—তার সম্বন্ধে না করলেন উনি কোনো উচ্চবাচ্য,—না করলে তুমি!

নির্ঝরিণী তখন অনিলের কীর্ত্তি এবং অনিল নির্ঝরিণীর জনবিশ্রুত সাহসিকতার কাহিনী সবিস্তারে বর্ণন করিল।

নির্ঝরিণী বলিল "দেখ্ ভাই ওর কাণ্ড—আমি যদি তখন পড়ে গিয়ে ঘাড় মুড় ভেঙ্গে মর্ত্তুম!"

নিরু নির্ঝরের কথায় যোগ দিয়া বলিল "সত্যি অনুদা বুড়োছেলে হ'লে তবু তোমার ছেলেমানুষি গেল না। বাবা যতক্ষণ বাড়ীতে থাকেন ততক্ষণ তুমি ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জান না। কিন্তু বাবা বাড়ীর বার হয়েছেন কি তুমি অমনি লেগে গেছ একটা না একটা কিছু কর্ত্তে!"

অনিল সাহাস্তে বলিল, "ভগবান যত কিছু জীব জন্তু সৃষ্টি কোরেছেন, তাদের সবাইর আত্মরক্ষার একটা না একটা উপায় সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি করে দিয়েছেন। বাঘকে দিয়েছেন দাঁত, হাতীকে শুঁড়, মহিষকে শিং, মশার হুল, বৃশ্চিকের পুচ্ছ—এমনি সব। মানুষকে আত্মরক্ষার জন্ত দিয়েছেন বুদ্ধি—ঐটেই তার সেরা অস্ত্র। ওটাকে চালনা না করলে ওর ভোঁতা এবং অকর্ম্মণ্য হয়ে পড়্বার যে নিদারুণ সম্ভাবনা আছে—সেটি যদি তোমরা কেউ হৃদয়ঙ্গম কর্ত্তে, তবে আমায় অযথা অভিযোগ না করে আমার সহকারিতাই কর্ত্তে।"

নির্ঝর বলিল "তোমার এম্-এও হয়ে গেছে ল-ও হয়ে গেছে। ওকালতীর যে সনদখানা মিলেছে—বুদ্ধিতে শাণ দিতে ওটা বুঝি তোমার যথেষ্ট হয় না!"

নীরজা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল, "অনুদা ওকালতির সনদই নিলে শেষটা! এই না তুমি করাচী যাবে, ভিজাগাপট্টম্ যাবে, বম্বে যাবে, বর্ম্মা যাবে—তা না হয়ে এই কৃষ্ণনগরেই নিলে চির-বসতি? কোথায় গেল তোমার সে রেভিং স্পিরিট?"

পরম গাম্ভীর্য্যসহকারে অনিল বলিল, "বয়স পড়ে এলেই স্পিরিটও পড়ে আসে। আগুন নিভ্লে আঁচও মরে।"

নির্ঝর ও নীরজা এক সঙ্গে হাসিয়া উঠিল। নির্ঝর বলিল "বয়স তোমার উর্দ্ধ্বচাবৃত্তে উঠ্‌ল কবে যে নাম্‌তে সুরু করল এরি মধ্যে? বস্তু-জগতের নিয়ম অনুসারে—"

অনিল দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিল, "আমি চৈতন্ত-স্বরূপ,—বস্তু-জগতের নিয়ম দিয়ে আমায় টেনো না, দোহাই তোমার। ভেবেছিলুম ছোটনাগপুরে গিয়ে ম্যাঙ্গানিসের খনি নেব, নয়ত ভিজাগাপট্টমের এক রাজসচিবের পদপ্রার্থী হব, কিম্বা বম্বে গিয়ে ব্যবসা ফাঁদব—কিন্তু বয়স পাক্‌তে পাক্‌তে ওদিকে ম্যাঙ্গানিসের খনি নিলে এক সাহেব কিনে, ভিজাগা-পট্টমের রাজসচিব হয়ে বস্‌লেন একজন রিটায়ার্ড ডেপুটি, বম্বের ব্যবসার টাকার অঙ্ক গেল চড়ে। কি করি কি করি ভাবছি এমন সময় মেসো-মশায় দিলেন আইন পড়্‌তে ঢুকিয়ে। এ দড়াটার গোড়াটা ছিল ওঁর হাতে, কাজেই টান মেরে উনি দিলেন এইখানে কুপকাৎ করে।

নীরজা ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল, "তুমি এমনি লক্ষ্মী ছেলে যে, বাবা টান মেরে তোমাকে এখানে বসিয়ে দিলেন, আর অমনি তুমি বসে পড়্‌লে। আসলে তোমার মন বসে গেছে এখানে।"

চোখ বুজিয়া অনিল বলিল, "তুমি যখন বল্‌ছ—তখন তা হ'তে পারে।"

"কিন্তু এই জঙ্গলে পচা নালা আর ডোবার রাজ্যে তোমার মনটি কিসে বাঁধা পড়্‌ল?"

"আমার মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের ভার যখন তুমি নিয়েছো—তখন তুমিই ওটা বলে ফেল দয়া করে!

নির্ঝর হাসিতে লাগিল। নীরজা "আহা"! বলিয়া উঠিয়া ছেলেকে দুধ খাওয়াইতে বসিল।

দূরে ধাবমান একটা ট্রেণের হুইসল্‌ ও ঘস্ত ঘস্ত শব্দ শোনা গেল। অনিল কান খাড়া করিয়া বলিল, "ঐ ন'টার গাড়ী চলে গেল, মেসোমশায় এলেন কিনা কে জানে।"

নির্ঝর বলিল, "খাবার রাখ্‌তে যখন লিখেছেন, তখন আস্‌বেন নিশ্চয়।"

নীরজা ছেলেকে দুধ খাওয়াইয়া আসিয়া গুটি-সুটি হইয়া নির্ঝরিণীর গায় ঠেস্‌ দিয়া বসিল।

গল্প চলিতে লাগিল।

এবার রাস্তায় ঘোড়ার গাড়ীর শব্দ পাওয়া গেল। নির্ঝর উঠিয়া "নিশ্চয় বাবার গাড়ী" বলিয়া উঁচু জানালার ভিতর দিয়া মাথা বাড়াইয়া দেখিতে লাগিল।

শীতের কুয়াশামাখা রাত্রি। নক্ষত্র-বিরল আকাশ। ম্লান জ্যোৎস্নার কোয়াশাঢাকা গাছগুলি সাদা কাপড় মুড়ি দেওয়া ভূতের মত দেখাইতেছে। দূরে বনান্ত-রেখা আকাশের সঙ্গে মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে।

শালবনের তল দিয়া ঘড়্‌ঘড় করিতে করিতে গাড়ী ঘুরিয়া বাড়ীর দরজার সম্মুখে আসিল।

নির্ঝর বলিল, "অনুদা, দেখ এসে, দুটো গাড়ী এসেছে—মেলা মাল-পত্তর মাথায়। তমলুক থেকে কারা এল বাবার সঙ্গে।"

অনিল জানালার কাছে আসিয়া বলিল "শ্রীমতী নির্ঝরিণী, স্বচ্ছ পদার্থ বলে যদিও তোমার বিশেষ খ্যাতি আছে—আমি তোমাকে অত্যন্ত অস্বচ্ছ রূপেই দেখ্‌তে পাচ্ছি। তুমি জান্‌লাটি পরিত্যাগ না করলে আমার দেখার আশা বিড়ম্বনা।"

নির্ঝর হাসিয়া সরিয়া গেল।

অনিল গেটের বাহিরে দণ্ডায়মান দুখানা গাড়ীর দিকে চাহিয়া বলিল, "অতিথি দ্বারে সমাগত, এখন আর এখানে দাঁড়িয়ে থাকা চলে না।"

অনিল চটি পায় ফট্‌ ফট্‌ শব্দ করিতে করিতে দ্রুত নীচে নামিয়া গেল।

গাড়ী হইতে নামিল রাঙ্গাচেলী পরা—নূপুর পাঁশুলী পায়, সিন্দুর কৌটা হাতে, সালঙ্কারা নববধূ।

অনিল লণ্ঠনটা উঁচু করিয়া ধরিয়া বিস্ময়ে অবাক্‌ হইয়া চাহিয়া রহিল।

বধূর সঙ্গে নামিল বধূর দাসী, তাহার পরে মুরারী বাবু। হাতে তাঁহার নূতন আংটি, রিষ্ট্‌ওয়াচ্‌—(এ জিনিসটার সম্বন্ধে মুরারী বাবুর অবজ্ঞার অন্ত ছিল না), গায়ে নূতন দামী শাল।

বাতির কাছে হাত ঘুরাইয়া ধরিয়া সময়টা দেখিয়া লইয়া মুরারী বাবু অনিলকে কহিলেন, "চাকরদের ডেকে জিনিসগুলো নামাওত অনিল।"

অনিল বাতি রাখিয়া বাড়ীর ভিতরে ছুটিল।

ভিতর বাড়ীর দরজার কাছে নির্ঝর দাঁড়াইয়া ছিল, অনিল তাহাকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। নির্ঝর বলিল, "কারা এসেছে অনুদা?"

অনিল নির্ঝরের হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "নির্ঝর, এবার তোমার যথার্থ সাহস দেখাতে হবে—মনকে শক্ত কর। যার কথা স্বপ্নেও তোমরা ভাবো নি সেই ব্যক্তিই অবশেষে এসেছে। এখানে তোমার দাঁড়িয়ে কাজ নেই, চল ওপরে নিরুর কাছে।"

অনিল নির্ঝরকে টানিয়া লইয়া চলিল। তাহার চোখের জল নির্ঝরের হাতের উপর ঝর ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িল।

অনিলের দেরী দেখিয়া মুরারী বাবু লণ্ঠনটা নিজের হাতে লইয়া বলিল, "এস তোমরা আমার সঙ্গে, অনিল এসে জিনিস-পত্র ওঠাবে এখন।"

মুরারী বাবু বধূর হাত ধরিয়া লইয়া চলিলেন।

বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া ঝি বলিল, "নোক ত কাউকে দেখ্‌ছিনে—জামাই বাবু কি একলাই থাকেন এখেনে?"

মুরারী বাবু বলিলেন, "আমার দু মেয়ে আছে এখানে। রাত হয়েছে, ওরা হয়ত শুয়ে পড়েছে।"

চন্দ্রলেখাকে মুরারী বাবু জনান্তিকে কহিলেন, "ওরা আজ যে তোমাকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা কর্ত্তে পার্ব্বে না তা ত তুমি নিজেই বুঝতে পার। সময়ে সয়ে যাবে,—তোমারও—ওদেরও। অনিল আছে—ওই দেবে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করে। ও খুব কাজের ছেলে।"

চন্দ্রলেখা অনিচ্ছা জানাইয়া কহিল, এত রাত্রিতে এই শীতে খাওয়ার ইচ্ছা তাহার মোটেই নাই,—তাহার দারুণ মাথা ধরিয়াছে, এখন সে শুইতে পাইলেই বাঁচে।

মুরারী বাবু তখন তাহাকে নিজের শয়নকক্ষে পৌছাইয়া দিয়া জিনিস-পত্রের তদারক করিতে নীচে নামিয়া আসিলেন।

অনিল গাড়োয়ানের ভাড়া চুকাইয়া দিয়া গাড়ী বিদায় করিল, জিনিস-পত্র সব যথা স্থানে রাখাইল, ঝিকে ডাকিয়া খাইতে বসাইয়া দিল, কিন্তু মুরারী বাবুকে সে গেল সম্পূর্ণ এড়াইয়া।

তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, মুরারী বাবু যেন একটা খুন করিয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, সর্ব্বাঙ্গ তাঁহার যেন সেই রুধিরে লিপ্ত হইয়া আছে—সে দৃশ্য যেন সে চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখিতে পারিবে না! নিরশ্রু নেত্রের দাহময় দৃষ্টি অন্ধকারে নিদ্রাহীন নক্ষত্রের মত নির্নিমেষে মেলিয়া সে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

অভিনয়ের শেষে অভিনয়-আরম্ভের ফিরে আসা স্মৃতির মত তাহার গত জীবনের কাহিনী তাহার মনে ভাসিয়া আসিতে লাগিল।

কোথাকার মানুষ সে, কোথায় আসিয়া ভিড়িয়াছে! এ বাড়ীর সে কেহ নয় অথচ এই বাড়ীতেই তাহার সব?

মাঝখানে একটি মানুষ ছিল— অরাইব রথনাভৌ" যে তাহার জীবনের সুখ দুঃখ আশা আনন্দ অভিলাষকে ধারণ করিয়া ছিল,—তাহার জায়গায় আজ এ বাড়ীতে যে আসিল—তাহার হাতে রথনাভি ও অরবৃন্দ এ দুইই পরস্পর হইতে বিযুক্ত হইয়া কোথায় কোন পথের মাঝে ধূলায় গড়াইবে তাহা কে জানে!

স্রোতের মুখে ভাঙ্গা নৌকার তক্তার টুক্‌রার মত সে আসিয়া লাগিয়াছিল এই ঘাটে—এক জন তাহাতে প্রতিমার পাদপীঠ রচনা করিয়া পুষ্প চন্দন ঢালিয়াছে। আজ সে চলিয়া গিয়াছে—ভাসিয়া আসা ভাঙ্গা কাঠের টুক্‌রা আবার ভাসাইয়া দেওয়ার সময় হয়ত আসিয়াছে!

অনিলের মনে অমনি জাগিয়া ওঠে নির্ঝরের কথা! নির্ঝর ত স্রোতের মুখে ভাসিয়া আসা কাঠের টুক্‌রা নয়—সে ত জন্মিয়াছে এই বাড়ীতে—ওর মন এখানকার মাটির রন্ধ্রে রন্ধ্রে শিকড় মেলিয়া দিনের পর দিন বাড়িয়া উঠিয়াছে!—তবু ত ওকে-ও হয় ত ওরি মত নিরুদ্দেশের স্রোতে ভাসিতে হইবে!

বিবাহের পর ওর স্বামী গিয়াছে বিবাগী হইয়া বাহির হইয়া—শ্বশুরঘরে ওর স্থান নাই। যে একটি মাত্র স্থানকে ও আশ্রয় করিয়া ছিল, আকস্মিক এক ভূ-বিদারণের উর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত অগ্নি-শিখায় তাহা গেল শূন্যে ছায়াকারে বিলীন হইয়া!

পুরুষের বাৎসল্য আত্মতৃপ্তির উপাদান—সঙ্গিনী নারীর প্রেমের তাহা শাখান্তর মাত্র। স্ত্রী মরিলে ক্ষয়িতমূল বাৎসল্য ওঠে শুখাইয়া।

নারী-জগদ্ধাত্রীর রূপের কাছে পুরুষের অভ্রস্পর্শী ক্ষমতা তাই দাঁড়ায় মাথা নোয়াইয়া!

পুরুষ দেয় অন্ন—নারী দেয় অমৃত।

এই অন্ন ও অমৃতের নিঃশেষিত থালি সম্মুখে লইয়া আজ তাহারা উভয়ে দাঁড়াইয়াছে!

অনিল নিজের দুঃখ ভুলিয়া গেল, তাহার সমস্ত মন পতি-পরিত্যক্তা আশ্রয়হীনা তাহার পার্শ্ববর্ত্তিনীর জন্য হা হা করিয়া কাঁদিয়া ফিরিতে লাগিল।

৩

মুরারী বাবু ছিলেন যদিও একজন বড় ঔপন্যাসিক, তবু ইম্‌পাল্‌স্‌ অথবা ইমোশন-এর কোনোটাকেই কাজের বেলা আমল তিনি বড় দিতেন না। অনিল মুরারী বাবুর পত্নীর প্রিয়সখীর ছেলে। ভাগ্যক্রমে দুজনে আসিয়াও পড়িয়াছিল এক জায়গায়। ইতিমধ্যে কাল বসন্ত বসন্ত কালের সহ অবতীর্ণ হইয়া সহরের অর্দ্ধেক অধিবাসীর সঙ্গে অনিলের মা বাপ জ্যেঠা ও এক পিসীকে ইহধাম হইতে অপসৃত করিয়া লইয়া গেল। ওর মা গেলেন সবার শেষে—যাওয়ার সময় সই-এর হাতে চার বছরের ছেলে এবং তার সঙ্গে এক বাণ্ডিল কাম্পানির কাগজ ও ছোট একখানা কাঠের কারবার সমর্পণ করিয়া গেলেন।

একটি ছেলের ভার ত সোজা নয়,—মুখের কথা বলিলেই ত হুস্‌ করিয়া অত বড় একটা বোঝা কাঁধে

তুলিয়া লওয়া যায় না! তবে সঙ্গে যদি তার একটা মুনাফা বাঁধা থাকে—তবে সে বাপ-মা-মরা ছেলেকে ভাসাইয়া দেওয়াও প্রাজ্ঞের কাজ হয় না। ভাবিয়া চিন্তিয়া মুরারী বাবু ছেলেটিকে গ্রহণই করিলেন।

অনিলের ওপর মুরারী বাবুর স্নেহ যে রকমই থাক, ওঁর স্ত্রীর স্নেহ ওর কোম্পানীর কাগজ ও কাঠের কারবারের দুই বাঁধা তট ছাড়াইয়া বহিল বহুদূর বিস্তৃত হইয়া। পুত্র-বঞ্চিত জননীর হৃদয়ে ক্রমে বাৎসল্যের স্বর্ণ-সিংহাসন জুড়িয়া অনিল বসিল।

সন্তান যে তাঁহার হয় নাই তাহা নয়। জন্মিয়াছে ক্রমান্বয়ে পাঁচটি মেয়ে। কন্যামাত্র-প্রসবিনী স্ত্রীর স্বামীর দারান্তরের সুব্যবস্থা শাস্ত্রকারগণ যেখানে অযাচিত ভাবে করিয়া দিয়া গিয়াছেন—সেখানে হোক্ না হাজারো একাল—মায়ের মনের কোণায় ভয়ের চমক ঘুচিত না।

পড়শীরা সান্ত্বনা দিত—ছেলে না হোক্—মেয়ে ত পাঁচটি আছে!—ভাগ্যে থাকিলে এক মেয়ে শত ছেলের কাজ করে।

তাও কি হয়?

মেয়ে পরের ধন। বিবাহ দিলে আজ বাদে কাল যাইবে পরের ঘর করিতে। ছেলে না থাকিলে শেষ বয়সে চাহিবেন-ই বা কাহার দিকে—কেই বা তাঁহাদের দিকে চাহিবে!

ছেলে অন্ধের হাতের নড়ি, ঘরের প্রদীপ, বুকের বল! বার্দ্ধক্যের তিমির-প্রদোষের ললাট উজ্জ্বল করিয়া এ সন্ধ্যাতারা তাঁহাদের জীবনাকাশে যখন উদয় হইল না—তখন তাঁহাদের জীবন-রজনী কাটিবে কিসের আলোকের নির্দ্দেশে!

ঔষধ-পত্র ছাড়িয়া গৃহিণী ঠাকুর-দেবতা সাধু-সন্ন্যাসীর সেবায় লাগিয়া গেলেন। সহরে যে-কয়টি কালীবাড়ী শিববাড়ী ষষ্ঠী সুবচনী গণেশ ইত্যাদি ছিল, সেগুলিতে মণ্ডা বাতাসা ঘীএর বাতি—মায় ছাগ-বলি পর্য্যন্ত চলিতে লাগিল।

ছেলে হইল না বটে—তবে ছেলে তিনি পাইলেন। এবং পাইলেন যে—সে কথাটা কখনও ভুলিলেন না।

ক্রমে নির্ঝরের বিবাহের সময় আসিল, মুরারী বাবু চাহিলেন নির্ঝরকে অনিলের হাতে সমর্পণ করিতে। কিন্তু মুরারী বাবুর পত্নী তাহাতে সম্মতি দিলেন না। অনিলকে তিনি পুত্র-সাধে পালন করিয়াছেন—তাহাকে জামাতৃ পদে অভিষিক্ত করিতে তাঁহার মন উঠিল না।

মায়েতে ছেলেতে থাকে প্রাণের নাড়ীর যোগ। জামাইর উপর স্নেহের টান যত বড়ই হোক,—জামাই তাহার গোত্র ভোলে না কখনো।

কর্ত্তা গৃহিণীর ভিতর বাদানুবাদ কি হইল তাহা অবশ্য অনিল জানিল না কিন্তু গোড়াকার কথাটা ভগিনীদের হাস্য-পরিহাসের স্রোতে তাহার কাছে পঁহুছিতে বিলম্ব হইল না।

ওর মনের ভিতরকার চিরন্তন পুরুষটি ঈপ্সিত নারী-লাভের অপরিসীম আনন্দে একবার বসন্তের পুষ্পিত কৃষ্ণচূড়ার মত রক্ত-শিখায় দীপ্ত হইয়া উঠিয়া ধূলায় ঝরিয়া পড়িল।

নির্ঝরের বয়স তখন বছর পনেরো—ওর বুদ্ধি ও চেতনা পুষ্পমুকুলের মত গুটি বাঁধিয়াছে—বিকশিত হয় নাই। স্বামীর ঘরে সে গেল হাসিমুখেই, বছর পরে ফিরিয়া যখন সে আসিল তখন অতল অশ্রুসাগরের তলায় যে মুখের বিম্ব সে প্রতিফলিত দেখিল,—তাহাকে সে না পারিল চূর্ণ করিয়া মিলাইয়া দিতে, না পারিল তাহাকে হৃদয়-দর্পণে তুলিয়া লইয়া তাহার শূন্য হৃদয় পূর্ণ করিতে!

বিবাগী হইয়া গৃহত্যাগ করিয়া যে চলিয়া যায়—সে কি আর ফিরিয়া আসে না! শাক্যসিংহ ত পথে ঘাটে জন্মায় না! নিরুদ্দেশের আগমন-পথে আশার দীপ সযত্নে জ্বালাইয়া ধরিয়া নির্ঝরিণী শুচিব্রতা তপস্বিনীর মত জাগিয়া বসিয়া রহিল।

তাহার পশ্চাতে অলক্ষিতে আরেক জন চরম নৈরাশ্যের পরপারে মুক্তির আলোক-আভাসের দিকে চাহিয়া জাগিয়া রহিল।

আজ এই পরম দুঃখের দিনে অনিলের একান্ত করিয়া এই কথাটাই মনে হইতেছিল, মানুষের জীবনের বিড়ম্বনার শেষই বা কোথায়, অর্থই বা কী! মাঝখানে যে

ট্র্যাজিক ফার্সটা মুহূর্তের মধ্যে ও মুহূর্তের জন্য ঘটিল তাহা না ঘটিলে এ জগতে কাহার কি ক্ষতি হইত!

ভিখারী হইয়া যে দুয়ারে দাঁড়াইয়াছিল তাহারই দুয়ারে আজ আসিল সে—যাহার স্বল্প সম্বৃত দান তাহাকে নিরন্ন করিয়া পথে পথে ঘুরাইয়াছে—কিন্তু আজ তাহাকে তাহার না আছে কিছু দিবার, না আছে তাহার নিকট হইতে কিছু লইবার!

সকাল বেলা অনিল মুখ হইতে সকল দুঃখ-দুশ্চিন্তার চিহ্ন মুছিয়া প্রশান্ত বদনে নির্ঝর ও নীরজার কাছে গেল। প্রভাতে প্রথম নয়ন মেলিয়া দুই বোন পরস্পরের কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া এই মাত্র থামিয়াছে। অনিল চকিতে উভয়ের মুখ একবার নিরীক্ষণ করিয়া লইয়া বলিল, "উঠেছো তোমরা? ভাল ভাল। মধুকে আমি বলে এসেছি দুধ ফুটিয়ে রাখ্‌তে। মেসোমশায়ের ওভালটিনটা আমিই তৈরি করে দেব এখন। মিটু সেফের চাবিটে আমায় দাও দেখি, রুটি মাখন কতটা আছে দেখি। এঁরা আবার কি খান, তা ত জানিনে—এ পর্য্যন্ত ত কাউকে দেখ্‌ছি না—ওঁদের জন্য আজকার মত না হয় কিছু খাবারই আন্‌তে বলি, আর তোমাদের জন্য—"

নির্ঝর বেদনামাখা হাস্যে বলিল, "অনুদা, এত আপ্যায়ন তুমি কর্ত্তে জান—জানতাম না। আমার কাজ আমি কত্তে পার্ব্ব, সে জন্য তোমার ভয় কর্ত্তে হবে না। মাত্র কাল এসেছেন—যাই হোক্ ভদ্রতা বলে একটা জিনিস আছে ত! আজই এড়িয়ে বসলে যা প্রকাশের অতীত তাকে করে তোলা হবে মেলোড্রামাটিক। ও আমি কখনই পছন্দ করিনে। কয়েক দিন থাক্—বাড়ীর গিন্নী বাড়ীর সব চিনে নিক্, তখন গিন্নীপণার ভার তাঁকে বুঝিয়ে দিয়ে আমি অবসর নেব।"

নীরজা অপ্রসন্ন স্বরে বলিল, "তোমার সব তাতেই বাড়াবাড়ী মেজদি। পালা সুরু না হ'তে শেষের গান তুমি গেয়ে দিলে। মা এ সংসার যখন তোমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন, তখন মায়ের ত আর ভীমরতি হয় নি! সেই ছোটটি থেকে তুমিই হয়ে রয়েছো এ সংসারের কর্ত্রী। বাবা যে পর্য্যন্ত নিজে তোমাকে ও সম্বন্ধে কিছু না বল্‌ছেন—তাবৎ কি জন্যে—অযাচিত ভাবে—সে সংসার এঁর হাতে তুলে দিতে যাবে, আমি ত তার কোনো মানে পাই নে! অতিশয় কিছুই ভাল নয় বাপু!"

নির্ঝর বলিল "এ তোদের বোঝার ভুল নীরু। মুঠোর মধ্যে যে জিনিস থাকে—তাকে স্বেচ্ছায় ত্যাগ করার ভিতর যতটা মর্য্যাদা আছে, কেড়ে নেওয়ায় আছে ঠিক ততটাই অমর্য্যাদা।"

"তুমি যা বললে তা কথাটা খুব খাঁটি, এবং তার মূল্যও যথেষ্ট, কিন্তু মেজদি সংসারের কাজ-কারবার এমন মোটা গোছের যে সব সময় খুব সূক্ষ্ম বুদ্ধি ওর সঙ্গে খাপ খায় না।"

নির্ঝর এ কথার উত্তর দেয় না চুপ করিয়া থাকে।

নীরজা অনিলকে অনুযোগ দিয়া বলে, "তোমার উচিত অনুদা, মেজদিকে কিছু বলা। ছোটর কথা বড়'র কাছে বড় হয় না কোনো দিনও। আমার কথা ত মেজদি হেসেই উড়িয়ে দেবে। হাজার হ'লেও তুমি ওর বছর তিনেকের বড়—ও তোমার কথা মানে বেশী—"

অনিল সহাস্যে বলে, "এ যুগ হোল শ্রদ্ধাহীনতার যুগ। ও জিনিসটা পাওয়ার উপর লোভ ও দাবী বেড়ে উঠেছে যত—দেবার কার্পণ্য বেড়েছে তার দ্বিগুণ। যে যুগে ছেলেমেয়ে বাপ-মাকে শ্রদ্ধা করে না—ছোট ভাই বোনকে করে না—ছাত্র গুরুকে করে না, অনভিজ্ঞ অভিজ্ঞকে করে না, কাঁচা মাথা পাকাকে করে না—সেই যুগে—মাত্র তিন বছর আগে পৃথিবীতে এসে ওর এতখানি শ্রদ্ধাভাজন যদি আমি হয়ে থাকি তবে আমার জীবন যে ধন্য হয়েছে সে বিষয়ে আমার সন্দেহ মাত্র নেই।"

নির্ঝর হাসিয়া বলে "তোমার কাছে আমার ভয় নেই, তুমি আমার ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় যে হস্তক্ষেপ কর্ব্বে না—তা আমি জানি।"

অনিল সবেগে মস্তক আন্দোলিত করিয়া উত্তর দেয় "নিশ্চয়ই না, নিশ্চয়ই না, চন্দ্র সূর্য্য যদি খসে পড়ে, হিমালয়ের চূড়া যায় ভেঙ্গে, সমুদ্র ওঠে শুখিয়ে—তবু ঐ ব্যক্তিগত অধিকার নামক জিনিষটির উপর কখনই হস্তক্ষেপ আমি কচ্ছি না।"

নীরজা হতাশ হইয়া বলে, "অনুদা, এই বুঝি হোল তোমাকে সাসিশ মানার ফল। চোরের সাক্ষী গাঁটকাটা হলে যে তুমি!"

"চোরের সাক্ষী গাঁটকাটা হলুম—বল কি নীরু! এরকম বিসদৃশ উপমানের দ্বারা—"

পিছনে পায়ের শব্দে অনিল থামিয়া গেল, নীরজা ও নির্ঝর উচ্চকিত হইয়া সম্মুখের দিকে তাকাইল।

৪

মুরারীবাবু বলিলেন, "নির্ঝর আমি বেরিয়ে যাচ্ছি, ওর সঙ্গে তোরা আলাপ কর। নীরু, দেখ্ দেখিনি আমার লাঠিটা কোথা।"

নীরু উঠিয়া লাঠি আনিয়া দিল। মুরারী বাবু মাথায় কম্ফর্টার বাঁধিতে বাঁধিতে বাহির হইয়া গেলেন।

চন্দ্রলেখা দরজার গায় ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। মুখের উপর তাহার দৃষ্টি অনুভব করিয়া মেয়েদের মাথা মাটির দিকে নীচু হইয়া যায়।

চিত্রার্পিতের মত তিনজনেই স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে।

সহসা অনিল এই অশোভনত্ব দূর করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বলে, "ওদের লজ্জায় ধরেছে, আপনিই কথাবার্তা সুরু করুন।"

অতটুকু একটা মেয়েকে প্রণাম করার কথা কাহারও মনে উদয় হয় না।

অনিলের কথায় চন্দ্রলেখা একটুখানি হাসিয়া মেয়েদের কাছে বসিয়া পড়ে।

দেখিতে সে নীরজার সমান। সুন্দরী তন্বী তরুণী। কজ্জলোজ্জল আয়ত কৃষ্ণতারক চঞ্চল নেত্র। পায়ে ভেলভেটের নাগরা, খোঁপার গোড়ায় চওড়া লাল রিবনের বো বাঁধা। মাদ্রাজীধরণে একখানি নীল রঙের মাদ্রাজী শাড়ী পরণে। বয়স যাই হোক দেখিতে ছেলেমানুষটির মত।

ওর ছোট্ট জীবনের ছোট্ট ইতিহাস। ওর বাবা চল্লিশের পরে ওর মাকে বিয়ে করেন। প্রথম পক্ষে সন্তান জন্মেই নাই। চন্দ্রলেখার পর আর একটি ছেলে রাখিয়া ওর বাবা ষাটের কাছে আসিয়া স্বর্গীয় হইলেন।

দীপের সঙ্গে দীপ-প্রভার মত তাঁহার জীবনের সঙ্গে সম্পদ সুখ গেল নির্ব্বাপিত হইয়া। কুমারী মেয়ে ও নাবালক ছেলেটিকে লইয়া ওর মা এক ভাসুরের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

বিধবা ও নাবালকের রক্ষকের ভক্ষক হইয়া উঠিতে বিশেষ দেরী লাগে না। ভাসুর বিধবা ভ্রাতৃবধূর হাতে যাহা কিছু ছিল গ্রহণ করিয়া মেয়েটিকে এক রকম করিয়া পাত্রস্থা করিয়া দিলেন।

মেধাবিনী বলিয়া চন্দ্রলেখার কোনো কালেই সুখ্যাতি ছিল না। অনেক ধাক্কা খাইয়া ও বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজার কাছে পৌঁছিয়াছিল সকলের পিছনে দাঁড়াইয়া। নিশীথ রাত্রিতে একাকিনী বসিয়া পরীক্ষার অনিশ্চিত পাঠ মুখস্থ করার ওপর ওর মনের ছিল একান্ত বিদ্বেষ—তার চেয়ে ও ঢের ভালবাসিত সঙ্গিনীদের সঙ্গে জুটিয়া গল্প করিতে ও গল্প শুনিতে। কিছু না করিয়া হাত পা মেলিয়া শুইয়া থাকাটাও ওর পক্ষে কম প্রলোভনের বস্তু ছিল না। স্বভাবটা ছিল ওর খুব কোমল, মন ছিল মমতায় মাখা, এবং অনায়াস-লব্ধ বস্তুর ওপর ওর ছিল বিশেষ পক্ষপাতিতা। মুরারী বাবুর সঙ্গে ওর জ্যেঠা যখন ওর বিবাহের সম্বন্ধ ঠিক্ করিয়া আসিলেন, তখন মা আহার নিদ্রা ছাড়িলেন, কিন্তু মেয়ের মুখে ম্লানিমা কিছুমাত্র দেখা গেল না। পিতৃহীন ও বিত্তহীন মেয়ের যে এর চেয়ে কোনো সদ্গতি হইতে পারে না মাকে অশেষরূপে বুঝাইয়া হাসিমুখেই ও স্বামীর ঘরে আসিল।

নীরজার মুখের দিকে চাহিয়া চন্দ্রলেখা বলিল, "তোমার নাম বুঝি নীরজা? তোমাদের আমার দিদি ব'লে ডাকৃতে ইচ্ছে করে—কিন্তু সম্পর্কে তা' বাধে।"

এ কথার উত্তরে নীরজা কি বলিবে তাহা ভাবিয়া না পাইয়া একটু ম্লান হাসি হাসিল।

তখন চন্দ্রলেখা অনিলের দিকে চাহিয়া হাস্যসরস কণ্ঠে কহিল, "আর সম্পর্ক হিসাবে তোমাকে আপনি বলা বিশ্রী শোনাবে,—কি বল?"

কুটিল কৃষ্ণ জলের উপর কাঞ্চন-তরণীর মত অশ্রু-সরসীর বুকে চন্দ্রলেখা হাসির যে ভঙ্গুর ভেলাটি ভাসাইল, তাহা মনোরম দেখাইল বটে কিন্তু গতি লাভ করিল না।

নির্ঝরিণীর গভীর বিষাদ-ছায়াচ্ছন্ন চক্ষের অপরিবর্ত্তনীয় দৃষ্টিতে ঠেকিয়া তাহা গেল নিশ্চল হইয়া।

অনিল সাহায্যার্থে অগ্রসর হইল, বলিল "মেসো মশায় বোধ হয় নীচে থেকেই খেয়ে গেছেন, আপনার খাওয়াটা এখানে এনে দি।"

চন্দ্রলেখা বেশ স্বচ্ছন্দ ভাবেই বলিল, "আমি এখনো মুখই ধুই নি। কটায় তোমরা ওঠো?"

"মেসোমশায় আর নির্ঝর ওঠে খুব ভোরে, তারপর নীরজা। তারপর আমি উঠি। গোটা সাতেক বাজে তখন।"

"কথাটা হচ্ছে কি জান, তোমরা সবাই যদি আর্লি রাইজার হও তবে আমার হবে মহা বিপদ। আমি বাপু কুঁড়ে মানুষ,—আটটার আগে ওঠা আমার মুস্কিল। মা বলে দিয়েছেন পরের ঘরে আমাকে ভোর ছটায় উঠ্‌তে। এখন, তোমাদের মধ্যে কেউ যদি সাতটায় ওঠে—তবে মাকে গিয়ে আমার বলার সুবিধা হবে যে আমি ঠিক্ সময়েই শয্যাত্যাগ করে যথারীতি আমার কর্ত্তব্য পালন কর্চ্ছি।"

অনিল ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল, "আপনার অভ্যস্ত সময়েই আপনি উঠ্‌বেন।"

"সকালে কি খাও তোমরা?"

এবার নীরজা বলিল, "চা, রুটি মোহনভোগ, কখনও বিস্কুট।"

"চা খাও তোমরা? মিছিমিছি ওরা আমায় কি ভয়টা ধরিয়ে দিয়েছিল! কেউ বলে নুন লঙ্কা দিয়ে পান্তাভাত খাব, কেউ বলে চাল চিবিয়ে জল খাব—কেউ বলে মটর কড়াই খাব—কথার চোটে ঘাবড়ে গিয়েছিলুম একেবারে! আমারও ভাই, চা নইলে একদিন চলে না!"

নির্ঝর উঠিয়া বলিল, "আমি যাই নীচে, তোমাদের খাবারটা সব ঠিক্ করি গিয়ে।"

"আমায়ও নিয়ে চল ভাই, স্নানের ঘরটা কোন্ দিকে একটু দেখিয়ে দেবে।"

চন্দ্রলেখাকে লইয়া নির্ঝর নীচে নামিয়া গেল।

নীরজা অনিলের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল "এ রকম কিন্তু আমরা কল্পনায়ও কখনও আনতে পারিনি। কি দাঁড়াবে শেষটা অনুদা?"

উদ্গত অশ্রু গোপন করিয়া অনিল বলিল, "না হয় নেই, খারাপ হবে বলে মনে ত হচ্ছে না।"

"ভগবান জানেন" বলিয়া নীরজা চোখ মুছিল।

বাবু একজন খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক। সাহিত্যাকাশে সমুদিত এক জ্যোতির্ম্ময় ভাস্কর। সমালোচকের দল কেউ বলেন যুগ-সারথি কেউ বলেন অতি-মানব।

সময়টাও ছিল কিছু ক্রিটিকাল। বঙ্কিমচন্দ্রের বিশুদ্ধ ভাব-তরঙ্গে সিঞ্চিত হইয়া যে সাহিত্য-ক্ষেত্র ঘনশ্যামলিমায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, বিংশ শতাব্দীর রিয়্যালিজ্‌মের উত্তাপে তাহা তপ্ত বালুতটে পরিণত হইল। নূতনের অভিযান-পতাকা উড়াইয়া খাত খনন করিয়া তরুণের দল যাহা সৃষ্টি করিল, তাহাতে পঙ্কজ ফুটিল কচিৎ, কিন্তু পঙ্কের রহিল না অবধি।

কুলনাশী মুষল লইয়া আনন্দোৎসব-প্রমত্ত যদুবংশধরগণের মধ্যে সহসা আবির্ভূত রুদ্রতপা দুর্ব্বাসার মতন উদয় হইলেন মুরারী বাবু।

ভাষা তাঁহার ওজস্বী, ব্যঞ্জনা বিশুদ্ধ, আদর্শ অভ্রস্পর্শী।

রিয়ালিজমের ঢক্কানিনাদের মোটা আওয়াজ ভেদ করিয়া বাজিল সুরসারঙ্গের মধুর নিক্কণ।

অসংযম ও অসুন্দরের অশিব যজ্ঞে বাজিয়া উঠিল শিব-সুন্দরের পাঞ্চজন্য।

মুরারী বাবু যে শুধু ঔপন্যাসিক ছিলেন, তাহা নয়, সমালোচকও ছিলেন তিনি খুব বড়। তাঁহার নূতন গ্রন্থ 'ডম্বরু' ডম্বরুর মতই সাহিত্যের নিরঙ্কুশ আসরে ধ্বনি জাগাইয়াছে।

যন্ত্রস্থ 'মেঘমন্দ্রে'র প্রুফশীট টেবিলের উপর মেলিয়া সকাল বেলা মুরারী বাবু সংশোধনে নিমগ্ন, এমন সময় নির্ঝরিণী ঘরে আসিল।

চন্দ্রলেখা আসার পরে সে আর এ ঘরে আসে নাই। মনের ভিতর তাহার প্রচ্ছন্ন প্রতপ্ত অভিমান জলদঙ্গারের মত জ্বলিতে থাকে, থাকিয়া থাকিয়া চক্ষু ওঠে বাষ্পাকুল হইয়া; নিদ্রাহীন বেদনা-কণ্টকিত রাত্রি চোখের কোলে

গভীর কালিমার আত্মপ্রকাশ করে, কিন্তু বনবিহঙ্গমের মত ওর অতীত আততায়ী অনাগতকে চঞ্চু আঘাত করিতে থাকে।

তাহার বোনেরা—যাহারা স্বামীর ঘরে গিয়াছে অথবা যাইবে—এ বাড়ীর বিষাদময় স্মৃতি তাহারা যাইবে পিছনে ফেলিয়া; অন্ধকার জলতলে বিবরবাসী তিমিঙ্গিলের মতন সেই অপরিসীম বেদনার মাঝখানে নীড় বাঁধিয়া তাহার দিন কাটাইতে হইবে!

মুরারী বাবু লিখিতে লিখিতে মাথা উঠাইয়া বলিলেন, "কি রে নিরি, কি চাস্?"

নির্ঝরিণী আগাইয়া আসিয়া মুঠা হইতে ভাঁড়ার সিন্দুক আলমারী ট্রাঙ্কের চাবির গোছা টেবিলের উপর রাখিয়া বলিল, "কিছু চাই নে—এই চাবিগুলো দিতে এসেছি।"

মুরারী বাবু হাতের কলম রাখিয়া মেয়ের মুখের দিকে চাহিলেন।

নির্ঝরিণী চোখের পাতা নীচু করিল।

মুরারী বাবু বিস্ময়ভরা কণ্ঠে কহিলেন, "কিসের চাবি?"

"এত দিন যে সব চাবি আমার কাছে ছিল।"

"আমার চাবির কি দরকার? তোর কাছে থাক্।"

নির্ঝরিণীর কণ্ঠে কথা আটকাইয়া গেল, যাহা সে বলিতে চাহিয়াছিল ও বলিতে আসিয়াছিল তাহা ছন্নাকার হইয়া গেল, আম্‌তা আম্‌তা করিয়া সে বলিল, "যদি অসুবিধা হয় কিছু আমার কাছে থাক্‌লে—তাই দিতে এসেছিলাম।"

মুরারী বাবু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, "নতুন লোক বাড়ীতে এসেছে বলে বাড়ীর ব্যবস্থা নতুন কিছুই হ'বে না। যে পিছনে এসেছে—সে পিছনেই থাক্‌বে। যা—চাবি নিয়ে যা, ও সব এক্সেন্ট্রিক পানা করিস্ নে।"

নির্ঝরিণী নিঃশব্দে চাবির গোছা তুলিয়া লইয়া বাহির হইয়া আসিল।

ঘরের বাহিরে খানিকটা খোলা ছাদ, এক কোণে তাহার গোটা কয়েক দীর্ঘশির নারিকেল ছায়া মেলিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, নির্ঝরিণী সেই কোণটিতে আসিয়া দেওয়ালে মাথা রাখিয়া দাঁড়াইল, এতক্ষণ ধরিয়া যে কান্নাটাকে সে বুকের ভিতর ঠেলিয়া ঠেলিয়া রাখিতেছিল, তাহা এতক্ষণে ছাড়া পাইয়া উপচিয়া উঠিল।

ঘরের ভিতর নির্ঝরিণী যেমন সর্ব্বময়ী, বাহিরে ছিল তেমনি অনিল। সকল কাজের কাজী সে, ডাক পড়ে তাহার সব দিকে সব খানে। তারি ভিতর দৃষ্টি তাহার সজাগ থাকে পার্শ্বচারিণী নির্ঝরিণীর উপর—যে হয়ত সর্ব্ব সুখের অধিশ্বরী হইতে পারিত, কিন্তু যে হইয়া রহিয়াছে সর্ব্বসুখ-বঞ্চিতা। ওর মমতার নদী কাঁদিয়া কুলু কুলু করিয়া বহিতে থাকে উহারই দিকে। বিহঙ্গমাতার মত সে রাখে তাহাকে পক্ষপুটে আবৃত করিয়া—ওর অসুবিধা ক্লেশ উদ্বেগের সম্ভাবনা যেখানে, সেখানে সে পড়ে ঝাঁপাইয়া।

চন্দ্রলেখা আসিবার পর হইতে অনিলের চক্ষু ফিরিতেছিল, তাহারই পিছনে। আকাশ যেমন বিস্তৃত নদীপ্রবাহকে বেষ্টন করিয়া থাকে, তেমনি করিয়া সে তাহাকে চারিদিক দিয়া বেষ্টন করিয়া থাকে। কাঁদিবার নিভৃত অবকাশ নির্ঝর পায় না, অনিল ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া আসিয়া একটা না একটা কাজে তাহাকে ডাকিয়া লয়, একটা না একটা কথা পাড়িয়া বসে।

নির্ঝরকে চাবির গোছা হাতে লইয়া তেতালায় যাইতে দেখিয়া অনিল ব্যাপারটা বুঝিয়া লইয়াছিল। আসল প্রয়োজনটা প্রচ্ছন্ন রাখিয়া অপর একটা প্রয়োজন আবিষ্কার করিয়া লওয়ার জন্য সে এঘরে ওঘরে ঘুরিতে লাগিল।

কয়েকখানা চিঠি হাতে করিয়া নীরজা উপরে উঠিতেছিল, অনিল ডাকিল, "নীরু, চিঠি কার?"

নীরজা এক ধাপ নামিয়া বলিল, "একখানা দিদির, একখানা বাবার—আর দুখানা তোমার।"

"দুখানাই আমার, তবু আমায় বাদ দিয়ে তুমি সরাসর ওপরে উঠে যাচ্ছ? খুব মেয়ে ত তুমি!"

"আপনি যে এখানে তা আমি জানতুম না মশাই, আমি ভেবেছি আপনি আপনার ঘরে!"

"এও ত তোমার ভারী অন্যায় বাপু! আমার হচ্ছে এখন পূর্ণ স্বাধীনতার যুগ—কলেজের ঘানিটানা শেষ হয়েছে, অথচ চাকুরীর জোয়াল এখনও কাঁধে ওঠে নি। এহেন

অবস্থায় সকাল বেলা ঘরের ভিতর বসে আমি কি কর্চ্ছি তোমার মনে হয়েছিল ?"

"উনুনে ঘুঁটে যখন পোড়ে, তখন দেয়ালের গোবর যা ভাবনা করে তাই ভাব্‌ছ ঘরে বসে—এই. আমি ধরে নিয়েছি ! চাকুরী হচ্ছে তোমাদের পরমপদ, সুতরাং মাঝে মাঝে তার ধ্যানে মগ্ন হওয়াটা এমন অস্বাভাবিকই বা কি ?"

"কিছু নয় কিছু নয়। ঠিক ধরেছ তুমি। চাকুরী এমন পরমপদ, যে তার কাছে সব পদই গোষ্পদ। তোমার সূক্ষ্ম-দৃষ্টিকে আমি বহুতর ধন্যবাদ দিচ্ছি। এখন দাও দেখি আমার চিঠি দুখানা।"

নীরজা অনিলের নাম লেখা চিঠি দুখানা তাহার হাতে দিল।

অনিল বলিল, "মেসোমশায়ের চিঠিখানাও আমায় দিতে পার। উনি ত তেতালার ঘরে—তুমি আর কষ্ট করে অতটা যাবে কেন, আমিই দিয়ে আস্‌ছি !"

নীরজা খুসী হইয়া চিঠিখানা অনিলের হাতে দিয়া তাহার পিঠ চাপড়াইয়া বলিল "কি লক্ষ্মী ছেলে তুমি অনুদা—তুমি যেখানে থাক, সেখানে লোকের রাম-রাজত্বে বাস !"

অনিল চিঠি লইয়া উপরে উঠিতে উঠিতে বলিল, "তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি যা-হোক্ কিছু আছে তবু। আমি যে কি রকম একটা লোক, তা তোমরা যদি মাঝে মাঝে আমায় না শোনাও, তবে হয় ত একদিন আমি নিজের স্বরূপ ভুলে যাব, তখন তোমরা হয় ত আবার রাম-রাজত্বের সুকৃতি ছাড়িয়ে রাবণ-রাজত্বের দুর্ভোগে পড়্‌তে পার !"

অনিল তিন লাফে সিঁড়ি পার হইয়া মুরারী বাবুর কাছে গিয়া চিঠি দিল। পথে ছাদের কোণে প্রাচীরের উপর মাথা রাখিয়া ক্রন্দনরত নির্ঝরিণীকে দেখিয়াও সে না দেখার ভাণ করিয়া গেল।

নির্ঝরিণী একান্তে যাহা গোপন করিতে চাহে, তাহার নিগূঢ়তার উপর অনিলের ছিল অক্ষয় শ্রদ্ধা। তার মনের কছে ঐ বালিকা ঝলমল করিত পুষ্পদলে প্রভাতের সুনির্ম্মল শিশির বিন্দুর মত—দূর হইতে সে তাহাকে মুগ্ধ নয়নে দেখিত—কিন্তু স্পর্শ করিবার স্পর্দ্ধা রাখিত না।

মুরারীবাবুর ঘর হইতে চটি ফট্ ফট্ করিতে করিতে বাহির হইয়া অনিল ছাদে আসিল, এবং নির্ঝরকে সহসাই যেন দেখিয়া ফেলিয়াছে এরূপ ভাবে বলিল, "কত ডাব ধর্‌বে তাই দেখ ছ বুঝি! ঐ যে ফুলের ছড়া দেখছ—ওর পোনেরো আনাই যাবে ঝরে—অসংখ্য ফুলের ভিতর টি কে থাক্‌বে কোনো রকমে গুটি কয়েক নিতান্ত নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ফল—তাও হয় ত অকালে ভূমিসাৎ হবে।"

বেদনা দিবে বলিয়া অনিল নিজের মনের বেদনা নির্ঝরিণীর কাছে উদ্ঘাটিত করিতে যেমন চাহিত না, নিশ্চিহ্ন করিয়া নয়নান্তরালে তাহা গোপন করিয়াও রাখিতে পারিত না।

প্রাণের তারে গান্ধারে যাহার দুঃখের মীড় বাজে, নিখাদে চপল রাগিণীর মূর্চ্ছনা যে তাহার সঙ্গে মিশে না—অনিলের অবচেতন মনে তাহার অস্পষ্ট একটা আভাস জাগিত, এবং তাহা ফাল্গুনের নিঃশ্বাসে মুঞ্জরিত ফুলবনের মত ওর সমস্ত মনকে তুলিত অতিচেতন করিয়া। অস্তরবির রাগরঞ্জিত ধরণীর মত ওর মন তারি বর্ণে বর্ণ লাভ করিত। নির্ঝর এতক্ষণে নিজেকে সামলাইয়া লইয়াছে, অনিলের কথায় সে বলিল "যার কোনো সার্থকতা নেই, তার সৃষ্টিই বা কেন ? এই নিরর্থক নষ্ট হওয়ার মধ্যে ক্ষতির যে দুঃখ আছে—"

অনিল হাসিয়া বলিল, "তা তোমার আমার মনকে যতটা পীড়িত করুক না কেন, তোমায় আমায় যিনি সৃষ্টি কোরেছেন, তাঁকে পীড়া দেয় খুব কমই। যার অল্প থাকে, ক্ষতির হিসাব থাকে তারি বেশী, যার অজস্র থাকে, ক্ষতি সম্বন্ধে সচেতন সে খুব কমই। জগৎ জুড়ে এক বিরাট্ দেবের অনন্ত ঐশ্বর্য্যের লীলা চলেছে—ভাঙেন তিনি গড়ার জন্য, গড়েন ভাঙার জন্য।"

নির্ঝর কিছু না বলিয়া সিঁড়ি দিয়া নামিতে লাগিল, অনিল তাহার পিছনে নামিতে নামিতে বলিল, "চাবির গোছাটা বুঝি মেসোমশায়কে দিতে গিয়েছিলে, তিনি বুঝি নিলেন না ?

"না।"

"স্বাধিকার রক্ষার বেলায় উদারনীতি একটুখানি ছেঁটে নেওয়া স্বাভাবিক ও বিধিসঙ্গত। যদি তা না করা যায়, তা

হ'লে এই জগৎ-যন্ত্রটার সব জয়েন্ট গুলো আল্‌গা হয়ে পড়্‌বার ভীষণ যে একটা দুঃশঙ্কা আছে—তা আমি নিঃসংশয়ে বলতে পারি। নিজের জায়গা সহজে কাউকে ছেড়ে দিতে নেই। ব্যাপারটা কি বুঝ্‌তে না পেরে মেসোমশাই যদি এই চাবি সম্বন্ধে কিছু উচ্চ-বাচ্য না কর্‌তেন, তবে, আখেরে এর ফলটা কারুর পক্ষেই বড় ভাল হোত না। নিজের সুবিধার কথা তুমি না-ই ভাব যদি আমাদের সুবিধার কথা ত একবার ভাব্‌বে? এ সংসার থেকে তুমি যেদিন আল্‌গা হ'বে,—সেদিন অনেক কেউ এবং অনেক কিছুই আল্‌গা হয়ে যাবে। সুতরাং তোমার কাছে আমার এই মিনতি যে মহৎ কর্ম্মের অনুপ্রেরণায় আমাদের একেবারে ভুলে বোসো না। হিরোইজ্‌ম্‌ জিনিসটা খুব বড় সন্দেহ নেই, কিন্তু তাকেও স্থান কাল পাত্র ছাড়িয়ে যেতে দিতে নেই।"

নীঝর সিঁড়ির নীচের ধাপে নামিয়া বলিল, "হোল তোমার বক্তৃতা শেষ অন্নদা?"

"যার আরম্ভ আছে—তার শেষও যখন আছে,—তখন আমার বক্তৃতাও যে শেষ হবে তার সন্দেহ কি!"

তাহাদের কণ্ঠস্বর শুনিয়া চন্দ্রলেখা পাশের ঘর হইতে বাহির হইয়া বলিল, "কোথায় ছিলে তুমি, ওপরে? ওদিকে ঠাকুর চেঁচাচ্ছে কি রান্না চড়াবে, নরেশ বল্‌ছে বাজারের বেলা হয়ে গেল,—কয়লাওয়ালা দামের জন্য দাঁড়িয়ে রয়েছে—ঘুর্ণী থেকে মিস্তিরী এসে হাঁকাহাঁকি কর্চ্ছে—আমি বেচারী পড়ে গেছি মহা ফাঁপরে।"

শুনিয়া নির্ঝর ত্বরান্বিত হইয়া রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল. অনিল বলিল, "এসব আপনারই ত এখন দেখা উচিত।"

চন্দ্রলেখা একটুখানি হাসিয়া বলিল, "তোমার বুঝি ধারণা যে মানুষ উচিত কাজের জন্যই পৃথিবীতে জন্মেছে। এবং সে পুণ্যব্রত উদ্‌যাপনের জন্যই উদগ্রমনা হয়ে বসে আছে?"

চন্দ্রলেখার দীপ্ত মুখের দিকে চাহিয়া অনিলের মনে হইল অতর্কিতে সে ঢিল ছুঁড়িয়াছে অতল জলের বুকে—অনেক খানি আবর্ত্ত সৃষ্টি করিয়া।

ইহার জন্য সে প্রস্তুতও ছিল না—সুতরাং হঠাৎ একটা উত্তরও তাহার জোগাইল না।

চন্দ্রলেখা বলিল, "অবাক করে দিলুম তোমায়? ছেলে-মানুষ তুমি কি-ই বা জানো! আমি কিন্তু এ দেখে আস্‌চি যে উচিতের চেয়ে অনুচিতই মানুষের মনকে টানে বেশী।"

ওর মনের তলাকার প্রচ্ছন্ন কথাটা জানিতে কুতূহলী হইয়া অনিল বলিল "দু একটা উদাহরণ দিন্‌ না!"

"দেব"?

হাসির ভিতর দিয়া ওর বুকের ভিতরকার জমাট অশ্রু-সাগর, শরতের শুভ্র দীপ্ত মেঘমালার অন্তরে গহন নীল আকাশের মত ওর আয়ত কৃষ্ণতারক নেত্রে ক্ষণিকের মত বিম্বিত হইয়া উঠে।

অনিলের চোখের উপর হইতে একটা পর্দ্দা সরিয়া যায়, বিস্মিত স্তব্ধ দৃষ্টিতে চন্দ্রলেখার দিকে চাহিয়া থাকে। মুখের মুখোস খসিয়া পড়িয়া যেন তাহার নৈরাশ্য-পীড়িত জীবনের দগ্ধ ছবি উন্মুক্ত চিত্র-পটের মত অনিলের চোখের কাছে ভাসিয়া ওঠে।

চন্দ্রলেখার বুকে ঝলকিয়া উঠে, তড়িল্লেখার মত নিগূঢ় পরিতাপের বহ্নিরেখা—দয়িত হইয়া যে পাশে দাঁড়াইতে পারিত. সে দাঁড়াইল পুত্রস্থানীয় হইয়া, আর বাপের বয়সী যে পুরুষ জীবনের প্রদোষ-বেলায় পঁহুছিয়াছে সে দাঁড়াইল স্বামীর আসন অধিকার করিয়া!

পিছন হইতে ঘরে ঢুকিলেন মুরারী বাবু।

কুসুমে যে বিষধর কীট প্রচ্ছন্ন ছিল, সহসা তাহা মুখ বাহির করিয়া মুরারী বাবুর বুকের পাঁজরে হুল ফুটাইয়া দিল।

বাক্‌স্ফূর্তি হইল না কাহারও,—তবু মনের কথা অগোচর রহিলনা কাহারও।

অপ্রস্তুত অনিল ব্যস্ত হইয়া বলে, "মেসোমশায় ঘূর্ণির মিস্তিরি ত এসেছে, কারখানায় কি আমি যাব এখন?"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া মুরারী বাবু বলেন "যাও"। অনিল তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া যায়।

অন্ধকার মুখে মুরারী বাবু চন্দ্রলেখাকে জিজ্ঞাসা করেন, "কি কথা হচ্ছিল ওর সঙ্গে?"

"ও বল্‌ছিল সংসার আমার দেখা উচিত, আমি বল্‌ছিলুম আমার তা দরকারও করে না, আমি তা পারিও না।"

"এই শুধু"?

"এ ছাড়া আর কি?—ওর কাছে কি আর বল্‌বই বা!" বলিয়া চন্দ্রলেখা উপরে নীরজার কাছে চলিয়া যায়।

মুরারী বাবু রোষ-কুটিল কটাক্ষে তাহার গতিপথের দিকে চাহিয়া থাকেন!

(ক্রমশঃ)

শ্রীআমোদিনী ঘোষ

লেখাপড়া

শ্রীযুক্ত রাইমোহন সামন্ত এম্‌-এ

আমরা অতি ছোটবেলা হইতে শুনিয়া আসিতেছি,—'লেখাপড়া করে যেই, গাড়ী ঘোড়া চড়ে সেই'। এই মিথ্যা আদর্শের পিছু ছুটিয়া কেমন করিয়া আমাদের দেশের জীবনীশক্তি দিন দিন নষ্ট হইতে চলিয়াছে,—সে কথা আমি এখানে আর তুলিব না। লেখাপড়াই জীবনের উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য-সিদ্ধির সহায়কমাত্র, একথা ভুলিয়া গিয়া, সমগ্র জীবনকে দূরে ঠেলিয়া, সমস্ত আনন্দকে অস্বীকার করিয়া মধ্যযুগের গুহাবাসী সন্ন্যাসীদের মত বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট কয়েকখানি পুস্তকের মধ্যে কেমন করিয়া সমস্ত উৎসাহ, উদ্দীপনা আমরা নিঃশেষে ঢালিয়া দিয়াছি ও দিতেছি, সে কথা বহুজনে বহুবার বলিয়াছেন। অবশ্য ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে কেহই এ পর্য্যন্ত "কঃ পন্থার" এমন কোন সুষ্ঠু সন্ধান দেন নাই যাহার কোন বাস্তবিক মূল্য আছে অথবা যাহা বেশ যুক্তিযুক্ত। তথাকথিত সমাজ সংস্কারকদিগকে যুবকগণ বেশ জোর করিয়াই বলিতে পারে—"নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়—আমাদের অন্যপথ কই"?

আমি এ প্রবন্ধে, প্রচলিত ছড়াটিকে একটু অন্যদিক দিয়া দেখিয়া আমাদের জাতিগত একটা বিশিষ্টতার আভাষ দিব। শিক্ষা বলিতে অতিপূর্ব্ব কালেও লোকে পড়ার সহিত লেখার নিবিড় সংযোগ মানিত। ইংরাজিতে তিন আর (Reading, 'Riting, 'Rithmetic) শিক্ষার গোড়াপত্তন। অবশ্য পূর্ব্বকালের লেখার ধারণা একটু অন্যরূপ ছিল, লেখা বলিতে তখন হাতের লেখা অর্থাৎ লেখার অনুকরণ বুঝাইত। হাতের লেখা যাহার ভাল হইত শীঘ্র তাহার চাকুরি মিলিত,—তাই লেখার তখন এত কদর ছিল। মুদ্রাযন্ত্রের পূর্ব্বে পুস্তকাদি হাতে লিখিয়া প্রচারিত হইত এবং পুস্তক লিখিবার জন্য দস্তুরমত একটা class ছিল। মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কারের পর হইতে লেখার আদর অনেকটা কমিয়া আসিয়াছিল,—তারপর "টাইপরাইটার" আবিষ্কৃত হইয়া লেখার আদর একেবারেই চলিয়া গিয়াছে। সদাগরি আফিসে হাতের লেখা দেখাইয়া চাকুরি মিলিবার সম্ভাবনা এক্ষণে অল্প। এখন সকলে চান টাইপরাইটারের স্পীড। সর্টহ্যাণ্ড জানা থাকিলে আরও ভাল, সত্যই জগৎ পরিবর্ত্তনশীল।..

লেখার আদর গিয়াছে অথচ আমরা এখনও পুরাতন ছড়াটির ব্যবহার করিয়া থাকি। সুতরাং ইহার কালোপযোগী নূতন অর্থ দেওয়া উচিত। "লেখা" অর্থে এক্ষণে আমরা রচনাই বুঝিয়া থাকি। অমুক মাসিকে অমুকের বেশ একটা লেখা বাহির হইয়াছে বলিতে আমরা স্পষ্টই রচনার কথাই ভাবি। লোকটা বেশ লিখিয়ে বলিতেও ঐ-অর্থেই বুঝি। সুতরাং দেখিতেছি পূর্ব্বে লেখা বলিতে বুঝিতাম অক্ষরগুলির গঠন, পুঁক্তির সমাবেশ;—লেখা ছিল তখন চিত্রবিদ্যার পর্য্যায়ভুক্ত (অবশ্য ভাবশূন্য)। এখন লেখা বলিতে বুঝি সৃষ্টি,—অক্ষর এখন আর তাহার গঠনের জন্য সুন্দর নয়,—শব্দের প্রতীক বলিয়া প্রয়োজনীয়। আবার সেই অক্ষর লইয়া বাক্য, যাহা ভাবের প্রতীক। সেই শব্দের যথাযথ যোজনা দ্বারা লেখক ভাবের প্রকাশ করেন। এক্ষণে লেখা বলিতে বুঝি সেই দৃশ্যমান লেখার অন্তরালের অশরীরী ভাবটি।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে লেখার এই অধুনাতন অর্থ লইয়া আমাদের আজকালের শিক্ষার বিচার করিব। আমার প্রথম জিজ্ঞাস্য আমরা কি সত্যই এই নূতন অর্থে লেখা-পড়া করি? পড়ি সকলেই কিন্তু লিখি কয়জনা! প্রত্যেক বাঙালীকে যেন কেহ কাণে কাণে বলিয়া গিয়াছে 'শতং পঠ মা লিখ'। আমরা স্কুলের নিম্নতম ক্লাশ হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষার মধ্যে পাঠ্য-অপাঠ্য কত কিছুই না পড়ি, কিন্তু তাহার তুলনায় লিখি কতটুকু? সম্পাদক-বন্ধু হয়ত

বলিবেন, 'আপনি জানেন না, বাঙালীরা সবাই লেখে, অন্ততঃ কবিতা'। আমি কিন্তু তা' বিশ্বাস করিনা, যৌবনের উদ্দাম চাঞ্চল্যে একটা হঠাৎ খেয়ালের ঝোঁকে দশলাইন অর্থ-শূন্য কবিতা হয়ত দুদশজনা লেখেন, কিন্তু একটা চিন্তাকে বেশ ভাবিয়া গদ্যে বা পদ্যে তাহাকে একটা বিশিষ্ট রূপ দিবার চেষ্টা কয়জনা করেন? আমি নিজের কথা বলিতে পারি, পরীক্ষা-হলের প্রবন্ধগুলিছাড়া কখনও কিছু স্বেচ্ছায় লিখিতে বসিয়াছি বলিয়াত মনে হয় না। এবং আমি যে বাঙালী ছাত্রমণ্ডলীর মাত্র একটি ব্যতিরেক, এ কথা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি।

যাঁহারা কেবল পাশ করিবার জন্য পড়েন,—কোনরকমে নামের শেষে ডিগ্রীটা বসাইতে পারিলেই পাঠ সার্থক মনে করেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট পুস্তক কয়খানি ছাড়া আর কোন কিছু পড়িবার আবশ্যকতা আছে, যাঁহারা একথা বিশ্বাস করেন না—আবার সেই নির্দিষ্ট পুস্তকগুলিও পড়িবার যাঁহারা অবকাশ পান না, নোট-তরী বাহিয়াই যাঁহারা ডিগ্রী-সমুদ্র পার হইয়া আসিয়াছেন, আমি তাঁহাদের কথা বলিতেছি না,—কারণ তাঁহারা পড়েনও না লেখেনও না। কিন্তু যাঁহারা সত্যকার পাঠক,—যাঁহারা পাঠে প্রকৃত আনন্দ পান,—একটা সুন্দর ভাবের সুষ্ঠু প্রকাশ যাঁহাদের সৌন্দর্য্য-পিপাসু আত্মায় একটা মনোরম সজাগতা দেয়, একটি ছোট্ট গীতি-কবিতা যাঁহাদের আনন্দে অধীর করিয়া তুলে,—আমি তাঁহাদের কথাই বলিতেছি। পাঠের আনন্দ তাঁহাদিগকে ভুলাইয়া লইয়া আস্তে আস্তে একেবারে হজম করিয়া ফেলে, পরের চিন্তা তাঁহাদিগকে নাড়া দেয় বটে, কিন্তু সচল করে না, পরের সৃষ্টি তাঁহাদিগকে টানিয়া লয়, ছাড়িয়া দিয়া নূতনতর সৃষ্টিতে প্রলুব্ধ করে না। ফলে শতকরা পচানব্বই জন বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতবিদ্য ছাত্রই সমস্ত জীবন পরের চিন্তারাশি বহিয়া জীবন কাটাইয়া দেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমাদের বাঙালী প্রোফেসরদের ধরা যাইতে পারে। নিজ নিজ বিভাগে তাঁহারা অনেকেই কৃতবিদ্য ধুরন্ধর, কিন্তু তাঁহাদের শিক্ষার গভীরতা জানিতে হইলে তাঁহাদের মুখে তাঁহাদের পঠিত পুস্তকের তালিকা আদায় করিতে হইবে। সারাটা জীবন তাঁহারা পরের চিন্তার বোঝা বহিয়াই কাটাইয়া দেন, আপনার মধ্যে কিছু ছিল কি না—তাহা একবার হাতড়াইয়া দেখিবার অবকাশও তাঁহাদের হয় না।

ইংরাজিতে একটা কথা আছে অতিরিক্ত পাঠ শরীরের ক্লান্তিস্বরূপ। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতবিদ্য ছাত্রদের অধিকাংশকেই এই রোগে ধরে। শিক্ষার অর্থ নিজের বৈশিষ্ট্যের বিকাশ, চারিত্রিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক। চরিত্র আধ্যাত্মিকতা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম,—মানসিক বিকাশও আমাদের হয় কই! অনেকে জ্ঞানকে আলোকের সহিত তুলনা করেন,—আমরা সে জ্ঞানকে ফিরাইয়া দিই বটে, কিন্তু যেমনটি পাইলাম ঠিক সেইরূপ ভাবেই। সে আলোকে নিজস্ব একটা ছাপ দিই কই? সূর্য্যের আলোক সমস্ত জগতে পড়ে, কিন্তু সকলেই কি একই ভাবে উহা প্রত্যর্পণ করে? শিশির-ভেজা কচি পাতার উপর, দিগন্তবিস্তৃত তুষারস্তূপের উপর, ফেনস্কন্ধ উত্তাল উর্ম্মিরাজির উপর, চপলা নুড়িমুখরা পার্ব্বত্য পাগলাঝোরার উপর, সূর্য্যকিরণের খেলা যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয় একথা বলিবেন না। কিন্তু বাঙ্গালী পাঠকের মধ্যে জ্ঞানালোক বিকীরণ করিবার যাঁহারা সুযোগ ও সুবিধা পান, তাঁহার কেবলমাত্র বিস্মিত ছাত্রদের সম্মুখে অগণিত পুস্তকের ভারি ভারি নাম করিয়া তাহাদিগকে অবাক করিয়া দিয়াই ক্ষান্ত হন। আর যাঁহাদের ভাগ্যে সে সুযোগও না ঘটে, প্রোফেসরের চেয়ারে বসিবার সৌভাগ্য যাঁহাদের না ঘটে তাঁহারা জ্ঞানের আলোক একেবারে বেমালুম হজম করিয়া লন। কিন্তু জিজ্ঞাস্য, কষ্ট করিয়া এই ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে পরের চিন্তা এমন সযত্নে প্যাক করিয়া রাখায় কৃতিত্ব কিছু থাকিলেও, সত্যকার কোন আবশ্যক ইহার আছে কি,—বিশেষ বিংশ শতাব্দীর এই সভ্যতার দিনে যখন অতি অল্পমূল্যে জগতের যে কোন চিন্তার অধিকারী হইতে পারা যায়।

বহু পূর্ব্বে ইংরাজ লেখক ফ্রান্সিস বেকন বলিয়াছিলেন, লেখাই মানুষকে সম্পূর্ণ করে। অনেক কিছু জিনিষই আমরা পড়ি কিন্তু যতক্ষণ না আমরা সে সকল বিষয় একবার নিজের মধ্যে ভাবিয়া লিখিতে যাইব ততক্ষণ তাহারা কিছুতেই আমাদের হইতে চাহিবে না। লিখিতে বসিলে তবে অনেক ঘোলাটে অস্পষ্ট ধারণা পরিস্ফুট হয়, বিক্ষিপ্ত

চিন্তার মধ্যে ক্রমে ক্রমে একটা পর্য্যায়, একটা গোছাল ভাব আসে। লেখায় মানুষের চিন্তা করিবার ক্ষমতা বাড়ায়, স্মরণশক্তির অনাবশ্যক বোঝা কমাইয়া তাহার প্রখরতা দেয়। লেখার প্রধান উপকার এই যে ইহা নিজের উপর বিশ্বাস আনে। আমাদের অধিকাংশের মধ্যেই নিজের চিন্তাশক্তির উপর বিশ্বাস অল্প, নিজের মতামতের যেন কোনই মূল্য নাই। একটা কোন কিছু প্রতিপন্ন করিবার জন্য সময়ে অসময়ে খ্যাত অখ্যাত কত লোকেরই নাম আমাদের লইতে হয়, আপনার নিরবলম্ব বিচারশক্তির উপর দাঁড়াইবার আমাদের ভরসা নাই। লেখা জিনিষটা আমাদের অধিকাংশের কাছেই অজানা বলিয়া আমরা লেখার মূল্যও দিই অত্যধিক। আমরা নিজেরা লিখি না তাই মনে করি যাঁহারা লেখেন, তাঁহারা না জানি কি! কাজেই ছাপার অক্ষরে যাহা দেখা দেয় তাহার আর যেন অন্যথা নাই। কোন লেখাকে নিজের বুদ্ধি দ্বারা বিচার করিতে আমাদের ভরসা হয় না। শিক্ষার উদ্দেশ্য চিন্তাশক্তিকে স্বাধীনতা দেওয়া, কিন্তু আজকালের শিক্ষায় আমরা সমুদয় চিন্তাশক্তির স্বাধীনতাকে বিসর্জ্জন দিয়া আসি। দাসমনোভাবের বোধ হয় ইহাই প্রথম ও শেষ স্তর।

লেখা ও পড়া,—একে অপরের সম্পূরক হইলেই প্রকৃত শিক্ষা হইল বলা যায়। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে কদাচিত এ দুয়ের সামঞ্জস্য দেখা যায়। ইহাদের মধ্যেও যেন লক্ষ্মীসরস্বতীর বিবাদ,—জগতে যাঁহারা সত্যকার কিছু দিয়া গিয়াছেন, কি সাহিত্যে কি বিজ্ঞানে, কি দর্শনে,—তাঁহাদের অধিকাংশই খুব বেশি পড়েন নাই। মেকলের মত প্রতি লাইন লিখিবার জন্য চল্লিশখানি পুস্তক পাঠের আবশ্যক অধিকাংশেরই হয় না। আবার যাঁহারা একবার সম্ভ্রমের সহিত পড়িতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহারা সাধারণতঃ পড়িয়াই চলেন,—"অনন্তজ্ঞানম্ কিল শব্দশাস্ত্রং" তাঁরা পার হইতে চান,—কিছু লিখিবার কথা তাঁহাদের স্বপ্নেও মনে হয় না। ইংরাজ লেখকগণ আফশোষ করেন লর্ড অ্যাক্টনের অত পাণ্ডিত্য বিফলে গেল,—জগতে তেমন কিছু তিনি দিয়া গেলেন না। আমাদের বাংলাদেশে কত অ্যাক্টন যে জগৎকে কিছু না দিয়াই চলিয়া যাইতেছেন তাহার খবর কে রাখিবে!

আমাদের জাতিগত এই দোষ সংশোধন করিতে হইলে শৈশব হইতে ছেলেদের লিখিবার জন্য উৎসাহ দেওয়া উচিত। স্কুলকলেজে ম্যাগাজিনের রেওয়াজ ধীরে ধীরে হইতেছে; শিক্ষকদেরও এ দিকে নজর রাখিয়া শিশুদের চিন্তাকে নানা দিকে চালিত করিতে শিক্ষা দেওয়া উচিত, এবং কাহারও মধ্যে সত্যকার চিন্তাশক্তি বা প্রকাশশক্তি দেখিলে তাহাকে উৎসাহিত ও পুরস্কৃত করা উচিত। পাঠ্য কেতাবগুলি গলাধঃকরণ অপেক্ষা স্বাধীন চিন্তা (ভুল হইলেও) করিবার শক্তি ও সাহস বহুগুণে প্রশংসনীয়। অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজে রীতিমত কবিতা ও রচনার প্রতিযোগিতা হয়, আমাদের দেশেও তাহার প্রচলন করা যাইতে পারে।

কেহ যেন মনে না করেন, আমি শিক্ষিতদের বেকার সমস্যা উদ্ধার করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গিয়াছি, এবং বহু গবেষণার ফলে আবিষ্কার করিয়াছি যে লিখিতে শিখি নাই বলিয়াই এম্‌ এ, বি-এ পাশ করিয়াও আমরা চাকুরি পাই না, সুতরাং একটু লিখিতে শিখিলেই জীবনে আর চাকুরির অভাব থাকিবে না, তাহার আর সন্দেহ কি! পড়ার সঙ্গে সঙ্গে লিখিতে শিখিলেই বুঝি গাড়ীঘোড়া চড়িবার পক্ষে আর কোনরূপ আটক থাকিবে না! সত্য বলিতে কি, বাঙালীর অন্ন-সমস্যার সমাধানের মত উচ্চাকাঙ্খা আমার নাই, এতশীঘ্র তাহার সমাধান হইতে পারে সে বিশ্বাসও আমার নাই। তবে শুষ্ক পুঁথি হজম করার সঙ্গে সঙ্গে লিখিতে অভ্যাস করিলে নীরস পাঠ অনেকটা সরস হইবে,—আর নিজের লেখা পড়িতে যে সুখ তাহারও কিঞ্চিৎ আস্বাদ করা হইবে, এই যা!

শ্রীরাইমোহন সামন্ত

পূর্ব্বাপর

শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

সেদিন বন্ধুমহলে কথাটা তর্কে পরিণত হইয়াছিল।

ভাবপ্রবণ সুরেশ বলিল—নারী যদি পুরুষকে একবার ভালোবাসে, তাহলে সে আর-কারুকেই জীবনে ভালোবাসতে পারবে না—এ যেমন সত্যঃসিদ্ধ—তেমনি, পুরুষও যদি কোন নারীকে একবার গভীরভাবে ভালোবাসে তাহলে সেও জীবনে কোনদিন অন্য-কারুকে বিবাহ ক'রে সুখী হ'তে পারবে না।

কথাটা উঠিয়াছিল, বন্ধু মন্টুকে লইয়া। একটি মেয়ের সহিত তাহার ভাব হইয়াছে; শুধু ভাবই নয়, সম্প্রতি তাহাদের মধ্যে প্রেম এতই প্রগাঢ় হইয়া উঠিয়াছে যে, দুই জনেই পত্র-মারফৎ প্রতিজ্ঞা করিয়াছে—জীবনে তাহারা বিবাহ করিবে না, এবং করিলেও অন্য কারুকেই ভালোবাসিবে না; পরস্পর পরস্পরের কাছে একখানি করিয়া ফটো রাখিবে এবং সেই প্রতিকৃতিখানি বুকে ধরিয়াই তাহারা জীবন অতিবাহিত করিবে।

সকল কথা সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া সোচ্ছ্বাসে সুরেশ বলিল—এখন ওদের যদি না বিয়ে হয়, তাহলে মেয়েটির কথা ত ছেড়েই দাও, মন্টুর জীবনটাও একদম ব্যর্থ হ'য়ে যাবে।

শৈলেশ এতক্ষণ একখানা আরাম-কেদারায় শুইয়া বোধ করি বা সুরেশের কথাই শুনিতেছিল; উঠিয়া বসিয়া বলিল—ব্যর্থ কেন হবে? অমন একটা valuable life ব্যর্থ হ'লেই হ'ল। কিছুদিন যাক্, তারপর দেখে শুনে আর একটি মেয়ের সঙ্গে মন্টুর বিবাহের ব্যবস্থা করলেই সব ঠিক হ'য়ে যাবে।

এ সকল বিষয়ে শৈলেশের উপর সুরেশ-এর বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল না। শৈলেশ হাতুড়ি পিটিতে পারে, লোহা লক্কড়ের গুণ যাচাই করিতে পারে, রেল-লাইন বানাইতে পারে, কিন্তু প্রেম সম্বন্ধীয় ব্যাপারে সে যে একজন ঘোর অনধিকার-সমালোচক সে বিষয়ে সুরেশের কোন সন্দেহ ছিল না। তাই তাহার কথার উত্তরে সে বলিল—তুমি জিনিষটাকে তোমার লোহার যন্তর-চালানোর মতোই সহজ করে দেখলে; কিন্তু আসলে তা নয়। তুমি জানো না, কিন্তু আমি জানি—মন্টুর মন অত্যন্ত নরম এবং স্নেহ-পিপাসু। একবার তার মনে গভীর-ভাবে যে-দাগ পড়েছে, সে-দাগ যে আবার কোনদিন মুছে যাবে—এ কথা কিছুতেই মানতে পারবো না। তাই, যদি সে মেয়েটিকে না পায় তাহলে তার ভবিষ্যৎ-জীবন যে কীরকম দাঁড়াবে, তার ছবি আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

শৈলেশ এবার ঈষৎ উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল—দেখ, মেয়েটিকে না পেলে মন্টুর জীবন যে বর্ত্তমানে অনেকখানি ক্ষতিগ্রস্ত হবে—সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু মানুষের জীবনে হাত-নাগাদ যে ক্ষতিটা হয় তার জন্যে তার দুঃখও যেমন স্বাভাবিক, আবার ভবিষ্যতে হয়ত আরও একটা বৃহত্তর প্রাপ্তির দ্বারা সে-ক্ষতি পূরণ হ'য়ে যাবে, এই আশায় কালে তার ক্ষতির গভীরতাকে বিস্মৃত হওয়াও মানুষের পক্ষে তেমনি স্বাভাবিক। আমাদের জীবনে একদিকে লাভ এবং একদিকে ক্ষতির এই balance যদি না থাক্‌তো, তাহ'লে সংসারে কোন বড় কাজই হতে পারতো না।

সুরেশ বলিল—কিন্তু তোমার ও-কথা প্রেম সম্বন্ধে একেবারেই খাটে না। ভালোবাসার একনিষ্ঠত্ব জিনিষটাকে তুমি একেবারেই আমোল দিচ্ছ না।

শৈলেশ জবাব দিল—অনেক সময়ে দেখা যায়, কোন বিশেষ বস্তুর প্রতি কোন কোন লোকের একটা unflinching attachment থাকে; কোনমতেই সেটাকে সে ছাড়তে চায় না; কিন্তু তার সেই ছাড়া-না-ছাড়ার মধ্যে যুক্তিও কিছু

নেই। প্রেমের একনিষ্ঠত্বও, আমার মতে, তাই। একটা উদাহরণ দিয়ে কথাটা বুঝিয়ে দিই। অমর চিরকালই শার্ট্ পরে; কোনদিন কোন কারণেই আজও পর্য্যন্ত ও পাঞ্জাবী বা অন্য কোনরকম জামা পরলে না, হয়ত ভবিষ্যতে কোনদিন পরবেও না। শার্ট্ পরলে ওকে ভালো মানায়—হয়ত এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হয়েই ও শার্ট্ পরতে আরম্ভ করেছে এবং চিরকাল তাই প'রেই কাটাবে; কিন্তু শার্ট্ ছাড়িয়ে পাঞ্জাবী পরিয়ে দিলেও ওকে হয়ত মন্দ দেখাবে না। সুতরাং শার্টের প্রতি ওর যে অনন্য-নিষ্ঠা তার পিছনে কোন যুক্তি নেই,—আছে নিজেকে লোকচক্ষে প্রিয়দর্শন প্রতিপন্ন করবার একটা স্থূল মোহ। হৃদয়ের ব্যাপারেও—

সুরেশ সবেগে বলিল—থাক্! অ্যানালজিটা তোমার খুব জোরালো, মানছি। কিন্তু, একজনকে ভালোবেসে পরক্ষণেই আর একজনকেও ঠিক তেমনি কোরেই ভালোবাসা যায়—এ তুমি বিশ্বাস করো?

শৈলেশ বলিল—পরক্ষণেই না যাক, কিন্তু একজনকে ভালোবেসে তাকে না পেলে ভবিষ্যতে অন্য আর-কারুকে যে তেমনি গভীর ভাবেই ভালোবাসতে পারা যায়—এ-কথা আমি আমার সমস্ত জীবন দিয়ে বিশ্বাস করি। কথাটা যখন এমনভাবে উঠেছে, তখন আমি তোমাদের একটি interesting জিনিষ শোনাবো।

সকলেই উৎসাহিত হইয়া উঠিল। প্রেমের তর্কের চেয়ে, প্রেমের গল্প যে অধিকতর মুখরোচক সে বিষয়ে কাহারো মতদ্বৈধ ছিল না।

শৈলেশ বলিল—কিছুদিন হ'ল আমি একটি গল্প রচনা করেছি। সেইটেই তোমাদের কাছে পড়ব। নর-নারীর অন্তরের যে ভালোবাসার কথা সুরেশ এতক্ষণ বলছিল—আমার গল্পের ভিতর সেই-কথাই তোমরা পাবে। তবে তার মধ্যে নারীর অন্তরের ভাষাকে হয়ত যথাযথ রূপ দিতে পারি নি; তার অনেকস্থানেই হয়ত আমার বোধশক্তির আলো গিয়ে পড়ে নি। কিন্তু পুরুষের দিক থেকে না-বোঝার কোন ধোঁয়াই আমি জমা ক'রে রাখিনি, মেঘমুক্ত আকাশের মতোই তাকে স্পষ্ট ক'রে সবার সামনে ধ'রে দিইছি। নিজের জীবনের কথাকেই গল্পের আকারে সাজিয়ে রেখেছি—তাকেই আজ তোমাদের কাছে পড়ব।

শৈলেশ গল্প লিখিয়াছে!! অভাবিত বিস্ময় শ্রোতৃবর্গের গল্প শোনার আগ্রহকে কিছুক্ষণের জন্য ছাপাইয়া উঠিল। অবিচলিত সুরেশ বলিল—কার মধ্যে যে কী থাকে তা কে বলতে পারে? যাক্, তোমরা গোলমাল কোরো না। শৈলেশ, আরম্ভ কর।

শৈলেশ তাহার দেরাজ হইতে একখানি বাঁধানো মোটা খাতা বাহির করিল। তারপর উঠিয়া গিয়া টেবিল-ল্যাম্পের আলোর নীচে বসিয়া খাতা খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল।

পশ্চিমের একটা নাম-করা শহর। তাহাকে দ্বিধা-বিভক্ত করিয়া যে ক্ষীণ-কায়া নদীটি বহিয়া গিয়াছে তাহাকেই সেতু দিয়া বাঁধিতে হইবে। উপরওয়ালা বলিয়া দিলেন,—এই সামান্য কাজের জন্য তিনি আর কি যাইবেন,—আমি একাই যথেষ্ট। তথাস্তু। লোকজন লইয়া একদিন রাত্রিশেষে যাত্রা করিলাম।

মাসখানেক কাটিয়া গিয়াছিল। কাজ বিশেষ অগ্রসর হয় নাই। নাবি-বর্ষায় গাঁথুনী কিছুতেই তেমন পাকা হইয়া বসে না। এক-একটা পিল্‌পার ভিত্তি স্থায়ী করিতেই এক সপ্তাহ কাটিয়া যায়।

প্রত্যহ সকালে তাঁবুর বাহির হই। ফিরিতে দ্বিপ্রহর গড়াইয়া যায়। তাঁবুর ভিতর এমনি ভাবের নিঃসঙ্গ জীবন অতিবাহিত করা, অন্যের যেমনই লাগুক, আমার কাছে ইহা রৌদ্র-বৃষ্টির মতোই সহজ-সহনীয় হইয়া গেছে। তাই আরামেই দিনের পর দিন যাপন করিয়া চলি। বিশেষ করিয়া, স্থানটি আমায় অত্যন্ত মুগ্ধ করিয়াছে। প্রত্যূষে সূর্য্য ওঠার সঙ্গে অগণিত শ্রমজীবীদের কর্ম্ম-চাঞ্চল্যের সুর, প্রখর স্তব্ধ দ্বিপ্রহরের বিস্তীর্ণ আলস্য, গোধূলির ম্লানায়মান সূর্য্যাস্ত-দীপ্তি,—ইহাদের সহিত নিজের জীবনের ছন্দের সুর মিলাইয়া একটা অবিচ্ছিন্ন সঙ্গতি অনুভব করি।

প্রতিদিনের মতো সেদিনও বৈকালের দিকে সুরথ বাবু আসিলেন। ভদ্রলোকটিকে পাইয়া প্রবাসের নিঃসঙ্গতার ভার অনেকখানি লঘু হইয়াছে। এমন সরল প্রকৃতির লোক সংসারে সচরাচর চোখে পড়ে না। সাহিত্যে কয়েকটা বড় বড় ডিগ্রী আছে; স্থানীয় কলেজে অধ্যাপনা করিতেন। সম্প্রতি, স্বাস্থ্যের বৈলক্ষণ্যে কর্ম্ম হইতে বাধ্য হইয়া অবসর লইয়াছেন। কলেজের কর্ম্ম নাই থাক, গৃহে সকল সময়েই প্রাচীন পুঁথীর বর্ণোদ্ধার, পুরানো ঐতিহাসিক এবং প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা লইয়া ব্যস্ত থাকেন। জীবন তাঁহার নিবেদিত তাহারই সাধনায়।

তাঁবুর ভিতর মুখ বাড়াইয়া বলিলেন—এই যে, তৈরী? চলুন, বেরিয়ে পড়া যাক।

দুইজনে আমরা প্রত্যহ নদীর তীর ধরিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিতাম। বৈকালিক চা-পান সমাপন করিয়া প্রস্তুত হইয়াই ছিলাম। বাহির হইলাম।

সুরথ বাবুর মতো এত বড় বক্তার লোক আর দুটী দেখি নাই। তাঁহার ঐতিহাসিক গবেষণার সূক্ষ্ম তত্ত্বের কিছুই বুঝি না। কিন্তু তাহারই সুদীর্ঘ এবং বিস্তারিত বিবরণের উত্তরে উপলব্ধি-সূচক মস্তক-সঞ্চালন করিতে হইত এবং তিনিও সঙ্গে সঙ্গে দ্বিগুণ উৎসাহিত হইয়া উঠিতেন। ভগবানের সৃষ্টি-বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ সঙ্গতি কি কোথাও দেখিব না; না হইলে, এত বড় প্রতিভার মধ্যে এতখানি উৎকেন্দ্রিকতা আশ্রয় পাইল কেমন করিয়া?

সেদিন কিন্তু সহসা অন্যরূপ প্রসঙ্গের অবতারণা করিলেন; বলিলেন—আচ্ছা, কৈ, আপনি ত একদিনও আমাদের বাড়ী গেলেন না?

বলিলাম—তার আর কি! একদিন গেলেই হ'ল।

সুরথবাবু বলিলেন—হাঁ; আমার স্ত্রীও তাই বলছিলেন—রোজ রোজ তুমি শৈলেশবাবুর তাঁবুতে গিয়ে তাঁর চা-কেক ইত্যাদির শ্রাদ্ধ ক'রে আসো, অথচ ভদ্রলোককে একদিনও তোমার বাড়িতে নিমন্ত্রণ করলে না; আমরাও তাঁর সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত রইলাম। এই বলিয়া সুরথবাবু মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

বলিলাম—আপনার স্ত্রীকে আমার নমস্কার জানিয়ে বলবেন—যবে তিনি আদেশ করবেন, আমি গিয়ে হাজির হব। কিন্তু বেশ ত আছি, দু'একদিন তাঁর হাতের আতিথ্য গ্রহণ করা আমার পক্ষে শাকের ক্ষেত দর্শন করা হবে বৈত নয়!

সুরথবাবুর উচ্চকণ্ঠের হাসির সুর নদীর বুকে বহুদূর অবধি সঞ্চারিত হইয়া গেল।

ব্রীজের কাজ অগ্রসর হইতেছে। সুরথবাবু প্রত্যহ আসিতেছেন এবং আমাকে তাঁহার বাড়ি যাইবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন। সেদিন কথা দিয়াছিলাম।

সহরের উত্তর দিকে যে-পথটি একটু ঘুরিয়া গিয়া সোজা চলিয়া গেছে তাহারই কিছুদূর গিয়া সুরথবাবুর ফাঁকা ছোট্ট দ্বিতল বাড়িখানি চোখে পড়ে। সম্মুখে গেটের চারিধারে নানা রকম মরশুমি ফুলের গাছ। গেটের পিছনে লাল-কাঁকরের পথ আঁকিয়া বাঁকিয়া বাড়িখানিকে বেষ্টন করিয়া আছে। গেটের নিকটে উপস্থিত হইতেই গৃহস্বামী হাসিমুখে বাহির হইয়া আসিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। লাল-রাস্তা পার হইয়া দুইজনে সম্মুখের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছি, এমন সময় পিছন হইতে কিসের একটা অস্পষ্ট সৌরভ ভাসিয়া আসিল; সঙ্গে সঙ্গে কঙ্কণের শব্দও যেন শুনিতে পাইলাম।

সুরথবাবু বলিলেন—আমার স্ত্রী এসেচেন।

ও! বলিয়া দুই-হাত একত্র করিয়া মুখ ফিরাইলাম।

পৃথিবীতে সত্যকারের আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হয় কোন কিছুই নাই! যুক্তকর তেমনিই রহিল; মুখ দিয়া শুধু বাহির হইল—তুমি!!

সুরথবাবু সশব্দে হাসিয়া উঠিলেন। আমার মনে হইল, ইহার পর আর বোধ করি ভাষা খুঁজিয়া পাইব না।

অপরিমিত হাসিতে হাসিতে সুরথবাবু বলিলেন—কেমন surprise দিইছি? হাঃ, হাঃ, হাঃ! কিছুতেই আগে পরিচয় দিই নি। কেমন;—

এই বলিয়া তিনি ভিতরের দিকে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার মুখ-চোখের ভাব দেখিয়া মনে হইল, জীবনে এত বড়

প্রকাণ্ড রসিকতা তিনি যেন আর কখনো কাহারো সহিত করেন নাই।

বোধ করি মুহূর্ত্তকালের জন্য আত্ম-বিস্মৃতি ঘটিয়াছিল; পরক্ষণেই নিজেকে সম্বরণ করিয়া লইয়া বলিলাম—এমন ভাবে পরিচয় গোপন কোরে স্বামীকে দিয়ে আহ্বান—এর কোন নিহিত অর্থ আছে নাকি?

—দেখছিলাম, পরস্ত্রীর ওপর আজো তোমার কতখানি লোভ আছে। যাক, দেখে আশ্বস্ত হলাম। বাবা, বাবা! কতদিন ধ'রে যে খোসামোদ করতে হয়েছে তার ঠিক নেই!

—পৃথিবীটার পরিধি সত্যিই কি আশ্চর্য্য-রকম কম সুনন্দা! কাল পর্য্যন্ত বোধ হয় স্বপ্নেও ভাবতে পারতাম না যে, এমন-জায়গায় তোমার সঙ্গে এমন ভাবে দেখা হ'তে পারে! কিন্তু তুমি যে হঠাৎ তোমার কথার মধ্যে 'আজো' কথাটার ওপর কি অর্থে জোর দিলে তা ত বুঝলাম না?

সুনন্দা মাথা নাড়িয়া হাসিয়া বলিল—তোমার সব জানা-শোনা কি এইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই শেষ ক'রে নিতে চাও? এসো, ভিতরে এসো।

সম্পূর্ণ-সুন্দর সুসজ্জিত গৃহস্থলী; তাহারই সর্ব্বময়ী কর্ত্রী আজিকার সুনন্দার সহিত পূর্ব্বেকার সে-সুনন্দার কোন সাদৃশ্যই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। শরৎ-উষায় যাহাকে বিদায় দিয়াছিলাম, তাহাকে দেখিলাম বসন্তের প্রদীপ্ত সমারোহের মাঝে।

একটি একটি করিয়া জীবনের সকল কথাগুলি জানিয়া লইয়া হাসিয়া সুনন্দা বলিল—সমস্তটা জীবন কাব্য ক'রেই কাটাবে নাকি? বিয়ে-থা করতে হবে না?

মনে মনে বলিলাম—পরিপূর্ণতার তৃপ্তিতে সার্থক হইয়া তুমি না-হয় আমার কাছে আজ একান্ত সহজ হইয়াই আসিতে পারিলে; কিন্তু অপরের কাছে আজো যাহা সহজ হয় নাই, তাহার সেই গোপন দুর্ব্বলতার সুবিধা নেওয়া, এ কেবল তুমি বলিয়াই পারিলে। কিন্তু তাই বলিয়া আজ আর তোমাকে আত্মপ্রসাদের গর্ব্ব অনুভব করিবার অবসর কোনমতে দিব না। সহজ কণ্ঠে বলিলাম—না করবার ধনুর্ভঙ্গ পণ ত কিছু করিনি; কিন্তু তেমন সুবিধা-মতো মেয়ে পাওয়া যাচ্ছে না;—এক-জায়গায় ত কথাবার্ত্তা সব ঠিক হ'য়ে আছে (এটা মিথ্যা), কিন্তু আমার তেমন মত নেই। দেখ না, তোমার সন্ধানে—

—ঘটকালির কী কি দেবে?

উত্তর দিবার পূর্ব্বেই সুরথবাবু আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন। প্রিয়তমার মুখের প্রতি চাহিয়া স্মিত-প্রফুল্লমুখে বলিতে লাগিলেন—ওঃ, কত কষ্টে যে তোমার পরিচয় ওঁর কাছে গোপন ক'রে রেখেছিলাম, তার সীমা নেই। তুমি ত ব'লে খালাস—"দেখ, গোড়াতে ওঁর কাছে আমার নাম কিছুতেই কোরো না;" কিন্তু আমার যে কী অবস্থা তা ত জানো না; উনিও কিছুতেই আসবেন না; আমিও না-ছোড়-বান্দা!

জলযোগের সহিত অনেক কথা হইল। আমার এই সহায়-সঙ্গীহীন জীবন-যাত্রার প্রতি সুরথবাবু অনেকখানি সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন; তারপর বলিলেন—বলছিলাম কি শৈলেশবাবু,—আর যে-কটা দিন এখানে আছেন, ক্যাম্পে না থেকে আমাদের এই খানেই থাকুন না? সুনন্দাও তাই বলছিল। আমরা ত আপনার একেবারে পর নই।

সুনন্দার প্রতি তাকাইলাম। তাহার উত্তর-প্রত্যাশী দুই-চোখের দৃষ্টি যেন আমার চোখের উপর পথ হারাইয়াছে।

হাসিয়া বলিলাম—আপনাদের এই সহানুভূতি সত্যিই আমার মনকে খুসীতে ভরিয়ে দিলে; সংসারে আজো যে কেউ আমার জন্যে একটুখানিও ভাবে,—এ-কথা জেনে আমি যে কি আনন্দ পেলাম তা ভাষায় বোঝাতে পারবো না। কিন্তু আমি ত বেশ আছি; কাজ কি আপনাদের এই সাজানো বাগানে আগাছার জঞ্জাল বাড়িয়ে।

আপনার সঙ্গে কথায় কে পারবে বলুন, বলিয়া সুরথবাবু প্রস্থান করিলেন।

বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, পৃথিবীর উপর বহুক্ষণ হইল সন্ধ্যার ছায়া নামিয়া আসিয়াছে; বলিলাম—অনুমতি কর ত এইবার উঠি।

সুনন্দা মুখ নীচু করিয়া বসিয়া ছিল, আমার সঙ্গে উঠিয়া

দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিল—আর কতদিন তোমার এখানে কাজ হবে?

—ঠিক বলতে পারি না; তবে আশা করছি, মাস-খানেকের মধ্যেই পোলের শেষ পন্টুন্‌খানা ভাসাতে পারবো।

—আমি বলছি, সে-কদিন তাঁবুর বাসা তুলে এইখানে এসে থাক। কোনও অসুবিধে তোমার হবে না।

সুনন্দার কণ্ঠস্বরে সুদূর অতীতের মাঝে ফিরিয়া গেলাম। তখনকার দিনের তেমনি-তর আদেশের সুরই যেন তাহার কথায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া নিঃশব্দে শুধু একটুখানি হাসিলাম; কথা বলিলাম না।

আমার ও-হাসির অর্থ সে ভালো করিয়াই জানে; বলিল—আপত্তিটা কিসের শুনি। তাঁবুর ভিতর বর্ষার জল পড়ে, এ ত তুমি নিজেই স্বীকার করলে; আর তারই মধ্যে যে, কোন মানুষ সুস্থচিত্তে দিন কাটাতে পারে তা ধারণা করা অসম্ভব। নিজে রেঁধে খাওয়া-দাওয়া তোমার দ্বারা যে কতদূর কি হয় তা আমিই জানি। তাই বলছি—

তাহাকে বাধা দিয়া বলিলাম—পরিচিত-জনের প্রবাস-বাসের দুঃখ নিজের হাতে তুলে নিতে চাইছো,—তোমার এ মহত্ত্ব আমি চিরদিন সকৃতজ্ঞ-চিত্তে স্মরণ করব। কিন্তু ওর মধ্যেই আমার এতগুলো দিন কেটেছে, বাকী অসংখ্য দিনগুলোও ওরই মধ্যে দিয়ে আমায় কাটাতে হবে। শুধু শুধু মাঝখান থেকে দিনকতক আরাম উপভোগ করলে অভ্যাস খারাপ হবে বৈত নয়। তোমার পরোপকার-প্রবৃত্তি চিরজীবী হোক, সুনন্দা; আমার জন্যে চিন্তা কোরো না।

মনে মনে বলিলাম—নিজের সম্পদের গর্ব্বে আমার সম্বন্ধে তুমি না হয় আজ নিঃশঙ্ক-চিত্ত হইয়াছ; কিন্তু যাচিয়া তোমার আতিথ্য গ্রহণ করিবার পশ্চাতে অন্তরের যে দীনতা লুক্কায়িত আছে তাহা মাথা পাতিয়া লইবার মতো ছোটও আমি নই।

দুইজনে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইতেই অদূরে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে বাগানের ভিতর সুরথবাবুকে দেখিতে পাইলাম। তাঁহার গাছের সখের কথা শুনিয়াছিলাম; কিন্তু তাহা যে কত উগ্র তাহা এখন প্রত্যক্ষ করিলাম। মাটির উপর বসিয়া একটা ছোট কোদাল লইয়া সম্মুখের মৃত্তিকা নাড়াচাড়া করিতেছেন এবং পাশের মালীটাকে বোধ করি নানা জ্ঞাতব্য বিষয় বুঝাইয়া দিতেছেন। হাতে-পায়ে, জামা-কাপড়ে ভিজা-মাটির স্নেহ-স্পর্শ লাগিয়াছে; সম্মুখে মাটির উপর একখানা ছবি-আঁকা পাতা-খোলা বই পড়িয়া রহিয়াছে।

কাছাকাছি আসিতেই তিনি হাসিমুখে উঠিয়া দাঁড়াইলেন; তারপর আমাকে উদ্দেশ করিয়া কি বলিবার উপক্রম করিলেন,—কিন্তু মুখের কথা মুখেই থাকিয়া গেল, সহসা সুনন্দা উচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—মাগো! আবার তুমি শুধু-পায়ে ভিজে-মাটিতে ব'সে আছ! তারপর একেবারে স্বামীর বুকের কাছে সরিয়া আসিয়া তর্জ্জনী হেলাইয়া বলিল—কতদিন না তোমায় বলেছি, সন্ধ্যেবেলা এমন ক'রে ঠাণ্ডা লাগিয়ো না! তুমি কি একদিনও আমায় শান্তিতে থাকতে দেবে না? যাও, এখুনি কাপড় ছেড়ে মোটা-জামা গায়ে দিয়ে এসো।

অকস্মাৎ পত্নীর এই প্রবল উচ্ছ্বাসে সুরথবাবু অতিশয় অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলেন; বলিলেন—এ আবার কি! কবে আবার—? আচ্ছা, আচ্ছা, আমি এখুনি গরম জামা গায়ে দিয়ে আসছি, ইত্যাদি বলিতে বলিতে তিনি বাড়ীর ভিতর প্রস্থান করিলেন। সুনন্দা নির্নিমেষ-নয়নে স্বামীর গমন পথের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সুরথবাবুর শরীরে যে কঠিন অসুখ আছে তাহা তাঁহার নিজের মুখেই শুনিয়াছিলাম; বলিলাম—হ্যাঁ; রোগী মানুষ, এমন-কোরে ঠাণ্ডা লাগানো উচিৎ নয়।

—কত বলি; কিন্তু কে-বা কার কথা শোনে। আমি আর পারি নে!

কম্পিত কণ্ঠস্বর কান্নার আভায় অপরূপ হইয়া উঠিল। ইহার পর আর বাক্‌বিস্তার করা সম্ভব-পর হইল না। নিঃশব্দে বিদায় গ্রহণ করিলাম।

বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, রাত্রি অনেকখানি অগ্রসর হইয়াছে। আকাশ যেন এক খণ্ড ঘন-কৃষ্ণ চন্দ্রাতপ; তাহারই গায়ে তারাগুলো যেন আজ অধিকতর দীপ্যমান। রাত্রি অমাবস্যা।

যতদূর দৃষ্টি চলে, দেখিলাম, উদার উন্মুক্ত পথ দূরে বহুদূরে অসীম আকাশের গায়েই বিলীন হইয়া গিয়াছে। এই পথ দিয়াই আমাকে চলিতে হইবে, কতদিন ধরিয়া কে জানে?

সুনন্দার কথাগুলো তখনো কানের ভিতর ঝঙ্কৃত হইতেছিল; নিজেকে সে আজ সর্ব্বতোভাবে আমার দিক হইতে মুক্ত করিয়া লইয়াছে—এ সংবাদ দিনের আলোর মতোই আমার কাছে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ইহা ভালোই হইয়াছে যে, তাহার জীবন হইতে সে আজ আমাকে এমন অনায়াসে নিস্কাসিত করিতে পারিয়াছে; মনে মনে মুক্তির আনন্দ অনুভব করিবার নিমিত্ত একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতে গেলাম; কিন্তু ফেলিতে গিয়া দেখি কোথা হইতে একটা অনির্দ্দেশ্য কাঁটার আঘাতে নিঃশ্বাস রুদ্ধ হইয়া যায়।

সহসা মনে হইল, এই যে অনন্ত-বিস্তীর্ণ পথ-রেখা, সুবিশাল নীলাকাশ, স্নিগ্ধ-শান্ত পৃথিবী, ইহারা একান্তই অর্থহীন অকারণ, এবং ইহাদের সঙ্গে আমার জীবনও নিখিল বিশ্বের সুবিন্যস্ত সুসঙ্গতির মাঝে এমনি এক উদ্দেশ্যহীন সৃষ্টি।

একে একে সকল কথাই মনে পড়িতে লাগিল; বিশেষ করিয়া একটি দিনের একটি কথা। গ্লাসগোর এক বসতি-বিরল শহরতলীর নির্জ্জন গৃহকোণে বসিয়া যেদিন সুনন্দার বিবাহের সংবাদ পাইলাম, সেদিন মনে হইয়াছিল এতখানি দুঃখের আঘাত সহ্য করিবার শক্তি বোধ করি আমার নাই। মনে হইল, এতদিনের এই কঠোর পরিশ্রম, কৃতী হইবার এই প্রবল উচ্চাশা,—ইহার পর সবই যেন প্রয়োজনহীন হইয়া পড়িল। নোঙর-ছেঁড়া নৌকার মতো নিজেকে যেন নিতান্ত লক্ষ্যহীন বলিয়া মনে হইতে লাগিল। ছন্দের উপর অধিকার ছিল, লাইনের শেষে অনবদ্য মিল গাঁথিতেও পারিতাম,—কিন্তু তাই বলিয়া বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদুনি গাহিয়া বাণীর জ্যোৎস্না-স্মিত কমল-কুঞ্জে অমাবস্যা ঘনাইয়া তুলিবার প্রবৃত্তি ছিল না; রুগ্ন-চিত্ত ভাব-বিলাসীর মতো নয়, স্বাস্থ্যবান সৈনিকের মতোই আমার অনতিবর্ত্তনীয় দুঃখকে বরণ করিয়া লইলাম।

জানি, এই নিঃশব্দ ব্যর্থতার ইতিহাসকে কেন্দ্র করিয়া যুগে যুগে অনেক বেদনাতুর কাব্য, অনেক বিক্ষুব্ধ কাহিনীর সৃষ্টি হইয়াছে; কিন্তু আজিকার আয়ত্তাতীত সম্পদ একদিন আমারও হইতে পারিত বলিয়া নিষ্ফল হতাশ্বাসে প্রবাসের দিনগুলা ভারী করিয়া তুলি নাই; যথাক্রমে দুই-তিনটা পরীক্ষা পাশ করিয়া, সনন্দ লইয়া, দেশের ছেলে দেশে ফিরিলাম।

লোকালয়ের ভিতর দিয়া পথ অতিক্রম করিতেছিলাম। পথের দুই ধারে ছোট ছোট কুটীর; তাহারই অধিবাসীবৃন্দ এতক্ষণে রাত্রের আহার সমাধা করিয়া, কেহ বা রামায়ণ, কেহবা ভজন, কেহবা নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে। এখানকার বাসিন্দারা সকলেই দিন-মজুর, আমরা যাহাদের ছোটলোক বলিয়া অভিহিত করি, তাহাই। অট্টালিকা নাই, সাজসজ্জা নাই, আরাম-প্রদ বিলাসের কোন উপকরণ ত দূরের কথা জীবনকে সুসহ করিবার জন্য যাহা একান্ত প্রয়োজনীয় তাহাও হয়ত সকলের নাই,—তবুও ইহাদের দেখিলে মনে হয়, যে-সুখ যে-শান্তিটুকু ইহারা জীবনে আহরণ করিতে পারিয়াছে, ধনীর প্রাসাদেও তাহাকে কোনদিন খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

সহসা গতি রুদ্ধ হইয়া গেল। সম্মুখের স্বল্প-দীপালোকিত একটি গৃহাভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত করিয়া চোখের যেন আর পলক পড়িতে চাহিল না। যাহা দেখিলাম তাহা অসাধারণও নয়, অদৃষ্টপূর্ব্বও নয়; কিন্তু তাহাই যেন আজ আমার চোখে একান্ত অপূর্ব্ব এবং রমণীয় হইয়া ফুটিয়া উঠিল। একটি ক্ষুদ্র শ্রমিক পরিবার। স্ত্রী আলোর সম্মুখে বসিয়া কোলের ক্রন্দন-নিরত শিশুটিকে ঘুম-পাড়ানী গানের সুরে নিদ্রিত করিবার চেষ্টা করিতেছে; শিশু কিন্তু কিছুতেই ঘুমাইবে না, হাত-পা ছুঁড়িয়া বারবার বিদ্রোহ ঘোষণা করিতেছে। অদূরে খাটিয়ার উপর স্বামী বসিয়া লুব্ধ-নেত্রে স্ত্রীর প্রতি তাকাইয়া আছে; তাহার প্রতি অপাঙ্গে দৃষ্টিপাত করিবার সময় স্ত্রীর মুখের উপর দুষ্টামির যে বাঁকা হাসিটুকু ফুটিয়া উঠিতেছে তাহা স্বামীর নজরে পড়িতেছে না।

সভ্যতা-জ্ঞান-হীন, অসামাজিক নর-নারীর জীবন-যাত্রা-পথের এই অনাবৃত ছবিখানি আমাকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া দিল। চলিতে চলিতে মনে হইল, আমিও যদি এমনি একখানি অনাড়ম্বর শান্তির নীড় রচনা করিতে পারিতাম!

সমাজ, সংস্কার এবং লোকালয়ের বাহিরে এমনি একখানি নির্জ্জন কুটীর, এমনি একটি দেবতার শুভ্র-শুচি আশীর্ব্বাদ, এমনি একজন সেবা-পরায়ণা স্ত্রী—

সহসা চকিত হইয়া উঠিলাম। মনের ভিতরকার সংস্কার-বদ্ধ সামাজিক-জীবের ক্ষুব্ধ ধিক্কারে স্বপ্ন ভাঙিয়া গেল। সঙ্কোচের আর অবধি রহিল না। আমার শান্তি-মৌন গৃহাঙ্গনে স্নেহ-কোমল পত্নীর যে অনিন্দ্য-সুন্দর মুখখানি কল্পনায় প্রস্ফুটিত হইয়াছিল, সে-মুখ সুনন্দার!

তাঁবুতে ফিরিয়া শুনিলাম, আমার আজিকার এই বিলম্ব দেখিয়া লোকজন লইয়া সহকারী নান্নুলাল আমাকে খুঁজিতে বাহির হইয়াছে।

পরদিন সাহেবকে তার করিলাম—রিইন্‌ফোর্সমেন্ট্ প্রয়োজন; এখানকার কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করিয়া ফেলিতে চাই।

সেদিন যখন তাঁবুতে ফিরিলাম, তখন প্রায় অপরাহ্ণ।

সুরথ বাবু বলিয়া উঠিলেন—আমাদের আর একবার খাবার সময় হোয়ে এলো যে গুপ্ত সাহেব! আপনার একী অসম্ভব দেরী!!

সুনন্দা পাশে দাঁড়াইয়া ছিল, বলিল—এই রকমই হয়ত রোজ হয়! সহ্য হ'য়ে গেছে।

হাসিয়া বলিলাম—কতক্ষণ এসেছেন সব? হাঁ, প্রায়ই এই রকম দেরী হয়।

সুনন্দা বলিল—তারপর? রান্নার তো কোন চিহ্নই দেখছি না। এইবার কি রাঁধতে আরম্ভ করবে?

বলিলাম—ভগবানের রাজ্যে তাঁর প্রজার জন্যে সকল রকম ব্যবস্থাই আছে; সুতরাং ব্যস্ত হবার প্রয়োজন নেই—রান্না তৈরী হ'য়ে আছে।

সকালেই স্নান সারিয়া লইয়াছিলাম। মুখ-হাত ধুইয়া, পাশের কুঠ্‌রিতে গিয়া ইক্‌মিক্ কুকারটি খুলিয়া বাক্স কয়টি বাহির করিয়া লইলাম। সুনন্দা অদূরে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল।

সুরথবাবু বলিলেন—আপনার কুকারের রান্না খেতে বড্ড লোভ হচ্ছে শৈলেশবাবু। চমৎকার হাইজিনিক!

হাসিমুখে পাত্রগুলির ঢাকা খুলিতেই মুখ শুখাইয়া গেল; সঙ্গে সঙ্গে পার্শ্বে দণ্ডায়মানা সুনন্দার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিবার চেষ্টা করিলাম; চোখোচোখী হইতেই সে মুখ ফিরাইয়া লইল।

একটা পাত্রের মাংসগুলি যেন চাহিয়া আছে। অন্য পাত্রের চালগুলা বোধ হয় বারকয়েক ফুটিয়া উঠিয়া অর্দ্ধপথেই থামিয়া গিয়াছে। জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনের দিনে রন্ধন-যন্ত্র বিশ্বাসঘাতকতা করিল।

রহিয়া গেলাম।

সমস্ত-কিছু হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া একান্ত করিয়া শুধু আপনাকেই অনুভব করিবার অবসর ইহার পূর্ব্বে এমন করিয়া কখনো পাই নাই।

নিজের প্রতি লক্ষ্য রাখিবার নিমিত্ত যে-সময়ের প্রয়োজন হইত, সে প্রয়োজন শেষ হইয়াছে। এখন বুঝিয়াছি, সেই বিলক্ষণ দীর্ঘ সময়ের কী অপব্যবহারই না আমার হাতে হইয়াছে। নিজের অপটুত্ব এবং অক্ষমতাকে যখন মন্দ নয় বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করিতাম তখন জানিতাম না, যথার্থ ভালো করিয়া বাঁচিয়া থাকা কাহাকে বলে। সুনন্দার যত্নের মধ্যে কোথাও এতটুকু ফাঁক নাই; জীবনের এই যেমন-তেমন-করিয়া-কাটানো এতগুলো দিনের মধ্যে প্রতি পলে অপচয়ের যে ছিদ্র নিরন্তর বাড়িয়াই চলিয়াছিল, আজ তাহার সুপটু হস্তের ব্যঞ্জনায় তাহা ভরাট হইয়া উঠিয়াছে।

এক এক সময় সুনন্দা ঘরে আসিয়া বলে—ঠিক কোরে বলো, কোন অসুবিধে হচ্ছে না ত? কি জানি বাপু, যে চাপা মানুষ তুমি!

হাসিয়া বলি—এই চাপা মানুষটার সুবিধে-অসুবিধে জগতে আর কেউ না বুঝুক, তুমি যে বোঝো না, তা তোমার নিজের মনকেও বোঝাতে পারবে না। সুতরাং, সে-দিক থেকে নিজে নিশ্চিন্ত হ'য়ে শুধু যদি আমার মুখের দুটো মামুলী বাহবা শুনতে এসে থাকো, তাহলে বলছি—আমাকে না ধ'রে আনলেই পারতে।

আয়না-বসানো টেবিলের উপর চিরুণী ব্রস প্রভৃতি সাজাইয়া রাখিতে রাখিতে সুনন্দা বলিল—থাক্, আর লম্বা-চওড়া বক্তৃতায় কাজ নেই; দেশে গিয়ে যাতে নিন্দে না কর, সেটা আমায় দেখ্‌তে হবে ত! তারপর জামা-কাপড়গুলি যথাস্থানে গুছাইয়া রাখিয়া কহিল—আচ্ছা, উনি যখন বারবার আমার নাম কোরে তোমায় এখানে নিমন্ত্রণ করছিলেন, তখন তুমি আমায় খুব বেহায়া ভাবছিলে, না?

হাসিয়া বলিলাম—পরিচয় লুকিয়ে যখন নিমন্ত্রণ পাঠাচ্ছিলে, তখন তোমার নিজের মনেও এমনি একটা ধারণা নিশ্চয়ই জেগেছিল; সুতরাং এখন আমায় প্রশ্ন করা বাহুল্য।

—তা ত বটেই। আচ্ছা, যখন প্রথম আমায় দেখলে তখন কি মনে হ'ল?

প্রশ্ন কঠিন। তাই উত্তর দিতে কিছু বিলম্ব হইল। বলিলাম—প্রথমটা বিষম বিস্মিত হোয়ে গিছলাম। তারপর মনে বেশ আনন্দ পেলাম; দূর প্রবাসে একাকী থাকার সময় পরিচিত প্রিয়-মুখ দেখার যে সহজ আনন্দ, নিছক তাই। তার বেশী কিছু নয়।

অন্যান্য আরও সাধারণ দুচার কথার পর সুনন্দা কার্য্যান্তরে প্রস্থান করিল; আমিও Chapter the Lastএর শেষ পরিচ্ছেদ শেষ করিতে বই খুলিলাম।

সেদিন সন্ধ্যায় একাই বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলাম।

আজ যেন এমনি একটা নিভৃত অবকাশের প্রয়োজন আমার ছিল। আজ আর বাহিরের জগতে নয়, ভিতরকার জগতের পরিচিত পথ দিয়াই চলিতে লাগিলাম; তাহারই শোভা-সম্পদ, সেখানকার অধিবাসীবৃন্দের কথাই আজ বারবার আনাগোনা করিতে লাগিল। এই যে আমাকে দূর হইতে অতি নিকটে লইয়া আসা, এই যে আমার সকল সুখ, তুচ্ছতম স্বাচ্ছন্দ্যটির প্রতি এমন তীক্ষ্ণ অতন্দ্র দৃষ্টি,—ইহার অন্তরালে কি আছে, তাহাই জানিবার জন্য আমার মন একান্ত উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছে! ছাত্রাবস্থায় কিছুদিন মনস্তত্ত্ব লইয়া মাতিয়া উঠিয়াছিলাম; বাঙলা-সাহিত্যে মনস্তত্ত্ব-মূলক গ্রন্থরাজীরও অভাব ছিল না,—এই দ্বিবিধলব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে যে-বস্তুকে অতি সহজেই আবিষ্কার করিলাম তাহা যে কেন আজ আমাকে উদ্বেলিত করিয়া তুলিল না, তাহা নিজের কাছেই অতিশয় বিস্ময়কর লাগিল! অথচ এমন ত ছিল না। এমন দিন ছিল যখন তাহার নিকট হইতে সামান্য-তম আভাস-টুকুও আমাকে সারাদিন স্বপ্নমগ্ন করিয়া রাখিত, অহর্নিশি মনের মধ্যে গুঞ্জরণ তুলিত! তবে আজ সহসা মনের এ নিস্পৃহতার কারণ কি? ইহা কি অজন্মার্জ্জিত সংস্কার? না, তাহাও ত নহে। এই ত সেদিনও তাহার সহিত প্রথম সাক্ষাতের পর তাহাকে কি অসম্ভবরূপেই না কল্পনা করিয়াছিলাম!—আমার বাহিরের রক্তচক্ষু ত ভিতরের গোপন-সত্ত্বাটিকে কিছুমাত্র দমিত করিতে পারে নাই।

মনে হইল, সংসারে সকল বস্তুরই জন্ম, বিকাশ এবং ক্ষয় আছে। আমার জাগ্রত যৌবনের সন্ধিক্ষণে যে প্রেম পূর্ণ-বিকশিত হইয়া উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছিল, কালের খরস্রোতে তাহার তীক্ষ্ণতা হয়ত তরঙ্গাহত উপলখণ্ডের মতোই স্থূলধার হইয়া আসিয়াছে, তাই আজ তাহার দিকে দিকে এমন শ্যামলিমা ঘনাইয়া উঠিয়াছে!

সে যাহাই হোক, আপাততঃ বহির্জ্জগতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, মাথার উপর বোধ করি এতক্ষণ ধরিয়া মহাসমারোহে আয়োজন চলিতেছিল, লক্ষ্য করিয়া দেখি নাই; এইবার চারিদিক ঝাপ্‌সা করিয়া শ্রাবণের ধারা নামিয়া আসিল।

যখন বাড়ী ফিরিলাম, তখন নিজের অবস্থা দেখিয়া নিজেরই হাসি পাইতেছিল। সম্মুখের বাহিরের-ঘরে আলো জ্বলিতেছিল; ভেজানো দরজাটা খুলিয়া দিলাম।

দ্বারের দিকে পিছন ফিরিয়া সুরথ বাবু বসিয়া আছেন, আর তাঁহারই অপরদিকে আলোর কাছে বসিয়া কি একটা মোটা বই সম্মুখে লইয়া একটি তরুণী-মেয়ে একটানা সুরে পড়িয়া চলিয়াছে। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত দুইজনের কেহই আমার সাড়া পাইল না।

এখানে আসিবার দুই-এক দিনের মধ্যেই জানিতে পারিয়াছিলাম, সুনন্দা ব্যতীত এ-বাড়িতে আরও একটি-

মেয়ে আছে। বয়সে সে বোধ করি সুনন্দার ছোটই হইবে; সম্পর্কে সুরথবাবুর ভগ্নী। নাম তাহার মাধবী। আমি তাহাকে কোনদিন চাক্ষুস দেখিতে পাই নাই; হয়ত প্রয়োজন হইত না বলিয়াই সে আমার সম্মুখে বাহির হইত না; কিন্তু সমস্ত দিনের মধ্যে যতক্ষণ বাড়ি থাকিতাম ততক্ষণ তাহার সেই অন্তরালের অস্তিত্বটিকে নিরতিশয় স্পষ্টভাবেই অনুভব করিতাম। আমার জীবন-যাত্রার পথটিকে সুগম করিবার জন্য সুনন্দার সহিত এই মেয়েটিরও যে যোগ ছিল তাহা কেহ আমাকে বলিয়া না দিলেও, নিঃসংশয়ে বুঝিতাম। আমার কর্ম্ম শেষের অবকাশটিকে রমণীয় করিয়া তুলিবার জন্য অন্তরাল হইতে এই মেয়েটির প্রসারিত কল্যাণ-করের স্পর্শ, অমাবস্যার রাত্রে অন্ধকার পৃথিবীর বুকে সুদূর নক্ষত্রলোকের সুস্নিগ্ধ সহানুভূতির মতো একান্ত করিয়া উপভোগ করিতাম।

অন্তরালের সেই অরূপা কল্যাণীকে আজ বাধাহীন দৃষ্টি দিয়া চাহিয়া দেখিলাম। নমিতাঙ্গী শ্যামা মেয়েটি। চূর্ণ-কুন্তল-কীর্ণ কপালের নীচে ভুরু-দুটী প্রসারিত হইয়া নামিয়া আসিয়াছে। আয়ত স্বচ্ছ চোখদুটী যেন দুরবগাহ। বাহিরের অবিরাম বারি-বর্ষণের গুঞ্জন-গীতির মাঝে, মৃদু-আলোকিত ঘরের মধ্যে, পাঠ-নিরতা সেই সাধারণ মেয়েটি আমার চোখে যেন অপূর্ব্ব মাধুর্য্যময়ী বলিয়া প্রতিভাত হইল।

সহসা তাহার ক্ষীণ আকস্প্র কণ্ঠস্বরে চকিত হইয়া উঠিলাম,—দাদা! শৈলেশ বাবু। ওমা; একেবারে নেয়ে গেছেন যে!

ঘরে ঢুকিয়া বলিলাম—হ্যাঁ। এর জন্যে আমিই দায়ী। অনেক-ক্ষণ থেকে ওয়ার্ণিং দিচ্ছিল, আমিই গ্রাহ্য করিনি। যাই হোক, এখন এগুলো ছাড়তে পারলে সুবিধে হ'ত।

ক্ষিপ্রপদে মাধবী ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সুরথ বাবু আমার দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন —যে-বয়সে বৃষ্টি মাথায় ক'রে বাড়ি না ফিরে পথেই কোথাও আশ্রয় নিয়ে অপেক্ষা করতে হয়, যদিচ সে-বয়েস এখনো আপনার আসেনি, তবুও আজ এ-ভাবে শরীরকে risk করা আপনার মোটেই উচিত হয় নি।

দিন-কয়েক পূর্ব্বে আমার দিন-দুই ধরিয়া জ্বরের মতো হইয়াছিল; বুঝিলাম, কথাটা তিনি সেই সম্পর্কেই বলিলেন।

অনতিকাল পরেই একখানা ধুতি এবং একটা মোটা জামা লইয়া সুনন্দা আসিল এবং আমার এই হঠকারিতার জন্য আমাকে মধুরভাবে যথেষ্ট সস্নেহ তিরস্কার শোনাইয়া দিল।

হাসিয়া বলিলাম—কিন্তু ভিজ্‌তে এতো ভাল লাগছিল! মনে হচ্ছিল, সেই সঙ্গে যেন অনেকদিনের জমা-করা ক্লেদ ধুয়ে পরিষ্কার হ'য়ে গেল। যাক্, এখন এক-কাপ গরম চা যদি খাওয়াতে পারো, তাহলে তোমায় অনেক ধন্যবাদ দিই।

সুনন্দা ভিতরে চলিয়া গেল। আমি কাপড় ছাড়িয়া, সুরথ বাবুর বিপরীত দিকে টেবিলের সম্মুখে বসিয়া তাঁহার সহিত গল্প জুড়িয়া দিলাম।

কিছুক্ষণ পরেই, ধূমোদ্গারী দুই পেয়ালা চা হাতে লইয়া মাধবী ঘরে ঢুকিল। তাহার হাত হইতে পেয়ালাটি লইয়া সুরথ বাবুকে বলিলাম—আমি আসার আগে আপনাদের নিশ্চয় কিছু পড়াশুনো চলছিল। তাকে আবার পুনরারম্ভ করা যাক না কেন?

তিনি হাসিয়া তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তিনীটির প্রতি তাকাইলেন; বলিলেন—কোন গম্ভীর ব্যাপার কিছুই নয়! মাধু আমাকে Browning প'ড়ে শোনাচ্ছিল।

আশ্চর্য্য হইয়া মাধবীর দিকে চাহিলাম। ইহাকে ত ঠিক এমন-ভাবে কোনদিনও কল্পনা করিতে পারি নাই; বরং—

বরং-কে নিবারণ করিয়া বলিলাম—আমাদের কি সে শোনবার সৌভাগ্য হ'তে পারে না? দেখিলাম, লজ্জায় মাধবী যেন মাটির সহিত মিশিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে; তাড়াতাড়ি বলিলাম—তা ব'লে আপনাকে কোন অসুবিধের মধ্যে ফেল্‌তে চাইনে; বড্ড সঙ্কুচিত হ'য়ে পড়েছেন, দেখছি।

সুরথ বাবু তাহার প্রতি একবার সস্নেহ দৃষ্টিপাত করিলেন; তারপর স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিলেন—ওকে আর আপনি ব'লে সম্বোধন করবেন না; তাতে ওর লজ্জা বাড়বে বৈ কমবে না। কি বলিস, মাধু?

মৃদু হাসিয়া টেবিলের উপর হইতে বইখানা হাতে লইয়া

বলিলাম—এত কবি থাকতে এঁকেই শেল্‌ফ্‌ থেকে পাড়া হ'ল যে ?

সুরথ বাবু বলিলেন—উনিই যে আমার ফেভরিট্‌। মাধবীরও।

বলিলাম—এবং আমারও। আশ্চর্য্য বটে।

মিথ্যা বলি নাই। কবিতা অনেক পড়িয়াছি বটে; কিন্তু সেগুলো পড়িয়াছি, কবিতা মনে করিয়াই। অন্তরের অন্তরতম মূর্ত্তির বাণী যাঁহার লেখনী-মুখে উৎসারিত হইতে দেখিয়াছি—তিনি এই ইংরাজ-কবি। কবিতার মধ্যে জীবনের এত সূক্ষ্ম এবং বিস্তৃত উপলব্ধির কথা এমন স্পষ্ট এবং নির্ভীক ভাবে শুনাইতে আর কাহাকেও দেখি নাই।

পাতা খুলিয়া, প্রথমেই যে কবিতাটা নজরে পড়িল, পড়িতে আরম্ভ করিয়া দিলাম—

The rain set early to-night
The sullen wind was soon awake.
It tore the elm-tops down for spite
And did its worst to vex the lake,
I listened with heart fit to break
When glided in Porphyria …

কবিতাটা পড়িতে সুরু করিয়াই মনে একটু দ্বিধা উপস্থিত হইয়াছিল,—যাহারা শুনিবে তাহাদের মধ্যে অন্ততঃ একজনের কাছে ইহা পাঠ করা সঙ্গত হইবে কি না ? কিছুদূর অগ্রসর হইতেই মনের কুণ্ঠা কাটিয়া গেল; বহুবার-পড়া কবিতার পরিচিত লাইন-গুলির মধ্যে আত্মবিস্মৃত হইয়া গেলাম। শেষ-লাইন-কয়টি যখন পড়িলাম

And thus we sit together now
And all night long we have not stirred
And yet God hath not said a word

তখন পড়া শেষ হইবার পর বহুক্ষণ অবধি কেহই কোন কথা খুঁজিয়া পাইলাম না; বাহিরের অবিশ্রান্ত বর্ষণের মাঝে নিজেদের অন্তরের কথা যেন ডুবিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছিল।

কিছুক্ষণ পরে সুরথবাবু বলিয়া উঠিলেন—বাঃ! কী সুন্দর আপনি পড়তে পারেন, শৈলেশবাবু! চমৎকার !! ছবিটাকে যেন এতক্ষণ একেবারে চোখের সামনে প্রত্যক্ষ করছিলাম। তারপরেই ভগ্নীকে রেফার্‌ করিলেন—কি বলিস্‌ মাধু, না ?

মাধবীর দিকে চাহিয়া দেখিলাম, তাহার মাথা কোলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে; বুঝিলাম, আত্মভোলা অগ্রজের এই প্রশ্ন তাহাকে বিব্রত করিয়াছে; অস্ফুটে কি বলিতে চেষ্টা করিল, বোঝা গেল না।

বলিলাম—এই কাব্যগ্রন্থখানা আমি অনেকবারই পড়েছি; তাই হয়ত আপনাদের কাছে ভালো ক'রে পড়তে পারলাম।

সুরথবাবু বলিলেন—কথায় কথায় atmosphereটা নষ্ট করবেন না। আর একটা সুরু করুন।

হাসিয়া আরম্ভ করিলাম—

I send my heart up to thee, all my heart
In this my singing …

সহসা সুনন্দার তীক্ষ্ণ কলহাস্যে পড়া থামিয়া গেল। চাহিয়া দেখিলাম, কখন সবার অগোচরে সে দ্বারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আমি থামিতেই বলিল—বাঃ, বেশ ত আড্ডাটি জমেছে। একা আমিই কেবল ধুঁয়ো আর আগুনের মধ্যে হাঁপিয়ে মরছি।

আর কেউ না চিনুক, সুনন্দাকে চিনিতে আমার বাকী ছিল না; কথাগুলা যত সরলভাবেই সে বলুক, তাহার অন্তর্নিহিত ঝাঁঝটুকু আমার লক্ষ্য এড়াইল না। তাহাকে খুসী করিবার জন্য তাড়াতাড়ি বলিলাম—শুধু এই আড্ডা জমিয়েই ত রাত কাটবে না; এবং সেই বাস্তবের আয়োজনেই তুমি ব্যস্ত ছিলে। তোমার এ পরার্থপরতাকে এই তুচ্ছ বৈঠকের সঙ্গে তুলনাই করা যেতে পারে না। অচির-ভবিষ্যতের ভার তোমার হাতে তুলে দিইছি বলেই না এমন নিশ্চিন্ত মনে আমরা ব'সে থাকতে পেরেছি; সুতরাং আমাদের এই যে ক্ষণিক আনন্দ, এর জন্যেও তুমিই দায়ী।

সুনন্দা বলিল—থাম বচনবাগীশ; অনেক হয়েছে। এখন এমন জায়গায় এসে পৌঁছেচি, যেখানে দুখানা-হাতে আর চলে না। আরও দুখানা হাতের সাহায্য চাই। সেই জন্যেই তোমাদের বিরক্ত করতে আসা।

আর কিছু বলিবার পূর্ব্বেই মাধবী উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং সুনন্দার নিকটে গিয়া বলিল—আমায় আগেই ডাকলে না কেন বৌদি? ভারী অন্যায় তোমার!

তাহার কথার উত্তরে কিছু না বলিয়া সুনন্দা আমার প্রতি চাহিয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল—কবিতা পড়ার হয়ত ব্যাঘাত ঘটালাম। কিছু মনে কোরো না

বলিলাম—বিলক্ষণ! ব্যাঘাতের পিছনে যে সুস্বাদু সম্ভাবনা রয়েছে তাও ত বড় কম নয়।

তাহারা দুইজনে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। আমিও বই বন্ধ করিলাম। সাংসারিক কথা উঠিল; প্রথমে আমার, তারপর সুরথ বাবুর। ক্রমে মাধবীর কথা

সুরথ বাবু বলিলেন—ঠিক নিজের ছোট বোনের মতো কোরেই ওকে মানুষ করেছি। শিক্ষা-দীক্ষায়, বিদ্যা-বুদ্ধিতে ওকে কারুর চেয়ে ছোট কোরে তৈরী করি নি। কিন্তু তবুও ওকে যে কেমন কোরে মনোমত পাত্রে বিবাহ দিয়ে সংসারী করব তা কিছুতেই ভেবে পাইনে শৈলেশবাবু।

বোধ করি তাঁহার কথা আমার মুখে-চোখে যে বিপুল বিস্ময় জাগাইয়া তুলিয়াছিল তাহা তিনি লক্ষ্য করিলেন, মৃদু হাসিয়া বলিলেন—আপনাকে আজো কিছু জানানো হয় নি, তাই আপনি অবাক হ'য়ে গেছেন। হবারই কথা। মাধবী আমার সম্পর্কে কেউ হয় না। ওকে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনেছিলাম। এই বলিয়া ধীরে ধীরে মাধবীর জীবনের পাতাগুলি আমার সম্মুখে মেলিয়া ধরিলেন। যাহা বলিলেন, তাহা সংক্ষেপে এইরূপ—

তাঁহাদের গ্রামে এক দরিদ্র পরিবার বাস করিত। স্বামী এবং স্ত্রী। স্বামীর পূর্ব্বপুরুষের অবস্থা হয়ত এক কালে ভালই ছিল; এখন কিন্তু অভাব-অনাটনে তাহা তাহার জীর্ণ বাড়ীটির মতোই করুণ হইয়া উঠিয়াছিল। অস্বচ্ছলতাকে কেন্দ্র করিয়া স্বামী-স্ত্রীতে প্রত্যহই তুমুল বিবাদ বাধিত; এমত অবস্থায় বিবাহ করা যে তাহার অত্যন্ত লজ্জার কাজ হইয়াছে তাহা স্ত্রী স্বামীকে প্রত্যহই শুনাইয়া দিতেন। শুনিতে শুনিতে একদিন রাত্রি-শেষে বার দুই ভেদ বমির পর স্বামী চক্ষু বুজিলেন; এবং তাহার পরদিন হইতে স্ত্রীকেও সে গ্রামের মধ্যে কোথাও দেখিতে পাওয়া গেল না। দুইজনে দুইদিকে প্রস্থান করিল—রহিল শুধু তাহাদেরই কীর্ত্তি-গাথা বুকে আঁকিয়া—তিন বছরের একটি মেয়ে। সুরথবাবুর মা তাহাকে নিজের বাড়ীতে আনিয়া দাসীদের জিম্মায় রাখিলেন। সেই হইতেই মাধবী সুরথবাবুর কাছে মানুষ হইয়াছে।

কাহিনী শেষ করিয়া তিনি বলিলেন—যতই কেন না ওকে আপনার মতো ক'রে দেখি, পরের সঙ্গে ওর সম্বন্ধ স্থাপনের বেলায় এ-কথা ত চেপে রাখতে পারিনে। তাই, এ-সব শুনে আজ পর্য্যন্ত কেউ-ই ওকে গ্রহণ করতে রাজী হয়নি। অমন সর্ব্বসুলক্ষণা মেয়ের কপালে কি দোষে যে ভগবান এত বড় অভিশাপ এঁকে দিলেন, তা কিছুতেই ভেবে পাই না।

সুরথবাবুর শেষ কথায় আমার হাসি আসিল। কতকগুলা অন্ধ-আচারের অধীন হইয়া মানুষের মনুষ্যত্বের প্রতি যে বিচার-বুদ্ধিহীন অপমান আমরা প্রতিনিয়ত নিক্ষেপ করি, সে ত আমাদের নিজের হাতে তুলিয়া দেওয়া ক্ষমাহীন বিধান,—তাহার মধ্যে ভগবানের হাতের স্পর্শ ত কোথাও এতটুকুও দেখিতে পাই না!

উদ্যত-কথাটা চাপিয়া গিয়া প্রশ্ন করিলাম—মাধবী তার জীবনের এ-সব কথা জানে?

—হাঁ। মা মারা যাবার পর ওকে সমস্তই বলতে হয়েছে।

সে-রাত্রে আহারাদির পর বহুক্ষণ অবধি মাধবীর কথা মনের মধ্যে আনাগোনা করিতে লাগিল। অর্দ্ধস্ফুট রজনী-গন্ধার মতো নিষ্কলঙ্ক এই যে মেয়েটি, ভবিষ্যতে হয়ত সারা জীবন ইহাকে পথ অতিক্রম করিতে হইবে—এক সীমাহীন বিদগ্ধ মরু-প্রান্তরের মধ্য দিয়া, যেথায় না আছে আকাশের এতটুকু বর্ণরাগ, না আছে সার্থকতার এক ফোঁটা তৃপ্তি! এই যে কোমল নমনীয় পুষ্পটি রুক্ষ মরুতাপে ঝলসিয়া মরিয়া যাইবে, তাহার জন্য এতটুকু পাপও কি এ সংসারে কাহাকেও স্পর্শিবে না? মনে হইয়াছিল সুরথবাবুকে বলি—যাহারা নিজেদের পুঞ্জীকৃত দুষ্কৃতির ভার ইহার উপর চাপাইয়া দিয়া প্রস্থান করিল, তাহাদের কৃতকর্ম্মের জন্য ক্লেদ-কলুষ-হীন ইহার জীবনকে নষ্ট করিব কোন্ অপরাধে এবং নিজেদের কোন্ শুভ-বুদ্ধির প্রেরণায়? যাহার জন্য সে নিজে এতটুকুও

দায়ী নয়, তাহার জীবনের সেই অবাঞ্ছিত দিকটাকেই চিরকাল বড় করিয়া দেখিব, আর যে আজ এতদিন ধরিয়া শোভার সম্পদে নিজের জীবনকে অপার্থিব মহিমায় সমুন্নত করিয়া তুলিল, তাহার সেই নব-জাগ্রত নারীত্বকে সম্মানের আসন পাতিয়া দিবার স্থান কি সমাজের কোথাও এতটুকুও খুঁজিয়া পাইব না?

মন্থর গতিতে সময়ের চাকা ঘুরিয়া চলিয়াছে; তাহারই সহিত আমার নির্ব্বিকল্প দিনগুলা। গতকালের সহিত আগামী কালের যে কোন প্রভেদ থাকিবে না, এই সহজ সত্য যেন গা-সওয়া হইয়া গিয়াছিল। প্রত্যহ সকালে যখন ঘুম ভাঙিয়া যায়, মাথার শিয়রের জানালার বাহিরে কোন্ অদৃশ্য বৃক্ষ-নীড় হইতে পক্ষী-শাবকদের পরিচিত কল-কাকলী শুনিতে পাই। বিছানা হইতে উঠিয়াই সম্মুখের দেওয়ালে-টাঙানো ছবিখানির উপর প্রত্যহ-ই দৃষ্টি পড়ে;—প্রার্থনারতা মেয়েটির মুখের অভিব্যঞ্জনার কোথাও কিছুমাত্র ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায় না। কিছুক্ষণ পরেই চা ও জলখাবার হাতে তেমনি ভাবহীন মুখ লইয়া মাধবী প্রত্যহ ঘরে প্রবেশ করে; প্রত্যহই আমার অজস্র প্রশ্নের উত্তরে তার সেই স্বল্পবাক্ উত্তরগুলি কোনদিনও এতটুকুও দীর্ঘতর হয় না। আমার দিক হইতে তাহার সহিত ঘনিষ্ঠতা করিবার সকল চেষ্টাকে সে যেন দুইহাত দিয়া বহুদূরে সরাইয়া দেয়। একান্ত নিকটে পাইয়াও মনে হয়, সে যেন কোন্ এক অনধিগম্য-রাজ্যের প্রাণী, যেখানে পৌঁছানো আমার পক্ষে কোনদিনই সম্ভব নয়। তাহার অন্তরের এই সঙ্কুচিতা বৈরাগিণীকে আমি চিনি; তাই তাহাকে ভুল বুঝিয়া দোষারোপ করিও না। তাহার সুমিষ্ট ব্যবহারটুকুকে সম্ভ্রম করিয়া চলি।

সহসা আমাদের জীবনের এই সুনিয়ন্ত্রিত এবং বৈচিত্র্যহীন স্রোতের মধ্যে ভাবান্তর দেখা দিল, এবং তাহা প্রকাশ পাইল—সুনন্দার ব্যবহারে। তাহার দৃষ্টি যেন আজকাল বিশেষ তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে; মাধবীর প্রতি তাহার নিত্যকার আচরণ কঠিন হইতে কঠিনতর হইয়া উঠিতেছে।

সেদিন দ্বিপ্রহরের সুদীর্ঘ অবকাশকে কেমন করিয়া কাটাইব ভাবিতেছি, দ্বারের মুখে দৃষ্টি পড়িতে দেখিলাম, মাধবী ঘরে প্রবেশ করিতেছে। এমন সময় কী কাজে সে আমার কাছে আসিতে পারে তাহা ভাবিয়া পাইলাম না; বিছানা হইতে উঠিয়া বসিয়া তাহার পানে সপ্রশ্ন নয়নে তাকাইলাম।

হাতের গ্লাসটি তেপায়ার উপর নামাইয়া রাখিয়া মৃদুকণ্ঠে মাধবী বলিল—বৌদি আমের সরবৎ ক'রেছেন; পাঠিয়ে দিলেন।

বটে? তাই নাকি,—বলিয়া উঠিয়া আসিয়া গ্লাসটা মুখের কাছে ধরিয়া বলিলাম—বাঃ, কি মিষ্টি গন্ধই বেরিয়েছে! সুরথবাবু ফিরেছেন নাকি?

—না, দাদা এখনো আসেন নি।

পুনরায় প্রশ্ন করিলাম—তোমাদের খাওয়া দাওয়া হ'য়ে গেছে।

উত্তর আসিল—না, এইবার হবে।

বলিলাম—সুরথবাবুর কাছে শুনছিলাম, তোমার নাকি বই পড়বার খুব আগ্রহ। আমার কাছে কতকগুলো বই আছে; দেখো, ওর মধ্যে যদি কিছু নিজের কাজে লাগাতে পারো।

আচ্ছা, বলিয়া মাধবী দরজার দিকে পা বাড়াইল।

ইহার পর তাহাকে আর কি কি প্রশ্ন করিয়া আরও কিছুক্ষণ ধরিয়া রাখিতে পারি, তাহাই ভাবিতেছিলাম; সহসা বলিলাম—তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করবার আছে। আচ্ছা, মাধবী! তুমি কি আমাকে ভয় করো?

দুইচোখ মেলিয়া মাধবী বলিল—এমন প্রশ্ন কেন করছেন?

বলিলাম—কথাটা তোমাকে অনেকদিন ধ'রেই বলব মনে করছিলাম। আমি দেখেছি, তুমি প্রাণপণ চেষ্টায় আমার কাছ থেকে দূরে স'রে থাকতে চাও। আমার প্রতি তোমার এ অহেতুক ত্রাসের কি কোন কারণ আছে?

আমার সহিত দৃষ্টি মিলিত হইতেই মাধবী তাহার

চোখদুটী নামাইয়া লইল; মুহূর্ত্তকাল কি চিন্তা করিল, তারপর অস্ফুট-স্বরে বলিল—আপনাকে ত ভয় করি না।

বলিলাম—তাহলে—

অসমাপ্ত কথার মাঝেই সুনন্দা ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। একবার আমার প্রতি, আর একবার মাধবীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে উদ্দেশ করিয়া হাসিয়া বলিল—ওগো মেমসাহেব! ডেকে ডেকে যে সাড়াই পাওয়া যায় না। ভজুয়াকে খেতে দিবে হবে না? এটুকু কাজও কি তোমার কাছ থেকে আশা করতে পারি না?

চাহিয়া দেখিলাম, মাধবীর সমস্ত মুখ হইতে মুহূর্ত্তের মধ্যে রক্তের শেষ-বিন্দুটি পর্য্যন্ত কে যেন শুষিয়া লইয়াছে! ধীরে ধীরে সে দ্বারের বাহিরে অদৃশ্য হইয়া গেল।

কয়েক মিনিট নীরব থাকিয়া বলিলাম—সহসা কোন অপরাধে যে মাধবী মেমসাহেব ব'লে অভিহীত হ'ল, তাত বুঝলাম না! ডেকে সাড়া না পেলেই কি মানুষ মেমসাহেব হ'য়ে ওঠে নাকি?

হাসিতে হাসিতেই সুনন্দা বলিল—মেমসাহেব নয়? পুরুষদের সঙ্গে ব'সে ইংরেজী পদ্য পড়ে, মিসনরী স্কুলে গিয়ে সাহেবদের সঙ্গে একলা দাঁড়িয়ে কথা কয়, সেমিজ, ব্লাউজ, জুতো ছাড়া একদণ্ড চলে না,—এসব বিবিয়ানা নয়ত কি?

হাসিয়া বলিলাম—হঠাৎ তুমি যে কবে এত বড় গোঁড়া হিঁদু হ'য়ে উঠ্‌লে, তা ত জানি না। দরকার হ'লে ও-সব ত তুমিও পারো।

সুনন্দা বলিল—থাক্, আর চাটুবৃত্তিতে কাজ নেই। আমি কি পারি-না-পারি তা মহাশয়ের যে বিলক্ষণ জানা আছে, তা আমি জানি।

তাহার কথার ভঙ্গীতে হাসিয়া উঠিলাম। উত্তরে একটা কথা মুখে আসিয়াছিল; কিন্তু তাহা বলা সমীচীন হইবে কিনা ভাবিতে ভাবিতে হাতের বইখানা নাড়াচাড়া করিতে লাগিলাম।

বইখানার প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই সুনন্দা বলিল—কবিতার বই বোধ হয়। এতক্ষণ পড়ছিলে বুঝি? পড় না একটু শুনি। এই বলিয়া সম্মুখের সোফার উপর আধ-শোয়া অবস্থায় বসিয়া পড়িল।

তাহার প্রতি চাহিয়া বলিলাম—কবিতার বই বটে, তবে এতক্ষণ যে পড়ছিলাম, তোমার এ অনুমান ভুল। কিন্তু এখন তোমাকে কাছে পেয়ে আর কবিতা প'ড়ে সময়টা নষ্ট করতে ইচ্ছে করছে না।

আমার কথা কানে যাইবামাত্র সুনন্দা উঠিয়া বসিয়া তাহার দুই চোখ বড়ো করিয়া আমার পানে চাহিল। বলিলাম—ভয় পেয়ো না। বলছি যে, তোমার মুখের গল্প শুনতে আমার ভারী লাগে। মনে নেই, ছোট-বেলায় তোমায় একদিন বলেছিলাম যে, তোমার মুখের গল্প শুনতে শুনতে আমি সারাজীবন কাটিয়ে দিতে পারি?

সুনন্দার মুখের চকিতভাব ধীরে ধীরে অপসৃত হইয়া গেল; ঠোঁটের দুই কোণে স্বল্প একটু চাপা হাসি যেন উঁকি দিয়া মিলাইয়া গেল; পরক্ষণেই সে বলিল—আমার কাছে কবিতা না-হয় নাই পড়লে, তার জন্যে অত অছিলা ত তোমার কাছে চাই নি। পুরাকালে কবে আমায় কি বলেছিলে তা মনে ক'রে রাখ্‌বার মতো অপর্য্যাপ্ত স্মরণ-শক্তি আমার নেই!

এতক্ষণে তাহার ক্রোধের হেতুটা আমার কাছে স্বচ্ছ হইয়া গেল। বিস্মিত হইলাম, এবং সেই সঙ্গে একটা কৌতুকও অনুভব করিলাম। বলিলাম—যাক্। আর রাগারাগি করে কাজ নেই। শীঘ্রই এইবার আমার রওনা হ'তে হবে, সুতরাং যাবার আগের দিনগুলো আর ঝগড়ায় তেতো ক'রে তুলো না! এ-কদিন আমার জন্যে যা করলে তুমি, তোমার সে অপরিশোধ্য ঋণের কথা চিরদিন আমি মনে করব। তোমার যত্ন—

কথা শেষ হইল না; সুনন্দা প্রশ্ন করিল—কবে যেতে হবে?

—তার ঠিক নেই। হুকুম এলেই ষ্টার্ট্ করতে হবে।

—এরপর কি কলকাতায় ফিরবে? না, অন্য কোথাও?

—প্রথমে কলকাতায় যাবো। তারপর সেখান থেকে হুকুম হলেই আবার নতুন জায়গায় রওনা হ'তে হবে।

—এ-কাজের এই কি চিরদিনের ধারা?—এমনি ক'রে এখান-থেকে-ওখান, এই ক'রে বেড়ানো?

—হ্যাঁ। আমার যা কাজ তার এই চিরদিনের ধারা; এমনি ক'রে এখান-থেকে-ওখান, এই ক'রে বেড়ানো।

—তাহলে চিরকাল এমনি ঘুরে-ঘুরেই বেড়াবে?—সংসারী হ'তে হবে না?

হাসিয়া বলিলাম—দরকার কি? এই ত বেশ আছি।

—তা আছো। কিন্তু কী অলীক আকাশ-কুসুম রচনা কোরেই দিন কাটাতে পারো তোমরা!! আশ্চর্য্য হ'য়ে যাই তাই ভেবে। যা কোনদিন পাও নি, হয়ত পাবেও না কোনদিন—তাকেই একেবারে আপনার ক'রে নিয়ে খুশীর স্বর্গ তৈরী করো। যা তোমরা নও, নিজেদের অনুক্ষণ তোমরা তাই ভাবো।

সুনন্দার উত্তপ্ত কথার ধারা কোন পথ দিয়া প্রবাহিত হইতেছে তাহা বুঝিতে আমার একতিলও বিলম্ব হইল না; বলিলাম—কথাটা তোমার ঠিক। কবি বলেছেন—We pine for what we are not; ওটা পুরুষের প্রাণ-ধর্ম্ম। তার মন থেকে idealism-এর এই অনুভূতি যখন মুছে যাবে তখন জগতের সমস্ত রস এবং কাব্যের উৎস বাষ্প হ'য়ে উবে যাবে।

সুনন্দা বলিল—ছাই অনুভূতি! ও ত কেবল ফাঁকি দিয়ে মানুষের মন গলানোর ফন্দী! নিজেরাও ঠকে, পরের চোখেও ধাঁধাঁ লাগিয়ে দেয়!

ইহার উত্তরে কোন কথা বলিতে গেলে তর্ক ব্যক্তিগত আলোচনায় পরিণত হইবার সম্ভাবনা; কাজেই চুপ করিয়াই রহিলাম। কিছুক্ষণ নীরবে কাটিয়া গেল।

সহসা সুনন্দা বলিয়া উঠিল—আচ্ছা, রমেন-দা'কে চেন ত?

প্রশ্ন শুনিয়া মুখ তুলিলাম; বলিলাম—কোন্ রমেনদার কথা বলছ? তোমার মামাতো ভাই?

—হ্যাঁ। রমেন-দা আরও পাঁচটা নেই। ছেলেবেলার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, কিন্তু দুজনে একসঙ্গে দুবছর বিলাতে কাটালে, আর এখন চিন্‌তেই এত দেরী হচ্ছে!

মনে পড়িয়া গেল। বলিলাম—কিন্তু দুজনে একসঙ্গে দুবছর কেন, দুদিনও কাটাইনি সেখানে! সে থাকতো লণ্ডনে আর আমি থাকতাম গ্লাস্‌গোয়। দুটো স্থানের ব্যবধান বড়ো কম নয়। তবে হ্যাঁ, ল্যাণ্ড্‌লেডীর মেয়ের সঙ্গে লণ্ডনে বেড়াতে এলেই তার সঙ্গে দেখা করতাম বটে! শুনলাম, সে নাকি ডেন্‌টিষ্ট হ'য়ে ফিরে এসেছে?

আমার শেষ-প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া আপন মনেই সুনন্দা বলিল—ও, সে বুঝি ল্যাণ্ডলেডীর মেয়ে! তার কথাই জান্‌তে চাইছিলাম। তা, এখনো তাকে খরচ পাঠাতে হয় ত? কত ক'রে পাঠাও?

সহসা তাহার প্রশ্নে বিমূঢ় হইয়া গেলাম। বলিলাম—তার মানে?

—মানে বোঝা কি এতই শক্ত? রমেনদার কাছে সব শুনেছি। তিনি ফিরে এসেই আমাদের কাছে সব কথা ব'লে দেন। তুমি ত সেই মেয়েটিকেই—। কথাটা সে শেষ করিতে পারিল না; বোধ করি বা প্রগাঢ় লজ্জায় তাহার চোখ-মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল।

সহসা আকস্মিক বজ্র-পাতের ন্যায় এই নিদারুণ মিথ্যা কথায় কিছুক্ষণের জন্য আমার বাঙ্ নিস্পত্তি হইল না। রমেনকে আমার একজন হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু বলিয়াই জানিতাম। অবলীলাক্রমে এতবড় একটা মিথ্যা কথা প্রচার করিয়া তাহার যে কী ইষ্টসিদ্ধি হইল তাহা ত ভাবিয়া পাই না। হয়ত কোন গূঢ় দুরভিসন্ধি লইয়া সে এ কাজ করে নাই; হয়ত ইহা তাহার নিছক মস্তিষ্কহীনতার পরিচয়। তা সে যাহাই হোক, ক্ষতি যা হইবার তাহা ত হইয়াছিলই।

মুখ তুলিয়া দেখিলাম—সুনন্দা বাহির হইয়া যাইতেছে। একবার ভাবিলাম, তাহাকে ডাকিয়া তাহার মন হইতে এই জঘন্য ভ্রান্ত ধারণা বিদুরিত করিয়া দিই। পরক্ষণেই মনে হইল, কিন্তু তাহার কাছে আমার এই সাফাই-এর আজ কি আর কোন প্রয়োজন আছে? তাহার সমক্ষে নিজের কৈফিয়তের ভারে শুধু কি নিজের দুর্ব্বলতার বোঝাই ভারী করিয়া তুলিব না?

সুনন্দা প্রস্থান করিল, সম্পূর্ণ এক নূতন চিন্তা-তরঙ্গে আমাকে ডুবাইয়া দিয়া; আর আমি বসিয়া রহিলাম, সেই

তরঙ্গ-ক্ষুব্ধ সমুদ্রের গভীরতা পরিমাপ করিবার চেষ্টায় নিযুক্ত হইয়া।

সহসা মনে হইল—নিজেকে যে এতখানি বিপর্য্যস্ত মনে করিতেছি, তাহা হয়ত নিছক কোন কাল্পনিক ক্ষতির আঘাত স্মরণ করিয়াই। রমেন যাহা করিয়াছে, তাহা কি সত্যই আমার জীবনে বিশেষ কোন অপরিপূরণীয় ক্ষতি বহন করিয়া আনিয়াছে? নিজের অন্তরের মধ্যে তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলাম; কিন্তু কৈ, সেখানে কোন গভীর বেদনার স্থায়ী নিদর্শন ত খুঁজিয়া পাইলাম না। মনে হইল—আমার সম্বন্ধে রমেনের মিথ্যাকথা সুদূর অতীতে যে অনিষ্ট সাধন করিয়াছিল, তাহাই হয়ত নিজেরই অজ্ঞাতে অচির ভবিষ্যতের বৃহত্তর ইষ্টের ইঙ্গিত বহন করিয়া আনিয়াছে! সংসারে এমনি ত কতই প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আজ যাহা চরম অভিশাপের কাঁটা হইয়া অহরহ প্রতি অঙ্গে বিঁধিতেছে, কাল তাহাই হয়ত সবার অলক্ষ্যে পরম সাধনার ফুল হইয়া ফুটিয়াছে!

মনের মধ্যে এক অকল্পিত স্নিগ্ধতা অনুভব করিতে লাগিলাম। বোধ হইল যেন, নব-বসন্তের প্রথম দক্ষিণ-বায়ে অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে বহুদিনের জর্জ্জরিত জীর্ণ পত্রগুলি উড়িয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

•

সেদিন দ্বিপ্রহরের পরেই বাড়ি ফিরিলাম।

ঘরে ঢুকিতে গিয়া বাধা পাইলাম। ভিতরে আমার বই-এর আল্‌মারিটা খোলা; এবং তাহারই সম্মুখে বসিয়া মাধবী একমনে বোধকরি বইগুলিই নাড়া-চাড়া করিয়া দেখিতেছে। মেঘের মতো ঘন-চুল তাহার পিঠ ছাইয়া পড়িয়াছে। গায়ের কাপড় বিস্রস্ত।

দৃশ্যটি মনের মধ্যে এক অনির্ব্বচনীয় পুলকের সৃষ্টি করিল। মনে হইল যেন বিশ্বমানবের প্রতীকরূপে, যুগ-যুগ ধরিয়া, এই ছবিই আমি কল্পনা করিয়া আসিতেছি,—নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরের এমনি-তর মায়া-মোহ, কর্ম্ম-শ্রান্ত পুরুষের এমনি অসময়ে গৃহাগমন, ঘরের ভিতর মঞ্জুভাষিণী প্রিয়তমার এমনি অকুণ্ঠ ভঙ্গী—

স্বপ্ন ভাঙিল, যখন দেখিলাম ত্রস্তা মাধবী উঠিয়া দ্বার-প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে; দরজার মুখ বন্ধ করিয়া আমার দাঁড়াইয়া থাকার দরুণ বাহিরে আসিবার পথ খুঁজিয়া পাইতেছে না।

বলিলাম—আমার অনুপস্থিতিতে তুমি ওই বইগুলো দেখছিলে ব'লে লজ্জিত হবার কোন কারণ নেই। বইগুলো আর কেউ যত্ন ক'রে দেখছে বা তাদের কদর বুঝ্‌ছে—এ জেনে আমার আনন্দ হওয়াই উচিৎ। যাই হোক, উপস্থিত আমি বড়ো তৃষ্ণার্ত্ত! সুনন্দাকে গিয়ে বলো, আমায় একটু সরবৎ কিম্বা ওই গোছের কিছু—

কথা শেষ করিবার আগেই মাধবী ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। জামা-কাপড় ছাড়িয়া সোজা বিছনায় গিয়া শুইয়া পড়িলাম। এমন পরিপাটি করিয়া শয্যা রচনা করিতে সুনন্দার আর জুড়ী পাইলাম না; শ্রান্তি যেন নিজেই তাহার উপর অলস হইয়া ঘুমাইয়া পড়ে। দেখিলাম—আজ যেন ঘরের সাজ-সজ্জারও বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি সাধন করা হইয়াছে। সামান্য-কিছু-অদল-বদল করিয়া ঘরখানিকে নূতন করিয়া সাজানোর ভিতর একটি সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্য-বোধের পরিচয় পাইলাম। একএক জন এমন মানুষ থাকে, যাহার হাতের স্পর্শে সকল বস্তুই সৌন্দর্য্যের তীরে গিয়া উত্তীর্ণ হয়; সুনন্দা সেই রকম নারী।

মিনিটদশেক পরে একটা বড়ো কাঁচের গ্লাস হাতে লইয়া যখন মাধবী ঘরে প্রবেশ করিল তখন সত্যই একটু বিস্মিত হইলাম! সহসা সুনন্দা এতখানি উদার হইয়া উঠিল কেমন করিয়া?

মাধবীর হাত হইতে গ্লাসটি লইয়া বলিলাম—আঃ! আজকের সরবৎটাও ঠিক সেদিনকার মতো হয়েছে! সুনন্দা কি করছে?

মৃদুকণ্ঠে মাধবী বলিল—বৌদি বাড়ীতে নেই। দাদার বন্ধু ব্রজেনবাবুর মেয়ের আজ বিয়ে কি না, তাই সেখানে গিয়েছেন।

—কখন গেছে?

—ভোর বেলা। আপনি বেরিয়ে যাবার পরেই।

ইহার পর আর, কি জানি কেন, বলিবার মতো কোনকথাই

খুঁজিয়া পাইলাম না। কল্পনায় যাহা স্মরণ করিয়া আনন্দে উদ্বেলিত হইয়া উঠি, বাস্তবের মাঝে তাহাকেই যখন পাই তখন আমাদের অসহায়তার আর সীমা থাকে না,—মানুষের অন্তর বাহিরের এমনিই প্রভেদ! সারাক্ষণ কেবলই মনে হইতে লাগিল, আজ এই প্রকাণ্ড বাড়ীটায় শুধু আমরা দুইজন আছি; এই বাড়ীর বাহিরে আর-একটা জগৎ বলিয়া কোন কিছুই নাই; এই জনহীন জগতে আমরা দুইটী প্রাণী যেন নীড় বাঁধিয়া যুগ-যুগান্তর ধরিয়া বসবাস করিতেছি! স্নান-আহার শেষ করিয়া যখন নিজের শয্যার উপর আসিয়া বসিলাম তখন আমার নিখিল জগৎ ব্যাপিয়া এক অশ্রুতপূর্ব্ব আনন্দ-রাগিণী উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে! আজিকার এই অমৃত-স্বাদী অন্ন-ব্যঞ্জন, এই শুভ্র-শয্যা, ঘরের মধ্যেকার তুচ্ছতম বস্তুটি পর্য্যন্ত যাহার হাতের স্পর্শে এমন রমণীয় হইয়া উঠিয়াছে, সেই সুদূর-চারিণীকে আজ যেন নূতন করিয়া অনুভব করিতে লাগিলাম। আমার এই মৌনকে মাধবী কি ভাবে গ্রহণ করিল, জানি না, কিন্তু দেখিলাম, আজ একটি দিনের জন্য সে যে অধিকার লাভ করিয়াছে তাহার ব্যবহারে তাহার কোন সঙ্কোচ নাই, অনভ্যস্ততার কোন ত্রুটি নাই; একান্ত সহজ এবং স্বাভাবিক ভাবেই সে তাহার সকল কর্ম্ম সমাপন করিল।

কোমল বিছানার উপর গা মেলিয়া দিতেই দুই চোখ মুদ্রিত হইয়া আসিল। সর্ব্বদেহ কী এক বিপুল আবেশে মগ্ন হইয়া গেল। শিথিল মন বহুক্ষণ অবধি পাশের কক্ষে কর্ম্মনিরত লঘুছন্দা মেয়েটির সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

সুনন্দার মধ্যে একটা রুদ্র অস্থিরতা লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। যাহাকে চিরদিন করুণার পাত্র রূপেই দেখিয়া আসিয়াছি সে-যখন আমার সম্পদটিকে জয় করিয়া লইবার উপক্রম করে তখন নিজের গর্ব্ব, নিজের পৌরুষ রক্ষা করিবার জন্য মানুষের আত্মঘাতী যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার সময় মনের মধ্যে যে ভাব উপস্থিত হয়, সুনন্দার ব্যবহারে যেন সেই উগ্রতাকে প্রত্যক্ষ করিলাম।

সেদিন সন্ধ্যার সময় সুরথ বাবুর পড়িবার ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম—ভ্রাতা-ভগ্নীতে মিলিয়া একাগ্র-চিত্তে কিসের আলোচনায় মগ্ন হইয়া গিয়াছেন। সময় পাইলেই, সন্ধ্যার পর এই কক্ষের এই ক্ষণটুকু আমায় আকর্ষণ করিত; এবং সুরথ বাবুর সহিত যখন নানা বিষয়ের আলোচনায় যোগদান করিতাম তখন প্রায় সকল সময়েই মাধবীও সেখানে উপস্থিত থাকিত। ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিলাম—আজকের সভায় কাকে উপস্থিত করা হয়েছে?

সুরথবাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন—শোপেন্‌হাওয়ার। মাধবী আজ বড় একগুঁয়ের মতো তর্ক করছে। Essays on Womenকে মাধবী কিছুতেই নিরপেক্ষ প্রবন্ধ ব'লে বিবেচনা করতে চাইছে না।

হাসিয়া বলিলাম—কেন?

—ও বলছে, ভিনিসীয় মেয়েটি তাঁকে প্রত্যাখান ক'রে যদি না বায়রণকে গ্রহণ করত তাহলে কখনই Essays on Women লেখা হ'ত না; সুতরাং ওর পশ্চাতে একটা বিশেষ উদ্দেশ্য রয়েছে, এবং সেই ব্যক্তিগত বিদ্বেষের প্রেরণায় লেখা যে প্রবন্ধ তাকে নিরপেক্ষ ভাবে আলোচনা করা যেতেই পারে না।

একবার মাধবীর দিকে চাহিয়া সুরথ বাবুকে বলিলাম—এর উত্তরে আপনার কি বলবার আছে, শুনি?

তিনি হাসিয়া বলিলেন—ওঃ, আপনিও ওই দলে! তাহলে ও-আলোচনা আজ মুলতুবী থাক্; বরঞ্চ কিছু পড়ুন, শুনি।

মাধবীর দিকে ফিরিয়া সহাস্যে বলিলাম—এমন স্পষ্ট-ভাবেই উনি যখন হার স্বীকার করলেন তখন আর এ আলোচনা না চালানোই ভাল। কী বল?

মাধবী মাথা নীচু করিয়া বলিল—হার-জিতের জন্যে আমরা কেউ-ই ব্যস্ত হই নি। আপনি না এলেও আলোচনা ওইখানেই শেষ হ'য়ে যেত।

বলিলাম—তা ত যেতই। কারণ তুমি একাই ত সে-আলোচনাকে সমাপ্তির পথে টেনে এনেছিলে; সুরথ বাবু যে দলবৃদ্ধির কথা বলছিলেন, তার ত কোন প্রয়োজনই হয় নি।

ইহার উত্তরে মাধবী চুপ করিয়াই রহিল এবং সুরথ বাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন—কেমন! এইবার উত্তর দাও!

হাসিয়া বলিলাম—এমন কিছু কথা নয় যে তার উত্তর

দিতেই হবে। যাহোক, এখন কিছু পড়া যাক। সুরথ বাবু, আজ আপনি পড়ুন। এই বলিয়া শেল্‌ফ্‌ হইতে ব্রাউনিং খানা পাড়িয়া তাঁহার হাতে দিলাম।

সুরথ বাবু বলিলেন—পাগল হয়েছেন! আপনার অমন সুন্দর পড়ার পর আমি শেষকালে লোক হাসাবো? আপনিই সুরু করুন।

সঙ্গে সঙ্গে মাধবীও নিম্নকণ্ঠে তাহার দাদার শেষ কথার পুনরাবৃত্তি করিল। ইহার পর আর কথা না বাড়াইয়া আরম্ভ করিলাম—Two in the Campagna!

'আমি যদি তোমার ইচ্ছাটিকে একান্ত আপনার করিয়া লইতে পারিতাম, তোমার দৃষ্টি দিয়া বিশ্বসংসারকে দেখিতে পাইতাম, আপনার হৃদয়ের স্পন্দনটিকে যদি তোমার সাথে মিলাইয়া দিতে পারিতাম, তোমার আত্মার নির্ঝর হইতে যদি আমার তৃষ্ণার বারি সংগ্রহ করিতে পারিতাম তাহা হইলে আমার জীবনের চরম আকাঙ্ক্ষাটি চরিতার্থ হইত! কিন্তু না। আমার কামনা উর্দ্ধমুখী! আমি তোমার স্পর্শখানিকে নিবিড়ভাবে অনুভব করিয়া পরক্ষণেই দূরে সরিয়া যাই; তোমার আত্মার উত্তাপটিকে নিজের হৃদয় দিয়া স্পর্শ করি, তারপরেই সেই পরম-মুহূর্ত্তটি দূরে বহুদূরে সরিয়া যায়! এই এখনিই ত সেই পরম-ক্ষণ হইতে আমি কতদূরে সরিয়া গিয়াছি! কিন্তু, চিরদিন ধরিয়া কি এমনি ছিন্ন পত্রের ন্যায় বাতাসে বাতাসে ভাসিয়া বেড়াইব? আমার লক্ষ্যের পথে কোন অচঞ্চল ধ্রুবতারা, বন্ধুর কল্যাণ-কামনার মতো, তাহার আলোক বিকীর্ণ করিবে না?'

পড়া চলিয়াছে, এমন সময় মুখের উপর কাল-বৈশাখীর আভাস লইয়া সুনন্দা ঘরে ঢুকিল। একবার এদিক-ওদিক ঘুরিয়া একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিল। কিয়ৎকাল হয়ত আমার পড়া শুনিল কিম্বা শুনিল না, ঠিক বলিতে পারি না,—তারপরেই উঠিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

পড়িতে পড়িতে মনে মনে একটু হাসিলাম। এ পর্য্যন্ত সকল ক্ষেত্রেই সে মাধবীকে বিধ্বস্ত করিয়া আসিয়াছে; কিন্তু সম্প্রতি, সুরথ বাবুকে সম্মুখে রাখিয়া আমরা দুই জনে যে নব-নির্ম্মিত দুর্গটি গড়িয়া তুলিয়াছিলাম তাহার ভিতর প্রবেশের কোন পথই সে যেন খুঁজিয়া পাইতেছে না।

পরদিন সকালে বাহির হইবার পূর্ব্বে এক-মুখ হাসি লইয়া সুনন্দা ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল—আজ পারো ত একটু সকাল-সকাল ফিরো। বিকেলে একজন নতুন অতিথি আসচে, তার সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দেব।

বলিলাম—তাই নাকি! তা, এর জন্যে আর তাড়াতাড়ি কি? তিনি কি মাত্র এক-রাত্রির অতিথি যে, আলাপ করবার জন্যে আমায় খুব ত্বরায় বাড়ি ফিরতে হবে? জান ত আমার কাজের কী রকম চাপ পড়েছে? তাড়াতাড়ি কি, যখন তিনি আসচেন তখন আলাপ অবিশ্যি হবেই, আজ না-হয় কাল।

কথায় তোমার সঙ্গে কিছুতেই পারলাম না, বলিয়া হাসিতে হাসিতে সুনন্দা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

নদীর স্রোত দুর্জ্জয় হইয়া উঠিয়াছে। তাহারই মুখে বাঁধ বাঁধিতে হইবে। কাজের চাপও ছিল যেমনি প্রবল, তাহার দায়িত্বও ছিল তেমনি গুরুতর। সেদিনের মতো কাজ সাঙ্গ করিয়া যখন বাড়ি ফিরিলাম, তখন রাত্রি অনেকখানি অগ্রসর হইয়াছে। গেটের ভিতর প্রবেশ করিতেই, বাহিরের ঘর হইতে অপরিচিত কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিয়া কানে প্রবেশ করিল। বুঝিলাম—যাঁহার আসিবার কথা ছিল, তিনি আসিয়াছেন; এবং এতক্ষণে খাওয়া-দাওয়া সারিয়া আসর জমাইয়া তুলিয়াছেন।

দরজা ঠেলিয়া ঘরে প্রবেশ করিবার পরক্ষণেই অভাবিত বিস্ময়ের আতিশয্যে কিছুক্ষণের জন্য বাক্‌রোধ হইয়া গেল। নবাগতের অবস্থাও বোধ করি আমারই মতো হইয়াছিল; তিনিও কিছুক্ষণ পলক-হীন নেত্রে নির্ব্বাক হইয়া আমার পানে তাকাইয়া রহিলেন।

নিজেকে সম্বরণ করিয়া লইয়া বলিলাম—এঁরা সবাই মিলে যুক্তি ক'রে আমাদের দুজনকে অবাক ক'রে দিয়েছেন! দিন। তাতে আমাদের এই আকস্মিক মিলনের আনন্দ বাড়লো বৈ কমল না। এই বলিয়া অগ্রসর হইয়া গিয়া তাহার করমর্দ্দন করিলাম।

রমেন এইবার মাথা নাড়িয়া বলিয়া উঠিল—তা ঠিক। কিন্তু এরা বুঝি তোমাকেও আমার আসার কথা কিছু

বলে নি। আই সী। আমাকে শুধু বল্লে—সন্ধ্যার সময় একজন পরিচিত বন্ধুকে দেখতে পাবেন; কিন্তু আমি কিছুতেই গেস্ করতে পারি নি। তারপর খবর কি? এখানে কি সূত্রে?

সূত্রের কথা সংক্ষেপে বিবৃত করিলাম। রমেন তখন অনর্গল বকিতে লাগিল—জানেন সুরথ বাবু! এই শৈলেশ ছোকরা একেবারে অপদার্থ। বিলেত গেল, কিন্তু সেই যে বই নিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে বসল—বাস্! নড়চড় নেই! না দেখলে—লাইসীয়ামে নতুন নাটকের প্লে, না ভর্ত্তি হল কোন ক্লাবে, না কোথাও সঙ্গিনী নিয়ে এলো বেড়িয়ে! মাঝে মাঝে আসতো বটে, লণ্ডনে আমার সঙ্গে দেখা করতে, কিন্তু ওই পর্য্যন্তই! আচ্ছা শৈলেশ, কতগুলো ডিগ্রী সঙ্গে ক'রে এনেছিস—দুটো, তিনটে, চারটে, পাঁচটা?

তাহার কথার ভঙ্গীতে সুরথবাবু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন; সুনন্দাও মুখে কাপড় দিয়া হাসি চাপিতে লাগিল। কিন্তু আমার মন সহসা বিরক্তিতে পূর্ণ হইয়া উঠিল। মাধবী এতক্ষণ ধরিয়া এখানে বসিয়া আছে কী প্রয়োজনে? বিলাত প্রত্যাগত অভ্যাগতের মুখের হাল্কা গল্প শুনিবার মোহ কি তাহার মধ্যেও আছে?

শ্রান্তির অজুহাত দিয়া ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলাম। রমেনের উপর অন্তরের বিরূপতার আর অবধি রহিল না। মনের মঞ্জুষায় এতদিনের সঞ্চিত মাধুর্য্য এক নিমেষে অপরিসীম তিক্ততায় ভরিয়া উঠিল।

পরদিন রমেনের সহিত একত্রে আহার করিলাম। মাধবী আমাদের পরিবেশন করিল। কথায় কথায় জানিলাম—রমেন কলিকাতায় এক ফিরিঙ্গী ডাক্তারের সহিত মিলিত হইয়া একটি দাঁতের ডাক্তারখানা খুলিয়াছে, এবং অতি-আধুনিক সভ্যতা বিলাসের কৃপায় তাহাদের চিকিৎসালয়ে রোগীর অভাব হইতেছে না। কয়েকদিনের অবসর লইয়া সে এখানে বেড়াইতে আসিয়াছে।

ইহার পর দুইদিন আমার স্নানাহারের সময় রহিল না। নদীর দুর্ব্বার খর-স্রোতের বিরুদ্ধে মিস্ত্রির দল কিছুতেই বাঁধের শেষ স্তম্ভ গাঁথিতে পারিতেছে না; তাই আমাকে দিন-রাত্রির প্রায় সকল সময়ই নদীতীরেই অতিবাহিত করিতে হইতেছে। ইহা ভালই হইয়াছে যে, কাজের মধ্যে নিজেকে এমন করিয়া সারাক্ষণ ডুবাইয়া রাখিতে পারিয়াছি। অবাধ্য নদীর দুরন্ত স্রোতের মুখে বাঁধন দেওয়াই আমার কাজ, হৃদয়ের ব্যাপারে অনর্থক মস্তিষ্ক আন্দোলিত করিয়া বৃথা কালক্ষেপ করা আমায় নয়। যে কয়দিন এমনিই নষ্ট হইয়াছিল তাহারই ক্ষতি-পূরণের জন্য দ্বিগুণ উৎসাহে লাগিয়া গেলাম।

একাদিক্রমে সুদীর্ঘ আটচল্লিশ ঘণ্টা নদীতীরে কাটাইয়া মিস্ত্রিদের শেষ উপদেশ দিয়া শেষ-রাত্রে বাড়ী ফিরিয়া এক দীর্ঘ ঘুম দিলাম। পরদিন অধিক বেলায় যখন ঘুম ভাঙিল তখন বিরামহীন কর্ম্মের উত্তেজনার পর নির্ব্বিশঙ্ক অবকাশের অবসাদে মন ভারী হইয়া উঠিয়াছে।

রমেন আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল; কহিল—ব্যাপার কি হে? দুদিন ধ'রে যে চুলের টিকি দেখতে পেলাম না! সুনো বলছিল—মাঝে মাঝেই নাকি এই রকম হয়। আচ্ছা কাজ নিয়েছ ত!

হাসিয়া বলিলাম—মেমের দাঁত দেখে পয়সা রোজগারের ভাগ্য ত সবাইকার হয় না ভাই! যার যেমন।

—হ্যাঁ, কী যে বলো তার ঠিক নেই! তোমার সঙ্গে আমার তুলনা! যাই হোক, কয়েকদিন ভারী চমৎকার কাটলো। আজ বিকেলে চলতি।

—আজই?

—হ্যাঁ ভাই। তাছাড়া কোথাও বেশী দিন আমি টিঁকে থাকতে পারি না, জানোই ত আমার স্বভাব।

মনে মনে বলিলাম—তা আর জানিনা? কিন্তু তোমার আকস্মিক আবির্ভাব এবং তিরোভাবের হেতুটা ত স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারিলাম না।

বৈকালে সুরথ বাবুর সহিত আমিও ষ্টেশনে গেলাম। গাড়ী আসিবার বিলম্ব ছিল। এক সময় রমেন আমায় একান্তে ডাকিয়া লইয়া গিয়া অন্যান্য পাঁচ কথার পর বলিল—দেখ্ শৈলেশ! এক এক সময় মানুষ হঠাৎ এমন একটা মন্দ কাজ ক'রে ফেলে, যা করবার জন্যে তার মনে এতটুকুও অভিসন্ধি কোনদিন ছিল না;—এর জন্যে পরে তার যথেষ্ট

অনুতাপও হয়; কিন্তু তবুও অপরাধের একটা গ্লানি তার অন্তরে থেকেই যায় চিরকাল। এ বড় অদ্ভুত। জানিস্, তোর সম্বন্ধেও আমি একদিন এমনি একটা অনর্থক অন্যায় কাজ করেছিলাম! আর তার জন্তে আজো আমার অনুতাপের অন্ত নেই।

সমস্তই বুঝিলাম। তাহার অন্তরের এই অকৃত্রিম ছবিখানি বড়ই সুন্দর লাগিল। তাহার দুই হাত ধরিয়া বলিলাম—আমি সব জানি। আমি সর্ব্বান্তকরণে বলছি, তার জন্তে তোর ওপর আজ আর আমার এতটুকুও রাগ নেই।

—সত্যি বল্‌ছিস? আঃ! বাঁচা গেল। ওই যে গাড়ী আসচে। চিরকাল তুই সেই একই রকম র'য়ে গেলি, আশ্চর্য্য! এমনি ভাবেই চিরদিন কাটাবি বোধ হয়? এখানে আর কতদিন আছিস? কলকাতায় যাবি কবে?

তাহাকে ট্রেনের কামরায় তুলিয়া দিয়া বলিলাম—কতদিন আছি, ঠিক বলতে পারিনা। তবে যাব বোধ হয় শিগগির। দুদিন আগে কিম্বা পরে।

—গুড্ বাই।

—গুড্ বাই।

বাড়ীমুখো হইয়া সুরথ বাবু বলিলেন—বেশ প্রাণখোলা ভদ্রলোক। আমার বেশ পছন্দ হ'য়েছিল। তারপর সহসা প্রশ্ন করিলেন—আচ্ছা রমেনবাবু কেন এসেছিলেন, আপনি কিছু শোনেন নি?

বলিলাম—না। কেউ না বললে, আর শুনবো কার কাছে?

উত্তর শুনিয়া তিনি কিছুকাল নীরব রহিলেন; তারপর আপন-মনেই বলিলেন—নাঃ, এখন বোধ হয় আপনাকে বলতে কিছুই আপত্তি থাকতে পারে না। সুনন্দাই চিঠি লিখে ওঁকে আনিয়েছিল—মাধুর সঙ্গে ওঁর বিবাহের কথা-বার্ত্তা পাকা করবার জন্তে।

—তাই নাকি? বাঃ, বেশ ত! সব ঠিক হ'য়ে গেছে?

—না, কৈ আর হ'ল! সুনন্দার খুব ইচ্ছে ছিল, আমারও অমত ছিল না; আর রমেন বাবুও বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ ক'রেছিলেন। কিন্তু শেষ-পর্য্যন্ত মাধু বড্ডই বেঁকে বসল, কিছুতেই রাজী হ'ল না! ওর যখন অত আপত্তি তখন জোর ক'রে ত কিছুই করতে পারি না, কি বলেন?

বলিলাম—তা ত বটেই।

পথে আর বিশেষ কোন কথা হইল না। কথা কহিবার মতো মনের অবস্থা তখন আমার ছিল না। সারা পথ ব্যাপিয়া অন্তরের মধ্যে কী এক অব্যক্ত আনন্দ অপরূপ স্পন্দনের সঞ্চার করিতে লাগিল।

বহুদিন পরে সেদিন সান্ধ্য ভ্রমণে সুরথ বাবুকে সঙ্গী পাইয়া আনন্দলাভ করিলাম। তিনি আমার অপেক্ষায় প্রস্তুত হইয়া গেটের বাহিরে পদচারণা করিতেছিলেন, আমি তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইতেই বলিলেন—চলুন, আজ এই দিকটাতেই যাওয়া যাক।

চলুন, বলিয়া অগ্রসর হইলাম।

কিছুদূর গিয়া সুরথবাবু বলিলেন—শৈলেশবাবু! আপনার সঙ্গে একটা কথা ছিল।

বলিলাম—তাই নাকি? বলুন।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া তিনি কহিলেন—যাই হোক, এ'কদিন বেশ আমোদেই কাটানো গেল। এতদিন এখানে আছি কিন্তু আপনার মতো লোক—ইত্যাদি।

ভূমিকার বহর দেখিয়া হাসি পাইল। নীরবে তাঁহার সকল কথায় সায় দিয়া চলিলাম। অনেকক্ষণ অনেক অবান্তর কথার পর বহু দ্বিধা এবং গভীর লজ্জার সহিত তিনি আসল কথাটা প্রকাশ করিলেন। শুনিয়া বুঝিলাম, উহার জন্য ঠিক অতখানি ভূমিকারই প্রয়োজন ছিল। সুরথবাবুর বাক্যের অন্তরালে যাহার অস্তিত্বকে নিশ্চয় করিয়া প্রত্যক্ষ করিলাম, মনে মনে তাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলাম—যদি এ-কথা না বলিয়াই থাকিতে পারিলে না, অনর্থক এই সরল প্রকৃতির লোকটিকে এতখানি অপ্রতিভ করার কী প্রয়োজন ছিল? আজ তোমার এই কথা শুনিয়া আমার বিন্দুমাত্রও ক্ষোভ হইল না, বরং এমন সাধারণ এবং প্রত্যাশিত-ভাবে নিজেকে যে প্রকাশ করিয়া ফেলিলে তাহাতে আমার আনন্দই

হইল; কিন্তু সোজা কথায় না পারিতে, আভাসে-ইঙ্গিতে নিজেই আমাকে জানাইলেই ত হইত!—এ-ক্ষেত্রে নিজের স্বভাব-ধর্ম্মের একটুকু ব্যতিক্রম করিলে, এই নিরীহ লোকটি অপ্রিয় কার্য্য করিবার দুস্তর লজ্জা হইতে রক্ষা পাইত।

বলিলাম—এই কথা? তার জন্যে আপনি অতখানি 'কিন্তু' হচ্ছেন কেন? আমার কাজ শেষ হয়ে গেছে; দু'চার দিনের মধ্যেই আমাকে যেতে হ'ত। সুতরাং সেই দু'চার দিনকে দু-তিন দিন এগিয়ে আনা—আমার পক্ষে কিছুই অসুবিধে হবে না। তা ছাড়া আপনারাও যখন কাল-পরশু অন্য কোথাও কিছু দিন ঘুরে আসবেন বলছেন,—তখন আমারও কালকে রওনা হওয়াই দরকার।

দুরূহ কাজটা এমন সহজে সমাপিত হইয়া গেল দেখিয়া সুরথবাবু যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। বলিয়া ফেলিলেন—দেখুন, এ-কে আমি আজো ঠিক চিনতে পারলাম না। যখন আপনি আসেন নি, তখন আপনাকে এ বাড়ীতে আনাবার জন্যে কি ব্যস্ততা; অথচ আপনি এসে দুদিন থাকতে না থাকতেই—

মনে করিলাম বলি—সংসারে অনেক বস্তুই যখন আজো চিনিয়া উঠিতে পারেন নাই তখন নারী-চরিত্রের এই দিকটাও না হয় না-চিনিয়াই রাখিয়া দিলেন; ইহাকে লইয়া গবেষণা করিয়া কোন আনন্দই আহরণ করিতে পারিবেন না।

মুখে বলিলাম—মেয়েরা চিরকালই অমনি অস্থির-মতি। তার জন্যে আপনিও অস্থির হবেন না।

ট্রেনের কামরায় বসিয়া গাড়ী ছাড়িবার অপেক্ষা করিতেছিলাম। নির্দ্দিষ্ট সময়ের বহু পূর্ব্বেই ষ্টেশনে আসিয়াছিলাম; কি জানি যদি গাড়ী ফেল হইয়া যায়!

বাহিরে চাহিয়া দেখিলাম—আকাশ-প্রান্তে কালো মেঘগুলা ক্রমাগত কুণ্ডলী পাকাইতেছে; দূর হইতে ভিজা বাতাস মন্থর গতিতে ভাসিয়া আসিতেছে; পাখীর দল ঊর্দ্ধশ্বাসে নীড়ের অভিমুখে পাখা মেলিয়া চলিয়াছে; ঝড় উঠিল বলিয়া।

বাঁশী দিয়া গাড়ী দুলিয়া উঠিল। এমন সময় সম্মুখে চাহিয়া দেখিলাম—আমার চাপরাশিটা আমাকে লক্ষ্য করিয়া প্রাণপণে ছুটিয়া আসিতেছে।

—কি খবর?

—বাঁধ ভেঙ্গে গেছে। আপনাকে নামতে হবে।

কাজ করিব মুখে বলা, এবং তাহা সত্যকারের করার সংসারে মধ্যে কতই না প্রভেদ! নামিতে হইবে বলিলেই ত নামা যায় না। গাড়ী তখন ছুটিতে আরম্ভ করিয়াছে।

কালের অসীমতার মধ্যে একটা বৎসর সময় হিসাবে যতই অকিঞ্চিৎকর হোক, মানুষের এই হ্রস্ব জীবনের মাঝে তাহা নিতান্ত কম সময় নয়। সেই বিগত একটি বৎসরের প্রত্যেকটি দিনকে কেমন করিয়া নিজের হাতে হত্যা করিয়া আসিয়াছি শুইয়া শুইয়া তাহাই ভাবিতেছিলাম, সহসা ঘরের মধ্যে কাহার প্রবেশের সাড়া পাইয়া বলিলাম—কে?

—চিনতে পারবে না।

পরিচিত কণ্ঠস্বরে বিস্মিত হইয়া মুখ ফিরাইয়া দ্বিগুণ বিস্মিত হইয়া গেলাম। সুনন্দাকে যে আবার কোনদিন এমন করিয়া দেখিতে পাইব, তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। বলিলাম—তোমাকে চিনতে না পারা হবে আমার চরম দুর্ভাগ্যের দিন। তার এখনো বোধ হয় দেরী আছে। কিন্তু এ ঘোর অকালে আবির্ভাবের হেতু?

উঠিয়া বসিলাম। তাহার দিকে চাহিয়া দেখিলাম, সে যেন ঈষৎ মোটা হইয়াছে। বেশ-ভূষার অসামান্য পারিপাট্য।

আমার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলিয়া ধরিয়া সুনন্দা বলিয়া উঠিল—কতদিন এমন ক'রে ভুগছ? কাজকর্ম্ম সব ছেড়ে দিয়েছ না কি? চিঠি লিখেছিলাম, তার উত্তর দাও নি কেন?—

হাসিয়া তাহাকে বাধা দিলাম। বলিলাম—থামো, থামো। প্রশ্নের ভারে আমার নিঃশ্বাস বন্ধ কোরে দিতে চাও না কি? প্রথমে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও দেখি; তারপর বলছি।

সুনন্দা ততক্ষণে আমার খাটের একধারে বসিয়া পড়িয়া-

ছিল। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলাম—সুরথবাবু ভালো আছেন? কবে কলকতায় এলে?

—হ্যাঁ, ভালো আছে। মাস দুই। এখন কিছুদিন এইখানেই থাকবো। নতুন কার কিনেছি, লা-সেইল, সীডান।

—বাঃ, তাইতে ক'য়েই বুঝি একলা এসেছ?

—না; হঁ্যা।

—তার মানে?

—একলাই এসেছি।

বলিলাম—জেনে শুনেই যখন এসেছো, তখন অতিথি-সৎকারের ত্রুটি নিও না; কারণ তোমার মতো এমন অতিথি আমার ঘরে কখনও আসেনি, তা-ছাড়া তাকে সমাদর করবার উপযুক্ত লোকেরও অভাব।

সুনন্দার ঠোঁটের কোণে একটা অর্দ্ধস্ফুট হাসির রেখা দেখা দিল; বলিল—আমার প্রশ্নের উত্তর?

বলিলাম—বিশেষ দেবার কিছু নেই। জ্বর হয়েছে এই কয়েকদিন। কাজকর্ম্ম করবার মতো এনার্জি নেই। অনাবশ্যক-বোধে তোমার চিঠির উত্তর দিই নি। আজ সশরীরে তারই উত্তর নিতে এসেছো না কি?

সুনন্দা বলিল—তোমার সাহেবের সঙ্গে ওঁর একদিন দেখা হয়েছিল; সে বল্লে—সুবর্ণ-ভবিষ্যৎ অগ্রাহ্য ক'রে তুমি নিকর্ম্মা হ'য়ে বসে আছ! একটা খুব বড়ো কাজের ভার পেয়েছিলে; টাকা আর মান—দুই-ই অনেক ছিল। ছাড়লে কেন?

আশ্চর্য্য হইলাম। এত খবর ও সংগ্রহ করিল কোথা হইতে। আইরীশম্যান ওনীল সাহেব যে এত ফাঁপা ইতিপূর্ব্বে তাহা জানিতাম না। বলিলাম—বল্লাম ত, ভাল লাগে না। কাজে উৎসাহ পাই না। জীবনে অরুচি ধ'রে গেছে।

—কার জন্যে এমন হ'ল?—সুনন্দা, না স্বালি, না—?

অসহ্য-বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলাম—কি বলছ তুমি?

না-থামিয়াই সুনন্দা বলিতে লাগিল—আশ্চর্য্য হ'য়ে যাই শৈলেশদা', জীবনের প্রতি তোমাদের দৃষ্টির এই সঙ্কীর্ণতা দেখে। কাউকে ভালোবেসে না পেলেই তোমাদের জীবন রিক্ত হ'য়ে যায়; কাজকর্ম্ম ছেড়ে তোমরা একেবারে জগন্নাথ হ'য়ে যাও। নারীকে শুধুমাত্র ভালবেসে তোমাদের প্রেম সার্থক হয় না, তাকে নিজের অধিকারের মধ্যে একান্ত কোরে পেলেই তবে তোমরা চরিতার্থ হও। নারীকে ভোগের বস্তু ক'রে পাবার মধ্যেই এই যে তোমাদের জীবনের চরম সার্থকতা—এর মধ্যে কোন বড় আদর্শবাদ নেই। তাদের কাছে তোমরা প্রেরণা চাও না, প্রেম চাও না—চাও শুধু তাদের বাইরের খোলোসটাকে। আর সেই তুচ্ছ জিনিষটাকে না পেলেই তোমরা এক-একজন বড় বড় ব্যর্থ-প্রেমিক হোয়ে যাও; সংসার-ধর্ম্ম পালনে তোমাদের মুখের বিতৃষ্ণার আর অন্ত থাকে না। ভগবানের দেওয়া এই সুন্দর জীবনের উপযুক্ত মর্য্যাদা দিতে অপারক এই সব পঙ্গু-প্রেমিকের এই মনোভাবই আজকালকার মাসিক-পত্রের সব গল্পের মধ্যেই দেখতে পাই; এক রা। এ জীবনে লাভ-অলাভ হার-জিত ত থাকবেই; এ জীবনই ত একটা বড় রকমের খেলা; জানো ত খেলায় হেরে গেলে যারা অসন্তুষ্ট হয়, তারা sportsman নয়। হেরে গেলেই মানুষ কাপুরুষ হ'য়ে যাবে কেন?

সুনন্দার কথার ঝাঁঝে কান দুইটা গরম হইয়া উঠিল। পায়ের কাছ হইতে কম্বলখানাকে সরাইয়া দিয়া বলিলাম—বাড়ি ব'য়ে তুমি আজ আমাকে অপমান করতে এসেচো—কিন্তু না জেনে-শুনেই। তুমি জানো না যে, নারীকে আমি চিরদিন শ্রদ্ধার চোখেই দেখে এসেছি; নারী যে পুরুষকে অসীম শক্তি, অনন্ত প্রেরণা দিতে পারে—তা আমি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি। তুমি জানো না যে, আজো আমার মনে সংসার পাতবার সাধ জাগে; আমি স্ত্রী চাই, আমি তৃপ্তি চাই, জীবনের প্রিয়-সঙ্গী-পরিবৃত পথে আমি বড়ো হ'তে চাই—

সহসা মনে হইল—ছিঃ, ছিঃ! এ কী করিতেছি!! সস্তা নাটকের অন্তঃসারশূন্য নায়কের মতো এমন র‍্যাক্টিং করিতে আমি আবার কবে শিখিলাম; তাহাও আবার এমনি এক উগ্র কঠিন রমণীর সম্মুখে, হৃদয়াবেগ যাহার কাছে নিছক উপহাসের বস্তু?

সুনন্দা মুখ ফিরাইয়া লইয়াছিল; আমি নীরব হইলে বলিল—উঠ্‌ছ কোথায়? আমাকে বাড়ির বার ক'রে

দিতে নাকি? কিন্তু আমার সব কথা ত এখনো শেষ হয় নি। এই বলিয়া কাপড়ের ভিতর হইতে কি একটা বস্তু টানিয়া বাহির করিল; বলিল—দেখ ত, এটা কি?

সবিস্ময়ে বলিলাম—একি! এ যে দেখছি, আমার সেই মাফ্‌লারটা, যেটা তোমাদের বাড়ি হারিয়ে গিছল! এটা এতদিন ছিল কোথায়? তোমার কাছে? ছিঃ, সুনন্দা, শুধু শুধু এটাকে এতদিন তোমার কাছে রাখতে গেলে কেন?

সহসা সুনন্দার তীক্ষ্ণ চটুল হাস্যে আমি অপ্রতিভ হইয়া পড়িলাম; সে বলিল—আচ্ছা, একটা কথার উত্তর দাও ত। যদি একটি মেয়ে একজন ছেলের একটা পুরানো গলাবন্ধ চুরী ক'রে নিজের কাছে রেখে দেয়, মাঝে মাঝে সেটিকে বার ক'রে দেখে আর চোখের জলটুকু তাই দিয়ে মুছে ফেলে, তাহলে কি এই কথাই নিঃসংশয় প্রমাণ হ'ল না যে, মেয়েটি ছেলেটিকে সত্যিই খুব ভালোবাসে?

বিরক্ত হইয়া বলিলাম—তোমার কথাগুলো অত্যন্ত নাটকীয় হ'ল—মেলোড্রামার উপযুক্ত।

—নিশ্চয়। কোন্ এক বড়ো দার্শনিক ত বলেছেন—জীবনই একখণ্ড মেলোড্রামা। কোন মেয়ে তোমাকে এত ভালোবাসে জেনে তোমার আনন্দ হচ্ছে না? আমি হ'লে ত নেচে বেড়াতাম! আচ্ছা, উদয়শঙ্করের নাচ দেখেছ? দেখ নি। জীবনে ফাঁক র'য়ে গেছে। উঃ, তাণ্ডব যখন নাচলে, তখন সত্যি বলছি, গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ছিল; মাধুটা একেই ভীতু,—সে ত একেবারে—

তাহার এই অহৈতুক প্রগলভতা, এই অর্থহীন কলহাস্য—ইহার কোন সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাইলাম না; মৌন হইয়া বসিয়া রহিলাম।

সুনন্দা উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল; এখন একটা টুল অধিকার করিয়া বসিয়া বলিল—এ অমূল্য বস্তুটি এতদিন আমার কাছে ছিল না গো, আমার কাছে ছিল না। আচ্ছা সত্যিই কি কিছু বুঝতে পাচ্ছ না?

স্তব্ধ হইয়া গেলাম। সুনন্দা আজ একী পরমাশ্চর্য্য ইঙ্গিত লইয়া আসিল। কথাটা ভাবিতেও সমস্ত মন একটা অনির্ব্বচনীয় আনন্দের ভারে শিথিল হইয়া পড়িল। বলিলাম—তুমি যে কি পাগলের মতো বক্‌চ, সুনন্দা! তোমার ইঙ্গিত সত্যি ব'লে মেনে নেওয়া আমার পক্ষে সে কত শক্ত তা ত তুমিই সব-চেয়ে বেশী জান।

—কিন্তু এ সত্যি। সত্যিই মাধবী তোমাকে ভালোবাসে। নেবে ওকে?

তাহার কণ্ঠস্বর আবেগে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। মুখের অপরূপ রক্তাভা গাঢ় হইয়া উঠিয়াছে। বলিলাম—যার দূতি হয়ে তুমি আমার কাছে এসেচো তাকে পেলে যে-কোন পুরুষ ধন্য হ'য়ে যাবে, এ কথা নির্ভয় চিত্তে বলতে পারি। কিন্তু—

—আর কিন্তুতে কাজ নেই। মাধবীকে নিয়ে আসচি। কিন্তুটা যদি পারো, তাকেই বোলো।

—মাধবী? কোথায় সে?

—বাইরে। গাড়িতে।

—বাইরে! ভিতরে আনো নি কেন?

—বিনা অনুমতিতে ভিতরে আসবার অধিকার এতদিন একা আমারই ছিল, বলিয়া সুনন্দা হাসিতে হাসিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

মাধবী আমাকে ভালবাসে! সেই ভীরু অবলম্বন-প্রয়াসী মাধবী! আমার ব্যবহৃত একটা তুচ্ছ বস্তুকে অবলম্বন করিয়া সে তাহার নিরুদ্ধ প্রেম আমারই উদ্দেশ্যে উজাড় করিয়া দিয়াছে! একটা সম্পূর্ণ অভিনব অনুভূতির দোলায় সারা মন স্পন্দিত হইতে লাগিল। নিজেকে আজ নূতন করিয়া দেখিলাম; সুনন্দাকে নূতন করিয়া দেখিলাম; মাধবীকে নূতন করিয়া দেখিলাম। সমস্ত জগৎ যেন আজ আমার চোখে নবজন্ম লাভ করিয়াছে।

দুইজনে ঘরে প্রবেশ করিল। তাহাকে একেবারে আমার কাছে টানিয়া আনিয়া সুনন্দা বলিল—দেখছিস! তোরই ধ্যানে লোকটা নিজেকে ক্ষয় করে ফেলেছে। এর কি মূল্য দিবি তাই বল?

মাধবী আরক্ত মুখে নত-নেত্রে দাঁড়াইয়া রহিল; উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাহার হাত দুইখানি ধরিয়া বলিলাম—ধৃষ্টতা মার্জ্জনা কোরো মাধবী, কিন্তু আজ আর লজ্জা করবার সময়

নেই। যদি এসেচ, তাহলে তোমার এই অনারব্ধ গৃহস্থলী নিজের খুসীমতো সাজিয়ে নাও। এই অসহায় সম্বলহীনের সমস্ত ভার তুমি নাও, মাধবী।

কোন উত্তর পাইলাম না। শুধু আমার দুই হাতের মধ্যে তাহার হাত দুইখানি আর একবার কাঁপিয়া উঠিল। পিছন হইতে সুনন্দা বলিল—নেবে না ত কি! তোমার গলায় ফাঁস ও যখন সেধে নিজে পরেছে, তখন আর না নিয়ে যাবে কোথায়?

নিদারুণ লজ্জায় মাধবীর ঘাড় ঝুঁকিয়া পড়িল। তাহাকে বিছানার উপর বসাইয়া দিয়া বলিলাম—সুনন্দা আজ আমাদের যা-তা ব'লে নিচ্ছে! নিক্। ও সবাইকে জানলে কিন্তু নিজেকে এতটুকুও জানালে না। ও আমাদের ভাগ্য-দেবী। ওর কাছে আমাদের কিছুমাত্র লজ্জা নেই।

তারপর সুনন্দার দিকে ফিরিয়া বলিলাম—সুনন্দা! তোমার গাড়িখানা একবার বিকেলে দেবে? সেই কাজটার জন্যে একবার ওনীল সাহেবের কাছে—

—তা আমি এখন ঠিক বলতে পারি না। বিকেলে আমার কাজ আছে। বেরুতে হবে। এই বলিয়া সুনন্দা ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বাঞ্ছিতা

শ্রীযুক্ত প্রতাপ সেন বি-এস্-সি

ওগো প্রিয়া, ওগো বাঞ্ছিতা মোর তুমি,
অনুরাগ ভরা কপোলে তোমার চুমি;
নব-পরিচয় হ'ল আজ তব সাথে,
সাজিলে কেমনে অপরূপ মহিমাতে?
তোমার ওদুটি কালো আঁখি-তারা মাঝে,
আমার সকল স্বপনের ধন রাজে;
তোমার ও তনু আমাতে জড়ায়ে র'বে—
তোমার কামনা আমার কামনা হ'বে।
যুগ যুগ ধরি মানসী, লক্ষ্মী মোর—
মিলনের নিশি হবে নাক' কভু ভোর!
বিশ্বের যত সঙ্গীত-মধু আছে,
কানন-সভায় যত সুন্দরী নাচে,—
সকলে মিলিবে মোদের বাসর-রাতে;
পাণ্ডুর শশি হাসিবে তারকা সাথে।
সরমের বাস মানিবে না কোন বাধা—
বাঁশীতে যখন বেহাগ হ'বে গো সাধা!
মাতাল হাওয়ায় কোমল বক্ষ জুড়ে,
পাগল কেশের গুচ্ছ প'ড়িবে উড়ে';—
সেখানি সরাতে বাড়াইব করখানি,
পলকের মাঝে আমারে লইবে টানি'।
আবেশে বিভোল; হারাই যদি বা বাণী,
চোখে চোখে হ'বে মরমের কাণাকাণি।
সময় হারা'বে সীমার বাঁধন তা'র—
রচিব প্রেমের সীমাহীন পারাবার।

শ্রীপ্রতাপ সেন

স্পেনের বিবরণ

শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রলাল ধর

স্পেন সম্রাট এলফন্‌সো হঠাৎ রাজ্য হারালেন—স্পেনে গণদেবতার জয় হোল। ১৪ই এপ্রিল '৩১ পর্য্যন্ত রাজতন্ত্র তার সব কিছু স্বেচ্ছাচার স্বৈরতন্ত্র নিয়ে স্পেনে অব্যাহত ছিল জনসাধারণের সকল রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যকে দমন করে। বিস্ময়ে দুনিয়া তাকিয়েছিল—এই সাম্যের যুগেও এমন স্বেচ্ছাচার শাসনপ্রণালী জনসাধারণ সহ্য করতে পারে—এই দেখে। স্পেনেও এই সম্পর্কে আন্দোলন চলছিল কয়েক বছর ধরে—তারই ফলে এমনি একটা বিদ্রোহের সৃষ্টি হোল যার ফলে রাজতন্ত্রবাদীরা হোল পরাজিত আর স্পেনের রাজা সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। কর্ণেল মেসিয়া স্পেনের প্রজাতন্ত্রের পরিচালনা করবার ভার পেলেন। বহুদিন ইনি বন্দী ছিলেন এঁর এই বিপ্লব প্রচেষ্টার জন্য। স্পেনের প্রজাতন্ত্রের জন্ম এমনি আকস্মিক, যে সারা বিশ্ব আজ বিস্মিত এদের এই কর্ম্ম প্রচেষ্টা দেখে।

এই সঙ্গে আরো অনেকেরই কথা মনে পড়ে। ১৯২৫ সালে রাজ্য হারিয়ে পারস্যরাজ একখানি ভাঙ্গা চেয়ারে তাঁর শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন গত বছর প্যারী সহরে। অষ্ট্রেলিয়ার কার্ল রাজ্য ফিরে পাবার আশায় সব কিছুই ব্যয় করেছিলেন, তার ফলে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর রাণী না খেতে পেয়ে মারা যেতেন, স্পেনরাজ এলফনসোর কাছ হ'তে সাহায্য না পেলে। জার্ম্মাণ সম্রাট কাইজার আজ একটি ছুতোরের সঙ্গে সঙ্গে গাছ কেটে বেড়াচ্ছেন। গ্রীসের জর্জ্জ ইটালীতে কিসের স্বপ্ন দেখে দিন কাটাচ্ছেন, কে জানে।

স্পেনের অধিবাসীদের সংকল্প দৃঢ়তায় অটুট—তার পরিচয় আমরা পাই যখন দেখি মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই প্রজাতন্ত্রের সাফল্য এরা অর্জ্জন করল জনসাধারণ ভাবে। কর্ম্মক্ষেত্রে এরা যতই আধুনিক হোক না কেন আচার ব্যবহারে এরা অত্যন্ত রক্ষণশীল, তার পরিচয় পাওয়া যায় যখন দুশো বছর আগে বর্ণিত স্পেনের সঙ্গে আধুনিক স্পেনের কোথাও অমিল খুঁজে পাওয়া যায় না। এখনো স্পেনের গ্রাম্যপথে রাতে কেরোসিন তৈলের লণ্ঠন হাতে

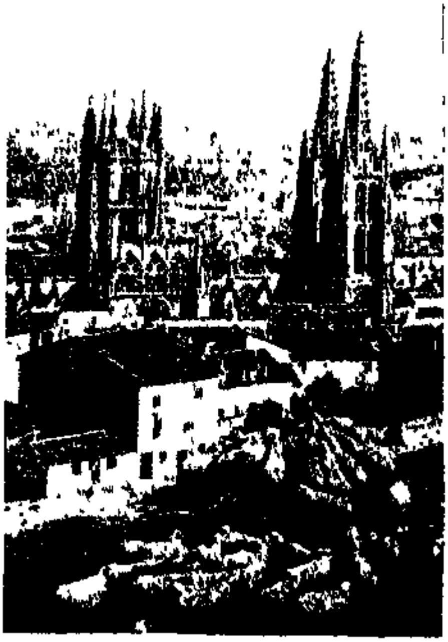


টোলেডো সহরের প্রবেশ তোরণ।
এটি মুরদের প্রাচীন সহর। পাহাড়ের উপর ঘোড়ার ক্ষুরের আকৃতিতে সহরটি তৈরী।

নিয়ে পাহারওয়ালাদের দেখা যায়। দুশো বছর আগের আর এখনকার মেষপালকের পোষাক পরিচ্ছদের একটুও পরিবর্ত্তন হয় নি।

স্পেনের প্রত্যেকটি সহর এক একটি পাহাড়ের উপর

অবস্থিত—প্রত্যেক সহরেই একটি করে প্রবেশদ্বার আছে, এগুলি মূরদের তৈরী। ছোট বড় সব সহরেই 'পসোদা' আছে বিদেশীদের আশ্রয় দেবার জন্য। এই পসোদার নীচের তলায় একটি করে মদের দোকান থাকে। বিদেশীরা প্রবেশ করলেই আগে প্রশ্ন হয়—ইংরাজ না ফরাসী? প্রশ্নকর্ত্তার প্রতি দৃষ্টি ফেরালেই চোখে পড়বে রুক্ষ মণ্ডামার্ক গুণ্ডার মত হাবভাব—বিদেশীর মনে ভীতির সঞ্চার করবে। কিন্তু এদের আকৃতির সঙ্গে এদের প্রকৃতির সামঞ্জস্য নেই একটুও—এরা মিষ্টভাষী, অতিথিবৎসল সরল-



স্পেনের বিখ্যাত "বার্গোস ক্যাথিড্রাল"।

প্রকৃতির এবং বন্ধুপ্রিয়। যে মুহূর্ত্তে তুমি উত্তর করবে, আমি ভারতীয়! ইণ্ডিজ্?—বলে সেই মুহূর্ত্ত হতে তারা তোমার সঙ্গে এমনি ব্যবহার সুরু করবে যে মনে হবে যেন এদের সঙ্গে তোমার কতদিনের পরিচয়—নিকট আত্মীয়ই বুঝি।

স্পেন সাম্যবাদীর দেশ—ভিখারী থেকে ঈশ্বরকে পর্য্যন্ত 'সিনর' বলে সম্বোধন করাই এদের রীতি। সামান্য ভিখারী পর্য্যন্ত তোমার সঙ্গে সমাসনে আহার করবে এবং প্রয়োজন হলে কথাবার্ত্তার ফাঁকে তোমাকে তারিফ করবার জন্য পিঠে দুটো মৃদু চাপড়ও মারতে পারে। পরিচিত অপরিচিত সকলকে অভিবাদন করবার আগে ঈশ্বরের নাম করাই এদের রীতি। আহারে বসলেই—তা যদি এক পয়সার বিস্কুটও হয়—তাহলেও পারিপার্শ্বিক পাঁচজনকে তার ভাগ দিতে হবে। আর তাদেরও সে ভাগ গ্রহণ করতে হবে তা' তারা যত ধনীই হোক না কেন! এদের বিশ্বাস অভুক্তদের দৃষ্টি পড়লে সে খাদ্য আর হজম হবে না, তাই আহারের সময় সমবেত সকলকেই অংশ দেওয়া এদের রীতি।

অর্থের দিকে স্পেনিশ্‌দের আগ্রহ নাই—অর্থ-উপার্জ্জনই এদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য নয়। অর্থের চেয়ে শৌর্য্য-বীর্য্য সৎসাহস নির্ভীকতা প্রভৃতি গুণের সম্মান এদের কাছে অত্যন্ত বেশী। এরা কাজ করে কাজ করবার আগ্রহে হাসিমুখে কিন্তু অর্থ উপার্জ্জনের জন্য নয়।

এদেশটা য়ুরোপ ও আফ্রিকার সংযোগস্থলে অবস্থিত, এই জন্য ওই দুটি মহাদেশের অধিবাসীদের আচার ব্যবহারের অনেক বৈশিষ্ট্য এদের মধ্যে প্রচলিত হয়ে গেছে। য়ুরোপের শ্বেতাঙ্গী আর আফ্রিকার কৃষ্ণাসুন্দরীদের এদেশে পাশাপাশি দেখতে পাওয়া যায়। এদের পোষাক পরিচ্ছদের উপর প্রাচ্যপ্রভাব খুব বেশী—মেয়েরা ওড়না না নিয়ে পথে বাহির হয় না। কোন কোন প্রদেশে পুরুষেরা এমনি ধরণের পায়জামা পরে যা শুধু প্রাচ্যেরই বৈশিষ্ট্য।

স্পেনিশ্ জীবনের উপর 'মূর'-দের প্রভাব অত্যন্ত বেশী। এই মূরেরা বার্বার জাতীয় আরব। অষ্টম শতাব্দীতে এরা আফ্রিকাতে অত্যন্ত শক্তিমান হয়ে ওঠে এবং স্পেন আক্রমণ করে' মাত্র দু'বছরের মধ্যে এরা সারা স্পেনটা জয় করে এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত অপ্রতিহত ভাবে রাজত্ব করে। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে স্পেনের একটি ছোট প্রদেশের দেশীয় রাজা 'ফার্ডিনাণ্ড' স্পেনকে মূরদের হাত হতে মুক্তি দেয়। এলফান্সো তাঁরই বংশধর। এই হোল স্পেনের ইতিহাস।

এই মূরদের শাসনকালে শিল্পে, বাণিজ্যে, বিজ্ঞানে স্পেনের উন্নতি হয় অসাধারণ। ধর্ম্মসম্বন্ধে য়ুরোপে মূরেরাই সর্ব্বপ্রথম সাম্যবাদ প্রচার করে। মূরেদের যা

বৈশিষ্ট্য, সবই স্পেনিশ জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করে, কেবল ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ব্যবধানটু ছাড়া—মুরেরা মুসলমান আর স্পেনিশরা খৃষ্টান।

স্পেনের অধিকাংশ সহরই মুরদের প্রতিষ্ঠিত। উদ্যান আর ঝর্ণাধারার এরা ছিল বিশেষ পক্ষপাতী—এদের প্রতিষ্ঠিত সব ক'টি সহরে তার পরিচয় পাওয়া যায়। বিখ্যাত 'কার্দোভা' উদ্যান, 'আল্‌কাজাবে'র প্রাচীন উদ্যান—প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ আজও আছে। তবু 'শেভাইল' ও 'গ্রানাডার' উদ্যানগুলি আজও তার সবকিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিরাজ করছে কালের ধ্বংস-কারী প্রভাবকে প্রতিহত করে। 'আলহামব্রা' প্রদেশের 'আলামেদা' উদ্যানের তুলনা পৃথিবীতে আর কোন উদ্যানের সঙ্গে হয় না। এর সৌন্দর্য্যের এমন একটা বৈশিষ্ট্য আছে, যা দর্শকমাত্রকেই অভিভূত করে অসাধারণভাবে। 'গ্রানাডার' 'জেনারেলিফ' উদ্যানে মুবরাজগণের গ্রীষ্মাবাস ছিল। এই উদ্যানটির চারিপাশ দিয়া কৃত্রিম ঝরণা বয়ে যাচ্ছে—উদ্যানটি আজও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে দর্শকদের মনে স্বর্গীয় ভাবের সৃষ্টি করে।

নৃত্য স্পেনের সাধারণ শ্রেষ্ঠ কলাবিদ্যা। নৃত্য এদের আচার ব্যবহারের এবং উৎসবের একটি অঙ্গ। এদের নৃত্যকলা প্রাচ্যের আদর্শে গঠিত। স্পেনিশ নৃত্যগীতে 'জিপ্‌সীর'ই আদর্শ-স্থানীয়। শেভাইল, গ্রানাডা, মালাগা মাদ্রিদ্—প্রভৃতি সহরগুলি স্পেনিশ্ নৃত্যকলার শিক্ষাকেন্দ্র। 'বোলেরা,' 'জোটা, 'ফ্লামেঙ্কো',—প্রভৃতি নৃত্য স্পেনের বৈশিষ্ট্য। 'বোলেরা' নৃত্যে একটি পুরুষ ও একজন রমণী অভিনয়ের ধরণে নৃত্য করে। 'জোটা' নৃত্যে নাচে একটি মেয়ে, সময় সময় একটি পুরুষও তাহার সহযোগী হয়। দূর হ'তে 'জোটা'-নৃত্য মল্লযুদ্ধের মত দেখায়। 'ফ্লামেঙ্কো' নৃত্য জিপ্‌সীদের নিজস্ব নৃত্যকলা। দর্শকরা সকলে অন্ধকারে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে উপবেশন করে, মধ্যস্থলে একজন সেতার বাজিয়ে গান গাইতে থাকে—গান যখন খুব জমে ওঠে তখন হঠাৎ দর্শকদের মধ্যে উপবিষ্টা একজন নর্ত্তকী গাত্রোত্থান করে নৃত্য করতে সুরু করে এত আকস্মিক ভাবে যেন গান শুনতে শুনতে নাচবার একটা প্রবৃত্তি তার মনে তীব্র ভাবে জেগে উঠেছে। প্রথমে সে নাচ সুরু করে ধীরে ধীরে গানের সঙ্গে, কিন্তু ক্রমে তার অঙ্গ-সৌষ্ঠবের লীলায়িত ভঙ্গিমাগুলি ক্ষিপ্র হতে ক্ষিপ্রতর হয়ে উঠে। তারপর হঠাৎ এক সময়ে নাচ থেমে যায়। আবার নতুন গায়কের সঙ্গে নতুন করে নৃত্য সুরু হয়—যেন অভিনয়ের এক একটি অঙ্ক শেষ হচ্ছে। স্পেনকে জানতে ও বুঝতে হলে স্পেনের নৃত্যের সঙ্গে পরিচয় থাকা দরকার।

নৃত্য ছাড়া স্পেনিশ জীবনে আর একটি আনন্দদায়ক ক্রীড়া আছে—সেটি ষাঁড়ের লড়াই। এই ষাঁড়ের লড়াই যে পাশব প্রবৃত্তির পরিচায়ক সভ্য জগৎ তাহা বিশেষভাবে স্বীকার করে, কিন্তু স্পেনিশরা এটিকে ধর্ম্মোৎসবের একটি অঙ্গ মনে করে। সেইজন্য সাধারণতঃ রবিবার দিন (উপাসনার দিন) এই ক্রীড়াটি অনুষ্ঠিত হয় আর ক্রীড়ামঞ্চে সংলগ্ন যে গির্জ্জাটি থাকে, ক্রীড়কেরা প্রথমে সেখানে প্রার্থনা করে, তারপর ক্রীড়ামঞ্চে প্রবেশ করে। ষাঁড়ের লড়াই দেখবার নেশা স্পেনিশদের মধ্যে এমন সংক্রামক যে অতি দরিদ্র ব্যক্তি তা'র পরিহিত সার্টটা বিক্রী করেও ষাঁড়ের লড়াই দেখতে যায়। রেলগাড়ীতে ভ্রমণকালে পথে যদি কোন 'ভেকাদা' বা ষাঁড়ের গোয়ালঘর পড়ে তাহ'লে স্পেনিশ যাত্রীদের উল্লাস ধ্বনিতে ট্রেনখানি মুখরিত হ'য়ে ওঠে। ষাঁড়ের লড়াই যারা করে স্পেনিশ্‌দের মুখে তাদের সুখ্যাতি আর ধরে না স্পেনিশ জীবনে তারাই হচ্ছে আদর্শস্থল।

মুরেরাই ষাঁড়ের লড়াই স্পেনে প্রবর্ত্তিত করেছিল একাদশ কি দ্বাদশ শতাব্দীতে, ষাঁড়গুলোও প্রথমে আসতো আফ্রিকা হতে। কিন্তু খেলার ধরণটা রোমান্‌দের আদর্শে প্রবর্ত্তিত। প্রত্যেক সহরেই একটি করে ক্রীড়ামঞ্চ আছে, সেগুলিকে 'প্লাজা দি টোরোজ্' বলা হয়। ধনী-দরিদ্র আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলে এখানে একত্রিত হয় এই লড়াই দেখবার জন্য। ক্রীড়ামঞ্চের ভিতর দিয়া প্রথমে প্রেসিডেন্ট প্রবেশ করে মঞ্চ-সংলগ্ন গির্জ্জায়, তাহার পশ্চাতে ক্রীড়কেরা শ্রেণীবদ্ধভাবে স্বর্ণাক্ত পরিচ্ছদে সুশোভিত হয়ে একে একে সেই গির্জ্জায় প্রবেশ করে। প্রেসিডেন্ট তাদের হাতে 'টোরিল'—যে ঘরে ষাঁড়গুলি রক্ষিত হয়—তার চাবি দিয়া

দেয়, কয়েক মুহূর্ত্ত পরে একটি ষাঁড় ক্রুদ্ধভাবে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করে—তারপরই লড়াই সুরু হয়।

ষাঁড়ের লড়াই তিন অংশে বিভক্ত—'সুর্টে ভ পিকার,' 'সুর্টে ভ ব্যাণ্ডারিল্যার' আর 'সুর্টে ভ মাটার'।

'সুর্টে ভ পিকার'এর ক্রীড়ককে বলা হয়—'পিকাদোরেস্', হাতে একটি বড় বর্ষা নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে এরা ক্রীড়ামঞ্চে প্রবেশ করে। ষাঁড়ের কাছে এসে অপূর্ব্ব কৌশলে এরা বর্ষা নিক্ষেপ করে, সময় সময় মত্ত ষাঁড়টি আঘাতকারীর ঘোড়াটিকে এমন ভাবে শৃঙ্গাঘাত করে যে তৎক্ষণাৎ তার মৃত্যু হয়, পিকাদোরাসও সেই সময় মাটিতে লাফিয়ে পড়ে। এই বিপজ্জনক মুহূর্ত্তে 'চালস্'রা লাল রংয়ের ন্যাকড়া নেড়ে ষাঁড়টিকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করে—পিকাদোরেসও ইতিমধ্যে অনেকটা সামালাইয়া ওঠে, আবার নতুন ঘোড়া আনা হয় তার ওপর আরোহণ করে পিকাদোরেস আবার লড়াই সুরু করে। ষাঁড়টি ক্লান্ত হয়ে উঠলে প্রেসিডেণ্ট ইঙ্গিত করে—প্রথমাঙ্ক শেষ হয়।

তারপর দ্বিতীয় অঙ্ক সুরু হয়—'সুর্টে ভ ব্যাণ্ডারিল্যার'। 'ব্যাণ্ডরিল্যার' দু'-ফিট লম্বা কয়েকটি বর্ষা নিয়ে ক্রীড়া-মঞ্চে প্রবেশ করে। এই অঙ্কটিই সবচেয়ে উত্তেজক দৃশ্য। অপূর্ব্ব কৌশল এবং নৈপুণ্যের সঙ্গে 'ব্যাণ্ডারিল্যার' একটার পর একটি বর্ষা ষাঁড়টির ঘাড়ে বিদ্ধ করে, এক মুহূর্ত্তও ইতস্ততঃ না করে। ষাঁড়টি উন্মত্ত হয়ে ওঠে, প্রতিমুহূর্ত্তেই তার শৃঙ্গাঘাতে মৃত্যুর আশঙ্কা ঘনীভূত হয়ে ওঠে—সেই সময়ে ষাঁড়ের ল্যাজটি ধরে ব্যাণ্ডারিল্যার ক্রুদ্ধ ষাঁড়ের সম্মুখ হতে আত্মরক্ষা করে। সবকটি বর্ষা ষাঁড়ের গর্দ্দানে বিদ্ধ হলে দর্শকদের আনন্দধ্বনিতে রঙ্গমঞ্চ ভেঙ্গে পড়বার উপক্রম হয়।

তারপর সুরু হয় শেষ দৃশ্য—'সুর্টে ভ মাটার'। একজন ক্রীড়ক ধীরে ধীরে প্রেসিডেণ্টের কাছে উপস্থিত হয়, প্রেসিডেণ্ট তাকে ষাঁড়টিকে হত্যা করবার অনুমতি দেন। এক হাতে একটি লাল রংয়ের ন্যাকড়া অপর হাতে একটি তীক্ষ্ণধার তলোয়ার নিয়ে সে ধীরে ধীরে ষাঁড়টির দিকে অগ্রসর হয়। লাল ন্যাকড়াখানি নাড়তে নাড়তে সে ষাঁড়টিকে আরো উন্মত্ত করে তোলে এবং এবং তার প্রত্যেকটি গতিভঙ্গী লক্ষ্য করতে করতে তার তলোয়ারখানি ষাঁড়ের গর্দ্দানে বসিয়ে দেয়—ষাঁড়টি ধরাশায়ী হয়, ঘাতক ফিরে আসে প্রেসিডেণ্টের সাম্নে, প্রেসিডেণ্ট ঘাতককে একটি ফুলের তোড়া উপহার দেন,—দর্শকের কাছ হতে আরো নানা রকমের উপহার এসে পড়ে রঙ্গমঞ্চের উপর—পুষ্প বৃষ্টির মত।

পরমুহূর্ত্তেই রঙ্গমঞ্চ হতে মৃত ষাঁড়টাকে সরিয়ে ফেলা হয়। তার পর আবার এই দৃশ্যের পুনরাভিনয় হয় ছয় বার। প্রতিবারে এমনি ভাবে ছয়টি করে ষাঁড় হত্যা করা



গ্র্যানেডার সিংহ-দরবার।
এটী মুরদের তৈরী—মধ্যের ফোয়ারাটি বারোটা সিংহমূর্ত্তির উপর রক্ষিত।

হয়। নববর্ষের প্রথম দিনে সাতটি ষাঁড়কে হত্যা করা হয়—এর নাম "টোরো স্কপ্রেসিরা"। স্পেনিশদের মনোবৃত্তির মধ্যে সহানুভূতির স্থান নাই—তার প্রমাণ পাওয়া যায় এই ষাঁড়ের লড়াইএ, যখন নির্জীব আহত একটি পশুকে হত্যা করার পর ঘাতক দর্শকদের কাছ হতে পায় বহুমূল্য উপহার।

গাম্ভীর্য্য স্পেনিয়ার্ডদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য—মনের মধ্যে যখন ঝড় বইছে তখন মুখে এদের কোনরকম চাঞ্চল্য

প্রকাশ পায় না। দৈনিক অবশ্য-করণীয় কর্ত্তব্যগুলির প্রতি একটা বীতস্পৃহা এদের স্বভাবসিদ্ধ। এদের আন্তরিক আগ্রহ হচ্ছে হিংসা-উদ্দীপক কাজের প্রতি। এদেশে জীবনের লক্ষ্য কর্ম্মক্ষেত্র নয়—এজন্ত সময়ের মূল্য খুব কম, সব কাজই এরা ফেলে রাখে আগামী কাল করবে বলে। ট্রেনও নির্দ্দিষ্ট সময়ের ঘণ্টা তিনেক পরে প্রায়ই ষ্টেশনে আসে—কিন্তু তাতে এদেশের লোকেরা কখনো বিরক্তি বোধ করে না।

ষাঁড়ের লড়াই থেকেই বোঝা যায় স্পেনিয়ার্ডরা অত্যন্ত হিংস্র প্রকৃতির। যাজকেরা সময় সময় নিজ নিজ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্ত টুকরো টুক্‌রো কাঁচের একরকম চাবুক তৈরী করে নিজ নিজ পৃষ্ঠে আঘাত করে, পৃষ্ঠে কাঁচের টুকরোগুলো বিঁধে রক্তধারা ছোটে, তবু তারা নিরস্ত হয় না। প্রণয়িণীর প্রশংসা লাভ করবার জন্ত প্রেমিকেরা সময় সময় নিজ নিজ দেহের যেখানে সেখানে ছোরা বসাইয়া দেয় কিম্বা চিরিয়া ফেলে, যন্ত্রণা এবং দৈহিক কষ্টের ওপর ভ্রূক্ষেপ না করাই স্পেনিশ জীবনের একটা চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য। অশ্বতর চালকেরা অশ্বতরগুলিকে এমনভাবে চাবুক মারে যে সেগুলি পথের ওপরে শুয়ে পড়ে চাবুকের ঘা খেতে খেতে, তবু চাবুকের বিরাম নেই। পশু-পক্ষীকে দয়া দেখানো এদের কাছে নির্ব্বুদ্ধিতার নামান্তর মাত্র, ভিখারীকে গৃহদ্বার হতে ফিরিয়ে দেওয়াই এদের কাছে মনুষ্যত্ব। কিন্তু বন্ধুর জন্ত এরা জীবন দান করতেও পরাঙ্মুখ হয় না।

বসন্তের সময় স্পেনে 'ফেরিয়া' বা বসন্তোৎসব হয় প্রায় এপ্রিল মাসের মধ্যভাগে। স্পেনের বিভিন্ন প্রান্ত হতে দলে দলে লোক আসে শেভাইল সহরে, উৎসবের এই তিনটে দিন উপভোগ করবে বলে। পথের আশপাশে তাঁবু খাটানো হয়, পত্রে-পুষ্পে চারিদিক সুশোভিত করা হয় এবং নৃত্য-গীত-বাদ্যে সারা স্পেন মশগুল হয়ে ওঠে। 'ফেরিয়া' উৎসবে প্রত্যেক বিদেশী বা অপরিচিত আগন্তুককে সাদরে বন্ধু বলে অভ্যর্থনা করা হয়।

শেভাইলে ইষ্টারের ছুটিতে আর একটি উৎসব হয়—"সেমানা সেণ্টা"। সহরের পথে গাড়ী ঘোড়া চলা বন্ধ হয়ে যায়—লোকে লোকারণ্য, রাজা উজীর থেকে ভিখারী পর্য্যন্ত সকলেই সেদিন পথের ওপর এসে জড় হয় শোভাযাত্রা দেখবার জন্ত। 'মেরীর' একটি বিরাট মূর্ত্তি পঁচিশ জন বাহক অদৃশ্যভাবে বহন করে নিয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে শাদা আলখাল্লা পরে কয়েকজন 'কফ্রাডিয়া' বা যাজক অগ্রে অগ্রে যায়। কয়েকজন রক্তবস্ত্রপরিহিত রক্ষী যায় অগ্রে অগ্রে পথ করে। যাজকদের পশ্চাতে আসে শ্বেতবস্ত্র পরিহিতা পাদুকাবিহীন রমণীরা। প্রতিমাটি অপূর্ব্ব সুন্দরভাবে সজ্জিত করা। মহামূল্য অলঙ্কারে শোভাযাত্রাটি ক্যাথিড্রালের সামনে এসে পড়লে, কয়েকজন কুমারী সমস্বরে দেশের মঙ্গল কামনা করে দেবীর নিকটে, তারপর তাদের মধ্যে একজন 'মেরীগোল্ড,' ফুলের একটি তোড়া দেবীর পদতলে প্রণামী দেয়। 'সাণ্টা মেরিয়া ক্যাথিড্রাল' জগতের মধ্যে 'গথিক্' স্থাপত্য শিল্পের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। এই ক্যাথিড্রালের মধ্যে প্রতিমাটি রক্ষিত হলে মণিমুক্তা, হীরা, জহরৎ প্রভৃতি ছড়িয়ে দেওয়া হয় দেবীর চরণতলে। 'গুড্ ফ্রাইডের পরদিন সন্ধ্যাকালে পূজা ও প্রার্থনা শেষে দেবীর চরণতলে 'সিরিও পাসক্যল'—একটি পঁচিশ ফিট উচ্চ বিরাট মোমবাতি জেলে দেওয়া হয়, বাতিটির ওজন সাধারণতঃ চারিশত চল্লিশ সের। সেইদিনেই উৎসবের অঙ্গ হিসাবে ষাঁড়ের লড়াইও দেখানো হয় সহরের সব কটি ক্রীড়ামঞ্চে।

স্পেনের সব কটি সহরই উচ্চ পাহাড়ের ওপর অবস্থিত। প্রথমেই 'টলেডো' সহরের নাম করা যেতে পারে। সহরটি মূরদের তৈরী, পাশ দিয়া 'টাজো' নদী প্রবাহিতা। রাজপথ দিয়া চলবার সময় মনে হয় দু'সারি কেল্লার মধ্য দিয়া চলেছি—পথের দিকে কোন বাড়ীরই জানালা দরজা নেই, যদিও থাকে তবে সেগুলি চিরদিনের জন্ত বন্ধ আছে। পথও খুব নির্জ্জন, মাঝে মাঝে ছাগল আর অশ্বতর ছাড়া কিছুই চোখে পড়ে না, কেবল পথ-প্রান্তস্থিত ভিখারীদের "আন্ কাকি ত্ত" ধ্বনি স্মরণ করিয়ে দেয় যে সহরে মানুষের বসতি আছে। এই টলেডো সহরই স্পেনের প্রাচীন সভ্যতার একটি কেন্দ্র ছিল। এখানে বিখ্যাত স্পেনিশ ভাস্কর 'এলগ্রিকো' জন্মগ্রহণ করেন।

গ্রানেডা স্পেনের একটি বিখ্যাত সহর—অধুনা ধ্বংসপ্রায়। এর ধ্বংসস্তূপের মধ্যে সুন্দর উদ্যানগুলো জেগে আছে অপূর্ব্ব সুষমা নিয়ে। 'আলহামব্রা'র বিখ্যাত উদ্যান দেখবার জন্য বিভিন্ন দেশ হতে দর্শকরা এখানে আসে। পাঁচশো বছরেরও আগে মূরেরা এটি তৈরী করেছিল, কত ভূমিকম্প ঘটে গেছে, রাজা মহারাজের প্রাসাদ ভূমিসাৎ হয়ে গেছে কিন্তু মূরদের এই রক্তপ্রাসাদ (আলহামব্রা) আজও দাঁড়িয়ে আছে অটলভাবে।



দরবার গৃহ
মাদ্রিদ সহরের রাজবাড়ী।

কার্দোভা সহরের 'কোর্ট অব্ অরেঞ্জেস্' আর 'বিরাট মসজিদ' স্পেনের মধ্যে বিখ্যাত। এই কোর্ট আর মসজিদের অপূর্ব্ব শিল্পকলা দর্শকদের দৃষ্টি ঝলসে দেয়! সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্তের সময় এই মসজিদের বুকে যে সুষমা ফুটে ওঠে তা অপূর্ব্ব অনিন্দ্যসুন্দর।

'সেভাইল' সহরটি অতি আধুনিক জীবন্ত সহর, 'আলকাজার' পুষ্পোদ্যান, 'গিরাল্ডা' প্রাসাদ স্বর্ণপ্রাসাদ প্রভৃতি সহরটির গৌরবের বস্তু। এ সহরটি স্পেনের সর্ব্বপ্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। আধুনিক যন্ত্রজগতের সঙ্গে সমতালে সামঞ্জস্য রেখে এই সহরটি অগ্রসর হচ্ছে। এখানকার অধিবাসীদের সাধারণতঃ 'আণ্ডালুস্তান' বলা হয়। এদের পরিচ্ছদ হচ্ছে ছোট কোট, আঁট সাঁট পায়জামা আর মাথার একটা চ্যাপ্টা টুপী। এরা বেশ বলিষ্ঠ সুপুরুষ আর আমোদপ্রিয়। এরা কখনো উচ্চৈঃস্বরে কথা বলে না, ধূমপান করতে খুব ভালবাসে, আর অত্যন্ত সরল প্রকৃতির লোক। আণ্ডালুস্তান রমণীরা কথা কইতে বড় ভালবাসে, প্রায় কফিখানায় দেখা যায় এরা দলবদ্ধ হয়ে আলাপ আলোচনা করছে, হাতপাখা সংগ্রহ করাও এদের একটা তীব্র নেশা, হাতে একখানা হাতপাখা থাকা চাইই। স্পেনিশ মেয়েরা সাধারণতঃ সকলেই সুন্দর হয় না কিন্তু তাদের কথাবার্ত্তায় এমন একটা স্নিগ্ধতা আছে, দৃষ্টিতে এমন একটা সুষমা আছে, হাসিতে এমন একটা মোহ আছে যা অনিন্দ্য, ও অপরূপ লাবণ্যময়। আণ্ডালুস্তান যুবকেরা প্রতিদিন সান্ধ্য উপভোগের আয়োজন করে গীতিবাদ্যে। আণ্ডালুস্তান প্রত্যেকেই বীণা বাজাতে অত্যন্ত ভালবাসে। ভিখারীরও একটি বীণা থাকে, সাতদিন উপবাসে কাটলেও সে বীণাটি সে প্রাণ থাকতে বিক্রী করে না। ছুটির দিনে এরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা খোস গল্প করেই অতিবাহিত করে। বই পড়তে এরা মোটেই ভালবাসে না তা সে যত বড় লেখকেরই লেখা হোক না কেন। এরা অত্যন্ত অতিথিবৎসল, গৃহদ্বারে অতিথি এলে সর্ব্বস্ব দিয়াও এরা তাকে পরিতৃপ্ত করতে পশ্চাৎপদ হয় না। গৃহস্বামী যত গরীবই হোক না অতিথিকে কখনও দ্বার হতে ফিরতে হবে না। ইংরাজদের মত অতিথেয়তার কোন মূল্য এরা গ্রহণ করে না। 'ফেরিয়া' উৎসবের দিনে এরা হাসিমুখে নিজ নিজ গৃহে অপরিচিত আগন্তুকদের স্থান করে দেয় এবং সকল প্রকার সুবন্দোবস্ত করতে কখনো পরাঙ্মুখ হয় না।

মাদ্রিদ্ সহরটী স্পেনের রাজধানী। সহরটির আবহাওয়া অত্যন্ত বিশ্রী—গ্রীষ্মকালে সূর্য্যের প্রচণ্ড উত্তাপ আর শীতে বরফের মত ঠাণ্ডা। স্পেনের অন্যান্য সহরের জীবনযাত্রা আর মাদ্রিদের জীবনযাত্রার প্রণালী একেবারে বিভিন্ন। সহরটি আধুনিকতায় কর্ম্মকোলাহলময় জীবনযাত্রায় মুখরিত। একটি

পোল পার হয়ে মাদ্রিদ সহরে প্রবেশ করতে হয়। পোলটি এমন জমকাল ধরণে তৈরী, যে সারা স্পেনের মধ্যে এধরণের পোল আর একটিও নাই। সহরটি দুই অংশে বিভক্ত—নতুন আর পুরাণো; পুরাণো অংশের অধিবাসীরা নতুনের অধিবাসীদের চেয়ে দুতিন শতাব্দী পিছিয়ে আছে। পুরাণো অংশটিতে প্রতি রবিবারে হাট বসে। পৃথিবীর যাবতীয় দ্রব্য সেই হাটে বিক্রী হয়। এতবড় হাট জগতে আর কোথাও বসে না। হাটের লোকদের নিজ নিজ জিনিষ বিক্রী করবার দিকে ততটা লক্ষ্য থাকে না যতটা লক্ষ্য থাকে খোস-গল্প করবার দিকে। সহরের নতুন অংশটি একেবারে প্যারীর ধরণের—পথঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, বাড়ীগুলো পর্য্যন্ত ছবির মত। মাদ্রিদের লোকদের অধিকাংশ সময় কেটে যায় পথে, পার্কে আর কফিখানায়। সকাল আটটার সময় এরা জড় হয় আর মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত আড্ডা দিয়েই কাটিয়ে দেয়—সঙ্গে আনে বাক্স বাক্স সিগার তা' সে নগদেই হোক আর ধারেই হোক! এই সব খোস গল্পের মধ্যে সাধারণতঃ রাজনীতি চর্চ্চাই হয় বেশী—রাজনীতিতে ওদের কেমন যেন একটা জন্মগত অধিকার। প্রতি সন্ধ্যায় সবকটি পার্ক জনতায় পূর্ণ হয়ে ওঠে—সন্নিকটস্থ পল্লীর স্ত্রীপুরুষ সকলেই জড় হয় সান্ধ্যবায়ু সেবন করতে, এই সান্ধ্য-ভ্রমণে বাহির হবার কালে মহিলাদের পোষাক পরিচ্ছদের চেয়ে হাতপাখার উপর লক্ষ্য থাকে বেশী। ও দেশের মেয়েরা যে যতগুলি সুন্দর সুন্দর হাতপাখা সংগ্রহ করতে পারে তার তত গৌরব—আমাদের দেশের মেয়েদের গয়নার মত।

স্পেনিশরা থিয়েটার দেখতে অত্যন্ত ভালবাসে, জগতের অন্যান্য দেশ আধুনিক ধারায় ভাল করে অভিনয় করবার আগেই স্পেনের অভিনয়-কলার অনেক উন্নতি ঘটে। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যেই এদেশে বহু নাটক অভিনীত হয়। জগতে সর্ব্বপ্রথম স্ত্রী-ভূমিকায় মেয়েরা অভিনয় করে এই স্পেন দেশেই। "থিয়েট্রো এস্পানোল" হচ্ছে মাদ্রিদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাচীন থিয়েটার। এদেশের ছেলেরাও শৈশব হতে থিয়েটারের পক্ষপাতী হয়ে ওঠে—অয়ে প্রত্যেকটি থিয়েটারে ম্যাটিনী শো হয় কেবল এই ছেলেদের জন্য। শিশুরা এদেশে দেবতার মত, ছেলেদের সবাই ভালবাসে খুব বেশী, আদর যত্ন করে অত্যন্ত কিন্তু তাই বলে আমাদের দেশের নন্দদুলালের মত হয়ে ওঠে না এরা ভবিষ্যতে। এদেশের ছেলেরা খুব শান্ত শিষ্ট, বিনয়ী এবং বাধ্য—আত্মসম্মান জ্ঞান এদের খুব বেশী। অপরিচিতদের সঙ্গে কথা বলতে হলেই সর্ব্বপ্রথম এরা উচ্চারণ করে—'মিল্ গ্রেশ্যাস্'—ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ'! রাত্রে শয়নের পূর্ব্বে প্রতিদিনকার কৃত-কর্ম্মের জন্য এরা ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং ঈশ্বরের কাছে করুণা ভিক্ষা না করে কখনো শয্যা গ্রহণ করে না।



গমের ক্ষেতে কর্ম্মনিরত নরনারী।
এরা কখনো চুপ করে কাজ করে না,—যতক্ষণ কাজ করে, ততক্ষণ গান করে।

মাদ্রিদে কয়েকটি প্রসিদ্ধ মিউজিয়ম আছে—'থ আর্মেরিয়া', 'থ মিউজিয়ো নাভ্যাল', 'থ মিউজিয়ো অর্কোলজিকো,' 'আকাডেমিয়া থ বেলাস্ আর্টিজ', মিউজিয়ো থ আর্টিমডার্ণো', এবং 'থ মিউজিয়ো ডেলপ্রাডো'। 'আর্মেরিয়া', 'নাভ্যাল' এবং 'আর্কেলজিকো' মিউজিয়ামে স্পেনের ঐতিহাসিক দ্রব্যাদি এবং অস্ত্রশস্ত্র রক্ষিত আছে, 'বেলাস আর্টিজ', 'আর্টি মডার্ণো' এবং 'ডেলপ্রাডো'র

মিউজিয়ামে বিখ্যাত স্পেনিশ শিল্পীদের চিত্র ও মর্ম্মর মূর্ত্তিগুলি রক্ষিত আছে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিত্রকর—'টিটিয়ান', 'রুবেণ', 'র‍্যাফেল', 'এল্‌ব্রেচট্‌ ডুরার', 'হলবেন'—প্রভৃতি শিল্পীদের শ্রেষ্ঠ চিত্রগুলি 'প্রাতোর' মিউজিয়মে রক্ষিত আছে।

কিন্তু শুধু সহর দেখলে স্পেনের গ্রাম্য জীবনের কোন পরিচয়ই পাওয়া যায় না। প্রতিগ্রামেই একটি করে তাড়িখানা আছে—দিবারাত্রি সেখানে খরিদ্দারের সংখ্যা কমে না কখনো। এই তাড়িখানার উপরতলাটি হচ্ছে অতিথি-শালা, আগন্তুকদের এইখানে আশ্রয় নিতে হয়। তাড়িখানার পাশে প্রকাণ্ড আস্তাবল থাকে সেখানে গ্রামের অশ্বতর, গাধা এবং বলদগুলো রাখা হয়। এই আস্তাবলের দুর্গন্ধে উপর তলে বাস করা কষ্টকর হয়ে ওঠে। ঘরগুলি কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। য়ুরোপের অন্যান্য দেশের মত ঘরে অগ্নিকুণ্ড নেই। প্রচণ্ড শীতে একপাত্র কাঠ-কয়লার আগুন ঘরে রাখা হয়। 'পাসোদা'র কর্ত্রী হচ্ছে 'সিনোরা'। এঁদের দেহটি প্রস্থে আমাদের দেশের গৃহিণীদেরও পরাস্ত করে। কিন্তু অতিথিদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য এঁদের বিপুল দেহ পরিশ্রমে কখনো পরাঙ্মুখ হয় না।

প্রতি রবিবারে গ্রামে 'ডিয়া ফেষ্টিভো' উৎসব হয়। তরুণ-তরুণীরা প্রজাপতির মত রঙীন পোষাকে সজ্জিত হয়ে নৃত্য-গীতে দিনটি অতিবাহিত করে।

স্পেনের সকল অংশেই জিপ্‌সীদের বাস। এরা দলভুক্ত হয়ে বাস করে। নৃত্যে এদের জন্মগত অধিকার। ছেলেমেয়েরা শৈশব হতেই নৃত্য শিক্ষা করে।

স্পেনের অধিকাংশ অধিবাসীরা 'বাস্কে' ভাষায় কথা বলে। বাস্কোরা য়ুরোপের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন জাতি বলে গর্ব্ব করে। বাস্কোদের মধ্যে অনেক প্রাচীন প্রথা আছে—জ্যেষ্ঠা কন্যা পৈতৃক বিষয়ের উত্তরাধিকারিণী হয়। এদের বিশ্বাস, যে-বলদের গাড়ীতে যত শব্দ হবে সেই গাড়ী তত শুভ। গাড়ীর চাকায় এরা কখনো তেল দেয় না, কেননা এই চাকার শব্দে অপদেবতা পলায়ন করে বলেই এদের বিশ্বাস!

স্পেনের 'এক্সট্রেমাদুরা' অঞ্চলে মেষপালন করা হয়। এক একটি দলে পঞ্চাশ হাজার পর্য্যন্ত মেষ থাকে। স্পেনের পশম য়ুরোপের মধ্যে বিখ্যাত। যদিও এদেশে পশম-শিল্পের উন্নতি হয়নি বিশেষভাবে, তাহলেও প্রায় দশ লক্ষ ব্যবসায়ী এই পশমের ব্যবসা করেই কোটিপতি হয়েছে।

মদ তৈরী এদেশে খুব লাভজনক। হাজার হাজার লোক অন্নের সংস্থান করে মদের কারখানায় কাজ করে।

এদেশের অধিবাসীরা সাধারণতঃ গরীব, এজন্য মৃৎ-পাত্রের ব্যবসা এদেশে বিশেষ লাভজনক।

মেয়েরা এদেশে পুরুষদের সঙ্গে সমভাবে কাজ করে। কঠোর পরিশ্রম করলেও এরা ক্লান্ত হয়ে পড়ে না। এরা অতিরিক্ত পরিশ্রম করে বটে কিন্তু এদের অঙ্গ-সৌষ্ঠবের সুষমা তার জন্য নষ্ট হয় না একটুও—হাস্যমুখে এরা সবকিছু দৈহিক পরিশ্রম সহ্য করে।

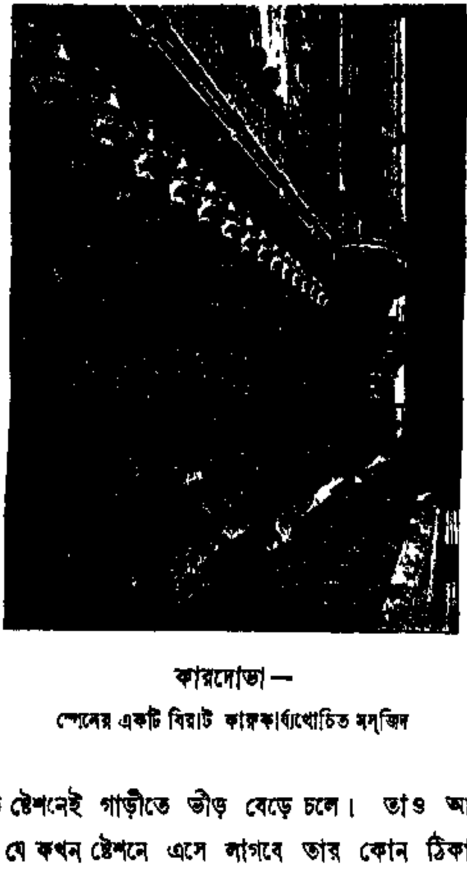
এরা খুব ধার্ম্মিক—ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে এরা সব কিছু ক্ষতি সহ্য করতে পারে। সপ্তাহে দু' 'সেন্টিমো' করে চাঁদা দিয়ে এরা 'সান্টামেরিয়া' উৎসবে ন'হাজার ডলার খরচ করে।

সিগারেটের কারখানা এদেশে অনেক। প্রত্যহ পঞ্চাশ বাক্স সিগারেট তৈরী করতে এরা একটুও ক্লান্তি বোধ করে না। যতক্ষণ এরা কাজ করে, ততক্ষণ কথা চলে, কথা না বললে এরা মোটে থাকতে পারে না। সহরে যখন ইষ্টারের ছুটিতে সান্টা মেরিয়া উৎসব হয়, গ্রামে তখন 'পাস্কোয়া ডি রেজারেক্শিয়ন' উৎসব হয়। এই উৎসবে যোগদান করবার জন্য অনেক দূরের গ্রাম হতে লোকেরা আসে পদব্রজে কেননা স্পেনের পার্ব্বত্যময় প্রদেশে রেলপথ নেই। ছোট ছোট গ্রামগুলি এই উৎসবের আমোদে মশগুল হয়ে ওঠে। এখানেও মেরীর প্রতিমূর্ত্তি বিরাট শোভাযাত্রায় পথে বাহির হয়, দেবী পূজার অনুষ্ঠানাদিও হয় ঠিক শ্রাভাইলেয় মত।

এদেশের লোকেরা খুব অতিথিবৎসল হয় আর দূরকে খুব শীঘ্রই আপনার করে নেয়—সে কথা আগেই বলেছি। কিন্তু পরিচিত হ'য়ে ওঠবার আগেই অসংখ্য প্রশ্ন ওঠে—'কোথায় যাবে?'—'এসিয়োর কোন দেশের অধিবাসী?'—'তোমরা ইংরাজী পোষাক পর কেন?' 'কত বছর ধরে

তোমরা পরাধীন আছ?—ইত্যাদি প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে হয়। কিন্তু একবার মেলামেশা সুরু হলে ভ্রমণকারীদের উপকারের জন্য নিজ ব্যয়ে যতটা সুখ স্বাচ্ছন্দ করা সম্ভব তা' করে।

এদেশের অধিবাসীদের ভ্রমণের সময় কষ্ট সহ্য করতে হয় খুব বেশী। পার্ব্বত্য অঞ্চলে রেলপথ একেবারেই নাই—সেখানে অশ্বতরের পৃষ্ঠে যাতায়াত করতে হয়। আর সমতল প্রদেশে যে রেলপথ আছে—তাতেও কষ্ট বড় কম নয়।



কায়দোভা—
স্পেনের একটি বিরাট কারুকার্য্যখোচিত মস্‌জিদ

প্রতি ষ্টেশনেই গাড়ীতে ভীড় বেড়ে চলে। তাও আবার রেল যে কখন ষ্টেশনে এসে লাগবে তার কোন ঠিকানাই নেই—নির্দ্দিষ্ট সময়ে তো আসবেই না, তার আগেও না; আসবে ঘণ্টা পাঁচ ছয় পরে। ঝড় বৃষ্টি হলে ষ্টেশনে দাঁড়াবার উপায় নেই—না আছে ওয়েটিংরূম না আছে একটা টিনের সেড (shade)। আর ষ্টেশন মাষ্টারই ষ্টেশনের সর্ব্বস্ব—টিকিট চেক্ (check) করা থেকে টেলিগ্রাম করা পর্য্যন্ত তাঁরই কাজ।

স্পেনকে চিন্‌তে হলে স্পেনিশ স্থাপত্য ও শিল্পকলাকে জান্‌তে হবে। এদেশের স্থাপত্য-শিল্প—ক্যাথিড্রাল, মসজিদ্ আর থিয়েটার-প্রাঙ্গন নির্ম্মাণে যা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে রোমান আর আরবীয় স্থাপত্য শিল্পের আদর্শে তা গঠিত।

পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত কলাবিদ্যার দিকে এদেশের দৃষ্টিই ছিল না—অভিনয় কলা নিয়েই তখন স্পেন মত্ত ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কয়েকজন 'ফ্লেমিশ' শিল্পী এদেশে এসে চিত্রকলার দিকে প্রথম এদেশীয়দের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তার পরেই আসে ইতালিয়ান চিত্রশিল্পীরা। এই যুগে স্পেনের বিখ্যাত চিত্রকর 'এল্‌গ্রিকো' জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পর একে একে 'ভ্যালেজকোয়ে', 'গোয়া', 'রিবেরা', ও 'জার্বারাণ'—এই খ্যাতনামা চারজন স্পেনিশ শিল্পী আবির্ভূত হন। এঁরা স্পেনের বাস্তব জীবনকে এঁদের চিত্রে রূপ দিয়ে গেছেন। স্পেনিয়ার্ডদের ব্যথা, বেদনা, সুখ, দুঃখকে যে অপরূপ রূপ এঁরা দিয়েছেন তা দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়,—এক একটি ছবি এক একটি কাহিনী যেন।

প্রত্যেকে স্বদেশের প্রথা, আচার, ব্যবহার আর সংস্কারকে জীবনের প্রত্যেক পদে পদে পালন করে চলে—রাজপুত্র থেকে ভিখারী চাষা পর্য্যন্ত। ধর্ম্মে এদের অটল বিশ্বাস, ধর্ম্মের জন্য জীবন দিতেও এরা পশ্চাৎপদ হয় না কখনও। দেশের জন্য একটি মাত্র ডাকেই এরা বেরিয়ে পড়তে পারে স্বেচ্ছাসেবক হয়ে। মৃত্যুকে যে এরা ভয় করে না মোটেই তার পরিচয় পাওয়া যায় যখন স্পেনিশ রাজারা মৃত্যুর পূর্ব্বেই সমাধিগৃহ দেখে আসে। এই বিখ্যাত 'এস্কোরিয়ালটি (সমাধিগৃহ) সম্রাট দ্বিতীয় ফিলিপের তৈরী, বংশ পরম্পরায় এখানে স্পেনিশ সম্রাটদের কবর দেওয়া হচ্ছে।

দৈহিক পরিশ্রমের কোন মূল্য নেই এদেশে, কাজেই অতিরিক্ত পরিশ্রম করে এরা উপার্জ্জন করে খুব অল্প। এইজন্য স্পেনিয়ার্ডরা অধিকাংশই গরীব।

ব্যবসা বাণিজ্যের চেয়ে শিল্প এবং সাহিত্যের দিকে এদের ঔৎসুক্য বেশী। ভাস্কর চিত্রকর আর লেখকের সম্মান অনেক কোটিপতির চেয়ে বেশী। কিন্তু ব্যবসা বাণিজ্যের দিকে দৃষ্টি না থাকায় বিদেশীর অর্থ এরা আত্মসাৎ করতে

পারে না ব্রিটেন আর আমেরিকার মত, দারিদ্র্যও তাই ঘোচে না একটুও। কিন্তু সভ্যতার প্রাচীনতা ধরলে য়ুরোপের মধ্যে রোমের পরেই স্পেনের স্থান—সাম্রাজ্যবাদেও।

এদেশের মত শিষ্টাচার য়ুরোপের আর কোন দেশে নেই। শিক্ষার প্রসারও এদেশে খুব বেশী এজন্য সহরের পথে-ঘাটে মাঠে কাফিখানায় সর্ব্বত্রই রাজনৈতিক আর সাহিত্যিক আলোচনা হয়। শিক্ষার প্রসারতার সঙ্গে সঙ্গে দেশবাসীর মনে এই যে রাজনৈতিক ভাবের বিকাশ—এরই ফলে স্পেনের গণতন্ত্র আজ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে রাজতন্ত্রের অবসান হয়ে। পরিশেষে স্পেনের সিংহাসন ত্যাগী সম্রাট—যিনি রাজ্যলোভে ঘরোয়া বিবাদে প্রজাদের রক্তক্ষয় করেননি সেই ধীরবুদ্ধি উদারচেতা আলফোন্সের ভবিষ্যৎ জীবনের পথ সুখময় হোক আর স্পেনের প্রজাতন্ত্র দীর্ঘজীবি হোক—ঈশ্বরের কাছে এই আমাদের প্রার্থনা!

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

তুমি যেন—

শ্রীযুক্ত অচ্যুত চট্টোপাধ্যায়

তুমি যেন—
বৈষ্ণব কবির এক কান্ত পদাবলী,
প্রতি পংক্তি যা'র প্রেম-মধুরসে ভরা;
ভ্রমর কাঁদিয়া ফেরে ফোটে নাই কলি,
খোলো দ্বার, খোলো দ্বার, খোলো দ্বার ত্বরা!

আঁকাবাঁকা প্রতি রেখা ও-চারু দেহের
ওরা যেন কবিতার প্রতিটি আখর;
আমি পড়ি বারবার সে-লিপি স্নেহের
তুমি আদি নারী যেন আমি আদি নর!

আমার নিরালা ঘরে ব'সে মাঝ্ রাতে,
সমুখে রয়েছে খোলা ছেঁড়া পুঁথিখানি,
আঁখি দু'টি খুঁজে ফেরে তা'র পাতে-পাতে,
কী যে বাণী, তুমি জানো আর্ আমি জানি!

আমার কবিতা তুমি, রচনা আমার,
আমি কবি পড়ি তাই বার্ বার্ বার্!

তৃষা

শ্রীযুক্ত তারাপদ রাহা এম্‌-এ।

কমলির ওখানে চায়ের নিমন্ত্রণ ছিল। কিসের একটা ছুটী ছিল, সুতরাং কারও কোন ওজর চলিবে না। আশা করিয়াছিলাম—আড্ডাটি জমিবে ভালো। কিন্তু সকাল হইতে যেরূপ বৃষ্টি সুরু হইল, তাহাতে নিজেই যাইতে পারিব কিনা তাহাতেও বিশেষ সন্দেহ রহিয়া গেল। বৈকাল ৫টায়ও যখন বৃষ্টি থামিল না এবং ৬টার আগে যখন বাবার মোটার আসিবার সম্ভাবনা নাই তখন অগত্যা একখানা রিক্স করিয়াই ওদের ওখানে গিয়া উঠিলাম।

আমাকে দেখিয়াই মীনা চীৎকার করিয়া উঠিল, 'এই যে অন্থ এসেছিস্ এইবার দেখাব মণ্টুদিকে। তারপর আমাকে হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে মণ্টুর কাছে লইয়া বলিল—'এই ত্যাখ্ না একবার তাকিয়ে, কেমন হাঁড়িপানা মুখ করে বসে আছে। ঝাড়া দু'ঘণ্টা ধরে সাধাসাধি করছি—একটা গান গাইলে না! সত্যি ভাই, আজকার পার্টিটা একেবারে ফেলিওর।"

মণ্টুকে জীবনে এত গম্ভীর দেখি নাই,—দেখিয়া কেমন মায়া হইল। তা'র কাঁধে হাত দিয়া বলিলাম—"কি হয়েচে তোর?"

মীনা ঝঙ্কার দিয়া উঠিল—'ছাই হয়েচে, ভূতে ধরেচে'।

তাহার কাঁধে হাত রাখিয়াই আবার বলিলাম—"কি হয়েচে, ভাই,—বল্ না? সত্যি তোকে এমন ত কোনদিন দেখি নি।"

মণ্টু ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল—'ভূতে ধরেচে'।

"যা:—"

"সত্যি ভাই ভূতে ধরেচে"

কমলি ট্রেতে করিয়া চা কেক্ লইয়া আসিল। মণ্টু একটা পেয়ালা হাতে লইয়া বলিল—'তোরা এ সবে বিশ্বাস করবি?"

অমিতা বলিল 'ছাখো, এইবার মেয়ে মহলেও গাঁজা সুরু হ'ল।"

তাহাকে ধমক দিয়া কহিলাম—"তোর সব তাতেই বাড়াবাড়ি", তারপর মণ্টুকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"কিসের কথা বল্‌ছ ভাই?"

"এই ভূতে,—ভূত বিশ্বাস কর তোমরা?"

বুঝিলাম মণ্টু আজ প্রকৃতিস্থ নাই, উত্তর দিলাম—'না, নিজে করি না বটে, তবে অপরে করলে তাতে আপত্তি করবারও তো কিছু খুঁজে পাই না।'

মণ্টু বলিল—

"কাল সন্ধ্যাবেলা পর্য্যন্ত আমিও তোমাদের দলে ছিলাম।"

গল্পের গন্ধ পাইয়া যে যার আসনে স্থির হইয়া বসিল। বাহিরে অশ্রান্ত বৃষ্টির শব্দ ছাড়া অন্ত কোন শব্দ তখন কানে আসিতেছিল না। মণ্টু বলিয়া চলিল—

"তোরা হয়ত বিশ্বাস করবি না, কিন্তু এ যে একেবারে কালকার ঘটনা, কাল সারা রাত আমি ঘুমুতে পারি নি।···

আমাদের ল্যান্‌স্‌ডাউন রোডের নোতুন বাড়ীতে ত সবাই গিয়েছিস্—না? ওর ডাইনে দু'খানা বাড়ীর পর যে ফ্যাকাশে বাড়ীখানা—ওখানা আমরা ওখানে গিয়ে অবধিই খালি দেখছি। মাস দুয়েক আগে আমি লজিক পড়ছি—এমন সময় আমাদের ঝিটা হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বল্লে—

"দিদিমণি শুনেছ, ওই যে পড়ো বাড়ীটা—ওতে নাকি ভূত আছে।"

লজিকের পাতা থেকে মুখ তুলে আমি হেসে বল্লাম—

"হুঁ তোকে বিয়ে করবে বলে ভাড়া নিয়েচে ও বাড়ী।"

"ওই ছাখো, সবই হেসে উড়িয়ে দাও তুমি! ও বাড়ীতে এক উকিল ভাড়াটে এসেছিল, তার বড় মেয়ে তিন তিন দিন ভূতটা দেখার পর আজ ওরা উঠে গেল।"

সেদিন ঝিকে এক বকুনি দিয়ে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম।

কাল সকালে কেবল চায়ের কাপ মুখে তুলেছি এমন সময় দামিনী এসে বল্‌লে—

"দিদিমণি সেবার তুমি আমার কথায় পেত্যয় করলে না, এবার এস, নিজে কানে শুনে যাবে এস।"

"কেন, কি হয়েচে ?"

"ঐ সেবার ত এক উকীলের মেয়ে ভূত দেখছিল—বলেছি না তোমায় ! এবার আর এক প্রোফেসার ঐ বাড়ী ভাড়া নিয়েছিল। ওরা মাত্র দু'দিন ও-বাড়ীতে বাস করেছে। বাবুর বড় মেয়ে নাকি কলেজে কি পড়ে। মেয়েটী সে ঘরটা থাকবে বলে বেছে নিয়েছিল, পেরথম্ দিন রাত্তিরে পড়তে বসে সেখানে ভূত দেখে চীৎকার করে ওঠে। সেদিন মিছিমিছি ভয় পেয়েচে বলে ওর মা নাকি ও ঘরে আর ঢুক্‌তে দেয় না। পরদিন গেরাহ্যি না করে আবার ও-ঘরে শুতে যায়,—রাম রাম বলো - আবার সেই ভূত! ভূতটা নাকি হাত জোড় করে ওকে ডাকতে থাকে।'

বড় কৌতুহল হ'ল। তাড়াতাড়ি চা শেষ করে ওঠে পড়লাম। দামিকে বল্‌লাম 'চল ত দেখি তোর ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ করে আসি।'

ওকে সঙ্গে করে যখন বাড়ীটার সামনে এসে দাঁড়ালাম, তখন দেখি মেয়েরা সব গাড়ীতে উঠেচে, দুটো গরুর গাড়ীতে প্রফেসারের জিনিষ পত্র বোঝাই, আর তিনি দারোয়ানের হাতে একখানা দশটাকার নোট্ গুঁজে দিয়ে বলছেন্—

'এতে আর আপত্তি করো না দারোয়ানজী—দু'দিন ত তোমার বাড়ীতে বাস করেছি। আর আগে বল নাই কেন বাবা—এ যে ভূতের বাড়ী এত সব্বাই জানে। পাড়ার সব্বাই ত বল্লে—এই দু'মাস আগে এক উকীল বাবু এই ভূতের দৌরাত্ম্যে এই বাড়ী ছেড়ে উঠে গিয়েছেন।'

পাড়ার লোকের কাছে এই বহুদিনের জানা সত্যটি এতদিন যে কি করে আমার কাছে গোপন ছিল, তা বুঝতে না পেরে তাঁকে জিজ্ঞেস্ করলাম "সত্যিই কি আপনি ভূতে বিশ্বাস করেন ?"

সৌম্যমূর্ত্তি অধ্যাপকটী একটু হেসে বল্লেন—

'এতদিন ত খোঁজ করে দেখি নি মা, নিজে ভূত বিশ্বাস করি কি না করি ! তারপর গাড়ীর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে বল্লেন—'কিন্তু তোমারই মত আমার একটি মা আছে, তাকে আমি অবিশ্বাস করতে পারি না—মা। ও নিজেও ত কিছু বিশ্বাস করত না, কিন্তু এই দুই রাত্রি পর পর কি একটা দেখে মা আমার অসুস্থ হয়ে পড়েচে।"

গাড়ীর দিকে তাকিয়ে দেখলাম-- মেয়েটীর ফুটন্ত মুখখানা যেন কালি হয়ে গিয়েচে।...

ওরা চলে গেল।

দারোয়ানজী আমার দিকে চেয়ে ভাঙ্গা বাঙালা বল্‌লে—'দেখো ত মাজী, ভদ্র আদমীকো ব্যবহার দেখলেন ? চাল্লিশ রূপেয়া ভাড়া লিয়ে দশ রূপেয়া দিয়ে গেল—বলে ভূতের বাড়ী।'

আমি বল্লাম—'দরোয়ানজী, আজকার জন্তে আমায় বাড়ীটা ভাড়া দেবে ? ৫৲ টাকা দেব।'

সে আমার দিকে চেয়ে রইল—হয়ত আমার কথা বিশ্বাস করলে না। বল্লাম—"আমাকে বিশ্বাস করছ না ?—ঐ পাশের বাড়ী আমাদের, তোমার কোন জিনিষ খোয়া যাবে না—আর যদি ভূত দেখতে পাই তবে তোমায় আরও ২৲ টাকা বকসিস্ দেবো।"

দারোয়ান বোধ হয় এইবার কথা বুঝ্‌লে, বল্‌লে—'আপ্‌কো মেহেরবাণি মাজী'। মোট কথা দারোয়ান স্বীকার করলে এবং আমাকে সঙ্গে করে সব ঘরগুলি একে একে দেখিয়ে দিলে। ওকেই জিজ্ঞাসা করে জেনে নিলাম—প্রফেসারের মেয়েটী কোন ঘরে থাক্‌তো।...একখানা স্প্রিং-ওয়ালা লোহার খাটে গদীপাতা—ঘরের এক কোণে একখানা টেবিল, তার ধারে দু'খানা বেতের চেয়ার, আর একখানা জীর্ণ সোফা। জানালার পর্দাগুলি বেশ ময়লা হয়ে উঠেচে। দারোয়ানকে বল্লাম—"এগুলি কি ওদের ব্যবহার করতে দিয়েছিলে ?"

সে বল্লে—"হাঁ, মাজী—ও আর কোথায় সরাবে ও ঐখানেই থাকে।"

"ঐ খাটে কি মেয়েটা বিছানা করত ?"

"হাঁ মাজী"

গদীটা নেড়ে চেড়ে দেখলাম। ঘরের দুটো দরজায় খিল দিয়ে দেখলাম বাইরে থেকে কারও ঢোকবার উপায় নেই। সুইচ্ টিপে দেখলাম—আলো ঠিক আছে। দারোয়ানকে বল্লাম—'সব ঠিক আছে, এইবার ঘরের চাবিটা দাও। কাল সকালে তোমার টাকা বুঝে নিও।'

দারোয়ান চাবী দিয়ে বললে—"মাজী, হামী রাত্রে কি এখানে থাকবে?"

ও হয়ত মনে করেছিলো আমি ভয় পেতে পারি,—বল্লাম—"না তোমার থাকবার প্রয়োজন নেই।"

দাসী এতক্ষণ কথা বলছিল না. বাড়ী ফিরবার পথে ও বললে—'খবর্দ্দার দিদিমণি, ও সব কথগুলো করতে যেও না —আমি এক্ষুনি কর্ত্তা বাবুকে বলে দিচ্ছি।' মাকে আনতে বাবা কাল ভোরে রাঁচি গিয়েছেন—সুতরাং সে ভয় আমার ছিল না।

নীতিদির সঙ্গে বায়োস্কোপ দেখতে যাচ্ছি বলে বেরিয়ে পড়লাম। অন্ততঃ দু'তিন ঘণ্টা ওখানে বসে থাকবো বলে একখানা বইও হাতে নিলাম। হাঁ—আরেক কথা—ও বাড়ীর ভূতের গল্প শুনে একটা জিনিষ আমি লক্ষ্য করেছিলাম সেটা হচ্ছে এই—যে যারা ভূত দেখেচে তারা দুজনেই মেয়ে এবং যুবতী মেয়ে। এ বয়সী মেয়েদের পেছনে যে সব ভূতেরা ঘোরে—এ ভূত তাদের একজন নয় ত? কত কি হ'তে পারে ভেবে একখানা ভুটানী ছুরিও সঙ্গে নিয়েছিলাম। তারপর দারোয়ানজীর চাবী দিয়ে গেট্ খুলে সেই নির্দ্দিষ্ট ঘরের তালাও খুললাম। সত্যিই আমার একটুও ভয় করে নি—বরং কেমন হাসি পাচ্ছিল—প্রফেসারের সেই ভীতু মেয়েটীর কথা ভেবে।

সুইচ্ টিপে ঘরের দরজায় খিল লাগিয়ে জানালাগুলিতে হাত দিয়ে দেখলাম—ঠিক আছে কি না। সব ভেতর থেকে বন্ধ—বাইরে থেকে কারও ঢুকবার উপায় নেই।' খাটের নীচে ঘরের কোণে তাকিয়ে দেখলাম—কোথাও কিছু নাই। নিশ্চিন্ত মনে বইয়ের পাতা খুলে বসলাম।

এক পৃষ্ঠাও পড়া হয়নি—হঠাৎ মনে হ'ল আমার ডাইনের চেয়ারে সাদা একটা কি! তাকিয়ে দেখি শাদা লংক্লথের এক পাঞ্জাবী গায়ে ২৪।২৫ বছরের একটি ছেলে আমার পাশে বসে। মুহূর্ত্তে আমার সারা গা পাথর হয়ে গেল; তবে? কোন রকমে সাহস সঞ্চয় করে হাতড়ে দেখলাম আঁচলের নীচে ছুরিখানা ঠিক আছে কি না। তারপর সেখানাকে মুটোর মাঝে এটে ধরে ওর দিকে ফিরে শুধালাম—

"আপনি—আপনি কে?"

যে রূঢ়তা নিয়ে ওর সঙ্গে কথা বলতে যাচ্ছিলাম—মুহূর্ত্তে তা জল হয়ে গেল। দেখলাম লোকটীর বয়স ২৪।২৫ হলেও মুখে শিশুর সারল্য। আর মুখখানিতে এমন একটা কাতর মিনতি মাখানো আছে যে দেখলে সত্যি মায়া হয়। ভূত সম্বন্ধে অদ্ভুত সংস্কার ছিল,—মনে হ'ত যদি ভূত থাকে, তবে তার কিম্ভূতকিমাকার চেহারা—তারা অত্যাচার করে, মানুষকে গলা টিপে মারে,—আরও কত কি। কিন্তু এর চেহারা দেখে মনে হ'ল—এ যদি ভূত হয়, তা'হলে এর সঙ্গে দু'দণ্ড কথা বলবার মত সাহস আমার আছে।

ওর দিকে চেয়ারটা ভালো করে সরিয়ে নিয়ে বল্লাম—

"আপনি কে?—এখানে কেন এসেছেন—কি করে এলেন?"

উত্তরে ও শুধু একটু হাসলে। সে ত হাসি নয় যেন পুঞ্জীভূত ব্যথা। এইবার মুখখানা আরও একটু ভালো ক'রে দেখলাম। দেখলাম—যেন একটি শ্বেতপদ্ম আউরে গিয়েচে,—চোখের কোণে একটু কালো ছোপ।

বল্লাম—"পরিচয় দিন।"

"কি হবে পরিচয় দিয়ে?"

কথায় সেই ব্যথার সুর।

হঠাৎ আমার সন্দেহ হ'ল—মানুষ নয় ত? দরজা জানলা সব আঁটা আছে ত?—উঠে দেখতে যাচ্ছিলাম। লোকটা হঠাৎ চেয়ার থেকে উঠে ঝরঝর করে কেঁদে আমার পায়ে ধরতে এল। বল্লে—"যাবেন না, আপনার দুটী পায়ে পড়ি যাবেন না—যদি দয়া করে এসেছেন, দু'দণ্ড বসুন।'

বল্লাম—'আমি যাচ্ছি না! কিন্তু তা'তে আপনার লাভ কি? আপনি ত -

"হাঁ আমি ভূত, আমার পাঞ্চভৌতিক দেহ নাই বটে, কিন্তু আর সব আছে। এ বুকে বড় ব্যথা। একটুখানি ভালোবাসা পাবার জন্ম আমার প্রাণটা পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে।'

লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে বড় কষ্ট হ'ল; বল্লাম—"কিন্তু আমাকে এ কথা বলছেন কেন?"

'আপনাকে যে আমি ভালবাসি।'

কিছু নয় তবু বুকের মাঝে যেন কেমন করে উঠ্‌লো—বল্‌লাম—"উকিলের মেয়ে কি প্রফেসারের মেয়ের সাথে সাক্ষাৎ হলে তাকেও ত আপনি এই কথাই বল্‌তেন?"

"হাঁ"

"তবে?"

লোকটা লম্বা চুলগুলি পাগলের মত নেড়ে চোখ ঘুরিয়ে বলতে লাগল—

"দেখুন, অতসত আমি বুঝি না। আমি একজনকে চাই যে আমার দিকে একটু ভালোবেসে চাইবে, তা' হো'ক সে উকীলের মেয়ে, অধ্যাপকের মেয়ে বা হ'ন যেন আপনি। এ বুকে অনেক দুঃখ জমা হয়ে আছে। সারা জীবন ভরে নারীর ভালবাসার স্বাদ পাই নি। মাটীতে পড়েই না কি মা হারিয়েছিলাম। মায়ের একটী চুমো পাবার জন্ম এখনও আমার গাল দুটো উশবিশ করছে। বড় হয়েও বামুন ঠাকুরের রান্না খেয়ে আর চাকরের করা বিছানায় শুয়ে আমার দিন কেটেছে!

তারপর ক্রমে যৌবন এল—আর একরূপে নারীকে পাবার জন্মে চিত্ত ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌লো,—কিন্তু কোন দেবীর চরণেই ভক্তের ক্রন্দন গিয়ে পৌঁছল না। সত্যি কি ভালোই লাগ্‌ত মেয়েদের, মনে হ'ত বুকটা পেতে দি আর তার উপর ওরা কেউ তার নরম পায়ের ছাপ রেখে যা'ক। লজ্জায় কাউকে কিছু বলতে পারি নি। এই ঘরেই ত জবা থাক্‌তো—আমার বাবার বন্ধুর মেয়ে—পড়তে এসেছিল। তাই ত এ ঘর ছাড়তে পারি না।·· তাকে ভালোবেসেছিলাম।·· সে আমার চা তৈরী করে খাওয়াতো,—ও:—কি মিষ্টি সে চা! নারীর সেবা পুরুষের কাছে কি দুর্লভ রত্ন, তা আপনি কি বুঝবেন? জবার ঐ একটুখানি সেবা আমার প্রেমের তৃষ্ণা বাড়িয়ে দিয়েছিল। কিছু বলতে পারতাম না তাকে—কিন্তু আমার চোখ হয়ত বল্‌ত। জবার চোখে ও সাড়া পেয়েছিলাম—তাই ত আমার এ স্পর্দ্ধা।· ···

অসুখে অজ্ঞান অবস্থায় কি প্রলাপ বকেছিলাম মনে নাই, জগতে আর কিছু পাবার সাধ ছিল বলেও ত মনে হয় না; কিন্তু মরবার আগে জবার সঙ্গে আর দেখা হ'ল না। তার একটী চুমুর জন্ম প্রাণটা যাচ্ছিল না। মরবার আগে তার গরম ঠোঁটদু'খানি যদি একবার আমার ঠাণ্ডা ঠোঁটে এসে লাগতো!"

লোকটা সহসা আমার দিকে তাকিয়ে কাতর হয়ে বল্‌লে—'দেবে একটা—দেবে? তুমি কি করবী? শেফালি? যূথী? জবা দিলে না—তুমি দেবে?—একটু ভালবাসা?··· এই সাধটুকু না মিট্‌লে যে আমার কত যুগ ঘুরে বেড়াতে হবে।'

লোকটার পাংশু ঠোঁট দু'খানি যেন আমায় চুম্বকের মত টেনে নিল। ওর দু'খানা হাতের মধ্যে আমার দেহটা আপনি এগিয়ে গেল।······

অমন করে আর কাউকে কোনদিন চুমু খেয়েছি বলে মনে হয় না। আবেশে চোখ বুজে এসেছিল,···কিন্তু চোখ মেলে আর তাকে দেখতে পেলাম না।"

কমলি ট্রে হাতে করেই দাঁড়িয়ে ছিল—বল্লে—'ভূতটা বোধ হয় উদ্ধার হয়ে গেল।'

বাহিরে তখনও বিরহীর কান্নার মত বৃষ্টি-ধারা অঝোরে ঝরিয়া পড়িতেছিল।

শ্রীতারাপদ রাহা।

পুস্তক-পরিচয়

"কাজল লতা" *

সুলতা নাম্নী একটা পরমা রূপবতী অথচ ততৈব নির্ব্বোধ মেয়ে ক্রমাগত হস্তান্তরিত হতে হতে শেষকালে উপযুক্ত হাতে পড়্‌ল। মেয়েটি বড় নিরীহ; পক্ষপাতবিহীন ভাবে সকলের সেবা ও সকলকে শ্রদ্ধা করে; ক্ষমাশীলতার প্রতিমূর্ত্তি; কোনো দিন আত্মসুখের কথা কল্পনা করতে পারে না; কোনো দিন দেহ সম্বন্ধে সচেতনই হয় নি এবং ভালোবাসা কী ব্যাপার তাও তার অজানা।

এমন মানুষকে কবি ব্রাউনিং বোধ করি বল্‌তেন half angel and half bird. একে যে কেমন ক'রে নারী বল্‌তে পারা যায় সেই এক আশ্চর্য্য। যাকে মানুষ বলা কঠিন ও নারী বলা ততোধিক কঠিন তার চরিত্র বিচার পূর্ব্বক তাকে সতী বা অসতী আখ্যা দেওয়া মূঢ়তা। আমরা উদ্ভিদের চরিত্র বিচার করিনে।

শীতলা বল্ল, "তোর মতন দুশ্চরিত্র হওয়া মানুষের গৌরব। নারীত্বের সঙ্গে সতীত্বের যে কত বড় তফাৎ তা তোকে না দেখ্‌লে বুঝ্‌তামই না।"

আমরা কিন্তু সুলতাকে দেখেও বুঝ্‌লুম না। "শেষ প্রশ্নে" যে পার্থক্য শরৎচন্দ্র বোঝাতে পেরেছেন, "কাজল লতায়" প্রবোধকুমার তা পারেন নি। কমল লৌকিক অর্থে সতী না হলেও নারী। সুলতা কপালকুণ্ডলার জাতি। মানুষের মধ্যে দৈবক্রমে এসে পড়েছে। নীতি দুর্নীতির বাইরে।

তা ব'লে সুলতাকে কিছুমাত্র কম জীবন্ত বোধ হয় না। প্রবোধকুমার সেই মৃন্ময়ীর মধ্যে জীবন্যাস করতে পেরেছেন। তাকে আমরা এই পৃথিবীর কোথায় যেন দেখেছি। সে অবাস্তব কিম্বা অস্বাভাবিক হয় নি। রবীন্দ্রনাথের "সুভার" মতো সে তার মূক অস্তিত্ব নিয়ে এক কোণে আত্মগোপন করেছিল। প্রবোধকুমার সেই অস্তিত্বকে উদ্‌ঘাটিত করলেন। হৃদয়হীনেরা তাকে অসতী বলে অবজ্ঞা করে করুক, আমরা তাকে ভালোবাসি।

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

"বুকের বীণা" *

অপরাজিতা দেবীর লিখনভঙ্গী লঘু তরল প্রয়াস-বর্জ্জিত ও বেগবান। এঁর কবিতার বিষয়বস্তুতে গুরুত্ব কিম্বা গাম্ভীর্য্য না থাকায় ইনি আমাদের মহিলা কবিদের সনাতন রীতি যে গজেন্দ্রগামিনীত্ব তার ব্যতিক্রম ঘটিয়েছেন। এই দুই নূতনত্বের দরুণ ইনি অল্প সময়ের মধ্যে পাঠক সমাজে আলোড়ন এনেছেন। বাংলার নারীরচিত কাব্যসাহিত্যে এই পুস্তিকাখানি যুগ পরিবর্ত্তনের সাক্ষ্য দিচ্ছে।

কিন্তু এ খানিতে কবিতা আছে দুটি কি একটি। যেমন, "শেষ রাত্রি" ও "কৈফিয়ৎ"। বাকীগুলিতে কবিতার পাঁপড়ি ইতস্তত ছড়ানো থাকলেও সেগুলিকে আমরা মডার্ণ মেয়েলি ছড়া ছাড়া অন্য কিছু বলতে পারিনে। কিন্তু ক'জন লেখিকা এঁর মতো মডার্ণ, এঁর মতো মেয়েলি, এঁর মতো নিখুঁৎ তাল ও মিল দিতে সমর্থ? 'দম্পতীর দ্বন্দ্ব', 'সন্ধির সূত্র,' 'বর্ষার বান্ধবীর চিঠি'—প্রত্যেকটিই পাকা রচনা পরম সুখপাঠ্য। এ গুলিতে একটি স্বাস্থ্যবান মনের রসিকতাপূর্ণ রংমশালের আলো সাংসারিক খুঁটিনাটির উপর ঠিক্‌রে প'ড়ে বাঙালীর গৃহজীবনকে রঙিন ক'রেছে। রুচিবাতিকগ্রস্তেরা

* মলাটের পরিকল্পনাটি অসামান্য। ছাপা-কাগজ-বাঁধাই আশাতীত স্মার্ট।

* ছাপা ও বাঁধাই নববধূর মতো অলঙ্কারবহুলা। সুতরাং নববধূ সাধারণের উপহার যোগ্য।

এগুলির স্থলে স্থলে অ-মার্জ্জনার গন্ধ পাবেন। আমরা বলি, মার্জ্জিত হলে সেই জিনিষই ঝক্‌ঝকে হয় স্বভাবত যা মলিন। 'দিনের শেষের' একটি কথাও শুধ্‌রে দেওয়া যায় না। দিলে তার যাদুটুকু অন্তর্হিত হয়। অপরাজিতা দাম্পত্য তুচ্ছতার যাদুকর।

আশা করা যাক্‌ ভবিষ্যতে এঁর রচনায় কবিত্ব আস্‌বে, এবং ইনি তুচ্ছতার থেকে উচ্চে উত্তীর্ণ হয়েও এমনি সুরসিকা থাক্‌বেন।

শ্রী অন্নদাশঙ্কর রায়

নানা কথা

আমাদের পাঠকবর্গের প্রতি নিবেদন

এতদিন পর্য্যন্ত আষাঢ় মাসে 'বিচিত্রা'র নূতন বর্ষ আরম্ভ হইত, এখন হইতে শ্রাবণ মাসে হইবে। ইহাতে নূতন গ্রাহকদের কোনো ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। যাঁহারা বৎসরের মাঝখান হইতে গ্রাহক হইয়াছেন, তাঁহাদের বাৎসরিক বা ষাণ্মাসিক চাঁদা অনুসারে সম্পূর্ণ বারোখানি বা ছয়খানি সংখ্যা পাইলে তবে তাঁহাদের চাঁদা ফুরাইবে। প্রতি বাংলা মাসের প্রথম দিনে 'বিচিত্রা' নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইয়া যাহাতে আমাদের গ্রাহকদিগের নিকট পৌঁছে,—তাহার জন্য যথা-সম্ভব সুবন্দোবস্ত করা হইতেছে। আশা করি আমাদের এই নিবেদন ১লা শ্রাবণই আমাদের গ্রাহকদিগের নিকট পৌঁছিবে। 'বিচিত্রা' এই যে চার বৎসর অতিক্রম করিয়া পঞ্চমবর্ষে পদার্পণ করিল,—এই চার বৎসরের মধ্যে অনেক বাধা-বিঘ্ন ইহাকে অতিক্রম করিতে হইয়াছে,—অনেক প্রতিকূল ঘটনা ও অবস্থার সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছে; বিশেষতঃ গত বৎসরের শেষ কয়েক মাস নানা বে-বন্দোবস্তের চাপে 'বিচিত্রা' যে নিতান্তই ক্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল,—সে-কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই, অস্বীকার করিয়াও কোনো লাভ নাই। সেই সব বে-বন্দোবস্ত দূর করিবার জন্যই আমরা এই একমাস সময় আমাদের পাঠকবর্গের নিকট হইতে ভিক্ষা করিয়া লইলাম,—এ কথা সহজেই অনুমেয়। এই দুর্দ্দিনে আমাদের গ্রাহক ও পাঠকবর্গের নিকট হইতে আমরা যে সহৃদয়তা লাভ করিয়াছি,—তাহার মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না।

পাঠকদিগের নিকট হইতে এই রকম সহৃদয়তা লাভ করিতে পারিলেই মাসিকপত্রের পক্ষে টিকিয়া থাকা সম্ভব। আমরা এই সহৃদয়তার অনুরূপ মূল্য আমাদের পাঠকদিগকে এযাবৎ দিতে পারিয়াছি কি-না,—তাহা তাঁহাদেরই বিবেচ্য, আমাদের দিক হইতে আমরা এইটুকু বলিতে পারি যে, আশা ও আদর্শ অনুযায়ী সাফল্য লাভ করিলে যে আত্ম-তুষ্টি পাওয়া যায়, আমরা এখনো পর্য্যন্ত তাহা পাই নাই;—যদি চ আমাদের ঘোরতর দুর্দ্দিনেও এদিকে আমাদের চেষ্টার একটুকুও শৈথিল্য ছিল না। এইদিক দিয়া এইটুকু সন্তোষ আমাদের মনে আছে যে, অতীতে অনেক খ্যাতনামা মনীষিদের লেখা 'বিচিত্রা'র পাতা অলঙ্কৃত করিয়াছে,—এবং ভবিষ্যতেও যে করিবে, এমন আশ্বাস আমরা নির্ভয়ে দিতে পারি। তবে ইহা অপেক্ষাও বেশী সন্তোষের বিষয় এই যে 'বিচিত্রায়' প্রথম লিখিতে আরম্ভ করিয়া দু'চারজন তরুণ লেখক ইহারই মধ্যে সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রভূত খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। শক্তিশালী নূতন লেখকদের পাঠক-সমাজে পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেওয়া মাসিক পত্রের একটা বড় সার্থকতা একথা বোধ হয় নিঃসন্দেহেই বলা চলে।

বস্তুত দৈনিক সংবাদ-পত্র ও সাময়িক পত্রের পার্থক্য ঠিক এইখানে। দৈনিক সংবাদ-পত্রের সম্পাদককে রোজকার-রোজ তাজা খবর সারা বিশ্ব হইতে সংগ্রহ করিয়া প্রতিদিন

প্রত্যূষে পাঠকদের জোগাইতে হয়। সেজন্য যে আয়োজন তাহার প্রধান অঙ্গ ক্ষিপ্রতা ও বিপুলতা। যন্ত্রযোগে পৃথিবীর অপর কোণ হইতে দিনের সংবাদ সংগ্রহ করিয়া বিরাট কল-কারখানার সাহায্যে বিপুলায়তন কাগজের উপর ক্ষিপ্রগতিতে মুদ্রিত করিয়া সেগুলি পরদিনই জন-সাধারণের নিকট বিলি করিতে হইবে। কাজেই একটা হৈ হৈ রৈ রৈ পড়িয়া যায়,—তাড়াতাড়ি হুড়োহুড়ির মধ্যে যে-উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, তার মধ্যে আর যত খবরই থাকুক না কেন, আসল ব্যক্তি-মানুষটিরই কোনো খবর থাকে না,—যে-মানুষ যুগে যুগে দেশে দেশে ইতিহাসে-বর্ণিত সভ্যতার ক্রম-বিবর্ত্তনের বিচিত্র স্তরের ভিতর দিয়া মহাকালের মধ্যে আপনাকে প্রকাশিত ও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে এবং করিতেছে। এই যে চিরন্তন মানুষটির যে খবর দৈনিক সংবাদপত্র দিতে পারে না, সেই মানুষটির সেই খবর দেওয়াটাই সাময়িক পত্রের কাজ। আয়োজনের বিপুলতায় যাহা হারাইয়া যায়, আয়োজনের স্বল্পতার দ্বারাই তাহার পুনরুদ্ধার করা সম্ভব। দৈনিকপত্র হুড় হুড় করিয়া ঢালিয়া দেয় যে উপকরণ, অবসরের নিভৃত অন্তরালে সেগুলিকে বাছাই করিয়া মাসিকপত্র করে সৃষ্টি। জগতে যাহা ঘটে, দৈনিকপত্র পাঠকের নিকট তাহারই সংবাদ দেয়, জগতে মানুষ যাহা কিছু চিন্তা করে ও সৃষ্টি করে, সাময়িক পত্র পাঠকের নিকট তাহাই পৌঁছাইয়া দেয়।

মহাকালের অনন্তপ্রবাহে কত মানুষ আসে যায়, কিন্তু এই আসা-যাওয়ার অবিচ্ছিন্ন ধারায় মানুষের যে-রূপটি বিকশিত হইয়াছে তাহা অমর। আজ পর্য্যন্ত মানুষ কত কী ভাবিয়াছে, বলিয়াছে, আবার ভুলিয়া গিয়াছে,—কত কী কল্পনা করিয়াছে, তারমধ্যে কত কল্পনা বাস্তবের মধ্যে রূপলাভ করিয়াছে, কত বা সাহিত্যে, কত বা চিত্রে, কত বা গানে,—মানুষের কত অচিন্তিত, অকথিত বাণী, কত অপরিতৃপ্ত আকাঙ্খা প্রকাশ-বেদনায় ও গভীর আকুলতায় সুরের মধ্যে গুমরিয়া গুমরিয়া উঠিয়াছে; বাহিরের বিশ্বপ্রকৃতির সহিত নিবিড় সম্বন্ধের মধ্যে কত নিগূঢ় বাণী শুনিয়াছে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক,—কত আনন্দের বাণী শুনিয়াছে কবি। দিনে দিনে জীবনের এই নিরন্তর প্রবাহের মধ্যে কত আন্দোলন, আলোড়ন, উত্তেজনা, উন্মাদনার তরঙ্গাঘাত প্রতিরোধ করিয়া যাহা কিছু টিকিয়া থাকে,—তাহাকেই আশ্রয় করিয়া মহামানবের এই অমর রূপটি গড়িয়া উঠিতেছে। বিরাট অপচয়ের মধ্যেও কিছু কিছু সঞ্চিত হয়। এই সব সঞ্চয়ের বস্তু জনসাধারণের নিকট প্রথম প্রচার করাটাই মাসিক পত্রের কাজ বলিয়া মনে করি। আমরা যদি তাহা কিয়ৎপরিমাণেও করিতে পারি তবে আমরা ধন্য হইব।

আমাদের দেশ আজকাল রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে বিক্ষুব্ধ ও আলোড়িত। এই আলোড়নের মধ্যে অপচয়ের সংখ্যাটা বোধ হয় অপরিমেয়। কিন্তু তা হউক,—শুধু সঞ্চয় নয়, অপচয় কথাটাও মানবজীবনের ধর্ম্ম। অনেক কিছু ব্যয় করিলেই তবে সঞ্চয়ের বস্তু কিছু সংগ্রহ করা যায়। এই কোলাহলের মধ্যেও যদি কিছু অমর বাণী কথিত হয় ত তাহা শ্রুত হইবেই। এই সব বাণী-প্রচারের প্রশস্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত করাটাই আমাদের কাজ; কিন্তু ইহার জন্য চাই সাধনা, শুধু আমাদের দিকে নয়,—আমাদের পাঠক-সাধারণের দিক হইতেও। নিম্নের প্রসঙ্গে এ বিষয় আলোচনা করিতেছি,—আপাতত এই প্রসঙ্গ শেষ করিবার পূর্ব্বে একটি কথা বলিয়া রাখিতে চাই যে,—যদিও 'বিচিত্রা'র পাতায় পাতায় এমন অনেক জিনিসই থাকে, যাহা ক্ষণিকের, চিরকালের নয়,—আমরা মানুষ,—অনেক অপচয়ও করিয়া থাকি,—তবুও আমাদের স্থির লক্ষ্য হইতেছে,—যাহা চিরন্তন, যাহা ধ্রুব তাহারই দিকে। দেশের মধ্যে যাহা কিছু মহৎ ও উদার ভাবরাজি চিন্তিত ও প্রকাশিত হইতেছে, যে-সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে মানুষ তাহার চিরন্তন সত্তাটিকে প্রকাশ করিয়া জীবনের সার্থকতা লাভ করিতেছে,—আমাদের উদ্দেশ্য তাহারই প্রচার করিয়া জাতীয় জীবনকে সমৃদ্ধতর করিবার চেষ্টা করা। তাই 'বিচিত্রা'র পাতায় সাধারণতঃ আমরা রাষ্ট্রীয় সাময়িক উত্তেজনার বিষয় আলোচনা করিয়া যেমন দৈনিক সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে অনধিকার প্রবেশ করি না,—তেমনি রাষ্ট্রীয় জীবনে যাহা কিছু আমাদের মনে হয় মানবজীবনের বৃহত্তর পটভূমিকায়

উপর একটা স্থায়ী রেখা অঙ্কিত করিতে পারে,—তাহারও আলোচনা হইতে আমরা বিরত হই না।

লেখক ও পাঠক

বলিতেছিলাম,—আমাদের যে কাজ,—তাহাতে সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে,—পাঠক-সাধারণের সহায়তা চাই,—কোন্ দিক দিয়া, তাহারই একটু আলোচনা করিব। প্রথমত সিদ্ধি জিনিসটিকে অনেক দিক দিয়া দেখা যাইতে পারে,—এবং জীবনের কোন্ অবস্থাকে সিদ্ধির অবস্থা বলিব, কোন্‌টাকে বলিব না,—তাহা নির্ভর করে অনেকটা ব্যক্তিবিশেষের মূল্য-বোধের উপর। আমাদের পাঠকেরা যদি ক্রমশঃ সংখ্যায় অত্যধিক পরিপুষ্ট হইয়া পড়েন,—তবে হয়-ত অচিরেই আমাদের অর্থকোষ এমন ভরিয়া উঠিবে যে বাহ্যাড়ম্বরে কলিকাতা নগরীকে তাক্ লাগাইয়া দিতে পারিব। এমন অবস্থা আমাদের যদি কোনোদিন হয় তবে যে মনে মনে খুসী হইব না, তাহা বলিতে পারি না; অথবা এমন অবস্থা অন্তরে অন্তরে যে আমরা কামনা করি না,—তাহা বলিলেও মিথ্যা বলা হইবে। কিন্তু এ কথা ঠিক যে, যে-আত্ম-তুষ্টির কথা আমরা উপরের প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছি, নিছক একটা আর্থিক প্রাচুর্য্যের অবস্থায় তাহার সন্ধান মিলিবে না। বাহিরের ঐশ্বর্য্যের কোনো মূল্য নাই একথা আমরা বলিতেছি না,—আশা করি, একথা বলিতে পারিব, এমন বৈরাগ্য আমাদের কোনো দিন হইবে না। বিশেষতঃ এই যুগে যখন অর্থের অনাটনে টিঁকিয়া থাকাই দায় হইয়া উঠিতেছে,—তখন অর্থের প্রতি সম্পূর্ণ অবহেলা করিতে পারেন,—এমন বৈরাগী সন্ন্যাসী সংসারে কমই দেখা যাইবে।

কিন্তু তাই বলিয়া সকল জিনিসেরই যে মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে হইবে একমাত্র অর্থ দিয়া, অর্থই যে আমাদের জীবনের উপর একাধিপত্য বিস্তার করিবে,—আমাদের উপর অর্থের এতখানি অত্যাচারটা একটু বেশী হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ বর্ত্তমান যুগে,—যখন পৃথিবীর সকল দেশেই ব্যক্তিমানবের স্বাধীনতা-রক্ষার জন্য সংগ্রাম বাধিয়া গিয়াছে, যখন কোনো মানুষেরই অত্যাচার আমরা সহ্য করিতে প্রস্তুত নহি,—তখন অর্থের ন্যায় একটা জড় পদার্থের অত্যাচার সহ্য করিব কেন? বাহিরের ঐশ্বর্য্য যে অর্থ তাহা ক্ষণিকের,—খরচ করিলেই ফুরাইয়া যায়, কিন্তু অন্তরের ঐশ্বর্য্য যে আনন্দ তাহা চিরকালের, যতই খরচ করি না কেন, কখনো ফুরায় না,—এই অতি পুরাতন সত্যটির আরো কতদিন ধরিয়া পুনরাবৃত্তি করিতে হইবে? অথচ আশ্চর্য্য এই যে, আমাদের মূল্য-বোধটা একবার বাহির হইতে অন্তরে সরাইয়া আনিতে পারিলেই জগৎটা এক নিমিষে আমাদের চক্ষে রূপান্তরিত হইয়া যায়! সেই রূপান্তরিত জগতের সহিত আমাদের নিবিড় যোগ, তাহার সহিত ঐকান্তিকতা অনুভব করিয়া আমরা জীবনে আনন্দলাভ করি, আমাদের জীবনটা সার্থক মনে করি। অপর পক্ষে জগৎটাকে যতক্ষণ আমরা জীবন-ধারণোপযোগী প্রয়োজনীয় বাসস্থান বলিয়া মনে করি,—ততক্ষণ তাহার সমস্ত জিনিসেরই মূল্য অর্থদ্বারা নির্দ্ধারণ করি, ততক্ষণ জগতের সহিত আমাদের নিরন্তর বিরোধ, তাহাকে জয় করিয়া আমাদের প্রয়োজন-সাধনের উপযোগী করিয়া লইতেই আমরা ব্যস্ত। জগতের এই দুটি রূপই সত্য,—ইহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য-বিধান করাটা সমগ্র মানবজাতির সাধনা।

সমগ্র মানবজাতির কথাটা ছাড়িয়া দিয়া আপাতত আমাদের দেশের কথাটাই ধরা যাক্। আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় যাঁহারা লেখক,—তাঁহারা যদি শুধুই অর্থের দ্বারা তাঁহাদের লেখার মূল্য নির্দ্ধারণ করিতেন, তবে তাঁহারা কখনো লিখিতেন না। শুধু অর্থের দ্বারা লেখার মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে বাধ্য হইয়া প্রতিভাশালী হইয়াও অনেকে লেখেন না,—এমন দৃষ্টান্ত খুঁজিলে মিলিতে পারে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। এমন অবস্থায় যে সকল প্রতিভা-শালী লেখক জীবনের অন্যান্য কর্ম্মক্ষেত্রে, অপেক্ষাকৃত আর্থিক স্বচ্ছলতার অবকাশ ছাড়িয়া দিয়া সাহিত্য বা শিল্প-সাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন,—তাঁহারা ধন্য। অনেকে আবার জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে অর্থোপার্জ্জন করিতে করিতে অবসর সময়ে সাহিত্যসাধনা করিয়া সাহিত্যক্ষেত্রেও যশস্বী হইয়াছেন,—তাঁহাদের ক্ষমতা অবশ্য অসাধারণ। কিন্তু মোটের উপর বাহিরের অর্থনৈতিক জগতের সহিত অন্তরের জগতের একটা অসামঞ্জস্যের দরুণই যে আমাদের জাতীয় সাহিত্য-সাধনায়

ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িতেছে,—একথা নিঃসন্দেহেই বলা যাইতে পারে। এই অসামঞ্জস্যের অবশ্য অনেক কারণ থাকিতে পারে কিন্তু পাঠক-সাধারণের মধ্যে সাধনার অভাব ইহার অন্যতম কারণ, একথা বলিলে অন্যায় বলা হইবে না।

কথাটা একটু পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি। অর্থটা বিনিময়ের সহায়ক মাত্র, অর্থাৎ যাঁহার যে জিনিসের প্রয়োজন, তিনি অর্থের বিনিময়ে সেই জিনিস সংগ্রহ করেন। জীবদেহে রক্ত চলাচলের মত সমাজ-দেহে অর্থ চলাচলের দ্বারাই সমাজের প্রত্যেক অঙ্গ, ব্যক্তি-বিশেষ সবল ও সতেজ থাকে। কিন্তু অর্থের মূল্য এই পর্য্যন্ত, এর বেশী নয়! জীবনের উন্নতি-অবনতি বা সমৃদ্ধির বিচার অর্থের দ্বারা করা চলিবে না। সে বিচারের জন্য অন্য মাপ-কাঠি আবশ্যক। সাধারণত বলিতে গেলে বলা চলে যে জীবনের উন্নতি মানে তার পরিপ্রেক্ষণা এমন বিস্তীর্ণ হওয়া, যাহার ফলে আমরা আর অল্পে সন্তুষ্ট থাকিতে পারি না,—'অধিক' দাবী করি, এবং সেই 'অধিকে'র অনুরূপ অর্থমূল্য দিতেও প্রস্তুত থাকি। যেমন বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে আমরা আর ঘোড়ার গাড়ী চড়িয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারি না, মোটর গাড়ী নহিলে আমাদের চলে না,—এবং তদনুরূপ অর্থমূল্য দিতেও কুণ্ঠিত নহি। সাহিত্যের উন্নতি বলিতেও আমরা তেমনি বুঝি আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের প্রয়োজন এমন গভীরতর হওয়া, যাহার ফলে আমরা আর অল্পে সন্তুষ্ট হইতে পারিব না,—'অধিক' দাবী করিব এবং তদনুরূপ মূল্য দিতেও কুণ্ঠিত হইব না,—যাহাতে দেশের সুসাহিত্যিকরা তাঁহাদের দৈহিক জীবনের অভাবগুলো অনায়াসেই মিটাইতে পারিবেন। আমরা যদি বড়ো দাবী করি, তবেই দেশে বড়ো সাহিত্যের সৃষ্টি হইবে, নতুবা যে হইতে পারে না, সাধারণ অর্থশাস্ত্রের নিয়ম দিয়াও একথা প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় রবীন্দ্রনাথের জন্ম বোধ হয় পৃথিবীর প্রথম আশ্চর্য্য, অষ্টম নয়, কেন না এর চেয়ে বড় আশ্চর্য্য কিছু আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। সে যাহাই হউক, রবীন্দ্রনাথের কল্যাণে আমাদের জাতীয় সাহিত্যের সমৃদ্ধির যে অবকাশ ঘটিয়াছে,—এই অবকাশের যদি যথোচিত সদ্ব্যবহার করিতে পারি, তবেই আমাদের কাজে আমরা সিদ্ধিলাভ করিয়াছি বলিয়া মনে করিতে পারিব। কিন্তু ইহার জন্য আমাদের লেখকদের সাধনা যেমন চাই,—পাঠকদেরও সাধনা তেমনি চাই,—কেন না তাঁহারা বড়ো করিয়া দাবী না করিলে, প্রতিভাশালী নূতন লেখকদের সন্ধান আমাদের অল্পই মিলিবে।

বস্তুতঃ সাহিত্য-জগতের অধিবাসীদের 'লেখক' ও 'পাঠক' এই দুটি মোটামুটী শ্রেণীতে বিভক্ত করা যদি বা চলে, তবুও বলিতে হইবে দুই শ্রেণীর সাধনা একই রকমের। দুঃখের বিষয়, সাহিত্যের সহিত যাঁহাদের কারবার, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই একজন ভালো লেখক হইব, এই উচ্চাকাঙ্ক্ষা মনে মনে পোষণ করিয়া থাকেন, কিন্তু একজন উঁচুদরের পাঠক হইব, এমন আকাঙ্ক্ষা মনে মনে যাঁহারা পোষণ করেন, তাঁহাদের সংখ্যা অনেক কম। পাঠকের চেয়ে অবশ্য লেখকের কৃতিত্ব বেশী, ইহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। কিন্তু একটি কথা আমরা প্রায়ই ভুলিয়া যাই যে, পাঠকের কৃতিত্ব না থাকিলে লেখকের কৃতিত্বের যে সার্থকতা তাহা অরণ্যের নির্জ্জনতায় ঝরিয়া-যাওয়া ফুলের মত! কৃতী লেখকের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা অপরিসীম,—একথা সত্য, কিন্তু সমজদার পাঠকের যে সমাদর তাহাও তুচ্ছ নয়। অধিকন্তু সমজদার পাঠক হইবার আকাঙ্ক্ষা যাঁহার নাই, ভালো লেখক হইবার দুরাশা তাঁহার না করাই উচিত। সাহিত্য-সাধনায় শ্রেষ্ঠ সিদ্ধির যে পথ, তাহা লেখকেরও বটে, পাঠকেরও বটে; প্রকৃতপক্ষে সেই পথে লেখক ও পাঠকের মধ্যে যে পরিচয়, যে জানাজানি যে সহৃদয়তা যে মিলন সংঘটিত হয়, তাহাতেই পরিপুষ্ট হয় সাহিত্য-সাধনার সিদ্ধি ফলটি।

এই পথ মানুষের জীবন-যাত্রার নিবিড় অনুভূতির পথ,—যে অনুভূতিতে বিশ্বের ক্ষুদ্রতম বস্তুর ইসারাতেও প্রাণ সাড়া দিতে পারে। আমাদের আকাঙ্ক্ষা কোনো একটি আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া যখনই অদম্য ও দুর্নিবার হইয়া উঠে, তখনই সেই আদর্শের সংস্পর্শে ক্ষুদ্রতম অভিলাষটিও মহীয়ান্ হইয়া সাহিত্যের বস্তুতে পরিণত হয়। মানুষের ক্ষুদ্রত্বের উপর মহীয়ানের এই যে আঘাতের বেদনা, এইখানেই শিল্পের উৎস। তাই উচ্চ-অঙ্গের সাহিত্য-পাঠে আমরা যে আনন্দ পাই, বেদনার অনুভূতির ভিতর হইতেই সেই আনন্দ

উৎসারিত হইয়া উঠে। অনুভূতি যতই তীব্র ও তীক্ষ্ণ হইবে, ততই তাহা মনকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ সত্য হইতে প্রশস্ততর সত্যের মধ্যে ঠেলিয়া দিবে। সাহিত্য এই প্রশস্ততর ও পূর্ণতর সত্যের মার্গে জয়-যাত্রা; ইহা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুভূতিগুলিকে, ছোটখাটো ঘটনাগুলিকে অবহেলা করে না; তাহাদেরই অবলম্বন করিয়া তাহাদেরই ভিতর হইতে টানিয়া বাহির করিয়া আনে আমাদের জীবনের অন্তর্নিহিত সত্যটুকু, আমাদের প্রাণের গোপন সৌন্দর্য্য-রাজি, আমাদের আত্মার ঐশ্বর্য্য-সম্ভার।

এই নিবিড় অনুভূতির চর্চ্চা না করিলে যে ভালো লেখক হওয়া যায় না, সে কথা বলাই বাহুল্য। উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যিকের চাই এমন একটা মনোবৃত্তি,—এমন একটী সমবেদনা,—এমন একটা সূক্ষ্ম ও কোমল হৃদয়তন্ত্রী যাহার উপর জীবনের তুচ্ছ ছোট-খাটো ঘটনাগুলিও আঘাত করিয়া একটা ভাবের ঝঙ্কার তুলিতে পারে। উচ্চ অঙ্গের সাহিত্য প্রতিভার সন্ধান এইখানেই মেলে। এই জিনিষটি যাঁহার আছে, তিনি দৈনন্দিন জীবনের যে কোনো ঘটনার মধ্যেই মহতের অনুপ্রেরণা লাভ করিতে পারেন, তুচ্ছতম বস্তুর মধ্যেও সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া পুলকিত হইয়া উঠেন, ক্ষুদ্রতম অভিলাষটিও তাঁহার জীবনের পরিপ্রেক্ষণা বিস্তীর্ণতর করিয়া দিতে থাকে, প্রত্যেক কর্ম্মের মধ্যেই তিনি বিশ্বের প্রাণ-স্পন্দন অনুভব করিতে থাকেন।

সাহিত্যের সহিত যাঁহাদের কারবার—কি লেখক হিসাবে, কি পাঠক হিসাবে,—তাঁহাদের প্রত্যেকেরই সাধনা এই মনোবৃত্তির চর্চ্চা করা। ইহার যথোচিত বিকাশ না হইলে ভালো লেখকও হওয়া যায় না, সমঝদার পাঠকও হওয়া যায় না। লেখক বাস্তব জীবন হইতে যে সমস্ত উপকরণ সংগ্রহ করিয়া সৃষ্টি করেন, পাঠককেও লেখকের রচনা হইতে সেই সমস্ত উপকরণ লইয়া আপনার মনের মধ্যে সেই সৃষ্টিই পুনরায় করিয়া লইতে হয়,—সেই একই মনোবৃত্তির সাহায্যে—সেই এক সমবেদনার, সেই একই কোমল সকরুণ অনুভূতির ভিতর। তাই বলিতেছিলাম,—সাহিত্যের রাজপথ লেখক ও পাঠক দুজনের পক্ষেই সমান, দুজনের একই সাধনার প্রয়োজন। ভালো লেখক হওয়া দুঃসাধ্য, ভালো পাঠক হওয়াও অনায়াস-সাধ্য নহে।

৺মধুসূদন দত্তের মৃত্যু-সাম্বৎসরিক

বিগত ২৯শে জুন ১৯৩১ খিদিরপুর মাইকেল লাইব্রেরী কর্ত্তৃক বাংলার অমর কবি ৺মাইকেল মধুসূদন দত্তের মৃত্যু-সাম্বৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। কবির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য প্রাতঃকালে মাইকেল লাইব্রেরীর কর্ত্তৃপক্ষ লোয়ার সার্কুলার রোডের সমাধি-ভূমিতে উপস্থিত হন। সেখানে বহুসংখ্যক সাহিত্যিক উপস্থিত ছিলেন। কবি-শেখর নগেন্দ্রনাথ সোম পরলোকগত কবির এবং কবির স্ত্রী হেন্‌রিয়েটার সমাধির উপর মাল্য স্থাপন করেন। সন্ধ্যাকালে মধুসূদনের কাব্য হইতে সঙ্কলিত গান এবং কবিতা বেতার যোগে মাইকেল লাইব্রেরী এবং বেতার-গৃহের সভ্যগণ কর্ত্তৃক গীত এবং আবৃত্ত হয়।

আমরা বঙ্গের মহাকবির আত্মার সম্মানে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাইতেছি।

[জন্ম—'যশোরে সাগরদাঁড়ী কপোতাক্ষ-তীরে' ২৫ই জানুয়ারী, ১৮২৪ (= ১২ই মাঘ ১২৩০), মৃত্যু—আলিপুরে ২৯শে জুন, ১৮৭৩।]

* * *

বঙ্গীয় কারু-শিল্প প্রতিষ্ঠান

বিগত ১৬ই আষাঢ় ১৩৩৮ কলিকাতার ৬ নং আর, জি, কর রোড শ্যামবাজারে 'বঙ্গীয় কারু-শিল্প প্রতিষ্ঠানে'র উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। উদ্বোধন কার্য্যে পৌরহিত্য এবং কারু-শিল্প কক্ষের দ্বারোদঘাটন করিয়াছিলেন শিল্পাচার্য্য শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্যোক্তা শ্রীযুক্ত নিতাইচরণ পাল একজন খ্যাতনামা মূর্ত্তি-শিল্পী। ইনি কয়েকজন সহকর্ম্মী লইয়া ভারতীয় লুপ্ত কারু-শিল্পের পুনরুদ্ধার ও তাহার যুগোপযোগী উন্নতি বিধান কল্পে এই প্রতিষ্ঠানটির পত্তন করিলেন। প্রতিষ্ঠানটি দুইটি বিভাগে বিভক্ত—(১) শিল্প (Art) বিভাগ ও (২) কারু (Industrial) বিভাগ। শিল্প বিভাগের অন্তর্গত হইবে (১) মৃৎশিল্প ও তৎসংশ্লিষ্ট

কারুকার্য্য সমুদয় (২) চিত্রাঙ্কন এবং প্রাচ্যকলাসম্মত দেব-দেবীর মূর্ত্তি গঠনের সংস্কার (৩) প্যারিস প্লাষ্টার ও নকল পাথরের প্রতিকৃতি নির্ম্মাণ (৪) প্রাচীন স্থাপত্যকলার অন্তর্গত প্রস্তর-খোদিত মূর্ত্তির অনুকরণে আধুনিক (concrete) পদ্ধতিতে মূর্ত্তি ও অট্টালিকাদির জন্য খোদিত টালি নির্ম্মাণ (৫) উদ্যান সাজাইবার মূর্ত্তি ও আসবাবপত্র ও (৬) ধাতুময় মূর্ত্তি ইত্যাদি নির্ম্মাণ প্রণালী এবং ছাঁচ তৈয়ারী। কারু-বিভাগের অন্তর্গত হইবে (১) জার্ম্মাণী জাপান প্রভৃতি দেশের অনুরূপ সেলুলয়েড কাগজের মণ্ড (paper pulp) কাঠ, রবার ইত্যাদির দ্বারা পুতুল ও খেলনা নির্ম্মাণ (২) শিক্ষা বিষয়ক মডেল (relief map, globe ইত্যাদি) (৩) সিমেণ্ট, শিশা প্রভৃতি দিয়া প্রস্তুত কাগজ-চাপা, টেবল ক্যালেণ্ডার কলমদানি ইত্যাদি (৪) শরীর-ব্যবচ্ছেদ শিক্ষা বিষয়ক ডাক্তারী মডেল (৫) শিশু-মঙ্গল ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় মডেল এবং (৬) পোষাক, চশমা, ঔষধাদির দোকানে ব্যবহার-যোগ্য বিজ্ঞাপন সম্বন্ধীয় মডেল। ভারতবর্ষে বিভিন্ন লুপ্ত কারু-শিল্পের প্রতি যাহাতে দেশবাসীগণের যথার্থ অনুরাগ সঞ্জাত হয় তদুদ্দেশ্যে এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে একটি বিশেষ গবেষণা-মণ্ডলী থাকিবে।

আমরা এই অতিশয় প্রয়োজনীয় এবং হিতকরী অনুষ্ঠানটির সর্ব্বতোভাবে মঙ্গল প্রার্থনা করি।

দুই নারী

বর্ত্তমান সংখ্যায় "দুই নারী" নামক যে গল্পটি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা ছাপা হইবার পর অনেকে আমাদের নূতন গ্রাহক হইয়াছেন। তাঁহাদের সুবিধার জন্য ঐ গল্পের যে প্রথমার্দ্ধ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার চুম্বক দিলাম।

পশ্চিমঘাট পাহাড়ের উপর কৃষ্ণাতীরে মহাদেব দেবের মন্দির। পূর্ণিমা রাতে "বাসে" বহু যাত্রীর আগমন হয়েছে। একের পর এক দুইটী মারাঠী মেয়ে গিয়ে বুকভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাসের সহিত দেবতাকে প্রণাম করল। একজন বালবিধবা, অপরটি আধুনিক শিক্ষিতা মেয়ে। তাদের এ ব্যথার কারণ কি?

* * *

পাড়াগাঁ ছেড়ে মাধব সহরে ইস্কুলে পড়তে এল। মারাঠা ব্রাহ্মণ, মজবুত চেহারা। সঙ্গে করে আনল, মারুতির একটা ছবি, তার সামনে রোজ ডন কসরত করত। দু'একজন বন্ধু জুটল, কিন্তু সে একা থাকতেই ভালবাসত।

ছেলেমেয়েদের একত্র ক্লাসে মাঝে মাঝে মেয়েদের ডেস্কের দিকে কাগজের টুকরা ছুড়ে ফেলা হয়। মাষ্টার বড় বড় নীতির কথা বলেন, তরুণ তরুণীর প্রাণের খবর কম রাখেন। মাধবের সরল chivalry তাকে ঝগড়ায় টেনে নিতে লাগল।

* * *

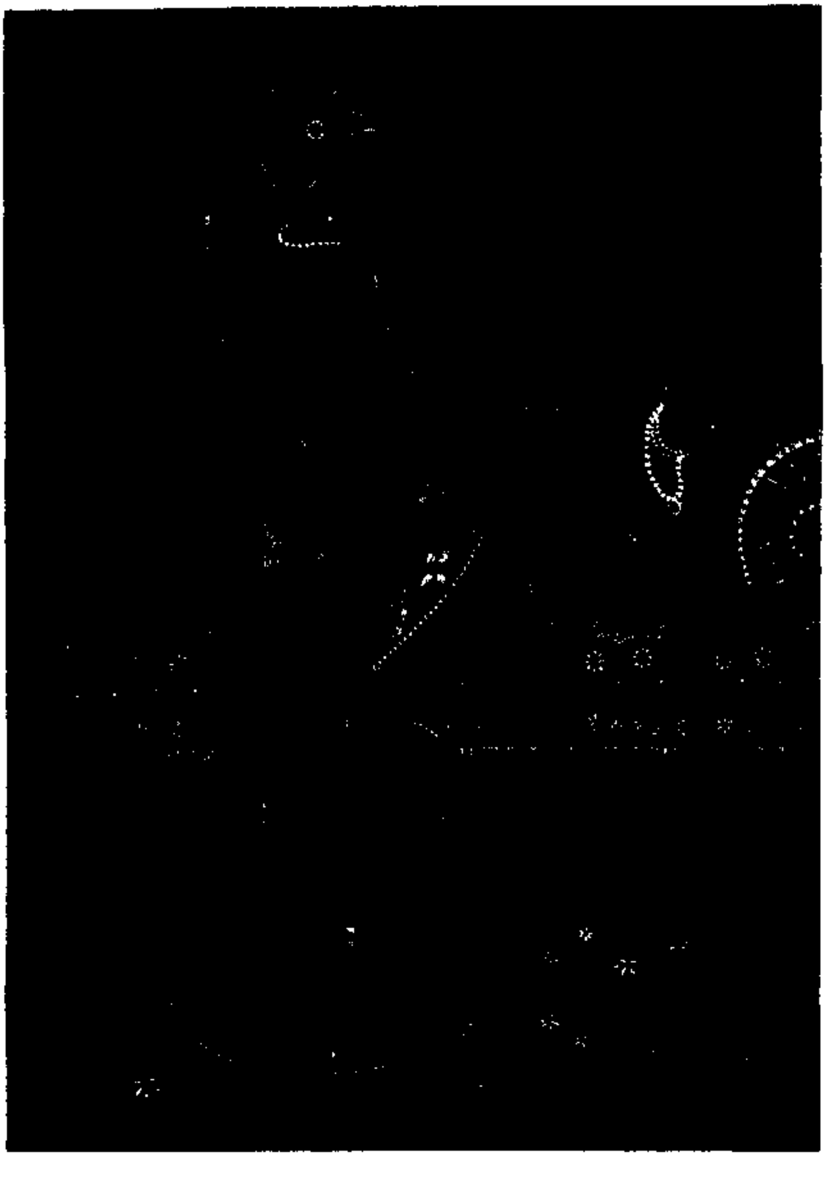
ক্লাসের মেয়েদের মধ্যে কমলা সবচেয়ে সুন্দরী, তাই ছেলে-মহলে তাকে নিয়ে খোসগল্প। ভাবপন্থী ছেলেরা কবিতা লেখে, কিন্তু বস্তুপন্থী দল সমালোচনা ও কুৎসাতে অধিক আনন্দ পায়।

মাধব কমলার হ'য়ে নিন্দুকের সঙ্গে ঝগড়া করল, তার প্রতিদানে পেল কমলার একটি স্নিগ্ধ দৃষ্টি! কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই উভয়ের মধ্যে আরম্ভ হ'ল কঠোর প্রতিযোগিতা—সংস্কৃতে প্রথম হওয়া নিয়ে। মাধবের বাপ ঘরে বারোআনা সংস্কৃত কথা বলেন, তাই সে প্রথম হয়।

পড়ার কথা নিয়ে কমলা ও মাধবের নিভৃতে আলোচনা আরম্ভ হ'ল। তারপর পুস্তক বিনিময়। তারপর চিঠি, ইংরেজী ভাষায়। ইংরেজী ব্যাকরণ লেখক অবশ্য তা' দেখে মাথা খুঁড়ে মরতেন।

একদিন কমলা মাধবকে নিমন্ত্রণ করল। বাড়ী খালি ছিল। লাড়ু, নারকেলের বরফী আর কাজু খেতে খেতে দুটি তরুণ তরুণীতে কত কথা হ'ল—কোনোটা অর্থপূর্ণ, কোনোটা বা অর্থশূন্য।

Edited by Srijut Upendranath Ganguli. Printed by Srijut Sarat Chandra Mukherji at the Sreekrishna Printing Works 259, Upper Chitpur Road, Calcutta and published by the same from 149, Raja Dinendra Street, Calcutta.



তন্ময়

বিচিত্রা

ভাদ্র, ১৩৩৮

শিল্পী—শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর মিত্র

বিচিত্রা

পঞ্চম বর্ষ, ১ম খণ্ড	ভাদ্র, ১৩৩৮	২য় সংখ্যা

সনাতনম্ এনম্ আহুর্ উতাদ্যস্যাৎ পুনর্নবঃ

—অথর্ববেদ

(ইনি সনাতন, ইনিই অদ্য পুনর্নব।)

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রাত কত হোলো ?
উত্তর মেলেনা।
কেননা, অন্ধ কাল যুগ-যুগান্তের গোলকধাঁধায় ঘোরে, পথ অজানা,
পথের শেষ কোথায় খেয়াল নেই।
পাহাড়তলীতে অন্ধকার মৃত রাক্ষসের চক্ষুকোটরের মতো ;
স্তূপে স্তূপে মেঘ আকাশের বুক চেপে ধরেচে ;
পুঞ্জ পুঞ্জ কালিমা গুহায় গর্ত্তে সংলগ্ন,
মনে হয় নিশীথ রাত্রের ছিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ;
দিগন্তে একটা আগ্নেয় উগ্রতা ক্ষণে ক্ষণে জ্বলে আর নেভে ;
ওকি কোনো অজানা দুষ্টগ্রহের চোখ-রাঙানী,
ওকি কোনো অনাদি ক্ষুধার লেলিহ লোল জিহ্বা ?
বিক্ষিপ্ত বস্তুগুলো যেন বিকারের প্রলাপ,
অসম্পূর্ণ জীবলীলার ধূলিবিলীন উচ্ছিষ্ট ;
তা'রা অমিতাচারী দৃপ্ত প্রতাপের ভগ্ন তোরণ, লুপ্ত নদীর বিস্মৃতিবিলগ্ন
জীর্ণ সেতু, দেবতাহীন দেউলের সর্পবিবরছিদ্রিত বেদী,
অসমাপ্ত দীর্ণ সোপানপংক্তি শূন্যতায় অবসিত।

অকস্মাৎ উচ্চণ্ড কলরব আকাশে আবর্ত্তিত আলোড়িত হ'তে
থাকে,
ও কি বন্দী বন্যা-বারির গুহা-বিদারণের রলরোল ?
ও কি ঘূর্ণ্যতাণ্ডবী উন্মাদ সাধকের রুদ্র মন্ত্র উচ্চারণ ?
ও কি দাবাগ্নিবেষ্টিত মহারণ্যের আত্মঘাতী প্রলয়-নিনাদ ?
এই ভীষণ কোলাহলের তলে তলে একটা অস্ফুট ধ্বনিধারা বিসর্পিত—
যেন অগ্নিগিরিনিঃসৃত গদগদ-কলমুখর পঙ্কস্রোত ;
তাতে একত্রে মিলেচে পরশ্রীকাতরের কানাকানি, কুৎসিত জনশ্রুতি,
অবজ্ঞার কর্কশহাস্য ।
সেখানে মানুষগুলো সব ইতিহাসের ছেঁড়া পাতার মতো,
ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্চে, মশালের আলোয় ছায়ায় তাদের মুখে
বিভীষিকার উল্কি পরানো ।
কোনো-এক সময়ে অকারণ সন্দেহে কোনো-এক পাগল তা'র প্রতিবেশীকে
হঠাৎ মারে, দেখ্‌তে দেখ্‌তে নির্ব্বিচার বিবাদ দিকে দিকে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে ।
কোনো নারী আর্ত্তস্বরে বিলাপ করে, বলে, হায় হায়, আমাদের দিশাহারা
সন্তান উচ্ছন্ন গেল,
কোনো কামিনী যৌবনমদবিলসিত নগ্ন দেহে অট্টহাস্য করে, বলে,
কিছুতে কিছু আসে যায় না ॥

২

উর্দ্ধে গিরিচূড়ায় ব'সে আছে ভক্ত, তুষারশুভ্র নীরবতার মধ্যে ;—
আকাশে তা'র নিদ্রাহীন চক্ষু আলোকের ইঙ্গিত খোঁজে ।
মেঘ যখন ঘনীভূত, নিশাচর পাখী চিৎকার শব্দে যখন উড়ে যায়,
সে বলে, ভয় নেই ভাই, মানবকে মহান্‌ ব'লে জেনো ।
ওরা শোনেনা, বলে, পশুশক্তিই আদ্যাশক্তি, বলে পশুই শাশ্বত ;
বলে সাধুতা তলে তলে আত্মপ্রবঞ্চক ।
যখন ওরা আঘাত পায়, বিলাপ ক'রে বলে, "ভাই তুমি কোথায় ?"
উত্তরে শুন্‌তে পায়, "আমি তোমার পাশেই ।"
অন্ধকারে দেখ্‌তে পায় না, তর্ক করে, "এ বাণী ভয়ার্ত্তের মায়া-সৃষ্টি,
আত্মসান্ত্বনার বিড়ম্বনা ।"

বলে, "মানুষ চিরদিন কেবল মরীচিকার অধিকার নিয়ে সংগ্রাম ক'রবে, হিংসা-কণ্টকিত অন্তহীন মরুভূমির মধ্যে॥"

৩

মেঘ স'রে গেল। শুকতারা দেখা দিল পূর্ব্বদিগন্তে, পৃথিবীর বক্ষ থেকে
উঠ্‌ল আরামের দীর্ঘনিশ্বাস, পল্লবমর্ম্মর বন পথে পথে হিল্লোলিত,
পাখী ডাক দিল শাখায়-শাখায়।
ভক্ত বল্‌লে, সময় এসেচে।
কিসের সময়?
যাত্রার।
ওরা ব'সে ভাব্‌লে। অর্থ বুঝ্‌লে না, আপন আপন মনের মতো করে অর্থ বানিয়ে নিলে।
ভোরের স্পর্শ নাম্‌ল মাটির গভীরে, বিশ্বসত্তার শিকড়ে শিকড়ে
কেঁপে উঠ্‌ল প্রাণের চাঞ্চল্য।
কে জানে কোথা হ'তে একটি অতি সূক্ষ্মস্বর সবার কানে কানে বল্‌লে,
চলো সার্থকতার তীর্থে।
এই বাণী জনতার কণ্ঠে কণ্ঠে মিলিত হ'য়ে একটি মহৎ প্রেরণায় বেগবান হয়ে উঠ্‌ল।
পুরুষেরা উপরের দিকে চোখ তুল্‌লে,
জোড় হাত মাথায় ঠেকালে মেয়েরা। শিশুরা করতালি দিয়ে হেসে উঠ্‌ল।
প্রভাতের প্রথম আলো ভক্তের মাথায় সোনার রঙের চন্দন পরালে,
সবাই ব'লে উঠ্‌ল, "ভাই, আমরা তোমার বন্দনা করি।"

৪

যাত্রীরা চারিদিক থেকে বেরিয়ে প'ড়ল—
সমুদ্র পেরিয়ে, পর্ব্বত ডিঙিয়ে, পথহীন প্রান্তর উত্তীর্ণ হয়ে।—
এল নীল নদীর দেশ থেকে, গঙ্গার তীর থেকে, তিব্বতের হিমমজ্জিত অধিত্যকা থেকে;
প্রাকাররক্ষিত নগরের সিংহদ্বার দিয়ে, লতাজালজটিল অরণ্যে পথ কেটে।

কেউ আসে পায়ে হেঁটে, কেউ উটে, কেউ ঘোড়ায়, কেউ হাতীতে, কেউ রথে চীনাংশুকের পতাকা উড়িয়ে।

নানা ধর্ম্মের পূজারী চল্‌ল ধূপ জ্বালিয়ে, মন্ত্র প'ড়ে; রাজা চল্‌ল, তার অনুচরদের বর্ষাফলক রৌদ্রে দীপ্যমান, ভেরী বাজে গুরু গুরু মেঘমন্দ্রে।

ভিক্ষু আসে ছিন্ন কন্থা প'রে, আর রাজ-অমাত্যের দল স্বর্ণলাঞ্ছন-খচিত উজ্জ্বল বেশে :—

জ্ঞান গরিমা ও বয়সের ভারে মন্থর অধ্যাপককে ঠেলে দিয়ে চলে চটুলগতি বিদ্যার্থী যুবক।

মেয়েরা চ'লেচে কলহাস্যে, কত মাতা, কুমারী, কত বধূ; থালায় তাদের শ্বেতচন্দন, ঝারিতে গন্ধসলিল।

বেশ্যাও চ'লেচে সেই সঙ্গে, তীক্ষ্ণ তাদের কণ্ঠস্বর, অতি প্রকট তাদের প্রসাধন।

চ'লেচে পঙ্গু খঞ্জ, অন্ধ আতুর, আর সাধুবেশী ধর্ম্মব্যবসায়ী, দেবতাকে হাটে হাটে বিক্রয় করা যাদের জীবিকা।

সার্থকতা !

স্পষ্ট ক'রে কিছু বলে না,—কেবল নিজের লোভকে মহৎ নাম ও বৃহৎ মূল্য দিয়ে ঐ শব্দটার ব্যাখ্যা করে, আর শাস্তিশঙ্কাহীন চৌর্য্যবৃত্তির অনন্ত সুযোগ ও আপন মলিন ক্লিন্ন দেহমাংসের অক্লান্ত লোলুপতা দিয়ে কল্পস্বর্গ রচনা করে।

দয়াহীন দুর্গমপথ উপলখণ্ডে আকীর্ণ।—
ভক্ত চ'লেচে,—তা'র পশ্চাতে বলিষ্ঠ এবং শীর্ণ,
তরুণ এবং জরাজর্জ্জর, পৃথিবী শাসন করে যারা,
আর যারা অর্দ্ধাশনের মূল্যে মাটি চাষ করে।
কেউ বা ক্লান্ত বিক্ষতচরণ, কারো মনে ক্রোধ, কারো মনে সন্দেহ।
তা'রা প্রতি পদক্ষেপ গণনা করে আর শুধায়, কত পথ বাকি।
তা'র উত্তরে ভক্ত শুধু গান গায়।
শুনে তাদের ভ্রূ কুটিল হয়, কিন্তু ফিরতে পারে না,
চলমান জনপিণ্ডের বেগ এবং অনতিব্যক্ত আশার
তাড়না তাদের ঠেলে নিয়ে যায়।

ঘুম তাদের ক'মে এল, বিশ্রাম তা'রা সংক্ষিপ্ত ক'রলে,
পরস্পরকে ছাড়িয়ে চলবার প্রতিযোগিতায় তারা ব্যগ্র,
ভয়, পাছে বিলম্ব ক'রে বঞ্চিত হয়।

দিনের পর দিন গেল। দিগন্তের পর দিগন্ত আসে, অজ্ঞাতের
আমন্ত্রণ অদৃশ্য সঙ্কেতে ইঙ্গিত করে।

ওদের মুখের ভাব ক্রমেই কঠিন আর ওদের গঞ্জনা উগ্রতর হ'তে থাকে।

৬

রাত হ'য়েচে।
পথিকেরা বটতলায় আসন বিছিয়ে ব'স্‌ল।
একটা দমকা হাওয়ায় প্রদীপ গেল নিবে, অন্ধকার হল নিবিড়,
যেন নিদ্রা ঘনিয়ে উঠ্‌ল মূর্চ্ছায়।

জনতার মধ্য থেকে কে একজন হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে অধিনেতার
দিকে আঙুল তুলে ব'ল্‌লে, "মিথ্যাবাদী, আমাদের বঞ্চনা করেচ।"

ভর্ৎসনা এক কণ্ঠ থেকে আরেক কণ্ঠে উদগ্র হতে থাক্‌ল।
তীব্র হ'ল মেয়েদের বিদ্বেষ, প্রবল হ'ল পুরুষদের তর্জ্জন।
অবশেষে একজন সাহসিক উঠে দাঁড়িয়ে হঠাৎ তাকে মারলে প্রচণ্ড বেগে।

অন্ধকারে তা'র মুখ দেখা গেল না। একজনের পর একজন
উঠ্‌ল, আঘাতের পর আঘাত ক'রলে, তা'র প্রাণহীন দেহ মাটিতে
লুটিয়ে পড়্‌ল।

রাত্রি নিস্তব্ধ। ঝরণার কলশব্দ দূর থেকে ক্ষীণ হয়ে আসচে।
বাতাসে যূথীর মৃদু গন্ধ।

৭

যাত্রীদের মন শঙ্কায় অভিভূত।
মেয়েরা কাঁদচে, পুরুষেরা উত্যক্ত হ'য়ে ভর্ৎসনা করচে, চুপ করো।

কুকুর ডেকে ওঠে, চাবুক খেয়ে আর্ত্ত কাকুতিতে তার ডাক থেমে যায়।

রাত্রি পোহাতে চায় না। অপরাধের অভিযোগ নিয়ে মেয়ে পুরুষে
তর্ক তীব্র হতে থাকে। সবাই চীৎকার করে, গর্জ্জন করে, শেষে যখন

খাপ থেকে ছুরি বের'তে চায় এমন সময় অন্ধকার ক্ষীণ হ'ল, প্রভাতের আলো গিরিশৃঙ্গ ছাপিয়ে আকাশ ভ'রে দিলে।

হঠাৎ সকলে স্তব্ধ ; সূর্যারশ্মির ইঙ্গিত এসে স্পর্শ ক'রল রক্তাক্ত মৃত মানুষের শান্ত ললাট।

মেয়েরা ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠ্‌ল, পুরুষেরা মুখ ঢাকল দুই হাতে।

কেউ বা অলক্ষিতে পালিয়ে যেতে চায়, পারে না ;
অপরাধের শৃঙ্খলে আপন বলির কাছে তা'রা বাঁধা।

পরস্পরকে তা'রা শুধায়, "কে আমাদের পথ দেখাবে ?"
পূর্ব্ব দেশের বৃদ্ধ ব'ল্‌লে,

"আমরা যাকে মেরেছি সেই দেখাবে।"
সবাই নিরুত্তর ও নতশির।

বৃদ্ধ আবার ব'ল্‌লে, "সংশয়ে তাকে আমরা অস্বীকার ক'রেচি, ক্রোধে তাকে আমরা হনন ক'রেচি, প্রেমে এখন আমরা তাকে গ্রহণ ক'রব, কেননা, মৃত্যুর দ্বারা সে আমাদের সকলের জীবনের মধ্যে সঞ্জীবিত, সেই মহা মৃত্যুঞ্জয়।"

সকলে দাঁড়িয়ে উঠ্‌ল, কণ্ঠ মিলিয়ে গান ক'রলে, "জয়
মৃত্যুঞ্জয়ের জয়।"

৮

তরুণের দল ডাক দিল, "চলো যাত্রা করি, প্রেমের তীর্থে, শক্তির তীর্থে, জ্ঞানের তীর্থে, অপরিমেয় ঐশ্বর্য্যের তীর্থে।"

হাজার কণ্ঠের ধ্বনি-নির্ঝরে ঘোষিত হল—

"আমরা ইহলোক জয় করব এবং লোকান্তর।"
উদ্দেশ্য সকলের কাছে স্পষ্ট নয়, কেবল আগ্রহে সকলে এক,
মৃত্যু বিপদকে তুচ্ছ ক'রেচে সকলের সম্মিলিত সঞ্চলমান ইচ্ছার বেগ।

তা'রা আর পথ শুধায় না, তাদের মনে নেই সংশয়,
চরণে নেই ক্লান্তি।

মৃত অধিনেতার আত্মা তাদের অন্তরে বাহিরে ;
সে-যে মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হয়েচে এবং জীবনের সীমাকে করেচে অতিক্রম।

তা'রা সেই ক্ষেত্র দিয়ে চ'লেচে যেখানে বীজ বোনা হল, সেই ভাণ্ডারের পাশ দিয়ে, যেখানে শস্য হয়েচে সঞ্চিত, সেই অনুর্ব্বর ভূমির উপর দিয়ে যেখানে কঙ্কালসার দেহ ব'সে আছে প্রাণের কাঙাল।

তা'রা চলেচে প্রজাবহুল নগরের পথ দিয়ে, চলেচে জনশূন্যতার মধ্যে দিয়ে যেখানে বোবা অতীত তা'র ভাঙা কীর্ত্তি কোলে নিয়ে নিস্তব্ধ; চলেচে লক্ষ্মীছাড়াদের জীর্ণ বসতি বেয়ে, আশ্রয় যেখানে আশ্রিতকে বিদ্রূপ করে।

রৌদ্রদগ্ধ বৈশাখের দীর্ঘ প্রহর পথে পথে কাট্‌ল। সন্ধ্যাবেলায় আলোক যখন ম্লান তখন তা'রা কালজ্ঞকে শুধায়, "ঐ কি দেখা যায় আমাদের চরম আশার তোরণচূড়া?"

সে বলে, "না, ও যে সন্ধ্যাভ্রশিখরে অস্তগামী সূর্য্যের বিলীয়মান আভা।" তরুণ বলে, "থেমো না, বন্ধু, অন্ধ তমিস্র রাত্রির মধ্য দিয়ে আমাদের পৌঁছতে হবে মৃত্যুহীন জ্যোতির্লোকে।"

অন্ধকারে তা'রা চলে। পথ যেন নিজের অর্থ নিজে জানে, পায়ের তলার ধূলিও যেন নীরব স্পর্শে দিক চিনিয়ে দেয়। স্বর্গপথযাত্রী নক্ষত্রের দল মূক সঙ্গীতে বলে, "সাথী, অগ্রসর হও।" অধিনেতার আকাশবাণী কানে আসে, "আর বিলম্ব নেই।"

৯

প্রত্যূষের প্রথম আভা অরণ্যের শিশিরবর্ষী পল্লবে পল্লবে ঝলমল ক'রে উঠ্‌ল।

নক্ষত্রসঙ্কেতবিদ জ্যোতিষী ব'ললে, "বন্ধু আমরা এসেচি।"

পথের দুইধারে দিক্‌প্রান্ত অবধি পরিণত শস্যশীর্ষ স্নিগ্ধ বায়ুহিল্লোলে দোলায়মান,—আকাশের স্বর্ণলিপির উত্তরে ধরণীর আনন্দবাণী।

গিরিপদবর্ত্তী গ্রাম থেকে নদীতলবর্ত্তী গ্রাম পর্য্যন্ত প্রতিদিনের লোকযাত্রা শান্ত গতিতে প্রবহমান। কুমোরের চাকা ঘুরচে গুঞ্জনস্বরে, কাঠুরিয়া হাটে আনচে কাঠের ভার, রাখাল ধেনু নিয়ে চলেচে মাঠে, বধূরা নদী থেকে ঘট ভ'রে যায় ছায়াপথ দিয়ে।

কিন্তু কোথায় রাজার দুর্গ, সোনার খনি, মারণ উচাটন মন্ত্রের পুরাতন পুঁথি?

জ্যোতিষী ব'ললে, "নক্ষত্রের ইঙ্গিতে ভুল হতে পারে না, তাদের সঙ্কেত এইখানে এসেই থেমেচে।"

এই ব'লে ভক্তিনম্রশিরে পথপ্রান্তে একটি উৎসের কাছে গিয়ে সে দাঁড়াল।

সেই উৎস থেকে জলস্রোত উঠচে যেন তরল আলোক,
প্রভাত যেন হাসি অশ্রুর বিগলিত গীতধারায় সমুচ্ছল।

নিকটে তালীকুঞ্জতলে একটি পর্ণকুটীর অনির্ব্বচনীয় স্তব্ধতায় পরিবেষ্টিত।

দ্বারে অপরিচিত সিন্ধুতীরের কবি গান গেয়ে বল্‌চে, "মাতা, দ্বার খোলো।"

১০

প্রভাতের একটি রবিরশ্মি রুদ্ধদ্বারের নিম্নপ্রান্তে তির্য্যক্ হয়ে প'ড়েচে।

সম্মিলিত জনসংঘ আপন নাড়ীতে নাড়ীতে যেন শুন্‌তে পেলে
সৃষ্টির সেই প্রথম পরম মন্ত্র—"মাতা, দ্বার খোলো।"

দ্বার খুলে গেল।

মা ব'সে আছেন তৃণশয্যায়, কোলে তাঁর শিশু, উষার কোলে যেন শুকতারা।

দ্বারপ্রান্তে প্রতীক্ষাপরায়ণ সূর্য্যরশ্মি শিশুর মাথায় এসে পড়ল।

কবি দিল আপন বীণার তারে ঝঙ্কার, গান উঠ্‌ল আকাশে,
"জয় হোক্ মানুষের, ঐ নব জাতকের, ঐ চিরজীবিতের।"

সকলে জানু পেতে বসল, রাজা এবং ভিক্ষু, সাধু এবং পাপী, জ্ঞানী এবং মূঢ়—

উচ্চস্বরে ঘোষণা ক'রলে, "জয় হোক্ মানুষের, ঐ নব জাতকের, ঐ চিরজীবিতের।"

পূর্ব্বদেশের বৃদ্ধ মনে মনে ব'ল্‌লে,
"আমার দেখা হোলো।"

শিল্পের স্বরূপ

শ্রীযুক্ত বিনায়ক সান্যাল এম্ এ

একথা স্বতঃই মনে হতে পারে যে যে-বিষয় নিয়ে বড় বড় পণ্ডিত এবং মনীষী ইতিপূর্ব্বে বহু আলোচনা করেছেন, সেই বিষয় নিয়ে নূতন কিছু বল্‌বার মত আমার কি থাকতে পারে। সত্য কথা বল্‌তে কি, এটা এমন একটা বিষয় যা বাস্তবিকই কঠিন এবং যার সম্বন্ধে বাদানুবাদের অন্ত নেই, অথচ আমার মত অল্পবিদ্য লোকও এ বিষয় নিয়ে দু'কথা বলতে পিছ্‌পা নয়। 'আর্ট হিসাবে ছবিখানা ভাল হয়নি', কিম্বা 'অমুক লোকের কলাজ্ঞান বলে কোন জিনিষই নেই' এই ধরণের উক্তি যার তার মুখে যখন তখনই শোনা যেতে পারে। কিন্তু বিষয়টা তলিয়ে খুব বেশী লোক বোঝেন কিনা সে-বিষয়ে আমার বিশেষ সংশয় আছে। আমার এই লেখার মধ্যে আমি যে আপনাদের খুব নূতন নূতন কথা শোনাতে পারব, অথবা আমার ব্যাখ্যার আলোকপাতে আর্টের অন্ধকার কক্ষ যে সহসা উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌বে, এমন ভরসা আমার নেই। যদি আমার কোন কথা, কোন ইঙ্গিতে আপনাদের মনে চিন্তার রসদ কিছু জোগাতে পারে, তবেই আমার শ্রম সার্থক হবে।

আর্ট বা ললিতকলা সমূহকে প্রধানতঃ দু'ভাগে ভাগ করা হয়

(১) স্থিতিশীল (static), যেমন চিত্রকলা, স্থাপত্য এবং ভাস্করশিল্প;

(২) গতিশীল (dynamic), যেমন কাব্য, সঙ্গীত ও তাদের শাখা—নাট্য ও নৃত্যকলা। মানুষের জীবন অনন্ত-গতিশীল, তার প্রবাহের বিরাম নাই, 'তার নিমন্ত্রণ লোকে লোকে, নব নব পূর্ব্বাচলে আলোকে আলোকে'। কত জন্মমৃত্যুপরম্পরার মধ্য দিয়ে জীবজীবন ভূমার পানে ছুটে চ'লেছে কে তার সংখ্যা করে? এই সুখদুঃখসমাকুল চিরচঞ্চল জীবনের দুরূহ জয়চেষ্টায়, বন্ধুর দুর্গম পথে আত্মার অশান্ত অভিযানের চলচ্চিত্র যে-শিল্পের মধ্যে প্রদর্শিত হয়, তারই আখ্যা দেওয়া হয় গতিশীল। স্থিতিশীল শিল্প একই স্থানে স্থির হ'য়ে থাকে; তার গতি নেই, আছে স্থিতি—আছে আরতি!

> "সমাধিমন্দির
> এক ঠাঁই রহে চিরস্থির;
> ধরার ধূলায় থাকি
> স্মরণের আবরণে মরণেরে যত্নে রাখে ঢাকি!"

কিন্তু জীবন চিরপ্রবহমান, নব নব উদয়াচলে তার নিত্যনূতন অভ্যুদয়—নব নব অনুভূতির মধ্য দিয়ে সে ক্রমাগত পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে চ'লেছে। তার নিত্যকালের নৃত্যলীলার তালে তালে চিত্ররূপসীর নূপুর দুখানি তো তেমন ক'রে বেজে ওঠে না!

কীটস ব'লেছেন—

> "Bold lover never, never canst thou kiss,
> Though winning near the goal—yet do not grieve;
> She cannot fade, though thou hast not thy bliss
> For ever wilt thou love and she be fair."

অর্থাৎ চিত্রলিপিতে যেখানে যেটিকে যেমন অবস্থায় দেখান হ'য়েছে তার বেশি তার একপাও অগ্রসর হবার উপায় নেই—তাই ঐ যে সুন্দরী মিলনাকাঙ্ক্ষায় আকুল আগ্রহভরে প্রেমাস্পদের পানে চেয়ে র'য়েছে, বল্লভের প্রেমচুম্বন ওর পক্ষে দুর্ল্লভ, কিন্তু জীবন্ত মানুষের উপর এক হিসাবে ওরা জিতে আছে। জীবনে প্রেমের পরিপূরণ তেমন দুর্ল্লভ নয় বটে কিন্তু তার স্থায়িত্ব বড় অল্প, কারণ জীবদেহ জরামরণের অধীন। ঐ যে শিল্পমূর্ত্তি, ওদের তো ক্ষয় নেই,

ওদের লাবণ্যের হ্রাসবৃদ্ধি নেই—তাই ওদের প্রেম শাশ্বত ও চিরসুন্দর। স্থিতিশীল শিল্প গতির সৌন্দর্য্য প্রদর্শনে অক্ষম। এইখানে কাব্যসঙ্গীতনাটক এদের চেয়ে মহত্তর। চলিষ্ণু সৌন্দর্য্যের একখানি অপরূপচিত্র পাঠকচিত্তে চিরমুদ্রিত ক'রে দিয়েছেন কবি চণ্ডীদাস তাঁর লোকপ্রসিদ্ধ কবিতার একটি অনবদ্য চরণে—'চলে নীল শাড়ি নিঙাড়ি' নিঙাড়ি' পরাণ সহিত মোর'। নীলবসনা রূপসীর প্রত্যেক পদপাতে বাসনার কমল ফুটে ফুটে চ'লেছে। ধন্য কবি, ভাষা ও ভঙ্গিতে, ভাবে ইঙ্গিতে যে সঙ্গীত তুমি ঝঙ্কৃত ক'রেছ তার তরঙ্গ এসে লেগেছে বিশ্ববীণার তারে তারে!

মামুলী শ্রেণিবিভাগ ছেড়ে দিয়ে এখন আমরা বুঝ্‌তে চেষ্টা করি শিল্প বল্‌তে বাস্তবিক কি বোঝায়। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে তিনটি মানুষ বাস করে। একজন তার দৈহিক ক্ষুধার তাড়নায় খাদ্য সংগ্রহে সতত ব্যস্ত। জগতে কেবলমাত্র টিঁকে থাক্‌বার জন্যে তার কি প্রাণপণ চেষ্টা! প্রকৃতির বিচিত্র ভাণ্ডার থেকে ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার জল, পরিধেয় বসন আহরণ করাই তার কাজ। এখানে প্রকৃতির সঙ্গে তার সম্বন্ধ একান্তই প্রয়োজনের।

আমাদের ভিতরকার দ্বিতীয় মানুষটি দেহের চিন্তায় ততটা বিব্রত নয়। দেহের ক্ষুধা যখন মিটেছে, সহজেই মনের খোরাক জোগাবার জন্যে সে তখন চেষ্টিত হয়। জগতের অসংখ্য ঘটনাপুঞ্জ তার মনের সামনে এসে জড় হয়, দৃশ্যমান প্রকৃতি তার বৈচিত্র্যের ডালি নিয়ে তার মনের দুয়ারে এসে আঘাত করে, আর সে মনে মনে তাদের ভিতরকার প্রচ্ছন্ন ঐক্যসূত্রটি আবিষ্কার করবার জন্যে তার ধীশক্তিকে যথাসম্ভব কাজে লাগাবার চেষ্টা করে। মানুষের মনটাই এমনভাবে গঠিত যে কেবল তথ্যের (fact) সন্ধান ক'রেই সে ক্ষান্ত হয় না, সেই বস্তুপুঞ্জের মধ্য দিয়ে যে-সার্ব্বজনীন নিয়মগুলি কাজ ক'রে চ'লেছে তাদেরও সে খুঁজে পেতে চায়। এখানেও বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ কতকটা প্রয়োজনের দ্বারাই সীমাবদ্ধ।

কিন্তু মানবমনের তৃতীয় মানুষটি একটু অন্তঃপুরগের; সে না চায় ক্ষুধার খাদ্য, তৃষ্ণার জল; না চায় আবিষ্কার ক'রতে প্রাকৃতিক নিয়ম। তার উদ্দেশ্য, প্রকৃতির নিগূঢ় অন্তরে যে অনন্ত সৌন্দর্য্য তরঙ্গিত র'য়েছে তার মধ্যে অবগাহন ক'রে আনন্দের মাণিক্য সংগ্রহ করা। নিখিল বিশ্বকে এই যে হৃদয় দিয়ে দেখা, এই সত্যকার দেখা। মানুষ হৃদয়ের আনন্দরসে অনুষিক্ত ক'রে বিশ্বের সঙ্গে প্রেমের যে নিগূঢ় সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়, দেহের ও মনের প্রয়োজনের বাহিরে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির যে আত্মীয়তার নিবিড় নীড় নির্ম্মিত হয়, তাই তো তাদের সত্যকার সম্বন্ধ!

মানুষের দেহের জগৎ—যেখানে চাষা চাষ ক'রছে, তাঁতী তাঁত বুনছে, মানুষের খাদ্য এবং পরিধেয় জোগাবার জন্য, কিম্বা তার মনের জগৎ—যেখানে বিজ্ঞান তার নিত্য নূতন আবিষ্কারের দ্বারা বিশ্বরহস্যের মূলে পৌঁছবার জন্যে চেষ্টিত, এরা সত্যজগৎ নয়; কারণ বস্তুপুঞ্জের মধ্যে তো সত্য নেই! তথ্য ও সত্য একজিনিষ নয়। আজ যে-বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কৃত হ'য়ে চূড়ান্ত ব'লে প্রতিপন্ন হ'চ্ছে, দশ বৎসর পরে যে সেই তথ্য মিথ্যা বলে প্রমাণিত হবে না তা কে ব'ল্‌তে পারে? আগে মানুষ বিশ্বাস করত সূর্য্যই পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরে, কিন্তু গ্যালিলিও মানুষের সে-বিশ্বাস ভেঙে দিয়েছেন। অতএব সত্য তাই যা কেবল এককালে এবং এক দেশেই সত্য নয়—যা দেশকালপাত্র-নির্ব্বিশেষে সত্য। বাস্তবিক "যা সত্য তার জিয়োগ্রাফী নেই।"

এই সত্যজগতের পথ দেখিয়ে দিতে পারে শুধু মানুষের হৃদয়। মানুষের দেহ এখানে অক্ষম, চিত্ত এখানে পঙ্গু। বুদ্ধি দিয়ে, বিচার দিয়ে একে পাওয়া যায় না—একে পেতে হয় অনুভূতি দিয়ে। অর্থাৎ যা দেখ্‌ছি, যা শুনছি, এক কথায় ইন্দ্রিয় দিয়ে যা কিছু গ্রহণ করছি তাকেই হৃদয়ের সঙ্গে একান্ত ক'রে যে-নেওয়া তাই হয় সত্য, তাই হয় সার্থক। মানুষের বুদ্ধির রাজ্যে বাস করে বিজ্ঞান, হৃদয়ের শাশ্বত স্বর্গেই শিল্পের সিংহাসন!

দৈনন্দিন অভাবের দৈন্যের দ্বারা যেখানে আমাদের আত্মা সঙ্কুচিত, প্রকৃতিকে নিজের কাজে লাগাবার জন্যে যেখানে মানুষের চিত্ত নিয়ত নিয়োজিত, সেখানে মানুষের হৃদয়ও শৃঙ্খলিত। আর্ট মুক্ত আত্মার ক্ষুধার আস্বাদন, স্বাধীন হৃদয়ের অজস্র উচ্ছ্বাস! প্রকৃতির সঙ্গে যেখানে আমাদের হৃদয়ের যোগ অবাধ ও প্রচুর, সেইখানেই শিল্প

বিনা-প্রয়োজনে এসে হৃদয়ের কোমল তারে একটি অপরূপ ঝঙ্কার তোলে। যেখানে আমাদের অন্তরের মানুষটি ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্যে পূর্ণ, শিল্পের প্রকাশ সেইখানেই। আবশ্যক যা, তা অভাবপূরণেই ব্যয়িত হ'য়ে যায়—অনাবশ্যক অনুরাগ ব'লেই তা ভাষা খোঁজে।

তাহ'লে পাওয়া গেল, অপ্রয়োজনের মাঝেই আর্টের জন্ম। কিন্তু সে পেতে চায় কি? না, সৌন্দর্য্য। "সুন্দর কি?"—এই প্রশ্নের উত্তরে মনীষী অস্কার ওয়াইল্ড ব'লেছেন, The only beautiful things are the things that do not concern us" অর্থাৎ আমরা এতক্ষণ যা ব'লেছি সেই একই কথা;—যার সঙ্গে আমাদের প্রয়োজনগত কোন সম্বন্ধ নেই, তাই সুন্দর। তিনি আরও ব'লেছেন, যখনই কোন জিনিস, হয় আমাদের বিশেষ কোন উপকারে আসে, না হয় আমাদের মনের মধ্যে আনন্দ বা বিষাদের ভাব জাগিয়ে দেয়, কিম্বা গভীর ভাবে আমাদের সহানুভূতির উদ্রেক করে, তখনই তা শিল্পসীমার বহির্ভূত হ'য়ে পড়ে। শিল্প-সৃষ্টির মধ্যে আমরা বস্তুর অন্বেষণ করি না—অন্বেষণ করি বৈশিষ্ট্য, সৌন্দর্য্য, অপরূপতা, কল্পনার বিস্তার। বস্তুসর্ব্বস্ব সাধনা শিল্পের নয়—বিজ্ঞানের। সত্য: কিন্তু তাই ব'লে এ কথা কিছুতেই অস্বীকার করা চ'লবে না যে সহানুভূতিই শিল্পের প্রাণ। মানবহৃদয়ের শ্রেষ্ঠ বৃত্তি এই সমবেদনা; এবং আমরা পূর্ব্বেই ব'লেছি যে শিল্প একান্তভাবে হৃদয়েরই জিনিস। কূটবুদ্ধির সঙ্কীর্ণ বঙ্কিমবর্ত্মে একে পাওয়া যায় না, একে পেতে হয় সরল সত্যের ঋজুরাজপথে। জড়বুদ্ধির কাছে শিল্পের পরিকল্পনা সময়ে সময়ে স্ফীত ও অবাস্তব ব'লে মনে হয়, কিন্তু বুদ্ধির নিকট যা অসত্য, হৃদয়ের দিক দিয়ে তাই পরম সত্য। রবীন্দ্রনাথ তাঁর "What is Art" শীর্ষক প্রবন্ধে ব'লেছেন, সাধারণ বুদ্ধির কাছে যা অতিশয়োক্তি—বুকের মাঝে তাই মূর্ত্ত সত্য। বিদ্যাপতি ব'লেছেন,

"জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল,
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয় রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেল!"

বস্তুতান্ত্রিক সমালোচক তর্জ্জন ক'রে ব'লে উঠ্‌বেন—এটা একটা কথার ফানুস, আলেয়ার আলো, অবাস্তব ও অসত্য। লক্ষ লক্ষ যুগ হৃদয়ে ধ'রেও প্রাণের বেদনা গেল না—এ আবার কেমন কথা? দুপাঁচ ঘণ্টাই বক্ষে রাখা যায় না, তা আবার লক্ষ লক্ষ যুগ! রুগ্ন হৃদয়ের প্রলাপ একেই বলে!

তথ্যের দিক দিয়ে যা মিথ্যা, রসের দিক দিয়ে তাই সার সত্য—তাই পরমসুন্দর। এইজন্যেই সাহিত্যদর্পণকার কাব্যের সংজ্ঞা-নির্দ্দেশ ক'রতে গিয়ে ব'লেছেন "বাক্যং রসাত্মকং কাব্যং" অর্থাৎ রসই কাব্যের একমাত্র উপজীব্য। যাকে আমি প্রাণ দিয়ে ভালবাসি, ইচ্ছা হয় যুগে যুগে জীবনে মরণে তার সঙ্গে প্রেম-ডোরে বাঁধা থাকি। থাকা সম্ভব কিনা সে বিচার কাব্যের নয়—মানব হৃদয়ের চিরন্তন আবেগের অভিব্যক্তিই কাব্য। শিল্পলিপিতে আমরা পাই বস্তুজগৎ সম্বন্ধে আমাদের ধারণার চিত্র—বস্তুজগতের চিত্র নয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর "ভাষা ও ছন্দ" কবিতাটির শেষ কতক চরণে শিল্পের স্বরূপটি বেশ সুন্দরভাবে উদ্‌ঘাটিত ক'রে ধ'রেছেন:—

"জানি আমি জানি তাঁরে, শুনেছি তাঁহার কীর্ত্তিকথা"
কহিলা বাল্মীকি, "তবু নাহি জানি সমগ্র বারতা,
সকল ঘটনা তাঁর ইতিবৃত্ত রচিব কেমনে?
পাছে সত্যভ্রষ্ট হই, এই ভয় জাগে মোর মনে।"
নারদ কহিলা হাসি' 'সেই সত্য যা রচিবে তুমি,
ঘটে যা তা সব সত্য নহে। কবি তব মনোভূমি
রামের জনমস্থান অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।"

চোখ দিয়ে দেখা যায় মানুষের বাহিরের রূপ, মনের মানুষকে দেখ্‌তে হয় অন্তর দিয়ে। আমাদের বাইরের প্রকাশ কি সকল সময়ে আমাদের অনুভূতির অনুরূপ? মা সন্তানকে ভর্ৎসনা করেন, বিরক্ত হ'য়ে কটূক্তি করেন, কিন্তু সন্তানের জন্য জননীর হৃদয়-ভাণ্ডে যে অজস্র অমৃত সঞ্চিত আছে, এই ভর্ৎসনা ও কটূক্তি কি সেই পীযূষরসের উচ্ছ্বাস? বাহিরের কাঠিন্য দেখে যদি মায়ের অন্তরের স্নেহকোমলতার পরিমাণ করা হয়, তবে মাতৃহৃদয়কে পদে পদে ভুল বোঝাই হবে। তবেই দেখা গেল, যা ঘটে তা সব সময়ে সত্য

নয়—চোখে-দেখার মধ্যে ভুল দেখার সম্ভাবনাই ষোল-আনা। "দেবতার গ্রাস" কবিতায় সাগরসঙ্গমে যাত্রার সময়ে মোক্ষদা তাঁর পুত্র রাখালকে তার মাসীর কাছে রেখে যেতে চেয়েছিলেন। ছেলে জোর ক'রে যাওয়ায় তিনি বিরক্ত হ'য়ে ব'লেছিলেন, "চল্, তোরে দিয়ে আসি সাগরের জলে।" তাই ফিরবার পথে যখন হঠাৎ মোহানার মুখে প্রবল ঝড় উঠে তাঁদের তরণীখানিকে গ্রাস করতে উদ্যত হ'ল তখন দেবতার রোষশান্তির জন্য মাঝির কথামত যাত্রীরা জলের মধ্যে যার যা ছিল সভয়ে ফেলে দিতে লাগ্‌ল। তবু দেবতার রোষ "শান্তি নাহি মানে"; তখন যাত্রীদলের নায়ক মৈত্র মহাশয় ব'লে উঠ্‌লেন,

"* * * এই সে রমণী
দেবতারে সঁপি দিয়া আপনার ছেলে
চুরি ক'রে নিয়ে যায়।"

এই শুনে "তরাসে নিষ্ঠুর" যাত্রীদল জোর ক'রে মায়ের দুলালকে তাঁর বুক থেকে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা ক'রতে লাগ্‌ল—এই নিদারুণ-সঙ্কট-সময়ে মোক্ষদা ভগবান্‌কে ডেকে ব'ল্‌লেন, "* * * অতি মূর্খ নারী আমি

কী ব'লেছি রোষবশে—ওগো অন্তর্যামী,
সেই সত্য হ'ল? সে যে মিথ্যা কতদূর
তখনি শুনে কি তুমি বোঝনি, ঠাকুর?
শুধু কি মুখের কথা শুনেছ দেবতা?
শোননি কি জননীর অন্তরের কথা?"

অতএব দেখা যায় আর্টের অভিব্যক্তির জগৎ বস্তুজগতের সঙ্গে একান্তভাবে মেলে না। আমাদের রসের মানুষটি বস্তুর অন্তস্তলে অনুপ্রবেশ ক'রে তার অনন্ত ও সত্য স্বরূপটিকে উপলব্ধি করে। সে তার সীমাহীনতার আবেগে চঞ্চল এবং সঞ্চয়ের প্রাচুর্য্যে অবিরাম সৃষ্টি ক'রে চলে। সুতরাং শিল্পের বিচার হয় অসীমের মানদণ্ডে; শিল্পীর চোখে বস্তুপুঞ্জ, ঘটনাপুঞ্জ মায়ামাত্র, সত্যসুন্দরের প্রকাশরূপেই তার শিল্পমূল্য নিরূপিত হয়। Middleton Murry তাঁর "Studies in Keats" নামক গ্রন্থে ব'লেছেন, "কোন বস্তুকে যখন আমরা ভালবাসি তখনই তা সত্য হ'য়ে দাঁড়ায়। আমাদের মনের আবেগগুলি যখন সম্পূর্ণরূপে সংস্কারমুক্ত হয় যাতে ক'রে আমাদের পক্ষে সমস্ত বস্তুকেই ভালবাসা সম্ভবপর হয়, তখনই আমরা শান্তির সুধাসদনে গিয়ে পৌঁছাই।" মোপাসাঁ তাঁর "Piere et Jean"-এর ভূমিকায় ব'লেছেন, "বস্তুকে বাইরের জিনিষ ব'লে বিশ্বাস করা নিতান্ত ছেলে-মানুষী, কারণ আমরা নিজেদের চিন্তা ও ইন্দ্রিয়ের মাঝেই তাকে নিয়ে ঘুরছি। আমাদের চক্ষু, আমাদের ঘ্রাণশক্তি, আমাদের শুনবার ক্ষমতা, আমাদের আস্বাদ, এ সবের প্রত্যেকটিই প্রত্যেকের পৃথক্। একজনের যে রকম অন্যের তা নয় এবং সেই কারণে পৃথিবীতে যত লোক আছে তত রকমের সত্যপ্রতীতি জন্মাচ্ছে। আমাদের প্রত্যেকের মন ইন্দ্রিয় হ'তে এসব গ্রহণ ক'রে বিশ্লেষ ও বিচার করে। সেই সত্যপ্রতীতির অভিব্যক্তিই আর্ট।"

প্রকৃতির মধ্যে আর্টের উপাদান আছে সত্য কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত তা মানুষের হৃদিস্থিত পূর্ণতার আদর্শের দ্বারা সংশোধিত না হয় ততক্ষণ তার শিল্পমূল্য বিশেষ কিছুই নাই। পরিপূর্ণতা বাহিরে নাই, আছে মানুষের অন্তরে। পূর্ণতার অর্থ পূর্ণ সৌন্দর্য্য। প্রকৃতির মধ্যে যে-সৌন্দর্য্য তার অনেকখানিই মনের আরোপিত। ফু'ল সুন্দর, পর্ব্বত মহান্, নৃত্যপরা কলভাষিণী তটিনী সুন্দরী; কিন্তু এদের রমণীয়তার অনেকটাই কি কল্পনার রঙেই বিচিত্র নয়? উদ্ভিদ্‌বিদ্ ফুলের যে-রূপটি দেখ্‌তে পান, তার দল গুলি, তার পরাগকেশরাদি বিশ্লেষণ ক'রে, তার জন্ম-পত্রিকা রচনা ক'রে যে আনন্দলাভ করেন—কলাবিদ্ তার সে বাস্তব রূপটির প্রতি মোটেই সচেতন নন, তিনি তাকে দেখেন সুন্দরের দূতরূপে—সে তাঁর অন্তরে ব'হে আনে অসীমের রভসস্পর্শ—জীবনের চরিতার্থতা।

সৌন্দর্য্য যদি বস্তুপুঞ্জেই একান্ত নিহিত থাকত তবে তার মূর্ত্তিটি সকলের কাছে একই রূপে প্রতিভাত হ'ত। কিন্তু তা তো হয় না। যে-লোকের রূপ দেখে সকলেই প্রশংসায় মুখর, তাকেই দেখে আমার চিত্তে বিরাগ পুঞ্জীভূত হ'য়ে উঠে কেন? জগতের চোখে যে কুৎসিৎ সেই আবার আমার হৃদয়বীণার তন্ত্রীতে আনন্দের অনুরণন তোলে কেন? সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বাহ্নে ঝড়ের যে-ভীষণ-মধুরতা তা বারান্দায় আরাম-কেদারায় শুয়ে বেশ উপভোগ করা যায় কিন্তু যে-

পথিক ক্লান্ত ও বিক্ষতচরণে পথ বেয়ে চলেছে তার মনে ঐ দৃশ্য সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবেরই সৃষ্টি করে। সৌন্দর্য্যবোধ মানুষের আছে ব'লেই—পরিপূর্ণতার একটি আদর্শ আমাদের অন্তরে বিরাজ ক'র্‌ছে ব'লেই আমরা প্রকৃতিকে সুন্দর বা অসুন্দর ক'রে দেখি। অনেক সময়ে তুলনায় বলি, একটি অপটির চেয়ে বেশি সুন্দর। আদর্শ একটি না থাক্‌লে এরূপ বিচার সম্ভব হ'ত না।

গ্রীক ঋষি প্লাতো ব'লেছেন, প্রাত্যহিক জীবনে বস্তু-পুঞ্জের মধ্যে যে সত্যের আভাস আমরা পাই তা' বস্তু-দেহের ভিতরে নিহিত নেই—সার সত্যের শুদ্ধ নিকেতন মানুষের অন্তর; বহিঃপ্রকৃতি মানুষের সেই অন্তঃপ্রকৃতির প্রতিচ্ছবিমাত্র। রস নয় রসাভাস, রূপ নয় রূপাভাস। প্লাতোর দৃষ্টিতে ললিতকলা ছায়ার ছায়া, অসত্য প্রকৃতির অন্ধ অনুকরণ। ইন্দ্রিয়াতীত সত্য-স্বরূপের প্রকাশ যে শিল্পে যত অল্প, তাঁর মতে সে শিল্প তত নিকৃষ্ট। খুব খাঁটি কথা; তবে বলা বাহুল্য যে উচ্চাঙ্গের শিল্পকলা অনুকরণ ক'রেই ক্ষান্ত হয় না, নব নব সৃজনীশক্তির প্রেরণাই শিল্পের প্রাণ। নিখিল বিশ্বের মধ্যেও এই শক্তিই কাজ ক'রছে—কলাবিৎও চান নিজের ভাবের আলোকে পুরাতন প্রকৃতিকে নূতন ক'রে গ'ড়ে তু'লতে; তাই বাহিরের জগতের চেয়ে শিল্পের জগৎ অধিক সত্য। তারপর প্লাতো চেয়েছেন আবশ্যকতার নিকষে শিল্পের দর যাচাই ক'র্‌তে। কিন্তু জৈবিক প্রয়োজনীয়তার অনেক ঊর্দ্ধে শিল্পের কল্পলোক—যেখানে মানুষ খায় না, কেবল গান গায়, প্রয়োজনের তাড়নায় ছুটাছুটি ক'রে বেড়ায় না—বিশ্বতানের সঙ্গে তাল মিলিয়ে করে অবিরাম ভঙ্গিতে আনন্দনৃত্য। বিখ্যাত জর্ম্মাণ কবি ও দার্শনিক শেলিং বলেন, অজ্ঞেয় প্রাকৃতিক শক্তির রাজ্য এবং অতীন্দ্রিয় আদর্শের পবিত্রলোকের মধ্যস্থলে সৌন্দর্য্যসৃষ্টির আবেগ অলক্ষ্যে তৃতীয় একটি লীলা-রাজ্য (gladsome Kingdom of play) সৃজন করে—যেখানে প্রেমের চির-বৃন্দাবন অধিষ্ঠিত এবং যেখানে লীলার আবেগে মানুষের দৈহিক ও নৈতিক সকল বন্ধন নিমেষেই মুক্ত হ'য়ে যায়। সেখানে পাখী গান গায়, ফুল ফুটে ওঠে, জ্যোৎস্নার অভ্র-হ্রদে ধরণী স্নান ক'রে শুচি হয়, সন্ধ্যাবেলায় রজনীগন্ধা তার গন্ধের অর্ঘ পাঠিয়ে দেয়, আর তারই সঙ্গে যেন ভেসে আসে "দূরের বঁধুর" উত্তরীয়ের হাওয়ার একটুখানি পরশ! সুন্দরের অঙ্গনে জীবাত্মার লীলাভিসারই তার আনন্দরূপকে প্রকাশিত করে। বৈষ্ণবের লীলাবলিও এই উক্তিরই সমর্থন করে। বৈষ্ণবের ধর্ম্ম রসের ধর্ম্ম—নীরস তত্ত্বের ধর্ম্ম নয়, বৈষ্ণব কাব্য-দর্শনে লীলার স্থান তাই এত উচ্চে। এই লীলা-লোকেরই নাম দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ 'সব পেয়েছির দেশ'—এ কীট্‌সের "সেই কাব্যকল্পধাম (fancie land) যেখানে মায়াবাতায়নগুলি তরঙ্গবন্ধুর ফেনিল সিন্ধুবক্ষের অভিমুখে অবিরাম উন্মুক্ত।" ললিতকলাকে প্রয়োজনের গণ্ডীর মধ্যে টেনে এনে বিচার করা সমীচীন মনে হয় না। প্রয়োজনের তাড়নায় জন্মলাভ করে বিজ্ঞান, আনন্দের প্রেরণায় জন্মে শিল্প। বিজ্ঞান চেষ্টা করে বুদ্ধিবলে প্রকৃতিকে একান্তভাবে কাজে লাগাতে, প্রকৃতির পদার্থপয়োধি মন্থন ক'রে উত্থিত হয় বস্তুসমূহের নিয়ামক কতকগুলি সার্ব্বজনীন সূত্র। সকলের কাছেই যা একইরূপে প্রতিভাত হয়—কার্য্যকারণ সম্বন্ধের দ্বারা যা একান্ত বিধৃত এবং মানবের জ্ঞানের বিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে যা কালে কালে বিবর্ত্তিত—বিজ্ঞানের কারবার তাই নিয়ে। বিজ্ঞান আবিষ্কার করে নিয়ম, শিল্প চায় আনন্দ। তাই শিল্পী যখন বলেন 'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে," আনন্দ হ'তেই এই বিশ্ব সমুদ্ভুত, আর কোন প্রশ্ন নিষ্প্রোজন, তত্ত্বের দিক দিয়ে দর্শন এবং ব্যবহারিক দিক থেকে বিজ্ঞান বিজ্ঞতার হাসি হেসে এর অন্তর্নিহিত কার্য্যকারণসূত্রটির আবিষ্কারে উঠে প'ড়ে লেগে যায়। বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিকের শুষ্ক জিজ্ঞাসা এবং তত্ত্ব-মীমাংসায় আমাদের অন্তর ভরে না, অথচ আসল বস্তুটি চিরদিনের মত রহস্যের অন্ধকারেই র'য়ে যায়। আজ যা সত্য ব'লে স্বীকৃত হয় দুদিন বাদেই তা মিথ্যা ব'লে প্রমাণিত হ'য়ে যায়। যখনই কোন প্রাকৃতিক সমস্যার সমাধানে সেই সম্বন্ধে আবিষ্কৃত কোন নিয়ম কার্য্যকরী না হয় তখনই তার মূল সূত্রটির সংশোধন আবশ্যক হয়। পরন্তু শিল্পকথিত সত্যের বিনাশ নাই—তার প্রবাহলীলা রভসনর্ত্তনে অনন্তসৌন্দর্য্য-সঙ্গমের উদ্দেশে অনাহত ধারায় ধেয়ে চলে।

পূর্ব্বেই বলা হ'য়েছে যে পরিপূর্ণতার চিত্র আছে কেবল

মানুষের মনে, সেই হেতু আর্ট প্রকৃতির অনুকরণ হ'তে পারে না। নকল ক'রলেই যদি শিল্প সৃষ্টি হ'ত তাহ'লে "ক্যামেরা" দিয়েই কাজ চ'লে যেত, শিল্পীর প্রয়োজন থাকৃত না। গ্যেটে বলেছেন, "In fact, Art is called Art because it is not Nature" অর্থাৎ প্রকৃতির প্রতিচ্ছায়া নয় ব'লেই আর্টকে আর্ট বলা হয়। যে-কোন জীবিত মানুষের সঙ্গে আর্টের মানুষের তুলনা ক'রলে দেখা যাবে জীবিত মানুষটি অপেক্ষাকৃত হীনশ্রী, কারণ শিল্প প্রকৃতির চেয়ে পূর্ণতর। প্রকৃতির মধ্যে যে অসম্পূর্ণতা বা অসামঞ্জস্য আছে শিল্পী তাঁর হৃদয়ের পূর্ণতা দিয়ে তার পূরণ করেন। ভিনস্-দি-মিলোকে প্রাচীন গ্রীক ভাস্কর্য্যের সুন্দরতম উদাহরণ ব'লে স্বীকার করা হয়। ঐ বিখ্যাত মূর্ত্তিটির সঙ্গে অনেক প্রসিদ্ধ বরাঙ্গনার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাপের তুলনা করা হয়—মূর্ত্তির সঙ্গে কারও সমুদয় মাপ মেলেনি। নিসর্গ-চিত্র (Landscape painting) বাস্তব নয় ব'লে অনেকে আপত্তি করেন। কিন্তু এ আপত্তি নিরর্থক। প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে যে অসামঞ্জস্য বা অপূর্ণতা আছে আর্ট কখনই তার প্রশ্রয় দিতে পারে না—প্রাকৃতিক চিত্র সুন্দর ও সার্থক হয় তখনই, যখন কলাবিৎ রূপের তুলিকা দিয়ে রসের মূর্ত্তি অঙ্কিত করেন। অর্থাৎ শিল্পী তাঁর চিত্রের মধ্যে কেবল যা চোখে দেখেছেন তাই আঁকেন না, সেই দৃশ্য দেখে তাঁর মনে যে অনুভূতির উদয় হ'য়েছে তাকেও রূপ দেবার চেষ্টা করেন। আমরা প্রত্যহ যে ভাষায় কথা বলি তার অর্থ বড়ই স্পষ্ট। যখন বলি ফুলটি লাল, তখন 'লাল' এই শব্দটি দিয়ে বোঝাতে চাই—ফুলটি সাদা, কাল, পীত বা অন্য কিছু নয়, সেটি লালই অর্থাৎ তার সম্বন্ধে আমাদের যে-চেতনা বা অনুবোধ (Sensation) আমরা তার নাম দিয়েছি "লাল"। কিন্তু লালফুল দেখে আমাদের মনে যে ভাবাত্মিকা রসানুভূতি জন্মে বর্ণসম্বন্ধে চেতনা তার একটি সামান্য অংশমাত্র; বস্তুবুদ্ধির দ্যোতক শব্দ, রসানুভূতির ভাবা শব্দরাশির অশরীরী নৃত্য, রেখা ও রংএর কুহকময় আলিম্পন, শব্দ চয়ন ও বয়নের কৌশলে কবি স্থায়িভাবের আশ্রিত হর্ষবিষাদাদি নানা বিচিত্ররসের ইঙ্গিত করেন, ছন্দঃ ও সুরের অনির্ব্বচনীয় সুষমায় রসলোকের রুদ্ধ দুয়ার অনায়াসেই মুক্ত ক'রে দেন। প্রত্যক্ষলোকের ভাষা শব্দ, অতীন্দ্রিয়ের আভাস দেয় সুর ও ছন্দঃ, রেখা এবং রং। টর্ণারের সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্তের ছবিগুলির সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরাই জানেন যে তিনি যা প্রত্যক্ষ ক'রেছিলেন তার চিত্র সেগুলি কিছুতেই নয়। গাছের ছায়া কখনই সূর্য্যের অভিমুখে প'ড়তে পারে না; এ কথা শিল্পী নিজেও জান্‌তেন, তবুও তাই পাওয়া যায় তাঁর রচনায়, কারণ, আর যাই করুন, প্রকৃতির অন্ধ অনুকরণ তিনি করেন নি; দৃশ্যমান্ রূপক প্রতীকের সাহায্যে তিনি প্রকাশ ক'রতে চেয়েছেন সেই সেই বস্তু সম্বন্ধে এক অখণ্ড অনুভূতির চিত্র। আতপচিত্রে মানুষের বহিরঙ্গের প্রকাশ হয় নিখুঁত কিন্তু তার বৈশিষ্ট্য, তার প্রতিভা, অর্থাৎ এক কথায় আসল মানুষটি ফুটে ওঠে ভাবুক শিল্পীর তুলির টানে। নেপোলিয়ন একজন দিগ্‌জয়ী বীর ও অলৌকিক প্রতিভাশালী পুরুষ ছিলেন। আতপচিত্রের কৃপায় আমরা তার অশ্বারূঢ় মূর্ত্তিটি দেখবার সুযোগ অনেকবার পেয়েছি কিন্তু তাতে আমাদের মন ভ'রে ওঠে নি; তার কারণ নেপোলিয়নের রূপসম্বন্ধে আমাদের 'ধারণা' প্রকৃত নেপোলিয়ন থেকে স্বতন্ত্র। মনস্বী কার্লাইল যথার্থ ই ব'লেছেন, "অনেক সময়ে কোন লোকের একখানি প্রতিকৃতি তাঁর সম্বন্ধে লেখা বিস্তৃত ইতিহাসের চেয়েও শিক্ষাপ্রদ, অথবা প্রতিকৃতি একটি জ্বলন্ত দীপশিখার মত যার সাহায্যে মানুষের জীবনেতিহাস অন্ধকারের মধ্যেও পরিষ্কার পড়া যেতে পারে।" মানুষের বহিরঙ্গেরই ছবি আতপচিত্র, তার সত্যস্বরূপটিকে ব্যক্ত ক'রতে পারে কেবল শিল্প।

প্রকৃতির বাহিরের রূপটিকে হুবহু ধ'রে দেওয়ার মধ্যে আর্টের বাহাদুরী কিছুই নেই। অন্তরের উপলব্ধ সত্যের আলোকে তার ব্যাখ্যার নামই শিল্প। এটা বলা কিছুই বেশি নয় যে শিল্পী যেখানে অন্ধ অনুকরণ ছেড়ে বিষয়বস্তুর অভ্যন্তরে কল্পসৃষ্টির ছন্দঃসুষমা সঞ্চার করেন সেখানেই আর্টের জন্ম হয়। প্রকৃতি কবির অন্তরে প্রেরণার অগ্নি উদ্দীপিত করে, কবি প্রকৃতির নশ্বরপ্রতিমায় অবিনাশী প্রাণশক্তির স্পন্দন এনে দেন। "Storm at Sea" যদি ঝটিকাক্ষুব্ধ সাগরলহরীর ভয়াবহ গর্জ্জনের অনুকৃতিমাত্র হ'ত

তবে তাকে আর্টের কোঠায় ফেলা কখনই চ'ল্ত না। অনৈসর্গিক নিসর্গশোভার রুদ্রভাবটি ফোটাতে পারে ব'লেই কলাহিসাবে তার সার্থকতা। রুদ্রের যে তাণ্ডবছন্দে শিল্পীর হৃদয় আন্দোলিত তারই আভাস আছে বলেই তা আমাদের কাছে সত্য হ'য়ে ওঠে।

অনেক সময়েই কিন্তু দেখ্তে পাওয়া যায় যে যখনই আমরা কোন চিত্রের দোষগুণের বিচার কর্'তে বসি, আমাদের চোখে-দেখা কোন বাস্তবদৃশ্যের নিকষেই তার দাম কষা হ'য়ে যায়। অথচ সঙ্গীতের বেলায় আমরা সেরূপ করি না। তার কারণ বোধ হয় এই যে শব্দসম্বন্ধে আমাদের কান যে-পরিমাণে শিক্ষিত, রূপ সম্বন্ধে চক্ষু তেমন নয়। আসলে কিন্তু রূপ ও রংএর সাহায্যে চিত্রকর যা গ'ড়তে চান্, তান-লয়-ও সম দিয়ে সেই সত্য-সুন্দরেরই ইঙ্গিত করেন সঙ্গীতকার। সাদৃশ্যের (verisimilitude) মাপ কাঠিতে শিল্পের বিচার হয় না। এই কারণেই আতপচিত্র আর্টের অন্তর্ভুক্ত নয়। আতপযন্ত্র যদি এক প্রকারের হয় এবং আলোকরশ্মি ও রাসায়নিক উপাদানের যদি সমতা থাকে তবে দশটি যন্ত্র দিয়ে তোলা দশখানি ছবি ঠিক একই রকমের হবে। কিন্তু দশজন শিল্পীর আঁকা একই লোকের ছবি দশ রকমের না হ'য়েই পারে না। কারণ ফ্রেডরিক ওয়াট্সের ভাষায় ব'ল্তে গেলে চিত্রকর ভাবের চিত্র আঁকেন, বস্তুর নয়—"paints ideas, not objects"। একজন ধনী গিদো রেণির অঙ্কিত নারীচিত্রগুলি দেখে জান্তে চেয়েছিলেন তাদের আদর্শ কোথায়। গিদো তাঁর সম্মুখে একজন কুৎসিৎ ব্যক্তিকে রেখে একটি সুন্দর ম্যাগ্ডালেন মূর্ত্তি অঙ্কিত করেন। 'মডেল' যাই হক্ কিছুই যায় আসে না; কারণ ভাব শিল্পীর হৃদয়ে। অবনীন্দ্রনাথ ব'লেছেন, "জগতে আমরা যে সকল বস্তু দেখিতে পাই, তাহার কোনটাই হুবহু নকল করা সম্ভব নয়, যদি সম্ভবও হইত তবে সেই অনুকরণকে শিল্পীর নৈপুণ্যের আদর্শ বলা চলিত না। বস্তুর আকার ও বর্ণ অনুকরণ করা কতকটা সহজ, কিন্তু কেবল আকার ও বর্ণের একটা অসম্পূর্ণ প্রতিরূপকে তো শিল্পলিপি বলা চলে না। প্রত্যেক রূপ একটি ভাবের সহিত মিশ্রিত থাকেই। সেই ভাবের আভাস বা প্রত্যক্ষ প্রকাশ শিল্পের প্রধান অঙ্গ। ফুলটি আঁকা তখনই সার্থক, যখন শিল্পী তাঁর চিত্রিত ফুলের মধ্যে স্বাভাবিক ফুলের ভাব-মাধুর্য্যের ইঙ্গিত করিতে পারেন।"

M. Zola প্রমুখ কতকগুলি সাহিত্যশিল্পী আর্টে Realism বা বাস্তবতার পক্ষপাতী। তাঁরা বলেন যেমনটি দেখা যায় তেমনটি আঁকাতেই শিল্পের সার্থকতা—তাঁদের মতে শিল্প সমাজের দর্পণ। সাহিত্যের মধ্যে সমাজের চিত্রই হুবহু প্রতিফলিত হওয়া চাই। কিন্তু এ মত যে টি কতে পারে না একথা পূর্ব্বেই ব'লেছি। এক সময়ে য়ুরোপে এই বাস্তবতার হাওয়া এমন উতল হ'য়ে উঠেছিল যে সাহিত্যিক মাত্রেই মানুষের নানাবিধ দুর্ব্বলতা ও অসংযমের চিত্রকেই উচ্চ সাহিত্যের অঙ্গ ব'লে মনে ক'র্তে সুরু ক'রেছিলেন। এখন ও যে সে হাওয়ার গতি ফিরেছে এমন মনে হয় না। জোলার 'নানা', বালজাকের "Droll Stories", মোপাসাঁর কতকগুলি ছোট গল্প এবং "বেলামি" প্রভৃতি উপন্যাসের মধ্যে বাস্তবতার নামে অনেক উচ্ছৃঙ্খলতার চিত্রই উঁচুদরের কথাসাহিত্য ব'লে করতালি পেয়ে ধন্য হ'য়েছে। অস্কার ওয়াইল্ডের কথায় ব'লতে গেলে এই সব লেখক "had mistaken the common livery of the age for the vesture of the Muses" অর্থাৎ আমাদের দৈনন্দিনজীবনের আটপৌরে পোষাকটাকেই এঁরা কলালক্ষ্মীর স্বর্ণমন্দিরে প্রবেশের পবিত্র পরিচ্ছদ ব'লে মনে ক'রেছিলেন।

শিল্পী ও নীতির সম্বন্ধে বিচার ক'র্বার পূর্ব্বে উপরি-উক্ত "Natural" কথাটির প্রকৃত তাৎপর্য্য কি হ'তে পারে তার একটু আলোচনা করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। "স্বাভাবিক" অর্থে যদি শিক্ষাদীক্ষা ও সংস্কৃতির পরিবর্ত্তে প্রকৃতিলব্ধ সংস্কারমাত্র বোঝায় তবে তার দ্বারা অনুপ্রাণিত যে-সৃষ্টি তা কখনই চিরন্তন ও চিরনূতন হ'তে পারে না। যে-বই একবার পড়ার পর আর প'ড়তে ইচ্ছা হয় না, যে-গান একবার শুনলে আর শোনা যায় না, তা কখনই উচ্চ অঙ্গের শিল্প হতে পারে না। অপরপক্ষে "স্বাভাবিক" ব'ল্তে যদি মানুষের বাহিরে অবস্থিত বস্তুনিচয়কে বুঝায় তাহ'লে অবশ্যই বল্তে হয় যে এই বস্তুসমষ্টির আলেখ্য

কখনই শিল্প আখ্যা পেতে পারে না। প্রকৃতির দুয়ারে যে-কল্পনা ও রসের অর্ঘ নিয়ে যাই আমরা, প্রকৃতি তাই আমাদের ফিরিয়ে দেয় মাত্র। শেক্সপীয়র যে বনতরুর অন্তরে, প্রবাহময় তটিনীহৃদয়ে, স্থিতিশীল প্রস্তরখণ্ডের অন্তরালে অনন্ত উপদেশের ইঙ্গিত পেয়েছিলেন সে তাঁর নিজের গুণে—প্রকৃতি তাঁর কর্ণকুহরে কোন মন্ত্রই গুঞ্জন করে নি; অতএব যাকে স্বাভাবিক বলি তাও ব্যক্তি-বিশেষের আবেগ ও কল্পনার রঙে রঞ্জিত।

অনেক সময়ে যা আমাদের বড় কাছাকাছি—যেমন যে-সময়ে আমরা বাস করছি সেই সময়কার সমাজ,—তাই নিয়ে সাহিত্য গ'ড়্‌তে গেলে তার ভিতরে কল্পনার লীলাবিস্তারের অবসর তেমন থাকে না। যা সুদূর, তাই মধুর। কাছের কত বড় জিনিসকেও আমরা ছোট ক'রে দেখি, আর অতীতের কত ক্ষুদ্র, তুচ্ছ বস্তুও কল্পনার রথে চ'ড়ে এসে বৃহদ্‌ রূপে প্রতিভাত হয়! কানে শুনছি যে বাঁশীর ধ্বনি, তা যত মধুর ও মোহনই হোক্ না,—যমুনাপুলিনে কেলিকদম্বমূলে যে বাঁশের বাঁশী বাজিয়ে রাধিকারমণ গোপিকার মনোহরণ ক'রেছিলেন তার মত অমৃতবর্ষী কখনই নয়। এইজন্যই কীট্‌স্‌ গেয়েছেন, "Heard melodies are sweet but those unheard are sweeter." একেই কোন বিখ্যাত লেখক ব'লেছেন "বর্তমানের ভিতরে অতীতের দ্রাক্ষামদিরা সঞ্চার করা।" "রোমান্স" গ'ড়ে ওঠে কল্পনা ও কাহিনীর সম্মেলনে; আর্টে বাস্তবতা এই 'রমন্যাসে'র মৃত্যুদূত। তাই 'Restoration' যুগের কৃত্রিমতার পরে Romanticism'এর, "ভিক্টোরীয়া" যুগের পরে "প্রাগ্‌ র‍্যাফেল" আন্দোলনের সৃষ্টি। যা অত্যন্ত অভ্যস্ত, চল্‌তে ফির্‌তে পথের দুধারেই যা দেখ্‌ছি, জীবনের প্রতিকাজেই অহরহ যেসব অভিজ্ঞতা আমরা পাচ্ছি, অতিপরিচয়ের অভ্যাসের ফলে তা' আমাদের মনকে মাতিয়ে দিতে পারে না। তাই ঠিক বর্তমানকে নিয়ে বড় সাহিত্য বা শিল্প গ'ড়ে ওঠে না। অপিচ যা সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত যার সম্বন্ধে আমাদের পূর্ব্বপরিচয় কিছুমাত্র নেই, যা' আমাদের জীবনধারার সম্পূর্ণ বিপরীত তা কখনই আমাদের তেমন ক'রে অভিভূত ক'র্‌তে পারে না। মিল্‌টনের অতবড় কাব্য—"Paradise Lost"—তাই আমাদের চিত্তকে স্পর্শ করে না—তাই অতিপ্রাকৃত হ'লেও ঘটোৎকচ-হিড়িম্বার উপাখ্যানও আমাদের কাছে যত সত্য, দান্তের "Divine Comedy" তার অর্দ্ধেকও নয়;—প্রত্যুত ভারতের ভাবধারা (tradition) অতীতের হ'লেও তা আমাদেরই।

মনস্বী কার্লাইল বলেন, "সমস্ত দৃশ্যমান বস্তুই প্রতীক, যে জিনিসকে আমরা যেখানে দেখ্‌তে পাই সে জিনিস সেখানে নিজের প্রয়োজনে আসে নি। কতকগুলি অতীন্দ্রিয়ভাবের দ্যোতনার জন্যই তারা সেখানে নিরপেক্ষভাবে বর্তমান। প্রত্যেক দৃশ্যই এক একটি বাতায়নের মত, যার মধ্য দিয়ে প্রকৃত চক্ষুষ্মান অনন্তের সন্ধান পান;—আমরা সকলে জ্যোতিষ্কণিকার মত, চিন্ময় সত্তার দ্বারা ওতপ্রোত ঈশ্বর-প্রবাহের উপর ভাসমান।" বেনোডিটো ক্রোচি বলেন, যা দৃশ্যমান তাই অবাস্তব, কারণ কোন জিনিসের সত্তা সে জিনিসের মধ্যে নেই, আছে যে দেখে তার মনে। সত্যই কবির কল্পনা, gives to airy nothings a local habitation and a name." "যে-গান কানে যায় না শোনা," যে-ছবি চোখে দেখা যায় না, আছে শুধু রূপদক্ষের নিভৃত চিত্ততলে রূপানুরাগের মধ্যে, তারই অভিব্যক্তি পাই কাব্যে, চিত্রে, সঙ্গীতে, ললিতকলার নানা বিভাগে। প্রকৃতির বস্তুপুঞ্জ হল তার 'raw material'—স্থূল উপাদান, 'প্ল্যান' আছে রূপকারের হৃদয়ে। পাথর দিয়ে তাজমহল তৈরী হ'য়েছিল ব'লে যদি পাথরগুলি কোনদিন ভেবে বসে যে তারাই "আর্ট" তবে আশঙ্কার কারণ যথেষ্ট আছে। বাস্তবিক শুধু ভাব বা কল্পনাও শিল্প নয়, উপাদানও শিল্প নয়—উপাদানের সাহায্যে ভাবাদর্শের অভিব্যক্তিই প্রকৃত শিল্প নামের যোগ্য। শিল্পকে অ-শিল্প থেকে পৃথক করে এই অভিব্যক্তি বা প্রকাশভঙ্গি, ইংরাজিতে যাকে বলা হয় style। অস্কার ওয়াইল্ড বলেন, সুষ্ঠু প্রকাশই শিল্পের প্রাণ,—"The very condition of any art is style। বাস্তবিক, শুধু কল্পনা এবং অনুভূতি, শুধু উপাদান এবং আদর্শের একত্র সন্নিবেশেই শিল্প সৃষ্ট হয় না, আমাদের অন্তঃস্থিত সেই কল্পস্বপ্ন যখন

ভাষার মধ্য দিয়ে ওতপ্রোতরূপে প্রকাশিত হয় তখনই হয় শিল্পের উদ্ভব। ভাবপ্রকাশে এই অপরূপ ভঙ্গির নামই 'style' অথবা 'technique'—একেই পেটর ব'লেছেন—ভাষায় সঙ্গে অন্তঃস্থিত ভাবস্বপ্নের শোভন সামঞ্জস্য—"The finer accommodation of speech to that vision within."

প্রত্যেক মানসিক অভিজ্ঞতার দুটি দিক আছে, একটি তার বিষয় বা উপাদানের দিক, অর্থাৎ যা-কিছু এই অভিজ্ঞতার প্রণোদক তাই ভাবসংযোগ (association), আবেগ (emotion), পরাবর্ত্ত (reflexes), বিমর্শ (reflection), কল্পনা (image), অনুচিন্তন (recollection), ব্যতিরেক (contrast), প্রভৃতির সাহায্যে আমাদের মধ্যে একটি বিশেষ মানস-অবস্থার সৃষ্টি করে। কিন্তু এই বিভিন্ন মনোভাবগুলি যদি বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকে তবে সামঞ্জস্য ও সংহতির ব্যাঘাত ঘটে এবং এইরূপ পরিচ্ছিন্ন মানসিক প্রক্রিয়াকে 'অনুভূতি' (experience) কিছুতেই বলা চলে না। অনুভূতির পূর্ণতার জন্য ঐগুলির সমীকরণ বিশেষ আবশ্যক। Technique ব'লতে আমরা **কোন্ বিষয়টি** শিল্পীর চিত্তকে অভিভূত ও অনুরঞ্জিত ক'রেছে শুধু তাই বুঝি না, প্রতীয়মান অনৈক্যের মধ্যেও **কেমন ক'রে** 'বিবাদী' ভাবগুলি সমীকৃত হ'য়ে একটি অখণ্ড একতা লাভ ক'রেছে তাও আমাদের উপলক্ষিত। আর্টের উদ্দেশ্য হ'ল ভাবের সংক্রমণ; কবির মনের নিগূঢ় ভাবটি কেমন ক'রে অপরের মনে সংক্রমিত করা যায়? শুধু শব্দের সাহায্যে কিছুতেই নয়। শব্দের অর্থ আছে, সে যা বলে তাই বলে, তার বেশি কিছু বলার সাধ্য তার নেই। শব্দাতীত ভাবকে প্রকাশ করে ছন্দ এবং গান। ছন্দের নর্ত্তনে, সঙ্গীতের ইঙ্গিতে আমরা কেবল স্থায়িভাবটিকেই হৃদয়ঙ্গম করি না, সেই ভাবটিকে কেন্দ্র ক'রে কবির চিত্তে যে বিভিন্ন ও বিচিত্র রসের সমন্বয় হ'য়েছিল তারও অনেকটা আমরা উপলব্ধি করি। অর্থ ও ধ্বনির এই যে একীকরণ যাতে ক'রে আমরা ভাষায় দ্বারা ভাষাতীতের আভাস দিতে সমর্থ, কাব্যজগতে এরই বিশেষ নাম বাক্‌সরণি (diction)। কল্পনা ও সৌন্দর্য্যবোধ তো অনেকেরই থাকে কিন্তু তাঁদের আমরা কলাবিৎ ব'লি না, কেননা তাঁরা তাঁদের উপলব্ধ সত্যের অমৃত নিখিলের মনের দুয়ারে পৌঁছে দিতে পারেন না। অতএব যে-পরিমাণে যে-শিল্পী জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে, বস্তুজগৎ সম্বন্ধে তাঁর সংবেদনাকে অপরের মনের সামনে ধ'রে দিতে পারেন সেই পরিমাণে তাঁর শিল্পলিপি সার্থক হ'য়েছে ব'লতে হবে। শিল্পের জগতে অনিয়ম, অসঙ্গতি অথবা বিচ্ছিন্নতার স্থান নেই—সেখানে "সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।" এই সম্পূর্ণ জগতের অস্তিত্ব আছে কেবল শিল্পের কল্পলোকে এবং মানবমনের নিভৃত কামনায়। সেই জন্যেই শিল্পের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ ক'রতে গিয়ে বেকন ব'লেছেন "Shows of things submitted to the desire of the mind" অর্থাৎ কাব্যে আমরা পাই হৃদয়ের বাসনা দিয়ে রঞ্জিত এক অপূর্ব্ব স্বপ্ন জগৎ। যদি কোন লোককে আমরা চোখের সামনে হত হ'তে দেখি তা'হলে আমাদের অন্তরাত্মা নিশ্চয়ই আতঙ্কে শিউরে ওঠে, তার কারণ, হত্যা ব্যাপারটা নিতান্ত খাপছাড়াভাবে আমাদের দৃষ্টিপথে এসে পড়ে।

প্রত্যুত, কলালিপিতে যে-কোন ব্যাপারের পূর্ব্বাপর সম্পূর্ণ ইতিহাসটি আমাদের জানা থাকে ব'লে এবং সেখানে দৈবের প্রভাবে কোন কিছুই ঘটে না ব'লে সেখানকার কঠোরতম দৃশ্যও আমাদের বিচলিত ক'রতে পারে না—সংহতির সুষমায় অংশের নিষ্করুণতা আনন্দেরই নিবন্ধন হ'য়ে দাঁড়ায়, তাই মিলনাত্মক নাটকের চেয়ে বিষাদমূলক নাটক আমাদের কম উপভোগ্য হয় না। সেই জন্য রূপসৃষ্টিকে বাহিরের জিনিসের দর্পণ না ব'লে বলা যেতে পারে তার আচ্ছাদন, কারণ শিল্পের পরিচ্ছদ প'রেই প্রকৃতির নগ্নতা দূর হয়,—তার রমণীয়তা এবং মাধুর্য্য বহুগুণে বেড়ে যায়। তাই শিল্পীর উদ্যানে যে-ফুল ফোটে, কবিকুঞ্জে যে-বিহঙ্গ গান গায় তাদের যে পূর্ণতা, যে অনির্ব্বচনীয়তা, তা প্রকৃতির ভাণ্ডারে দুর্লভ।

সাহিত্যের সংজ্ঞানির্দ্দেশ ক'রতে গিয়ে বিখ্যাত কলাসমালোচক ও কবি ম্যাথ্যু আর্ণল্ড ব'লেছেন, "সাহিত্য মানবজীবনের সমালোচনা।" অর্থাৎ জীবনকে বিশ্লেষ ক'রে তার ভালমন্দ

পৃথক পৃথক ক'রে ধ'রে দেওয়া এবং তার অসঙ্গতি ও অপূর্ণতাকে পূর্ণ করবার জন্তে মনের আদর্শমানুষটিকে বাস্তব মানবের পাশাপাশি ধ'রে দেওয়াই তার উদ্দেশ্য। এই সংজ্ঞার মধ্যে ত্রুটি আছে,—সাহিত্যকে বিশ্লেষ ক'রলে তার রসরূপের পূর্ণতার ব্যাঘাত ঘটে—সাহিত্য মনস্তত্ত্বের কোঠায় গিয়ে পড়ে, শিল্প বিজ্ঞান হ'য়ে দাঁড়ায়। বিজ্ঞানেও কল্পনা আছে, নাই সেখানে রস। বিজ্ঞান ব্যথিতের আর্ত্তিতে কাতর হয় না, প্রিয়ের বিরহে বিধুর হ'য়ে ওঠে না, অবিচার ও অত্যাচারের সম্মুখীন হ'য়েও তার ধমনীতে শোণিতস্রোত দুর্ব্বারবেগে প্রবাহিত হয় না। শিল্পসৃষ্টির মধ্যে কল্পনা ও বিচার থাকাই যথেষ্ট নয় 'দরদ'ই হ'ল সাহিত্যের 'জান'। সুতরাং সহস্র গুণসত্বেও একমাত্র দরদের অভাবেই অনেক সময়ে শিল্পসৃষ্টি সার্থক হ'তে পারে না।

মানুষের মনের মধ্যে যে একটি রসের মানুষ আছে অনির্ব্বচনীয়ের সঙ্গে তার নিত্য নব নব লীলার সম্বন্ধ। যিনি আমাদের হৃদয়শায়ী হ'য়েও আমাদের মনের বাহিরে—অসীম হ'য়েও যিনি, আমাদের প্রেমের ডোরে চিরদিন বাধা, সেই সীমাহীনের মণিনূপুরের ধ্বনিতরঙ্গ যখন আমাদের চিত্তবীণায় লেগে অপূর্ব্ব ঝঙ্কারে স্পন্দিত হ'য়ে ওঠে, তখন আমাদের প্রাণে সঙ্গীতের যে পূর্ণতা, আনন্দের যে অসীমতা, ভাবের যে অনির্ব্বচনীয়তা, সৌন্দর্য্যের অজস্র উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বিত হ'য়ে ওঠে তাকে ভাষা দেওয়াতেই শিল্পের চরম স্ফূর্ত্তি। আর্ট পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যের প্রতিচ্ছবি—যে-সৌন্দর্য্য আছে কেবল ভাবুকের হৃদয়পদ্মে। এই পরিপূর্ণতার আদর্শ কিন্তু সকলের সমান নয়। বৈচিত্র্যই বিশ্বের প্রাণ, জনে জনে মনে মনে দৃষ্টির বিভিন্নতা, অনুভূতির নূতনতা আছে ব'লেই সংসার সুসহ হয়েছে। রাত্রির পর দিন এবং দিনের পর রাত্রি, এরা যদি নিত্যকাল একই কথা ব'লত, রূপ ও রসের একই দৌত্য নিয়ে অনুদিন আমাদের অনুসরণ ক'রত, তবে এই আমাদের জীবন নিতান্তই দুর্ব্বহ হ'য়ে উঠ্‌ত সন্দেহ নেই। অসীম আকাশে ঐ যে তারা, ঐ যে চাঁদ জ্যোৎস্নার তরণী বেয়ে আমার মনের কূলে এসে নিত্য আমায় ডাক দেয়, ফুলের সৌরভে ভরপুর ঐ যে পেলবপবন অপূর্ব্ব হিল্লোলে আমার অঙ্গে অঙ্গে পুলকের শিহরণ জাগিয়ে দিয়ে যায়, ওদের যদি নূতন কিছু ব'ল্‌বার না থাক্‌ত, কিম্বা সকলের কানে যদি ওরা একই কথা পুনঃ পুনঃ গুঞ্জন ক'রে ফির্‌ত তবে নিশ্চয়ই এই বিশ্বসৃষ্টির অন্তরে আনন্দের যে অমেয়তা এবং ধ্যানের যে বিচিত্রতা আছে তা পদে পদে ক্ষুণ্ণ হ'ত। শিল্প এই ব্যক্তিগত রসানুভূতির অভিব্যক্তি, শিল্পীর নিজস্ব আনন্দের শোভনতম প্রকাশ। তাই শেলীর "স্কাইলার্ক" এবং ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের "স্কাইলার্ক" এক জিনিস নয়; তাই প্রত্যেক কবিই বাস করেন নিজের কল্পনা ও রসানুরঞ্জিত একটি স্বতন্ত্র জগতে। চোখ-দিয়ে-দেখা জিনিসকে মন দিয়ে দেখ্‌লে কেমন দেখায়—রূপ-তুলিকায় রসের মূর্ত্তিখানি কেমন অপূর্ব্ব-রূপে ফুটে ওঠে, তাই পাই আমরা রূপদক্ষের শিল্প-রচনায়। অথচ শিল্প বিশ্বজনীন। শিল্প সত্যসুন্দরের প্রকাশ, মানবমনের প্রাথমিক বৃত্তিনিচয়ের দ্যোতনা এবং দেশকাল-নির্ব্বিশেষে রসরুচির বিচারে তার মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি নেই। এই বিশ্বজনীনতা দেখা যায় পৃথিবীর বড় বড় রূপ-দক্ষের রচনায়—শেক্সপীয়রের 'ওথেলো', কালিদাসের শকুন্তলা, গ্যেটের "ফাউষ্ট", রবীন্দ্রনাথের কাব্য, র‍্যাফেল ও মাইকেল এঞ্জিলোর চিত্রাবলী, সাজাহানের তাজমহল এই কারণেই সর্ব্বজনস্বীকৃত। কিন্তু যা সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিগত তা সর্ব্বজনীন হয় কেমন ক'রে? এই যে তোমার দেখা এবং আমার দেখা, এরা সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিগত এবং সেই কারণে অনেক পরিমাণে বিভিন্ন হ'লেও এদের একটি কেন্দ্রগত ঐক্য আছে। তা যদি না থাকৃত তবে একজনের রচনা আর একজন প'ড়ে তৃপ্তি পেত না—একজনের গাওয়া গান আর একজনের কাণে সুধাবর্ষণ ক'রত না। বৈষম্যের মধ্যে মিলনের গানই শিল্প—বৈচিত্র্যের অভ্যন্তরে এই কেন্দ্রগত ঐক্যের বাণীই কাব্যে গানে, স্থাপত্যে, চিত্রে যুগে যুগে অভিব্যক্ত হ'য়ে এসেছে। ব্যক্তিগত রুচি যদি বিশ্বরুচির অন্তর্লীন না হ'ত, আমাদের প্রাথমিক চিত্তবৃত্তির দ্যোতনা শিল্পলিপিতে একমাত্র স্বাতন্ত্র্যের রূপেই যদি প্রতিভাত হ'ত তবে আর্টের মধ্যে বিশ্বজনীনতার প্রসঙ্গ অবান্তর হ'ত নিশ্চয়ই।

মনীষী বর্গস ব'লেছেন, আমাদের এবং প্রকৃতির মাঝ-খানে অর্থাৎ আমাদের ও আমাদের চৈতন্তের মধ্যে একখানি রহস্তের যবনিকা দোদুল্যমান র'য়েছে—তার ভিতর দিয়ে

স্পষ্ট কিছুই দেখা যায় না, তবে শিল্পীর দৃষ্টিতে কিছু কিছু প্রতিভাত হয়। এই পর্দা প্রয়োজনের পর্দা—সংসারে এসে মানুষকে বাঁচ্‌বার কথাই ভাব্‌তে হয়, তাই বস্তুজগতের মধ্যে যেটুকু আমাদের কাজে লাগে সেইটুকুর জন্যই আমরা ব্যস্ত হ'য়ে ছুটাছুটি করি। সাধারণ মানুষের কাছে তাই রস-লোকের দ্বার এমন ক'রে রুদ্ধ;—শিল্পী প্রয়োজনকে কেবল প্রয়োজন ব'লেই জানে—তাকেই সর্ব্বস্ব ব'লে স্বীকার করে না। তরুর মত ধরণীর স্তন্যরসে সে ধন্য হয় বটে কিন্তু তার শীর্ষে বর্ষিত হয় উর্দ্ধলোকের অজস্র মুক্তকিরণ। সেইখানে সে অমর; জীবলোকে মানুষ সান্ত, রসলোকে সে অনন্ত। এই অনন্ত সৌন্দর্য্যের অনুভূতিকে ব্যক্তিস্বরূপে উপলব্ধি করাই আর্টের ধর্ম্ম। চিত্র বল', স্থাপত্য বল', সঙ্গীত বল' প্রত্যেকেরই একমাত্র উদ্দেশ্য এই ব্যবহারিক প্রতীক, এই সামাজিক সুবিধা শৃঙ্খলার জন্য নির্ম্মিত মামুলী আইনগুলিকে পরিহার ক'রে—আমাদের ও সত্যের মাঝখানের পর্দ্দাখানি সরিয়ে ফেলে সত্যের সম্মুখীন হওয়া অর্থাৎ প্রতিমার জীর্ণ-পঞ্জরে যখন ভাবাদর্শের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয় তখনই আমরা সত্যের স্পর্শ পেয়ে ধন্য হই। কিন্তু এই আদর্শ শিল্পীর সম্পূর্ণ নিজস্ব। চিত্রকরের শিল্পপটে যে-ছবি মূর্ত্ত হ'য়ে ওঠে তা কোন একটি বিশেষ সময়ের, বিশেষ স্থানের ও বিশেষ কল্পনার দ্বারা অনুরঞ্জিত আলেখ্য। কবিবীণায় যে-বাণী ঝঙ্কৃত হয় তা তাঁর মনের বিশেষ একটি সত্যপ্রতীতির দ্বারা অনুস্যূত—যা কবি নিজেও হয়ত আর ফিরে পান না। তবে আর্ট বিশ্বের মহামহোৎসবে আনন্দের অমৃত বিলায় কেমন করে? কোন একটি ভাবকে আমরা সকলে সত্য ব'লে স্বীকার করি না ব'লেই যে সেটা বিশ্বজনীন হবে না তার কোন মানে নেই। হ্যামলেটের চরিত্রের চেয়ে অদ্ভুত এবং অসাধারণ আর কি হ'তে পারে? তবুও সাধারণে তাকে হৃদয় দিয়েই গ্রহণ করে;—এই হিসাবেই শিল্প সর্ব্ব-জনীন। কিন্তু যা একান্ত ব্যক্তিগত (individualised) তা সকলের হয় কি উপায়ে? কারণ তা অকৃত্রিম আবেগ-সম্মুখ। অকৃত্রিমতা জিনিষটি সংক্রামক—এক হৃদয় থেকে অপর হৃদয়ে সহজেই সঞ্চারিত হয়। জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কলাবিৎ ঋষি টলষ্টয় বলেন, শিল্পের উদ্দেশ্য অপরকে আমাদের আবেগের এবং আনন্দের অংশ দেওয়া। যে-সংবেদনা আমি অন্তর দিয়ে উপলব্ধি ক'রেছি, বস্তুসিন্ধু মন্থন ক'রে যে পীযুষ-প্রসাদ আমি পেয়েছি, জনে জনে মনে মনে সেই প্রসাদ পরিবেষণ ক'রে দেওয়াই হ'ল আর্টের কাজ। আবার ভাব যদি ঠিকমত ভাষা না পেয়ে থাকে, আমার ভাবের মধ্যে সত্যকার দরদের যদি অভাব থাকে, তবে তা কখনই অপর হৃদয়কে আলোড়িত ক'র্‌তে পারে না। বর্গস'র মত টলষ্টয়েরও অভিমত, শিল্পের সর্ব্বপ্রধান গুণ হ'ল তার অকৃত্রিমতা বা দরদ্‌—এই দরদ্‌ আছে ব'লেই একজনের আবেগ অন্যের হৃদয়ে সংক্রমিত হয়, একজনের আনন্দ বিশ্ব-বীণার তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে স্পন্দিত হ'য়ে ওঠে। এই সংক্রমণ (infection) সম্ভব হয় তখনই যখন আমরা ঠিক প্রকৃতির বুকেই মানুষ হই—যখন সভ্যতার কৃত্রিমতা বা আবেষ্টনীর প্রভাব আমাদের উপর কাজ না করে। তখন আমরা কবির সঙ্গে হাসি কাঁদি, তিনি আমাদের মনকে যে পথে হাত ধ'রে নিয়ে যান আমরা দ্বিধাহীনচিত্তে সেইপথেই এগিয়ে চলি। তবে যারা বর্ণান্ধ বা শব্দবধির তাদের কথা অন্যরূপ। টলষ্টয়ের মতে আবেগের অকৃত্রিমতাই হ'ল শিল্পের সার কথা—আবেগটি ভাল কিম্বা মন্দ, সুন্দর অথবা অসুন্দর সে বিচার শিল্পের নয়। তাঁর মতে সত্যকার 'দরদ' এবং সুষ্ঠু প্রকাশের উপরই আর্টের মহত্ত্ব নির্ভর করে।

শিল্পের আর দুটি প্রধান লক্ষণ তার অবিনশ্বরতা ও ব্যঞ্জনা। মানবজীবন ক্ষণস্থায়ী কিন্তু সেই ক্ষণভঙ্গুর জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা, অনুরাগ বিরাগ, প্রেমভক্তি প্রভৃতির উপাদানে যে শিল্প নির্ম্মিত হয়, তা শাশ্বত ও সনাতন। সাজাহান আজ জীবিত নেই—কিন্তু প্রিয়াবিয়োগবিরহে তাঁর বিমথিত চিত্তের যে দীর্ঘনিঃশ্বাস তিনি মর্ম্মরনির্ম্মিত তাজের মধ্যে রেখে গেছেন তার মৃত্যু নেই। যখনই তাজের কাছে যাই তখনই কেবল যে তার সৌন্দর্য্যের দ্বারা আকৃষ্ট হই তা নয়—সে আমার মনের কানে কোন্ দূরকালের প্রিয়াবিরহিত প্রেমিক সম্রাটের মর্ম্মন্তুদ ক্রন্দনধ্বনি বহন ক'রে নিয়ে আসে। এই জন্যেই ধ্বনিকার ব'লেছেন—কাব্যস্যাত্মা ধ্বনিঃ। সেই সম্রাট্ যিনি রাজৈশ্বর্য্যের চেয়ে তাঁর প্রেমকে বড় ক'রে দেখেছিলেন, পার্থিব বৈভবের

অনেক উচ্চে প্রেমের আসন দিয়েছিলেন, তারই কথা বারম্বার মনে পড়ে,—আর বর্ত্তমানের মধ্যে থেকে অতীতের দ্রাক্ষারসমদিরা পান ক'রে আমরা বিহ্বল হ'য়ে যাই। রবীন্দ্রনাথ ব'লেছেন তাজমহল স্থির হ'য়েও চঞ্চল, সে যেন পরলোকগত প্রিয়তমার সহিত রাজাধিরাজ সাজাহানের বাণীবিনিময়ের দূত—সে যেন মর্ম্মর দিয়ে রচিত একখানি আর্ত্ত সঙ্গীত। তাজমহলের উদ্দেশে শিল্পী হ্যাভেল ব'লেছেন, "তাজমহল নারী-সৌন্দর্য্যের চরণমূলে ভারতের শিল্প সাধনার মহনীয় শ্রদ্ধাঞ্জলি—ইহা প্রাচ্যের ভিনস্-দি-মিলো।" পেটর এক জায়গায় ব'লেছেন "আর্টের আদর্শ সঙ্গীত; যে-পরিমাণে যে-আর্ট সঙ্গীতকে লক্ষ্য ক'রে অগ্রসর হ'য়েছে অর্থাৎ সঙ্গীতের মত বস্তুমাত্রকে অগ্রাহ্য ক'রে সঙ্গীতধর্ম্মে অনুপ্রাণিত হ'তে পেরেছে সেই পরিমাণে তা সফল হ'য়েছে।" পেটরের ন্যায় রবীন্দ্রনাথও সঙ্গীতকে শিল্পের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়েছেন। তাঁর মতে "অসীম যেখানে সীমার মধ্যে সেখানে ছবি। অসীম যেখানে সীমাহীনতায় সেখানে গান। রূপরাজ্যের কলা ছবি, অপরূপরাজ্যের কলা গান। কবিতা উভচর, ছবির মধ্যেও চলে, গানের মধ্যেও ওড়ে। কেন না কবিতার উপকরণ হ'চ্ছে ভাষা। ভাষার একটা দিকে অর্থ, একটা দিকে সুর। এই অর্থের যোগে ছবি গ'ড়ে ওঠে, সুরের যোগে গান।" আর একস্থলে ব'লেছেন, "কথা সুস্পষ্ট এবং বিশেষ প্রয়োজনের দ্বারা সীমাবদ্ধ আর গান অস্পষ্ট এবং সীমাহীনের ব্যাকুলতায় উৎকণ্ঠিত, সেইজন্য কথায় মানুষ মনুষ্যলোকের, গানে মানুষ বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মেলে।" সঙ্গীতধর্ম্ম তাজের মধ্যে আছে পূর্ণমাত্রায়—সে হিসাবে তাজের শিল্পমূল্য অসামান্য। প্রত্যেক স্থাপত্যশিল্পেরই একটা প্রয়োজনের দিক আছে যেটা সসীম, আর একটা দিক আছে তার সৌন্দর্য্যের, যেখানে সে অসীমের মধ্যে মুক্ত। রৌদ্রবর্ষায় বস্তুজগতে সে আমাদের আশ্রয়,—ধ্যানলোকে সে আনন্দের চিরনন্দন, সৌন্দর্য্যের সুরধাম। স্থাপত্যের মধ্যে তাজ মহত্তম, কারণ তাকে দেখে সীমা বা প্রয়োজনের দিকটা মনেই আসে না—গঠনসুষমার অনিন্দ্য বিকাশে, ব্যঞ্জনার মহনীয়তায় সে একেবারে আমাদের হৃদয়ের ভিতরে প্রবেশ করে। মরিসের মতে আর্টের চরম অভিব্যক্তি হয় ভাবের সঙ্গে প্রয়োজনের অঙ্গাঙ্গি-মিলনে। তিনি ব'লেছেন, "কোন দেশে শিল্পের প্রসার কেমন হ'য়েছে আমি তার বিচার করি তার চিত্রগুলির মানদণ্ডে নয়, তার দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় জিনিষের মধ্যে সৌন্দর্য্যের আলিম্পন ও প্রতিবিম্বনে।" এই উক্তির দ্বারা মরিস একথাও ব'লতে চেয়েছেন যে যে-দেশের এবং যে-জাতির মধ্যে সৌন্দর্য্যপ্রীতি এতদূর ব্যাপক হ'য়ে পড়েছে যে প্রাত্যহিক ব্যবহারের তুচ্ছ জিনিসেও সে তার ছাপ রেখে গিয়েছে, সেই দেশের এবং সেই জাতির মধ্যে শিল্প তার সার্থকতা খুঁজে পেয়েছে। এই রূপচেতনা জাপানী জাতটার মধ্যে এমন ক্রিয়াশীল যে তাদের ওঠায় বসায়, চলনে বলনে এমন কিছুই পাওয়া যায় না যার মধ্যে ছন্দ এবং সুষমার অভাব ধরা পড়ে। "মানুষের ভিতরে সে কোন্ বস্তু আছে যা নিশ্চিত-মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়েও অমরত্বের দাবী করে? এ আমাদের সেই মনের মানুষ যে তার অফুরাণ ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্যে ঝল্‌মল্ ক'র্‌ছে" এবং লোকে লোকে কালে কালে শিল্প-কলার মধ্যে অভিব্যক্ত হ'চ্ছে। আর্টের চিরন্তনতা সম্বন্ধে কীট্‌স্ তাঁর "Grecian Man" কবিতার মধ্যে ব'লেছেন —মানবজীবন নশ্বর, আর্ট সুন্দর ও অবিনশ্বর; যার বিনাশ নেই, যা চিরন্তন, তা সত্য; অতএব আর্ট চিরন্তন, সত্য ও সুন্দর। সত্য সুন্দর পৃথক্ নয়, একই বস্তুর, দুই বিভিন্ন হৃদয়ে প্রতিভাত, বিভিন্ন মূর্ত্তি। সত্যসন্ধানীর কাছে যা সত্য, রূপদক্ষের চক্ষে তাই সুন্দর। "তাজমহল" শীর্ষক অপূর্ব্ব কবিতার কবি অনেকটা এই ভাবেরই ইঙ্গিত ক'রেছেন। তিনি ব'লেছেন, সময় মানুষের এবং তার সংসৃষ্ট যা কিছু, সকলেরই উপর তার অমোঘ প্রভাব বিস্তার করে যুগে যুগে; তাকে তো কেউ ভুলিয়ে রাখতে পারে না! সময়ের হৃদয়হরণ করতে পারে শুধু শিল্প, যখন সে তার সৌন্দর্য্যের অপরূপ উপচার নিয়ে,—তার কাননের কমনীয়তম কুসুমগুলি দিয়ে রমণীয় মাল্য গ্রথন ক'রে তার দ্বারে এসে উপস্থিত হয়।

"হে সম্রাট্, তাই তব শঙ্কিত হৃদয়
চেয়েছিল করিবারে সময়ের হৃদয়হরণ
সৌন্দর্য্যে ভুলায়ে;

কণ্ঠে তার কী মালা দুলায়ে
করিলে বরণ
রূপহীন মরণেরে মৃত্যুহীন অপরূপ সাজে!"

রস্কিন্ ব'লেছেন, আর্টের মধ্যে যা কিছু মহৎ তা অসীমের আরতি; অথবা রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

"যাবার আগে এই কথাটি জানিয়ে যেন যাই,
যা দেখেছি, যা পেয়েছি তুলনা তার নাই;
এই জ্যোতিঃসমুদ্র মাঝে, যে শতদল পদ্ম রাজে,
তারই মধু পান ক'রেছি ধন্য আমি তাই!"

হে ভগবান্, হে বিশ্বশিল্পী, তোমার বিচিত্র রচনার মধ্যে যখন যেটি ভাল লেগেছে, তাতেই আমার চিত্ত ভ'রে গিয়েছে। সেই যে ভাল-লাগা, তোমার প্রকাশের সঙ্গে আমার প্রাণের যে-প্রেমসম্বন্ধ, ক্ষণে ক্ষণে আমার হৃদয়াকাশে ইন্দ্রধনুর সপ্তবর্ণে রঞ্জিত হ'য়ে ফুটে উঠেছে; কোকিল-কূজনে, কমলগন্ধে যে-আনন্দ আমার জীবনকুঞ্জে নন্দিত হ'য়েছে, হে অনন্ত, জীবনান্তে সেই বন্দনাই যেন তোমার চরণারবিন্দে পৌঁছে দিতে পারি! যিনি অর্থ ও ভাষার অতীত, তাঁকে কিছু নিবেদন ক'র্তে হ'লে চাই এমন কিছু যা ভাষা ও অর্থের অতীত—মনুষ্যলোকে সুর ছাড়া এমন জিনিষ আর কি আছে যা আনন্দের প্রেরণায় পরম সুন্দরের চরণস্পর্শ ক'র্তে সমর্থ? সঙ্গীতের মধ্যে আমাদের অন্তরতম মানুষটি সেই বিরাট্ ও মহান্ মানুষের কাছে তাঁর লিপির উত্তর পাঠিয়ে দিচ্ছে, যে লিপি তিনি ছড়িয়ে রেখেছেন এই বিশ্বভুবনের আনন্দ-সন্দোহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে! শিল্পের মধ্যে তাই সঙ্গীতের আসন সর্ব্বোচ্চে!

আর্ট কি তা দেখা গেল। আর্ট কি নয় তারই আলোচনা ক'রে শেষ ক'র্ব। শিল্প যে প্রয়োজনের ত্রিসীমায় যায় না একথা প্রবন্ধারম্ভে বারবার বলা হ'য়েছে। ক্রোচি বলেন, শিল্প আনন্দেরও ধার ধারে না—সে আমাদের আনন্দ দিতে পারে কিনা কলালোচনার দিক থেকে সেকথা অবান্তর। আর্টকে তিনি একটি 'intuition' বা সহজ জ্ঞান মাত্র মনে করেন। এবং যেহেতু ভাল-লাগা, না-লাগা নির্ভর করে মানুষের শিক্ষাদীক্ষার উপর সেই হেতু তা স্বতঃউৎসরিত নয়; যাকে আমরা মনোবৃত্তি বলি সে জিনিসটা গড়ে ওঠে আবেষ্টনের মধ্যে। সুতরাং যা সহজোলব্ধ বা à priori নয় তা আর্ট বা সহজ-জ্ঞানের উপজীব্য হ'তে পারে না। এ-মত কিন্তু আমাদের বেশ সমীচীন ব'লে মনে হয় না—কেননা আনন্দকেও যদি শিল্পরাজ্য থেকে নির্ব্বাসিত ক'রে দেওয়া হয়, তাহ'লে "mere intuition" এর কি তাৎপর্য্য বোঝা যায় না। বাস্তবিক, আর্ট তো ব্যক্তিত্বের প্রকাশ, মনের বিশেষ অবস্থার সৃষ্টি (creation of the mood), কবি-হৃদয়ের ধ্যানস্বপ্ন। আনন্দ হ'তেই এর উৎপত্তি, আনন্দেই এর পরিসমাপ্তি। কোন বস্তুকে সম্বন্ধ-বিচ্ছিন্ন ক'রে সমগ্রের দিক দিয়ে দেখা সম্ভব নয়। সম্বন্ধের বিচ্ছিন্নতায় সমগ্রের ব্যাপ্তি ক্ষুণ্ণ হয় বটে—কিন্তু ব্যাপ্তির দিক দিয়ে যা হারাই, আবেগের তীব্রতার দিক দিয়ে তা দ্বিগুণ ক'রে ফিরে পাই। রবীন্দ্রনাথের 'উর্ব্বশী' কবিতায় নারী-সৌন্দর্য্যের সম্বন্ধবিরহিত রূপটিই প্রকাশিত হ'য়েছে। কল্পনার দিক দিয়ে এই কবিতা যেমন অনবদ্য মাধুর্য্যে মণ্ডিত হ'য়েছে, অবিমিশ্র রসের দিক দিয়ে এর সৌন্দর্য্যও সেই পরিমাণে খণ্ডিত হ'য়েছে সন্দেহ নেই। কল্পনা আমাদের বিস্মিত করে—স্পন্দিত করে না। তাই এই কবিতা একদিক দিয়ে যেমন অসাধাণ সুন্দর, আর এক দিক দিয়ে তেমনি এর কোথায় যেন অপরিমিত শূন্যতা!

আর্ট এত বেশি 'personal' (ব্যক্তিগত) ব'লেই তা আমাদের এত বেশি আনন্দ দিতে পারে—যেখানে সম্বন্ধ নেই সেখানে আবেগের তীব্রতা কোথায়? কাজেই আনন্দের অংশও তার মধ্যে অত্যন্ত কম। এই কারণেই বৈষ্ণব কবিরা ভগবানের সঙ্গে নানারূপ সম্পর্ক পাতিয়ে মানবীয় প্রেমের মধ্যে দিয়েই তাঁকে পেতে চেয়েছেন—এই কারণেই হিন্দুরা ভগবানের কতকগুলি প্রতীক কল্পনা ক'রে, তাঁর সঙ্গে নানা বিচিত্র বন্ধনে আবদ্ধ হ'য়ে তাঁর স্বরূপকে উপলব্ধি ক'র্তে চেয়েছিলেন। ধর্ম্মের দিক দিয়ে যাই হ'ক, কাব্যহিসাবে যে পদাবলী-সাহিত্য ভূতলে অতুলনীয় এ সম্বন্ধে দুই মত হ'তে পারে না। এখানে মনে রাখ্তে হবে যে ব্যক্তিত্ব আর বৈশিষ্ট্য এককথা নয়—

একজনের মনোবেগ অপরের হৃদয়ে সহজেই সঞ্চারিত হয়। মানুষে মানুষে যথেষ্ট প্রভেদ থাকলেও তাদের প্রত্যেকের মধ্যে এমন কতকগুলি সহজ ও অপরিবর্ত্তনীয় বৃত্তি আছে যা শিক্ষাদীক্ষা ও আবেষ্টনীর প্রভাবের অনেক উপরে এবং যা বিচিত্র কুসুমদামগ্রথিত মাল্যের মধ্যস্থিত সূত্রটির মত, এই বহুধাবিভক্ত মানবসমাজকে একান্তভাবে ধ'রে রেখেছে। তাই কবির হৃদয়ের যে ভাব—তাঁর অনুভূতির যে অনুপতা তা তাঁর সম্পূর্ণ নিজস্ব হ'লেও সহজেই অপর হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়। নানা বিচিত্রতা ও বৈষম্যের মধ্যেও "there is one touch of Nature which makes the whole world kin." কাজেই কবির অনুভূতি সহজেই বিশ্বের অনুভূতি হ'য়ে যায়। তবে ক্ষুদ্র আনন্দে শিল্পের মন ভরে না, সে বলে—"নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখম্"।

শেষকথা আর্ট নীতি নয়। স্কুলমাষ্টারীয় দাবী সে কোন কালেই করে না। নীতির অংশ প্রবেশ ক'র্‌লেই তার রসের ও আনন্দের অংশ হ্রাস হয়ে আসে। সরল সহজ নীতিকথা কোন কালেই আমাদের বেশ হৃদ্য হয় না। সুতরাং সাহিত্য ও শিল্পের মধ্যে নীতি ও উদ্দেশ্যকে (purpose) প্রচ্ছন্ন রাখ্‌তে হয়। নীতিপ্রচারের দ্বারা যেমন আর্টের আনন্দ ক্ষুণ্ণ হয়—তার স্বচ্ছন্দ বিকাশ বাধা পায়—তেমনি বাস্তবতার নামে দুর্নীতি প্রচারে শিল্পের শ্লীলতা ও শুচিতা নষ্ট হয়। অতএব সু কিম্বা কু কোন প্রকারের নীতি প্রচার করাই শিল্পের কর্ত্তব্য নয়; বাস্তবিক কোন বই সম্বন্ধে কেবল বলা যেতে পারে সেখানি সুলিখিত কিম্বা কুলিখিত; তার মধ্যে শীলোপদেশ আছে কিনা সেকথা সাহিত্যের পক্ষে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক।

নীতি সামাজিক শৃঙ্খলা ও সুবিধার জন্য বিরচিত নিয়মমাত্র। সুতরাং উপরে শিল্পের যে ব্যাখ্যা আমরা ক'রেছি সেই মাপকাঠি দিয়ে বিচার ক'র্‌লে অবশ্যই বল্‌তে হয় যে নৈতিক উপযোগিতার দিক দিয়ে কোন শিল্পলিপিরই মূল্য নির্দ্ধারিত হ'তে পারে না। আর্ট যদি intuition বা সহজ-জ্ঞান হয় তবে মানুষের নিজের-হাতে-গড়া কতকগুলি সাধারণ সামাজিক নিয়ম কখনই তার অঙ্গীভূত হ'তে পারে না। দেশকাল-পাত্রভেদে মানুষের নৈতিক আদর্শও ভিন্ন। সুতরাং একদেশের শিল্প-সাহিত্যে যা নীতির পরাকাষ্ঠা ব'লে বিবেচিত হয়, অন্য দেশে অথবা অন্য কালে তা' সেরূপ আদর পায় না বা সম্পূর্ণ অনাদৃত হয়। আমাদেরই দেশের সমাজচিত্রে পঞ্চাশবৎসর পূর্ব্বে যদি এক পুরুষের একাধিক বিবাহের প্রসঙ্গ থাকৃত তবে তা আদৌ অশোভন হ'ত না—কিন্তু এখন হয়। তেমনি সে সময়ের সাহিত্যে বিধবাবিবাহের প্রসঙ্গমাত্রও অরুচিকর ছিল, এখন তা সমাদরে সাহিত্যের আসরে স্থান পাচ্ছে। বিধবাবিবাহ-আন্দোলনে নিরতিশয় বিরক্ত ও মর্ম্মাহত হ'য়ে সেকালে গুপ্তকবি, দাশুরায় প্রভৃতির মত মননশীল লেখকও বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে তির্য্যগ-উক্তি ক'র্‌তে কুণ্ঠিত হন নি। বিভিন্ন দেশের নৈতিক আদর্শে যে বিভিন্নতা থাকতে পারে তা বলাই বাহুল্য। সুতরাং এরূপ পরিবর্ত্তমান নৈতিক আদর্শ কখনই উচ্চাঙ্গের শিল্পের স্থান পেতে পারে না। হুইট্‌ম্যান্ ব'লেছেন,

"I give nothing as duties.
What others give as duties, I give as loving impulses.
(Shall I give the heart's action as a duty?)

অর্থাৎ কর্ত্তব্যের বিশ্লেষণ সে আমার নয়।
অন্যে যারে কর্ত্তব্য বাখানে আমি তারে দিই 'প্রেম-নাম।
(হৃদয়ের স্বাধীন প্রয়াসে কর্ত্তব্য কি কভু বলা সাজে?)

উদ্দেশ্যের দিকটা যে-কাব্যের মধ্যে খুব পরিস্ফুট তার সঙ্গে আমাদের প্রাণের সুরটি তেমন মেলে না—শুদ্ধ সৌন্দর্য্যের মহিমা নিয়ে যা আমাদের অন্তরে এসে প্রবেশ করে তারই নাম কাব্য।

এ প্রসঙ্গে অতি-আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যের উল্লেখ করা যেতে পারে। সেখানে মানুষের যৌন প্রকৃতিকে এমন সূক্ষ্মভাবে চিরে দেখান হ'য়েছে, মনস্তত্ত্বের দিক থেকে তার প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের এমন পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করা হ'য়েছে, যে তার শিল্পসৌন্দর্য্য পদে পদে ব্যাহত

হ'য়েছে। যৌনজীবনের সৌন্দর্য্য ও শুচিতা নির্ভর করে রহস্যের গভীরতায়, বাসনায় নগ্নতায় নয়। দুটি হৃদয় যখন কোন এক অনির্দ্দেশ্য চিরন্তন আকর্ষণে পরস্পরের অতি কাছাকাছি এসে দাঁড়ায়—দেহের লালসা যখন উৎসারিত হয় পরিশুদ্ধ হৃদয়াবেগের উৎসমুখে তখনই তা চারুকলার বিষয়ীভূত হয়। জৈব প্রকৃতির ব্যবচ্ছেদ ও বিশ্লেষণ তো বৈজ্ঞানিকের কাজ—তার তত্ত্বের দিক। যৌন-অভিজ্ঞতার ভিতরে যে অনির্দ্দেশ্য রহস্য ও সহজ আনন্দ নিহিত আছে তারই রসসম্পৃক্ত বিবৃতির নাম সাহিত্য। অতএব আজকালকার তরুণ লেখকেরা পাশ্চাত্যের অনুকরণে আর্টকে বিজ্ঞানের কোঠায় এনে ফেলেছেন—তথ্যের চাপে সত্যের কণ্ঠরোধ ক'রেছেন। "কৃষ্ণকান্তের উইলে" গোবিন্দলালের প্রতি রোহিণীর অবৈধ (অবশ্য সামাজিক হিসাবে) আকর্ষণের কথা ব'লতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র একস্থলে ব'লেছেন, "কেন যে এতকালের পর তাহার এ দুর্দ্দশা হইল, তাহা আমি বুঝিতে পারি না এবং বুঝাইতেও পারি না। এই রোহিণী এই গোবিন্দলালকে বালককাল হইতে দেখিতেছে—কখন তাহার প্রতি রোহিণীর চিত্ত আকৃষ্ট হয় নাই। আজি হঠাৎ কেন? জানি না। যাহা যাহা ঘটিয়াছিল তাহা তাহা বলিয়াছি। তাহাতে কি হয় না হয় আমি জানি না। যেমন ঘটিয়াছে আমি তেমনি লিখিতেছি।" মনস্তত্ত্বের দিক থেকে এই প্রেমের নিপুণ বিশ্লেষণ বঙ্কিমের ক্ষমতার অতীত ছিল না তবু তিনি সে প্রয়াস করেননি কারণ শিল্প ও বিজ্ঞানের স্ব স্ব অধিকার সম্বন্ধে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ সচেতন; সাহিত্যে তত্ত্বের আলোচনায় শিল্পের অবাধ আনন্দ ক্ষুণ্ণ হয় একথা তিনি নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করতেন। নিখিলমানবের প্রাথমিক হৃদয়বৃত্তি এই যৌনকামনাকে অতিমাত্রায় জাগ্রত ক'রে তুলতে গিয়ে হুইটম্যানের "The Children of Adam" কাব্যখানি রসাংশে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হ'য়েছে ব'লে মনে হয়। যৌনজীবনের আলেখ্য অঙ্কনে শিল্পের আপত্তি নেই—আপত্তি তার অঙ্গের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যবচ্ছেদে। গ্রীক ভাস্কর-ক্ষোদিত নগ্ন প্রতিমা যখন দেখি তার মধ্যে কুৎসিৎ কিছুই পাই না—সমগ্রের সুষমায় নগ্নতা সৌন্দর্য্যেরই হেতু হ'য়ে দাঁড়ায় কারণ সেখানে বিচ্ছিন্নতা নেই, আছে সমীকরণ।

সবশেষে একথা বলা যেতে পারে যে নৈতিক শব্দের অর্থ যদি হয় "আধ্যাত্মিক" তবে তা শিল্পের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রনাথের মতে মানুষের অধ্যাত্ম-প্রকৃতির অভিব্যক্তির নামই শিল্প। আমাদের সকল আশা, সব ভালবাসা, অন্তরের গভীরতম পিপাসা যখন রূপের দুয়ার দিয়ে প্রবেশ ক'রে আমাদেরকে অপরূপের রাজ্যে নিয়ে যায় তখনই আমরা ললিতকলার চরমতম অবদানকে পেয়ে কৃতার্থ হ'য়ে যাই—তখনই কবিকণ্ঠে বেজে ওঠে,

"ধায় যেন মোর সকল ভালবাসা
প্রভু তোমার পানে, তোমার পানে, তোমার পানে।"

শ্রীবিনায়ক সান্যাল



রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প

শ্রীযুক্ত নীহাররঞ্জন রায় এম্-এ, পি-আর-এস্

সত্য করিয়া বলিতে গেলে বাঙ্‌লাসাহিত্যে সর্ব্বপ্রথম ছোট গল্পের সৃষ্টিই করিলেন রবীন্দ্রনাথ; তাঁহার আগে আমাদের সাহিত্যে ছোটগল্প বলিয়া কিছু ছিল না, পরেও যে অসংখ্য ছোট গল্প রচিত হইয়াছে তাহার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলির সঙ্গে সমান পর্য্যায়ে স্থান দেওয়া যাইতে পারে, এমন গল্পের সংখ্যা খুব বেশি নয়। অথচ বাঙলা-সাহিত্যে ছোট গল্পের সংখ্যাদৈন্য কিছু আছে, এখন আর এমন কথা বলা চলে না। রবীন্দ্রনাথের আগে বাঙ্‌লা সাহিত্যে ছোট গল্পের সৃষ্টি যে কেন হয় নাই, একথা ভাবিলে একটু বিস্মিত না হইয়া উপায় নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা কখনো ছোট গল্প রচনার দিকে আকৃষ্ট হয় নাই বলিয়াই মনে হয়। পরিসরে অথবা আয়তনে ছোট, এমন দু'একটি গল্প তাঁহার আছে, কিন্তু ছোট গল্প বলিতে কথাসাহিত্যের যে বিশেষ প্রকাশটিকে বুঝি, বঙ্কিমচন্দ্রের এই গল্পগুলিকে সে পর্য্যায়ে ফেলিতে পারি না। স্বল্প পরিসরের মধ্যে জীবনের একটি ক্ষুদ্র তুচ্ছ খণ্ডাংশকে, কোনো একটি বিশেষ অভিব্যক্তিকে বা বাস্তবানুভূতিকে, দু'একটি ঘটনার আবর্ত্তে, ভাব ও কল্পনার দ্বন্দ্বে আন্দোলিত করিয়া তাহাকে স্বাভাবিক পরিণতি দান করা,—ছোট গল্পের এই যে সুকঠিন আর্ট, রবীন্দ্রপূর্ব্ব বাঙ্‌লা সাহিত্যে ইহার প্রকাশ নাই বলিলেই চলে। অথচ আমাদের বাঙ্‌লা দেশে কিছুদিন আগে পর্য্যন্তও শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সকলের পারিবারিক জীবনযাত্রার যে ধারা ছিল, তাহার মধ্যে বিশেষ করিয়া ছোট গল্পের উপাদানই ছিল বেশি। উপন্যাসের সুবৃহৎ জগতে তাহার প্রবেশাধিকার বড় ছিল না; জীবনের যে বৈচিত্র্য, ঘটনার যে তরঙ্গপর্য্যায়, যে চঞ্চল রসসমৃদ্ধ জীবনলীলা উপন্যাসের প্রাণ, সমস্যার যে বিচিত্র জটিলতা উপন্যাসের ঘটনাস্রোতকে আবর্ত্তে চঞ্চল ও ঘনীভূত করিয়া তোলে, আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে তাহার প্রসার খুব বেশী ছিল না। যাহা ছিল, তাহার দিকেও বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টি ও হৃদয় বেশী আকৃষ্ট হয় নাই, তাঁহার সাহিত্যসৃষ্টিতে সে পরিচয়ও খুব বেশী নাই। সেই জন্যই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার উপন্যাসের উপাদান খুঁজিয়াছেন আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের বাহিরে; আমাদের জীবনের মন্দগতি ও ধীরপ্রবাহ তাঁহার চিত্তে উপন্যাসের রোমান্স সঞ্চার করিতে পারে নাই। কি পল্লীতে কি নগরে আমাদের জীবনযাত্রা ছিল অত্যন্ত সরল ও সহজ যদিও আজ তাহা নানান্ কারণে জটিল হইতে জটিলতর হইতেছে; পারিবারিক আক্রোশ, সামাজিক দলাদলি যথেষ্টই ছিল; উইল চুরি লইয়া, অন্যান্য দুই চারি রকমের জটিলতর সামাজিক অথবা পারিবারিক ব্যাপার লইয়া হয় ত দ্বন্দ্ব আন্দোলন ইত্যাদিও হইত; এসব উপাদান লইয়া রবীন্দ্র-পূর্ব্ব বাঙ্‌লা সাহিত্যে গল্প-উপন্যাস কম রচিত হয় নাই। কিন্তু তাহার রকম ও বৈচিত্র্য খুব বেশী নাই, কিম্বা খুব উৎকৃষ্ট সাহিত্যসৃষ্টিও তাহা লইয়া হয় নাই। দুই একটি মাত্র উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত আছে, যেমন 'কৃষ্ণকান্তের উইল' 'স্বর্ণলতা'। কিন্তু আমাদের জীবনের বাহিরের এই সহজ ও স্থূলতগোচর দিক্‌টা ছাড়া আর একটি গোপন নিভৃত তুর্লভগোচর দিক্ আছে।—একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টি লইয়া, একটু সহানুভূতিসম্পন্ন হৃদয় লইয়া এই নিভৃত দিকটির দিকে তাকাইলে সহজেই দেখা যায় পরিবারে ও সমাজে আমাদের দৈনন্দিন জীবন অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিক্ষোভে আন্দোলিত, বিচিত্র দুঃখ-বেদনায় পীড়িত, সুখ ও আনন্দে উদ্বেলিত। প্রতিদিনের কর্ম্মকোলাহলে সহজে সেদিকে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় না, বৃহত্তর জগৎ ও জীবনের মুখরতার মধ্যে তাহার ক্ষীণ আহ্বান সহজেই বিলীন হইয়া যায়। কিন্তু বৃহত্তর জগৎ বলিতে আমাদের কিছু ছিল না,

তাহার মুখরতাও বাঙলাদেশে বহুদিন পর্য্যন্ত কিছু শোনা যায় নাই। বলিয়াছি, আমাদের জীবন এক সময় অত্যন্ত সংকীর্ণ ও স্বল্পপরিসর ছিল, এখনও যে তাহা নয় এমন বলা চলে না; কিন্তু সংকীর্ণ ও স্বল্পপরিসর ছিল বলিয়াই জীবনে আমাদের কোনো আশা আকাঙ্ক্ষা ছিল না, কোনো দুঃখ ও বেদনা-বোধ সুখ ও আনন্দানুভূতি ছিল না, এমন নয়। মানুষের মন ও হৃদয়ের যতকিছু বিচিত্র ভাব ও অনুভূতি তাহা আমাদের অন্তরের মধ্যে নানারূপে ও রসে চিত্রিত বর্ণে ও গন্ধে নন্দিত হইত; কিন্তু তাহা প্রকাশের কোনো পথ ছিল না। তাই তাহার স্বরূপ কাহারও জানা ছিল না, জীবনের এই দুর্লভগোচর দিক্‌টাকে জানিবার আগ্রহও ছিল না। জীবনের এই সব ক্ষুদ্র তুচ্ছ ঘটনা ও খণ্ডাংশ এবং তাহার তুচ্ছতর সুখ দুঃখ লইয়া সাহিত্য-সৃষ্টির প্রয়াস রবীন্দ্রপূর্ব্ব বাঙলা সাহিত্যে বড় একটা দেখা যায় না। অথচ ক্ষুদ্র এবং তুচ্ছ বলিয়াই, পরিসর ইহাদের কম বলিয়াই ইহাদের মধ্যে ছোট গল্পের উপাদানও বেশী করিয়াই ছিল।

রবীন্দ্রনাথই বাঙলা সাহিত্যে সর্ব্বপ্রথম আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের সংকীর্ণ ও অকিঞ্চিৎকর বহির্বিকাশের দিক্ হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া জীবনের তলদেশে যে নিভৃত ফল্গুধারাটী তাহা আমাদের দেখাইয়া দিলেন। দেখিলাম, সেখানে ঘরের কোণে নদীর ঘাটে, সহস্র তুচ্ছ পরিচিত স্থানে ও আবেষ্টনে কত সহস্র তুচ্ছ ঘটনা খুঁটিনাটি উপলক্ষ্য করিয়া আমাদের জীবনে বিচিত্র আশা সম্পদ্ অবিরত স্পন্দিত হইতেছে, অসংখ্য ক্ষুদ্র বিক্ষোভে আন্দোলিত হইতেছে। আমাদের দৈনন্দিন কার্য্যের মধ্যে সেখানে অপরূপ মাধুর্য্য সুগভীর ভাবরসে বিধৃত হইয়া আছে। আমাদের বৈচিত্র্যবিহীন ভাবজীবন সেখানে বৈচিত্র্যে ভরপুর, আবেগে চঞ্চল, সেখানে তাহার কোনো দৈন্য নাই কোনো অভাব নাই। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কবিচিত্তের অপূর্ব্ব সুগভীর সহানুভূতি ও সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি দিয়া আমাদের জীবনের এই নিভৃত গোপন প্রবাহটি আবিষ্কার করিয়া তাহাকে আপন ভাব ও কল্পনার রূপে ও রসে আমাদের সম্মুখে ধরিয়া দিলেন। আমরা একটি নূতন জগৎ ও জীবনের সন্ধান পাইয়া বিমুগ্ধ বিস্ময়ে চাহিয়া রহিলাম।

কিন্তু জীবনের এই গোপনপ্রবাহটি খুঁজিয়া পাওয়ার মধ্যে কবিগুরুর কোনো সজাগ চেষ্টা ছিল একথা যেন আমরা কখনো মনে না করি। রবীন্দ্রনাথ কবি, এবং তাঁহার কবিপ্রতিভা একান্তভাবে lyric বা গীতিকবিতার প্রতিভা। সরস সাবলীল গীতবহুল ছন্দের মধ্যে একটি অপূর্ব্ব সুর ফুটাইয়া তোলা একটি অনাহত ধ্বনি বাজাইয়া তোলাই গীতিকবিতার ধর্ম্ম; স্বল্পের মধ্যেই তাহা উচ্ছ্বসিত, যদিও তাহার অধিকাংশই অব্যক্ত, খণ্ডের মধ্যেই তাহার পূর্ণতা, যদিও তাহার রেশটুকু অশেষ। এক হিসাবে ইহাই রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পের ধর্ম্ম। রবীন্দ্রনাথের lyric-প্রতিভার সমৃদ্ধির তুলনা নাই, সেই অতুলনীয় সমৃদ্ধি লইয়া তিনি যখন আমাদের জীবনের দিকে তাকাইলেন বাঙলাদেশের সহজ অনাড়ম্বর জীবনপ্রবাহ যখন তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল, তখন সংকীর্ণ বৈচিত্র্যবিহীন জীবনের বহির্বিকাশ তাঁহার কবিচিত্তে রসানুভূতির সঞ্চার করিতে পারিল না; তাঁহার গীতমুগ্ধ মনকে সহজেই দোলা দিল জীবনের নিভৃত গোপন প্রবাহটি যেখানে জীবনের খণ্ডাংশের মধ্যেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার মধ্যেই দুঃখ ও বেদনার সুখ ও আনন্দের এক একটি সুর পূর্ণ ও উচ্ছ্বসিত হইয়া ফুটিয়া রহিয়াছে অথচ সেখানেই তাহা শেষ হইয়া যায় না অন্তরের মধ্যে তাহা গুঞ্জন করিয়া বাজিতে থাকে। এই জন্যই রবীন্দ্রনাথের বেশীর ভাগ ছোট গল্পই একান্তভাবে গীতিকবিতার ধর্ম্মলাভ করিয়াছে; চিত্তের একটা বিশেষ mood বা ভাব হইতেই তাঁহার বেশীর ভাগ গল্পগুলি অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছে। আমার মনে হয়, এক কথায় ইহাই বলা যায় যে, যে মনোধর্ম্ম, মনের যে বিশেষ দৃষ্টি রবীন্দ্রনাথের সৃজনীপ্রতিভাকে গীতধর্ম্মী করিয়াছে সেই মনোধর্ম্ম, সেই দৃষ্টিভঙ্গীই তাঁহাকে তাঁহার ছোট গল্পের উৎসেরও সন্ধান দিয়াছে। গল্পগুলির আলোচনার সময় ক্রমেই একথা আরো পরিষ্কার হইবে, কিন্তু পূর্ব্বাহ্ণেই বলিয়া রাখা ভালো যে রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প তাঁহার গীতিকবিতার আর একটি দিক; একটু আল্‌গা করিয়া বলিতে গেলে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে গীতিকবিতারই

রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পগুলির রচনা যে সময়টাতে

আরম্ভ হয়, এবং জীবনের যে পর্ব্বটিতে অধিকাংশ গল্পগুলি রচিত হয় সেই উদ্ভব ও বিকাশের সময়টির প্রতি একটু লক্ষ্য রাখিলে, তাঁহার ছোটগল্পের উৎসটিকে, ধর্ম্মটিকে, আরো ভালো করিয়া বুঝিতে পারিব। তাঁহার বেশীর ভাগ গল্প রচিত হইয়াছিল মোটামুটি ভাবে ১২৯৮ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া ১৩১০ সালের মধ্যে; অবশ্য তাহার পরেও আরো কয়েকটি সুপ্রসিদ্ধ গল্প ১৩১৪ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৩২৫ সালের মধ্যে লেখা হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার গল্পগুলির মূলধর্ম্মটি ঐ ১২৯৮—১৩১০ সালের রচনাগুলির মধ্যেই পাওয়া যায়। এই বারো বৎসরের একটি যুগ রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের স্বর্ণযুগ; দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, সৃষ্টি যেন বান ডাকিয়া আসিল। "সোনার তরী" হইতে আরম্ভ করিয়া "চিত্রা," "চৈতালি," "কাহিনী" "কল্পনা" "কথা" "ক্ষণিকা"র কবিজীবন একেবারে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। বিশেষ করিয়া "সোনার তরী" "চিত্রা" ও "চৈতালি"র কবিতাগুলিতে সমস্ত বিশ্বহৃদয়ের সঙ্গে কি সহজ ও আনন্দপূর্ণ তাঁহার যোগ; সকল কাজ, সকল অভিজ্ঞতার মধ্যে তাঁহার অপূর্ব্ব বিস্ময়কর সৌন্দর্য্যবোধ। অতি তুচ্ছতম জিনিসটিও তাঁহার দৃষ্টি এড়াইতেছে না: জলে যে হাঁসগুলি ভাসিয়া বেড়াইতেছে, নদীর চরে যে লোকটি বসিয়া বসিয়া বাঁখারি চাঁছিতেছে, গ্রামের যে মেয়েটি নদীর ঘাটে বসিয়া অঙ্গের বসন ফেলিয়া দিয়া গা ঘসিতেছে, সবই তাঁহার চোখে পড়িতেছে, সব কিছুর মধ্যেই তিনি অপরিসীম প্রেম ও সৌন্দর্য্যের বিকাশ দেখিতে পাইতেছেন, সকল জিনিষ মিলিয়া তাঁহার প্রাণে এক অপূর্ব্ব মায়ালোক সৃজন করিতেছে। সৃষ্টির প্রতি তাঁহার একটি অপূর্ব্ব ভালোবাসা একান্ত শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস এই সময়ে কবিজীবনের মধ্যে বারবার প্রকাশ পাইয়াছে। মনের যখন এই অবস্থা, জীবনের অতিতুচ্ছ খুঁটিনাটি জিনিষগুলি যখন তাঁহার নিকট অপূর্ব্ব বলিয়া মনে হইতেছে, নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ হইয়া যখন তিনি প্রকৃতির অতিতুচ্ছ সামান্য ব্যাপারটিকে অত্যন্ত রহস্যময় বলিয়া মনে করিয়া আকুল আগ্রহে তাহা উপভোগ করিতেছেন, তখন, মনের ঠিক এই পরম মাহেন্দ্রক্ষণটিতে তাঁহার ছোট গল্প রচনার সূত্রপাত হইল এবং দেখিতে দেখিতে সেই অবস্থার মধ্যেই তাঁহার অধিকাংশ গল্পগুলি রচিত ও প্রকাশিত হইয়া গেল।

সেই প্রকৃতির সঙ্গে পরিপূর্ণ একাত্মবোধ, জীবনের অতি তুচ্ছ ব্যাপারগুলিকেও পরম রমণীয় ও অপূর্ব্ব রহস্যময় বলিয়া অনুভব করা, তাহাদের প্রতি অপূর্ব্ব শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস, আপনাকে একান্ত ভাবে নির্লিপ্ত করিয়া দিয়া একমনে জীবনটিকে প্রকৃতির সকল অভিব্যক্তির মধ্য দিয়া উপভোগ করা - এসমস্তই তাঁহার ছোট গল্পগুলির মধ্যেও অপূর্ব্ব রসে অভিষিক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

শুধু তাঁহার কাব্যসৃষ্টি হইতেই নয়, কবির এই সময়কার জীবনযাত্রার প্রতি লক্ষ্য করিলেও তাঁহার ছোটগল্প রচনার উদ্ভবের সময়টি আমরা বুঝিতে পারিব এবং তাহাতে এই গল্পগুলির বিশেষ ধর্ম্মটি আরো সহজে আমাদের কাছে ধরা দিবে। 'পোষ্টমাষ্টারে'র মতন একটি সুপ্রসিদ্ধ গল্প ১২৯৮ সালে লেখা। এই সময়, বরং ইহার কিছুদিন আগে হইতেই কবি জমিদারী দেখাশুনার ভার লইয়াছেন, এবং তাঁহার দিনগুলি কাটিতেছে পূর্ব্ববাঙলার এক নদীর উপরে নৌকায় ভাসিয়া ভাসিয়া—সাজাদপুরে, শিলাইদহে। অপূর্ব্ব আনন্দময়, বৈচিত্র্যে ভরপুর এই সময়কার জীবনযাত্রা। বাঙ্গলাদেশের একটি নির্জ্জনপ্রান্ত তাহার নদীতীর, উন্মুক্ত আকাশ, বালুর চর, অবারিত মাঠ, ছায়াসুনিবিড় গ্রাম, সহজ অনাড়ম্বর পল্লীজীবন, দুঃখে পীড়িত অভাবে ক্লিষ্ট অথচ শান্ত সহিষ্ণু গ্রামবাসী, সব কিছুকে কবির চোখের সম্মুখে মেলিয়া ধরিয়াছে, আর কবি বিমুগ্ধ বিস্ময়ে পুলকে শ্রদ্ধায় ও বিশ্বাসে তাহার অপরিসীম সৌন্দর্য্য আকণ্ঠ পান করিতেছেন। এমনি করিয়াই ধীরে ধীরে বাঙলাদেশের পল্লীজীবনের সুখদুঃখের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইতে আরম্ভ করিল; গ্রামের পথঘাট, ছেলেমেয়ে যুবাবৃদ্ধ সকলকে তিনি একান্ত আপনজন বলিয়া জানিলেন। "ছিন্নপত্রে" এই সময়কার প্রত্যেকটি চিঠিতে কবি নিজেই বারবার এসব কথা বলিয়াছেন। পল্লীজীবনের এই সব নানান্ বেদনা আনন্দ যখন তাঁহার মনকে অধিকার করিয়া বসিল তখন তাঁহার ভাব ও কল্পনার মধ্যে আপনা-আপনি বিভিন্ন গল্প রূপ পাইতে আরম্ভ করিল, তুচ্ছ ক্ষুদ্র ঘটনা ও ব্যাপারকে লইয়া এই সব বিচিত্র সুখদুঃখ

অন্তরের মধ্যে মুকুলিত হইতে লাগিল। মানবজীবনের বিচিত্র ঘটনা প্রকৃতির ভাবময় আবেষ্টনের সঙ্গে এক হইয়া গেল। ইহারই প্রেরণা পাইয়া গল্প লিখিবার ইচ্ছা ক্রমেই প্রবল হইয়া উঠিল; এক-একদিন একটি ছোটখাট ঘটনার সূত্র ধরিয়া এক-একটা গল্প মনের মধ্যে জমিয়া উঠিল। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে জুন (বাংলা বোধ হয় ১৩০০ সাল হইবে) শিলাইদা হইতে একটি পত্রে তিনি লিখিতেছেন:—

"আজকাল মনে হচ্ছে, যদি আমি আর কিছুই না করে ছোট ছোট গল্প লিখ্‌তে বসি তাহ'লে কতকটা মনের সুখে থাকি, এবং কৃতকার্য্য হ'তে পারলে পাঁচজন পাঠকেরও মনের সুখের কারণ হওয়া যায়। গল্প লিখ্‌বার একটা সুখ এই, যাদের কথা লিখ্‌ব তারা আমার দিনরাত্রির অবসর একেবারে ভরে রেখে দেবে, আমার একলা মনের সঙ্গী হবে, বর্ষার সময় আমার বদ্ধঘরের সংকীর্ণতা দূর করবে এবং রৌদ্রের সময় পদ্মাতীরের উজ্জ্বল দৃশ্যের মধ্যে আমার চোখের পরে বেড়িয়ে বেড়াবে। আজ সকাল বেলায় তাই গিরিবালা নাম্নী উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ একটি ছোট অভিমানী মেয়েকে আমার কল্পনারাজ্যে অবতারণ করা গেছে।'

এই ভাবে এই দিনটিতে "মেঘ ও রৌদ্রে"র মতন একটি সুবিখ্যাত ছোটগল্পের সৃষ্টি হইল। এই ভাবেই, দুই বৎসর আগে (২৯ জুন ১৮৯২) সাজাদপুরের কুঠিতে একদিন গ্রামের পোষ্টমাষ্টারের আগমন উপলক্ষ্য করিয়া "পোষ্টমাষ্টার" গল্পটির সৃষ্টি হইল। "সমাপ্তি" গল্পের মৃন্ময়ী, "ছুটি" গল্পের ফটিক এরাও এই সময়কার সৃষ্টি।

"পোষ্টমাষ্টার" গল্পটি রবীন্দ্রনাথের প্রথমতম গল্পগুলির অন্যতম। আমি যে বলিয়াছি, রবীন্দ্রনাথের একশ্রেণীর গল্প-গুলি একান্তভাবে গীতধর্ম্মী, এই গল্পটি হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। একটি স্বজনহারা নিঃসহায় গ্রামবালিকার স্নেহলোলুপহৃদয় আসন্ন স্নেহবিচ্যুতির আশঙ্কায় কি সকরুণ অশ্রুসজল একটি ছায়াপাত করিয়াছে এই গল্পটির উপর। পড়া শেষ হইয়া গেলেও যেন অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত একটি ব্যথাভরা করুণ সুর মনের মধ্যে কান্নার সুরে বাজিতে থাকে। আর মনে হয়, এই সকরুণ সুরটির সঙ্গে যেন বর্ষণসিক্ত পৃথিবীর কান্নাও মিশিয়া গিয়াছে, কিছু যেন আর বলিবার নাই, শুধু ভারাক্রান্ত একটি হৃদয় লইয়া বাহিরের বর্ষণমুখর আকাশের দিকে মনটা তাকাইয়া থাকে। রবীন্দ্রনাথের এই গীতধর্ম্মী গল্পগুলির একটা প্রধান বিশেষত্ব এই যে কবির কল্পলোকের মানুষগুলি, তাহার ঘটনার আবেষ্টনটি, বাহিরের চতুর্দ্দিকের জগতের সঙ্গে, প্রকৃতির ছায়া-আলো-গন্ধ-বর্ণ-ধ্বনি ও ছন্দের সঙ্গে একান্তভাবে মিশিয়া যায়, এবং বিশ্বজগতের পারিপার্শ্বিক ভাবময় আবেষ্টনের সঙ্গে এক হইয়া গিয়া একটি সুরের জগৎ সৃষ্টি করে, আমার রবীন্দ্র-রসরসিক সাহিত্যিক বন্ধুর ভাষায়, "সকল ঘটনার একটি আকাশ সৃজন করে।*" এই পোষ্টমাষ্টার গল্পটি, এবং এই রকম বহুগল্পের মধ্যে এই বিশেষত্বটি চোখে না পড়িয়াই পারে না। স্বজন হইতে দূরে, এক নিভৃত পল্লীতে দরিদ্র পোষ্টমাষ্টারের জীবন প্রথম প্রথম প্রায় নির্ব্বাসন তুল্য বলিয়াই মনে হইত। মাঝে মাঝে একা-একা ঘরে বসিয়া বসিয়া একটি 'স্নেহপুত্তলি মানবমূর্ত্তি'র সঙ্গ তিনি কামনা করিতেন, নিজের ঘরের ছেলেমেয়েস্ত্রীর কথা তাঁহার মনে হইত। এই কামনাটুকু গল্পটিতে কি সুন্দর একটি সুরের রূপ লইয়াছে।

"একদিন বর্ষাকালের মেঘমুক্ত দ্বিপ্রহরে ঈষৎ তপ্ত সুকোমল বাতাস দিতেছিল; রৌদ্রে ভিজা ঘাস, এবং গাছপালা হইতে একপ্রকার গন্ধ উত্থিত হইতেছিল, মনে হইতেছিল যেন ক্লান্ত ধরণীর উষ্ণ নিঃশ্বাস গায়ের উপর আসিয়া লাগিতেছে, এবং কোথাকার এক নাছোড়বান্দা পাখী তাহার একটা একসুরের নালিশ সমস্ত দুপুরবেলা প্রকৃতির দরবারে অত্যন্ত করুণস্বরে বারবার আবৃত্তি করিতেছিল। পোষ্টমাষ্টারের হাতে কাজ ছিলনা—সেদিনকার বৃষ্টি-ধৌত মসৃণ চিক্কণ তরুপল্লবের হিল্লোল এবং পরাভূত বর্ষার ভগ্নাবশিষ্ট রৌদ্রশুভ্র স্তূপাকার মেঘস্তর বাস্তবিকই দেখিবার বিষয় ছিল; পোষ্টমাষ্টার তাহা দেখিতে-ছিলেন ও ভাবিতেছিলেন, এই সময় কাছে একটি কেহ নিতান্ত আপ-নার লোক থাকিত—হৃদয়ের সহিত একান্ত সংলগ্ন একটি স্নেহপুত্তলি মানবমূর্ত্তি! ক্রমে মনে হইতে লাগিল সেই পাখী ঐ কথাই বারবার বলিতেছে, এবং এই জনহীন তরুচ্ছায়ানিমগ্ন মধ্যাহ্নের পল্লব-মর্ম্মরের অর্থও কতকটা এইরূপ।"

এই গল্পটিতেই, বিদায় যখন ঘনাইয়া আসিল, রতন পোষ্টমাষ্টারের সম্মুখ হইতে এক দৌড়ে পলাইয়া গেল। আর ভূতপূর্ব্ব পোষ্টমাষ্টার ধীরে ধীরে নৌকার দিকে চলিলেন।

* ছিন্নপত্র—শ্রীসোমনাথ মৈত্র—বিচিত্রা, ১৩৩৬।

"এখন নৌকায় উঠিলেন এবং নৌকা ছাড়িয়া দিল—বর্ষাবিস্ফারিত নদী ধরণীর উচ্ছলিত অশ্রুরাশির মত চারিদিকে ছলছল করিতে লাগিল তখন হৃদয়ের মধ্যে অত্যন্ত একটা বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন, একটি সামান্য বালিকার করুণ মুখচ্ছবি যেন এক বিশ্বব্যাপী বৃহৎ অব্যক্ত মর্ম্মব্যথা প্রকাশ করিতে লাগিল। একবার নিতান্ত ইচ্ছা হইল ফিরিয়া যাই, জগতের ক্রোড়বিচ্যুত সেই অনাথিনীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসি, কিন্তু তখন পালে বাতাস পাইয়াছে, বর্ষার স্রোত খরবেগে বহিতেছে, গ্রাম অতিক্রম করিয়া নদীকূলের শ্মশান দেখা দিয়াছে,—এবং নদীপ্রবাহে ভাসমান পথিকের উদাস হৃদয়ে এই তত্ত্বের উদয় হইল, জীবনে এমন কত বিচ্ছেদ কত মৃত্যু আছে, ফিরিয়া ফল কি? পৃথিবীতে কে কাহার!"

এমনি করিয়া পোষ্টমাষ্টার ও রতনের দুঃখ একটা উদাস সকরুণ পরিসমাপ্তি লাভ করিল, এবং সেই অব্যক্ত মর্ম্মব্যথা যেন সমস্ত বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হইয়া একটি অপূর্ব্ব সুরের জগৎ সৃষ্টি করিল। এমনিতর সুরের জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে তাঁহার অনেকগুলি গল্পেই। "একরাত্রি" গল্পটিতে সেই যে ঝড়ের রাত্রে বানের রাত্রে একটি বিচ্ছেদ-ব্যথিত প্রাণী "মহাপ্রলয়ের তীরে দাঁড়াইয়া অনন্ত আনন্দের আস্বাদন" লাভ করিয়াছিল, যাহার সমস্ত ইহজীবনে "কেবল ক্ষণকালের জন্য একটি অনন্ত রাত্রির উদয় হইয়াছিল, সেই রাত্রিটি শুধু সেই ভাঙা স্কুলের সেকেণ্ড মাষ্টারের কাছেই তুচ্ছজীবনের একমাত্র চরম সার্থকতা" হইয়া রহিল না, তাহার জীবনের সমগ্র Tragedy-টুকুও একটা সুরের মধ্যে অপূর্ব্ব সার্থকতা লাভ করিল। "কাবুলিওয়ালা" গল্পটিতেও ইহার পরিচয় আছে। এই গল্পগুলিতে ঘটনা অথবা চরিত্রবাহুল্য বলিতে কিছুই নাই, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শুধু কেবল একটি সকরুণ অনুভূতির সুরের মধ্যেই গল্পের পরিসমাপ্তি হইয়াছে। সেই যে বিবাহের দিনে মিনির সঙ্গে রহমতের আলাপ আর জমিল না, মিনি চলিয়া গেলে হঠাৎ রহমৎ বুঝিতে পারিল আটবৎসর তাহার নিজের মেয়েটির সহিত দেখা হয় নাই, অর্থাভাবে দেশে যাওয়া হইয়া উঠে নাই, এখন হয়ত সেই মেয়েটি মিনিরই মতন বড় হইয়াছে, তাহার সঙ্গেও আবার নূতন করিয়া আলাপ করিতে হইবে, এই আটবৎসরে তাহার কি হইয়াছে কে জানে? এই যে স্নেহবঞ্চিত পিতৃহৃদয়ের সকরুণ একটি ব্যথা, এই ব্যথানুভূতির মধ্য দিয়া আফ-গানিস্থানবাসী রহমৎ চিরদিনের জন্য সকলের হৃদয়ে আসন পাইয়া গেল। সকাল বেলায় শরতের স্নিগ্ধ রৌদ্রকিরণে যখন শানাই বাজিতে লাগিল, আর রহমৎ যখন কলিকাতার এক গলির ভিতর বসিয়া আফগানিস্থানের এক মরুপর্ব্বতের দৃশ্য দেখিতে লাগিল, তখন সঙ্গে সঙ্গে আমাদের হৃদয়েও শানাইয়ের ভৈরবী রাগিণীটি অত্যন্ত করুণ সুরে বাজিতে লাগিল। রবীন্দ্রনাথের গল্পগুলির মধ্যে মানুষ ও ঘটনার সঙ্গে প্রকৃতির যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের, নিবিড় ঐক্যের পরিচয় আছে সে পরিচয় অনেক গল্পেই পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা একটি পরিপূর্ণ গীতিকবিতার রূপ ধারণ করিয়াছে 'সুভা' গল্পে মূক বালিকার সহিত মূক প্রকৃতির নিবিড় ঐক্য সম্বন্ধের মধ্যে। নানান্ কার্য্যে ও ব্যবহারে, অদ্ভুত সরস ও সহজ বর্ণনার সাহায্যে মানবচরিত্র বিশ্লেষণ করিবার ক্ষমতা অনেক লেখকের মধ্যেই দেখা যায়, কিন্তু অপূর্ব্ব শিল্পকুশলী রবীন্দ্রনাথ যেমন করিয়া মনের বিভিন্ন বিচিত্র ভাব ও চিন্তা-ধারার সঙ্গে বিশ্বজগতের বিচিত্র প্রকাশের নিবিড় ভাবগত ঐক্যের সৃষ্টি করেন, এবং তাহার ফলে তাঁহার এক একটি গল্প যেমন করিয়া কল্পলোকের স্বপ্ন ও সঙ্গীত-মাধুর্য্যের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে, তেমন সৃষ্টি, তেমন প্রকাশ, আর কাহারো মধ্যে দেখিয়াছি বলিয়া আমার মনে হয়না। "মহামায়া" গল্পটিতে আমার এই কথার খুব সুন্দর দৃষ্টান্ত আছে। "মহামায়া" তাহার দীপ্ত চরিত্র লইয়া এক দুর্ভেদ্য অবগুণ্ঠনের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া রাজীবের নিকটে আপনাকে রহস্যময়ী করিয়া তুলিয়াছে; রাজীব তাহার নাগাল্ পায়না, "কেবল একটা মায়াগণ্ডীর বাহিরে বসিয়া অতৃপ্ত তৃষিত হৃদয়ে এই সূক্ষ্ম অথচ অটল রহস্য ভেদ করিবার চেষ্টা করিতেছে।" এমন সময়

"একদিন বর্ষাকালে শুক্লপক্ষ দশমীর রাত্রে প্রথম মেঘ কাটিয়া চাঁদ দেখা দিল। নিস্পন্দ জ্যোৎস্নারাত্রি সুপ্ত পৃথিবীর শিয়রে জাগিয়া বসিয়া রহিল। সেরাত্রে নিদ্রাত্যাগ করিয়া রাজীবও আপনার জানালায় বসিয়া ছিল। গ্রীষ্মক্লিষ্ট বন হইতে একটা গন্ধ এবং ঝিল্লির শান্তরব তাহার ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিতেছিল, অন্ধকার তরুশ্রেণীর প্রান্তে শান্ত সরোবর একখানি মার্জ্জিত রূপার পাতের ন্যায়

ঝকমক্ করিতেছে। মানুষ এরকম সময় স্পষ্ট একটা কোনো কথা ভাবে কিনা বলা শক্ত। কেবল তাহার সমস্ত অন্তঃকরণ একটা কোনো দিকে প্রবাহিত হইতে থাকে বনের মতো একটা গন্ধোচ্ছ্বাস দেয়, রাত্রির মতো একটা ঝিল্লিধ্বনি করে। রাজীব কি ভাবিল জানিনা, কিন্তু তাহার মনে হইল আজ যেন সমস্ত পূর্ব্ব নিয়ম ভাঙিয়া গিয়াছে। আজ বর্ষারাত্রি তাহার মেঘাবরণ খুলিয়া ফেলিয়াছে, এবং আজিকার এই নিশীথিনীকে মহামায়ার মতো নিস্তব্ধ সুন্দর এবং সুগম্ভীর দেখাইতেছে। তাহার সমস্ত অস্তিত্ব সেই মহামায়ার দিকে একযোগে ধাবিত হইল।"

তারপর কি করিয়া রাজীবের রহস্য টুটিয়া গেল, মহামায়া একটি মাত্র উত্তর না দিয়া এক মুহূর্ত্তের জন্য পশ্চাতে না ফিরিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, আর তাহার সেই "ক্ষমাহীন চিরবিদায়ের ক্রোধানল রাজীবের সমস্ত ইহজীবনে একটি দগ্ধচিহ্ন রাখিয়া দিয়া গেল" তাহা ত সকলেই জানেন। সমস্ত গল্পটির মধ্যে একটি অপূর্ব্ব রহস্য কি সুন্দর ভয়ঙ্কররূপে ঘনীভূত হইয়া উঠিয়া কিরূপে নিবিড়তর বিদায়রহস্যের মধ্যে পরিসমাপ্তি লাভ করিল, ভাবিলে সত্যই বিস্মিত হইতে হয়। ইহার মধ্যে যে শুধু একটা সবল কল্পনা-শক্তির পরিচয় আছে তাহা নহে, একটা খুব বড় Idealism এর স্পর্শও সমস্ত রহস্যটিকে একটি অপূর্ব্ব অভিব্যক্তি দান করিয়াছে। কিন্তু এই যে গল্পের ঘটনা বর্ণনা ও চরিত্রচিত্রণের ফাঁকে ফাঁকে প্রকৃতির সঙ্গে একটা নিবিড় ঐক্যের সৃষ্টি করা, ইহা রবীন্দ্রনাথের গল্পগুলির একটা বিশেষ কলাকৌশল, এবং ইহার effectটুকুও অতি চমৎকার। সর্ব্বত্রই আমি লক্ষ্য করিয়াছি, এবং উপরে যে দুই তিনটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছি তাহা হইতে পাঠকমাত্রেই লক্ষ্য করিতে পারিবেন যে এই বিশেষ কৌশলটি অবলম্বনের ফলে প্রায় প্রত্যেকটি গল্পেরই ঘটনা ও চরিত্র একটি sublimity বা ভাবগাম্ভীর্য্য, একটি অপূর্ব্ব প্রশান্তি লাভ করিয়াছে।

কিন্তু এই কৌশলটি রবীন্দ্রনাথ সজ্ঞানে (consciously) আয়ত্ত করিয়াছেন একথা যেন কেহ মনে না করেন। ইহা তাঁহার কবিচিত্তের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীরই ফল; মানুষকে, মানবজীবনের বিচিত্র ঘটনা ও প্রকাশকে প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত করিয়া দেখা তাঁহার কবিহৃদয়ের ধর্ম্ম, ইহাই তাঁহার অদ্ভুত Idealism—যে Idealism এর স্পর্শে পৃথিবীর ধূলামাটি আমাদের ব্যক্তিগত পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের যাহা কিছু তুচ্ছ, ক্ষুদ্র, দুঃখবেদনায় ব্যথিত, সমস্তই সোনা হইয়া গিয়াছে; অপূর্ব্ব রূপে ও রসে অভিষিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার এই Idealism এর স্পর্শে, যে বস্তু লইয়া তাঁহার কারবার, সেই বস্তুরই রূপ অনেক সময় একেবারে বদ্‌লাইয়া গিয়াছে, তাহাকে দেখিয়া আর চেনা যায় না। বরং মনে হয়, কবি বস্তুর যে রূপ আমাদের দেখাইলেন সেইরূপই তাহার সত্যরূপ। ব্যক্তিবিশেষের দুঃখকে, কোনো সবিশেষ ঘটনাসংশ্লিষ্ট বেদনাকে সকলের দুঃখ সকলের বেদনার মধ্যে পরিব্যাপ্ত করিয়া দিয়াছেন, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহাকে একটা অচঞ্চল অবসানের মধ্যে ডুবাইয়া দিয়াছেন, কোনো ক্ষুব্ধভাব কোনো বিক্ষোভের মধ্যে তাহার সমাপ্তিটুকু আন্দোলিত হইতে দেন নাই। তিনি তাঁহার চরিত্র ও ঘটনাবস্তুগুলিকে পৃথিবীর ধূলামাটির সঙ্গে সৃষ্টির এক পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া দেখিয়াছেন, এবং মানুষের দুঃখকে বেদনাকে সুখকে শান্তিকে সৃষ্টির সকল বস্তুর দুঃখ ও বেদনা সুখ ও শান্তি বলিয়া মনে করিয়াছেন। আগে যে 'কাবুলি-ওয়ালা', 'পোষ্টমাষ্টার' ও 'মহামায়া' গল্পের উল্লেখ করিয়াছি তাহাতেই এই কথার ভালো প্রমাণ আছে, কিন্তু সব চেয়ে সুন্দর প্রমাণ আছে 'অতিথি' গল্পটিতে। কিশোর তারাপদ কোথাও স্থির হইয়া থাকে না, কাহারো নিবিড়বন্ধনে বাধা পড়ে না; মতি বাবু অন্নপূর্ণা অথবা চারু কাহারো স্নেহপ্রেম বন্ধুত্বের মধ্যেও সে শেষ পর্য্যন্ত বাঁধা পড়িল না। তাহার চলিষ্ণু চিত্ত একদিন 'বর্ষার মেঘ-অন্ধকার রাত্রে আসক্তি-বিহীন উদাসীন জননী বিশ্বপৃথিবীর নিকট চলিয়া গেল। এই সমস্ত স্নেহবন্ধন উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যাইবার ব্যাপারটির সঙ্গে যে দুঃখবেদনা জড়িত হইয়া আছে, যে tragdyর আভাস আছে, তাহাকে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কল্পিত ঘটনাবস্তু ও ব্যক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিলেন না, তাঁহার স্বাভাবিক Idealism-বিহারী মন এই চলিয়া যাইবার ব্যাপারটিকে সমস্ত বিশ্বসংসারের সঙ্গে যুক্ত করিয়া দিল।

"দেখিতে দেখিতে পূর্ব্বদিগন্ত হইতে ঘন মেঘরাশি প্রকাণ্ড কালো পাল তুলিয়া দিয়া আকাশের মাঝখানে উঠিয়া পড়িল, চাঁদ আচ্ছন্ন হইল, পূবে

বাতাস বেগে বহিতে লাগিল ; মেঘের পশ্চাতে মেঘ ফুলিয়া উঠিল, নদীর জল খল খল হাস্যে স্ফীত হইয়া উঠিতে লাগিল , নদীতীরবর্ত্তী আন্দোলিত বনশ্রেণীর মধ্যে অন্ধকার পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিল, ভেক ডাকিতে আরম্ভ করিল, ঝিল্লিধ্বনি যেন করাত দিয়া অন্ধকারকে চিরিতে লাগিল,—সম্মুখে আজ যেন সমস্ত জগতের রথযাত্রা, চাকা ঘুরিতেছে, ধ্বজা উড়িতেছে, পৃথিবী কাঁপিতেছে , মেঘ উড়িয়াছে, বাতাস ছুটিয়াছে, নদী বহিয়াছে, নৌকা চলিয়াছে ।"

এই দ্রুত চলমান চরাচরের মধ্যে কিশোর তারাপদই বা স্থির হইয়া থাকিবে কেন ? ইহাই রবীন্দ্রনাথের কল্পনা, তাঁহার Idealism এর পরশমণি, যাঁহার ছোঁয়ায় সকল বস্তু এক অখণ্ড রসপরিণামের মধ্যে সমাপ্তি লাভ করিয়াছে। বস্তুকে লইয়াই তাঁহার প্রত্যেক সৃষ্টির সূত্রপাত, কিন্তু তাঁহার কল্পনা বস্তুকে ছাড়াইয়া রসের ঊর্দ্ধলোকে উঠিয়া গিয়া শাশ্বত ভাবলোকের মধ্যেই আত্মবিসর্জন করিয়াছে। ইহাই তাঁহার প্রতিভার মূলকথা, এবং প্রতিভার এই অপূর্ব্বশক্তি আছে বলিয়াই তিনি কবিকুলগুরু।

যে Idealismএর কথা এইমাত্র বলিলাম তাহার স্পর্শ 'দুরাশা' গল্পটিতেও একটি সুরাবেগের সঞ্চার করিয়াছে। এই গল্পটির স্বল্প পরিসরের মধ্যে ঘটনাবাহুল্য প্রচুর, তাহার বৈচিত্র্যও কম নয় ; কিন্তু বস্তুত গল্পটি দুর্ব্বার অজেয় প্রেমের একটি প্রশস্তি মাত্র। একটি সুর যেন প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত স্পন্দিত, শুধু মাঝে মাঝে বাধা পাইয়া যেন আরো দ্বিগুণবেগে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে। নিয়তসংযত শুদ্ধাচারী একটি ব্রাহ্মণের গৌরবর্ণ ধূমলেশহীন জ্যোতিঃশিখার মতন সু-উন্নত দেহ ও তাঁহার দৃপ্ত ব্রাহ্মণ্যের গর্ব্ব এক নবাবপুত্রী মুসলমান দুহিতার মুগ্ধ হৃদয়কে শ্রদ্ধায় ও প্রেমে বিনম্র করিয়া তুলিল। সেই দুর্ব্বার প্রেমে ষোড়শী নবাবপুত্রীর হৃদয়কে শ্রদ্ধায় ও প্রেমে বিনম্র করিয়া তুলিল। সেই দুর্ব্বার প্রেমে ষোড়শী নবাবপুত্রী অন্তঃপুর ছাড়িয়া বাহির হইল ; এবং বাহির হইয়া প্রথমেই তাহার সংসার-দেবতার নিকট হইতে অত্যন্ত নিষ্ঠুর নিষ্করুণ সম্ভাষণ প্রাপ্ত হইল। কিন্তু প্রেম কিছুতেই পরাজয় মানিল না।

"মুহূর্তের মধ্যে সংজ্ঞালাভ করিয়া কঠোর কঠিন নিষ্ঠুর নির্বিকার পবিত্র ব্রাহ্মণের পদতলে দূর হইতে প্রণাম করিলাম—মনে মনে কহিলাম, হে ব্রাহ্মণ ! তুমি হীনের সেবা, পরের অন্ন, ধনীর দান, যুবতীর যৌবন, রমণীর প্রেম, কিছুই গ্রহণ কর না ; তুমি স্বতন্ত্র, তুমি একাকী, তুমি নির্লিপ্ত, তুমি সুদূর, তোমার নিকট আত্মসমর্পণ করিবার অধিকারও আমার নাই।"

কিন্তু নবাবপুত্রীর প্রেম ব্রাহ্মণের মনে কোনো ভাবান্তর আনিল না ; নীরবে সেই ব্রাহ্মণ মুসলমান দুহিতার সেই পবিত্র প্রেম প্রত্যাখ্যান করিয়া চলিয়া গেল। তারপর সেই নবাবদুহিতার সুকঠিন কৃচ্ছ সাধন আরম্ভ হইল। একদিকে সেই ব্রাহ্মণকে খুঁজিয়া বাহির করিবার আকুলপ্রয়াস, আর একদিকে নিজের আজন্ম মুসলমান সংস্কার দূর করিয়া আপনাকে একান্ত করিয়া ব্রাহ্মণ করিয়া তুলিবার অপূর্ব্ব চেষ্টা। দুর্জ্জয় দুর্ব্বার প্রেমের কাছে কিছুই আর অসম্ভব রহিল না ; সে সমস্ত পূর্ব্বসংস্কার ধীরে ধীরে বিসর্জন দিল, সংস্কৃত শিখিল, ভক্তিভরে ব্রাহ্মণের সমস্ত শাস্ত্রপাঠ করিল। ত্রিশবৎসরের চেষ্টায় সে অন্তরে বাহিরে আচারে ব্যবহারে কায়মনোবাক্যে ব্রাহ্মণ হইল।

"আমি মনে মনে আমার সেই যৌবনারম্ভের প্রথম ব্রাহ্মণ, আমার যৌবনশেষের শেষ ব্রাহ্মণ, আমার ত্রিভুবনের এক ব্রাহ্মণের পদতলে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্কোচে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া একটি অপরূপ দীপ্তি লাভ করিলাম।"

এইভাবে সে যখন দেহে এবং মনে প্রতিদিন ও প্রতি-মুহূর্ত্তে তাহার আরাধ্য দেবতার নিকটবর্ত্তী হইতেছে, সে যখন ভাবিতেছে তাহার তরী তীরে আসিয়া পৌছিয়াছে, তাহার জীবনের পরমতীর্থ অনতিদূরে তখন তাহার তরী হঠাৎ ডুবিয়া গেল। পরমতীর্থ ধূলিসাৎ হইয়া গেল। সে দেখিল

"বৃদ্ধ কেশরলাল, তাহার আযৌবনপূজিত ব্রাহ্মণ, ভুটিয়া পল্লীতে ভুটিয়া স্ত্রী এবং তাহার গর্ভজাত পৌত্রপৌত্রী লইয়া ম্লানবস্ত্রে মলিন অঙ্গনে ভুট্টা হইতে শস্য সংগ্রহ করিতেছে।"

সে বুঝিল, যে-ব্রাহ্মণ্য তাহার কিশোর হৃদয় হরণ করিয়া লইয়াছিল তাহা অভ্যাস তাহা সংস্কার মাত্র ! যে-ব্রাহ্মণ্যের পদতলে সে তাহার সমস্ত জীবন ও যৌবন বিসর্জন দিয়াছে, চরম নিষ্করুণ ব্যর্থতা লইয়া সেই জীর্ণভিত্তি ধূলিশায়ী ভগ্ন

ব্রহ্মণ্যের নিকট সে তাহার শেষ বিদায় গ্রহণ করিল। একটি অপূর্ব্ব উর্দ্ধশিখ প্রেমের জ্যোতি যেন হঠাৎ এক ফুৎকারে নিবিয়া গেল। সমস্ত গল্পটী যেন একটি মেঘাচ্ছন্ন কাহিনী, একটি দৃপ্ত সুগম্ভীর রাগিণী একটি পরম ব্যথার মধ্যে আত্মবিসর্জ্জিত, একটি গভীর অচঞ্চল আবেগ যেন হঠাৎ মরুমরীচিকার মধ্যে ক্রন্দনরত।

এই ধর্ম্ম শুধু তাঁহার সাধনার যুগে লিখিত সেই পদ্মাচরের মাধুর্য্যপূর্ণ জীবনযাত্রার মধ্যে লিখিত গল্পগুলির মধ্যেই আবদ্ধ নয়। বহুদিন পরে লিখিত কয়েকটি গল্পের মধ্যেও এই পরিচয় সহজেই পাওয়া যায়। ১৩২১ সালে আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসে লিখিত দুইটি গল্প হইতে এই সুরধর্ম্মের পরিচয় লওয়া যাক্। 'শেষের রাত্রি' গল্পটিতে ঘটনা বা চরিত্র-চিত্রণ বলিতে কিছুই নাই, শুধু মাসির স্নেহ-দুর্ব্বল শঙ্কিত চরিত্রটি একটি অপরূপ মাধুর্য্যে ফুটিয়াছে। যতীন্ নিজের মনে নারীদেবতার একটি পীঠস্থানে তাহার স্ত্রী মণিকে বসাইয়া রাত্রিদিন তাহার প্রেমের পূজা নিবেদন করিতেছে, মণি ফিরিয়াও তাকায় না, বেদনায় যতীনের মন ভরিয়া ওঠে। কিন্তু তাহার আশা পরাভব মানে না, প্রতিমুহূর্ত্তে প্রত্যেক ব্যাপারে সে আত্ম-প্রতারিত; আর মণি যে তাহাকে দূরে রাখিয়াই চলে, একথা জানিলে যতীন্ দুঃখ পায় মাসি তাহা জানেন বলিয়া তিনিও মণির মিথ্যা পরিচয়ে যতীনকে প্রতারণা করেন। কিন্তু মৃত্যুপথযাত্রী যতীনের এই আত্মপ্রতারণার মিথ্যা আবরণ প্রায় খসিয়া পড়িতে চলিয়াছে। সেই চরম ক্ষণে সেই রোগবিকারের মধ্যেও যতীন্ তাহার স্খলিতপ্রায় প্রেমের ছদ্মাবরণটি প্রাণপণে আঁকড়াইয়া ধরিতে চাহিতেছে। কি সকরুণ দীর্ঘনিঃশ্বাস-ক্ষুব্ধ এই মিথ্যা প্রয়াস। সমস্ত গল্পটির মধ্যে, বিশেষ করিয়া তার পরিসমাপ্তির মধ্যে, আশায় উর্দ্ধশিখ প্রেমের নিষ্ঠুর ব্যর্থতার একটি করুণ চাপা কান্নার সুর, দুঃখের দুর্ব্বল ব্যথার অস্ফুট একটি রাগিণী কি নিবিড় স্পন্দনের মধ্যে অবিরত আহত! ইহার কয়েকদিন পরে লেখা 'অপরিচিতা' গল্পটিও যেন একটি গানের উচ্ছ্বসিত সুরে বাঁধা। গল্পটির প্রথম পর্ব্বের মধ্যে বিশেষ কিছু নাই—বিবাহের দেনাপাওনা লইয়া আমাদের সমাজে অহর্নিশ যা ঘটিয়া থাকে তারই একটি চিত্র। অবশ্য উহাতে হইতে-পারিত-শ্বশুর শম্ভুনাথের শান্ত অথচ তেজোদৃপ্ত চরিত্রের পরিচয়ের মধ্যে এবং পরে ট্রেণে কল্যাণীর সহজ অথচ দৃপ্ত উজ্জ্বল ব্যবহারের মধ্যে বেশ একটু নৈপুণ্য আছে, সমাজে ইহা নূতনও বটে। কিন্তু গল্পটি তাহার গানের রূপ লাভ করিয়াছে শেষের পর্ব্বে; এবং সেই গানের একটি মাত্র ধুয়া, তাহা সেই অপরিচিতার অন্তরতম অনির্ব্বচনীয় কণ্ঠের একটি মাত্র শব্দ, "জায়গা আছে।" কি করিয়া ঘটনাচক্রে চারিবৎসর পরে এক রেলোয়ে ষ্টেশনে সাতাশ বৎসরের যুবকের সঙ্গে সেই অপরিচিতার দেখা হইয়া গেল, কি করিয়া তাহার মনের মধ্যে সেই অপরিচিতা একটি অখণ্ড আনন্দের মূর্ত্তি ধরিয়া, একটি সুরের রূপ ধরিয়া জাগিয়া উঠিল, কি করিয়া উভয়ের পরিচয় লাভ ঘটিল, কিন্তু তারপরেও দুইজনে কেমন করিয়া আবার মিলনের মধ্যেই বিচ্ছেদকে বরণ করিয়া লইল, গল্পের মধ্যেই তাহার সবিশেষ পরিচয় আছে। কল্যাণী বিবাহে রাজী হইল না, মেয়েদের শিক্ষার ব্রত গ্রহণ করিল।

> "কিন্তু আমি আশা ছাড়িতে পারিলাম না। সেই সুরটি যে আমার হৃদয়ের মধ্যে আজো বাজিতেছে। আর সেই যে রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে আমার কানে আসিয়াছিল, "জায়গা আছে", সে যে আমার চিরজীবনের গানের ধুয়া হইয়া রহিল। তখন আমার বয়স ছিল তেইশ, এখন হইয়াছে সাতাশ।… তোমরা মনে করিতেছ, আমি বিবাহের আশা করি না, কোনোকালেই না। আমার মনে আছে, কেবল সেই একরাত্রির অজানা কণ্ঠের মধুর সুরের আশা—"জায়গা আছে।" নিশ্চয়ই আছে। নইলে দাঁড়াব কোথায়? তাই বৎসরের পর বৎসর যায়,—আমি এইখানেই আছি। …ওগো অপরিচিতা, তোমার পরিচয়ের শেষ হইল না, শেষ হইবে না, কিন্তু ভাগ্য আমার ভালো এইতো আমি জায়গা পাইয়াছি।"

বাস্তব জীবনে কি হয় জানিনা, হয়ত সেখানে সমস্ত জীবন অন্যরকম সমাপ্তিলাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হয়। কিন্তু যে Idealism এই গল্পটিতে প্রকাশ পাইয়াছে, সাহিত্যে তাহার মূল্য যে আছে, এই গল্পটিই তাহার প্রমাণ। গল্পের এমন গীতিমাধুর্য্য, এমন অপূর্ব্ব রসপরিণতি এমন অপরূপ সুরসমাপ্তি আমি অন্য কোনো ছোটগল্পের মধ্যে দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না।

একান্তভাবে গীতধর্ম্মী গল্পগুলি ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের

একশ্রেণীর কয়েকটা বিশেষ গল্প আছে, যাহার মধ্যেও এই সুরধর্ম্মই বিশেষ ভাবে অভিব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে। এই গল্পগুলিতেও প্লট বা আখ্যানভাগ বলিতে কিছুই নাই; থাকিলেও তাহার মূল্য খুব বেশী কিছু নয়; সমস্ত কাহিনীটিকে, আখ্যানভাগটিকে ছাড়াইয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে মনের একটা বিশেষ mood, মানসিক বিকৃতির একটা অপূর্ব্ব গীতময় প্রকাশ; অন্ততঃ "নিশীথে" ও "ক্ষুধিত পাষাণ" গল্পে এই গীতিধর্ম্মই সব কিছুকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে। উপাদান বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে এই গল্পগুলির একটা বৈশিষ্ট্য সহজেই চোখে পড়ে। এবং সেইদিক হইতে আলোচনা করিয়া বিদগ্ধ সমালোচক অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই গল্পগুলিকে একটি বিশেষ পর্য্যায়ভুক্ত করিয়াছেন। আমাদের প্রতিদিনের বাস্তবজীবনের মধ্যে অতীন্দ্রিয় অতি-প্রাকৃত ভৌতিক রহস্যের আবির্ভাব ও অভিব্যক্তিই সেই উপাদান। শ্রীকুমার বাবু এই উপাদান লইয়া রচিত গল্পগুলির খুব চমৎকার আলোচনা করিয়াছেন, বলিয়াছেন,—

"সাধারণ বাঙ্গালীজীবনের সহিত অতি-প্রাকৃতের সংযোগ সাধন একদিক দিয়া বিশেষ সহজ, অপর দিক দিয়া বিশেষ আয়াসসাধ্য। সহজ এই জন্য যে, আমাদের মধ্যে এখনও কতকগুলি বিশ্বাস ও সংস্কার সজীব ভাবে বর্ত্তমান আছে, যাহাদের অতি প্রাকৃতের প্রতি একটা স্বাভাবিক প্রবণতা আছে। আবার অন্য দিকে, আমাদের সাধারণ জীবন এতই বিশেষত্বহীন ও ঘটনাবিরল, যে ইহার মধ্যে মনোবিজ্ঞানসম্মত উপায়ের দ্বারা অতি-প্রাকৃতের অবতারণা নিতান্ত দুরূহ। রবীন্দ্রনাথের গল্পমধ্যে উভয়বিধ গল্পেরই উদাহরণ মিলে।"

কিন্তু উপাদান লইয়া সাহিত্য নয়, উপাদান বিশ্লেষণ দ্বারা সাহিত্য-সৃষ্টিকে ভোগও করিতে পারি না। আমি বুঝিতে চাই লেখকের মনের সেই বিশেষ ধর্ম্মটীকে, তাঁহার বিশেষ ভঙ্গিটিকে যাহার সহায়তায় সেই উপাদান একটা রসময় ভাষারূপ লাভ করে। সেইদিক হইতে দেখিলে এই ধরণের গল্পগুলিকে একটি বিশেষ পর্য্যায়ভুক্ত করিবার কারণ কিছু নাই; কারণ যে সুরধর্ম্ম যে কল্পনার ঐশ্বর্য্য রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য গল্পে এ পর্য্যন্ত আমরা দেখিলাম, অতি-প্রাকৃত ভৌতিক রহস্যাবৃত এই গল্পগুলিতেও সেই সুরধর্ম্ম, সেই কল্পনার ঐশ্বর্য্যই বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। শুধু তাহাই নয়; ইহার উপরে কলাকৌশলের দিক্ হইতেও রবীন্দ্রনাথের একটা বৈশিষ্ট্য এই গল্পগুলিতে সহজে লক্ষ্য করা যায়। শ্রীকুমারবাবু সত্যই বলিয়াছেন, বাস্তবজীবনের সহিত অতি-প্রাকৃতের সমন্বয়-সাধন অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার, তিনি দেখাইয়াছেন, এ বিষয়ে ইংরেজী সাহিত্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পী কোলরিজকেও—

"অতি প্রাকৃতের উপযুক্ত ক্ষেত্র রচনা করিতে অনেক প্রয়াস পাইতে হইয়াছে,—নৈসর্গিকের সীমা লঙ্ঘন করিতে হইয়াছে, শরীরী প্রেতের আবির্ভাব ঘটাইতে হইয়াছে। যে প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে তাঁহাকে এই অনৈসর্গিকের অবতারণা করিতে হইয়াছে তাহাতেও অজ্ঞাত অপরিচিতের সুদূর রহস্য মাখানো । পরিচিতজগতের মধ্যে আসিয়া তাঁহাকে মায়া-তরী ডুবাইতে হইয়াছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আশ্চর্য্য কুহকবলে আমাদের অতিপরিচিত গৃহাঙ্গনের মধ্যেই অতিপ্রাকৃতকে আহ্বান করিয়া আনিয়াছেন এবং নৈসর্গিকের সীমা ছাড়াইয়া এক পদও অগ্রসর হন নাই।

এই ধরণের গল্প রবীন্দ্রনাথের খুব বেশী নাই। গল্পরচনার আদিপর্ব্বে লেখা 'সম্পত্তিসমর্পণ' ও কয়েক বৎসর পরে লেখা "গুপ্তধন" গল্পদুটী নিতান্তই আমাদের সহজ ভৌতিক বিশ্বাসকে অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। তাহার মধ্যে বিশেষ কোন কলাকৌশল, কল্পনার কোনো সমৃদ্ধি প্রকাশ পায় নাই; শুধু গল্প বলিবার জন্যই যেন এই গল্পগুলির রচনা, রসসৃষ্টির কোনো প্রয়াস এই গল্পগুলির মধ্যে নাই, ইহাদের মধ্যে অতীন্দ্রিয় অনৈসর্গিকের রহস্য কিছু নিবিড় হইয়া উঠিয়া মনের মধ্যে মায়াজালের সৃষ্টি করে না। "কঙ্কাল" গল্পটিতে এই মায়াজাল-সৃষ্টির প্রয়াস তবু কতকটা দেখা যায়, কিন্তু তাহাও একটা রূপযৌবনগর্ব্বিতা প্রেমমুগ্ধা মৃতানারীর বিগতজীবনের কাহিনীমাত্র। যে মৃতানারী এক সুষুপ্ত যুবকের মস্তিষ্ক বিকৃতির মধ্যে আবির্ভূত হইয়া এই কাহিনী যুবককে শুনাইতেছে, তাহার কথাবার্ত্তায়, হাসিতে, ইঙ্গিতে মৃত্যুলোকের সেই সুগভীর uncanny ও অতীন্দ্রিয় রহস্য নিবিড় হইয়া ফুটিয়া উঠে নাই। 'জীবিত ও মৃত' গল্পটিও কতকটা এইরূপ, যদিও সেখানে কাদম্বিনীর মনোবিকারের কাহিনীটুকু একটু জটিল ও অদ্ভুত। লেখকের

কল্পনা কাদম্বিনীর মানসিক বিকৃতির স্বরূপটিকে আবিষ্কার করিয়াছে সত্য, কিন্তু খানিকটা অসাধারণ বলিয়াই হোক্ বা অন্য যে কোন কারণেই হোক্ এই মনোবিকৃতির রহস্যটুকু খুব convincing হইয়া পাঠকের মনকে অধিকার করিয়া বসে না, তাহার মনকে কল্পনার রসে অভিষিক্ত করিয়া দেয় না। বাড়ীর লোকেরা জানে কাদম্বিনী মরিয়াছে, শ্মশানে তাহার দেহ ভস্মীভূত হইয়াছে; এবং শ্মশানপ্রত্যাগতা কাদম্বিনী নিজেও নিজকে মৃত বলিয়াই মনে করিতেছে, ভাবিতেছে 'আমি তো বাঁচিয়া নাই, আমাকে বাড়ীতে লইবে কেন?··· জীবরাজ্য হইতে আমি যে নির্ব্বাসিত হইয়া আসিয়াছি, আমি যে আমার প্রেতাত্মা।' আর যেখানেই সে যাইতেছে, সেখানেই তো সকলেই তাহাকে প্রেতাত্মা বলিয়াই মনে করিতেছে। কিন্তু এমন করিয়া প্রতিদিন প্রতি কার্য্যে প্রতি ঘটনায় জীবিতের সাথে মৃতের সংঘর্ষ কাদম্বিনী কেমন করিয়া সহিবে, সহিয়া কেমন করিয়া মৃতের মতন হইয়া বাঁচিয়া থাকিবে? কাজেই অবশেষে তাহাকে মরিয়া প্রমাণ করিতে হইল যে সে মরে নাই। সুকৌশল ঘটনার সন্নিবেশে গল্পটির সমগ্র আখ্যানভাগ ভালই জমিয়া উঠিয়াছে, বিশেষ করিয়া জীবিতের সঙ্গে মৃতের সংঘর্ষের tragedyর শেষ অধ্যায়টুকু, যেখানে কাদম্বিনী অনেক দিন পরে অনুভব করিল যে, সে মরে নাই—সেই পুরাতন ঘরদ্বার, সেই সমস্ত, সেই খোকা, সেই স্নেহ, তাহার পক্ষে সমান জীবন্তভাবেই আছে, মধ্যে কোনো বিচ্ছেদ কোনো ব্যবধান জন্মায় নাই। তৎসত্ত্বেও গল্পটির অনুভূতি পাঠকের মনকে মৃত্যুলোকের অশরীরী কোনো ভয়াবহ রহস্যে কম্পিত করে না, চিত্তকে নিবিড় কল্পনারসে ভরিয়া দেয় না।

এই ধরণের গল্পগুলির মধ্যে সবচেয়ে রসঘন ও রহস্য-নিবিড় গল্প 'ক্ষুধিত পাষাণ'। প্রাচীন ও আধুনিক, দেশী ও বিদেশী কোনো সাহিত্যেই, এই বিশেষ ধরণের গল্পে এমন অপূর্ব্ব কলাকৌশল, রহস্য-নিবিড় বর্ণনা-ভঙ্গি অপরূপ কল্পনার ঐশ্বর্য্য, সর্ব্বোপরি এমন উচ্ছ্বসিত সুরপ্রবাহ দেখিয়াছি বলিয়া মনে করিতে পারি না। শ্রীকুমারবাবু সত্যই বলিয়াছেন 'ভাষার ধ্বনি, ব্যঞ্জনা ও সাঙ্কেতিকতায় এক De Quincy-র Dream Visions ভিন্ন রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণের' অনুরূপ কিছু ইংরেজী সাহিত্যে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।' গল্পটির পরিবেশ রচিত হইয়াছে 'শুস্তা' নদীর তীরে বরীচ নগরে আড়াই-শ' বছর আগেকার তৈরী দ্বিতীয় শা' মামুদের ভোগবিলাসের নির্জ্জন প্রাসাদে। তাহার কক্ষে একদিন—

> 'অনেক অতৃপ্ত বাসনা, অনেক উন্মত্ত সম্ভোগের শিখা আলোড়িত হইয়াছে। সেই সকল চিত্তদাহে সেই সকল নিষ্ফল কামনার অভিশাপে এই প্রাসাদের প্রত্যেক প্রস্তরখণ্ড ক্ষুধার্ত্ত তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া আছে; সজীব মানুষ পাইলে তাহাকে লালায়িত পিশাচীর মতন খাইয়া ফেলিতে চায়।'

এমনই রহস্যময় পরিবেশের মধ্যে লেখকের কল্পনা ছাড়া পাইয়াছে। সেই অবাধ কল্পনা ও সঙ্গীতপ্রবাহের মধ্যে যেন অবাস্তব কোথাও কিছু নাই, অস্পষ্ট কুহেলিকার আবরণ যাহা কিছু বা ছিল সব ঘুচিয়া গিয়াছে। তুলার মাশুল-আদায়কারী যে নির্জ্জন প্রাসাদবাসী সেই ভদ্রলোকটী এই গল্পের নায়ক, সূর্য্যাস্তের পর হইতে সে যেন আর নিজের মধ্যে থাকে না, মোগলাই-খানা খাইয়া, ঢিলা পায়জামা, মখমলের কেজ্ দীর্ঘচোগা, ও ফুলকাটা কাবা পরিয়া, রুমালে আতর মাখিয়া,············

> 'শত শত বৎসরের পূর্ব্বেকার কোনো এক অলিখিত ইতিহাসের অন্তর্গত আর একটা অপূর্ব্ব ব্যক্তি হইয়া উঠে, একটা নেশার জালের মধ্যে বিহ্বলভাবে জড়াইয়া পড়ে।'

তখন সম্মুখে শুস্তার জলে বিজন প্রাসাদের সিঁড়িতে, তাহার কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে এক রহস্যময় ইন্দ্রজাল বিস্তৃত হয়। এক একটা রাত্রি যেন এক একটা স্বপ্নময় নিরবচ্ছিন্ন সঙ্গীত; বুঝি এই স্বপ্ন এই সঙ্গীতের শেষ কোথাও হইত না যদি প্রতিদিন প্রত্যূষে জনশূন্য পথে পাগলা মেহের আলীর 'তফাৎ যাও তফাৎ যাও,' চীৎকার এই নিরবচ্ছিন্ন স্বপ্ন ও সঙ্গীতপ্রবাহের মধ্যে অকস্মাৎ একটা বাধার মতন আসিয়া নিক্ষিপ্ত না হইত। প্রতিরাত্রির স্বপ্নসঙ্গীতের আবর্ত্তের মধ্যে সেই বহুদিন-বিস্মৃত বাদশাহী ঐশ্বর্য্যের দীপ্তি ও লালস, অতৃপ্ত কামনা ও সম্ভোগের ক্ষুব্ধ হতাশ যেন সব সজীব মূর্ত্তি ধরিয়া সেই বিজন প্রাসাদের কক্ষে কক্ষে জাগিয়া বসিয়াছে, তাহার মধ্যে মায়া

বা বিভ্রম কোথাও কিছু নাই। এই অপূর্ব্ব কল্পনার পাথার উপর ভর করিয়া একটির পর একটি রাত্রি যেন স্বপ্নসঙ্গীতের মালা গাঁথিয়া চলিয়াছে। গল্পের মধ্যে কোন্ কবির কল্পনা এমন করিয়া শতদল মেলিয়া বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, এমন সঙ্গীতপ্রবাহ উচ্ছ্বসিত হইয়া ছুটিয়াছে? এই কল্পনার ঐশ্বর্য্য, এই সুরধর্ম্মই 'ক্ষুধিত পাষাণ'কে এমন রসময় ভাষারূপ দান করিয়াছে; তাহার উপাদান এক্ষেত্রে তুচ্ছ। একটী মাত্র দৃষ্টান্ত না দিয়া পারিলাম না।

"আবার সেইদিন অর্দ্ধরাত্রে বিছানার মধ্যে উঠিয়া বসিয়া শুনিতে পাইলাম, কে যেন গুমরিয়া বুক ফাটিয়া ফাটিয়া কাঁদিতেছে, যেন আমার খাটের নীচে এই বৃহৎ প্রাসাদের পাষাণ ভিত্তির তলবর্ত্তী একটা আর্দ্র অন্ধকার গোরের ভিতর হইতে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছে, তুমি আমাকে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাও—কঠিন মায়া, গভীর নিদ্রা নিষ্ফল স্বপ্নের সমস্ত দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তুমি আমাকে ঘোড়ায় তুলিয়া তোমার কাছে চাপিয়া ধরিয়া বনের ভিতর দিয়া পাহাড়ের উপর দিয়া নদী পার হইয়া তোমাদের সূর্য্যালোকিত ঘরের মধ্যে আমাকে লইয়া যাও। আমাকে উদ্ধার কর।

"আমি কে! আমি কেমন করিয়া উদ্ধার করিব! আমি এই ঘূর্ণ্যমান পরিবর্ত্তমান স্বপ্নপ্রবাহের মধ্য হইতে কোন্ মজ্জমান্ কামনা-সুন্দরীকে টানিয়া তুলিব! তুমি কবে ছিলে, কোথায় ছিলে হে দিব্যরূপিণি! তুমি কোন্ শীতল উৎসের তীরে খর্জ্জুর কুঞ্জের ছায়ায় কোন্ গৃহহীনা মরুবাসিনীর কোলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে? তোমাকে কোন বেদুয়ীন্ দস্যু বনলতা হইতে পুষ্পকোরকের মত মাতৃক্রোড় হইতে ছিন্ন করিয়া বিদ্যুৎগামী অশ্বের উপর চড়াইয়া জ্বলন্ত বালুকারাশি পার হইয়া কোন্ রাজপুরীর দাসীহাটে বিক্রয়ের জন্য লইয়া গিয়াছিল! সেখানে কোন্ বাদসাহের ভৃত্য তোমার নববিকশিত সলজ্জ কাতর যৌবনশোভা নিরীক্ষণ করিয়া স্বর্ণমুদ্রা গণিয়া দিয়া সমুদ্র পার হইয়া তোমাকে সোনার শিবিকায় বসাইয়া প্রভুগৃহের অন্তঃপুরে উপহার দিয়াছিল! সেখানে সে কি ইতিহাস! সেই সারঙ্গীর সঙ্গীত, নূপুরের নিক্বণ, এবং সিরাজের সুবর্ণমদিরার মধ্যে মধ্যে ছুরির ঝলক্, বিষের জ্বালা, কটাক্ষের আঘাত! কি অসীম, কি ঐশ্বর্য্য, কি অনন্ত কারাগার! দুইদিকে দুই দাসী বলয়ের হীরকে বিজুলি খেলাইয়া চামর দুলাইতেছে; শাহেন্‌শা বাদ্‌শা শুভ্র চরণের তলে মণিমুক্তাখচিত পাদুকার কাছে লুটাইতেছে;—বাহিরের দ্বারের কাছে যমদূতের মত হাব্‌শী, দেবদূতের মত সাজ করিয়া খোলা তলোয়ার হাতে দাঁড়াইয়া। তাহার পরে সেই রক্তকলুষিত ঈর্ষাফেনিল ষড়যন্ত্রসঙ্কুল ভীষণোজ্জ্বল ঐশ্বর্য্যপ্রবাহে ভাসমান্ হইয়া তুমি মরুভূমির পুষ্পমঞ্জরী কোন্ নিষ্ঠুর মৃত্যুর মধ্যে অবতীর্ণ অথবা কোন নিষ্ঠুরতর মহিমাতটে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিলে?"

কি অপূর্ব্ব এই প্রশস্তি সঙ্গীত! এমনি সঙ্গীত-প্রবাহ চলিয়াছে এক রাত্রি হইতে অন্য রাত্রিতে। তাহার বর্ণনার ভঙ্গিতে, ভাষার ধ্বনিতে, শব্দের চয়নে কি সুন্দর সুর, কি অপরূপ মাধুর্য্য! প্রত্যেকটী বাক্যে তাহার ইঙ্গিতে ও ব্যঞ্জনায় কত কথা কত ইতিহাস যেন প্রাণ পাইয়া সজীব হইয়া উঠিয়াছে। কলাকৌশলের দিক্ হইতে গল্পের settingটীও খুব লক্ষ্য করিবার। ইহার আরম্ভিক ভূমিকা যেমন স্বল্পপরিসর, ইহার সমাপ্তিও তেম্‌নি আকস্মিক; অন্য গাড়ী আসিবার অবসরে ষ্টেশনের বিশ্রামকক্ষে এই গল্প বর্ণনার সূত্রপাত, সেইখানেই ইহার আকস্মিক সমাপ্তি। খাঁটি গল্পভাগের সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ খুব অস্পষ্ট; গল্পের আরম্ভ ও সমাপ্তির জন্য পাঠককে কিছু প্রস্তুত হইতে হয় না। রঙ ও রেখায় দীপ্ত সবল সুন্দর একটী ছবি যেন কাঠের কঠিন ও সুনির্দ্দিষ্ট একটি ফ্রেমের মধ্যে বাঁধা পড়িয়াছে।

"নিশীথে" গল্পটী আরও সহজ ও স্বাভাবিক পরিবেশের মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছে; উহার জন্য কোনো বিজন প্রাসাদ বা কোনো অতীত যুগের মধ্যে কল্পনাকে পক্ষমুক্ত করিতে হয় নাই। আমাদের প্রতিদিনের অতি সহজ কথা এবং কাজ কর্ম্মের মধ্যেই কেমন করিয়া অতীন্দ্রিয় অতিপ্রাকৃত জগতের মায়াজাল বিস্তৃত হয়, দৈনন্দিন তুচ্ছ একান্ত স্বাভাবিক কথা ও কর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া অতিপ্রাকৃতের স্পর্শ আকস্মিক একটা সাময়িক মনোবিকার ঘটাইয়া দেয়, এবং তাহাকেই অবলম্বন করিয়া কবির কল্পনা সমস্ত আখ্যানটিকে রসে রহস্যে সুনিবিড় করিয়া তোলে, এই গল্পটি তাহার একটা সরস ও প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। রুগ্না স্ত্রীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া কেনো এক উদ্বেলিত মুহূর্ত্তে স্বামীর পক্ষে বলা সহজ "তোমার ভালোবাসা আমি কোনো কালে ভুলিব না।" কিন্তু কথাটা শুনিয়া রুগ্না স্ত্রীও হা হা করিয়া সুতীক্ষ্ণ হাসি হাসিয়া উঠিয়াছিল। সে হাসির মধ্যে স্ত্রীর লজ্জা ও সুখের অনুভূতি একটু হয়ত ছিল, কিন্তু তাহার চেয়ে বেশী ছিল অবিশ্বাস

ও পরিহাসের তীব্রতা! সেই এক বিহ্বল মুহূর্ত্তের কথাটা যে কত মিথ্যা তাহা ধরা পড়িয়া গেল রুগ্না স্ত্রীর মৃত্যুশয্যার আড়ালে নূতন প্রেমের সঞ্চারে, গোপনে গোপনে নূতন করিয়া নূতন মানুষের সঙ্গে প্রেমের লীলায়। মৃত্যুশয্যাশায়িনীর চোখেও বুঝিবা তাহা ধরা পড়িয়াছিল, তাহার হৃদয়ের ভাঁটায় বুঝিবা টান পড়িয়াছিল। তাই, মনোরমা যখন তাহাকে দেখিতে আসিল, রুগ্না অবহেলিতা স্ত্রী চম্‌কিয়া উঠিয়া স্বামীর হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"ওকে? ওকে, ও কেগো?" স্ত্রী তো মরিল; স্বামী দ্বিতীয়বার বিবাহও করিল। কিন্তু প্রথমা স্ত্রীর প্রতি অবহেলা, অপরাধ ও মিথ্যাচরণের গুরুভার তাহার বুকের উপর অনুক্ষণ চাপিয়া রহিল, মনোরমাও সহজভাবে স্বামীকে গ্রহণ করিতে পারিল না;

'আমি যখন আদরের কথা বলিতাম প্রেমালাপ করিয়া তাহার হৃদয় অধিকার করিতে চেষ্টা করিতাম, মনোরমা হাসিত না গম্ভীর হইয়া থাকিত। তাহার মনের কোথায় কি খট্‌কা লাগিয়াছিল, আমি কেমন করিয়া বুঝিব?'

কিন্তু তবু আর এক বিহ্বল মুহূর্ত্তে বলিতে হইল, 'মনোরমা, তুমি আমাকে বিশ্বাস কর না, কিন্তু তোমাকে আমি ভালবাসি, তোমাকে কোনোকালে আমি ভুলিতে পারিব না।' এই কথা শুনিয়াই একদিন রুগ্না প্রথমা স্ত্রী অবিশ্বাস ও পরিহাসের সুতীক্ষ্ণ হাসি হাসিয়াছিল। আবার যখন সেই কথাটাই নূতন করিয়া দ্বিতীয় স্ত্রীকে প্রেম জানাইবার জন্য নিবেদন করিতে হইল, তখন এক মুহূর্ত্তেই তাহার নিজের মিথ্যা নিজের ফাঁকি নিজের কাছেই অত্যন্ত ক্রুর নিষ্ঠুর রহস্য লইয়া উন্মুক্ত হইয়া পড়িল; এবং পরক্ষণেই একটা অতীন্দ্রিয় ভৌতিক শিহরণে নিজেই কাঁপিয়া উঠিল, একটা মানসিক বিকার তাহার সমস্ত সত্তাকে অধিকার করিয়া বসিল। সেই মুহূর্ত্তেই 'বকুল গাছের শাখার উপর দিয়া, ঝাউ গাছের মাথার উপর দিয়া কৃষ্ণপক্ষের পীতবর্ণ ভাঙা চাঁদের নীচ দিয়া গঙ্গার পূর্ব্বপার হইতে পশ্চিম পার পর্য্যন্ত সেই অবিশ্বাস ও পরিহাসের হাহা-হাহা-হাহা হাসি দ্রুতবেগে বহিয়া গেল।' আর সেই যে মৃত্যুপথযাত্রিণীর ও কে, ও কে, ও কে গো প্রশ্ন তাহাও অনুতপ্ত অপরাধগ্রস্ত স্বামীকে অব্যাহতি দিল না; এই যে প্রেমবিহ্বল স্বামীর পাশে পাশে নবপরিণীতা নূতন স্ত্রী, আকাশ বাতাস পথ ঘাট বিশ্বজগতের যাহা কিছু সবই যেন উহার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কেবলি প্রশ্ন করিতেছে, ও কে, ও কে, ও কেগো। নির্জ্জন পদ্মার চর পর্য্যন্ত সেই এক হৃদয়বিদারক প্রশ্ন তাহাকে অনুসরণ করিয়া চলিল; জনমানবশূন্য নিঃসঙ্গ মরুভূমিতে শুনা যায় ও কে, ও কে, ও কেগো? রাত্রির অন্ধকারে সুষুপ্তির মধ্যে কে যেন অস্ফুটকণ্ঠে কেবলি জিজ্ঞাসা করিতে থাকে ও কে, ও কে, ও কেগো? কি অপূর্ব্ব সহজ ও স্বাভাবিক এই ভৌতিক শিহরণ! অতিপ্রাকৃতের এই স্পর্শ দৈনন্দিন জীবনে আমরা কতই অনুভব করিয়া থাকি। এক একটা ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া তুচ্ছ এক একটা কথা, একটা ছবি, এমন অনপনেয় রেখায় আমাদের মনের পটে আঁকা হইয়া যায়, মনকে এমন গুরুভারে পীড়িত করিয়া মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটায়—তখন সেই কথা সেই ছবিটাই যেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, তাহার প্রতিধ্বনি ও প্রতিচ্ছবি যেন সকলদিক হইতে সমস্ত জীবনকে চাপিয়া ধরিয়া মৌন আর্ত্তনাদে উৎপীড়িত করে, কিছুতেই তার হাত হইতে মুক্তি পাওয়া যায় না। 'নিশীথের' গল্পভাগ এই প্রকার মনোবিকৃতি হইতেই উদ্ভূত, কিন্তু লেখকের সুদূরবিসপী কল্পনার ঐশ্বর্য্য, তাঁহার স্বাভাবিক কবিচিত্তের সুরধর্ম্ম ইহাকে একটি অতুলনীয় রসময় রহস্যঘন রূপ দান করিয়াছে। এই অতিপ্রাকৃতের শিহরণ যখন এক একটা climaxএ আসিয়া উঠিয়াছে, অতীন্দ্রিয় অনুভূতির উঁচু পর্দ্দায় আসিয়া চড়িয়াছে, সেইখানেই এই কল্পনার মুক্তগতি ও সহজ সুরধর্ম্মের পরিচয় পাওয়া যায়—ম্লানজ্যোৎস্নালোকিত শুভ্র বকুলবেদীতে, জনমানবশূন্য নিঃসঙ্গ পদ্মাচরের উপর অথবা অন্ধকার রাত্রিতে বোটের মধ্যে মসারীর নীচে। শেষ দৃষ্টান্তটি মাত্র উদ্ধৃত করিতেছি।

"তখন অন্ধকারে কে একজন মসারীর কাছে দাঁড়াইয়া সুষুপ্ত মনোরমার দিকে একটি মাত্র দীর্ঘ শীর্ণ অস্থিসার অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া যেন আমার কানে কানে অত্যন্ত চুপি চুপি অস্ফুটকণ্ঠে কেবলি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল "ওকে? ওকে? ওকে গো?"—

"তাড়াতাড়ি উঠিয়া দেশলাই জ্বালাইয়া বাতি ধরিলাম। সেই মুহূর্ত্তেই মিলাইয়া গিয়া, আমার মশারী কাঁপাইয়া, বোট দুলাইয়া, আমার সমস্ত

ঘর্ম্মাক্ত শরীরের রক্ত হিম করিয়া দিয়া হাহা—হাহা একটা হাসি অন্ধকার রাত্রির ভিতর দিয়া বহিয়া চলিয়া গেল। পদ্মা পার হইল, পদ্মার চর পার হইল, তাহার পরবর্ত্তী সমস্ত সুপ্ত দেশ, গ্রাম, নগর, পার হইয়া গেল —যেন তাহা চিরকাল ধরিয়া দেশদেশান্তর লোকলোকান্তর পার হইয়া ক্রমশঃ ক্ষীণ, ক্ষীণতর ক্ষীণতম হইয়া অসীম সুদূরে চলিয়া যাইতেছে,—ক্রমে যেন তাহা জন্মমৃত্যুর দেশ ছাড়াইয়া গেল—ক্রমে যেন তাহা সূচীর অগ্রভাগের ন্যায় ক্ষীণতম হইয়া আসিল—এত ক্ষীণ শব্দ কখনো শুনি নাই, কল্পনা করি নাই, আমার মাথার মধ্যে যেন অনন্ত আকাশ রহিয়াছে, এবং সেই শব্দ যতই দূরে যাইতেছে, কিছুতেই আমার মস্তিষ্কের সীমা ছাড়াইতে পারিতেছে না. অবশেষে যখন একান্ত অসহ্য হইয়া আসিল, তখন ভাবিলাম, আলো নিবাইয়া না দিলে ঘুমাইতে পারিব না। যেমনি আলো নিবাইয়া শুইলাম অমনি আমার মশারীর পাশে, আমার কানের কাছে, অন্ধকারে আবার সেই অবরুদ্ধ স্বর বলিয়া উঠিল :—"ও কে, ও কে, ও কে গো।" আমার বুকের রক্তের ঠিক সমান তালে ক্রমাগতই ধ্বনিত হইতে লাগিল,—ও কে, ও কে, ও কে গো! সেই গভীর রাত্রে নিস্তব্ধ বোটের মধ্যে আমার গোলাকার ঘড়িটাও সজীব হইয়া উঠিয়া তাহার ঘণ্টার কাঁটা মনোরমার দিকে প্রসারিত করিয়া শেল্‌ফের উপর হইতে তালে তালে বলিতে লাগিল, "ও কে, ও কে, ও কে গো! ও কে, ও কে, ও কে গো!"

অতিপ্রাকৃতের এই uncanny feeling সঞ্চারের সার্থক প্রয়াস 'মণিহারা' গল্পেও দেখিতে পাই। পত্নীপ্রেম-বঞ্চিত স্বামীর পত্নীবিয়োগে শোকভারগ্রস্ত চিত্তের বিকার হইতেই এই গল্পের সৃষ্টি; কিন্তু ইহার মধ্যে যে অতীন্দ্রিয় ভৌতিক রহস্য তাহা অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে গল্পের শেষ দিকে। এবং সেখানেও যে এই অতীন্দ্রিয় অতিপ্রাকৃতের রহস্য খুব নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে, আমার এমন মনে হয় না; কল্পনার ঐশ্বর্য্যও খুব দীপ্তি লাভ করিতে পারে নাই, বর্ণনার সাঙ্কেতিকতায় অতীন্দ্রিয়ের অনুভূতিও খুব উঁচু পর্দ্দায় পৌঁছিতে পারে নাই। তবে গল্পের প্রথমভাগে ফণীভূষণ ও মণিমালিকার পরস্পরের হৃদয়লীলার পরিচয়ের মধ্যে লেখকের সুতীক্ষ্ণ মনোবিশ্লেষণ-ক্ষমতা ও সহজ বোধশক্তির আশ্চর্য্য প্রমাণ আছে। ইহা ছাড়া, শ্রীকুমার বাবু খুব নিপুণতার সহিত গল্পটীর আর একটি বিশেষত্বের দিকে ইঙ্গিত করিয়াছেন, যাহা একটু মনোযোগী পাঠকমাত্রের চোখে ধরা না পড়িয়াই পারে না। তাহা এই যে,

> "এই তুষার-শীতল, মৃত্যুরহস্যগূঢ় স্বপ্নকাহিনীর চারিদিকে একটা ইস্পাতের মত শক্ত বাস্তবতার বন্ধন দেওয়া হইয়াছে। এই অদ্ভুত স্বপ্নবৃত্তান্ত যিনি বর্ণনা করিয়াছেন তাঁহার চক্ষে স্বপ্নজড়িমার লেশমাত্র নাই, বরং একটা তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণশক্তি শাণিত ছুরিকাগ্রভাগের ন্যায় চক্‌ চক্‌ করিতেছে। স্ত্রীপুরুষের পরস্পরের সম্বন্ধের মধ্যে আদিম রহস্য ও বর্ত্তমান যুগের সমাজে সেই সনাতন নীতির বৈপরীত্য—এই অতি গভীর চিন্তাশীলতাপূর্ণ আলোচনার মধ্যে, বুদ্ধি তর্কের অতীত অতীন্দ্রিয় জগতের ভয়াবহ ইঙ্গিতটি আশ্চর্য্য সুসঙ্গতির সহিত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গল্পের উপসংহারটিও আবার বাস্তব সত্যকে প্রাধান্য দিয়া একটা সংশয়াকুল সন্দেহবিজড়িত অনিশ্চয়ের মধ্যে গল্পটিকে হঠাৎ শেষ করিয়া দিয়াছে।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীনীহাররঞ্জন রায়

এপার ওপার

শ্রীযুক্ত নীরদরঞ্জন দাশ গুপ্ত এম-এ, বার-এ্যাট-ল

দুই

বর্ষা

ঘুম ভেঙে চেয়ে দেখি গ্রামের পরে
ঝম্ ঝম্ ঝম্ ঝম্ বাদল ঝরে ;
বাতায়ন খোলা মোর,
রজনী হইল ভোর,
প্রভাতের গায়ে গায়ে বরষা-মাখা,
সারাটা আকাশখানি মেঘেতে ঢাকা।

গুরু গুরু গুরু গুরু মেঘ ডেকে যায়
ভুবনের বুকে বুকে দামামা বাজায় ;
আশেপাশে দূরে দূরে
সেই পুরাতন সুরে
দাদুরীর ডাকে রাতি হ'ল ফরসা ;
আকাশ ভরিয়া এল ঘন বরষা।

গ্রামের নদীর জলে বাদলধারা
ছল্ ছল্ ছল্ ছল্ দিতেছে সাড়া ;
ধান ক্ষেতে আশে পাশে,
মাঠে মাঠে ঘাসে ঘাসে
এঁকে বেঁকে দুপারেই জল ছুটে যায় ;
কুল কুল গান শুনি নদী-কিনারায়।

সন্ সন্ সন্ সন্ বাদ্লে হাওয়া—
থেকে থেকে এলো মেলো আসা-ও-যাওয়া ;
ডালে ডালে ঢেউ তোলে
পাগল দোলায় দোলে,
ভিজে শিহরণ কাঁপে পাতায় পাতায়,
সজল পরশ লাগে মোর সারা গায়।

কিছু দূরে চেয়ে দেখি বকুল গাছে
একটি শালিক পাখী বসিয়া আছে ;
খেলাধূলা নাচ গান
আজ সব অবসান,
ভিজে ভিজে আধ-মরা নড়ে নাক তাই,
এ প্রভাতে তারে কোনো প্রয়োজনই নাই।

*　　*　　*　　*

শুয়ে আছি ঘরে মোর খোলা বাতায়ন,
কত কথা কানে কানে কয় মোর মন ;
মনে হয় সব মিছে
আছে যারা আগে পিছে—
মিছে মোর যত কাজ সকলের মাঝে,
কি যেন হারিয়ে-যাওয়া ব্যথা প্রাণে বাজে।

বরষার ঘন ধারা করেছে আড়াল,
আমি যেন বড় একা আছি চিরকাল,
পাশেই পুণ্যা নদী
বহিতেছে নিরবধি,
এপার ওপার আজি বাদল ধারায়
দুজনেই দুজনারে কেবলি হারায়।

মনে হল আজ ভোরে গগন ছেয়ে
বিরাট বিরহ নামে ভুবন বেয়ে,
মিলনের মাঝখানে
বারি ধারা টেনে আনে
ব্যথা হয়ে স্মৃতিটুকু বাদল মাঝে
ছল্ ছল্ ছল্ ছল্ কেবলি বাজে।

* * * *

ভাষা নাই মোর প্রাণে কি দিয়ে বোঝাই
কী যে আমি দেখেছিনু তাই ;
আষাঢ়ের বেলাশেষে
বারিধারা নেমে এসে
বাঁধনবিরামহীন কেবলি ঝরে,
ঝর্ ঝর্ ঝর্ ঝর্—গ্রামের পরে।

চারিদিকে মাঠগুলি জলে গেল ঢাকি
দাহুরীরা করে ডাকাডাকি ;
মেঘে মেঘে বারে বারে
বিজলি চমক মারে,
গুরু গুরু সুর ভাসে আকাশের গায়,
ধীরে ধীরে বহু দূরে ভেসে চলে যায়।

মাঝে মাঝে নদী বেয়ে দাঁড়ে দিয়ে টান
নাও যায়—মাঝি গায় গান ;
সেই সুর বরষায়
শতধারে ভেঙে যায়,
ছড়ায়ে নদীর জলে উছলিয়া বাজে,
কান পেতে শুনি আমি মোর হিয়া মাঝে।

* * * *

ধীরে ধীরে বারিধারা কিছুকাল পর
ক্ষণতরে নিল অবসর ;
বাহিরিনু ভিজে পায়,
এনু নদী-কিনারায় ;
এ কী রূপ বরষার—ব্যাকুল সজল,
গোধূলি আলোয় ম্লান করে টল মল।

আষাঢ়ের বেলাশেষে আঁধার ঘনায়
বেলাটুকু, তাও নিতে যায় ;
আকাশের মেঘে মেঘে
আঁধারের ছোঁয়া লেগে
পূর্ণা নদীর জলে কালো ছায়া ভাসে,
নিবিড় সন্ধ্যা গ্রামে ঘনাইয়া আসে।

হেন কালে চেয়ে দেখি ওপারের মাঠে
এলো চুলে কে আসে ও ঘাটে,
কলসী ভরাবে ব'লে,
এল বুঝি নদীজলে,
বসিল ঘাটের প'রে শেষ কিনারায়,
ছল্ ছল্ পায়ে বেধে নদী বয়ে যায়।

একাকিনী বসে আছে বড় আনমনা—
হোলো কি এ, কি এত ভাবনা !
ম্লান দুটো আঁখি ভ'রে
কালো মেঘ খেলা করে,
আঁচল খসিয়া পড়ি নদী জলে ভাসে,
হুঁস নাই, অন্ধকার ঘনাইয়া আসে।

আর যেন যাবে না'ক কোন দিন ঘরে,
ঘাটে বসে রবে চিরতরে ;
নদী জলে দেবে প্রাণ,
এত যেন অভিমান

কার পরে ?—কে আছে তার এত ভালবাসে ?
জানি না—তাহাতে মোর কিবা যায় আসে !

শুধু জানি—ক্ষণ পরে সকলি আঁধার—
মুছে গেল মোর চারি ধার ;
বাহিরের ছবিখানি
নিজ হাতে তুলে আনি
গোধূলির ম্লান রঙে প্রাণেতে এঁকেছি।
চিরকাল চিরদিন যতনে রেখেছি।

* * * * *

তাইত যখন নিশীথ রাতে ভাঙল আমার ঘুম,
চারিদিকে সকলি নিঝুম ;
মুক্ত আমার বাতায়নে
রইনু চেয়ে আপন মনে,
বাইরে তখন ঝম্ ঝম্ ঝম্ বাদল ধারা ঝরে ;
আমার পরাণ ভেবে ভেবে মরে।

ভাবি মনে আজকে বুঝি আসবে প্রলয় ধেয়ে
সারা আকাশ সারা ভুবন বেয়ে ;
এই যে ছিন্ন দৈন্য জরা
ডুবিয়ে দেবে জীর্ণ ধরা,
মাথায় লয়ে প্রলয়, মোরা আজকে নিশীথ রাতে
ভাসব শুধু দুজনে এক সাথে।

কাল সকালে নবীন রঙে প্রথম আলোয় গড়া
দেখব চেয়ে নূতন বসুন্ধরা ;

তখন তোমার কাণে কাণে
প্রথম আলোয় প্রথম গানে
কইব কথা—হিয়া তোমার কাঁপবে দুরু দুরু,
নূতন সৃষ্টি আবার হবে সুরু।

আবার ভাবি আজকে রাতে বাদল ধারার মাঝে
তোমার আমার মিলন-বাণী বাজে ;
কোথায় যেন গেছি ভুলে
কোন সে নদীর বিজন কূলে
এমনি শ্রাবণ বাদল রাতে—গভীর অন্ধকার,
হয়েছিল মোদের অভিসার।

আজকে আকাশ অন্ধকারে সেই স্মৃতিতে ভরা
সেই স্মৃতিতে কাঁপে বসুন্ধরা ;
আজকে রাতে বাদল ধারা
সেই স্মৃতিতে বাঁধন-হারা,
সেই সে স্মৃতি বুকের পরে পাগল হয়ে নাচে,
পরাণ আমার সেই স্মৃতিতে বাঁচে।

আজ নিশীথে পেলাম তোমার সত্য পরিচয়,
আজকে শুধু জয় তোমার জয় ;
আজ শ্রাবণে বাদল ধারায়
আপনাকে প্রাণ আপনি হারায়,
আকাশ পাতাল জলে স্থলে কেবল তোমার তরে
পথ হারিয়ে ঘুরে ঘুরে মরে ॥

[ক্রমশঃ]

শ্রীনীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত

বিচারপতি

শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ইহার পর তিন দিন কাটিয়া গেল, যুবরাজ সেদিনের সন্ধ্যায় সেই যে চলিয়া গিয়াছেন, আর ফিরিয়া আসেন নাই, শ্রীলতা এই কদিনে অন্ততঃ অর্দ্ধেকখানি শ্রী হারাইয়া উৎসুক আকুল চক্ষে সকল সময়েই মনে মনে তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছিল। সামান্য বাতাসের শব্দেও চকিত হইয়া উঠে, বুক তার আশায় আনন্দে এবং একটা অননুভূত আশঙ্কায় কাঁপিতে থাকে, আবার সে আশা ব্যর্থ হইয়া গেলে সমস্ত চিত্ত তার নিরাশার অন্ধকারে ডুবিয়া যায়।

এমন করিয়া প্রায় সপ্তাহ অতীত হইলে, সুখহীন ও উদ্বিগ্নচিত্ত পিতামাতাকে সে একদিন খুব স্ফূর্ত্তিযুক্ত দেখিল। দুএকটী প্রতিবেশিনী সঙ্গে লইয়া ইচ্ছাময়ী যে কোন বিশেষ উৎসবের আয়োজনে ব্যাপৃত হইয়াছেন তাহাও তাঁহার কর্ম্মব্যস্ততা এবং ভাণ্ডারে দ্রব্যাদির প্রাচুর্য্য দ্বারা জানিতে পারা গেল, ঘোরতর সন্দিগ্ধ বিস্ময়ে চিত্ত ভরিয়া শ্রীলতা নীরব হইয়া রহিল। বাড়ীতে আজ কিসের আয়োজন একথা জিজ্ঞাসা করিতেও তার ভরসা হইল না ;—অনিশ্চিত আতঙ্কে শুধু তার বুক কাঁপিতে লাগিল।

সেদিন আকাশ মেঘে ব্যাপ্ত, আসন্ন বর্ষণের প্রতীক্ষায় প্রকৃতি যেন মৌন স্তব্ধতায় উন্মুখ হইয়া রহিয়াছেন, চারিদিক সুপ্তিমগ্ন কেবল গভীর রাত্রেও বেদনায় বিদ্ধ চিত্তে শয্যায় পড়িয়া জাগিয়া আছে শ্রীলতা।

জানালায় কে' যেন মৃদু মৃদু করাঘাত করিল কি? কৈ না, বোধ হয় উপদ্রবশীল ইন্দুরের ধাবনধ্বনিমাত্র! না, ঐ আবার কে অতিমৃদু সঙ্কেতাঘাত করিতেছে! আশায় ও আশঙ্কায় স্পন্দমান বক্ষে উঠিয়া শ্রীলতা অতিশয় সন্তর্পণে গৃহের বাহির হইয়া আসিল।

তার আশা এবং আশঙ্কা দুই-ই যথার্থ! বাস্তবিক যুবরাজ রাজ্যপালই বটে! প্রথমেই একটা অদম্য আনন্দোচ্ছ্বাসে শ্রীলতার ক্ষুদ্র হৃদয় যেন প্লাবিত হইয়া গেল, তবে তিনি তাকে একেবারেই ভুলিয়া যান নাই; তার নারীচিত্ত লইয়া মুহূর্ত্তের খেলামাত্র খেলিয়াই তাকে চির-দুঃখিনী করিয়া সরিয়া পড়েন নাই; আসিয়াছেন, তার এই ঘোরতর দুর্দ্দিনের প্রারম্ভেই আবার তাকে দেখা দিয়াছেন! আবার সঙ্গে সঙ্গেই তার মনের মধ্যে একটা গভীর আতঙ্ক জাগিয়া উঠিল, এতরাত্রে, এমন ভাবে এই যে তাদের সাক্ষাৎঘটা, এ যদি তার পিতামাতা জানিতে পারেন!

যুবরাজ ইঙ্গিতে তাহাকে অনুসরণ করিতে বলিয়া অগ্রসর হইলেন এবং একেবারে আম বাগানের মধ্যের একটা ঘন ছায়াময় স্থানে দুজনে পৌছিলে, গতিরুদ্ধ করিয়া সহসা তার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন,—

"কি, শ্রীলতা! আবার নাকি নূতন করে মালা গাঁথচো? এবার কার গলায় পরাবে? তা বেশ! ক'বার এরকম মালা গাঁথা-গাঁথি—আর পরাণ-টরাণ চলবে বলতে পার?"

যুবরাজ যাহা প্রত্যাশা করিয়াছিলেন তাহা হইল না, শ্রীলতা রাগ করিল না, তার পরিবর্ত্তে সে ঝাঁপাইয়া যুবরাজের বুকের উপর পড়িয়া আর্ত্ত আকুল হইয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল, "অমন করে আমায় তুমি বিঁধোনা, জানো নাকি তুমি, আর কারুকে মালা দেওয়া আমার পক্ষে তুমি অসম্ভব করেই রেখেছ? সব জেনে শুনে আবার ওইরকম করে ঠাট্টা করচো?"

রাজ্যপাল এই অপ্রত্যাশিত অভিব্যক্তিতে প্রথমটা ঈষৎ বিস্ময়স্তম্ভিত হইয়াছিলেন, পরক্ষণে বিপুল পুলকে তাঁর যুবকচিত্ত যেন নাচিয়া উঠিল। অন্তরের সমস্ত ঈর্ষাদাহ এক মুহূর্ত্তেই প্রশমিত হইয়া গিয়া গভীর প্রেমে তাহা

ভরিয়া উঠিল, সশ্রদ্ধ অনুরাগে আত্মদানকারিণীকে নিজের বক্ষে টানিয়া লইয়া কহিলেন, "তবে এস শ্রী! আমরা আজ রাত্রেই চলে যাই আরতো দিন নেই, আগত পরশ্বই তো তোমার বিয়ে।"

শ্রীলেখা সর্ব্বাঙ্গে শিহরিয়া উঠিল, যুবরাজের মুখের প্রত্যেক শব্দটাই তাহাকে অগ্নিতপ্ত শেলের মত বিঁধিয়া দিল। সে তাঁর বাহুবন্ধন হইতে আপনাকে বিমুক্ত করিয়া লইয়া রুদ্ধশ্বাসে উচ্চারণ করিল, "লুকিয়ে পালাবো! ছি ছি লোকে আমায় যে কুলত্যাগিনী বলে গাল দেবে!"

রাজাপাল স্থির সহাস্য নেত্রে তার আবেগোদ্বেজিত মুখের দিকে চাহিয়া সব্যঙ্গ মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, –

"তবে কি পরশু দিন নূতন বিয়েরই জন্য মন স্থির করে নিলে? বিধবা নয়, আমি এখনও বেঁচে আছি — কিছুদিন পর্য্যন্ত থাকবো! সধবা বিয়ে?"

এই ভর্ৎসনা-নিহিত পরিহাস শ্রীলতার সহসা অবসন্ন মনের উপর জ্বলন্ত হইয়া বাজিল, ইহা তাহাকে উত্তেজিত করিয়া তুলিল, সে তখন আপনাতে আপনি সংযত হইয়া উঠিয়া ধীর গম্ভীরস্বরে উত্তর করিল, –

"যুবরাজ! ব্রাহ্মণকন্যাকে অতটাই লঘুচেতা মনে করবেন না, পুকুরে জল থাকতে শ্রীলতা দ্বিচারিণী হ'তে যাবে কিসের দুঃখে? শুধু মালা নয়, এ দেহও তো আজ আপনাকেই আমি দান করে দিয়েছি। আর কি তা আমি অন্যকে দে'বার জন্য ফিরিয়ে নিতে পারি?"

এই উত্তর রাজাপালের সকল সঙ্কোচকেই পরাভূত করিয়া দিল, তিনি তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হইয়া আত্মদানকারিণী কিশোরীকে নিজের বক্ষে টানিয়া লইয়া তাহার ললাটে প্রথম প্রেমচুম্বন মুদ্রিত করিয়া দিয়া গভীর আবেগভরে কহিলেন,—

"মাথার উপর মানবের একমাত্র সৃষ্টিকর্ত্তা সাক্ষী রহিলেন, শ্রীলতা! তুমি আমার ধর্ম্মপত্নী। আমি যদি রাজা হই, তুমি রাণী হবে, ভিখারী হতে হলে ভিখারিণী!"

ক্ষণপরে আত্মস্থৈর্য্য সম্পাদন করিয়া লইয়া কহিলেন, "তবে এস শ্রীলতা! যা আমায় দিয়েছ তা ফিরিয়ে নে'বারও যেমন, নষ্ট করবারও তেমনই অধিকার তোমার নেই। এখন তোমার দেহ আমার, আমার জিনিস আমি ফেলে রেখে যাবো না, আমরা গোপনে বিবাহিত হয়ে কিছুদিন দেশান্তরে বাস করবো, তারপর ফিরে এলে — যা হয় হ'বে।"

শ্রীলতা নিজেকে নিঃশব্দে যেন নিঃশেষেই সঁপিয়া দিয়াছিল, কিন্তু চোক দিয়া তার নীরব অজস্র অশ্রুধারা ঝর ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছিল, সে একান্ত কাতর হইয়া কহিল, –

"কিন্তু আমার মা বাবা আমার শোকে মরে যাবেন? কুমার! যুবরাজ! আমিতো তোমারই, কিন্তু আমায় ওঁদের ছেড়ে যেতে বলো না। তোমার আদেশ আমি লঙ্ঘন করতে পারচিনে, কিন্তু ওঁদের জন্যেও যে আমার বুক ফাটচে।"

রাজাপাল তাহার বক্ষলুণ্ঠিত অবসন্ন মস্তকে সস্নেহে হাত বুলাইয়া আদর করিয়া কহিলেন,—

"বোকার মতন কথা বলচো যে শ্রী! তুমি মরে গেলে তাঁরা কি বেশী সুখী হবেন? এতো তবু আবার আমরা ফিরে আসবো, আবার তাঁরা তোমায় দেখতে পাবেন, হয়ত রামাবতীর বরেন্দ্রীর যুবরাজ্ঞীর রূপেই দেখতে পাবেন। কিন্তু তুমি যদি জলে ডুবে মরেই যাও তখন তাঁদের কাছে কে থাকবে শ্রীলতা? সেকি তাঁদের উপর বেশী করে নিষ্ঠুরতা করা হবে না?"

শ্রীলতা এবার সত্যই অভিভূত হইয়া পড়িল। এই গভীরতাভরা প্রিয়প্রেমস্পর্শ, আনন্দময় পৃথিবী ছাড়িয়া কোথায় কোন অনন্ত গভীর রহস্যময় মৃত্যুলোকে— তাও বিভীষিকাময়ী অপমৃত্যু দ্বারা প্রবেশ করিতে এই নবীন যৌবনে, তরুণ জীবনে কার মনে স্পৃহা জাগে? সে রাজাপালের বক্ষে অশ্রুসিক্ত মুখ রাখিয়া অশ্রুস্পন্দিত প্রগাঢ় কণ্ঠে উত্তর করিল,

"আমার ভাল মন্দ আমি তোমারই হাতে তুলে দিয়েছি, যা উচিত বোধ কর, আমার নিয়ে তুমি তাই করো, আর আমি ভাবতে পারচিনে।"

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

বিচিত্রা

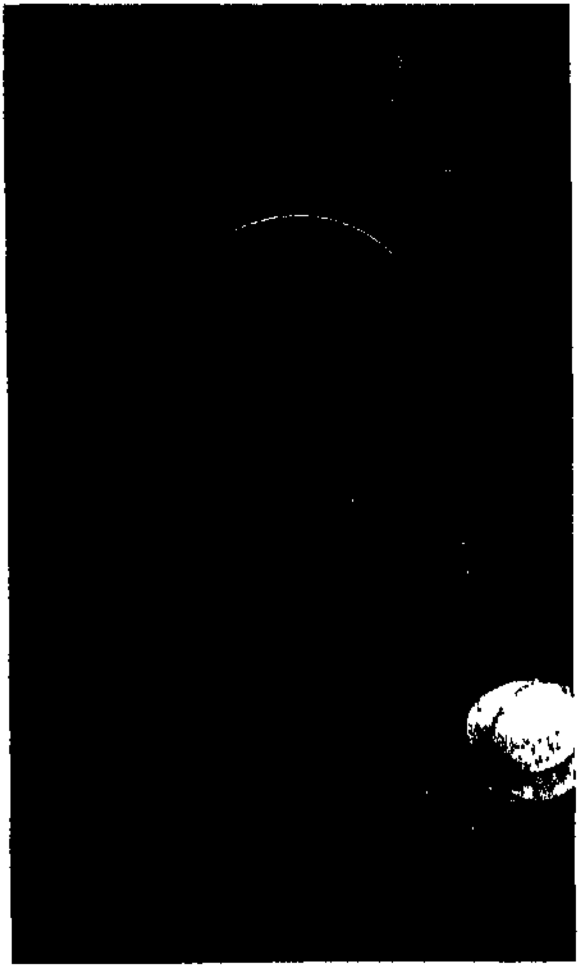
শ্রীযুক্ত প্রমোদকুমার



সিদ্ধার্থ-গোপা

চিত্রশালা

চট্টোপাধ্যায়ের চিত্রাবলী



প্রণব



অশোক



রাণা প্রতাপ



বিরহিণী



চিন্তা



তপোভঙ্গ



কুরুসভায় শ্রীকৃষ্ণ

সত্যাসত্য

শ্রীযুক্ত লীলাময় রায়

৬১

প্রভু কহে, এহো বাহ্য, আগে কহ আর।
রায় কহে, কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ সাধ্য সার॥

বীণা নিবিষ্ট মনে ও বিনম্র স্বরে পাঠ করছে, বীণার খাশুড়ী মালা জপ করতে করতে ব্যাখ্যা করছেন, উজ্জয়িনী স্তব্ধ হয়ে শুনছে। তার চোখে জলের আভাস।

খাশুড়ী বলছেন, "স্বধর্ম্মাচরণ বেশ ভালো জিনিস বৈকি; জীবমাত্রেই নিজ নিজ ধর্ম্ম পালন করলে তবে তো সৃষ্টি থাকবে: কিন্তু ওর ভিতরে একটু কথা আছে মা। সেইজন্যেই গৌরচন্দ্র বললেন এটা বাহ্য। না, না, বাজে নয়, বাজে নয়।"—মুচ্‌কি হেসে আপন মনে বলে যাচ্ছেন, "বাহ্য। তার মানে বাহ্যিক। তুমি আমি স্বধর্ম্মাচরণ করছি কিছু একটা ফল কামনা ক'রে। নিজে সেই ফল ভোগ করবো এই আমাদের অভিলাষ। গৌরহরি বললেন, এ তো বাহ্যিক। এর থেকে গূঢ় কিছু জানো তো বলো। রায় রামানন্দ বললেন, আছে বৈকি প্রভু।"—হাসিমুখে মাথা নেড়ে বলছেন, "আছে। ফলটুকু শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করতে হবে। আমি কাজ করে যাবো, তিনি ফল ভোগ করবেন। আমি রাঁধবো, তিনি খাবেন। আমি ঘর বাঁধবো, তিনি বাস করবেন। আমি ধন সংগ্রহ করবো, তিনিই মালিক হবেন। বুঝলে না, মা!"

উজ্জয়িনী ঘাড় নেড়ে জানাচ্ছে—হাঁ, বুঝেছে।

বীণা আবার পাঠ করছে:—

প্রভু কহে, এহো বাহ্য, আগে কর আর।
রায় কহে স্বধর্ম্মত্যাগ সর্ব্ব সাধ্য সার।

বলছেন, "ওমা আমার কী হবে! বলো কি গৌর, এও বাহ্য? এঁ্যা!"—মুচ্‌কি হেসে বলছেন, "একটু মজা আছে। কর্ম্ম করবো কেন? কী দরকার? যিনি এত বড় জগৎ চালাচ্ছেন তিনি কি আমারই সামান্য কর্ম্মটুকুনের উপর নির্ভর করেন? বলো তো মা। আমি খাওয়ালে তিনি খাবেন, নইলে খেতে পাবেন না, এ কি একটা কথা হলো?"

উজ্জয়িনী ঘাড় নেড়ে জানাচ্ছে—না, তা কি হয়!

খাশুড়ী বলছেন, "মহাপ্রভুকে সন্তুষ্ট করা কি সহজ? কত বড় বড় নৈয়ায়িককে তর্কে পরাস্ত করেছেন যিনি, রায় রামানন্দ কিনা তাঁকে করতে চা'ন পরীক্ষা। ব'লে ফেললেই তো হয় যে, শ্রীরাধার প্রেমই সর্ব্ব সাধ্য সার। না, সে কথাটি বলবার নাম করবেন না। এটা বলবেন, ওটা বলবেন, সেটা বলবেন না! ভারি বুদ্ধিমান লোক, তার সন্দেহ কী! কিন্তু প্রভুর সঙ্গে বুদ্ধির খেলায় কি পারবেন? দেখো তোমরা শেষে তিনি কেমন—না, না, আগে থেকে ব'লে ফেলবো না, মা।"

থেমে বলছেন, "হাঁ, কী বলছিলুম। একেবারে ছেড়ে দিতে হবে। কাজকর্ম্ম ছেড়ে দিতে হবে। তাঁকে বলতে হবে, ঠাকুর, তোমার কাজ তুমি আমাকে দিয়ে করিয়ে নিতে চাও তো করিয়ে নাও। যা তোমার খুশী। আমি তোমাকেই জানি, তোমাকেই ভালোবাসি, তোমাকে ভেবে আনন্দ পাই, তোমাকে দেখে কৃতার্থ মানি। আমাকে খাটিয়ে নিতে চাও তো নাও, কিন্তু আমি তোমার সুমুখ থেকে স্বেচ্ছায় এক পা নড়বো না।"

উজ্জয়িনী এবার বুঝতে পারছে না, কিন্তু সেকথা স্বীকার করতে সংকোচ বোধ করছে। খাশুড়ী সেটা অনুমান ক'রে বলছেন, "বুঝবে, মা, বুঝবে, ক্রমে বুঝবে। সব কি এক দিনে হয়। তোমার বয়সে আমরা কী অবোধ ছিলুম, কী

পাতকী ছিলুম। তাঁর কৃপা না হলে কি কেউ কিছু বুঝ্‌তে পারে! তোমার উপর তাঁর এমন থেকেই কৃপা দেখে বড়ই আশ্চর্য্য হয়েছি, মা।"

উজ্জয়িনীর চোখ থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ছে। সে দুই হাত বাড়িয়ে দিয়ে বীণার শাশুড়ীর পায়ের ধুলো নিয়ে কী বল্‌তে চাইছে, কিন্তু তার কণ্ঠ বাষ্প-রুদ্ধ। তার হৃদয় ভাবাবেগে আকুল হয়ে তার চোখ দিয়ে ঝর্ণার মতো ফুটে বেরচ্ছে ছুটে বেরচ্ছে।

শাশুড়ী বল্‌ছেন, "থাক্‌, মা, থাক্‌। হয়েছে, খুব হয়েছে। পাগ্‌লী মী আমার। কত বড় লোকের মেয়ে, কত বড় লোকের বৌমা, কিন্তু কী চমৎকার স্বভাব! ঠিক যেন একটি পল্লীবধূ!"—তিনি উজ্জয়িনীর চিবুক স্পর্শ ক'রে সেই হাত নিজের মুখে ছোঁয়ালেন।

রোজ দুপুরে উজ্জয়িনী বীণাদের বাড়ী যায়। ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ হয়। কোনোদিন শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, কোনোদিন শ্রীভক্তমাল গ্রন্থ, কোনোদিন শ্রীপদকল্পতরু। এমন জিনিষ পৃথিবীতে ছিল সে জান্‌ত না। এতদিন কেউ তাকে জানায় নি বলে সকলের উপর তার অভিমান—বাবার উপর, স্বামীর উপর, সুধীদার উপর। ওঁরা নিজেরাও যেমন বঞ্চিত উজ্জয়িনীকেও তেমনি বঞ্চিত ক'রে রেখেছিলেন। কিন্তু ভগবান তো আছেন, তিনি উজ্জয়িনীর উপর কৃপা ক'রে বীণাকে ও বীণার শাশুড়ীকে পাঠিয়ে দিলেন। করুণাময়ের করুণা! যতদিন তাঁর করুণা না হয় ততদিন বঞ্চিত থাকা ছাড়া উপায় কী!

দিবারাত্র একটা আবেশের মধ্যে বাস করে—স্নান করে, আহার করে, আলাপ করে, চিন্তা করে, ধ্যান করে, শয়ন করে। অকারণে তার মন কেমন করে, কারো জন্য নয়, এমনি। চোখ দিয়ে হু হু করে গরম জল উথলে পড়ে, দেহে রোমাঞ্চ লাগে, পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত তড়িৎ রেখা ছুটে যায়। বীণার শাশুড়ীর পায়ের ধুলো নিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা কর্‌বে ভাবে কিন্তু লজ্জায় পারে না—"মা, হবে তো? আমার মুক্তি হবে তো? অধম পাতকী আমি, মূঢ়মতি দুর্ম্মতি!"

বীণা সেদিনকার মতো পাঠ শেষ করছে:—

প্রভু কহে, এই সাধ্যাবধি সুনিশ্চয়।
কৃপা করি কহ যদি আগে কিছু হয়॥
রায় কহে, ইহার আগে পুছে হেন জনে
এতদিন নাহি জানি আছয়ে ভুবনে॥
ইহার মধ্যে রাধার প্রেম সাধ্য শিরোমণি।
যাহার মহিমা সর্ব্ব শাস্ত্রেতে বাখানি।"

শাশুড়ি সগর্ব্বে বল্‌ছেন, "কেমন, মা, শুন্‌লে তো? শুন্‌লে তো রায় নিজ মুখে স্বীকার কল্লেন যে প্রভুর সঙ্গে এ ভুবনে কেউ পারবে না। কাল শুনো রায় আবো কী বল্‌লেন। সে ভারি মজা। একেবারে নাকে খৎ যাকে বলে। কী বল্‌লেন, আমি কিছুই না জানি। যে তুমি কহাও সেই কহি আমি বাণী।"

শাশুড়ী জোরে হেসে উঠ্‌ছেন। বীণা বাধ্য হয়ে হাসির ভাণ করছে। এত বড় একটা তামাসার কথা, না হাস্‌লে অপদস্থ হতে হয়। কিন্তু উজ্জয়িনী হাস্‌তে পারছে না। সে ভাবছে শ্রীরাধার প্রেম কি মানুষে সম্ভব? জীব যতদিন শ্রীরাধার মতো প্রেমিক না হয়েছে ততদিন কি তার মুক্তি সম্ভব?

শ্রীরাধার কথা ভাব্‌তে তার কী যে ভালো লাগে। পদাবলীর শ্রীরাধার সঙ্গে ইতিমধ্যে তার পরিচয় হয়েছে। "ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবনি অবনী বহিয়ে যায়," "রাধার কী হৈল অন্তরে ব্যথা", "সই, কেবা শুনাইল শ্যাম নাম," ইত্যাদি তার মুখস্ত হয়ে গেছে। গান তার আসে না। তবু যখন একা থাকে তখন আপন মনে গুণ গুণ ক'রে গায়। বেচারি রাধিকার জন্যে তার শোক উথলে ওঠে। যে কৃষ্ণ তাঁকে এত ভালোবাস্‌লেন ও ভালোবাসালেন সেই কৃষ্ণ কিনা একদিন তাঁকে ফেলে মথুরায় চলে গেলেন। আর ফিরে এলেন না। রাধার দুঃখ জানাবার জন্যে ব্রজের নাকি গোপবালকরা অবশেষে তাঁর কাছে গেছ্‌ল। তিনি নাকি তাঁদের চিন্‌তেই পার্‌লেন না, পারবেন কেন তিনি যে তখন মথুরার রাজা!

নিজের জীবনের সঙ্গে রাধিকার জীবন মিলিয়ে উজ্জয়িনীর ব্যথা দ্বিগুণ হয়। বাদল কি কোনোদিন বিলাত থেকে

ফিরবে? উজ্জয়িনী যখন শ্বশুরের সঙ্গে বিলাত যাবে তখন তাকে কি বাদল স্ত্রী ব'লে স্বীকার করবে?

উজ্জয়িনীর চিন্তার জল কোথা থেকে কোথায় গড়ায়!

৬২

উজ্জয়িনী তার বাবাকে ভোলেনি। সে নিজে যে আনন্দ পাচ্ছিল তার বাবাকে—শুধু তার বাবাকে কেন, বিশ্বের সব সংশয়বাদীকে—সেই আনন্দের বার্ত্তা দেবার জন্যে ব্যাকুল হয়েছিল। তার সংশয় ছিল না যে অন্যান্য সংশয়বাদীরাও তারই মতো আবিষ্কারের আনন্দে আত্মহারা হবে এবং উদ্ভ্রান্ত হয়ে হরিসংকীর্ত্তনে নাম্‌বে। তাই তার বাবাকে অতি গদ্‌গদ ভাবে তার অভিনব অভিজ্ঞতার সংবাদ দিয়েছিল। উত্তরে তিনি লিখেছেন ;—

মা, তোর দিদিদের আচরণ আমাকে তেমন ব্যথিত করে নাই কোনোদিন, তোর এই শোচনীয় অধঃপতন আজ যেমন করিতেছে। ছি ছি খুকী, তুই করিতেছিস্ কী, হইয়াছিস্ কী! এতদিন তোকে হাতে গড়িলাম, তোর মনটা যাহাতে সম্পূর্ণ সংস্কারমুক্ত হয় তাহার জন্য তোকে শিশু বয়স হইতে বিজ্ঞানশিক্ষায় ব্রতী করিলাম, যুক্তি এবং তথ্য এই দুই অশ্বকে দিয়া তোর কৈশোরের রথ পরিচালন করিলাম সারথি স্বয়ং আমি। আজ দেখি তুই শত্রুপক্ষের শিবিরে ভাবাবেশে ধেই ধেই করিয়া নাচিতেছিস্, অবসাদে ঢলিয়া পড়িতেছিস্ অশ্রুরসে গলিয়া পড়িতেছিস্। ধিক্!

তোর মধ্যে আমার সনাতন স্বদেশের সনাতন দুর্ব্বলতাকে প্রত্যক্ষ করিয়া আমার আর কিছুতে মন বসিতেছে না। দূর হউক, কী হইবে এ দেশে দর্শন-চর্চ্চা, বিজ্ঞানচর্চ্চা, বিশুদ্ধ যুক্তি তথ্যের উপাসনা, scientific attitude! রক্তের মধ্যে নেশার প্রতি টান ইংরাজের ডাণ্ডা খাইয়া ঠাণ্ডা হইয়া আসিতেছিল কিন্তু ইংরাজ তো স্থায়ী হইবে না, কাল উহারা গেলে পরশু আমরা তন্ত্র মন্ত্র পুরাণ লইয়া বোতল হাতে-করা মাতালের মতো বুঁদ হইয়া যাইব, চুর হইয়া যাইব। ইংরাজী শিক্ষা যে আমাদিগের রক্তে মিশে নাই তাহার প্রমাণ তো ভূরি ভূরি দেখিতেছি। বৃথাই এতদিন এত ইন্‌জেকশন লওয়া, দুর্ব্বলতা তো জীবাণু নহে যে ইন্‌জেকশনে মরিবে।

হতাশ হইয়া গিয়াছি, খুকী। তুই যদি ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ তবে ভারতবর্ষের অতীত কে!

বাদলের উপর এখনো আমার ভরসা আছে। সেই হয় তো এই মরা দেশে ভাগীরথীর ধারা আনিবে। যতটুকু তাহার সঙ্গে আলাপ করিয়াছি, করিয়া আশান্বিত হইয়াছি। টাকা সিকি আধুলি দুয়ানি কোনো কিছুকে সে না বাজাইয়া লয় না, যতই হউক না কেন তাহার বাজার দর, যতই থাকুক না কেন তাহার উপর রাজার মাথার ছাপ। মানি না বলিতে পারা সহজ, আজকালকার অনেক ছেলে তো কিছু মানে না। কেন মানি না, তাহার কারণ দর্শাইতে পারে একমাত্র বাদল। বাদল যেমন মানে না তেমনি মানেও। বিচার ফল, পরীক্ষা ফল, গবেষণার ফল তাহার কাছে আসল টাকার মতো দামী।

বাদল হয় তো জীবনে কিছু করিয়া যাইতে পারিবে না, আমাদের দেশে আমরা কাহাকে কিছু করিয়া যাইতে দিই না, কেবল বিবাহ চাকুরি ও বক্তৃতা ছাড়া। আমার জীবন যেমন স্ত্রী-কন্যার স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে ব্যয়িত হইল উহার জীবনও হয় তো তেমনি ব্যর্থ যাইবে। বড় জোর চাঁদা দিয়া দুই চারিজন দরিদ্র ছাত্রকে কলেজে পড়াইবে, দুই একটা ইস্কুল কি লাইব্রেরী কি হাঁসপাতাল বসাইবে, সরকারী চাকুরে হইয়া খদ্দর পরিয়া তাক লাগাইয়া দিবে। এমনি করিয়া তাহার নিজের জীবন আমাদিগের শিক্ষিত সাধারণের জীবনের মতো ট্র্যাজিক হইবে। না, না, ট্র্যাজেডী অত সস্তা নয়, অত একঘেয়ে নয়, আমাদের ব্যর্থতা লইয়া কোনো কবি ট্র্যাজেডী লিখিবেন না। বীরত্বের ব্যর্থতা লইয়া ট্র্যাজেডী, স্থবিরত্বের ব্যর্থতা লইয়া প্রহসন। আমরা মনের দিক দিয়া জন্ম স্থবির। ছাত্র জীবনে দু'দিনের জন্য দপ করিয়া উঠি, চাকুরী জুটিলে বিবাহ করিয়া নিভিয়া যাই।

তবু বাদলের উপর আমার একটুকু ভরসা আছে যে সে কিছু না করিতে পারুক তাহার scientific attitudeটিকে

সারা জীবন জীয়াইয়া রাখিবে। উহা বড় কম কঠিন কাজ নহে, উহাই তো সত্যকারের দেশের কাজ। আমার স্বপ্নের ভারতবর্ষে অন্নবস্ত্রের অভাব হয় তো ঘুচিবে না, দারিদ্র্য এই রকমই লাগিয়া থাকিবে। কিন্তু ভারতবর্ষের মানুষ পর্য্যবেক্ষণ করিবে পরীক্ষা করিবে সিদ্ধান্ত গড়িবে সিদ্ধান্ত ভাঙিবে, কোনোরূপ সহজ মীমাংসাকে প্রশ্রয় দিবে না, প্রত্যেক স্বতঃসিদ্ধকে সন্দেহ করিবে। যখনি অলৌকিক কিছু দেখিবে বা শুনিবে অমনি একবার ডাক্তারকে দিয়া চক্ষু বা কর্ণ পরীক্ষা করাইয়া লইবে। ম্যাজিককে প্রাণপণে ঘৃণা করিবে, miracleকে যতদিন না নিজে ঘটাইতে পারে ততদিন হাসিয়া উড়াইয়া দিবে। তাহা বলিয়া কেবল বৈনাশিক হইবে না, অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত শাস্ত্রগ্রন্থ পড়িবে ও ঈশ্বরভক্তকে প্রণাম করিবে। তবে ইহাও সমস্তক্ষণ মনে রাখিবে যে অল্প বয়সে কোনো নদীর গভীরতা নির্ণয় করিতে নামা নিরাপদ নহে। বড় হইয়া বৈজ্ঞানিক শিক্ষার দ্বারা মনকে মজবুৎ করিয়া পাকা ডুবারীর মতো আধ্যাত্মিকতার সমুদ্রে অবতরণ করিবে। দর্শনের সঙ্গে ভক্তির, যুক্তির সঙ্গে সংস্কারের, নীতির সঙ্গে লোকাচারের ও জ্ঞানের সঙ্গে পারলৌকিক পাটোয়ারীবুদ্ধির গোঁজামিলন দেখিতে দেখিতে বুড়া হইয়া গেলাম। যেমন প্রাচীন ভারত তেমনি আধুনিক ভারত—গোঁজামিলনের দুই বিরাট ওস্তাদ। গোঁজামিলনকে সমন্বয় নাম দিয়া বিবেকানন্দের দল বেশ কিছুদিন কালোয়াতীর আসর জমাইলেন। এতদিনে ইঁহারা ইঁহাদিগের যথোপযুক্ত কর্ম্ম পাইয়া গেছেন। সেটা দরিদ্র নারায়ণ সেবা। ইঁহাদিগের পূর্ব্বে ব্রাহ্মরা উপনিষদের সহিত বাইবেলের ও উভয়ের সহিত পাশ্চাত্য দর্শনের গোঁজামিলন ঘটাইয়া চমক লাগাইয়া দিয়াছিলেন; ক্রমে হৃদয়ঙ্গম করিলেন যে সমাজ-সংস্কারই তাঁহাদিগের প্রকৃত কাজ। আমার পিতা আনুষ্ঠানিকতা পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধমাত্র সংস্কার কার্য্যে ব্রতী হইলেন।

আজ ভারতবর্ষের দক্ষিণ উপকূল হইতে কী এক উদ্যমের বার্ত্তা কানে আসিতেছে। কামনা করি তাহা গোঁজামিলনের অতীত হউক। তবু দেশের মাটীর উপর সন্দেহ ধরিয়া গিয়াছে, খুকী। দেশের জল বাতাস মানুষকে পুরাদমে খাটিতে দেয় না। মানুষ চালাকি দিয়া ফাঁকি পোষাইয়া দিতে বাধ্য হয়। এখনি তো শুনিতেছি উঁহারা বিজ্ঞানকে অবজ্ঞা ও করুণা করিতেছেন। বিজ্ঞানের বড় বড় তত্ত্বগুলা নাকি যোগবলে আবিষ্কার করা যাইতে পারে, scientific method-এর নাকি কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। এ সব শোনা কথা সত্য কি না জানি না, সত্য হইলে ভীত হইব। চিরকাল একদল মানুষ লোহাকে অবজ্ঞা করিয়া সোনা তৈরি করিবার কৌশল খুঁজিয়াছে। অথচ আজ আমরা জানি লোহা বড় তুচ্ছ ধাতু নহে, লোহা ছিল বলিয়াই এত বড় সভ্যতার বিপুল উপকরণ সম্ভার সম্ভব হইল। নহিলে এঞ্জিন হইত না, যন্ত্র হইত না, রেল হইত না, পুল হইত না, এমন কি সামান্য একটা ছুঁচ হইত না। লোহা এবং কয়লা মিলিয়া সভ্যতাকে এতদূর আগাইয়া দিয়াছে, লোহা এবং পেট্রলিয়াম মিলিয়া আরো অনেক দূর লইয়া যাইবে। তোমার সোনা তো অত্যন্ত সৌখীন ধাতু, উহার কাজ উপকরণ নির্ম্মাণ নয় উপকরণ বিনিময়সৌকর্য্য। তাহাও আজ বেহাত হইয়া কাগজের হাতে পড়িল। পণ্ডিচেরীর alchemistগণ মানবপ্রকৃতির লোহাকে সোনা করিবার প্রক্রিয়া অনুসন্ধান করিতে গিয়া সেকালের alchemistগণের মতো ভ্রান্ত পথে ঘুরিয়া ফিরিয়া শ্রান্ত হইলে পরে "al"-টুকুর মোহ কাটাইয়া শুধু chemist হইবেন। তখন এই লোহাকে ইহার যথাযোগ্য মর্য্যাদা দিয়া ইহার দ্বারা কত কী করাইয়া লইবেন। সোনার দ্বারা এত কিছু করানো যাইত না, সোনার যথার্থ কাজ অলঙ্করণ।

আমি বলি মানব প্রকৃতিকে সকলে এক জোট হইয়া অবজ্ঞা করায় মানব-প্রকৃতির বিকাশ ব্যাহত হইয়াছে। মানুষকে মুক্তি নির্ব্বাণ Salvation ইত্যাদির আশায় বিপথগামী না করিলে মানুষ তাহার বিচিত্র প্রকৃতির অনুশীলন করিতে করিতে এতদিনে পথ পাইয়া যাইত। স্বর্ণযুগের পশ্চাদ্ধাবন যেমন লৌহযুগকে পিছাইয়া দিল, নহিলে দুই হাজার বছর আগে রোটারি মেশিনে বই কাগজ ছাপিয়া বাহির হইত, তেমনি দেবপ্রকৃতির মিথ্যা সম্মোহন মানব প্রকৃতিকে দুই তিন হাজার বছর পিছাইয়া রাখিয়াছে।

আমি বলি মুক্তি-টুক্তি বাজে, উহার জন্য সিকি পয়সা সময় নষ্ট করিতে নাই, মৃত্যুর পরের কথা পরে বুঝা যাইবে, আপাততঃ যতদিন বাঁচিয়া আছি ততদিন যেন মানব-প্রকৃতিকে সহজ চরিতার্থতা দিই—খাই, শুই, কাজ করি, খেলা করি, আবিষ্কার ও উদ্ভাবন করি, আঁকি, লিখি, গাই, বাজাই, নাচি, ঝগড়া করি, সন্ধি করি, ঘরে ডাকিয়া আতিথেয়তা করি, ছুটিয়া যাইয়া সেবা সাহায্য করি, ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে বিশেষ সম্বন্ধ পাতাই ও দু'জনে মিলিয়া বংশরক্ষা করি। "Give human nature a chance"—ইহাই আমার বাণী।

৬৩

পত্রসূত্রে পিতার সঙ্গ পেতে উজ্জয়িনীর বিশেষ ভালো লাগে। তার পিতা তিনি, বন্ধু তিনি, গুরু তিনি। কিন্তু অধুনা তাঁর পত্র উজ্জয়িনীকে পীড়া দিচ্ছে। ছেলের সঙ্গে মতের অমিল হলে মায়ের মনে যেমন পীড়া লাগে। বিশেষতঃ সে মত যদি ধর্ম্মবিশ্বাসসংক্রান্ত হয়। উজ্জয়িনী তার ঘরের দেয়ালে লম্বমান শ্রীকৃষ্ণের প্রতিকৃতিকে বলে, "প্রভু, তুমি রাগ কোরো না, বাবা অতবড় পণ্ডিত হলে কি হয় সার্ব্বভৌমের মতো একদিন পরম ভক্ত হবেন।

'অশ্রু, স্তম্ভ, পুলক, স্বেদ, কম্প থরহরি
নাচে, গায়, কান্দে, পড়ে প্রভু পদ ধরি'।

বেচারা বাবা! কোনোদিন তোমার কৃপা হলো না তাঁর উপর, আপনা থেকে তো কেউ হরিভক্ত হতে পারে না!"

বাবার চিঠি দু'তিনবার পড়লে হয় তো তার মর্ম্ম গ্রহণ করতে পারত। কিন্তু না, পড়তে চায় না, কী হবে প'ড়ে! যারা জন্মান্ধ তারা জন্মান্ধের মতোই তর্ক করবে, সূর্য্য চন্দ্র উড়িয়ে দেবে, তর্কের স্বপক্ষে এমন সব কথা বানিয়ে বলবে যার উত্তরে শুধু একটা দেশলাইকাটি জ্বাললেও ঢের হয়, কিন্তু জন্মান্ধ যে! তার থেকে আলোর সত্যতার প্রমাণ পাবে না। স্বয়ং শ্রীভগবান ছাড়া এদের উদ্ধার করবার ক্ষমতা আর কারো হাতে নেই। মূকং করোতি বাচালং, পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং।

উজ্জয়িনী বীণার শাশুড়ীর ইষ্টদেবতা অষ্টধাতুর গোবিন্দজী মূর্ত্তির সেবা দেখতে যায়। তার শ্বশুর আজকাল প্রায়ই সফরে বেরন, অস্থায়ীভাবে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট হয়েছেন।

ভোর হলো, শাশুড়ী ইতিমধ্যে গঙ্গাস্নান করে এসেছেন, ফুল তুলে এনেছেন। গোবিন্দজীর ঘুম ভাঙল, গোবিন্দজী স্নান করলেন, প্রসাদ সেবন করলেন। এ তাঁর প্রাতর্ভোজন। যথাকালে মধ্যাহ্ন ভোজন হবে, গোবিন্দজী শয়ন করবেন, চামর ঢুলানোর দরকার হবে। অপরাহ্নে তাঁর ঘুম ভাঙলে আর একবার ভোজন। নূতন সজ্জা। ফুলের মালা পরিধান। তারপর তাঁর আরতির সময় হবে। ধূপধুনা জ্বলবে। শাঁখ বাজবে, কাঁসি বাজবে, ঘন্টা বাজবে। স্বয়ং কমলবাবু ঘন্টা বাজাবেন, বীণা বাজাবে শাঁখ, উজ্জয়িনী কাঁসি। গোবিন্দজী কিছুক্ষণ ঢুলবেন। রাত্রিভোজন করবেন। নিদ্রা যাবেন।

উজ্জয়িনী এতদিন জানত বীণারা মাত্র তিনজন মানুষ। তা তো নয়। ওরা চারজন। গোবিন্দজী ওদেরই একজন। তাঁকে ওরা ধাতুমূর্ত্তি বলে ভাবতে পারে না, তিনি যদি ধাতু-মূর্ত্তি হন তবে ওরাই বা এমন কি! ওরাও তো মৃৎপিণ্ড মাত্র। গোবিন্দজী খাচ্ছেন, পাখা হাতে ক'রে হাওয়া করতে হবে, বড় গরম খাবার মুখে দিতে ওঁর নিশ্চয়ই কষ্ট হবার কথা। গোবিন্দজী ঘুমচ্ছেন। চুপ, চুপ, চুপ। জোরে কথা কইলে ওঁর ঘুম ভেঙ্গে যাবে। বাইরে কে ডাকাডাকি করছে, ওকে চুপ করতে বলো তো, ঝি।

প্রতিমা যে কত জীবন্ত, কত সত্য হতে পারে উজ্জয়িনী প্রত্যক্ষ করল। কে বলবে গোবিন্দজীর প্রাণ নেই! আহা দেখলে প্রাণ জুড়িয়ে যায়। কী হাসি, কী চাউনি! মাঝে মাঝে বেশ মনে হয় গোবিন্দজী সব কথা শুনছেন, শুনে টিপে টিপে হাসছেন। শাশুড়ী বলেন, "ও কি কম পাজী! ঐখানে বসেই সমস্ত সৃষ্টি চালাচ্ছে, গোপিনীদের সঙ্গে কেলি করছে শুক-সনকাদি মুনিরা তপস্যা ক'রে ওর দেখা পাচ্ছেন না, ঐটুকুটুকু পা দিয়ে বলি রাজাকে পাতালে চেপে রেখেছে।"

উজ্জয়িনীর কল্পনাচক্ষু স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল পরিক্রম করে,

বৃন্দাবনে আটকে' যায়। আছে, আছে, এখনো বৃন্দাবন ঠিক সেই রকমটি আছে। রাধা তেমনি অভিসারিণী, কৃষ্ণ তেমনি বংশীধারী। কেউ চর্ম্মচক্ষুতে প্রত্যক্ষ করতে পায় না, মানবীয় শ্রুতিপথে শ্রবণ করতে পায় না। তবু কল্পনাবৃত্তির চালনা করলে আভাসটা ইঙ্গিতটা পায়। ভক্তিবৃত্তির চালনা করলে কিছুই অগোচর থাকে না। ধন্য বীণার শাশুড়ী। তিনি দিব্যদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করতেন সৃষ্টি পরিচালন, বৃন্দাবনলীলা, শুক-সনকের তপস্যা, বলির প্রতি ছলনা! কী সাহস তাঁর, বলেন কি না "পাজী!" ভক্তি কত বেশী হলে সাহস এত বেশী হয়!

এই উপলব্ধির কাছে দরিদ্রসেবা, সমাজ সংস্কার, দেব প্রকৃতি পরিগ্রহ, দেশের স্বাধীনতা, বৈজ্ঞানিক মনোভাব—সব তুচ্ছ, সব উপেক্ষণীয়। সারাক্ষণ তাঁকে দর্শন করতে স্পর্শ করতে সেবা করতে চাই। অন্য কিছু করবার জন্যে সময় কই? উজ্জয়িনীর ঘুম মাঝ রাত্রে ভেঙে যায়, ভোর হ'তে আর কত দেরি? ফুল তুলতে হবে যে! গঙ্গাস্নানে যাবার জো নেই, শ্বশুর শুনতে পেলে বকবেন, ভোরবেলা স্নান করে উঠলে ঠাণ্ডা লেগে যাবে। ভারি তো ঠাণ্ডা লাগা। লাগুক না একটু। ঠাণ্ডা লাগলেই যদি নিমোনিয়ায় দাঁড়াতো, আর নিমোনিয়া হলেই যদি মরণ হতো তা হলে দুনিয়া উজাড় হয়ে যেতো। আর মরণ হলেই বা কী! কৃষ্ণনাম জপ করতে করতে মরবে, বৃন্দাবনে গোপী হয়ে জন্মাবে, গোপীরা তো মুক্ত হয়েই আছে, মুক্তির ভাবনা করতে হবে না।

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

সন্ধ্যাতারা

শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় দেব

১

সন্ধ্যাতারা, সন্ধ্যাতারা,
সাঁঝের বেলায় ঝিকিমিকি, কেন অমন আঁখিঠারা ?
তোমার চোখের গোপন ভাসে,
কী যে স্বপন ভেসে আসে,
কোন অজানার মিলনরসে চিত্তে বহে সুধার ধারা,
আবেশ ভরা সুধার ধারা,
মন্দাকিনীর সুধার ধারা ।

২

সন্ধ্যাতারা, সন্ধ্যাতারা,
কেন অমন চেয়ে থাকো, আমার পানে উদাসপারা ?
তোমার চোখের গভীর আলো,
ঘরের কথা সব ভুলালো,
কোন বিরহের ব্যথার নেশায় আকুল তোমার আঁখিতারা,
পাগলকরা আঁখিতারা,
করুণ উজল আঁখিতারা ।

৩

সন্ধ্যাতারা, সন্ধ্যাতারা,
তোমার হাসি হাওয়ায় ভাসি কোন অমরার দেয় ইসারা ?
সেথায় কিগো কুঞ্জবনে,
খেলে সবাই আপন মনে,
চেয়ে থাকে প্রিয়ের পানে, তোমার মতোই নিমেষহারা ?
পুলকঝরা সন্ধ্যাতারা,
পলকহারা সন্ধ্যাতারা ।

৪

সন্ধ্যাতারা, আমার প্রিয়া,
তোমার গানের নীরব সুরে জাগলো আমার সুপ্ত হিয়া,
সাঙ্গ হলে হেথার মেলা,
প্রভাতকালে যাবার বেলা,
চুমার ছলে কপোলতলে যেয়ো তোমার পরশ দিয়া,
বিদায়বিধুর পরশ দিয়া
উষার শীতল পরশ দিয়া ।



মেটারলিঙ্ক পরিচয়

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র রায়

মরিস্ মেটারলিঙ্কের নাম বিশ্বসাহিত্যে আজ সুপরিচিত। তিনি ১৯১১ খৃষ্টাব্দে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক বলিয়া নোবেল প্রাইজ পাইয়াছিলেন। প্রবাসী পত্রিকায় তাঁহার নাটক বোধ করি দুখানি অনূদিত হইয়াছিল, 'সাহিত্যেও' বহুপূর্ব্বে তাঁহার প্রবন্ধ অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করা হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে তিনি যে আমাদের নিকট বিশেষ কোন বিস্ময় ও আনন্দ বহন করিয়া আনিতে পারিয়াছিলেন এমন মনে হয় না। যাঁহারা ইংরাজী সাহিত্যের খবর রাখেন—তাঁহাদের নিকটও মেটারলিঙ্কের খুব সমাদর হয় নাই; তাহার কারণ মেটারলিঙ্ক অপূর্ব্ব কবিত্বশক্তিসম্পন্ন হইলেও তাঁহার ভাব সহজবোধ্য নহে। অনুভবের গভীরতা হইতে তাঁহার রচনা উৎসারিত হইয়াছে, গভীর অনুভব বস্তুটি সহজলভ্য নহে, এই জন্যই মেটারলিঙ্কের লেখা সকলে বুঝিতে পারেন না। এই জন্য মেটারলিঙ্কও রবীন্দ্রনাথের মত 'মিষ্টিক' আখ্যা পাইয়াছেন।

প্রথমতঃ মেটারলিঙ্কের একটুখানি বাহিরের পরিচয় দিয়া পরে ভাবের দিক দিয়া মেটারলিঙ্কের যেটুকু পরিচয় পাইয়াছি তাহা ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিব। ভাবের দিকের পরিচয়কেই সাহিত্যক্ষেত্রে সত্যকার পরিচয় বলিয়া স্বীকার করিলেও বাহিরের পরিচয়ের জন্যও একটা মানবীয় কৌতূহল থাকিয়া যায়। সংক্ষেপে এই কৌতূহল মিটাইয়া লইয়া মেটারলিঙ্কের ভাবলোকে যাত্রা করিবার সঙ্কল্প রহিল।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ২৯শে আগষ্ট মরিস্ মেটারলিঙ্ক বেলজিয়মের অন্তর্গত (Ghent) ঘেণ্ট সহরে জন্মগ্রহণ করেন। বেলজিয়ম ও হল্যাণ্ড এদুটি দেশের অপর নাম Netherlands অর্থাৎ নিম্নভূমি; এই দুটি অতি ক্ষুদ্র দেশ ফ্রান্স ও জার্ম্মাণীর উত্তর সীমান্তে সমুদ্রোপকূলে অবস্থিত; উপকূলে না বলিয়া সমুদ্রের মুখের ভিতর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বড় বড় বাঁধ বাঁধিয়া এই দুটি দেশ সমুদ্রের কবল হইতে আত্মরক্ষা করিয়া বাঁচিয়া আছে। মানবশক্তি যেন কোন রকমে দুর্দ্দম সাগরের শক্তিকে ঠেলিয়া রাখিয়াছে। কখন্ যে তাহার প্রচণ্ড আবির্ভাবে সব ভাসিয়া যাইবে কে বলিবে? এমনই দেশের কবি যে চেতনার জাগরণের সঙ্গে সঙ্গেই মানবজীবনকে অসীম ও অবাধ রহস্যময় শক্তির নিষ্ঠুর লীলাভূমি বলিয়া দেখিবেন ইহা আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হয় না।

ইহার উপর বিশেষ ভাবে ঘেণ্টের পারিপার্শ্বিক দৃশ্য এবং বাল্য ও শৈশবের শিক্ষা মিলিয়া মেটারলিঙ্কের তরুণ মনে যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে মেটারলিঙ্কের নাটকের ভাবোন্মেষের অনেকটা কারণই বুঝিতে পারা যাইবে।

ঘেণ্ট সহরটি খুব বড় নহে; বর্ত্তমানে ইহা ব্যবসার কেন্দ্র হইলেও মধ্যযুগের বেশটিকে সে এখনও বর্জ্জন করিতে পারে নাই। হল্যাণ্ডের শেল্ট (Scheldt) নদীর তীরে টার্ণিউজেন (Ternrwzen) পর্য্যন্ত এখান হইতে জাহাজ চলিবার একটি খাল আছে। মেটারলিঙ্কের শৈশবকাল ইহারই তীরে কাটিয়াছে

এই সহরটির চারিদিক ঘিরিয়া সাত আট মাইল ব্যাপী প্রাচীর রহিয়াছে; সাতটি বৃহৎ ফাটকের মধ্যে দিয়া এই সহরে প্রবেশ করিবার পথ। অনেকগুলি খাল এই সহরের মাঝ দিয়া যাওয়ায় সহরটি ২৬টি খণ্ডদ্বীপে পরিণত হইয়াছে। মধ্যযুগের প্রাচীন অন্ধকারাচ্ছন্ন দুর্গ, সেকেলে উচ্চ মিনার (watch tower) স্রোতহীন কৃষ্ণবর্ণ জলপ্রণালী, মধ্যযুগের বড় বড় ফাটক, প্রাচীর

যেরা সন্ন্যাসীদের মঠ, (যেমন, Grand Beguinage) নিস্তব্ধ ম্লানান্ধকার গির্জ্জা, সরু গলির দুপাশে বহুপ্রাচীন ঝুঁকিয়া-পড়া, পরিত্যক্তপ্রায় প্রাসাদ শ্রেণী এবং নিরানন্দ হাঁসপাতাল—এই সমস্ত মিলিয়া, কবি এবং চিত্রকরের দৃষ্টির সম্মুখে ঘেণ্ট মধ্যযুগের একটি পরিত্যক্ত, নিস্তব্ধ, নিদ্রামগ্ন এবং ভীতিসমাচ্ছন্ন নগরের বেশ লইয়া দাঁড়ায়। ঘেণ্ট মেটারলিঙ্কের উপর কি ভাবের প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল বুঝিতে হইলে আমাদিগকে এই চিত্রটি মনে রাখিতে হইবে। কারণ মেটারলিঙ্কের শৈশব ও যৌবন এইখানেই অতিবাহিত হইয়াছিল। ইহার উপর বেলজিয়মের বিস্তীর্ণ জলাভূমির, পাইন বনানীর অন্ধকারাচ্ছন্ন নীরবতা বৃক্ষচ্ছায়াচ্ছন্ন রাজপথের (aveneu) জনকোলাহলহীন নিস্তব্ধ সৌন্দর্য্য, সামুদ্রিক কুয়াসাচ্ছন্ন প্রকৃতির গুমস্তভাব এবং সমুদ্রের অশ্রান্ত কল্লোলের রহস্যময় ভাষা—যে মেটারলিঙ্কের চিত্তকে এক অপূর্ব্ব স্বপ্নরাজ্যের জ্যোৎস্নামগ্ন নীরবতার মধ্যে টানিয়া লইত, তাহার অন্তর যে কোন্ অজানিত রহস্যলোকের ভীতি ও বিস্ময় অনুভব করিত ইহাতে বিস্মিত হইবার কি আছে? এক এক সময় মনে হয় যেন ঘেণ্টের পারিপার্শ্বিক বিশ্বসৌন্দর্য্যেরই একমাত্র স্বাভাবিক বাণী মূর্ত্তিমতী হইয়া মেটারলিঙ্কের রচনায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। মেটারলিঙ্কীয় নাটকের atmosphere সৃষ্টির আলোচনায় মেটারলিঙ্কের চিত্তের উপর এই বহিঃসৌন্দর্য্যের প্রভাবটি আরও স্পষ্ট করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিব।

মেটারলিঙ্ক প্রথম জীবনের সাত বৎসর সাঁবার্ব কলেজে (College of St. Barbe) শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। এই কলেজটি খৃষ্টান জেসুইট (Jesuit) পাদ্রীদের দ্বারা পরিচালিত বলিয়া ইহার শিক্ষা দীক্ষা সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতাপূর্ণ; বিশেষতঃ এখানকার অধিকাংশ বালকই ভবিষ্যতে পাদ্রী হইবার জন্য শিক্ষা-প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই জন্য এখানকার স্কুল-জীবন নিতান্তই শুষ্ক এবং কঠোর ছিল। যাহাদিগকে ভবিষ্যতে ধর্ম্মযাজক হইয়া ধর্ম্মোপদেশ দিতে হইবে এবং মৃত্যু ও শয়তানের ভয় দেখাইয়া, জীবনের শত বিচিত্র আনন্দ প্রেরণাকে মোহের ছলনা বলিয়া বুঝাইয়া যাহাদিগকে মানুষের মধ্যে ধর্ম্মবুদ্ধি এবং অনুতাপ জাগাইয়া তুলিতে হইবে তাহাদের শিল্প এবং সাহিত্য আলোচনা যে বিষবৎ অনিষ্টকর একথা পাদ্রী-কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষভাবেই জানিতেন। মেটারলিঙ্ক যখন যৌবনে পা দিয়াছেন—তখন বেলজিয়মের সাহিত্যে একটা নবজাগৃতির সূচনা হইয়াছে। নবজাগ্রত সাহিত্য তখন নবীন উৎসাহে আপনার আনন্দকে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। La Jeune Belgique পত্রিকাখানির মধ্য দিয়া তখন এই জাগরণের সঙ্গীত ফুটিয়া উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে। সাঁবার্ব কলেজের দেয়াল এ সঙ্গীতকে ফিরাইয়া দিতে পারে নাই। অদৃষ্টের এমনই পরিহাস যে কর্ত্তৃপক্ষের ঘোরতর অসম্মতি সত্ত্বেও নবীন বেলজিয়মের কয়জন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক এখান হইতেই বাহির হইয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে দুইজন মেটারলিঙ্কের সহপাঠী ছিলেন (১৮৮৩ খৃঃ), ইঁহাদের নাম লোবের্ঘ (Lerberghe) এবং গ্রেগোয়ার ল' রয় (Gregoire Le Roy)। পরবর্ত্তী জীবনে ইহারা মেটারলিঙ্কের সাহিত্যিক বন্ধু হইয়া দাঁড়ান এবং উপরোক্ত পত্রিকার লেখক বলিয়া পরিচিত হন। স্কুলে থাকিবার সময় কিন্তু অতি সঙ্গোপনে চুরি করিয়া ইহারা এই পত্রিকাপাঠ সম্পন্ন করিতেন। চুরি করিয়া বাগানের যে ফলটি খাওয়া যায়, তাহার স্বাদ ক্রীত ফলের স্বাদ হইতে যে অনেক বেশী মধুর এ কথা নীতিবিদ্ অস্বীকার করিলেও সত্য; বোধ করি এই জন্যই অভিসারিকার প্রেমের মত গোপনলব্ধ সাহিত্যরস এই তরুণ যুবক কয়টিকে একটু বেশী রকমেই মুগ্ধ এবং আকৃষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল। যৌবনের সহজ আনন্দ ও স্ফূর্ত্তিকে রুদ্ধ করিয়া রাখা যে একটা নিদারুণ শাস্তি এ কথা মেটারলিঙ্ক মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়াছিলেন। মিসেস্ মেটারলিঙ্ক বলেন "সাঁবার্ব কলেজের জেসুইট পাদ্রীদের সঙ্কীর্ণতাময় শাসনের অত্যাচার মেটারলিঙ্ক কখনও ক্ষমা করিবেন না··· আমি প্রায়ই তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি যে প্রথম জীবনকে ফিরিয়া পাইতে হইলে যদি সেই সঙ্গে তাঁহার স্কুলের সাত বৎসরও ফিরিয়া আসে, তাহা হইলে তিনি সে জীবন চান না। তিনি প্রায়ই বলিয়া থাকেন যে ক্ষমার অতীত একটি মাত্র অপরাধ আছে; শিশুর হাসিকে যাহা নষ্ট করে,

তাহার আনন্দকে যাহা বিষাক্ত করিয়া তোলে, তাহাই সেই অপরাধ"।

চিকিৎসাশাস্ত্রের দিকে বিশেষ আকর্ষণ সত্ত্বেও পিতামাতার ইচ্ছায় বাধ্য হইয়া ইঁহাকে আইন পড়িতে হয়। ঘেণ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন ক্লাসে আসিয়া মেটারলিঙ্ক আবার তাঁহার সহপাঠী লোবেয়ার্ঘ এবং গ্রেগোয়ার ল' রয়ের সাক্ষাৎ পাইলেন; আর একজনের সহিত তিনি এখানে পরিচিত হইলেন (১৮৮৫ খৃঃ), তিনি কবি এমিল ভেরহারেন (Emile Verharen); ইনি বয়সে মেটারলিঙ্কের চেয়ে বছর সাতেকের বড়। বর্ত্তমানে ইনি বেলজিয়মের একজন শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া বিবেচিত। আইন অধ্যয়নের উদ্দেশ্যে ২৪ বৎসর বয়সে মেটারলিঙ্ক যখন প্যারিস যাত্রা করিলেন তখন তিনি অল্প স্বল্প triolet কবিতা এবং গদ্য লিখিয়া সাহিত্য সাধনার সূত্রপাত করিয়াছেন মাত্র। প্যারিসের পথে সাথী জুটিলেন বন্ধু গ্রেগোয়ার ল' রয়। দুই বন্ধু মিলিয়া আইন চর্চ্চা যে কতদূর করিয়াছিলেন তাহা বলা যায় না।

কিন্তু আমরা জানি যে এই ল'রয় মেটারলিঙ্ককে লইয়া প্যারিসের সাহিত্যিক সমাজে মেলামেশা আরম্ভ করেন, এবং এই মেলামেশার ফলেই মেটারলিঙ্ক Villiers de l' Isle Adam প্রভৃতি সাহিত্যিকগণের সহিত পরিচয়সূত্রে আবদ্ধ হন। ইঁহাদের মধ্যে Villiers এর প্রভাব মেটারলিঙ্ক নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। গ্রেগোয়ার ল' রয় মেটালিঙ্কের তরুণ রচনা Massacre of the Innocents খানি প্যারীর উক্ত সাহিত্যিকদের নিকট পড়িয়া শোনান। এবং এই পরিচয়ের ফলে এই কয়েকটি তরুণ সাহিত্যিক ১৮৮৬ সালের মার্চ্চ মাসে (La Pleiade) লা প্লিয়াদ নাম দিয়া একখানি পত্রিকা প্রকাশ করিলেন; কাগজখানা কিন্তু বেশী দিন বাঁচিয়া থাকিতে পারিল না, ছয়খানি সংখ্যা মাত্র ইহার প্রকাশিত হইয়াছিল। অল্পায়ু হইলেও কিন্তু সিম্বলিজম্-পন্থীদের ইতিহাসে এই কাগজখানার নাম বাদ পড়িবে না। এই কাগজেই মেটারলিঙ্কের উপরোক্ত রচনাটি এবং পরে Serres Chaudes পুস্তকে সংগৃহীত কবিতাগুলি প্রকাশিত হয়। এই সময় মেটারলিঙ্ক 'সিম্বলিজম্' মতবাদটাকে অতিমাত্রায় আঁকড়াইয়া ধরেন; তাহার ফলে তাঁহার সাহিত্য-সাধনা কিরূপ পরিণতি প্রাপ্ত হয় পরে তাহার আলোচনা করা যাইবে।

আইন শিক্ষা হইল; ছয়মাস পরে (১৮৮৭খৃঃ) ঘেণ্টে ফিরিয়া আসিয়া মেটারলিঙ্ক আইন ব্যবসা আরম্ভ করিলেন; অপরদিক দিয়া 'লা জন বেলজিকে' লেখা আরম্ভ করিলেন। ১৮৮৯ সালে তাঁহার Serres Chaudes প্রকাশিত হইল বটে—কিন্তু আইন-জীবন এইখানেই অবসান লাভ করিল। এ কাজটা তাঁহার সহিল না। তাহার একটি কারণ, গলাবাজি করার শক্তি হইতে বিধাতাই তাঁহাকে বঞ্চিত করিয়াছিলেন। কণ্ঠস্বর তাঁহার একদিকে যেমন কর্কশ, অপর দিকে তেমনি মৃদু হওয়ায় ওকালতীর মত বাজি জিতিবার সম্ভাবনা তাঁহার একটুও ছিলনা,—তাছাড়া স্বভাবটি আবার তাঁহার নিতান্ত লাজুক ধরণের ছিল। নিঃসঙ্গ নির্জ্জনে থাকিতেই তিনি ভালবাসিতেন, লোকসঙ্গ তিনি মোটেই পছন্দ করিতেন না। কিন্তু তাই বলিয়া যদি কেহ মনে করিয়া বসেন যে মেটারলিঙ্ক নিতান্ত বিষণ্ণভাবে ঘরের কোণে বসিয়া থাকিতেন—তাহা হইলে ভুল করিবেন। ওকালতী ছাড়িয়া ঘেণ্টের অনতিদূরে উষ্টাকের (Oostaker) বাগানবাড়ীতে আশ্রয় লইয়া তিনি যেমন নিবিষ্ট মনে সাহিত্যচর্চ্চা করিতে লাগিলেন,—তেমনি মৌমাছি-পালন, নৌকাবিহার, বাইসিকেল ও মোটর ভ্রমণ ইত্যাদিও চলিতে লাগিল। একজন লেখক মেটারলিঙ্কের এই সময়কার বাসস্থান বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে উহা অনেকটা তাঁহার Les Sept Princesses 'লে সেৎ প্রাঁসেস্' নাটকের দৃশ্যের মত, 'a land of marshes, of pools, and of oak and pine forests,' জলাভূমি, ওক এবং পাইন-বনানীর দেশ।

এই ১৮৮৯ সালেই এমন একটা কাণ্ড ঘটিল, যাহাতে মেটারলিঙ্কের নাম সারা ইউরোপে হঠাৎ একটা কৌতূহলের বিদ্যুৎপ্রবাহ বহাইয়া দিল। La Princess Maleine নাটকখানা এই বৎসরেই প্রকাশ হওয়ার পর প্রসিদ্ধ Figaro পত্রিকায় (১৮৯০, ২৪ শে আগষ্ট) বিখ্যাত ফরাসী সমালোচক Octave Mirabeau 'বেলজিয়ান্ সেক্সপিয়ার' নাম দিয়া মেটারলিঙ্কের প্রতিভাকে স্বর্গে চড়াইয়া একটি প্রবন্ধ লিখিয়া

বলিলেন এবং তিনি যে মেটারলিঙ্ককে সেক্সপীয়র হইতেও উচ্চে স্থান দিতে প্রস্তুত এ ভাবটিও প্রকাশ করিলেন। এতবড় একখানি কাগজে এতবড় প্রশংসার প্রচণ্ড মশাল জালিয়া দেওয়ার ফলে যারা ঘুমে ঢুলিতেছিল তারা যেমন জাগিয়া উঠিল, তেমনি যারা জাগিয়াই ছিল তারাও চমকিয়া উঠিয়া ব্যাপারটা স্বপ্ন না সত্য ভাবিয়া চোক রগড়াইতে আরম্ভ করিল। নিন্দা এবং প্রশংসা দুইই যুক্তির সীমা ছাড়াইয়া হৃদয়াবেগের আতিশয্যে টগবগ্ করিয়া উঠিল। মেটারলিঙ্ক—লোকটি কে এবং কোন্ গ্রহ হইতে হঠাৎ আসিয়া বিশ্ববাসীকে এমন চকিত করিয়া তুলিলেন ইহা জানিবার জন্য লোক এমনই ভিড় করিয়া তাঁহার নিকট আসিয়া জুটিতে লাগিল যে তিনি রীতিমত বিপদ গণিয়া পলায়নের পথ খুঁজিতে লাগিলেন। যে লোকটি চিরদিন নিরালায় থাকিতেই ভালবাসিত, তাহাকে লইয়া সারা ইউরোপ চঞ্চল হইয়া উঠিল।† মেটারলিঙ্ক তাঁহার নাটকখানি লিখিতে গিয়া সেক্সপীয়রের ভাব ও ভাষা চুরি করিয়াছেন, নিন্দার মাত্রা যখন এতদূর গড়াইল, তখন নিন্দুকদের চিত্তকে শান্ত করিবার উদ্দেশ্যে তিনি এই নাটকখানাকে Shakespearterie 'সেক্সপীয়রাস্বস্ত' বলিয়া বোধকরি মনে মনে একটু হাসিয়াছিলেন।

আগাগোড়াই ইঁহার প্রকৃতির মাঝে লাজুকভাব ও আপনাকে একান্তে গুটাইয়া থাকার ইচ্ছাটি দেখা যায়। নিন্দাপ্রশংসার দিকে কান দিবার প্রকৃতি ইঁহার নয়। ইনি নিজেকে 'গ্রাম্য' বলিয়া সামাজিক মেলামেশা হইতে বিরত থাকিতে ভালবাসেন। কথা ইঁহার এত মৃদু যে অনেক সময় তাহা শোনাই যায় না; কায়দাদুরস্ত বার্ত্তালাপের চেয়ে সহজ দিলখোলা কথাবার্ত্তাই ইঁহার প্রকৃতিগত। একজন লেখক বলিয়াছেন যে ইঁহাকে দেখিলেই মনে হয় যেন ইঁহার চোক দুটি বাহিরের দিকে চাহিয়া নাই, যেন অন্তরের মাঝে ইঁহার দৃষ্টি মগ্ন হইয়া আছে।

মেটারলিঙ্কের লেখার মাঝে তাঁর অন্তরের এমনই এক গভীর ভাবুকতার ও সূক্ষ্ম রসবোধের পরিচয় পাওয়া যায় যে এই লোকটাই যে মৌমাছি পালনে ব্যাপৃত থাকেন এবং নানা রকমের শারীরিক ব্যায়ামের মাঝে—যেমন ঘুসোঘুসি, তলোয়ার খেলা, মোটর দৌড়, বাইসিকেল ভ্রমণ, নৌকাচালনে আনন্দ পান, তাহা বিশ্বাস করিতে আমাদের বিস্ময় জাগে। কারণ আমাদের কেমন একটা ধারণা হইয়া গেছে যেন সূক্ষ্ম রসবোধ ও গভীর ভাবমগ্নতার সঙ্গে হৃষ্টপুষ্ট সবল সতেজ ক্রীড়াপটু শরীরের কোন যোগ থাকাই সম্ভব নয়; যেন ভাবুকতা ও কবিত্বের সহিত বাতাসে-ভাঙ্গিয়া-পড়া দেহ এবং অবসাদ পীড়িত দৃষ্টিরই একটি অখণ্ড যোগ রহিয়াছে।

প্রিন্সেস্ মেলাইন্-এর পর ১৮৯০ সালে আরও দু'খানি নাটিকা—L' Intruse (অনাহূত) এবং Les Avengles (দৃষ্টিহারা) এবং ১৮৯১ সালে "লে সেত্ প্রাঁসেস্" নামে আর একখানা নাটিকা বাহির হয়। সেই সঙ্গে Ruysbroeck নামক একজন প্রাচীন মিষ্টিক সাধকের লেখার অনুবাদও প্রকাশ হয়। এই অনুবাদের ভূমিকায় যেমন অতীন্দ্রিয় রহস্যের প্রতি তাঁহার চিত্তের আকর্ষণ ব্যক্ত হয়, তেমনি প্লেটো, প্লটিনাস্, ডায়োনিসাস্, জেকব বেহ্মে, নোভালিস্ এবং কোলরিজ্ প্রভৃতির প্রতি তাঁহার অনুরাগও ধরা পড়িয়া যায়। এমার্সন এবং কার্লাইলও তাঁহার চিত্তের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন; পরবর্ত্তী লেখায় ইঁহাদের প্রতি মেটারলিঙ্কের গভীর প্রীতি ও শ্রদ্ধা স্বতঃ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। ইহার পর ১৮৯২ সালে মেটারলিঙ্কের Pelleas et Melisande নাটকখানি প্রকাশিত হয়; ইহার মধ্যে মেটারলিঙ্কের ভাব ও অপূর্ব্ব শিল্প-নৈপুণ্য এমনই সুন্দর প্রকাশ পায় যে অবিলম্বে ইহা বহুপ্রশংসিত এবং বহুবার অভিনীত হইয়া যায়।

১৮৯৪ সালে মেটারলিঙ্কের আরও তিনখানি নাটিকা—Alladine et Palomides, Interieur, এবং La Mort de Tintagiles* প্রকাশিত হয়। এইগুলির মধ্যে মেটারলিঙ্ক অদৃষ্টের নির্ম্মম বিভীষিকাকেই ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। পাঁচ ছয় বৎসর পরে এগুলির

† "Proud, shy, sensitive resetevеd and modest, he was startled to hear that Europe was ringing with his name"
M. Clark: Maurice Maeterlinck p. 16

* তিন্তাজিলের মৃত্যু—অনুবাদক শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত—(বিজলী বর্ষ সংখ্যা ১৩৩১)

সমালোচনা করিয়া মেটারলিঙ্ক নিজেই বলিয়াছেন যে এগুলি যাহা প্রকাশ করিতেছে তাহা হইতেছে, 'The disquiet of a mind that has given itself wholly to mystery. (The Buried Temple. End. Mystery p. 109) অদৃষ্ট রহস্যবোধ জাগরণের ফলে মানব চিত্তের ভীতিপূর্ণ অস্বস্তি'। সে যাহোক্ এ নাটিকা কয়খানি প্রকাশ হওয়ার পর হইতেই মেটারলিঙ্কের নাম ইব্‌সেনের সঙ্গে আলোচিত হইতে আরম্ভ হয়। ১৮৯৫ সালে মেটারলিঙ্ক এলিজাবেথান যুগের নাট্যকার ফোর্ডের 'Tis Pity She's a Whore নাটকখানির অনুবাদ এবং ভূমিকায় এলিজাবেথান্ ইংরাজি সাহিত্যের প্রতি তাঁহার অনুরাগ প্রকাশ করেন। এবং সেই সঙ্গেই Les Disciples a Sais et les Fragments de Novalis ভূমিকাসহ প্রকাশ করেন।

১৮৯৫ সালে মেটারলিঙ্ক দেশত্যাগ করিয়া প্যারীর অধিবাসী হইলেন। এত বড় এত বিচিত্র নগরীতে আসিয়াও কিন্তু মেটারলিঙ্ক কয়েকটি অন্তরঙ্গ বন্ধু লইয়া নিরালাতেই রহিয়া গেলেন। এই বৎসরেই মেটারলিঙ্কের যে দুইখানি পুস্তক—Tresor de Humbles ও Aglavaine et Selysette বাহির হয়, তাহাতে মেটারলিঙ্কীয় ভাবের একটা বিশেষ পরিণতি লক্ষিত হয়; পূর্ব্বযুগের নৈরাশ্য ও রহস্যভীতি কাটিয়া গিয়া তাঁহার চিত্তে উজ্জ্বল আশার আলোক ফুটিয়া উঠিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। ম্যাডাম মেটারলিঙ্ক বলেন যে 'এগ্লাভেন ও সেলীসেট' নাটকের মধ্য দিয়া মেটারলিঙ্ক একটা নূতন শক্তি আনন্দ ও আশা—a new atmosphere, a will to happiness, a power of hope —প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। Les Tresor des Humbles সম্বন্ধে উক্ত কথা কয়টি আরও বেশী খাটে। কিন্তু এই বছরেই প্রকাশিত কবিতাপুস্তক—Douze Chausonsএ তাঁহার এই ভাব-পরিবর্ত্তনের কোনই আভাস পাওয়া যায় না। Tresor des Humbles (দীনের সম্পদ) বইখানার মধ্যে মেটারলিঙ্কের সমস্ত সৌন্দর্য্য ও গভীর অনুভব এমন সুন্দর ভাবেই প্রকাশ পাইয়াছে যে একমাত্র এই বইখানি পড়িলেই মেটারলিঙ্কের সমগ্র ভাবের একটা পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে তাঁহার অতীন্দ্রিয়বাদ, গভীর জীবনের বার্ত্তা, অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যবোধ এবং গভীর প্রেমানুভবের এক আশ্চর্য্য বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। এই জন্যই তাঁহার নাটক হইতে এই বইখানির পাঠক সংখ্যা অনেক বেশী।

১৮৯৮ সালে মেটারলিঙ্কের যে বইখানি বাহির হয় তাহার নাম La Sagesse et la destinee 'অন্তর্দৃষ্টি ও অদৃষ্ট'। 'দীনের সম্পদ' বইখানির মত এখানিও Georgette Leblanc নাম্নী একজন প্যারীর অভিনেত্রীর নামে উৎসর্গ করা হইয়াছে।

মেটারলিঙ্ক ইঁহাকে "মূর্ত্তিমতী অন্তর্দৃষ্টি" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইনিই পরবর্ত্তী জীবনে ম্যাডাম মেটারলিঙ্ক নামে পরিচিত হইয়াছেন। (১) 'অন্তর্দৃষ্টি ও অদৃষ্ট' পুস্তকখানির মধ্যে মেটারলিঙ্ক আপনার মতবাদটিকে বিস্তৃতভাবে এবং কতকটা শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন—; এই বইখানিও 'দীনের সম্পদ' পুস্তকখানির প্রায় সমকক্ষ। তবে ইহাতে দার্শনিকের মত যুক্তির অধীন হইয়া শান্ত এবং সতর্কভাবে কথা বলিবার চেষ্টা করায়, ইহার মধ্যে 'দীনের সম্পদে'র উচ্ছ্বসিত আনন্দ ও আবেগের অবাধ প্রকাশটুকু পাওয়া যায় না।

১৯০১ সালে মেটারলিঙ্ক এক অভিনব বেশে সাধারণের নিকট দেখা দেন। La vie de abeilles 'মক্ষিকা জীবন' পুস্তকের মধ্যে তিনি যে শুধু মক্ষিকা-জীবনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ ও বৈজ্ঞানিক সত্যানুসন্ধানের পরিচয় দিয়াছেন তাহা নয়, তাহার মধ্যে মেটারলিঙ্ক যে অন্তর দিয়া মক্ষিকা জীবনের সৌন্দর্য্য ও কারুণ্য চিত্রিত করিয়াছেন তাহাও ধরা পড়িয়া গিয়াছে। বৈজ্ঞানিক পর্য্যবেক্ষণের দিক দিয়া বিচার করিতে গেলেও বইখানিকে মিথ্যা বলিবার যেমন উপায় নাই তেমনি বইখানি পড়িতে পড়িতে, স্বভাবতঃই ইহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া ইহাকে একখানি অতি অপূর্ব্ব কাব্য না বলিয়া পারা যায় না। বৈজ্ঞানিক সত্যকে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ও রহস্যমণ্ডিত করিয়া দেখিবার ও দেখাইবার শক্তি

(১) প্রবাসী (আশ্বিন ১৩২০)-১৩শ ভাগ ১ম খণ্ড ৬ষ্ঠ সংখ্যা ৭১১-১২ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত মেটারলিঙ্ক গৃহিণীর কাহিনী দ্রষ্টব্য।

একমাত্র মেটারলিঙ্কেই সম্ভব। অন্য কয়েকটি লেখায়ও মেটারলিঙ্ক পরে তাঁহার এই অদ্ভুত শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। এই বৎসরেই Ardiane et Barbe Blue 'আদ্রিয়ান্ ও নীলদাড়ি' এবং Sœur Beatrice 'ভগ্নী বিয়াট্রিস্' এই দুইখানি নাটক বাহির হয়। ইহার পরবৎসর Monna Vanna নাটক এবং Le Temple Enseveli 'গোপন মন্দির' নামক প্রবন্ধসংগ্রহ প্রকাশিত হয়। ১৯০৩ সালে Joyzelle এবং Le Miracle de st Antoine, ১৯০৪ সালে Le Double Jardin (রহস্যোদ্যান) নামক প্রবন্ধসংগ্রহ এবং ১৯০৭ সালে L' Intelligence des fleurs (জীবন ও পুষ্প) নামক আর একখানি প্রবন্ধ পুস্তক প্রকাশিত হয়। ইহাদের বিস্তৃত আলোচনা আমরা স্থানান্তরে করিব। ১৯০৯ সালে ইংরাজীতে এবং ১৯১০ সালে ফরাসীতে মেটারলিঙ্কের অপূর্ব্ব রূপকনাট্য L' Oiseau নীলপাখী প্রকাশিত হয়। Herbert Trench এই বইখানির সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে "আর কোন পুস্তকেই মেটারলিঙ্ক একটি সুন্দর উপকথার মধ্য দিয়া এমনভাবে একটা সমগ্র মতবাদ প্রকাশ করিতে পারেন নাই, যাহা পড়িয়া একটি বালকও বুঝিতে পারে এবং আনন্দলাভ করিতে পারে।" * Mary Magdalene নাটকখানিও এই বৎসরেই প্রকাশিত হয় এবং পরবৎসর মেটারলিঙ্ক বিখ্যাত নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত হন। ঐ অর্থ দিয়া 'মেটারলিঙ্ক প্রাইজ ফণ্ড' স্থাপিত হইয়াছে, উদ্দেশ্য—শ্রেষ্ঠ ফরাসী সাহিত্যস্রষ্টাদিগকে পুরস্কৃত করা। ১৯১২ সালে প্রসিদ্ধ Middle weight champion Georges Carpentier এর সঙ্গে মেটারলিঙ্ক ঘুসোঘুসির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অগ্রসর হন; ঐ উপলক্ষে উপার্জ্জিত অর্থ পরোপকারে ব্যয়িত হয়। ইহার পর ১৯১৩ সালে La Mort (ইংরাজীতে ১৯১১ সালেই) 'মৃত্যু' শীর্ষক একখানা পুস্তক বাহির হয়। পূর্ব্বলিখিত 'অমরতা' শীর্ষক প্রবন্ধের † সূত্র ধরিয়াই এই পুস্তকখানি লিখিত। ইহার মধ্যে মৃত্যু এবং অমরতার আলোচনায় মেটারলিঙ্কের প্রবল আশাবাদ ফুটিয়া উঠিয়াছে।

১৯১৩ সালে মেটারলিঙ্ক 'মৃত্যু' পুস্তকখানিকে আরও পরিবর্দ্ধিত আকারে 'আমাদের নিত্যতা' নাম দিয়া প্রকাশিত করেন। ইহাতে তাঁহার পরলোক সম্বন্ধীয় বিষয়ে অনুসন্ধানপ্রিয়তা এবং থিওসফিষ্ট সম্প্রদায়ের প্রচারিত জন্মান্তরবাদের দিকে আকর্ষণ ফুটিয়া উঠিতে আরম্ভ করে। ফলে এই বিষয়ে আরও সূক্ষ্ম আলোচনা করিয়া তিনি মানবাত্মার মগ্নচেতনার (Subconscious) বিপুলরহস্যে বিশ্বাসী হইয়া উঠেন এবং 'অজানা অতিথি' নামক পুস্তকে তাঁহার আলোচনা লিপিবদ্ধ করিয়া ১৯১৫ সালে তাহা প্রকাশিত করেন। এই সময় (১৯১৪—১৮) ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ আসিয়া যে তুমুল বিপ্লবের সূচনা করে তাহাতে মেটারলিঙ্কের স্বদেশ বেলজিয়ম জাম্মাণীর নিষ্ঠুর সামরিক গ্রাসে পতিত হইয়া চরম দুর্দ্দশায় উপনীত হয়। ফলে ভবিষ্যবাদী মেটারলিঙ্ক যে বিশ্বাস লইয়া অগ্রসর হইতেছিলেন তাহাতে একটা প্রচণ্ড আঘাত আসিয়া লাগে। কিন্তু মেটারলিঙ্কের চিত্ত যুদ্ধের নিষ্ঠুর নগ্ন বীভৎসতাকে বড় করিয়া দেখিতে পারে নাই। জাম্মাণীর প্রতি অপরিসীম ঘৃণা জন্মিলেও তিনি মানবজাতির আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রতি বিশ্বাস হারাইতে পারেন নাই। ১৯১৬ সালে প্রকাশিত 'ঝড়ের মাতন' বইখানিতে জাম্মাণ সভ্যতার ও জাতির প্রতি নিদারুণ ঘৃণা ফুটিয়া উঠিয়াছে বটে, সেই সঙ্গে সঙ্গে আবার এই যুদ্ধের মাঝেও যে বিশ্বমানবাত্মার আধ্যাত্মিক বিকাশের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে তাহার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে তিনি ভুলেন নাই। তাঁহারই দেশীয় প্রসিদ্ধ সিম্বলিষ্ট কবি Emile Verhaeren (1855—1916) এই যুদ্ধের আঘাতে একেবারে বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন কিন্তু মেটারলিঙ্ককে আমরা বিপর্য্যস্ত হইতে দেখি না। তাঁহার লেখায় মানব উন্নতির উপর অবিচলিত বিশ্বাস দেখিতে পাই। পার্ব্বত্যপথ (১৯১৯) এবং পরমরহস্য (১৯২২) পুস্তক দুখানির মধ্যে মেটারলিঙ্কের অধ্যাত্মবাদের প্রাচীন মিষ্টিসিজ্‌ম্ এর প্রতি প্রবল অনুরাগ ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই বই দুখানির সর্ব্বত্র তাঁহার উপর হিন্দুদর্শনের অসাধারণ

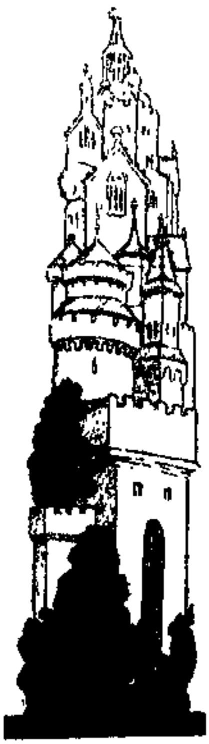
* "In none of his work has Maeterlinc thus put a whole philosophy into a gay fairy-tale that may be understood and laughed over by a child."
Edward Thomas: M. Maeterlink.

† 'জীবন ও পুষ্প' পুস্তকের অন্তর্গত।

প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। জন্মান্তরবাদ, কর্ম্মবাদ এবং হিন্দুসভ্যতার মর্ম্মগত অসাধারণ সত্যদৃষ্টির উপর তাঁহার বিশ্বাস হইয়া আসিয়াছে দেখিতে পাই। ১৯২৮ সালে 'পাত্রী নির্ব্বাচন' নামে যে নাটকখানি প্রকাশিত হয় তাহা নীলপাখীরই উপসংহার মাত্র; ইহাতে মেটারলিঙ্কীয় যুগল-তত্ত্বটিকে বর্ত্তমান মনস্তত্ত্বের মগ্নচেতনাবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা লক্ষিত হয়। বার্গোমাষ্টার (১৯ ৮), মেঘাপসরণ (১৯২৩) এবং মৃতের দাবী (১৯২৩)—এই তিনখানি নাটকে মেটারলিঙ্কীয় নাট্যপদ্ধতির পরিপূর্ণ পরিবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি যে বাস্তবনাট্য রচনায় দক্ষ হইয়া উঠিয়াছেন তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। এই সব নাটকে অতীন্দ্রিয়রহস্যবাদী মিষ্টিক মেটারলিঙ্কের ছায়াও দেখিতে পাওয়া যায় না।

১৯২৫ সালে মেটারলিঙ্কের Ancient Egypt নামক একখানি বই বাহির হইয়াছে। তাহাতে মিসর সম্বন্ধে যে-সব বিস্ময়কর তথ্য জানা গিয়াছে তাহার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তারপর Life of the Bees মতই মেটারলিঙ্ক Life of the White Ant উই পোকার জীবন সম্বন্ধে একখানি চিত্তাকর্ষক বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ লিখিয়াছেন। মেটারলিঙ্ক যে একাধারেই কবি বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক তাহারই প্রমাণ তিনি বার বার দিয়াছেন। ১৯২৮ সালে তিনি Life of Space গ্রন্থে আধুনিকতম আপেক্ষিকতা-বাদটিকে দার্শনিকের মত আলোচনা করিয়াছেন। যথাস্থানে আমরা এই পুস্তকের পরিচয় দিবার চেষ্টা করিব।

শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায়

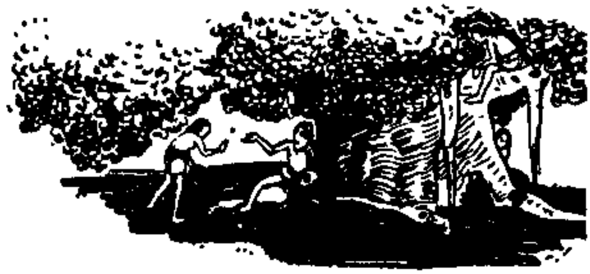


গোলক-ধাঁধা

শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত আই-সি-এস্

ভাসে চাঁদ নীল গগনে,
নাচে ডাল সমীরণে।
লালিমা উষার ভালে,
চষে ক্ষেত চাষী হালে॥
কোলে মার শিশু হাসে,
মাতে বন ফুলের বাসে।
টল মল নদীর জলে
নেয়ে দাঁড় বেয়ে চলে॥

আকাশে উজল তারা,
মুখরা নিঝর-ধারা।
পাখী গায় বনের কোণে,
উছলে আবেগ মনে॥
বরষে বাদল-ধারা
নিঝরী পাগল পারা।
কমলের বুকে মধু,
উতলা ভোমরা বঁধু॥



নিঝুমে ঝিল্লী ডাকে,
পথে বৌ কলসী কাঁখে।
কোথায় ঐ বাঁশী বাজে,
টানে বৌ ঘোমটা লাজে॥
দুপুরে ছায়ার তলে
খেলে গায় ছেলের দলে।
পূরবী হাওয়া মেতে'
খেলে ঢেউ হরিত্ ক্ষেতে॥
মাঠেতে খেলার মেলা
সোনালি সাঁঝের বেলা।
গোধূলির ছায়া ঘিরে
ধেনু পাল ঘরে ফিরে॥

কোকিলের কুহু তানে
কি কথা জাগে প্রাণে?
জোছনার আঁধার আলো,
কে কারে বাসে ভালো?
যতনে বাসা বাঁধা,
দুদিনের হাসা কাঁদা।
জীবনে মরণেতে
কে দিল মালা গেঁথে?
প্রাণে প্রাণ বাঁধে ভেলা,
অসীমে অশেষ খেলা।
প্রণয়ী প্রেমের গানে
খুঁজে পথ কাহার পানে?

অবিরাম চলে জগৎ,
কে তারে দেখায় রে পথ ?
ধরারে করে' সরা
কে করে' ভাঙ্গা-গড়া ?
কেন হয় ব্যথার খনি
পরাণের পরশ মণি ?
ঝিনুকের ভেঙ্গে' মরম
কেন হয় মোতির জনম ?

করে' সে ভবের খেলা
কোথা যায় ভোরের বেলা ?
অতলের তলে নিধি
কি লাগি গড়ে বিধি ?
ধ'রা কয় তারার সাথে
কি কথা নিশীথ রাতে ?
বিশাল এই গোলক ধাঁধা
কি প্রেমের ডোরে বাঁধা ?



মরণের পর পারে
পে'তে প্রাণ চাহে কারে ?
বিরহের ব্যথা কেন
মিলনের সোপান হেন ?
ধরণীর ধূলায় গড়া
দেহে কার আসন জোড়া,

বঁধু আর বধূর সনে
মিলে কোন স্বরগ কোণে ?
সসীমের বুকের মাঝে
অসীমের সাড়া বাজে।
ফুটা'য়ে ফুলে ফুলে
নেবে সে কোলে তুলে' ॥

শ্রীগুরুসদয় দত্ত

ফক্কা গেরো

শ্রীযুক্তা আমোদিনী ঘোষ

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

৬

ঝম্ ঝম্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল। চারিদিক্ অন্ধকার। আষাঢ়-সন্ধ্যা বাহিরে অবিরল-পল্লব বনতলে ও তরু-ছায়াচ্ছন্ন নদীতটে ধনায় নাই, রুদ্ধ দ্বার ও বাতায়নের পশ্চাতে অপরাহ্ন হইতে নিবিড়তর রূপে থমকিয়া রহিয়াছে।

নীরজার ঘরে বাতি জ্বালা হইয়া গিয়াছে, এবং সেই বাতির সম্মুখে ছেলেকে দাঁড় করাইয়া ধরিয়া নীরজা অনিলের সঙ্গে গল্প করিতেছিল। নির্ঝর এইমাত্র উঠিয়া ভাঁড়ার দিতে গিয়াছে।

চন্দ্রলেখা দোতালা হইতে নামিয়া নির্ঝরের পরিত্যক্ত জায়গাটিতে বসিয়া পড়িল।

নীরজা বলিল, "কেমন খেলে মালপোয়া?

মুখখানি একটুখানি বাঁকাইয়া চন্দ্রলেখা বলিল, "আমি খাইনিক। তোমাদের এতবার বলেছি যে আমার খাবারটা ওপরে পাঠিয়ো না—আমি তোমাদের সঙ্গে খাব—তা তোমরা শুনবেই না। তোমাদের হয়ত আমার সঙ্গে খেতে ভাল লাগে না, কাজেই তোমরা ওপরে পাঠিয়ে দিয়ে কোনো রকমে নিস্তার পাও।"

নীরজা ব্যস্ত হইয়া বলিল, "কক্ষনো না। তুমি ছিলে বাবার কাছে, কাজেই তোমারটা আর বাবারটা একসঙ্গেই পাঠিয়ে দিয়েছি।"

"যেখানে দিয়েছো সেখানেই তা রয়েছে, আমি তা ছুঁইও নি।"

নীরজা অনিলের দিকে চাহিয়া বলিল, "অনুদা, যাও না, ওপর থেকে রেকাবিখানা নামিয়ে এনে দাও।"

অনিল উঠিয়া খাবারের রেকাবী লইয়া আসিল। চন্দ্রলেখা একখানা মালপোয়া ভাঙ্গিয়া তিন টুকরা করিয়া একভাগ নীরজার মুখে গুঁজিয়া দিয়া আর এক ভাগ নিজের মুখে দিল, বাকিটা অনিলের দিকে আগাইয়া ধরিয়া বলিল, "খাওনা ভাই লক্ষ্মীটি"—

ওর মুখে চোখে কৌতুক উপচিয়া ওঠে। নীরজা ও অনিল একটুখানি হাসে।

চন্দ্রলেখা বলে, "আমাকে এক গ্লাস জলও দিয়ো—আমি যদি জল চাইতে নাই, তবে হয় জল পড়ে ঘর যাবে ভেসে, নয়ত কলসীটিই যাবে ফুটো হয়ে। তোমরা সব কেমন কম্মিষ্ঠা মেয়ে—কি যে ভাব তোমরা আমায় দেখে! কিন্তু আমারই বা কি দোষ বল, ছেলেবেলা থেকে বাবা আদর দিয়ে আমার মাথাটি খেয়ে দিয়েছেন, আমায় কখনও নড়ে বসতে দেন নি—আমিও বসি নি। আমার হুকুম খাটার লোক জুটে যায় সর্ব্বদাই, ওখানে ছিল ওরা, এখানে রয়েছ তোমরা! জন্মে কোনো কাজ করি নি—এখন এই বুড়ো বয়সে আর কিছু করা পোষাবেও না।"

অনিল বলিল, "আজ সকালে নীরুর শাশুড়ীর চিঠি এসেছে—নীরুকে ওখানে পনেরো তারিখে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্যে।"

"এ তোমার রচা কথা, চিঠি এসেছে না হাতী এসেছে! আমায় ভয় দেখাবার জন্যে যত সব কথা বানিয়ে বলা!"

"আপনাকে ভয় দেখিয়ে আমার কি পুণ্যি হবে? মেসো মশায়ের কাছে সে চিঠি আছে আপনি চেয়ে নেবেন।"

"পাঠাতে লিখলেই যে পাঠাতে হবে তার কি মানে? আমিও লিখে দেব যে এখন আমরা ওকে কিছুতেই পাঠাতে পারিনে। কি বল খোকন বাবু?"

চন্দ্রলেখা হাতের রেকাব নামাইয়া রাখিয়া নীরুর ছেলেকে কোলে তুলিয়া নিল।

নীচের থেকে নির্ঝরের ডাক আসিল—"নীরু—নীরু!"

"যাচ্ছি"—বলিয়া নীরু উঠিয়া গেল।

চন্দ্রলেখা বলিল, "নির্ঝরের নীচের কাজ কিছুতেই ফুরোয় না! আমরা এখানে বসে গল্প সল্প করি, ও পড়ে থাকে রান্না ঘরে উনুনের আঁচের মধ্যে, নয়ত ভাঁড়ারের হাঁড়ি কুড়ির গুমসো ভাপের মধ্যে!"

অনিল বলিল, "গিন্নীর তা থাকতেই হয়। বাড়ী শুদ্ধ লোকের খাওয়া-দাওয়া আরাম-বিরাম সুখ-সুবিধা যার ওপর নির্ভর করে, সে নিজে যদি আরাম খোঁজে—তা হলে আর কাউকে আরাম পেতে হয় না।"

চন্দ্রলেখা সভয়-শিহরণে বলিল, "ভাগ্যিস্ আমায় গিন্নী হ'তে হয় নি! নির্ঝর না থাকলে তোমরা আমার ওপর সব ভার চাপিয়ে দিতে ত? আমার ইচ্ছে করে ওকে আমি ফুল বেলপাতা দিয়ে পূজো করি!"

অনিল একটুখানি হাসিল, কিছু বলিল না।

চন্দ্রলেখা বলিল, "আমার ইচ্ছেটা খুব স্বার্থপরের ইচ্ছার মত শোনাচ্ছে, নয়? কিন্তু দেখ, আমি সত্যি বলছি, ওর জন্য আমার ভারী দুঃখ হয়। আহা বেচারী! মনের কথা ওর মুখে ফোটে না, কিন্তু কি দুঃখে যে ওর দিন কাটে আমি তা খুব বুঝি। ওর মনের ভিতর দুঃখের সেই চরম আঘাত ওকে দিয়েছে নিঃসাড় করে,—ও কাজ করে যায় কলের মত, বোধ করে না কিছু-ই। বিয়ে ত সবারই হয়—কারো বা সুখের সীমা নেই, কারো বা দুঃখের সীমা নেই! কেন যে এমন হয়! বিয়ের পরদিনই ওর স্বামী ওকে ছেড়ে গেল?"

"গেল ত।"

"কেন?"

"আগে থাকতেই সে ছিল সংসারে উদাসীন, ওর মা ভাবলে বিয়ে দিলেই ছেলে সংসারে আটক পড়বে। কিন্তু হোল তার উল্টো। যাও-বা ছেলে ঘরে ছিল—বিয়ে দিতেই ঘর ছেড়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল।"

"এর চেয়ে ওর কুমারী হয়ে থাকা অনেক ভাল ছিল!"

"তা ছিল বৈ কি!"

"তুমি ত বাবু ওদের সগোত্র নও,—তা তুমি-ই বা ওকে বিয়ে কল্লে না কেন?"

কথাটা অনিল শুনিতে পায় নাই যেন, এরূপ ভাবে বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল।

চন্দ্রলেখা হঠাৎ চোখ চাপিয়া ধরিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "গেছি আমি! গেছি, গেছি!"

"কি হোল?" বলিয়া অনিল তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিল।

"একটা পোকা ঢুকেছে চোখে—খেয়ে ফেল্লে আমার চোখ—ওগো বাবা গো, মরলাম গো" বলিতে বলিতে চন্দ্রলেখা কান্না সুরু করিয়া দিল।

"চোখে পোকা ঢুকেছে তার জন্য এত অস্থির! পোকা এখনি আমি বার করে দিচ্ছি। শান্ত হোন, শান্ত হোন।"

অনিল চক্ষু রগড়াইয়া কৌশলে পোকা বাহির করার চেষ্টা করিতে লাগিল।

থাকিয়া থাকিয়া চন্দ্রলেখা অনিলের বাহুর উপর নেতাইয়া পড়ে, অনিল তাহাকে খাড়া করিয়া রাখে জোর করিয়া।

এমন সময় উপর হইতে নামিলেন মুরারী বাবু। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে চন্দ্রলেখার চক্ষু হইতে পোকা গেল বাহির হইয়া এবং অনিল ও চন্দ্রলেখা উভয়ে মুখ তুলিতেই তিনি আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেন।

চন্দ্রলেখা বলিল, "চোখ আমার খেয়েই ফেলেছিল পোকাটা! উঃ কি কামড়ই কামড়েছিল!"

"পোকা কামড়েছিল, বটে?" বলিয়া মুরারী বাবু উভয়ের দিকে এক বিষম দৃষ্টিপাত করিলেন।

অনিল বলিল, "উনি একেবারে ছেলেমানুষ। চোখে পোকা গেছে—তা একেবারে কেঁদে কেটে অস্থির।"

অনিল হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া গেল, কিন্তু তাহার মনের ভিতর মুরারীবাবুর সংশয়-কুটিল চক্ষের চাহনি বিদ্ধ হইয়া রহিল।

বলীময় ললাট কুঞ্চিত করিয়া মুরারীবাবু কহিলেন "অনিলের সঙ্গে তোমার খাতির দিন দিন বেড়ে চলেছে

দেখ্‌ছি। অন্ত একজন যুবক ছেলে—তার সঙ্গে তোমার এত গায় পড়াপড়ি কেন? শেষটা কি তুমি আমার নাম হাসাবে? তোমার মত মেয়েকে আনাই আমার মাটি খাওয়া হয়েছে! আমার কাছে তোমার খাওয়া হোল না—ওখান থেকে খাবার তুলে এনে এখানে ওর সঙ্গে খাওয়া হোল! আমিও বলে দিচ্ছি—এর পর—আমার সঙ্গেই তোমার খেতে হবে। এখানে এদের সঙ্গে আমি তোমায় খেতে দেব না। তুমি মনে রেখো—তুমি আমার স্ত্রী, আমার কথায় তোমাকে উঠ্‌তে বস্‌তে হ'বে। আমি যা বল্‌ব—তা-ই হচ্ছে তোমার সেরা আইন—আমাকে এড়িয়ে এক পাও তোমার চলার সাধ্য নেই। ভাল হয়ে চল ত ভাল, নইলে—"

মুরারী বাবুর চক্ষু অগ্নি বর্ষণ করিতে লাগিল, চন্দ্রলেখা প্রস্তর-প্রতিমাবৎ নিষ্পন্দ হইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল।

অনিলের ঘরখানা ছিল সব ঘরের মাঝখানে। গল্পের আড্ডাটা পড়িত ওর ঘরেই সব চেয়ে বেশী। উঠিতে বসিতে সে যেমন সকলের চোখে পড়িত, তাহার চোখেও সকলে পড়িত। ওর দ্বার ছিল অবারিত, এবং ঘরের ভিতর ঘরের বাহিরকার মানুষের আমন্ত্রণ ছিল অব্যাহত।

কিন্তু এই কথাটা আর সকলের কাছে যতই পরিস্ফুট হোক, অনিল নিজে সে সম্বন্ধে বিশেষ অবহিত ছিল না। আজ তাহার সমস্ত মন অপ্রত্যাশিত এক আঘাতে মুহূর্ত্তে অতি-চেতন হইয়া উঠিয়া নিশাচর পাখীর মত বেদনার অন্ধকারে, অন্তরালে একান্ত নির্জ্জনতার আশ্রয় যখন খুঁজিতে লাগিল, তখন তাহার চোখে পড়িল যে তাহার ঘরটা অতিরিক্ত মাত্রায় সকলের চোখের উপরে। আলোক পড়িয়াছে এখানে এত বেশী যে ছায়া গেছে শূন্যে মিলাইয়া।

সকাল বেলা মুরারী বাবু আগে নামিলেন, তাহার একটু পরে চন্দ্রলেখা। অনিল সরিয়া ঘরের কোণার দিকের জানালাটার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। আজ তাহার কাহাকেও দেখিবার ও দেখা দিবার ইচ্ছা নাই।

চন্দ্রলেখা একবার অনিলের দরজার কাছ দিয়া চলিয়া গেল, আবার খানিক পরে ফিরিয়া আসিয়া চৌকাটের উপর দাঁড়াইয়া গলা বাড়াইয়া ভিতরের দিকে চাহিল।

অনিলকে যদিও দেখা গেল না, ঘরের কোণ হইতে উদ্গত চুরুটের ধোঁয়ায় চন্দ্রলেখার বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে সে এ ঘরে আছে।

চন্দ্রলেখা ঘরে ঢুকিয়া অপর জানালার গায় ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইল।

অনিল কথা কহিল না, শুধু মুখ হইতে চুরুটটা বাহির করিয়া জানালা গলাইয়া নীচে ফেলিয়া দিল।

অনিল কোনও কথা কহে না দেখিয়া চন্দ্রলেখা বলিল, "তুমি আমার ওপর রাগ করেছ নিশ্চয়।"

অনিল হাসিয়া বলিল "না।"

"তবে কথা কইছ না যে!"

"আপনাকে বিপদে ফেল্‌তে ইচ্ছে করি না।"

"হিতোপদেশ এবং হিতচেষ্টা এ দুটো মাঝে মাঝে গ্র্যাটিস্ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু বিকোয় কম।"

"যার চোখ আছে তার কর্ত্তব্য হচ্ছে যার চোখ নেই তাকে পথ বাৎলানো। যে পর্য্যন্ত আপনার চোখ না ফুটছে, সে পর্য্যন্ত আমরা, যারা আপনার কাছে আছি,—আপনাকে পথ দেখানোর কাজে ভলান্টিয়ার হব।" বলিয়া অনিল উঠিয়া পড়িল।

চন্দ্রলেখা বলিল "চল্লে বুঝি?"

"যাই, একটু কাজ কর্ম্ম দেখি গে।"

চন্দ্রলেখা আরেক দিকে মুখ ফিরাইয়া রহিল। অনিল নীচে নামিয়া গেল।

খানিকক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরিয়া রান্নাঘরের বারান্দায় নির্ঝরিণী যেখানে বসিয়া তরকারী কুটিতেছিল সেইখানে অনিল একটা চৌকি টানিয়া বসিয়া পড়িল।

একটা বড় চাল কুমড়া ফালি ফালি করিয়া কাটিয়া নির্ঝরিণী সেগুলি কাঁটা দিয়া খুঁড়িতেছিল, অনিল তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, "আহা এ কর্চ্ছ কি!"

নির্ঝরিণী যেমন কাঁটা খুঁড়িতেছিল তেমনি খুঁড়িতে খুঁড়িতে বলিল, "বাবার জন্যে মোরব্বা কর্চ্ছি।"

"মোরব্বা ত কর্চ্ছ, আহা, এ বেচারীদের অসহায় হৃদয়গুলি এ ফোঁড় ও ফোঁড় করে কি ভীষণ রন্ধ্র সারা করে দিচ্ছ!—

নির্ঝরিণী হাসিয়া বলিল, "তোমার হাতে বুঝি কোনো কাজ নেই এখন।"

"নেই—তাও বলতে পারি নে,—আছে তাও বলতে পারি নে।"

"কাজ যদি তেমন কিছু না থাকে—তবে যাওনা একবার কাপড়ের দোকানে, হিসাবটা পরিষ্কার করে নিয়ে এস।"

"কাপড়ের দোকানে যাব আমি এখন! মার্ডার করে দিলে সব! আমার মনে কি বিরাট উচ্চাকাঙ্ক্ষার উদয় হয়েছে তা যদি তুমি একটু বুঝতে, কাপড়ের দোকান, মিস্তিরির ফর্দ, গয়লার হিসাব, এসব তুচ্ছাতিতুচ্ছ কথার এখন উল্লেখই কর্ত্তে পারতে না।"

"বিরাট উচ্চাকাঙ্ক্ষাটা কি তা না হয় ভেঙ্গেই বল।"

"ভাবছি কি জান—এম্ এ বি এল্ পাশ করে এখানে এই জঙ্গলে মশার মধ্যে আস্তানা করে কি লাভ? তার চেয়ে চলে যাই রেঙ্গুনে"

"রেঙ্গুনে?"

নির্ঝরিণীর হাতের কাজ গেল স্থগিত হইয়া, এবং তাহার চক্ষের চমকিত চাহনি অনিলের মুখের উপর রহিল স্থির হইয়া।

অপ্রতিভ অনিল তাড়াতাড়ি বলিল, "যাব ভাবলেই ত আর রেঙ্গুনে যাওয়া হোল না। সবাই আমাকে বলছে যে ওখানে গেলে পসার হয় খুব।"

নির্ঝরিণী যেমন হঠাৎ থামিয়া গিয়াছিল, তেমনি হঠাৎ হাত চালাইতে সুরু করিয়া বলিল, "তা বেশ ত"।

শঙ্কিত অনিল মনে মনে বুঝিল, কথাটা কিছুতেই তাহার বেশ হয় নাই। কিন্তু তখন কথা ফিরাইবার পথ নাই, এবং নিক্ষিপ্ত তীরের মত তাহা যে অলক্ষ্য স্থানে গিয়া বিঁধিয়াছে, সেখান হইতে উৎপাটনের সম্ভব অসম্ভব কোনো উপায়ও তাহার জানা নাই।

অনিল হতাশ হইয়া ভাবিল,—

"আমরা গর্ব করিতে জানিনা কথা,
কি কথা বলিতে কি কথা বলিয়া ফেলি!
অসময়ে গিয়ে লয়ে আপনার মন
পদতলে ফিরে চেয়ে থাকি আঁখি মেলি!

তোমরা—

পিছন হইতে নীরজা বলিল, "অনুদা যে বড় মাথা গুঁজে চুপটি করে বসে আছ? বকা খেয়েছো বুঝি বাবার কাছে?"

অনিল হাসিয়া বলিল, "বকা যদি খেয়েও থাকি, তা কি আর তোমার কাছে বলব? শোন দেখি, একটা কথা নিষ্পত্তি করে দাও দেখি। কেউ কেউ আমায় বলছে রেঙ্গুনে গিয়ে প্র্যাক্‌টিস্ কত্তে তোমার কি মত এ সম্বন্ধে?"

"তোমার বোর্ডিং স্পিরিট বুঝি এতদিনে চাড়া দিয়ে উঠ্‌ল!"

"বর উঠেছে—পরামর্শটা তুমি কি দাও তা শুনি।"

নীরজা বসিয়া পড়িয়া বলিল, "পোঁটলা পুঁটলি বেঁধে সোজা রেঙ্গুন রওনা হয়ে পড় তবে এবার। পসারের আশা যেখানে, সেখানেই বসা ভালো।"

হাত বাড়াইয়া কতকগুলি চালকুমড়ার খোসা কুড়াইয়া নিয়া উঠানে ছুড়িতে ছুড়িতে বলিল, "বাকি রইল এখন শুধু মেসো মশায়কে বলা।"

নীরজা বলিল, "ও, বাবাকে এখনো বলো নি?"

"নিজের মন আগে না বুঝে বাবাকে আগে কি বলব?"

"এ তোমার মন বোঝার অধ্যায় তবে?"

নির্ঝর তখন বঁটি কাৎ করিয়া তরকারীর থালা হাতে করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে, অনিল তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "কোন্‌টা যে কিসের অধ্যায়,—তার সুরু কোনখানে শেষ কোনখানে—কে-ই বা তার কি খবর জানে! ফুলের কোষে যত বীজ জন্মায়, তার সবই যদি গাছ হয়ে দাঁড়াত,—তবে পৃথিবী হোত মহারণ্য। মানুষের মনেও যত ইচ্ছার ও জল্পনা কল্পনার উদয় হয়, তার সবই যদি সত্যিকারের কাজে পরিণত হোত, তবে পৃথিবীটার চেহারাটা কি রকম হোত বল দেখি?"

"নেহাৎ মন্দটই বা কি হোত?

"কিন্তু তুমি ভুলে যাচ্ছ পৃথিবীর পনেরো আনা লোকই সাধু সজ্জন নয়—তাদের ইচ্ছা ও জল্পনা-কল্পনাগুলো কার্য্যে পরিণতি লাভ করলে, পৃথিবীর যে এক আনা লোক ধর্ম্মের এক চরণ স্বরূপ হয়ে এই জগৎটাকে ধারণ করে আছে—তাঁদের পক্ষে বিশেষ সুবিধার ব্যাপার হোত না। তারপর—নির্ব্বোধ মূর্খ, যুক্তিহীন, মন্দধী এঁরা আছেন একদল, তারপর আছে—দার্শনিক, কবি, উদাসী একদল, আরেকদল আছে—"

নীরজা কপালে চোখ তুলিয়া বলিল "মাথায় থাকুন তাঁরা। তাঁদের আর এ আসরে নেমে কাজ নেই। দেখ্‌ছো ভাই মেজদি অন্তদার ব্যাখ্যার বহর! কি কথায় কি যে টেনে আন্‌ছেন তার ঠিক্ নেই।"

নির্ঝর ততক্ষণে রান্নাঘরে ঢুকিয়া পড়িয়াছে, বাহির হইতে নীরজা তাহার কোন উত্তর পাইল না।

অনিল নীরজার সঙ্গে কিছুক্ষণ একথা সেকথা বলিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

খানিক পরে কাজ সারিয়া নির্ঝর দালানে আসিতেই বাড়ীর শেষ প্রান্তের বহুদিনের অবরুদ্ধ ঘরের খোলা দরজার দিকে তাহার নজর পড়িল।

স্নান করিতে যাইবে বলিয়া নির্ঝর কেশপাশ মোচন করিয়া তেল দিতে যাইতেছিল, ঘর কে খুলিয়াছে তাহা দেখিবার জন্য তেলের শিশি তুলিয়া রাখিয়া সেই ঘরের দিকে গেল।

ঘরটা বন্ধ রহিয়াছে ওর মায়ের মরণের পর হইতে। ভাঙ্গা-চোরা অব্যবহার্য্য জিনিস, ক্রিয়া কর্ম্মে ব্যবহারের বড় বড় জিনিস, সংসারের নানা কাজের নানা তোলা জিনিসে ঘরটা ভর্ত্তি। তারই এক পাশে একখানা তক্তাপোষ, কাজ কর্ম্মের দিনে নির্ঝরের মায়ের এখানে ছিল ক্ষণিক বিশ্রামের জায়গা।

ঘরের ভিতর উঁকি দিতে নির্ঝর সবিস্ময়ে দেখিল, অনিল সেই তক্তপোষের উপর দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া আছে।

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া নির্ঝর ধীরে গিয়া অনিলের কাছে দাঁড়াইল।

অনিল মুখ তুলিয়া চাহিল। নির্ঝর জিজ্ঞাসা করিল "কি হয়েছে আমায় বল্‌বে না?"

ঈষৎ হাস্যে অনিল বলিল "ধরা যখন পড়ে গেছি, তখন কবুলতি দিতেই হ'বে।"

"দিতেই হবে এমন কোনো কথা নেই, তোমার আপত্তি বা অনিচ্ছা থাকলে আমি শুনতে চাই নে।"

অনিল কিছু না কহিয়া দীপ্ত দীপের মত তাহার দুই চক্ষু নির্ঝরের চোখের উপর স্থাপিত করিল। সার্চ-লাইটের আলোর মত সে তীব্র দৃষ্টি নির্ঝর সহ্য করিতে না পারিয়া চোখ নামাইয়া লইল।

অনিল বলিল "তোমায় বল্‌তে চাইনি, তার মানে হচ্ছে এই যে, বল্লে তুমি তাতে সুখী হবে না। তরুণী ভার্য্যা ঘরে এনে মেসোমসায়ের কিঞ্চিৎ বুদ্ধিবিকার যে ঘটেছে—তা কি লক্ষ্য করেছ?"

নির্ঝর অস্পষ্ট স্বরে বলিল, "না"।

"মোদ্দা কথা হচ্ছে এই যে ওপরের ঘরে থাকা ত আমার পোষাবেই না—এবাড়ীতে থাকাই আর হয়ত প্রীতি-জনক হবে না। ভাব্‌ছিলুম তাই—এই ঘরটা আছে সকলের আসা-যাওয়ার পথ থেকে আড়ালে দূরে—এঘরের জিনিস-গুলো যদি অন্য কোথাও সরাতে পারো, তবে আমার আস্তানাটা এইখানে ফেলি।"

"বাবা যদি কারণ জিজ্ঞাসা করেন—কি বল্‌বে?"

"তাও একটা ভাববার কথা বটে। এ চোরার কিল খেয়ে 'আ' বল্‌বারও জো নেই 'উ' বল্‌বারও জো নেই। এই এই সব নানা জঞ্জালের জন্যই রেঙ্গুন পাড়ি দেবার কথা ভাব্‌ছিলুম।"

"তা,—যেয়ো, ক্ষতি কি!"

"যেদিক থেকে বিপদের ভয় করলাম, বিপদ সেদিক থেকে এল না, এল নির্ভাবনায় যে তীর ঘেঁসে দাঁড়ালুম,—সেদিক্ থেকে।"

নির্ঝর বলিল, "বিধি বাম হ'লে সবই ঘটে।"

মুখোমুখী অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ অনিল বলিল, "এখন কথাটা হচ্ছে কি জান, এখানে কারুর না থাকাটাই হচ্ছে এখন সব দিক থেকে বাঞ্ছনীয়।"

নির্ঝরিণী বিশুষ্ক মুখে বলিল, "তোমরা কিনা বাইরের জীব—খুসী মাফিক যেখানে ইচ্ছা সেখানে যেতে পারো, যেমন ইচ্ছা তেমনভাবে থাকতে পারো—কিছুই তোমাদের আটকায় না। কিন্তু আমাদের অবস্থা যে সম্পূর্ণ বিপরীত। যে-ঘর ছাড়া আর কিছুই আমরা জানি না, সে ঘর ছাড়ার কথা আমরা কল্পনাও করতে পারি না।"

"নীলিমাদি নীরু ওরা বুঝি বাড়ী ছেড়ে যায় নি?"

"কি যে বল তুমি! ওরা গেছে নিজের ঘরে।"

"তোমার নিজের ঘর বুঝি আর হ'তে পারে না?"

"হয়নি যখন—তখন সে স্পর্দ্ধা আর কিসে কর্ব্ব?"

"স্পর্দ্ধা বল্‌ছো তুমি?"

"কি আর বলবো বল!"

"আমি যদি বলি অনুগ্রহ—"

নির্ঝরিণী দীপ্ত চখে চাহিয়া বলে—"অনুগ্রহ—চাও?"

অনিল ঈষৎ হাসিয়া বলে "একটা কথার ওজনে সবখানি মেপো না। যে অর্থে ও কথাটা প্রয়োগ করেছি—তা বুঝবার ক্ষমতা তোমার আছে কি না জানি না।"

নির্ঝরিণীর মুখ রাঙ্গা হইয়া ওঠে, সে চোখ নীচু করিয়া থাকে।

চাহিয়া চাহিয়া অনিল বলে "কেন এ অন্ধতা তোমার? কি তুমি আঁকড়ে রয়েছো? যে-পুরুষ স্ত্রী বলে তোমায় গ্রহণ করে নি—বিবাহ-বাসরে যে তোমায় ত্যাগ করে গেছে—বারো বছর তারি পথ চেয়ে কাটিয়েও কি তোমার ধৈর্য্য টুটল না? কি আশা তোমার তার ওপরে লগ্ন হয়ে রয়েছে—কি দাবী তুমি মনে পুষছো? স্ত্রী-মুখ দর্শন করাও যে পাপ মনে করে—তারি পায়ের তলায় জীবন বিছিয়ে দিয়ে-ই কি তুমি মরণান্ত কাল পর্য্যন্ত পড়ে থাকবে? যে দীপ তোমার জ্বলল না কখনো—সেই শূন্য আধারের দিকে চেয়েই তুমি জেগে থাকবে—আর যে—"

অনিলের মাথায় মুখে শোণিতোচ্ছ্বাস তটবিপ্লবী স্রোতের ধারার মত বহিতে লাগিল, কথার মাঝখানে সে থামিয়া গেল।

নির্ঝরিণী বলিল, "সত্যি কথা আমি তোমায় বল্‌ছি—আমার তীরু মন ভরসা পায় না। এগুতেও না—পেছুতেও না। বলতে গিয়ে যে কথা ফিরিয়ে নিলে সে কথা আমি জানি। তবু—তবু—"

অনিল বলিল "ভরসা নেই তোমার! তার মানে?"

দুজনের চক্ষু দুই জনের চক্ষে চুম্বকের মত লগ্ন হইয়া রহিল।

অনিল বলিল "আমি তোমাকে ভুল বুঝ্‌ব না—মানে কি তুমি নিজেই বল।"

নির্ঝরিণী মাথা নীচু করিয়া থাকে, মুখে তাহার কথা যোগায় না।

অনিল উদ্দীপ্ত চক্ষে চাহিয়া বলে, "আমার ওপর তোমার বিশ্বাস নেই।"

অপরিসীম এক আবেগে নির্ঝরিণীর ওষ্ঠাধর কম্পিত হইতে থাকে, ব্যগ্র কণ্ঠে সে বলে "আমায় তুমি ভুল বুঝো না।"

কালিমালিপ্ত মুখে অনিল উত্তর দেয় "তোমাকে ভুল বুঝে আমার একমাত্র সান্ত্বনার মূলোচ্ছেদ করতে আমি কিছুমাত্র ব্যস্ত নই। কি ভয় তোমার—ভেঙ্গেই না হয় বল—প্রত্যক্ষের মাঝখানে খানিকটা অপ্রত্যক্ষ যেখানে থেকে যায়—প্রেতের মত সংশয় তার অন্ধকার কোটরে বাসা বাঁধে। কি জন্য ভরসা পাও না শুনতে দাও একবার।"

"যে অপরাজেয় প্রকৃতি মানুষকে পুতুল নাচের পুতুলের মত নাচিয়ে বেড়ায়—তাকে আমি ভয় করি—অত্যন্ত ভয় করি।"

"বুঝলুম না। একটু সাদা কথায় বল।"

"একান্ত ভাবে পাওয়ার ভিতর একটা নিরতিশয় ফাঁকি আছে—জানো?"

"না জানি না। সোজা স্বীকার কর্চ্ছি। উঃ! তোমায় কি যে আমার বল্‌তে ইচ্ছে কর্চ্ছে—আমি নিজেও তার আকার খুঁজে পাচ্ছি না! প্রাণ কি তোমার পাষাণে গড়া?"

নির্ঝরের চক্ষে জল টলটল করিতে থাকে। ধরা গলায় নির্ঝর বলে, "না, প্রাণ আমার পাষাণে গড়া নয়। এ আগুণেপোড়া মাটি—এর রংটা কাঁচা মাটির সঙ্গে মেলে না। সাধারণতঃ সকলের জীবন যেমন কাটে আমার জীবন যদি তেমনি কাটত তবে হয়ত আমি—সাধারণতঃ সকলে

যা—আমিও তাই হয়ে উঠ্‌তাম। বারো বছর আগে যে মন নিয়ে আমি জীবনের উপকূলে দাঁড়িয়েছিলাম,—এই বারো বছর পরে আমার সে মন গেছে সম্পূর্ণ আরেক রকম হয়ে। চোখের দৃষ্টি আমার গেছে বদলে ভিন্ন হয়ে—আমার মন ভরসা পায় না এই জন্যে, যদি সে দৃষ্টির সঙ্গে তোমার দৃষ্টি না মেলে—"

ক্ষুণ্ণ স্বরে অনিল বলে "এতদিন যদি না মিলে থাকে—তবে অবশ্য এখনও না মিল্‌তে পার্‌বারই কথা!"

"আমার সব কথা না শুনে আমার ওপর রাগ কোরো না। মানুষ যে জিনিস সহজে পায়—তা নষ্টও হয় সহজে। শাস্ত্রে বলে, মূল্যের দ্বারা দ্রব্য শোধিত করে গ্রহণ কর্ব্বে। বিনামূল্যের জিনিসের না থাকে কোনো মর্য্যাদা না থাকে কোনো গুরুত্ব। ঘরে ঘরে স্ত্রী-পুরুষে মিলে সংসারের সহজ নিয়মে ঘর বাঁধে,—কত সুখ-সাধে কত আনন্দে কত আশায় সে মিলনের বাঁশী বাজে,—কিন্তু 'ঘুম না ভাঙ্গিতে আঁখি না মেলিতে, ভেঙ্গে যায় হায় সাধের খেলা'—তখন বাঁশী বাজে বিলাপে, চোখে জ্বলে আগুণ, ফুলহার গলায় ফণিহার হয়ে ওঠে। বিরোধ বিসম্বাদে কলহের তিক্ততায় হৃদয়-যমুনা হ'য়ে ওঠে গরল-মাখা কালিন্দী। তখন প্রাণের পুষ্পবেদী জুড়ে দাঁড়িয়ে হুহুঙ্কারে তর্জ্জন করে—স্বার্থপরতন্ত্রতার প্রমত্ত অন্ধ দানব, জীবনে যা কিছু সুন্দর, যা কিছু পবিত্র যা কিছু গৌরবের—তার পায়ের তলায় পিষে যায় চূর্ণ হয়ে! ঘরে ঘরে এই যে দৃশ্য—এতেও কি—"

দুই হাতের ভিতর মাথা রাখিয়া অনিল বলিল,—"থাক্‌ আর বোলো না, আমায় বুঝ্‌তে খানিকটা সময় দাও।"

নির্ঝর কথা বলিত কম, কিন্তু বলিত যখন, তখন বলিত সবখানি। অনিলের কথায় ঈষৎ হাস্যে সে বলিল, "আর শোনা হোল না তবে তোমার। কথা কি আর ধরা থাকে?"

"থাকে না? কি জানি! আচ্ছা তবে বল। তোমার কাছ থেকে কথা ত সব সময়ে পাওয়া যায় না—আজ যখন স্বাতী নক্ষত্রের জলের ছিঁটে লেগেছে তোমার মনে—তখন এ শুভ অবকাশ বয়ে যেতে দেওয়া হবে না।"

"আচ্ছা তোমার কি কখনও মনে হয় নি মানুষের জীবন কি নিদারুণ ট্র্যাজিক ফার্স'এর মত?"

অনিল নির্ঝরের মুখের দিকে চাহিয়া বলে "না অতটা মনে হয় নি। সংসারটাকে এরকম চিরে চিরে বিশ্লেষণ ক'রে দেখি নি কখনো। দেখার দরকারও হয় নি। অন্ধকার পথে যে পথিক আকাশের তারার দিকে চেয়ে পথ চলে, তার চোখ ভরে থাকে শুধু সেই তারার জ্যোতি—পথের বিভীষিকা সে চোখে দেখে না।"

নির্ঝরিণী মাথা নীচু করিয়া থাকে, বক্ষ দুরু দুরু কাঁপে, নিঃশ্বাস আসে বন্ধ হইয়া। অনিল এক দৃষ্টে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলে—"গেল আগল বন্ধ হয়ে?"

নির্ঝরিণী হাসিয়া বলে "না। ছেলেমানুষের বয়স ত পার হয়ে গেছে—এখনকার ভুলের ক্ষমা নিজের কাছেও নেই। পূর্ণবয়সের গৌরব এই জন্য যে, দৃষ্টি তখন পূর্ণতা লাভ করে। সংসারের যে দিকটা আমরা দেখি, সেটা ত সংসারের আসল দিক নয়,—জীবনের ওপরে আছে একটা সুদৃশ্য আবরণ,—নানা বর্ণে নানা ছন্দে নানা কারু-কার্য্যে খচিত। কিন্তু তার তলায় আছে অসহ্য কদর্য্যতা, কুশ্রীতা, অঙ্গহীন বিকলতা, ক্লেদাক্ত বীভৎস মত। যার চোখে সে দৃশ্য একবার পড়ে, বাইরের সাজানো আবরণটা তার চোখের কাছ থেকে যায় উড়ে আর সত্যের বেশে মিথ্যার যে মায়ারূপ জগৎ জুড়ে বসে আছে তা যায় ছায়াকার হয়ে মিলিয়ে।"

"মনে মনে আমার মন যে তোমাকে ভয় করেছে—তার মানেই হচ্ছে এই যে, আমার অবচেতন মন আমার চেতন বুদ্ধির বহু আগে জেনেছে যে তুমি অতি ভয়ানক লোক। যা সব বল্‌ছো—তাতে আমার রক্ত হিম হয়ে আস্‌ছে। যেখান থেকে তুমি আমায় আহ্বান করছ—সেখানে নাগাল আমি পাব কি না পাব তা-ও জানি না। আমার উপলব্ধির যা অতীত তা নিয়ে তোমার কাছে স্পর্দ্ধা করবার মত দুঃসাহস আমার নেই।"

"কি কর্ব্ব বল, আমার ভাগ্য আমায় হিঁচড়ে টেনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে এমন এক জায়গায়—যেখানে আর কারো পায়ের শব্দ পাওয়ার কল্পনা দুষ্করনা। এ ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয় পথ—তবু এই আমার একমাত্র পথ। আমার জীবন থেকে ভগবান যা ছিঁড়ে নিয়েছেন—উচ্ছিন্ন করে দিয়েছেন—তা কেড়ে নিতে, কি কুড়িয়ে নিতে

অভিলাষ আমার নেই। তখন যা মনের কাছে বড় ছিল, এখন তা গেছে ছোট হয়ে, এখন যা মনের কাছে বড়—তখন তা ছিল আমার উপলব্ধির বাইরে। আমার মন চলেছে "নেতি"র পথে—খোসার মত একে একে সব খসে যাচ্ছে—"

অনিল বেদনা-মথিত হৃদয়ে বলে—"আমি তা হলে খোসার মত খসে গেছি!" কণ্ঠস্বর তাহার কাঁপিয়া গিয়া আরেক রকম শোনায়।

নির্ঝর কোনো উত্তর দেয়না, কিন্তু দীপ্ত নয়নে ফুটিয়া উঠে অকথিত এক অপ্রমেয় বাণী। অনিল নিষ্পলক চক্ষে তাহার দিকে চাহিয়া থাকে।

নির্ঝর বলে, "মানুষ চিরদিনই মানুষ। তার দুর্ব্বলতাও আছে যেমন, অভিমান আছে তেমন। আমি খোসা চাই নি—চেয়েছি এক খনি—যা ফুরুবে না—ক্ষয় হবে না—যার আদ্যন্ত নেই, সমুদ্রের মত যা আপনাতে আপনি পূর্ণ। লোভ আমার অনেক বড়"।

"কিন্তু আজ আমাকে তোমার কোনো উত্তর দেওয়ার দরকার নেই। সম্বৎসর পরে—না হয় তারো পরে উত্তর দিয়ো। নিজের মন বুঝে নাও আগে। এই জগতের মেকির বাজারে প্রেম যেখানে বিকোয় আত্মসুখের মূল্যে—বেসাতি আমার সেখানে যদি অচল হয়ে ওঠে—তাতে আমার দুঃখ নেই!" (ক্রমশঃ)

—শ্রীআমোদিনী ঘোষ

বৎসপত্তন কৌশাম্বী

শ্রীযুক্ত অম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল, পি-আর-এস

কৌশাম্বী অতি প্রাচীন নগরী। শতপথ ব্রাহ্মণে এবং পাণিনি ব্যাকরণেও "কৌশাম্বের" কথাটির উল্লেখ দেখা যায়। কুশাম্ব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত এই অর্থে কৌশাম্বী কথাটি সিদ্ধ হইয়াছে। রামায়ণ ও পুরাণ সমূহ হইতে এই কুশাম্ব নৃপতির পরিচয় পাওয়া যায়। "অক্লিষ্টব্রত, ধর্ম্মজ্ঞ, সজ্জনপ্রতিপূজক, মহাতপস্বী কুশ নামক জনৈক ব্রহ্মতনয় ছিলেন। তাঁহার চারিপুত্র কুশাম্ব, কুশনাভ, অমূর্ত্তরজস ও বসু। তন্মধ্যে মহাতেজস্বী বসু কৌশাম্বীপুরীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।" (আদিকাণ্ড, ৩২শ অধ্যায়)

পুরাণমতে এই কুশ চন্দ্রবংশীয় নৃপতি পুরূরবার নবম অধস্তন পুরুষ। বিভিন্ন পুরাণে তাঁহার চারিপুত্রের নামে পরস্পরের মধ্যে কতকটা পার্থক্য দেখা যাইলেও তাহা রামায়ণবর্ণিত নামচতুষ্টয়ের সহিত একই বলা যাইতে পারে।

বৌদ্ধ সাহিত্য হইতে বুদ্ধদেবের প্রাদুর্ভাবকালে অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব্ব সপ্তম—ষষ্ঠ শতকের মধ্যে ভারতবর্ষে ষোড়শটী মহাজনপদ ছিল বলিয়া জানা যায়। তন্মধ্যে বৎস জনপদ অন্যতম। কৌশাম্বী ছিল এই বৎস দেশের রাজধানী। সে কারণ ইহা বৎসপত্তন নামেও অভিহিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে বৎসরাষ্ট্রের অনেকস্থলে কৌশাম্বীমণ্ডল বা শুধু কৌশাম্বী বলিয়া উল্লেখ দেখা যায়। রামায়ণেও বৎসদেশের উল্লেখ আছে। গঙ্গার দক্ষিণে, প্রয়াগসঙ্গমের অদূরে প্রমোদিত ও সুন্দর শস্যযুক্ত বৎসদেশ অবস্থিত ছিল। (অযোধ্যাকাণ্ড ৫২ অধ্যায়, ১০১শ শ্লোক; ৫৪ অধ্যায়।)

বৎসরাজ্যের রাজধানী কৌশাম্বী বারাণসী হইতে ৩০ যোজন দূরে যমুনাতটে অবস্থিত ছিল বলিয়া পালিসাহিত্য হইতে পরিচয় পাওয়া যায় (অঙ্গুত্তারটিকা ১।২৫)। এই সকল বিবরণ হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে কৌশাম্বীনগরী আধুনিক প্রয়াগের সন্নিকটে কোনও স্থানে অবস্থিত ছিল। পরলোকগত পণ্ডিত সার আলেকজাণ্ডার কানিংহাম এলাহাবাদের ২৮ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত কোসম পল্লীকে প্রাচীন কৌশাম্বীপুরীর ধ্বংসনিদর্শন বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। সে আজ অনেক কালের কথা। ভিন্সেণ্ট স্মিথ প্রমুখ কোন কোন পণ্ডিত সে কথা দীর্ঘকাল মানিতে না চাহিলেও বর্ত্তমানে কানিংহামের সিদ্ধান্ত সর্ব্বাংশে অভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে।

প্রাচীন সংস্কৃত এবং পালি গ্রন্থসমূহে কৌশাম্বীর ভূরি ভূরি উল্লেখ দেখা যায়। পুরাণকাহিনী মতে, জলপ্লাবনে হস্তিনাপুর বিনষ্ট হইলে পরে পরীক্ষিতের পঞ্চম অধস্তন পুরুষ নিচক্ষু বা নেমিচক্র কৌশাম্বীতে রাজপাট উঠাইয়া আনিয়াছিলেন (বিষ্ণুপুরাণ ৪।২১।৩)। তাঁহার ২১শ অধস্তনপুরুষ উদয়ন রাজা ভারতীয় ইতিহাস ও সাহিত্যের সুপরিচিত ব্যক্তি। বৌদ্ধমতে তিনি ভগবান বুদ্ধদেবের সমসাময়িক ছিলেন এবং তাঁহার ধর্ম্মও গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহাবংশ, ললিতবিস্তর, মেঘদূত, স্বপ্নবাসবদত্তা, প্রতিজ্ঞা-যৌগন্ধরায়ণ, কথাসরিৎসাগর, রত্নাবলী, প্রিয়দর্শিকা প্রভৃতি গ্রন্থ এবং হিউয়েনসঙ্গের ভ্রমণ বিবরণমধ্যে তাঁহার পরিচয় পাওয়া যায়। ঐ সকল বিবরণ হইতে বেশ বুঝা যায় যে বৎসরাজ উদয়ন প্রাচীন ভারতবর্ষের প্রধান নৃপতিবর্গের অন্যতম ছিলেন। *

ঐ সকল গ্রন্থ হইতে প্রাচীন কৌশাম্বীর সুখ-সমৃদ্ধির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। কৌশাম্বী প্রাচীনযুগে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ঊনবিংশ নগরের অন্যতম বলিয়া বিবেচিত হইত। বুদ্ধদেবের সময়ে কৌশাম্বীর উপকণ্ঠে চারিটী বিহার বা

* উদয়ন সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার জন্য ১৩৩৯ সালের পৌষের বিচিত্রায় প্রকাশিত মল্লিখিত "বৎসরাজ উদয়ন" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

আরাম ছিল, তাহাদের নাম ছিল বদরিকারাম, কুক্কুটারাম, ঘোষিতারাম এবং পাবারিয় আম্রবাটিকা (বিনয় ৪, ১৬; সংযুক্ত ৩১১)। ঘোষিতারাম বা ঘোষাবতারামটী রাজা উদয়নের অন্যতম অমাত্য ঘোষিত বা ঘোষিল কর্তৃক ভগবান বুদ্ধপ্রমুখ সঙ্ঘকে উৎসৃষ্ট হইয়াছিল। বুদ্ধত্ব লাভের পর ভগবান তথাগত ৬ষ্ঠ ও ৯ম বর্ষ কৌশাম্বীতে যাপন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অমূল্য বাণী ও উপদেশাদির মধ্যে অনেকগুলিই কৌশাম্বীর আরাম চতুষ্টয়ের কোন না কোনটী হইতে প্রদত্ত হইয়াছিল।

পুরাণমতে উদয়নের চতুর্থ অধস্তন পুরুষ ক্ষেমকের সহিত পৌরববংশের অবসান হইয়াছিল। বৌদ্ধগ্রন্থসমূহ হইতে জানা যায় যে মগধের বিম্বিসার, কোশলের প্রসেনজিৎ ও বৎসদেশের উদয়ন ও অবন্তীর প্রদ্যোৎ পরস্পর সমসাময়িক ছিলেন। প্রত্যেকেরই চতুর্থ অধস্তন পুরুষের সহিত বংশলোপ হইয়াছিল বলিয়া পুরাণে লিখিত হইয়াছে। তাহা যে শুধুই দৈবক্রমে ঘটিয়াছিল এরূপ মনে করা সঙ্গত নহে। উহার অপর একটি গুরুতর কারণ ছিল বলিয়াই মনে হয়। ইহার পর মগধে শূদ্র নন্দরাজগণের আধিপত্য হয়। ক্ষত্রিয়কুলান্তক, দ্বিতীয়ভার্গবতুল্য শূদ্রবংশীয় মহাপদ্ম নন্দের অভ্যুদয়েই অপরাপর রাজশক্তির উচ্ছেদ ঘটিয়াছিল এবং কৌশাম্বী মগধরাষ্ট্রভুক্ত হইয়াছিল বলিয়াই বোধ হয়। নন্দরাজগণের নিকট হইতে চন্দ্রগুপ্ত বহুবিস্তৃত সাম্রাজ্যের আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। একারণ মনে হয় নন্দরাজবংশের প্রতিষ্ঠাতার হস্তেই কৌশাম্বীর স্বাধীনতা বিনষ্ট হইয়াছিল।

খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতেও কৌশাম্বী তাহার গৌরব হারায় নাই। বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহে লিখিত আছে যে বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণের শতবর্ষ পরে বৈশালীতে বৌদ্ধদিগের দ্বিতীয় মহাসঙ্গীতি হইয়াছিল। তাহার বিবরণ মধ্যে দেখা যায় যে স্থবির যশ বৈশালীর বৃজ্জিভিক্ষুগণের উৎপীড়নে বাধ্য হইয়া বৈশালী হইতে কৌশাম্বী প্রস্থান করেন এবং তথা হইতে অপরাপর স্থানে সংবাদ প্রেরণ করেন (মহাবংশ, ১৬)।

দিব্যাবদানে অশোকের তীর্থভ্রমণ প্রসঙ্গে বুদ্ধদেবের জীবনী সম্পর্কে পূত যে সকল স্থান ধর্ম্মগুরু উপগুপ্ত সমভিব্যাহারে তিনি দেখিয়াছিলেন বলিয়া লিখিত হইয়াছে তাহার মধ্যে কৌশাম্বীরও নাম দেখা যায়।

অশোকের সময়ে কৌশাম্বী যে মৌর্য্যসাম্রাজ্যের একটি প্রধান নগর এবং অন্যতম শাসনকেন্দ্র ছিল তাহা স্বতন্ত্র এক প্রমাণ হইতেও জানা যায়। এলাহাবাদ দুর্গমধ্যে অবস্থিত অশোকের প্রস্তরস্তম্ভগাত্রে কৌশাম্বীর মহামাত্রকে আদেশ করিয়া প্রচারিত একটি অনুশাসন উৎকীর্ণ দেখা যায়। সে কারণ ঐতিহাসিক মহলে উহা "কৌশাম্বী অনুশাসন" নামে পরিচিত। সঙ্ঘে ভেদবিবাদ আনয়নের বিরুদ্ধে আদিষ্ট অশোকের সুপ্রসিদ্ধ অনুশাসনটির ইহা অপর এক সংস্করণ মাত্র সাঁচি ও সারনাথে এই ধরণের অনুশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাই বুঝা যায় যে অশোকের সময়ে কৌশাম্বীর পূর্ব্ব গৌরব অক্ষুণ্ণ ছিল এবং সাঁচি ও সারনাথের ন্যায়ই এখানকার বৌদ্ধসঙ্ঘ সম্রাটের প্রাণের জিনিস ছিল। অশোকের ঐ স্তম্ভটী প্রথমে কৌশাম্বী নগরে প্রতিষ্ঠিত ছিল, পরে কোন সময়ে এলাহাবাদে আনীত হইয়াছে বলিয়া সকলে মনে করেন। ঐ স্তম্ভগাত্রে সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয়কাহিনীর বিবরণ সম্বলিত এক প্রশস্তি উৎকীর্ণ আছে, ইহা হইতে বুঝা যায় যে তাঁহার সময়েও কৌশাম্বী রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান নগর ছিল।

সমুদ্রগুপ্তের পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ চীনপর্য্যটক ফাহিয়ান এদেশে আগমন করেন। তাঁহার লিখিত ভ্রমণকাহিনীর মধ্যে কৌশাম্বীর উল্লেখ আছে, তবে তাহা হইতে তিনি স্বয়ং এতদঞ্চলে পদার্পণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। তিনি লিখিয়াছেন "মৃগদাবের ১৩ যোজন -উত্তর-পশ্চিমে কৌশাম্বীরাজ্য। এখানে গোশীরবন নামে একটি সঙ্ঘারামের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়, পূর্ব্বে বুদ্ধদেব এখানে বাস করিতেন। হীনযানমতাবলম্বী যতিগণ এখনও এখানে বাস করে।"

হিউয়েনসঙ্গের লিখিত বিবরণ ইহা অপেক্ষা বিশদ। তিনি বলেন, "কৌশাম্বী দেশের পরিধি প্রায় ৬০০০লি ও রাজধানীর পরিধি ৩০লি (৫ মাইল)। দেশটী খুব উর্ব্বর ;—উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ আশ্চর্য্যজনক। চাউল

ও ইক্ষুদণ্ড প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। জল হাওয়া গরম। অধিবাসিরা কঠোর প্রকৃতির ও অভদ্রধরণের; তবে তাহারা লেখাপড়ার চর্চ্চা করে এবং ধার্ম্মিক। দশটী সঙ্ঘারামের ভগ্নাবশেষ এখনও দেখা যায়;—ঐগুলি এক্ষণে জনমানবহীন। হীনযানমতাবলম্বী ৩০০০ ভিক্ষু এখনও এখানে বাস করে। দেবমন্দিরের সংখ্যা ৫০টি এবং বিধর্ম্মীদের সংখ্যা অগণ্য।

নগরে প্রাচীন প্রাসাদের মধ্যে ৬০ ফুট উচ্চ একটি বৃহৎ বিহার আছে, তন্মধ্যে চন্দনকাষ্ঠনির্ম্মিত বুদ্ধমূর্ত্তি রক্ষিত—তাহার উপরে প্রস্তরের চাঁদোয়া। রাজা উদয়ন কর্ত্তৃক ঐ মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছিল। দৈবশক্তি বলে মধ্যে মধ্যে ইহা হইতে দিব্য এক জ্যোতিচ্ছটা স্ফুরিত হয়। নানাদেশীয় নৃপতিবৃন্দ এই মূর্ত্তি নিজ নিজ রাজ্যে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। সে কারণ তাঁহারা ইহার অনুকরণে নির্ম্মিত মূর্ত্তির পূজা করেন এবং ইহারই প্রতিলিপি বলিয়া প্রচার করেন।

তথাগত পূর্ণজ্ঞানলাভের পর নিজ জননীর হিতার্থে প্রচারের জন্য স্বর্গে আরোহণ করিয়া তথায় তিন মাসকাল অবস্থান করেন। রাজা উদয়ন তাঁহার এক প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া মৌদ্গল্যায়নকে স্বীয় ঐশ্বরিক শক্তিবলে বুদ্ধদেবের শরীরচিহ্ন লক্ষ্য করিবার জন্য ও মূর্ত্তি-গঠনের জন্য এক শিল্পীকে স্বর্গে প্রেরণ করিতে অনুরোধ করেন। তথাগতের স্বর্গ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর মূর্ত্তি উঠিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। ইহাতে পৃথিবীপতি তাহাকে বলিলেন "অবিশ্বাসিদিগকে ধর্ম্মে দীক্ষিত করা এবং ধর্ম্মপথে চালিত করাই ভবিষ্যতে তোমার কার্য্য নির্দ্দিষ্ট হইল।"

নগরের দক্ষিণপূর্ব্বদিকে গোশীরের বাসস্থানের ধ্বংসাবশেষ অবস্থিত। মধ্যভাগে বুদ্ধদেবের জন্য নির্ম্মিত বিহার, একটি স্তূপমধ্যে তাঁহার কেশ ও নখ রহিয়াছে। তাঁহার স্নানাগারের ধ্বংস নিদর্শন আজিও দেখা যায়।

নগরের দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে, অল্পদূরেই, একটি পুরাতন সঙ্ঘারাম আছে। ঐখানেই গোশীর উদ্যান ছিল। অশোক রাজা এইখানে ২০০ ফুট উচ্চ একটি স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ঐস্থানেই তথাগত ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন। স্তূপের চারিপাশে চারিজন পূর্ব্বতন বুদ্ধের ভ্রমণ ও উপবেশনের স্থানের চিহ্ন এবং অপর এক স্তূপে তথাগতের কেশ ও নখ আছে।

সঙ্ঘারামের দক্ষিণ পূর্ব্বে ইষ্টক নির্ম্মিত এক দ্বিতল সৌধের উপরের একটি কক্ষে বসুবন্ধু বোধিসত্ত্ব বাস করিতেন। এইখানেই তিনি হীনযানী ও বিধর্ম্মিগণকে পরাস্ত করিবার নিমিত্ত "বিজ্ঞানমাত্রসিদ্ধিশাস্ত্র" রচনা করিয়াছিলেন। নিকটেই এক আম্রকাননের মধ্যে পুরাতন প্রাচীরের ভিত্তির নিদর্শন দেখা যায়। এই স্থানে অসঙ্গ বোধিসত্ত্ব "হীন হিয়াং সিকি ও শাস্ত্র" রচনা করেন।

নগরের ৮।৯লি দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে বিষাক্ত নাগের শৈলাবাস অবস্থিত। তথাগত নাগকে পরাজিত করিয়া গুহামধ্যে স্বীয় ছায়া রাখিয়া গিয়াছেন এরূপ এক কিম্বদন্তী প্রচলিত থাকিলেও বর্ত্তমানে ছায়ার কোনই নিদর্শন দেখা যায় না। এইখানে অশোকরাজা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত ২০০ ফুট উচ্চ একটি স্তূপ আছে। নিকটে তথাগতের ভ্রমণের চিহ্ন এবং এক স্তূপ মধ্যে তাঁহার চুল ও নখ রক্ষিত আছে। রোগগ্রস্ত ব্যক্তিরা এইখানে প্রার্থনা করিলে আরোগ্য লাভ করে। সাম্যের ধর্ম্ম লোপ পাইতে পাইতে এই দেশেই কোন প্রকারে শেষ লাভ করিয়া জীবিত থাকিবে—এই জন্য ছোট বড় যাহারা এদেশে আসে সকলেই ফিরিয়া যাইবার পূর্ব্বে অভিভূত হইয়া পড়ে।"

হিউয়েনসঙ্গের আগমনকালে কৌশাম্বী যে সমগ্র উত্তরা-পথের অধীশ্বর সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের রাজ্যভুক্ত ছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। দীর্ঘকাল আর কৌশাম্বীর কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। কান্যকুব্জে গুর্জ্জর-প্রতিহার রাজগণের অভ্যুদয় হইলে পরে কৌশাম্বী যে তাঁহাদেরই আয়ত্তাধীন ছিল তাহা না বলিলেও চলে। পালরাজ মহিপালদেবের রাজত্বের ১১শ বর্ষে উৎকীর্ণ ও নালন্দার ধ্বংসাবশেষ মধ্যে প্রাপ্ত একটি লিপিতে আবার কৌশাম্বীর নাম পাওয়া যায়। উহা হইতে জানা যায় যে, ঐ স্থান হইতে সমাগত বালাদিত্য নামক জনৈক ব্যক্তি অগ্নিদাহে বিনষ্ট নালন্দার মন্দিরের জীর্ণ সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন। বারাণসী পর্য্যন্ত সমগ্র অঞ্চল মহিপাল-দেবের রাজ্যভুক্ত ছিল বলিয়া জানা গিয়াছে। আরও কিঞ্চিৎ

পশ্চিমে কৌশাম্বী অবধি তাঁহার অধিকারে ছিল কি না ঠিক জানা না থাকিলেও, তাহা যে একেবারেই সম্ভবপর ছিল না এমন কথাও জোর করিয়া বলা চলে না।

খারা দুর্গের তোরণের উপর উৎকীর্ণ একটি লিপি হইতে প্রকাশ যে ১০৯২ সম্বৎ বা ১০৩৫ খৃষ্টাব্দে কৌশাম্বী রাজ্য কনোজের অধীনতা-পাশ ছেদন করিয়া স্বাধীন হয়। (J A. S. B., V. 731)

সন্ধ্যাকর নন্দীর "রামচরিত" কাব্যে দোরপবর্দ্ধন নামে এক কৌশাম্বী নৃপতির অস্তিত্ব অবগত হওয়া যায়। তিনি কৈবর্ত্তনায়ক ভীমের বিরুদ্ধে রামপালদেবকে স্বীয় পিতৃরাজ্য উদ্ধারে সাহায্য করিয়াছিলেন। রামপালদেবের রাজ্যকাল আনুমানিক ১০৮৭ হইতে ১১৩০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ধরা যাইতে পারে।

অতিপ্রাচীনকাল হইতে কৌশাম্বী নগরীর যে পরিচয় সাহিত্য ও শিলালিপি আদি হইতে পাওয়া যায়, তাহা সংক্ষেপে বলা গেল। এবার আধুনিক যুগে কৌশাম্বীর যে ধ্বংসনিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার সম্বন্ধে মোটামুটি কিছু বলিব। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমার একবার কোসমের ধ্বংসরাজি দেখিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে E. C. Bayley কানিংহাম সাহেবকে বলেন আধুনিক কোসমই সম্ভবতঃ প্রাচীন কৌশাম্বীর নিদর্শন। শিক্ষাবিভাগের তদানীন্তন অন্যতম কর্ম্মচারী বাবু শিবপ্রসাদের নিকট হইতে কানিংহাম আরও সংবাদ পান যে, কোসমপল্লী স্থানীয় অধিবাসীবৃন্দের নিকট কৌশাম্বী নগর নামে অভিহিত হইয়া থাকে; উহা জৈনদের একটি তীর্থস্থান এবং মাত্র শত বর্ষ পূর্ব্বেও অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও এখানে একটি অপেক্ষাকৃত বড়গোছের সহর ছিল। ইহা হইতে তাঁহার মনে হইল যে কোসমপল্লীই তাহা হইলে সেই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ নগরীর নিদর্শন। অতঃপর এখানে অনুসন্ধানে আসিয়া একটি ভগ্ন স্তম্ভগাত্রে উৎকীর্ণ আকবরের সময়ের একটি লিপিতে এই স্থানকে "কৌশাম্বীপুর" বলিয়া উল্লিখিত হইতে দেখিয়া আধুনিক কোসম এবং প্রাচীন কৌশাম্বীর সম্বন্ধে তাঁহার আর কোনই সন্দেহ রহিল না। ১৮২৪-২৫ খৃষ্টাব্দে ক্ষোদিত একটি লিপিতেও এই স্থানের কৌশাম্বী নগর বলিয়া উল্লেখ হইতে বুঝা যায় যে স্থানীয় অধিবাসিরা বরাবরই তাহাদের গ্রামের প্রকৃত পরিচয় জ্ঞাত ছিল, তাহা কখনই বিস্মৃতির গহ্বরে নিমগ্ন হইতে দেয় নাই। বলা বাহুল্য প্রাচীন জনপদসমূহের আধুনিক ইতিহাসে এরূপ ঘটনা খুব কমই চোখে পড়ে।

কোসমপল্লীর সন্নিকটে এখনও প্রাচীনযুগের ধ্বংস-নিদর্শন বহুদূর বিস্তৃত স্থান জুড়িয়াই অবস্থিত রহিয়াছে। এখানকার প্রধান দ্রষ্টব্য একটি ভগ্ন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ এবং একটি সুবৃহৎ প্রস্তরস্তম্ভ। স্তম্ভটি সম্রাট অশোকের প্রতিষ্ঠিত স্তম্ভসমূহের অন্যতম বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। ভগ্নপ্রায় দুর্গটি কোসমপল্লীকে দুই অংশে বিভক্ত করিয়াছে; পূর্ব্বের অংশ কোসম খিরাজ এবং পশ্চিমের অংশ কোসম ইনাম নামে পরিচিত। শেষোক্ত পল্লীর অদূরে পালি নামে একটি গণ্ডগ্রাম আছে, গড়ের প্রাকারের মধ্যেও বড় গড়োয়া এবং ছোট গড়োয়া নামে দুইটি গ্রাম আছে।

গড়টি আকারে চতুষ্কোণ, উহার পরিধি ৪ মাইলের কিছু অধিক। আশপাশের সমতল ক্ষেত্রসমূহ হইতে তাহা এখনও ২০।২২ হাত উচ্চ হইবে। গড়ের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের অনেকখানি অংশ যমুনার প্লাবনে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অভ্যন্তরদেশ ভগ্ন ইষ্টকখণ্ডে সমাচ্ছন্ন—জঙ্গল বড় একটা নাই। মধ্যস্থলে আধুনিককালে নির্ম্মিত পরেশনাথের একটি জৈনমন্দির আছে। এই স্থানের নাম "দেওরা"। মন্দিরের পূর্ব্ব ও পশ্চিম উভয়পার্শ্বেই বৃহৎ ইমারতের ভিত্তির চিহ্ন এখনও দেখা যায়। বড় গড়োয়া গ্রামে কানিংহাম একটি মূর্ত্তির পাদপীঠ এবং নানাপ্রকার কারুকার্য্যমণ্ডিত দুইটি রেলিংয়ের স্তম্ভ পাইয়াছিলেন। বেদীর গায়ে খৃষ্টীয় ৮ম ও ৯ম শতকে প্রচলিত অক্ষরে

"যে ধর্ম্ম হেতুপ্রভবা হেতুস্তেষাং তথাগতোহ্যাহ।
তেষাং চ যে নিরোধ এবং বাদী মহাশ্রমণঃ॥"

এই সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ শ্লোকটি উৎকীর্ণ ছিল। ছোট গাড়োয়া গ্রামেও কানিংহাম একটি প্রস্তরস্তম্ভ পাইয়াছিলেন, তাহার তিন দিকের গাত্রে সুন্দর স্তূপচিত্র ক্ষোদিত ছিল। এই সকল হইতে বেশ বুঝা যায় যে কোসমগড়ের মধ্যে প্রাচীন যুগে এককালে সুবৃহৎ হর্ম্ম্যাদি ছিল।

জৈনমন্দিরের কিছু উত্তরে অখণ্ড প্রস্তর নির্ম্মিত সুদীর্ঘ একটী স্তম্ভ ভগ্নাবস্থায় আজিও দণ্ডায়মান রহিয়াছে। স্তম্ভটির গায়ে অশোকের যুগের ভাস্কর্য্যের বিশেষত্ব যে উজ্জ্বল পালিস, তাহা আজিও দীপ্তিমান রহিয়াছে। স্তম্ভটী সর্ব্বাংশে অশোকের অন্যান্য স্তম্ভেরই অনুরূপ। এটিও অশোকপ্রতিষ্ঠিত স্তম্ভসমূহের অন্যতম। কিন্তু দীর্ঘকাল যাবৎ এটীকে কেহ অশোকের স্তম্ভ বলিয়া বুঝিতে পারেন নাই, কারণ ইহার গাত্রে উক্ত মৌর্য্য সম্রাটের কোন অনুশাসন উৎকীর্ণ দেখা যায় না। যে সকল লেখা আছে তাহাদের অধিকাংশ যাত্রী ও দর্শকবৃন্দের নাম এবং আধুনিক নাগরী অক্ষরে উৎকীর্ণ।

কানিংহাম যখন আবিষ্কার করিয়াছিলেন তখন স্তম্ভটী কতকটা বক্রভাবে দণ্ডায়মান ছিল। তলায় এত রাবিশ জমিয়াছিল যে উহার প্রায় অর্দ্ধেকটা অংশ দেখা যাইত না —মাত্র ১৪ ফুট উচ্চ স্তম্ভদণ্ড উপরে জাগিয়াছিল। নিকটেই আর দুইটি ভগ্ন খণ্ড পড়িয়াছিল, উহাদের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ৪ ফুট ৬ ইঞ্চি এবং ২ ফুট ৩ ইঞ্চি। স্তম্ভটীর দৈর্ঘ্য জানিবার জন্য কানিংহাম চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু ৭ ফুটেরও অধিক পরিমাণ স্থানের রাবিশ সরাইয়া তাহার প্রান্তভাগ পান নাই। গ্রামবাসিরা বলে প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে স্তম্ভটী বৃহৎ এক নিম্ববৃক্ষের উপর হেলিয়া পড়িয়া দাঁড়াইয়াছিল। কতকগুলি রাখাল একদিন সেই গাছের নীচে আগুন জ্বালে। বহ্ন্যুত্তাপে স্তম্ভটীর মাথা ভাঙ্গিয়া যায়। স্তম্ভটীর আকার ও ডৌল অন্যান্য অশোকস্তম্ভের সহিত তুলনা করিয়া কানিংহাম অনুমান করেন অভগ্ন অবস্থায় এটী ৩৪ ফুটের অন্যূন দীর্ঘ ছিল। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ডিষ্ট্রিক্ট ইন্‌জিনিয়ার নেসবিট সাহেব পুনরায় তলদেশে খনন করেন। যখন স্তম্ভটী পড়িয়া যাওয়ার ভয়ে কাজ বন্ধ করা হয় তখনই ৩৪ ফুট দীর্ঘ স্তম্ভদণ্ড বাহির হইলেও তাহার প্রান্তভাগ দেখা যায় নাই। তাই নেসবিট মনে করিয়াছিলেন উহা ৪০ ফুট অপেক্ষাও দীর্ঘ।

কৌশাম্বীর স্তম্ভটী যে দীর্ঘকাল হইতেই এইভাবে বক্রভাবে রহিয়াছে তাহা ইহার গাত্রে উৎকীর্ণ কয়েকটী লেখা হইতে বেশ বুঝা যায়। ঐগুলি যে-ভাবে লেখা তাহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে উহাদের খোদাই করিবার পূর্ব্ব হইতেই স্তম্ভটি হেলিয়া রহিয়াছিল। পূর্ব্বে একবার বলিয়াছি ইহাতে প্রাচীন যুগের কোন অনুশাসন বা ঘোষণাপত্র নাই। তবে গুপ্তযুগ হইতে আধুনিক কালের সকল যুগের অক্ষরেই উৎকীর্ণ বহু সংখ্যক খণ্ড খণ্ড লেখা আছে। একটিতে "মোগল পাতিসা আকবর পাতিসা গাজীর" উল্লেখ আছে। অপর একটিতে ১৬২১ সম্বতের (১৫৬৭ খৃষ্টাব্দ) একটি স্বর্ণকার পরিবারের বংশবিবরণে আদিপুরুষ আনন্দরামদাস কৌশাম্বীপুরে স্বর্গগত হয় বলিয়া লিখিত হইয়াছে; অর্থাৎ কোসমই যে কৌশাম্বী তাহা তখনও সকলে অবগত ছিল।

কোসমখিরাজের পূর্ব্বদিকে যমুনাতটে গোপসাস নামে একটি গ্রাম আছে। কানিংহাম মনে করিয়াছিলেন উহা 'গোশীর্ষ' কথাটার অপভ্রংশ এবং তিনি ঐখানেই গোশীর্ষের উদ্যানের স্থাননির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। কোসমখিরাজ বা হিসামাবাদ গ্রামে বহু প্রাচীনকীর্ত্তির নিদর্শন দেখা যায়। এখানকার এবং আশপাশের গ্রামের অধিবাসিদের বাটীগুলি পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে প্রাচীন যুগের ইষ্টক এবং কারুকার্য্যখচিত প্রস্তরখণ্ডযোগে ঐগুলি নির্ম্মিত। চারিদিকে এত অনায়াসলভ্য ইষ্টক ও প্রস্তর থাকিতে কেহ আর নূতন করিয়া ইষ্টক নির্ম্মাণ বা প্রস্তর কাটিবার পরিশ্রম এবং অর্থব্যয় করিতে প্রস্তুত নহে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়াই এইভাবে ইষ্টক প্রস্তর সংগ্রহের ফলে, সুধু কৌশাম্বী কেন, ভারতবর্ষের প্রায় সকল পুরাতন স্থানই কিরূপ বিনষ্ট হইয়াছে তাহা ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকের অজ্ঞাত নহে।

কোসমখিরাজ গ্রামের তিন মাইল উত্তর পশ্চিমে এবং কোসমইনাম ও পালি গ্রামের দুই মাইল দূরে যমুনার উত্তরতীরে একটি ছোট পাহাড় আছে। তাহার উপরে প্রায় ত্রিশ ফুট ঊর্দ্ধে পভোসা গ্রাম অবস্থিত। ইহাই সেই প্রাচীন প্রভাস পর্ব্বত; সংস্কৃত গ্রন্থাদি হইতে জানা যায় যে অন্তর্ব্বেদী বা গঙ্গাযমুনার মধ্যবর্ত্তী দোয়াব প্রদেশ মধ্যে প্রভাস পর্ব্বতই একমাত্র পাহাড়। পভোসা পর্ব্বতগাত্রে, খুব ঊর্দ্ধে, এক দুর্গম স্থানে মনুষ্যহস্তবিরচিত একটি গুহা আছে। গ্রামটির পশ্চাতে প্রস্তরগাত্রে ক্ষোদিত ১১০ টি সিঁড়ি দিয়া পাহাড়ে আরোহণ করিয়া একটি কৃত্রিম সমতল স্থানে আসিয়া পৌঁছান যায়; সেখানে একটি

আধুনিক যুগের ছোট জৈনমন্দির অবস্থিত। সন্নিকটেই পর্ব্বতগাত্রে তিনটি দণ্ডায়মান দিগম্বর মূর্ত্তি ক্ষোদিত দেখা যায়। মন্দির হইতে প্রায় শতহস্তদূরে পর্ব্বতগাত্র একেবারে খাড়া উচ্চ হইয়া ৪৭ ফুট উঠিয়াছে, তাহার সর্ব্বোচ্চস্থানে গুহাটী অবস্থিত। গুহাটী যখন নির্ম্মিত হইয়াছিল তখন নিশ্চয়ই উহার মধ্যে গমনাগমনের ব্যবস্থাও করা হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে তাহার কোনই নিদর্শন দেখা যায় না। মই বা ভারা বাঁধা ব্যতীত গুহামধ্যে প্রবেশের অপর কোন উপায় নাই। সে কারণ মনে হয় যে সপ্তম শতাব্দীতে হিউয়েনসঙ্গ দেখিবার পর এবং বিগত শতাব্দীর শেষভাগে Dr. Führer কর্ত্তৃক আবিষ্কারের মধ্যে কোন সময়ে প্রস্তরছেদকগণ কর্ত্তৃক প্রস্তরসংগ্রহের ফলে তাহা একেবারেই অপসৃত হইয়াছে।

এইটিই হিউয়েনসঙ্গ-দৃষ্ট নাগরাজের গুহা বলিয়া মনে হয়। উক্ত চীনপরিব্রাজকবর্ণিত দূরত্বাদির সহিত গুহাটির অবস্থানের মিল দেখা যায়। তবে গুহাটী কোসমের উত্তর পশ্চিমদিকে অবস্থিত, হিউয়েনসঙ্গের বর্ণনামত দক্ষিণ-পশ্চিমে নহে। তাই পণ্ডিতগণ মনে করেন হিউয়েনসঙ্গ ভ্রমক্রমে "উত্তর-পশ্চিম" লিখিতে "দক্ষিণ পশ্চিম" লিখিয়াছিলেন। সপ্তম শতাব্দীতে প্রচলিত নাগের কাহিনী এখনও গুহা সম্পর্কে গ্রামবাসিদের মধ্যে প্রচলিত দেখা যায়। তাহাদের বিশ্বাস গুহামধ্যে এক নাগ বাস করে। তাহার মস্তক যমুনার জলে এবং পুচ্ছদেশ গুহার ভিতরে অবস্থিত। সকলেই নাগের কথা শুনিয়া থাকিলেও এবং দেওয়ালীর দিবসে তাহাকে দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া প্রবাদ প্রচলিত থাকিলেও তাহাকে কেহ কখনও দেখিয়াছে এ কথা কখনও গ্রামবাসিদের মধ্যে শুনা যায় না। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তাই যখন গুহামধ্যে ক্ষোদিত লিপিগুলির নকল লইতে ডাঃ ফুরার ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিলেন তখন সকলে মনে করিয়াছিল যে তাঁহাকে আর প্রাণ লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে না। গুহার আশেপাশে চারিদিকে পর্ব্বতগাত্রে বন্য মধুমক্ষিকার চাক। পাহাড়ে বন্য মধুমক্ষিকা যে কিরূপ ভীষণ বন্য তাহা অনেকেই অবগত আছেন। তাহাদের ভয়ে ডাঃ ফুরার যখন ৪৭ ফুট উচ্চ ভারা বাঁধিয়া গুহামধ্যে প্রবেশ করেন, তখন একাধিক দিবসের আলোকে কাজ করিতে সাহস করেন নাই। রাত্রিকালে লণ্ঠন হাতে লইয়া এ দুর্গম পথে গুহামধ্যে প্রবেশ করেন এবং লণ্ঠনের ম্লান আলোকে অনুশাসনগুলি নকল করেন।

এবারে গুহাটির ও অনুশাসনগুলির কথা বলিব। গুহাটি প্রস্তরগাত্র ছেদিয়া নির্ম্মিত। উহার ভিতরের মাপ দৈর্ঘ্যে ৯ ফুট, প্রস্থে ৭ ফুট ৪ ইঞ্চি এবং উচ্চতায় ৩ ফুট ৩ ইঞ্চি। গুহার বামদিকে পাষাণ খুদিয়া রচিত একটি নাতি-উচ্চ বেদী এবং তদুপরি একটি উপাধান আছে। গুহাবাসী ভিক্ষুর শয়নের ব্যবস্থা ইহাতেই হইত স্পষ্টই বুঝা যায়। খট্টাটি লম্বে ৯ ফুট, প্রস্থে ২০ ইঞ্চি এবং গৃহতল হইতে ১৪ ইঞ্চি উচ্চ। ইহার গাত্রে খৃষ্টীয় চতুর্থ হইতে অষ্টম শতাব্দী মধ্যে প্রচলিত বিভিন্ন ধরণের অক্ষরে উৎকীর্ণ দশটী ছোট ছোট লেখা আছে। এগুলি শুধু যাত্রী বা দর্শকবৃন্দের স্ব স্ব নাম খুদিয়া অমর হইবার স্পৃহার পরিচায়ক, ইহাদের অপর কোন ঐতিহাসিক মূল্য নাই। গুহাটীর ভিতরে প্রবেশ করিবার দ্বারদেশ উচ্চতায় ২ ফুট ২ ইঞ্চি এবং বিস্তারে ১ ফুট ৯ ইঞ্চি। উপরের এবং নীচের চৌকাঠের গাত্রে কয়েকটী চতুষ্কোণ ছিদ্র আজও দেখা যায়। বলা বাহুল্য ভিতর হইতে কাষ্ঠ বা বংশদণ্ডযোগে প্রবেশপথ রুদ্ধ করিবার ব্যবস্থা ছিল। দ্বারদেশের কিঞ্চিৎ বামে পাহাড় খুদিয়া গুহাটির জন্য রচিত দুইটি বাতায়ন আছে। এগুলি সত্যই গবাক্ষ অর্থাৎ গোচক্ষুর আকারের।

এই গুহাটিতে দুইটি প্রাচীন লিপি উৎকীর্ণ দেখা যায়। প্রথমটি গুহার বাহিরে প্রবেশপথের উপরে এবং অপরটি গুহার অভ্যন্তরে পশ্চিম দেওয়ালে ক্ষোদিত। অক্ষরগুলি সুপ্রাচীন ব্রাহ্মী বর্ণমালার—অশোকাক্ষর অপেক্ষা কিছু পরবর্ত্তী যুগের—আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় হইতে প্রথম শতকের মধ্যে এই ধরণের অক্ষরের প্রচলন ছিল। লেখা দুইটিতে প্রকাশ যে রাজা বহসতিমিত্রের মাতুল, অধিছত্রের রাজা বৈহিদরী গোপালীর পুত্র আষাঢ়সেন কর্ত্তৃক ঐ গুহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। অহিছত্র, অহিক্ষেত্র, অধিছত্র অতি প্রাচীন স্থান। মহাভারতে তাহা উত্তর পাঞ্চালের রাজধানী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। টলেমী

"আদিসদ্রা"ও ভিউয়েনসঙ্গ "ওভিবিটালো" নামে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। বেরেলী সহর হইতে কিছু দূরে রামনগর, নসরৎগঞ্জ ও অহিছত্তর নামক পরস্পর সন্নিকটবর্ত্তী তিনটী গ্রামসমীপে বহুদূরব্যাপী তাহার ধ্বংসাবশেষ আজিও দেখা যায়। (Cunningham—Archaeological Survey of India Reports, Vol. I. pp. 255-265)। বহসতিমিত্রকে সকলে কৌশাম্বীর কোন রাজা বলিয়াই মনে করিতেন, কারণ কোসম হইতে তাঁহার নামযুক্ত অনেকগুলি মুদ্রা বাহির হইয়াছে। কিন্তু এক্ষণে জানা গিয়াছে যে বহসতিমিত্র মিত্র বা শুঙ্গবংশের প্রতিষ্ঠাতা পুষ্যমিত্রেরই নামান্তর মাত্র। বহসতিমিত্র কোন প্রবলপরাক্রান্ত নৃপতি না হইলে তাঁহার মাতুল বলিয়া পরিচয়ে আষাঢ়সেনকে গৌরব অনুভব করিতে দেখা যাইত না। কারণ প্রাচীন অপর কোন অনুশাসনে কাহাকেও স্বীয় পরিচয়-প্রসঙ্গে ভগিনীপুত্রের নামোল্লেখ করিতে দেখা যায় না।

কোসমে বহুসংখ্যক প্রাচীনমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়া থাকে। কতকগুলিতে কোন লেখা নাই, কতকগুলিতে গো-মূর্ত্তি অঙ্কিত। সম্ভবতঃ ইহাই ছিল বৎসদিগের লাঞ্ছন। সুদেব পর্বত, জেঠমিত্র, অশ্বঘোষ, ধনদেব প্রভৃতি নামাঙ্কিত কতকগুলি মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। ইঁহারা কে ছিলেন সে সম্বন্ধে অপর কিছুই জানা যায় না। তবে মুদ্রাগুলির অক্ষর হইতে জানা যায় যে ইঁহারা খৃষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। সারনাথের সুপ্রসিদ্ধ সিংহস্তম্ভে অশোকের অনুশাসন ব্যতীত এক রাজা অশ্বঘোষের একটি অনুশাসন দেখা যায়। তাহাও খৃষ্টীয় প্রথম শতকে প্রচলিত অক্ষরে উৎকীর্ণ। সারনাথের অশ্বঘোষ এবং কৌশাম্বীর অশ্বঘোষকে অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়াই বোধ হয়। এবং সে ক্ষেত্রে বারাণসী হইতে কৌশাম্বী পর্য্যন্ত ভূভাগে তাঁহার আধিপত্য বিস্তৃত ছিল দেখা যাইতেছে।

পভোসাগ্রামে ধর্ম্মশালার দেওয়ালে গাঁথা রক্তবর্ণ প্রস্তরে উৎকীর্ণ একটী আধুনিক যুগের শিলালিপি আছে। উহা ১৮৮১ সম্বতে বা ১৮২৪খৃষ্টাব্দে জৈন তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের একটি মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে বিরচিত হইয়াছিল। ইহাতে "কৌশাংবী নগরবাহ্য প্রভাস পর্ব্বতোপরি...অংগরেজ বাহাদুর রাজ্যে শুভম্ —" ইত্যাকার পদ দেখা যায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে বিগত শতাব্দীতে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের চর্চ্চা নিয়মিতভাবে বিদ্বৎসমাজে আরম্ভ হইবার এবং প্রাচীন কৌশাম্বীর অবস্থান পণ্ডিতসমাজকে ব্যস্ত করিবার বহু পূর্ব্ব হইতেই জনসাধারণে কোসম ও পভোসাকে কৌশাংবী ও প্রভাস বলিয়া জানিত।

১৯২১-২৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিভাগের অন্যতম কর্ম্মচারী রায় বাহাদুর পণ্ডিত দয়ারাম সাহানী কোসমে অনুসন্ধানকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি অশোকের স্তম্ভটীকে সোজা করিয়া পুনর্বার প্রতিষ্ঠা করেন। সাহানীর খননের ফলে জানা যায় যে স্তম্ভটির দৈর্ঘ্য ৩৪৷৷০ ফুট তন্মধ্যে তলদেশের ১ ফুট ৯ ইঞ্চি পরিমাণ অংশে, মৃত্তিকাগর্ভে প্রোথিত থাকিবে বলিয়া মসৃণ করা বা পালিস দেওয়া হয় নাই। অশোকের অন্যান্য কয়েকটি স্তম্ভের ঐ অংশের পরিমাণ ৪ ফুট হইতে ৮ ফুট দেখা যায় এবং সেগুলির তলদেশে গুরুভার সহনক্ষম প্রস্তরের বেদী প্রদত্ত হইয়াছিল। পক্ষান্তরে কোসমস্তম্ভের দুই ফুটেরও কম অংশ মৃত্তিকামধ্যে প্রোথিত ছিল; এবং ইহার তলায় সেরূপ প্রস্তরবেদী প্রদত্ত হয় নাই। সুধু ভূগর্ভে গর্ত্ত করিয়া স্তম্ভটিকে বসান হইয়াছিল। এরূপ অবস্থায় এত গুরুভার দ্রব্য দীর্ঘকাল সোজা হইয়া থাকিতে পারে না। কালক্রমে যখন স্তম্ভটী চাপে মাটির মধ্যে বসিতে আরম্ভ করিল তখন তলায় ভার সহিবার মত বেদী না থাকার ফলে তাহার অধোগতি রোধ করিবার কিছুই রহিল না। সামান্য যে ইষ্টকচত্বর চতুষ্পার্শ্বে রচিত হইয়াছিল তাহার সে বেগ প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা ছিল না। ফলে স্তম্ভটি হেলিয়া পড়িল এবং সেই সময়েই তাহার উপরের পশুমূর্ত্তিটী সম্ভবতঃ ভাঙ্গিয়া নীচে পড়িয়া গেল। সাহানীর মতে খুব সম্ভব স্তম্ভটীর দক্ষিণে এখনও চূড়া দেশ মৃত্তিকামধ্যে প্রোথিত রহিয়াছে। উপযুক্ত অনুসন্ধানের ফলে হয়ত তাহা কালক্রমে বাহির হইতেও পারে। চারিদিকে কৃষকগণের শস্যক্ষেত্রের অবস্থানের জন্য সাহানীর পক্ষে সেরূপ কোন অনুসন্ধান করা সম্ভব হয় নাই।

সাহানী তাঁহার রিপোর্টে লেখেন যে কোসম-ই যে প্রাচীন কৌশাম্বী সে বিষয়ে আর কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে

না। কিন্তু একথা সম্পূর্ণ ঠিক নহে। কানিংহাম দীর্ঘকাল পূর্ব্বেই উভয় স্থানের অভিন্নতা সুস্পষ্টরূপেই প্রমাণ করিয়া গিয়াছিলেন। এক ভিন্‌সেণ্টস্মিথ ব্যতীত আর সকলেই সে সিদ্ধান্ত মানিয়াছিলেন। স্মিথের লেখা যাঁহারা পড়িয়াছেন তাঁহারা জানেন কিরূপ অন্যায় ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়া তিনি অন্যরূপে কৌশাম্বীর অবস্থান নির্দেশ করিয়াছিলেন। সুতরাং এতকাল পরে সাহানী কর্ত্তৃক কৌশাম্বী ও কোসম অভিন্ন প্রতিপন্ন হইল একথা বলিলে পরলোকগত কানিংহামের প্রতি নিতান্তই অবিচার করা হয়।

কৌশাম্বীর কথা বলিতে বসিয়া এলাহাবাদের অশোক-স্তম্ভটার কথা বলা বোধ হয় নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কারণ পূর্ব্বে একবার বলিয়াছি এলাহাবাদ দুর্গমধ্যে যে অশোকস্তম্ভটী দেখা যায় তাহা মূলতঃ কৌশাম্বীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, পরে কোন সময়ে তথা হইতে এলাহাবাদে নীত হইয়াছিল। কোন সময়ে কে লইয়া গিয়াছিলেন তাহা বলিবার উপায় নাই। তবে খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পাঠান সম্রাট ফেরোজ তোগলক অন্যস্থান হইতে দুইটি অশোকস্তম্ভ আনিয়া দিল্লিতে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন বলিয়া মুসলমান ঐতিহাসিকের পৃষ্ঠা হইতে জানা যায়। সুতরাং এ স্তম্ভটীরও স্থানান্তরকরণ উক্ত সম্রাটেরই কার্য্য এ কথা বোধ হয় মনে করা চলে।

নানা কারণে এই স্তম্ভটী ঐতিহাসিকের নিকট সবিশেষ মূল্যবান এবং ইহার অদৃষ্টে এত ঘটনা বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে যে অশোকের অপর কোন স্তম্ভের অদৃষ্টে সেরূপ ঘটে নাই। সম্রাট অশোকের কারুণ্য ও ত্যাগের বাণী বক্ষে ধারণ করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইলেও, গুপ্তসম্রাট সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয়কাহিনী ধারণ করা-রূপ সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য ইহার অদৃষ্টে ঘটিয়াছে। তদ্ভিন্ন মোগল বাদশাহ জাহাঙ্গীরের বাগাড়ম্বরপূর্ণ বংশ পরিচয় আজ মৌর্য্যসম্রাট অশোকের শান্তি ও মৈত্রীধর্ম্মের বাণীকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে।

১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম এলাহাবাদ দুর্গমধ্যে ভূপতিত অবস্থায় স্তম্ভটী আবিষ্কৃত হয়। পর বৎসর সেনাবিভাগের জনৈক ইঞ্জিনিয়ার কর্ম্মচারী কাপ্তেন স্মিথ ইহাকে এলেনবরা ব্যারাকের সন্নিকটে ইহার বর্ত্তমান অবস্থানে প্রতিষ্ঠা করেন—সেই সময় ইহার তলার বেদীটি নির্ম্মিত হয়। স্থির করা হইয়াছিল যে ইহার শিরোভাগে বিচিত্র গঠনের একটী প্রকাণ্ড পুষ্পগুচ্ছ স্থাপন করা হইবে। কিন্তু অশোক-স্তম্ভের উপরে সিংহমূর্ত্তির কথা স্মরণে এসিয়াটিক সোসাইটি সিদ্ধান্ত করেন যে যতখানি সম্ভব মূলানুগত করিয়াই জীর্ণ-সংস্কার করা সঙ্গত। সে জন্য, বসাঢ় ও নন্দনগড়ের সিংহমূর্ত্তির আদর্শে ইহার চূড়াদেশ সংস্কারের ভার উক্ত কাপ্তেন সাহেবকে দেওয়া হয়। যাঁহারা অশোকের ঐ স্তম্ভদ্বয় বা তাহাদের চিত্র দেখিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে ঐ দুইটির চূড়াদেশ কত মনোরম, সুগঠিত বেদীর উপরে উপবিষ্ট সিংহমূর্ত্তি সজীবের মতই প্রাণময়। কিন্তু স্মিথের কৃত মূর্ত্তি নিতান্তই কদর্য্য, পশুরাজ মূর্ত্তি তাহার নামের নিতান্তই অযোগ্য হইয়াছিল। কানিংহামের ভাষায় বলিতে "ঠিক যেন পেটে খড়ভরা একটা কুকুরছানা উল্টাইয়া রাখা একটা ফুলের টবের উপর বসিয়া রহিয়াছে।" সৌভাগ্যের বিষয় স্তম্ভটীর মাথায় এরূপ শিরোভূষা উঠে নাই।

প্রয়াগস্তম্ভটীর দৈর্ঘ্য ৩৫ ফুট, তা ছাড়া মাটির মধ্যে আরও ৭৷৷০ ফুট পরিমাণ অংশ প্রোথিত আছে। স্তম্ভটী তলা হইতে উপর দিকে ক্রমশঃ ধীরে ধীরে সূক্ষ্ম হইয়া গিয়াছে, অশোকস্তম্ভগুলির মধ্যেও অন্যান্যগুলির তুলনায় এটি খুব সুডৌল এবং সুগঠিত, উপরিভাগে সপদ্ম মৃণাল-লতিকাচিত্র খোদিত। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে ইহা ভারতীয় শিল্পে গ্রীক প্রভাবের অন্যতম নিদর্শন, আবার স্পারগুসান প্রমুখ কোন কোন পণ্ডিতের মতে এ শিল্পকলার জন্ম গ্রীক ও ভারতীয় উভয়েরই আসিরিয় শিল্পীর মন্ত্রশিষ্য। যাহা হউক এখানে সে আলোচনার স্থান নাই। অন্য এক স্বতন্ত্র প্রবন্ধে ভারতীয় শিল্পে বৈদেশিক প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে।

প্রয়াগ স্তম্ভের গাত্রদেশ উৎকীর্ণ লিপিতে একেবারে কণ্টকিত হইয়া আছে। সম্রাট অশোকের আটটি অনুশাসন ব্যতীত ইহাতে সমুদ্র-গুপ্তের প্রশস্তি, জাহাঙ্গীরের ঘোষণাপত্র এবং সাধারণ যাত্রী ও দর্শকবৃন্দের বহু লেখা আছে। অশোকের সুপ্রসিদ্ধ সপ্তম স্তম্ভলিপির প্রথম ছয়টি অনুশাসন

এলাহাবাদ স্তম্ভে দেখা যায়। এগুলি অন্যান্য স্থান হইতেও আবিষ্কৃত হইয়াছে। বাকী দুইটি অনুশাসন ক্ষুদ্র বা অপ্রধান স্তম্ভলিপি পর্য্যায়ে গণ্য হইয়া থাকে। লেখাগুলি স্তম্ভগাত্র বেড়িয়া মণ্ডলাকারে ক্ষোদিত; অক্ষরগুলি পরস্পর সমান এবং সুন্দর ও গভীর ভাবে উৎকীর্ণ। নানাকারণে লেখাগুলির বড়ই ক্ষতি হইয়াছে। মধ্যের প্রায় সাত পংক্তি জাহাঙ্গীরের বাগাড়ম্বরপূর্ণ বংশকাহিনী ক্ষোদাই করার ফলে একেবারে বিনষ্ট হইয়াছে; তজ্জন্য তৃতীয় ও চতুর্থ অনুশাসনের অনেকাংশ নাই। পঞ্চম অনুশাসনের মাত্র দুই লাইন আছে, অবশিষ্টাংশ প্রস্তরগাত্রে চটা উঠার ফলে বিলুপ্ত হইয়াছে। ষষ্ঠ অনুশাসনে সুধু একস্থানে আধলাইন নষ্ট হইয়াছে।

অপ্রধান লিপি দুইটি মূল লিপিগুলির নিম্নে যে ভাবে উৎকীর্ণ তাহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে এগুলি প্রথমোক্তগুলির সহিত সমকালে উৎকীর্ণ নহে। নিম্নেরটী পাঁচ লাইনে এবং দেবী বা মহিষীলিপি নামে পণ্ডিতসমাজে পরিচিত। ইহাতে সম্রাটের দ্বিতীয়া মহিষী তীবরমাতা দেবী কারুবাকীর দানশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। সমগ্র অশোক অনুশাসন মধ্যে সুধু তাঁহার নামোল্লেখ হইতে মনে হয় যে তিনি এবং তাঁহার গর্ভজাত পুত্র সম্রাটের অতি প্রিয় ছিলেন। মহিষীলিপির উপরে চারি লাইনের আর একটি অনুশাসন দেখা যায়। ইহার এক্ষণে নিতান্তই চরম দশা। কৌশাম্বীর মহামাত্রকে আদেশ করিয়া প্রচারিত বলিয়া আবিষ্কারক কানিংহাম ইহার "কৌশাম্বীলিপি" নাম দেন।

অশোকের অনুশাসনের ঠিক নীচেই সভাপণ্ডিত হরিষেণ বিরচিত সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের প্রশস্তি উৎকীর্ণ। নানাকারণে ঐতিহাসিকের চক্ষে এই লিপিটী অমূল্য। ইহা বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় রচিত এবং উক্ত ভাষায় রচিত অনুশাসনসমূহের মধ্যে প্রাচীনতম। দিগ্বিজয়ী সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের সম্বন্ধে যাহা কিছু জানা যায় তাহা এই লিপিটী হইতেই।

গুপ্তাক্ষরের পরবর্ত্তী মধ্যযুগের কোন প্রকার অক্ষরে লিখিত কোন লিপি স্তম্ভটীর গাত্রে দেখা যায় না। তবে আধুনিক নাগরী অক্ষরের বহু লেখা আছে। অশোক ও সমুদ্রগুপ্তের অনুশাসন সমূহের প্রায় সমপরিমাণ স্থান জুড়িয়াই এগুলি অবস্থিত। ঐতিহাসিক মূল্যবিহীন এই ধরণের রাবিশ মৌর্য্য ও গুপ্ত সম্রাটদ্বয়ের ধর্ম্মজয় এবং সামরিকজয়ের কাহিনীকে চারিদিক হইতে প্রায় ঢাকিয়া ফেলিয়াছে এবং উহাদের বহুলাংশে ক্ষতি করিয়াছে।

এই লেখাগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিলে স্তম্ভটীর ইতিহাস কতকটা বুঝিতে পারা যায়। অশোকের যুগের ব্রাহ্মীঅক্ষর এবং গুপ্তাক্ষরের মধ্যবর্ত্তী কালের প্রচলিত অক্ষরের কতকগুলি লেখা স্তম্ভগাত্রে বহু উর্দ্ধে এবং উপর হইতে নীচের দিকে লম্বমানভাবে উৎকীর্ণ দেখা যায়। তাহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে, অশোক কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইবার পর কোন সময়ে স্তম্ভটী মাটিতে পড়িয়া গিয়াছিল এবং ভূপতিত অবস্থায় থাকাকালে ঐগুলি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। কৌতূহলী সাধারণ দর্শক যাহাতে সকলে দেখিতে পায় হাতের নিকটে এরূপ জায়গাতেই নিজ নাম লিখে। সকলের দৃষ্টির বাহিরে, বা উপর হইতে নীচের দিকে লম্বভাবে কিম্বা মাচান বাঁধিয়া উঠিয়া নাম লিখে না; কিম্বা সেভাবে লিখিবার সম্ভাবনাও তাহাদের থাকে না।

সমুদ্রগুপ্ত কর্ত্তৃক উত্তোলিত এবং পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবার পর স্তম্ভটী আবার কবে ভূপতিত হয় তাহা ঠিক বলা চলে না। তবে গুপ্তাক্ষরের পরবর্ত্তী মধ্যযুগের বা খৃষ্টীয় সপ্তম হইতে একাদশ শতক মধ্যে প্রচলিত কোন প্রকার অক্ষরের লেখা ইহাতে দেখা যায় না। তাহার পর আবার সম্বত ১২৯৭ হইতে ১৩৯৮ (খৃষ্টীয় ১২৪০ হইতে ১৩৩১ অব্দ) অব্দের মধ্যের তারিখযুক্ত বহুসংখ্যক ছোট ছোট লেখা দেখা যায়। এগুলি সব স্তম্ভটীর এক পিঠে লেখা অর্থাৎ মাটিতে পড়িয়া থাকাকালে যে পিঠটা উপরে ছিল তাহার গাত্রেই লেখাগুলি ক্ষোদিত হইয়াছিল। সুতরাং অন্যূন ১২৪০ হইতে ১৩৪১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত স্তম্ভটী আবার মাটিতে পড়িয়াছিল।

স্তম্ভটী কোন সময়ে এবং কাহার দ্বারা কৌশাম্বী হইতে প্রয়াগে স্থানান্তরিত হইয়াছিল সে কথা সঠিকভাবে বলিবার কোন উপায় নাই; তবে নানাকারণে সুলতান ফেরোজকেই ঐ কার্য্যের জন্য কৃতিত্ব দেওয়া সঙ্গত তাহা পূর্ব্বে একবার বলিয়াছি। সুলতান ফেরোজ ১৩৫৬ খৃষ্টাব্দে মীরাট এবং তোপরা হইতে দুইটি অশোকস্তম্ভ বহন

আয়াসে এবং বহু অর্থব্যয়ে দিল্লীতে আনিয়াছিলেন বলিয়া জানা আছে। ১৩৪১ খৃষ্টাব্দের পর মধ্যের কিছুকালের তারিখযুক্ত কোন লেখা দেখা না গেলেও আবার ১৪৬৪ সম্বত (১৪০৭ খৃষ্টাব্দ) হইতে ১৬৬০ (১৬০৩) সম্বতের মধ্যে তারিখযুক্ত বহুসংখ্যক ছোট ছোট লেখা—সবগুলিই স্তম্ভের এক পিঠে অর্থাৎ যে দিকটা উপরে ছিল—স্তম্ভগাত্রে উৎকীর্ণ আছে। ইহা হইতে জানা গেল যে ১৩৪১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অর্থাৎ মহম্মদ তোগলকের দেহত্যাগের অব্যবহিত পর অবধি, স্তম্ভটী মাটিতে পড়িয়াছিল। তাহার কয়েকবৎসর পরে সুলতান ফেরোজ কর্ত্তৃক স্তম্ভটী এলাহাবাদে আনীত হয়। তথায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবার পর এবং সুলতান ফেরোজের প্রিয়বস্তু বলিয়া ইহাতে আর সাধারণ যাত্রীর নাম খোদাই করা কিছুকালের মত বন্ধ হইয়াছিল। তাহার পর পাঠান সাম্রাজ্যে অন্তর্বিপ্লব বাধিলে, অল্পকালমধ্যেই স্তম্ভটী আবার ভূপতিত হয় এবং সুদীর্ঘ দুই শত বর্ষেরও অধিক কাল এইভাবে যে ছিল তাহা ১৪০৭ হইতে ১৬০৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে উৎকীর্ণ লেখাগুলি হইতেই প্রকাশ। অতঃপর জাহাঙ্গীর বাদসাহ আবার স্তম্ভটিকে প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার অনুশাসন ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে ক্ষোদিত হয়। জাহাঙ্গীর যে স্তম্ভটী কৌশাম্বী হইতে আনয়ন করেন নাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে, ১৬৩২ সম্বত বা ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে লিখিত আকবরের সভাসদ রাজা বীরবলের একটি লিপিতে তীর্থরাজ প্রয়াগের কথা দেখা যায়।

প্রতিষ্ঠাকালে জাহাঙ্গীর স্তম্ভটীর চূড়ায় প্রস্তরের একটি গোলক এবং তদূর্দ্ধে একটি কোণাকৃতি কারুকার্য্য স্থাপন করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পাদ্রী Tiffenthaler যখন দেখিয়াছিলেন তখনও জাহাঙ্গীর স্থাপিত শিরোভূষা যথস্থানে সন্নিবেশিত ছিল। সে সময়ে স্তম্ভটী দুর্গের মধ্যভাগে অবস্থিত ছিল।

১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে এলাহাবাদ দুর্গের সংস্কারকালে স্তম্ভটীকে আবার উৎখাত করা হয়। গেটের নিকট নূতন মুরচা নির্ম্মিত হইতেছিল। তাহার পথে অবস্থিত বলিয়া জেনারল কীডের আদেশে ইহাকে ভূপতিত করা হয়। জাহাঙ্গীরকৃত কারুকার্য্য সেই সময়েই বিনষ্ট হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। ব্রাহ্মীবর্ণমালার পাঠোদ্ধার তখনও হয় নাই, অশোকের নাম তখন পর্য্যন্ত পণ্ডিতসমাজে অজ্ঞাত। এই অবস্থায় পড়িয়া থাকার সময়ও প্রয়াগ দুর্গে অক্ষয়বট দর্শনে সমাগত যাত্রীবৃন্দ যে ইহার গাত্রে নাম খুদিয়া যাইত তাহা ১৭৯৮ হইতে ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যের কয়েকটী লেখা হইতে জানা যায়। তাহার পর প্রিন্সেপ কর্ত্তৃক ব্রাহ্মীবর্ণমালার পাঠোদ্ধার এবং প্রিয়দর্শী ও অশোকের অভিন্নতা প্রতিপন্ন হইবার পর স্তম্ভটী আবার নূতন করিয়া আবিষ্কৃত হইল এবং ইহার ঐতিহাসিক মূল্য সকলে পরিজ্ঞাত হইল। পরবৎসর এসিয়াটিক সোসাইটির চেষ্টায় স্তম্ভটীকে উত্তোলন করিয়া তাহার বর্ত্তমান স্থানে স্থাপন করা হইয়াছে।

শ্রীঅম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

জন্মাষ্টমী

শ্রীযুক্ত প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

ভ্রমিয়া সহস্র তীর্থ অযুত নগর পল্লী ভ্রমি
শ্রাবণের শেষরাত্রে কারাগারে এল জন্মাষ্টমী,
নিরানন্দ অন্ধকারে পুরপ্রান্তে ; আসিল খুঁজিতে
যেন কোন্ প্রিয়তমে—যেন তার চিরপরিচিতে।
কালের সাগরগর্ভে একদিন যে গেছে হারায়ে
তারে যেন ফিরে চায়। স্তব্ধরাত্রে দুবাহু বাড়ায়ে
দেহহীন ডেকে ফিরে ভাষাহীন ব্যাকুলিত স্বরে
যুগে যুগে যেন তারে ; একদিন যারে বক্ষোপরে
পেয়েছিল বহুভাগ্যে এমনি কারার কক্ষমাঝে,
সে যে নাই হেন কথা অভাগী বুঝেও বুঝেনা যে !
ভ্রান্তি হলোনাকো দূর সহস্র সহস্র বর্ষ ধরি
মানব আত্মীয় যত ভুলে গেছে, খেলা সাঙ্গ করি,
ছেড়ে গেছে রঙ্গভূমি। মথুরার পাষাণ কারার
চিহ্ন নাই। কালস্রোতে কতলক্ষ বন্দীশালা তার
পশ্চাতে ভাসিয়া গেছে ; কতশত হস্তিনা দ্বারকা,
কতরাজা, কতরাজ্য ! নিভে গেছে কতনা তারকা
নভোতলে ; সে কেবল বক্ষে লয়ে অনির্ব্বাণ আশা
সন্ধানে ফিরিছে আজও ; নিঃশব্দে করিছে যাওয়া আসা,
সজল শ্রাবণরাত্রে সুখহীন কারায় কারায়।
মিশায়ে আপন অশ্রু আকাশের আঁখির ধারায়,
দীপহীন রুদ্ধকক্ষে বসেছিনু জাগিয়া একাকী
মধ্যরাত্রে ; বহির্দেশে বাতাস ফিরিতেছিল ডাকি
ঘোররবে, জলধারে দশদিক যেতেছিল ভাসি।
ঘরে সঙ্গীগণ সবে সুপ্তি মগ্ন ; হেনকালে আসি
কে যেন পশিল কক্ষে ; দাঁড়াল সম্মুখে যেন মম
অতীতের স্মৃতিসম, স্বপ্নসম, প্রহেলিকা সম !
মনে হলো দেখিলাম, মনে হলো বুঝিলাম মনে,
মনে হলো চিনিলাম, কহিলাম কথা তার সনে
তাহারি ভাষায় ; রাখি লৌহদ্বারে ক্লান্তদেহভার
সে যেন চাহিয়াছিল ; আমি যেন শুনিলাম তার
ব্যাকুল আঁখির প্রশ্ন ; উত্তর দিলাম বিধিমতে
মনে নাই কি কৌশলে, মনে নাই স্বপ্নে কি জাগ্রতে।
কহিলাম প্রণমিয়া, "হে কল্যাণি ! তুমি যারে চাহি
খুঁজিয়া ফিরিছ, আজ ধরণীতে সে কোথাও নাহি।"
সে বলিল, "মিথ্যা কথা ; সে আছে, সে নিত্য কাল রবে,
দেখিছ না তারই লাগি সারাদেশ সেজেছে উৎসবে !
জ্বালিয়াছে দীপমালা ! শুনিছ না তারি লাগি আজি
মন্দিরে মন্দিরে কত শঙ্খ ঘণ্টা উঠিয়াছে বাজি !"
'আমি কহিলাম, "ভদ্রে ! এ কেবল স্মৃতিপূজা তার।"
সে বলিল, "আমি জানি। দেখিতে এসেছি উপচার
সম্পূর্ণ হয়েছে কিনা—খুঁজিতেছি কোন্ পাত্রে সুধা
দেবতা পাঠালো পুনঃ বাঁচাইতে আহত বসুধা।
কারায় কারায় তাই ফিরিতেছি বন্ধনে বন্ধনে
আতুরের আর্ত্তনাদে, কাতরের করুণ ক্রন্দনে
শুনিবা বোধন-গীতি ! মনে হয় লগ্ন বুঝি হলো—
সে বুঝি আসিল ফিরে ! তোল, তোল, জয়ধ্বনি তোল !
ভোল, ভোল সর্ব্বভয় ; ওরে মূঢ় ! এমনি দুর্দ্দিনে
তার আসিবার দিন ! ওরে অন্ধ ! অন্ধকারে চিনে
তাহারে পূজিতে হয় ! ওরে পাপী ! মৃত্যুঞ্জয়ী প্রভু,
তুমি বলো সে মরেছে !" নানা তর্ক করিলাম তবু,
শুনালাম ইতিকথা, বর্ত্তমান অতীতের ভেদ,
সংসারের বিপর্য্যয়। যত শুনে তত তার জেদ
আরো যেন বেড়ে চলে ; পাগলিনী কিছুতে না বোঝে।
সে বলে, "জানিগো জানি, ফিরিতেছি আমি যার খোঁজে—
সে ফিরিবে। সে নামিবে বিধাতার রুদ্র রোষ সম
চূর্ণ করি অন্যায়েরে ; সূর্য্যসম বিতাড়িয়া তম
অজ্ঞানের, সে জ্বলিবে ; তাহার ভৈরব শঙ্খনাদ
মুহূর্ত্তে ডুবায়ে দিবে ক্ষুদ্রতার সমস্ত বিবাদ।
সত্য সে আসিবে, ওরে, আসিবে কি, আজও সে আসিছে,
যুগে যুগে যাত্রা তার দেশে দেশে ! তুমি কেন মিছে
মূর্খ সম তর্ক করো ? আমার মর্ম্মের মধ্যখানে
সে আসিছে, আমি তার পদশব্দ শুনিতেছি কানে
রাত্রিদিন ; জানি আমি পাবো তারে যারে ভালবাসি,
প্রত্যয় না হয় যদি মৌন হয়ে থাকো অবিশ্বাসী !
আমারে দিয়োনা বাধা, মিথ্যা কথা বলোনা আমারে,
ধর্ম্ম সহিবেনা।"—হায়, কি বলিব, কে বুঝাবে তারে ?
বুদ্ধিহীনা উন্মাদিনী ! স্তব্ধ হয়ে শুধু চেয়ে থাকি।
চেয়ে থাকে বর্ষারাত্রি সাথে মোর,করুণায় অশ্রুপূর্ণ আঁখি।

শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রহের ফের

শ্রীযুক্ত মতিলাল দাস এম্-এ, বি-এল্

১

রেল পথে চলিয়াছি।

তরু শ্রেণীর বিতত-মাধুরী, উদাস প্রান্তরের বেহাগ রাগিণী, গ্রামপথবাহিনী ভামিনীদের কল-কৌতুক নয়নকে মুগ্ধ করিয়া তুলে।

কিন্তু প্রকৃতির আবেদনের চেয়ে ঘুমের বেগ গভীর। তন্দ্রাতুর চোখ বলিল, "শয্যা নাও।"

তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী।

সকলে উপহাস করে আর বলে "এ নিশ্চয়ই কৃপণ গো।" দেশের যারা সব, তাদের ফেলিয়া মন অভিজাত সাজিতে চায় না। দুঃখ ও দারিদ্র্যের পঙ্কে যারা ঘুমাইয়া আছে, তাহাদের জীবনের স্পর্শ অনুভব করিয়া দেশমাতার স্পর্শকে পাইতে চাই।

পরিষ্কার ধুতি আর জামা দেখিয়া নগ্নগাত্র গরীবেরা স্থান করিয়া দিল। ঠিক ভয়ে নয়, তবে হয়ত বহুদিনের সঞ্চিত সংস্কারের ফলে।

ঘুমাইয়া পড়িলাম। কতক্ষণ ঘুমাইছিলাম মনে নাই, যখন জাগিলাম, তখন কুলীরা হাঁকিতেছে "বনগ্রাম, বনগ্রাম!"

পাশে রেলওয়ে ক্রু টিকিট পরীক্ষা করিতেছিলেন। সহসা বলিয়া উঠিলেন "Hallo Kasem, here is a W. T." (দেখ কাসেম! এই লোকটা বিনা টিকিটে যাচ্ছে)

২

বাংলার পাড়া গাঁ।

ভাদ্রের ভরা যৌবন ধানের ক্ষেতে নিটোলরূপ মেলিয়া ধরে। চারিদিক জলে জলে থৈ থৈ করে। কাদায় পথে চলা ভার, হাঁটু ডুবিয়া যায়। সারাদিন ক্ষেতের কাজ সারিয়া নাজিম বেলাশেষে শ্রান্ত-চিত্তে কুঁড়ে ঘরে ফিরিল। সারা দিন খাওয়া হয় নাই, ভোর বেলায় পান্তায় উদর ভরিয়া ক্ষেতে গিয়াছিল। কাজ শেষ করিবার উন্মত্ততা তাহাকে পাইয়া বসিল। ক্ষুধার তাড়না ভুলিয়া জমির ঘাস নিংড়াইল।

সন্ধ্যা বেলায় পত্নীর কলহ ও প্রেমের মানাভিনয় হইবে, এইরূপ একটা মোহন স্বপ্ন সারাদিন তাহার চিত্তকে ফুল্ল ও দীপ্ত করিয়া রাখিল। ক্লান্ত হস্ত দিয়া কাস্তেখানি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া সে স্নেহাতুর কণ্ঠে ডাকিল "পরীবানু!"

উত্তর আসিল না।

পুনরায় ডাকিল "বানু বেগম!"

পরীবানু নাজিমের স্ত্রী—মদন সেখের আদরিণী ছোট কন্যা। বড় ঘরের মেয়ে। আসনাই হওয়ায় নাজিমের কুঁড়ে আলো করিয়াছে।

নাজিমের মনে প্রতিদিন ভাবনা, হয়ত পরীবানু তাহার কাছে প্রাপ্য আদর পাইতেছে না। গরীবের আর কিছু না থাকুক, বুক-ভরা প্রেম ছিল। সেই প্রেমেই নাজিম স্বর্গ গড়িয়া তুলিয়াছিল।

বাহিরে বিশ্বজগতের অশ্রান্ত কল্লোল—অশান্ত হাহাকার। নাজিম আপন দৈন্যের চাপে ডুবিয়া থাকে,—জগৎ বেগের খোঁজ রাখেনা।

পরীবানু বাহির হইয়া আসিল। ছল ছল আঁখি, দেখিয়া মনে হইল সে ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছিল। অশ্রুর ধারা সুগৌর গণ্ডে তখনও ছাপ রাখিয়া দিয়াছে।

নাজিম ত্রস্ত হইয়া উঠিল। ব্যাকুল-চিত্তে জিজ্ঞাসা করিল "কি হয়েছে বানু?"

পরীবানু কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল "বাবা বাঁচেনা, আমায় নিয়ে চল।"

প্রাচীন একটু ইতিহাস আছে।

মদন সেখ কন্যাকে সৎপাত্রস্থ করিবার জন্ত চেষ্টিত ছিল। বড় ঘরের ছেলেরা রূপসী পরীবানুর উমেদার ছিল। কিন্তু প্রেম অন্ধ, পরীবানু জোর করিয়াই মায়ের আদরে আপন জিদ বজায় রাখিল। বৃদ্ধ মদন পত্নীর অনুরোধ এড়াইতে পারিল না। কিন্তু দুই পরিবারে আত্মীয়তা হইল না!

গরীব নাজিম আপন কুঁড়ে ঘরে প্রেমের আতিশয্যকে সম্পৎ মনে করিয়া ভুলিয়া রহিল। ধনের আকাঙ্ক্ষা, শ্বশুর বাড়ীর আদর ও আপ্যায়নের প্রতি লোভ তাহাকে ভুলাইল না।

জীবনে যে জিদ চলে, মৃত্যুর দ্বারে তাহা টিকে না। মানুষ ক্ষণিকের খেলাঘরে নাচিয়া বেড়ায়, ভুলিয়া যায় তাহার সময় দীর্ঘ নহে। তাই'ত পদে পদে কলহ অভিমান জাগিয়া ওঠে।

নাজিম আপন প্রবল ক্ষুধা ভুলিল।

পত্নীকে লইয়া শ্বশুর-গৃহে চলিল। বাড়ীর পাশে খাল, ডিঙ্গি-নৌকা বাঁধা ছিল। পত্নীকে তাহাতে বসাইয়া সবল হস্তে সে বৈঠা ধরিল।

তখন আকাশে রঙের বাহার লাগিয়াছে।

ফিকা সবুজের সরোবরের পাশে আগুন-লাগা কালো পাহাড়, তাহার উর্দ্ধে যেন দৈত্যের সারি চলিয়াছে। ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তন হয়, সরোবরের জলে উচ্ছ্বাস জাগে। প্রকৃতির এ মাধুর্য্য শোকাতুর দম্পতির চিত্ত স্পর্শ করে না।

মানুষের দুঃখে প্রকৃতির অনুকম্পা কোথায়? আমি দুঃখে মরি, তবুও চাঁদ উঠে, ফুল ফুটে পাখী গান গায়, নদী কলতান তুলে।

পথে চলিতে চলিতে পরীবানু বলিল "বাবার জন্ত কিছু খাবার নিতে হয়। কি করা যায় বল?"

মেয়েদের মধ্যে সামাজিকতা-বুদ্ধি প্রবল। কারণ সমাজকে ওরা আঁকড়িয়া থাকে।

নাজিম বলিল "বেশ তোমাকে পৌছে দিয়ে, বারাসত থেকে সেরটাক রসগোল্লা কিনে নিয়ে আসবো।"

পরীবানু মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

৩

নাজিম ঘরে ফিরিয়া দেখিল, নগদ টাকা কিছুই নাই।

মহাজন শিবু সার কাছে যাইয়া দুইটি টাকা ধার করিয়া লইল।

ট্রেন ছাড়ে ছাড়ে।

বামুন গাছি ষ্টেশনে নাজিম দৌড়াইয়া গাড়ী ধরিল। টিকিট কাটিতে পারে নাই। বারাসতে তাই আক্কেলসেলামি দিতে হইল।

রসগোল্লা লইয়া যখন ফেরত গাড়ীর জন্ত ষ্টেসনে পৌছিল তখন দেখিল গাড়ী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। টিকিট কিনিয়া সে তাড়াতাড়ি গাড়ীতে উঠিল, ভাবিল সন্ধ্যা ৮টার পূর্ব্বেই বাড়ী পৌছিবে।

সেদিন ছিল ১লা সেপ্টেম্বর।

রেল-কোম্পানী সমস্ত গাড়ীর সময় অদল বদল করিয়া ফেলিয়াছে। কাজেই বারাসতের সন্ধ্যাগাড়ী পূর্ব্বেকার মত প্যাসেঞ্জার না হইয়া এক্সপ্রেস হইয়া পৌছিল। বেচারা নাজিম কিছুই জানিল না।

গাড়ী আর থামে না।

যে-দৌড় দিল সে যেন অশ্রান্তধাবন। বামুনগাছি সন্ধ্যার আঁধারে ফেলিয়া দত্তপুকুর দোগাছিয়া পার হইয়া চলিল। রাত্রির অন্ধকার জমাট হইয়া আসে। ক্ষুধাতুর নাজিমের চিত্তও আঁধারে ভরিয়া ওঠে।

হাতে আর কিছুই নাই—অনিশ্চিত কোথায় চলিয়াছি—এ ভাবনা মনের কোণে দেখা দিয়া যায়।

ভাবিয়া কূল নাই। গভীর অবসাদে সে এলাইয়া পড়ে।

গাড়ী আসিয়া বনগ্রামে নিঃশ্বাস লয়। সহযাত্রী বহু লোক তাহার মত বিপদে পড়িয়াছে, তাহাদের সহিত নামিয়া পড়ে।

ক্ষুধায় ছাতি ফাটিয়া যায়। ষ্টেসন প্লাটফর্ম্মে ফেরি-ওয়ালাদের সজ্জিত দোকানের দিকে লুব্ধ দৃষ্টিতে চায়।

হাতের রসগোল্লার ঠোঙ্গার রস গড়াইয়া পড়ে। অলক্ষিতে চাটিয়া লয়। একজন বুড়া মুসলমান পাশে পাঁউরুটি চিবাইতে-ছিল। খানিক নাজিমকে দিল। নাজিম 'না' বলিতে পারিল না।

সময় জগদ্দলের পথের প্রাচীরের মত বুকে চাপিয়া বসে।

যখন চাহিনা, তখন সে বসিয়া রয়। যখন চাহি, তখন সে উড়িয়া পলায়।

৪

খুলনার ট্রেন ঝম্ ঝম্ করিয়া আসিয়া পড়িল। নাজিম ভীত-মনে আমাদের কামরায় উঠিয়া পড়িল।

কতলোক কতদিন ফাঁকি দিয়া যায়। কিন্তু যেদিন ধরা পড়িতে চায় না, বিপদ সেদিন দেখা দেয়। ভূতের বাসস্থান অশত্থ তলাতেই পথচারী পথিকের সন্ধ্যা হয়।

ক্রু-সর্দার কাসেম রণ ভূমিতে দেখা দিল।

গরীব বেচারীর হইয়া তাহার সঙ্গে বচসা করিলাম। কিন্তু ভবী ভুলিবার নয়।

কাসেমের তাড়নায় নাজিম নানা অবান্তর কাহিনী মিলাইয়া যাহা বলিয়াছিল আর তাহার সহিত আলাপে পরে যাহা জানিয়াছিলাম, উপরে তাহারই চিত্র আঁকিয়াছি।

নাজিমের চোখের কোণে অশ্রু-রেখা সজল হইয়া দেখা দেয়।

শালের পাতার কোণ গড়াইয়া রস-ধারা নিগ্ড়াইয়া ঝরিয়া পড়ে। কিন্তু মানুষের মনে ব্যবসায়ের যুগে রসধারার স্থান নাই।

কাসেম বলিল "ওসব চালাকীতে ভুলছি না, এখন যদি পয়সা দাও, তাহলে এক টাকা সাড়ে দশ আনায় মিটবে, আর ষ্টেসনে আদায় করলে ৯ টাকা সাড়ে দশ আনা লাগবে বলছি।"

নাজিম ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া থাকে।

পাশে সহযাত্রী বুড়া মুসলমান কতকগুলি ছিল, বলিল "বাবু ছাড়ান দ্যান, পয়সা মোরা ষ্টেসনেই যোগাড় দেব।"

কাসেম কি করিবে কিছুই বলে না। ভারিক্কী চালে চলিয়া যায়। বলে "যা করবে ভেবে দেখ, এখুনি আসছি।"

নাজিমের সহিত আলাপ করি। নিজের দুঃখের ইতিহাস সে বলিয়া চলে। সব কথা সে গুছাইয়া বলে না, কল্পনায় অনেক জুড়িতে হয়।

৫

ট্রেন ছাড়িয়া দেয়।

গরুর গাড়ীর মত পথে বিপথে থামিতে থামিতে চলে। মুসলমানেরা পরামর্শ করিতে বসে।

নাজিমের কথা শুনিয়া অন্তর আর্দ্র হইয়া ওঠে। ভাবি নিজেই টাকাটা দিয়া দিই।

মন একবার অগ্রসর হয় একবার পিছায়। স্থির করিতে পারি না। কৃপণতা ছবি জাগায়, কলিকাতায় অনেক পয়সা খরচ করিতে হইবে। দাতাকর্ণ সাজিলে ক্ষতি হইবে।

অনুকম্পা বলে "না হয় না হইল, গৃহিণীর মুখ নাড়া না হয় একটু খাইবে, কিন্তু কত বড় আত্ম-প্রসাদ।"

কৃপণতা উত্তর দিতে চায় না। জানে তাকে জেতা সহজ নয়। চুপ করিয়া ফাঁকি দিতে চায়, সময় লইতে চায়।

অনুকম্পাকে বুঝায় "ব্যস্ত হওয়া ভাল নয়, দেখনা কোথাকার জল কোথায় গড়ায়।"

এ যুক্তি মন ভুলায়।

মনকে বলি, "আসুক আবার কাসেম, তখন তর্কের বাণ হানিব, যদি ব্যর্থ হই, তখন দেব না হয় গাঁটের পয়সা।"

ভাবী যুদ্ধের কল্পনায় মন বিভোর হইয়া ওঠে।

সারাদিনের ক্লান্তি রেলের চলার গতির গানে মুগ্ধ হইয়া যায়। ধীরে ধীরে তন্দ্রা নয়নকে বিহ্বল করিয়া তুলে।

কখন যে ঘুমাইয়া পড়িলাম মনে নাই। যখন জাগিলাম তখন শিয়ালদহে কুলীরা হাঁকিতেছে "শ্যালদা! শ্যালদা!"

বামুনগাছি আর গরীবের ট্রাজেডী কলিকাতার কল্ম কোলাহল থামাইয়া দেয়। জানিনা নাজিম কেমন করিয়া ঘরে ফিরিয়াছিল। পত্নীর অন্তর সাধ মিটাইয়াছিল কিনা ভগবান জানেন।

এখনও যখন খুলনার পথে চলি, বামুনগাছির পথ-পানে চাহিয়া থাকি। মন গ্লানিতে ভরিয়া উঠে। অনুশোচনায় আত্মা ক্লিষ্ট হয়। জানিনা সেই অজানা পাতার কুঁড়ে ঘরে দম্পতির মিলনালাপ দুঃখব্যথায় ঘন হইয়া ওঠে কি না।

কত ছোট মন আমার; এখন বুঝিয়াছি। দেশের ভাইকে ভালবাসি একথা আর বড়াই করিয়া বলিতে পারি না। তৃতীয় শ্রেণীতে তাই আর উঠি না।

শ্রীমতিলাল দাশ

খেলনা

শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন নিয়োগী এম্-এ

খেলনা আমাদের ঘরে ঘরে প্রয়োজন। যেখানে শিশুরা আছে সেখানেই খেলনা চাই, কারণ "খেলা" করাই শিশুদের একমাত্র "কায"। ক্রমে শিশু যত বড় হতে থাকে তত খেলনার রূপের পরিবর্ত্তন হয়, প্রকারভেদ হতে থাকে। আস্তে আস্তে জীবনে যেমন খেলার ভাগ কমতে থাকে, কর্ত্তব্য এসে পড়ে, তেমনি খেলনার প্রয়োজনও চলে যায়।

খেলনাকে সাধারণতঃ আমরা "খেলার" সঙ্গেই যোগ করে থাকি, কিন্তু খেলনার যে আর একটা দিক আছে সেটা ভুলে যাই—সেটা হচ্ছে "শিক্ষার" দিক। আমাদের দেশে এ দিকটায় কখনও মনোযোগ দেওয়া হয়েছিল বলে মনে হয় না। শিশুর মন অতর্কিত ভাবে খেলার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে থাকে। তাকে অল্প সময়ের মধ্যে পৃথিবীর অনেক জিনিস শিখে নিতে হয়—আমরা যে সময়ে মনে করছি যে শিশু কেবল আমোদ করছে বা আনন্দ পাচ্ছে, যাকে আমরা বলি "খেলা" করছে, প্রকৃতপক্ষে সে সময়ে সে কেবল খেলা করছে না, সে শিখছে, জগৎকে পরখ করে নিচ্ছে—সে ক্রমাগত Experiment করে সব আয়ত্ত করে নিয়েছে। Conscious ভাবে করছে না বটে, কিন্তু করছে।

কাজেই শিশুর জীবনে খেলবার একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। তার মনকে সজীব ও প্রফুল্ল রাখা তার শরীরকে সুস্থ রাখার চেয়ে কম প্রয়োজনীয় নয়। খেলনা তার বুদ্ধিবিকাশেরও সহায়তা করে। আমরা সাধারণতঃ সে কথা ভুলে যাই এবং খেলনা কেনাটাকে একটা বাজে খরচ বলে মনে করি, যেন "দায়ে পড়ে" খেলনা কিনে দিয়ে শিশুকে শান্ত করতে চেষ্টা করি, আর শিশু যদি শান্ত হল তাহলেই যথেষ্ট মনে করি। অন্নজলের মতন খেলনাটাও যে তার একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিস তা ধারণা করতে পারি না। কিন্তু পাশ্চাত্য জগতে এ ভ্রান্তধারণা একেবারেই নেই এবং সেখানে সকল দেশই খেলনার প্রয়োজনীয়তা বুঝেছে বলে এ বিষয়ে একেবারেই অবহেলা করে না। তারা খেলনাটাকে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস মনে করে; বাড়ীর ছেলে মেয়েদের জন্যে যথেষ্ট খেলবার জিনিস কেনা তাদের কর্ত্তব্য মনে করে এবং সম্ভবমত ছেলেমেয়েদের খেলা এবং হুড়োহুড়ির জন্যে একটা ঘর—nursery পৃথক করে রাখে, যেখানে অবাধে তারা "দুরন্তপানা" করতে পারে। এ ব্যবস্থায় একদিকে ছেলেমেয়েরাও যেমন প্রাণভরে ফুর্ত্তি করবার সুযোগ পায়, অন্যদিকে বাড়ীর লোকদের অসুবিধার কোনো কারণ থাকে না, সমস্ত বাড়ী "নোংরা" হয় না। ছেলেমেয়েদের রাজত্ব আলদা করে দিয়ে বাড়ীর আর সকলে আরামে ও স্বচ্ছন্দে থাকবার সুযোগ পান।

এই কারণে পাশ্চাত্য দেশগুলিতে খেলনা প্রস্তুত করার ব্যবসা একটা প্রকাণ্ড ব্যবসা হয়ে উঠেছে। ইংলণ্ড, জার্ম্মাণী, অষ্ট্রিয়া, ফ্রান্স, আমেরিকা প্রভৃতি দেশ প্রতি বৎসর কোটি টাকার—এটা অত্যুক্তি নয়—খেলনা প্রস্তুত ও বিক্রি করে। খেলনা প্রস্তুত করার জন্য বড় বড় কারখানা আছে, কোথাও বা আবার বিস্তৃতভাবে কুটীর-শিল্পের ব্যবস্থা আছে—অর্থাৎ এক একটী খেলনার অঙ্গ বা parts এক এক পরিবারে প্রস্তুত হয়। এতে সহস্র সহস্র লোকের উপার্জ্জন ও ভরণপোষণের উপায় হয়, দেশের অর্থ বাড়ে ও দারিদ্র্য দূর করার একটা পন্থা হয়। আমাদের দেশেও এখন মহা সমস্যা উপস্থিত হয়েছে—ব্যক্তিগতভাবে অর্থোপার্জ্জন এবং সমষ্টিগতভাবে দেশের অর্থবৃদ্ধি। এই উদ্দেশ্যে নানাদিকে চেষ্টা হচ্ছে, কিন্তু খেলনা প্রস্তুত করার দিকে যে খুব বেশী মনোযোগ দেওয়া হয়েছে তা মনে হয় না।

অন্যান্য ব্যবসায়ের তুলনায় খেলনার ব্যবসা অবশ্য সামান্য, তবু ভাল করে দেখলে একে একেবারে নগণ্যও বলা যায় না। এ ব্যবসার পরিমাণ ভারতের আমদানী রপ্তানীর statistics দেখলে কতকটা বুঝতে পারা যায়। নানাদেশ থেকে প্রতি বৎসর যে খেলনা আমাদের দেশে আসে তার কয়েক বৎসরের মোট মূল্যহার এখানে দেওয়া গেল :—

বৃটিশ ভারতে "খেলনা ও খেলার" (Toys and games) আমদানী

বৎসর	টাকা
১৯১৭—১৮	২৫,৮৯০০০৲
১৯১৮—১৯	৩৫,১৫০০০৲
১৯১৯—২০	৫২,৪৪০০০৲
১৯২০—২১	৫৯,১০০০০৲
১৯২১—২২	৩৪,২৬০০০
১৯২২—২৩	৫৭,৩৬০০০
১৯২৩—২৪	৬২,৮৮০০০৲
১৯২৪—২৫	৫৯,০৬০০০৲
১৯২৫—২৬	৫৪,২৭০০০৲
১৯২৬—২৭	৬২,১১০০০৲

এই তালিকা দেখলে খেলনার ব্যবসার একটা ধারণা করা যেতে পারে। ১৯১৭ সনে ছাব্বিশ লক্ষ টাকার খেলনা ভারতে আসে, কিন্তু তিনবৎসরের মধ্যেই আমদানী ঠিক দ্বিগুণ অর্থাৎ বাহান্ন লক্ষ হয়ে ১৯২০ সনে একেবারে প্রায় ষাট লক্ষে দাঁড়ায়। তারপরে ১৯২১—২২সনে বিদেশী খেলনার বিক্রী হঠাৎ কমে যায়,—কিন্তু পরের দুই বৎসরে পূর্ব্বের চেয়েও বেড়ে ১৯২৩ সনে প্রায় তেষট্টি লক্ষ হয় এবং মধ্যে কিছু কমে গিয়ে পুনরায় ১৯২৬ সনে বাষট্টি লক্ষ হয়। এই থেকে সহজেই অনুমান করা যায় আমাদের দেশে খেলনার কাটতি কি রকম বেড়ে চলেছে এবং এদেশে খেলনা প্রস্তুত করার ব্যবসা বেশ চলতে পারে। আমাদের যুবকেরা এখন নানা দিকে উপার্জ্জনের পথ খুঁজে বেড়াচ্ছেন, এই চেষ্টায় বিদেশে গিয়ে নানা শিল্প ইত্যাদি শিখে আসছেন। মনে হয়, খেলনা প্রস্তুত করার ব্যবসাও তাঁরা সহজে আরম্ভ করে অর্থাগমের নূতন উপায় অবলম্বন করতে পারেন।

অন্যান্য ব্যবসার ন্যায় এ ব্যবসায়েরও দুই বিভাগ আছে—এক, বিদেশ থেকে খেলনা আমদানী করে বিক্রি করা; দুই, দেশের মালমসলা ও দেশী শ্রমিক দিয়ে খেলনা প্রস্তুত করা। বলা বাহুল্য যে এ পর্য্যন্ত আমাদের দেশে প্রথমটাই হয়ে এসেছে, দ্বিতীয়টীতে বেশী মনোযোগ দেওয়া হয় নি। একথাও বুঝিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন নেই যে এই দ্বিতীয় উপায় অবলম্বন করলেই দেশের অর্থবৃদ্ধি হবে, প্রথমটীতে নয়।

চালানী খেলনা অধিকাংশ জার্ম্মানী ও জাপান থেকে আসে। ইংলণ্ড থেকেও আসে বটে কিন্তু তার দাম অপেক্ষাকৃত বেশী বলে অন্যগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পারে না; তবে জিনিষ হিসেবে ইংলণ্ডের খেলনা ভাল ও টঁ্যাকসই মনে হয়। আমেরিকার প্রস্তুত খেলনাও আসে, কিন্তু পরিমাণে জার্ম্মানী ও জাপানের মত নয়। দামে জাপান যত সস্তায় খেলনা দেয় অন্য কোনো দেশ তা পারে না, কিন্তু জিনিষ হিসেবে জাপানী খেলনা "খেলো"।

আমাদের দেশেও খেলনা কিছু কিছু প্রস্তুত হয় সে কথা সকলেরই জানা আছে। সেগুলির প্রধান উপাদান মাটি, কাঠ, বাঁশ, কাগজ, শোলা, কাপড় ইত্যাদি। স্থলবিশেষে পিতল, লোহার মতন ধাতুও ব্যবহার হয়ে থাকে। এসকল খেলনা অতি মোটা রকমের, আকৃতি ও অবয়ব বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কবিবর্জ্জিত, যদিও শিশুদের কাছে অপূর্ব্ব সামগ্রী। এগুলির দাম অতি কম, স্থায়িত্বকালও তাই। এ সকলের ব্যবসা বংশানুক্রমে চলে আসছে, অর্থাৎ এক এক পরিবারে বা এক এক শ্রেণীর লোকে আবদ্ধ। প্রস্তুত-প্রণালীর বিশেষত্ব কিছু নেই, সহজেই করা যায়; কোনো কল কারখানা বা যন্ত্রপাতি লাগে না, মোটামুটি কয়েকটী জিনিষ হলেই চলে। আমাদের যুবকদের এদিকে দৃষ্টি দেওয়ার কোনো প্রয়োজন বা প্রলোভন নেই, উচিতও মনে হয় না, কেন না যারা বংশ পরম্পরায় এই কাজ করে আসছে তাদের উপার্জ্জনে বাধা দেওয়া হবে। তবে এ শ্রেণীর খেলনা-প্রস্তুতের উন্নতি সাধন যদি কেউ করতে পারেন তাহলে এই ব্যবসায়ীদের উপকার হওয়ার সম্ভাবনা, কেননা কম দামে যদি আর একটু ভাল খেলনা এরা দিতে পারে তবে তার বিক্রী বেড়ে যাওয়ার কথা। তাছাড়া এ জাতীয় খেলনা প্রস্তুতের

আর একটা উপকারিতা আছে—কুটীর-শিল্প হিসেবে খুব সহজেই এগুলি প্রস্তুত করা যায়। দরিদ্র বা অনাথ স্ত্রীলোক বা বালক, কিম্বা যাহাদের অন্য কাজ ক'রে কিছু অবসর আছে, বা যারা অন্য কোন উপার্জ্জন করতে পারছে না, তারা সহজেই সামান্য টাকা লাগিয়ে অল্প পরিমাণে এ জাতীয় খেলনা প্রস্তুত করতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে এগুলির বিক্রির ভাল ব্যবস্থা হওয়াও প্রয়োজন।

বিদেশ থেকে আমরা যে খেলনা আমদানী করি উপাদান হিসেবে তাকেও শ্রেণীবিভক্ত করা যায়। সাধারণতঃ নিম্নলিখিত উপাদানে প্রস্তুত খেলনা আমাদের বাজারে পাওয়া যায়—কাঠ, টিন বা লোহার পাত, চীনা মাটি, রবার, সেলুলয়ড্, পাপিয়েমাশে,* পেষ্ট-বোর্ড (মোটা কাগজ) উল, কাপড় ইত্যাদি। এত বিভিন্ন রকমের উপাদান ব্যবহারের কয়েকটী কারণ আছে, যেমন, মালমশলার উপর দামের কমবেশী অনেকাংশে নির্ভর করে; এক এক রকম খেলনা এক এক রকম মালমশলায় ভাল হয়; এক এক মালমশলার এক একটা বিশেষ গুণ আছে, যেমন, হালকা, সহজে ভাঙ্গে না, স্থিতিস্থাপক (elastic), ইত্যাদি।

আর একভাবে খেলনার শ্রেণী বিভাগ করা যায়, যথা,

১। স্থির (মাটি, চীনা মাটি বা কাঠের পুতুল, জন্তু, বা অন্য কোনো জিনিষ)

২। সচল ও গতিশীল (Mechanical)

(ক) শিশু নিজে যাকে চালিত করে—যেমন টানলে বা ঠেললে যে খেলনা চলে বা নড়ে।

(খ) অন্য শক্তি দিয়ে চালিত—স্প্রিং, মাধ্যাকর্ষণ শক্তি, বাষ্প, বিদ্যুৎ, গ্যাস ইত্যাদি।

এগুলির মধ্যে স্প্রিং এর প্রচলন বেশী, কেননা ইহাতে ব্যয় কম, ইহা সহজসাধ্য এবং ইহাতে ভয়ের কোনো কারণ নাই।

এই সঙ্গে আরেকটী জিনিষ আমাদের বিবেচনা করতে হবে—খেলনার সঙ্গে শিশুমনোবিজ্ঞানের (Child Psychology র) খুব ঘনিষ্ট যোগ। শিশু যা চায়, যা ভালবাসে তাকে তাই দিয়ে আমোদ ও আনন্দ দিতে হবে। যুক্তি তর্ক দিয়ে শিশুকে বশ করা যায় না, এ সব সে গ্রাহ্য করে না। তাকে শাসন করা বা ভয় দেখান সহজ, কিন্তু যদি তাকে আনন্দ দিতে হয় তবে তার মতন করে চলতে হবে। সুতরাং খেলনা যদি শিশুর আনন্দদায়ক করতে হয় তবে শিশু-প্রকৃতিটা খুব ভাল করে অনুধাবন করতে হবে। মোটামুটি এই দেখা যায় যে শিশুরা শব্দ, বর্ণ, গতি এই তিনটী জিনিষ ভালবাসে। বোধ হয় তাদের পৃথিবী সম্বন্ধে সচেষ্ট জ্ঞানের ক্রমও এই। আকার (shape, form) সম্বন্ধে ধারণা প্রথমে হয় বলে মনে হয় না; সেটা পরে অল্পে অল্পে আসে। সুতরাং খেলনা প্রস্তুতের সময় শব্দ, বর্ণ ও গতি—এই তিনটী বিষয়ে মনোযোগ দিতে হয়। এ ছাড়া খেলনা সম্বন্ধে আর যা কিছু সুন্দর বা অসুন্দর বিবেচনা করা হয় সেটা বড়দের পছন্দ; শিশুদের সে বিষয়ে কোনো পছন্দ বা অপছন্দ নেই।

শিশু প্রথমেই শব্দ ভালবাসে। আরম্ভেই যে সে খুব জোরের শব্দ ভালবাসে তা মনে হয় না—সুশ্রাব্য কিছু চায়, যেমন ঝুমঝুমি। ক্রমে সে শব্দটা বেশী চায়—তখন বাঁশী, ঢোল, ইত্যাদি পছন্দ করতে আরম্ভ করে। সুর সম্বন্ধীয় আমোদ অনেক পরে হয়। বর্ণ সম্বন্ধে একটু অন্য রকম দেখা যায়—প্রথমেই সে খুব ঘোর বা উজ্জল রং চায় এবং এই উজ্জ্বলবর্ণ-প্রিয়তা অনেক বড় বয়স পর্য্যন্ত থেকে যায়। ক্রমে সৌন্দর্য্য-জ্ঞান পরিস্ফুট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে হালকা বা ফিকে রং পছন্দ করতে আরম্ভ করে। এই কারণে খেলনার রং সাধারণতঃ খুব উজ্জল বা bright করা হয়, যাতে শিশুর চোখ সহজেই আকৃষ্ট হয়। আবার, খেলনাতে রং জিনিষটা এতই প্রয়োজনীয় যে কোন্ রং ছেলেরা বেশী পছন্দ করে, কিম্বা কোন্ বর্ণের সমাবেশ তাদের বেশী আকৃষ্ট করে এ সকল বিষয়ে খুব ভাল করে অনুধাবন করতে হয়।

তারপর, শিশুর প্রধান আকর্ষণের বস্তু হল "গতি"। স্থির কোনো বস্তু শিশুকে বেশীক্ষণ আনন্দ দিতে পারে না, কোনো সচল বা গতিশীল জিনিষ পেলেই সে সেদিকে যাবে। এই কারণে এই জাতীয় খেলনার চাহিদা এত বেশী ও

* Papier-mache'—রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে কাঠের নরম অংশকে কাদার মতন করা বস্তু।

আধুনিক খেলনা এই দিকেই এত উন্নতি করে চলেছে। ইউরোপে গতিশীল ও সচল খেলনা যে কত রকম তৈরী হচ্ছে তার ইয়ত্তা করা যায় না; নতুন নতুন অথচ অতি সহজ কৌশল উদ্ভাবন করে এই জাতীয় খেলনা প্রস্তুত করা হচ্ছে। অবশ্য কৌশল যতই সহজ মনে হোক না কেন প্রকৃত পক্ষে তা নয়, কেন না এই কৌশল বার করতে খুব মাথা খেলাতে হয়। কিন্তু ও-দেশীয় লোকদের চেষ্টার বিরাম নেই, তারা ক্রমাগত চেষ্টা করছে সস্তা মালমশলা অথবা ফেলনা কাঠ বা কাপড়ের টুকরো অথবা অন্য কোনো বাজে জিনিষ কি করে এই কাজে লাগাতে পারে। অন্যান্য বিষয়ে যেমন, খেলনা প্রস্তুতেও তেমনি তাদের উদ্ভাবনীশক্তি দেখলে আশ্চর্য্য হতে হয়। অতি সামান্য উপাদান থেকে তারা ছেলেমেয়েদের মন ভুলানো খেলনা সব তৈরী করছে। আমাদের দেশেও যারা এ ব্যবসা করতে ইচ্ছুক হবেন তাঁদেরও এই উদ্ভাবনীশক্তির চর্চ্চা করতে হবে, ক্রমাগত ঐ চিন্তাতেই থাকতে হবে যে কি করে অল্পব্যয়ে ও নতুন কৌশলে গতিশীল বা সচল খেলনা করতে পারা যায়।

পূর্ব্বেই বলা হয়েছে যে গতিশীল খেলনাতে "স্প্রিং" খুব বিশিষ্ট স্থান লাভ করেছে। সস্তা খেলনার প্রায় সবই স্প্রিং চালিত, কাজেই স্প্রিং আমাদের দেশে প্রস্তুত হয় কি না কিম্বা প্রস্তুত করতে পারা যায় কি না সন্ধান লওয়া প্রয়োজন। এ ছাড়া বাষ্প (steam) ও বিদ্যুতের প্রচলন ইদানীং খুব আরম্ভ হয়েছে, বিশেষতঃ শেষেরটীর। এ সকল দিয়ে খেলার জাহাজ, রেলগাড়ী, ইত্যাদি চালিত করা হয়; বড় ছেলেমেয়েরা এতে খুব আমোদ পায় এবং বুদ্ধি খেলাবার সুযোগও পায়। এ জাতীয় খেলনার দাম খুব বেশী, সুতরাং ধনীরাই কিন্‌তে পারেন।

আর এক শ্রেণীর খেলনাকে নাম দেওয়া যায়—"গড়ে-তোলার খেলনা", অর্থাৎ কাঠের বা কাগজের ছোট ছোট টুকরো ছেলেমেয়েদের দেওয়া হয় এবং কি তৈরী করতে হবে বা গড়তে হবে তার ছবি দেওয়া হয়। এই ছবি দেখে ঐ ছোট ছোট টুকরো দিয়ে অনুরূপ ছবি বা জিনিষ গড়ে তুলতে হয়।

উপরে যা বলা হয়েছে তা ছাড়া খেলনার আরও কয়েকটী গুণ থাকা উচিত—খেলনা হাল্‌কা, ট্যাঁকসই এবং সস্তা হওয়া চাই। শিশু সহজে ও বিনা কষ্টে যাতে খেলা করতে পারে তাই খেলনা হাল্‌কা হওয়া প্রয়োজন; আবার যাতে সহজে না ভাঙে, ছেঁড়ে বা নষ্ট হয়, বা জলে না ভেজে এসবও দেখতে হবে। এই উদ্দেশ্যে অন্যান্য দেশে নানা প্রকার চেষ্টা করা হয়েছে; এ সকল চেষ্টা যে খুব সফল হয়েছে তা বলা না, তবু চেষ্টা করা হচ্ছে। খেলনার আর একটী প্রধান গুণ যে সস্তা হবে, কারণ তা না হলে সকলের অর্থে কুলোবে না, বিক্রি যথেষ্ট হবে না। আমাদের দরিদ্র দেশে বিশেষ করে এ বিষয়ে খুব দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

ছেলেমেয়েরা যখন বড় হতে থাকে তখন দেখা যায় যে শুধু "খেলনাতে" তাদের মন ওঠে না, সে সময়ে তারা "খেলা" চায়, ইংরেজিতে যাকে Games বলা হয়। 'খেলার" (Games এর) আদর আজকাল কি রকম সব ঘরেই জানা আছে, এবং বিলিতি "খেলা" কি ভাবে সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়ছে তা'ও সকলে দেখছেন। "খেলনা" ও "খেলার" পার্থক্য এই যে "খেলনা" নিয়ে শিশুরা নিজেরাই খেলতে পারে, কারও সাহায্য বা সাহচর্য্য দরকার হয় না, কিন্তু "খেলা" একলা একলা হয় না, এতে সাহচর্য্য ও প্রতিযোগিতা চাই। তাছাড়া কিছু পরিণত বুদ্ধিও দরকার হয়, কাজেই একটু বড় না হলে "খেলার" আনন্দ শিশু বুঝতে পারে না। সাধারণতঃ পাঁচ বা ছয় বৎসরের পূর্ব্বে "খেলার" আমোদের আস্বাদন ছেলেমেয়েরা পায় না। যাই হোক, এ ব্যবসায়ের এটীও একটী বিশিষ্ট বিভাগ এবং এদেশে "খেলার" ব্যবসাও বেশ চলতে পারে। তবে ইহার বাধা এই যে বিলাতি কোনো "খেলা"ই এদেশে প্রস্তুত করার সুযোগ নেই, কেননা সেগুলির স্বত্ব প্রায়ই পেটেন্ট দ্বারা সংরক্ষিত থাকে, এখানে প্রস্তুত করা আইন-বিরুদ্ধ। এ অবস্থায় একমাত্র উপায় সেইগুলির অনুকরণে নতুন নতুন "খেলার" উদ্ভাবনা করা এবং এমন খেলা উদ্ভাবন করা যাতে ছেলেমেয়েদের আগ্রহ ও উৎসাহ অক্ষুণ্ণ থাকে।

খেলনা প্রস্তুত সম্পর্কীয় আয়োজনের মধ্যে দুইটী জিনিষ প্রধান—কলকারখানা এবং রসায়নবিদ্যা। কলকারখানা

না হলে সস্তা ও অধিক সংখ্যক খেলনা প্রস্তুত করা যে সম্ভব নয় তা সহজেই অনুমেয়। খেলনা সামান্য জিনিষ বলে এর কলকারখানা সামান্য বা সহজ তা মনে করলে অত্যন্ত ভুল হবে। এই কলকারখানা শিখবার জন্যেই বিদেশে যাওয়া প্রয়োজন, নহিলে বিদেশী খেলনার সঙ্গে কোনো প্রতিযোগিতা সম্ভব নয়। অন্যান্য বিদ্যার ন্যায় এ বিদ্যালাভ করতেও তিন চার বছরের কম লাগে না। আবার রসায়নবিদ্যা এ ব্যবসার একটী প্রধান অঙ্গ। যে সকল উপাদানের কথা উপরে বলা হয়েছে সেগুলি কাজের উপযোগী করে নিতে রসায়নের সাহায্য তো লাগেই, তাছাড়া বিশেষ করে রং সম্বন্ধীয় সমস্ত কাজে রসায়ন শাস্ত্রের প্রয়োজন প্রতি পদে হয়। এ বিষয়ে জার্ম্মাণী যতটা অগ্রসর হয়েছে আর কোনো দেশ তা হয় নি, কাজেই জার্ম্মাণীতে এ বিদ্যালাভ করাই প্রশস্ত। অল্প ব্যয়ে যত সুন্দর রংএর সমাবেশ করা যায় খেলনার আদর তত বেশী হয়, কেননা রং ছাড়া প্রায় কোনো খেলনাই হয় না, তা যে মালমসলা দিয়েই খেলনা প্রস্তুত হোক না কেন। আবার কোন্ উপাদানের সঙ্গে কোন রং ভাল মিশবে বা ভাল খাপ খাবে তাও অনুধাবনের বিষয়। এই সকল কারণে রং সম্বন্ধে এ ব্যবসাতে বিশেষ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

এ ব্যবসা আরম্ভ করতে হলে প্রথমেই কয়েকটি জিনিষে মনোযোগ দিতে হবে, যেমন, কোন্ কোন্ উপাদান আমাদের দেশে অল্পব্যয়ে সহজ-লভ্য এবং সে উপাদান দিয়ে কোন্ শ্রেণীর খেলনা প্রস্তুত হতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, কোন্ প্রকারের খেলনা কম কলকারখানার সাহায্যে হতে পারে; তৃতীয়তঃ, এখানকার শ্রমিকদের দিয়ে কতদুর সে কাজ লাভজনকভাবে হতে পারে। সবদিক দিয়ে বিবেচনা করে মনে হয় যে কাঠ, মোটা কাগজ, পাপিয়ে মাশে, এই তিনটী জিনিষ দিয়ে খেলনার ব্যবসা আরম্ভ করা যেতে পারে, কিন্তু কলকারখানা ও বিদেশে শিক্ষা ভিন্ন যে বেশী-দূর অগ্রসর হওয়া যাবে না, তা বলা বাহুল্য।

আবার, প্রথম অবস্থায় বিদেশী খেলনার আকার প্রকার কৌশল ইত্যাদি, অনুকরণ ছাড়া উপায় নেই। যত প্রকারের বিদেশী খেলনা বাজারে পাওয়া যায় সব সংগ্রহ করে তার সকল অঙ্গ ও কৌশল অনুধাবন করতে হবে; যতটা সম্ভব সে সব অনুকরণ এবং সেই সঙ্গে যাতে নতুন কৌশল উদ্ভাবন করা যায় তার ঐকান্তিক চেষ্টা করতে হবে। এ বিষয়ে বুদ্ধি খেলাবার সুযোগ খুব আছে এবং বিষয়টীও খুব শিক্ষাপ্রদ, সুতরাং সুতীক্ষ্ণবুদ্ধি যুবকেরা সহজেই একাজে আগ্রহ বোধ করবেন ও আনন্দ পাবেন।

শেষের কথা এই যে খেলনার ব্যবসাতেও, অন্যান্য ব্যবসার ন্যায়, একটা বিষয়বুদ্ধির দিক business side আছে। কেবল খেলনা তৈরী করতে পারলেই সবটা কাজ হবে না। বাজারে তার কাটতি কি ভাবে করতে হবে, ভাল বিক্রির ব্যবস্থা, বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা, হিসেব পত্রের দিক, এসব সামলিয়ে না চালালে এ ব্যবসায়ে কখনও সফল হওয়া সম্ভব নয়। সাধারণতঃ আমাদের দেশে দেখা যায় যে যদি বা কোনো জিনিষ ভাল তৈরী হতে আরম্ভ হল, তার business side কাটতি ইত্যাদির দিকটাকে এমন অবহেলা করা হয় যে সেই দোষেই সে ব্যবসাটা মাটি হয়ে যায়। সুতরাং যাঁরা খেলনা-তৈরীর ব্যবসায়ে অগ্রসর হতে ইচ্ছুক হবেন তাঁরা একথাগুলিও স্মরণে রাখলে ভাল হয়।

শ্রীনিরঞ্জন নিয়োগী



পথ

শ্রীযুক্ত সুধাংশু বিকাশ রায়চৌধুরী

জাহাজ ছাড়িয়া দিল। একটু একটু করিয়া নিস্তরঙ্গ গঙ্গার শুব্ধ জলরাশি কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিল। ক্রমশঃ আউট্রাম ঘাটের তটরেখা দূর হইতে দূরে সরিয়া পড়িতে লাগিল। জানিনা কোন্ এক অজানা আশঙ্কায় বুকের ভিতরটা দুলিয়া উঠিল। যে চোখের জল লোকচক্ষু হইতে ঢাকিয়া রাখিতে চাহিতেছিলাম, কোন্ এক অবোধ্য চিন্তার সূক্ষ্মজালস্পর্শে শতধারে তাহা যেন বাহির হইতে চাহিতেছিল। পাশে দাঁড়াইয়া যে মেয়েটী,--আমার হাতে হাত বাঁধা,—কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার চোখ দুটি জবাফুলের মত হইয়াছে। নিজেকে একটু সংযত করিয়া বলিলাম, "ছিঃ, আবার কাঁদচ? এই না সেদিন কত কথা বল্‌ছিলে, আজ বুঝি সব ভুলে গেলে? ভয় কি রাণু, এই যে আমিই রয়েচি।" রুমাল দিয়া চোখ দুটী মুছাইয়া দিলাম, বলিলাম, "চল লক্ষ্মীটি ডেকে গিয়ে দাঁড়াই—সন্ধ্যার গঙ্গা কি সুন্দর দেখ্‌বে।" অবরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল—"থাক্, তুমিই যাও, আমি একটু এক্‌লাটী থাকি"—আকুল কণ্ঠে আবার বলিল, "মন যে কেমন কচ্ছে রবিদা, আচ্ছা—আর ফিরে যাওয়া হয় না? মা, বাবা, বাড়ীর খোকাখুকুরা সবাই খুব কাঁদচে, না?"

বলিলাম, "এসেচো যখন লক্ষ্মীটি তখন সবই ভুলতে হ'বে—সবই সইতে হইবে। ছিঃ, কত জোর করে, কত কথার বোঝা ঘাড়ে নিয়ে এসেচো তুমি—তা' কি ভুলে যাচ্ছ? তুমি যদি এম্‌নি করে মুসড়ে পড় তবে আমার উপায় কি হ'বে তা' কি একবার ভাব্‌বে না? লক্ষ্মীটি শুধু জাহাজের এই কটা দিন আমায় ভুলিয়ে রেখো; জানতো কি দিয়ে কেমন করে রবিদা এ সমুদ্র পাড়ি দিচ্ছে?"

গভীর ভাবে আমার দিকে চাহিয়া, আমার হাত দুটী ধরিয়া বলিল, "তোমার কেবিনে গিয়ে বসা যাক্ চল।" আবার বলিল—"আচ্ছা, আমি সিল্কের শাড়ী ব্লাউজটাই এখন পরি! মোজাটা এখন থাক্—কি বল?"

বলিলাম, "যেমন ইচ্ছে, এখন তো আর বাইরে যেতে হচ্ছে না।"

রাণী তাহার কেবিনে কাপড় বদ্‌লাইতে গেল; আমি পাশে আমার কেবিনে ঢুকিলাম। জানালা দিয়া এক টুক্‌রা চাঁদের হাসি আমার ধব্‌ধবে বিছানার উপর পড়িতেছে। সুটকেশ খুলিয়া একটা কাশ্মিরী সিল্কের সুট্ খুলিয়া পরিলাম, কোটটা তুলিয়া রাখিয়া ট্রাউজারের পকেটে হাত দিয়া ডেকে একটু ঘুরিতে লাগিলাম। জাহাজের সহস্র শব্দের ঝঙ্কার মনের চিন্তার পথ ঘুরাইয়া দিতে পারিল না। নিজের ভবিষ্যৎকে ভাবিবার চেষ্টা করিলাম না,—পুরুষ মানুষ—আমার জীবনের পথ যদি শত কাঁটায় কণ্টকিত হয় তবু হয়তো পুরুষোচিত ক্ষুদ্রশক্তির দম্ভ লইয়া নিজেকে অনেকটা বহন করিতে পারিব। কিন্তু সাথীটী? যৌবনের দ্বারে দাঁড়াইয়া যাহার চোখের সম্মুখে জীবনের অনন্ত-বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র প্রসারিত পড়িয়া রহিয়াছে, কোন্ শক্তির দম্ভে তাহার সমস্ত ভার ঘাড় পাতিয়া লইলাম? জানি—জীবনের বন্ধুর পথে দুই জনের পথ দুই দিকে—জীবনের বাস্তবক্ষেত্রে এক সূত্রে এদের বন্ধন ভগবান গোড়াতেই নষ্ট করিয়া দিয়াছেন; তবে কোন্ সাহসে এ ফুলের মত মেয়েটার ভবিষ্যৎকে বুকে তুলিয়া লইলাম? পৃথিবীর গ্লানিপূর্ণ বিদ্রূপ ও সমাজের রক্তচক্ষু হইতে কেমন করিয়া বাঁচাইব একে? একটা কথার বিষে ইহার ভবিষ্যৎ হয়তো জ্বলিয়া পুড়িয়া নষ্ট হইয়া যাইবে, শুক্‌নো ফুলের মত হয়তো সমাজ একে দূরে সরাইয়া দিবে। আর আমি? সংসারের সমস্ত আঘাত সহ্য করিবার ক্ষমতা আমার আছে; সমাজই বা কত শক্তি ধরে যে আমার অখণ্ড ভবিষ্যতের বিপুল সম্ভাবনাকে নষ্ট করিতে পারে! রওনা হইবার পূর্ব্বে একবার রাণীকে সব কথা বুঝাইয়া বলিয়াছিলাম; ও বলিয়াছিল, "ছিঃ, রবিদা, আমি একটা মেয়ে হয়ে যা' ঘাড়ে বইতে রাজি আছি—তুমি পুরুষ হয়ে সেটা বইতে ভয় পাচ্ছ? নিজেকে

এত দুর্ব্বল ভাবো তুমি? তা' ছাড়া তোমার কি? সইবার ভার তো মেয়েমানুষের—সে সইবার ক্ষমতা ভগবান আমায় দিয়েচেন। নতুন একটা কিছু করতে গেলে যে দুনিয়ার সব কাদা গায়ে মাখতে হয়—তুমি বিদ্বান মানুষ—তা'কি তোমায় বোঝাতে হ'বে ভাই! তুমি দুর্ব্বল হ'যে আমার বড় হ'বার সম্ভাবনাটা নষ্ট করো না, লক্ষ্মীটি।" আমার হাতটা ধরিয়া উদ্বেল কণ্ঠে বলিয়াছিল, "আমায় শুধু ওখান পর্য্যন্ত যেতে দাও—তা'র পর তোমায় আমি রেহাই দেব; শুধু আমি চার দিক্‌টা একটু দেখে শুনে নি, তারপর তোমায় আমি মুক্তি দেব।" এই প্রচণ্ড সাহসী, অথচ প্রগল্‌ভা মেয়েটির চোখের দিকে চাহিয়া ভাবিয়াছিলাম—কী এই ছোট্ট মেয়েটার সাহস? কোন শক্তির উদ্দামতায় দুনিয়াটাকে ও অবহেলা করিতে চায়; বলিয়াছিলাম, "না ভাই, তোমায় আমি তুলে' নিলুম। আমার যতটুকু দেবার সম্ভব সবই আমি দেব, তুমি বড়ো হও, গৌরবময়ী হও লক্ষ্মী! ভাগ্যহীনের আশীর্ব্বাদ যে ফলে না ভাই, যদি ফল্‌ত—আশীর্ব্বাদ করতুম দুনিয়াটাকে পরাজিত করে নিজকে সার্থক করার ক্ষমতা তোমার হোক্। জীবনে আমায় দিয়ে তোমার কতটুকুই বা প্রয়োজন; যতটুকু প্রয়োজন সেটুকু আজ তোমার হাতে তুলে দিলুম ভাই।"

ডেকে বেড়াইতে বেড়াইতে গঙ্গার ধারে বলা সেই পুরাণ কথাগুলি মনে হইতেছিল। হঠাৎ রাত্রির খাবার ঘণ্টা পড়িল; চমকিয়া উঠিলাম, ও কি করিতেছে, একা একা হয়তো বাড়ীর কথা ভাবিয়া ভাবিয়া কাঁদিয়া চোখ দুটী জবা-ফুল করিয়া ফেলিয়াছে। তা' ছাড়া খাওয়া-দাওয়া তো হয় নাই এখনো। তাড়াতাড়ি আসিয়া ওর দরজায় মৃদু টোকা দিলাম, ডাকিলাম, "খাবার যে সময় হ'ল, দোরটা খুলবে না?" কোন শব্দ নাই। আবার জোরেই ধাক্কা দিলাম। কার্পেটে লুটান আঁচলটা হাত দিয়া গায় তুলিয়া দিতে দিতে আসিয়া দরজাটা খুলিয়া দিল। চুলগুলি উস্কোখুস্কো, চোখের জল শুকাইয়া মুখে ও ঢলঢলে গালে লাগিয়া রহিয়াছে। এক মিনিট ওর বিষাদ-স্নিগ্ধ শ্যামল বর্ণ-ভঙ্গীর দিকে তাকাইয়া রহিলাম। মুহূর্ত্ত মাত্র মনে হইল—হয়তো বা ভুলই করিয়াছি। গাঢ় কণ্ঠে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিল, "ঘণ্টা কিসের রবিদা? খাবার? রাত কটা?" রিষ্টওয়াচ্‌টা দেখিয়া বলিলাম, "আট্‌টা হবে।" একটু হাল্কা করিবার জন্য বলিলাম, "দুষ্টু মেয়ে, মেম সায়েব হ'তে যাচ্ছ—খেয়াল আছে? কল্‌কাতায় দেখেছি ঘণ্টাখানেক লাগ্‌ত চুল পাট করতে; আর আজ চুলগুলি কি করেচ দেখ দিকিনি। যাও লক্ষ্মী, বাথ্‌রুমে গিয়ে চোখমুখ বেশ করে ধুয়ে এসো। মাথাটা টপ্ করে ঠিক করে নাও—ডাইনিং সেলুনে যেতে হবে যে"। ও অনুনয়ের স্বরে বলিল, "না, না ভাই ওটা হবে না। ডাইনিং সেলুনে আজ নয় লক্ষ্মীটি, আজ আমি এখানেই খাই। জান্‌লা দিয়ে দিব্যি হাওয়া বইচে—এখানেই তো বেশ লাগ্‌বে—না না—আজ কিছুতেই নয়।" আমি বলিলাম, "তবে আমি?" আশা করিতেছিলাম হয়তো আমাকেও নিজের কেবিনেই খাবার আনিতে বলিবে। আমার দিকে চাহিয়া বলিল, "তুমি? অনেকদিন পরে হয়তো আবার আজ তোমার সাথে খাওয়া হবে না, তুমি তোমার মিস্তির সায়েব, দত্ত সায়েব বন্ধুদের সাথে খানা খাবে সায়েবী ক'রে—আমি কেমন করেই বা তোমায় আটুকে রাখি।" বলিলাম, "আমার খাবার এখানেই আনাই—ডাইনিং সেলুনের হটগোল ভাল লাগ্‌চে না—কেমন?" উৎফুল্ল হইয়া আমার হাত দুটী ধরিয়া বলিল, "তাই কর রবিদা, নইলে যে বড্ড খালি খালি লাগ্‌বে। তা' ছাড়া আমার বড্ড ভয়ও যে করে।" আবার ত্রস্ত কণ্ঠে চঞ্চল হইয়া বলিল, "তুমি ডেক্‌চেয়ারে একটু গড়িয়ে নাও ভাই, আমি একটু হাতমুখে জল দিয়ে নি"

কেবিনে খাবার আসিয়া হাজির হইল। আমি টাই খুলিয়া সিল্কের সার্টটার হাত গুটাইয়া প্রস্তুত হইলাম। ও আসিয়া বেশ হাল্কা স্বরেই বলিল, "কী সায়েবীটা দেখো! এ সায়েবী করবার জন্য তো তুমি কল্‌কাতায় মরছিলে নিশ্চয়ই।" কথায় হাল্কা ভাব পাইয়া মনটা খুসিতে ভরিয়া উঠিল; ও যে এত সহজেই বাড়ীর ও স্বজনগণের ব্যথা ভুলিয়া উঠিয়া বেশ স্বচ্ছন্দে কথাবার্ত্তা বলিতেছে—তাহাতে আমার মনের পুঞ্জীভূত বেদনাও যেন ভুলিয়া গেলাম। হাত ধরিয়া চেয়ারে বসাইয়া বলিলাম, "মেম সায়েব, খাও দিকিনি এখন!" হঠাৎ গম্ভীর হইয়া গেল;

জানালা দিয়া অনন্ত বিস্তীর্ণ জলরাশির অফুরন্ত কল্লোল-সঙ্গীত প্রবাহের মত ভাসিয়া আসিতেছে; তারার মালা, চাঁদের অচঞ্চল রূপ -সব অপরূপ হইয়া আজ যেন দুঃখভারাক্রান্ত মনটা ভারী করিয়া তুলিতেছে। ও সেদিকে চাহিয়া রহিল, সিল্কের ব্লাউজের হাতার ডগ্‌ডগে লাল প্রান্তটীর উপর শাড়ীর আঁচলটা খেলিতেছিল—ও একদৃষ্টিতে তাই দেখিতেছিল, আর চোখ ছাপিয়া টপ্‌ টপ্‌ করিয়া জল পড়িতেছিল। হঠাৎ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া ও বিছানায় লুটাইয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। আমি নিঃশব্দে এ মর্ম্ম-যন্ত্রণার অভিব্যক্তি দেখিতে লাগিলাম। সমদুঃখীর অশ্রু-সরস স্পর্শ পাইয়া আমার ভারাক্রান্ত মনের সব কথা যেন চোখের জলে লুটাইয়া পড়িতে চাহিতেছে। রুমাল দিয়া চোখ মুছিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া গেলাম; পূর্ণ স্বাস্থ্য লাবণ্যময় দেহটী ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে—"মা, মা—মাগো—বাবা।" চোখ আমার বাধা মানিল না, হাতটি আমার হাতে নিয়া বলিলাম, "রাণু, ওকি কাঁদচ, এতক্ষণ তো বেশ ছিলে।" আমার হাতটি বুকে চাপিয়া ধরিল, আর্ত্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "রবিদা, ও রবিদা গো—আমি যে আর পারচিনে—ওঃ।" ধীরে ধীরে হাতটা ধরিয়া তুলিলাম, দাঁড় করাইয়া জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলাম, রুমাল দিয়া চোখ দুটী মুছাইয়া দিলাম। চোখের জলে আমার সিল্কের সার্ট ভিজিয়া গেল, সস্নেহে দুটী হাতে চাপ দিয়া একটু কাছে টানিয়া মাথাটী আমার বুকে হেলাইয়া দিয়া বলিলাম, "তুমি কি আমায় পাগল ক'রে দেবে? ছিঃ অত কাঁদে? এই তো কত নতুন জিনিষ কাল ভোর থেকে দেখবে—সমুদ্দুর—কতদিশি লোক—আরো কত কী? ছিঃ, কাঁদতে হয়! কাল থেকে কিন্তু একটু পড়্‌তে হ'বে। লক্ষ্মীটি একটু শান্ত হও।" পরম নির্ভরে আমার বুকে মাথা দিয়া এই অসহায়া মেয়েটি দাঁড়াইয়া রহিল, আমি চাঁদের সহিত মেঘের লুকোচুরী দেখিতে লাগিলাম। কতক্ষণ কাটিয়া গেল জানি না, খেয়াল হইলে বলিলাম, "চল খেয়ে আসা যাক্‌," পরিপূর্ণভাবে আমার দিকে চাহিয়া, আমার গুটান সিল্কসার্টের আস্তিন খুলিতে খুলিতে গাঢ় স্বরে বলিল, "রবিদা, রাগ করবে না ভাই,—আমার একটা কথা"—সস্নেহে বলিলাম, "কি কথা রাণি?"

"খিদে নেই, আজ খাব না, তুমি খাও ভাই—আমি দেখি"—। মুখোমুখী দাঁড়াইয়া ওর চোখদুটীর দিকে তাকাইয়া বলিলাম, "তুমি তো বেশ জানো, তা' হ'লে আমারো আজ খাওয়া হ'ল না। তবে এগুলো থাক্‌"। "নাঃ—না—ছিঃ তুমি খাও—আজ তো তোমার খাওয়াই হয় নি, ৪।৫ দিন যাবৎ তো ছুটাছুটিতেই ছিলে, খাওয়া-দাওয়া কিছু হয় নি। সে হয় না, তুমি খাও।" চুপ করিয়া মুখ ফিরাইয়া রহিলাম। আমার মুখটী তুলিয়া ধরিয়া বলিল, "রাগ করলে? খেতে ভাল লাগচে না তাই বলছিলুম।" একটু নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল—"রবিদা, তুমি আমায় যা-ই মনে কর না কেন—আমি জানি আমাকে এনে কত নিন্দা-বিদ্রূপ, অত্যাচার, অবিচারের বোঝা ঘাড়ে তুলে নিয়েচ; এর পরেও যদি তোমায় আমি অনাহারে রাখি—সেকি আমার সইবে ভাই?"

মিষ্টি কথার একটা বিশ্রী দোষ আছে, তাহা মানুষকে কড়া কথার চেয়েও বেশী কাঁদাইতে পারে; এ মেয়ের কথায় একটু বিহ্বল হইয়া পড়িলাম। যাহা হউক কোনো রকমে কান্নাকাটির পালা থামাইয়া খাওয়া শেষ করিলাম।

রাত্রির সমস্যা অনেকক্ষণ মনে হইয়াছিল, এবার শুইবার সময় অগ্রসর হইবার সঙ্গেই সে সমস্যা আরও জটিল হইতে লাগিল। নিজের মন যদিও অনেক অগ্নিপরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, তবু যেন তাহাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলাম না। মানুষের মনের উপর হাত কতটুকুই বা! কিন্তু মন যদি একবার রাশ ছাড়িয়া যায় তবে তাহার ফল কোথায়—অন্তর্যামীই জানেন। যে দায়িত্ব ঘাড়ে স্বেচ্ছায় তুলিয়া নিয়াছিলাম তাহা নিষ্কলুষ ভাবে সম্পাদন করিবার মধ্যে যে গৌরব—তাহা হইতে বিচ্যুত হইবার মত দুষ্প্রবৃত্তি যেন আমায় পথভ্রান্ত না করে,—এই হইল এখন আমার জীবনের সবচেয়ে জটিল সমস্যা। এই যে আধ-ফোটা কুঁড়ির মত মেয়েটা—যে শুধু আমাকে নির্ভর করিয়া প্রবাসের সমস্ত অনির্দ্দিষ্ট দুঃখের ও ভবিষ্যতের শত জটিল সমস্যা বরণ করিয়া লইল, এক মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতার আঘাতে কি তাহাকে আমি বিফল করিয়া দিব? আমার মনুষ্যত্বের কি এই হীন পরিণাম? এই ভীরু পাখীর মতো মেয়েটা, যে কোন দিন মা-ঠাকুমা'র পাশছাড়া শোয় নাই, রাত্রিতে

ঘুমের ঘোরে যে ভয়ে চমকিয়া ওঠে—আজ তাহাকে মধ্য-রাত্রির নিস্তব্ধতার মধ্যে, এ নূতনত্বের আবেষ্টনের মধ্যে কেমন করিয়া রাখি? ও এ সম্বন্ধে কোন কথাই বলিল না; ভাবিলাম, যাক্ সহজ ভাবেই সব কাটাইয়া দেওয়া যাইবে। বলিল, "কী ভাব্‌চ?" চেয়ারের উপর মাথাটা ঝুলাইয়া দিয়া, এলায়িত ভাবে বলিলাম, "আকাশ—পাতাল—ভাবনার কি আর ছাই মাথামুণ্ড আছে?" বলিল, "বয়টাকে বলে ডেক্ চেয়ার দুটো ডেকে নিয়ে নাও না —হাওয়ায় একটু বসা যাক্।" বয়কে ডাক দিলাম; ও আমার চুলগুলিতে হাত চালাইতে লাগিল, ধীরে ধীরে ভাঙ্গাগলায় বলিল, "চুলগুলি তো আজ তোমার বেশ বাঁধা হয়েচে, বেশ পরিষ্কার হয়েই এখনো আছে। কিছু মেখেচ বুঝি?" মৃদু হাসিয়া বলিলাম, "সত্যি এগুলোকে বাগ মানাতে বড্ড কষ্ট হয়ই বটে; একটু সভ্যের মতো থাক্‌তে তো হয় এখন থেকে।" ক্লান্তভাবে একটা হাই তুলিয়া বলিল, "বটেই তো, সাহেব মানুষ তো! চল যাই।"

পাশাপাশি দু'খানি ডেক চেয়ারে দু'জনে বসিয়া আছি। জাহাজের ক্লাব রুমের হল্লার শব্দ এখনো বেশ আছে। কচিৎ দু'একজন ডেকে পায়চারী করিতেছে। জাহাজের সার্চলাইটটা মাঝে মাঝে জলের বুকের সৌন্দর্য্য উন্মুক্ত করিয়া দিতেছে। একটু দূরে একটা সাহেব শিষ্ দিতেছিল। আধ-অন্ধকারে আমাদিগকে ঠাহর করিতে না পারিয়া কথার ছুতায় কাছে আসিল, বলিল—Got matches? বলিলাম, No, sorry। দু'জনে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছি। ওর হাত আমার হাতের মধ্যে ঘামিয়া উঠিতেছে। বাতাসে ওর সিল্কের সাড়ীর আঁচল উড়িয়া আসিয়া আমার গায়ে পড়িতেছে। এ মোহময় নিস্তব্ধতায় কথা না বলার মত আনন্দ বুঝি আর নাই। ওর চাপা নিশ্বাসে মৌন নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া গেল; ও হাত ছাড়াইয়া লইল, উদাস ভাবে বলিল, "বেশ লাগ্‌চে; রাতটা এখানেই কাটিয়ে দিতে ইচ্ছে হচ্ছে।" আমি চুপ করিয়া রহিলাম। "রবিদা বুঝি ঘুমুচ্চ?" বলিলাম,—"না।" সোজা হইয়া বসিয়া বলিলাম, "আজ গান শুনতে ইচ্ছে করচে। কল্‌কাতায় যা' দিতে আমায় তুমি কৃপণতা করেচ এখানে যে তা' তুমি আমায় উজাড় করে দেবে, সে ভরসা তো পাই নে।" ম্লান হাসিয়া বলিল, "জানি তোমার এম্‌নিই ধারণা, তা' আমি আর কি বলব। এখানে গাইলে যদি কোন অসুবিধে না হয়—কি কোন বারণ না থাকে তবে তোমায় এ ভাঙ্গা গলায় সারারাত গান শোনাতে পারি। বল—গাইব কি?" মেয়েদের মনে ব্যথা দিতে একটা উল্লাস আছে, সে লোভটুকু সম্বরণ করিতে পারিলাম না, তাই বলিলাম, "না - সেকথা বল্‌চিনে, কারো কাছ থেকে কোন কিছু চাইবার বা পাবার অধিকারও তো চাই"। দু'টী হাত জোড় করিয়া বলিল,—"থাক্, ঝগড়া করবার মতো মনের অবস্থা আজ আর নেই, মাপ করো; তা' ছাড়া আমার কাল্পনিক অপরাধগুলো তুমি মনের মধ্যে যত পুরে রেখেচ তার প্রতিশোধ কি আজ থেকেই আরম্ভ করবে? বিঁধ—যত পার আমায় বিঁধ।" ওর চোখ ছল্-ছল্ করিয়া উঠিল, ওর মাথাটি কাঁধের উপর রাখিয়া বলিলাম, "মনোহারিণি—রাগ হলো? ঠাট্টা করছিলুম যে! দেখি মুখখানা—ওকি চোখ ছল্ ছল্ করচে যে!" ও চুপ করিয়া রহিল, আমি ওর হাতটা লইয়া খেলা করিতে লাগিলাম। রাত্রি যেন নিঃশব্দপদসঞ্চারে অগ্রসর হইয়া মরণকাঠির স্পর্শ দিয়া পৃথিবীটাকে অচেতন করিয়া রাখিল। গালে একটা মৃদু টোকা দিয়া বলিলাম, "ঠাণ্ডা পড়্‌চে, এবার কেবিনে গিয়ে শুয়ে পড় দিকিনি।" চোখ প্রসারিত করিয়া হাতের ঘড়িটা দেখিয়া বলিলাম, "রাতও যে অনেক হোল,—ঘুমুতে যাও লক্ষ্মী, শরীর যে খারাপ হবে। তা' ছাড়া তোমায় ঘুম পাড়িয়ে যে আমায় কেবিনে ফিরতে হবে, ওঠো—"

ও উঠিয়া আসিল, আমার বাহুসংলগ্ন হইয়া ক্লান্তপদে কেবিনের দিকে রওনা হইল, গায়ের জেস্‌মিনের গন্ধ সমুদ্রের উতলা হাওয়াকে মোহময় করিয়া তুলিল। কেবিনে ঢুকিয়া বলিলাম, "এবার কাপড়-চোপড়গুলো ছেড়ে ফেলে হাল্কা আটপৌরে সাড়ী-সেমিজ পরে নাও দেখি। আমি এই যে বাইরেই আছি।" কয়েক মিনিট পরেই ডাকিল, "ও রবিদা, কোথায় গেলে, এসো না?" একটু, আমোদ করিবার জন্য চুপ করিয়া রহিলাম—হয় তো ভয় দেখাইবার জন্যও। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ; আবার ডাকিল, "রবিদা, ও রবিদা—" কেবিনে ঢুকিয়া দেখিলাম মেয়েটা আবার কাঁদিতে সুরু

করিয়াছে। আমি ওকে বুকে টানিয়া লইলাম, হাসিয়া বলিলাম, "এই বুঝি মেয়ের সাহস, দু'মিনিট বাইরে দাঁড়ালুম—আর অমনি কান্না!" ঠোঁট দুটী টিপিয়া বলিলাম,—"রাত্তিরে ঘুমুবে কেমন করে?"

সে কথা বলিল না, আমার হাতে একটা মৃদু আঘাত করিয়া একটা স্নিগ্ধহাসি হাসিয়া ফেলিল। আমি ওকে বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া রাগ্‌টা টানিয়া পা' দুটী ঢাকিয়া দিলাম এবং নিজে মাথার কাছে একটা ইজিচেয়ারে শুইয়া পড়িলাম। ও বলিল, "আমার ঘুম এক্ষুণি আস্‌বে, তখন তুমি যেও যেন—নইলে যে আমার বড্ড ভয় করবে!" ক্লান্ত শরীরের শ্রান্তিহারা একটা হাই তুলিয়া বলিলাম,—"আচ্ছা, সে হ'বে; তুমি ঘুমোও দেখি রাণী—লক্ষ্মীটীর মতো ঘুমোও—তুমি যে পর্য্যন্ত না ঘুমোবে আমি সে পর্য্যন্ত এখানেই আছি।" চঞ্চল ছোট্ট মেয়েটীর মতো মুখ নাড়িয়া বলিল, "আমি ঘুমোলাম কি না ঘুমোলাম তুমি বুঝ্‌বে কেমন করে মশাই!" চট্ করিয়া উত্তর দিলাম, "যেম্‌নি উঠে যাব অমনি যদি তুমি 'মাগো' বলে না চেঁচাও—"

খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া বলিল, "কথায় দুষ্টু ছেলের সঙ্গে পারার যো নেই।" একটু অন্যমনস্ক হইয়া রহিল, কতক্ষণ কি যেন ভাবিল, তার পর হঠাৎ গম্ভীর হইয়া বলিল, "মা, বাবা, ছেলেপিলেরা সকলেই ঘুমুচ্চে এখন—না? এখন কটা? তুমিও তো এম্‌নি সময় ঘুমুতে যেতে? মা, বাবা এখনো খুব কাঁদচে—না রবিদা?" কথা ঘুরাইবার জন্য বলিলাম, "দুষ্ট মেয়ে—ফের গল্প, ঘুমোও দেখি,—এ দেখ্‌চি আমায় ঘুমুতেই দেবে না। কথা বন্ধ করতে হয় কেমন করে—আমি জানি কিন্তু—সেটা তো জানো"?

ইজি চেয়ার হইতে উঠিয়া ওর বিছানার উপর বসিলাম। চশ্‌মাটা খুলিয়া কেসে ভরিয়া ট্রাউজারের পকেটে রাখিলাম। ওর মাথার কাছে এলাইয়া বসিয়া ওর চুলের মধ্যে হাত চালাইতে লাগিলাম। ও যেন একটু তন্দ্রামগ্ন হইয়া নিঝুম হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। আমি আমার হাতটী গলাইয়া ওর ঘাড়ের নীচে দিলাম ও মাথাটা আমার বুকের কাছে টানিয়া আনিলাম। সে বাধা দিল না, শুধু রুদ্ধ কান্নার ফোঁপানিতে মাঝে মাঝে তার বুক দুলিয়া উঠিতে লাগিল। আমি ওর মুখে, চোখে গালে হাত বুলাইতে লাগিলাম। আমার মধ্যের দুর্দ্দান্ত মানুষটী হয়তো মুহূর্ত্তের জন্য বিভ্রান্ত হইয়া উঠিতেছিল। মনে হইতেছিল যেন ওকে বুকের পাঁজরের সাথে মিশাইয়া গুঁড়া করিয়া দিই, মনে হইল অজস্র চুমুতে ওকে নিঙ্‌ড়াইয়া লই। যৌবনের যে উদ্দাম উদ্বেলতা মাঝে মাঝে উচিত অনুচিতের সীমারেখা পার হইয়া যাইতে চায়—তাহার বয়স ও তাহার গোপন মাধুর্য্যটুকু উপভোগ করিবার সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা আমার মধ্যে সজীবই ছিল। কিন্তু এ অসহায়া মেয়েটী আমার কাছে যে দাবী লইয়া উপস্থিত—সে দাবীর অমর্য্যাদা করিবার মত নীচু মন ভগবান আমায় দেন নাই। যে আমার উপর একান্ত নির্ভর করিয়া প্রবাস-পথে যাত্রা করিয়াছে, তাহার বিশ্বাসের মর্য্যাদা নষ্ট করিবার দুষ্প্রবৃত্তিকে দূরে রাখিতে পারিব—এ বিশ্বাস আমার অটুট ছিল। সেই ক্লান্ত, আধ-ঘুমঘোরে চেতনাহারা মুখটীর পানে কতক্ষণ চাহিয়া রহিলাম জানি না, শুধু একটা বুকভাঙ্গা নিশ্বাসে সম্বিৎ ফিরিয়া পাইলাম। সস্নেহে ওর কপালে ও ঠোঁটে মৃদু ওষ্ঠস্পর্শ করিয়া নিঃশব্দে বাহিরে আসিলাম। উত্তেজনায় আমার নাক মুখ ঘামিয়া গিয়াছে, সিল্কের পাতলা সার্ট বাহিয়া ঘামের জল যেন ঝরিয়া পড়িতেছে। চোখ বুজিয়া ডেক্ চেয়ারে পড়িয়া রহিলাম। কেমন করিয়া আমার তন্দ্রা টুটিয়া গেল জানি না, যখন জাগিয়া উঠিলাম তখন রাত তিনটা। কেবিনে আসিয়া বিছানায় এলাইয়া পড়িলাম; কতক্ষণ যে আধ-ঘুম, আধ-তন্দ্রায় পড়িয়াছিলাম জানি না; সমুদ্রের জলো হাওয়া সমস্ত শরীর স্পর্শ করিয়া বহিয়া যাইতেছে—তাহার ঠাণ্ডা স্পর্শে আধ-ঘুমঘোর যেন চোখের পাতায় জড়াইয়া রহিল। হঠাৎ কি শব্দে যেন জাগিয়া উঠিলাম; শেষ রাত্রিতে ক্লান্ত চাঁদের আলো আমার কেবিনের জানালা দিয়া বিছানায় লুটাইতেছে। দোর খুলিয়া বাহিরে গেলাম, ভালো লাগিল না, কেবিনেই ডেক্ চেয়ারটা পাতিয়া শুইয়া পড়িলাম—ঘুম আসিয়া সব ভুলাইয়া দিল।

যখন জাগিলাম—সমুদ্রের বুকে আলোর সমারোহ। আলোর এত অপরূপ মাধুর্য্য বুঝি জীবনে কখনো দেখি নাই, তাহার স্পর্শে সমুদ্রের জল যেন আজ মুখর হইয়া উঠিয়াছে;

আমি এলায়িত তনু ঢালিয়া দিয়া শুধু জল আর জল দেখিতে লাগিলাম। কাল রাত্রির অন্ধকারে যাহা নীরব ছিল দিনের আলোর স্পর্শে তাহা যেন সব সজীব হইয়া উঠিয়াছে; জাহাজের শব্দে, কথার কলগুঞ্জনে, জলের কল্লোলে—সব মিলিয়া যেন জাহাজের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া ঘুমের রাজত্বের অবসান করিয়াছে। লোকজনের চলাফেরা আরম্ভ হইয়াছে, ডেকের উপর একটী একটী করিয়া যাত্রীর আগমন হইতেছে; নূতন যাত্রার অভিনবত্ব, নব পৃথিবীর অনুপম সৌন্দর্য্য সব যেন আজ প্রবাস পথের আশ্বাচ্ছন্দ্য ভুলাইয়া দিল।

কপালে একটী ঠাণ্ডা হাতের স্পর্শে চম্‌কিয়া উঠিলাম। চাহিয়া দেখি ভোরের শেফালীর স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য লইয়া—হয়তো যাহারই কথা ভাবিতেছিলাম—সেই। সদ্যস্নাতা—চুলগুলি পিঠের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে, কয়েকটী গুচ্ছ করিয়া শুধু দুই দিক দিয়া বুকের উপর লুটাইতেছে। পরণে সিল্কের ক্রেপ সাড়ী, ফের্‌তা দিয়া পরা, জলোবঙ্গের হাফ্‌হাতা ঢিলে ব্লাউজ; রাত্রিতে ঘুমের অভাবে মুখখানা একটু শুক্‌নো, চোখের পাতা ভারী। প্রভাতে যে আলোর ললিমায় আমি দিবালোককে বরণ করিলাম—তা'র চেয়ে এ যেন আরও কত স্নিগ্ধ। চাহিয়া রহিলাম। বলিল, "কী দেখচো; তোমায় কাল ঘুমুতেই দিলুম না—কেমন?"

"না—ঘুমিয়েচি তো—"

"ছাই ঘুমিয়েচ! অম্‌নি করে কি ঘুমনো যায়; দু'বার শোও তো দশবার ওঠো—!"

হাতখানা হাতের মধ্যে লইলাম, রাত্রিতে যাহা বুঝি নাই দিনের আলোয় তাহা বুঝিতে পারিলাম। কোথায় কতদূরে চলিয়াছি। মনটা তাই ভারী লাগিতেছে। আমাকে একটা নাড়া দিয়া বলিল, "ওঠ দেখি, যাও চান্‌টান্ সেরে এস,—অনিদ্রায় চোখমুখ কোথায় গেছে!"

ক্লান্ত ও অলসভাবে একটা হাই তুলিয়া বলিলাম,

"যাচ্ছি না,—ওঠো! তুমি বড্ড আল্‌সে হচ্চ দিন দিন, এত পড়াশুনো কর্‌বে কেমন করে?"

বলিলাম, "ওটা হচ্ছে সংসর্গের দোষে—কি বল -?"

হাসিয়া জোরে মাথা ঝাঁকাইয়া বলিল, "মোটেই না—ইঃ, আমায় আল্‌সে বল্‌বে কেগো? কত ভোরে উঠেচি জান?" তার পর ছোট মেয়েটীর মতো আমার গায় ঢলিয়া পড়িয়া বলিল,—"বল্‌তে পার—কোন দিন ভোরের সূর্য্যের সাথে তোমার দেখা হয়েছে?"

হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া উঠিলাম,—"সেটা অবশ্যি বল্‌তে পার, কারণ সূর্য্যি ঠাকুরের ভোরের মুখটী দেখিনি কখনো—তখন তো সবে আমার মাঝরাত্তির!"

"ফের গপ্প আরম্ভ হ'ল,—না—যাও দেখি! দেখো, চকোলেট্ খাবে, আস্‌বার সময় মেজ্‌দা দিয়ে দিয়েচেন। ওকি—খাবে না বুঝি; বুড়ো মানুষটির মতো এটা খাবেন না—ওটা খাবেন না!"

দু'দিন পর।

মেঘ্‌লা আকাশ; সমুদ্রের হাওয়ায় উদ্দামতা। জলো হাওয়া আসিয়া মাঝে মাঝে কেবিনের শান্তিভঙ্গ করিতেছে। বালিশে হেলান দিয়া পায়ের উপর রাগ্ জড়াইয়া ইংরেজী নভেল পড়িতেছিলাম। মেঘের ফাঁকে ফাঁকে স্তিমিত সূর্য্যের কিরণরেখা যেন এক ঝলক আগুন আনিয়া মাঝে মাঝে জলের উপর ছড়াইয়া দিতেছে; আবার কালো মেঘের ঘোড়-শোয়ারগুলি যেন জলের বুকের উপর দিয়া দৌড়াইয়া যাইতেছে। মনোযোগ গাঢ় হইয়া উঠিল, বাতাসে চুলগুলি উড়িয়া মুখের উপর পড়িতে লাগিল,—কিন্তু সে দিকে মনোযোগ দিবার সুযোগ ছিল না, শুধু পাতার পর পাতা উল্টাইয়া যাইতে লাগিলাম। কখন যে সে আসিয়া মাথার কাছে দাঁড়াইল—টের পাইলাম না। ওর গায়ের সুবাস যেন বাতাসকে পাগল করিয়া দিল। এ অঙ্গ-সুবাস কাহার যেন বেশ বুঝিতে পারিলাম, কাহার লোভনীয় স্পর্শটুকু তাহাও যেন চিনিতে দেরী হইল না। তবু যেন পরিপূর্ণভাবে ওকে কাছে পাইলাম না। মনের রাশ যেন খুলিয়া গিয়াছে—সে যেন কোন্ মহাসমুদ্রের ওপারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। হয়তো আমায় তন্ময় দেখিয়া সে মর্ম্মাহত হইল, হয়তো বা ভাবিল আমি উপেক্ষা করিলাম। কতক্ষণ গেল জানি না, হঠাৎ আমায় একটা ধাক্কা দিয়া বলিল, "তুমি যেন কী,—কতক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছি—একটু বল্‌তেও বল্লে না!"

আমার এখন একটা বোঝা মনে হচ্ছে—সে আমি জানি।"

সত্যই কাজটা অন্যায় হইয়া গেছে। ও হয়তো ভালো লাগে নাই বলিয়াই আমার কাছে আসিয়াছে, আর আমি ওকে তেমনি আদর করিয়া কাছে বসাইলাম না। ওর স্বর গাঢ় হইয়া উঠিল, পাশ ফিরিয়া ও সমুদ্রের জল-তরঙ্গ দেখিতে লাগিল। আমি বইটা বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিলাম। অর্দ্ধোত্থিত হইয়া ওর হাত ধরিয়া আকর্ষণ করিতেই হাত ছাড়াইয়া লইল, তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিল, "যাও—"

আমি ওর কথা শেষ হইতে না দিয়াই বলিলাম, "আমি বড্ড ডুবেছিলুম বইটার মধ্যে। তুমি লক্ষ্মীটি আমায় এসেই অধিকার করে নিতে পার্লে না—সে কি আমার দোষ?"

"থাক্, ওসব মেয়েলী কথা আমার ভালো লাগে না। আমি যাই, আমি তো কাউকে বিরক্ত করতে চাইনে!"

হাতটা ধরিয়া কাছে টানিয়া আনিলাম, ও হাত ছাড়াইবার জন্য জোর করিতে লাগিল, দু'টা হাত ধরিয়া মুখোমুখি দাঁড় করাইয়া বলিলাম, "তাকাও দেখি আমার পানে—তাকাও।"

সে অন্যদিকে চাহিয়া রহিল; চোখের কোনে শীতান্তের শীর্ণ শিশিরের মতো অশ্রুরেখা। বলিলাম, "ওকি? কান্না আরম্ভ হোল! আচ্ছা পাগল যা' হোক্! লক্ষ্মীটী-এস—" টান দিয়া বুকের উপর আনিয়া ফেলিলাম। রুমাল দিয়া চোখ দুটী মুছাইয়া বলিলাম, "তুমি আমায় ভুল বুঝ্‌লে রাণি! সারা সকালটা কার কথা ভাবছিলাম—জানো? বিশ্বাস কর্‌বে? আর তুমি বল্‌তে চাইছ তা'কেই আমি উপেক্ষা কর্‌ছি; তাকাও দেখি—!"

সে সজল স্নিগ্ধ চোখ দুটী আমার চোখের উপর তুলিয়া ধরিল; বলিল, "ছাড়ো।" হাতে একটু চাপ দিয়া বলিলাম, "যদি না ছাড়ি?" মুখ ফিরাইয়া বলিল, "কিঃ জ্বালা,—না ছাড়ো; টানা-হেঁচড়া করতে ভাল লাগ্‌চে না।"

"কে বল্‌চে তোমার টানা-হেঁচড়া করতে? চুপটী করে' বস থাকোনা লক্ষীটী।"

আবেশময় চোখে আমার চোখের দিকে তাকাইয়া বলিল, "দুষ্টুর জাহাজ! লজ্জা সরমও খেয়েচ?" ঠোঁটের উপর মৃদু ওষ্ঠ স্পর্শ করিয়া পাশে বসাইলাম। সে সেলাই আরম্ভ করিয়া দিল; আমি একদৃষ্টিতে তার সজল ও উজ্জ্বল মুখখানির স্নিগ্ধরূপটুকু দেখিতে লাগিলাম। একটু মুচ্‌কি হাসিয়া বলিল, "কি দেখ্‌চ; খেয়ে ফেলবে নাকি?" বলিলাম, "সে লোভ সত্যি হচ্চে রাণু।" আমার বাহুতে একটা মৃদু চিমটি কাটিয়া বলিল, "কী যে বলো ঠিক নেই! বড় কি তুমি আর হ'বে না?" হাসিয়া উঠিলাম, কথার ভঙ্গীটুকু বড়ই ভালো লাগিল, বলিলাম, "তুমিতো বেশ, পনেরো দিনেই বুঝি আমায় বুড়ো করে ফেল্‌তে চাও—কেন? হাত-ছাড়া হ'ব বলে?"

হাত দিয়া আমার মুখ চাপিয়া বলিল—"থামো, নাঃ পারিনে আর তোমায় নিয়ে।" সে চুপ করিয়া সেলাই করিতে লাগিল আর মাঝে মাঝে কটাক্ষে আমার পানে চাহিতে লাগিল। গোপন চাউনির নিজস্ব লজ্জাটুকু বড় মধুর লাগিল। কতক্ষণ এমনি করিয়া বসিয়া রহিলাম, মন যেন সমস্ত কথার ভাণ্ডার গোপন করিয়া গুম্ হইয়া বসিয়া রহিল; শুধু দৃষ্টির রন্ধ্রপথে মনের অনেক কথাই যেন রূপায়িত হইয়া উঠিল। হঠাৎ মাথা ঝাড়া দিয়া চুলগুলি সরাইয়া বলিল, "আচ্ছা রবিদা, একটা কথা জিজ্ঞেস ক'র্‌ছি—উত্তর ঠিক দেবে?"

বলিলাম, "অঠিক যদি দেবার সুবিধে থাকে তবে আপাততঃ ঠিক দেবার ইচ্ছে নেই—।" ও হাসিয়া উঠিল "হয়েছে, আর মিছেই বা কি,—কথার হেঁয়ালী করতে পেলে তো তুমি বেজায় খুসী। কিন্তু মাঝে মাঝে মুখের দিকে চাইলে ভয়ে আমার বুক দুরুদুরু করে!"

আমি উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলাম,—"কেন, শেষটায় আমায় বদ্‌রাগী অপবাদ দেবার ইচ্ছে নাকি?" মুচ্‌কি হাসিয়া স্থচটায় সুতা পরাইতে পরাইতে বলিল, "ইচ্ছেই তো? অন্যের হ'লে হোত; তুমিও যখন রাগ কর সত্যিই তখন কেমন যেন ভয় হয়। যাক্, কথাটা বুঝি বল্‌তেই দেবেনা?" বলিলাম, "নিশ্চয়ই, ভণিতা তো হ'ল, এবার কথাটা শুনা যাক্ দেখি। কান্নার পালার পর প্রশ্নের পালা—খাপ্ খাচ্ছেনা—না?" ও ঝাঁঝিয়া উঠিয়া বলিল, "বড্ড দুষ্টু হচ্চ আজ কাল তুমি। ওখানে আড্ডায় পড়্‌লে তোমায় আর

খুঁজেই পাওয়া যাবেনা—আমি জানি,—"। হাসিয়া বলিলাম, "তাইতেই তো তোমার সাথে আনা"।

"রাখো—রাখো, বাজে কথা শুন্‌তে গা জ্বালা করে। একটা কথা কইতে চাইলুম, তা' এম্‌নি লেগেছ যে বল্‌তেই দেবেনা!"

"আচ্ছা, এবার। সত্যি লক্ষীটি, এবার বল।"

শিশুটীর মতো দুলিয়া আমার গা ঘেঁসিয়া আদর-গলান সুরে বলিল, "আচ্ছা রবিদা ভাই, যদি ধরো জাহাজটা ডুবে যায় তবে তুমি আমায় নিয়ে কি কর"—বলিয়াই ও তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে আমাব দিকে চাহিয়া রহিল। ও কী শুনিতে চাহিতেছে বুঝিতে পারিলাম; ইহা যে একটু ঝগড়া করিবার পূর্ব্বসূচনা তাহাও বুঝিতে দেরী হইল না; হাসিয়া বলিলাম, "তুমি ঠিক যেমন্‌টী শুন্‌তে চাইছ—তাই বল্‌ব কিন্তু—কেমন?" ও মাথা দুলাইয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিল, "বাঃ তা' কেন! ঠিক্ যা' সত্যি তাই বল্‌তে হবে বলে দিচ্ছি।"

"যা' বল্‌ব তা' নিয়েতো তুমি দিব্যি ঝগড়া আরম্ভ করে দেবে—না?"

সেলাইটা রাখিয়া আঁচলটা গায়ের উপর তুলিয়া দিয়া এলাইয়া পড়িল; তা'র পর ক্লান্তভাবে হাই তুলিয়া বলিল, "বলই না দেখি, মিছে কথা তো বল্‌বেই জানি; তোমায় কি একরত্তিই বিশ্বাস আছে?"

উঠিয়া কেবিনে পায়চারী করিতে করিতে ওর কাছে গিয়া দাঁড়াইলাম। বলিলাম, "কি করব জান?"

পরিপূর্ণভাবে মুচ্‌কি হাসিয়া ও আমার পানে চাহিয়া রহিল।

হাত দিয়া মুখটী তুলিয়া ধরিয়া বলিলাম, "যদি জাহাজ ডুবেই যায় তবে কি করব জানো? তোমায় জলে চেপে ধরে নিজে লাইফ্-বেল্ট নিয়ে ভেসে পড়্‌ব। যখন দেখ্‌ব আর পাত্তাটী নেই তখন একটা স্বস্তির নিশ্বেস ফেলে ভাব্‌ব—বাঁচা গেল। হোল? এবার ঝগড়া আরম্ভ হোক্।"

"বোঝা গেছে। তুমি তাই কর্‌বে সেকি আমি জানিনে? তুমি ভাব্‌ছ আমি ঠাট্টা ধরে নেব, তা' মোটেই নয়, তুমি তাই কর্‌বে।"

জোরে হাসিয়া উঠিলাম, মাথাটী ঝাঁকাইয়া দিয়া বলিলাম, "দুষ্টু, দিনরাত শুধু বুঝি বাজে চিন্তে,—পড়াশুনো বুঝি শেষ—।" ও নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিল। আমি কেবিনের এপাশ হইতে ওপাশ পায়চারী করিতে লাগিলাম। হঠাৎ কি ভাবিয়া যে এই প্রগল্‌ভা, হাস্যাননা মেয়েটী গম্ভীর হইয়া গেল—তাহা বুঝিবার মতো ক্ষমতা আমার হইল না। কাছে গিয়া দাঁড়াইয়া হাতটী ধরিয়া আঙুলগুলি মট্‌কাইতে লাগিলাম, সস্নেহে বলিলাম, "কী ভাব্‌চ?" চুপ করিয়া রহিল; মুখটী আমার দিকে ফিরাইয়া দিলাম, ও ঘাড় সরাইয়া লইল, ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, "আঃ, কী যে জ্বালাতন কর সব সময়! তোমার সত্যি বড্ড সাহস বেড়েচে দেখ্‌তে পাচ্চি—"

ওর কাঁধে মুখ রাখিয়া বলিলাম, "সত্যি না কি? এ্যাঁ—সাহস বেড়েচে?"

সে উঠিয়া বসিয়া সেলাই আরম্ভ করিয়া দিল, আমিও বইটা খুলিয়া বসিলাম—হয়তো প্রতিশোধ দিবার জন্যই। অনেকক্ষণ দু'জনেই চুপ করিয়া রহিলাম। কেবিনটার অখণ্ড নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিবার জন্য ছিল শুধু সমুদ্রের উদ্দাম হাওয়া।

বহুক্ষণ কাটিয়া গেল।

হঠাৎ ও চোখ তুলিয়া চাহিয়া বলিল, "দেখো শুনচ? একটা কথা বলি ঠাট্টা নয় কিন্তু, তুমি যেন হেঁসেই উড়িয়ে দিও না।"

দেখিলাম ওর মুখ থম্‌থমে হইয়া গেছে—একটু যেন বিষাদ-ক্লিষ্ট।

আমি ধীরে বলিলাম, "কী কথা রাণি?"

"আমায় একটা কথা দেবে?"

"কী কথা দেবো তোমায়? তুমি আমার কাছে একটা কথা চাইছ শুধু?"

"শুধু একটা কথাই চাইছি রবিদা! শুধু একটা কথা—দেবেনা ভাই?"

ওর স্বর গাঢ় হইয়া উঠিল, আবেগে ওর রক্তিম ওষ্ঠ দুটী মৃদু মৃদু কাঁপিতেছে, একটী হাঁটুর উপর চিবুক রাখিয়া ও পরিপূর্ণভাবে আমার পানে চাহিয়া আছে। কহিলাম, "যদি

দেবার মতই কথা হয়—তা' যে তোমায় আমি দেবো সে কি তুমি জানোনা—লক্ষ্মীটি আমার ?"

চোখ্ দুটী নীচু করিয়া পরিষ্কার স্বরে বলিল, "রবিদা, দেশে গৌরব অর্জ্জন করে ফির্‌বেই তুমি, তুমি বড় হবেই—সে আমি জানি—বড় হয়ে তুমি বিয়ে করো -সংসারী হয়ো ! এ ভিক্ষা তুমি আমায় দিও !"

চমকিয়া উঠিলাম। কী বলিতে চায় এ হেঁয়ালী-ভরা মেয়েটা ! জীবনের জমার খাতায় যে দেউলিয়া হইয়া গেছে, সংসারের বিস্তীর্ণক্ষেত্রে যে শুধু বিষপান করিয়া নীলকণ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে—তাহাকে কী দিয়া বাঁধিতে চায় এ মেয়েটা ? আমার জীবনে বিবাহের স্থান নাই, আমাকে গ্রহণ করিয়া সার্থক করিয়া তুলিবার গুরুভার কোন্ অভাগিনীর উপর ন্যস্ত করিয়া তাহার জীবনের বিপুল সম্ভাবনাকে নষ্ট করিয়া দিব ! কথাটা আমার কানে আসিয়া বাজিল ! ওর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলাম।

বলিল, "উত্তর দিচ্ছনা যে ?"

একটু স্পষ্ট করিয়াই বলিলাম, "উত্তর দেবার ইচ্ছে ছিলনা, কিন্তু দিচ্ছি ; এ সম্বন্ধে আমার মত তোমার কোন দিনই অজানা নেই—"

হঠাৎ রাগতঃ ভাবে বলিয়া উঠিল, "সে আমি জানি, কিন্তু কেন তুমি বিয়ে কর্‌বেনা শুনি ?"

ছোট্ট করিয়াই উত্তর দিলাম, "ইচ্ছে !"

ও সোজা হইয়া বসিয়া বলিল, "অমন নেয়াড়া ইচ্ছে দমন কর্‌তে হয়—জানো ? বিয়ে কর্‌ব না—একথা ব'লে ভালোমানুষ অনেকেই সাজে রবিদা,—কিন্তু পরে বেহায়ার মতো মাথা মুড়োতে লজ্জা তা'দেরই কম থাকে—একথা আমি জানি।"

বইটা বন্ধ করিয়া রাখিয়া ম্লান হাসিয়া বলিলাম, 'একথাটা হঠাৎ আজ তুলে আমায় শাস্তি দেবার কি কোন উদ্দেশ্য আছে রাণি ?"

ও কথায় বিষ ঢালিয়া বলিল, "তোমার অম্‌নি মধুমাখা কথা শোনা আমার অভ্যেস আছে—তা'ছাড়া আমার কাছে ভালোমানুষ সাজবার আর প্রয়োজনও নেই ! কিন্তু বিয়েতে কী আপত্তি শুন্‌তে পাইনে ?"

চুপ করিয়া রহিলাম। ও কিছুক্ষণ আমার দিকে চাহিয়া রহিল, ওর চোখে অসহ্য দীপ্তি, কণ্ঠে কে যেন এক-রাশ বিষ ঢালিয়া দিয়াছে। ফণিনী যেমন করিয়া শিকারের দিকে তাকাইয়া থাকে, তেম্‌নি করিয়া ও আমার পানে চাহিয়া রহিল। কিন্তু এ নিষ্ঠুর অভিনয়ের অভিনব সজ্জায় যেন ওর অঙ্গসৌষ্ঠব সহস্রগুণে বাড়িয়া উঠিয়াছে। গালে ওর লালিমা, নাসিকা বিস্ফারিত, নিশ্বাসের সাথে সাথে বুক দুলিতেছে ; মুহূর্ত্তের জন্য এ দৃপ্ত ভঙ্গিমা আমার চোখ দুটীকে মুগ্ধ করিল, তীব্রকণ্ঠে ও বলিয়া উঠিল, "তুমি কী মনে করেছ রবিদা ! দুনিয়ার সব মেয়েদের কাছে তুমি ভালোবাসার বেসাতি নিয়ে ঘুরবে—কিন্তু কারো দায়িত্ব নেবার সৎসাহস তোমার হবে না ? কী ভেবেচ তুমি - তোমার মনোবৃত্তিকে আমি ঘৃণা করি, জানো" ?

আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম, এ অতর্কিত আক্রমণ আমার স্বপ্নের বাহিরে—বিশেষতঃ এ অবস্থায়। আমার সমস্ত মন যেন ঘুলাইয়া গেল, ওর কাছে গিয়া দাঁড়াইয়া শান্তকণ্ঠে বলিলাম, "তুমি তো জানো রাণি—রাগাতে তুমি আমায় পারবে না—কিন্তু চোখের জল বার করবার কথার ঝাঁজ মেয়েদের আছে—তোমার সেটা ভালোই আছে, কিন্তু কেন তুমি আজ আমায় এমন করে অপমান কর্‌চো" ? সে জলিয়া উঠিল, আগুন-ছড়ানো কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "তোমার যে রাগ নেই এ বাহাদুরী আমি খুব শুনেচি—না বল্লেও হবে। কিন্তু আমি তোমাকে অপমান করচি না তুমি আমাকে অপমান করচ ?"

জিজ্ঞাসুভাবে ওর দিকে চাহিলাম, "কবে তোমায় অপমান কর্‌লুম রাণি ? আমার জীবনে যে নারীর স্থান নেই, ভালোবাসার দরবারে আমি চিরদিনের দেউলে—"

"অপমান তুমি আমায় করনি ?"—আগুনের মতো জলিয়া উঠিয়া ও বলিয়া উঠিল—"অপমান তুমি আমায় প্রতি মুহূর্ত্তে করচ ! বিয়ে না করার কারণ—তোমার জীবনে নারীর স্থান নেই—ভালো কথায় তুমি বিশ্বাস কর না—"। একটু থামিয়া বলিল "আমায় তুমি কি মনে কর রবিদা ? তুমি প্রতারক, তুমি ভণ্ড—সে আমি জানি, আমায় তুমি

লোভ দেখাচ্ছ আদর দিয়ে—এত নীচ অভিসন্ধি তোমার—ছিঃ, ছিঃ!"

পৃথিবীটা যদি দুমড়াইয়া মোড়াইয়া একটা জড়পিণ্ডের মতো পায়ের তলায় পড়িয়া যাইত—তাহা হইলেও হয়তো এতটা আশ্চর্য্যান্বিত হইতাম না। আমি বিভ্রান্ত হইয়া গেলাম, ওর উজ্জ্বল চোখের উজ্জ্বলতর তারকার দিকে চাহিয়া আমি দিশেহারা হইয়া গেলাম। ওর মুখ চাপিয়া ধরিয়া আর্ত্তকণ্ঠে বলিলাম, "রাণী, ও কি বল্‌চ তুমি! কী অপরাধ আমি করেচি তোমার কাছে যে আমায় তুমি এম্‌নি করে আঘাত দিচ্চ—বল—বল—"

জোরে হাত সরাইয়া দিল; হয় তো একটু ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, এলোথেলো বসন, ও পরিপূর্ণ দেহের শোভা এলায়িত বসনের বন্ধনভারমুক্ত হইয়া রূপায়িত হইয়া আছে; থামিয়া আবার বলিয়া উঠিল, "তোমার অহঙ্কার আমি জানি রবিদা। তুমি ভাবচো বাংলা দেশের সব মেয়ে মালার মতো তোমার পায়ে লুটোবে—আর তুমি যেটাকে ইচ্ছে তুলে' সার্থক করবে। কোন্ জোরে তোমার এ দুরন্ত অহঙ্কার শুনি? কি আছে তোমার? ঐ তো রূপ, ঐ তো অবস্থা; ভিক্ষাজীবি হয়ে বিদেশে যাচ্ছ—এই গুমোরে দুনিয়াটাকে তুমি উড়িয়ে দিতে চাও? সত্যি—তোমার সাহস আর অহঙ্কারের তুলনা নেই—"

আমি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম, মুখের রক্ত হয় তো এক মুহূর্ত্তে কোথায় সরিয়া গেছে। কিছুই যেন বুঝিতে পারিলাম না; শুধু মনে হইল আমার ছোট্ট আকাশের চাঁদটা যেন ডুবিয়া গেল কাজল-কালো অন্ধকারে, বসন্তের সরস-স্পর্শের মতো আমার সহস্রবেদনাহত জীবন এই তরুণীর স্নেহ-স্পর্শে বাঁচিয়া উঠিতেছিল—তা'র স্পর্শ-শক্তি আজ যেন নিষ্ঠুর দেবতা কাড়িয়া লইল। শুধু সর্ব্বহারার মতো সমস্ত পৃথিবীটাকে একেবারে খালি দেখিতে লাগিলাম। আমার চারি পার্শ্বে কেউ নাই—যতদূর চোখ যায় শুধু দুনিয়ার আঘাত বুকে করিয়া একলা পথিক আমি—জীবনের দুস্তর পথ বাহিয়া চলিতেছি।

সে বলিতে লাগিল, "আজ তোমার সব ব্যবহার একটী একটী করে মনে হচ্ছে; ওঃ কত বড় শঠ তুমি! তোমার কত বড় ফন্দী। লোকে যখন তোমায় শতমুখে প্রশংসা করত—জানো, গর্ব্বে আমার বুক ফুলে উঠ্‌ত। সবাই যখন বল্‌ত—ছেলের মতো ছেলে—আমার চোখ ছেপে আনন্দে জল আস্‌ত! কিন্তু এই তুমি? এদিকে বল্‌চ জীবনে নারীর স্থান নেই, কত বড়ো তোমার সাহস,—মুখের ওপর আমার অমর্য্যাদা করবার সাহস তোমার?"

"আমি কী বল্লুম রাণী তোমায় যে আমায় ভুল বুঝে এমনি করে বিঁধচ? তুমিও শেষটায় আমায় ভুল বুঝ্‌লে?"

মুখ তুলিয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া বলিল, "ভুল আমি কাউকে বুঝিনে। আমায় যত বোকা তুমি মনে কর—ততটা বোকা আমি নই রবিদা"!—

ওর মাথায় হাত রাখিয়া বলিলাম, "রাণি, যাকে ভালবাস্‌তে পারব না তাকে সারা জীবনের সঙ্গিনী করবার কী অধিকার আছে—এ সোজা কথা তোমায় বুঝিয়ে দিতে হবে? কোথায় কী আমার হারিয়ে গেছে তুমি কী তা' জানো না?"

ও চুপ করিয়া রহিল, ভাবিলাম হয়তো বা রাগ পড়িয়াছে। মাথার চুলগুলিতে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলাম, "এত নীচ তুমি যদি আমায় ভেবে থাকো তবে কেন আমায় তোমার স্নেহ দিয়ে বাঁচিয়ে তুল্লে, এখন কী নিয়ে রইব আমি?"

ও জোরে মাথাটী সরাইয়া লইয়া বলিল, "থাক্—থাক্—ও সব কথা আমি শুন্‌তে চাইনে—আমি যাই—"

আমি ওর দু'টী হাত ধরিয়া প্রায় জোর করিয়াই বসাইয়া দিলাম। চোখে আমার কিসের জ্বালা, মনের গহন বনে যেন আগুন লাগিয়াছে। হঠাৎ ওর মুখটী তুলিয়া ধরিয়া বলিলাম, "তাকাও দেখি রাণি এদিকে! কী দেখ্‌তে পাচ্চ? এ দুঃখভারাক্রান্ত কুঞ্চিত ললাটে কিসের রেখা? চোখদু'টা দিয়ে কি তুমি আমার বুকের সব ভাষা ঠাহর করতে পারচনা? বল—শঠতা, নীচতার স্থান কী এর মধ্যে আছে—বল, বল রাণি!"

আমার আর্ত্তকণ্ঠে, আমার ব্যাকুলতায় মুহূর্ত্তের জন্য ও যেন কেমন হইয়া গেল। দাঁত দিয়া ঠোঁট চাপিয়া ধরিয়া বলিলাম, —"স্নেহের ভাণ করে তোমার প্রলোভন দেখাচ্চি—

এই যদি তুমি ভেবে থাকো কেন তবে তুমি দিনের পর দিন এমনি করে তোমার সান্নিধ্য দিয়ে আমায় বাঁচিয়ে তুল্‌ছিলে? মানুষই যদি আমায় ভাব্‌তে না পারলে কেন তবে পশুর মতোই আমার সাথে ব্যাবহার করলে না? এ কী আজ করলে রাণি—আমায় যে আজ নিঃসহায় করে দিলে!"

আমি উন্মাদের মতো কেবিনে পায়চারী করিতে লাগিলাম। ও মুখ গুঁজিয়া বসিয়া রহিল; চারিদিকের কলকোলাহল তেমনি উদ্দাম চলিতেছিল। ওর কাছে সরিয়া আসিয়া বলিলাম, "তুমি যে কথাটা জান্‌তে চাইছ সে কথাটা খুব পরিষ্কার করেই বল্‌চি রাণী; যদি এতেও তোমার মনে কোন সন্দেহ থাকে—তবে আমায় ভুলেই যেও।" অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলাম, উচ্ছ্বসিত জল-প্রবাহ আমার মনকে একটুও বিভ্রান্ত করিতে পারিল না; বলিলাম, "আমার মন এত বিশাল নয় যে তা'তে দু'জনের স্থান করতে পারি। তা' ছাড়া নিজকে ভাগ করে দেবার মতো ক্ষমতাও আমার নেই, তাই আর কারো জন্য ঠাঁইও আমার মনে হবে না—তবু বিয়ে করে আমায় মিথ্যেটাকে বড় করতে হবে?—আর সারা জীবন সে বিপুল মিথ্যার জের টেনে যেতে হ'বে? তুমিই বলো—আমি যে বুঝ্‌তে পারচি নে!"

এবার মুখটি তুলিয়া আমার পানে চাহিল; চোখের জল ছল্‌ ছল্‌ করিতেছে। আমার উত্তেজিত, যন্ত্রণাহত মুখের দিকে চাহিয়া হয় তো মুহূর্ত্তের জন্য করুণায় ওর মন ভিজে গেল। সেলাইটা হাতে লইয়া উঠিল, আঁচলটা গায় জড়াইয়া পুষ্ট দেহটা ঢাকিয়া দিল। ত্রস্তে যাইবার সময় রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "সন্দেহ যখন হয়েচেই রবিদা তখন সব শেষ ক'রে দেওয়াই ভালো। তা' ছাড়া পুরুষমানুষকে বিশ্বাস করতে ভয় হয়,—সে যেই হোক্‌—।" আমি ওর সঙ্গে সঙ্গে যাইতেই ও কেবিনে ঢুকিয়া আমার সমুখেই দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল। আমি আহতের মতো টলিতে টলিতে কেবিনে আসিয়া শুইয়া পড়িলাম।

জাহাজের অপ্রতিহত গতি তেমনি উদ্দাম। শুইয়া শুইয়া শুনিলাম খাইবার ঘণ্টা; লোকজনের সোরগোল, হাস্যধ্বনি, সমুদ্রের গর্জ্জন—সব যেন ঐক্যতান আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। আমি শুইয়া রহিলাম—অবচেতনার মধ্য দিয়া কতক্ষণ কাটিয়া গেল জানি না। জানালা দিয়া বাহিরের ঘন অন্ধকার যেন গায়ে আসিয়া ঠেকিতেছে। চতুর্দ্দিকে যখন দৃষ্টি প্রতিহত তখন আপনার মধ্যে আপনিই যেন নিজেকে পরিপূর্ণ ভাবে অনুভব করিতে পারিলাম। ভাবিলাম—খাইবার ঘরে আমায় দেখিয়া কি ওর মনে কোন কথাই জাগিবে না? সমস্ত চিন্তার আবরণ ভেদ করিয়া যেন কেবলই একটা মুখ সব ভুলাইয়া দিতে চাহিতেছে; অথচ এই ক্ষণটাতেই হয় তো তাহাকেই ভুলিতে চাহিতেছিলাম। এ কী জ্বালা! বাহিরের অপরিচিত শত পদধ্বনির মধ্যে যেন কাহার কুণ্ঠা-কুটিল পদধ্বনির মৃদুশব্দের জন্য কান সজাগ হইয়া রহিল। মনের ঘাড়টা ধরিয়া ফিরাইয়া এ ভিক্ষাবৃত্তি শেষ করিয়া দিতে চাহিতেছিলাম, কিন্তু একটী মুখের কাছে আমার পৌরুষ পরাজয় মানিয়া আসন ছাড়িয়া দিল। সমস্ত রাত্রিটা আধ-ঘুমঘোরে ওকেই দেখিলাম শতরূপে, শতবার। ওর নানা কথা, আমাকে ঘিরিয়া ওর জীবনের কতগুলি পাপ্‌ড়ী যে দলে দলে বিকশিত হইয়াছে,—তাহার রূপ সব মনের অন্ধকারকে আলোকিত করিয়া তুলিতে লাগিল; তাই এই আসন্ন বিচ্ছেদ ওকে যেন আমার কাছে আরও প্রিয়—আরও মধুর করিয়া তুলিল। রাত্রির অন্ধকারে মনে হইতে লাগিল ওকে ছাড়া জীবনের এ বিপুল বোঝার ভার যেন আর বহিতে পারিব না। অনেক রাত হইয়া গিয়াছে, চোখের ঘুম যেন কোথায় পলাইয়াছে; কিন্তু এ জাগরণে ওর মুখটা যেন চিরন্তন হইয়া আমার বুকে দাগ কাটিয়া বসিল।

যখন জাগিয়া উঠিলাম তখন বেলা অনেক। কাহার আগমন যেন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। এক একবার ইচ্ছা হইল নিজে যাইয়াই একটা বোঝাপড়া করিয়া সব মিটাইয়া দিই, কিন্তু যেন অভিমানে আঘাত লাগিল। ওর পথ চাহিয়া রহিলাম—আজিকার দিনটা যদি আমায় না দেখে—তবে নিশ্চয়ই ও ব্যাকুল হইয়া উঠিবে। এ সুমধুর সম্ভাবনায় মন নিজের অগোচরেই যেন প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। উঠি উঠি করিয়াও উঠিতে পারিলাম না, বিছানা জড়াইয়া পড়িয়া রহিলাম, জলো-হাওয়ার স্পর্শে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

যখন জাগিলাম তখন খাওয়া-দাওয়া শেষ হইয়া গেছে, সূর্য্য যেন সারা দিনটা আপনাকে বিলাইয়া দিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। অনাহারে শরীরটা বিকল বোধ হইতেছিল, শুধু নিজের উপর প্রতিশোধ লইবার জন্যই ভাবিলাম—আজ অনাহারে কাটাইয়া দিব। জানিতাম ইহা ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করিবেই।

প্রায় সন্ধ্যা। আমি বিছানায় এলাইয়া পড়িয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিলাম, চোখ বুজিয়া নিজের মধ্যে নিজে নিবিড় ভাবে ডুবিয়া রহিলাম। এক একবার ভাবিতেছিলাম বাহিরের হাওয়ায় শরীরটাকে একটু তাজা করিয়া লই, কিন্তু অভিমানহত মন আরামের পথ দিয়া যাইতে চাহিল না, সুতরাং শুইয়াই রহিলাম। ভালো লাগিল না, তাই আবার উঠিয়া পড়িলাম। এ্যাটাচি কেস্ হইতে পেন্ ও প্যাড লইয়া বসিলাম, ভাবিলাম—ওর সাথে শেষ কথা আজ কালীর আঁচড়েই শেষ করিয়া ফেলি; কিন্তু মন কিছুতেই বশ মানিতে চাহিল না, মাঝে মাঝে দোরের দিকে তাকাইতে লাগিলাম, কোন্ সুগুপ্ত সম্ভাবনায় মনটা চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল। লিখিলাম, "রাণী, ভুলের রন্ধ্রপথে অভিমানের দেবতা আমাদের হয় তো আজ দূরে সরাইয়া দিল—কিন্তু তুমিও জানো, আমিও জানি আমাদের জীবনে এ ঘটনাটী কত বড় একটা অসামঞ্জস্য। তবু আমাকে তোমার সুমধুর সান্নিধ্য হইতে দূরে সরাইয়া তোমাকে নিরাপদ করিলাম; ভরসা করি আমার অমূর্ত্ত উপস্থিতি তোমার অনাগত দিনগুলিকে বিড়ম্বিত করিবে না। শুধু তোমার কাছে এই ভিক্ষা চাই—যতটুকু আমাকে দিয়াছ তাহা যেন নেহাৎই আমার নিজস্ব বলিয়া অন্তরের মণি-কোঠায় সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারি, শুধু এই ভিক্ষাই আমি চাই। আশীর্ব্বাদ কখনো কাহাকে করি না, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিবার মতো কাপুরুষতাও আমার নাই; শুধু ভাবি আমায় ভুলিতে যেন তোমার ভুল না হয়—তোমার অন্তরে আমার শেষ সমাধি হোক্।" চিঠিটা লিখিয়া কতবার পড়িলাম, বসিয়া বসিয়া পড়িলাম, আবার শুইয়া পড়িলাম—মনে হইল আরও কত কথার ভাণ্ডার উন্মুক্ত পড়িয়া আছে, লেখনীর মুখে তাহারা যেন ভীড় করিয়া ঠেলিয়া বাহির হইতে চাহিতেছে। মনে হইল চিঠিটা অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল—এ যেন দীন ভিখারীর ক্ষীণকণ্ঠে ভিক্ষা-প্রার্থনা, আমার পৌরুষ এখানে ব্যাহত হইয়া গেছে। তাই চিঠিটা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া আলো নিভাইয়া শুইয়া পড়িলাম। হঠাৎ বুঝিতে পারিলাম আমার উন্মুখ মন যাহাকে একান্তে কামনা করিতেছে সে যেন নিঃশব্দ চরণে ঘরে ঢুকিয়া দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল। আমার বুকে দোলা দিয়া উঠিল; ঘুমের ভাণ করিয়া পড়িয়া রহিলাম।

সে আসিয়া আমার মাথার কাছে দাঁড়াইল, তার অঙ্গ-সুষমা আমার চোখে, কাণে, নাকে যেন পরশ বুলাইয়া দিল। আমি নিঃসাড় হইয়া পড়িয়া রহিলাম, ওর নীরব উপস্থিতিটুকু সত্যই বড় মধুর লাগিল। আজ যেন অভিমান নাই, রাগ নাই —মনের সমস্ত ক্ষুদ্র দ্বিধা-দ্বন্দ্ব যেন ওর সান্নিধ্যে দূরে পলাইয়া গেল; আমি পরিপূর্ণ ও ভারাক্রান্ত মনে ওর আবেগ ছোঁওয়ায় শিহরিয়া উঠিতে লাগিলাম। মুক্ত জ্যোৎস্নালোকে দেখিলাম সে একদৃষ্টিতে শিয়রে দাঁড়াইয়া আমার দিকে তাকাইয়া আছে। আমি একটা হাই তুলিয়া হাত দিয়া চোক ঢাকিয়া পাশ ফিরিয়া শুইলাম। সে অতি ধীরে ধরা গলায় বলিল, "তোমার অসুখ করেচে?" চুপ করিয়া রহিলাম, বোধ হয় আমায় নীরব দেখিয়া মুসড়াইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ পরে আমার ললাটে শীতল হাতটা দিয়া স্পর্শ করিয়া একটু ঝুঁকিয়া পড়িয়া আবেগরুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "তোমার অসুখ করেচে রবিদা?" চোখ মেলিয়া চাহিলাম, ওর প্রাণ-গলান কথায় যেন দুনিয়ার সকল স্নেহ উৎসারিত হইয়া পড়িতেছে; আমি বিহ্বল হইয়া গেলাম, শূন্য দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিয়া বলিলাম, "অ্যাঁ,—রাণু—তুমি?" আর গলায় কথা জোগাইল না, ও চাপা গলায় বলিল, "আমি রাণুই রবিদা, আমায় ভুলে গেছ এক্ষুণি।" চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিল, "দু'দিন অনাহারে রইলে কি আমার ওপর রাগ করে—রবিদা?" তার হাতটী ধরিয়া বলিলাম, "আমায় পথে ফেলে দিয়েছিলে—আবার কি পথ থেকেই কুড়িয়ে নিতে এসেচ রাণি? পথ চলতে ঘাসের ফুল দেখে তা'কে অবজ্ঞাই করো রাণী—গৌরব দিয়ে আর কাজ নেই।" সে কাঠ হইয়া আঁচলে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া রহিল; তার হাত

আমার হাতে আবদ্ধ ; আবেগে আমি ওর হাত দুটোতে চাপ দিয়া যেন গুঁড়া করিয়া দিতেছিলাম, ও বাধা দিল না। হঠাৎ ধরা গলায় অতি ধীরে বলিল, "রবিদা, অপরাধ করে মাপ চেয়ে অভিনয় করবার প্রবৃত্তি আমার নেই ; তা' ছাড়া যা' করেচি তারপর যদি মহত্ত্ব দেখাবার জন্ম তুমি আমায় মাপই করে বোস—তবে সে মার্জ্জনা আমি সর্ব্বান্তঃকরণে গ্রহণ করতে পারব না।" আমি ব্যাকুল হইয়া ওকে থামাইয়া দিয়া বলিলাম, "ও কী বলচ তুমি, মাপ আমি কা'কে করব রাণি! সত্যিই হয় তো আমার মধ্যে এমন কিছু রয়েচে যা'তে করে' তোমার কাছ থেকে অতটাই আমার যথার্থ প্রাপ্য ছিল। এতে রাগের তো এমন কিছু নেই, তবে দুঃখ হয় তো বা হ'তে পারে—তবে সেটাও অধিকার-সাপেক্ষ।"

হঠাৎ ডুকারিয়া কাঁদিয়া সে আমার বুকে লুটাইয়া পড়িল, আর্ত্তরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল,—"তুমি আমার অপরাধটাই বড় করে দেখলে রবিদা ; দুদিন কী যন্ত্রণায় আমার গেছে—তা' তো তুমি ভাবলে না। আমার অসহায় অবস্থাটাও কি তোমার একটু মনে গেলনা ? এম্‌নি কঠোরই যদি তুমি হ'বে, তবে কেন এত অধিকার আমায় দিয়েছিলে ?" ওকে তুলিয়া আমার কোলে ওর মাথা রাখিলাম, ও মুখ ঢাকিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। ওর কপালে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলাম, "তুমি যেমন করে দূরে সরিয়ে দিলে তারপর তোমার কাছে যেয়ে তোমার বন্ধুত্বের দাবী করবার সাহস যে আমার হোল না—লক্ষ্মীটী! হয়তো তোমায় ভুলই বুঝেছিলাম ; কিন্তু সে ভুল বুঝ্‌তে আমার বুকের কতখানি ছিঁড়ে গেছে—সেতো তুমি জানোনা!"

চোখ মুছিয়া আমার হাতটী বুকে চাপিয়া ধরিয়া ও বলিল, "আমায় এমনি করে বুক দিয়ে ঘিরে রেখে যদি বল তোমার জীবনে নারীর স্থান নেই—তবে সেটা কত বড় মর্ম্মান্তিক কথা হয়ে দাঁড়ায়—সে কি তোমায় বলতে হবে রবিদা ? আমি তো চিরদিনই তোমার কষ্টের কারণ হয়েচি, কিন্তু নিজকে অত নীচুতো কথনো করিনি রবিদা! তোমার পায়ে পড়ি—তুমি তোমার আকাশস্পর্শী দয়া আর মহত্ত্ব নিয়ে আমায় মাপ করোনা —কঠোর হয়ে আমায় শাস্তি দাও।"

ওকে তুলিয়া বসাইয়া রুমাল দিয়া চোখ্ মুছাইয়া দিয়া বলিলাম, "থাক্‌না ও সব কথা। ওযে দুঃস্বপ্ন, হয়তো এ বিচ্ছেদটুকু আমাদের নেহাৎই প্রয়োজন ছিল ; তুমি যে আমার কী তা' যেন এ দুদিনের অভাবে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করছিলুম্।"

সে ম্লান হাসিয়া কটাক্ষে আমার দিকে চাহিয়া বলিল, "জানো, কাল রাত্রে স্বপ্নে দু'বার তোমায় দেখে চেঁচিয়ে ডেকেচি ; আজ ভোরে ঘুম থেকে উঠেই ভাব্‌লুম তোমায় দেখ্‌ব—কিন্তু তুমি যেন কী! উঃ—তোমার একটু মায়া নেই ; হোলই বা আমার অপরাধ ; আমার অসহায় অবস্থাটা কি তুমি ভাব্‌লে না—রবিদা ?"

ওর গাল টিপিয়া দিয়া বলিলাম, "অসহায় কোথায় হোল ? আমিতো সর্ব্বক্ষণই ছিলুম। সহায় অসহায় অবস্থা যাচাই কর্‌বার অবস্থা হলেই দেখ্‌তে পেতে যে আমার বুকের মধ্যে দিব্যি নিরাপদে বসে আছ—" বলিয়া নিবিড় করিয়া ওকে আকর্ষণ করিলাম। সে নিস্পন্দ হইয়া প'ড়িয়া রহিল ; তার চোখ আমার চোখে আবদ্ধ, ঈষদ্দীপ্ত চোখ মুখে লাবণ্য ঠিক্‌রাইয়া পড়িতেছে ; বলিল, "ওঃ সত্যি যেন একটা দুঃস্বপ্নই গেছে। আমি কী-ই না হয়ে গেছ্‌লুম সেদিন! সত্যি, তুমি যখন বল্লে তোমার জীবনে নারীর স্থান নেই, আমার মনে হোল যেন চারদিক অন্ধকার হয়ে গেছে ; তখন তোমার আমার সম্বন্ধটা কী বিকট হয়ে দাঁড়ায় বল দেখি" ?

হাসিয়া ওর মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিলাম "যাক্, যাক্, দুঃস্বপ্ন ভুলে যাওয়াই ভালো। চলো ডেকে গিয়ে দাঁড়ান যাক্"। ও পড়িয়াই রহিল, হঠাৎ আমার হাতটী ধরিয়া বলিল, "আচ্ছা রবিদা, আমায় তেম্‌নি করে তুমি গ্রহণ করতে পার্‌লে ? বাধল না কোথাও ?" হাত দুটী চাপিয়া ধরিয়া বলিলাম "সত্যিই বল্‌চি, তোমায় যেন আজ আরও নিবিড় করে পাচ্ছি। তোমার আঘাতের দান বইবার ক্ষমতা দিয়ে যে তোমায় দিতে নিলুম—এ আমার কত বড় অহঙ্কার তা'

কি তুমি বুঝতে পারচনা?" সে তন্দ্রালুর মতো আমার কোলে মাথা রাখিয়া পড়িয়া রহিল, আমি এক দৃষ্টিতে তার অঙ্গ-লাবণ্য দেখিতে লাগিলাম। হঠাৎ ভারী গলায় বলিল,—"ডেক্ থাক্, এখানেই থাকি, কেমন?"

বলিলাম, "বেশ তো।"

একটা কথা ভাবিয়া মুচ্‌কি হাসিতে লাগিলাম, ওর দৃষ্টি এড়াইল না; জিজ্ঞাসু ভাবে চোখ্ তুলিয়া কহিল, "হাসচো যে? কী হোল?"

"নাঃ—এম্‌নি।"

"না—বল্‌তেই হ'বে কেন হাসচ।"

"সব কথাই কি বল্‌তে হয়?" মুখ ভার করিয়া উঠিয়া বসিল—"সত্যিই, সব কথাই কি জান্‌তে হয়? জান্‌তে চাইবারও তো একটা অধিকার চাই।"

হাসিয়া বলিলাম, "আমার কিন্তু লোভ হচ্ছে অমনি করে একটু শুতে—আমি জানি চোখের পাতা তবে আপ্‌নিই বুজে আস্‌বে।"

সলজ্জ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, "শোনো, এই তো বসলুম, কে তোমায় শুতে মানা করেচে? নাও, শোও দেখি—" এই বলিয়া সে চটাগাত দিয়া আমার মাথাটা টানিয়া লইয়া ওর উষ্ণ, পুষ্পপেলব অঙ্কে তুলিয়া লইল। আমি চুপ করিয়া পড়িয়া রহিলাম, ওর দৃষ্টি বাহিরের সমুদ্রের বুকে খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল, আর হাত দিয়া ও আমার রুক্ষ, বিপর্যস্ত চুলের রাশিতে হাত বুলাইতে লাগিল। কী যেন ভাবিয়া ওর হাতটা ধরিয়া বলিলাম, "রাণি, জীবনের উপর মানুষের কতটুকু অধিকার ভেবে দেখেচো কখনো?"

ও পরিষ্কার কণ্ঠে অন্যমনস্ক ভাবে বলিল, "না—কিন্তু এ প্রশ্ন কেন, রবিদা?"

"এম্‌নি মনে হোল।"

"না, এম্‌নি নয়। নিশ্চয়ই তুমি একটা কিছু ভাবচ।"

"দেখো, জীবনটাকে যেমনি ভাবে গঠন করেচি, যেমনি ক'রে তার পথ যাত্রা ভেবে রেখেচি—তাকে সার্থক করবার জন্য হয়তো বা যাকে প্রয়োজন—তা'কে কোন একটা অজ্ঞেয় শক্তি যেন দূরে নিয়ে আমার জীবনের অখণ্ড ও বিপুল ভবিষ্যৎকে কণ্টকময় করে তুলচে। তবে আমার অধিকার রইল কোথায়, কোথায় রইল আমার পুরুষকার?"

সে আমার দিকে চাহিয়া রহিল, কোন উত্তর করিল না।

বলিলাম, "ভগবানকে জানিনা,—চিনিনি, চিন্‌বার চেষ্টা করিনি, করবও না। তবে সে লোকটা যেই হোক্—সে বয়সের ভারে পৃথিবীর অনেক কথাই ভুলে বসে আছে; আর বুড়ো হ'লে মানুষের মনে যে রুক্ষ মলিনতা আসে—সে রুক্ষতা দিয়ে সে সহস্র সহস্র মানুষের রূপায়িত জীবনের অখণ্ড সম্ভাবনাকে নষ্ট ক'রে, অনেকগুলি জীবন ব্যর্থ করেছে। সত্যি—ভেবে দেখো রাণি, জগতে যারা নিজেকে সনিব্‌ করে' পরিপূর্ণভাবে পরের জন্য বিলিয়ে দেয় তাদের মতো দুর্ভাগা দুনিয়ায় কেউ নেই;—আর প্রতিপদে ঐ নিদ্রিত ভগবান তা'দের জীবনকেই কণ্টকিত করে তোলে বেশী। পৃথিবীতে সব জিনিসই মিথ্যার ভরে উঠেচে—সব চেয়ে বিরাট, অসহনীয় ও দুর্দ্ধর্ষ মিথ্যা হ'ল—'ভগবান।'"

রাণী উত্তর করিল না, আমার হাত দুটী নিবিড়ভাবে নিজ মুষ্টির মধ্যে গ্রহণ করিল। আমি উত্তেজিত কণ্ঠে বলিতে লাগিলাম, "জানো—রাণি, আজ বিজ্ঞান দিয়ে যদি ভগবানকে স্থানচ্যুত করা যেত—আমি তবে আমার সমস্ত জীবন বিজ্ঞান-সেবায় লাগাতুম। যদি বানরের গ্ল্যাণ্ড দিয়ে সেই অতি পুরাতন জরা জীর্ণ ধূলি দিয়ে ভগবানকে নবযৌবনে পল্লবিত করা যেত—যাতে করে সে মানুষের জীবনে প্রেম-মিলনের অপূর্ব্ব মর্ম্ম বুঝতে পারে—তা হ'লে আমি তাই করতুম, শুধু পৃথিবীটাকে একটু বেঁচে থাক্‌বার উপযুক্ত করতে। কিন্তু যার এর কাছে সব ক্ষমতা ধুলো হয়ে মিশে যায়, সব আকাঙ্ক্ষা মিথ্যে হয়ে যায়—"

সে সস্নেহে আঁচল দিয়া আমার মুখের ঘাম মুছাইয়া দিয়া ধীর কণ্ঠে বলিল, "একথা কেন বলচ রবিদা? কী তোমার অভিমান, কেনই বা তোমার অভিমান—বল্‌বে আমায়?"

আমি একটু চুপ্ করিয়া রহিলাম, ওর গভীর দৃষ্টি যেন আমার অভিমানকে আরো উদ্বেগ করিয়া তুলিল। বলিলাম, "না, অভিমান আমার কিছুই নেই—তবে মনে জ্বালা রয়েচে যথেষ্ট। কী দিয়ে অভিমান করব বল! আমার সহস্র

অভিমান সে দুর্দ্ধর্ষ বিধাতার সৃষ্টির মিথ্যা বিধানকে একটুও বদ্‌লাতে পার্‌বেনা। অভিমান আমি করচিনে—তবে ভাবি এমন দিন কি হ'বেনা যখন মানুষ এত শক্তি ধারণ করবে যে ভগবানের অন্যায় বিধানকে জয় করবার ক্ষমতা ও দুঃসাহস তার হবে!"

রাণী আমার কপালে হাত বুলাইতে লাগিল, হাত দিয়া আমার কপালে একটু চাপ দিয়া বলিল, "থাক্ রবিদা—যাঁর বিধানকে জয় করবার ক্ষমতা কারো কোনদিন হ'বেনা তা নিয়ে মিথ্যা অভিমান করে কষ্ট পাবার কি কোন সার্থকতা আছে? কিন্তু কোথায় তোমার আঘাত আমায় বল্‌বেনা?"

হাত দুটী চাপিয়া ধরিয়া বলিলাম, "সে যদি তুমি না বুঝে থাক—তবে বল্‌বার প্রয়োজন দেখচিনে, কিন্তু রাণীটি আমার—তুমি কি ভগবানের যে বিধান সমাজকে চালিত করে—তাকে ভাঙ্গবার কোন উপায়ই দেখ্‌চো না? ভগবান কেউ নয়—সব চেয়ে বড় মানুষ—সব চেয়ে ভক্তি পাবার উপযুক্ত হচ্ছে তার মন।"

"কিন্তু তার মন যদি ভ্রান্ত হয় রবিদা—যদি তাকে খারাপ পথে চালিয়ে নিয়ে যায়? সে মন যদি অসম্ভবই চেয়ে বসে!"

"কাকে তুমি অসম্ভব বল্‌চো? যা'কে তুমি অসম্ভব বল্‌ সে হচ্ছে সমাজের গড়া একটা অতি পুরাণ—জীর্ণ আইন; জান তো সব আইনই মানুষের সম্পূর্ণ ও পরিপূর্ণ প্রকাশকে বাধা দেয়। একবার তা'কে ভাঙ্গা আরম্ভ করে দাও দেখ্‌বে যে ঐ যে চালাক লোকটা দূরে বসে আছেন—তিনি অতি সহজভাবেই এ আইন-ভঙ্গ মেনে নেবেন—যেমন করে এদেশে লবণ-আইন-ভঙ্গ ইংরেজ নিয়েচে!"

আমার মাথায় খুন চাপিল, ওর হাতদুটীতে সমস্ত শক্তি দিয়া চাপ দিয়া বলিলাম, "কী সার্থকতা আছে তোমাকে আমার থেকে চিরদিনের জন্য ছিনিয়ে নিয়ে আমাকে ব্যর্থ করবার, পারি নাকি আমরা এ বিপুল মিথ্যার বিধানকে ভেঙ্গে মানবতার দাবীকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে? যে রক্তের সম্বন্ধের জন্য তোমার আমার মিলন সমাজের চোখে অসঙ্গত—ভেবে দেখো মনুষ্যত্বের দিক্ দিয়ে—সৃষ্টির দিক দিয়ে সেই মিলন কতবড় পরিপূর্ণ ও মহান্!"

সে চুপ করিয়া রহিল, তার চোখমুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে—হয়তো আমার মনের সুগুপ্ত কথা এত স্পষ্ট হইয়া ব্যক্ত হইতে দেখিয়া সে একটু বিহ্বল হইয়া গিয়াছে। অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, "থাক্, থাক্—যা' অসম্ভব তা' নিয়ে কথা বলবার দরকার নেই। তা' ছাড়া তোমার দিক্ থেকে অভিমানের তো কোন কারণ দেখ্‌চিনে রবিদা!"

চুপ করিয়া রহিলাম; উত্তেজনায় মুখে এতগুলি কথা কোন দিনই বলি নাই, তাই একটু বিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। শুধু ওর কোলে পাশ ফিরিয়া শুইলাম; মনে হইল, না হইলই বা আমার আকাশে চন্দ্রের অফুরন্ত প্রকাশ, কিন্তু এ তারকার দীপ্তিটুকু আমার নিজস্ব হইয়াই থাক্। রাণী নিঃশব্দে আমার অজস্র কেশ-সম্ভার লইয়া দুরন্ত শিশুর মতো খেলা করিতেছিল। আর আমি একান্তে ওর কোলের উষ্ণ স্পর্শটুকু আমার উদগ্র ইন্দ্রিয় দিয়া অনুভব করিতেছিলাম। কথা বলিবার প্রয়োজন বা অবসর হয়তো আমার ছিলনা—শুধু আমাকে সমগ্রভাবে ওর কোলে বিলাইয়া দিয়াই আমি থালাস। আমি অপলক নেত্রে ওর স্নিগ্ধ-লালিম মুখচ্ছবি দেখিতে লাগিলাম, ওর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নমনীয় ঋজু ভঙ্গীটি, ওর চোখের আবেগোচ্ছল গোপন চাউনি, ওর আঙ্গুলের কমনীয় নখাগ্র-শোভা আমাকে যেন পাগল করিয়া তুলিল; হঠাৎ উহাকে বুকে টানিয়া লইলাম—বলিলাম—"রাণি,—সত্যিই ভগবানের বিধানকে যদি মেনেই নিতে হয় তবে কী সম্বল নিয়ে রইব আমি? জানো কেমন করে দিনগুলো কাটচে আমার; না, তোমায় যে আমার চাইই—দূরে থাক্ সমাজ।" আমি পাগলের মতো উহাকে সহস্র চুম্বনে অভিষিক্ত করিয়া দিলাম, যে দুর্ব্বলতা আমায় কখনো সীমারেখা ছাড়াইয়া লইয়া যায় নাই—আজ তাহা সব বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিল—অজস্র চুম্বনে ওকে শ্বেত কমলের মতো শাদা করিয়া দিলাম—ও চোখ বুজিয়া তন্দ্রালুর মতো আমার আদরের সমস্ত উদ্দামতাটুকু গ্রহণ করিতে লাগিল, ক্ষণপরে নিজকে ছাড়াইয়া লইয়া সরিয়া বসিল; সলজ্জ-দৃষ্টিতে আর আমার দিকে চাহিতে পারিল না—দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজিয়া বসিয়া রহিল।

মনে হইল—হয়তো বা উহাকে অপমানই করিলাম, তাই

একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলাম। ওর হাত দুটী টানিয়া লইয়া বলিলাম, "তুমি রাগ করলে? এটা আমার দুর্ব্বলতা—তোমায় অপমান করলুম আমি?" মুখ তুলিয়া ক্ষণিক দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া বলিল—"যাঃ—ও, কে বল্লে? আবার উহাকে বুকে টানিয়া লইলাম, মাথাটী বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া বলিলাম—"রাণু—ভগবানের কাছে পরাজয় মেনে যদি তোমায় নাই পাই তবে কী নিয়ে থাকব আমি? এমন কিছু কি আমায় দেবে না—যা' নিয়ে চিরদিন আমি বেঁচে থাকতে পারি? বেঁচে থাক্ দুনিয়ার ভগবান—কিন্তু আমায় তো বাঁচতে হবে? কী আমায় দেবে রাণি?" অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল; পরে ধরা গলায় বলিল—"কী আমার আছে রবিদা, যা' আছে সব কা'র পায়ে লুটিয়ে দিয়েছি—আজকার এ সন্ধ্যায় কী সেটাও তোমায় বলতে হ'বে? ভগবানের বিধান জয়ী হোক্—কিন্তু আমার বিধানে আমি তো নিজকে পরিপূর্ণ ভাবে তুলে দিলুম—তোমার হাতে: সংসার যাই মনে করুক, সমাজও যাই মনে করুক, আমি জানি—" কথাটা শেষ হইল না। সে লজ্জায় মুখ লুকাইল। আমার আকাশে যেন শত কোকিল গাহিয়া উঠিল, এমন পরিপূর্ণ আত্মদান যাহার কাছে—তাহার পৌরুষ-অভিমান দৃপ্ত হইবেই। কিন্তু ওর কথার স্নিগ্ধ রূপটুকু আমাকে সংযত করিল, কোনরূপ অধীরতা প্রকাশ না করিয়া শুধু ক্ষণে ক্ষণে ওর মাথাটী বুকে চাপিয়া ধরিতে লাগিলাম। হঠাৎ ও হাত ছাড়াইয়া উঠিল, সলজ্জ ও আবেগ-বিস্ফারিত চোখে কী যেন চাহিল—তারপর হঠাৎ আমার ঠোঁটে একটী উষ্ণ চুম্বন দিয়া বলিল—"এর চেয়ে মূল্যবান আমার কিছুই নেই—এই তোমায় আমি দিলুম—আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপহার।"

পাঁচ বছর পরে।

দেশে ফিরিয়া পশ্চিমে কাজ করিতেছি, রাণীও সুদূর আসামে।

সেদিন এক অর্দ্ধালোকিত প্রভাতে আমার ক্ষুদ্র বাংলোর বারান্দায় বসিয়া চা' খাইবার বন্দোবস্ত করিতেছিলাম। কাল রাত্রিতে ঘুম ভালো হয় নাই, কারণ গ্রীষ্ম এখনো বর্ষাকে হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে—আকাশে বাতাসে আগুনের সমারোহ এখনো শেষ হয় নাই। বারান্দার চারিদিক ঘেরিয়া আইভিলতা, আর অদূরে কামিনী ফুলের মনোমদ গন্ধ আমার বাতাসকে উপভোগ্য করিয়া তুলিয়াছে। চাপরাশি চিঠির ফাইল দিয়া গেল; অলসভাবে চিঠিগুলির ঠিকানায় চোখ বুলাইয়া যাইতে লাগিলাম। হঠাৎ একটা অতি পরিচিত হাতের লেখায় চমকিয়া উঠিলাম। কিছুদিন হয় সে লেখার প্রতীক্ষায় ছিলাম। ক্ষিপ্র হস্তে খাম খুলিলাম, সেই পরিচিত হাতের ছোট্ট অক্ষরগুলি যেন সজীব হইয়া আমার চোখে চোখ বুলাইতে লাগিল। চিঠিটা লইয়া ইজি-চেয়ারে শুইয়া পড়িলাম, লিখিয়াছে,—"এ কী করেচ তুমি? আমার একটা মুহূর্ত্তের বিহ্বলতার বলা কথায় তুমি বিয়ে করলে না? তোমার মা আমায় কী ভাবচেন বল তো? তুমি বিয়ে করে সার্থক হও—আর একটী ভাগ্যবতীর জীবনকে সার্থক করে তোল—লক্ষ্মীটি আমার! আমার কোন কথা তো তুমি অবহেলা কর নি—আজ করবে? আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তোমায় আর একটীর হাতে তুলে দেব তুমি সন্ন্যাসী হয়ো না, তোমার দু'টী পায়ে পড়ি। আমার কথা যদি না শোন—তো তোমায় জাহাজে আমি যা' দিয়েছিলুম তা'র অধিকার তুলে নিলুম। তোমার—রাণী।"

পুরাতনের বিচিত্রলীলা আজ আবার চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল। আমার যৌবন-জীবনের সমস্ত ঘেরিয়া যাহার স্মৃতি দীপ্যমান, যাহার মুখ এখনো আমার শত কাজের কথা ভুলাইয়া দেয়—তাহার নিজকে কাড়িয়া লওয়ার প্রস্তাবে হয় তো একটু চমকিয়া গিয়াছিলাম। দেখিলাম জীবনের পাকে পাকে যে জড়াইয়া গিয়াছে—তাহার সোণার গ্রন্থি ছিঁড়িবার মতো ক্ষমতা আমার নাই। কাগজ কলম লইয়া লিখিলাম,—"রাণী আমার, আবার কি ঝগড়া করতেই এলে? তুমি আমাকে যা'র তা'র হাতে তুলে দিয়ে বুঝি তোমার অনুরাগ দেখাচ্ছ? আমি কিন্তু তোমায় কারো হাতে তুলে দেব না—যে আমার নিজস্ব তাকে হারিয়ে দেউলে হতে রাজী আমি নই। লিখেচ—যে-অধিকার আমায় জাহাজে দিয়েছিলে তা' তুলে নেবে। যা' নিয়ে জীবনের পথে ধারে ব্যবসা ফেঁদেছি—তা' কেড়ে নিয়ে আমায় দেউলে করতে চাও? মন তোমার এ'তে সায় দিচ্চে—না শুধু আমায় সরিয়ে দেবার জন্যই এসব? থাক, বাজে কথা থাক। আমার ক্ষুদ্র সাম্রাজ্যের রাণীটি শীগ্‌গীরই তা'র রাজ্যে এসে পরিপূর্ণ ক্ষমতায় বসবেন এ খবর তোমায় দিচ্চি; অধিকার অনধিকারের কথা তখনই যাচাই হ'বে। ইতি—"

চিঠি শেষ করিয়া দেখি—দূরে মাঠের বুক আলো করিয়া সকালের সূর্য্য খেলিতেছে—আমার বুকেও তখন আলোর সমারোহ।

শ্রীসুধাংশুকুমার রায় চৌধুরী

সাহিত্যের প্রভাব

শ্রীযুক্ত শশাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী বিদ্যাবিনোদ

যুগ যুগ ধরিয়া মানুষের সাধনা চলিতেছে। মানুষের সততই চেষ্টা প্রকৃত মানুষ হইতে। বিশ্ব-সৃষ্টি বিকাশের পর মানুষ কি ছিল? বোধ হয় অরণ্যের পশু-সদৃশ তাহার জীবন অতিবাহিত হইত। কিন্তু আজ মানুষকে অরণ্যের পশু বলিলে চলিবে না। আজ তাহার বিজয়-কেতন জগতের বক্ষে সগর্ব্বে উড়িতেছে। মানুষের এই সাধনার ফল আজ একটী বৃহৎ রূপে প্রকাশ পাইয়াছে। সর্ব্বত্রই সূক্ষ্ম-স্থূল, উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্ট, সাধু-অসাধু, উচ্চ-নীচ সংমিশ্রণে মানুষের সাধনা অনেক বাধা পাইতেছে। কিন্তু সাধনার ফলে প্রতি যুগেই মানুষ যাহা সত্য, যাহা নিত্য তাহাকেই পাইয়াছে। মানুষের এই সাধনার পথে অনেকাংশে তাহাকে সাহায্য করিয়াছে, সাহিত্য।

যতদিন না মানুষ এই সাহিত্যকে উপলব্ধি করিয়াছে, ততদিন তাহার সাধনা পরিস্ফুট হয় নাই। সাহিত্যই ত' মানুষের প্রাণের সাধনাকে ব্যক্ত করে। সভ্যতার প্রথম অবস্থাতেই মানুষ সাহিত্যের সহযোগিতা লাভ করিয়াছে। ঋষিদিগের কণ্ঠে কণ্ঠে যখন প্রথম বেদ-মন্ত্রের ধ্বনি উঠিতে লাগিল, তখন সাহিত্য সম্বন্ধে লোকের ধারণাই ছিল না। কিন্তু যখন ইহার প্রভাব মানুষের মধ্যে বিস্তারিত হইল তখনই বুঝা গেল, সাহিত্যই মানুষের সভ্যতার আলোক।

নির্জ্জন অন্ধকারের বক্ষে আলোক ফুটাইয়া তুলিতে হইলে, কেহ যেমন ইচ্ছামাত্রই তাহা করিতে পারে না—তাহার নানা উপকরণ চাই, তবে আলোক জ্বলিবে, অন্ধকারের বিনাশ হইবে, সেইরূপ অসভ্য অরণ্যবাসী মানুষের নিকট সাহিত্যালোক সহসা জ্বলিয়া উঠে নাই।

জগতের প্রথম কবি বাল্মীকির জীবন-কাহিনী হইতে সাহিত্যের বিকাশ আমরা জানিতে পারি। বাল্মীকি একজন দস্যু, অসভ্য, অসুরপ্রকৃতির মানুষ ছিলেন। জীব-হত্যা, লুণ্ঠন এবং অখাদ্য কুখাদ্য ভক্ষণই তাঁহার জীবনের কর্ম্ম ছিল। সেই বাল্মীকি আবার ঋষি হইলেন, কত বৎসর তপস্যা করিয়া বজ্র কঠিন প্রাণকে কোমল করিয়া জগতের হিতে বিলাইয়া দিলেন—তবেই তাঁহার হৃদয়-বীণায় সাহিত্যের সুললিত ধ্বনি বাজিয়া উঠিয়াছিল। সামান্য এক ক্রৌঞ্চ-বধ দেখিয়া তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছিল এবং সেই সহানুভূতিপূর্ণ বেদনার ফলে তিনি বিশ্বের প্রভাত-কালে সাহিত্যের অরুণ কিরণ-ছটা ছড়াইয়াছিলেন।

সেই সময় হইতেই মানুষ সাহিত্যকে জানিল। সেই সময় হইতেই কত মহাকবি মানব-সমাজে হৃদয়-ভরা সৌন্দর্য্য লইয়া জাগতিক সুখ দুঃখকে গভীর বেদনার রসে পুষ্ট করিয়া মানবের জীবন-ধারাকে সত্য ও সুন্দর করিয়া দিলেন। সেই হইতেই সাহিত্য হইল, সুবিশাল, সুপ্রশস্ত, পরিপূর্ণ সত্যের পথে অপূর্ব্ব জয়-যাত্রা! অন্তরের গভীর আঁধারে যে সত্যকে মানুষ পূর্ব্বে অনুভব করিতে পারে নাই, সাহিত্যের আলোকে সেই সত্য চিনিয়া লইল। দেখিল সে সৌন্দর্য্যের শেষ নাই। পরম সুন্দর যিনি, সর্ব্বজীবের প্রসবিতা যিনি, যাঁহার রূপের শেষ নাই, যাঁহার ঐশ্বর্য্যের শেষ নাই, চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-তারা যাঁহার রূপের কণা লইয়া অনন্তগগনে শোভমান সেই পরম-পুরুষের প্রাণের সৌন্দর্য্য মানুষ প্রাণ ভরিয়া অনুভব করিল। সেই হইতেই সাহিত্য হইল—পরম সুন্দরের ধ্যানের মন্ত্র—ভক্ত কবির সাধনালব্ধ হৃদয়ার্ঘ্য, তপস্বীর পূত-কণ্ঠ-নিনাদিত প্রভাতের সামগান।

এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সকল বস্তুকে সম্যকরূপে জানিতে, বুঝিতে, অনুভব করিতে এবং প্রতিদিবসের কর্ম্মে ব্যবহার করিতে মানুষের কত আগ্রহ, কত আকাঙ্ক্ষা। শুধু সকল বস্তুকে দেখিয়া মানুষের প্রাণ তৃপ্ত নহে। ফুলের মধ্যে কত সৌন্দর্য্য আছে, কত গন্ধ আছে। মানুষ শুধু সেই সৌন্দর্য্য

দেখিয়া ও গন্ধ আঘ্রাণ করিয়াই তৃপ্ত নহে। পাখীরা সুললিত স্বরে কত গান করে এবং সেই গান শুনিয়া সকলেই মুগ্ধ হয়; মানুষ সেই গান শুনিয়াই ক্ষান্ত নহে। জগতের সকল সৌন্দর্য্য, সকল মধুরতা ও সকল রসের মধ্যে তাহার প্রাণের প্রেরণা ও আবেগ জাগ্রত করাতেই মানুষের তৃপ্তি। এই প্রাণের প্রেরণা লইয়া সে শুধু একটী মনের মতন জিনিষ চাহিয়া থাকে, তাহাই লাভ করিতে সাহিত্য-রসস্রষ্টা মানুষের বিপুল ক্ষুধা-নিবৃত্তির জন্য মানব-সমাজের প্রতিভূস্বরূপ হইয়া জগতের অনন্ত ভাণ্ডার হইতে সত্যবস্তুগুলি আহরণ করেন। কত যুগযুগান্তর হইতে সাহিত্য-রস-স্রষ্টা বিপুল অধ্যবসায়ের সহিত মানুষের কাম্যবস্তুগুলি সাহিত্যের মধ্যে সঞ্চিত করিতেছেন।

মানব সমাজে সাহিত্য অতিশয় প্রয়োজনীয়। সেইজন্য ইহার উপর সাহিত্যের প্রভাবও খুব বেশী। মানুষ সংসারে চলিতেছে—তাহার মধ্যে কত ছন্দ, কত সুর, কত তাল, কত আশা, কত আকাঙ্ক্ষা। এইগুলি সমস্তই সাহিত্যের মধ্যে অনন্তকাল হইতে সঞ্চিত হইতেছে। মানুষের মধ্যে যখন অন্তরের পিপাসা জাগ্রত হয়, সাহিত্যের উৎস তখনই খুলিয়া যায়। সেইজন্য নিরক্ষর বিদ্বান, মূর্খ পণ্ডিত, নির্দ্ধন ধনী সকলেরই উপর ইহার কম-বেশী প্রভাব রহিয়াছে।

কিন্তু সাহিত্য মাত্রই যে সকলের উপর প্রভাব বিস্তার করিবে, তাহা নহে। যে সাহিত্য প্রকৃত পক্ষে স্থায়ী, বহু পুরাতন হইলেও মানবের অন্তর হইতে যাহার ধ্বংস সাধন হয় না—সেই সাহিত্যই সকলের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হয়। জগতে কত সাহিত্য উঠিতেছে, কিন্তু সকল সাহিত্য স্থায়ী হইতে পারিতেছে না এবং সেইজন্য মানুষের উপর তাহাদের প্রভাবও নাই। মানুষের বিচিত্র জীবন-যাত্রা সত্ত্বেও তাহার মধ্যে একটী চিরন্তন সত্য আছে। জগতের যেদিকে গতি, চিরন্তন সত্য সেইদিক লক্ষ্য করে। সাহিত্য সেই সত্য অনুসরণ করিয়া জীবনী শক্তি লাভ করে।

সমাজের মধ্যে এমন এক একজন মহামানব জন্মগ্রহণ করেন যে, তাঁহাদের অপূর্ব্ব মনীষা বলে ধর্ম্ম, সমাজ ও জাতির পরিবর্ত্তন হয়। কিন্তু তাহার গতি সাহিত্যের মধ্যেই চলিতে থাকে। এই গতি লক্ষ্য করিয়া অনেকেই তাঁহাদের সাহিত্য-সম্ভার জগতকে উপহার দিয়াছেন এবং তাহার দ্বারা তাঁহাদের সাহিত্য স্থায়ীও হইয়াছে। অনেকে যুগ-মহা-মানব-দিগের পথে না গিয়া সাহিত্যের গতি অন্যদিকে ফিরাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু জগতের মধ্যে সেই সাহিত্যের প্রভাব বিস্তারিত হয় নাই এবং তাঁহারা তাঁহাদের গঠিত সাহিত্যকে স্থায়ীত্ব দান করিতে পারেন নাই। হয় ত' তাঁহারা সাহিত্যের মধ্য দিয়া সাময়িক উত্তেজনা অনেকখানি আনিয়াছেন, হয়ত' তাঁহাদের চিন্তানুশীলনে অনেক লোকই মাতিয়া উঠিতেছেন, হয়ত' তাঁহাদের প্রদর্শিত পথে অনেকেই অগ্রসর হইতেছেন—কিন্তু তাঁহাদের চিন্তার-ধারা জগতের গতি অনুসরণ না করার ফলে বহুযুগ ধরিয়া চলিবে না। যুগ যুগ ধরিয়া যে আদর্শ ও চিন্তার ধারা মানুষের হৃদয়-দর্পণে ছায়া-পাত করিয়াছে, তাহা কখনই কালের নিষ্ঠুর-পরশে মুছিয়া যাইবে না।

আমাদের দেশের রামায়ণ ও মহাভারত অতি প্রাচীন সাহিত্য। কত বৎসর পূর্ব্বে যে এই সাহিত্য রচিত হইয়াছে, তাহা কেহ বলিতে পারে না। কিন্তু সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে ইহার প্রভাব লক্ষিত হয়। সামান্য একজন কৃষক বা দোকানদার—সাহিত্যের তাহারা কিছুই জানে না, তবু শ্রীরামচন্দ্রের আদর্শ চরিত্র, সীতার পতিভক্তি, লক্ষ্মণ ও ভরতের ভ্রাতৃ-ভক্তি, যুধিষ্ঠিরের ন্যায়পরতা, অর্জ্জুনের শৌর্য্য বীর্য্য—সাহিত্যের এই রত্নরাজি তাহাদের প্রাণে প্রাণে গাঁথা রহিয়াছে। জন্মদুঃখিনী, স্বামী-পরিত্যক্তা, মিথ্যাপবাদ-ভাগিনী সীতার চক্ষের জলে আজো সকলের চক্ষু অশ্রুময়। সীতার অসহনীয় ব্যথার সুরে আজো সাহিত্য মুখরিত। পাণ্ডবমাতা কুন্তীর আজীবন দুঃখভোগ ও ঈশ্বর-নির্ভরতা এখনো দারিদ্র্য-প্রপীড়িত নরনারীর প্রাণে শান্তি আনয়ন করে। সতীসাধ্বী সাবিত্রী, উমা, মন্দোদরী, দময়ন্তী, বেহুলা প্রভৃতি আদর্শ-নারীর মহিমা লোকের স্মৃতি-পটে এখনো অঙ্কিত রহিয়াছে।

অমর-কবি কালিদাসের কাব্যগুলি যেন অমৃতের খনি। তাঁহার শকুন্তলা, মেঘদূত, কুমারসম্ভবের মধ্যে যে অমৃত সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে, সে অমৃতের আর শেষ নাই। এই অমৃত মানুষ যত পান করিতেছে, ততই নূতন নূতন সৌন্দর্য্য ইহার

মধ্য হইতে ফুটিয়া বাহির হইতেছে। শকুন্তলার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া জার্ম্মাণ-কবি গেটে বলিয়াছেন—"তোমার মধ্যে কি স্বর্গ এবং মর্ত্ত্য একসঙ্গে মিলিয়াছে?"—সত্যই শকুন্তলার সৌন্দর্য্যের তুলনা নাই। শকুন্তলা শুধু বাহিরের রূপেই সুন্দরী ছিলেন না—তাঁহার অন্তরের মধ্যে যে অনন্ত অপার সৌন্দর্য্যকে কবি সাহিত্যে রূপ দিয়াছিলেন—সমগ্র জগত তাহা বিস্ময়-নেত্রে দেখিতেছে।

বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক শ্রীগৌরাঙ্গ সাহিত্যের মধ্য দিয়া যে অমৃতের ধারা আনিয়াছিলেন, তাহা পান করিয়া এখনো ভক্তমাত্রই প্রেমোন্মাদনায় মত্ত। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জয়দেব, গোবিন্দদাস, লোচনদাস প্রভৃতি মহাজনের পদাবলী সংসার-দুঃখ-প্রপীড়িত নর নারীর প্রাণে যুগে যুগে শান্তি-সলিল বর্ষণ করিতেছে। যে রবীন্দ্র-সাহিত্য আজ বিশ্ব-সাহিত্যের মধ্যে বাংলা সাহিত্যকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, শ্রীগৌরাঙ্গের প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব-সাহিত্যই তাহার ভিত্তি।

সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ লেখকগণ ও সমাজের আদর্শ-পুরুষগণ যুগপ্রবর্ত্তক। তাঁহাদের চিন্তানুশীলনে এক একটি যুগের সংস্কার সাধন হয় এবং সেই আদর্শে সাহিত্যের একটি সত্য গতি নিরূপিত হয়। সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করিলে স্পষ্টই দেখা যায় এই মনীষিদিগের একটিমাত্র গতিতে পরবর্ত্তী ও সাময়িক সাহিত্যসেবকদিগের মধ্যে যাঁহারা চলিয়াছিলেন, মানব-সমাজের উপর কেবলমাত্র তাঁহাদেরই প্রভাব বিস্তারিত হইয়াছিল। বাল্মীকি, বেদব্যাস প্রভৃতি সাহিত্যের গতি যে দিকে ফিরাইয়াছিলেন, সকলেরই সেইদিকে গতি হইয়াছিল। গৌরাঙ্গের সময় একমাত্র বৈষ্ণব-সাহিত্য ব্যতীত আর কোন সাহিত্য দৃষ্ট হয় না।

সাহিত্যরূপ মহামহীরুহের ছায়াতলে অনেক বৃক্ষ বেশী মস্তক তুলিতে পারে না, বরং মরিয়া যায়। ইহা সত্য বটে, যুগ-মানবের প্রদর্শিত পথ সত্য এবং সাহিত্যও সেই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত; কিন্তু ইহাও স্বীকার্য্য, অন্যের ভিতর সেই সত্য কিছু না কিছু থাকিতে পারে। হয় ত' তাঁহারা সাহিত্যের মধ্যে কিছু দিতে পারিতেন, ক্ষেত্র পাইলে কিছু প্রভাব বিস্তার করিতে পারিতেন। কালের নিষ্ঠুর পরিহাসে তাঁহাদের সাহিত্য বেশীক্ষণ স্থায়ী হইতে পারে না।

যুগপ্রবর্ত্তকদিগের প্রভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাহিত্যগুলির অনেক ক্ষতি হয় বটে, কিন্তু সেই সাহিত্যের যদি যথার্থ মূল্য থাকে, একদিন না একদিন তাহা লোক-সমক্ষে বাহির হইবেই হইবে। যুগযুগান্তের পর ইরাণের প্রেমিক-কবি ওমর খৈয়ামের "রুবাইয়াৎ" বাহির হইয়াছে। আজ সমগ্র জগত তাহার রস-পানে বিভোর। যদি কালের কবলে এইরূপ সাহিত্যের ধ্বংস-সাধন না হয়, তবে নিশ্চয়ই মানুষ তাহার সমাদর করিবে এবং মানব-সমাজে তাহার প্রভাবও হইবে।

সাহিত্যের মধ্যে যে প্রকৃত সত্য নিহিত থাকে, তাহা সর্ব্ব সময়ে বা সর্ব্বস্থানে প্রকাশিত হয় না। ইহার একটী নির্দ্দিষ্ট সময় বা স্থান আছে। এই নির্দ্দিষ্ট সময় বা স্থানেই সাধারণে তাহা সম্যকরূপে বুঝিতে পারে। ইউরোপ ও আমেরিকার মধ্যে আজ যে প্রজাশক্তির প্রবলতা দেখা দিয়াছে, মহাকবি বাল্মীকির মনে তাহার গৌরব প্রথম জাগিয়াছিল। তিনি প্রজারঞ্জন রামচন্দ্রের চরিত্রে তাহাই দেখাইয়াছেন। রামচন্দ্র নিজে সর্ব্বজনাদৃত রাজা হইয়াও প্রজাশক্তিকে ভয় করিয়াছিলেন। রাশিয়ার আজ যে রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, জারের (Czar) অস্তিত্ব বিলুপ্ত করিয়া জগতের সমক্ষে দেখা দিয়াছে, ইহার দ্রষ্টা ছিলেন কাউণ্ট লিও টলষ্টয়, কার্লমার্কস্ প্রভৃতি সাহিত্যিকগণ। রাশিয়ার বারংবার বিপ্লবের মূলে, সমাজগঠনের মূলে, লোকশিক্ষার মূলে তাঁহাদেরই সাধনা-প্রসূত চিন্তাধারা জাতিকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র গাছপালার জীবন আবিষ্কার করিয়া জগতকে স্তম্ভিত করিয়াছেন। কিন্তু বহুপূর্ব্বে ইহাকে তিনি সাহিত্যের বস্তুরূপে দেখিয়াছিলেন। তখন তিনি নিজেই জানিতেন না যে, এরূপ বস্তু সত্য হইতে পারে। যাহা তাঁহার নিকট কল্পনার বস্তু ছিল, তাহাই সত্য হইল দেখিয়া তাঁহার হৃদয় সাহিত্যের প্রভাবে মুগ্ধ হইয়াছিল।

অনেকে সাহিত্যকে কল্পনা মনে করেন। কিন্তু যখন

সেই কল্পনা কার্য্যক্ষেত্রে সত্যরূপে পরিণত হয়, তখন তাহাকে শুধু কল্পনা বা প্রহেলিকা বলা চলে না। আজ যাহা নিত্য সত্যরূপে মানব সমাজে প্রতিষ্ঠিত আছে, কাল তাহা মাত্র কল্পনা বা প্রহেলিকাচ্ছন্ন ছিল। যে সাহিত্য আজ মানবের কাছে মহামূল্য, একদিন তাহা কালের তিমির-গর্ভে নিহিত ছিল। হয় ত' এখনও এমন কোন সাহিত্য আছে, যাহা লোকহৃদয়ের তৃপ্তি সাধন করিতে পারিতেছে না, কিন্তু একদিন আসিবে যখন সমগ্র জগত তাহাকে সাদরে বরণ করিয়া লইবে। ইহাই জগতের রীতি। সেইজন্যই বলিতেছি, সাহিত্যকে শুধু কল্পনার জালে সুন্দর করা হয় নাই। সাহিত্য জাগ্রত আত্মার বাণী। ইহার মধ্যে চির-নূতনের সুর বাজিতেছে।

মানুষ সাহিত্যকে এত আপনার করিয়া লইয়াছে যে, ইহা যেন তাহার জীবনের আশ্রয় স্বরূপ হইয়াছে। সুখে দুঃখে, আনন্দে নিরানন্দে, বিপদে সম্পদে ইহার সুর সকলেরই প্রাণে ঝঙ্কার দিয়া উঠে। তুমি দারুণ দুঃখসাগরে পড়িয়া হাবুডুবু খাও—তখন তোমার ভেলাস্বরূপ হইবে মনীষিদিগের চিত্রিত কোন আদর্শ চরিত্র। সারাদিন পরিশ্রমের পর যখন তোমার দেহমন ক্লান্ত হইয়া পড়ে, তখন তোমার প্রাণে একখানি প্রাণময় দরদ-ভরা সঙ্গীত তোমার সকল ক্লান্তি দূর করিয়া দিবে। প্রিয়জনের বিরহে যখন তুমি জর জর, তখন তুমি কোন সদ্গ্রন্থ পাঠ করিয়া সকল দুঃখ-বেদনা দূর করিয়া শান্তিলাভ করিতে পার। সুখ-বিলাসে, প্রেমোন্মাদনায়, বসন্ত-সমীর-হিল্লোলে, কুসুম-বিকশিত-বন মধ্যে এবং আনন্দোৎসবের মধ্যেও মানুষের মন সাহিত্যের স্নিগ্ধ-পরশে পুলকিত হয়।

আমাদের দেশে কবির গান, পাঁচালী, কবির লড়াই, কথকতা, রামায়ণ সঙ্গীত প্রভৃতি সাধারণের উপর এককালে খুবই প্রভাব বিস্তার করিত। বিশেষতঃ নিম্ন-সমাজের যথেষ্ট উপকার করিত। তাহাদের পরিশ্রান্ত জীবনের দুঃখ-সুখের মধ্যে, হাসি-তামাসা আনন্দ-ব্যথায় এই শ্রেণীর সাহিত্যগুলি তাহাদের সবুজ প্রাণগুলিকে মধুর করিয়া দিত!

আমাদের দেশের এই শ্রেণীর সাহিত্যগুলি কত মূল্যবান তাহা বলিয়া প্রকাশ করা যায় না। আমাদের দেশে সাহিত্যের যত আদর ছিল, ইতিহাসের তত ছিল না। কিন্তু যে সমস্ত সাহিত্য-রত্নাবলী প্রতি রসজ্ঞ মানুষের হৃদয়ে, প্রতি মহাজন-পদাবলীতে, প্রতি ভক্ত-সাধকের দোঁহাতে, প্রতি নিরক্ষর রাখালের সঙ্গীতে ছড়াইয়া রহিয়াছে তাহার দ্বারা যথেষ্ট ইতিহাসের উপকরণ সংগৃহীত হইতে পারে। আমাদের দেশের ইতিহাস ত' এই রূপেই সংগৃহীত হইতেছে। বহু প্রাচীন পুঁথি, শিলালিপি, তাম্রলিপি, শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ মনীষীদিগের গ্রন্থ হইতে আমাদের দেশের ইতিহাস রচিত হইয়াছে।

সাহিত্যের মধ্যে একটা জীবনী শক্তি আছে। এই শক্তির দ্বারা সাহিত্যই যে শুধু জীবন্ত থাকে তাহা নহে; মানব-সমাজের উপরও ইহা অধিক পরিমাণে জীবনী শক্তি প্রদান করে। সমাজের ভিতর যখন মিথ্যা, অনাচার, অলসতা, দুর্ব্বলতা প্রভৃতি আসিয়া জুটে, যখন সমাজ জীবন্মৃত অবস্থার ধ্বংসের পথে চলে—সাহিত্য সেগুলি দূর করিয়া মিথ্যার স্থানে সত্য, অনাচারের স্থানে সদাচার, অলসতার স্থানে কর্ম্মের শক্তি, দুর্ব্বলতার স্থানে সবলতা আনিয়া সমাজকে নূতন জীবন দান করে। সাহিত্য সমাজের দোষগুণ পক্ষপাতশূন্য হইয়া সহজ সতেজ সুরে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দেয়। সমাজের উপর তাহার অবাধ কর্তৃত্ব। সাহিত্য শুধু ফুলের সৌন্দর্য্য, পাখীর কল-গান, তটিনীর কলোচ্ছ্বাস, পর্ব্বত অরণ্যানীর মনোহারিণী শোভা, প্রেমাসক্তি ও বিলাস-বাসনা লইয়াই মানুষের চিত্তাকর্ষণ করে না। যশের উচ্চ-মন্দিরে উঠিবার জন্য সাহিত্য শুধু ধনীর দুয়ারে ভেট দেয় না। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের বাণী প্রতিধ্বনিত করিয়া সাহিত্য সতত বলিতে চায়—"উচ্চ-মঞ্চ সাহিত্যের জন্য নয়। পৃথিবীর ধূলামাটীতে যে ফুল ফুটিয়াছে, শস্য জন্মিয়াছে, মাটি হইতে যে রস লইয়াছে, সাহিত্য তাহাদেরই ভালবাসে। মাটী কর্ষণ করিতে করিতে যাহারা দুঃখ পাইয়াছে, তাহাদের জন্য সাহিত্য বেদনা অনুভব করে। সকলের বেদনার রূপকে প্রকাশ করা সাহিত্যের কাজ।" প্রয়োজন হইলে সাহিত্য যুদ্ধ-যাত্রী সৈনিকের প্রাণে উৎসাহ-বহ্নি জ্বালাইয়া দেয়, সত্যের প্রতিষ্ঠা-কল্পে মিথ্যার ধ্বংস-সাধনে খড়্গহস্ত হইয়া উঠে এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে কালের করাল বক্ষের উপর নাচিয়া ন্যায়ের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত রাখে।

আধুনিক যুগে পাশ্চাত্য সাহিত্যের বন্যা আসিয়াছে এবং সর্ব্বত্র তাহার প্রভাব বিস্তৃত হইতেছে। এই বন্যার মুখে সমস্ত দেশের অতীত সভ্যতাগুলি চলিয়া যাইতেছে এবং তাহার স্থানে ক্রমে ক্রমে পাশ্চাত্য সভ্যতা রহিয়া যাইতেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমাদের দেশের কথা বলা যাইতে পারে। আমাদের দেশে এতদিন ব্রাহ্মণ্য শক্তির নিকট শূদ্র-শক্তি অবনত ছিল, ব্রাহ্মণের নির্দ্দেশ অনুসারে সমাজের কার্য্য নির্দ্ধারিত হইত—আজ শূদ্র-জাগরণের ফলে সমাজের বহু পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। এতদিন চতুষ্পাঠীর ক্ষুদ্র কোণে বসিয়া এদেশের ছাত্র-মণ্ডলী অধ্যাপকের নিকট জ্ঞানার্জ্জন করিত, আজ তাহারা সেই ক্ষুদ্র গণ্ডী ত্যাগ করিয়া পাশ্চাত্যালোক-রঞ্জিত আকাশের দিকে ছুটিয়াছে। কঠোর অধ্যবসায়ের ফলে যে স্থানে একদিন কুটীর-শিল্প উৎপন্ন হইত এবং তাহার দ্বারা সাধারণের জীবিকা-নির্ব্বাহ হইত, আজ সে স্থানে কলকারখানার প্রভাব বিস্তারিত হইয়াছে। জীবনযুদ্ধে আমাদের দেশের নারীরা বহুদিন হইতে পুরুষের পশ্চাতে ছিল, তাহারা শুধু অন্তঃপুরের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি করিত—আজ ইউরোপীয় সাহিত্য ও শিক্ষার প্রভাবে তাহারা জীবনযুদ্ধে পুরুষের সহিত সমানভাবে চলিতে চেষ্টা করিতেছে।

পাশ্চাত্য সাহিত্য বাহিরের নানা চাকচিক্য, ভাষার আড়ম্বর, ছন্দের ঝঙ্কার, অবাধ ও অসাধারণ আকাঙ্ক্ষার আবরণে সুসমৃদ্ধ। "ইহজগতের সুখই সুখ" এই বাণী পাশ্চাত্য সাহিত্যের অন্তরে অন্তরে ধ্বনিত হইতেছে। মানুষের অন্তরের মধ্যে যে অনিন্দ্য-সুন্দর দেবতা রহিয়াছেন, বাহিরের অলঙ্কারের মোহে পাশ্চাত্য তাহা ভুলিয়াছে। পাশ্চাত্য সাহিত্য সেইজন্য ভোগের সাহিত্য। তাহাদের মধ্যে এত কর্ম্মতৎপরতা, এত শক্তি, এত জ্ঞান শুধু ভোগ করিবার জন্য। কিন্তু প্রাচ্য সাহিত্য ত্যাগের উপর প্রতিষ্ঠিত। ভারতের অহিংসা-ব্রত, সংযম, সদাচার, ধর্ম্ম-বিশ্বাস সমগ্র প্রাচ্যকে ত্যাগের দিকে লইয়া গিয়াছিল।

আজ পাশ্চাত্য সাহিত্য জগদ্ব্যাপ্ত। সেইজন্য প্রাচ্য সাহিত্যও দিন দিন ভোগের দ্রব্য হইতেছে। প্রাচীন যুগের ত্যাগপূত সমাজের সভ্যতা ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতেছে। তপোবনের নিভৃত ছায়া-তলে, যেখানে মানুষ একদিন বিশ্ব-প্রকৃতির সহিত মিলিতে পারিয়াছিল, আজ সেখানে সে সহরের জন-সম্পদ-পূর্ণ প্রাসাদের মধ্যে সত্য বস্তু অন্বেষণ করিতেছে। জন-বিরল তটিনীর তীরে যেখানে মানুষ একদিন অন্তরের সৌন্দর্য্যকে প্রকাশ করিয়াছিল, সেখানে আজ মানুষ কলকারখানা স্থাপন করিয়া বহির্জ্জগতের মাধুরী প্রকাশ করিতেছে। তথাপি প্রাচ্যের সাহিত্য সেই ত্যাগপূত গৌরবকেই সাদরে বক্ষে ধারণ করিবে।

বিক্রমাদিত্য যখন ভারতের সম্রাট ছিলেন, শক, হূন, চীন, পারসি, রোমান, গ্রীক্ প্রভৃতি জাতিরা তখন আমাদের দেশের চতুর্দ্দিক ঘিরিয়া ফেলিয়াছিল। সে সময়ে তপোবন ও নির্জ্জন নদীতটের গৌরব অনেকখানি নষ্ট হইয়াছিল। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্যশালীরা প্রাচ্যের সভ্যতা-কেন্দ্র ভারতের বুকে ভোগের প্রভাব আনিয়াছিল। কিন্তু বিক্রমাদিত্যের সভাকবি কালিদাস, ঐশ্বর্য্যমদগর্ব্বিত, বিচিত্র-হর্ম্ম্য বিভূষিত রাজসভাতলে বসিয়া ভারতের অতীত গৌরবকে ভুলিয়া যান নাই। তিনি মানুষের ভোগ-লিপ্সাকে তুচ্ছ করিয়া শান্ত তপোবনের মধ্যে আর্য্য ঋষিদের সাধনালব্ধ ত্যাগপূত আদর্শকেই সাহিত্যের মধ্যে আনিয়াছিলেন।

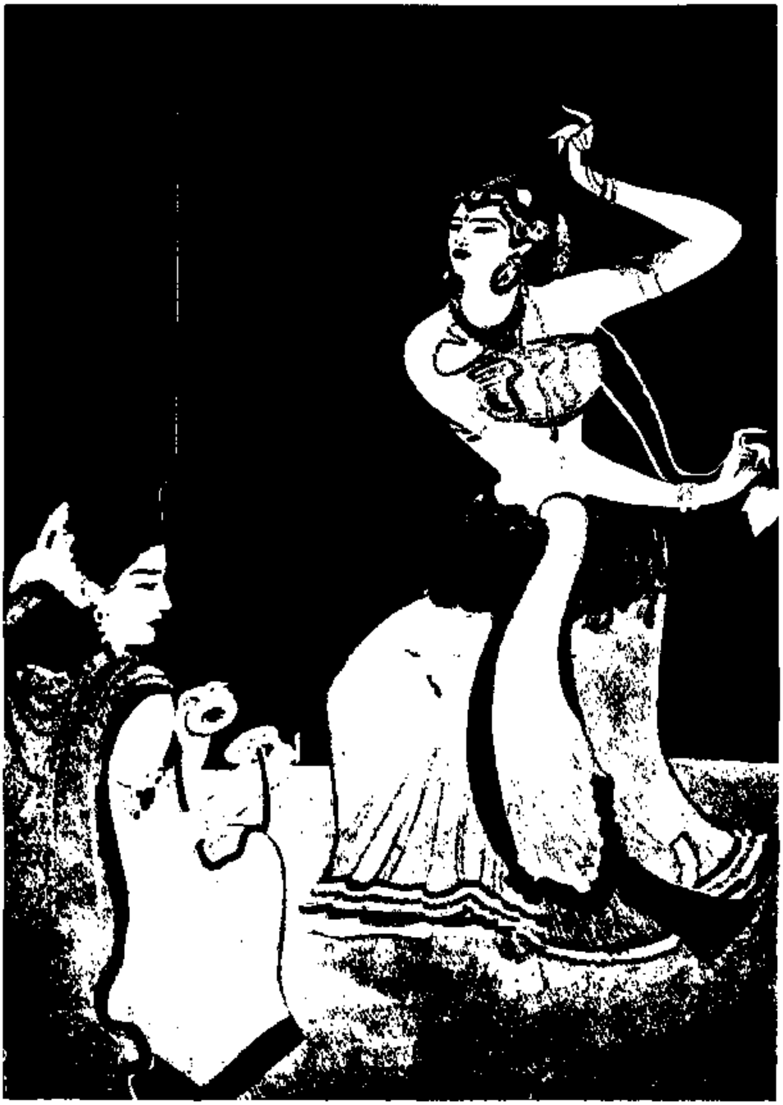
ভোগবাসনাপূর্ণ পাশ্চাত্য সাহিত্য জগতের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িলেও জগতের শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ মনীষিগণ ত্যাগের পূর্ণমূর্ত্তি ভারতের অতীত সভ্যতার দিকে তাকাইয়া দেখিতেছেন। আজ পাশ্চাত্য বিশ্বের মধ্যে চিরন্তন সত্যের অন্বেষণ করিতেছে।

কলহ, দুঃখ, দারিদ্র্য ও ভোগলিপ্সার জন্য মানুষের সাধনা অনেক পিছাইয়া গিয়াছে। সেইজন্য মানুষের সঙ্গে মানুষকে ভ্রাতৃভাবে মিলিতে হইবে। জগতের সাহিত্য এই মিলনের বাণী জগতের বক্ষে প্রচার করিতেছে। ভারতের সাহিত্য এই মিলনের বাণী চিরকাল প্রচার করিয়াছে। তাই যুগে যুগে ভারতের বুকে বুদ্ধ, শঙ্কর, রামানুজ, কবীর, নানক, চৈতন্য প্রভৃতি মহামানবের আবির্ভাব হইয়াছে। আজিও ভারতের বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী প্রভৃতি মনীষিগণ নবযুগের মিলন-পুরোহিত হইয়া ভারতের ত্যাগপূত সাহিত্য জগতকে বিলাইতেছেন। ভারত-সাহিত্য আজ বিশ্ব-সাহিত্যের উপর ক্রমশঃ প্রভাব বিস্তার করিতেছে।

সাহিত্যকে মহাসমুদ্রের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। কত মণি রত্ন যে ইহার মধ্যে আছে, তাহা কেহ জানে না। সন্ধানী মানুষ এই মহাসমুদ্র মন্থন করিয়া কত রত্ন তুলিয়াছে; তবু এই রত্নের শেষ নাই। অতল-স্পর্শ মানব হৃদয় এই সমুদ্রের তল পাইয়াছে। যে কয়টী রত্ন মানুষ উদ্ধার করিয়াছে, তাহা লইয়াই সে এই মহাসমুদ্রের কল্লোল-ধ্বনি-মুখরিত-সঙ্গীত শুনিতেছে।*

শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী

* বরাহনগর পিপ্‌লস্‌ লাইব্রেরীর ষ্টাডি সারকেল সেকসানে লেখক কর্ত্তৃক পঠিত।



বিচিত্রা　　　　　　দেবদাসী

ভাদ্র, ১৩৩৮　　　　　　শিল্পী—শ্রীযুক্ত বাসুদেবন্

সূত্র

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র দাস

যত কথা সে বলে, তার ভেতর অনেক বেশীই না-বলা থেকে যায়। কম কথা-কওয়া তার স্বভাব। সে কাঁদতে পারে না, নিজের প্রয়োজনের কোনো জিনিষ চাইতে জানে না—চায় না। এ যেন সমস্ত মানুষ-জাতটার ওপর তার বিরাট অভিমান।

একা থাক্‌তে তার ভালো লাগে। নিশুতি রাতে বিছানা ছেড়ে উঠে' পথে-পথে ঘুরে বেড়ায়, নদীর তীরে তীরে,—আকাশের তারার সাথে প্রহর জাগে।

থাকে সে সহরতলীর এক ব্যারাকে। সেখানে থাকে না, এমন ধরণের লোক পৃথিবীতে খুব কমই আছে। লোকে বলে, ওটা মানুষের মিউজিয়াম। সত্যি তাই—কিন্তু কেবল মানুষের নয়, সব জিনিসের। এক একখানি খোপ্‌রি নিয়ে এক একজনের জগৎ—এক একটি ক্ষুদ্র মিউজিয়াম।

দিনের বেলায় কে কোথায় থাকে, তার কোনো পাত্তা মেলে না। হয়তো কেউ পথে-পথে ভিক্ষে করে বেড়ায়, কেউবা 'চক্ষুরত্ন' বজায় থাক্‌তেও অন্ধের ভাণ করে' পথিকদের করুণা আকর্ষণ করে, কেউ বা ষ্টেশনের ভিড়ের মাঝে অসাবধানী যাত্রীর পকেট হাত্‌ড়ায়—এই সব তাদের পেশা।

কিন্তু রাত্রির অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গেই তারা এসে এই ব্যারাকের খোপ্‌ড়িগুলো দখল ক'রে বসে।

সারাদিনের অভিজ্ঞতার আলোচনা হয়। ঝগ্‌ড়া হয়—মারামারি, কাড়াকাড়ি, ব্যভিচার।

তারপর ধীরে ধীরে কোলাহল নিভে যায় -

নিঝুম নিশুতি রাত মড়ার মতো পড়ে' থাকে।

এই ব্যারাকেরই ওপরের একটা খোপ্‌রিতে নবীন থাকে।

মানুষের দুর্ভাগ্য যখন তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে টেনে এনে তাকে পঙ্কের মাঝে নামিয়ে দেয়, তখন কিছু বল্‌বার থাকে কি? নবীনেরও কিছু বল্‌বার ছিল না।

মেঝের এক প্রান্তে একটা জীর্ণ আধ-ময়লা বিছানা-পাতা, তার ওপর তেলচিটে-পড়া দুটো বালিস, জানালার ধারে একটা পা ভাঙা চেয়ার, আর এখানে-ওখানে দু'একটা খুঁটিনাটি জিনিষ,--আর কিছু না। সে যেন এই ব্যারাক্-জীবনের ভেতরেই সম্পূর্ণ একটি আলাদা সমাজের লোক—তার সঙ্গে এদের কোনোই সামঞ্জস্য নেই।

কিন্তু মানুষে তাকেও ঝেঁটিয়ে বা'র ক'রে দিয়েছে, জীর্ণ আবর্জ্জনার মতো—পথের পাশের পচা আস্তাকুঁড়ের মতো। অপরাধ অসংখ্য—দারিদ্র্য, পরিচয়হীন জন্মসূত্র, আরো কতো কি! তার মনের সুপরিণতি দিয়ে মানুষ তাকে বিচার করবে-- সভ্য-মানুষ এত বোকা নয়!

সন্ধ্যা হয় হয়। পশ্চিমের আকাশটার গায়ে কে যেন খানিকটা সিঁদুর লেপে দিয়েছে।

সেই দিকে মুখ ক'রে জানালার গরাদে ধ'রে দাঁড়িয়ে আছে নবীন। পৃথিবীর সভ্য-মানুষের নিষ্ঠুরতার ছাপ তার মুখে-চোখে—সর্ব্বাঙ্গে।

নীচে ব্যারাকের সাম্‌নে একটি মেয়ে এসে দাঁড়ায়। বুকের উপর তার ছোট্ট একটি শিশু চাম্‌চিকের মতো আঁক্‌ড়ে' আছে। নবীন সেই দিকে তাকাতেই মেয়েটি হাত ইসারা ক'রে তাকে ডাকে।

কিন্তু নবীন নীচে নেমে যেতে-না-যেতেই দেখে, ব্যারাকের নীচে-তলার কয়েকটা লোক মেয়েটাকে ঘিরে' দাঁড়িয়েছে।

বেশ হৈ-চৈ বেধে গেছে। নবীন কাছে গিয়ে যা' বুঝ্‌লে, তা' এই—মেয়েটি বিদেশী, আজ্‌কের রাত্তিরের মতো তাদের এখানে একটু আশ্রয় চায়। দয়া প্রদর্শনের এমন সুযোগটা কে লাভ করবে—এই নিয়ে কাড়াকাড়ি আর হৈ-চৈ।

ও পাশে ব্যারাকেরই কয়েকটা মেয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই গণ্ডগোলটাকে বেশ উপভোগ করছে এবং মেয়েটির দিকে তাকিয়ে মুচ্‌কি হাসচে, দু' একটা কুৎসিৎ ইঙ্গিতও করচে।

নবীন মেয়েটির আপাদমস্তক একবার চোখ বুলিয়ে দেখে নেয়। বয়স বোধহয় বাইশ-তেইশ হবে। মাতৃত্বের পরিপূর্ণ গৌরবও তার দেহ-ঐশ্বর্য্য থেকে যৌবনকে শুক্‌নো-পাতার মতো খসিয়ে দিতে পারেনি। রূপ বল্‌তে তার কিছুই নেই,—কিন্তু সে-বয়সে রূপ না-থাক্‌লেও নারী পুরুষের চোখে অভিনব হ'য়ে ধরা দেন, তার সে বয়স এবং যৌবন আছে।

মেয়েটি কিন্তু লোকগুলোর এই আত্ম-কলহে বেশ একটু কৌতুক অনুভব করছিল। দাক্ষিণ্য-প্রদর্শনের এমন প্রতিযোগিতার বহর সে হয়তো আর দেখেনি।

নবীন সেদিকে খেয়াল না করে মেয়েটিকে বল্‌লে, তুমি এখান থেকে চ'লে যাও। এখানে আশ্রয় মিল্‌বে না। এখানে মানুষ থাকে না—তা, বুঝ্‌তেই পারছ হয় তো।

মেয়েটি চিন্তাকুল জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে নবীনের দিকে একবার মুখ তুলে তাকায়।

নবীন কণ্ঠস্বরে একটু বিরক্তি ভরে' আবার বলে, আঃ! কিছুই কি বুঝ্‌তে পারছ না?—এতই কি ছেলেমানুষ তুমি? বলছি এখানে আশ্রয় মিল্‌বে না। চলে' যাও—ভালো হবে।

এটুকু তাড়াতাড়ি বলে ফেলেই সে আবার ব্যারাকের ভিতর ঢুকে পড়ে। বেশী কথা সে বল্‌তে পারে না—ধৈর্য্যের মাত্রাও কম। সিঁড়ি বেয়ে খানিকটা পথ উঠে' সে আবার পিছন-ফিরে তাকায়। মেয়েটি তখনো লোকগুলোর দিকে চেয়ে আগ্রহ-ভরা মুখ তুলে দাঁড়িয়ে ছিল।

নবীন এবার দস্তুরমতো রেগে গিয়ে তর্‌ তর্‌ ক'রে নেমে এসে একেবারে মেয়েটার একটা হাত ধরে' টান্‌তে টান্‌তে বল্‌লে, চলো—

মেয়েটা তার সঙ্গে সঙ্গে ঘরে এসে ঢোকে। বাইরের জনতা তখন শিকার হাত-ছাড়া হওয়ার ক্ষোভে ওইখান থেকেই বিশ্রীভাবে গালাগালি দিতে সুরু করে। নবীন সেদিকে কান না দিয়ে মেয়েটিকে ব'লে, ওই কোণে একটা বাটিতে খানিকটা দুধ আছে, ছেলেটাকে খাওয়াও। আর তুমি কি খাবে?—আজ আর কিছু জুটবে না; আমার খান কয়েক রুটি আছে, তাই ভাগাভাগি ক'রে দু'জনে খাওয়া যাবে' খন।

নবীন তার বিছানা মেয়েটির জন্য ছেড়ে দিয়ে, নিজের জন্য একটু ইতস্ততঃ কর্‌তে থাকে। মেয়েটি একটু হেসে বলে, এতবড়ো উপকারটা কর্‌লেন, আর তার বিনিময়ে আপনাকে আমি এই ঠাণ্ডা-রাতে বাইরে চ'লে যেতে বোল্‌বো—এতখানি অকৃতজ্ঞ বোধ হয় কেউ-ই হতে পারে না।

নবীন অগত্যা ঘরের অন্য পাশে একটা কম্বল পেতে শুয়ে পড়ে।

মেয়েটি কিন্তু শিশুটিকে শুইয়ে দিয়ে, আলো নিবিয়ে জান্‌লার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

একটুখানি ফিকা জ্যোছনা ঘরের মাঝখানে এসে পড়েছে। ঘরের জিনিষ-পত্তর সব আবছা আলো আঁধারে কেমন দেখায়! একটা টিক্‌টিকি দেয়ালের গা বেয়ে এদিকে ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে—এই নিশুতি রাতে ওর চোখেও ঘুম নেই! দূর বনান্তরাল থেকে একটা কুকুরের গলার আওয়াজ ভেসে আস্‌চে। নিশীথ-বাতাস মুখচোরা!

নীচের কুঠ্‌রীগুলোতে তখনো মাঝে-মাঝে বিকট কোলাহল শোনা যায়। কখনো মাতালের মাতলামী, কখনো নারীকণ্ঠের বিশ্রী গানের দু'একটা ভাঙা টুক্‌রা—কখনো হাসির হর্‌রা। মেয়েটি কিন্তু বিশেষ উৎসুক হ'য়েই কাণ পেতে সে-সব শুন্‌ছে।

সে একবার নবীনের দিকে ফিরে চাইলে। জীর্ণ ময়লা কম্বলটার ওপর সে তখন দিব্যি আরামে ঘুমিয়ে পড়েছে। মুখখানিতে একটি নিবিড় প্রশান্তি। ওর দীর্ঘ শ্বাস-প্রশ্বাস-গুলো ঘরের মধ্যে হিস্‌ হিস্‌ কর্‌চে।

কি মনে ক'রে মেয়েটি একবার তার খুব কাছে এগিয়ে গেল। তার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে' কি যেন দেখ্‌তে লাগ্‌লো।

তারপর আবার ফিরে এসে জানালার গবাদের ওপর মাথা রেখে স্তব্ধ হ'য়ে বসে রইলো।

আবার একটু পরেই শিশুটির কাছে গিয়ে ইচ্ছে করেই যেন তাকে জাগিয়ে দেয়। কাঁচা ঘুম ভেঙে যাওয়াতে ছেলেটা চীৎকার করে' কেঁদে ওঠে।

সে-কান্না শুনে নবীনেরও আচম্‌কা ঘুম ভেঙে যায়। সে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে দেখে, সে ছেলেটিকে কোলে নিয়ে স্তন্যপান করাচ্ছে।

নবীন ধীরে ধীরে আবার ঘুমিয়ে পড়ে নির্ব্বিকার ভাবে।

তার দিকে চেয়েই মেয়েটি এবার শিশুটিকে কোলে নিয়ে ভুম্ ভুম্ করে দরজার কাছে যায় এবং দড়াম্ করে' শব্দ করে দরজাটা খুলে ফেলে।

নবীন এক লাফে বিছানার ওপর উঠে' বসে' চীৎকার ক'রে ওঠে, চোর—চোর—

মেয়েটি দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ পিছন ফিরে জোর গলাতে বলে, আমি চোর নই। ইচ্ছে হয়, খুঁজে-পেতে দেখ্‌তে পারো। কিন্তু তুমি এখানে কেন আমায় আশ্রয় দিলে?—কে-ন—কেন—?

মেয়েটির শেষের দিকের কথাগুলো একটু বেশীরকম কেঁপে ওঠে, একটুখানি ভারীও বোধ হয়।

কিন্তু নবীন কিছু বল্‌বার আগেই মেয়েটি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে।

নবীন বোকার মতো বিছানার ওপর বসে থাকে, এক পা-ও নড়ে না। চোখের ঘুমও যেন তার চোখের পাতা থেকে মেয়েটির সঙ্গেই পালিয়ে গেছে।

হঠাৎ নীচে-তলা থেকে একটা বিকট আনন্দ-কোলাহল ভেসে আসে নবীনের কাণে। সে উৎসুক হ'য়ে খানিকক্ষণ কাণ পেতে থাকে, তারপর আগ্রহ চাপ্‌তে না পেরে পা টিপে টিপে অন্ধকারের ভিতর দিয়ে নীচে নেমে যায়।

একটু পরেই সে আবার ফিরে আসে। অন্ধকারে মুখটা দেখা যায় না।·· মেয়েটি যে-বিছানাটায় শুয়েছিল, সেখানে সে মুখ গুঁজে পড়ে থাকে মড়ার মতো—

নিশুতি রাতের তারা তেম্‌নি করে মাটীর পৃথিবীর পানে চেয়ে প্রহর জাগে, আর মিটমিট করে হাসে।*

শ্রীসত্যেন্দ্র দাস

* রুশীয় গল্প থেকে।



সঙ্কলন

ভারতীয় সঙ্গীত ও রবীন্দ্রনাথ

শ্রীযুক্ত ভীমরাও শাস্ত্রী

আমি অনেক দিন হইতে মনে করিয়াছিলাম পূজনীয় গুরুদেবের গান সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব কিন্তু নানা কারণ বশতঃ তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। আজ এই উৎসবের অবসরে সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিতেছি।

সকলেই জানেন আমাদের মধ্যে সঙ্গীত ও গীত এই শব্দ প্রচলিত আছে। এই দুইটি শব্দকে বিচার করিয়া দেখিলে ইহাদের মধ্যে অর্থ ভেদ বিশেষ করিয়া দেখিতে পাই। যেখানে স্বরই প্রধান ভাবে থাকে তাহাকে বলে সঙ্গীত, আর যেখানে ভাবের প্রাধান্য থাকে, সুর কেবল ভাবেরই অনুসরণ করে তাহাকে বলে গীত।

তর্ক শাস্ত্রের মত সঙ্গীত শাস্ত্রেও লক্ষ্য লক্ষণের সমাবেশ আছে। লক্ষ্য মানে শুধু গান অর্থাৎ কথা। লক্ষণ মানে রাগ ও তাহার নিয়মাদি অর্থাৎ শাস্ত্র। এই শাস্ত্রের পৃষ্ঠপোষকতা না থাকিলে কলার উন্নতি হইতে পারে না। এস্থলে সন্ধি প্রকাশ রাগের উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। যেমন ধরুন পূরবী, ইহাতে কোন্ সুরের প্রাধান্য রাখিতে হয়, কোমল ঋ ও কড়ী মধ্যম কি পরিমাণে ব্যবহার করিতে হয়, বাদী ভেদে রাগ ভেদ কি প্রকারে করা যাইতে পারে এইরূপ সমস্ত নিয়মগুলি কলাবিৎ না জানিয়া, সহস্র রকমের তান দিন না কেন ও যত প্রকারে হউক হাহাকার করুন না কেন তিনি কিছুতেই ভাল শ্রোতাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিবেন না ইহা নিশ্চিত।

রাগের নিয়ম একত্র করিয়া গ্রন্থন করাকেই গ্রন্থ সঙ্গীত বলে। চৌষট্টি কলার মধ্যে লোকের মনোরঞ্জন করিতে সঙ্গীতই শ্রেষ্ঠ একথা সকলেই স্বীকার করিবেন।

কিন্তু রঞ্জকতায় রুচি ভেদ অনুসারে সঙ্গীতেরও নানা ভেদ হইয়াছে। নানা রুচি অনুসারে তাহাকে আসরে নামিতে হইয়াছে বলিয়া প্রাচীন সঙ্গীত আজ প্রায় নাম শেষ অবস্থায় উপনীত, আর সঙ্গীতজ্ঞ ওস্তাদগণও হেয় হইয়া দাঁড়াইয়াছেন।

এটা অবশ্য স্বীকার্য্য যে সব কিছুই পরিবর্ত্তনশীল। যেমন এখন আর শব্দকল্পদ্রুম ও বাচস্পত্য অভিধানে চলে না, অজস্র শব্দ ভাষায় নূতন নূতন প্রবেশ করিতেছে বলিয়া নূতন অভিধানেরও দরকার। তেমনি সেই প্রাচীন মান্ধাতার আমলের রাগরাগিণীই স্থিরভাবে টিকিতে পারেনা, নূতন নূতন পরিবর্ত্তন আসিবেই। লোকের রুচি যেমন যেমন বদলাইতেছে সঙ্গীতও সেই রুচির অনুগামী বলিয়া বদলাইতে থাকিবে। এই বদলের কর্ত্তা কাল। তবে এক কথা যে এই পরিবর্ত্তনের সময় সঙ্গীতজ্ঞগণকে বিশেষ সতর্ক থাকা দরকার। আকবরের দরবারে তানসেন যে সব রাগ সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার কিছু পরিচয় পাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে এ সব বিষয়ে কোন গ্রন্থ বা স্বরলিপি না থাকায় বর্ত্তমানে অশিক্ষিত ওস্তাদদের মধ্যে মতভেদ থাকা মারাত্মক নহে।

তারপর মুসলমান্ আমল হইতে সঙ্গীতে এক মস্ত ভুল থাকিয়া গেল যে ভাবে ও সুরে মিল হইল না। তাহার প্রধান কারণ মনে হয়—আমাদের সাহিত্যের সঙ্গে তাঁহাদের পরিচয় ছিল না বলিয়া তাঁহারা গানে ভাব দিতে পারেন নাই। ভাব ও সুর সূর্য্য ও রৌদ্রের মত পরস্পর অবিযুক্ত ভাবে থাকিবে।

আজকাল কলাবিদ্‌গণ সবদিক সামলাইয়া চলিতে পারেন না। শ্রোতারা হয় তো দেখিতে চান ভাব ও সুর এক সঙ্গে মিলিল কিনা আর ওস্তাদ চলিলেন ঠিক তাহার উল্টা পথে, সে জন্য আমাদের প্রায় ওস্তাদের গানে রাগের ও ভাবেতে মিল নাই। ধরুন আশাবরী করুণ-রস-প্রধান

রাগিণী, কিন্তু তাহাতে আদি রসের অনেক গান আছে। পরজের সুরটি কেহ যেন ডাকিতেছে এই ভাব সূচিত করে কিন্তু ঐ রাগে "কারী কারী কমরিয়া" অর্থাৎ হে গুরু, আমায় কালো রঙের কম্বল দাও প্রভৃতি এই ভাবের প্রাচীন ওস্তাদী গান রহিয়াছে। ইহাতে রাগ ও ভাবের মিল নাই। কিন্তু উপর্য্যুক্ত ঐ দুই রাগে পূজনীয় গুরুদেবের আশাবরীতে "নিশিদিন মোর পরাণে" আর পরজে "ডাকো এ নিশীথে" এই গান দুইটির তুলনা করুন, এখানে রাগে ও ভাবের মিলন অপূর্ব্ব। এরূপ শত শত গানে তাঁহার ভাব ও রাগের ঐক্য বিরাজমান।

ভাবুক সঙ্গীত-গায়ক বৈষ্ণবরা ভাব দিতে পারেন কিন্তু সুর দিতে পারেন না, কারণ তাঁহারা সুরের বৈচিত্র্য শিক্ষা করেন নাই। আমি যত প্রকার কীর্ত্তনাদি এদেশে শুনিয়াছি তাহাতে ধানশ্রী কানাড়া জয়জয়ন্তী প্রভৃতি রাগের গান শুনা যায়।

পূজনীয় গুরুদেবের প্রাচীন ব্রহ্ম-সঙ্গীতে বিশুদ্ধ রাগ রাগিণীর অনেক গান আছে, আবার নূতন গান গুলিতে নূতন নূতন সুর অনেক আছে যাহা ভাবের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে মিলিত। কর্ণাটক অঞ্চলে মুসলমানের প্রভাব বিস্তৃত হয় নাই, সেখানে যাহা শুনা যায় তাহা দেব-দেবতার স্তুতি, অন্য ভাবের বা রসের গান নাই, কাজেই তাহাও অসম্পূর্ণ। আর কেবল (ওস্তাদের) সুরের গান অসম্পূর্ণ। অতএব ভাব রস সুর তাল প্রভৃতিতে সর্ব্বাঙ্গ পরিপূর্ণ গান যদি কাহারো থাকে তাহা পূজনীয় গুরুদেবের। আজ না হউক দুদিন পরে আমাদের এই গান সকলেরই অবশ্য শিক্ষা করিতে হইবে। কাজেই পূজনীয় গুরুদেব শুধু যে সাহিত্যের নবযুগ-প্রবর্ত্তক তাহা নহে তিনি সঙ্গীতেরও নবযুগ-প্রবর্ত্তক। সাহিত্য ও সঙ্গীত দুইটি এক জিনিস হইলেও কদাচিৎ ইহাদিগকে একত্র দেখা যায় কিন্তু ঐ দুইটি পূজনীয় গুরুদেবে বর্ত্তমান্। তাহার নিদর্শন উল্লেখ করা বাহুল্য।

[শান্তিনিকেতন পত্র হইতে]

শাওনের গান

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় এম-এ

শাওনে প্রকৃতি মনোকোণে
ক্রন্দনে রোধে প্রাণপণে,
আকুলিয়া সে যে ব্যাকুলিয়া হিয়া—
বাহিরিয়া আসে ক্ষণে ক্ষণে ;
পেয়ে মনোবন আজি নিরঞ্জন,
ঘন নবঘন করে গরজন,
এত আলোড়ন, এত বিলোড়ন,
সহে রে কেমনে ভাবি মনে।

কা'রা প্রিয়হারা করে ক্রন্দন ?
আঁখিগলা ধারা করে বন্ধন—
নাহি আজি ছেদ, নাহি কোন ভেদ-
ধরা, রামগিরি, নন্দনে !
আজি চারিধারে অযুত, লক্ষ,
বিগলিত চিত বিরহী যক্ষ,
আষাঢ়েও ছিল বাঁধিয়া বক্ষ—
শাওনে ক্ষিপ্ত জনে জনে।

মানুষ ও বিজ্ঞান

শ্রীযুক্ত মতিলাল সেন-গুপ্ত বি-এস্‌-সি

বিজ্ঞান মানুষকে কি দান করিয়াছে, এইরূপ প্রশ্ন করা বর্ত্তমানে যথেষ্ট ধৃষ্টতা বলিয়াই গণ্য হইবে, কিন্তু তাহা হইলেও এইরূপ কার্য্য করা একেবারে অন্যায় নয়। বিজ্ঞান আমাদিগকে অনেক কিছু দিয়াছে এবং আধুনিক বিজ্ঞানের সহিত আমাদের দৈনন্দিন জীবন ওতপ্রোত ভাবে জড়িত রহিয়াছে। বিজ্ঞানের প্রভূত দানের প্রমাণ আমাদের চক্ষের সম্মুখে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও, তাহার দান সম্বন্ধে আমাদের মনে মাঝে মাঝে একটা কৌতূহলী সংশয়ের উদয় হয়। বিজ্ঞান দুই হাতে তাহার ঐশ্বর্য্যের ভাণ্ডার খুলিয়া আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছে; তাই আজ নিতান্ত কৌতূহলের বশেই মনে আপনি একটী প্রশ্ন উদিত হইতেছে—'বিজ্ঞান আমাদের কি দিয়াছে'? এক কথায়, বিজ্ঞান আমাদিগকে অনেক কিছু দিয়াছে বলিয়াই আমরা আজ সেই প্রশ্ন করিতে সাহসী হইয়াছি। এইরূপ প্রশ্ন আপাতদৃষ্টিতে pradoxical মনে হইলেও দেখা যায়, এই প্রশ্ন বিদ্বৎ-সমাজে কোন না কোন আকারে দেখা দিয়াছে। তাই আজ স্যার অলিভার লজ, বার্ট্রাণ্ড রাসেলের মত বহু পাশ্চাত্য মনীষী নিতান্ত বিজ্ঞানের ক্রোড়েই লালিত পালিত হইয়াও মহামানবের নানাবিধ মহাসমস্যার জন্য বিজ্ঞানকেই প্রকারান্তরে দোষী সাব্যস্ত করিতেছেন। দুনিয়ার সমস্ত সমস্যার মূলেই নাকি বিজ্ঞানের কূট হস্তক্ষেপ রহিয়াছে, তাই সেই সব সমস্যার সমাধানের জন্য প্রতিদেশেই এক ধুয়া সুরু হইয়াছে যে,—আধুনিক যন্ত্র-বিজ্ঞানকে ছাড়,—Machineryর প্রশ্রয় দিও না।

উপরোক্ত প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে হইলে প্রথমেই বিচার করিতে হয়, 'বিজ্ঞান' শব্দে কি বুঝায়। বিশেষ ভাবে জ্ঞানলাভ করাকেই যদি বিজ্ঞানের সম্যক্ অর্থ বলিয়া মানিয়া লওয়া যায়, তবে জ্ঞানলাভ করার দরুণ মানুষ অসুখ, অশান্তি ভোগ করিতেছে, এবং জ্ঞানলাভ করার দরুণই মানুষের সমস্যা দিন দিন বাড়িয়া চলিতেছে, এইরূপ মত প্রকাশ হয় ত সকলের মনঃপূত হইবে না এবং হওয়া উচিত নয়। প্রকৃত বিজ্ঞানের বাণী একটু সুগভীর, তাহার গণ্ডী এতটা সীমাবদ্ধ নয়। Tennyson প্রকৃত বিজ্ঞানের বাণীটিকেই কবির ভাষায় বলিয়াছেন :—

"So runs my dream. But what am I?
An infant crying in the night;
An infant crying for the light;
And with no language but a cry!"

তাহা হইলেই দেখা যায়, মানব সমাজে যে সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, তাহার জন্য প্রকৃত বিজ্ঞানকে সম্পূর্ণ দোষী করা চলে না। যদি কোথাও কখনও একটী বৃহৎ অশ্বত্থ গাছের উৎপত্তি হয় এবং তাহার পরিবর্ত্তে লতা-গুল্মের দ্বারা যদি দৈবাৎ একটী ঝোপ সৃষ্টি হইয়া যায়, তজ্জন্য অশ্বত্থ গাছ দায়ী নয়। নদীবক্ষ মথিত করিয়া জলযান দ্রুতবেগে চলিয়া যায়, তাহার ফলে যে ঊর্ম্মিমালার সৃষ্টি হয়, তাহা যদি পারের মাটীকে আঘাত করিয়া ক্রমশই পারকে নদীর বক্ষে টানিয়া লইয়া যায়, তজ্জন্য জলযানকে সম্পূর্ণ দোষী করিলে চলিবে না। সমুদ্র মন্থন করিতে হইলে শুধু অমৃতকেই চাই, এইরূপ বলিলে চলিবে না, তার সঙ্গে যে বিষের উদ্ভব হইবে, তাহাকেও সামলাইতে হইবে। বিজ্ঞান সেইরূপ জ্ঞান-সমুদ্রোদ্ভবা রূপসী; তার একহাতে বিষকুম্ভ আর একহাতে অমৃত ভাণ্ড। অমৃতের আস্বাদ করিতে হইলে তাহার বিষেরও খানিকটা অংশ লইতে হইবে। প্রকৃত বিজ্ঞান শুধু অমৃতই দেয়; তাহার শাখা-বিজ্ঞান শুধু বিষই বিলায়। আমার মনে হয় যে-সব কারণে আমরা বিজ্ঞানকে দোষী করিতে ইচ্ছা করিতেছি, তাহা এই বিষের অধিকারী শাখা-বিজ্ঞানের পক্ষেই প্রযোজ্য, অর্থাৎ এক কথায়, এই শাখা-

বিজ্ঞান হইল অধুনাতন শিল্পবিজ্ঞান বা Industrial Science এবং দুনিয়ার সমস্ত আর্থিক সমস্যার উৎপত্তিই হইল, এই শাখা-বিজ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া। প্রকৃত বিজ্ঞানের পাশে এই শাখা-বিজ্ঞানের উৎপত্তিকে লক্ষ্য করিয়া কোন কোন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত বিজ্ঞানের ব্যবহারিতাকে (application), prostitution of scince বলিতেও কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। এরিষ্টট্‌ল্‌ও এককালে বলিয়াছিলেন—'Industrial work tends to lower the standard of thought'।

বিজ্ঞানের দানকে যদি সংখ্যায় এক দুই করিয়া গুণিয়া হিসাব করিতে হয়, তবে তাহার সংখ্যা বৃহৎ বই ক্ষুদ্র হইবে না। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, এই বহুসংখ্যক দানের দ্বারা বিশ্বমানব কতটুকু উপকৃত হইয়াছে। বিজ্ঞান-সমুদ্র মন্থনের ফলে যে অমৃত ও গরলের উদ্ভব হইল, তন্মধ্যে অমৃত বেশী না গরল বেশী? আর, যে অমৃতটুকু উঠিয়াছে তাহাতে মানবের অমরত্ব লাভ হইবে কি? না, বিষের ক্রিয়ায় সেই অমৃতের গুণটুকুও লুপ্ত হইবে? এই প্রশ্নকে লইয়াই এই প্রবন্ধের উৎপত্তি, সুতরাং ইহার একটু বিশদ আলোচনা আবশ্যক।

রেল, ষ্টীমার, টেলিগ্রাফ, বেতার, এরোপ্লেন, কলকারখানা ইত্যাদি করিয়া এমন কতগুলি অভিনব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার আজকাল মানুষের জীবনে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে যে, ইহার একটীকে বাদ দিলে সমাজদেহ বিশ্রীভাবে পঙ্গু হইবে। যে আদিম দম্পতি সয়তানের পাল্লায় জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইয়া নন্দন-বন হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন, তাঁহাদেরই অধস্তন সন্তান-সন্ততি আজ বিজ্ঞান-বৃক্ষের ফলাস্বাদ করিয়া ঊর্ণনাভের মত স্বরচিত জালে আবদ্ধ হইয়া বাহির হইবার পথ খুঁজিয়া পাইতেছে না। কয়লা যদি পৃথিবীর গর্ভে স্তূপীকৃত হইয়া থাকিত, তবে হয় ত বিশেষ ক্ষতি হইত না, কিন্তু মানুষ যখন তাহাকে বাহিরে আনিয়া পুড়াইয়া গলাইয়া কাজে লাগাইয়াছে, তখন কয়লার অভাব তাহার সহিবে কেন? কয়লার আল্‌কাতরা হইতে উদ্ভূত শত সহস্র বর্ণে রঞ্জিত বসন পরিধান করিয়া যে নারী নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিতেছেন, তিনি আবার বাঘছাল বা হরিণছাল কিম্বা গাছের বাকল পরিয়া দয়িতের মনস্তুষ্টি করিতে স্বীকৃত হইবেন, ইহা কি বিশ্বাস করা যায়? মাটীর নীচ হইতে খুঁড়িয়া আনিয়া যে সোনা প্রিয়তমার গলায় হার করাইয়া পরাইয়া মানুষ তৃপ্তিবোধ করিয়াছে, তাহার গলায় আবার পৃথিবীর আদিম ভার্য্যার মত মৃতমুণ্ডের মালা পরাইয়া দিতে কোন্ স্বামীর প্রাণে সহিবে? দিয়াশলাই জ্বালাইয়া যে গৃহিণী উনুন ধরান, তিনি আবার পাথরে পাথরে ঘসিয়া আগুন জ্বালিয়া রান্না করিবেন ও তদ্দ্বারা স্বামীপুত্রের দেহপুষ্টি করিবেন, ইহা এখন সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য। বৈদ্যুতিক আলো সুশোভিত ঘরের পরিবর্ত্তে পর্ণকুটীরের এক কোণে একটী মৃৎভাণ্ডে উদ্ভিজ্জ তৈল জ্বালাইয়া সেই স্তিমিত আলোকে বসিয়া বর্ত্তমান বিশ্বজন তাল বা খর্জ্জুর পত্রে নিজেদের ভাব সন্নিবেশিত করিবেন, ইহা এখন কল্পনার বহির্ভূত। এইরূপ আরও শত শত দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়, যাহা শুধুই প্রমাণ করিবে যে বিজ্ঞান আমাদিগকে আশাতিরিক্ত অনেক কিছুই দান করিয়াছে। কেহ কেহ হয়ত বলিবেন—বিজ্ঞান আমাদিগকে অসহায় করিয়াছে। বিজ্ঞান আমাদিগকে তার বেড়াজালে আবদ্ধ করিয়া আমাদের মুক্তির পথ বন্ধ করিয়াছে।

আবার দেখুন, বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে সংযোজন রসায়ন এমন কতগুলি আবশ্যকীয় পদার্থ প্রেক্ষাগৃহে সংযোজিত করিয়াছে, যার জন্য বিজ্ঞানকে ভগবানের একটী আশীর্ব্বাদ বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে এদেশে যে নীলের চাষের প্রবর্ত্তন হইয়াছিল, তার ইতিহাসের মূলে যে কত করুণ ও হৃদয়-বিদারক কাহিনী জড়িত রহিয়াছে, তাহা হয়ত আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। দেশের নরনারীর উপর ধনলুব্ধ প্রভুদের নির্ব্বিবাদ অত্যাচারের কথা হয়ত অধুনা একটা ঐতিহাসিক ব্যাপার মাত্র; কিন্তু এই অত্যাচারের নিবৃত্তি সম্ভব হইয়াছিল, একমাত্র বিজ্ঞানেরই কৃপাবলে। যদি জার্ম্মাণীর প্রেক্ষাগৃহে এই নীল সংযোজিত না হইত, তবে ভারতের নরনারীর উপর যে কি অমানুষিক অত্যাচার চলিত, তা' এখন কল্পনা করা যায় না। সভ্যতার বাজারে রবারের চাহিদা খুব বেশী। এই রবার এককালে রবারের গাছ হইতে নির্ম্মিত হইত এবং তার উপযুক্ত কেন্দ্রস্থল ছিল প্রশান্ত মহাসাগরস্থ দ্বীপপুঞ্জ,

জাভা, সুমাত্রা ইত্যাদি। এই রবার প্রস্তুত কার্য্যের সঙ্গেও তত্রত্য নরনারীর কত হা-হুতাশ, কত অশ্রুবারি যে সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে, আজ তাহা বর্ণনা করিয়া কোন লাভ নাই। কয়েক বৎসর আগে একমাত্র প্রেক্ষাগৃহে বিজ্ঞান এই রবারের সৃষ্টি সম্ভবপর করিয়া মানুষের কিঞ্চিৎ অশ্রু নিবারণ করিয়াছে। এই হিসাবে বিজ্ঞানকে ভগবানের আশীর্ব্বাদ ছাড়া কি বলিব? আজও এমন অনেক জিনিষ আছে, যা' বিজ্ঞান সহজ উপায়ে প্রস্তুত করিতে সক্ষম হয় নাই বলিয়া, প্রভুত্বের উৎপীড়নে কত শত দেশের নরনারীর অশ্রুজলে পৃথিবী-বক্ষ প্লাবিত হইতেছে, তাহার হিসাব কে রাখে?

অন্যদিক্ দিয়া দেখিতে গেলে, বিজ্ঞান মানুষকে দুঃখও কম দেয় নাই। নীলের চাষ, রবারের চাষ কমাইয়া হয়ত বিজ্ঞান মানুষকে অনেকটা অব্যাহতি দিয়াছে, কিন্তু তাহার ফলে বিভিন্ন দেশে কলকারখানার উৎপত্তি হওয়ায় তাহাতে যে অসংখ্য কুলীমজুর খাটিয়া খাটিয়া প্রাণপাত করিতেছে, হৃতসর্ব্বস্ব হইতেছে, ধনগর্ব্বী বণিকদের অত্যাচারের প্রশ্রয় দিতেছে, তজ্জন্য বিজ্ঞান খানিকটা দায়ী নয় কি? প্রতি দেশে কয়লার খনিতে বা চা বাগানে বা কাপড় ও পাটের কলে শ্রমিকদের যে অসহনীয় অবস্থা হইয়াছে, তাহার জন্য বিজ্ঞানের জবাবদিহি নয় কি? অতি পুরাকালে মানুষের অস্ত্র ছিল প্রায়ই বদ্ধমুষ্টি, কোন কোন স্থলে হয়ত দুই একটা গাছ তুলিয়া লড়াই করিয়া কাজ শেষ করা হইত, কিন্তু Stone age, Bronze age ও Iron age করিয়া যে যে যুগ পার হইয়া বর্ত্তমান যে যুগ চলিয়াছে, তাহা কি প্রমাণ করে না যে বিজ্ঞান সুধু মানুষ মারিবার নূতন ও সহজ উপায়ই আবিষ্কার করিয়াছে। বর্ত্তমান যুগে যে সব মারণযন্ত্রের আবিষ্কার হইয়াছে বা হইতেছে, তাহাতে মানুষের মৃত্যুর জন্য বিজ্ঞানকে দোষী সাব্যস্ত করায় আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই এবং হয়ত এমন এককাল আসিবে, যখন বিজ্ঞানকে সাক্ষাৎ যমরূপী ভাবিয়া মানুষ শিহরিয়া উঠিবে।

বিজ্ঞান অর্ণবযান আবিষ্কার করিয়াছে, সাম্রাজ্যান্ধ রাজন্যবর্গ এই সুবিধা পাইয়া দেশে দেশে বিজয়বাহিনী অবাধে চালাইয়া সেই সেই দেশে যেমন বিদেশী সভ্যতার চালান দিয়া নূতন রোগের পত্তন করিয়াছে, আবার সেই সেই দেশ হইতে এমনই সব মারাত্মক রোগের আমদানী করিয়াছে, যে আজ বিশ্বমানব মুক্তির জন্য হাহাকার করিয়া উঠিয়াছে। রোগমুক্তির জন্য বিজ্ঞান যে কিছুই করে নাই এমন নয়, কিন্তু রোগ প্রসারের সহায়তা করিয়া বিজ্ঞান যতটা অপকার বা সর্ব্বনাশ করিয়াছে, ততটা উপকার ত সে করিতে পারে নাই। যেখানে পূর্ব্বে নন্দনকানন ছিল, আজ সেখানে হয়ত রোগের লীলাভূমি হইয়াছে, কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, রোগক্লিষ্ট মানবশিশু আবার করুণনয়নে সেই বিজ্ঞানের দিকেই চাহিয়া আছে। বিজ্ঞানও তাই সদৃপ্ত গলায় বলিতেছে—
'আমিই জ্বেলেছি দীপ, আমিই নিভাব।'

তাই মনে হয়, বিজ্ঞান একাধারে যেমন জীবন, তেমনি মৃত্যু। বিজ্ঞান সুধা ও গরল, এই দুই উপাদানেই গঠিত। তার অমৃতের ভাগী হইতে হইলে, বিষকেও গলাধঃকরণ করিতে হয়। বিজ্ঞানের সহিত মানবতার সম্বন্ধ এখনও সম্পূর্ণ নিরূপিত হয় নাই। আজকাল মানুষ জড়বিজ্ঞানের যেমন আলোচনা করিতেছে, তেমন বিশদভাবে যদি কখনও নর-বিজ্ঞান (Human Science) আলোচিত হয়, তবে হয়ত ভবিষ্যতে বিজ্ঞানে ও মানুষে একটা-মধুর সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিবে।

শ্রীমতিলাল সেনগুপ্ত



দুর্ঘটনা

শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র গুপ্ত

পাত্র—ভূধর চাটুয্যে, বয়স ৩৩।

পাত্রী—ভূধরের আড়াই বৎসরের কন্যা—খুকী।

ভূধরের স্ত্রী—সুভাগিনী।

ডোমজাতীয়া ঝি—রাধাসতী।

প্রথম দৃশ্য

ভূধরের অন্তঃপুর

কাল—বেলা ৭টা

[সুভাগিনী রন্ধনশালার ভিতরে আছে ; সদ্য ঘুম ভাঙ্গিয়া ...য়া ভূধর শয়নগৃহের বারান্দায় স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছে ; উঠানে একজোড়া জুতা রহিয়াছে ; খুকী রান্নাঘরের বারান্দায় বসিয়া একঘেয়ে রোদন করিতেছে এবং ঘুরাইয়া ফিরাইয়া অসংখ্যবার আবৃত্তি করিতেছে—]

—মা, মুড়ি দাও···চারটি দাও, মা, তোমার হু'খানি পায়ে পড়ি—দাও, মা ; আমার পেট পুড়ে গেল দাও মা দু'টি···এইবারটি দাও, মা ; আর আমি চাইব না—মরে' গেলেও চাইব না···দাও, মা, এইবারটি···

ভূধর। দাও না দু'টি ; ম'ল যে মেয়েটা···সহ্যও হ'চ্ছে কানে !

(সুভাগিনী মেয়ের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল)

সুভাগিনী। কি বল্‌লে ?

ভূধর। বল্‌লাম, দাও না মুড়ি না কি চায় মেয়েটা।

সুভাগিনী। চুপ কর্, হারামজাদি—কথা শুন্‌তে দে··· তোরই ওকালতি হ'চ্ছে বুঝি !···কি বল্‌ছ ?

(খুকী কৌতূহলী এবং হঠাৎ আশান্বিত হইয়া চুপ করিল)

ভূধর। মুড়ি দু'টি দাও না সাম্‌নে, খামুক।

সুভাগিনী। এনে দাও না কত্তা।···দেড় পহর বেলায় ঘুম থেকে উঠে হুকুম চালা'তে বস্‌লে ! আমি কি বসে' আছি হাত পা কোলে করে' ?···আরাম কর্‌ছি ?

ভূধর। যা-ই করো, চারটি দিলেই ত' চুকে যায় ! বাসিমুখে আর বক্‌তে পারিনে

সুভাগিনী। থেমে থাক—কে ডাক্‌তে গিয়েছিল ? (খুকীর প্রতি) আয়, দিচ্ছি তোকে মুড়ি। ফেলে যদি চলে' যাও আধ-খাওয়া করে' তবে তখন দেখ্‌ব' তোমার হাড়ের মাসের আলাদা ওজন কত···

খুকী। (পুলকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া) দাও, সবক'টিই খাব বসে' বসে'।

সুভাগিনী। যাচ্ছিস্ কোথায় ? বোস্।

(খুকী বসিয়া পড়িল)

(সুভাগিনী এতবড় বাটির একবাটি মুড়ি আনিয়া খুকীর সম্মুখে ঠাস্ করিয়া রাখিয়া দিল)

খুকী। দু'খানা বাতাসা···

(ভূধর ও-বারান্দায় হাসিয়া উঠিল)

সুভাগিনী। বাতাসা ? দিচ্ছি··

(পোয়াটেক বাতাসা অঞ্জলিপূর্ণ করিয়া আনিয়া প্রদান)

(রাধাসতীর প্রবেশ)

রাধাসতী। হেই দিদিমণি, এলাম···

সুভাগিনী। এলে ? খবর পেয়ে ধন্যি হ'লাম, কৃতার্থ হ'লাম···আমার ভাগ্যির বাড়্‌বাড়ন্তর সীমে নেই।···আর একটু বেলা-কাটিয়ে এলে দু'বেলার বেগার তোমার এক বেলাতেই সারা হ'ত।···বাসি উঠোন্ হা হা ক'র্‌ছে এই বেলা অব্‌ধি···দু'পুর বেলায় গিন্নি আমার খবর দিয়ে এসে দাঁড়ালেন—হেই, দিদিমণি, এলাম।···বামুনের ঘরের আচার কি তোদের ছোটলোকের আচার আচ্‌রণের মত ! তোরা যেমন নোংরা তেমনি লক্ষ্মীছাড়া।···না পারিস্ বাপু, বিদেয় নে, জবাব দে···কাজ কি তোর পথ বেয়ে কষ্ট করে !···

রাধাসতী। হেই, দিদিমণি, রোষ ক'রো না।···দেরী সাধ ক'রে করি নাই গো—পড়্‌শীর ঘরে বড় বিপদ আজ··· মাতুর মাসীর ব্যায়রাম ছিল—সকালবেলা উঠে শুনি ঘরের ভেতর মরে' আছে—ইঁদুরে কি কিসে তার চোখ একটা

কুরে' খেয়েছে···সে কি চেহারা হ'য়েছে মাসীর—ছেই মাগো···

(শিহরিয়া উঠিয়া ঝাঁটা আনিয়া ঝাঁট দিতে লাগিল)

(ভূধর উঠিয়া খিড়কী পুকুরে মুখ ধুইতে গেল)

সুভাগিনী। (খুকীর প্রতি) খাচ্ছিস্, না হাঁ ক'রে গল্পই গিলছিস্?

খুকী। খাচ্ছি, মা। (তাড়াতাড়ি খাইতে আরম্ভ করিল)

সুভাগিনী। (রাধার প্রতি) দেখে এলি? · মাগো, চোখ খেয়ে দিয়েছে কিসে?

রাধাসতী। কি জানি দিদিমণি, তা জানিনে।

সুভাগিনী। নিয়ে গেছে?

রাধাসতী। যাবার যোগাড় হ'চ্ছে দেখে এলাম··· এতক্ষণে বুঝি নিয়ে গেল।···তুমি রোষ করছ ভেবে ছুটে ছুটে এলাম।

(রাধাসতী ঝাঁট দিতে দিতে উঠানে যে জুতাজোড়া পড়িয়া ছিল তাহা পা দিয়া সরাইয়া দিল।)

সুভাগিনী। ও কি করলি?

রাধাসতী। কি, দিদিমণি?

সুভাগিনী। বামুনের জুতো তুই পা দিয়ে ঠেলে দিলি? ··এত বড় স্পর্দ্ধা তোর?······এত বাড় হয়েছে ছোট কের!···দেমাকে চোখে দেখো না!···বামুনের ব্যবহারের তায় লাথি মেরে নেকি আবার শুদোচ্ছিস্, কি দিদিমণি? ভীত্ নেই তোর?···পরকাল নেই? ··

(ভূধরের প্রবেশ)

ভূধর। কি হ'ল?

সুভাগিনী। বামুনের পায়ের জুতো মাথায় করে' বইতে তোরা বর্ত্তে যাস্ ··তাই তুই পায়ে করে' ঠেলে দিলি! ·

ভূধর। ভারি অন্যায়।—(বলিয়া ঘরে গেল)।—

রাধাসতী। হেই, দিদিমণি রোষ করো না···বামুনের বে আমার কপাল পুড়ে যাবে, দিদিমণি; আমার স হবে···বামুন যে কলির দেবতা গো---কলিতে কি দেবতা আছে!···আনমনে পাপ করেছি, দিদিমণি, কমো।···বামুনের জুতোয় এই আমি দণ্ডবৎ করলাম।

(দণ্ডবৎ করিল)

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাধাসতীর বাড়ী

কাল—রাত্রি ৭৷৷০টা

বারান্দায় মাদুরে ভূধর সুখাসীন—
সম্মুখে লণ্ঠন জ্বলিতেছে।

(রাধাসতী ঘরের ভিতর হইতে পান সাজিয়া আনিয়া ভূধরের হস্তে দিল)

রাধাসতী। তামাক খেলে?

ভূধর। খেলাম।

রাধাসতী। কটু লাগ্‌ল' না?

ভূধর। না!······কটু লাগ্‌বে কেন?

রাধাসতী। জল ফিরোয় নি' আজ পাঁচ দিন।·····বস' একটু একলা—আমি রান্নাঘরের কাজটুকু সেরেই আস্‌ছি···

(বলিয়া সিঁড়ির প্রথম ধাপে বাঁ পা নামাইয়াই)

---ইস্ · ···

ভূধর। কি হ'ল?

রাধাসতী। পায়ে কি বিঁধল'!

(বসিয়া পড়িল)

ভূধর। কাঁটা?

রাধাসতী। তা' নয় ত' কি বাজ?·· ···জ্বলছে বড়।

ভূধর। দেখি, উঠে এস।

(রাধা খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে আসিয়া ভূধরের পার্শ্বে বসিল)

---কোন্ পায়ে?

রাধাসতী। বাঁ পায়ে। উ হু হু · ···

ভূধর। (সাগ্রহে)—দেখি, পা ইদিকে দাও · ·

(পা টানিয়া নিজের হাঁটুর উপর তুলিয়া লইল এবং বাঁ হাতে করিয়া লণ্ঠন তুলিয়া ধরিল)

---কোথায়?

রাধাসতী। বুড়ো আঙুলের নীচে, উঁচু মাংসে · ···

ভূধর। (নির্দ্দিষ্ট স্থান টিপিয়া)—এখানে?

রাধাসতী। উঁ হুঁ'—আর একটু বাঁ দিকে সরে'······

ভূধর। এখানে?

রাধাসতী। ইস্—আস্তে · ঐখানেই বটে··· · ঝিলিক্ মেরে উঠ্‌ছে · ·

ভূধর। (মনোযোগপূর্ব্বক লক্ষ্য করিয়া)---কিছু দেখতে পাচ্ছিনে ত!

রাধাসতী। পায়ে যে মাটী··· ..

ভূধর। দাঁড়াও, ধুয়ে নি' জায়গাটা।······ (বলিয়া ভূধর জল আনিতে গেল এবং ঘটিতে করিয়া আনিয়া দেখিল, রাধা সেখানে নাই।)

শ্রীজগদীশচন্দ্র গুপ্ত

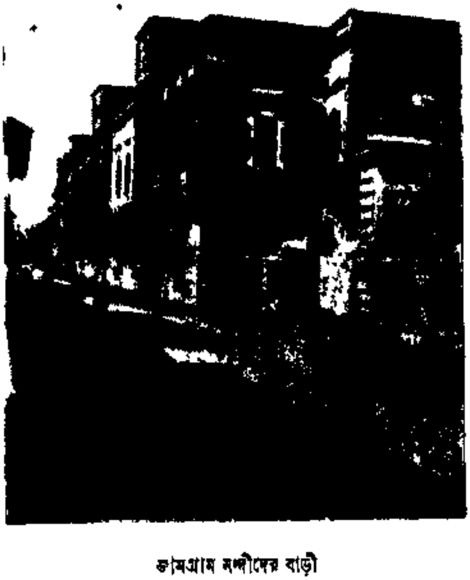
পল্লীর কথা

জামগ্রাম ও পাণ্ডুয়া

শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র দে

পাণ্ডুয়া ষ্টেশনে নেমে যখন দেখলাম একখানা মাত্র মোটর বাস দাঁড়িয়ে রয়েছে তখন তাড়াতাড়ি আমরা চলতে লাগলাম পাছে বাস চলে যায়। শোফার বল্লে যে জামগ্রামে এ গাড়ি যাবে না, আমাদের রিজার্ভ ক'রে নিতে পরামর্শ দিলে। তিনজনে কুড়িজনের বাস রিজার্ভ মানে কি অনুমান ক'রে আমরা অন্যত্র গাড়ীর সন্ধানে চল্লাম; কিন্তু কই, ঘোড়ার গাড়ী বা গরুর গাড়ী কিছুই দেখ্‌তে পেলাম না। শুন্‌লাম মোটরের আমদানীতে অশ্ব-যান ও গো যান অচল হ'য়ে বন্ধ হ'য়ে গিয়েছে, আর আমাদের দুরদৃষ্টবশতঃ অশ্ব-গো-যান-নিষ্কাশণকারী মোটর গাড়ী দুখানি আজ দু'দিন নিজেই অচল; সুতরাং এই সাত মাইল রাস্তা বোঝা নিয়ে হাটার কথা ভেবেই প্রমাদ গণলাম। কলিকাতাবাসী এক ভদ্রলোকের অবস্থা আমাদের চেয়েও শোচনীয়। তিনি বহুদিন পরে সস্ত্রীক শ্বশুরবাড়ী যাচ্ছেন, তাঁরও ধারণা ছিল না যে যানের এই অবস্থা। স্ত্রীকে waiting roomএ বসিয়ে গোযানের চেষ্টায় গিয়েছিলেন, হতাশ হ'য়ে ফিরে এসে আমাদের সঙ্গে বাস গাড়ীখানি রিজার্ভ করাই যুক্তিযুক্ত মনে ক'রলেন। শোফারের সঙ্গে কথা বল্‌ছি এমন সময় একজন বিহারবাসী কাছে এসে আমার নামধামের সংবাদ নিয়ে গাড়ীতে উঠতে বলল। তার বাবুরা আমাদের জন্যই তাকে ষ্টেশনে পাঠিয়েছে এবং বাসখানি আমাদের জন্যই রিজার্ভ করা, কেবল এ ট্রেনে আমরা আসি নি মনে ক'রে একটু দূরে ব'সে থাকাতেই আমাদের এই অনর্থক নিগ্রহভোগ হ'য়েছে। ভদ্রলোক ও তাঁহার স্ত্রী আমাদের গাড়ীতেই উঠলেন।

বিশ মিনিটের মধ্যে আমরা জামগ্রামে এসে পৌঁছলাম। বাড়ীর কর্ত্তারা আমাদের অভ্যর্থনা ক'রে উপরে বৈঠকখানায় বসালেন। আমাদের সঙ্গে— বাবুও আস্‌ছেন অনুমান করেছিলেন, তাকে না দেখে একটু ক্ষুণ্ণ হ'লেন। আমাদের কিন্তু কোন অসুবিধাই হয় নি। তাঁহাদের আদর, আপ্যায়ন ও আতিথেয়তা আমাদের বহুদিন মনে থাকবে। জামগ্রামের



জামগ্রাম নন্দীদের বাড়ী

নন্দীবাবুদের কথা অনেকেই শুনে থাকবেন—তাঁদের মত
বড় একান্নবর্ত্তী পরিবার বাঙ্গলায় নেই, ভারতবর্
কি না ঠিক জানি না। পূর্ব্বে তাহাদের পূর্ব
নন্দী যখন এই গ্রামে এসে মুদীর দো ... আছে
তাঁরা মাটীর ঘরে বাস করতেন ... পুরুষ লক্ষ্মীকান্ত

প্রসাদ নন্দী দুই ভাই কলিকাতায় সুপারীর কারবার আরম্ভ করেন। লক্ষ্মী সুপ্রসন্না হ'লেন। আদি ভিটার কাছেই নূতন জমির বন্দোবস্ত নিয়ে পাকা বাড়ী উঠ্‌ল। পরিবার বৃদ্ধির



বেহুলা নদী ও তীরে আঁইচ গাছ

সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর পরিসর বেড়ে চলেছে, আজ তাঁদের বাড়ীর সীমানার মধ্যে আর সকলের স্থান হয় না। বর্ত্তমানে নারী ও পুরুষ নিয়ে পরিবারের সংখ্যা ৪৫০ জন। এঁদের কলিকাতায় দু'তিনটি কারবার চল্‌ছে, জমিদারীও আছে। যৌথ পরিবারের কর্ত্তা রাখালদাস নন্দী মহাশয় অমায়িক লোক, তাঁহার পক্ষপাতশূন্য ও নিঃস্বার্থ ব্যবস্থা ও নির্দ্দেশ সকলেই মেনে চলে।

বৈঠকখানা বাড়ি মাত্র ৭০।৮০ বছর হ'ল নির্ম্মিত হয়েছে। বৈঠকখানা ঘরে যে সব দেবদেবীর তৈলচিত্র আছে সেগুলি পাশের গ্রামের এক পোটোয় আঁকা, ৭০।৮০ বৎসরের ছবির রংএর এমন ঔজ্জ্বল্য যে ৮।১০ বৎসরের বলে ভ্রম হয়। যে-গ্রামে এমন সব লোকের বাস ছিল—যারা পুরুষানুক্রমে এই ছবি আঁকার কাজ করে আস্‌ছিল,—আজ সেখানে এক ঘরও পোটো নেই।

গ্রামে ছেলেদের মধ্য-ইংরাজি স্কুল আছে, মেয়েদের প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে, দুইটিই নন্দীবাবুদের চেষ্টায় ও অর্থে স্থাপিত। একটি পাঠাগারও এঁরা প্রতিষ্ঠা করেছেন,—প্রায় দু'হাজার বই আছে এবং গ্রামের অনেকেই বই নিয়ে পড়েন। বৈঠকখানা বাড়ীর নীচের তলায় একজন পাশ করা অভিজ্ঞ ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে ডাক্তারখানা আছে। বাইরের রোগীও বিনামূল্যে ব্যবস্থা ও ঔষধ পেয়ে থাকে। এ পরিবারের কাহারও অন্ন, শিক্ষা ও চিকিৎসার জন্য চিন্তা করতে হয় না, যৌথ সম্পত্তিতে সমস্ত ব্যবস্থাই আছে।

বেড়াতে বেড়াতে আমরা গ্রামের প্রান্তভাগে এসে পড়্‌লাম। একটি নদী এঁকে বেঁকে চলেছে। এই সেই বেহুলা নদী যার উপর কলার ভেলায় সাধ্বী বেহুলা মৃত স্বামীর গলিত শব কোলে ক'রে ভেসে চলেছিলেন। বিপন্না নারীর স্বামীর শব বক্ষে আঁকড়ে ধরে সেই আর্ত্তদৃষ্টি যেন কল্পনার চক্ষে দেখ্‌তে লাগ্‌লাম। গাঙ্গুর নদী বেহুলা নাম নিয়ে সতীর পুণ্যস্মৃতি বহন করে চলেছে। নদীর বাঁকের মুখেই একটি দহ আছে সেইখানে এক আঁইচ গাছের তলায় কুবের নন্দী মহাশয়



দীঘি-পুকুর

তপঃসিদ্ধ হ'য়েছিলেন। তিনি একজন সাধক বলে প্রসিদ্ধ ছিলেন। সে আঁচ গাছ নেই, কিন্তু নন্দী মহাশয়দের পূর্ব্ব-

পুরুষের এই সাধনার স্থানে কোন নিদর্শন রাখেন নাই এটা আশ্চর্য্যের বিষয়।



'বাইশ-দরজা' মন্দিরের বাইরের দিক

আজকের এই শীর্ণা বেহুলা নদী একদিন চাঁদসদাগরের সপ্তডিঙ্গা বুকে করে প্রবাহিত হ'য়েছিল, দু'শ বৎসর পূর্ব্বেও গ্রামের মাল বোঝাই নিয়ে নৌকা এসে ঘাটে লাগ্‌ত। লোকে বলে যে পূর্ব্বে নদী থেকে বেরিয়ে একটি স্রুতি এই গ্রামকে বেষ্টন করেছিল। সেই স্রুতি এত গভীর ছিল যে নৌকা অনায়াসে যাতায়াত করতে পারত। সে স্রুতির এখন কোন চিহ্ন নাই।

ফেরবার পথে দক্ষিণ দিকে একটি উঁচু ভূখণ্ড দেখলাম, তাকে দেউলপোতা বলে। তার প্রান্তভাগ দিয়ে একটি গড় ছিল, তার নিদর্শন রয়েছে; জনপ্রবাদ এই যে দেউলপোতায় কোন হিন্দু রাজার প্রাসাদ ছিল।

পরদিন সকালেই আমরা পাণ্ডুয়ায় চল্‌লাম, কিন্তু বাবুরা অতিথিদের একলা যেতে দিতে কিছুতেই রাজি হ'লেন না,-- জিতেনবাবু সঙ্গে চললেন। ১৫ মিনিটের মধ্যেই মোটার পাণ্ডুয়ায় এসে উপস্থিত হ'ল। আমরা গাড়ী থেকে নেমে একটা সরু রাস্তা ধরে চল্‌তে লাগলাম,—দু'ধারে মাঠ ও জঙ্গল,—একটা বড় পুষ্করিণীর সামনে এসে পড়লাম। এই পুকুরেরই নাম পীর পুকুর ;— এর পশ্চিম দিকের উঁচুপাড় ও অন্য দিকের পাড়ের ভগ্নাবশেষ দেখে এককালে যে এটা বেশ বড় ও গভীর পুষ্করিণী ছিল তা সহজেই বোঝা যায়। এখন অনেক ভরাট হ'য়ে এসেছে, আধখানা পদ্মপাতায় ঢাকা, পদ্মফুলও ফুটে রয়েছে। ১লা মাঘ পাণ্ডুয়ায় যে বারণ মেলা হয় সে সময় বহু লোক এই পুকুরে স্নান করতে আসে, যার যাহা মানসিক থাকে দেয়—কেউ তথায় জল সিন্নি দেয়, কেউ দেয় মুরগী। এই পুষ্করিণীতে দুটি কুমীর আছে,—যে কয়জন মুসলমান আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছিল, তাদের একজন একটি মুরগী নিয়ে এসে পূর্ব্বপাড়ে জলের ধারে দাঁড়িয়ে ডাক্‌তে লাগল, 'কালে খাঁ, ধলে খাঁ'। আমরা আশ্চর্য্য হ'য়ে দেখ্‌লাম যে পুকুরের অপর প্রান্ত থেকে জল তোলপাড় করতে করতে ছুটে এল দুটি কুমীর। তীরের খুব কাছে এসে বড়টা যখন পৌঁছল তখন তার মুখের সামনে মুরগীটা ফেলে দেওয়া হ'ল। একবার ঘাড় তুলে সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে,



'বাইশ দরজা' মন্দিরের অভ্যন্তর

মুরগীকে মুখের ভিতর পূরে আবার ওপাড়ের নির্দ্দিষ্ট স্থানে চলে গেল।



পাণ্ডুয়ার মিনার

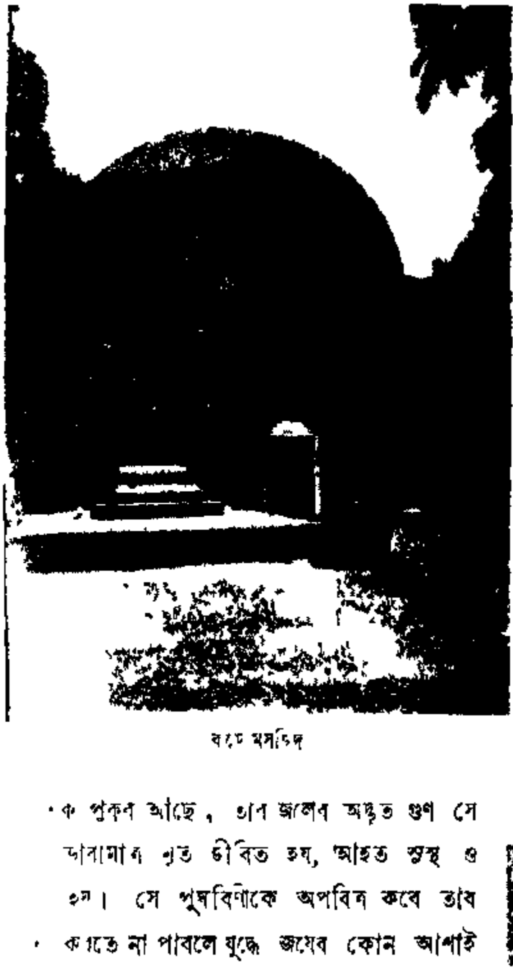
থেকে এক মাইল দূরে নমাজডাঙ্গা, সেই খানেই হিন্দুমুসলমানের যুদ্ধ হ'য়েছিল, এখনও অনেক কবর ও কবরের চিহ্ন আছে—সেগুলি, যে-সব মুসলমান মরেছিল তাদেরই স্মৃতিচিহ্ন আর যে সব হিন্দু মরেছিল তাদের কথা আজ কেউ জানে না। সেইখানকার একজন মুসলমান তার বৃদ্ধ ঠাকুরদার কাছে এই যুদ্ধের গল্প যা শুনেছে আমাদের বল্‌তে লাগল। হিন্দুরাজার সরকারে একজন মুসলমান চাকরী করতেন, তাঁর ছেলের 'কাটনা' উপলক্ষে তিনি গো বধ করেছেন এ সংবাদ রাজার কাছে পৌছতেই তিনি তাঁকে ও তাঁর ছেলেকে ডাক করলেন। মুসলমান গো-বধ স্বীকার করতেই তাঁর ছেলেকে মেরে ফেল্‌বার হুকুম হ'ল। দুঃখে, অভিমানে মুসলমান এ দেশ ছেড়ে চললেন দিল্লি, রাস্তায় দেখা হ'ল পীরসাহেব সফীউদ্দিনের সঙ্গে। তিনি বল্‌লেন, 'তুমি ফিরে চল, সেখানে একঘর মুসলমান ছিল তাই এই অত্যাচার হয়েছে, রাজার ঘর মুসলমান সেখানে বসাব চ'ল।' পীরসাহেব এসে এই পীরপুকুরের ধারেই বাস করতে লাগলেন। একদিন সকলে পীরসাহেব হাতে একখানা চামড়া নিয়ে রাজার সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। পাণ্ডুর রাজা আগে অতিথিদের প্রার্থনা পূর্ণ করে— তবে রাজসভায় যেতেন। সকালেই পীর অতিথি এসেছেন, রাজা জানতে চাইলেন তাঁর প্রার্থনা। পীর বল্‌লেন, 'আমি আপনার রাজ্যে বাস করতে চাই, আমাকে এই চামড়ার মাপে যতটা জায়গা হয় ততটা জমি দানের হুকুম দিন।' রাজা তখনই তাঁর প্রার্থনা গ্রাহ্য করলেন। পরদিন একজন রাজকর্ম্মচারীর সামনে সেই চামড়াখানি বিস্তৃত করে জমি মাপতে গিয়েই গণ্ডগোল বাধল; চামড়া বেড়েই চলে, সারা পাণ্ডুয়া রাজ্য মাপের মধ্যে আস্‌তে চায়! পীর এসে রাজাকে তাঁর রাজ্য ছেড়ে দিয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে বললেন। রাজা এই অদ্ভুত কথা শুনতে চাইলেন না। এই হ'ল বিবাদের কারণ। সফীউদ্দিন তাঁর বন্ধু জাফর খাঁ গাজী ও সংগ্রাম সাকোর সাহায্য চাইলেন, দিল্লির বাদশার আত্মীয় পীর, বাদশার ফৌজের সাহায্যও পেলেন। যুদ্ধে কিন্তু পাণ্ডুয়ার



মিনার হইতে পাণ্ডুয়ার দৃশ্য

রাজাকে হারাতে পারা অসম্ভব হ'য়ে উঠল,—ভোজবাজির মত আজ যে সব যোদ্ধা মরে ও আহত হয় কাল তারা আবার

...কে যুদ্ধ করতে আসে। যে-গোয়ালা পীরকে দুধ ..., সে সন্ধান এনে দিল যে রাজার মহাদেবের জীবৎকুণ্ড



বড়ো মসজিদ

...ক পুকুর আছে, তার জলের অদ্ভুত গুণ সে ...রামাত্র মৃত চীবিত হয়, আহত সুস্থ ও ...য়। সে পুষ্করিণীকে অপবিত্র করে তার ...রাতে না পারলে যুদ্ধে জয়ের কোন আশাই কিন্তু একাজ করবে কে? গোয়ালার পীরের ...শী ভক্তি ও বিশ্বাস ছিল, সেই এ কাজ ...শেষে রাজি হ'ল। হিন্দু যোগী সেজে মাথার ...ত গরুর মাংস লুকিয়ে নিয়ে জীবৎকুণ্ডের সামনে ...হ'ল; প্রহরীরা বাধা দিবার পূর্ব্বেই স্নানের ...জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে লুকান গো মাংস জলে ...য়ে জলের দৈবগুণ নষ্ট করে দিলে। প্রহরীরা ...ত্যা করবার জন্ম ছুটল, গোয়ালা পীরের ...শখা সিদ্ধ মন্ত্রের গুণে বক হয়ে উড়ে গেল, ...টা তীর এসে লাগতেই সে মাটিতে পড়ে প্রাণ-

ত্যাগ করলে। পীরের কাছে আগেই সে মুসলমান হ'য়েছিল, পীর নগরের প্রবেশদ্বারে তার সমাধি নির্মাণ করালেন। আজও তাকে লোকে বলে নগরগুরুর সমাধি। হিন্দুরা যুদ্ধে এবার হেরে গেলেন, মুসলমানের অধিকারে এল পাণ্ডুয়া। পাণ্ডুয়া বিজয়ের যে সব প্রচলিত গল্প শোনা যায় তাদের সঙ্গে গল্পাংশে এর অনেকটা মিল থাকলেও একটু পার্থক্য আছে। হিন্দুর সর্ব্বনাশ হিন্দুর দ্বারাই সাধিত হয়েছে, এই চিরন্তন কথা এর মধ্যে স্থান পেয়েছে।

এইবার আমরা মন্দিরের দিকে এলাম। ট্রেনে যখনই পাণ্ডুয়া অতিক্রম ক'রে গিয়েছি, তখনই এ উচ্চ মিনার চোখে পড়েছে, যতক্ষণ দেখা যায় দেখতে দেখতে গিয়েছি। আজ সেই মন্দির তলায় উপস্থিত। এই গোলাকার স্তম্ভটির নিম্নতলের ব্যাস ৬০ ফুট এবং ক্রমশ: সরু হ'য়ে উপরতলে ১৫ ফুটে দাঁড়িয়েছে। ১২৭ ফুট এই স্তম্ভটি উচ্চ এবং উপরে উঠবার সিঁড়ি ১৬০টি। সূর্য্যোপাসক কোন হিন্দু-রাজা ঊষার আলো দিগন্তে ছড়িয়ে পড়তে না পড়তে সূর্য্য-দর্শনের পুণ্যসঞ্চয় উদ্দেশ্যে এই স্তম্ভ নির্মাণ করেছিলেন, কি পাণ্ডুয়া বিজেতা সুফীউদ্দিন যুদ্ধজয়ের নিদর্শন স্বরূপ বিজয় স্তম্ভরূপে এই মিনার নির্মাণ করিয়েছিলেন, তা ঠিক জানা যায় না। ৩০ বৎসর পূর্ব্বের ভূমিকম্পে মিনারের উপর-



পাণ্ডুয়ার সূর্য্যমূর্ত্তি

তলায় খানিক অংশ ভেঙ্গে পড়েছিল, গবর্ণমেণ্টের টাকায় সংস্কার করা হ'য়েছে। আমরা সিঁড়ি দিয়ে সর্ব্বোচ্চ তলায় উঠ্‌লাম—চারদিকে গাছ ও জঙ্গল, তারই মাঝে ভগ্নস্তূপ; কোথাও কচিৎ দুই একখানা পাকা ছোট বাড়ী। কল্পনার গড়া অতীতের স্মৃতি একবার চোখের সম্মুখে ভেসে গেল, একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে নেমে এলাম।

সামনেই 'বাইশ দরজা' মসজিদ, প্রবেশের জন্য ২২টি খিলান-করা দরজা। ছাদ পড়ে গিয়েছে, চারিদিকের



পাণ্ডুয়া—প্রস্তরস্তম্ভ, প্রাচীন হিন্দুমন্দিরের নিদর্শন

দেওয়ালও অনেক জায়গায় নেই। যে ৪২টি কাল পাথরের থামের উপর এই ছাদ দাঁড়িয়েছিল, সেই থামের ৬টি মাত্র আজ অবশিষ্ট আছে। এই কারুকার্য্যবিশিষ্ট থামগুলির উপর চার স্তবকে মিনার অনুকরণে সুন্দর কাজ করা খিলানের উপর ছাদ। পশ্চিম দিকের দেওয়ালে অনেকগুলি পাথরের তৈয়ারি কুলুঙ্গি ছিল, এখনও দুটি অক্ষত অবস্থায় আছে, দেখ্‌লে মনে হয় এগুলি দেবতার বেদী, একদিন হিন্দুর দেবতারা এই বেদীগুলিতে বিরাজ করতেন।

এই মসজিদের দক্ষিণে গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের উপরে একটি প্রাচীর ঘেরা বাগানের মধ্যে একদিকে সুফীউদ্দিনের আস্তানা, অপরদিকে কড়ে মসজিদ্। সুফীউদ্দিন পাণ্ডুয়া-বিজয়ের পর মারা যান ও এইখানেই তাঁকে কবর দেওয়া হয়। তাঁর মৃত্যু সম্বন্ধে এক অদ্ভুত গল্প প্রচলিত আছে। তিনি একদিন রাত্রে নিদ্রা যাবার সময় তাঁর চাকরকে প্রত্যূষে ঘুম ভাঙ্গিয়ে দেবার আদেশ দিয়েছিলেন। চাকর কিন্তু ঘুমিয়ে পড়ে, ঘুম ভেঙ্গে দেখে যে বেলা হ'য়ে গিয়েছে। মনিবের মেজাজ ও কড়া স্বভাব জানা ছিল, ঘুম থেকে উঠে মনিব যে তার রক্ষা রাখবেন না তা সে জানত। তখন সে অনন্যোপায় হ'য়ে ঘুমন্ত মনিবকে এক তরোয়াল দিয়ে খুন করে নিজেও আত্মহত্যা করে। সে চাকর হিন্দু ছিল কিনা জানা যায় না, কিন্তু এই ঘটনা থেকেই সুফীউদ্দিন অন্যদিক দিয়ে শাহিদ্ বলে শ্রদ্ধা পেয়ে থাকেন।

পশ্চিমের দিকের দেওয়ালের গায়ে দুটি প্রস্তর ঠেকান রয়েছে দেখা গেল। নেড়ে দেখলাম যে দুটিই প্রস্তর-লিপি, ছোটটি কড়ে মসজিদে বসান ছিল, পড়ে যাওয়াতে এখানে রাখা হ'য়েছে; অপরটি 'বাইশ-দরজা' মসজিদের গাত্রে প্রোথিত ছিল। এই প্রস্তরের খোদিত লিপির পাঠোদ্ধার ক'রেই ঐতিহাসিকেরা পাণ্ডুয়া বিজয়ের ও এই মসজিদ নির্ম্মাণের সময় নির্দ্ধারণ করেছেন। এই প্রস্তর-লিপি উল্টে দেখতেই এক সূর্য্যমূর্ত্তি চোখে পড়ল। মূর্ত্তিটি সম্পূর্ণ নয়, আধখানা মাত্র আছে। শেষতলায় সাতটি অশ্ব, তাদের উপর ব'সে অরুণ তাদের চালনা করছেন। দু'পাশে দুটি স্ত্রীমূর্ত্তি—ঊষা ও প্রত্যূষা—তীর ধনু নিয়ে সূর্য্যকিরণ ছড়িয়ে দিচ্ছে। দু'পাশে দুই পুরুষমূর্ত্তি—দক্ষিণে তরবারি হস্তে দণ্ড ও বামে লেখনী হস্তে পিঙ্গল, মধ্যস্থলে সূর্য্যদেবতার মূর্ত্তি। গঠন-নৈপুণ্য দেখে সুদক্ষ শিল্পীর তৈয়ারী ব'লে মনে হয়। হিন্দু মন্দিরের মালমসলায় মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়ে মূর্ত্তিবিদ্বেষী মুসলমান মন্দিরের প্রধান উপাস্য দেবতা সূর্য্যমূর্ত্তিকে ভেঙ্গে শিলা-লিপির জন্যে প্রস্তরখণ্ডের কাজে ব্যবহার ক'রে থাকবে।

কড়ে মসজিদের দক্ষিণে রোজাপুকুর—এ পুষ্করিণী একদিন অতি সুন্দর ছিল আজ এর কোন সৌন্দর্য্যই নেই।

অনেক দেবদেবীর মূর্ত্তি এই পুষ্করিণীর গর্ভে গিয়েছে। ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই পুষ্করিণীর পঙ্কমধ্যে বিষ্ণু, লক্ষ্মী ও সরস্বতী মূর্ত্তির অংশ পেয়েছিলেন। এই বড় মসজিদের সামনেই ১লা মাঘ বারুণী মেলা বসে, মিনারের তলা ও গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রাস্তার ধারের দোকানে হাট হ'য়ে থাকে। পরের দিন ধরে এই জনাকীর্ণ স্থান দোকানদার ও খরিদ্দারের কোলাহলে মুখরিত হ'য়ে উঠে। মসজিদের সামনের উঠানে ও 'বাইশদরজা' মসজিদের সামনের মাঠে পাথরের থাম, পাথরের বারবারা কত ভগ্নাংশের নিদর্শন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রয়েছে। এই পাথরহীন দেশে



পাণ্ডুয়ার [illegible]

কত দূর থেকে কত অর্থ ব্যয় করে প্রাসাদ ও মন্দির নির্ম্মাণের যে সব উপকরণ সংগৃহীত হয়েছিল তার তাদেরই ভগ্নাবশেষ এখনও দাঁড়িয়ে এই সহরের অতীত সমৃদ্ধির সাক্ষ্য দিচ্ছে। জামগ্রাম থেকে একক্রোশ দূরে কুন্তী নদীর ধারে পাথরেঘাটা নামে এক গ্রাম আছে। জনপ্রবাদ এই যে গড় মহাল ও অন্যদেশ থেকে নৌকা করে পাথর আনিয়ে ঐ গ্রামেই নামান হ'য়েছিল।

পাণ্ডুয়ার অতীত ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন। বুদ্ধদেবের পিতৃব্য পাণ্ডুশাক্য কোশলরাজ কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে প্রথমে এ দেশে এসে রাজত্ব স্থাপনা করেন এবং তাঁর নাম থেকেই পাণ্ডুয়ার নাম হয়েছে এ কথা কতদূর সত্য বলা যায় না। 'বাইশ দরজার' থাম ও প্রাচীর গাত্রে কেউ কেউ বৌদ্ধ ভাস্কর্য্যের নিদর্শন দেখে ও বং সাহেবের এই অঞ্চলে ১৩০০ শত বৎসরের পুরাতন দুটি বৌদ্ধযুগের মুদ্রা পাওয়ার কথা শুনে এ অঞ্চল কোন বৌদ্ধরাজ্যের রাজ্যভুক্ত ছিল এরূপ অনুমানও করেন। প্রাচ্যবিদ্যার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় শিবাজের কোকথানি গ্রন্থে পাণ্ডুভূমি বিহারের উল্লেখ পেয়ে মুসলমান বিজয়ের পূর্ব্বে বহু বৌদ্ধাচার্য্য ও উপাসিকা পরিবেষ্টিত বৃহৎ বৌদ্ধ বিহার ভেঙ্গেই বাইশ দরজা মসজিদ নির্ম্মিত হ'য়েছে এরূপও মনে করেন। সূর্য্যমূর্ত্তি, বিষ্ণুমূর্ত্তি ইত্যাদির আবিষ্কারে পাণ্ডুয়াকে হিন্দুপ্রধান স্থান ছিল মনে করাই অধিক সঙ্গত।* সপ্তগ্রাম বিজয়ের ত্রিশ বৎসর পরে ভিমুবসাহ এর রাজত্বকালে মুসলমানেরা পাণ্ডুয়া জয় ক'রে হিন্দুমন্দির ভেঙ্গে সেই মালমসলায় মসজিদ তৈয়ারি করেন। সঙ্গে সঙ্গে পাণ্ডুয়া একটি প্রধান মুসলমান পল্লীতে পরিবর্ত্তিত হ'য়েছিল। সফী-উদ্দীনের সঙ্গে যে সব মুসলমান এসেছিলেন তাঁরাই আস্তানাদার হ'য়ে এখানে বসবাস আরম্ভ করলেন। ব্রাহ্মণ সন্তানেরা ইলছোবা ও পার্শ্বের গ্রামে পালিয়ে গেলেন, আর তাঁহাদের বাড়ি, জমি দখল করে সংসারত্যক্ত এবং ত্যাগী ধর্ম মুসলমান সংসার পেতে বসলেন। একদিকে রসাতল আর অন্যদিকে কালাদাবোদর হুগলী, সাতগাঁর সঙ্গে পাণ্ডুয়ার যাতায়াত ও বাণিজ্যের পথ সুগম করে দিয়ে পাণ্ডুয়ার শ্রীবৃদ্ধির বিশেষ সাহায্য ক'রেছিল। মোগলের সময়ে সারা বাংলা অধিকারে আসার পর পাণ্ডুয়া একটি পরগণার প্রধান সহর ব'লে গণ্য হয়। টোডরমলের রাজস্বের তালিকায় পাণ্ডুয়া পরগণায় ৪৫,৫৮০ টাকা রাজস্ব নির্দ্ধারিত ছিল।

* এ সম্বন্ধে আলোচনা প্রবাসী ১৩৩৬ জ্যৈষ্ঠ ও ৩৭ সালের আষাঢ় সংখ্যায় বাহির হইয়াছে।

আস্তানার ফটকের পাশেই একখানি ছোট মুদিখানা দোকান। দোকানদার একজন আবমাদারের বংশধর। তাঁর বংশের পূর্ব্বগৌরব কথা বলতে স্বভাবতঃই তাঁর সঙ্কোচ বোধ হ'চ্ছিল। প্রপিতামহের সময়েও তাঁদের অবস্থা বেশ স্বচ্ছল ছিল, ঠাকুরদাদা ও বাবার সময়ে দেনার দায়ে সমস্ত বিষয় বিক্রী হ'য়ে গেছে। তাঁর কাছে শুনলাম যে এখন মাত্র চল্লিশ ঘর আবমাদার আছে,—অনেকেরই অবস্থা হীন। এই সব আবমাদার বংশ থেকেই পূর্ব্বে ইংরাজ আদালতের হিন্দু নয় মুসলমানদেরও দোতলা বাড়ী একখানিও নেই। হিন্দুপল্লীতে বারোয়ারী দুর্গাপূজা হয়,—৭০ বৎসর পূর্ব্বে সেনেরাই ইহার প্রবর্ত্তন করেন।

হাটতলার পাশেই বড় পুকুর আছে সেটাও অতি প্রাচীন, পীরপুকুরের সমসময়েরই হ'বে কিন্তু আকারে তার চেয়েও বড়। এই 'পাণ্ডুয়ার দীঘি'র সে পূর্ব্বের গভীরতা না থাকলেও, উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত এই বৃহৎ দীঘি পাড়ের উপরের গাছগুলি নিয়ে আজও সুন্দর দেখায়।



পাণ্ডুয়া দীঘি

অনেক কাজি নিযুক্ত হ'য়েছিলেন, পরে দু'চারজন বড় চাকরীও পেয়েছিলেন। এখন মুসলমান পল্লীগুলি জঙ্গলে পরিপূর্ণ হ'য়ে আসছে আর হিন্দু পল্লীর শ্রী দেখা দিচ্ছে।

মন্দিরতলা থেকে অল্প দূরেই হিন্দুপল্লীর বেনেপাড়ায় কয়েক ঘর গন্ধবণিকের বাস। হাটতলায় এঁদের অনেকেরই দোকান। কারো কারো অবস্থা স্বচ্ছল—পাকা বাড়ীঘরও উঠ্ছে কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে সব বাড়ীই একতলা। শুনলাম দোতলা বাড়ী করা নিষেধ। পীর আছেন নীচে লোকে থাকবে উপরে -একথা হ'তেই পারে না, -তাই শুধু

ফেরবার পথে একটি খাদের চিহ্ন দেখলাম। এই খাদ অনেক দূর পর্য্যন্ত চলেছে, এইটেই পাণ্ডুয়ার দুর্গকে বেষ্টন করেছিল। ৭০ বৎসর পূর্ব্বের ম্যাপে ক্রফোর্ড (Crawford) সাহেব দুর্গ ও গড়ের চিহ্ন দেখেছিলেন।

পাণ্ডুয়ার অতীত দিনের কথা,—উৎসবমুখর রাজপ্রাসাদের ছবি,—সুস্থ সবল চিদানন্দ মূর্ত্তির কথা ভাবতে ভাবতে আমরা জামগ্রামে ফিরে এলাম।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র দে

আলোকচিত্রগুলি হুগলি কলেজের শিক্ষক শ্রীমান সুরেন্দ্রনাথ নন্দী কর্ত্তৃক গৃহীত।

আলোচনা

"নামের পদবী"

শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায়

চন্দ্রগুপ্তের পুত্রের নাম ছিল সমুদ্রগুপ্ত, তাঁর পুত্রের নাম ছিল চন্দ্রগুপ্ত দ্বিতীয়, তাঁর পুত্রের নাম ছিল কুমারগুপ্ত এবং তাঁর পুত্রের নাম ছিল স্কন্দগুপ্ত। পদবী যে কত প্রাচীন এই তার প্রমাণ। এর আগেরও প্রমাণ আছে। পুষ্যমিত্র ছিলেন ব্রাহ্মণ, তাঁর পুত্র অগ্নিমিত্র ক্ষত্রিয় কন্যা বিবাহ করায় তাঁর বংশধরগণ হলেন ব্রহ্মক্ষত্রিয়। তাঁদেরও পদবী ঐ মিত্র। অতএব পদবীর সঙ্গে জাতির কোনো বাঁধা সম্বন্ধ ছিল না। আধুনিক যুগেও নেই। ঘোষ, দত্ত, পাল পদবী কোনো বিশেষ জাতের একচেটে নয়। জাত যাঁরা ছেড়েছেন তাঁরা পদবীটি ছাড়েন নি। ব্রাহ্ম ও খৃষ্টান বন্দ্যোপাধ্যায় বসু সেনগুপ্ত দেখেছি।

সেই গুপ্ত আছে, সেই ঘোষ আছে। তবে চন্দ্রগুপ্ত ও নরেশচন্দ্র গুপ্ত অশ্বঘোষ ও অশ্বিনীকুমার ঘোষ এঁদের মধ্যে দুটি তফাৎ আছে। প্রথমত গৌড়ীয় বাগ্‌বাহুল্যবশত নামের একটি অঙ্গ ক্রমশঃ স্ফীত হতে হতে দানবিক আকার ধারণ করছে। ছিল চন্দ্রগুপ্ত, হলো চন্দ্রশেখরেন্দ্রনাথ গুপ্ত। ঠাকুর পরিবারে এই গৌড়ীয় প্রকৃতির চরম বিকাশ দেখা যায়। এই বাহুল্যকে প্রশ্রয় দেওয়া চলে না, কারণ আধুনিক মানবের সময় বড় অল্প, সে প্রত্যেকবার Herbert George Wells বল্‌তে পারে না ব'লেই বলে H. G. Wells, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বল্‌তে পারে না ব'লেই বলে রবি ঠাকুর। তা ছাড়া একা রবীন্দ্র যথেষ্ট অর্থহীন ছিল, তার সঙ্গে একটা নাথ জুড়ে দেওয়ায় হলো tautology।

দ্বিতীয়তঃ সংস্কৃতের অনুসরণে কালীচরণদাস না লিখে ইংরেজীর অনুকরণে কালীচরণ দাস লেখা হয়। সেটা একটা কুঅভ্যাস। এখনো কেউ কেউ ইংরেজী হরফে কালী চরণ দাস লিখে থাকেন। এই কুঅভ্যাসটা না থাকলে চন্দ্রগুপ্ত ও নরেশচন্দ্রগুপ্ত ছাপার অক্ষরে দেখতে এক জাতীয় হতো। তা দেখ্‌লে রবীন্দ্রনাথ পদবীবর্জ্জনের প্রস্তাব কর্‌তেন না।

বাগ্‌বাহুল্য দূর কর্‌লে ও কুঅভ্যাসটার সংশোধন কর্‌লে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম হবে রবিঠাকুর, বড়জোর রবীন্দ্রঠাকুর। কুমারগুপ্ত যদি অর্থহীন কিম্বা অবজ্ঞাসূচক না হয় তবে এও হবে না।

আসল কথা, পদবী পরিহার নয়, অর্থনীতির ভাষায় যাকে বলে rationalisation আমাদের তাই দরকার হয়েছে। কেউ কেউ ইতিমধ্যেই প্রেমেন্দ্র মিত্র, নরেন্দ্র দেব লিখ্‌ছেন। ওটা ইংরেজীয়ানা। সোজাসুজি প্রেমেন্দ্রমিত্র নরেন্দ্রদেব লিখ্‌লে আর্য্যভট্ট মণ্ডনমিশ্র প্রভৃতি নামের অনুরূপ ঐতিহাসিক মর্য্যাদা লাভ হয়। তবে কতকগুলি মুসলমানী উপাধি ও অনার্য্য পদবী কারো কারো আছে। তাঁরা ওগুলিকে হাইফেনের সাহায্যে নামের সঙ্গে লট্‌কে দিন্। যথা, প্রমথ-চৌধুরী, শিশির-ভাদুড়ী।

শ্রীঅন্নদাশঙ্কররায়

পুনশ্চ

পদবী হচ্ছে নামের সেই অংশ যে অংশ পিতা থেকে পুত্রে অনুক্রামিত হতে হতে একটি বংশে স্থায়িত্ব পায়। প্রচলিত পদবীগুলিকে সকলে মিলে বর্জ্জন কর্‌লেও নূতনতর পদবীর উৎপত্তি হতে পারে। আজকাল সাধারণতঃ রামেন্দ্রনাথের পুত্র শ্যামেন্দ্রনাথ, শ্যামেন্দ্রশঙ্করের পুত্র শ্যামেন্দ্র-শঙ্কর, রামেন্দ্রকৃষ্ণের পুত্র শ্যামেন্দ্রকৃষ্ণ, রামেন্দ্রলোচনের পুত্র শ্যামেন্দ্রলোচন ইত্যাকার হয়ে থাকে। এর ব্যাপকতা দেখে মনে হয় ভবিষ্যতে ইন্দ্রনাথ, ইন্দ্রশঙ্কর, ইন্দ্রকৃষ্ণ ইত্যাদি পদবী চল্‌তি হবে

শ্রীঅন্নদাশঙ্কররায়

পুস্তক-পরিচয়

বধূবরণ : শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রণীত,—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১৯৬ পৃষ্ঠা দাম দেড় টাকা।

এটি গল্পের বই। বধূবরণ, 'অতি ঘরন্তী না পায় ঘর', ভঙ্গুর, চক্ষুদান, মৃত্যুভয়, জনি ও টনি,—এই পাঁচটি গল্প বইখানিতে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। গল্প-লিখিয়ে হিসাবে শৈলজা বাবু সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত, আলোচ্য বইখানি তাঁর সেই যশ বাড়িয়ে দেবে, কমিয়ে দেবে না। গল্পগুলি সত্যই চমৎকার, আমরা পড়ে মুগ্ধ হ'য়েছি। যেমন সুন্দর ভাষা, তেমন অপরূপ বর্ণনা-ভঙ্গি, তেমনি গল্পের উপকরণ-নির্ব্বাচনের কৌশল। প্রথম দুটি গল্পকে ঠিক ছোট গল্প বলা চলে না, সে দুটি বড় গল্প। বধূবরণ ৬৯ পৃষ্ঠা, ও 'অতি ঘরন্তী না পায় ঘর' ৬৮ পৃষ্ঠা। কিন্তু এত বড় গল্পেও,—অনেক তুচ্ছ ছোট-খাট ঘটনার বিবৃতির মধ্যে পাঠকের আগ্রহ কোথাও একটুও শিথিল হয় না, সমান গভীরতার সহিত গল্পের শেষ পরিণতির জন্য প্রতীক্ষা করে থাকে। গল্পে বর্ণিত চরিত্রগুলির দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছ ঘটনাগুলি গল্পের সমগ্রতার সঙ্গে একটা অঙ্গাঙ্গি-সংযোগের আশ্রয়ে তাদের তুচ্ছতা ও ক্ষুদ্রতা ছাড়িয়ে ওঠে,—এমনই অপূর্ব্ব শৈলজা বাবুর গল্পের উপকরণ-নির্ব্বাচনের কৌশল। শৈলজা বাবু জীবনের অনেক কিছুই দেখেছেন,—জীবন বেশ জানেন ও চেনেন,—তার ভূরি ভূরি প্রমাণ এই গল্পগুলির মধ্যে দিয়েছেন। বাস্তব জীবনের অনেক কিছু দুর্ব্বলতা, অনেক কিছু কদর্য্যতা তিনি উদ্ঘাটিত করতে ভয় পান না,—কিন্তু সুদক্ষ শিল্পী তিনি,—তাঁর হাতের সোনার কাঠির স্পর্শে বাস্তবতার অতি কদর্য্য ক্ষুদ্রতাগুলিও পাঠকের হৃদয়কে অনির্ব্বচনীয় করুণারসে সিক্ত করে তার অন্তরে সকরুণ হাহাকার তোলে—আহা এমনটি ত হ'তে পারত,—কেন হ'ল না?—"নিখিলব্যাপী বিরাট মিথ্যাচারের বাহিরে সত্য-বস্তু কোথাও কিছু থাকিতেও ত পারে"!

এখানে আমরা গল্পগুলিকে বিশ্লেষণ করে বিস্তারিত আলোচনা করবার ইচ্ছা সম্বরণ করলাম। সেজন্য পৃথক প্রবন্ধ প্রয়োজন,—সংক্ষিপ্ত সমালোচনার জায়গায় তার একান্তই স্থানাভাব। আমরা আমাদের পাঠক-পাঠিকাদের এই গল্পের বইখানি পড়তে অনুরোধ করি,—সৎসাহিত্য-পাঠের আনন্দ তাঁরা পাবেন,—এ আশ্বাস অনায়াসেই দিতে পারি।

শ্রীসুশীলচন্দ্র মিত্র

হীরের ফুল : মৌলভী মোহাম্মদ মোদাব্বের প্রণীত। মূল্য ।৵০ আনা। দি মুসলমান পাবলিশিং কোম্পানী লিমিটেড ১১ ৫ কড়েয়া বাগান রোড, কলিকাতা।

হীরের ফুল কতগুলো কল্পকথা ও রূপকথার সমষ্টি, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য লেখা। গল্পগুলি মুসলমান জাতির রূপকথা। অনেক নতুন ধরণ লেখক সরস করে বল্‌তে চেষ্টা করেছেন। "পাপের ফল" আমাদের বেশ ভাল লেগেছে।

গ্রন্থখানি ছেলেমেয়েদের কৌতূহলোদ্দীপক হবে, এবং তাদের সন্ধানী মন এতে খুশী হ'য়ে উঠবে।

জরীন কলম

হারামণি : মৌলভী মুহম্মদ মনসুর উদ্দিন, এম, এ, কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও সম্পাদিত গ্রাম্যসঙ্গীতগ্রন্থ। মূল্য ১৷০; প্রাপ্তি স্থান প্রবাসী আফিস।

গ্রন্থের আশীর্ব্বচন উচ্চারণ করেছেন শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রচ্ছদলিপি এবং প্রচ্ছদপট এঁকে দিয়েছেন আচার্য্য শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অন্তরে যদি ভাব থাকে, তাকে ভাষায় ফুটিয়ে তুলতে ভাবনার দরকার হয় না, এই কথাটি গ্রন্থখানির প্রতিছত্রেই আমরা দেখতে পাই। সম্পাদক যাঁদের ভাবধারা একত্রিত

করেছেন তাঁদের কেহই শিক্ষিত সমাজে পরিচিত নন। সকলেই নিরক্ষর,বাউল, ফকির অথবা অতি সাধারণ গ্রাম্য নরনারী। কিন্তু তাঁরা যে ভাবধারার সন্ধান পেয়েছিলেন, তা যদি এই ভাবে গ্রন্থাকারে রক্ষিত না হ'তো, তা হলে অতি অল্প কালের মধ্যেই সেগুলি লোপ পেয়ে যেত। সম্পাদক এই হারামণির মালা গেঁথে সর্ব্বসাধারণের ধন্যবাদ অর্জ্জন করেছেন। এ বিষয়ে তাঁর সুদীর্ঘকালব্যাপী পরিশ্রম সর্ব্বতোভাবেই সফল হয়েছে। আশা করি তাঁর এই সাধু প্রচেষ্টা এই খানেই শেষ হবে না, তিনি তাঁর সকল শক্তি দিয়ে বাঙ্গালীর পরম গৌরবের এই গ্রাম্য গানগুলি সংগ্রহ করবেন।

বাউল গানছাড়া বইখানিতে নানা জেলার হিন্দু ও মুসলমান রমণীগণের রচিত অনেকগুলি গ্রাম্যগীত আছে। এগুলি পাঠ করলে আমাদের দেশের সাধারণ রমণীগণের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। বাঙ্গলা দেশের বিভিন্ন জেলার ভাব ও ভাষার একত্র সমাবেশের দিক দিয়েও বইখানি খুবই মূল্যবান হয়েছে।

শ্রীসুরথকুমার সরকার

কোরাণের আলো মৌলভী মোহাম্মদ আক্রাহার উদ্দীন এম এ সঙ্কলিত। মূল্য বারো আনা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান, মোহাম্মদী অফিস। ৯১, অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

বাংলার খাঁটী কবি রামপ্রসাদ গেয়েছেন,

"এমন মানব জমিন রইল পতিত
আবাদ করলে ফলত সোনা।"

সোজা কথায় এমন ভাবে আজ কেউ বাঙলার পতিত মনের দিকে নজর দিতে বলেন নাই। এত বড় কথা অথচ কত অনাড়ম্বরভাবে প্রকাশ পেয়েছে!

বাঙলা দেশের মুসলিম জনসাধারণের মনজমিন পতিত বহুকাল ধরে রয়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহ করবার কোন সুবিধে ও সুযোগ নেই। অথচ কোন ওস্তাদ চাষীই এই সব চেয়ে উর্ব্বর দো-আঁসলা জমিতে চাষবাসের আয়োজন করেন নি।

মানুষের মনের চেয়ে বড় জিনিষ নেই এবং তার চাষবাসের আয়োজন যে কত প্রয়োজনীয় তা বলে শেষ করা যায় না। মানুষের মনের খোরাক আমাদের বাঙলা দেশে মুসলমানেরা একেবারেই উৎপন্ন করতে চেষ্টা করেন নাই। এর ফলে আমাদের মনোরাজ্যে যতদেশের আবর্জ্জনা এবং জঞ্জাল জমে রয়েছে। এবং সেই জঙ্গল ও বুনোঘাস দূর করবার নাম ত নাই পরন্তু কুসংস্কারের আর অন্ধ বিশ্বাসের মালমসলা জমিয়ে তাকে অধিক সতেজ ও সর্ব্বনাশকর করে তোলা হ'য়েছে।

পতিত জমিতে লাঙল দেওয়া বড়ই দুঃসাধ্য এবং পাকা চাষীরও ভয় হয়। কিন্তু বন্ধু আক্রাহারউদ্দীন বুড়ো চাষীকে হার মানিয়েছেন। তিনি হাতিয়ার পত্তর নিয়ে মহাউৎসাহে মুসলমানদের মনের জমিনে ফসল জন্মানোর জন্য তৈরী হয়েছেন। এর চেয়ে আশা আর আনন্দের কথা কি হ'তে পারে?

অতি আধুনিক কালে আমাদের বাঙলা দেশে একদল তরুণ মুসলিম ধর্ম্মকে বৃদ্ধ অঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করতে বদ্ধপরিকর হয়েছেন! কিন্তু সব চেয়ে দুঃখ এবং পরিতাপের বিষয় যে তাঁরা ব্যাপারটা গভীর ভাবে এবং ধীরে ভাবে ভেবে না দেখেই এই হঠকারিতায় লিপ্ত হয়েছেন, বলে মনে হয়।

ধর্ম্ম জিনিষটা কি তার আলোচনা এখানে করতে যাওয়া অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু তবুও ধর্ম্মের উপর যে জাতির বনিয়াদ স্থাপিত রয়েছে, তা বল্লে বোধ হয় অন্যায় বলা হ'বে না। ধর্ম্ম একটা বিশিষ্ট মতবাদ বা আইনের সমষ্টি। কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ নির্ব্বিচারে গ্রহণ না করলে প্রতিপাদ্যে পৌঁছানো সম্ভবপর নয়। জিওম্যাট্রির বেলায় যা খাটে মানবজীবনের বেলায়ও তার ব্যতিক্রম হয় না।

আর তাছাড়া আমাদের সেই তরুণদল যদি একটু চিন্তা করে দেখেন তা'হলে দেখ্‌তে পাবেন যে বাঙলার হিন্দুদের নব জাগরণের মূলে রয়েছে এই ধর্ম্মের গভীর ও সুন্দর সত্য। রাজা রামমোহন রায় এবং রামকৃষ্ণ পরমহংসই প্রকৃতপক্ষে এই নব জাগরণের হোতা। বিবেকানন্দ যে অমিততেজ ও চুলচেরা মেধা নিয়ে বাঙলার বাণী প্রচার করলেন তাঁর সে শক্তির উৎস কোথায়?

আসল কথা ধর্ম্মকে আমরা যতই ঘৃণা বা অবজ্ঞা করি না কেন ধর্ম্মছাড়া কোন জাতি বা রাষ্ট্র উঠ্‌তে পারে না। সকল রকম উন্নতির মূলে রয়েছে এই ধর্ম্মের প্রেরণা, সত্যের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধা এবং মানুষের প্রতি প্রেম।

মুসলমানধর্ম্মের সত্যিকার মর্ম্মবাণী সহজে এবং সংক্ষেপে জানবার সুবিধে এতকাল ছিল না। এই অভাবটায় আমরা বড়ই মর্ম্মাহত হ'য়ে ছিলুম, কিন্তু মৌলবী আজাহারউদ্দীন সাহেব আমাদের সে ক্ষোভ দূর করে দিয়েছেন। মুসলমান-ধর্ম্মের সার হ'চ্ছে কোরাণ মজিদ। এবং মৌলবী আজাহার-উদ্দীন বাঙলার জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহারের সুবিধের জন্ম সমগ্র কোরাণ হ'তে চয়ন করে এই "কোরাণের আলো" আমাদের সামনে ধরেছেন।

অধিকাংশ মুসলমানের পক্ষে কোরাণের সরল, সবল এবং সুন্দর সত্যগুলি এতদিন সহজভাবে জানবার উপায় ছিল না। এক কথায় কোরাণ Sealed Book ছিল! বাঙলা ভাষার ওপেন সিসেম মন্ত্রে কোরাণের সেই রত্ন ভাণ্ডার উন্মুক্ত হয়েছে। কোরাণের বজ্রগর্ভবাণী মুসলমানের জীবন স্বার্থক ও গরীয়ান করে তুলুক।

সঙ্কলিয়তার ভাষা বেগবতী, গভীর, সরস এবং প্রাঞ্জল। এমন সুন্দর একখানা বই আমরা বাঙলার যুবকযুবতী, বালকবৃদ্ধ সকলের হাতে দেখ্‌তে চাই। এবং এ বই পড়ে যে তাঁরা খুসী হ'বেন তা আমরা জোর গলায় বল্‌তে পারি। মৌলবী আজাহারউদ্দীন সাহেব এই যুগোপযোগী সঙ্কলন করেছেন এবং তার জন্ম আমরা তাঁকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও আনন্দ জানাচ্ছি।

গ্রন্থখানি মূল্যবান পুরু এণ্টিক কাগজে, ঝরঝরে পাইকা হরফে মুদ্রিত। এই অর্থ নৈতিক দুর্দ্দিনে এত সুন্দর বই এত সুন্দর কাগজে ছেপে এত স্বল্প মূল্যে প্রকাশ করা এক প্রকার adventure বটে!

জরীণ কলম

নানা কথা

কলিকাতায় সাধারণের রবীন্দ্র জয়ন্তী উৎসব

রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিবর্ষে পদার্পণ করা উপলক্ষে, কলিকাতায় সপ্তাহব্যাপী এক বিরাট উৎসবের আয়োজন হইতেছে, এ-কথা আশা করি সকলেই জানেন। বিগত ১৬ই মে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সভাপতিত্বে কলিকাতাবাসীদের একটী সাধারণ সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সেই সভায় স্থির হয় যে রবীন্দ্রনাথের গৌরবময় জীবনের এই সপ্ততিতম বর্ষটি আমরা একটী যথোপযুক্ত উৎসবের দ্বারা স্মরণীয় করিয়া রাখিব, এবং সেই উৎসবের ভিতর দিয়া কবির প্রতি আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিব।' সেই দিনই এই উৎসবের আয়োজন করিবার জন্ম একটি সমিতি গঠিত হইয়াছিল; পরে ১৮ই জুলাই তারিখে সেই সমিতির একটি অধিবেশনে সমিতির সভ্যসংখ্যা আরও বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের এই সপ্ততিতম জন্মোৎসবটি দেশ-বিদেশেও উত হইয়াছে। এই উপলক্ষে দেশ-বিদেশের মনীষিদের মধ্যে অনেকেই রবীন্দ্রনাথের, তথা ভারতবর্ষের প্রতি তাঁহাদের শ্রদ্ধা-অর্ঘ্য পাঠাইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ বর্ত্তমান জগতে ভারতবর্ষের গরিমা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন,—যেমন করিয়াছিলেন অতীত জগতে ভারতবর্ষের শ্রদ্ধেয় মহর্ষিরা। আমরা, রবীন্দ্রনাথের দেশবাসীরা,—আমাদের সেই জাতীয় গৌরব সম্বন্ধে কতখানি সচেতন, তাহার পরিমাপ করা যাইবে, প্রস্তাবিত এই অনুষ্ঠানটির বিপুলতা ও সফলতার দ্বারা। বলা বাহুল্য আমাদের প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য এই অনুষ্ঠানটিকে যথোপযুক্ত গৌরবমণ্ডিত করিবার সহায়তা করা, কেন না ইহার গৌরবেই আমরা আমাদের জাতীয় গৌরব বিশ্বের সমক্ষে প্রচার করিতে পারিব। দেশের বীরপূজা করিয়াই প্রত্যেক জাতি জাতীয় গৌরব উপলব্ধি ও বৃদ্ধি করিয়া থাকে।

তাই আমরা আমাদের পাঠক-পাঠিকাদিগের নিকট হইতে এ বিষয়ে নিজ নিজ সামর্থ্য অনুসারে সহযোগিতা প্রার্থনা ও প্রত্যাশা করি। এই উদ্দেশ্যে ১৬ই মে তারিখে গঠিত সমিতি কর্ত্তৃক উৎসবের যে ব্যবস্থা প্রস্তাবিত হইয়াছে তাহার একটা বিবরণ দিলাম। এই ব্যবস্থা বেশ সুচিন্তিত ও সমীচীন বলিয়া বোধ হয়, তবে আবশ্যক হইলে ইহার পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন এখনো সম্ভব, প্রস্তাবকারীরা সে কথা জানাইয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভার বিচিত্র বিকাশক্ষেত্রের প্রত্যেকটা দিকের সহিতই যাহাতে আমাদের প্রস্তাবিত উৎসবটির যোগ থাকে,—জয়ন্তী-সমিতির সভ্যেরা সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছেন। প্রথমতঃ বাংলা-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের দানের মাহাত্ম্যের পরিমাপ করা যায় না। পৃথিবীর ইতিহাসে আজ পর্য্যন্ত কোনো দেশের কোনো কালের কোনো সাহিত্যিকই তাঁহার জাতীয় সাহিত্যকে সর্ব্ববিষয়ে এতখানি সমৃদ্ধ করিয়াছেন বলিয়া আমাদের জানা নাই। ইংরাজী সাহিত্যেও রবীন্দ্রনাথের যে দান, তাহার মূল্য যে কতখানি, তাহা একজন ইংরাজ লেখকের মুখেই শোনা যাক্। তাঁহার মতে 'ইংরাজী সাহিত্যের সমগ্রতার উপর রবীন্দ্রনাথ এমন কিছু যোগ করিয়া দিয়াছেন, যাহার অনুরূপ কিছু আর কোথাও মেলে না'। দ্বিতীয়তঃ সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভিতর দিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে যে রবীন্দ্র-দর্শন,—বিংশ শতাব্দীর জগতের আধ্যাত্মিক পুনর্গঠনের কাজে তাহা যে কতখানি সাহায্য করিবে,—তাহা এখনো আলোচনার বিষয়, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এখনো লিখিত হয় নাই। তবে রবীন্দ্র-সাহিত্য যাঁহারা পড়িয়াছেন, তাঁহারাই জানেন ভারতবর্ষের শতসহস্র-বর্ষ-ব্যাপী সাধনা ও চিন্তাধারা রবীন্দ্রনাথের রচনায় আধুনিক পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া কেমন করিয়া তাঁহার বিশ্ব-মানবতার ধর্ম্মের মধ্যে নূতন রূপলাভ করিয়াছে এবং সৃষ্টিশীল মানবজীবনের স্বাধীনতার শাশ্বতবাণী বহন করিয়া আনিয়াছে। তৃতীয়তঃ মানুষের সৃষ্টিশক্তিকে তিনি কত বিচিত্র ধারাতেই না উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন! চিত্রাঙ্কন, অভিনয়, নৃত্যকলা ইত্যাদিতে কত নূতন ভঙ্গির আবিষ্কার ও প্রচলন করিয়াছেন, সঙ্গীতে কত নূতন নূতন সুর রচনা করিয়াছেন, —এমন কি দৈনন্দিন জীবনের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষগুলির ব্যবহারের ভিতর দিয়াও বাঙালীর কুটীর-শিল্পের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্য-বোধকে উদ্বুদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। রাষ্ট্র-সমস্যা, পল্লী-সংগঠন, শিক্ষা-সমস্যা প্রভৃতি ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা সমান ভাবেই কাজ করিয়াছে। তাঁহার বহু বক্তৃতায় ও প্রবন্ধে আমাদের দেশের বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় সমস্যার সমাধানের যে উপায় তিনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তদ্ভিন্ন অন্য কোনো উপায়ে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জ্জন করা যে সম্ভব নয়, অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই বোধ হয় তাহা স্বীকার করিতেছেন,—যাঁহারা এখনও করেন না, অচিরেই তাঁহাদিগকে করিতে হইবে। পল্লী-সমস্যা ও শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁহার যে কাজ, শ্রীনিকেতন ও শান্তিনিকেতনের সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে, তাঁহারা তাহা ভাল রকমই জানেন। বিশ্বভারতীতে আজ বিশ্বমানবের মহামিলনের যজ্ঞের যে আয়োজন চলিতেছে, আশা করি তাহার কীর্ত্তি রবীন্দ্রনাথের কবিকীর্ত্তিরই অনুরূপ হইবে।

এই সব বিচিত্র সাধনার সকল দিকে দৃষ্টি রাখিয়া যে উৎসবের আয়োজন হইতেছে,—অন্ততঃ এক সপ্তাহকাল ব্যাপী না হইলে সে উৎসব কখনো সুসম্পন্ন হইতে পারে না, সে কথা বলাই বাহুল্য। সেই সপ্তাহটি "রবীন্দ্র-সপ্তাহ" নামে অভিহিত হইবে, এবং নিম্নলিখিত ক্রমে দিনের পর দিন বিভিন্ন কর্ম্মগুলি অনুষ্ঠিত হইবে।

প্রথম দিন—(প্রাতে) যথোপযুক্ত অনুষ্ঠানের দ্বারা রবীন্দ্র-সপ্তাহের উদ্বোধন।

(অপরাহ্নে)—কোনো লব্ধপ্রতিষ্ঠ বাঙালী সাহিত্যিকের সভাপতিত্বে সাহিত্য-বৈঠক। এই বৈঠকে বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে রবীন্দ্রনাথের দান সম্বন্ধে আলোচনা হইবে এবং সেই উপলক্ষে রচিত প্রবন্ধাদি পাঠ করা হইবে। রবীন্দ্রনাথকে নিবেদন করা কয়েকটি কবিতাও পাঠ করা যাইতে পারে।

দ্বিতীয় দিন—(প্রাতে ও অপরাহ্নে) অবাঙালী কোনো খ্যাতনামা ভারতবাসীর সভাপতিত্বে একটি বৈঠক। এই বৈঠকে রবীন্দ্রনাথের ইংরেজী রচনা, দর্শন, ধর্ম্ম, ললিতকলা, রাষ্ট্রনীতি, শিক্ষাতত্ত্ব, জাতি-সংগঠন, পল্লী-

সংগঠন, বিশ্বভারতী প্রভৃতি বিষয়ে ভারতীয় ও য়ুরোপীয় মনীষিদের রচিত প্রবন্ধাদি পাঠ করা হইবে।

তৃতীয় ও চতুর্থ দিন—(অপরাহ্ণে ও রাত্রে) সঙ্গীত-বৈঠক। তৃতীয় দিনে বাংলায় ও চতুর্থ দিনে ইংরাজিতে রবীন্দ্র-সঙ্গীত সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বৈঠক আরম্ভ হইবে। ইংরাজী প্রবন্ধটি যিনি লিখিবেন,—তাঁহার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় সঙ্গীত-শাস্ত্র সম্বন্ধে বিশিষ্ট জ্ঞান থাকা দরকার। প্রবন্ধ পাঠের পর, রবীন্দ্রনাথের সুর-রচনার অপরূপ বৈচিত্র্য বেশ হৃদয়ঙ্গম করা যায় এমন ভাবে বাছাই করিয়া রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি সঙ্গীত খ্যাতনামা গায়কগণ কর্ত্তৃক গীত হইবে।

পঞ্চম দিন—(অপরাহ্ণে) রবীন্দ্রনাথের একটি নাটকের অভিনয়।

ষষ্ঠ দিন বিভিন্ন সভা-সমিতি কর্ত্তৃক কবিকে অভিনন্দনপত্রাদি ও অর্থ-উপহারের দ্বারা সম্বর্দ্ধনা।

সপ্তম দিন—উন্মুক্ত উদ্যানে কবির সহিত সাধারণের আলাপ আলোচনা।

এই সমস্ত অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে একটি রবীন্দ্র-জয়ন্তী-মেলা বসিবে। রবীন্দ্রনাথের মতে মেলা ভারতীয় উৎসবের একটা প্রয়োজনীয় অঙ্গ, এবং শান্তিনিকেতনে ও শ্রীনিকেতনে উৎসবের সঙ্গে সঙ্গে একটি করিয়া মেলা বসিয়া থাকে। অতএব এই মেলার ভিতর দিয়া রবীন্দ্রনাথের সারা জীবনের কর্ম্মের একটি দিকের প্রতি আমরা শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে পারিব।

মেলার অঙ্গ হইবে, একটী প্রদর্শনী, আমোদ-প্রমোদ, খেলা-ধূলা এবং সর্ব্বসাধারণের উপভোগ্য চিত্তাকর্ষক বিষয়ে বক্তৃতাদির ব্যবস্থা। প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হইবে, (১) রবীন্দ্রনাথের অঙ্কিত চিত্রাবলী,—(২) তাঁহার লেখার যে সব পাণ্ডুলিপি এখন পাওয়া যায়, (৩) তাঁহার গ্রন্থাবলীর বিভিন্ন সংস্করণ, এবং তাঁহার বাল্যরচনা যাহা পরে আর পুনর্মুদ্রিত হয় নাই, (৪) তাঁহার গ্রন্থাবলীর বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ, (৫) রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে বিভিন্ন ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলী, (৬) কবির বিভিন্ন বয়সে এবং দেশ-বিদেশে গৃহীত প্রতিকৃতি, (৭) দেশ-বিদেশ হইতে প্রাপ্ত কবির উপহার-রাজি, (৮) কলাভবন, শ্রীভবন ও শ্রীনিকেতনের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রস্তুত করা কলা ও শিল্পলিপি, (৯) বাংলার বিভিন্ন জেলা হইতে সংগৃহীত প্রাচীন ও আধুনিক কুটীরশিল্পের নিদর্শন এবং (১০) বাংলা দেশে অঙ্কিত চিত্রাবলী।

আমোদ-প্রমোদের মধ্যে থাকিবে (১) কথকতা, (২) যাত্রা, (৩) কীর্ত্তন, (৪) বাউল, ময়নামতীর গান, গম্ভীরার গান প্রভৃতি লোক-সঙ্গীত, (৪) রায়-বেঁশে প্রভৃতি লোক-নৃত্য যাহা অধুনা পুনঃ-সঞ্জীবিত করিবার চেষ্টা হইতেছে। খেলাধূলার মধ্যে থাকিবে (১) দেশীয় ক্রীড়া ইত্যাদি, (২) ব্রতীবালক ও ব্রতীবালিকাগণ কর্ত্তৃক নানাবিধ কৌশল প্রদর্শন এবং (৩) জিউজিৎসু, যাহা অধুনা শান্তিনিকেতনে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। বক্তৃতাগুলিতে শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের নানাবিধ ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে ল্যাণ্টার্ণ স্লাইড্ সংযোগে আলোচনা করা হইবে।

বড়দিনের ছুটীর মধ্যে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে একটি বিরাট প্যাণ্ডেল নির্ম্মাণ করিয়া এই উৎসবের আয়োজন করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। বড় দিনের সময়টা নির্ব্বাচন করিবার কয়েকটি কারণ জয়ন্তী-সমিতির সভ্যেরা দেখাইয়াছেন। প্রথমতঃ তখন আফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ সব বন্ধ থাকিবে, কংগ্রেসের অনুষ্ঠানও সেই সময়ে আজকাল হয় না। দ্বিতীয়তঃ আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে উন্মুক্ত স্থানে মেলা বসাইবার পক্ষে শীতকালই সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী। তৃতীয়তঃ এই সব আয়োজন করিবার জন্য এবং তাহার ব্যয় সঙ্কুলানের অর্থসংগ্রহের জন্য মাস-চারেক সময়েরও প্রয়োজন। আমাদের বিবেচনায় জয়ন্তী-সমিতির এই প্রস্তাব সর্ব্ববিষয়েই যুক্তিযুক্ত।

অর্থসংগ্রহের কথাটাও বাংলাদেশের সর্ব্বসাধারণের বিশেষ করিয়া বিবেচনা করা প্রয়োজন। এমন একটা উৎসবের অনুষ্ঠানের জন্য কয়েক সহস্র টাকার নিশ্চয়ই আবশ্যক হইবে। জয়ন্তী-সমিতির সভ্যেরা প্রস্তাব করিয়াছেন যে "রবীন্দ্র-সপ্ততিবার্ষিকী-উৎসব-সমিতি"র সভ্যপদ যদি ৫৲ টাকা চাঁদা ধার্য্য করিয়া সর্ব্বসাধারণের নিকট উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া যায়, তবে আগামী দুইতিন মাসের মধ্যে সভ্যসংখ্যা দুই-তিন হাজার না হইবার কোনো কারণ নাই। উৎসবের

একমাস পূর্ব্বের কোনো নির্দ্দিষ্ট দিন পর্য্যন্ত এই সভ্য-তালিকা খোলা থাকিতে পারে,—তার পর অবশ্য বন্ধ করিতে হইবে। এই "রবীন্দ্র-সপ্ততিবার্ষিকী-উৎসব-সমিতির" সভ্যেরা অবশ্য উৎসব-সংক্রান্ত প্রায় সমস্ত অনুষ্ঠানগুলিতেই যোগদান করিতে পারিবেন। তারপর উৎসবের বিস্তারিত কর্ম্ম-তালিকা প্রকাশিত হইলে "রবীন্দ্র-সপ্তাহে"র সমস্ত অনুষ্ঠান-গুলিরই জন্য "সিজ্ন্ টিকিট" বিক্রয় করা যাইতে পারে, এবং উৎসবের সময়েও বিভিন্ন দিনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য বিভিন্ন মূল্যে টিকিট বিক্রয় হইতে পারে। (সপ্তম দিনের উত্থান-সম্মেলনের জন্য অবশ্য টিকিট বিক্রয় হইবে না)। এই সিজ্ন্-টিকিট ও প্রতিদিবসের টিকিট বিক্রয় হইতেও অনেক টাকা পাওয়া যাইবে আশা করা যায়। অধিকন্তু মেলাতেও অনেক লোক-সমাগম হইবে আশা করা যায়,—এবং নামমাত্র কিছু প্রবেশ-মূল্য নির্দ্ধারিত করিলেও বেশ কিছু টাকা পাওয়া যাইতে পারে। অতএব সর্ব্বসাধারণের সহযোগিতা লাভ করিতে পারিলে উৎসবের ব্যয় সঙ্কুলানের উপযোগী যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ করা তেমন শক্ত হইবে বলিয়া বোধ হয় না। আমরা আশা করি জয়ন্তী-সমিতি এই সহযোগিতা লাভ করিতে সমর্থ হইবেন।

এতদ্ব্যতীত, কবিকে অর্থ-উপহার দিয়া সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য একটি বিশেষ চাঁদার খাতা খুলিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। এই চাঁদার ন্যূনতম অঙ্ক ধার্য্য করা হইয়াছে ২৫৲ টাকা। সুখের বিষয় বাংলাদেশের প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় (ইনি জয়ন্তী-সমিতির অন্যতম সহকারী সভাপতি) এ বিষয়ে সমিতিকে বিশেষ সাহায্য করিতেছেন। তিনি এই উদ্দেশ্যে অর্থ-সংগ্রহের জন্য বাংলাদেশের জেলায় জেলায় পরিভ্রমণ করিতে রাজী আছেন। আমরা এই আয়োজনের সর্ব্বাঙ্গীন সিদ্ধি কামনা করি।

স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র রায়—

বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ্ হইতে প্রকাশিত "পদকল্পতরু"র সম্পাদক সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় গত ৫ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে নারায়ণগঞ্জ মহকুমা অন্তর্গত ধামগড় গ্রামে নিজ গৃহে পরলোক-গমন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে বাঙ্গালা সাহিত্যের যে সমূহ ক্ষতি হইল তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

১২৭৩ সালের ১লা কার্ত্তিক ধামগড় গ্রামেই এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ জমিদার-বংশে সতীশচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতা জেনারেল এসেম্ব্লিস্ ইনস্টিটিউসন্ হইতে সংস্কৃতে অনার্স লইয়া তিনি প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে সংস্কৃত কলেজ হইতে সংস্কৃতে এম এ পরীক্ষা দিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং সোনামণি বৃত্তি লাভ করেন। ইহার পর তিনি কিছুদিন ঢাকার জগন্নাথ কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপকের কাজ করেন। পড়াশুনা ও গবেষণার পক্ষে সে কাজ বিঘ্নকর হওয়ায় তিনি চাকুরী পরিত্যাগ করেন এবং সংস্কৃত ও প্রাচীন সাহিত্যের প্রগাঢ় আলোচনায় ব্যাপৃত হন।

১৩০৪ সালে তাঁহার সম্পাদিত "পদকল্পতরু" কলিকাতার ভারতীয় গ্রন্থ-প্রচার-সমিতি কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়। তাঁহার সম্পাদকতায় পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত প্রামাণিক সংস্করণ বাহির হইবার পূর্ব্বে ইহা পদকল্পতরুর অন্যতম উৎকৃষ্ট সংস্করণ বলিয়া বিবেচিত হইত। পরে তিনি মহাকবি কালিদাসকৃত "মেঘদূত" জয়দেবকৃত "গীতগোবিন্দ" এবং ভানুদত্ত প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ "রসমঞ্জরী" কাব্যের সুললিত পদ্যানুবাদ প্রকাশিত করেন। ১০।১২ বৎসর পূর্ব্বে তিনি "অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী" নাম দিয়া সুবিস্তৃত ভূমিকা, পাদ-টীকা ও শব্দ-সূচী সহ ছয় শতের অধিক নবাবিষ্কৃত ও অপ্রকাশিত বৈষ্ণব পদাবলীর একটি উৎকৃষ্ট সংগ্রহ (anthology) প্রকাশিত করিয়াছিলেন। এই পুস্তকখানি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহাদের বি-এ শ্রেণীর পাঠ্য নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকার একজন নিয়মিত লেখক ও পদকল্পতরুর সম্পাদক হিসাবে তিনি দীর্ঘ-কাল ধরিয়া বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের সহিত ঘনিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পরিষদের এক সভায় তিনি সর্ব্ব-সম্মতি-ক্রমে পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

তাঁহার দ্বারা সম্পাদিত ও পরিষদ্ কর্ত্তৃক ৫ খণ্ডে প্রকাশিত "পদকল্পতরু" বঙ্গসাহিত্যের একটি গৌরবের বস্তু;

উহা কেবল তাঁহারই নহে, পরিষদেরও একটি স্থায়ী কীর্তি-স্তম্ভ। বৈষ্ণব সাহিত্য প্রকাশ-কার্য্যে তাঁহার অধ্যবসায়, গবেষণা ও নৈপুণ্য যে বঙ্গ-সাহিত্যের প্রভূত উপকার করিয়াছে তাহা স্বর্গগত মনীষী রামেন্দ্রসুন্দর, বিশ্ববরেণ্য রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ সুধীবর্গ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন।

শেষ জীবনে সতীশচন্দ্র পদাবলী সাহিত্যের আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দী ও উর্দ্দু সাহিত্যের চর্চ্চায় ব্যাপৃত ছিলেন। সংস্কৃতে অগাধ ব্যুৎপত্তি থাকায় অল্পদিনের চেষ্টাতেই তিনি হিন্দীতে সুদীর্ঘ গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধাদি লিখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত হিন্দী প্রবন্ধ বহু প্রসিদ্ধ হিন্দী মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি প্রয়াগের হিন্দী-সাহিত্য-সম্মেলনের স্থায়ী সমিতির সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন এবং কয়েক বৎসর বৃন্দাবন ও ভরতপুরে হিন্দী সাহিত্য-সম্মেলনের যে অধিবেশন হইয়াছিল তাহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। ভরতপুর-অধিবেশনে তিনি বিদ্যাপতির উপর একটি সুদীর্ঘ গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করেন। উহা পরে প্রয়াগের হিন্দী-সাহিত্য সম্মেলন কর্তৃক "বিদ্যাপতি ঔর উনকী কবিতা" নামে একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়।

মৃত্যুর ৩।৪ বৎসর পূর্ব্বে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক কবি ভবানন্দের "হরিবংশ" নামক প্রাচীন কাব্য সম্পাদন করিবার জন্য নিযুক্ত হন। হরিবংশের ন্যায় প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যের একটি বহুমূল্য কাব্যরত্নের আবিষ্কার ও সম্পাদন করিয়া তিনি বঙ্গ-সাহিত্য ভাণ্ডারে একটি অমূল্য সম্পদ দান করিয়া গিয়াছেন।

গত ৪০ বৎসর যাবৎ বৈষ্ণব পদাবলীর আলোচনায় সতীশচন্দ্র ব্যাপৃত ছিলেন। এরূপ দীর্ঘকাল ধরিয়া একনিষ্ঠ-ভাবে একটি বিষয়ে নিরত থাকার দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে বিরল। সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি ছাড়া জ্যোতিষ ও সঙ্গীত শাস্ত্রেও তাঁহার অসামান্য অধিকার ছিল।

"পরিচয়"

এই নূতন ত্রৈমাসিক পত্রিকাটি হাতে পাইয়াই সর্ব্বপ্রথম মনে যে ভাবের উদয় হইয়াছিল,—একটি ছোট্ট কথায় তাহা সুন্দরভাবে প্রকাশ করা যাইতে পারে—"বাঃ!" এণ্টিক কাগজে পরিষ্কার মুদ্রিত ১৫৪ পৃষ্ঠা ব্যাপী প্রথম সংখ্যার মলাটের উপর তাকাইলেই,—এক নজরে জানিতে পারা যায় সংখ্যাটিতে কোন্ কোন্ বিষয় কোন্ কোন্ লেখক কর্তৃক আলোচিত হইয়াছে। এ যেন একটা উচ্চ অঙ্গের বিলাতী সাহিত্য-পত্রিকার মত, যাহার সম্পাদকেরা অনাড়ম্বরে অথচ সগৌরবে মাসের পর মাস সাময়িক শ্রেষ্ঠ সাহিত্য পাঠকদিগের নিকট বিতরণ করিয়া থাকেন। ভিতরে উল্টাইয়া দেখিলে,—এই রকম মনের ভাবটি অক্ষুণ্ণ থাকে, এমন কথা বলিলে অবশ্য একটু অতিরঞ্জন দোষ আসিয়া পড়ে, কিন্তু তাহার জন্য পরিচয়ের সম্পাদক ও পরিচালক-মণ্ডলী দায়ী নহেন। আমাদের জাতীয় সাহিত্যের বর্ত্তমান অবস্থায় কোন সাময়িক পত্রিকাকে যতখানি উৎকর্ষ দান করা সম্ভব,—'পরিচয়ে'র পরিচালক-মণ্ডলী তাহা দিতে সমর্থ হইয়াছেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। এই দিক দিয়া 'পরিচয়'কে মাসিক না করিয়া ত্রৈমাসিক পত্রিকা করিয়া পরিচালকেরা সুবিবেচনার কাজ করিয়াছেন।

কোনো নূতন পত্রিকা বাহির করিলেই জনসাধারণের নিকট একটা কৈফিয়ৎ দাখিল করাটা একটা রেওয়াজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যেন সাধারণভাবে সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করাটা একটা যথেষ্ট সদুদ্দেশ্য নয় যাহার জন্য একটা নূতন পত্রিকা বাহির করা চলিতে পারে! 'পরিচয়ে'র সম্পাদক মহাশয়ও সাধারণের নিকট এই কৈফিয়তের ঋণ শোধ করিয়াছেন, বলিয়াছেন,—সাহিত্যক্ষেত্রেই পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি পরস্পরের মধ্যে জানাজানির ভিতর দিয়া এক মানবতা-সূত্রে আবদ্ধ হইতে পারে, "পরিচয়ের" উদ্দেশ্য, এই শুভদিনের আবির্ভাবকে যথাশীঘ্র সংঘটন করা; "বাংলাদেশে পরিচয় আজ এই ভারই লইতে চাহে। তাহার প্রধান উদ্দেশ্য, প্রাচীন ও আধুনিক সমস্ত ভাব-গঙ্গার ধারা বাংলা ভাষার ক্ষেত্রের ভিতর দিয়া বহাইয়া দেওয়া। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বিভিন্ন ভাষার বিশিষ্ট দানগুলিকে 'পরিচয়' বাঙালী পাঠককে উপহার দিতে অভিলাষী, কখনো মূল ভাষার অনুসরণে আলোচনা করিয়া, কখনো বা ভাষান্তরের সাহায্য লইয়া; কখনো সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করিয়া

কখনো বা মূলানুগ অনুবাদ করিয়া। এই সঙ্গে মাতৃভাষার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির দিকেও 'পরিচয়' তাহার দৃষ্টি সদাজাগ্রত করিয়া রাখিবে"। বলা বাহুল্য এই উদ্দেশ্য যেমনই সাধু তেমনি ব্যাপক; ইহার ব্যাপকতার মধ্যে ইহার বিশিষ্টতা চাপা পড়িয়া গিয়াছে;—আমাদের দেশের উচ্চ অঙ্গের সাময়িক পত্রিকা মাত্রেই সাধ্যানুসারে এই উদ্দেশ্য-সাধনের চেষ্টা করিয়া থাকে। কিন্তু হায়, "সাধ যত, সাধ্য তার বহু পশ্চাতে"!

কিন্তু "সাধ্য বহু পশ্চাতে" হইলেও একথা স্বীকার করিব, এবং এই জন্যই 'পরিচয়ে'র সম্পাদককে আমাদের সাদর অভিনন্দন জানাইতেছি,—যে 'পরিচয়ের' মধ্যে এই চেষ্টা যেমন সুস্পষ্ট, অন্য পত্রিকাগুলির মধ্যে তেমন নয়। "পরিচয়" অপাঠকের মন পাতার পর পাতা ছবিতে ঠেসিয়া ভুলাইবার চেষ্টা করে নাই,—কিংবা অসাহিত্য দিয়া কু-পাঠকের মনোরঞ্জন করিবার চেষ্টাও করে নাই; কেবলমাত্র আমাদের দেশে যে কয়জন পরিমিত-সংখ্যক সু-পাঠক আছেন, তাঁহাদেরই উৎসাহের উপর নির্ভর করিয়া এই দুরূহ কার্য্যে অবতীর্ণ হইয়াছে। এমন সৎসাহসের তারিফ না করিয়া থাকা যায় না। আমরা যে 'পরিচয়ে'র সর্ব্বাঙ্গীন সিদ্ধি কামনা করিতেছি,—সে কথাটা বিশেষ করিয়া বলাটাই অতিরিক্ত।

'পরিচয়ে'র প্রথম সংখ্যাটির মধ্যে বিশেষ করিয়া যাহা চোখে লাগিল, তাহা, ইহার "পুস্তক-পরিচয়" বিভাগ। ১১৪ পৃষ্ঠা হইতে ১৪৯ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত দেশী ও বিদেশী অনেক আধুনিক গ্রন্থের সুদক্ষ আলোচনা। আমাদের মনে হয়, এই সমস্ত আলোচনার পরিপূর্ণ সার্থকতালাভের পথে আমাদের দেশে একটা প্রকাণ্ড অন্তরায় আছে, তাহা এই, যে এই সমস্ত আলোচনা পাঠ করিয়া আলোচিত গ্রন্থগুলি পাঠ করিবার বাসনা যাঁহাদের প্রাণে জাগে, তাঁহাদের অনেকেরই সে বাসনা মিটাইবার উপায় নাই; কেন-না কোনো সাধারণ গ্রন্থাগারে সে বইগুলি পাওয়া যায় না, কিনিবার অবস্থাও অনেকের নাই। আমাদের দেশের বর্ত্তমান অর্থনৈতিক অবস্থায় বাংলা ভাষায় যে অল্পসংখ্যক সদ্‌গ্রন্থ মাঝে মাঝে প্রকাশিত হয়, তাহারই কাটতি হইতে অনেক বিলম্ব হয়; কাজেই যথেষ্ট অর্থসংস্থান না থাকিলে বিদেশী বই কেনা অনেকেরই সাধ্যাতীত। অতএব মাসিক ২।০ টাকা আন্দাজ একটা কিছু চাঁদা ধার্য্য করিয়া যদি 'পরিচয়ে'র সহিত সংশ্লিষ্ট একটি আধুনিক দেশী ও বিদেশী সাহিত্যের গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত করিতে পারা যায় তবে 'পরিচয়ে'র যে বিশেষ উদ্দেশ্য তাহা ক্রততর সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে পারে। যে পরিমিতসংখ্যক পাঠকমণ্ডলীর উৎসাহের উপর নির্ভর করিয়া 'পরিচয়' কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে, আধুনিক দেশী ও বিদেশী সাহিত্যের সহিত পরিপূর্ণ পরিচয়লাভের সুযোগ পাইলে, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই মাসে ২৲ টাকা আন্দাজ চাঁদা দিতে স্বীকৃত হইতে পারেন। যাঁহাদের মধ্যে যথার্থ পাঠানুরাগ আছে অথচ উপযুক্ত অবকাশের অভাবে এই অনুরাগ তৃপ্ত করিতে পারেন না তাঁহারা নিশ্চয়ই মাসে ২৲ টাকার পরিবর্ত্তে একটা আধুনিক সাহিত্যের গ্রন্থাগারের যথেচ্ছ ব্যবহারের সুযোগ-লাভ এবং বিনামূল্যে 'পরিচয়' পত্রিকালাভ করাটা যথেষ্টের চেয়েও অনেক অধিক মনে করিবেন। শিক্ষিত বাঙালীদের মধ্যে এমন দু'হাজার লোক কি নাই? আমাদের বিশ্বাস অনেক বেশী আছে—তবে হয় ত কলিকাতা সহরের মধ্যে নাই,—সারা বাংলা এবং বাংলার বাহিরে ছড়াইয়া আছে। যাঁহারা কলিকাতার বাহিরে থাকেন, সামান্য কিছু ডাক-খরচা বহন করিলেই তাঁহারা ইচ্ছামত ডাকযোগে বই আনাইয়া লইতে এবং পড়া হইয়া গেলে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাহা ফিরাইয়া দিতে পারিবেন।

যাঁহাদের উৎসাহের উপর উচ্চঅঙ্গের সাহিত্য-পত্রিকার শ্রীবৃদ্ধি নির্ভর করিতেছে,—কোনো রকমে সঙ্ঘবদ্ধ করিতে পারিলে, তাঁহাদের দলবৃদ্ধিও হইতে পারে। এই দলবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই জাতীয় সাহিত্যের যথার্থ উন্নতি সম্ভব। এবং এই উন্নতির অবস্থায় উচ্চ অঙ্গের সাহিত্য-পত্রিকা একখানি কেন দশখানিও বেশ চলিতে পারে, কেন না সুপাঠকের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সুলেখকের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় একখানিও চলা শক্ত। দুঃখের বিষয়,

আমাদের সংসার-জ্ঞানী মন বর্ত্তমান অবস্থাকে চরম বলিয়া স্বীকার করিয়া সাহিত্যের আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও প্রতিযোগিতার ভাবকে অনেক সময় ঠেলিয়া রাখিতে পারে না; ভুলিয়া যায়, যে আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রের মূলমন্ত্র প্রতিযোগিতা নয়, সহযোগিতা; এখানে কাহারও স্থানাভাব নাই, মিলিতে পারিলেই হইল। বাঁচিয়া থাকিবার জন্ম যিনি লড়াই করেন,—তিনি হয় ত অন্যত্র বাঁচিয়া থাকেন, কিন্তু এখানে তিনিই মরেন; 'প্রাকৃতিক বাছাই-কাজে'র প্রণালী এখানে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বর্ত্তমানের নানাবিধ অসম্পূর্ণতার উপর অন্তরস্থিত আদর্শের আলোক-সম্পাত করিতে না পারিলেই যে মনোভাবের উদয় হয়,—সেটী বিশেষ আশঙ্কাজনক,—ইংরাজীতে তাকে বলে 'সিনিসিজ্‌ম',—সকল প্রকার উন্নতি ও অগ্রসরের তাহা অন্তরায়। আমাদের শিক্ষিত সমাজে এই 'সিনিসিজ্‌ম' কিঞ্চিৎপরিমাণে প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া মনে হয় এবং ইহাতে আমরা শঙ্কান্বিত হইয়া উঠিয়াছি। কিন্তু এখানে এ বিষয়ের আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে,—বারান্তরে করিবার ইচ্ছা রহিল। আমরা 'পরিচয়ের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি। যে সাধু উদ্দেশ্য লইয়া 'পরিচয়' সাহিত্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে,—সে উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে থাকিলে,—দেশের অন্যান্য সাহিত্য-পত্রিকাগুলিরও উন্নতি হইবে আশা করা যায়। বস্তুতঃ জাতীয়-সাহিত্যের উন্নতির পরিমাপ, দেশে কতগুলি উচ্চ-অঙ্গের সাহিত্য-পত্রিকা চলিতেছে,—তাহার দ্বারা যদি করা হয় ত বিশেষ অন্যায় হয় না।

নিউ-ইণ্ডিয়া এসিওরেন্স কোং

বাণিজ্য-জগতের এই দুর্দ্দিনে নিউ-ইণ্ডিয়া এসিওরেন্স কোম্পানীর জীবনবীমা বিভাগ যে-পরিমাণে কাজ করিয়াছে বলিয়া দেখা যায়,—তাহা যেমন আশ্চর্য্য তেমনি আনন্দের বিষয়। মাত্র দুই বৎসরের কিঞ্চিৎ অধিককাল হইল,—ইঁহারা জীবন-বিভাগ খুলিয়াছেন। সাধারণ সময়েও এই দুই বৎসরের মধ্যে এত পরিমাণে কাজ করাটা যে কোনো স্বদেশী বা বিদেশী কোম্পানীর পক্ষে বাহাদুরীর বিষয়; কিন্তু এই সময়ে ভারতবর্ষের এই বিষম সঙ্কট কালে,—যখন কত ভাল ভাল কারবার একটির পরে একটি বন্ধ হইয়া গেল—তখন যে আমাদের দেশীয় ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীগুলি টিঁকিয়া থাকিয়া ভালরকমই কাজ চালাইয়াছে,—ইহা বিশেষ সন্তোষের বিষয়! নিউ-ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে একটু বিশেষ করিয়া তারিফ করিতে হয়, কেন না এই দুর্দ্দিনের মধ্যেই তাহারা আত্মপ্রসারণ করিয়াছে।

অবশ্য একথা সত্য যে গত দুই বৎসরের মধ্যে যে স্বদেশ-প্রীতির প্রবল বন্যা দেশের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে,—তাহাই দেশীয় কোম্পানীগুলিকে টিঁকিয়া থাকিবার জন্য বহুল পরিমাণে সাহায্য করিয়াছে। কিন্তু এ কথাও ঠিক যে যাঁহারা টিকিয়া আছেন,—তাঁহাদের নিজের জোরও ছিল। আমরা নিউ-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর যে রিপোর্ট পাইলাম তাহাতে প্রকাশ যে তাহাদের জীবন-বিভাগ খোলার দ্বিতীয় বৎসরের মধ্যেই তাহারা এক কোটি ছয় লক্ষ টাকার কাজ করিয়াছে,—তাহাও আবার ব্যবসা-বাণিজ্যের এই দুর্দ্দিনে। ইহা সত্যই আশ্চর্য্যের বিষয়,—যে-কোনো বিদেশী কোম্পানী ইহাতে গৌরব অনুভব করিতে পারে। ইহা সম্ভব হইল কেমন করিয়া? বিপুল মূলধন ও গচ্ছিত ধনের বলে নিউ-ইণ্ডিয়া কোম্পানী সাধারণের মনে বিশ্বাস জাগাইতে পারিয়াছে,—প্রথম শ্রেণীর কারবার বলিয়া তাহাদের খ্যাতিও যথেষ্ট আছে,—সেই জন্যই ইহা সম্ভব হইয়াছে। আমরা এই দেশীয় কোম্পানীর সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি।

শ্রীমতী মৈত্রেয়ী বসু

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে জার্ম্মেণীর মুনিক্ সহরের India Institute of Die Deutsche Akademie হইতে ডাক্তার শ্রীমতী মৈত্রেয়ী বসুকে একটা বৃত্তি দেওয়া হইয়াছে। এই বৃত্তি লইয়া চিকিৎসা শাস্ত্রে অধিকতর

জ্ঞানলাভ করিবার জন্য তিনি শীঘ্রই জার্ম্মেণী যাইতেছেন। এখানে এম্-বি পাশ করিয়া তিনি চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে এতদিন নিযুক্তা ছিলেন। আমরা শ্রীমতী মৈত্রেয়ীকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি, এবং জীবনে তিনি সর্ব্ববিষয়ে সিদ্ধিলাভ করুন, এই কামনা করি। নীচে তাঁহার একটি ফটোগ্রাফ মুদ্রিত করিলাম।



অধ্যাপক খোদা বক্স ও চট্টরাজ

বিগত ২৪ শে শ্রাবণ রবিবার অধ্যাপক খোদাবক্সের ও ২৫শে শ্রাবণ অধ্যাপক কালীপ্রসন্ন চট্টরাজের মৃত্যুতে বাংলা দেশ উপর্য্যুপরি দুজন কৃতী সন্তান হারাইল। শ্রীযুক্ত খোদা বকস্ কয়েকদিন যাবৎ ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার বয়স ৫৪ বৎসরের বেশী হয় নাই; শ্রীযুক্ত চট্টরাজের বয়স হইয়াছিল ৬৬ বৎসর, কিন্তু তাঁহার মৃত্যু বড়ই আকস্মিক, মরণের পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত তিনি কাজ করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত খোদা বক্স অল্প বয়সেই ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন এবং অক্সফোর্ডে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার অক্সফোর্ডের এই দিনগুলির স্মৃতি সারাজীবন ধরিয়া তিনি মনের মধ্যে রত্নের মত সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। অক্সফোর্ডের আবহাওয়া ও জ্ঞান-সমৃদ্ধ পরিবেশ তাঁহার মনের মধ্যে যে গভীর ছাপ অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিল,—তাঁহার উত্তরকালের জীবন পর্য্যালোচনা করিলে তাহার চিহ্ন লক্ষ্য করা যায়। কৃতিত্বের সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি দেশে আসিয়া ব্যরিষ্টরী আরম্ভ করেন, এবং ব্যবসায়ে বিপুল পসারও জমাইয়াছিলেন, কিন্তু কেহ তাঁহাকে কখনো অবসর কাল কোনো আদালত-গৃহে যাপন করিতে দেখে নাই। অবসরসময়ে তিনি পড়াশুনা করিতেন, অধ্যাপনা করিতেন এবং বই লিখিতেন। মানবজাতির জ্ঞান-ভাণ্ডারে তিনি যে স্থায়ী কিছু রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহার গ্রন্থ-তালিকা হইতেই প্রমাণ হয়। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার "History of Islamic Civilisation" প্রকাশিত হয়। তারপর ১৯১২ খৃষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া উপর্য্যুপরি প্রকাশিত হয় তাঁহার (১) "Essays: Indian and Islamic", (২) "History of the Islamic Peoples", (৩) "Maxims and Reflections", (৪) "The Orient under the Caliphs", (৫) "Politics in Islam", (৬) "Love offerings", (৭) "The Arab Civilisation", (৮) "Studies: Indian and Islamic"। এই শেষোক্ত গ্রন্থে, মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের তিনটি চমৎকার চরিত্র-চিত্রণ আছে। মৃত্যুর সময় পর্য্যন্ত তিনি "Renaissance of Islam" শীর্ষক একখানি গ্রন্থ-রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন; এই গ্রন্থের কিয়দংশ ওস্‌মানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখপত্র 'ইস্‌লাম কাল্‌চারে' প্রকাশিত হইয়াছে।

খোদা বক্সের জীবনের এই সব কাজ হইতে বোঝা যায় যে ইংরাজ মহিলার পাণিগ্রহণ করিলেও তিনি মনে প্রাণে প্রকৃত মুসলমান ছিলেন,—এবং ইস্‌লাম সংস্কৃতি বিশ্বের মধ্যে প্রচার করিবার জন্য প্রাণপাত করিয়াছিলেন। বিশ্বসাহিত্য, আর্ট, ও কাব্যের মধ্যে তিনি এমনই ডুবিয়া থাকিতেন, যে তাঁহার মনের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার লেশমাত্র স্থান ছিল না। তাঁহার অকালমৃত্যুতে ভারতবর্ষের ও ইস্‌লাম জগতের যাহা ক্ষতি হইল, তাহা সহজে পূরণ করা যাইবে না।

অধ্যাপক কালীপ্রসন্ন চট্টরাজের জীবন-কাহিনী আড়ম্বর বিহীন, কিন্তু গৌরবময়। বাংলাদেশের মুরশিদাবাদ জেলার এক পল্লীগ্রামে দারিদ্র্যের মধ্যে তিনি প্রতিপালিত শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বহুগ্রন্থ রচনা করিয়া তাঁহার খ্যাতির পরিসর বৃদ্ধি করিবার তিনি প্রয়াস পান নাই, কিন্তু গত চল্লিশবৎসর যাবৎ তিন পুরুষ ধরিয়া বাংলাদেশের তরুণ ছাত্র সম্প্রদায়ের মধ্যে তিনি যে কাজ করিয়াছিলেন, তাহার পরিসরও যেমন অল্প নয়, তাহার ভিৎও তেমনি পাকা। তাঁহার প্রণীত 'বীজগণিত' অনেক ছাত্রই পাঠ করিয়া পরীক্ষা পাশ করিয়াছেন,—কিন্তু ছাত্রদের উপর তাঁহার ব্যক্তিগত প্রভাবই ছিল গভীরতর। অঙ্কশাস্ত্র ছাড়াও অনেক শাস্ত্রে তিনি পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা হাস্যরসে ও তাঁহার ব্যক্তিগত মাধুর্য্যে-মণ্ডিত হইয়া, ছাত্রদের মনহরণ করিত।

আমরা এই দুই শোক-সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আমাদের গভীর সমবেদনা নিবেদন করিতেছি।

Edited by Srijut Upendranath Ganguli. Printed by Srijut Sarat Chandra Mukherji at the Sreekrishna Printing Works 259, Upper Chitpur Road, Calcutta and published by the same from 149, Raja Dinendra Street, Calcutta.



বিগত জন্মোৎসব উপলক্ষে শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার
কবিকে যে পুঁথি উপহার দিয়াছিলেন, তাহার একটী পাটার প্রতিলিপি

বিচিত্রা

পঞ্চম বর্ষ, ১ম খণ্ড	আশ্বিন, ১৩৩৮	৩য় সংখ্যা

তীর্থযাত্রী

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[illegible]

[illegible]

[illegible] আবিষ্কার কর [illegible]

[illegible] তাদের সংবাদ তাদের বাহনে, বৃষ্টি [illegible] কি না, [illegible] কি না, শত্রু নিকট আছে কি নেই।

মানুষ সংবাদ বহন ক'রে আনে নিজের অন্তরে। সৃষ্টির সংবাদ বা প্রলয়ের সংবাদ, যুগান্তের বা যুগান্তরের সংবাদ। মানুষ যখন দেখা দেয়, তখন তার কাছে প্রত্যাশার অন্ত থাকে না। অতিথিকে শাঁক বাজিয়ে তখন অভ্যর্থনা করি, অগ্র এগিয়ে দিই, মা তাকে বলে, তুমি আমার ধন। আমরা বলি, ঐ কথাটা সার্থক হোক্, এই যেন সত্য হয় যে, অপূর্ণকে তুমি পূর্ণতর করেছ, জীর্ণকে করেছ নূতন, মগ্নকে উদ্ধার করেছ, মলিনকে করেছ উজ্জ্বল।

সংসারে যখন শান্তি নেই, [illegible] আলোকের [illegible] পথ অবরুদ্ধ, তখন দূরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করি, [illegible] নবজীবনের দূত, কোথায় তুমি? মাতার [illegible] ভিতর দিয়ে তুমি কি এসেছ, হে আদিত্যবর্ণ মহান পুরুষ 'তমসঃ পরস্তাৎ'?

যারা [illegible] জপ তপ আচার অনুষ্ঠানের কথা [illegible], নক্ষত্রের এবং হিসাবীলোকের মন্ত্রযন্ত্র-দ্বারা অকল্যাণের প্রতিকার করবে, তারা মানুষকে চেনে না। [illegible] দুঃখ দুর্ভিক্ষ বাহিরের দুর্যোগে, মানুষের [illegible] অকল্যাণ অন্তরের দুর্গতিতে। মানুষকে নূতন ক'রে জন্ম [illegible] হবে তার শোধন। মানুষ দ্বিজ, বার্থ জন্মের বিকার থেকে পরিত্রাণের জন্যে নূতন জন্মের সংস্কার তার চাই।

যাঁরা মহান্ পুরুষ তাঁরা আপন জন্মে সমস্ত মানুষের জন্যে নবজন্ম এনেছেন। তাঁরা মানুষকে দান করেছেন অমর জীবনের অর্ঘ্য।

কাকে বলে অমর জীবন? মানুষের একটা জন্ম হোলো দৈহিক জীবনে। কালের দ্বারা সে জীবন পরিমিত, দিন গণনা করে তার দৈর্ঘ্য। তার দ্বিতীয় জন্ম অমিতায়ু। এই জন্মের জীবনকে পরিপূর্ণতার আদর্শে বিচার করতে হয়,—জ্ঞানে প্রেমে কর্ম্মে দেশকালের সীমা সে উত্তীর্ণ হয়ে যায়। এই

জীবনকে কোনো মানুষ তার নিজের ব্যক্তিগত অধিকারের মধ্যে ধারণ ক'রে রাখতে পারে না, এইখানে সকল মানুষের চিরজীবনে সে জীবিত।

অমর জীবনের বলে বলে জ্ঞানে বিজ্ঞানে, সৌন্দর্য্য সৃষ্টিতে, বিশ্বকর্ম্মে। মানুষ এর জন্যে প্রাণ দিয়েচে, দুঃখ পেয়েচে, ভুলেচে নিজের স্বার্থ, প্রমাণ করেচে তার দ্বিজত্ব। লাভের লোভে, শক্তির দম্ভে, বুদ্ধির বিকারে যখন তার দ্বিজত্বকে আচ্ছন্ন করে, তখন তার পশুধর্ম্ম একেশ্বর হ'য়ে ওঠে।

পশু যখন আপন পশুত্ব সম্পূর্ণ বিরাজ করে তখন তাতে তা'র কোনো ক্ষতিই হয় না। কিন্তু মানুষের সংসারে পশু প্রভাব সর্ব্বনাশ আনে, হয় জড়ত্বের তামসিকতায় সে জীবন্মৃত হয়ে থাকে, নয় বন্যার গিরিগাত্রের শিলাস্খলনের মতো দুর্নিবার আঘাতে প্রতিঘাতে পরস্পরের মধ্যে প্রলয় ঘটিয়ে তোলে। তখন তাণ্ডব ধরে তার সমস্ত রচনায়, দেবতার সিংহাসন দখল করে দানবে, পরস্পরের মধ্যে অকারণ ঈর্ষা কলহ আলোড়িত হয়ে ওঠে, উদ্দাম বিপুল বন্যা খসিয়ে ফেলাকে মানুষ মনে করে পৌরুষ। এমনি ক'রে কত প্রাচীন সভ্যতার জ্যোতিষ্ক আপন আলো নিবিয়ে অখ্যাতির মধ্যে স্তব্ধ হয়ে আছে, কত সভ্যতা এখনিই রক্ত সংঘাতে আপন চিতা জ্বালিয়ে আত্মহত্যার পথে চলেচে।

দৈন্য দুঃখ দুর্ভিক্ষ অপমান কোথায়, কোথায় জনসমুদ্রমথনের বিষোদ্গার? কোথায় মানুষে মানুষে সম্বন্ধ নিষ্ক্রিয় নির্জ্জীব, কোথায় মানুষে মানুষে সম্বন্ধ হিংস্রতায় ছিন্নবিচ্ছিন্ন? যেখানে অমর জীবনের দায়িত্ব মানুষ আলস্যে অজ্ঞানে বা প্রবৃত্তির অন্ধতায় অস্বীকার করেচে।

তখনি অমৃতের জন্যে প্রার্থনার সময়। সেই অমৃত যন্ত্রে তৈরী হয় না। দূত জন্মলাভ করেন সেই অমৃত আপন পানপাত্রে বহন ক'রে। বিশ্বাসী ভক্ত অপেক্ষা ক'রে থাকেন নবজন্মের অরুণোদয়ের জন্যে, কেননা তিনি এই দৈববাণী শুনেচেন, সম্ভবামি যুগে যুগে। সনাতন মানব নূতন জীবনে জন্মলাভ করেন বারে বারে।

মানুষের ইতিহাস এমনি ক'রেই অমৃতের অভিমুখে প্রবাহিত। "মৃত্যোর্ম্মাঽমৃতং গময়" এই তার বাণী কত নব নব সভ্যতার রূপধারণ করেচে, মৃত্যুধর্ম্মী যে জীবন তার থেকে জ্ঞানের পথে কর্ম্মের পথে আনন্দের পথে তাকে সোপানে সোপানে উত্তীর্ণ ক'রে দিল।

"মৃত্যোর্ম্মাঽমৃতং গময়" এই মন্ত্রকে মানবের মাঝে দাঁড়িয়ে যে মহাপুরুষ উচ্চারণ করলেন অবিশ্বাসী তাঁকে বিদ্রূপ করেচে, অন্ধ তাঁকে মেরেচে। কিন্তু মৃত্যুর দ্বারাই তিনি মৃত্যুকে জয় করেচেন। দুঃখের দ্বারা তিনি সত্যকে প্রমাণ করেচেন।

সেই মৃত্যুঞ্জয় যাঁরা, কোনদিকে তাঁরা মানুষকে পথ দেখালেন? পুরাতন পদ্ধতির দিকে নয়, নূতন ব্যবস্থার দিকে নয়, নবজন্মের দিকে।

আদিকাল থেকে মানবের সাথে যাত্রীরা চলেছে সার্থকতার তীর্থ খুঁজে, নানাদেশে নানাকালে। সে তীর্থ কুবেরের ভাণ্ডারে নয়, ইন্দ্রলোকে নয়, বৈকুণ্ঠে নয়, সে তীর্থ সেইখানে পুরাতন মানব যেখানে নূতন হয়ে জন্মলাভ করেচেন, যিনি ঘোর দুর্দ্দিনে দুঃসহ দুঃখের মধ্যে মানুষকে এই আশ্বাস জানিয়েচেন, সম্ভবামি যুগে যুগে। রাজা আসচে পীড়িত আসচে ক্ষুধাতুর আসচে দীর্ঘ রাত্রি কাটিয়ে দীর্ঘ পথ বেয়ে নবশিশুর কাছে, প্রশ্ন করলে, "তুমি এসেচ?" মাতা বললেন—"তুমি আমার ধন"—সকলে বললে "জয় হোক নবজাতকের"।

এই কথাটি আছে কালিদাসের কুমারসম্ভবে। দেবতা পরাভূত, স্বর্গ শ্রীভ্রষ্ট। সুরেন্দ্র প্রশ্ন করলেন, সুরলোককে কে উদ্ধার ক'রবে? উত্তর এল, মন্ত্রতন্ত্র নয়, দেবসমিতি নয়, কোনো কর্ম্মপদ্ধতি নয়, অমরাবতী অপেক্ষা ক'রে আছে নবজাত কুমারের প্রত্যাশায়; দৈত্যপীড়িত দেবসমাজের তীর্থ মাতার অঙ্কলীন সেই শিশুর কাছে। শিশু জন্ম নিল, সপ্তর্ষির জ্যোতিরুজ্জ্বল আশীর্ব্বাণী ধ্বনিত হোলো লোকে লোকান্তরে—"জয় হোক নবজাতকের।"

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



রবীন্দ্র জয়ন্তী

বিচিত্রা

আশ্বিন ১৩৩৮



রবীন্দ্র জয়ন্তী

পূর্ব্ব ও পশ্চিম

আমেরিকার প্রতি কবির বাণী

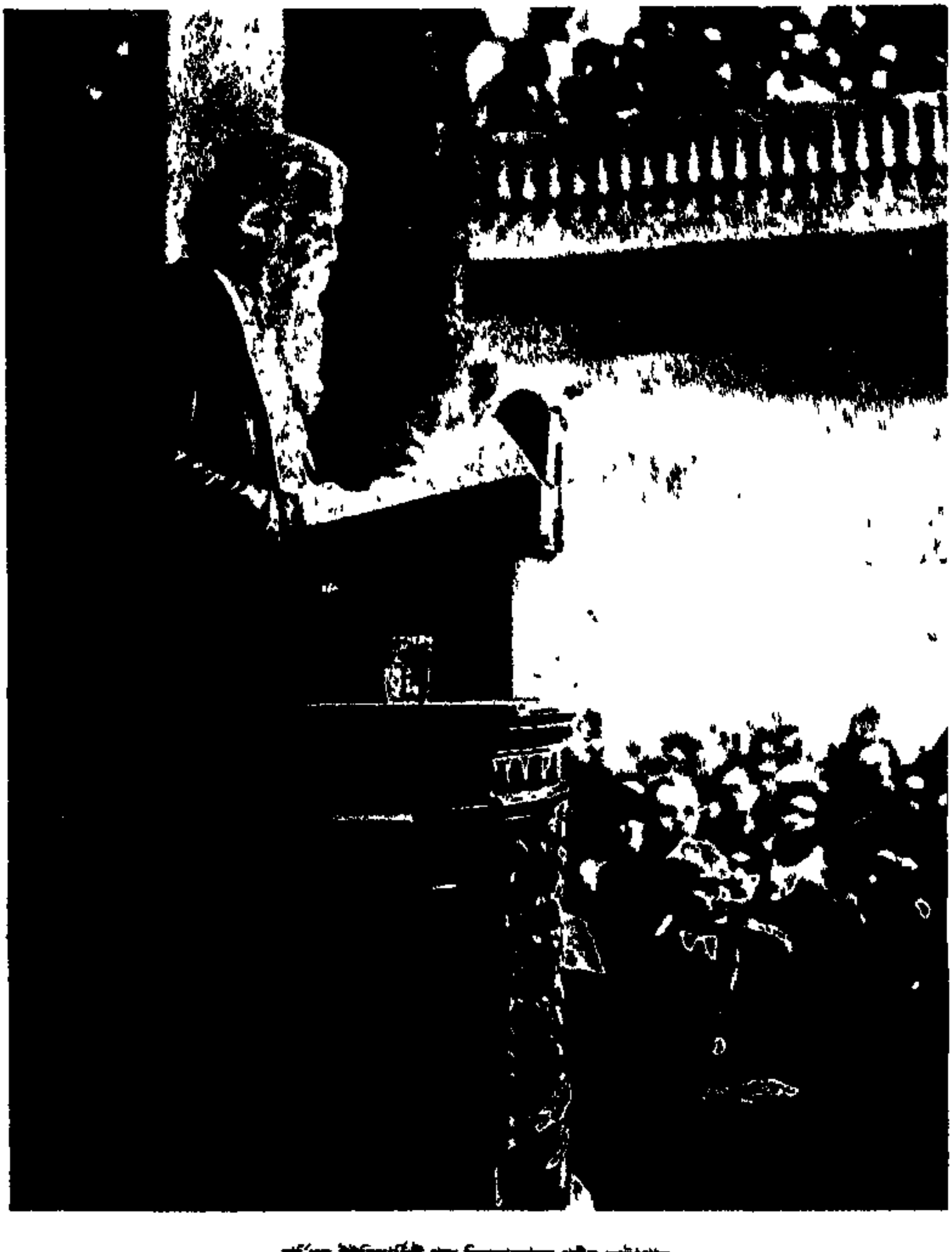
[বিগত জন্মোৎসব উপলক্ষে]

আমেরিকা আবিষ্কারের পরে য়ুরোপেরই নূতন করে আবিষ্কার হ'ল নূতন মাটিতে, নূতন আবেষ্টনের মধ্যে। নব নব অভিজ্ঞতার এই যে বিস্ময়—সমস্ত প্রাচীন সংস্কৃতির পুনর্যৌবনলাভের জন্য এটা প্রয়োজন। অদৃষ্টের এই শুভ যোগাযোগেই পাশ্চাত্য সভ্যতা এই পুনর্জন্মের ভিতর দিয়ে নবজীবন লাভ করতে পেরেছিল, এবং একটা অনভ্যস্ত উদ্দীপনায় তার নূতন নূতন সম্ভাব্যতার মধ্যে দৃষ্টিনিক্ষেপ করবার সুযোগ পেয়েছিল।

মধ্যযুগে য়ুরোপের অশ্রান্ত প্রাণ অসমসাহসিকতায় দেশ-বিদেশে ভাগ্য অন্বেষণে বেরিয়ে পড়েছিল,—অন্যের উৎপাদিত ধনের উপরই ছিল তার দৃষ্টি। কিন্তু আমেরিকায় সে তৈরী করল একটা নূতন বাসভূমি। অতীত গৌরবের উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া কৌশলে ও দক্ষতায় একটা অনধ্যুষিত মহাদেশের যাবতীয় উপকরণ দিয়ে সে সেই-খানেই উৎপন্ন করল আপনার ধন। অদম্য উদ্যমে অপ্রতিহত এই সৃষ্টিক্রিয়ার মধ্যেই সে ফিরে পেল তার যৌবন, এবং পূর্ব্বপুরুষদের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে প্রবৃত্ত হ'ল একটা স্বতন্ত্র জাতি-গঠন-ক্রিয়ায়।

এই নূতন জাতীয় জীবনের প্রথম প্রস্ফুটনের আবেগ শারীরিক গঠন-ক্রিয়াতেই নিয়োজিত হ'য়েছিল। এই গঠন-কার্য্য দ্রুত অগ্রসর হ'তে লাগ্‌ল, ধনাগমের অফুরন্ত উৎস সব আবিষ্কৃত হ'ল, এবং বাস্তব ঐশ্বর্য্য এমন পরিমাণে বেড়ে উঠ্‌ল যা' জগতে আর কখনো দেখা যায় নি। কিন্তু অন্তরাত্মার মানব-ধর্ম্মের যে পরিণতি, তা' স্বভাবতই অনেক বেশী সময়সাপেক্ষ; তাই বহুকাল পর্য্যন্ত মনে হয়েছিল, আমেরিকার মন বুঝি য়ুরোপীয় মনেরই নূতন সংস্করণ,—বস্তুতঃ অতীত সংস্কারের ভিতর থেকে সাগর পাড়ি দিয়ে যে জীবন-যাত্রার নমুনা আমেরিকা বহন করে এনেছিল, নূতন আবেষ্টনের মধ্যেও তারই পুনরাবৃত্তি করবার জন্য সে একটা সকরুণ আগ্রহ দেখিয়েছে।

জীবন কিন্তু সমৃদ্ধতর হ'য়ে আপনার শক্তিকে অক্ষুণ্ণ রাখে, পুনরাবৃত্তির মধ্য দিয়ে নয়, বৈচিত্র্য বিধানের নিত্য-নূতনতার মধ্য দিয়েই। এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই নিত্য-পরিবর্ত্তনের গতির সাহায্যেই আমেরিকার সভ্যতার মধ্যে এক নূতন ব্যক্তি-মানব গড়ে উঠ্‌ছে। সে তরুণ; তার এখনো আদর্শের চিরন্তনতার উপর বিশ্বাস আছে, এবং সেই বিশ্বাসই সৃষ্টির মূল। সেই বিশ্বাস ভেঙে যাওয়াটাই হ'চ্ছে একটা কঠিন রোগ; জরাজীর্ণ সভ্যতার ক্ষয়প্রাপ্ত পেশীগুলো যখন সমস্ত আত্মাকে বিষিয়ে তোলে, তখনই সেই রোগ উৎপন্ন হয়। জরার অভ্রান্ত নিদর্শন যে সিনিসিজ্‌ম্ আমেরিকার সাহিত্যে মাঝে মাঝে তা' যদিও পাওয়া যায়, তবুও বেশ মনে হয়, সেটা অনুকরণমাত্র, এই তরুণজাতির বিশ্বাস-হারাণোর একটা অকৃত্রিম প্রকাশ নয়। আমেরিকা মহাদেশটার যে একটা স্বাতন্ত্র্য আছে তাতে আমার কোনো



বার্লিন ইউনিভার্সিটি গৃহে বিদ্যুতালোকে গৃহীত ফটোগ্রাফ

সন্দেহ নেই। আমেরিকা বৃহত্তর য়ুরোপের একটা সংযুক্ত অংশ নয়। তার একটা নিজস্ব সভ্যতা, একটা সত্যিকারের প্রাণবান্ বৈশিষ্ট্য আছে।

রাষ্ট্রীয় সংঘর্ষ, সীমান্ত-নির্ণয়, পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা ও প্রতিযোগিতার দ্বারা ছিন্নবিচ্ছিন্ন য়ুরোপ আজ পর্য্যন্ত কোনো সত্যকারের মহাদেশীয় ঐক্য গড়ে তুলতে পারে নি। নানাবিধ চিন্তা ও প্রচেষ্টা, কপট সন্ধি ও ততোধিক দুর্বণীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষার লজ্জাজনক পরিণাম, প্রাচীন যুদ্ধ কাহিনীর জ্বালাময়ী স্মৃতির সঙ্গে মিশে য়ুরোপকে যেন সত্যসত্যই একটা ডাইনীর কেট্‌লিতে পরিণত করেছে, সেখানে দুরূহ সমস্তার আর অন্ত নেই। এই অন্তর্নিহিত বিরোধের ফলে য়ুরোপের সামাজিক বন্ধন ও আধ্যাত্মিক ঐক্য দ্রুত শিথিল হ'য়ে পড়ছে; অন্যদিকেও কোনো কিছু নূতন নিষ্পত্তি হ'চ্ছে না।

অপর পক্ষে সামুদ্রিক ব্যবধান ও প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্যের দরুণ আমেরিকাকে কোনো সঙ্কীর্ণতার মধ্যে আবদ্ধ থাকতে হয় নি; তাই তার সুগভীর আত্ম-প্রসারণের সম্ভাব্যতা নিয়ে সে তার নূতন জীবন আরম্ভ করেছে। সুপ্রতিষ্ঠিত রাজ্যের মধ্যে নির্ভাবনায় সে তার স্বাধীনতাকে পরিপূর্ণ পরিণতি দান করতে পারে। জীবন-যাত্রার যে উচ্চ বিধি রাজ্যগুলিতে প্রচলিত আছে তা' দেশের ঐশ্বর্য্য ও অপূর্ব্ব উদ্ভাবনী-প্রতিভারই অনুরূপ, কিন্তু বাস্তব ঐশ্বর্য্যের এই অতি প্রাচুর্য্যই আমেরিকার মনকে অন্তরের ঐশ্বর্য্যের জন্য আকুল করে তুলছে। জীবনের আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্যগুলিকে আমেরিকার মতন এমন ঐকান্তিকতার সহিত বর্ত্তমান জগতে অন্য কোথাও অনুধাবন করা সম্ভব হয় না; এবং প্রভূত ধনোৎপাদন আমেরিকার অন্তর্দৃষ্টিকে আড়াল করা দূরে থাক্, তার কল্পনাকে এমন একটা সৃজনপটু সাধারণ-তন্ত্রতার মধ্যে মুক্তি দিয়েছে, যার মধ্যে মানবাত্মার সত্যকারের স্বাধীনতার সন্ধান মিলতে পারে।

আশা করা যাক্ যে আমেরিকার সভ্যতার এই আধ্যাত্মিক অভিযান আত্ম-প্রকাশের নিত্য-নূতন পথ খুঁজে নেবে; রোগ জয় ক'রে ও জীবন-ধারণের বৈজ্ঞানিক বিধি জনে জনে সংক্রামিত করে তার বাস্তব ঐশ্বর্য্যকে সে বিশ্ব-মানবের কল্যাণ-বিধানের কাজে লাগাবে, এবং তার বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সুদক্ষ পরিচালনায় যে ইষ্ট সাধিত হ'বে, তা' তার ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম ক'রে দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়্‌বে। আধ্যাত্মিক চরিতার্থতার যে সাধনা আমেরিকাকে আজ বিশিষ্টতা দান করেছে, এবং যার জন্য দেশ-বিদেশ থেকে সত্য, ভণ্ড, নানাজাতীয় ভবিষ্যদ্বক্তা তার দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে, সেই সাধনা নিশ্চয় একদিন এমন একটা নূতন সভ্যতার মধ্যে আত্ম-পরিচয় দেবে, যা' য়ুরোপকে তার মৃত অতীতের জীর্ণ বোঝা ও নানাবিধ বিরোধের বাধা থেকে মুক্ত ক'রে নবজন্ম দান করবে; এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সত্যকারের যা' কিছু দান, সেগুলোকে এক মানবাত্মার অখণ্ডতার মধ্যে আত্মসাৎ করতে করতে একটা নূতন এগিয়ে-চলা আদর্শের জীবনী-শক্তি ক্রমশই পূর্ণতর স্ফুরণের মধ্যে বিকশিত হ'তে থাক্‌বে।

* ইংরাজী হইতে অনূদিত।



রবীন্দ্রনাথ-আইনষ্টিন সংবাদ

[গত বৎসর য়ুরোপ ভ্রমণের সময় একদিন আইনষ্টিনের সহিত রবীন্দ্রনাথের যে কথোপকথন হয়, তার সারমর্ম 'এসিয়া' পত্র থেকে আমরা অনুবাদ করে দিলাম। এই কথোপকথন থেকে বেশ বোঝা যায়, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের চিন্তা-প্রণালীর পার্থক্যের ভিতরেও মানুষের সমস্ত চিন্তাধারা ও আকাঙ্খার মধ্যে কেমন একটা সূক্ষ্ম ঐক্যসূত্র আছে।]

রবীন্দ্রনাথ—আজ ডাক্তার মেণ্ডেলের সঙ্গে কথা হচ্ছিল,—গণিতশাস্ত্রের যে সব নূতন আবিষ্কার তাতে বলে পরমাণুর জগতে অনেক কিছুই আকস্মিক। যা' কিছু বিদ্যমান সকলেরই আবির্ভাব ও তিরোভাব পুরোপুরি পূর্ব্বনিরূপিত নয়

আইনষ্টিন—যে সব তথ্যের (facts) জন্যে বিজ্ঞান এই মতের দিকে ঝুঁকে পড়ে,—তারা ত কার্য্যকারণবাদকে একেবারেই বিদায় দেয় না।

রবীন্দ্রনাথ—তা' হ'তে পারে,—কিন্তু মনে হয়, সৃষ্টির মূল উপাদানগুলির মধ্যে কার্য্যকারণত্ব নেই, অন্য একটা শক্তি তাদেরকে নিয়ে একটা সুশৃঙ্খল বিশ্ব গড়ে' তোলে।

আইনষ্টিন—এই শৃঙ্খলাটা যে কেমন তা আমরা বুঝতে চেষ্টা করি, একটা উচ্চতর স্তর থেকে। যেখানে বড় বড় উপাদানগুলি পরস্পর সংযোগের মধ্যে সৎপদার্থকে নিয়ন্ত্রিত করে, সেখানে আমরা দেখি শৃঙ্খলা,—কিন্তু ক্ষুদ্রতম উপাদানগুলির মধ্যে নেমে এলে এই শৃঙ্খলাটা আর দেখা যায় না।

রবীন্দ্রনাথ—অস্তিত্বের গভীরতম তলে এই দ্বৈত আছে—একদিকে অসংযত আবেগ এবং অন্যদিকে সেই আবেগকে পরিচালনা করে' সমস্ত জিনিষের মধ্যে একটা বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা উদ্ভাবন করে যে ইচ্ছাশক্তি,—এই দুইয়ের বিরোধ।

আইনষ্টিন—আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান বলে না যে এরা বিরোধী। দূর থেকে মেঘকে দেখলে মনে হয় এক রকম, কিন্তু কাছে থেকে দেখ্‌লে মনে হয় সেগুলো এলোমেলো বারিবিন্দু ছাড়া আর কিছুই নয়।

রবীন্দ্রনাথ—মনোরাজ্যেও এর তুলনা মেলে। আমাদের কামনা-বাসনাগুলো সব অসংযত,—কিন্তু আমাদের চরিত্র সেগুলোকে সংযত করে তাদের একটা সুসঙ্গত সমগ্রতা দেয়। বস্তুজগতেও কি এমনি কিছু ঘটে? উপাদানগুলি কি সব স্বৈরচারী,—আপন আপন আবেগে চঞ্চল? অন্য কোনো শক্তি কি সেগুলোকে শাসন করে সুনিয়ন্ত্রিত বিধির মধ্যে আবদ্ধ করে' রেখে দেয়?

আইনষ্টিন—উপাদানগুলির মধ্যেও একটা লিপিবদ্ধ সুনির্দ্দিষ্টতার অভাব নেই। যেমন রেডিয়ম তার আপনার নিয়ম কখনই লঙ্ঘন করবে না। উপাদানগুলির মধ্যেও তাহ'লে একটা লিপিবদ্ধ নির্দ্দিষ্টতা আছে।

রবীন্দ্রনাথ—তা' না হ'লে জীবনটা বড়ই এলোমেলো খাপছাড়া রকমের হ'ত। আকস্মিকতা ও পূর্ব্ববিধান—এই দুইয়ের চিরন্তন সঙ্গতির মধ্যে দিয়েই আমাদের জীবন-লীলা চিরনবীন ও প্রাণবান্ হ'য়ে ওঠে।

আইনষ্টিন—আমার বিশ্বাস আমরা যা' কিছু করি বা যা' কিছুর জন্য বেঁচে থাকি, সমস্তই কার্য্যকারণত্বের অধীন। তবে আমরা যে সেটা সব সময় দেখতে পাই না, তা' ভালোই।

রবীন্দ্রনাথ—তবে মানুষের জীবনে তার কতকটা শিথিলতাও আছে,—অল্প পরিসরের মধ্যে কিছু স্বাধীনতা,—আমাদের ব্যক্তিত্বের প্রকাশের জন্য সেটা প্রয়োজন। এ যেন কতকটা আমাদের ভারতীয় সঙ্গীতশাস্ত্রের মত,—পাশ্চাত্য সঙ্গীতশাস্ত্রের মত তা' অত ধরাবাঁধার মধ্যে নেই। আমাদের সুর-রচয়িতারা একটা খসড়া বেশ সুনির্দ্দিষ্ট করে

দেন, তার মধ্যে রাগ-রাগিণী ও তাল-মান-লয়ের একটা পরিষ্কার বিধান থাকে, কিন্তু সেই বিধানের মধ্যে বাদক তাঁর অবস্থা ও প্রয়োজন অনুসারে একটু-আধটু এদিক-ওদিকও করতে পারেন। কোনো একটা রাগিণী-বিশেষের নিয়মের মধ্যে তাঁকে অবশ্য থাকতেই হবে,—কিন্তু তার মধ্যে তাঁর



রবীন্দ্রনাথ ও আইনষ্টিন

সঙ্গীতাবেগের একটা স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রকাশ দিতে কোনো বাধা নেই। সুরের ভিত্তি এবং তার উপর একটা কোঠা খাড়া করে দেওয়ার জন্য আমরা সুর-রচয়িতার প্রতিভার তারিফ করি, কিন্তু বাদকের কাছ থেকেও আশা করে থাকি রাগিণীর মধ্যে নানা চাক্‌চিক্য ও কারুকার্য্যের বৈচিত্র্য-রচনার কৌশল। সৃষ্টির মধ্যেও সমস্ত অস্তিত্বের কেন্দ্রগত নিয়ম আমরা মেনে চলি, কিন্তু সৃষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যদি না পড়ি, তবে আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের স্বল্প পরিসরের মধ্যেই পরিপূর্ণ আত্ম-প্রকাশের জন্য যথেষ্ট স্বাধীনতা থাকে।

আইনষ্টিন—এটা সম্ভব সেইখানেই, যেখানে সঙ্গীতশাস্ত্রে জনমত পরিচালনার জন্য বহুকালের আচরিত একটা শিল্প-সংস্কার থাকে। য়ুরোপে সঙ্গীতশাস্ত্র জনসাধারণের শিল্প ও অনুভূতি থেকে অনেক দূরে চলে এসেছে, এবং স্বকীয় সংস্কার ও প্রথাগুলি নিয়ে যেন অনেকটা একটা গূঢ় শিল্পের মত হ'য়ে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথ—আপনাদের তাই এই জটিল সঙ্গীতশাস্ত্রের কাছে বিনা-প্রতিবাদে মাথা নোয়াতে হয়। আমাদের দেশে কিন্তু গায়কের মধ্যে যতখানি ব্যক্তিগত সৃজনীশক্তি থাকে,—ততখানি তার স্বাধীনতাও থাকে। সে রচয়িতার গান নিজের মত করেই গাইতে পারে,—যদি কোনো রাগিণীর সাধারণ রূপের ব্যঞ্জনার মধ্যে আপনাকে সে স্রষ্টা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

আইনষ্টিন—বিশেষ উচ্চ অঙ্গের কৌশল না থাকলে কোনো সুরের অন্তর্নিহিত বিরাট ভাবটি এমন ভাবে ধরা যায় না,—যাতে ক'রে সেই সুরের মধ্যে ইচ্ছামত অদল-বদল করা চলে। আমাদের দেশে সুরের সমস্ত পরিবর্ত্তনই আগে থেকে নির্দ্দেশ করা থাকে।

রবীন্দ্রনাথ—কর্ম্মে মঙ্গলের সমস্ত নিয়মগুলি মেনে চল্‌তে পারলেই আমরা সত্যকারের স্বাধীনতা পাই। কর্ম্মের নিয়ম ত আছেই,—কিন্তু যা' সেগুলোকে সত্য, এবং করে তোলে,—তা' আমাদের চরিত্র—সেটা আমাদের নিজেদেরই সৃষ্টি। আমাদের সঙ্গীতেও এই স্বাধীনতা ও পূর্ব্ব-বিধানের বৈবাক্য আছে।

আইনষ্টিন—গানের কথাগুলি সম্বন্ধেও কি স্বাধীনতা আছে? অর্থাৎ গান গাইবার সময় গায়ক কি ইচ্ছামত সেই গানে নিজের কথা জুড়ে দিতে পারেন?

রবীন্দ্রনাথ—হাঁ। বাংলাদেশে এক রকমের গান আছে,—আমরা তাকে বলি কীর্ত্তন,—গায়ক ইচ্ছা করলে তার মধ্যে কিছু কিছু নিজের মন্তব্য জুড়ে দিতে পারেন। এতে অনেকখানি উচ্ছ্বাস বেড়ে যায়,—শ্রোতারা সব সময়েই গায়কের জুড়ে-দেওয়া একটা একটা নূতন স্বতঃস্ফূর্ত্ত মধুর আবেগে পুলকিত হ'য়ে ওঠেন।

আইনষ্টিন—ছন্দের নিয়ম কি খুব কঠোর?

রবীন্দ্রনাথ—হাঁ—নিশ্চয়ই। ছন্দের মাত্রা একটুও অতিক্রম করে যাবার জো নেই। গায়ককে তার সমস্ত পরিবর্ত্তনের মধ্যেই নির্দ্দিষ্ট তাল ও লয় মেনে চল্‌তে হ'বে। য়ুরোপের সঙ্গীতে আপনাদের লয় সম্বন্ধে কিছু স্বাধীনতা আছে, কিন্তু সুর সম্বন্ধে নেই। ভারতবর্ষে আমাদের সুর সম্বন্ধে কিছু স্বাধীনতা আছে, কিন্তু লয় সম্বন্ধে নেই।

আইনষ্টিন—ভারতবর্ষীয় সঙ্গীত কি কথার সাহায্য না নিয়ে গাওয়া যেতে পারে? বিনা কথায় কি গান বোঝা যায়?

রবীন্দ্রনাথ—হাঁ,—আমাদের অনেক গান আছে,—তার কথার কোনো মানে হয় না, শুধুই ধ্বনি সুরগুলোকে বহন করে। উত্তরভারতে সঙ্গীত একটা স্বতন্ত্র আর্ট,—বাংলাদেশের সঙ্গীতের মত ভাব ও ভাষাকে সুরে তরজমা করা তার কাজ নয়। সে সঙ্গীত বড়ই সূক্ষ্ম ও দুর্ব্বোধ্য,—যেন একটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সুরের জগৎ।

আইনষ্টিন—সে সঙ্গীত কি বহুধ্বনিবিশিষ্ট (polyphonic) নয়?

রবীন্দ্রনাথ—যন্ত্র ব্যবহার করা হয় বটে, কিন্তু সঙ্গতের জন্য নয়, তালের জন্য এবং পূর্ণতা ও গভীরতার জন্য। আপনাদের সঙ্গীতে সঙ্গতের চাপে সুর কি ক্ষুণ্ণ হয় নি?

আইনষ্টিন—হয় বই কি খুবই। কখনো কখনো সঙ্গতের মধ্যে সুর একেবারে চাপা পড়ে যায়।

রবীন্দ্রনাথ—সঙ্গীতে সুর ও সঙ্গৎ, চিত্রে রেখা ও রঙের মতন। একটা সাধারণ রেখা-চিত্র সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হ'তে পারে—তাতে রঙ লাগালে সেটা হয় ত অস্পষ্ট ও অর্থহীন হ'য়ে পড়ে। তথাপি রঙ রেখার সঙ্গে মিশে বড় বড় চিত্র সৃষ্টি করতে পারে যদি তা' রেখাকে চাপা দিয়ে তার কদর নষ্ট করে না ফেলে।

আইনষ্টিন—এটা বেশ চমৎকার তুলনা। রেখা ও রঙের চেয়ে অনেক প্রাচীন। মনে হয় আপনাদের সুর আমাদের সুরের চেয়ে অনেক সমৃদ্ধতর। অন্ততঃ জাপানী সুর তাই মনে হয়।

রবীন্দ্রনাথ—আমাদের মনের উপর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সঙ্গীতের যে ক্রিয়া, তা' বিশ্লেষণ করে দেখা শক্ত। পাশ্চাত্য সঙ্গীত আমার মনকে খুব নাড়া দেয়। আমি বেশ অনুভব করি যে সে সঙ্গীতের ঠাট যেমনি বিশাল, তাঁর রচনা তেমনি উদার, সে সঙ্গীত মহীয়ান। আমাদের নিজেদের সঙ্গীত আমাকে মুগ্ধ করে তার লিরিক দিক দিয়ে, কিন্তু য়ুরোপীয় সঙ্গীতের ধরণটা এপিকের মত,—তার পরিকল্পনা বিশাল ও তার ঠাট গথিক।

আইনষ্টিন—ঠিক—ঠিক—একেবারে ঠিক। আপনি য়ুরোপীয় সঙ্গীত প্রথম শুনেছিলেন কবে?

রবীন্দ্রনাথ—যখন আমি প্রথম য়ুরোপে এসেছিলাম। তখন আমার বয়স সতেরো। তখন থেকে য়ুরোপীয় সঙ্গীতের সঙ্গে আমার নিবিড় পরিচয়, কিন্তু তার আগেও আমাদের বাড়ীতে আমি শুনেছি। ছেলেবেলাতেই শপা (Chopin) এবং অন্যান্য রচয়িতাদের সঙ্গীত আমি শুনেছি।

আইনষ্টিন—আমাদের সঙ্গীতে আমরা এত বেশী অভ্যস্ত যে একটা কথা আমরা য়ুরোপীয়েরা ঠিক বুঝতে পারি নে। সেটা হ'চ্ছে এই—যে-অনুভূতিকে আশ্রয় করে আমাদের সঙ্গীত রচিত হয়, সেটা কি আমাদের কোনো মূল অনুভূতি না কোনো প্রথাগত অনুভূতি। যে সঙ্গৎ-অসঙ্গৎ আমাদের কাণে লাগে সেটা কি স্বাভাবিক না অভ্যাস-জাত?

রবীন্দ্রনাথ—পিয়ানোটা কেমন যেন আমি বুঝতে পারি নে। তার চেয়ে বেহালা আমার অনেক বেশী ভালো লাগে।

আইনষ্টিন—যৌবনে কখনো শোনে নি এমন কোনো ভারতীয়ের য়ুরোপীয় সঙ্গীত কেমন লাগে জান্‌তে আমার বড় আগ্রহ হয়।

রবীন্দ্রনাথ—একবার আমি একজন ইংরেজ সঙ্গীতজ্ঞকে বলেছিলাম, কোনো ক্লাসিকাল সঙ্গীত বিশ্লেষণ করে আমায় বুঝিয়ে দিতে তার মধ্যে সৌন্দর্য্যের কি কি উপাদান আছে।

আইনষ্টিন্—মুস্কিল হ'চ্চে, যে সত্যকারের ভালো সঙ্গীত বিশ্লেষণ করা যায় না—কি প্রাচ্যের, কি পাশ্চাত্যের।

রবীন্দ্রনাথ—ঠিক তাই। শ্রোতাকে যা গভীরভাবে স্পর্শ করে,—তা' তার নাগালের বাইরে।

আইনষ্টিন—কি এশিয়ায়, কি য়ুরোপে, মানুষের শিল্প-সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতার মূলে যা কিছু আছে, সবই এই রকম অনির্দ্দিষ্ট। এমন কি ঐ লাল ফুলটা যা আমি আপনার টেবিলের উপর দেখছি,—তা' আমাদের দুজনের কাছে এক না হ'তে পারে।

রবীন্দ্রনাথ—তবুও ব্যক্তিগত রুচি আর সার্ব্বজনীন মাপকাঠি,—এদের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য-ক্রিয়া জগতে চলে আস্‌ছে সর্ব্বদাই।



রবীন্দ্রনাথের রেডিও-বক্তৃতা

(দ্বিতীয়াংশ)

[নিউইয়র্ক—১০ই নভেম্বর ১৯৩০]

যন্ত্রকে আধ্যাত্মিক করে তুলব বলা সম্পূর্ণ অর্থহীন; যন্ত্র যে ব্যবহার করে সে নিজের সত্তাকে আধ্যাত্মিক করে তুলতে পারে। যেমন, আমাদের দেহের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে দোষ বা গুণ ব'লে কিছু নেই, দোষগুণ যা আছে আমাদের মনে। প্রলোভন যেখানে সামান্য আমাদের নৈতিক বুদ্ধি সেখানে জয়ী সহজেই হয়। কিন্তু আত্মাকে যখন বড় অঙ্কের ঘুষ খাওয়ান হয়, তখন আত্মসম্মানে আঘাতটা টেরই পাই না। যন্ত্র থেকে আজ যে মুনফাটা এসে আমাদের ঘর ভর্ত্তি করে দিল সেটা এতই বৃহদাকার যে তা নিয়ে কাড়াকাড়ি ক'রে মনুষ্যত্ব খোয়াতেও আমাদের মনে দ্বিধা নেই। আমাদের ভিতরকার অন্তরপুরুষটি যে শুকিয়ে মরচে সে কথা ঢাকা প'ড়ে গেছে বাইরের বস্তুর অসঙ্গত স্ফীতিতে। যা হারালাম তার জন্যে দুঃখ করার সময় পর্য্যন্ত নেই। এ অবস্থায় একমাত্র আশা যে বিজ্ঞানই মানুষের শুভবুদ্ধি ফিরিয়ে আনবে, এই বস্তুসত্তার নিয়ে জুয়োখেলার সুযোগ কমিয়ে দিয়ে। প্রকৃতির ভাণ্ডারে প্রবেশের যে উপায় বিজ্ঞান উদ্ভাবন করেচে তা এতই জটিল যে তা শুধু বিজ্ঞানের অপরিণতিই প্রমাণিত করবে; সে যেন প্রথমশিক্ষার্থীর সাঁতার কাটা, তাতে প্রয়াসহীন সহজগতির একান্ত অভাব। যন্ত্রের এই গুরুভার জটিলতার ফলে অধিকাংশ লোকের কাছে আজ তা অব্যবহার্য্য; এবং এই জন্যেই যন্ত্রকে কেন্দ্রীভূত করতে হয়েছে আসুরিক কারখানাগুলোয়, যার শ্রমিকদের জীবনকে তার স্বাভাবিক ক্ষেত্র থেকে উৎপাটনের ফলে হয়েছে শুধু দুঃখবৃদ্ধি। অমঙ্গলের এই নাগপাশ থেকে বিজ্ঞান একদিন আমাদের মুক্তি দেবে, ধনসৃষ্টির পথগুলো প্রশস্ত করে দিয়ে ব্যক্তিগত লোভের প্রচণ্ডতা বিজ্ঞানই দেবে কমিয়ে—এই আশায় বুকবাঁধা ভিন্ন আর ত কোন উপায় দেখিনা।

আমার বিশ্বাস আজকের দিনে পৃথিবীর সকল সমাজে যে অশান্তি দেখা দিয়েছে তার মূলে আছে আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার বিরুদ্ধে মানুষের আত্মার বিদ্রোহ। প্রগতি যাকে বলি সে ত যন্ত্রপাতির প্রসার; এ প্রসার যেন আমাদের দেহেরই অঙ্গপ্রত্যঙ্গের। তাতে যে বস্তুগত সুখ সুবিধা পাওয়া গেছে তাতে প্রলুব্ধ হয়ে আজকের দিনে মানুষ তার অধ্যাত্ম সম্পদ হারিয়ে বিপথে গিয়ে পড়েচে। জগতের ভারসামঞ্জস্য এমনি করে নষ্ট হতে বসেচে। ধর্ম্ম ও সামাজিকতার ভিতর দিয়ে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধে পূর্ণতা সংঘটনই ছিল প্রাচীন সভ্যতার প্রধান কাজ। কিন্তু আজ গৃহ হয়ে দাঁড়িয়েচে হোটেল, আপিসের ধুলোয়-ভরা অবরুদ্ধ আবহাওয়ায় সামাজিক জীবনের কণ্ঠ-শ্বাস উপস্থিত, নরনারী প্রেমকে ভয় করে, চারিদিকে শুধু চীৎকার উঠেচে প্রাপ্য নেবার দাবী নিয়ে, দেবার কথা সবাই ভুলেচে। আনন্দের চেয়ে আরাম হল বড়, সৌন্দর্য্যের চেয়ে আড়ম্বর। প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে যে সকল বিরাট সভ্যতা পূর্ব্বকালে গড়ে উঠেছিল তারা মানুষের প্রাণের চিরকালের খোরাক জুগিয়েছে বলেই প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা তাদের ছিল, এবং সেই শ্রদ্ধাকে ভিত্তি করে তারা চেয়েছিল জীবনকে গড়তে। এই বৃহৎ সভ্যতাকে মারল সেইসব মানুষ যারা আজকের দিনের অকালপক্ক ইস্কুলের-ছেলেদের মত অতিচালাক, যাদের সমালোচনার প্রবৃত্তি অত্যুগ্র হয়েই আছে, আত্মপূজাই যাদের একমাত্র পূজা; অর্থ ও শক্তি লাভের দিকে নজর



রবীন্দ্রনাথ ও বার্ণার্ড শ

গত জানুয়ারী মাসে লণ্ডনে All Peoples Association হইতে কবিকে যে অভিনন্দন দেওয়া হইয়াছিল, সেই সময়ে গৃহীত ফটোগ্রাফ

রেখে যারা হাটের দরদস্তুর করতে থাকে, কারবার যাদের শুধু ক্ষণভঙ্গুর বস্তু নিয়ে। এরা চায় টাকা দিয়ে মানুষের প্রাণ কিনতে, আর তা শুষে নিয়ে ধুলোয় ফেলে দিতে। আপন প্রবৃত্তির আত্মঘাতী শক্তির তাড়নায় এরা অবশেষে প্রতিবেশীর ঘরে দেয় অগ্নিকাণ্ড বাধিয়ে আর নিজেরা সেই আগুণেই পুড়ে ছাই হয়।

মহৎ আদর্শই বৃহৎ মানবসমাজ সৃষ্টি করে, অন্ধ রিপু সেই সমাজ শুধু ভেঙে খান খান করতে পারে। সমাজ বাঁচে ততদিন মানবাত্মার খোরাক যতদিন সে জোগাতে পারে, ক্ষুধিত বাসনার অনলে যেখানে জীবন জ্বলে যায় সভ্যতার সেখানে মৃত্যু। সেই মহতী বিনষ্টি থেকে আমাদের বাঁচাবে বস্তু নয়, সত্য—এই আমাদের ঋষিবাক্য।

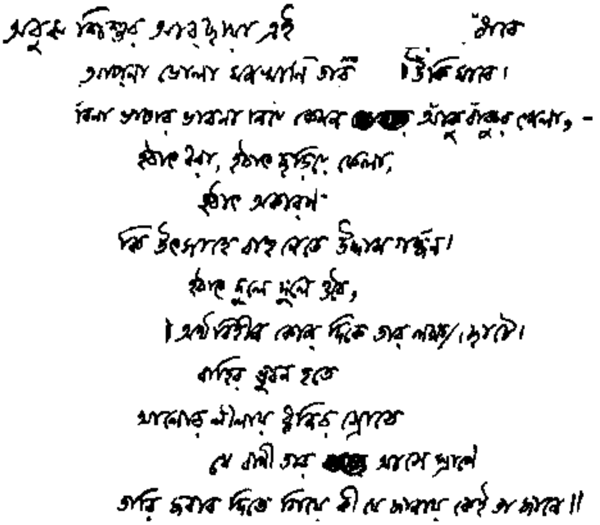
সত্যের দান শান্তি, সত্যের দান আনন্দ। শক্তির সঙ্গে যে-সমাজে আন্তরিক কোন সত্যের যোগ নেই সেখানে সামঞ্জস্য নষ্ট হয়, ফলে মানুষ দুঃখ পায়। সে সমাজ যেন এক চলন্ত মোটরগাড়ী যার চালক অনুপস্থিত।

ইংরাজী হইতে অনুদিত


Where the mind is without fear
and the head is held high;
Where Knowledge is free;
Where the world has not been broken up
into fragments by narrow domestic walls;
Where words come out from the depth of truth;
Where tireless striving stretches its arms
towards perfection;
Where the clear stream of reason
has not lost its way
into the dreary desert sand of dead habit;
Where the mind is led forward by thee
into ever-widening thought and action
Into that heaven of freedom, my Father,
let my country awake.
Rabindranath Tagore

রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা

চিত্র-জগতে এই অনধিকার প্রবেশের জন্য আমার নিকট থেকে একটা কৈফিয়তের দাবী উঠ্‌তে পারে। একটা যে কথা আছে,—যেখানে দেব-দূতেরা ভয়ে ভয়ে সাবধান হ'য়ে চলেন, সেখানে দুঃসাহসের কাজ তারাই করতে পারে যারা নিজেদের অজ্ঞতা সম্বন্ধে একেবারে অন্ধ,—আমি হয়-ত এই কথাটার একটা জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত দিলুম। আমার এই সাহসের জন্য চিত্রকর হিসাবে আমি কোনো প্রতিভারই দাবী করতে পারি নে; কেন না এ সাহস হ'চ্চে তারই যার মধ্যে কোনো রকম কুণ্ঠতা নেই; স্বপ্নে যে-মানুষ বিপদ্‌সঙ্কুল পথ দিয়ে হেঁটে যায়, অথচ বিপদের কোনো রকম আশঙ্কা না থাকার দরুণই রক্ষা পায়, কতকটা তারই মত।



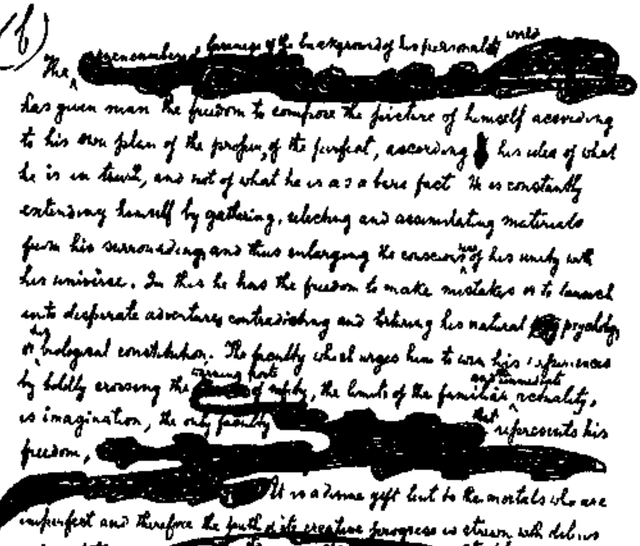
শিক্ষা বলতে যদি আমি কিছু শৈশবে পেয়ে থাকি, তা হ'চ্চে ছন্দের শিক্ষা,—চিন্তায় এবং ধ্বনিতে। আমি বুঝে-ছিলুম যে, যা' বিক্ষিপ্ত, এলোমেলো এবং অকিঞ্চিৎকর, তাকেই ছন্দ প্রাণ দিয়ে সত্য ক'রে তোলে। তাই যখনই আমার পাণ্ডু-লিপিতে কাটাকুটিগুলো পাপীর মত মুক্তির জন্য চীৎকার ক'রে উঠত এবং তাদের অপ্রাসঙ্গিকতার সমস্ত কদর্যতা নিয়ে আমার চোখে আঘাত দিত,—তখনই আমি করুণাদ্র হ'য়ে হাতের কাজ ফেলে রেখে তাদের উদ্ধার করে ছন্দের মধ্যে একটা পরিণতি দেবার জন্যে অনেক বেশী সময় অতিবাহিত করতুম।

এই উদ্ধার-ক্রিয়ার মধ্যে একটা তথ্য আমি আবিষ্কার ক'রে ফেল্‌লুম যে, এই রূপময় বিশ্বে রেখাগুলোর মধ্যে একটা অবিশ্রান্ত প্রাকৃতিক বাছাই-কাজ চল্‌ছে, এবং সেই যোগ্যতমেরাই শেষ পর্য্যন্ত টি'কে যায় যাদের মধ্যে একটা যতির সঙ্গতি আছে; এবং আমার মনে হ'ল যে পরস্পর-সম্বন্ধ সামঞ্জস্যের একটা পরিণতির মধ্যে এই সমস্ত নানাজাতীয় ঘর-ছাড়া অভাগাদের বেকার-সমস্যা সমাধান করাটাই হ'চ্চে আসল সৃষ্টি।

আমার চিত্রগুলো হ'চ্চে রেখায় ছন্দ-যোজনা। যদি দৈবাৎ তারা লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয় তো তা' কোনো ভাবের অভিব্যক্তির জন্য নয়, বা কোনো তথ্যের প্রতিকৃতি হিসাবেও নয়,—সে প্রধানতঃ তাদের ছন্দোবদ্ধ যে চরম রূপ তারই একটা প্রচ্ছন্ন অভিপ্রায়ের জন্য।

২

ধ্বনির জগৎটা হ'চ্চে অনন্তের মৌনতার মধ্যে একটা পরমাণুবৎ বুদ্বুদ। এই বিশ্বের একমাত্র ভাষা হ'চ্চে ইঙ্গিত, চিত্র ও নৃত্যের সহযোগেই বিশ্ব কথা কয়। বিশ্বের প্রত্যেকটি বস্তুই তার রেখা ও রঙের মূক সঙ্কেত দিয়েই জানিয়ে দেয় যে সে একটা ন্যায়শাস্ত্রের চিন্তামাত্র নয়,


(b) The [illegible] has given man the freedom to compose the picture of himself according to his own plan of the proper, of the perfect, according to his idea of what he is in truth, and not of what he is as a bare fact. He is constantly extending himself by gathering, selecting and accumulating materials from his surroundings and thus enlarging the consciousness of his unity with his universe. In this he has the freedom to make mistakes or to launch into desperate adventures contradicting and taking his natural psychology or biological constitution. The faculty which urges him to win his experiences by boldly crossing the [illegible] of safety, the limits of the familiar actuality, is imagination, the only faculty that represents his freedom, [illegible] It is a divine gift but to the mortals who are imperfect and therefore the path of its creative progress is strewn with debris of devastation and stages of perfection are reached through startling deformities.
One thing we must acknowledge that our best creations are not isolated freaks of our own individual mind. It is the consciousness of the universal personality of man, explicit or implicit within us, which works in all great expressions of art and therefore they attain, more or less, the quality of the eternal. [illegible] they proclaim the truth that we [illegible] identify our own selves with all that is beyond us [illegible] we attain our reality. This truth of our personality which is ever widening its consciousness in an expanding range of sympathy is not made tangible by our senses or provable by our intellect but is realizable by the one faculty of ours

বা কেবলমাত্র প্রয়োজন-সাধনের সামগ্রী নয়,—তার সত্তার সবটুকু রহস্য নিয়েই সে অদ্বিতীয় হ'য়ে এই ধরণীতে বিরাজ করছে।

জগতের অসংখ্য জিনিষের সঙ্গেই আমাদের পরিচয় ঘটে,—কিন্তু ভালো-মন্দের বিচারটা বাদ দিয়ে তাদের সত্যের মহিমার মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত করে তাদের আমরা দেখি না। ফুলটা আছে, ফুল হিসাবে থাকাটাই তার পক্ষে যথেষ্ট; কিন্তু আমার ধূমপানপ্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করা ছাড়া আমার সিগারেটটার আর কোনো দাবীই আমার উপর নেই।

কিন্তু এমন আরো অনেক জিনিষ আছে, যারা তাদের ছন্দের সচলতার দ্বারা আমাদের স্বীকার করিয়ে ছাড়ে যে তারা বিদ্যমান। বিশ্বকর্ম্মার খাতায় তারা লাল পেন্সিলে চিহ্নিত, তাই তাদের এড়িয়ে যাবার জো নেই। তারা যেন আমাদের চেঁচিয়ে বলে, "দেখ, আমি আছি"। আমরা মাথা নত করি, "কেন আছ?" এ প্রশ্ন করার সাহস হয় না।

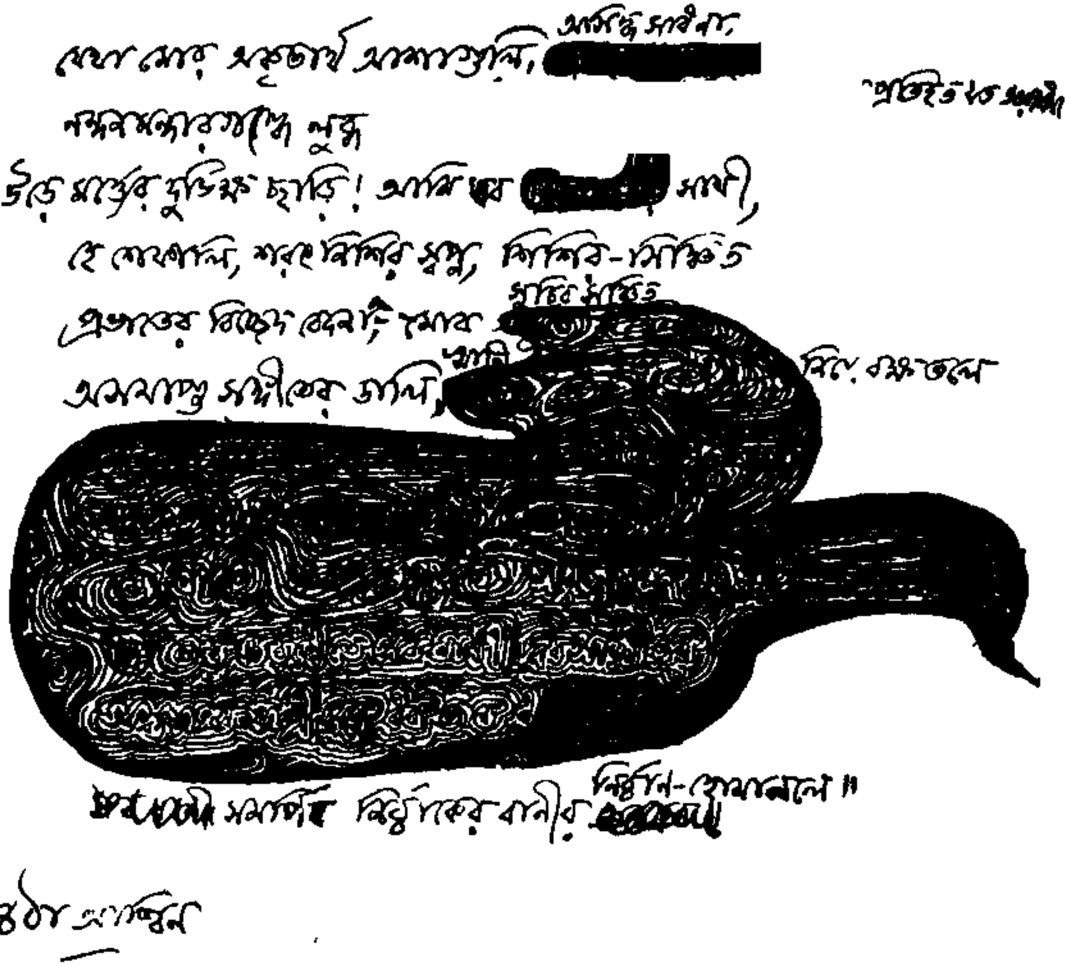
যা একান্ত এবং নিঃসন্দেহেই আছে,—ছবিতে চিত্রকর তারই ভাষা সৃষ্টি করেন। আমরা দেখে বলি,—বাঃ! হয় ত তা কোনো সুন্দরী নারীর প্রতিকৃতি নয়, একটা অতি-সাধারণ রাসভের, কিম্বা এমন একটা কিছুর যার অস্তিত্বের কোনো সাক্ষ্য বাইরের প্রকৃতিতে নেই, আছে তার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্যের অভিপ্রায়ের মধ্যে।

লোকে প্রায়ই আমাকে জিজ্ঞাসা করে, আমার ছবিগুলোর অর্থ কি। আমি চুপ করে থাকি, আমার ছবিগুলোরই মত। তাদের কাজ প্রকাশ করা, ব্যাখ্যা করা নয়। তাদের যে বিদ্যমানতা তার মধ্যেই তাদের চরম সার্থকতা নিহিত থাকে,—তার বাইরে তাদের সম্বন্ধে গবেষণার বা বর্ণনার বস্তু কিছুই নেই। তা না' হ'লে বিস্মৃতির গর্ভে নিক্ষিপ্ত হওয়া ছাড়া তাদের আর গত্যন্তর নেই,—তা' তাদের মধ্যে বিজ্ঞানের বা নীতি-তত্ত্বের যতই বড় কথা থাকুক না কেন।

শকুন্তলা-নাটকে বর্ণিত আছে, এক কর্ম্ম-মুখর প্রভাতে তপোবনবাসিনী কুমারীর সামনে এসে নতমুখে দাঁড়িয়েছিল এক অপরিচিত যুবক। সে তার নাম প্রকাশ করে নি, কিন্তু তরুণীর অন্তরতম আত্মা তখনই তাকে বরণ ক'রে নিয়েছিল বিনা বাক্যব্যয়ে। তাকে সে জানত না, শুধু

দেখেছিল মাত্র, কিন্তু সেই দেখাতেই তার মনে হ'য়েছিল এ যেন শিল্পী ভগবানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, তাই এর কাছে প্রেমের পূর্ণ নিবেদন করা ছাড়া আর উপায় নেই।

দিন গেল। কুমারীর দুয়ারে এল আর এক অতিথি, এক প্রবীণ, শ্রদ্ধেয় শক্তিশালী ঋষি। একান্ত নিশ্চিন্তমনে

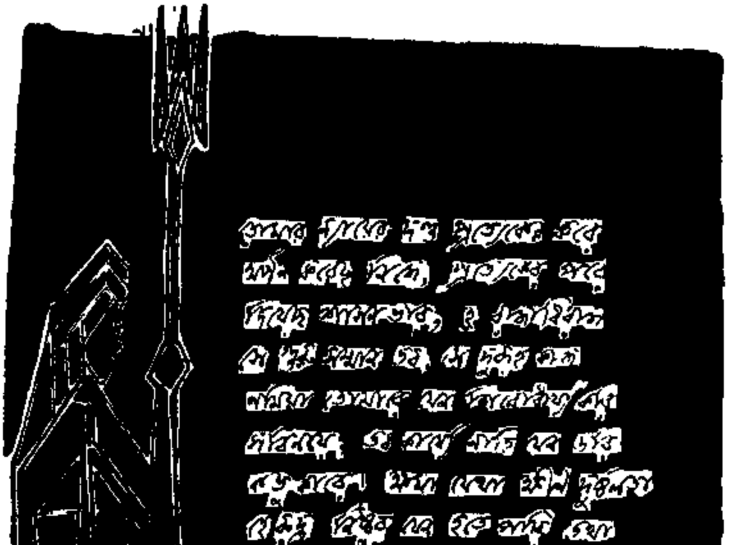


তাঁর প্রাপ্য সমাদরের দাবী করে উদ্ধত কণ্ঠে তিনি ঘোষণা করলেন, "আমি এসেছি।" কিন্তু সে কণ্ঠস্বর তরুণীর কাণে গেল না, কেন-না তার মধ্যে ত কোনো অন্তর্নিহিত অর্থ ছিল না,—তার অর্থবোধের জন্য যে প্রয়োজন ছিল সংসার-ধর্ম্মের ভাষ্য, সুনীতির আদেশ,—যার মধ্যে অতিথির পবিত্র মর্য্যাদার কথা আছে বটে, কিন্তু সে মর্য্যাদা নৈতিক দায়িত্ব-বোধের, দায়িত্ব-বিহীন শিল্পের নয়। প্রেম হ'চ্ছে আর্টের স্বজাতি, তাই অনির্ব্বচনীয়। লোক-হিত দিয়ে কর্ত্তব্যের পরিমাপ হ'তে পারে, লাভ ও ক্ষমতা-অর্জ্জন দিয়ে প্রয়োজনীয়তার পরিমাপ হ'তে পারে, কিন্তু আর্টের পরিমাপ আর কিছুতেই হ'তে পারে না। জীবনের অনেক জিনিষ আছে যারা দর্শকের মত আসে, যায়; কিন্তু আর্ট হ'চ্ছে অতিথি, সে আসে এবং থাকে। অন্যেরা হয় ত প্রয়োজনীয়, কিন্তু আর্ট অপ্রতিরোধ্য।

৩

পাঁচ বছর বয়সে যখন পড়ার বই থেকে পড়া অভ্যাস করতে আর দিতে হ'ত তখন মনের মধ্যে এই ধারণাই ছিল যে, ছাপা পাতার উপর সাহিত্যের প্রকাশ নিগূঢ় রহস্যমণ্ডিত,

সাহিত্যকে নিখুঁৎ পারিপাট্যের অসাধারণ জুলুমবাজী ব'লে মনে হ'ত। সন্ত্রাসের এই রকম একটা হতাশাপূর্ণ অনুভূতি থেকে আমার মন মুক্তি লাভ করলে যখন দৈবক্রমে আমি আমারই মধ্যে আবিষ্কার করলাম



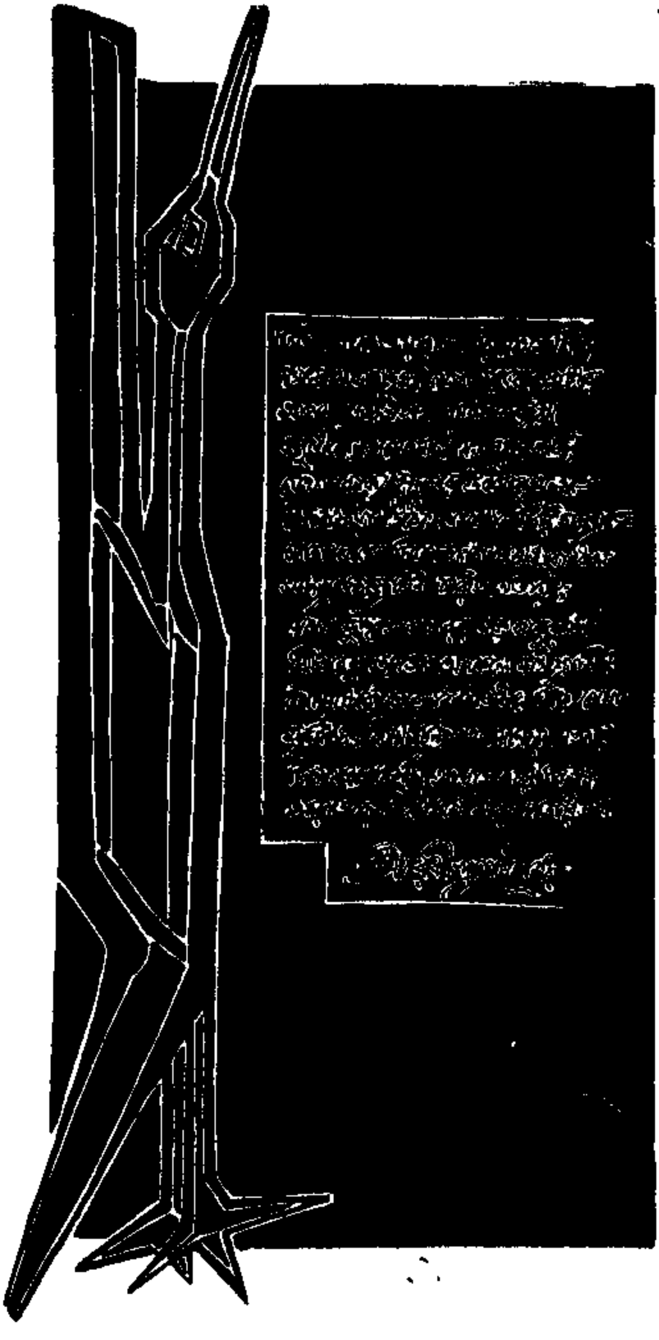
যে কবিতা রচনা অপরিণত বুদ্ধি এবং কম্পিত হস্তাক্ষরের সীমার বাইরের ব্যাপার নয়। তখন থেকে আমার প্রকাশ-ক্রিয়ার একমাত্র আশ্রয় হ'ল কথা,—ষোল বছর বয়সে তাকে অনুসরণ ক'রে উপনীত হল সুর—আমাকে ঠিক তেমনি ভাবেই বিস্মিত ক'রে।

ইত্যবসরে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র অবনীন্দ্রনাথ কর্তৃক প্রাচ্য ধারানুগত বর্তমান শিল্প-আন্দোলন প্রবর্তিত হয়েছিল। শব্দ-রাজ্যের সুসংবদ্ধ সীমা অতিক্রম করবার সনদ আমার অদৃষ্ট আমাকে দেয়নি এ বিষয়ে মনে মনে অসংশয়িত হ'য়ে আমি তাঁর কার্য্য-কলাপ ঈষৎ ঈর্ষাসংযুক্ত আত্ম-সঙ্কোচের সঙ্গে নিরীক্ষণ করতাম।

কিন্তু সব রকম শিল্পের মধ্যে যে বস্তুটি বর্ত্তমান, তা হচ্ছে ছন্দের তত্ত্ব, যা জড় পদার্থকে সজীব পদার্থে পরিণত করে। এর সঙ্গে আমার সহজ পরিচয়ের মধ্য দিয়ে এবং এর প্রয়োগকার্য্যে আমার সাধনার সুযোগে, আমি বুঝেছিলাম যে রেখা আর রঙ্‌ শিল্পের মধ্যে কোনো তথ্য প্রকাশ করে না, চিত্রের মধ্যে তারা একটি ছন্দের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করবার চেষ্টা করে। তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য বাইরের কোনো ঘটনাকে বা ভিতরের কোনো কল্পনাকে ব্যাখ্যা করা বা অনুকরণ করা নয়, পরন্তু এমন একটি অখণ্ডতা গ'ড়ে তোলা যা আমাদের দর্শনেন্দ্রিয় দিয়ে মানস-রাজ্যে প্রবেশ লাভ করতে পারে। অর্থের প্রশ্নে অথবা অনর্থের ভারে এ আমাদের মনকে পীড়িত করেনা—কারণ এ সর্ব্ব অর্থের অতীত।

অসংবদ্ধ রেখার দল তাদের অসঙ্গতির নিশ্চলতা দিয়ে আমাদের দৃষ্টির স্বাচ্ছন্দ্যকে ব্যাহত করে। বস্তুপুঞ্জের মহাযাত্রার সঙ্গে তারা গতিশীল নয়। তাদের অস্তিত্বের

সপক্ষে কোনো যুক্তি নেই, সেই জন্যে তারা তাদের আবেষ্টনকে নিজেদের বিরুদ্ধে জাগিয়ে তুলে সর্ব্বদা অশান্তির সৃষ্টি করে। এই জন্যে আমার পাণ্ডুলিপির মধ্যে ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত কাটাকুটি আর জোড়াতাড়া গুলো আমাকে বিরক্ত করে। তারা যেন শোচনীয় দুর্ঘটনা, —যেন হাঁ-করা নির্ব্বোধের দল একটা ভুল জায়গায় আট্‌কে পড়েছে, কোথায় এবং কি ভাবে যেতে হবে সে বিষয়ে দ্বিধাগ্রস্ত। কিন্তু যদি সেই দলের অন্তস্তলে নৃত্যের প্রভাব সঞ্চারিত করা যায় তা হ'লে সেই অসংযুক্ত বহু পরম একতা লাভ করে, এবং থাকা এবং না-থাকার দ্বিধা থেকে মুক্ত হয়। আমার সংশোধনগুলিকে নৃত্যশীল করতে, ছন্দের যোগসূত্রে তাদের সংযুক্ত করতে, এবং যে সকল বস্তু কেবলমাত্র সঞ্চিত হয়ে উঠেছিল তাদের অলঙ্কারে পরিবর্ত্তিত করতে আমি চেষ্টা করি।



ছবি আঁকার বিষয়ে এই হচ্চে আমার অচেতন সাধনা। নষ্টোদ্ধারের এই কাজে আমি নিঃস্বার্থ আনন্দলাভ করি, এবং আমার মনোযোগের উপর যে-সাহিত্যের ষোল আনা দাবী আছে এবং যে-সাহিত্য জগতের কাছ থেকে অনেক সময়ে একটা পাকা রকমের খ্যাতি প্রত্যাশা করে, তার প্রতি আমার সাক্ষাৎ কর্ত্তব্য সম্পাদনে যতটা সময় এবং মনোযোগ দিই, অনেক সময়ে তার চেয়ে বেশি দিই এই নষ্টোদ্ধারের কাজে। রেখাসমূহের পরস্পরের মধ্যে বিভিন্ন ভঙ্গিতে যেমন যেমন যোগ-সাধন হ'তে থাকে, কেমন বিচিত্র ভাবে তারা জীবন এবং প্রকৃতি লাভ করে এবং কি অপূর্ব্বভাবে তাদের মধ্যে সভঙ্গি-ভাষণ আরম্ভ হয়ে যায়—তা আমি গভীর ঔৎসুক্যের সঙ্গে নিরীক্ষণ করি। বিশ্বকে আমি রেখার বিশ্ব ব'লে কল্পনা করতে পারি—যে রেখাসমূহ তাদের গতি এবং সংযোগের দ্বারা কালের অন্তহীন প্রবাহে তাদের অস্তিত্বের আভাষ সঞ্চার করছে। পর্ব্বত এবং মেঘ, তরু-শ্রেণী, জলপ্রপাত, দীপ্তিশালী গ্রহমণ্ডলের নৃত্য,—অন্তহীন জীব-যাত্রা নিঃশব্দ

মহাকাল এবং সীমাহীন মহাশূন্যতার মধ্য দিয়ে সুসঙ্গত ইঙ্গিত প্রেরণ করে, যার সঙ্গে মিলিত হয় পরিপূর্ণতার দৈব মিলনেচ্ছায় ইতস্ততঃ সঞ্চরমাণ অনাথা বেদিনীদের মত রেখাগুলির মূক বিলাপ।

বিশ্ব-সৃষ্টির খসড়ায় বিশ্ব-সম্মত সৌন্দর্য্য এবং সমতাতত্ত্বের বিরোধী চিরনিন্দিত ভ্রমসঙ্কুল রেখা, কাটাকুটি আর অবচ্ছিন্ন অসঙ্গতি আছে। তারা রহস্য জাগিয়ে তোলে এবং সেই জন্যে মহাশিল্পী বিশ্বকর্ম্মাকে উপকরণ জোগায়, কারণ তারাই হ'চ্ছে সেই সব আসামীর দল যাদের স্বাতন্ত্র্যের কলরবকে বিশ্বজনীন ঐক্যের নূতন সুরে বাঁধতে হবে।

আমার নিজের পাণ্ডুলিপির গোলযোগগুলির বিষয়েও আমার এই রকম অভিজ্ঞতাই হয়েছিল, যখন অপনোদিত ভুলগুলির স্বেচ্ছাচারিতা অপূর্ব্ব মূর্ত্তি এবং প্রকৃতি পরিগ্রহ ক'রে একটি ছন্দানুগত আত্ম-সংশ্রবে রূপান্তর লাভ করেছিল। কোনোটা একটা সম্ভবপর জন্তুর পরিমিত অতিরঞ্জন ধারণ করলে—এমন একটা প্রাণী যা অনির্দেশ্য কারণে অস্তিত্বের সম্ভাবনা থেকে বঞ্চিত হয়েছে, কোনোটা বা এমন একটা পাখী হ'ল যা কেবলমাত্র আমাদের স্বপ্নেই উড়তে পারে এবং একমাত্র আমাদের চিত্র-পটের উপর সদয় রেখা-পাতে বাসা পেতে পারে। কোনো কোনো রেখা ব্যক্ত করলে ক্রোধ, কোন রেখা সৌম্য পরোপকার প্রবৃত্তি, কোনো কোনো রেখা ফুটিয়ে তুললে এক রকম মৌলিক হাসি যা নিজের পরিচয় সাধনের জন্য মুখের আকারে নিজেকে গঠিত করতে অস্বীকার করলে—মুখ ত দৈবাৎ-সৃষ্ট ব্যাপার ভিন্ন আর কিছু নয়। এই রেখাগুলি যে-সকল প্রবৃত্তি ব্যক্ত করে তা প্রায়ই সগুণ, প্রকৃতি যা' গ'ড়ে তোলে তার নির্ভর সূক্ষ্ম ইঙ্গিতের উপর। সুকুমার শিল্পের শ্রেণীতে এই সব অস্বেচ্ছাপ্রসূত অশ্রেণীবদ্ধ জীব স্থান পেতে পারে কি-না তা যদিও আমি জানি নে, তারা আমাকে প্রগাঢ় সন্তোষ দান করে এবং অনেক সময়েই আমার প্রয়োজনীয় কাজে অবহেলা ঘটায়। এই সম্পর্কেই আমার মনের মধ্যে সঙ্গীতের মুক্তি-ঘোষণার কথা উপস্থিত হ'ল। এ কথা নিঃসন্দেহ যে, সর্ব্ব-প্রথমে কথার জালে নিহিত ভাবগুলিকে ফুটিয়ে তুলে সুর কথাকে অনুসরণ করত। কিন্তু সঙ্গীত এই আনুগত্যের শৃঙ্খল বিমোচিত করলে এবং কথা হ'তে নিষ্কর্ষিত ভাবসমূহের ভঙ্গী এবং অনির্দ্দিষ্ট প্রকৃতির আশ্রয় হ'ল। প্রকৃতপক্ষে এই নির্ম্মুক্ত সঙ্গীত স্বীকার করে না যে, যে-সকল ভাব ভাষার দ্বারা ব্যক্ত হ'তে পারে তারা সঙ্গীতের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়, যদিও সঙ্গীতের গঠন ব্যাপারে তারা গৌণ স্থান অধিকার করতে পারে। এই স্বাধীনতার অধিকার সঙ্গীতকে তার মহত্ত্ব দিয়েছে, এবং আমার মনে হয় নৈসর্গিক তথ্য কিম্বা ঘটনার একান্ত আনুগত্য থেকে মুক্তি-লাভেরই উদ্দেশ্যে চিত্রকলা এবং সুকুমার কলার বিবর্ত্তন এই ধারায় অগ্রসর হচ্ছে।

সে যা হ'ক, আমি কোনো শিল্প-বিধির নিয়মন করতে চাইনে, আমি শুধু এইটুকু ব'লেই সন্তুষ্ট থাকতে চাই যে, আমার ক্ষেত্রে আমার ছবিগুলি সনাতন ধারার সংযত অনুশাসনে এবং ছবি আঁকবার সাগ্রহ প্রচেষ্টায় জন্মলাভ করে নি, পরন্তু ছন্দবোধ সম্বন্ধে আমার সহজ চেতনায় এবং রেখা এবং রঙের সুসঙ্গত সম্মেলনের আনন্দে করেছে।

২রা জুলাই, ১৯৩০।

ইংরাজী হইতে অনূদিত।

চিত্র সম্বন্ধে বিদেশের অভিমত

১

ফিলাডেল্‌ফিয়ার "Public Ledger" হইতে—

৩রা জানুয়ারী ১৯৩১।

নিউম্যান গ্যালারীতে রবীন্দ্রনাথের যে চিত্রগুলি এখন প্রদর্শিত হ'চ্চে, তা প্রাণের মধ্যে এক অননুভূতপূর্ব্ব আবেগের ঝঙ্কার তোলে।

যার ছন্দ উপরিতলের বহুনিয়ে স্পন্দমান। রেখার প্রবাহে ও রঙের ঝঙ্কারে নারীর যে মুখাবয়ব ছন্দের সুষমায় বিকশিত হ'য়েছে, তার মধ্যে যেন একটা সমগ্রজাতির আকাঙ্খা লিপিবদ্ধ রয়েছে। সংযম, বাসনা, রুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা, মিষ্টিসিজম্‌,—এই ধরণের সব আবেগ ও চিন্তালহরী শিল্পীর সৃষ্টিকে অনুপ্রাণিত করে।

আত্ম-প্রকাশের জন্য ছবি আঁক্‌তে রবীন্দ্রনাথ শেষ



কবি ও মিষ্টিক, সুর-রচয়িতা ও জগৎ-গুরু রবীন্দ্রনাথের এই যে আর্ট,—এর উৎস জাতীয় অভিজ্ঞতারই গভীরতার মধ্যে, অথচ এর মধ্যে সেই সার্ব্বজনীন আবেদনও আছে, যা' সত্যকারের শিল্প-সৃষ্টির প্রকৃত পরিচয়।

প্রত্যেকটি জল-রঙা ছবির মধ্যে যেন দেখা যায় ভারতবর্ষের ঝঙ্কারময়, স্পর্শভীরু প্রাণের এমন একটা লীলা,

জীবনে আরম্ভ করে থাক্‌তে পারেন, কিন্তু কোনো দিনই তিনি আনাড়ি ছিলেন না। কবি ও সুর-রচয়িতা হিসাবে ছন্দ ও গঠন-প্রণালী বিষয়ে তাঁর বহুদিনের অভিজ্ঞতা ছিল। এই সব ছন্দ তাঁর চিত্রে প্রতিফলিত হ'য়েছে। তাঁর চিত্র কবির চিত্র,—রেখা-রঙের ঢেউ; তার মধ্যে আদিমকালের অদ্ভুত পক্ষী-মূর্ত্তি থেকে

আরম্ভ করে রঙের সূক্ষ্মতম সাবলীল প্রকাশ পর্য্যন্ত সবই আছে।

একটা ছবিতে কবি মানবজাতিকে রূপায়িত করেছেন,—দণ্ডায়মান মূর্ত্তি, বাহুদুটি ঊর্দ্ধে উত্তোলিত,—অগ্নিবর্ণ পটভূমিতে লোহিত-পিঙ্গলের একটা ক্ষীণ ইঙ্গিত। কামনা, সংগ্রাম, একটিমাত্র অর্ঘ্যে অটুট বিশ্বাস—এই সব তার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে।

আর এক কল্পলোকে দেখি অন্য একটা মূর্ত্তির আভাস,—বাহুযুগলে দেহটাকে বেষ্টন করে অবনতমস্তকে একটা রূপালী ঝরণা-ধারার নীচে দাঁড়িয়ে আছে। প্রথমটি যেমন সবটাই অগ্নিবর্ণ, জ্বল-জ্বলে রঙের মধ্যে বেদনায় ও উচ্চাকাঙ্ক্ষায় যেন দ্যুলোক-বিচরণের একটা পিয়াস,—দ্বিতীয়টি তেমনি শান্ত,—যেন জীবনের সেই পুণ্য মুহূর্ত্ত যখন সুসঙ্গতি অবিশ্রান্তবর্ষণে অন্তরাত্মার উপর ঝ'রে পড়ে। আর্টের ভাষায় বল্‌তে গেলে এ যেন একটা চরম আনন্দের সারবস্তুর প্রকাশ।

…এ চিত্র মানুষের সমস্ত আবেগ ও সমস্ত অনুভূতিকে জাগিয়ে তোলে। কে কতখানি এই ছবি দেখে মুগ্ধ হন,—তাই দিয়ে তাঁর আবেগ ও অনুভূতির গভীরতার পরিমাপ করা যেতে পারে। এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বল্‌ছেন মানুষ ও তার অদৃষ্টের কথা, পারিপার্শ্বিক সীমার বিরুদ্ধে মানব-জীবনের অবিশ্রান্ত সংগ্রামের কথা, প্রাণ-প্রদীপের নির্ব্বাণ-হীন জলন্ত শিখার কথা, আদিমকালের অকৃত্রিম ও আধুনিক যুগের কৃত্রিম আবেগ ও প্রবৃত্তির কথা।

আধুনিক পাশ্চাত্য শিল্পীর মত তিনি হাঁড়ি-কলসী নিয়ে কালক্ষেপ করেন না; তাঁর কাছে আর্ট হ'চ্চে প্রাণকে লীলায়িত, বিকশিত ও অভিব্যক্ত করবার উপায়। দেহ ও তার আশ-পাশের জিনিষ নিয়ে যে বস্তুতন্ত্রতার কারবারি, এবং যার উপর সমসাময়িক পাশ্চাত্য আর্ট প্রতিষ্ঠিত,—এই ভারতীয় কবির আর্ট তার ধার দিয়েও ঘেঁসে না। তবুও মনে হয় যে, আমাদের চোখ বাস্তবকে দেখতে এতই অভ্যস্ত যে এই কথঞ্চিৎ অবাস্তব আর্টের পক্ষে সমাদর লাভ করা হয়-ত একটু কঠিন হ'বে,—যদিও যে-অল্প কয়েকজন এ রসের অধিকারী তাঁরা এর থেকে অনির্ব্বচনীয় তৃপ্তি লাভ করবেন।

২

প্যারি সহরে গ্যালারী পিগলে রবীন্দ্র-নাথের চিত্র-প্রদর্শনী উপলক্ষে শ্রীযুক্ত আঁরি বিদু কর্ত্তৃক লিখিত প্রবন্ধের কিয়দংশ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন যে কবি হিসাবে তাঁর যে কাজ আর চিত্রকর হিসাবে যে কাজ, এ দুইয়ের মধ্যে কোনো সংযোগ নেই। কবি হিসাবে তিনি যা বর্ণনা করেন, তা' তাঁর চোখের সাম্‌নে থাকে,—একটা কিছু দৃশ্য,—কিংবা তাঁরই কথায় বল্‌তে গেলে একটা মানসিক প্রতিকৃতি। তিনি দেখলেন, একটা প্রাকৃতিক দৃশ্য, কিম্বা একটা উদ্যান, কিম্বা একখানি মুখ; তারই যে ছবি তাঁর মনের মধ্যে অঙ্কিত হ'য়ে গেল, চিত্রকরের মতই তিনি সেইটের অনুকরণ করতে থাকেন। তাঁর ছন্দ এই সমস্ত দেখা কিম্বা সৃষ্টি-করা ছবিগুলিই পাঠকের উপলব্ধি গোচর করে। অপর পক্ষে তিনি যখন ছবি আঁকেন, (এইটেই হ'ল সবচেয়ে আশ্চর্য্য কথা),—ঠিক যে জায়গায় অন্যেরা অনুকরণ আরম্ভ করে,—সেই জায়গায় তিনি অনুকরণ বন্ধ করেন। আগে থেকে ভেবে-নেওয়া কোনো কিছুকে তাঁর চিত্রগুলি মূর্ত্ত করে তোলে না। আগে থেকে দেখা দূরে থাক্, আঁকবার সময় তিনি নিজেই জানেন না সেগুলি কী হ'য়ে উঠ্‌তে চলেছে। কাজেই দেখা যায়, কবিতা লেখ্‌বার সময় তিনি কাজ করেন চিত্রকরের মতো। এখন তিনি চিত্রকর হ'য়ে উঠেছেন, এখন তিনি কাজ করছেন কবির মতো। তাঁ'র এই সমস্ত নতুন কাজগুলো দুই বিজ্ঞান অথবা দুই কলার সীমারেখার উপর অবস্থিত।

তাঁর প্রথম অঙ্কনগুলো আমি দেখেছি। বাংলা কবিতার পাণ্ডুলিপিগুলিতে তিনি কাটাকুটি করেছিলেন।

কবিরা সুন্দর হস্ত লিপি-লিখিয়ে। তাই সেই সংশোধনগুলি করা হ'ত কুজোকুজি কাটা লাইন দিয়ে; কালো লাইনগুলির ফাঁকে ফাঁকে সরু সরু শাদা সূত্ররেখা থাকৃত। শাদা শাদা ডোরা-দেওয়া এই সুদর্শন জমিটাকে তিনি একটা সীমারেখা দিয়ে ঘিরে দিতেন; কখনো কখনো তা দু'

সমস্ত পাতাটার উপর এই রকম অনেকগুলি সংশোধন ছড়ান থাক্‌ত; মনে হ'ত যেন তারা এক একটা দ্বীপ, প্রত্যেকের আকার ও আয়তন স্বতন্ত্র। অনুপ্রেরণার খেয়ালেই যেন সাগর থেকে ওঠা এই দ্বীপপুঞ্জ কখনো পাতার এক কোণে গুমায়াত হ'ত, কখনো বা সমস্ত



লাইন পর্য্যন্ত বিস্তৃত হ'ত। তারপর যদি আবার নীচের লাইনের সংশোধনটা খানিকটা বাঁদিকে চলে আস্‌ত, তাহ'লে সবটা হ'যে দাঁড়াত হয় ত একটা পাখীর ঠোঁট, নয়ত একটা নৌকো,—অথবা যেন একটা পাখী উড়ে যাচ্ছে পশ্চিমের দিকে।

পাতাটায় ছড়িয়ে থাকৃত,—স্থির বাতাসে তরঙ্গ-ফেনার মত সরু সরু বাংলা অক্ষরগুলির পরিবেষ্টনে তারা একতা-সূত্রে বদ্ধ। রবীন্দ্রনাথ এই সমস্ত সংশোধনের দ্বীপ মালা পরম্পর সংযুক্ত করতেন, প্রাণহীন সোজা রেখা দিয়ে নয়, তরল, প্রবহমান বাঁকা রেখা দিয়ে; তাদের মধ্যে প্রাণ যেন

স্পন্দিত হ'য়ে উঠত, সবটা মিলে একটা যে সুচিত্রিত সুদৃশ্য কারুকার্য্য গড়ে উঠ্‌ত তার মধ্যে দেখা যেত প্রাণের নিঃশ্বাসের খেলা সুরু হ'য়েছে।

এই নিয়ম কবির হাতকে আপনার আয়ত্তের মধ্যে রেখে দিত। চিন্তিত-পূর্ব্ব কোনো চিত্রণ—কাজ ফুটিয়ে তোলার তিনি কল্পনাও করতেন না,—তিনি কেবল একটা নূতন রেখার জন্মলাভে সাহায্য করতেন। সে রেখা সম্বন্ধে কোনো ধারণাই তাঁর থাকত না,—সেটা যেন জন্মের জন্যই এতক্ষণ প্রতীক্ষা ক'রে ছিল। তাঁর মনও আগে থেকে বুঝ্‌তে পারত না যে সেই বিশেষ রেখাটা এই বার আস্‌বে, কেবল যখন সেটা আস্‌ত, তখন তাঁর মন চিন্‌তে পারত যে ঠিক এই জায়গাটার এই রেখাটাই আস্‌বার জন্য এতক্ষণ চেষ্টা করছিল,—যেন রেখাটা আগে থেকে আঁকাই ছিল, দেখা যাচ্ছিল না। এমন একটা সূক্ষ্ম সুগভীর সত্যকে হিসাব কসে, গবেষণা করে, পরীক্ষা করে সহসা আবিষ্কার করবার সাধ্য আমাদের যুক্তিশীল মনের নেই; অসংখ্য সম্ভবপর আকারের মধ্যে থেকে এই বিশেষ আকারটাকেই ফুটিয়ে তুল্‌তে পারে শুধু কবির হাতখানি, তার আত্মশক্তিতে সঞ্জীবিত হ'য়ে। কবির সঙ্গে পরামর্শ করবারও তার দরকার হয় না—বহুকাল ধরে ছন্দ বানিয়ে বানিয়ে ছন্দ যে সে হাতের মজ্জার সঙ্গে মিশে গিয়েছে! আমি পাণ্ডুলিপিতে অঙ্কিত এই রকম বক্ররেখা অনেকগুলি দেখেছি। তাদের সুষমার, সঞ্জীবিত নমনীয়তার, অন্তর্নিহিত প্রাণলীলার তুলনা নেই।

তবুও মাঝে মাঝে তিনি ভুল করেন, আমাকে নিজেই তিনি বলেছেন। যেন একটা ফুলের বোঁটা নোয়াতে গিয়ে সেটা ভেঙে যায়। যে রেখাটা ভুল করে টানা হ'য়েছে, মরণ ছাড়া আর তার উপায় থাকে না। তিনি বেদনায় তাকে পরিত্যাগ করেন, জানেন,—তার মরণের তিনিই কারণ। কেন-না এই সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকৃতিগুলি যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এক একটি প্রাণী,—তিনিই তাদের বিকশিত করে তুলেছেন, তাঁর কাছ থেকেই তারা মুক্তিলাভের আশা করে।…এই সমস্ত বক্র রেখাগুলি, যার মধ্যে গণিত-শাস্ত্রের সূক্ষ্মতম তত্ত্বগুলি লুকানো আছে, এরা কী রহস্যময়!



সংবাদ পত্রের অভিমত

Muenchener Telegramm—Zeitung,
Muenchen (23. 7. 30)

কবি তাঁর চিত্রগুলিকে আখ্যা দিয়েছেন "রেখার কাব্য"। তিনি এ কথাও বলেছেন যে, ছন্দানুগত আকারই তিনি তাঁর পক্ষে প্রয়োজনীয় মনে করেন। এই দুই দিক থেকে দেখলে, দর্শক এই ছবিগুলির মধ্যে স্পর্শের



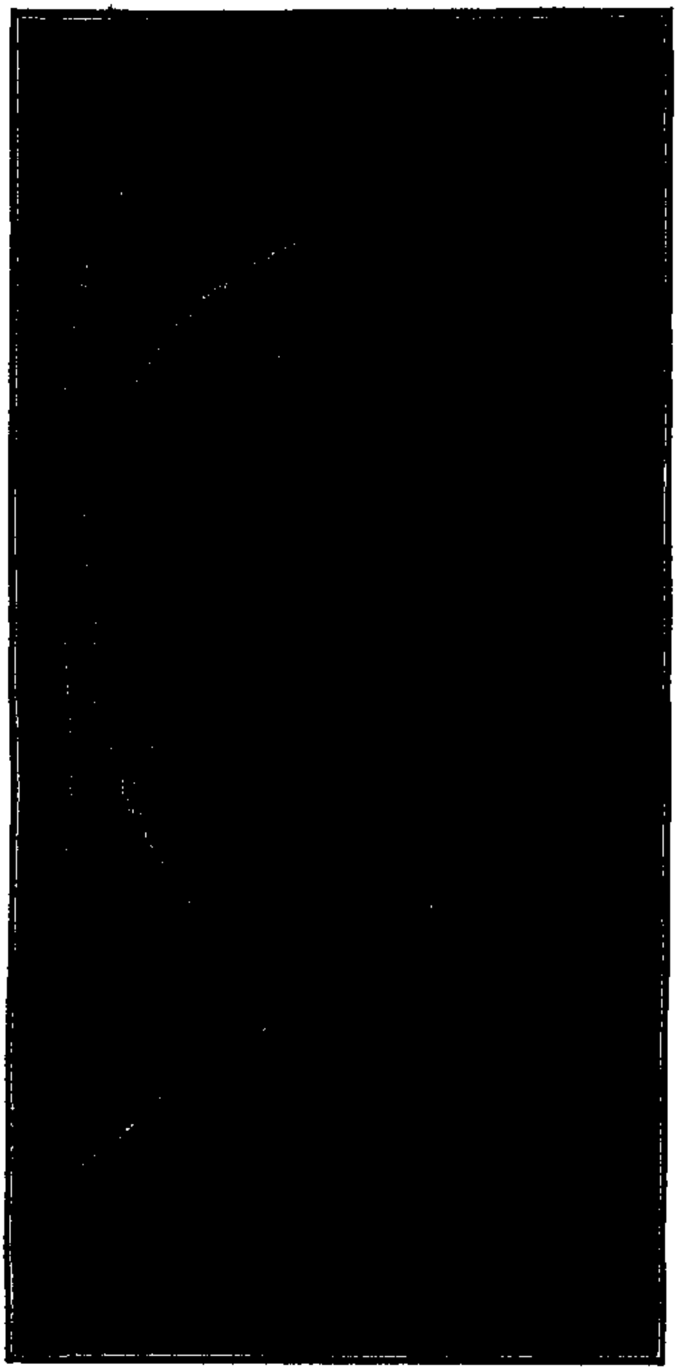
একটা অনুভূতি বোধ করেন—আধুনিক ইউরোপীয় আদর্শের সহগামী ব'লে যে ছবিগুলি অতিশয় কৌতূহলোদ্দীপক।

বিষয়-বস্তুর অজস্রতা এবং কলাকৌশল পরীক্ষার বহুত্ব বিস্ময় উৎপাদন করে। নানা রঙের রঙিন পোঁচগুলিকে সবল কালো কালীর রেখা বিভক্ত ক'রে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অলঙ্করণের নমুনা ক'রে তুলেছে। এর পর পূর্ব্ব-দেশবাসী ভারতীয় জাদুকর তাঁর পরিচ্ছন্ন-ভাবে নক্সা-কাটা রূপকথার অদ্ভুত পাখী আর অপরূপ জন্তু এবং মানুষের মুখের মত বহু আকারের মুখস নিয়ে প্রকাশিত হলেন। স্থৈর্য্য এবং প্রশান্তির একটি সুর এই সব বিচিত্র সৃষ্টি-গুলির মধ্যে প্রবহমান। নীলবর্ণের আলো-ছায়ায় আঁকা একটি নটীর মূর্ত্তি প্রতিভার অতি উচ্চস্তরে স্থান পাবার যোগ্য, এবং বেগুণী রং-এর বড় বড় বাদামী রেখা-চক্রে রচিত একটি রমণীর বৃহৎ মুখমণ্ডলে সূক্ষ্ম রেশমী আমেজ।

* * *

Hamburger Fremdenblatt (26. 7. 30)

এই প্রদর্শনীর মধ্যে শিল্পীরূপে—অর্থাৎ চিত্রশিল্পীরূপে—রবীন্দ্রনাথের আধুনিকতম অভিব্যক্তি আমরা দেখ্‌তে পাই। বিষয় এবং তার প্রকাশ-ভঙ্গীর নূতনত্ব এবং মৌলিকতা আমাদের অভিভূত করে।·· সারা বিশ্বের মর্ম্মের মাঝে তাঁর ছবিগুলি সুদূর কোন্ জগতের অপরূপ জাদু জাগিয়ে তোলে; তাঁর ধ্যান-লোকে হয়ত কোনো



দিন জার্ম্মানী এবং ভারতবর্ষের পরিচয় নিবিড়তর হয়ে উঠ্‌বে।

* * *

Mannheimer Tageblatt

(22. 7. 30.)

রবীন্দ্রনাথ এবার সকলকে বিস্মিত ক'রে দিয়েছেন। তিনি ছবি আঁকেন। প্রদর্শনীতে তাঁর ৩০০ ছবি আছে। প্রকৃতির ছবি,—জন্তু, ফুল, পাখীর ছবি।...উপকথার অপরূপ সব প্রাণী, দুর্ল্লভ পাখী, কোণাচে গড়নের আঁকা-জোকা। উজ্জ্বল পৃষ্ঠপটের উপর মাতৃ-মূর্ত্তি। আকার সংযোজনে স্বপ্নময়তা। ... ছন্দ-সৌষ্ঠবে এবং মানস-লোকের সঙ্গীতে সমস্ত পরিব্যাপ্ত। বর্ণ বিন্যাসে রবীন্দ্রনাথ সুরুচি দেখিয়ে বিস্মিত করেছেন।

* * *

Nationaltidende—9. 8. 31

—Copenhagen.

প্রদর্শনীটি সর্ব্বতোভাবে অপূর্ব্ব। অধিকাংশ লোক নিশ্চয় প্রথমে প্রবলভাবে মাথা নাড়বে, কিন্তু পরে তারা উত্তরোত্তর আকৃষ্ট হয়ে উঠ্‌বে এবং অবশেষে বুঝ্‌তে পারবে যে, যে-বিখ্যাত কবির সামনে তারা উপস্থিত তিনি অবলীলাক্রমে একজন বড় চিত্রকর হ'তে পারতেন, এমন কি সময়ে সময়ে তাঁকে তাই বলেই মনে হয়। অভাব যা তা শিক্ষার। কিন্তু শিক্ষা বোধ হয় তাঁর কলা-কৌশলকে সাক্ষাৎ অনুভূতি, কল্পনার মৌলিকতা এবং

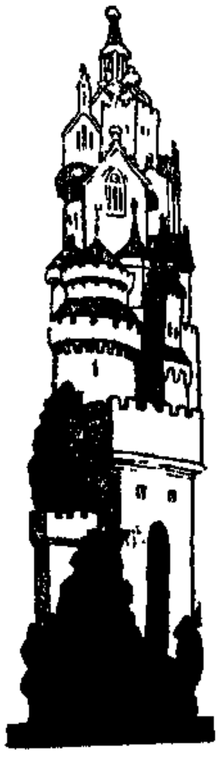
ঘটনাবলীর স্বপ্নময় পরিকল্পনা থেকে বঞ্চিত করত,—বর্ত্তমানে তাতাই তাকে মূল্যবান ক'রে তুলেচে।··· মূর্ত্তি দেবার বিষয়ে তাঁর ক্ষমতা থেকে আমরা তাঁর অন্তর্জাত শক্তির সন্ধান পাই। আকার, রেখা এবং রঙের বিষয়ে তাঁর সমতাবোধও,—যার পরিচয় সর্ব্বত্র দেখতে পাওয়া যায়—তাঁর অন্তর্জাত এবং অবচেতন শক্তি হ'তে উৎপন্ন ব'লে মনে হয়।···

সুনিপুণ কাব্যশ্রী-সম্মত ছন্দের অনুভাবে কবি আত্ম-প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথের ছবিগুলির সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা কঠিন। কোন প্রচলিত ধারাকে তারা অনুসরণ করে না···কলাকৌশলও অভিনব···বাস্তবতার কোনো কথাই ওঠে না। সুদূর ও অপরূপের কল্পনা দিয়ে গড়া স্বপ্নলোক হ'তে তারা কাব্যদৃষ্টি,—কল্পনা এবং সুরের ছন্দের সহিত একান্ত পরিচিত কলা-কৌশলীব্যক্তির রচিত।

* * *

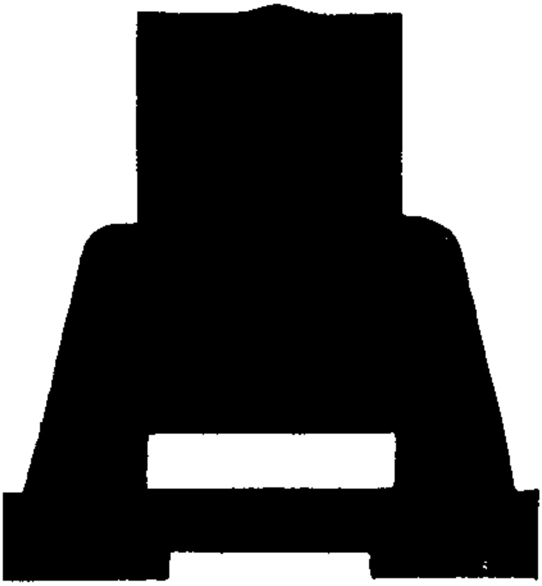
Dresdener Anzeiger—Dresden.

রবীন্দ্রনাথের পক্ষে কলানুগত অভিব্যক্তির একটা নূতন উপায় হচ্ছে ছবি আঁকা। তাঁর কবি-দৃষ্টিগুলিকে মূর্ত্তিতে বাঁধবার জন্যে তিনি সুকৌশলে একে কাজে লাগান। গত দু বৎসর তিনি —কয়েক শ ছবি এঁকেছেন, তার আগে তিনি কখনো ছবি আঁকেন নি। সে-ছবিগুলি আপনা-আপনিই সৃষ্টিলাভ করেছে। এই অপরূপ ছবিগুলির মধ্যে আছে তাঁর সুরের খেলা। প্রাচ্যের আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে প্রতীচীর আকারের সুস্পষ্টতা ফুটে উঠেচে—কিন্তু সেগুলি সম্পূর্ণভাবে মৌলিক—কোথাও একটুও অনুকরণ নেই। সেগুলির মধ্যে দেখ্‌তে পাওয়া যায় সৃষ্টির প্রবল আবেগ—অন্তর্লোকের সম্পদের ভাণ্ডার। রবীন্দ্রনাথের ছবিগুলি তাঁর আত্মার অংশ,—তারা কাব্য এবং সুর,—অপরূপ, কিন্তু কপটতা এবং কৃত্রিমতা বর্জ্জিত। মহিমাময় আত্মার সেগুলি ঐকান্তিক অভিব্যক্তি।



রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর চিত্রকলা

কবির ছবি দেখবার সুযোগ এই লেখকের এবার হয়েছিল। তাঁর কলম আপনি চ'লে যেরূপ অপরূপ রূপ-লোকের সৃষ্টি করে তাঁর ছবিও ঠিক তাই, তবে একটি হ'ল তাঁর সারা জীবনের সাধনার ফল এবং অপরটি অবলীলা-ক্রমে যা এসেচে তাই তিনি এঁকে গেছেন। তাতে সাধনার স্থলে আছে ঐকান্তিক আনন্দ। কবির মনের



শ্রীযুক্ত অসিতকুমার গঠিত প্লাক্

কোণের যে রেখা রঙের ভাষা এতদিন তাঁর কাব্যের মধ্যে ফুটে উঠেচে তারই যদি আমরা প্রতিচ্ছায়া এই সব ছবিতে দেখতে যাই ত হয় ত আমরা হতাশ হ'ব। কিন্তু যদি যে উৎস থেকে উৎসারিত হয়ে তাঁর কাব্যকলা প্রাণ পেয়েচে তার সন্ধান আজ আমরা পাই ত দেখব যে এই অপরূপ রেখা রঙের খেলাগুলি তারই অন্যতম অভিব্যক্তি। কলা-কুশলী সাধক শিল্পীরা এখন যে অপরূপ এক রূপ-জগতের সন্ধান আজ দেশ বিদেশে করচেন সেগুলিতেও ঠিক এই একই প্রকারের সহজ ভাব দেখতে পাওয়া যায়।

কবির যে বাল্যকাল থেকেই চিত্রকলার প্রতিও বিশেষ অনুরাগ ছিল তা সকলেই বিদিত আছেন। তিনি তাঁর যৌবনে তাঁর কনিষ্ঠ আত্মীয়দের মধ্যে যাঁর এতটুকুও শিল্প-কলার অনুরাগ আছে দেখতেন তাঁকেই নিজের কাছে ডেকে নিয়ে অশেষ যত্ন করতেন যাতে তাঁর সেই শিল্প-চর্চ্চায় কোনো বাধা না পড়ে। নানা প্রকার কাব্যে ও গানে তাঁকে অনুপ্রাণনা দিতেন। শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথও তরুণ বয়সে তাঁরই উৎসাহে উৎসাহিত হয়ে চিত্রাঙ্গদার চিত্রাবলী এঁকেচেন। কবির নিকট এপর্য্যন্ত কত শিল্পীই এ বিষয় ঋণী তার ইয়ত্তা নেই। কবির কাছে যাঁরা পৌঁছতেও পারেন নি এমন সব দেশের শিল্পীরা আছেন যাঁরা তার কাব্য ও গানের ভিতর দিয়ে ভাবরাজ্যের দুয়ারের সন্ধান পেয়েছেন।

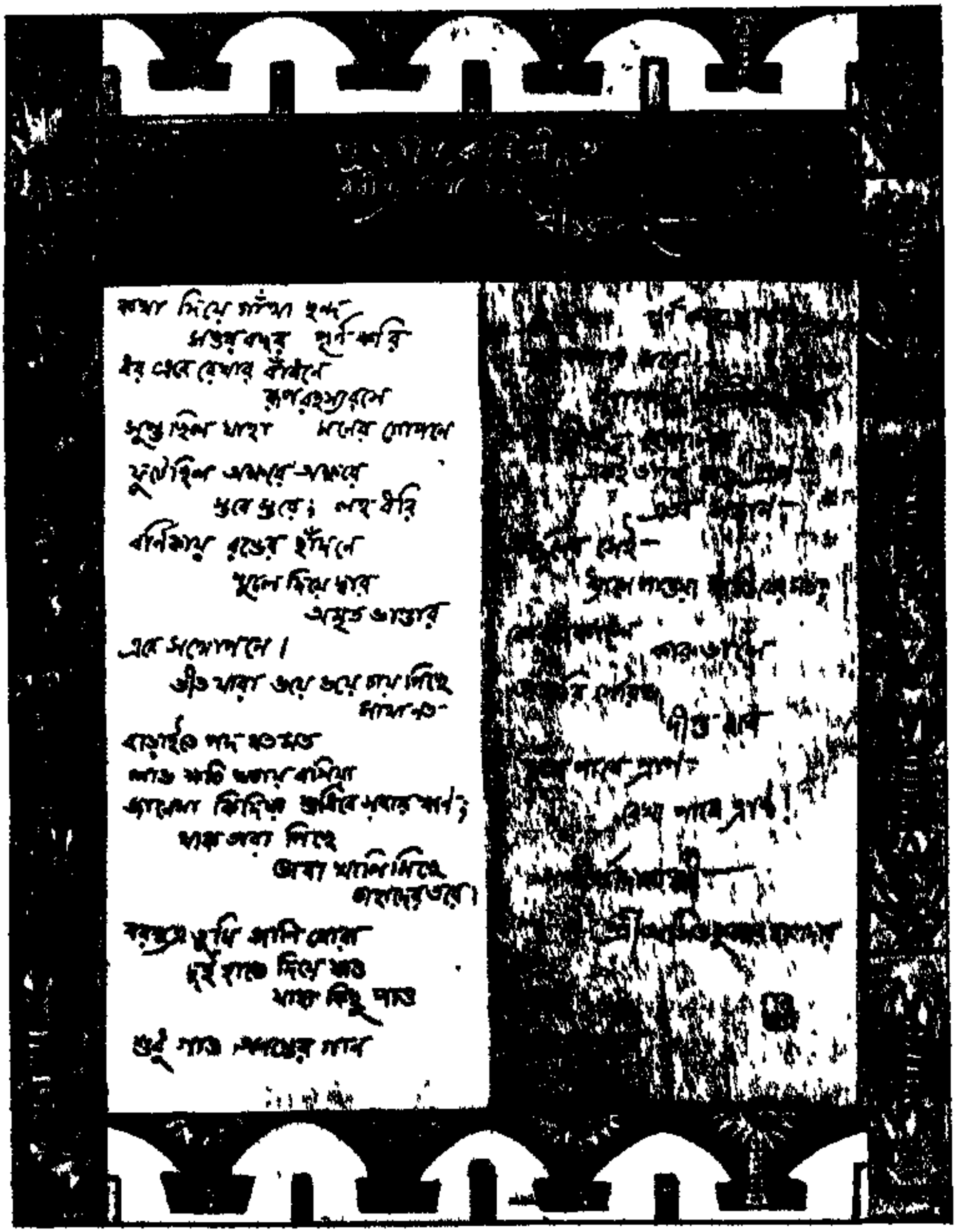
রেখা ও রঙ ফলানোর বিশেষ শিক্ষা কবির শিল্পী হিসাবে না থাকলেও কবি হিসাবে যে রঙ ও রেখা কাব্যের পাতায় পাতায় আজ পর্য্যন্ত পরিবেশন করে এসেচেন তার আস্বাদ গ্রহণ যুগে যুগে শিল্পীরা করবে এবং যুগে যুগে তার নূতন জন্মলাভ হবে। আমরা তাঁর এই চিত্রগুলিতে শিক্ষা-সংযত রেখা-বিন্যাস বা বর্ণ-বিন্যাস পাইনা বটে কিন্তু পাই অপূর্ব্ব এক রচনা-কৌশল যা কবির করতলগত হয়েচে আপনা থেকে এবং তার ব্যাখ্যা হয় না। ব্যাখ্যা জিনিষটা শিল্পকলার পক্ষে কতটা দূর চলে তা বলা যায় না। সাধারণ রুচি ও শিক্ষার উপর নির্ভর করে ছবি ভাল লাগা না লাগা। যিনি পার্শী থিয়েটারের পটাবলীর পক্ষপাতী তাঁর সেইরূপ

ধরণের উৎকট স্বাভাবিক স্বভাব-চিত্রই ভাল লাগে এবং যিনি হয়ত কবির 'ডাকঘর' বা 'ফাল্গুনী' প্রভৃতি নাট্যরসের রসিক তাঁর নিকট ঠিক্ সেইরূপ লাগসই সূক্ষ্মরসবোধের ব্যাপারই আনন্দ দেয়। সুতরাং এক কথায় কোনো শিল্পীর সাধনাকে একজন কেউ উড়িয়ে দিলেও আর একজন হয়ত তার তারিফ করবেন। তবে আমরা অতি আধুনিক ইউরোপীয় শিল্পের ভিতর যে একটা নাড়াচাড়া পড়েচে দেখচি এবং আমাদের গতানুগতিক পন্থার উপর ক্রমশঃ যে বীতশ্রদ্ধ ভাব আসচে তা থেকে এই অনুমান করা যায় যে বাঁধা পথে চলা শিল্পজগতে আর চলবে না। এখন নিজের ব্যক্তিত্বকে ফোটাবার চেষ্টা করতে হবে নানান ভাবে। তার প্রথম ও চরম পথ পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের দেখিয়েছিলেন পূজনীয় অবনীন্দ্রনাথ। লাল টিনের খেলনা-লোলুপ শিশুর মত আমরা যে হাত বাড়িয়ে বসেছিলুম অন্যদেশের শিল্পজননীর কাছে কিছু পাব বলে, সেটা যে কতদূর অহিতকর তা' আমরা হাড়ে হাড়ে এখন বুঝতে শিখেছি। তাঁরই জ্যেষ্ঠ পূজনীয় গগনেন্দ্রনাথই অপর দিকে দেশীয় রীতিতে আঁকা দেশের আর্টের ভিতর সর্ব্বপ্রথমে বিদেশের অতি-আধুনিক ভাঙ্গা গড়া futurist school cubist school প্রভৃতির রসযোজনা করেন। এখন আবার এপ্‌ষ্টিনের মত primitive আর্টের চলন যা বিদেশে চলেচে তার কতকটা আজ কবির আঁকা ছবিতে অনেকে দেখতে পাচ্ছেন। অবশ্য এ বিষয় সঠিক বিচার করা চলেনা। তাঁর ছবিতে কখন কখন আদিমযুগের জীবজন্তুর আকারের মূর্ত্তি দেখে কোনো কোনো ভাবুকব্যক্তি বলচেন যে অতি আধুনিক ইউরোপীয় futurist-দের চেয়েও অতি ভবিষ্যৎ যুগের শিল্পকলার গোড়াপত্তন কবি আজ করলেন। তবে এইরূপ ভাঙ্গাগড়াটা রক্ষণশীল বনিয়াদিদের পক্ষে অচল মনে হতে পারে কিন্তু উন্নতিশীল সাধারণের পক্ষে যে হিতকারী এ বিষয় কোনো সন্দেহ নেই।

রুদ্র কাল বৈশাখীর ঝড় যেমন আসে সব ওলটপালট করে দুনিয়ার সব জঞ্জাল পরিষ্কার করে দেবার জন্যে, তেমনি আর্টের মধ্যেও ঐরূপ এক একটি প্রলয়-শিল্পীর অভ্যুত্থান হতে দেখা যায় যাঁরা সব গতানুগতিক রীতি ভেঙ্গে ফেলে দিয়ে এক-একটি নবযুগের সৃষ্টি করেন। 'সেঁহা' 'ভ্যানগঘ' 'গোঁগা' 'রেঁদা' 'এপ্‌ষ্টিন্' প্রভৃতি ইউরোপের শিল্পীদের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। আজ মনে পড়চে এই লেখক যখন ভারতী পত্রিকায় ১৯০৯ সালে অজন্তার বিবরণ চলতি ভাষায় লেখেন তখন তাঁর সুধী সাহিত্যিক বন্ধুরা তাঁর ভাষার 'গুরু-চণ্ডালী' দোষ দেখে হতাশ হয়েছিলেন, এখন কিন্তু সেরূপ ভাষাই বাঙ্গলা ভাষায় চলতে দেখা যাচ্চে। আবার সাদাসিধে রাস্তা না ধ'রে একবার সরল রেখার উপর ভিত্তি করে পূজনীয় কবির একটি প্রতিমূর্ত্তি আঁকার দরুণ শিল্প-জগতে লেখককে একসময় লাঞ্ছিত হ'তে হয়েচে। কিন্তু আজ এই যে জগতের ভিতর সর্ব্বত্রই রুদ্রের প্রচণ্ড আঘাত ও সংঘাত চলেচে দেখা যাচ্চে তাতে আর সেই বাপদাদার মুখোস প'রে বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে লাঠি ঠক্‌ঠকিয়ে চললে যে এ দুনিয়ায় চলবে না তা বুদ্ধিমান জীবমাত্রই টের পেয়েচেন। অতএব কবির এই অতি-আধুনিক চিত্রকলা দেখে, কল্প-লোকের ব্যাঙ্গমাব্যাঙ্গমীর ছবির ভিতরকার রস পেত হয়ত আর বেগ পেতে হবে না। ছবি আঁকার আনন্দে ছবি আঁকার তৃপ্তি যিনি পান তিনিই শিল্পী, আর যাঁরা ছবির বাজার-দরই একমাত্র দর বলে মনে করেন তাঁদের স্থান ঘি চিনি আটার আড়তে। ঠিক্ এই জিনিষটি আমরা আজ বিশেষ ভাবে জানতে পারি কবির ৭০ বৎসর বয়সে ছবি আঁকার চেষ্টা দেখে। তাঁর কবিতা লেখার কালে কাটাকুটি অংশগুলি অন্যমনস্কভাবে দাগা বুলোতে বুলোতে নানান বিচিত্র জীবজন্তুর আকার ধারণ করত। ছবিগুলিও ঠিক তাঁর সেই উপায়ে কলমের আগায় আপনি যে রূপ নিয়েচে তা বেশ বোঝা যায়। তাঁর স্বাভাবিক ছন্দোবদ্ধ রেখা ছন্দ ধরবারই অনুসন্ধান করচে তাঁর এই চিত্রকলায় এবং তারই যে আনন্দরস কবি লাভ করেচেন তা এই চিত্রগুলিতে একেবারে জাজ্জ্বল্যমান।

কবির ছবির বিষয় তাঁর আমেরিকার চিত্রপ্রদর্শনীর তালিকার ভূমিকায় শিল্প-রসিক ডাঃ আনন্দকুমার স্বামী যা' বলেচেন তার উল্লেখ করে এবং লেখকের সম্প্রতি কবির জন্মদিন উপলক্ষ্যে লেখা একটি ছন্দ লেখার আবৃত্তি করে আজকের মত এই সুধীমণ্ডলীর নিকট রবিবাসরে বিদায় গ্রহণ করচি।

৪



চিত্র-প্রদর্শনী

ডাঃ কুমার স্বামী বলেছেন Poet Tagore's art is child-like but not childish। আমরা এ কথার সম্পূর্ণ অনুমোদন করি এবং তাঁকে আজ অভিবাদন করে ঈশ্বরের নিকট তাঁর দীর্ঘজীবন কামনা ক'রে বলি :

কথা দিয়ে গাঁথা ছন্দ
সত্তর বছর
পূর্ণ কবি
ধর এবে রেখার বাঁধনে
রূপ-রহস্য-রসে
সুপ্ত ছিল যাহা
মনের গোপনে —
ফুটেছিল অক্ষরে অক্ষরে
স্তরে স্তরে ;
লহ ধরি—
বর্ণিকায় রঙের ছাঁদনে
খুলে দিয়ে দ্বার
অমৃত ভাণ্ডার
এবে সঙ্গোপনে।
ভীত যারা ভয়ে ভয়ে চাব পিছে
মাথা নত
বাড়াইতে পদ থতমত
লাভ ক্ষতি খতায় বসিয়া
জানে না কি দিয়া
শুধিবে সবার ঋণ—

থাক তারা পিছে
ভাবা খালি মিছে
তাহাদের তরে।
বরপুত্র তুমি জানি মোরা
দুই হাতে দিয়ে যাও
যাহা কিছু পাও।—শুধু গাও
অনন্তের গান
পূর্ণ করে প্রাণ
সবাকার ঘরে।
বীণাপাণি আশীর্ব্বাদ শিরে
রেখাটিরে—লেখাটিরে
একই ভাবে দাও প্রাণ
এ তব সন্ধান
অর্জ্জুনের সেই
ধ্যানে পাওয়া গাণ্ডীবের মত
কোনো কালে
কারু ভালে
তাহারি সৌরভ দীপ্ত হবে
খুঁজে পাবে প্রাণ
রেখা পাবে ত্রাণ।

শ্রীঅসিতকুমার হালদার



শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শিক্ষাকে জীবনযাত্রা থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে তাকে বিদ্যালয়ের গড়া কৃত্রিম সামগ্রী করে তুললে তার অনেকখানিই আমাদের পক্ষে ব্যর্থ হয়। এতে জীবনারম্ভের সুদীর্ঘকাল প্রতিদিন মনক্লিষ্ট হয়ে তার স্বাভাবিক শক্তি কত যে নষ্ট হয় আমরা তার হিসাব স্পষ্ট আকারে দেখ্‌তে পাইনে বলেই বুঝতে পারিনে।

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের প্রধান লক্ষ্য এই যে, এখানে ছাত্রেরা বিদ্যাশিক্ষাকে তাদের অখণ্ড প্রাণপ্রকৃতির ও মনপ্রকৃতির বিচিত্রলীলার অঙ্গরূপেই যেন গ্রহণ করতে পারে।

এই লক্ষ্য যদি যথার্থভাবে আমরা সাধন করি তবে এখানকার ছাত্রছাত্রী এখানকার শিক্ষক ও তাঁদের পরিজনবর্গের পক্ষে এই বিদ্যালয় যথার্থ আশ্রম হয়ে উঠ্‌বে, ইস্কুল হয়ে থাকবে না।

প্রাচীনকালে একদিন ভারতবর্ষে এই আদর্শ ই প্রচলিত ছিল এবং আধুনিককালে টোল চতুষ্পাঠীতেও এই আদর্শকেই অনেক পরিমাণে স্বীকার করা হয়।

* * *

এই আদর্শকে যদি মানি তবে প্রথম দরকার বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে এখানকার শিশুদের আন্তরিক যোগসাধন। লোকালয়ের কৃত্রিম জীবনযাত্রায় এই যোগ বিচ্ছিন্ন ও বিকৃত হয়।

শান্তিনিকতন কোনো সহরের মধ্যে না থাকাতে আমাদের এই লক্ষ্য আপনা আপনিই অনেক পরিমাণে সাধিত হচ্চে। তা ছাড়া এখানকার গান ও ঋতু উৎসব প্রভৃতিও এ সম্বন্ধে আমাদের আনুকূল্য করে।

কিন্তু এই যথেষ্ট নয়। এর সঙ্গে সঙ্গে প্রাত্যহিক সাধনারও প্রয়োজন আছে। এই সাধনা সফল হয় জ্ঞানে এবং কাজে।

এই আশ্রমে গাছপালা পশুপাখী যা-কিছু আছে ছাত্রেরা তাদের সম্পূর্ণভাবে জান্‌বে এটি খুবই দরকার। এখানে বাস করে অথচ তারা এদের লক্ষ্যগোচরই হয় না এর চেয়ে ক্ষতি আর কিছুই নেই। বাহিরের সম্বন্ধে আমাদের প্রায় সকলেরই এই যে একটা স্বাভাবিক ঔদাসীন্য আছে তার দ্বারা আমাদের মনকে বঞ্চিত করি। আমাদের অধ্যাপনায় পুঁথিগত বিদ্যার পরেই আমাদের একান্ত সতর্কতা, কিন্তু কত বিদ্যা আমাদের চোখের কাছে কানের কাছে হাতের কাছে আমাদের মনোযোগের প্রতি অপেক্ষা ক'রে প্রত্যহই ব্যর্থ হয়ে যাচ্চে। তা'তে করে কেবল-যে একটা দেশ-জোড়া চিত্তদৈন্য ঘটচে তা নয় দেশের প্রতি আমাদের অনুরাগের সম্পূর্ণতাও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্চে।

আশ্রমে গাছপালা আছে, তাদের কার কত সংখ্যা, তাদের কখন্ প্রথম ফুল ধর্‌ল, ফল ধর্‌ল, পাতা ঝর্‌ল, পাতা উঠ্‌ল, তাদের ডালপালা শিকড় প্রভৃতির আকৃতি ও প্রকৃতি কি রকম, নিজের পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা যাতে ছেলেরা তা জানে তার উৎসাহ দেওয়া ও ব্যবস্থা করা আবশ্যক। পশুপাখী এমন কি কীটপতঙ্গ সম্বন্ধেও এই একই কথা।

এই অল্প পরিধির মধ্যে বাহিরের বিশ্বের যা-কিছু জান্‌বার বিষয় আছে তাদের সুপরিচিত করে নেওয়া দুঃসাধ্য

নয়। এর মধ্যে শক্ত হবে, যিনি পরিচয় সাধনে সহায়তা করবেন এমন একজন সুদক্ষ উৎসাহী চোখ-কান খোলা মানুষ পাওয়া।

শিক্ষায় এই যেমন জানার দিক তেমনি আবার কাজের দিক্‌ও আছে। আশ্রমের গাছপালা পশুপাখীকে সেবা করাও একটা বড় সাধনা। বিশেষ বিশেষ ছেলে আশ্রমের বিশেষ বিশেষ গাছের ভার নিয়ে তাতে জল দেওয়া, তার গোড়া খুঁড়ে দেওয়া সার দেওয়া প্রভৃতি প্রাত্যহিক কাজের দ্বারা তার প্রতি মমতার চর্চ্চা করে এরও একটা বড় শিক্ষা আছে। তেমনি স্থানে স্থানে কাঠবিড়ালী পাখী প্রভৃতির জন্যে তারা পানীয় ও নিজের খাদ্যের অংশ রেখে দেবার ব্যবস্থা করে দেয় এটাও চাই। এরও বাধা হচ্চে লোকের অভাব। ছেলেদের উৎসাহ সর্ব্বদা সজীব করে রাখতে পারে এমন একজন অনুরাগী কর্ম্মশীল লোক পাওয়া চাই। যিনি নিজে উদাসীন তিনি কেবল নিয়মে বাধ্য হয়ে এই সকল কাজে ছাত্রদের আনুকূল্য করতে পারেন না।

আশ্রমের ভিতরে ও বাইরে নিকটবর্ত্তী স্থানে যে সকল পথ আছে তার দুইধারে ছেলেমেয়েরা নিজের জন্মদিন বা অন্য কোনো উপলক্ষে একটি একটি গাছ রোপণ করে সেই গাছ রক্ষার ভার নিজেরা নেবে। সেই গাছের সঙ্গে রোপণ-কর্ত্তার নামের ফলক সংলগ্ন থাকবে। ছুটির পূর্ব্বে রোপণকর্ত্তারা যদি দুই চার আনা বেতন স্বরূপ দিয়ে যায় তবে সেই কয়মাসের জন্য গাছগুলিকে রক্ষা করবার মালী পাওয়া কঠিন হবে না।



রবীন্দ্রনাথ একটি ক্লাস পড়াইতেছেন

* * *

এই যেমন প্রকৃতির সঙ্গে যোগের কথা হল তেমনি লোকালয়ের সঙ্গে যোগও চাই। ভুবনডাঙ্গা গ্রাম ও সাঁওতালপাড়াগুলির সম্যক্ পরিচয় যাতে ছেলেরা পায়

সেদিকে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। তাদের সঙ্গে আমাদের ছাত্রদের যোগে সেবার সম্বন্ধ রাখা আবশ্যক। পিয়র্সন যখন ছিলেন তখন এই কাজ যতটা সজীব ছিল এখন ততটা নেই বলে আশঙ্কা করছি।

আশ্রমে ব্রতীবালক সম্প্রদায় গড়া হয়েছে। নিকটবর্ত্তী পাড়ায় ব্রতীসম্প্রদায় স্থাপন ক'রে তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে চারিদিকের পাড়ার কাজ আমাদের ভালো করে চালাতে হবে। এই ব্রতীকৃত্য শিক্ষা আমাদের অন্য কোন শিক্ষার চেয়ে কম গুরুতর নয়।

আশ্রমের মধ্যে যেখানে কোনো জঙ্গল বা গর্ত্ত ডোবা

যে আদর্শের কথা গোড়ায় বলেছি তাকে রক্ষা করতে হলে ছাত্রদের সঙ্গে শিক্ষকদের সম্বন্ধ কেবল শিক্ষাদানের সম্বন্ধ হলে চলবে না, যথার্থ আত্মীয়তার সম্বন্ধ হওয়া চাই। যখন ছাত্রসংখ্যা অল্প ছিল তখন শিক্ষকদের সঙ্গে তাদের যোগ যত ঘনিষ্ঠ ছিল এখন ততটা থাকা দুঃসাধ্য। কিন্তু তা হলেও এই আত্মীয় সম্বন্ধকে জাগিয়ে তোলবার জন্যে আমাদের বিশেষ চেষ্টা করা চাই।

ছোট ছেলেদের খাওয়ানোর -ভার গুরুপল্লীর গৃহিণীদের মধ্যে ভাগ করে দেবার প্রস্তাব এক সময় আমি করেছিলুম। তার অনেক আর্থিক বাধা আছে জানি, সেই বাধা দূর করা



শ্রীনিকেতনের একটি উদ্যান-রচনার ক্লাস

আছে, যেখানে চলাচলের রাস্তা ভেঙে চুরে গেছে, যেখানেই কোথাও জল জ'মে মশার, ও ময়লা জ'মে মাছির উৎপত্তির কারণ হয়েছে, সেইখানেই সংস্কার কার্য্যে ব্রতীরা যেন মনোযোগ করে। ছেলেদের শোবার ঘরের মেঝে ও তাদের বিছানাপত্র মাঝে মাঝে কার্ব্বলিক জল প্রভৃতি পূতি-নাশক পদার্থ দ্বারা বিশেষ বিশেষ দিনে ভালো করে ধুইয়ে দেওয়াও তাদের কাজ। ছেলেদের বিছানায় ছারপোকা প্রভৃতির উৎপাত যদি ঘটে তাও বিহিত প্রণালীতে দূর করবার ভার তাদের পরে।

* * *

সম্ভবপর কিনা সে কথা আমাদের বিবেচনা করে দেখা উচিত। গুরুপল্লীর সঙ্গে ছাত্রনিবাসের স্নেহ সেবার সম্বন্ধ নানা উপায়ে নানা উপলক্ষ্যে জাগিয়ে রাখার চেষ্টা করতে হবে। আমাদের প্রত্যেক ছাত্রনিবাস এক-একটি গুরুপরি-বারের সঙ্গে সংলগ্ন হওয়া যদি অবাধে সম্ভবপর হতে পারত তবে সেইটেই সব চেয়ে ভালো হ'ত। . .

* * *

আর একটি গুরুতর শিক্ষার বিষয় আছে সেটি হচ্চে লোক ব্যবহার। মানুষ সামাজিক জীব এইজন্যে যেমন তার সামাজিক নীতি আছে তেমনি তার সামাজিক রীতিও

আছে। সেই রীতি পালনের দ্বারা মানুষের পরস্পরের সম্পর্ক সুন্দর ও সুসহ হয়।

সাধারণতঃ আমাদের দেশে অন্তত বাংলা দেশে গ্রাম্য-সমাজের রীতিই প্রচলিত ছিল এবং কিছু কিছু পরিমাণে এখনো আছে। অর্থাৎ বাপ দাদা ও প্রতিবেশীদের সঙ্গে ব্যবহার করবার যোগ্য আমাদের অধিকাংশ কায়দা-কানুন। তা ছাড়া এক জাতের সম্পর্কে আর এক জাতের আচরণ কি রকম হওয়া উচিত তারও একটা বাঁধা নিয়ম সমাজে পাওয়া যায়। কিন্তু আজকাল শিক্ষাঘটিত ও অর্থঘটিত পরিবর্ত্তনে গ্রাম্যজীবনের সংস্কারগুলি অনেক নষ্ট এবং অনেক শিথিল হয়ে গেছে। সুতরাং সে সমাজের রীতিও নেই আর সাধারণভাবে পৃথিবীর দূর নিকট সকল মানুষের সঙ্গে আমাদের কি রকম ব্যবহার করা শোভন তারও কোনো রীতি আমাদের অভ্যস্ত হয়নি। এমনতর রীতি বিকৃতার মত কুশ্রী আর কিছুই হতে পারে না। নিজের ব্যবহারে এই রকম রূঢ়তা যে আমাদের নিজের পক্ষেই অপমানজনক তাও আমরা বুঝতে পারিনে।

আমার শরীর যখন সুস্থ ছিল এবং ছাত্রদের সঙ্গে যখন সর্ব্বদা নিকট সংস্রব ছিল তখন তারা যাতে পরস্পরের ও অন্য সকলের প্রতি ভদ্ররীতি রক্ষা করে চলে তার প্রতি বিশেষ সতর্ক ছিলুম।

এখন কেবল যে ছাত্রসংখ্যা বেড়ে গেছে তা নয়, অন্য দেশ ও প্রদেশ থেকে ছাত্র আসচে। তা ছাড়া বয়স্ক ছাত্র, যাঁরা অন্যত্র কিছু পরিমাণে শিক্ষা সমাধা ক'রে এখানে যোগ দিয়েছেন তাঁদের সংখ্যাও প্রতিদিন বেড়ে চলেচে। এঁদের পরস্পরের মধ্যে অন্তরের সম্বন্ধ সত্য হয়ে ওঠা ত চাইই কিন্তু বাহিরের রীতি সুন্দর হওয়া সর্ব্বাগ্রে দরকার। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ স্বীকারের প্রথম ও সাধারণ উপায় হচ্চে অভিবাদন ও নমস্কার। এ সম্বন্ধে আমাদের ছাত্রদের মধ্যে ভদ্র অভ্যাস পাকা করিয়ে দেওয়া চাই।



পান্থশালা—শান্তিনিকেতন

ছাত্রেরা আপন পরিবারের বাহিরে গুরুজনের পাদগ্রহণ করবে এটা আমি পালনীয় মনে করিনে। কিন্তু নত হয়ে নমস্কার করা তাদের কর্ত্তব্য। আর তাঁরা সম্মুখে এলে উঠে দাঁড়ানো চাই। যেখানে অনেকে সমবেত, সেখানে সকলে মিলে একসঙ্গে নমস্কার করাই শোভন। কোনো সভার অধিবেশনকালে বা ক্লাসে গুরুজনের আগমনে আসন ত্যাগ ক'রে ওঠা সাধারণত অনাবশ্যক। কিন্তু শিক্ষক যখন ক্লাসে প্রবেশ করেন তখন ছাত্রেরা উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে

অভিবাদন করবে; অথবা ক্লাসে বা অন্যত্র যেখানে শিক্ষকেরা কেউ বসে আছেন তাঁদের অভিবাদন না করে ছাত্রেরা আসন গ্রহণ করবেনা। গুরুপত্নীদের সম্বন্ধেও এই নিয়ম। বাহিরের অতিথিরা দর্শকরূপে ক্লাসে উপস্থিত হলে ছাত্রেরা সমবেতভাবে তাঁদের নমস্কার করবে। দিনের মধ্যে প্রথম সাক্ষাৎ কালে ছাত্রেরা পরস্পরকে নমস্কার করবে। ছাত্রনিবাসে কোনো অতিথি এলে ছাত্রেরা তাঁকে নমস্কার করবে ও তার প্রয়োজন সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ক'রে তার যথোচিত ব্যবস্থা করবে।

কিছুকাল পূর্ব্বে অতিথিসেবা সম্বন্ধে ছাত্রেরা বিশেষ যথাসময়ে উপস্থিত না হওয়া অন্যদের প্রতি অসম্মান একথা মনে রাখা কর্ত্তব্য।

মন্দিরে ক্লাসে বা সভায় অপরিচ্ছন্ন হয়ে যাওয়াও অভদ্রতা। ভারতবর্ষে এ সম্বন্ধে মুসলমানদের আচার ভদ্র আচার। আশ্রমে কোন্ বিশেষ পরিচ্ছদ ছাত্রদের ও শিক্ষকদের সভায় বা মিলন অনুষ্ঠানে ব্যবহার্য্য তা সকলে পরামর্শ করে স্থির করা ও প্রচলিত করা উচিত।

কিছুকাল পূর্ব্বে ছেলেরা পালা করে পরিবেষণ করত এখন সে নিয়ম আছে কিনা জানিনে, কিন্তু থাকা উচিত।

বাস সম্বন্ধেও ভদ্রতার রীতি আছে। ঘর ও ঘরের



শান্তি-নিকেতন—আশ্রমমন্দির

ভার গ্রহণ করত। এখন তার ত্রুটি হচ্চে বলে আশঙ্কা করি,—আবার তার ভালো ক'রে প্রবর্ত্তন করা দরকার।

ভারতের অন্য প্রদেশ থেকে যে সব ছাত্র আসে বাঙালী ছাত্রদের জানা উচিত যে তারা বিশেষভাবে তাদেরই অতিথি। সকল বিষয়ে তাদের আনুকূল্য করা বাঙালী ছাত্রেরই কর্ত্তব্য এবং যাতে সেই সকল অন্য প্রদেশের ছাত্র দলছাড়া হয়ে না পড়ে এটাও তাদের দেখতে হবে।

সকল কাজে সময় পালন করাও এই রীতিপালনেরই অঙ্গ। ক্লাসে, সভায়, উপাসনাগৃহে বা ভোজনশালায় আসবাব ও নিজের ব্যবহার্য্য সামগ্রী নোংরা ও কদর্য্য হ'তে দেওয়া অভদ্রোচিত এ সম্বন্ধে একটি সুন্দর আদর্শ আমাদের আশ্রমে থাকে তার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত।

ছাত্রদের নিজের যত্নে ও নৈপুণ্যে ছাত্রনিবাসের চারিদিক যদি কাঁকর দেওয়া রাস্তায় ফুলগাছে মনোরম হতে পারে তবে তার মধ্যেও ছাত্রদের আত্মসম্মান-বোধের পরিচয় পাওয়া যায়।

ভদ্ররীতি পালন সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া এবং ছাত্রদের

সতর্ক রাখা একজন কোনো বিশেষ পরিদর্শকের বিশেষ ও নিত্য কর্ত্তব্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত। নইলে নিয়ম কোনো কাজেই লাগ্‌বে না। সাধারণভাবে শিক্ষকদের উপর ভার দিলেও সমস্ত ব্যর্থ হবে।

*　　*　　*

এখানে ছাত্রদের মধ্যে লৌকিকতার চর্চ্চাও তাদের শিক্ষার প্রধান অঙ্গ।

পালাক্রমে এক একটি ছাত্রনিবাস তার প্রতিবেশী ছাত্রনিবাসের ছেলেদের সম্মিলনীতে নিমন্ত্রণ করে সঙ্গীত, অভিনয়, খেলা ও সৌজন্য দ্বারা তাদের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করবে। নিমন্ত্রিতদের সংখ্যা অত্যন্ত বেশি হওয়া শ্রেয় মনে করিনে।

শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যেও এরকম নিমন্ত্রণ হতে পারে।

*　　*　　*

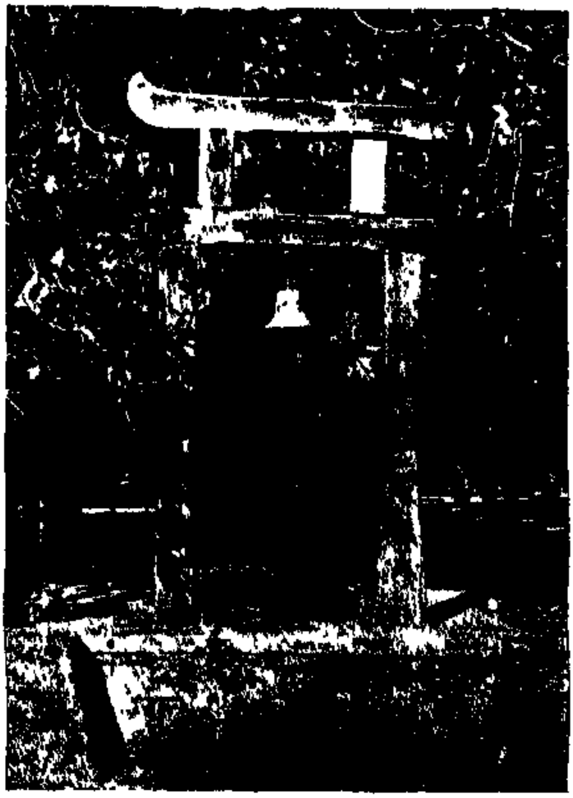
এই উপলক্ষ্যে আর একটি কথা বলবার আছে। এখানকার আশ্রম যে সাধারণ বিদ্যালয়ের মত একটা তৈরি করা জিনিষ এখানে কেবল যে কিছুকালের জন্য ছাত্রেরা বাইরে থেকে এসে প্রবেশ করে এবং কিছুকাল পরে বাইরে চলে যায় এমন ধারণা যেন তাদের কিছুতে না হয়। তারা যেন অনুভব করে যে, তারাও এ'কে গড়ে তুলচে, জানে যে তারা এর প্রাণ। বিদ্যালয়ের নানা প্রকার ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাদের নিজের ইচ্ছার চালনার বহুবিধ উপায় করে দেওয়া কর্ত্তব্য, নানাপ্রকার কাজে তাদেরও সম্মতির স্থান থাকা চাই। এ'তে তাদের সেই আত্মকর্ত্তৃত্বের চর্চ্চা হয় যে কর্ত্তৃত্ব দায়িত্ব-বোধের দ্বারা পদে পদে নিয়ন্ত্রিত।

*　　*　　*

ছাত্রদের শিক্ষাপ্রণালীর আলোচনা অল্প কথায় শেষ করা অসম্ভব। এ সম্বন্ধে যে কথাটা আমার কাছে সকলের চেয়ে গুরুতর বলে মনে হয় সেইটিমাত্র আমি লিপিবদ্ধ করতে ইচ্ছা করি।

মানুষের শারীরিক ও মানসিক সকল প্রকার শক্তির মধ্যে একটি অখণ্ড যোগ আছে। পরস্পরের সহযোগিতায় তারা বল লাভ করে।

দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের প্রচলিত শিক্ষার প্রথায় আমরা সাধারণত পুঁথিগত কয়েকটি বিষয় বাছাই করে নিয়ে আর সমস্তকে অস্বীকার করি। পাশ্চাত্য সমাজে বিদ্যালয়ের বাহিরেও নানা উপায়ে স্কুল কলেজে শিক্ষণীয় বিষয়ের অভাব পূরণ করে দেয়। আমাদের দেশে স্কুল কলেজের বাহিরে



শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের ঘণ্টা

ছাত্রদের অন্য শিক্ষার ক্ষেত্র নেই বল্লেই হয়। তাই নোট নেওয়া মুখস্থ করা বিদ্যায় তাদের মন যে পরিমাণ বস্তু পায় সে পরিমাণ খাদ্য পায় না।

দেহের শিক্ষা যদি সঙ্গে সঙ্গে না চলে তাহলে মনের শিক্ষারও প্রবাহ বেগ পায় না। অনেক ছেলেকে ক্লাসে জড়বুদ্ধি দেখি তার কারণই এই যে শিক্ষার ব্যাপারে তাদের

দেহের দাবী কোনোই আমল পায়না। সেই অনাদরে তাদের মনের দৈন্য ঘটে।

দেহের চর্চ্চা বলতে আমি ব্যায়াম বা খেলার চর্চ্চা বলচিনে। দেহের দ্বারা আমরা যে-সব কাজ করতে পারি সেই সব কাজের চর্চ্চা—সেই চর্চ্চাতে দেহ সুশিক্ষিত হয় তার জড়তা দূর হয়। সেই সব কাজের প্রণালীর ভিতর দিয়ে দেহের সঙ্গে মনের যোগ হয়—সেই যোগেই উভয়ের বিকাশের সহায়তা ঘটে।

আমার মত এই যে, আমাদের আশ্রমে প্রত্যেক ছাত্র-কেই বিশেষভাবে কোনো না কোনো হাতের কাজে যথাসম্ভব সুদক্ষ করে দেওয়া চাই। হাতের কাজ শিক্ষাই তার মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, আসল কথা, এই রকম দৈহিক কৃতিত্ব চর্চ্চায় মনও সজীব সতেজ হয়ে ওঠে। যে-সব ছেলেকে আমরা নির্ব্বোধ বলে মনে করি তাদের অনেকেরই সুপ্তচিত্ত এই দৈহিক কর্ম্মদক্ষতার সোনার কাঠির স্পর্শ অপেক্ষা করে আছে। দেহের অশিক্ষা মনের শিক্ষার বল হরণ করে নেয়। তা ছাড়া যার দেহ শিক্ষিত হয়নি সে যত বড় পণ্ডিতই হোক্ সংসার-ক্ষেত্রে অধিকাংশ বিষয়েই তাকে পরাসক্ত হয়ে জীবন ধারণ করতে হয়—সে অসম্পূর্ণ মানুষ। এই অসম্পূর্ণতা থেকে আমাদের প্রত্যেক ছাত্রকেই বাঁচাতে হবে। এ সম্বন্ধে সম্ভবত কোনো কোনো অভিভাবকের কাছ থেকে আমরা বাধা পাব কিন্তু সে বাধাকে স্বীকার করা আমাদের কর্ত্তব্য হবে না।

দেহের শিক্ষার সঙ্গে মনের শিক্ষার, দেহের সচলতার সঙ্গে মনের সচলতার যোগ আছে এই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। উভয়ের মধ্যে ভালোরকম মিল করতে না পারলে আমাদের জীবনের ছন্দ ভাঙা হয়ে যায়। এই কারণেই আমি মনে করি পথচারী বিদ্যালয়ই বিদ্যালয়ের আদর্শ। ইস্কুলের বদ্ধ ঘরে শিক্ষা দিলে আমাদের জীবনলীলার অধিকাংশ উদ্যমই সেই শিক্ষাপ্রণালী থেকে বাদ পড়ে। যেমন খাঁচার শিক্ষায় পাখীকে বুলি শেখানো অসম্ভব হয় না, কিন্তু তাকে উড়তে শেখানো যায় না।

ভ্রমণ করতে করতে ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়াই শিক্ষার প্রকৃষ্ট উপায়। তার কারণ কেবলমাত্র এ নয় যে, ভ্রমণে নানা বিষয় পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা আয়ত্ত হয়, তার কারণ এই যে, নিত্যই নূতনের সংযোগে এবং অন্তর বাহির উভয়ের সম্মিলিত পদক্ষেপে আমাদের জাগরুক চিত্তবৃত্তি সর্ব্বদাই উৎসুক হয়ে থাকে। এমন অবস্থায় ছাত্রেরা শিক্ষার বিষয় যা-কিছু পায় তাকে গ্রহণ করা তার পক্ষে সহজ হয়। প্রাণবান মানুষের পক্ষে এই রকম জঙ্গম শিক্ষা প্রণালীই সম্পূর্ণ ফলদায়ক, ক্লাসে বদ্ধ স্থাবর শিক্ষা প্রণালীতে তার দেহে মনে আত্মীয় বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেয়। তাতে দেহ থেকে যায় অনিপুণ, মন থেকে যায় নিরুদ্যোগী। তাতে বাক্য পরিচয়ের অভ্যাস হয় বিষয় পরিচয়ের অভ্যাস হয় না।

অনেককাল থেকে বিশ্বভারতীর যোগে এই রকম পথচারী বিদ্যালয় স্থাপনের সংকল্প মনে পোষণ করে রেখেছি। দেশের লোকের কাছে আবেদনকে সার্থক করবার শক্তি যদি আমার থাকত আর ভিক্ষায় যদি ক্ষুদ্ না মিলে ধানও মিল্‌ত, তা হলে অনেককাল আগেই এ কাজে প্রবৃত্ত হতুম। মরবার আগে এ কাজ প্রবর্ত্তন করে যাব এমন আশা এখনো ছাড়িনি। কেননা যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ।

আপাতত দেশপ্রচলিত শিক্ষাপ্রণালীর প্রাচীর-ঘেরা সঙ্কীর্ণক্ষেত্রের মধ্যে ছাত্রদের দেহমনের যতটা চালনা সম্ভব তারই দিকে লক্ষ্য রাখ্‌তে হবে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শান্তিনিকেতন পত্র হইতে উদ্ধৃত।

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের আদর্শ

[অধ্যাপক উইলিয়াম্ কিল্প্যাট্রিক্ কর্ত্তৃক ১৯৩০ সালের ৬ঠা নভেম্বর তারিখে নিউইয়র্ক ইণ্টারন্যাশনাল হাউসে প্রদত্ত বক্তৃতার সারমর্ম।]

প্রথমেই আমাদের বোঝা দরকার যে জগতের ইতিহাসে ভারতবর্ষের সভ্যতা দুইটি সর্ব্ব পুরাতন সভ্যতার অন্যতম। কবে কোন্ সে আদিকালে এ সভ্যতার জন্ম আমি জানি না, কেউই বোধ হয় জানে না। যুগ যুগ ধরে ভারতবর্ষের সভ্যতা চলে এসেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের সাহিত্য ভারতবর্ষের দর্শন আজও সেই পুরাতন গৌরব অক্ষুণ্ণ রেখে বেঁচে আছে। যখন কোনও জাতির সভ্যতা বহু পুরাতন কাল থেকে চলে আসে তখনই দেখতে পাই সেই জাতির মধ্যে সৃষ্টি হয়ে ওঠে একটা বিশিষ্ট আধ্যাত্মিক প্রকাশ। ভারতবর্ষের জনসঙ্ঘের পিছনে এইরূপ একটা অন্তরাত্মার বৈশিষ্ট্য আমাদের স্বীকার করতেই হবে।



শান্তিনিকেতন গ্রন্থাগারের ছাদ হইতে

একদিন ভারতের ইতিহাসে গ্রেটব্রিটেনের সঙ্গে হ'ল

তার মিলন। ফলে ধীরে ধীরে ভারতবর্ষে শিক্ষাদান প্রণালীর মধ্যে এক পরিবর্তন সুরু হ'ল। এবং কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল ভারতবর্ষের বিদ্যালয়গুলি বিলেতের আদর্শে গড়ে উঠ্‌চে। এমনও অনেক সময় মনে হয়েছে যে ইংলণ্ডের কতকগুলি স্কুলকে তুলে নিয়ে একটু রং বদলে ভারতবর্ষের জমির উপর বসিয়ে দেওয়া হয়েচে। বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলিও যেন লণ্ডনের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রতিমূর্ত্তি। বিদ্যা বিতরণের চেয়েও পরীক্ষা নিয়ে ছাত্রদের উপাধি দেওয়াটাই যেন এর বড় কাজ। এ আদর্শ লণ্ডন বিশ্ব-বিদ্যালয়েরই আদর্শ। এই পরীক্ষা নেওয়ার রীতি ভারত-বর্ষকে গ্রেটব্রিটেনের একটা বিশিষ্ট দান। এবং ফলে দাঁড়িয়েচে এই যে আজকের দিনে শিক্ষা বিতরণের ক্ষেত্রে পরীক্ষা নেওয়ার কাজটা ভারতবর্ষে যত বড় হয়ে উঠেছে এমন বোধ হয় আর কোথাও হয় নি; বিদ্যাশিক্ষার চেয়ে উপাধি নেওয়াটাই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার যেন মুখ্য উদ্দেশ্য। উপাধি নিলে বাজারে দর বাড়ে চাকুরীর সুবিধা হয়। ছাত্রদের ত কথাই নাই। ছাত্রদের পিতারাও আসল শিক্ষার অপেক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাধি গ্রহণটাই বড় করে দেখেন। এবং ছেলেদের সত্যকারের শিক্ষা হোক বা না হোক কোনও রকমে পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হয়ে উপাধি পেলেই তাঁরা সন্তুষ্ট। এবং সঙ্গে সঙ্গে যখন দেখতে পাই যে বিলাতি আদর্শে এবং বিলাতি ভাষায় এই সব পরীক্ষা নেওয়া হয়, তখনই বুঝতে পারি ভারতের ইতিহাস ভারতের অন্তরাত্মার সঙ্গে এই আধুনিক শিক্ষাপ্রণালীর যোগসূত্র একেবারে ছিন্ন হয়ে গিয়েছে।

এখন দেখা যাক কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিদ্যালয়ের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের এই শিক্ষা সমস্যার সমাধান করবার কতখানি চেষ্টা করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আমরা দেখতে পাই সেই ধরণের কবি, যিনি একটা জাতির বিরাট এবং মহান্ সভ্যতাকে পূর্ণভাবে একান্তভাবে উপলব্ধি করতে পারেন। এবং ভারত-বর্ষের সভ্যতাকে শুধু পূর্ণভাবে উপলব্ধি করেই তিনি ক্ষান্ত হন নি। তিনি আরও বড় করে দেখেছেন, বেশী করে দেখেছেন, ভারতবর্ষের সভ্যতাকে আরও মহান করে নিজের প্রাণের মধ্যে তাকে অনুভব করেছেন। মানুষের জীবনের অনুভূতিগুলি তাঁর প্রাণে সাড়া দিয়েছে—গভীর ভাবে, নিবিড় ভাবে।



শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের একটী ক্লাস চলিতেছে

কাজেই রবীন্দ্রনাথ যখন নিজের দেশের শিক্ষাপ্রণালীর দিকে চেয়ে দেখ্‌লেন তাঁর বুঝতে দেরী হয় নি যে এই শিক্ষা-প্রণালীর মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষ নিজেকে পাবে না। ভারতের

ইতিহাস ভারতের অন্তরাত্মার মধ্য দিয়ে এ শিক্ষা কোনও দিনই সত্য হয়ে সুন্দর হয়ে উঠবে না। সমস্ত প্রাণ দিয়ে তিনি এসত্য উপলব্ধি করেছিলেন এবং এ দৈন্যের ব্যথা তাঁর গভীরতম প্রাণকে স্পর্শ করেছিল।

তাই রবীন্দ্রনাথ সংকল্প করলেন "আমি এমন একটি বিদ্যালয় তৈরী করব যার মধ্যে ভারতবর্ষ ধরা দেবে।" এবং এ সংকল্প করবার অধিকার তাঁর ছিল কেননা তিনি শুধু কবি নন' তিনি একজন শিক্ষাদাতা—সর্ব্বকালে, সর্ব্বযুগে মানুষকে শিক্ষা দেবার অদ্ভুত শক্তি তাঁর মধ্যে বিদ্যমান— আমি জানি। তাঁর জীবনের এদিকটা নিয়ে আমি অধ্যাপনা করেছি, আলোচনা করেছি। তাই একথা আমি আজ নিঃসঙ্কোচে আপনাদের কাছে বলতে পারি।

আজ আমি কেমন করে তাঁর সেই বিদ্যালয়ের রূপটি আপনাদের বোঝাব জানি না। বোধ হয় কল্পনা করাও আপনাদের পক্ষে কঠিন হবে যে—বনে সত্যকারের গাছতলা তাঁর বিদ্যালয়ে, বিদ্যাবিতরণের ক্ষেত্র। যতদূর দৃষ্টি যায় চারিদিকে বৃক্ষরাজি-সুশোভিত উন্মুক্ত প্রান্তর—নানারূপ ফল এবং ফুলের বাগান। বড় বড় ইট পাথরের তৈরী প্রাসাদ সেখানে মূর্ত্তিমান উৎপাতের মত মাথা তুলে দাঁড়িয়ে নেই। বৃক্ষরাজির মধ্যে মাথা নীচু করে বাড়ীগুলি দাঁড়িয়ে আছে—কোথাও এতটুকু বেমানান মনে হয় না। সে আশ্রমের বড় কথা, বড় বড় অট্টালিকা নয়—বৃক্ষ। ভারতবর্ষ এই বৃক্ষের মধ্যেই ধরা দিয়েছে।

আপনারা জানেন বোধ হয় ভারতবর্ষে উন্মুক্ত আকাশের নীচে প্রকৃতিদেবী হিন্দুদের প্রাণে যেমনতর সাড়া দিয়েছেন এমনতর বোধ হয় আর কোনও দেশে দেননি। গাছে গাছে প্রাণের হিল্লোল হিন্দুদের প্রাণে গিয়েই পৌছেছে। এ ভাব অবশ্য কতকটা আমরা জাপানে দেখ্‌তে পাই, তার কারণ জাপানে বুদ্ধধর্ম্মের প্রভাব। এবং সে ধর্ম্মের জন্ম হিন্দুস্থানেই। কবির কল্পনাপ্রসূত এই বিদ্যালয় কবিরই সৃষ্টি। এখানে জাতিবিচার নাই ; স্ত্রী-পুরুষ একসঙ্গে মিলে মিশে এখানে বিদ্যাশিক্ষা করে। মিথ্যা সংস্কারের বেড়া দিয়ে স্ত্রী-পুরুষকে আলাদা করে রেখে দেওয়া হয়না— এই বিদ্যালয়ে।



শান্তিনিকেতন—কলা ভবন

চারুকলা, চিত্রকলা, সঙ্গীত, ধর্ম্ম—এই সব ভারতবর্ষের নিজের রূপেই সার্থক হ'য়ে ওঠে—এই বিদ্যালয়ের শিক্ষার মধ্য দিয়ে। আমার মনে পড়ে আমি যখন এই বিদ্যালয় দেখ্‌তে গিয়েছিলাম, ঘরে ঢুকবার সময় আমার জুতাজোড়া আমাকে

বাইরে রেখে যেতে হয়েছিল। ভারতবাসীর দিক দিয়ে এর অর্থ যে কত গভীর কত পবিত্র তা তিনিই বুঝতে পার্বেন যাঁর কোনদিন ক্ষণেকের তরেও ভারতবর্ষের অন্তরাত্মার সঙ্গে এতটুকু পরিচয় ঘটেছে।

একটা জিনিষ দেখে বিশেষ মুগ্ধ হয়েছিলাম। নয়, দশ কি এগার বছরের ছেলেরা মিলে নিজেদের হাতে একটি বাড়ী তৈরী করেছে—কেবলমাত্র ছাত তৈরী করতে পারেনি। বাড়ীতে তিনখানি কামরা; একখানিতে পুস্তকাগার, একখানি দোকান এবং একখানি তাদের বস্‌বার জন্ম ব্যবহৃত হয়। তাদের কী অহঙ্কার এই বাড়ীখানি তৈরী করেছে বলে। এই ত চাই! ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থায় এই রকম শিক্ষারই ত প্রয়োজন। শতাব্দীর বিদেশী শাসনে ভারতবর্ষের আর যাই হোক না কেন কর্ম্মশক্তির অনুপ্রেরণা ভারতবর্ষ হারিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তা জানেন। তাই তাঁর বিদ্যালয়ে এই সব প্রচেষ্টা। তাইত মনে হয় রবীন্দ্রনাথ যে কেবল ভারতবর্ষের সভ্যতাই প্রাণ দিয়ে উপলব্ধি করেছেন তা নয়, পশ্চিমের যা-কিছু ভাল তা তিনি গ্রহণ করেছেন এবং বিদ্যালয়ে বিদ্যাদানের মধ্যে তিনি পশ্চিমকে অবহেলা করেন নি।

কৃষির উন্নতি, গ্রাম্য সংস্কার—এই সমস্তও তাঁর বিদ্যালয়ের অন্তর্গত। এবং সঙ্গে সঙ্গে তিব্বত থেকে আনীত পুরাতন জীর্ণ পুঁথির মধ্যে প্রাণ ঢেলে দিয়ে পণ্ডিতদের গবেষণা করতে দেখেছি—বৌদ্ধ ধর্ম্মের নূতন রূপ যদি কিছু আবিষ্কৃত হয়। একটি লোককে আবার দেখলাম বাংলা অভিধান তৈরী করবার জন্ম অক্লান্ত পরিশ্রম করছে।

কবির বিদ্যাশ্রমে একটি মন্দির আছে—ধর্ম্ম-মন্দির। কোনও সম্প্রদায় বিশেষের মন্দির নয়। মানবের ধর্ম্মের, বিশ্বমানবের ধর্ম্মের যা কিছু গভীর, যা কিছু সত্য, যা কিছু মহান—প্রাণে তারই স্পর্শ পাওয়া যায় এই মন্দিরের মধ্যে।

মহাত্মা গান্ধীর মুখে শুনেছি, ভারতবর্ষে যেদিন ত্রিশ কোটী লোক অন্ততঃ এক বেলা দুমুঠো অন্নের সংস্থান করতে পারে—সেদিন ভারতবর্ষের একটী শুভ দিন। যে দেশে দারিদ্র্য এত প্রখর, এত ভীষণ সে দেশে এরূপ একটি বিদ্যাশ্রমের সৃষ্টি অদ্ভুত এবং আশ্চর্য্য বলে মনে হয়।



শ্রদ্ধাঞ্জলি

রবীন্দ্র জয়ন্তী

১

রবীন্দ্র জয়ন্তী উপলক্ষ্যে যখন কেউ আমাদের অর্থাৎ আমাদের মত বাঙলা লেখকদের দু'কথা লিখতে অনুরোধ করেন, তখন আমরা সত্যসত্যই উভয় সঙ্কটে পড়ি। কারণ আমাদের পক্ষে এ অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করাও অসম্ভব, অথচ কি যে লিখ্‌ব তা ভেবে পাই নে। কেন এ অবস্থা ঘটে সেই কথাটা প্রথমে স্পষ্ট করে বলি।

আমরা যখন কোন কবি কিম্বা কাব্যের বিষয় আলোচনা করি তখন সে আলোচনার স্পষ্ট না হোক্‌' প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য হচ্চে সেই কবি অথবা কাব্যকে পাঠক সমাজের কাছে পরিচিত করিয়ে দেওয়া। এখন জিজ্ঞাস্য হচ্ছে রবীন্দ্রনাথকে পাঁচ-জনের কাছে পরিচিত করিয়ে দেবার কি কোন প্রয়োজন আছে? যে কবি আজ বিশ্বমানবের মতে এ যুগের শ্রেষ্ঠ কবি বলে গণ্য হয়েছেন, দেশের লোকের কাছে তাঁকে নূতন করে চিনিয়ে দেবার চেষ্টাটা কি অদ্ভুত ধৃষ্টতা নয়?

তা ছাড়া কাব্য সমালোচনার মূলে আর একটি মনোভাব আছে। প্রতি সমালোচকই মনে করেন যে কবির যে গুণ কি যে দোষ অপরের চোখে পড়ে নি তা তিনি সকলের চোখে আঙুল্‌ দিয়ে দেখিয়ে দিতে পারেন। সমালোচকের কলম হচ্ছে এক রকম অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা। যাঁর মনে এ-হেন বিশ্বাস নেই তিনি কখন কবি কিম্বা কাব্যের সমালোচনায় হস্তক্ষেপ করেন না। এ জাতীয় অহঙ্কার মানব-সুলভ। কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাটিও কি সমান সত্য নয়, যে কোন একটি কবি, পাঠক সমাজের কাছে বড় কবি বলে গ্রাহ্য হবার পরেই অসংখ্য সমালোচকের দল তাঁর কাব্যের ব্যাখ্যা সুরু করেন? এই কারণেই অপরের গায়ে পড়ে রবীন্দ্রনাথের interpreter হ'তে আমার তাদৃশ উৎসাহ হয় না। কাব্য মাত্রেই সহৃদয় হৃদয়-বেদ্য, আর হৃদয় বস্তুটি সমালোচকের একচেটে নয় বহু পাঠকেরও নৈসর্গিক সম্পত্তি।

২

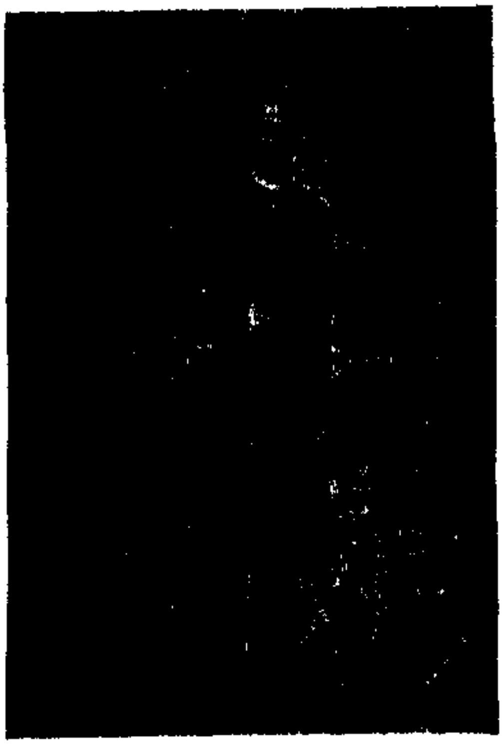
তবে এ কথাও সমান সত্য যে মানুষে যে বস্তুকে বড় মনে করে, মানুষে যুগে যুগে তার আলোচনা করবেই। মহাকবির বাণী কোনও দেশের গণ্ডীতেও আবদ্ধ নয় কোনও কালের গণ্ডীতেও নয়। ফলে যুগে যুগে তার নব নব টীকা ভাষ্য রচিত হবেই। ঐ টীকা ভাষ্যই প্রমাণ যে যা বড় তা মানুষের মনকে চিরদিনই উত্তেজিত করে আর সেই সঙ্গে তাকে মুখর করে তোলে।

ধরুণ ধর্ম্মের কথা। বুদ্ধ-বচনের যে অসংখ্য টীকা ভাষ্য আছে তা কে না জানে। খৃষ্টধর্ম্মের পিঠ-পিঠ ইউরোপে theology বলে একটি বিপুল শাস্ত্র গড়ে উঠেছিল। আর বেদান্তের অর্থাৎ উপনিষদের যে নানা ভাষ্য আছে তা শিক্ষিত লোকমাত্রেই জানেন।

আর এ ঘটনা যে শুধু সেকালে হয়ে গেছে তাই নয়।

আজও ইউরোপীয় পণ্ডিতরা বৌদ্ধ ধর্ম্মের নিত্য নব ভাষ্য রচনা করছেন।

আর খৃষ্টবচন ইউরোপের মনের উপর আজও সমান প্রভুত্ব করছে, অর্থাৎ সে দেশের নব ধর্ম্ম অর্থাৎ পলিটিকসেরও মূলে আছে খৃষ্ট বচন। এমন কি যে নব পলিটিকাল ধর্ম্ম আপাত দৃষ্টিতে খৃষ্টধর্ম্মের মারাত্মক শত্রু, সেই Bolshevism-ও খৃষ্টধর্ম্মের একটা নূতন সংস্করণ মাত্র, আর সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট উক্ত নব ধর্ম্মের নব Church মাত্র।



প্রথম যৌবনে রবীন্দ্রনাথ
সতেরো বৎসর বয়সে বিলাতে গৃহীত ফটোগ্রাফ

আর আমরাও অর্থাৎ ইংরাজী শিক্ষিত বাঙালীরাও যে বেদান্ত নিয়েই নিত্য বাক্‌বিস্তার করছি তার প্রমাণের জন্য বেশী দূর যেতে হবে না। বাঙলার মাসিক পত্রের সূচিপত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই সকলেই তা প্রত্যক্ষ করতে পারবেন।

এখন মানুষে যাকে আর্ট বলে তাও হচ্ছে ধর্ম্মেরই স্বজাতীয়। আর কাব্য অবশ্য আর্টেরই অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ যখন মহাকবি, তখন এ কথা ভরসা করে বলা যায় যে ভবিষ্যতে যুগ যুগ ধরে, তাঁর কাব্যের আলোচনা হবে—এবং ভবিষ্যৎ মানব তাঁর কাব্য থেকে নূতন রস নূতন প্রাণ আহরণ করবে। আর আমাদের নিন্দা প্রশংসার একশ বৎসর পরে কি কোনও মূল্য থাকবে? Shakespeare সম্বন্ধে Miltonএর মতের কি আজ কোনও মূল্য আছে, যদিচ তিনিও ছিলেন একজন মহাকবি?

৩

লোকে যখন কাব্য কিম্বা ধর্ম্ম কিম্বা ঐ জাতীয় অপর কিছুর সমালোচনা করে, তখন তারা সুধু সেই কাব্য কিম্বা ধর্ম্মেরই পরিচয় দেয় না, সঙ্গে সঙ্গে নিজেরও পরিচয় দেয়। সমালোচনা করতে গেলেই যে আত্ম-পরিচয় দিতে হয়—এ বিষয়ে সকলে সমান সজ্ঞান নন। কিন্তু কথাটা সত্য। এখন এই উপলক্ষ্যে আমাদের অর্থাৎ বাঙালী লেখকদের একটা কথা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করবার সুযোগ হয়েছে। আমরা যে ভাষা নিয়ে কারবার করি সে ভাষা রবীন্দ্রনাথ আমাদের দান করেছেন। বাঙলা ভাষা রবীন্দ্রনাথের হাতে যে অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য ও সৌন্দর্য্য লাভ করেছে সে বিষয়ে ত কোনও সন্দেহ নেই। আর আমরা যে লেখার কারবার করি, সে একমাত্র তাঁর সৃষ্ট ভাষা নিয়ে। আর আমরা যাকে ভাব বলি,—তার প্রকাশ অবশ্য ভাষা-সাপেক্ষ।

নিত্য দেখতে পাই যে তরুণ কবিদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনা হয় যে তাদের কবিতা সুধু রবীন্দ্রনাথের কবিতার প্রতিধ্বনি মাত্র। কিন্তু সমালোচকরা ভুলে যান যে আমরা রবীন্দ্র-সাহিত্যের আবহাওয়ার ভিতর বড় হয়েছি, আর আজও বাস করছি। সুতরাং তাঁর কবিতার ভাব, ভাষা, ও ধ্বনির প্রভাব থেকে মুক্ত হবার একমাত্র উপায় হচ্ছে নীরব হওয়া। আমি যদি কবিতাকার হতুম ত এ হেন অভিযোগ আমি বিনাবাক্যব্যয়ে সাদরে শিরোধার্য্য করতুম। কিন্তু আমি লিখি গদ্য, পদ্য নয়। আর যে গদ্য আমি লিখি তা যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাবেই গড়ে উঠেছে ও

বর্ত্তমান রূপ ধারণ করেছে এ বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ নেই— অন্ততঃ তাঁর মনে, যিনি রবীন্দ্র-সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত; উপরন্তু বাঙলা গদ্যের ইভলিউসনের ইতিহাস জানেন। বর্ত্তমানে আমরা বঙ্কিমী অথবা হুতোমী ভাষা গায়ের জোরে লিখতে পারি—কিন্তু সহজে ও স্বচ্ছন্দচিত্তে নয়। আর তা করতে গেলেই, আমাদের সেই ভাষাই হবে যথার্থ নকল। কারণ রবীন্দ্র-সাহিত্য গত যুগের সাহিত্যিক ভাষাকে আমাদের কাছে archaic করে ফেলেছে। পদ্য লেখকরাও আজকের দিনে আর হেম নবীনের ভাষায় লেখেন না, কারণ সে ভাষার দীনতা আজ লেখক পাঠক উভয়েরই কাছে সমান, প্রত্যক্ষ। আমি সুধু ভাষার কথাই উল্লেখ করছি, কারণ ভাষা-বঞ্চিত ভাব নেই; আর যদি থাকে ত সে ভাবের সাহিত্যে স্থান নেই।

আর বাঙালী সাহিত্যিকদের এই উপলক্ষ্যে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে বাঙলায় যদি রবীন্দ্রনাথ আবির্ভূত না হতেন ত আজকের দিনে বাঙলায় সাহিত্য বলে কোন জিনিষ থাকত না, যেমন ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশে নেই। অতএব আমাদের আত্ম-পরিচয়ের প্রথম এবং প্রধান কথা হচ্ছে যে আমরা সকলেই রবীন্দ্র-প্রতিভার স্পর্শে প্রাণবন্ত হয়েছি। এক্ষেত্রে বিশ্বমানবের সঙ্গে আমাদের প্রভেদ এই যে, তাঁরা যতবড় গুণগ্রাহী হ'ন না, তাঁরা রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভোক্তা-মাত্র, আর আমরা যতই মন্দ সাহিত্যিক হই না কেন, আমরা তদ্রূপ ভোক্তা ত বটেই উপরন্তু আমরা এ যুগের বঙ্গ-সাহিত্যের ক্ষুদে কর্ত্তাও বটে। এবং এই সাহিত্যকর্ত্তা হিসাবেই কালিদাসের এ উক্তি আমাদের সকলেরই স্বগতোক্তি।

"অথবা কৃতবাগ্দ্বারে বংশেঽস্মিন্ পূর্ব্বসূরিভিঃ
মণৌ বজ্রসমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ"।

অবশ্য পূর্ব-সূরিদের স্থলে একমাত্র রবীন্দ্রনাথকে বসিয়ে দিয়ে এবং বংশ শব্দের নূতন অর্থ করে।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

রবীন্দ্রনাথ

পৃথিবীতে কখনও কচিৎ এমন মানুষ জন্মে যাঁর প্রতিভা মানব ইতিহাসের বিস্ময়। মনে হয় প্রজাপতি নিজের বিভুত্ব একবার দেখিয়ে দিলেন। রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্য এই রকম একটি পরম বিস্ময়। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর বাঙলা দেশে কোন্ মাটির রস টেনে, কোন্ আকাশ বাতাসের আবেষ্টনে এমন প্রতিভার জন্ম ও বিকাশ সম্ভব হ'ল ভবিষ্যৎ কালের ঐতিহাসিকেরা সে তত্ত্বের অনুসন্ধান ক'রবেন। কিন্তু চোখেই দেখছি সে প্রতিভা তার জন্মের পারিপার্শ্বিককে ছাপিয়ে বিশ্বমানবের সভ্যতাকে রসপুষ্ট করছে; চিরদিনের মানুষের জন্য আনন্দের একটি অক্ষয় উৎস সৃষ্টি করেছে।

রবীন্দ্রনাথ কবি। তিনি নিজে বলেন তাই হচ্ছে তাঁর প্রথম ও শেষ পরিচয়; আর যা কিছু হয় অবান্তর নয় আনুষঙ্গিক। তাঁব কবি-প্রতিভা যে কাব্য-সাহিত্যের জন্ম দিয়েছে তার লোকোত্তর মাধুর্য্য ও দীপ্তি, ও তার অতুল ঐশ্বর্য্য পাঠককে রসের অমৃতলোকে পৌছে দেয়; সমা-লোচককে স্তব্ধ ও নির্ব্বাক করে। নর-নারীর চিত্তের সমস্ত ভাবধারা তাঁর কাব্যের বীণায় ঝঙ্কার তুলেছে। মানুষের জীবনযাত্রার সাধারণ সুখ দুঃখ, তার সরল সহজ অনুভূতি তাদের তুচ্ছতা ও ক্ষণিকতা পরিহার ক'রে তাঁর কাব্যে সৌন্দর্য্যের নিত্যলোকে উত্তীর্ণ হয়েছে। বাইরের বিশ্বের ও মানুষের মনের বিরাট রহস্য ও জটিলতা, তা-ও তাঁর কাব্যে লাভ ক'রেছে রসের চরম মূর্ত্তি। রবীন্দ্রনাথ এই ধরণীকে ভালোবেসেছেন। এর মেঘ ও রৌদ্র, এর আকাশ সমুদ্র, এর নদী পর্ব্বত, এর অরণ্য ও শস্যক্ষেত্র তাঁর চোখে সৌন্দর্য্যের যে অঞ্জন লেপেছে তাঁর প্রাণে ভাবের যে বাঁশী বাজিয়েছে তা তাঁর কাব্যে রূপ ও রসের যে মূর্ত্তি নিয়ে ফুটে উঠেছে তার তুলনা নেই। অকৃপণা প্রকৃতি নিজের ঐশ্বর্য্য উজাড় ক'রে রবীন্দ্রনাথকে গড়েছে। প্রকৃতির সে দান তিনি ফিরে দিয়েছেন। তাঁর তুল্য 'লিরিক' কবি পৃথিবীতে আর জন্মেছে ব'লে মনে হয় না। তাঁর কাব্যের পাশে অনেক শ্রেষ্ঠ লিরিক' কবির কাব্য মনে হয় বিটহোফেনের 'সিম্ফনির' পাশে একতারার বাজনা। মানুষের মনের একটি দুটি তারে তিনি ঝঙ্কার তোলেন নি, তার সমস্ত হৃদয়কে তিনি বাজিয়েছেন।

কাব্যের স্বর্গ থেকে বুদ্ধি ও চিন্তার মাটিতে নেমেও দেখি রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা সেখানে যে বিশাল সাহিত্যের সৃষ্টি ক'রেছে তার বৈচিত্র্য গভীরতা সকল দেশের সাহিত্যেই দুর্লভ। সরসতার কথা না-ই তুল্‌লুম্। তাঁর সামান্য লেখাও, মহাশিল্পীর তুলির দু একটি টানে, শুধু বুদ্ধিজীবী ও চিন্তাজীবী লেখকদের লেখা থেকে নিজের ভিন্নগোত্র জানিয়ে দেয়। সাহিত্যের কোন প্রদেশ তাঁর দানে ঐশ্বর্য্যশালী নয়? ভাষা ও সাহিত্য-সমালোচনা, শিক্ষা ও ধর্ম্ম, সমাজ ও রাজনীতি, ইতিহাস ও জীবনী, ভাষাতত্ত্ব ও ব্যাকরণ—এ সবই তাঁর চিন্তার আলোতে উজ্জ্বল হ'য়েছে। প্রবন্ধ-লেখক হিসাবে তাঁর স্থান পৃথিবীর মহাশক্তিশালী প্রবন্ধকারদের মধ্যে।

শুধু বাণীই তাঁকে বরণ করে নি। সুরের তিনি রাজা। নাট্যশিল্পে তিনি মহান্। আজ রেখাও এসে তাঁর হাতে ধরা দিয়েছে। সৃষ্টি ও প্রকাশের কোনও উপকরণ তার স্পর্শ না নিয়ে থাক্‌তে পারে না। আর যা তাঁর ছোঁয়া পায় তাই অমৃতত্ব লাভ করে।

বাঙ্গালা সাহিত্য ও বাঙ্গালীর জীবন তাঁর কাছে থেকে কি পেয়েছে তা বলার চেষ্টা কর্‌বো না। গণনা ক'রে তা শেষ করার জিনিষ নয়। আমরা আজ তাঁর ভাষা লিখি, তাঁর ভাবে ভাবুক হই, তাঁর চিন্তা চিন্তা করি, তাঁর কাব্যে

রসের চরম আস্বাদ পাই, তাঁর সুরে তাঁর কথা গান করি। জীবন ও সভ্যতার তাঁরি-ই আদর্শ বাঙালীর অন্তরতম অন্তর স্বীকার করেছে। বাঙালীর ভাব ও চিন্তার পায়ের শিকল তিনি ভেঙেছেন। বাঙালীর সাহিত্য ও জীবনকে লৌকিক জীবন মানুষের মনে ভাব জাগায় ও তাকে কর্মের প্রেরণা দেয়। কবি যখন কবি, অর্থাৎ কাব্যকার, তখন সে জীবন তাঁর কাছে কাব্য-সৃষ্টির উপাদান মাত্র। ভাবের ফুল সেখানে কর্মের ফলে পরিণতি লাভ করে না, তাকে



বাল্মিকী-প্রতিভা অভিনয়ে বাল্মিকীর ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ—১৮৯১ সাল

প্রাদেশিকতার দেয়াল ভেঙে বিশ্বসাহিত্য ও সমগ্র মানব-সভ্যতার মুখোমুখি এনেছেন।

কবি যখন সৃষ্টি করেন তখন লৌকিক জীবনকে তিনি দেখেন অলৌকিক দৃষ্টি দিয়ে। মানুষের সাধারণ দেখা যদি স্বাভাবিক দেখার মাপকাঠি হয় তবে কবির দৃষ্টি অস্বাভাবিক। চুঁইয়ে রসের মহার্ঘ আতর তৈরী হয়। জীবনের উপর কবির এই দৃষ্টি অনাসক্তের দৃষ্টি, মমত্বহীনের দৃষ্টি। কিন্তু কবি তাঁর সমগ্র জীবনে কিছু কাব্যকার নন্। লৌকিক জীবনের সামাজিক দাবী তাঁকেও মিটাতে হয়। কিন্তু দেখা যায় অনেক কবি, যেমন অনেক শিল্পী, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক

লৌকিক জীবনে এই দাবী কখনও সম্পূর্ণ স্বীকার করতে পারেন না। তাঁদের সৃষ্টির ও নিষ্কাম জ্ঞানের প্রতিভা তাঁদের মনকে যে-দিকে উন্মুখ করে, সে মুখ ঘোরান তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। মানুষের সমাজ তাঁদের প্রতিভার দান মাথা পেতে নিয়ে সমস্ত ত্রুটিকে উপেক্ষা করে। মানুষ বোঝে তাঁদের একদিকের অসাধারণ প্রাচুর্য্য তাঁদের আর সমস্তদিকের রিক্ততাকে পূরণ ক'রে বহুগুণ ছাপিয়ে যায়।

রবীন্দ্রনাথের জীবনে এই রিক্ততার লেশ কোথাও নেই। রসস্রষ্টা কবি তাঁর ভাব ও কর্ম্মকে দুর্ব্বল ও পঙ্গু করেন নাই। প্রকৃতি যে প্রতিভার অজস্রত্ব তাঁকে দান করেছে মহাকবির বিশাল রসসৃষ্টিও তাকে নিঃশেষ করে না। প্রতিভার সৃষ্টিতে শক্তির যে অপরিমিত ব্যয় তা স্বভাবত আসে জীবনের আর সব অংশ থেকে সরিয়ে এনে শক্তিকে এক কেন্দ্রে প্রবল ক'রে। রবীন্দ্রনাথের তা প্রয়োজন হয় নি। তাঁর মধ্যে প্রতিভার যে অফুরন্ত ভাণ্ডার রয়েছে কোনও দিকে অজস্র ব্যয়ের জন্য অন্য দিকে তার সংকোচ ঘটাতে হয় না। স্বদেশ ও মানব-সমাজের দুর্দ্দশা ও আশা রবীন্দ্রনাথকে কর্ম্মে রত করেছে। মনে হয় যেন কত স্বাভাবিক! তাঁর মত মহাকবি ও মহাশিল্পীর পক্ষে এ কর্ম্মপ্রচেষ্টা যে কত অসাধারণ তা ভেবে দেখলেই বোঝা যায়। কিন্তু এর অসাধারণত্বের কথা সচরাচর আমাদের মনেই হয় না। এমনি সহজে তাঁর প্রতিভার বিরাটত্ব আমরা মেনে নিয়েছি। দেশের লোক যে তাঁর কাছে নানা অসম্ভব আশা করে, এবং দাবী পূরণ না হওয়ায় বিরক্ত হয় তারও মূল এইখানে। তাঁর প্রতিভার উপর আমাদের ভরসার অন্ত নেই।

দেশ ও জাতির গণ্ডী সরিয়ে মানুষে মানুষে মৈত্রীর বাণী যাঁরা প্রচার করেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁদের মধ্যে একজন প্রধান। কালকের না হোক তার পরদিনের পৃথিবী এ বাণীকে স্বীকার করবে। সেদিনকার মানব-সমাজ কবি রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ঋষি রবীন্দ্রনাথকেও প্রীতির অঞ্জলি দেবে।

মানব-সভ্যতার রসের আনন্দ-ভাণ্ডার তিনি দানে পূর্ণ ক'রেছেন; চিন্তার জগৎ তাঁর প্রতিভার আলোতে উজ্জ্বল; বিশ্বমানবের মৈত্রীবন্ধন তাঁর কর্ম্মের লক্ষ্য। মানব সমাজের উপর তিনি ভগবানের আশীর্ব্বাদ। রবীন্দ্রনাথকে জন্ম দিয়ে বাঙ্গলাদেশ ধন্য হ'য়েছে। তাঁর শুভ সপ্ততিতম জন্মোৎসবে তাঁকে আমাদের শ্রদ্ধা ও প্রীতি নিবেদন করছি।

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত



বিশ্ব-পুরোহিত

আমার জীবন আমি ধন্য বলে মানি,
হে কবি! হে বিশ্ব-পুরোহিত! আমি জানি
বিশ্বের কল্যাণ মন্ত্র পড়িবার তরে
তুমি এলে, জন্ম নিলে মানবের ঘরে
উদার আকাশ তলে। তাই গান গাও,
আকাশ পাতাল তুমি ছন্দেতে নাচাও,
মর্ম্মরিয়া ওঠে বাণী হাওয়ায় হাওয়ায়,
গভীর মৃদঙ্গ বাজে তারায় তারায়।

হে কবি! আমি দেখি চেয়ে দেখি মুক্ত বাতায়নে
নিবিড় নিশীথ রাতে সুদূর গগনে,
আকাশের গায়ে গায়ে তব মন্ত্রগুলি
মহাকাল চিরতরে লইয়াছে তুলি।

মুক্ত বাতায়নে মোর উন্মুক্ত হৃদয়
সেই মন্ত্রে আপনার নিল পরিচয়।

শ্রীনীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত

'রবীন্দ্রানুস্মৃতি'

১৯১০ এর সেপ্টেম্বর মাসে আমি প্রথম বোলপুরে কবিগুরুর দর্শন লাভ করি। তখন আমার তরুণ বয়স, কলেজি বিদ্যার পাট সবে শেষ করেছি। বোলপুরে গিয়ে যখন তাঁকে প্রথম দেখলাম তখন চক্ষু যেন কি স্নেহাঞ্জনে শীতল হয়ে গেল ও মনের মধ্যে একটা কি যেন নূতন সাড়া পেলাম। এতদিন শুধু বিদ্যালয়েই পড়েছিলাম, অনেক প্রবীণ অধ্যাপকদেরও সঙ্গলাভ করেছিলাম, বাল্যকাল থেকে অনেক সাধু মহাপুরুষদের সঙ্গেও সাহচর্য্য করবার অবসর পেয়েছি, কিন্তু প্রথম দর্শনেই মনে হ'ল যে এমনটী আর দেখি নাই। আমার বেশ মনে পড়ে যে আমার সমস্ত দেহ-যন্ত্র যেন কি এক সুরের আবেশে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠে সমস্ত চিত্ত প্লাবিত করে যেন একটা অস্ফুট কাকলী শব্দময় হয়ে প্রাণকে বিবশ করে তুলল। প্রাণের সুরকে কণ্ঠের সুরের মধ্য দিয়ে বাজিয়ে তুলবার জন্য কবির সামনে বসে জুলুম করলাম যে আপনার 'কি সুর বাজে আমার প্রাণে' এই গানটী করুন। এই একটী গানই এক বৈঠকে পাঁচবার করে শুনলাম। আজ সে কথা মনে হ'লে মনে লজ্জা পাই, আর মনে হয় কতখানি কোমলতা কতখানি স্নিগ্ধতা থাকলে একটী দ্বাবিংশ বর্ষীয় যুবকের চিত্তরঞ্জনার্থে অতবড় একজন লোক যে এমন অনায়াসে তার চিত্তের সঙ্গে আপনাকে নুইয়ে দেবেন—এটা যে কতবড় মহত্ব তা আজ বেশ বুঝিতে পারি। তিনি সপ্ততি বর্ষের বৃদ্ধ, তিনি জগতের মধ্যে ভারতবাসীর পরিচয়, পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সকল ভাবা-ভাবীরা তাঁ'র যশ-গানে মুখর, আজ আমরা ভক্তি ও সম্ভ্রমের কুণ্ঠায় তাঁ'র দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হয়েছি এবং আসন গ্রহণ করতে সঙ্কোচ বোধ করি, কিন্তু তাঁর এ মথুরার ঐশ্বর্য্য তাঁর বৃন্দাবনের মাধুর্য্য হরণ করতে পারে নি, আজও দেখি অল্পবয়স্ক বালকবালিকাদের সহিত তাঁ'র খেলা ও সখ্য তেমনি নিবিড় রয়েছে। তিনি তাদের বন্ধু, তা'রা তাঁ'র বন্ধু। তাদের সঙ্গে অনিমিত্ত চিঠি পত্রের আদান-প্রদানে হাস্য কৌতুকে এমন কি বড় বড় কথার আলোচনায় তাঁ'র কোনও অবহেলা নেই। সাধারণত দেখা যায় যে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এমন কঠিন খোলস পড়ে ওঠে যে সে আবরণ ভেদ ক'রে অন্তরের রসকোমল ধাতু বাহিরের আকাশ বাতাসের সহিত তা'র অনায়াস সম্পর্ক রাখতে পারে না, বাহিরের আঘাতে সে আহত হয় না এবং লীলা-চঞ্চল বায়ুর দোলাতে সে আপনাকে খেলাতে পারে না। একটী গাছ যখন বেড়ে ওঠে ও ক্রমশ স্থবির হয়ে পড়ে তখন তা'র বাহিরের ত্বক্ শুকিয়ে যায়। কুড়ালীর আঘাতে ছিন্ন করলেও সে আহত হয় না। স্নিগ্ধ জলাভি-সিঞ্চনেও তা'র কোনও প্রফুল্লতা বাড়ে না। কিন্তু রবীন্দ্র-নাথের অলৌকিক প্রাণ প্রতিভার বিশেষত্ব এই যে তিনি তাঁর বয়স জ্ঞান গরিমা ঐশ্বর্য্য বিশ্ববিশ্রুত খ্যাতি তাঁর অলৌকিক ধ্যান-সম্পদ বুদ্ধি-সম্পদ এ সমস্তকে তাঁর ঢিলা পরিচ্ছদের ন্যায় তাঁর অঙ্গে ধারণ করেন। এরা তাঁর গায়ে গাছের বাকলের মতন কিংবা যোদ্ধারি বর্ম্মের মতন এঁটে থাকে না। তাই তিনি অন্তরে বাহিরে সর্ব্বদাই নবীন সর্ব্বদাই কাঁচা। আমাদের ভক্তি শাস্ত্রকারেরা লোকত্তর প্রাণসম্পদের এই বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়া মথুরার কৃষ্ণ ও ব্রজের কৃষ্ণের একত্ব প্রতিপাদন করে মুগ্ধ হয়েছেন। এই উপমা স্মরণ করে আমারও এই কথাই মনে হয় যে বিশ বৎসর আগে অনায়াসে যাঁর সহিত মিশতাম আজ

সত্তর বৎসরের রবীন্দ্রনাথ সে-ই আছেন। আজও কিশোর ও তরুণেরা যখন তাঁর সঙ্গ লাভ করে তখন তারা সেই রবীন্দ্রনাথকেই পায় এবং সেই সত্যভাবে তাঁকে পাওয়াই তাঁকে সত্য পাওয়া। আজ নানা আড়ম্বরের মধ্যে বয়স ও খ্যাতির মধ্যে তাঁর যে প্রতিবিম্বটী আমরা পাই সেটী আমাদের মিথ্যা পাওয়া। সেই জন্য আমার মনে হয় তাঁর সত্তর বৎসর বয়স হ'ল এই ভূমিকায় যে উৎসবের আয়োজন হয়েছে এটা এই হিসাবে মিথ্যা। বরং সত্তর বৎসরেও তাঁহার বয়স হয় নাই ইহাতেই তাঁর জয়াভিনন্দন।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

কবি

হে কবি!
তোমার মানসপটে মানবের মিলনের ছবি
দেবদূত এঁকেছিলো স্বপনের বরণসম্ভারে
জনমের ষষ্ঠবাসরের নিশাযোগে। তুমি তারে
মূর্ত্ত করিয়াছ তব অপরূপ বীণার ঝঙ্কারে
নানাছন্দে। জীবনের বদ্ধদ্বার অন্ধ কারাগারে
এনেছ গানের আলো। যে মানুষ ছিল প্রাণহীন,
অসীম দৈন্যের কূপে অতীতের স্বপ্নমোহে লীন,
তারে তুমি, হে মরমী, শিখায়েছ নূতন বারতা,
শিখায়েছ আশাভরা চিরন্তন আনন্দের কথা,
দিয়েছ নূতন প্রাণ। শিখায়েছ ক্ষুদ্র মানবেরে
বিরাট বিচিত্র বিশ্বে বিস্তারিয়া নিরুদ্ধ মনেরে
লভিতে মুক্তির স্বাদ। তোমার সুরের স্পর্শ লাগি'
হে মায়াবী, দৃষ্টিহীন চক্ষু লভি উঠিয়াছে জাগি,
যেথায় উর্ব্বশী তার পরিপূর্ণ যৌবনের রসে
প্রস্ফুটিত হয়ে আছে নিখিলের মানস সরসে;
প্রাণের নির্ঝর তব ভগ্ন করি সংস্কারের কারা
মরতের মরুভূমে সঙ্গীতের মন্দাকিনী ধারা
করিয়াছে প্রবাহিত। জগৎসভায় ভারতেরে,
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছ আপনার দানের সুসারে,
গীতের সুবর্ণ অর্ঘ্য দিয়া। এ পারের বিজন প্রান্তরে,
সঞ্চয় করেছ যাহা একা বসি নদীর কিনারে,
নিঃশেষে দিয়েছ ভরি ভারতীর সোণার তরণী
সপ্ততিবরষ ধরি। আজ তব প্রদীপ্ত সরণী
ঝলিছে আনন্দ রেখা জননীর নিরানন্দ মুখে
মেঘপ্রান্তে রৌপ্যলেখা সম। নব বরষের বুকে
তোমার প্রতিভা আজ শোভিতেছে বরমাল্যরূপে
তোমার পায়ের ধ্বনি মরমসোপানে চুপে চুপে
রচিতেছে বিচিত্র রাগিণী। তোমার বীণার সুরে
এমনি রণিবে হিয়া আজি হতে শতবর্ষ পরে—
সেদিন রহিব কোথা কোন মৃত্তিকার সনে মিশে,
অথবা ঘুমের শেষে জাগিয়া উঠিয়া নববেশে
সুদূর দিগন্তে চাহি নির্নিমেষে বসি বাতায়নে
চেয়ে রব আরবার তোমার আসার পথপানে।

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় দেব

"রবীন্দ্র জয়ন্তী"

বয়সের প্রতি শ্রদ্ধা একদিন অকারণ ছিল। আমাদের যুগে প্রায় প্রত্যেক দেশেই এর প্রতিক্রিয়া লক্ষিত হচ্ছে। অধিক বয়সীকে আমরা সকারণেও শ্রদ্ধা দিতে কুণ্ঠিত। যে তারুণ্যের আমরা উপাসক সে নাকি একটা বিশেষ বয়সের ধর্ম।

রবীন্দ্রনাথ এই আধুনিক কুসংস্কারটার মূর্তিমান প্রতিবাদ। তিনি আমাদের কারো থেকে কম সক্রিয় নন্—কী দেহে কী মনে। সত্তর বৎসর বয়স্ক ভগ্নস্বাস্থ্য কবির অভিলাষ আকাশপথে পারস্য যাত্রা করবেন। দুষ্টু ছেলের মতো টো টো করে বেড়ে জাহাজে পৃথিবী ঘুরছেন। জাহাজের ক্যাবিনের যে আরাম আমি তার ভুক্তভোগী। ইংলণ্ডের শীতকালটা যুবজনেরও রোমহর্ষক। কবি কিন্তু অকুতোভয়।

তাঁর মনের সক্রিয়তার আধুনিকতম প্রমাণ তাঁর "রাশিয়ার চিঠি"। রাশিয়ার মতো নিরীশ্বরবাদী দেশ এত বড় ঈশ্বরবাদীর আশীর্বাদ ও সহানুভূতি পায়নি। রাশিয়াকে দেখে ধর্মসম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অভিমত কিছু বদলেছে। সম্প্রতি তিনি "হিন্দু মুসলমান" নামক যে প্রবন্ধটা লিখেছেন সেটিতে ধর্মের প্রতি তাঁর অনাস্থা প্রকাশ পেয়েছে। বস্তুত অক্সফোর্ডে "Religion of Man" নামক বক্তৃতা দেবার সময় থেকে মানবিকতার দিকে তিনি ঝুঁকেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে আধুনিক জগতের সকল মানবপ্রেমিক নিরীশ্বরবাদী, অজ্ঞেয়বাদী ও ঈশ্বরবিশ্বাসীর মিলবে। মানুষ যে মানুষ এজন্যে তার লজ্জিত হবার দিন গেছে। প্রকৃতি তাকে ছোট ক'রে গড়েনি। যতদিন দাস-মানব ছিল ততদিন দাসের ভগবানকে নিয়ে দাসধর্ম ছিল। মুক্ত মানবের মুক্তির ধর্মকে রবীন্দ্রনাথের অতি তরুণ মন সহজেই চিনতে পেরে স্বীকার করেছে। হিন্দু খ্রীষ্টান মুসলমান ইত্যাদি দাগে দাগী হয়ে মানুষ মানুষের থেকে স্বেচ্ছায় পর হয়ে রয়েছে আত্মীয়তাবাদী রবীন্দ্রনাথকে এ'তে পীড়া দিয়েছে।



রবীন্দ্রনাথ
আনুমানিক ৮৯০ সালে গৃহীত ফটো বয়স ২৯

অস্তপ্রায় রবির এ এক অভিনব রূপে অভ্যুদয়। আমাদের শ্রদ্ধার যোগ্য; প্রণতির যোগ্য।

শ্রীলীলাময় রায়

দু'জনে 'বলাকা' পড়ি—

শিয়রের কুলুঙ্গির মাঝে
সিঁদুরের কৌটা থাকে, চিরুণী, মাথার কাঁটা আরো কত ছাই-পাশ বাজে,
জমাখরচের খাতা, খোকার দপ্তরে-বাঁধা ধারাপাত আর বোধোদয়—
তারি নীচে দিন ভোর সীমাহারা মহাকাশ চুপ করে' ঘুমাইয়া রয়।
ছোট্ট মাটির ঘর। হাতের কাঁচের চুড়ি নানাকাজে বাজে চারিপাশ—
চুড়ির বাজনা শোনে কবিতা-পুঁথির পাতে ঘুমে লীন নীলিম আকাশ।...

দিন ক্রমে ডুবে যায়, রাতি আসে। ছুটি পাই। শ্রান্তদেহ এলাইয়া পড়ি।
জানালার বাহিরেতে অগণন তারকারা জেগে ওঠে রাত্রির প্রহরী।
ও-ঘরে শিকল পড়ে। শেষ হ'য়ে গেল তবে এতখনে ঘরণার কাজ—
হলুদে কালিতে মাখা ঘোমটা নামায়ে দিয়ে টিপি-টিপি আসিল সলাজ।
একটু দাঁড়ায়ে থাকে; তারপর হেসে কয়—'কই, তুমি পড়িতেছ কই?'
কুলুঙ্গির কোল হ'তে বাহির করিয়া আনি পাতা-ছেঁড়া কবিতার বই—
একখানা পুরাণো 'বলাকা';
প্রতিটি কবিতা তার পড়েছি যে কতবার, পাতে-পাতে কালি-ঝুলি মাখা!
মাঝরাত গ্রামটিতে, খেয়াঘাটে লোক নেই, ঝাঁপ-আঁটা মুদীর দোকান,—
মোরা দু'টী চুপি-চুপি তখন কবিতা পড়ি—জেগে ওঠে আকাশের গান।

—দু'টি মাথা এক সাথে; দু'টি মন পাশাপাশি উড়ে যায় দুইখানি পাখা—
পাখনার দোলা লেগে আঁধিয়ারে ঢেউ জাগে,—নিশি-রাতে উড়িল বলাকা!
সহসা কি চাঁদ ওঠে কাঁঠালের বনচূড়ে? বাঁধ ভেঙে আসে কি জোয়ার?
বান এসে লুঠে পড়ে ঘরের বেড়ার 'পরে—কেঁপে ওঠে খিল-আঁটা দ্বার!
খুঁটিনাটি দরকারী শতেক ঘরের কাজ নতমুখে পড়ে থাকে নীচে—
গভীর নিশুতি রাতে গুণ্ গুণ্ গুণ্ করে' মেঘলোকে বলাকা উড়িছে!...

রবীন্দ্র জয়ন্তী

আকুল নয়ন দিয়া ওর মুখে চেয়ে থাকি, ও চাহিয়া রহে মোর পানে—
ওই দু'টি আঁখি তুলে আমার কুটীর-কোণে সোণার স্বপন ডেকে আনে।
চেয়ে চেয়ে দেখি কতখন,
হলুদের দাগ-লাগা ঘোমটার আবছায়ে উছলিছে রঙীন জীবন!

রাতি ফুরাইয়া যায়। অলস ধানের বনে মাঠপারে চাঁদ পড়ে ঢলি'—
আমার কোলের 'পরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে একগোছা শালুকের কলি।
উষা ওর মুখ 'পরে রাঙা ছায়া বুলাইয়া দিয়াছে কি অপরূপ রূপ—
রাজার ঝিয়ারী যেন কোলের পালঙে শুয়ে, দেখি তাই বসিয়া নিশ্চুপ!
শিথিল আবেশ ভরে ঠোঁটের পাপড়ি দুটি ঈষৎ নড়িছে মাঝে মাঝে—
ডাকে বুঝি—'প্রিয়তম!'···আমি কোন মহারাজা, ধ্বনিহীন ডাক মনে বাজে।

হঠাৎ তাকায়ে দেখি, 'বলাকা'র খোলাপাতা উড়ে গেল সারা ঘরময়,—
ভোরের বাতাস লেগে নিভিল ঘরের বাতি, স্বপন পালালো পেয়ে ভয়।
কি জানি কি ভাবি বসে'!··· ··অশ্রু-সায়র কূলে মানুষের চিরকাল বাস—
সুখের বাসর ভাঙে, এ কিছু নূতন নয়।—তবু পড়ে একটি নিঃশ্বাস।···
মোদের জীবন লাগি' হে কবি, পুঁথির পাতে আলোক রাখিয়া গেছ ভরি'—
আঁধারে মরেছে যারা—চোখ ভরে' জল আসে আজি যবে তাহাদের স্মরি।
আমার যে বেচা-কেনা তাহা শুধু দিনমানে, রাত হ'লে বসি রাজপাটে,
সত্তর বছর আগে যাহারা বাঁচিয়াছিল, রাত-দিন পড়ে' র'ত হাটে।

শ্রীমনোজ বসু



শ্রদ্ধা-নিবেদন

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের প্রতি যে শ্রদ্ধা এবং ভালবাসা সানন্দে ও সগৌরবে হৃদয়ের মধ্যে পোষণ করি, তাহা না পারি ভাষায় রূপ দিতে, না পারি কথায় প্রকাশ করিতে। আমার কথা, আমার ভাষা কিছুতেই আমার মনের গভীরতম, একান্তভাবে অনুভবগোচর সত্যটিকে প্রকাশ করিতে পারে না। সুতরাং, আমার এই শ্রদ্ধা-নিবেদনের মধ্যে যাহা ধরা পড়িবে, তাহা শুধু আমার প্রকাশ-শক্তির দীনতা; সেই দীপ্ত প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধার যে ঐশ্বর্য্য আমার মন ও হৃদয়ের মধ্যে সঙ্গোপনে সঞ্চিত হইয়া আছে, তাহার পরিচয় আমি দিতে পারিলাম না।

কবিগুরুর প্রতি আমার এই অবর্ণনীয় শ্রদ্ধা ও ভালবাসার সঞ্চার কবে কি করিয়া হইয়াছে, কি করিয়া ধীরে ধীরে আমার মন ও হৃদয়ের মধ্যে তাহা সযত্নে লালিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহা কিছুই সুস্পষ্ট করিয়া বলিতে পারি না। আমরা যখন ইস্কুলে পড়িতাম, তখন পাঠ্যপুস্তকে রবীন্দ্রনাথের কবিতা অথবা প্রবন্ধের স্থান ছিলনা বলিলেও চলে। তাহা ছাড়া, শিক্ষক ও গুরুজনদের মুখে মাইকেল বঙ্কিমচন্দ্রের কথা শুনিতেই অভ্যস্ত ছিলাম, যদিও তখন রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার চারপাঁচবৎসর আগেই পাইয়া গিয়াছেন। অবশ্য, যৌবনের সীমা যাঁহারা তখনও অতিক্রম করেন নাই তাঁহাদের কাছে মাঝেমাঝে রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলালের কথাও শুনা যাইত। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গের প্রান্ততম সহরের অধিবাসী আমরা, আমাদের ওখানে রবীন্দ্র-সাহিত্য চর্চ্চা একেবারেই কিছু ছিল না বলিলে মিথ্যা বলা হইবে না। তবু, সেই অবস্থার মধ্যেই, আমার স্পষ্ট মনে আছে, বাঙলা কাব্য সাহিত্যের যে বইখানি আমার কিশোর চিত্তকে কাড়িয়া লইয়া চিরকালের জন্য তাহা অধিকার করিয়া বসিল তাহা রবীন্দ্রনাথের 'কথা ও কাহিনী'। তাহার পর ইস্কুলের সীমা পার হইবার আগেই একটি একটি করিয়া কবির প্রায় সব কবিতার বই-ই পড়িয়া ফেলিয়াছিলাম। সেই বয়সে সকল বইয়ের সকল কথা বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু তাহাতে কিছু অভাব বোধ হইত না, কিছু ক্ষতিও হয় নাই। আমার স্পষ্ট মনে আছে, যখন যে-কবিতাটি পড়িতাম, তখন সেই কবিতাটির একটা সমগ্ররূপ আমার চোখের সম্মুখে যেন ফুটিয়া উঠিত, তাহাকে ধরিবার ছুঁইবার জন্য যেন চঞ্চল হইয়া উঠিতাম। প্রত্যেকটি বইয়েরই কয়েকটি কবিতা আমার ভারী ভাল লাগিত, তাহাদের কি যে যাদু ছিল তখন কিছুই জানিতাম না, কিন্তু যখনই মনে হইত তখনই যেন সমগ্র দেহ মন একটা অব্যক্ত পুলকে অভিভূত হইয়া পড়িত। মফঃস্বল সহরে এক পুস্তক বিক্রেতার দোকান ছাড়া রবীন্দ্রনাথের বই পাওয়া তখন সহজ ছিল না; দুই চারিজন যাহাদের সংগ্রহের মধ্যে চার ছয়খানা বই ছিল, তাহাদের কাছে চাহিতে গেলে বিদ্রূপ ও তিরস্কার লাভ ছাড়া আর কিছুই হইত না। আমাদের মধ্যবিত্ত পরিবারে সর্ব্বদা ইচ্ছামত বই কিনিবার সামর্থ্যও ছিল না; তবু কষ্টে সৃষ্টে তখন পর্য্যন্ত রচিত রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কাব্য গ্রন্থই সযত্নে সংগ্রহ করিয়াছিলাম—তাহাদের সঙ্গে যেন আমার নাড়ীর টান ছিল। রোজই একটা না একটা বই না পড়িলেই চলিত না, পড়িতে পড়িতে অনেক কবিতাই মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল। সময়ে অসময়ে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করা যেন একটা অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়াইয়া গিয়াছিল; বন্ধুরা সহপাঠীরা বিদ্রূপ করিত, শিক্ষক গুরুজনেরা উত্যক্ত বোধ করিতেন, পাঠ্য বিষয় পড়ার অবহেলার জন্য তিরস্কার করিতেন। বলিয়াছি, তখন মফঃস্বল সহরে রবীন্দ্র-কাব্য পাঠের 'চল' ছিল না, আজিকার মত তাহা এত সহজ ছিল না, এবং রবীন্দ্রনাথের দিব্য প্রতিভাকে তখনও দেশবাসী

আজিকার মত করিয়া স্বীকার করিয়া লয় নাই। শুধু তাহাই নয়, তখন কলিকাতার সাহিত্যজগতে রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রসাহিত্যের বিরুদ্ধে যে একটা লজ্জাকর আন্দোলন চলিতেছিল, তাহার ঢেউ আমাদের সেই সুদূর মফঃস্বল সহরটিকেও স্পর্শ করিয়াছিল। সেই সময় আমার মত ইস্কুলে-পড়া এক কিশোর বালকের চিত্তে রবীন্দ্র-কাব্যের প্রতি অনুরাগ কি করিয়া সঞ্চারিত হইয়াছিল, জানিনা। আমি তখন-ও কলিকাতায় আসি নাই, রবীন্দ্রনাথকে দেখি নাই, শান্তিনিকেতনের জীবনযাত্রার পরিচয় পাই নাই, কলিকাতায় রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করিয়া যে সাহিত্যমণ্ডলটি গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহার কথাও কিছুই জানিতাম না। তৎসত্ত্বে-ও রবীন্দ্রকাব্য যেন আমাকে পাইয়া বসিয়াছিল; এবং তাহার ফলে মন ও জীবনযাত্রার যেন একটা অদ্ভুত ও অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়া গিয়াছিল। অশনে বসনে ভূষণে চলনে বলনে বাহিরের সর্ব্ববিষয়ে যেন একটা সুলভ কবি-য়ানার মোহের মধ্যে নিজকে ডুবাইয়া দিয়াছিলাম। আজ সে মোহ কাটিয়া গিয়াছে, বাহিরের সেই কবিয়ানার খোলস আপনা হইতেই খসিয়া গিয়াছে; কিন্তু রবীন্দ্রকাব্যের সোণার কাঠির স্পর্শ সেই যে সমগ্র চিত্তকে এক নূতন রাজ্যে জাগরিত করিয়া দিয়া গিয়াছে আজো তাহার শেষ নাই, রবীন্দ্রকাব্যের যাদু আজ-ও আমাকে সমানভাবে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছে। এই রবীন্দ্র-সাহিত্য-প্রীতির জন্য, এবং প্রীতির ফলে মনে ও জীবনে যে নূতন রসের ও রূপের সন্ধান এবং আস্বাদ পাইয়াছিলাম তাহার জন্য বিদ্রূপ ও লাঞ্ছনা কম ভোগ করিতে হয় নাই; কিন্তু একদিন যে তাহা করিয়াছিলাম, তাহারই ফলে আজ এক অমূল্য সম্পদের অধিকারী হইয়াছি, এবং রসের ও সৌন্দর্য্যের, সাধনা ও সংস্কৃতির এক নূতন জগতে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছি।

কৈশোরের সীমা অতিক্রম করিয়া কলেজে আসিয়া যখন বুদ্ধির কমল ধীরে ধীরে ফুটিতে আরম্ভ করিল, একটা নব জাগ্রত intellectual ও objective attitude দিয়া যখন সমস্ত রস ও সৌন্দর্য্যকে, ভাব ও কল্পনাকে ধীরে ধীরে ভাল করিয়া মন ও হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করিবার শক্তি অর্জ্জন করিতে লাগিলাম, তখন নূতন করিয়া আবার রবীন্দ্র-সাহিত্যের পাঠ ও চর্চ্চা সুরু হইল। এবার শুধু কাব্য নয়—সমগ্র সাহিত্য: কাব্য, গল্প, নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধ যাহা কিছু রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব্ব প্রতিভার সৃষ্টি সব কিছুর পরিচয় লইবার জন্য মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তখন হইতে আজ পর্য্যন্ত সেই পরিচয়ই লইতেছি, এ জীবনে কোনোদিন হয় ত এই পরিচয়ের শেষও হইবে না। শেষ যেন কখনও না হয়, এই কামনা করি। এক একটী বই কতবার যে পড়িয়াছি—লেখার সময়ের ক্রম হিসাব করিয়া পড়িয়াছি, বিষয়বস্তুর দিক হইতে, কলাকৌশলের অভিব্যক্তির দিক্ হইতে পড়িয়াছি, শুধু রস ও সৌন্দর্য্য আহরণ করিবার জন্য নিজের খেয়ালমত যখন হাতের কাছে যাহা যেমন ভাবে পাইয়াছি, পড়িয়াছি, আরও কতভাবে পড়িয়াছি, দেখিয়াছি—পড়িতেছি, দেখিতেছি। এখনও সকল রসের, সকল ভাবের সন্ধান পাই নাই, সব কিছুর মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে পারি নাই। কবে পারিব, তাহা-ও জানি না। অফুরন্ত এই রসের ও রহস্যের ভাণ্ডার।

বঙ্কিমচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিকতম কাল পর্য্যন্ত বাংলা সাহিত্যের পরিচয় ভাল করিয়াই লইয়াছি, উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত ইংরেজীর সাহিত্যের, এবং অনুবাদের সাহায্যে বর্ত্তমান য়ুরোপীয় সাহিত্যের আস্বাদনও কিছু কিছু পাইয়াছি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আমার সাহিত্য ও সৌন্দর্য্যবোধকে যেমন করিয়া জাগাইয়াছেন, রবীন্দ্র-সাহিত্য আমার ভাব ও কল্পনার, চিন্তা ও কর্ম্মের সকল দিককে যেমন করিয়া উদ্বোধিত করিয়াছে এমন আর কেহই করে নাই, কিছুতেই হয় নাই। অন্যের কি হইয়াছে জানি না, কিন্তু আমি নিজে মনে ও জীবনের প্রতি পদবিক্ষেপে এমন ভাবে ইহা অনুভব করি যে কবিগুরুর প্রতি শ্রদ্ধা-নিবেদন করিবার কালে তাহা আমি সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার না করিয়া পারিলাম না। জীবনের যাহা কিছু সুন্দর ও শ্রীমান্, ভাব ও চিন্তার স্বপ্ন যাহা কিছু ঐশ্বর্য্য, শিল্প ও সাহিত্যের প্রতি যাহা কিছু অনুরাগ সমস্তই আমি পাইয়াছি রস ও সৌন্দর্য্যের, ভাব ও চিন্তার সেই একতম উৎস হইতে। সেই অক্ষয় অমৃত ভাণ্ডার হইতে নিজের অলক্ষ্যে নিজেই আপন ভাণ্ডার ভরিতে প্রয়াস পাইয়াছি, আজ

তাহা স্বীকার করিতে গৌরব বোধ করিতেছি। যতই দিন যাইতেছে, ততই আরো বেশী করিয়া বুঝিতেছি, আমি এবং আমার অনেকেই আমরা যে ভাষায় লিখি, যে ভাবে কথা বলি, যে ধারায় চিন্তা করি, সমস্ত কিছুর মূলে রহিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ। আমরা বাঙালী শিক্ষিত ও সংস্কার-প্রাপ্ত ভদ্র-সম্প্রদায় যে বাংলাদেশে বাস করি, সে বাংলাদেশ রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি! আজ যে আমরা সাহিত্যের নব সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, বিশ্বসাহিত্যের রস ও সৌন্দর্য্য বুঝিবার ও ভোগ করিবার যে শক্তি অর্জ্জন করিয়াছি তাহা কি আমরা রবীন্দ্র-স্যাহিত্য হইতেই পাই নাই, রবীন্দ্রনাথই কি সে দৃষ্টি আমাদের দেন নাই? বাঙলা সাহিত্যের নবতম অধ্যায়ের যাঁহারা লেখক ও পাঠক তাঁহারা এ প্রশ্নের কি উত্তর দিবেন, জানি না; আমার মনে এ রকম কোনো প্রশ্ন জাগিবার অবসর মাত্র নাই।

শুধু তাহাই নয়। তুলনা করা চলে না, তবুও আমার বদ্ধধারণা, কালিদাস সেক্সপীয়র ও গ্যয়টের পর বিশ্বসাহিত্যে রবীন্দ্র-প্রতিভার সমকক্ষ আর কোনো প্রতিভারই নাম করা যায় না; এবং সাহিত্যের বিচিত্র ক্ষেত্রে এমন করিয়া আর কাহারও প্রতিভা এমন সুমহান্ দীপ্তি লাভ করে নাই। নোবেল পুরস্কারের মাপকাঠিতে আমরা রবীন্দ্রনাথকে বিচার করিতে অভ্যস্ত হইয়াছি; এ বিচার যে কতদূর হাস্যকর তাহা আমরা কবে বুঝিব? নোবেল পুরস্কারের দীর্ঘ তালিকাটিতে যে কয়টি সাহিত্য-গুরুর নাম আছে, তাহার একজন-ও যে রবীন্দ্রনাথের সমকক্ষ নহেন, একথা আমরা কবে বুঝিব? কবে বুঝিব যে নোবেল পুরস্কার রবীন্দ্রনাথকে গৌরবান্বিত করে নাই, রবীন্দ্রনাথই নোবেল পুরস্কারকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন!

আমার কেন জানি মনে হয়, বাঙ্‌লাদেশের শিক্ষিত ও সংস্কারপ্রাপ্ত ভদ্রসম্প্রদায়কে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়:— এক, যাঁহারা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য পড়িয়াছেন, আর যাঁহারা তাহা পড়েন নাই। যাঁহারা রবীন্দ্র-সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ট আত্মীয়তা স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহাদের জীবনযাত্রার মধ্যে রবীন্দ্র-সাহিত্য এমন অলক্ষ্যে আপন প্রভাব বিস্তার করিয়াছে যে সহজে তাহা চোখেই পড়িতে চায় না। তাঁহাদের প্রতিদিনের জীবনযাত্রায়, তাঁহাদের চলনে বলনে, অশনে বসনে, ভাবে ও চিন্তায়, কর্ম্মে ও ব্যবহারে, ঘরে ও বাহিরে সর্ব্বদা ফুটিয়া উঠিয়াছে একটি সুমধুর শ্রী, একটি ললিত সৌকুমার্য্য, একটি সংযত সুসমঞ্জস সুতীক্ষ্ণ সৌন্দর্য্য-প্রেরণা, এই পৃথিবীর দিকে তাকাইবার এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গি। একথা আমি যুক্তি তর্কের সাহায্যে প্রমাণ করিতে পারি না, কিন্তু ইহার অনুভূতি আমার কাছে সূর্য্যালোকের মতন সুস্পষ্ট।

কবিগুরুর সঙ্গে ব্যক্তিগত কথা আমি আর কি বলিব? আমা অপেক্ষা নিবিড়তর সম্বন্ধ যাঁহাদের আছে, তাঁহারাই সে কথা ভাল করিয়া বলিতে পারিবেন। আমি বরাবর দূর হইতেই সেই প্রদীপ্ত প্রতিভার দিকে বিমুগ্ধ বিস্ময়ে তাকাইয়া থাকি, দূর হইতেই বারবার তাঁহাকে প্রণাম করি। তাঁহার কাব্য ও বিচিত্র সাহিত্য-সৃষ্টির ভিতর দিয়া তাঁহাকে আমার মন ও হৃদয়ের মধ্যে যেমন নিবিড় করিয়া যেমন বিচিত্ররূপে পাইয়াছি, সেই পাওয়াই আমার একান্ত হইয়া থাকুক। সেই অপূর্ব্ব সম্পদের যে ঐশ্বর্য্য আমার চিত্তের মধ্যে সঞ্চিত হইয়া আছে, তাহা অপেক্ষা বিপুল ঐশ্বর্য্য আমি আর কিছু কামনা করি না। ব্যক্তিগত পরিচয়ের সৌভাগ্যও একটু একটু আমার হইয়াছে, এবং তাঁহার স্নেহদৃষ্টিপাতে আমার জীবন ধন্য ও কৃতার্থ হইয়া গিয়াছে, একথাও আমি স্বীকার না করিয়া পারি না। একদিন তিনি নিজেই আমার ঠিকানা সংগ্রহ করিয়া সস্নেহে তাঁহার কাছে আহ্বান করিয়া আমাকে যে গৌরবদান করিয়াছিলেন, তাহা আমি চিরকালের জন্য মাথার মুকুট করিয়া রাখিয়াছি। প্রাচীর প্রদীপ্ত সূর্য্যকে সেই আমি প্রথম দেখিলাম, এবং পরিচয় লাভ করিয়া ধন্য হইলাম। কি সংকোচ-মিশ্রিত ভয়ে, শ্রদ্ধায় ও সম্ভ্রমে সেদিন তাঁহার কাছে গিয়াছিলাম, মনে হইলে এখনও পুলকের সঞ্চার হয়। তারপর সময়ে অসময়ে, কতদিন কতবার তাঁহার কাছে গিয়াছি, আব্দার করিয়াছি, অর্থহীন কত কথা বলিয়াছি; অপার স্নেহ ও ধৈর্য্যের সহিত সকল কথা তিনি শুনিয়াছেন, আব্দার অভিযোগ রক্ষা করিয়াছেন, কখনও এতটুকু বিরক্তি বোধ করেন নাই। এক একদিন এমন হইয়াছে, একটি প্রশ্ন তুলিয়া দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিয়াছি, তিনি ধীরে ধীরে অনেকক্ষণ ধরিয়া সেই প্রশ্নের উত্তর

দিয়াছেন, বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে তখন তাঁহার চিন্তা ও ভাবের ধারা ধীর প্রবাহে বহিয়া গিয়াছে—নিজের বিচিত্র সৃষ্টি সম্বন্ধে, সাধারণ ভাবে শিল্প ও সাহিত্য সম্বন্ধে। সে সব কথা ও স্মৃতি মনের মধ্যে চিরকালের জন্য সঞ্চিত হইয়া আছে। নিজের স্বল্পজ্ঞান ও চিন্তার ভাণ্ডারে ব্যক্তিগতভাবে যে ঋণ তাঁহার নিকট হইতে লইয়াছি, আমার জীবনে তাহার তুলনা নাই। ব্যক্তিগত সম্বন্ধের অনেক ছোট বড় কথা ও ঘটনার স্মৃতি চিত্তপটে আঁকা হইয়া আছে; সকল কথা সকলের কাছে বলিবার নয়, শুধু নিজে নীরবে ভোগ করিবার। সেই সকল সস্নেহ শুভ কামনা, সকল কথা ও স্মৃতি, সকল ঋণ, তাঁহার নিকট হইতে বিচিত্রভাবে যাহা লইয়াছি, যাহা দ্বারা ধন্য, কৃতার্থ ও উপকৃত হইয়াছি, সকল কিছু স্বীকার করিয়া নতমস্তকে ভক্তিবিনম্র হৃদয়ে আজ তাঁহার 'জয়ন্তী' উপলক্ষে আমার পরিপূর্ণ শ্রদ্ধানিবেদন করিয়া ধন্য মানিলাম।

শ্রীনীহাররঞ্জন রায়

রবীন্দ্রনাথ

তোমার কবিতাগুলি পড়ে আছে শয্যার দুপাশে
পড়িতেছি না'ক।
ভাবিতেছি স্নিগ্ধ মনে এগুলিরে কোন্ বর্ণ দিয়ে
কেন তুমি আঁক!

তোমার পৃথিবী বন্ধু,—রাত্রি তার ভয় নাহি জানে
রৌদ্রে নাহি তাপ।
ঝটিকায় পেলে শুধু শক্তির মহিমা; বজ্রে তব
নাই অভিশাপ!

সাজ করি ফিরে আসি দিবসের নির্লজ্জ সংগ্রাম,
পড়ি তব লেখা;
সুমধুর স্বপ্নগুলি শুভ্র পক্ষে নামে চারিধারে
মোছে অশ্রুরেখা।

তোমার কবিতা বন্ধু, জীবনের আতপ্ত ললাটে
বুলায় অঙ্গুলি।
আকাশ যে নীল বন্ধু, ধরণীর মন্থনের বিষে
সে কথাও ভুলি।

পৃথিবীর যত অশ্রু,—তুমি তার লয়েছ যে স্বাদ,
জান গ্লানি তার।
বিধাতার কার্পণ্যের, তাই বুঝি দিতে চাহে শোধ
মমতা তোমার।

মোহের অঞ্জন তাই পরাইতে চাও, হে ব্যাকুল
অমৃত সন্ধানী—!
নমস্কার কে করিবে; হৃদয়ের এত কাছে আছ,
লও হাত খানি।

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

সুর-পুরুষ রবীন্দ্রনাথ

(রবীন্দ্র-জয়ন্তী অধিবেশনে আগড়তলা কিশোর সাহিত্য-সমাজে পঠিত)

কবির সপ্ততিতম বর্ষে তাঁর অম্লান জীবন দীপটি যেমনি জ্বলচে, অনাগত সুদূর ভবিষ্যৎ ভরিয়া ও আলোর শিখা ছড়াইয়া ইহা তেম্‌নি জ্বলুক—এই কামনা বিধাতৃচরণে নিবেদন মানসে আমরা আজ সমাগত হয়েচি। তাঁর সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া তাঁরি প্রার্থনামন্ত্র পাঠ করচি—

"আমার এই দেহখানি তুলে ধরো
তোমার ওই দেবালয়ে প্রদীপ করো
নিশিদিন আলোক-শিখা জ্বলুক গানে।"

'আগুনের পরশমণি' তাঁর প্রাণে ছুঁয়াইয়া বাণীমন্দিরে তিনি যেমন এতদিন দীপ-শিখা হ'য়ে জ্বলেচেন তেম্‌নি নিশিদিন আলোকের গান গেয়ে তিনি অনাগত দীর্ঘ ভবিষ্যৎ আলোকিত করুন এই বাঞ্ছা আমাদের সকলের অন্তর হ'তে ফুটে উঠুক!

রবীন্দ্রনাথ সার্থকনামা কবি। যে নাম তাঁর রূপকে সত্তর বৎসর ধরে' ছেয়ে আছে যে-নাম তাঁর অন্তর-পুরুষকে বিশ্ব-সংসারে প্রতিষ্ঠা দিয়েচে সে নামের মূর্ত্তরূপ হ'য়ে যেন তিনি জন্মেচেন। রবি শব্দের অর্থে আলোর উল্লেখ নাই, আছে রবের সম্বন্ধ। রবির যে রবের সহিত অন্বয় এ ত আমাদের নিকট স্পষ্ট নয়। আমরা জানি রবি অর্থে জবাকুসুমসঙ্কাশ সাতরঙের অখণ্ড মণ্ডল। আসল কথা এই, ধরণীর সকলরঙের তুলি যেমন তাঁর হাতে, সকল সুরের তারও তাঁরি হাতে। তাঁর রঙের ভাঁজে ভাঁজে সুরের ভাঁজ আছে—সাত রঙের মধ্যে সাত সুর মিশান। তিনি একদিকে আলো ছড়াচ্চেন আবার আলোর অন্তরে সুর-ঝঙ্কার তুলচেন। তাঁর গান আমাদের কাণে পৌঁছায় না পাখীরা হয়ত শুনতে পায়। পলে পলে সে সুরের রূপ নূতন হয় তাই দিনের এক এক লগ্নে এক এক সুরের বিধি! গ্রীক সূর্য্য-দেবতা এপলোর বীণা স্মরণ করলে রবি অর্থের দ্যোতনা অনেকটা স্পষ্ট হ'বে মনে হয়।

রবীন্দ্রনাথে রবির সে সুপ্ত সুর জাগ্রত হ'য়ে তাঁকে সাহিত্যে এমন এক রূপ দিয়েচে যার তুলনা নাই। কবিদের সম্পদ 'বাগর্থ', কালিদাসের যেমন গেটে-দান্তে-শেক্‌সপিয়ারেরও তেমন। কিন্তু সুরের অনুপ্রাণনায় রবীন্দ্রনাথের যেমন প্রতি অক্ষর মন্ত্রিত এমন কোন কবির রচনা আছে কি না জানিনা। কবির 'বাগর্থের' মূল ছন্দ, রবীন্দ্রনাথের 'বাগর্থের' মূল সুর। রবীন্দ্রনাথকে সুরের ভিতর দিয়া যে চিনিতে পারে নাই—তাহার নিকট রবি একেবারে অব্যক্ত! রবির সহিত গানের মধ্যে যাহার পরিচয় নাই, তাহার পক্ষে রবীন্দ্রনাকে চিনিয়া উঠা অত্যন্ত দুরূহ। রবীন্দ্রনাথ কোন এক খানে লিখেচেন যে তাঁর "গানগুলি যেন নিভান প্রদীপ"। কথাটি তাঁরি উপযুক্ত। বাতি যখন জ্বলেনা, নিভান অবস্থায় ঘরের কোণে খুঁটিনাটি জিনিসের মধ্যে গণ্য হ'য়ে একেবারে নগণ্য হ'য়ে উঠে তখন তার যে অবস্থা, কবির গান সম্বন্ধেও কবি সেই ব্যবস্থাই করচেন যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তাতে সুরের আলো জ্বলেচে! কিন্তু বাতিতে যখন আলো ফুটল আর গৃহের সকল আঁধার দূর করে' গৃহস্বামীকে তার আপন অধিকার বুঝাবার একটি অত্যাজ্য অবলম্বন হ'য়ে উঠ্‌ল—তখন বাতি আর খুঁটিনাটির মধ্যে নয়—তার আসন তখন গৃহস্থের মনে। গৃহস্থের পঠনে দর্শনে আলাপনে বাতি যেন তার অন্তরের সঙ্গে মিশে যায়, যাকে ছেড়ে তার চল্‌বার জো নেই। কবির গান সম্বন্ধে সেই একই কথা। যাঁরা গানের উপর সুরের আলো জ্বলা দেখেন নাই, শুধু বাতির গোছার ন্যায় গানটিকে ছাপার হরপে দেখেচেন তাঁদের অন্তরের সঙ্গে

রবীন্দ্রনাথের মিশ্‌বার কোনো পথ নেই—তিনি তাঁদের ঘরের আসবাব পত্রের সঙ্গেই তাঁর কাব্যগ্রন্থের পত্রে পত্রে রুদ্ধ হ'য়ে বাইরে আটকা পড়ে' থাকেন।

রবীন্দ্রনাথের সুর যে শুধুই তাঁর গানের মধ্যে তা নয়, তাঁর কবিতার ছন্দেও সেই উৎস নিবিড়ে উপচে উঠ্‌চে—এমন কি তাঁর গল্পরচনায়ও সঙ্গীতের সুর বিরাম পায় নি, ভিতরে ভিতরে আত্মপ্রকাশ করে' আস্‌চে। এই যে সঙ্গীত তার এত বড় নিজস্ব, এবং যা তাঁর প্রাণের আসল রূপ, তার ছাপ না লেগেচে এমন রচনা তাঁর নেই। সঙ্গীতাত্মিকা তাঁর তপস্যা সাহিত্যে যে ভাবের অঞ্জলি অর্দ্ধশতাব্দীর অধিককাল বহন করে' আস্‌চে, তাঁর আসলরূপ কবির জীবন-প্রভাতে ধরা পড়ে নি। সেই কথাটারই একটু অল্প আলোচনা করব। অনেকেই জানেন রবীন্দ্রনাথের নামে আপত্তি, একটা ঐতিহাসিক সত্য হ'য়ে বাঙলার মাসিকের পৃষ্ঠা অনেক ক্ষতবিক্ষত করেচে। আজ যদিও তার প্রতিবাদ বড় একটা শুনা যায় না তবু যে সে জিনিষটার পরিসমাপ্তি ঘটেচে এমন নয়। এবং বোধ করি কোন কালে হবেও না—তার কারণ এই যা বলা হ'ল, যতদিন পর্য্যন্ত তাঁর প্রাণের আসল রূপটির সহিত পরিচয় না ঘটবে ততদিন তিনি হৃদয়ের অন্তঃপুরে প্রবেশ-পথ পাবেন না। আমাদের একাডেমী হলে তিনিই কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বলেছিলেন যে, যখন তাঁর নাম কেউ লয় না, কেউ তাঁকে জানে নি, জীবনের সেই প্রথম বেলায় তিনি মহারাজ বীরচন্দ্রের "স্বস্তি বচন" ও 'মা ভৈ' রব শুনেছিলেন। বীরচন্দ্র তাঁকে চিনেছিলেন। কেন? যেহেতু তিনি ছিলেন সঙ্গীত-পারঙ্গম। গানের চক্ষু তাঁর ছিল, তাই তিনি রবির আসল রূপটিকে দেখতে পেয়েছিলেন।

যে চক্ষু বীরচন্দ্রের ছিল, সে চক্ষু কলিকাতার সাহিত্য-কাননের কলহংসের ছিল না। সেখানে তখন মাইকেল-বঙ্কিম-হেম-নবীনের যুগ, তাঁদের মধ্যে কেউ সুরালাপী ছিলেন না। এঁদের অঞ্জলিতে মার শূন্য কোল ভরে উঠল, তাঁদের দেখাদেখি এক কচি কবিও মার পূজার অঞ্জলি দিতে হাত বাড়ালেন। আর অমনি সমালোচনার বজ্রবাণ তাঁর হাতে এসে পড়্‌ল, পুণ্যফল না থাকলে কবির যে কবেই তিরোধান ঘটত তাতে আর সন্দেহ কি! সমালোচক কাব্যবিশারদ মহাশয় তাঁহার নামকরণ করেছিলেন রবি-রাহু। রাহুতে রবি গ্রস্ত হয় বটে কিন্তু সে চিরন্তন নয়, রবীন্দ্রনাথের তাই ঘটল।

রবীন্দ্রনাথের রচনার মূলে আপত্তি ক্রমে কঠিনরূপে এসে দাঁড়াতে লাগল—বাঙলার মহাভাগ্য যে, সে আপত্তির ঠেলায় তার লেখনী থেমে যায় নি। তাঁর প্রতিপক্ষ-মেঘের ঘনঘটায় আকাশ ছেয়ে গেল, রবির আলো কিন্তু চাপা পড়ল না। যাঁরা এই মেঘের আসর সাজিয়েছিলেন তাঁদের সহিত তাঁর বিরোধ ছিল ঘোরতর। সমালোচকের তৌলে তাঁর রচনার ওজন পাওয়া যায় নি, কাজেই এর মূল্য দেওয়ার পক্ষে বাধা ঘটল অনেক। তখনকার দিনে সাহিত্যের মাপকাঠি ছিল ইংরেজের হাতে গড়া—সে মাপকাঠিতে যদি আশানুরূপ ফল না হ'ত তবে রচনার ব্যর্থতা প্রমাণিত হ'ত। মিল্টনকে যে গজের হাতে মাপা হয়েছিল, সেটা 'মেঘনাদ বধে' লাগিয়ে দেখা গেল—এটা তাঁর পাশাপাশি ব'স্‌তে পারে:—এম্‌নি করে বঙ্কিম হলেন স্কট, নবীন সেন হ'লেন বায়রণ ইত্যাদি। কিন্তু সে সোজা উপায়ে, যখন রবীন্দ্রনাথের লেখার কোন একটা সুর খুঁজে পাওয়া গেল না—তখন তাঁর দুর্গতি নিশ্চয়। তাঁকে ত্রিশঙ্কুর অবস্থায় ফেলে দেওয়া হ'ল। সাহিত্য মণ্ডপে তিনি একরূপ অস্বীকৃত হ'লেন। তাঁর রচনা বের হ'বার সঙ্গেই মাসিক সাহিত্যের সমালোচনার খাতায় কিরূপে তাঁকে জর্জ্জরিত হ'তে হত, সাহিত্য-রসিক বাঙালী মাত্রেই তা জানেন। মেঘমেদুর দিনে সূর্য্যের শক্তি জনমনকে সতেজ সপ্রভ করে না, রাহুগ্রস্ত রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সেই একই কথা। তাঁর অপরিমিত যে শক্তির কিরণে আজ বাঙ্গলার হৃৎকমল দল ছড়িয়ে ফুটে উঠেচে, তখন সমগ্র বাঙ্গলায় সে সাড়া জাগে নি। সমালোচক যে জনমত বাটাল দিয়ে মানুষের হৃদয়ে খুদে দিয়েছিলেন—তা ঘসে' তুলে ফেলে এমনটির প্রত্যাশা অনেকের পক্ষেই খাটিত না। সমালোচকের হাতে কবির যে ছবি ফুটল—সে একটি খণ্ড সূর্য্য, পূর্ণ নয়। কারণ মেঘনাদবধ ও বৃত্রসংহারের ন্যায় পূর্ণ কাব্য তাঁর হাতে



বিচিত্রা

আশ্বিন, ১৩৩৮

অন্ধ বাউল

শিল্পী—শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার

বেরোয় নাই—যা বেরিয়েছে সে খণ্ড কবিতা। রবীন্দ্রনাথের সে খণ্ড ছবি ঘরে ঘরে ঠাঁই পেল, বাঙালী বুঝলে এ কবির দৌড় কতদূর!

যদি রবীন্দ্রনাথের ভাগ্যে দীর্ঘায়ু-যোগ না থাকত, পঞ্চাশের আঙ্গিনায় তাঁর জীবন-দীপ নির্ব্বাণ হ'ত তবে রবির যে রূপ আজ বিশ্বজগৎকে আলোকিত করে রেখেছে—সে রূপ একেবারে চাপা পড়ে যেত, জগৎ সংসার তার কোন খোঁজ পেত না। যখন অনুকূল বয়স ছিল, স্বদেশে মহানগরী ছেড়ে, তাঁকে আশ্রমের কোলে থাকতে হয়েছে, কর্ম্মক্ষেত্র ফেলে বানপ্রস্থের গণ্ডীতে আপনার গাণ্ডীবকে বিশ্রাম দিয়েছেন; 'পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ' এর পালা সুরু হ'বার লগ্নে তাঁর মন, বন ছেড়ে জন-সমুদ্রের মধ্যে দাঁড়াবার ইচ্ছা করলে, পশ্চিম জগৎ যেন অপরাহ্নের এই রবিকে ডাক দিলে। তাই সহসা পঞ্চাশ পেরিয়ে প্রৌঢ় রবি, তাঁর গীতাঞ্জলি নিয়ে য়ুরোপের প্রাঙ্গণে এসে হাজির। পশ্চিম জগৎ 'নোবেল-তিলক' পরিয়ে রবির প্রশস্তি গাইলে, সেই থেকে রবীন্দ্রনাথের জীবনে এক নূতন অধ্যায় এল। বানপ্রস্থের বয়সে কুরুক্ষেত্র দেখা দিল। তাঁর কর্ম্মক্ষেত্র যেমনি দেশের সীমানা না মেনে সকল জাতির উপর দিয়ে এঁকে বেঁকে চলে যেতে লাগল, স্বদেশে বিরোধের গণ্ডীটি তেমনি সঙ্কীর্ণ হ'তে হ'তে একেবারে অস্তিত্ব হারিয়ে ফেললে। যাঁরা তাঁর প্রতিপক্ষ ছিলেন তাঁদের আয়ুরথ পঞ্চাশের বেশী বাইরে না যেতেই যেতেই থেমে গেল, সুতরাং তিনি যখন অলন্ত তপনের ন্যায় এসে দেশে দাঁড়ালেন—দেশের মাথা তাঁর কাছে নুয়ে পড়্‌ল। সংস্কৃতে একটা কথা আছে—"মাঘে মেঘে গতং বয়ঃ।" যখন বয়সের স্রোতে ভাটা এল তখন হ'লেন মাঘ কবি, আর যখন কালিদাস মেঘদূতের পাতায় পাতায় বিরহের তপ্তশ্বাস ফুটিয়েছিলেন তখন তিনি ছিলেন প্রবীণ। প্রৌঢ়ে কর্ম্মক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ ইহারই পুনরাভিনয় করলেন! য়ুরোপে যে অঞ্জলি দিয়ে তাঁর আসন প্রতিষ্ঠা হ'ল, সে অঞ্জলি গানের। কাজেই যা তাঁর স্বাভাবিক, তাই তিনি পশ্চিম জগতের সুমুখে ধরলেন। য়ুরোপ গানের দীপ জ্বেলে তাঁর মুখখানি দেখতে পায় নি সত্য তবে শব্দের ভিতরে লুকান সুরের গন্ধ হয় ত কিছুটা পেয়ে থাক্‌বে—তাই নিয়েই য়ুরোপ প্রমত্ত হ'য়ে উঠ্‌ল। পশ্চিম জগৎ রবির ভিতরে কবিকে দেখেছে, সম্প্রতি তাঁর ছবিকেও জেনেছে কিন্তু রবির যে গানের রূপ তা সে দেখতে পায় নি।

চিকাগো বক্তৃতার ফলে বিবেকানন্দের আসন যেমন স্বদেশে পাকা হ'য়ে গেল—নোবেল-সম্মানের সঙ্গেই দেশের সকল বাতায়নে বাতায়নে তেম্নি তাঁর জন্যে আলপনা আঁকা হ'য়ে গেল। তাঁকে ঠেকাবার চেষ্টা সেই থেকে লোপ পেল। রবীন্দ্রনাথ আজ সমগ্র জগতের শিক্ষার মানদণ্ড-স্বরূপ—পৃথিবীতে সূর্য্যালোক না এলে যেমন সকলি অসার অন্ধকার, বাঙ্গলার এই পুরুষ-সূর্য্যের কিরণে বিশ্ব-সাহিত্য তেমনি উদ্ভাসিত। তাঁর দেব-দুর্লভ মুখাবয়ব যেমন বিধাতার সুচারু পরিকল্পনার পরিচায়ক, তাঁর অতুলনা ধীশক্তিও তেমনি সর্ব্বজ্ঞের একটি সোপান বিশেষ। আকাশের ভাস্করের ন্যায় তিনি নিত্য সুন্দর, অন্তরের প্রতিভায়ও তিনি নিত্য অমৃত। বার্দ্ধক্যের লক্ষণ কাল তাঁর চুলে বুলিয়ে দিলেও তুষার শুভ্র শিরে চিরোজ্জ্বল হিমালয়ের ন্যায় তিনি অজর, দেখিতে এত সুন্দর যেন বয়সের ধারাপাতে তিনি ধরা পড়েন নি, আবার রচনার কমনীয়তায়ও তিনি চির নব-কিশোর, তাঁর লেখায় অদ্যাপি বয়সের দাগ বসে নি। সুতরাং অমন রূপ নিয়ে তিনি যখন পৃথিবীর সুমুখে এসে দাঁড়ান তাঁর শ্রীর পাশে সকল শ্রী মলিন হ'য়ে যায়, তাঁর স্বরের কাছে সকল স্বর হেরে যায়, তাঁর লেখার নিকট সকল লেখনী নুয়ে পড়ে। অধুনা জগতের মধ্যে তিনিই একমাত্র পুরুষ, যিনি মানুষের নামে কথা বল্‌বার অধিকারী। রাজনীতি ও জাতীয়তার পোষাক খুলে ফেল্‌লে পৃথিবীতে এমন একটি লোকও থাকবে কিনা সন্দেহ যিনি স্বতন্ত্ররূপে টিকে থাক্‌তে পারেন। যাঁর যত নাম তাঁর গায়ে তত অধিক মূল্যের পোষাক পরা। কাজেই রবীন্দ্রনাথের সাম্‌নে এসে সমান হ'তে পারে এমন জন তাঁর বাইরে নেই।

মানুষের তিনি প্রতিনিধি, মানুষের কথা কওয়ার তিনি অধিকার পেয়েছেন। এই সূত্রেই দুর্দ্দণ্ড-প্রতাপ মুসোলিনীর রাষ্ট্রে তাঁর আমন্ত্রণ ঘটেছিল। পদানত ভারতের একজনকে ইটালীর ন্যায় ইতিহাস-বিখ্যাত দেশের আতিথ্যে বরণ করার

সম্মান কোন ভারতীয়ের কথনো ঘটে নাই, কোন য়ুরোপীয়েরও কথনো ঘটে কিনা সন্দেহ। যদিও রবীন্দ্রনাথ মুসোলিনীর আনুকূল্য করার সুযোগ না দেখে সে বন্ধুত্বের প্রত্যাহার করেছিলেন এবং ইটালীও খুব ক্ষেপে উঠেছিল কিন্তু প্রদত্ত সম্মানের অস্বীকার চলে না। এ ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব কত বড, যাঁকে বন্ধুরূপে পেলে রাজনীতির শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য তাঁর প্রাপ্য হ'তে সে তিনি হেলায় ত্যাগ করলেন। সেই থেকে যুরোপের রাষ্ট্রমণ্ডল তাঁর সম্বন্ধে বোধ করি সারতিত সচকিত হয়েছে। সেদিনও তিনি সোভিয়েট রাশিয়ার আতিথ্য উপভোগ ক'রে' এসেছেন। যে রাশিয়ার প্রবল রোষানলে জার পরিবার ভস্মীভূত, যাদের বিপক্ষতায় য়ুরোপ ব্যতিব্যস্ত, যাদের বিরুদ্ধে হিসেব ক'রে' কথা বল্‌তে হয়,—সেই সোভিয়েট শক্তির মুখের উপর রবীন্দ্রনাথ যে কড়া কথা বল্‌লেন—এমনটি বলা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। অথচ তার জন্য কড়া শাসন তিনি পান নি—পেয়েছেন ফুল বিছান পথ। য়ুরোপের প্রাঙ্গনে দাঁড়িয়ে আর দেশী ভাষায় কথা কওয়া যায় না—ইংরেজী ভাষায় আত্মপ্রকাশ করতে হয়। রবীন্দ্রনাথের ইংরেজী বাঁধা গৎএর উপর চলে না—যার চলার ছন্দ অভিনব এবং যার কাছে বিলাতের উচ্চ-সম্প্রদায়ের ভাষার গতি যেন স্বাভাবিক অক্ষমতায় সীমাবদ্ধ।

রবীন্দ্রনাথের বিদেশ যাত্রার প্রতিকূলে কথনো কথনো শুনা যায় যে তিনি দেশের উপর অভিমান করে সম্মান নিতে ও-দেশে যান। এ বয়সে তাঁর বাইরে ঘুরা ফিরা সমীচীন নয় ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু আমাদের দেশের লোক এ কথাটা হয়ত খুব কমই চিন্তা করে যে তিনি যখন গর্বান্ধ য়ুরোপ আমেরিকায় পদার্পণ করে তাঁদের অর্ঘ্য গ্রহণ করেন, সে মধুপর্ক ভারতের পায়ে এসে পড়ে। যে ভারত তাঁদের নিকট অস্বীকৃত হ'য়ে অপাংক্তেয় হ'যে আছে, সে দীন ভারতকে স্বীকার করিয়েছিলেন বিবেকানন্দ আর আজ করাচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর পদক্ষেপে য়ুরোপ যখন সচকিত হ'য়ে উঠে তখন ভারতের জীবন্ত স্মৃতি তাঁদের অভিজাত্যকে ঠেলা দিয়ে যেন নীচুতে ফেলে দেয়! আকাশের সূর্য্যকে দেখলে যেমন সকল আলোক আত্ম বিস্মৃত হ'য়ে পড়ে, রবীন্দ্রনাথকে প্রত্যক্ষ করার সঙ্গে সঙ্গে আত্ম-দৈন্যতায় আত্মম্ভরি জাতিসমূহ কুণ্ঠিত হয়ে যায়। এ যদি দেশ-সেবা না হয় তবে একে শুধুই দ্বেষ করা হবে।

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের জীবন, কালিদাসের উজ্জয়িনী সমান না হ'লেও এর একটা মাধুর্য্য আছে। এ বিষয়ে কবি খুব ভাগ্যবান সন্দেহ নাই। যাঁরা তাঁর জীবন-



রঘুপতির ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ

ধারাকে সেখানে দেখার সুযোগ পান নাই—তাঁরা তাঁর জীবনের আনন্দকে দেখ্‌তে পারার কটক পার হন নি। সত্য ব'টে কালিদাসের শ্রোতা বিক্রমাদিত্যের ন্যায় তাঁর কোন রাজচক্রবর্ত্তী বন্ধু বসে বসে' কাব্যগ্রন্থের পাঠ শুনেন

নি, এবং প্রীতির চিহ্নস্বরূপ আপন কণ্ঠহার গলায় পরিয়ে দেন নি—তা সত্ত্বেও তাঁর শান্তিনিকেতনে জীবন যাপনের একটা অতুলনীয় সার্থকতা আছে, কারণ অনন্তুমেয় আনন্দের প্রস্রবণ সেখানে তাঁকে ঘিরে রেখেচে। কবির কল্পনায় এমন এক রাজ্য গড়া খুবই সম্ভব যেখানে কবি হবেন রাজা, আর তাঁর ভক্তেরা হবে সব প্রজা; যেখানে আইন-আদালত উকিল-মোক্তার জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট পুলিস সেপাই হাকিম-আমলা কিচ্ছু থাক্‌বে না—থাক্‌বে শুধু অধ্যাপক-পল্লী ও ছাত্রের আশ্রম, যেখানে প্রাতঃসন্ধ্যায় কবির গান ন্যাশনেল এন্থেমের ন্যায় গীত হ'বে এবং যেখানে কবির লেখা হ'বে ছাত্রদের পাঠ্য। সেখানে সকল পৃথিবী সুপ্ত হ'য়ে থাক্‌বে, কেননা সেখানকার জাগ্রত সত্য ঐ কবি; তাঁর নূতন লেখার প্রথম পাঠ ফুলের আঘ্রাণের ন্যায় সেখানে ছড়িয়ে, পরে জগতের হাটে আস্‌বে। স্বপ্নের ন্যায় লঘুচরণে দিনগুলি আস্‌বে এবং কবির গানে ঝঙ্কৃত হ'য়ে তার সমাপ্তি ঘট্‌বে, আর কবি প্রধান নট সেজে তাঁর নিত্যনূতন ভাবের সমষ্টিকে নাট্য-শালায় অভিনয় করে জগতের কাছে তার খসড়া পাঠিয়ে দেবেন। এমন যে কবি-সুলভ নিছক কল্পনা তাকে রবীন্দ্রনাথ বাস্তবে পরিণত করেছেন তাঁর অতি প্রিয় শান্তিনিকেতনে। সেখানকার তিনি মহারাজা—বিস্তৃত ভূভাগের নয় অফুরন্ত জ্ঞানরাজ্যের। রবীন্দ্রনাথ যেরূপ স্বরচিত পুরে বাস করে কাব্য রচনা করেন এমন কোন কালের কবি কখনো করেচেন কি না জানি না, অবশ্য তাঁদের নায়কদের জন্যে কল্পপুরী গড়েচেন অনেক। আর তাঁর অতিথিরূপে বিশ্বের বরেণ্য বৈদেশিক বিবুধ বৃন্দের সমাগমে যে দীপালী জ্বলে উঠে তেমন আলো একটা বড় মহানগরীতেও মিলান হয়ত দুষ্কর।

কবি যে আজ ছবি নিয়ে মেতে উঠেচেন এবং য়ুরোপকে তাঁর নবজাত শক্তির নিদর্শন দেখিয়ে বিস্মিত করেচেন এ খবর আধুনিক সংবাদপত্র বিশ্বময় বহন করেছে। আমরা সেই কবির জীবন-পথের একটা রেখাচিত্র এঁকে দিলাম। তাঁর কাব্য ও গানের, গল্প ও নাট্যের অন্তর্লোকে যে সুর-পুরুষ বিদ্যমান তাঁকে প্রারম্ভেই দেখে এসেচি। সে পুরুষের অভিনয় আজ সত্তর বৎসর উত্তীর্ণ হ'ল—নাট্যের অঙ্ক ও দৃশ্য ল'য়ে বিচার এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়, তাই আমরা অভিনায়ককে নিয়ে আমাদের কথা শেষ করতে চাই। সেদিন মাসেককাল পূর্ব্বে (চৈত্র ১৩৩৭) তাঁর জোড়াসাঁকোর বিচিত্রাভবনে এক সভা বসেছিল—তাতে বক্তব্যের বিষয় ছিল 'মর ও অমর লেখন'। সভার এক কোণে বসে' বসে' তার অপূর্ব্ব ভাষণ শুনছিলাম। য়ুরোপের সাহিত্য বাতায়নে তিনি যে জয় পরাজয়ের ছবি দেখে এসেচেন তার কথা বল্‌ছিলেন। কিছুদিন আগে যাঁদের কবিতা আস্বাদনের জন্য পাঠকের ত্বক্ শুকিয়ে থাক্‌ত, তাঁদের নাম করায় এখন আপত্তি উঠে, যেমন টেনিসন ও রাডিয়ার্ড কিপ্‌লিঙ। যাঁদের লেখা রূপে রসে যৌবন-সুষমায় ঢল ঢল কর্‌ত, কবি বল্‌লেন, তাঁদের রচনা জরার ছাপে মলিন হয়ে গেছে দেখে এসেছেন। কালের হাত লাগলেই সব মরচে ধরে যায়, উই যেমন বই কেটে ছারখার করে, কালের প্রবাহও তেমনি যে-লেখায় অমৃতের ভাগ নেই তাকে ভস্মীভূত করে ফেলে। কিন্তু যে-লেখার মধ্যে অমৃতের সঞ্জীবনী মন্ত্র রয়েচে, কালের করাল দংষ্ট্রা সেখানে ব্যাহত হয়। কালের আঁচড় তাতে লাগে না, কত যুগযুগান্তর চলে গেছে, ভারতের সিংহাসনে কত অদল বদল চলেচে কবি কালিদাসের আসন টলে নি। শতাব্দী শতাব্দী ইতিহাসের ব্যবধানে কত রুচি-বিপর্য্যয় ঘটেচে কিন্তু কবির কাব্য-পাত্য পদ্মপাতার ন্যায় আজও যেন সদ্যঃবিকশিত ঠেকচে। সেক্স্‌পিয়রের যে-ভাষা কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই মরা নদীর ন্যায় স্থানে স্থানে মরে গেচে কালিদাসের ভাষায় সে চড়া পড়ে নাই, তাঁহার ভাষা সুরধুনীর ন্যায় আজও 'ক্বচিৎ ছিন্না কচিৎ ভিন্না' নহে। ভাষার দিক দিয়ে রবীন্দ্র-নাথের মহাকবির সহিত মিল আছে মনে হয়। তাঁর ভাষায় কালের পরশ লাগ্‌বে না এটা বোধ করি সত্য। তবে রবীন্দ্রনাথের একটা মস্ত অসুবিধা আছে যেটা মহাকবির ছিল না—সে হ'চ্চে এমন পরাধীনতার যুগে জন্মান, যখন সংস্কৃত ভাষা একেবারে মিউজিয়মে রাখার গোছ হ'য়ে এসেচে। সংস্কৃত ভারতের একমাত্র ভাষা যার গর্ভে সকল মন্ত্রতন্ত্র দর্শন সাহিত্য ঢুকে আছে এবং যা আসমুদ্রহিমাচল, অধুনাতন ইংরেজীর ন্যায়, সকল জাতির গলায় সাধা ছিল। সুতরাং মহাকবি সংস্কৃত ভাষার প্রসাদে উজ্জয়িনীতে বসে বসে নিখিল ভারতের জনগণমন বিজয় করেছিলেন অনায়াসে,

এবং সে জয়তিলক আজও তাঁর কপালে পরা আছে; আর রবীন্দ্রনাথ তাঁর অমৃতের বীজ বপন করলেন বাংলার কোষে যে বাংলা একটি প্রাদেশিক ভাষা মাত্র যার মত প্রাদেশিক ভাষা দিকে দিকে ঢের রয়েচে। কাজেই রবীন্দ্রনাথের শ্রোতা সংক্ষেপ র'য়ে গেল কালিদাসের চাইতে অনেক, এবং রচনায় সাড়া পাওয়া গেল না পাঞ্জাব, বোম্বাই মাদ্রাজের ততদিন যতদিন না নোবেল-পর্ব্ব সমাপ্ত হ'ল এবং তাঁর ইংরেজী গীতাঞ্জলি এসব দেশে ছড়িয়ে গেল। এত বড় বাধা ঠেলেও যে এতখানি উঠেছেন সে ইংরেজীর দরদে—ইংরেজী সংস্কৃতের স্থান দখল করেচে। কিন্তু স্বরাজ অধ্যায়ের সমাপ্তির মধ্যে ভারতের ভবিষ্যৎ নিহিত রয়েচে, যদি ইংরেজীর বদলে হিন্দির প্রসার হয়, তবে হয়ত রবীন্দ্রনাথকে চেঁচে পুঁছে হিন্দি করে ফেলা হবে। তাতে তাঁর সবখানি মাখন যে উঠ্‌বে সে ভরসা নেই, অনুবাদের জলে অনেক গুলে যাবে। ভারতের ভাগ্য বিপর্য্যয়ে যত আমূল পরিবর্ত্তন ঘটুক না কেন সংস্কৃতের বিলোপ কখনো ঘটবে না—এবং মহাকবির আসনটিও অম্লান অপরাজিত থাকবে।

তাই আমার মনে হয় রবীন্দ্রনাথের রচনা যদি সংস্কৃতে হ'ত তবে কবিতার যে রাজত্ব তিনি গড়েচেন, তাঁকে সেখানে পরাভূত করবার ক্ষমতা কারুর ছিল না স্বয়ং কালিদাসেরও নয়। অথচ কালিদাসের সঙ্গে তাঁর নাম নিতে আমাদের জিভ্ যেন আড়ষ্ট হয়ে যায়। এর কারণ এই যে হিরণ্ময়ী রাজরাজেশ্বরী ভাষা কালিদাসের, আর রবীন্দ্রনাথের হাতে মাটির প্রদীপ। বাঙ্গলা ভাষায় যে ক'খানি কাব্য বা মহাকাব্য আছে তাদের বনীয়াদ ইংরেজী আদর্শে গড়া,—মাইকেলই কাব্য-ভাষার পথ-প্রদর্শক। তিনি মিল্টনকে অমিত্রাক্ষর ছন্দে বেঁধে ফেলেন, সেই থেকে কাব্যের সোপান গড়ে উঠ্‌ল। যত সুন্দরই তাঁর দান হ'ক না কেন এতে যে বিলাতী প্রভাব রয়ে গেল তাকে মুছে ফেলবার সাধ্য নেই। আমাদের অজন্তা চিত্রাবলীতেও গান্ধারশিল্পের ন্যায় গ্রীসীয় ছাপ লেগেচে এইটি প্রমাণ করবার জন্য পাশ্চাত্য শিল্পবিদ্‌গণ খুব সমুৎসুক—আর আমরাও দরাজ গলায় জানিয়ে দি অসম্ভব। মোট কথা আর্য্য-সভ্যতা পরস্ব-অপহারী এ অপবাদ আমরা দূর দূর করে উড়িয়ে দি। সংস্কৃত সাহিত্য আর্য্যসভ্যতার প্রাণ—সেখানে সবই তার নিজস্ব, কেননা দান করবার যার ভাণ্ডার অফুরন্ত, ঋণ করবার তার কি দরকার? সুতরাং মেঘনাদবধ কাব্য যদি সংস্কৃতে রূপান্তরিত হ'ত, সংস্কৃত কবিদের ইংকে পাংক্তেয় করতে বাধা হ'ত অনেক। যদিচ বর্ত্তমানে এই কাব্যটি বাঙ্গালীর প্রাণ ভরে বিরাজ করচে, কিন্তু যখন ইংরেজী কুজ্ঝটিকা দেশ থেকে সরে যাবে তখন এ অমূল্য কাব্যটি কতকটা বিদেশীয় ধাতে আঁকা ছবির ন্যায় হয়ত সে প্রাণ থেকে নেবেও যেতে পারে। এ বিপদের ঝাপটা রবীন্দ্রনাথের গায়ে লাগবে বলে ত মনে করিনে। তাঁর কবিতা যে ছন্দের উপর ভর করে দাঁড়িয়েচে সে ছন্দ তাঁর প্রাণের গভীর উৎস থেকে ভাগীরথীর ন্যায় বেরিয়েচে। যতদিন আর্য্য সভ্যতার নিজস্বরূপ থাক্‌বে ততদিন রবীন্দ্রনাথ নিদাঘম্লান মঞ্জরীর ন্যায় কখনো শুকিয়ে যাবেন না। আজ ভারত জুড়ে স্বরাজ্যকামিদের রব উঠেচে স্বরাজ চাই—স্বাধিকার অর্থে পিতৃপিতামহের সহস্র সহস্র বৎসরের 'স্ব' কে বাঁচিয়ে, তাকে খৃষ্টান করে নয়। রবীন্দ্রনাথ সেই কতদূর ফুটিয়েচেন নূতন যুগের অনাগত বংশধরেরা তার পরিচয় পাবে।

সাগরের ঢেউ যেমন উঠ্‌চে পড়্‌চে কিন্তু থেমে যাচ্ছেনা, রবীন্দ্রনাথের অন্তরে তেম্নি এক ভাব-সমুদ্র নিয়ত উথ্‌লে উঠ্‌চে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কবির ভাবের উপর ভাটা এসে পড়ে, কবিরা বাধ্য হ'য়ে লেখনী থামিয়ে দেন আর তা সত্ত্বেও যদি লেখার মোহ ত্যাগ করতে না পারেন তবে সে লেখায় প্রাণের পরিচয় থাকে না, থাকে কতখানি কথার ফেনা! রবীন্দ্রনাথের অন্তরে যেন কুবেরের ভাণ্ডার, মণিমাণিক্যের কত বৃষ্টি হ'ল কিন্তু তার অভাব ভাণ্ডারকে ক্ষীণ করতে পারলে না। ভাবের ভাণ্ডার দিয়ে কবি মালাকরের ন্যায় একশত মাত্র শ্লোকে উড়ন্ত মেঘকে কদম ফুলের ন্যায় গেঁথে ফেলেচেন, রবীন্দ্রনাথ সহস্র কবিতায় তাঁর বর্ষা-প্রশস্তি গেয়েছেন, সহস্রকে মিশ্র করে, একটা গল্পের সূতায় গাঁথ্‌তে পারেন নি। কালিদাস যক্ষের বিরহী-হৃদয়কে দিয়ে যেমন পাঠকের চিত্তকে বেঁধে গল্পের ছলে তাঁর ভিন্ন ভিন্ন কবিতা শুনাচ্ছেন রবীন্দ্রনাথের বর্ষাসহস্রীতে

সে গন্ধভাগ নেই। তাই তাঁর লেখা ফুলবন রচেছে কিন্তু ফুলমালা গড়ে পাঠকের হাতে এসে পড়ে নি। এই বিক্ষিপ্ততার জন্তে মেঘদূতের মত যে আর একখানি মুক্তা বাংলার ঝিনুক ফেটে সহস্র বৎসরের ব্যবধানে ফুটে উঠেচে —পাঠক সমাজে তাই নিয়ে সহসা ব্যস্ততা জাগতে পারে নি। বর্ষার ছন্দ ও গন্ধ উভয়ই আছে, কালিদাস বর্ষার ছন্দ ধরতে পেরেচেন, রবীন্দ্রনাথে উভয়ই বিকাশ পেয়েচে। কবিতায় তিনি মেঘের ছন্দ গেঁথেচেন, আর গানে মেঘ-মল্লার ফুটিয়েচেন। কাযেই বর্ষার যে অখণ্ড রূপ তিনি দিয়েচেন কালিদাসে সে মিলন নেই। যাঁরা রবীন্দ্রনাথের বর্ষা সুর শুনেননি তাঁরা আমার কথা অত্যুক্তি মনে করবেন, সে ভণিতা প্রারম্ভেই করেচি। তারপর সংস্কৃত সাহিত্যে নটরাজের জোড়া নেই—গানের ভিতর দিয়ে তিনি ঋতুর আবির্ভাব-তিরোভাব এমনি ফুটিয়েচেন যে তাতে মনে হয় নটরাজের রূপ যেমন তিনি দেখেচেন, সুরও তেমনি শুনেচেন। সৃষ্টির মধ্যে বিধাতার সুর অহোরাত্র অবিশ্রান্ত চলচে সে অশ্রুত সুর তাঁর হৃদয়-বীণায় পলে পলে বেজেছে। তিনি সেগুলোকে কথনো ছন্দে কথনো মন্ত্রে ফুটিয়েছেন। তাঁর হৃদয়যন্ত্রের সঙ্গে যেখানে বিশ্ব-বীণার যোগ, সেখানে মর্ত্ত্যের সহিত অমৃতের যোগ। মর্ত্ত্যলোকে এ অমৃতের আমন্ত্রণ যুগ-মানবের জন্য চিরকাল সঞ্চিত থাকবে।

শ্রীভূপেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

স্মরণের কবি

আমার ঘরের খোলা বাতায়ন তলে,
দখিন হাওয়ার মাতামাতি যবে চলে,
নবমুকুলের মদির সুরভি আসে,
সকল ভোলানো কোনো ফাল্গুন মাসে,—
প্রদীপবিহীন শূন্য কক্ষ কোণে,
আমার কবিরে তখন পড়ে যে মনে!

প্রভাত আলোকে, সন্ধ্যার ছায়াতলে,
বর্ণে গন্ধে কত না রঙ্গ চলে,
গগনে পবনে, নিখিল ভুবন ভরি'—
সে কথা, যে কবি শুনাল নূতন করি,
কর্ম্মবিহীন দ্বিপ্রহরের ক্ষণে
নিয়ত আমার তারেই পড়ে যে মনে!

পায়ে চলা পথে একেলা চলিতে ফিরে,
জোছনাহসিত নির্জ্জন নদীতীরে,
শ্যামতৃণদলে শিশিরকণার রূপে,
শতকোটিবার স্মরি তারে চুপে চুপে,—
বরষাধারায় কাজল মেঘের গানে
যে জন ভাবের বন্যা আনিল প্রাণে!

সান্ত্বনা দেয়, আনন্দ দেয় ঢেলে,
কাব্য যাহার শত শতদল মেলে,
চলিতে ফিরিতে সকল কাজের ফাঁকে,
অগণিত যার সঙ্গীত মোরে ডাকে,
আজ ব'লে নয়, তারে ভাবি প্রতিদিনই!
শুনি দিকে দিকে ঝঙ্কার রিনিঝিনি!

সে কবি আমার, আমারি সে একেলারি,—
সে-ই বলিবে, যে পরিচয় পেল তারি !
বন্ধু আমার, সখা সে আপনতম,
নহে' সে সুদূর, সে যে সতীর্থ সম।
সে যে অমলিন,—দীর্ঘজীবন লয়ে
প্রার্থনা মোর, রবে আপনার হ'য়ে।

হিয়া জয় করা সেই ত তোমার খেলা,
ওগো অকরুণ এখনি বিদায় বেলা
আসিতে কি পারে ? কেন চঞ্চল হেরি ?
এখনো সন্ধ্যা আসিতে অনেক দেরী !
দোস কবি, আরো ধরো নব নব সুর,
প্রেমের কাব্য—সুন্দর সুমধুর !
মুগ্ধ তরুণ তোমারে কহিছে ডেকে,
শেষের সে গান গেয়োনা এখন থেকে !

তুমি চ'লে গেলে, ভাবিতে পারিনা মনে
কে দিবে সুষমা প্রিয়ার নয়ন কোণে ;
কে দিবে নূতন অশ্রুহাসির বাণী
মধুর করিতে বিষণ্ণ মনখানি ;
উৎসবদীপ নিভে যাবে কলরোলে,
সে কি হ'তে পারে ? তুমি কভু যাবে চ'লে !

যুগ যুগ যাবে তুমি রবে শুধু জেগে !
বরষে বরষে সজল কাজল মেঘে
ধ্বনিয়া উঠিবে তোমারি প্রাণের কথা ;
বৈশাখী ঝড়ে উন্মাদ আকুলতা ;
শরতে, শিশিরে, বসন্ত-উৎসবে,
নিত্য নূতন ছন্দে আপন হবে !
গঙ্গার জলে গঙ্গাপূজার মত
হায় কবি, কথা তোমারে শুনাব কত !
অগণিত তব বন্ধু জনের মাঝে
আমার এ ক্ষীণ সুর মিলাইবে লাজে॥

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু



রবীন্দ্রনাথের দান

বিখ্যাত ইংরাজ ঐতিহাসিক লর্ড এ্যাক্টন একবার বলেছিলেন যে ঊনবিংশ শতাব্দীর মানুষের পক্ষে নবম বা দশম শতাব্দীর মানুষের মনস্তত্ত্ব বোঝা বড়ই কঠিন, কারণ রাষ্ট্রে, সমাজে, কার্য্যে, চিন্তায় ও ধর্ম্মে তারা ছিল সম্পূর্ণ অন্য ধরণের মানুষ—বর্ত্তমান যুগের মানুষের সঙ্গে তাদের কোথাও কোনো মিল নেই। এই মূলসূত্রটি মনে রাখ্‌লে ইতিহাসের যে সকল অবিচার, নৃশংসতা ও অকারণ রক্তলোভের কাহিনী আজকাল আমাদের দুর্ব্বোধ্য মনে হয়, তা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বলে মনে হবে, কারণ সে যুগের মনোবৃত্তির সঙ্গে এদের কার্য্যকারণ-সম্পর্কটুকু আমরা আবিষ্কার করে ফেল্‌বো।

লর্ড এ্যাক্টনের উক্তিটি ব্যাপকভাবে যদি গ্রহণ করি, এবং এর অন্তর্নিহিত তত্ত্বটুকু বুঝ্‌তে চেষ্টা করি, তাহ'লে এই দাঁড়ায় যে শতাব্দীর পর শতাব্দী যতই পার হয়ে যাচ্ছে, মানুষ ততই দ্রুত এগিয়ে চলেচে—একযুগের গোঁড়ামী, ধর্ম্মান্ধতা, কুসংস্কার অন্যযুগের মানুষের পক্ষে পরম বিস্ময়ের বস্তু, এ যুগের মিরাক্‌ল্‌ পরবর্ত্তী যুগের সুপরিচিত দৈনিক ঘটনা—সহস্র শতাব্দী পারের কোন সুনির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যের উদ্দেশে তার যাত্রা, এখন সে সব গৌরবময় বিবর্ত্তনের কাহিনী আমাদের কল্পনারও অতীত।

বিশ্বমানবের এই অগ্রগতির সাহায্যের জন্য মাঝে মাঝে এক একজন লোক আসেন, যাঁরা একাধারে মানুষের সকল দিকের সকল পরিণতির আদর্শ। রবীন্দ্রনাথ আমাদের মধ্যে সেই রকম একটি মানুষ। যে অসীমতার তৃষ্ণা মানুষের এই অগ্রগমনের সাথী ও পথ প্রদর্শক রবীন্দ্রনাথের লেখার মধ্যে দিয়ে তা আমাদের সাহিত্যে সর্ব্বপ্রথম একটি মৌলিক রূপ ধরে দেখা দিয়েচে। এমন এক সময় ছিল যখন আমাদের দেশের লেখকের উৎকর্ষতার পরিচয় দিতে হ'লে প্রতীচীর সেই শ্রেণীর লেখককে মাপকাঠি রূপে ব্যবহার করা হোত—এইটাই ছিল সাহিত্যে তাঁদের স্থান-নির্ণয়ের প্রকৃষ্ট পদ্ধতি। তাই দেশবাসীরা বঙ্কিমচন্দ্রকে বাংলার সার ওয়াল্টার স্কট্‌, মধুসূদনকে বাংলার মিল্টন্‌, কালীপ্রসন্ন ঘোষকে বাংলার এমার্সন নামে অভিহিত করে সাহিত্যে তাঁদের স্থান সুনিপুণভাবে নির্দ্দিষ্ট করা হয়ে গিয়েচে ভেবে পরম আনন্দ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেল্‌তেন। আমাদের সাহিত্যের এই পরমুখাপেক্ষী দাসমনোবৃত্তি দূর কর্ল্লেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতিভার অমিত তেজে—তাঁর স্থান এ ধরণে নির্দ্দেশ কর্ত্তে কেউ সাহস কর্ল্লে না—মানুষ সেখানে দিশাহারা হয়ে পড়ল, গতযুগের মাপকাঠির উপর আস্থা হারাল, তাদের চোখ ধাঁধিয়ে গেল, তারা নিশ্চিন্ত মুরুব্বিয়ানার সুরে তাঁকে বাংলার শেলী কি বাংলার মেটারলিঙ্ক্‌ বল্‌তে পার্ল্লে না, রবীন্দ্রনাথ রয়ে গেলেন একটি unclassified phenomenon—অমুক শেল্‌ফের অমুক নম্বরের তাকে রবীন্দ্রনাথের স্থান নির্দ্দিষ্ট করা চলল না সহজে।

রবীন্দ্রনাথ আমাদের সাহিত্যের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছেন নানাভাবে। একটা কথাই এখানে বলি। আমার হাতের কাছে একখানা বাংলা উপন্যাস রয়েচে, নাম 'বিজয় বল্লভ', ১৮৮০ সালে সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত। লেখক ভূমিকায় বলেচেন, "ইংলণ্ডীয় ভাষায় নবেল্‌ নামে মনোহর প্রসিদ্ধ উপাখ্যান গ্রন্থসকল যে প্রণালীতে সঙ্কলিত হইয়া থাকে, সেই প্রণালী অনুসারে এই পুস্তকখানি রচিত হইয়াছে" ইত্যাদি। উপাখ্যানভাগ অবশ্য কাদম্বরীর অনুকরণে রচিত, প্রকৃতি বর্ণনার মধ্যে পাই Decadent যুগের সংস্কৃত কাব্যের অনুকরণে আড়ষ্ট ও মামুলী ধরণের বাঁধিগৎ। পূর্ণিমা থেকে কোকিলের কুহু পর্য্যন্ত তাতে সবই আছে, নেই কেবল প্রাণ। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রকৃতি-বর্ণনাও সম্পূর্ণভাবে

সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাবমুক্ত নয়, কিন্তু সর্ব্বপ্রথমে রবীন্দ্রনাথেরই মধ্যে পাই প্রকৃতির বিপুলতা ও রহস্যকে। অনাড়ম্বর ও বাহুল্যবর্জ্জিত বলেই তা প্রাণবন্ত; অসাধারণ চক্ষুষ্মান্ প্রতিভা সেখানে কেতাবী বর্ণনাপদ্ধতির মোহপাশ কাটিয়ে দিয়ে নিজের চোখ ও মনকে বড় বলে মেনেচে; সে দর্শনও যেমন নিখুঁত, তেমনি convincing—পদ্মাচরের বিপুল প্রসারের সঙ্গে, পুষ্পিত কাশবনের সৌন্দর্য্যের সঙ্গে মন সেখানে একদিকে যেমন এক হয়ে মিশে যায় অন্যদিকে তেমনি নতুন শক্তির উৎসমুখের সন্ধান পেয়ে নতুন পথে দিগ্বিজয়ে বার হবার অদম্য স্ফূর্ত্তিকে লাভ করে।

জীবনের ও জগতের ব্যাপারে এই আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গিও রবীন্দ্রনাথের কাব্যে পাই সর্ব্বপ্রথম। আমাদের সাহিত্যের যে আদর্শ ছিল অত্যন্ত খর্ব্ব, রবীন্দ্রনাথ তাঁর গত পঞ্চাশ বৎসরের সাধনায় তার ষ্ট্যাণ্ডার্ড এত উঁচু করে দিয়েচেন—সাধারণ গতিতে চল্‌তে চল্‌তে হয়তো দেড়শো বছরেও তা ঘট্‌ত কিনা সন্দেহ। তাঁর নব দৃষ্টিভঙ্গি প্রত্যেক জিনিষটী নতুন করে দেখেচে, বিশ্বমানবের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির যোগ-সূত্রকে আবিষ্কার করেচে,—দৃষ্টির সঙ্গেই নবসৃষ্টির সূচনা হয়েচে। এমন একটী জীবন্ত, সদাজাগ্রত মনের পরিচয় আমরা পাই, পদ্মবুকের বজ্‌রার কামরায় যা নিদ্রিত হয়ে পড়ে নি—নির্জ্জন রাত্রে রহস্যময়ী প্রকৃতি কখন অবগুণ্ঠন উন্মোচন করেন, কখন তাঁর সঙ্গে চোখোচোখি দেখা হবে—তারই আশায় বিনিদ্র রজনী যাপন করেচে।

রবীন্দ্রনাথের দানের তুলনা নেই, জীবনের এমন কোনো দিকও নেই, যেদিকে তাঁর দৃষ্টি পড়েনি, যার সম্বন্ধে তিনি কিছু না কিছু নতুন কথা না শুনিয়েচেন, তা শরৎ-কালীন দুপুর সম্বন্ধেই হোক্, বা নাম উচ্চারণ করবার পদ্ধতি নিয়েই হোক্। এ যুগের বাংলার কবি, কথাসাহিত্যিক, প্রবন্ধলেখক—তাঁর কাছে সবারই ঋণের বোঝা বিপুল, বর্ত্তমান চিন্তাধারাকে নিয়ন্ত্রিত করেচেন তিনি, রূপ দিয়েচেন তিনি—বিশ্লেষণ করে দেখ্‌লে সকলেরই চিন্তার উপর রবীন্দ্রনাথের এই প্রভাব ধরা পড়্‌বেই।

একটা ক্ষুদ্র প্রাদেশিক সাহিত্য থেকে তিনি বাংলা সাহিত্যকে আজ বিশ্বের দরবারে সকলের আসনে বসিয়েচেন, এই বিপুল দানের, মানব প্রতিভার এই অনন্যসাধারণ বিকাশের তুলনা নাই বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে।

তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টির মূলে আছে যে প্রগাঢ় অনুভূতি, তা সাধারণ মনের ব্যাপার নয়, চেতনা ও অনুভূতির সে স্তর সাধারণের দুরধিগম্য—তাই তাঁর কাছে আমরা যে লোকের সন্ধান পাই, আমাদের দৈনন্দিন তুচ্ছ অনুভূতি পরম্পরার বহু উর্দ্ধে সে এক অপরূপ আনন্দলোক—তাঁকে পথ-প্রদর্শক না পেলে সেটা আমাদের নিকট অপরিজ্ঞাতই রয়ে যেতো চিরদিন। জাতীয় চেতনার এই অগ্রগতি রবীন্দ্র-সাহিত্যের নিকট অপরিসীম ঋণে ঋণী—গত শতাব্দীর অলঙ্কার ও অনুপ্রাস-বহুল বাংলা কাব্যের কথা বাদ দিলেও রবীন্দ্রনাথের অব্যবহিত পূর্ব্বের কাব্যের সহিত তাঁর যে তফাৎ, তা বল্মীকস্তূপ ও হিমালয়ের তফাৎ। অনুভূতির এই অপরিমেয় ঐশ্বর্য্যের কথা ভেবে শুধুই এই কথা মনে হয় এক জীবনে এত বিপুল রসাস্বাদ কি করে সম্ভব হোল, তখনি আবার তাঁরই কথায় তাঁকে বল্‌তে ইচ্ছা করে—

কোন্ আলোতে প্রাণের প্রদীপ
জ্বালিয়ে তুমি ধরায় এস
সাধক ওগো, প্রেমিক ওগো, পাগল ওগো ধরায় এস।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ

এই সুন্দর ধরণীর আলো নয়নে যখন লাগিল এসে
মনের নয়ন জাগেনি তখনো, সুধু উঠেছিল তনুটি হেসে।
মুগ্ধ এ চোখে অঞ্জন দিল মঞ্জুলা মম ধাত্রী ধরা
মনের নয়ন ঘুমায়ে তখনো, হ'ল নাকো তায় কাজল পরা !

শৈশব যবে মাগিল বিদায়, কৈশোর আসি চুমিল কায়া,
গগনে ভুবনে আলোকে আঁধারে ধরা প'ড়ে গেল মোহিনী মায়া,
সেই সুলগনে মনের গোপনে আধ-ঘুমঘোরে জাগিয়া দেখি
সম্মুখে আমার অগাধ অপার সুধার সাগর হাসিছে একি !
ভ গ্য মোদের অতুলন, তাই জনমেছি কবি তোমার পরে—
ভাগ্য মোদেব অতুলন, তাই জনমেছ তুমি মোদেরি ঘরে !
কৈশোর হ'তে আজো করি' পান তব কাব্যের অমিয়া ধারা
মিটে নাই সাধ, মিটিবে না কভু, হইয়াছি শুধু আত্মহারা !
প্রকৃতির মায়া-মাধুরী-লীলায় করিয়াছি ভোগ নয়ন দিয়ে
হৃদয়ের তৃষা মিটায়েছি কবি, তব কাব্যের অমৃত পিয়ে !

আষাঢ়ের কালো মেঘের বুকে যে বেদনার ছায়া ঘনায়ে ওঠে
তোমার ছন্দে তা'র নবরূপ মোদের হৃদয়-আকাশে ফোটে !
ধরা কালো হয়, দেয়া গরজয়, কেয়া-পরিমল ছড়ায়ে পড়ে
কদম শিহরে, হিমবায়ু বয়, ময়ূর মোহন পেখম ধরে !
ফোঁটা ফোঁটা জল, নবীন বাদল, নামে নিদাঘের তৃষিত বুকে
তব সঙ্গীত-কবিতা-ছন্দে নেহারি সে সব নীরব সুখে !
শরতের হাসি, পৌষের ধান, জননীর স্নেহ-ক্ষীরের ধারা
তব কাব্যের সুধা-সমুদ্রে, হেরি সবে এসে হয়েছে হারা !

হৃদয়ের কোণে নিভৃতে গোপনে যে কথা নিরত গুমরি মরে
হেরি বিস্ময়ে মনোমত হয়ে তব গানে তারা মূরতি ধরে !
যে ভাব হৃদয়ে আধ-ফুটন্ত কলির মতন ঘুমায়ে ছিল
তোমার ছন্দ-মলয়-মারুতে তাহারে ফুটায়ে গন্ধ নিল !
মঞ্জুল ছবি নিখিলের মাঝে যেখানে যেখানে ছড়ায়ে আছে
তব অতুলন তুলিকা লিখনে এনে দিলে তুমি চোখের কাছে।
ভুবনে, ভবনে, জাগরে, স্বপনে এত যে মাধুরী জীবনে ভরা—
ওহে সুন্দর ! তোমারি ছন্দে তা'রা আনন্দে দিয়েছে ধরা !

মর্ত্যের তুমি মানব নহ ত, স্বর্গলোকের চারণকবি
অমৃতের গান এ মৃতের দেশে শোনা'তে নামিয়া এসেছ রবি !
নামিয়া এসেছ কিরণ-ছটায় মাটির এ বুকে, অরুণ সম—
নীলাকাশ বেয়ে পথরেখা তব পড়িয়া রয়েছে সুদূরতম !
ধরায় রয়েছ মাটি তৃণে জলে, সে তব দীপ্তি, সে তুমি নহ,
তুমি রহি' দূরে অমৃতের সুরে অমরায় তরে অর্ঘ্য বহ ॥

আমরা মানব, তোমা' পানে চাই ঊর্দ্ধে মেলিয়া মুগ্ধ আঁখি
অন্তরে ধরি সুরধারা তব, সারা গায়ে তব কিরণ মাখি !
আমাদের ঘরে জনমিয়া তুমি বিশ্বের তরে গাহিছ গান—
পূর্ব্ব তোরণে উঠে রবি, করে সর্ব্ব ভুবনে আলোক দান !
জগতের বুকে কল্যাণে সুখে চিরকাল তুমি দীপ্ত রহ
কোটি গুণিজন-শিষ্যের সাথে এ অভাজনেরো প্রণাম লহ ॥

শ্রীরামেন্দু দত্ত

শ্রদ্ধা-অর্ঘ্য

বাংলায় জাতীয় জীবনে রবীন্দ্র-সাহিত্যের আবির্ভাবটা যতখানি আকস্মিক ব'লে মনে হয়,—ঠিক ততখানি সহজ-ভাবেই রবীন্দ্র সাহিত্য তার চারিদিকে আপনার প্রভাব-জাল বিস্তার করেছে। রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের প্রথম যুগে যাঁরা তাঁকে গালি পাড়্তে লাগ্লেন,—তাঁরাই চিন্তা করতে আরম্ভ করলেন, রবীন্দ্রনাথেরই প্রবর্তিত ধারায়,—আত্ম-প্রকাশের জন্য ব্যবহার করলেন রবীন্দ্রনাথেরই সৃষ্ট ভাষা। এটা যতই বিস্ময়কর মনে হো'ক না কেন,—সেই সব রবীন্দ্র-সমালোচকদের আমরা আর কিছু দোষ দেব না,—শুধু এই টুকু ছাড়া,—যে আলো দেখে তাঁদের চম্‌কে যাওয়াটা উচিত হয় নি-ক। এ যে আলো—বাংলার সাহিত্যাকাশে রবীন্দ্র-নাথের আবির্ভাবটা যে ঠিক অরুণোদয়েরই মত। প্রাগ্-রবীন্দ্র যুগের সাহিত্যাকাশে দেখি বঙ্কিম জল্ জল্ করছেন, যেন শুকতারা। সূর্য্যোদয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে ধরণীর যে রূপ দেখা যায়, বাংলার সাহিত্যাকাশে তখন যেন ঠিক সেই রূপটি ফুটে উঠেছিল। বাংলার অন্তরাত্মা তখন যেন একটা প্রকাশ-ব্যাকুলতায় স্পন্দমান, গগনে গগনে কোন্ অন্তরাল থেকে যেন আলোর ছটা ঠিক্‌রে পড়্তে চাইছে, গাছে গাছে যেন কী একটা অস্পষ্টতা আকারের সন্ধানে ব্যাকুল হ'য়ে নয়নের উপর ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা ভেসে বেড়াচ্চে; মূক ধরণীর গম্ভীর নিস্তব্ধতা যেন আলোকের মুখরতার মধ্যে ফেটে পড়ল বলে! ঠিক এই সময় হ'ল রবির উদয়, গাছে গাছে পাখী ডেকে উঠল,—সেই কল-কাকলীর ছন্দে বাংলাদেশ মুখর হ'য়ে উঠ্ল। এই আলোর মধ্যে কারো তপস্যার যদি বিঘ্ন হ'য়ে থাকে, ত আলোর মধ্যে থেকেই গালি পাড়া ছাড়া আর উপায় কি? গালি পাড়ার জন্য কোন্ অন্ধকার রাজ্যের অনুসন্ধান তাঁরা করতে যাবেন!

আমাদের পরম সৌভাগ্য, আমরা এই আলোর মধ্যে জন্মেছি ও বেড়ে উঠেছি। তাই আমাদের মনের সমস্ত সম্পদ আমরা এমনই সহজভাবে রবীন্দ্রনাথের নিকট পেয়েছি, যে সে ঋণটা স্বীকার করার কথা পর্য্যন্ত আমা-দের মনে থাকে না। যেমন জলবায়ুখাদ্য থেকে যখন দেহের পরিপুষ্টি সাধন করি,—তখন তাদের কাছে সে ঋণটা স্বীকার করার প্রয়োজন বোধ করি না। এ মনোভাবটা সাধারণ হ'লেও প্রশংসনীয় নয়, কেন-না ঋণ স্বীকার করার মধ্যেও গৌরব আছে; বিশেষতঃ রবীন্দ্র-সাহিত্য থেকে মনের যে পরিপুষ্টি পেয়েছি,—সেটা তলিয়ে বিশ্লেষণ করে স্বীকার করতে পারলে মনের সম্পদ আরোই বাড়্বে। বীরপূজা করার সব চেয়ে বড় সার্থকতা বীরকে সম্মান করা নয়, সেই পূজার ভিতর দিয়ে বীরের গুণগুলি কিয়ৎপরিমাণে আপনার মধ্যে সংক্রামিত করা। তাই আজ কবির এই সত্তর বছর পূর্ণ করা উপলক্ষে কবির নিকট আমাদের এই ব্যক্তিগত ঋণ স্বীকার করার সুযোগ পেয়ে আপনাকে ধন্য মনে করছি।

কিন্তু এই সুযোগ পাওয়াটা যত সহজ, ঋণের পরিমাপ করা ও তার স্বরূপ নির্দ্ধারণ করাটা তত সহজ নয়। রবীন্দ্র-সাহিত্যের আলোয় আমাদের মানসিক বিকাশ এমনই সহজ পথে স্ফূর্তিলাভ করেছে যে তার উপকরণগুলো আমাদের বিশ্লেষণ-শক্তির নাগাল এড়িয়ে যায়। শুধু মনে পড়ে অতি শৈশবে রবীন্দ্রনাথের ছন্দ আমাদের শিশু-মনকে কেমন নাচাত ও দোলা দিত! রবীন্দ্রনাথের সদা-সজাগ, চির-সচল, স্পর্শভীরু মন একদিন 'জল পড়ে, পাতা নড়ে',—মাত্র এই কথাটির ছন্দে ও ধ্বনিতে নেচে উঠেছিল। সার্থক সেদিনের জল-পড়া, পাতা-নড়া; সেই নাচন ছড়িয়ে পড়ল বাংলা দেশের ঘরে ঘরে, গাছে গাছে, পাতায় পাতায়। আমাদের শৈশবেও রবীন্দ্র-সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়ের বহু পূর্ব্বে একদিন

জল পড়েছিল, পাতা নড়েছিল, কিন্তু মন নাচে নি। সেই মনকে নাচিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। আজ আমাদের জীবনের প্রত্যেকটি কর্ম্ম ও চিন্তা সেই নৃত্যের তালে নিয়ন্ত্রিত।

এই নৃত্য মহাকালের,—এরই ছন্দে বিশ্বজীবন বাঁধা। রবীন্দ্র-কাব্যের অন্তরে বাইরে এই ছন্দ লীলায়িত হ'য়ে যেন অব্যক্তকে ব্যাকুল করে তুলেছে, তার প্রত্যেকটি স্পন্দন যেন সৃষ্টির এক একটা গভীর নিগূঢ় মর্ম্ম আমাদের মানস-নয়নে উদ্ঘাটিত করে দিতে চাইছে। কথা থেকে সুরে, সুর থেকে রেখায় ছাড়িয়ে পড়ে এই ছন্দ রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সাধনাকে একটা আশ্চর্য্য পরিপূর্ণতা দান করেছে। শুধুই কাব্য-সাধনায় নয়, জ্ঞানের সাধনায় ও কর্ম্মের সাধনায়ও এই ছন্দই রবীন্দ্রনাথের সমস্ত জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করেছে, এবং তাঁর জীবনের বহুল বৈচিত্র্যকে একটা অখণ্ড সুসঙ্গতি দান করেছে। রবীন্দ্রনাথ বার বার বলেছেন,—তিনি শুধু কবি,—কবি ছাড়া আর কিছুই ন'ন। একথা মিথ্যা নয়,—তাঁর বিচিত্র কর্ম্মের মধ্যে এবং বহু বিষয়ে তাঁর অসংখ্য রচনার মধ্যেও এই কবি-রূপটিই দেখা যায়।

এই কবির দৃষ্টিতে সৃষ্টির সমস্ত রহস্যটুকু ধরা পড়েছে। জীবনের এমন কোনো দিক নেই, যা' তিনি গভীর ভাবে আলোচনা করেননি। এ কথা বোধ হয় নিঃসঙ্কোচে বলা যায়,—যে যদি এমন কেউ থাকেন যিনি শুধুই রবীন্দ্র-সাহিত্য আগাগোড়া ভালো ক'রে পড়েছেন,—এবং তার বাইরে আর একখানি বইও পড়েন নি,—তবুও তিনি যে-কোনো উচ্চ-শিক্ষিত ব্যক্তির প্রাপ্য যে সম্মান তা অনায়াসেই দাবী করতে পারেন। আমরা ব্যক্তিগতভাবে রবীন্দ্র-সাহিত্যের নিকট যা' পেয়েছি, তার না পারি পরিমাপ করতে না পারি তা' ভাষায় বর্ণনা করতে। জীবনের অভিব্যক্তিগুলো এতই বিচিত্র ও পরস্পরবিরুদ্ধ, যে তার সুখ-দুঃখ, আশা-নৈরাশ্য, আনন্দ বেদনার উত্তাল তরঙ্গাঘাতে আমরা বোধ হয় দিশেহারা হ'য়ে পড়তাম,—জীবনকে এবং এই ধরণীকে বোধ হয় এতখানি ভালোবাস্তে পারতাম না,—যদি না রবীন্দ্রনাথ তাদের অন্তর্নিহিত ছন্দের আনন্দময় লীলাটি আমাদের দেখিয়ে দিতেন।

শ্রীসুশীলচন্দ্র মিত্র

শ্রদ্ধাঞ্জলি

না জানি খচিতে ছন্দ, রচিতে বন্দনা,—
তব শুভ জন্মদিনে হে কবি-সম্রাট্!
তবুও অন্তর ভরি' কে দেছে সান্ত্বনা—
কে দেছে হৃদয় ভরি' আনন্দ বিরাট।
কবিতা-গগনে ওগো সবিতা ভাস্বর—
ছড়ায়েছ তব জ্যোতি অমর লিখনে;
পাঠায়েছে রশ্মি তা'র দিক্-দিগন্তর,
উজলিয়া, কবি-গুরু, নিখিল ভুবনে।

প্রচারি' প্রাচীর মন্ত্র প্রতীচীর কাছে,
প্রতীচীর সাম্যবাদ পীড়িত মানবে—
রচেছ ঐক্যের তান। সেই সুর বাজে
মহামানবের প্রতি মুক্তির আহবে।
জানি না পৌঁছিবে কিনা শ্রদ্ধাঞ্জলি মোর,
দীন-ভকতের অর্ঘ্য—আনন্দন-লোর।

শ্রীপ্রতাপ সেন

দূর্বাদল

বিচিত্রার রবীন্দ্র জয়ন্তীর ছাপা এগিয়ে চলেচে,—মনের মধ্যে একটা উৎকণ্ঠাও উত্তরোত্তর বেড়ে উঠচে—লিখ্‌তে হবে, একটা কিছু লিখ্‌তেই হবে। উপরোধ অনুরোধ ক'রে সকলকে লেখাচ্চি—আর নিজেই লিখ্‌ব না? না,—লেখা চাই-ই। কিন্তু লিখি কি? অতল-স্পর্শী মন্থনের দ্বারা রবীন্দ্র-সাহিত্য-সাগরের কাব্য-লক্ষ্মীকে উদ্ধার ক'রে তার একটা বিস্তারিত বিবরণ দেবো? কিম্বা বিশ্ব-সাহিত্য-ভাণ্ডারে বিশ্বকবি কি দান করলেন চুলচেরা সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের দ্বারা তার গবেষণামূলক হিসাব-নিকাস করব? করলে ত ভালই হয়, কিন্তু ভেবে দেখ্‌লাম সে বিষয়ে ছটি বাধা আছে। প্রথমতঃ পাণ্ডিত্যের অভাব, দ্বিতীয়তঃ সময়ের অনটন।

সময়ের অনটন অবশ্য সত্যসত্যই গুরুতর বাধা, কিন্তু পাণ্ডিত্যের অভাবটা কিছু নয়। আজকালকার যুগ হচ্চে বুদ্ধির যুগ, বিত্তের নয়; প্রতিভার, পরিশ্রমের নয়। পরিশ্রমের ফলে বস্তু থাকৃতে পারে, কিন্তু প্রতিভার ফলে উজ্জ্বলতা আছে। সুতরাং পরিশ্রমের ফল দিয়ে মানুষকে পুষ্ট করা যায় কিন্তু তুষ্ট করা যায় না। তা ছাড়া, প্রতিভার দ্বারা সময়ের অর্থাৎ সময়াভাবের অসুবিধাকে অতিক্রম করা যায়, কিন্তু পরিশ্রম সময়ের সঙ্গে এক নিগড়ে বাঁধা।

স্থির করলাম, প্রতিভারই আশ্রয় নেওয়া ভাল।

শুনেছি, রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন 'আট ন' বৎসর, বালক রবীন্দ্রনাথ কবিতা লেখেন শুনে সাতকড়ি দত্ত নামে এক ব্যক্তি তাঁকে বলেছিলেন, "শুনলাম তুমি কবিতা লেখ। আচ্ছা, বল দেখি, এর পর কি করবে?

রবিকরে জ্বালাতন আছিল সবাই,
বরষা ভরসা দিল আর ভয় নাই।"

রবীন্দ্রনাথ এক মুহূর্ত চিন্তা ক'রে বলেছিলেন,

মীনগণ হীন হ'য়ে ছিল সরোবরে,
এখন তাহারা সুখে জলে ক্রীড়া করে।

মনে করলাম এই 'মীনগণ হীন হ'য়ে' থেকে আরম্ভ ক'রে কবির বর্ত্তমান কালের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-সৃষ্টি পর্য্যন্ত একটি অচ্ছিন্ন এবং অচ্ছেদ্য সূত্র টেনে দেখাব যে, এই ছুটি এবং এ ছুটির অন্তঃপাতী যা-কিছু রচনা সমস্তরই মধ্যে একটি অখণ্ড ভাব-ধারা প্রবহমান; কখনো বীজ হ'তে বৃক্ষে আরোহণ ক'রে, কখনো বৃক্ষ হ'তে বীজে অবরোহণ ক'রে প্রমাণ করব যে, বৃক্ষের সমস্ত সম্ভাবনা বীজের মধ্যে নিহিত, আবার বীজের বাসস্থান বৃক্ষের সপল্লব পুষ্প গর্ভের মধ্যে। দেখাব, আপাত-খণ্ডিত বহু রচনার মধ্যে পরম একের অনাহত ধ্বনি বাজছে। 'যে সুর কানে যায় না শোনা' সেই সুরকে ফুটিয়ে তুলে সকলের কাছে স্পষ্ট করব। তর্ক করব, বিচার করব, অর্থ করব, ব্যাখ্যা করব—যে কথা কেউ কখনো বলেনি সেই কথা ব'লে সকলকে চকিত ক'রে তুলব।

গবেষণার প্ররোচনায় মুখ গম্ভীর হ'য়ে উঠেছে—আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে ভালো ক'রে দিন দুই-তিন কথাই কচ্ছিনে, এমন সময়ে সুধী শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের কাছ থেকে জয়ন্তীর লেখা এসে উপস্থিত হ'ল। চোখ বুলোতে বুলোতে হঠাৎ চোখে পড়ল এক জায়গায় লিখেচেন, সমস্ত বিশ্বের নিকট যিনি বর্ত্তমান কালের শ্রেষ্ঠ কবি ব'লে পরিচিত তাঁর পরিচয় দিতে যাওয়া ধৃষ্টতা।

হাজার বার ধৃষ্টতা! মন হাল্কা হ'য়ে গেল, মুখ প্রফুল্ল হ'ল। শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়াই ত উদ্দেশ্য—গবেষণার রক্ত-জবা দিয়ে তা যদি একান্ত না-ই হয়, না হয় ভক্তির দূর্ব্বাদল

দিয়েই হবে। মনে মনে বললাম, হে কবি, যে অমেয় দান তুমি দিয়েছ, আমার সাধ্য কি তা নির্ণয় করি। যে বস্তু অনির্ব্বচনীয়, বাক্য দিয়ে বর্ণনা করতে গিয়ে তার অনির্ব্বচনীয়-তাকে ক্ষুণ্ণ করতে চাইনে। কৈশোর থেকে আরম্ভ ক'রে আজ পর্য্যন্ত যে অপূর্ব্ব মাধুর্য্যে তুমি আমার চিত্ত পরিপূর্ণ করেছ তার অজস্রতা এবং অপার্থিবতা স্মরণ ক'রে আমি তোমাকে নমস্কার করি।

মনের মধ্যে ছন্দের গুঞ্জন আরম্ভ হ'য়ে গেল। মনে মনে ভাবলাম, ভালই হয়েচে, ছন্দ দিয়েই ছন্দের অধিরাজকে বন্দনা করা যাক্; যে ভাব ছন্দকে আশ্রয় ক'রে মনের মধ্যে এসে উপস্থিত হয়েচে কথার জাল দিয়ে তাকে ধরি। কাগজ কলম নিয়ে চেয়ার টেবিলে ব'সে গেলাম। চক্ষু চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করে, সেই জন্যে চিত্তনিরোধের উপায় হচ্চে চোখ বোজা। ভাবটাকে মনের মধ্যে একটু ভাল ক'রে জমাট বেঁধে নেবার উদ্দেশ্যে প্রথমটা চোখ বুজে ভাবতে লাগলাম। ছন্দের মধ্যে কথা সবে মাত্র ঝিলিক্ মারতে আরম্ভ করেছে, এমন সময়ে ইলেক্‌ট্রিক্ বেল বেজে উঠ্‌ল—ক্রিড়ি রিং!

চোখ খুলে গেল। আহূত ব্যক্তি ঠিক আসছে কি-না দেখ্‌বার জন্যে সবিরক্তি ঔৎসুক্যে সিঁড়ির দিকে চেয়ে রইলাম। আস্‌ছে; দৃষ্টি আমরই উপর ন্যস্ত। ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করলে, "আপনি ডাক্‌ছেন?" মনে মনে প্রবল ভাবে ভর্ৎসনার সুরে বললাম্ 'না হে বাপু, না! ভাব দেখে বুঝ্‌তে পারছনা আমি ডাকছিনে?' চিন্তা-সূত্র ছিন্ন হবার ভয়ে কথা কইলাম না, মাথা নেড়ে ইঙ্গিতে জানালাম, 'এ ঘর নয়, ও ঘর'। কর্ম্মচারী প্রস্থান করলে আবার জমিয়ে বসলাম। কিছুক্ষণ পরে বাক্য আবার সাড়া দিলে। কাল বিলম্ব না ক'রে লিখে ফেল্‌লাম—

> হে কবি, তোমার যশের রুচির কিরণে ভরিল সকল বিশ্ব,
> জগজ্জনেরে বুঝাইল তুমি বঙ্গ-জননী নহেক নিঃস্ব।
> ভারতের তুমি মন্ত্রদ্রষ্টা, এশিয়ার তুমি অমৃতপুত্র,
> গভীর উদার বাণীতে তোমার বিশ্ববাসীরে করিলে শিষ্য।

একেবারেই পছন্দ হলনা। প্রথমতঃ, এ ছন্দ অত্যন্ত নাচুনে ছন্দ, এর মধ্যে কোনো গভীর ভাব বাসা বাঁধ্‌তে পারে না; রাজপথে ক্ষোরাসে গান গেয়ে যাওয়ার পক্ষে এ ছন্দের উপযোগিতা থাক্‌তে পারে। দ্বিতীয়তঃ, ভাবগুলি অত্যন্ত খাপছাড়া; দ্বিতীয় ছত্রটি ত' অচল। কেটে ফেল্‌লাম। তারপর একটু ভেবে চিন্তে নিয়ে লিখ্‌তে আরম্ভ করলাম—

> বন্ধু, তোমারে পরম বন্ধু জানি।
> যে-জন এমন বাঁধে প্রাণমন বান্ধব তারে মানি।

সুরটা কতক উঠেচে বটে, কিন্তু ঠিক মনের মতো এখনো হয় নি। এইটেই লিখে যাব, না নূতন ক'রে আর একটা আরম্ভ করব ভাবচি, এমন সময়ে আবার বেল বেজে উঠ্‌ল—ক্রিড়ি রিং!

জ্বালাতন! এ আবার সব সময়ে একবার বেজেই নিরস্ত হয় না—থেমে থেমে তিনবার, চারবার বাজে। ১নং, ২নং, ৩নং, ৪নং—তার চার রকম অর্থ আছে। এবার তিনবার বেজে থাম্‌ল। আহূত ব্যক্তি এসে জিজ্ঞাসা করলে, "আমাকে ডাকচেন?"

ওগো, নাগো, না! তোমাকে ডাকচিনে! যাঁকে ডাক্‌চি, তোমাদের এই ডাকাডাকির উপদ্রবে তাঁর সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না! মাথা নেড়ে পূবদিকের ঘর দেখিয়ে দিলাম। বুঝ্‌লাম এই কর্ম্মকোলাহলের মাঝখানে কমলার আসন পাতা যেতে পারে—কিন্তু কমলাসনা বাণীর পক্ষে এ স্থান অনুকূল নয়। তল্পি-তাল্পা নিয়ে একটু দূরে স'রে পড়ব মনে করছি, এমন সময়ে আমার তরুণ সহকর্ম্মী সুশীলচন্দ্র এসে বল্‌লেন, "এ ছবিটি জয়ন্তীর মধ্যে যাচ্ছে—কিন্তু এর বিষয়ে ত' কোনো লেখা নেই। একটা কিছু লিখে দিলে হয় না?" ছবিটি রবীন্দ্রনাথকে মধ্যে নিয়ে কয়েকজনের ছায়াচিত্র। ১৩১৬ সালে ভাগলপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের তৃতীয় অধিবেশন কালে ছবিটি তোলা হয়।

ছবিটি দেখে হঠাৎ রবীন্দ্রনাথ সংক্রান্ত সেই সময়ের একটা কথা মনে প'ড়ে গেল—মনটা খুশীতে ভ'রে উঠ্‌ল। সুশীলচন্দ্রকে বল্‌লাম, "লেখা ত নিশ্চয়ই উচিত। আচ্ছা, সে লেখার ভার আমিই নিলাম।" বুঝলাম, এতক্ষণে ঠিক পথে পড়েছি। আমি চিরকাল গল্প বলি, আমার কবিতা লেখার সখ কেন? উপন্যাসের তরুপল্লবমর্ম্মরিত ছাঁকা-

বাঁকা পথে পাঠকচিত্তকে টেনে নিয়ে চলা যার পেশা সে কেন বিশ্বের সঙ্গে নিঃস্ব মিলিয়ে পরিশ্রান্ত হয়?······তল্পি-তাল্পা নিয়ে ইলেক্‌ট্রিক্ বেলের এলাকা থেকে স'রে পড়লাম।

১৩১৬ সালের ১লা ফাল্গুন ভাগলপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের তৃতীয় অধিবেশন হয়। সভাপতি ছিলেন স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্র মহাশয়।

তখন বসন্তকাল—কিন্তু সে বৎসর তখনো শীত তার মিয়াদ চুকিয়ে সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয় নি—রাত্রে তার প্রকোপ, দিনে গ্রীষ্মের। তরুশ্রেণী শাখায় শাখায় নব-পল্লব ফেলেছে—পথের ধারে ধারে শিরীষ গাছ লাল টক্‌টকে হয়ে উঠছে, আমের মঞ্জরীতে মৌমাছির ভন্‌ভনানি। এমন দিনে লেগে গেল সাহিত্য সম্মিলনের উৎসব। সমস্ত ভাগলপুর উৎসাহে আনন্দে মেতে উঠ্‌ল। সদস্য ও নিমন্ত্রিতগণের অবস্থিতির জন্যে দিকে দিকে শিবির স্থাপিত হ'ল, শিবিরে শিবিরে ভাণ্ডার। বড় বড় জমিদারগণ কর্ত্তৃক প্রেরিত বিবিধ উপকরণ সম্বলিত রসদে রসদে ভাণ্ডারগুলি ভ'রে উঠ্‌ল। প্রাচীনেরা উৎসবের বিধি-ব্যবস্থায় মগ্ন হলেন, যুবকেরা কাজ-কর্ম্মে, বালকেরা ফায়-ফরমাসে, বালিকারা গান-বাজনায়। নব-নিযুক্ত পাইক, পিয়ন্, চাকর-বাকররা চতুর্দ্দিকে ছুটো-ছুটি ক'রে বেড়াতে লাগ্‌ল। একটা যেন বিরাট যজ্ঞ লেগে গেল।

অধিবেশনে যোগ দেবার জন্যে রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে আহ্বান করা হয়েছিল, কিন্তু যতদূর মনে পড়ে তিনি অধিবেশনের প্রথম দিনে উপস্থিত হতে পারেন নি—দ্বিতীয় দিনে হয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ভাগলপুরে উপস্থিত হওয়া মাত্র আমরা কয়েকজন আত্মীয় বন্ধু তাঁর পরিচর্য্যার ভার গ্রহণ করলাম। অবশ্য এ কাজের জন্যে কর্ত্তৃপক্ষকে আমাদের খুঁজে বার করতে হয়নি—ভাগলপুর রেল ষ্টেশনেই তাঁরা আমাদের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন এবং আমাদের আচরণ থেকে বুঝেছিলেন যে রবীন্দ্রনাথের পরিচর্য্যায় আমাদের মোতায়েন না করলে সম্মিলনের আর কোন কাজেই আমাদের মোতায়েন করা চল্‌বে না। যে কাজ বাধ্য হ'য়ে করতে হ'ত সে কাজ ইচ্ছাপূর্ব্বক ক'রে তাঁরা সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিলেন।

আমরা জন ছয়েক স্বেচ্ছাসেবক কায়মনোবাক্যে কবি-পরিচর্য্যায় লেগে পড়লাম। অতি-পরিচর্য্যার দ্বারা রবীন্দ্রনাথকে একটু বিব্রত করিনি, এ কথা বল্‌লে সত্যের অপলাপ হবে—কারণ সেবা বিষয়ে আমাদের পরস্পরের মধ্যেও একটু প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল।

কবিবরের অবস্থিতির জন্য সহরের কেন্দ্রভাগ হতে কিছু দূরে সুপ্রসিদ্ধ টিলাকুটির দক্ষিণে একটি সুরম্য বাগান-বাড়ি স্থির করা হয়েছিল। চতুর্দ্দিকে ফলের ও ফুলের গাছ—শাখায় শাখায় নব মুকুল—বাতাসে তার সুমিষ্ট সৌরভ—গাছে গাছে পাখীর গান। এই মনোরম আবেষ্টনের মধ্যে কবি মাত্র দুটি দিন ছিলেন।

দ্বিতীয় দিনের অপরাহ্নে আমরা ছ'জন কবিকে মধ্যস্থলে বসিয়ে ফটো তুলিয়েছিলাম। এটা বোধ করি অতি-পরিচর্য্যার জোর করে আদায় করা পুরস্কার। কারণ, তখনকার কথা স্পষ্ট মনে না থাকলেও আজ রবীন্দ্রনাথের ছবি একটু ভাল ক'রে নিরীক্ষণ করে মনে হচ্ছে, তাঁর মুখমণ্ডলে উৎসাহের চেয়ে ঈষৎ কাতরতার ভাবই প্রতীয়মান;—যেন বলতে চাইছেন, তোমাদের ছজনার হাত থেকে যতক্ষণ পরিত্রাণ নেই ততক্ষণ যা করাবে তা করতেই হবে। অপর ছজনের মুখ দৃঢ়তাব্যঞ্জক।

সন্ধ্যার পরেই আমরা রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে সহরের মধ্যে একটি বাসায় উঠে এলাম। রাত্রি ১টার গাড়িতে তিনি বোলপুর যাবেন—অতদূর থেকে সে সময়ে ষ্টেশনে যাওয়া অসুবিধাজনক হবে। রাত্রি ৮টার মধ্যে তাঁকে আহার করিয়ে দিয়ে আমরা বল্‌লাম, "এবার আপনি শুয়ে পড়ুন, কারণ গাড়িতে ঘুমের ব্যাঘাত হবার সম্ভাবনা। আমরা ঠিক সময়ে আপনাকে ঘুম থেকে তুলে গাড়িতে তুলে দিয়ে আস্‌ব।" রবীন্দ্রনাথ একবার আমাদের দিকে তাকিয়ে কিছু বল্‌বার চেষ্টা করলেন—কিন্তু তাতে কোনো ফল হবে না বুঝতে পেরে পিছন ফিরে শয্যার উপর উঠে পড়লেন। ছজনের ঐকান্তিক অনুরোধ অনুশাসনের আকার ধারণ করে, এ কথা তাঁর অগোচর ছিল না।

আলোটি ঘর থেকে বারান্দায় বার ক'রে দিয়ে দোর ভেজিয়ে আমরা বাড়ির একেবারে অপর পাশে একটি ঘরে গিয়ে আশ্রয় নিলাম। আধঘণ্টা পরে একজন গিয়ে রবীন্দ্রনাথের ঘরের দোরে কান লাগিয়ে শুনে এল ঘরের মধ্যে কোনো সাড়া শব্দ নেই। তা হ'লে ঘুমিয়েচেন। তখন আমরা আমাদের ঘরের দোর জান্‌লা বন্ধ ক'রে দিয়ে একটি গ্রামোফোন বাজনা জুড়ে দিলাম। একজন রবীন্দ্রনাথের ঘরের কাছ থেকে শুনে এসে বল্‌লে—এত কম শোনা যাচ্ছে যে তাতে নিদ্রার ব্যাঘাত হবার কোন সম্ভাবনা নেই।

তা হ'লেই হল। চার পাঁচটি রেকর্ড বাজাবার পর একটি কীর্ত্তন দেওয়া গেল। কীর্ত্তনের সুমধুর সুরে গান চলেছে—"বঁধু তোমারি গরবে গরবিণী আমি রূপসী তোমারি রূপে"—এমন সময়ে খুট্ ক'রে দোর একটু খুলে গেল।

"কে?"

তাকিয়ে দেখি দুয়ারের অপর দিকে ফাঁকের ভিতর



শ্রীযোগেশচন্দ্র মজুমদার শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীমন্মথনাথ সেনগুপ্ত, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় শ্রীগিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীসত্যসুন্দর বসু

ভাগলপুর—৩রা ফাল্গুন, ১৩১৬]

দিয়ে একজোড়া উজ্জ্বল চোখ দেখা যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি, গ্রামোফোন বন্ধ ক'রে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম—"আপনি না-কি ?"

দুয়ার খুলে প্রবেশ করলেন রবীন্দ্রনাথ,—মুখে দৃঢ়তার চিহ্ন, অর্থাৎ, আর আমাদের অনুরোধ কিছুতেই মানবেন না। বললেন, "আমাকে নির্ব্বাসন দিয়ে তোমরা এখানে আনন্দের বাজার খুলে বসেচ—এ তোমাদের কী রকম ব্যবহার তা'ত বুঝিনে। আমার প্রতি অতটা ভক্তি না দেখিয়ে আরো কিছু দেখাতেও ত' পার।"

আমরা বললাম—"কিন্তু ঘুম!"

"আহা, ঘুমটা কি এতই হাত ধরা জিনিষ ব'লে তোমরা মনে কর যে, রাত একটার সময়ে ঘুমের ব্যাঘাত হ'তে পারে ব'লে রাত আটটায় ঘুমিয়ে নেওয়া চলে? তোমাদের ভাগলপুরে এসে এমন গুরুতর অপরাধ কিছু করিনি যার দণ্ড চোখে ঘুম নেই অথচ অন্ধকার ঘরে বিছনায় শুইয়ে রেখে দিতে পার। নাও, গ্রামোফোনই না হয় চালাও।" ব'লে একটা চেয়ারে ব'সে পড়লেন।

গ্রামোফোন আর চলল না—কিন্তু রাত নটা থেকে রাত বারোটা পর্য্যন্ত যা চলল তার আর তুলনা নেই! গল্প, হাসি, তর্ক, গান—অবাধ, অফুরন্ত! শুষ্ক গ্রামোফোনের গানের পরিবর্ত্তে রবীন্দ্রনাথ যখন গান ধরলেন, জানি জানি কোন্ আদিকাল হ'তে—তখন আমরা সকলেই মনে মনে বলছিলাম, তুমি ভাগলপুরে এসে কি অপরাধ করেছ তা জানিনে, কিন্তু আমরা তোমার কি এমন সেবা করেছি তা'ও জানিনে যার পুরস্কার এমন ক'রে দিয়ে গেলে!

জীবনের সেই শুভদিনটি স্মরণ ক'রে হে বিশ্বকবি তোমাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করলাম। গভীর গম্ভীর তেমন কিছু দেওয়া হ'লনা—কিন্তু তাই ব'লে এই সামান্য দূর্ব্বাদল কোনো রক্তজবার চেয়ে হীন নয়। তুমি আজ আমাদের এই ব'লে আশীর্ব্বাদ কর যে, তোমার বাঁশির নিত্যনূতন তান এখনো বহু-বহু বর্ষ যেন আমরা শুনতে পাই।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়



কবি-পত্নী

সুরলোকপ্রস্থিতা সাধ্বী সহধর্ম্মিণীর উদ্দেশে পত্নীবিয়োগ-বিধুর রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন :—

"ঘরে যবে ছিলে মোরে ডেকেছিলে ঘরে
তোমার করুণাপূর্ণ সুধা কণ্ঠস্বরে।
আজ তুমি বিশ্বমাঝে চলে গেলে যবে
বিশ্বমাঝে ডাক মোরে সে করুণ রবে!"

তাহার পর প্রায় ত্রিশ বৎসর অতীত হইতে চলিল! রবীন্দ্রনাথ আজ সুখদুঃখময় সংসারের বহু উর্দ্ধে! বাঙ্গালার কবি আজ বিশ্বের কবি! তাঁহার আশা, আকাঙ্ক্ষা ও আনন্দের উৎস আজ সীমাবদ্ধ সংসারের কোনও বস্তুতে কেন্দ্রীভূত নহে! অসীম বিশ্ব আজ তাঁহার সংসার, সমগ্র বিশ্ববাসী আজ তাঁহার নিকটতম আত্মীয়।

বিশ্ববাসী আজ তাঁহার জয়গানে উন্মত্ত! কিন্তু বিশ্বদেবতার চরণাশ্রয়ে তাঁহার যে গৃহলক্ষ্মী বিশ্বলক্ষ্মীরূপে দেখা দিয়া, তাঁহার অমৃতস্পর্শে কবিকে উচ্চতর অপার্থিব সুখের অধিকারী করিতেছেন, আজ কি কেহ তাঁহার কথা একবারও চিন্তা করিতেছেন?

ইহা নিতান্ত বিস্ময়ের বিষয় যে কবির জীবনচরিতকারগণ তাঁহার সম্বন্ধে একবারে নীরব! অথবা লোকোত্তরগুণসম্পন্ন নরদেবতার চরিতলেখক আদি কবির নিকটেও যখন আত্মগোপনপ্রয়াসিনী মহিমময়ী নারী উপেক্ষিতা হইয়াছেন তখন অন্যের কথা কি? কবি স্বয়ং তাঁহার স্বর্গীয় সুরে হৃদয়ের অনেক নিগূঢ় রহস্য, অনেক গভীরতম অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করিয়াছেন, অসীম, অব্যক্ত ও অজ্ঞাতকেও সুরের সীমার মধ্যে ধরিয়া আনিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার পবিত্র দাম্পত্যজীবনের চিত্র কোথাও সম্যকরূপে বর্ণে প্রতিফলিত করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না! হয়ত যে সকল ভাব too deep for human tears তাহা বাণীর বরপুত্রও যথাযথভাবে প্রকাশ করিতে অক্ষম। অথবা তিনি মনে করেন এ সকল কথায় বাহিরের লোকের প্রয়োজন নাই। কারণ তাঁহার মতে "কবির জীবন মানুষের কোন কাজে লাগে না",—জীবনচরিত কর্ম্মবীরদের—কাব্য মহাকবিদের। সেইজন্যই বোধ হয় তাঁহার 'জীবন-স্মৃতিতে' তাঁহার কবি-জীবনের যত পরিচয় পাওয়া যায়, পারিবারিক জীবনের তত পাওয়া যায় না। কিন্তু যাঁহাকে সকলে নিতান্ত আপনার জন বলিয়া মনে করে, তাঁহার জীবনের প্রত্যেকটী ঘটনার কথা তাহারা জানিতে সমুৎসুক—সে ঘটনা কবির পক্ষে যতই অকিঞ্চিৎকর হউক না কেন। কবি কবে কাহাকে কি একটি ক্ষুদ্র কথা বলিয়াছিলেন, কবে কাহাকে কি একছত্র লিখিয়াছিলেন, কবে কি সামান্য ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাঁহার প্রিয়জন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহা জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে, তাঁহার সম্বন্ধে তাহাদের কৌতূহলের সীমা নাই। কবি "স্মরণ" নামক কবিতা পুস্তকে তাঁহার সহধর্ম্মিণীর উদ্দেশে যে-সকল স্বর্গীয় সুষমামণ্ডিত কবিতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার পবিত্র করুণ সৌন্দর্য্য এই শ্রেণীর কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে উহাকে সর্ব্বোচ্চ আসন প্রদান করিয়াছে। কিন্তু কবি-পত্নী সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহল উহাতে পরিতৃপ্ত হইবার নহে।

সাময়িকপত্র সম্পাদকগণ কখনও কবি-পত্নীর একখানি চিত্রও প্রকাশিত করিয়াছেন বলিয়া আমরা জ্ঞাত নহি; কবির জীবনচরিতকারগণ তাঁহার নামেরও কোথাও উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া স্মরণ হয় না।

সেইজন্য যখন 'বিচিত্রার' উৎসাহশীল সম্পাদক, আমাদের

পরম শ্রদ্ধাভাজন সুহৃদ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে তাঁহার পত্রের 'রবীন্দ্র-জয়ন্তী' সংখ্যায় পাঠকগণের চিত্তাকর্ষক কোনও অপ্রকাশিত-পূর্ব্ব সময়োপযোগী চিত্রের সন্ধান দিতে পারি কি না, তখন সর্ব্বপ্রথমেই আমার মনে উদিত হইয়াছিল চরিতাখ্যায়কগণ কর্তৃক উপেক্ষিতা কবির জীবনলক্ষ্মীর কথা।

অতঃপর সম্পাদক মহাশয় আমাকে চিত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিখিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। যাঁহারা অমায়িক লিপিবদ্ধ করিবার চেষ্টা আমাদের পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র। রবীন্দ্রনাথের উপযুক্ত সহধর্ম্মিণী—ইহাই তাঁহার প্রকৃষ্ট পরিচয়।

যশোহর জিলার অন্তর্গত দক্ষিণডিহিতে এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবারে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম বেণীমাধব রায়চৌধুরী। পিতৃগৃহে ইঁহার নাম ছিল ভবতারিণী, ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের সহিত বিবাহের পর ইঁহার নূতন নামকরণ হয়—মৃণালিনী, এবং এই নামেই তিনি



মৃণালিনী দেবী

ও বন্ধুবৎসল সম্পাদক মহাশয়ের সহিত পরিচয়লাভের সৌভাগ্য অর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে তাঁহার অনুরোধ পালন না করা কিরূপ অসম্ভব। কিন্তু কি লিখিব? কবির সুবর্ণময়ী লেখনী—যাহা তাঁহার হৃদয়ের গূঢ়তম রহস্য, অনির্ব্বচনীয় ভাব ও অবর্ণনীয় অনুভূতিকেও সুরের সীমার মধ্যে আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছে—সে লেখনীও যে পরিচয় লিপিবদ্ধ করিতে কম্পিত হইয়াছে, কবির জীবনীকারগণ যে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হন নাই, সে পরিচয় সুপরিচিতা ছিলেন। বিবাহের সময় তিনি ক্ষীণকায়া ছিলেন। বিবাহের পর রবীন্দ্রনাথের তৃতীয় অগ্রজ হেমেন্দ্র-নাথের পত্নী নীপময়ী তাঁহার স্বাস্থ্য ও শিক্ষার উন্নতির ভার লন। তাঁহার কন্যা প্রতিভা দেবী (লেডি চৌধুরী) প্রভৃতির সহিত তাঁহার শিক্ষাকার্য্য অগ্রসর হয় এবং তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই শিক্ষায় যথেষ্ট উন্নতিলাভ করেন। বাঙ্গালা ও ইংরাজী গল্প গ্রন্থাদি তিনি আগ্রহের সহিত পাঠ করিতেন। সঙ্গীতেও তিনি শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন এবং

বালকবালিকাগণের ক্রীড়ায় যোগদান করিতে আনন্দ অনুভব করিতেন। মাননীয়া শ্রীযুক্ত স্বর্ণকুমারী দেবী মহোদয়ার মুখে শুনিয়াছি যে তিনি মহিলাগণের শিল্প-মেলায় অনেকবার অভিনয়ে যোগদান করিয়া সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। একবার 'রাজা ও রাণী'র অভিনয়ে তিনি ব্রাহ্মণীর ভূমিকায় অবতীর্ণা হইয়াছিলেন। তিনি কখনও কোনও রচনা লিখিয়াছিলেন কিনা জিজ্ঞাসা করায় স্বর্ণকুমারী বলেন যে তাঁহার স্বামী বাঙ্গালার একজন শ্রেষ্ঠ লেখক, সেইজন্য তিনি স্বয়ং কিছু লেখা প্রয়োজন মনে করেন নাই।

মৃণালিনী দেবী অত্যন্ত স্নেহশীলা ও দয়াবতী রমণী ছিলেন এবং নীরবে কাজ করিতে ভালবাসিতেন। রবীন্দ্রনাথ একটি সনেটে তাঁহার এই আত্মগোপনের ভাবটি এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন:—

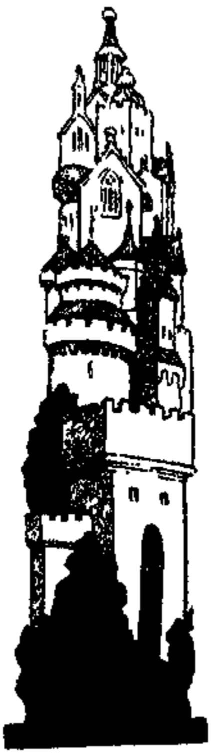
"যত কাল কাছে ছিলে বল কি উপায়ে
আপনারে রেখেছিলে এমন লুকায়ে?
ছিলে তুমি আপনার কর্ম্মের পশ্চাতে
অন্তর্যামী বিধাতার চোখের সাক্ষাতে।
প্রতি দণ্ড মুহূর্ত্তের অন্তরাল দিয়া
নিঃশব্দে চলিয়া গেছ নম্র-নত-হিয়া।
আপন সংসারখানি করিয়া প্রকাশ
আপনি ধরিয়াছিলে কি অজ্ঞাতবাস!
আজ যবে চলি গেলে খুলিয়া দুয়ার
পরিপূর্ণ রূপখানি দেখালে তোমার!
জীবনের সবদিন সব খণ্ড কাজ
ছিন্ন হয়ে পদতলে পড়ি গেল আজ!
তব দৃষ্টিখানি আজি বহে চিরদিন
চিরজনমের দেখা পলক-বিহীন।

১৩০৮ বঙ্গাব্দে ১৪ই পৌষ এই সাধ্বী সতীলোকে প্রয়াণ করেন।

আমরা আশা করি কবির ভবিষ্যৎ চরিতকারগণের নিকট এই মহিয়সী মহিলার স্মৃতি উপেক্ষিতা হইবে না।

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ

[এম-এ; এফ্-এস্-এস্; এফ্-আর্-ই-এস্]



গগনে গগনে নব নব দেশে রবি
নব প্রাতে জাগে নূতন জীবন লভি॥

২৫ বৈশাখ
১৩৩৮

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[রবীন্দ্র জয়ন্তী সমাপ্ত

মেঘদূত ও কুমারসম্ভব *

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন

[শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন জনৈক তরুণ সাহিত্যিক। তিনি যে বংলার সাহিত্য-সমাজে আজও তাদৃশ সুপরিচিত নন, তার কারণ তিনি কবিতা কিম্বা গল্প লেখেন না —লেখেন ঐতিহাসিক প্রবন্ধ। বলা বাহুল্য সে প্রবন্ধের পাঠক দেশে খুব বেশী নেই, কারণ সে প্রবন্ধ লেখাও যেমন কষ্টসাধ্য, পড়াও তদ্রূপ না হোক কিঞ্চিৎ যত্নসাধ্য।

সেন মহাশয়ের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় নেই, আছে শুধু চিঠির আলাপ। তিনি শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেনগুপ্তকৃত মেঘদূতের অনুবাদের যে চমৎকার মুখপত্র লিখেছেন, তা পড়ে আমি তাঁকে যে পত্র লিখি,—সে পত্রে আমি তাঁর একটি কথায় সন্দেহ প্রকাশ করি। মেঘদূতের জন্ম কুমারসম্ভবের আগে কি পরে এই ছিল আমার জিজ্ঞাস্য। তিনি বলেন—আগে, আমি বলি—পরেও হ'তে পারে। এবং কি কারণে আমার মনে এ সন্দেহ উদয় হয়েছে—সংক্ষেপে তাও বলি। সে প্রশ্নের উত্তরে তিনি যা দিয়েছেন, আমি তা প্রকাশযোগ্য মনে করি। কারণ কালিদাস কোন কাব্যখানি আগে লিখেছিলেন কোনখানি পরে তার কোনও external evidence নেই। এ বিচার করতে হবে একমাত্র internal evidenceএর সাহায্যে। এ বিচারে নানাদিক্ থেকে নানাবিধ evidence সংগ্রহ করতে হবে। এবং নানা অনুমানের যোগফলে যে জাতীয় প্রমাণ সিদ্ধ হয়,—সেই প্রমাণ আমাদের অস্বীকার করতে হবে। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেনের পত্র যে নব literary Criticismএর একটি অতি সুন্দর নমুনা, তা—যাঁর কালিদাসের কাব্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে,—তিনিই স্বীকার করতে বাধ্য]

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

আমি কুমারসম্ভবকে মেঘদূতের পরবর্ত্তী ও কালিদাসের অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সের লেখা বলে লিখেছি। আপনি আমার এ মতটি সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। আমিও গোড়াতেই স্বীকার করছি যে এ বিষয়ে আমি যে একেবারে নিঃসন্দেহ তা মোটেই নয় ; "কারণ এসব বিষয়ে জোর করে কিছু বলা অসম্ভব" এ কথা আপনিই লিখেছেন। প্রথম প্রথম আমিও কুমারসম্ভবকে মেঘদূতের পূর্ব্ববর্ত্তী বলেই মনে করতুম ; পরে আরও বিচারের পর আমার এ মত পরিবর্ত্তন করেছি। কেন সে কথা পরে বলছি। আগে আমার পূর্ব্বোক্ত মতের বিরুদ্ধে আপনি যে তিনটী যুক্তি দেখিয়েছেন সে সম্বন্ধে আমার মতামত আপনাকে জানাচ্ছি।

কুমারের ষষ্ঠ সর্গে 'ওষধিপ্রস্থের' যে বর্ণনা আছে তাকে মেঘদূতের অলকার first sketch বলে মনে করা সঙ্গত মনে হয় না। ওষধিপ্রস্থের বর্ণনার চেয়ে অলকার বর্ণনা অবশ্যই অধিকতর জঁাকালো এবং কবিত্বপূর্ণ কিন্তু তা হলেও ওষধিপ্রস্থের বর্ণনা অলকার বর্ণনার পূর্ব্বগামী না-ও হতে পারে। কারণ মেঘদূতে অলকার স্থান যতটা প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োজনীয়, কুমারে ওষধিপ্রস্থ তার কিছুই নয়। তাই অলকার বর্ণনায় কবিকে যতটা মনোযোগ দিতেই হয়েছে, ওষধিপ্রস্থের বর্ণনায় তা মোটেই দিতেই হয় নি—নেহাৎ প্রসঙ্গক্রমে কবি দশটি মাত্র শ্লোকে ঐ বর্ণনার কার্য্য সেরে নিয়েছেন। পক্ষান্তরে কুমারের তৃতীয় সর্গে অকালবসন্ত-সমাগমের বর্ণনা থেকে মদনদহনের দৃশ্য পর্য্যন্ত যে কবি-শক্তির পরিচয় পাই তার তুলনা নেই ; techniqueএর দিক্ থেকেই হোক্, কবিত্বের দিক থেকেই হোক্ কুমারের তৃতীয় সর্গ মেঘদূতের কোনো অংশের চেয়েই হীন নয় ;—ওই তৃতীয় সর্গে কালিদাস তাঁর সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করেছেন, কারণ ওটা কবির মুখ্যস্কিমের অন্তর্গত। পূর্ব্বমেঘে পাঁচটি শ্লোকে (৫২-৫৬) হিমালয়ের যে বর্ণনা আছে তাকে কুমারের প্রথম সর্গের হিমালয়ের চমৎকার বর্ণনার frist sketch মনে করা যেতে পারে। এ বিষয়ে আপনার কি মনে হয় আমাকে আমাকে জানালে সুখী হব।

* এই প্রবন্ধটি পত্রাকারে লেখক কর্তৃক শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়কে লিখিত—বিঃ সঃ।

বন্ধ্যা বধূ

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন দে

মঞ্জরি, তোর খোকাকে আজ নিয়ে
        সারাটা দিন লাগ্‌ল বড় ভালো,
জড়িয়ে আমায় হাত দু'খানি দিয়ে
        আঁধার বুকে জাল্‌ল কিসের আলো !
    ছোট্ট মুখের ছোট্ট হাসিটুক্
    কোন্ পুলকে পূর্ণ করে বুক
    কোমল দেহের মধুর পরশ টুক্
        আজ্‌কে আমার জীবন জুড়ালো !
সেদিন দেখি, মুখুয্যেদের নীলা
        ছোট্ট কাঁথায় নাম লিখেছে "মিনি,"
ছোট্ট মোজা বুন্‌ছে চারুশীলা
        ছোট্ট জুতোয় ফুল তুলেছে বিনি ;
    তাদের খোকা দুষ্টু নাকি বড়ো,
    পুতুল ভেঙে কর্‌বে ঘরে জড়ো,
    মায়ের কাছে খাবে দু'চার চড়ও
        দস্যিপনা কর্‌বে সারাদিনই !
পরশুদিনে দ'য়ের বাড়ী গিয়ে
        ধোপার সাথে ঝগড়া শুনি বসি',
ছেলের কটা ছোট্ট কাপড় নিয়ে
        হারিয়ে বুঝি ফেলেছে রামশশী ;
    আমিই শেষে খোকার কাপড়গুলি
    আপন হাতে মিলিয়ে নিলাম তুলি'
    কাট্‌ল বেলা আপন গৃহ ভুলি'
        লাগল ভালো দামের কষাকষি !
স্নানের ঘাটে সোপান বেয়ে' বেয়ে'
        আস্‌ছে উঠে ছোট্ট পায়ের ছাপ,
জলের কাছে এসে দাঁড়িয়ে থাকি চেয়ে'
        পাই যে বুকে দগ্ধ মরুর তাপ !
    কোন্ দেবতা অস্ফুট রেখা আঁকি'
    কোন্ অমরার চিহ্ন গেছে রাখি' ?
    সন্ধানে তাঁ'র ফির্‌ছে পোড়া আঁখি,
        বুকের ভিতর কাঁদ্‌ছে অভিশাপ !
সেবার দেখি দাঁড়িয়ে দ্বারের পাশে
        বাগ্‌দীবোয়ের চার বছরের "জিনে",
একটা শুধু পয়সা পাবার আশে
        আমার কাছেই আসে রথের দিনে ;
    ছোট্ট মুঠায় পয়সা দিলাম ভরে'
    জিজ্ঞাসিলাম হাত দুটী তা'র ধরে'
    'আমার কাছে আসিস এমন ক'রে—
        নতুন পুতুল অনেক দোব কিনে।"
পূজার সময় পড়্‌লে ঢাকে কাটি,
        ছুটবে পাড়ার "নোটন" "বিন্তু" "বাণী",
ছোট্ট পায়ের শব্দে কাঁপে মাটি
        হাস্যে ভরে শরৎ আকাশখানি !
    নবান্ন'তে ওদের কলরবে
    শীতের হাওয়া নিত্য মুখর হবে,
    "পিঠের দিনের" আনন্দ উৎসবে
        ওরাই ধরায় স্বর্গ দেবে আনি'।
আলোক-ছায়া রুদ্ধ প্রাণের স্রোতে
        কোন্ কামনার গোপন্ কমল হাসে !
শুষ্ক মরুর বক্ষে কোথা হ'তে
        দূর বনানীর ফুলের হাওয়া ভাসে !
    কোন্ চকোরীর অন্ধ আঁখির কোণে
    চাঁদের আলো ব্যথরি স্বপন বোনে !
    কোন্ চাতকীর পিয়াস-পাগল মনে
        মেঘের আশা বিফল হয়ে আসে !

প্রথম ও শেষ প্রশ্ন

শ্রীযুক্ত গোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' বাঙ্‌লা উপন্যাস সাহিত্যে নূতন ধারার প্রবর্ত্তন ও প্রথম প্রশ্ন করিয়াছিল, আর আজ বোধ করি 'শেষ প্রশ্নে' শরৎচন্দ্র শেষ প্রশ্ন করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের পুরোবর্ত্তী যুগের উপন্যাসসমূহ পাঠে দেখা যায় যে তৎকালীন লেখকেরা problem অপেক্ষা factকে প্রাধান্য দিয়াছেন—উদাহরণস্বরূপ বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' বা 'কৃষ্ণকান্তের উইল' ধরা যাক্‌

বিষবৃক্ষে কুন্দনন্দিনী এবং কৃষ্ণকান্তের উইলে রোহিণীকে ভিত্তি করিয়া যে সমস্যার সৃষ্টি করা হইয়াছে তাহা এত সামান্য যে সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণে সক্ষম হয় না—শেষ পর্য্যন্ত প্রচলিত সামাজিক বিধি সকলের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইবার নিমিত্ত উহাদের মৃত্যু ঘটাইয়া সমস্যার শেষ করা হইয়াছে। কিন্তু সেই তুলনায় ঘটনার সমাবেশ এত বেশী করা হইয়াছে যে এই সকল উপন্যাসকে অনায়াসে 'ঘটনামূলক' বলা চলে। অনেকে হয় ত 'আনন্দমঠের' নাম করিবেন।

'আনন্দমঠে' বাঙ্‌লাদেশের পরাধীনতার গ্লানিকে অবলম্বন করিয়া সমস্যার সৃষ্টি করা হয় নাই, এবং তাহা কেমন করিয়া অপনোদন করিতে হইবে তাহার নির্দ্দেশও নাই; ইহা কেবল বঙ্কিমচন্দ্রের vision। একটুখানি ঐতিহাসিক ঘটনাকে ভিত্তি করিয়া কল্পনায় তিনি ছবি আঁকিয়াছেন…… যদি এমনি সন্তানদলের সৃষ্টি করা যাইত, যদি এমনি করিয়া দেশমাতৃকার দুঃখের শেষ করা যাইত তাহা হইলে তাহা কত মধুর ও সুন্দর হইত!

এদিকে সাড়ে ছয় শত পৃষ্ঠার 'গোরায়' ঘটনা-কথা বলিতে হইলে বোধ করি পাঁচ ছয় পৃষ্ঠার অধিক প্রয়োজন হয় না………প্রায় সমস্তটাই সমস্যা। হিন্দুধর্ম্মের ও সমাজের ভিতর কোন গলদ ঢুকিয়াছে কি না, তাহার কোন অঙ্গ পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছে কি না, যদি হইয়া থাকে তাহা একেবারে পরিত্যাজ্য কি না?……ইহা লইয়াই পাতার পর পাতা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিতর্ক এবং চুলচেরা বিভাগ—কিন্তু সমস্যার সমাধান বা তাহার পন্থা নির্দ্দেশ করা নাই। সপক্ষে ও বিপক্ষে সর্ব্বপ্রকার মতামুমত লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠকের ও ভবিষ্য সংস্কারকদের উপর সমাধানের ভার দিয়াছেন।

এই যে উপন্যাসকে সমস্যামূলক করিবার চেষ্টা এবং এই শ্রেণীর প্রশ্নের সমাবেশ আমরা 'গোরার' আগে দেখিতে পাই না—তাই 'গোরা' বাঙ্‌লা উপন্যাস-সাহিত্যে নূতন ধারার প্রবর্ত্তন ও প্রথম প্রশ্ন তুলিয়াছে বলিতেছিলাম।

তাই বলিয়া এ কথা মনে করিলে ভুল হইবে যে, তৎকালীন লেখকেরা সমস্যা সম্বন্ধে চিন্তা করিতেন না। ফরাসী বিপ্লব সংঘটনের ফলে equality, fraternity, liberty-রূপ মতবাদ সারা বিশ্বে যে আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছিল বাঙ্‌লার তৎকালীন লেখকবৃন্দও তাহার প্রভাব কাটাইতে পারেন নাই। উদাহরণস্বরূপ, বঙ্কিচন্দ্রের 'সমস্যা' প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। 'শ্রীকৃষ্ণচরিত্র' 'ধর্ম্মতত্ত্ব' 'গীতার ভাষ্য' প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠে দেখা যায় যে ধর্ম্মমূলক সমস্যা লইয়াও তাঁহারা যথেষ্ট আলোচনা করিতেন। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে যথেষ্ট চিন্তা করিলেও উপন্যাস আকারে শুষ্ক সমস্যার আলোচনা করা তাঁহারা পছন্দ করিতেন না বা তখনকার রীতি ছিল না।

'গোরা'র প্রায় ত্রিশ বৎসর পরে শরৎচন্দ্র তাঁহার শেষ প্রশ্ন লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

Romantic উপন্যাসাকারে শরৎচন্দ্র যে জটিল ও দুরূহ প্রশ্ন উপস্থাপিত করিয়াছেন, তাহা বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ তথা সারাবিশ্বের জীবনে সত্য হইয়া উঠিয়াছে। সভ্যতার প্রগতি থামিয়া যায় নাই—দিনের পর দিন, আমরা ক্রমোন্নতির পথে

অগ্রসর হইতেছি, কিন্তু বিদ্যা, সভ্যতা, ও অভিজ্ঞতা-লব্ধ জ্ঞানকে ব্যবহারিক জীবনে অনুসরণ করিতে পারি না কেন?

আমরা প্রায় সকলেই সূর্য্যগ্রহণের ও চন্দ্রগ্রহণের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাকে স্বীকার করি এবং জ্ঞান ও যুক্তিদ্বারা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি, কিন্তু রাহুগ্রাসের দোষ কাটাইবার জন্য হাঁড়ি ফেলিতে দেখি—নিজেরই বাড়ীতে। তাহাতে বাধা দিবার মত জোর বা প্রবৃত্তি আসে না। ঈশ্বর সম্বন্ধে আলোচনা করিবার কালে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ প্রভৃতি হইতে উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার একত্বের প্রমাণ করিতে যাই কিন্তু কার্য্যকালে ঘেঁটু মাকালকেও প্রণাম না করিবার মত মনের জোর আমাদের নাই। যখন শুনি, কোন স্ত্রী তাহার দুশ্চরিত্র স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়াছে, তখন ব্যথায় ও রাগে অভিভূত হইয়া পড়ি। যুক্তি দ্বারা রাগের কোন কারণ খুঁজিয়া না পাইলে 'মনুর নির্দ্দেশ আমাদের সর্ব্বদা পালনীয়' প্রভৃতি অন্ধযুক্তি দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থন করিবার চেষ্টা করি। 'শেষ প্রশ্নে' আশুবাবু এক জায়গায় বলিতেছেন,—"মা, কমল, তুমি যখন আমাদের যাহা কিছু পুরাতন ও আদর্শ বলিয়া জানি, তাহাকেই আক্রমণ কর, তখন কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করিতে থাকি অথচ তাহার বিরুদ্ধে বলিবার মত একটী কথাও খুঁজিয়া পাই না, কিন্তু সত্য বলিয়া স্বীকারও করিতে বাধে।"

তাই শরৎবাবু প্রশ্ন করিয়াছেন, যুক্তি ও সংস্কারে এই যে দ্বন্দ্ব, সংস্কারকে পরিত্যাগ করিয়া যুক্তিকে গ্রহণ করিবার ও নির্ভীকভাবে পালন করিবার মত মনের জোর ও দৃঢ়তা কবে আসিবে? কম দিন ত কাটিয়া যায় নাই—ক্রমোন্নতি-শীল সভ্যতার ছায়ায় অনেকদিন ত বাস করিতেছি, কিন্তু এখনও কি সত্যকে পালন করিবার মত দৃঢ়তা আসিবার সময় হয় নাই?

হয়ত, এই প্রশ্নই শেষ নয়—ইহার পরে, অন্য কেহ আবার প্রশ্ন করিবেন। তবুও ইহাকেই শেষ প্রশ্ন বলিলাম, কারণ ইহা শুধু হিন্দুর সমাজকে লইয়া নয়,—আধুনিক পৃথিবীর সকল সমাজের সকল লোকের প্রতি অনুবিধরূপ প্রযোজ্য।

এই ত্রিশ বৎসরের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া শরৎচন্দ্র পর্য্যন্ত অনেকেই ত অনেক প্রশ্ন করিলেন, কিন্তু কয়টী প্রশ্নের উত্তর মিলিয়াছে বা কতটা সংস্কার হইয়াছে?

'শেষ প্রশ্নের' যাদুকরী প্রভাবের মধ্য দিয়াও যে অসঙ্গতি দৃষ্টিগোচর হয় সে সম্বন্ধে কিছু বলিবার চেষ্টা করিব। আগাগোড়া, আমরা দেখিতে পাই কমল সত্য-পালন এবং তাহাকে সর্ব্বসময়ে ও সর্ব্বকালে স্বীকার ও অনুসরণ করাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম ও মনুষ্যত্বের চরম বিকাশ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। যে পঙ্কিলতার মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা অকপটে স্বীকার এবং এই শ্রেণীর অন্যান্য উক্তি হইতে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি কোনখানে ভগবানকে স্বীকার বা অস্বীকার কিছুই করেন নাই এবং সত্যের permanencyতেও বিশ্বাসী নন। তিনি বলিয়াছেন, সত্য পরিবর্ত্তনশীল ও অশাশ্বত, কাল যাহা সত্য ছিল আজ তাহা নহে এবং আজ যাহা সত্য কাল হয়ত তাহা থাকিবে না। কিন্তু আমাদের মনে হয়, প্রদীপের পলিতার যে অংশ জ্বলিয়া ছাই হইয়া গিয়াছে, যে অংশ জ্বলিতেছে এবং যে অংশ জ্বলিবার অপেক্ষায় রহিয়াছে সবই সত্য, কোনটাই মিথ্যা নয়—সে যাই হোক্।

তিনি সত্যকে অশাশ্বত বলিয়াছেন বটে, কিন্তু অতীত ও অনাগতকে একেবারে অস্বীকার করেন নাই কেননা, বাতুল ছাড়া তাহা পারে না। অতীত ও ভবিষ্যতের বর্ত্তমানের সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা কেমন করিয়া সম্ভব হয়। বর্ত্তমান যদি permanent না হয়—তাহার যদি stability না থাকে, তাহা হইলে কেমন করিয়া বর্ত্তমানের উপর নির্ভর করিয়া অতীত ও ভবিষ্যৎকে তাহার সহিত সংযোগ করিতে পারি?

কমল অনাগত দুঃখের ভয়ে বর্ত্তমানের ক্ষণিক যে আনন্দ তাহাকে উপেক্ষা করিতে চান নাই—কিন্তু তিনি বলিয়াছেন—অনাগত দুঃখ যখন আগত হইবে তখন বর্ত্তমান আনন্দের স্মৃতিগুলিই তাঁহার সান্ত্বনা হইয়া থাকিবে

—ক্ষণবাদী কমলের এই অতীতকে নির্ভর কেমন যেন অসামঞ্জস্যের সৃষ্টি করিয়াছে।

কমলের এই যে বর্ত্তমানের উপাসনা-জগতে নূতন নয়—পূর্ব্বে বৌদ্ধ সমাজে ক্ষণবাদী বলিয়া এক সম্প্রদায় ছিল, যাঁহারা বর্ত্তমানের উপাসনায় ও উচ্চকণ্ঠে তাহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রচারে ব্যাপৃত ছিলেন কিন্তু কালে তাঁহাদের অস্তিত্ব লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা সমাজ ও সভ্যতাকে সুন্দর ও নূতন—বহুতর দানে বিভূষিত করিলেও এত আবর্জ্জনার আমদানী করিয়াছিলেন যে তাহাতে একটা পঙ্কিলতার সৃষ্টি করিয়াছিল। বোধ করি, এই সমাজ তাঁহাদের অবলুপ্ত করিবার প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিল এবং তাহা কার্য্যেও করিয়াছিল।

এম্‌নি আর কোন সম্প্রদায়ের নাম না পাওয়া গেলেও গ্রীক ও ভারতীয় দার্শনিকদের মধ্যে অনেক ক্ষণবাদীর সন্ধান পাওয়া যায় কিন্তু কেহই এই মতকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই। তবে?

শ্রীগোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

* পণ্ডিত উপেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত শাস্ত্রীর সভাপতিত্বে Docteur Guin's Ben Venuto de-novo Chatra নামীয় তর্কসভার পাক্ষিক অধিবেশনে লেখক কর্ত্তৃক পঠিত ও বিতর্কিত।

কথা! কথা!! কথা!!!

শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়

কথা - কথা—কথা দিয়ে প্রাণের শূন্যতা আজো চাহি
ভরিতে মা—চলি' নিত্য বাঙ্ময়ী তরণীখানি বাহি'।
দিন আসে ··দিন যায় বর্ষ পাছে বর্ষ নিত্য ছুটে···
বাক্যদাবদগ্ধ বক্ষে ঊষর অতৃপ্তি জেগে উঠে···
তবু ভাবি: রিক্ত বাক্যবীজে বুঝি ফলিবে ফসল·
হৃদি পুষ্পপাত্রে বুঝি সাজাইয়া কুসুম নকল
উপচিবে পদ্মগন্ধ! ভাবি—বুঝি কথা-মালা গাঁথি'
গিলে তোরে!·হায়! শুধু কথা হয় পুঁজি—চিরসাথী!

সে দীন সম্বল সখ্যে যবে পরে নাহি মিলে তৃপ্তি,—
শুষ্ক হৃদাকাশে যবে নাহি জাগে বারিদের দীপ্তি
মেদুর বরণে,—যবে জাগে তৃষা প্রাণের নিরালে,—
অস্বীকার করি তারে ভুলি বচনের ইন্দ্রজালে!
ক্ষোভে চাই মিটাতে মা, অন্তরের গূঢ় পিপাসায়
শব্দভেদী শরধারে—রচি শুধু শরশয্যা হায়!

হেন অভিনয় ছাড়ি' তোরে আহ্বানিব প্রাণভরা!
নীরব অঞ্জলি-অর্ঘ্যে কবে—ছাড়ি' কথার পসরা?
কবে মুখরতা-ফণা নম্রশীর্ষ হবে মাগো তোর
মৌনস্পর্শে—মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গম সম? কবে মোর
চিদাকাশে তরঙ্গিয়া যাবে তোর অরূপ কল্লোল?
কবে হবে স্তব্ধ—বৃথা কথা—কথা—কথা উতরোল?

ফক্কা গেরো

শ্রীযুক্তা আমোদিনী ঘোষ

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

৮

সুবিখ্যাত প্রবন্ধকার ও সমালোচক রূপে মুরারী বাবু প্রখর মনীষা ও সুগভীর অন্তর্দৃষ্টির বলে, জগতের অনেক জটিল তথ্য ও তত্ত্ব উদ্ভেদ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু চন্দ্রলেখার ভিতরকার মানুষটিকে না পারিলেন ধরিতে ছুঁইতে, না পারিলেন কোনও প্রকারে বুঝিয়া উঠিতে।

অতি সাধারণ মেয়ে চন্দ্রলেখা! বিদ্যা বুদ্ধি তেমন কিছু ওর প্রখর নয়। গোটা মানুষটা যেন এক ধীর মন্দাক্রান্তা ছন্দে গড়া ওর—কোথাও তীব্রতা নাই, তীক্ষ্ণতা নাই। বয়স নাতিনীর সমান—বাল্যদশাও তাহার অতিক্রান্ত হয় নাই। জীবনে কি-ই বা সে দেখিয়াছে, কি-ই বা সে জানে? তবু তাহার কাছে তাঁহার পরাভব ঘটিল। ও যেন দুর-বিস্তৃত দুনিরীক্ষ্য কুজ্ঝটিকা। অবয়বহীনা তবু সর্ব্বাচ্ছাদক। মুরারী বাবুর রোষ-তপ্ত চিত্ত ব্যর্থ অভিলাষে আহত হইয়া ভুজঙ্গের মত ফণা মেলিয়া ফুঁসিতে থাকে। মনের আকাশ অসহ্য বিষ-বাষ্পে ভরিয়া ওঠে। লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক—লেখার জন্য সম্পাদকদের তাগিদের চিঠি টেবিলে জমিতে থাকে। যে লেখনী অহোরাত্র অবিশ্রান্ত চলিত, তাহা ওঠে নিশ্চল হইয়া।

অনিল আসিয়া বলে "মেসো মশায়, পায়রাডাঙা থেকে যারা টিকায়ের অর্ডার দিয়েছিল, তারা আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।"

উদ্‌ভ্রান্ত কল্পনার মাঝখানে জাগিয়া উঠিয়া মুরারী বাবু অনিলের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকেন, তাহার পর অবহিত হইয়া বলেন, "বিকালে ৫টায় আসতে বলে আয়। এখন আমার দেখা করার সময় নেই।"

অনিল চলিয়া গেলে কালীতে কলম ডুবাইয়া খুব খানিকটা খচ্ খচ্ করিয়া লিখিতে থাকেন, কিন্তু পড়িয়া দেখেন লেখাটা হইয়াছে জোলো দুধের মত বস্তুহীন। আকার আছে, অথচ সত্তা নাই।

সহকারী কুঞ্জবিহারী আসিয়া বলে "নীহারিকার শেষ প্রুফশীট এসেছে, খুল্‌ব এখনই?"

মুরারী বাবু কুঞ্জবিহারীর দিকে তাকান। বয়স তাহার বছর পঁচিশেক শ্যাম বর্ণ, সুষ্ঠু গড়ন, মুখে যৌবনের দীপ্তি কালো ভ্রূর নীচে দীপ্ত ধূসর কৃষ্ণ চোখ।

মুরারী বাবুর মনে হয়, এই লোকটাকে তিনি যেন নূতন দেখিলেন, ওর সর্ব্বাঙ্গে বিকীর্ণ যৌবনপ্রভা তীক্ষ্ণ তীরের মত মুরারী বাবুর চক্ষে বিঁধিল।

কথার উত্তর না পাইয়া কুঞ্জবিহারী বলিল, "বাণ্ডিলটা আপনার কাছে এনে দেব?"

রাগিয়া মুরারী বাবু বলিলেন "আমি ত তোমার বলিনি বাণ্ডিল আমার কাছে আন্‌তে। আমি-ই যদি কর্ব্ব—তবে তোমাকে রাখায় আমার প্রয়োজনটা কি? যাও, নিজের চরকায় তেল দাও গে।"

কুঞ্জবিহারী মাথা নীচু করিয়া চলিয়া গেল।

মুরারী বাবু হাঁকিলেন, "রামভজন, তামাক দিয়ে যা।"

গড়্‌গড়াতে কলিকা সাজাইয়া সটকা নল কাঁধে ফেলিয়া রামভজন আসিল।

লোকটা খোট্টা। লম্বা-চৌড়া আঁট-সাঁট, পেশল বপু। বয়স কাঁচা। অঙ্গে পারিপাট্যের লেশ নাই, তবু চেহারা কান্তিময়।

মুরারী বাবুর মিঠা তামাক তিতো হইয়া গেল। গুণ্ডার সর্দ্দারের মত এই ষণ্ডা লোকটা তাঁহার সংসারে কবে ঢুকিল!

পালোয়ান দারোয়ান রাখা চলে, পালোয়ান চাকর বসিয়া বসিয়া শুধু অন্ন ধ্বংস করে। দেড় পোয়া চালের জায়গায় খায় দেড় সের চালের ভাত। নিরিটার এখনও বুদ্ধি পাকা হইল না; এ সোজা কথাটা তাহার মাথায় এতদিনে ঢুকিল না।

কটমট্ করিয়া চাহিয়া মুরারী বাবু কহিলেন, "এই, তোম্‌কো মুলুক কাঁহা?"

টুলের উপর সন্তর্পণে আলবোলা নামাইয়া রাখিয়া রামভজন বলিল "আরা জিলা হুজুর।"

"কেৎনা রোজসে তোম্ হিঁয়া হ্যায়?"

"ছ সাত্ মাহিনা হোবে হুজুর।"

"কোন্ তোম্‌কো হিঁয়া লায়া?"

হাস্য-বিকসিত আস্যে রামভজন কহিল "আপ্ হি লায়া হুজুর মধব্ বাবুকা কোঠিসে। হাম্ ত উন্‌হিকো কাম কর্‌তেথে পহলে।"

ভ্রুকুটি করিয়া মুরারী বাবু গুড়গুড়ি টানিতে লাগিলেন। রামভজন চলিয়া গেল। মুরারী বাবু উঠিয়া বাড়ীর ভিতর গেলেন।

পায়ের শব্দ পাইয়া নির্ঝরিণী কাছে আসিল, বলিল, "বাবা, ভিখন ঠাকুর বাড়ী যেতে চাইছে, ওর ছোট ছেলের বিয়ে।"

"বাড়ী যাবে· লোক দিক্ আগে।"

"লোক ও এনেছে। তাকে বহাল করে আজকার গাড়ীতেই যাবে বলছে।"

"লোক এনেছে? কোথায় লোক দেখি।"

আজ্ঞা শুনিয়া ভিখন ঠাকুর তুইজন সঙ্গীসহ রান্নাঘর হইতে বাহিরে আসিল।

ভিখন ঠাকুরের চুল পাকিয়াছে। কিন্তু যে লোক দুটিকে সে আনিয়াছে প্রবীণতার উপর বিন্দুমাত্র দাবী তাহাদের নাই। বলিষ্ঠ ঋজু শ্যাম সুচিক্কণ দেহ।

খাপ্পা হইয়া মুরারী বাবু কহিলেন, "এ ছুটো ত নভিস্, এদের দ্বারা কাজ চলবে না—লোক আমি নিজে আনব।"

নির্ঝরিণী মিনতি করিয়া বলিল, "ভিখন যে আজকার গাড়ীতেই যাবে বাবা।"

মুরারী বাবু চলিয়া যাইতে যাইতে বলিলেন, "আজ কিছুতেই যেতে পারবে না।"

ভিখন অর্দ্ধহাস্যে কহিল, "হাম ত আজ জরুর যাইব দিদি। শিউপরসাদকে বহাল করিয়ে দিয়ে যাইব, পিছে বাবু দুসরা আদমি রাখিয়ে লিবেন। ই ত পাক ভালাই জানে, বাবু দুদিন খাইলে আপ্‌সে ঠাণ্ডা হোইয়ে যাবে।"

মুরারী বাবু বাগানে গেলেন। বাগানটা শুধু ফুলের নয়। অর্দ্ধেক তার সব্জির। একটা মালী খাটে। আগে ছিল ওর বাপ। বুড়া ছেলেকে রাখিয়া বাড়ী গিয়াছে।

বাগানের একধারে গোয়াল ঘর। তিন চারিটি গরু। নবকৃষ্ণ ওরফে নবা গরুর রাখালি করে। মালীর ছেলে বলাইয়ের সঙ্গে ওর মিতালি। মটরসুঁটির ক্ষেতের ওপিঠে ফুলদল-বিকীর্ণ শেফালির তলায় ঘাসের উপর বসিয়া বলাই নবাকে বংশীবাদন শেখায়। মাথার উপর ওদের পাখী ডাকে, গায়ে ফুল ঝরিয়া পড়ে, দূরে নদীর কলগান শোনা যায়।

উন্মনস্ক মুরারী বাবু মটর সুঁটির ফুল ও পাতা ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে সেইখানে গিয়া দাঁড়াইলেন।

ছিন্ন-জ্যা ধনুকের মত দুই বন্ধু পরস্পরের কণ্ঠাশ্লেষ ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

তর্জ্জন করিয়া মুরারী বাবু কহিলেন, "কি হচ্ছে এখানে? বাঁশী বাজানো? থিয়েটারের বাবু হয়েছেন সব; র‍্যাস্কেল কোথাকার, বাগানে ক'ঘড়া জল দিয়েছিস্ আজ? কটা ক্ষেত কুপিয়েছিস্? যা, কাস্তে আন্ ঘাস নিড়া গিয়ে। এই উল্লুক, গরু কই তোর?"

"এজ্ঞে, মাঠে চর্‌তে গিয়েছে।"

"কাল থেকে গরু চর্‌তে যাবে না, তুই ঘাস কেটে এনে খাওয়াবি। যত ফাঁকিবাজ, আলসে, অকর্ম্মণ্যের দল এসে জুটেছে!"

বলাই কাস্তে আনিতে তাহার ঘরের দিকে চলিল; নবা, যে মাঠে গরু চরিতেছে সেই মাঠের দিকে যাত্রা করিল।

মুরারী বাবু রোষকুটিল কটাক্ষে অপস্রিয়মান লঘু দুঠাম দুই পল্লী-তরুণের দিকে চাহিয়া রহিলেন। খানিক পরে গেট ঠেলিয়া বাহির হইলেন পথে হাঁটিতে; মনের ভিতরে

তাঁহার মন যে-কথাটা স্বীকার করিতেছিল, তাঁহার বাহিরের মন ধরিতেছিল সেই স্বীকারোক্তির কণ্ঠরোধ করিয়া! স্খলিত দন্ত, পলিত কেশ, গলিত দৃষ্টির ভিতর দিয়া পরপারের ডাক যখন তাঁহার কাছে পঁহুছিয়াছে; তখন জীবনবৃন্তে নবোদ্ভিন্ন মাধবী তিনি আহরণ করিলেন কেন?

মনের ভিতর প্রশ্ন উঠিতে থাকে,—জলবুদ্বুদের মত। উত্তরের শেষে প্রশ্ন আসে, প্রশ্নের শেষে উত্তর। প্রথম নম্বর মনের কথায় দ্বিতীয় নম্বর মন চটিয়া বলে সংসারে যে ধারা প্রচলিত, যে কার্য্যে লোক অভ্যস্ত,—তাহার আবার জবাবদিহি কি! পুরুষ প্রয়োজন বোধে নারীকে চিরদিন গ্রহণ করিয়াছে—অমন ধর্ম্মপ্রাণ রাজা দশরথ—তাঁহার রাণী ছিল সাত শ'র ও ওপরে। বল্মীকস্তূপে পরিণত সহস্র বৎসরের বৃদ্ধ চ্যবনমুনি-হাড়ে যাহার ঘাস গজাইয়া গিয়াছিল,—সে এক ষোড়শী রাজকন্যার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে বিবাহ করিয়াছিল!

নারীর সাহচর্য্য বিনা নরের জীবন যাত্রা কোথায় কবে নির্ব্বাহ হইয়াছে! ছলে বলে কৌশলে নারীকে গ্রহণ করার অধিকার পুরুষের চিরদিন চলিয়া আসিতেছে!

ভাবিতে ভাবিতে মুরারী বাবু বাড়ীর দিকে ফিরিয়া চলেন। অন্দরে ঢুকিতে উচ্ছলিত হাস্যরোল কানে আসে।

ভিতরে পা বাড়াইতেই দেখেন, রান্নাঘরের বারান্দায় নির্ঝরিণী, চন্দ্রলেখা, অনিল এবং তাহার সঙ্গে আরেক জন যুবক হাস্যালাপে বিভোর।

মুরারী বাবুর পড়ন্তি বয়স—চন্ করিয়া রক্ত মাথায় চড়িয়া গেল।

কতক্ষণ হইল বা তিনি ঘরের বাহির হইয়াছেন! তখন ত ইহাদের কাহাকেও কোথাও দেখেন নাই, যেই অন্তরালে গিয়াছেন অমনি ইহারা একত্র সমবেত হইয়াছে! কন্‌স্পিরেটর্ আর কাহাকে বলে!

নিরিটা পর্য্যন্তও এই দলে! দুনিয়ার কাহাকেও আর বিশ্বাস করিবার যো নাই!

মুরারী বাবু চন্দ্রলেখার দিকে চাহিলেন। পরণে তাহার একখানা ডালিমফুলী শাড়ী, গায়ে গোলাপী রংএর ব্লাউস। কাঞ্চনবরণা গৌরীর গায় কাঞ্চনালঙ্কার মিশিয়া গিয়াছে। সীমন্তে ও ললাটে দীপ্ত সিন্দুর রেখা। অধরে তাম্বুল-রাগ। হাস্যচ্ছটায় মুখ উদ্ভাসিত। চন্দ্রলেখা পরিপূর্ণ চন্দ্রলেখার মত অনবগুণ্ঠিতা ও নিরবগুণ্ঠিতা।

গোটা উর্ব্বশী কবিতাটা মুরারী বাবুর মনে ঝলকিয়া উঠিল। আষাঢ় গগনে মুহুর্মুহু চমকিত বিদ্যুৎবিভার মত আগা হইতে গোড়া পর্য্যন্ত তাহার বিশেষ চরণগুলি—(মুরারী বাবু নিজে একবার এ কবিতাটি বিশদ সমালোচনা করিয়াছিলেন। পঞ্চাশের কাছে বয়স হইলেও তাঁহার স্মৃতিশক্তির কিছুমাত্র ন্যূনতা ঘটে নাই) তাঁহার চিত্তাকাশ অগ্নি-রেখায় দীপ্ত করিয়া তুলিল।

সহসা চকিত এক ইঙ্গিতের নিগূঢ় সঞ্চারে সব হাসি চিহ্নহীন হইয়া মিলাইয়া গেল, সব চপলতা অচলতায় পরিণত হইল।

যে ছেলেটি অপরিচিত, মুরারী বাবু তাহার দিকে ফিরিয়া অতি পরুষ কণ্ঠে কহিলেন "তুমি কোথা থেকে এসেছো?"

নির্ঝরিণী অগ্রসর হইয়া কহিল, "ও ভবেশ, বড়দির দেওর। ও ত এখানেই থাকে।"

"এখানে থাকে? কৈ, আমার সঙ্গে ত কখনও দেখা হয় নি।"

অপ্রস্তুত ভবেশ মাথা চুলকাইতে থাকে।

মুরারী বাবু ভ্রূকুটিকুটিল আস্যে জিজ্ঞাসা করেন, "পূজোর সময় তুমি বিজয়ার প্রণাম করতে এসেছিলে, নয়?"

"আজ্ঞে হাঁ"।

"তারপর আর বাড়ী যাও নি"?

"না"।

"কোথায় থাক"?

"দু তিন জনে মিলে একটা ছোট বাসা নিয়েছি এখানে।"

"এ পর্য্যন্ত আর এখানে এসোনি?"

আম্‌তা আম্‌তা করিতে করিতে ভবেশ বলিল, "আজ্ঞে এসেছিলুম।"

"আবার এলে আমার সঙ্গে দেখা কোরো। তোমার ত ঢের সময়—প্রাক্টিসগুলো তোমায় দিয়ে করিয়ে নেব।"

মুরারী বাবু উপরে উঠিয়া গেলেন।

অবেশ বক্র হাস্তে চন্দ্রলেখার দিকে চাহিয়া কহিল, "চলুন।"

অনিল উঠিয়া পড়িয়া বলিল, "চলুন আমিও আস্‌ছি আপনার সঙ্গে।"

৯

তিনদিন অবিশ্রান্ত চিন্তা করিয়া মুরারীবাবু ঠিক করিলেন, তিনি ইহার একটা সুরাহা করিবেন। শত্রুসঙ্কুল স্থানে যাহার বাস,—আত্মরক্ষার জন্য কোনো বিশেষ উপায় অবলম্বন তাহার অনিবার্য্য।

আত্মানং সততং রক্ষেৎ—শুধু কৌটিল্যের বিধান নয়। ওটা সর্ব্ববাদীসম্মত সার্ব্বজনীন নীতি। আত্মরক্ষার জন্য মানুষ মানুষকে নির্ব্বিবাদে হত্যাও করিতে পারে। আইনে পর্য্যন্ত তাহা বাধে না।

মুরারীবাবু কোন্ পন্থানুসরণ করিয়া আত্মরক্ষা করিবেন তাহা মনে মনে স্থির করিয়া ফেলিয়া পরম উল্লসিত হইয়া উঠিলেন।

নজর পড়িল টেবিলের উপর ঈষৎ আরক্ত রিভিউ অফ রিভিউ'র এক সমালোচনার উপর। উৎসাহে ও আনন্দে কাগজটা টানিয়া নিয়া লিখিতে বসিয়া গেলেন। পাতার পর পাতা ভরিয়া উঠিতে লাগিল। সূক্ষ্ম গবেষণার আকর্ষণে খর বিশ্লেষণের জালে জ্ঞানাম্বুধির তল-নিহিত অমূল্য রত্নরাজি সে প্রবন্ধ-সৈকতে আহরিত হইয়া প্রভা বিকীর্ণ করিতে লাগিল।

লেখা শেষ করিয়া আদ্যোপান্ত একবার পাঠ করিলেন। তাহার পর পরম পরিতৃপ্ত মনে বেড়াইতে বাহির হইলেন।

ফিরিয়া যখন আসিলেন, তখন সঙ্গে দুইজন মিস্ত্রি ও দুইজন রাজমিস্ত্রি। বাবুর সঙ্গে সরাসর তাহারা উপরে তেতালার ঘরে গেল।

অনিলের রুদ্ধ ঘরে চন্দ্রলেখা ঝড়ের মত উড়িয়া আসিয়া পড়িল।

অনিল সেভিংকেস খুলিয়া ক্ষুরে ধার দিতেছিল, তাহা ছাড়িয়া দিয়া শশব্যস্তে উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল "ব্যাপার কি?"

চন্দ্রলেখা বলিল, "আমায় বাঁচাও।"

বেদনাদিগ্ধ করুণ হাস্তে অনিল বলিল, "ব্যস্ত হোয়ো না মা! বিষয় কি তা আমায় আগে জান্‌তে দাও।"

"দেখেছো ওপরে কারা গেল?"

"কারা গেল?"

"দুজন ছুতোর, ও দুজন রাজমিস্ত্রি।"

"তাতে কি হোল? ছুতোর গেছে মেসোমশায়ের টেবিলের ভাঙ্গা পায়া সার্‌তে, রাজমিস্ত্রি গেছে ফাটা ছাদ সারতে।"

"তা নয়, তা নয়—ওরা এয়েছে আনারকলিকে জ্যান্ত কবরে গাড়্‌তে।"

"কি বলেন—আনারকলির জ্যান্ত কবর—কি তার মানে?"

"মানে আর বোঝাতে হবে না—আপনিই তা সবাইকে বুঝিয়ে নেবে। সভা না ভাঙ্গতেই শেষের গানের শেষের ধুয়াটি গেয়ে যাই—বিদায় বৎস, চিরবিদায়!"

চন্দ্রলেখার চোখের জল কপাল বাহিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

অনিলের চক্ষু বাষ্পাকুল হইয়া উঠিল। গভীর নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে কহিল, "কোনো পথ যদি আমি দেখ্‌তে পেতাম—কোনো ক্ষমতা যদি আমার থাক্‌ত—

চন্দ্রলেখা দুই হাতে অনিলের হাত সাপটিয়া ধরিয়া বলিল—"তা হ'লে তুমি আমায় বাঁচাতে? বল, শুধু এই কথাটিই না হয় বল?"

অনিল উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে একবার খোলা দরজার দিকে চাহিয়া তাহা বন্ধ করিয়া দিয়া তাহাতে পিঠ দিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—'আপনি আপনার মার কাছে যদি যেতে চান, তবে আমি আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসতে পারি।"

"মার কাছে? বেচারা নিঃসহায় নিরুপায় মা আমার। ছিল রাজেন্দ্রাণী, এখন ভিখারিণী, পরের প্রসাদোপজীবিনী। একটি ভাই আমার তারই দাঁড়াবার জায়গা নেই। খুড়ীমা উঠ্‌তে বস্‌তে দোষ ধরেন; দিন কাটে পরিবাদে অপবাদে

চোখের জলে। কোথায় রাখবে আমাকে আমার মা? কোথায় কোন্‌খানে আশ্রয় দেবে? ক্রখে গিয়ে ছিনিয়ে যখন আনবে তখন মা কোন্ সান্ত্বনা নিয়ে বাঁচবে? এখন মা জানে আমি সুখে সম্পদে আছি—অত বড় জামাই তার—"

বাধা দিয়া অনিল বলিল, "কিন্তু এ-ও ত হ'তে পারে যে আপনি শুধু শুধুই এতটা ঘাবড়াচ্ছেন।"

"আমার দুঃসংশয় যে নিঃসংশয় সত্যে পরিণত হতে যাচ্ছে—তার প্রমাণ আমি পেয়েছি—আপনার মেসোমশায় উপরে উঠ্‌বার সময় আমার দিকে যে দৃষ্টিপাত করে গেলেন—সেই দৃষ্টিতে। অন্য মেয়ে হ'লে এখন ডেস্‌পারেট একটা কিছু করে বস্‌ত। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে এই যে আমার ও রকম শক্তিও নেই সাহসও নেই। ভয়ানক ভীরু মেয়ে আমি—একেবারে ব্যাক্‌বোন্‌লেস্। আমি যত দিন বাঁচব ততদিন আমার কাটাতে হবে—"

বলিতে বলিতে চন্দ্রলেখা উচ্ছলিত ক্রন্দনবেগে অনিলের বাহুর উপর লুটাইয়া পড়িল।

সন্ত্রস্ত হইয়া অনিল বলিল "অত ব্যাকুল হচ্ছেন কেন! খুব খারাপও যদি কিছু ঘটে তারো ভিতর পথ একটা থাক্‌বেই। আপনি যা করতে চান—আমি তার সহায় হব এইটে জেনে রাখুন। এখন শান্ত হোন,—ঐ মেসো মশায় নামছেন—পালান, শীগ্‌গীর পালান।"

উচ্চকিত হরিণীর মত চন্দ্রলেখা চকিতে অন্তর্হিত হইয়া গেল। অনিল তাড়াতাড়ি বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

খানিকক্ষণ পর অনিল ফিরিয়া আসিয়া নির্ঝরিণীকে খুঁজিয়া বাহির করিল।

কপাট ভেজাইয়া নির্ঝরিণী তাহার ঘরে শুইয়া ছিল। আজ তাহার মনও বিষম ব্যাকুল। সে যাহা বুঝিয়াছিল এবং যাহা বোঝে নাই, নিজের কল্পনার মধ্যেই সে তাহার মীমাংসার পথ খুঁজিতেছিল। কিন্তু সে পথ ঘিরিয়া চারিদিকে অন্ধকার শুধু নামিতেছিল।

দরজার কাছ হইতে অনিল বলিল, "তুমি এখানে আছ!"

নির্ঝরিণী উঠিয়া বসিয়া বলিল, "তুমি না বেরিয়ে গেলে?"

অনিল টেবিলের কাছে বেতের মোড়াটি টানিয়া বসিয়া বলিল "যে কাজে গিয়েছিলুম, তা হাসিল করে এলুম। আয়োডিন্ আছে তোমার কাছে?"

"আছে।"

"আমার বাঁ হাতটায় একটু মালিশ করে দেবে?"

নির্ঝরিণী কিছু না কহিয়া আলমারী খুলিয়া আয়োডিনের কৌটা বাহির করিয়া আনিল। মনে মনে সে শুধু একটু বিস্মিত হইল, অনিল তাহার সেবা করিয়াই ক্ষান্ত—সেবা লওয়ার দিকে ওর কোনো ব্যগ্রতা কখনও প্রকাশ পায় নাই। আজ একটা ব্যতিক্রম ঘটিল বটে। কৌটা হাতে করিয়া নির্ঝরিণী জিজ্ঞাসা করিল, 'কি হয়েছে? পড়ে গেছ বুঝি রাস্তায় কোথাও? বাইকে বেরিয়েছিলে?"

"কি হয়েছে দয়া করে না হয় নিজেই একটু দেখ্‌লে!" বলিয়া অনিল বাঁ হাতের আস্তিন গুটাইয়া রাখিল।

নির্ঝরিণী চাহিয়া দেখিয়া কহিল "কৈ, কাটা কাটা কিছু ত দেখ্‌ছি না!"

'কিছুই দেখ্‌ছো না?"

"ও ত শুধু একটা সিন্দুরের দাগ!"

"শুধু একটু সিন্দুরের দাগ বলে ত তুমি উপেক্ষায় উড়িয়ে দিলে! কিন্তু আমার হাতে এ দাগ কি করে পড়্‌ল তার কারণ জান্‌তে তুমি কিঞ্চিৎ কৌতূহলী হবে ব'লে আমার ধারণা ছিল। শাস্ত্রে বলে মেয়েদের কৌতূহল অসাধারণ—আমি দেখ্‌ছি তোমার উপেক্ষা অসাধারণ!"

"সিন্দুরের দাগ হাতে পড়ার মধ্যে এমন কি অসাধারণ কাহিনী থাক্‌তে পারে যে তুমি তার এত বড় উপক্রমণিকা

অনিল হাসিয়া ভ্রু বাঁকাইয়া বলিল, "এ বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বীচি নয় গো নির্ঝরিণী—এর ভেতর শাঁস আছে ঠাসা, পুরু, শক্ত!"

নির্ঝরিণী হাসিল, বলিল, "সোজা কথাটা কি তা বলই না! ভণিতা করেই ত সারা হলে। কোথা থেকে এল ও

সিন্দুরের দাগ? মায়ের সিন্দুরের ঝাঁপিটি বুঝি উল্টিয়ে এসেছো কোনো কেরামতিতে!"

"ঝাঁপি ওল্টানো সিঁদুর এ নয় গো,—এ সিঁদুর ছিল একজনার কপালে। এই হাতের ওপর সে মাথা রেখেছিল—"

নির্ঝরিণীর মুখখানি নিমেষে পাংশু হইয়া গেল। স্তব্ধ দৃষ্টিতে সে অনিলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

অনিল মনে মনে হাসিয়া বলিল, "শ্রীমতী নির্ঝরিণী, এবার ধরা পড়লে তুমি হাতে-কলমে! চোরের দশ দিন, সাধুর এক দিন। এ শর্ম্মাকে আর ফাঁকি দেওয়া চল্‌বে না!" বাহিরে মুখখানি খুব ভাল মানুষের মত করিয়া বলিল, "তুমি অবাক্ হয়ে চেয়েই রইলে যে! বল ত লোকটি কে!"

নির্ঝর ধীরে বলিল "জানি না।"

"না হয় একটা আঁচই কর!"

"কি জানি বাপু, তোমার হেঁয়ালি বোঝার সাধ্য আমার নেই।"

"জিৎ সব সময় বজায় রাখা চলে না, মাঝে মাঝে এক আধবার হারতেও হয়, বুঝলে কি না!"

মনের ভিতর সুনিবিড় আনন্দের উদ্বেল উচ্ছ্বাস অনিল আর গোপন রাখিতে পারে না, মেঘান্তরাল হইতে বিচ্ছুরিত রবি-কর-রেখার মত ওর মুখে চোখে তাহার আভা ফুটিয়া ওঠে। নির্ঝর ওর মুখের দিকে চাহিয়া লজ্জিত হইয়া মাথা হেঁট করে। কথা বন্ধ হইয়া যায়।

অনিল সহসা অবহিত হইয়া উঠিয়া বলে, "বাড়ীতে কি কারখানাটা হচ্ছে খবর রাখ?"

সবিষাদে নির্ঝরিণী বলিল "চোখ আছে সবাকারই, কি যে হয়েছে বাবার কিছুই বুঝতে পারি না। কি দরকার ছিল এ বিয়ের! একটা মেয়েকে এনে শুধু শুধু এ রকম নিগ্রহ করা কি জন্তে! ছেলেমানুষ বেচারী শুধু কাঁদে আর কাঁদে!"

অনিল হাসিয়া বলিল "এ সিঁদুরের দাগ তাঁরই চোখের জলে গলে আমার হাতে লেগেছে, বুঝলে গো নির্ঝরিণী! মেসোমশায় ওঁকে ওপরের ঘরে বন্দী রাখার বন্দোবস্ত কর্চ্ছেন—রাজমজুর ছুতোর লেগেছে কাজে। বল্লুম—চলুন মা'র কাছে পৌছে দিয়ে আসি, বেচারী সাহস পায় না।"

অনিল সমবেদনায় গভীর নিঃশ্বাস ফেলে, নির্ঝরিণীর মুখের বিবর্ণতা দূর হইয়া বেদনার ছায়া ফুটিয়া ওঠে।

অনিল বলিল "কিছুই কি করা যায় না এ দুর্দ্দশা থেকে ওঁকে বাঁচাতে? চোখের কাছে এ দৃশ্য দেখে মুখে ভাত রুচবে কি করে!"

নির্ঝরিণী বলিল "দেখব একবার চেষ্টা করে বাবার মন ভিজাতে পারি কি না। আমি ত ভাবছি, দিনরাতই ভাবছি এই কথা। পথই কি আছে কোনো দিকে! সমাজ আছেন মাথার ওপর খাঁড়া ধরে—পুরুষের যথেচ্ছাচারের কোনো জবাবদিহি নেই, যত শাসন পীড়ন মেয়েদের ওপর। দুনিয়া শক্তের ভক্ত, নরমের যম। তোমাদের পিঁজরাপোল আছে,—পশুক্লেশনিবারিণী সভা আছে, অনাথ-আশ্রয় আম্‌স হাউসও আছে—নেই শুধু অত্যাচারী স্বামীর পীড়ন থেকে অসহায়া স্ত্রীর আত্মরক্ষার কোনো উপায়! দয়া মায়া করুণা সহানুভূতি সব কিছুরই বাইরে ওরা! ওদের বাঁচাবার জন্যে—ওদের দুঃখভার লাঘব করার জন্যে একটি আঙ্গুলও কেউ নাড়বে না!"

বিষণ্ণ দৃষ্টিতে বাহিরের কনকাঞ্চিত রৌদ্রের দিকে চাহিয়া উভয়ে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

১০

মুরারী বাবুর বাড়ীটি সহরের প্রত্যন্ত দেশে, নিরতিশয় জন-বিরল স্থানে। দেখিয়া শুনিয়া পছন্দ করিয়া বাড়ীটি তিনি ভাড়া করিয়াছিলেন নগরের কোলাহলের বাহিরে। বিঘা খানেক জমির ওপর উঁচু পাঁচীল ঘেরা তেতালা বাড়ী। পিছনে অবিরল-পল্লব প্রাচীন শালবন, তাহার প্রান্ত ভাগে ক্ষীণাঙ্গী জলঙ্গী নদী নিঃশব্দে বহিয়া চলিয়াছে। ওপারে শারদ মধ্যাহ্নের ঝলকিত শুভ্র অভ্রদামের মত রৌদ্রকরোজ্জল পুষ্পিত কাশবন।

বাড়ীখানা হালে তৈরি হইলেও ছাঁদটা তাহার সেকালের। স্বাস্থ্যনীতি অপেক্ষা অন্তঃপুরবাসিনীদের আব্রু রক্ষার দিকে মনোযোগ অধিক পরিস্ফুট। দরজা জানালা সংখ্যায় বিরল ও আয়তনে অপ্রশস্ত। পাশাপাশি তিনখানি ঘর, তিনখানারই এক ঘরের ভিতর দিয়া অন্য ঘরে যাওয়ার কোনও রাস্তা নাই, একটি করিয়া কপাট বারান্দার মুখে, পিছনের দিকে ছোট ছুটি জানালা মাথার ওপর বসানো। কিছু দেখিতে হইলে মেয়েদের জলচৌকির উপর দাঁড়াইতে হয়।

জানালার সামনে শালবন। নীচের মাটি ও ওপারের আকাশ ঢাকা। আশে পাশে পড়শীরও কোনো চিহ্ন নাই। অনিল ইহারই একটি গবাক্ষের কাছে দাঁড়াইয়া বাহিরের দিকে ঝুঁকিয়া কি দেখিতেছিল।

পিঠের উপর চাবির গোছা রিনিঠিনি বাজাইয়া পানের ডিবা হাতে করিয়া নির্ঝর ঘরে আসিল, এবং অনিলকে তদবস্থ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "অত কি দেখ্‌ছ?"

অনিল ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "দেখ্‌ছি যা এতদিন দেখি নি। আমাদের রামভজনের মত কসম খা কর্‌ হম্ কহ্‌ সক্‌তে,—এ বাড়ীটি যিনি বানিয়েছিলেন তিনি মেসোমশায়ের স্বর্গীয় ছিলেন। দেখ তুমি চারিদিকে ঘুরে—এর কোনো খান দিয়ে মানুষের মুখ চোখে পড়্‌বে না। এ যেন আগেকার ইংরাজ জায়গীরদারদের এক টাওয়ার বিশেষ। একদল লোক্‌ এখানে বাস করে আবেক দল লোকের ভববাস ঘোচাবার জন্যে।"

নির্ঝর পানের ডিবা অনিলের হাতে দিয়া বলিল, "বাবা যখন এ বাড়ী নেন, তখন আমরা সবাই-ই কিন্তু আপত্তি করেছিলুম, কিন্তু মাকে বাবা পটিয়ে নিলেন তখন, বাকীটা সবার ফিরিয়েছিলে।"

"তখন আমরা অনেকটি ছিলুম এ বাড়ীতে, তাই এ বাড়ীর আসল রূপটি আমাদের চোখে ধরা পড়ে নি। এখন তোমরা ওটি দুই লোক যদি নীচের তলায় থাক, আর আমাকে উপরের ঐ তেতালার ঘরে নির্ব্বাসন দাও—তা হলে আমি নিশ্চিন্ত বল্‌ছি—"

এমন সময় বিদ্রুক কুন্তলে অবগুণ্ঠিতা চন্দ্রলেখা তাহাদের মাঝখানে আসিয়া পড়িল। সন্ত্রস্ত হইয়া অনিল বলিয়া উঠিল "হোল কি, হোল কি?"

অনর্গল হাস্তে অবগুণ্ঠমানা চন্দ্রলেখা বলিল, "হয়েছে কি জানো—কপোতীর কণ্ঠচ্ছেদ করতে ব্যাধ যখন পিঞ্জরে হাত পুরেছে—তখন রাজবাড়ী থেকে খবর এল—"

অনিল হাসিয়া বলিল, "আজ কলেজের গভর্ণিং মেম্বরদের মিটিং—মেসোমশায় সেখানে গেলেন বুঝি!"

মাথা কাৎ করিয়া চন্দ্রলেখা বলিল, "হাঁ মহাশয়।"

নির্ঝর বলিল, "আজ না পরিতোষ বাবুদের বাড়ী যাবার নেমন্তন্ন? সেখানে কল্‌কাতা থেকে সাহিত্য মণ্ডলীর কারা এসেছে—বাবা সেখানে না গিয়ে নিশ্চয় পার্ব্বেন না।"

অনিল বলিল "আরে সে ত রাত্তিরে খাওয়ার নেমন্তন্ন! তাতে মিটিং আটকায় কিসে?"

চন্দ্রলেখা আবার হাসিয়া ওঠে, বলে "তা হ'লে শুধু বিকালটা নয়—রাত্তির পর্য্যন্ত শান্তি, শান্তি শান্তি!"

নির্ঝরের মুখ মলিন হইয়া যায়, অনিল একটা চাপা নিঃশ্বাস ফেলে। স্তব্ধ হইয়া দুইজনে নত নয়নে চাহিয়া থাকে।

চন্দ্রলেখা হাসিতে থাকে,—আনন্দলেশহীন, কান্না মাখা অস্বাভাবিক হাসি। হঠাৎ থামিয়া গিয়া বলে, "থাম্‌লো কথা? রাত্রি শেষে যে দীপ নেভে, সন্ধ্যায় তা দিতে হয় উস্কে। এর পর যখন তোমাদের মুখ আমি চোখে দেখ্‌ব না, তোমাদের কথা কানে শুনবো না,—তখন,—এখন তোমরা যা কর্চ্ছ এবং বলছ,—তাই জপে আমার দিন কাটিবে।"

নির্ঝর চন্দ্রলেখার কাঁধের উপর হাত রাখিয়া বলে, "কথা কি বল্‌ব বল, দুঃখের কোনো ভাষা নেই। মনে হয় তোমার দুঃখ নিজের কাঁধে তুলে নিতে যদি পার্‌তুম!"

চন্দ্রলেখা নির্ঝরের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলে "তুমি আর ও কথা বোলো না? তোমার দুঃখটাই বা কম কি?"

অনিল মাঝখান হইতে বলিয়া ওঠে "আচ্ছা, আপনি ত নেহাৎ খুকীটি নন। কেন রাজি হলেন এ বিয়েতে? আসলে মেয়েরা বিয়ের কথায় এমনি গলে যায়—"

"এ বাপু তোমার মিথ্যা নিন্দা করা। শোন বলি আমার বিয়ের কাহিনী। আমাদের ভাগ্য ভুব্‌ল বাবার সঙ্গেই, ওগুচে মানুষ ছিলেন—রেখে যেতে পারেন নি কিছুই।

একখানা বাড়ী পর্য্যন্ত না। এলুম কাকার বাড়ী। আমরা তিন জন পুষ্যি—আমাদের ভারে খুড়ীমার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটতে লাগ্‌ল। এমন সময় কাকার এক বন্ধু এ সম্বন্ধ করে দিলেন। লাগবে না কাণা কড়িও—মেয়ে পড়্‌বে মস্ত লোকের হাতে। বয়সটা অবশ্য কিছু আছে—তা পুরুষের তাতে কিছুই আসে যায় না। দিব্যি চেহারা, দিব্যি ঘর বাড়ী। মেয়ে পায়ের ওপর পা থুয়ে দিন কাটাবে। মার চোখের জল পড়্‌ল। আমি মাকে বল্লুম, মা, অত বড় লেখক—অত তাঁর নাম—অত টাকা কড়ি—আমার মালা এই বরেণ্য দেবের জন্যই গাঁথা হোক্।"

হায়রে হতভাগী! বলে মা চোখ মুছ্‌লেন। বিয়ে হয়ে গেল। আমার গল্পটি ফুরুল, নটে গাছটি মুড়ুল।

সকলেই খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকে, ভাবিয়া ভাবিয়া অনিল পরামর্শ দেয়—"একবার হাতে পায়ে ধরে দেখুন না!"

"হাতে পায়ে ধরব কার?" চন্দ্রলেখা দৃপ্ত স্বরে জিজ্ঞাসা করে।

অনিল শেষ পর্য্যন্ত পঁহুছিবার জন্য সাহস সঞ্চয় করিয়া বলে "স্বামীর।"

হাহা করিয়া চন্দ্রলেখা হাসিয়া উঠিয়া বলে "ভাগ্যিস্ আপনারা এখানে ছিলেন—নইলে সম্পর্কটা কি তা জিজ্ঞাসা করার জন্য হয়ত বা আমায় ভজুয়ার কাছেই যেতে হোত!"

অনিল রহস্য-প্রলুব্ধ মনে বলে "আহা, বেচারা বুড়ো মেসোমশায়!"

চন্দ্রলেখার চক্ষু জ্বলিয়া ওঠে। বলে "দেখ—বাজে লোকের বাজে কথা বজ্রসম বাজে প্রাণে। নিজে স্বয়ম্বরা হয়ে বুড়োর গলায় মালা দিয়েছি—তার জন্যে আমার দুঃখ ছিল না এক কণাও। লেখা পড়ে মুগ্ধ হয়ে ভেবেছি কি সরল সুকোমল কারুণ্যময় উদার বিরাট প্রাণ! আমি ছিলুম মনীষার পূজক—মর্ত্ত্যের মানুষ আকাশের সূর্য্যের দিকে যেমন করে তাকায় তেমন করে আমি এই অনন্যসাধারণ প্রতিভার দিকে তাকিয়েছিলুম। বয়সের কথা ভাবিও নি কখনও। আমার এক জাটতুতো বোনের স্বামী তোমার মেসোমশায়'র চেয়ে কিছু ছোট নয়—তবু রাজাদিকে দেখ্‌তুম আহ্লাদে থই পেত না। সঙ্গিনীরা—যাদের আমার ঢের আগে বিয়ে হয়ে গেছে—বলেছে—কাঁচার হাতে পড়ে ছেঁচা সয়েছে তারা অনেক, পাকার হাতে পড়ে আমি থাক্‌ব শিকের তোলা। ভেবেছি হ'বেও বা। পেয়ারা কাঁচায় কষ্টি, পাক্‌লে হয় মিষ্টি!"

অনিল ছাড়ে না, বলে, "ডাঁশা পেয়ারা আপনি বুঝি খান্ নি কখনো?"

চন্দ্রলেখা সমভাবেই উত্তর দেয় "না।"

নির্ঝর কথার ধারা ফিরাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া বলে, "বাবা তোমাকে এনেছিলেন সংসার করার জন্যে—মাঝখানে এমন মতি বিগড়ে গেল কেন?"

"আমি কি করে বল্‌ব কিসে তাল কাটুল! কবে যে সুর মিল্‌ল, কবে যে তার ছিঁড়্‌ল বুঝ্‌লুমই না কিছু।"

নির্ঝর বলিল, "আমি তোমাকে বলি এই যে—তুমি রাগ কোরো না। মেয়েমানুষকে অনেক সইতে হয়, অনেক ক্ষমা কর্ত্তে হয়, অনেক ছেড়ে দিতে হয়। মিনতি করে, পায় ধরে,—যেমন করে হোক, তুমি এ মিটিয়ে ফেল।"

উদ্দীপ্ত হইয়া চন্দ্রলেখা বলে, "যে হাত আমাকে আশ্রয় দিল না দিল শুধু আঘাত—সেই হাত আমি মাথায় ঠেকাব—এমন 'মেরেছিস্ কলসীর কানা তা বলে কি প্রেম দেব না' মহাভাব নিয়ে আমি জন্মেছি বলে ত মনে হয় না। দুঃখ স্বীকারে আছে গৌরব, অপমান স্বীকারে আছে হীনতা। এ অবিশ্বাসের অমর্য্যাদা আমি ভুল্‌তে পারি না এবং ভুলব না। মার দিলে হাড় ভাঙ্গে—তবু সারে—এ হচ্ছে খড়্গাঘাতে শিরশ্ছেদ করা—ওঁর আর আমার মধ্যে যা-কিছু ছিল এক ঘায়েই সব নিকাশ হয়ে গেছে। দয়া ভিক্ষা আর যারই করি—অপমানকারীর কর্ব্ব না।"

নির্ঝর ও অনিল কোনো উত্তর খুঁজিয়া পায় না, ঘরের হাওয়ায় একটা গুরু বিষাদের বাষ্প অচল হইয়া জমিয়া উঠিতে থাকে।

১১

চন্দ্রলেখা প্রভাতে ঘর হইতে বাহির হইবার উপক্রম করিতেই মুরারী বাবু রুক্ষকণ্ঠে কহিলেন, "যাচ্ছ কোথা?"

ফিরিয়া দাঁড়াইয়া চন্দ্রলেখা বলে "নীচে।" চক্ষু তাহার উদ্দীপ্ত, নাসারন্ধ্র স্ফুরিত, বক্ষ স্পন্দিত।

আদেশের স্বরে মুরারী বাবু বলেন, "যেতে পার্ব্বে না নীচে। এখন থেকে তোমায় এই ঘরেই বাস করতে হবে।" চক্ষে তাঁহার একটা হিংস্র আনন্দ জ্বলিয়া ওঠে।

চন্দ্রলেখা কোনো উত্তর দেয় না। নীরবে আসিয়া জানালার কাছে দাঁড়ায়।

মুরারী বাবু তাহাকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে বলে "মুখে যে আর রা নেই। কথার অমন ফোয়ারা বন্ধ হয়ে গেল এক মুহূর্ত্তে? কাকে কাকে ডেকে আনতে হবে একটা লিষ্ট দাও—তাদের এন্‌টারটেইনমেণ্টের জন্য কি কি আয়োজন কর্ত্তে হবে বল। কোন্ রঙ্গের শাড়ী চাই, কোন্ রঙ্গের ব্লাউস্ চাই, কোন্ কোন্ গয়না চাই,—শুনি একবার!"

খর ব্যঙ্গের টানে মুরারী বাবুর ললাট গভীর বলীরেখায় ভরিয়া ওঠে।

দলিত কমলের মত চন্দ্রলেখার মুখ ওঠে নীল হইয়া। ঠোঁটের উপর ঠোঁট চাপিয়া সে অন্যদিকে চাহিয়া থাকে।

হাত বাড়াইয়া মুরারী বাবু বলেন, "দাও, তোমার চাবী দাও।"

চন্দ্রলেখা আঁচল হইতে চাবি খুলিয়া পায়ের কাছে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়।

চাবি কুড়াইয়া নিয়া মুরারী বাবু শুধান, "তোমার ট্রাঙ্ক্ হাত বাক্স কোথায়?"

চন্দ্রলেখা জবাব দেয় না।

ঘরের চারিদিকে চাহিয়া মুরারী বাবু বাক্স দুইটা আবিষ্কার করিয়া লন। অরাতির শস্ত্রাগার অধিকার কালে বিজেতার গর্ব্বোজ্জ্বল হাস্য তাঁহার মুখে ফুটিয়া ওঠে। ট্রাঙ্কের কাছে চেয়ার টানিয়া নিয়া বসিয়া বাক্স খোলেন। নানা রংএর সুতা, রেশম জরিতে কাজ করা রং বেরং-এর ব্লাউস রং বেরং-এর শাড়ী উল্টাইয়া দেখিয়া বলেন, "গেরস্তের বউর নগরের নটীর মত এত রকমারি পোষাকের বাহার কি জন্যে! তোমার মার অভ্যাসও বুঝি তোমার মতই ছিল,—নইলে তোমায় এ সব এমন করে গুছিয়ে কি আর অমনি অমনিই দিয়েছেন? এ দিকে রাত্তিরে ঘরে আসা হয় শাদা জামা সাদা কাপড়ে।"

বলিতে বলিতে মুরারী বাবুর মাথায় আগুন জ্বলিয়া ওঠে। জিজ্ঞাসা করেন "তোমার বাক্সের মধ্যে বেষ্ট্ শাড়ী কোন্‌টা?"

চন্দ্রলেখা উত্তর দেয় না।

বাক্স ঘাঁটিয়া মুরারী বাবু বেনারসী শাড়ীখানা টানিয়া বাহির করেন। সঙ্গে একটা জামাও। বলেন "তোমার মা যখন সাজাবার জন্যেই এ সব দিয়েছেন তখন তাঁর অভিলাষ পূর্ণ না করা অন্যায়। নাও, এস এদিকে—এই শাড়ী জামা গয়না সব পরে এখানে দাঁড়িয়ে থাক—আমি দেখে চক্ষু সার্থক করি।"

চন্দ্রলেখা উত্তরও দেয় না, নড়েও না। মুরারী বাবু গর্জ্জিয়া বলেন, "এস এদিকে।"

কাঠ হইয়া চন্দ্রলেখা দাঁড়াইয়া থাকে।

মুরারী বাবু উঠিয়া এক হেঁচকা টান দিয়া তাহাকে লইয়া আসিয়া বলেন, 'পর এ সব! তোমার এত সজ্জার সাধ। আমি যদি তা না মেটাই তবে মেটাবে কে? নাও, পর।"

চন্দ্রলেখার চক্ষে অশ্রুসাগর অগ্নিময় হইয়া ওঠে। একে একে সে শাড়ী গয়না পরিতে থাকে।

শেষ হইলে মুরারী বাবু বলেন, "এখন কেশবিন্যাস হোক্, এমন প্রসাধান-কলা-সুনিপুণা তুমি—তোমায় আর বাৎলে দিতে হবে কেন? স্নো পাউডার পোমেড্ রুজ এ সব বার কর বাক্স থেকে।"

চন্দ্রলেখা দ্বিরুক্তি না করিয়া আদেশ সমাধা করে।

শ্লেষবিদ্ধ স্বরে মুরারী বাবু বলেন, "এবার হাস্যবিলোল কটাক্ষে আমার দিকে চাও।"

চন্দ্রলেখা প্রস্তর প্রতিমার মত দাঁড়াইয়া থাকে।

মুরারী বাবু গর্জ্জিয়া বলেন, "তাকাও!"

চন্দ্রলেখা মুখ উঠায় না।

মুরারী বাবু উঠিয়া তাহার কাছে গিয়া দাঁড়ান; ডান হাতে তাহার কোমল করপল্লব নিষ্পেষিত করিয়া বলেন, "এইবার শেষবার বলছি,—তাকাও!"

মুদিত কুমুদের মত চন্দ্রলেখা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকে।

মুরারী বাবুর মাথায় খুন চড়িয়া ওঠে। দন্তে দন্ত নিষ্পেষিত করিয়া দুই হাতে চন্দ্রলেখার গলা টিপিয়া ধরেন। চন্দ্রলেখা নিস্পন্দ হইয়া থাকে।

মুরারী বাবু মুখ ছাড়িয়া তাহার গলা টিপিয়া ধরেন।

এবার শব্দ বাহির হয়। দোতালায় উৎকর্ণ অনিলের কানে একটা অস্পষ্ট গোঙানির শব্দ ভাসিয়া আসে।

অনিল দৌড়াইয়া নির্ঝরিণীর কাছে গিয়া বলে, "নির্ঝর, ছুটে যাও তেতালায়—বেচারীকে মেরে ফেল্লে বোধ হয়।"

নির্ঝর উর্দ্ধশ্বাসে উপরে ওঠে। অনিল অর্দ্ধেক পথে উঠিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, তেতালায় যাইতে সাহস পায় না।

সহসা নির্ঝরিণীকে পায়ের উপর নিপতিত দেখিয়া মুরারী বাবুর আত্মচৈতন্য ফিরিয়া আসিল। চন্দ্রলেখাকে ছাড়িয়া দিয়া মেয়ের দিকে তাকাইলেন।

মুরারী বাবু ছাড়িয়া দিতেই অর্দ্ধ-বিচেতন চন্দ্রলেখা ছিন্নমূল কদলীর মত মাটিতে পড়িয়া গেল।

নির্ঝরিণী শশব্যস্তে তাহাকে কোলে উঠাইয়া ধরিল। মুরারী বাবু কোনো দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া নীচে নামিয়া গেলেন।

নির্ঝর চীৎকার করিয়া ডাকিল, "অনুদা, শীগ্গীর এস।"

এক এক লাফে দুই তিন ধাপ পার হইয়া অনিল আসিল। নির্ঝর বলিল, "ঐ কুঁজোয় জল আছে, মাথায় ঢালো আগে।"

জল ঢালিতে গিয়া চন্দ্রলেখার অস্বাভাবিক সজ্জার উপর উভয়ের দৃষ্টি পড়িল। অনিল বলিল "ব্যাপার কি? যাচ্ছিলেন কোথাও?"

হতাশ্বাসে নির্ঝর বলিল, "কি জানি কি ব্যাপার! তুমি দেখ, জ্ঞান আছে ত!"

জল ঢালিতে ঢালিতে অনিল বলিল, "জ্ঞান না হ'লেই ভাল ছিল!"

(ক্রমশঃ)

শ্রীমতী আমোদিনী ঘোষ

সমুদ্র

শ্রীযুক্ত সুবোধ রায়

সমুদ্র

বহুদিন পরে, সহসা আবার আজি
তোমারে স্মরিয়া চিত্ত উঠিয়াছে বাজি
নানা ছন্দে। উঠিয়াছে মনের নদীতে
তোমার তরঙ্গমালা, বিচিত্র ভঙ্গিতে।
মনে হয়, একবার তেমনি আবার,
তোমার তরঙ্গমাঝে করিব বিহার।
তব নৃত্য তরঙ্গের উচ্চতম শিরে
বসিয়া নৃপতিসম, উন্মত্ত সমীরে
ভেসে চলে যাই পুনঃ অনন্তের কোলে।
মিলাইয়া যাই ঐ তিমির অতলে।
একদিন শিশুকালে, মনে পড়ে মোর,
তোমার সৈকতে ব'সে, হয়ে আসে ভোর,
বিহঙ্গ ওঠেনি ডাকি আঁধার অম্বরে।
সে আঁধারে, ব'সে ব'সে বালুর উপরে
দেখিতেছি জলখেলা, সমুদ্র তোমার।
সেইক্ষণে অম্বরের ছিঁড়ি চারিধার
বাহিরিল যে আলোক তড়িতের মত
সে নহে তড়িৎ। করেছিল উদ্ভাসিত

বনের সবুজ সে আলোকে। দূরে, তীরে, নীরে,
সহস্র মুকুট পরাইল,—নম্রশিরে।
মনে হল সেইক্ষণে, কেন, নাহি জানি
আমার কালিমা যত, মুছে নিল টানি,
সে অপূর্ব্ব, সে চঞ্চল, অজানা আলোকে,—
প্রভাত-সূর্য্যের মত।
শেষে, বহুদিন পরে, আমার জগতে
সে আলোক ফুটেছিল অপূর্ব্ব বিভাতে।
ঠেলে নিয়ে গেল মোরে, সেই সিন্ধু-তীরে,
সেই অনন্তের কোলে—অজ্ঞান তিমিরে।
যে আলোক বহুদিন আগে, মোর মনে
ফুটে উঠেছিল, মম আঁধার গগনে,
সে আলোক,—মূর্ত্তিরূপে আমার হৃদয়ে
অসীমের মর্ম্মকথা চলে গেল কয়ে।
আজি মোর ক্ষুদ্র গৃহে, বসিয়া নীরবে
ভাবিতেছি, হে আলোক! মূর্ত্তি নিয়ে কবে
আসিবে আবার মম অন্তর-ভুবনে?
তুমি শুধু কয়ে গেলে আমার জীবনে
তোমার অনন্ত গাঁথা, তোমার কাহিনী,
কান পেতে শুনেছিনু, কিছুই বলিনি,
করি নাই কোন প্রশ্ন, অসীম আমার!
গোপন অন্তরে কিগো ফুটিবে আবার?
হে সাগর! তোমা সাথে দেখা চিরদিন।
কত কথা কয়ে, তুমি এ চিত্ত নবীন
করে দিয়েছিলে। হে আমার কবি-গুরু!
তুমি হাতে ধরে', মোর লেখা কর সুরু।

আজি দূরে বসি', তুমি লহ নমস্কার।
তব আশীর্ব্বাদ মোরে দেহ পুরস্কার।
তোমারি অন্তরে এসে পেয়েছি তাঁহাকে,
তোমারি তরঙ্গ মাঝে হেরেছি যাঁহাকে,
মোর মনোজগতের অধিষ্ঠাত্রী কবি,
অপূর্ব্ব, আনন্দময়, সে জাগ্রত ছবি।
ভ্রমিয়াছি, হে সাগর! তোমার জগতে,
কি উচ্ছ্বাস, ভাবলীলা, পরতে পরতে,
হে সুন্দর! হে অনন্ত! হে জাগ্রত ছবি!
বাহিরের সব মিথ্যা, তুমি শুধু কবি।
শুধু কি দেখেছি তব তরঙ্গ মহিমা?
দেখি নাই শান্তিময় আনন্দ প্রতিমা?
একদিন, মনে পড়ে, দুপুর বেলায়,
সৈকতের কোলে, ঘন বনের ছায়ায়,
ব'সে ব'সে দেখিতেছি, প্রশান্ত, উদার,
ঊর্ম্মিহীন, অচঞ্চল, অনন্ত, অপার,
তোমার নির্ম্মল মূর্ত্তি। কোথায় অদূরে,
কতগুলি ক্ষুদ্র নৌকা, ক্ষুদ্র পাল ভরে'
তর তর চলিয়াছে, কিসের সন্ধানে
আজি নিতান্ত নির্ভয়ে, কোথায়, কে জানে?
অতসী পুষ্পের শ্রেণী অনুকূল স্রোতে,
কে জানে, ভাসিয়া এল কতদূর হতে?
সুদূরে, দৃষ্টির শেষে, যুগল-মিলন
নীলিমার, কালিমার, কঠিন বন্ধন।
সে সুন্দর, সে আনন্দ, সে কি অপূর্ব্বতা!
করেছি আমার দীন দৃষ্টি সার্থকতা।

শ্রীসুবোধ রায়



দাশরথি রায় ও তাঁহার পাঁচালী

শ্রীযুক্ত বিমল ভট্টাচার্য্য

সকল জাতির সাহিত্যেই আমরা দেখিতে পাই যে, যে জাতি আধুনিক সাহিত্যে যতই উন্নত হউক না কেন, সে তাহার পুরাতন সাহিত্যকে শ্রদ্ধা করে—তাহা লইয়া আলোচনা করে, সহস্র পুস্তকও লিখিত হয় সেই পুরাতন সাহিত্যের সমালোচনায়। নূতন সাহিত্যকে সে পূজা করে—প্রত্যহ পাঠ করে বটে, কিন্তু পুরাতনকে অবহেলা করে না। কারণ, এই যে সাহিত্যের ধারা চলিয়া আসিতেছে, ইহার উৎপত্তিস্থান দেখিবার কাহার না ইচ্ছা হয়? হইতে পারে হরিদ্বারের গঙ্গা ক্ষীণকায়া,—কিন্তু সেই গঙ্গারই না কতখানি প্রসার এই বঙ্গদেশে হইয়াছে! তেমনি আমাদের বাংলা দেশের পুরাতন কাব্যধারা ক্ষীণকায়া হইলেও, আমরা দেখিতে পাই তাহার ভিতর সেই শক্তি, সেই ওজোগুণ সেই উদ্বেল প্রবাহ-বেগ লুক্কায়িত রহিয়াছে যাহার বিকাশে আজ বাংলার কাব্যগাথা এত সমৃদ্ধ, এত প্রশস্ত। পুরাতন সাহিত্যের প্রতি আমাদের কাব্যপিপাসুদিগের অবহেলা বড় অধিক বলিয়াই মনে হয়—তাই আমাদের অতীতকালের গুপ্তরত্ন এক প্রকার অনাবিষ্কৃতই রহিয়া গেল! ···ইংরাজী সাহিত্যক্ষেত্রে দেখি, সেলী, কীট্‌স, সুইনবার্ণ, মেসফিল্ড (Masefield) বা ব্রিজেস লইয়া তথাকার সাহিত্যিকগণ যেমন ব্যস্ত আছেন, তেমনই চসার, স্পেন্‌সার, মিল্টন প্রভৃতির কথাও ভোলেন না। এখনও ইঁহাদের সম্বন্ধে নূতন তথ্য বাহির হইতেছে—সকলেই তাঁহাদের প্রতি সমোৎসুক। কিন্তু আমাদের বাংলা সাহিত্যের দুর্ভাগ্য যে, সে রকম পুরাতন-অনিসন্ধিৎসু প্রকৃতির সাহিত্যিক অতি অল্পই আছেন।

এখন যাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে অগ্রসর হইব—তাঁহার ও আমাদের মধ্যে কালের ব্যবধান খুব বেশী না হইলেও—আমাদের বাহ্যিক জীবনের ও চিন্তাশক্তির অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেছে। আমাদের আজিকার বাংলা ও একশত বৎসরের পূর্ব্বের বাংলার ভিতর বেশ একটী পার্থক্য আসিয়া গেছে—এবং তাহা অস্বাভাবিকও নহে। উপরে চন্দ্রাতপ, নিম্নে সতরঞ্চির উপর অসংখ্য লোক—তার ভিতর দেশের ধনী, জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ ও বিদ্বান ব্যক্তিরাও আছেন; আর সেই মণ্ডলীর মধ্যে দাশরথি রায় পাঁচালী আবৃত্তি করিতেছেন, এ প্রকার দৃশ্য খুব inferior পল্লীগ্রামে ভিন্ন আর কোথাও দেখা যায় না—বা আজকালের বুদ্ধি-শিক্ষা-মার্জ্জিত লোকের কাছে এ সব একেবারেই হাস্যাস্পদ। কিন্তু এমনই ভাবে একদিন দাশরথি রায় তাঁর স্বরচিত পাঁচালীর ছড়া আবৃত্তি করিয়া সমগ্র বঙ্গদেশ বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁর জীবনী সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত কিছু বলিয়া আমরা তাঁর কবি-প্রতিভার আলোচনা করিব।

দাশরথি রায় ১২১২ সালের মাঘমাসে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল দেবীপ্রসাদ রায়। দাশরথির পিত্রালয় ছিল বর্দ্ধমান জেলার বাঁধমুড়া গ্রামে, কিন্তু তিনি পিতার কাছে না থাকিয়া তাঁহার মাতুল রামজীবন চক্রবর্ত্তীর নিকট থাকিতেন। লেখাপড়া বিশেষ কিছু শিখেন নাই—তাহার সুবিধা বিশেষ কিছুও ছিল না। পাঠশালা হইতে শুভঙ্করের কিছু আর্য্যা মুখস্থ করিয়া আর যুক্তাক্ষরযুক্ত ধনুষ্টঙ্কারের মত নাম লিখিয়া তাঁর পাঠ সমাধা করেন। মাতুল তাঁহার কর্ম্মস্থান কুঠুরিয়া গ্রামের নীলকুঠিতে থাকিতেন। সুতরাং শাসনদীপ্ত অভিভাবক না থাকায় দাশরথি স্বেচ্ছাচারী হইয়াছিলেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর সুমিষ্ট ছিল—পাড়ার মেয়েরা তাঁহাকে অনুরোধ করিয়া গান গাওয়াইত। এই সময় মুখে মুখে রচনা করিয়া তিনি গান গাহিতেন। তখনকার দিনে পল্লীগ্রামের আনন্দের প্রধান উপকরণ ছিল 'কবিগান'—এখনকার মত 'এমেচার-থিয়েটার পার্টি' ছিল না। সেই

গ্রামে অকাবাই বা অক্ষয়া-পাটনী নামে এক দুশ্চরিত্রা 'কবিনী' ছিল। তাহার এক কবিগানের দল ছিল—সে নিজে নেত্রী, হইয়া 'পালা' রচাইয়া গান গাহিয়া বেড়াইত। দাশরথি তাহার সঙ্গে প্রেমে পড়িলেন। মাতুল তাহা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে কর্ম্মস্থানে লইয়া গেলেন—কিন্তু অক্ষয়াও লুকাইয়া সেখানে যায়, ও তাহাদের পূর্ব্বপ্রকার প্রেমলীলা চলিতে থাকে। এই ব্যাপারে দাশরথি লোকের অখ্যাতিভাজন হইলেও, আমরা বুঝিতে পারি, কবিজীবনের পক্ষে এই প্রকার romantic lifeএর প্রভাব কতখানি প্রয়োজন ছিল। জীবনের সাধারণ শুষ্ক-গতির উপর এই রকম সরস-রস-লেখা দাশরথির ভিতর লুকায়িত কবি-প্রতিভার পরিস্ফুটন করে। অক্ষয়া ও দাশরথি উভয়ে মিলিয়া নানাবিধ ছন্দ-পয়ার সমন্বিত করিয়া পালাগান সৃষ্টি করে। এখন হইতে সুমধুর, সুললিত, মনোরম পদাবলীর সৃষ্টি হয়—এবং তাহাই পাঁচালী নামে পরিচিত হইয়াছিল। দাশরথির জীবনে এই বন্যা যখন তাঁহাকে ভাসাইয়া লইতেছিল, হঠাৎ তাহাতে এক পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী নিধিরাম শুঁড়ি'রও এক পালাগানের দল ছিল—একদিন এক গানের আসরে সে দাশরথির কলঙ্ক গাহিতে থাকে। তখন হইতে তাঁহার জীবনের গতি ফিরিল, আবার সংসারের ভিতর ফিরিয়া আসেন ও বিবাহ করিয়া সংসারী হ'ন।. তাঁর স্বরচিত কবিগান অতিশয় লোকপ্রিয় হইয়া উঠে—তাঁর প্রসিদ্ধি দেশ হইতে দেশান্তর বিস্তৃত হইতে থাকে। এই পালাগান গাহিয়া তিনি প্রভূত ধনের অধিকারী হইয়াছিলেন। নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলী পর্য্যন্ত তাঁর ক্ষমতায় মুগ্ধ ছিলেন। ১২৬৪ সালে কোজাগরী চতুর্দ্দশীদিনে তিনি দেহত্যাগ করেন।

এই বিচিত্রজীবনের কবি-প্রতিভার দিকে লক্ষ্য করিলে যাহা প্রথমেই চোখে পড়ে তাহা হইতেছে যে, তাঁর ভিতর সৃষ্টি করার ক্ষমতার চেয়ে, সৃষ্ট জিনিষের সৌন্দর্য্য সম্পাদনের ক্ষমতাই বেশী ছিল। কবিতা বলিতে আমরা আজকাল যাহা বুঝি, তাহা তিনি করিতে চাহেন নাই—তাহার প্রয়োজনও হয় ত ছিল না। রামায়ণ ভাগবতের আখ্যানাদি উপজীব্য করিয়া তিনি পালা-গান সৃষ্টি করেন—এবং ইহা তিনি নিজে সুমধুর স্বরে আবৃত্তি করিতেন। আমাদের পুরাতন কাব্যসাহিত্যের দিকে দেখিলেই আমরা বুঝিতে পারি যে তাহা অনেকস্থলে অনুপ্রাস-বহুল। ভারতচন্দ্রের ভিতর যাহা, ঈশ্বরগুপ্তের ভিতরও তাহা—বরং অধিক মাত্রায়। এই প্রকার অনুপ্রাস যে কেবল একই শব্দের পুনঃ পুনঃ ব্যবহারে সৃষ্ট হইত তাহা নহে, একই কথা. একই শব্দ বিভিন্ন অর্থযুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হইত। দাশরথির ভিতর এই প্রকার অনুপ্রাস-প্রবণতা যথেষ্ট পরিমাণ দেখা যায়—এবং অনেক স্থ'লে ইহাই তাঁহার বিশেষত্ব। এই জন্যই আমাদের পুরাতন কবির ভিতর অনেক সময় একটা আড়ষ্ট ভাব দেখি—তাঁহারা form-এর খাতিরে ভাব পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। দাশরথির একটা অনুপ্রাস-যুক্ত স্থান উদ্ধৃত করিলাম—

> "কি দোষে আমারে গুরু ফেলিবে অহিতে।
> হিত ভিন্ন অহিত কি করে পুরোহিতে॥
> তুমি কেন আমারে **রহিত** কর হিতে।
> কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কথায় না পারি **রহিতে**॥

'হিত'—শব্দের অপূর্ব্ব সমাবেশ! যদিও অনুপ্রাস-বহুল, তথাপি স্বীকার করিতে হয়, ইহা শ্রুতিকটু নহে। ছন্দের উপর তাঁর যথেষ্ট প্রভাব ছিল। নিম্নলিখিত পংক্তি দুটি পড়িলে বুঝা যাইবে, কবি যেন অনুপ্রেরণায় লিখিয়া গিয়াছেন—

> "না হেরে সেই অচ্যুত, ক'রো না পদ পদচ্যুত,
> চল পদ বিপদ ঘুচাইরে।
> প্রাপ্তে হরি উচ্চপদ, তুচ্ছ হবে ব্রহ্মপদ,
> **শ্যামপদ সম্পদ** কর ভাইরে॥

তাঁর রচনার ভিতর এমন একটা প্রয়োগ-যাথার্থ্য আছে যে কোন কথার পরিবর্ত্তনে অন্য শব্দ প্রয়োগ একেবারে অসম্ভব। কথিত আছে—দাশরথি 'কোদণ্ড' কথাটী 'কোদাল' এই অর্থে ব্যবহৃত করেন, কিন্তু এ রকম অপপ্রয়োগে সেকালের পণ্ডিতবর্গ রাগান্বিত হয়েন। তখন নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলীর কাছে বিচার প্রার্থনা হইলে, তাঁহারা সেই স্থান পড়িয়া উপলব্ধি করেন যে সে কথাটীর বদলে সেই অর্থে অন্য কথা প্রয়োগ একেবারেই অসম্ভব। তখন তাঁরা অভিধানে

'কোদণ্ড' কথার অর্থের স্থানে লিখিয়া রাখেন, "দাশরথি রায়ের প্রযুক্ত অর্থে কোদাল।"

তাঁর পাঁচালীর নানাস্থান পড়িলে দেখা যায়, কর্কশ শব্দের ব্যবহার বেশী। মনে হয়—ছন্দঃ অব্যাহত নাই। কিন্তু একটী কথা আমাদের মনে রাখিতে হইবে, এইগুলি তিনি নিজে আবৃত্তি করিতেন, এবং এমন সুর-লয়-তাল সহকারে পড়িতেন, যে কোন স্থানেই কর্কশ বলিয়া মনে হইত না। দাশরথি রায়ের পাঁচালী পাঠ করার একটী নিজস্ব ভঙ্গী আছে—সাধারণ কবিতার মত পাঠ করিলে ইহার সরসতা অনুভূত হইবে না। তাঁর পাঁচালীর মাঝে মাঝে গান আছে—সেগুলির ভিতর অনুপ্রাস ও সঙ্গীত উভয়ই অচ্ছেদ্য ভাবে মিশিয়া আছে—

কহিছে শিখরী কি করি অচল,
নাহি চলাচল হ'লাম হে অচল,
চঞ্চলার মত জীবন চঞ্চল,
অঞ্চলের নিধি পেয়ে হারাল'।

এই প্রকার শব্দ-সমাবেশ আমাদের কাব্যে খুব কমই আছে।

তাঁর ভিতর lyric-প্রতিভা ছিল না, তিনি যেন ছিলেন রাজপুতানার চারণ, বা ফরাসীর troubadours। অবশ্য তিনি ইহাদের মত বীরগাথা গাহিয়া বেড়াইতেন না—তিনি গা'হতেন ধর্ম্মগাথা। তাঁহার রচনার মধ্যে অবশ্য পারিপার্শ্বিক জীবনের ছায়াপাত হইয়াছে—ঘটনাবস্তু স্মরণাতীত কালের হইলেও লিখিত সময়ের প্রভাব একেবারে অতিক্রম করে নাই। তিনি নিজের উপলব্ধিভূত জীবনের কোন মহত্তর প্রকোষ্ঠ আবিষ্কার করিতে পারেন নাই—তিনি সাধারণ হিন্দু-সমষ্টিগত হিন্দু-দর্শনের আভাস দিয়া গিয়াছেন। ব্যাস বাল্মীকির মতই বলিয়া গিয়াছেন এ জীবন অনিত্য, সেই পরম সত্য নিত্য বস্তুর সন্ধানে হে মন! নিবিষ্ট হও ইত্যাদি।

ভারতচন্দ্র বা ঈশ্বরগুপ্ত প্রভৃতি পুরাতন বাংলা কবিদিগের মধ্যে যেমন একটী অশ্লীলতার আমেজ বা গন্ধ পাওয়া যায়, তেমনই দাশরথির ভিতরও ইহা দেখিতে পাই। বাঁধনহারা ভাবের বেগ অনেক স্থলেই সুরুচি-সঙ্গত হইত না। তখনকার আবার যেন mannerismই ছিল অশ্লীলতার আভাস দিয়া কাব্য সৃষ্টি করা। যে জিনিষগুলি সত্যই সাত্ত্বিকভাবজনক সৌন্দর্য্যময়, তাহার ভিতর এই প্রকার অশ্লীলতার অবতারণা একেবারেই দোষাবহ। এই Sense of propriety না থাকায়, দাশরথিও যে "বিরহ" আখ্যান লিখিয়াছেন, তাহা সুরুচিসম্মত হয় নাই। তবে সেকালের লোক এ জিনিষকে তত অপছন্দ করিত না। স্থানে স্থানে গ্রাম্যতা-দোষও দেখা যায় ও পরিহাসাদি অনেকস্থলে অতি নিম্নধরণের হইয়াছে।

সবশেষে বলা যায় যে, দাশরথি রায়ের রচনায় একটী সাবলীল গতি, একটী স্বচ্ছন্দ-বিহারের ভাব আছে। ঠিক বঙ্গদেশের তৃণ-শস্যেরই মত তাঁর কবিগান শ্যামল, সুন্দর ও পুষ্ট। তাহার মধ্যে মার্জ্জিতভাব না থাকিলেও, তাহা সহজ, সরল, অনাড়ম্বর ও বেগশীল। আজকালের বাজারে দাশরথি রায়ের পাঁচালীর সমাদর না থাকিলেও, এ কথা আমরা নিশ্চ:ই বলিতে পারি যে, বাংলার পুরাতন কাব্য-সাহিত্যের প্রতি যিনি মনোনিবেশ করিতে যাইবেন তাঁহাকে কবি-প্রতিভা পরিচয়ে যে বিফল হইতে হইবে না তাহা সুনিশ্চিত। ভারতচন্দ্র, মুকুন্দরাম, দাশরথি রায় প্রভৃতির ভিতর তিনি নিশ্চয়ই বাংলার খাঁটি কবি-প্রাণের কথা শুনিতে পাইবেন।

শ্রীবিমল ভট্টাচার্য্য

নর-বাঁধ

শ্রীযুক্ত মনোজ বসু

ছোটকাকার বিয়েতে বরযাত্রী চলিয়াছিলাম। তিন ক্রোশ পথ পায়ে হাঁটিয়া কানাইডাঙার ঘাটে নৌকা চাপিতে হইবে।

সে আজিকার কথা নয়, তখন বয়স আমার নয় কি দশ। এই উপলক্ষ্যে বেগুণী রঙের ছিটের জামা এবং একজোড়া মোজা জুতা কেনা হইয়াছে। সেই নূতন জামা গায়ে দিয়া অতি সন্তর্পণে পথ চলিতেছি, ধুলা না লাগে। আর-আর ছেলেরা যাইতেছিল, তাহাদের বেগুণী জামা নাই—অনুকম্পার সহিত মাঝে মাঝে তাহাদিগকে তাকাইয়া দেখিতেছি। মেঠোপথে খারাপ হইয়া যাইবার আশঙ্কায় জুতাজোড়া পরিতে মন সরে নাই, খবরের কাগজে জড়াইয়া বগলে লইয়াছি। বরের পাল্কী ও বাজনদার আগে চলিয়া গিয়াছে, পিছনে পড়িয়া আমরা। ক্রমে বেলা পড়িয়া আসিল। ডোঙাঘাটা ছাড়াইলাম, তারপর সাগরদত্তকাটী গ্রামের খেজুর বন, তারপর ভাঙা মসজিদ, সারি সারি তিনটা তেঁতুলগাছ, শেষে কুমোরপাড়ার বড় বাঁশবাগানটা পার হইয়া একেবারে ফাঁকা বিলের মধ্যে।

ধানের সময়। ধানবন একেবারে ওপারের গাছপালার গোড়া অবধি চলিয়া গিয়াছে, ধানের গোছায় কোনখানে বিলের জল দেখিবার উপায় নাই। আর দেখিলাম, তেপান্তর ভেদ করিয়া উত্তর-দক্ষিণে সোজাসুজি সারবন্দী চলিয়া গিয়াছে বড় বড় শিরীষ গাছ। বিলের মধ্যে অমন করিয়া গাছ পুঁতিয়া রাখিয়াছে কে? বড় আশ্চর্য্য লাগিল।

বারিক দত্ত গ্রাম-সম্পর্কে ঠাকুরদাদা, বুড়া লাঠি ঠক-ঠক করিয়া পাশে পাশে যাইতেছিলেন। কথাটা জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি কহিলেন—শুধু কি গাছ? এইটুকু এগিয়ে আয়—দেখ্‌বি কত্তো বড় রাস্তা। বল্লভ রায়ের রাস্তার নাম শুনিস্‌ নি?

নামটা বরাবরই শুনিয়া থাকি, সেই রাস্তার উপর দিয়া তবে আজ যাইতে হইবে!

রাস্তার উপর গিয়া যখন উঠিলাম বিস্তার দেখিয়া সত্যসত্যই তাক লাগিয়া গেল। দত্ত-বুড়াকে পুনরায় কি একটা প্রশ্ন করিতে যাইতেছিলাম কিন্তু দেখি হাতের লাঠিটা ফেলিয়া একটা শিরীষগাছের গোড়ায় বসিয়া পড়িয়া ইতিমধ্যেই তিনি ভাবে গদ-গদ হইয়াছেন। বলিতে লাগিলেন—দেখেছো ভায়ারা, লক্ষ্মী-ঠাকরুণের দয়াটা একবার দেখো—। মরি মরি—যেন দু'হাতে ঢেলেছেন। এই পুঁটিমারীর বিলে আমার লাখেরাজ ছিল আড়াই বিঘে—সে কি আজকের?—রূপচাঁদ রায়ের দত্ত দেবোত্তর। নিবারণ চক্কোত্তি ডাহা ফাঁকি দিয়ে নিলে!—ওর ভালো হবে কখনো!

মন্মথচরণ কহিল—আবার বসে' পড়লেন কেন দত্ত মশায়, চলুন—চলুন—জায়গা খারাপ, আঁধার না হ'তে এইটুকু পার হ'তে হবে—

দত্তমহাশয় আঙুল দিয়া আর একটা গাছের গোড়া নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন—ও মন্মথ, ওহে তুমিও একটুখানি বসে নাও না। ছোট ছোট ছেলেপিলে হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছ, না জিরিয়ে নিলে ওদের হাঁপ ধরে' মরবে-যে—। বলিয়া বুড়া নিজেই প্রবলবেগে হাঁপাইতে লাগিলেন।

কিন্তু সকলে সমস্বরে না—না—করিয়া বারিক দত্তের প্রস্তাবটা উড়াইয়াই দিল।—সে কি করে' হবে? নর-বাঁধ পার না হয়ে বসাবসি নেই—। লাখ টাকা দিলেও রাত্তির কালে অশথতলা দিয়ে যাওয়া যাবে না। তাড়াতাড়ি হেঁটে চলুন মশাইরা সব—তাড়াতাড়ি, খুব তাড়াতাড়ি—আরো—।

ফলে উল্টা উৎপত্তি হইল। বিশ্রাম ত পড়িয়া মরুক, ইহার পর যে কাণ্ড আরম্ভ হইল তাহাকে হাঁটিয়া যাওয়া

কোনক্রমে বলা চলে না। ছোট বড় গুণতি করিয়া আমাদের দলে বরযাত্রী জন চল্লিশের কম হইবে না। এবার একা দ্বারিক দত্ত নয়, সকলেই দত্তর মতো হাঁপাইতে লাগিল।

হরি জেঠা আসিয়া আমার হাত ধরিলেন, বলিলেন—শিবু, আর একটু—উই যে সামনে মস্ত উঁচু-মাথা অশ্বত্থগাছ—ঐ-ঐ—ঐখানে। নর-বাঁধটা পার হয়ে আস্তে আস্তে চলবো। আমার কান্না পাইতেছিল। বলিলাম—আর কতদূর? জেঠা বলিলেন—কানাইডাঙা? পথ আর বেশী নেই, নরবাঁধের পর বাঁয়ে একটা ভাঙাড়—সেইটে দিয়ে রশিটাক এগুলে গাঙ পড়বে।—

সন্ধ্যার আগেই বড় একটা খালের ধারে পৌঁছান গেল। জেঠা বলিলেন—এই নরবাঁধ। এদিক ওদিক তাকাইয়া দেখি, বাঁধের চিহ্ন কোন দিকে কিছু নাই, কেবল খালটী মাত্র। লাখ টাকা দিলেও রাত্রিবেলা যে অশ্বত্থতলা দিয়া এই চল্লিশটা মানুষ একসঙ্গে যাইতে স্বীকার করিবে না সেই গাছটি দেখিলাম। কেন যে সকলের এত ভয় ডাল-পালা মেলানো সুপ্রাচীন গাছের চেহারা দেখিলে তাহা তৎক্ষণাৎ বোঝা যায়, আমার ত সেই দিনের বেলাতেই গা ছম ছম করিতে লাগিল।

সকলে কাপড় জামা খুলিয়া পুঁটলী বাঁধিয়া লইল। আমি হরি জেঠার কাঁধে চড়িলাম এবং আমার কাঁধে কাগজে মোড়া সেই নূতন জুতা জোড়া। জিজ্ঞাসা করিলাম—জেঠা, বাঁধ কই? দুই ধারে বাঁশের খোঁটা পোঁতা, তাহার মধ্য দিয়া জল ভাঙিয়া সকলে চলিয়াছে। সেই বাঁশ দেখাইয়া জেঠা কহিলেন—বাঁধ ভেসে গেছে বর্ষার টানে, বাঁশগুলো আছে—আবার মাঘ মাসে জল কমলে চাষীরা নতুন করে' বেঁধে দেবে—।

কে একজন পিছনে আসিতেছিল, তাহার নামটা মনে নাই, কহিল—চাষা বেটাদের বুদ্ধি দেখ না—ফি বছর এই রকম গতর ঘামিয়ে পয়সা খরচ করে' বাঁধ বাঁধবে,—তার চেয়ে একবার এক পাঁজা ইঁট পুড়িয়ে যদি দুইধার পাকা করে' বেঁধে দেয়—ব্যস!

দ্বারিক দত্ত কোথায় ছিলেন, হঠাৎ দেখি জলের মধ্যে লাঠি খোঁচাইতে খোঁচাইতে কাছে আসিয়া পড়িয়াছেন। বলিলেন—কি বল্লে, পাকা ইঁটের গাঁথনী হ'লেই বাঁধ টিকে থাকবে? তা আর হ'তে হয় না। বল্লভ রায়ের টাকা তো কম ছিল না বাপু—পারলে না কেন? টাকাতে এ হয় না—একটা নরবলি দিয়ে এইটুকু চড়া পড়েছে—সহস্র নরবলি হ'লে তবে যদি মা কালী খুসী হয়ে খাল ভরাট করে' দেন—।

ভয়ে সর্ব্বদেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিল। এইখানে মানুষ বলি হইয়াছিল নাকি? আবার হয়ত অনাগত দিবসে কে কবে আসিয়া সহস্র বলি দিয়া আগাগোড়া খাল ভরাট করিয়া দিবে! জল বাড়িতে বাড়িতে ক্রমে হরি জেঠার বুক অবধি তলাইয়া গেল। আমি চুপটি করিয়া কাঁধের উপর বসিয়া আছি। দ্বারিক দত্তের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করিলাম—ও বুড়ো দাদা, এখানে নরবলি হয়েছিল নাকি?

দ্বারিক দত্ত উত্তর দিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু হরিজেঠার বোধ করি মনে মনে ভয় হইয়াছিল। হঠাৎ বিরক্তভাবে প্রসঙ্গ থামাইয়া দিলেন—বক্-বক্ কোরো না শিবু, শক্ত করে' ধরে' বোসো—

তখন হইল না, কিন্তু সেই দিনই রাত্রিবেলা গল্পটা শুনিয়াছিলাম। পানসীতে উঠিয়া বরযাত্রী-দলের ভয় কাটিয়া মুখ আবার প্রসন্ন হইল। দুই জোড়া পাশা পড়িল এবং তাহার উৎসাহ ও চীৎকার উদ্দাম হইয়া ক্ষণে ক্ষণে নদীর বুক কাঁপাইয়া তুলিতে লাগিল। কেবল দ্বারিক দত্ত মহাশয় দলছাড়া, পাশা খেলা জানেন না—বৃথাই চুল পাকাইয়াছেন। একাকী গলুয়ের উপর বসিয়া ছিলেন। আমি কাছে গিয়া চুপি চুপি বলিলাম—বুড়োদাদা, গল্প বলো—

—গল্প? কিসের গল্প শুনবি?

বলিলাম—ঐ নর বাঁধের—

হাতে কাজ নাই, দ্বারিক দত্ত তখনই প্রস্তুত। আরম্ভ করিলেন—তবে শোন্—

পুঁটিমারীর বিল হইতে ক্রোশ সাতেক দক্ষিণে এখন সেখানটা ভদ্রা নদী গ্রাস করিয়াছে, কেবল কতকগুলি অনেক

কালের বড় বড় ঝাউগাছ নদীতীর আঁধার করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ঐখানে বল্লভ রায় মহাশয়ের বাড়ী ছিল। ঢাকার নবাব-সরকারে চাকরী করিতেন, নবাবের ভারী বিশ্বাস তাঁহার উপর। দেউড়ীর কাছে একখানা প্রকাণ্ড সেগুন কাঠ পড়িয়া ছিল, তেমন কাঠ আজকালকার দিনে ভূভারতে কোথাও হয় না। বল্লভ একদিন কাঠখানা চাহিয়া বসিলেন। নবাব ঐপথে সর্ব্বদা আসিতেন যাইতেন কিন্তু নবাব-বাদশার ত নীচের দিকে তাকাইবার নিয়ম নাই, কাজেই খেয়াল ছিল না। প্রশ্ন করিলেন—কিসের কাঠ? কত বড়? বল্লভ দুই হাতে আন্দাজী আয়তন দেখাইলেন এবং বলিলেন—দেশে গিয়ে একখানা কুঁড়ে বাঁধবার ইচ্ছে করছি সেই জন্যে। হুকুম হইয়া গেল। নবাবের বারো হাতি লাগাইয়া তবে সেই কাঠ গাঙে নামাইতে হয়, তারপর বড় ভাউলের সঙ্গে বাঁধিয়া ভাসাইয়া আনা হইয়াছিল। ঐ এক কাঠে বল্লভের তিন মহল বাড়ীর কড়ি বরগা হইয়া গিয়াছিল। যাঁহারা রায় মহাশয়ের বড় অন্তরঙ্গ ছিলেন তাঁহারা খুব গোপনে আর একটা কথা বলিতেন—বল্লভ নাকি বাবাটিখানা সোনার ইঁট নবাবের তোষাখানা হইতে সরাইয়া ঐ ভাউলের খোলে পুরিয়া বাড়ী আনিয়াছিলেন। সত্য মিথ্যা সেই স্বর্গীয়েরাই জানিতেন কিন্তু ইহার পর বল্লভ রায় আর ঢাকায় ফিরিয়া যান নাই। ভদ্রার উভয়কূল দিয়া একেবারে ভৈরব অবধি জায়গা-জমি কিনিয়া ও কাড়িয়া-কুড়িয়া রাজ্য করিতে লাগিলেন। ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে মাহিনা-করা ঢালির দল ঢালসড়কী লইয়া পাহারা দিত। সেই দলের সর্দ্দারের নাম ছিল মৃত্যুঞ্জয় দাস। অমন খেলোয়াড় আর হয় না। এখনো এ অঞ্চলের লাঠিয়ালেরা লাঠি ধরিবার আগে মৃত্যুঞ্জয়ের নামে মাটী হইতে ধূলা তুলিয়া মাথায় ও কপালে মাখিয়া থাকে।

শোনা যায় মৃত্যুঞ্জয়ের বাড়ী ছিল পূব অঞ্চলে পদ্মাপারে। যৌবনে খুন ডাকাতি দাঙ্গা করিয়া খুব নাম কিনিয়াছিল, তারপর বয়স ভারী হইলে নিজেই ডাকাতের দল গড়িল। কিন্তু বউ মরিয়া যাইবার পর যেন কি হইল। আঁতুড় ঘরে বউ মরিয়াছিল, ছেলেটি বাঁচিয়া উঠিল—ক্রমে সে বছর পাঁচেকের হইল, সকলে কুড়োন বলিয়া ডাকিত। সেই কুড়োনকে লইয়া মৃত্যুঞ্জয় শান্ত ভালো মানুষ হইয়া ঘর পাতিল। বড় ছেলের নাম যাদব, তাহাকেও ফিরাইতে অনেক চেষ্টা করিয়াছিল—কিন্তু যাদবের নূতন বয়স, রক্ত গরম—বাপের কথা শুনিল না, দলে রহিয়া গেল।

কিন্তু ঘর করা কপালে ঘটে নাই।

বয়সকালে যাহাদের সহিত শত্রুতা সাধিয়া আসিয়াছে এখন যো পাইয়া একদিন রাত্রে তাহারা চার পাঁচ শ' লোকে বাড়ী ঘিরিয়া ফেলিল। জাগিয়া উঠিয়া মৃত্যুঞ্জয় দেখে মশালের আলোকে চারিদিক আলো-আলোময়। যেন সিংহের বিক্রম বুকের মধ্যে আসিল। কুড়োনকে কাঁধে করিয়া লাঠি ঘুরাইতে ঘুরাইতে ব্যূহ ফুঁড়িয়া বাহির হইয়া গেল, এতগুলি মরদের মধ্যে কাহারও এমন সাধ্য হইল না যে একটা হাত উঁচু করিয়া তুলে। তারপর দেশ ছাড়িয়া ঘুরিতে ঘুরিতে আসিয়া পড়িল বল্লভের সীমানার মধ্যে। বল্লভের তখন রাজ্যপত্তনের মুখ, এমন গুণীলোক পাইয়া বাঁচিয়া গেলেন। মৃত্যুঞ্জয়কে করিতে চাহেন ঢালিদলের সর্দ্দার। মৃত্যুঞ্জয় কিন্তু কিছুতে রাজী নয়—বলে, না রায় মশায় এসব আর নয়। জীবন নিয়ে খেলা আর কোরবো না—বউ মরবার সময় কিরে করেছি। বল্লভ নাছোড়বান্দা, বলিলেন—দাঙ্গাফ্যাসাদে কোনদিন তোমায় পাঠাবো না, তুমি কেবল আমার ঢালিদের খেলা শিখিও। শেষ পর্য্যন্ত মৃত্যুঞ্জয় রাজি না হইয়া পারিল না, বলিল—বেশ তাই হোল। তোমার নুন যখন খাবো তোমার জন্য জীবন দিতে পারবো—কিন্তু কারো জীবন কখনো নেবো না, এই চুক্তি—। তারপর কত বড় বড় দাঙ্গা হইয়াছে, মৃত্যুঞ্জয় সে সবের মধ্যে না যাইয়া পারে নাই। কিন্তু এমন আশ্চর্য্য কায়দায় লাঠি চালাইত যে তাহার হাতে আর একটা লোকও মরে নাই।

এ সব যে-আমলের কথা তখন বল্লভের চুলে পাক ধরিয়াছে, তাঁহার মায়ের বয়স আশীর উপর। গঙ্গাহীন দেশ —চাকদার এদিকে আর গঙ্গা নাই। মরণকালে বুড়ামায়ের গঙ্গালাভ হইবে না, এই আশঙ্কায় শেষের ক'টা দিনের জন্য মাকে চাকদায় পাঠান ঠিক হইল। রায় মহাশয়ের মা যাইতেছেন, সহজ কথা নয়—লাঠিয়াল-পাইক সাজিল, চাল-ডাল-ঘি লইয়া বিস্তর লোকজন আগে আগে ছুটিল, পথের মধ্যে মধ্যে জায়গা পরিষ্কার করিয়া পরম শুদ্ধাচারে হবিষ্যান্ন প্রস্তুত

হইবে। তিন চারি দিনের পথ। ষোল বেহারা হুম-হুম করিয়া বুড়ীকে বহিয়া লইয়া চলিল। জ্যোৎস্না রাত, সাত ক্রোশ বেশ কাটিল—একশো পাইক হুঙ্কার দিতে দিতে চলিয়াছে, কিন্তু সাত ক্রোশের মাথায় গিয়া পড়িল ঐ দুরন্ত খাল। পাড় ভাঙিয়া ডাক ছাড়িয়া দুই পাশের ধানবন দলিয়া মলিয়া হু হু বেগে খাল ছুটিতেছে, টানের মুখে কুটাটি ফেলিলে দুই খণ্ড হইয়া যায়। জলে নামিয়া খাল পার হইবে কাহার সাধ্য? পাল্কী নামাইয়া সমস্ত রাত সেই খালের পাড়ে বসিয়া। তারপর সকালে অনেক কষ্টে একখানা ডিঙা যোগাড় করিয়া খালে আনিয়া পাল্কী পার করিবার চেষ্টা হইল। কিন্তু এত লোক-জন বোঠে বাহিয়া গলদঘর্ম্ম, ডিঙা কিছুতেই খালে ঢুকিল না, দুইদিন সেখানে সেই অবস্থায় কাটাইয়া অবশেষে সকলে ফিরিয়া আসিল।

মা ফিরিয়াছেন শুনিয়া বল্লভ সকল কর্ম্ম ফেলিয়া তাড়াতাড়ি দেখা করিতে আসিলেন। কিন্তু মা কথা কহিলেন না; পা ধরিয়া এত কান্নাকাটি, কিছুতেই না। তারপর অকস্মাৎ উচ্চৈঃস্বরে কান্না—সে কী ভয়ানক কান্না! নিজের পোড়া অদৃষ্টের কথা, মরিবার আগে গঙ্গাস্নানটাও হইল না—এই দুঃখ। বল্লভ রায়ের ভারী মনে লাগিল, কঠিন দিব্য করিলেন—তিন মাসের মধ্যে ঐখাল বাঁধিয়া একেবারে চাকদা পর্য্যন্ত সোজা রাস্তা তৈয়ারী করিয়া সেই রাস্তায় মাকে নিজে পৌছাইয়া দিয়া আসিবেন, তাহা না পারিলে তিনি অব্রাহ্মণ। পরদিন হইতে হাজার লোক কাজে লাগিল। বল্লভ রায়ের ঢালা হুকুম—খাল বাঁধিয়া চাকদা পর্য্যন্ত রাস্তা করিতেই হইবে, উহাতে সর্ব্বস্ব খরচ করিয়া পথের ফকির হইতে হয় সেও স্বীকার। এপারে ওপারে রাস্তা বাঁধিতে বেশী বেগ পাইতে হইল না, কিন্তু খাল লইয়াই বাধিল যত মুস্কিল।

এখন আর খালের কি আছে? দুই কূল মজিয়া বিল হইয়াছে, মাঝখানে ক্ষীণ জলধারা। বর্ষার সময় টান হয় কিন্তু সে সব দিনের তুলনায় একেবারে কিছুই নয়। বল্লভের লোকজন জলের মধ্যে বাঁশ পুঁতিয়া রাজ্যের খড় সেই বাঁশের গায়ে বাঁধিয়া জলের বেগ কমাইবার কত চেষ্টা করিতে লাগিল, নৌকার পর নৌকা বোঝাই ইট ও মাটি খালে ঢালিল, কিছুতেই কিছু হয় না, সমস্ত ভাসাইয়া লইয়া যায়। অথচ খাল বাঁধিতে না পারিলে প্রতিজ্ঞা পণ্ড হয়। তিন মাসের আর তিন দিন বাকী। বল্লভ ত ক্ষেপিয়া গিয়াছেন, দিনের মধ্যে পঞ্চাশবার—জয় মা চণ্ডিকে, মুখ রাখিস্ মা—বলিয়া চীৎকার করেন এবং খালের ধারে নিজে থাকিয়া রাতদিন তদারক করিতেছেন, কোন উপায় হইতেছে না। তিন দিনের মধ্যে সুরাহা না হইলে খালের জলে ডুবিয়া মরিবেন মনে মনে মতলব আছে। এ সঙ্কল্পের কথা কাহাকেও বলেন নাই, তবে ভ্রূকুটিময় ভীষণ মুখ দেখিয়া লোকজন মনে করে ঝড় আসন্ন।

সেদিন গভীর রাত্রিতে সকলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। আকাশ-ভরা মেঘ। বল্লভের চোখে ঘুম নাই, তাঁবু হইতে বাহির হইয়া একাকী নূতন বাঁধা রাস্তায় পায়চারী করিতেছেন। এত অন্ধকার যে কোলের মানুষ দেখা যায় না, এমন সময় হু-হু করিয়া হাওয়া বহিয়া গেল। চারিদিকে প্রকাণ্ড বিল, ডাকভরের মধ্যে মানুষের বসতি নাই। এত বড় সাহসী মানুষ, তবু বল্লভের গা'টা ছম ছম করিয়া উঠিল, ফিরিয়া তাঁবুতে আসিয়া শুইয়া পড়িলেন এবং আশ্চর্য্য ব্যাপার, সাথে সাথেই চক্ষু ঘুমে ঢুলিয়া পড়িল। স্বপ্নে দেখিলেন, সশরীরে দেবী চণ্ডিকা—সে কথা বলিতে সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া ওঠে, একেবারে সত্যসত্যই কালিমূর্ত্তি! তিনি যেন হাতের খাঁড়া নাড়াইয়া বল্লভকে ইসারা করিলেন, বল্লভ পিছু-পিছু খাল-ধার অবধি আসিয়া দাঁড়াইলেন। তারপর দেবী দেখিতে দেখিতে বাতাসে মিলাইয়া গেলেন। হঠাৎ ঝপ্ ঝপাস শব্দে কি-একটা খালে পড়িল, জল ছিটকাইয়া উঠিল; বল্লভ দেখিলেন, স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন—একটা কবন্ধ দেহ জলের টানে একবার ভাসিয়া উঠিয়া পলকের মধ্যে তলাইয়া গেল, আর তাঁহার চোখের সামনে শূন্যে নিরবলম্বন ঝুলিতেছে মুণ্ডটি। বড় বড় চোখ ঠিকরাইয়া বাহির হইয়াছে, গলা দিয়া রক্তের ধারা বহিয়া খালের জল লাল হইয়া গেল। মুণ্ডটার দিকে ভাল করিয়া তাকাইলেই বল্লভ যেন চিনিতে পারিবেন, কিন্তু চাহিতে পারিতেছেন না। এমন সময়ে সর্ব্বাঙ্গে অননুভূতপূর্ব্ব কম্পন জাগিয়া উঠিল, বল্লভের ঘুম ভাঙিল। আগাগোড়া ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে,

আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। উঠিয়া তখনই গিয়া মৃত্যুঞ্জয়কে ডাক দিলেন—মৃত্যুঞ্জয়, ও মৃত্যুঞ্জয়!

কুড়োনকে লইয়া মৃত্যুঞ্জয় খালের ধারে মাদুর মুড়ি দিয়া শুইয়া ছিল। বাপে-বেটায় ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। ইসারা করিয়া বসন্ত তাঁবুতে ডাকিলেন। আবার ইসারা করিয়া মৃত্যুঞ্জয়কে একা একাই আসিতে বলিলেন,—কুড়োন ওখানে থাকুক, বড় গোপন ব্যাপার। ছেলেকে বসাইয়া রাখিয়া নিঃশব্দে দুজনে অগ্রসর হইল। আট দশ পা আসিয়াছে—এমন সময়ে মৃত্যুঞ্জয়ের পিছনে কাপড়ে টান, তাকাইয়া দেখে কুড়োন আসিয়া কাপড় ধরিয়াছে। বসন্ত ফিরিয়া চাহিলেন, আবার বাঁহাত নাড়িয়া উহাকে রাখিয়া আসিতে বলিলেন। মৃত্যুঞ্জয় জোর করিয়া কাপড় ছাড়াইয়া লইল ত কুড়োন বাপের হাত জড়াইয়া ধরিল। অন্ধকারে ভয় করিতেছে, সে কিছুতেই বাপকে ছাড়িবে না। মৃত্যুঞ্জয় ধমক দিল, মিষ্টকথায় বুঝাইল, কিন্তু তেপান্তরের মাঠের মধ্যে আঁধার অশ্বত্থগাছের কাছে বালক কিছুতেই বসিয়া থাকিবে না। অগত্যা কুড়োনকেই তাঁবুর মধ্যে পাঠাইয়া দিয়া দু'জনে খালের ধারে বসিয়া পরামর্শ হইল।

কিছুই সাব্যস্ত হয় না। মৃত্যুঞ্জয়ের সেই এক কথা—আমি জীবন দিতে পারি রায়মশায়, জীবন নিতে পারবো না—সে তো তুমি জানো। তোমার হুকুম মানি কি করে'?

বসন্ত কহিলেন—আমার হুকুম নয়, চণ্ডীর হুকুম। স্বপ্নে আমায় স্পষ্ট দেখিয়ে দিল—নররক্ত না খেয়ে বেটী কিছুতে খাল বাঁধতে দেবে না—।

মৃত্যুঞ্জয় নিজের প্রকাণ্ড বুকের উপর থাবা মারিয়া বলিল—আমাকেই তবে বলি দাও। তোমার নুন খেয়েছি, তাতে পিছপাও নই। কুড়োন থাক্‌বে, তাকে তুমি দেখো।

কিন্তু ইহা কাজের কথা নয়। বসন্ত শেষ অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন, জানেন যে ইহা অব্যর্থ। বলিলেন—তোমার দরকার হবে না মৃত্যুঞ্জয়, আমি আছি। সে সব মনে-মনে আমার ঠিক করাই আছে। তুমি একবার খোঁজাখুঁজি করে দেখে এসো—হোক না হোক পরশু রাত পোহাবার আগে কেনা চাই। নরবলির ভাবনা কি? বলিয়া আরও গম্ভীর হইলেন।

মৃত্যুঞ্জয় উঠিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু দাঁড়াইয়াও কি ভাবিতে লাগিল।

বসন্ত বলিলেন—নাস্তিকের মতো কথা বলো কেন? জীবন নেওয়া তুমি বলো কারে? মায়ের পুজোর বলি জোগাড় করে' আনা আর মানুষ খুন করা এক-কথা হোলো? ছি—ছি—ছি—

সেই টানিয়া-টানিয়া-বলা ছি-ছি-ছি মৃত্যুঞ্জয়কে যেন তিনবার মুগুর মারিল। মনিবের হুকুমের পর আর কোন দিন সে দ্বিরুক্তি করে নাই। কহিল—আমি মুখ্যু মানুষ, ধর্ম্ম অধর্ম্ম বুঝিনে। তুমি বল্লে রায় মশায়, দোষ হয় না—আমি চল্লাম। কুড়োন রইল তোমার তাঁবুতে, বড্ড ভীতু,—ওরে দেখো—।

দীর্ঘমূর্ত্তি অন্ধকারে অশ্বত্থ গাছের ছায়ায় অদৃশ্য হইল। বসন্ত তাঁবুর মধ্যে ঢুকিলেন। দেখিলেন, আলগা খড়ের উপর বসন্তের বিছানার পাশে কুড়োন বিভোর হইয়া ঘুমাইতেছে।··

মাঝে একটা দিন-রাত্রি, তারপর আবো একটা দিন কাটিয়া রাত্রি আসিল, শেষের রাত্রি! কাল সন্ধ্যার সময় ঠিক তিন মাস পূর্ণ হইয়া যাইবে। প্রতিজ্ঞা পণ্ড হইয়া গেলে তাহার পর খাল বাঁধা না-বাঁধা একই কথা। এই রাত্রির মধ্যেই ক্ষুধিত করালীর বলি চাই, নররক্তে খাল লাল হইলে তবে জলের বেগ কমিবে। বসন্ত জানেন—একেবারে নিশ্চিন্ত হইয়া আছেন, যেমন করিয়া হোক মৃত্যুঞ্জয় রাত্রির মধ্যে বলি লইয়া ফিরিয়া আসিবেই। সন্ধ্যার আগে সমস্ত লোকজন বিদায় করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহারা পাঁচক্রোশ দূরের গ্রামে চলিয়া গেল। নরবলির কথা ঘুণাক্ষরে কেহ জানেনা। বাহিরে কেবলমাত্র প্রকাশ, কার্য্যসিদ্ধির জন্য রায় মহাশয় ভয়ঙ্কর কালি-সাধনা করিতেছেন, আজ তার পূর্ণাহুতি। পরম সৌভাগ্যবান উৎসর্গিত বলির মানুষটি যখন আর্ত্তনাদ করিবে সে কণ্ঠ দেবতা ছাড়া বাহাতে বাহিরের লোকের কানে না পৌঁছায় বসন্ত সর্ব্বপ্রযত্নে তাহার

ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু সামান্য একটা খুঁত রহিয়া গেল—সে কুড়োন। কত লোভ দেখান হইল, কত বুঝানো হইল—সে কিছুতেই গ্রামে গেল না। তাহার ভয় করে, আর কোথাও গিয়া থাকিতে পারে না। হতভাগা ছেলে চিনিয়া রাখিয়াছে কেবল বাবাকে আর রায় মশায়কে। দুইদিন বাবাকে দেখে নাই, ভারী মন কেমন করে, গোপনে গোপনে খুব কাঁদিয়া থাকে—কিন্তু বসন্তকে দেখিলে চোখ মুছিয়া হাসে, তাঁহার সামনে কান্নাকাটি করা বড় লজ্জার ব্যাপার বলিয়া মনে করে।

কুড়োন তাই রহিয়া গিয়াছে। তা ঐ বালকের জন্য ভাবনা কিছু নাই। একবার ঘুমাইয়া পড়িলে ঢাক-ঢোল পিটিয়াও তাহার ঘুম ভাঙান যায় না। নিশি রাত্রির ব্যাপার সে কিছু জানিতে পারিবে না।

প্রহরের পর প্রহর নিঃশব্দে কাটিয়া যাইতেছে, মৃত্যুঞ্জয় এখনো ফিরিল না। কুড়োন ঘুমাইয়া পড়িলে বসন্ত অনেকক্ষণ ধরিয়া নূতন হাঁড়িতে ঘসিয়া ঘসিয়া খড়্গ শানাইয়াছেন, অন্ধকার তাঁবুর মধ্যে রক্তলোলুপ সেই শাণিতাস্ত্র ঝকমক করিতেছে। কদিন রাত্রির পর রাত্রি জাগিয়া চক্ষু আগুনের ভাঁটার মতো লাল, আজ আবার রক্তবর্ণের চেলী পরিয়াছেন, কপালে বাহুতে বড় বড় সিঁদুরের ফোঁটা। বাতাসে এক-একবার ধানবন কাঁপিয়া ওঠে, অশ্বথগাছের দু'চারিটা পাতা উড়িয়া তাঁবুর কাছে পড়ে, অমনি কাঁধের উপর খড়্গ তুলিয়া উঠিয়া দাঁড়ান। শেষে আর তাঁবুর মধ্যে তিষ্ঠাইতে পারিলেন না, খড়্গ কাঁধে বাহিরে আসিলেন। চারিদিক নিস্তব্ধ, ভয়ঙ্কর অন্ধকার, কোনখান হইতে খালের আরম্ভ বুঝিবার উপায় নাই। জলস্থল একাকার হইয়া গিয়াছে। বাতাসও বন্ধ হইয়া গিয়াছে, গাছের পাতাটি নড়ে না। বসন্তের মনে হইল বুঝি এইমাত্র মহাপ্রলয় হইয়া গেল, শব্দময় প্রাণপ্রবাহের মৃত্যু ঘটিয়াছে, জীবজগৎ নাই, জন্মমৃত্যু সমস্তই একাকার, তিনিও এইবার নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া পড়িয়া যাইবেন। নিঃশব্দতা পাথর হইয়া বুক চাপিয়া ধরিয়াছে, প্রতি মুহূর্ত্তেই চাপ বাড়িতেছে। অসহ্য মনে হইল। চীৎকার করিয়া উঠিলেন—জয় মা চণ্ডিকে! সেই চীৎকারে নিজেরই সর্ব্বদেহ শিহরিয়া উঠিল। দেবী চণ্ডী উপবাসী, বসন্তের মনে হইল রক্তবুভুক্ষু মুণ্ডমালিনী তাঁহার ঠিক সামনেই অতল অন্ধকারের মধ্যে কৃপাণ মেলিয়া নিঃশব্দে অপেক্ষা করিতেছেন। মাথার মধ্যে রক্ত চড়িয়া উঠিল। মনে হইল অশ্বথগাছের তলা হইতে দ্রুতপদে কাহারা বাহির হইয়া আসিতেছে—এক—দুই—তিন—চার—অনন্ত। ডাকিলেন—কে? কারা? উত্তর নাই। খুব জোরে আবার ডাকিলেন—কে? কে? কে? গাছের তলায় গিয়া দেখিতে লাগিলেন। এক হাতে শক্ত মুঠায় খড়্গ ধরিয়া আর এক হাত বাড়াইয়া অশ্বথ গুঁড়ির চারিদিক হাতড়াইতে লাগিলেন। উপরে তাকাইয়া দেখিলেন। বোধ হইল ডালপালার ভিতরে প্রকাণ্ড ঢালের মতো একটা লেলিহান জিহ্বা লকলক করিয়া দুলিতেছে এবং জিহ্বার দুই পাশ দিয়া দেহহীন চক্ষুর আশ্রয়হীন কেবলমাত্র দুইটি দৃষ্টি হাউই বাজীর মতো আগুন ছড়াইতে ছড়াইতে তাঁহার দিকে অতি দ্রুতবেগে ছুটিয়া আসিতেছে। খড়্গ উঁচু করিয়া তুলিয়া দেখেন লোহার উপরে যে চক্ষুটি আঁকান ছিল তাহাও আগুন হইয়া জ্বলিয়া একেবারে চোখোচোখি তাকাইয়া আছে। ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, ছুটাছুটিতে মাথার মধ্যে আগুন যেন টগবগ করিয়া ফুটিতে লাগিল। তাঁবুর চারিপাশে খালের পাড়ে অশ্বথতলায় নূতন বাঁধা রাস্তার উপর দিয়া বসন্ত দুমদুম করিয়া পা ফেলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ছিন্নমস্তার মতো নিজের মাথা নিজেরই কাটিয়া ফেলিতে ইচ্ছা হইল। অন্ধকার তরল হইয়া আসিতেছে, পূর্ব্বাকাশে রক্তিমাভা। রাত্রি পোহাইতে আর দেরী নাই। বসন্ত রায় পাগল হইয়া উঠিলেন। মৃত্যুঞ্জয় এখনো ফিরিল না, সে বিশ্বাসঘাতক। ঠিক বুঝিলেন, বড় অনিচ্ছার সহিত গিয়াছিল, এখন চক্রান্ত করিয়া কোন দেশে পলাইয়া রহিয়া আছে। কাল বসন্ত সুর্দ্ধ মকমে অপদস্থ হইলে তারপর হয়ত ফিরিয়া আসিবে। প্রান্তর কাঁপাইয়া প্রবল হুঙ্কার দিলেন—জয় মা চণ্ডিকে!—খড়্গ লইয়া তাঁবুর মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন।

কুড়োন জাগে নাই, বিভোর হইয়া ঘুমাইতেছিল, একবার ঘুমাইলে কিছুতে ঘুম ভাঙে না। বসন্ত আর একবার চীৎকার করিলেন—জয় মা—

কুড়োন জাগিল না।

আলো করিয়া ফর্শা না হইতেই মৃত্যুঞ্জয় ফিরিয়া আসিল। দু'দিনে সে অনেক দূর গিয়াছিল, অবশেষে রাত্রি বেলা এক সুকুমার ব্রাহ্মণ শিশুকে ঘুমন্ত অবস্থায় চুরিও করিয়াছিল। মুখ বাঁধিয়া কাঁধের উপর ফেলিয়া ক্রোশ পাঁচ-ছয় ছুটিয়া আসিয়াছে, এমন সময়ে গুড়-গুড় করিয়া মেঘ ডাকিয়া উঠিল—বিদ্যুৎ চমকাইল। মাঠের মধ্যে তাহার আলো বালকের মুখের উপর পড়িল। চাহিয়া দেখে ছেলেটি জাগিয়াছে—ভীতি-বিহ্বল অসহায় দৃষ্টি, মুখ বাঁধা বলিয়া শব্দ করিতে পারিতেছে না, এক-একবার গলার মধ্যে ঘড়-ঘড় আওয়াজ উঠিতেছে। কে যেন মৃত্যুঞ্জয়ের পা দু'খানা ঐখানে আটকাইয়া ফেলিল। তাকাইয়া তাকাইয়া বারবার ছেলেটির মুখ দেখিতে লাগিল। হঠাৎ মনে হইল সে যেন কুড়োনের মুখ বাঁধিয়া হাঁড়িকাঠের মধ্যে লইয়া যাইতেছে। মাঠ পার হইয়াই এক গৃহস্থ বাড়ী। তাহাদের চণ্ডীমণ্ডপে ছেলেটাকে নামাইয়া রাখিয়া মৃত্যুঞ্জয় ছুটিয়া পলাইল। বিল ভাঙিয়া সোজাসুজি দৌড়িয়া আসিয়াছে, ধানবনের মর্ম্মরে পিছল পথে অনবরত পিছন হইতে মুখ-বাঁধা বালকের ঘড়ঘড়ানি গলার আওয়াজ শুনিতে শুনিতে আসিয়াছে। খালের ধারে আসিয়া বল্লভকে দেখিতে পাইল। জলের কাছে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া তিনি গভীর মনোযোগের সহিত নীচের দিকে নিরীক্ষণ করিতেছেন।

বল্লভের সম্বিৎ নাই। দেখিতেছেন—গভীর নিম্নদেশে জমা রক্তের চাপ গুলিয়া গিয়া ক্রমশঃ সমস্ত খালের জল রাঙা হইয়া উঠিতেছে, একটু একটু করিয়া জলের বেগ কমিতেছে, এক-একবার মাটির চাঁই জলে ফেলিয়া পরীক্ষা করিতেছেন—না, আর তেমন আগের মতো পাক খাইয়া মাটি ভাসাইয়া লইয়া যায় না। এইবার—এখনি—আর একটু পরে জল স্থির হইয়া দাঁড়াইবে।···মৃত্যুঞ্জয় অনেকক্ষণ পিছনে বসিয়া রহিল। রায় মহাশয়ের এ ভাব সে আর কখনও দেখে নাই। ডাকিতে সাহস হইল না। শেষকালে উঠিয়া গিয়া বল্লভের তাঁবুর মধ্যে ঢুকিল। তাঁবুর মধ্যে কুড়োন নাই। এক পাশের অনেকগুলি খড় তুলিয়া ফেলা হইয়াছে, নীচের শুকনা ঘাস বাহির হইয়া পড়িয়াছে, আর আশেপাশের খড়ের উপর তাজা রক্তের ছিটা। যে-মৃত্যুঞ্জয় সমস্ত যৌবনকাল হাতে পায়ে রক্ত মাখিয়া নাচিয়া বেড়াইয়াছে বুড়া বয়সে ক'ফোঁটা রক্ত দেখিয়া তাহার সর্ব্বদেহ কাঁপিয়া উঠিল। বল্লভকে গিয়া বলিল—রায় মহায়, আমার কুড়োন কোথায়?

বল্লভ তাহার দিকে ফিরিয়া তাকাইলেন, সে দৃষ্টির কোন অর্থ হয় না।

মৃত্যুঞ্জয় তাঁহার হাত ধরিয়া প্রকাণ্ড ঝাঁকি দিয়া বলিল—শুনছো? শুনছো? তোমার কাছে রেখে গেছ্‌লাম, আমার কুড়োন কোথায় গেল? বলে দাও—সে কোথায় গেল?

উদ্‌ভ্রান্তের মতো মৃত্যুঞ্জয় চলিয়া গেল, এক ফোঁটা চোখের জল পড়িল না। পরদিন সমস্ত দিনমান কোথায় ঘুরিয়া বেড়াইল কেহ বলিতে পারে না। এদিকে চাঁটগার দিকে যে কারকুন গিয়াছিল এমনি দৈবচক্র, সকাল বেলাতেই বিস্তর লোক লইয়া সে আসিয়া পড়িল। সন্ধ্যার মধ্যেই খাল-বাঁধা শেষ।

বল্লভের প্রতিজ্ঞা রক্ষা হইল, কিন্তু তিনি আর শান্তি পাইলেন না।

সেদিন নিশীথরাত্রে বল্লভ জাগিয়া ছিলেন। হঠাৎ সদ্য-সমাপ্ত বাঁধের উপর দিয়া ছুটিতে ছুটিতে মৃত্যুঞ্জয় আসিয়া বল্লভের হাত ধরিয়া আগের দিনের মতো প্রশ্ন করিল—আমার কুড়োন কোথায় গেল? তাকে কোথায় রেখেছ—বলে দাও—বলে দাও—। বল্লভ কেবল হতভম্বের মতো তাকাইয়া দেখিলেন আবার মৃত্যুঞ্জয় ছুটিয়া চলিয়া গেল।

ইহার পরে বল্লভের যে কি হইল, তিনি আর বাড়ী ঘরে ফিরিলেন না। দিনরাত খালের ধারে তাঁবুর মধ্যে চুপ করিয়া কাটাইতেন। মৃত্যুঞ্জয়ের বড় ছেলে যাদবকে খবর দিয়া আনা হইল। বিস্তর জমিজমা দিয়া তাহাকে বসত করাইলেন। লোকে বলে, মৃত্যুঞ্জয় নাকি প্রতিরাত্রেই আসিত। দিগন্তবিসারী জনহীন প্রান্তরের মধ্যে নিস্তব্ধ নিশীথে প্রভু ভৃত্যে কথাবার্ত্তা হইত, বল্লভের কোন কোন কর্ম্মচারী তাহা স্বকর্ণে শুনিয়াছে। মৃত্যুঞ্জয় বলিত—রাং

মশায়, আমি জীবন দেবো—জীবন নেবো না কখনো। বল্লভ বলিতেন—সে আমি জানি, জানি—তুই কক্ষণো জীবন নিবিনে—

তবু বল্লভ রায়ের জীবন গেল। মাস দেড়েক পরের কথা, পরিষ্কার পূর্ণিমা রাত, ভাদ্র মাসের শেষ কোটাল। বাঁধের গায় প্রবল বেগে জোয়ারের জল ধাক্কা দিতেছে। হঠাৎ তুমুল কলকল্লোল শুনিয়া বল্লভ রায় ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া দেখেন বাঁধ ভাঙিয়াছে, হুহু করিয়া খালের মধ্যে জল ঢুকিতেছে। দেখিতে দেখিতে সমস্ত বাঁধের আর চিহ্নমাত্র রহিল না। তারপর দেখিলেন ওপারে জ্যোৎস্নার মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় দাঁড়াইয়া আছে। ঠিক এই সময়ে রোজই সে মনিবের কাছে আসিত। বাঁধ ভাঙিয়া যাওয়ায় আজ আর তাঁহার কাছে আসিতে পারিতেছে না। মৃত্যুঞ্জয় ডাকিতে লাগিল—রায় মশায়, রায় মশায়,—

বল্লভ বলিলেন—কি করে' যাই? দেখছিস জলের টান!

সে বলিল—চলে এসো, মোটে হাঁটু জল—। ওপার হইতে মৃত্যুঞ্জয় নামিয়া আগাইয়া আসিতে লাগিল, হাঁটু জলও নয়। এপারে বল্লভ নামিলেন। কিন্তু এপারে জল বেশী, বুকজল ক্রমে গলাজল হইয়া দাঁড়াইল। বল্লভ ডাকিয়া বলিলেন তুই এগিয়ে আয় মৃত্যুঞ্জয়, আমি আর পারছিনে। মৃত্যুঞ্জয় কহিল—আর একটু রায় মশায়, আর একটু—এইবার জল কমবে। জলের টানে ঘুমন্ত অবোধ বালকের চাপা কান্নার মতো শোনা যাইতে লাগিল। মাথার উপর মেঘনির্ম্মুক্ত পূর্ণিমার চাঁদ। মাঝখানে আসিয়া দুজনে প্রবল আকর্ষণে পরস্পরকে জড়াইয়া ধরিল। তারপর জোয়ারের বেগে কে কোথায় ভাসিয়া গেল, তাহা কেহ জানে না।

দ্বারিক দত্ত আর কি-কি বলিয়াছিলেন পনের বছর পরে এখন তাহা মনে নাই। তবে এটা মনে পড়ে—সে দিন সন্ধ্যায় ভাঁটা সরিয়া গিয়া ঈষন্নিম্ন সমতল নদীগর্ভ অনেকখানি অনাবৃত হইয়া পড়িয়াছিল এবং চাঁদের আলোয় বালুকারাশি চিক-চিক্ করিতেছিল। গল্প শুনিতে শুনিতে একটু পরেই চোখ বুঁজিয়া জড়সড় হইয়া পড়িলাম, ভয়ে রাতের মধ্যে চোখ আর মেলি নাই।

পরদিন গোধূলি লগ্নে নির্ব্বিঘ্নে ছোট কাকার বিবাহ হইয়াছিল, বরযাত্রীরাও আকণ্ঠ মিষ্টান্ন ভর্ত্তি করিয়াছিলেন। সেই ছোট কাকী এখন পাঁচটি ছেলেমেয়ের মা। দেখিতে দেখিতে পনেরটা বছর কাল-সমুদ্রে বিলীন হইয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে শেষের বছর দশেক আমরা একদম দেশ ছাড়া। বাড়ী শুদ্ধ সকলে কাশীতে আছি—সেখানে বাবা কাঠের ব্যবসা দিব্য জমাইয়া বসিয়াছেন। অবস্থা ফিরিয়াছে। কেবল ফি বছর বাবা স্বয়ং একবার করিয়া দেশে যান। স্বদেশপ্রেমবশতঃ নয়, পুঁটিগারীর বিলে সুবিধামতো অনেক জায়গা জমি কেনা হইয়াছে বলিয়া। যদিও দক্ষ নায়েব একজন আছে, তবু নিজে গিয়া এক একবার দেখিয়া আসিতে হয়।

এদিকে আমি আইন পাশ করিয়া একরকম নিরুপদ্রব হইয়া আবার কাশীর বাড়ীতে অধিষ্ঠান করিয়াছি। বাবা জানেন, আমিও জানি—ঐ পাশের বেশী আমার দ্বারা আর কিছু হইবে না। সুতরাং কোর্টে যাইবার জন্য কোন পীড়াপীড়ি নাই। যে দিন বীণার সঙ্গে ঝগড়া হইয়া যায়, ভারী রাগ করিয়া গায়ের উপর চোগা চাপকান চাপাইতে লাগিয়া যাই—আবার হাসিয়া যখন সে দুয়ার আটকাইয়া দাঁড়ায় ঐ বোঝা নামাইয়া ফেলিয়া নিশ্চিন্ত আরামে শুইয়া পড়ি। এমনি চলিতেছিল। ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি একদিন হঠাৎ বাবা ডাকিয়া বলিলেন—একবার দেশে যাও, কাল পরশুর মধ্যে—

অবাক হইয়া গেলাম। দশ বছরের অভ্যাসক্রমে বাংলা মুলুকের সেই সুদুর্গম গ্রামটি মন হইতে ক্রমাগত দূরে সরিতে সরিতে প্রায় আন্দামান দ্বীপের সমান তফাৎ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাপ হইয়া এমন বিভ্রাট বাধাইতে চান কেন?

কহিলাম—কেন, আপনি?

বাবা কহিলেন—আমি নাগপুরে যাচ্ছি হপ্তাখানেকের মধ্যে, কাঠের চালান আনতে। সে তো তুমি পারবে না?

না, তাহাও পারিব না—অতএব চুপ করিয়া রহিলাম।

বাবা বলিতে লাগিলেন—পুঁটিমারীর জমি নিয়ে প্রজাদের সাথে গণ্ডগোল বেধে উঠেছে—ঘনশ্যাম চিঠি লিখেছে। আবার মামলা-টামলা যদি হয় ও বেটা তো রাঘব বোয়াল, টাকাকড়ি হাতে যা পাবে নিজেই গিলবে। তুমি গিয়ে কিস্তির মুখটা কাটিয়ে সব মিটমাট করে দিয়ে এসো গে। লেখাপড়া শিখেছ, আইন পাশ করলে, অন্ততঃ নিজেদের এষ্টেটপত্তোরগুলো দেখা শুনা করো।

হায় কি কুক্ষণেই যে আইন পাশ করিয়াছিলাম!

দিন চার-পাঁচ পরে একটা সুটকেশ হাতে করিয়া রাত্রির মেলে যশোহর ষ্টেশনে নামিলাম। প্রায় দশ বছর আগে আর একদিন রাত্রে এখান হইতে গাড়ী চাপিয়াছিলাম, সে সব দিনের কথা ভাল মনে নাই। তবু মনে হইল ষ্টেশনটি প্রায় এক রকমই আছে। রাত্রি আর বেশী নাই, খোলা ওয়েটিং রুম দিয়া প্লাটফরম অবধি মাঠের জোলো হাওয়া আসিতেছে। এ সময়ে যাহার নিতান্ত গরজ, তেমন লোক ছাড়া আর কাহারো জাগিয়া থাকার কথা নয়। কিন্তু ট্রেনের মধ্যে থাকিতেই তুমুল গণ্ডগোল কানে আসিতেছিল। ওয়েটিংরুমে দাঙ্গা বাধিয়াছে নাকি? যেই সেখানে পা দিয়াছি আর যাইবে কোথায়—জন পচিশেক মানুষ চারিদিক হইতে ছুটিয়া আসিয়া যেন ছাঁকিয়া ধরিল। সকলেই জিজ্ঞাসা করে—কোথায় যাবেন? কোথায় যাবেন? সাঁতার-না-জানা মানুষ গভীর জলের মধ্যে পড়িলে যেমন হয় আমার দশা সেই প্রকার। কোন দিকে কূল-কিনারা দেখি না, পলাইবার পথ নাই। উত্তর না দিলে কেহ পথ ছাড়িবে না, কাজেই বলিয়া ফেলিলাম—যাব নাগরগোপ। যেইমাত্র বলা অমনি একজনে ডান হাতের সুটকেসটা ছিনাইয়া লইয়া দৌড়। পলক ফিরাইয়া দেখি অন্য সকলে ঐ সাথে অন্তর্দ্ধান করিয়াছে। কিঞ্চিৎ দূরে আর একজন হতভাগ্য যাত্রীরও আমার দশা। সে দিকে আর না গিয়া পাশ কাটাইয়া সরিয়া আসিলাম। তা তো হইল—এখন আমার উপায়? সুটকেশের মধ্যে আমার সমুদয় কাপড় চোপড় এবং দশখানি দশ টাকার নোট রাখিয়াছিলাম। যশোহরে যে সদর জায়গায় দল বাঁধিয়া আজকাল এমন রাহাজানি সুরু করিয়াছে তাহা জানিতাম না। মিউনিসি-প্যালিটির রাস্তায় মাইল অন্তর কেরোসিনের আলোর ব্যবস্থা আছে, কালিতে কালিতে রাত্রিশেষে আলোগুলি এমন আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে যে সে আলোকে চোর চিনিয়া ধরা পাছের কথা, নিজের হাত-পা গুলি চিনিয়া লওয়াই মুস্কিল। সামনের রাস্তায় নামিয়াছি, ভক্ করিয়া পিছনে আওয়াজ। তাকাইয়া দেখি, সর্ব্বনাশ—প্রায় ঘাড়ের উপরে একখানা বাস আসিয়া পড়িয়াছে। এক দৌড়ে আগে গিয়া প্রাণটা বাঁচাইলাম। তারপর ভালো করিয়া চাহিয়া দেখি, কেবল একখানা নহে—সারি সারি ঐ রকম বিশ-ত্রিশখানি বাস। সকলেই ষ্টার্ট দিয়াছে, একবার আগাইতেছে, একবার পিছাইতেছে এবং তারস্বরে কে কোথায় যাইবে তাহা ঘোষণা করিতেছে। চীৎকারের যেন প্রতিযোগিতা চলিয়াছে। ঠিক সামনে যে গাড়ীখানা ছিল তাহার ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করিলাম—বলতে পার, আমার সুটকেশ নিয়ে এইদিক দিয়ে কে পালাল?

ড্রাইভার হাসিয়া বলিল—আজ্ঞে আসুন—এই যে—আপনি নাগরগোপ যাবেন তো! উঠে পড়ুন—এই নিন আপনার জিনিষ।

নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম। ভয় ধরাইয়া দিয়াছিল। ঝাঁঝের সহিত কহিলাম—তুমি বেশ লোক তো বাপু, না বলে' কয়ে' সুটকেশ নিয়ে চম্পট—

ড্রাইভার সবিনয়ে বলিল—আজ্ঞে, সে তো আপনার সুবিধের জন্যে। ভারী জিনিষ বয়ে' আনতে অসুবিধে হচ্ছিল, তাই দেখে—বলিয়া কথা শেষ না করিয়াই আরো দুইটি লোক প্লাটফরম পার হইয়া আসিতেছিল তাহাদের পাকড়াও করিতে ছুটিয়া গেল।

সুস্থির হইয়া বসিয়া চারিদিক তাকাইয়া তাকাইয়া দেখিতে লাগিলাম। দেখিয়া সম্ভ্রমের উদয় হইল।

লোকে সভ্য হইয়া উঠিতেছে বটে, মফস্বল শহরেও তাহার ব্যতিক্রম নাই। সামনেই হিন্দু চায়ের দোকান, সাইনবোর্ডে বড় বড় করিয়া লেখা—এই যে গরম চা, আসুন—সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণের দ্বারা প্রস্তুত। ট্রেণ হইতে নামিয়া ইতর-ভদ্র দলে দলে গিয়া সেই সাত্ত্বিক চা খাইতে বসিয়াছে। নূতন বায়স্কোপ খুলিয়াছে, ষ্টেশনের দেয়াল জুড়িয়া তাহার বিজ্ঞাপন···ভ্রাম্যমাণ সাড়েবত্রিশভাজা-ওয়ালার ঠুন্-ঠুন্ ঘণ্টার বাজনা···ডাক্তারখানার লাল-নীল আলো···দেখিয়া শুনিয়া মনে হইল শিয়ালদহের মোড়ের খানিকটা যেন এখানে আনিয়া বসাইয়া দিয়াছে।

ড্রাইভার ফিরিয়া আসিয়া নিজের জায়গায় বসিল। যাত্রী এত ভর্ত্তি হইয়া গিয়াছে যে একরূপ অখণ্ডমণ্ডলাকার অবস্থা। তা'ছাড়া এতগুলি মানুষ নিতান্ত মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া বসিয়া নাই। গাড়ী ছাড়িলে নড়িয়া চড়িয়া সোজা হইয়া বসিলাম। হুস্ হুস্ করিয়া শেষ রাত্রির ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে লাগিতে লাগিল।

জিজ্ঞাসা করিলাম—এগাড়ী যাবে কদ্দূর অবধি?

ড্রাইভার কহিল—আপনি ত নামবেন নাগরগোপে—তারপর বাঁকাবড়শী মাদারডাঙা ছাড়িয়ে চলে যাবে সেই কাটাখালীর কাছ বরাবর—

—নরবাঁধ পার হবে কি করে'?

অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া সে আমার দিকে তাকাইল। বলিল—দেশে থাকেন না বুঝি? সেখানে গেল বছর মস্ত পুল হয়ে গেছে। টার্ণার-ব্রিজ—টার্ণার সাহেবের আমলের কিনা! দেশের কি আর সেদিন আছে!

মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, সত্যই সেদিন আর নাই। বারো চোদ্দ বছর আগে একবার এই শহরে আসিয়া বাবার সাথে তিন দিন ছিলাম। তখন এখানে এক ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের আর এক পুলিশ সাহেবের, মাত্র এই দু'খানি মোটরগাড়ী ছিল। বিকালে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব নিজে গাড়ী চালাইয়া কেশবপুরের পথে বেড়াইতে যান, কথাটা শুনিবার পর পাকা তিন ঘণ্টা রাস্তার পাশে তীর্থকাকের মতো ধর্ণা দিয়া তবে হাওয়াগাড়ী দেখিতে পাইয়াছিলাম। সেই জীবনে প্রথম মোটর দেখা।

ড্রাইভার লোকটির উৎসাহ কিছুতেই খর্ব্ব হইতে ছিল না। বোধ করি সে স্কুল-পাঠ্য ভারতবর্ষের ইতিহাসের শেষ অধ্যায়টি ভাল করিয়া পাঠ করিয়া থাকিবে। আবার আরম্ভ করিল যাই বলুন মশায়, আপনাদের স্বরাজ-টরাজ ফক্কিকার, এমন কোম্পানীর রাজার মতো কেউ হবে না—রাস্তা-ঘাট রেল-ষ্টীমার ট্যাক্সি-বাস আর কি চাই? করুক দেখি কোন বেটা পারে?

ঘুমের ঘোরে নবনির্ম্মিত টার্ণার-ব্রিজ কোন সময়ে পার হইয়াআসিয়াছি, তাহা বুঝিতে পারি নাই। নাগরগোপের স্কুলঘরের কাছে নামিলাম। তখন বেশ বেলা হইয়াছে। এখান হইতে মাইলটাক হাঁটিয়া বাড়ী যাইতে হয়। ডাহিনে দেখিলাম, পুঁটিমারীর বিলে জল চক-চক করিতেছে। চমক লাগিল—কাণ্ডখানা কি? দশ বছর আগেকার কথা সঠিক মনে নাই। তবু আবছা স্বপ্নের মতো মনে পড়ে—এই সময়ে ঘন সতেজ সবুজ ধানে এই বিল ভরিয়া থাকিত। যত দিন দেশে ছিলাম ইহার কখন ব্যতিক্রম ঘটে নাই। পাঁচু মোড়ল, বিশে মোড়ল, রাইচরণ দাস, সর্দ্দারেরা ছকাই কান্তরাম, শান্তরাম—ইহারা কি বছর এক-একটা গোলা বাঁধিত। গোলা তৈয়ারী করা এ অঞ্চলের মানুষের যেন নেশার মতো হইয়া গিয়াছিল। তেঁতুলতলায় মুচিরা রান্না করিত, ঢপ-ঢপ করিয়া কুড়ালের উপর মুগুরের ঘা দিয়া বাঁশ ফাটাইত, সর্দ্দারদের মজাপুকুরে আটি বাঁধিয়া বাখারী পচাইতে দিত, সমস্ত কথা মনে পড়িতে লাগিল।

রাস্তার পাশে একজন লোক একমনে বসিয়া মাছধরা দোয়াড়ী বুনিতেছিল। কহিলাম—মাছ পড়ছে খুব?

লোকটি উত্তর করিল না, তাকাইয়াও দেখিল না।

সেটা বটতলা। শিকড়ের উপর দাঁড়াইয়া তরঙ্গাকুল সীমাহীন জলরাশি দেখিতে বেশ লাগিতেছিল। পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলাম—ও মোড়লের পো, বিল যে এবার একদম ওঠেনি - বড্ড বর্ষা হয়েছিল বুঝি—

এবার লোকটি চাহিয়া দেখিল। হাতের কাছের একখণ্ড বাঁশ আগাইয়া দিয়া কহিল—বসুন।

আমি বলিলাম—না বসবো না আর—তোমাদের বাড়ী বুঝি ঐ গাঁয়ে। ঘরগুলো বেশ দেখাচ্ছে, ঠিক সুন্দর একটা দ্বীপের মতো—।

দ্বীপ কাহাকে বলে লোকটার জানা নাই, অতএব দ্বীপের সৌন্দর্য্য বুঝিতে পারিল না। মোটে সেদিক দিয়াই গেল না। কহিল—বাবু, আমরা মহারাণীর কাছে দরখাস্ত করবো—কিছু হবে না?

—দরখাস্ত কিসের?

—নরবাঁধ বেঁধে ছোট করে পোল দিয়েছে, মহারাণী এসে পোল ভেঙে দিয়ে যান। এত বড় বিলের জল এই ফাঁকটুকুতে বেরোয় কখনো? তিনি নিজের চোখে একবার দেখে যান না—।

ভারী বিরক্ত হইলাম। যত ভাল কাজই গবর্ণমেণ্ট করুক না কেন দেশের লোকের খুঁত ধরা কেমন স্বভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুদূর পাড়াগায়েও সে বিষ ঢুকিতে বাকী নাই। বলিলাম—টাকাকড়ি খরচ করে' পোল দিয়েছে—বড্ড অপরাধের কাজ করেছে। আগে এখানে বুক জল হ'ত—লোকে পার হ'ত গামছা পরে'। আর আজকে দিব্যি মোটরে করে' চলে' এলাম—এক ফোঁটা জল কাদা গায়ে লাগলো না, কত বড় সুবিধে বল দিকি!

লোকটি তাতিয়া উঠিল। রুক্ষকণ্ঠে কহিল—ছাই হয়েছে, ঘরদোর জায়গা জমি জলে ডুবে রয়েছে—। হঠাৎ গলার স্বর ভারী হইয়া উঠিল। বলিতে লাগিল—এ কী রকম জুলুমবাজী? গোলায় এক চিটে ধান নেই—ঘরের মধ্যে ভাসা-বাদার সাপ উঠছে, খুঁটির গোড়ার মাটি জলে ধুয়ে যাচ্ছে, কোন দিন ঘরখানাই বা ধ্বসে যায়। সাতপুরুষে ভিটে ছেড়ে ছেলেপুলের হাত ধরে' এখন কোথায় যাবো? বলিতে বলিতে লোকটি চুপ করিল। বোধ করি বা কান্না ঠেকাইল। পুরুষ মানুষের কাঁদিতে নাই কিনা।

একটু স্তব্ধ থাকিয়া আবার বলিতে লাগিল—বুঝিয়ে সুঝিয়ে লিখলে মহারাণীর ঠিক দয়া হবে—কি বল বাবু? তুমি যাচ্ছো কোন্ গাঁয়ে?

—ওই ত সামনেই—ইন্দির ঘোষ মহাশয়ের বাড়ী। আমি তাঁর ছেলে, এখন বাড়ী-ঘরে থাকি নে—

লোকটি কপালে হাত ঠেকাইয়া সেলাম করিল। কহিল—চিনলাম। তোমার বাড়ীতে আমরা যাব, একখানা দরখাস্ত লিখতে। এই আমাদের যত দুঃখধান্ধার কথা ভাল করে বুঝিয়ে সুঝিয়ে—ভাল করে লিখলে মহারাণী ঠিক শুনবে—একটা ভালো জলপথ করে' দিয়ে যাবে—যাবে না?

নিরক্ষর গ্রাম্যচাষী আমাকে হয়ত মহারাণীর জ্ঞাতিগোত্র ঠাওরাইয়াছে। যে যাহা ভাবুক আমার ক্ষমতার দৌড় আমি ত বুঝি—হাঁ কিম্বা না কিছুই না বলিয়া কেবল মাত্র ঘাড় নাড়াইয়া হাঁটিতে সুরু করিলাম। পিছন হইতে শুনিলাম, লোকটি বলিতেছে—যদি দরখাস্ত না শোনে—জোর করে' ঐ পোল ভাঙ্‌বো, তারপর জেল ফাঁস যা হয় হবে—

দশ বছর পরে বাড়ীর সামনে দাঁড়াইয়া সে বাড়ী আর চিনিতে পারি না। উত্তর দালানের ছাত খসিয়া পড়িয়াছে, সিঁড়ির ঘরের মাথায় প্রকাণ্ড আকাশভেদী অশ্বত্থগাছ, ভিতরের উঠানে একহাঁটু উঁচু ঘাস। ঘনশ্যাম গাঙ্গুলী দাখিলা লিখিতেছিল—হিসাব ফেলাইয়া হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিল—ও দিকে যাবেন না—ও দিকে যাবেন না—পরশু ঐ ঘাসের মধ্যে কেউটে সাপের খোলস পাওয়া গেছে—। সঙ্গের মুটেটাকে ডাকিয়া কহিল—হাঁ করে দেখছিস কি বেটা? ঐ চামড়ার বাক্স-টাক্স কাছারীঘরে এনে রাখ—

তা কাছারীঘরখানির অবস্থা ভালই বলিতে হয়।

বাঁশের খুঁটি চাঁচের বেড়া সারি সারি তিনখানা তক্তাপোষ তার উপর সতরঞ্চি পাতিয়া ফরাস করা হইয়াছে। ডাবা হুঁকা হুঁকা-দান ত্রুটী কিছু নাই। পাশেই রান্নাঘর। পিছনে জঙ্গলাকীর্ণ বৃহৎ বাড়ীটার সহিত সদরের কাছারী বাড়ীর কোন সম্পর্ক নাই।

ঘনশ্যাম অর্থটা সমঝাইয়া দিল। বলিল—দরকার কি? অতবড় বাড়ী মেরামতী অবস্থায় রাখা আর ঐরাবত হাতী পোষা এক কথা। ও বছর কর্ত্তাবাবু এসে মেরামতের কথা বললেন, আমি বললাম—এখন কাজ নেই, আপনারা যদি

কখনো দেশ-ভুঁয়ে আসেন তখন সে-সব। ঘোড়া হলে' চাবুকের জন্ম আটকাবে না।

জিজ্ঞাসা করিলাম—কেমন আছ নায়েব মশায় ?

ঘনশ্যাম বলিল—আছি ভালো আপনাদের দয়ায়। মাছটা খুব মিলছে আজকাল, জিনিষ পত্তোরও সুবিধে। জোন-মজুর ভারী সস্তা, দু আনায় সমস্ত দিন খাটছে। আগে খোসামোদ কর্‌তে কর্‌তে প্রাণ যেতো—এখন বাবা পায়ে ধর আর কাজে লাগ। কোন বেটার ঘরে কিছু নেই—

—বিলে চাষ বন্ধ বলে বুঝি ?

ঘনশ্যাম বলিল—তা ছাড়া আর কি। বেঁধেছি মশায়—ছোট লোকের ঘরে পয়সা হলে রক্ষে আছে ? বিল যে যার ইহজন্মে উঠবে তারও কোন ভরসা নেই—বলিয়া হা-হা করিয়া হাসিতে লাগিল।

বলিলাম—তাহলে প্রজাদের চলবে কি করে !

—না চলে, উঠে যাক।—যাচ্ছেও। অত বড় পুব পাড়ার মধ্যে একলা রাইচরণ আর তার দুটো ভাইপো টিম-টিম করছে। ওরাও যাবে শিগগির—ভিটের থেকে কি নোনাজল খেয়ে থাকবে ? সেবার পঁচিশ শ' টাকা গুণে দিয়ে আমাদের এষ্টেটের পঁচিশ বিঘে জমী মৌরশী নিয়েছিল মশায়, অষাঢ় মাসে এসে বলে—নায়েব মশায়, খাওয়া জুটছে না—ছেলে-পিলেগুলো শুকিয়ে মরছে—চোখের উপর আর দেখতে পারি নে। মনটা আমার বড্ড নরম, শুনে কষ্ট হ'ল। বললাম—এক কাজ কর রাইচরণ, এই পঁচিশ বিঘে বরং বাবুদের এষ্টেটে ফের বেচে ফেল—দশ টাকা হিসেবে বিঘে, আড়াই শ' টাকা পাবি।

আশ্চর্য্য হইয়া কহিলাম—আড়াই হাজারে কিনে আড়াই শ' টাকায় বিক্রী—রাজী হোলো ?

নায়েব অর্থপূর্ণ হাসি হাসিয়া বলিল—না রাজী হয় নি, —উল্টে দল পাকাচ্ছে। কিন্তু তাই বা দেয় কে ? জলে ডোবা জমির দাম আছে কিছু ? ওদের এখন ঘরপোড়া ছাই—যা পায় তাই লাভ। বোঝেনা বেটারা—।

—আমাদেরই বা ঐ জমি কিনে কি হবে ?

ঘনশ্যাম আমার অজ্ঞতায় অবাক হইয়া খানিকক্ষণ কথাই বলিতে পারিল না। শেষে বলিল—লাভ নয় ? বলেন কি ? —আমরা ত এই চাই। সমস্ত চক এমনি করে আস্তে আস্তে খাস করে' নেব। শেষে গোটা বিলটা জেলেদের কাছে বিলি হবে। জলকরে সুবিধে কত মশায় ! প্রজা-বেটাদের নানান আবদার—আজ বাঁধ ভাঙলো, কাল নোনা লেগেছে—হেনো করো তেনো করো—। এখন কিছু হাঙ্গাম নেই—বছর অন্তর জেলের কাছ থেকে করকরে টাকা একসঙ্গে গুণে নেও—তারা জাল ফেলুক—ব্যস !

চুপ করিয়া রহিলাম। বুঝিলাম, পুঁটিমারীর বিল-ডুবি হওয়ায় জমীদারের কিছু লোকসান নাই। মরিতে মরিবে অভাগা প্রজারা। সাত পুরুষের ভিটা ছাড়িয়া চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে দেশান্তরে চলিয়া যাইবে।

ঘনশ্যামের কৃতিত্বের কাহিনী তখনো শেষ হয় নাই। বলিতে লাগিল—শুনি ঐ রাইচরণ নাকি গোপনে দল পাকাচ্ছে। ওরা ভাবে আমরা চেষ্টা করলে বিলের জল-পথটা বড় করে দিতে পারি। আরে বাপু, পারি ত পারি—আমরা তা করতে যাব কেন ! যা আছে তাতে আমাদের গরলাভটা কি ? দল পাকান হচ্ছে, কোন জেলেকে বিলের মধ্যে জাল নামাতে দেবে না—দাঙ্গা-ফ্যাসাদ বাধাবে। তা হলে নাকি আমাদের গরজ হবে। বলিয়া হা-হা করিয়া আর এক ঝোঁক হাসিয়া লইল। বলিল—জমিদারীর কাজে চুল পাকিয়ে ফেললাম, দাঙ্গা হাঙ্গামায় কি আমরা পিছপাও ! বোঝেনা বেটারা—।

আমি বলিলাম—না—কোন হাঙ্গামা না বাধলেই ভাল।

ঘনশ্যাম কহিল—কিছু ভাববেন না, আপনি কেবল চুপ করে' বসে' বসে' দেখুন না। এখনো জানে না, ঘনশ্যাম গাঙ্গুলী লোকটা কে । ঐ রাইচরণের গুষ্টিশুদ্ধ দেশছাড়া করবো না ? টিঁকবে ক'দিন ! দেখুন গিয়ে এতক্ষণ আপনার রজনী পাইক উঠোনে গিয়ে বসে' আছে ঠিক—

বলিয়া একটুখানি থামিল। তারপর আবার দম লইয়া বলিতে লাগিল—এদিকে বেটা আবার বলে, আমরা মানী ঘর —মান রেখে কথাবার্ত্তা না বললে চলবে না। না চলে বাস ওঠাও। সোজা পথ দেখা যাচ্ছে—। থাকবার জন্যে পায়ে ধরে' খোসামোদ কে করছে বাপু ? আমরাও ত তাই চাই। পরশু দুপুরে হয়েছে কি—রজনী ত ওর দাওয়ায় চেপে

বসেছে, রাইচরণ বাড়ী নেই—ছেলে দুটো ট্যাঁ-ট্যাঁ করছে। বোঝা গেল চাল বাড়ন্ত। ভারী রসিক আপনার কাছারীর পাইক ঐ রজনী। জানে সব, তবু বলে—খাজনার টাকা দেও, নইলে উঠছি নে। আর নয় ত নতুন হাঁড়ি বের কর—চাল আন—ডাল আন—সিধে সাজাও—যে ক'দিন টাকা না পাব তোমাদের বাড়ী অতিথ হয়ে খাব। তিনটে গোলা আছে—তিন বেলা তিন গোলার ধানের চাল। চাষা লোকের মেয়ে হ'লে কি হয়, রাইচরণের বৌটার বুদ্ধি খুব। খোঁটাটা বুঝতে পারলে, চোখ দিয়ে টপ-টপ করে' জল পড়তে লাগল।—

দিন পাঁচ সাত কাটিয়া গেল। ভালই কাটিল, নায়েব মহাশয়ের আয়োজনের ক্রটী নাই! পুঁটিমারীর বিল হইতে সকালে বিকালে ঝুড়ি ঝুড়ি টাটকা মাছ আসিতেছে, যশোহর হইতে দাদখানি চাউল—দুধেরও অপ্রতুল নাই। দুপুরে খাইতে বসিয়াছি, ঘনশ্যাম লোনা ও মিঠা জলের মাছের আস্বাদের তুলনা করিতেছে। হঠাৎ বিশ ত্রিশ জন ভয়ঙ্কর চীৎকার করিতে করিতে কাছারীবাড়ীর উঠানে দৌড়িয়া আসিল। খুন! খুন! খুন!

খাওয়া ঐ পর্য্যন্ত। দেখিলাম, বড় বিপদের মধ্যেও ঘনশ্যাম বিচলিত হয় না।—খুন কিরে? কে কাকে খুন করলে?—

—রজনীকে। রাস্তায় লাস পড়ে আছে—রাইচরণ আর তার ভাইপোরা সড়কী মেরেছে। কাছারী নাকি লুঠ করতে আসছে—

ঘনশ্যাম তাচ্ছিল্যের সহিত কহিল—আসুকগে। বেটাদের বড় বাড় হয়েছে—আচ্ছা। আমাকে উদ্দেশ করিয়া কহিল—কিছু ভাববেন না, বিছানা পাতা আছে—বিশ্রাম-টিশ্রাম করুন গিয়ে—। আমি লাসটা নিয়ে আসি।—

জন কয়েক ধরাধরি করিয়া রজনীকে লইয়া আসিল। চক্ষু মুদ্রিত। তাজা রক্তে কাপড় চোপড় ও সর্ব্বাঙ্গ ভাসিয়া গিয়াছে—এক এক জায়গায় রক্ত চাপ বাঁধিয়া লাগিয়া রহিয়াছে। হাঁটুর নীচে হইতে তখনও রক্ত গড়াইয়া গড়াইয়া কাছারী ঘরের দাওয়ার উপর পড়িতে লাগিল। এমন দৃশ্য আর দেখি নাই। আপাদমস্তক হিম হইয়া গেল, মনে হইল মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যাইব।

হঠাৎ দেখিলাম লাসটি কথা কহিতে কহিতে দিব্য উঠিয়া বসিল। যাক, মরে নাই তবে!

ঘনশ্যাম কহিল—তবু ভালো যে মরিস নি, তা' হ'লে সাক্ষী পাওয়া মুস্কিল হ'ত—

রজনী হাত দিয়া ক্ষত মুখ চাপিয়া ধরিয়া কহিল—ওরা তাক করতে পারে নি। পায়ে সড়কী মারলে কখনো ঘায়েল হয়? দিতে পারত আর খানিক উঁচুতে তলপেটে বসিয়ে। আমি নিজেই হয়ত খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে একরকম চলে আসতে পারতাম নায়েব মশায়, কিন্তু চোখ বুঁজে পড়ে' রইলাম; লোকের হৈ চৈ শুনে কেমন ভয় ধরে' গেল।

ক্ষত-কি গাছ-গাছড়া শিলে বাটিয়া ক্ষতমুখে লাগাইয়া দেওয়া হইল। এমনি ঘণ্টা খানেক চলিল। রক্ত বন্ধ হইল। রজনীর ভাব দেখিয়া বুঝিলাম, এর কম আঘাতে উহারা কাবু হয় না।

এইবার ঘনশ্যামের মোকর্দ্দমা সাজাইবার পালা। জিজ্ঞাসা করিল—ঘটনাটা কি রে?

রজনী কহিল—এমন কিছু নয়, আপনার হুকুম মতো গিয়ে বললাম—আজ যদি কাছারী না যাস রাইচরণ, কান ধরে' ঘোড়দৌড় করিয়ে নিয়ে যাবার হুকুম। রাইচরণ বল্লে—তুমি একটু দাঁড়াও, কাপড়খানা ছেড়ে দুটো টাকা গাঁটে করে' আসি—কাছারীতে বাবু এসেছেন, তাঁর নজরাণা। আমি গাছতলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বেশ তামাক খাচ্ছি, হঠাৎ পেছন থেকে সড়কী বসিয়ে দিলে—

সমস্ত বিকাল ধরিয়া কতলোক যে আসা যাওয়া করিতে লাগিল তাহার ইয়ত্তা নাই। আমি নির্লিপ্তের মতো একদিকে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। ঘনশ্যাম পরামর্শ আঁটিতে লাগিল, সাক্ষী সাজাইতে লাগিল, আবার জেরা করিয়া তাহাদের ভুল ধরাইয়া দিতে লাগিল। মুখের প্রসন্নতা দেখিয়া সন্দেহ রহিল না, রাইচরণকে লইয়া অনতিবিলম্বে ভয়ঙ্কর কাণ্ড সুরু হইবে। সন্ধ্যার আগে ঘনশ্যাম কহিল—এইবার ব্রহ্মাস্ত্র তৈরী হয়ে গেল, আমি থানায় চল্লাম। খবর পাচ্ছি—বেটারা ভয়ানক ক্ষেপে গিয়েছে, রাত্রিবেলা কাছারী এসে একটু হৈ চৈ করতে পারে। আপনি সাবধান হয়ে থাকবেন—কিছু ভয় নেই—।

পাহারার জন্ত ঘনশ্যাম গোপন ব্যবস্থা যদি কিছু করিয়া গিয়া থাকে তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু প্রকাশ্যতঃ ফরাসের উপর বসিয়া রহিলাম কেবল মাত্র আমি এবং নীচে খোঁড়া পা লইয়া রজনী পাইক। সন্ধ্যার পরেই কেবল কাছারী বাড়ীতে নয়, সমস্ত গ্রামের মধ্যে মানুষের সাড়া একদম বন্ধ হইয়া গেল। দুপুরে তাজা নররক্তের যে প্রবাহ দেখিয়াছি অন্ধকারের মধ্যে যেন তাহার বিভীষিকা দেখিতে লাগিলাম। ঘরের সামনেই আম কাঁঠালের ঘন বাগান। এক একবার মনে হইতে লাগিল সড়কী বল্লম লইয়া কাহারা যেন পা টিপিয়া টিপিয়া উহার মধ্য হইতে বাহির হইয়া নিঃশব্দে আমার ঘরের কানাচের দিকে আসিতেছে। হেরিকেনটা সত্যসত্যই একবার উঁচু করিয়া দেখিয়া লইলাম। দুয়ার খোলা, রজনী তাহার নিকটেই বসিয়াছিল, দুয়ারটা ভেজাইয়া দিতে বলিলাম। রজনী খোঁড়া পায়ে উঠিয়া দাঁড়াইয়া খিল আঁটিয়া দিল, কারণ জিজ্ঞাসা করিল না। বোঝা গেল, ভয় কেবল আমার একার নহে। মেঘ করিয়া চারিদিক এত আঁধার করিয়াছে যে এরূপভাব আমার জন্মে দেখি নাই। এই অন্ধকার রাত্রিতে বিদ্রোহী রাইচরণের দল নিশ্চয় চুপ করিয়া বসিয়া নাই, এমনি আশঙ্কায় গা ছমছম করিতে লাগিল। ঘনশ্যাম সেই যে থানায় গিয়াছে এখনো ফেরে নাই। রান্নাঘরে আলো নিবানো। যে লোকটা রান্না করিয়া থাকে সে এই দুর্য্যোগে হয়ত আসে নাই, কিম্বা আসিয়া থাকে ত ইতিমধ্যে কোন গতিকে কাজ সারিয়া খিল আঁটিয়া দিয়াছে। রজনী তামাক সাজিয়া আপন মনে টানিতে লাগিল। যা-হোক কিছু কথাবার্ত্তা কহিবার জন্ত বলিলাম - ও রজনী, রাইচরণের পশ্চিম ঘরের কানাচে যে রাস্তা - কাণ্ডটা ঘটলো বুঝি সেখানে—

রজনী উত্তর করিল না, যেন শুনিতেই পাইল না।

আবার জিজ্ঞাসা করিলাম —রাইচরণ কি বলে? কাছারীতে বাবু এসেছেন, তাঁর নজরাণা নিয়ে যাচ্ছি— এই না?

রজনী মুখ ফিরাইয়া বাইরের দিকে ইসারা করিয়া চুপি চুপি কহিল – ওসব কথা থাকগে এখন বাবু, রাত্তিরেতে দরকার কি? কে কোথায় ওৎ পেতে বসে' আছে তার ঠিক নেই—

কথা শুনিয়া সর্ব্বদেহে কাঁটা দিয়া উঠিল। ইহা সম্ভব বটে। আমি যেখানে বসিয়া আছি তাহার পাশে একটি মাত্র চাঁচের বেড়ার ব্যবধানে হাত দুয়েকের মধ্যে হয় ত সেই খুনে লোকেরা ঢাল সড়কী লইয়া দল বাঁধিয়া নজরাণা দিতে বসিয়া আছে। দশবছর পরে পাড়াগাঁয়ে পা দিয়াছি, দশবছর আগেকার যেসব দিনের অস্পষ্ট স্মৃতি এখনো মনের মধ্যে আছে সে সময়ে মানুষ এমন করিয়া মানুষের রক্তপাত করিত না। তখন দেখিতে পাইতাম ক্ষেত চষিবার ও গোলা বাঁধিবার ভীষণ প্রতিযোগিতা। পেটে খাইতে যে পয়সা খরচ হয় এ বোধ কাহারও ছিল না। আমাদের বাড়ীতেই দেখিয়াছি—উনুনে সমস্ত দিন অনির্ব্বাণ রাবণের চিতা জ্বলিতেছে। সেজজেঠাকে কালোয়াতী রোগে ধরিয়া-ছিল, পাখোয়াজ ঘাড়ে করিয়া ক্রোশ দুই দূরে মাদারডাঙায় চলিয়া যাইতেন। দুপুর রাত্রি হইয়া যাইত, কোন দিন মোটে ফিরিতেন না, আবার কোন কোন দিন একেবারে জন পাঁচ সাত সঙ্গী সহ হানা দিতেন। তখন হয়ত ঠাকুরমা, ন'পিসি, জেঠাইমা'রা সকলে শুইয়া পড়িয়াছেন। আবার উঠিয়া ভাত চাপাইতে হইত, মুখে একটু বিরক্তভাব কখনও দেখি নাই। বাড়ীতে লোক আসিয়াছে, রাঁধিয়া বাড়িয়া খাওয়ানো ইহাত মস্ত আনন্দের কথা। এখনকার রীতি নীতি দেখিয়া অনেক সময় সন্দেহ হয়, হয়ত উহা কবে একদিন ছেলেবেলায় স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম—উহার কোন সত্য অস্তিত্ব নাই। পরক্ষণে আবার তাকাইয়া তাকাইয়া দেখি, কাত্তরায়ের বড়ছেলের কুড়েঘরের পাশটিতে জঙ্গলাকীর্ণ সারি সারি পাঁচটি গোলার ভিটা নিবন্ত পঞ্চপ্রদীপের মতো এখনো পড়িয়া আছে। তখন মনে হয়—না, মিথ্যা নয়—উহা সত্য, সত্য!

বেড়ার ফাঁকে নজরে পড়িল, রাস্তার উপর একটি আলো।—কে? ও কে? কথা বল না কেন? কেবলি প্রশ্ন করিতেছি, কিন্তু উত্তর দিতে যেটুকু অবকাশের প্রয়োজন তাহা দিতেছি না। রজনীও উঠিয়া দাঁড়াইয়া আমার সহিত সমস্বরে প্রশ্ন সুরু করিল। আলো নিকটতরে আসিয়া কাছারীর দাওয়ায় উঠিল, তারপর বলিল—রজনী, দুয়োর খোল্। ঘনশ্যামের কণ্ঠস্বর। যাক রক্ষা পাইলাম।

সঙ্গে আর .কাহারা আসিতেছিল। তাহাদের উদ্দেশ্যে ঘনশ্যাম বলিল—তোরা বাপু বাড়ী যা—আর দরকার নেই। তারপর গলাটা নামাইয়া মৃদু হাসিয়া বলিল—অত চেঁচামেচি করছিলেন কেন? রাহাজানি করতে আসে কি হেরিকেন জ্বেলে সন্ধ্যাবেলায়?

তা বটে। ভাবে বোঝা গেল—বেশ জোরপায়েই ঘনশ্যাম চলিয়া আসিয়াছে। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া জিরাইয়া লইল, তারপর রজনীর দিকে চাহিয়া কহিল—তুই বেটা এরি মধ্যে খাঁড়া হয়ে দাঁড়িয়েছিস যে, মোকর্দ্দমার অসুবিধে হবে। হাঁসপাতালে শুয়ে থাকতে হবে নিদেনপক্ষে তিনটি মাস। সেই রকম এজাহার লিখিয়ে দিয়ে এলাম—। বলিয়া হঠাৎ যেন কি মনে পড়িয়া গেল—রজনী, একটু বাইরের দিকে গিয়ে বস ত—

হুকুম তো হইয়া গেল, কিন্তু আজিকার রাত্রে বাহিরে গিয়া বসা যে-সে কর্ম্ম নয়। একবার সড়কীর তাক ফস্কাইয়া পায়ে আসিয়া বিঁধিয়াছে, বারান্তরে উহারা ভুল সংশোধন করিয়া লইবে না তাহার নিশ্চয়তা কি? অথচ মুস্কিল এই এতবড় কাছারীর পাইকের পক্ষে ভয়ের কথাটা মুখ ফুটিয়া বলা চলে না। রজনী যেমন বসিয়াছিল, তেমনি রহিল।

ঘনশ্যাম হুঙ্কার দিয়া বলিল—বেটা শুনতে পাস নে? বলছি, একটা গোপন কথা আছে—

নিতান্ত মরীয়া হইয়া রজনী ডানহাতে লইল একখানা লাঠি, তারপর অতি সন্তর্পণে এদিক ওদিক তাকাইয়া দাওয়ার কোণে গিয়া বসিল।

ঘনশ্যাম ফিস-ফিস করিয়া কহিল—এই ইয়ে—টাকাকড়ি যা আছে একটা থলিতে ভরে' কোমরে বেঁধে ফেলুন গতিক বড় সুবিধের নয়?—বুঝলেন? কাগজ-পত্তোর যা কিছু গোলমাল দেখে অনেক দিন আগেই সরিয়ে ফেলেছি।—তারপর খাঁ করিয়া গলা একেবারে সপ্তমে চড়িল।—থানায় গিয়ে দেখি ভোঁ—ভোঁ—; ছোট দারোগা বড় দারোগা দুজনেরই পাত্তা নেই সকাল থেকে। টুনে-ঘরা ডাকাতির কেসে গিয়েছে। ফিস্‌ফুবি হয়ে' বেটারা যেন সিংহীর পাঁচ-পা দেখেছে—রোজই খুনজখম চুরিডাকাতি। টের পাবে—"পিপীলিকার পাখা ওঠে মরিবার তরে—'

কবিতার এক চরণ আবৃত্তি করিয়াই চুপ করিল। আমি কহিলাম—রাত অনেক হয়েছে, খেয়ে দেয়ে এবার শোবার ব্যবস্থা হোক—ঘুম পাচ্ছে—।

ঘনশ্যাম তৎক্ষণাৎ ব্যস্ত হইয়া উঠিল।—না, সকাল সকাল শুতে হবে—দেরী করে, কাজ নেই। সকাল থেকে আবার খাটনী সুরু। একসঙ্গে একেবারে বিশখানা ওয়ারেন্ট বের করে' দিয়ে এলাম। রাত না পোহাতেই বন্দুক-টন্দুক নিয়ে পুলিশ আসবে। তখন এক এক বাড়ী ঘেরাও কর, আর মেয়ে-মর্দ্দ ধরে' ধরে' চালান দেও। সড়কী-মারা বের করে' দিচ্ছি—ঘুঘু দেখেছেন, ফাঁদ দেখেন নি।—

চোখ টিপিয়া ইসারায় আমাকে বলিল—আশে পাশে যদি কেউ থাকে তো শুনে যাক—ভয়ে হাত-পা পেটের ভিতর সেঁদিয়ে যাবে।

রজনী আসিয়া ঘরে ঢুকিল, তাহার মুখ পাংশু। অন্ধকারের দিকে আঙুল বাড়াইয়া বলিল নায়েব মশায়, মানুষ—আশ্‌শ্যাওড়ার বন ভেঙে থড়মড় করে' চলে' গেল।

আমি কহিলাম—শেয়াল টেয়াল হবে, তোমার ভয় লেগেছে রজনী, তাই ঐ রকম ভাবছো। তুমি ঘরের মধ্যে এসে বোসো—

ঘনশ্যাম মৃদুস্বরে বলিল—যাই হোক, এখন আর রান্নাঘরে গিয়ে কাজ নেই—ঘরের বেড়াটা তেমন সুবিধে না। এক রাত না খেলে আর কেউ মরে' যায় না। গেল বছর কি হল—সাতবেড়ে কাছারীতে ম্যানেজার কালিচরণ শিকদার এলেন তদারক করতে। ভদ্রলোক কেবল মাছের ঝোলের বাটী টেনে নিয়ে বসেছেন—গুড়ুম-করে' এক গুলি। দিন দুপুরে এত বড় কাণ্ড—খুনের মোটে আস্কারাই হ'ল না। সব প্রজা একজোট কিনা—।

শুনিয়া আর ক্ষুধা রহিল না। বলা-ত-যায় না, রান্নাঘরে যদি রাইচরণ নজরাণা লইয়া দেখা করিতে আসে। এদিকে কোথাও কিছু নয়—ঘনশ্যাম আরম্ভ করিল বিষম চেঁচামেচি—ওরে বেটা উজবুক, হাঁ করে বসে' রইলি যে। সমস্ত রাত এইরকম কাটিবে নাকি? তুই না পারিস আর কাউকে বল। ফরাসের উপর দুটো তোষক পেতে দিক্। আপনার 'পরে

চাদর আছে, বাবুর বিছানার উপর পেতে দে—আমার লাগবে না। আর দুটো কাঁথা দিস্, রাত্তিরে বিষ্টি হলে শীত লাগতে পারে—।

বলিয়া কিন্তু কাহারও অপেক্ষা না করিয়া ঘনশ্যাম নিজেই চটপট সমস্ত পাতিয়া লইল। দুইজনে শুইয়া পড়িলাম। পরক্ষণেই আবার উঠিয়া আলো নিভাইয়া দিল।

বলিলাম আলোটা জ্বালা থাক্‌লেই ভাল হোত।

ঘনশ্যাম কহিল—না, আর তেল পোড়ায় লাভ কি?—বলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।

ইহার পর বোধ করি ঘণ্টা দেড়েক কাটিয়া থাকিবে। ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঘুম বেশ জমিয়া আসিয়াছিল। হঠাৎ গলার উপর মানুষের হাতের শীতল স্পর্শ। একমুহূর্ত্তে ঘুমের মধ্যেও সারাদিনের আতঙ্ক মাথা খাড়া করিয়া উঠিল। রাইচরণের দল ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া গলা কাটিতে আসে নাই ত'? চীৎকার করিতে যাইতেছিলাম, এমন সময় ঘনশ্যাম আমার মুখের উপর হাত চাপিয়া চুপি চুপি কহিল—আমি—আমি—ভয় পাবেন না। উঠুন তো।

উঠিয়া বসিলাম। অন্ধকারে তাহার চোখ দুটো যেন জ্বলিতেছে, হাতে লম্বা সড়কী। বলিল—এখানে শোওয়া হবে না। বেটারা হচ্চে কুকুরের মতো ক্ষেপে গেছে, রাত্রে কি করে' বসে তার ঠিক নেই—। চলুন—

আবার চলিতে হইবে—বলে কি! ঘুম উড়িয়া গেল। ভগবান, কাহার মুখ দেখিয়া যে এই জংলী পাড়াগাঁয়ে মরিতে আসিয়াছিলাম! এই ঘনান্ধকার বর্ষারাত্রে না জানি কোথায় যাইতে হইবে!

ঘনশ্যাম বলিতে লাগিল—উঠুন, অসুবিধে কিছু নেই—বেশ ভালো জায়গা দেখা আছে। এ গ্রামে কাউকে বিশ্বাস করিনে, কোন বেটার মনে কি আছে কে জানে? যাব একেবারে বাঁকাবড়ণী নীলাম্বর বিশ্বেসের বাড়ী। আবার ভোর থাকতে ফিরে এসে শোব—কাক-পক্ষীতে টের পাবে না।

বাঁকাবড়ণী গ্রাম আমার চেনা, অনেক বৈঁচির জঙ্গল আছে। ছোটবেলায় বৈঁচির ফল খাইতে খাইতে একদিন ততদূর অবধি চলিয়া গিয়াছিলাম। বলিলাম—বাঁকাবড়ণী ত' অনেক দূর—

ঘনশ্যাম তাচ্ছিল্যের সহিত বলিল—কোথায় দূর! মোটে আধ ক্রোশ পথ। খাল পার হ'তে হবে—তা মজবুত সাঁকো বাঁধা আছে—অসুবিধে কিছু নেই—।

না থাকিলেই ভাল। আর, সে বিবেচনা করিবার অবসরই বা কোথায়? জুতা পায় দিতেও ঘনশ্যামের আপত্তি, বলিল—উঁহু, শব্দ হবে। কে কোথায় ওৎ পেতে বসে আছে—কাজ কি? দাঁড়ান—

বলিয়া একটা পাশের বালিশ আমার শিয়রের বালিশের উপর শোয়াইল, সযত্নে তাঁহার উপর কাঁথা চাপা দিল। অন্ধকারে দেখিতে পাইতেছিলাম না, কিন্তু বিছানার ঠিক পাশে বসিয়াছিলাম বলিয়া সমস্ত টের পাইলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম—এ আবার কি ঘনশ্যাম?

ঘনশ্যাম কানের কাছে মুখ আনিয়া কহিল—এ মতলব থানা থেকে আসবার পথেই ভেবে রেখেছি। ঐ যে হৈ-চৈ করে' রজনী পাইককে বিছানা করতে বল্লাম—সব তা'র মানে আছে মশায়। আশেপাশে চর টর যারা আছে শুনে গিয়ে খবর দিক। কাঁথা চাপা পাশবালিশ রইল, রাত্রে ঘরে ঢুকে কোন বেটা যদি কোপ-টোপ ঝাড়ে, কি বেকুব হবে বলুন তো। কালকে এসে হয়ত দেখব, বালিশটা দুইখণ্ড হয়ে' আছে।

স্বর শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম শত্রুর সম্ভাবিত বেকুবীতে ঘনশ্যাম ভারী খুসী হইয়াছে।

নিঃশব্দে সে দরজা খুলিল, আমি পিছনে পিছনে চোরের মতো বাহির হইয়া আসিয়া দরজায় শিকল লাগাইলাম। টিপ-টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতে সুরু হইয়াছে, কোথাও হাঁটু অবধি কাদা, জায়গায় জায়গায় জল বাধিয়া রহিয়াছে, জল ছিটকাইয়া একেবারে মাথা অবধি উঠিতেছে। সে যে কী দুঃখের যাত্রা, মনে করিলে এখনও কান্না পায়। খালি পা, অন্ধকারে ছাতা খুঁজিয়া পাই নাই,—তার উপর ঘনশ্যাম ফাঁকা রাস্তা দিয়া চলিতে দিবে না—তাহাতে আততায়ীর নজরে পড়িবার সম্ভাবনা। বনজঙ্গল ভাঙিয়া অতি সন্তর্পণে চলিতে লাগিলাম। রজ্জার মধ্যে অন্ধকারে ক্রমে ক্রমে দৃষ্টি খুলিয়া গিয়া ঘনশ্যামের অস্পষ্টমূর্ত্তি দেখিতে পাইতেছিলাম। কোথা দিয়া কোনখানে যাইতেছি তাহার কিছুই আন্দাজ

ছিল না, কেবল কোন গতিকে উহার পিছন ধরিয়া চলিয়াছিলাম। এক একবার সে স্থির হইয়া দাঁড়ায়, চারি দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিয়া লয়, আমি সভয়ে জিজ্ঞাসা করি—কি? কোন কিছু দেখতে পাচ্ছ নাকি? ঘনশ্যাম জবাব দেয়—না, চলুন—আবার অগ্রসর হইতে থাকে। হঠাৎ একবার পিছনে আমার দিকে চাহিয়া বলিল—সর্ব্বনাশ, শুধু হাতে আসছেন নাকি? শিগগীর একটা জিওলের ডাল ভেঙে নিন—শিগগীর—

ক্রমে খালের ধারে পৌছিলাম। মেঘ ও অন্ধকার আবার এত জমিয়া আসিল যে ঘনশ্যামকেও আর দেখা যায় না। অতঃপর চোখ দিয়া দেখিয়া নয়, পা দিয়া স্পর্শ করিয়া বুঝিলাম বাঁশের সাঁকোর উপর উঠিয়াছি। একখানি মাত্র বাঁশ, পা টিপিয়া টিপিয়া তাহার উপর দিয়া যাইতেছি, হাতে ধরিবার জন্ম আর একখানি বাঁশ উপরে বাঁধা আছে। দুইটা মানুষের ভারে বাঁশ মচ-মচ করিতে লাগিল, বুঝি বা সবশুদ্ধ ভাঙিয়া চুরিয়া নিশীথরাত্রে খালের জলে গিয়া পড়িতে হয়। ঘনশ্যাম ওপারে গিয়া নিঃশ্বাস ফেলিল। বলিল—যাক্, নিশ্চিন্ত। খাল পার হয়ে কোনো শর্ম্মা আর এদিকে আসছেন না। এই খাল হ'ল আমাদের এলাকার সীমানা—

আবার বলিল—এখনো পার হ'তে পারলেন না? তা আসুন—আস্তে আস্তেই আসুন। খুব সাবধান হয়ে' ধরে' ধরে' আসবেন—বিষ্টির জলে বাঁশ পিছল হয়ে গেছে। সেদিন একটা লোক এইখান থেকে পড়ে' যা দুর্গতি—ভাসতে ভাসতে আর একটু হ'লে বেড়জালের মধ্যে ঢুকে গেছিল আর কি—

খাল পার হইয়াও পথ ফুরাইল না। কত পথ চলিলাম জানি না, শেষে বাঁশের বেড়া ডিঙাইয়া এক গৃহস্থের বাহিরের উঠানে আসিয়া দাঁড়াইলাম। ঘনশ্যাম বলিল—নীলাম্বর বিশ্বাসের বাড়ী।

তবু ভাল। ভাবিয়াছিলাম তাহার ঐ আধ ক্রোশ পথ চলিতে বুঝি সমস্ত রাত্রিতেও কুলাইবে না।

ঘনশ্যাম বাহিরের আলগা বড় ঘরখানির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। কিন্তু পা দিয়াই চক্ষের নিমিষে নামিল। যেন সাপ দেখিয়াছে। এদিকে কাদায় বৃষ্টিতে সমস্ত কাপড় চোপড় মাখামাখি, মাথা দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছে, একটুখানি চালের আশ্রয় পাইলে বাঁচিয়া যাই। আবার নামিয়া আসিতেছে দেখিয়া বিরক্তি ধরিল, সারারাত এমনি করিয়া ঘুরাইয়া বেড়াইবে নাকি? এমন দগ্ধিয়া মরার চেয়ে সড়কীর আঘাতে প্রাণ দেওয়া যে ঢের ভাল ছিল। জিজ্ঞাসা করিলাম—কি হ'ল?

জবাব দিল—এখানে হ'বে না। এ ঘরে কেউ শোয় না বলে' জানতাম। আজ দেখছি এক পাল মানুষ—।

আমি কহিলাম—হোক গে। মানুষ শুয়েছে—বাঘভাল্লো নয়। তুমি ওদের ডেকে বলো। দু'জনে একটা রাত মাথা গুঁজে প'ড়ে থাকব—তা দেবে না? যেখানে হয় শুয়ে পড়ি—

ঘনশ্যাম মাথা নাড়িয়া কহিল—তা হয় না। ডেকে তুলব কি মশায়, হঠাৎ যদি কেউ জেগে উঠে আমাদের দেখে ফেলে তা হ'লে সর্ব্বোনাশ তা বুঝছেন না? কাল যদি এ অবস্থা জানাজানি হয়ে' যায় এ অঞ্চলে কোনও বেটা আর মানবে? চলুন—আর এক বাড়ী যাই—এবারে ফিরবো না—এবারে নির্ঘাৎ—।

হায় ভগবান!

ঘনশ্যাম বলিল—দূর নয়, কাছেই। আধ ক্রোশও হবে না—উঠুন।

ফের আধ ক্রোশ? আধ ক্রোশের কথা শুনিয়া শুনিয়া যে আর পারি না। আমি ছাঁচতলায় বসিয়া পড়িয়াছিলাম, মরীয়া হইয়া বলিলাম—নায়েব মশায়, আর এক পাও যাচ্ছিনে—যা থাকে কপালে এখানে হয়ে' যাক। কোথাও না জোটে এই উঠোনেই শুয়ে পড়বো। কার মুখ দেখে যে কাশী থেকে বেরিয়ে ছিলাম।

ঘনশ্যাম চিন্তিত হইল। কহিল—ভারী মুস্কিলে ফেল্লেন—কি করা যায়, তাইতো—আচ্ছা দেখি—বলিতে বলিতে অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল। একটু পরেই ফিরিয়া আসিয়া কহিল—আসুন—হয়েছে—।

জিজ্ঞাসা করিলাম—আর কতদূর।

—এই বাড়ীতেই,—নিতান্ত মন্দ হবে না।

ঢুকিতে হইল গোয়ালঘরে। গরু এবং বাছুরে ঠাসাঠাসি, তিল ফেলিলেও বোধ হয় স্থানাভাবে গরু-বাছুরের গায়ের উপরে

রহিয়া যাইবে। এবং গোবর ও গোমূত্র সহযোগে মেজের উপর এমন গভীর সুপবিত্র কর্দ্দমের সৃষ্টি হইয়াছে যে তাহার মধ্যে কোথায় যে শুইতে হইবে ভাবিয়াই পাইলাম না।

কিন্তু শুইবার জায়গা ঠিক হইয়াছে নীচে নয়—উর্দ্ধলোকে।

আড়ার উপরে বর্ষার জন্য সঞ্চিত শুকনা বাঁশের চেলা-কাঠ সাজানো, ঘনশ্যাম অবলীলাক্রমে খুঁটি বহিয়া তাহার উপরে উঠিল, আমাকে কহিল—হাত ধরবো নাকি?

হাত আর ধরিতে হইল না। স্বর্গারোহণ করিলাম। দেখি, সেখানেও সুখের অতিউত্তম ব্যবস্থা। মশা ভন ভন করিতেছে, পিছনের ডোবা হইতে কোলাবেঙের একটানা আওয়াজ, ফুটা চাল হইতে দু'এক ফোঁটা বৃষ্টিও যে গায়ে আসিয়া না লাগিতেছে এমন নয়। মাঝে মাঝে আশঙ্কা হয় যদি ইহার একখানা বাঁশের চেলা এদিক ওদিক সরিয়া যায় তাহা হইলে এই জীবনে একটা রাতি অন্ততঃ মহাদেব হইয়া গোপৃষ্ঠে চড়িয়া দেখা যাইবে।

কিন্তু ঘুমাইয়া পড়িতে দেরী হইল না। পরক্ষণে বাঁশ মচমচ করিয়া উঠিল। গ্রহের দৃষ্টি বুঝি কাটে নাই, ভাঙিয়া পড়ে নাকি! তাড়াতাড়ি চোখ মেলিয়া দেখি—না, তাহা নয়—ঘনশ্যাম নামিয়া যাইতেছে।

কহিল—শুয়ে থাকুন, এক্ষুণি ঘুরে আসছি।

জিজ্ঞাসা করিলাম—আবার কোথায়?

—কাছারী বাড়ী। বড্ড একটা ভুল হয়ে গেছে। যাবো আর আসবো। আপনি স্বচ্ছন্দে শুয়ে থাকুন।—

ঘুম এমন আঁটিয়া আসিয়াছিল যে আর দ্বিরুক্তি করিলাম না। তারপর আর কিছুই জানি না। জাগিয়া উঠিলাম যখন ঘনশ্যাম হাত ধরিয়া টানাটানি করিয়া ডাকিতেছে—উঠুন, শীগ্‌গীর উঠুন, ভোর হয়ে এলো। কেউ না উঠতে কাছারীর বিছানায় গিয়ে ভালোমানুষের মতো শুতে হবে।—

বাহিরে আসিয়া দেখি, আকাশ পরিষ্কার—মেঘ কাটিয়া গিয়াছে। কৃষ্ণপক্ষের শেষাশেষি কি-একটা তিথি। বিগত-প্রায় রাত্রির আকাশে পাণ্ডুর ক্ষীণ চাঁদ উঠিয়াছে। সাঁকোর উপর উঠিয়া ডানহাত দিয়া বাঁশ ধরিতে যাইতেছি, হাতের দিকে নজর পড়িতে চমকিয়া উঠিলাম—এ কি, রক্ত কোথা আসিল? দুপুর হইতে রক্তের বিভীষিকা দেখিতেছি, রাত্রির শেষ প্রহরে মুক্ত বিলের সীমানায় আমার সর্ব্বাঙ্গ রক্তের আতঙ্কে থর-থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। ঘনশ্যাম পিছনে ছিল, ফিরিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—ঘনশ্যাম, দেখ দেখ—আমার হাতে রক্ত এলো কোত্থেকে?

চাহিয়া দেখি, ঘনশ্যামের মুখ শুকাইয়া গিয়াছে। জবাব কি দিবে তাহারই কাপড় চোপড়ে যেখানে সেখানে গাঢ় রক্তের মাখামাখি। কি একটা অস্ফুটভাবে বলিয়া তাহাই সে এক নজরে দেখিতেছিল।

সাঁকো হইতে নামিয়া আসিলাম। কঠোর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলাম—এ কি? কি করেছ? আমায় সত্যি কথা বলো—

ঘনশ্যামের কথা নাই।

তাহার দুই কাঁধ ধরিয়া প্রচণ্ড নাড়া দিয়া কহিলাম—শুনতে পাচ্ছো? রাত্তিরে বেরিয়েছিলে—কা'র সর্ব্বনাশ করে' এলে?

জিভ দিয়া ওষ্ঠ ভিজাইয়া লইয়া কোন গতিকে কহিল—ও এমনি—

—এমনি-এমনি আকাশ ফুঁড়ে রক্ত এলো! আজ পাঁচ-ছ' দিন ধরে' তোমার কাণ্ড দেখছি। মালিক আমরা, মুনাফা আমাদের—কথা বলতে পারি নে। কিন্তু এর কি সীমা নেই? কাল পুলিশ এলে আমি নিজে সাক্ষী দিয়ে তোমার খুনী বলে ধরিয়ে দেব।—বলিতে বলিতে মনে হইল বুঝি বা কাঁদিয়া ফেলিলাম।

ঘনশ্যাম এমনি করিয়া তাকাইল যেন আমার কথা বুঝিতে পারিতেছে না। কহিল, বাবু ঠাণ্ডা হন—খুন হ'ল কোথায়, যে অমন করছেন?

—রাত্তিরে উঠে কোথায় বেরিয়েছিলে? বলো—বলতে হবে—

এবারে ঘনশ্যাম বিরক্ত হইল। কহিল,—বলেছি ত—কাছারী বাড়ীতে। একশ' বার এক কথা। বলে—যার জন্যে চুরি করি—। যাকগে, কর্ত্তা নিজে যদি আসতেন আমার কদর হ'ত। একটা ভুল হয়ে গিয়েছিল, তাই গেছলাম। ভুল-চুক কার না হয়, মশায়?

বলিয়া খালের কিনারায় বসিয়া হাত ও কাপড়ের রক্ত ধুইতে বসিয়া গেল। বলিল—আপনার হাতটাও ধুয়ে ফেলুন, চিহ্ন রাখতে নেই। হাত ধরে' আপনাকে ডেকে তুলবার সময় একটুখানি লেগে গেছে। যে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার, আগে টের পাই নি যে এত রক্ত লেগেছে।

আমি অমন শান্ত হইয়া বসিয়া হাত ধুইতে পারিলাম না। বলিলাম—ঘনশ্যাম, কপাটা ভাঙছো না কেন? কি করে' এলে—বলো শিগ্‌গীর।

ঘনশ্যাম কহিল—ভুল করে' ফেলেছিলাম। থানায় এজেহার দিলাম—পাইকের পায়ে সড়কী মেরেছে। দারোগা জিজ্ঞাসা করল—কোন পায়ে? বললাম—বাঁ পায়ে। শুয়ে শুয়ে হঠাৎ মনে হলো, বাঁ পায়ে তো নয়—ডান পায়ে। ভাগ্যিস কথাটা মনে উঠলো?

কহিলাম—ডান পায়েই তো। আর একটু হলে রজনীর প্রাণটা যাচ্ছিল, ওকে কি চোখ দিয়ে দেখো নি একবার?

ঘনশ্যাম বলিল—দেখেছিলাম বৈকি। সবই ঠিকঠাক লিখিয়ে দিইছি—কেবল ঐ একটা ভুল। ভুল আর কার না হয় বলুন—তবে বড় মারাত্মক ভুল। সকালে দারোগা আসবে তদন্তে—মামলা ফেঁশে যাওয়ার জোগাড়। তাই রাত থাকতে থাকতে একবার নিজের চোখে দেখতে গেলাম।

কহিলাম—দেখে আর কি হ'ল, গোলমাল যা হবার সে ত হবেই—

হঠাৎ ঘনশ্যাম বিনয়ে অত্যন্ত অভিভূত হইয়া পড়িল। কিন্তু বিনয় নয় বাহাদুরী। কহিল—আজ্ঞে, গোলমাল হবে ত এ অধীন আছে কি করতে? ভাবনা নেই, সব ঠিক করে' দিয়ে এসেছি। রজনীর বাড়ী আপনি দেখেন নি। চার পোতায় একখানা মাত্র ঘর, সে ঘরের আবার সামনে বেড়া নেই। সুবিধে হ'ল। গিয়ে দেখলাম বেহুঁস হয়ে ঘুমুচ্ছে—বৌটাও আর এক পাশে। ঠাউরে দেখি, জখম ডান পায়েই বটে। তখন সড়কী দিয়ে বাঁ পায়ে আবার একটু খুঁচিয়ে দিয়ে এলাম। বাবাগো—বলে' যেই চেঁচিয়ে উঠেছে, আমি অমনি সুড়ুৎ করে' সরে' এলাম।

বলিয়া নিজের চতুরতায় হি-হি করিয়া হাসিতে লাগিল। বলিল—একেবারে ডবল সুবিধে। এই নিয়ে রাইচরণের নামে ফের আর এক নম্বর চলবে। এখন বাকী রইলো ডান পা বাঁ পায়ের গোলমালটা। আগে যাচ্ছি রজনীর বাড়ী, দারোগা জিজ্ঞাসা করলে যা'তে বলে—দিনে মেরেছিল বাঁ পায়ে, রাতে ডান পায়ে। আজ আর হেঁটে কাছারী আসতে হবে না আপনার পাইক-বাহাধনের—

অভিভূতের মতো শুনিয়া যাইতেছিলাম।

ঘনশ্যাম কহিল—কই, হোলো আপনার হাত ধোওয়া?—চলুন।

কাছারী বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়াছি, এই সময়ে ঘনশ্যাম ডাইনের পথ ধরিল। বলিল—আপনি সোজা চলে' যান—আমি রজনীর বাড়ী ঘুরে এক্ষুণি যাচ্ছি।

কহিলাম—দাঁড়াও ঘনশ্যাম।

বোধকরি কণ্ঠস্বরের মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু প্রকাশ পাইয়া থাকিবে। সে চমকিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল।

বলিলাম—আমি এক্ষুণি কাশী চলে' যাচ্ছি, তোমার সাথে আর দেখা হবে না। পয়লা মোটরে যশোর গিয়ে ট্রেণ ধরতে হবে।

ঘনশ্যাম সন্ত্রস্ত হইয়া হাত জোড় করিয়া কহিল—আজ্ঞে, কি অপরাধ করলাম?

আমি বলিলাম—অপরাধের কথা নয়। আমি এসব পেরে উঠছি না, বাবাকে পাঠিয়ে দেব—তা'তে কাজের সুবিধে হবে।

ইহাতে ঘনশ্যামের মতদ্বৈধ নাই, অতএব প্রতিবাদ করিল না, কেবলমাত্র কহিল—কিন্তু অন্ততঃ আজকের দিনটে থেকে যান, দারোগাবাবু আসবেন—আমরা আইন-টাইন তো তেমন বুঝিনে।

বলিলাম—ফল তাতে বড় সুবিধে হবে না ঘনশ্যাম, দারোগার সামনে হয়ত কি বলে' বসব, কেস মাটী হয়ে যাবে। তাতে কাজ নেই।

বলিয়া হন-হন করিয়া পথটুকু পার হইলাম।

কাশী গিয়া বাবাকে যেই খবরটা জানাইয়াছি অমনি যেন বারুদে আগুন লাগিল। বলিলেন—যাক্ প্রাণ, রোক্ মান।

তুমি কোন লজ্জায় পালিয়ে এলে বাপু। রাইচরণের মুণ্ডটা আনতে পারলে না, যেত দু'পাঁচ হাজার—যেত। আমার কি? আমি আর কদিন—চোখ বুঁজলে সব ফক্কিকার—

বলিয়া গুম হইয়া বসিয়া খানিকক্ষণ বোধকরি সংসারের নশ্বরতাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। বলিলেন—এই গ্যাঁট হয়ে' বসে' রইলাম। নাগপুরেও যাচ্ছিনে—দেশেও না। বিষয়-আশয় কারবার পত্তোর সব গোল্লায় যাক, কারো যখন গরজ নেই। আর যদি কোন দিন নড়ে' বসি ত'হলে—

একটা ভয়ানক রকমের শপথ করিতে গিয়া সামলাইয়া লইলেন। বুদ্ধির কাজ করিয়াছিলেন, কারণ শপথ সন্ধ্যা নাগাত ত ভাঙ্গিতেই হইত। বিকাল বেলায় জিনিষপত্র গোছাইবার ধুম পড়িয়া গেল। আয়োজন গুরুতর। পাঁচজন পশ্চিমী গুণীলোক সঙ্গে যাইতেছে। আর যে কি-কি যাইতেছে তাহার সঠিক খবর বলিতে পারি না, আন্দাজ করা চলে। বলিলেন—না মরলে আর অব্যাহতি আছে? ছাগল দিয়ে লাঙল চষা হ'লে লোকে আর ষাঁড় কিনতো না—

ইঙ্গিতটা আমাকে উপলক্ষ্য করিয়া। কিন্তু অনর্থক। আমি ত কোন দিন ষণ্ডত্বের গৌরব করি নাই।

বাবা ততক্ষণে ট্রেণে চাপিয়া হয়ত মোগলসরাই পার হইয়া গেলেন। বীণা প্রশান্ত চোখ দুটি আমার দিকে মেলিয়া শুইয়াছিল। আমি সেই রজনী পাইকের গল্প বলিতেছিলাম। হঠাৎ সে চোখ বুঁজিয়া জড়সড় হইয়া মাথাটি আমার কোলের মধ্যে গুঁজিয়া দিল। বলিল—তুমি থামো, আমার ভয় করে—।

আমি কহিলাম—বীণা, তবু ত সে রক্ত তুমি চোখে দেখো নি।

বীণা কথা কহিল না। আলগোছে হাত দু'খানা বাহির করিয়া আমার মুখ চাপিয়া ধরিল। চক্ষু তেমনি বোজাই আছে।

খানিক পরে চোখ মিট-মিট করিয়া চাহিয়া দেখিল, চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া আমি কি করিতেছি। আর মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। তারপর আবার চোখ বুঁজিয়া দিব্য ভালমানুষের মতো ঘুমাইতে সুরু করিল।

বাবা ফিরিলেন দিন পনেরো পরে। আবার গেলেন। এমনি যাতায়াতে বছর খানেক কাটিল। আগে যে মুখ গম্ভীর বিমর্ষ থাকিত ক্রমশঃ তাহাতে হাসি ফুটিয়া উঠিল। বলিলেন ঘনশ্যাম খুব জাঁহাবাজ লোক—টাকাকড়ি একটু এদিক-ওদিক করে বটে, কিন্তু ক্ষমতা আছে। মহাল একেবারে যাকে বলে পায়রা-চোখো—।

আমার কেমন ধারণা হইয়াছিল রাইচরণ বাঁচিয়া থাকিতে বিবাদ মিটিবে না। বাবার সেই পাঁচ হাজারের বিনিময়ে মুণ্ড আনিবার আক্রোশটাও মনে ছিল। জিজ্ঞাসা করিলাম—রাইচরণ মরেছে না দেশ ছেড়েছে?

বাবা কহিলেন—মরেও নি, দেশও ছাড়েনি। উচ্ছেদ করেছিলাম, তা বৌ ছেলেপিলে নিয়ে কাছারী এসে পায় জড়িয়ে ধরল। ভাবলাম—চাষীদের মধ্যে সবচেয়ে মানীবংশ—যখন এত কাবু হয়েছে, থাকগে। পাই পয়সা না নিয়ে সেই মৌরশী পচিশ বিঘে কবলা করে' দিয়ে গেল। আর ঘনশ্যামকে বলেছে ধর্ম্মবাপ। এবার একবার গিয়ে দেখে এস তো—

মধুসূদনকে মনে মনে স্মরণ করিয়া সভয়ে প্রার্থনা করিলাম, যেন দেখিয়া আসিবার প্রয়োজন সেবারকার মতো আর কখনো না হয়!

কিন্তু মধুসূদন সে প্রার্থনা কানে শুনেন নাই।

ইহার কিছুদিন পরেই কেবলমাত্র চোখের দেখা দেখিয়া আসা নয় দেশে চিরস্থায়ী বসবাস করবার প্রয়োজন ঘটিল। বাবা স্বর্গীয় হইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে কারবারটিও। বীণা বাপের বাড়ী গিয়াছিল, মাকে শ্যামবাজারে মাতুলালয়ে আনিয়া রাখিলাম। তারপর বাড়ীঘর মেরামত করিয়া বাসযোগ্য করিবার জন্য ঘনশ্যামের সুশাসিত নিরুপদ্রব মহলে অনেকদিন পরে আবার আসিয়া পৌঁছিলাম।

না, ইতিমধ্যে দেশের বিস্তর উন্নতি হইয়াছে বটে। গঞ্জের আটখানা দোকানে টিনের চাল দিয়াছে। আধঘণ্টা অন্তরঃ বাস,—কোন অসুবিধা নাই। বাসের ছাতের উপর বাক্স বোঝাই হইয়া শহরে মাছ চালান যায়। নূতন পোষ্টাফিস হইয়াছে। মাঝে মাঝে দেশ-বিদেশের ভদ্রলোকেরা বন্দুক লইয়া বিলে পাখী শিকার করিতে আসেন। মাছ চালান দিতে অনেক বরফের দরকার হয় বলিয়া একটি আইস-ফ্যাক্টরী খুলিবার কথা হইতেছে। কোন কোম্পানী জায়গাও দেখিয়া গিয়াছে। গ্রামের প্রান্তে তিনটি তাড়িখানা। এবার নাকি একটি মদের দোকানের ডাক হইবে। মোটের উপর সর্ব্বরকমে সুবিধা—যা' চাও তাহাই মিলিবে।

সর্ব্বাগ্রে উঠানের জঙ্গলগুলি কাটাইবার দরকার। সকালবেলা ঘনশ্যামকে লইয়া নিজেই বাহির হইলাম, প্রাতভ্রমণ হইবে মজুরের তল্লাসও হইবে। কিন্তু মজুর পাওয়া কিছু কঠিন—অঞ্চলে মোটে চাষাভূষা নাই, তার পাইবে কোথায়? খালি খালি ভিটা পড়িয়া রহিয়াছে। দু'চারজন যাহারা আছে অবস্থা ভাল হইয়া গিয়া তাহারা আর মজুরী করিতে চাহে না। অবস্থা ভাল হইয়াছে ঘনশ্যামের মুখে শুনিলাম, নীচু নীচু জীর্ণ কুঁড়ে গুলি দেখিয়া মনে হয় বইয়ে যে ধীবরের বাসস্থান পড়িয়াছি তাহা বোধকরি এই প্রকার। ইহার মধ্যে মানুষ যে সত্যসত্যই ঘর সংসার করিয়া বাঁচিয়া থাকে, চোখে না দেখিলে তাহা বিশ্বাস হয় না।

দুই জনের বাড়ী হইয়া তারপর গেলাম চরণ বেপারীর বাড়ী। চরণ দেখি কাঁচের গেলাসে করিয়া কি খাইতেছে। বলিল—নায়েব মশায়, বিশ্রী অভ্যেস হয়ে গেছে। সকালে উঠে আগে চাই মিছরীর পানা।—নইলে মাথা ধরবে।

রোগ কঠিন বটে।

বলিলাম—ও চরণ, ভাল আছিস? আজকাল বেশ পয়সাকড়ি কামাই করছিস—না?

চরণ চিরদিনই বিনয়ী লোক। মুখখানা কাচুমাচু করিয়া জোড়হাতে বলিল—যে আজ্ঞে। লক্ষ্মীর কিরপা মুখ ফুটে কি বলব,—আপনার মা-বাপের আশীর্ব্বাদে হচ্ছে এক রকম। বাবু, এলেন কবে?

ঘনশ্যাম বলিল—বাবুরা সব দেশে-ঘরে চলে' আসছেন। বাড়ীর বাগান সাফ হবে আজকে জোন খাটবি চরণ?—

চরণ বলিল—খাটবো—তারপর ঘাড়টা ডানদিকে কাত করিয়া আবার বলিল—খাটবো, বাবুরা এসেছেন খাটবো না? নিশ্চয় খাটবো।

—তবে যাস সকাল-সকাল—বলিয়া বাহির হইলাম। পিছন হইতে ডাকিল—নায়েব মশায়!

দুজনেই ফিরিয়া দাঁড়াইলাম।

চরণ হাসিয়া বিচিত্র ভঙ্গীতে বলিল—একটা টাকা। জোনের দাম আগাম না দিতে পারেন চোটা হিসেবে দিন। সুদ দৈনিক দু'পয়সা—যা বাঁধা রেট আছে। আজকের সুদ কেটে নিয়ে সাড়ে পনেরো আনাই দিয়ে দিন বরং—

ঘনশ্যাম কহিল—সকালবেলা টাকা কি হবে?

আমরা বাড়ীর মধ্যে ঢুকিবার সঙ্গে সঙ্গে চরণের বৌ মাথায় কাপড় টানিয়া লজ্জায় জড়সড় হইয়া উঠানের এককোণে বসিয়া বসিয়া ঝাঁট দিতেছিল। আঙুল দিয়া তাহাকে দেখাইয়া চরণ কহিল—মাগীর বজ্জাতি। বলছে চাল বাড়ন্ত। সব চাল বেচে খেয়েছে, থাকবে কোত্থেকে?

এত বড় অভিযোগের পর লজ্জাবতী আর বসিয়া থাকিতে পারিল না। উঠিয়া দাঁড়াইয়া ঘোমটা আরো একটু বাড়াইয়া দিয়া এক প্রকার স্বগতভাবেই বলিয়া উঠিল—বেয়াক্কিলে কথা—সব চাল বেচে খেয়েছে। কত চাল এসেছিল শুনি?

চরণ কহিল—কাল পাঁচসিকের মাছ বিক্রি হ'ল তার হিসেব দে। দে শিগ্গীর।

বৌয়ের হিসাব-জ্ঞান খুব প্রখর বলিতে হইবে। অমনি মুখে মুখেই তৎক্ষণাৎ সুরু করিল—শোন্। চুরি করে' খেয়েছি নাকি? এই সরু বালাম চাল দু'সের—ছ'আনা, ঘি সাড়ে সাত আনা, মিছরী গরমমশলায় দু'সাত পয়সা—আর রইল এক পয়সা, তুই বললিনে যে এক পয়সা রেখে কি হবে—কর্পূর কিনে নিয়ে আয়, জলে দিয়ে খাওয়া যাবে। সে কি আমার দোষ?

হিসাব পাইয়া চরণের আর কথা কহিবার উপায় রহিল না।

ঘনশ্যাম জিজ্ঞাসা করিল—কাল রাত্তিরে বুঝি কিছু হয়নি।

চরণ কহিল—না। কাল বড্ড পাহারায় ছিল। কোন দিন যে কি হবে কিছু ঠিক করে' বলবার যো নেই—তবে মোটের উপর ব্যবসাটা ভাল। বেশ আছি। কোন ঝক্কি নেই, বাবাঠাকুর। মাঠের উপর হাঁটু জলে হৈ হৈ করে' গরু তাড়িয়ে লাঙল চষে' বেড়ানো—রোদ নেই, বৃষ্টি নেই, ও সব কি আর পোষায়?

পথে আসিয়া চরণ বেপারীর ব্যবসায়ের কথাটা পাড়িলাম। কি এমন সুবিধাজনক ব্যবসা আরম্ভ করিয়া দিয়াছে?

ঘনশ্যাম সমস্ত কথা খুলিয়া বলিল। একা চরণের এ ব্যবসা নয়, চাষীদের মধ্যে যাহারা এখনো এ অঞ্চলে টিঁকিয়া রহিয়াছে সকলেই ইহা ধরিয়াছে। ব্যবসাটা ভাল। রাত্রিবেলায় ঘণ্টা তিন-চারের কাজ মোটে। সারা দিন সকাল দুপুর সন্ধ্যা কখনও কোন পুরুষ মানুষকে নড়িয়া বসিতে হয় না। পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া দেখ—হয় ঘুমাইতেছে, নয় তাস খেলিতেছে, নয়ত তাড়ি খাইতেছে। দশটা বেলা না হইতেই সাবান ও গন্ধতৈল লইয়া দলে দলে পুকুরঘাটে নাহিতে বসে। চুল বাগাইয়া টেরী কাটিতে, সময় কিছু যায়। গভীর রাত্রিতে গ্রামের মধ্যে যখন নিশ্চল নিষুপ্তি সেই সময়ে জাল ঘাড়ে কুঁড়ে হইতে টিপি টিপি এক একজন করিয়া বাহির হইয়া পড়ে। পরস্পর ফিস-ফিস কথা, ঝুপ করিয়া এক একবার জাল পড়ার শব্দ ·· আবার ভোর হইবার আগে যে যার ঘরে ফিরিয়া আসে। জেলেদের পাহারার যে ব্যবস্থা আছে তাহা যথেষ্ট নয়, অত বড় সুবিস্তীর্ণ বিলের সবদিকে নজর রাখিতে পারে না। আর ইহারাও সুযোগ সন্ধান সমস্ত শিখিয়া ফেলিয়াছে। তবে নিতান্ত বেকায়দায় পড়িলে পিঠের উপর কোনদিন দুই এক ঘা যে না পড়ে তাহা নহে—কিন্তু তাহার বেশী আর কিছু না। দু-দশটা মাছ চুরি জেলেরা তেমন গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না।

সকাল হইতে কাজ মেয়েদের। মাছ গঞ্জে লইয়া বেচিয়া বাজার করিয়া যাবতীয় ঘরকন্না সারিয়া রাঁধিয়া পুরুষ মানুষদের ডাকিয়া তুলিয়া খাওয়াইতে হয়।

তা মন্দ নয়, আছে বেশ।

ফিরিবার পথে রাইচরণের বাড়ী। সেই রাইচরণ দাস, যাহার গুণের প্রতি বাবার অত আগ্রহ ছিল।

ঘনশ্যাম বলিল—যাবেন ওর বাড়ী? আজকাল মজুরী খাটে।

আমি বলিলাম—বেলা হয়ে গেছে—আজ থাক।

ঘনশ্যাম বলিল—না—না দেখে যাই—চলুন। উঠানে গিয়া ডাকিল—রাইচরণ? ও রাইচরণ?

লম্বা চওড়া বিশাল দেহ লইয়া সামনে দাওয়ার উপর পড়িয়া আছে, তবু সাড়া দিবে না। বেটা মরিয়া গেল নাকি?

কিন্তু গরজ আমার, আমি ডাক দিলাম—ও রাইচরণ, অসুখ করেছে?

এবার অস্ফুট সাড়া আসিল—উঁ—

বলিলাম—বেলা দুপুর হয়ে গেছে, এখনো ঘুমুচ্ছো?

চোখ দুটা মেলিয়া আমার দিকে তাকাইল, যেন টকটকে রাঙা দুটি গুলি, দেখিয়া ভয় করে। একেবারে মেয়ে মানুষের মতো রাইচরণ ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

ঘনশ্যাম বলিল—আকণ্ঠ তাড়ি গিলেছিস বুঝি? আজকে জোন খাটতে যাবি?

যাবো—বলিয়া স্বীকার করিয়া পুনশ্চ সে ঘুমাইতে সুরু করিল।

বেলা বাড়িতেছিল, ইহার কাণ্ড দেখিয়া আর রাগের সীমা রহিল না। ঘনশ্যামকে বলিলাম—চলো—চলো—যাওয়া যাক—বেটা মাতাল—।

কথাটা রাইচরণের কানে গিয়াছিল। ধীর গম্ভীরভাবে উঠিয়া বসিল। তারপর একখানা পা বাড়াইয়া দিয়া কোণের চাউলের কলসীটায় ঠন করিয়া লাথি মারিয়া কহিল—না, আমি যাবো না।

ঘনশ্যাম জিজ্ঞাসা করিল—কেন? কি হোল?

—কলসীতে চাল আছে নড়ে উঠেছে—বলিয়া তৎক্ষণাৎ শুইয়া পড়িল। হাত নাড়াইয়া আমাদের চলিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিয়া বলিল—গতর খাটানো ছোট লোকের কাজ, ও সব আমি করিনে—

দিন পনেরোর মধ্যে বাড়ীর জঙ্গল একদম সাফ হইয়া গেল, আবার শ্রী ফিরিল। চার পাঁচটা কুঠরী চুণকাম করিয়া একেবারে নূতনের মতো হইয়াছে, আর-আর যাহা কাজ আছে ধীরে-সুস্থে পরে করিলে চলিবে। জ্যৈষ্ঠ মাস শেষ হইয়া গেল, আষাঢ়ের প্রথমেই নূতন সংসার পাতিবার আর কোন বাধা নাই। এক দিন বৈকালে নাগরগোপের স্কুল-ঘরের কাছে বল্লভ রায়ের রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইলাম। আগে শ্যামবাজার হইয়া শ্বশুরবাড়ী যাইব। বেশীক্ষণ দাঁড়াইতে হইল না, বাস আসিল। গাড়ীতে উঠিয়া দিব্য আরামে গদীর উপর জাপটাইয়া বসিলাম। আর একদিন ছেলে-বয়সে ছোট কাকার বিয়েয় এই পথে কত দৌড়াদৌড়ি করিয়া মরিতে হইয়াছিল। দেশের কি আর সেদিন আছে!

তীরের মতো ছুটিয়া চলিয়াছি। দূরের গ্রাম হইতে এক পাল গরু চরাইয়া রাখালেরা ফিরিয়া আসিতেছে। গাড়ী হর্ণ বাজাইতে বাজাইতে পালের মাঝখান দিয়া চলিল। এ পথে এমন হইয়াছে যে গরুগুলো পর্য্যন্ত আজকাল মোটর গাড়ী ভ্রূক্ষেপ করে না।

মুক্ত বিলের বাতাসে রাস্তার দুই পাশে ছলছল শব্দে জলের আঘাত লাগিতেছে। যতদূর দৃষ্টি যায় কেবলি সীমাহীন জলরাশি। জলের মধ্যে মধ্যে দু'একটি তাল ও শিমুল গাছ। চারিদিক অন্ধকার করিয়া আকাশে মেঘ জমিয়া আসিল। দু'একটি লোক ছাতা খুলিয়া পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইতেছে। হেডলাইট জ্বালিয়া গাড়ী ছুটিতেছে। চতুর্দ্দিকের প্রচণ্ড নিস্তব্ধতার মধ্যে মোটর-এঞ্জিনের একটানা আওয়াজ।

মাঝে মাঝে পথ সাপের মত আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে। বাঁক ফিরিবার মুখে গাড়ীর তীব্র আলো এক একবার জলের উপর পড়ে। বল্লভ রায়ের উঁচু পাকা রাস্তা, মানুষের ঘরবাড়ী ডুবিয়া যায় কিন্তু রাস্তার উপর জল উঠে না। মোটর হর্ণ বাজাইতে বাজাইতে নির্বিঘ্নে ছুটিতে লাগিল।

হঠাৎ একটি গাছের তলায় আসিয়া গাড়ী থামিয়া গেল। ড্রাইভার নামিয়া পড়িল, ম্যাগনেটে কি দোষ হইয়াছে, পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ঠিক হইয়া যাইবে। যাত্রীরাও সকলে নামিয়া পড়িলাম। গাছটিকে চিনিলাম—অশ্বত্থগাছ। সামনেই নূতন পুল। দেখিতে দেখিতে পিছন হইতে তিন খানা বাস পর পর আমাদের পাশ কাটাইয়া আগে চলিয়া গেল। উজ্জ্বল আলোকে অশ্বত্থগাছের আগাগোড়া, টার্গার ব্রিজ, এবং রাস্তার বহুদূর অবধি উদ্ভাসিত হইল। এই অশ্বত্থগাছের তলা দিয়া লক্ষ টাকার বদলেও কেহ যাইতে চাহিত না। আজ আর সেদিন নাই। গাছের ডালপালা ছাঁটিয়া বেশ পরিষ্কার করিয়া দেওয়া হইয়াছে, যাহাতে গাড়ী চালাইবার কোন অসুবিধা না হয়।

পাঁচ মিনিটের জায়গায় পনের মিনিট কাটিয়া গেল, কিন্তু আমাদের গাড়ীখানি যেমন স্থাণু হইয়াছিল তেমনি রহিল। বেড়াইতে বেড়াইতে ব্রিজের উপর গিয়া দাঁড়াইলাম। নিম্নে সঙ্কীর্ণ পরিসরের মধ্য দিয়া পুঁটিমারী বিলের সুবিপুল জলরাশি বাহির হইবার চেষ্টায় পাক খাইয়া প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি করিতেছে। লোহার কপাট ফেলা আছে। জলের এমন উন্মত্ত গর্জ্জন, যেন একসঙ্গে সহস্র মানুষ ঐ লোহার কবাটে মাথা ঠোকাঠুকি করিয়া মরিতেছে। চুপ করিয়া অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম। মনে হইল, এমনি একাগ্রে যদি নিশীথ রাত্রি অবধি কান পাতিয়া থাকিতে পারি তবে নিশ্চয় জলের ভাষা বুঝিতে পারিব। বহুকাল পূর্ব্বে এক নিরীহ ঘুমন্ত শিশুর রক্ত দিয়া এখানে বাঁধ-বাঁধা হইয়াছিল, জলস্রোত অবহেলায় সে বাঁধ ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল। এবার গবর্ণমেণ্ট বড় বড় ইঞ্জিনিয়ার লাগাইয়া লোহা লক্কড়ে অপূর্ব্ব সেতু বাঁধিয়াছেন—নিষ্ফল আক্রোশে বিলের জল গর্জ্জন করিয়া মরিতেছে, সেতুর একটা লোহাও ঢিলা করিতে পারে না।

সেকালের নর-বাঁধের কথা মনে পড়িল, ছোটকাকার বিয়ের কথা মনে পড়িল, দ্বারিকাদত্তের কথা মনে পড়িল। একদিন আসন্ন সন্ধ্যায় গামছা পরিয়া কোমর জল ভাঙিয়া এই বাঁধ পার হইতে হইতে বলিয়াছিলেন—সহস্র নরবলি না হইলে এই খাল আর কি বাঁধা যাইবে না। সুহস্র গৃহস্থ ইহাকে কেন্দ্র করিয়া কাঁদিতে থাকিবে।- বুড়ার ভবিষ্যৎবাণী সত্য হইল না তো। কাহাকেও তো কাঁদিতে দেখিলাম না।

কান্না কোথায়, দেশের দিন ফিরিয়াছে—চারিদিকে হাসি—হাসি! জলের শব্দে যেন উচ্ছল হাসির শব্দ শুনিতে লাগিলাম। চরণ বেপারী হাসিয়া বলিতেছে—হেঁ হেঁ—

সকালে উঠে মিছরীর পানা আগে চাই। রাইচরণ পা দিয়া চালের কলসী নাড়াইয়া দেখিতেছে, ঠন-ঠন করিয়া বিলের জলের মধ্যে সেই কলসীর আওয়াজ হইতে লাগিল। তাড়ি খাইয়া পাঁচুমণ্ডল, রাখু, বিশে সকলে যেন হল্লা করিয়া কোমরে হাত দিয়া ঐ জলের মধ্যে বাইনাচ করিতেছে আর বলিতেছে বেশ আছি·· বেশ আছি·· ঝক্কি নেই—খাসা আছি।

একটি বুড়াগোছের সহযাত্রী বেড়াইতে বেড়াইতে আমার দিকে আসিলেন। কহিলেন—বড় ঘুরঘুটি অন্ধকার—এই যা। নইলে, নরবাঁধ বেড়াবার বেশ জায়গা—।

আমি বলিলাম—নরবাঁধ বল্‌ছেন কা'কে? সে-সব আর নেই, এ হোল টার্ণার ব্রিজ।

বৃদ্ধ বলিলেন—ঐ একই কথা। বুড়ো বয়সে ইংরাজী-মিংরাজী বেরোয় না। আমরা নরবাঁধই বলে থাকি।

গলাটা দ্বারিক দত্তের মতো ঠেকিল। দ্বারিক দত্ত আসিলেন নাকি? কিন্তু দত্ত বুড়া যে মারা গিয়াছেন অন্ততঃ বছর আষ্টেক আগে।

শ্রীমনোজ বসু

ভ্রম-সংশোধন

এই সংখ্যায় "প্রথম ও শেষ প্রশ্ন" প্রবন্ধ যে পাতায় আরম্ভ হইয়াছে, সেই পাতা হইতে পূর্ব্বপাতা পর্য্যন্ত ক্রমিক নম্বর যথাক্রমে ৩৬৯ হইতে ৪০৮ হইবে। পাঠকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক সংশোধন করিয়া লইবেন।
বিঃ সঃ

সত্যাসত্য

শ্রীযুক্ত লীলাময় রায়

৬৪

বিলাতী মেল! সুধীবাবুর চিঠি। পাটনার ঠিকানায় উজ্জয়িনীর নামে সুধীবাবুর চিঠি এই প্রথম এলো। বিলাতে কি অন্য কোনোরকম ডাকটিকিট চলে না কিম্বা বা'র হয় না? ঐ সনাতন রাজার মাথা, তাও মুকুটহীন ও প্রায় টাক পড়া? আমেরিকার ডাকটিকিটে কেমন ওয়াসিংটন ফ্রাঙ্কলিন লিঙ্কন। জার্ম্মাণীর ডাকটিকিটে কেমন গ্যেটে কাণ্ট বিস্মার্ক। ফ্রান্সের টিকিটে কেমন—

সুধীর চিঠি পড়ে উজ্জয়িনী থ' হয়ে গেলো। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তার নিঃশ্বাস পড়্‌ল না, যখন পড়্‌ল তখন দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়্‌ল। অনেকক্ষণ তার চিন্তা-প্রবাহ রুদ্ধ হ'য়ে রইল, যখন বইল তখন দু'চোখ বেয়ে বইল।

বাদলকে তো সে সত্যি ভোলে নি। 'ভুলে থাকা সে তো নয় ভোলা।' তার কঠিন গভীর তপশ্চর্য্যা বাদলেরই মুক্তির জন্য, তার নিজের মুক্তি এমন কিছু জরুরি নয়। কিন্তু এ কেমন মুক্তি বাদল চায়? উজ্জয়িনীর সঙ্গে সম্বন্ধ থেকে মুক্তি? বাদল তা হলে অন্যকে তার সঙ্গিনী করবে? উজ্জয়িনী এখন থেকে কি বাস্তবে কি কল্পনায় সর্ব্বতোভাবে নিঃসঙ্গ? সুদূর ভবিষ্যতেও বাদলের সঙ্গ পাবে না জানলে কল্পনাও ফাঁকা হয়ে যায় যে! নীরস হয়ে যায় যে! কী নিয়ে উজ্জয়িনীর দিন কাটবে? ধর্ম্ম নিয়ে? হঠাৎ তার মনে হলো ধর্ম্মকর্ম্ম সব মিথ্যা, স্বামীই সব। বীণার ধর্ম্মে মতি আছে, কারণ তার স্বামী আছে। বীণার শাশুড়ীর ধর্ম্মে প্রেরণা আছে, কারণ তাঁর স্বামীর চিহ্ন আছে।

কিন্তু সেটা শুধু ক্ষণকালের জন্য। পর মুহূর্ত্তে সে নিজেকে দৃঢ় করল। নিবেদিতার কেউ ছিল না। পাশ্চাত্য মনস্বিনীরা কুমারী। স্বয়ং শ্রীচৈতন্য স্বজন সংসার ত্যাগ করেছিলেন। উজ্জয়িনীও ত্যাগ করবার জন্য বিয়ের আগে প্রস্তুত ছিল। ছেলেখেলার মতো একটা রাত্রের বিয়ে, তার দরুণ এমন কী পরিবর্ত্তন ঘটেছে যে উজ্জয়িনী বাদলকে ধ্রুব-তারা ক'রে জীবনান্তকাল অবধি পথ চল্‌বে?

উনিই আমার স্বামী, উনি আমার সঙ্গী হবেন।—এই বলে সে শ্রীকৃষ্ণের পটখানার দিকে চাতকের মতো চেয়ে রইল। আবার তার চোখ দিয়ে ও গাল বেয়ে ঝরণা ছুটতে লাগ্‌ল, তার জানায় বাধা পেয়ে ছপ ছপ করতে লাগ্‌ল। হেতুহীন অবাধ্য অশ্রুর উপর তার রাগ হলো, রাগ ক'রে চোখ দুটোকে অতিরিক্ত মুছতে মুছতে পদ্মের মতো লোহিত করে তুলল। তবু জল ক্ষরে, লোহিত পদ্মে শিশির বিন্দু টলমল করে, ক্রমশ যখন জলাধিক্য হয় তখন সরোবর-গর্ভে লোহিত পদ্ম টল টল করে।

সেদিন বীণা তাকে দেখে বল্ল, "সত্যি ভাই, কেমন করে পারো?"

উজ্জয়িনী আশ্চর্য্য হয়ে বল্ল, "কী পারি?"

বীণা তার স্বভাবসিদ্ধ সংকোচের সঙ্গে বল্ল, "কিছু না, এমনি বলছিলুম।"

উজ্জয়িনী চেপে ধরল। বীণা বল্ল, "উনি এক দিনের জন্যে কোথাও গেলে আমি ম'রে যাই। বিলেতে যাবার কথা ওঁরও উঠেছিল। আমি বল্লুম, 'যাও না? কে ধরে রাখছে?' উনি বল্লেন, 'বিলেতে না গিয়েও বিদ্যাসাগর হওয়া যায়।' হ্যাঁ ভাই, তুমি তো ফিজিক্স্ পড়েছ, না?"

উজ্জয়িনী আবেগ দমন করে বল্ল, "পাগল!"

বীণা টের পেল না আঘাত কোনখানে লাগ্‌ল। বলে চল্ল, "কোনো কাজে লাগলুম না, ভাই। স্বামীর একেবারে

অযোগ্য। কেন যে তিনি এত ভালবাসেন আজো বুঝলুম না।”

উজ্জয়িনী সহসা বল্ল, “বলো দেখি আমিই কেন এত ভালোবাসি ?”

“কাকে ?”

“তোমাকে ?”

“যাঃ। তোমার যা কথা। ভারি দুষ্টু। আমাকে মুখ্যু দেখে ঠাট্টা কর্‌ছ।”

“না ভাই বীণা। তোমা বিনা আমি আর কারুকে ভালোবাসিনে।”

“ওমা আমার কী হবে! আর কারুকে ভালোবাসো না? সত্যি বল্‌ছ? তিন সত্যি? ইস্! মেয়ের মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে উনি কেমন সত্যবাদী।”

“তুমি বিশ্বাস না করলে আমি কী কর্‌ব বলো!”

উজ্জয়িনীর ভাঙা কণ্ঠস্বর বীণাকে দমিয়ে দিল। কিছু একটা ঘটেছে নাকি? শুনেছে বটে সে স্বামী-স্ত্রীতে মনোমালিন্য কোনো কোনো পরিবারে হয়। কিন্তু তার জানাশুনা সকল স্বামীস্ত্রীই সুখী। সে ও তার স্বামী তো জন্মজন্মান্তর সুখী হয়ে এসেছে। যদিও তার একরত্তি যোগ্যতা নেই, তবু উনি নিজগুণে অভাগীর সব দোষ ক্ষমা করেন।

অন্য কোনো মেয়ে হলে পীড়াপীড়িপূর্ব্বক উজ্জয়িনীর মন থেকে কথা বা'র কর্‌ত। কিন্তু বীণার স্বভাব অমন নয়। সে ধীরে ধীরে উজ্জয়িনীর গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে থাক্‌ল। তারপর উঠে গিয়ে ঠাকুরের চরণামৃত এনে তাকে খাইয়ে দিল। বল্ল, “কল্যাণ হবে।” তবু উজ্জয়িনীর মুখখানা বিমর্ষ দেখে তার আর সহ্য হলো না। সে আঁচলের খুঁট দিয়ে নিজের চোখ মুছ্‌তে লাগ্‌ল।

উজ্জয়িনী হেসে উঠে বল্ল, “বাঃ, বেশ মেয়ে তো। ভালোবাসি শুনে খুশী হয়ে কিছু খাওয়াবে, না, কেঁদেই ভাসালে ?”

বীণা লজ্জিত হয়ে বল্ল, “যাও। কী যে বলো। আমার বুঝি ওসব শুন্‌বার বয়স আছে!”

উজ্জয়িনী নেহাৎ অরসিক নয়। মাঝে মাঝে তারও মুখ খুলে যায়। বল্ল, “তার চেয়ে বলো, যার তার কাছে কি ওসব শোন্‌বার বয়স আছে! সকলে তো কমলবাবু নয়।”

বীণা খপ করে উজ্জয়িনীর মুখে হাত চাপা দিয়ে তারপর কী মনে ক'রে সরিয়ে নিল এবং নিজের দুই কান দুই হাতে বন্ধ কর্‌ল।

উজ্জয়িনী কথাটা ভেঙে বল্ল না, বল্‌তে পার্‌ল না। বীণা তার বন্ধু বটে, কিন্তু বন্ধুকেও কি সব কথা বলা যায়? হয় তো বলা যায়, যদি তেমন-তেমন বন্ধু হয়, যদি সম-দশাপন্ন বন্ধু হয়। স্বামীপরিত্যক্তার ব্যথা স্বামীসোহাগিনী কী বুঝ্‌বে! মনে মনে করুণা কর্‌বে, কিন্তু করুণা কে চায়?

বাবাকে লিখ্‌তে পারে না, মা'কে জানাতে পারে না, বোনেরা পর। শ্বশুরকে বল্‌বার মতো নয়, বীণার শাশুড়ীর সঙ্গে বয়সের দূরত্ব অনেক। সুধীবাবুকে ভালো করে চেনে না। তিনি তার দাদার মতো, তার ইচ্ছা করে তাকে দাদা বলে ডাক্‌তে, কিন্তু অধিকার নেই। তিনি যদি দাদা হতে অসম্মত হন। তা ছাড়া তাঁর সঙ্গে মতেরও অমিল ঘটবে। উজ্জয়িনীর ধর্ম্মকর্ম্মকে তিনি প্রচ্ছন্নভাবে ব্যঙ্গ করেছেন, অমর্য্যাদা করেছেন। তুচ্ছ গৃহকর্ম্ম, রাঁধা আর খাওয়া আর খাওয়ানো—যা পশুতেও করে—তাই কিনা সুধীবাবুর মতে ধর্ম্মের মতো করণীয়। বীণা ও কাজ করে, তার স্বামীর জন্যে, স্বামীর জননীর জন্যে, উজ্জয়িনী কার জন্যে করে মর্‌বে? তার স্বামী নেই, স্বামী না থাকায় শ্বশুরও নেই।

এ বাড়ীতে থাকা বিবেক সঙ্গত কি না উজ্জয়িনী ভাব্‌তে আরম্ভ কর্‌ল। বাবার কাছে ফিরে যেতেও মন চায় না। বাপ্‌ রে। সেখানে শুষ্ক নীরস বিজ্ঞান ছাড়া আর যদি কিছু থাকে তবে সেটা মা'র অনুশাসনাবলী। তুমি এখন বিবাহিতা মেয়ে, তোমার এটা করা উচিত, ওটা শেখা উচিত, সেটা বলা উচিত। অমন করে হাস্‌তে নেই, এমন করে চল্‌তে নেই, তেমন করে পর্‌তে নেই। মা ইতিমধ্যে বহু-বার চিঠি লিখে উপদেশ দিয়েছেন। তাঁর সেই মাদ্রাজী-জায়া ইঙ্গ-দুহিতা বন্ধুনীকে পাঠাতে চেয়ে উজ্জয়িনীর উত্তর পাননি।

বীণাদের গোবিন্দজীকে ছেড়ে কোথাও যাবার কথা ভাবা যায় না। উজ্জয়িনী মনকে চোখ ঠারে—বাদলের মুখ থেকে তো ও কথা শোনেনি, শুনেছে সুধীর মারফৎ। বাদল নিজে বলুক, তারপর দেখা যাবে। ততদিনে নিশ্চয়ই একটা উপায় গোবিন্দজী দেখাবেন। হয় তো বৃন্দাবনেই নিয়ে যাবেন, রাখ্‌বেন কোনো কুঞ্জে। কিম্বা তীর্থে তীর্থে ঘোরাবেন। কোথাও থাকৃতে দেবেন না। লীলাময়ের লীলা! ভক্তকে দুঃখ দেওয়াই তো তাঁর চিরকেলে রীতি।

বাদলের উপর উজ্জয়িনীর অভিমান অন্য রূপ ধারণ করল। সে পদাবলী মন্থন ক'রে অভিমানের কবিতায় লাল পেন্সিলের দাগ দেয়। শ্রীরাধাকে অবহেলা ক'রে কিম্বা বিস্মৃত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে গেছেন। শ্রীরাধা কৃষ্ণকথা চিন্তা করছেন কৃষ্ণরূপ ধ্যান করছেন ও আত্ম-নিপীড়নের সীমা মান্‌ছেন না। উজ্জয়িনী চোখের জলে ডুব্‌তে ডুব্‌তে এই সব পড়ে। তার ভারি তৃপ্তি হয়। সে যে সকলের থেকে দুঃখিনী, সে যে যৌবনে যোগিনী, সে যে প্রিয়-প্রত্যাখ্যাতা এই পরম গৌরব। হবে, হবে, তেমন দিন হবে যেদিন বাদল অনুতপ্ত হয়ে উজ্জয়িনীর পায়ে ধরে সাধ্‌বে। গলদশ্রুনয়নে বল্‌বে, 'তখন বুঝ্‌তে পারি নি তুমি কী মহীয়সী, তখন চিন্‌তে পারি নি তুমি দেবী।' এত বড় তপশ্চর্য্যা ব্যর্থ যাবে না, এ কঠোর নিষ্ঠা এর নিশ্চয়ই পুরস্কার আছে।

বাদল যদি তাকে চিঠি লেখে উজ্জয়িনী ঘটা করে উত্তর লিখ্‌বে। বাদলের রথ বাদলকে মথুরায় নিয়ে গেছে, বাদল রাজা হোক, অভাগিনী উজ্জয়িনীকে মন থেকে মুছে ফেলুক, বৃন্দাবনকে—ভারতবর্ষকে—ভুলে থাক্‌। উজ্জয়িনীর জীবন তো ব্যর্থ হয়ে গেছেই, কিন্তু ব্যর্থতার মধ্যে তার পরম সার্থকতা সে এক হিসাবে শ্রীরাধার চাইতেও দুঃখিনী, শ্রীরাধার ললিতা বিশাখাদি সখী ছিল, তার এমন কেউ নেই যার কাছে প্রাণের ব্যথা ব'লে হৃদয়ভার লঘু করতে পারে।

উজ্জয়িনী মেজের উপর শোয়া সুরু করল। একটি হাতকে বালিশ করে, অন্য হাতটি দিয়ে বইয়ের পাতা উল্টায় চোখ মোছে। ঘর সংসারের কাজ দেখা চুলোয় গেলো, ছাই ঘর সংসার, ঘর সংসারের কাজ তাকে কোন স্বর্গে নিয়ে যাবে শুনি? নিজের জন্যে সে কিছু দাবী করছে না, একবেলা চারটি ভাত (গোবিন্দজীর প্রসাদ হলেই ভালো হতো, কিন্তু তার উপায় নেই) একটু দই (উজ্জয়িনী দই বড় ভালোবাসে), যে-কোনো ফল। বেঁচে থাক্‌বার পক্ষে এই অনেক, কিন্তু কেন বেঁচে থাক্‌তে হবে হে ভগবান ব'লে দাও। পৃথিবীতে কার জন্যে, কী জন্যে, বেঁচে থাকা দরকার? যারা দেশকে স্বাধীন করছে, জন-সাধারণের দৈন্য দারিদ্র্য দূর করছে, পীড়িতের সেবা ও রুগ্নের শুশ্রূষা করছে তারা দীর্ঘজীবী হোক্‌, কিন্তু আমি উজ্জয়িনী কারুর উপকার করতে পারবো না, আমি চাই নিজের মুক্তি, আমাকে বৃন্দাবনে নিয়ে যাও।

উজ্জয়িনী ভক্তিমার্গে বীণাকে ছাড়িয়ে গেলো। বীণা তার ঐকান্তিকতা দেখে উল্টো বুঝ্‌ল। ভাব্‌ল বেচারি বুঝি তার প্রবাসী স্বামীর জন্যে কাতর হয়ে পড়্‌ছে ক্রমে ক্রমে। তবু মুখ ফুটে বল্‌ছে না। বিরহ বীণার জীবনে দীর্ঘকালীন হয়নি, তার স্বামী থাকেন পাটনায় ও পিতা আরায়, সে বাপের বাড়ী গেলে স্বামী শনি রবিবার সেইখানে কাটিয়ে আসেন। কয়েকদিনের বিরহও বীণাকে কান্না পাইয়ে দেয়, তাই থেকে সে জানে যে মাসের পর মাস যে নারী প্রোষিতভর্তৃকা সে নারী জীবন্মৃত না হয়ে পারে না। পারে বটে তারা, যাদের কোলে শিশু ও হাতে বৃহৎ সংসারের ভার, অধিকবয়স্কা গিন্নীবান্নী মানুষ। আহা বেচারি উজ্জয়িনী!

বীণা বলে, "বাস্তবিক, ভাই, এ বড় অন্যায়। ছেলে বিলেত যাবে, যাক্‌; কিন্তু তাকে বিয়ে দিয়ে পাঠানো কেন? তার নিজের মনেও কষ্ট, তার বৌয়ের মনেও কষ্ট। দু'দিনেই মায়া পড়ে যায় যে। বেচারা বাদলবাবুরও কি কম কষ্টটা হচ্ছে! বিরহ, ভাই, এমন ধারালো জিনিষ, এদিকেও কাটে ওদিকেও কাটে। ওর দেশবিদেশ নেই। বিলেতেও বাদলবাবু ঠিক তোমারি মতো দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছেন।"

উজ্জয়িনী রসিকতা ক'রে বলে, "হিম লাগ্‌লে কমল শুকিয়ে যায় জানি, কিন্তু বাদল যে নিজেই হিমশীতল।"

বীণা কানে আঙুল দিয়ে মিষ্টি হাসে। বলে, "যাও! যত সব বাজে কথা!"

৬৬

পাটনায় আসার ছ'মাসের মধ্যে উজ্জয়িনীর এমন পরিবর্ত্তন হবে কে জানত। যোগানন্দের কাছে বাদলের কাছে রায় বাহাদুরের একটা দায়িত্ব আছে। যোগানন্দ যদি বেড়াতে এসে বলেন, "এঁ্যা! এ কী করেছ, মহিম! মেয়েটাকে ভদ্র-সমাজের অযোগ্য করে তুলেছ!" কিম্বা বাদল যখন ফিরে এসে বলবে, "এই আমার স্ত্রী!" তখন রায় বাহাদুরকেই কৈফিয়ৎ দিতে হবে।

বেশ তো ছিল সে বহরমপুরে, তার মা-বাবার কাছে, তাকে পাটনায় এনে বৈষ্ণবী হয়ে ওঠার সুযোগ না দিলেই হতো। তাকে বাধা দিতে সাহস হয় না, পরের মেয়ে, হাজার হোক। পাশের বাড়ীর সেই বুড়ীটা ও ছুঁড়ীটা কখন এসে দীক্ষা দিয়ে যায়, তারা ভদ্রমহিলা না হয়ে থাক্‌লে তাদের ধমকে দেওয়া যেত, কিন্তু ভদ্র পুরুষের এটুকু অধিকার নেই যে নিজের বাড়ীতে অপরিচিতা ভদ্র-মহিলার যাতায়াত ঠেকায়।

এই ছ'মাসের মধ্যে উজ্জয়িনী বড় কোথাও বেরয়নি। যাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছে তাদের সবাইকে নিমন্ত্রণ করেনি। রায় বাহাদুরের ব্যারিষ্টার ও সিবিলিয়ান বাঙালী বন্ধুরা ইতিমধ্যেই পরিহাস করে বলেছেন যে জুনিয়ার মিসেস সেন নাকি সিনিয়র মিসেস্ সেন-এর মতো পর্দ্দানশীন। (যদিও বাদলের মা বহুকাল মৃত তবু রায় বাহাদুরের সমবয়সী বন্ধুদের পক্ষে পনেরোটা বছর যেন সেদিন।)

অগত্যা রায় বাহাদুর মিসেস গুপ্তের প্রস্তাব অনুসারে মিসেস স্যামুয়েল্‌স্‌কে আনাবার চেষ্টা কর্‌লেন, উজ্জয়িনীর অজ্ঞাতসারে চিঠিপত্র চল্‌তে থাক্‌ল। মিসেস্ স্যামুয়েল্‌স্ নিজের দুই ছেলেকে ইউরোপীয় ইস্কুলে দিয়ে দেশীয় মেয়েদের ইংরেজী শেখাবার জন্যে একটি প্রাইভেট ইস্কুল খুলেছেন, কাজেই তিনি সহজে আস্‌তে রাজী নন্। তবু তাঁর টাকার টানাটানি এবং ইস্কুলের থেকে টাকা যা হয় রায় বাহাদুর তার দু'গুণ দিতে প্রস্তুত।

একদিন রায় বাহাদুর মফঃস্বলে গেছেন, একখানা ট্যাক্সি তাঁর বাড়ীর সাম্‌নে দাঁড়িয়ে হর্ন বাজালো। উজ্জয়িনী প্রাতঃস্নান ক'রে সবে ধ্যান কর্‌তে বসেছে, শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি ক্রমশঃ বাদলের মূর্ত্তি হয়ে উঠ্‌ছে, ঠিক এমন সময় কে এসে বল্ল, "মা, মেমসাহেব এসেছেন।"

কোনো মেমসাহেবের এই অসময়ে আসার কথা ছিল না, বাঙালী মেমসাহেব না ইংরেজ মেমসাহেব তাও জানা নেই। উজ্জয়িনী রামপিয়ারীকে জেরা করবে, ভাব্‌ল। কিন্তু ততক্ষণ মেমসাহেবকে অভ্যর্থনা কর্‌বার কেউ নেই, তাঁর প্রতি অভদ্রতা হবে। নূতন করে কাপড় পর্‌তেও সময় লাগে। উজ্জয়িনী উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে সেই কাপড়েই নেমে গেলো, যা থাক্ কপালে।

মিসেস্ স্যামুয়েল্‌স্ বোধ করি আশা করেছিলেন মিসেস্ গুপ্তের কন্যাকে দেখ্‌বেন, তাঁরই মতো সুবেশা সুন্দরী, তাঁরই মতো সপ্রতিভ। উজ্জয়িনীকে চিন্‌তে পার্‌লেন না। বল্লেন, "আমি কি একবার মিসেস্ সেনের সঙ্গে দেখা কর্‌তে পারি?" (ইংরেজীতে)

উজ্জয়িনী আশ্চর্য্য হয়ে বল্ল, "মিসেস্ সেন! কে তিনি? আপনি ভুল বাড়ীতে আসেন নি তো?" (ইংরেজীতে)

ভদ্রমহিলা অপ্রস্তুত বোধ কর্‌লেন। "পিওন তো বলে এইটেই রায় বাহাদুর এম্-সি সেনের বাড়ী।"

"কিন্তু তাঁর স্ত্রী তো বেঁচে নেই।"

"আমি জানি। কিন্তু আমি যাঁকে চাই তিনি তাঁর পুত্রবধূ।"

তখন উজ্জয়িনীর মনে পড়্‌ল যে তাকেও মিসেস্ সেন বলে ডাকা যেতে পারে। বাদল তাকে পত্নীত্ব থেকে বঞ্চিত কর্‌লেও পত্নীপদ থেকে বিচ্যুত করেনি।

সে লজ্জিত হয়ে বল্ল, "আমিই সেই।"

মিসেস্ স্যামুয়েল্‌স্ তাঁর নামের কার্ড দিয়ে বল্লেন, "বটে? এত বড়টি হয়েছ? যখন তোমাকে বাঁকুড়ায় দেখেছিলুম তখন বোধ করি তোমার বয়স বছর দশেক ছিল। কিন্তু তোমার খৃষ্টান নামটি ভুলে গেছি, মাই ডিয়ার।"

উজ্জয়িনী খ্রীষ্টান নয়। মনে মনে বিরক্ত হলো। কিন্তু এই স্নেহপরায়ণা মহিলাটির কাছে বিরক্তি প্রকাশ কর্‌তে পার্‌ল

না। বল্ল, "বাড়ীতে আমাকে খুকী বলে ডাকত, কিন্তু আমার নাম উজ্জয়িনী। আমি বৈষ্ণব।"—গম্ভীরভাবেই বল্ল।

মিসেস স্যামুয়েলসের বয়স বছর পঁয়তাল্লিশ হবে। চুলে সামান্য পাক ধরেছে। ঋজু, সুঠাম গড়ন। সাড়ে পাঁচ ফুট লম্বা। যতক্ষণ হ্যাট মাথায় দিয়ে বসেছিলেন ততক্ষণ তাঁর চোখদুটির সৌন্দর্য্য ঢাকা পড়েছিল, হ্যাট খুলে রেখে বল্লেন, "ডার্লিং, আমি তোমার মায়ের বন্ধু, মায়ের মতো। তোমার মায়ের অনুরোধে তোমার সঙ্গে থাক্‌তে এসেছি। তোমার দিদিরা আমাকে আণ্টি বলে ডাক্‌ত মনে পড়ে। তুমিও তাই বলে ডেকো।"

মায়ের উপর উজ্জয়িনী কোনোদিন প্রসন্ন ছিল না। সে ছোটবেলায় ভাব্‌ত তার মা নেই, সে আকাশ থেকে তারার মতো খসে পড়েছে। বড় হয়ে বুঝ্‌ল, মা আছে বটে, কিন্তু না থাক্‌লেও চল্‌ত। এখন তার মনে হতে লাগ্‌ল, না থাক্‌লেই ভালো হতো।

মিসেস্ স্যামুয়েল্‌স্ নিয়ে সে করে কী! তার ধর্ম্মকর্ম্মের মধ্যে তিনি কোথা থেকে এসে জুড়ে বস্‌লেন। তাঁর কাছে সর্ব্বদা হাজিরা দেওয়া যায় না, অথচ তাঁকে সঙ্গ দেবার তাঁর তত্ত্ব নেবারও লোক চাই। বাঙালী হলে বাঙালীদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে পাড়া বেড়াতেন। ভারতীয়কে বিবাহ করেও ইনি ভারতীয় আচার অবলম্বন করেন নি। এঁর রান্নার ব্যবস্থা অবশ্য সহজেই হতে পারে, বাড়ীতে বাবুর্চি আছে, কিন্তু কে এঁর সঙ্গে বসে খাবে? মায়ের উপর উজ্জয়িনীর রোষ অহেতুক নয়।

কথায় কথায় বেরিয়ে পড়ল যে তার শ্বশুরও এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। তিনি যে কয় দিনের জন্যে মফঃস্বলে গেছেন ও কবে ফিরবেন এটা উজ্জয়িনীর অবিদিত হলেও মিসেস্ স্যামুয়েলসের নয়। শ্বশুরের প্রতি মমত্ব তার এদানীং কমে আস্‌ছিল, সুধীবাবুর চিঠি পাবার পর। বাদল যখন তার কেউ নয় তখন বাদলের পিতাও অনাত্মীয়। তাঁর উপর উজ্জয়িনীর অশ্রদ্ধা ধরে গেলো। পুত্রবধূকে কোনো শ্বশুর এমন বিপদেও ফেলে যায়! তাও অল্পবয়স্কা পুত্রবধূ।

৬২

রায় বাহাদুর ইচ্ছা করেই গা-ঢাকা দিয়েছিলেন, পাছে মিসেস্ স্যামুয়েলসকে অভ্যর্থনা করবার মুহূর্ত্তে উক্ত মহিলার সম্মুখেই উজ্জয়িনী শ্বশুরের কাছে কৈফিয়ৎ চায়। ব্যাপারটা এতক্ষণে তার ঠাহর হয়ে গেছে, এখনো যদি বা তার রাগ থাকে তবু বিস্ফোরকের মতো শব্দ ক'রে ফেটে বেরবে না। এই ভাব্‌তে ভাব্‌তে তিনি সদর থেকে ফির্‌লেন।

রায় বাহাদুর অতিরিক্ত চালাক হতে গিয়ে ঐ রকম বাজে চাল দিয়ে থাকেন। ওতে ফল হয় উল্টো। ঝুনো ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটদের ঐ দস্তুর। ওঁরা সরকারের এক পয়সা বাঁচাতে চেয়ে দশজন মানুষকে অসন্তুষ্ট করে তোলেন, দু'একটা বেআইনী কাজও করতে ছাড়েন না।

উজ্জয়িনী শ্বশুরের সঙ্গে কথাটী কইল না। মিসেস্ স্যামুয়েল্‌সের কাছে শ্বশুরকে ইন্‌ট্রোডিউস করে দিয়ে নিজের ঘরে চলে গেলো। মিসেস্ স্যামুয়েল্‌স্ বল্লেন, "দিনটি চমৎকার। না?" রায় বাহাদুর বল্লেন, "হেঁ-হেঁ-হেঁ হেঁ। হবেই তো, হবেই তো। আপনার আগমনে আনন্দে গিয়াছে দিক ছেয়ে। সিগ্‌রেট খান তো, ম্যাডাম?"

মিসেস স্যামুয়েল বল্লেন, "না। ধন্যবাদ।"

রায়বাহাদুরের বাস্তবিকই আনন্দ উথ্‌লে উঠ্‌ছিল্। একটা জ্যান্ত মেমসাহেব তার বাড়ীতে স্থায়ী অতিথি। এ কি স্বপ্ন, না মায়া, না মতিভ্রম? কালকেই বাঙালী মহলে তাঁর প্রেষ্টিজ বেড়ে যাবে। পরশু ইংরেজ তাঁর বাড়ী নিমন্ত্রণ রক্ষা করে যাবে। তার পরের দিন গেজেট। তিনি ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট হিসাবে কায়েমী হলেন। রাজার জন্মদিনে নতুন খেতাবের ষোলো আনা সম্ভাবনা রইল। মানুষের আর কী কাম্য থাক্‌তে পারে?

"মাফ করবেন, ম্যাডাম, ট্রেনে আপনাকে আন্‌তে যেতে পারিনি। পিয়ন ট্যাক্সি নিয়ে গেছ্‌ল তো ঠিক্?"

"গেছ্‌ল বৈ কি। আপনার করুণা।"

"হেঁ-হেঁ-হেঁ। Please don't mention it. মহাসম্মানিত অতিথি আপনি। আমি হিন্দু। আমাদের কাছে অথিতি হলেন স্বয়ং নারায়ণ।"

রায় বাহাদুর সাড়া না পেয়ে একটু উৎসাহিত হয়ে বল্লেন, "You are divinely beautiful.

মিসেস্ স্যামুয়েল্‌স্ সতেরো বছর এদেশে আছেন। চাটুবাক্য ইতিপূর্ব্বে অসংখ্যবার শুনেছেন। সেকেলে ধরণের

ভারতীয়রা ওটাকে একটা নির্দ্দোষ আর্ট জ্ঞান ক'রে থাকেন। যেমন ইংরেজ দোকানদাররাও ক'রে থাকে। তিনি শুধু একবার মুচ্‌কে হাস্‌লেন।

রায় বাহাদুর আরো উৎসাহিত বোধ করলেন। প্রথম দিনেই অতিথির প্রতি এমন সব বিশেষণ প্রয়োগ করলেন যা প্রথম বয়সে ব্যক্তি বিশেষের প্রতি প্রযোজ্য। অকস্মাৎ তাঁর তারুণ্য ফিরে এলো বুঝি। কিম্বা ভীমরতি এগিয়ে এলো। না হোক এমন কোনো ব্যবহার তিনি কর্‌লেন না যা ভদ্রতা-বিরুদ্ধ বা অসাধু। এক জাতীয় পুরুষ আছে তারা পোষা কুকুরের মতো। তারা মনিবকে কামড়ায় না, পরকে তাড়া ক'রে যায়। মিসেস স্যামুয়েলস্ রায় বাহাদুরকে এক আঁচড়েই চিনে নিলেন। নিরীহ প্রাণীর উপর রাগ ক'রে কি হবে? একটু পিঠ চাপড়ে দেওয়াই বিধি।

মিসেস স্যামুয়েলস্‌কে সঙ্গ দেবার জন্যে রায় বাহাদুর টেবিলে খেলেন, আমিষ খেলেন ও উজ্জয়িনীকে বাধা করতে না পেরে বাইরে বিরক্ত হলেও অন্তরে আশ্বস্ত হলেন। উজ্জয়িনী উপস্থিত থাক্‌লে রসের কথা হতো না। উজ্জয়িনী মেয়েটা যে আস্ত পাগল এবং তাকে সর্ব্বতোভাবে মানুষ কর্‌বার ভার যে তিনি একা বহন করতে অপারগ এই কথাটা মিসেস স্যামুয়েলস্‌কে বাছা বাছা ইংরেজী ফ্রেজ ও ইডিয়মের সাহায্যে হৃদয়ঙ্গম করালেন। পরিশেষে বল্লেন, হিন্দু আমিও। কিন্তু ঐ যে কুসংস্কার—ম্লেচ্ছের সঙ্গে আহার করব না কিম্বা ম্লেচ্ছের সঙ্গে নাচ্‌ব না—খাঁটি হিন্দুত্ব ওর বহু উর্দ্ধে। পাশের বাড়ীর মেয়েরা ওটা বোঝ্‌বার মতো বুদ্ধিবিদ্যার অধিকারিণী নন্। উজ্জয়িনীকে ওদের কবল থেকে উদ্ধার কর্‌বার জন্যে আপনি অবতীর্ণ হয়েছেন, আপনি ওর সেভিয়ার।"

মিসেস স্যামুয়েলস্ শুধু দন্ত বিকাশ করলেন। উৎসাহ পেয়ে রায় বাহাদুর পুনরায় তাঁকে হিন্দুত্বের মর্ম্ম অবগত করালেন ম্লেচ্ছের সঙ্গে আহার কর্‌ব না, ম্লেচ্ছের সঙ্গে নাচ্‌ব না, এগুলো অন্ধবিশ্বাসীদের বাড়াবাড়ি। রায় বাহাদুর এইমাত্র আহার ক'রে প্রমাণ ক'রে দিলেন যে তিনি বাড়াবাড়ির বিরোধী। এবার একটু নাচ্‌তে পার্‌লেই প্রমাণটা সর্ব্বাঙ্গীন হতো, কিন্তু কেউ শিখিয়ে না দিলে তিনি কেমন ক'রে নাচবেন?

আফশোষের বিষয়, ইঙ্গিতটা মাঠে মারা গেলো। মিসেস্ স্যামুয়েলস্ পাদ্রীর মেয়ে, নাচ সম্বন্ধে তাঁর বিরাগ ছিল, তাঁর স্বামীও ছিলেন মিশনারী কলেজের প্রোফেসার। সুতরাং তাঁর কাছে সাড়া পাওয়া গেলো না। তাঁর ধারা ওদিক দিয়ে বয় না। রায় বাহাদুর যদি পরিষ্কার ভাষায় বল্‌তেন, "আমাকে একটু নাচ্‌তে শিখিয়ে দিন না" তা হ'লে তিনি সম্ভবত শক্ পেয়ে স্তম্ভিত হয়ে যেতেন, সাম্‌লে নিয়ে বল্‌তেন, "আমাকে মাফ করবেন। আমি পারব না।" কিন্তু ইঙ্গিতটা সূক্ষ্ম, সুতরাং তিনি কিছু না বুঝ্‌লেও ভদ্রতার খাতিরে আর একবার দন্ত বিকাশ কর্‌লেন। রায় বাহাদুর এর উত্তরে গ্রামোফোনে jazz রেকর্ড চড়ালেন। নাকী সুরে গান চল্‌তে লাগ্‌ল। উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে বাজনা বাজ্‌তে লাগ্‌ল। কেবল বাহুতে বাহু জড়িয়ে পায়ে পা মিলাবার লোকের অপেক্ষা। রায় বাহাদুর একলাই একটু ঘুর ঘুর কর্‌লেন। তাঁর ধারণা তিনি Waltz নাচছেন। চিড়িয়াখানার ভালুকের ধারণা ঐ। তবু মিসেস স্যামুয়েলস্ ইঙ্গিতটা গ্রহণ করলেন না। তিনি ভাব্‌লেন এ বাড়ীর বুঝি এইটেই রীতি। তিনি একটা গদীমোড়া চেয়ারে বসেই থাক্‌লেন। অনড়, অচল, বেদরদী। "বয়" যখন ছোটো পেগ নিয়ে এলো রায় বাহাদুর অনুরোধ কর্‌লেন, "What about some drink Madam?" তিনি ঘাড় নাড়লেন এবং একটু মুচকে হাস্‌লেন।

শ্রীলীলাময় রায়

ভ্রমসংশোধন—ভাদ্র সংখ্যা বিচিত্রার 'সত্যাসত্যের' নীচে নামটি ভ্রমক্রমে 'লীলাময়ের' পরিবর্ত্তে 'অন্নদাশঙ্কর' ছাপা হইয়া গিয়াছিল। পাঠকেরা অনুগ্রহ করিয়া সংশোধন করিয়া লইবেন। বিঃ সঃ

পুস্তক-পরিচয়

১। **মেঘমল্লার**—শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায় প্রণীত—২১৯ পৃষ্ঠা, বরেন্দ্র লাইব্রেরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। দাম দুই টাকা। ছাপা ও বাঁধাই ভালো।

এটি গল্পের বই। দশটি গল্প এর মধ্যে সন্নিবিষ্ট হ'য়েছে। গল্পগুলি সবই ইতিপূর্ব্বে মাসিকে প্রকাশিত হ'য়েছিল,—তাই মাসিকপত্রের নিয়মিত পাঠক-পাঠিকাদের নিকট নিতান্ত অপরিচিত না হ'তে পারে। কিন্তু পুস্তকাকারে একসঙ্গে গ্রথিত হ'য়ে গল্পগুলি বাংলা সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করেছে, এই কথাটাই বইখানি পড়ে আমাদের প্রথম মনে হ'ল। শুন্‌তে পাই আমাদের দেশে উপন্যাসের যেমন কাট্‌তি হয়, ছোট গল্পের বইয়ের তেমন হয় না; এর ঠিক কি কারণ, তা জানি না। একটা কারণ এই হ'তে পারে, যে মাসিকে ক্রমশঃ প্রকাণ্ড উপন্যাস পড়্‌তে অনেকের ধৈর্য্য থাকে না, কিন্তু ছোট গল্পগুলি মাসিকেই অনেকের পড়া হ'য়ে যায়, কাজেই বই আকারে বেরুলে আর কেন্‌বার দরকার হয় না। আমাদের এই অনুমান যদি সত্য হয় তবে বল্‌তে পারি, যে 'মেঘ-মল্লার' বইখানি সম্বন্ধে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হওয়া উচিত; কেননা 'মেঘমল্লারে'র গল্পগুলি ঠিক সেই জাতীয় গল্প নয়, যা মাসিকে একবার পড়ে সরিয়ে রেখে দেওয়া যেতে পারে; সময়ে অসময়ে চিত্তের আনন্দ-খোরাক জোগাবার জন্য সাহিত্য-রসিক ব্যক্তিমাত্রেরই লাইব্রেরীতে যে ধরণের বই না থাক্‌লেই নয়, মেঘমল্লার সেই জাতীয় বই।

ভূমিকাতে লেখক একটা ত্রুটী স্বীকার করেছেন। বলেছেন, "গল্পগুলি নানা সময়ের নানা মানসিক অবস্থা-প্রসূত, সুতরাং বিভিন্ন শ্রেণীর রোমান্স ও mystery tales এর সঙ্গে দৈনন্দিন জীবন যাপনের কাহিনী মিশে আছে, কিন্তু সময় ও সুযোগের অভাব বশতঃ শ্রেণীবিভাগ করে দেওয়া সম্ভব হয় নি।" এই শ্রেণী-বিভাগের অভাব সত্ত্বেও কিন্তু গল্পগুলির মধ্যে একটা ভাবের ঐক্যসূত্র ধরা পড়ে। সেটা হ'চ্ছে, প্রত্যেকটি গল্পের মধ্যে একটা নিবিড় human interest, তা সে গল্প 'দৈনন্দিন জীবন যাপনের কাহিনীই' হোক আর romance বা mystery talesই হোক। মানবজীবনের প্রত্যেকটি অনুভূতির তুচ্ছতা ও ক্ষণিকতার মধ্যেও যে গভীরতা মানুষকে অমৃতের নিত্যলোকে পৌঁছে দেয় প্রত্যেকটি গল্পের মধ্যে সেই গভীরতা পাঠকের প্রাণে একটা অনির্ব্বচনীয় ভাবের ঝঙ্কার তোলে। ভাষাও এই ভাবেরই গভীরতার অনুরূপ; এই ভাষার গুণে প্রকৃতি প্রাণময়ী হ'য়ে উঠে মানুষের জীবনের সঙ্গে এক হ'য়ে মিশে গেছে। প্রত্যেকটি চরিত্র তার পরিপার্শ্বিকের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে সজীব হ'য়ে উঠেছে, এবং মানব-জীবনের আকাঙ্ক্ষার চিরন্তনতার মধ্যে তাদের তুচ্ছতা ও ক্ষণিকতা পরিহার করেছে। এই গুণটি বাংলা সাহিত্যে এক রবীন্দ্রনাথের গল্পেই পেয়েছি বলে মনে পড়ে অন্যকোথাও পেয়েছি বলে মনে পড়ে না। তাই এই গল্পগুলির সমালোচনা করতে বসে লেখনী সংযত করা শক্ত।

সমস্ত গল্পগুলির বিস্তৃত সমালোচনা করবার এখানে স্থান নেই; আমরা উপরে যা' বলেছি, তারই দৃষ্টান্তস্বরূপ মাত্র দু' একটী গল্পের উল্লেখ করব। 'নাস্তিক' গল্পটিতে লোকনাথের মধ্যে পাই এক গম্ভীরপ্রকৃতি দার্শনিকের চরিত্র। লোকনাথের মানসিক জীবনে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের গূঢ় তত্ত্ব সম্বন্ধে বড় বড় ভাবরাজির যাওয়া-আসা লেখক অপরূপ কৌশলে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু দার্শনিকের মধ্যেও যে সাধারণ সর্ব্ব যুগের মানুষটী বাস করে, তাও লেখকের সৃষ্টিশীল অন্তর্দৃষ্টির নিকট ধরা না পড়ে পারে নি। গল্পের শেষে লোকনাথের মৃত্যু-পাণ্ডুর নয়নের সামনে সাধারণ জীবন-যাত্রার ছবিগুলি যখন যাওয়া-আসা করতে লাগ্‌ল, তখন তাঁর "মরণাহত দৃষ্টি বিরাট্ বিশ্বের উপর সেই ভাবেই মুগ্ধ, আবদ্ধ রইল, বহুবৎসর পূর্ব্বের শৈশবকালে গ্রামসীমার মাঠে

তাঁর অজ্ঞান শিশু-নয়ন দু'টি যে ভাবে আবদ্ধ রইত… প্রায়ান্ধকার জগৎটা আবার একটা বিরাট প্রশ্নের রূপ পরিগ্রহ করে তাঁর মুখের দিকে জিজ্ঞাসুনেত্রে চেয়ে রইল… প্রশ্নের কোনো উত্তর তাঁর কাছে পাওয়া গেল না…।" "বউ-চণ্ডীর মাঠ" গল্পটিতে লেখক বর্ণনা করেছেন, একটা অতি তুচ্ছ কাহিনী,—কবে প্রায় আশী বৎসর পূর্ব্বে এক লজ্জা-কুণ্ঠিতা পল্লীবধূ আতঙ্কে তার বৃদ্ধ স্বামীর কক্ষ ছেড়ে অন্তর্হিতা হ'য়েছিল,—তার সেই লজ্জা ও সন্ত্রাসের রেশ শতাব্দী ভেদ করে বাতাসে বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে,—"নির্জ্জন গ্রামের মাঠে সাদা কুয়াসায় ঘোমটা-দেওয়া ঝাপ্সা জ্যোৎস্না-রাত্রি অল্পে অল্পে লুকিয়ে চোরের মত আত্ম-প্রকাশ করছে, অনেক-কাল আগেকার লজ্জা কুণ্ঠিতা ভীরু পল্লীবধূটির মত।" মেঘ মল্লার গল্পটী একটা অপূর্ব্ব mystery tale। লেখকের কল্পনায় এই রহস্য-কাহিনী আশ্চর্য্য রকম বাস্তব হ'য়ে উঠেছে,—গল্পের মধ্যে দৈনন্দিন জীবনের কাহিনীর মতই একটা নিবিড় human interest ফুটে উঠেছে,—আর মানবজীবনের ক্ষণিকত্বার মধ্যেও সেই চিরন্তনতা উঁকি মা'ছে। উদাহরণ কত দেব! একমাত্র "পথের পাঁচালী" প্রকাশ করে বিভূতিবাবু যে সাহিত্য-যশের অধিকারী হ'য়েছেন, আমাদের দেশে অন্য কোনো লেখকের ভাগ্যে বোধ হয় এমনটা ঘটে নি। কিন্তু এর জন্য বিভূতিবাবুর ভাগ্য যদিই বা দায়ী হয়, তার চেয়েও বেশী দায়ী, বিভূতিবাবুর সৃষ্টি-শক্তি। তাঁর সাহিত্য-সাধনায় তাঁর ললাটে জয়-টীকা পরিয়ে দিতে আমাদের এতটুকুও কুণ্ঠা নেই।

শ্রীসুশীলচন্দ্র মিত্র

২। **আগাছা**—উপন্যাস। শ্রীরাসবিহারী মণ্ডল প্রণীত।

প্রকাশক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ নাথ। নাথ ব্রাদার্স ২৩ সি ওয়েলিংটন্ ষ্ট্রীট্। মূল্য ১৲।

একটী ভাল গল্প আমাদের প্রাণকে মুগ্ধ করবে—সাধারণতঃ এই আশা নিয়েই আমরা উপন্যাস পড়তে আরম্ভ করি। এবং যদি শেষ পর্য্যন্ত আমরা যথার্থই মুগ্ধ হই তবেই লেখকের লেখা সার্থক। এই সার্থকতা লাভ করতে হলে উপন্যাস লেখকের বিভিন্নমুখী শক্তি থাকা প্রয়োজন; যথা চরিত্র-সৃষ্টি কৌশল, কথিত ঘটনাসমাবেশের শিল্পচাতুর্য্য ঘটনার উপযোগী আবহাওয়া সৃজন ইত্যাদি।

রাসবিহারী বাবুর উপন্যাস খানা আগাগোড়া পড়ে মনে হ'ল তাঁর এ লেখা মোটের উপর সার্থক হয়েছে। উপন্যাসের দুইটি চরিত্র শান্তা এবং অবনী কেউই মৃত কিংবা আধমরা নয়। কথিত ঘটনার সমাবেশ মোটের উপর বেশ পরিপাটি। তাই বইখানা শেষ পর্য্যন্ত পড়তে ধৈর্য্যের বা কষ্ট-সহিষ্ণুতার পরিচয় দিতে হয় না। এবং সকলের চেয়ে বড় কথা, রাসবিহারীবাবু যা বলতে চান তা তিনি জানেন। শান্তা, অবনী, পুলিশকোর্টের আসামী, শান্তার স্বামী এবং বিশেষ করে পুলিশকোর্টের আবহাওয়া যে রাসবিহারীবাবুর নিকট সুপরিচিত সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই।

শ্রীনীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত



নানা কথা

উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গের বন্যা

উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গে এবারকার বন্যা যে করাল মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে তাহা কাহারও অবিদিত নাই। গত ১৯২২ সালের বন্যায় ৪০০ বর্গমাইল জলময় হইয়াছিল, এবার হইয়াছে ১০,০০০ বর্গ মাইল! ইহা হইতে বন্যার প্রকোপ অনুমেয়। হাজার হাজার গ্রাম জলমগ্ন হইয়াছে, লক্ষ লক্ষ লোক গৃহহীন অন্নহীন বস্ত্রহীন হইয়াছে, জলের নীচে হইতে বাঁশ দিয়া ধানের শীষ বাহির করিয়া তাহাই ফুটাইয়া মানুষে খাইতেছে, ফলে স্থানে স্থানে ভীষণ প্রকোপে কলেরা দেখা দিয়াছে। বাংলার নিদারুণ দুর্দ্দিন উপস্থিত!

দেশের নেতাগণ অবশ্য এ বিপদে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া নাই। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র সঙ্কটত্রাণ-সমিতির অধিনায়করূপে সাহায্য ভাণ্ডার খুলিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তি-নিকেতনে অনুরূপ সাহায্য-সমিতি গঠিত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু এবং অন্যান্য নেতারাও এ বিষয়ে তৎপর হইয়াছেন। সুতরাং আশা করা যায় বন্যা-পীড়িত জন-সাধারণের অপরিসীম দুঃখের কিছু উপশম হইবে। বঙ্গদেশে এবং বঙ্গদেশের বাহিরে যে-সকল বাঙ্গালী আছেন তাঁহাদের প্রতি আমাদের একান্ত অনুরোধ; বাংলার এই মহা দুর্দ্দিনে তাঁহারা যেন ঔদাসীন্য না দেখান, প্রত্যেক বাঙ্গালীই যেন মনে মনে এই কথা সত্য-সত্যই ভাবিতে পারেন—এ ঘোর বিপদে কর্ত্তব্যের আমার অংশটুকু আমি নিষ্ঠার সহিত পালন করিয়াছি। তাহা হইলে বেদনা-বিদ্ধ হইয়া রবীন্দ্রনাথ দেশবাসীর প্রতি যে বাণী প্রেরণ করিয়াছেন তাহাকে সম্মান করা হইবে। নচেৎ নহে।

রবীন্দ্রনাথের বাণী

অন্নহারা গৃহহারা চায় ঊর্দ্ধপানে,
ডাকে ভগবানে।
যে দেশে সে ভগবান মানুষের হৃদয়ে হৃদয়ে
সাড়া দেন বীর্য্যরূপে দয়ারূপে দুঃখে কষ্টে ভয়ে,
সে দেশের দৈন্য হবে ক্ষয়,
হবে তার জয়।

The famished and the homeless
raise their hands towards heaven
and utter the name of God.
Their call will never be in vain in the land
Where God's response comes through hearts
of Man in heroic service and love.

আমাদের রবীন্দ্র জয়ন্তী

বিচিত্রার বর্ত্তমান সংখ্যায় রবীন্দ্র জয়ন্তী প্রকাশে শ্রীযুক্ত অমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর নিকট হইতে আমরা যে অপরিমিত সাহায্য পাইয়াছি সে কথা সর্ব্বাগ্রে স্বীকার না করিলে আমাদের কর্ত্তব্যের চ্যুতি ঘটিবে। আমরা তাঁহাকে আমাদের ঐকান্তিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।



অনারেব্‌ল্‌ শ্রীযুক্ত কে জি এম্‌ কারোফি

শ্রীযুক্ত নীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত এবং শ্রীযুক্ত সোমনাথ মৈত্রও এবিষয়ে আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে—এবং যে-সকল লেখক অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদের লেখা পাঠাইয়া আমাদের উপকৃত করিয়াছেন তাঁহাদিগকে—আমাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

রবীন্দ্র জয়ন্তী প্রকাশে আমাদের যে-সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটিয়াছে তজ্জন্য সহৃদয় পাঠকপাঠিকাগণ আমাদের ক্ষমা করিবেন। কবির বিষয়ে আমাদের মন নিরুদ্বেগ আছে, কারণ তিনি জানেন ইহা শ্রদ্ধাঞ্জলি—সুতরাং রক্ত-পদ্মেও চলে, শিউলি ফুলেও চলে।

* * * *

বাংলার কুটীর-শিল্প

আমাদের দেশের কুটীর-শিল্পের উন্নতির জন্য আজ গভর্ণমেণ্ট যে মনোযোগী হইয়াছেন, সেজন্য বাণিজ্য ও কৃষি বিভাগের মন্ত্রী অনারেবল্‌ শ্রীযুক্ত কে, জি, এম্‌ কারোফি মহাশয়ের নিকট দেশের লোক কৃতজ্ঞ। গত জুলাই মাসে

এই সম্বন্ধে যে-বিলটি ব্যবস্থাপক-সভায় পাশ হইয়াছে, তাহাতে কুটীর-শিল্পের বিশেষ উন্নতি হইতে পারে আশা করা যায়। গভর্ণমেণ্ট বেশ স্পষ্টই ঘোষণা করিয়াছেন যে কুটীর-শিল্পের উন্নতিসাধনের জন্য অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা করা হইবে। এই দুর্দ্দিনে, যখন চারিদিকেই খরচ কমানোর ব্যবস্থা করা হইতেছে, তখন এই বিলটি পাশ করানো শ্রীযুক্ত ফারোকির বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় বলিতে হইবে, বিশেষতঃ যখন প্রতিকূল বাধার অভাব ছিল না। মূলধন কর্জ্জ দেওয়ার যে সুব্যবস্থা এই আইনে করা হইয়াছে, তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন শিল্পকার্য্যে দীক্ষিত অনেক তরুণ যুবকের বেকার সমস্যা সমাধান হইতে পারে, অনেকেই নিজ নিজ ব্যবসা করিয়া জীবিকা-উপার্জ্জনের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। আমার আশা করি গভর্ণমেণ্ট শুধু আইনটি পাশ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিবেন না, আইনের ব্যবস্থাগুলিও কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য যত্নবান্ হইবেন।

আমরা আরো শুনিয়া সুখী হইলাম যে গভর্ণমেণ্টের Industries বিভাগে কুটীর-শিল্পের উন্নতির জন্য নানা রকম পরীক্ষা-কার্য্য চলিতেছে। এবিষয়ে গভর্ণমেণ্টের Industrial Engineer শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র বি-এস্-সি (লণ্ডন) পথপ্রদর্শক। তিনি বেলিয়াঘাটার একটি সুসজ্জিত পরীক্ষাগৃহে এ বিষয়ে নানা রকম পরীক্ষা করিয়া এমন সব সুন্দর ছোট ছোট যন্ত্র আবিষ্কার ও প্রস্তুত করিয়াছেন, যাহার সাহায্যে আজকালকার বিশালায়তন কারখানাগুলির সহিত প্রতিযোগিতায় আমাদের ছোট ছোট কুটীর-শিল্পগুলি আত্মরক্ষা করিতে পারে। শ্রীযুক্ত সতীশ-চন্দ্রের সাধনা সর্ব্ববিষয়েই জয়যুক্ত হউক আমরা এই কামনা করি। তাঁহার আবিষ্কৃত যন্ত্রাদি ও তাহাদের কার্য্য-কারিতা ও উপযোগিতা সম্বন্ধে আমরা শীঘ্রই একটি সচিত্র প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

* * * *

ভারতের ভাগ্য নির্ণায়ক গান্ধিজী

মহাত্মা গান্ধি লণ্ডনে পৌছিয়াছেন। আধ্যাত্মিক বলের সহিত পরাক্রান্ত রাজশক্তির মৈত্র রাজিনামার ফল কিরূপ দাঁড়ায় জানিবার জন্য শুধু ভারতবর্ষ কেন, সমস্ত জগৎ সাগ্রহে অপেক্ষা করিয়া আছে। মহা-মানবের ইষ্ট কামনায় শান্তির দূত স্বরূপ যিনি ইংলণ্ডে পদার্পণ করিয়াছেন তাঁহার দ্বারা কোনো অন্যায় অথবা অবিচার সংঘটিত হইবে না, এ আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি; কারণ তিনি কোনো প্রকার সাম্প্রদায়িক জবরদস্তির দ্বারা বিচলিত হন না, এমন কি নিজের মতের জবরদস্তির দ্বারাও নয়, যদি সে মতকে ভ্রান্ত বলিয়া তাঁর মনে বিশ্বাস জন্মে। সুতরাং প্রতিপক্ষেরও বিচলিত হইবার কোনো কারণ নাই।

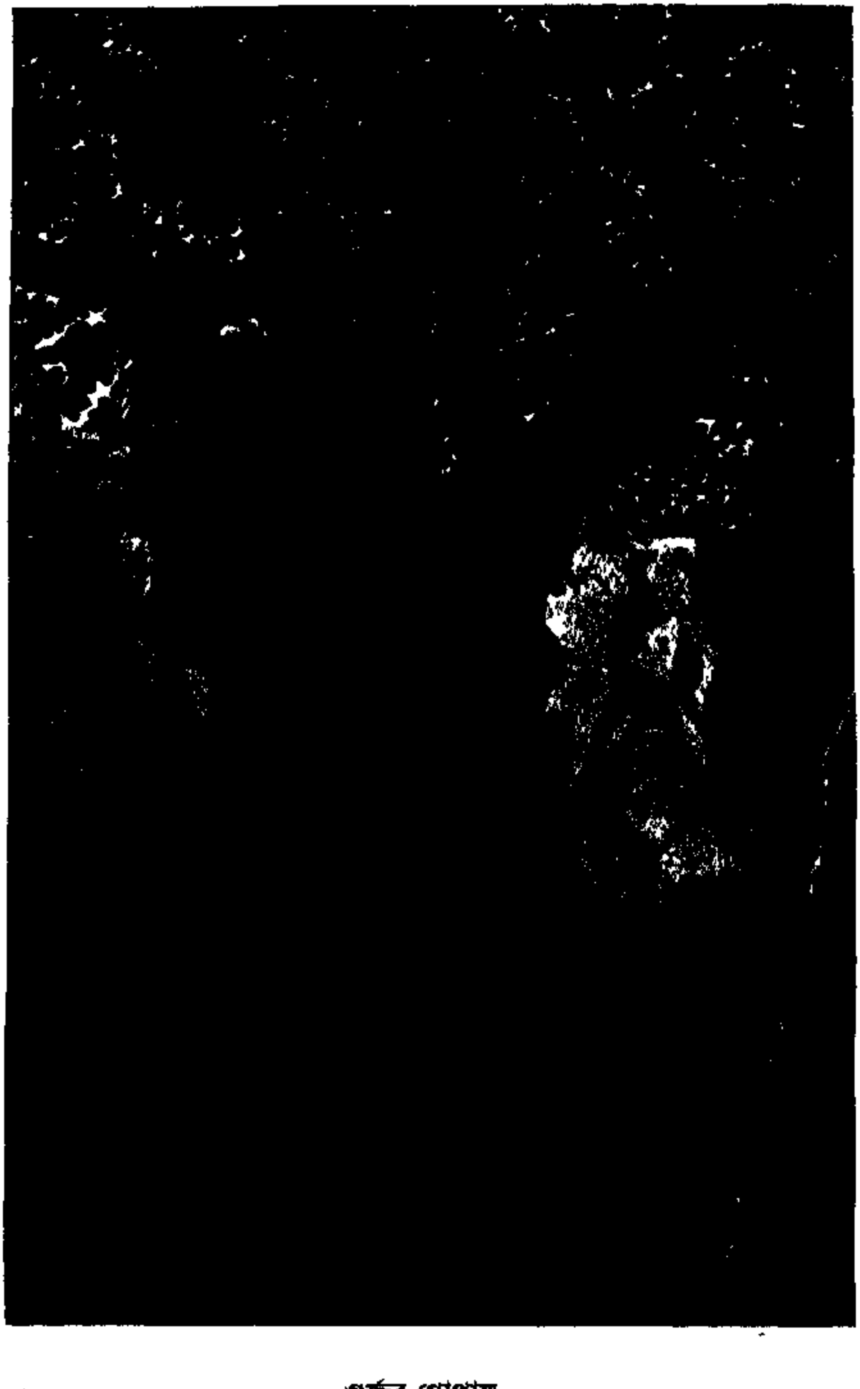
মহাত্মাজীর শান্তি সংস্থাপনের প্রয়াস জয়যুক্ত হউক।

* * * *

আমাদের পূজার সংখ্যা

আগামী কার্ত্তিক সংখ্যা 'বিচিত্রা'র পূজার সংখ্যা। ঐ সংখ্যা ১লা কার্ত্তিক বাহির না হইয়া পূজার ছুটির পূর্ব্বেই বাহির হইবে। ২০শে আশ্বিন ঐ সংখ্যা বাহির করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি, এবং তদনুযায়ী ব্যবস্থা হইতেছে। অতএব বিজ্ঞাপনদাতারা নুতন বিজ্ঞাপন দিতে হইলে অথবা পুরাতন বিজ্ঞাপন পরিবর্ত্তন বা বন্ধ করিতে হইলে, অনুগ্রহ পূর্ব্বক ১২ই আশ্বিনের মধ্যে আমাদের জানাইবেন। ১২ই আশ্বিনের পরে জানাইলে তদনুযায়ী কাজ যদি না হয় তবে তজ্জন্য আমরা দায়ী থাকিব না।

Edited by Srijut Upendranath Ganguli. Printed by Srijut Sarat Chandra Mukherji at the Sreekrishna Printing Works 259, Upper Chitpur Road, Calcutta and published by the same from 149, Raja Dinendra Street, Calcutta.



বিচিত্রা

গুর্জ্জর গোপাল

কার্ত্তিক, ১৩৩৮

শিল্পী—শ্রীযুক্ত প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়

বিচিত্রা

পঞ্চম বর্ষ, ১ম খণ্ড   কার্ত্তিক, ১৩৩৮   ৪র্থ সংখ্যা

অভিভাষণ

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবি-সার্ব্বভৌম

আপনারা জানেন আমার দেহ দুর্ব্বল ও ক্লান্ত, আমার মন নানা চিন্তায় ব্যাপৃত। সেই জন্যে সংস্কৃত বিদ্যামন্দির থেকে যে সসম্মান অভিবাদন আমি পেলাম তার যথাযোগ্য প্রত্যভিবাদন করতে পারি এমন শক্তি আমার নেই। সেই জন্যে আমি ক্ষমা চাই। এই বিদ্যামন্দির থেকে সম্মান লাভের কল্পনা কোনো দিন আমি করিনি, এ আমার আশার অতীত। এক দিন ছিল যখন পাণ্ডিত্যের সঙ্গে বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের বিরোধ ছিল। এর প্রতি কিছু অবজ্ঞাও তখন করা হয়েচে। প্রাচীন সংস্কৃতের আলয় থেকে বাংলা তখন যথোচিত সম্মান পায়নি তার কারণও হয়তো ছিল। তখন বাংলা ছিল অপরিণত, সাহিত্যের অনুপযোগী। এর দৈন্যকে উপেক্ষা করা সহজ ছিল। কিন্তু যে শক্তি তখন এর মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল, সে শক্তি এ কোথা থেকে পেয়েচে? সংস্কৃত ভাষারই অমৃত উৎস থেকে। সেই কারণেই তার পরিণতিও চলেচে, কোথাও বাধা পায়নি। বাইরে থেকে যে সকল বিদ্যা আমরা লাভ করেচি, তা আমাদের ভাষায় রক্ষা করা সম্ভব হল, কারণ বাংলার দৈন্য ও অভাব আজ আর বেশি নেই। পারিভাষিকের কিছু দারিদ্র্য আছে বটে, কিন্তু সে দারিদ্র্য পূর্ণ করবার উপায় আছে সংস্কৃতের মধ্যে।

একদিন ছিল ভারতবর্ষে ভাষা-বোধের একটা প্রতিভা। ভারতবর্ষ পাণিনির জন্মভূমি। তখনকার দিনে প্রাকৃতকে যাঁরা বিধিবদ্ধ করেছিলেন, তাঁরা ছিলেন পরম পণ্ডিত। অথচ প্রাকৃতের প্রতি তাঁদের অবজ্ঞা ছিলনা। সংস্কৃত ব্যাকরণের চাপে তাঁরা প্রাকৃতকে লুপ্তপ্রায় করেননি। তার কারণ ভাষা সম্বন্ধে তাঁদের ছিল সহজ বোধ-শক্তি। আমরা আজকাল সংস্কৃত শিখে ভুলে যাই যে বাংলার একটি স্বকীয়তা আছে। অবশ্য সংস্কৃত থেকেই সে শব্দ-সম্পদ পাবে, কিন্তু তার নিজের দৈহিক প্রকৃতি সংস্কৃত দ্বারা আচ্ছন্ন করবার চেষ্টা অসঙ্গত। আমাদের প্রাচীন পণ্ডিতেরা কখনও সে চেষ্টা করেননি। আমি সেকালের পণ্ডিতদের বাংলায় লেখা অনেক পুরানো পুঁথি দেখেচি। তার বানান তাঁরা বাংলা ভাষাকে প্রাকৃত জেনেই করেছিলেন। তাঁদের যত্ব ণত্ব জ্ঞান ছিলনা, একথা বলা চলেনা। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আমলেও এখনকার নব পণ্ডিতদের মত যত্ব ণত্ব নিয়ে মাতামাতি করা হয়নি। তা করলে "শ্রবণ" থেকে উদ্ভূত "শোনা" কখনই মূর্দ্ধন্য ন-এর অত্যাচার ঠেকাতে পারত না। যাঁরা মনে করেচেন বাইরে থেকে বাংলাকে সংস্কৃতের অনুগামী করে উজ্জ্বল

করবেন, তাঁরা সেই দোষ করচেন যা ভারতে ছিল না। এ দোষ পশ্চিমের। ইংরেজিতে শব্দ ধ্বনির অনুযায়ী নয়। ল্যাটিন ও গ্রীক থেকে উদ্ভূত শব্দে বানানের সঙ্গে ধ্বনির বিরোধ হ'লেও তাঁরা মূল বানান রক্ষা করেন। এই প্রণালীতে তাঁরা ইতিহাসের স্মৃতি বেঁধে রাখতে চান। কিন্তু ইতিহাসকে রক্ষা করা যদি অবশ্যকর্ত্তব্য হয় তবে ডারউইন কথিত আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের যে অঙ্গটি খসে গেচে সেটিকে আবার সংযোজিত করা উচিত হবে। প্রসঙ্গক্রমে আধুনিক পণ্ডিতদের একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি, তাঁদের মতে "বানান" শব্দে কোন ন লাগবে?

বাংলাকে বাংলা ব'লে স্বীকার ক'রেও একথা মানতে হবে যে সংস্কৃতের সঙ্গে তার ঘনিষ্ট যোগ আছে। সংস্কৃত ভাষায় ভারতীয় চিত্তের যে আভিজাত্য, যে তপস্যা আছে, বাংলা ভাষায় তাকে যদি গ্রহণ না করি তবে আমাদের সাহিত্য ক্ষীণপ্রাণ ও ঐশ্বর্য্যভ্রষ্ট হবে।

এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে য়ুরোপীয় বিদ্যার যোগে নতুন বাংলা সাহিত্য, এমন কি কিয়ৎ-পরিমাণে ভাষাও তৈরি হয়ে উঠেচে, বর্ত্তমান কালের ভাব ও মনন-ধারা বহন ক'রে এই যোগ যেমন আমাদের উদ্বোধনের সহায় হয়েচে, সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের নিরন্তর সম্বন্ধও আমাদের তেমনি সহায়। য়ুরোপীয় চিত্তের সঙ্গে আমাদের সাহিত্যের যদি বিচ্ছেদ ঘটে, তবে তাতে ক'রে আমাদের যে দৈন্য ঘটবে সে আমাদের পক্ষে শোচনীয়, তেমনি সংস্কৃতের ভিতর দিয়ে প্রাচীন ভারতীয় চিত্তের যোগপ্রবাহ যদি ক্ষীণ বা অবরুদ্ধ হয়, তবে তাতেও বাংলাভাষার স্রোতস্বিনী বিশুদ্ধিতা ও গভীরতা হারাবে। ভাবের দিকের কথা ছেড়েই দেওয়া যাক, শব্দের দিক থেকে বাংলাভাষা সংস্কৃতের কাছে নিরন্তর আনুকূল্যের অপেক্ষা না ক'রে থাকতে পারে না।

বাংলায় লিখতে গিয়ে আমাকে প্রতিপদে নতুন কথা উদ্ভাবন করতে হয়েচে। তার কারণ বাংলা ভাষা একদিন শুদ্ধ মাত্র ঘরের ভাষা ছিল। সেজন্য এর দৈন্য বা অভাব যথেষ্ট রয়ে গেচে। সে দৈন্য পূরণের সুযোগ আমাদের দেশেই আছে। জাপানী ভাষার মধ্যে অনুরূপ একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। জাপানী ভাষায় তত্ত্বঘটিত শব্দরচনা সহজ নয়। জাপানীর সঙ্গে সেজন্যে চীনে ভাষার যোগ রয়ে গেচে। যুদ্ধের দ্বারা যেদিনও জাপান চীনকে অসম্মান করেচে, অপমান করেচে। কিন্তু ভাষার মধ্যে সে চীনকে সম্মান করতে বাধ্য। তাই জাপানী অক্ষরের মধ্যে চৈনিক অক্ষরও অপরিহার্য্য। ঘরের কথা জাপানী ভাষায় চলে হয়তো, কিন্তু চীনে ভাষা সঙ্গে না থাকলে বড়ো কোনো জ্ঞান বা উপলব্ধির প্রকাশ অসম্ভব হয়। অনুরূপ কারণেই বাংলাকে সংস্কৃত ভাষার দানসত্র ও অন্নসত্র থেকে দূরে নিয়ে এলে তাতে গুরুতর ক্ষতি ঘটবে।

আমাকে যে উপাধিতে আপনারা ভূষিত করলেন, তার জন্যে আবার আপনাদের প্রতি আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করচি। কিন্তু এও বলি যে, অযোগ্য পাত্রে যদি সম্মান অর্পিত হয়ে থাকে সে দায়িত্ব আপনাদের। আমার কিছুই গোপন নেই। সংস্কৃত ভাষায় আমার অধিকার সঙ্কীর্ণ। তথাপি যখন আপনারা আমাকে এই পুরস্কার দিলেন এর জন্যে কাউকে যদি নিন্দাভাগী হতে হয়তো সে আপনাদের। *

---

* সংস্কৃত কলেজ হইতে "কবি সার্ব্বভৌম" উপাধিদান ও অভিনন্দনের উত্তরে রবীন্দ্রনাথের অভিভাষণ। শ্রীসুবোধ রায় কর্ত্তৃক অনুলিখিত।

অভিনন্দন

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

প্রিন্সিপাল, সংস্কৃত কলেজ

[রবীন্দ্রনাথকে কবি-সার্ব্বভৌম উপাধি দেওয়া উপলক্ষে]

"হে পূজনীয় অতিথি, আপনাকে আমরা পরম শ্রদ্ধার সহিত অভিবাদন করি। কোনও স্তুতিবাদ কোনও গুণ-খ্যাপন আপনার কাছে পর্য্যাপ্ত নয় তাই আমরা নিরলঙ্কার নিরাভরণ স্বাগতবচনে আপনাকে আহ্বান করিতেছি। বিশ্বের নিকট আপনি ভারতবাসীর পরিচয়। হে **'কবি-সার্ব্বভৌম'** সমস্ত দেশের সমস্ত ভাষাতে আপনি আপনার রসোজ্জ্বল আধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন। কত জ্ঞানী গুণী পণ্ডিত কত দেশের কত রাজন্যবর্গ আপনার রস-মহিমার প্রভাবে অভিভূত হইয়া কত বহুমূল্য উপহারে ও অর্ঘ্যে আপনাকে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন। আমরা অকিঞ্চন অধ্যাপক, আমাদের কিছু দিবার নাই তাই একটি শব্দ-মাত্র আপনাকে উপহার দিতে আজ আসিয়াছি। আপনিই ত শব্দকে রস-মর্য্যাদায় পূর্ণ করিয়াছেন তাই আমরা প্রার্থনা করি যে এই শব্দটিকে আপনি গ্রহণ করিয়া আপনার মহিমায় ইহাকে মহিমান্বিত করুন।

সংস্কৃত ও ইয়োরোপীয় বিদ্যা শিখাইবার জন্য ১৮২৪ সালে এই বিদ্যালয় প্রথম স্থাপিত হয়। এই বিদ্যালয়ে প্রথম কেবল মাত্র সংস্কৃতই পড়ান হইত এবং সেই সঙ্গে ইচ্ছানুসারে সংস্কৃতপাঠী ছাত্ররা ইংরাজীও পড়িতে পারিত। পরে ৺বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রথমে ইংরেজী শিক্ষাকে অবশ্য বিধেয় রূপে ব্যবস্থা করেন, তাহার পরে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে স্কুলটী স্থাপিত হয় এবং কলেজ হইতে I.A, B.A. পরীক্ষা দিবার বিধান হয় কিন্তু তখনও দীর্ঘকাল ধরিয়া এ কলেজের ছাত্ররা এখানে কেবল মাত্র সংস্কৃতই শিক্ষা করিত প্রেসিডেন্সী কলেজে ইংরাজী শিখিত। বর্ত্তমানে ইংরাজী বিভাগের সকল বিষয়ই এই কলেজেই পড়ান হয়। কেবল মাত্র দু একটি বিষয়ে প্রেসিডেন্সী কলেজের সঙ্গে যোগ আছে। টোল বিভাগে কেবল মাত্র সংস্কৃতই পড়ান হয়। ইহা ছাড়া সংস্কৃত কলেজকে কেন্দ্র করিয়া একটি বিরাট সংস্কৃত প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে। ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বস্থানেই এই প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্র আছে এবং সকল স্থানের ছাত্ররাই এই প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষায় পরীক্ষা দিয়া থাকে। পাঠ্য তালিকা নির্দ্দেশের দ্বারা ও পরীক্ষা নিয়মের ব্যবস্থার দ্বারা এই প্রতিষ্ঠানটি সমস্ত ভারতবর্ষের সংস্কৃত শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে।

৺বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন ইংরাজী শিক্ষাকে অবশ্য বিধেয় ভাবে প্রবর্ত্তিত করেন তখন এই সম্বন্ধে কাশীর সংস্কৃত কলেজের সহিত কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের একটী মতদ্বৈধ হয়। কাশীর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ বেলেনটাইন সাহেব বলেন যে ইংরাজী শিক্ষাকে সংস্কৃত শিক্ষার সহিত অবশ্য বিধেয় ভাবে প্রবর্ত্তিত করিলে এই উভয় ভাষার মধ্য দিয়া যে সমস্ত ধর্ম্ম ও দর্শনের মতবাদ ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাদের ঐক্য সম্বন্ধটি বিশদভাবে বুঝাইয়া দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে ইয়োরোপীয় মতবাদের সহিত ভারতীয় মতবাদের ঐক্য দেখাইতে গেলেই বাঙ্গালী পণ্ডিতদের প্রাচীন সংস্কার ও সঙ্কীর্ণতা আরও নিরূঢ়মূল হইবে। তাঁহারা মনে করিবেন যে আমাদের কথাই যখন ইয়োরোপীয়েরাও বলিতেছে তখন আর ইয়োরোপীয় মতবাদ শিক্ষা করিবার প্রয়োজন কী? আলেকজেন্দ্রিয়ার লাইব্রেরী

পোড়াইবার আদেশ দিতে গিয়া বাদশা বলিয়াছিলেন যে লাইব্রেরীর বহিগুলিতে যদি কোরাণের মতই প্রচার করা হইয়া থাকে তবে সেই বইগুলিতে আর প্রয়োজন নাই আর যদি সেগুলিতে কোরাণের বিরুদ্ধ মত থাকে তাহা হইলে তাহা মিথ্যা ও সেইজন্য তাহার প্রয়োজন নাই। অতএব ইংরাজী শিক্ষা হইতে যে আলোক আমরা প্রচার করিতে চাই তাহা অসম্ভব হইবে।

ইংরাজী সভ্যতার দানের সহিত সংস্কৃত সভ্যতার দান সম্মিলিত করা প্রয়োজন কিনা এবং কতটুকু কিভাবে তাহাদের যোগ হওয়া উচিত সেই সমস্যা আজ আবার উপস্থিত হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রস্তাব উঠিয়াছে যে সংস্কৃত শিক্ষাকে বৈকল্পিক করিয়া দেওয়া হউক। এই বৈকল্পিক বিধান প্রচেষ্টার পিছনে যে ভাবটী কাজ করিতেছে তাহার মূলে ইহা দেখিতে পাওয়া যায় যে আজকালকার আধুনিকতার দিনে প্রাচীন সংস্কৃত শিক্ষার আর কোনও উপযোগিতা নাই। যাঁহারা সংস্কৃত শিক্ষার অবশ্য বিধেয়তায় বিশ্বাস করেন তাঁহাদেরও মনে সর্ব্বদাই এই সমস্যা উঠে যে বর্ত্তমান কালের প্রয়োজনে ও ব্যবহারে প্রাচ্য প্রতীচ্যের মিলন সন্ধান কেমন করিয়া ঘটাইতে পারা যায়। আপনি যে কেবল শ্রেষ্ঠ কবি তাহা নয় সংস্কৃত সাহিত্যেও আপনার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি আছে। এতদিন ধরিয়া নানা রস-সৃষ্টিতে ও তত্ত্বচিন্তায় প্রাচ্য প্রতীচ্যের মিলনসেতু গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন। আজ নূতন করিয়া শিক্ষার যে যুগসন্ধি উপস্থিত হইয়াছে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য কেমন করিয়া দান প্রতিদান করিবে এই যে সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে, আজ এই নূতন সমস্যার সমাধান করিয়া এমন কিছু উপদেশ দান করুন যাহাতে আমরা এই নূতন যুগের নব মিলনের একটী মন্ত্রের সাক্ষাৎ পাইতে পারি। আমাদের এই বিদ্যালয়ে প্রাচীন সংস্কৃত শিক্ষা ও ইংরাজী শিক্ষা উভয়েই পাশাপাশি রহিয়াছে কিন্তু ইহার মিলন-গ্রন্থি আমরা খুঁজিয়া পাইতেছি না। আপনি এই বিষয়ে আমাদের মধ্যে নূতন বোধির সঞ্চার করুন।"

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত



বাংলার তাঁতি

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাংলা দেশের কাপড়ের কারখানা সম্বন্ধে যে প্রশ্ন এসেচে তার উত্তরে একটি মাত্র বলবার কথা আছে, এগুলিকে বাঁচাতে হবে। আকাশ থেকে বৃষ্টি এসে আমাদের ফসলের ক্ষেত দিয়েচে ডুবিয়ে, তার জন্যে আমরা ভিক্ষা করতে ফিরচি, কার কাছে? সেই ক্ষেতটুকু ছাড়া যার অন্নের আর কোন উপায় নেই তারই কাছে। বাংলা দেশের সব চেয়ে সাংঘাতিক প্লাবন, অক্ষমতার প্লাবন, ধন-হীনতার প্লাবন। এদেশের ধনীরা ঋণগ্রস্ত, মধ্যবিত্তেরা চিরদুশ্চিন্তায় মগ্ন, দরিদ্রেরা উপবাসী। তার কারণ, এদেশের ধনের কেবলই ভাগ হয়, গুণ হয় না।

আজকের দিনের পৃথিবীতে যারা সক্ষম তারা যন্ত্র-শক্তিতে শক্তিমান। যন্ত্রের দ্বারা তারা আপন অঙ্গের বহু বিস্তার ঘটিয়েচে, তাই তারা জয়ী। এক দেহে তারা বহুদেহ। তাদের জনসংখ্যা মাথা গণে নয়, যন্ত্রের দ্বারা তারা আপনাকে বহুগুণিত করেচে। এই বহুলাঙ্গ মানুষের যুগে আমরা বিকলাঙ্গ হয়ে অন্য দেশের ধনের তলায় শীর্ণ হ'য়ে পড়ে আছি!

সংখ্যাহীন উমেদারের দেশে কেবল যে অন্নের টানাটানি ঘটে তা নয়, হৃদয়ের ঔদার্য্য থাকেনা। প্রভুমুখ-প্রত্যাশী জীবিকার সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা বিদ্বেষ কণ্টকিত হয়ে ওঠে। পাশের লোকের উন্নতি সইতে পারিনে। বড়োকে ছোট করতে চাই, একখানাকে সাতখানা করতে লাগি। মানুষের যেসব প্রবৃত্তি আগুন ধরাবার সহায় সেই গুলিই প্রবল হয়, গ'ড়ে তোলবার শক্তি কেবলি খোঁচা খেয়ে খেয়ে মরে।

দশে মিলে অন্ন উৎপাদন করবার যে যান্ত্রিক প্রণালী তাকে আয়ত্ত করতে না পারলে যন্ত্রীরাজদের কুস্তইয়ের ধাক্কা খেয়ে বাসা ছেড়ে মরতে হ'বে। মরতেই বসেচি। বাহিরের লোক অন্নের ক্ষেত্রের থেকে ঠেলে ঠেলে বাঙালীকে কেবলি কোণ-ঠেসা করচে। বহুকাল থেকে আমরা কলম হাতে নিয়ে একা একা কাজ ক'রে মানুষ—যারা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে কাজ করতে অভ্যস্ত আজ ডাইনে বাঁয়ে কেবলি তাদের রাস্তা ছেড়ে দিয়ে চলি, নিজের রিক্ত হাতটাকে কেবলি খাটাচ্চি পরীক্ষার কাগজ, দরখাস্ত এবং ভিক্ষার পত্র লিখ্‌তে।

একদিন বাঙালী শুধু কৃষিজীবি এবং মসীজীবি ছিলনা;. ছিল সে যন্ত্রজীবি, মাড়াই-কল চালিয়ে দেশ দেশান্তরকে সে চিনি জুগিয়েচে। তাঁত যন্ত্র ছিল তার ধনের প্রধান বাহন। তখন শ্রী ছিল তার ঘরে, কল্যাণ ছিল গ্রামে গ্রামে।

অবশেষে আরো বড় যন্ত্রের দানব-তাঁত এসে বাংলার তাঁতকে দিলে বেকার ক'রে। সেই অবধি আমরা দেবতার অনিশ্চিত দয়ার দিকে তাকিয়ে কেবলি মাটি চাষ ক'রে মরচি—মৃত্যুর চর নানা বেশে নানা নামে, আমাদের ঘর দখল ক'রে বসলো।

তখন থেকে বাঙলা দেশের বুদ্ধিমানদের হাত বাঁধা পড়েচে কলম চালনায়। ঐ একটি মাত্র অভ্যাসেই তারা পাকা, দলে দলে তারা চলেচে আপিসের বড়বাবু হবার রাস্তায়। সংসার-সমুদ্রে হাবুডুবু খেতে খেতে কলম আঁকড়িয়ে থাকে, পরিত্রাণের আর কোন অবলম্বন চেনে না। সন্তানের প্রবাহ বেড়ে চলে, তার জন্যে যারা দায়িক তারা উপরে চোখ তুলে ভক্তি করে বলে, জীব দিয়েচেন যিনি আহার দেবেন তিনি।

আহার তিনি দেন না, যদি স্বহস্তে আহারের পথ তৈরী না করি। আজ এই কলের যুগে কলই সেই পথ। অর্থাৎ প্রকৃতির গুপ্ত ভাণ্ডারে যে শক্তি পুঞ্জিত, তাকে আত্মসাৎ করতে পারলে তবেই এ যুগে আমরা টি'কতে পারবো।

একথা মানি যন্ত্রের বিপদ আছে। দেবাসুরে সমুদ্র-মন্থনের মতো সে বিষও উদ্গার করে। পশ্চিম মহাদেশের কল-তলাতেও দুর্ভিক্ষ আজ গুঁড়ি মেরে আসচে, তা ছাড়া অসৌন্দর্য্য, অশান্তি, অসুখ কারখানার অন্যান্য উৎপন্ন দ্রব্যেরই সামিল হ'য়ে উঠলো। কিন্তু এজন্য প্রকৃতিদত্ত শক্তি-সম্পদকে দোষ দেবোনা, দোষ দেবো মানুষের রিপুকে। খেজুরগাছ, তালগাছ বিধাতার দান, তাড়িখানা মানুষের সৃষ্টি। তালগাছকে মারলেই নেশার মূল মরেনা। যন্ত্রের বিষদাঁত যদি কোথাও থাকে তবে সে আছে আমাদের লোভের মধ্যে। রাশিয়া এই বিষদাঁতটাকে সজোরে ওপড়াতে লেগেচে কিন্তু সেই সঙ্গে যন্ত্রকে সুদ্ধ টান মারেনি; উল্টে, যন্ত্রের সুযোগকে সর্ব্বজনের পক্ষে সম্পূর্ণ সুগম ক'রে দিয়ে লোভের কারণটাকেই সে ঘুচিয়ে দিতে চায়।

কিন্তু এই অধ্যবসায়ে সব চেয়ে তার বাধা ঘটচে কোন্‌খানে? যন্ত্রের সম্বন্ধে যেখানে সে অপটু ছিল সেখানেই। একদিন জারের সাম্রাজ্যকালে রাশিয়ার প্রজা ছিল আমাদের মতো অক্ষম। তারা মুখ্যত ছিল চাষী। সেই চাষের প্রণালী ও উপকরণ ছিল আমাদেরই মতো আদ্যকালের। তাই আজ রাশিয়া ধনোৎপাদনের যন্ত্রটাকে যখন সার্ব্বজনীন করবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত তখন যন্ত্র যন্ত্রী ও কর্ম্মী আনাতে হচ্চে যন্ত্র-দক্ষ কারবারী দেশ থেকে। তাতে বিস্তর ব্যয় ও বাধা। রাশিয়ার অনভ্যস্ত হাত ভুটো এবং তার মন না চলে দ্রুত গতিতে, না চলে নিপুণ ভাবে।

অশিক্ষা ও অনভ্যাসে আজ বাংলা দেশের মন এবং অঙ্গ যন্ত্র-ব্যবহারে পঙ্গু। এই ক্ষেত্রে বোম্বাই আমাদেরকে যে পরিমাণে ছাড়িয়ে গেচে সেই পরিমাণেই আমরা তার পরোপজীবি হ'য়ে পড়েচি। বঙ্গবিভাগের সময় এই কারণেই আমাদের ব্যর্থতা ঘটেছিল, আবার যে-কোনো উপলক্ষ্যে পুনশ্চ ঘটতে পারে। আমাদের সমর্থ হতে হবে—সক্ষম হতে হবে, মনে রাখতে হবে যে, আত্মীয় মণ্ডলীর মধ্যে নিঃস্ব কুটুম্বের মত কৃপাপাত্র আর কেউ নেই।

সেই বঙ্গবিভাগের সময়েই বাংলা দেশে কাপড় ও সুতোর কারখানার প্রথম সূত্রপাত। সমস্ত দেশের মন বড় ব্যবসায় বা যন্ত্রের অভ্যাসে পাকা হয়নি তাই সেগুলি চলচে নানা বাধার ভিতর দিয়ে মন্থর গমনে। মন তৈরী ক'রে তুলতেই হবে, নইলে দেশ অসামর্থ্যের অবসাদে তলিয়ে যাবে।

ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশের মধ্যে বাংলাদেশ সর্ব্বপ্রথমে যে-ইংরেজী বিদ্যা গ্রহণ করেচে, সে হ'লো পুঁথির বিদ্যা। কিন্তু যে ব্যবহারিক বিদ্যায় সংসারে মানুষ জয়ী হয় য়ুরোপের সেই বিদ্যাই সব শেষে বাংলা দেশে এসে পৌঁছলো। আমরা য়ুরোপের বৃহস্পতি গুরুর কাছ থেকে প্রথম হাতে খড়ি নিয়েচি, কিন্তু য়ুরোপের শুক্রাচার্য্য জানেন কি ক'রে মার বাঁচানো যায়—সেই বিদ্যার জোরেই দৈত্যেরা স্বর্গ দখল ক'রে নিয়েছিল। শুক্রাচার্য্যের কাছে পাঠ নিতে আমরা অবজ্ঞা ক'রেচি—সে হলো হাতিয়ার বিদ্যার পাঠ। এই জন্যে পদে পদে হেরেচি, আমাদের কঙ্কাল বেরিয়ে পড়লো।

বোম্বাই প্রদেশে একথা বল্‌লে ক্ষতি হয় না, যে, চরখা ধরো। সেখানে লক্ষ লক্ষ কলের চরখা পশ্চাতে থেকে তার অভাব পূরণ ক'রচে। বিদেশী কলের কাপড়ের বন্যার বাঁধ বাঁধতে পেরেচে ঐ কলের চরখায়। নইলে একটি মাত্র উপায় ছিল নাগাসন্নাসী সাজা। বাংলা দেশে হাতের চরখাই যদি আমাদের একমাত্র সহায় হয় তা'হলে তার জরিমানা দিতে হবে বোম্বাইয়ের কলের চরখার পায়ে। তাতে বাংলার দৈন্যও বাড়বে অক্ষমতাও বাড়বে। বৃহস্পতি গুরুর কাছে যে বিদ্যা লাভ ক'রেচি তাকে পূর্ণতা দিতে হবে শুক্রাচার্য্যের কাছে দীক্ষা নিয়ে। যন্ত্রকে নিন্দা ক'রে যদি নির্ব্বাসনে পাঠাতে হয় তা'হলে যে-মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে

সেই নিন্দা রটাই তাকে স্তব্ধ বিসর্জ্জন দিয়ে হাতে-লেখা পুঁথির চলন করতে হবে। এ কথা মানবো যে, মুদ্রাযন্ত্রের অপক্ষপাত দাক্ষিণ্যে, অপাঠ্য এবং সুপাঠ্য বইয়ের সংখ্যা বেড়ে চলেচে তবু ওর আশ্রয় যদি ছাড়তে হয় তবে আর কোনো একটা প্রবলতর যন্ত্রেরই সঙ্গে চক্রান্ত ক'রে সেটা সম্ভব হতে পারবে।

যাই হোক বাংলা দেশেও একদিন বিষম ব্যর্থতার তাড়নায় বঙ্গলক্ষ্মী নাম নিয়ে কাপড়ের কল দেখা দিয়েছিল। সাংঘাতিক মার খেয়েও আজও সে বেঁচে আছে। তার পরে দেখা দিল মোহিনী মিল, একে একে আরো কয়েকটি কারখানা মাথা তুলেচে।

এদের যেমন ক'রে হোক্ রক্ষা ক'রতে হবে—বাঙালীর উপর এই দায় রয়েচে। চাষ করতে করতে যে কেবল ফসল ফলে তা নয়, চাষের জমিও তৈরী করে। কারখানাকে যদি বাঁচাই তবে কেবল যে উৎপন্ন দ্রব্য পাবো তা নয়, দেশে কারখানার জমিও গ'ড়ে উঠবে।

বাংলার মিল থেকে যে-কাপড় উৎপন্ন হচ্চে যথাসম্ভব একান্ত ভাবে সেই কাপড়ই বাঙালী ব্যবহার করবে বলে যেন পণ করে। এ'কে প্রাদেশিকতা বলেনা, এ আত্ম-রক্ষা। উপবাসক্লিষ্ট বাঙালীর অন্ন-প্রবাহ যদি অন্য প্রদেশের অভিমুখে অনায়াসে বইতে থাকে এবং সেই জন্য বাঙালীর দুর্ব্বলতা যদি বাড়তে থাকে তবে মোটের উপর তাতে সমস্ত ভারতেরই ক্ষতি। আমরা সুস্থ সমর্থ হ'য়ে দেহ রক্ষা করতে যদি পারি তবেই আমাদের শক্তির সম্পূর্ণ চালনা সম্ভব হ'তে পারে। সেই শক্তি নিরন্ন-ক্ষীণতায় অবমর্দ্দিত হ'লে তাতে শুধু ভারতকে কেন পৃথিবীকেই বঞ্চিত করা হ'বে।

বাঙালীর ঔদাসীন্যকে ধাক্কা দিয়ে দূর করা চাই। আমাদের কোন্ কারখানায় কি রকম সামগ্রী উৎপন্ন হচ্চে বার বার সেটা আমাদের সাম্‌নে আনতে হবে। কলকাতার ও অন্যান্য প্রাদেশিক নগরের মিউনিসিপ্যালিটীর কর্ত্তব্য হবে প্রদর্শনীর সাহায্যে বাংলার সমস্ত উৎপন্ন দ্রব্যের সংবাদ নিয়ত প্রচার করা, এবং বাঙালী যুবকদের মনে সেই উৎসাহ জাগানো, যাতে বিশেষ ক'রে তারা বাঙালীর হাতের ও কলের জিনিষ ব্যবহার করতে অভ্যস্ত হয়।

অবশেষে উপসংহারে একটা কথা বল্‌তে ইচ্ছা করি। বোম্বাইয়ের যে সমস্ত কারখানা দক্ষিণ আফ্রিকার কয়লার কল চালিয়ে কাপড় বিক্রি করচে তাদের কাপড় কেনায় যদি আমাদের দেশাত্মবোধে বাধা না লাগে তবে আমাদের বাংলা দেশের তাঁতিদের কেন নির্ম্মম হ'য়ে মারি? বাঙালী দক্ষিণ আফ্রিকার কোনো উপকরণ ব্যবহার করে না, করে বিলিতী সুতো। তারা বিলাতের আমদানি কোনো কল চালিয়ে কাপড় বোনে না, নিজেদের হাতের শ্রম ও কৌশল তাদের প্রধান অবলম্বন, আর যে তাঁতে বোনে সেও দিশি তাঁত। এখন যদি তুলনায় হিসাব ক'রে দেখা যায়, আমাদের তাঁতের কাপড়ের ও বোম্বাই মিলের কাপড়ের কতটা অংশ বিদেশী, তাহলে কী প্রমাণ হবে? তা ছাড়া কেবলি কি পণ্যের হিসাবটাই বড়ো হবে, শিল্পের দাম তার তুলনায় তুচ্ছ? সেটাকে আমরা মূঢ়ের মতো বধ করতে ব'সেচি। অথচ যে-যন্ত্রের বাড়ি তাকে মারলুম সেটা কি আমাদেরই যন্ত্র? সেই যন্ত্রের চেয়ে বাংলা দেশের বহু যুগের শিক্ষাপ্রাপ্ত গরীবের হাত দুখানা কি অকিঞ্চিৎকর? আমি জোর করেই বল্‌বো, পূজোর বাজারে আমাকে যদি কিন্‌তে হয় তবে আমি নিশ্চয়ই বোম্বাইয়ের বিলিতী যন্ত্রের কাপড় ছেড়ে ঢাকার দিশি তাঁতের কাপড় অসঙ্কোচে এবং গৌরবের সঙ্গেই কিনবো। সেই কাপড়ের সুতোয় বাংলাদেশের বহুযুগের প্রেম এবং আপন কৃতিত্ব গাঁথা রয়ে আছে।

অবশ্য সস্তা দামের যদি গরজ থাকে তাহলে মিলের কাপড় কিন্‌তে হ'বে, কিন্তু সেজন্য যেন বাংলা দেশের বাইরে না যাই। যাঁরা সৌখীন কাপড় বোম্বাই মিল থেকে বেশি দাম দিয়ে কিন্‌তে প্রস্তুত তাঁরা কেন যে তার চেয়ে অল্প দামে তেমনি সৌখীন শান্তিপুরী কাপড় না কেনেন তার যুক্তি খুঁজে

পাইনে। এক দিন ইংরেজ বণিক্ বাংলা দেশের তাঁতকে মেরেছিল, তাঁতির হাতের নৈপুণ্যকে আড়ষ্ট ক'রে দিয়েছিল, আজ আমাদের নিজের দেশের লোকে তার চেয়ে বড় বজ্র হান্‌লে। যে-হাত তৈরী হ'তে কতকাল লেগেচে, সেই হাতকে অপটু করতে বেশী দিন লাগে না। কিন্তু স্বদেশের এই বহুকালের অর্জিত কারুলক্ষ্মীকে চিরদিনের মতো বিসর্জন দিতে কি কারো ব্যথা লাগ্‌বে না? আমি পুনর্ব্বার বল্‌চি কাপড়ের বিদেশী যন্ত্রে বিদেশী কয়লায় বিদেশী মিশাল যতটা, বিলিতী সুতো সত্ত্বেও তাঁতের কাপড়ে তার চেয়ে বহুতর। আরো গুরুতর কথা এই যে আমাদের তাঁতের সঙ্গে বাংলার শিল্প আছে বাঁধা। এই শিল্পের দাম অর্থের দামের চেয়ে কম নয়।

এ কথা বলা বাহুল্য বাংলা তাঁতে স্বদেশী মিলের বা চরখার সুতো ব্যবহার ক'রেও তাকে বাজারে চলনযোগ্য দামে বিক্রি করা সম্ভবপর হয় তবে তার চেয়ে ভালো আর কিছুই হতে পারে না। স্বদেশী চরখার উৎপাদন-শক্তি যখন সেই অবস্থায় পৌঁছবে তখন তাঁতিকে অনুনয় বিনয় করতেই হবে না কিন্তু যদি না পৌঁছয় তবে বাঙালী তাঁতিকে ও বাংলার শিল্পকে বিলিতী লৌহযন্ত্র বিদেশী কয়লার বেদীতে বলিদান করব না।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রক্তের টান

শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বসু এম্-এ

১

"ধ্যাৎ"!

দাক্ষিণাত্যের একটী বৃহৎ হাঁসপাতাল-সংলগ্ন মেডিক্যাল ছাত্রাবাসের ভোজন-গৃহে একদিন বেলা দশটায় এই শব্দটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে এক যুবক তাহার সম্মুখের ভাতের থালাতে একটা ধাক্কা দিয়া হঠাৎ টেবিল ছাড়িয়া উঠিল। যাইতে যাইতে আপন মনে বলিতে লাগিল, "এ দেশেও মানুষ থাকে, এ সব খাওয়া খেয়েও বাঁচা যায়?"

পার্শ্বে দণ্ডায়মান ম্যাঙ্গলোরি রসুয়ে সে ভাষা বুঝিল না, কিন্তু যুবকের মুখভঙ্গী দেখিয়া অর্থ বুঝিতে বাকী রহিল না। তাহার সযত্ন-রন্ধিত ভাজি, রসম্ এবং আমটি কেন যে ঐ ভাবী ডাক্তারের রসনা তৃপ্তি করিতে অক্ষম হইল, তাহা সে কিছুতেই ঠাহর করিয়া উঠিতে পারিল না।

যুবকের রং কিছুটা কাল। ঠোঁট পাতলা, তবে চোয়াল দুটি ভারী ও মজবুত। মাথার চুল উল্টানো, তার উপর শোলা হ্যাটের দাগ। অঙ্গভঙ্গীতে মনে হয়, বেশ চালাক-চতুর, "স্মার্ট।" চোখের মৃদু উজ্জ্বলতা আর অন্ত প্রদেশের প্রতি তুচ্ছতার ভাব তাহার বাঙ্গালীত্ব ঘোষণা করে। বাংলা ভাষার টান পদ্মার পূর্ব্বতীরের পরিচয় দেয়। তবে সে যে ক্রিশ্চ্যান একথা কেহই কল্পনা করিতে পারিবে না, যে পর্য্যন্ত না শুনিবে যে তাহার নাম, পল স্যামুয়েল জি মোহান। 'পল'টা বাস্তবিক তাহার ক্রিশ্চ্যান নাম নয়, পদবী,—'পালের' রূপান্তর। 'জি' গিরীন্দ্রের সংক্ষেপ। 'মোহান' মোহনের ঈষৎ পরিবর্ত্তিত রূপ। এখনও বাঙ্গালীতে নাম জিজ্ঞাসা করিলে বলিয়া থাকে, "শ্রীগিরীন্দ্রমোহন পাল", কিন্তু মিশনরি সমাজে ও বাংলার বাহিরে সে পি, এস, জি, মোহান নামেই পরিচিত। হয়ত কালক্রমে তাহার বংশধরেরা যদি রংয়ের কতক পরিবর্ত্তন করিতে পারে, তবে নিজেদের সদ্য ইউরোপ হইতে আগত মোহান পরিবার বলিয়া ঘোষণা করিতে কুণ্ঠিত হইবে না,—অবশ্য যদি ততদিন পর্য্যন্ত ইউরোপীয় হওয়া লাভজনক ব্যাপার থাকে। তবে মোহান এখনই রেলের ইউরোপীয় তৃতীয় শ্রেণীতে যাতায়াত করে। একবার পরিধানে ধুতি ছিল, তাহা দেখিয়া পাশের এক বুড়ী মেম যখন গার্ডকে ডাকিয়া দেখাইল, এবং গার্ড তাহাকে সেখানে বসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিল, তখন মোহান শুধু সংক্ষিপ্ত ভাবে বলিল, "আমি ইউরোপীয়ান" এবং সে কামরা ত্যাগ করিবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা প্রকাশ করিল না। গার্ড ষ্টেশন মাষ্টারসহ ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, মোহান ইতিমধ্যে প্যান্ট ও হ্যাট পরিয়াছে। ষ্টেশন মাষ্টার নাম জিজ্ঞাসা করিলে সে গম্ভীরভাবে বলিল "পল স্যামুয়েল জি মোহান।" বুড়ী মেম তখন খুবই অপ্রস্তুত হইয়াছিল।

ভোজন-গৃহ হইতে নিজ ঘরে আসিয়া মোহান অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চেয়ারের উপর বসিয়া রহিল। চুল ব্রাস করিল না, টাই পরিল না, লেকচারে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইল না। তাহার শুধু মনে হইতে লাগিল, সেই বাংলা দেশ, কি আরামের, কি সুখের,—আর কোথাকার এ সৃষ্টিছাড়া দেশে আসিয়া পড়িয়াছে! এরি নাম ডাল? এরি নাম তরকারী? এরি নাম টক? ছি! ছি! বিরক্তিতে মোহানের সমস্ত মন তিক্ত হইয়া উঠিল। মনে পড়িল, বাংলার সেই ইলিশ মাছের ঝাল, সেই কই মাছ আর ফুল কপির ঝোল! সেই পটোলের ডালনা! সেই মসুর ডাল, —বিশেষ করিয়া বরিশালের মসুর ডাল! মোহান ভাবিল, সেও দেশ আর এও দেশ!

ভাবিতে ভাবিতে সেই বহু মৎস্য-শালিনী, বহু আনাজ-পরিপূর্ণা, সুজলা, সুফলা বঙ্গভূমির জন্য তাহার প্রাণ কাঁদিয়া

উঠিল। দুই তিন বারের চেষ্টাতেও টেবিলের ব্রাস মাথায় উঠিল না, খুঁটির টাই খুঁটিতেই রহিল। ঘড়ির কাঁটা সাড়ে দশটা অতিক্রম করিয়া গেল। মোহান আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া দেখিল, তাহার মুখখানা একেবারে মুষ্‌ড়িয়া গিয়াছে! নিজের প্রতি নিজের দয়া হইল।

কিন্তু হঠাৎ তাহার ভারি চোয়াল দুটি শক্ত হইয়া উঠিল, তাহার চক্ষুর দৃষ্টি কঠিন হইল। মোহানের মনে হইল, আহারের অপূর্ণতার জন্য তাহার দেহের গ্ল্যাণ্ডগুলির আভ্যন্তরীণ রসনিঃসারণ হইতেছে না, তাই তাহার চিত্ত এভাবে অবসাদ-গ্রস্ত হইয়া পড়ে। ভাবিল, হয়ত তিন বৎসর পরে পরীক্ষা পাশ করিয়া দেশে যাইবে, কিন্তু ততদিনে তাহার সমস্ত গ্ল্যাণ্ডের 'ইনটারনেল সিক্রেশন' বন্ধ হইয়া যাইবে, আর তার ফলে তাহার সমস্ত প্রফুল্লতা, সমস্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা, সমস্ত উদ্যম চলিয়া যাইবে, তাহার স্বভাব সংগ্রামের প্রবৃত্তি হারাইয়া ফেলিবে। তখন হয়ত বসিয়া বসিয়া শুধু ব্যর্থ প্রেমের কবিতা লিখিবে, অথবা নৈরাশ্যবাদী দার্শনিক হইবে, অথবা মস্ত ধার্ম্মিক হইয়া শুধু দিবারাত্রি প্রার্থনা করিতে থাকিবে!

ব্রাস ও টাই রাখিয়া মোহান শুধু ভাবিতে লাগিল, গ্ল্যাণ্ডগুলিকে কি করিয়া অবনতির পথ হইতে রক্ষা করা যায়, কি করিলে তাহাদের স্বাভাবিক রসনিঃসারণ হয়। কিছুক্ষণ ভাবিয়া ভাবিয়া স্থির করিল, সেদিন সন্ধ্যা হইতে শুধু রুটি আর মাংস খাইবে, আর কিছুই খাইবে না, সে রুটি গমেরই হোক, জোয়ারীরই হোক আর রাজরীরই হোক। পূর্ব্বের খানা হইতে শুধু ঝোলটুকু লইবে। যদি দরকার হয়, তবে সিগারেট ছাড়িয়া দিয়া পয়সা বাঁচাইবে।

মোহান ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল, এগারটা বাজিবার আর পাঁচ মিনিট মাত্র বাকী। তখন সে চুলও ব্রাস করিল না, টাইও পরিল না, মাথায় হ্যাটও দিল না, এমন কি দরজায় তালা পর্য্যন্ত লাগাইল না;—ছুটিয়া হস্পিটালের অভিমুখে চলিল।

২

মোহান মেডিক্যাল স্কুলের লেক্‌চার গ্যালারীর সিঁড়িতে পা দিবে, এমন সময় পেছন হইতে একজন কম্পাউণ্ডার ডাকিয়া বলিল, "হ্যালো ডাক্তার, রক্তের অভাবে একটা "কেসের" অপারেশন হচ্চে না, তোমাদের কারো কাছ থেকে মিল্‌বে কি?"

এখানে সকলেই ডাক্তার, এমন কি স্যুটপরিহিত আগন্তুক মাত্রকেই 'ডাক্তার' বলিয়া সম্বোধন করা হয়। তবে আজকাল সাহিত্যদর্শনেরও 'ডাক্তার', আছে, তাই সংজ্ঞাটার একেবারে অপলাপ হয় না।

মোহান সিঁড়িতে উঠিল না। কম্পাউণ্ডারকে জিজ্ঞাসা করিল, "অপারেশন কখন, আলেক্‌জাণ্ডার?"

কুড়িটাকা মাহিনার সোলাপুরি-চেকের-স্যুটপরা, কৃষ্ণকায় প্রৌঢ় কম্পাউণ্ডারটিই এ বিরাট নামে অভিহিত।

আলেকজাণ্ডার বলিল, "বেলা একটায়।"

মোহান অবাক্ হইয়া বলিল, "এখনও রক্ত পাওয়া যায় নি?"

আলেকজাণ্ডার বলিল, "রোগিণীর সঙ্গেই লোক ছিল, কিন্তু তার সঙ্গে রক্ত মেলে নি।"

মোহান জিজ্ঞাসা করিল, "কি রোগ তার?"

আলেকজান্দার বলিল, "টি বি অব দি ইন্‌টেষ্টিন্‌স্ (অন্ত্রের ক্ষয়)। পুরানো রোগ। এ শেষ ষ্টেজ। এনিমিয়া দেখা দিয়েচে! শরীরে অপারেশন করবার মত রক্ত নেই। অন্যের রক্ত ছাড়া নিরুপায়।"

মোহান বলিল, "আমি রক্ত দেব। চল, পরীক্ষা করাবে।"

এই কয়মিনিট আগে মোহান দেহপুষ্টির জন্য এত ব্যস্ত হইয়াছিল, এরি মধ্যে দেহক্ষয় করিতে প্রস্তুত হইয়া গেল? তবে কি তাহার কঠোর সংকল্পের প্রভাবে গ্ল্যাণ্ডগুলি আভ্যন্তরীন রসনিঃসারণ আরম্ভ করিয়া পৌরুষভাব জাগাইয়া তুলিয়াছে? তাহা হইলে গ্ল্যাণ্ড শুধু মনকে চালায় তাহা নয়, মনও গ্ল্যাণ্ডকে চালাইতে পারে?

মোহান ক্লিনিকে চলিল, আলেকজাণ্ডার "কেস" আনিতে গেল। ধোবী যেমন ভাবে কাপড়ের দিকে চায়, মুচি যেমন ভাবে জুতার দিকে চায়, ছুতার যেমন ভাবে কাঠের দিকে চায়, এ প্রবীন কম্পাউণ্ডার তেমনই করিয়া রোগীর দিকে চায়! তাহারা তাহার কাছে শুধু "কেস,"—

কোনোটা জীবনীশক্তিপূর্ণ, কোনোটা মরণের প্রথম ধাপে, কোনোটা দ্বিতীয় ধাপে কোনোটা বা তার চেয়ে আরও বেশী অগ্রসর। সে তাহাদিগকে ব্যাণ্ডিজ করিয়া, মলম লাগাইয়া, পোলটিস্ দিয়াই ক্ষান্ত হয়, তার অধিক কিছু ভাবে না।

ক্লিনিকের দরজা খুলিয়া যখন আলেকজাণ্ডার ঢুকিল ও তাহার পশ্চাতে শ্বেতবসনা তাহার "কেস" আসিল, তখন ঘরের এক কোণ হইতে মোহান সহসা উঠিয়া দাঁড়াইল। সে এতক্ষণ দীপশিখার উপর কাচের 'স্লাইডে' যক্ষা-বীজাণুর প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করিতেছিল, মুহূর্ত্ত মধ্যে সে-সমস্ত ভুলিয়া নিবিষ্ট দৃষ্টিতে শুধু চাহিয়া রহিল, সে 'কেস'টীর দিকে। এতো তাহার কাছে শুধু 'কেস' নয়, তাহা যদি হইত, তবে তাহার হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া হঠাৎ দ্রুত হইয়া উঠিবে কেন, তাহার স্নায়ুমণ্ডলীর ভিতর এত টানা-হেঁচড়া চলিবে কেন?

মোহান দেখিল, একটী সুন্দর তরুণ দেহ ফুলের মত মিয়াইয়া পড়িয়াছে। দেখিল, শীর্ণ শুভ্র মুখখানি। ঈষৎ ভাঙ্গাপড়া কপালটি। অস্বাভাবিক রকম উজ্জ্বল দুটি চোখ গভীর কোটরের ভিতর হইতে তীক্ষ্ণ কোমল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে। গাল শুকাইয়া গিয়াছে, কিন্তু তার উপর কেমন একটা অলৌকিক চাকচিক্য, কেমন একটা অবাস্তব লাবণ্য! নাকের ডগাটি অসম্ভব রকম তীক্ষ্ণ! ঠোঁটের রেখাগুলি কালো হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু সে রেখায় স্পষ্টতা ঠোঁট দুটিকে চিত্রের মত সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে!

জীবনান্তের এ অপরূপ রূপচ্ছটা মোহানের হৃদয় মুগ্ধ করিল।

ল্যাবরেটরী এসিষ্ট্যাণ্ট মোহনের আঙ্গুলে সূচ ফুটাইয়া একটু রক্ত লইল। রোগিণীর আঙ্গুলে সূচ ফুটাইতে গেলে সে ভীত হইল। এসিষ্ট্যাণ্ট বলিল, "ভয় নেই, কিছু হ'বে না।"

আলেকজাণ্ডার বলিল, "ও কিছু নয়, শুধু এক ফোঁটা রক্ত নেবে!" কিন্তু রোগিণী তাহার ঈষৎ কম্পিত হাতখানি তুলিয়াও তুলিল না। মোহান অগ্রসর হইয়া নিজের হাতখানা দেখাইয়া, বাংলা, হিন্দি ও মারাঠা মিশাইয়া বলিল, সেও রক্ত দিয়াছে, তাহার কোনও কিছু হয় নাই। তখন রোগিণী ঈষৎ হাসিয়া, হাতখানি বাড়াইয়া পরিষ্কার ইংরাজীতে আস্তে আস্তে বলিল, "আচ্ছা বেশ, তবে দেখ্‌বেন ব্যথা যেন না দেওয়া হয়।"

সে হাসিটি আবার বেচারী মোহানের স্নায়ুমণ্ডলীকে আর একটি মোচড় দিয়া গেল। বুকের ভিতরে সব রক্তগুলি আলোড়ন করিয়া উঠিল।

এসিষ্ট্যাণ্ট রোগিণীর রক্ত লইল, এবং দুই রক্ত মিলাইয়া দেখিতে টেবিলের দিকে গেল।

মোহান রোগিণীর দিকে চাহিয়া বলিল, "আশা করি আমার রক্ত আপনার কাজে লাগ্‌বে।"

মেয়েটি মাথা নোয়াইয়া, একটী পা একটু বাড়াইয়া, সলজ্জ-ভাবে বলিল, "আপনি আমার জন্য কত কষ্ট করতে প্রস্তুত হয়েচেন!"

উত্তরে মোহান আশ্বাস দিয়া বলিল, "এ আবার কষ্ট! এ কিছুই নয়। কত সময় আঙুল কেটে কত রক্ত পড়ে যায়! রক্ত আর কত নেবে—৬০ c. c.? ৮০ c. c.? ১০০ c. c.? এতে আর কি এসে যাবে?"

মোহানের উৎসাহপূর্ণ বাক্যে মেয়েটি তাহার কোমল চোখ দুটি তুলিয়া তাহার পানে চাহিল। এ অপ্রত্যাশিত সহানুভূতি তাহার হৃদয় স্পর্শ করিল।

এ দৃষ্টিতে মোহানের প্রাণের উৎসাহ দশগুণ বাড়িয়া উঠিল! তাহার অন্তর বলিতে চাহিতেছিল, "১০০ c.c. রক্ত কেন, আমার দেহের সবখানি রক্ত নিঃশেষে দিয়েও যদি তোমার প্রাণ রক্ষা করতে পারি, তবে নিজেকে কৃতার্থ মনে করবো!" কিন্তু মুখে তাহা বলিতে পারিল না। শুধু তাহার নীরব মমতাভরা দৃষ্টিটুকু সে বার্ত্তা বহন করিতে চাহিল।

দীর্ঘকালের রোগিণী। দৈনন্দিন শত তিক্ততায় তাহার প্রাণ জর্জ্জরিত। তারপর আসন্ন মৃত্যুর প্রতীক্ষায় হৃদয় অবসন্ন। এ অবস্থায় ঐ তরুণ যুবকের উজ্জ্বল প্রশংসমান দৃষ্টির সামনে তাহার ফ্যাকাশে মুখখানি সহসা রক্তিম হইয়া উঠিল।

মোহান ভাবিল, রক্তপরীক্ষা দিয়া দেখিবে। কিন্তু

কেমন যেন একটা মুখের আকর্ষণে তাহার চক্ষু দুটি ফিরিয়া আবার সে তরুণীর ব্যথা-স্নিগ্ধ মুখখানির উপর ন্যস্ত হইল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি পড়তেন বুঝি?"

তরুণী বলিল, "না, শিক্ষয়িত্রীর কাজ করতাম্।"

মোহান জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার ব্যারাম কবে থেকে?"

তরুণী বলিল, "ইস্কুলে কাজ নেবার কিছুকাল পরেই হয়, তবে প্রথম অবস্থায় বুঝতে পারি নি।"

মোহান বলিল, "অতিরিক্ত খাটুনি, আহারের অপূর্ণতা, পর্য্যাপ্ত আলোক হাওয়ার অভাব এ সবই এ রোগের কারণ।" এমন সুন্দর তরুণী মেয়েটি দুর্ব্বহ কর্ম্মভারে পীড়িত, একথা ভাবিতেই মোহানের হৃদয় করুণায় দ্রব হইয়া উঠিল।

তখন এসিষ্টাণ্ট সহাস্য মুখে আসিয়া বলিল, "রক্তের মিল হয়েচে!"

একটা অদম্য উল্লাসে মোহানের প্রাণ নাচিয়া উঠিল। সে উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ!" তরুণীর দিকে চাহিয়া বাজলার সহজ ভাবপ্রবণতার বশে বলিল, "তা' হ'লে হয়ত ভগবানের ইচ্ছায় আপনার জীবন রক্ষা হ'বে!"

মেয়েটির মুখমণ্ডলে যা-কিছু রক্ত ছিল, তার প্রায় সবই আসিয়া তাহার গাল দুটিতে জড় হইল। মোহান মূকভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। উচ্ছ্বাসের তাড়নায় তাহার হৃদয়ের সমস্ত আবেগ যেন বরফের মত কঠিন হইয়া পড়িল। আর্য্যাবর্ত্তে আর দাক্ষিণাত্যে এই প্রভেদ!

কম্পাউণ্ডার আলেকজাণ্ডার বলিল, "এখন ডাক্তারের কাছে যেতে হ'বে। তিনিই রক্ত নেবেন।"

মোহান এসিষ্টাণ্টের হাত হইতে রক্তপরীক্ষার কর্ম্মখানা লইয়া কম্পাউণ্ডারের হাতে দিল। দিবার পূর্ব্বে রোগিণীর নাম পড়িল—"মিস্ চম্পা ঘোরগেরীকর।"

আলেকজাণ্ডার তাহার কেস্ লইয়া চলিয়া গেল। মোহান বাহিরে আসিতে আসিতে মনে মনে আবৃত্তি করিতে লাগিল, "চম্পা ঘোরগেরীকর।" চম্পা নামটী যেন মিষ্টি লাগিল তাহার কাছে। কিন্তু "ঘোরগেরীকর" নামে সে কষ্ট হইয়া উঠিল। ঐ কোমলা, ক্ষীণা, তন্বী মেয়েটির নাম, "ঘোরগেরীকর"? তাহার কাছে ইহা একটা উৎকট বিদ্রূপ বলিয়া মনে হইল। কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে এই শ্রুতিকঠোর শব্দটি ভুলিয়া গেল, তাহার মনে ঘর্ঘর জাতীয় একটা অস্পষ্ট ঝঙ্কার রহিল মাত্র! তবে মেয়েটির ব্যক্তিগত নামটি তাহার মনে গাঁথা হইয়া রহিল—চম্পা! চাঁপার কলি!…

৩

সেদিন বেলা সাড়ে বারোটায় হস্পিটালের ২৭ নম্বর ঘরে ২১৩ নম্বরের 'কেস্'টী অপারেশনের অপেক্ষায় বসিয়া ছিল। তাহার সঙ্গের লোক মধ্যাহ্ন আহারে গিয়াছে, তাই সে একা।

তখন একটি তরুণ যুবক সজোর, সোল্লাস পদক্ষেপে তাহার ঘরের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল।

মোহান হাসিমুখে বলিল, "কেমন আছেন আপনি? ইতিমধ্যে আমি স্কুলে গিয়ে একটা লেক্‌চার শুনে এলাম। একটু ভাল বোধ হচ্ছে, না, মিস্ চম্পা?"

মোহানেরই দেওয়া রক্তে চম্পার গালদুটি অপ্রত্যাশিত ভাবে লাল হইয়া উঠিল। সে একটু আবেগভরে বলিল, "এমন ভাল বহুদিন থাকিনি।" মিষ্টবাক্যে তাহাকে ধন্যবাদ জানাইল।

মোহান ঘরে গিয়া একখানা চেয়ার টানিয়া বসিল। রোগিণীর সঙ্গীর খোঁজ লইল। অপারেশন বিষয়ে তাহাকে নির্ভয় হইতে বলিল। অপারেশনের উল্লেখে চম্পার মুখ ক্লিষ্ট হইয়া পড়িল।

মোহান বলিল, "আপনি ভুল করেছেন। অনেকদিন আগেই অপারেশন করানো উচিত ছিল।"

চম্পা বিষাদমাখা হাসি হাসিয়া বলিল, "তা' বুঝি। তবে হয়ত ঈশ্বরের ইচ্ছা ছিল যে আপনার সাহায্য নিতে হ'বে, তাই দেরী হ'ল।"

একথায় মোহান অনেকটা ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া গেল। রং আরও ফর্সা হইলে তাহার গালও রাঙিয়া উঠিত।

কিছুক্ষণ পরে মোহান বলিল, "আপনি তৈরি হোন আপনাকে কয়েক মিনিটের মধ্যেই অপারেশন-থিয়েটারে যেতে হ'বে।"

চম্পার মুখ শুকাইয়া গেল বলিল, "আমি তো তৈরিই।" তারপর চুপ করিয়া রহিল। একটা কি ভাবনা যেন তাহার মন চাপিয়া বসিয়াছিল। সে শুধু টাইলমোড়া মেজটার দিকে চাহিয়া রহিল।

মোহান বলিল, "আপনি কি ভাবচেন" ?

চম্পা চোখ তুলিয়া, একটু চকিতভাবে বলিল, "ভাবচি, আপনার সঙ্গে এই শেষ দেখা।" তাহার কৃষ্ণ পক্ষরাজি জলসিক্ত হইল। এক ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া শীর্ণ গালটার উপর পড়িল।

মোহান বলিল "দূর্। আপনি ভারি ভীরু। আমি বল্‌চি, বিশ্বাস করুন, আপনি একেবারে সেরে যাবেন। আমার রক্তগুলো কখনো বৃথা যাবে না।"

চম্পা মোহানের মুখের দিকে এক মুহূর্ত্ত নিবিষ্টভাবে চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল "আচ্ছা মিষ্টার—" বলিয়া মোহানের দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনার নাম তো আমি জানি নে।"

মোহান আগ্রহের সহিত বলিল, "আমার নাম মোহান, স্যামুয়েল মোহান"।

চম্পা তাহার দিকে স্থিরভাবে চাহিয়া বলিল, "আপনি ক্রিশ্চ্যান্?"

মোহান বলিল, "হাঁ।" বলিয়া যেন একটু অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। বলিল, "আমি বাঙ্গালী। আমাদের দেশে হিন্দুতে ক্রিশ্চানে ভেদভাব নেই। আমার অধিকাংশ বন্ধুই হিন্দু।"

চম্পা একটু হাসিয়া বলিল, "আমিও ক্রিশ্চ্যান্।"

পুরুষ যখন ক্রিশ্চ্যান্ হয়, তখন তাহার নাম হয়, মাইকেল, স্যামুয়েল, জোসেফ ইত্যাদি। কিন্তু মেয়ে ক্রিশ্চ্যানদের নাম, চম্পা, বিমলা, তরুলতা, এসবই থাকে। যেমন পুরুষ ক্রিশ্চ্যান্ হ্যাট্‌কোট পরিয়া সাহেব সাজে, কিন্তু মেয়ে ক্রিশ্চ্যান্ শাড়ীই পরে। তাই চম্পার নামের মধ্যে মোহান তাহার ধর্ম্মের পরিচয় পায় নাই।

মোহান চমকিত উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিল, "আপনি ক্রিশ্চ্যান্? আপনাদের কোন্ চার্চ্চ?"

চম্পা ধীরে ধীরে বলিল, "এ্যামেরিকান্ প্রেস্‌বিট্যারিয়ান্। আপনাদের?" বলিয়া উৎসুকভাবে মোহানের দিকে চাহিল।

মোহান্ বলিল, "স্কটিস্ প্রেস্‌বিট্যারিয়ান্।"

দুজনে চোখে চোখ মিলাইল। সে দৃষ্টি-বিনিময়ে একটা নূতন আত্মীয়তা গড়িয়া উঠিল।

একটু থামিয়া চম্পা সলজ্জভাবে বলিল, "আচ্ছা, মিষ্টার মোহান, আপনি যে আপনার নিজ শরীর থেকে ঐ রক্তগুলি দিয়েচেন, তা' আমি বলে' দিয়েচেন, না যাকে-তাকেই দিতেন?"

প্রশ্নটা যে এত জটিল হইবে মোহান কল্পনা করে নাই। ক্ষণকাল সে শুধু অবাক হইয়া চম্পার লজ্জা-বিধুর দৃষ্টিটি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। তারপর উৎসাহভরে বলিল, "হয়ত অন্যকেও দিতাম্, তবে আপনাকে যেমন অন্তরের সহিত দিয়েচি, অন্যকে কক্‌খনো তেমন দিতাম্ না।"

চম্পার দৃষ্টিটি আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে বলিল, "আচ্ছা আমি যদি ভাল হ'য়ে উঠি, তবে আপনার সঙ্গে আবার দেখা হ'বে?"

মোহান জোর গলায় বলিল, "তা' আর বল্‌তে আছে? আপনাদের বাড়ী কোথায়?"

চম্পা বলিল, "আহ্‌মদনগরে।"

মোহান বলিল, "তা বেশ। ঠিকানাটা রেখে যাবেন, আমি প্রত্যেক ছুটির সময় দেশে আস্‌তে যেতে আপনাদের ওখানে হয়ে আস্‌ব।"

চম্পার মন যেন পূর্ব্ব চিন্তাতেই মগ্ন ছিল। সে বলিল, "আচ্ছা, আমি যদি মরে যাই, তবে আমাকে আপনার মনে থাকবে?" বলিয়া দুর্ব্বল চক্ষুদুটি তুলিয়া চাহিল।

মোহান বলিল, "এ কথার আমি উত্তর দিব না। কেন না, আমরা যে আপনাকে মরতেই দিব না।"

চম্পা মৃদু হাসিল। গভীর বেদনামাখা সে হাসিটি; তবে ভিতরে যেন একটা বুক-ভাঙ্গা কাঁদন লুকানো ছিল।

চম্পা বলিল, "আমি তো মরলামই, শেষ সময়ে আপনাকে কষ্ট দিয়ে গেলাম্। আপনার ঋণ—"

মোহান বাধা দিয়া বলিল, "সে সব কথা বল্‌বেন না, মিস্ চম্পা, তা' বল্‌লে আমি রাগ করবো!"

সে কথার সুরে নারীরই মত অভিমান মাখা ছিল! চম্পা কতকটা বিস্মিত হইল। বাঙ্গালীর হৃদয়ের সঙ্গে জীবনে তাহার এই প্রথম পরিচয়!

উত্তরে নীরবে বসিয়া রহিল। মোহানের মুখখানি অত্যন্ত ক্লিষ্টভাব ধারণ করিল।

সে নীরবতা ভঙ্গ হইল নার্সের আগমনে। ২৭ নম্বর ঘরে তখন তাহার 'ডিউটি' ছিল। মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্রকে রোগিণীর পাশে ওরকম মুখ করিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া তরুণী নার্স খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

তাহার মাথায় শাদা "হুড্", ঘোমটার মত ঢাকিয়া আছে, গায়ে লম্বা গাউনের উপর শাদা আবরণ। তাহার রংটি মিশ্ মিশে কালো, ভারী ঠোঁট, মোটা নাক, পুরু গাল। বয়স কম হইলেও বেশ লম্বা, চৌড়া, জবরদস্ত চেহারা। জাতিতে আদি-দ্রাবিড়, হিন্দু সমাজের আইন মতে অতিশূদ্র, অস্পৃশ্য! বোধ হয় সমাজের এবং গ্রামের বাহিরে থাকে বলিয়া ইহাদের জীবন সহজ, সক্রিয়, স্বাস্থ্যপূর্ণ। সে যদি ক্রিশ্চান না হইত, তবে হয়ত এখন সাতারা জেলার এক সবুজ অধিত্যকার উপর মোষ চরাইত—এবং মাঝে মাঝে চড়িতও! ক্রিশ্চান হইয়া সভ্য ভব্য হইয়াছে। তবে বংশানুক্রমিক দুরন্ত জীবনী-শক্তির (elan vital) বশে এক এক সময়ে হঠাৎ তাহার ঠোঁট দুটি খুলিয়া যায়, শাদা দাঁতের পাটি ঝল্‌মল্ করিয়া উঠে, গাল ভাঙ্গিয়া পড়ে, তরুণী কারণে অকারণে হাসিয়া কুটি কুটি হয়। সেই মুক্ত প্রাণ-খোলা হাসি যাহা তাহার স্ববংশীয়েরা এখনও মাঠময় ছড়াইয়া দেয়।' প্রবীণা এ্যামেরিক্যান ম্যাট্রনের ভ্রূকুটি এতদিনের মধ্যেও সে হাসিকে দমন করিতে পারে নাই।

নার্সকে দেখিয়া মোহান কেমন মুখ কাচু মাচু করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল্। তাহা দেখিয়া তাহার অবরুদ্ধ হাসি তুবড়ী বাজির মত ছুটিয়া বাহির হইল। সে কাপড় দিয়া মুখ যতই চাপে, হাসি ততই উদ্বেলিত হইয়া উঠে।

অনেক চেষ্টায় নার্স আত্মসংযম করিয়া বলিল, তাহাকে সে ঘরের বিছানা তৈরি করিতে হইবে, অপারেশনের পর রোগিণীকে রাখিবার জন্য।

রোগিণী বিছানা ছাড়িয়া উঠিল। মোহন বলিল, "আপনাকে বাইরে যেতে হ'বে না, এই চেয়ারটাতে বসুন্।" বলিয়া চেয়ারখানা আগাইয়া দিল। নার্স বিছানার পুরাণো চাদর ফেলিয়া নূতন চাদর পাতিতে পাতিতে দুই হাতে চাদরের কোণ দিয়া সজোরে মুখ চাপিয়া রাখিতেছিল,—শুধু তাহার শ্বাসরোধক্লিষ্ট ডাগর কালো চোখ দুটি ভিতরের অদম্য হাসির সন্ধান দিতেছিল।

নার্সের ভাব দেখিয়া মোহান তো চটিয়া অগ্নিশর্ম্মা। বিশেষ রকম কঠোরভাবে তাহাকে কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় চম্পার অভিভাবক হোটেল হইতে মধ্যাহ্নের আহার সারিয়া ফিরিয়া আসিল। মোহানকে দেখিয়া অনেক রকম সৌজন্য প্রকাশ করিতে লাগিল। মোহান অপরাধী বালকের মত প্রত্যেক কথাতেই মাথা নাড়িয়া চলিল। অবশেষে চম্পার দিকে ফিরিয়া বলিল, "কম্পাউণ্ডার আস্‌চে, আপনাকে এখন অপারেশনের জন্য যেতে হ'বে, আমি এবার পালাই।" রোগিণীর গভীর অক্ষিকোটর হইতে দুইটী ক্ষীণ চক্ষু অতৃপ্তভাবে যুবকের গতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

৪

অপারেশন ঘর। বড় একটী হল, দুই দিকে অনেক দূর পর্য্যন্ত কাচের বেড়া; দেয়াল, মেঝে সাদা ঝক্‌ঝকে টাইল দিয়া মোড়ানো। উজ্জ্বল আলোতে সারা ঘরখানা ধব্ ধব্ করিতেছে।

তখন বেলা একটা। ঘরের মাঝখানে একটা টেবিল, চারিদিকে লোকে ঘেরা। অদ্ভুত পোষাক তাহাদের,—মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত সাদা কাপড়ে ঢাকা। এক দিকে একটী লোক একটা শিশি হাতে দাঁড়াইয়াছে, তাহা হইতে ফোঁটা ফোঁটা ক্লোরোফর্ম্ম টেবিলে শায়িত দেহটীর নাসারন্ধ্রের উপরে একটী ছোট জালিতে পড়িতেছে। অপর সকলেই দেহটিকে ধরিয়া রহিয়াছে। শুধু একজন—সার্জ্জন্—অস্ত্রোপচারে ব্যস্ত।

দেহখানি সাদা কাপড়ে জড়ানো। শুধু মুখ আর বুকের নীচ হইতে কোমর পর্য্যন্ত খোলা। কোমরের কাছে একটা ভাগ কাটিয়া ভিতরের অন্ত্র উন্মোচিত করা হইয়াছে। ডাক্তার গভীর অভিনিবেশের সহিত সে অন্ত্রের এক অংশ পৃথক করিল। তার পর অপর দুইভাগ সেলাই করিতে লাগিল।

সেই দ্বিখণ্ডিত অন্ত্রটি ছাড়া যে জগতে কিছু আছে, ডাক্তারের চিত্ত এখন তাহা জানে না।

ডাক্তার সকালে সাতটায় চা খাইতে খাইতে বন্ধুদের সঙ্গে হাসিঠাট্টা করিয়াছে, বেলা দশটার পত্নীর সঙ্গে খানা খাইবার সময় দেশের চিঠির বিষয় আলোচনা করিয়াছে, অপারেশনের পর বেলা দুইটায় ছাত্রদের কাছে বক্তৃতা করিবে, বেলা ছয়টায় টেনিস খেলিবে, সন্ধ্যা নয়টায় পিয়ানো বাজাইবে,—কিন্তু এখন ঐ দুইটা নাড়ী জোড়া দেওয়া ছাড়া আর কিছুই জানে না। তাহার মস্তিষ্কের ভিতর তাহার জন্মভূমি নিউইয়র্ক ষ্টেট হইতে আরম্ভ করিয়া এই বোম্বে প্রেসিডেন্সি পর্য্যন্ত কত নগর, নদী, পাহাড়, সমুদ্র, বন্দর, জাহাজ, রেলের ছাপ রহিয়াছে। কিন্তু এই মুহূর্ত্তে, অন্ত্রের ভিতর সূচী প্রয়োগের জ্ঞান ছাড়া আর কোনও স্মৃতিই তাহাতে নাই। রোগিণীর চারিদিকের সকলের চক্ষু সেই ছিন্ন অন্ত্রটির উপরই নিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।

সহসা একজনের হাত বহু অভ্যাস সত্ত্বেও কাঁপিয়া উঠিল,—সে নাড়ী ধরিয়াছিল। আড়ষ্ট কণ্ঠে সে ডাক্তারকে বলিল, "নাড়ী বড় দুর্ব্বল।"

বিদ্যুতাহতের মত অস্ত্র ফেলিয়া ডাক্তার নাড়ী ধরিল। ক্ষণেকের জন্য তাহার রৌদ্র-দগ্ধ সাদা মুখখানা ফ্যাকাসে হইয়া গেল।

ডাক্তার পাঁচ সেকেণ্ডের মধ্যে নিজেকে সামলাইয়া, দৃঢ় কণ্ঠে একটা ঔষধের নাম করিল। পাশ হইতে নার্স সে ঔষধ তুলিয়া ধরিল। তাহা রোগিণীর নাকে প্রয়োগ করা হইল।

ডাক্তার আবার নাড়ী ধরিল। তাহার মুখ শান্তভাব ধারণ করিল। হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "রক্ত যে দিয়েছিল, সে কোথায়?" বলিয়া দরজায় দণ্ডায়মান রোগিণীর অভিভাবকের দিকে চাহিল।

আলেকজাণ্ডার রোগিণীর এক পাশে দাঁড়াইয়াছিল। বলিল, "মোহান।"

ডাক্তার বলিল, "তাকে শিগ্‌গির ডাক, আরো রক্ত চাই।"

আলেকজাণ্ডার নিমেষের মধ্যে ছুটিয়া গেল। হাঁপাইতে হাঁপাইতে সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া নামিল। সামনে দুইজন চাকর পাইয়া একজনকে ছাত্রাবাসে ও অপরকে স্কুলের দিকে পাঠাইল।

অপারেশন ঘরে ডাক্তার তাহার শক্তিতে যতদূর কুলায়, দ্রুতভাবে ছিন্ন অন্ত্র সেলাই করিতেছিল। হয় ত পাঁচ মিনিট, এমন কি দুই মিনিট দেরী হইলে রোগিণীর জীবন শেষ হইয়া যাইতে পারে। তখনকার একএকটা সেকেণ্ড অতি মূল্যবান।

৫

"মোহান্!"

সকলের চকিত দৃষ্টি দ্বারের দিকে ফিরিল। ডাক্তার বলিল "মোহান, রক্ত রোগীর পক্ষে প্রচুর হয় নি। তুমি আরো দিতে প্রস্তুত আছ?" ডাক্তারের দ্রুত আমেরিকান উচ্চারণের মধ্যে মোহান অতি কষ্টে কথাগুলি উদ্ধার করিল।

ডাক্তার দৃঢ় দৃষ্টিতে মোহানের দিকে চাহিল। তার অর্থ, সত্বর উত্তর চাই। একটি সেকেণ্ডও অপচয় করা যায় না।—মোহান উত্তর দেয় না কেন?

সে রক্ত দেওয়া না দেওয়ার কথা ভাবিতেছিল না, শুধু অবাক হইয়া চাহিয়াছিল চম্পার এলায়িত দেহখানির প্রতি। দেখিতেছিল, সেই অস্ত্রবিদ্ধস্থান, তার ভিতরের অন্ত্রসমষ্টি, বাহিরের 'ক্লিপ-কুঞ্চিত' দেহভাগ,—আর পাণ্ডুর, মড়ার মত মুখ—

একটী মুহূর্ত্তের তরে মোহানের চক্ষুদুটী অলসভাবে সে দৃশ্যটির মধ্যে ডুবিয়া রহিল,—একটী মুহূর্ত্তের তরে সে নির্ব্বাক নিষ্ক্রিয় হইয়া শুধু দেখিতেই লাগিল।

ডাক্তার বলিল, "তবে?"

সন্দেহের দারুণ কশাঘাতে মোহানের চক্ষু দুটি ফিরিয়া ডাক্তারের কঠোর দৃষ্টির সম্মুখীন হইল।

মোহান বলিল, "আমি প্রস্তুত।"

মোহানের রক্ত টিউবে লইয়া যখন ডাক্তার চম্পার দেহে সঞ্চারিত করিতে লাগিল, তখন তাহার চিত্ত পুলকে শিহরিয়া উঠিল। মোহানের মনে হইল সে যেন তাহার বক্ষের তাপ দিয়া চম্পার শীতল দেহখানিকে উষ্ণ করিয়া তুলিতেছে। মনে হইল যেন সে-মুহূর্ত্তের তরে চম্পা তাহার,—একান্তভাবে তাহারই।

ডাক্তার বলিল, "ধন্যবাদ।" বলিয়া আবার ক্ষিপ্রহস্তে অস্ত্রচালনা আরম্ভ করিল। এবার অন্ত্রের অপর দিকে আর একটা ঘা আবিষ্কার করিয়া তাহাতে অস্ত্র চালাইল। রোগিণীর এক একটী নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে তাহার জীবন মরণের সম্ভাবনা জড়িত। তাই ডাক্তারের আঙুল যুগপৎ দৃঢ় ও চঞ্চল। তাহা যদি একটিবার একটু শ্লথ হইয়া পড়ে, একটিবার যদি তাহার হাত কাঁপে, একটিবার যদি হৃদয় উতলা হইয়া উঠে, স্নায়ু দুর্ব্বল হইয়া যায়, তবে রোগিণীর প্রাণসংশয়। এই কয়েকটী মিনিটের তরে আজ তাহার সমস্ত পৌরুষ, সমস্ত মনুষ্যত্ব ঐ যন্ত্রটীর আগায় কেন্দ্রীভূত।

ডাক্তারের প্রতি অঙ্গুলি চালনার সঙ্গে সঙ্গে মোহানের বক্ষরক্ত আন্দোলিত হইতে লাগিল। ডাক্তারের এক একবার হাত ওঠা নামার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে তাহার মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ খেলিয়া যাইতে লাগিল।—

হঠাৎ ডাক্তার রোগিণীর হাত ধরিল কেন? তবে কি নাড়ীচলা বন্ধ হইয়া গিয়াছে? ডাক্তার কি হঠাৎ অস্ত্র ফেলিয়া বলিবে,—'Next case!' 'পরের রোগী আন'?

ডাক্তার আবার অস্ত্র হাতে লইয়াছে। আবার সে নাড়ী সেলাই করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এক একটা সেলাইর টান যেন মোহানের হৃদয়ের গ্রন্থীকে ছিন্ন করিয়া দিতেছে।

প্রতিটি সেকেণ্ড এখন তাহার কাছে একটী মর্ম্মন্তুদ বেদনা হইয়া দাঁড়াইল। মোহান ডাক্তারের স্থির কঠিন মুখের দিকে চাহিয়া নিজ ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশ হইল; ভাবিল, সে কোনও দিন সার্জ্জন হইতে পারিবে না, শুধু ঔষধ প্রেসক্রিপশন করিয়াই তাহার চিকিৎসাবিদ্যার পরাকাষ্ঠা দেখাইতে হইবে।

মোহানের দেহে রোমাঞ্চ বহাইয়া ডাক্তার অস্ত্রশুদ্ধ হাত তুলিল, অস্পষ্ট ভাবে বলিল, 'ঘরে নিয়ে যাও, মাথায় খুব বরফ দাও। দরকার হ'লে একটা ইনজেক্‌শন দিতে হ'বে।'

মোহানের স্নায়ুপুঞ্জ জ্যামুক্ত ধনুকের মত ছাড়া পাইল। তবে চম্পা জীবিত! তাহার শিরায় শিরায় রক্তের স্রোত উল্লাসে নৃত্য করিয়া ছুটিল।

মোহানের চক্ষে আনন্দের দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল। হয়ত চম্পা আরোগ্য হইবে। হয়ত এ কঠোর ব্যাধির হাত হইতে মুক্তি পাইবে! হয়ত একদিন সুস্থ দেহে আসিয়া তাহার সামনে দাঁড়াইবে। তখন রোগের কথা ভুলিয়া যাইবে, তাহার কোটরগত চোক দুটি ডাগর হইয়া উজ্জ্বল হইয়া তাহার দিকে চাহিবে!

"ষ্ট্রেচারে" করিয়া চারিজন বাহক চম্পাকে উপর তলা হইতে নীচে নামাইয়া আনিল, এবং ২৭ নম্বর ঘরের দিকে চলিল। মোহান পাশে থাকিয়া শুধু বলিতে লাগিল, "আস্তে! আস্তে!" সেই স্পন্দহীন জড়বৎ দেহখানির দিকে এক একবার চাহিয়া মোহানের চিত্ত শঙ্কান্বিত হইয়া উঠিতেছিল।

৬

রাত্রি আটটা। মোহান বিকালের চা খায় নাই, সন্ধ্যায় ডিনার খায় নাই, রোগিণীর মাথার পাশে বসিয়া ছিল। তাহার মুখখানা ভার, চোখ ছল-ছল। চম্পার অভিভাবক—দাদা—বরফ আনিয়া ভাঙ্গিয়া দিল। নার্স "আইস-ব্যাগ" বরফ লইয়া রোগিণীর মাথায় লাগাইয়া রাখিয়া যখন চলিয়া যাইতেছিল, মোহান তৎক্ষণাৎ গিয়া নিজ হাতে তাহা লইয়া মাথায় তুলিয়া ধরিল। তাহা দেখিয়া যে নার্সের চোকদুটি হাসিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল তাহার শাদা দাঁতগুলির উপর কাপড় চাপা দিতে হইয়াছিল—মোহানের তাহা লক্ষ্য করিবার সময় হয় নাই।

রোগিণীর অভিভাবক শয্যাপাশে বসিয়া রহিল। মোহান 'আইস-ব্যাগ' প্রয়োগ করিতে লাগিল। কিছুকাল পরে কয়েক মিনিটের জন্ম "ডিউটীর" খাতিরে কয়েকটা রোগীকে একবার দেখিতে গেল। আজ "ডিউটি" করিতে তাহার মন সরিতেছিল না। ভাবিতেছিল, কি কাজ ওসব দুনিয়ার হতচ্ছাড়া লোকদের পরিচর্য্যা করিয়া? তাহার অধীনস্থ প্রথম রোগী—কৃষ্ণকায়, দাড়িওয়ালা, রক্ত-চক্ষু, মধ্যবয়স্ক একটী লোক,—তাহাকে দেখিয়া ভাবিল, 'দুর্ব্বৃত্ত সারাজীবন সমাজের নর্দ্দমায় পড়ে থেকে, পচে গলে, দারুণ ব্যাধি নিয়ে এসেচে, তার জীবন রক্ষার জন্ম আমাদের চেষ্টা করতে হ'বে! কেন? তা'কে দিয়ে জগতের কি উপকার হ'বে? তা'কে অপারেশন কর, ইনজেক্‌শন দাও, ধোয়াও, ঔষধ দাও, তার পর কতক ভাল হ'য়ে সমাজে ফিরে গিয়ে, আবার দুচার বছর পরে রোগকে আরও কঠিন, আরও সংক্রামক করে' নিয়ে ফিরে আস্‌বে!' সেই দাড়িওয়ালা মোহানকে দেখিয়া কাতরাইতে লাগিল। মোহান তাহাকে উপেক্ষা করিয়া অপর রোগীদের কাছে গেল। তাহাদের চোখের দেখা দিয়া ফিরিতে ফিরিতে ভাবিল "Clay souls! কাদার গড়া অন্তর এদের—এদের জন্ম কেন আমরা ভেবে মরবো?" এক ঘরে দেখিল দুইজন মিশনারি মেয়েমানুষ রোগীদের খৃষ্টবিষয়ক ধর্ম্মসঙ্গীত শোনাইতেছে। মোহান মনে মনে হাসিল, ভাবিল, "এ বিপদের সাহায্যে ফাঁকি দিয়ে ধর্ম্মভাব ঢোকানো, সে ভাবের স্থায়িত্ব বা মর্য্যাদা কতটুকু?"

মোহান চম্পার ঘরে ফিরিয়া আসিল। চম্পার অজ্ঞান দেহটার পাশে দুইটী লোক নীরবে বসিয়া রহিল।

সান্ধ্য বাতাসের সঙ্গে একটা অর্দ্ধস্ফুট বেদনার কোলাহল ভাসিয়া আসিতেছিল। তাহা একবার ডুবিয়া যায়, আবার উঁচু হইয়া উঠে। হঠাৎ নিকটবর্ত্তী ওয়ার্ড হইতে একটা তীব্র আর্ত্তনাদ ছুরীর মত তাহাদের কানে আসিয়া প্রবেশ করিল। চম্পার দাদা চকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ কি?"

মোহান বলিল, "ও কিছু নয়, হয়ত পুরানো ব্যাণ্ডেজ খুলিয়া নূতন ব্যাণ্ডেজ দেওয়া হচ্ছে, হয়ত বা ইনজেক্‌সন দিয়েচে। ওরকম করে কাঁদা একটা অভ্যাস, 'নার্ভ' ও 'মাসেলের' প্রতিক্রিয়া। যে যেভাবে ব্যথা প্রকাশে ছেলেবেলা হ'তে অভ্যস্ত হয়েচে, সে সেইভাবেই প্রকাশ করবে।"

মোহান কথা বলিবার সুযোগ পাইয়া খুসী হইল। বলিতে লাগিল, "দেখ, সমুদ্রে জাহাজ ডুবি হইলে এদেশী লস্করেরা ডাক-হাঁক হৈ-চৈ করে, কিন্তু ইউরোপীয় নাবিকেরা নীরবে কাজ করে; এর মানে এই নয় যে এ দেশীয়েরা ভীরু; এ শুধু একটা অভ্যাসের বিষয়।"

চম্পার দাদা মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

আবার নারীকণ্ঠের করুণ চীৎকার উঠিল। যেন কার হৃৎপিণ্ডে সূচ ফুটাইয়া দেওয়া হইতেছে, যেন কার মজ্জার ভিতর বিদ্যুৎ চালনা করা হইতেছে।...

মোহান আবার উঠিয়া ডিউটীতে গেল। দেখিল একটী মেয়ের ভাঙা কনুইর ব্যাণ্ডেজ খুলিয়া বাঁধা হইতেছে, আর সে নিদারুণ ব্যথায় আর্ত্তনাদ করিতেছে। দেখিল, দাড়ি-ওয়ালা কালো লোকটী দাঁত মুখ খিচাইয়া বিছানা হইতে উঠিয়া বসিয়াছে, দেহের নিম্নার্দ্ধে তীব্র বেদনায় বাঁকিয়া পড়িয়াছে। দেখিল, এপেণ্ডিক্স্‌ অপারেশন করা একজন ইউরোপীয়ান রোগিণী বিছানায় ছট্‌ফট্ করিতেছে।

মোহান দ্রুতবেগে ২৭ নম্বর ঘরে ফিরিল। তখন রোগিণীর শ্বাস পূর্ব্বাপেক্ষা লঘু হইয়া আসিয়াছে। জ্ঞানহীন দেহ হইতে ধীরে ধীরে ক্লোরোফর্ম্মের নেশা কাটিয়া যাইতেছে। উভয়ে চকিতভাবে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে চম্পা মাথা ফিরাইল। অস্পষ্ট স্বরে বলিল, "আয়ী গ!" মোহান মারাঠী না জানিলেও এ কথাটির সহিত খুব পরিচিত। "আয়ী গ!"—মা গো!—এ ভারতের ব্যথার ভাষা! পরমেশ্বরকে প্রার্থনা নয়, সাধুসন্তের আশ্রয় ভিক্ষা নয়, দারুণ ব্যথায় জননীকে আহ্বান!

চম্পা চোখ মেলিল। মোহান সামনে দাঁড়াইয়া বলিল, "আপনি কেমন আছেন?"

চম্পা বলিল, "মিষ্টার মোহান? আমি কোথায়? ঘরে আঁধার কেন?"

মোহান আলো জ্বালাইল। রোগিণীর দেহে চাঞ্চল্য দেখা দিল, বমন আরম্ভ হইল। মোহান চম্পার দাদাকে বুঝাইতে লাগিল, এ ক্লোরোফর্মের প্রতিক্রিয়া, ভয়ের কোনও কারণ নাই।

তারপর চম্পা খুব কথা বলিতে লাগিল। মোহন বলিল, এও ক্লোরোফর্মেরই ক্রিয়া।

চম্পা বলিল, 'আমার অপারেশন হয়েচে ?"

মোহান বলিল, "হ্যাঁ, খুব সুন্দররূপে হয়েচে, কোনও ভয় নেই।"

চম্পা চঞ্চলভাবে বলিতে লাগিল, "মিঃ মোহান্, আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। আপনার হৃদয় অতি মহৎ।"

তারপর তাহার দাদাকে মারাঠীতে দ্রুতভাবে আরও কত কি বলিল।

মোহান আইস্ ব্যাগে আবার বরফ ভরিয়া দৃঢ়ভাবে রোগিণীর মাথায় চাপিয়া ধরিল। দেখিল চম্পার শুভ্র কপালটির উপর চূর্ণ-কুন্তল ছড়াইয়া পড়িয়াছে।······'চূর্ণ-কুন্তল'। কথাটা মোহান একটী বাংলা উপন্যাসে পড়িয়াছিল।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া চম্পা আবার বলিতে লাগিল, "মিষ্টার মোহান, আপনি নিশ্চয়ই আমাদের বাড়ী আস্‌বেন, নিশ্চয়ই! দাদা, তাকে তুমি বিশেষ করে অনুরোধ করো।"

নার্স আসিয়া তাপ লইয়া দেখিল, রোগিণীর জ্বর আসিয়াছে। বলিল, ক্লোরোফর্মের প্রতিক্রিয়া, ভয় নাই।

জ্বর বাড়িয়া চলিল। চম্পা আবার দ্রুত কথা বলিতে লাগিল। বলিল, "মিষ্টার মোহান্, আমি আপনাকে একটা কথা বল্‌তে চাই। হয় ত আমি বাঁচতে পারি, হয় ত বা নাও বাঁচতে পারি,—আমি আমার প্রাণের একটা কথা আপনাকে বল্‌তে চাই—"

বলিয়া ধীরে ধীরে, ক্ষীণভাবে মোহনের হাতে তাহার হাত মিলাইল। সে শীর্ণ হাতখানির উষ্ণস্পর্শে মোহানের চিত্ত অধীর হইয়া উঠিল।······ধীরে ধীরে হাতখানা নামিয়া আসিল। মোহান দেখিল, চম্পার ঘুম আসিয়াছে।

কিছুক্ষণ পরে সে উঠিল। চম্পার দাদাকে বলিল, ঘুমের যেন কিছুমাত্র ব্যাঘাত না হয়। বলিল, অস্ত্রপ্রয়োগ একা, তবে রোগিণীকে নিয়া এখন আর বেগ পাইতে হইবে না।

চম্পার দাদা মোহানকে বিশেষ ধন্যবাদ দিল। বলিল, তাহাদের বাড়ী হইতে লোক আসিবার কথা ছিল, আসিয়া না পৌছাতে অসুবিধা হইয়াছে। মোহানের সাহায্য না পাইলে সে কিছুই করিতে পারিত না। ইত্যাদি।

সেখান হইতে মোহান সোজা ঘরে গেল না, নিজের 'ডিউটি' সমাপ্ত করিতে চলিল। সেই দাড়িওয়ালা কালো লোকটিকে মর্ফিয়া ইনজেক্‌শন্ দিয়া বিছানায় শোয়াইল, অপর একজনের দেহে যন্ত্রপাত করিয়া গুরুভারের লাঘব করিল, আর একজনের ব্যাণ্ডেজ খুলিয়া আবার বাঁধিয়া দিল।

মোহান শুধু নিজের 'ডিউটি' করিয়াই ক্ষান্ত হইল না, তাহার সমপাঠীদের কাজে সাহায্য করিতে লাগিল। সেদিন সে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত হস্পিটালের প্রায় অধিকাংশ ওয়ার্ডেই ঘুরিয়া বেড়াইল। ঘরের দিকে যাইবার পূর্ব্বে শিশুর চীৎকার শুনিয়া 'ম্যাটারনিটি ওয়ার্ডে' গেল। দেখিল, নার্সরা কেহই নাই, খাটে খাটে মায়েরা সব শুইয়া আছে, পাশে লোহার ফ্রেমে ঝোলানো পালনায় তাহাদের শিশুরা ঘুমাইতেছে। শুধু একটি শিশু চেঁচাইতেছে, তাহার দুর্ব্বল মা বিছানায় ছট্‌ফট করিতেছে, শিশুকে সাহায্য করিবার ক্ষমতা নাই। মোহান 'ডায়েপার' শুদ্ধ শিশুটিকে হাতে লইয়া দোলা দিতে লাগিল। ধীরে ধীরে শিশুর কান্না থামিয়া আসিল।

এমন সময় দুইজন নার্স আসিল। মোহানের শিশু পালনের দৃশ্য দেখিয়া পিছনের নার্সটী সঙ্গিনীর ঘাড়ে দুইহাত রাখিয়া হি হি করিয়া হাসিয়া উঠিল। মোহান চাহিয়া দেখিল, সেই অল্পবয়সী মেয়েটি, কালো মুখের ভিতর দুইপাটি কাগজের মত শাদা দাঁত! নার্সদের দেখিয়া সে শিশুটীকে তাহার পাল্‌নায় রাখিতে গেল, তখন শিশু আবার কাঁদিয়া উঠিল। মোহান তাই তাহাকে আবার তুলিয়া ধরিল। জিভ তালুতে লাগাইয়া টকাটক শব্দ করিয়া শিশুকে থামাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু এ যে আট দশ দিনের শিশু, ওসব বোঝে না, তাহা বেচারী মোহানের জানাই ছিল না!

ওদিকে সেই তরুণী নার্স যে হাসিতে হাসিতে মাটিতে গড়াগড়ি যাইবার উপক্রম! বয়োজ্যেষ্ঠা নার্সটী মোহানের

দিকে অগ্রসর হইয়া বলিল, "আমার কাছে দিন্!" তখন মোহান শিশুর পা আগে দিবে কি মাথা আগে দিবে তাহা নিয়া ফ্যাসাদে পড়িল। সে ঘরে যত খানা খাট তত জোড়া উজ্জ্বল চক্ষু মোহানকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। তরুণী নার্স হাসিয়া খুন হয় আর কি! মোহান ভারী অপ্রস্তুত হইল, এবং ভারী বিরক্ত হইল। ভাবিল, পুরুষের ওয়ার্ডে তো সকলে তাহার দিকে এমন ভাবে চায় নাই, কোনও কম্পাউণ্ডারকে তো তেমন ভাবে হাসিতে দেখে নাই। মনে মনে বলিল, "মেয়েমানুষদের কি সব ব্যাপার রে বাবা!" মোহানের বিরক্তির ভাব দেখিয়া হাস্যময়ী নার্সটী নিজেকে সংযত করিয়া চাপা গলায় বলিল, "আমি বড় দুঃখিত, স্যার!" কিন্তু মোহান দরজার বাহিরে পা বাড়াইতে আবার তাহার হাসি প্রভাতের শেফালির মত অঝোরে ঝরিতে লাগিল!

মোহান ঘরে ফিরিবার পূর্ব্বে আবার চম্পার ঘরে গেল। আস্তে আস্তে দরজার ভিতরে মাথা নিয়া শুনিল, চম্পা ঘুমাইতেছে। বোধহয় জ্বরের জন্য একটু জোরে নিঃশ্বাস বহিতেছে। ভাবিল, এখন কোনও প্রকার গোলমাল না করাই সমীচীন।

মোহান বাহিরে সরু রাস্তা ধরিয়া চলিল। তার উপর ম্লান জ্যোৎস্না পড়িয়াছিল। মোহানের চিত্ত এখন অপরিসীম তৃপ্তিতে ভরা।

সে হাউস্‌সার্জ্জনের বাড়ী ছাড়াইয়া ধনী রোগীদের কটেজের পাশ দিয়া চলিল। হঠাৎ একটা জানালার কাছে আসিয়া শুনিতে পাইল, ভিতরে কথা চলিতেছে—বাংলাতে!

"তোর ঘুম পায়নি, ছোট খোকা?"

"না রে দাদা! বাবা কি কর্চ্ছেন?"

"পড়ছেন।"

এ শিশুদের আলাপ যেন কোন্ স্বপ্নালোক হইতে ভাসিয়া আসিতেছে। মোহান ভিতরে গেল, সৌজন্যের অপেক্ষা রাখিল না, কেননা, কোনও অলিখিত আইন অনুসারে বাঙ্গালীর কাছে বাঙ্গালীর সতত অবারিত দ্বার—অবশ্য প্রবাসে।

মোহান খোকাদের সঙ্গে আলাপ করিল। বড় ছেলেটি বলিল, তাহার টন্‌সিল কাটা হইয়াছে। ছোটটী বলিল, "আমারও তন্‌সিল কাত্তা হয়েছে।" মোহান তাহাদের পিতার সঙ্গে পরিচয় করিল ও তাহাদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করিবার ইচ্ছা জানাইল।

ঘরে আসিয়া মোহান টেবিলের উপরে ঢাকা দেওয়া রুটি ও মাংসের কিঞ্চিৎ আহার করিয়া বিছানায় শুইল। শোওয়া মাত্রই গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল। কর্ত্তব্যের শেষে ক্লান্ত দেহে গৌরবের নিদ্রা সে।

মোহানের যখন নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন জানালা দিয়া রোদ আসিয়া তাহার টেবিলের উপর পড়িয়াছে। দীর্ঘ আট ঘণ্টা নিবিড় সুষুপ্তির পর তাহার গত দিনের খাটুনি, রক্তহানি, দেহের উত্তেজনা, সমস্ত শুধরাইয়া গিয়াছে। প্রভাতের স্নিগ্ধ রৌদ্রতাপে তাহার স্নায়ুমণ্ডলী সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। সে দেহ হাল্কা বোধ করিল, তাহার চিত্ত প্রফুল্ল হইল।

প্রাতঃকৃত্য সারিয়া চা খাইতে খাইতে মোহানের হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল। ভাবিল, মাংস রুটির ফল দেখা দিয়াছে, গ্ল্যাণ্ডের 'ইন্‌টারনেল সিক্রেশন' জোরে চলিয়াছে,—যদিও গত রাত্রে মাংস রুটির অতি সামান্যই উদরস্থ করিয়াছিল।

মোহান যখন বাহিরে আসিল, তখন প্রভাতের মনোরম রোদে হাঁসপাতালটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। অপারেসন ঘরের কাচের উপর হইতে একটা শুভ্র জ্যোতি বিকীর্ণ হইতেছিল। নূতন লেকচার হলটার লাল টালি বসন্তের বনে কৃষ্ণচূড়ার মত আকাশের গায়ে রাঙিয়া উঠিয়াছিল।

প্রভাতের কোমল স্পর্শ রোগীদের রোগবাতনার লাঘব করিয়া একটা সহজ স্ফূর্ত্তির ভাব জাগাইয়াছে। কন্যামাতা তাহার নবজাত শিশুর পালনায় দোলা দিতেছে, পা-কাটা পুলিসের জমাদার বারান্দায় বসিয়া শিশুদের খেলা দেখিয়া হাসিতেছে। এপেণ্ডিক্স-বিহীনা স্ত্রীর পাশে বসিয়া তাহার গ্রেনে আগত স্বামী তাহাদের নূতন বাড়ীর সাজসরঞ্জামের বিষয় আলোচনা করিতেছে।

হাঁসপাতালের চেরিগাছগুলি ফুলে ফুলে ভরিয়া গিয়াছে। হাউসসার্জ্জনের বাড়ীর বাগানের বেলীলতার থোপে থোপে কলি আসিয়াছে, নিমের শাদা ফুলের পাপড়ি আর হলদে পাতা ইটের লাল রাস্তাটির উপর যেন মিনার কাজ করিয়া রাখিয়াছে।

পথে দুই এক জায়গায় দেখিয়া শুনিয়া মোহান যখন ২৭নং ঘরের দরজায় গেল, তখন হঠাৎ অবাক হইয়া দাঁড়াইল। দেখিল সে ঘরের সামনে আলেকজাণ্ডার দাঁড়াইয়া আছে, তাহার পাশে একটা 'স্প্রে' করিবার মেসিন। বারান্দার একধারে রেলিংএর উপর ঝুঁকিয়া তরুণী কালো নার্সটি দাঁড়াইয়া আছে। মোহানকে দেখিয়া সে মাথা তুলিল, তাহার কালো ডাগর চোকদুটি দিয়া ঝর ঝর করিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। সে রোরুদ্যমান মুখে রুমাল চাপিতে লাগিল, তাহার চক্ষুদুটি লাল হইয়া উঠিল।

আলেকজাণ্ডার মোহানকে সব খবর দিল। মধ্য রাত্রে নার্স রিপোর্ট করে, রোগিণীর জ্বর প্রবল, নাড়ী ক্ষীণ। ডাক্তার আসিয়া ইনজেক্‌শন দিয়া যায়। কিন্তু শেষরাত্রে রোগিণীর 'হার্টফেল' হইয়া যায়। আলেকজাণ্ডার বলিল, "অপারেশন খুব ভালই হয়েছিল, তবে ক্লোরাফর্ম্ম বেশী দিতে হয়েছিল, রোগিণী তার চোট সহ্য করতে পারেনি। এমন কেস্‌ হয়ে থাকে মাঝে মাঝে।" তারপর বলিতে লাগিল, "রোগিণীর অভিভাবক একজন অপদার্থ লোক, কিছুই করে উঠ্‌তে পারে না। নার্স বলছিল, মরে যাবার আধ ঘণ্টা পর পর্য্যন্তও সে মাথায় বরফই দিচ্ছিল!"

এ কথায় নার্সের রোরুদ্যমান, অশ্রুসিক্ত মুখখানি হঠাৎ অদম্য হাসিতে কুঞ্চিত হইয়া পড়িল!

আলেকজাণ্ডার বলিল, "ঘরখানি সত্বর খালি হওয়া দরকার, আর একজন রোগীকে এ ঘর দেওয়া হয়েচে, তার বেলা ন'টাতে অপারেশন।"

চম্পার অভিভাবক বন্দোবস্ত করিতে বাহিরে গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিলে মোহান তাহার সাহায্যে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেল। এক ঘণ্টার মধ্যে ২৭ নম্বরের ঘরটী খালি হইয়া, নানাপ্রকারের "ডিস্‌ ইন্‌ফেক্‌ট্যাণ্ট" দ্বারা শোধিত হইল, এবং নূতন শুভ্র চাদরে সজ্জিত হইয়া নবাগত রোগীকে গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিল।

৮

সেদিন মোহান যখন ঘরে ফিরিল তখন বেলা প্রায় দুইটা। সে হাতে ছোট একমুঠা কাগজ লইয়া ফিরিয়াছে। তাহার ভিতর হইতে বাহির হইল, গুটিকতক কার্ড-সাইজের ফোটোগ্রাফ—চম্পার শেষ অবস্থার। নিজের হাত-ক্যামেরাটি দিয়া সে এই ছবিগুলি তুলিয়াছে। চম্পার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধা করিয়া সে ফোটোর 'নেগেটিব'গুলি লইয়া এক পরিচিত ফোটোগ্রাফারের বাড়ী গিয়াছিল, সেখানে এতক্ষণ পর্য্যন্ত বসিয়া থাকিয়া তাহা "ডেভেলপ" ও "প্রিণ্ট" করাইয়া আনিয়াছে।

মোহান ছবিগুলি টেবিলের উপর রাখিয়া একে একে পরীক্ষা করিল। সেগুলির উৎকৃষ্টতা অনুসারে একের পর একটি রাখিল, তারপর খুলিয়া আবার দেখিল, আবার রাখিল।

তাহার মনের ভিতর শুধু জাগিতেছিল, শান্ত মধ্যাহ্নে মাঠের কোনে একটী ঘুঘুর নিবিড় প্রাণভরা ডাক,—আর একটা অজ্ঞাত, অস্পষ্ট অথচ গভীর ব্যথা। ছবিগুলি সামনে রাখিয়া মোহান বহুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। ধীরে ধীরে তাহার উজ্জ্বল চোখ দুটি জলে ভরিয়া আসিল।

এক ফোঁটা জল একখানা ছবির উপর পড়িয়া তার একদিক কতকটা ঝাপ্‌সাইয়া দিল। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া চোষ কাগজ আনিয়া তাহা চোষ করিল, এবং কাপড়ের খুঁটি দিয়া আবার মুছিল।

মোহান অতৃপ্তভাবে সে ছবিখানা দেখিতে লাগিল। হঠাৎ তাহার মনে কি একটা ভাবনা জাগিল। সে ট্রাঙ্ক খুলিয়া একখানা ছোট ছবির এলবাম বাহির করিল। ক্রিষ্টমাসে এক পাদ্রীসাহেব তাহা তাহাকে উপহার দিয়াছিল, তাহাতে সাধুসন্তের ছবি ছিল। মোহান একখানা একখানা করিয়া সবগুলি ছবি খুলিয়া ট্রাঙ্কে একটা বইয়ের ভিতর রাখিল। তারপর সে এলবামেতে চম্পার সবগুলি ছবি ধীরে ধীরে লাগাইল। ছবিগুলি লাগাইয়া এলবামখানা বন্ধ করিয়া টেবিলের ড্রয়ারে রাখিল। তাহার মনে একটা তৃপ্তি আসিল।

তখন হঠাৎ দরজায় কে করাঘাত করিল। দুই দরজার ফাঁক দিয়া বহু এসিড-ও-লোশন-রঞ্জিত দুইটি আঙুল ঢুকিল, ও সে ফাঁকটি কিঞ্চিৎ বিস্তৃত হইলে তার ভিতর আলেক্‌জাণ্ডারের ক্লান্ত, ঘর্ম্মাক্ত মুখখানা দেখা গেল। আলেক্‌জাণ্ডার বলিল, "মোহান আছ?"

মোহান ব্যস্ত সমস্তভাবে চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "হ্যাঁ, এস।"

আলেক্‌জাণ্ডার ঘরে ঢুকিয়াই বলিল, "মিস্ ঘোরগেরীকর। মিষ্টার মোহান।" বলিয়া তাহার পিছনে দাঁড়ানো মেয়ে-মানুষটির প্রতি চাহিয়া, "আমার বড্ড কাজ, যাচ্ছি" বলিয়া বাহির হইয়া গেল।

মোহান মুহূর্ত্তের জন্য বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া রহিল। দেখিল, এতক্ষণ যে ছবিখানা দেখিয়াছে, তারই জীবন্ত প্রতিকৃতি, সজীব, উজ্জ্বল নূতন হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে! সেই গভীর ডাগর চোক দুটি, কিন্তু শীর্ণ নয়, ম্লান নয়, পুষ্ট, নধর, গাঢ় গোলাপী। নাকটী তেমনই তীক্ষ্ণ, তবে কত কোমল, কত মাধুর্য্যমাখা! ঠোঁট দুটি তেমনই রেখার ন্যায়, কিন্তু ফুলের পাপড়ির মত মোলায়েম। তেমনই চিক্কণ কালো চুল, কিন্তু মুষ্টিমাত্র নয়, বড় খোপায় ঘাড়ের উপর জড় হইয়া আছে। কপালের উপর চূর্ণ-কুন্তল বিছাইয়া পড়িয়াছে! বক্ষোদেশ "দরিদ্রানাং মনোরথ ইব" নয়, নবযৌবনের গৌরবে দৃপ্ত! যেন মর দেহখানি কোন অমর লোকের বৈতরণীতে স্নান করিয়া স্বর্গীয় সুষমায় মণ্ডিত হইয়া আসিয়াছে!

মোহান চমকিতভাবে বলিল, "মিস্ ঘোরগেরীকর? চম্পা?"

তরুণী সলজ্জভাবে মোহানের চোকে চোকে চাহিয়া বলিল, "আমি মিস্ শারদা ঘোরগেরীকর। চম্পা আমার বড় বোন ছিল।"

মোহানের চমক ভাঙিল। সে বলিল, "আমায় ক্ষমা করবেন। আপনি বুঝি আহ্‌মদনগর থেকে এসেছেন?"

শারদা বলিল, "না, পুনা থেকে। আমি সেখানে কলেজে পড়ি। আমার টার্ম্ নষ্ট হবে বলে কাল আসিনি। কিন্তু আজ আসা বৃথা হ'ল।"

তাহার সুকৃষ্ণ পক্ষ্মরাজি জলসিক্ত হইল। সে একখানা ছোট রুমাল দিয়া চোক মুছিতে লাগিল।

মোহান দেখিল, চম্পা এম্‌নি করিয়া চোকের জল মুছিত, কাঁদিবার সময় এম্‌নি করিয়া তাহার ঠোঁট ভাঙিয়া পড়িত, নাসারন্ধ্র ফুলিয়া উঠিত!

শারদা বলিল, সে তাহার দাদার কাছে মোহানের উদারতার কথা শুনিয়া তাহাকে ধন্যবাদ দিতে আসিয়াছে। বলিল, "আমরা কোনোদিনও আপনার ঋণ শোধ কর্‌তে পার্‌বো না।"

মোহান লক্ষ্য করিল, শারদার কথার সুর চম্পারই মত, শুধু একটু বেশী সতেজ; যত করুণ তার চেয়ে বেশী মিষ্টি।

শারদা বলিল, "দাদার কাছে জান্‌লাম আপনি দিদির শেষ কালের কয়েকখানা ফোটো নিয়েছেন।"

মোহান বলিল, "হাঁ তবে সেগুলি ভাল হয় নি।"

শারদা বলিল, "আমি তার একখানা চাই।" বলিয়া তাহার দিকে যাচ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টি করিল। চম্পারই মত দৃষ্টি, তবে শারদার চোখদুটি টল-টলে, আর তাহার গালদুটী লজ্জায় অতিশয় লাল হইয়া পড়ে।

মোহান বলিল, "তা দেব'খন। আচ্ছা, আপনার দিদির কোনও ফোটো আছে,—অসুখ হ'বার আগেকার?"

শারদা বলিল, "আছে, একখানা। দিদি তখন সবে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেচে।"

মোহান বলিল, "তখন আপনার মত বয়স ছিল?"

শারদা বলিল, "হাঁা।"

মোহান বলিল, "তা হ'লে দেখ্‌তে অনেকটা আপনারই মত ছিল, বোধ হয়?"

শারদা মাথা নোয়াইল। বলিল, "সম্ভবতঃ। লোকে বলে আমাদের চেহারায় খুব সাদৃশ্য আছে।"

মোহান বলিল, "আমি শুধু কৌতুহলের জন্য বল্‌ছি, মাফ করবেন,—আচ্ছা বলুন তো, আপনার দিদি যখন সুস্থ ছিল, তখন লোকে আপনাদের দুজনার মধ্যে কা'কে বেশী সুন্দরী মনে করত?"

শারদা ঘাড় নোয়াইল। তাহার ঠোঁট দুটী ঈষৎ হাসিতে

কুণ্ঠিত হইল। সে সহজভাবে বলিল, "তা' আমি বল্‌তে পারি না।"

মোহান একটু বাধা পাইয়া বলিল, "আপনার স্বাস্থ্যটি বেশ; দেখ্‌বেন আপনার দিদির মত যেন তা' খুইয়ে না বসেন।"

শারদা বলিল, "আমার কোনোদিন অসুখ হয় না।"

মহান ড্রয়ার হইতে এলবামটি খুলিল। খুলিয়া তাহার ভিতর হইতে একটি ছবি তুলিল। বলিল, "এ ছবিতে আপনার দিদির প্রতি অন্যায় করা হয়। সে অসুখের সময়ও এর চেয়ে ঢের বেশী সুন্দর ছিল।—অবিশ্যি আপনার মত নয়।"

শারদা সলজ্জ হস্তে ছবিখানা হাতে লইল। লইয়া তার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি করিল। মুহূর্ত্তের তরে সেই তুচ্ছ কালীর ছাপটী যেন তার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইল।......

শারদা মোহানকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইল। বলিল, তাহার এবং তাহার দাদার অনুরোধ, মোহান যেন ছুটিতে একবার তাহাদের বাড়ীতে যায়।

মোহান স্থিরভাবে শারদার মুখের দিকে চাহিল। বলিল, "আচ্ছা মিস্ শারদা, আমি যদি আপনার কাছে কিছু চাই, আপনি তাহা দিতে স্বীকৃত হ'বেন কি?"

ইহাতে শারদার মুখ প্রথম গম্ভীর, তারপর ম্লান, তারপর লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিল।

মোহান বলিল, "আপনি তো বল্‌ছিলেন আমার কাছে আপনাদের ঋণ আছে?"

শারদার গাল দুটী রাঙিয়া উঠিল, চোখের দৃষ্টিতে বিদ্যুৎ খেলিল। কোমল ঠোঁট দুটি মেলিয়া বলিল, "মিষ্টার মোহান!"

মোহান বলিল, "আপনার দিদি ম্যাট্রিক পাশের পর যে ফোটোখানা তুলেছিলেন, তা' আমায় দিতে হ'বে।"

শারদা যেন মর্ম্মাহত হইল। নিজকে সাম্‌লাইয়া ধীর ভাবে বলিল, "আচ্ছা, তা পাঠিয়ে দেবো।" একটু থামিয়া বলিল, "আপনি যখন আমাদের বাড়ী আস্‌বেন, তখনই নিতে পারবেন।"

মোহান গম্ভীর স্বরে বলিল, "না" আমায় ক্ষমা করবেন, মিস্ শারদা। আপনার দিদি যদি বেঁচে থাকতেন, তা'হলে নিশ্চয়ই আস্‌তাম্। এখন সেকথা মনেও স্থান দিতে পারি না।"

শারদার চোখ দুটী অকারণ জলে ভরিয়া আসিল। সে মুহূর্ত্তকাল নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিল, "আমি এখন আসি।"

মোহান দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "গুড্ বাই।" শারদা চলিয়া গেল।

মোহান ভাবিল, "মেয়ের প্রতি ব্যবহারটা কেমন হইল? ওরকম সোজা 'না' বলাটা ঠিক হয় নি!"

ভাবিল, "ছিঃ, মেয়েমানুষের সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করিয়াছে! মনে করিল, আবার হস্পিটালে যাইবে, যোরগেবীকরদের খুঁজিয়া ৪৩৩-off করিয়া আসিবে।

কিন্তু কিছুই সংকল্প করিতে পারিল না। মনটা শুধু খুঁৎ খুঁৎ করিতে লাগিল। কতক্ষণ পরে নিজেকে আশ্বাস দিয়া, ঠোঁট বাঁকাইয়া বলিল,—"ধ্যাৎ! মেয়েছেলের ওসবই ব্যাপার। কে যাবে ওদের পেছনে? ওরা আমার কে? চম্পার সঙ্গে যে আমার রক্তের টান ছিল!"

শারদাকে একখানা ছবি দেওয়াতে এলবামের এক পৃষ্ঠা খালি হইয়া পড়িয়াছিল। মোহান পরের পৃষ্ঠার ছবিখানি সে পৃষ্ঠাতে আনিয়া লাগাইল, এবং একে একে পরের ছবিগুলি এক পৃষ্ঠা আগে আনিল। তারপর সবগুলি ছবি আবার উল্টাইয়া দেখিল। প্রথম ছবিখানা বাস্তবিকই প্রথম স্থানের উপযুক্ত কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ হইল, তখন তাহা তুলিয়া অন্য ছবিগুলির সঙ্গে তুলনা করিতে লাগিল। তুলনায় সে ছবিখানাই প্রথম বলিয়া সাব্যস্ত হইল। তখন সে তাহা আবার এলবামে লাগাইল, এবং এলবামখানা দুইহাতে ধরিয়া একবার নিকট হইতে আর একবার দূর হইতে ছবিখানা নিরীক্ষণ করিল। মোহানের চক্ষু তৃপ্ত হইল, সে হৃষ্টচিত্তে এলবামখানা বন্ধ করিয়া ট্রাঙ্কে পুরিয়া রাখিল।

তারপর 'শেল্‌ফ' হইতে একখানা 'এনাটমি'র বই নামাইয়া গম্ভীর অভিনিবেশের সহিত পাঠ করিতে আরম্ভ লাগিল।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বসু

সেই আমি

সেই আমি, আজো সেই আছি,
যদিও মাথার চুল একগাছি
নাই আর সেদিনের মত,
যে হাসি নিয়ত,
বলেছিলে আলো দিত তোমার ভুবনে,
সে আজ লুকায়ে এককোণে
আছে ভয়ে ভয়ে!
নিবু নিবু দীপ প্রতিক্ষণে।
আলোকের পরিহাস আঁধার নিলয়ে।

বাহিরে চাহিয়া মনে হয়,
এ কদিন বসন্তের যেই পরিচয়
পেয়েছিনু শুধু চোখ মেলে;
আজ সব ফেলে,
মনের গভীরে মোর নামায়ে ডুবারি
কিবা তার তুলিবারে পারি?
মুকুতার মত!
অঞ্জলিতে লবণাক্ত বারি
শুধু দেবতার পায়ে ঝরে অবিরত।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী

তবু বলি, হয়নি বদল

তবু বলি হয়নি বদল!
সে শুধু মুখের কথা? চিত্তশতদল
ঝরিয়া পড়েনি একেবারে,
বৃন্ত একধারে
বেঁচে আছে বুকে নিয়ে বীজ-কোষ তার।
লাবণ্যের সকল সম্ভার
গিয়ে থাকে যদি,
যার হাতে সুষমা আধার
গড়ি ওঠে, অমর সে আছে নিরবধি।

বলি তাই চেয়ে মুখ'পরে
বদল যা বাহিরে সকলে চোখে পড়ে,
মণিদীপ, মনের কোঠায়
জ্বলিতেছে ঠায়!
তারি আলো সুজনায় করেছে সুন্দর,
উজলি অন্তর গেহ আরতি আলোকে,
তুমি তাই চির মনোহর,
আমার বাসন্তী-ছবি আজো স্থির চোখে।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী

বিচিত্রা

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ



চিত্রশালা

বিশীর উড কট্ চিত্রাবলী















শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বিশী



নবীন কবি

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কিছুকাল পূর্ব্বে একবার যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের আহ্বানে ঢাকায় গিয়েছিলুম তখন বুদ্ধদেব বসুর লেখা একখানি কবিতা আমার হাতে পড়ে। সেই সময়ে তাঁর কিশোর বয়স। মনে আছে লেখাটি প'ড়ে আমার কোনো একজন সঙ্গীকে বলেছিলুম, এই কবিতায় ছন্দ ভাষা এবং ভাব গ্রন্থনের যে পরিচয় পাওয়া গেল তাতে আমার নিশ্চয় বিশ্বাস হয়েচে কেবল কবিত্ব শক্তি মাত্র নয় এর মধ্যে কবিতার প্রতিভা রয়েচে, একদিন প্রকাশ পাবে।

অনেক কাল থেকে কাগজপত্র পড়া আমি প্রায় ছেড়ে দিয়েচি। কেন, সে কথাটা একটু বিস্তারিত ক'রেই বলব। এর কারণ ঔদাসীন্য নয়, ব্যর্থ বিক্ষোভ থেকে নিজেকে বাঁচাবার ইচ্ছা। প্রশংসাবাক্যে খুসি হইনে মনের এমন অসাড়তা ঘটেনি তবু প্রশংসার লালসা থেকে মুক্তি পেয়েচি। কিন্তু সাহিত্যিক রূঢ়তা বা অসৌজন্যকে যাঁরা ডিমক্রাসির শৌর্য্যলক্ষণ ব'লে গণ্য করেন আমি তাঁদের দলের নই। অর্থাৎ শস্যক্ষেতে ফসলের চর্চ্চাকে কাঁটাগাছের স্পর্দ্ধার দ্বারা অবমানিত দেখ্‌লে অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ করি।

কিছুকাল থেকে সাহিত্যক্ষেত্রে কোমর বেঁধে এই কাঁটাগাছের আবাদ চলেচে। যে-জাতের লোকের চরিত্র দুর্ব্বল, তা'রা মানুষকে পীড়া দিয়েই বাহাদুরী করে। আমাদের দেশে বরযাত্রদের ব্যবহারে বাঙালী বহুকাল থেকে এই কাপুরুষতার পরিচয় দিয়ে এসেচে। যে-পক্ষ শত্রুপক্ষ নয়, কেবল মাত্র অপর পক্ষ, তাকে কটুবাক্যে ও উদ্ধত ব্যবহারে উৎপীড়িত অবমানিত করাকে তারা স্বপক্ষের জিৎ ব'লে মাতামাতি করতে ভালোবাসে। কে কাকে দু'য়ো দিতে পারলে এই নিয়ে তাদের আস্ফালন। অর্থাৎ কোন এক পক্ষের মাথা হেঁট হয়ে গেল এতেই ভারি খুসি। সে-পক্ষ অপরাধ ক'রেচে ব'লে নয়, সে-পক্ষ আমার পক্ষ নয় ব'লে, এমন কি, তার কোনো পক্ষীয় হবারই দরকার নেই। এই পীড়নের এই অবমাননার অভদ্রতায় দর্শকদেরও মহা আনন্দ। সে আনন্দের মূল্য শত্রুতায় নয়, কটুবাক্য সম্ভোগের এবং কারো অসম্মানের দৃশ্যটা দেখবার অহৈতুক পুলকে। আমাদের দেশ কবির লড়াইয়ের দেশ, তর্জ্জার দেশ, এদেশে নির্লজ্জ নিষ্ঠুরতায় মানুষকে অপমান করবার নৈপুণ্য কেবলমাত্র হতভাগ্য নিরপরাধ কন্যাকর্ত্তার ঘরে নয়, সাহিত্যের আসরেও জয়মাল্য সন্ধান করে। এই গ্রাম্যপ্রবৃত্তি আমাদের পলিটিক্‌স্‌কে কলুষিত করেচে এবং সকল প্রকার লোকানুষ্ঠানের মর্য্যাদা এবং অস্তিত্বকে পর্য্যন্ত শরশয্যাশায়ী করতে উদ্যত। নিঃসহায় মোরগ ও মেড়ার লাঞ্ছনায় যে আনন্দোচ্ছ্বাস নিঃশেষিত হ'লে অপেক্ষাকৃত লঘুতর অপরাধ হোত আমাদের সেই দুয়ো দেবার দুর্দ্দাম নেশাকে আমরা সকল উপলক্ষ্যেই ভোগ করবার চেষ্টা করি ব'লে বাংলাদেশে কোনো

বড়ো কাজই ভদ্রভাবে বেড়ে ওঠবার সুযোগ পেল না ; নিজের দেশের মানুষকে এবং কাজকে নিজের হাতে খর্ব্ব করবার সখ আমাদের কিছুতেই মিটতে চায় না। এই সখ্ বিছুটির মত গজিয়ে ওঠে, আমাদের রাষ্ট্রসভায় ধর্ম্মসম্প্রদায়ে, সাময়িক পত্রে, জনসেবাকর্ম্মে, ছাত্রদের হস্‌টেলে। আমাদের সাহিত্য-বিচারে মননবস্তুর দৈন্য যথেষ্ট, সেই অভাবকে ঢেকে দিই ছুঁয়ো দেবার উত্তেজক মসলায়। যাকে আমরা ভালো ব'ল্‌তে চাই তাকে ভালো ব'লেই আনন্দ পাইনে, তাকে পক্ষভুক্ত ক'রে নিই, এবং আর একজনকে প্রতিপক্ষ খাড়া ক'রে তবে আমাদের সখ মেটে। একজন গুণীর পরিচয়কে উজ্জ্বল করবার উপলক্ষ্যে আর একজনের প্রতিপত্তিকে ধূলিশায়ী করবার যে-উৎসাহ সে সাহিত্য নয়, সে সাহিত্যিক মোরগের লড়াই। এই লড়াইয়ে কোনোদিন আমি যোগ দিইনি, যদিও খোঁচা অনেক খেয়েচি।

সাহিত্যই যদি আমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হোত তা হ'লে এই কাঁটাবন দিয়েও চল্‌তে হ'ত। কিন্তু অকারণে বা তুচ্ছকারণে মনকে বিক্ষুব্ধ করবার অবকাশ দিলে জীবনকে সার্থকতা দেবার অবকাশ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সংসারে যে-ক্ষেত্রে ধূলি উড়িয়ে মল্লযুদ্ধ হয়, সে ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল কাটালুম্ এমন কি বঙ্গসাহিত্যে গঞ্জনহাটের মাঝখানে ব'সে সম্পাদকীও করেচি। আশা করি আমার ভাগ্যে যে ভোগ জমা ছিল এই দিয়ে তার ক্ষয় হয়ে গেছে। মেয়াদ আর বেশীদিন নেই অতএব এখন আমি ছুটি দাবী করতে পারি এবং একথা যদি কবুল করি যে, আধুনিক সাহিত্যিক হাটের রাস্তা দিয়ে চলা প্রায় বন্ধ করেচি তা হলে আমার এই সঙ্কোচ নিন্দার যোগ্য ব'লে কেউ মনে করবেন না।

এই সঙ্গে একথা বলাও দরকার যে, আধুনিক যে-লেখকেরা বাংলাসাহিত্যের ভিতর সভার আসন নিয়েছেন বা দ্বারে অপেক্ষা করচেন তাঁদের পরে আমার উপেক্ষা বা অবজ্ঞা নেই, তাঁদের বিরুদ্ধে কোনো সংস্কারকে প্রশ্রয় দিইনে। ক্ষণে ক্ষণে দৈবক্রমে গদ্যে বা পদ্যে তাঁদের যে পরিচয় আমার চোখে পড়ে তাতে অনেক স্থলেই আমি আনন্দ ও বিস্ময় বোধ করেচি। সেই কারণেই বারম্বার মনে এই দুঃখ লেগেচে, যে নূতনত্বের কোমরবাঁধা চেষ্টায় এবং বাঁধামতের গদীয়ান মহাজনীর বিরুদ্ধে স্পর্দ্ধা প্রকাশের প্রলোভনে নিজের শক্তির প্রতি আধুনিক লেখকেরা বুঝি বা অবিচার করচেন। মানুষের যে সমস্ত অসংযম সস্তাদামের, যাকে অল্প একটু নাড়া দিয়ে বিচলিত করতে অধিক শক্তির দরকার করে না, তা'ক দিয়ে পসরা তারাই সাজাক্, যাদের মূলধন পথের ধারে তাড়ির দোকানটুকু খোলবার মতো। তা ছাড়া যে নূতনত্ব বাহিরের ভঙ্গীতে, অর্থাৎ যা কেবল নূতনত্বের মুদ্রাদোষ, অল্পদিনেই সে নিজেও শ্রান্ত হয় অন্যকেও শ্রান্ত করে। বস্তুত জন্মকাল থেকেই তাকে জরায় পেয়েচে। যে নূতনত্ব ভঙ্গীতে নয় সঙ্গীতে, যা আপন ঐশ্বর্য্যের আন্তরিক্ অজস্রতাবশতই পুরাতনকে আত্মসাৎ করতে ভয় পায় না, তার মূল্য আকস্মিক বাজারদরের উপর নির্ভর করে না। সে চিরকাল নূতন ব'লেই পুরাতন।

বোধকরি মহাযুদ্ধের অপঘাতে বা অন্য গভীরতর ভূমিকম্পে য়ুরোপের ভিৎ ন'ড়ে গেছে। সেখানে সাহিত্যে শিল্পে সমাজে বাণিজ্যে আজ সর্ব্বত্রই যে একটা কষ্টকল্পনা দেখা যাচ্চে সেটাকে যদি আমরা উৎকর্ষের লক্ষণ মনে করি তবে প্রদীপের শিখার অন্তিম চাঞ্চল্যকেও তেলের প্রাচুর্য্যের লক্ষণ ব'লে মনে করা যেতে পারে। অনেক সভ্যতা য়ুরোপীয় শরৎকালের বনপল্লবের মতো মরবার আগে অতি প্রগল্‌ভ রং ফলিয়ে গেছে।

সেটাকে বসন্তের উপরে টেক্কা দেওয়া ব'লে কেউ যেন ধ'রে না নেন্। মাঝে মাঝে ভয় হয়েচে আমরা য়ুরোপের বর্ত্তমান কালকে চিরকাল ব'লে মেনে নেবার ভুল করচি।

যাই হোক্ বাংলাদেশের আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে বেশি কথা বলবার অধিকার আমার নেই। তার কারণ পূর্ব্বেই জানিয়েচি। দৈবক্রমে বুদ্ধদেব বসুর লেখার প্রথম যে পরিচয় পেয়েছিলুম তার থেকে আমার মনের মধ্যে এ বিশ্বাস ছিল যে, বাংলা সাহিত্যে নিঃসন্দেহ তিনি সম্মান লাভ করবেন। আগামীকালের সাহিত্যদৌবারিক যাঁরা, যথাযোগ্য আসনে তাঁকে এগিয়ে নিয়ে যাবার ভার তাঁদেরই পরে। টিকিট তাঁরাই দেখে নেবেন, আমরা বাইরে থেকে নমস্কার ক'রে বিদায় নেব।

সম্প্রতি দিলীপকুমার কয়েকটি কাঁচি-ছাঁটা পাতায় তাঁর আপন মন্তব্যের দ্বারা পরিকীর্ণ ক'রে বুদ্ধদেব বসুর ছয়টি কবিতা আমাকে পড়তে পাঠিয়েচেন। তার মধ্যে কয়েকটি কবিতা সবটা দেন নি। যে কয়টি ও যতটুকু কবিতা পাওয়া গেল প'ড়ে খুসি হলুম। খুসি হলুম্ বল্‌লে মনে হবে মুরুব্বিয়ানা করচি। কেননা যখনতখন ব্যবহারের ঘর্ষণে ঐ কথাটার ধার খ'য়ে গেছে। তবু বলতে হবে খুসি হওয়ার চেয়ে বড়ো দাম কবিতার পক্ষে আর কিছু নেই। এই রচনাগুলি জলভরা ঘনমেঘের মতো, যার ভিতর থেকে সূর্য্যের আলোর রক্তরশ্মি বিচ্ছুরিত। ভয় ছিল পাছে সৃষ্টিছাড়া নূতনত্বের গলদ্‌ঘর্ম্ম প্রয়াস দেখা যায়। সে দুর্লক্ষণ না দেখে আরাম পেয়েচি। কবিতাগুলিতে সহজ স্বকীয়তার গাম্ভীর্য্য ছন্দে ভাষায় ও উপমায় ঐশ্বর্য্যশালী।

যে কয়টি কবিতা আমার সামনে এসে পড়েচে তার বাইরে নিশ্চয় আরো অনেক লেখা আছে। হয়তো কেবলমাত্র এই লেখাগুলি নিয়ে সমগ্রভাবে কবির বিচার করা সঙ্গত হবে না। তাঁর হাতে যে যন্ত্রটি আছে তার কতগুলি তন্ত্র, তার কোন্ কোন্ পর্দ্দায় কত রকমের সুরের মীড় লেগেচে, তা বল্‌তে পারলুম না। যে লেখা কয়টি দেখ্‌লুম তার সমস্তগুলি নিয়ে মনে হোলো এ যেন একটি দ্বীপ। এই দ্বীপের বিশেষ একটি আবহাওয়া, ফল ফুল, ধ্বনি ও বর্ণ। এর সরস উর্ব্বরতার বিশেষ একটি সীমার মধ্যে এক-জাতীয় বেদনার উপনিবেশ। দ্বীপটি সুন্দর কিন্তু নিভৃত। হয় তো ক্রমে দেখা যাবে দ্বীপপুঞ্জ, হয় তো প্রকাশ পাবে উদার বিচিত্র মহাদ্বীপের "তমালতালীবনরাজিনীলা" তটরেখা। কিন্তু সৃষ্টিসম্বন্ধে করমাস চলে না। যা পাওয়া গেল সে যদি গজমুক্তার কৌটো হয় তবে আবদার করলে চলবে না কষ্টী কোথায়।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



সত্যাসত্য

শ্রীলীলাময় রায়

৬৭

উজ্জয়িনী কর্তব্য স্থির করতে পারছিল না। বাদল তার কেউ নয়। কাজেই এ বাড়ী তার বাড়ী নয়। এখানে যা ঘটছে ঘটুক, সে বাধা দেবার কে? কিন্তু বাদল ও কথা নিজ মুখে বলেনি, নিজে চিঠি লিখে জানায় নি। সুধী বাবুর কথাই কি চূড়ান্ত হতে পারে? তা যদি না হয় তবে উজ্জয়িনী এ বাড়ীর উপর থেকে অধিকার প্রত্যাহার করবে না, এখানেই থাক্‌বে এবং এর অনাচার সহ্য কর্‌বে না। মিসেস্ ত্যামুয়েল্‌স্‌কে সে আমন্ত্রণ করে নি, তিনি তার মায়ের পরামর্শে তার শ্বশুরের অতিথি এবং অতিথির যেটুকু প্রাপ্য তদতিরিক্ত পাবার দাবী রাখেন না। শাশুড়ীর অবর্তমানে উজ্জয়িনীই এ বাড়ীর গৃহিণী, অতিথি যেন সেটা স্মরণ রাখেন।

আবার তার চিন্তার ধারা ঘুলিয়ে যাচ্ছিল। অতিথি বটে, কিন্তু ইতিমধ্যে শ্বশুরের কাছে যেরূপ অভ্যর্থনা পেয়েছেন সেইরূপ চল্‌তে থাক্‌লে অচিরেই গৃহিণীর স্থান নিয়ে দ্বন্দ্ব বাধবে। তখন উজ্জয়িনীকেই সরে যেতে হবে। তখনকার লজ্জা থেকে সে বাঁচবে কেমন করে? বাপের বাড়ী চলে যাবে—কিন্তু সে বাড়ীতেও লজ্জা, সে বাড়ীতে তার শ্রীকৃষ্ণের অসম্মান। আচ্ছা, দেখা যাবে তখন। অত আগে থাক্‌তে ভেবে কি হবে! কোথাও যদি আশ্রয় না মেলে তবে ত ভালই, তবে ত প্রভু নিজেই তাকে আশ্রয় দেবেন তাঁর বৃন্দাবনে। মীরার মত সে গাইবে—

চাকর রহস্যুঁ বাগ লগাস্যুঁ
'নিত্ উঠ দরশন পাস্যুঁ'
বৃন্দাবন কি কুঞ্জ গলিন্‌মে
তেরি লীলা গাস্যুঁ।

আহা, সে কি জীবন, কি সৌভাগ্য! বৃন্দাবন! শ্রীবৃন্দাবন! নীপতমালতরুপুঞ্জিত কুঞ্জ, কালিন্দীর উজান গতি, অদৃশ্য রাখালের বেণুধ্বনি, চির বসন্তের গীতগন্ধরূপময় উৎসব। আহা!

উজ্জয়িনী ভাবে, মানব মানবীর ছদ্মবেশে এখনো সেখানে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধা শ্রীদাম সুদাম ললিতা বিশাখা চিত্রলেখা ইত্যাদি বিচরণ করছেন, কেবল চিনে নিতে পারলে হয়। ধবলী শ্যামলীর গোষ্ঠ হয়ত নেই, অঘাসুর বকাসুর পুতনা ইত্যাদি অবশ্য রূপকথা, কিন্তু যা শাশ্বত যা সাধকসাধারণ আবহমানকাল দিব্য-দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করে এসেছেন, যা জ্ঞানদাস গোবিন্দদাস বলরামদাসের যুগেও বিদ্যমান ছিল তা কি আজ না থাক্‌তে পারে! ঐতিহাসিক ঘটনা একবার ঘটে, ইতিহাসের মানুষ একবার জন্মায় ও একবার মরে, ইতিহাসের জগতে আরম্ভ ও সমাপ্তি আছে। কিন্তু ইতিহাস-রচয়িতার অগোচর একটা মায়ালোক আছে, তার সংবাদ যাঁরা রাখেন তাঁরা বলেন যে তার যৌবন অনাহত, তার অধিবাসীগণ অজরামর। এবং সেই মায়ালোক আমাদের এই পৃথিবীতেই ছদ্মবেশে অবস্থিত।

উজ্জয়িনী অতিথিকে যথাবিহিত সম্মান প্রদর্শন কর্‌ল, কিন্তু তাঁকে ঘনিষ্ঠ হতে দিল না। বেশীর ভাগ সময় নিজের ঘরে বন্ধ থাকে, বই পড়ে, ধ্যান করে, চিন্তা করে। হঠাৎ খেয়াল হলে নেমে গিয়ে বীণাদের বাড়ীর দরজায় টোকা মারে। বীণা দরজা খুলে দিলে কৈফিয়ৎ দেয়, "এক জায়গায় ঠেক্‌ছে। শ্রীমদ্‌ভাগবতে শ্রীরাধাকে বাদ দেওয়া হয়েছে কেন? কি তাঁর অপরাধ?" বীণাটা সত্যিই মুখ্‌খু। জন্মাবধি এই সব শুনছে, তবু এমন প্রশ্নের উত্তর জানে না, বোধ হয় কোনো প্রশ্নই তার মনে ওঠে না। তার শাশুড়ী ত স্পষ্ট বল্‌ছিলেন সে দিন, "আমরা সারা

জীবন চর্চা করেও বৈষ্ণব শাস্ত্রের যা জানিনে উজ্জয়িনী এই এক মাসের মধ্যে তা জেনেছে। পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতি আর শ্রীগোবিন্দের করুণা! নইলে এমন ত কখনো দেখা যায় না।"

মিসেস্ স্যামুয়েল্‌স্ উজ্জয়িনীর শিক্ষায় ও সামাজিকতায় সাহায্য করতে এসেছেন, তার শ্বশুরের চাটুবাক্য শুন্‌তে আসেন নি। তিনি এসে অবধি উজ্জয়িনীর নাগাল পাচ্ছেন না। সে খাওয়া দাওয়া করে নিজের ঘরে, মিসেস্ স্যামুয়েলসের সঙ্গে দেখা হলে বলে, "কেমন আছেন? রান্না পছন্দ হচ্ছে ত? ওবেলা আপনার কি কি ভাল লাগবে? আচ্ছা, আপনি স্যালাড্ ভালবাসেন কি?" এর পর বলে, "দেখুন আণ্টি, আমি পাগল মানুষ। আমার দোষ ধরবেন না। আমার নিগূঢ় সাধনায় আমি যে আনন্দ পাচ্ছি সেই আমার একমাত্র কৈফিয়ৎ।" মিসেস্ স্যামুয়েলস্ এর উপর বলবার মত কথা পান না। বিমর্ষ হয়ে যান। তিনি স্নেহপ্রবণ মানুষ। তাঁর সন্তানরা দূরে। এই মেয়েটিকে আপনার করতে পার্‌লে তাঁর সন্তানবিরহ উপশমিত হয়। কিন্তু দুজনের দুই স্বতন্ত্র ধর্ম্মমত। তিনি শুনেছেন কৃষ্ণ অত্যন্ত দুশ্চরিত্র ও কুটিল ব্যক্তি ছিলেন, মোটেই যীশুর মত নির্ম্মলচরিত্র না। হিন্দুরা যে কেন তাঁর মূর্ত্তি পূজা করে তা নিয়ে তিনি বিস্মিত এবং দুঃখিত হয়েছেন। শিক্ষিত ভদ্রলোকরাও তাঁকে সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেন নি। অথচ বিশুদ্ধ কুসংস্কার বলে অবজ্ঞা করতেও পারেন না। গীতার অনুবাদ তাঁকে স্থলে স্থলে আশ্চর্য্য করেছে। কিন্তু ওগুলির উপর নিশ্চয়ই খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রভাব পড়েছে। কেমন করে পড়েছে ও কবে পড়েছে তিনি বল্‌তে পার্‌বেন না। কিন্তু Farquhar সাহেব মিথ্যা বল্‌বার পাত্র নন্। যেমন করে হোক হিন্দুদের ধর্ম্ম যে লৌকিক কুসংস্কারের সঙ্গে খ্রীষ্টীয় তত্ত্বের সংমিশ্রণ এইরূপ একটা ধারণা মিসেস স্যামুয়েল্‌স তাঁর স্বামীর সমর্থনের সহিত পোষণ করে আসছিলেন।

অন্যান্য খ্রীষ্টান মিশনারীবংশীয়ার মত তাঁর ধর্ম্ম প্রচারের বাতিক ছিল না, তিনি অপরকে ভজান-র জন্য আহার নিদ্রা ত্যাগ করতেন না। তাঁর মনে কষ্ট হত এই বলে যে শিক্ষিত লোকেও স্বেচ্ছায় salvationএর সুযোগ হারাচ্ছে। তিনি মনে মনে সেই সব ভ্রান্ত আত্মার জন্য প্রার্থনা করতেন। কখনো কখনো তাদেরকে ধর্ম্মগ্রন্থ উপহার দিতেন। তাদের গায়ের রং কাল বলে তাঁর অবজ্ঞা ছিল না, থাক্‌লে কি তিনি কয়লা-কাল মাদ্রাজীকে বিয়ে করে স্বজন-পরিত্যক্ত হতেন? তিনি ভারতীয় খ্রীষ্টান ও ইউরোপীয় খ্রীষ্টানের মধ্যে পার্থক্য দেখতেন না এবং বর্ণবিদ্বেষী ইউরোপীয়দের প্রতি কুপিত ছিলেন। তারা যে "She has gone native" বলে তাঁকে আন্তরিক অশ্রদ্ধা করত এটা তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করেছিলেন, যদিও এর ফলে তাঁর সাংসারিক অসুবিধা তাঁর স্বামীর জীবিতকালে হয় নি। পক্ষান্তরে ভারতীয় খ্রীষ্টানরা তাঁকে দেবতার মত ভক্তি কর্‌ত। তারা যদি অত্যন্ত দরিদ্র ও ইউরোপীয় সাহায্য-পুষ্ট না হত তবে তারা তাঁকে সন্তানের শিক্ষা-ব্যয়ের জন্য হীদ্‌ন্-এর দ্বারস্থ হতে দিত না। তবে তাদের মনের কোণে অসম্ভবের আশাও ছিল—মিসেস স্যামুয়েল্‌সের ব্যক্তিত্বের দ্বারা যদি একটি হীদ্‌ন্‌কেও "ডুবন"—(baptism) পূর্ব্বক ত্রাণ করে!

সামুয়েল্‌স্-জায়া ভারতীয় বলেই নিজের পরিচয় দিতেন, যদিও পোষাকটির সম্বন্ধে তিনি ছিলেন ভাষাটির সম্বন্ধে যেমন—তেমনি ভীতু তেমনি গোঁড়া। পাছে হিন্দী বলতে ভুল হয়, লোকে হাসে। পাছে শাড়ীর পরণে খুঁৎ থেকে যায়, লোকে হাসি চাপে। Salvation Armyর মেয়েদের কাণ্ড ত তিনি দেখেছেন! সঙ্ আর কাকে বলে!

৩৮

ক্রমশঃ রায় বাহাদুরের অন্য মূর্ত্তি দেখা গেল। তিনি চাকর মহল লণ্ডভণ্ড করে ধমকে বেড়াতে লাগলেন। মেম সাহেবকে শুনিয়ে শুনিয়ে একটাকে বলেন, "এই উল্লুক, হামারা মকানমে ইত্‌না রোজ কাম কর্‌তা হায়, আবভিতক পাঁকচুয়ালিটি দুরস্ত নেহি কিয়া?" আর-একটাকে দেখতে না পেয়ে বলেন, "কাঁহা গিয়া সুয়ারকা বাচ্চা? উস্‌কো কহলসেল্, কব্ হোগা? মেম সাব্‌কা তক্‌লিফ্ হোতা রহা।"

ঘেউ ঘেউ করে পরকে তাড়া করে নিয়ে যাবার পর ভালকুত্তা যেমন প্রভুর পাবে ফিরে এসে ল্যাজ নাড়ে ও জিভ বের করে রায় বাহাদুর তেমনি মিসেস্ স্যামুয়েলসের চেয়ারের কাছে চেয়ার টেনে নিয়ে বসেন ও অকারণে হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ করেন। একজাতীয় মানুষ আছে তাদের হাসি অবিকল কুকুরের জিভ-বের-করা মাথা-কাঁপান চোখ জলজল-করা আনন্দজ্ঞাপনের মত।

মিসেস্ স্যামুয়েলস্‌কে তিনি নিজের ঘরটা ছেড়ে দিয়েছেন। উজ্জয়িনীরটাই ছিল সব চেয়ে বড় এবং সাজান ঘর। কিন্তু তাকে বেদখল করতে তাঁর সাহসে কুলায়নি। আই এম এস্ অফিসারের কন্যা, ওর দূর সম্পর্কের এক আত্মীয় এখন গবর্ণমেন্ট অব্ ইণ্ডিয়ার মেম্বার। উজ্জয়িনীকে তিনি ভয় এবং সমীহ করে থাকেন। তাকে পুত্রবধূরূপে পাওয়া তাঁর পক্ষে কত বড় সম্মানের বিষয়। তাই তাঁর ইচ্ছা থাকলেও উজ্জয়িনীকে তার ঘর থেকে নড়তে বল্লেন না।

মেম সাহেবকে বল্লেন, "ম্যাডাম, এ বাড়ীতে আপনার যারপর নাই অসুবিধা হচ্ছে জানি। কিন্তু আর দেরি নেই।"—হেঁ হেঁ হেঁ করলেন। ব্যাপারটাকে রহস্যময় করে তুলে তারপর সেই রহস্যের নিরাকরণ করলেন।—"আর দেরি নেই। দিন কয়েকের মধ্যেই ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট হিসাবে পাকা হব। তারপর উঠে যাব ম্যজিষ্ট্রেটের কুঠিতে। কিন্তু—"

ব্যাপারটাকে আর একটু ঘোরাল করার জন্য চশমার নীচে ও গালের ভাঁজে আর একবার হাসির লহর তুল্লেন। শালগ্রাম শিলার মত মাথার গড়ন। অর্থাৎ মাথার পিছনটা একটা ঢিবির মত। সেদিক থেকে কপালের দিকটা ঢালু। যৌবনকালে যখন চুলের জঙ্গল ছিল তখন এই অদ্ভুত চড়াই উৎরাই ঢাকা পড়েছিল। এখন কানের উপরকার দুটি ওয়েসিস্ ছাড়া বাকীটা মরুভূমি।

"কিন্তু পাটনাতে হয় ত রাখবে না, ম্যাডাম। ছোটখাট একটা জেলা দেবে। যথা, পুরী। পুরী গেছেন, ম্যাডাম? ···গেছেন? ঘোর পৌত্তলিক স্থান। ভাল লাগেনি নিশ্চয়।··· লেগেছে? হেঁ হেঁ হেঁ!···সমুদ্র কার না ভাল লাগে? বিশেষতঃ আপনার!"

মিসেস্ স্যামুয়েলস্ নীরব। বেশী কথা বলা তাঁর জাতীয় স্বভাবে নেই। অল্পকথা বলতে তিনি কুণ্ঠিত হচ্ছিলেন। বাক্যের অভাবে হাস্য বিধেয়। তাই সমস্তক্ষণ তাঁর মুখে মৃদু হাসির সল্‌তে জল্‌ছিল। তিনি স্বভাবত লজ্জাশীলাও বটে।

রায় বাহাদুর একতরফা বকে চল্লেন। "রিটায়ার করতে এখনো বছর সাতেক দেরি। কমিশনার হতে পারা খুব বেশী অবিশ্বাস্য নয়।" ওটুকু গদ্‌গদভাবে বল্লেন। যখন তিনি উত্তেজিত হয়ে ওঠেন তখন তাঁর গলার সুরের সঙ্গে নাকের সুর যোগ দেয়। "তবে ঐ যে হতভাগা স্বরাজিষ্ট-গুলো কমিশনার পদ তুলে দেবার ধুয়ো ধরেছে তার ফলে দেশের কি পরিমাণ ক্ষতি হবে সেটা ত ধীরভাবে বিবেচনা করছে না। বাস্তবিক, ম্যাডাম, কমিশনার পদ উঠে গেলে শান্তি ও শৃঙ্খলাও উঠে যাবে।"

স্যামুয়েল্‌স্-জায়া এদেশের শাসন প্রণালী সম্বন্ধে মোটামুটি এই জানেন যে বড়লাট ও প্রাদেশিক লাট ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশের সাহায্যে রাজকার্য্য চালান। কমিশনারের প্রয়োজন ও পদমর্য্যাদা তাঁর জ্ঞানের বাইরে। তিনি অজ্ঞতার পরিচয় দিতে না চেয়ে টিপে টিপে হাস্‌তেই থাক্‌লেন।

রায় বাহাদুর থাম্‌লেন না। কমিশনারের বেতন, নিজের বেতন, নিজের ব্যয় তালিকা, নিজের ব্যাঙ্ক্ ব্যালান্স্, আর একখানা মোটর কেনার আবশ্যকতা, নূতন কুঠির সাজসজ্জার কথা এইসব নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বক্ বক্ করলেন। অপিসের সময় হলে ঘটা করে আফশোষ জানালেন।—"একলাটি আপনার বড় কষ্ট হচ্ছে, গল্প করবার সাথীর অভাব, সে কি আমি বুঝ্‌তে পারিনে? অল্প-বয়সীদের সঙ্গে আমাদের মনের মিল হবে কেন? ওরা জীবনের কতটুকু জানে, কি-ইবা দেখেছে। খালি বুড় মানুষের মত নিরামিষ খেলে ও মালা গড়ালে হল!"—উত্তেজিত হয়ে নাকী সুরে বক্তব্য সমাপন করলেন।—"কোনো কোনো বুড়মানুষ আছেন তাঁদের লজ্জা নেই, অল্প-বয়সীর কানে পাকামির মন্ত্র দেন। নিছক ঈর্ষা—তাছাড়া আর কিছু নয়, ম্যাডাম। নিজের ছেলে বিলেত যেতে পারল না, আই সি এস হবার সুযোগ হারিয়ে দেরুণ টাকা

মাইনের লেকচারার হল, অতএব পরের ছেলের উপর শোধ তুলতে হবে সে বেচারার বৌকে বিগ্‌ড়ে দিয়ে। ধনী মানুষ কৃতী মানুষ দেখ্‌লে কারুর কারুর চোখ টাটায় কেন বল্‌তে পারেন? নানাদিক থেকে তাকে অসুখী করে তুলে তারপর বলা হয় কিনা, ধনের শাস্তি ও মানের সাজা বিধাতা দিয়েছেন। ধিক্‌ ধিক্‌ ধিক্‌!" (পাঠক ইচ্ছামত চন্দ্রবিন্দু বসিয়ে নেবেন।)

মিসেস্‌ স্যামুয়েলস্‌ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন। বুঝ্‌তে পারলেন না কার প্রতি কটাক্ষ করা হল।

মনের কথা খুলে না বল্লে মনের ব্যথা হাল্‌কা হয় না। বীণার শিক্ষা দীক্ষা হয় ত হাই স্কুল অবধি গেছে কিন্তু তার বুদ্ধির দৌড় ও কল্পনার গতি উজ্জয়িনীর সম-দূর নয়। উজ্জয়িনীর সমস্যা বীণার অভিজ্ঞতার বাইরে। তার জগতে সবাই সুখী, সকলে সপ্রেম। ব্যথা বড় জোড় বিরহব্যথা। দুঃখ সাধারণত রোগভোগের বা চাকরী না হবার দুঃখ। খেদ একমাত্র নিঃসন্তান রইবার খেদ। উজ্জয়িনী ইতিমধ্যেই বীণার অন্তর চিনে নিয়েছে। বোন হিসাবে বীণার তুলনা নেই। নিরহঙ্কার নিঃস্বার্থ নিরভিমান, সরলতার প্রতিমূর্ত্তি, স্নেহসেবার অবতার। কিন্তু সখা হিসাবে বীণা অচল।

বীণাকে সে বারম্বার পরীক্ষা করেছে, পাস্‌-এর সুযোগ দিয়েছে। কদমকুঁয়ার একটু দক্ষিণে রেলরাস্তা। রেলরাস্তা ছাড়িয়ে খাল ডিঙিয়ে পাকা সড়কের দু'ধারের বুনো ফুল তুলে বেড়ান উজ্জয়িনীর অপরাহ্নকালীন নিত্যকর্ম্ম। সেই সব ফুল দিয়ে মালা গেঁথে বীণাদের গোবিন্দজীকে ও নিজের শ্রীকৃষ্ণকে উপহার দেওয়া হয়। বীণা মাঝে মাঝে তার সহকর্ম্মী হয়। বীণাকে সঙ্গে না নিলে যে তার ভয় করে এমন নয়। উজ্জয়িনী মানুষকে ভয় করে না। কে তার কি করতে পারে? গায়ে হাত তুল্লে কান মলে দেবে। হাত চেপে ধরলে লাথি চালাবে। উজ্জয়িনী বীণার মত সরলা অবলা নয়। পিতার সঙ্গে টেনিস্‌ খেলেছে, শীকার করেছে, তার কব্‌জিতে পুরুষমানুষের কব্‌জির সমান জোর। সে শাড়ী পরে শাড়ীকে খাটো করে নিয়ে। তাই তার পক্ষে দৌড়ান অস্বচ্ছন্দ নয়, দৌড়ানর অভ্যাসও তার আছে। সে হাঁটে পুরুষমানুষের মত জোরে জোরে পা ফেলে। তার বাবার সঙ্গে সকালবেলা পায়ে হেঁটে বেড়ানর দরুণ সে সামরিক কায়দায় হাঁটতে অভ্যস্ত। বীণাটা নেহাৎ মেয়েমানুষ। হাঁটে যেন কেন্নোর মত crawl করতে করতে। মাথার কাপড় দিয়ে পুরুষ পদাতিকদের চোখে নিজেকে এত রহস্যাচ্ছন্ন করা কেন? ওরা প্রাণভরে চেয়ে দেখুক, দেখে হাসি পায় ত হাসুক, কান্না পায় ত কাঁদুক, পিছু ধরে ত ধরুক। যতক্ষণ না গায়ে হাত তুলেছে কিম্বা পথের বাধা হয়েছে ততক্ষণ ওরা নিরাপদ। তারপরে কিন্তু ওদের অপরাধের মার্জ্জনা নেই। উজ্জয়িনী বিনা দ্বিধায় ওদের খুন করে ফেলতে পারে। তার বৈষ্ণব ধর্ম্ম আততায়ীকে প্রশ্রয় দিতে বলে না, বল্লেও সে শুনবে না। শ্রীকৃষ্ণ যে কংসারি।

বীণাকে সঙ্গে নিয়ে যায় মনের বোঝা নামাতে। কিন্তু বীণাটা এমন নির্ব্বোধ যে ঠিক জায়গাটিতে সাড়া দেয় না। কথা উঠ্‌ল, "বিলেত দেশটা মজার। সেখানে যেই যায় সেই হয়ে যায় ভারি কাজের লোক।" এক্ষেত্রে বীণার বলা উচিত ছিল, "তাই নাকি ভাই উজ্জয়িনী? বাদলবাবু চিঠি লেখেন না প্রতি সপ্তাহে?" প্রশ্নটা শুন্‌লে উজ্জয়িনী সুদীর্ঘ উত্তর দিত। তার উত্তর শুনে বীণা হয়ত বল্‌ত, "বল, বল উজ্জয়িনী, কেন এমন হল? তুমি ত কোনো অপরাধ করনি? তুমি ত সুশ্রী স্বাস্থ্যবতী ও তন্বী। বিলেতের মেয়ের না হয় রং সুন্দর, কিন্তু তোমার যে মন সুন্দর, উজ্জয়িনী।" উজ্জয়িনীর চোখের বাষ্প জল হয়ে ঝরে পড়্‌ত। বীণা আঁচলের প্রান্ত দিয়ে ঝরা জল মুছে নিত, ঝরন্ত জলকে বাধা দিত। দুই সখীতে অনেকক্ষণ চুপ করে বাণীবিনিময় করা হলে বীণা বল্‌ত, "ভয় কি? বিরাট বিশ্ব, তারার মেলায় পৃথিবী একটা জোনাকি, সামান্য পার্থিব ব্যথা তোমাকে অভিভূত করতে পারে না, উজ্জয়িনী। তুমি বিশ্বদেবের পায়ে সুখদুঃখের পুষ্পাঞ্জলি নিক্ষেপ করে নিশ্চিন্ত হও।" কিম্বা বল্‌ত, "স্বামী সব নয়। স্বামীর চেয়েও যিনি প্রিয় যিনি নিকট, তিনি তোমার উপায় করবেন। ভাবনা কিসের?"

কিন্তু বীণা উজ্জয়িনীর কাল্পনিক বীণা নয়, কাজেই

মজার কথাটা শুনে বলে, "আমি জানি। আমার সেজকাকা যখন বিলেতে ছিলেন তখন ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা করছেন কিনা, তাই তাঁর চিঠি আস্‌ত দু'মাসে একবার। তা বলে উদ্বিগ্ন হওয়া তোমার সাজে না, উজ্জয়িনী। এবারকার মেলে না আসে আস্‌ছে বারের মেলে আস্‌বে, না এলে আমাকে বোলো।" তার ডাগর দুটো চোখে সরল বিশ্বাসের নিশ্চয়তা ব্যঞ্জিত হয়। উজ্জয়িনী মুগ্ধ হয়ে তাই দেখে, প্রসঙ্গটা চেপে যায়।

অন্য একদিন আমবাগানের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে বলে, "আচ্ছা, কে কার স্বামী কে কার স্ত্রী, এটা পূর্ব্ব জন্ম থেকেই স্থির হয়ে থাকে। না?"– একথা শুনে বীণা বলি বল্‌ত, "নিশ্চয়। বাদলবাবুর সঙ্গে যেদিন তোমার বিয়ে হল সেইদিন হঠাৎ তোমার ওকথা মনে হল। তারপর ধীরে ধীরে প্রত্যয় হল। কেমন? ঠিক্ বলেছি কি না, ভাই উজ্জয়িনী।" এর উত্তরে উজ্জয়িনী বিয়ের রাত্রের একটা স্মৃতি-সুরভিত বর্ণনা দিত। তার পরের সেই কয়েকটি পরম মহার্ঘ দিন সেগুলিকে বিস্মৃতির বৈতরণীর ওপার থেকে এপারে আন্‌ত। বীণার প্রশ্নকে উপলক্ষ করে নিজে আর-একবার সেই বিগত অবস্থার মধ্যে বাঁচবার স্বাদ পেত। বীণা তার বর্ণনা শুনে বল্‌ত, "এক জন্মে এর বেশী সুখ কেউ পায় না। তুমি যা পেলে তা অমৃত তার স্মৃতিও অমৃত, তার চিন্তা ত অমৃত-ই তার কল্পনাও অমৃত।" উজ্জয়িনীর সাধ যেত কাঁদ্‌তে। বীণার কোলে মাথা রেখে সে আমবাগানের নির্জ্জনতার মধ্যে অলস চরণে চল্‌ত, চল্‌তে চল্‌তে দাঁড়াত। আর-একবার অতীতের মধ্যে বাস করে নিত।

কিন্তু বীণা ত উজ্জয়িনীর মানসী সখী নয়, সে যা সে তাই। সে অতি সরল গন্ত। সে বল্ল, "শুধু এ জন্মে নয়, পরজন্মেও সেই একই স্বামীস্ত্রী। জন্মজন্মান্তরের সম্বন্ধ— যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ।" (ক্রমশঃ)

শ্রীলীলাময় রায়



প্রভাত সঙ্গীত

শ্রীযুক্ত যুগলকিশোর সরকার, বি-এ

রবীন্দ্র-সাহিত্য আজ বিশ্বচিত্তবীণায় এক অপূর্ব্ব ঝঙ্কার আনিয়া দিয়াছে, বিশ্ব-চেতনায় একটা আনন্দ-লোকের সৃষ্টি করিয়াছে। রবীন্দ্র-সাহিত্যের সহিত যাঁহারা সুপরিচিত তাঁহারা জানেন কি বিপুল সেই সৃষ্টি, কত বিচিত্র তাহার প্রকাশ, কত বিভিন্নমুখী তাহার গতি, কি অনুপম তাহার মাধুরী! মানব-চিত্ত স্বভাবতই অনুসন্ধিৎসু। তাই রবীন্দ্র-কাব্য-মহাক্রমের এই সার্থক পরিণতি দেখিয়া কাব্য-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রেই কিশোর কবির কাব্যে ও জীবনে সেই বীজের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন যাহা প্রথমে অঙ্কুরিত পরে পল্লবিত পুষ্পিত হইয়া ক্রমশঃ উৎকর্ষের বিভিন্ন স্তর-পর্য্যায় বাহিয়া আসিয়া আজ বিশ্বের মুগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। কবি তাঁহার বয়ঃসন্ধির বহুপূর্ব্ব হইতেই কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। 'জীবন-স্মৃতি'তে তিনি লিখিয়াছেন—"ভগ্ন-হৃদয় যখন লিখিতে আরম্ভ করি তখন আমার বয়স আঠারো।" 'কবি-কাহিনী', 'গাথা' 'বনফুল' প্রভৃতি কয়েকটি কাব্য, এবং 'রুদ্রচণ্ড' নাটক 'ভগ্নহৃদয়ের' পূর্ব্বের রচনা। এগুলিকে তাঁহার 'শৈশব-রচনা' আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। "য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র"ও "ভগ্ন-হৃদয়ের" সমসাময়িক রচনা। এই সব গদ্য ও পদ্য রচনা-বলীর মধ্যেও যথেষ্ট কবিত্ব শক্তির আভাস পাওয়া যায়। তবে যে উদ্দাম প্রেরণা কবির মর্ম্ম-চৈতন্যে প্রচ্ছন্নভাবে বর্ত্তমান ছিল তাহা প্রকাশলিপ্সায় চঞ্চল হইয়া উঠিল প্রথম এই "প্রভাত-সঙ্গীতে"। বস্তুতঃ কবির অন্তরতম সত্তা আনন্দ-বেদনায় এখানে এমনিধারা চঞ্চল যে প্রত্যেকটি কবিতার ভিতর দেখি একটা উদ্দাম গতি-বেগ, একটা চলমান ক্রিয়াশীল অবস্থা, একটা প্রাণশীলতা। "জীবন-স্মৃতিতে" কবির নিজের উক্তি হইতেও ইহার সত্যতা প্রমাণিত হয়। কবি লিখিতেছেন, "প্রভাত-সঙ্গীতে" আমার অন্তর প্রকৃতির প্রথম বহির্মুখ উচ্ছ্বাস, সেই জন্যে ওটাতে আর কিছুমাত্র বাচবিচার নাই।" সত্যই তাই। আঁধার এখানে যেন আলোকের পথে প্রথম তীর্থ-যাত্রী,—গুপ্ত যেন ব্যক্ত হইতে চায়, অস্ফুট স্ফুটতর হইতে চায়, নিষ্ক্রিয় ক্রিয়াশীল হইতে চায়। কবির অন্তরতম সত্তা এখানে যেন ধ্বনিময়, প্রাণময়, গীতময় সুন্দরতর কোন এক জগতকে প্রত্যক্ষ করিতে উদ্যত। অত্যন্ত এই সুন্দরী ধরণী তাঁহার নব-জাগ্রত ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া আরও অপূর্ব্ব হইয়া উঠিয়াছে। "জীবন-স্মৃতিতে" এবিষয়ে তিনি লিখিয়াছেন—"শিশুকাল হইতে কেবল চোখ দিয়া দেখাতেই অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিলাম, আজ যেন সমস্ত চৈতন্য দিয়া দেখিতে আরম্ভ করিলাম।" তাই আজ প্রকৃতির কক্ষে কক্ষে তাঁহার নিমন্ত্রণ;—তাই কবি আজ দৃশ্যে একটা লীলাময় রূপের, গন্ধে একটা অনির্দ্দিষ্ট মাদকতার, গানে একটা উদাত্ত সুরের আভাস পাইতেছেন।

"সহসা আজিকে জগতের মুখ
নূতন করিয়া দেখিনু কেন?"

যে-জগতের সহিত কবি শিশুকাল হইতে পরিচিত, সেই জগতের আকাশ যেন তাঁহাকে হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে, বাতাসে যেন পরিচিত অথচ বিস্মৃত কোন সুখস্পর্শ আবার নূতন করিয়া অনুভব করিতেছেন:—

"বাতাস যেন প্রাণের সখা,
প্রবাসে ছিল দুজনে দেখা
ছুটিয়া আসে বুকের কাছে
বারতা শুধাইতে"

বস্তুতঃ "প্রভাত-সঙ্গীত" লিখিবার সময় কবির মনোভাব ঐ প্রকারই ছিল। "জীবন-স্মৃতিতে" ঐ বিষয়ে কবির উক্তি এই প্রকার;—"তখনকার দিনে এই পৃথিবী-বস্তুটার রস কি নিবিড় ছিল সেই কথাই মনে পড়ে। কি মাটি, কি জল,"

কি গাছপালা, কি আকাশ সমস্তই তখন কথা কহিত ;— মনকে কোনমতে উদাসীন থাকিতে দেয় নাই।" কবির বিস্ময় কবির পুলক, কবির প্রেম, প্রভাত-সঙ্গীতের সর্ব্বত্র উদ্রিক্ত ও জাগ্রত দেখিতে পাই। সে প্রভাত কবির নিকট কত অপূর্ব্ব এবং কত বিস্ময়কর হইয়া উঠিয়াছে :—

"প্রভাত হ'ল যেই কি জানি হ'ল একি !
আকাশ পানে চাই কি জানি কারে দেখি !"

এ বিষয়ে কবি "জীবন-স্মৃতিতে" লিখিয়াছেন ;—"প্রত্যহ প্রত্যুষে ঘুম হইতে উঠিবামাত্র আমার কেমন মনে হইত যেন দিনটাকে একটা সোনালী-পাড় দেওয়া নূতন চিঠির মত পাইলাম। লেফাফা খুলিলেই যেন কি অপূর্ব্ব খবর পাওয়া যাইবে।" এইরূপ ভাবাবেশ কবির সতেরো বৎসর হইতে আরম্ভ হইয়া বাইশ তেইশ বৎসর পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিল।

তুচ্ছ একটি জিনিষ বা সামান্য একটি ঘটনাকেও তখন তিনি সামান্য মনে করিতে পারিতেন না। "জীবন-স্মৃতিতে" কবি লিখিয়াছেন, "রাস্তা দিয়া একজন যুবক যখন আরেক যুবকের কাঁধে হাত দিয়া অবলীলাক্রমে চলিয়া যাইত তখন সেটাকে আমি সামান্য মনে করিতে পারিতাম না।" পারিবার কথা নয়। বাহিরের বিশ্ব যে তাঁহার হৃদয়বৃত্তির বিচিত্র রসে সিক্ত, বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠিয়া একটি অপূর্ব্ব মানস-জগৎ সৃষ্টি করিয়া তুলিতেছে। তিনি তুচ্ছতম জিনিষের ভিতরেও একটা অন্তহীন অপরিমেয়তা, তুচ্ছতম ঘটনার ভিতর একটা অনন্ত সম্ভাবনার আভাস পাইতেছেন ;—

"একটি পাখীর আধখানি গান
জগতের গান গাহিল যেন।"

—"একটি পাখীর আধখানি গানের" ভিতর বিশ্বসঙ্গীতের এই যে আভাস, স্বল্প-পরিসর চেতনার মধ্যে বিশ্বচেতনার এই যে আশ্চর্য্য অনুভূতি ইহা ব্লেকের "To see the world in a grain of sand" এর মতই আমার নিকট প্রতিভাত হয়। এতদিন যে বিশ্বকে কবি খণ্ডাকারে অসম্পূর্ণভাবে দেখিয়া আসিতেছিলেন আজ তাহার অখণ্ডিত আকৃতি পরিপূর্ণরূপ দেখিতে পাইলেন।

"জগত আসে প্রাণে, জগতে যায় প্রাণ
জগতে প্রাণে মিলি গাহিছে একি গান।"

—ইহা একটা দিব্যানুভূতি। প্রকৃতির সহিত এই যে অখণ্ড ঐক্য, অন্তঃপ্রকৃতির সহিত বাহ্য প্রকৃতির এই যে নিবিড় যোগ, কবিচেতনার এই যে অন্তহীন পরিব্যাপ্তি, গোচরের ভিতর অগোচরের, সীমার মধ্যে অসীমের এই যে সার্থক উপলব্ধি—ইহার উপর কোন প্রকার সমালোচনা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। 'রবার্ট ব্রাউনিং' 'চসার' প্রভৃতি কবিগণের তুলনামূলক সমালোচনা প্রসঙ্গে মুগ্ধ সমালোচক উইলিয়াম স্যাভেজ ল্যানডার শেকসপীয়রের কবি-প্রতিভা সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য এক কথায় লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন :—

"Shakespeare is not our poet but the world's
Therefore on him no speech" !

এরূপ মন্তব্য কবির আলোচ্য উক্তি সম্বন্ধেও সবদিক দিয়া প্রযোজ্য হইতে পারে। আমার বক্তব্য এই যে ইহা কেবল একটি অলৌকিক কল্পনা বা ভাবানন্দ মাত্র নহে। অথবা একটা মধুময় আবেশ বা বিলাস বা বিভ্রম মাত্র নহে ; ইহা প্রত্যক্ষ অনুভূতির জীবন্ত, জলন্ত প্রকাশ, ইহাই শ্রেষ্ঠ কল্পকলা। ইহা কবিহৃদয়ের স্বতঃউৎসারিত সমগ্র প্রীতির ছন্দোময়ী হ্লাদিনী মূর্ত্তি !

ইহা সর্ব্বাঙ্গীন সত্য বস্তু। কবির জগতের ও কবির প্রাণের মিলিত কণ্ঠের এই যে অপূর্ব্ব সঙ্গীত ইহা সম্পূর্ণরূপে উপভোগের, অনুভূতির ও ভাবনার বস্তু। একের পক্ষে অন্যের ভিতর এ আনন্দ সঞ্চারিত করা সম্ভব নয়। মন উপভোগক্ষম হওয়া আবশ্যক, হৃদয়ের গ্রহণ-ক্ষমতা থাকা চাই, প্রশস্তি থাকা চাই, ঔদার্য্য থাকা চাই নতুবা এ আনন্দ উপলব্ধ হইতে পারে না। রূপের রসের শুষ্কগুলি মাপকাঠিতে এই অতীন্দ্রিয় অনুভূতিকে ঠিকমত পরিমাপ করিতে পারা যায় না। কথায় ঠিক কোনো জবাব দিতে পারা যায় না। বর্ণনা করার একটা সীমা (limits of description) বলিয়া ভাষশাস্ত্রে যে ইঙ্গিত আছে তাহা প্রলাপ বাক্য নহে। কবির জগতের ও কবির প্রাণের মিলিত কণ্ঠের এই অপূর্ব্ব সঙ্গীত—'লিপিকাতে' কবির কথায় পুনরাবৃত্তি করিয়া বলি —মাধবী ও মল্লার সেনের মিলিত কণ্ঠের গানের মত—"যেন

আকাশ ও পূর্ণচাঁদে কণ্ঠ মিলিয়ে গাওয়া।" বিশ্ব-সঙ্গীতের এই অপূর্ব গুঞ্জনধ্বনি শ্রবণে ধ্বনিত হয় মাত্র। ইহার 'আভাস পাওয়া যায় কিন্তু নাগাল পাওয়া যায় না।'

কবি-হৃদয় যে জগৎ ও প্রাণের এক অপূর্ব মিলন ক্ষেত্র! ধরণী ও আকাশ এখানে এক রমণীর যোগসূত্রে গ্রথিত হয়। সংসার ও পরমার্থ, প্রত্যক্ষরাজ্য ও ভাবরাজ্য, সান্ত ও অনন্ত এখানে সোনার রাখীবন্ধনে বাঁধা পড়ে। এখানে "আলো ছায়াকে কোলে তুলে নেয়, পূরবী বিভাসের গলা জড়িয়ে ধ'রে হাসে।" আবার এ মিলন এমন সহজভাবে ও স্বাভাবিক নিয়মে সাধিত হয় যে কোন ব্যবধান কাহারও চক্ষে পতিত হয় না,—এ যেন ফলে ফুলের স্বাভাবিক পরিণতি। মিলনের এই পরিপূর্ণ রূপেই সত্যের প্রতিষ্ঠা। সত্য ত্যাগ করিয়া কাব্য অসম্ভব। কবির পরিণত বয়সের "আবর্ত্তন" কবিতায় ছবি এখানে সুস্পষ্ট বিদ্যমান।

"ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে,
গন্ধ সে চাহে ধূপেরে রহিতে জুড়ে।

*　　*　　*

ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া
অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ,
সীমা চায় হ'তে অসীমের মাঝে হারা।

*　　*　　*

বন্ধ ফিরিছে খুঁজিয়া আপন মুক্তি
মুক্তি মাগিছে বাঁধনের মাঝে বাসা।"

দার্শনিকপ্রবর আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল বিগত ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংখ্য দর্শনের আলোচনা প্রসঙ্গে যে সুচিন্তিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন তাহার সারাংশ চল্লিশ বৎসর বা ততোধিক পূর্ব্বে লিখিত কবির "জগত আসে প্রাণে, জগতে যায় প্রাণ"র ভিতর নিহিত রহিয়াছে। আচার্য্য শীলের প্রবন্ধের কিয়দংশে আছে:— "Hindoo philosophers see centre in the circumference, circumference in the centre, part in the whole and whole in the part." অবশ্য কোন তত্ত্বপদার্থের প্রচার বা কোন বিশেষ সত্যকে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য কবি ঐরূপ লিখেন নাই। কবি লিখিয়াছেন তাঁহার সুতীব্র অনুভূতির প্রেরণায়, তাঁহার উদ্বেল হৃদয়ের স্বতঃউৎসারিত আনন্দের উচ্ছ্বাসে। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ বলেন,—"A poet sings because he must"—গান গাওয়া ভিন্ন যে তাঁর গত্যন্তর নাই। দেশ-কালপাত্রের প্রতিকূলতা বা পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনের কোন দৈন্য বা অপূর্ণতা তাঁহার উদ্ভিদ্যমান এই কবি-চেতনাকে চাপা দিয়া রাখিতে পারে না। শরীরী জীবের পক্ষে আহার-নিদ্রা যেরূপ অপরিহার্য্য কবির পক্ষে কাব্য-সৃষ্টিও সেই প্রকার। ইহাই তাঁহার কাজ, ইহাই তাঁহার কবি-ধর্ম্ম।

"যখন যা মনে আসে উঠিবি গাহিয়া
এই শুধু এই তোর কাজ।"

পরবর্ত্তী সময়ের "কবি হ'য়ে জন্মেছি ধরায়" কবিতার ভিতরও ঐ একই সুর ধ্বনিত। প্রকৃত কবির বাণী দৈব-বাণী, দৃষ্টি সত্যদ্রষ্টার দৃষ্টি। তাই কোন বিশেষ তত্ত্বের প্রকাশ বা বিশেষ সত্যের প্রতিষ্ঠা সাক্ষাৎভাবে কবির ইঙ্গিত না হইলেও পরোক্ষভাবে তাহা আপনা আপনি সম্পন্ন হইয়া যায়। কোনো তত্ত্বের প্রকাশ ও প্রচারই যদি কবির ইঙ্গিত হইত তবে "প্রভাত-সঙ্গীতে"র কবি বিষ্ণুশর্ম্মার ন্যায় বৈষয়-বুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া লিখিতেন,

"অলব্ধং চৈব লিপ্সেত, লব্ধং রক্ষেদবেক্ষয়া,
রক্ষিতং বর্দ্ধয়েৎ সম্যক্, বৃদ্ধং তীর্থেষু নিক্ষিপেৎ॥"

তিনি কখনও লিখিতেন না,

"আ-মরি মরি অমনি যদি
ফুলের মত ফুটিতে পারি;

*　　*　　*

ফুলের মত অমনি যদি
বিমল হাসি হাসিতে পারি।"

কি অনাবিল নিকলুষ প্রার্থনা!!!—পুষ্পের সৌন্দর্য্য, প্রভাতের প্রীতি, উদ্বেল হৃদয়ের অনাবিল নির্ম্মল হাসি প্রেম কিশোর কবির এই সুকুমার "গাথা"টির সহিত জড়াইয়া রহিয়াছে। এই সুপ্রিয় বাসনাটি ব্যাপিয়া প্রেম, আকাঙ্ক্ষা,

"অলৌকিক শোভা, সম্ভ্রম ও শুভ্রতা বিরাজ করিতেছে।" অথবা—

"পূর্ব্ব মেঘমুখে প'ড়েছে রবি-রেখা
অরুণ রথ-চূড়া আধেক দেয় দেখা।"

এখানেও অনাগত কিন্তু অচিরভাবী দীপ্তিমান মধ্যাহ্নের আভাস পাওয়া যাইতেছে।—"ভিতের প্রথম ইটখানিতেই গোটা বাড়ির কথা"।—বিশ্ব-কবির কবি-জীবনের সুপ্রভাতের এই পরম প্রার্থনা তাঁহার পরবর্ত্তী জীবনে অক্ষয় অক্ষরে পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। তাঁহার অমর কাব্যাবলী ফুলের অমল ও অনবদ্য সম্পদেই শ্রীসম্পন্ন হইয়াছে। "প্রভাত-সঙ্গীতের "সাধ" পরিণত বয়সের বহু কাব্য, উপন্যাস ও নাটকে মিটিয়াছে। প্রভাত-সঙ্গীতের ব্রত গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-নৈবেদ্য বলাকায় বরদমূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছে। কবির আত্মা যে ঊর্দ্ধলোকের আনন্দের আত্মীয়, কবি যে অমৃতের সন্ধানী, কবি যে সুদূরের পিয়াসী কবি যে সার্থক প্রেমিক—তাই কবি মানুষের প্রাকৃত-ধর্ম্ম ও প্রাকৃত প্রয়োজনের বহু বহু ঊর্দ্ধে। এবং সেই জন্যই পৃথিবীর এই ক্ষুদ্র আয়তন, ধরণীর স্নেহরস, ক্ষুদ্র লাভ ক্ষতি সুদূরের পিয়াসী তাঁহার ঊর্দ্ধগামী চিত্তকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে না। এই নিখিল ভূর্ভুবঃ স্বঃ যে তাঁহার আবাসভূমি। অকারণ পুলকে কবি তাই পুলকিত হইয়া ওঠেন অজানার উদ্দেশ্যে কবির মন তাই প্রধাবিত হয়। জীবনের কল্পনা-রঙিন এই মধুর কৈশোরে—"যখন কবির বয়সই কেবল আঠারো ছিলনা, আশেপাশের সকলের বয়সই যখন আঠারো ছিল"—তখন কবি ত একজন 'সিবিলিয়ান' বা জবরদস্ত ব্যারিষ্টার হইবার বা রাজা-মহারাজা খেতাব পাইবার রঙিন স্বপ্নে বিভোর হইলেন না, কবি বাঞ্ছা করিলেন ফুলের মত ফুটিতে!!!

"A poet is among us but not one of us"—ইংরেজ লেখকের এ উক্তি সর্ব্বাবয়বে সত্য। "What is fear, 'grandmama"—নেলসনের এই শৈশব-উক্তি হইতে যদি 'ট্রাফাল্গারের' বিজয়ী বীরের আভাস পাওয়া যায় তবে 'কৈশোরের মান-যশ-খ্যাতি-প্রতিপত্তির জন্য আকাঙ্খিত না হইয়া ফুলের অমল অনাবিল শ্রীর অধিকারী হইবার বাসনা হইতে ভাবী বিশ্বকবিকে কল্পনা করা যাইতে পারে না কি? ফুলের মত ফুটিয়া থাকিবার বাসনা কবির সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া বিদ্যমান রহিয়াছে।—"হুঁচ হ'য়ে না কোটাই, ফুল হ'য়ে ফুটি"—নিন্দুকের তীক্ষ্ণ সূচি মর্ত্ত্যের এই পারিজাতকে নিরঙ্কুশভাবে বিদ্ধ করিয়াছে, হাস্যমুখে তিনি তাহা সহ্য করিয়াছেন। "নিন্দুকের প্রতি নিবেদন" শীর্ষক কবিতায় তাঁহার কবিহৃদয় অঘস্র নিন্দামানির পঙ্ককুণ্ডে শ্বেতশতদলের মতই বিকশিত হইয়া রহিয়াছে।

"আকাশ পুরিয়া যাবে শেষ,
উঠিবে গানের মহাদেশ।
কবির গানের মাঝে বাস,
লইবরে গানের নিশ্বাস,
ঘুমাইব গানের মাঝারে,
ব'হে যাবে গানের বাতাস।"

"গানের রাজারই" উপযুক্ত উক্তি। কবির পঞ্চাশৎবর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে সুকবি ৺সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের রচিত কবিতার দুই চরণ মনে পড়ে;—

"বিশ্ব-কবি-সভায় মোরা তোমারই কবি গর্ব্ব
বাঙালী আজ গানের রাজা বাঙালী নহে খর্ব্ব।"

শেক্স্‌পীয়র ও তাৎকালিক নাট্যশালা সম্বন্ধে অনেক সমালোচক মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন;—"The blood of the theatre was in his veins." কবির প্রাগুক্ত কাব্য সম্বন্ধেও ঐ উক্তি সর্ব্বাবয়বে প্রযোজ্য হইতে পারে। বিশ্বসঙ্গীতের শাশ্বত ধারা কবিহৃদয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার অন্তরে একটা অমিয়সাগর রচিত হইতে চলিয়াছে। তাই আজ তাঁহার সমগ্র সত্তা, সমগ্র চৈতন্য ঐ বংশী-ধ্বনিতে পরিপূর্ণ। তাই তাঁহার মানস-জগৎ সর্ব্বত্র আজ গীতময়, বাণীময়, ছন্দোময়। কবির পরিণত বয়সের

(ক) "যে গান গাইতে আসা আমার
হয়নি সে গান গাওয়া"
বা
(খ) "গাবার মত হয়নি কোন গান"
বা
(গ) "সুরে সুরে বাঁশি পুরে
মোরে আরো আরো আরো দাও তান"—

প্রকৃতির ভিতর যে অতৃপ্তির বেদনা অনুভূত হয় তাহাতে অপূর্ণতা সূচিত হয় না। পরন্তু এই অনন্ত অতৃপ্তি পূর্ণতারই স্বরূপ। সমগ্রভাবে পরিপূর্ণ কোন জিনিষ বিশ্ব-প্রকৃতিতে পরিলক্ষিত হয় না। মানুষ অপূর্ণ বলিয়াই শ্রেষ্ঠ। কবি-চেতনার অভিব্যক্তির অনন্ত সম্ভাবনা আছে বলিয়াই শাশ্বত তাহার অসম্পূর্ণতা। কবিচিত্ত তৃপ্তিহীন;—তৃপ্ত হইতে পারে না, হইবে না। কিরূপে হইবে? কবি যে ইন্দ্রিয় দিয়া অতীন্দ্রিয়কে ধরিতে চায়, রূপের ভিতর রূপাতীতকে দেখিতে চায়, ক্ষুদ্রমিলনের ভিতর মহামিলনের অনুসন্ধান করে। তাই মিলনের ভিতরেও বিরহের ছায়াপাত হয়, একটা অতৃপ্তির বেদনা, না-পাওয়া-আরও একটা-কিছুর জন্য ব্যর্থতার ক্রন্দনধ্বনি শ্রুতিগোচর হয়। সার্থক রসভাবময়ী শ্রীরাধার প্রেম;—তাই পরিপূর্ণ মিলন-সম্ভোগের ভিতরও শ্রীরাধা দেহমনে বিরহ ও অতৃপ্তির বেদনা অনুভব করিয়াছিলেন।

"জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল
* * *
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেল।"

প্রেমাস্পদ সহজলভ্য যেখানে, প্রেমের তৃপ্তি যেখানে সহজ, সেখানে প্রেমের পূর্ণ পরিস্ফূর্ত্তি বা সমগ্রমূর্ত্তি দেখি না। প্রেম কেবলমাত্র আনন্দ নহে, আবার কেবলমাত্র বেদনাও নহে। আবার প্রেমের পূর্ণ পরিণতিতে এই দুইয়ের অপূর্ব্ব মিলনই পরিলক্ষিত হয়। তৃপ্তি সমাপ্তির গানই গাহিয়া থাকে, আরামকে দুর্ব্বহ করিয়া তোলে। আকাঙ্ক্ষা যেখানে তৃপ্ত হইয়াও চিরজাগ্রত, অন্তরের ক্ষুধার নিবৃত্তি হইলেও অন্তর যেখানে চির-বুভুক্ষু থাকিয়া যায় সেইখানেই ত প্রেমকে সার্থক সত্যে প্রতিষ্ঠিত দেখি। কবির পরিণত বয়সের একটি কবিতার ভিতর প্রেমের এই সমগ্র আনন্দ-রূপ দেখিতে পাই।

"অনাদি বিরহ-বেদনা ভেদিয়া
ফুটেছে প্রেমের সুখ
যেমনি আজিকে দেখেছি তোমার মুখ।
সে অসীম ব্যথা অসীম সুখের
হৃদয়ে হৃদয়ে রহে,
তাই ত আমার মিলনের মাঝে
নয়নে সলিল বহে।
এ প্রেম আমার সুখ নহে, দুখ নহে"

'প্রভাত-উৎসব' কবিতাটি একটি পরিপূর্ণ মহোৎসবের ছবি। ইহার ভিতর কোন অপূর্ণতা, কোন দৈন্য দেখি না। সর্ব্বত্র একটা দুনিয়া-ভোলা আনন্দ, একটা নিখিল-প্লাবী উচ্ছ্বাস দেদীপ্যমান। আবার ঐ আনন্দ, ঐ উচ্ছ্বাস এত উচ্চ গ্রামে উঠিয়াছে যে অলঙ্কার শাস্ত্রের "হাতে এখানে পানি পায় না।" অঙ্কশাস্ত্রের ভাষায় বলিতে হয়,—"Everything here has been raised to the nth power" আকাশ-বাতাস, গিরিনদী, পশুপক্ষী জড় চৈতন্য—সবের ভিতরই যেন একটা অপূর্ব্ব আনন্দ-লীলার উপলব্ধি হইতেছে। সবই যেন প্রাণে চৈতন্যে আনন্দে শুভেচ্ছায় পরিপূর্ণ;—সবই মধুময়

"তরুণ আলো দেখে পাখীর কলরব
মধুর আহা কিবা মধুর মধু সব।
মধুর মধু আলো মধুর মধু বায়
মধুর মধু গানে তটিনী বহে যায়।"

যে-প্রভাতের অপূর্ব্ব মাধুরী দেখিয়া বিশ্বের সমস্ত দৈন্য, গ্লানি, অপূর্ণতা অমঙ্গল ভুলিয়া গিয়া, বুকভরা "optimism" লইয়া কবি ব্রাউনিং—"All is right with this world"—বলিয়া উদাত্তস্বরে ঘোষণা করিয়াছিলেন সেই পরম প্রভাত আরও শত সহস্রগুণ রমণীয় হইয়া বিশ্ব-কবির মানস-চক্ষে প্রতিভাত হইয়াছিল। তাই তিনি এই মধু উৎসবের এমন মর্ম্মস্পর্শী বর্ণনা করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

"জীবন-স্মৃতি"তে কবি লিখিয়াছেন যে, যে-দিন তিনি "জল পড়ে, পাতা নড়ে" পড়িয়াছিলেন সেদিন তাঁহার সমস্ত চৈতন্য ব্যাপিয়া "জল পড়িয়াছিল ও পাতা নড়িয়াছিল!" 'প্রভাত-উৎসব' লিখিবার সময়ও ঐ 'গগন-ভরা প্রভাত' তাঁহার সমগ্র সত্তার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছিল এবং তাঁহার সমগ্র চৈতন্য প্রভাতের ঐ লীলাময় রূপে মন্ত্রমুগ্ধ ও মোহাবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। "বুকের মাঝে বিশ্বলোকের পাবি সাড়া" ... "হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি" ... "মুকুল কলির হিঁড়িয়া ভেদিয়া" প্রভাত ঐ

দিন কবির দৃষ্টিপথে তাহার অনবদ্য নবরূপ উদ্ঘাটিত করিয়াছিল এবং কবি সেই সত্য-সুন্দর প্রতিমাখানি তাঁহার অন্তর-দেউলে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন।

"নিজের গলা হ'তে কিরণ মালা খুলি
দিতেছে রবি দেব আমার গলে তুলি।"

কবির পরবর্ত্তী কাব্যে এই ছবি আরও পরিস্ফুট ;—

"তখনি হাসিয়া প্রভাত তপন
দিলেন আমারে টিকা—আমার
হৃদয়ে জ্যোতির টিকা।"

এদিকে "প্রভাত-সঙ্গীতে" দেখিতে পাই

"যেদিকে আঁখি যায় সেদিকে চেয়ে থাকে,
যাহারি দেখা পায় তারেই কাছে ডাকে,
নয়ন ডুবে যায় শিশির-আঁখি-ধারে
হৃদয় ডুবে যায় হরষ পারাবারে।"

কবির আনন্দ-রূপিণী অন্তর-প্রিয়া আলোক-মাতাল এই পরম প্রভাতেই তাঁহার ললাট চুম্বন করিয়া তাঁহার কবিজীবনের অভিষেক সম্পন্ন করিয়া গৌরব-মুকুট পরাইয়া দিয়াছিলেন। এইরূপ "প্রভাত-উৎসবের" প্রায় সর্ব্বত্র কবির প্রথম প্রাণের নবীনতা, প্রথম প্রাণের হর্ষ ও চঞ্চলতা পরিলক্ষিত হয়। বিশ্ব তাঁহার নব-জাগ্রত ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া অপূর্ব্ব হইয়া উঠিতেছে; সর্ব্বত্র একটা বাধাবন্ধহীন, গ্লানিহীন, প্রাণময় অবস্থা—আনন্দে লীলায়িত, আবেগে চঞ্চল। প্রথম প্রাণের ধর্ম্মই এই। জীব-জগতেও দেখিতে পাই শিশুর চঞ্চলতা ও উদ্দামতা যুবাপেক্ষা অধিক। শিশুর নিকট জগত অভিনব। তাই সে এই আশ্চর্য্য জিনিষটিকে দেখে তাহার সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়া, ইহার আনন্দ-রস পান করে তাহার অসংখ্য লোমকূপ দিয়া—"a child that feels its life in every limb—" কবিচিত্ত তাই অধীর, উদ্দাম। তাই আকাশ, বাতাস, মেঘ, জ্যোতিষ্কমণ্ডলী—সকলকে একে একে আহ্বান করিয়া তাঁহার অন্তর প্রাণের করুণ মিনতি দিয়া বলিতেছেন,

"আকাশ, এস এস, ডাকিছ বুঝি ভাই,
গেছি ত তোমারি বুকে আমি ত হেথা নাই।"

কোন "সারথির উধাও মনোরথে" কবিচিত্ত এরি মধ্যে আকাশ-পারাবারে পাড়ি জমাইয়াছেন।

"ওঠ হে ওঠ রবি, আমারে তুলে লও,
অরুণ তরী তব পূরবে ছেড়ে দাও।"

কবির "হৃদয় যে আকাশে উঠিয়া উষার মত হাসিতে চায়।" ঊর্দ্ধলোকের আলোকের আত্মীয় কবির আত্মা তাই ত ধরণীর শ্যামাঞ্চলের বন্ধনে পীড়া বোধ করিতেছেন :—

"আয়রে আয় বায়ু যা'রে যা প্রাণ নিয়ে
জগত মাঝারেতে দে যে তা প্রসারিয়ে।"

কবি 'শেলী' west-windকে উদ্দেশ করিয়া ঠিক ঐ কথাই বলিয়াছিলেন :—

"Make me thy lyre, even as the forest is.

Drive my dead thoughts over the universe
Like withered leaves to quicken a new birth!"

কবি-প্রতিভার কেন্দ্রাতিগ শক্তি অপরিসীম বৈচিত্র্যে আপনাকে শতধা বিস্তার করিবার চেষ্টা করিতেছে। "প্রভাত-সঙ্গীতে"র অন্যান্য কবিতার ভিতরও কবির প্রাণ এইরূপ অসামান্য পরিব্যাপ্তির জন্য ব্যাকুল। অল্পায়তন গৃহকোণ, অত্যন্ত আবেষ্টন ও সমাজ-সংসারের সঙ্কীর্ণতা হইতে মুক্তি লাভ করিবার জন্য কবিচিত্ত একান্ত উৎসুক :—

(ক) আঁধার কোনে থাকিস্ তোরা
জানিস কি রে কত সে সুখ
আকাশ পানে চাহিলে পরে
আকাশ পানে তুলিলে মুখ"

(খ) "অসীম আকাশে স্বাধীন পরাণে
প্রাণের আবেগে ছোটে,
পরাণ নাচিয়া ওঠে;"

(গ) "আজিকে বারেক ভ্রমরের মত
বাহির হইয়া আয়,
এমন প্রভাতে এমন কুসুম
কেনরে শুকারে যায়।"

কবির পরবর্ত্তী কাব্যে এই ভাব আরও পরিস্ফুট। মানব জীবনের বৃহত্তর সার্থকতাকে লক্ষ্য করিয়া বাঙালী

জীবনের সুদ্রব-পদুর ও নির্জীবত্ব পরিহার করিতে তিনি আরও মুক্তকণ্ঠ ;—

নিমেষ তরে ইচ্ছা করে বিকট উল্লাসে
সকল টুটে' যাইতে ছুটে' জীবন-উচ্ছ্বাসে।
শূন্য ব্যোম অপরিমাণ মত্ত সম করিতে পান,
মুক্ত করি' রুদ্ধ প্রাণ ঊর্দ্ধ নীলাকাশে !
থাকিতে নারি ক্ষুদ্র কোণে আম্রবনে ছায়ে
সুপ্ত হ'য়ে লুপ্ত হ'য়ে গুপ্ত গৃহবাসে।"

কবি অন্যত্র বলিয়াছেন,—"জগতের যতটা জ্ঞানের দ্বারা আমি জানিব, হৃদয়ের দ্বারা পাইব ততটা আমারই ব্যাপ্তি, আমারই বিস্তৃতি। জগৎ যে পরিমাণে আমার অতীত সেই পরিমাণে আমিই ছোট। সেই জন্য আমার মনোবৃত্তি, হৃদয়বৃত্তি, আমার কর্ম্মশক্তি নিখিলকে কেবলি অধিকার করিবার চেষ্টা করিতে থাকে।" এমনি করিয়া আমাদের সত্তা সত্যে ও শক্তিতে বিস্তৃত হইয়া উঠে। "সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়"—ভিক্টর হিউগো বলিতেন,—"সেই কবিতাই প্রকৃত কবিতা, তাহাই কবিতার শিরোমণি যাহার মধ্যে পাই একটা বৃহতের ভাব—"Immensité"—বিশালতা, বিপুলতা। যদি ইহাই কাব্য-বিচারের প্রকৃত তুলাদণ্ড হয় তাহা হইলে আলোচ্য কবিতাটি "প্রভাত সঙ্গীতের" কবিতাগুলির মধ্যে একটা উচ্চ স্থান অধিকার করিবে। ইহার ভিতর আছে অসীমের অভিব্যঞ্জনা, অনন্তের বিস্তার, বিশ্বপ্লাবী তরঙ্গোল্লাস। তমসাবৃত অনন্ত মহাশূন্যে ব্রহ্মার ধ্যান-মৌন সমাধি, তাঁহার অনন্ত হৃদয়ে অনাগত কিন্তু অচিরভাবী ভ্রূণ জগতের স্থাণুবৎ নিশ্চল অবস্থা, রহস্যময় গর্ভগৃহ হইতে স্পন্দমান প্রথম প্রাণের উন্মত্ত ব্যাকুলতা, অসীম অনবচ্ছিন্ন বিশ্বচৈতন্য হইতে উৎসারিত বেদগানের উদাত্ত সুর—এ সমস্তই এক আশ্চর্য্য বিপুলতায়, বিশালতায় পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। কবির দৃষ্টি এখানে সমাজ-সংসার-রাষ্ট্রের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নহে। কবির ভাবপুঞ্জ কোন জাতিবর্ণের বিভেদে, কোন আচার-অনুষ্ঠান-সংস্কারের অনুশাসনে শাসিত হয় নাই ;—কবি তাঁহার দিব্যদৃষ্টির অনুভূতি প্রলয়ে দেখিয়াছেন আদি স্রষ্টার "বিশ্বরূপ!" তিনি এখানে গাহিয়াছেন বিশ্বগান, গাহিয়াছেন বিশ্ববাক্, সৃষ্টি করিয়াছেন ভাব ও রূপের একটা মহাসমুদ্র।

অসংহত জ্যোতি, পিণ্ড সমূহের অনন্ত ব্যোমপথে অবস্থিতি, গ্রহে গ্রহে, নক্ষত্রে নক্ষত্রে, চন্দ্রে সূর্য্যে, বাষ্পে বাষ্পে, প্রেমে পুলকে বিলাসে আলিঙ্গন—যেন আনন্দের একটা বান ডাকিয়াছে।

"কি করিবে আপনা লইয়া
যেন তাহা ভাবিয়া না পায়—
আনন্দে ভাঙিয়া যেতে চায়।
যে প্রাণ অনন্ত যুগ রবে
সেই প্রাণ পেয়েছে নূতন
আনন্দে অনন্ত প্রাণ যেন
মুহূর্ত্তে করিতে চায় ব্যয়।"

"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে"—উপনিষদের ইহা সার্থক উক্তি। নব-সৃষ্টির এই উন্মাদ আবেগ-চঞ্চলতার মাঝখানে বিষ্ণুর মন্ত্রপাঠ ও শঙ্খধ্বনি ;—সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড কল্লোল স্তব্ধ হইল, অসংযত উচ্ছ্বাস নির্ব্বাপিত হইল। সৌন্দর্য্য ও মঙ্গলের অপরূপ লীলা-বিলাসের ভিতর দিয়া সমাজ-সংসার গড়িয়া উঠিল—ব্রহ্মার অবচ্ছিন্ন, বিশৃঙ্খল ধ্যানগুলি ছন্দের বন্ধনে "জগতের মহা বেদব্যাস" শৃঙ্খলিত করিলেন ;—'কাব্যের কথা ধরা পড়ে যথা ছন্দের বাঁধনে'—উচ্ছৃঙ্খল সৃষ্টি মিলন ও মৈত্রীর ডোরে আবদ্ধ হইল। জগতের মর্ম্ম এখন প্রেমরসসিক্ত, প্রাণ এখন স্থিতিশীল, মন সুন্দরের জয়-ধ্বনিতে পরিপূর্ণ :—

"পৃথিবীর সমুদ্র-হৃদয়
চন্দ্রে হেরি উঠে উথলিয়া
পৃথিবীর মুখ পানে চেয়ে
চন্দ্র হাসে আনন্দে গলিয়া॥

মিলনের কি অপূর্ব্ব পূর্ব্বাভাস! পিপাসিত অন্তরের বাঞ্ছিতের প্রতি কি নিবিড় আকর্ষণ !! যে-আকর্ষণের প্রভাবে কালিদাস গিরি-নদী-নগরের ব্যবধানকে উপেক্ষা করিয়াছিলেন, আলোচ্য ক্ষেত্রে সেই আকর্ষণের প্রভাবেই বিশ্বকবি অনন্ত মহাশূন্যকে অস্বীকার করিয়া বিভিন্ন জ্যোতিষ্ক লোকের মধ্যেও এ আকর্ষণের প্রভাব স্বীকার করিয়াছেন।

"জগতের মুখ পানে চেয়ে
লক্ষ্মী যবে চাহিলেন হাসি
মেঘেতে ফুটিল ইন্দ্রধনু
কাননে ফুটিল ফুল রাশি"

প্রেমের কি মহনীয় মূর্ত্তি! সৌন্দর্য্য ও মঙ্গলের ভিতর দিয়া কি সার্থক বিকাশ, কি সহজ প্রতিষ্ঠা!!

"একি হেরি যৌবন উচ্ছ্বাস
একি রে মোহন ইন্দ্রজাল
সৌন্দর্য্য কুসুমে গেল ঢেকে
জগতের কঠিন কঙ্কাল"

শান্ত, স্নিগ্ধ, সুন্দর ছন্দোবদ্ধ সৃষ্টি, নিয়ম-কানুন ও শাসন-সংযমের বিবিধ প্রাকার বেষ্টিত সৃষ্টি" কালের তমিস্র ভেদ করিয়া যুগ যুগান্ত বাহিয়া চলিতে লাগিল। ক্রমে শান্তির আরাম দুর্ব্বহ হইয়া উঠিল, নিয়মের গুরুভারে সৃষ্টির প্রাকৃত প্রাণ আড়ষ্ট হইয়া পড়িল, বন্ধনের বিপুল বেদনায় সৃষ্টি একটা ক্রন্দনধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। ইহাই যে শাশ্বত নীতি, বিবর্ত্তনের ইহাই যে অনিবার্য্য বিধান। ধ্বংস না হইলে যে নবজীবনের পত্তন হয় না, নবসৃষ্টির আনন্দ-রূপ দেখিতে পাই না। গোধূলির রক্তিম চিতায় দিবসের শুভ্র পরিসমাপ্তি হয় বলিয়াই আবার নবীন সূর্য্যোদয়ে প্রভাত নবজীবনের দীক্ষা গ্রহণ করে, শীতের উসর বক্ষে বীজ সমাহিত হয় বলিয়াই বসন্তে নব মঞ্জরীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। ইংরেজ কবি টেনিসন্ তাই বলিয়াছেন;—

"The old order changeth yielding place
to new
Lest one good custom shall corrupt the
world"

কবি তাই যথার্থ ই বলিয়াছেন,—

"যাও শেষ মরণ সঙ্গীত
পাব তোমা নূতন জীবন!"

কবি শেলীর উক্তিরও অনুরূপ সুর ধ্বনিত হয়;—

"If winter comes
Can spring be far behind?

তাই প্রলয়-পিনাক গর্জ্জিয়া উঠিল। সৃষ্টির স্নিগ্ধ শান্তমধ্যে প্রজ্বলিত ধূমকেতুর ন্যায় রুদ্র আবির্ভূত হইলেন—যেন ধ্বংসের মূর্ত্ত বিগ্রহ। রবি শশী গ্রহতারা কক্ষচ্যুত হইয়া পরস্পরের সহিত ঘাত-প্রতিঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। আকাশের অনন্ত হৃদয় ধূর্জ্জটির জটাবিক্ষোভে আলোড়িত, প্রচণ্ড নর্ত্তনে কম্পমান প্রলয়-বহ্নিশিখায় প্রধূমিত। বিপুল সৃষ্টি রেণু রেণু হইয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল!—রহিল কেবল প্রলয়াগ্নির অনির্ব্বাণ দীপ্তি। অনলের ঐ মহা-সমুদ্রে মহাদেব আবার সমাধিস্থ হইলেন। আলোচ্য কবিতাটিতে একটি জিনিষ লক্ষ্য করিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইবার যথেষ্ট কারণ আছে। জগতের আদি-সৃষ্টি বিষয়ে আমাদের শ্রৌত ও স্মার্ত্ত উক্তির সহিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের এমন অপরূপ সঙ্গতি স্বপ্ন ও সত্যের এমন সমন্বয় আর কুত্রাপি এমন অপরূপ কাব্যরসের মধ্যে সার্থক হইয়া উঠে নাই।

*   *   *   *

"অনন্ত জীবন" ও "অনন্ত মরণ"—কবিতা দুইটিকে পরস্পরের অনুপূরক কবিতা বলাই সঙ্গত মনে করি। একটিকে ছাড়িয়া দিলে অন্যটি যেন অসম্পূর্ণ বলিয়া মনে হয়। জীবন ও মরণ এই দুইটি গভীর রহস্যময় জিনিষ কবির নিকট নূতন রূপে রূপায়িত হইয়াছে। মরণকে কবি বিভীষিকার আধার রূপে কল্পনা করেন নাই; সত্যদ্রষ্টা কবি মরণের ভিতরেও অমৃতের সন্ধান পাইয়াছেন। জীবন ও মরণ তাঁহার নিকট যেন একটা জিনিষেরই নামান্তর মাত্র:—

"জীবন যাহারে বলে মরণ তাহারি নাম,
মরণ তো নহে তোর পর!
আয় তা'রে আলিঙ্গন কর,
আয়, তার হাতখানি ধর।"

কবি পরবর্তী জীবনে মরণকে আরও নবতর মোহনরূপে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়াছেন। কিন্তু যৌবনের উন্মেষেই এতখানি তত্ত্বজ্ঞান, সত্যের এমন সার্থক উপলব্ধি যথার্থ ই বিস্ময়কর। পরবর্ত্তী কালের কবি মৃত্যুকে প্রেমাস্পদের মত দেখিয়াছেন, বাঞ্ছিতের বেশে দেখিয়াছেন। মৃত্যুর আগমনী তাঁহার নিকট নূপুরের গুঞ্জন-ধ্বনির মত বোধ হইয়াছে।—

(ক) "মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান—"

(খ) "তুমি মোর জীবনের মাঝে
মিশায়েছ মৃত্যুর মাধুরী"

(গ) "বরণ ডালা গাঁথা আছে
আমার চিত্তমাঝে
কবে নীরব হাস্ত মুখে
আসবে বরের সাজে ?
* * *
মিলন হবে তোমার সাথে
একটি শুভদৃষ্টি পাতে
জীবন বধূ হবে তোমার
নিত্য অনুগতা"।

(ঘ) "পাঠাইলে আজি মৃত্যুর দূত
আমার ঘরের দ্বারে ;
* * *
আজি এ রজনী তিমির আধার
ভয় ভারাতুর হৃদয় আমার
তবু দীপ হাতে খুলি দিব দ্বার
নমিয়া লইব তারে।"

(ঙ) "ভরা আমার পরাণখানি
সম্মুখে তার দিব আনি'
শূন্য বিদায় কর'ব না ত উহারে"।
* * *
এত দিনের সব আয়োজন
চরম দিনে সাজিয়ে দিব উহারে।"

(চ) "রাজার বেশে চলবে হেসে
মৃত্যুপারের সে উৎসবে।"

মরণের ইহা অপেক্ষা মোহিনী মূর্ত্তি কোন ভাবুক কোন কবি কল্পনা করেন নাই। একজন জার্ম্মাণ সমালোচক এ বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন তাহার ইংরাজী অনুবাদ এই প্রকার —"To him, death is an exciting adventure"। মহাকবি শেকস্‌পীয়র মরণের যে ছবি অঙ্কিত করিয়াছেন তাহাতে ত নরকের বীভৎসতা, নরকের নৈরাশ্য, ভীতি ও বিষাদের ছায়াপাতই দেখিতে পাই।

(a) "* * * the delighted spirit
To bathe in fiery floods or to reside
In thrilling regions of thick-ribbed ice,
* * * * 'tis too horrible."

(b) "The undiscover'd country from whose bourn
No traveller returns."

জন্মান্তরবাদে কবির অচঞ্চল আস্থা। মৃত্যুকে তিনি জীবনের শেষ যবনিকা মনে করেন না। মৃত্যু তাঁহার নিকট অনন্ত জীবন নাট্যের একটা অঙ্কের পরিসমাপ্তি মাত্র। কাজেই মৃত্যুকে তিনি জীবনের সহজ, সরল এবং স্বাভাবিক ঘটনাই মনে করেন। ইহার ভিতর কোন অস্বাভাবিকতা বা আকস্মিকতা তিনি দেখেন না। কবির পরবর্ত্তী কাব্যে এ ভাব আরও পরিস্ফুট ;—

(ক) "এ আশ্চর্য্য বিশ্বলোকে জীবনের বিচিত্র গৌরবে
মৃত্যু মোর পরিপূর্ণ হবে—"

(খ) "ওগো আমার এই জীবনের
শেষ পরিপূর্ণতা—
সারাজীবন তোমার লাগি,
এতদিন যে আছি জাগি,
তোমার তরে বহে বেড়াই
দুঃখ সুখের ব্যথা—"

(গ) "জীবনে যা' প্রতিদিন
ছিল মিথ্যা অর্থহীন
ছিন্ন ছড়াছড়ি,
মৃত্যু কি ভরিয়ে সাজি
তা'রে গাঁথিয়াছে আজি
অর্থ পূর্ণ করি।"

কোন কবিই আজ পর্য্যন্ত সেই আনন্দ-লোকের সন্ধান দিতে পারেন নাই,—

"যেথা সুগম্ভীর বাজে ,"
অনন্তের বীণা, যার শব্দহীন সঙ্গীত ধারায়
ছুটেছে রূপের বন্যা গ্রহে সূর্য্যে তারায় তারায়"

"অমৃতস্য পুত্রোঽহম্‌" উপনিষদের এই পরম বাণীটি জীবনের প্রভাতেই তাঁহার চিত্তকে আবিষ্ট করিয়াছিল। আপনার সাধনার বলে তিনি সেই অমৃতের সন্ধান পাইয়াছেন, সত্যের "আনন্দ-রূপ" প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তাই জীবন ও মরণের প্রকৃত স্বরূপ, প্রকৃত রহস্য উপলব্ধি করিয়া তিনি রসজ্ঞ। এজন্য জীবনের প্রতি তাঁহার অহেতুক মমত্ব-বোধ নাই, মরণও তাঁহার নিকট বিভীষিকার আধার নহে। প্রকৃত কবি কেবল মাত্র 'স্রষ্টা' নহেন, তিনি 'দ্রষ্টা'। কার্লাইল বলেন,—"The poet is a seer"—আমাদের শাস্ত্রেও বলে কবি ক্রান্তদর্শী, কবি তত্ত্বজ্ঞ, কবি দ্বন্দ্ববিবেকী, কবি পরমপুরুষ। মরণের এমন আনন্দ-রূপ যিনি কল্পনা করিতে পারেন, মরণকে এত সৌন্দর্য্যমণ্ডিত করিয়া দেখিতে যিনি অভ্যস্ত, জীবনকে তিনি আরও কত সুন্দর, কত রমণীয়, কত মধুময় দেখেন তাহা ত সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়। আমাদের বহু ধর্ম্মপুস্তকে জীবনকে এবং পরিদৃশ্যমান জগৎকে কেবল মায়াময়, মিথ্যাময়, অসার ও অসত্য বলিয়া চিত্রিত করা হইয়াছে। মরণই ধ্রুব, মরণই বিশ্বজয়ী এই কথাই বার বার উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করা হইয়াছে। জীবনকে মিথ্যা এবং মরণকে চরম ও পরম সত্য জ্ঞান করিয়া অনেকে গৃহীর মনে পরিপূর্ণ বৈরাগ্যের সঞ্চার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন; এমন কি অনেকে গৃহীকে সংসার ত্যাগ করিয়া সত্বর প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। তাঁহাদের বাণী জীবনের অনিত্যতা এবং মরণের জয়ধ্বনিতেই পরিপূর্ণ। কবি জীবনকে এতদূর তিরস্কার ও ধিক্কার করিয়া মরণের গলদেশে জয়মাল্য অর্পণ করিতে পারেন নাই। অধিকন্তু তাহার বিপরীত কার্য্যই করিয়াছেন। ইহা বলা আমার উদ্দেশ্য নয় যে মরণের অমোঘতা, অবশ্যম্ভাবিত্ব বা ধ্রুবত্বে তিনি সন্দিহান। তবে মরণকে তিনি যে পরিমাণে সত্য মনে করেন, জীবনকে তদপেক্ষা অধিক সত্য মনে করেন।

"ভালো বাসিয়াছি এই জগতের আলো
জীবনের তাই বাসি ভালো

* * *

তবুও মরিতে হবে এও সত্য জানি।

* * *

এমন একান্ত করে চাওয়া
এও সত্য যত
এমন একান্ত ছেড়ে যাওয়া
এও সত্য তত।
এ দুয়ের মাঝে তবু কোনখানে
আছে কোন মিল
নহিলে নিখিল
এত বড় নিদারুণ প্রবঞ্চনা
হাসি মুখে এতকাল
কিছুতে বহিতে পারিত না।"

জীবন এবং জগৎ তাঁহার নিকট মিথ্যা নয়, সম্পূর্ণ সত্য। আরম্ভকে মিথ্যা ভাবিয়া পরিসমাপ্তিকে সত্য বলিয়া কল্পনা করিতে তিনি কুণ্ঠিত। জীবন কবির নিকট সত্যে, আনন্দে, আশায় ও কল্যাণে পরিপূর্ণ। জীবনের রস-নিগূঢ় বিচিত্র সঙ্গীতে তাঁহার কাব্য পরিপূর্ণ।

—"মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।"

জীবনের দ্রাক্ষাকুঞ্জের প্রমত্ত মধুপ উচ্ছল সুধারস নিঃশেষে উজাড় করিয়া পান করিতে চান। জীবনকে সকল দিক দিয়া উপভোগ করিয়া পরম পরিতৃপ্তি ও প্রশান্তির ভিতর দিয়া ঈপ্সিতকে লাভ করিতে ইচ্ছা করেন।

"ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করি যোগাসন
সে নহে আমার।
যে-কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমারি আনন্দ রবে তারি মাঝখানে।"

জীবনের এমন আনন্দ-রূপ এবং তাহা অনুভব এবং উপভোগ করিবার এমন হ্লাদিনী শক্তি, এক প্রাচীন সাহিত্য ব্যতীত অন্যত্র পরিলক্ষিত হয়-না।

"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে,
আনন্দেন জাতানি জীবন্তি,
আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।"

—জীবন অনন্ত, আত্মা অবিনাশী ;—

"নাই তোর নাইরে ভাবনা
এ জগতে কিছুই মরে না

*　　*　　*
*

মরণ বাড়িবে যত,
　　জীবন বাড়িবে তত
পলে পলে উঠিবে আকাশে
নক্ষত্রের কিরণ-নিবাসে"

'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'—'প্রভাত সঙ্গীতের' একটি অনুপম কবিতা। ইহার ছন্দের ভিতর সর্বত্র একটা আবেগ-চঞ্চল উচ্ছ্বাস, একটা উদ্দাম গতি-বেগ ও ক্রিয়াশীলতা পরিলক্ষিত হয়। এই রূপকের অন্তরালে কবি গাহিয়াছেন একটা বিরাট জাগরণীর গান, আঁকিয়াছেন একটা সার্থক জয়-যাত্রার ছবি। আঁধার এখানে আলোকের জন্য প্রার্থনা করিতেছে, অস্ফুট স্ফুটতর হইতে চাহিতেছে, মোহাবিষ্ট চৈতন্য উদ্বুদ্ধ হইবার আকাঙ্ক্ষা করিতেছে। ইহার ভিতর আছে একটা দুনিয়া-ভোলা নেশা, একটা নিখিলগ্রাসী উচ্ছ্বাস, অনন্ত উদ্দীপনা, অসীম কৌতূহল ;—আর সবার উপর আছে মুক্তির উদাত্ত সুর। ভূধরের কুক্ষির অন্ধকার কারাগৃহে এতাবৎ আবদ্ধ নির্ঝর আজ মুক্তি-পথযাত্রী। জগৎ দেখিবার জন্য 'অগাধ বাসনা', 'অসীম আশা' আজ তাহার সমস্ত সত্তা ছাইয়া ফেলিয়াছে। যে-কোনো বাধা বিপত্তিই আজ তাহার কাছে অকিঞ্চিৎকর, যে-কোনো কাজই সুসাধ্য। সে আজ পাষাণ-কারা চূর্ণ করিবে, করুণা ধারায় জগৎ প্লাবিত করিয়া পাগলিনীর মত ছুটিয়া বেড়াইবে। কিছু বাকী রাখিবে না—যতটুকু প্রাণ আছে তাহার সবটুকু উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিয়া সে আজ উদ্দাম-প্রমত্ত-গতিতে বাঞ্ছিতের উদ্দেশ্যে চলিয়াছে।

"অগাধ বাসনা　　　　অসীম আশা
জগৎ দেখিতে চাই !
জাগিয়াছে সাধ　　　　চরাচরময়
প্লাবিয়া বহিতে চাই।"

এ যেন সূর্যের জ্যোতিপথ বাহিয়া বাধার অন্ধকার-শিখর পুলকিত জয়যাত্রা—প্রত্যূষের তরুণালোকে আকাশের ইশারায় ইশারায়, আনন্দ-লোকের সুরে সুরে সার্থক এই জয়যাত্রা—অনির্দিষ্ট চরম ও পরম সিদ্ধির পথে, অভিব্যক্তির পথে, মুক্তির পথে।

"এত কথা আছে,　　　এত গান আছে,
　　এত প্রাণ আছে মোর
এত সুখ আছে,　　　এত সাধ আছে,
　　প্রাণ হ'য়ে আছে ভোর।"

বিরামহীন এই গতিশীলতা প্রাণের এই অপরিমেয় পর্যাপ্তি, কল্পনার এই অকুণ্ঠিত প্রসার, বাসনার এই অফুরন্ত উৎস, তেজের এই অপ্রতিরোধ্য বিকাশ—ইহার ভিতর কবির পরবর্তী জীবনের উচ্চতর সার্থকতা ও বৃহত্তর কৃতার্থতার ছবি পরিপূর্ণভাবে দেদীপ্যমান। শ্রেষ্ঠ কবি মাত্রেই "নবনবোন্মেষশালী দৈবশক্তি" সম্পন্ন। বিশেষে কবি যখন 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' লিখিয়াছিলেন, তখন তিনি কিশোর বয়স। যৌবন সবেমাত্র তাহার রক্তকেতু কবির হৃদয়-প্রাকারে বিস্তার করিয়াছে। নব উন্মেষের রাগে পার্থিব সমস্ত বস্তুই তখন তাঁহার কাছে রঙিন। রুদ্র দীপক তখন তাঁহার সুরে বাজিয়া উঠিয়াছিল। কঠিন প্রতিকূলতার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া আপনাকে জগতে শতধা প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা করিবার ইচ্ছা তখন তাহার সমস্ত সত্তা ব্যাপিয়া বিদ্যমান। সংসারের ক্ষুদ্র স্বার্থ, সমাজের অনুশাসন, রাষ্ট্রের ভ্রূকুটি কিছুতেই তাঁহার গতিরোধ করিতে পারিবে না। কাজেই তাঁহার মনের ছবি যে তাঁহার রচিত কবিতার ভিতর দেখিতে পাওয়া যাইবে তাহা আর বিচিত্র কি ? সদর স্ট্রীটের বাড়ীর বারান্দা হইতে ফ্রী স্কুলের বাগানের গাছগুলির পল্লবান্তরালে সূর্যোদয় দেখিতে দেখিতে কবি এক "অনন্ত মুহূর্তের" সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন। কবিত্বের প্রথম বিকাশের ঐ প্রাথম্যের প্রভাতে কবি 'বিশ্ব-সংসার অপরূপ মহিমায় সমাচ্ছন্ন এবং সর্বত্র আনন্দে ও সৌন্দর্যে তরঙ্গিত' দেখিয়াছিলেন। ঐ আনন্দ-লীলার মধ্যে ঐ দিনেই "নির্ঝরের স্বপ্ন-ভঙ্গ কবিতাটি নির্ঝরের মতই উৎসারিত হইয়া চলিয়াছিল।" প্রজ্ঞা-করুণা-মৈত্রীর অবতার বুদ্ধ জীবনের ঐরূপ এক 'অনন্ত

বুদ্ধদেব বৃদ্ধের লোলচর্ম্মে ও পলিত কেশে শুধু যৌবনের পরাভব প্রত্যক্ষ করেন নাই, অধিকন্তু জরা, মৃত্যু, ব্যাধি প্রভৃতি বিবিধ দাহের 'নির্ব্বাণ' মন্ত্রের সন্ধান পাইয়াছিলেন।

ইহা সত্য যে যৌবনের উগ্রসুরার উন্মত্ততাতেই তিনি এই জাগরণ-গীতি, এই জয়ধ্বনি গাহেন নাই। উদ্দামতা তাঁহার পরবর্ত্তী জীবনের বহু কবিতাতে দেখিতে পাওয়া যায়।

(ক) "ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন্ "

(খ) "ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ * * *
ভূলগুলো সব আন্‌রে বাছা বাছা।"

(গ) "ওরে সাবধানী পথিক, বারেক পথ ভুলে মর ফিরে "

(ঘ) "ভজন পূজন সাধন আরাধনা সমস্ত থাক পড়ে· "

তবে 'নির্ঝরের স্বপ্ন-ভঙ্গের' ভিতরে কেবল যে ঝটিকার উদ্দামতাই দেখিতে পাওয়া যায় তাহা নহে, মেরুর বাতাসের চিরপরিচিত স্পর্শও অনুভূত হয়, শ্রাবণ রাত্রির বজ্রধ্বনির সহিত কাশকেতকী হাসিয়া উঠে, বৈশাখের প্রদীপ্ত ভ্রুকুটির পার্শ্বে বর্ষার মৌন, গম্ভীর, প্রশান্ত, শ্যামল-শ্রী দেখিতে পাই, শীতের রিক্ততা বসন্তের মদির হাসিতে পূর্ণ হইয়া উঠে। "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের' ভিতর তাই উদ্দামতা, ও মত্ততার পাশাপাশি সংযম শোভনতা ও মঙ্গলের ছবি দেখিতে পাই।

কবিদের প্রথম-বিকাশের ঐ লাবণ্যময় প্রভাতে—ঐ "অমৃত রেখা"টি কবিকে যে আধ্যাত্মিক উপলব্ধি দান করিয়াছিল তাহা কবি ১৯৩০ সালে অক্সফোর্ডে "হিবার্ট-লেকচারে" বলিয়াছিলেন—এ বিষয়ে সংবাদপত্রে এইরূপ লিখিত হইয়াছিল। "Dr. Tagore mentioned particularly a spiritual experience when he was aged eighteen. He was watching the sunrise when he suddenly felt the veil drawn from the face of nature giving universal meaning to complicated tangle of life inspiring his poem "Awakening of Waterfall."

আমি "প্রভাত-সঙ্গীতের" সমালোচনা শেষ করিলাম। কাব্যমোদী ব্যক্তিগণ বিভিন্ন দিক হইতে ইহার সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণ করিতে পারেন। শক্তিমান সমালোচক ইহার ভিতরে প্রচ্ছন্ন নব নব রহস্যের উদ্ভেদ করিতে পারেন। কিন্তু ইহার ভিতর যে বিষয়টি আমাকে সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়াবিষ্ট করিয়াছে সে বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক মনে করি। তাহা এই যে কবির পরবর্ত্তী কাব্য-সমূহের ভাব-সম্পদের সব-কিছুই এখানে বীজরূপে বর্ত্তমান। বাহুল্য ভয়ে বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব হয় নাই, নতুবা আমি দেখাইতে পারি যে পরবর্ত্তী কাব্য সমূহের প্রায় সকলগুলিরই অঙ্কুর এখানে রহিয়াছে। কবিও 'জীবন স্মৃতিতে' লিখিয়াছেন,—"বিশেষ মানুষ জীবনে একটা বিশেষ পালাই সম্পূর্ণ করিতে আসিয়াছে—পর্ব্বে পর্ব্বে তাহার চক্রটা বৃহত্তর পরিধিকে অবলম্বন করিয়া বাড়িতে থাকে—প্রত্যেক পাককে হঠাৎ পৃথক বলিয়া ভ্রম হয়, কিন্তু খুঁজিয়া দেখিলে দেখা যায় কেন্দ্রটা একই।"

শ্রীযুগলকিশোর সরকার



ট্র্যাজিডি

শ্রীযুক্ত কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়

ছুটীর দিন। "ঠাণ্ডাশালা"র মজলিস সবেমাত্র জ'মে উঠেছে। কোণে ব'সে শীতল মাঝে-মাঝে তবলায় চাঁটি দিচ্ছিল। এমন সময়ে বিজন এসে হাজির হ'ল। ওরা তিন পুরুষ গানের সাধনা ক'রে আসচে। সকলেই ওকে সম্বর্দ্ধনা ক'র্‌লে গানের ফরমাস দিয়ে—রামকেলি না হয় ইমন-কল্যাণ। প্রভাত শুয়ে ছিল। ও স্কুলের শিক্ষক। তাই ছুটীর দিনে ওর আলস্যই সবচেয়ে বেশী। শুয়ে শুয়েই বল্‌লে, "হাঁ-হাঁ,

'Music that gentlier on the spirit lies
Than tired eye-lids upon tired eyes."

উত্তর এল, "আজ আর ও-সব নয় হে। আজ বেহাগের দিন। খবর বড় খারাপ।"

পাশ থেকে সরোজ চেঁচিয়ে উঠ্‌ল, "বেশ ত' বিজনদা, কবিই বলেচেন, 'Our sweetest songs are those that tell of saddest thoughts.' বেহাগ-ই একটা হোক না।

গানের ফরমাসে বিজন কোনদিন আপত্তি করে না। তাই একটু গম্ভীর হ'য়েই জিজ্ঞাসা ক'র্‌লুম, "কিসের খারাপ খবর হে?" তার মুখটা বেশ একটু বিষণ্ণ। সে একটু ম্লান হাসি হেসে বল্‌লে, "শোননি, হরেন যে এবার ফেল করেচে?"

খবরটা খুবই অপ্রত্যাশিত। মজলিসের সেই মুখর কোলাহলের পরে যেন একটা দমকা হাওয়া এসে সব আমোদ নিমেষে নিবিয়ে দিলে। হরেন আমাদের এক মহাপাণ্ডা। সে বড় লোক। শুধু কমলাই তাকে করুণা করেন নি,—বাণীও। এবার সে অনার্স নিয়ে B. A. পরীক্ষা দিয়েছিল।

একটু থেমে গম্ভীর হ'য়ে বিজন নিজেই বললে, "ইণ্টার-মিডিয়েটে সেকেণ্ড হ'য়েও,—এ যেন অদ্ভুত ব্যাপার। সেদিন ওদের বাড়ীতে গেচি, শুনলুম, খবর এসেচে, ইংরেজীতে ও সেকেণ্ড ক্লাস ফার্ষ্ট হয়েচে। ওর বাপ ব'ললেন, বাবুগে, যদিও এর চেয়ে ভাল করবারই আশা ছিল, তবু এতে আমার দুঃখ নেই। আমি ব্যারিষ্টার। যত শীগ্‌গির ওকে আদালতে বার করতে পারলেই সবদিক পরিষ্কার হ'য়ে যাবে। সেদিন ত' তোদের সে কথা ব'ল্‌ছিলুম। সব ঠিক-ঠাক্। এই জাহাজেই হরেন বিলেত যেত। এমন সময় কাল খবর এল—সংস্কৃতে ও ফেল করেচে। একেই ব'লে বরাত।"

শ্যাম একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ব'ল্‌লে, "না, একেই বলে ট্র্যাজিডি!" সবেমাত্র সে ডেপুটী হ'য়েচে। হরেনকে I. C. S. পরীক্ষা দেবার জন্যে অনেকদিন ধ'রে পরামর্শ দিচ্ছিল। তাই ব্যথাটা সবচেয়ে ওরই বোধহয় বাজ্‌ল।

কিন্তু শিশিরদা আর চুপ ক'রে থাকতে পার্‌লেন না। বয়সে তিনি সবার ওপর। তাছাড়া তিনি সাহিত্য-সমালোচক। স্বভাবটা বড় খুঁতখুঁতে ও খিট্‌-খিটে। জীবনে সব বিষয়ের সমালোচনা করাই যেন ওঁর কাজ। তিনি চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন, "ট্র্যাজিডি কি রকম? তোরা কথা বলিস্, কথার মানে না বুঝেই। ডেপুটী হ'য়েও এখনো এই বদ্ অভ্যেস গেল না! ট্র্যাজিডি কাকে বলে বলত?"

—"কেন শিশিরদা, যা পাবার জন্যে চেষ্টা করলুম, তা' না পাওয়ার ব্যর্থতার মধ্যেই ত' ট্র্যাজিডির বীজ। অবশ্য এ ব্যর্থতার রূপ-বৈশিষ্ট্য আছে। সব ব্যর্থতাই ট্র্যাজিক নয়—, যেমন সব রচনা সাহিত্য নয় যদিও সাহিত্য মাত্রই রচনা।"

ঠাণ্ডাশালার যারা নিয়মিত আসে, তারা প্রত্যেকেই রস-লিপ্সু। একে যৌবনের নেশা, তা'তে পরিবর্ত্তনশীল মনের ভাব-প্রবণতা। তাই অতি সহজেই ছোট কথা থেকে বড় কথার অবতারণা করতে কারু মনে দ্বিধা জাগে না। শ্যামের উত্তরটা শিশিরদার মনের মত হ'ল না। তিনি বললেন, "ছাৎ, এ অতি মামুলি আদ্যিকালের ধারণা। তোরা বড় 'ন্যাকো'।

জহর খুঁজ্‌বি ত' ডুব দিয়ে একেবারে সাগরের তলায় যা'। শুধু ওপরের সাদা ফেনার মধ্যে হাতড়ালে কি কিছু মেলে? অনেক লোকে ব'লচে ব'লেই কি কোন একটা মত সত্য হ'য়ে যায়? বয়স আর ভক্তের সংখ্যার মাপকাঠি দিয়েত' সত্যের বিচার চলে না। সেকালের সংস্কৃত সাহিত্যে ট্র্যাজিডির বালাই ছিল না, সেকথা না হয় ছেড়েই দিলুম। কিন্তু গ্রীক ট্র্যাজিডি আর সেক্সপীয়রের ট্র্যাজিডি কি এক? আবার, ট্র্যাজিডি সম্বন্ধে সেক্সপীয়রের বা গেটের যা' ধারণা, তা' কি ইব্‌সেন বা গলস্‌ওয়ার্দির ধারণার সঙ্গে সমান?"

প্রকান্ত ভ্রূ-কুঞ্চিত ক'রে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল, "না না শিশিরদা, ও সব চল্‌বে না। আপনি যে বড় বাজারের নামজাদা লেখকগুলোর নাম দিয়ে ছলে-ছুতোয় আমাদের কেবল কাবু ক'রে রাখ্‌বেন, তা' শুনব না। বলুন, আপনার নিজের সত্যিকারের মত কি। তা' না হ'লে শুধু কথা দিয়ে কথার জাল বুনে, অত্যন্ত সরলকে যে ক'রে তুল্‌বেন সব চেয়ে জটিল,—ও ব্যবসাদারী সমালোচকী কায়দা মাসিকের আসরে জম্‌বে ভাল,—সাদা কথায় বলি, এখানে ওর আদর নেই।"

—"যাই বল প্রকান্ত, ট্র্যাজিডির ধারণাটা এতই সূক্ষ্ম, আর তা' যুগে যুগে এতই বদ্‌লেচে যে ওকে সংজ্ঞা দিয়ে বাঁধ্‌তে যাওয়া যেমন কঠিন তেম্‌নি নীরস। ট্র্যাজিডিকে সত্যি ক'রে বুঝ্‌তে হয় মাথা দিয়ে নয়—হৃদয় দিয়ে! এই সত্যটুকু বুঝ্‌তে পেরেছিলুম্ যেদিন জীবনের পায়ে চলার পথে সত্যিই ট্র্যাজিডির সঙ্গে দেখা মিলেছিল। তাই শিশিরদার আপত্তিতে আমি দোষ দিই না।" বিপিন ব্যবসাদার মানুষ। পূর্ব্বপুরুষের বাঁধা কারবারে রাশি রাশি হিসেবের কাগজের মধ্যে ওর দিন কাটে। জীবনে ও পেতে চায় একান্ত বাস্তবতা, যা' ওর কারবারের হিসেবের মতই হবে নির্ভুল। তাই ও রোমান্স খোঁজে জীবনের অক্ষরের লিপির মধ্যে - অচেতন গ্রন্থে নয়।

প্রকান্ত একটু হেসে উত্তর দিলে, "সংজ্ঞা না হয় নাই দিলে বিপিন। ও ত' শুধু অর্থহীন কথার বোঝা দিয়ে সরল ভাবের গতিরোধের চেষ্টা। শিশিরদা ছাড়া আমরা কেউ 'ওঁ'-র শিষ্য চেষ্টার জন্যে পীড়াপীড়ি কর্‌চি না। কিন্তু জীবনে সত্যিকারের যে ট্র্যাজিডির স্বাদ পেয়েছিলে, তা' আজ এই বৈঠক সভাকে একটু দান কর্‌লে ক্ষতি কি?"

—"তবে সুরু করি শোন। নীতেশ আমার মাসতুতো ভাই। লক্ষ্ণৌএ এক স্কুলে ক'র্‌ত মাষ্টারী। তখন আমরাও থাক্‌তুম লক্ষ্ণৌএ। সংসারে আপন বল্‌তে তার কেউ ছিল না। জীবনের পথে সে যেন নিঃসঙ্গ পথিক। বিয়ের জন্যে অনুরোধ কর্‌লে ব'লত, "যাত্রা যখন একাই সুরু করেছি, একাই শেষ ক'র্‌ব। ইচ্ছে ক'রে বাঁধন এনে তা'কে বিড়ম্বিত কর্‌তে চাই না। নিজে প'ড়্‌তো আর ছেলেদের পড়াতো—এই নিয়ে আরামেই তার দিন কাট্‌ছিল। কিন্তু হঠাৎ একদিন বাধা এল। তার জীবনপথে এসে দাঁড়াল

—"এই রে রোমান্স সুরু হ'ল বুঝি!"

—"না না ব্যাপারটা তা' নয়। সস্তা রোমান্স দিয়ে তোমাদের ভোলাতে চাই না। অনীতা ছিল এক মেয়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী। ও যেমন সুশিক্ষিতা ছিল, তেমন সুন্দরী ছিল না মোটেই। অত্যন্ত সাধারণ, চলনসই। তবু সেই পুঁজি নিয়েই চল্‌ল ভালোবাসার কারবার। এক দিন দুজনেই দুজনকে প্রেম-নিবেদন কর্‌লে। দুজনেই নিঃসঙ্কোচে প্রাণের কথা খুলে বল্‌লে। কিন্তু বিয়ের প্রস্তাবে অনীতা একটু আপত্তি জানালে। নীতেশ ব'ল্‌লে, কেন নীতা, যদি সত্যি সত্যিই আমরা পরস্পরকে ভালোবেসে থাকি, তবে বিয়ে ক'রে জীবন সার্থক ক'রে তুল্‌বো না কেন? এতে বাধা কিসের? অনীতা উত্তর দিলে, রাগ ক'র না নীতেশ, সংসার আজ যেরকম জটিল হ'য়ে পড়েচে, তা'তে গরীবের বিয়ে করা সাজে না। দুজনেই আমরা গরীব। সংসারে বিয়েকে সার্থক ক'রে তোলবার মত পুঁজি আমাদের কারো নেই—তাই এস সবুর করি। স্ব-ইচ্ছায় তুমি সময় দাও এক বছরের—আমিও। এই সময় সময়ের মধ্যে

দুজনেই যত পারি টাকা জমাবো,—সেইটাই হবে আমাদের বিয়ের যৌতুক ; আর তা' জমা থাকবে সেই অনাগত তাদের জন্য যারা আসবে আমাদের মিলনের মধ্যে দিয়ে।

কথাটার গুরুত্ব নীতেশ বুঝেছিল, তাই ওতেই ও রাজী হ'ল। দুজনেই কৃচ্ছ্র-সাধন করতে সুরু ক'রে দিলে। ওরা ভুলে গেল, জীবনের বিলাসিতা,—সহজ, সাধারণ সুখও। এমনি ক'রে দিন যায়। বছর প্রায় পূর্ণ হ'য়ে এল। নীতেশ একদিন অধৈর্য্য হ'য়ে বললে, নীতা, মিনতি করি, এবার তুমি ক্ষান্ত দাও। অকারণ দুঃখভোগ করায় না আছে পুণ্য, না বা সুখ। বাকী যে ক'টা দিন আছে, সে ক'টা দিনের দুঃখভোগ একা আমারই থাকুক—তুমি নিজেকে এবার রেহাই দাও। অনীতা হেসে জবাব দিলে, সে কি নীতেশ, দাম্পত্য-জীবনে আমাদের সমান অধিকার। সে অধিকার ত' সত্যি ক'রে পাবনা আজ যদি কৃচ্ছ্র-সাধন হয় এক তরফা!"

—"এ যে একেবারে স্বাধিকারের ব্যাপার! যাই বল, বিপিন, গল্পটা তোমার কারবারের হিসেবের মতই মাপা-জোপা, নীরস। অনীতার অন্তরে এত ভালোবাসার আবেগ, তবুও একটু কাঁদলে না, না-বা মিনতি-ভরা ব্যাকুল কণ্ঠে বললে,

'Teach me, O love, as I ought

I'll speak thy speech, love, think thy thought."—প্রভাত হেসে ওঠে।

—"এইটাই ত' খুব স্বাভাবিক, প্রভাত। শিক্ষকতা যাদের পেশা, তাদের জীবন যেমন নিরস, তেমনি একঘেয়ে। তাই দেখ্‌বে তাদের প্রেমে স্বপ্ন-ভরা রোমান্স থাকে না—থাকে হিসেব-করা বাস্তবতা। যা'-হোক একমাস পরে তাদের বিয়ের দিন ঠিক হ'য়ে গেল। বিধি-লিপি কে খণ্ডাবে? দিন পনেরো পরে নীতেশ খবর পেলে তার এক কাকার মৃত্যু হ'য়েছে,—আর তার লক্ষ টাকার সম্পত্তির আজ নীতেশই একমাত্র মালিক। জীবনে যিনি দূরেও তার খোঁজ নেন্‌নি, মরণে তিনিই দিয়ে গেলেন ভোগের ভাণ্ডার,—সংসারের সব চেয়ে বড় পুঁজি। মানুষ ভাগ্যের ক্রিড়নক্। সামান্য সঞ্চয়ের জন্যে এই বছর খানেক ধ'রে তারা আত্মাকে কতরূপেই না বিড়ম্বিত করেচে। কিন্তু আজ এক নিমেষেই অতি অপ্রত্যাশিত ভাবেই এলো অগাধ ঐশ্বর্য্য—আশাতীত সম্পদ। নীতেশ ভাব্‌লে, কখন-না-আসার চেয়ে অসময়ে-আসাও ভাল। জোড়হাত ক'রে সে নমস্কার করে—অলক্ষ্যে থেকে মানুষের ভাগ্যের যিনি বিধান দিচ্ছেন তাঁকে। বলে, তোমার অবোধ্য বিধান মানুষের বুদ্ধির অগম্য। তাই সে বিলম্ব সহ্য করতে পারে—দুঃখকে বুক পেতে নিতে পারে। নতুবা ভবিষ্যৎ যদি তার দৃষ্টির সাম্‌নে স্পষ্ট হ'য়ে ধরা প'ড়্‌ত, তবে পাবার আশায় আর না-পাবার বেদনায় জীবন তার হ'ত দুর্ব্বিসহ!

বুক-ভরা আশা নিয়ে নীতেশ গেল অনীতাকে এই শুভ-সংবাদ শোনাতে। কিন্তু অনীতা এতে কোন বিস্ময় প্রকাশ করলে না—না-বা একটু আনন্দ। বরং ব্যথায় তার মুখখানা কালি হয়ে গেল। নীতেশের সেদিকে দৃষ্টি ছিল না। তৃপ্তির আনন্দে তখন তার চিত্ত পরিপূর্ণ। অনীতার হাত দুটি জোর ক'রে তুলে ধ'রে সে ব্যগ্রকণ্ঠে বললে, নীতা লক্ষীটি, আর ত' দেরী সহ্য হয় না। সাম্‌নের সোমবারেই ভাল দিন আছে। অনীতা মুখ না তুলেই উত্তর দিলে, আচ্ছা নীতেশ, কাল সকালে তোমার শেষ উত্তর দেব। আজ রাত্তিরটা আমায় ভাব্‌তে দাও। নীতেশ আর কোন কথা বললে না। সবুর করার কি পরিণাম, তা' ওর জীবনে ঘটেচে। তাই একরাত্রি সবুর করতে ও মোটেই দ্বিধা করলে না। ওর আজ আনন্দের সীমা নেই। ও যেন এক নূতন গ্রহে এসে পৌঁচেছে। ওর অন্তরমনে আজ জেগে উঠেচে রাজ্যের কামনা।

পরের দিন ভোরবেলা অনীতার কাছ থেকে একটা চিঠি এল, 'নীতেশ, একদিন তোমায় একান্ত ক'রেই চেয়েছিলুম, কিন্তু সে আজকের এই লক্ষপতি নীতেশকে নয়। সেদিন যাকে পাবার আশা ছিল, আজ তোমার মধ্যে তাকে

পাওয়া অসম্ভব। সেদিন বিয়ের সার্থকতার জন্যে চেয়েছিলুম অর্থ, কিন্তু সে অর্থ ত' এ অর্থ নয়। এ অর্থের ভারে আজ অধিকার হবে পদে পদে ক্ষুণ্ণ, ব্যক্তিত্ব হবে নিরন্তর লাঞ্ছিত। তাই যে পথে দুঃখ অনিবার্য্য, সে পথ থেকে স'রে গেলুম,—সন্ধানের কোন চিহ্ন না রেখেই। আমাকে আর তুমি কামনা ক'র না, এই আমার শেষ মিনতি।"

বিপিন চুপ করতেই শ্যাম বলে উঠ্‌লো, "বাঃ, বেশ চমৎকার ত'। মনে হয়, এ যেন কারবারের হিসেব নয়—একেবারে সত্যিকারের সাহিত্য। ট্র্যাজেডি জিনিষটা তুমি প্রাণ দিয়েই অনুভব করেচ।"

শিশিরদা একটু বিরক্ত হ'য়েই ব'ল্‌লেন "ট্র্যাজিডি সম্বন্ধে তোদের ধারণা দেখ্‌চি অত্যন্ত স্থূল।" বিজন প্রায়ই শিশিরদাকে সমর্থন ক'রত। সেই সমর্থনের আশায় তার দিকে চাইতেই সে আরম্ভ ক'রে দিলে, "তবে শোন, ট্র্যাজিডি সম্বন্ধে আমার জীবনে প্রত্যক্ষ কি জ্ঞান পেয়েচি। বেশীদিনের কথা নয়। আজও চোখের সাম্‌নে স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছি সেই করুণ দৃশ্য!

নীরেনদা'র প্রথম পক্ষের স্ত্রী যখন পাড়ি দিলেন অজানার সন্ধানে, তখন তাঁর সে কি ডুক্‌রে-ডুক্‌রে কান্না! শ্মশানে স্ত্রীর জলন্ত চিতার ওপর ঝাঁপিয়ে প'ড়তে গেছলেন। জীবনে শোকের অতবড় আবেগ আর কখন দেখিনি,—দেখবো কিনা জানি না। শ্মশান থেকে ধরাধরি ক'রে যখন বাড়ী নিয়ে আসা হ'ল, তখন সেই যে শয্যা নিলেন, সাত দিন সাত রাত আর পাশ ফেরেন নি। শুধু কেঁদেচেন আর বলেচেন, ভগবান, আমাকেও তুমি নাও। ভগবানের নিয়ম কিন্তু ঠিক উল্টো। যে যত বেশী ক'রে যাবার কামনা করে, তাকেই তিনি তত বেশীদিন অমর ক'রে রাখেন। নীরেনদা আমার বৌদির ভাই। বাপ চিকিৎসা ক'রে রেখে গেলেন অগাধ ঐশ্বর্য্য আর বিপুল প্রতিপত্তি। তাই ছেলেও চিকিৎসক হ'য়ে খুব শীঘ্র পসার ক'রে ফেলেছিল।

যাক্, বৌদিদের সেবার গুণে যখন একটু সুস্থ হ'লেন, তখন মনে হ'ল, অসুস্থতাই ছিল ভাল। এক কথায় চিকিৎসা একেবারে ছেড়ে দিলেন। ব'ল্‌লেন, যে শাস্ত্র মানুষকে আরাম দেবার শুধু ভাণ করে,—নীরোগ করতে পারে না, তা' দিয়ে নিজেও আর ঠেক্‌ব না, লোককেও ঠকাব না! তারপর স্ত্রীর নামে নানা কাজে নানা 'ফাণ্ড' খুলে দুহাতে টাকা ছড়াতে লাগ্‌লেন। আত্মীয়েরা বাধা দিলে ব'ললেন্, গণিতের শূন্যের মত এদের ত' নিজস্ব কোনো দাম নেই, অন্যের ডানপাশে বসলেই এদের দাম বাড়ে একেবারে দশগুণ। নতুবা এ শুধু বোঝা। যার ডানপাশে বস্‌লে এদের থাক্‌ত দাম,—হ'ত আদর, তাই-ই যখন চিরদিনের মত জীবন থেকে চ'লে গেছে, তখন এ মিথ্যা মায়া নিয়ে আর জীবনের ভার বাড়াই কেন? ইটালি থেকে এক নামজাদা ভাস্করকে নিয়ে এসে স্ত্রীর এক মূর্ত্তি গড়ালেন। এ'ছাড়া অরুণা-বৌদির নানা ধরণের চিত্রে বাড়ীর দেওয়াল ভরে উঠ্‌ল। তিনি বললেন, অরুণার সঙ্গে সঙ্গে আমারও হয়েচে মৃত্যু। যার বর্ত্তমান আর ভবিষ্যৎ আছে, তা'রই জীবনে আছে গতি। যারা তা' নেই, অন্তর্জীবনে তার গতি গেচে থেমে—হ'য়েচে মৃত্যু। আজ আমার বর্ত্তমানও নেই,—ভবিষ্যৎও নেই। আছে শুধু অতীত। জীবনের সঙ্গে তার অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ। সেই অতীতের মধ্যেই আমি বেঁচে থাক্‌ব। সেই অতীতের আবহাওয়া সৃষ্টি করবে এই সব চিত্র আর মূর্ত্তি। স্মৃতির সাধনা দিয়ে এদের মধ্যে নিয়ে আস্‌ব প্রাণ, জাগিয়ে তুল্‌ব অরুণাকে। এই আমার শব-সাধনা। এই ব'লে সেই যে তিনি নিজের মহলে ঢুক্‌লেন, তারপর আর না ক'রলেন কারো সঙ্গ' দেখা, না-বা কোন আলোচনা। তাঁর মহলে চাকর-দাসীরও ঢুক্‌বার কোনো হুকুম রইল না। শুধু যেতে পারতেন আমার বৌদি আর নীরেনদার খাস-চাকরটা। এম্নি ক'রে একমাস দুমাস নয়, বছর চারেক কেটে গেল। সকলেই হাল ছেড়ে দিয়ে হতাশ হ'য়ে পড়লেন। ভাব্‌লেন, এম্নি ক'রেই বুঝি তার জীবনটা

ফেলতে যাবে। কিন্তু তাও হ'ল না। মানুষের মনটাকে নিয়ে সেই সুদূর বাল্মীকির যুগ থেকে কত সাধারণ তত্ত্বই না আবিষ্কার করা হয়েছে,—তা' ভাব্‌লেও হাসি পায়। এ'টা এতই সচল যে এটাকে কেউ কখন ঠিক্-ঠিক্ বুঝ্‌তে পেরেচে ব'লে মনেই করি না। যদি কেউ কখন বুঝে থাকে ত' সে শুধু এই কথাটি জেনেচে যে মানুষের মনটা অহরহ বদ্‌লাচ্চে। তা'কে ধ'রে রাখা যেমন দুঃসাধ্য, বোঝাও তেমনি দুষ্কর। তাই, তা' নিয়ে generalise করা শুধু নিরর্থক নয়—পাগলামিও। তোমরা যাই বল, আমি কিন্তু একথা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি, মুহূর্ত্ত আগে আমরা যা' ছিলুম, এক মুহূর্ত্ত পরে আমরা আর তা' নই। তাইত' আমাদের মধ্যে প্রকৃতির এত বিচিত্র খেলা।"

আমি একটু অস্থির হ'য়ে বল্লাম, "থাক্, থাক্, যে সস্তা generalisationএর সংখ্যাধিক্যে তোমার এত বিরাগ, তা'কে আর অকারণে বাড়িয়ে তুলে পাপ ক'র না। গল্পটা এবার শেষ কর।"

—"শেষ ক'রব ব'লেই ত' এত মুখবন্ধ। তারপর আর কি? প্রকৃতির যা' চিরন্তন নিয়ম। নীরেনদা সেদিন চিত্তের যে একাগ্রতা নিয়ে সাধনা সুরু করেছিলেন, তা' ক্রমে হ'য়ে এল শিথিল। তাঁর মনে জাগ্‌ল সংশয়—এল শঙ্কা। অন্তরে যতই এল জড়তা, সাধনা ততই হ'ল উগ্র। তাঁদের কোনো সন্তান ছিলনা। তাই বৌদির স্মৃতির জীবন্ত কোনো চিহ্ন মিল্‌ল না। শেষে অরুণা-বৌদির ছোট্ট বোনটিকে নিয়ে এসে কুমারী পূজা সুরু ক'রে দিলেন। মনে আশা, এ থেকে যদি আসে প্রাণ, আসে প্রেরণা অন্তরের শূন্যতা ভরিয়ে দিয়ে। বাড়ীর অন্য সব ছবি ফেলে দিয়ে সমস্ত বাড়ীখানা বৌদির ফটোয় মুড়ে দিলেন। বিশ্ব-সাহিত্যে যতকিছু বিরহ আর বিচ্ছেদের উচ্ছ্বাস প্রকাশিত হ'য়েছিল তা' উজাড় ক'রে আনিয়ে ঘর বোঝাই কর্‌লেন। কিন্তু অন্তরে স্মৃতির চপল দীপটি যখন ম্লান হ'য়ে আসে কালের গতির দমকা হাওয়ায়, তখন বাইরের চেষ্টা দিয়ে কি তা'কে জাগিয়ে রাখা যায়। মনের ছবি যখন অন্ধকারে হ'য়ে পড়ে আবছায়া, দেওয়ালের ছবি তখন ক'রবে কি! নিরুপায় হ'য়ে নীরেনদা সুরু কর্‌লেন কবিতা লিখ্‌তে—বিচ্ছেদের কবিতা বেদনার ছন্দে মরমের রক্ত দিয়ে লেখা। কাগজে কাগজে প্রশংসা বেরুলো। বিরহের ব্যথা এমন ক'রে নাকি আর কেউ বাংলা সাহিত্যে ফুটিয়ে তুল্‌তে পারেন নি, অবশ্য রবীন্দ্রনাথ ছাড়া। কিন্তু নীরেনদার প্রাণ যা' খুঁজছিল, তা' মিল্‌ল না। মর্ম্মের বেদনা যতই রূপ পেতে লাগ্‌ল অবিরাম ছন্দে, স্মৃতির ভার ততই হ'য়ে পড়্‌ল লঘু। শোকের প্রথম দিকেও নীরেনদা কবিতা লিখ্‌তে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তখন অন্তর ছিল পূর্ণ, চিত্তে ভাবের আবেগ ছিল জমাট, তাই ভাষার তারল্যের মাঝে তা' সহজ-স্বাভাবিক রূপ নিতে পার্‌লে না। কিন্তু আজ 'এমোসানে'র উগ্র আবেগ যখন শান্ত হ'য়ে পড়েচে,—এখন ছন্দে তার প্রকাশ অতি সহজেই সম্ভব হ'ল। কিন্তু কবিত্ব তার পূর্ব্ব-প্রায় স্মৃতিকে জাগিয়ে রাখ্‌তে পার্‌লে না। শেষে তার মনে সুরু হ'ল দুর্ব্বিষহ দ্বন্দ্ব। নিষ্ঠুর বিধাতার কাছে জোড়হাতে ভিক্ষা চাইলেন, যা'কে নিঃশেষে তুমি কেড়ে নিয়েচ, তার স্মৃতিটুকু শুধু মনের মধ্যে জাগিয়ে রাখ। তার ছায়া নিয়েই আমার জীবন যেন কাটিয়ে দিতে পারি! কিন্তু যে কারণে অকারণে শুধু নিতে জানে দিতে পারেনা, ভিক্ষা চাওয়া তার কাছে নিষ্ফল। বিধাতা যে বিধাতারই মত পাষাণ! এদিকে স্মৃতিকে জোর ক'রে ধ'রে রাখ্‌তে গিয়ে ক্রমে একান্ত ক'রেই সে হাতছাড়া হ'য়ে গেল। ব্যথায়, ধিক্কারে, অভিমানে নীরেনদা শেষে ফিরে দাঁড়ালেন। ব্যর্থ আক্রোশে অরুণা বৌদির ছবিগুলো দিলেন পুড়িয়ে, মূর্ত্তিটা টেনে ফেল্‌লেন নদীর জলে। বৌদির বোনকে পাঠিয়ে দিলেন বাপের বাড়ী। বিধাতা যা'কে কেড়ে নিয়েচেন, তা'কে নিশ্চিহ্ন ক'রেই বিসর্জ্জন দিলেন শুধু বাড়ী থেকে নয়—মন থেকেও। মনে মনে ভাব্‌লেন, সঙ্কিক্ষণ জীবনে আসে, তা'তে দুঃখ নেই। কিন্তু সন্ধিক্ষণ যখন জীবনের সব আশা ভাসিয়ে নিয়ে যায়, তখনই জীবনের দুর্দ্দিন। যা'কে পেলুম না, তাকে পাবার আশাও আর রাখব না। কিন্তু জীবনে তা'কি সম্ভব? যাক্‌গে, শেষ কথাটা বলি। গত শনিবার দিন নীরেনদা আবার বিয়ে করেচেন এক সুশ্রী, সাধারণ মেয়েকে - সে যেন রূপসী অরুণা বৌদির

studied contrast। এর মধ্যেও রয়েচে সেই প্রতিক্রিয়ার উগ্র ঝাঁজ। যা' ভোলবার নয়, তা'কে নিঃশেষে ভোলবার একান্ত চেষ্টা।

আমরা তিনজনে একসঙ্গে ব'লে উঠ্লুম, "আশ্চর্য্য!"

কিছুক্ষণ পরে শ্যামু বল্লে, "তোমরা যাই বল'না কেন, এটা সত্যি ঘটনা কখনই নয়। ও কথা-সাহিত্যিক। এটা ওর সেই উর্ব্বর প্রতিভার নির্জ্জলা কল্পনা।"

কিন্তু শিশিরদা ধীরে ধীরে মাথা নাড়্তে নাড়্তে বল্লেন, "না-না শ্যামু, ঠিক অসত্যিও নয়। হ'তে পারে এতে আছে ওর সাহিত্য প্রতিভার অত্যুক্তি, কিন্তু এটা একেবারে নিছক বাজে গল্প নয়।"

অনিল সায় দিয়ে উঠ্ল, "ঠিক বলেচেন, শিশিরদা, যা প্রকৃত ঘটনা, তার বাইরে যার দৃষ্টি যেতে পারে, তার-ই ত' সত্যিকার সাহিত্য-প্রতিভা। বাল্মীকি যখন রামের জীবন-কাহিনী সম্পূর্ণ না জানার কথা জানালেন, তখন নারদের মুখ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ এই কথাই বলেছিলেন,

'ঘটে যা' তা' সব সত্য নহে। কবি তব মনোভূমি
রামের জন্মস্থান অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।"

—"হাঁ, বাস্তবিকই তাই। বিজন, তুমি যদি গল্পটা কোন মাসিকে দাও ত' আমি সমালোচনা ক'রে দেখিয়ে দোব যে ⋯"

—"রক্ষে করুন শিশিরদা, এর মধ্যে আর সমালোচনা হজম হবে না। আপনি কি সমালোচনা-রাজ্যের স্বয়ং-অবতার,—God's Anointed? তাই স্থানে-অস্থানে, কারণে-অকারণে সক্রেটীসের মত শুধু সমালোচনাই ক'রে বেড়াচ্ছেন?"

অনাথ এবার কথা কইলে। তার বাপ দেশ বিখ্যাত পণ্ডিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্যের তুলনামূলক সমালোচনায় তাঁর নিপুণ হাত। অনাথ তা'র কিছু-কিছু ভাগ পেয়েছিল। তাই শিশিরদার সমালোচনা ও প্রায়ই সহ্য করতে পারত' না। একটু হেসে ও বলে যায়, "ট্র্যাজিডির ধারণা তোমাদের সকলেরই এক-তরফা। ট্র্যাজিডির অন্তর্নিহিত বেদনার একদিকটাই তোমরা দেখ্তে পেয়েচ। কিন্তু সবচেয়ে বড় ট্র্যাজিডি কি তাই আমি তোমাদের দেখাব।"

সরোজ বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে বল্লে, "সবচেয়ে বড় ট্র্যাজিডি কি তাত' ওস্কার ওয়াইল্ড নিজেই ব'লে গেচেন, 'The soul is born old, but grows young. That is the comedy of life. The body is born young and grows old. That is life's tragedy."

—থামো সরোজ। কথাটা আমায় বল্তে দাও। এটা আমার জীবনে প্রত্যক্ষ দেখা নয়, শোনা গল্প। বাবার মুখে শুনেচি। তাঁর সেই সুললিত বর্ণনার গুণে যা গল্প ছিল, তা আমার কাছে হ'য়ে পড়েচে প্রত্যক্ষের মত। যাক্,—লেখক একজন বিদেশী। তার পরিচয় বাবাকে জিজ্ঞাসা ক'রে আর একদিন না হয় ব'লব। গল্পটা কার এবং কবেকার তা' জানার আগে গল্পটা কি তা' জানাই উচিৎ।" এই ব'লে সে একটু কেশে নিয়ে সুরু করলে।

"এর আরম্ভ অতি মামুলি। ইটালীর এক যুবক। যেমনি গরীব, তেমনি নিরাত্মীয়। সামান্য মাইনেতে কোনো অফিসে কেরাণীগিরি ক'রে জীবিকা চালায়। মাঝে মাঝে সাপ্তাহিকে গল্প লেখে। একাদশীর ক্ষীণ চাঁদেও লেগে থাকে একটুখানি ম্লান হাসি। এত দুঃখের মধ্যেও তার দুরাশার অন্ত নেই। প্রাণের একান্ত কামনা, যুগের মধ্যে সবচেয়ে বড় হাস্য-রসাত্মক গল্প-লেখক হবে,—humourist। ছোট্ট সম্বল, তবু আশা কম নয়। জ্ঞান ত' দুঃখের মধ্যে—ব্যথার মধ্যে লুকিয়ে থাকে যে হাসি, সেখান থেকেই আসে সত্যিকার humour। নজিরের অভাব নেই। Lamb হ'তে পেরেছিল ইংলণ্ডের সবচেয়ে বড় humourist কারণ তার জীবন ছিল সব চেয়ে ট্র্যাজিক। ছেলেটি সঙ্কুচিত জীবনের সকল অভাবকে দূর করবার চেষ্টা কর'ত এই হাসি দিয়ে।

সেই চেষ্টাই মাঝে মাঝে ফুটে উঠ্‌ত—ছোট্ট গল্প বা সামান্ত প্রবন্ধে। তা' নিয়ে বিপুল আশায় সে সম্পাদকদের দ্বারে দ্বারে ঘুর্‌ত কিন্তু আদর পেতনা কোথাও।

এম্নি ক'রে তার দিন যায়। সংসারের সস্তা সুখে, সাধারণ আরামে তার যেমন আসক্তি ছিল না মোটেই, মেয়েদের 'পরেও ওর বিশেষ কোন আগ্রহ দেখা যেত না। একাগ্র হ'য়ে সে তার জীবনের সমস্ত শক্তিকে উৎসর্গ ক'রেছিল—সাহিত্য-সাধনায়। এমন একান্ত হ'য়ে সাধনা কর্‌ত ব'লেই সে সকল বাধাকে উপেক্ষা কর্‌তে পার্‌ত নির্ব্বিকার চিত্তে। কিন্তু হঠাৎ একদিন এল ব্যাঘাত। তার অন্তরে প্রজাপতি উঠ্‌ল' জেগে। Graziaকে সে ভালোবেসে ফেল্‌লে। Grazia বড় ঘরের মেয়ে, যেমনি সুন্দরী, তেম্‌নি বিলাসী। ছেলেটিও জন্মেছিল বড় ঘরে। কিন্তু বিত্ত যেখানে নেই, বংশমর্য্যাদা সেখানে হ'য়ে পড়ে অগৌরব, জীবনের দুর্ব্বিষহ ভার। এক্ষেত্রে হ'লও তাই। Grazia তার প্রেমকে কর্‌লে প্রত্যাখান। ব'ল্লে, বিবাহকে উপভোগ কর্‌বার মত সামর্থ্য যেদিন আস্‌বে, সেদিন বিবাহের আশা ক'রো, আজকে নয়। ছেলেটি মিনতি ক'রে ব'ল্‌লে, বাইরের সম্পদকেই দেখ্‌লে Grazia,—ভেতরের মানুষটিকে দেখ্‌লে না? যা' তুমি চাইচ, আমার জীবনে যদি সত্যিই সেদিন আসে, তার জন্তে কি অপেক্ষা ক'র্‌তে পার্‌বে না? মেয়েটি নিষ্ঠুর হাসি হেসে ব'ল্‌লে, স্বপ্ন-বিলাসী, জীবনকে ভোগ কর্‌তে চাও স্বপ্নের পুঁজি দিয়ে? জাননা কি এর মেয়াদ কতটুকু? মেয়েটির এই নিষ্ঠুর প্রত্যাখান ও সহ্য কর্‌তে পার্‌লে না। মরীয়া হ'য়ে উঠ্‌ল। তার সাহিত্য-সাধনা শেষ হ'য়ে গেল। জীবনের সকল আশা ঘুচে গেল। নিরাশার দুঃখকে ভোলবার জন্তে সস্তা আমোদের পঙ্কিলতায় আপনাকে ডুবিয়ে দিলে। চাক্‌রী দিলে ছেড়ে। যে বইখানা ছাপাবার জন্তে চেষ্টা ক'র্‌ছিল এতদিনের একাগ্র সাধনার সেই অমূল্য সম্পদ—সেখানা কুটি-কুটি ক'রে ছিঁড়ে ফেল্‌লে। শেষে পেহ-পণ্য-বীথির আবিলতায় আশ্রয় নিলে। কিন্তু সেখানেও না মিল্‌ল তৃপ্তি, না-বা সুখ। একদিন এল reaction—যেমনি কঠোর, তেমনি প্রবল। লজ্জায়, ঘৃণায়, হতাশায় সে স্থির কর্‌লে, আত্মহত্যা ক'রব। সব ঠিক্-ঠাক্। কিন্তু সেখানেও এল বিঘ্ন। আত্মহত্যা করা আর হ'ল না।

সেই দুর্যোগের অন্ধকার থেকে এল আলো,—জাগ্‌ল আশা। তার মনে হল, পথ চলাইত' জীবন। মৃত্যুতে ত' মিল্‌বে না জীবনের আনন্দ। সে আনন্দ শুধু আসে জীবনের দীর্ঘ পথেই। অদৃষ্টের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে যদি বেঁচে থাকি একদিন হ'য়ত আস্‌বে সাফল্য,—মিল্‌বে তৃপ্তি। রোশী সেই রাত্রেই গোপনে ইটালি ছেড়ে চ'লে গেল। সঙ্কল্প ক'র্‌লে, সাহিত্য-সাধনাকে সফল ক'রে তুলে একদিন আবার আস্‌ব ইটালিতে ফিরে—অগাধ ঐশ্বর্য্য নিয়ে। সেদিন তাই দিয়ে Graziaর গর্ব্বকে খর্ব্ব ক'রে তার চিত্ত জয় ক'রব,—তবেই পাব বিশ্রাম।

যাক্, বাকিটা কম কথাতেই বলি। মরীয়া হ'য়ে যারা নিজেকে ধ্বংস ক'র্‌তে পারে, মরীয়া হ'য়েই তারা গড়তে পারে নিজেকে। অষ্ট্রিয়ার এক নিরালা কুটীরে ব'সে লাঞ্ছনা, পীড়ন আর মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে রোশী সাধনা সুরু ক'রে দিলে। বারবৎসর কঠিন সাধনার পর সত্যিই একদিন সিদ্ধি মিল্‌ল। শ্রেষ্ঠ humourist ব'লে দেশে দেশে তার খ্যাতি হ'ল। কমলা অকৃপণ হস্তে ঐশ্বর্য্য দিয়ে তার মনের আশা ভরিয়ে দিলেন। সেদিন এল ইটালিতে ফের্‌বার দিন।

এতদিন প্রেসিয়ার যে রূপমূর্ত্তি তার দৃষ্টির সাম্‌নে ভাসত—তা' সেদিনের সেই রূপসী তরুণীর। গর্ব্বে, আনন্দে, আশায় রোশী যখন ইটালীতে ফিরে এল,—দেখ্‌লে, গ্রেসিয়া আর সে গ্রেসিয়া নেই। বিগতপ্রায় যৌবন তার মধ্যে ফুটিয়ে তুলেচে এক মাধুর্য্য,—তরুণীর চপলতার স্থানে এসেচে কমনীয়তা। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে পুরুষের অন্তরের ক্ষুধাও বদ্‌লে যায়। গ্রেসিয়াকে দেখে আজ রোশীর মনে হ'ল, একেই যেন সে জন্মে জন্মে চেয়ে এসেচে; এই রূপ, এই কমনীয়তা এরই কামনায় যেন ওর সমস্ত অন্তর এতদিন প্রতীক্ষা ক'রে ছিল। একদিন সুযোগ পেয়ে ও গ্রেসিয়াকে ব'ললে, আজো কি আমার জীবনে সেদিন আসে নি—যেদিনের ইঙ্গিত একদিন একান্ত ঘৃণাভরে তুমি দিয়েছিলে এক গরীব স্বপ্ন-বিলাসীকে? আজো কি আমায় প্রতীক্ষা ক'রে থাক্‌তে

হবে সেদিনের আশায়? গ্রেসিয়ার চোখ ছুটি জলে ভ'রে এল। সে মনের আবেগ দমন ক'রে বল্লে, তোমার পথের পানে চেয়েই ত' এতদিন অপেক্ষা ক'রে আছি রোণী! যেদিন আমার কথা শুনে তুমি ক্ষুব্ধ হ'য়ে জন্মের মত চ'লে গেলে,—তারপরে তোমার সেই আত্ম-বিস্মৃতি,—সেই পচা পাঁকের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখার চেষ্টা, সবই আমার কানে এল। তখন মুসোলিনীর সঙ্গে আমার বিয়ের কথা চল্‌চে। সে শুধু জমীদার নয়, নামজাদা পণ্ডিতও। তাই বাবা এমন গুণী পাত্রকে হাতছাড়া কর্‌তে চাইলেন না। যতশীঘ্র সম্ভব বিয়ের স্থির ক'রে ফেল্‌লেন। যেদিন রাতে আমাদের শেষ কথা হ'য়ে গেল, তার পরের দিন ভোরবেলা শুন্‌লুম তোমার আত্মহত্যার কথা। সে কথা যে মিথ্যে, তা' সেদিন কে জান্‌ত! জীবনে মানুষ কি এতই দুর্ব্বল? মনের ওপর কি তার কোন হাত নেই? আগের দিন রাতে যা'কে না পেলে ভেবেছিলুম জীবন ব্যর্থ হ'য়ে যাবে, সেদিন মনে হ'ল তা'কে যেন কোনোদিনই ভালবাসি নি। তা'কে পাওয়াই যেন জীবনের সবচেয়ে বিড়ম্বনা। অথচ যা'কে একদিনের জন্যেও ভালোবাস্‌তে পারিনি, বরং গরীব, নিঃসহায়, ভাবপ্রবণ ব'লে উপেক্ষা ক'রে এসেচি, তোমার আত্মহত্যার কাহিনী শোন্‌বার পর মনে হ'ল, সেই যেন আমার অন্তরের চিরকালের দেবতা। আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলুম। এতদিন এত বড় ভালোবাসা এত ছোট হ'য়ে কোথায় লুকিয়ে ছিল। দু'দিন ধ'রে মনকে কত কথাই বোঝালুম, কিন্তু কোন ফলই হ'ল না। অশান্ত মন মুসোলিনীর সংসর্গে দুর্দ্দান্ত হ'য়ে প'ড়্‌ল। শেষে একদিন লজ্জা, সম্ভ্রম, দ্বিধা সমস্ত কাটিয়ে মুসোলিনীকে সব কথা খুলে বল্‌লুম।...কিন্তু সে কথা থাক্।......আজ আমিই তোমার কাছে মিনতি জানাচ্ছি, সেদিনের প্রায়শ্চিত্ত কি এতদিনেও শেষ হয় নি?

জানু হেসে ব'ল্‌লে, "অর্থাৎ বিয়োগান্ত হ'তে হ'তে প্লটটা শেষ হ'ল মিলনান্ত হ'য়ে।"

অনাথ একটু বিরক্ত হ'য়েই ব'ল্‌লে, "তোমরা যা' ভাব্‌চ ঠিক তার উল্টো বরং এই মিলনের মধ্যেই সুরু হ'ল ট্র্যাজিডি। বাবা যেমন ক'রে বলেছিলেন, তেমন মর্ম্মস্পর্শী ক'রে বল্‌তে পার্‌লুম না। কিন্তু সে অসাধ্য সাধনের ইচ্ছেও আমার নেই। গল্পের শেষকথা এবার সুরু করি। কিছুদিন পরেই ওদের বিয়ে হ'য়ে গেল। বিয়ের রাতে রোণী বল্‌লে, গ্রেসিয়া, আজ আমার এ মিনতিটুকু রাখ। আজ রাতের মত আমাকে ছুটি দাও। গ্রেসিয়া এই অদ্ভুত আচরণে একটু বিস্মিত হল কিন্তু কিছু বল্‌লে না।...পরের দিন ভোরবেলা দেখা গেল, পড়ার ঘরে রোণীর মৃতদেহ ধূলায় লোটাচ্ছে আর তার হিম-শীতল বুকের উপর একখানা লম্বা চিঠি।"

আমরা সকলেই উৎসুক হ'য়ে শুন্‌ছিলুম। অনাথ সেদিকে দৃষ্টি না ক'রেই বলে যায়, "তোমরা হয় ত তামাসা ক'রে ভাব্‌চো, এটা একটা Mystery play, কিন্তু মোটেই তা' নয়। চিঠিতেই লেখক তা' পরিষ্কার ক'রে দিয়েচেন। চিঠিতে যা' লেখা ছিল, তার ভাবটুকু নিজের কথাতেই বলি। 'গ্রেসিয়া, তোমাকে সত্যিই একদিন ভালোবেসেছিলুম, তাই আজ ঠকাতে পারলুম না। একদিন জীবনে একান্ত ক'রে চেয়েছিলুম,—খ্যাতি, অর্থ আর তোমার পাণি। বার বৎসরের সাধনায় তিনটি আশাই যেদিন পরিপূর্ণ হ'ল তখন দেখ্‌লুম, কামনার মধ্যে যে আনন্দ, তৃপ্তির মধ্যে তা' নেই। যেদিন তুমি মুক্তচিত্তে জানালে, আমার প্রতীক্ষায় তোমার জীবন কাটিয়ে দিয়েচ—যেদিন নিশ্চিত ক'রে জান্‌লুম, নিঃশেষে তোমাকে পেয়েচি, সেদিন অন্তরে জেগে উঠ্‌ল পাওয়ার তীব্র বেদনা। পাওয়াটা এত নিরর্থক—এর আগে কখন ভাবি নি। সেদিন বুঝ্‌লুম আমার অন্তর্জীবনে এসেচে জরা,—এসেচে মৃত্যু। চাওয়ার মধ্যেই আছে জীবনের বীজ। কামনা মানুষকে এনে দেয় জীবনের গতি। তৃপ্তির নিরানন্দের মাঝে আছে মৃত্যুর শীতলতা। মানুষের কামনার যেদিন শেষ হয়, সেদিন আসে তা'র সত্যিকারের মৃত্যু। মনে হয়, ভারতের বৌদ্ধেরা একথা জান্‌ত। তাই, তারা বলেচে, কামনার পারে যাও। অর্থাৎ কামনার শেষে ইহজীবনের চরম পরিণতি ঘটলেই হ'বে মুক্তি। যেদিন তোমাকে পেয়ে সব কামনা মিটল, সেদিন এই সত্যটুকু বুঝ্‌তে পারলুম। এই ক'দিন ধ'রে কত চেষ্টা

ক'রেছি অন্তরের কামনাকে নূতন করে জাগাতে,—জীবনের তৃষ্ণাকে আরও বাড়িয়ে দিতে,—সন্তানের আকাঙ্ক্ষা দিয়ে ভবিষ্যৎ সৃষ্টি করতে; কিন্তু জীবনের যাত্রাকে নতুন ক'রে সুরু করবার শক্তি অন্তরে শুকিয়ে এসেছিল,—সেখান থেকে কোনো সাড়া পেলুম না। তোমার সায়াহ্নের শান্ত যৌবন থেকেও কোনো প্রেরণা এল না। বুঝ্‌লুম, আর চেষ্টা করা মিথ্যে। তাই তৃপ্তির ব্যথা নিয়ে জীবনের অভিশাপ হ'য়ে থাকার চেয়ে এর শেষ ক'রে দেওয়াই ভাল।"

বেদনায় অনাথের কণ্ঠ গাঢ় হ'য়ে গেছল। তাই একটু থেমে সে তার বক্তব্য শেষ করলে, "কথাটা খুবই সত্যি। কামনার মধ্যে আছে সতেজ আনন্দ; তৃপ্তির মধ্যে আছে নিরর্থক নিরানন্দ। যা' একান্ত ক'রে চাওয়া যায়, তা' না পাওয়ার ব্যথার মধ্যেই শুধু ট্র্যাজিডি নেই; জীবনের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজিডি হচ্ছে, যা' চাওয়া যায়, তা' পাওয়ার তৃপ্তির মধ্যে।"

শ্রীকাননবিহারী মুখোপাধ্যায়

স্বরলিপি

পিলু—দাদরা

যেন একটি গানে—
জীবন আমার বাজিতে চায়
করুণ তানে তানে।
কোন্ কথাটি নাহি জানি
এ জীবনে পায়না বাণী,
তারি লাগি' সুরটি আমার
বিরাম নাহি জানে।

যেন কি ফুল হায়,
লতার তনু-মাঝে কাঁদে
ফোটার বেদনায়!
যেন গো কোন্ আঁধার টুটে
সোনার আলোক পড়্‌বে লুটে
সকল বেদন মালা হ'য়ে
জড়াবে কার প্রাণে।

কথা—শ্রীসুবোধচন্দ্র পুরকায়স্থ

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীহিমাংশুকুমার দত্ত, সুরসাগর

ণপা ণা I
যে ন।

+ ২ ০ + ২ I
II ণা -া -সা । ণসা -রমজ্ঞা রসরা I ণসা -া -া । ণা -া -া I
এ - ক্ টি - - - - গা - নে - - - - -

[সা ন্‌সা -রজ্ঞা । জ্ঞরা জ্ঞা -া [রজ্ঞা -মজ্ঞা রা । জ্ঞরা সন্‌া - সা]
জী ব - - ন্ আ মা র বা - - জি তে - গে ল্

[সা সরা -গা । -সরা গা মপা [মজ্ঞা -া -া । রমা -জ্ঞরা -সন্‌া]
ক ক - - ণ্ ভা বে - ভা - - - বে - - - - -

[ন্‌পা -ন্‌া -সা । - ন্‌সা -রমজ্ঞা সরা [সা -া -া । -া ন্‌পা ন্‌া]]
এ - ক্ - টি - - - - গা - নে - - - যে ন

+ ২ + ২
]] { -া -া সন্‌া । সা গা মা [মপা পা -া । -া -া -া]
- - কোন্ ক থা টি না হি - - - -

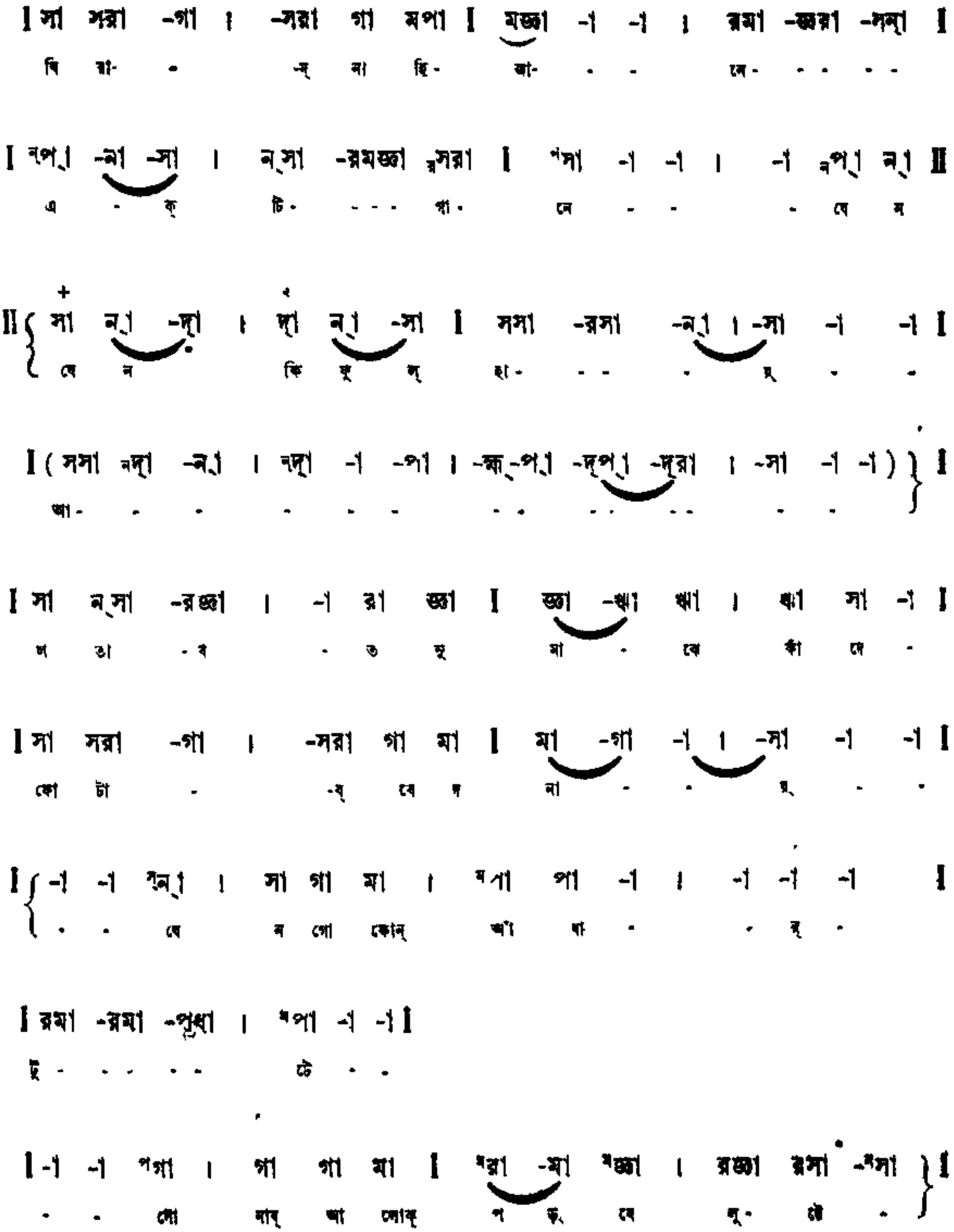
(পপা -মজ্ঞজ্ঞা -পদা । পজ্ঞা -পা -া) } [পধা -মপা -ধর্সণা । পধা -পা -া]
জা - - - - - নি - - জা - - - - - নি - -

-া -া পগা । গা গা মা [মরা -মা মজ্ঞা । রজ্ঞা রসন্‌া -সা]
- - এ জী ব নে পা র্ না বা- ণী - - -

{ -া -া সা । জ্ঞা রা জ্ঞা [জ্ঞা -ঋা ঋা । ঋা সন্‌া -সা]
- - তা রি লা গি সু র্ টি আ মা- র্

ন্‌সা -গমা -পধা । মপা -া -া [গমা -পধা -পমা । -গমা -পমা -জ্ঞরা]
ভা- - - - - রি - - লা - - - - - - - - - - -

-রজ্ঞা -রজ্ঞা -রসা । ন্‌সা -া -া) }
- - - - - - গি - -



I { -া -া সা । সজ্ঞা ঋা জ্ঞা I জ্ঞা -ঋা ঋা । ঋা সা -া I
. - - স কল্ যে মন মা - লা হ' য়ে -

I (-া -া পা । পা পধা পা I পমা -া মগা । ঋগা ঋসা -া I
- - স কল যে মন মা - লা হ' - য়ে

I সা ন্সা -গমা । -পা -া -া I পপা -ধপা -া । -পঋা -া -া I
স ক - - - ল্ - যে - - - - - - -

I ঋগা -মঋা -গমা । -ধপা -মগা -ঋগা । -মপা -মজ্ঞা -ঋসা । -ন্া -সা -া) I
হ - - - - - - - - - - - - - - - - ন্ -

I সা সঋা -গা । -সঋা গা মা I মজ্ঞা -া -া । ঋমা -জ্ঞঋা -সন্া I
জ ড়া - - - - যে খাব প্রা - - ণে - - - - -

I সপ্া -ন্া -সা । ন্সা -ঋমজ্ঞা সঋা । সা -া -া । -া সপ্া ন্া II II
এ ক টি - - - গা মে - - - যে ন

এ স্বরটিতে শুদ্ধ, কড়ি কোমল নিয়ে বারোটি স্বরই ব্যবহৃত হ'য়েছে। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে পিলুতে সব স্বরেরই ব্যবহার পাওয়া যায়। "অজব ঠাট সখি পিলুকো বতাবত, সব সুর শুদ্ধ অরু বিকরত ,—একটি লক্ষণ গীতে রাগ পিলু সম্বন্ধে এরূপ বলা হ'য়েছে। স্বরলিপিতে কতকগুলি তান ও বোলতান দেওয়া হ'ল। প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে সেগুলি বাদ দিয়ে স্বরলিপিটি আয়ত্ত করা সহজ হবে ব'লে তানগুলি বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হ'ল। এ গানটি শ্রীমতী সতী দেবী গ্রামোফোনে রেকর্ড করেছেন; রেকর্ড শীঘ্রই প্রকাশিত হ'বে।

শ্রীহিমাংশুকুমার দত্ত

নাম ও পদবী

বীরবল

১

শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায়, ভাদ্র মাসের বিচিত্রায় নামের পদবী নিয়ে যে আলোচনা করেছেন তার সার্থকতা ও উদ্দেশ্য যে কি তা ঠিক বোঝা গেল না। কিন্তু বিষয়টি যে গুরুতর সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আর এ জাতীয় আলোচনার মহাগুণ এই যে এই সূত্রে অনেক রকম শাস্ত্রালোচনা করা যায়।

প্রথম এই আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা ইতিহাসের দেশেও একটু ঘোরাফেরা করতে পারি। পদবী যে কত প্রাচীন তাই দেখাবার জন্য তিনি গুপ্তবংশীয় ও সুঙ্গবংশীয় রাজাদের পুত্রপৌত্রাদিক্রমে নামের ফর্দ্দ দিয়েছেন। ইতিমধ্যে তিনি আমাদের একটি নূতন কথা শুনিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে "পুষ্যমিত্র ব্রাহ্মণ, তাঁর পুত্র অগ্নিমিত্র ক্ষত্রিয় কন্যা বিবাহ করায় তাঁর বংশধর হলেন ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয়"—Sir Chimanlal Setalvad-এর জাত। এ তত্ত্ব তিনি কোথা থেকে উদ্ধার করলেন? মালবিকাগ্নিমিত্র নাটক থেকে? মালবিকা বাসবদত্তার পরের সংস্করণ—আর রত্নাবলীর পূর্ব্ব সংস্করণ, অতএব ধরে নেওয়া যেতে পারে যে তিনি ক্ষত্রিয়কন্যা। কিন্তু সে মালবিকার গর্ভে ও অগ্নিমিত্রের ঔরসে যে কোনও আধা-ব্রাহ্মণ, আধা-ক্ষত্রিয় পুত্র-সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিল এ কথা ত কালিদাস কোথাও বলেননি। "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা" এ শাস্ত্রবচন রাজারাজড়াদের অবজ্ঞাত। এ ছাড়া উক্ত নাটকে অগ্নিমিত্রের আরও দুটি রাণীর আমরা সাক্ষাৎ পাই এবং তার ভিতর একজন ত মদ খেয়ে রসনা উঁচুয়ে রাজাকে তাড়া করেছিলেন। এ রাণীটি যে ক্ষত্রিয়কন্যা শুধু তাই নয় উগ্র ক্ষত্রিয় কন্যা, তা তাঁর ব্যবহার থেকেই বোঝা যায়। কিন্তু অগ্নিমিত্রের দেবী খুব সম্ভবতঃ ছিলেন ব্রাহ্মণকন্যা। সুতরাং তাঁর পর যিনি রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন তিনি যে ব্রহ্মক্ষত্রিয় ছিলেন তার কোনও প্রমাণ নেই। সে যাই হোক সুঙ্গ রাজাদের পদবী চিরকালই এক ছিল না, মিত্র শেষটা ভূমিতে পরিণত হয়েছিল। সুতরাং পদবী জিনিষটা প্রাচীন কি অর্বাচীন বলা কঠিন।

২

সেকালের আমাদের পদবী ছিল কি না জানিনে, তবে একালের বাঙালীদের যে আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আর সে সব পদবীই কিছু জাতিবাচক নয়। শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্করও লক্ষ্য করেছেন যে ঘোষ, দত্ত, পাল পদবী কোনো বিশেষ জাতের একচেটে নয়। ও তিনটি কেন আরও এমন অনেক পদবী আছে যা ব্রাহ্মণেতর বর্ণদের একমালি সম্পত্তি, যথা—দেব, দে, চন্দ্র, সেন, রক্ষিত, পালিত, ইত্যাদি। এর থেকে যদি কিছু প্রমাণ হয় ত এই প্রমাণ হয় যে—এককালে বাঙালীরা সব বৌদ্ধ ছিল। আর যখন তারা বৌদ্ধ ছিল, তখন নামের যেটি শেষাংশ ছিল, সেই অংশই কালক্রমে পদবীতে পরিণত হয়েছে। দেব, দত্ত, পাল, চন্দ্র, রক্ষিত পালিত, শীল, ঘোষ, বসু মিত্র, এই সকল শব্দকে বুদ্ধ, সংঘ, ধর্ম্ম—এই তিনটি শব্দের পিছনে বসিয়ে দিন,—ফলে, বৌদ্ধ-শাস্ত্রে সুপরিচিত সব নাম পাওয়া যাবে। শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর মনে করেন যে ভবিষ্যতে ইন্দ্রনাথ প্রভৃতি নামের অংশ পদবী-আকার ধারণ করবে। তা করবে কি না জানিনে কিন্তু অতীতে যা ছিল নামের অংশ তা যে বর্ত্তমানে পদবীতে পরিণত হয়েছে সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। আর সে কালে দেবী, দাসী প্রভৃতির বালাই ছিল না। কারণ বুদ্ধরক্ষিতের গৃহিণী অনায়াসে সঙ্ঘমিত্রা হতে পারতেন। পদবীরই কোন লিঙ্গ নেই, নামের আছে।

একমাত্র ব্রাহ্মণদের পদবীগুলিই বাংলা নামাবলীতে প্রক্ষিপ্ত। তার কারণ ব্রাহ্মণ-জাতটাই বোধ হয় বাংলা দেশে প্রক্ষিপ্ত অথবা ভুঁইফোড়। উপাধ্যায়, ভট্টাচার্য্য, চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি খুব সম্ভবতঃ বৌদ্ধ নাম নয়। অবশ্য এ সব প্রধানতঃ রাঢ়ীয় শ্রেণী ও বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের পদবী। শুধু বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের পদবীগুলিই, সংস্কৃত নয়

প্রাকৃত। আর সে প্রাকৃত একেবারে অনার্য্য প্রাকৃত। আর্য্য-অনার্য্যের এই নামের মিলনের মূলে হয়ত আছে রক্তের মিলন। সে গেরো আজ খোলা অসম্ভব।

৩

এখন পদবী ছেড়ে নামে আসা যাক্। প্রথমেই একটি কথা বলে রাখি। নামের কোনও পদবী নেই—আছে লোকের। এমন বহুলোককে আমি জানি, আর দেশশুদ্ধ লোকে জানেন—যাদের নাম এক কিন্তু পদবী ভিন্ন।

কিছুদিন পূর্ব্বে দেশে উপাধি বর্জ্জনের একটি জোর প্রস্তাব উঠেছিল, তাতে কেউ আপত্তি করেননি—কারণ এদেশে লাখে একেরও উপাধি নেই। যা নেই তা ত্যাগ করতে কে না প্রস্তুত?

এখন শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর কি চান যে দেশের লোক পদবী বর্জ্জন করুক? যদি উক্তরূপ পদবী বর্জ্জন করলে দেশের লোক সভ্যতার সিঁড়ি ভাঙতে পারে তাহলে আমাদের নামের ও লেজ কেটে দিতে বোধ হয় কেউই আপত্তি করবেন না। আজও স্বদেশী সমাজ শ্রেণীতন্ত্র, কিন্তু বর্ত্তমান সভ্যতার ঠেলা আমাদের সমাজকে গণতন্ত্রের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আর "যো আপসে আতা উসকো আনে দেও" এই হচ্ছে এ যুগের প্রগতি-কামী লোকদের মত, আর আমিও হচ্ছি গতির পক্ষপাতী, তা সে গতি, প্রগতিই হোক্, উর্দ্ধগতিই হোক, অনুগতিই হোক্ আর অপগতিই হোক। সুতরাং পদবী বর্জ্জনে আমার কোনই আপত্তি নেই।

তবে আমার মনে হয় যে পদবীহীন নাম, প্রথম প্রথম আমাদের কানে একটু নেড়া নেড়া লাগবে, যেমন, pant এর বদলে half-pant আমাদের চোখে মধ্যপদলোপী বেশ লোছ লাগে। যদিচ আমরা জানি যে কাপড়ের হাঁটুর উপর ওঠাটা সভ্যতার ক্রমোন্নতির চোখে-আঙুল-দেওয়া প্রমাণ। আমাদের চোখ কান আমাদের মনের মত free নয়. অনেকটা অভ্যাসের দাস। ইহজীবনে মুক্তির প্রধান বাধাই এই যে মানুষ ইন্দ্রিয়ের হাত থেকে সহজে মুক্তি লাভ করতে পারে না।

৪

শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর কিন্তু পদবী ছাঁটবার স্পষ্ট প্রস্তাব করেননি—প্রস্তাব করেছেন শুধু আমাদের নাম retrench করবার।

"রবীন্দ্রনাথ" এ নাম শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর বরদাস্ত করতে পারেন না। তাঁর আভিধানিক ও আলঙ্কারিক আত্মা এ নামের বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। অতএব ও নামের ইন্দ্রনাথ তিনি লোপ করে দেবার পক্ষপাতী। অপর পক্ষে প্রমথ চৌধুরী তাঁর হুকুমের অপেক্ষা না রেখেই আগে ভাগে নাথ বর্জ্জন করেছেন কিন্তু তাতেও তিনি কিন্তু কিন্তু করেন। তিনি প্রশ্ন করেছেন প্রমথ ও চৌধুরীর মধ্যে হাইফেন নেই কেন? নেই এই জন্যে যে নামটা বিলেতি নয় দেশী। এ ক্ষেত্রে নাম ও পদবীকে ঘেঁসাঘেঁসি বসিয়ে দিলে, ও উভয়ে জোড় লেগে কি একটি সমস্ত পদ হয়? নাম যখন সংস্কৃত আর পদবী যখন মুসলমানী তখন ও দুয়ের কি entente সমাস হয় না দ্বন্দ্ব-সমাস? তবে ও দুয়ের যে কোনরূপ সন্ধি হয় না তা জানি।

সে যাই হোক, আমাদের অধিকাংশ লোকের জোড়া নাম দুটো নাম নয় একটি নাম। ও নাম retrench করা চলে না, dismiss করাই চলে। কারণ এ সব নামকে amputate করলে তা কদর্থ হয়ে পড়ে। প্রমথনাথের নাথ বাদ দেওয়াও যা, ভূতনাথের নাথ বাদ দেওয়াও তাই। কারও বাপ মা ছেলের ওনাম রাখতে পারেন না, কেননা অতটা ভবিষ্যদ্দৃষ্টি জনক জননীর প্রায়ই থাকে না। শেষার্দ্ধপদ ছেঁটে দেবার আরও একটা বিপদ আছে। বাঙালীরা ছেলের নামকরণের সময় লিঙ্গ বিচার করেন না। তাই এদেশে পুরুষের মধ্যে যত রমণী, মোহিনী, সারদা, অন্নদা পাওয়া যায় পৃথিবীর আর কোথাও তা পাওয়া যায় না। সুতরাং মেয়ের নাম ছেলের রাখতে হলে তার সঙ্গে মোহন, কান্ত, প্রসাদ কিম্বা শঙ্কর জুড়তেই হবে। সুতরাং বাঙালীর সমস্ত নাম নিয়ে আমাদের ব্যস্ত হবার প্রয়োজন নেই।

বীরবল

শরৎচন্দ্র

শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত

বাঙ্গালী চিরকালই তাহার সাহিত্যে সামাজিক চিত্র, ঘর-গৃহস্থালীর কথা বেশ জীবন্ত করিয়া আঁকিয়া দেখাইতে পারিয়াছে। এই বিষয়ে তাহার আছে স্বাভাবিক প্রতিভা; অন্যান্য ক্ষেত্রে কারিগরীর জন্য তাহাকে কিছু যত্ন চেষ্টা করিতে হয়। বৃহৎ জীবনের কথা, শৌর্য্য, বীর্য্য, উদাত্ত আকাঙ্খা আস্পৃহার কথা—যেখানে প্রয়োজন চেতনার বা ভাবের বিস্তার সামর্থ্য দার্ঢ্য কাঠিন্য, তাহা বাঙ্গালী শিল্পীর হাতে খুব কমই সজীব হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু যখনই সে তাহার গাঁয়ের, তাহার ঘরের তাহার পারিবারিক কান্তকোমল বৃত্তির ছবি দিয়াছে, কেমন সহজ সুস্পষ্ট প্রাণস্পর্শী তাহা হইয়া উঠিয়াছে।

শরৎচন্দ্রেও এক হিসাবে অনেকখানি আমরা পাই এই সত্যটিরই সমর্থন। তিনিও বাঙ্গালীর এই চিরপরিচিত কোটের বাহিরে যাইতে চান নাই। শেষ দিক দিয়া তিনি একটু চেষ্টা করিয়াছেন বটে ফ্রেমটা কিছু বড় করিয়া ধরিতে, দৃষ্টিকে উঁচুতে তুলিয়া ধরিয়া গভীরে সুদূরে তাহাকে প্রসারিত করিয়া দিতে। তবে শরৎচন্দ্রের প্রতিভার বৈশিষ্ট্য, বিস্তৃতি বৈচিত্র্য অপেক্ষা একাগ্রতা তীক্ষ্ণতা বেশী। তীক্ষ্ণতারও পাই আবার মাত্রাধিক্য অর্থাৎ উগ্রতা। তাঁহার নিজের ক্ষেত্রটির মধ্যেও যে জীবন-ছন্দের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে নানাত্ব খুব বেশি নাই—কিন্তু সর্ব্বত্রই আছে ঝাঁঝাল সজীবতা। শরৎচন্দ্র বাঙ্গালীর অভ্যস্ত কোটের বাহিরে যান নাই—কিন্তু সেখানে আনিয়া দিয়াছেন—গভীরতা হয়ত ততখানি নয়, কিন্তু একটা "অসীম অপরিসীম" খরতা, তীব্রতা।

শরৎচন্দ্র বাঙ্গালীর সমাজকে দেখিয়াছেন, দেখাইয়াছেন ভিতর হইতে। বাহির হইতে দর্শকে যে ভাবে দেখে, সে রকমের চিত্র আগে অনেকেই দিয়াছেন—তাহাতে দর্শনের নৈপুণ্য সত্যতা, এমন কি আন্তরিকতাও যথেষ্ট আছে। কিন্তু শরৎচন্দ্র যেন ভিতরকে উল্টাইয়া বাহিরে ব্যক্ত করিয়া ধরিয়াছেন। তাঁহার জগতে বস্তু ঘটনা চরিত্র যাহা, তাহাদের বাস্তব রূপায়নটি প্রধান কথা নয়—প্রধান কথা তাহাদের প্রাণের গতি, সেই গতির তোড়। জিনিষের একটা সম্পূর্ণ নিটোল মূর্ত্তি তাঁহাতে ফুটিয়া উঠিয়াছে কি না সন্দেহ। ঘটনার অব্যর্থ পারম্পর্য্য, ব্যক্তির অঙ্গে অঙ্গে অটুট সঙ্গতি, আবহাওয়ার একটা সহজ স্বাভাবিকতা অনেক সময়েই হয়ত পাইব না—তাঁহাতে জাগ্রত মুখরিত জিনিষের অন্তরের প্রেরণা, আবেগ, আশা, আকাঙ্খা। বাঙ্গালীর সমাজের বা ব্যক্তিজীবনের যে চিত্র তিনি দিয়াছেন, বাস্তবের সহিত মিলাইয়া দেখিলে হয়ত দেখিব সেখানে আছে কেমন অত্যুক্তি আতিশয্য, অতিরঞ্জন, সত্য হইলেও সত্যকে অনাবশ্যক জোরে চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইবার প্রয়াস—ফলে একটা, অনেকে যাহার নাম দিবেন, ঠাট বা ঢঙ। কিন্তু গোটা বস্তুকে ত শরৎচন্দ্র দেখাইতে চাহেন নাই, তাঁহার হাতে বাজিয়াছে বস্তুর অন্তরের একটা তন্ত্রী—দেহ নয়, তাঁহার লক্ষ্য দেহগর্ভস্থ নাড়ীর ধমনীর চঞ্চল লাস্য। বাঙ্গালীর সমাজের প্রাণময় লোকে—রক্তের ধারায় কি আবেগ কি সত্য উৎকণ্ঠিত অধীর হইয়া উঠিয়াছে, বাহিরের দেহ-চেতনায় অচলায়তনের চাপে কি কথা মুখ ফুটিয়া তাহার বলা হইতেছে না, উহাই শরৎচন্দ্রের কথা।

শরৎচন্দ্রের একটি মানুষ উত্তেজনার বশে হঠাৎ একটা বিসদৃশ কিছু করিয়া ফেলিয়া শেষে লজ্জিত হইয়া ভাবিতেছেন, "কি অভিনয় আমি এই করিলাম?" এই "অভিনয়"ই এক হিসাবে শরৎচন্দ্রের শিল্প রচনায় একটা মূল সূত্র দিয়াছে বলা যায়। তাঁহার সৃষ্টির যে চাল, যে ছন্দ প্রাণের যে গতিভঙ্গী তাহা অনেকখানি আনিয়াছে এই জিনিষটিকে ধরিয়া। কথায় কথায় কাঠ হইয়া, নির্ব্বাক হইয়া, স্তব্ধ হইয়া যাওয়া—হঠাৎ ছুটিয়া পলায়ন করা—বিস্ময়ের ব্যথার ভীতির সীমা-পরিসীমা না থাকা—গভীর

অবসাদ—চিত্ত জুড়িয়া বিদ্রোহের জ্বালা—ঝর ঝর চোখের জল—অথবা প্রয়োজন মত যে ঘটনাটি যেখানে যে সময়ে ঘটিলে চমকপ্রদ হয় তাহার ব্যবস্থা—এই যত প্রকার Deus ex machina, শরৎচন্দ্রের পাতায় পাতায় তাহা ছড়াইয়া আছে।

কিন্তু রহস্তের কথা এই, এতখানি melodrama বা অতি-অভিনয়ের উপকরণ থাকা সত্ত্বেও, শরৎচন্দ্রের সৃষ্টি কিছু মাত্র আড়ষ্ট বা কৃত্রিম হইয়া পড়ে নাই। বরং এই সকলের কল্যাণেই তাঁহার সৃষ্টি পাইয়াছে তাহার স্বকীয় তীব্রতা, উগ্রতা। মনে হয় একটা জগৎ আছে যেখানে এই ধরণের অভিনয়ই হইল সেই জগতের সত্যের স্বাভাবিক ও জীবন্ত প্রকাশ। শরৎচন্দ্র সেই জগতেরই অধিবাসী, সেই জগতেরই স্রষ্টা।

. আর একদিক দিয়া আবার কিন্তু শরৎচন্দ্রের সৃষ্টি যেমন সজীব সচল, আমাদের গোচর অন্তরঙ্গ হইয়া উঠিয়াছে, তেমনি পাইয়াছে একটা বৃহত্তর ছন্দেরই দোল; যেহেতু তাঁহার দৃষ্টিশক্তি খেলিয়াছে একটা আধুনিক মনকে আশ্রয় করিয়া। তাঁহার বিষয়, উপকরণ ক্ষেত্র পাত্র অনেকখানি প্রাচীন পুরাতন—প্রাচীন সমাজ, পুরাতন সংস্কার, সামাজিক মানুষে মানুষে গতানুগতিক সম্বন্ধ, ব্যক্তির মধ্যে নিত্য-নৈমিত্তিক বৃত্তি। এই সকলেরই উপর তিনি ফেলিয়াছেন আধুনিক বুদ্ধির আলোক, ইহাদিগকে দেখিয়াছেন, দেখাইয়াছেন বর্ত্তমান যুগের জিজ্ঞাসাকে ধরিয়া।

এই জিজ্ঞাসা বৃত্তিই হইল আধুনিক মনের প্রধান লক্ষণ—জিজ্ঞাসা অর্থ জিনিষকে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখা, ওলট পালট করিয়া, ভিতর হইতে বাহির হইতে, সর্ব্বতোভাবে সকল দিক দিয়া; কি, কেন, কি রকম, কোথা হইতে, কোন দিকে? এই যাবতীয় ঔৎসুক্যই হইল জিজ্ঞাসা। অতীতের যুগে, যাহা আছে, আছে বলিয়াই তাহাকে বিনা প্রশ্নে মানিয়া লওয়া হইত—জিনিষ যেমনটি আছে তেমনটি দেখানই ছিল তখনকার শিল্পীর কার্য্য। আধুনিক মন কিন্তু যাহা আছে তাহাকে এই কুর্ণিশ প্রশ্ন দিয়া পরিচয় আরম্ভ করে—"তুমি আছ?" সত্য সত্যই, না ভাণ করিতেছ? সত্যই যদি থাক, তবে আছ কোন অধিকারে? তুমি না থাকিলেই বা জগতের কি আসিত যাইত?" আধুনিকের জিজ্ঞাসা-বৃত্তিতে এই রকমে মিশিয়া আছে একটা অজ্ঞেয়তা-বুদ্ধি—আসল সত্যখানা যে কি তাহা কিছুই বুঝা যায় না, এই রকম একটা সন্দিগ্ধতা।

কিন্তু ইহারই কল্যাণে আধুনিক মন পাইয়াছে একটা পরম ঔদার্য্য। সকল জিনিষকেই সে দিতেছে সমান মর্য্যাদা। এককালে যাহা ছিল মন্দ বা পাপ ব্যক্তিগত নীতি হিসাবে হো'ক আর সামাজিক রীতি হিসাবেই হো'ক—এখন তাহাকে আর তত মন্দ তত পাপ বলিয়া মনে হয় না। আর যাহা ছিল ভাল পুণ্য, তাহাকেও তত উঁচুতে রাখিতেছি না। জগতে যে একটি সত্য বা সুন্দর বা মঙ্গল আছে তাহা নয়, একটি বিশেষ সত্য, সুন্দর, মঙ্গল যে আর সকলের উপরে, তাহাও নয়। আছে অনেক সত্য সুন্দর মঙ্গল—প্রত্যেকেই নিজের নিজের ধর্ম্মে মহান। জগতে সব জিনিষই আপেক্ষিক কিন্তু আপেক্ষিক বলিয়া যে আবার তুচ্ছ বা মিথ্যা তাহাও না হইতে পারে।

দাম্পত্য ও একান্নবর্ত্তিতা—আমাদের সমাজ-বন্ধনের এই দুটি মূল সূত্র শরৎচন্দ্রের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। একান্নবর্ত্তিতার যে কি দোষ কি ত্রুটি, ব্যক্তি-জীবন এবং সামাজিক জীবনে কি বিষ তাহা আনিয়া দিতেছে, তাহার চিত্র যত স্পষ্ট হইতে পারে, তাহা তিনি আঁকিয়া দেখাইয়াছেন। ইহা অবশ্য আধুনিক সকল বিদ্রোহ বা iconoclasm এর কাজ, বিদ্রোহী হিসাবে শরৎচন্দ্র কাহারও পিছনে নহেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি আবার তেমনি দরদ দিয়া নিপুণতার সহিত দেখাইয়াছেন এই সুপ্রাচীন ব্যবস্থাটির সত্য কোথায়, সৌন্দর্য্য কোথায়—ইহাতেও ফুটিয়া উঠিতে পারে কি মহত্ব। বিবাহের সংস্কার বা দাম্পত্য সম্বন্ধ একদিক দিয়া তিনি দেখাইয়াছেন কেমন প্রাণহীন প্রথা, গোষ্ঠীজীবনের কাছে ব্যক্তির আত্মবলি; কিন্তু এই অনুষ্ঠানেরও প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা যাইতে পারে, ইহাকেও গভীর সত্যে সৌন্দর্য্যে ভরিয়া তোলা যায়, উন্নীত করা যায় একটা জীবন্ত উদাত্ত চেতনার স্তরে—প্রাচীন হিসাবে নয়, স্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ প্রভৃতি কোন মানসিক আদর্শের আজ্ঞায় নয় কিন্তু (কিম্বা হয়ত ইহারও পশ্চাতে ছিল একটা)

অধুনা সমগ্র প্রাণের সত্যকার যে দাবি তাহার কল্যাণে। একই বস্তুর মধ্যে এই যে দ্বিধা প্রকৃতি, ইহাই অনেক সময়ে শরৎচন্দ্রের রচনায় দিয়াছে তাহার dramatic interest, ঘটনায় ঘটনায় চরিত্রে চরিত্রে একটা তীব্র সজ্ঘাত।

আধুনিকের সুতীক্ষ্ণ সন্ধানী চেতনার আলোকে প্রাচীনের সমাজ সংস্কার রীতি নীতি ভাঙ্গিয়া গলিয়া যাইতেছে, আর ভাঙ্গিয়া গলিয়া যাইতেছে বলিয়াই তাহারা যেন শেষ একবার তাহাদের স্বকীয় একটা সত্য ও সৌন্দর্য্য লইয়া আসিয়া দেখা দিতেছে। শরৎচন্দ্র এই সন্ধি-জগতের, এই সন্ধিযুগের দ্রষ্টা ও শিল্পী। তাঁহাতে দেখিতে পাই পুরাতন সামাজিক ব্যবস্থার ও মানুষের ছিল কোথায় জীবন, কোথায় প্রাণ, কোথায় আকর্ষণী শক্তি—সেই সঙ্গেই আবার পাই কি ত্রুটি, কি অসম্পূর্ণতা, কি অনুপযোগিতা, কি অমানবিকতা তাহাদিগকে কেবল অতীতেরই বস্তু করিয়া রাখিয়াছে। শরৎচন্দ্রের অনেক মানুষের মধ্যে আবার পুরাতনের ও নূতনের যুগপৎ সমাবেশও পাই। কাঠামোটা পুরাতন কিন্তু তাহাতে তিনি ভরিয়া দিয়াছেন নূতন জীবনের উগ্র সুরা। তাঁহার অনেক নারী আধুনিক স্বাধীনার মতি গতি পাইয়াছে, যদিও সে মতি গতি খেলিয়াছে পুরাতন আবেষ্টনে, গতানুগতিক ব্যবস্থায়। পরে ("পথের দাবী"তে ও "শেষ প্রশ্নে") এই আবেষ্টনও তিনি ভাঙ্গিয়া ফেলিতে চাহিয়াছেন বা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দিয়াছেন—তবে নূতন আধার তিনি দেন নাই, কেমন বোধ হয় সেখানে মুক্ত প্রাণটি অশরীরী হইয়া ত্রিশঙ্কুর মত হাওয়ায় ঘুরিতেছে—জীবন্ত দেহ, বাস্তব আয়তন তাহা পায় নাই, কেবল মস্তিষ্কের চিন্তাকে কল্পনাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে।

আধুনিক জগতে জীবনে যে বিপুল ভাঙ্গা গড়া চলিয়াছে—তাহার একটা ধাক্কা আমাদের পারিবারিক কোণ, আমাদের ঘরমুখী প্রাণের উপরে পর্য্যন্ত আসিয়া পড়িয়াছে—সেখানেও তুলিয়া দিয়াছে সমস্যা সব। সমস্যার পূরণ করিবেন, যাঁহারা পারিবেন। শরৎচন্দ্র শিল্পী, সমস্যাসঙ্কুল জীবনের একটা জীবন্ত আলেখ্য যদি তিনি সম্যক দিয়া থাকেন তাহাতেই তাঁহার শিল্পীর কাজ শেষ হইয়াছে।

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

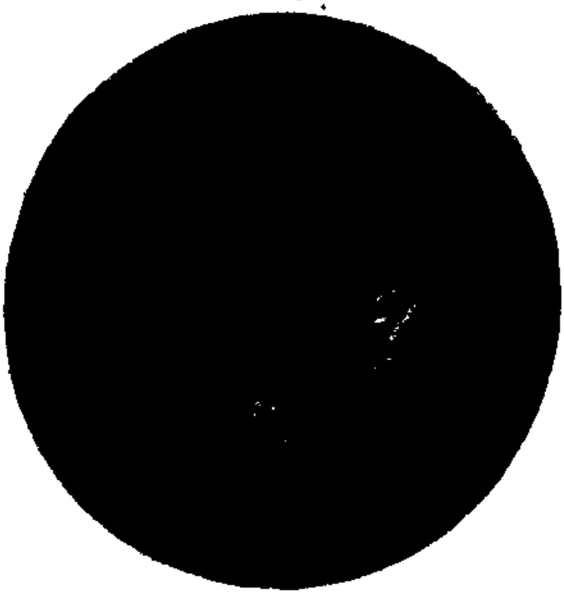
সনেট

শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র ঘোষ

কেমনে পাশরি তারে যারে দেখি নাই,
আজো লভি' নাই যার লাজ পরশন,
নয়নের অধরের সঙ্কোচ মিলন—
স্বপ্ন-বাতায়ন পথে এসে ফিরে যাই!
আমার দুয়ার পাশে দেখিবারে পাই
চিহ্ন রেখে গেছে তার অলক্ত চরণ,
অলকের গন্ধ বহে গৃহ-সমীরণ,
বাহিরে গুঞ্জন শুনি পিছু ফিরে চাই।

যাহারে দেখিনি কভু—তাহারি জয়তি
প্রতি পরমাণু মোর গাহিবারে চায়
রচি' তার ধ্যানে ফোটা কল্পনা-মূরতি।

বিস্মৃতি কামনা মাঝে আপনা বিকায়,—
কোন্ জনমের এই অতৃপ্ত নিরতি
তারি 'পরে—যারে আজো দেখিনিকো হায়!



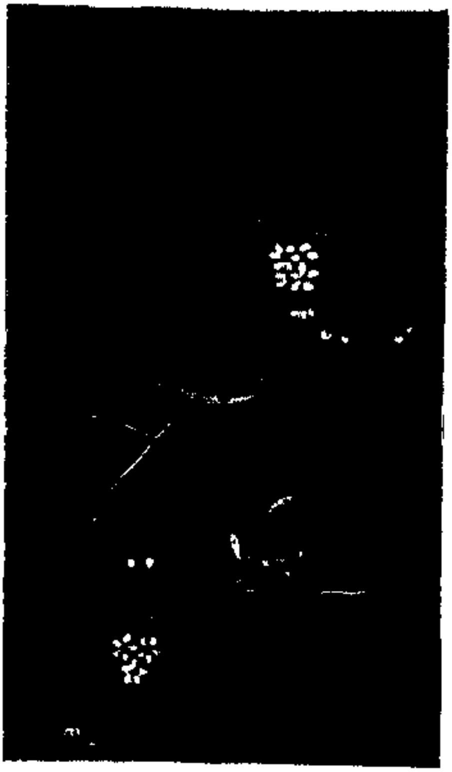
জেসো-চিত্র

কুমারী সুরভী চট্টোপাধ্যায়
অঙ্কিত

"কোকিল শুধু মুহুর্মুহু
আপন মনে কুহরে কুহু
ব্যথায় ভরা বাণী।"   —রবীন্দ্রনাথ



"সরবর খেলয়
চক্রবাহাস"   —বিদ্যাপতি



"কুসুমের ভারে কত অবনত শাখি
তঁহি শুক শারিকা বোল" —গোবিন্দ দাস

জেসো-চিত্র

কুমারী সুরভি চট্টোপাধ্যায় অঙ্কিত এই চিত্রগুলি "জেসো" Gesso শিল্প-অন্তর্ভূত একপ্রকার বিশিষ্ট চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতি অবলম্বনে অঙ্কিত, সেই কারণে ইহাদের "জেসো-চিত্র" বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। বিভিন্ন চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতির (art of painting) মধ্যে এই বিশেষ পদ্ধতিটি অন্যতম। কারু-শিল্প ও চিত্র-কলা উভয়েরই পর্য্যায়ে ইহাকে অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। ক্যানভাস্ কিংবা কাগজের উপরে চিত্রাঙ্কন করিতে হইলে শিল্পকারের যতখানি শিল্প-চাতুর্য্য এবং রসবোধ প্রয়োজন জেসো-চিত্র সৃজনেও ততখানি সূক্ষ্ম রসানুভূতি ও নৈপুণ্যের আবশ্যক; কেবল পার্থক্য এই যে এই পদ্ধতি অনুযায়ী ক্যানভাস বা কাগজের পরিবর্ত্তে কাষ্ঠফলক বা মোটা ঘন "পেষ্ট-বোর্ডের" উপরে ছবি আঁকিতে হয় এবং ছবি আঁকিবার উপকরণ সম্বন্ধে উভয়ের বিশেষ তারতম্য আছে। তাহা ছাড়া বর্ণসম্পাতে বা অঙ্কন-প্রণালীতে (colouring এবং technique of of drawing) উভয়েই প্রায় সমপন্থী। চিত্রাঙ্কনের এই প্রথাটি আমাদের দেশে একেবারে খাশ নূতন আমদানী না হইলেও আমাদের শিল্পীকুলের অবহেলা অথবা শিল্প-সৃষ্টি সম্বন্ধে কল্পনার প্রসারতার অভাবে এই অনুপম শিল্পকলার সুপ্রচলন এই দেশে তেমন ভাবে বিস্তার লাভ করে নাই যেমন ভাবে পাশ্চাত্য দেশ সমূহে অথবা জাপান ও চীনে করিয়াছে। আমাদের দেশস্থ অধিকাংশ শিল্পী বা পটুয়ার নিকট এই সূক্ষ্ম ও সুন্দর শিল্পকলা একপ্রকার অপরিজ্ঞাত ইহা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে বলিতেছি। একমাত্র পশ্চিম ভারতের কয়েকটি কারু-সম্প্রদায়, বিশ্বভারতী কলাভবনের জনকয়েক শিল্পী এবং বঙ্গদেশের কেবলমাত্র

চইচারিটী সম্ভ্রান্ত পরিবারের সুশিক্ষিত এবং শিল্প-রসজ্ঞ মহিলাগণ এই সকল কারু-কলার মঙ্গল দীপ-শিখা জ্বালাইয়া রাখিয়াছেন বলিয়াই এখনও আমরা চারু-শিল্পের উৎকর্ষ সাধনার ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য ও অভিনবত্বের দিক হইতে আমাদের জাতীয় গৌরব অনেকখানি অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছি।

এখন জেসো-শিল্পের কি বিশেষত্ব দেখা যাক্। "Gesso" অথবা "Jesso" কথাটি একটি ইতালীয় শব্দ; ল্যাটিন "Gypsum" শব্দ হইতে ইহা উৎপন্ন। "জিপসাম্" নামক খনিজ পদার্থ হইতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত "Plaster of Paris" এর অনুরূপ একপ্রকার মণ্ডকে প্রাচীনকালে ইতালীতে "জেসো" বলা হইত। য়ুরোপ ও অন্যান্যদেশের প্রাচীন বিহার ও মন্দির-গাত্র সমূহের bas reliefs অথবা freeze decorations প্রভৃতি পরিশোভন কার্য্যের মশলা স্বরূপ বহুক্ষেত্রে এই মণ্ড-জাতীয় উপকরণটি ব্যবহৃত হইত। তারপর শিল্পকলার ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন দেশে—বিশেষ করিয়া ইতালী, ফ্রান্স ও জাপানে এই উপকরণ সহযোগে সাধারণ চিত্রাঙ্কনের একটা নূতন পথ উদ্ঘোষিত হইয়াছে—ঐ সব দেশের জেসো-শিল্প এখন সর্ব্বদেশে সমাদৃত। ভারতবর্ষে বিকানীর, টঙ্ক, হায়দ্রাবাদ, কারনুল প্রভৃতি স্থানের জেসো-শিল্প বহু প্রাচীন কাল হইতে ভারতীয় কারুকের বহুমুখী শিল্প-দক্ষতার নিদর্শন জ্ঞাপন করিয়া আসিতেছে। কারু-কলার ক্ষেত্রে (crafts) ঐ সকল স্থানের জেসো-শিল্প বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে সত্য কিন্তু চারু-শিল্পের (fine-arts) ক্ষেত্রে এই দেশের জেসো-শিল্প এখনো চীন, জাপান অথবা প্রতীচ্যের মত অতখানি সমৃদ্ধিলাভ করিতে পারে নাই।

জেসো-চিত্র আঁকিবার পদ্ধতির মধ্যেও একটি উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব আছে। জেসো-চিত্রকে অনেকটা Lacquer work বা গালার কাজ বলিয়া বোধ হয় যদিও উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। জেসো-চিত্রকে আঁকিতে হইলে প্রথমত একখণ্ড কাষ্ঠ-ফলকের উপরে "জেসো" নামক রাসায়নিক মণ্ডটি ঘন করিয়া জমাইতে হয়। ঐ ঘনীভূত জমির উপরে চিত্রকর তাঁহার পরিকল্পনা ও অভিরুচি অনুযায়ী তুলিকা সাহায্যে চিত্রাঙ্কনে নিযুক্ত হন। ড্রয়িং বা অঙ্কন কার্য্য সমাপ্ত হইলে পর সাধারণ জমি (surface) হইতে মূল চিত্র-রেখা গুলি অল্পবিস্তর উন্নত রাখিয়া অবশিষ্টাংশ নির্দ্দিষ্ট যন্ত্রের দ্বারা কাটিয়া ও পরিমৃষ্ট করিয়া সমান করিয়া লইতে হয়। চিত্ররেখা ও তাহার বাহিরের জমির এই তারতম্য বশতঃ জেসো-চিত্রকে কতকটা "রিলিফ" চিত্রের মত উচ্চাবস্থিত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সাধারণ চিত্র অপেক্ষা ইহা তুলিকা-সৃষ্ট বস্তুকে আরও অধিকতর realistic বা প্রত্যক্ষবৎ করিয়া তুলিতে এবং চিত্রাভ্যন্তরস্থ আখ্যানের সজীবতা (life-like) পরিস্ফুটনে সহায়তা করে। সর্ব্বশেষে শিল্পকারের প্রয়োজন ও অভিপ্রায়ানুসারে "অয়েল কলার", "ওয়াটার কলার" সোনালী অথবা রূপালী প্রভৃতি বিবিধ বর্ণ-সম্পাতে ছবির প্রসাধন ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। পার্শ্বস্থ চিত্র-বাজির মধ্যে ১নং চিত্রটী জলের রঙ ও সোনালী পাতার সংমিশ্রণে এবং ২ ও ৩নং চিত্রদ্বয় তৈলবর্ণে রঞ্জন করা হইয়াছে। শিল্প-কাটির সুনিপুণ প্রযোজনায় এবং বর্ণ-সম্পাতের বিচিত্র লীলায় জেসো-চিত্র কতখানি রূপ-শোভায় বিভূষিত হয় তাহার নিদর্শন পাই এই চিত্র সমূহের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে। দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে এই অনুপম চিত্রকলা এখনও আশাপ্রদভাবে জনপ্রিয় হইয়া উঠে নাই; কিন্তু শিল্পী-সমাজে ইহার সুপ্রচলন হইলে আমাদের জাতীয় শিল্প-কলা, বিশেষ করিয়া আমাদের গৃহস্থালী-শিল্প একঘেঁয়ে পথ অতিক্রম করিয়া যে একটী অভিনব ও সুশোভন পথের সন্ধান পাইবে সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ইহা দ্বারা শুধু যে ছবি আঁকার একটী নূতন পদ্ধতি অনুসৃচিত হইবে তাহা নয়; আমাদের বিভিন্ন প্রকার আসবাব-পত্রের এবং নিত্যাব্যবহার্য্য দ্রব্যাদির কলাসঙ্গত শোভা বর্দ্ধনেও ইহা বিশেষ সহায়তা করিবে। এই সকল কারণে উপরোক্ত সুচারু শিল্পকলার উৎকর্ষ সাধনে যে নবীনা ছাত্রীটী আপনাকে নিযুক্ত করিয়াছেন তাঁহার প্রচেষ্টা সর্ব্বতোভাবে বরণীয়।

* চিত্রগুলি শ্রীমনুজমোহন চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।



স্বর্গীয়া মৃণালিনী দেবী

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পরলোকগতা পত্নী]

কার্ত্তিক, ১৩৩৮

বঙ্কিম সম্মেলন

শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী

বঙ্কিম-সাহিত্য সম্মেলনের এই অধিবেশনে সভানেত্রীর পদে আমায় নির্ব্বাচিত করিয়া আপনারা আমায় যে গৌরব দান করিয়াছেন, সেজন্য আপনাদের ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি,—যদিও এই নির্ব্বাচনকে আমার দিক হইতে আমি সুনির্ব্বাচন বলিতে পারি না। আমার বোধ হয় আমাকে এই দায়ীত্বপূর্ণ পদে নির্ব্বাচিত না করিয়া অপর কোন যোগ্যতর ব্যক্তিকে এই সম্মানের আসন প্রদান করিলে অধিকতর যুক্তিসঙ্গত হইত এবং আপনাদেরও উদ্দেশ্য সফল হইতে পারিত। যাঁর পুণ্যস্মৃতির সংরক্ষণ উদ্দেশ্যে এই সম্মেলন সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাঁর সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার এবং ভূয়োদর্শনজ্ঞানের সহিত যিনি শ্রোতৃবৃন্দকে কথঞ্চিন্মাত্রও পরিচিত করিতে পারিবেন এ অধিকার পাওয়ার যোগ্যতা শুধু তাঁহারই আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতি-সম্মেলনের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইবে, যদি না বাংলার উপন্যাস-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রকে কূট-রাজনৈতিক বঙ্কিমচন্দ্র, ন্যায়নিষ্ঠ সমাজ-শিক্ষক বঙ্কিমচন্দ্র, গভীর স্বদেশ-প্রেমিক বঙ্কিমচন্দ্র এবং নিগূঢ় ধর্ম্মতত্ত্বান্বেষী ও সুমধুরধর্ম্মরসপিপাসু বঙ্কিমচন্দ্ররূপে, তাঁর পরিপূর্ণ স্বরূপে, তাঁর প্রিয়তম দেশবাসীর সম্মুখে প্রকটিত করিতে সমর্থ হওয়া যায়—তাঁর সমুদয় ভাবধারার সহিত তাঁর স্বদেশবাসিদের পরিচিত করার যোগ্যতা না থাকে। আমার মধ্যে সে সামর্থ্য আছে এ বিশ্বাস আমার নাই। অন্তরের কোন একটা সহজাত বৃত্তির প্ররোচনা এ কার্য্যে আমায় ইতিপূর্ব্বেই প্ররোচিত করিয়াছে, তথাপি নিজ মনের এই মিথ্যা প্রলোভনে প্রলোভিত হই নাই; যে বস্তুটী নিজের মধ্যে অনুভব করিয়াছি অন্যকে সেই আলোক প্রদর্শন করিতে পারিব, এমন আশ্বাস আমার মনে ছিল না এবং তাহা ছিল না বলিয়াই আমি এ কার্য্যে হস্তক্ষেপও করি নাই। কিন্তু আমাদের কর্ম্মের নিবিড় ঘনজাল যে আমাদের তার কোন সূত্র দিয়া কেমন করিয়া কোথায় জড়াইয়া ফেলে তার রহস্য ভেদ করা আমাদের সহজ বুদ্ধির অতীত।

আমার শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে কেহ কেহ হয়ত এইখানেই এমনও বলিতে পারেন, যদি নিজেকে এ কার্য্যের অযোগ্য বলিয়াই জান ··তবে আজিকার এ পদ গ্রহণ করিলে কেন? নিজেও আমি ঠিক এই কথাটাই কয়দিন যাবৎ ভাবিয়া আসিয়াছি। এমন কি আজিও হয়ত সেই সন্দেহের দ্বন্দ্ব আমার চিত্ত হইতে সম্পূর্ণরূপেই প্রশমিত হইয়া যায় নাই এবং সেই সন্দেহের দ্বিধাই এখন পর্য্যন্ত আমাকে আপনাদের মধ্যে একজন অনধিকারীর কুণ্ঠায় কুণ্ঠিত রাখিয়াছে। তথাপি যে প্রস্তাব মাত্রেই আমি বঙ্কিম-সাহিত্য সম্মেলনের নবম বার্ষিক অধিবেশনের সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছিলাম তাহার সর্ব্বপ্রধান কারণ, হয়ত বা একমাত্র কারণ, এই যে বাঙ্গালা সাহিত্যের বিশেষতঃ বাঙ্গালার উপন্যাস-সাহিত্যের যুগপ্রবর্ত্তক বঙ্কিমের সমস্ত বাঙ্গালীর দ্বারা সম্পূজিত স্মৃতির জন্য নয়, এই সাহিত্যরথী বঙ্কিমের অন্তরালে যে মানুষ বঙ্কিম ছিলেন,—আমার পিতামহদেবের প্রিয় শিষ্য, আমার পিতৃদেবের কর্ম্মজগতের সর্ব্বপ্রধান উপদেষ্টা, আমাদের পরিবারের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে পরিচিত স্নেহ-সম্পর্কিত প্রতিবেশী যে বঙ্কিমকে আশৈশব আত্মীয়ের মতই চিনিয়াছিলাম তাঁহারই সেই স্মৃতির সম্মাননার অতিশয় ক্ষুদ্র দাবীতেই যেন অনি-বার্য্যক্রমে এই পদ আমি গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছি।

অনেকেই, বিশেষতঃ শিক্ষিত বঙ্গবাসীমাত্রেই, হয়ত জানেন,—অন্ততঃ তাঁদের জানা সঙ্গত বলিয়াই মনে করি,—

বঙ্কিম-সাহিত্য-সম্মেলনের নবম অধিবেশনে সভানেত্রীর অভিভাষণ।

আমার পিতামহ মহাত্মা ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই কাঁঠালপাড়ার পার্শ্বস্থ নৈহাটীর পরপারবর্ত্তী চুঁচুড়া সহরে তাঁর জীবনের অধিকাংশ কাল যাপন করিয়াছিলেন, এবং সেই সঙ্গে এ কথাও হয়ত জানেন যে, আপনাদের অদূরবর্ত্তী ঐ কলকলনিনাদিনী সুপবিত্রা জাহ্নবীর সুপবিত্র তীরভূমিই আমার জীবনের সেই প্রত্যক্ষদেবতার শেষশয়ানের অনন্ত-শয্যা। তাই এই আশৈশবের শত সহস্র পুণ্যময় স্মৃতিপূত আনন্দময় বাল্যকৈশোরের ক্রীড়াক্ষেত্র, চিরারাধ্যের অধিষ্ঠান ও তিরোধানভূমি আমার কাছে মোক্ষভূমির মতই সমাদৃত। এদেশের ক্ষণিকমাত্র দর্শনের অবসরকেও আমি আমার পক্ষে পরমলাভ বোধ করি, আর সেই পুণ্যস্মৃতির সঙ্গেই পূর্ণরূপে বিজড়িত বঙ্কিম-স্মৃতি সম্বন্ধেও দু একটি কথা বলিবার ইচ্ছা করিয়াই এ পদ যোগ্যতা বা অযোগ্যতাব বিচার ব্যতিরেকে গ্রহণ করিয়াছি।

আমার পিতামহদেবের সহিত বঙ্কিমবাবুর প্রথম পরিচয় কোন সময়ে ঘটে, সে খবর আমি জানি না। তবে তাহা যে আমাদের জন্মের বহুপূর্ব্বে সে কথা ভালরূপেই জানিতাম। শৈশবকাল হইতেই আমি আমার পিতামহদেবের সঙ্গলিপ্সু ছিলাম। তাঁর কাছেই আমার সারাদিনেব অধিকাংশ কাল কাটিত। তাঁর কাছে অনেক জাতীয়, বহুধর্ম্মী, বহুতর শ্রেণীর সাধারণ এবং অসাধারণ ব্যক্তিরা সর্ব্বদাই গমনাগমন করিতেন। তাঁদের নাম পরিচয় আমার খুব ছোটবেলা হইতেই কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছিল। তাঁদের মধ্যেও অনেকেই আমায় স্নেহ করিতেন। হেমবাবু, রাজকৃষ্ণ রায় এবং বঙ্কিমবাবুও আমাদের বাড়ীতে মধ্যে মধ্যে আসিতেন দেখিয়াছি, এবং শুনিয়াছি চাকরী উপলক্ষ্যে বঙ্কিমবাবু যখন আমাদের গঙ্গাতীরের বাড়ীর সন্নিকটবর্ত্তী বাড়ীটিতে কয়েক বৎসর ধরিয়া এবং বহরমপুরে আমার পিতামহদেবের থাকার সময়ে বাস করিয়াছিলেন, তখন সর্ব্বদাই আমাদের বাড়ীতে পিতামহদেবের নিকট আসিয়া কাব্যশাস্ত্রালোচনায় কালযাপন করিতেন। বঙ্কিমবাবুর সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা প্রভৃতি প্রবন্ধাদির এই সকল সাহিত্যালোচনার অবসর হইতেই যে উদ্ভব হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। আমার মনে হয় তাঁর সুগভীর স্বজাতি-প্রীতি এবং স্বদেশপ্রেম আর একজন অকৃত্রিম দেশপ্রেমিকের সংস্পর্শ পাওয়ায় সমধিক স্ফূর্ত্ত হইয়া উঠিতে অধিকতরই সুযোগলাভ করিয়াছিল। সমানুভূতির অরুণকিরণের মৃদু-স্পর্শও শতদলকে পূর্ণবিকশিত করিয়া তোলে।

কেহ কেহ হয়ত মনে করিতে পারেন যে, একথা বলিয়া আমি বঙ্কিম-মাহাত্ম্য খর্ব্ব করিতে চাহিতেছি। গতানুগতিকভাবে শ্রদ্ধেয়কে শ্রদ্ধাজ্ঞাপনই সাধারণতঃ লোকপ্রিয়। মৌলিক তথ্য এবং অজ্ঞাত সত্যান্বেষণ অনেক সময় "গোঁড়া ভক্ত"বৃন্দের রুচিকর হয় না। কিন্তু আমাদের শ্রদ্ধাভাজনকে তাঁর সমুদয় পারিপার্শ্বিক পরিবেষ্টনের মধ্য দিয়া তাঁর জীবনগঠনের সবটুকু উপাদানের সহিত পরিচয় রাখিয়াই আমাদের দেখিবার চেষ্টা করা সঙ্গত। তাঁর সংসর্গের, সংস্পর্শের সমস্ত ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচিত হওয়ায় তাঁহাকে পূর্ণরূপেই জানা যায়। আমরা অলৌকিকে আস্থা স্থাপন করিতে পারি, কিন্তু লৌকিকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করিতে আমাদের বাধে। তাঁর জীবনের যে দিকটাতে অনেকের লক্ষ্য পড়ে নাই, সেই দিকটাকে ঈষন্মাত্র প্রকটিত করিতে চাহিয়া এইটুকুই জানাইলাম। বিদ্যা বিনয় দান করে এ শাস্ত্রবাক্য যে মিথ্যা নয়, বঙ্কিম-জীবনীতেই তার প্রমাণ আছে, এবং দুইটি তড়িৎভরা মেঘ সন্নিকটবর্ত্তী হইলে পরস্পর হইতে বিদ্যুদাকর্ষণ করিয়া লওয়া অনিবার্য্য, বঙ্কিমে ও ভূদেবের সংস্পর্শে এই নীতির ব্যতিক্রম ঘটে নাই। আমার এ বিশ্বাসের স্বপক্ষীয় কয়েকটি প্রমাণও আমি আপনাদের নিকটে উপস্থাপিত করিব। কিন্তু তৎপূর্ব্বে বঙ্কিমবাবুর জীবনের উপরে আমার পিতামহদেবের শিক্ষার প্রভাব কিরূপ কার্য্যকরী ছিল সেই সম্বন্ধে একটীমাত্র উদাহরণ পিতৃদেবের দ্বারা সঙ্কলিত "সদালাপ" নামক পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ড হইতে এখানে উদ্ধৃত করিলাম। ইহা হইতেই আপনারা দেখিতে পাইবেন বঙ্কিমবাবুর সহিত তাঁহার কেমন মধুর গুরুশিষ্যবৎ সম্পর্ক ছিল—"বহরমপুরে থাকার সময় প্রত্যহ সন্ধ্যার পর পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়, সুপ্রসিদ্ধ বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এবং অন্যান্য কয়েকজন ভদ্রলোক ভূদেববাবুর বাসায় একত্র হইয়া নানা বিষয়ে, বিশেষতঃ

সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে, আলোচনা করিতেন। বঙ্কিমবাবু তখন বহরমপুরের ডেপুটি কলেক্টর ছিলেন। বহরমপুর কলেক্টরীর একজন প্রধান আমলাও ভূদেববাবুর বাসায় ঐ বৈঠকে মধ্যে মধ্যে আসিতেন এবং সকলের সহিত একত্রে বসিয়া আনন্দে কথাবার্ত্তায় যোগ দিতেন। একদিন বঙ্কিমবাবু সেখানে বসিয়া আছেন এমন সময়ে আমলাটি আসিয়া সকলের সহিত বসিলে বঙ্কিমবাবু হঠাৎ উঠিয়া চলিয়া গেলেন। দু একদিন পরে আবার এমন ঘটিল যে ঐ আমলাটি তথায় বসিয়া আছেন এমন সময়ে বঙ্কিমবাবু আসিয়া উঁহাকে দেখিয়া আর বসিলেন না; "কাজ একটা মনে পড়িল" বলিয়া চলিয়া গেলেন। এরূপ যে ঘটিতেছে তাহা কেহই লক্ষ্য করেন নাই। বঙ্কিমবাবু ইহার পরদিন ভূদেববাবুকে বলেন "আমলাদের নিয়ে একত্রে বসেন কেন?" ইহাতে ভূদেববাবু বুঝাইতে চেষ্টা করেন, 'চাকুরীর পদমর্য্যাদা শুধু সরকারী কাজ করিবার সময়ে; চব্বিশ ঘণ্টা কেহ চাকরী করেনা। সিবিলিয়ান কমিশনর ইউরোপীয় সব-ডেপুটির সহিতও ক্লাবে মেশেন।' এই সকল কথা বঙ্কিম বাবুর মনঃপুত হইল না। "সবডেপুটিরা আমলাদলের নয়" ইহা বলিয়া সেদিন একটু ক্ষুণ্ণভাবেই অন্ত কথাবার্ত্তা পাড়িলেন। সাত আট দিন ওবিষয়ে আর কোন কথাবার্ত্তাই হইল না। বঙ্কিমবাবু সকলের অগ্রে অল্প সময়ের জন্ত আসিতে লাগিলেন।

"কন্যাদের বিবাহ দেওয়া বড়ই কঠিন হইতেছে, যাহাদের কুল আছে তাহাদের বিদ্যা নাই, যাহাদের কুলবিদ্যা উভয়ই আছে, তাহাদের ভালরূপ অন্নসংস্থান নাই,"—একদিন ভূদেববাবু এইরূপ কথাবার্ত্তা পাড়িলে বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "একটি কন্যার বিবাহের জন্য আমিও বড়ই ভাবনায় পড়িয়াছি।"

ভূদেববাবু বলিলেন "তোমাদেরই ঘর, পুরুষে তোমাদের চেয়ে কিছু উচু একজন আছেন। ছেলে এবারে প্রথম বিভাগে বিএ পাশ করিয়াছে ও মাতামহের বিষয় অনেক হাজার টাকা উত্তরাধিকার-সূত্রে পাইয়াছে। বাপ কেরাণীগিরি করেন এবং বলেন 'ছেলের সম্পত্তি হইতে খাইব কেন?' সে লোকটিকে তুমি জানো, এখানের কালেক্টরীতে কাজ করেন। আমার স্বগোত্র, তোমার কাজে লাগিতে পারে।"

বঙ্কিমবাবু আগ্রহ সহকারেই বলিলেন "কে? অমুক? তাঁর ছেলে এত ভাল আর তাঁর মন এত উঁচু তা'তো জান্‌তাম না।" তখন ভূদেববাবুর হাসিমুখ দেখিয়াই বঙ্কিমবাবু সমস্ত বুঝিতে পারিলেন। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন "এটা সেদিনকার তর্কের শেষ নিষ্পত্তি হইল! আপনার কাছে আসিয়া যদি সৎশিক্ষা না পাইব তবে কোথায় পাইব?" বঙ্কিমবাবু ইহার পর খুব উচ্চ হাস্য করিয়া সরল ভাবে কহিলেন "সত্য সত্যই মনে হইতেছিল যে ছুটি লইয়া কলিকাতা হইতে ঐ বিবাহ দেওয়া যায়। যেখানে কন্যাদানের কথাও উঠিতে পারে, সেখানে আর আদালতের বাহিরে আমলা হাকিমের পার্থক্য কোথায়? এ বিষয়ে আমার বড়ই ভ্রম ছিল।"

এই ঘটনায় বঙ্কিমবাবুর পিতামহদেবের প্রতি শ্রদ্ধা যে কিরূপ প্রগাঢ় ছিল ইহা আপনারা দেখিতে পাইলেন। শুধু এই একটি বিষয়েই নয়, অনেক সময়ই তিনি তাঁর যেমন সামাজিক, তেমনই সাহিত্যিক মতভেদকেও কোথাও বিচার এবং বিতর্ক দ্বারা প্রমাণ পূর্ব্বক, কোথাও বা সহজ-সিদ্ধান্তেই স্বীকার করিয়া লইয়া নিজ মতবাদের ত্রুটী সংশোধন করিয়াছেন। বিনয়াতিশয্যেই যে তিনি এইরূপ করিয়াছেন তাহা মনে হয় না। গৌরব-গরিমায় প্রদীপ্ত ভাস্কর সদৃশ এই মহামনীষী যিনি আমাদের মত খদ্যোতিকাপুঞ্জের তুলনায় জ্যোতিষ্কস্বরূপই ছিলেন, তাঁরপক্ষে নির্ব্বিচারে কাহারও মতানুবর্ত্তী হওয়া কখনই সম্ভবপর নহে। কিন্তু প্রকৃত বিদ্বানও যাঁরা তাঁরা কখনই ভ্রমনিরসনে বিরত থাকিয়া অসত্যের প্রশ্রয় প্রদান করেন না।

কোন বিষয়ে বঙ্কিমবাবু পূর্ব্বে যে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন পরে তাহার পরিবর্ত্তন করেন। ইহাতে তাঁহাতে কেহ অব্যবস্থচিত্ততার আরোপ করিলে তিনি বলেন "যিনি কখন মত পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হন নাই, তিনি মহাপুরুষ। যিনি পূর্ব্বের মত ভ্রান্ত জানিয়াও তাহাতে বদ্ধ থাকেন, মত পরিবর্ত্তন স্বীকার করেন না, তিনি কপটাচারী। আমি মহাপুরুষ নহি এবং কপটাচারী হইতে আমার প্রবৃত্তি নাই।"

পারিবারিক প্রবন্ধ পাঠের পর বঙ্কিমবাবু যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা হইতে "সামাজিক প্রবন্ধ" লেখার মধ্যে বঙ্কিমবাবুর আগ্রহাতিশয্য পিতামহদেবকে কতখানি প্রভাবিত করিয়াছিল ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। যিনি গ্রহণ করিতে জানেন, দিবার অধিকারও তাঁহারই থাকে। ঐ পত্রের কিয়দংশ এইরূপ :—

"পারিবারিক প্রবন্ধ" পাইয়াছি এবং পুস্তকখানি ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে পড়িয়া সমাপ্ত করিয়াছি। পুস্তকখানিতে নাম না দিয়া ছাপান হইয়াছে। একমাত্র যাঁহার হস্তে উহা লিখিত হইতে পারে তাঁহার নাম সাধারণের কাহারও বুঝিতে বাকী থাকিবে না। এক্ষেত্রে নাম না দেওয়া সঙ্গতই হইয়াছে, প্রকৃত পূজা গুপ্তভাবেই হইয়া থাকে। সমস্ত পুস্তকখানিই মনুষ্য-হৃদয়ের সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্রতম অনুরাগের একটি মহান সঙ্গীত এবং অদৃশ্য গায়কের কণ্ঠেই উহা সর্ব্বাপেক্ষা সুমধুর শোনায়। সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ কবিতা সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ ব্যবহারিক জ্ঞানসম্বলিত হইয়া থাকে, কারণ উহাই বাস্তব জীবনে কবিত্ব। সেক্সপিয়রের নাটকে বেকনের বা অন্য যে কোন ইংরাজী পুস্তক অপেক্ষা অনেক অধিক ব্যবহারিক জ্ঞান নিহিত আছে। আমার স্বদেশীয়ের মধ্যে অনেকেই এই কথার সত্যতা স্বীকার করিবেন—তবে খুব অল্প সংখ্যকই ইহা নিজের জীবনে নিজের ভিতর অনুভব করিয়াছেন। আমার বিশ্বাস আপনার ক্ষুদ্র পুস্তকখানি পড়িলে তাঁহারা উপকৃত হইবেন।

আমি আশা করি আপনি আমাদের পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে যেরূপ লিখিয়াছেন আমাদের সামাজিক জীবন ও কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণ সম্বন্ধে সেইরূপ লিখিবেন। এই উভয়ের মধ্যে আমাদের সামাজিক সমস্যাগুলিই অধিকতর সংশয়াত্মক। আমাদিগের পারিবারিক ব্যবস্থাগুলির স্বাভাবিক উৎকর্ষ ও **আমাদের স্ত্রীলোকদিগের প্রকৃত মহত্ত্ব** আমাদিগের পারিবারিক জীবনকে খণ্ড-বিখণ্ডিত হওয়া (ডিসইনটেগ্রেসন) হইতে রক্ষা করিতেছে।"

অনেকেই হয়ত জানেন আবার অনেকেই হয়ত জানেন না যে, আমার পিতামহদেবের "ঐতিহাসিক উপন্যাসই" বাঙ্গালায় ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখার প্রথম সূচনা। ৺বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস "মৃণালিনী"ও এইরূপ ঐতিহাসিক ঘটনার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এক্ষেত্রেও আপনারা তাঁহার কল্পনাকে ৺ভূদেবের চিন্তানুসারিণী দেখিতে পাইতেছেন তথ্যানুসন্ধানে কল্পনার স্থান যে উচ্চ নয়, পরন্তু সত্যই একমাত্র অবলম্বনীয় ;—এ বিশ্বাস আমার দৃঢ় না হইলে হয়ত মনে করিতাম এই ভাবের উপন্যাস রচনার আদর্শ হয়ত বা তিনি ঐ "ঐতিহাসিক উপন্যাস" হইতেই পাইয়াছিলেন। বস্তুতঃ সকল দিক দিয়া দেখিলেই দেখা যায় যে বঙ্কিম-সাহিত্য আকস্মিক নয় ; জগতে অবশ্য কোন জিনিষই আকস্মিক হয় না। বর্ত্তমান অতীতের ভিত্তির উপরেই সংগঠিত হয়, সুবিদ্বান ও প্রতিভাবান নবীন লেখক পূর্ব্বগামীদিগের প্রদর্শিত পথেই তাঁর নব-নবীন কল্পনার যাত্রারথকে পরিচালিত করেন। চিন্তাশীল, দূরদর্শী, সমাজহিতৈষী মহাপুরুষের পবিত্র চিত্তের প্রতিচ্ছায়া সমপ্রকৃতিক মহাত্মার চিত্তমুকুরেই প্রতিবিম্বিত হয়। বস্তুতঃ ভূদেবের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবের আদান-প্রদান ফলে একই ভাবধারা দুই মহাত্মার অন্তরে অন্তরে প্রবাহিত হইতেছিল। সেই ভাবধারা প্রসারিত হইয়া একদিকে সমগ্র ভারতভূমিকে প্লাবিত করিল এবং অন্যদিকে বঙ্গজননী বঙ্গভূমিকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। সেইজন্য আমরা ভূদেবের লেখনী হইতে "পুষ্পাঞ্জলি" এবং বঙ্কিমের লেখনী হইতে "আনন্দমঠ" পাইয়াছি। এই দুই পূত-গ্রন্থের আদর্শের মধ্যে যে একটী সাম্য আছে তাহা উদাহরণ সাহায্যে দেখাইতে পারা যায় ; যথা :—

"ব্রহ্মচারী স্বয়ং আগে আগে চলিলেন, মহেন্দ্র পাছু পাছু চলিলেন। ভূগর্ভস্থ এক অন্ধকার প্রকোষ্ঠে কোথা হইতে সামান্য আলোক আসিতেছিল।... সেই ক্ষীণালোকে এক কালীমূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন।"

ব্রহ্মচারী বলিলেন "দেখ মা যা হইয়াছেন।"

মহেন্দ্র সভয়ে বলিল "কালী।"—আনন্দমঠ, ১১শ পরিচ্ছেদ।

"ব্রাহ্মণেরা * * * একটী সঙ্কীর্ণ সোপানপরম্পরা দ্বারা কতদূর নামিলেন। পথটী ঘোর অন্ধকারাবৃত। কিয়দ্দূর গমন করিলে একটি দীপালোক দৃষ্ট হইল। পরে একটি প্রকোষ্ঠ মধ্যে গিয়া দেখিলেন, শবাসনা পাষাণময়ী

কালিকামূর্ত্তির সমক্ষে একজন ব্রাহ্মণ একটী প্রদীপ হস্তে দণ্ডায়মান আছেন। দীপধারী কহিল "ইনি মহারাজ শিবাজীর প্রতিষ্ঠাপিতা মহাদেবী করালী।" —পুষ্পাঞ্জলি, নবম অধ্যায়।

"মধ্যে সুবর্ণনির্ম্মিতা দশভূজা প্রতিমা নবারুণ-কিরণে জ্যোতির্ম্ময়ী হইয়া হাসিতেছে। ব্রহ্মচারী কহিলেন, "এই মা যা হইবেন। দশভুজ দশদিকে প্রসারিত * * * পদতলে শত্রু বিমর্দ্দিত, পদাশ্রিত বীরকেশরী শত্রুনিপীড়নে নিযুক্ত—দিগভূজা।"

—আনন্দমঠ, ১১শ অধ্যায়।

"এমন পবিত্র তীর্থ এমন জাগ্রত দেবতা আর কোথায় দেখিবে? দর্শন কর এই কূর্ম্ম, তাহার পৃষ্ঠে বাসুকী, তাহার উপর পৃথিবী, তদুপরি সিংহ—সিংহবাহিনী সঞ্জীবনী দেবী সর্ব্বোপরি বিরাজিতা।"

—পুষ্পাঞ্জলি, নবম অধ্যায়।

আপনারা ইচ্ছা করিলেই দেখিতে পাইবেন যে পুষ্পাঞ্জলি-কার পুষ্পাঞ্জলিতে বহু পূর্ব্বে যে কাঠাম গড়িয়াছিলেন, যে মাতৃমূর্ত্তি গঠন করিয়াছিলেন, মাতৃপূজার যে বিধি নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন, আনন্দমঠে সেই মূর্ত্তিই সসজ্জ এবং প্রাণবন্ত হইয়াছে এবং মাতৃপূজার মহামন্ত্রের সরলার্থ প্রচারিত হইয়াছে। পুষ্পাঞ্জলির ত্রিকালজ্ঞ সপ্তকল্পান্তজীবী মার্কণ্ডেয় আনন্দমঠের 'জ্ঞানময় মহাপুরুষ হইতে অভিন্ন এবং আনন্দমঠের সত্যানন্দ পুষ্পাঞ্জলির বেদব্যাস ব্যতীত অপর আর কেহই নহেন। পুষ্পাঞ্জলিতে জিজ্ঞাসু বেদব্যাস তাঁহার ধ্যানদৃষ্ট যে মূর্ত্তির সম্বন্ধে মার্কণ্ডেয়কে প্রশ্ন করিলেন তাঁর এই রূপ আমরা দেখিতে পাই,—

"মুনিরাজ! আমি ধ্যানে কি অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দর্শন করিলাম! ঐ মূর্ত্তি চিরকালের নিমিত্ত আমার হৃদয়কন্দরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল। পাদপদ্মের কি অনুপম সৌন্দর্য্য! অঙ্গের কি জাজ্জ্বল্যমান প্রভা—মুখচন্দ্রের কি রুচির কান্তি! ইনি পর্ব্বতরাজপুত্রী পার্ব্বতীর ন্যায় সিংহবাহনে আরূঢ়া নহেন, ত্রিপথগামিনী গঙ্গাদেবীর যাবতীয় শোভা ইঁহার অঙ্গের একদেশেই বিদ্যমান—ইঁহাকে মাধবপ্রিয়া বলিয়াও ভ্রম হয় না; রমা মত্তাম্বরা; ইনি হরিদ্বসনা ব্রহ্মনন্দিনীর ন্যায় ইঁহার সুস্নিগ্ধ সৌম্যভাব বটে; কিন্তু ইনি বীণাপাণি নহেন, আর অন্য সকল দেবদেবী হইতে ইঁহার বৈচিত্র্য এই যে, ইনি নিরন্তর অপত্যবর্গ লইয়া সকলকে মাতৃভাবে অন্নপান প্রদান করিতেছেন। মুনিবর! ইনি কোন দেবী?—পুষ্পাঞ্জলি গ্রন্থের আভাষ—

"হেমপ্রভা হরিদম্বরা পদতলে নীলাম্বু লীলাঙ্কিতা।
স্নিগ্ধা স্নিগ্ধতরঙ্গিনী সুরধুনী পীযূষনিস্যন্দিনী॥
সূর্য্যেন্দু প্রতিবিম্বিতাম্বর লসৎ প্রান্তের মৌলিজ্জ্বলা।
সৌম্যাম্ভাদধিভারতী ভবহরা নিত্যান্নদা শান্তয়ে॥
"মাতর্নমামি ভবতীং হি সতীদেহরূপাং, মাতর্নমামি
বসুধাতল পুণ্যতীর্থং
মাতর্নমামি পদযুগ্মধৃতাম্বুরাশিং মাতর্নমামি হিমগৌর-
কিরীটভূষাং।"

—৺ভূদেব রচিত।

আপনারা এখন তুলনা করুন, এই অধি-ভারতী বা ভারতের অধিষ্ঠাত্রীর যে মূর্ত্তি পুষ্পাঞ্জলিকার তাঁর দিব্যদৃষ্টিতে দেখিয়া যাঁহাকে শ্লোকচ্ছন্দে রূপ দিয়াছিলেন সেই হরিদম্বরা জলধিলীলাঙ্কলা স্নিগ্ধা, আবার সূর্য্যেন্দুপ্রতিবিম্বিতা এই হিম-গৌরকিরীটভূষিতা মাতৃমূর্ত্তির সহিত—

"সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং
শস্য শ্যামলাং মাতরম্" অথবা
ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণীম্
কমলা কমলদলবিহারিণীম্

বাণী বিদ্যাদায়িনীত্বাং—ইত্যাদির কিছু প্রভেদ আছে কি? তবে প্রভেদ আছে এইখানে, ভূদেবের স্বদেশপ্রেম বাঙ্গালা অথবা বাঙ্গালীপ্রেমের পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে; তাহা ব্যাপকভাবে সমস্ত ভারতবর্ষের এবং ভারতবর্ষীয়ের উপরেই সম্বন্ধ। ভারতের ত্রিশ কোটি অধিবাসীই তাঁর আত্মজন, সতীদেহরূপা আসমুদ্রহিমাচল তাঁর স্বদেশ। বঙ্কিমবাবুর চিত্ত বঙ্গজননীর "সপ্তকোটি" সন্তানের কণ্ঠোত্থিত "কলকলনিনাদে" গৌরবোজ্জ্বল। এই-খানেই আমরা দেখিতে পাই তাঁহার দেশাত্মবোধ ৺ভূদেবের উদারতর দেশাত্মবোধে পঁহুছিতে সমর্থ

হয় নাই। কিন্তু কে বলিবে যে, যে জীবনসূর্য্য জীবন-সায়াহ্নের পূর্ব্বেই রাহুগ্রাসে নিপতিত হইয়া অস্ত গেল তাহা তার পূর্ণাবসর লাভ করিতে পাইলে "সপ্তকোটির" পরিবর্ত্তে "ত্রিংশকোটি" কণ্ঠের সহিত কণ্ঠ মিলাইত কিনা? আমরা নেত্রঝলসিতকারী তীব্র জ্যোতিষ্মান মধ্যাহ্ন-ভাস্করকেই দেখিলাম; সংহততেজ, স্নিগ্ধজ্যোতি সায়াহ্নতপনের গোধূলি-রক্তরাগ আমরা তো উপভোগ করিতে পাইলাম না। পাইলে হয়ত দেখিতাম আসমুদ্রহিমাচল সমস্ত ভারতবর্ষের উপরেই তাঁহার সহানুভূতির স্বর্ণরশ্মি বিকীর্ণীত হইয়েছে। শুনিতাম "ত্রিংশকোটিকণ্ঠকলকলনিনাদকরালে।"

বঙ্কিমবাবুর লিখিত সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাস-সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা বহুতর সুধীজন বিশেষতঃ—রবীন্দ্রনাথ ও ললিত-কুমারের পর আর কিছু করিবার আছে এমন কথা আমার মনে হয় না। কিন্তু তাঁর প্রবন্ধাবলী আমি তাঁর উপন্যাস-সাহিত্য হইতে একটুও অল্পমূল্য বলিয়া মনে করি না। আজি-কালিকার দিনের পক্ষে অধিকতর প্রাসঙ্গিক হইবে বোধ করিয়াই আমি তাঁর প্রবন্ধগুলি লইয়া অতি সামান্য একটুখানি আলোচনা করিব।

বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাভঙ্গীর তুলনা আমিতো দেখিতে পাই না, তাঁর অঙ্কিত বর্ণিত সেই সকল সরস, বিরস, কোমল, কঠোর চিত্রগুলি যেন একটী ছুটী তুলির টানে জীবন্ত বাস্তব হইয়া উঠে, সুখে দুঃখে আমাদের জীবনের সকলক্ষেত্রে আপন হইয়া আসন পাতিয়া বসে। তথাপি আমার মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব তাঁর অকৃত্রিম দেশানুরাগে। স্বদেশের, স্বজাতির, স্বধর্ম্মের এবং স্বীয়সমাজের পুরাতন ইতিহাস, শাস্ত্র, ধর্ম্ম, সমাজনীতিকে তিনি ঐকান্তিক শ্রদ্ধার সহিতই সন্দর্শন করিতেন এবং অপরকেও ঐ দৃষ্টি দিয়া দেখিবার সর্ব্বপ্রযত্নেই সহায়তাও করিতেন। কোন কোন আধুনিক, এমন কি প্রবীণ, লেখককেও লিখিতে দেখিয়াছি যে অতীত লইয়া আলোচনা করা আর মড়া আগলাইয়া বসিয়া থাকা একই কথা। অর্থাৎ তাঁহারা "লেট্ দি ডেড্ পাষ্ট বেরি ইট্স্ ডেড" (Let the dead past bury its dead) এই ইংরাজী বাক্যটাকে সমর্থন করেন। কিন্তু অতীত চিন্তা ব্যতীত যে বর্ত্তমানের কর্ম্মধারা নিয়ন্ত্রিত এবং পরিচালিত হইতে পারে না, এ সত্য বঙ্কিমবাবু বুঝিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, যে জাতির পূর্ব্বমাহাত্ম্যের ঐতিহাসিক স্মৃতি থাকে তাহারা সেই মাহাত্ম্যরক্ষার চেষ্টা করে; কোন মূল্যবান দ্রব্য যাহার ভাণ্ডারে ছিল এবং হারাইয়া গিয়াছে সে ঐ হারানো রত্নের পুনঃপ্রাপ্তির জন্য চেষ্টিত হয়; যাহা ছিল না, তাহা পাওয়াও যায় না। এই ভাবের অভিব্যক্তি তাঁহার সীতারাম, আনন্দমঠ ও দেবীচৌধুরাণী। বাঙ্গালীর বাহুবল, বাঙ্গালীর শৌর্য্যবীর্য্যের এতটুকু মাত্র ঐতিহাসিকতা তিনি যেখানেই খুঁজিয়া পাইয়াছেন, সাদরে বরণ করিয়া লইয়াছেন এবং স্বদেশীয় বীরত্ব ও মহত্ত্বের সেই চিত্রখানিকে প্রাণবন্তরূপে স্বদেশীয় পাঠকবর্গের সম্মুখীন করিয়াছেন। দুঃখ হয় তাঁর সময়ে বাঙ্গলার ইতিহাসের যে অপ্রকাশিত পৃষ্ঠাগুলি আজ বঙ্গীয় বুধগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বধ্বংসী কালের চক্রনেমির তলদেশ হইতে উত্থিত হইয়া বিস্ময়ানন্দে-বাঙ্গালীর চিত্তকে পরিপ্লুত করিতেছে—মিথ্যা কলঙ্কে কলঙ্কিত বাঙ্গালীর চিরকলঙ্ককালিমা ক্ষালনপূর্ব্বক জগতের বীরেন্দ্রসমাজ যে একদিন বাঙ্গালীর স্থান কাহারও অপেক্ষা নিম্নে ছিল না এই সত্য ঘোষণা করিতেছে—এই গৌরব-গরীমা তিনি দেখিয়া যান নাই। এই যে আজ বাঙ্গালীর লুপ্তকীর্ত্তি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা ও যত্ন বাঙ্গালার অধিবাসীর মধ্যে জাগ্রত হইয়াছে, ইহার মধ্যে এই দেশপ্রাণ মহাপুরুষের কতখানি সাগ্রহ প্রচেষ্টা ও আকুতি রহিয়াছে তাহা তাঁহার "বঙ্গদর্শন" হইতে পুনর্মুদ্রিত "বিবিধ প্রবন্ধে"র "বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা", "বাঙ্গলার কলঙ্ক" প্রভৃতি যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারাই অবগত আছেন। বাঙ্গালীর ভীরু অপবাদ তাঁহাকে বজ্রবলে বিঁধিয়াছিল; বিঁধিবারই কথা—সকল দেশপ্রাণ মহাত্মার বুকেই স্বজাতির সত্য এবং বিশেষ করিয়া মিথ্যা অপবাদ বজ্রবলেই বিদ্ধ হয়, এবং সেই আঘাত বেদনাই তাঁকে স্বজাতির যথার্থ ইতিহাস জানিবার এবং মিথ্যা কলঙ্ক অপনয়নের জন্য জাগ্রত করিয়া তোলে। বাঙ্গালী যে চিরদরিদ্র ছিল না, ভীরু ছিল না, হীন ছিল না, এই সকল বাক্য যে নবাগতের কূটরাজনীতিপ্রসূত মিথ্যা রটনা—এই নূতন চাণক্যনীতির বলে যে শৌর্য্যবীর্য্যশালী বাঙ্গালীকে তার

গৌরবময় অতীত বিস্মৃত করাইয়া হংসপুচ্ছধারী কেরাণীকুলে সহজেই পরিণত করা এবং রাখা যাইবে—এ তথ্য যেমন মহাত্মা ভূদেবের তেমনই বঙ্কিমবাবুর দৃষ্টিতে প্রতিভাত হইয়াছিল। স্বদেশীয় মিথ্যাকলঙ্কে ক্ষুব্ধ হইয়া বড় দুঃখেই তিনি বলিতেছেন:--"কদাচিৎ অন্যান্য ভারতবাসীর বাহুবলের প্রশংসা শুনা যায়, কিন্তু বাঙ্গালীর বাহুবলের প্রশংসা কেহ কখন শুনে নাই। সকলেরই বিশ্বাস বাঙ্গালী চিরকাল ভীরু, চিরকাল দুর্ব্বল, চিরকাল স্ত্রীস্বভাব, চিরকালই ঘুষি দেখিলে পালাইয়া যায়। মেকলে বাঙ্গালীর চরিত্র সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, এরূপ জাতীয় নিন্দা কখন কোন লেখক কোন জাতি সম্বন্ধে কলমবন্দ করেন নাই। ভিন্নদেশীয়দিগের বিশ্বাস সে সকল কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। ভিন্ন জাতীয়ের কথা দূরে থাকুক, অধিকাংশ বাঙ্গালীর চরিত্র সমালোচনা করিলে, কথাটা কতকটা যদি সত্য বোধ হয়, তবে বলা যাইতে পারে বাঙ্গালীর এখন এ দুর্দ্দশা হইবার অনেক কারণ আছে। মানুষকে মারিয়া ফেলিয়া তাহাকে মরা বলিলে মিথ্যা কথা বলা হয় না। কিন্তু যে বলে যে বাঙ্গালীর চিরকাল এই চরিত্র, বাঙ্গালী চিরকাল ভীরু, চিরকাল দুর্ব্বল স্ত্রীস্বভাব, তাহার মাথায় বজ্রাঘাত হউক, তাহার কথা মিথ্যা।

সত্য বটে বাঙ্গালী মুসলমান কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিল, কিন্তু পৃথিবীতে কোন্ জাতি পরজাতি কর্ত্তৃক পরাজিত হয় না? ইংরাজ নর্ম্মান জাতি কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিল, জর্ম্মানি প্রথম নেপোলিয়নের অধীন হইয়াছিল। ইতিহাসে দেখি ষোড়শ শতাব্দীর স্পেনীয়দিগের মত তেজস্বী জাতি রোমনদিগের পর আর কেহ জন্মগ্রহণ করে নাই। যখন সেই স্পেনীয়েরা আটশত বৎসর মুসলমানের অধীন ছিল, তখন বাঙ্গালী পাঁচ শত বৎসর মুসলমানের অধীন ছিল বলিয়া সে জাতিকে চিরকাল অসার বলা যাইতে পারে না। ইংরাজ ইতিহাসলেখক উপহাস করিয়া বলেন সপ্তদশ মুসলমান অশ্বারোহী আসিয়া বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল। বঙ্গদর্শনে দেখান হইয়াছে সে কথার কোন মূল্য নাই।" * * *

বাঙ্গালীর পক্ষে পরম গৌরবের বিষয় যে বাঙ্গালীর অতীত কাহিনী আজ আর দুর্ব্বলের, ভীরুর, অক্ষমের রূপকথায় পরিগণিত থাকে নাই। আজ প্রজাপুঞ্জদ্বারা সুনির্ব্বাচিত বাঙ্গালী মহারাজচক্রবর্ত্তীত্বে অভিষিক্ত গোপাল, ধর্ম্মপাল, দেবপাল, প্রথম মহিপাল, রামপালের বঙ্গ, বিহার, উত্তরাপথ, কামরূপের সার্ব্বভৌম্য, আজ তাঁদের প্রধানমন্ত্রিত্বে অভিষিক্ত এবং সর্ব্বপ্রকারে পরামর্শদাতা গর্গদেবাদি বাঙ্গালী ব্রাহ্মণকুলের মন্ত্রকুশলতা শাস্ত্রজ্ঞান এবং চরিত্রমহিমা বিঘোষিত; আজ সেন, গঙ্গ প্রভৃতি বাঙ্গালী রাজাদের অতীত গৌরবগাথা বিগত দিনের স্তব্ধনীরব স্থূল যবনিকা ভেদ করিয়া গ্রীষ্মসায়াহ্নের পশ্চিমাকাশের অস্তগত তপনের শেষ রশ্মিরেখার মতই সুবর্ণোজ্জ্বল রক্তচ্ছটা বিকীর্ণ করিয়া বাঙ্গালীর কলঙ্ককালিমা বিমোচন করিতেছে। বাঙ্গালী দিব্যোকের ও ভীমের বীরত্ব-কাহিনী সমগ্র জগতকে জানাইয়া দিতেছে, ন্যায় এবং ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইলে, যতবড় প্রবল পরাক্রান্তই হও, তোমারই ক্ষুদ্র প্রজার হস্তেই তোমার ধ্বংস সুনিশ্চিত! বাঙ্গালার প্রজা তাদের রাজা নির্ব্বাচন করিতে সমর্থ ছিল এবং অত্যাচারী রাজাকে দণ্ড দিতেও বাঙ্গালী প্রজার সামর্থ্যের অভাব মাত্র ছিল না।

বড় দুঃখ হয় বাঙ্গালীর এই অক্ষয় কীর্ত্তিগাথা আজ যাঁর অমৃতময়ী লেখনীপ্রসূত হইলে অমরত্বলাভ করিতে পারিত, তাঁর পরিবর্ত্তে আমার মত অযোগ্যার হস্তে এই মহাভার পড়িল! "ত্রিবেণী"র উপাদান সেদিনে সংগৃহীত থাকিলে, "রাজসিংহের পরিবর্ত্তে আমরা "রামপাল"ই পাইতাম, তাহাতে আমার সংশয় নাই।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সমুদয় অন্তর্বাহ্য দিয়া তাঁর স্বদেশ বাঙ্গালাকে ভালবাসিতেন। তাঁর প্রেমের পরিধি বাঙ্গালা, তাঁর ধ্যানের দেবতা বঙ্গমাতা, ধ্যানমন্ত্র বন্দেমাতরম, বাঙ্গালী তাঁর দেহের শোণিত, বাঙ্গালার অতীত তাঁর কল্পনার সুখ, বঙ্গের ভবিষ্যৎ তাঁর চিন্তার আনন্দ। বাঙ্গালী কি ছিল তাহা জানিবার জন্য তাঁহার যে ব্যাকুলতা, যে আবেগ, বাঙ্গালী কি হইবে তার জন্যও তাঁর আগ্রহ তেমনই প্রবল। বর্ত্তমান বাঙ্গালী (তাঁহার কালের) তাঁহার দেশপ্রেমিক চিত্তকে যে কিরূপ আঘাত ব্যথা প্রদান করিয়াছে তাহা তাঁহার "বাবু" প্রভৃতি প্রবন্ধাবলীতেই সুব্যক্ত! মানুষ যখন নিজের ছোট ভাই বা নিজের ছেলেকে বেত্রাহত করিতে বাধ্য হয়, তখন সে যে কত বড় দুঃখেই করে তাহা সহৃদয়কে বলিয়া জানাইবার

আবশ্যক করে না। সে আঘাতে আহতের অপেক্ষা আঘাত-কারীই অধিকতর দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে, অথচ প্রকৃত প্রেমাস্পদের যথার্থ মঙ্গলের জন্যই, কঠিন রোগগ্রস্তকে রোগ-মুক্ত করিবার জন্যই এই অস্ত্রোপচার। বিষ-জর্জ্জরিত দেহকে সুস্থ করিবার জন্যই এই "কোড়া" প্রয়োগ। তাঁর "হনুমদ্বাবু সংবাদ," "বাবু" প্রভৃতি প্রবন্ধে তিনি তাঁর স্বদেশবাসীকে কাঁটার চাবুক মারিয়া চেতাইতে চাহিয়াছেন। আধুনিক বাঙ্গালীর যে চিত্র তিনি তাঁর "বাবু" প্রবন্ধে অঙ্কিত করিয়াছেন তাহার নিখুঁৎ প্রতিকৃতি এখনও আমরা বহু স্থলেই দেখিতে পাই।

"যাঁহার ইষ্টদেবতা ইংরাজ * * * যিনি মিশনরীর নিকট খৃষ্টান, কেশবচন্দ্রের নিকট ব্রাহ্ম, পিতার নিকট হিন্দু এবং ভিক্ষুকের নিকট নাস্তিক, তিনিই বাবু। যাঁর স্নানকালে তৈলে ঘৃণা, আহারকালে আপনার অঙ্গুলীকে ঘৃণা এবং কথোপকথোনকালে আপন মাতৃভাষাকে ঘৃণা, তিনিই বাবু। যাঁহার যত্ন কেবল পরিচ্ছদে, তৎপরতা কেবল উমেদারীতে, রাগ কেবল সৎগ্রন্থের উপর, তিনিই বাবু। হে নবনাথ! আমি যাঁহাদিগের কথা বলিলাম, তাঁহাদিগের মনে মনে বিশ্বাস যে আমরা তাম্বুল চর্ব্বণ করিয়া, উপাধান অবলম্বন করিয়া, দ্বৈভাষিকী কথা কহিয়া এবং তামাকু সেবন করিয়া ভারতবর্ষের পুনরুদ্ধার করিব।"

এই চাবুকের আঘাত যে জাতির মর্ম্মস্পর্শ করিয়াছে, তাঁহার চিত্রিত বাবুদের মধ্য হইতে যে কেহ কেহ "বাবুত্ব" পরিহারপূর্ব্বক মনুষ্যত্ব লাভ করিতে অগ্রসর হইয়াছেন, এ দৃশ্য নিঃসন্দেহ সেই স্বজাতি-প্রেমিকের আত্মাকে পরিতৃপ্ত করিতেছে। বাঙ্গালা এবং বাঙ্গালী যে তাঁর প্রাণপ্রিয়।

তিনি যেমন স্বদেশীয় অপরাধকে বিন্দুমাত্র ক্ষমার চক্ষে দেখিতে পারেন নাই, যেখানেই অনাচার, অত্যাচার বা ভ্রষ্টাচার দেখিয়াছেন, সে যে শ্রেণীর মধ্য হইতেই হউক না কেন, তৎক্ষণাৎ তাহার তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ ও সমালোচনা করিয়াছেন তেমনই বিদেশীর অবিচারকেও সমর্থন করেন নাই বা ধৃষ্টতাতে উপেক্ষা দেখান নাই। ইলবার্টবিল ইত্যাদির তীব্র প্রতিবাদে, ভারতবর্ষের তথা মেকলে-কথিত বাঙ্গালীর চরিত্র-চিত্রের তীব্রতর প্রতিবাদে, মিল, ডারুইনের নাস্তিক্যবাদের প্রতিবাদে এবং মিনহাজ উদ্দিনের সতেরজন পাঠান কর্ত্তৃক বঙ্গ-বিজয়ের জনশ্রুতিমূলক অতিরঞ্জিত প্রবাদকাহিনীর যুক্তিমূলক প্রতিবাদে সর্ব্বত্রই তাঁহার এই স্বাধীনতন্ত্রতার সমুজ্জ্বল রূপ আমরা দেখিতে পাই। একদিকে তিনি 'ব্যাঘ্রাচার্য্যবৃহল্লাঙ্গুল' মহাশয়ের মুখ দিয়া ইউরোপীয় মহামহোপাধ্যায়ের ভারত সম্বন্ধীয় অজ্ঞতার বাণী ব্যঙ্গচ্ছলে বলাইতেছেন, আমরা যাহা দেখিয়াছি তাহাই বলিব, অন্য পর্য্যটকদিগের যে সকল অমূলক উপন্যাস শুনিয়া আসিতেছি সে কথা বিশ্বাস করি না। আমরা পূর্ব্বাপর শুনিয়া আসিতেছি মনুষ্যেরা ক্ষুদ্রাকার হইয়াও পর্ব্বতাকার গৃহনির্ম্মাণ করে। ঐরূপ গৃহে তাহারা বাস করে বটে, কিন্তু কখন তাহাদিগকে আমি ঐরূপ গৃহ-নির্ম্মাণ করিতে চক্ষে দেখি নাই। সুতরাং তাহারা ঐরূপ গৃহনির্ম্মাণ করিয়া থাকে তাহার প্রমাণাভাব। আমার বোধহয় তাহারা যাহাতে বাস করে তাহা স্বভাবসৃষ্ট পর্ব্বত।*

ঐ ব্যাঘ্রপণ্ডিত অন্যত্র নিত্য এবং নৈমিত্তিক উভয়বিধ বিবাহের ব্যবস্থায় যাহা বলিতেছেন, আজ সেই বাণীই অধিকাংশ বাঙ্গালা উপন্যাস ও গল্পের জীবনকাঠি বা মেরুদণ্ড স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে। অর্থাৎ মন্ত্রহীন বিবাহের সুপবিত্রতার সুপ্রচার! এদেশের প্রথিতযশা খ্যাতনামা লেখকরাও এখন অতি হেয় উপায়ে জাতা, হীনকুলোদ্ভবা বর্ণসঙ্কর এবং উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তির মন্ত্রহীন বিবাহে-বিবাহিতা ও পরিত্যক্তা এক নারীকে সমুন্নত ভদ্রসমাজের মধ্যে প্রতিষ্ঠাপিতা ও সম্পূজিতারূপে কল্পনা করিতে এবং উহারই মুখ দিয়া এবং আচরণ দিয়া যতদূর নীচ যুক্তি পরম্পরা সংসারের পঙ্ক মধ্যে নিহিত থাকিতে পারে সেই সমস্তের দ্বারায় হিন্দু সমাজের "সংস্কার"সাধন কল্পনা করিতেও কুণ্ঠাবোধ করেন না। আর তার চেয়েও আশ্চর্য্যের বিষয়, ইহারও-প্রতিবাদ করিবার লোক নাই! হায় বঙ্কিমচন্দ্র! ব্যাঘ্রাচার্য্যের মতবাদে তুমি

* পাঠক মহাশয়, বৃহল্লাঙ্গুলের ভারতবর্ষের ব্যুৎপত্তি দেখিয়া বিস্মিত হইবেন না, এইরূপ তর্কে ম্যাক্সমুলর স্থির করিয়াছেন প্রাচীন ভারতবর্ষীয়েরা লিখিতে পড়িতে জানিতেন না। এরূপ তর্কে জেমস মিল স্থির করিয়াছেন যে প্রাচীন ভারতবর্ষীয়েরা অসভ্য জাতি এবং সংস্কৃত অসভ্য ভাষা। বস্তুতঃ এই ব্যাঘ্র-পণ্ডিতে এবং মানুষ-পণ্ডিতে অধিক বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না।

যে সন্দেহে বিচলিত হইয়াছিলে এ তাহারই পূর্ণ ফল। বৃহল্লাঙ্গুল বলিয়াছিল :—

"অনেক মনুষ্যই নৈমিত্তিক বিবাহে (অর্থাৎ যাহা গোপনে হয়, তবে যুগ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে এক্ষণে গোপন শব্দটা অভিধান হইতে বিদায় লইতেছে। মানুষ আর কোন অসৎ কার্য্যই এখন গোপনে করে না, শুধু চুরি ছাড়া) সম্মত, তবে পুরোহিত প্রভৃতির ভয়ে মুখ ফুটিতে পারে না।

" * * * যাঁহারা আমাদিগের ন্যায় সুসভ্য, সুতরাং পশুবৃত্ত, তাঁহারাই আমাদিগের অনুকরণ করিয়া থাকেন। আমার এমনও ভরসা আছে যে কালে মনুষ্যজাতি* আমাদিগের ন্যায় সুসভ্য হইলে নৈমিত্তিক বিবাহ তাহাদের মধ্যে সমাজসম্মত হইবে। অনেক মনুষ্য-পণ্ডিত তৎপক্ষে প্রবৃত্তিদায়ক গ্রন্থাদি লিখিতেছেন। তাঁহারা স্বজাতিহিতৈষী সন্দেহ নাই। আমার বিবেচনায় সম্মানবর্দ্ধনার্থ তাঁহাদিগকে এই ব্যাঘ্রসমাজে অনারারী মেম্বর নিযুক্ত করিলে ভাল হয়। কেননা তাঁহারা আমাদের ন্যায় নীতিজ্ঞ এবং লোক-হিতৈষী।" আধুনিক সাহিত্যজগতে সুপরিচিত "সুপবিত্র" মন্ত্রহীন বিবাহই যে এই নৈমিত্তিক-বিবাহ, তাহা বোধকরি আপনারা লক্ষ্য করিয়াছেন।

সর্ব্বতোভাবে ইংরাজীর অনুকরণ এবং বিশেষ করিয়া ইংরাজী ভাষাকে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের ভাষায় পরিণত করার বিরুদ্ধে বঙ্কিমবাবু বহুতর যুক্তি প্রয়োগ করিয়া দেখাইতে চাহিয়াছেন যে, "আমরা যত ইংরাজী পড়ি, যত ইংরাজী কহি, যতই ইংরাজী লিখি না কেন, ইংরাজী কেবল আমাদিগের মৃতসিংহের চর্ম্মস্বরূপ হইবে মাত্র। * * পাঁচ সাত হাজার নকল ইংরাজ ভিন্ন কোটী কোটী সাহেব কখনই হইয়া উটিবে না। গিল্‌টী পিতল হইতে খাঁটি রূপা ভাল। নকল ইংরাজ অপেক্ষা খাঁটি বাঙ্গালী স্পৃহণীয়।

" * * * এ কথা কৃতবিদ্য বাঙ্গালী কেন যে বুঝেন না তাহা বলিতে পারি না। * * * যদি কেহ এ কথা মনে করেন সুশিক্ষিতদের উক্তি কেবল সুশিক্ষিতদের বুঝা প্রয়োজন তিনি ভ্রান্ত। সমস্ত বাঙ্গালীর উন্নতি না হইলে দেশের উন্নতি নাই।"

* অর্থাৎ হিন্দু।

আজ ইংরাজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সকলেই না হউন, মহাত্মাজীর অনুগত দেশপ্রাণ ব্যক্তিমাত্রেই মাতৃভাষাকে জাতীয় ভাব প্রকাশের সহায়করূপে গ্রহণ করিয়া ঐ সকল নকল ইংরাজগণ ব্যতীত দেশের জনসাধারণের সহানুভূতি লাভ করিতেও সমর্থ হইতেছেন।

"সাহিত্য ও ধর্ম্ম" প্রবন্ধে তিনি যে সারগর্ভ উপদেশ দিয়াছেন তাহার সামান্য অংশমাত্র উদ্ধৃত করিলাম : —

"যেগুলি ধর্ম্ম বলিয়া হিন্দু ও খৃষ্টানের দোষে তাঁহাদের কাছে পরিচিত হইয়াছে সেগুলি ধর্ম্ম নহে অধর্ম্ম। ধর্ম্মের মূর্ত্তি বড় মনোহর। ঈশ্বর প্রজাপীড়ক নহেন, প্রজা-পালক। ধর্ম্ম আত্মপীড়ন নহে আপনার উন্নতিসাধন। ঈশ্বরে ভক্তি, মনুষ্যে প্রীতি এবং হৃদয়ে শান্তি ইহাই ধর্ম্ম। ভক্তি, প্রীতি, শান্তি এই তিনটী শব্দ দ্বারা যে বস্তু চিত্রিত হইল তাহার মোহিনী মূর্ত্তির অপেক্ষা মনোহর আর কি আছে? তাহা ত্যাগ করিয়া আর কোন বিষয়ের আলোচনা করিতে ইচ্ছা করে? * * সাহিত্যের আলোচনায় সুখ আছে বটে, কিন্তু যে সুখ তোমার উদ্দেশ্য এবং প্রাপ্য হওয়া উচিত সাহিত্যের সুখ তাহার ক্ষুদ্রাংশ মাত্র। সাহিত্যও ধর্ম্ম ছাড়া নহে, কেননা সাহিত্য সত্যমূলক। যাহা সত্য তাহা ধর্ম্ম। যদি এমন কুসাহিত্য থাকে যে তাহা অসত্যমূলক এবং অধর্ম্মময়, তবে তাহা পাঠে দুরাত্মা বা বিকৃতিরুচি পাঠক ভিন্ন কেহ সুখী হয় না। * * সাহিত্য ত্যাগ করিও না, কিন্তু সাহিত্যকে নিম্ন সোপান করিয়া ধর্ম্মের মঞ্চে আরোহণ কর।"

আজ এই যে অসৎ সাহিত্যের ঘন জঙ্গলে বাঙ্গালার সাহিত্য-কানন কণ্টকাকীর্ণ হইয়া উঠিয়াছে; ছিন্নপত্র কমলের মৃণাল-কণ্টকাঘাতে বঙ্গ-ভারতীর চরণ-কমল কণ্টকক্ষতে রুধিরাক্ত হইতেছে; লেখক, পাঠক, সম্পাদক, সমালোচক সকলকারই যে আজ ব্যভিচার-কলুষিত, স্বেচ্ছাচার-বিধ্বংসিত চরিত্রহীন ও চরিত্রহীনার পুঙ্খানুপুঙ্খ মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণাত্মক, ধর্ম্ম সমাজনীতি ও মনুষ্যত্ব বিনষ্টকারী দুষ্ট সাহিত্যের লিখন, পঠন, আন্দোলনই প্রিয়ের চেয়েও প্রিয়তর হইয়া উঠিয়াছে, ইহা তাঁহার বোধ করি বা স্বপ্নেরও অগোচর ছিল! তাই এই শ্রেণীর লেখকদের সম্বন্ধে তিনি

কিছুমাত্র শিষ্টাচার প্রদর্শন করাও প্রয়োজন হয় ত বা বোধ করেন নাই। নতুবা তাদের সম্বন্ধে এমন কি, "দুরাত্মা"র মত শব্দও তিনি অনায়াসে প্রয়োগ করিয়া বসিলেন কেমন করিয়া! তবে তাঁকে দোষ দিতে পারি না, তাঁর সময়ে এই শ্রেণীর লেখকদের সকল শ্রেণীর মধ্যেই এরূপ প্রচুরতররূপে প্রাদুর্ভাব ঘটে নাই। বিশ পঁচিশখানা, হয় ত বা তারও কম, "বটতলার উপন্যাস" নামে পরিচিত ইংরেজীর অনুকৃত উপন্যাস সৃষ্ট হইয়া থাকিবে। যাদের কাহারও সম্বন্ধে মহাকবি মাইকেল মধুসূদন লিখিয়াছিলেন,—

"চাঁড়ালের হাত দিয়া পোড়াও পুস্তকে ;
ভস্মরাশি ফেলে দাও কর্ম্মনাশাজলে,"—

কিন্তু এর চেয়েও সাহসিক দৃষ্টান্ত আছে। বঙ্কিমচন্দ্র "অনুশীলন" গ্রন্থের সপ্তবিংশ অধ্যায়ে 'চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি' প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—"কিন্তু কাব্যই এ বিষয়ে মনুষ্যের প্রধান সহায়। তদ্দ্বারাই চিত্ত বিশুদ্ধ এবং অন্তঃপ্রকৃতি সৌন্দর্য্যে প্রেমিক হয়। এই জন্য কবি, ধর্ম্মের একজন প্রধান সহায়। কিন্তু সে বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকা উচিত। যাহারা কুকাব্য প্রণয়ন করিয়া পরের চিত্ত কলুষিত করিতে চেষ্টা করে, তাহারা তস্করদিগের ন্যায় মনুষ্যজাতির শত্রু, এবং তাহাদিগকে তস্করাদির ন্যায় শারীরিক দণ্ডের দ্বারা দণ্ডিত করা বিধেয়।"

এর উপর আর মন্তব্য করা নিষ্প্রয়োজন।

ত্যাগ, সংযম, চিত্তশুদ্ধি যে কত মূল্যবান, এ সকল যে স্বার্থপর, মূর্খ পুরোহিতদিগের জুয়াচুরীপ্রসূত ব্যবসায়াত্মক নহে পরন্তু সকল দেশে, সকল ধর্ম্মে মানব-চিত্তবৃত্তির এই মহোচ্চ ভাবগুলি অমূল্যরত্নসম্ভারের মতই শ্রেষ্ঠ, চিত্তশুদ্ধিই ধর্ম্ম, যাহার চিত্তশুদ্ধি নাই সর্ব্বগুণান্বিত হইলেও সে ধার্ম্মিক নহে—এই কথা তিনি তাঁর "চিত্তশুদ্ধি" নামক প্রবন্ধটিতে অতি বিশদভাবে আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন,—"চিত্তশুদ্ধি কেবল হিন্দু ধর্ম্মের সার এমত নহে, ইহা সকল ধর্ম্মের সার। ইহা হিন্দুধর্ম্মের সার, বৌদ্ধধর্ম্মের সার, ইসলাম ধর্ম্মের সার, খ্রিষ্টধর্ম কোমৎ ধর্ম্মের, সার। যাঁহার চিত্তশুদ্ধি আছে তিনি শ্রেষ্ঠ হিন্দু, শ্রেষ্ঠ খ্রীষ্টিয়ান, শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ, শ্রেষ্ঠ মুসলমান, শ্রেষ্ঠ পজিটিভিষ্ট। যাঁহার চিত্তশুদ্ধি নাই তিনি কোন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যেই ধার্ম্মিক বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না। * * * তবে প্রধানতঃ হিন্দুধর্ম্মেই ইহা প্রবল। যাঁর চিত্তশুদ্ধি নাই, তিনি হিন্দু নহেন। * * চিত্তশুদ্ধির প্রথম লক্ষণ ইন্দ্রিয়ের সংযম।"

যাঁহারা সাহিত্যে সমুচ্চ আসন দাবী করেন, যাঁহারা সাহিত্যে সেই সমুচ্চ আসন বহুকাল ধরিয়া অধিকার করিতে চান, তাঁরা বঙ্কিমচন্দ্রের এই সর্ব্ব ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠধর্ম্ম "চিত্তশুদ্ধির" সহিত নিজেদের পরিচিত করিতে পারিয়াছেন কি? চিত্তশুদ্ধির প্রথম লক্ষণ সংযমের শিক্ষার পরিবর্ত্তে সাহিত্যে সমাজে ঘোরতর অসংযমের নরকাগ্নির জ্বালা ধরাইবার জন্যই কঠিন প্রতিজ্ঞা লইয়া তাঁরা সাহিত্যক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছেন বলিয়াই মনে হয় নাকি? যাহাই সংযমশুদ্ধ, যাহাই ত্যাগদীপ্ত, যাহাই সত্যপূত তাহাই এঁদের কাছে উপহাস ও অবজ্ঞার বস্তু; অপর পক্ষে উচ্ছৃঙ্খলতা, অসংযম ও অসত্যই সর্ব্বপ্রযত্নে প্রচারের বিষয়। বঙ্কিমবাবু প্রশ্ন করিয়াছেন "ঈশ্বরের সৃষ্টির অপেক্ষা কোন কবির সৃষ্টি সুন্দর? বস্তুতঃ কবির সৃষ্টি ঈশ্বরের সৃষ্টির অনুকারী বলিয়াই সুন্দর।" আমরা আধুনিক নব্যরুচির লেখক, পাঠক, সম্পাদকদিগকে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করি, যে-সব সুপ্রসিদ্ধ অপ্রসিদ্ধ উপন্যাস ও গল্প লেখকদিগের রচনা বাঙ্গালা মাসিকের বিপুল কলেবরের বিপুলতা সাধিত করিয়া নব্যবঙ্গের তরলমতি নারীপুরুষের ধর্ম্মশিক্ষাহীন জীবনক্ষেত্রে বিষবৃক্ষের ন্যায় রোপিত হইতেছে, ঐ সকলের কতকগুলি যথেচ্ছাচারপরায়ণ, ইন্দ্রিয়ভোগলিপ্সু, কল্পিত নায়কাদির সৃষ্টিতে ঐশ্বরিকভাবের কোন্ বর্ণচ্ছায়া প্রতিফলিত হইয়াছে? আপনারা বলুন দেখি, এই সকল নারীপুরুষের অসংস্কৃত ও অসংযত হীনবৃত্তির বিশ্লেষণাত্মক রচনাকে কি "কবির সৃষ্টি ঈশ্বরের সৃষ্টির অনুকারী বলিয়াই সুন্দর" বলা যায়?

সাহিত্যকে সমাজের দর্পণ বলিয়া অভিহিত করা হইয়া থাকে, সাহিত্যিকদিগের স্কন্ধে যে লোকশিক্ষার কত বড় দায়িত্ব, কতখানি গুরুভার ন্যস্ত সে কথা বঙ্কিমবাবু ভালরকমেই বুঝিয়াছিলেন, তাই তাঁর প্রত্যেক রচনায় আমরা সেই সুকঠিন দায়িত্বপালনের সম্যক পরিচয় পাইতে থাকি। তাঁর উপন্যাসে যেমন, তাঁর ধর্ম্মতত্ত্ব, লোকতত্ত্ব ও

রাজনীতিতত্ত্বেও ঠিক সেই মত দূরদৃষ্টি ও সূক্ষ্মদর্শনপ্রসূত সমস্ত সমাজসেবার যথোচিত সংস্কারের প্রচেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি সুদীর্ঘজীবী এই সমাজের শত শত বর্ষীয় অধীনতার মধ্যেও আত্মসত্তার হানি বা হ্রাস না হওয়ার সম্বন্ধে প্রকৃত তত্ত্বদর্শীর মতই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসন্ধান করিয়া তাঁর সেই অনুসন্ধান-ফল প্রকাশ করিতে দ্বিধামাত্র করেন নাই। তিনি তাঁর দেশের পুরাতনকালের ধর্ম্মে, সমাজে, সাহিত্যে, রাজনীতিতে সর্ব্বত্রই উদারতা, মহত্ত্ব, সৌন্দর্য্য এবং সূক্ষ্মদর্শন দেখিয়াছেন। জাতীয় গৌরবের আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়াছেন, "আমাদেরও একবার সেইদিন হইয়াছিল। অকস্মাৎ নবদ্বীপে চৈতন্যচন্দ্রোদয়, তারপর রূপসনাতন প্রভৃতি অসংখ্য কবি, ধর্ম্মতত্ত্ববিৎ, পণ্ডিত। এদিকে দর্শনে রঘুনাথ শিরোমণি, গদাধর, জগদীশ; তন্ত্রে কৃষ্ণানন্দ, স্মৃতিতে রঘুনন্দন এবং তৎপরগামিগণ। আবার বাংলা কাব্যে জলোচ্ছ্বাস। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস চৈতন্যের পূর্ব্বগামী। কিন্তু তাহার পরে চৈতন্যের পরবর্ত্তিনী যে বৈষ্ণবদর্শন এবং বাংলার কৃষ্ণবিষয়িনী কবিতা, তাহা অপরিমেয়, তেজস্বিনী, জগতে অতুলনীয়।"

এই সব অতীত গৌরবের কাহিনী তিনি তাঁর স্বদেশীকে শুনাইতে ভালবাসিতেন, কারণ ভবিষ্যতের আশা প্রচুরতররূপেই তাঁর চিত্তে সন্নিবেশিত ছিল।

বঙ্কিমবাবুর সম্বন্ধে আলোচনা করিতে বসিলে শেষ করিয়া উঠাই কঠিন। তাঁর প্রত্যেকটি রচনা ও মতামত সম্বন্ধে এই সুদীর্ঘকাল ধরিয়া যথেষ্ট আলোচনা হওয়ার পরে এখনও এত কিছু আলোচ্য বাকি আছে যে তাহার শেষ শীঘ্র হইতে পারে না, অথচ অনেক কথা একদিনে বলা বা শোনা সম্ভব নয়। তাই কেবলমাত্র তাঁহার ভবিষ্যদৃষ্টির অনুসরণপূর্ব্বক আমরা আজকার মত একটী শেষ কথা বলিয়া আপনাদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিব। তিনি বলিয়াছেন, "তখনও বঙ্গীয় আর্য্যগণের অভ্যুদয়ের সময় হয় নাই। এখন সে সময় বোধ হয় উপস্থিত। বাহুবলে না হউক্ বুদ্ধিবলে যে বাঙ্গালী অচিরে পৃথিবী মধ্যে যশস্বী হইবে তাহার সময় আসিয়াছে।"

অতএব হে বঙ্গীয় যুবকবৃন্দ! হে বঙ্গবাসী নারী-পুরুষ! আপনারা আজ ক্ষুদ্র স্বার্থ-মোহ, তুচ্ছ বিলাস এবং সর্ব্বাপেক্ষা হেয় রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক দলাদলি পরিত্যাগ করিয়া সেই দূরদর্শী দেশপ্রাণ মনীষীর চিরপোষিত আশা, চির-সঞ্জীবিত আকাঙ্ক্ষাকে সফলতা প্রদান করুন। ভারতের ভাগ্য-বিধাতার আহ্বানে সমস্ত ভারতবাসীর সহিত সমচিত্ত ও সমান আকুতি লইয়া কলঙ্কের পশরার পরিবর্ত্তে যশের মুকুট শিরে পরিতে অগ্রসর হউন।

বন্দেমাতরম্।

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী



আগাগোড়া

শ্রীযুক্ত বিমল মিত্র

গলির মোড়ের শিউলি গাছটিতে এ বছরে নূতন পাতা গজাইয়াছে ; ফুল ফোটে—তাহারই গন্ধে সারাটি রাস্তা আমোদিত হইয়া যায়। কত বছর ধরিয়া গাছটিকে দেখিয়া আসিতেছি—কিন্তু এর পূর্ব্বে কখনও ফুলও ফোটে নাই—নূতন পাতাও হয়ত গজায় নাই! এ বছরে এই আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া আমার মত অনেকেই বিস্মিত হইয়া গিয়াছিল। রাস্তায় চলিতে চলিতে অনেকেই হঠাৎ গন্ধ পাইয়াই উপরের দিকে তাকাইয়া দেখে। সকাল বেলা মাটির উপর ফুলগুলি বিছাইয়া পড়িয়া থাকে ; পাড়ার কতগুলি মেয়ে আসিয়া কখন যে সেগুলি কুড়াইয়া লইয়া যায়, কেহ জানে না।

কিন্তু সে কথা যাক্, আমি ফুলগাছের ইতিহাস লিখিতে বসি নাই তো! আজ সন্ধ্যাবেলা বাড়ী ফিরিবার পথে হটাৎ গাছটি নজরে পড়িল তাই এত কথা বলিলাম।

কাগজে দু'টি বিজ্ঞাপন দেখিয়া বাহির হইয়াছিলাম। একটি চাকরীর, অন্যটি বিবাহের।

চাক্রীটি আর কিছু নয়—মাষ্টারী। চারটি ছেলেকে পড়াইতে হইবে ; সকালে একঘণ্টা, বিকালে অথবা রাত্রে আর একঘণ্টা!

পুরোন খবরের কাগজ বিক্রী করিয়া চার আনা পয়সা পাইয়াছিলাম—তাই লইয়া দু'ইটি কাজ এক সঙ্গে সারিব বলিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছিলাম। দুপুর বেলা সস্তার সেকেণ্ড ক্লাশ ট্রাম—কতই বা খরচ! ···আর সরবৎ কিংবা চুরুটের জন্য তিন চারটি পয়সা কাছে থাকা ভাল।

ছেলে চারটির গার্জ্জেন তখন অফিসে—সুতরাং বাড়ীর সামনে গ্যাশ্‌পোষ্টের ছায়ায় সমস্ত দিন বসিয়া রহিলাম। সন্ধ্যাবেলা কর্ত্তা আসিতেই একবার সবিনয়ে নমস্কার করিলাম।

আমাকে দেখিয়াই বলিলেন—ওঃ তুমি এসেছ—তা' এখন কি করে' হয় বাপু—মাস্‌কাবার হ'তে এখনো বারো দিন দেরী ;···আমি কি পালিয়ে যাচ্ছি, না তোমার টাকা নিয়ে আমি বড়লোক হবো···

বলিয়াই এক মুহূর্ত্ত দেরী না করিয়া বাড়ীর ভিতর হন্ হন্ করিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন। ···বাধা দিয়া বলিলাম—আজ্ঞে—তা' নয়—কাগজে যে নোটিস্ দিয়ে ছিলেন···ছেলের মাষ্টারীর জন্যে···

ভদ্রলোক থমকিয়া দাড়াইলেন। বলিলেন—ও হ্যাঁ—তা' হ'লে দাঁড়াও—ওরে ভবা, বৈঠকখানার দরজাটা খুলে দে বাবা। – হ্যাঁ—তুমি তা' হ'লে ওইদিকে দরজার সামনে দাঁড়াও গিয়ে—আমি আসছি ; তুমি কি পাশ?

বলিলাম—বি, এ ; ইংরিজীতে অনার্স ছিল—টাকার অভাবে ছেড়ে দিয়েছিলুম। আর একটা কথা, দেখুন –

কথাটি না শুনিয়াই উনি চলিয়া গেলেন।

দরজা খোলা হইল। দেখিয়া মনে হইল ভবানামক ব্যক্তিটি চাকর নয়, কর্ত্তারই ছেলে বোধ হয়। তক্তপোষের উপর লণ্ঠনটি ছিল—তাহারই পাশে কোঁচার কাপড় দিয়া ধূলা ঝাড়িয়া বসিয়া পড়িলাম।

কর্ত্তা আসিলেন। বলিলেন—কত সালে বি, এ, দিয়েছ? উনিশ শো আটাশ্? তা' হ'লে হোল গিয়ে তোমার—তিন বছর আগে! তা' হ'লে তো সবই এতদিনে ভুলে গিয়েছ,—সাইকলজি বানান্ কি বলতো?

বলিলাম—আজ্ঞে, বি, এ তে সাইকলজি আমার ছিল যে—সাইকলজি বানান্ আর জানি নে? পি, এস্, ওয়াই, সি, এইচ্, ও, এল্···

কর্ত্তা বাধা দিয়া বলিলেন—আচ্ছা—একটা অঙ্ক বল দিকিনি। এই ধর গিয়ে আজ হোল চোদ্দই আশ্বিন; আজ তুমি মহাজনের কাছ থেকে ন'সিকে দেনা করলে—দিনে টাকায় দেড় পয়সা সুদ হিসেবে,—তা' হ'লে এগারোই পৌষ সুদে আসলে কত দাঁড়াবে বল দেখি?

অঙ্কটি এমন কিছু শক্ত নয়। বলিলাম—দাঁড়ান্ ভেবে দেখি—ন'সিকে—

কর্ত্তা বাধা দিয়া বলিলেন—ওই তো! ··এই সহজ অঙ্ক আবার ভেবে দেখতে হবে? ···বি, এ পাশ করেছো এই টুকু জানো না! ··আমরা সেকালের এণ্ট্রান্স পাশ একালের এম, এ কে শেখাতে পারি—বুঝলে? ··দাঁত মাজো কি দিয়ে?

বলিলাম—ঘুঁটের ছাই দিয়েই মাজি।

কর্ত্তা বলিলেন—তাই দাঁতে অত ময়লা, পয়সা নেই তো দাঁতন করতে পার না?

বলিলাম—আজ্ঞে, দাঁতন আমাদের ওখানে বিক্রী হয়—এক পয়সা এক আঁটি। ঘুটের ছাই যে অমনি মেলে।

কর্ত্তা বলিলেন—দাড়ি কামাতে তো হপ্তায় ছ'পয়সা খরচ কর—আর দাঁতের জন্যে এক পয়সা জোটে না?

দুর্ভাগ্যক্রমে আজই দাড়ি কামাইয়াছিলাম বলিয়া কর্ত্তার এই ভুল ধারণা—নহিলে দাড়ির জন্য আমার এক মাসেও ছ'পয়সা খরচ হয় কি না সন্দেহ।

কর্ত্তা বলিলেন—বল্‌তে গেলে, তোমার দ্বারা ছেলে পড়ানো এক রকম অসম্ভব—তবে যখন বোলছ অভাবগ্রস্থ গরীব তুমি—তাই;·· তা' দেখ—চারটি ছেলেকে পড়াতে হবে—একটি আমার ছেলে, আর তিনটি নাতি। পড়ে থার্ড ক্লাশে। বরাবর ওই থার্ড ক্লাশেই পড়ে' আসছে··· যদি পাশ করিয়ে দিতে পারো তা হ'লে মাইনে কিছু বাড়িয়ে দেবো—আপাততঃ কত হ'লে তুমি রাজী হও?

বলিলাম—আজ্ঞে—আমাকে মস্ত বড় ফ্যামিলি সাপোর্ট করতে হয়—যদি তিরিশ টাকা করে মাসে দ্যান্—তা' হ'লে ··

কর্ত্তা হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। যেন এমন কথা তিনি জীবনে কখনো শোনেন নাই এমনি ভাবে বলিলেন—তিরিশ টাকা? বল কি হে?—আমার ছেলে তিরিশ টাকা কোনদিন রোজগারই করেনি—তা'র ছেলের জন্যে তিরিশ টাকা খরচ? তা' হ'লে তোমার দ্বারা হবে না বাবু!

বলিলাম—আপনি কত দেবেন?

কর্ত্তা বলিলেন—প্রথমতঃ তুমি তো সেই সহজ অঙ্কটাই পারলে না—তা'র ওপর তোমার কাছে ছেলেদের ছেড়ে দিয়ে বাঁদর হ'তে দিতে আমার ইচ্ছে নেই—তবে তোমার খুব অভাব তাই,—তা' দেখ পনেরো টাকায় যদি পারো।···

বলিলাম—কুড়ী টাকাই দেবেন! আজকালকার বাজারে···

অনেকখন পরে কুড়ী টাকাতেই রফা হইল। সর্ত্ত এই যে—একদিন কামাই করিলে চার আনা কাটা যাইবে।

চলিয়া আসিবার সময় কর্ত্তা বলিলেন—আচ্ছা তা' হ'লে পয়লা তারিখ থেকেই এসো—এ ক'টা দিন যাক্। তবে মনে থাকে যেন—সকালে এক ঘণ্টা আর রাতেও এক ঘণ্টা!

আচ্ছা—বলিয়া চলিয়া আসিলাম। খানিকটা হাঁটিয়া আসিলাম—কতকগুলি পয়সা বাঁচিয়া গেল। তারপর ধর্ম্মতলার মোড়ে চারিদিকে চাহিয়া লইয়া বোঁ করিয়া সেকেণ্ড ক্লাশে চড়িয়া বসিলাম।

বাড়ী ফিরিয়া দেখি ভোনা তখনও রান্না করিতেছে। কী-ইবা এত রান্না!

ভোনা আমার ছোট বোন্। বিয়ের বয়স হইয়াছে—কিন্তু পয়সার অভাবে পাত্র জুটিতেছে না। ভোনাকে বলিলাম—আমার চাকরী হয়েছে রে ভোনা, সাড়ে পাঁচ পয়সার হরিরলুট দিস্—এই নে পয়সা।

পকেট হইতে সাড়ে পাঁচটি পয়সা বাহির করিয়া দিলাম।

ভোনা যেন বিশ্বাস করিতে চাহে না, বলে—হ্যাঁ দাদা সত্যি?

বলিলাম—সত্যি না তো কি মিথ্যে নাকি? ঠাকুর দেব্‌তার সঙ্গে চালাকি নয় বাবা,—ভগবানের সঙ্গে চালাকী করে' পিতম্বরের কি হয়েছিল—জানিস্ না?

ভোনা আমারই বোন্‌তো, গল্প ভালবাসে। বলে—পিতম্বর আবার কে? সেই সর্ব্বেশ্বরের ভাই বুঝি?

বলিলাম—দূর, এ আমাদের কলেজের পিতাম্বর; এ কোনও দিন ভূত মানত না; তারাপদ ছিল এক নম্বর ভূত-ভক্ত! কিন্তু পিতম্বর বলতো ভূত না দেখালে সে কখনো

বিশ্বাস করবে' না ;—তারাপদ একদিন এসে পিতম্বরকে বললে—চল্ আজই তোকে ভূত দেখিয়ে দেবো।

ভোনা বলিল—তারপর ?

—তারপর সেইদিনই রাত্তির বেলা গেল দু'জনে টালিগঞ্জের জঙ্গলে। আগের দিন বিষ্টি হ'য়ে গ্যাচে—কাদা প্যাচ্ প্যাচ্ করছে—চললো দু'জনে।······

পিতম্বর বলে—কই রে তোর ভূত—তারাপদ ?

তারাপদ বলে—চল্না—দেখাচ্ছি,—খাড় মট্কালে তখন কিন্তু আমায় দোষ দিতে পারবিনি !

চারদিকে অন্ধকার। পায়ে বড়ো বড়ো জোঁক আটকে ধরেছে—আর মশা কি বাপ্ রে বাপ্। সেই জোঁকের আর মশার কামড় খেয়ে পিতম্বর বেচারীর পা ধরে' এল। মাথা ঘুরতে লাগলো—সামনে সব অন্ধকার। চোখে একটুও কিছু দেখা যায় না।

তারাপদ খানিকবাদে বললে—সামনে চেয়ে ত্থাখ্ পিতাম্বর ; কী দেখছিস্ ? কথা বার্ত্তা নেই পিতম্বর হঠাৎ ধপাস্ করে' পড়ে' গেল সেই জল কাদার ওপরেই।

ভোনা বলিল—পিতম্বর চেয়ে কি দেখলে ?

বলিলাম—কি দেখতে পেলে তা' কি আর পিতম্বরের মনে আছে ? জোঁকের আর মশার কামড়ে তখন কি তা'র আর জ্ঞান আছে······তারাপদ বুদ্ধি করে' মোজার ওপর বুটজুতো পরে' গিয়েছিল।—তারপর তারাপদ কোনও রকমে পিতম্বরকে বাড়ী নিয়ে এল। পরের দিন পিতম্বরের সে কী জ্বর। থারমোমিটারে একশো তিন টেম্পারেচর উঠ্লো·· ···পিতম্বরের বাড়ী গিয়ে দেখি—

পাশের ঘরে বাবা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া পড়িয়া আছেন। বলিলেন—কে কথা কইছে রে ভোনা ? রাম এসেছে বুঝি ?

ভোনার হইয়া আমিই উত্তর দিলাম ;—বলিলাম—আজ্ঞে হ্যাঁ।

তৎক্ষণাৎ দাঁত খিচাইয়া বলিয়া উঠিলেন—এত রাত অব্ধি কোথায় আড্ডা দেওয়া হচ্ছিল শুনি ?······গেল্‌বার সময়ে ঠিক বাড়ী এসে হাজির—না এলেই পারতে।

এ-তো নিত্যকার বুলি ; আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। অন্য দিন উত্তর দিবার কিছু থাকে না তাই চুপ করিয়া থাকি। আজ উত্তর ছিল। বলিলাম—আজ্ঞে একটা চাকরীর জন্তে এতক্ষণ সাধ্য সাধনা করছিলুম—অনেক বলে' কয়ে তবে হোল। দিতে কি চায় ?—যাক্—বসে' থাকার চেয়ে মাস গেলে কুড়িটা টাকা মন্দ কি !

হঠাৎ যেন সুর বদলাইয়া গেল ; বলিলেন—চাকরী হয়েচে ? ·····তবে ওম্নি আসবার পথে সেই নিমু কবিরাজের বাতের মালিশটা নিয়ে এলি না কেন ? বুড়ো বাপ বাঁচুক আর মরুক—সেদিকে তোদের এতটুকু নজর নেই !···আমার মরণ হ'লেই বাঁচিরে বাবা !

বাবার যে পেন্সন্ আসে তাহা হইতেই সংসার চলে ; প্রতি মাসে টাকা আসিলেই কোথা দিয়া যে তাহা খরচ হইয়া যায় বোঝা যায় না। বাবার বাতের মালিশ আজ কিনি কিনি করিয়াও তিন মাস ধরিয়া কেনা হইতেছে না ; চাকরী হলেই যে তৎক্ষণাৎ টাকা পাওয়া যায় না—পক্ষাঘাতগ্রস্ত হওয়াতে এ বুদ্ধিটুকু বোধ হয় বাবার লোপ পাইয়াছে।

মা এতক্ষণ ঠাকুর ঘরে আহ্নিক করিতেছিলেন ; কথাবার্ত্তা শুনিয়া বাহিরে আসিয়া মা বলিলেন—হ্যাঁ রে—চাকরী হয়েছে ? ··তবে বাবা এইবার ভোনার জন্তে সেই পাত্রটাকে একবার গিয়ে বলে' আয়—হাজারখানেকেই রাজি ! ধার কর্জ্জ করে যেখান থেকে পারি দেবো ; বয়স তো আর কম হোল না ; আর তাঁ'র কৃপায় যখন তোর একটা স্থিতি হোল····· তখন যেমন করে হোক্ এ ক'টা পেট চলে' যাবে !

বলিলাম—তোমাদের চেয়ে আমি কম ভাবি না, মা, আমারও ভাবনা হয়—এক হাজারে যদি প্রতুল রাজী হয়—তা হ'লে যেখান থেকে হয় জোগাড় করতেই হবে—এমন কি বাড়ী বাঁধা রেখেও। তবে আমার চাকরী তো আর কাল থেকেই নয়,—পয়লা থেকে আরম্ভ ; একবার চাকরীটা আরম্ভ হোক—তখন কিছু বাকি রাখবো না ; বাবার বাতের মালিশ, ভোনার বিয়ে, তোমার—

মা বলিল—আমার জন্তে আর কিছু নয় বাবা, তোদের সকলের ভালো হ'লেই আমার ভালো।

বলিলাম—বেশ, তবে তোমার জন্তে কিছু নয়।—আমারই খরচ বেঁচে গেল। বলিয়া চলিয়া আসিলাম।

আমার ঘরে গিয়া জামাটা সেলাই করিব বলিয়া বসিবার উদ্যোগ করিতেছি—এমন সময়ে দেখি ভোনা পেছনে পেছনে আসিয়াছে।

বলিলাম—কি রে—রান্না হ'য়ে গেল?

ভোনা সে কথার উত্তর না দিয়া বলিল—তারপর কি হোল দাদা?

বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—কিসের তারপর—চাকরীর?

ভোনা বলিল—না—সেই পিতম্বরের?·· ··

সরলা মেয়েটি এখনো সেই কথা মনে করিয়া রাখিয়াছে! এই ভোনার মত ভুতুড়ে গল্পের ঝোঁক আর কাহারও দেখি নাই।

বলিলাম—তারপর কি আর হোল,—তারাপদ সাড়ে পাঁচ পয়সার হরির লুট দিতেই পরের দিন পিতম্বর বিছানা থেকে গা ঝাড়া দিয়ে উঠলো। তখন তারাপদর জয় জয়কার। সেই দিন থেকে পিতম্বর ভূত প্রেত মানে—আর হপ্তায় হপ্তায় কালীঘাটে গিয়ে বাবা পঞ্চাননের নামে পূজো দিয়ে আসে।

ভোনা শুনিয়া বিস্মিত হইয়া গেল; কিন্তু আশ্চর্য্য এই—ইহার এক বর্ণও একটু অবিশ্বাস করিল না। ভোনা, এমনি!

সেদিন বিয়ের বিজ্ঞাপনটি লইয়া বাহির হইলাম। বাড়ী খুঁজিয়া লইতে দেরী হইল না।

রবিবার—ছুটির দিন। ভদ্রলোক বোধ হয় ভিতরে ভিতরে কলতলা পরিষ্কার করিতেছিলেন; একটা গামছা পরিয়া উদয় হইলেন।

বলিলাম—একটা কাগজে বিজ্ঞাপন দেখছিলাম—বিয়ের,—তাই—

বলিলেন—আপনি ঘটক বুঝি?

বলিলাম—আজ্ঞে না, সন্ধানে পাত্র আছে। এখন সময় হবে?

—আচ্ছা দাঁড়ান আসছি, বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। চারিদিকে একবার চাহিয়া দেখিলাম। বাড়ী দোতলা। জায়গায় জায়গায় বালির আস্তর খসিয়া গিয়াছে। দেখিয়া মনে হয় এককালে পয়সা ছিল—এখন ভাগ্য-বিড়ম্বনায় বাড়ীটির রূপ মূল্য মর্য্যাদা সব গিয়াছে। বাড়ীর সম্মুখে ছোট এতটুকু জায়গা—তাহাতে গুটিকতক ঘাস জন্মিয়াছে; সেই খানেই গরু খানেক দড়ি দিয়া একটি বাছুর বাঁধা; শ্যামলা বাছুর।

একটি চাকর আসিয়া বাহিরের ঘরের দরজা খুলিয়া দিল; ভিতরে গিয়া বসিলাম।

ভদ্রলোক আসিয়া বলিলেন—পাত্রটি কে?

কথাটি আর গোপন করিলাম না। বলিলাম—দেখুন, আমিই পাত্র। বি, এ পাশ, কলকাতায় বাড়ী আছে আমাদের—তা' ছাড়া বাপ মা বেঁচে আছেন—সম্প্রতি আমার কোনও চাকরী নেই—তবে পরলা থেকে একটা চাকরীর প্রতিশ্রুতি পেয়েছি।

বলিলেন আপনিই বড় ছেলে বুঝি?

তারপর অনেক কথা হইল। কন্যাটির বয়স আঠারো; রূপ আছে—কিন্তু কথা বলিতে পারে না, অর্থাৎ বোবা! তা হউক্, তাহার জন্য নগদ এক হাজার টাকা পাওয়া যাইবে। এ পর্য্যন্ত অনেকেই আসিয়া দেখিয়া গিয়াছে—কিন্তু বোবাকে লইয়া কেহ সংসার করিতে রাজী হয় নাই।

খানিক পরে মেয়েটি আসিল।

···রূপসী বলা চলেনা—তবে সুন্দরী বটে! চোখ দুটি অতল রহস্যের পরিচায়ক না হইলেও—চাহিয়া দেখিতে বেশ লাগে। মেয়েটির নাম ললিতা। কবিতা লিখিবার পক্ষে নামটি বেশ, কিন্তু আমি তো কবি নই···ওর নাম মাতঙ্গিনী হইলেও আমার কোনও ক্ষতি ছিল না।

জিজ্ঞাসা করিবার কিছুই ছিলনা—আর থাকিলেই বা উত্তর দিবে কে?

দেখা শেষ হইল; মেয়েটি ধীর গতিতে ভিতরে চলিয়া গেল।

ভদ্রলোককে ডাকিয়া সকলরকম কথাবার্ত্তা হইল।... তিন দিন পরে আশীর্ব্বাদ—সেই দিনই যেন অর্দ্ধেক টাকা দেওয়া হয়। ভদ্রলোক রাজী হইলেন।

জলযোগান্তে বিদায় লইলাম।

বাড়ীতে আসিয়া মা'কে বলিলাম—মা, বিয়ের ঠিক করে' এলুম। এমন লক্ষ্মী বউ আর পাবে না; বকো ঝকো কথাটি বলবে না। যখন আসবে দেখে নিও—বলবে, হ্যাঁ, রামের পছন্দ আছে বটে!

মা বলিল—বলিস কি রে—কা'র বিয়ে?

বলিলাম—কা'র আবার, আমার। বউ হবে বোবা, তা' হোক্—এক হাজার টাকা নগদ পাচ্ছি—তাইতে প্রতুলের সঙ্গে ভোনার বিয়ে দেবো,—বুঝেছ? এক ঢিলে দুই পাখী মারা হবে!

মা বলিল—তাঁর ইচ্ছের যখন সবই হোল—তখন ভালোয় ভালোয় কাজটা শেষ হ'লে বাঁচি। ভোনার বিয়েটা হ'য়ে যাক্—মা'র বাড়ীতে স'পাঁচ আনার পূজো দিয়ে আসবো,—গুরু তুমিই সত্য!

পাশের ঘর হইতে বাবা বলিলেন—কে কথা কইছে—রাম বুঝি?

বলিলাম—আজ্ঞে হ্যাঁ—আমি।

তৎক্ষণাৎ স্বর সপ্তমে তুলিয়া বলিলেন—এত রাত্তির অবধি কোথায় ছিলি শুনি? বাড়ীতে কি ঠাঁই হয় না?··· বাতের মালিশটা আর এ পর্য্যন্ত নিয়ে এলিনা!

কীই বা উত্তর দেবার ছিল! চুপ করিয়া রহিলাম! ছোটবেলা হইতে কখনও বাবার মুখ হইতে একটু স্নেহের কথা শুনিতে পাই নাই—আর এখন তো কথাই নাই!

ভোনার জন্য বড় ভাবনা ছিল; ছোট একমাত্র বোন্—উপযুক্ত শিক্ষা দিবার মত অর্থ ছিলনা—এখন যদি সুপাত্র দেখিয়া বিবাহ দিতে পারি তবেই সমস্ত দুঃখ কিছু দূর হইবে। আমার বিয়েতে এক হাজার টাকা লইয়া প্রতুলকে দিলে সে ভোনাকে বিবাহ করিতে রাজী আছে; প্রতুল ছেলেটি ভালো—সে নিজে হয়তো টাকা না লইয়াই বিবাহ করিতে পারে—কিন্তু তার বাবার অমত।

আজকাল এমনি ভাবনা সারাক্ষণ মন জুড়িয়া থাকে।

গোটাকতক টাকা ধার করিবার আবশ্যকতা অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছিল। জামা কয়টির সবগুলি ছিঁড়িয়া গেছে······সেগুলির পরিবর্ত্তন দরকার।

বন্ধুদের মধ্যে সাগর এখনো ডাকিয়া কথা কয়; ছেলেটির মন ভালো। তাহার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা বহুদিনের, শুধু তাই নয়, তা'র বোন বিভা আমাকে যে ভালবাসে এ কথা জানাইতে আমার লজ্জা নাই। সন্ধ্যাবেলা গিয়াই দেখা হইল। বলিলাম—চারটে টাকা ধার দে ভাই।

সাগর ডাকিল—বিভা, রাম এসেছে—শুনে যাও।

সাগরকে বলিলাম—তোর সাহিত্য-সাধনায় বাধা দিলাম—কিছু মনে করিস্ নি। সম্প্রতি একটা বিয়ে করছি—তা'তে নেমন্তন্ন কোরবো—তা' হ'লে হবে তো? চমৎকার মেয়েটি কিন্তু—

বিভা আসিল।

বলিল—এই যে আপনি এসেছেন—আজকে মনে হচ্ছিল কে যেন আসবে, কে যেন আসবে।· ভালো আছেন তো?

বলিলাম—ভালো আছি বটে এখনকার মত—তবে শীঘ্র খারাপ হবার আশঙ্কা আছে—কারণ চব্বিশে তারিখে আমার বিয়ে।

বিভা হয়তো আশ্চর্য্য হইয়া গেল—না হলে মুখের ভাব অমন বদলাইয়া যায়?

বলিলাম—বিশ্বাস হচ্ছে না? আচ্ছা, পরশু যখন নেমন্তন্নর চিঠি পাবে তখন বিশ্বাস হবে তো?······এখন অনুগ্রহ করে দাদার বাক্স খুলে চারটে টাকা ধার দাও দিকি ক্যাশিয়ার মশায়! এই নিয়ে সবসুদ্ধ, দশ টাকা হোল বোধ হয়, না?

বিভা সে কথায় কান দিল না। চাবি দিয়া বাক্স খুলিয়া টাকা আনিয়া দিল। দেখি মুখটি একটু ভার ভার! বলিলাম—দুঃখ কেন বিভা? আমায় বিশ্বাস হচ্ছে না?·· আচ্ছা দেখ, এই আমি প্রতিজ্ঞা করে গেলুম·····তোমায় ঠিক নেমন্তন্ন কোরবো কোরবো, কোরবো!

এবার বিভা হাসিয়া ফেলিল—বলিল—বা রে আমি কি বলছি নাকি যে আমায় নেমন্তন্ন করুন করুন করুন! বেশ তো আপনি! আমি ভাবছি চব্বিশে তারিখে আমার যে এক জায়গায় এন্‌গেজমেণ্ট্ ছিল—সেই দিনই পড়ে' গেল আপনার বিয়ে!······আচ্ছা এ সুযোগটা যখন হাত-

ছাড়া হ'য়ে যাচ্ছে—তখন আর কি করা যাবে!—আপনার ছেলের ভাতের সময়ে যেন বাদ না যাই—দেখবেন!

—আর যদি ছেলে না হয়?

বিভা আমার দিকে কৌতুক দৃষ্টিতে চাহিল—অর্থাৎ?

বলিলাম—ধর, এই ছেলে না হ'য়ে যদি মেয়ে হয়! —কিম্বা মোটেই কিছু যদি না হয়?

বিভাকে সাগর বাঁচাইয়া দিল; বলিল—তোমার বৌভাতের দিনে তো আর ওর এন্‌গেজমেণ্ট নেই—সেদিন ও যাবে ঠিক্!

বলিলাম—সেদিন কিন্তু আমার বউকে উদ্দেশ করে তোমার লেখা একটা কবিতা উপহার দেওয়া চাই-ই! না হ'লে ভারী রাগ কোরব! আর কখনো টাকা ধার করতে আসব না।

বিভা যে ইচ্ছা করিয়া হাসিয়া উঠিল—তাহা বুঝিতে পারিলাম। সমস্ত প্রসঙ্গ চাপা দিবার উদ্দেশ্যে বলিলাম—বড় খিদে পেয়েছে সাগর—বাড়ীতে কিছু ছিল না—কিছু খাইয়ে দে ভাই।

সাগর বলিল—চল্—"দীপাশ্রিতার" সম্পাদকের সঙ্গে একবার দেখা করবার কথা আছে, ওখান থেকে চাইনিজ রেস্তোর াঁয় গিয়ে "চাউ চাউ" খাওয়া যাবে!

বাহিরে আসিবার সময় পিছন ফিরিয়া দেখি—কই অন্য দিনের মত বিভা দরজার কাছে দাঁড়াইয়া নাই তো!

প্রথমে কথাটা বিশ্বাস হয় নাই। কিন্তু ললিতার বাবার মুখ হইতে শোনা, অবিশ্বাস করিবার কোনও হেতু নাই।…

ললিতা মারা গিয়াছে—যাক্ বিবাহের পর মরিয়া বাবাকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া যায় নাই! কিন্তু করিয়াছে আমাকে—ভোনাকেও! এক হাজার টাকার মায়া কাটাইলে প্রতুলের মায়াও কাটাইতে হয়! তাই ভোনার বিবাহ হইল না। আমার না হয় বিবাহ না করিলেও চলে।

কিন্তু বিভার গোপন অভিশাপের যে এমন প্রত্যক্ষ ফল ফলিবে কে জানিত?

আজ পয়লা!

কুড়ি টাকার মায়া কাটান শক্ত। বিরহ-যন্ত্রণা ভোগ করা অপেক্ষাও শক্ত!

সকাল বেলা গেলাম। প্রাতর্ভ্রমণ স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকর। গোটাকতক পয়সা বৃথা খরচ না করিয়া প্রথম দিনটা পায়ের সদ্ব্যবহার করিলাম।

বাহির হইতেই দু'তিনটি ছেলের একত্র চীৎকার সহকারে পড়িবার শব্দ শোনা গেল।

ভিতরে ঢুকিয়াই দেখি তক্তপোষের উপর চারিটি ছেলে বসিয়া পড়িতেছে—আর তাহাদেরি সুমুখে আমারই বন্ধু পরিতোষ তাহাদের পড়া বলিয়া দিতেছে; অদূরে কর্ত্তা বসিয়া কেমন পড়ানো হইতেছে তাহাই হয়ত লক্ষ্য করিতেছেন।

রীতিমত বিস্মিত হইয়া গেলাম!

কর্ত্তা আগেই উঠিয়া আসিলেন। বলিলেন—এই যে এসে গেছ, ভালোই হয়েছে। এই দেখ, তুমি আমায় কী ঠকান্‌ই ঠকাচ্ছিলে বল দিকিন্!

বিস্মিত হইয়া বলিলাম—আজ্ঞে, আমি আপনাকে ঠকাচ্ছিলুম?

কর্ত্তা বলিলেন—এ ঠকানো না ত' কী! ডাকাতি, বাটপাড়ী, জোচ্চরী! তুমি বি, এ পাশ, কুড়ী টাকা চেয়েছিলে—আর ওই দেখ দিকি ওই ছোক্‌রা এম, এ পাশ, পনেরো টাকায় পড়াচ্ছে কেমন! আমরা সব বুঝি বাবা, সব বুঝি। আমরা সাবেকী এণ্ট্রান্স……একালের এম, এ কে শিখিয়ে দিতে পারি। তুমি কোন্ সাহসে কুড়ী টাকা উল্লেখ করলে বাপু?

বলিলাম—তবে আপনি যে তখন রাজী হয়েছিলেন! তখন বল্লেই পারতেন পনেরো টাকার বেশী দিতে পারবো না!

কর্ত্তা বলিলেন—তুমি যে অমন ঠকান্ ঠকাবে—কী করে' জানবো বাপু!

রাগ হইয়া গিয়াছিল। বলিলাম—দশ টাকায় রাখবেন এখন?

হঠাৎ কর্ত্তার মুখের ভাব বদলাইয়া গেল! বলিলেন—তা' তা' তা'—হ্যাঁ—তা' কেন রাখব না…কেন…তা' তা'……

মনে হইতেছিল কর্ত্তার মুখে সজোরে এক চড় মারিয়া চলিয়া আসি। কিন্তু না! তাড়াতাড়ি চলিয়া আসিতে-ছিলাম, পিছন হইতে পরিতোষ ডাকিল—রামানন্দ!

ফিরিয়া গেলাম। কর্ত্তা তখন বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেছেন।

বলিলাম—কি হে পরিতোষ—তুমি আবার এস, এ হ'লে কবে?

পরিতোষের মুখের ভাব অস্বাভাবিক! কাঁদিয়া ফেলিবে নাকি?……

বলিল—কাউকে বোল না ভাই। বউ ছেলে উপোস করে' আছে—তাই এই মিথ্যের আশ্রয় নিতে হয়েচে। কিছু মনে কোর না। তুমি কেমন আছ?

একটাও কথা না বলিয়া হন্ হন্ করিয়া চলিয়া আসিলাম। পৃথিবী বোধ হয় আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছে!

কাল আমাদের গলির মোড়ের শিউলি গাছটিকে কে কাটিয়া লইয়া গিয়াছে; কা'রো দরকার পড়িয়াছিল হয়তো!

শ্রীবিমল মিত্র

বাংলাভাষা ও বৃহত্তর বঙ্গ

শ্রীসুশীলকুমার বসু

গ্রেটব্রিটেন আয়তনে প্রায় বাংলা দেশের সমান এবং জনসংখ্যায় এইদেশ অপেক্ষা ক্ষুদ্র। কিন্তু পৃথিবীর ১৬ ষোল কোটির উপর লোক বর্ত্তমানে ইংরাজীভাষী। ইংরাজী যাহাদের মাতৃভাষা নয় এরূপ আরও বহুকোটি লোক ইংরাজী শিখেন, ইংরাজীতে গ্রন্থাদি রচনা করেন এবং ইংরাজী পুস্তক পত্রিকা প্রভৃতি ক্রয় ও পাঠ করেন। এইরূপে অতি-বিস্তৃত ক্ষেত্র প্রাপ্ত হওয়ায় ইংরাজী সাহিত্যের অসম্ভব উন্নতি ও সম্পদবৃদ্ধি সম্ভব হইয়াছে।

ইংরাজের অতি বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য, তাহার পৃথিবীব্যাপী বাণিজ্যের প্রসার এদিকে তাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সাহায্য করিয়াছে। বাঙ্গালীরা সংখ্যায় ইংরাজদিগের অপেক্ষা কিছু অধিক হইলেও, বাঙ্গালীদিগের সাম্রাজ্য বা বিস্তীর্ণ বাণিজ্য নাই এবং হইবারও সম্ভাবনা নাই। কাজেই ইংরাজীর ন্যায় বাংলাভাষার প্রসার বা অতখানি শ্রীবৃদ্ধির আশা নাই।

কিন্তু, সাম্রাজ্য ও বাণিজ্য ব্যতীতও ইংরাজের উদ্যম, দৃঢ়তা, আত্মপ্রত্যয় ও মর্য্যাদাবোধও ইংরাজী সাহিত্যের বিস্তারে কম সহায়তা করে নাই। আমাদিগেরও ঐ সকল গুণ যদি ঐ পরিমাণে থাকিত, তবে বাংলাভাষা এতদিনে মাত্র একটি প্রাদেশিক ভাষার অবস্থা হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিত। অল্পসংখ্যক ইংরাজও যেখানে গিয়াছেন, সেখানে তাঁহারা নিজেদের বৈশিষ্ট্য বা ভাষা বিসর্জ্জন দেন নাই। সেখানকার লোককে ইংরাজী শিখাইয়া আস্তে আস্তে ইংরাজ করিয়া তুলিয়াছেন। আর আমরা আমাদের বৈশিষ্ট্য ও ভাষার উপর এরূপ শ্রদ্ধাহীন যে যখনই কোন বিদেশে গিয়াছি তখনই নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ও ভাষা পরিত্যাগ করিয়া সেই দেশের লোক হইয়া গিয়াছি।

বিস্তৃতি জীবনের এবং সঙ্কোচন মৃত্যুর লক্ষণ,—ব্যক্তির পক্ষেও, জাতির পক্ষেও। এই স্বাভাবিক ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইবার ফলে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের মধ্য দিয়া যে বৃহত্তর বঙ্গ গঠিত হইতে পারিত, সমগ্র ভারতবর্ষে বাঙ্গালীর যে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত তাহার সম্ভাবনা ক্রমেই সঙ্কুচিত হইয়া যাইতেছে।

এই ঔদাসীন্যের ফলে নিজ প্রদেশেও আমাদের ক্ষতির পরিমাণ নিতান্ত অল্প নহে। বাঙ্গলার ছোট বড় সকল ব্যবসা অবাঙ্গালীর হাতে। এখানকার মজুর মিস্ত্রী প্রভৃতিও ভিন্নপ্রদেশবাসী। ইহাদের অনেকে আজীবন এদেশে থাকিয়াও বাংলা শিক্ষা করে না, এবং আমরাই কোনক্রমে ইহাদের ভাষা শিখিয়া ও ভাঙ্গা ভাঙ্গা বলিয়া কাজ চালাইয়া দিই। যাহারা কোন বিদেশে যায় তাহারা সেই দেশের ভাষা না শিখিয়া গেলে বিশেষ অসুবিধায় পতিত হয়। কিন্তু যাহারা বাংলাদেশে আসিবে তাহারা এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইয়া আসিতে পারে যে বাঙ্গালীরা তাহাদের ভাষা শিখিয়া তাহাদের কাজ চালাইয়া দিবে। কলিকাতা ব্যতীত বাংলার পল্লী অঞ্চলে এবং মফঃস্বল সহরে বহু পেশোয়ারী ও কাবুলি, মহাজনী ও নানাপ্রকার দ্রব্য বিক্রয় করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করে। ইহারা বাঙ্গালীদের সহিত কথাবার্ত্তা বলিবার জন্য বাংলা না শিখিয়া হিন্দী শিখে। সম্ভবতঃ তাহার অন্যতম প্রধান কারণ, বাঙ্গালীরা কোন বিদেশীর সহিত কথা বলিবার সময় ইংরাজী অথবা হিন্দী ব্যবহার করেন—এমন কি, ঐ বিদেশী বাংলা বুঝিলেও। ইহার মূলে বাঙ্গালীর নিজের ভাষা ও জাতীয়তা সম্বন্ধে গৌরববোধের অভাব রহিয়াছে।

কলিকাতা বাংলার সহর হইলেও যে বাঙ্গালীর সহর নহে তাহা শুধু মাত্র ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যাপারেই সুস্পষ্ট নহে, এখানকার সার্ব্বজনীন ভাষাও অনেকাংশে হিন্দী। বিদেশী যাহারা কলিকাতায় আসেন তাঁহারাও স্থানীয় ভাষা হিসাবে হিন্দীই শিক্ষা করেন। ইহার প্রধান কারণ অবশ্য বড় বড়

ব্যবসা হিন্দীভাষীদের হাতে এবং বিদেশী ব্যবসায়ীদের ইঁহাদের সহিতই সম্পর্ক। কিন্তু, এ কথা খুচরা ব্যবসায়ীদের সম্বন্ধে খাটে না। তাহাদিগকে এদেশী লোকের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিতে হয়। কেহ বলিতে পারেন, কলিকাতা বিশ্বের একটা প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র, পৃথিবীর সমস্ত দেশের লোকের এখানে যাতায়াত, এখানে স্থানীয় ভাষার প্রাধান্য হইতে পারে না। কিন্তু, পৃথিবীর অন্যান্য বাণিজ্য কেন্দ্রে কি হয়। লণ্ডন বা নিউইয়র্কের কথা না হয় ছাড়িয়াই দেওয়া গেল, কারণ ইংরাজীর প্রতিপত্তি পৃথিবী-ব্যাপী। ফ্রান্স, জার্ম্মানি বা জাপানের কোন বাণিজ্যকেন্দ্রে, টোকিও, ইয়োকোহামা, ওসাকা, বার্লিন, হাম্বার্গ বা মার্সেলস্এ কি স্থানীয় ভাষা ব্যতীত অন্যভাষা চালান সম্ভব হইবে ? এই সকল স্থানের ভাষা না জানিয়া কেহ কি এখানে খুচরা ব্যবসা করিতে যাইতে পারিবে।

এই ত গেল নিজ প্রদেশের কথা। বাংলার বাহিরে বাংলাভাষার বিস্তারের কথায় সর্ব্বপ্রথম আসামের কথা বলিতে হয়। আসামের মোট লোক সংখ্যা ৭০ সত্তর লক্ষের উপর। ইহার মধ্যে বাঙ্গালীর সংখ্যা ৩৫ পঁয়ত্রিশ লক্ষ। আসামকে সর্ব্ববিষয়েই বাংলার অংশ বলা যায়, এবং ভাষার দিক দিয়া ত' বিশেষ ভাবে। আসামীর সংখ্যা এখানে মাত্র ১৭½ সাড়ে-সতের লক্ষ। ইঁহারা যে ভাষা ব্যবহার করেন তাহা অসামিয়া নামে খ্যাত হইলেও, বাংলারই একটি বিভাষা মাত্র। ইহা বাংলা অক্ষরে লিখিত হয় এবং ইহার শব্দসম্ভার ও বাক্যবিন্যাস বাংলা হইতে সামান্যই বিভিন্ন। আসামীকে যদিও একটী স্বতন্ত্র ভাষা বলিয়া ধরা হয়, তাহা হইলেও ইহার ব্যবহারকারীদের সংখ্যা এত অল্প যে তাঁহাদিগের ভারতের একটী বৃহত্তর ভাষা শিখিতেই হইবে।

বাংলার নিকট-জ্ঞাতি বলিয়া ইহাকে গ্রহণ করা ব্যতীত অন্য কারণেও ইঁহাদিগকে বাংলার আনুগত্য স্বীকার করিতে হইবে। নিজেদের অপেক্ষা সংখ্যাবহুল বাঙ্গালী সম্প্রদায়ের দ্বারা নিজ দেশেই ইঁহারা পরিবেষ্টিত। এই স্থানের ভূমির পরিমাণ ও প্রাকৃতিক সম্পদের তুলনায় লোক সংখ্যা অত্যন্ত অল্প বলিয়া পূর্ব্ব বঙ্গের বহু মুসলমান কৃষক এই দেশে যাইয়া বাস করিতে থাকায় এই সংখ্যা ক্রমেই বাড়িতেছে। বিদ্বান, বুদ্ধিমান্ ও ধনশালী হিন্দুরাও ক্রমে এই দেশের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া ইহার প্রাকৃতিক সম্পদের উন্নতি সাধনে সহায়তা করিবেন এইরূপ আশা করা যায়। আসাম বর্ত্তমানেও অনেকটা বাংলার উপনিবেশ, বাঙ্গালীরা একটু উদ্যোগী এবং সচেষ্ট হইলে ইহা সর্ব্বতোভাবে বাঙ্গালীর উপনিবেশে পরিণত হইবে।

আসামের কুলী উপনিবেশে পরিণত হইবার একটা আশঙ্কা আছে। ইহার বিস্তৃত চা বাগানে যে বহুসংখ্যক কুলী কাজ করিতেছে তাহাদের সংখ্যা প্রায় নিযুতের কোটায় উঠিবে। প্রায় ৫ পাঁচ লক্ষ কুলী জমি জমা কিনিয়া স্থায়ীভাবে বসবাস করিতেছে। এই সংখ্যা সম্ভবতঃ ক্রমে আরো বর্দ্ধিত হইবে। কিন্তু, বৃহত্তর বঙ্গের গঠনে ইহা বিরুদ্ধতা না করিয়া বরং এক পক্ষে সহায়তা করিতে পারে। কারণ, বহু কুলী ছোট নাগপুর অঞ্চল হইতে সংগৃহীত এবং কোনও না কোনও প্রকারের পার্ব্বত্য-ভাষী হইলেও ইহাদের মধ্যে নানাদেশের, নানাজাতির এবং নানাভাষার লোক আছে। ইহাদের মধ্যে স্বাভাবিক সংযোগ ও সংহতি বর্ত্তমান থাকিবে না এবং কোনও বৃহৎ সংস্কৃতির সহিতও ইহাদের যোগ নাই। কাজেই প্রতিবাসী বৃহত্তর সভ্যতা ও ভাষার প্রভাব ইহারা এড়াইতে পারিবে না। ঐ প্রদেশের এবং বাংলার বাঙ্গালী-দের সহিত ইহাদের নিত্য সংস্পর্শে আসিতে হইবে এবং এই কারণে কালক্রমে ইহাদের বাঙ্গালী হইয়া যাইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা রহিয়াছে।

আসামের পার্ব্বত্য অঞ্চলে নানাজাতির লোক অর্দ্ধ সভ্য অবস্থায় বাস করিতেছে। লুসাই, নাগা, গারো এবং উত্তর কাছাড় পাহাড় এবং খাসি ও জয়ন্তীয়া পাহাড়ের ব্রিটীশ অংশের অধিবাসী নাগা, কুকি, আবর, মিস্‌মি প্রভৃতি জাতীয় লোকদিগেরও বাংলার ভাষা ও সভ্যতা গ্রহণের সম্ভাবনা আছে। এই সকল জাতি এবং কুলীদের মধ্যেরও বহুলোক আদিম জাতীয়। বাংলার হিন্দুধর্ম্ম সংস্কারকেরা ইহাদিগকে হিন্দু করিবার চেষ্টা করিলে সহজেই এক সঙ্গে উভয় কার্য্য করিতে পারিবেন। হিন্দুমিশন এবং ব্রাহ্মসমাজ এদিকে দৃষ্টি দিতে পারেন। মুসলমানদিগের কথা এই জন্য বলিলাম না যে, তাঁহাদের ধর্ম্ম প্রচারের মধ্যে আজও বাঙ্গালীর বিশিষ্টরূপ

দেখা দেয় নাই ; এবং বাংলার সভ্যতা বা ভাষাকে আজও তাঁহারা বড় করিয়া দেখেন না।

খ্রীষ্টান মিশনারীরা ইহাদের মধ্যে অনেক কাজ করিতেছেন ও ইহাদিগকে খ্রীষ্টান করিয়া ইংরাজী শিখাইতেছেন। বহুদূর দেশে আসিয়া সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির জাতিদের তাঁহারা তাঁহাদের ধর্ম্ম ও ভাষা শিখাইতেছেন ; অথচ, সহজেই যাহারা আমাদের সভ্যতা ও ভাষার অধিকারী হইয়া আমাদের শক্তিবৃদ্ধি করিতে পারিত, সর্ব্বপ্রকার পারিপার্শ্বিক আনুকূল্য থাকা সত্ত্বেও আমাদের মনোযোগ এবং উদ্যমের অভাবে তাহারা পর হইয়া যাইতেছে। আমাদের পক্ষ হইতে কোনও প্রকারের প্রচার বা চেষ্টা না থাকিলেও এই সকল জাতির অনেকের যে বাংলা শিখিবার ইচ্ছা রহিয়াছে তাহা একজন কুকি ভদ্রলোকের নিম্নোদ্ধৃত উক্তি হইতেই বুঝা যাইবে।

"আমাদের ভাষার কোনও বর্ণমালাও নাই। পাদ্রীদের কল্যাণে আমাদের ভাষায় রোমান বর্ণমালায় অনুদিত হইয়া মাত্র কতকগুলি খ্রীষ্ট ধর্ম্মগ্রন্থ ও চার্চ্চের গানের পুস্তক ছাপা হইয়াছে।……………রোমান বর্ণমালা একে বিদেশী তার উপর আমাদের ভাষার যথার্থ উপযোগী বলিয়া মনে হয় না। রোমান বর্ণমালা অপেক্ষা বাংলা বর্ণমালাতে আমাদের ভাষা ভাল লেখা হইবে বলিয়া মনে হয়। বাঙ্গালীরা আমাদের প্রতিবেশী। আমাদের সমুদয় ব্যবসা বাঙ্গালীদের সঙ্গে। সুতরাং বাংলা ভাষা জানা আমাদের নিতান্ত দরকার। তার উপর বাংলার মত একটী উন্নত ভাষার মানসিক সম্পদের অধিকারী হইবার সুযোগ পাইলে আমাদের যথার্থ উপকার হয়। আমাদের সমগ্র জাতিই বাংলা ভাষা শিখিবার জন্ম খুব উৎসুক। কিন্তু সুযোগ কোথায়…………মিশনারীদের স্কুলে কখনও বাংলা ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয় না।………… বিদেশী বর্ণমালায় আমাদের লেখাপড়া চলিতেছে। প্রতিবেশী বাঙ্গালীর সঙ্গে আমাদের কথা কহিতে হইলে আমাদের ইংরেজীর আশ্রয় লওয়া ছাড়া উপায় নাই।"

প্রবাসী ; ভাদ্র, ১৩৩৭।

মণিপুর একটী দেশীয় রাজ্য ; ইহার অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় চার লক্ষ। এখানে বাংলাভাষা প্রচারের চেষ্টা করিলে ইহাদের মধ্যেও বাংলা-ভাষার প্রসার অবশ্যম্ভাবী। কোনও বৃহত্তর ভাষা এবং সাহিত্যের সহিত সংযুক্ত হওয়া ইহাদের পক্ষেও অপরিহার্য্য এবং বাংলার অনুকূলে পূর্ব্বোক্ত কারণ সমূহ এখানেও বর্ত্তমান। এ সম্বন্ধে আসামের বাঙ্গালীদের বিশেষ কর্ত্তব্য রহিয়াছে। যাহাতে আসামের এই সকল ছোট ছোট বিভিন্ন জাতিকে বাংলা শিখাইয়া সভ্যতা ও ভাষায় তাহাদিগকে বাঙ্গালী করিয়া তুলিতে পারেন তাহার চেষ্টা তাঁহাদিগকে করিতে হইবে। তাঁহাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে কোন বৃহৎ ভাষা বা সভ্যতার সহিত প্রত্যক্ষভাবে ইহারা যুক্ত না থাকায় নানা লোকেই ইহাদের সহায়ে নিজেদের শক্তিবৃদ্ধির চেষ্টা করিবে। তাহাতে আংশিক সফল হইলেও একদিকে যেমন তাঁহাদের নানা অসুবিধা হইবে, অন্যদিকে নিজ প্রদেশে আত্মবিস্তৃতির চেষ্টার স্বাভাবিক ও সহজ কর্ত্তব্য হইতে তাঁহারা বিচ্যুত হইবেন। বাংলা হইতেও যাহাতে ক্রমে অধিক সংখ্যক বাঙ্গালী ওখানে যাইয়া বসবাস করেন তাহার চেষ্টাও এই জন্যই তাঁহাদের করা উচিত। বাংলা দেশ হইতেও এই উদ্দেশ্যেই প্রচার সমিতি স্থাপিত হওয়ার এবং একান্ত উপেক্ষিত, অথচ বাঙ্গালীর ভবিষ্যত বিকাশের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়, এই বিষয়টির প্রতি বাঙ্গালী মাত্রেরই অবহিত হইবার প্রয়োজন আছে।

বাংলারও অন্ততঃ দুইটী জেলায় এই প্রকারের কাজ করিবার ক্ষেত্র রহিয়াছে। চট্টগ্রামের জঙ্গলাকীর্ণ পার্ব্বত্য অঞ্চলে লক্ষাধিক পার্ব্বত্যজাতীয় লোকের বাস আছে। দার্জ্জিলিং জেলাতেও বাঙ্গালী-অধ্যুষিত সমতল ভূমি বাদ দিলে, নানাশ্রেণীর পার্ব্বত্য জাতি বাস করে। ইহারা অধিকাংশ অনার্য্যধর্ম্মী। খ্রীষ্টান মিশনারীদিগের চেষ্টায় অনেকে খ্রীষ্টান হইতেছে। কেহ কেহ মুসলমানও হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে হিন্দুধর্ম্ম ও বাংলা ভাষা প্রচারের সুবিস্তৃত ক্ষেত্র রহিয়াছে। ইহারা অনেকে ভাঙ্গা বাংলা বলিতে পারে, সুযোগ পাইলে আগ্রহের সহিত লিখিতে ও পড়িতে শিখিবে।

এ পর্য্যন্ত যাহাদের কথা বলা হইল, বাঙ্গালীর চেষ্টা থাকিলে তাহাদের পক্ষে বাংলা শিক্ষা করা অনেকটা

অপরিহার্য্য হইয়া পড়িবে। কিন্তু ইহা ব্যতীত, উদ্যম ও আগ্রহ থাকিলে, বাংলার ভাষা, সাহিত্য ও সভ্যতাকে বিস্তৃত করিবার বৃহত্তর ক্ষেত্র রহিয়াছে।

সাঁওতাল পরগণা প্রদেশ-হিসাবে বিহারের অন্তর্গত হইলেও বাংলার সীমান্তে অবস্থিত। এখানকার অধিবাসীরা বাংলার প্রভাব হইতে মুক্ত নহে। কাজকর্ম্মের জন্যে ইহাদের বাঙ্গালীর সংস্পর্শে আসিতে হয়, এবং বাঙ্গালীরাও কাজ কর্ম্ম ও স্বাস্থ্য পরিবর্ত্তন উপলক্ষে এ অঞ্চলে যাতায়াত করিয়া থাকেন। বিশেষভাবে চেষ্টা করিতে পারিলে ইহাদের মধ্যে বাংলার প্রচলন খুবই সম্ভব। সম্পূর্ণ না হইলেও আংশিকভাবে যে ইহাদিগকে বাংলাভাষী করিয়া তোলা যাইতে পারে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু, একথাটা মনে রাখা দরকার যে হিন্দীভাষীরা এ বিষয়ে একেবারে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া নাই। অহিন্দী প্রদেশগুলিতে হিন্দীকে জনপ্রিয় করিবার চেষ্টা ব্যতীত ইঁহারা বৃহৎ ভাষার সহিত সংযোগহীন আদিম অধিবাসীগণের মধ্যে হিন্দী চালাইবার যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন।

ইহার পর ছোটনাগপুরের কথা বলা যাইতে পারে। এখানে কোল, ওরাঁও প্রভৃতি নানা উপজাতির বাস। সংখ্যাতেও ইহারা নগণ্য নহে। খ্রীষ্টান মিশনারীরা ইহাদের মধ্যে প্রশংসনীয় কার্য্যতৎপরতা দেখাইতেছেন। বাঙ্গালীরা একান্ত উদাসীন না থাকিলে ইহাদের অনেককে নিজ ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে পারিতেন ও ইহাদের মধ্যে এই দেশীয় সভ্যতা ও ভাষা প্রচলন করিতে পারিতেন। এখানকার প্রধান দু'টী সহর হাজারিবাগ ও রাঁচি—অনেকটা বাঙ্গালীর সহর; মানভূম প্রভৃতি অঞ্চলেও বহু বাঙ্গালীর বাস আছে। সুপ্রযুক্ত হইলে বাংলার প্রভাব এখানকার বন্য জাতিগণের উন্নয়নে যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারে।

সাঁওতাল পরগণা ও ছোটনাগপুরে বাংলার শিক্ষা, সভ্যতা, ধর্ম্ম ও ভাষার বিস্তার ত কতকটা স্বাভাবিক ও সহজসিদ্ধ। কিন্তু আমরা যদি পাশ্চাত্য জাতিগণের এক-শতাংশও উদ্যমশীল হইতাম এবং তাঁহাদের আত্ম-বিস্তৃতির চেষ্টা ও নিজেদের ধর্ম্ম, সাহিত্য ও বৈশিষ্ট্যের প্রতি অনুরাগের সামান্য অধিকারীও হইতাম তাহা হইলে সমগ্র ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া এতদিন বৃহত্তর বঙ্গের সৃষ্টি হইত। সমগ্র ভারতবর্ষে এখনও প্রায় এককোটি অনার্য্য-ধর্ম্মী লোক রহিয়াছে। আদিমজাতীয়দের মধ্যে যাহারা খ্রীষ্টান হইয়াছে তাহাদের ধরিলে এই সংখ্যা আরও অনেক অধিক হইবে। পৃথিবীর অপর প্রান্ত হইতে খ্রীষ্টান মিশনারীরা আসিয়া যদি এই সকল জাতির মধ্যে কাজ করিতে পারেন এবং তাঁহাদের চেষ্টা আংশিক ফলবতী হইয়া থাকে, তবে আমাদের পক্ষে এই চেষ্টা অনেক অধিক সহজ এবং সাফল্যমণ্ডিত হইত। এই কল্পনা অনেকটা অলস ভাববিলাসের মত শুনাইতে পারে, কিন্তু ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী অসম্ভব ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য জাতিগণের চেষ্টা সফল হইয়াছে। আফ্রিকার মরুভূমি ও অরণ্যেও ইঁহারা নিজেদের ভাষা ও ধর্ম্ম লইয়া গিয়াছেন; আমাদের দেশের এই সকল লোকের মধ্যেও আনিতেছেন।

আমাদের দেশের এই সকল জাতির মধ্যে যেরূপ দ্রুত সভ্যতার বিস্তার হইতেছে, তাহাদের দুর্গম বাসভূমি সভ্য-মানুষের অধিগম্য হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে অনতিকাল মধ্যেই ইহারা কোনও না কোনও সভ্য এবং প্রবল জাতির কুক্ষিগত হইবেই। ইহারা কোন্ কোন্ জাতির শক্তিবৃদ্ধি করিবে তাহা সেই সেই জাতির কর্ম্ম, উদ্যম ও অধ্যবসায়ের উপর নির্ভর করিতেছে।

এইসকল চেষ্টা ব্যতীত সুসভ্য এবং সমৃদ্ধিশালী ভাষার অধিকারী জাতিদের মধ্যেও বাংলাভাষা ও সাহিত্যের প্রচার অসম্ভব নহে। কিন্তু, ইহার জন্য যে স্বজাতিপ্রীতি এবং সুদৃঢ় আত্ম-মর্য্যাদার প্রয়োজন তাহার অভাবেই ইহা হইয়া উঠিতেছে না। ওড়িয়ারা আমাদের প্রতিবাসী। ইঁহাদের ভাষার সহিত বাংলা ভাষার অতি নিকট সম্পর্ক। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই একজন ওড়িয়া বাংলা শিক্ষা করিতে পারেন এবং অনেকে করিয়াও থাকেন। জীবিকার জন্য ইঁহাদের বহুলোক বাংলায় আসেন এবং বৎসরের অল্লাধিক সময় বাস করেন। বাঙ্গালীরাও স্বাস্থ্যের জন্য, তীর্থ ও সখের ভ্রমণের জন্য এবং চাকরী ও ব্যবসা উপলক্ষে উড়িষ্যায় যাইয়া

থাকেন। কাজেই ওড়িয়াদের বাংলাভাষী করা সম্ভব না হইলেও ইঁহাদের বহুলোক আমাদের সাহিত্যের সহিত পরিচিত ও তাহার অনুরাগী হইতে পারিতেন।

উড়িষ্যার পক্ষে যাহা সত্য বিহার ও যুক্ত প্রদেশের কতক অংশের পক্ষে তাহা সত্য। বিহারীরা যদিও হিন্দীকে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা হইলেও এখানকার স্থলবিশেষের কথ্যভাষার সহিত হিন্দী অপেক্ষা বাংলার সাদৃশ্য অধিক, এবং এখানকার প্রতি বড় সহরেই বহুসংখ্যক বাঙ্গালী বাস করেন। ইঁহারা অধিকাংশই উচ্চ শিক্ষিত ভদ্রলোক এবং ঐ দেশের যে সকল লোকের সহিত ইঁহাদের মিশিতে হয় তাঁহারাও সাধারণতঃ উচ্চ শিক্ষিত অভিজাত বংশীয়। প্রবাসী-বাঙ্গালীরা চেষ্টা করিলে এই সকল বিদেশী ভদ্রলোককে বাংলা শিখাইতে পারেন। এই প্রকারে যাঁহারা বাংলা শিখিতে পারেন, তাঁহাদের সংখ্যা খুব অধিক না হইলেও, তাঁহাদের উৎকৃষ্ট শিক্ষা ও সামাজিক প্রতিপত্তির ফলে ঐ সকল প্রদেশের চিন্তাশীল ও শিক্ষিত লোকের একাংশের সহিত বাঙ্গালীর চিন্তাধারার এবং শ্রেষ্ঠ জিনিষগুলির যে পরিচয় ঘটে তাহা পরোক্ষভাবে ঐ সকল দেশে বিস্তৃতিলাভ করিতে পারে। ইহাতে বাংলার উৎকৃষ্ট সাহিত্য একটু বিস্তৃততর ক্ষেত্রও প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু ইহার জন্য প্রবাসী বাঙ্গালীদের মধ্যে সামাজিক সংহতি, উদার সহানুভূতি এবং মাতৃভাষা ও মাতৃভূমির প্রতি প্রবল অনুরাগ প্রয়োজন।

আমাদেব শিথিলতার জন্য শুধু যে বিদেশে অবাঙ্গালীদের মধ্যে বাংলা ভাষা বিস্তারের ব্যাঘাত হইতেছে তাহা নহে; অনেক বাঙ্গালীপরিবার দুই এক পুরুষ বিদেশে থাকিবার পর মাতৃভূমির সহিত সর্ব্বপ্রকারে সংশ্রবশূন্য হইয়া পড়েন এবং মাতৃভাষা ও স্বজাতির সকল প্রকার আচার ব্যবহার ও রীতি নীতি বিস্মৃত হইয়া গিয়া বিদেশী হইয়া যান। প্রবাসী বাঙ্গালীদের মধ্যে এদিকে কিছু কিছু উদ্যোগ ও চেষ্টা দেখাইলেও, আজও তাহা প্রয়োজনরূপ শক্তি ও ব্যাপকতা লাভ করে নাই। বাংলা দেশে পূর্ব্বোক্তরূপে বৃহত্তর বঙ্গ গঠনের চেষ্টা দেখা দিলে প্রবাস বাঙ্গালীরাও অধিকতর উদ্যোগী হইবেন।

শ্রীসুশীলকুমার বসু

তিন দিনের গল্প

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রমোহন সেন

"অমন করে তাকিয়ে আছ কেন আমার দিকে ?"

বেণীদোলানো ফর্সা মেয়েটি চোখ ঘুরাইয়া প্রশ্ন করিল।

"তোমার মুখখানি যে ভারী সুন্দর, তাইত এমন করে তাকিয়ে আছি।"

"ওমা! কি অসভ্য গো!"

"মুখের দিকে চেয়ে থাকলেই অসভ্য হয় নাকি ?"

"হয়ই ত, একশবার হয়।"

"কে বলেছে ? কোন পুস্তকে পড়েছ ?"

মেয়েটি এবার ফ্যাসাদে পড়িল। বাস্তবিক ইহা সে কোন পুস্তকেই পাঠ করে নাই। তা ছাড়া ইহার সত্যতা প্রমাণের জন্য যে কোন আপ্তবাক্য সংগ্রহ করিয়া রাখিবার প্রয়োজন আছে একথা সে কখনো ভাবিয়া দেখে নাই। তবুও নিজের যুক্তিকে শক্তিশালী করিবার নিমিত্ত সে দ্বিগুণ জোরের সহিত বলিয়া উঠিল, "হ্যাঁ হ্যাঁ, জানি। তোমাকে আর বাজে বকতে হবে না।"

এর পর আর কথা কি! তাহার কথায় তিলমাত্র সন্দেহপ্রকাশের অবকাশটুকুও ছিল না। কিন্তু অপরাধী এজন্য মোটেই লজ্জিত অথবা দুঃখিত হইল না। সমস্ত কথা স্বীকার করিয়া লইয়া বলিল "বেশ তো। তা হোলেই বা! তবুও আমি চেয়ে থাকবো।"

"না, কিছুতেই চাইতে পাবে না। আমার তো মুখ!"

"চাইবো-ই ত, একশবার চাইবো। চোখও ত আমার।"

"দাঁড়াও না, বাবাকে সব কথা বলে দেব'খন তখন টেরটা পাবে।"

বেণী দুলাইয়া চলিয়া গেল। প্রথম দিনের আলাপ এইখানেই পরিসমাপ্ত হইল।

যে বোর্ডিংএ থাকি তাহারই গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া আছে চারকোণা ছোট্ট পার্কটি। বিকালবেলা পাড়ার ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের কেউ বড় বাকী থাকে না; পার্কের ভিতরে সকলকেই দেখা যায়। আমার ঘর হইতে সমস্তই দেখা যায়, আলাপ পরিচয় করাও চলে।

মেয়েটি সত্যিই বেশ। সুন্দর ওর বেণীটি, সুন্দর ওর চোখ দুখানি, সুন্দর ওর কথাগুলি। কিন্তু ও যখন ক্ষেপিয়া গিয়া চোখ পাকাইয়া ওঠে, তখনই ওকে সব চেয়ে সুন্দর দেখায়।

পরের দিন বিকাল বেলা ঠিক সেই সময় তাহাকে দেখা গেল। তাড়াতাড়ি টেবিল হইতে মোটা একখানি বই তুলিয়া লইয়া গম্ভীরভাবে তাহাতে মনোনিবেশ করিলাম। সে কাছে আসিয়া জানালার দিকে মুখ তুলিয়া দাঁড়াইল। টুক্‌টাক্ নানা রকম শব্দ করিল, আমার জানালার কবাটের উপর ঠকাঠক কাঁকর বর্ষণ হইতে লাগিল; কিন্তু আমার গভীর মনোযোগ আর কিছুতেই ভাঙ্গে না—পরীক্ষা আসন্ন যে!

আমার এই তপস্যা ভঙ্গ করিতে ব্যর্থকাম হইয়া শেষে যেন আপন মনেই বলিতে লাগিল, "না হয় তাকাতেই বলি নি, তাই বলে কি কথা বলতেও বারণ করেছি ?"—উত্তর নাই। "বাবারে বাবা! কি রাগ! কেন আমি কি করেছি? বাবার কাছে সত্যি সত্যিই ত আর বলে দেই নি। তবে, তবে আবার কেন ?"—উত্তর নাই।.."আহা হা কি মজা! নিজেই করবেন দোষ, আবার নিজেই রাগ দেখাবেন! ভারী-ই—" উত্তর নাই। এবার সে দস্তুর মত চটিয়া উঠিল, ক্ষেপিয়া গিয়া বলিল, বেশত, না হয় নাই বল্লে কথা। ভারী ত বয়ে গেল। আমি যেন কথা বলতেই এসেছিলাম আর কি! যেন আমার কথা বলবার লোক আর কেউ নেই! যেন সব কথা খালি তিনিই বল্‌তে পারেন, আর সব্বাই বোবা! যেন—।" তাহার তহবিলে আর কতগুলি

'যেন' আছে, শুনিতে ইচ্ছা ছিল। কিন্তু ঠিক এই সময় বাড়ীর ঝী আসিয়া "মা ডাকছেন" বলিয়া তাহাকে হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া গেল। তাহার বক্তব্য সে মাঝপথেই বন্ধ করিতে বাধ্য হইল।

একটা আপোষের ব্যবস্থা করিব ভাবিতেছি, এমন সময় কোথা হইতে অলক্ষণা ঝাঁটা আসিয়া সে পথে কাঁটা দিল। একটু আলাপ জমাইবার জন্ত এত চেষ্টা। আর আমি কিনা একটু সাড়াও দিলাম না। মনটা ভয়ানক খুঁৎখুঁৎ করিতে লাগিল। ভাবিলাম, যাক্ কাল বিকাল বেলা ইহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। কালের দেবতা বোধ করি আড়াল হইতে একটু হাসিলেন।

তাহার পর কয়েকদিন তাহাকে আর পার্কে দেখিতে পাইলাম না। বিকালবেলা মনটা তাহার জন্ত কেমন উস্‌খুস্ করিত, কিছুতেই মন বসিতে চাহিত না। আসন্ন পরীক্ষা— কিন্তু আমার চক্ষু দুইটি বই ছাড়িয়া পার্কের দিকেই বেশী নিবিষ্ট থাকিত।

সে দিন কি একটা বিশ্রী স্বপ্ন দেখিয়া শেষ রাত্রির দিকে জাগিয়া উঠিলাম। মনটা ভারী খাবাপ হইয়া গেল। জাগিয়া উঠিলেও অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত স্বপ্নটা আমাকে একেবারে ছাড়িয়া চলিয়া যায় নাই; মনের আশে পাশে আনাচে কানাচে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। পাশের কোন এক বাড়ী হইতে বুকফাটা একটা কান্নার শব্দ তীক্ষ্ণ শরের মত রহিয়া রহিয়া আমার বুকের মধ্যে আসিয়া বিঁধিতেছিল। কোন হতভাগিনী তাহার প্রাণের সর্ব্বস্ব হারাইল কে জানে। এ কান্নার আর শেষ নাই। মনে হইল যুগ যুগ ধরিয়া এই কান্নাই যেন শুনিয়া আসিতেছি, যুগযুগান্ত পরেও এই কান্নাই শুনিতে থাকিব। এ কান্না যেন কোন ব্যক্তি বিশেষের নয়— প্রকৃতির জমাটবাঁধা অশ্রু যেন এই অশ্রুনির্ঝরের প্রাণ যোগাইতেছে—সৃষ্টির প্রথম প্রভাত হইতে যত প্রাণ পৃথিবীর বুক খালি করিয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহাদের সকলের বিয়োগ ব্যথা যেন এই রোদনধ্বনির মধ্য দিয়া অভিব্যক্ত হইয়া উঠিতেছে।

সকাল হইলে উঠিয়া জানলার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলাম। সমস্ত আকাশ মেঘে ঢাকা, টিপটিপ করিয়া বৃষ্টি ঝরিতেছিল। এই মেঘে ঢাকা আকাশ, এই টিপিটিপি বৃষ্টি, এই ঠাণ্ডা দমকা হাওয়া—সমস্তই যেন ঐ অবিশ্রান্ত ক্রন্দনের যোগ্য আবেষ্টন।

"বল হরি হরি বোল!"

চমকিয়া চাহিয়া দেখি ৫।৬ জন লোক একটি মৃতদেহ কাঁধে করিয়া লইয়া যাইতেছে। উহারা কাছে আসিলে মৃতের মুখখানি দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলাম। সেই মুখ, সেই চোখ, সেই চুল—সব সেই। আধমেলা চোখ দুটি নির্ব্বাক দৃষ্টিতে যেন আমার দিকেই চাহিয়া আছে। আজ তাহার কোন কথা বলিবার নাই—আজ তাহার কোন কথা শুনিবার নাই। সমস্ত আলাপ পরিচয়ের বাঁধ কাটিয়া দিয়া সে চিরদিনের জন্ত চলিয়া গেল। সেদিন সে ডাকিয়া ডাকিয়া আমার উত্তর পায় নাই; আজ যদি তাহার কাণের কাছে চীৎকার করিয়া মরি তবুও তাহার নিকট হইতে কোন সাড়া পাইব না। একি মর্ম্মান্তিক প্রতিশোধ! বেণী দোলানো ফরসা মেয়েটী চিরদিনের জন্ত আমার বুকে অনুতাপের আগুন জালিয়া দিয়া চলিয়া গেল!—কাঠের মূর্ত্তির মত স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

কালের দেবতা বোধ করি তখন নিজের অপরূপ রসিকতায় নিজেই হাসিয়া লুটোপুটি খাইতেছিলেন।

শ্রীসত্যেন্দ্রমোহন সেন

পল্লী-শরৎ

শ্রীযুক্ত গোপাললাল দে

দোপাটি ফুটেছে আগুন ভরিয়া পাশে হাসে লাখো কৃষ্ণকলি,
হেরি রাতারাতি শেফালির পাঁতি তলা আলো করি পড়েছে ঢলি,
ডালিমের ডালে গাল কোটে কার ওষ্ঠ অধর বাঁধুলি ফুলে,
কার হাসি-মাখা চাহনির মত প্রথম আলোয় পদ্ম খুলে ;
তোরণে মালতী মধুমঞ্জরী বিদেশিনী ফুল 'প্রভাত রুচি,'
মেহেদী বেড়ায় অপরাজিতার মাঝে তরুলতা ফুলের গুছি,
জলের কিনারে কেতকী ফুটেছে লুটায় বাতাসে গন্ধখানি,
জানি জানি, ওগো সোণার শরৎ, পল্লী শরৎ, তোমারে জানি ।

শ্যামল ধানের শিয়রে আকাশ ফেলিয়াছে নীল গভীর কালো,
মলিন করেছে হেথা মেঘদল ওই ঝলমল আলোয় আলো,
কাণায় কাণায় জল টলমল, আধো দেখা যায় পাতালপুরী,
রক্ত কুমুদে অনলের হাসি সন্ধ্যা রাঙিমা করিয়া চুরি ;
নধর পালায় ভরা সরোবরে খর্জ্জুর তাল্পী কদলী ছবি,
মরালের দল ভাসে আশে পাশে বক বসে আছে শিকার-লোভী ;
ঘাটে বালাদের কলকল ধ্বনি বধূদের চাপা মধুর হাসি,
তৃণ ফুলে শত পদ পাতে ঝরা চন্দনাগুরু আলতা রাশি ।

শষ্পের বনে ফিরিছে শলভ শত পতঙ্গ সঙ্গে লয়ে,
ঘন ঘন আসে প্রজাপতি দূত কোন্ কুঞ্জের কাহিনী ব'য়ে,
মৌমাছি বুলে ঝিন্টির ফুলে বন-সোনা-দলে নীল ভ্রমর ;
চন্দনা বসে পেয়ারার শাখে পরিণত ফলে করিয়া ভর,
গৃহ-বল ভীতে এসেছে বিহগী সাথে নবশিশু চাহি সভয়,
বাতাস ছাপিয়া আকাশে ভাসিছে কোলাহল কল কাকলীময়,
সুদূরে দেখায় নীল বন-শির সমান করিয়া তুলিতে আঁকা,
সুখাবেশময় সোণার শরৎ, চিনেছি তোমার অঙ্গরাখা ।

দীর্ঘ দিনের কত যে বেদনা দুঃখ হতাশা জমেছে মনে,
কালে কালে কত মলিন কালিমা ভরিয়া উঠেছে ঘরের কোণে,
রোগ দারিদ্র্য চির সহচর মরণের সনে সতত বাস,
তবু মনে হয় যেন সুখ ছিল বাঁচিতে আবার হয় যে আশ !
ঘরে ফিরে হেরি প্রিয়-পরিজন মলিন মুখেতে ফুটেছে হাসি,
মার্জ্জিত গৃহে প্রদীপ জ্বলেছে, পূরবীর সুরে বেজেছে বাঁশী ;
হেনকালে আসে বন্ধু স্বজন লয়ে বিজয়ার আলিঙ্গন,
নীল-কণ্ঠেরে হেরি দ্বারদেশে জয় যাত্রার আমন্ত্রণ ।

শ্রীগোপাললাল দে

যুবরাজ

শ্রীযুক্ত সুবোধ বসু

ডিউ টাইমের পঁয়ত্রিশ মিনিট পরে শিয়ালদহ ষ্টেশনে পৌছান গেল।

অন্বেষু চোখে বাহিরের দিকে তাকাইয়া রহিলাম। বন্ধুদের একজনের নিশ্চয় আসিবার কথা। এত ভীড়ের ভিতর কিন্তু তাদের কাহাকেও চোখে পড়িল না। মোট যখন কুলীরা নামাইয়া ফেলিল তখন নিজেকেও নামিতে হইল। হৈ-চৈ; গণ্ডগোল। হুঁসিয়ার,—লগেজ যাইতেছে। পাশের নবাগতদের সাথে মুটেদের খুব কড়া চুক্তি হইতেছে,—এত্না মাল, এক রূপেয়াব কম কি হয়! সাবধান, গিড়ে মত্—ও প্যাট্রাটায় কাঁচের জিনিষ আছে।

আমি ঠায় দাড়াইয়া। ক্যা হুজুর ট্যাক্সি হোগা? চলিয়ে না?

বল্লাম, দাঁড়ানারে বাপু, আমার বাড়ি থেকে গাড়ি নিয়ে লোক আস্‌বে। বকশিষ্? বকশিষ কেন?

না না রাজাবাবু আমি নই।

লুঙ্গী-পরা এক মুসলমান আসিয়া দীর্ঘসেলাম করিয়া কহিল, ঘোড়া-গাড়ি হোগা হুজুর?

আরো আপ্যায়িত করার আগেই বলিয়া দিলাম, নেহী।

ভোজপুর হইতে বোধ হয় সদ্য-আগত এক সিটিজেন্ খৈনীটুকু মুখে ফেলিয়া কহিল, বাহির মে কুলী?

ঘাড় নাড়িয়া বলিলাম, তাও না।

পরমুহূর্ত্তেই হাতের ভিতর একটা কার্ড। দি রয়েল বেঙ্গল, —টাইগার নয়,—হোটেল, দৈনিক চার্জ্জ বারো আনা। হোটেলের এজেন্টকেও নিরাশ করিতে হইল। কিন্তু ব্যাপার যা দেখিতেছি তাতে রয়েলে না উঠিলেও কোন একটা হোটেলেই শেষে উঠিতে হইবে। কোথায় ওঠা যায়,—আধা-সাহেবী না আধা-বাঙ্গালী? আর দেরীতে কুলীদের ধৈর্য্য-ভঙ্গও হইতে পারে। কহিলাম, ট্যাক্সি। আপাতত ট্যাক্সিতেই ওঠা যাক্।

অকস্মাৎ পিছন হইতে এক দারুণ ঝাঁকানি। সঙ্গে সঙ্গে মোটা গলার স্বর—তোমাকে আমি খুন্ করব,—আধঘণ্টার ওপর আমার তুমি নষ্ট করেচ।

চমকিয়া ফিরিয়া দেখিলাম—অরিজিৎ।

অরিজিৎ আমার হাতটা ছোঁ মারিবার মত করিয়া টানিয়া লইল। তারপর শেক করার সাথে সাথে হাড়গুলি পর্য্যন্ত নাড়াইয়া দিয়া কহিল, সময়ের দাম জানো না—

বল্লাম, বেশ তো উল্টো চাপ দিচ্চ। ঠায় পনেরো মিনিট প্লাটফর্ম্মে দাঁড়িয়ে, মহারাজদের কারুর দেখাই নেই। একটু আর্লি রাইজিঙ্ অভ্যেস করো।

অরিজিৎ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। সে আর অভ্যেস করতে হবে না। কম ভোরে উঠেচি ! ওয়েটিঙ্ রুমে এসে তো দাঁত মেজেচি। তোর গাড়ির অভদ্র দেরী দেখে কার ধৈর্য্য থাকে বল্ সরাব্জীর ওখানে চা খাচ্চি, ওদিকে বলা নেই, কহা নেই তোর গাড়ি এসে উপস্থিত। ভদ্রতাজ্ঞান যদি একটু থাকে!

যেন গাড়ী লেট হওয়ার দোষও আমার, আর তার চা খাওয়া শেষ হওয়ার আগে আসিয়া পৌছানর দোষও আমারই একার। অরিজিৎ কুলীগুলিকে তাড়া দিল, দূরের একটা সাহেবের সঙ্গে টুপী নাড়ানাড়ি করিল, তারপর শিষ দিতে দিতে আমাকে এক রকম টানিয়া লইয়া প্ল্যাটফর্ম্মের বাহিরে আসিয়া পড়িল।

বুইক্ গাড়ী। পিছনের দিকটায় হোল্ড-অল্ আর সুটকেসগুলি স্থান পাইল। সামনে গিয়া চুড়িয়া বসিলাম। অরিজিৎ বলিল, সেল্ফ্-ষ্টারটারটা বিগড়ে গেছে, একটু কসরৎ করতে হবে। কসরতের চোটে গাড়িটা গর্জ্জাইয়া

উঠিল। লাফাইয়া উঠিয়া সীটে বসিয়া অরিজিৎ কহিল, ক' মাইল?

না বুঝিয়া বলিলাম, কি?

টপ্ স্পীড্ দেব? রাস্তায় এখনো ট্রাফিক পুলিশ আসেনি।

শঙ্কিত হইয়া কহিলাম, না, আমার কন্ডিশনের ভয় বড্ড বেশী।

গন্তব্য স্থান টৌর রোডে অরিজিৎদের ব্যাচেলার্স ডেন্-এ। সেখানে থাকে তারা চার বন্ধু। অজয়, অরিজিৎ, অরুণ আর আনন্দ। চার জনেই অদ্ভুত! একটু বোহেমীয়ান্ গোছের কিন্তু পুরা নয়। ভিত্তিটা ঠিকই আছে কেবল কারুকার্য্যের উপর খুব কতকটা খেয়ালের ছাপ। বিবাহ তাদের একজনও করে নাই। আয় বেশ, ব্যয়ও তাই। একটু অসাধারণ ধরণে তাহারা জীবন কাটাইতেছে।

লোয়ার সার্কুলার রোড দিয়া গাড়ী চলিতেছে। অরিজিৎ কহিল, তারপর ঘুমিয়েছিস কেমন?

বার্থ রিসার্ভড্ ছিল।

তা থাকলই বা। গাড়িতে উঠলে কিন্তু আমার ঘুম হয় না। ভাবছিলাম ফ্লাস্কে ক'রে খানিকটা চা নিয়ে আসি, গাড়িতে ব'সে break thirst হয়ে যেতো,—ভুলে গেছি। নে চুরুট খা।

বল্লাম, চুরুট তো খাই না, এরই মধ্যে ভুলে গিয়েছিস?

অরিজিৎ প্রচুর হাসিয়া উঠিল। ওঃ আই সী, তুই তো আবার সেই সেকেলে গোছের গুড্ বয়। হাইজিনের বইয়েতে লেখা না থাকলে খাবারও বুঝি খাস্ না?

অরিজিৎ চুরুট ধরাইল। ক' বছর আগে কলিকাতা ছাড়িয়া গিয়াছি, অনেক কিছুই নতুন নতুন মনে হইতেছিল। কহিলাম, আরে, এ যে বিস্তর দোতালা বাস্!

আমার দিকে কিছুক্ষণ কৃপা-ভরা চোখে চাহিয়া সহাস্তে বন্ধু কহিল, ওঃ মাই গড্, তুই কি জব্ চার্ণকের কলকাতায় ছিলি নাকি? সিটিটাকে তবে যে ফের চিনে নিতে হবে। একেবারে বদলে গেছে। সমস্ত সহর একেবারে এমেরিকানাইজড্—টকিজ, সোডা-ফাউন্টেন্‌স আর ডবল-ডেকার বাস্।

বল্লাম, তুই যে আমাকে দমিয়ে দিচ্ছিস্! আমি অতিথি তা মনে রেখো,—দেবতা। ইউ অট্ টু হিউমার মি।

চোখ টিপিয়া অরিজিৎ সহাস্তে কহিল, ওল্ড গার্ল, আন্ আই স্ট্যাণ্ড অন্ ফরম্যালিটী? মফঃস্বলের অন্ধকার জঙ্গল থেকে এসেছিস্, আলোক লাগিয়ে দিচ্ছি,—গ্রেটফুল থাকা উচিত। ফের্ যদি হাইকোর্ট দেখতে চাস্ দেখিয়ে আনি। এই ছাখ্ প্র্যাট মেমোরিয়াল স্কুল।

নিজের খুসীতেই সে হাসিতে লাগিল। বলিল, উই যে একটা ভাবী প্যালেসের লোহার ফ্রেম-ওয়ার্ক দেখছিস ওটা আমাদের ফার্ম্মের কনট্রাক্ট। পাঁচ লাখ টাকা। কত কুলী যে রোজ খাটছে হিসেব দিলে ভাববি তাজমহলের কথাটা নেহাৎ আজগুবি নয়,—এক বছরে শেষ ক'রে দিতে হবে কিনা। এতো আর তোদের ললিত কলা নয়—এ বাস্তব সত্য।

তাড়াতাড়ি কহিয়া উঠিলাম, পেটের অবস্থা তর্ক করবার অনুকূল নয়। আগে বাড়ী চলো।

গাড়ী ছুটিয়া চলিল। অরিজিৎ চুপ করিয়া থাকিতে পারে না। কহিল, দারুণ মুটিয়েছিস্,—ইনকামট্যাক্সের পয়সা কিনা।

কিছু বলিবার উপায় নাই। কারণ সে কোনও ফরম্যালিটীর ধার ধারে না। চোখে একটা টুইঙকাল দিয়া সহসা সে কহিয়া উঠিল, Well how's your Jill?

প্রথমে অর্থবোধ হয় নাই, বুঝিতে পারিয়া কহিলাম, এতক্ষণে হয়ত পান সাজতে বসেছে।

বিস্ময়ে অরিজিৎ কহিল, পান? ন্যাষ্টি হ্যাবিট্!

ভোঁ ভোঁ। হ-র্র্-র্-র্।

দেখ সেলফ-ষ্টারটারটা না থাকাতে হাতের কি অবস্থা হোয়েছে।

চাহিয়া দেখিলাম। লাল লাল দাগ, ফোস্কা পড়ার মত হইয়া উঠিয়াছে! কহিলাম, ড্রাইভারকে সঙ্গে আনিস নি কেন?

পরিহাস করিয়া অরিজিৎ কহিল, তাতো কথা ছিল না। কথা ছিল তুমি আমি এক তরীতে যাবো ভেসে। তাও

যদি মেয়ে হতিস্ আহত হাতটাকে কাঁধের উপর বিছিয়ে দিতাম। ওয়ান্-আর্ম ড্রাইভার কাকে বলে জানিস্ তো ?

হ্ রু-র্-র্। ঘস্‌স্। বালিগঞ্জ ময়দানের উত্তর দিকে ষ্টোর রোডের উপর একটা দোতালা বাড়ীর সম্মুখে গাড়ী থামিল। নামিয়া পড়া গেল। উপরের ফ্লাট্ বন্ধুদের, নীচে একটা জার্ম্মাণ পরিবার থাকে। বেয়ারা আসিয়া মাল পত্রের ভার লইল। আমরা উপরে উঠিয়া গেলাম।

ড্রইং-রুমের দরজার বাহিরেই শ্রীমানরা দাঁড়াইয়া। কলেজ হোষ্টেলে থাকিতে আমাদের আনন্দের অভিব্যক্তি ছিল যতটা সম্ভব শব্দের সৃষ্টি করা। টেবিল, চেয়ার, কটকা ভেঁপুবাঁশী দিয়া শব্দের যে সিম্ফনি হইত তাহাতে কাহারও খুন চাপিলে আপত্তির কিছু ছিল না। কিন্তু আমরা সেটাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীত-কলা মানি আর না মানি,—অরিজিৎ মানিত —আনন্দ তাতেই হইত সব চেয়ে বেশী। এ যেন হোলির দিনে খোট্টাদের কাদা খেলা। কাপড়-জামা গেলো, কাদায় শরীর ভূতের মত,—কিন্তু ছা রা রা রা একেবারে বুকের আনন্দের সাগর হইতেই খুসীর ঝড়ের মত ক্ষণে ক্ষণে জাগিয়া উঠিতেছে। দেখিলাম আমিই শুধু বুড়াইয়া গেছি,—বন্ধুরা এখনো সেই একুশ বছরে পড়িয়া আছে।

অজয়ের মুখে একটা জার্ম্মাণী বাঁশী। প্যাঁ, পোঁ প্যোঁ— যন্ত্রটার ভিতর হইতে সবটা শব্দ বাহির করিয়া আনিতে মুখখানা লাল হইয়া উঠিয়াছে। অরুণ ভেঁপুটা লইয়া এক লাইনের সেই ভয়ঙ্কর পশ্চিমা গত্‌টার আলাপে জায়গাটা বাঝায় করিয়া তুলিল। এমন কি আনন্দ পর্য্যন্ত গোটা পাচেক ইলেকট্রিক ভালভ্ পর-পর ভাঙিয়া অভ্যর্থনার গান ছুটাইল। ঘরের ভিতর পিয়ানোতে অরিজিৎ গিয়া আনাড়ি হাতের আন্দাজী টিপুনীতে একটা বেসুরা শব্দের ঝড় সৃজন করিয়া তুলিয়া কি যে গান ধরিল তাহার কিছুই বোঝা গেল না শুধু তাহার মোটা গলার শব্দ ঘরের ভিতর গম গম্ করিতে লাগিল।

চীৎকার করিয়া কহিলাম, কিদে পেয়েছে।

প্যোঁ পোঁ, ভোঁ-ও-ও—চুম্-টুঙ্‌ টাঙ্ ডুঙ্ ডিঙ্।

আরো কতক্ষণ যে এমনিতর অভ্যর্থনা চলিত কে জানে। নীচের জার্ম্মাণ দম্পতী তাহাদের ছেলে মেয়ে লইয়া দন্-এ বাহির হইয়া পড়াতে অরকেষ্ট্রা পার্টির হুঁস্ হইল। তখন তাহাদের একজনের হাত হইতে আর একজনের হাতে আকর্ষিত বিকর্ষিত হইতে হইতে ড্রইঙ্-রুমের এক গদী-আঁটা চেয়ারের উপর গিয়া বসিয়া পড়িলাম।

আগা গোড়া কার্পেট মোড়া ফ্লোর। দেওয়ালগুলি সী-ব্লু। সারা দেওয়ালে একটী মাত্র ছবি। একটা বক উড়ান দেবার জন্য পাখা মেলিয়াছে। শুভ্র-পক্ষের উপর অস্ত-সোণায় রঙানো কয়টা নল-খাগড়া। অনেকটা জাপানী ছবির মতো। এক পাশে ফ্লাওয়ার ষ্ট্যাণ্ডের উপর পিতলের বাসনে মস্ত বড় একটা পাম। অন্যদিকে সেই কটেজ পিয়ানো। আবলুস্-রঙা ছোট একটা টি-পয়ের উপর একটা রেডিও সেট্,—তার গায়েও একটা পাখী আঁকা। আর মাঝখানে চায়ের সরঞ্জাম সাজানো টেবিলটার চারিদিকে আমরা বসিয়া আছি।

অরুণের মুখখানা প্রায় মেয়েলী ধরণের। তাকে কবি হইতে হইবে বলিয়াই হয়ত ভগবান সুকুমার করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন। না হইলে অনেক কবির মতন কাব্যে দোষ থাকুক আর না থাকুক নিজেকেই প্রথমে ছন্দ-ভঙ্গ করিয়া ফেলিতে হইত। বন্ধুদের মহলে তার আদর যথেষ্ট। গান গাহিয়া আর কবিতা শুনাইয়া অরিজিৎ বাদে আর সকলকেই সে মুগ্ধ করিয়াছে।

অরুণ কহিল, মুখটুক ধুবি না। লোভীর মত এসেই যে খেতে বসেছিস্ ?

বল্লাম, গাড়িতেই ও-পাট সেরে আসা গেছে।

অজয় বিলাত ফেরত ডাক্তার। সুগঠিত দেহের একটা দৃঢ়তা যেন মুখের উপর পর্য্যন্ত জাগিয়া উঠিয়াছে। মস্ত-লম্বা দুটা হাত,—দীর্ঘ গভীর চোখ। চওড়া বুক। সে যেন দিগ্বিজয়ী তরুণ আলেকজেণ্ডার কিন্তু সেই দৃপ্ত লোকটিকেই ছেলে মানুষের মত অজস্র হাসিতে দেখিলে সহসা কেমন সন্দেহ বাঁধিয়া যায়। সে অরুণকে তাড়া দিয়া চায়ের পটটা দেখাইয়া কহিল, ওয়েল্ হাস্‌নী, দিস্ ইস্ ইওর্ ট্যাস্ক্।

অরুণ কহিল, সবাই যখন হাত গুটিয়ে বসে তখনই বুঝতে পারা গিছ্‌ল। একদিনও যদি স্বার্থপরেরা আমাকে

একটু আরাম করতে দেবে। অন্ততঃ এই চা-বানানর দায় এড়াতেই আমাকে একটা বিয়ে করতে হবে দেখতে পাচ্ছি।

অরিজিৎ টিপ্পনী কাটিয়া কহিল, আর পুডিঙ বানাবার জন্ম আরেকটা।

আনন্দ সাধারণতই গম্ভীর এবং বিষণ্ন। একটু আগেই তাহার আনন্দ-উচ্ছ্বসিত রূপ দেখিয়াছিলাম এখন চাহিয়া দেখিলাম কখন অলক্ষ্যে তাহার রঙ্ বদলাইয়া গেছে। আনন্দ জমিদারের একমাত্র ছেলে। কিন্তু কোনো দিন তাহাকে মোটা দেশী কাপড় ছাড়া পরিতে দেখি নাই। গায়ে মোটা খদ্দরের যে পাঞ্জাবী দেখিয়াছিলাম তাহার কোনো বৈচিত্র্যই আর হইল না। সে যেন ঐশ্বর্য্যের বিলাসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া সমস্ত বৈভব বিলাইয়া দিয়াছে। আনন্দকে আমি কোনো দিন বুঝিতে পারি নাই। কি যে সে সারাক্ষণ ভাবে, কেন যে সে শত আত্ম-নিগ্রহ করিয়া নিজেকে কষ্ট দেয়, কেন যে সে ধনী আত্মীয় পরিচিতদের এড়াইয়া চলে ভাবিয়া পাই না। তাহার আধ-ময়লা রঙের উপর কেমনতর একটা দ্যুতি যেন তপঃকৃশ দেহের আভার মত জাগিয়া উঠিয়াছে। তাহার চোখের দিকে আমি বেশীক্ষণ চাহিতে পারি না। একটা বর্শার ফলক যেন এক নিমেষে ঝল্‌সাইয়া যায়। তাহাকে আমরা সকলেই মনে মনে ভয় করিতাম কিন্তু তাহাতে বন্ধুত্বে কোনো দিন বাধে নাই। এমন একটা সন্ন্যাসের ভিতর যে হৃদয়ের অতটা প্রাচুর্য্য রহিয়াছে তাহার সাথে নিবিড় করিয়া না মিশিলে তাহা বুঝা যায় না।

আনন্দ চা খায় না, খানিকটা দুধ খাইল। আমরা পেয়ালার পর পেয়ালা নিঃশেষ করিয়া ফেলিলাম। আনন্দের কি দরকার ছিল। আমার কাছে বারবার ত্রুটী স্বীকার করিয়া বাহির হইয়া গেল। কহিলাম, এইবার তোমাদের কেউ পিয়ানো বাজিয়ে শোনাও।

অরিজিৎ বলিল, কে বাজাবে, আমি না অজয় ?

কে ভাল ?

দুজনেই বিটোফেনের কম্পিটিটার। গ্যাস্ লাইট্ সোনাটা বাজাবো একটা ?

হো-হো করিয়া সবাই হাসিয়া উঠিল। কহিলাম, কি বাজাতে জানো নাকি ?

অজয় কহিল, তাতে কি আবার সন্দেহ হয়,—অরিজিৎ তো এরই ভেতর একটু নমুনা দিয়েছে।

বিস্মিত হইয়া কহিলাম, অরুণও বাজাতে জানো না।

ও বিলিতী বাজনা, আমি বাজাই সেতার।

তবে ওটা কিনবার মানে ?

অজয় প্রবল হাসিয়া উঠিল। বাজাতে না জানলেই কিনতে হবেনা তা তাকে কে বল্লে, ওটা হচ্ছে রেসপেক্‌টেবি-লিটির এমব্লেম,—মোটর-বিহারিণীর বেটে-ছাতার মতো। পিয়ানোটা আছে।—সুর তুলতে পারিনা, হাতের এক্‌সারসাইজ করি এবং—

কথা কাড়িয়া অরুণ কহিল, মোটরে যেতে যেতে নরনারী সুরের টুক্‌রো শুনে বিদ্যার দৌড় জানতে পারে না, শুধু ভাবে বেশ মিউজিকাল বাড়িটা, আস্‌তে যেতে সারাক্ষণ, পিয়ানোর টুং-টাং শোনা যায়।

বিস্ময়টা কাটিয়া গেল।

গোটা দুই তিন দিন একটা অখণ্ড হৈ-চৈ এর ভিতর কাটিল। মোটারঙ্, গ্যাস্‌লাইট্ সোনাটা পিঙ্-পঙ্, ব্রীজ, হাসি আর কোলাহল। অজয়ের গান অজিতের পিয়ানোর সাথে জমে ভালো। ওরা বলে, আমরা যখন একটা লক্ষ্মীছাড়ার দল তখন আর কি,—কণ্ঠে যদি সুর না থাকে করব কোলাহল। সেটা অপর্য্যাপ্তই হইত। অরুণ ব্যাপারটাকে একটা কালচারের ছাপ দিতে চায়,—বলে, ও হচ্ছে একপ্রকার Folk song. এরা সব যেন বৈশাখের মেঘ। খুঁটী বাঁধা নাই,—খেয়ালের আকাশে উড়িয়া বেড়ায়। আমার মাত্রা ভঙ্গ হইবার যোগাড় হয় কিন্তু ওরাই আমাকে টানিয়া লইয়া চলে। শুধু এই উচ্ছ্বাসের ভিতর একটা আশঙ্কা আমার মনে শুধুই বাজিতেছিল, আনন্দ সেই যে সেদিন প্রাতরাশের পর চলিয়া গেছে এ কদিন আর তাহার দেখা নাই। কোথায় গেল, কোনও একসিডেণ্ট হয় নাই তো ? কিন্তু আমার বন্ধুদের কোনো উদ্বেগ নাই। ওতো প্রায়ই এমন করে,—ওর নিরুদ্দেশের সময় ওকে খোঁজাও বারণ।

প্রশ্ন করিলাম, কোথায় যায় ?

কেহই জানে না।

আনন্দ একটা রহস্ত। আমাদের এত কাছে থাকিয়াও সে কোনো দিন ধরা দিল না। গাম্ভীর্য্যের নিকষ-মেঘের বুকে বিদ্যুতের মত হয়ত কখনো সে ঝলসিয়া উঠিয়া ক্ষণেকের জন্য নিজেকে প্রকাশ করে তারপর তার মনের উদ্দেশ আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

অরুণ কহিল একদিন রুক্ষচুলে, ছেঁড়া কাপড় পরে এসে উপস্থিত হবে—তারপর কদিন সাধারণ জীবন,—তারপর আবার নিরুদ্দেশ এই রকমই চলে।

অরিজিৎ কহিল, বিপ্লবীর দলে যোগ দিয়েছে নিশ্চয়। বল্‌লে তো হেসে উড়িয়ে দেয়।

শিহরিয়া উঠিলাম। মনে পড়িল আনন্দের অসি-ধার চোখ দুটীর চাউনি।

ক্লান্ত হইয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া সন্ধ্যাবেলায় আলো জ্বালিয়া বার্ণার্ড শ'কে নিয়া পড়া গেল। বাড়িতে কাহারো সাড়া-শব্দ নাই। আমার ফিরিয়া আসিবার কথা ছিলনা। কে আর আমার অপেক্ষা করিবে! ময়দানটা প্রায় জন-শূন্য হইয়া আসিয়াছে। রাইডিঙ্‌ স্কুলের সইস ঘোড়াগুলিকে আস্তাবলে পূরিল! মোটরের ভোঁ ভোঁ। ও-পাশের ফিরিঙ্গী মেয়েটী পিয়ানো টিপিয়া কাঁপা-গলায় সুর তোলে,—ইন্‌ দা মেম্‌রি লেন্‌—।

সন্ধ্যার আঁধার তরল হইয়া শেষে জ্যোৎস্নায় গলিয়া পড়িল। সম্মুখের ইউক্যালিপ্‌টাস্‌ গাছে তাহারই আভা ঝকমক করিতেছে। অন্যমনস্ক হইয়া গিয়াছিলাম। সহসা শুনি অরুণের ঘর হইতে আসিতেছে সেতারের মৃদু-মূর্চ্ছনা। তবে সে বাহির হয় নাই! উঠিয়া পড়া গেল। আরে তুমি! এসো এসো, নো ফরম্যালিটী।

ঢুকিয়া পড়িলাম। অরুণ কহিল, কখন ফিরলে ?

কিছুক্ষণ আগে। কিন্তু তুমি যে বড় বেড়াতে বেরোও নি ?

একটা কবিতা বইয়ের প্রুফ্‌ দেখছিলাম।

কহিলাম, তোমার নতুনতম "নীপকুসুম" আমার ভাল লেগেছে।

অরুণ কহিল, আমার ভাল লাগে নাই। ওরা জোর ক'রে ছাপ্‌ল। ওতে বাস্তবের ছবি আঁকতে গিয়ে কবিতাকে গলা টিপে মারা হোয়েছে।

ফুলন্ত কৃষ্ণ-চূড়া গাছটার আড়ালে খণ্ডচাঁদ উঠিয়াছে। কি একট ঘাসের ফুলের গন্ধ। অরুণ সেতারটা রাখিয়া দিল। আলো নিবানো ঘরে জ্যোৎস্না প্রবেশ করিয়াছে।

কহিলাম, সেতারটা রাখ্‌লে কেন ?

বাজাতে লজ্জা হচ্ছে। কোনো মেয়ে যদি জ্যোৎস্নার পা মেলে দিয়ে সেতারের তারে সুর তুলতো তবে মানাত এখন।

কহিলাম, মেয়েদের এত ভাল লাগে ?

লাগে বইকি! আমি তো পাথর নই। তাছাড়া মেয়েদের ভালো না লাগলে কবির ব্যবসাই যে চলে না। তরুণ বসন্ত নিস্ফল হ'তো তাদের হাসি না হ'লে, তাদের খোঁপারই জন্যই নববর্ষার কদম-ফুল ফোটান,—তাদের কালো চোখের উপমা যোগাবার জন্য আকাশ মেঘে কালো হয়ে উঠ্‌ল।

কেমন যেন একটা মদির উচ্ছ্বাস তাহার কথার ভিতর গোপন করা। কহিলাম, তবু তো বিয়ে কর্‌লে না!

তা করলুম না বটে।

কিন্তু কেন ?

একটু নীরব থাকিয়া অরুণ কহিল, হয়ত এই কাব্যেরই জন্য।

বুঝিতে পারিলাম না। কহিলাম বিয়ে করলে কি আর কাব্য হয় না ?

অরুণ ইহার সোজা জবাব দিলনা। কহিল, জানো পক্ষীতত্ত্ববিদ্‌রা বলেন যে কতকগুলি পাখী আছে যাদের মিলনকাল আসন্ন হ'লে রঙীন পালকে তাদের সারা দেহ অপূর্ব্ব হয়ে ওঠে। কেন জানো ? আশার রঙে।

অর্থাৎ ?

পাখীর ডানার মত কত মানুষের মনও যে রঙীন হয়ে ওঠে তার কি ঠিক আছে ? এক অজানা প্রেয়সীর কল্পনায় এই কবির মনও ঝলমল করে। আশা যেদিন শেষ হবে মনের রামধনু-বর্ণও সেদিন উধাও হবে। তাই ভয় হয়, কল্পনা যদি যায়, কবিতাও যাবে।

বলিলাম, কিন্তু কবিরা কি সবই—

না না তা নয়। তবুও। আর জানো এ ছাড়াও একটা বড় ভয় আছে।

বলো।

অরুণ একটু চুপ করিয়া রহিল। সেতারের তারে ঝঙ্কার দিল। একটু হয়ত দ্বিধা করিল। তারপর কহিল, যাকে স্বপ্ন বলে চিরদিন ভেবে এসেচি, ভয় হয় বাস্তবে তাকে দেখ্‌লে মন হতাশার ভরে উঠ্‌বে। কাব্যে যার মিল ভাঙে নি, হয়ত দিনের আলোকে তার ছন্দ ভঙ্গ হবে। রবীন্দ্রনাথ একে বলেছেন, 'প্রত্যহের ম্লানস্পর্শ'।

ওসব কাব্যের সূক্ষ্মতত্ত্ব বুঝিতে পারি না। কহিলাম, পরিষ্কার ক'রে বলো।

অরুণ কহিল, তোকে নিয়ে মুস্কিল—আকারে ইঙ্গিতে বুঝিস্ না। তবে শোন্ গল্প করেই বলি! এই ধর একজন মেয়ে আমি ভালোবাসি—

বলিলাম বীণা গাঙ্গুলীকে তো?

হাসিয়া অরুণ কহিল, হ্যাঁ ধর তাই। সে এখন আমার মানসলোকবাসিনী, তার না আছে ত্রুটী না আছে কোনো বিচ্যুতি। তার সাথে সপ্তাহে বড় জোর আমার একদিন দেখা হয়। দূর থেকে সে আমার কাছে একটা স্বপ্ন,—phantom of delight তারপর বিয়ের পর সে যখন কাছে এলো তখন হতাশ হয়ে দেখব যা ভাবা গিছল তা নয়। সবটাই তো তার কবিতা নয়। সে হাইও তোলে। গা-হাত ও চুলকায়। ফোঁড়া হ'লে পুলটিস্‌ও লাগায়। সেটা হবে আমার পক্ষে মর্ম্মান্তিক। তার চেয়ে সেও দূরে থাক আমিও দূরে। তার কথা স্মরণ করে গভীর নিশীথে দু'চোখ ভরে' জল আস্‌বে,—ছন্দে তার চুড়ির ঝঙ্কার তুলতে চাই, কথা দিয়ে তার রূপ আঁকার প্রয়াস করি। এ স্বপ্ন চিরকাল ধরে চল্‌বে।

আর আমার কিছু বলিবার রহিল না। অরুণ কবি,—এতক্ষণে তাহা নিঃসন্দেহে বুঝিলাম। সে স্বপ্ন-পসারী, কল্পনা লইয়া তার বেসাতি।

এমন সময় সিঁড়িতে ঘোরতর পদশব্দ। ওরা সব ফিরিয়া আসিয়াছে। অরুণ উঠিয়া পড়িয়া কহিল, চলো, রাক্ষসরা সব চরার থেকে ফিরেছে। দেখা যাক্ কি আন্‌ল,—হাতী না মানুষ। আমি অন্যমনস্ক হইয়া গিয়াছিলাম। অরুণের আকর্ষণে উঠিয়া পড়িলাম।

ডিনার মানে শুধু খাওয়া নয়। প্যাটিস্ আর রোষ্টের সাথে সাথে গল্প। পুডিঙ্ আর আপেলের ফাঁকে ফাঁকে হাসি।

বল্লাম, একটা প্রশ্ন জাগছে। সারা দেওয়ালে শুধু একটা মাত্র ছবি কেন?

অরুণ কহিল, ছবিটা চোখে পড়্‌তে পাবে ব'লে। অনেকগুলি ছবি যদি লট্‌কান থাক্‌ত তবে কোনোটাকেই দেখা হ'তো না। অলপত্তা দৃষ্টি এখন গিয়ে ওর উপর পড়্‌তে পাবে।

ওঃ।

তা ছাড়া আরেকটা কথাও আছে। দেখ্‌তে পাচ্ছ একটা পাখীর ছবি। সুদূর পিয়াসী চঞ্চল মনের রূপক।

অজয় কহিল, লেক্ কেমন লাগ্‌ল?

কহিলাম, বিশেষ ভালো আর কি। ঐ রকম একটা দীঘি দেখে অতটা উচ্ছ্বসিত হবার কি আছে।

অরিজিৎ কহিল, মফঃস্বল—

বলি, তা বটে, আদেখ্‌লারা জল দেখিস্ নি কিনা। এক সময় গ্রীকরা নন্-গ্রীক মাত্রকেই ভাব্‌ত বারবেরিয়ান্, গ্রীসের বাইরে গৌরবের যে কিছু থাকতে পারে তাই ভাব্‌তে পারত না

অরিজিৎ হাসিয়া পরাজয় স্বীকার করিল। তোর তো আবার হিষ্ট্রি ছিল। তবে ঢাকুরিয়া লেকের একটা flaw আমার চোখে পড়ে। আমাদের ফার্ম্মকে যদি কনট্রাক্ট দিতো, তবে করতাম অর্দ্ধচন্দ্রাকার,—সৌন্দর্য্য খুলে যেত।

অরুণ প্রশ্ন করিল, আর টকিজ, টকিজ কেমন লাগল?

অরিজিৎ কহিল, ওয়াণ্ডার নয় কি না?

হতাশ করিতে হইল। কহিলাম, লোককে নষ্ট করে দেয়। আর বড্ড মেটালিক সাউণ্ড এখন পর্য্যন্ত। ওর চেয়ে নির্ব্বাক ছবিই ছিল ভালো।

অরিজিৎ কাফির পেয়ালাতে একটা চুমুক দিয়া কহিল, তুই একটা এনাক্রনিজম,—তোদের ওখানে বুঝি গোরুর গাড়িতে যাতায়াত করতে হয়? টকিজ, সায়ান্সের কত বড় একটা ট্রায়াম্ফ, ধারণা করতে পারিস্ না। মহাভারতের দিনে তোর বাস করা উচিত ছিল। যাত্রা শুনতে ভালো লাগে?

যাক্ আহারের পর্ব্ব শেষ করা গেল। অরিজিৎ কহিল, চল্ মোটরিঙে বের হওয়া যাক্। অরুণ কবি। বাহিরের জ্যোৎস্না উৎসবের পানে চাহিয়াই হয়ত সে রাজী হইল। আমি আর অজয় গেলাম না। বড় ক্লান্ত বোধ করিতেছিলাম।

অত তাড়াতাড়ি ঘুম আসিতেছিল না। খাণিক ক্ষণ ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া উঠিয়া পড়া গেল। অজয়ের ঘরে আলো জ্বলিতেছে। খানিকটা গল্প করিয়া আসিলে মন্দ হয় না।

এসো এসো স্বপ্নের ঘোরে উঠে আসো নি তো?

কহিলাম, না ঘুম হচ্ছিল না তাই। মাত্র সাড়ে দশটা। ওটা কি হচ্ছে?

টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া উড্‌পেন্সিল লাগাইয়া অজয় বসিয়াছিল। কহিল, ক্রস্-ওয়র্ড পাজ্‌ল্। বলতো পাঁচ অক্ষরে একটা সমুদ্রের মাছের নাম?

বল্লাম, ও তো টেলিফোঁ গার্লদের প্যাস্টিম্।

হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া অজয় খাতা-পত্র রাখিয়া দিল। কহিল, অল্পদিন অভ্যেস্ করছি। সীপ এতে একলা একলা সময় কাটাতে হবে তো।

কহিলাম, সীপ্-এতে? কোন্ সীপ্-এতে?

অজয় একটা সিগার ধরাইল। তারপর দেশলাইটা টেবিলের দিকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া কহিল, জাহাজ, সী-গোয়িঙ্ ভেসল! জানিস্ তো জাহাজের আফিসে ডাক্তারী করি। অনেক জোগাড় করে দূর-দেশযাত্রী একটা সীপে কাজ জোগাড় করা গেল।

আমি বিস্ময়ে তার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। তারপর কহিলাম, সাধ করে' সীতে যেতে চাচ্ছো?

খুশী ভরা মুখে অজয় কহিল, হ্যাঁ।

কহিলাম, হঠাৎ এ খেয়ালের মানে?

অজয় হাসিয়া কহিল, খেয়ালের মানে হয় না। তবু— মুখের ভিতর একটা দৃঢ়তা আনিয়া কহিল, একটা টাইফুনে পড়তে বড় সাধ হয়।

একেবারে অবাক্ হইয়া গেলাম। অজয় কহিল, সাগরের ঢেউ উঠে আকাশের বুকে আছ্‌ড়িয়ে মরছে,— আমাদের জাহাজ মোচার খোলার মত তারি ভিতর অসহায় গতিতে উঠল পড়ল। মৃত্যু-ভীত নর-নারীর আর্ত্তনাদ! ঢেউয়ের হুঙ্কার, বাতাসের গর্জ্জন,—সেই তাণ্ডবের ছবি দেখতে বড় সাধ হয়।

কহিলাম কিন্তু সে তো শুধু ছবি দেখা নয়,—সে যে জীবন-মৃত্যুর ব্যাপার।

তা জানি। অমন ছবির দাম দিতে হবে বৈকি! প্রলয়ের ঝাপ্‌টায় জাহাজ যদি টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ে অকূল সাগরে ঝাঁপ দিয়ে পড়ব। তারপর যতক্ষণ পারি মত্ত ঢেউয়ের সাথে যুদ্ধ চল্‌বে। হয়ত স্রোতের টানে ভেসে গিয়ে এক অজানা রাজ্যের সাগর তীরের জেলে-পল্লীতে অর্দ্ধমৃত দেহ গিয়ে ঠেক্‌বে, নয়ত সাগরের অতল তলে চিরসমাধি,—Sea-nymph দের ding-dong bell!

তারপর হঠাৎ গাঢ়-স্বরে বলিয়া উঠিল, এ জীবন নিয়ে আমি হাঁপিয়ে উঠেচি। নিরীহ মেষের জীবন এতে স্বাদগন্ধ নেই। আমি চাই বাঁচতে, জীবনটাকে বাজিয়ে দেখতে চাই।

ভালো করিয়া মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম। পরিহাস করিতেছেনা তো। মুখের ভিতরের দৃঢ়তার ছাপ তেমনি স্পষ্ট হইয়া আছে।

কহিলাম, এ তোমার হতাশার desperateness-এর মত মনে হচ্ছে! বিয়ে টিয়ে করে' সংসারী হও দেখবে সব সহজ হয়ে আসবে।

নিরাসক্ত সুরে সে কহিল, ওঃ বিয়ে! হয়ত বিয়ে করলে এদ্দিনে পুরো মেষ বনে' যেতাম কিন্তু বিয়ে করার পাত্রীই পেলাম না।

কহিলাম, বলো কি, বাঙলাদেশে তোমার মত ছেলের পাত্রী জোটেনা! বলোতো আমিই—অজয় হাসিয়া কহিল, না না সে চেষ্টা ক'রো না। তারপর জোর দিয়া কহিল,

ঘটকের মধ্যস্থতায় যে বিয়ে তাকে আমি ঘৃণা করি। তেমন বিয়ে করলে অনেকবার বিয়েই আমার হ'তে পারত, এদ্দিনে তোমার মত জুড়িয়ে যেতে ত আটকাতো না।

হুঁ, তবে তুমি কি চাও,—কোর্টসিপ্?

উদাস-কণ্ঠে অজয় কহিল, তা জানিনা, কিন্তু নিজে যাকে জয় করে নিতে পারবনা তাকে আমার দরকার নেই।

একটুক্ষণ নিঃশব্দে কাটিয়া গেল। গলাটা পরিষ্কার করিয়া লইয়া অজয় কহিল, একজন মেয়েকে একদিন আমি ভালোবেসেছিলাম। কিন্তু তাকে আমি পেলাম না। সে ছিল মেডিক্যাল কলেজে আমার সহ-পাঠিনী। কি বিরাগের চোখেই যে আমায় প্রথম দেখেছিল সেই জানে, মন তার গল্‌লই না।

নির্ব্বাক মুখে অজয়ের ঈষৎ করুণ মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। সে বলিয়া গেল, আমাকে তার ভাল লাগ্‌তনা। মুখে সে সে-কথা কোনো দিন বলেনি সত্য কিন্তু এতো আর অগোচর থাকে না। বুঝতে পেতাম আমার মতো দুর্দান্তকে তার ভালো লাগে না। সে চায় শান্ত ধীর বেচারী-গোছের স্বামী। আমার সমস্ত পৌরুষের গর্ব্ব,—খেলায় সম্মান, মাংসপেশীর দৃঢ়তা, শরীরের দৃপ্ত গঠন, আমার অট্টহাসি সবই ব্যর্থ হলো। ব্যর্থ হয়ে একান্ত দুঃখেই আশা ছাড়্‌তে হয়েছে।

কহিলাম, ওঃ তার কথা ভেবেই তোমার এই চির-কৌমার্য্য; এ সত্যই দুঃখের ইতিহাস!

অজয় সহসা চেয়ার হইতে উঠিয়া পড়িল। কহিল, এইবারে ভুল হ'লো। এ যাকে পাওয়া গেল না তার জন্ত দুঃখ নয় এ দুঃখ আমার নিজের পরাজয়ের বেদনায়। হার মেনে গেলাম এইটেই তো বেদনা, নইলে অতসীকে আমি প্রায় ভুলেই গেছি।

বিস্ময়ের আমার অন্ত রহিল না। কহিলাম, ভাই ব্যাপারটা একটু সহজ ক'রে বলো, আমি যে ঠিক ঠাহর ক'রে উঠ্‌তে পারছি না।

অজয় ঘরের ভিতর পায়চারি করিতেছিল। আমার কৌচের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। কহিল, অতসীকে আমি বিয়ে করতে পারতাম জানো?

কহিলাম, তবে?

নিজের ইচ্ছায় তাকে প্রত্যাখ্যান করলাম। একটু চুপ থাকিয়া অজয় বলিয়া গেল, একটু আগে বলছিলে না বাঙলাদেশে আমার মত ছেলের লোভনীয়তার কথা। অতসীর বাবা তার মেয়েকে আমার হাতে দেবার জন্ত পাগল হয়ে উঠেছিল। অতসীও আপত্তি করে নাই।

তবে তোমার আর কোন্ আপত্তি ছিল,—তবে আর হলো না কেন?

অজয় একটা সুগভীর দীর্ঘশ্বাস গোপন করিল।

কহিলাম, কি তাই বলো?

করুণ দুটী চোখ আমার দিকে মেলিয়া অজয় কহিল, নিজে যাকে জয় করতে পারিনি ব্যাঙ্ক্-ডিপসিটের লোভ দেখিয়ে তাকে আমি টান্‌ব, আমার যৌবনের এ অপমান যদি আমার সইতে হ'তো তার চেয়ে আমার মরাই ছিলো ভালো। যাকে নিজের শক্তিতে জয় করতে পারি নি তাকে আমি পেলুম না, কোন্ লজ্জায় তার ভার আমি বয়ে' বেড়াব!

নীচে একটা মোটর থামার শব্দ হইল। হয়ত অরুণ ওরা ফিরিয়া আসিয়াছে। অজয় তাই তাড়াতাড়ি তার বাকি কথাটুকু সারিয়া ফেলিল।—অতএব যাচ্ছি দুরূহ অভিসারে, ঝঞ্ঝা-প্রলয়ের পথে। ঝড়কে আমি ভয় করি না, মরণকেও না। আমাকে জয় করতে হবে এই কথাটাই শুধু জানি,—সেই কথাটাই স্মরণ করে' যাত্রা সুরু করব। কাকে যে এবার জয় করব তা কি বল্‌তে পারি! হয়ত এক নারীকেও জয় করতে পারি,—কিম্বা হয়ত সাউথ আফ্রিকার একটা সোণার খনি, হয়ত নতুন একটা দ্বীপ।

ডাক্তার কত রোগকে জয় করিয়াছে, এবার অজানাকে জয় করিতে চলিল।

ভোরবেলায় ব্রেকফাষ্টের পরে ঘরে গিয়া অরিজিৎ দারুণ চীৎকার আরম্ভ করিয়াছে। তার কোটের একটা বোতাম ছিঁড়িয়া গেছে তাহার মেরামত করে কে। অরুণ বাড়ির ডি-ফ্যাক্টো হাস্‌ইক্। কিন্তু আজ সে অরিজিৎকে সাহায্য করিতে অনিচ্ছুক। নিজের ঘর হইতে সে

চেঁচাইয়া কহিল, অত বড় লোহার বর্শা চালাতে পারো আর ছোট্ট সূঁচটা কাপড়ে ফুঁড়ুতে পারবে না। প্রত্যুত্তরে অরিজিৎ কহিল সূঁচটা নেহাৎ ছোট্ট জিনিষ,—ও আমার এলাকার ভেতর নয়। কোমল যাদের আঙুল ও তাদেরই মানায়। এই পরিহাসের পরে অরুণ আর যাইতে পারে না। এঞ্জিনীয়ারের সাহায্যের জন্ম আমাকেই যাইতে হইল। বল্লাম, প্ল্যান্ করতেই শুধু জানো নিজে করবার কোনো ক্ষমতা নেই।

অরিজিৎ হাসিয়া কহিল, খেলাই শেষ হওয়ার আগে আমি কোনো জবাব দিতে চাই না।

খাটো খাকী প্যাণ্ট, পুরু মোজা, আর হাত-কাটা সার্ট পরিয়া কাজে বাহির হইবার জন্ম অরিজিৎ প্রস্তুত। দু-তিন বার আঙুল ফুঁড়াইয়া বোতামটা কোনো রকমে আটকাইয়া দেওয়া গেল। খুসী হইয়া সেটা গায়ে পরিয়া অরিজিৎ কহিল, আই এ্যাম্ ফিলিঙ্ লাইক্ কিসিঙ্ ইউ, ওল্ড গার্ল।

কহিলাম, এখনও শেভ্ হয়নি।

অরিজিৎ হো—হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

কহিলাম, আর কতদিন পরমুখাপেক্ষী থাকবে। একটা বিয়ে করে ফেলো, বোতাম আর টাইপিনের ভাবনা ভাবতে হবে না।

গম্ভীরভাবে সে কহিল, তারি চেষ্টায়ই তো যাচ্ছি। বিয়ে করবার চেষ্টায়।

অবাক্ হইয়া কহিলাম, এই বেশে? এতো অভিসারে যাবার বেশ নয়।

এ্যাস্‌ট্রের উপর চুরুটের ছাইটা অরিজিৎ ঝাড়িয়া ফেলিল। কহিল, না এখনই ঠিক বৌ আনতে যাচ্ছি না,—আনবার জোগাড়ে যাচ্ছি। কুলীদের তাড়া দিতে হবে।

ব্যাপারটা ক্রমেই যেন ঘোরালো হইয়া উঠিতেছে। বিস্ময়-ভরা স্বরে কহিলাম, কুলীদের?

হাঁ। এই মাসেই কাজটা শেষ না হ'লে কনট্রাক্টের টাকা মিলবে না। আর টাকা যদি না মেলে তবে বিয়ে করব কি দিয়ে। আই ওয়ার্ক হার্ড বিকজ্ আই ওয়াণ্ট টু লিভ্ হ্যাপিলি।

বলিলাম কনট্রাক্টের টাকা না পেলে বিয়ে করতে পারবে না বলো কি! ইম্পিরীয়াল্ ব্যাঙ্ক্‌এ যে ক'লাখ টাকা আছে তার কি হ'লো। আর কার্ম থেকে এলাওয়েন্সও তো মাসে শ' পাঁচেক পাও শুনেছি।

তাচ্ছিল্যের সুরে অরিজিৎ কহিল, ও paltry sum ওতে হবে না।

দারুণ দমিয়া গেলাম। মাসে গড়পরতা হাজারখানিক টাকা লইয়াও সে একজন স্ত্রীকে ভরণ-পোষণ করিতে পারে না এ বলে কি। কহিলাম, একজন মেয়ে আর কত টাকা ব্যয় করবে শুনি?

অরিজিৎ ক্যালেণ্ডারের ডেট্‌টা বদ্‌লাই দিয়া কাছে ফিরিয়া আসিয়াছে। সুটকেস্ খুলিয়া গোটা তিনেক রুমাল পকেটে পুরিল। তারপর আর একটা নতুন সিগার জ্বালাইয়া কাছে আসিয়া বসিল। কহিল, কি বলছিলি, একজন মেয়ে কত টাকা ব্যয় করবে, তাই না? কিন্তু একজন মেয়ে তাই বা তোকে কে বল্লে। আমি বহু বিবাহের পক্ষপাতী।

পরিহাস করিতেছে ভাবিয়া চোখের দিকে চাহিলাম। পরিহাস ছাড়া আর কি হইবে। বিংশ শতাব্দীর একজন শিক্ষিত যুবক এমন কথা যে সত্য করিয়া বলিতে পারে তাহা ধারণারও অতীত। কিন্তু তাহার চোখের দিকে চাহিয়া ঠিক পরিহাস করিতেছে বলিয়া মনে হইল না।

কহিলাম নাউ টু বি সীরিয়াস্. কবে বিয়ে করবি বল্‌তো।

দৃঢ়তার সাথে অরিজিৎ কহিল, যেদিন বহু বিবাহ করবার মত আর্থিক অবস্থা হবে।

কহিলাম, ঠাট্টা নয়!

তেমনি করিয়া অরিজিৎ কহিল, ঠাট্টা আমি করছি না। বিয়ে যদি কোনো দিন করি তো একাধিক মেয়েকে করব, নয়ত চিরকুমার,—এমনিতর বোহেমীয়ান্ জীবন। পর-পর দুইদিন এক টাই বাঁধতে হ'লে রেগে উঠি, পর-পর দু-বেলা এক রকমের ডাল খেতে পারি না, একই গান তিনবার শুনলে বিশ্রী লাগে আর সারা জন্ম একটা মেয়েকে নিয়া কাটাব কি করে? জীবনে আমার ভ্যারাইটীর দরকার,—প্রেম-জীবনেও।

হাসিয়া কহিলাম সত্যই যদি তাই বলিস তবে বলব এটা সভ্যতা-বিরোধী মনোভাব।

একটু ভাবিয়া অরিজিৎ কহিল, তা বলা যায় না হে। সভ্যতা হু-হু ক'রে বদ্‌লাচ্ছে। প্রাগ্‌-সভ্যতা যুগের মত জগৎটাতে আবার নর-নারীর মৌরসী-পাট্টা-সম্বন্ধের মধ্যে গোলমাল ঢুকেছে। তারই অভিব্যক্তি দেখচ, অজস্র ডাইভোর্সে, Dean Inge আর Shawর বিবাহ-সংক্রান্ত ফিলজফিতে, কন্‌ট্রাক্‌ট্‌ ম্যারেজ, টেমপোরারি ম্যারেজ, এবং ট্রিপ্‌ল্‌ ম্যারেজের প্রপোসালে।

আমি প্রতিবাদ করিয়া কহিলাম, টেম্পরারি ম্যারেজ—যা Dean Inge সাজেষ্ট করেছে,—তা তো অসভ্য অবস্থায় ফিরে যাওয়া। এ কি মঙ্গলের হবে ?

অরিজিৎ কহিল, মনে তো হয়। পুরুষ পলিগেমাস্‌ জীব,—তাকে বাধা দিয়ে লাভ নেই।

আমি বিস্ময়ে, আতঙ্কে এবং অবজ্ঞায় একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেলাম। এ যে আমার কল্পনাকেও ছাড়াইয়া গেছে। অরিজিৎ টুপীটা তুলিয়া লইয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিল, এদিক দিয়ে দেখতে গেলে বিদ্যাসাগর দেশের একটা ডিস্‌-সার্ভিস করে গেছেন। যাক্‌, আমি যাচ্ছি বহুবিবাহেরই জোগাড় করব—তার অর্থনৈতিক আপত্তিটা মেটাতে হবে। মনে যে ছবিটা আছে বলে যাই। সুন্দরবনের জঙ্গল কেটে পাণ্ডব যুগের মত সুন্দর এক নগর। আর নিজে প্ল্যান করে ওঠাব ঐ বিশৃঙ্খল ম্যানসানের মত—না না তার চেয়ে অনেক বড়—একটা অভ্রভেদী প্রাসাদ,—এমেরিকাতে যাকে বলে স্কাইস্ক্রেপার। তার এক-এক তলায় এক-এক প্রেয়সীর হারেম। কারো নামটী মৃণালিকা কারো নামটী চিত্রলেখা—বলিয়া হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বিমূঢ় আমার পিঠটা চাপড়াইয়া গট্‌ গট্‌ করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

আমি সেইখানেই স্তব্ধ হইয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম—অরিজিৎ তাহার নিজের কল্পনার কথাই বলিয়া গেল না তার স্বভাবসিদ্ধ একটা প্রকাণ্ড পরিহাস করিয়া গেল।

দুপুর বেলায় নির্জ্জন বাড়িটাতে সোফায় একা গড়াগড়ি করিতেছি। চারিদিক নিস্তব্ধ,—মোটর চলারও শব্দ হয় না। কৃষ্ণচূড়া গাছের পাতা কাঁপাইয়া ঝিরঝির করিয়া একটু হাওয়া আসে। দু-একটা চড়ুই পাখীর কিচির মিচির। একটু হয়ত মেঘও করিয়াছে,—রোদটা কেমন ম্লান হইয়া গেল। বন্ধুরা সব যে-যাহার কাজে বাহির হইয়া গেছে। শুইয়া শুইয়া তাহাদেরই কথা ভাবিতেছিলাম। এক-একজন এক-একটা টাইপ,—কল্পনার বৈচিত্র্যে তারা প্রত্যেকেই বিশেষ হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের নিজের ব্যক্তিত্ব হারাইয়া ফেলিবার ভয় আর নাই। কেমন একটা বোহেমীয়ান্‌ গোছের কিন্তু তাই ছন্দ ভঙ্গ হয় নাই।

কোন্‌ একটা শোবার ঘর হইতে একটা চেয়ার নাড়ার শব্দ হইল। ঝন্‌ ঝন্‌ একটা শব্দ তারপর। হয়ত একটা পেয়ালা পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল, নয়ত একটা ফুলদানি। সুটকেশের তালা খোলার খট্‌-খট্‌।

হয়ত অরুণ ফিরিয়া আসিয়াছে। দুপুর রোদে কবির আর কোন্‌ কাজ। কাজল-বর্ষা-মেঘ এ বাড়ির উপরও নিবিড় হইয়া উঠে, বাতাস কৃষ্ণচূড়াফুলের পাপ্‌ড়ি উড়াইয়া ঘড়ের ভিতর আনিয়া ফেলে।

কহিলাম, কে, অরুণ ?

কোনো জবাব আসিল না। একটু অপেক্ষা করিয়া উঠিয়া পড়িতে হইল। কে জানে কে ? দুইটা ঘর পার হইয়া আনন্দের ঘরের কাছে গিয়া দেখি দরজা খোলা,—ভিতর হইতে শব্দ আসিতেছে।

কে ভাই, আনন্দ এসেছ ?

তবু জবাব নাই।

তাড়াতাড়ি যাইয়া ঘরে ঢুকিলাম। একটা ছোট সুটকেশের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আনন্দ তাহারই ভিতর গুটীকয়েক খদ্দরের জামা-কাপড় গুছাইয়া লইতেছে। চুলগুলি রুক্ষ, বিরস মুখের ওপর আসিয়া বারবার পড়িতেছে। হয়ত ক'দিন দাড়ি কামানো হয় নাই। ঠোঁট দুটী প্রায় শুক্‌নো গায়ের রঙ্‌ কালো হইয়া গেছে, জামাটা ময়লা। কিন্তু সমস্ত মুখে তাহার কঠিন প্রতিজ্ঞার ও কী দীপ্তি একেবারে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সত্যই চমকিয়া উঠিলাম,—বজ্রের মত উজ্জ্বল-ভয়ঙ্কর এ মূর্তি সে কোথায় পাইল ?

দৃঢ়তার তেজে ভাস্বর হইয়া সে অনির্বচনীয় হইয়া উঠিয়াছে।

কহিলাম, কোথায় ছিলে এতদিন আনন্দ?

সে কহিল, কাজে ছিলাম ভাই।

কি কাজে ছিল সেটা আর জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না। সুটকেশটাতে গোটা ছয়েক বই পুরিয়া আনন্দ কহিল, আজই আবার যাচ্ছি।

আজই? কহিলাম, আজিই আবার? কখন?

এখুনি।

শঙ্কিত হইয়া প্রশ্ন করিলাম, তোমার খাওয়া হয়েছে?

আনন্দ বাক্সটা আটকাইয়া ফেলিল। তারপর অন্যমনস্ক-ভাবে কহিল, এখন আর খাবোনা। তার কথার ওপর জোর করিয়া কিছু বলি এমন শক্তি পাইনা। শুধু জিজ্ঞাসা করিলাম, কখন ফিরবে? আনন্দ একটু হাসিতে চেষ্টা কিন্তু পারিলনা। মুখটা অন্যদিকে ফিরাইয়া সে কহিল, জানিনা। হয়ত এজীবনে আর ফেরা হবে না।

আনন্দ বলে কি? এ কেমন সুরে সে কথা বলিতেছে। নির্বাক-বিস্ময়ে ও আশঙ্কায় ক্ষণকাল তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিয়া উঠিলাম, আনন্দ, আনন্দ, ওর মানে কি?

আনন্দ মুহূর্তকাল নীরব থাকিয়া কহিল, একদিন হারজিতের পাশাখেলায় জীবন পণ করে' ছিলাম, এবার সেই পণের খেলা খেল্‌তে চলেছি।

সে যেন কোন্ সুদূর হইতে কথা বলিতেছে তার ঠিক নাই। একরাশ আশঙ্কা আমার মনের ভিতর ভীড় করিয়া আসিল।

আনন্দ নীরস হাসি হাসিয়া কহিল, হাঁ, পাশা খেলাইতো। ব্যথা-জর্জরিত মুক্তি-পিয়াসী একটা সমগ্র জাতির আর্তনাদ আজ বাতাসকে অবধি ছেয়ে ফেলেছে। আমার ভাইদের মাথা কাটুল, আমার বোনেরা গেল জেলে। এরপর পাশা খেলার ডাক আর এড়ান যায় না,—জীবনে গ্লানির শুধে আর অন্ত থাকবেনা।—

সামান্যই উচ্ছ্বাস, কিন্তু কতটা জ্বালা যে তাহার বুকে লুকাইয়া আছে তাহা একেবারে গোপন রহিল না।

বল্লাম, তুমি কি জেলে যেতে চাও নাকি?

আনন্দ উদাস-চোখে জানলা দিয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া ছিল। আন্‌মনার মত কহিল, আরো আরো দূরে হয়ত।

বিহ্বলের মত কিছুক্ষণ তাহার দিকে তাকাইয়া রহিলাম। তারপর কহিলাম, তুমি কি বোমা-পন্থী?

আনন্দ কহিল, মহাগুরুর মন্ত্রে রিভলবার বাতিল হ'য়ে গেছে, আমি অহিংসা-ব্রতী।

তবে, তবে আর ফিরবেনা আশঙ্কা করছো কেন ভাই।

আনন্দের চোখ দুটী সহসা জ্বলিয়া উঠিল। দৃঢ়-কণ্ঠে কহিল, আশঙ্কা কি বলো আশা,—যা অন্যায় মনে করি তার বিরুদ্ধে এগিয়ে যাবার আশা—অনেকদিনের জমা পাপ, প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে বৈ কি। সেই আমার চিরদিনকার আকাঙ্খা, আমার যৌবনের স্বপ্ন, তারি জন্য নিজেকে আমি প্রস্তুত করে এনেছি।

আমি প্রায় চীৎকার করিয়া কহিয়া উঠিলাম, আবার তুমি ভেবে দেখো আনন্দ।

আনন্দ কহিল, ভেবেছি, অনেক ভেবেছি, ভেবে ঠিক করেছি। যেখানে নির্দয় মার এখন সেইখানেই মাথা পাত্‌তে চল্লাম। যদি কোথাও গুলি ছোটে আমার বুক তার জন্য পাতা রইল। মারব না, মার খাবো। আর কি করতে পারি বলো।

সেই তেজস্বী সন্ন্যাসীর দৃপ্ত-তেজের আলোকে বিমূঢ়ের মতন বসিয়া রহিলাম। কি যে তাহাকে বলিব তাহাই ভাবিয়া পাই না।

আকাশ তখন মেঘে কালো হইয়া উঠিয়াছে। খোলা জানালা দিয়া তাহারি ছবিটা চোখে পড়িতেছিল। সহসা আনন্দ কাছে আসিয়া কহিল, একটা কথা দেবে?

কি?

এ-কথা কাউকে জানাবে না। কাউকে না।

কেন ভাই ?

আনন্দ একটু ভাবিয়া কহিল, অমনি। আমি চাই না এ খবর কেউ জানে। কেমন কথা দিলে তো ?

মন্ত্র-মুগ্ধের মত কহিলাম, কেন যে সবাইকে না জানিয়ে তুমি চলে যাচ্ছো তা তুমি জানো কিন্তু আমিও তোমার ইচ্ছার বিরোধী কোনো কাজ করব না।

খুসীর একটু ক্ষীণ আভা আনন্দের মুখে জাগিয়া উঠিল।

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ করিয়া বসিয়াছিলাম। বাহিরের আকাশ বৃষ্টির সূচনা করিয়া তুলিয়াছে। গাছে গাছে আমন্ত্রণ জাগিয়া উঠিল! ঘরটা প্রায়ান্ধকার হইয়া উঠিয়াছে। তখন আনন্দ নিজের চেয়ারটাকে আমার অতি কাছে টানিয়া লইয়া আসিল। হয়ত একটু দ্বিধা করিল। তারপর প্রায় মেয়েলী কোমল গলায় কহিল, আরেকটা কাজ তোমাকে দিয়ে যাব ভাই।

বলো।

আনন্দ নিজের আঙুল হইতে সরু সোণার তারের একটা আঙটী খুলিয়া আমার হাতে তুলিয়া দিল। কহিল, যদি কোন দিনই আর ফিরে না আসি তবে এইটেকে তুমি এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিও।

পকেট হইতে ঠিকানা লেখা এক টুকরা কাগজ আনন্দ সরল-ভীরু হাতে বাহির করিয়া দিল। তাহার করুণ মুখের দিকে চাহিয়া কহিলাম, কে এ মেয়েটী ভাই ?

আনন্দের গলার স্বরটা ভারী হইয়া উঠিল। কহিল, ওকে আমি ভালোবাসতাম সুনির্মল,—বাসতাম· কেন এখনো বাসি। ওর ভয়ে আমি কলকাতা ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছি।

কেন ?

ওর কাছে থাক্‌লে কোন মুহূর্ত্তে যে ভেঙে পড়ব তার ঠিক নেই। মানুষ দুর্ব্বল, বড় দুর্ব্বল,—ভয়ে ওকে এড়িয়ে চলি। মনের ভেতর একটা ইচ্ছা দুর্দ্দমনীয় হয়ে উঠতে চায়, তাকে প্রাণপণ করে' ঠেকিয়ে রাখতে হচ্ছে। সে যে কি বেদনা, সে যে আমার পক্ষে কত কঠিন, কত মর্ম্মান্তিক, তা হয়ত তুমি বুঝবে না। কত দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে ভেবেছি, যাক্‌ সব সাধনা মিলিয়ে—তাকে না হ'লে আমার চলবে না, তাকে পাওয়াই আমার যৌবনের সার্থকতা হোক্‌।' তারপর প্রাণপণ করে' মোহ কাটিয়েছি। ভালবাসা সহজ, মরা তো সহজ নয়।

আনন্দ একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করিল। তারপর কহিল, ওকেও কি কম ব্যথা দিয়েছি। শুধু একটী মাত্র মুখের কথা জান্‌তে চেয়েছে ভালোবাসি কিনা। নিষ্ঠুরের মত বলেছি, না, ভালোবাসি না। মুখখানা তার বেদনায় পাণ্ডুর হয়ে উঠেছে,—তা উঠ্‌লে কি করব।

নিজের অলক্ষ্যেই গলাটা ভিজিয়া উঠিল। কহিলাম, কেন ভাই সে কথা জানাতে কি দোষ ছিল ?

অন্যমনস্কের মত আনন্দ কহিয়া গেল, বাঁধন একবার আল্‌গা হলে মনকে কি আর বশে রাখতে পারতাম ? আমি জানি ওকে পাওয়া এ-জীবনে আমার হবে না, হবে না। জন্মকালে যে বিধাতা পুরুষ আমার কপালে বিদ্রোহের তিলক পরিয়ে দিয়েছিলেন আমার বধূ তিনিই ঠিক ক'রে রেখেছেন। তার দীর্ঘ কালো অবগুণ্ঠন জীবনের শেষে খুলবে। তবে মাধবীকে আর জীবনে জড়াই কেন। যতটা পেরেছি সরিয়ে দিয়েছি।

আনন্দ একটু থামিল। তারপর দীর্ঘ চোখ আমার দিকে মেলিয়া কহিল, মানুষের মন,—হয়ত বা একদিন সে ভুলতেও পারবে। কিন্তু যদি দুর্ব্বল হয়ে একদিন নিজেকে প্রকাশ করে দিতাম তবে তার সান্ত্বনার আর কোন কথাটা রইত ? যে জ্বালা মেটাতে পারব না তাকে বাড়িয়ে দিয়ে যদি চলে যেতাম তবে আমার আনন্দ-মরণের ভিতরও শান্তি পেতাম না।

আনন্দ উঠিয়া পড়িল। কহিল, যদি আর না ফিরি তবে এইটিকে তুমি তার কাছে পাঠিয়ে দিও। আর কিছু নয়। সে চিনবে।

একটু ভাবিল। তারপর কহিল, হয়ত ওটা না দেওয়াই ভালো ছিলো। পুরাতন স্মৃতি জাগিয়ে আর লাভ কি! কিন্তু কি জানো, মাধবী আমাকে ভুলেই যাবে,—কোনো দিনই আর ভাববে না, তা' আমি কি ক'রে সইব ? না, না দিয়ো তাকে আঙটীটা পাঠিয়ে। সে যদি একটু আন্‌মনা হয় হোক্‌,—আমি অনেক কেঁদেছি।

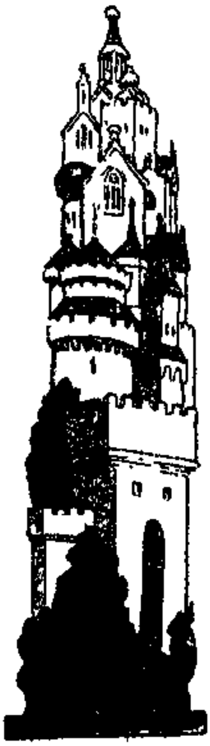
কতটা বেদনা বুকে লইয়া যে এই সংযত-বাদী সন্ন্যাসী সর্ব্বত্যাগ করিয়া চলিল তাহা ভাবিতে অদম্য বাষ্পোচ্ছ্বাসে দুটি চোখ আমার ভরিয়া আসিল। একটা মহান্ আদর্শের দিকে চাহিয়া নিজেকে সে সমস্ত দিক দিয়া বঞ্চিত করিয়া গেল এবং সে ত্যাগের ইতিহাসও সে সবার কাছ হইতে গোপন রাখিতে চায়। চোখের সমুখে জাগিয়া উঠিল বহু শতাব্দী পূর্ব্বের এক ছবি। গভীর নিশীথে এক যুবরাজ একবার মাত্র নিদ্রিত প্রিয়া-পুত্রকে চাহিয়া দেখিয়া সর্ব্ব-ত্যাগীর গৌরবে মহামানবের মুক্তির সন্ধানে বাহির হইয়া গেলেন।

আনন্দ আর কিছু বলিল না। সুটকেশটা উঠাইয়া লইয়া ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

বিদায় দিতে আসিলাম। আকাশ কী দুরন্ত কালো হইয়া উঠিয়াছে। রুদ্ধ বাতাস বারবার গর্জ্জন করিয়া উঠিল। কৃষ্ণ-চূড়ার বনে আর্ত্তনাদ জাগিয়াছে। বিদ্যুতের ঝলসানি, মেঘের গুরু-গম্ভীর মন্দ্র। সমস্ত বাহিরের প্রকৃতি ঝঞ্ঝা-পথের পথিকের যাত্রা-পথ রচনা করিয়া দিল। বৃক্ষপত্রে কীর্ণ, বিজুলী আলোকে উদ্ভাসিত, বজ্ররবে মুখর।

মেঘছায়াচ্ছন্ন রাজপথে আনন্দের কৃশতনু কখন অদৃশ্য হইয়া গেল।

শ্রীসুবোধ বসু



স্বামী বিবেকানন্দের বাণী

অধ্যাপক শ্রীবটুকনাথ ভট্টাচার্য্য।

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী বিবৃত করা সহজ নহে। তিনি দেশমাতার এক মহামনস্বী সন্তান ছিলেন। মায়াবতী সংস্করণের প্রায় ২৫০০ পৃষ্ঠা ব্যাপ্ত গ্রন্থসমূহে অসংখ্য বিষয়ে তাঁহার মতামত ও উপদেশ নিবদ্ধ হইয়াছে। এই বিপুল মনীষার বিকাশকে সমগ্রভাবে অন্তরে গ্রহণ করিয়া, সে-সকল আয়ত্ত করিয়া—উপস্থিত করিবার শক্তি কয়জনের আছে? আরও একটি কারণে এই-জাতীয় উদ্যম আমার নিকট দুঃসাহস বলিয়া মনে হয়। স্বামিজী নিজেই বলিয়াছেন যে, প্রতিভার লক্ষণ—আত্মপ্রকাশের সরলতা ও প্রাঞ্জলতা। এই উক্তি সর্ব্বাংশে তাঁহাতে সার্থক। তাঁহার মনীষা সত্যই স্ফটিকের মত স্বচ্ছ—হীরকের মত উজ্জ্বল ছিল। এ জাতীয় স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল ধী-শক্তির যিনি অধিকারী নহেন—তিনি স্বামিজীর উপদেশ বিবৃত করিতে প্রয়াসী হইলে—প্রতিপাদ্যটিকে জটিল ও অস্পষ্ট করিয়া তুলিবেন—এইরূপ আশঙ্কাই অধিক। একারণে বড়ই সঙ্কোচে ও সন্তর্পণে আজিকার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

বর্ত্তমান সময়ে হিন্দু সমাজে যে সকল আন্দোলন ও প্রচেষ্টা চারিদিকে দেখা যায়—সে সকলের সহিত স্বামিজীর সম্বন্ধ ভাবিতে গেলে, সত্যই মনে হয়—তিনি বর্ত্তমান যুগের প্রবর্ত্তক ছিলেন। তিনি যে সকল মতামত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহাকেই মূল করিয়া যেন হিন্দু জাতির মনোবৃত্তি অধুনা নানা দিকে শাখা প্রশাখার আকারে প্রসৃত হইতেছে। এই প্রসঙ্গে প্রাচীন দার্শনিক-শিরোমণি প্লেটোর সম্বন্ধে আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ মনীষী ইমার্সনের উক্তি মনে পড়ে। তিনি বলিয়াছেন—আজও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের মধ্যে যে সকল বিষয় আলোচিত ও লিখিত হইয়া থাকে—তৎসমস্তই প্লেটো হইতে আসিয়াছে। সকল সভ্য জাতির মনীষিগণ তাঁহারই সন্তান-পরম্পরা এবং তাঁহার মনোবৃত্তি দ্বারা অনুরঞ্জিত। বর্ত্তমান যুগে হিন্দুজাতির চিন্তা ও কার্য্য প্রণালী চিন্তা করিলে, এই উক্তিটী সর্ব্বতোভাবে স্বামিজীর সম্বন্ধে প্রযোজ্য বলিয়া বোধ হয়। এবং এই কারণেই আমাদের চিন্তাধারা ও কর্ম্মপ্রণালীকে সুব্যবস্থিত করিবার জন্য তাঁহার উপদেশগুলির অনুস্মরণ করা আবশ্যক।

আজকাল ধর্ম্ম, সমাজ, সাহিত্য ও রাজনীতিক্ষেত্রে একটা বিশৃঙ্খলা ও বিপর্য্যয়ের ভাব লক্ষিত হইয়া থাকে। সাহিত্যে দুর্নীতির অভিযোগ নিত্যই শুনা যায়। ইহার একটী কারণ ইহাই মনে হয় যে, যাঁহারা নেতা, যাঁহারা সমাজ-মনকে চালিত ও প্রভাবিত করিতেছেন, তাঁহারা কোন বিশিষ্ট ধর্ম্ম ও নীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নহেন। বাঙ্গলার রাজনৈতিক দলাদলিতে যে সকল উদ্ভট ও কদর্য্য ব্যাপার ঘটিতেছে, তাহার হেতু কি ইহাই নহে? যাঁহারা লোক-সেবায় বা রাষ্ট্র ব্যবস্থায় অগ্রণী, তাঁহাদের চরিত্রের খুঁটী কোথায়—তাঁহারা নৈতিক কোন্ নিয়মের অধীন—তাহা বুঝা যায় না। ইঁহাদিগকে ধরা-ছোঁয়া কঠিন। ভারতীয় ধর্ম্ম ও চরিত্র-নীতির মানদণ্ডে ইঁহাদিগকে বিচার করিতে যাইলে, ইহারা ইয়োরোপকে গুরু ও আদর্শ বলিয়া আশ্রয় করেন। আবার পুরাপুরি বিলাতী মানদণ্ডের প্রয়োগ করিতে উদ্যত হইলে—ইঁহারা স্বদেশী ভাব ও আদর্শের উপাসক বলিয়া নিজদিগকে খ্যাপন করেন। ইঁহারা ঠিক ঘরেরও নহেন—বাহিরেরও নহেন—দু'য়েরই অন্তর্ভুক্ত বা দু'য়েরই বাহ্য। এই অব্যবস্থিত চিত্তবৃত্তিই দেশের কর্ম্মধারাকে উন্নতির সরল পথে অগ্রসর হইতে দিতেছে না বলিয়া অনুমান হয়। Philosophy of English Literature (ইংরাজী সাহিত্যের তত্ত্বকথা)—নামক গ্রন্থের লেখক অধ্যাপক Bryan বলিতেছেন—যুগপৎ সাহিত্য ও সমাজে যে নৈতিক বিপ্লব দেখা যায়, তাহা দৈবী সত্তাকে মুছিয়া ফেলারই ফল। কারণ সমাজকে

সংহত সজীব আকারে, ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে বদ্ধ করিতে একমাত্র শাশ্বত সত্যগুলির সম্যক্ উপলব্ধিই সমর্থ। ইহা হইতেই উত্তরোত্তর সুস্থ ও স্থির বুদ্ধি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি কোন দেউলেই পূজা করে না—সে কোন নিয়মেই বাধ্য নহে—এবং নিয়ম বর্জ্জন করিয়া জীবনও থাকিতে পারে না। এই উক্তিটীর গম্ভীর ভাবটী অনুধাবন করা ভারতবাসীর—বিশেষতঃ হিন্দু বাঙ্গালীর পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছে। আর্য্য ভারতের বর্ত্তমান পরিস্থিতি ও ভবিষ্যৎ পরিণতি সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টি অতি বিশদ ও পরিষ্কার ছিল। তিনি সত্যদর্শী ছিলেন। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, ভারতের ধর্ম্ম, সমাজ প্রভৃতি বিষয়ে যাঁহারা চিন্তা করেন, তাঁহারা একচক্ষু হরিণের মত। ইঁহাদের মধ্যে একদল শুধু অতীতকেই স্বীকার করেন—আবার অন্য দল কেবল বর্ত্তমান জগতের পরিবেশকেই মানেন। স্বামিজীর দুই হস্ত দুই দিকে প্রসারিত হইয়া যুগপৎ অতীত ও বর্ত্তমানকে ধরিয়াছিল। এইখানে তাঁহার বিশেষত্ব। বর্ত্তমান জাগতিক অবস্থাকে তিনি তুচ্ছ করেন নাই—এবং সেই সাথে অতীতের নিকট আমাদের যে অপরিমেয় ঋণ তাহাও কখন ভুলেন নাই। সেইজন্য দেখি একস্থলে তিনি বলিতেছেন—তোমরা কি চাও যে গঙ্গানদী নিজ তুষারময় খাতে পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত এবং নূতন ধারায় প্রবাহিত হউক? ইহাও যদি সম্ভব হয়, তথাপি এদেশের পক্ষে তাহার ধর্ম্মজীবনের বিশিষ্ট ধারা পরিত্যাগ করা এবং রাজনীতি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নূতন জীবন-প্রণালী অবলম্বন করা সম্ভব নহে। অধিকন্তু তিনি বলিয়াছেন—ইতিহাসের ভিতর দিয়া আমরা যে জাতীয়-চরিত্র অর্জ্জন করিয়াছি—তাহা রক্ষা করিতেই হইবে। আধুনিক সংস্কারান্দোলনগুলি প্রায় স্থলেই পাশ্চাত্য কার্য্য ধারা ও উপায় সমূহের বিবেচনা-হীন অনুকরণ মাত্র। ভারতে ইহা চলিবে না। যাঁহারা রুশিয়া বা জার্ম্মেণী বা আমেরিকা হইতে আধুনিকতম সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থার পরিকল্পনাগুলি এদেশে প্রতিরোপণ করিতে প্রয়াসী হইতেছেন—তাঁহারা এই সত্যের দিকে দৃক্‌পাত করিবেন কি? স্বামিজী অন্যত্র বলিয়াছেন—আমাদের জীবনের মূলীভূত উপাদানগুলির সহিত পরিচিত হইতে হইবে—যে জীবন-শোণিত-ধারা আমাদের শিরা-উপশিরায় বহিতেছে—তাহা বুঝিতে হইবে। জানিতে হইবে যে আধ্যাত্মিকতা আমাদের সেই জীবন-শোণিত। হিন্দু চরিত্রের এই মজ্জাগত সংস্কার—এই সুদৃঢ় প্রকৃতি ও প্রবণতা সম্বন্ধে তিনি কখনও সন্দিহান হন নাই। তাই অটুট বিশ্বাসে ভর করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন—হিন্দু যে নাস্তিক—ঈশ্বরে অবিশ্বাসী—হইতে পারে—ইহা আমার প্রত্যয় হয় না। এরূপ প্রাণস্পর্শিনী স্পদ্ধার কথা—স্বজাতির উপর গভীর আস্থার কথা কচিৎ শুনা যায়। এত বড় বিশ্বাস না থাকিলে নিঃসম্বল, অনাহুত অবস্থায় চিকাগো ধর্ম্ম-সভায় উপস্থিত হইয়া তিনি কি হিন্দু মহিমার পতাকা উড্ডীন করিতে পারিতেন?

বর্ত্তমান যুগে হিন্দুসমাজের অস্তিত্ব ও কল্যাণের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত তিনটী সমস্যা অতি উগ্রভাবে আমাদের সমক্ষে উপস্থিত। অথচ এই তিনটী বিষয়েই নানারূপ বিরোধ ও মতভেদ সমাধানের পথ-রোধ করিতেছে। একটির সম্বন্ধে আমাদের প্রবল প্রতিবেশি-সম্প্রদায় প্রতিবাদী। দ্বিতীয়টীর সম্বন্ধে আমাদের সমাজের অন্তর্গত গতানুগতিক বা অতীতপন্থী বা সনাতনী সম্প্রদায় প্রতিকূল। এবং তৃতীয়-প্রশ্ন-সম্পর্কে জাতির যাঁহারা মুখপাত্র—শিক্ষায় ও ধীশক্তির অনুশীলনে যাঁহারা উন্নত—মার্জ্জিত-রুচি ও রসজ্ঞতায় যাঁহারা দেশের মধ্যে বরেণ্য—তাঁহারা বিমুখ। এই তিনটি বিষয়েই স্বামী বিবেকানন্দের মতামত আলোচনা করিলে তাঁহার পূর্ব্বোক্ত সত্যদর্শিতা, অতীত ও বর্ত্তমান জগতের উপর তুল্যদৃষ্টি—প্রকৃষ্টভাবে প্রমাণিত হয়।

হিন্দুধর্ম্ম proselytising religion—দীক্ষাদ্বারা বিধর্ম্মীকে আত্মসাৎ করিতে পটু ধর্ম্ম নহে—এইরূপ একটা ধারণা আজও অনেকের মনে বদ্ধমূল। কালক্রমে ইহা একটা প্রবাদ-বাক্য—একটা পৌরাণিক বার্ত্তাতে পরিণত হইয়াছে। যাঁহারা উদার-শিক্ষা-প্রাপ্ত তাঁহারাও—ইতিহাস জানা সত্ত্বে এই মত-প্রকাশ করিয়া থাকেন। অথচ বিশ্ব-

বিখ্যাত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আর্য্যীকরণ নামে হিন্দু সমাজের এই যুগযুগান্তস্থত প্রচেষ্টা প্রমাণিত করিয়াছেন। স্বামিজীও বলিয়াছেন—যাহারা জন্মতঃ পৃথক্ জাতি, তাহারাও অতীতে দলে দলে হিন্দু সমাজে গৃহীত হইয়াছে এবং এখনও সে কার্য্য চলিতেছে। আর এক স্থলে তিনি বলিয়াছেন—কেবল যে আদিম অধিবাসিগণ বা ভারতের প্রান্তবাসী জাতি সকল তাহা নহে—পরন্তু মুসলমান আক্রমণের পূর্ব্ববর্ত্তী আমাদের বিজেতৃগণও এবং যে সকল উপজাতির স্বতন্ত্র উদ্ভবের কথা পুরাণাদিতে উক্ত হইয়াছে—আমার মতে—তাহারা সকলেই মূলতঃ পৃথক্ জাতি হইলেও এই-ভাবে গৃহীত হইয়াছে। এই সকল তথ্য যখন তিনি প্রচার করেন—তখন হিন্দু সমাজে প্রবল আন্দোলন যে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা নিশ্চিত। কারণ যাঁহারা উচ্চ-মর্য্যাদা-সম্পন্ন, যাঁহারা অভিজাত-সম্প্রদায়-ভুক্ত, তাঁহারা সমাজের চতুস্পার্শে ও প্রান্তভাগে যাহা ঘটিতেছিল, তদ্বিষয়ে উদাসীন ও অমনোযোগী হওয়ায়—এসকল বহুদিন হইতে লক্ষ্য করিতে অভ্যস্ত ছিলেন না। সমগ্রভাবে সামাজিক চেতনা একরূপ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। এই জন্য স্বামিজীর নিকট নানারূপ প্রশ্ন উপস্থিত হইত। নব্য দীক্ষিত বা পুনঃ প্রত্যাবৃত্তগণের সমাজে কিরূপ স্থান হইবে—এইরূপ জিজ্ঞাসায় তাঁহাকে অপ্রস্তুত করিতে পারে নাই। তিনি স্পষ্ট ও দৃঢ়ভাবে বলিয়াছেন—যাঁহারা ধর্ম্মান্তর-গ্রহণের পর পুনঃ প্রত্যাগত তাহারা পূর্ব্বজাতিতে মিলিত হইবে। এবং নবদীক্ষিতগণ নূতন জাতি গঠন করিবে। তাঁহার এই সকল সিদ্ধান্ত আদবেই স্বকপোল-কল্পিত নহে। যুগে যুগে ভাগবত ধর্ম্ম, বৈষ্ণবাচার ইহাই প্রমাণিত করে। তাই তিনি বলিয়াছেন—রামানুজাচার্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া বঙ্গের চৈতন্যদেব পর্য্যন্ত সকল বৈষ্ণব মহাপুরুষ ও উপদেষ্টা ইহাই করিয়াছেন। যবন হরিদাসের কাহিনী এদেশে সুবিদিত। শ্রীমদ্বল্লভাচার্য্য সম্বন্ধেও একথা খাটে। ব্রজবুলি ভাষায় লিখিত উক্ত গোস্বামিমহারাজের জীবনী ইহার সাক্ষ্য প্রদান করে। গোঁসাইজী যখন মথুরায় অবস্থান করিতেছিলেন, তখন আলিখান পাঠান নামক এক ভক্ত প্রতিদিন তাঁহার ভাগবত ব্যাখ্যা শুনিত। ভাগবত শ্রবণে তাহার আগ্রহ ও ব্যাকুলতা দেখিয়া তিনি স্বতঃই তাহার প্রতি কৃপাপরবশ হন এবং তাহাকে ভাগবত-শ্রবণের প্রকৃত অধিকারী বলিয়া বুঝেন। সে ব্যক্তি না আসিলে তিনি ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত হইতেন না। ইহাতে তাঁহার হিন্দু ভক্তগণ কিছু ঈর্ষ্যান্বিত হয়। একদিন তাহার আসিতে বিলম্বের জন্য পাঠ আরম্ভ না হওয়ায়, এই সকল ভক্ত পরস্পরের মধ্যে নানারূপ বলাবলি করিতে আরম্ভ করে—ইহা গোসাইজীর মনোযোগ আকর্ষণ করে। অতঃপর আলিখান পাঠান উপস্থিত হইলে গোসাইজী ঐ সকল হিন্দুভক্তগণকে পূর্ব্বদিনের পাঠের প্রতিপাদ্য বিষয়টী তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিতে বলেন। তখন তাহারা পরস্পরের মুখের দিকে তাকাইতে থাকে এবং নিরুত্তর হয়। অতঃপর গোসাইজী আলিখান পাঠানের দিকে দৃষ্টিপাত করেন। ভক্তটী তখন পূর্ব্বদিনের ব্যাখ্যার মর্ম্ম তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দেয় এবং তৎপূর্ব্বদিন ও তত্তৎপূর্ব্বদিন তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাও বিবৃত করে এবং পরিশেষে বলে যে, পাঠারম্ভ হইতে প্রতিদিন গোঁসাইজীর ব্যাখ্যান তাহার চিত্তফলকে অঙ্কিত হইয়া আছে। এই কাহিনী হিন্দু-সমাজের রক্ষা ও পুষ্টিকল্পে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট কার্য্যের কথা বুঝাইয়া দেয়। যাহারা পতিত, যাহারা মর্য্যাদা-হীন, যাহারা দীন, যাহারা ধর্ম্মের আস্বাদে বঞ্চিত—বৈষ্ণবগণ যুগে যুগে তাহাদিগকে হাতে ধরিয়া তুলিয়াছেন—সমাজের কোলে স্থান দিয়াছেন। নানা বৈষম্য, প্রভেদ ও বিভাগ সত্ত্বে আজও যে হিন্দুসমাজ টুকরা-টুকরা হইয়া যায় নাই, এখনও যে সংহত আকার ধারণ করিয়া আছে—তাহার কারণ বৈষ্ণবাচার্য্যগণের প্রচারিত প্রেম-ও সেবা-ধর্ম্মের মহিমা—"জীবে দয়া, নামে রুচি ও বৈষ্ণব-সেবন।" সমাজে প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের সহিত বৈষ্ণব প্রধানগণের মধ্যে বর্ত্তমানে আভিজাত্য-বুদ্ধি জন্মিয়াছে। এই সকল প্রাচীন উদার সমাজ সেবার কাহিনী স্মরণ করাইলে, তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, এ সকল প্রামাণিক নহে—এবং এসকলের দ্বারা

বৈষ্ণব সমাজের আচার অনুষ্ঠানও নিয়ন্ত্রিত হয় না। ফলে তাঁহাদের যুগ-যুগানুসৃত সমাজ কল্যাণের কর্ম্ম পরিহার করিয়া, তাঁহারা অধিকার-বৈষম্যের প্রপঞ্চ ও শৌচ, আচার ও অনুষ্ঠানের পরিপাটীর সমর্থক স্মার্ত্ত সম্প্রদায়ের কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া, উঁহাদিগেরই সহিত তালে তালে পথ চলিতে চেষ্টা করিতেছেন।

স্বামিজীর সত্যদর্শিতার প্রমাণ জাতিভেদ ও বর্ণ-ব্যবস্থার সংস্কার প্রসঙ্গেও সুস্পষ্টভাবে পাওয়া যায়। কঠিন বাস্তবের ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠ ছিলেন বলিয়াই, তিনি বলিযাছেন—কোন সামাজিক প্রথার পরিবর্ত্তন করা যদি প্রয়োজন হয়—সর্ব্বাগ্রে তাহার অন্তর্নিহিত আবশ্যকতার আবিষ্কার করা দরকার এবং সেই আবশ্যকতা পরিবর্ত্তিত করিলেই প্রথাটী আপনি বিনষ্ট হইয়া যাইবে। অন্যথা কেবল নিন্দা বা প্রশংসায় কোন লাভ হইবে না। তিনি চাতুর্ব্বর্ণ্যে বিশ্বাসী ছিলেন—কিন্তু বর্ণ ও জাতির চতুঃসাহস্রীতে বিশ্বাসী ছিলেন না। অসংখ্য উপজাতি ও উপবর্ণের ফলে যে অনিষ্ট ঘটিতেছে—তাহা তিনি দূর করিতে প্রয়াসী ছিলেন। তাই তাঁহার বাণী এইরূপ—সমগ্র হিন্দুজন-সঙ্ঘকে পুনরায় পূর্ব্বকালের মত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই মূল চারি জাতিতে বিভক্ত করিতে হইবে। ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যে অসংখ্য অবান্তর ভেদ ঐ বর্ণকে এতগুলি স্বতন্ত্র জাতিতে খণ্ড বিখণ্ড করিয়াছে তাহা দূর করিতে হইবে—এবং সে সকলকে মিলিত করিয়া একটী মাত্র ব্রাহ্মণবর্ণে পরিণত করিতে হইবে। অবশিষ্ট তিন বর্ণকেও এইভাবে মাত্র এক একটী শ্রেণীতে লইতে হইবে—বৈদিক যুগে এইরূপ ব্যবস্থাই ছিল। সকল জাতির মধ্যে সাম্য ও ঐক্য স্থাপনের প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন—জাতি বৈষম্যকে সমভূমিতে উন্নীত করিবার একমাত্র উপায়—উচ্চ জাতির প্রভাবের নিদান—শিক্ষা ও সংস্কৃতি আত্মসাৎ করা। তিনি শূদ্রবর্ণের সম্বন্ধে বলিয়াছেন—শূদ্রজাতি আর থাকিবে না—তাহাদের কার্য্য যন্ত্রদ্বারা নিষ্পন্ন হইবে। এই সকল উক্তির তাৎপর্য্য ইহাই মনে হয় যে, হিন্দুসভ্যতার মহান্ আদর্শ সকল জাতি ও বর্ণের মধ্যে ক্রমশঃ সঞ্চারিত করিতে হইবে। সেইজন্য তিনি একস্থলে বলিয়াছেন—আমি ভারতীয় সকলকেই ব্রাহ্মণ করিয়া তুলিতে চাই। প্রকৃতই হিন্দুর পক্ষে ইহা ভিন্ন বা ইহা হইতে উচ্চতর কোন আদর্শ থাকিতে পারে না। সেইজন্য দেখি বিচক্ষণ এটর্নী রূপে, বা সুদক্ষ শাসকরূপে বা ইট-কাঠ-চুণের হিসাবে নিবিষ্ট এঞ্জিনিয়াররূপে যিনি আজীবন কাটাইলেন, তিনিও প্রবীণ বয়সে জটাশ্মশ্রুতে মণ্ডিত তপস্বীর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া, মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিয়া হিন্দু-জীবনের সার্থকতা লাভে প্রয়াস করিতেছেন। এই ব্রাহ্মণ্য মনোভাব সমাজময় অনুপ্রবিষ্ট করাই ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্র ও ধর্ম্মের চরম পূর্ণতা ও পরিণতি। স্বামিজী বলিয়াছেন—প্রত্যেক অভিজাত সম্প্রদায়ের নিজ কবর খনন করাই কাজ। আধ্যাত্মিক আভিজাত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ে এ নিয়ম ব্যাহত হইতে পারে না। তাই স্বামিজী বলিয়াছেন—জাতিভেদ সমস্যার সমাধান ব্রাহ্মণকে নিষ্পিষ্ট করিয়া, মুছিয়া ফেলাতে নহে। ব্রাহ্মণত্ব—ভারতে মনুষ্যত্বের আদর্শ। সেই ব্রাহ্মণ, সেই ভাগবত পুরুষ, সেই ব্রহ্মজ্ঞ, সেই আদর্শ মানব, সেই পূর্ণ ও প্রকৃষ্ট মানুষকে রক্ষা করিতে হইবে—সে নষ্ট হইতে পারে না। নষ্ট যে হইতে পারে না—তাহার প্রমাণ যুগে যুগে হিন্দু সমাজভুক্ত সকল শ্রেণীর মধ্যে ব্রাহ্মণধর্ম্মী মুনিবৃত্তি মহাপুরুষের আবির্ভাব। ইঁহাদের গৌরবই হিন্দু সমাজের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ ও আত্মরক্ষার অক্ষয় কবচ। তাই স্বামী বিবেকানন্দ বা মহাত্মা গান্ধী ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের হন্তারক বা কলঙ্ক নহেন—ইহার গৌরব-নিধান ও জয়স্তম্ভ।

স্বামিজীর সত্যদর্শিতার পরিচয় জাতীয়তা বনাম বিশ্বমানবতা—এই প্রশ্নের আলোচনা প্রসঙ্গেও প্রকৃষ্টভাবে পাওয়া যায়। তিনি বর্ত্তমান জাগতিক অবস্থানিচয় নয়ন উন্মীলন করিয়া, স্থিরদৃষ্টিতে লক্ষ্য করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার ফলে উদার আদর্শ ও উদাত্ত ভাবুকতা হইতে বিচ্যুত হন নাই।

তিনি বলিয়াছেন—ভারতের দুর্দ্দশা ও অবনতির একটী প্রধান কারণ ইহাই যে, সে নিজেকে সংকীর্ণ করিয়াছে, শুক্তির মত নিজ কোটরের ভিতর প্রবিষ্ট হইয়াছে, এবং অন্যান্য মনুষ্য জাতিকে তাহার বহুমূল্য ভাবরাজ্যের মণিমাণিক্য ও অধ্যাত্ম-সম্পদ্ বিতরণ করিতে বিমুখ হইয়াছে, আর্য্য-গোষ্ঠীর বহির্ভূত তৃষিত জাতি-সমূহকে প্রাণপ্রদ সত্যগুলি দান করিতে বিরত হইয়াছে। বিশ্বের দরবারে নূতন করিয়া হিন্দু-জাতির এই বদান্যতার প্রবর্ত্তন করাই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। তাই তিনি এক সময়ে বলিয়াছিলেন—আমি কল্পনা-বিলাসী মানুষ—হিন্দুজাতি কর্ত্তৃক নিখিল বিশ্ববিজয় আমার অভিপ্রায়। তাঁহার নিকট আন্ত-র্জাতিকতা (Internationalism) বা বিশ্বমানবতার এই অর্থই ছিল। এবং ইহার উপায় বেদান্তের প্রচার ও কার্য্যতঃ প্রয়োগ বলিয়া তিনি মনে করিতেন। দেশপ্রীতির রাজনৈতিক অপেক্ষা লোকসেবা-বোধক অর্থই তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। দেশপ্রীতির অর্থ—স্বদেশে যে নিত্য বিরাজমান দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও অজ্ঞতা—তাহার সহিত সংগ্রাম। বিশ্বপ্রেমের অর্থ ছিল—সকল মানবে ব্রহ্মদর্শন। বর্ত্তমান সময়ে যে বিশ্বমানবতার ধুয়া উঠিয়াছে তাহার বীজ স্বামিজীর প্রচারের মধ্যেই উপ্ত হয়। কিন্তু যে বিশ্বমানবতা শুধু নানাজাতির লৌকিক স্বার্থের বোঝাপড়ার উপর প্রতিষ্ঠিত - যাহা মানবকে তাহার নিজ দেশের, নিজ জাতির স্বতন্ত্র নিয়তি ও সংস্কৃতি ভুলাইয়া দেয়—সেরূপ বিশ্বপ্রেমে তাঁহার আস্থা ছিল না। ভারতের নিকট বিশ্বপ্রেম একটা অপূর্ব্ব ও অচিন্ত্য বস্তু নহে। ভারতীয় শিক্ষা-দীক্ষা শুধু আমিত্বের প্রসার অভ্যাস করিতেই হিন্দুকে বলিয়াছে। স্মার্ত্তবিধানে যে আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত জগতের তৃপ্তি সাধন—তাহার মূল এইখানে। 'সর্ব্বত্র কৃষ্ণের মূর্ত্তি করে ঝলমল, সেই হেরে যার আঁখি হয় নিরমল'—বৈষ্ণবের এই উক্তিরও সেই তাৎপর্য্য। 'প্রতি জীবে শিব জ্ঞান'—এই কথাই বুঝায়। নানাজাতির স্বার্থের হিসাব নিকাশ দ্বারা সামঞ্জস্য-বিধান ও কেবলমাত্র জ্ঞানবিনিময় যে বিশ্বমানবতার ভিত্তি—তাহা সাধ্য ও সম্ভব বলিয়া স্বামিজী মনে করিতেন না। তিনি একস্থলে বলিয়াছেন—দ্বন্দ্ব না করিয়া, হিংসা না করিয়া, কামনা বর্জ্জন করিয়া মানুষ পৃথিবীতে বাঁচিতে পারে না। যখন এরূপ আদর্শ সমাজে বাস্তবরূপে পরিণত হইবে, সে অবস্থায় জগৎ আসিয়া এখনও পৌঁছায় নাই। বর্ত্তমান জগতের ব্যাপারও ইহাই প্রমাণিত করে। তাই আধুনিক বিশ্ব-মানবতার প্রচারে চীন মুখ ফিরাইয়া লয়—ইতালী মুষ্টি উদ্যত করে। তিনি আরও বলিয়াছেন—বিশিষ্ট জাতি, ধর্ম্ম, ভাষা ও শাসন প্রণালী এ সকলে মিলিয়া nation গঠিত হয়। এই কারণে বিশ্বমৈত্রী-স্থাপন-সমস্যাব তিনি ভারতীয় ভাবে সমাধান করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন—ভারতের জাতীয় আদর্শ হইতেছে ত্যাগ ও সেবা। যে সময়ে বৃহত্তর ভারত প্রত্যক্ষ বস্তু ছিল, তখনও হিন্দু এই দুই উপায়েই সর্ব্বত্র জয়লাভ করে। প্রশান্ত মহাসাগরের যব ও বালি প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জ হইতে তুর্কীস্থানের পশ্চিমদিক্ পর্য্যন্ত, মহাচীন হইতে পারস্য উপসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগে আর্য্য সভ্যতা যখন প্রচারিত হয়, তখন অসি-বাণ-হস্তে বিপুলরণবাহিনী-সমন্বিত অভিযানের প্রয়োজন হয় নাই। বিশ্ব-কল্যাণ-ব্রতই হিন্দুকে সর্ব্বত্র জয়ী করিয়াছিল। এই ত্যাগ ও তিতিক্ষা, সেবা ও প্রেম, জ্ঞান ও বৈরাগ্যের অভিযানে সকল হৃদয়ের দ্বার স্বতঃই উদ্ঘাটিত হইয়া যায়। স্বামিজীর ভাষায় ইহাই Practical vedantism—বেদান্তের প্রয়োগবিজ্ঞান। স্বামী বিবেকানন্দ সর্ব্বাগ্রে ভারতীয় চিন্তার এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবদান বিশ্বে বিলাইবার জন্য জীবন পণ করিয়াছিলেন। এবং ইহা হইতে যুগপৎ ভারতের কল্যাণ ও বিশ্বের কল্যাণ ঘটিবে—ইহা বিশ্বাস করিতেন।

তাঁহার এই বেদান্তের ব্যাখ্যান বিশ্বের লোকসমাজ উৎকর্ণ হইয়া, বিস্ময় বিমুগ্ধ হইয়া শুনিয়াছিল—ইহার মধ্যে এক নূতন প্রেরণা, নূতন সান্ত্বনার সন্ধান লাভ করিয়াছিল। ভারতীয় জীবনে বেদান্তের প্রয়োগ উপলক্ষ্য করিয়া তিনি বলিয়াছেন—দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ বা অন্য কোন বাদ

বা ধর্ম্মমত প্রচার করিতে চাহি না। যে তত্ত্বের বর্ত্তমানে আমাদের প্রয়োজন তাহা—আত্মা—তাহার শাশ্বত বিভূতি, অক্ষয় বল, তাহার অবিনশ্বর পবিত্রতা ও তাহার অনন্ত উৎকর্ষ—এই বিস্ময়কর তত্ত্ব ভিন্ন আর কিছু নয়। একস্থানে হিন্দুর অবনতি দর্শনে আক্ষেপ করিয়া তিনি বলিয়াছেন—আমরা আত্মপ্রত্যয় হারাইয়াছি। নচিকেতার মত বিশ্বাসবান্ হও। আর এক স্থলে হিন্দুকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য বলিতেছেন—হে আধুনিক হিন্দুগণ নিজেদের মোহনিদ্রা হইতে মুক্ত কর। এই প্রসঙ্গে তিনি মদালসার কাহিনী স্মরণ করাইয়া বলিয়াছেন—রাজ্ঞী মদালসা শিশু সন্তানকে দোলা দিবার সময় বলিতেন—তুমি নিরঞ্জন, তুমি নিষ্পাপ, তুমি সর্ব্বশক্তিমান্, তুমি মহান্। মনুষ্যত্বের এই অপার মহিমায়, এই অনন্ত ঐশ্বর্য্যে পুনর্বার আস্থাবান্ না হইলে হিন্দুর কল্যাণের পথ কোথায়?

জ্ঞান, কর্ম্ম ভক্তিযোগ ও অন্যান্য অধ্যাত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার উপদেশগুলির যখন আলোচনা করি, তখন তাঁহার বাণীর দুইটা বিভাগ বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাই। এবং মনে পড়ে যে, হিন্দুধর্ম্ম-শাস্ত্রগুলিকেও স্বামিজী দুইটা কোঠায় ভাগ করিয়াছেন—যথা সাময়িক ও সনাতন। তিনি বলিয়াছেন—আমাদের শাস্ত্রে দুই জাতীয় তত্ত্ব দেখিতে পাই—এক শ্রেণীর তত্ত্বগুলি মানবের শাশ্বত স্বভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত। এসকল ঈশ্বর, আত্মা ও প্রকৃতির মধ্যে যে চিরন্তন সম্বন্ধ তাহা লইয়া আবৃত। অন্যগুলি দৈহিক অবস্থা, সাময়িক পরিবেশ, বিশিষ্ট কালের সামাজিক বিধান-ব্যবস্থা লইয়া ব্যাপৃত। স্মৃতিগুলি উত্তরোত্তর চলিয়া যাইবে, ঋষিগণ প্রাদুর্ভূত হইবেন এবং তাঁহারা যুগপ্রয়োজন অনুসারে সমাজকে পরিবর্ত্তিত করিয়া, আরও প্রশস্ত খাতে উৎকৃষ্ট পথে, নূতন কর্ত্তব্যরাশির অভিমুখে চালিত করিবেন; কারণ এতদ্ভিন্ন সমাজের বাঁচা অসম্ভব।

ইংরাজ অধিকারের প্রারম্ভ হইতে বিগত দেড়শত বৎসরে হিন্দুসমাজে নানা সংস্কার-চেষ্টা ও আন্দোলন হইয়াছে। এতৎসম্পর্কে রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের প্রদত্ত মূল মন্ত্রে নির্ভর করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, এই ইতিহাসে তাহার বৈশিষ্ট কি? মুসলমান আমলের শেষ হইতে হিন্দু নিজেকে ক্রমশঃ সঙ্কুচিত করিয়া, বর্জনের গণ্ডী ও পার্থক্যের দেয়াল তুলিয়া, আত্মরক্ষায় ব্যস্ত আছে। স্বামিজীর কথায়—এই বর্জন নীতি—এই পরিহারের প্রাচীর উনবিংশ শতাব্দীতে প্রথম ভেদ করেন রাজা রামমোহন রায়। তিনি একমাত্র উপনিষদ্-বাণীকে ভিত্তি করিয়া সমাজের সংস্কার করিতে প্রবৃত্ত হন। তুলনামূলক ধর্ম্মালোচনার তিনি প্রবর্ত্তক। তাঁহার ভাবকে উপচিত করিয়া, আরও পুষ্ট করিয়া সাধারণ ও নববিধান ব্রহ্ম সমাজ অগ্রসর হয়। ইহাদের সংস্কার-প্রণালীকে একারণে চয়নাত্মক বা eclectic বলা যায়। উনবিংশ শতাব্দীর পরার্দ্ধে স্বামী দয়ানন্দও হিন্দু সমাজকে নূতন আকারে আকারিত করিবার উদ্দেশ্যে আর্য্যসমাজের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার আদর্শ ছিল—বৈদিক যুগের আর্য্য-সমাজ-ব্যবস্থা। তাহাকেই বর্ত্তমান সময়ে পুনরুজ্জীবিত করিতে তিনি প্রয়াসী হন। সুতরাং তাঁহার প্রণালীকে অতীতের পুনরানয়ন প্রচেষ্টা বা revivalism বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। ইতিহাসের ভিতর দিয়া, সমাজের নানা ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের ফলে হিন্দু যে চরিত্র ও বিশিষ্টতা অর্জন করিয়াছে—তাহা এই দুই সম্প্রদায়ই মুছিয়া ফেলিতে চাহেন—শ্লেটটী নূতন করিয়া ধুইয়া সাফ করিয়া তাহাতে রেখাপাত করা—ইঁহাদিগের ব্রত হয়। স্বামী দয়ানন্দ সম্বন্ধে বিবেকানন্দ স্বামী বলিয়াছেন—সংহিতাই যে একমাত্র বেদ—ইহা আধুনিক ধারণা এবং স্বামী দয়ানন্দই ইহার উদ্ভাবক। এই মতের প্রাচীন-পন্থী সমাজের উপর কোন প্রভাব নাই। তিনি আরও বলিয়াছেন—যদি মাত্র সংহিতাসমূহের ভিত্তিতে সুসংলগ্ন ধর্ম্মমত রচনা করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে উপনিষদের ভিত্তিতে সুসঙ্গত ও সুশৃঙ্খলিত মতের প্রতিষ্ঠা সহস্র

গুণ অধিক সম্ভব। অধিকন্তু এক্ষেত্রে পূর্ব্ব হইতে গঠিত জাতীয় মনোভাবের বিরুদ্ধে যাইবার প্রয়োজন নাই। এ বিষয়ে সকল আচার্য্যই তোমার সপক্ষে এবং নূতন উন্নতির ক্ষেত্রও বিশাল।

ঐতিহাসিক যুগে হিন্দু সমাজের ক্রম-বিবর্ত্তের ধারা অনুধাবন করিলে ইহাই মনে হয় যে, সম্পূর্ণভাবে অতীতকে পরিত্যাগ করিয়া বা হুবহু অতীতকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়া ইহা অগ্রসর হয় নাই। বৈদিক সময়ের ক্রিয়াকাণ্ড যখন বৌদ্ধমত-প্রচারে ব্যাহত হয় তখনও হিন্দু সমাজ ব্যবস্থা বিধ্বস্ত হইয়া যায় নাই। চাতুর্বর্ণ্যের অন্তর্গত হইয়াও বহু ব্যক্তি শ্রমণ হইয়াছিল। পরে খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে কুমারিল ভট্ট যখন হিন্দুসমাজের পুনঃ প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হয়েন—তখন তিনি বৈদিক যুগকে সম্পূর্ণভাবে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন—ইহা সত্য। তিনিও পুনরুজ্জীবক বা revivalist। কিন্তু পরবর্ত্তী তিন চারি শত বৎসরেই তাঁহার সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যায়। কলিবর্জ্জ্য বিধান ইহার সুস্পষ্ট প্রমাণ দিতেছে। বৈদিক সমাজ-বিন্যাস ও জীবন প্রণালীর অঙ্গীভূত নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য, সন্ন্যাস, অগ্নিহোত্র, সুরা-ও পশু-সাধ্য যাগ প্রভৃতি নানা বিষয় পুরাণবচনের বলে ও নিবন্ধকারগণের ব্যবস্থার ফলে নিষিদ্ধ হইয়া পড়ে। সুতরাং ইহাই মনে হয় যে হিন্দুসমাজের ক্রম পরিণতি নদনদীর অবস্থাপরিবর্ত্তনের সদৃশ। কোন একটা বস্তুর উপর পর পর লেপ পড়িলে বা নদীর খাতে স্তরের পর স্তর পলি পড়াতে, উহার আকারটা বাহ্যতঃ যেরূপ এক রকম বজায় থাকে, অথচ ভিতরে প্রকৃতই মহাপরিবর্ত্তন ঘটিতে থাকে, হিন্দু সমাজেও তাহাই হইয়াছে। যুগে যুগে হিন্দুর অগ্রগতি এই নিয়মেই সম্পন্ন হইয়াছে—ইহাই হিন্দু জাতির প্রকৃতি ও পরিবর্ত্তনের ধারা। উনবিংশ শতাব্দীর হিন্দু-সমাজ-সংস্কারকগণের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দই ইহা বিশদভাবে লক্ষ্য করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। সেইজন্য সংহিতা—পুরাণ—নিবন্ধ দ্বারা প্রভাবিত, নানা উপাস্য ও উপাসনা-রীতিতে অনুরক্ত, মধ্যযুগীয় হিন্দু মনোভাবকে অকস্মাৎ করিয়া, ছাঁটিয়া ফেলিয়া তিনি সংস্কারে হস্তক্ষেপ করেন নাই। এবং তাঁহার সম্প্রদায়ের সাফল্যও এই কারণে বিপুল পরিমাণে ঘটিয়াছে। তিনি উনবিংশ শতাব্দীর সংস্কারান্দোলন ও প্রচেষ্টাকে হিন্দু চরিত্র ও মনোবৃত্তির এই চিরন্তন ভগীরথ খাতে মিলাইয়া দিয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার বিশিষ্টতা এবং কর্ম্মসাফল্যের নিদান।

খৃষ্ট ধর্ম্মের প্রসারের ইতিহাসেও আমরা এই ঘটনা লক্ষ্য করি। যতদিন খৃষ্টধর্ম্ম বনে, জঙ্গলে, গুহায় ও মরুভূমিতে আশ্রয় লইয়াছিল এবং ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ ছিল, ততদিন ইহা ফলপ্রসূ হয় নাই—পরবর্ত্তী যুগের ন্যায় বিপুল শস্যসম্ভারে সমৃদ্ধ হয় নাই। পরে রোম-সম্রাট্ কনষ্টান্‌টাইন্ নিজ রাষ্ট্রের ধর্ম্ম বলিয়া অনুমোদন করার সময় হইতে ইহার জনমনের উপর প্রভাব বহুগুণ বর্দ্ধিত হয়। তিনি ঈশা-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম স্রোতকে ইয়োরোপীয় মানবজীবনের মূল ধারার সহিত মিলিত করিয়া দেন। ইহাতে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মমত উদারভাবে চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। তাই ইংরাজ সমালোচক-প্রবর ম্যাথ্যু আর্ণল্ড বলিয়াছেন—

জাতীয় ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠান সমগ্রতাবুদ্ধির অনুকূলতা করে; পক্ষান্তরে সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মগুলি প্রাদেশিকতাবুদ্ধির পরিপোষক। রাষ্ট্র-সমর্থিত ধর্ম্মসংঘ আমাদিগের ব্যক্তিগত অভিরুচি ও কল্পনার অতীত, মনুষ্যজীবনের মধ্যগত ঐতিহাসিক সূত্র দেখাইয়া দেয়। কোন একটা কাল্পনিক মতবাদ পোষণ করা অপেক্ষা মনুষ্যজীবনের এই মূল ধারার সংস্পর্শে আসা অধিক প্রয়োজনীয়। নিজ সম্প্রদায়ের সহিত একত্রে উপাসনাই শ্রেষ্ঠ—কিন্তু দার্শনিক চিন্তা নির্জ্জনেই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হয়। সমাজের সম্মতি, প্রাচীনতা, রাষ্ট্রতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষকতা দীর্ঘকাল-প্রচলিত অনুষ্ঠান-পদ্ধতি, জাতীয় বৈশিষ্ট্য-সূচক দেবগৃহ—ধর্ম্ম সাধনার পক্ষে ইহাই সর্ব্বস্ব।

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী জনমনকে, ভারতীয় সাধনার যুগ যুগানুসৃত ধারার দিকে আকৃষ্ট করে। এবং এই জন্যই উহা হিন্দুসমাজের মর্ম্মস্পর্শ করিতে সমর্থ হইয়াছে। দেশময় রামকৃষ্ণ মিশনের যে বিপুল প্রতিপত্তি ও প্রসার তাহার কারণ ইহাই মনে হয়। ইহার কর্ম্মপ্রণালীতে

আত্ম-নিবেদন করিয়া, ইহার আস্থান-ভাণ্ডারে জীবনের সঞ্চয় উৎসর্গ করিয়া, ইহার লোক-সেবার মহা-ব্রতের পালনে সহায়তা করিয়া, প্রত্যহ বর্দ্ধমান জনসঙ্ঘ যে জীবনে সান্ত্বনা ও অন্তিমে শান্তি পাইয়া থাকে—তাহার হেতু ইহাই। ইংরাজী শিক্ষার প্রথম সংস্পর্শে, উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বার্দ্ধে যে হিন্দু নিজ ঘর ছাড়িয়া, পথহারা হইয়া বেড়াইতেছিল, তাহাকে তাঁহার আপন অঙ্গনে সঞ্চিত সম্পদের প্রতি পুনরায় মমতাও প্রেমে বাঁধিয়াছিলেন বলিয়াই স্বামিজীর উপদেশাবলীর এতদূর প্রভাব। এই উপদেশাবলীর মূল সূত্র—ত্যাগ ও সেবা। এই প্রসঙ্গে তাঁহার উক্তি প্রসিদ্ধ ও চিরস্মরণীয়—দীন ও আর্ত্ত আমাদের মুক্তির নিমিত্ত—উহাদিগকে উপলক্ষ্য করিয়া ভগবৎ সেবাই উদ্দেশ্য। পরের সাহায্য করা তোমার সাধ্য নহে—তুমি শুধু আপনারই উপকার করিতে পার। এই মূল সূত্র ধরিয়াই রামকৃষ্ণ মিশনের অসংখ্য শাখা ও কেন্দ্র দেশময় উত্তরোত্তর ব্যাপ্ত ও বর্দ্ধিত হইতেছে। বর্ত্তমানে দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িতের সাহায্যার্থ যে অসংখ্য সমিতি ও প্রতিষ্ঠান আত্মনিয়োগ করিতেছে—এ সকলের আদর্শ ও পথপ্রদর্শক রামকৃষ্ণ-মিশন। জনসঙ্ঘের সহিত এইভাবে নিবিড় আত্মীয়তা বন্ধন-স্থাপনের দ্বারাই স্বামিজীর বাণী জনমনকে ক্রমশঃ তাঁহার উপদিষ্ট যুগ-প্রয়োজন মত নব-ভাবে সমাজ-গঠন ও সংস্কারের পদ্ধতির দিকে চালিত করিতেছে।

উদীয়মান ইংরাজ রাজনৈতিকগণকে একটী উপদেশ দেওয়া হইয়া থাকে—তাঁহারা যেন প্রসিদ্ধ রাষ্ট্রতত্ত্ববিদ্ বার্কের বক্তৃতাবাণী দিবসে অভ্যাস ও রাত্রিতে ধ্যান করেন। এ দেশের যুবক সম্প্রদায়কেও অসঙ্কোচে বলা যাইতে যে, তাঁহারা যদি ভারতের মর্ম্ম ও প্রকৃতি জানিতে চাহেন—হিন্দু সমাজের অন্তরের ভাব বুঝিতে চাহেন—যদি নানা প্রকার দার্শনিক মত, উপাসনাপদ্ধতি, প্রথা, আচার প্রভৃতিতে জড়িত এই প্রাচীন আর্য্যজাতির কর্ম্মধারা ও চিন্তাপ্রণালী সহজ ও সরল উপায়ে আয়ত্ত করিতে চাহেন—তাঁহারাও যেন ঐকান্তিক সাধনা ও অসাধারণ মনীষার অপূর্ব্ব ফল স্বামিজীর এই গ্রন্থাবলী নিবিষ্টভাবে আলোচনা ও ধ্যান করেন। স্বামিজীর ইংরাজী ভাষায় প্রদত্ত বক্তৃতাবলী ওজঃ ও প্রসাদগুণে ভাস্বর। তাঁহার উক্তিসকল অব্যাহত গতিকে শ্রোতার ও পাঠকের চিত্তভূমিকে অধিকার করিয়া ফেলে। সেই জন্য জনসমাজকে বুঝাইবার ও উদ্বুদ্ধ করিবার পক্ষে তাঁহার বাক্‌শিল্প অতুলনীয়—তাঁহার রচনাভঙ্গী অপূর্ব্ব শক্তিময়। দেশের যুবক সম্প্রদায় ভাব ও ভাষার এই অমূল্য সম্পদ্ শ্রদ্ধা ও অবধান সহকারে অন্তরে গ্রহণ করিলে, আপনারা ধন্য হইবেন এবং জাতির কল্যাণকে আমন্ত্রণ করিবেন।

শ্রীবটুনাথ ভট্টাচার্য্য

২০ই আগষ্ট তারিখে বিবেকানন্দ সমিতির শনিবাসরীয় অধিবেশনে প্রদত্ত বক্তৃতার মর্ম্মাবলম্বনে লিখিত।



ফস্কা গেরো

শ্রীযুক্তা আমোদিনী ঘোষ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

১২

একাদশীর দিন স্নান করিয়া নির্ঝর থালায় করিয়া ফুটি কাটিতেছিল। অনিল বাহির হইতে ঘুরিয়া আসিয়া সেইখানে মাটিতেই বসিল। এ ছিল তাহার চিরদিনের বৈঠকীর জায়গা।

নির্ঝর জিজ্ঞাসা করিল, "খাবে দুখানা ফুটি ?" অনিল হাত পাতিল। নির্ঝর উঠিয়া একখানি রেকাবিতে চিনি দিয়া দুখানা ফুটি তাহার হাতে দিল।

অনিল জিজ্ঞাসা করিল, দুপুর বেলা ফুটি বেল শশা— এ সব ফলাহারের আয়োজন কার জন্য হচ্ছে ?"

ভজুয়া উঠানে কাপড় মেলিতেছিল, সে বলিল "দিদিকে একাদশী হোবে।"

অনিল সবিস্ময়ে বলিল, তোমার একাদশী হোবে ··সে কি রকম ?"

ভজুয়া নাছোড়বান্দা, বলিল, "গিয়া মহিনামে ভি দিদি একাদশী কৈলেন।"

অনিল বলিল "বটে, আমাদের ফাঁকি দিয়ে তুমি এই সব চালাচ্চ! আজ আমারো একাদশী। ওরে ভজুয়া ঠাকুরকে বল, হামার ভি একাদশী আছে, হাম ভি ভাত নেহি খায়গা।"

ভজুয়া সহাস্যে বলিল "কি কোহেন দাদা বাবু, কেনো ভাত খাইবেন না; আজ বাবু বাজারসে একটা বড় মচ্ছি আন্‌লো, কোই যব্ নেহিয়ে খাইবেন, সব ত বরবাদি না হোইবে।"

অনিল বলিল "ছমাস না যেতে যেতেই বাঙ্গালী বাড়ীর চাকরগুলো মুরুব্বিয়ানা চাল দিতে শেখে। বরবাদি হয় হবে—তোর তাতে কি, তুই যা ঠাকুরকে বল্ গিয়ে আমার আজ একাদশী।"

নির্ঝর অপ্রস্তুত হইয়া ওঠে। অত্যন্ত কুণ্ঠিত ভাবে সে বলে, "অনুদা কি পাগলামি কর; তোমার একাদশী করার কি পড়েছে! আজ একটা মহাশোল এনেছে—বেশ ভাল মাছটা—আমি নিজে রেঁধেছি—আর তুমি খাবে না কি রকম!"

"কি কর্ব্ব বল! দিব্যি বেড়িয়ে টেড়িয়ে—এলুম, বাড়ীতে ঢুকেই মাথায় লাগ্‌ল একটা ধাক্কা। বোঁ করে মাথা ঘুরে গেল। শরীরটা যাচ্ছে তাই লাগ্‌ছে, চোখটা কন্ কন্ করছে, নাকটা ছন্-ছন্ করছে, মাথা বন্-বন্ করছে, পেট চন্ চন্ করছে—কি করে আর খাই বল!"

ঘন পক্ষচ্ছায়-বিতত স্থির কমল নয়ন দুটিতে নির্ঝরের অভিমানের ছায়া পড়ে। অনিলের মুখের দিকে চাহিয়া নির্ঝর বলে—"সত্যি খাবে না ?"

"খাব--এক সর্ত্তে।"

"কি সর্ত্তে ?"

"তুমি আমার সঙ্গে খাবে।"

"বুড়ো বয়সে তোমার সঙ্গে বসে খাব—লোকে বল্‌বে কি ?"

"নীরু এখানে এলে আমার সঙ্গে বসেত খায়ই—পাতের থেকে কেড়েও খায়।"

"নীরু ছেলেমানুষ!"

"ওর চেয়ে দু'বছরের বড় হয়ে তুমি 'হলে বুড়ো মানুষ! বেশ সঙ্গে না খাও, অন্ততঃ পাশে থাকবে—কিন্তু আমি যা খাব তাই তোমার খেতে হবে।"

হাল ছাড়িয়া দিয়া নির্ঝরিণী বলে "তোমার জ্বালায় অনুদা কিছু যদি করার যো থাকে!"

"তা যদি জানই, তবে এসব দুশ্চেষ্টা করাই বা কেন! মাসীমা মৃত্যু-শয্যায় আমায় বলে গেছেন—অনু, নীরিকে তুই দেখিস্। সুতরাং আমি তোমায় না দেখে পারি কি! দাও দেখি আর দুখানা রুটি, কি যে দিলে, মুখেই লাগ্‌ল না!"

নির্ঝর এবার বেশী করিয়া রুটি দিল। অনিল একখানা খাইয়া বলিল, "এতগুলি দিয়ে ফেল্লে যে ও কিছুতেই খাওয়া যাবে না। নাও, খাও দেখি দুখানা। আমি নিজে এ রুটিটা কিনেছি, সুতরাং ফেল্‌তে কিছুতেই পারি না।"

নির্ঝর একটুখানি হাসিয়া রুটি খাইতে সুরু করিল। অনিল জিজ্ঞাসা করিল, "মেশোমশায় নাকি মানভূম যাবেন আজ?"

"শুনেছি ত তাই।"

"এবার ত লম্বা পাড়ি—জায়গা কিন্‌বেন—তার কথাবার্ত্তা হবে, দলিল রেজিষ্ট্রি হবে—চট্ করে ত আর ফির্‌তে পার্চ্ছেন না। ওপরের চাবি সঙ্গেই নিয়ে যাচ্ছেন না কি? স্নানাহার যা কিছু সব ওখানে এ ক'দিন স্থগিত রাখার বন্দোবস্ত কর্চ্ছেন না ত?"

"বাবা যে রকম সব কাণ্ডকারখানা কর্চ্ছেন—তাতে আশ্চর্য্যিও নেই কিছু!"

"একবার ওঁকে ওখান থেকে বার কর্ত্তে পারলে, আমি ওঁকে এক আশ্রমে দিয়ে আসব। শক্তিমানের শক্তি সার্থক তখন, যখন তা দুর্ব্বলের রক্ষায় নিয়োজিত হয়। অসহায় অক্ষমের উপর প্রবলের অত্যাচারে এমন একটা নীচ কাপুরুষতা আছে যে তা বরদাস্ত করা সুকঠিন। মুখে বল্‌তে পারি না কিছু—বুকের ভিতর রক্ত ফোটে টগবগিয়ে। এক এক সময় মনে হয় দেশ ছেড়ে চলে যাই।"

"তোমার ত সেদিন বর্ম্মা থেকে এক এন্‌গেজমেন্ট লেটার এল!"

"এলেই কি আর যেতে পারি! আমি যদি এখন যাই ঘূর্ণীতে আমাদের টিম্বারের কারখানাটি মাটি হয়ে যাবে। দেখি আর দু এক বছর, তারপর যা হয় কর্ব্ব।"

নির্ঝর ভাল করিয়াই জানিত ঘূর্ণীর কারখানা চালান মুরারীবাবু, অনিল তাঁহার ফরমাশ মত দু একটা কাজ করিয়া থাকে মাত্র। কিন্তু সে অনিলের কথার কোনো প্রতিবাদ না করিয়া চুপ করিয়া রহিল।

অনিল বলিল, "ভাল, একটা খবর তোমায় দিতে ভুলে গেছি। পুষ্পবৃষ্টি চন্দনবৃষ্টি রক্তবৃষ্টি কর্দ্দমবৃষ্টির কথা ত শুনেছো, বেনারসী বৃষ্টির কথা শুনেছো কখনো?"

ঈষদ্ধাস্যে নির্ঝর বলিল "না।"

অনিল পকেটে হাত ঢুকাইয়া কুচি কুচি করিয়া কাটা এক মুঠা বেনারসীর টুকরা বাহির করিয়া নির্ঝরের হাতে দিল।

সবিস্ময়ে নির্ঝর বলিল "এ কি?"

"বাগানের পশ্চিম কোণে এগুলি আমি বৃষ্টি হতে দেখেছি। বল্লে ত বিশ্বাস করবে না, তাই কতগুলি কুড়িয়ে আন্‌লুম!"

নির্ঝর তাহার হাতের টুকরাগুলির দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল।

অনিল জিজ্ঞাসা করিল, "চিন্‌তে পেরেছো জিনিসটা? এ সেই সেদিনের সাড়ী। এর ভিতর একটা গভীর রহস্য আছে।"

এমন সময় উপরে জানালা খোলার শব্দ পাওয়া গেল। মুরারীবাবু দোতলা হইতে মাথা বাহির করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "নীরি, রান্না হয়েছে, খেতে আসব?"

"এস" বলিয়া নির্ঝর রান্নাঘরে মুরারীবাবুর ভাত বাড়াইতে গেল। অনিল বাহির বাড়ী চলিয়া গেল।

১৩

আষাঢ়ের বারিধারা রাত্রি হইতে অবিশ্রান্ত অবিচ্ছিন্ন ভাবে নামিয়াছে। মেঘান্ধকার প্রভাত। পাখীর দল উষায় ডাকিয়া উঠিয়া ক্লিষ্ট কণ্ঠে কখন থামিয়া গিয়াছে। জানালার খড়খড়ির ফাঁকে ধারা-ধূসর মলিন দিবসের নিষ্প্রভ আলো ঈষৎ চোখে পড়ে, নিশিশেষের পাণ্ডুর আকাশের মত। চারিদিকে জল-কোলাহল।

অনিল উঠিয়া জানালা খুলিয়া বাহিরের দিকে চাহিল, শালবনের ঘনপল্লব প্রচ্ছায় যে জলঙ্গী নদী ক্ষীণাঙ্গ সঙ্গোপন করিয়া নিঃশব্দে প্রবাহিত হইতেছিল, গর্জ্জিত কলস্বরে স্ফীত

কলেবরে সহসা তাহাকে তাহার চোখের সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করিতে দেখিয়া অনিল অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া গেল।

বারান্দা হইতে নির্ঝর ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "অনুদা, হোল কি আবার?"

অনিল বলিল, "দেখ্‌বে এস।"

নির্ঝর জলচৌকির উপর গলা বাড়াইয়া বাহিরের দিকে চাহিল।

অনিল জিজ্ঞাসা করিল, "কি দেখ্‌ছো?"

সবিস্ময়ে নির্ঝর বলিল "এ কি, নদীটা এত কাছে এসে পড়্‌ল কি করে! পূবের দিকে শালবনের সামনের জায়গাটা কোথায় গেল?"

"দেখে আসতে হচ্ছে ব্যাপারটা কি!" বলিয়া অনিল সার্ট গায় দিতে লাগিল।

নির্ঝর বলিল "অনুদা, আমি কিন্তু সাহস পাচ্ছি না।"

"কি সাহস পাচ্ছ না?"

"তেতালার ঘরে যেতে।"

"কথাটা আমিও ভেবেছি। আমার অবস্থাও তথৈবচ।"

"বাবা ত কাল রাত বারোটার গাড়ীতে গেলেন। শেষ পর্য্যন্ত আমি ছিলাম; কিছুতেই পারলুম না গিয়ে তালা খুলতে। ভাবলুম রাতটা কাটুক।"

"রাত ত কেটেছে, এখন কি কর্ব্বে?"

"তুমি এস সঙ্গে।"

"দাঁড়াও, আগে দেখে আস্‌ছি নদীর ব্যাপারটা কি।"

বাগানে বাহির হইতেই কুঞ্জবিহারী ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "বাবু ওদিক পানে যাবেন না. মাটিতে ফাট ধরেছে। কাল রাত্তিরে শালবনের মুখে অড়র ক্ষেতটা তলিয়ে নিয়েছে।"

চিন্তিত হইয়া অনিল বলিল "চল্ একটু দেখে আসি কতদূর ভাঙ্‌ল।"

বাগান ঘুরিয়া অনিল নদীর ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। কুঞ্জ বলিল "অত কাছে যাবেন না বাবু, নদীর কি কিছু বিশ্বাস আছে? ভাঙতে যখন লেগেছে একবার, কোথায় কতদূর ভাঙবে কে জানে!"

অনিল সরিয়া দূরে আসিয়া দাঁড়াইল, তাহার সঙ্গে সঙ্গেই যে জায়গাটা হইতে সে সরিয়া আসিল সেই জায়গাটা তুমুল জলোচ্ছ্বাসের ভিতর নদীগর্ভে মিলাইয়া গেল।

কুঞ্জবিহারী চীৎকার করিয়া উঠিল, বলাই দৌড়াইয়া আসিল।

অনিল হাসিয়া বলিল, "ভাগ্যিস্ তুই আমায় সাবধান করেছিলি কুঞ্জ, নইলে ত এখনই মরেছিলুম!"

পাড় ভাঙ্গিয়া পড়ার শব্দে রাস্তা হইতে আধা-বয়সী একজন ভদ্রলোকও সেখানে আসিলেন। ঘটনা শুনিয়া তিনিও বলিলেন. "বড় ভাগ্যে বেঁচে গেলেন মশাই, অতখানি পাড় সুদ্ধু ভেঙ্গে পড়্‌লে বাঁচার আশাও আর করতে হোত না।"

"নদী যে রকম ভাঙতে সুরু কোরেছে তাতে বিশেষ চিন্তার কারণই হোল বটে।"

"সামনে এই বাড়ীটায় থাকেন?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"আপনার পিতার নাম?"

"এ আমার মেসোমশাই মুরারীমোহন মহলানবিশের

"মুরারীবাবু—সেই যে বড় লেখক?"

"আজ্ঞে"।

ভদ্রলোক ফিরিয়া বাড়ীটার দিকে চাহিয়া বলিলেন "মুরারীবাবু আছেন বাড়ীতে?"

"না, মানভূম গেছেন।"

"বাড়ী ওঁর নিজের?"

"না, ভাড়াটে বাড়ী।"

"পরিবার আছেন?"

"আছেন।"

"আপনি ছেলেমানুষ—আপনাকে আমার সতর্ক করে দেওয়া উচিত মনে হচ্ছে। এত কাছে নদী রেখে নিশ্চিন্তে থাক্‌বেন না। আজ না হোক্ কাল পরশুই আপনারা বাড়ী ছেড়ে অন্যত্র যান। সাবধানের ত আর মার নেই। এ বাড়ীতে থাক্‌বেন না।"

ভদ্রলোক চলিয়া গেলেন।

কুঞ্জ ডাকিল, "বাবু"

অনিল তাহার দিকে ফিরিয়া কহিল, "কি রে?"

"বলাই বল্‌ছে কি—"

"কি বল্‌ছে বলাই ?"

"আসুন একটু এদিকে।"

বলাই উবুড় হইয়া মাটিতে অভিনিবেশ সহকারে কি দেখিতেছিল, অনিল তাহার কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি দেখ্‌ছিস্ ?"

"এজ্ঞে দেখুন চেয়ে"—

অনিল বিশেষভাবে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, "চুলের মত একটা দাগ ত দেখ্‌ছি।"

অনিল দাগটা কতখানি গেছে তাহা দেখিতে লাগিল।

বোঝা গেল না বেশী কিছু। মাটি যতদুর তৃণাবরণহীন ততখানিই দেখা গেল, তাহার পর খানিকটা ইঁটের স্তূপ, খানিকটা জঙ্গল, তাহার পরে মুরারীবাবুর বাড়ীর প্রাচীর।

কুঞ্জ বলিল, "পরশু কি বাবু, বাড়ী আজই ছাড়ুন।"

বলাই তাহার সঙ্গে সঙ্গে বলিল, "আর একদিনও নয় বাবু নদী মাটির তলায় ঢুকেছে—ছপ্ করে এখুনি না টেনে নেয়।"

দুশ্চিন্তিত হইয়া অনিল বলিল, "বিপদ ত এ রকম, এদিকে মেসোমশায় নেই—কি যে করি। কোথায় যাব, কোথায় বা বাড়ী পাব! তোরা বাড়ীওয়ালাকে ত চিনিস্। যা, তাকে খবর দিয়ে আয় আগে। দেখি আমি এদিকে কি কর্ত্তে পারি।"

ঘরে ঢুকিতেই নির্ঝর অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি দেখ্‌ছিলে অত ?"

"এস, তোমায় দেখিয়ে আনি, তা'হলে কথাটা আর বোঝাতে হবে না।"

"দেখব পরে, আগে তোমার মুখে শুনি ব্যাপার কি ?"

"শালবনের সমুখের অড়র ক্ষেতটা রাত্রিতে নদীগর্ভে ত গেছেই,—এখনো অনেক কিছু যাবে তার সঙ্গে। আরেকটু হলে আমি নিজেই গিয়েছিলাম—কুঞ্জটা আগে সতর্ক করায় বেঁচে গিয়েছি। মাটিতে কতদুর যে চিড় খেয়েছে তা বলা যাচ্ছে না। এখান থেকে আমরা যদি না সরি, তবে এক সময়ে হঠাৎ দালান কোঠা সব শুদ্ধ, জলঙ্গীর জঠরে লোপ পেয়ে যাব। আমি চল্লুম এখন উঠে পড়বার মত একটা জায়গা খুঁজতে, তুমি খাওয়া দাওয়াটা আজ খুব প্রাঞ্জল ভাবে বন্দোবস্ত করে ফেল। তেতালার মানুষটিকে এই সুযোগে তুমি একেবারে ফ্রি করে দিতে পারবে। আমার ফিরতে দেরী হলে তোমরা দুজনে গোছগাছ করে ফেলো।

যথাবিহিত উপদেশ দিয়া অনিল বাহির হইয়া গেল। নির্ঝরিণী চাবী লইয়া তেতালায় উঠিল।

১৪

মুরারী বাবু মানভূম হইতে ফিরিলেন। সুবিধা মত দরে অনেকখানি জমি কিনিয়া মনে তাঁহার উল্লাসের তরঙ্গ বহিতেছিল। ষ্টেশনে যখন নামিলেন, তখন অপরাহ্ণ। সঙ্গে একটি মাত্র সুটকেশ, সুতরাং গাড়ী ভাড়া করিলেন না, কুলির মাথায় সুটকেশ চাপাইয়া দিয়া হাঁটিয়া বাড়ী চলিলেন।

বাড়ীর রাস্তায় আসিয়া হঠাৎ তাঁহার মনে হইল যে বাড়ীটা দেখা যাইতেছে না।

মেটে বাড়ীও নয় চালা ঘরও নয়। তেতালা দালান—ক্রোশ দুই তফাতের রাস্তা হইতে তাহার মাথা দেখা যায়—আজ কেন তাহার চিহ্নমাত্রও দেখা যাইতেছে না! সবিস্ময়ে চারিদিকে চাহিয়া মুরারী বাবু সঙ্গের কুলিকে কহিলেন, "আরে কিধর্ আয়া তোম্? ই কৌন রাস্তা হ্যায় ?"

কুলি একবার রাস্তার দিকে একবার মুরারী বাবুর দিকে চাহিয়া কহিল, "হাম্ নয়া আয়া বাবু, হাম্ নেই জানতে ইধর কিধর হ্যায়।"

মুরারী বাবু মহা ধন্দে পড়িয়া চলিতে লাগিলেন। ক্রমে শালবনের সম্মুখে পর্য্যন্ত বিস্তৃত অদূরবর্ত্তী জলঙ্গীর ধবল বীচি-বিভঙ্গ চোখে পড়িল।

তখন রাত্রি আসন্ন প্রায়। চারিদিক জনমানবহীন। পথের দুধারে তরুতলে অন্ধকার নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে, অরণ্য-শির দিগন্তে মিশিয়াছে। অন্ধকারে একদিকে একটা দেয়ালের কোলে ইটের একটা স্তূপ মাত্র দেখা গেল। মুরারী বিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

কুলি অসহিষ্ণু ভাবে কহিল, "আরে বাবু ক্যিা জঙ্গলমে

ক্যা করেজে—চলিয়ে ছুসরা রাস্তা—কোঠি জরুর মিল্ জায়গা। হিঁয়া শূনা পর্ ক্যা দেখতে!"

মুরারী বাবু ফিরিয়া চলিলেন।

বড় রাস্তায় আসিয়া মোক্তার মহিম বাবুর সহিত সাক্ষাত ঘটিয়া গেল। মহিম বাবু চলিতে চলিতে থামিয়া গিয়া বলিলেন, "কোথায় যাচ্ছেন মুরারী বাবু?"

"যাচ্ছিলুম ত বাড়ী, কিন্তু রাস্তাটা যেন অন্ধকারে ঘুলিয়ে গেছে—ঠিক পাচ্ছিনা কোন্ দিকে যাব। আপনি কি জানেন—"

"আজ্ঞে জানি বই কি! কিন্তু আপনার কি বিপদ হয়ে গেছে তা আপনি জানেন না দেখছি। এসেছিলেন আপনি ঠিক রাস্তায়—কিন্তু আপনার বাড়ীটি গত শুক্রবার মাঝ রাত্রিতে নদীতে ভেঙ্গে নিয়েছে। আশ্চর্য্যি যে খবরটা আপনার কাছে পৌঁছে নি এখনো।"

"বাড়ী নদীতে ভেঙ্গে নিয়েছে—আর আমার স্ত্রী, আমার মেয়ে—কোথায় তারা?"

মুরারী বাবুর কম্প্র কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল।

মাথা চুলকাইয়া মহিমবাবু কহিলেন, "আজ্ঞে, তাঁদের খবর আমি বল্‌তে পারলুম না। আপনি এই রাত্তির বেলা কোথায় যাবেন, আমার ওখানেই চলুন, কাল সকালে তাঁদের খবর পাওয়া যাবে। হয়ত তাঁরা চলে গেছেন—নয়ত এখানেই কোথাও আছেন। খোঁজ পাব নিশ্চয় সকালে।"

"বল্‌ছেন মাঝ রাত্রিতে বাড়ী ভেঙ্গেছে—তারা তখন ঘুমিয়ে ছিল—কে তাদের জাগিয়েছে—কে তাদের এ বাড়ী থেকে টেনে নিয়ে গেছে?

"সহরে এত জায়গা থাকতে মশাই বা কেন এমন জন-মানবহীন স্থানে বাড়ী নিয়েছেন! পশুপক্ষীও দলবদ্ধ হয়ে বাস করে—একের বিপদে আর একজন সহায় হয়—কিন্তু আপনি যে-ভাবে বাস করেছেন—তাতে ভগবান ভিন্ন মানুষের সাহায্যের কোনো পথ রাখেন নি। অত রাত্রে এখানে কি ঘটেছে তা কে-ই বা দেখেছে—কেই বা জানে। যে-ই যা বল্‌ছে—সবই ত অনুমানের ওপর। যাক্ এখন দুর্ভাবনা করে কোনো লাভ নেই, আশা-ই করা যাক্ যে তাঁরা কোথাও আশ্রয় নিয়েছেন।"

মুরারী বাবু কোনো কথা কহেন না দেখিয়া মহিম বাবু তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া চলিলেন।

রাত্রি কাটিল বিনিদ্র চিন্তায় ও পথে পথে ঘুরিয়া বিলাপে প্রলাপে। আয়ত্তের ভিতরে যে চন্দ্রলেখা অতি সামান্য নারীরূপে প্রতিভাত হইয়াছিল, আয়ত্তের বাহিরে সেই চন্দ্রলেখা উদিত হইল অলোক-সামান্যা মহীয়সী রূপে। সঙ্গে সঙ্গে নিজের হীনচিত্ততা, ক্রুর কুটিল ঈর্ষা, নীচ স্বার্থপরতা, হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতা, কঠিন অত্যাচারের সহস্র স্মৃতি সহস্রমুখী অগ্নিশিখার মত চিত্ত বেড়িয়া জ্বলিতে লাগিল।

ললাটে করাঘাত করিয়া মুরারী বাবুর ললাট ফুলিয়া গেল, কাঁদিয়া চক্ষু রক্তবর্ণ হইল, ধূলায় কেশ ধূসর হইল।

রাত্রি প্রভাতে আবার নূতন করিয়া খোঁজ চলিতে লাগিল। সঠিক খবর কেহই বলিতে পারিল না। একমাত্র বাড়ীওয়ালা, যে ঘটনাটা খাঁটি জানিত, অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাকেও পাওয়া গেল না। তিনি নবদ্বীপ তীর্থে গিয়াছেন।

দুপুর বেলা ভবেশ আসিল। মুরারী বাবু তাহাকে দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

ভবেশ নত হইয়া পায়ের ধুলা লইয়া বলিল, "কি হয়েছে, এমন কর্চ্ছেন কেন, দেশের থেকে কোনো দুঃসংবাদ এসেছে কি? বৌদির ত চিঠি পেয়েছি, তাঁরা ত ভালই আছেন।"

"দেশের কথা কি বলছো ভবেশ আমার স্ত্রী কন্যা—"

উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনে মুরারী বাবুর বাক্‌রোধ হইয়া গেল।

ভবেশ আশ্চর্য্যে কহিল, "কেন, আপনার স্ত্রী কন্যার কি হয়েছে, তাঁরা ত ভালই আছে। এই মাত্র ত আমি তাঁদের সঙ্গে কথা কয়ে এলুন।"

"তারা ভাল আছে? তুমি এই মাত্র তাদের সঙ্গে কথা কয়ে এলে? সত্যি বলছ?"

"তাঁরা যে আমার বাড়ীতেই আছেন!"

"তাঁরা তোমার বাড়ীতেই আছেন?"

মুরারী বাবু বিস্ফারিত প্রদীপ্ত চক্ষে ভবেশের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

ভবেশ বলিল, "যেদিন বাড়ী নদীতে নিল, সেদিন সন্ধ্যাবেলা জিনিস পত্র নিয়ে ওঁরা আমার ওখানে চলে

এসেছিলেন। বিদেশে অনর্থক আপনাকে উদ্বাস্ত করে কোনো লাভ নেই বলে দুদিনের জন্য আপনাকে খবর দেওয়া হয় নি। আপনার ত আর কিছু ক্ষতি হয় নি—বাড়ীটা শুধু বদ্‌লাতে হোল, এই যা এ দুদিনে আমি ও অনিল বাড়ী দেখেও রেখেছি।"

শোক ও হতাশার স্থানে মুরারী বাবুর মুখে এবার ক্রোধের আভা ফুটিয়া উঠিল। বলিলেন, "তোমরা ত আচ্ছা ফোকরদালাল হে! বাড়ী আমার, বিপদ হোল আমার—আর আমাকে তোমরা একটি বর্ণও জানানো দরকার মনে করলে না; কাল সন্ধ্যা থেকে এ পর্য্যন্ত আমি এই যে হা-হতোস্মি করে পথে পথে ঘুরে বেড়ালুম—এ ত সম্পূর্ণ নিরর্থক! নিজেও হায়রাণ হয়েছি—যে ভদ্রলোকের বাড়ীতে আছি,—তাকেও হায়রাণি করেছি। এখন পর্য্যন্ত স্নানাহারও হোত না যদি না মহিম বাবু জোর করেই নাওয়া খাওয়াটা করাতেন।"

"আজ্ঞে, আপনি যে কাল এসেছেন তা কি করে জানব। বাড়ীতে আসার খবরটা পূর্ব্বাহ্ণে যদি দিতেন, হ'লে আমরা ষ্টেশনেই থাকতে পার্ত্তুম। আজ লোকমুখে আপনার আসার খবর পেয়ে খোঁজ করে করে এখানে এসেছি। বিপদের খবর আপনাকে নিশ্চয়ই দেওয়া হোত,—তা নির্ম্মল দি বল্লেন যে আপনি বিষয়-কর্ম্মে ওখানে গেছেন—খবরটা ওখানে দিলে আপনার কাজের সমূহ ক্ষতি হবে। বিপদ ত এখানে কিছু ঘটে নি—যা হয়েছে আপনি এসে দেখ্‌লেও এমন কিছু হানি হবে না। যাক্, যা হ'বার তা হয়ে গেছে, চলুন এখন আমার বাসায়।"

পুরা আধ ঘণ্টা টয়লেট করিয়া পাটভাঙ্গা ধুতি চাদরে বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া মুরারী বাবু ভবেশের সঙ্গে বাহির হইলেন।

নীরজা তখন কাজের শেষে শ্রান্তি দূর করিতেছে। চন্দ্রলেখা ও অনিল ভবেশের বসিবার ঘরে এর পর চন্দ্রলেখার ললাটে যাহা ঘটিবে সেই নিরতিশয় স্বচ্ছ ভবিষ্যতের সমালোচনা করিতেছিল। অনিল জোর করিয়া বলিতেছিল, "এবার আমার কথা রাখুন—আপনি আপনার মার কাছে চলে যান।"

ম্লান হাস্যে চন্দ্রলেখা বলিল, "কী ছেলেমানুষি কথাই যে বল! আজ মা'র কাছে যেতে পারি—কিন্তু কাল? মুক্তি যদি চাই—তবে সে মুক্তি সর্ব্বৈব সত্য কি না তা আমায় যাচাই করে নিতে হবে। ভীরুতা ছিল অনেকখানি—কিন্তু আজ আর তা নেই। বন্ধন মোচন হয়ে গেছে। এখন যে পথ চাই—সে পথের শেষে ক্লাইও গ্লানি না থাকে, এই চাই।"

"মেশোমশায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আপনাকে রক্ষা করার ক্ষমতা আমার নেই। যন্ত্রণা লাঘব কর্ত্তে গিয়ে তাতে যন্ত্রণাই শুধু বাড়াব। আপনার মুক্তি আপনার নিজের হৃদয়বলের উপরই নির্ভর করে—এইটি আপনি নিশ্চিত জানবেন। নইলে—আমি যদি আলাদা বাড়ী করি—আপনি সেখানে—

চন্দ্রলেখা বলিল "জানি। কিন্তু সবই নিরর্থক। অনেক কিছুই ভেবেছি,—অনেক পথ খুঁজে ফিরেছি। একটা চরম চিন্তা এখন মনে জাগ্‌ছে—যে দিন সে সঙ্কল্প কাজে পরিণত করতে পার্ব্ব—সেদিন আপনাকে জানাব, তার আগে কিছু কইব না।"

অনিল হাসিল, বলিল, "একেবারে রেভলিউশনারি স্পিরিট!"

"প্রবলের পীড়ন দুর্ব্বল সয় ততদিন যতদিন দুর্ব্বলের ভগবান চরম পেষণে চক্ষু মেলে না তাকান।"

চন্দ্রলেখার কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে মুরারী বাবু ঘরে ঢুকিলেন। অনিল মাথা নীচু করিয়া অন্য দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেল।

অলোক-সামান্যা মহীয়সী চন্দ্রলেখা সামান্যা নারী রূপেই আবার মুরারীবাবুর চক্ষে প্রতিভাত হইল। ক্রোধে তাঁহার চক্ষু জবাকুসুম সঙ্কাশ হইয়া উঠিল, ললাটের শিরা স্ফীত হইয়া নাসারন্ধ্রে ঝটিকা বহিতে লাগিল।

চন্দ্রলেখা মুরারীবাবুর দিকে চাহিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল।

দন্ত কড়মড়ির সঙ্গে মুরারীবাবু যাহা কহিলেন, চন্দ্রলেখা তাহা শুনিয়া দুই হাত দিয়া কর্ণরোধ করিল।

খানিক পরে ঘরের ভিতর হইতে অস্ফুট একটা

চীৎকারের শব্দ শোনা গেল, ভবেশ ও নীরজা দৌড়াইয়া ঘরে ঢুকিল। ভবেশ মুরারীবাবুকে টানিয়া ঘরের বাহিরে লইয়া গেল, নীরজা ভূপতিত চন্দ্রলেখাকে ধরিয়া তুলিয়া বসাইল।

ললাটের বিগলিত শোণিত-ধারা অঞ্চলে মুছিয়া চন্দ্রলেখা নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিল। নীরজা জল আনিয়া মুখ ধোয়াইয়া কপালে জলপটি দিয়া দিল।

চন্দ্রলেখা বলিল, "নীরো, বয়সে আমি যা-ই হই—তবু আমি তোমার মা, তুমি আমার মেয়ে। তোমার নিজের মায়ের এ অবস্থা যদি তুমি চোখে দেখ্‌তে—কি করতে?"

গাঢ় স্বরে নির্ঝর বলিল, "সে কথা আমায় জিজ্ঞাসা কোরো না—এর উত্তর এমনি দেওয়া যায় না।"

"থাক্‌ ও কথা। আরেক কথা বলি তবে শোনো। আজ রাত্রি শেষের ট্রেণে আমি আমার মায়ের কাছ যাব—তোমরা আমার সাহায্য না কর, বাধা দিয়ো না। সেখানে এক মিশনারী মেমের সঙ্গে আমার আলাপ আছে—এখন আমি তাঁর আশ্রয় নিতে যাচ্ছি। লোকের নানা কথায় তোমরা নানা ভাবনায় পড়বে—তাই তোমাকে আমার উদ্দেশ্য বলে গেলুম।"

অনিল নিঃশব্দে আসিয়া কাছে দাঁড়াইল। চন্দ্রলেখার কথা শেষ হইলে সে বলিল, "এবার আপনার ভগবান আপনার ভিতর জেগেছেন। দুঃখ স্বীকার করার ভিতর আছে মহত্ত্ব, কিন্তু দুর্গতি স্বীকারে আছে হীনতা। এই লাইন অফ্‌ ডিমার্কেশন যে-ই ভোলে সে-ই অধঃপতনের পথে দাঁড়ায়। আমার এই আমি—সে অনেক বড় আমি—সে হচ্ছে ত্রিকালের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত বিরাট দেব। কোনো কিছুর জন্যই তাঁকে খর্ব্ব করা যায় না, ক্ষুদ্র করা যায় না। পৃথিবীর যত কিছু ব্যাপার—সুখ, দুঃখ, হাসি, কান্না, রৌদ্র, বৃষ্টি, তুফান—আসে আর যায়—কিন্তু আমার এ আমি,—অটল, অবিচল, অক্ষয়—শাশ্বত মূর্ত্তি। এ আমির সমকক্ষ কিছু নেই। এ শঙ্করের শিবময় আমি, বেদান্তের চিন্ময় আমি—এ আমি সবার বাড়া আমি, সবার বড় আমি।"

নির্ঝর বিস্মিত নয়নে অনিলের দিকে চাহিয়া ছিল, অনিল থামিলে বলিল "কবে থেকে তুমি এমন তাত্ত্বিক হ'লে? নীরু যদি থাক্‌ত তা'হলেও ব্রেভো দিত—আমি যদি দি—তুমি মনে কর্ব্বে ঠাট্টা—তাতে তুমি যা বল্‌ছিলে তার করা হবে অপমান।"

অনিল নির্ঝরের মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলে—"এর একটা মানে আছে। জগতে কারণ বিনা কার্য্য নেই। যে তব্‌লা বাজায় সে গায় না—কিন্তু যে গায়, তার সুরের সঙ্গে তাল রাখতে তাকে সুরসাধনা কর্ত্তে হয় গায়কের সঙ্গে সম মাত্রায়। আমি পড়ে গেছি এমনি এক তবল্‌চির সঙ্গে, তার সুরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে রাখতে আমার কর্ত্তে হচ্ছে অসাধ্য সাধন।"

চন্দ্রলেখা অনিলকে বলে "তোমাকে আমি বুঝতে চেষ্টা করেছিলুম কিন্তু পারি নি ঐ জন্যে—যা ধরেছি তার বাইরে রয়েছে অনেকখানি। তবু তোমার কাছ থেকে আমি পেয়েছি অনেক। ছিলুম একটা জেলিফিশের মত, —তুমি আমার ভিতর অস্থি সঞ্চার কোরেছো। তোমার বাণী আমার জীবনে আমি সফল করে তুল্‌বো, এই রইলো আমার সব চেয়ে বড় দুরাকাঙ্ক্ষা!"

১৫

ভোর বেলায় উঠিয়া নির্ঝরিণী মুরারীবাবুকে লইয়া নতুন বাড়ীতে আহারাদির বন্দোবস্ত করিতে গেল, অনিল গেল বাজার করিতে। সঙ্গে ভবতোষও আসিয়া জুটিল।

মুরারীবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, বাড়ীতে কে রহিল।

অনিল বলিল বাড়ীতে রহিল চন্দ্রলেখার ভাই। এখানকার সংবাদ জানিয়া তাহার মা তাহাকে মেয়ের কাছে পাঠাইয়াছিলেন! কাল সন্ধ্যাবেলা সে আসিয়াছে।

মুরারীবাবু ভ্রূকুটি করিলেন।

বাড়ীটা পুরাতন, এখানে ওখানে ভাঙ্গা, কপাট, চৌকাঠ কোন কোনটা খসিয়া পড়িয়াছে। একতালায় চারিখানি ও দোতালায় দুখানি ঘর। সব দেখা শুনা ও কোন ঘরে কে থাকিবে ইত্যাদি মীমাংসা হওয়ার পরে নির্ঝরিণী বলিল, "আর সব এক রকম চলে যাবে,—কিন্তু সামনের ওই কপাট দুটো ও ওপরের গোটা দুই জানালা আজই সারিয়ে না নিলে

রাতে নির্ঘাত চুরি হবে। হয় তোমরা বাড়ীওয়ালাকে খবর দাও, নয়ত নিজেরা মিস্তিরি লাগাও।"

অনিল বলিল "মিস্তিরির ওখানে আমি যদি যাই, তবে বাজার কে করে দেবে? ভবতোষবাবু—"

ভবতোষ মুখের কথা কাড়িয়া বলিল, "আর আমার যে গরুরগাড়ী আন্‌বার কথা। এখন গাড়ীর যোগাড় না কর্ত্তে পার্লে সারাদিনেও আর গাড়ী পেতে হবে না।"

মুরারীবাবু বলিলেন, "তা বটে। বাড়ীওয়ালার ঠিকানাটা দাও, আমিই যাচ্ছি সেখানে। বাড়ী হোল পরের—মিস্তিরি খরচা আমি কেন দিতে যাই! শেষে ভাড়ায় কাটতে রাজি যদি না হয় তবে তখন লাগ্‌বে খিটি মিটি!"

ভজুয়াকে নিঝরের ফরমাস খাটিবার জন্য রাখিয়া তিন জন তিন দিকে বাহির হইয়া গেল।

বাড়ীওয়ালার বাড়ী যাওয়া মাত্র বাড়ীওয়ালার সঙ্গে মুরারী বাবুর সাক্ষাৎ হইল না। ঘণ্টা দুই সেখানে বসিয়া থাকিয়া তাহার পর তাহার সঙ্গে তর্কবিতর্কাদি করিয়া মিস্তিরি লইয়া ফিরিতে বেলা হইয়া গেল বিস্তর। রান্নাবান্না তখন প্রায় হইয়া গিয়াছে, অনিল ভজুয়াকে লইয়া উপরের ঘর ধোয়াইতেছে, ভবতোষ গরুর গাড়ী লইয়া বসিয়া আছে।

নির্ঝর বলিল "বারোটা যে বাজিয়ে দিলে বাবা? নাইবে খাবে কখন! এর পর মাল পত্তর আনা রয়েছে।"

মুরারীবাবু জুতার ফিতা খুলিতে খুলিতে বলিলেন, "ওরা মাল আনলেই ত হোত!"

"তা ত ওরা গেল না, তোমার জন্যে বসে রয়েছে।"

ভিতরকার কথাটা নির্ঝরিণীও কিছু বলিল না, এবং মুরারীবাবুও সে সম্বন্ধে আর কোন উচ্চবাচ্য করিলেন না।

নির্ঝর বলিল, "জুতো আর খুল্‌ছো কেন, ওবাড়ী যাও। ভবতোষবাবুকে মাল আন্‌তে লাগিয়ে দাও, তুমি মাকে নিয়ে এস।"

মুরারীবাবু ফিতা পালটিয়া বাঁধিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

নির্ঝর বলিল, "ভবতোষবাবু, গাড়ী ওবাড়ী পৌঁছুতে পৌঁছুতে আপনি নেয়ে খেয়ে যান।"

ভবতোষ বলিল, "আমার চাকরের অবশ্য আমার জন্য রাঁধার কথা। কিন্তু আমি যেকালে বাড়ী নেই—সেকালে তার হলিডে এন্‌জয় করার দিকে ঝোঁক হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা। এক্ষেত্রে আপনার নিমন্ত্রণ গ্রহণ না করা সুবুদ্ধির কাজ হবে না। যো ধ্রুবানি পরিত্যজ্য সুধীজনের উপদেশ রয়েছে।"

মুরারীবাবু চলিয়া গেলেন, অনিলকে লইয়া ভবতোষ স্নান করিতে গেল।

অনিল ভাতে হাত দিয়াছে এমন সময় চন্দ্রলেখার ভাই কুমুদ আসিল। হাতে তাহার বড় বড় গোটা চারি কাগজের মোড়ক।

অনিল জিজ্ঞাসা করিল, "কি কুমুদবাবু কি কেনা হল?"

মোড়কগুলি তাকের উপর সাবধানে রাখিয়া কুমুদ বলিল, "কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল কয়েকটা কিন্‌লুম।"

"কোথায় পেলেন? বাড়ীতে এনেছিল?"

"না। লেখা বল্লে ঘূর্ণী গিয়ে কিনে আন্‌তে। অমনি স্থানটাও দেখা হোল। সহরটাও একটু ঘুরে দেখে এলুম। রটন প্লেস্ মশাই। মিউনিসিপ্যালিটির বন্দোবস্ত অতি সুচারু! এর চেয়ে গ্রাম ঢের ভাল।"

ভবতোষ বলিল "ভাগ্য-গতিকে যখন পৃথিবীর এই বিশেষ অংশেই বাসা বাঁধতে হয়েছে, তখন চেঁচামেচি করে আর কি কর্ব্ব বলুন! কিন্তু আপনাকে না আমরা বাড়ীর চার্জ্জে রেখে এলুম, আপনি কার চার্জ্জে বাড়ী রেখে এলেন?"

"আমার কোনো দোষ নেই মশাই। আর্লি এক কাপ্ চা খেয়ে আমি লম্বা একটা ঘুম দেবার বন্দোবস্ত কচ্ছিলুম, কিন্তু লেখা কিছুতেই আমায় তা দিলে না। এখনই তার এ পুতুল না কিনে আন্‌লে কিছুতেই চল্লে না। বল্লুম—আমি যাব যে, বাড়ীতে থাকবে কে? বল্লে বাড়ীতে থাকব আমি! আমি কি কচি খুকী না মনুষ্যেতর জীব যে তুমি আমায় পাহারা দেবে? আমরা নিযুক্ত আছি অন্ হার ম্যাজেষ্টিস্ সারভিস্এ কাজেই যা হুকুম করলেন, তাই কল্লুম। এখনকার মেয়েরা কি আগেকার মেয়েদের মত পুরুষের ডিপেণ্ডেণ্ট মশাই, তাঁদের এখন ইম্পীরিয়াল মেজাজ—অর্ডার ওবে করা চাই-ই। অনিলবাবুকে একটা চিঠি দিয়েছেও—এখনি ভুলে যাচ্ছিলুম।"

বলিয়া কুমুদ পকেট হইতে হাতড়াইয়া চিঠি বাহির করিয়া অনিলের হাতে দিল।

অনিল চিঠিটা পিড়ীর উপর উল্টাইয়া রাখিয়া খাইতে সুরু করিয়া আবার থামিয়া গিয়া নিঝ´রকে বলিল "তুমি পড়ে দেখ, হয়ত কোনো জরুরী কথা আছে—যা এখনি করা অথবা দেখা দরকার হতে পারে।"

চিঠি পড়িতে পড়িতে নিঝ´রের মুখ ফ্যাকাশে হইয়া গেল, চিঠিটা নিঃশব্দে সে অনিলের হাতে দিল। চিঠিতে কোন পাঠ নাই। শুধু কয়েকটি ছত্র মাত্র, তাহা এই—

আমায় ক্ষমা করো। আমার সব চেয়ে বড় যে দুরাকাঙ্ক্ষা—তা-ও আমায় ত্যাগ কর্ত্তে হোল। জিজ্ঞাসা কর্বে—কেন? তার উত্তর হচ্ছে এই দিনের পরে দিন মাসের পর মাস মরণান্ত কাল পর্য্যন্ত নিত্য নিরন্তর যুঝে আপনাকে টিঁকিয়ে রাখার শক্তি ও সাহস আমার হবে না। গাছে ফুল ফোটে বটে—কিন্তু সে ফুল আসলে ফোটায় সূর্য্য। যে গাছ আলো পায় না—তা বাড়েও না ফুলও ফোটায় না। সে গাছ নিরর্থক। কার জন্যে আর কি জন্যেই বা আমার যুঝাযুঝি! এ সুখহীন স্বাদহীন লক্ষ্যহীন দুর্ব্বহ দুর্ভর জীবন নিয়ে আমি কর্ব্ব-ই বা কি—করবার প্রয়োজনই বা কি!

কালোহ্যয়ং নিরবধি, বিপুলা চ পৃথ্বী। সুতরাং একটি কথা বলে যাব। আমার কথা যখন মনে করবে - তখন মনে করো আমার মত শত সহস্র মেয়ে নিরন্তর কাল ব্যেপে এই দেশে এই ভাবে জীবন কাটাচ্ছে। হিন্দু স্বামীর অধিকারের অন্ত নাই, কিন্তু হিন্দু স্ত্রীর পাদমেকং রাখ্বার জায়গা নেই। ওরা কীট পতঙ্গেরও অধম। ওদের প্রয়োজন শুধু পুরুষের সেবার জন্যে। তাও সমষ্টিভাবে—ব্যক্তি হিসাবে না আছে তাদের কোনো মূল্য—না আছে ওজন কোনো স্থান! ওদের পরে কারো দয়া নাই, মায়া নাই, করুণা নাই, সহানুভূতি নাই,—মানবোচিত কোনো কর্ত্তব্য নাই। অত্যাচার, অবিচার, উৎপীড়ন, নিগ্রহ হচ্ছে ওদের ওয়েজেস্ অফ্ লাইফ্। কশাইর হাতের পশু ওরা—ওদের জন্ম জবাই হবার জন্যে,—তার ওপর কারো কিছু বল্‌বারও নেই করবারও নেই। যদি পারো—এই অতি নিঃসহায় নিরুপায় নিরাশ্রয় সকলের উপেক্ষিত ও পরিত্যক্ত হতভাগিনীদের দুঃখ লাঘবের কোনো একটা প্রচেষ্টা কোরো—আমার আত্মা তাতে তৃপ্তি লাভ কর্বে।

জগতের এই নেওয়া-দেওয়ার আনন্দের হাটে—আমার দেওয়াও হোল না কিছু—নেওয়াও হোল না কিছু। এসেছিলুম রিক্ত—ফিরেও চল্লুম রিক্ত!

চিঠিটা দুমড়াইয়া পকেটে গুঁজিয়া অনিল উঠিয়া দাঁড়াইল। কুমুদ সবিস্ময়ে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, "হোল কি?"

অনিল সে কথার উত্তর না দিয়া বলিল, "এ চিঠি আপনাকে কখন দিয়েছিলেন?"

"গোটা সাতেক হবে তখন। ব্যাপার কি?"

ভাতের গ্রাস ফেলিয়া কুমুদ কুণ্ঠিত দৃষ্টিতে অনিলের দিকে চাহিল।

"সাতটায় চিঠি দিয়েছিলেন? তবে আর আশা নেই—আমি চল্লুম।"

অনিল হাত ধুইয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। কুমুদ তাহার অনুগামী হইল। বিবর্ণ মুখে ভবতোষ উঠিয়া পড়িল। নিঝ´রিণী রান্নাঘরে শিকল তুলিয়া দিয়া ভজুয়াকে গাড়ী আনিতে হুকুম দিল।

মুরারী বাবু ততক্ষণে বাসায় পঁহুছিয়াছেন। এ ঘর ওঘর করিয়া চন্দ্রলেখার সাক্ষাৎ পাইলেন না। ছাদে কাপড় মেলিতে গিয়াছে মনে করিয়া রাগত ভাবে ছাদে উঠিলেন। সাড়ীতে কি আর জায়গা নেই ছাদে তাই কাপড় মেলিতে ওঠা হইয়াছে? উদ্দেশ্য যাহা—তাহা তিনি আর কিছু বোঝেন না! এক মিনিট ছাড়া পাইয়াছে কি অমনি নষ্টামীর ফন্দী! মেয়ে জাত কি ভয়ানক জাত! শাস্ত্রকারেরা ওদের কালসর্পিণী নাম কি সাধে দিয়াছেন! সাধু পুরুষেরা নারীমুখ দর্শন পর্য্যন্ত করেন না। নারী নরকের দ্বার, যত অনর্থ অশুভের মূল।

ভাবিতে ভাবিতে মুরারী বাবু ছাদে পঁহুছিলেন। ছাদে সিঁড়ীর সংলগ্ন একটি চিলকুঠরী, তারও দরজা বন্ধ।

দেখিয়াই মুরারী বাবুর মেজাজ চড়িয়া গেল। দুপুর বেলা রোদে ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া তিনি আসিয়াছেন—স্নানাহার পর্যান্ত হয় নাই—কোথায় আগ্‌ বাড়াইয়া ঘরে লইবে, আদর আপ্যায়নে শ্রম দূর করিবে—তাহা দূরে থাক্—খুঁজিয়া পাওয়ার পর্যান্ত সাধ্য নাই। কি লক্ষ্মীছাড়া মেয়ে মানুষ লইয়াই তিনি পড়িয়াছেন!

দরজায় মুষ্ট্যাঘাত করিয়া মুরারী বাবু সগর্জ্জনে কহিলেন, "কপাট খোল।"

ভিতর হইতে কোনো উত্তর আসিল না।

মুরারী মুষ্ট্যাঘাতের পরিবর্ত্তে পদাঘাত করিলেন, কপাট ঝন্‌না দিয়া বাজিয়া উঠিল। তাহার ওপিঠে নিশ্চল গহন গম্ভীর নীরবতা তেমনি অক্ষুণ্ণ রহিল।

মুরারী বাবু গালাগালি ধরিলেন। কপাট যখন খুলিতেছে না—তখন নিশ্চয় ঘরে অন্য লোক। অনিল, ভবতোষ ত ওবাড়ীতে—এ নূতন লোকটি কে? হয়ত ওর মামাত ভাই কুমুদ-ই! আশ্চর্য্যই বা কি তাতে! অসৎ স্ত্রীলোকের অসাধ্য কোনো কাজই নাই! এবার ধরা পড়িবে হাতে হাতে!

মুরারী বাবু নিঃশব্দে নীচে নামিয়া গিয়া রান্না ঘরের দাওয়া হইতে কুড়াল খানা লইয়া আসিলেন।

ভাড়াটে বাড়ীর পুরাণো দরজা—গোটা কয়েক বাড়িতেই ভাঙ্গিয়া পড়িল। কুঠার হস্তে মুরারী বাবু অরাতির ব্যূহ-কেন্দ্রে ধাবমান রোমান বীরের মত কক্ষমধ্যে ধাবিত হইলেন। কিন্তু অগ্রসর হইতে পারিলেন না।

ঘরের ভিতর এক পা বাড়াইতে না বাড়াইতে ছিটকাইয়া বাহিরে আসিয়া পড়িলেন। ঘরের মাঝখানে কড়িকাঠে দড়িবাঁধা আবৃতবদনা, শুভ্রবসনা, নিরাভরণা, বিমুক্তকুন্তলা এক নারীর শবদেহ ঝুলিতেছিল, মুরারী বাবুর ধাক্কা খাইয়া তাহা নিঃশব্দে দোল খাইতে লাগিল।

মুরারী বাবুর জিহ্বা শুষ্ক হইয়া তালুতে লাগিয়া গেল, হাত পা অসাড় হইয়া গেল, পিছনের দেয়ালে ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইয়া সম্মুখের এই দারুণ বিভীষিকার দিকে বিচেতনের মত চাহিয়া রহিলেন।

নীচে অনিল নির্ঝরিণী ও ভবতোষের গলা শোনা গেল। মুরারী বাবুর ইচ্ছা হইল চীৎকার করিয়া তাহাদের ডাকেন, নয়ত দাঁড়াইয়া এখান হইতে পলাইয়া যান। কিন্তু চীৎকার করিতে গলা খুলিল না, পলাইয়া যাইতেও পা উঠিল না। কে বা কাহারা জুতা পায় সিঁড়ী দিয়া দ্রুতপদক্ষেপে উপরে উঠিতে লাগিল, তাহাদের পদশব্দ বহু দূরাগত শব্দের মত মুরারী বাবুর কাণে অস্পষ্টরূপে ধ্বনিত হইতে লাগিল।

বিশ্রী একটা কোলাহলের মাঝখানে মুরারী বাবু ঘরের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন "ওকে ও?"

ভবতোষ, কুমুদ, নির্ঝরিণী নির্ব্বাক্ হইয়া সেই অনাবৃতমুখ শুভ্রবসনা নিরাভরণা শবের দিকে চাহিয়া থাকে।

মুরারী বাবু সহসা উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়া "এ ভবতোষের গুণ্ডামী—ওর বাড়ীতে এ বিধবা কোত্থেকে এল?"

অনিল ছিল সকলের পিছনে দাঁড়াইয়া। মুরারী বাবুর কথায় সে অগ্রসর হইয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করে, ভবতোষকে বলে "আর কিছু না পাও, নীচ থেকে বঁটিটা নিয়ে এস।"

ভবতোষ দৌড়াইয়া গিয়া বঁটি আনে। দুইজনে দড়ি কাটিয়া শবদেহ বাহিরে আনিয়া শোয়াইয়া দেয়। অনিল মুরারী বাবুর দিকে চাহিয়া বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে বলে, "দেখে যান এ কে।"

মুরারী বাবুর পা চলে না, তবু আকৃষ্টবৎ গিয়া শবের কাছে দাঁড়ান।

অনিল শবের গলা হইতে দড়ি খুলিয়া মুখাবরণ উন্মোচন করে।

নির্ঝরিণী উচ্চকণ্ঠে কাঁদিয়া ওঠে, কুমুদ চন্দ্রলেখার নাম ধরিয়া চীৎকার করিয়া ওঠে, ভবতোষ দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ফোঁপায়। শিয়রের কাছে মুরারী বাবু ও পায়ের কাছে অনিল নিষ্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। চন্দ্রলেখার সিন্দূর-চিহ্ন-বিরহিত শুভ্র সীমন্ত, শুক্লাম্বর, নিরলঙ্কার বেশ তাহার অন্তিম বাণী সকলের কাছে উৎকটরূপে মূর্ত্ত করিয়া তোলে।

ভবতোষ সহসা সচেতন হইয়া বলে, "আমি চলুম ডাক্তারের বাড়ী—শেষ চেষ্টা তবু একবার দেখা যাক্।"

ভবতোষ হুড়মুড় করিয়া নামিয়া যায়। কুমুদ অশ্রুপ্লাবিত মুখ মুছিয়া রক্তচক্ষে মুরারী বাবুর দিকে চাহিয়া মুষ্টি প্রকম্পন

করিয়া বলে, "আপনার এ পেজোমি আমি এখানে এসে সব জেনেছি। ওকে হত্যা করেছেন আপনি। আমি চলুম পুলিশের কাছে। শয়তানী আরো যাতে না খেল্‌তে পারেন আমি রাত্রা শুদ্ধ লোক এখানে পাহারা রেখে যাচ্ছি। খবরদার, ওকে আপনারা কেউ ছোঁবেন না—কিছু বদলাবেন না। যেমন ও আছে তেমনি থাক। লাইফ্‌ ফর্‌ লাইফ্‌—এ ছাড়া এর অন্য বিচার নেই। ভগবান এখানে আমায় পাঠিয়েছেন ওর র‍্যাভেঞ্জার করে—মানুষ মানুষের কাছে জাষ্টিস্‌ পায় কিনা এবার আমি দেখে নেব।"

কুমুদ চলিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে কতগুলি অপরিচিত লোক সিঁড়ী বাহিয়া ছাদে আসিল; মুরারী বাবু নির্বোধের মত তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার বক্ষ ঝাঁটুনীর টানে টানে যে গেরো ফকাইয়া গিয়াছে—অন্ধকারে অনির্দ্দেশ্যে তাঁহার মন তাহা হাতড়াইয়া ফেরে—হাতে ঠেকে শুধু অসীম শূন্যতা!

(সমাপ্ত)

শ্রীআমোদিনী ঘোষ

বিচিত্রা

শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়

যবে চলিতেছিনু মা জীবনের
উল্‌-মুগ্ধ—প্রমোদ-দীপ্ত,—
তুমি পাঠালে অলকা-কিরণের
দূতী—ধূপছায়া-অভিষিক্ত।

শুধু সে বেদনে মম আশাটি
ভাঙি' ভাতিলে দুরাশা বরণে,—
ঝড়ে উড়ায়ে ক্ষুদ্র বাসাটি
দিলে নিলয় নিসীম গগনে!

চিত কাঁপিল উচ্ছসি' সঘনে
তুলি' বিচিত্র আশা-ছন্দে
ত্রাস শিঞ্জিল মৃদুচরণে,
প্রেম ধ্বনিল মুরজ মন্দ্রে!

ছিনু মমতার মাটি আঁকড়ি'
তুমি সহসা নোঙর কাটালে;
ছিনু মরুচরে তোমা পাসরি'
সেথা ত্রিপথগা-তুরী বাজালে!

যবে দীপালি-আসব মাঝারে
ক্রমে হারাতেছিনু মা চেতনা,—
তুমি ঘেরিলে নিভৃতি আঁধারে
আঁখি ফুটাতে হানিলে বেদনা।

পাল তুলি' চলেছিনু যবে গো
মোর মেলি' হিয়াখানি সরসা,—
তুমি সহসা সিন্ধু-রবে গো
মোর লাঙ্গিলে তটভরসা।

শুধু   বিচিত্র সেই সিন্ধু,
আরো বিচিত্র ঢেউ-সরণী,—
পথ   হারায় না আশাবিন্দু
যবে   সে-ঢেউয়ে মগ্ন তরণী !

শুধু   তিমির-তুফান বিথারি'
সে যে চূর্ণে বাসনা যাত্রা,—
শুধু   দিবা-অভিমান নিবারি'
কানে   ঘোষে ছায়াপথ-বার্ত্তা।

যবে   সে-ছায়াপথের ডাকে মা,
নদী   ছাড়ি' লভি নিধি-অঙ্ক,—
হেরি   অপরূপ সেই বাঁকে মা
আরো অপরূপ লীলাভঙ্গ !—

—সেথা দিশারী উঠে না দীপিয়া,
তবু   কালোজলে আলো মুছে না ;
যায়   সুখের কাকলি নিভিয়া,—
তবু   কলকল্লোল ঘুচে না।

সেথা দিগন্তে নাহি বিভাতে
কোনো নিটোল উদয়ানন্দ,—
তবু   অস্ফুটে চাহে বিলাতে
কোন্ অচিন-চেনা-সুগন্ধ !

—সেথা চাঁদিমা রহে অতৃপ্ত
ঢাকা মৌন মেঘ-নিকুঞ্জে,—
তবু   তারি মৃগমদে নিত্য
বুকে মধু-তৃষ্ণিকা মুঞ্জে !

—সেথা মরত-বাঁশরী গাহে না,—
তবু   মূক নহে গীতিছন্দ,
কেহ   কামনা-ক্ষেপণী বাহে না,—
তবু   নহে খেয়া নিস্পন্দ !

—সেথা ধরা-রলরোল সুপ্ত
তবু   উথলে তাহার আবাহন ;
সেথা দ্যুলোক—অলখ, গুপ্ত,
তবু   চুমে সে প্রাণ-বাতায়ন।

এ কী বিচিত্রা তুমি ভাবিয়া
মাগো পাইনা কুহেলি শিয়রে !
মোরা   রহি কার পথ চাহিয়া—
যাচি'   কোন্ মায়াভ্র-শিখরে ?

যাহা   বয় মা সলীল বেলা'পর
যদি   লীলা পারে হয় অভিশাপ,
তবে   কেনই বা বাঁধি খেলাঘর
কেন   পদে পদে করি পরিমাপ—

হেথা   কতটুকু ভাল মন্দ ?
হেথা   কতটুক পাপ পুণ্য ?
কী বা বন্ধন—কী আনন্দ ?
কী বা সার্থকতা,—কী শূন্য ?

আজি   করি গতিসাথে সন্ধি,
উঠি   উলসি' লহরী-ভঙ্গে,—
কালি   ফিরায়ে আনন বন্দি
কোন্ ধূসর নিস্তরঙ্গে ?

পূজা ভকতি দেউলে লভে নীড়
তবু সংশয় কেন যায় না ?
হিয়া মূলে মুহুমুহু ক্ষরে ক্ষীর
কেন রসনা সে স্বাদ পায় না ?

যারে ছাড়ে সে তারেই অনিশ
উঠে আকুলি' থাকিয়া থাকিয়া ?
তাহে উঠেনি চিত্ত ভরিয়া
তবু মনে তাহারেই মাগিয়া ?

বড় অভিমান প্রাণে ছায় মা,
তুমি আছ—তবু জাগে প্রশ্ন
নিতি নীলাম্বরে যে চায় মা,
মিছে তারি শৃঙ্খল-বন্ধ ?

যদি মিথ্যা প্রশ্ন ভ্রান্তি
দাও প্রেম নির্ঝরে নামায়ে,
ছায়া মরীচিকা যদি—শান্তি
দাও আলোক গঙ্গা নামায়ে !

শ্রীদিলীপকুমার রায়



ব্যথার উপর

শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র গুপ্ত

পাত্র—রাজেন্দ্র ; বয়স ৩৯ বৎসর ; মাথার চুল পাঁচ আনা আন্দাজ পাকিয়াছে।

পাত্রী—অমিয়া ; বয়স ৩১ বৎসর ; নিঃসন্তানা এবং অনবনমিতযৌবনা।

মাধুবী, গৌরী, সুনীলা, ক্ষণদা, শকুন্তলা—প্রতিবেশীগণের কন্যা, বধূ ; বয়স ১৭ হইতে ২০।

দৃশ্য : দুইটি কক্ষ।

প্রথম কক্ষে সখীগণসহ অমিয়া ইতস্ততঃ আসীনা ; কাহারো কাহারো হাতে সেলাই প্রভৃতির কাজ।

দ্বিতীয় কক্ষে রাজেন্দ্র অর্দ্ধ শায়িত ; তাহার অসুস্থাবস্থা।

প্রথম কক্ষে—

*　　*　　*　　*

শকুন্তলা। আমার ব্লাউস্‌টা কেটেছ ত', অমিয়াদি ?

অমিয়া। কেটেছি ত'—তোমার দে'য়া ব্লাউসের মাপে ; খাট' না হয় ; মুটিয়েছ একটু।

শকুন্তলা। না, হবে। আগেরটা একটু ঢিলে ঢিলে ছিল।

মাধুবী। (কাজের উপর হইতে মুখ না তুলিয়াই)—এখানে আসা আর হয় না, ভাই ; সেলাই শেখা আমাদের অদেষ্টে নেই।

গৌরী। কেন ?

মাধুরী। নতুন ভাড়াটে' এসেছে চাঁপারা যে-বাড়ীতে ছিল সেই বাড়ীতে। তাদের বৈঠকখানা ঘেসে' রাস্তা······ ছেলেটা হাঁ করে' চেয়ে থাকে।

সুনীলা। তোর দাদাকে বলিস্—ধরে' কিলিয়ে দেবে।

মাধুরী। দূর, তা' কি হয় ? তা' বল্‌তে পারিনে।

অমিয়া। ওরই আসা বন্ধ করে' দেবে। তার চাইতে আমি ওঁকে বলব' ; উনি—

মাধুবী। না, না, সে-ও ভারি বিশ্রী হবে।

(দ্বিতীয় কক্ষে রাজেন্দ্র কাৎ হইয়া প্রথম কক্ষের দিকে মুখ করিল।)

অমিয়া। (রাগ করিয়া)—তবে আসিস্‌নে তুই।

মাধুবী। আস্‌ব বৈকি থাক্ না তাকিয়ে—আমার তাতে বয়েই গেল।···ঐ যাঃ একঘর ভুল হ'য়ে গেল। আমার দ্বারা কার্পেটের কেষ্টঠাকুর হ'ল না দেখ্‌ছি। ঘর গুলো খুলে' দে, ভাই।

(শকুন্তলা খুলিয়া দিতে লাগিল।)

অমিয়া। আমি দিয়েছিলাম অম্‌নি এক ছোক্‌রা বাবুকে আচ্ছা করে' চড়িয়ে।

সুনীলা। (হাসিয়া)—চড়িয়ে ? কোথায় ?

অমিয়া। কংগ্রেসের সেই এক্‌জিবিসনে।

গৌরী। ওমা, যাব কোথা' !···বল, দিদি, গল্পটা, শুনি।

(দ্বিতীয় কক্ষে রাজেন্দ্র চক্ষু বুজিয়া ছিল—খুলিল।)

অমিয়া। আমরা ট্রাম্ থেকে নেমে এক্‌জিবিসন্ দেখে' দেখে' বেড়াচ্ছি, আর অনেকক্ষণ থেকেই লক্ষ্য করছি, একটি ছোক্‌রা গোছের স্কুল-বাবু যাচ্ছেন আর থেমে' থেমে' আমাদের পানে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখ্‌ছেন···এগিয়ে যান্, একটা দোকানে দাঁড়িয়ে আমাদের এগিয়ে যেতে দেন -

শকুন্তলা। কে কে ছিলে তোমরা ?

অমিয়া। ছিলাম আমি আর আমার ছোট জা সুষমা।

মাধুরী। হাঁা, তারপর ?

অমিয়া। তারপর আমাদের পাশ দিয়ে গা ঘেঁসেই তাড়াতাড়ি হেঁটে যান্—যেন অন্য কাজেই খুব ব্যস্ত। আমি

সুষমাকে বল্‌লাম, দেখ্‌ছিস মজা! সুষমা বল্‌লে, দেখ্‌ছি ত'; কি করা যায় বল দেখি? আমি বল্‌লাম, দেখ্‌ছি দাঁড়া।...বলে' আমরা লাইফ ইন্সিওরের পুতুলের ঘরে গিয়ে উঠ্‌লাম।

শকুন্তলা। লাইফ ইন্সিওরের পুতুল কি?

অমিয়া। ছিল সব বড় বড় পুতুল—একটা লোক খাটে শুয়ে মারা যাচ্ছে, কান্নাকাটি লেগেছে......নাবালক ছেলেপিলে কতকগুলো, স্ত্রী, বয়স্থা কুমারী কন্যা, এরা সব নিঃসম্বল অসহায় হয়ে পড়্‌ছে—এই সবের পুতুল গড়ে' একটা ঘরে রাখা ছিল—সত্যিকার মানুষের মত বড় বড়...

সুনীলা। যাক্‌গে—

অমিয়া। আমরা গিয়ে দাঁড়িয়েছি—তখনি দেখি বাবুটিও সেখানে গিয়ে হাজির... আমার একেবারে পাশে—যেন কতই মন দিয়ে বক্তৃতা শুন্‌ছেন, অন্য হুঁস্ নেই।... কোম্পানীর একটা লোক বক্তৃতা করছিল; জীবন-বীমা করলে কি সুবিধে।...আমি চট্ করে' ঘুরে' দাঁড়িয়ে সেই বাবুর গালে এক চড়—কসে' এক চড়।......আরো চার পাঁচজন বাহিরের লোক সেখানে ছিল—তারা মহা ব্যস্ত হ'য়ে উঠ্‌ল; কিন্তু বাবুটি চড় খেয়েই মুখ বুজে' পালালেন।

ক্ষণদা। তারপর?

অমিয়া। তারপর তোর মুণ্ডু......আবার কি?...... সবাই বুঝ্‌লে ব্যাপারটা। যিনি বক্তৃতা করছিলেন, তিনি বল্‌লেন, মা, আপনারা ঐ চেয়ারে একটু বসুন।—চড় মেরেই আমি হাঁপাচ্ছিলাম কিনা!

(সকলে কলকণ্ঠে হাসিতে লাগিল।)

(দ্বিতীয় কক্ষে রাজেন্দ্র পুনরায় চোখ বুজিল।)

শকুন্তলা। বাবা, তুমি ত' পার্‌লে: আমি হলে কি কর্‌তাম জানিনে।

গৌরী। আমিও পারি... ...

সুনীলা। ঐ মুখেই ....(অমিয়ার প্রতি)—তোমার এত বয়স হয়েছে, বৌদি; তেমনটি কিন্তু দেখায় না! চুল পেকেছে?

অমিয়া। ঢের, দশ বিশ গণ্ডা। আমার জা—যার কথা এখুনি বল্‌লাম—চুল তোলার তার ভারি সখ—মাথা পেলেই পুট্ পুট্ করে' সারাবেলাই তুলতে আলিস্যি নেই। আমি ক'ল্‌কাতা গেলেই পাকাগুলো তুলিয়ে মাথাটাকে ছেলেমানুষ ক'রে নিয়ে আসি।

ক্ষণদা। উনিও তাই একদিন বল্‌ছিলেন যে, রাজেন বাবুর স্ত্রীর কথা তোমরা বল বটে বয়স ঢের; কিন্তু দেখে' তা' মনে হয় না—আঠার উনিশ বছরের মত দেখায়।

(দ্বিতীয় কক্ষে রাজেন্দ্র চোখ্ বড় করিয়া
ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া রহিল।)

অমিয়া। (রক্তিমমুখে)—তিনি আমায় কোথায় দেখ্‌লেন?

ক্ষণদা। ক্ষীরোদবাবুর মেয়ের বিয়ের রাত্তিরে তোমায় দেখেছিল—কে না-কি দেখিয়ে দিয়েছিল, ঐ রাজেনবাবুর স্ত্রী।

অমিয়া। তারপর?

(তারপর কি থাকিতে পারে তাহা ভাবিয়া
না পাইয়া ক্ষণদা প্রভৃতি বিস্মিত হইয়া
রহিল।) .....

(এবং দ্বিতীয় কক্ষে খুক্‌খুক্ কাশীর আওয়াজ
হইল।)

সুনীল। ও-ঘরে কাশলে কে?

(অমিয়া একটু হাসিল।)

সুনীলা। (ফিস্ ফিস্ করিয়া) কাছারী যান্‌নি?

অমিয়া। না; দাঁতের গোড়া ফুলে জরই হয়েছে একটু।

(রাজেন্দ্র যন্ত্রণায় মুখভঙ্গী করিল।)

শকুন্তলা। (খুব খাটো গলায়)—ছি, ছি; বড় বেহায়াপনা করা হয়েছে।

অমিয়া। দূর......

(গৌরী এবং ক্ষণদা দাঁতে জিব্ কাটিল।)

গৌরী। (চাপা গলায়)—সাবধান করে' দিতে হয়! ভারি ইয়ে তুমি......কত কথা শুনলেন তার ঠিক্ নেই! ......চল্ পালাই।

অমিয়া। বোস্..... তাতে হয়েছে কি?

শকুন্তলা। (হাসিয়া এবং চুপি চুপি) চুপি চুপি কত কথা কইব? হাঁপিয়ে মরব যে!

(বিদায় লইয়া সকলের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় কক্ষে—

অমিয়া। এখন কেমন আছ? ব্যথা একটু কম্‌ল?

(রাজেন্দ্র কথা কহিল না।)

অমিয়া। ওষুধটা দিয়ে আবার কুলকুচি করবে—দেব?

রাজেন্দ্র। (ব্যাণ্ডেজের উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে) কেন আসে ওরা রোজ রোজ?

অমিয়া। কারা?

রাজেন্দ্র। ঐ মেয়েগুলো·········

অমিয়া। বেড়াতে আসে, সেলাই শিখ্‌তে আসে·····কি ক্ষেতিটা হয়েছে তাতে?

রাজেন্দ্র। ক্ষেতি কিছু নেই। তবে দন্তমূল ফুলে আমার জ্বর হয়েছে এ খবরটা তাদের কাছে দে'য়ার কি দরকার ছিল তোমার? আর তাদেরই বা তা' নিয়ে আলোচনা করা কেন?

অমিয়া। অবাক্ করলে। তাতে হয়েছে কি! দাঁতের গোড়া মানুষের ফোলে না? —যবনিকা।—

শ্রীজগদীশচন্দ্র গুপ্ত

পুস্তক পরিচয়

৩। **পাঁচমিশেলি**—শ্রীঅবনীনাথ রায় প্রণীত ডি, এম্, লাইব্রেরী। দাম এক টাকা।

পাঁচমিশেলিতে প্রবন্ধ আছে দশটি। গ্রন্থকার সাতটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের সাহিত্যের বিচার করিয়াছেন, আর তিনটিতে আমাদের সমাজসমস্যার কোন কোন দিক আলোচনা করিয়াছেন। মানবজীবনকে যাঁরা দরদ দিয়া উপলব্ধি করেন তাঁরা সাহিত্যিক, আর সাহিত্যিককে যাঁরা দরদ দিয়া বুঝিতে চেষ্টা করে তাঁরা রসবেত্তা। অবনীবাবুর সাহিত্যালোচনার মধ্য দিয়া একটা জিনিষ খুব বেশী করিয়া প্রকাশ পাইয়াছে—তাহা হইতেছে তাঁহার দরদী হৃদয়। তিনি বিচার করেন নাই, তাঁহার কাছে দেবদাস, বিরাজ বৌ, উপীন—এরা সব একান্ত জীবন্ত মানুষ। ইহাদের হৃদয় আছে, আর তিনিও হৃদয় দিয়া ইহাদিগকে একান্ত আপনার করিয়া লইয়াছেন। সাহিত্য স্রষ্টার হৃদয়ের আপনার ধন, তাই সাহিত্যে চিরাচরিত প্রথা ও conventionএর অতীত একটা জগতের সন্ধান পাওয়া যায়। সাহিত্যিকের কাছে মানুষের মনুষ্যত্বই বড় জিনিষ, তাহার সংস্কার-দাসত্ব ইহার কাছে গৌণ। অবনীবাবুও সমাজের মাপকাঠিকে বর্জ্জন করিয়া সাহিত্য জগতের গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করিয়াছেন। সাহিত্যের মন্দিরের কড়িকাঠ ও দেয়ালের রূপ ও শক্তি লইয়া আলোচনা করেন নাই, তাহার অন্তরের দেবতা তাঁহার কাছে একান্ত প্রাণবান্। মানুষের মধ্যে একটা জিনিষই তিনি খুব বেশী করিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন তাহা হইতেছে তাহার 'মানবত্ব'। মানুষের বিচার তিনি করিয়াছেন সামাজিক শুভাশুভের মাপকাঠি দিয়া নহে, তাহার অন্তর্নিহিত অনুভূতিকে স্বীকার করিয়া। তিনি বলিয়াছেন, ভালবাসার ভালমন্দ নাই, তাহাত একটা কাজ নহে, তাহা একটা বৃত্তি। তাহাকে স্বীকার করিতেই হইবে। তাহা না হইলে আমরা মানুষের বিচার করিব, কিন্তু তাহার মনুষ্যত্বের সন্ধান পাইব না। সংস্কারের চশমা ছাড়িয়া তিনি সাহিত্য উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাই তাঁহার প্রবন্ধ পড়িয়া দেবদাস, কিরণময়ী, বিরাজবৌ আমাদের কাছে একেবারে সজীব হইয়া উঠিয়াছে। সমালোচকের এই শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য তিনি নিপুণভাবে সম্পন্ন করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ মরমী কবি। প্রাত্যহিক জীবনের ক্ষুদ্রতার অন্তরালে যে আনন্দময় অদ্বৈত আছে তাহা তাঁহার কাব্যে অভিব্যক্ত হইয়াছে। অবনীবাবু রবীন্দ্র-কাব্যের এই মূল সুরটির সন্ধান পাইয়াছেন। তাঁহার রচনায় ফাল্গুনীর নব যৌবনের স্পন্দন ধ্বনিত হইয়াছে; অচলায়তনের প্রাচীর ভাঙিয়া নবযৌবনের যে আহ্বান আসিয়াছিল তাহারও সন্ধান তিনি আমাদিগকে দিয়াছেন। তিনি কবির সৃষ্টির বিচার করেন নাই, কবির সৃষ্টি তাঁহার মনে যে অপরূপ রসের

সঞ্চার করিয়াছে, তাহাকেই প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধগুলির উদ্দেশ্য রসোপলব্ধি, রসবিচার নহে।

সামাজিক সমস্যার তিনি যে আলোচনা করিয়াছেন তাহা পাণ্ডিত্যের দ্বারা ভারাক্রান্ত হয় নাই বা গভীর গবেষণার দ্বারা জটিল হইয়া উঠে নাই। তিনি শুধু দুই একটা মোটা কথা আমাদিগকে স্মরণ করাইতে চাহিয়াছেন; তাহা এই যে বাঁচিয়া থাকা, স্বচ্ছন্দে থাকা—ইহা মানুষের জন্মগত অধিকার; তাহা হইতে কাহাকেও বঞ্চিত করিয়া যে সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা মূল্যহীন। আর মানুষকে বিচার করিবার পূর্ব্বে তাহাকে চিনিতে হইবে, বুঝিতে হইবে। এই সত্যকথাগুলিকে তিনি সমস্ত হৃদয় দিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন, আর আমাদিগকে নূতন করিয়া উপলব্ধি করাইয়াছেন। যিনি এই বই পড়িবেন, তিনি গ্রন্থকারের অনুভূতি-গভীরতা ও সংস্কার-বিবর্জ্জিত দৃষ্টির স্বচ্ছতা দেখিয়া মুগ্ধ হইবেন। এই বইতে জটিল তথ্য নাই, কিন্তু সহজ, সরল, অথচ একান্ত গভীর উপলব্ধি আছে। শ্রীসুবোধচন্দ্র সেন গুপ্ত

সোফিয়াঃ—উপন্যাস মৌলবী মোবারক আলী বি, এ, প্রণীত—মূল্য এক টাকা। প্রাপ্তিস্থান ডাঃ টি, রহমান, এল, এম, এফ, নওগাঁ (রাজসাহী)।

তুর্কীর নব জীবনকে পটভূমি করে এ উপন্যাস খানা লেখা হ'য়েছে। ইয়োরোপের রাজনৈতিক হাসপাতালের রুগ্ন মানুষটি হঠাৎ একদিন কি করে অপ্রত্যাশিত ভাবে সুস্থ, সবল ও কর্ম্মঠ হ'য়ে উঠল তার গুপ্ত রহস্য গ্রন্থকার সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন। আত্মত্যাগের ও কঠোর সাধনার বন্ধুর পথে কী করে মুষ্টিমেয় একদল নিঃস্ব, উৎসাহী ও স্বদেশ প্রেমিক তরুণ যাত্রা সুরু করেছিল তার অলিখিত রোজ-নামচা এই উপন্যাস। বর্ত্তমানকে উপন্যাসে ধরতে যাওয়া বড়ই দুঃসাধ্য; গ্রন্থকার এক্ষেত্রে সেই দুঃসাধ্য ব্যাপারকে সহজসাধ্য ও মনোরম করে তুলেছেন।

মোহাম্মদ হোসেনের ও এদিবের চরিত্র সুন্দর হয়েছে।

গ্রন্থকারের চলিত ভাষায় একটু আধটু ত্রুটী রয়েছে বলে মনে হ'ল। পূর্ব্ব বাংলার সাহিত্যিক কথ্য ভাষায় বই লিখতে গেলে যে মুদ্রাদোষে তাঁদের বই দুষ্ট হয় বর্ত্তমান লেখকও তার হাত থেকে রেহাই পাননি।

প্রথম প্রচেষ্টা হলেও লেখক বেশ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। গ্রন্থকার যদি আফগানিস্থান আর পারস্যকে অবলম্বনে এই ধরণের উপন্যাস লেখেন তা হ'লে বেশ ভাল হয়।

আগুন নিয়ে খেলাঃ—উপন্যাস শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় আই-সি-এস, এম, সি, সরকার, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

অতি আধুনিক জনকয়েক ইংরেজ ও আমিরেকান ঔপন্যাসিকে মিলে উপন্যাসকে একেবারেই Light Literature করে তুলেছেন। টমাস ম্যানের Magic Mountain বা রবীন্দ্রনাথের গোরা যে প্রকার গুরুগম্ভীর উপন্যাস, এডগার ওয়ালেস, বা ওপেনহেমের উপন্যাস সে-ধরণের নয়। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার মানুষের ফুরসতকে এমনভাবে কেড়ে নিয়েছে যে উপন্যাসকে চিত্ত-বিনোদনের সামগ্রীতে পরিণত করেছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা খেলনাকে যেমন মনে করে আধুনিক কালের শিক্ষিত জনসাধারণ উপন্যাসকে সেই চোখে দেখতে সুরু করেছে।

আমাদের বাংলা দেশে উপন্যাস এখনও সমাজ-সংস্কারের কোঠায় রয়েছে। মানুষের মনের সহজ স্ফূর্ত্তির দিকে এর নজর দেবার সময় এখনও ঘটে ওঠে নাই। সমাজ ও গোত্র অজ্ঞাত লোকের সঙ্গে আমরা মন খুলে মেলামেশা করতে অনভ্যস্ত। আমরা মানুষকে বিচার করি তার সামাজিক ব্যক্তিত্ব নিয়ে।

'আগুন নিয়ে খেলার' মধ্যে একটা নতুন ধরণের আগুন আমরা পাচ্ছি। 'সবার উপরে মানুষ সত্য' এই ভাবটা যেন বহুদিন পরে আবার নতুন করে শুনা যায়। এই মনোভাব প্রবল হলেই আমরা হিন্দু মুসলমান, ব্রাহ্মণ, নমশূদ্র প্রভৃতি ভেদাভেদের উপরে উঠতে পারব।

লেখকের ভাষা ও রীতি racy। চরিত্র-অঙ্কন সুষ্ঠু এবং পরিণতি লাভ করেছে। কন্‌কনে শীতের মধ্যে সকালবেলা কাফিখানায় বসে খুশ গল্প করতে করতে কাফি খেয়ে যে রকম স্বস্তি ও আরাম পাওয়া যায় এ বইখানা পড়ে আমরা সেই রকম আনন্দ লাভ করেছি।

জসীম কমল

জাগরণ

শ্রীযুক্ত শ্যামরতন চট্টোপাধ্যায়

এ জীবন রথে,   তুমি আছ বসি
ভুলিয়া ছিলাম নাথ,
পথ হারা হ'য়ে,   তাই ঘুরে মরি,
ছুটাছুটি দিনরাত।

নিবিড় আঁধার   ঘেরি চারিধার
আমারে দেখায় ভয়,
আলোকের রেখা,   দেখিতে না পাই,
কোথা তুমি, দয়াময়!

ঘোর ঘন ঘটা,   গরজে অশনি,
ক্ষিপ্তবায়ু করে রণ,
সিন্ধু সীমাহীন,   অধীর আবেগে
ঢেউ তুলে অগণন।

এরি মাঝে মোর   ছোট তরীখানি
উঠে পড়ে বারবার—
যত ভাবি আমি,   উপায় না হেরি
কেমনে হইব পার।

এ হেন সময়   বিজলীর মত
কি যেন পশিল প্রাণে,
নিরাশ হৃদয়   অভিনব এক
আশার আলোক আনে।

ঐরাবত সম   মত্ত অহঙ্কার
নিমিষে ভাসিয়া যায়,
কি মোহকুহকে,   এতকাল আমি
ঘুমায়ে ছিলাম হায়!

তোমার পরশে   হে দীনশরণ,
ভাঙ্গিল আমার ভুল,
আমি হারাইনু   তোমার মাঝারে,
পাইলাম তাই কূল।

নানা কথা

গান্ধী-জয়ন্তী

বিগত ১৫ই আশ্বিন শুক্রবার মহাত্মা গান্ধী ৬৩ বৎসর বয়সে পদার্পণ করিয়াছেন। তাঁহার এই জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে আমরা তাঁহাকে প্রণাম করি। গত বৎসর তাঁহার জন্মোৎসবের সময় তিনি ছিলেন কারাগারে,—এ বৎসর সুদূর প্রবাসে। কিন্তু যেখানেই তিনি থাকুন না কেন,—নিখিল-ভারতব্যাপী তাঁহার এই জন্মোৎসবের দিনে কেহ কোথাও তাঁহার অভাব অনুভব করে নাই। তিনি সমস্ত ভারতবর্ষে,—শুধু ভারতবর্ষে কেন সারা বিশ্বে, তাঁহার একান্ত সত্য-সাধনার ভিতর দিয়া পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার জন্মদিনে "মহাত্মা গান্ধীর জয় হউক" এই যে বাণী সমস্ত ভারতবর্ষের আকাশ মুখরিত করিয়াছিল,—সে বাণী কোনো ব্যক্তি-বিশেষের বাণী নয়, কোনো দেশ-বিশেষের বাণী নয়, কোনো জাতি-বিশেষের বাণীও নয়,—তাহা মানুষের অন্তরাত্মার বাণী। মহাত্মা গান্ধীর জয় মানে সত্যের জয়, মানুষের জয়।

মহাত্মা গান্ধী তাঁহার জীবন-ব্যাপী অক্লান্ত কর্ম্ম-সাধনায় লক্ষ লক্ষ নরনারীর চিত্তে যে অনির্ব্বাণ দীপ-শিখা জ্বালিয়াছেন, সেই আলোকেই তিনি আপনার পরিবেশের দেশকাল সম্বন্ধীয় সীমা অতিক্রম করিয়া অনন্তের জ্যোতিস্ময় লোকে আপনার বাসা বাঁধিয়াছেন। মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া মানুষকে অমরতার সন্ধান দিয়াছেন, এবং ভারত-বাসীর প্রাণে এক মরণহীন বিশ্বাসের জীবনীশক্তি সঞ্চারিত করিয়াছেন। মানুষকে কেন্দ্র করিয়া মানুষের মুক্তির জন্য ভারতবর্ষের চিরদিনের যে-সাধনা, তাহারই বাণী আজ ভারতবর্ষের কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হইতেছে,—"জয় হো'ক মানুষের," তাহারই শক্তি আজ ভারতবর্ষের কর্ম্মীকে অনুপ্রাণিত করিতেছে। এই বাণী সকল মানুষেরই মর্ম্মে প্রবেশ করুক,—সকল মানুষকে উদ্বোধিত করুক, ইহারই শক্তি সমস্ত বিশ্বের প্রচেষ্টাকে অনুপ্রাণিত করুক, ইহারই আলোক মানুষের সভ্যতার প্রগতিকে নিয়ন্ত্রিত করুক,—মহাত্মাজীর জন্মদিনে তাঁহার দীর্ঘায়ু কামনা করিয়া আমরা ইহাই প্রার্থনা করি; এই প্রার্থনাই তাঁহার শ্রেষ্ঠ জয়াভিনন্দন।

মহাত্মাজীর জীবন-ব্যাপী সংগ্রাম,—সে ত' শুধু বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে নয়,—দেশব্যাপী যে অজ্ঞান, অবিবেক ও কুসংস্কার,—জাতিভেদ, দলাদলি প্রভৃতি সামাজিক রিপু এই বিদেশী শাসনের ভিৎ পাকা করিয়াছে,—তাহারই বিরুদ্ধে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—মহাত্মার জন্মদিনে দেশবাসীর এই কথাটাই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। মুক্তি মানুষের অন্তরের মধ্যে; যে-জাতি এই আত্মার মুক্তিপথের সন্ধান পাইয়াছে, বাহিরের অবস্থার বন্ধনকে ছিন্ন করিতে সে জাতির বেশি দেরী লাগে না। তাই মুক্তির পথে মহাত্মাজীর যে জয়যাত্রা,—ভারতের রাষ্ট্রীয় অবস্থাকে অবলম্বন করিয়া যদিও সেই যাত্রা সুরু হইয়াছে,—ভারতবাসীর কল্যাণ-সাধন যদিও তাহার প্রধান লক্ষ্য,—তবুও সেই যাত্রা-পথে বিশ্বের মানুষের প্রতি আহ্বান রহিয়াছে। মুক্তিকে ভারতবর্ষ অন্তরের দিক হইতে বড়ো করিয়া কল্পনা করিয়াছে; তাই ভারতবর্ষের মুক্তি মানে বিশ্বের মুক্তি। এত দীর্ঘকাল ধরিয়া যে ভারতবর্ষ পরাধীনতার বেদনা ও দুঃখ বহন করিয়াছে,—তাহার গভীরতর কারণ বোধহয় এই দিকে অনুসন্ধান করিলে পাওয়া যায়,—জীবনকে ও জগৎকে একটা উচ্চতর স্তর হইতে কল্পনা করিবার এই আকাঙ্ক্ষার মধ্যে। ত্যাগ দিয়া, প্রেম দিয়া, সেবা দিয়া, দুঃখ দিয়া ভারতবর্ষ শুধু আপনাকে নয়,—সমস্ত বিশ্বের মানুষকে বড়ো করিয়া তুলিতে চায়; তাই স্বাধীনতা-লাভের জন্য ভারতবর্ষের যে সংগ্রাম,—তাহার প্রণালীও স্বতন্ত্র। মহাত্মাজীর আজীবন সাধনার

ভিতর প্রকাশ পাইয়াছে,—ভারতবর্ষেরই এই আকাঙ্ক্ষা,—এই কথাটি স্মরণ রাখাই মহাত্মাজীকে শ্রদ্ধা নিবেদন করিবার শ্রেষ্ঠ উপায়।

শরৎচন্দ্রের জন্মদিনোৎসব—

বিগত ৩১ ভাদ্র, ইংরাজী ১৭ই সেপ্টেম্বর, প্রেসিডেন্সী কলেজের বঙ্কিম-শরৎ পরিষদে বাংলার শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ষট্‌পঞ্চাশত্তম জন্ম-দিবসোৎসব হইয়া গিয়াছে। উৎসব-কক্ষটি পুষ্পে মাল্যে এবং অন্যান্য প্রসাধন সামগ্রীতে চিত্তাকর্ষকরূপে সজ্জিত হইয়াছিল এবং ধূপধূনার গন্ধ সমবেত দর্শকমণ্ডলীর চিত্তে উৎসবের একটি পবিত্র ভাব জাগাইয়া তুলিয়াছিল।

একটি সঙ্গীতের দ্বারা উৎসবের কার্য্য আরম্ভ হয় এবং পরে আরও কয়েকটি সঙ্গীত হয়। সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাতড়ি মহাশয় একটি আবৃত্তি করেন।

বঙ্কিম-শরৎ পরিষদের পক্ষ হইতে শরৎচন্দ্রের প্রতি একটি অভিভাষণ পঠিত হওয়ার পর কয়েকজন বক্তা বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের অমেয় দানের বিষয়ে আলোচনা করিয়া তাঁহার দীর্ঘ-জীবন কামনা করেন।

এই উপলক্ষে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় শরৎচন্দ্রের বিষয়ে একটি লেখা লিখিয়া পাঠান। তাহাতে তিনি বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের সৃষ্টি হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রম-বিকাশের মধ্য দিয়া শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে তাহার বর্ত্তমান পরিণতি নির্দ্দেশ করেন। রবীন্দ্রনাথের লেখাটি পঠিত হইবার পর একজন বক্তা এই বলিয়া অনুযোগ করেন যে, সমস্ত লেখাটির মধ্যে একেবারে শেষভাগে শরৎচন্দ্রের বিষয়ে উল্লেখ আছে সুতরাং লেখাটিকে হ্যামলেটহীন হ্যামলেটের অভিনয়ের মত মনে হয়। আমাদের মতে এ আক্ষেপটি একেবারে অকারণ। আদি হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত লেখাটি শরৎচন্দ্রের উপন্যাসকে স্মরণ করিয়া লিখিত—এবং প্রবন্ধটির আদ্যোপান্ত একটি অখণ্ড যুক্তিধারায় সুসংবদ্ধ। গাছের কাণ্ড, শাখা-প্রশাখা, পত্র-পল্লব যেমন গাছের ফুলের পক্ষে অবান্তর নয়, এই অতি-উৎকৃষ্ট প্রবন্ধটির কোন অংশই তেমনি প্রবন্ধের শেষ অংশের পক্ষে অবান্তর নয়। শরৎচন্দ্র কিন্তু তাঁহার উত্তর-অভিভাষণে রবীন্দ্রনাথের লেখাটিকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা এবং আনন্দের সহিত নিঃসংশয়চিত্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন, সুতরাং এ বিষয়ে অধিক লেখা নিষ্প্রয়োজন।

আমরা এই আনন্দের অবসরে শরৎচন্দ্রের অটুট স্বাস্থ্য এবং সুদীর্ঘ আয়ু কামনা করি।

রবীন্দ্রনাথের নূতন উপাধি

বিগত ৩রা আশ্বিন, ইংরাজি ২০শে সেপ্টেম্বর, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ গৃহে একটি স্মরণীয় অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। ঐদিন তথাকার অধ্যাপকবর্গ রবীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ করিয়া অতিশয় নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধাসহকারে তাঁহাকে "কবিসার্ব্বভৌম" উপাধি দান করিয়াছিলেন। সভাগৃহে সেদিন যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা সংস্কৃত কলেজের সুযোগ্য অধ্যক্ষ ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ত মহাশয়ের অভিভাষণের আন্তরিকতায় এবং সমস্ত অনুষ্ঠানটির সুনিবদ্ধ পরিচালনায় পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। উৎসবের আনন্দের সহিত বিষয়ের প্রগাঢ়তা যুক্ত হইয়া সমস্ত কার্য্যধারাকে কমনীয় করিয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথকে উপাধি দান করা হইলে কোন পক্ষ বেশী সম্মানিত হন,—রবীন্দ্রনাথ, না উপাধিদানকর্ত্তা,—তাহা অনেক সময়েই বিবেচনার বিষয়। কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রের কথা স্বতন্ত্র। শতাধিক বর্ষ ধরিয়া সমস্ত ভারতবর্ষের সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্রস্বরূপ এই সংস্কৃত কলেজ তাহার চিরাগত সংস্কার এবং ঐতিহ্যের মধ্য দিয়া এমন একটি মহিমা অর্জ্জন করিয়াছে যাহার জন্য তাহার এই প্রকার স্বেচ্ছাপ্রণোদিত দানের মূল্য সামান্য নহে। সুতরাং যোগ্য কর্ত্তৃক সুযোগ্যের প্রতি এই সম্মান প্রদর্শনে সকলেই পরিতৃপ্ত হইয়াছেন। উপাধি নির্ব্বাচনেও সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকবর্গ সুবিবেচনার পরিচয় দিয়াছেন; যে কবি পৃথিবীর সমস্ত ভূমিখণ্ডে স্বীয় কবিত্বশক্তি বলে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন তিনি নিঃসন্দেহ কবিসার্ব্বভৌম।

আধুনিক কালে সংস্কৃত শিক্ষার অবশ্যবিধেয়তা সম্বন্ধে এবং ইংরাজি শিক্ষার দানের সহিত সংস্কৃত শিক্ষার দানের যোগস্থাপনের উপযোগিতা সম্বন্ধে যে সমস্যা উঠিয়াছে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ত মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতে তাহার মীমাংসা প্রার্থনা করেন। উত্তরে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অভিভাষণে বলেন, একদিকে য়ুরোপীয় সাহিত্যের সহিত যোগরক্ষা ভিন্ন যেমন আধুনিক বাংলা ভাষার উদ্বোধন সম্পূর্ণ হইবে না, অপরদিকে সংস্কৃত ভাষার সহিত যোগ ছিন্ন করিলে বাংলা ভাষা তাহার আভিজাত্য ও ঐশ্বর্য্য হারাইবে। বর্ত্তমান সংখ্যার আদিভাগে মুদ্রিত দুইটি অভিভাষণে এই অতি-প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনা আছে।

রবীন্দ্রনাথের গীত-উৎসব

বক্তার সাহায্যকল্পে কলিকাতায় সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথ যে গীত-উৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন, দর্শকমাত্রকেই তাহা চমৎকৃত করিয়াছে। সর্ব্বোচ্চ অঙ্গের নৃত্য-কলা অবশ্য রবীন্দ্রনাথের অনুষ্ঠানগুলিতে চিরকালই আমরা দেখিতে অভ্যস্ত, কিন্তু এবার দেখিলাম রবীন্দ্রনাথ নৃত্যকলায় একটি সম্পূর্ণ নূতন ধারা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, অভিনয়েরও একটি সম্পূর্ণ নূতন রূপ উদ্ভাবন করিয়াছেন। যতদূর জানি সকল দেশেই মানুষ আজ পর্য্যন্ত নৃত্যকলায় আশ্রয় লইয়াছে অন্তরের কোন আবেগ প্রকাশ করিবার জন্য। সেকালে রাজসভায় রাজাদের চিত্তবিনোদনের জন্য, কিম্বা উৎসবের সময় কিম্বা প্রাকৃতিক দেব-দেবীর মনোরঞ্জনের জন্য, কিম্বা অকারণেই প্রাণের অফুরন্ত উল্লাস ব্যক্ত করিবার জন্য নরনারী নৃত্য করিয়াছে। সভ্যতার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির সহিত মানুষের নিবিড় যোগ এবং তৎসংক্রান্ত নানারকমের সূক্ষ্ম অনুভূতি, সৃষ্টির ছন্দ, অন্তরের আনন্দ-বেদনা-মিশ্রিত জটিল আবেগরাজি মানুষ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সুষ্ঠু ছন্দোবদ্ধ গতি-ভঙ্গিমার ভিতর দিয়া প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছে। ভাষায় যাহা ব্যক্ত করা যায় না, মানুষ ধ্বনির জগতে তাহা



গীত-উৎসবে রবীন্দ্রনাথ

ব্যক্ত করিতে চাহিয়াছে সঙ্গীতে এবং রূপের জগতে ব্যক্ত করিতে চাহিয়াছে নৃত্যে। এমনি করিয়াই নৃত্যকলা সঙ্গীতের সহিত জড়িত হইয়া সঙ্গীতের মধ্যে আপনার পরিপূর্ণতা অনুসন্ধান করিয়াছে এবং সঙ্গীত-সহযোগে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গতিভঙ্গির অপরূপ সুষমা এবং অনির্ব্বচনীয় মাধুরী বিকাশ করিয়া মানুষের আত্ম-প্রকাশের একটা শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। যে-সকল শিল্পকলার সাহায্যে মানুষ ইন্দ্রিয়াতীতকে অনুসন্ধান করিয়া একটা পরম আনন্দলোকে উত্তীর্ণ হইতে চায়, নৃত্যকলা তাহাদেরই অন্যতম। এই



গীত-উৎসবে পৌত্রী ও ভ্রাতুষ্পৌত্র সহ রবীন্দ্রনাথ

নৃত্যই এতকাল দেখিয়া আসিয়াছি।

এবার দেখিলাম, শুধু সঙ্গীত নয়, একটি ভাবকে আশ্রয় করিয়াও সর্ব্বোচ্চ অঙ্গের নৃত্য-কলা সম্ভব,—যদি সেই ভাব আপনার গভীরতায়,—এবং তাহার যে পরিচ্ছদ ভাষা তাহার লীলায়িত ছন্দে এবং সেই ছন্দের আবেগময়ী আবৃত্তিতে ইন্দ্রিয়াতীতকে স্পর্শ করিতে পারে। দেশে ও বিদেশে পৃথিবীর অনেক বিখ্যাত শ্রেষ্ঠ শিল্পীর নৃত্য দেখিয়াছি, কিন্তু নৃত্যকলার এ অভিনব কৌশল ও প্রণালী (টেক্‌নিক্) আর কোথাও দেখি নাই।



গীত-উৎসব

বুঝি বা এ শুধু রবীন্দ্র-কাব্যেই সম্ভব, কেন-না রবীন্দ্র-কাব্য শুধু ত কাব্য নয়, সঙ্গীতও বটে; ভাব ও ভাষাকে আশ্রয় করিয়া সে কাব্য যে আমাদের কোন্ অমৃত লোকের সন্ধান দেয়, তাহা বিশেষজ্ঞেরাই জানেন। কিন্তু তবুও সে কাব্য কাব্যই, ভাব ও ভাষাকে সে অবহেলা করে না; তার প্রতিটি ছত্রে অর্থ সুপরিস্ফুট। এমন কাব্যের নিগূঢ় মর্ম্মের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি অঙ্গভঙ্গির সাহায্যে পরিষ্কার রূপান্বিত করিয়া তুলিতে পারে যে-নৃত্যকলা, তাহা যে কতখানি অসাধারণ তাহা সহজেই অনুমেয়। অপরপক্ষে এ কথাও বোধ হয় ঠিক যে কাব্য যখন এমনই একটা কল্পলোকের সৃষ্টি করে, তখনই সেই কাব্যের আবৃত্তির সঙ্গে এমন নৃত্যকলা সম্ভব। রবীন্দ্রনাথের আবৃত্তি ও শ্রীমতীর নৃত্য



গীত উৎসব



গীত-উৎসব

পরস্পরের সহযোগে এমনই একটা আনন্দলোকের সৃষ্টি করিয়াছিল, যাহার আর তুলনা নাই।

নৃত্য সহযোগে এই আবৃত্তির মধ্যে শিল্পকলার একটা নূতন রূপ দেখিলাম। ইহাকে কি বলিব জানি না; ইংরাজিতে representation কথাটি যেমন ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়, সেই রকম ব্যাপক অর্থে 'অভিনয়' কথাটি ব্যবহার করিলে, ইহাকে অভিনয় বলা চলে। কিন্তু অভিনয়ের এ এক অভিনব রূপ, আগে কোনো দিন দেখি নাই, সম্ভব

বলিয়াও কল্পনা করিতে পারি নাই। অভিনয় বলিতে এতদিন বুঝিতাম কোনো নাটক, বা নাটকের আকারে গদ্যে বা ছন্দে লিখিত কোনো পুস্তকের সঙ্গীত ও নৃত্য-সহযোগে বা বিনা সঙ্গীতে ও বিনা নৃত্যে অভিনয়। কিন্তু সেদিন গন্ত-উৎসবে যাহা অভিনীত হইয়াছিল তাহা নাটক বা নাটকের আকারে লিখিত কোনো পুস্তিকা নয়; সেটি একটি গদ্য কবিতা। 'বিচিত্রা'র পাঠক-পাঠিকারা তাহা ভাদ্রের 'বিচিত্রায়' পাঠ করিয়াছেন। যে আকারে 'বিচিত্রায়' তাহা প্রকাশিত হইয়াছিল, এক-আধ জায়গায় একটু আধটু ভাষার পরিবর্তন ধর্তব্যের মধ্যে না আনিলে, ঠিক সেই আকারেই সেটিকে দর্শকদের সম্মুখে রঙ্গমঞ্চের উপর রূপায়িত করা হইয়াছিল, নৃত্য-সহযোগে আবৃত্তির ভিতর দিয়া। সুদীর্ঘ গদ্য-কবিতার প্রত্যেকটি ভাবই দর্শকেরা রঙ্গমঞ্চের উপর নৃত্যের মধ্যে প্রতিফলিত দেখিয়াছিলেন। ইহা অভিনয়েরই একটা রূপান্তর বটে, কিন্তু এ ধরণের অভিনয় পূর্ব্বে কখনো দেখি নাই, ভবিষ্যতেও যে রবীন্দ্রনাথের কৃপা ভিন্ন অন্য কোথাও দেখিব, এমন আশা বড়ই কম, কেননা এমন অভিনয়ের জন্য যে-শিল্প-প্রতিভার প্রয়োজন, তাহা অত্যন্ত বিরল!

স্বর্গীয়া মৃণালিনী দেবীর চিত্র

গত আশ্বিন মাসের বিচিত্রায় রবীন্দ্র জয়ন্তীর অন্তর্গত কবি-পত্নী প্রবন্ধে আমরা কবি-পত্নী মৃণালিনী দেবীর একটি চিত্র প্রকাশিত করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। আশ্বিনের বিচিত্রা প্রকাশিত হইবার অব্যবহিত পরেই আমরা তাঁহার অপর একখানি বড় ছবির সন্ধান পাই। বর্ত্তমান সংখ্যায় আমরা সেই ছবিখানির একটি প্রতিকৃতি মুদ্রিত করিলাম। মহীয়সী নারীর এই নূতন প্রতিকৃতি-খানি সাধারণে শ্রদ্ধা এবং আনন্দের সহিত গ্রহণ করিবেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

পরলোকগত সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার

বিগত ২১শে ভাদ্র ১৩৩৮ রায় বাহাদুর সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন। উচ্চতম হিন্দু সঙ্গীত ও সঙ্গীতজ্ঞগণের বিষয়ে যাঁহারা কিছু সংবাদ রাখেন তাঁহারা বুঝিবেন সুরেন্দ্রনাথের মৃত্যুতে সঙ্গীত-জগতে কত বড় ক্ষতি হইয়া গেল। অতি উচ্চ শ্রেণীর ওস্তাদ গায়ক বলিয়া সুরেন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের বহু প্রসিদ্ধ গায়ক সমাজে সম্মানের আসন অধিকার করিয়াছিলেন। বাঙালী হইলেও বাংলা দেশেই বোধ হয় তাঁহার পরিচয় অপেক্ষাকৃত অল্প ছিল; তাহার কারণ, বাংলা দেশে খেয়াল গায়কের একান্ত অভাব না থাকিলেও এখানকার সাধারণ আবহাওয়া খেয়ালের নহে। সঙ্গীতের আবহাওয়া কেবল গুণীর দ্বারাই সৃষ্ট হয় না, গুণগ্রাহীরও সে বিষয়ে একান্ত প্রয়োজন।

সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন সেই শ্রেণীর শিল্পী যাঁহারা স্বকীয় প্রতিভা বলে শিল্প-শাস্ত্রের বিধি বিধানকে ব্যতিক্রম করেন না, কিন্তু অতিক্রম করেন। পাণিনি সূত্র নির্ভুল প্রতিপালন করিয়াই কালিদাস কালিদাস হন নাই—কালিদাস হইবার জন্য তাঁহাকে তাহার অতিরিক্তও কিছু করিতে হইয়াছিল। সাধারণ ওস্তাদেরা মনে করেন সঙ্গীত শাস্ত্রের নিয়মগুলি একান্তভাবে পালন করিতে পারিলেই তাঁহাদের কর্ত্তব্য সম্পাদিত হইল, তা যত কঠোর ভাবে এবং যত নীরস ভাবেই হউক না কেন। তানের ডিগ্‌বাজী খাইতে খাইতে সমের উপর ঝাঁপাইয়া বসিতে পারিলেই তাঁহারা মনে করেন সঙ্গীতের পরাকাষ্ঠা হইল। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, "শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠত্যগ্রে"র মধ্যে ছন্দের নিয়ম অবহেলিত না হইলেও কাব্যলক্ষ্মী অবহেলিত হন। তাই সাধারণ ওস্তাদগণের ওস্তাদীগানের উপর সাধারণ শ্রোতার শুধু ঔদাসীন্যই নাই, আতঙ্কও আছে।

সুরেন্দ্রনাথ কিন্তু তাঁহার অসাধারণ সৌন্দর্য্য-বোধের রসে সঙ্গীতশাস্ত্রের কঠোর নিয়মগুলিকে পরিপাক করিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন মিশ্রীকে জলে গুলিয়া পানা করিতে না পারিলে তাহা শুধু মিষ্টই লাগে না, কঠোরও লাগে। তাই তাঁহার ওস্তাদী গান শুনিয়া সাধারণ শ্রোতাও পরিতৃপ্ত হইত। একটি সুন্দরী সুনিপুণা নটীকে তাহার রসাপ্লুত নৃত্যচ্ছন্দ হইতে বিচ্যুত করিয়া ড্রিল্ অথবা জিম্‌ন্যাষ্টিক করাইলে যে রস-বিপর্য্যয় ঘটে, রবীন্দ্রনাথের গানগুলিকে কালোয়াতি ঢঙে গাহিলে অনুরূপ রস-বিপর্য্যয়

ঘটে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। কিন্তু সুরেনবাবুর মুখে খেয়ালি ঢঙে রবীন্দ্রনাথের "আমার পরাণ যাহা চায় তুমি তাই তুমি তাই গো" "মাঝে মাঝে তব দেখা পাই চিরদিন কেন পাই না" প্রভৃতি গানগুলি শুনিবার সৌভাগ্য যাঁহাদের হইয়াছিল তাঁহারা জানেন দুইটি বৃহৎ বস্তুর বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া তাহাদিগকে রস-সামঞ্জস্যে মিলিত করিবার অপূর্ব্ব কৌশল তাঁহার কিরূপ আয়ত্ত ছিল। অতি উচ্চ প্রতিভার শিল্পী না হইলে কাওয়ালি চালে রবীন্দ্রনাথের গান গাহিয়া রস-সৃষ্টি করা সম্ভবপর নহে।

সুরের মধ্যে ভাব সঞ্চার করিবার (Expression) অসামান্য ক্ষমতা তাঁহার ছিল। দরবারী কানাড়ার মধ্যে সুগভীর রসোচ্ছ্বাসের সৃষ্টি, ভৈরবীর মধ্যে সুমধুর বৈরাগ্যের সঞ্চার, সিন্ধুর মধ্যে সাবলীল মিষ্টতার অবতারণা—এ সকল তিনি অবলীলার সহিত করিতেন। গান গাহিতে গাহিতে কোনো এক সময়ে যখন তিনি তান দিতে আরম্ভ করিতেন তখন তাহার আকস্মিকত্বে ও ঔৎকর্ষ্যে শ্রোতা চকিত হইয়া উঠিত। তাঁহার তানগুলিকে মনে হইত যেন সুরের আতস বাজি—কোনোটা হাউই, কোনোটা তারাবাজি, কোনোটা ফুলঝুরি, কোনোটা কদমফুল!

ধ্রুপদ এবং ঠুম্‌রি গান গাহিলেও সুরেন্দ্রনাথ প্রধানত খেয়াল গায়ক ছিলেন।

সাহিত্য-ক্ষেত্রেও সুরেন্দ্রনাথ যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। রসরচনায় তিনি সুদক্ষ ছিলেন। বিচিত্রার পাঠক-পাঠিকা তাঁহার লেখার সহিত অপরিচিত নহেন। "ভৌতিক প্রেম," "ডেপুটির দুরবস্থা" প্রভৃতি লেখাগুলি বিচিত্রায় প্রকাশিত হইয়াছিল। অধুনা-লুপ্ত "সাহিত্য" মাসিক পত্রে সুরেন্দ্রনাথের বহু রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল।

চিত্রবিদ্যাতেও সুরেন্দ্রনাথ পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার অঙ্কিত কোনো চিত্রের অনুকৃতি সাধারণে প্রকাশিত হইয়াছে কিনা মনে পড়ে না কিন্তু আসল চিত্রগুলি যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা জানেন চিত্রাঙ্কন বিষয়েও তাঁহার ক্ষমতা অল্প ছিল না।

এই প্রতিভাশালী মনীষীর তিরোধানে বাংলা দেশ বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইল তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

১২৭২ সালের ৯ই ফাল্গুন পাবনা জেলার পাকুড়িয়া গ্রামে সুরেন্দ্রনাথের জন্ম হয়। সুতরাং মৃত্যু-কালে তাঁহার বয়স ৬৫ বৎসরের কয়েক মাস বেশি হইয়াছিল।

গত ফেব্রুয়ারী মাসে সুরেন্দ্রনাথের পত্নী-বিয়োগ হয়। তাঁহার ৮৬ বৎসর বয়সের কাশীবাসিনী মাতা এখনও জীবিতা! সুরেন্দ্রনাথের এক পুত্র ও দুই কন্যা। প্রথম কন্যার বিবাহ হাইকোর্টের উকিল ৺কিশোরীমোহন রায়ের পুত্র শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রমোহন রায়ের সহিত এবং দ্বিতীয় কন্যার বিবাহ তাহিরপুরের কুমার শ্রীযুক্ত শিবশেখরেশ্বর রায়ের সহিত। পুত্র শৈলেন্দ্রনাথ বিহার উড়িষ্যার ইন্‌কমট্যাক্স অফিসার।

সুরেন্দ্রনাথের শোক-সন্তপ্ত পরিজনবর্গকে আমরা আমাদের গভীর সমবেদনা জানাইতেছি।

পরলোকগত কবি কিরণধন চট্টোপাধ্যায়—

গত ১০ই আশ্বিন, রবিবার, কবি কিরণধন চট্টোপাধ্যায় পরলোকগমন করিয়াছেন। কিরণধনের কবিত্বের উৎস ছিল জীবনের গভীর বেদনার মূলে, সুতরাং তাঁহার বাঁশিটি বাজিত করুণ রাগিণীর সুরে। আন্তরিকতা ছিল তাঁহার রচনার বৈশিষ্ট্য।

কবি কিরণধনের মৃত্যুতে আমাদের ঐকান্তিক দুঃখ প্রকাশ করিতেছি।

হিজ্‌লীর ব্যাপার

হিজ্‌লীতে অসহায় রাজবন্দীদের উপর নিষ্ঠুর গুলি-চালনার সংবাদে আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি। কিছু বলিতে চাইনা,—যাহা বলিবার, সেদিন গড়েরমাঠে বিরাট জনসঙ্ঘের মাঝখানে দেশের লোকের পক্ষ হইতে রবীন্দ্রনাথ দৃপ্ত ভাষায় বলিয়াছেন। আমরা শুধু, "যাহাদের কণ্ঠস্বর চিরদিনের মতো নীরব" হইয়া গিয়াছে, তাহাদের শোকতপ্ত পরিবারের প্রতি আমাদের আন্তরিক বেদনা নিবেদন করি। এই বেদনায় কবির এই কথাটি আমাদের মনে রাখা কর্ত্তব্য যে "আমরা নিজের চিত্তে সেই গম্ভীর শান্তি যেন রক্ষা করতে পারি যাতে করে পাপের মূলগত প্রতিকারের কথা চিন্তা করবার স্থৈর্য্য আমাদের থাকে এবং আমাদের নির্য্যাতিত ভ্রাতাদের কঠোর দুঃখস্বীকারের প্রত্যুত্তরে আমরাও কঠিন দুঃখ ও ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হ'তে পারি।" পরিশেষে কবির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া আমরাও বলি যে "এই মর্ম্মভেদী দুর্য্যোগের একদা সম্পূর্ণ অবসান হ'লেও দেশবাসী সকলের ব্যথিত স্মৃতি দেহমুক্ত আত্মার বেদীমূলে পুণ্যশিখায় উজ্জ্বল দীপ্তিদান করবে।"

আমাদের পূজার ছুটী—

পূজা উপলক্ষ্যে আমাদের কার্য্যালয় ৩০শে আশ্বিন হইতে ৯ই কার্ত্তিক অবধি বন্ধ থাকিবে। এই সময়ের মধ্যে যে সকল চিঠি পত্রাদি আসিবে, তাহার ব্যবস্থা ১০ই কার্ত্তিকের পর কার্য্যালয় খুলিলে করা হইবে।

Edited by Srijut Upendranath Ganguli. Printed by Srijut Sarat Chandra Mukherji at the Sreekrishna Printing Works
259, Upper Chitpur Road, Calcutta and published by the same from 149, Raja Dinendra Street, Calcutta.



নব বধূ

শিল্পী—শ্রীযুক্ত প্রভাত নিয়োগী

বিচিত্রা

পঞ্চম বর্ষ, ১ম খণ্ড	অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮	৫ম সংখ্যা

নাত বৌ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অন্তরে তা'র যে মধু মাধুরী পুঞ্জিত,
সুপ্রকাশিত সুন্দর হাতে সন্দেশে।
লুব্ধ কবির চিত্ত গভীর গুঞ্জিত
মত্ত মধুপ মিষ্টরসের গন্ধে সে।
দাদামশায়ের মন ভুলাইল নাতিত্বে,
প্রবাস-বাসের অবকাশ ভরি' আতিথ্যে,
সে-কথাটি কবি গাঁথি রাখে এই ছন্দে সে॥

সযতনে যবে সূর্য্যমুখীর অর্ঘ্যটি
আনে নিশান্তে, সেও নিতান্ত মন্দ না।
এও ভালো যবে ঘরের কোণের স্বর্গটি
মুখরিত করি' তানে মানে করে বন্দনা।
তবু আরো বেশি ভালো বলি শুভাদৃষ্টকে
থালাখানি যবে ভরি' স্বরচিত পিষ্টকে
মোদক-লোভিত মুগ্ধ নয়ন নন্দে সে॥

প্রভাতবেলায় নিরালা নীরব অ ন
দেখেছি তাহারে ছায়া-আলোকের সম্পাতে।
দেখেছি মালাটি গাঁথিছে চামেলি রঙ্গনে,
সাজি সাজাইছে গোলাপে জবায় চম্পাতে।
আরো সে করুণ তরুণ তনুর সঙ্গীতে
দেখেছি তাহারে পরিবেষনের ভঙ্গীতে,
স্মিতমুখী মোর লুচি ও লোভের দ্বন্দ্বে সে॥

বলো কোন্ ছবি রাখিব স্মরণে অঙ্কিত,
মালতী-জড়িত বঙ্কিম বেণী-ভঙ্গিমা?
দ্রুত অঙ্গুলে সুরশৃঙ্গার ঝঙ্কৃত?
শুভ্র সাড়ির প্রান্তধারার রঙ্গিমা?
পরিহাসে মোর মৃদু হাসি তা'র লজ্জিত,
অথবা ডালিটি দাড়িমে আঙুরে সজ্জিত,
কিম্বা থালিটি থরে থরে ভরা সন্দেশে?

বিজয়া দ্বাদশী
১৩৩৮
দার্জ্জিলিং

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



পত্রাবলী

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ও

রাজকোট

কল্যাণীয়েষু,

মণ্টু, ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হ'য়ে প'ড়েছি, সম্প্রতি আছি কাঠিয়াবাদে রাজকোটে, এখান থেকে আরো নানাস্থানে ঘুরপাক খেতে হবে। হয় ত ডিসেম্বরের আরম্ভে একবার আমেদাবাদ যাব, তখন যদি তুমি সেখানে যাও দেখা হবে।

সঙ্গীত সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে আমার মতের যদি অনৈক্য থাকে তা নিয়ে কোনো সঙ্কোচ বোধ কোরো না। পৃথিবীর ভূগোলসংস্থানে পাহাড়ের সঙ্গে সমুদ্রের যদি অনৈক্য নিয়ে ঝগড়া হ'ত তাহ'লে জীবজন্তু টিঁকতে পারত না—আর যদি পাহাড়ে সমুদ্রে কোন অনৈক্যই না থাকৃত তাহ'লে সেই মরু-বসুন্ধরায় টেঁকা আরো দায় হ'ত। মানুষের মানসজগতে মতের অনৈক্য থাকৃবে অথচ সেই অনৈক্য নিয়ে বিরোধ হবে না; সংঘাত হবে কিন্তু অপঘাত হবে না; এইটেই হচ্চে প্রার্থনীয়। তুমি সঙ্গীততত্ত্ব নিয়ে আমার মতের প্রতিবাদ করলেও আমি বিবাদ করব না এ কথা নিশ্চয় জেনো। মতের সম্বন্ধ না থাকলেও প্রীতির সম্বন্ধ থাকৃতে পারে এটার দ্বারাই প্রীতির গৌরব প্রকাশ পায়। ইতি, ১১ই নভেম্বর, ১৯২৩

স্নেহাসক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

৬ই বৈশাখ ১৩৩৫
শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু,

মণ্টু, কিছুকাল থেকে মনে মনে তোমার সন্ধান করছিলুম, কিন্তু বাহ্যজগতে তোমার গতিবিধির কোনো নিশ্চিত বিবরণ না জানা থাকাতে, এবং আমাদের ঋষি পিতামহদের দিব্যদৃষ্টির উত্তরাধিকার আমার জন্মকালের

বহুপূর্ব্বে নিঃশেষিত হ'য়ে যাওয়াতে হাল ছেড়ে দিয়ে ব'সে ছিলুম। হেনকালে তোমার পত্র এল—বোধ করি তার মধ্যে আমার ইচ্ছাশক্তির কিছু প্রভাব ছিল। আশা করি সেই ইচ্ছাশক্তি শেষ পর্য্যন্ত কাজ করবে এবং তোমার সঙ্গে দেখা হবে। ইচ্ছাশক্তির তুলনায় আমার চলৎশক্তি অনেক কম—তাই এখানে ব'সে ব'সে তোমার জন্যে অপেক্ষা করব। ইতি

স্নেহানুরক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু,

মণ্টু, অমিয়কে যে চিঠি লিখেচ দেখলুম। একটি কথা কেবল বল্‌তে চাই—আমি তোমাকে গভীর ভাবেই স্নেহ ক'রে এসেচি—আজ কোনো কারণে তার অপঘাত ঘট্‌বে এমন আশঙ্কা মাত্র নেই। আমি কোনোদিন আঘাতের স্মৃতি স্নিগ্ধজনের বিরুদ্ধে মনে টাঙিয়ে রাখি নে।

বারবার বলেচি আবার বলি, আমি যে-কাজকে আমার নিজের কাজ ব'লে এতকাল বহন ক'রে এসেচি—সে কাজে আমার সহায় প্রায় কেউ নেই—শরীরও ক্লিষ্ট মনও ক্লান্ত, আয়ুও শেষের দিকে। আজ এই কাজের ভার সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করেচি—অন্য কোনো দাবী যদি এর উপর চাপাই তবে আমি ব্যর্থ হব। তোমরা একথা এই কারণেই বুঝতে পার না, যেহেতু এটাকে তোমরা যথেষ্ট গুরুতর মনে কর না। শরীর ভাল থাক্‌লে বয়স অল্প হ'লে সঙ্গীতে যে-কাজ তুমি আমার কাছে চেয়েচ সে-কাজে যোগ দিতে চেষ্টা করতুম—একদিন ছিল যখন বহুলোকের দাবী মিটিয়েচি, আজ শক্তি নেই। আমার নিজের কর্ম্মতরীর লগি অনেককাল একলাই ঠেলে এসেচি, তৎসত্ত্বেও অন্যের বোঝায় কাঁধ দিয়েচি।

পণ্ডিত ভাতখণ্ডের পক্ষ আমি সমর্থন করি নি এমন কথা তুমি অমিয়র পত্রে কেন লিখেচ বুঝতেই পারলুম না—আমি স্পষ্ট ক'রে একমাত্র ভাতখণ্ডের পক্ষই সমর্থন করেচি—দ্বিতীয় কারোরই না।

আর একটি কথা। বেশি নাড়াচাড়া করলেই যে বোঝাপড়ার সব সময়ে সুবিধা হয় তা তো নয়। এক এক সময়ে সহজে বোঝবার অবস্থার ব্যতিক্রম হয়, তখন তাড়া লাগিয়ে বোঝাতে গেলে আরো বিপত্তি ঘটে। একথা তুমি অনেক সময়ে ভুলে যাও দেখেচি যে ব্যক্তিগত কারণের উপর যুক্তিগত আলোচনার জোর প্রায়ই খাটে না। গায়ে যখন জ্বরের কাঁপুনি ধরে তখন বসন্তের হাওয়াকেও শীতের হাওয়া ব'লে মনে

হয়। সে সময়ে তাপমান যন্ত্রের সাহায্যে হাওয়াটার উত্তাপ নির্ণয়ের বৃথা চেষ্টা না ক'রে কম্বল মুড়ি দিয়ে প'ড়ে থাকাই একমাত্র উপায়। ইতি, ৮ই ফাল্গুন ১৩৩৪

স্নেহানুরক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু,

মণ্টু, তোমাকে যদি অন্তরের সঙ্গে স্নেহ না করতুম তাহ'লে তোমার সঙ্গে বোঝাপড়া করবার লেশমাত্র চেষ্টা করতুম না। জীবনে এত লোক আমাকে বারবার ভুল বুঝেচে যে সে-সম্বন্ধে আমার একটা উপেক্ষা-বোধ জ'ন্মে গেছে। আমি পারতপক্ষে কৈফিয়ৎ দিতে যাইনে। তা ছাড়া, আমাকে ভুল বোঝবার সাইকলজিকাল কারণ যখন বুঝতে পারি তখন ক্ষোভ অনেক চ'লে যায়। একদিকে বাতাস হালকা হ'লে অন্য দিক্ থেকে ঝড় আসে এ নিয়ে মকদ্দমা ক'রে ত কোনো লাভ নেই। হালকা বাতাসেরও দোষ নেই, উদ্দাম বাতাসেরও। উভয়ের মধ্যেকার অসঙ্গতি একটা উপদ্রব ক'রেই থাকে। আমার নিজের স্বভাবের সব দিক সহজে পরিদৃশ্যমান নয়—বিশেষভাবে যে-দিক্‌টাতে আমার মর্ম্মস্থান। এইজন্যে আমার অসম্পূর্ণ পরিচয়ের দ্বারা মানুষ যে আঘাত পায়, এবং সব কাজের ঠিক্ হিসাব পায় না,—সেটা আমার অদৃষ্টের চক্রান্তে। বস্তুতই সেটা অদৃষ্টের রচনা—অর্থাৎ তার মূল হচ্চে আমার যে-জায়গা দৃষ্ট নয় সেইখানে। যাক্‌গে। ঝড় আপনিই থেমে যায়—বিরোধের অসঙ্গতি আন্দোলনের ভিতর দিয়ে আপনিই সামঞ্জস্যে গিয়ে পৌঁছয়। আরোগ্যের দাওয়াইখানা বিভাগ কালের হাতে। ইতি, ১০ই ফাল্গুন ১৩৩৪

স্নেহানুরক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু,

মণ্টু, ঝগড়া যদি করতেই হয় সেটা মোকাবিলায় ভালো, লিখিত পত্রে নৈব নৈব চ। যেটাকে পাণ্ডু-লিপি বলা হয় সেটা ঘোরতর কৃষ্ণলিপি, ভাবের অনেকখানি আলো সে লুপ্ত করে। তাছাড়া, বাদবিবাদের

পাকা দলিল যদি না থাকে সেটাকে অস্বীকার করা সহজ হয় ; এমন কি স্থান কাল পাত্রে সেটাকে উপভোগ করাও চলে। মনে পড়চে, Keats তাঁর প্রণয়িনীর rich angerএর কথা খুব লালায়িত ভাষায় বলেচেন, তার কারণ, angerএর সঙ্গে কম্পিত ওষ্ঠাধর ও বাষ্পম্লান নীল চোখ দুটিকে মিশ্রিত ক'রে তবে সেটা তাঁর কাব্যের থালাতে অমন সরস ক'রে সাজাতে পারলেন। কিন্তু ভেবে দেখ angerটি যদি পৌঁছত রেজেস্ট্রিপত্রযোগে তাহলে কবিকে মাথায় হাত দিয়ে পড়তে হ'ত। তাঁর কফির পেয়ালা অনাস্বাদিত, বেক্‌ন্ ও ডিম্ব অভুক্ত এবং সিগারেট অ-ধূপিত হ'য়ে থাক্‌ত। তোমাদের গানের আসরে তুমি এবার আমার নিমন্ত্রণ বন্ধ করবার উদ্যোগে ছিলে, এর পরে বোধহয় ধোবা-নাপিত বন্ধ করবার চেষ্টা করবে, সকলের চেয়ে শোকাবহ ব্যাপার হবে তোমার কন্যার সঙ্গে আমার বিবাহের সম্ভাবনামাত্র থাকবে না, ম'লে পোড়াবে না তার চেয়ে এটা অনেক বেশি, কারণ চিতাদাহের চেয়ে বিরহের চিত্তদাহ অনেক উগ্রতর। কবি মাত্রই একথা অন্তত কবিতায় লিখে থাকেন। স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছি তোমাদের হাতে স্বরাজ পড়লে আমার পক্ষে সেটা ভয়াবহ হবে। এই কথাটাই মনে ক'রে মনে স্বস্তি পাচ্চিনে, কেন না অতি সম্ভব তোমরা স্বরাজ পাবে এই গুজবটা দীর্ঘকাল থেকে চল্‌চে।

কিন্তু হিন্দুস্থানী গান সম্বন্ধে আমার যতটা বদনাম শুনেচ তার সবটা আমার অপরাধ নয়, অর্থাৎ ফাঁসি বা নির্ব্বাসনের আমি যোগ্য নই, এক আধবার এক আধখানা টিকিট পাঠিয়ো, নইলে দরজা ভাঙবার দলে ঢুকতে হবে। এমন ক'রে তোমার কাছে টাকা ধার ক'রে তোমার কন্সার্টের টিকিট কেনা পর্য্যন্তও এগোতে পারি, তবে কবুল করছি যে তার পরে শোধ করবার বেলায় স্মরণশক্তির ত্রুটি হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব নয়।

রমাঁ রোলাঁর সঙ্গে তোমার সাঙ্গীতিক আলাপ আলোচনা পড়েচি, অনেক তর্কের বিষয় আছে, সেটা সাক্ষাতে হবে। ইতি, ৮ই মাঘ ১৩৩৪।

স্নেহাসক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উপরের পত্রগুলি শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়কে লিখিত

"জয় হোক্ মানুষের"

[ভাদ্রের বিচিত্রায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের "সনাতনম্ এনম্ আহুর্ উতাদ্যস্যাৎ পুনর্নবঃ" সম্পর্কে লিখিত]

শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার বসু

মানুষের যে জয়গান, সহজের যে অভিনন্দন রবীন্দ্র-সাহিত্যের এক বৃহৎ অংশ জুড়িয়া আছে; নানা প্রবন্ধে, কবিতায়, উপন্যাসে ও নাটকে, সভ্যতাপিষ্ট মানুষের যে কাতর ক্রন্দন ক্ষণে ক্ষণে ধ্বনিয়া উঠিয়া পাঠকের চিত্তকে বিভ্রান্ত করিয়াছে; চিরন্তন সত্যের প্রতি যে দৃঢ় নির্ভর, কবির দৃষ্টিকে আধুনিক সভ্যতার নিত্য অনুচর সহস্র পঙ্কিলতা পার করিয়া, বহু উর্দ্ধে আলোকের রাজ্যে লইয়া গিয়াছে; তাহারই এক নবতন রূপ, অপূর্ব্ব বেগবান ছন্দোময় গদ্যে অপরূপ চমৎকারিত্বে ফুটিয়া উঠিয়াছে এই রূপক্ রচনাটির মধ্যে।

পশ্চিমের মদস্ফীত সভ্যতার অশোভন আস্ফালনের নীচে যে মানুষের বুকফাটা ক্রন্দন চাপা পড়িয়া যাইতেছে, এ সভ্যতা যে একান্তই আত্মঘাতী এবং মানবশোণিতপুষ্ট, একথা কবি চিত্তকে বারবার আন্দোলিত করিয়াছে। পশ্চিম সমুদ্রতটের এই লোহিত-রাগকে কবি কোনওদিন নবারুণ লেখা বলিয়া মানিয়া লইতে পারেন নাই। সজ্জাহীন সহজের কাছে আত্মসমর্পণ করিয়াই যে ইহাকে বাঁচিতে হইবে; দুর্যোগ রাত্রির অবসানে মুক্তির শুভ্র প্রভাতকে যে বরণ করিয়া লইবে, সে হয়ত আজ 'বহু দুঃখে নম্র-লাজে' পূর্ব্ব সিন্ধুতীরেই মৌন হইয়া আছে; কবি আমাদের এই আশ্বাসবাণী দিয়াছেন।

বর্ত্তমান সভ্যতা যে বিরাট দানবের ন্যায় সমগ্র পৃথিবীর বুকের উপর পা দিয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহার গগন-বিসর্পী সজ্জিত দেহকে পুষ্ট করিতে যে কোটি কোটি মানুষের হৃদয়রক্তের নিত্য প্রয়োজন হইতেছে; পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে যে দুঃখের ঋণ জমিয়া উঠিতেছে; সে কথা আমাদের অপেক্ষা অধিক আজ আর কে জানে। সে যে, কল্যাণকে অস্বীকার করিয়াছে, তাহার রথের দুর্নিবার বেগ মানুষের সুখের নীড়গুলিকে চূর্ণ করিয়া চলিয়াছে। মানুষ সভয়ে জিজ্ঞাসা করিতেছে "তুমি কোন্ মহাতীর্থের যাত্রী, 'কোন্ বন্ধুসাথে হবে দেখা' ", কিন্তু, অগ্রসর হইবার সর্ব্বনাশা মোহে, সে কথায় সে কর্ণপাত করে না। মথিত মানুষের ক্ষুব্ধ ক্রন্দনে পৃথিবীর আকাশ বাতাস কলুষিত হইয়া উঠিয়াছে। তাই, জগদ্ব্যাপী স্বার্থের দ্বন্দ্ব, মানুষে মানুষে হানাহানি, ভ্রাতৃরক্তে তর্পণের বিশ্বজোড়া ব্যবস্থা।

ব্যথিত কবি-চিত্ত তাই বেদনার ঝঙ্কারে বাজিয়া উঠিয়াছে। 'মুক্ত ধারা'র মধ্যেও এই আবেগের চাঞ্চল্য, 'রক্তকরবী'ও এই বেদনায় স্পন্দিত। কোনও বিশেষ দেশ, কাল বা ঘটনার বহুউর্দ্ধে যদিও এই কাব্যের স্থান, তাহা হইলেও পড়িতে পড়িতে মনে হয় যেন, ভারতবর্ষের মূক মর্ম্মবেদনা ইহার মধ্যে মূর্ত্তি পাইয়া সজীব হইয়া উঠিয়াছে, এবং তাহার সাধনার পথ এবং সিদ্ধির ইঙ্গিতও যেন ইহা বহন করিয়া আনিয়াছে। চিরন্তন ও চির-নবীনের বর্ণিত লীলারূপটির সহিত ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থার যেন একটা আশ্চর্য্য সাদৃশ্য রহিয়া গিয়াছে।

* * * *

মহাকালের যে ভয়াবহ রূপবর্ণনায় মধ্য দিয়া কাব্য আরম্ভ হইয়াছে, দুঃস্বপ্নের মত তাহা পাঠকের মনের উপর

চাপিয়া থাকে। আজ জগৎ হইতে প্রকৃত ধর্ম্ম, সহজ আনন্দ, মনুষ্যত্বের মর্য্যাদা বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। এখানে আজ পরশ্রীকাতরের কানাকানি, কুৎসিৎ জনশ্রুতি, অবজ্ঞার কর্কশ হাস্য। চারিদিকে মানুষের সহস্র অপমান।

"যত অশ্রুজল,
যত হিংসা হলাহল,
সমস্ত উঠেছে তরঙ্গিয়া,
কূল উল্লঙ্ঘিয়া।"

আজ,

"ভীরুর ভীরুতাপুঞ্জ, প্রবলের উদ্ধত অন্যায়
লোভীর নিষ্ঠুর লোভ,
বঞ্চিতের নিত্য চিত্ত-ক্ষোভ,
জাতি অভিমান,
মানবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বহু অসম্মান"

বিধাতার বক্ষে শেল হানিতেছে।

নির্ব্বিচার বিবাদ দিকে দিকে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতেছে। এখানে মানুষের কোনও মূল্য নাই। এই বিভীষিকাময় ধ্বংসের তাহারা মাত্র ইচ্ছাহীন যন্ত্র স্বরূপ। কল্যাণরূপিণী নারীর মাতৃহৃদয় এই বিপর্য্যয়ে ক্ষত-বিক্ষত আর যৌবনমদ-বিলসিত নগ্নদেহ অপরজন ইহাতেই মাতিয়া উঠিয়াছে। এই ক্লেদাক্ত জগৎ তাহার সমস্ত কলুষের সহিত এক প্রলয়-রাত্রির ঘনকৃষ্ণ অন্ধকারের মধ্যে নিমজ্জিত। উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন উঠিতেছে "এ রাত্রির কি অবসান নাই? 'নূতন উষার স্বর্ণদ্বার খুলিতে বিলম্ব কত আর।' "

প্রলয়রাত্রির কি ভয়াবহ বর্ণনা!

[এখানে বর্ণনীয় বিষয়ের ভীষণ রূপকে ভীষণতম করিবার জন্য নাটকীয় কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু, পাঠকের মনের উপর ইহার ফল অব্যর্থ হইলেও, কোথারও নাটকীয় অত্যুক্তি বা নিরর্থক উক্তি রচনার শিল্পসৌন্দর্য্যকে আঘাত করে নাই।]

* * * *

মুক্তির ইঙ্গিত, আলোর ইঙ্গিত যেখান হইতে আসিতেছে, সেখানে জনতা নাই, কোলাহল নাই, বিপুল আয়োজন নাই। তুষারশুভ্র নীরবতার মধ্যে ভক্তের চক্ষু আলোর ইঙ্গিত খুঁজিতেছে। বিপদ যখন ঘনীভূত হইয়া উঠে, মানুষ আর্ত্ত-স্বরে চিৎকার করে, তখন ভক্তের অভয়বাণী শুনা যায়। তিনি মনুষ্যত্বের জয়গান করেন। সন্দিগ্ধ লুব্ধ মানুষ বিশ্বাস করিতে চায় না। সে সাধুতাকে বলে আত্ম-প্রবঞ্চনা; সে পশুশক্তিকে আত্মাশক্তি বলিয়া জানে। সে মনে করে মানুষকে চিরদিন মরীচিকার অধিকার নিয়া হিংসাকণ্টকিত মরুভূমির মধ্যে সংগ্রাম করিতে হইবে।

[ইহার মধ্যে যেন বর্ত্তমান জগৎ এবং তাহারই একপাশে বসিয়া যে কয়জন মনীষী শান্তির বাণী প্রচার করিতেছেন— তাহার চিত্রটি এক বিশেষ রূপ নিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।]

* * * *

জগতের পূর্ব্ব দিগন্তে শুক তারা দেখা দেয়। কেন না, মানুষ হাঁপাইয়া উঠে; সে মুক্তির জন্য পাগল হইয়া যায়। তাই সময় বুঝিয়া ভক্ত আসিয়া ডাক দেন, যাত্রার জন্য। যুবক, বৃদ্ধ, শিশু, নারী সবাই আসিয়া যোগ দেয় — বিপুল উৎসাহে যাত্রা আরম্ভ হয়।

কিন্তু, আজও মানুষ নিজের রিপু জয় করিতে পারে নাই। কেবল নিজের লোভকে মহৎ নাম ও বৃহৎ মূল্য দিয়া উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যা করে, আর শান্তি-শঙ্কাহীন চৌর্য্যবৃত্তির অনন্ত সুযোগ ও আপন মলিন, ক্লিন্ন দেহমাংসের অনন্ত লোলুপতা দিয়া কল্প স্বর্গ রচনা করে। তাই যাত্রা ব্যর্থ হয়। অতৃপ্তলোভ পুরুষদের তর্জ্জন প্রবল হইয়া উঠে, মেয়েদের বিদ্বেষ তীব্র হয়। ইহারা অধিনেতাকে বলে মিথ্যা প্রবঞ্চক এবং অবশেষে তাঁহাকেই আঘাত করে। এই অভিযানের মধ্যেই ইহার ব্যর্থতার বীজ লুকানো ছিল। এই যাত্রা শুধু সত্যসন্ধানীর নয়। থালায় শ্বেত চন্দন ও ঝারিতে গন্ধবারি লইয়া, মাতা, কুমারী, বধূ চলিয়াছিলেন; আর সেই সঙ্গে চলিয়াছিল বেশ্যা; চলিয়াছিল সাধুবেশী ধর্ম্মব্যবসায়ী, দেবতাকে হাটে হাটে বিক্রয় করা যাদের জীবিকা। তাদের কাহারও মনে ক্রোধ, কাহারও মনে সন্দেহ।

[এখানে যাত্রার উন্মাদক বর্ণনা, তাহার করুণ ব্যর্থতা পাঠকের মনে সত্যই কল্পলোক সৃষ্টি করিয়া তোলে। জগতে কতবার এমন হইয়াছে; কত বিপুল উদ্যমে মুক্তি-

যাত্রা আরম্ভ হইয়াছে, আর যাত্রীদের নিজেদের দুর্ব্বলতা এবং ভিতরের রিপুই এই পথে বৃহত্তম বাধা সৃষ্টি করিয়াছে। এই যাত্রার বর্ণনাটি আমাদের গতবর্ষের ভারতবর্ষের কথা মনে করাইয়া দেয় "জ্ঞানগরিমা ও বয়সের ভারে মন্থর অধ্যাপককে ঠেলে দিয়ে চলে চটুলগতি বিদ্যার্থী যুবক। মেয়েরা চলেছে কলহাস্যে, কত মাতা, কুমারী, কত বধূ ···।"]

* * * *

মুক্তির আহ্বান ব্যর্থ হয় না। সর্ব্বাপেক্ষা আকুল হইয়া উঠে মেয়েরা,—কেন না, ব্যথা এখানেই গভীরতম। ভগবানের দয়া হয়; পূর্ব্বাকাশ আবার লোহিতাভ হইয়া উঠে। মানুষ বুঝিতে পারে, সংশয়ের মোহে সে সত্যকেই আঘাত করিয়াছে। সে ক্রোধে যাহাকে হনন্ করিয়াছিল সংশয়ে যাহাকে অস্বীকার করিয়াছিল, তাহাকে প্রেমের দ্বারা লাভ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া উঠে। এবার আর অধিনেতার প্রয়োজন হয় না। সবাই সত্যাগ্রহী। যখন বাধা আসে তরুণ বলে "থেমো না বন্ধ, অন্ধ তমিস্র রাত্রির মধ্য দিয়ে আমাদের পৌঁছতে হবে মৃত্যুহীন জ্যোতির্লোকে।" পূর্ব্বদেশের বৃদ্ধ এবার পথ দেখান।

[বারে বারে মুক্তির বাণী শান্তির বাণী পূর্ব্বদেশ হইতেই আসিয়াছে এবং সম্ভবতঃ কবি বিশ্বাস করেন প্রাচ্যই জগৎকে মুক্তির পথ দেখাইবে।]

* * * *

আবার যাত্রা আরম্ভ হয়। এবার শুধু অগ্রসর হয় সাধকের দল। তরুণের দল ডাক দিয়া বলে "চলো, যাত্রা করি, প্রেমের তীর্থে, শক্তির তীর্থে, জ্ঞানের তীর্থে, অপরিমেয় ঐশ্বর্য্যের তীর্থে।" এবার সকলে সুদৃঢ় শুধু ইহলোককে জয় করিবার জন্য নয় লোকান্তরকেও। এবার অন্তরের কলুষ খসিয়া পড়িয়াছে। ক্ষুদ্রলোভ আজ আর মহৎ সার্থকতার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইতে পারিতেছে না। এবার মুক্তির সন্ধান মিলিল। কিন্তু, রাজার দুর্গ, সোনার খনি, মারণ উচাটন মন্ত্রের মধ্যে নয়—প্রচুর ঐশ্বর্য্য, বিপুল আয়োজনের মধ্যে নয়। সহজ, সরল জীবনের মধ্যে শ্যামল ধরণীর বুকে, উন্মুক্তদ্বার পর্ণকুটীরের মধ্যে আবার মানুষ আপনাকে কুড়াইয়া পাইল। দিগ্‌দিগন্তে মনুষ্যত্বের জয় ঘোষিত হইল।

আজ জগৎ এই তরুণ সাধকদলের জন্যই উদ্‌গ্রীব হইয়া আছে। *

শ্রীসুশীলকুমার বসু

* পাঞ্জিয়া সারস্বত পরিষদে পঠিত।

বাংলা অক্ষরবৃত্ত ছন্দের স্বরূপ

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন, এম্‌-এ

বাংলা ছন্দকে প্রধানতঃ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। আমি ঐ তিনটি ধারার যথাক্রমে নাম দিয়েছি—মাত্রাবৃত্ত, স্বরবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্ত।* বাংলা ছন্দে তিনটি বিভিন্ন উপায়ে ধ্বনির মূল্য নির্দ্ধারিত হয়ে থাকে এবং ধ্বনির পরিমাণ-নির্ণয়ের এই তিনটি বিভিন্ন পদ্ধতি থেকেই বাংলা ছন্দের তিনটি মূল প্রবাহের উৎপত্তি হয়েছে। মাত্রাবৃত্ত স্বরবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্ত, ছন্দের এই তিন ধারাতেই অযুগ্ম ধ্বনির (অ আ ই ঈ ক কা কি ইত্যাদি) একই মর্য্যাদা, সংস্কৃত ভাষার স্বভাবদীর্ঘ স্বরগুলিও হ্রস্ব স্বরের সমান মর্য্যাদাই পেয়ে থাকে অর্থাৎ একমাত্রিক বলে গণ্য হয়ে থাকে। কিন্তু এ তিন ছন্দে যুগ্ম ধ্বনির পরিমাণ-নির্ণয় হয় তিনটি স্বতন্ত্র পদ্ধতিতে। মাত্রাবৃত্তে যুগ্ম ধ্বনি, তা সে স্বরান্তিকই হোক আর ব্যঞ্জনান্তিকই হোক্‌, সর্ব্বত্রই দ্বিমাত্রিক বলে গণ্য হয়; অল্প কথায় এই বলা যায় যে মাত্রাবৃত্তে সর্ব্বদাই যুগ্ম ধ্বনির শেষাংশটিকে অর্থাৎ আশ্রিত বর্ণটিকে গণনার মধ্যে ধরা হয়। দৃষ্টান্ত—

যে বাণী আমার্‌ | কখনো কারে ও্‌ | হয়্‌ নি বলা
তাই্‌ দিয়ে গানে | রচিব নূতন্‌ | নৃত্যকলা।

—নিবেদন, মহুয়া, রবীন্দ্রনাথ

এখানে দণ্ডচিহ্নিত তিনটি ব্যঞ্জনান্তিক যুগ্ম ধ্বনিকে দ্বিমাত্রিক বলে গণনা করা হয়েছে; যোগচিহ্নিত দু'টি স্বরান্তিক যুগ্ম ধ্বনিকেও দ্বিমাত্রিক বলেই ধরা হয়েছে; অর্থাৎ র্‌ য়্‌ ত্‌ এই তিন আশ্রিত ব্যঞ্জন এবং ও্‌ আর ই্‌ এই দু'টি আশ্রিত স্বর ‡, এরা সকলেই গণনার আমলে এসেছে। সুতরাং ছন্দ মাত্রাবৃত্ত।

স্বরবৃত্তের ব্যবস্থা তার ঠিক উল্টো অর্থাৎ এ ছন্দে যুগ্ম ধ্বনিকে দ্বিমাত্রিক বলে গণ্য করা হয় না, আশ্রিত বর্ণগুলি হিসাবের আমলে আসে না। মোট ধ্বনি সংখ্যা গু'ণে গেলেই এ ছন্দের প্রকৃতি ধরা পড়ে। দৃষ্টান্ত—

সে দিন্‌ যেন | কৃপা আমায়্‌ | করেন্‌ ভগ- | বান্‌,
মেশীন্‌-গান্‌-এর্‌ | সম্মুখে গাই্‌ | জুঁই ফুলের্‌ এই্‌ | গান।

—চিঠি, পূরবী, রবীন্দ্রনাথ

এখানে প্রতি পংক্তিচ্ছেদে চারটি করে স্বর বা ধ্বনি আছে, কেবল শেষ ছেদে একটি করে; দণ্ডচিহ্নিত ব্যঞ্জনান্তিক যুগ্ম ধ্বনি এবং যোগচিহ্নিত স্বরান্তিক যুগ্ম ধ্বনি, কাউকেই হিসাবে ডবল বলে ধরা হয়নি অর্থাৎ দশটি আশ্রিত ব্যঞ্জন এবং তিনটি আশ্রিত স্বর কেউ গণনার আমলে আসেনি। সুতরাং ছন্দ স্বরবৃত্ত।

অক্ষরবৃত্তের ব্যবস্থা এ দুয়ের মাঝামাঝি অর্থাৎ এ ছন্দে যুগ্ম ধ্বনিকে কোথাও ডবল বলে গণনা করা হয়, কোথাও হয় না। অবশ্য এ গণনার একটি নির্দ্দিষ্ট নিয়ম আছে, সেটি হচ্ছে এই—শব্দের মধ্যবর্ত্তী* যুগ্ম ধ্বনিকে ধরা হয় এক, কিন্তু শব্দের অন্তস্থিত* যুগ্ম ধ্বনিকে ধরা হয় দুই। দৃষ্টান্ত—

* প্রবাসী—১৩২৯, পৌষ—চৈত্র; ১৩৩০, বৈশাখ, মাঘ—চৈত্র।

‡ আশ্রিত স্বরবর্ণকেও আশ্রিত ব্যঞ্জনবর্ণের ন্যায় হসন্তচিহ্নযোগে নির্দ্দেশ করা গেল। ছন্দপ্রসঙ্গে হসন্তচিহ্নকে আশ্রয়চিহ্ন নামে অভিহিত করাই সঙ্গত মনে করি।

* এ প্রবন্ধে শব্দের অ-প্রান্তবর্ত্তী স্বরমাত্রকেই মধ্যবর্ত্তী বলে ধরা হয়েছে এবং একস্বর শব্দের স্বরধ্বনিটিকে প্রান্তবর্ত্তী বলে গণ্য করা হয়েছে।

উদয়-দিগন্তে ঐ শুভ্র শঙ্খ বাজে।
মোর চিত্ত মাঝে
চির নূতনেরে দিল ডাক
পঁচিশে বৈশাখ।

—পঁচিশে বৈশাখ, পূরবী, রবীন্দ্রনাথ

এখানে দণ্ডচিহ্নিত যুগ্ম ধ্বনিগুলিকে এক বলে গণ্য করা হয়েছে, কারণ এগুলি শব্দের মধ্যে অবস্থিত; আর যোগচিহ্নিত যুগ্ম ধ্বনিগুলিকে দুই বলে ধরা হয়েছে, যেহেতু এগুলি শব্দের অন্তে অবস্থিত। শব্দের অন্তস্থিত যুগ্ম ধ্বনিগুলি যে আসলে দ্বিমাত্রিক তার প্রমাণ হচ্ছে এই যে এই ধ্বনিগুলিকে শব্দমধ্যবর্ত্তী ধ্বনিগুলির চেয়ে দীর্ঘতর করে অর্থাৎ টেনে উচ্চারণ করতে হচ্ছে; তার আরেক প্রমাণ এই যে 'বৈশাখের' ঐ-কারকে এক বলে ধরা হলেও প্রথম পংক্তিস্থিত 'ঐ'কে প্রত্যক্ষতই দুই বলে গণনা করা হয়েছে।

কবিরা কিন্তু অক্ষরবৃত্ত ছন্দ রচনার সময় শব্দের এই অন্তিম দ্বিমাত্রিক প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখেন না; তাঁরা শুধু ধ্বনির চাক্ষুষ প্রতিরূপ অর্থাৎ লিপিবদ্ধ অক্ষর সংখ্যা গুণেই এ ছন্দ রচনা করেন। বলা বাহুল্য এই কৃত্রিম ও স্থূল বিচারের ফলে এ ছন্দে সময় সময় ত্রুটি ঘটে থাকে; কি করে তা হয় তাই দেখাচ্ছি। ভাষার ধ্বনিপ্রকৃতির প্রতি যথেষ্ট লক্ষ্য না রেখে রচনা করা সত্ত্বেও অক্ষরবৃত্ত ছন্দে যে এত কম ত্রুটি ঘটে সেইটেই আশ্চর্য্যের বিষয়; কিন্তু তার কারণ আছে। দৈবক্রমে ভারতবর্ষে ব্যঞ্জনসংহতিকে যুক্তাক্ষরের সাহায্যে প্রকাশ করার পদ্ধতি হয়েছিল; বাংলা ভাষায়ও (বিশেষতঃ সংস্কৃত শব্দের বেলায়) এই রীতি অনেকটা প্রচলিত আছে; তাই বাংলায় অক্ষরবৃত্ত ছন্দের সৃষ্টি হতে পেরেছে; নতুবা অর্থাৎ বাংলায় যদি ইংরেজি ও অন্যান্য ভাষার মতো হসন্ত বর্ণকে স্বতন্ত্ররূপে লেখার রীতি থাকৃত, তবে অক্ষরবৃত্ত ছন্দের উদ্ভব হতে পারত না। এই উক্তিটি আপাতত বিস্ময়কর মনে হলেও একটু তলিয়ে দেখ্‌লেই এ কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি হবে। একটা দৃষ্টান্ত ধরা যাক্—

ঝঞ্‌ঝার্ মঞ্‌জীর্ বাঁধি উন্‌মাদিনী কাল্‌বই্‌শাখীর্
নৃত্য্ হোক্ তবে।

—বর্ষশেষ, কল্পনা, রবীন্দ্রনাথ

এখানে শুধু যুগ্মধ্বনিগুলিকে আলাদা করে দেখিয়েছি; স্বরবর্ণগুলিকে প্রচলিত আ-কার ই-কার রূপেই রেখেছি। ইংরেজির মতো স্বতন্ত্র করে দেখালে এই কথাগুলি আরও দীর্ঘ হয়ে যেত। কিন্তু এখানে উদ্ধৃত কথাগুলিকে ইংরেজির তুলনায় সংক্ষিপ্ত আকারে লেখা গেল; এ রকম লিপি-পদ্ধতিও যদি প্রচলিত থাকৃত তবু কি শুধু অক্ষর গুণে ছন্দরচনার অন্ধ অভ্যাস এদেশে হতে পারত? এর একমাত্র উত্তর, পারত না। আর ইংরেজির মতো স্বরবর্ণগুলিও যদি স্বতন্ত্ররূপে লেখা হত তবেতো আর কথাই ছিল না। কিন্তু বাংলায় যুগ্মধ্বনিকে যুক্তাক্ষরের সাহায্যে লেখা হয় বলেই যুক্তাক্ষরকে এক গণনা করে এই অক্ষরবৃত্ত ছন্দ রচনা করা হচ্ছে। তবে মনে রাখা উচিত যে বাংলায়ও এই যুক্তাক্ষরের লিপিপদ্ধতি বিশেষভাবে শুধু সংস্কৃত শব্দের পক্ষেই খাটে। অনেক অ-সংস্কৃত খাঁটি বাংলা বা বাংলায় প্রচলিত বৈদেশিক শব্দে যুক্তাক্ষর ব্যবহারের প্রচলন নেই; যথা—বোল্‌তা, বাদ্‌লা, পশ্‌লা বাদ্‌শা, বুল্‌বুলি, মস্‌জিদ ইত্যাদি; এই সমস্ত হসন্ত-মধ্য অ-সংস্কৃত শব্দগুলিকে অক্ষরবৃত্ত ছন্দে যথাসম্ভব পরিহার করে চলারই চেষ্টা দেখা যায়, কারণ হসন্তবর্ণগুলিকে গ্রাহ্য করা হবে কি না এ সম্বন্ধে সব সময়েই একটু দ্বিধা থেকে যায়। কিন্তু 'উৎসব' 'বৎসর' প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দ যুক্তাক্ষরের সাহায্যে লেখা না হলেও খণ্ড ৎ কে পরবর্ত্তী বর্ণের সঙ্গে যুক্ত বলেই ধরে নেওয়া হয়। যথা—

আশ্বিনে উৎসব-সাজে শরৎ সুন্দর শুভ্র করে
শেফালির সাজি নিয়ে দেখা দিবে তোমার অঙ্গনে।

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, পূরবী, রবীন্দ্রনাথ

কিন্তু 'দিক্‌চক্ররেখা,' 'দিক্‌ভ্রান্ত' প্রভৃতি শব্দে হসন্ত ক্-কে স্বতন্ত্র বলে গণ্য করা হবে কি না, এ বিষয়ে সংশয় দেখা যায়। যথা—

কেন আসিতেছ মুগ্ধ মোর পানে চেয়ে
ওগো দিক্‌ভ্রান্ত পান্থ, তৃষার্ত্ত নয়ানে
লুব্ধ বেগে !

—মরীচিকা, চিত্রা, রবীন্দ্রনাথ

এখানে "দিক্‌ভ্রান্ত" শব্দে চারটি অক্ষর গোণা হয়েছে। কিন্তু,

"উদয়-দিক্‌-প্রান্ত-তলে নেমে এসে"

—পঁচিশে বৈশাখ, পূরবী, রবীন্দ্রনাথ

এখানে "দিক্‌প্রান্ত" শব্দে তিন অক্ষর ধরা হয়েছে। যদি লেখা হত—

উদয়ের দিক্‌প্রান্ততলে নেমে এসে

তা হলেও খারাপ শোনাত না; কারণ 'দিক্‌ভ্রান্ত' শব্দের মতো এখানেও 'দিক্' কথাটিকে একটু টেনে পড়তে হত। রবীন্দ্রনাথ নিজেই অন্যত্র 'দিক্‌প্রান্ত' শব্দটিতে তিন অক্ষর না ধরে চার অক্ষর ধরেছেন। যথা—

চলেছে উজান ঠেলি' তরণী তোমার,
দিক্‌প্রান্তে নামে অন্ধকার,

—নববধূ, মহুয়া রবীন্দ্রনাথ

দিক্‌প্রান্তে তারি ওই ক্ষীণ নম্র কলা
নীরবে বলুক আজি আমাদের সব কথা বলা।

—প্রত্যাগত, মহুয়া রবীন্দ্রনাথ

যাহোক আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে অক্ষরবৃত্ত ছন্দ-রচনায় সংযুক্তবর্ণকে এক অক্ষর বলে ধরে নেওয়ার অভ্যাসের ফলে এই শব্দের মধ্যবর্ত্তী অসংযুক্ত অথচ হসন্ত বর্ণগুলিকে (বিশেষতঃ অ-সংস্কৃত শব্দে) কি হিসাবে গণনা করা হবে, এ বিষয়ে খুবই একটা সংশয় রয়ে গেছে। তাই এ ছন্দে সংযুক্তাক্ষরবহুল সংস্কৃত শব্দ ব্যবহারের এত প্রসার দেখা যায়। তা ছাড়া 'ধর্‌ব,' 'কর্‌ব' 'কর্‌ত' প্রভৃতি হসন্ত-মধ্য প্রাকৃত ক্রিয়াশব্দগুলি অনেকটা ওই কারণেই এ ছন্দের ধাতুতে সহ্য হয় না; গর্ব্ব, সর্ব্ব, মর্ত্ত্য, গর্ত্ত প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দগুলি কিন্তু এ ছন্দে অনায়াসেই চলে; শুধু উক্ত প্রাকৃত ক্রিয়াপদগুলি ধরিব, করিব, ধরিত, করিত প্রভৃতি সাধুবেশধারী না হলে এ ছন্দের আসরে স্থান পায় না। তাই অক্ষরবৃত্ত ছন্দটা শুধু সাধুভাষার ছন্দ হয়েই রইল; কোনো বিদ্রোহী কবিই আজ পর্য্যন্ত চল্‌তি বাংলায় অক্ষরবৃত্ত ছন্দ রচনা করতে সাহস পান নি।

আমরা দেখলুম যে শব্দের মধ্যবর্ত্তী হসন্ত বর্ণগুলিকে (বিশেষত সংস্কৃত শব্দে) পরবর্তী বর্ণে যুক্ত করে দেওয়ার প্রথা থাকাতেই অক্ষরবৃত্ত ছন্দের উৎপত্তি হতে পেরেছে এবং যেখানেই শব্দের মধ্যে হসন্ত বর্ণ অসংযুক্ত থেকে যায় সেখানেই এ ছন্দকে ইতস্তত করতে এবং বহুস্থানেই পশ্চাৎপদ হতে হয়। কিন্তু যুগ্মস্বর ব্যবহারের ক্ষেত্রেই এ ছন্দের দুর্ব্বলতা বেশি ধরা পড়ে। আমরা দেখেছি যে সংস্কৃত ভাষায় অই্ আর অউ্ ছাড়া যুগ্মস্বর নেই, অথচ বাংলায় আই্, ইউ্, এউ্, অও্, আও্ ইত্যাদি বহু যুগ্মস্বর রয়েছে। লক্ষ্য করার বিষয় এই যে সংস্কৃত যুগ্মস্বর দুটির জন্যে দুটি স্বতন্ত্র অক্ষর রয়েছে, যথা ঐ (অই্) এবং ঔ (অউ্); বাংলায় যে সব অতিরিক্ত যুগ্মস্বর আছে তাদের জন্যে কিন্তু কোনো স্বতন্ত্র অক্ষর নেই, দুটি স্বতন্ত্র স্বরবর্ণের যোগে তাদের প্রকাশ করতে হয়। এই পার্থক্যের জন্য অক্ষরবৃত্ত ছন্দকে কতকটা মুশ্‌কিলে পড়তে হয়েছে। সংস্কৃত শব্দের মধ্যবর্ত্তী অই্ এবং অউ্ এদুটি যুগ্মস্বর ঐকার ঔকারের যোগে লিখিত হয় বলে এরা প্রত্যেকেই এক স্বর বলেই গৃহীত হয়; কিন্তু আই্, ইউ্ প্রভৃতি যুগ্মস্বরের জন্য স্বতন্ত্র অক্ষর না থাকাতে এরা দ্বিস্বর বলে গণ্য হয়। এই দ্বৈধ ব্যবহারের ফলে অক্ষরবৃত্ত ছন্দে যে স্থানে স্থানে অসামঞ্জস্য দেখা যায় তা বলা বাহুল্য। একটি দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক—

বর্ষার নবীন মেঘ এলো ধরণীর পূর্ব্ব দ্বারে,
বাজাইল বজ্রভেরী। * * *
* * তাহাদের লাগি'
অন্ধকার নিশীথিনী তুমি, কবি, কাটাইলে জাগি'
জয়মাল্য বিরচিয়া। * * *
আছে তাহে ভৈরবীতে বিদায়ের বিষণ্ন মূর্চ্ছনা,
আছে ভৈরবের সুরে মিলনের আসন্ন অর্চ্চনা।

না জানি সে কোন্ শান্ত শিউলি-ঝরার শুক্লরাতে ;
দক্ষিণের দোলা-লাগা পাখী-জাগা বসন্ত প্রভাতে।

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, পূরবী, রবীন্দ্রনাথ

এই পংক্তিগুলিতে দু'টি ঐকার ছাড়া আরও তিনটি যুগ্মস্বর (যোগ-চিহ্নিত) আছে এবং তিনটিই শব্দের মধ্যবর্ত্তী, অন্তস্থিত নয়। কিন্তু ঐকার দুটিকে একস্বর বলে ধরা হয়েছে, কেন না একটি মাত্র বর্ণলিপি (ঐ) বা বর্ণসঙ্কেত (ৈ) যোগেই তাকে প্রকাশ করা যায়; আর আই্ (বাজাইল, কাটাইলে) কিংবা ইউ্ (শিউলি) এ দুটিকে প্রকাশ করাব মতো একমাত্র বর্ণলিপি বা বর্ণসঙ্কেত নেই বলেই এদের দ্বিস্বর বলে গণনা করা হয়েছে। অথচ ধ্বনি-মর্য্যাদা হিসাবে আই্, ইউ্ এবং অই্ বা ঐ এর মধ্যে কিছুমাত্র পার্থক্য নেই। এখানেই অক্ষরবৃত্ত ছন্দের দুর্বলতা ধরা পড়ে। এ দুর্বলতা ঢাকা দেবার জন্যই অক্ষরবৃত্ত ছন্দের শব্দমধ্যবর্ত্তী আই্, ইউ্ প্রভৃতি যুগ্মস্বর পৃথকভাবে আ-ই, ই-উ (যথা বাজা-ই-ল, শি-উ-লি) ইত্যাদি রূপে টেনে উচ্চারণ করতে হয়। কিন্তু শিউলি কথাটার মধ্যে যে আসলে দুটিমাত্র ধ্বনি আছে তা ঐ শব্দটিকে স্বরবৃত্ত ছন্দে বসালেই ধরা পড়বে; যথা—

আশ্বিনে ঐ | শিউলি শাখে |
মৌমাছিরে | যেমন ডাকে |

—প্রবাহিনী, ঋতুচক্র (৪৭), রবীন্দ্রনাথ

এখানে সমস্ত যুগ্মধ্বনিকে একক বলে গ্রহণ করা হয়েছে এবং তাতেই অই্ (ঐ) অউ্ (ঔ) এবং ইউ্ যে একই মর্য্যাদার ধ্বনি তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কিন্তু অক্ষরবৃত্ত ছন্দে ঐ আর ঔকে অন্য যুগ্মস্বরগুলি থেকে পৃথক্ মর্য্যাদা দেওয়া হয়। তার ফল এই হয় যে আই্ ইউ্ প্রভৃতিকে টেনে পরে আ-ই, ই-উ ইত্যাদি রূপে পৃথক উচ্চারণ করতে হয়; আর যে ধ্বনিটা মূলে এক তাকে যদি অকারণে দুয়ের মতো করে উচ্চারণ করা যায় তবে ছন্দের মধ্যে শৈথিল্য দেখা দেয়। অক্ষরবৃত্ত ছন্দরচয়িতা কবিরা এ ছন্দের এ দুর্ব্বলতাটা প্রতি পদেই টের পেয়ে থাকেন; তাই তাঁরা শব্দের মধ্যবর্ত্তী ঐ এবং ঔ ছাড়া আর সমস্ত যুগ্মস্বরকেই বর্জ্জন করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। এজন্যই দেখা যায় আজকাল কবিরা 'হইতে, লইয়া, যাইবে' প্রভৃতি সাধুশব্দের যুগ্মধ্বনিটাকে বর্জ্জন করার অভিপ্রায়ে 'হ'তে, ল'য়ে, যা'বে' প্রভৃতি সংক্ষিপ্ত চলতি রূপের প্রতিই পক্ষপাতিত্ব ক'রে থাকেন; অথচ আমরা আগে দেখেছি যে শব্দের মধ্যবর্ত্তী অসংযুক্ত হসন্ত বর্ণকে পরিহার করার চেষ্টায় তাঁরা 'করব, ধরত' প্রভৃতি চলতি রূপের পরিবর্ত্তে করিব, ধরিব ইত্যাদি সাধুরূপেরই ব্যবহার করেন। তার ফলে অক্ষরবৃত্ত ছন্দের ভাষাটা সাধু ও চলতি ভাষার একটা অদ্ভুত মিশ্রণে পরিণত হয়েছে। শিউলি প্রভৃতি শব্দের যুগ্ম ধ্বনিটাকে দ্বিধাবিভক্ত করে টেনে পড়ার অভ্যাসের ফলে এক সময় কবিরা প্রয়োজনের খাতিরে ঐ এবং ঔ-কেও ভেঙে ব্যবহার করতে ইতস্তত করতেন না; তাই বাংলা অক্ষরবৃত্তের রাজ্যে 'গউড়, পউষ' প্রভৃতি শব্দে ঔকারের দ্বিধাকৃত শিথিল রূপের অভাব নেই। তবে সুখের বিষয় আজকাল আর কবিরা এ দুর্ব্বলতাটুকুকে প্রশ্রয় দেন না। আধুনিক কালের রচনা থেকেও ঔকারের সম্প্রসারণের দুটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। যথা—

পউষের পাতা-ঝরা তপোবনে
আজি কি কারণে
টলিয়া পড়িল আসি' বসন্তের মাতাল বাতাস।

—১৩, বলাকা, রবীন্দ্রনাথ

বিগাঢ়যৌবনা তন্বী, আকারে বালিকা,
পরিণত দেহখানি আঁট সাঁট ক্ষুদ্র।
শিশির-ঋতুর স্নিগ্ধ মসৃণ রউদ্র
ঘনীভূত করে' গড়া স্বর্ণ পাঞ্চালিকা।

—সনেট-সুন্দরী, পদ-চারণ, প্রমথ চৌধুরী

এখানে 'পউষের' এবং 'রউদ্র' কথা দুটিতে ঔকারকে ভেঙে অ-উ করা হয়েছে এবং উকারের স্বতন্ত্র উচ্চারণ করা প্রয়োজন। পৌষের বা পউ্ষের এবং রৌদ্র বা রউ্দ্র এ রকম উচ্চারণ করলে ছন্দ অক্ষুণ্ণ থাকবে না; আর দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটিতে র-উ-দ্র না পড়ে রউ্দ্র অর্থাৎ রৌদ্র পড়লে পূর্ব্ববর্ত্তী "ক্ষুদ্র" শব্দের সঙ্গে তার মিলও অব্যাহত থাকবে না।

অ-সংস্কৃত বাংলা বা বাংলায় প্রচলিত বিদেশী শব্দে যেমন অনেক সময় হসন্তবর্ণকে পরবর্ত্তী ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত না করারই প্রচলন দেখা যায় (যথা—মাত্‌লামি, হাল্‌কা পাল্‌টা, পশ্‌লা) তেমনি অ-সংস্কৃত শব্দে ঐ এবং ঔকেও অযুক্ত রাখাই রীতি, যথা—লইতে, লউক, প্রভৃতি শব্দকে লৈতে, লৌক এরূপ লেখা বিধি নয়। তার ফল এই হয়েছে যে অক্ষরবৃত্ত ছন্দে শৈল, দৈব প্রভৃতি শব্দে দু'অক্ষর ধরা হয়; মৌন, ধৌত ইত্যাদিতে দু'অক্ষর, আর হউন্‌, লউক্‌ ইত্যাদিতে তিন অক্ষর। শুধু অক্ষর গুণতির দিক্‌ থেকে না দেখে ধ্বনির দিক্‌ থেকে বিচার করলে অক্ষরবৃত্তের এ ত্রুটিগুলোকে গুরুতর বলেই স্বীকার করতে হবে। প্রাচীন কবিরা কিন্তু অনেক সময় হৈতে, লৈয়া ইত্যাদি রূপ ব্যবহার করতে ইতস্তত করতেন না। এক হিসাবে এরূপ ব্যবহারকে সঙ্গত বলে স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু তাঁরা সব সময় এ রীতি রক্ষা করতেন না বলে ছন্দেও ত্রুটি থেকে যেত। কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণ থেকে দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

বঙ্গদেশে প্রমাদ হৈল সকল অস্থির।
বঙ্গদেশ ছাড়ি ওঝা আই্‌লা গঙ্গাতীরে॥

* * * * * *

গঙ্গাতীরে দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিকে চায়।
রাত্রিকাল হৈল ওঝা শুতিল তথায়॥

* * * * * *

জ্যেষ্ঠ পুত্র হৈল তার নাম যে ভৈরব।
রাজার সভায় তার অধিক গৌরব॥

এখানে সবগুলি যুক্তস্বরই একাক্ষর বলে গণ্য হয়েছে, কেবল 'দাঁড়াইয়া' কথায় এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয়েছে। বিশেষ লক্ষ্য করার বিষয়, 'আই্‌লা' শব্দে 'আই্‌' যুগ্ম-ধ্বনিটি এক বলেই গৃহীত হয়েছে, যদিও এর জন্য কোনো একটি মাত্র নির্দ্দিষ্ট বর্ণলিপি নেই। 'হৈল' শব্দের 'অই্‌' এবং ভৈরবের 'ঐ' প্রাচীন কবির কাছে সমান মর্য্যাদা পেয়েছে। কিন্তু আধুনিক কবিরা প্রাচীন বানান-রীতি গ্রহণ করতেও প্রস্তুত নন, অথচ প্রচলিত বানান-পদ্ধতি রেখে 'অই্‌' 'আই্‌' ঐ, ঔকে সমান মর্য্যাদা দিতেও রাজি নন, কারণ তাতে চাক্ষুষ গুণতির হিসাব ঠিক্‌ থাকে না। এভাবে কানকে চোখের অধীন করে রাখার ফলে আর যাই হোক্‌ না কেন, অক্ষরবৃত্ত ছন্দের কিছুমাত্র উপকার সাধিত হবে না।

ঐ এবং ঔকারের বানানের এই স্বৈরাচারের ফলে বাংলা অক্ষরবৃত্ত ছন্দের কবিদের আরেক রকম সমস্যা আছে, তাই এখন দেখাচ্ছি। বাংলায় কতগুলি শব্দ আছে যার উচ্চারণ স্থির আছে, কিন্তু ঐ এবং ঔকারের যুক্ত ও বিভক্ত দুই রূপের ফলে তাদের বানান স্থির নেই। যথা—বৈঠা, পৈঠা, পৈতা, বৌমা প্রভৃতি শব্দের যুক্তধ্বনিকে বিযুক্ত করে বইঠা, পইঠা, পইতা, বউমা, ইত্যাদি রূপেও লেখা যায়। যে ভাবেই লেখা হোক্‌ না কেন, এদের ধ্বনি যখন স্থির আছে তখন মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত ছন্দে এ শব্দগুলিকে ব্যবহার করতে কবিদের কিছুমাত্র ভাবনায় পড়তে হয় না। যথা—

শৈলের পৈঠায় এস তনু-গাত্রী
পাহাড়ের বুকচেরা এস প্রেমদাত্রী।

—ঝর্ণা, বিদায়-আরতি, সত্যেন্দ্রনাথ

এখানে যদি 'পইঠায়' লেখা হত তা হলেও ছন্দ ঠিক্‌ই থাক্‌ত; কারণ চোখের হিসাবে এদের মধ্যে অক্ষর-সংখ্যার পার্থক্য থাকলেও কানের হিসাবে এ দুটি শব্দের মধ্যে ধ্বনি-পরিমাণের কিছুমাত্র পার্থক্য নেই। কিন্তু অক্ষরবৃত্ত ছন্দ রচনার সময় কবিরা কানকে অস্বীকার করে চোখের দ্বারা চালিত হয়ে থাকেন বলে এই সমস্ত দ্বিরূপ শব্দ ব্যবহারের সময় তাঁদের প্রতারিত হবার সম্ভাবনা আছে। সংখ্যাপূরণের দিকে দৃষ্টি রেখে তাঁরা হয়তো কখনও পৈঠা লিখে দুঘর ভর্ত্তি করতে পারেন; আবার কখনও বা প্রয়োজনের খাতিরে 'পইঠা' লিখে তিন ব'লে গণ্য করতে পারেন। এ রকম করা রচনাকার্য্যের পক্ষে সুবিধাজনক হতে পারে; কিন্তু ছন্দ-সৌষ্ঠবের পক্ষে মারাত্মক নয় কি?

শব্দের অন্তস্থিত ঐকার নিয়েও কবিদের মধ্যে সংশয় আছে। পূর্ব্বেই বলেছি যে অক্ষরবৃত্ত ছন্দে শব্দের প্রান্তবর্ত্তী যুগ্মধ্বনি আসলেই দ্বিমাত্রিক এবং সেজন্যই ব্যঞ্জনান্তিক বা

স্বরান্তিক উভয় প্রকার যুগ্মধ্বনিকেই শব্দের অন্তে একটু টেনে দীর্ঘ উচ্চারণ করে পড়তে হয়। পূর্ব্বে একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছি ; এস্থলে আরেকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

+ + × + × ×
দাও, খুলে দাও্ দ্বার্, | ওই্ তার্ বেলা হলো শেষ, |

+
বুকে লও্ তারে।

। × × × × ×
শান্তি-অভিষেক্ হোক্, | ধৌত হোক্ সকল্ আবেশ্ |

। ।
অগ্নি-উৎস-ধারে।

—সাবিত্রী, পূরবী, রবীন্দ্রনাথ

এখানে শব্দের মধ্যবর্ত্তী তিনটি যুগ্মধ্বনি (দণ্ড-চিহ্নিত) একাক্ষর বা একমাত্রিক হিসাবেই উচ্চারিত হচ্ছে ; কিন্তু শব্দের প্রান্তবর্ত্তী যুগ্মধ্বনিগুলি (স্বরান্তিক ধ্বনি যোগ-চিহ্নিত, ব্যঞ্জনান্তিক ধ্বনি গুণ-চিহ্নিত) দ্বিমাত্রিক এবং সে জন্য এগুলির দীর্ঘ বা বিলম্বিত উচ্চারণ হচ্ছে। বাংলা ছন্দ-রচয়িতারা কিন্তু এ ছন্দের বিচার এভাবে করেন না ; তাঁরা শুধু লিপিবদ্ধ অক্ষরসংখ্যা গুণেই এ ছন্দ রচনা করেন ; এই গুণতির হিসাবে তাঁরা যুক্তবর্ণ, অযুক্তবর্ণ, হসন্তবর্ণ, স্বরবর্ণ সকলকেই আদমসুমারির মতো সমান মর্য্যাদা দিয়ে থাকেন। উদ্ধৃত পংক্তিগুলিতে স্বরান্ত ব্যঞ্জন (যুক্ত ও অযুক্ত), হসন্ত ব্যঞ্জন ও স্বরবর্ণ সবাইকে প্রচলিত হিসাবে সমান দর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এখানে আশ্রিত ব্যঞ্জন (অর্থাৎ হসন্ত ব্যঞ্জন)-গুলির কোনো স্বাতন্ত্র্য নেই, আশ্রয়দাতা স্বরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এরা যে যুগ্মধ্বনির সৃষ্টি করেছে তারই বিচার করতে হবে ; এ বিচারে শব্দের অ-প্রান্তবর্ত্তী আশ্রয়দাতা স্বরগুলি (দণ্ড-চিহ্নিত) লঘু স্বরের মত একমাত্রিক বলেই গণ্য হয়েছে (যেমন স্বরবৃত্ত ছন্দে হয়), আর শব্দের প্রান্তবর্ত্তী আশ্রয়-দাতা স্বরগুলি (গুণচিহ্নিত) দ্বিমাত্রিক বলে গ্রাহ্য হয়েছে (যেমন মাত্রাবৃত্ত ছন্দে হয়)। ঠিক তেমনি আশ্রিত স্বরবর্ণগুলির কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই, পূর্ব্ববর্ত্তী আশ্রয়দাতা স্বরের (যোগ-চিহ্নিত) সঙ্গে যুক্ত হয়ে যে-যুগ্ম স্বরের সৃষ্টি করেছে তারই ধ্বনিপরিমাণ বিচার করতে হবে এবং সে বিচারে এখানে সমস্ত যুগ্মস্বরগুলিই প্রান্তবর্ত্তী বলে দ্বিমাত্রিক রূপে গণ্য হবে। প্রচলিত হিসাবে এ ছন্দটি আট, দশ ও ছ' অক্ষরের ত্রিপদী ছন্দ। ধ্বনিপরিমাণের হিসাবেও এ ছন্দের তিন পাদে যথাক্রমে আট, দশ ও ছ'টি ধ্বনি মাত্রা রয়েছে। দুই হিসাবেই মোটের উপর গণনার ফল সমান হয়েছে, অতএব ছন্দ ঠিক্ আছে। কিন্তু সর্ব্বত্রই যে এরূপ দুই হিসাবের মধ্যে সাম্য থাক্‌বেই এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। কারণ শুধু সংখ্যাগুণতির হিসাবের মধ্যে ধ্বনিপরিমাণ-নির্ণয়ের কিছুমাত্র চেষ্টা থাকে না। কাজেই এই সংখ্যা গোণার ফলে অনেক রকম বিপদ ঘটতে পারে তা আগে দেখিয়েছি। এখানে আরেকটি বিপদের কথা উল্লেখ করছি।

উপরের দৃষ্টান্তটির প্রথম পংক্তিতে একটি শব্দ হচ্ছে 'ওই'; এ যুগ্ম স্বরটির আসলরূপ 'ঐ'। বাঙালীর উচ্চারণে অই্, ওই্ এবং ঐ একই রকম। উক্ত দৃষ্টান্তটিতে যদি 'ওই' এর জায়গায় 'ঐ' লেখা হত, তবু ছন্দ-পতন হত না ; কারণ ধ্বনিপরিমাণে 'ওই্' আর 'ঐ' সমতুল্য অর্থাৎ দ্বি-মাত্রিক। কিন্তু 'ওই' না লিখে 'ঐ' লিখ্‌লে অক্ষর গুণতির হিসাবে এক অক্ষর কম পড়ে যায় ; তাই কবি অতি সতর্ক ভাবে ঐ-কে পরিহার করে 'ওই' বসিয়েছেন। এটা লক্ষ্য করার বিষয় যে স্বরবৃত্ত ছন্দে কিংবা মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রবীন্দ্রনাথ 'ঐ' ব্যবহার করতে কখনও ইতস্তত করেন না ; যথা—

ঐ বাজেরে | ঘণ্টা বাজে।
চম্‌কে উঠেই | হঠাৎ দেখে | অন্ধ ছিল | তন্দ্রা মাঝে।

(স্বরবৃত্ত ছন্দ)

—বিজয়ী, পূরবী, রবীন্দ্রনাথ

ঐ আসে ঐ | অতি ভৈরব | হরষে
জলসিঞ্চিত | ক্ষিতিসৌরভ | রভসে

(মাত্রাবৃত্ত ছন্দ)

—বর্ষামঙ্গল, কল্পনা, রবীন্দ্রনাথ

কিন্তু অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রবীন্দ্রনাথ সর্ব্বত্রই 'ঐ' বর্জ্জন করে 'ওই' ব্যবহার করেন। এখানে একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

এই তৃণ, এই ধূলি—ওই তারা, ওই শশী-রবি
সবার আড়ালে
তুমি ছবি, তুমি শুধু ছবি !
—ছবি, বলাকা, রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের সমস্ত কাব্যগ্রন্থের মধ্যে অক্ষরবৃত্তে ব্যবহৃত একটি মাত্র 'ঐ' আমার চোখে পড়েছে ; সেটি আছে পূরবীর 'পঁচিশে বৈশাখ' কবিতাটিতে। যথা—

উদয়-দিগন্তে ঐ | শুভ্র শঙ্খ বাজে।

অক্ষরসংখ্যা ঠিক্ রাখার জন্যই যে রবীন্দ্রনাথ 'ঐ' ছেড়ে 'ওই' ব্যবহার করেন তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু অক্ষরবৃত্ত ছন্দে শব্দের প্রান্তস্থিত যুগ্মধ্বনি সর্ব্বদাই দ্বিমাত্রিক বলে 'ঐ' ছেড়ে 'ওই' ব্যবহারের আবশ্যকতা নেই। ('ঐ' একস্বর শব্দ বলে এর ধ্বনিটাকে প্রান্তিক বলেই ধরতে হবে।) উপরের দৃষ্টান্তটিতেই একথার সত্যতা প্রমাণিত হয়। আরও দুয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলে এ বিষয়ে সন্দেহের আর অবকাশ থাকবে না।—

পিতৃহীন, নিরুপায়, | দরিদ্র সে—ঐ তার ঘর ;
দাসী ভেবেছিনু যারে | —মা তাহার, নহেক অপর !
—সত্যদাস, জাগরণী, যতীন্দ্রমোহন

ঐটুকু ছোট পায়ে | কতদূর গেল সে যে চলি !
সেখানে যায়না যাওয়া ? | সে পথ কি দিতে পার বলি'?
যুগ্ম অশ্রু, নীহারিকা, যতীন্দ্রমোহন

ঐ টুকু কচি বুক | কোন্ ভয়ে করে দুরু দুরু
কি বেদনা ঐ মর্ম্মমূলে !
—দেয়ালা, নীহারিকা, যতীন্দ্রমোহন

বলা বাহুল্য এ তিনটি দৃষ্টান্তই অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। ওই তিনটি দৃষ্টান্তের মধ্যে চার জায়গায় 'ঐ' কথাটি দ্বিমাত্রিক রূপেই ব্যবহৃত হয়েছে অথচ ছন্দ পতন হয়নি, একথা নিশ্চয়। সুতরাং অক্ষরবৃত্তেও দ্বিমাত্রিক ধ্বনির স্থান আছে, এ বিষয়ে সন্দেহ থাকতে পারে না।

ওই বা ঐ সম্বন্ধে যা বলা হল দই বা দৈ, বউ বা বৌ প্রভৃতি সম্বন্ধেও তাই সত্য। অর্থাৎ কেউ যদি অক্ষরবৃত্ত ছন্দে দই বা বউ না লিখে দৈ বা বৌ লেখেন তথাপি শ্রুতির হিসাবে অক্ষরসংখ্যা কম হলেও ছন্দ পতন হবে না। কারণ যে রূপেই লেখা হোক্ না কেন ওই, ঐ, দই, দৈ, বউ, বৌ প্রভৃতি শব্দ অক্ষরবৃত্ত ছন্দেও সর্ব্বদাই দ্বিমাত্রিক রূপেই ব্যবহৃত হয়। একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে যে অই্ (বা ওই্) এবং অউ্ এর ন্যায় আই্, আও্, অও্ প্রভৃতি শব্দের প্রান্তবর্ত্তী যুগ্মস্বরও অক্ষরবৃত্ত ছন্দে দ্বিমাত্রিকই বটে। সুতরাং এ ছন্দে যাই, যাও, লও প্রভৃতি শব্দকে দুটি অক্ষর বলে না ধরে ঐ, দৈ, বৌ প্রভৃতি শব্দের ন্যায় দুটি মাত্রা বলে ধরাই সঙ্গত। আর অই্ কিংবা অউ্ যেমন শব্দের মধ্যে (শেষ প্রান্তে না হলেই তাকে মধ্যে বল্ছি) একমাত্রিক বলে গণ্য হয় (যথা শৈব, মৌন) তেমনি আই্, ইউ্, প্রভৃতি যুগ্ম স্বরকেও শব্দের মধ্যে একমাত্রা হিসাবেই গণ্য করা উচিত। প্রকৃত পক্ষে অক্ষরবৃত্তে দৈ এবং দৈব, বৌ এবং মৌন কার্য্যত সমান ; কারণ এ ছন্দে উভয়কেই দুই বলে ধরা হবে। একই কারণে 'শিউলি'কেও তিন না ধরে দুই ধরা উচিত। আর এ ছন্দে যুগ্ম স্বরের ন্যায় ব্যঞ্জনান্তিক যুগ্মধ্বনিও শব্দের অন্তে দ্বিমাত্রিক বলেই গণ্য হয়। অর্থাৎ অই্ (ঐ), অউ্ (ঔ) আই্, আউ্ ইত্যাদির ন্যায় অর্, ইন্, আপ প্রভৃতিকেও দুটি অক্ষর না বলে দুটি মাত্রা বলাই উচিত, যদি এরা শব্দের শেষে থাকে। কিন্তু মধ্যে থাকলে অই্, অউ্ প্রভৃতির ন্যায় এরা একমাত্রিক বলেই গ্রাহ্য হবে। সুতরাং অক্ষরবৃত্ত ছন্দের ধ্বনিপরিমাণ নির্ণয় প্রণালী হচ্ছে এ রকম—

দাও্, খুলে দাও দ্বার্, | ওই তার্ বেলা হলো শেষ, |
বুকে লও্ তারে।
শান্তি অভিষেক্ হোক্, | ধৌত হোক্ সকল্ আবেশ |
অগ্নি-উৎস-ধারে।

আশ্রিত ব্যঞ্জন (অর্থাৎ হসন্ত বর্ণ) এবং আশ্রিত স্বর উভয়কেই হসন্ত চিহ্নের দ্বারা চিহ্নিত করা হল এবং শব্দান্তস্থিত দ্বিমাত্রিক বা যুগ্মধ্বনিগুলি যুগ্মদণ্ড চিহ্নের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট করা হল। আর অযুগ্মধ্বনি এবং শব্দমধ্যবর্ত্তী

যুগ্মধ্বনিগুলিকে একটিমাত্র দণ্ড-চিহ্নের দ্বারা নির্দেশ করা হ'য়েছে। প্রচলিত প্রণালীতে অক্ষর না গুণে এই দণ্ড-সংখ্যাগুলি গুণ্‌লেও দেখা যাবে যে এটি যথাক্রমে আট, দশ এবং ছয় ধ্বনির (অক্ষরের নয়) ত্রিপদী ছন্দ।

প্রচলিত প্রণালীতে এ ছন্দের হিসাব রাখা হয় চাক্ষুষ ভাবে অক্ষরসংখ্যা গুণে,' ধ্বনিপরিমাণ নির্ণয়ের দ্বারা নয়, —এ কথা বলা হয়েছে। কিন্তু ধ্বনির প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য না রেখে সব সময়ই শুধু অক্ষর গোণা হয়, একথা বলা অন্যায় হবে। আগেই দেখেছি 'উৎসব', 'বৎসর', 'ভৎ´সনা' প্রভৃতি শব্দে খণ্ড-ৎ কে স্বতন্ত্র দেখা গেলেও তাকে স্বতন্ত্র ভাবে গোণা হয় না; একে পরবর্ত্তী ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত বলেই ধরা হয়। কাজেই এখানেও ধ্বনির চেয়ে অক্ষর-গুণ্‌তির প্রতিই লক্ষ্য বেশি। কিন্তু 'চাওয়া, পাওয়া, হাওয়া' প্রভৃতি শব্দকে দেখতে তিন দেখলেও এগুলিকে দুই বলেই ধরা হয়; কারণ এসব স্থলে 'ওয়া'র উচ্চারণ পৃথক হয় না অন্তঃস্থ 'ব'-য়ের মতো এক সঙ্গেই উচ্চারণ হয়। সুতরাং এখানে ধ্বনির প্রতি লক্ষ্য থাকার পরিচয় পাওয়া গেল। আবার 'আমারই' 'তোমারও,' 'যখনই' প্রভৃতি শব্দকেও দেখতে চার দেখালেও এরা আসলে 'আমারি, তোমারো, যখনি' প্রভৃতির মতো উচ্চারিত হয়, তাই এগুলিকে তিন বলেই ধরা হয়; এখানেও অক্ষর সংখ্যার চেয়ে ধ্বনিরই প্রাধান্য। দৃষ্টান্ত—

মোর্ সন্ধ্যাদীপালোক্,
পথ্-চাওয়া দুটি চোখ্,
যত্নে গাঁথা মালা
— অশেষ, কল্পনা, রবীন্দ্রনাথ

হে ধরণী, কেন প্রতিদিন
তৃপ্তিহীন
একই লিপি পড়ো ফিরে ফিরে?
—লিপি, পূরবী, রবীন্দ্রনাথ

এখানে 'চাওয়া' এবং 'এক-ই' কোথাও তিন ধরা হয়নি; ধ্বনির প্রতি লক্ষ্য রেখে দুই ধরা হয়েছে।

কিন্তু ধ্বনির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য না রেখে লিপিবদ্ধ অক্ষর-সংখ্যার প্রতি নজর রাখাই এ ছন্দের সাধারণ রীতি। সুতরাং এ ছন্দের গোড়ার কথাই হচ্ছে বাংলা লিপিপদ্ধতি। আগেই দেখানো হয়েছে যে যদি বাংলায় যুক্তবর্ণগুলিকে বিযুক্ত করে লেখার প্রথাই এ দেশে প্রচলিত থাকৃত তবে অক্ষর গোণার অন্ধ অভ্যাস হতে পারতনা, সুতরাং অক্ষরবৃত্তছন্দেরই উৎপত্তি হত না। বাংলা স্বরবর্ণের লিপিপদ্ধতির ফলে অক্ষরবৃত্ত ছন্দের উপর কি প্রভাব হয়েছে, এখন তাই দেখা যাক্। অযুগ্ম স্বরের লিপিপদ্ধতিতে (অন্তত ছন্দের তরফ থেকে) কোনো গোলযোগ নেই। কিন্তু যুগ্মস্বরের লিপি-পদ্ধতি নিয়েই যত মুশ্‌কিল। আমাদের বর্ণমালায় দুটি মাত্র যুগ্মস্বর-(অই্ এবং অউ্) এর স্থান আছে; কারণ এরা সংস্কৃত ভাষা থেকে আমাদের ভাষায় স্থানলাভ করেছে। এ দুটি যুগ্মস্বরের যুক্তরূপ হচ্ছে ঐ এবং ঔ; আর ব্যঞ্জনের সঙ্গে মিলিত হলে এদের প্রকাশের জন্য স্বতন্ত্র সঙ্কেত-লিপিও আছে, যথা—ৈ এবং ৌ। কিন্তু অসংস্কৃত যুগ্মস্বর-(আই্, আউ্ ইত্যাদি) গুলির কোনো স্বতন্ত্র যুক্তরূপ নেই এবং তাদের জন্য কোনো সঙ্কেত-লিপিও নেই। এর ফলে অক্ষরবৃত্ত ছন্দের স্বরূপ সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানলাভের পথে অনেক বাধা হয়েছে।

যদি অই্ এবং অউ্ এর কোনো যুক্তরূপ ও বিশেষ সঙ্কেত-লিপি না থাকৃত, অর্থাৎ যদি শৈল, মৌন প্রভৃতি শব্দকে শইল, মউন ইত্যাদি রূপে লেখার রীতি থাকৃত, তবে অক্ষর-গোণা ছন্দের যে কি রূপ হত তা সহজেই অনুমেয়। পক্ষান্তরে যদি আই্, আউ্ ইত্যাদি সমস্ত যুগ্মস্বরেরই স্বতন্ত্র যুক্তরূপ থাকৃত, তবে বাংলা অক্ষরবৃত্ত ছন্দের বর্ত্তমান রূপ হতে পারৃত কিনা সন্দেহ। দুটি দৃষ্টান্ত দিলেই আমার বক্তব্য বিষয় স্পষ্ট হবে আশা করি।

হে স্ব
তোমার নয়নজ্যোতি প্রেমবেদনায়
কভু না হোক্ ম্লান—লৈনু বিদায়।
— স্বর্গ হইতে বিদায়, চিত্রা, রবীন্দ্রনাথ

যদি 'হউক্' এবং 'লইনু' কথা দুটিকে উদ্ধৃতরূপে লেখা আবশ্যিক হত, তবে এই পংক্তিগুলিতে ছন্দ ঠিক থাকৃত

কি না তা অনুমান করা শক্ত নয়। আবার যদি 'আই'কে 'ৈ' এই সঙ্কেত-চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করাই রীতি হত তবে নিম্নোক্ত পংক্তিগুলির কি আকার হত দেখা যাক্—

অন্ন চৗ, প্রাণ চৗ, আলো চৗ, চৗ মুক্ত বায়ু,
চৗ বল, চৗ স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু।
—এবার ফিরাও মোরে, চিত্রা, রবীন্দ্রনাথ

এরকম লিখ্লেও কিন্তু ছন্দপতন হবে না; কারণ চাক্ষুষ গুণতির হিসাবে পার্থক্য থাক্লেও ধ্বনি-পরিমাণের হিসাবে 'চাই' এবং 'চৗ' এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই; অক্ষরবৃত্ত ছন্দে যেমন 'ওই' এর বদলে 'ঐ' লিখ্লে, কিংবা 'বউ' না লিখে 'বৌ লিখ্লে ছন্দ-গত কোনো পরিবর্তন ঘটেনা, তেমনি 'চাই' না লিখে 'চৗ' লিখ্লেও কোনো পরিবর্তন ঘট্বে না। ঠিক্ এভাবে যদি অও্, আও্, ইউ্ প্রভৃতি যুগ্মধ্বনি প্রকাশেরও একেকটি সঙ্কেত-চিহ্ন থাক্ত তবে বাংলা অক্ষরবৃত্ত ছন্দ কিরূপ আকৃতি ধারণ কর্ত তা কল্পনা করা খুব কঠিন নয়।

'চাই' কে 'চৗ' লেখাতে উদ্ধৃত দৃষ্টান্তের প্রথম পংক্তিতে আপাত দৃষ্টিতে চারটি অক্ষর কমে গেছে; কিন্তু ধ্বনিমাত্রা-সংখ্যার (আঠারোর) কোনো পরিবর্তন হয়নি বলে ছন্দ অব্যাহতই আছে। তেম্নি যাও, লও, দেই, ঢেউ, প্রভৃতি কথাকেও যদি সঙ্কেতে লেখার ব্যবস্থা থাকত তথাপি অধুনা-প্রচলিত অক্ষরবৃত্ত ছন্দ অক্ষুণ্ণই থেকে যেত; কিন্তু অনেক স্থলেই অক্ষর সংখ্যার মধ্যে বিপর্য্যয় উপস্থিত হত এবং তার দ্বারাই প্রমাণ হত যে অক্ষরবৃত্ত ছন্দও আসলে অক্ষর-সংখ্যার উপর মোটেই নির্ভর করে না। *

* সংস্কৃত অক্ষরবৃত্ত ছন্দে কিন্তু নির্দ্দিষ্ট অক্ষরসংখ্যার কখনও ব্যতিক্রম ঘটে না। কারণ প্রাচীন ভারতীয় লিপিপদ্ধতিতে আশ্রিত ব্যঞ্জনবর্ণ কিংবা আশ্রিত স্বরবর্ণ কখনও স্বতন্ত্রভাবে লিখিত হয় না, সর্ব্বদাই যুক্তরূপে লিখিত বা গৃহীত হয়। সুতরাং সংস্কৃত ছন্দে প্রত্যেকটি লিপিবদ্ধ অক্ষর প্রকৃতপক্ষে একেকটি সিলেব্ল্। বাংলায় কিন্তু বহুস্থলেই যে সব আশ্রিত স্বর বা ব্যঞ্জনবর্ণের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই তারাও স্বতন্ত্রভাবেই লিপিবদ্ধ হয়; এইজন্যই বাংলা অক্ষরবৃত্ত ছন্দের উপরোক্ত মিশ্র প্রকৃতির উদ্ভব হয়েছে। বাংলায় স্বতন্ত্রভাবে লিপিবদ্ধ বা মুদ্রিত হরফ্ মাত্রকেই একটি অক্ষর বলে গণ্য করা হয়; আমারাও প্রচলিত অর্থেই অক্ষর শব্দের ব্যবহার করছি। বাংলায় অক্ষর বল্তে সিলেব্ল্ বোঝায় না। এ কথাটি মনে রাখা আবশ্যক।

আমরা আগেই দেখেছি যে স্বরবৃত্ত ছন্দে শুধু স্বরসংখ্যা অর্থাৎ যুগ্ম বা অযুগ্ম ধ্বনির সংখ্যাকেই গণনা করা হয়, ধ্বনিমাত্রার পরিমাণ-নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয় না। পক্ষান্তরে মাত্রাবৃত্ত ছন্দ সম্পূর্ণরূপে ধ্বনিমাত্রার উপরই নির্ভর করে, এ ছন্দে ধ্বনিসংখ্যা অর্থাৎ স্বরসংখ্যার প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য থাকে না। যথা—

পদ্মকোষের্ | বজ্রমণি | ওরাই্ ধ্রুব | সুমঙ্গল্;
আলাদিনের্ | মাথার্ প্রদীপ্ | ওই্ আমাদের্ | ছেলের দল্
ছেলের দল, কুহু ও কেকা, সত্যেন্দ্রনাথ

এখানে প্রতি পংক্তিচ্ছেদে চারটি করে স্বর বা ধ্বনি আছে, শেষ ছেদে তিনটি করে; যুগ্ম ও অযুগ্ম ধ্বনি অর্থাৎ গুরু ও লঘু ধ্বনির মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হয় নি; সুতরাং ধ্বনির মাত্রাপরিমাণ স্থির নেই। অতএব এ ছন্দকে স্বরবৃত্ত ছন্দ বল্‌ব। পক্ষান্তরে—

চিরযুবা | শূর্বীর্ | বিজয়ীর্ | কুঞ্জে
আমাদের্ | মঞ্জীর্ | মদালসে | গুঞ্জে;

ফুটে উঠি | হাসি সম | খড়্গের্ | ঝলকে,
মোরা কার | মনোরম | মৃত্যুরে | পলকে।
—বিদ্যুৎপর্ণা, তুলির লিখন, সত্যেন্দ্রনাথ

এখানে প্রতি পংক্তিচ্ছেদে চারটি করে ধ্বনিমাত্রা আছে, শেষ ছেদে তিনটী করে; যুগ্ম বা গুরুধ্বনিগুলি দ্বিমাত্রিক, কাজেই যুগ্মদণ্ড-চিহ্নিত হয়েছে, আর অযুগ্ম বা লঘু ধ্বনিগুলি একমাত্রিক বলে একটি করে দণ্ডচিহ্নে-চিহ্নিত হয়েছে। এই হিসাবে প্রতি পংক্তিচ্ছেদে ধ্বনির মাত্রাপরিমাণ স্থির রয়েছে বলে এ ছন্দকে মাত্রাবৃত্ত বল্‌ব। বলা বাহুল্য এখানে স্বরবৃত্তের মতো ধ্বনির বা স্বরের সংখ্যা স্থির নেই।

এখন একটি অক্ষরবৃত্তের দৃষ্টান্ত ধরা যাক—

বিপরীত্ | মুখে তারে | পড়েছিনু | তাই্
বিশ্বজোড়া | সে লিপির্ | অর্থ বুঝি | নাই্

—৪০, নৈবেদ্য, রবীন্দ্রনাথ

স্বরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্তের একটি বিশেষ মিশ্রণের ফলে উদ্ধৃত পংক্তি দুটি রচিত হয়েছে; প্রত্যেকটি শব্দের পূর্ব্বাংশে রয়েছে স্বরবৃত্তের তত্ত্ব, সেখানে রয়েছে ধ্বনিসংখ্যারই প্রাধান্য (বিশ্ব ও অর্থ শব্দের পূর্ব্বাংশে দুই না ধরে একই ধরা হয়েছে); আর তার শেষাংশে আছে মাত্রাবৃত্তের তত্ত্ব, ধ্বনিমাত্রাই এখানকার গোড়ার কথা (লিপির্ শব্দের শেষ ধ্বনিটিকে মাত্রা হিসাবে দুই ধরা হয়েছে, সংখ্যাহিসাবে এক ধরা হয় নি)। স্বরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্তের এই যৌগিক রীতিতে উদ্ধৃত পংক্তিতে প্রতি পর্ব্বে চারিটি করে unit বা একক রয়েছে, শেষ পর্ব্বে আছে দুটি করে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই এককগুলি কোন্ তত্ত্বের একক? ধ্বনিমাত্রার নয়, কারণ মাত্রাহিসাবে প্রথম পংক্তিতে চোদ্দমাত্রা থাক্‌লেও দ্বিতীয় পংক্তিতে আছে ষোল (বিশ্ব ও অর্থ শব্দে একমাত্রা করে বেশি আছে); ধ্বনিসংখ্যারও নয়, কারণ এর পর্ব্বগুলিতে সংখ্যার সাম্য নেই। অর্থাৎ এতে ধ্বনিমাত্রা ও ধ্বনিসংখ্যা কারও স্থিরতা নেই, সুতরাং এ ছন্দ মাত্রাবৃত্তও নয়, স্বরবৃত্তও নয়।

পূর্ব্বেই বলেছি এ ছন্দ আসলে মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্তের মিশ্রণ-জাত একটি মিশ্র ছন্দ; কাজেই এর গোড়ায় যে তত্ত্ব আছে তার একক বা unitকে একটা বিশেষ নাম দেওয়া সম্ভব নয়। তাই অগত্যা এই unitকে 'অক্ষর' নাম দিয়ে এ ছন্দকে অক্ষরবৃত্ত বলে অভিহিত করেছি। এ নামকরণের অবশ্য আরেকটি কারণ আছে; সেটি হচ্ছে গোড়ায় আপাত দৃশ্যমান অক্ষরসংখ্যা গুণে 'ছন্দ' রচনার অভ্যাস থেকেই এ ছন্দের উৎপত্তি হয়েছে এবং আজকালও প্রধানত অক্ষরসংখ্যার প্রতি লক্ষ্য রেখেই এ ছন্দ রচনা করা হয়ে থাকে। সুতরাং এদিক্ থেকে দেখ্‌তে গেলে একে "অক্ষরবৃত্ত" নাম দেওয়া অসঙ্গত মনে হবে না।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন

ভ্রম-সংশোধন

এই প্রবন্ধে ছাপার কিছু ত্রুটী রহিয়া গিয়াছে, পাঠকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক পড়িবার সময় নিম্নলিখিত সংশোধনগুলি করিয়া লইবেন।

৫৭৪ পৃঃ ১ম কলমে নীচে হইতে একাদশ পংক্তিতে—"ফলে এই শব্দের মধ্যবর্ত্তী"-র পরিবর্ত্তে "ফলে এই ছন্দে শব্দের মধ্যবর্ত্তী" পড়িবেন।

৫৭৪ পৃঃ ১ম কলমে নীচে হইতে সপ্তম পংক্তিতে "ধরব করব"র পরে 'ধরত' কথাটি বসাইয়া লইবেন।

৫৭৫ পৃঃ ১ম কলমে নীচে হইতে ৬ষ্ঠ লাইনে "পরে"র স্থলে 'পড়ে' পড়িবেন।

৫৭৬ পৃঃ ১ম কলমে উপর হইতে অষ্টম পংক্তিতে,—"তু' অক্ষর ধরা হয়;" এর পরে "কিন্তু হইল, লইব প্রভৃতিতে তিন অক্ষর ধরা হয়"—এই কথা কয়টি বসাইয়া লইবেন।

৫৭৬ পৃঃ ২য় কলমে নীচে হইতে তৃতীয় পংক্তিতে "ঐকার নিয়েও" এর পরিবর্ত্তে "ঐকার ও ঔকার নিয়েও" পড়িবেন।

৫৭৮ পৃঃ ২য় কলমে নীচে হইতে অষ্টম পংক্তিতে 'দাও' কথাটির উপর এক দণ্ডের পরিবর্ত্তে যুগ্ম দণ্ড হইবে।

সন্ধ্যাসঙ্গীত

শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র কর

কবির আধুনিক কাব্যসংগ্রহের প্রথম গ্রন্থ সন্ধ্যাসঙ্গীত। ইহার আগেও তিনি কবিকাহিনী, বনফুল ও ভগ্নহৃদয় এই তিনখানি কাব্যপুস্তক লিখিয়াছিলেন। কিন্তু সেগুলির রচনা নেহাৎ কাঁচা এবং বিশেষত্বহীন বিবেচনায় তিনি কাব্য-গ্রন্থে তাহাদের স্থান দেন নাই, প্রথম সংস্করণের পর সেগুলিকে আর মুদ্রিতও করেন নাই, বরাবর লোকচক্ষুর অগোচর রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সন্ধ্যাসঙ্গীতে কবি আত্মপ্রকাশের বিশিষ্ট ধারাটি প্রথম খুঁজিয়া পান। এই বইখানি সম্বন্ধে শোভন সংস্করণ কাব্যগ্রন্থের ভূমিকাতে তিনি লিখিয়াছেন—"ইহার কবিতার মধ্যে কবির লজ্জার কারণ যথেষ্ট আছে কিন্তু যদি তাহাদের পরবর্ত্তী রচনায় কোনো গৌরবের বিষয় থাকে, তবে এই প্রথম প্রয়াসের নিকট সেজন্য ঋণ স্বীকার করিতেই হইবে।"

এ যাবৎ কবির জীবনে বহুবিচিত্র সাধনা ও সিদ্ধির সমাবেশ ঘটিয়াছে। বাণী এবং ব্যঞ্জনাভঙ্গীও তাঁহাতে কালে কালে বহুবিচিত্র হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। সন্ধ্যা-সঙ্গীতের প্রবল উদ্বেগের মধ্যে পরিণত জীবনের সেই বাণী ও ব্যঞ্জনা-ভঙ্গীর অস্ফুট আভাস মিলে।

সন্ধ্যা বাহিরের কর্ম্মজগতে বিরামদায়িনী। কিন্তু অন্তরের চিন্তাজগতে সংঘাত-ঘোর ঘনাইয়া তোলে। দিনের অনারব্ধ, অসমাপ্ত বা বিফল উদ্যমের মর্ম্মপীড়ার মধ্যে সার্থক কর্ম্মের ক্ষীণ আনন্দটুকু মৃৎপ্রদীপের আলো বিতরণ করে। যেখানে অতীতের সেই সার্থক কর্ম্ম নাই, সেখানে আগামী দিবসের নূতন চেষ্টার উদ্দীপনা হৃদয়কে উদ্ভাসিত করে। সন্ধ্যাসঙ্গীত রচনার সময় কবিজীবনে এমনি একটি সন্ধ্যা নামিয়াছিল।* তাহার পূর্ব্বে যে-দিন অবসান হইয়াছে, তাহার ব্যর্থ প্রয়াসের হতাশ্বাস, অমূর্ত্ত অভিলাষের উদ্বেগ এবং ভাবী স্বপ্নই বইখানাতে সঙ্গীতের রূপ ধরিয়া উহাকে সার্থক নামা করিয়াছে।

প্রথম কবিতা "উপহারে" কবি সন্ধ্যাকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন—"সন্ধ্যা, তোরই যেন স্বদেশের প্রতিবেশী, তোরি যেন আপনার ভাই, আজ আমার প্রাণের প্রবাসে দিশা হারাইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বেড়াইতেছে।" প্রকৃতির সহিত অন্তরঙ্গতার পরিচয় এখানে পরিস্ফুট।

শিশুবয়সে প্রকৃতির রূপ এবং সঙ্গমাধুর্য্য মানুষকে পাইয়া বসে। তাহার জল, আলো, আকাশ, বাতাস, গাছপালা, কীটপতঙ্গ, মানুষ, গরু প্রত্যেকটি শিশুমনে এক একটি সৌন্দর্য্যের রেখাপাত করে। বয়স যত বেশি হয়, সংসারের জনসমাজের সংস্পর্শে আসিয়া তাহার সেই প্রকৃতিপ্রেম তখন বিশেষভাবে জীবপ্রেমে রূপান্তর লাভ করে। এবং তাহা জীবনের পটভূমিতে গুহাহিত নির্ঝরিণীর মতো সুদূরে অলক্ষ্য থাকিয়া প্রাণের গতিবেগ সঞ্চার করে। কিন্তু বৃহৎ যাঁহাদের মন, সব সময়ই জীব এবং প্রকৃতি সমানভাবে উভয়ের প্রেমেই তাঁহাদের হৃদয় পূর্ণ হইয়া থাকে। সেই বিপুল প্রেমের বলে তাঁহারা ক্ষুদ্র গৃহ ছাড়িয়া বিশাল জগতকে বক্ষে পাইতে ব্যগ্র হন। এই সময় আগে যে-মন থাকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, বয়সবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহাই হইয়া উঠে সংহত যোগধর্ম্মী। কারণ আগে কেবল এইটি ভালো, ঐটি মন্দ—এই করিয়া বিশ্বের নানা বস্তুর সহিত খণ্ড-পরিচয় বাড়িতে থাকে। কিন্তু ক্রমে এই পরিচিতের সংখ্যা এত বেশী হইয়া দাঁড়ায় যে প্রত্যেকটি বস্তুকে বিচ্ছিন্নভাবে সুদীর্ঘকাল মনে রাখা অসম্ভব হইয়া পড়ে। তাই তখন প্রয়োজন হয় একটি সাধারণ শৃঙ্খলা। সেই শৃঙ্খলার গুণে দিনেদিনে জমানো বিচিত্র দ্রব্যসম্ভার

* শান্তিনিকেতনে "রবীন্দ্র-পরিচয় সভার" তৃতীয় বার্ষিক প্রথম অধিবেশনে পঠিত।

ভাণ্ডারের সঙ্কীর্ণ স্থানে সুবিন্যস্ত রাখিয়া গিন্নীরা আজীবন ঘরকরণা চালাইয়া থাকেন। দ্রব্য সাজাইবার শৃঙ্খলাটি জানা থাকিলে যতদিন যাক্ না কেন, ঘরের তৃণটুকু পর্য্যন্ত তাঁহাদের অগোচরে কোথাও সরিয়া যাইতে পাবে না। ভাণ্ডারে রাজ্যের জিনিষের মধ্যে ডুব মারিয়া থাকিলেও শৃঙ্খলার সূত্রে বাঁধা পড়িয়া প্রয়োজনের বেলায় তাহা এক মুহূর্ত্তে হাতের কাছে আসিয়া ধরা দেয়। এই শৃঙ্খলার প্রয়োজনবোধ পরিণত বয়সে মানুষের মনে আপনা হইতেই উদিত হয়। ক্রমে তাঁহারা সাধনার দ্বারা তাহা লাভ করিতেও সমর্থ হন। এই শৃঙ্খলার সূত্র ধরিয়া তাঁহাদের প্রেম তখন লীলায়িত হইতে থাকে। কেহ এই সূত্রকে বলেন ভগবান, কেহ বলেন প্রকৃতি, অদৃষ্টনিয়তি। যিনি যে-নামরূপই তাহাতে আরোপ করুন না কেন, সকলে সেই এক সূত্র ধরিয়াই বিশ্বের বিচিত্র বস্তুর মধ্যে একটি নিগূঢ় যোগের আকর্ষণ অনুভব করেন। তখন কত অজানাই যে তাঁহাদের জানা হইয়া যায়, কত ঘরে তাঁহাদের ঠাঁই মিলে, দূর তাঁহাদের নিকট হইয়া যায়, পর তাঁহাদের ভাই হইয়া উঠে। এইভাবে মনের প্রসার হওয়ায় তাঁহারা মহাত্মা হইয়া সর্ব্বদা সর্ব্বজনের হৃদয়ে, ঔষধিতে, বনস্পতিতে তদ্গতচিত্তে বিহার করিতে থাকেন। বুদ্ধ, চৈতন্য প্রভৃতি জগতের মহাপুরুষদের জীবন এই ধারাতেই বিকশিত হইয়াছে।

জীবনের ন্যায় কবির কাব্যও আশৈশব এই স্বাভাবিক পরিণতি লাভ করিয়াছে। প্রথম হইতেই তিনি প্রকৃতিকে গভীরভাবে ভালোবাসিয়াছিলেন। তাহাতে প্রাণে যে অপরিমেয় রসের আধান হইয়াছিল, তাহাই পরবর্ত্তী জীবনে তাঁহাকে সাজাইয়াছে বিচিত্রের দূত, বিশ্ব-প্রেমিক কবি।

সন্ধ্যাসঙ্গীতে এই প্রকৃতিই একরকম সারা কাব্যজগত ছাইয়া বসিয়াছে। উহার লতাপাতা, ফুল ফল, আকাশ বাতাস, চন্দ্রসূর্য্যতারকাই কবির সব। উহাদের মধ্যে তিনি আপনার ঈপ্সিতের আভাস পান, তার গান শোনেন, কিন্তু সুরের পথ বাহিয়া তখনো "পূর্ব্বজনমের প্রথম প্রেয়সীর" সহিত একাত্ম হইয়া মিশিতে পারেন না। তাঁহার ব্যাকুল মন—

"আবার ফিরে যেতে চায়
পথ তবু খুঁজিয়া না পায়।"

কিন্তু খুঁজিয়া না পাইলেও যেটুকু আভাস পান, কখনো তাহার কণামাত্র যদি অনুভবে কম পড়ে, তবে আর উদ্বেগের সীমা থাকে না। মনে হয় সব গেল :—

"ফুল গেল, পাখী গেল, আলো গেল, রবি গেল,
সবি গেল, সবি গেল।"

এই সব হারাইবার বেদনায় 'দুঃখ'কে আহ্বান করিয়া কবি এই বইতে নানা খেদোক্তি করিয়াছেন ;—

আয় দুঃখ আয় তুই
তোর তরে পেতেছি আসন,
হৃদয়ের প্রতি শিরা টানি' টানি' উপাড়িয়া
বিচ্ছিন্ন শিরার মুখে তৃষিত অধর দিয়া
বিন্দু বিন্দু রক্ত তুই করিস শোষণ ;
জননীর স্নেহে তোরে করিব পোষণ !
হৃদয়ে আয়বে তুই হৃদয়ের ধন।"

যাঁহারা কবিকে দুঃখবাদী বলিয়া থাকেন, ইহা শুনিয়া তাঁহারা হয়তো আর একটি চারিত্র-লক্ষণের সন্ধান ইহাতে পাইবেন। কিন্তু কবিকে আসলে দুঃখবাদী বলা যায় কিনা তাহাতেই বিশেষ সন্দেহ আছে। যে অবস্থায় আকাঙ্খা থাকে কিন্তু তাহা পূর্ণ করিবার আর কোনো আশা বা উপায় থাকে না, মানুষের সেই অবস্থাই যথার্থ দুঃখের অবস্থা। যাঁহারা বস্তুতান্ত্রিক, এই দৃশ্যমান বস্তুজগতকেই মাত্র সত্য বলিয়া জানেন, তাঁহাদের নিকট মৃত্যু এরূপ একটি দুঃখের অবস্থা।

সন্ধ্যাসঙ্গীতে কবি দুঃখ বলিয়া যে জিনিষকে আহ্বান করিয়াছেন, তাহা এই অর্থে ঠিক দুঃখের পর্য্যায়ে পড়ে না, তাহাকে বরঞ্চ উদ্বেগ বলিলেই যথার্থ বলা হয়। ইহা সৃজনের পূর্ব্বে প্রলয়ের আলোড়ন, প্রসূতির প্রসব-বেদনার উন্মাদনা। প্রসবের পূর্ব্বে প্রসূতির চক্ষে চারিদিক

যেমন ঘোর হইয়া আসে, সেই ঘোরান্ধকার নয়নে লইয়া কবিও বলিয়াছেন—

"সম্মুখে অসীম পারাবার
সম্মুখেতে চির অমানিশি
সম্মুখেতে মরণ বিনাশ
গেল, গেল, বুঝি নিয়ে গেল,
আবর্ত্ত করিল বুঝি গ্রাস।"

কবির তখনকার এই বেদনা-উন্মাদনার তীব্রতা কিছু অনুভূত হয়, যখন শুনা যায় তিনি দুঃখকে বলিতেছেন—

"প্রাণের মর্ম্মের কাছে
একটি যে ভাঙা বাদ্য আছে,
তুই হাতে তুলে নেরে সবলে বাজায়ে দেরে
নিতান্ত উন্মাদ সম ঝন্‌ঝন্‌ ঝন্‌ঝন্‌!
ভাঙে তো ভাঙিবে বাদ্য ছিঁড়ে তো ছিঁড়িবে তন্ত্রী,
নেরে তবে তুলে নেরে, সবলে বাজায়ে দেরে,
নিতান্ত উন্মাদ সম ঝন্‌ঝন্‌ ঝন্‌ঝন্‌!
দারুণ আহত হ'য়ে দারুণ শব্দের ঘায়
যত আছে প্রতিধ্বনি বিষম প্রমাদ গণি,
একেবারে সমস্বরে
কাঁদিয়া উঠিবে যন্ত্রণায়
দুঃখ তুই আয়, তুই আয়।"

বেদনা সাময়িকভাবে কবিকে মুহ্যমান করিয়াছে, কিন্তু একেবারে নিরাশার অসাড় করিয়া ফেলিতে পারে নাই; বরঞ্চ ঐ বেদনার আঘাতই যে প্রতিবোধ-চেষ্টা জাগাইয়া তাঁহার হৃদয়ে নবীন তেজের উদ্দীপনা আনিয়াছে—এ কথা কবির মুখেই শুনা যায়—পরাজয় সঙ্গীতে,—

(ক) "এই বেলা প্রাণপণ কর,
এই বেলা ফিরে দাঁড়া তুই
স্রোতমুখে ভাসিস্‌নে আর।"—

সংগ্রামসঙ্গীতে—

(খ) "ফিরে নেব, কেড়ে নেব আমি
জগতের একেকটি গ্রাম!
ফিরে নেব সন্ধ্যা আর উষা,
পৃথিবীর শ্যামল যৌবন,
কাননের ফুলময় ভূষা!
ফিরে নেব হারানো সঙ্গীত,
ফিরে নেব মৃতের জীবন,
জগতের ললাট হইতে
আঁধার করিব প্রক্ষালন।"

কিন্তু এইখানে একটি কথা উঠে। প্রকৃতির মধ্যে কবি যাহার আভাস পাইয়াছেন, এবং যাহাকে ধরিতে না পারিয়া বিরহব্যথায় ব্যাকুল হইয়াছেন, তাঁহার সেই "পূর্ব্ব জনমের প্রেয়সীটি" কে; কি তাহার পরিচয়, কবির জীবনে পরিণত রূপই বা তাহার কি রকম?

সন্ধ্যাসঙ্গীতে সন্ধ্যা, সুখ দুঃখ, ভগবান, আশা, ইত্যাদি এত জিনিষের আহ্বান আছে, যে, সে সকলের মধ্য হইতে কোনো একটিকে নিশ্চিত করিয়া তাঁহার ঈপ্সিতা বলা শক্ত। তবে এইমাত্র বোঝা যায় যে প্রকৃতির বিচিত্র বস্তু তাঁহার হৃদয়ে বিচিত্র রসের সঞ্চার করিয়াছে এবং তিনি অন্তরের সেই বিচিত্র রসকে কোনোরূপে প্রকাশের জন্য উদ্বিগ্ন।

প্রকাশই কবির ধর্ম্ম। উহা তাঁহার চিরকামনা, চিরসাধনার ধন। তিনি যে কবি, তাঁহার এই পরিচয় আজ জগতে কাহারো অবিদিত নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, এই পরিচয়ের সূচনাও সন্ধ্যাসঙ্গীতেই রহিয়াছে। গ্রন্থের প্রারম্ভেই কবি হৃদয়ের মধ্যে দূর দূরান্তরে কোথাকার কোন-এক উদাসী প্রবাসীর কণ্ঠগীতি শুনিতেছেন। তাঁহার মধ্যজীবনের রচনা "উৎসর্গের" মধ্যে সেই প্রবাসী যে তিনি নিজেই, ইহা স্পষ্টতর করিয়া বুঝিয়াছেন ও বুঝাইয়াছেন। কিন্তু তাহাতেও তাঁহার সব বোঝানো শেষ হয় নাই। জীবন-সায়াহ্নে সত্তর বাৎসরিক জয়ন্তীউৎসবে তিনি যে বাণী বিতরণ করেন, তাহাতে বাকী পরিচয়টুকু পূর্ণ করিয়া বলিলেন :—

"জীবনের এই দীর্ঘ চক্রপথ প্রদক্ষিণ করতে করতে বিদায়কালে আজ সেই চক্রকে সমগ্ররূপে যখন দেখতে পেলাম, তখন একটা কথা বুঝতে পেরেছি যে, একটিমাত্র আমার পরিচয় আছে, সে আর কিছুই নয়, আমি কবি মাত্র।…আমি তত্ত্বজ্ঞানী, শাস্ত্রজ্ঞানী গুরু বা নেতা নই।—"

"শুধায়ো না মোরে তুমি মুক্তি কোথা, মুক্তি কারে কই,
আমি তো সাধক নই, আমি গুরু নই।
আমি কবি সদা আছি
ধরণীর অতি কাছাকাছি—।"

ঠিক সন্ধ্যাসঙ্গীতেও দেখা যায়, গ্রন্থের মধ্যে একস্থানে তিনি বলিতেছেন—"কবি হ'য়ে জন্মেছি ধরায়"—,এবং নানা ভাবনা ও বর্ণনার পর গ্রন্থের শেষদিকে যখন তাঁহার গান-সমাপনের সময় সন্নিকট হইয়াছে, তখনও আপন সত্যস্বরূপের পরিচয় সম্বন্ধে তাঁহার লেখনী দিয়া এমনি একটি উক্তি বাহির হইয়াছে :—

এমন পণ্ডিত কত রয়েছেন শত শত
এ সংসারতলে,
আকাশের দৈত্যবালা উন্মাদিনী চপলারে
বেঁধে রাখে দাসত্বের লোহার শিকলে।
আকাশ ধরিয়া হাতে নক্ষত্র অক্ষর দেখি
গ্রন্থ পাঠ করিছেন তাঁরা,
জ্ঞানের বন্ধন যত ছিন্ন করে দিতেছেন,
ভাঙি ফেলি' অতীতের কারা।
আমি তার কিছুই করি না,
আমি তার কিছুই জানি না।
এমন মহান এ সংসারে
জ্ঞানবত্ন রাশির মাঝারে,
আমি দীন শুধু গান গাই।"

সুর গতিছন্দ এবং সুপরিণতি লইয়াই গান। খাঁটি কবির রচনামাত্রেই কিছু না কিছু সংগীতধর্ম্ম থাকে। সে রচনার বৈশিষ্ট্য এই যে, তাহার মধ্যে ভাবের সুকুমার রেশ, ছন্দময় গতি এবং সুসম পরিণতি প্রকাশ পায়। তাহা ভাবা আশ্রয় করিলে হয় কবিতা, সুর আশ্রয় করিলে হয় সঙ্গীত, রং রেখার আশ্রয়ে হয় চিত্র এবং জীবনের আশ্রয়ে হয় "লীলাখেলা"। পরিণত জীবনে যদিও কবির এ সকল রকম প্রকাশই সম্ভব হইয়াছে, সন্ধ্যাসঙ্গীতের জীবনে কিন্তু একটির বেশি প্রকাশরূপ তাঁহার চোখে প্রতিভাত হয় নাই। সেই প্রকাশটি হইতেছে ছন্দোবদ্ধ হৃদয়ের বাণীরূপ কবিতায়। তাই যখন নানা জিনিষের মধ্যে "সাধের কবিতাকেও" সন্ধ্যা-সঙ্গীতে আহ্বান করিতে শোনা যায়, তখন ঐ একটি খণ্ডরূপকে উপলক্ষ্য করিয়া তিনি যে পরবর্ত্তী জীবনের বিচিত্র প্রকাশ-ব্যাকুলতারই সূচনা করিলেন, এ ইঙ্গিতে পাঠকের মন স্বতই বিস্মিত হইয়া উঠে। জীবন যত বাড়িয়া চলিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে কবিতা ছাড়াও সঙ্গীত, নৃত্য, অভিনয়, শিক্ষা-দীক্ষা, ধর্ম্ম-সাধনা, দেশসেবা, বিশ্বসেবা,—কত কী প্রকাশের বিচিত্র মূর্ত্তি দেখিয়া তিনি অনুপ্রাণিত হইয়াছেন! এবং সেই অনুপ্রেরণা হইতেই পরে "চিত্রায়" প্রকাশের ভাবঘন অখণ্ড আদর্শকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন :—

"কত না বর্ণে কত না স্বর্ণে গঠিত,
কত যে ছন্দে কত সঙ্গীতে রটিত,
কত না গ্রন্থে কত না কণ্ঠে পঠিত,
তব অসংখ্য কাহিনী
জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্ররূপিণী।"

কবির সমগ্র কাব্য-জীবনের উপসংহারে পৌঁছিয়া দেখা যায়, প্রথম জীবনে সন্ধ্যাসঙ্গীতের "পূর্ব্বজনমের প্রেয়সী" বলিয়া প্রকৃতির মধ্যে যাহার আভাস পাইয়াছেন, তাহাকেই পরবর্ত্তী জীবনে গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, গীতালিতে ভগবানের রূপে দেখিয়াছেন; জীবনসন্ধ্যায় সেই এক 'শুভ্রকেই' বহুরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে দেখিয়া "বিচিত্র" এই বিশেষ একটি নিজস্ব নামরূপে বিভূষিত করিয়া লইয়াছেন। আর ইহা দেখিয়াও মুগ্ধ হইতে হয় যে, কবি নিজে প্রথম হইতেই তাঁহার প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া সাধ্বী সহধর্ম্মিণীর মত বিচিত্র রূপরচনার কাজে পতির ধর্ম্ম অনুসরণ করিয়া আসিয়াছেন। জীবনদেবতার শেষ পরিচয়ে তিনি বলিয়াছেন—"শুভ্র নিরঞ্জনের যাঁরা দূত তাঁরা পৃথিবীর পাপক্ষালন করেন, মানবকে নির্ম্মল নিরাময় কল্যাণব্রতে প্রবর্ত্তিত করেন, তাঁরা আমার পূজ্য, তাঁদের আসনের কাছে আমার আসন পড়েনি। কিন্তু সেই এক শুভ্র জ্যোতি যখন বহুবিচিত্র হন তখন তিনি নানা বর্ণের আলোকরশ্মিতে আপনাকে বিচ্ছুরিত করেন, বিশ্বকে রঞ্জিত করেন; আমি সেই বিচিত্রের দূত। আমরা নাচি, নাচাই, হাসি, হাসাই, গান করি, ছবি আঁকি,

যে আবিঃ বিশ্বপ্রকাশের অহৈতুকী আনন্দে অধীর, আমরা তাঁরি দূত। যে-বিচিত্র বহু হ'য়ে খেলে বেড়ান দিকে দিকে সুরে গানে নৃত্য, চিত্রে, বর্ণে বর্ণে, রূপে রূপে, সুখে দুঃখের আঘাতে সংঘাতে, ভালমন্দের দ্বন্দ্বে—তাঁর বিচিত্ররসের বাহনের কাজ আমি গ্রহণ করেছি, তার রঙ্গশালার বিচিত্র রূপগুলিকে সাজিয়ে তোলবার ভার পড়েছে আমার উপর। ······বিশ্বে বিচিত্রের লীলায় নানা সুরে চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌চে নিখিলের চিত্ত, তারি তরঙ্গে বালকের চিত্ত চঞ্চল হ'য়েছিল, আজো তার বিরাম নেই।......এই আশ্রমের কর্ম্মের মধ্যেও যেটুকু প্রকাশের দিক তাই আমার।······এই ধূলোমাটি ঘাসের মধ্যে আমি হৃদয় ঢেলে দিয়ে গেলাম, বনস্পতি ওষধির মধ্যে।" এই বিচিত্রের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ প্রথম হইতেই 'আমি-তুমি'র দ্বৈতভাবাপন্ন। পূর্ব্বরাগে শিখি-চূড়া, পীতবসন, বংশীরব রাধার হৃদয়াশ্রয়ে কৃষ্ণপ্রেমের উদ্দীপনা আনিয়াছিল। সন্ধ্যাসঙ্গীতে দেখা যায় প্রকৃতির আকাশ বাতাস, ফুলফলের মৌন স্পর্শই কবির হৃদয়ে তখনকার প্রকৃতিরূপধারী বিচিত্রের অনুরাগ-বীজ উপ্ত করিয়াছে। যাহাকে ভালোবাসিয়াছেন, আপনার সব দিয়া তাহাতেই সমাহিত হইবার কামনা সন্ধ্যাসঙ্গীত হইতেই কবির মনে অঙ্কুরিত হইয়াছে। সে কামনা এত উদগ্র, যে তিনি চান,—

"আকাশে হেরিলে শশী আনন্দে উথলি' উঠি
দেয় যথা মহা পারাবার
অসীম আনন্দ উপহার,
তেমনি সমুদ্রভরা আনন্দ তাহারে দিই
হৃদয় যাহারে ভালোবাসে,
হৃদয়ের প্রতি ঢেউ উথলি' গাহিয়া উঠে
আকাশ পুরিয়া গীতোচ্ছ্বাসে।
ভেঙ্গে ফেলি' উপকূল পৃথিবী ডুবাতে চাহে
আকাশে উঠিতে চায় প্রাণ,
আপনারে ভুলে গিয়ে হৃদয় হইতে চাহে
একটি জগতব্যাপী গান।"

গোড়াতে প্রেমের এই বিশাল অনুভব ছিল বলিয়াই পরবর্ত্তী কালে তাঁহার পক্ষে বিশ্বপ্রেমিকে পরিণত হওয়া সম্ভব হইয়াছে। যে কবিতায় তিনি এই বিশ্ব-প্রেমের সূচনা দেখাইয়াছেন, সেই "অনুগ্রহ" কবিতাতেই তাঁহার পরিণত জীবনের প্রেমের বাণীর একটি চমৎকার পূর্ব্বাভাস দেখিতে পাওয়া যায়। প্রেমতত্ত্বের আকর বৈষ্ণবসাহিত্যে প্রেমের উৎকর্ষপথে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পাঁচটি স্তবভেদ করা হইয়াছে। শান্ত হইতে বাৎসল্য এই চারিটি স্তরেই নায়িকা নায়ককে নিজের চেয়ে কোন-না-কোন গুণে শ্রেষ্ঠতর ভাবে, তাহাতে পূর্ণ মিলন না হইয়া পরস্পর তাহারা কিছু-না-কিছু দূরে থাকে। কিন্তু মধুর রতির স্তরে নায়ক-নায়িকা পূর্ণ সমতার ভাবে এক হইয়া যায়, তুলনামূলক কোন গুণের পার্থক্য-বোধ তাহাদের মনে স্থান পাইতে পারে না। ভারতবাসী বিশেষতঃ বৈষ্ণবসম্প্রদায় বিশ্বাসীর ভাবনা ও সাধনার প্রিয়তম প্রতীক ভগবানকে মধুররতির বিষয় করিয়া প্রেমের খেলাতে আদিকাল হইতে অভ্যস্ত। কিন্তু প্রতীচ্যে প্রেমের এই স্তরের কথা বহুদিন কল্পনার অতীত ছিল। খেয়ালী ভগবানের খেয়ালী বিচারব্যবহার দণ্ড-আশঙ্কা লইয়া পাপবাদী খৃষ্টানমণ্ডলী অনুগ্রহভিক্ষায় দিন কাটাইত। কবি তাঁহার গীতাঞ্জলির মারফতে তাঁহাদিগকে ভারতের এই মধুর প্রেমের সন্ধান দান করেন। এই রসামৃত আস্বাদনে তাহারা ভয়ভাবনা ভুলিয়া জীবনের এক নব-উদ্বোধন অনুভব করিয়া নূতন মুক্তিপথে যাত্রা করিল। এবং দিশারীকে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপনসূচক নোবেলপ্রাইজের অর্ঘ্য দান করিল। যে মধুর প্রেমের বাণী শুনাইয়া পরিণত জীবনে তিনি প্রতীচ্যের এই প্রাণের অর্ঘ্য লাভ করিলেন, সন্ধ্যাসঙ্গীতে সেই প্রেমের বাণীর প্রাথমিক আলাপ রহিয়াছে। তখন হইতে তাঁহার মনে খটকা বাধিয়াছে, এই বিশ্ব কি কাহারো অনুগ্রহের দান? আমরা কি কোন ঐশ্বর্য্যমদগর্ব্বিত স্রষ্টা বিধাতার কৃপাকটাক্ষের ভিখারী? তাহা হইতেই পারে না।

"এই যে জগৎ হেরি আমি
মহাশক্তি জগতের স্বামি,
এ কি হে তোমার অনুগ্রহ
হে বিধাতা, কহ মোরে কহ।"

যদি তাই হয়, তবে—

"মুছে তুমি ফেলহ আমারে—
চাহি না থাকিতে এ সংসারে।"

আমি যে—

"কবি হ'য়ে জন্মিছি ধরায়
ভালবাসি আপনা ভুলিয়া,
গান গাহি হৃদয় খুলিয়া
ভক্তি করি পৃথিবীর মতো,
স্নেহ করি আকাশের প্রায়।
আপনারে দিয়েছি ফেলিয়া
আপনারে গিয়েছি ভুলিয়া,
যারে ভালোবাসি তার কাছে
প্রাণ শুধু ভালোবাসা চায়।"

এই ভালোবাসাই লীলার মূলধন। জীবনের প্রারম্ভে তাই কবি সুখের আশা করেন নাই, সমস্ত মনপ্রাণ দিয়া তিনি চাহিয়াছেন প্রেম।

"সুখ কারে চায় প্রাণ তোর
সুখ কার করিস্ রে আশা ?"
সুখ শুধু কেঁদে কেঁদে বলে
ভালোবাসা—ভালোবাসা গো।"

সুখ দুঃখ দুইই আপেক্ষিক, সঙ্কীর্ণ অবস্থা মাত্র। উহারা এই আছে তো এই নাই। কিন্তু প্রেমবস্তু শাশ্বত; সমুদ্রের মত বিস্তারের আর অবধি নাই, উহার মধ্যে সুখ দুঃখ দুইই আছে; সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো তাহাদের উত্থান পতন। কবি প্রথম হইতে ঢেউয়ের উপর নির্ভর না করিয়া সমুদ্রেই তরণী ভাসাইয়াছেন। ঢেউ-সংঘাত আন্দোলিত হইয়া তাহা যেখানেই যখন গিয়া পড়ুক না কেন, নৃত্যছন্দ, কলধ্বনি ও অপরূপ দৃশ্যলীলাই আপনার চারিদিকে জাগাইয়া তুলিয়াছে। তাঁহার যে বেদনা, তাহা বিচিত্রের সহিত বিচ্ছেদের বেদনা, তাঁহার যে আনন্দ তাহাও বিচিত্রের সহিত মিলনেরই আনন্দ। বিচিত্রের সাধনার প্রতি লক্ষ্য থাকায়, এই আনন্দ-বেদনাও বিচিত্ররূপে প্রকাশ না পাইয়া থাকিতে পারে নাই। প্রিয়বিরহে দুঃখের কঠোর স্বর রাগিণী হইয়া শতছিদ্রময় হৃদয়-বাঁশিতে এক একটি রূপ প্রকাশ করিতেছে—সন্ধ্যা-সঙ্গীত হইতেই এ কথার সূচনা হইয়াছে। তারপরে প্রৌঢ় বয়সেও যখনই তাঁহার সাংসারিক কোন প্রিয়-বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে অমনি সেই দুঃসহ বেদনা কোন-না-কোন অপূর্ব্বকাব্যে মূর্ত্ত হইয়া তাহার রসে রূপে কবিকে ও মানব-সমাজকে আনন্দিত করিয়াছে। অণুপরমাণু হইতে ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া চিরকাল তাঁহার চোখে সেই এক বিচিত্রই নানা নামরূপে বিরাজমান। সে ছাড়া কোথাও একটু শূন্যতা নাই। প্রেম প্রাণের শূন্যতা দূর করে। তাঁহার মধ্যে এই প্রেমের ধারা আজন্ম প্রবাহিত আছে বলিয়া বেদনাও তাঁহার কাছে আনন্দের রূপ ধরিয়াছে, সন্ধ্যাসঙ্গীতে তাই তিনি জোরের সহিত বলিতে পারিয়াছেন—

"দুঃখ ক্লেশে আমি কি ডরাই,
আমি কি তাদের চিনি নাই,
তারা সবে আমারি কি নয় ?"

বিভিন্ন বস্তু, বিভিন্ন অনুভূতি সেই একেরই সুধাস্পর্শে তাঁহাকে অভিভূত করিয়াছে। তাই দুঃখকেও তিনি আপন বলিয়া প্রেমের সহিত হৃদয়ে স্থান দিয়াছেন। এই জন্যই পরবর্ত্তীকালে আত্মীয়দের মরণ তাঁহাকে টলাইতে পারে নাই। মরণের মধ্যে অতি অদ্ভুত দোললীলা দেখিয়া তিনি পরম বিস্ময়ে ও পুলকে জীবনদেবতাকে বলিয়াছেন—

"আছে তো যেমন যা ছিল,
হারায়নি কিছু ফুরায় নি কিছু
যে মরিল যেবা বাঁচিল।
বহি' সব সুখ দুখ,
এ ভুবন হাসিমুখ
তোমারি খেলার আনন্দে তার
ভরিয়া উঠেছে বুক।
আছে সেই আলো, আছে সেই গান,
আছে সেই ভালোবাসা।
এই মতো চলে চিরকাল গো
শুধু যাওয়া শুধু আসা।"

আরো কিছুকাল পরে পূরবীর জীবনে পৌঁছিয়া তিনি বলিলেন—"

আমি যে রূপের পথে ক'রেছি অরূপ-মধুপান,
দুঃখের বক্ষের মাঝে আনন্দের পেয়েছি সন্ধান।"

এই আনন্দ দুঃখ ও সুখকে এক চরম উপলব্ধির মধ্যে মিলাইয়া লয়। সত্যের খণ্ডরূপই সংসারে সুখ দুঃখের

আলোড়ন জাগাইয়া তোলে, পরিপূর্ণ সত্যের বোধজনিত যে আনন্দ তাহার মধ্যে সুখ দুঃখ এক সমগ্র চেতনার মহাসমুদ্রে এক হইয়া আছে, সেখানে বিশুদ্ধ সত্তার পরম প্রকাশ। সেখানে প্রেমের পূর্ণ উদ্বোধন।

বাস্তবিক প্রেমিকের নিকট সুখ দুঃখ বলিয়া কোন কাম্য জিনিষ নাই, প্রেমই তার সবার বড়ো একমাত্র সাধনার বস্তু। সন্ধ্যাসঙ্গীতের যুগে সর্ব্বপ্রথম প্রকৃতির সংস্পর্শ হইতে কবির মধ্যে এই প্রেমের উদ্রেক হয়, এবং প্রাকৃত জীবনলীলার অবসান মুখেও তিনি এই প্রেমই জগতে রাখিয়া যাইবার সঙ্কল্প সকলকে শুনাইলেন—

"এ জন্মের গোধূলির ধূসর প্রহরে
বিশ্বরস সরোবরে
শেষবার ভরিব হৃদয় মন দেহ
দূর করি' সব কর্ম্ম, সব তর্ক সকল সন্দেহ,
সব খ্যাতি, সকল দুরাশা,
বলে যাবো "আমি যাই, রেখে যাই, মোর ভালোবাসা।"

শ্রীসুধীরচন্দ্র কর

স্বরলিপি

স্বপনে দোঁহে ছিনু কী মোহে
জাগার বেলা হোলো,—
যাবার আগে শেষ কথাটি বোলো।

ফিরিয়া চেয়ে এমন কিছু দিয়ো—
বেদনা হবে পরম রমণীয়,
আমার মনে রহিবে নিরবধি
বিদায়খনে খনেক তরে যদি
সজল আঁখি তোলো॥

নিমেষহারা এ শুকতারা
এমনি উষাকালে
উঠিবে দূরে বিরহাকাশভালে।

রজনী শেষে এই যে শেষ কাঁদা
বীণার তারে পড়িল তাহা বাঁধা,
হারানো মণি স্বপনে গাঁথা রবে,
হে বিরহিণী, আপন হাতে তবে
বিদায় দ্বার খোলো॥ বিচিত্রা, চৈত্র, ১৩৩৭

কথা ও সুর—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বরলিপি—শ্রীযুক্ত দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সা সা ‖ রা -া -পা পমা । পা -া পা ধা ‖ ধমা -ণা -ণধা পা । মা -গা মা -রা ‖
স্ব প নে ০ ০ দোঁ হে ০ ছি নু কী ০ ০০ মো ০ হে ০ জা ০

‖ গা -মা -ধা পা । পমা -গা মা -রা ‖ সা -া -া -া । -া -া সা -া ‖
গা ০ র্ বে লা ০ হ ০ লো ০ ০ ০ ০ ০ যা ০

সা -মা -া মগা । গপা -া -া -া ‖ মপা -ধনা -র্সর্রা র্সনা । র্সা -ধণা ণপা -া ‖
বা ০ র্ আ গে ০ ০ ০ শে ০০ ষ্ ক থা ০০ টি ০

[ধা -র্সণা ধপা -া । -া -া -া -া [রা- গা গরা -পা । -া -া সা সা]]
খো • • লো • • • • • খো • লো • • • "স্ব প"

পা পা]] পা -া -া ধা । ধা -া ধা -া [ধা না না না । না -ধা না -া]
ঝি রি ঝা • • চে রে • এ • ম ন কি ছু দি লো •

[-া -া না না । ধা -না -র্সা র্সা [র্সা -না র্রর্সা -না । ধা না র্সা র্সনা]
• • বে দ না • • হ বে • প • র ম র ম

[ধনা -র্সনা ধপা -া । -া -া র্সা -না [র্সা -নর্গা র্গা র্রা । র্গর্সা -না ধা না]
ঐ • • র • • • আ • মা • • র ম নে • র হি

[র্সা -নর্গা র্রা র্সা । র্সা -না র্রর্সা -না]
বে • • নি র ব • থি •

ধা না র্সা র্সনা । ধপা -া পা -ক্ষা [পা -ক্ষধা পা পা । পা -ক্ষা ক্ষা -া]
বি দা য় থ নে • থ • নে ক্ ত রে য • থি •

[সা রা রা গা । গা -া গরা -গমা [মা -া -া -া । -া -া মা -া]
স জ ল আঁ খি তো লো যা

[মা -গা -পা পক্ষা । পা -া -া -া [ক্ষপা -ধনা -র্সর্রা র্সা । র্সা -ধণা ধপা -া]
বা • র্ আ গে • • • শে • • ষ্ ক থা • • টি •

[ধা -র্সণা ধপা -া । -া -া -া -া [রা -গা গরা -পা । -া -া সা সা]]
খো লো • • খো লো • "স্ব প"

-া -া]] সা সা সা সা । রা -া -া -া [রা রা গা গরা । গা -া -া -া]
নি মে ষ হা রা • • • ও ক তা রা • • • •

[রা গা মা গা। মা -গা পা -ক্ষা [পা -া পা পা। পা -া পা -ক্ষা [
এ ম নি উ ০ধা ০ ধা ০ লে ০ উ ঠি বে ০ দূ ০

[ধপা -া মা মা। মা -গধা ধপা মগা [মা -রা সা -া। -া -া পা পা [
রে ০ নি র ঠা ০০ কা শ ভা ০ লে ০ ০ ০ র অ

[পা -া -া পা। ধা -া ধা -না [র্সা -র্গা র্গর্রা -র্না। র্সা -না র্রর্সা -া [
নী ০ ০ লে মে ০ এ ই সে ০ শে ষ্ নী ০ মা ০

[-া -া র্সা -না। নধা -না র্সা র্সনা [র্রর্সা -া র্সা না। নধা -না র্সা র্সনা [
০ ০ নী ০ পা ০ র ভা রে ০ প ড়ি ল ০ তা হা

[ধনা -র্সনা ধপা -া। -া -া -া -া [
বী ০০ ধা ০ ০ ০ ০ ০

[র্সা র্সর্গা র্গা র্রা। র্ধর্সা -না ধা না [র্সা -নর্গা র্গর্রা র্সনা। র্সা -না র্রর্সা -না [
হা য় নো ম ণি ০ স্ব প লে ০০ গাঁ পা র ০ বে ০

[ধা না র্সা না। ধপা -া পা -ক্ষা [পা ক্ষধা পা পা। পা -মা মা -া [
হে বি র হি ণী ০ আ ০ প ন হা তে ত ০ বে ০

[সা -রা রা -গা। গা -া -া -মা [মরা -গমা মা -া। -া -া মা -া [
বি ০ দা য় বা ০ ০ বৃ খো ০০ লো ০ ০ ০ যা ০

[মা -গা -পা পক্ষা। পা -া -া -া [ক্ষপা -ধনা -র্সর্রা র্সনা। র্সা -ধণা ধপা -া [
ঝা ০ র্ আ গে ০ ০ ০ শে ০০ ব ক থা ০০ টি ০

[ধা -র্সণা ধপা -া। -া -া -া -া [রা -গা গরা -পা। -া -া সা সা [[
বো ০০ লো ০ ০ ০ ০ ০ বো ০ লো ০ ০ ০ "এ ম"

—o—

এপার-ওপার

শ্রীযুক্ত নীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত এম-এ, বার-এ্যাট-ল

তিন

শরৎ ও হেমন্ত

বড় কথা বড় করে
বিশ্বসভা মাঝে
কইতে নাহি জানি,
সোজা কথা সরল হয়ে
আমার বুকে বাজে
দোলায় হিয়া খানি।
মোর প্রাণেরি তারে তারে
নানান্ সুরে বারে বারে
কাঁপন লেগে ছড়িয়ে পড়ে সারা বিশ্বময়,
সে কথাটি শুধু তোমার আর ত কারও নয়।

সে কথাটি কইব বলে
তোমার কানে কানে
আজও বেঁচে আছি,
সে কথাটি কবে তোমার
রঙ্ লাগাবে প্রাণে,
তবেই আমি বাঁচি।
বিশ্ব-জোড়া রঙের মেলা,
আজ প্রভাতে রঙের খেলা,
আকাশ ভরে সুনীল রঙে একী গভীরতা—
আজ প্রভাতে রঙ মেখেছে আমার মনে কথা।

আজ শরতে নবীন প্রাতে
মাঠের ঘাসে ঘাসে
করে কাণাকাণি,
আমার কথা নিয়ে তারা
ছড়ায় আশে পাশে
করে জানাজানি।
আজকে এ প্রাণ আবেগ ভরে
আলো রঙে লুটিয়ে পড়ে,
মাঠে মাঠে ধানের ক্ষেতে গাছের ডালে ডালে
রৌদ্রটুক্ দেছে ধরা আমার মায়াজালে।

আজ সকালে চেয়ে দেখি
পুণ্যা নদী খানি
ঘুম ভেঙেছে তার,
সলাজ আঁখি মিট্‌মিটিয়ে
মোর পানেই জানি
চাইছে বারে বার।
ছোট ছোট ঢেউএর পরে
কী যে মায়া নৃত্য করে
মোর প্রাণেরই পরশ ভাসে পুণ্যানদী জলে
প্রতিবিন্দু ঝিক্‌মিকিয়ে সেই কথাই বলে।

মোর কথাটি ভুবন মাঝে
আপন রূপ ধ'রে
আজকে দিল দেখা,
মোর কথাই শরত প্রাতে
দূরে গগন পরে
গভীর নীলে লেখা।

তাইত তুমি মাঠের পরে
আজ সকালে ক্ষণেক তরে
ঐ ওপারে যখন আসি বারেক দাঁড়ালে,
আমার মায়ায় আপনাকে আজ আপনি হারালে।

আজকে আমার প্রাণ বেরুলো পথে
নবীন পথে
শরৎ কালের অরুণ আলোর রথে।
আজকে এমন সকাল বেলায়
ভুবনভরা আলোর মেলায়
আপনাকে আজ পাঠিয়ে দেবো দূরে
অনেক দূরে—
চারিদিকে ভুবন ভরে বেড়াব আজ ঘুরে।

যাবো চলে কোন্ বিদেশে বনে
গভীর বনে,
আলোছায়ার দোলা দেবো মনে।
গাছের পাতায় ফাঁকে ফাঁকে
দেবো ধরা আলোর ডাকে,
চারিদিকে কিচির-মিচির খেলা
পাখীর খেলা—
বনে বনে কাটিয়ে দেবো সারা সকাল বেলা।

আবার যাব অনেক দূরে মাঠে
খোলা মাঠে,
মাঠ পেরিয়ে যাবো নদীর ঘাটে।
পাদুটি মোর ভিজিয়ে জলে
রইব শুয়ে গাছের তলে,
ঘাসে ঘাসে রৌদ্রটুকু চিনে
নেবো চিনে—
এমন প্রভাত পরাণ দিয়ে আজকে নেবো কিনে।

হয়ত যাবো ঐ দূরে ঐ পথে
গগন পথে,
যাবো ভেসে সাদা মেঘের রথে।
আকাশ ভরা নীল সাগরে
তলিয়ে গিয়ে সিনান করে—
আসব নেমে মাঠের শেষে দূরে
অনেক দূরে—
পথ হারিয়ে এদিক ওদিক বেড়াব আজ ঘুরে।

দেখব হঠাৎ মাঠের পরে এলে
আবার এলে,
ঘরছাড়া কার ডাকের সাড়া পেলে।
রৌদ্রটুকু আঁচল ভরে
ছড়িয়ে দিলে দেহের পরে
সলাজ আঁখি তুলে সরস প্রাণে
রঙীন প্রাণে
শরত প্রাতে চাইলে বারেক আমার মুখের পানে

সেই আলোতে অচেনা পথ চিনে
নিলেন চিনে;
দিগ্বিজয়ে আকাশ ভুবন জিনে।
এই যে মায়া ভুবনভরা
তোমায় আজি দিল ধরা
তোমার রূপে রূপ নিয়েছে প্রাণ
বিশ্বপ্রাণ—
গগন ভরে বাজে বাঁশী— তোমার বিজয় গান।

ভাবি মনে আসবে সেদিন কবে,
যবে
শরৎ কালের দুপুর বেলা ছায়াপথে বনে
চলব আমি নিরিবিলি কেবল তোমার সনে,
যাবো অনেক দূরে
গাছের তলায় তোমায় নিয়ে বনে বনে ঘুরে।

শ্রান্ত হয়ে যাবো বনের শেষে,
এসে
দেখব চেয়ে হঠাৎ আকাশ ফাঁকায় দেছে ধরা,
ছোট্ট নদী ঘাসের বনে কূলে কূলে ভরা—
স্বচ্ছ কালো জল
দুপুর বেলার আলো ছায়ায় কর্‌তেছে টল্‌মল।

ক্লান্ত তোমার অবশ তনু নিয়ে,
গিয়ে
একেবারে নদীর কূলে ঘনঘাসের পরে
বস্‌ব মোরা গাছের তলে গভীর অলস ভরে।
বিছিয়ে আঁচল ভুঁয়ে
সেই খানেই এলিয়ে দেহ রইবে তুমি শুয়ে।

স্তব্ধ সবই, কারোই সাড়া নাই,
তাই
উঠব কেঁপে, হঠাৎ যখন দমকা হাওয়া এসে,
মর্ম্মরিয়া গাছের পাতা যাবে জলে ভেসে।
দূরে সঙ্গীহারা
একটা ঘুঘু ডেকে ডেকে বনে হবে সারা।

খানিক পরে হঠাৎ কখন দেখি,
একি—
থেমে গেছে মোদের কথা মোদের আলাপন,
কিসের যেন মায়ায় অবশ ধরা দেছে মন।
কেবল নদীর জলে
কুলু কুলু তোমার আমার পরাণ ভেসে চলে।

তোমার মুখে আমার অলস আঁখি
রাখি,
দেখ্‌ব তখন গভীর সুখে ঘুমিয়ে আছ তুমি,
গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে যাচ্ছে আকাশ চুমি
তোমার নয়ন দুটী;
শুব্ধ দুপুর অবশ করে তোমায় নিল লুটি।

হেমন্তের বেলা শেষে বেলা নাই আর,
দিন বয়ে যায়—
অলস রৌদ্রটুকু শেষ হয়ে এল
নীরবে ঝিমায়।
মাঠে মাঠে পাকা ধানে
গভীর স্নেহের টানে
বিদায়ের ব্যথাটুকু আলো হয়ে ভাসে
চারিদিকে মোর আশে পাশে।

শরতের সুখস্বপ্ন কিছু নাই আর,
ভেঙে গেছে সব;
বসে আছি নদী কূলে, থেমে গেছে প্রাণে
যত কলরব।
চেয়ে দেখি নদী নীর
বড় শান্ত বড় স্থির
ক্লান্ত রৌদ্রটুকু ভাসে নদী জলে,
অবসন্ন আকাশের তলে।

চেয়ে দেখি দূরে ঐ পশ্চিম গগনে
আরক্ত তপন
বিদায়ের ব্যথা দিয়ে বনানীর শিরে
এঁকেছে চুম্বন।
ঝাঁকে ঝাঁকে দলে দলে
সুনীল গগন তলে
পাখী উড়ে যায় ফিরে আপন কুলায়,
বেলা যায়—বেলা বয়ে যায়।

বেলা যায়, মোর প্রাণে বেলা বয়ে যায়—
বৃথা এ জীবন!
এখনি আঁধার হবে, মোর প্রাণে আলো
জ্বলিবে কখন?
পশ্চিম গগন তলে
দিবসের চিতা জ্বলে
নানা রঙে লেলিহান, মোর বুক পানে
আগুনের দীপ্ত শল্য হানে।

মিছে সবই মিছে মোর প্রাণের বারতা?
মিছে এ জল্পনা?
বিলাসের মদিরায় শুধু কি অলসে
করেছি কল্পনা?
ধীরে ধীরে পথ ঘাট
গাছ পালা বন মাঠ
আঁধারের ছায়া লেগে বিষাদে মলিন—
বসুন্ধরা হল দীন হীন।

হেনকালে চেয়ে দেখি ওপারের ঘাটে
এলে তুমি এলে,
কলসী ভরায়ে আজও তেমনি নীরবে
ঘরে চলে গেলে।

এই তব আসা-যাওয়া,
চরণের ধ্বনি পাওয়া,
সন্ধ্যার গায়ে গায়ে পদ-চিহ্ন আঁকা,
মাঠে মাঠে পথধূলি মাখা—

এ যে মোর অঙ্গে অঙ্গে প্রতিরক্ত কণা
পুলকে নাচায়,
আমার অবশ প্রাণ প্রচণ্ড আঘাতে
ঘা মেরে বাঁচায়।
অপরূপ ঢেউ তোলে,
আকাশ পাতাল দোলে,
শিরায় শিরায় প্রাণ পূর্ণ বেগে চলে,
নয়নে নয়নে দীপ জ্বলে।

তখন চাহিয়া দেখি আকাশে আকাশে
তারায় তারায়,
তোমার নয়ন দুটি অগ্নি হয়ে ভাসে,
মোর পানে চায়।
স্তব্ধ আঁধারের প্রাণ
চূর্ণ করি শতখান
তোমার প্রাণের আলো জ্বলে মোর প্রাণে—
সত্য মিথ্যা—কেই বা তা জানে!

(ক্রমশঃ)

শ্রীনীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত



শিল্পী শ্রীযুক্ত রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

বর্ত্তমান সংখ্যার চিত্রশালায় আমরা প্রতিষ্ঠাবান শিল্পী শ্রীযুক্ত রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর সাতখানি শিল্প-সৃষ্টির প্রতিকৃতি প্রকাশিত করিলাম। এগুলি কলারসলিপ্সু সুধিবর্গের চক্ষুরঞ্জন করিতে সমর্থ হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বিচিত্রার পাঠকপাঠিকাগণের নিকট শিল্পী রমেন্দ্রনাথের পরিচয় আজ নূতন হইবে না, ইতিপূর্ব্বে বিচিত্রায় বুদ্ধের জন্ম প্রভৃতি তাঁহার কয়েকখানি বহুবর্ণ চিত্র প্রকাশিত হইয়া সমাদৃত হইয়াছিল।

রমেন্দ্রনাথ শিল্পীবর শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয়ের বিশিষ্ট শিষ্যবর্গের মধ্যে অন্যতম। বিশ্বভারতী কলাভবনে তিনি তাঁহার গুরু-প্রবর্ত্তিত শিল্প ধারায় শিক্ষা লাভ করিলেও সেই সময়েই তিনি বিদেশী শিল্প অনুশীলন করিবারও সুযোগ পাইয়াছিলেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপন করিবার পর দেশভ্রমণের দ্বারা রমেন্দ্রনাথ তাঁহার শিল্প বিদ্যাকে সমৃদ্ধ করেন। অন্ধ্র জাতীয় কলাশালার চারুশিল্প শাখার অধ্যক্ষরূপে মসুলিপট্টনমে অবস্থান কালে তিনি কাঠের ছাঁচ হইতে বস্ত্র চিত্রণ বিদ্যা ও বাটিক প্রস্তুত করিবার কৌশল অনুশীলন করেন।

গোলাপ ফুলের গাছ যেমন যে-দেশেরই জল বায়ু হইতে পুষ্টি সাধন করুক না কেন ফুল ফুটাইবার সময়ে গোলাপ ফুলই ফুটায়, তেমনি এই নানা দেশের নানাপ্রকার শিল্পসৃষ্টি হইতে আহৃত জ্ঞানের দ্বারা স্বীয় কলাজ্ঞানকে পরিপুষ্ট করিলেও রমেন্দ্রনাথ যে-শিল্প-সামগ্রীই রচনা করেন তাহার মধ্যে তাঁহার স্বকীয়তা, তাঁহার শিক্ষাপদ্ধতির আনুগত্য ফুটিয়া উঠে। বিদেশের আহার্যকে পরিপাক করিয়া তিনি নিজ দেহের মধ্যে রক্ত বৃদ্ধি করেন যাহা তাঁহার শরীরকে পুষ্ট করে কিন্তু আকৃতিকে পরিবর্ত্তিত করে না।

এ কথা তাঁহার চিত্রাঙ্কন বিষয়ে যেমন খাটে—মূর্ত্তি গঠন, উড কট্ এবং এচিং সম্বন্ধেও তেমনি খাটে। বিচিত্রার বর্ত্তমান সংখ্যায় পাঠকপাঠিকাগণ চিত্রশালার মধ্যে রমেন্দ্রনাথের মূর্ত্তি গঠনের দুইখানি নমুনা ও পূর্ণপৃষ্ঠ স্বতন্ত্র ছবিতে এচিংএর একখানি নমুনা পাইবেন। এই দুইটি সামগ্রী হইতে আমাদের উল্লিখিত কথার সারবত্তা প্রমাণ হইতে পারে। শ্রীযুক্ত দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত যাঁহাদের সাক্ষাৎ পরিচয় আছে তাঁহারা বুঝিবেন তাঁহার মূর্ত্তিখানি কত সুন্দর ও যথাযথ হইয়াছে। আকৃতির প্রধান বৈশিষ্টগুলি অতি নিপুণভাবে শিল্পী তাঁহার গঠিত মূর্ত্তির মধ্যে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। এচিং ব্যাপারটি সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য—কিন্তু অহল্যাঘাটের এচিংখানির মধ্যে ভারতীয় শিল্পকলার রীতি যে সুপরিস্ফুট তাহার জন্য সূক্ষ্ম দৃষ্টির প্রয়োজন নাই।

উড্ কট্ রচনাতেও রমেন্দ্রনাথ সিদ্ধহস্ত। আমরা বারান্তরে তাঁহার উড্ কট্ চিত্রাবলী "বিচিত্রা-চিত্রশালায়" প্রকাশিত করিব। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় বার-য়্যাট্-ল রমেন্দ্রনাথের রচিত কুড়িখানি উড্ কটের একটি আলবাম্ প্রকাশিত করিয়াছেন। নানা প্রকার বিষয় অবলম্বন করিয়া আলবামটি শিল্পভাণ্ডারের একটি রমণীয় সম্পদ হইয়াছে। প্রবল এবং সূক্ষ্ম রেখার সামঞ্জস্যে বিষয়-বস্তুগুলি অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। আলবামটির মূল্য পচিশ টাকা—সুতরাং শুনিয়া সহসা মনে হইতে পারে দুর্ম্মূল্য—কিন্তু দেখিলে মনে হইবে অমূল্য। প্রত্যেক চিত্রটি শিল্পী কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত স্বতন্ত্র প্লেটে সুরক্ষিত—এমন কুড়িখানি প্লেটের মূল্য পচিশ টাকা অধিক নহে।

বর্ত্তমানে রমেন্দ্রনাথ কলিকাতা গভর্মেণ্ট আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষের প্রধান সহকারীর পদে কার্য্য করিতেছেন। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি এই প্রতিভাবান শক্তিশালী শিল্পীর শিল্প-সাধনা জয়যুক্ত হউক।

সম্পাদক



শিবের বিবাহ

চিত্রশালা

শ্রীযুক্ত রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর
চিত্রাবলী



সাঁওতাল জননী



বুদ্ধ ও সুজাতা



সাঁওতাল নৃত্য



রাখাল বালক

মূর্ত্তিগঠন শিল্প



শ্রীযুক্ত দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

মূর্ত্তি-গঠন শিল্প



[illegible]

Stained glass window

গুণী সুরেন্দ্রনাথ*

শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়

একজন চিন্তাশীল আর্ট ক্রিটিক বড় সুন্দর ব'লেছেন: "Art is the expression of a certain attitude towards reality, an attitude of wonder and value, recognition of something greater than man. Where that recognition is not art dies." বাংলার অদ্বিতীয় গুণী ৺সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের গানের পাশাপাশি বিনিষ্ট ভারতের অধুনাতন শতকরা নিরানব্বই জন ওস্তাদের প্রাণহীন গান শুনেছেন তিনিই জানেন একথাটি কত সত্য।

সাতষট্টি বৎসর বয়সে বাংলার গুণীমুকুটমণি সুরেন্দ্রনাথ গত ভাদ্রমাসে তাঁর ভাগলপুরের ভবনে গঙ্গাতীরে দেহত্যাগ ক'রেছেন। হয় তো গুণী, স্রষ্টা, রচয়িতা সুরেন্দ্রনাথের গুণপনা বিচারের সময় এ নয়। আজ আমরা তাঁর বিয়োগে কাতর—বাংলার সত্য সঙ্গীতানুরাগীদের মনে তাঁর তিরোধানের বেদনা পুঞ্জীভূত। কিন্তু তবু সুরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কিছু আমি আজ বল্‌ব—তাঁর অমর প্রতিভার তর্পণচ্ছলে। কারণ ভারতে যে কয়টি মুষ্টিমেয় স্রষ্টা গুণী ভারতীয় সঙ্গীতের লুপ্ত গৌরবের তথা অদূর-নবজন্মের আভাষ দিতে পারতেন তিনি ছিলেন যে তার প্রধান পুরোধা। বাংলায় বাংলাগানের যে নূতন ও সমৃদ্ধ বিকাশ হবে তিনি যে ছিলেন তার অন্যতম রূপকার। এককথায় শ্রুতিপথে বাঘাজিনী জগতে অতুলন রাগসঙ্গীতের দোলা ভারতবর্ষে যে অমর ঝঙ্কার রূপায়িত ক'রে তুল্‌তে চান বর্ত্তমান যুগে, সুরেন্দ্রনাথের হৃদয়বীণায় ধ্বনিত হ'য়েছিল যে তার প্রথম রেশ—বাংলাদেশে। তাঁর দেহ রক্ষার মুহূর্ত্তেও তাই তাঁর প্রতিভা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা কর্ত্তব্য মনে করছি।

প্রথমেই মনে হয় তাঁর অপরূপ সুকণ্ঠের কথা। তাঁর কণ্ঠ যিনি শুনেছেন তিনিই জানেন সুকণ্ঠের পরিণতি কতদূর হ'তে পারে। শুধু অপরূপ মিষ্টকণ্ঠ নয়। যেমন তার জোয়ারি, তেমনি তার সুরেলা বাহার, তেমনি তার দরদ, তেমনি সমৃদ্ধি, তেমনি ঔদার্য্য, তেমনি রেঞ্জ। সমগ্র ভারতে সব প্রথম শ্রেণীর ওস্তাদের গানই আমি শুনেছি, কিন্তু অকুতোভয়ে বল্‌তে পারি—সুরেন্দ্রনাথের মতন কণ্ঠমহিমা কখনো কোথাও শুনি নি না পুরুষ গায়কের মধ্যে না বাইজীদের মধ্যে। সুরের নিছক মিষ্টতায় এক কাশীর বিখ্যাত মোতিবাই তাঁর একটু কাছাকাছি আস্‌তে পারতেন বটে, কিন্তু গলার গাম্ভীর্য্য ও বিশেষ করে রেঞ্জে গায়িকারা তো কোনো দেশেই পুরুষদের সমকক্ষ ন'ন। তবু আমাদের দেশে আজকাল অধিকাংশক্ষেত্রে বাইজীরা ওস্তাদদের চেয়ে ঢের বড় গুণী, গানের মন্দিরে প্রাণপ্রতিষ্ঠার বড় দরদী পূজারী। কেবল সুরেন্দ্রনাথের মতন দুচারটি গুণীর কণ্ঠ দরদে তাঁদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে সক্ষম। হার্বার্ট স্পেন্সার ব'লেছেন "Many persons are almost incapable of expressing by ascents and

* রায় বাহাদুর সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার ভাগলপুরের বিখ্যাত এক্সিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার রামরতন মজুমদারের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ১৮৬৩ সালে জন্ম। ১৮৮৭ সালে বি এ অনার্স-এ প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। পর বৎসরে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। "সাহিত্যে" "বিচিত্রায়," "ভারতবর্ষে," "উত্তরায়," প্রভৃতি বাংলার নামা পত্রিকায়ই তাঁর অপূর্ব্ব মৌলিক রসিকতাপূর্ণ বহু গল্প প্রকাশিত হইয়াছে। পুস্তকাকারে উঁহার মাত্র কয়েকটি গল্প প্রখ্যাত "কর্ম্মযোগের টীকার" সম্বন্ধ হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। সুরেন্দ্রনাথের পুত্র শৈলেন্দ্রনাথ, জামাতা কুমার শশিশেখর রায় ও ভাগিনেয় যোগেন্দ্রলাল রায় মহাশয়কে আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ—সুরেন্দ্রনাথের সমস্ত ছোট গল্প, সঙ্গীতনিবন্ধ প্রভৃতি একটি খণ্ডে অবিলম্বে প্রকাশ করুন তাঁহার ছোট জীবনী সমেত। বাংলায় সে পুস্তকের সমাদর অবশ্যম্ভাবী। গত ভাদ্রমাসে সুরেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়।

descents of voice, any of the gentler feelings." সত্য। কারণ খুব কম গায়কের কণ্ঠেই বীণাপাণি তাঁর সোনার কাঠি ছোঁয়ান—বিশেষ আমাদের ওস্তাদ-তজ্জিত দেশে। সুরেন্দ্রনাথের কণ্ঠে কিন্তু শ্বেতভুজা দুহাতে ঢেলে দিয়েছিলেন তাঁর এই মিষ্টতার মন্দাকিনী—লালিত্যের মুক্তধারা। তাঁর কণ্ঠ যে কী আশ্চর্য্য সাবলীল ছিল, কী রঙীন ছিল, কি দীপ্ত মনোহর ছিল তা যাঁরা তাঁর গান না শুনেছেন তাঁরা কোনোমতেই এমন কি কল্পনাও করতে পারবেন না। একান্ত সহজতার—effortlessness সঙ্গেই তিনি ফুটিয়ে তুলতেন যে-কোনো সূক্ষ্মতম আবেগ। শুধু gentler feelings-ই নয়, গরিমা, বর্ণিমা, মেদুরতা, প্রবলতা, মন্দ্র-গাম্ভীর্য্য তার-স্নিগ্ধতা সবই তাঁর ছিল যেন ইঙ্গিত-অধীন। একজন বড় ফরাসী কবি সম্বন্ধে বিখ্যাত সমালোচক Jules Lemaitre যে-প্রশস্তি জ্ঞাপন ক'রেছেন সুরেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে বলা চলে অবিকল সেই কথা:—"Il fait de tous ces mots ce que d'autres n'en feraient pas: Il y fait passer le phosphore que les grands poètes ont au bout des doigts."

—"সাধিতে যাহা পারে না হেথা অপরে
মোদের গুণী শবদে তা-ই বিতরে
হেলায় কবি যে ঝিকিমিকি জ্বালে গো
মোদের গুণী অঝোরে তা-ই ঢালে গো।"

সত্যই সুরেন্দ্রনাথের কণ্ঠের ছিল এই বিরল সম্পদ: God's plenty. কণ্ঠস্বরে একাধারে এতগুণ—দুর্লভ—যেকোনো দেশেই।

বেশ মনে আছে আমার শৈশবে ও বাল্যে পিতৃদেবের ওখানে তো কত গানই শুনেছি, কিন্তু নিছক কণ্ঠস্বরের মনোহারিত্বে এমন মুগ্ধ হ'য়েছি মাত্র দুজন গুণীর গানে—বাঙালীর একমাত্র সত্যকার বড় ধ্রুপদী ৺অঘোরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও বাঙালীর একমাত্র সত্যকার বড় খেয়ালিয়া সুরেন্দ্রনাথ।

বাল্যে কোনো ললিতকলারই শ্রেষ্ঠতম আবেদন সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করা যায় না। কিন্তু তবু যে সুরেন্দ্রনাথের উচ্চতম শ্রেণীর খেয়াল ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুনতে পারতাম সে শুধু তাঁর কণ্ঠস্বরের মাদকতায়। বেশ মনে আছে—আমার সর্ব্বাঙ্গ সে-মিষ্টতায় যেন রিম ঝিম ক'রে আস্‌ত। তাঁর সুশ্রী উজ্জ্বল আনন ও সরস ব্যক্তিত্বও অবশ্যই এ আবেশের অন্যতম কারণ ছিল, কিন্তু শুধু তা-ই নয়। আসলে ছিল তাঁর কণ্ঠস্বর। "রাঙা জবা কে দিল তোর পায়ে মুঠো মুঠো, দে না মা সাধ হ'য়েছে পরিয়ে দেনা মাথায় দুটো," গানটি তো কত শতবারই তাঁর মুখে শুনেছি। ওর তানের বৈচিত্র্য-সমৃদ্ধি ও অপরূপ মাধুর্য্যে সে-বাল্যে রস পাওয়া আমার পক্ষে নিশ্চয়ই অসম্ভব ছিল। কিন্তু তবুও মনে পড়ে শুধু এ গন্ধর্ব্বকণ্ঠ গুণীর কণ্ঠস্বরের যাদুতে ভক্তের সেই উচ্ছ্বসিত আনন্দ কতরকম রূপই না পরিগ্রহ করত আমার বালক কল্পনায়। যখন তিনি অন্তরায় গাইতেন:

মা ব'লে ডাক্‌ব তোরে হাততালি দে', নাচ্‌ব সুখে
দেখে মা হাস্‌বি কত আবার বেঁধে দিবি ঝুঁটো

তখন তাঁর তার-সপ্তকের অজস্র তানের উচ্ছল প্রবাহে নয়নের সাম্‌নে জেগে উঠ্‌ত বাংলা-গানের মধ্যে এক নূতন সম্ভাবনা। তখন উচ্চসঙ্গীতের কতটুকুই বা বুঝতাম! কিন্তু তবু অজ্ঞাতে সেই বাল্যের মাহেন্দ্র লগ্নে তাঁকেই প্রথম গুরু-পদে বরণ করি—ও তিনিও আমাকে শিষ্যপদেই বরণ ক'রে ধন্য ক'রেছিলেন। তাঁর কাছে কত যে শিখেছি তা বল্‌বার নয় তাই আজ তাঁর তিরোধানের দিনে আমার এই সর্ব্বোত্তম দীক্ষাগুরুর উদ্দেশে বার বার প্রণাম জানাচ্ছি।

আবাল্য তাঁর গানই আমার অবচেতনার নিত্য নব ছন্দে উপ্ত ক'রে গেছেন তিনি। আবাল্য বিভোর হ'য়ে শুনতাম তাঁর গান। অবশ্য শিল্পকলায় বালকের নিন্দাপ্রশংসার তেমন মূল্য থাক্‌তেই পারে না, কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের গান যত বয়স হ'য়েছে ততই যে বেশি ভালবেসেছি, যতই বুঝতে শিখেছি ততই যে তার মধ্যে গভীরতর স্পর্শ পেয়েছি একথার মূল্য নিশ্চয়ই আছে! পরে ভারতের একপ্রান্ত হ'তে অপরপ্রান্ত ঘুরেছি—শুধু গান শুনতে। কিন্তু যতই শুনেছি ততই বুঝেছি সুরেন্দ্রনাথের প্রতিভা কি স্তরের ছিল। মহত্ত্বের ধর্ম্মই এই সে গ্রহীতাকে দেয় তার গ্রহণ-অনুপাতে। কত নামজাদা ওস্তাদের গান শুনেছি—যত বয়স হ'ত ততই তাদের গুণপনার মধ্যে নানা অসম্পূর্ণতা

চোখে পড়ত ও বালকের উচ্ছ্বাস-জোয়ারে আস্‌ত ভাঁটা। ছোট বই, ছোট কবি, ছোট শিল্পীর ক্ষেত্রে এমনিই হয়। কিন্তু বড় বই বড় কবি বড় শিল্পী গ্রহীতার প্রবর্দ্ধমান মনের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে বাড়ে যেহেতু বড়র ধর্ম্মই ওই। মনে পড়ে বাল্যে ও কৈশোরে কত গায়ক গায়িকার গানই না মুগ্ধ হ'য়ে শুন্‌ত আমার গান-পাগল তৃষিত বালক-মন। কিন্তু যতদিন যেত তাদের মোহ ঘনিয়ে না উঠে যেত পাণ্ডুর হ'য়ে। একা সুরেন্দ্রনাথ আমার বয়োক্রম নিবিড়ায়মান রসস্পৃহার ও নবনবোন্মেষী অনুসন্ধিৎসার খোরাক সমানে জুগিয়ে যেতেন। তাঁর এক একটি গান অজস্রবার শুনেছি—কিন্তু কখনো একঘেয়ে হয় নি, পুরোনো হয় নি! মনে পড়ে ভাগলপুরে, কলকাতায়, পুরুলিয়ায় তাঁর "পটতোরা" ব'লে একটি ইমন কতবারই না শুনেছি, "বনঘন মুরলিয়া" ব'লে একটি মালকোষ, "রঙ্গিলে লালে" ব'লে একটি বাহার "ঘাঁউ ঘাঁউ ঘন গরজে" ব'লে একটি দেশ, "বিয়োগী বিধুরা রাজবালা" ব'লে একটি ভৈরবী "এই তো কানন গো" ব'লে একটি কীর্ত্তন—সে কত গান! কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে কোনো গান কখনো দুবার এক রকম শুনি নি। সেইজন্য তাঁর আরও কয়েকটি ভক্তের সঙ্গে আমি প্রায়ই বলাবলি করতাম যে তাঁর গান শেখা কত শক্ত! তাঁর কণ্ঠে নিত্য এত নতুন নতুন ঢঙের তান মীড় ও স্বরবিন্যাস তাঁর অফুরন্ত কল্পনার ঐশ্বর্য্যে দীপ্যমান্ হ'য়ে ফুটে উঠ্‌ত যে শিক্ষার্থী দিশেহারা না হ'য়েই পারত না। শিখ্‌ব কী—চিত্ত ছেয়ে যেত প্রতিদিনের অভিনবত্বের আবেশে। কী দরদ!—কী চাল! কী লচক! কী বৈচিত্র্যের চমক!—তানের কতরকম উদ্ভাবনা!—রসের সে কী প্লাবন! কূলে কূলে ব'য়ে চ'লেছে ভরা নদী। কোথাও কি এতটুকু দৈন্য আছে? এতটুকু অগভীরতা? এতটুকু স্রোতের অভাব, গতির বাধা-পাওয়া কলস্বনের দৌর্ব্বল্য? কখনো এ সুরের প্রবাহিনী চলে হৃদয়ের শত উষরতা ও অনুভবের দৈন্যকে স্নিগ্ধ ও উর্ব্বর ক'রে দিয়ে, কখনো বা সে ব'য়ে যায় তার হাজারো হেমবিশ্বের লাস্যলীলায় অপার বিস্ময় জাগিয়ে, কখনো সে জাগে হৃদয়ের নিহিত কুঞ্জে আনন্দ-বেদনা-নিষিক্ত লাখো গোলাপ ফুটিয়ে, কখনো কখনো বা সে বাণ ডাকিয়ে দিয়ে যায় দ্যুতোজ্জ্বল রোমাঞ্চ-শিহরণে অনুভবকুণ্ঠ হৃদয়ের সব জড়িমাকে ভাসিয়ে দিয়ে।

তাঁর গান শুনে নিত্যই মনে হ'ত অমর কবি ভবভূতির সেই—"স্রোতস্তেবা প্রতিহতরয়ঃ সৈকতং সেতুমোঘঃ।"

—যে-স্রোতোধারা বাধারে বাধা বলিয়া নাহি মানে
সৈকতের বাঁধেরে ভাঙে উচ্ছল অভিযানে।

কত সময়ে হৃদয়ের কত অন্ধকার তাঁর যাদুকণ্ঠ মুহূর্ত্তে ক'রেছে দূর—মনে হ'য়েছে কবি মরিসের সেই—

The wind that sighs before the dawn
Chases the gloom of night,
The curtains of the East are drawn
And suddenly—'tis light!

—যে পবন ফেলে দীরঘশ্বাস নব-উদয়ের আগে
নিশির তিমির পলায় পরশে তার!
প্রাচী-গুণ্ঠন পড়ে খসি,'—ও কী! সে আননে অনুরাগে
ঝরিল সহসা আলোক গঙ্গাধার!

সত্য—সত্য। কতদিনই না মনে হ'য়েছে যে এক সুরে-শ্বরীর প্রেরণায়ই এ-ইন্দ্রজাল মর্ত্তে নামে। শুধু হায়! সুরেন্দ্রনাথের মতন কয়জন সুরসাধক সে-দেবীর প্রেরণাকে অনাবিল রাখ্‌তে সক্ষম তাঁদের গোপন অন্তরের পূত ধ্যান-লোকে? কয়জনা পারেন ভগীরথের তপস্যায় এ অরূপ-ভাগীরথীকে ধূলির ধরণীতে নামিয়ে আন্‌তে? কয়জনার ভাগ্য হয় শ্বেতসরোজবাসিনীর অমল ধবল পদাম্বুজ হৃদয়-কমলে ধারণ করবার?

এ সব যে ভক্তের ভক্তি-উচ্ছ্বাস নয় তা হয়ত যাঁরা সুরেন্দ্রনাথের গান শোনেন নি তাঁদের বোঝানো যাবেই না। কিন্তু তাঁর সুর-অলকনন্দাধারে বিধৌতগ্লানি হবার সৌভাগ্য যাঁদের হ'য়েছিল তাঁরাই জানেন যে এ তর্পণ একটুও বাড়াবাড়ি নয়। অবশ্য যে কেউ যে তাঁর গানের মহিমা বুঝবে এমন কথা বল্‌লে সে হবে পাগলের মতন কথা। দরদী হওয়া চাই—মরমী হওয়া চাই—সুরপাগল হওয়া চাই। কারণ সুরেন্দ্রনাথ তাঁর সূক্ষ্ম সুর-মূর্চ্ছনায় যে-সব পেলব সৌন্দর্য্যের মায়াজাল প্রতি মুহূর্ত্তে সৃজন করতেন তার লাবণী ও অপূর্ব্ব ছন্দিমা স্থূলদৃষ্টি স্থূলরুচি বে-দরদীর জন্যে নয়। He

who hath ears let him hear একথা বলা যায় সব বড় আর্ট সম্বন্ধেই। তাই আমি একথা বলতেই পারি না যে অরসিকের কাছেও তাঁর সুর-নিবেদন সার্থক হ'ত। তবে এ কথা বোধ হয় গৌরব করেই বল্‌তে পারি যে সুরের প্রেমিক তাঁর গানের মধ্যে যে স্বাদ পেত সে এক অননুভূতপূর্ব্ব স্বাদ। তার কাণে তাঁর স্বরলহরী নিত্য আলোক লহরীর তালেই উঠত বেজে। এক কথায় সুরেন্দ্রনাথের গান তার কাছে প্রতিভাত হ'ত revelation এরই ছন্দে।

মনে পড়ে কতদিন এক একটি রাগের আলাপ ও বিস্তার শুনেছি—সে কতক্ষণ ধ'রে! কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্যেও কি পুরোণো হ'য়েছে? সে কি পুরোণো হবার? সে প্রতিভা-বতারের কণ্ঠ দিয়ে মীড় মূর্চ্ছনা গমক মন্দ্রমধ্যতার সপ্তকের স্বরগ্রামে যে কী নিত্যনব ছন্দে খেলে যেত! কোনো সময়ে তাঁর তানালাপের রূপ ছিল যেন খাপখোলা তরবার—বিদ্যুৎগতি, ধারালো, দীপ্যমান্; কোনো সময়ে বা "বসনে পরিধূসরে বসানা" ছায়াগুণ্ঠিতা বিরহিণীর; কোনো সময়ে শান্ত উদয় গরিমার চলদীপ্তির; কখনো বা অলস মধ্যাহ্নের পাতাঝরা দীর্ঘশ্বাসের; কখনো শারদ প্রভাতে নির্মেঘ নীলিমার,—সে কতরকম উপমা বা মূর্ত্তি—image—যে শ্রোতার চিত্তপটে ফুটে উঠত তাঁর গানের কিরণসম্পাতে! কবি যেমন চলচ্ছক্তিহীন শব্দকে নিমেষে ছন্দের সঞ্জীবনোষধিরসে উজ্জীবিত ক'রে তোলেন, চিত্রী যেমন কয়েকটি স্বল্প রেখায় এক সমাপ্তিহীন গতিপ্রবাহকে লীলায়িত ক'রে তোলেন, প্রিয়জন যেমন একটি নীরব চাহনিতে হৃদয়ে পুঞ্জীভূত আনন্দ-বেদনাকে তরঙ্গায়িত ক'রে তোলেন, সুরেন্দ্রনাথ তেমনি তাঁর মীড় দিয়ে আঁকতেন ছবি, তাল দিয়ে সৃজন করতেন কাব্য, সুরের উদাত্ত স্থিতির মধ্য দিয়ে নিয়ে যেতেন স্বপ্নরাজ্যে।

এ বেদনার বা স্তুতির আতিশয্য নয়। বস্তুতঃ তিনি যে-সঙ্গীতে একই রাগের নানা তান লয় ও মূর্চ্ছনার প্রকার-ভেদে রসের অফুরন্ত প্রস্রবণ বইয়ে চল্‌তেন সে প্রেরণা এক বাণীর বরপুত্রের কণ্ঠেই দেখা দেয়।

আর কী আশ্চর্য্য ছিল তাঁর ঢং! এখানে ঢং সম্বন্ধে দুএকটা কথা বলতেই হবে—যেহেতু সুরেন্দ্রনাথের একটা প্রধান সম্পদ ছিল তাঁর ঢঙের বাহার। হিন্দুস্থানী গানের চাল বা ঢং বল্‌তে যে ঠিক্ কী বোঝায় খুব কম বাঙালীই তা জানেন—কারণ বাঙালী মূলতঃ সঙ্গীতপ্রিয় জাতি নয়—কাব্য-প্রিয় (যদিও বাঙালী নিজে একথা জানেও না—এবং জানেনা ব'লেই বাঙালীর কণ্ঠে হিন্দুস্থানী গান বা নিছক্ সুরবৈচিত্র্য প্রায়ই উত্‌রোয় না) কিন্তু আমি যত বাঙালী গায়কের গান শুনেছি তাঁদের মধ্যে একমাত্র সুরেন্দ্রনাথই জান্‌তেন ঢং কাকে বলে।* আরও আশ্চর্য্য এই যে হিন্দুস্থানী গান হিন্দুস্থানী ঢঙে গেয়েও তিনি তার মধ্যে এক অপূর্ব্ব বাংলা সৌকুমার্য্য এনেছিলেন—যাকে বলা যেতে পারে colour; এ বস্তু এক কল্পনাপ্রবণ বাঙালীই আনতে সক্ষম। এই কারণে তাঁর হিন্দুস্থানী গানে এমন এক মহিমাময় স্বকীয়তা ফুটে উঠ্‌ত যা এমন কি গুণিরাজ আবদুল করিমের মধ্যেও মেলে না। বস্তুতঃ এ বিষয়ে সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের সঙ্গে তুলনা করতে হ'লে হিন্দুস্থানীর কাছে যাওয়া চলবে না যেতে হবে ঐ বাঙালীরই কাছে—[যে বাঙালী অবশ্য হিন্দুস্থানী ঢঙে নিজেকে রসিয়ে তুল্‌তে পেরেছে]—যেমন তন্ত্রিরাজ আলাউদ্দীন খাঁ, বা তাঁর তরুণ শিষ্য বাঙালীর গৌরব তিমিরবরণ। দুঃখের বিষয় বর্ত্তমান সময়ে বাঙালীর মধ্যে আর কেউই নেই ভরসা করে যাঁর নাম করা যেতে পারে—সত্য হিন্দুস্থানী ঢঙের রসস্রিতা ব'লে। আর গায়কদের মধ্যে বাংলাদেশে সুরেন্দ্রনাথের মতন খেয়ালিয়া অদূর ভবিষ্যতে মিল্‌বে ব'লে ভরসা তো হয় না।

ভরসা না হওয়ার অনেক কারণ আছে। প্রথমতঃ তো এই গেল ঢঙ। হিন্দুস্থানী ধ্রুপদ খেয়াল বাংলা ঢঙে গাওয়াও যা আর হারমোনিয়মে রাগের আলাপ করাও তাই। যিনিই রসজ্ঞ তিনিই একথা জানেন—এবং যিনি ঢঙ্ সম্বন্ধে রসজ্ঞ নন, তিনি সুরেন্দ্রনাথের প্রতিভার একটা

*৺অঘোর চক্রবর্ত্তীর গান আমি বাল্যকালে শুনেছি, তাই কিছু বলতে পারি না জোর ক'রে তার ঢং সম্বন্ধে। বাঙালীর মধ্যে এক বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সত্য গায়ক—সত্য হিন্দুস্থানী চাল কি বস্তু জানেন। তার কারণ অঘোর চক্রবর্ত্তী ধ্রুপদ ও খেয়াল শিখতে শেষবয়সে গিয়ে থেকেছেন ওয়াজিদ আলি শার বিখ্যাত সভাগায়ক আলিবক্সের কাছে। বামাচরণ বাবুর কাছে তবু সে সময়কার ধ্রুপদেরও একটু আমেজ পেয়েছি।

মস্ত দিক্ সম্বন্ধেই অজ্ঞ র'য়ে গেছেন বলা যেতে পারে। একথাটা বিশেষ ক'রে বলছি শুধু দেখাতে কি কারণে সুরেন্দ্রনাথ বিরাট প্রতিভা সত্ত্বেও বাংলাদেশে এক রকম অজ্ঞাতই র'য়ে গেছেন।

কিন্তু শুধু ঢঙই সুরেন্দ্রনাথের একমাত্র সম্পদ ছিল না একথা বলাই বেশি। তাঁর আর একটি মহান্ সম্পদ ছিল এই যে তিনি ছিলেন প্রায় যাকে বলে audience-proof। তাঁকে দুজন শ্রোতার সামনেও যেমন তদ্গতচিত্তে গাইতে দেখেছি—দুশো জনের সামনেও ঠিক তেমনি। বস্তুতঃ তিনি গাইতেন কিন্তু বাহবার জন্যে না; রাগের মধ্যে চমকপ্রদ যোগাযোগ ঘটাতেন কিন্তু চমকে দেবার জন্যে না; অপরূপ স্বরসম্পাতে শ্রোতার সঙ্গে দরদের বন্ধন অবলীলাক্রমে গ'ড়ে তুল্তেন অথচ শ্রোতার মুখ চেয়ে না। ওস্তাদদের মধ্যে নিত্য যে বাহবাস্ফোটের ভাব সুকুমার-হৃদয় শ্রোতাকে নিত্য পীড়া দেয়—এ নিরভিমান গুণীর গানে সে তাল ঠোকার, জাহির করার ভাবটি একেবারেই ছিল না। তাই তো তাঁর গুণিহৃদয়ের মনোজ্ঞ স্পন্দনে দরদীর হৃদয়তন্ত্রীও কেঁপে উঠত এত সহজে। সত্য আত্মপ্রকাশ যেখানেই দেখি, অকৃত্রিম আবেগস্ফূরণ যেখানেই দেখি সেখানেই যে আমরা তাঁকে ছুঁই যিনি সব প্রকাশের পিছনে থেকে সৃষ্টিকে সার্থক করেন। "পর্য্যাপ্তপুষ্পস্তবকাবনম্রা" ছিল তাঁর বিনয়গৌরবা প্রতিভা। ভারতীয় সঙ্গীতের এ-অধঃপতনের যুগে সুরেন্দ্রনাথের আবির্ভাবকে তাই সত্য রসজ্ঞমাত্রেই অভিনন্দন করবেন। অবশ্য ওস্তাদেরা চিরদিন তাঁর নিন্দাই ক'রে গেছে। আমরা কত সময়ে অধৈর্য্য হ'য়েছি—কত আসরে তাঁর অপমানে; কিন্তু সুরেন্দ্রনাথকে অপমান করবে তাদের সাধ্য কি? যিনি জন্ম-নিরভিমান অপমান কি তাঁকে স্পর্শ করতে পারে? ওস্তাদেরা তাঁকে বুঝত না। বুঝবে কোত্থেকে? সব দেশেই একদল গুণী থাকেন যাঁরা হচ্ছেন সুরের পালোয়ান—acrobat, যাঁদের বিজ্ঞম্মন্য সমালোচনা সম্বন্ধে হাবার্ট স্পেন্সার ব্যঙ্গ করে বলেছেন: "Musical critics often give appplause to compositions as being scientific"; এই দলের গুণী ও গুণজ্ঞ সুরেন্দ্রনাথের গান শুনে শুধু বলত "হাঁ, মিঠা গাতে হেঁ।" কারণ তাঁর গানে না ছিল সুরের মল্লযুদ্ধ, না ছিল তালের লম্ফঝম্প, না ছিল আত্মগুণকীর্ত্তন, এবং সর্ব্বোপরি না ছিল বিজ্ঞম্মন্যদের সায়েন্টিফিক "তৈলাধার-পাত্র কিংবা পাত্রাধার-তৈল" তর্কের অবসর। তিনি অনেক সময়েই রাগ গাইতে গাইতে বদলাতেন। সে প্রেরণা এলে কখনো তাকে তথাকথিত রাগশুদ্ধতার খাতিরে অপমান করতেন না। শুদ্ধভাবে রাগালাপ করবার কৃতিত্বের তাঁর অভাব ছিল না—অথচ শুচিবাই তাঁর ছিল না একেবারেই। আমাকে কতবার মালকোষে কোমল রে, কেদারায় কোমল নি, ভৈরবীতে কড়ি মধ্যম প্রভৃতি লাগিয়ে শোনাতেন। বল্তেন "ওস্তাদেরা এতে এত অগ্নিমূর্ত্তি হ'য়ে ওঠেন—জানোই তো কিন্তু কী করব? এতে আমি দোষ দেখি না—এমন কি ভস্ম হবার ভয়েও না।"

এতে দোষ দেখতেন না কারণ তিনি ছিলেন, বৈয়াকরণিক না—গুণী টীকাকার না—স্রষ্টা, শুষ্ক সমালোচক না—দরদী। তাই তিনি রাগের বিস্তারে অসামান্য শিল্পী হ'য়েও কোথাও কোনো গানে নতুন কিছু সৌন্দর্য্য দেখলেই আনন্দে শিশুর মতন আত্মহারা হ'য়ে উঠতেন। আমার পিতৃদেব দ্বিজেন্দ্র লালের অনেকগুলি খেয়াল-ঘেঁষা গানই সুরেন্দ্রনাথের গান শুনে রচিত। পিতৃদেব অনেক গানের সুররচনায় সময়ই তাঁর কাছে নানা নির্দ্দেশ গ্রহণ করতেন। সুরেন্দ্রনাথের কাছে তিনি শিখেছিলেনও অনেক গান,—তাই তো তাঁর রচনায় ভারতীয় রাগসঙ্গীতের লীলায়িত সৌন্দর্য্য এত বেশী প্রকট—যার জন্যে তাঁর গান গুণীর কাছেও এত সমাদর পেয়েছে। কিন্তু যখনই তিনি কোনো রাগে চ্যুতি ঘটাতেন বা মিশ্র করতেন মিষ্ট হ'লে তাতে সবচেয়ে খুসি হতেন সুরেন্দ্রনাথ। অতবড় ওস্তাদ হয়েও ও রাগসঙ্গীতের মর্ম্মে প্রবেশ করেও রাগের বাঁধাবাঁধি দিয়ে তিনি কখনো নিজের রসবোধকে পিষে মারতেন না। এককথায়, তিনি গান গাইতেন বা বিচার করতেন খোলা মন নিয়ে। ওস্তাদরা এর পরেও তাঁকে ভস্মীভূত করতে না চেয়ে পারে?

আর এই জন্যেই সুরেন্দ্রনাথকে কেউ ওস্তাদ বললে—অসামান্য ওস্তাদ হওয়া সত্ত্বেও সবচেয়ে কুণ্ঠিত হতেন তিনি নিজে। এমনকি ওস্তাদি আসরে পারতপক্ষে গাইতেও তিনি চাইতেন না। একবার কলকাতায় আমাদের বাড়ীতে

বিখ্যাত আবদুল করিমের গান হয়। সুরেন্দ্রনাথেরও সে আসরে গাইবার কথা ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি এলেন না। পরে দেখা হ'লে কেন এলেন না জিজ্ঞাসা করায় বলেছিলেন: "ওস্তাদি আসরে আমার গান কি কখনো জমতে দেখেছ দিলীপ? না ওদের সামনে গেয়ে আমাকে আনন্দ পেতে দেখেছ? ওস্তাদদের কাছে গাওয়া উচিত ওস্তাদদের।" ব'লে, মুখটিপে তাঁর অপরূপ স্নিগ্ধ ভঙ্গীতে হেসে বললেন: "যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ—এ আর বুঝলে না।" অল্প দু একটি কথা ব'লে সুকুমার ব্যঙ্গের সঙ্গে এমনি হাসিই হাসতে পারতেন তিনি দরকার হ'লে!

ওস্তাদদের নিয়ে এমন কতরকম ঠাট্টাই যে তিনি করতেন! অথচ তার মধ্যে কোথাও কি এতটুকু দাগ ছিল? অথচ ওস্তাদদের মধ্যে সত্য গুণপনার তিনি আন্তরিক সম্মান করতেন—কারণ তিনি ব্যঙ্গ-প্রিয় হলেও মনে প্রাণে ছিলেন যাকে বলে—"কদরদান"—reverent; কিন্তু কালোয়াতের নানা মুদ্রাদোষের নকল, নানা ভঙ্গির সম্বন্ধে স্নিগ্ধ উপভোগ্য ঠাট্টা, কত আসরে কত কি হাস্যজনক ব্যাপার ঘটত তার নানান্ কাহিনী এমন অপরূপ ঢঙেই বলতেন! এমন রসিক "গপ্পে" লোক জীবনে কমই দেখেছি। এ বিষয়ে তিনি ছিলেন "কোষ্ঠীর ফলাফল" প্রণেতা রসরাজ কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের স্বজাতি।

তাঁর ওস্তাদদের নিয়ে রসিকতার একটিমাত্র উদাহরণ দেই, কারণ এ প্রবন্ধে বেশি উদাহরণ দেওয়ার স্থানাভাব। তাঁর অনুপম বলার ভঙ্গী বা টোন্ তো লিখে ফোটানো যাবে না—তাই তাঁর কথাগুলি সরস করবার জন্যে ছড়ায় বলি—কল্পনাশীল পাঠক পাঠিকা এ থেকে তাঁর সরস ভঙ্গী কল্পনা ক'রে নেবেন এই মিনতি।

তখন তিনি কলকাতায় ছিলেন একটি বাসা ভাড়া করে। প্রায়ই সন্ধ্যায় তার ওখানে আসর হত, একতলায়। একদিন যেতেই বললেন:

"জানো দিলীপ, নাতনি আমার দুধ খেতে না চায়,
কোনো মতেই ঘুম ভাঙে না।"—"ঘুমিয়ে কি দুধ' খায়?"
– "নাহে, পরম দয়াময় যে দিলেন একটি বর
একটি বিরাট্ ওস্তাদ আসেন নিত্য সাঁঝের পর।"
—"তাতে কি?"—"বাঃ! হুঙ্কারে তার আঁৎকে ওঠেন মেয়ে
তিনতলাতে—ঢক্ ক'রে খান দুধ মহাভয় পেয়ে।"

ওস্তাদদের নিয়ে এ ধরণের ঠাট্টার তাঁর আর অন্ত ছিল না, এবং বোধ করি সেই জন্যেই নিজেকে ওস্তাদ বলে পরিচয় দিতেন না ভুলেও। অথচ ওস্তাদের তানের ক্ষমতা, দম, রাগজ্ঞান, লয়দুরস্ত্, সুরের কর্তৃত্ব এ সবই তাঁর ছিল পুরোপুরিই। সারা ভারতবর্ষে ঘুরে সমস্ত বড় বড় ওস্তাদের গান শুনেই আমি নির্ভয়ে বলতে পারি যে রাগের যে বিকাশ সুরেন্দ্রনাথ তাঁর অপূর্ব্ব ঢঙে নিত্য প্রাণময়, গতিময়, দীপ্তিময়, ক'রে তুলতেন সে সকম ভাবে রাগের পূর্ণ বিস্তার করতে শুনেছি—মাত্র একজন ওস্তাদকে। তিনি ভারতের অদ্বিতীয় গায়ক—আবদুল করিম খাঁ। তাই এ প্রবন্ধের সমাপ্তি টান্বার আগে তাঁর সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথের একটু তুলনা ক'রে দেখাবার প্রয়াস পাব সুরেন্দ্রনাথ কোথায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন।

ওস্তাদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ থাকা সত্ত্বেও তাঁরা প্রায় সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন যে আলাপের ঢঙে* রাগের রূপবিস্তার-নৈপুণ্যে আবদুল করিমের মতন গায়ক—ইনি আলাপচারী গায়ক—ভারতে দুটি নেই। এঁর (তথা চন্দন

* আমি ধ্রুপদ আলাপের কথা ছেড়েই দিচ্ছি, কারণ সমগ্র ভারতবর্ষে এমন একজন ধ্রুপদীও আমি শুনিনি যাঁর ধ্রুপদে সত্য নিবিড় রস ফুটে ওঠে। এক চন্দন চৌবের তথাকথিত ধ্রুপদে প্রাণকাড়া স্বরস্থিতি ও মীড়ে ধ্রুপদের খানিকটা রস ফুটে ওঠে বটে। কিন্তু চন্দন চৌবের ধ্রুপদকে ধ্রুপদ কেন বলা চলে না ধ্রুপখেয়াল বলাই সঙ্গত—তার কারণ "ভ্রাম্যমানের দিনপঞ্জিকায়" বিশদ ক'রে বলেছি। তার মোট কথা এই যে ধ্রুপদের নানা গুণ তাঁর গানে থাকা সত্ত্বেও তার প্রধান গুণটিই নেই—যথা, ধ্রুপদের গাম্ভীর্য্য ও স্থাপত্য (architecture)। বস্তুতঃ সারা ভারত ঘুরে একটিও এমন কি দ্বিতীয় শ্রেণীর ধ্রুপদীও দেখতে পাইনি। শুধু আমি না পণ্ডিত ভাতখণ্ডেও পাননি। তাই কয়েক বছর আগে আমায় কাছে দুঃখ ক'রে বলেছিলেন যে ধ্রুপদ আজকের দিনে ম'রে ভূত হ'য়ে গেছে। ধ্রুপদের এই গঠন-গাম্ভীর্য্য ও স্থাপত্য-কাজ যদি আজকের দিনে কারুর গানে একটুও পাওয়া যায় তবে তিনি বোধ হয় কাশীর হরিনারায়ণ বাবু। রামপুরের-উজীর সাহেব ও মহম্মদ আলীর সঙ্গে তানসেনের ঘরোয়ানা ধ্রুপদের অন্ত্যেষ্টিসৎকার হয়ে গেছে একথা অস্বীকার করে লাভ নেই।

চৌবের) সম্বন্ধে আমার "ভ্রাম্যমানের দিনপঞ্জিকায়" যা লিখেছি তার পুনরুক্তি করলে হয়ত ভাল হ'ত—কিন্তু স্থানাভাব বশতঃ তা করতে পারছি না। এখানে সংক্ষেপে শুধু সুরেন্দ্রনাথের গরিমার বৈশিষ্ট্যটি নির্দেশ করবার জন্যে এই দুই অনুপম খেয়ালীর একটু তুলনামূলক সমালোচনা ক'রেই ক্ষান্ত হব।

আবদুল করিমের গানে কর্তৃত্ব—mastery—সুরে দখল, রাগের জ্ঞান অবশ্যই সুরেন্দ্রনাথের চেয়ে অনেক বেশি। গলায় তিনি বীণার সূক্ষ্ম কাজ "বাংলাতে" সক্ষম। আমি স্বকর্ণে তাঁকে পর পর অনেকগুলি পর্দায় কোমল অতি কোমল শ্রুতি গলায় "বাংলাতে" দেখেছি—(তাঁর গলার শ্রুতি নিয়েই ক্লেমেণ্টস্ সাহেব তাঁর বাইশ শ্রুতির হার্মোনিয়াম তৈরি ক'রেছিলেন)—এবং এযে কত কঠিন তা জানেন এক নিপুণ গায়ক। সঙ্গীতরত্নাকরের টীকাকার সিংহভূপাল "সঙ্গীত সময়সার" গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত ক'রেছেন :

'তে তু দ্বাবিংশতির্নাদা ন কণ্ঠেন পরিস্ফুটাঃ।
শক্যা দর্শয়িতুং তস্মাদ্বীণায়াং তন্নিদর্শনম্॥

কিন্তু আবদুল করিমের কাছে আমি কিছুদিন স্বরসাধনা শিখেছিলাম ব'লেই জানি যে তিনি এ "দ্বাবিংশতির্নাদাঃ" কণ্ঠেই পরিস্ফুট করবার শক্তি ধরতেন। তবলা তরঙ্গে ঘোর কোলাহলের মধ্যে কন্সার্ট হলে বসন্তের ঠাটে সুর বাঁধতে দেখেছি মিনিট দুয়েক মধ্যে—এমনিই আশ্চর্য্য সূক্ষ্ম তাঁর কান। তানপুরো বাঁধতে তাঁর কখনো এক মিনিটের বেশি সময় লাগতে দেখিনি। গাইতে গাইতে দুধারে দুটো তানপুরোর একটি তারও এতটুকু উঁচু নীচু হ'লেই তৎক্ষণাৎ সে তারের নীচেকার কড়িটি সরিয়ে মুহূর্ত্তে সুর মিলিয়ে গেয়ে চলেন। তার ওপর অগাধ তাঁর কসরৎ। মাদ্রাজে আমার কয়েকটি বন্ধুর কাছে শুনেছি যে তাঁরা আবদুল করিমের গান শুনতে আরম্ভ ক'রেছেন রাত দশটায় আর শেষ ক'রেছেন পরদিন সকাল সাতটায়। সমস্ত রাত গেয়েছেন খাঁ সাহেব একা। আর এরকম ভাবে গাইতেও পারেন তিনি দিনের পর দিন রাতের পর রাত। এছাড়া অদ্ভুত তাঁর গানের সাধনা—সুরের তপস্যা। এই বছর দুই আগেও এখানে তাঁকে তিন সপ্তকের বিজলি-তান দিতে শুনেছি হলক তান, জমজমা তান, তোড়ের তান, দীর্ঘ গমক, কঠিন মীড়, বিদ্যুদ্গতি আরোহণ অবরোহণ, এক রাগ থেকে মুহূর্ত্তে অন্য রাগে প্রস্থান, মিনিটে মিনিটে ষড়জ-সংক্রমণ (change of key বা modulation), জলদ সার্গম রাগের ঠায় গতি দুন চৌদুন—সে কী বিপর্য্যয় নৈপুণ্য! আর শুধু নৈপুণ্যই নয় অবশ্য, এ-সব আনুসঙ্গিকের সঙ্গে আছে সেবা বস্তুটি, আছে সুরের দরদ, আছে রাগের প্রাণকাড়া বিস্তার, আছে গানে জীবনের স্ফূর্তি, আছে আত্মপ্রকাশের স্বতঃউৎসারিত স্রোতোধারা। কবি বদলেয়ারের সুরে মন ব'লে ওঠে :

La musique souvent me prend comme une mer!
Vers ma pâle étoile,
Sous un plafond de brume ou dans un vaste éther
Je mets à la voile.

"গান টানে গো মোরে সিন্ধু যথা টানে তাহার স্রোতে
মোর শান্ত তারা পানে,
আমি কুহেলিঘন চাঁদোয়াতলে বিপুল ব্যোমপথে
চলি পাল তুলি' উজানে।"

অবশ্য এসব দিকে সুরেন্দ্রনাথও অসামান্য ছিলেন নিশ্চয়ই। কিন্তু তবু নানা বিষয়ে তিনি আবদুল করিমের সমকক্ষ ছিলেন না—যথা কসরতে, দমে, গলার 'পরে বিস্ময়কর কর্তৃত্বে ও পুঁজির অজস্রতায়। কিন্তু তাই ব'লে প্রতিভায় native genius এ—তিনি আবদুল করিমের চেয়ে হীন ছিলেন না, ঢঙের স্বকীয়তায় (originality) ও গরিমায় নিশ্চয়ই তাঁর সমান ছিলেন, এবং কল্পনায় ও কণ্ঠস্বরের মিষ্টতায় ছিলেন আবদুল করিমের চেয়ে অনেক বড়। আবদুল করিমের কল্পনা ছিল না বলা আমার উদ্দেশ্য নয়—কারণ কোনো আর্টেই কল্পনা বিনা সত্যি বড় হওয়া যায় না—কিন্তু তাঁর কল্পনার প্রেরণার অনেকখানি যোগাত তাঁর অনন্যসাধারণ নিষ্ঠা ও সাধনা এই-ই আমার বলবার কথা। শুধু আবদুল করিম কেন, যে কোনো "তৈয়ার গাওয়াইয়া"-র সঙ্গে তুলনা করলেও সুরেন্দ্রনাথের সুর-সাধনাকে "সাধনা"

আখ্যায় অভিহিত করা চলে না। (আমাদের ওস্তাদদের এই বিপুল সাধনার ক্ষমতাকে গুণী মাত্রেই যে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতে বাধ্য একথা আমি "ভ্রাম্যমানের দিন পঞ্জিকায়" ব'লেছি, কাজেই ওস্তাদদের "প্রাপ্য" যে আমি তাঁদের দিতে নারাজ আমার বিরুদ্ধে এ-অভিযোগ সত্য নয়।) কিন্তু ঐখানেই তাঁর প্রতিভার জলন্ত প্রমাণ নয় কি? আমি তো অনেকবারই তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রেছি "আপনি তো খুবই পড়াশুনো ক'রে ফার্ষ্ট ক্লাস অনার্সে বি-এ পাশ করলেন, ডেপুটি পরীক্ষায় ফার্ষ্ট হ'লেন, চিরজীবন চাকরির হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে গেলেন—সাহিত্য-চর্চ্চায়ও সময় কম দেন নি—অথচ এরকম গান করেন কী ক'রে? তাছাড়া শুনলেনই বা কোথায়, আর শিখলেনই বা কবে?" সুরেন্দ্রনাথ এসব প্রশ্নের বড় একটা উত্তর দিতেন না। জনশ্রুতি—কয়েকজন প্রথম শ্রেণীর বাইজীর কাছেও না কি তিনি লুকিয়ে লুকিয়ে শিখ্‌তেন স্কুলকলেজ পালিয়ে। কিন্তু যতই কেন শিখুন না—খোঁজ ক'রে জানা গেছে যে বড় জোর দু-তিন বছরের বেশী তিনি শেখেন নি—আর তা-ও সাগ্‌রেদরা ওস্তাদজীর কাছে যে ভাবে "তনুমনধন" ঢেলে শেখে সেভাবে শেখেন নি কখনো।* শুধু তাই না। গানের চর্চ্চা রাখারই বা সময় ও সুযোগ তিনি কতটুকু পেতেন? একে ত ডেপুটির হাড়ভাঙা খাটুনি, তার উপর এমন সব পাণ্ডব-বর্জ্জিত দেশে নিরন্তর বদ্‌লি হওয়া যে গানের আসর বসবে কোত্থেকে? তিনি এমন সব জায়গায় বছরের পর বছর কাটিয়েছেন যে গড়পড়তা হয়ত বছরে একমাসও গান ক'রেছেন কি না সন্দেহ। মনে আছে একবার ছুটেছিলাম পুরুলিয়ায় তাঁর গান শুনতে। (অনেকদিন তাঁর গান না শুনলে কি রকম যে একটা তৃষ্ণা জাগত!) সুরেন্দ্রনাথ বললেন: "তাই তো হে—কতদিন যে গান করিনি—এখানে কেউ শোনে না হে আমার গান—লুচি সন্দেশ খাওয়ার নিমন্ত্রণ না করলে!" .. যাহোক্ অতি কষ্টে তানপুরোর নতুন তার চাড়িয়ে খুঁজে পেতে এক অখাদ্য তবলচিকে তো যোগাড় করা গেল। কিন্তু যে লোক তিনচার মাস গান করে নি—তার বিখ্যাত "নিবিড় আঁধারে মাগো চমকে অরূপরাশি" গানটি বাগেশ্রীতে ধরতে না ধরতে কি স্বয়ং বীণাপাণি তাঁর কণ্ঠে বাঙ্ময়ী! মনে আছে মনে মনে তাঁর চরণে প্রণাম ক'রে সেদিন ব'লেছিলাম: "গুণী, এমার্সন যে প্রতিভাকে 'বিপুলশ্রমক্ষমতা' ব'লে বিরাট ভুল ক'রেছিলেন তা তাঁকে মানতে হ'তই যদি মাত্র একটিবার তোমার গান শোনবার সৌভাগ্য তাঁর হ'ত।" এই জন্যই মনে হয় যে native genius-এ সবজড়িয়ে সুরেন্দ্রনাথ আবদুল করিমের চেয়ে কম তো ছিলেনই না—হয়ত বড় ছিলেন। অন্ততঃ আবদুল করিম একটি বছর ব'সে থাকুন তো দেখি গান না গেয়ে। তারপর গাইতে সুরু করলে কী দেখতাম? না—গলায় সুর তেমন বস্‌ছে না, রাগের রূপ তেমন খুলছে না, কণ্ঠপেশীর জড়িমা কাটিতে চাইছে না—কত কী। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ এবিষয়ে ছিলেন যেন পিতামহ ভীষ্মদেব। বহুদিন তীর ধনুক স্পর্শ করেন নি। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে কুরুক্ষেত্রে অর্জ্জুন বললেন "পিতামহ, যুদ্ধং দেহি," অম্‌নি পিতামহ যে সব্যসাচী সেই সব্যসাচী। আর এমন "যুদ্ধই দিলেন" যে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণকে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিয়ে রণক্ষেত্রে নামিয়ে তবে জলগ্রহণ! এম্‌নিই তাঁর বৃদ্ধ হস্তের নিপুণ সন্ধান!

সত্যি, বৃদ্ধ বয়সেও সুরেন্দ্রনাথের গান যতবারই শুনেছি ততবারই মনে জেগেছে এই পিতামহ ভীষ্মদেবের ছবি। তাঁর শেষ গান শুনি আমাদের ওখানে—কলকাতায়—১৯২৮এর মাঝামাঝি। তখন তাঁর বয়স চৌষট্টি বৎসর। দেহ দুর্ব্বল, অঙ্গে প্রত্যঙ্গে বাত' অম্লশূল—তার উপর পায়ে কি এক অসহ্য জ্বালা—সর্ব্বদাই। কিন্তু সব ভুলে গেলেন এ সুস্থ-সুন্দর মানুষটি তানপুরো ধরতে না ধরতে। আর কী গানই গাইলেন! এক দৌড়ে সন্ধ্যা

* গুণিচূড়ামণি খাঁ আলাউদ্দীনের মুখে শুনেছি রামপুরের উজীর খাঁর কাছে তিনি বার বছর শিখেছিলেন—তামাক সেজে। আর সে কী সাধনা! সে এক শোন্‌বার জিনিষ। তরুণ বাঙালী-গৌরব তিমিরবরণকেও মাইহারে আলাউদ্দীন কম সাধনা করান নি। রোজ রাত তিনটে থেকে সকাল আটটা সাধতেন। দিনে শিক্ষা আবার সন্ধ্যায় সাধনা ইত্যাদি। বস্তুতঃ ওস্তাদি সঙ্গীতে এই সাধনার বিবরণী সত্যই বিস্ময়কর। অনন্য-সাধারণ প্রতিভা নইলে প্রচণ্ড সাধনা বিনা উচ্চ সঙ্গীতে প্রথম শ্রেণীর গুণী হওয়া যায় না। তবে এবিষয়ে সুরেন্দ্রনাথের প্রতিভা ছিল এক আলাদা শ্রেণীর।

সাতটা থেকে রাত সাড়ে দশটা। একাই। আরও তাঁর গাইবার ইচ্ছা ছিল—কিন্তু তাঁর শরীর অসুস্থ বলে আমরা জোর ক'রে তাঁকে বাড়ী পাঠিয়ে দিলাম।

আর তখনও কী খোলা মিষ্ট কণ্ঠ! যৌবনের সে প্রাবল্য বা তেজ নেই শুধু। কিন্তু আর সবই আছে। সেই অপূর্ব্ব সুরের দরদ, সেই বিচিত্র কল্পনা, সেই নিখুঁৎ সুরের কাজ, সেই প্রাণস্পর্শী মীড়, সেই তারাসপ্তকের মধ্যম পঞ্চমে অচঞ্চল স্থিতি ও মন্দ্র সপ্তকে ইচ্ছামাত্রই খরজে নেমে আসা —বস্তুতঃ সে না দেখলে বিশ্বাস হয় না। Spirit willing হ'লে যে flesh weak এর অজুহাতটা মায়া,



৺সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার

একথার যেন সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন জীবন্ত সাক্ষ্য। তাঁর গান শুনতে শুনতে প্রাদেশিকতায় আমাকে বার বার পেয়ে বসত —বন্ধুবর সার্ব্বভৌমিক সুভাষচন্দ্রের উদ্দীপ্ত প্রতিবাদ সত্ত্বেও। মনে হ'ত বাঙালীর যত ত্রুটিই থাকুক না কেন নিষ্ঠায়, সাধনায়, নিয়মানুগত উচ্ছ্বাসপ্রবণতায়,—তার দরদ আবেগ ও সর্ব্বোপরি কল্পনা যাবে কোথায়? কই অন্য প্রভিন্স বার করুক তো দেখি একজন সুরেন্দ্রনাথ—একজন আলা-উদ্দীন—একজন তরুণ তন্ত্রী তিমিরবরণ! ও যে বাঙালীর পিতৃপৈতামাহিক প্রাণসম্পদ—মরিয়া না মরে রাম! বনেদি ঘরের ছেলে যে! কতুর হ'লেও এখনই চাল তার কি যায়!

সুরেন্দ্রনাথ হয়ত আমাদের সঙ্গীত জগতের শেষ এলাহি চালের গাইয়ে—বনিয়াদি ঘরের শেষ বংশধর। কিন্তু তাই ব'লে তিনি শুধু বনিয়াদি ঘরের ছেলেই ছিলেন না। তিনি ছিলেন এক অত্যাশ্চর্য্য শিল্পী। দুঃখ এই যে চাকরির হাড়ভাঙা খাটুনির চাপে তাঁর নানামুখী প্রতিভা যথোচিত বিকাশ পাবার সুযোগ পায় নি, কিন্তু তবু তিনি যাই করতেন তাতেই তাঁর মৌলিকতার ছাপ রেখে গেছেন। কী আসর জমানোয়, কী গল্প লেখায়, কী গানে, কী ক্যারিকেচারে। এর উপর ছিলেন তিনি নিপুণ চিত্রী, আশ্চর্য্য শিকারী, সেরা সামাজিক মানুষ—একান্ত বন্ধুবৎসল, মহৎ উদার, অমায়িক, বসুধৈবকুটুম্বক প্রীতি-নিলয়।

কিন্তু মানুষ সুরেন্দ্রনাথ বা সাহিত্যিক সুরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বর্ণনীয়োগ্য অনেককিছু থাকলেও এ প্রবন্ধে তার স্থান নেই—যেহেতু এর বর্ণনীয়—শুধু গুণী সুরেন্দ্রনাথ, সঙ্গীতস্রষ্টা সুরেন্দ্রনাথ। তাঁর এই দিকের আর একটি কথা ব'লেই তাই বিদায় নেব। কারণ ভারতীয় সঙ্গীতের আসন্ন রেনেসাঁসে তাঁর গানের এ গুণটির মূল্য বোধহয় তাঁর অন্য কোনো অবদানের চেয়েই কম না।

সে গুণটি হচ্ছে সুরেন্দ্রনাথের গানের সৌকুমার্য্য refinement। এমন কি অতবড় যে গুণী আবদুল তাঁরও গানেও সময়ে সময়ে মাত্রাজ্ঞানের অভাব দেখা যায়। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের গানের মধ্যে কথনো গ্রাম্যতা বা কর্কশতা বা লম্ফঝম্প —coarseness—আসতে দেখি নি—ভাল আসরে তো নয়ই,—হাজার coarse শ্রোতার মাঝেও না। এটা যে কত কঠিন তা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। বিশেষ ক'রে গানে, অভিনয়ে ও বাগ্মিতায় মন্দ শ্রোতার স্থূল মাধ্যাকর্ষণ যথাযথ কাটিয়ে চলতে পারা প্রথম শ্রেণীর শিল্পীর পক্ষেও দুঃসাধ্য। সস্তা যশের মোহে না পড়া সম্ভব হয় কেবল বহু পুণ্যফলে, যে জন্য চিন্তাশীল অ্যালডুস্ হাক্সলি দুঃখ ক'রেছেন এ যুগের শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর য়ুরোপীয় সঙ্গীতকারদেরও বললে: "Even serious musicians seem to find it hard to dispense with barbarism."

রেডিয়ো ও গ্রামোফোনের যুগে এ barbarism হ'য়ে উঠছে আরও সহজ (এবং তার স্বপক্ষে চমৎকার চমৎকার যুক্তিও গ'ড়ে উঠছে অবশ্যই—যার সাইকো-অ্যানালিটিক নাম—rationalization)—এবং ঠিক সেইজন্তেই এত আনন্দ হয় ভেবে যে সুরেন্দ্রনাথ এ যুগের মানুষ ছিলেন না। কারণ এই প্রাণখোলা, সদানন্দ, স্বভাবনম্র, উচ্চাশা-বিরহিত, স্নিগ্ধভাষী, সুশীল, উদার, অমায়িক অথচ তীক্ষধী মানুষটি গান করতেন এ-যুগের কাড়াকাড়ির ভাব নিয়ে না, একহাত দেখাব এ তাল ঠোকার ভাব নিয়েও না—এমন কি (সেটা শুন্‌লে হয়ত আধুনিকী অনেকেরই বাড়াবাড়ি মনে হবে) নিজের গুণপনাকে ফুটিয়ে তোলার জন্তেও না। তিনি গান করতেন—গান করা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ছিল ব'লে—গান না করে তিনি থাকতে পারতেন না ব'লে।

গান না ক'রে তিনি যে থাকতে পারতেন না এর একটি সরস দৃষ্টান্ত দেবার লোভ সংবরণ করতে পারছি না—বিশেষ এইজন্তে যে এতে ক'রে তাঁর অপূর্ব্ব নিরভিমানিতার বড় একটা মনোজ্ঞ পরিচয় দেওয়া হবে। এ ধরণের ছোট ছোট দৃষ্টান্তে তো আসল মানুষটা কম ফুটে ওঠে না।

আমাদের দেশের দুর্ব্বাসা-সোদর গুণীদের সঙ্গে যে ভুক্তভোগীরই পরিচয় আছে তিনিই জানেন গায়কের সঙ্গে বাদকের ললিত সহযোগিতার সম্বন্ধ অনেক ক্ষেত্রেই কী ভায়োলেণ্ট নন-কোঅপারেশনের রক্তারক্তিতে রূপান্তরিত হ'য়ে থাকে। কিন্তু "তরোরিব সহিষ্ণু" সুরেন্দ্রনাথ এ বিষয়ে ছিলেন মাটির মানুষ। যে-রকমই তবলচি হোক্ না এ নিরভিমান মিষ্টভাষী গুণী মানিয়ে চল্‌বেন। ভাল সঙ্গতদারের সঙ্গে ঝগড়া হওয়া তো দূরের কথা অতি নিকৃষ্ট তবলচিকেও তিনি সদা প্রসন্ন ভাবে বাকে বলে চালিয়ে নিতেন। অনেক সময়ে এতে ভারি মজা হ'ত। একটা মাত্র ঘটনার উল্লেখ করি।

তখন আমার এক ভ্রাতা শচীন্দ্র সবে মাত্র তবলায় একতালা ও তেতালায় ঠেকাটি শিখেছেন। সেদিন ভাগলপুরে তবল্‌চি পাওয়া গেল না—(কারণ বরাদ্দ লুচি সন্দেশের বন্দোবস্তে সেদিন কি কারণে চুক হ'য়ে গিয়েছিল) অথচ আমরাও গান শুন্‌বই। কী করা যায়?

সুরেন্দ্রনাথ বল্‌লেন "তাতে কি, শচীনই ঠেকা দেবে।" সে-বেচারী তো অতবড় ওস্তাদের সঙ্গে সঙ্গত করতে হবে ভেবে কেঁপেই অস্থির। কিন্তু সদাশিব সুরেন্দ্রনাথ ছাড়লেন না। বল্‌লেন "ভয় কি? কাওয়ালির ধা ধিন্ ধিন্ ধা, ধা ধিন্ ধিন্ ধা, না তিন্ তিন্ তা, তা ধিন তেটে ধিন্—এই অবধিও তো জানো? তাই সই। ও-ই দিয়ে চলো।" গান তো শুরু হ'ল।

কিন্তু তাই বা সে পারবে কেন? অত বড় গাইয়ে! নিঘম নার্ভাস হ'য়ে পড়ল। ফলে কখনো বা ঢিমা তেতালায় ষোল মাত্রার জায়গায় কুড়ি মাত্রা পরে "সম" দেয়, কখনো বা একতালায় বারো মাত্রার জায়গায় ভুলে পনের মাত্রা বাদে "ফাঁক" দেয়। এ ধরণের রসভঙ্গে অন্য যে-কেউ হ'লেই থেমে যেত। কিন্তু পাছে তাতে তার মনে আঘাত লাগে ব'লে সুরেন মামা হেসে বল্‌লেন—

"মাভৈঃ শচীন, বাজাও না ভাই, প্রাণের মায়া ছেড়ে
চলো উধাও বাজিয়ে সাথে—হর্ষে মাথা নেড়ে।"
কইনু আমি—"সে কি বলুন! মাত্রা যে ভুল করে!
ফাঁকের পরে চার তাল দেয়—বাক্য মোদের হরে!"
কহেন গুণী—"তাতেই বা কী? যেমন বাজাও, জেনো
সমে এসে মিলিয়ে দেবই,—মুখখানি চুণ কেন?
শুধু তুমি এইটি কোরো—তালটি যেয়ো দিয়ে,
ফাঁক ও সমের হিসেব আমিই শ্রেফ্ নেব মিলিয়ে।"

আমাদের মধ্যে হাসির সাড়া পড়ে গেল। শুধু সে হাসির সঙ্গে সে সভায় কোন্ শ্রোতার না মনে মুগ্ধ ভক্তি জেগেছিল—এ নিরহঙ্কার ভোলানাথের সদানন্দ চরিত্রের প্রতি?

বস্তুতঃ সুরেন্দ্রনাথ যে একটা সহিষ্ণুতা অবলম্বন করতে পারতেন তার প্রধান কারণ—বড় গাইয়ে ব'লে এতটুকু self-consciousness তাঁর ছিল না। এবং সেই জন্যই তিনি অমন শ্রোতা-নিরপেক্ষ হ'য়ে গান ক'রে যেতে পারতেন, ভাল শ্রোতা মন্দ শ্রোতা উভয়কেই সমভাবে আদর ক'রে তাঁর গান শোনাতে পারতেন। সত্যি, নিরভিমান তাঁর এত মজ্জাগত ছিল যে শুধু যে ধনী দরিদ্রেরই তাঁর কাছে প্রভেদ ছিল না তাই নয় যে তাঁর গানের নিন্দা করত সেও তাঁর গান

শুনতে এলে তাঁর গানের অনুরাগীর সঙ্গে সমানই আদর পেত। তিনি ভুলেও ভাবতেন না শ্রোতা তাঁর গানের মহিমা বুঝছে কি না। তিনি শুধু গেয়ে যেতেন—দুহাতে বিলিয়ে যেতেন—তাঁর সুরের স্ফুলিঙ্গ অপরের মনে আগুন জ্বাল্‌ল কি না জ্বাল্‌ল সে নিয়ে তাঁর কোনো মাথাব্যথাই কখনো দেখি নি। বাস্তবিক, কোনো গায়ক যে এমন প্রশংসানিরপেক্ষ হ'য়ে আজীবন গান ক'রে যেতে পারে, অসমজদারের কাছেও যে এমন উদার ছন্দে তার সুরৈশ্বর্য্যের ঝুলি উজাড় ক'রে আনন্দ লাভ করতে পারে, এবং সর্বোপরি তার উচ্চতম প্রেরণার কাছে অনুক্ষণ খাঁটি থাকতে পারে—শ্রোতার বাহবার লোভে একটুও নীচে না নেমে—এ মহিমাময় দৃশ্য আমি জীবনে আর কোথাও দেখি নি, না এদেশে, না য়ুরোপে।

কেবল এক আক্ষেপ জাগে। এতবড় প্রতিভা আমাদের সঙ্গীতজগতে নিজেকে এমন অবাধে বিলিয়ে দিয়ে গেল, এমন আত্মভোলা প্রতিভার বরপুত্র আমাদের মধ্যে আমাদেরই একজন হ'য়ে তার স্বরসাধনায় সুরজাহ্নবীকে মর্ত্ত্যে বইয়ে দিয়ে গেল অথচ আমরা তাকে চিন্‌লাম না। গীতায় নিষ্কামতার সান্ত্বনা রয়েছে বটে, কিন্তু তবু ভাবতে কি একটু দুঃখ না হ'য়ে পারে যে—the world does not know its greatest men ?—অন্ততঃ কোনো অনাদৃত প্রতিভার ভক্তদের মনে?—আমাদের মনে? যে আমরা জানি যে তিনি কী ছিলেন?

কিন্তু না। দুঃখ কেন? কতটুকু আমাদের দৃষ্টির পরিধি যে তাই দিয়ে ফলাফল বিচার করতে যাই? কেন মনে করি যে সুরেন্দ্রনাথের গান সমজদারের সংখ্যাবাহুল্যের অভাবে ব্যর্থ হ'য়ে গেল? জীবনে সত্যের যে-আগুন একবার জ্বলে সে কি কখনো নেভে? না, তার আলো, শক্তি, পাথেয় কখনো পথহারা হয়?

সুরেন্দ্রনাথ আমাদের আভাষ দিয়ে গেছেন বাংলা ও হিন্দী গানের ভবিষ্যৎ বিকাশ কোন্ লীলায়িত উজ্জ্বল পথ নেবে। তিনি তাঁর সুরের আলোয় প্রতিভার স্রোতস্বিনীতে পথ কেটে চ'লে গেছেন—দেখিয়ে গেছেন গানে চাইলে কী বস্তু পাওয়া যায়, আমাদের চোখ ফুটিয়ে দিয়ে গেছেন গানে সত্যতম রস কাকে বলে। তাঁর দেহদীপ আজ নির্ব্বাপিত বটে—কিন্তু গানে তাঁর সত্যোপলব্ধির বহ্নিবাণী চিরদিন আমাদের হৃদয়ে অনির্ব্বাণ হ'য়ে জ্বলবেই। আমাদের উচ্চ সঙ্গীতের ভবিষ্যৎ বিকাশ সুরেন্দ্রনাথ তাঁর যে-জ্ঞানদৃষ্টিতে দেখে গেছেন—সে দৃষ্টিবর তিনি আমাদের সকলকেই দিয়ে গেছেন চিরদিনের জন্যে। তাই আজ আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁকে প্রণাম ক'রে বলি:—

গুণী গাইলে হেথায় যে গান, সে কি গাওনি চিরতরে
দানি বিস্মৃতিরে লাজ?
তুমি যে কিঙ্কিণী বাজিয়ে এ-প্রাণ সুধায় দিলে ভ'রে
সে কি লুটবে ধূলামাঝ?
দূরে ঐ যে তারা পড়্‌ল খসি,'—স্পন্দটি তার সারা
আকাশ লয় না কি বুক পেতে?
হেথা কলস্বনা একটিও ঢেউ হয় কি সাগরহারা
থামি' মধ্য পথে যেতে?
তোমার কান্ত প্রাণের শান্ত গানে করলে যে আরতি
তাহে অলখ এল নেমে;
তোমার সেই পূজারই পায় পূজারী আমরা—করি নতি
উছল ভক্তি প্রীতি প্রেমে।
তোমার ঝঙ্কারে এই উষর ভূঁয়ে জাগ্‌ল নাকো ফুল
তাহে আঁধার হ'ল আলা!
বাণী গন্ধে তারি অবতরি,'—ফুলিয়ে তারা দুল
নিলেন তোমার বরণমালা
তোমার নিত্য নূতন সৃষ্টি জালে বাঁধলে এ অন্তর
সে কি বিচিত্র বাঁধন!
সে-সুর যতই গাঁথে ততই ভাঙে বেসুরো পিঞ্জর
রচি' জাগ্রতে স্বপন!
তোমার তানের আরাধনে দ্যুলোক নাম্‌ল ভূলোকে
পরি' বাসর মিলন হার;
তুমি রচলে গুণী, সে-সঙ্গমের চুম্বন-পুলকে
সে কোন্ সুদূর অভিসার!
হেথা আন্‌লে বাহি' কোন অলকার দীপ্র সুরধুনি
যাহে পৃথী উতরোল?
সে কোন্ চির চেনায় ডাক দিলে হে মূর্চ্ছনা ফাল্গুনী!—
বুকে জাগিয়ে অচিন্ দোল!
তুমি মোদের মাঝে চির জীবন রইলে ছদ্মবেশী
তোমার নয়ত হেথায় ধাম!
দিয়ে সেই ধামেরি একটু পরশ হ'লে নিরুদ্দেশী,
মোদের লও গুরু, প্রণাম।

শ্রীদিলীপকুমার রায়

—০—

টুক্‌রি

শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত রায়চৌধুরী

ভূমিকা

গগনের কথা সূর্য্যের আলো ;
ধরণীর কথা সূর্য্যমুখীর বনে।
পাখী কথা কয়, বৌ কথা কও ;
সখীতে সখীতে কানে কানে হয় কথা।
বাজারে বাজারে চলে সারা বেলা
কথার হট্টগোল।
আমি ফিরি তারই মাঝে,
কথা কুড়োনোর ব্যাবসা আমার
টুক্‌রি বোঝাই করি ॥

দ্বন্দ্ব

ঝড়ের সকালে পাখী পড়ে আছে
আমবাগানের তলে,
মণিতে বিনুতে তারে নিয়ে কাড়াকাড়ি।
মণি বলে—ওকে পুষ্‌ব খাঁচায়—
বিনু বলে, ওকে বাসায় ফিরিয়ে দেব।
এ তর্কে পাখী আপনার শেষ কথা
জানালো দিনের শেষে—
বাসা ও খাঁচার দ্বন্দ্ব মিটিয়া গেল।

কলাপাতা

তালের পাতা ঘন দোলায় মাথা,
শালের পাতা
বাজায় করতালি,
খেজুর পাতার শূন্যে লড়াই
লক্ষ হাজার বর্শাফলক তুলে।
ঝোড়ো-হাওয়ায় বাঁশের পাতা নাচে,
আম্‌লা পাতার শাম্‌লা নাচের নেশা,
কেবল শুধু কাঁদে কলার পাতা
ছিন্ন ভিন্ন বেশে।

ভরা বাদর

পথের আকাশ মেঘের কালোয়
ভরলো দিকে দিকে।
দত্ত বাড়ীর
মরা দীঘি কানায় কানায় ভরা
কাক-চক্ষু জলে।
আমবাগানে, জামবাগানে, নেবুর বাগানে
স্তূপে স্তূপে সবুজ হলো ঘন।
আমার মনে উঠ্‌লো ভরে অকারণের ছায়া।

চোর

কেউ বা বলে—লোকটা পাগল।
কেউ বা বলে—চোর।
কেউ বা বলে – বেজায় রোগা, ম্যালেরিয়ার রুগী।
রুলের গুঁতো দিয়ে পুলিস বলে—রে বদমাস।
লোকটা বলে—দুঃখী আমি,
তার বেশী দোষ নেই।

জ্যৈষ্ঠ

রক্তজবা ঝিম্‌রে আসে রোদে ;
পাপ্‌ড়িগুলি নেতিয়ে পড়ে নুয়ে,
কাঁঠালবনে পাতার আগায় তীক্ষ্ণ আলো
চক্‌চকিয়ে ওঠে।
শুক্‌নো কুয়োর ধারে নামে
জলের আশায় দলছাড়া দাঁড়কাক ;
খেঁকি কুকুর নর্দ্দমাতে ঠাণ্ডা কাদায় শুয়ে
চক্ষু বুঁজে জিভ্‌ লেলিয়ে হাঁপায় বোসে।

বন-পথে

বনের পথে কঠিন কাঁটা,
একটা বুঝি ফুটলো পায়ে।
চোখ নামিয়ে দেখি
ক্ষত চরণ মোহন রঙে ঘিরে
চাইল ক্ষমা কাঁটা-লতার ফুল।

পলাতকা

বুড়ো বরের হাতে আমায় দিলি,
বুড়ো গেল ম'রে।
এক্‌লা ঘরে কেমন কোরে থাকি ?
মাগো, আমি চলে যাবো তোদের সঙ্গ ছেড়ে
ইষ্টিসনের কলগাড়ীতে চেপে,
রাত্রি যখন নিশুত হবে,
আঁধার হবে বন,
সঙ্গে রবে করিম গাজীর ছেলে।
নিয়ে যাবে পদ্মাপারের দেশে ;
গড়িয়ে দেবে হাতের বাজু,
পরিয়ে দেবে গলায় মটরমালা।

রথ

ছুটে এসে দুয়ার খুলে চাই,
বর গিয়েছে চলে,
দূরে বাজে রথের শব্দ—শূন্য আঁধার পথ।

শিশির

পথের পাশে
ঘুমিয়ে ছিলেম,
কখন এলে গোপনচারিণী।
সকাল বেলায়
ললাটে মোর স্বপ্ন শেষের শিশিরঝরা জল।

শিকারী

ঘুরে ঘুরে পড়ে ধূলায় লুটিয়ে,
চঞ্চুর সাথে চঞ্চু মিলায়ে ডাকে,
অবশ ডানায় ডানা ঝাপটিয়া
নীরব নিচল সাথীরে জাগাতে চায়।
যারে মারো নাই,
তাহারে শীকারী
মেরেছ অনেক বেশি।

চাঁপা

এই চাঁপারে চিনিনে তো,
সেই চাঁপাটি কই ?
সেই যে তোমার প্রথম চোখের চাওয়া,
খোঁপার থেকে খসিয়ে দেওয়া প্রথম দোলন চাঁপা।

রক্তজবা

দেখ্‌তে পেলেম, বুনোছেলে
রক্তজবা পরিয়ে দিল কালো মেয়ের কানে।
একটু দূরে—আরেক মেয়ে
  কেমন করে তাকিয়ে থাকে এই ছেলেটির দিকে।
দেখ্‌তে দেখ্‌তে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ায়,
এক পলকে ছিনিয়ে নিয়ে নিজের মাথার জবা
অকারণেই ছুঁড়ে ফেলে ছিন্ন ছিন্ন ক'রে।

সকাল বেলা

মাকড়্‌সা-জাল ঘাসের পরে মেলা।
 বেলা বাড়ে, শিশির শুকায়,
মাকড়সা-জাল ছিঁড়ে হয় খান খান,
ফুলের ফুরায় পালা।
তৃণ-বেদিকায় ক্ষণিকের আল্পনা,
তারি পর দিয়ে লক্ষ্মীর পা দুখানি
  চলে গেল—হেরিলাম।

মোতিয়া

যে গেছে তাহারই শূন্য পথের পানে
প্রজাপতি, তোর ডানা তোরে নিয়ে চলে।
মোতিয়া কাটালো সারা রাত পথ চেয়ে,
গেল যবে চ'লে
  এলি সন্ধানে তারি।

খেলা

বৃষ্টির জল ছলো ছলো
  শিউলি গাছের পাতায় পাতায়,
টগর গাছে ভিজে ফুলের দল
  পূব হাওয়াতে ঘরছাড়া হয় বুঝি।
আজ আমারো বাদল লাগা মন
  আকাশ থেকে পেয়েচে কার দোলা।

কে—

লাল ঠোঁট!
ভাসা ভাসা চোখ!
কালো এলোচুল বাতাসে দুলিয়ে
সকাল বেলায়
চলে গেল ঐ পথের বাঁকে।

শেষের খেয়া

দূর থেকে ঐ আব্ছা আলোয় হাত ছানি দেয়
অস্তাচলের তারা,
শেষের খেয়ার পাল তোলে মোর
পারাপারের মাঝি।
তবু আমার মন্থর মনখানি
পিছিয়ে পড়ে রইলো তোমার ঘাটে।

নতুন খেলা

ডাণ্ডাগুলি—নোন্তা—হাডুডু,
সব খেলাই তো হচ্ছে পুরোণো।
নতুন খেলা চাই আমাদের
বলছে খেলার দল।
তাই পুরোণো খেলাগুলোর সাজের বদল কোরে
ডাকে নতুন নতুন নামে খেলার সর্দ্দার॥

প্রজাপতি

কোনো কাজ নেই, নানা-রঙা সাজ প'রে
হেথা হোথা ফেরে কিসের প্রশ্ন নিয়ে,
আলোয় ছড়ায় ডানা।
চরণে জড়িত চূর্ণ পরাগ,
মধু কণা তার মুখে—
অকারণে বেলা হেলায় কাটায়
মোর মন প্রজাপতি।

এক পশ্‌লা

কেমন কোরে জান্‌বো বলো
মোর আঙিনার কাঙাল টগর গাছ
শুধু কেবল এক পশ-লা বৃষ্টি জলের তরে
এম্‌নি তরো ছিলো উদাস হয়ে,—
যেম্‌নি পেল ঐ টুকু দান পথিক মেঘের হাতে
অমনি যে তার ডালে ডালে ফুলের মাতন লাগে।

জল-মুক্তা

কচুর পাতায় মুক্তো ছিলগো,
সকালবেলার আলোয় ঝল-মল্ ;
যেমনি তারে দিলেম নাড়া
ভূষণটি তার হারালো সে,
আমি পেলেম ফাঁকি।

ছবি

মাথার কাছে ঐ যে দেখি
মেঘ, না ওকি চুল,
হাত পা ওকি লতার বাঁকা ডাল,
যায়না বোঝা নারী কিম্বা পরী।
তারো চেয়ে সত্য ওযে
মন আমারে বলে,
ঐ তো ছবির মায়া।

ছবি

আমার মুখের ছবিটি কিনিল
সোনার মোহর দিয়ে ;
মনটি আমার বিনা দামে কেন
কিনিল রাজার ছেলে ?

হরিণী

ফল-জল-পাতা পড়ে থাকে পাশে,
আঁখি ছুটি তুলে কোন দূরে যেন চায়—
      বনের দুলালী ওযে।
ওগো সৌখীন সহরের বিলাসিনী,
ওর স্থকঠোর চিরজীবনের দুখে
যেটুকু তোমার সুখ,
যদি তা হারাও পর নিমেষেই
      রবেনা তাহার স্মৃতি।

ঝড়ের পরে

আজ সন্ধ্যায়
ঝড়ে উড়ে পড়ে জানালায় বার বার
মোর আঙিনার মধুমল্লিকা শাখা।
বিজন রাতের বেলা,
আমার শূন্য বুকে
বার বার কোরে উড়ে উড়ে পড়ে কার সে মুখের স্মৃতি।

শ্রাবণ পূর্ণিমা

আকাশ ভ'রে জমে আছে
শ্রাবণ মাসের কাজল-কালো জল ;
সেই জলেতেই বারেক ডুবে,
বারেক ভেসে উঠে—
কোন রূপসী—পঞ্চদশী
      সাঁতার কাটে আজ।

ভালুক নাচ

তোরঙ্গ তোল মাথার উপরে,
এবার তোমার শশুরবাড়ীতে যাও।
দেখাও তো দাদা, শাশুড়ীকে তুমি প্রণাম কোরেছ
                  কেমন কোরে।
বৌটি তোমার প্রথম তোমাকে দেখেছিল যেই দিন
কতখানি জিব বার কোরেছিল দেখাও দেখি।
—না না, হলো নাতো,
পাজী বেয়াদব ! দেখা, ভালো কোরে দেখা।
নাকের দড়িতে টান পড়ে যেই—
      দারুণ যন্ত্রণায়
ভালুকের জিভ্ ঝুলে পড়ে মুখ থেকে।
দর্শক দল
তাই দেখে দেখে হাততালি দিয়ে হাসে।

ভালোবাসা

বধূ বলে এসে সখিরে তাহার,
"ওকি যাদু জানে সই,
কী মন্ত্রে ওযে কেড়ে নিল প্রাণমন"।
বর বলে তার বন্ধুরে ডেকে,
"বুঝি ও বাসেনা ভালো,
ভালো কোরে কথা বলেনা আমার সাথে"।

পাখী

মেয়ে যেন রেলগাড়ী, মা বলেন হেসে,
কেন এত তাড়াতাড়ি ; কোথা যাবে শুনি ?
মেয়ে বলে,
জান না মা, বোসেদের পুকুরের পাড়ে
আতা গাছে ব'সে আছে না-জানা কী পাখী,
এক্ষুনি উড়ে যাবে !
মা হঠাৎ মনে ভাবে, এ মেয়ে বুঝিবা
আমার অজানা পাখী !
চোখে এলো জল।

আনমনা

"আন্‌মনে কোন ভাব্‌না তোমার
বকুল বনের নির্জ্জনে ?"
ভাব্‌নার ভার সয়না যে আর
তাই এসেচি—
ঝরিয়ে দেবো ঝড়ে-পড়া বকুল ফুলের মতো।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনিশিকান্ত রায়চৌধুরী

অতিথি

(প্রহসন)

শ্রীযুক্ত সুবোধ বসু

প্রথম দৃশ্য

[পট উঠাইলে দেখা গেল রঙ্গমঞ্চ অন্ধকার। খোলা একটা জানলা দিয়া কিছুকাল পরে প্রভাতের আলোর একটু আভাস পাওয়া গেল। আলো যখন আরো স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে তখন দেখা গেল সেটা একটা লাইব্রেরী-ঘর। বই-এর সেল্‌ফ্‌; বড় বড় দু-একটা ছবি। মাঝখানে বড় একটা সেক্রেটারিয়েট টেবিল। কতগুলি চেয়ার ইতঃস্তত ছড়ান। একধারে একটা মশারি টাঙান রহিয়াছে কিন্তু কোনো খাট পালঙ্ক নাই।

ঘরের দরজা একটা নিঃশব্দে খুলিয়া গেল। বাড়ীর প্রধান ভৃত্য বনমালী প্রবেশ করিল। মশারিটার কাছে আগাইয়া গিয়া কি চিন্তা করিয়া চুপ করিয়া রহিল। আলো এখন বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। বনমালী সবগুলি জানালা খুলিয়া দিল। কিছুকাল অপেক্ষা করিবার পর :]

বনমালী। বাবু! [মশারিটা একটু নড়িয়া উঠিল] বাবু! [ঘুমভাঙা অর্দ্ধেন্দু চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে মশারিটির ভিতর হইতে বাহির হইল। অর্দ্ধেন্দু সুপুরুষ; বয়স আন্দাজ সাতাশ। চুলগুলি এলোমেলা হইয়া কপালে আসিয়া পড়িয়াছে। চোখ দুটি নিদ্রালসে স্তিমিত থাকিলে, দীর্ঘ মনে হয়। ঠোঁট দুটি সুকুমার—চেহারাটা একটু লাজুক গোছের তাহা চোখে দেখিলেই সন্দেহ হইতে পারে কিন্তু ঠোঁট ও চিবুক দেখিলে বেশ বুঝা যায়। মৃদু হাই তুলিয়া তুড়ি দিতে দিতে জিজ্ঞাসু-চোখে ভৃত্যের প্রতি তাকাইল। বনমালী এদিকে মশারিটা তুলিয়া ফেলিয়াছে। তখন দেখা গেল অর্দ্ধেন্দু একটা ইজিচেয়ারে ঘুমাইয়াছিল]

বনমালী

বাবু! আরো তিনবাবু এইমাত্র এয়েছেন; ঐ যে যারা দু'হপ্তা আগে মাসখানেক থেকে চলে গিয়েছিল।

অর্দ্ধেন্দু

[উদাস-ভাবে] হু'।

বনমালী

ইষ্টিশনে তাদের গাঁয়ের আরো নাকি পাঁচ জন রয়েছে তারাও নাকি এ-বাড়িতেই এসে উঠবে। বাবু জায়গা হবে কোথায়? বাড়ি আপনার হোটেল হয়ে উঠ্‌ল বাবু।

অর্দ্ধেন্দু

কাল যে বুড়া বাবুদের যাবার কথা ছিল তাঁরা যান্‌নি।

বনমালী

না:। তাদের মকদ্দমার তারিখ পড়েছে। আরো দিন সাতেক তারা থাক্‌বেন বল্লেন। [অর্দ্ধেন্দু দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল]

অর্দ্ধেন্দু

আর ঐ আমার পিসির খুড়ার শ্বশুরের শালার শ্বশুর; তার তো যাবার কথা ছিল কাল ভোরেই। তার বিছ্‌নাটাতো খালি আছে।

বনমালী

না তার যাওয়া হ'লো না। তার বাতের ব্যামোটা হঠাৎ বেড়ে যাওয়াতে আরো কিছুদিন থেকে চিকিৎসা করাবেন মনে করেছেন। আপনাকে ডাক্তার আন্‌তে বলবার জন্য বলে দিলেন। কাল কবিরাজের টাকা আমাদের তহবিল থেকেই নিয়েছেন। [অর্দ্ধেন্দু ঢোক গিলিল]

অর্দ্ধেন্দু

আর ঐ বাবার বন্ধুর ভাগের নাত্‌-জামাই?

বনমালী

তিনি কোকো আর ডিমের পোচ্ হুকুম দিয়েছেন। কাল রাত্তে বলে গিছলেন খিচুড়ী খাবেন। ব্রজঠাকুর কাট্‌লেট্ করতে ভুলে গিছ্‌ল বলে খিচুড়ীর থালা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

অর্দ্ধেন্দু

হুঁ।

বনমালী

কিন্তু বাবু ঐ যে আপনার দিদিমাদের দেশ থেকে বুড়ো বাবু এসেচেন তাকে নিয়ে মহামুস্কিলে পড়েছি। দৈনিক এক সের করে ছাগলের দুধ না হ'লে তিনি তো চটে মটে আগুন,—কিন্তু এদিকে ছাগলের দুধ তো আমি জোগাড়ই করতে পারি না। বাবু আপনিই বলুন তো সে কি আমার দোষ,—গয়লা ব্যাটারাও এমন হয়েছে কোনো ব্যাটা যদি ছাগলের দুধ রাখে। নইলে আন্‌তে আমার আর কি আপত্তি,—পয়সা আপনার,—আপনার অতিথ্‌দের খাওয়াব তাতে আমার কি? [অর্দ্ধেন্দু বিব্রত ভাবে ঘাড় নাড়িল]

অর্দ্ধেন্দু

সবশুদ্ধ আজ ক'জন আছেন ওরা?

বনমালী

আজ্ঞে এদের নিয়ে পনেরো জন হলেন। আগের মাসের চেয়ে কিছু কমেছেন। আপনার কিন্তু বাবু সত্যি বলতে কি আমার বড় রাগ হয়। যত রাজ্যের যত লোক এসে মাস-মাস এখানে থেকে যাবে—তাও না আছে এদের একটু হুঁস-পবন, না আছে একটা কাণ্ডাকাণ্ডি জ্ঞান। রাগ কি সাধে হয় বাবু, এদের জ্বালায় নিজের শোবার ঘরেও আপনার জায়গা হ'লো না শেষে চেয়ারে শুয়ে আপনাকে রাত কাটাতে হয়। আমি হলে কিন্তু বাবু শক্ত হতুম—যে সে এসে আমার বাড়ীতে হোটেল বসাবেন সে আমি ঘটতে দিতাম না—হুঁ। আমি হ'লে—

অর্দ্ধেন্দু

আহা কি বল বনমালী! এঁরা সব আসেন, এঁদের তো আর চলে যেতে বা না আসতে বলতে পারব না। চুপ কর, এ সব শুনলেই ওরাই বা কি মনে করবেন। [একটু চুপ] ওদের ভোরের খাবার ব্যবস্থা ট্যাবস্থা কি করেচ?

বনমালী

তা আজ্ঞে সব প্রস্তুত হচ্চে। মন্টু বাবু খাবেন কোকো আর ডিমের পোচ; মুকুন্দবাবু চা আর টোষ্ট আর ডিম সেদ্ধ; অনুকূল বাবু খাবেন চিড়ে দৈ। অখিল বাবু হুকুম করেন, তিনি ছোলা সেদ্ধ, মাখন আর পেস্তার সরবত করতে বলেছেন। কুন্থু বাবুর শুধু এক পেয়ালা দুধ মিস্রি দিয়ে। বিভূতি বাবুর চাই চিড়ে ভাজা আর নারকোল কোরা। আর কারুর জন্য লুচি আর ডাল্‌না, না হয় পরোটা আর অমৃতি এই সব। তাছাড়া বুড়ো বাবুদের জন্য তামাক আন্‌তে হবে। গঙ্গা বাবু খান মিঠে, যোগেশ বাবু খান কড়া। মন্টু বাবুর চাই কাঁচি চুরুট; কুন্থু বাবুর বিড়ি। আর বিশু বাবু—[ঘরের দরজাটা অকস্মাৎ খুলিয়া গেল। এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক এক ক্যাম্বিসের ব্যাগ ও ছাতা বগলে উপস্থিত হইলেন। দাড়ি গোঁফে মুখ আচ্ছন্ন, যেমন কালো তেমনি মোটা। জুতোটাতে যত রাজ্যের ধুলো কাদা লাগিয়া আছে। তিনি ময়লা ব্যাগটা ও ছাতাটা সেক্রেটারিয়েট টেবিলের উপরে অনায়াসে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া তীক্ষ্ণ গর্ব্বিত দৃষ্টিতে ঝাঁটার মত একবার অর্দ্ধেন্দুর পানে চোখ বুলাইয়া আশ্চর্য্যান্বিত অর্দ্ধেন্দুর প্রতি রুক্ষস্বরে]

আগন্তুক

বলি প্রণাম করতে পার না? দু-পাতা ইংরেজি শিখে সে জ্ঞানও হারিয়েছ নাকি?

অর্দ্ধেন্দু

[বিব্রত-ভাবে] আপনাকে কিন্তু চিন্‌তে পারছি না ত।

আগন্তুক

চিন্‌তে পারছ না তো হয়েছে কি? হামেশাই কি আর আমি তোমার বাড়ী আসি যে চিনতে পারবে? চেনে নয়নপুরের লোক—নায়েব মশাইর নাম শুনলে ছেলে বুড়ো ভয়ে কাঁপতে থাকে। আগে নমস্কার কর,—তারপর পরিচয় দিচ্ছি।

অর্দ্ধেন্দু

[দ্বিধা না করিয়া] আজ্ঞে—

আগন্তুক

কি, প্রণাম করতে তোমার মান ক্ষয় হয়? গোপেশ্বর ভট্টচাজের পদধূলির জন্য নয়নপুরে কাড়াকাড়ি পড়ে যায় আর তুমি কোথাকার কোন্ নবাবপুত্র যে গুরুজনকে একটা প্রণাম করতে তোমার অপমান লাগে। চল্লুম তবে,—এখানে আর এক মুহূর্ত্ত নয়। নিতান্ত আত্মীয়পুত্রের বাড়ী বলেই এসেছিলাম, নয়ত কলকাতা সহরে কত গণ্ডা লাখোপতি গোপেশ্বর ভট্টচাকে বাড়ী নেবার জন্য লালাচ্ছে তার ঠিক নাই! শোনো মূর্খ, আমি তোমার বাবার সাক্ষাৎ কাকার মাসতুত ভাইয়ের সাক্ষাৎ কাকার শ্বশুর। [ব্যাগ ও ছাতা উঠাইয়া দ্বারের দিকে হন-হন করিয়া হাঁটিয়া চলিয়া গেল। তারপর সহসা ফিরিয়া] কেমন যাবো চলে? থাকতেও বলবে না?

অর্দ্ধেন্দু

আপনি দয়া করে থাকলে তো অত্যন্ত খুসী হবো, আর কি বলতে পারি? [প্রৌঢ় তখন ফিরিয়া আসিল। একটু দ্বিধা করিয়া অর্দ্ধেন্দু একটা প্রণাম করিয়া ফেলিল]

গোপেশ্বর

দীর্ঘজীবি হও বাছা। এই তো সুবুদ্ধি ফিরে এসেচে। গুরুজন দেবতার মতো,—দেবতাকে নমস্কার না করেও গুরুজনকে শ্রদ্ধা করলেও স্বর্গপথ অক্ষয়। [বনমালীর দিকে ফিরিয়া] ওহে শোনো, আমি কিন্তু ভাত খাই না,—লুচির ব্যবস্থা করো। বিশেষ কিছু করতে হবে না, লুচি, পাঁটার ঝোল, মাছের কোপ্তা, চাটনী আর রাবড়ি। আর এখন কিছুটা কাঁচা ছানা আর মিশ্রি হলেই হবে।

অর্দ্ধেন্দু

বনমালী, বাবুকে একটা ঘর দেখিয়ে দাও।

[তাহাদের প্রস্থান]

[অর্দ্ধেন্দু একটা টুথ্-ব্রাসে পেষ্ট মাখিয়া দাঁতন করিতে লাগিল। এমন সময় আর একজন চাকর আসিয়া খবরের কাগজ দিয়া গেল। অর্দ্ধেন্দু সেটা খুলিয়া লইতেই একজন অতিথি ঘরে ঢুকিয়া—]

অতিথি

কী খবর লিখছে আজকে [আগাইয়া আসিয়া] দেখি দেখি। [এক হাত দিয়া কাগজটা কাছে আকর্ষণ করিয়া] উঃ ভারী জোর খবর। ঢাল নেই, তরোয়াল নেই ছোঁড়া-গুলির আস্পর্দ্ধা দেখ না, যাবে ইংরেজের সঙ্গে লড়তে; আর জব্দও হয় তেমনি,—দেখি ভাল করে। [কাগজ সম্পূর্ণ টানিয়া লইয়া চোখ বুলাইতে লাগিল। অর্দ্ধেন্দু নির্ব্বাক ভাবে দাঁত মাজিতে লাগিল] [সহসা চীৎকার করিয়া ডাকিয়া] কেমন মধুচন্দ্র, বলেছিলাম কিনা—যে নেপচুন থিয়েটারে আজ টোডরমল্ল হবে। বাজ বড় যে বাজী রেখেছিলে, দেখনা এখন চাঁদ তোমার—[বলিতে বলিতে কাগজ লইয়া সে অন্তর্হিত হইয়া গেল]

[মুখ ধুইবার জন্য অর্দ্ধেন্দু বাহির হইয়া গেল। মধু ঘরে প্রবেশ করিল। সিল্কের পাঞ্জাবী গায়, পায়ে চক্চকে পাম্প্। চুল বারো আনি, চার আনি ছাঁটা। সে আসিয়া ইজি চেয়ারটা দখল করিয়া টেবিলটার উপর পা তুলিয়া দিল এবং একটা সিগ্রেট ধরাইয়া গান ধরিল। তারপর গান থামাইয়া হাঁকিল, বনমালী, বনমালী]

মধু

[ডাকিয়া] বনমালী! বনমালী! ইডিয়টগুলির যদি একটু কাণ্ডজ্ঞান থাকে। আধ ঘণ্টা হ'লো কোকো আর পোচ্ অর্ডার করেচি এতক্ষণেও তার দেখা নেই। যত সব ই-রেস্পন্সএব্লদের আড্ডা হয়েছে এ জায়গাটা; টায়ার্ড হয়ে পড়েচি বাবা। বনমালী, ওহে বনমালী চন্দর [বনমালী প্রবেশ করিল] কিহে, দুপুরের আগে কি ভোরের খাবার তোমাদের বাড়ীতে পাওয়া যাবে না? এমন জায়গায় জন্মে—

বনমালী

আজ্ঞে আপ্নার ঘরে তো দিয়ে আসা হয়েছে।

মধু

কোথায়, ঐ ডান্কেনটাতে! ওখানে তোমার বাবুকে বসে খেতে ব'লো,—আমি বাপু ঐ ছোট ঘরেই খাওয়া শোওয়া চান করা সব সারতে পারব না। শোনো বাপু, ওগুলি এইখেনে নিয়ে এসো,

বনমালী

কিন্তু বাবু এটা পড়ার ঘর।

মধু

পড়ার ঘর তা জানি। সেটা আমাকে শেখাতে হবেনা। লাইব্রেরীর কথা তুমি আমাকে কি শেখাবে,—আমি যখন ইস্কুলে পড়তুম তখন আমাদের লাইব্রেরী ছিল, - দাঁড়িয়ে রইলে কেন? ঠাণ্ডা কোকো আমি খাইনে জান তো।

বনমালী

কিন্তু বাবু যে ওখানে এক্ষুনি পড়্‌তে আসবেন। পড়া-শোনার বিঘ্ন হ'লে ওর বড় রাগ হয়।

[চটিয়া] তোমার বাবু রাগ হবেন তো আমি সারা ভোরে নাই খেলাম আর কি। তার চেয়ে তোমার বাবু স্পষ্ট বলুন না কেন চলে যাই।

বনমালী

আহা সে কি একটা কথা হ'লো। তবে কিনা বাবু— পড়ার ঘর। এখানে কোনো দিন,—তা আপনি বলছেন এনে দিচ্ছি। [প্রস্থান] [একটু পরে অর্দ্ধেন্দুর প্রবেশ]

মধু

এই যে অর্দ্ধেন্দুবাবু গুড্‌ মর্ণিঙ্‌। কিন্তু মশায় আপনার চাকরগুলি হয়েছে এমনি বেয়াড়া যে আর কি বলব। চলুন ওহে,—হ্যাঁ ভালকথা আপনার লাইব্রেরীতে ভাল বই-টই মোটেই রাখেন না দেখতে পাচ্চি। কাল সারা দুপুরটা আলমারীগুলি হাতড়ে ফিরেছি একটা যদি ডিটেকটিভ্‌ উপন্যাস পেলাম। বড় সুন্দর লেখে ঐ তিনকড়ি ভৌমিক। 'রূপসীর গুপ্তকথা' পড়েছেন? [অর্দ্ধেন্দু ঘাড় নাড়িল] পড়্‌বেন, বেড়ে লিখেছে। [অর্দ্ধেন্দু একটা চেয়ারে বসিয়া টেবিলের উপর হইতে একটা বই টানিয়া পড়িতে সুরু করিল।]

মধু

আচ্ছা মশায় রোশ্‌নারাকে লাগে কেমন আপনার? রোশ্‌নাই করে কিনা? [অর্দ্ধেন্দু বিহ্বলের মত তাকাইয়া রহিল] কি রকম, রোশ্‌নারাকে চেনেন না না কি? এও বিশ্বাস করতে হ'বে? আর থাকেন কলকাতায়! একা রোশ্‌নারাই নেপ্‌চুন্‌ থিয়েটারকে রোশ্‌নাই ক'রে রেখেচে।

অর্দ্ধেন্দু

[বিব্রতভাবে] আজ্ঞে আমি থিয়েটারে যাইনা।

মধু

আর দেখলেন আপনার চাকরটার কাণ্ড। পাঁচ মিনিট হয়ে গেল খাবারগুলি এখানে আন্‌তে বলে দিলাম তো নবাবপুত্রের দেখাই—[বনমালী প্রবেশ করিল] কি হে আনতে পেরেচ? [বনমালীর হাত হইতে কোকো ও পোচ্‌ লইয়া মধু অর্দ্ধেন্দুর একটা দামী সুন্দর মলাটের বয়ের উপর সেগুলি রাখিয়া আহারে মনযোগ দিল। আড় চোখে একবার অর্দ্ধেন্দুর দিকে চাহিয়া বনমালীর প্রস্থান]

[বাহিরে খক্‌ করিয়া কাসি ফেলিবার একবার শব্দ হইল এবং তারপর চোখে রূপার ফ্রেমের চশমা আঁটিয়া থেলো হুকা টানিতে টানিতে যোগেশবাবুর প্রবেশ। বৃদ্ধ, এবং কদাকার দেখিতে। সে আসিয়া অর্দ্ধেন্দুর সম্মুখে একটা চেয়ার টানিয়া কহিল —]

যোগেশ

ওহে অর্দ্ধেন্দুবাবু, বাবা আজ রব্‌বার, খাওয়ার ব্যবস্থাটা একটু ভাল করে করো দেখিনি। সেই তো আগের রব্‌বার পোলাও মাংশ করেছিলে তারপর এক হপ্তা একটা, ভাল খাওয়াই হ'লোনা তেমন। ব্যাটারা মাংস করে প্রায়ই কিন্তু তারই সাথে চাট্টি করে পোলাও রঁাধ্‌বে সে বুদ্ধি পেটে নেই। আর পরশু মাংস তো আমার রীতিমত কম [বলিয়া হুকায় জোরে টান দিয়া দারুণ কাসিয়া উঠিল। তারপর থক্‌ করিয়া এক দলা কফ্‌ আনিয়া মেজেতে ফেলিল]

অর্দ্ধেন্দু

[শিহরিয়া উঠিয়া তারপর] আচ্ছা, বেশ তো। বনমালী শুনে যাও তো। [বনমালীর প্রবেশ] ওরা আজ পোলাও মাংস খাবেন তার ব্যবস্থা ক'রো।

বনমালী

অখিলবাবু নিরামিষ খাবেন বলেছেন। মুকুন্দবাবু শুধু ফলমূল দিয়ে একাদশী। গঙ্গাবাবু শুধু শুকতো দিয়ে ভাত, বিভূতিবাবু খাবেন শুধু দই আর সন্দেশ।

যোগেশ

তা ওরা ওসব খান্‌ গিয়ে আমার কি বলবার আছে?

কিন্তু আমি বাবু আজ পোলাও মাংস ছাড়া কিছু খাবনা। আর, হ্যাঁ দেখ বৌবাজার থেকে কিছু রাবড়ি দেখে নিয়ে এসো তো।

মন্টু

আর কিছু ডিমের চপ্।

যোগেশ

[হুকাটা টানিয়া দেখিয়া] উঁহু, আগুন নেই। [কলিকাটা সেক্রেটারিয়েট টেবিলটার উপর উপুড় করিয়া ছাই ফেলিয়া বনমালীর হাতে আগাইয়া দিল] নাও তো, আর এক ছিলুম সেজে আন। শীগ্‌গীর ক'রো বাপু। [বনমালীর প্রস্থান] তখন সেই দরজা দিয়ে প্রবেশ করিল বিভূতিবাবু। বাতের বেদনা পিঠে বলিয়া উপুড় হইয়া চলে প্রায়। সে আসিয়া একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া অর্দ্ধেন্দুর দিকে ক্রুদ্ধ চোখে চাহিয়া বলিল]

বিভূতি

বেশ, বেশ ভদ্রতা শিখেচ। কাল রাত থেকে আছি বাতের ব্যথায় পড়ে একবার দেখতে যেতে পারলে না,— খুব অতিথি সংকার শিখেচ যা হোক।

[বিব্রত ভাবে] আজ্ঞে আমি শুধু একটু আগে শুনলুম। তা কবিরাজের ওষুধটা লাগিয়েছেন তো।

বিভূতি

[চটিয়া] কিন্তু কেবল কব্‌রেজের চিকিৎসার উপরই ভরসা করে থাক্‌ব কেন,—আমার কি দুঃখটা পড়েচে? বিদেশ বিভূঁয়ে এসে পড়েচি বলে মরতে তো আসিনি। তোমারও যেমন আক্কেল বাপু যে এত বড় একটা গুরুতর ব্যাপার কথা শুনেও বই টেনে পড়তে বসেচ। কেন ক'লকাতা সহরে কি ডাক্তার নেই নাকি। পাঁচ সাতটা ডাক্তার কব্‌রেজ একত্র হ'লে তবেই না চিকিৎসা— [যোগেশের দিকে চাহিয়া] কেমন কিনা?

যোগেশ

তাতে আর সন্দেহ কি?

বিভূতি

তবে বলেন ত, অনাত্মীয়ের বাড়ী হ'লেই কি আমাকে কব্‌রেজের হাতে ছেড়ে দিয়েছে। নইলে একজনের চিকিৎসা করতে কত টাকাই আর ব্যয় হয়। [অর্দ্ধেন্দুর দিকে] এক গৃহাগত অতিথির জন্য যদি পাঁচ-সাতশো টাকা ব্যয় হয় তাতেই বা এমন কি।

মন্টু

[বিভূতিকে] কিন্তু আপনিই তো সার ঐ কব্‌রেজকে ডাকিয়েছিলেন।

বিভূতি

চুপ করো ডেঁপো ছোঁড়া! ডাকিয়েছিলাম তো কি হয়েছে। তার জন্য আমার প্রতি কারুর কোন কর্ত্তব্যই বুঝি আর থাক্‌বেনা। মহা জ্বালায় পড়েছি।

অর্দ্ধেন্দু

বনমালী! [বনমালীর প্রবেশ] আমাদের ডাক্তার বাবুকে খবর দিয়ে এসো তো। শীগ্‌গির করে আসতে বলবে।

মন্টু

[ব্যঙ্গ করিয়া] বলো অবস্থা খুব খারাপ।

বিভূতি

[চটিয়া] কি, আমার অবস্থা খারাপ! তোর অবস্থা খারাপ, যমের বাড়ি থেকে খাট এসেছে তোকে নিতে। মুখে বলতে একটু বাধ্‌ল না। কোথাকার নচ্ছার—

যোগেশ

[বাধা দিয়া] আহা চটেন কেন বিভূতিবাবু?

বিভূতি

চটি কেন? আশ্চর্য্য হলুম। এতে চট্‌ব না তো চট্‌ব কিসে? ছোঁড়া বলে কিনা আমার অবস্থা খারাপ। হ'তো যদি নিজের বাড়ি,—হুঁ। [হাস্যকর মুখভঙ্গী করিল] বলে কিনা আমার অবস্থা [সহসা বিকৃত মুখভঙ্গী করিয়া] উঃ মাগো, ব্যথাটা আবার চাড়া দিয়ে উঠ্‌ল, উঃ উঃ [বিভূতিবাবু চেয়ার হইতে উল্টাইয়া পড়িতেছিল, অর্দ্ধেন্দু, মন্টু, যোগেশ প্রভৃতি তাড়াতাড়ি আসিয়া ধরিয়া ফেলিল। তারপর বনমালীকে ডাকিয়া সকলে ধরাধরি করিয়া তাহাকে তাহার ঘরে লইয়া গেল]

[একটু পরে একটা খোলা টেলিগ্রাম হাতে করিয়া অর্দ্ধেন্দু প্রবেশ করিল। সঙ্গে আসিল বনমালী।]

বনমালী

কিসের টেলী বাবু?

অর্দ্ধেন্দু

[নিরুত্তরে কিছুকাল ভাবিয়া তারপর] আরো দুজনের জন্য খাওয়ার তৈরী রাখতে বলে এসো ঠাকুরকে।

বনমালী

[বিস্ময়ে] আরো দুজন?

অর্দ্ধেন্দু

এরা আমাদের খুব সম্ভ্রান্ত অতিথি বনমালী। বাবার পুরানো বন্ধু বিভাসবাবু বোম্বাই থেকে আসছেন কলকাতায়। সঙ্গে তাব মেয়ে আসছেন। আমাকে লিখেছেন একটা হোটেল ঠিক ক'রে রাখতে। কিন্তু সেটা ভালো দেখায় না,—তার চেয়ে বরঞ্চ এখানেই নিয়ে আসি।

বনমালী

কিন্তু থাকবার জায়গা?

অর্দ্ধেন্দু

সেটা করে নেওয়া যাবে। ছাদের উপরের ঘর দুটিতে খাট-টেবিল নিয়ে সাজিয়ে দাও। আলমারী খুলে গালচে বের করো। সিন্দুকের ভেতর থেকে রূপোর ফুলদানীগুলো। আর গদি-আঁটা ভাল দেখে কতগুলি চেয়ার। বেশ ভাল করে সাজিয়ে রাখো। আর দেখো এ-ঘরটাও গুছিয়ে রেখো একটু,—যা নোঙ্‌রা করছে তা বলবাব নয়। আমি ইষ্টিশানে চললুম তাদের আনতে। শোফারকে গাড়ি ঠিক করতে বলে দাও তো।

বনমালী

আজ্ঞে গাড়ি নিয়ে এতক্ষণ অতিথ্‌দের একদল কালিঘাটের গঙ্গায় চান্ করতে গেচে। বিভূতিবাবু ব'লে দিয়েছেন মাটী খানিকটা নিয়ে আসতে,—পিঠে মেখে বাত-বেদনা কমাবেন। গাড়িটার যে কি অবস্থা হবে ভগবানই জানেন।

হুঁ। যাক্ ট্যাক্সিকরেই যাবো এখন। [প্রস্থান]

[বনমালী ঘরটা গুছাইতেছিল এমন সময় মন্থু যোগেশ বাবু মুকুন্দ বাবু এবং অন্যান্য জন পাঁচেকের প্রবেশ।]

মুকুন্দবাবু

বেশ, এই উপযুক্ত ঘর হয়েছে। তবে যোগেন তোমা একটু উচ্চৈস্বরে পাঠ ক'রো,—তা বইখানার নাম বেশ, 'প্রেমের কাঠপিঁপড়া,—হেঁঃ হেঁঃ।

বনমালী

আজ্ঞে, আপনারা যদি অন্য ঘরে গিয়ে বসতেন তবে বড় সুবিধা হ'তো,—এঘরটা ঝেড়ে-পুছে একটু ঠিকঠাক করতাম,—একজন ভদ্রলোক আস্‌বেন

মুকুন্দ

কে হে তুমি ধৃষ্ট,—যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা। ভদ্রলোক আসবেন তো কি পিতৃনাম ভুলে যেতে হবেন নাকি! বলি আমরা কি ভদ্রলোক না

বনমালী

আজ্ঞে তাই কি আমি বলছি, আমি শুধু—

যোগেশ

তাই বলছ না তো বলছি কি। তাইতো বলছ।

মন্থু

আমাদের কি আব কান নেই' বলি কালা পেয়েছ আমাদের?

মুকুন্দ

[রাসভারী কণ্ঠে] আর কুত্রাপি নয়, এইস্থানে।— এইস্থানেই আমরা অবস্থান করব। তোমার বাবুর বাবা এসে সরায় কি ক'রে দেখি। যাও যাও এখন পথ দেখ। আর দেখ, আপেল যেন বেশী করে আনা হয়,—আজ শুধু ফলমূল খাবো। মনে আছে তো না সে এরই মধ্যে ভুলে মেরে দিয়েচ? [বনমালীর প্রস্থান]

যোগেশ

বেশ তাড়ান গেছে ব্যাটাকে। তবু শুনুন মুকুন্দবাবু,— হ্যাঁ হে মন্থু বলি কর্ত্তার কাছ থেকে আজ ঘৌড়দৌড়ের টিকিটের পয়সাটা আদায় করতে পারো? ছোঁড়া হাবা-গবা টাকা-পয়সা আদায় করতে সুবিধা [সকলে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।]

মুকুন্দ

বাবা, হাবা গবা না হ'লে আর এদ্দিন ধরে ঘাড়ে পদক্ষেপ করে দিব্য আনন্দে থাকা যাচ্ছে এখানে। হাড় মূর্খ। শাস্ত্রে আছে মূর্খদের নিপীড়ন করলে দোষ নেই।

কুমু

[বিড়ি ধরাইয়া] বিশেষত নিপীড়ন করলে যদি এ হেন রাজভোগ আসে দিনের পর দিন। মাছ-মাংস মিষ্টি ফল-মূল-এ দিব্যি রাজার হালে কাটান যাচ্ছে হিঃ হিঃ হিঃ। বাড়ি গিয়ে এখন আর ডাল ভাত মুখে রুচবে না। তাছাড়া দিব্যি বিড়ির পয়সা পাওয়া যাচ্ছে; চাইলেই পান আর দোক্তা পাওয়া যায় [সবাই হাসিয়া উঠিল]

মন্নু

এইবার মাইরি কিনা একে-একে দু-একজন করে সরা ভাল। শেষ কালে একদিন রেগে মেগে সব না মাটী করে দেয় সায়্। তারপর বদ্‌লে বদ্‌লে পরে এলেই চল্‌বে।

মুকুন্দ

তাই না তো বিভূতি-বুড়োকে বলেছিলুম কি। তার চোটেই হঠাৎ পিঠে তার বাতের রস গিয়ে দাঁড়াল। [সকলে আবার হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল]

একজন

তা আপনারা একটা রুটিন্ করে ফেল্লেই তো সব গোল চুকে যায়। এখন কে আগে যাবে কে পরে যাবে করেই না মারামারি। রুটিন করলে যাওয়া আর ফিরে আসার নিয়ম বাঁধা হয়ে যাবে। কেউ বেশী দিন বাইরে থাকবে না।

যোগেশ

এ প্রস্তাব মন্দ নয়। সব কিছুই সইয়ে সইয়ে করা ভাল। বেশী টানাটানি করলে ছোঁড়ার মতি যদি বিগড়ে যায় তবে এ-কূল ও-কূল দু-কূলই যাবে। তার চেয়ে মোকদ্দমার যদি কদিন পরে পরে দিন পরে তবে আপত্তি হতেই পারে না। [হাসি]

মন্নু

বেশ আজই একটা রুটিন করা যাবে না হয়। মোদ্দা পোলাও মাংসটা আগে খাওয়া যাক্

যোগেশ

আর টোডর মল্লের টিকিটের টাকাটা যদি পারো।

মন্নু

দেখ্‌বো।

একজন

চলুন আগে স্নান টান সারা যাক গিয়ে। রসুই ঘর থেকে মাংসের গন্ধ আস্‌ছে চমৎকার। পড়া এখন থাক্।

যোগেশ

তা ঠিক, আজ বাপু আমি ফার্ষ্ট বাচ্-এ। সেদিন আমার কম পড়ে গিছ্‌ল। নাও ওঠো এখন [সকলে উঠিয়া পড়িয়া] প্রেমের কাঠপিপ্‌ড়াটা না হয় স্নানের পরে পড়া যাবে।

একজন

[যাইতে যাইতে] তা যাই বলুন অর্দ্ধেন্দু ছোঁড়ার কল্যাণে স্বাস্থ্যটা ভালো হয়ে যাচ্ছে। [সকলে হাসিয়া উঠিবা প্রায় ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল এমন সময় অন্য দুয়ার দিয়া বিভাসবাবু সুনীতা ও অর্দ্ধেন্দু প্রবেশ করিল।]

সুনীতা

[আশ্চর্য্য হইয়া অর্দ্ধেন্দুকে] এরা সব কারা?

অর্দ্ধেন্দু

আমার অতিথি।

সুনীতা

আজ কি গঙ্গা চান টান কিছু আছে নাকি?

না ওরা নিত্য নৈমিত্তিক অতিথি; প্রায়ই ওরা এখানে থাকেন। গঙ্গা স্নান টান বিশেষ কিছু করেন না অমনি শুয়ে বসে কাটান্।

বিভাস

তোমার আত্মীয় স্বজন্ বোধ হয় এরা?

অর্দ্ধেন্দু

ঠিক জানিনা।

সুনীতা

জানেন না। তবে এরা এখানে এলেন কি করে?

এরা যে দলে বেশ পুষ্ট আছে দেখতে পাচ্চি, জন দশেক হবে।

অর্দ্ধেন্দু

আরো জন নয়েক অন্যত্র আছেন। তবে এরা এখানে এলেন কি করে বলতে পারি না। বাবার সঙ্গে হয়ত পরিচয় ছিল, সেই সূত্রেই এখানে ওঠেন।

বিভাস

তবে শুধু এখানে আমাদের টেনে মিছে মিছি তোমার হাঙ্গামা বাড়ালে কেন বাবা। দিব্যি তো এক হোটেলে গিয়ে উঠ্‌তে পারতুম,—আর ভাল সব হোটেল হয়েছে এখন শুনেছি।

অর্দ্ধেন্দু

আপনি বলেন কি? আমার বাড়ি থাকতে আপনাকে হোটেলে উঠ্‌তে দেব! তবে ভয় হচ্চে আমার। বাড়ির এই হোটেলে আপনাদের অসুবিধা না হয় [বাহিরে শব্দ]

সুনীতা

[হাসিয়া] আমাদের অসুবিধে না হয়েই পারে না। এখন আপনার ধর্ম্মশালা,—আমরা যাত্রী এসেচি। তবে একটা খাটিয়া যদি পাওয়া যায় তবে আর কথা নেই,—রাত্রি কাটিয়ে পরদিন আবার ট্রেণ ধরব।

অর্দ্ধেন্দু

আপনি অতটা শঙ্কিত হবেন না। আপনাদের জন্য ছাতে দু-টো ঘর ঠিক আছে,—আর যদিও খাটিয়া নেই তবে খাটের যোগাড় করব বলেছিলুম।

বিভাস

[হাসিয়া] তবে তোমার অতিথদের ভেতর পড়ে একেবারে মাঠে মারা যাব না দেখ্‌তে পাচ্চি। কিন্তু— [বনমালীর প্রবেশ]

বনমালী

আজ্ঞে খাবার ঠিক হয়েছে।

অর্দ্ধেন্দু

চলুন

বিভাস

খাবার? খাবার কে খাবে এখন। আমাদের ভোরের খাওয়া তো গাড়িতেই সারা গেছে। [সুনীতার প্রতি] খাবি তুই সুনীতা?

সুনীতা

উঁহু। গঙ্গাস্নান করব। হ্যাঁ, অর্দ্ধেন্দুবাবু, পাঁজি টাজি আছে আপনাদের বাড়ীতে। দেখুন না আজ কোনো পুণ্য তিথি টিথি একটা খুঁজে পাওয়া যায় না কি। [হঠাৎ প্রবল শব্দ শুনিয়া] ওঃ কিসের শব্দ?

বিভাস

কি হে অর্দ্ধেন্দু, মহাতব খাঁ কি তোমার দুর্গ আক্রমণ করল না কি?

অর্দ্ধেন্দু

আজ্ঞে আমার অতিথ্‌রা সব স্নানের উদ্যোগ করছেন।

সুনীতা

তবে এসো না বাবা আমরাও চীৎকার করে স্নানের উদ্যোগ করি,—আমরাও তো অতিথ্‌!

অর্দ্ধেন্দু

আপনারা একটু বসুন,—আমি ওদের একটু দেখে আস্‌ছি। ওদের অভিমান বড্ড,—দেখা শুনা সব সময় না করলে রেগে যান বড়ো। ওরা ভাবেন আমি ওদের যথেষ্ট আদর করিনে [প্রস্থান]

সুনীতা

[বনমালীকে] এটা তো পড়ার ঘর দেখতে পাচ্ছি; কিন্তু এ কোণায় ঐ মশারিটাই বা টাঙ্গানো কেন? [বিভাসবাবু খবরের কাগজ তুলিয়া পড়িতে লাগিলেন]

বনমালী

আজ্ঞে বড্ড মশা,—রাত্তিরে মশারী না টাঙ্গালে কামড়ায় বড়।

সুনীতা

মশারী টাঙিয়ে পড়া-শোনা করেন বুঝি তোমাদের বাবু?

বনমালী

আজ্ঞে না, এইখানেই ঘুমোন্‌। বাড়ি ভরা সব অতিথি,—বাবুর শোবার ঘরও তাদের কৃপায় খালি নেই। আর

অতিথিরা দিদিমণি আজও আছে কাল আছে, নড়েনও না সরেনও না। বাবুর খুবই কষ্ট হয় কিন্তু এমনি দেবতার মত মানুষ যে বাড়ি কেউ এলে তার একটু অযত্ন—অবহেলা অসুবিধে ঘটতে দেন্ না।

সুনীতা

এরা বুঝি অনেক দিন ধরে আছেন?

বনমালী

অধিকাংশ। এই তো যোগেশবাবু আছেন তিন মাস। বিভূতিবাবু মাস চারেক। মন্মথবাবু সাড়ে তিন চার। তারপর আছেন অখিলবাবু, নন্দবাবু, অনুকূলবাবু এরা সব বছরের অধিকাংশ সময় এখানেই থাকেন। আর যারা এক সঙ্গে বেশী দিন থাকেন না তারা ঘুরে ঘুরেই আসেন, যান্।

সুনীতা

এরা বুঝি চাক্‌রির খোঁজে আসেন।

বনমালী

কেউ বলেন মোকর্দ্দমা করতে, কেউ বলেন চিকিচ্ছে করাতে, কেউ বা চাকরীর খোঁজে। তবে সত্যি বল্‌তে দিদিমণি কাউকেই কিছু করতে দেখিনি। দাদাবাবু সারা দুপুর অফিসে খেটে মরেন আর এরা সব দিব্যি তাসা পাশা, খাবা আর ঘুমিয়ে আরাম করেন।

সুনীতা

আর কোনো আপত্তি করেন না তোমাদের বাবু?

বনমালী

আজ্ঞে দিদিমণি তবে আর বলচি কি। বাবু মহাদেব কিছুতেই তাঁর আপত্তি নেই! কিন্তু দিদিমণি, আমার রাগ হয় ভারি। মাসের পর মাস এরা আল্‌সেমী ক'রে বাবুর ঘাড়ে ভর করে কাটাবে তা আমার কাছে অসহ্য মনে হয়। কিন্তু বাবুর কাছে কিছুতো বলবার জো নেই। বলেন এরা এলে যেতে বল্‌তে পারিনে তো। অথচ দিদিমণি আমি শুনেচি ওরা সব বাবুকে বোকা বলে' আড়ালে ঠাট্টা করে। কেননা, ওদের বসিয়ে আরাম্ করিয়ে খাওয়াচ্ছে। [সুনীতা ভাবিতে লাগিল] আর এদের দৌরাত্যির কি শেষ আছে দিদিমণি। পান-দোক্তা, চুরুট, তামাক, বিড়ি, লেমনেড্ সোডা, বরফ। কারুর দৈ-সন্দেশ। কারুর পোলাও মাংস। কারুর মুড়ো-ঝোল। কারুর চাই পাঁপড় ভাজা, কারুর পলতা ভাজা। কারুর লুচি, কারুর পুরী, কারুর গরুর দুধ, কারুর ছাগলের দুধ,—ফরমাস যুগিয়ে আর পারিনে দিদিমণি। অথচ এক মিনিট দেরী হ'লে আর রক্ষে নেই, যেন ওরা সব—

সুনীতা

[বিভাসকে] বাবা শুন্‌চো [বিভাস ফিরিয়া তাকাইলেন] অর্দ্ধেন্দু বাবুর অতিথিদের সম্বন্ধে যা আমরা শুনেছিলাম সবই একেবারে ঠিক। [বনমালীকে দেখাইয়া] এই তো এর কাছ থেকে সব খবর শুনে নিলুম। ভদ্রলোকের ওপর এদের দৌরাত্ম্যের আর সীমা পরিসীমা নেই।

বিভাস

বেশী ভালো মানুষ হ'লে অমনি সকলে তাকে পেয়ে বসে। আমাদের দেশের লোকগুলিই এমনি যে লোকের উদারতার সুযোগ নিয়ে তার উপর অত্যাচারের ভার চাপাতে কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করে না।

সুনীতা

কিন্তু এ আমার সহ্য হয় না। এর একটা প্রতিবিধান না ক'রে এখান থেকে আমি কিছুতেই যাব না। অম্‌নি কতগুলো লোফার বসে বসে দিনের পর দিন একজনের অন্ন-ধ্বংস করবে,—তার শোবার জায়গাটুকু পর্য্যন্ত রাখবে না—শুনলে আমার গা জ্বালা ক'রে ওঠে। আর এদের কি রকম সব ফাই-ফরমাস, তুমি যদি সব শুনতে আশ্চর্য্য হয়ে যেতে। যেন সব লাট সাহেব পোলাও, মাংস, দৈ-সন্দেশ, চপ্-কাট্‌লেট, লেমনেড-সোডা হুকুম করা মাত্র না পেলে বাবুরা রেগে লাল।

বিভাস

কিন্তু যার বাড়ী তারই যখন আপত্তি নেই তখন—

সুনীতা

তার আপত্তি নাই থাক্‌ল কিন্তু আমি বলুম এর একটা কিছু উপায় না করে আমি এ-বাড়ী থেকে নড়ব না কিছুতেই। আর কী অকৃতজ্ঞ লোকগুলো, ওঁর আতিথেয়তার ওপর জুলুম করে তাবে বোকা পেয়ে তারা ঠকাচ্ছে ওকে।

বনমালী

দিদিমণি আপনি এর একটা ব্যবস্থা করে দিন,—এ আর সহ্য হয় না।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

[প্রকাণ্ড বড় একটা ঘর। সমস্ত ঘর তক্তপোষে ভরা; তাতে এক একজনের বিছানা পাতা রহিয়াছে। মেঝেতে সতরঞ্চি পাতিয়াও কতগুলি বিছানা রচনা হইয়াছে। বড় বড় ছবিগুলির উপর কাহারও-কাহারও কাপড়-জামা ঝুলিতেছে। এখানে-ওখানে ময়লা ছেঁড়া জুতার ছড়াছড়ি। কোথাও তামাকের ছাই পড়িয়া আছে, কোথাও থুথু। ভাল ভাল কতগুলি চেয়ারে তামাক, টিকে প্রভৃতি বিরাজমান।

এই ঘরেতে এখানে ওখানে বিছানায় মেঝেতে বসিয়া আছে যোগেশ, মনু, মুকুন্দ, নন্দবাবু, মন্তু, টুনু, অখিল ইত্যাদি। পট উঠিলেই দেখা গেল তাহারা ভারী উত্তেজিত অবস্থায়।)

মুকুন্দ

কোথাকার কে উড়ে এসে জুড়ে বসে রাজত্ব সুরু করলেন। তাব প্রতাপ দেখ না,—দুদ্দণ্ড প্রতাপ।

যোগেশ

অথচ আমরা যা নিজেরা তাই,—বাপকে নিয়ে তো ছুঁড়ি এখানে গিল্‌তে এসেচে—নয়ত কি?

মন্তু

এ যেন হ'লো সার্ পরের ধনে পোদ্দারি,—বেশ মজা বাবা।

নন্দবাবু

কথায় বলে যার বিয়ে তার মনে নাই পাড়া-পড়সীর ঘুম নাই। এও যে তাই হ'লো।

অখিল

আজ তিন দিন ধরে পেস্তার সরবৎ পাওয়া যাচ্ছে না,—আর শালার ঐ চাকর হয়েছে যেমন বদমাস্। বল্লেই জোড় হাত,—আজ্ঞে,—দিদিমণির কাছে বলব। দিদিমণির কাছে বলবে তো আপ্যায়িত হয়ে গেলাম আর কি! কি কাণ্ড দেখুন তো মশার পেস্তার সরবত না খেয়ে মারা গেলুম যে!

মনু

টায়ার্ড হয়ে পড়ছি দাদা। দু-দিন ধরে কোকো আর পোচের দেখা নেই,—কতগুলি রুটি আর হালুয়া,—ব্যাটাকে বল্লুম, পাঁচটা ডিমের পোচ, ওতে আর এমন কি খরচ লাগে,—কেপ্‌টামো করোনা। সব কথাই দিদিমণিকে বলবে। আর উড়ে আসা দিদিমণিটা এমনি হাড়-কঞ্জুষ,—হাত দিয়ে একটা ডিম গলে যদি। না খেয়ে না খেয়ে রোগা ইঁদুরটি হয়ে যাচ্ছি।

যোগেশ

আর বলো না ভায়া। কোথায় গেল ভোরের লুচি ডাল্‌না আর অমৃত্তি আর কোথাই বা গেল বৌ-বাজারের রাবড়ি। আর দুপুরে খেতে বসে কান্না পায় ভাই, মিছে বল্‌ছিনা কান্নাই পায়। আজ পাঁচ দিন ধরে মাংস খাই না,—আর চার রকমের মাছের জায়গায় দাঁড়িয়েছে এক রকম। তাও যদি এক টুকরোর বেশী পাওয়া যায়,- বলি সুখের আর রৈল কি।

একজন

স্বাস্থ্য টেকা ভার।

মুকুন্দ

আর ডাইনী মাগীর হুকুমে তিন ঘরের লোক আমাদের জড়ো করেছে এনে এক ঘরে,—যোগেশ বাবুর নাক ডাকের চোটে রাতে না পারি ঘুমোতে—আর তোমার অখিলের শরীর মর্দ্দানোর চোটে কাক ডাকার আগেই লাফিয়ে উঠতে হয়—জীবন অতিষ্ঠ ক'রে তুলেছে।

টুনু

এদিকে পাঁচ দিন থেকে বিড়ির পয়সা বন্ধ।

মন্তু

আর কাঁচির।

যোগেশ

আর তোমার যা আসে তাতে [কাসিয়া উঠিয়া মেঝেতে কফ ফেলিয়া] এক ছিলুম সাজা ভার।

অখিল

যোদ্দা ঐ ব্যাটা চাকরটা, আজ যদি পেস্তার সরবত না আনে তবে আর কথা নেই,—নাকের উপর বিরাশি শিক্কার

একখানা [ইঙ্গিতে ঘুষি বুঝাইয়া দিল] তারপর জেলে যেতে হয় সেও হাঁ আচ্ছা।

মুকুন্দ

চাকরের আর দোষ কি,—এ-সব ঐ মিটমিটে ভান ছুঁড়ির কারসাজী। কর্ত্তার আমাদের বয়স কাঁচা কিনা, ধিঙ্গী বিবি দিয়েছে মাথা ঘুরিয়ে। এখন ভাঁড়ার এসেছে ওর হাতে', বাড়ির তিনি কর্ত্রী হয়ে উঠেছেন।

যোগেশ

আর কর্ত্তার খুঁজে তো দেখাই পাওয়া যায় না,—দেখা হ'লে না হয় সব বলতে পারতাম। কদিন ধরে খাওয়াটা মোটেই যুতসই হচ্চে না,—বল্লে হয়ত পোলাও মাংস একদিন করতে পারত।

মন্থু

আর করতে পারত। তেমন উপন্যাস টুপান্যাশ পড়েন নি তো নইলে দেখতেন কি করে মেয়েমানুষগুলি পুরুষকে বোকা বানিয়ে দেয়।

টুনু

কামরূপে ভেড়া বানায় যেমন। আচ্ছা ভেড়া বানিয়ে শেষে তার মাংস খায় নাকি ওখানে?

মুকুন্দ

মোটকথা এ অবস্থা আর সহ্য করা যায় না। আমি চুপ করে একটা সেদি নক্কার ছুঁড়ির কাছে হার মান্‌ব এ হেন ব্যক্তি আমি বটি না। এর একটা বিহিত না করলে নাম আমার মুকুন্দ বাড়ুয্যেই নয়

মন্থু

টাম্বার্ড হয়ে পড়ছি দাদা

একজন

স্বাস্থ্যও ক্রমেই খারাপ হচ্চে।

যোগেশ

তেমন যুতসই একটা খাওয়াই হচ্চেনা। না হচ্ছে মাংস, না হয় পোলাও। [দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া] আর রাবড়ী! বলছে কি ভায়া রাবড়ীটা আমি বড্ড ভালো বাসি।

টুনু

কিন্তু কষ্ট হচ্চে বড় বিড়ি না খেয়ে। আজ পাঁচ পাঁচ দিন বিড়ি টানি না,—মুখের কথা নয়।

মুকুন্দ

অতএব বিহিত একটা করতেই হবে।

যোগেশ

অবশ্য। কিন্তু কথা হচ্চে [উপুড় হইয়া বিভূতিবাবুর প্রবেশ। ঘরে ঢুকিয়া চারদিক চাহিয়া সে যখন দেখিল যে সবাই মিত্র-শ্রেণীর তখন আগাইয়া দাঁড়াইল] এই যে আসুন বিভূতিবাবু। আমরা বলছিলাম কি না যে এমত অবস্থা তো আর সহ্য হয় না। অদ্ধেন্দুর পিতৃ-বন্ধুর এই লক্ষীছাড়ী মেয়েটার দৌরাত্ম্যে যে টেকা ভার হ'লো।

বিভূতি

[চটিয়া] তোমরা যেমন কাপুরুষ তেমনি সহ্য করচ এই অপব্যবহার। কেন হাতে কি তোমাদের জোর নেই নাকি, গলাতে শব্দ লোপ পেয়েছে নাকি? টেবিল ভাঙ্গ, চেয়ার ভাঙ্গ, বাতির বাল্‌ব্ ফাটাও, চীৎকার করে একটা দক্ষযজ্ঞ বাধিয়ে দাও। চাকরটাকে পিটাও, হতচ্ছাড়ী ছুঁড়িটাকে গাল দাও,—দেখ্‌বে সব গোলমাল চুকে যাবে যেমন ছিলে আবার দিব্যি তেমনি আরাম ক'রে থাকা যাবে।

মন্থু

কিন্তু আর শেষকালে কর্ত্তাবাবু যদি চটেমটে বেরিয়ে যেতে বলে দাদা তখন কি হবে মশায়।

বিভূতি

[ভেঙচাইয়া] বেরিয়ে যেতে বল্লেই হ'লো। আমরা যেন আইন জানিনা,—নোটিশ দিক্ আগে এক মাসের তবে তো উঠ্‌ব। আর তাইবা ধর, কেন,—আদালতে মোকদ্দমা টেনে ছাড়ব। এই বাড়িতে এদ্দিন ধরে আছি,—থাকার আমাদের একটা অধিকার হয়ে গেছে,—

মন্থু

ওসব মশায় চালাকি চল্‌বে না। পুলিশ ডেকে ঠেঙ্গিয়ে তাড়াবে,—তারা সত্য বাতও বুঝ্‌বেনা মিথ্যে বাতও বুঝ্‌বেনা।

বিভূতি

মিথ্যে বাত কি রকম। হতচ্ছাড়া, তুমি আমার ব্যাধির উপর ইঙ্গিত করো। লজ্জা করেনা? বাত-বেদনায় এদিক ওদিক হ'তে পারিনা আর একটা অর্ব্বাচীন এসে বলবেন আমার বাত মিথ্যে। বলি, এখানে থাকার জন্য আমি তোদের মত কেয়ার করি না কি যে মিথ্যে ছল ক'রে আঁক্‌ড়ে থাক্‌ব? পাজী, শূয়াব,—

যোগেশ

আহা রাগেন কেন, বিভূতিবাবু। ওকি তাই বলেছে? ও বলছে পুলিশ এসে সত্য মিথ্যে দুই—[কাশিয়া কফ ফেলিল]

বিভূতি

[বাধা দিয়া] রাগি কেন? ওকি বলতে চায় সে কি আমি বুঝি না,—আমি কি হাবা, আমার মগজে কি অতটুকু বুদ্ধি নেই? আমি [সহসা মুখ বিকৃত করিয়া বেদনার অভিনয় করিয়া] উঃ মাগো [চেয়ার উল্টাইয়া পড়িতে যাইতেছিল, দু-একজন ধরিয়া ফেলিল। ধরাধরি করিয়া তাহার ঘরে লইয়া গেল। এমন সময় অন্য দরজা দিয়া প্রবেশ করিল গোপেশ্বর ভট্‌চায্‌]

গোপেশ্বর

[রাগিয়া] বাড়িটা এখন কার মশায় শুনি? এটার কি মালিক বদলে গেছে? বলি চন্দ্রকান্তবাবুর পুত্রের বাড়ি কি আর নয় এটা? নইলে কোথাকার এক নির্লজ্জ এসে যাচ্ছে-তাই ক'রে বেড়াচ্ছে মশায়?

যোগেশ

ব্যাপার যেন তাই মনে হচ্চে। মশায়ে না খেয়ে না খেয়ে—

গোপেশ্বর

ভাত খাইনা বলে লুচির ব্যবস্থা করতে বলেছিলুম, আর এই চারদিন ধরে তার বদলে আসচে কিনা মশায় আটার রুটী। শুক্‌তলির মত শক্ত,—দাঁত দিয়ে টেনে ছেঁড়া যায় না। শুনি আমি কি ঘোড়া যে রুটী চিবিয়ে জীবন ধারণ করব? বলুন তো মশায় কাণ্ড?

মুকুন্দ

তবে আর বলচি কি এতক্ষণ মশায়। রাজভোগ এসে ঠেকেচে কুলীর খাওয়ায়,—এবার কোন্ দিন না বলে বসে, ছাতু নয়ত উপোস।

গোপেশ্বর

বল্‌লেই হ'লো আর কি। মূর্খের দেখা পাইনা, নয়ত শুনিয়ে দিয়ে আসতাম গোপেশ্বর ভট্‌চায নিতান্ত আপনার লোক বলেই দয়া ক'রে এস্থানে উঠেছিল নইলে কলকাতা সহরে যাঁকে যাঁকে লাথোপতি তাকে বাড়ি নেবার জন্য লালাচ্ছে।

যোগেশ

আর তিন দিন দেখি। তারপর খাওয়া দাওয়ার উন্নতি যদি না হয় তবে বাড়িই ফিরে যাব। এ হেন খেয়ে বিদেশে থাকা আর পোষায় না।

টুনু

ডিমের পোচের আর আশা নেই।

মনু

আর বিড়ির

অখিল

পেস্তার সরবত না পেয়ে মারা যাচ্চি।

মুকুন্দ

[দাঁড়াইয়া উঠিয়া] ভাই সব, আপনাদের কাছে একটা প্রস্তাব উপস্থাপিত করচি, মনযোগ দিয়া অবধান করুন্। অর্দ্ধেন্দুর পিতৃ-বন্ধুর পুত্রীর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের,—অতিথিদের,—সেবায় এ-বাড়ীতে এ-হেন অ-মন-যোগ অবহেলা, এবং ইচ্ছাকৃত অপমান হচ্চে যে এর একটা বিহিত না করলেই কোনো মতে চলে না। আমি আপনাদের ইহার প্রতিকারের জন্য আহ্বান করছি। ভাই সব, সঙ্ঘবদ্ধ কাজের দ্বারা পৃথিবীতে কিই না ঘটানো চলে,—এই তো রিশ্‌ড়ার কুলীরা সেদিন ধর্ম্মঘট ক'রে এক আনা করে মাইনে বাড়িয়ে নিয়েচে। অতএব আপনাদের আমি আহ্বান করছি আপনারা সঙ্ঘবদ্ধ হউন,—আসুন একসঙ্গে আমরা ধর্ম্মঘট ক'রে বলি যে আমাদের খাওয়া দাওয়ার যদি উন্নতি না হয়, যোগেশবাবুর পোলাও, মাংস, মনুর পোচ, অখিলের

পেস্তার সরবত, ইন্দুর বিড়ি, গোপেশ্বরবাবুর মুচি, আমাদের বরফ, লেমনেড, তবে আমরা এক-যোগে নিরম্বু উপবাস ক'রে এই স্থানেই পড়ে থাকবো। না খেয়ে এই স্থানেই আমরা দেহ ত্যাগ করব -

একজন

আজ্ঞে আমি নতুন বিয়ে করেচি।

মুকুন্দ

চুপ কর মূর্খ। দেহ ত্যাগ কি আমরাই করব? ও শুধু ভীতি প্রদর্শন। তারপর দেখা যাক্ কোথাকার জল কোথা গিয়ে দাঁড়ায়। এ অবস্থা আর সহ্য হয় না। তাইসব আমার প্রস্তাব আপনাদের সমুখে নিবেদন করলাম এখন এসম্বন্ধে আপনারা কি বলেন?

যোগেশ, গোপেশ্বর, মন্টু, টুনু, অখিল প্রভৃতি।

চমৎকার চমৎকার। এই একমাত্র উপায়। ধর্ম্মঘট ধর্ম্মঘট।

অন্য কয়জন

সে হয় না, সে হয় না, লজ্জার মাথা তা হ'লে খেতে হয়।

যোগেশ, গোপেশ্বর প্রভৃতি

তা ছাড়া উপায়?

অন্য কয়েকন

আর উপায়? উপায় নেই। এবার বাড়ি চল।

যোগেশ গোপেশ্বর প্রভৃতি

যাও কাপুরুষের দল,—একটা নির্লজ্জা স্ত্রীলোকের নিকট পরাজিত হয়ে ল্যাজুড় গুটিয়ে বাড়ি পালাও।

অন্য ক'জন

অপমানিত হয়েও বেহায়ার মত পড়ে থাকার চেয়ে সেটা ভাল।

গোপেশ্বর প্রভৃতি

কি আমরা বেহায়া? তোদের বাপ্ বেহায়া, তোদের চোদ্দ পুরুষ বেহায়া। [হৈ চৈ পড়িয়া গেল। উভয় পক্ষই ঘুষি উদ্যত করিল। মারামারি লাগে আর কি। এমন সময় ঘরে প্রবেশ করিল বনমালী]

বনমালী

আজ্ঞে আপনারা যদি একটু আস্তে কথাবার্ত্তা চালান্ তবে বড় সুবিধে হয়। দিদিমণির বড্ড মাথা ধরেচে।

মুকুন্দ

ধৃষ্ট, কে তুমি হে চুপ করতে বলবার? যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! তোমার দিদিমণির মাথা ধরেচে তবে কি আমাদের মাথা কেটে ফেলতে হবে নাকি?

বনমালী

আজ্ঞে আমি কি আর তাই বল্লুম?

যোগেশ

তাই তো বল্লে, বল্লে না আবার কি রকম?

গোপেশ্বর

আস্তে কথা বলব? কেন, কার হুকুম? বলব না আস্তে। আরো চীৎকার করব। এসো তো সবাই—প্রচণ্ড চীৎকার করা যাক্। আস্তে কথা বল্‌বে,—যেন দায় পড়ে এসেচি এখানে! কত ন্যাখোপতি—

মুকুন্দ

তোমার দিদিমণি এ কোলাহল সহ্য করতে না পারেন তবে অন্যত্র চলে যান্।

মন্টু

তাকে মাথার দিব্যি দিয়ে এ বাড়িতে রাখেনি তো কেউ।

বনমালী

আজ্ঞে, এ তারই বাড়ি,—তিনি আর যাবেন কোথায়?

যোগেন

কি রকম?

মুকুন্দ

[যোগেশ প্রভৃতিকে] বলেছিলুম কিনা যে ছুঁড়ি আমাদের কর্ত্তার মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে। যা সোমত্ত মেয়ে,—তারপর কর্ত্তাটিও আইবুড়ো,—হবেনা কেন?

গোপেশ্বর

আরে আমরা কি আর বুঝিনা,—ঐ জন্যই উঠেছিলেন এসে এখানে।

বনমালী

আজ্ঞে বাড়িটা দিদিমণির বাবা কিনে নিয়েছেন। এখন এটা তাদেরই বাড়ি। [সকলে বিস্ময়ে চাহিল]

করেকজন

তবে তো আমাদের আজই চলে যেতে হবে।

মুকুন্দ

কি রকম আমাদের খবর না দিয়েই বিক্রি ক'রে দেওয়া হ'লো! কি রকম কথা হ'ল এ শুনি।

যোগেশ

আমাদের কোনো ব্যবস্থা না করেই পালাল না কি ছোঁড়া?

গোপেশ্বর

সোজা কথা হচ্চে বাড়ি যারই হোক্ এখান থেকে আমরা উঠ্‌চি না।

মন্থ

আমাদের একটা occupancy right হয়ে গেছে। কিন্তু শোন চন্দর কথা হচ্চে এই যে আমার ডিমের পোচ্ হয়েছে?

অখিল

[গর্জ্জাইয়া] আর আমার পেস্তার সরবত।

গোপেশ্বর

আর আমার কাঁচা ছানা আর মিশ্রি। বলি সকলের খাবার তৈরী হয়েছে আমাদের?

বনমালী

আজ্ঞে রুটী আর হালুয়া প্রস্তুত আছে।

অখিল

আর আমার পেস্তার সরবত?

মন্থ

আমার পোচ?

গোপেশ্বর

আমার কাঁচা ছানা?

বনমালী

আজ্ঞে সে-সবের আমি কি বলব। দিদিমণি যা করতে বল্লেন তাই আমি করেছি বইত নয়। যার চাকর তার হুকুম ছাড়া আমি আর—[অখিল যেন লাগাইয়া দিবে এমনি রকম ঘুসি বাগাইতে লাগিল। গোপেশ্বর যেন রাগিয়া আগুণ। মন্থ বিরক্ত। যোগেশ পর্য্যন্ত দুঃখিত]

গোপেশ্বর

আস্তাকুড়ে ছু'ড়ে ফেলে দেব তোমার রুটী আর হালুয়া।

অখিল

থেঁৎলে তোমার হালুয়া বানিয়ে ছাড়ব।

মন্থ

ভোরে পোচ না হ'লে আমার চলেনা,—তোমাদের অত্যাচারে টায়ার্ড হয়ে পড়ছি দাদা। রুটী আর হালুয়া তোমার দিদিমণিকে দাও গে।

যোগেশ

রুটী আর হালুয়া একটা খাওয়া হলো—পেটে গেলে বরং হয়ে যাবে। [ধীরে ধীরে বনমালী ঘরের বাহির হইয়া গেল]

গোপেশ্বর

ব্যাটা চলেই গেল দেখা যায়।

মন্থ

পোচের আশা নেই।

অখিল

পেস্তার সরবত ও আর হ'লো না।

যোগেশ

কিন্তু খিদেতে পেট চোঁ-চোঁ করচে দাদা। রুটী আর হালুয়া নেহাৎ খারাপ জিনিষ নয়। কি বলেন মুকুন্দবাবু—

মুকুন্দ

তা বটে।

মন্থ

চলুন, যা পাওয়া যায় তাতেই লাভ।

গোপেশ্বর

[মুখ বিকৃত করিয়া] রুটী আর হালুয়া আবার একটা খাবার। তবে,—হ্যা চল। [সকলে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল]

[অন্য দ্বার দিয়া প্রবেশ করিল অর্দ্ধেন্দু ও একটু পরেই সুনীতা]

সুনীতা

কি ভয়ঙ্কর; আপনি এখানে কেন? সমস্ত প্লট্ এক্ষুনি মাটি হয়ে যাবে। আপনাকে পেলে ওরা কি আর বশে থাক্‌বেন!

অর্দ্ধেন্দু

কিন্তু এর পরেই কি আমাকে আশ্রু রাখ্‌বে?

সুনীতা

সেটা পরের কথা। বর্ত্তমানে আমার কাছে যে প্রতিজ্ঞা করেছেন সেটা রক্ষা করাই আপনার সব চেয়ে বড় কর্ত্তব্য। কেবল খাবার সময়ে চুপ চুপি বাড়ি আস্‌বেন আর অনেক রাত্তিরে শুতে। [হাসিয়া] বাড়ি তো আর আপনার নয় এখন, আমরা কিনে নিয়েচি;—আমি যা করব শুনতে হবে।

অর্দ্ধেন্দু

[আশঙ্কিত] সত্যি সত্যি ওদের তাই বলেচেন নাকি? বাড়ি বিক্রী করে' দিয়েচি?

সুনীতা

[হাসিয়া] দিদিমণির নামে অর্ডার পর্য্যন্ত সব পাশ, হচ্চে বলেন কি। আর আমাকে কী গালাগালি ওরা দিচ্ছেন তার—

অর্দ্ধেন্দু

কেন মিছে মিছি আমার জন্ম গালাগাল যেচে নিচ্ছেন ? তার চেয়ে ওরা আছেন থাকুন, যদ্দিন পারি খাওয়াই। আর ওরা কি সহজেই এখান থেকে যাবেন মনে করেছেন ?

সুনীতা

অতিথদের জন্ম আপনার একটা মায়া হ'য়ে গেছে সন্দেহ হচ্ছে আমার কিন্তু একটু মায়াও নেই। আপনার বাড়িটা একটা আলসের আড্ডা হয়ে উঠবে, ভালোমানুষ পেয়ে যত রাজ্যের যত ভ্যাগাবণ্ড্ এসে অত্যাচার লাগাবে আপনার ওপর সে আমি সহ্য করতে পারিনে। নইলে পরশুই তো আমাদের চলে যাবার দিন ছিল,—বাবাকে কিছুতেই যেতে দিলুম না।

অর্দ্ধেন্দু

তা আপনারাই বা অত শীগগির চলে যাবেন কেন ?

সুনীতা

আপনার অতিথদের না তাড়িয়ে আমি যাচ্ছি না।

অর্দ্ধেন্দু

তারপর ?

সুনীতা

তারপর আর কি। তারপর চলে যাব।

অর্দ্ধেন্দু

[অন্যমনস্কভাবে সুনীতার দিকে চাহিয়া] কেন ?

সুনীতা

[হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া] কেন ? কেন আবার কি। আপনার অতিথদের ওপর বড্ড মায়া দেখতে পাই।

অর্দ্ধেন্দু

[মৃদু হাসিয়া] বড্ড।

সুনীতা

[ইঙ্গিত উপেক্ষা করিয়া] উঃ, আপনাকে ভদ্রলোকেরা এ কদিন ধরে কি জ্বালাতনই করেছে তাই শুধু আমি ভাবি। অথচ আপনি যে কিছু করবেন তা আপনার দ্বারা হয়ে ওঠে নি। অত মুখ-চোরা কেন আপনি ?

অর্দ্ধেন্দু

মুখ খুলব তবে ?

সুনীতা

আমার কাছে নয়, ওদের কাছে গিয়ে খুলুন।

[মৃদু হাসিয়া] ওদের কাছে নয়, শুধু আপনার কাছে।

সুনীতা

[লজ্জিত ভাবে] তাতে বীরত্ব নেই কিছু।

অর্দ্ধেন্দু

বীরত্ব ? বীরত্ব চাই নে। বীরত্বে আমার কী হবে বলুন তো,—সেই সম্মানের বুদ্বুদ্—সেক্সপীয়ার যাকে বলেছে,—bubble reputation,—তা দিয়ে আমার কি প্রয়োজন। আমার প্রয়োজন—

সুনীতা

থাক্ থাক্ যথেষ্ট মুখ খুলেছে। আর খুলতে হবে না।

অর্দ্ধেন্দু

[হাসিয়া] কেবল আরম্ভ হ'লোতো

সুনীতা

শেষও এইখানেই করুন। যারা খেতে গিয়েছিল তারা ফিরলেন বলে। আর এসেই যদি দেখেন যে বাড়ির ভূতপূর্ব্ব [হাসিয়া] মালিক এইখেনে বসে আছে তবে একটা বিপ্লব না বাধিয়ে আর ছাড়বেন না।

অর্দ্ধেন্দু

বীরত্ব দেখাবার তবে একটা ক্ষেত্র পাওয়া যাবে,—আমার বীরত্ব নেই বলে আপনার যে আক্ষেপ সেটা দূর ক'রে দেওয়া যেত।

সুনীতা

[হাসিয়া] আমার কাছে দাঁড়িয়ে যেটা বীরত্বের বড়াই করছে সেটা ওদের সুমুখে জলে না দাঁড়ালে বাঁচি।

অর্দ্ধেন্দু

আপনার সঙ্গে আর কথায় পারা যাবে না। অতএব কি করতে হবে বলুন।

সুনীতা

শীগগির পলায়ন করুন,—ওদের আসার আগেই। সেটা বীরদের না হ'লেও মহাজনদের পন্থা। আর বীরদের প্রতি আপনার যেমন বিরাগ মহাজনদের প্রতি তেমনি ভক্তি। পলায়ন আপনাকে মানাবে ভালো।

অর্দ্ধেন্দু

আপনাকে বাড়ি থেকে একদিন তাড়িয়ে বীরত্বের পরিচয় আমি একটা দেবই।

সুনীতা

দেখা যাবে।

অর্দ্ধেন্দু

কিন্তু আমার জামার বোতামটা যে ছিঁড়ে গেছে,—এখন বের হই কি ক'রে। চলুন একটু সেলাই ক'রে দেবেন।

সুনীতা

[মুখ টিপিয়া হাসিয়া] যান্, আমি বনমালীকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। ও সেলাই করে ভালো।

অর্দ্ধেন্দু

থাক্ গে, আর একটা জামা পরে' যাবো এখন। [প্রস্থান]

[একটু হাসিয়া লইয়া সুনীতাও বাহির হইয়া গেল। তখন অন্য দরজা দিয়া অতিথিরা কোলাহল করিয়া প্রবেশ করিতে লাগিল। পট পতন]

তৃতীয় দৃশ্য।

[সেই একই ঘর। অতগুলি তক্তপোষ আর নাই। পাশাপাশি তিনটা তক্তপোষ এক-ধারে বিদ্যমান। আর এক ধারে একটা তক্তপোষ খালি পড়িয়া আছে। তামাকের ধোঁয়ায় ঘর আচ্ছন্ন। এখানে ওখানে টিকে-তামাকের ছাই, কাগজ ছেঁড়া এইসব পড়িয়া আছে। সময় সন্ধ্যা।

পট উঠিলে দেখা গেল নিজ নিজ তক্তপোষে বসিয়া আছে মুকুন্দ, বিভূতি-বুড়ো এবং গোপেশ্বর। বিভূতি আলবোলা টানিতেছে। গোপেশ্বর ক্রুদ্ধ। মুকুন্দ মর্ম্মাহত।

মুকুন্দ

লজ্জার কথা। নিতান্তই লজ্জার কথা। একে-একে সবগুলি কাপুরুষই রণে ভঙ্গ প্রদান করে পলায়ন করল।

বিভূতি

[চটিয়া] জাহান্নামে যাক্ তারা।

গোপেশ্বর

এই কাপুরুষরা কেনই পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করে,—যে জননীগণ এহেন সন্তান প্রসব করে তাদেরও আক্কেল বলি।

মুকুন্দ

অথচ সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে কাজ করলে কে তাদের সরায়। দিব্যি আনন্দে সবাই একত্র বসবাস করা যেত।

গোপেশ্বর

মোট কথা তারা যাক্ আর থাকুক্ নিদেন গোপেশ্বর ভট্চায এখান থেকে নড়চেনা। যেতে পারতাম কত লাখোপতির কাছেই কিন্তু কেন যাব শুনি? চন্দ্রকান্তবাবুর অকালকুষ্মাণ্ড পুত্রের অতিথদের বঞ্চিত করে' পিতৃগৃহ বিক্রী করার কোন্ অধিকারটা আছে মশায়?

বিভূতি

অধিকার আছে কিনা জান্‌তে চাইনা,—আমার বাত নিয়ে আমি সরি কোথায়? চল্লেই হ'লো। এইখানে,—এইখানেই আমি থাক্‌ব,—দেখি কার বাপের সাধ্যি সরায়।

গোপেশ্বর

রইলাম আমিও। এ-বাড়ির ইট-কাঠ যদ্দিন আছে, আমিও আছি।

মুকুন্দ

কাপুরুষরা গেছে যাক্, কিন্তু এ শর্ম্মা আরো শক্ত ধাতুর। চন্দ্র সূর্য্য কক্ষ থেকে ছিট্‌কে পড়্‌বে তো আমি এখান থেকে নড়্‌বনা।

গোপেশ্বর

নড়্‌ব কেন? কার কথায়? বাড়ি যদি বিক্রী হয়েই থাকে তবু ক্রেতা কোনমতে বিক্রেতার অতিথদের সেবার দায় এড়াতে পারে না। আইনের কথা আর আমাকে শেখাতে হবেনা, সব ঠোঁটাগ্রে। কম দিন নায়েবী করেচি নাকি। আর বরখাস্ত হয়েছি কোন্ শালা বলে,—নিজের ইচ্ছায় কাজে ইস্তাফা দিয়ে এসেচে গোপেশ্বর ভট্চায, নয়ত কি!

বিভূতি

এক কথা আমার,—এস্থান হ'তে পাদমেকম্ ন গচ্ছামি।

মুকুন্দ

ঠিক্ ঠিক্ ঐ যোগেন ভট্চায্যির মত ছোঁড়ার ভেবেছিলুম সাহস টাহস আছে। অখিলের মুগুর ভাঁজাই সার। সবগুলিই শেষে মাথা নীচু করে বেরিয়ে গেল। কিন্তু এ শর্ম্মার কাছে চালাকি নয়। কমই খেতে দাও, শোবার অসুবিধে কর, মার ধোর্ যা ই'চ্ছে করতে পার, কিন্তু হার স্বীকার কর্‌বনা কোনো দিন।

গোপেশ্বর

দেখি হারেই কে আর জেতেই কে। যে সে লোকের হাতে পড়নি বাবা, নন্দনপুরের নায়েব একটা কেষ্ট-কেটা নয়। যার নামে বাঘে গরুতে একঘাটে জল খায়, তারই সাথে লড়্‌তে এসেচে সে দিনের এক ছুঁড়ী।

বিভূতি

[চটিয়া] নারী-জাত অতীব অধম জাত।

মুকুন্দ

আজ্ঞে যা বলেছেন। পৃথিবীতে যত হাঙ্গামা বাধে এই এদের জন্য।

গোপেশ্বর

নারী-জাতি ধরা-পৃষ্ঠ হ'তে বিলুপ্ত হ'লে শান্তিতে থাকা যেতো মশায়। তবে পুত্রের জন্মে বিঘ্ন হ'তো এই যা। শুনেচি পুৎ নরক নাকি অত্যন্ত ভয়াবহ স্থান। এরই জন্যই তো মশায় গিন্নীকে সহ্য করে থাকি, নইলে পরে—দেখোত মুকুন্দবাবু, রাত বাজে কটা।

মুকুন্দ

এইতো সন্ধ্যা হ'লো মাত্র। আর কি মুস্কিল বলুন তো মশায়, দুপুরের ঘুম ঘুমিয়ে উঠ্‌তে না উঠ্‌তেই রোজ দেখি রাত্রি হয়ে গেছে।

গোপেশ্বর

তা দিবা নিদ্রা অবহেলার জিনিষ নয়। স্বাস্থ্যের পক্ষে ওটা অপরিহার্য্য। দুপুরে যদি না ঘুমোও দেখ্‌তে দেখ্‌তে কদিনের মধ্যে স্বাস্থ্য ভেঙে পড়্‌বে।

বিভূতি

তাই যদি না হবে তবে আর আমি সারাক্ষণ শুয়ে থাকি কেন? আর মাসখানেক যদি নির্ব্বিঘ্নে শুয়ে কাটাতে পারি তবে অসুখ বিসুখ কি আর ঘেঁষ্‌তে পার্‌বে? তবে খাওয়াটা যুৎসই চাই। কিন্তু কি অবিবেচকের পাল্লায়ই পড়েছি যে এদিকে কোনই দৃষ্টি নেই। এখন স্বাস্থ্য থাকে কি ক'রে হ্য?

মুকুন্দ

একা যদি পৃথিবীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয় তাও রাজী যোদ্ধা এ দেহে জীবন থাক্‌তে এ স্থান থেকে নড়ছি না। কাল থেকে বেড়াতেও আর যাব না। কে জানে মশায় দেউড়ীর গেট যদি বন্ধ করে দেয় তবেই গেল।

গোপেশ্বর

যা বলেছ দাদা। বরঞ্চ—[এমন সময় বনমালী ঘরে প্রবেশ করিল। তার হাতে গোটা-দুয়েক বালিশ, বিছনার চাদর ইত্যাদি। পরিত্যক্ত বিছানাটার কাছে গিয়া সে চাদর বালিশ পাতিয়া ঠিক করিল। উল্টো দিকের একটা দরজা অর্দ্ধেক খোলা হইল। তার ভিতর দিয়া দেখা গেল সুনীতাকে। সে ইসারা করিয়া কি যেন বনমালীকে বুঝাইয়া দিল]

মুকুন্দ

এ বিছানা হচ্ছে কার?

বনমালী

আজ্ঞে দিদিমণির এক পিস্‌তুত ভাইয়ের মামাশ্বশুরের।

গোপেশ্বর

ভালো ভালো। তোমার দিদিমণির যে দিল্ বড় দরাজ হয়ে গেছে,—নইলে অতিথিকে দরজা থেকে বিদায় না করে শোবার জায়গাও একটা করে দেওয়া হচ্ছে। বড় কম কথা নয়।

বিভূতি

[চটিয়া] অতিথ্ যে দেবতা সে জ্ঞান্‌টা এদ্দিনে হয়েছে নাকি?

বনমালী

আজ্ঞে না, সে ভদ্রলোক নেহাৎ ঠেকায় পড়েই এখানে এসে উপস্থিত হচ্ছেন। হোটেলেই এসে তো তিনি বরাবর ওঠেন কিন্তু এবার কোনো হোটেলে—মেসে নেবে না আর তাকে।

মুকুন্দ

কেন হে ফেরারী নাকি?

গোপেশ্বর

তবে তো তাকে এ-ঘরে থাক্‌বে দিতে পারিনে। আমার ব্যাগে কম ক'রে কোন্ তিন চার টাকা না-আছে!

বিভূতি

[চটিয়া] কী এত বড় আস্পর্দ্ধা,—চোর বাট্‌পাড় সঙ্গী কর্‌বে আমাদের! জাননা আমরা কোন বংশ জাত? গোকুল-ডাঙার বাড়ুয্যের বংশের—

বনমালী

আজ্ঞে না, তিনি চোর বাট্‌পাড় মোটেই নন্,—সকালে বিকালে সন্ধ্যা-আহ্নিক করেন,—নিরিমিষ খান্,—

মুকুন্দ

অমন বক-ধার্ম্মিক অনেক ব্যাটাকেই দেখা গেছে,—তাই ব'লে ভদ্রলোকের সাধু সঙ্গ তার জন্য নয়। অন্যত্র তার ব্যবস্থা করো।

বনমালী

আজ্ঞে জানেন তো অন্য সব ঘরই চুণকাম হচ্ছে। দিদিমণির, বড় বাবুর আর আপনাদের এই তিন ঘর বাদে সবগুলি বাঁশে আর চুণে ঠাসা। আর একটা জায়গা নেই যে তাতে শোবার ব্যবস্থা করতে পারি। [বনমালী চলিয়া যাইতে যাইতে ঘরের শেষ প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল। একটা দরজা অর্দ্ধেক ফাঁক হইল। দেখা গেল সুনীতা তাকে ইসারাতে কি বলিতেছে]

বনমালী

[ফিরিয়া আসিয়া] আজ্ঞে আপনাদের সব টিকে হয়েছে তো?

গোপেশ্বর

দুই ছিলুম টানা যায়-না তো টিকে হয়েছে। কত পয়সার টিকে আনো শুনি?

বনমালী

আজ্ঞে আমি সে কথা বলছি না। বলি বসন্তের টিকে নিয়েছেন আপনারা?

মুকুন্দ

[শঙ্কিত হইয়া] কেন হে চক্কর্ত্তি, বলি সহরে মা শেত্‌লার গুরুতর প্রকোপ আরম্ভ হয়েছে নাকি? [হাত জোড় করিয়া শীতলার উদ্দেশে প্রণাম করিয়া] কী ভয়ানক ব্যাপো দাদা, টিকে দাও আর না দাও কি আর এসে গেল। যেবার পরিবারের ওপর হল মা শেত্‌লার দয়া,—যেই নি শোনা মুকুন্দ চক্কোর্ত্তীকে আর কোন্-শালা ঘরে

বেঁধে রাখে। বাপ্‌রে বাপ্‌ কি ব্যামো,—শুন্‌লে গা শিউরে ওঠে [আবার হাত জোড় করিয়া প্রণাম]

বনমালী

আজ্ঞে না টিকে হ'লে আর তেমন ভয় নেই। তবু একটু সাবধানে থাকবেন। দেখবেন যেন ছোঁয়াছুঁয়ি না হয়,—একই ঘর কিনা একটু সতর্ক থাকা ভালো।

মুকুন্দ

[শঙ্কিত] ছোঁয়াছুঁয়ি! ছোঁয়াছুঁয়ি কার সাথে!

বনমালী

আজ্ঞে ঐতো দিদিমণির পিসতুত ভাইয়ের মামাশ্বশুরের সাথে। এই বিছানাই ওর থাকার ব্যবস্থা করা হ'লো কিনা। কি বলব বাবু সারা গা ছেয়ে গিয়েছে,—

মুকুন্দ

কী সর্বনাশ!

বিভূতি

কোন্‌ শালা আনে তাকে দেখি। খপরদার—

গোপেশ্বর

বলি এইখেনে আনার কি দরকার। ইচ্ছে হ'লেই হ'লো আর কি,—আমরা কি আর মানুষ নই,—আমাদের জীবনের মূল্য তুমি অর্থ কি জান? নন্দনপুরের নায়েব, একটা যেউ যেটা নয়। আর মহামারীগ্রস্ত একটা কুলাঙ্গারকে বাড়িতে স্থান দেবার কোন্‌ প্রয়োজনটা হ'লো?

বনমালী

আজ্ঞে একটা লোক অচিকিৎসায় অশুশ্রূষায় বিঘোরে বিদেশে এসে প্রাণ হারাবে সেই কি আর একটা ভালো কথা হ'লো! তাইতো দিদিমণি তাকে থাকতে বল্লেন। আর ঘর ঠিক নেই বলেই তো আপনাদের এখানে আনতে হ'লো নইলে আর,—হ্যাঁ যাই, শ্যালদর কাছে এক হোটেলে তিনি পড়ে আছেন। আনবার ব্যবস্থা করি গে। প্রস্থান]

বিভূতি

ধৃষ্টতা দেখে মারা যাই। না যদি থাক্‌তো পিঠে বাতের বেদনা তবে দেখে নিতাম কোন্‌ শালা আসে ঘরে।

গোপেশ্বর

সম্মুখ রণে না পেরে এখন যমকে লেলিয়ে দিয়ে ভয় দেখাচ্চে। কিন্তু বাবু যে সে লোক নই আমি,—রইলুম এখানে,—তা মহামারীই আসুক আর প্লেগই আসুক।

মুকুন্দ

না মশাই, আমি আর না। যে স্থানে মায়ের দয়া [নমস্কার করিয়া] সে স্থানে আমি আর নই। প্রাণে বাঁচলে তবে তো মশায় থাকা আর খাওয়া। আর মুহূর্ত বিলম্ব নয়,—এক্ষণি আমি চল্লুম। [বোচ্‌কা গুছাইয়া ছাতা লইয়া হাস্যকর দ্রুততার সহিত প্রস্থান]

গোপেশ্বর

নিতান্ত কাপুরুষ! পলায়ন করল।

বিভূতি

[ক্রুদ্ধভাবে] আসুক সেই মহামারীগ্রস্ত নরাধম। এক দিনেই তার পঞ্চত্বের ব্যবস্থা না করি তো আমার নাম বিভূতিই নয়। কিন্তু তার ভয়ে নড়ব? হাস্যকর!

গোপেশ্বর

আমরা আজও রইলাম, কালও রইলাম।

[দরজা খুলিয়া এমন সময় প্রবেশ করিল বনমালী। তার পিছনেই হ্যাট্‌-কোট পরিয়া একজন লোক। তাহার বুক-পকেট হইতে স্টেথিস্কোপ উঁকি দিতেছে। ডাক্তার নিশ্চয়। [আর একটা দরজা অর্দ্ধেক ফাঁক হইলে দেখা গেল সুনীতা কি ইসারা করিতেছে]

বনমালী

[ডাক্তার কে] আজ্ঞে ইনিই রোগী,—বহুদিন যাবত পিঠে বাতের ব্যথা হয়ে কষ্ট পাচ্ছেন। [বিভূতিকে] ইনি হ'লেন ডাক্তার সাহেব। বহুদিন ধরে শুধু-শুধু কষ্ট পাচ্ছেন এই জন্য দিদিমণি শেষে এঁকেই আনালেন।

বিভূতি

[বিরক্ত] মশায়ের নাম কি?

ডাক্তার

নাম দিয়ে আর কি হবে? তবে জেনে রাখুন আমি বাত-রোগের স্পেশালিষ্ট্‌। [আগাইয়া আসিয়া] বেদনাটা কোথায় দেখি।

বিভূতি

কত চুল-পাকা টাক-ওয়ালা বদ্যি-হেকিম হাঁড়িয় হাল্‌ আর সেদিনকার এক ছোকড়া এসেছেন চিকিচ্ছে করতে।

ডাক্তার

দেখুন, কথা কাটাকাটি করবার আমার সময় নেই। চৌষট্টি টাকার একটা ভিজিটের জন্য আর দু-ঘণ্টা সময় নষ্ট করতে পারিনা। বেদনাটা কোথায় বলুন।

বনমালী

আজ্ঞে ওনার বেদনা হচ্ছে পিঠে। কী কষ্টটা মাস তিনেক ধরে পাচ্ছেন সে আর কি বলব। বিছানায় শুয়ে শুয়েই খাওয়া-পরা, মাথা ধোওয়া,—একটু নড়লে চড়লেই পিঠের ব্যথাটা চাগিয়ে উঠে।

ডাক্তার

ক'দিন ধরে হচ্ছে?

বনমালী

মাস তিনেকের ওপরে হবে।

ডাক্তার

কি, মাস তিনেক ধরে পিঠে বেদনা,—আর কোনো ওষুধেই সারেনা! সিরীয়াস্ কেস্, বলি পেকে টেকে যায় নাই তো [বিভূতির উপর ঝুকিয়া প'ড়িয়া] উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ুন দেখি। [বিভূতি অনিচ্ছার অভিনয় করিল। কিন্তু ডাক্তার এক রকম জোর করিয়াই তাহাকে উপুড় করিয়া শোয়াইয়া দিল। তারপর নানা রকম ভাবে সেই স্থানের পরীক্ষা চলিল। কাসুন তো একবার [বিভূতির তথাকরণ] জোরে নিঃশ্বাস নিন [তথাকরণ] [পরীক্ষা করিতে করিতে ডাক্তারের মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল। তার-পর আঙ্গুল দিয়া পিঠটা টিপিয়া বিমর্ষ মুখে সরিয়া বসিল] [বনমালীকে] কোন্ ডাক্তার এতদিন ওর চিকিৎসা করেছিল বলোতো,—তার নামে আমি কেস্ করব। এ অত্যন্ত সিরীয়াস্ অবস্থা,—যখন—তখন একটা যা-তা হয়ে যেতে পারে। অথচ সেই হাতুড়ে ডাক্তার এতদিন টেরও পেলনা।

বনমালী

[শঙ্কিতভাবে] আজ্ঞে অবস্থা কি খুব খারাপ ?

ডাক্তার

খারাপ ? এর চেয়ে খারাপ কেস্ আমার হাতে পড়েনি কখনো। সমস্ত পিঠ একেবারে পেকে গেছে।

বনমালী

এখন উপায় ?

বিভূতি

কোথাকার তুমি ডাক্তার ভয় দেখাতে এসেচ। বলি পাকা ডাক্তার যে হয়ে উঠেচ, কটা রোগী মরেছে তোমার হাতে ? শতমারী না হ'লে আবার বদ্যি কি রকম !

ডাক্তার

চুপ করুন্, অত স্ট্রেই'ন্ হ'লেই হার্ট-ফেল্ করা অসম্ভব নয়।

বনমালী

এখন কি উপায় ডাক্তার সাহেব।

ডাক্তার

যদি বাঁচাতে হয় এক্ষুণি ওর পিঠে অস্ত্র করতে হবে। সারা পিঠটা আক্রান্ত, ক্লোরোফর্ম্ম করে সারা পিঠ না ফেঁড়ে ফেল্‌লে সেপ্‌টিক হয়ে মর্‌বে। তুমি গরম জল করতে বলে দাও, আমি আধঘন্টার ভেতরই অস্ত্রটস্ত্র নিয়ে এসে হাজির হব।

বিভূতি

এত গণ্ডা ডাক্তার কবরেজ গেল কেউ অস্ত্র করল না আর বিলেত থেকে বড় বিদ্যে শিখে এসেচেন অস্ত্র না করলে তার চলেনা। ওষুধ দাও মাখতে পারি,—কাটাকুটি মরে গেলেও করতে দেবনা। পিঠটা আমার সে জ্ঞান আছে তো ?

ডাক্তার

তা আছে। কিন্তু আপনি রাজী হন্ আর নাই হ'ন্ আমাকে কর্ত্তব্যের খাতিরে অস্ত্র করতেই হবে। আর অত বড় একটা অ-পারেশান্ মেজর মিত্রকেই ডেকে আন্‌ব মনে করছি। কারণ একটু এদিক ও-দিক হ'লে আর রক্ষা নাই।

বিভূতি

কোন্ শালা অস্ত্র করে আমার পিঠে।

ডাক্তার

[বনমালীকে] অস্ত্রের কথা শুনে এর ভয়ে মাথা খারাপ হয়ে গেছে সন্দেহ হচ্চে। দেখো ইনি যেন বিছানা থেকে উঠে পালাতে না চেষ্টা করেন। আমি শীগ্‌গীরেই অস্ত্রশস্ত্র-গুলি আর মেজর মিত্রকে নিয়ে আস্‌ছি। আর গরম জল যেন ঠিক থাকে। [ডাক্তারের প্রস্থান।]

বনমালী

[বিভূতিকে] উঠে বস্‌তে চেষ্টা করবেন না কিন্তু বাবু। ভয়ের আর এতে কি আছে ; অস্ত্র হ'তে গিয়ে অনেকে মারা পড়ে বলে আপনিও যে মর্‌বেন তার কি কথা আছে [প্রস্থান]

বিভূতি

[গোপেশ্বরকে] কাণ্ডখানা দেখুন তো মশায়, কাণ্ডখানা দেখুন তো। কোথা থেকে এক ভুঁইফোঁড় এসে বলে বস্‌লেন কিনা পিঠ ফেঁড়ে ফেলবেন। এখন কি করি মশায় বলুন তো,—এখন উপায়টা কি করি,—এযে সত্যি সত্যি ছুরি আন্‌তে ছুটল।

গোপেশ্বর

পিঠ যদি পেকে' যেয়ে থাকে তবে অস্ত্র না করে আর করে কি ?

বিভূতি

পিঠ পেকেছে না ওর মাথা হয়েছে। মশায় আমার অসুখ, আমি জানিনে ? পিঠ আমার পাকা দূরের কথা এমন কি বেদনার বংশও পিঠের আশে-পাশে নেই। বাত মশায় আমার কোনো কালে ছিলনা।

গোপেশ্বর

তবে ?

বিভূতি

তবে আর কি। বাতের নাম দিয়ে ক'মাস ছিলাম সুখে, তা মশায় ভাগ্যে সে সুখও সইলনা। ব্যাপার ক্রমেই

সঙ্গীন হয়ে আসছে,—শেষে সুদ্ধ পিঠেই ব্যাটারা ছুরি লাগাবে দেখ্‌তে পাচ্ছি। এখন উপায়টা কি করি বলুন তো,—জীবনটা শেষে খোয়াব নাকি।

গোপেশ্বর

তবে মশায় আর দেরী কর্‌বেন না। ব্যাটারা এসে পড়বার আগেই পোট্‌লা পুটুলি নিয়ে সটান চম্পট দিন্‌।

বিভূতি

[উঠিয়া দাঁড়াইয়া] তা ছাড়া আর উপায় নাই। [পোট্‌লা পুটুলি গুছাইয়া লইয়া এদিক-ওদিক চাহিয়া এক ছুট্‌]

গোপেশ্বর

[হাই তুলিয়া উঠিয়া পড়িয়া] যাই একটু জলটল খেয়ে আসি। নবাবপুত্র ব্যাটাদের ডেকে তো আর পাওয়া যাবে না। [তখন অন্য দ্বার দিয়া প্রবেশ করিল সুনীতা, অৰ্দ্ধেন্দু, বনমালী]

সুনীতা

[অৰ্দ্ধেন্দুকে] আপনার সোফারটা যে অত ভাল থিয়েটার করতে পারে তা আমি ভাব্‌তেই পারতুম না। অথচ ডাক্তারের পার্টটা করে এলো একেবারে নিখুঁত।

অৰ্দ্ধেন্দু

বুড়োটা যে নিত্যি করে এদ্দিন বাতের অভিনয় করেছিল সেটা আমি ভাব্‌তেই পারিনি,—সেটা সোফারের চেয়েও ভালো হয়েছিল। তবে এদের এম্‌নি ক'রে তাড়ান কি ঠিক হচ্চে।

সুনীতা

একশোবার হচ্চে। যারা শঠতা করে পরের ঘাড়ে পা দিয়ে থাক্‌বে, নির্ব্বোধ না হ'লে আর কেউ তাদের চিরদিন সহ্য করেনা।

অৰ্দ্ধেন্দু

সুনীতা

কিন্তু কিছু নয়। আপনি এখন চুপ করে থাকুন। দেখুন ব'সে বসে' কেমন ক'রে এই গোফ্‌-আলা গোপেশ্বরকে তাড়াই। এটা কি ভয়ানক মানুষ বলুন, একেবারে আঠার মত আটকে রয়েচে। অথচ ওকেই নাকি কত লাখোপতি বাড়ি নেবার জন্য লালাচ্ছিল। [বনমালীকে] দেখ ঠিক যখন শ' আটটা বাজ্‌বে, তখন দেবে সব মসালগুলিতে আলো জ্বেলে! আর চাকরগুলিকে সব জোগাড় করে ঠিক ঐ গোপেশ্বর বাবুর ঘরের পাশে এক-একটা করে মসাল হাতে দাঁড় করিয়ে দেবে। আর বিস্তর ধূপ ছিটিয়ে দেবে তার ওপর,—আগুণ যেন খুব উঁচুতে ওঠে। আর ফট্‌কা ছোটাবে, আর সব হৈ-হৈ চাৎকার। রীতিমত একটা অগ্নি কাণ্ড করা চাই। তারপর দেখি বুড়ো কেমন করে বাড়ির বের না হয়। তোমার ঠিক আছে তো সব, যেমন সব বলে দিয়েছিলাম।

বনমালী

সব ঠিক দিদিমণি।

অৰ্দ্ধেন্দু

তার চেয়ে সোজাসুজি বলে দিলেই তো হ'তো।

সুনীতা

সোজাসুজি বলে দিলে হ'তো কিনা এ সম্বন্ধে আমার বিস্তর সন্দেহ আছে,—আর সন্দেহ যে অমূলক নয় তা আপনিও জানেন। কিন্তু বুড়োকে খানিকটা শাস্তি না দিয়ে আমি ছাড়্‌বনা কিছুতেই। [বনমালীকে] আর দারোয়ানকে আবার বলে রেখ যেই বুড়ো ফটকের বার হয়েছে,—অমনি গেট্‌ দেবে আট্‌কিয়ে। লাখোপতির বাড়িতেই এখন ওর যাওয়া দরকার। নইলে তারা রাগ হবে যে। [অৰ্দ্ধেন্দুকে] আসুন এখন আমরা যাই,—অগ্নিকাণ্ডের সময় প্রায় হ'য়ে এলো। [হাসিয়া] বাড়ি আপনার ইন্সিওর করা আছে তো?

অৰ্দ্ধেন্দু

[হাসিয়া] আছে,—আপনার কাছে।

[সকলের প্রস্থান]

[একটু পরে গোপেশ্বর পুনঃ প্রবেশ করিল।]

গোপেশ্বর

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে আছে যে অল্প-নিদ্রা স্বাস্থ্যের পক্ষে প্রশস্ত। অতএব স্বাস্থ্য লাভে আর বাধা কি। [বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল। একটুক্ষণ শান্তিতে কাটিল। গোপেশ্বরের তন্দ্রা আসিয়াও ছিল। সহসা কক্ষের চারিদিক আগুণের আভায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল,—তাহাদের শিখা যেন ঘরের ভিতরও প্রবেশ করিতেছে। ফট্‌ফট্‌ শব্দ হইতেছে। আগুণ আগুণ বলিয়া আর্ত্ত ভীত চীৎকার উঠিল,—চারিদিকে একটা হৈ-চৈ পড়িয়া গেল।

ঘুম-বিজড়িত চোখে উঠিয়া বসিয়া গোপেশ্বর ভ্যাবাচাকা খাইয়া গেল। কোথা হইতে আগুণের আঁচ আসে। ফট্‌ফট করিয়া বুঝি দুয়ার জান্‌লা ফাটিতেছে। আগুণ—আগুণ বলিয়া বিষম কোলাহল। [সহসা সেই ডাক্তারের প্রবেশ।]

ডাক্তার

পালান্‌ পালান্‌ মশাই। বাড়ি-ঘর পুড়ে' ছাই হয়ে গেল। আর এক মিনিট দেরী করলে পুড়ে আপনিও কয়লা হয়ে যাবেন। শীগ্‌গীর আসুন আমার সাথে।

গোপেশ্বর

[চীৎকার] কী সর্ব্বনাশ কী সর্ব্বনাশ, পৈত্রিক-প্রাণটা খোয়ালাম শেষে। মাগো আমার কি হবে গো। বাবা! বাবা!

ডাক্তার

চলে আসুন্।

গোপেশ্বর

আমার ব্যাগ্ যে পড়ে রইল [কান্না]

ডাক্তার

তবে পুড়ে ছাই হোন্।

গোপেশ্বর

ওরে বাবা যাই কোথা, চারদিকে যে আগুণ। এবার যদি প্রাণে বাঁচি তো কানমলা,—গিন্নীর পাশ ছেড়ে আর এক মুহূর্ত কোথাও নড়্‌ব না [দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য হইয়া ডাক্তারের আগেই ছুট্ দিল। কাছা খুলিয়া গেল। ব্যাগ পড়িয়া রহিল। চেয়ারের সাথে গুঁতা খাইল। আশে-পাশের জিনিষ-পত্র লণ্ডভণ্ড করিয়া খালি গায়ে খালি পায়ে গোপেশ্বর বাহির হইয়া গেল। পিছনে পিছনে হাসিয়া ডাক্তারের প্রস্থান।

কিছুক্ষণ রঙ্গমঞ্চ খালি রহিল। আগুণের চিহ্নমাত্র নাই। ভিতর হইতে হাসির এক হর্‌রা উঠিয়াছে।

তারপরে প্রবেশ করিল সুনীতা ও পরে অর্দ্ধেন্দু]

সুনীতা

[হাসিয়া] এত অগ্নিকাণ্ডেও বাড়িটা পুড়্‌ল না যা হোক।

অর্দ্ধেন্দু

[হাসিয়া] আপনার কাছে যে ইন্‌সিওর করা আছে।

সুনীতা

সত্যি ?

অর্দ্ধেন্দু

[হাসিয়া] হ্যাঁ।

সুনীতা

যাক্, আমার কাজ সারা হয়েছে। কালই আমরা বোম্বাই চল্লাম।

অর্দ্ধেন্দু

কেন ?

সুনীতা

আরে কি মুস্কিল। বাড়ি ফিরে যাব না।

অর্দ্ধেন্দু

এত শীগ্‌গীর ?

সুনীতা

আমরা তো আর আপনার সাক্ষাৎ মাসতুত ভাইয়ের সাক্ষাৎ কাকার শ্বশুর নই যে বাড়িতে আগুন লাগা না পর্য্যন্ত বিদেয় হব না। [হাসি] এদ্দিনই আর কে আপনার বাড়ি থাকত,—কেবল ঐ ভ্যাগাবণ্ডদের তাড়াবার জন্যই তো।

অর্দ্ধেন্দু

অতিথি না হ'লে আমার চলে না জানেন তো—হাঁপিয়ে উঠি। [সুনীতার পানে চাহিয়া হাসিয়া] অতিথের ওপর একটা মায়া পড়ে গেছে।

সুনীতা

[না দেখা অভিনয় করিয়া] বেশ্, বিভূতিবাবুকে তার করে দেই।

অর্দ্ধেন্দু

উহুঃ, ভাল নয়।

সুনীতা

[ঔদাসীন্য অভিনয় করিয়া] তবে মুকুন্দবাবু ?

অর্দ্ধেন্দু

[সুনীতার দিকে চাহিয়া হাসিয়া] যাঃ

সুনীতা

আমি চল্লুম।

অর্দ্ধেন্দু

আমার অতিথদের তাড়িয়ে এখন বুঝি চল্লেন। তা হবে না,—অতিথদের যেমন তাড়িয়েছ তেমনি [হাসিয়া] তোমাকে থাক্‌তে হবে। আর একদিন দু'দিনের জন্য নয়,—সারা জন্মের জন্যে। [অর্দ্ধেন্দু সুনীতার কাছে আগাইয়া গেল]

সুনীতা

দূর্ [বলিয়া মিষ্টি করিয়া মুখ ভেঙ্‌চাইয়া দুষ্টু মেয়ের মত ছুট্ দিল। অর্দ্ধেন্দু তাহার পিছনে ছুটিতেছিল সহসা চেয়ারে পা বাঁধিয়া পড়িয়া যাইবার অভিনয় করিয়া]

অর্দ্ধেন্দু

[ব্যথা পাওয়ার অভিনয় করিয়া] ঈঃ মাগো, গেলুম, [উপুড় হইয়া বসিয়া পড়িল। সুনীতা ফিরিয়া দাঁড়াইল। তার পর শঙ্কিতভাবে কাছে আসিয়া]

সুনীতা

কি হ'লো।

অর্দ্ধেন্দু

[তেমনি] উঃ মাগো।

সুনীতা

চেয়ারটাতে উঠে বসুন, দেখি কি হয়েছে [অর্দ্ধেন্দুকে উঠিতে সাহায্য করিল। চেয়ারে বসিলে পরে] কোথায় লেগেচে ?

অর্দ্ধেন্দু

[সুনীতার হাত চাপিয়া ধরিয়া] এইখানে [বুক দেখাইয়া দিল। তারপর সুনীতার হাত টানিয়া বুকে চাপিয়া ধরিয়া চক্ষু বুজিল। ভাবাবেশে চেয়ারে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল হয়ত বেশী। সহসা চেয়ার-সহ অর্দ্ধেন্দু উল্টাইয়া পড়িল। সুনীতা তাড়াতাড়ি তাহার কাছে ছুটিল।]

যবনিকা।

শ্রীসুবোধ বসু

সত্যাসত্য

শ্রীযুক্ত লীলাময় রায়

৬৯

বাদল হচ্ছে ভাবের মানুষ। এক একটা ভাবনা নিয়ে বিভোর থাকে, কখন রাত ভোর হয়ে যায় সে খবর রাখে তার এলার্ম টাইমপিস্। খাচ্ছে, কিন্তু কি খাচ্ছে খেয়াল নেই, সঙ্গিনীর কথাগুলি মনোযোগীর মত শুনছে, কিন্তু প্রশ্নের উত্তরে বল্‌ছে, "ক্ষমা চাইছি, কইনি। কি বল্‌ছিলে ঠিক্ ধর্‌তে পারিনি।" ট্রেনে কিম্বা বাস্-এ চড়ে কোথাও যাচ্ছে, আপন মনে ফিক্ করে হাস্‌ছে। যাচ্ছে ত যাচ্ছেই, গাড়ী থেকে নাম্‌বার কথা ভুলে গেছে। মাঝে মাঝে দয়া করে ক্লাসে উপস্থিত হয়, সেখানেও প্রোফেসারের দিকে এমন ভাবে তাকিয়ে থাকে যে তিনি মনে করেন ইনি তন্ময় হয়ে শুন্‌ছেন। বাদলের সৌভাগ্যক্রমে ছাত্রকে প্রশ্ন করার রীতি ইংলণ্ডের অধ্যাপক মহলে নেই, নতুবা বাদল পদে পদে অপদস্থ হত।

ইদানীং তার মাথায় কি এক ভাব চেপেছে, যে কিছু একটা দেখ্‌লেই ভাবে, বাস্তবিক, বিশ বছর পরে দেশে ফির্‌ছি, ফিরে দেখ্‌ছি দেশের তুমুল পরিবর্ত্তন ঘটে গেছে; যেখানে ছিল Foundling Hospital সেখানেটা এখন ফাঁকা জমি, শুনছি সেখানে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজের বাড়ী উঠ্‌বে। মন্দ প্রস্তাব নয়, কিন্তু funny! অত বড় একটা পুরাতন ইমারৎ আমি দেখ্‌তে পেলুম না, আমার আসার আগেই ভেঙে ফেলেছে। এই ত সেদিন Grosvenor Houseটাকেও ফেল্লে ভেঙে। ১৯২৪ সালে ভাঙ্‌ল Devonshire House; এখন সেখানে হোটেল আর ফ্ল্যাট্। মন্দ নয়, কিন্তু funny! রিজেণ্ট্ ষ্ট্রীটের চেহারা বদলে গেছে, Strand ত এখন বেশ চওড়া হয়েছে, পার্ক লেন-এর আভিজাত্য গর্ব্বিত প্রাসাদ এখন ধনগর্ব্বিতদের রুচি অনুযায়ী প্রথমে ধূলিসাৎ ও পরে পুনরায় নির্ম্মিত হচ্ছে, Dorchester House নাকি হবে Dorchester Hotel। মন্দ নয়, যুগের দাবী মানতে হবেই ত, কিন্তু funny! আমার অনুপস্থিতিতে দেশটার আমূল পরিবর্ত্তন ঘটে গেল।

বিশ বছর আগে মাটীর নীচে এত রেল লাইন ছিল না, ইলেক্ট্রিসিটি দ্বারা চালিত হত না কোনো ট্রেন। রাস্তায় মোটরের ভিড় ছিল না, এত মোটর বাস্ কল্পনার অতীত ছিল, এই যে সব পথপ্রান্তীয় গারাজ্, এগুলি অধুনাতন। ট্রাফিক একটা মস্ত সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পুলিশের হাতে নিয়ন্ত্রণের ভার থাকা আর পোষাচ্ছে না দেখ্‌ছি। রেলের মত সিগ্‌ন্যাল চাই রাস্তায় রাস্তায়। অটোমেটিক সিগ্‌ন্যাল। দেশটাকে আর একটু Modernise কর্‌তে হবে। না, না, "Modernise করা" বলে কোনো কথা থাক্‌তে পারে না। অর্থহীন বুলি। Rationalise কর্‌তে হবে। অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা। অবস্থা বদ্‌লে যাচ্ছে, ব্যবস্থা বদলে না গেলে ঘোর দুর্গতি অবশ্যম্ভাবী।

বাস্তবিক, বিশ বছর পরে দেশে ফিরতে বড় funny লাগে। সিটি অঞ্চলের শ্রী দেখ! ব্যাঙ্ক্ অব্ ইংলণ্ড-এর সাবেক কালের বনেদী সৌধ নতুন ছাঁচে তৈরি হবে কেউ ভাব্‌তে পার্‌তে? আর লয়েড্‌স্ ব্যাঙ্ক কিনা পাড়া ছেড়ে পালিয়েছে। হা হা হা!

মহাযুদ্ধের চিহ্নাবশেষ বাদল লণ্ডনের সর্ব্বত্র আবিষ্কার কর্‌ছে। ধর, সন্ধ্যার আগে দোকান বাজার বন্ধ করা। এ নিয়ম ত প্রাগ্‌যুদ্ধীয় ইংলণ্ডে ছিল না। তখনকার রাস্তাগুলো অর্দ্ধেক রাত্র অবধি আলো-ঝল্‌মল্ কর্‌ত। শত্রুপক্ষের এরোপ্লেন আলো দেখ্‌লে বোমা ছুঁড়বে বলে D. O. R. A. (Defence of the Realm Act) সন্ধ্যার পর অন্ধকারের যবনিকা টেনে দিল। ইস্, ছিল বটে সে একদিন! মাথার উপর সাঁই সাঁই করে এরোপ্লেন ছুটেছে, কানের কাছ দিয়ে গোলা বন্ বন্ করে ধাওয়া করেছে, জলের নীচে সাব্‌মেরিন কিলবিল কিলবিল, ডাঙার উপর "Tank" গড়গড়! তখন বাদল ছিল বহু দূরে, এত বড় একটা ব্যাপার ঘটে গেল বাদলের অনুপস্থিতিতে, বাদলের বিনা সহযোগে। তখন তার বয়স আট থেকে বার। তার বয়সের ইংরেজ ছেলেরা বোমা ফাট্‌ছে শুনে ভয় পাওয়া দূরে থাক্ পুলকিত হয়ে বল্‌ত, ডিম ফাট্‌ছে। আহা, তখন যদি বাদল বিলেতে থাক্‌ত! অমন একটা যুদ্ধ শতাব্দীতে একবার আসে, যদি এল দশ বছর পরে এল না কেন? দশ বছর আগের কথা বাদলের মনে পড়ে যায়। তখন সে ইংরেজী দৈনিকপত্রের বড় বড় হেড্‌লাইনগুলো পড়ে তার বাবাকে শোনাত। সব কথা বুঝ্‌তে পার্‌ত না। বল্‌ত "বাবা, GERMAN OFFENSIVE AGAINTT ROUMANIA—এর মধ্যে একটা কথা আছে, offensive। ওটার মানে কি?" বাবা বল্‌তেন "ডিক্সনারী থেকে নিজেই খুঁজে বের কর্।" বাদল বিরক্ত

হয়ে ডিক্সনারী খুলে বস্‌ত। ইংরেজী-বাংলা ডিক্সনারী বাড়ীতে রাখা বারণ। চেম্বার্স ডিক্সনারীতে ইংরেজী কথার ইংরেজী অর্থ বাদলের বোধগম্য হত না, তবু তার বাবার আদেশে তাই মুখস্থ কর্‌তে হত। সেই থেকে বাদলের চিন্তার ছাঁদটা ইংরেজী। তা বলে তার বাবার ইংরেজী জ্ঞানের প্রতি তার শ্রদ্ধা ছিল না। তিনি যে তাকে ডিক্সনারী দেখ্‌তে বাধ্য করতেন সেটার মূল কারণ তাঁর নিজের অজ্ঞতা কিম্বা আনিশ্চয়তা। সেদিন CAMOUFLAGE শব্দটা নিয়ে তিনি বিষম ফাঁপরে পড়েছিলেন। বাদল বল্ল "ডিক্সনারীতে নেই।" বাবা বল্লেন, "অসম্ভব। আমার যৌবনকালে আমি A থেকে E পর্য্যন্ত ডিক্সনারীর সমস্তটা কণ্ঠস্থ করেছি। আমি জানি, আছে।" তারপর সত্যিই যখন ডিক্সনারীতে নেই দেখা গেল তখন তিনি বল্লেন, "কি করে থাকবে! এটা ত একখানা চটি ডিক্সনারী। আচ্ছা আমি আজ ওয়েবষ্টার আনিয়ে দেখ্‌ছি।" তাতেও পাওয়া গেল না। তখন তিনি বল্লেন "শব্দটা একটু archaic হয়ে গেছে বলে ডিক্সনারীর নতুন এডিশন থেকে তুলে দিয়েছে। ঠিক মনে পড়্‌ছে না, ওর মানে পতাকা টতাকা কিছু হবে। ঐ যে শেষের দিকে flag আছে কিনা।"

ওসব মনে পড়লে বাদলের হাসি পায়। তার বাবা বলেছিলেন, "জার্ম্মানরা রুমেনিয়ার প্রতি offence অর্থাৎ অপরাধ করেছে।" জার্ম্মানগুলো অত্যন্ত নীচমনা নীচপ্রকৃতির লোক। ইংরেজের সঙ্গে এঁটে উঠ্‌তে পার্‌ছে না, রুমেনিয়ার মত ক্ষুদ্র রাজ্যের পিছনে লেগেছে। ওরা ঠিক হেরে যাবে দেখিস্‌। অধর্ম্মের পরাজয় হবে না?" বাদল অত শত বুঝ্‌ত না। জার্ম্মান কাইজারের চেহারাটা তার মনে ধরেনি। ইংরেজ পঞ্চম জর্জ্জের প্রতিকৃতি তার পছন্দ হয়েছে। কাইজারটা বদ্‌মাইসের মত দেখ্‌তে। বাদলের শত্রুরা কাইজারের জয় সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ। ক্লাসের কয়েকটা গুণ্ডা ছেলে বাদলকে একলা পেলে তার গাল টিপে দেয়, তার সঙ্গে পাঞ্জা কষ্‌বার ভাণ করে তার হাতখানাকে পিষে গুঁড়িয়ে ফেল্‌তে চায়, তাকে আচম্‌কা প্যাঁচ দিয়ে চিৎপাত করে। ঐসব ডাকাতদের রাজা কাইজার, আর বাদলের মত ভদ্রলোকদের রাজা পঞ্চম জর্জ্জ। বাদল তার এক শত্রুর সঙ্গে বাজি রেখেছিল, যদি কাইজার জেতে তবে বাদল চার আনার চানাচুর খাওয়াবে, যদি পঞ্চম জর্জ্জ যেতেন তবে সুকুমার চার আনার জলছবি কিনে দেবে। দুঃখের বিষয় বেচারা সুকুমার ঠিক সেইদিন মারা গেল যেদিন আর্ম্মিষ্টিস্‌ ঘোষণা হয়। বাদল তার জন্য কেঁদেছিল, ভগবানকে প্রার্থনা করেছিল—"হে প্রভু, সুকুমারকে বাঁচিয়ে দাও। ও ত এখন আমার বন্ধু। আর্ম্মিষ্টিস্‌ হয়ে গেল, আর কিসের কলহ? ওকে তুমি বাঁচিয়ে দাও।" বেচারা সুকুমারের জন্য এখনো বাদলের কান্না পায়। তাকে এখনো স্বপ্নে দেখে। সে তেমনি দুর্দ্দান্ত, তেমনি বাদলের প্রাইজ্‌ বই চুরি করে নিজের বলে চালায়, বাদলের মাথায় চাঁটি মারে ও হাস্‌তে হাস্‌তে বলে, "আহা রাগ করিস্‌নে, লক্ষ্মীটি।" স্বপ্নে এখনো বাদল ক্ষেপে যায়, দাঁত কিড়মিড় করে।

মহাযুদ্ধের কত কথাই মনে পড়ে যায়। কিন্তু ওসবকে প্রশ্রয় দিলে চল্‌বে না। বাদলের নিজস্ব স্মৃতি বলে কিছু থাক্‌বে না। ইংরেজ ছেলেদের যে স্মৃতি বাদলেরও সেই স্মৃতি। বাদল কল্পচক্ষুতে দেখে বোমা পড়ে ফেটে চৌচির হচ্ছে, সে উল্লসিত হয়ে বল্‌ছে, ডিম ফাট্‌চে। পচা ডিম। হা হা হা।

৭০

অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে। মেয়েরা কেশ ও বেশ হ্রস্ব করেছে। তারা আর গজেন্দ্রগামিনী নয়। বাদলদের পাড়ার অনেক মেয়ের বাইসিকল আছে। কত মেয়ে মোটর সাইক্লিষ্টদের পিছনে বসে প্রাণ হাতে করে বেড়াতে বেরয়। থিয়েটারে বেআব্রু মেয়ে শত শত। নাচের বাতিক সংক্রামক হয়েছে। মন্দ বাতিক নয়। স্বাস্থ্যের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। বাদল নাচ শিখতে চেয়েছিল। কিন্তু কুইনী বিশেষ আপত্তি করেছেন। বলেছেন, "তোমার সঙ্গীতের কান একেবারেই নেই, বার্ট। তোমার পদক্ষেপ বেতালা হবে।" বাদল ক্ষুণ্ণ হয়েছে। তার ধারণা ছিল সে ইচ্ছা কর্‌লেই যে কোনো বিষয়ে কৃতী হতে পার্‌বে। মানুষ কি না পারে? "What a man has done a man can do." ইচ্ছা কর্‌লে বাদল একজন বিচক্ষণ সেনাপতিও হতে পার্‌ত। বৈজ্ঞানিক কিম্বা মেরু আবিষ্কারক, সঙ্গীতকার কিম্বা ফিল্‌ম্‌ ষ্টার, বণিক কিম্বা ইঞ্জিনীয়ার, যা খুসী তা হতে পারা কেবলমাত্র ইচ্ছা, উদ্যোগ, সময় ও সাধনা সাপেক্ষ। "অসম্ভব" বলে কোনো কথা নেপোলিয়নের অভিধানে ছিল না, বাদলের অভিধানেও নেই।

কুইনী এর উত্তরে বলেছিলেন, "নাচ ত খুব কঠিন বিষয় নয়, বার্ট। চাও ত তোমাকে আজকেই শিখিয়ে দিতে পারি। কি জান, ও জিনিষটা আজকাল এত খেলো হয়ে উঠেছে যে কোনো ভদ্রলোকের ও জিনিষ মানায় না।"

বাদল গম্ভীর ভাবে বলেছিল, "ওকথা আমারও মনে হয়েছিল, কুইনী। বাস্তবিক মহাযুদ্ধের পর থেকে ইংলণ্ডের স্ত্রী-চরিত্র থেকে dignity চলে যাচ্ছে। আমরা পুরুষরাও এর জন্যে বহু পরিমাণে দায়ী। সিরিয়াস্‌ মেয়ে দেখ্‌লে আমাদের গায়ে জ্বর আসে।" – এই বলে বাদল তার কলেজের সহপাঠী ও সহপাঠিনীদের বর্ণনা দিয়েছিল। সহপাঠিনীরা সামনের সারিতে বসে। প্রোফেসারের প্রত্যেকটি আপ্তবাক্য

খাতায় টুকে নেয়। সহপাঠীরা এই নিয়ে তাদের অসাক্ষাতে রসিকতা করে থাকে। কেউ কেউ তাদের কার্টুন আঁকে। ইউনিভার্সিটি ইউনিয়নের একটি "সোশ্যাল"-এ বাদল নিমন্ত্রিত হয়েছিল। সেখানে ছেলেরা ও মেয়েরা মিলে "There was a miner fortyniner" ইত্যাদি হাস্য সঙ্গীত গেয়েছিল। বাদলের কাছে যে মেয়েটি বসেছিল সে বলেছিল, "আপনি গাইছেন না যে।" বাদল বলেছিল, "গানটা জানা থাক্‌লে ত?" মেয়েটি তার নিজের বইখানা বাদলের সঙ্গে ভাগ করে বাদলকে বলেছিল, "গলা ছেড়ে গান ধরুন। সকলেই আনাড়ি, কে কার ভুল ধরবে?" বাদল তাই করেছিল। কিন্তু সে কি জান্‌ত যে গানটা এত লঘু? আস্তে আস্তে গাইতে গাইতে হঠাৎ শেষের দিকে এক নিঃশ্বাসে ও একসঙ্গে সবাই চেঁচিয়ে উঠল।

"Then I kissed the little sister
And forgot my Clementine."

বাদলের ত লজ্জায় বাক্‌স্ফূর্তি হল না। দিনের বেলার ঐ সব লক্ষ্মী মেয়ে সন্ধ্যা বেলা এই সব গানে ছেলেদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছে? বাদল পরে ভেবে দেখেছিল। অন্যায়টা এমন কি হয়েছিল? চুম্বন করা ত কথা বলার মতই একটা শারীর ক্রিয়া। এদেশে ত ভাইবোন মা-বাবা সবাই সবাইকে চুম্বন করে কিন্তু ওটা না হয় মাফ করা যায়। গানের পর সেই যে নাচটা হল সেটাতে বাদল যোগ দিতে না পেরে এক কোণে চুপটি করে বসেছিল। পুরুষ সংখ্যা কম পড়ে যাওয়ায় মেয়েরা জোড়া জোড়া হয়ে নাচতে বাধ্য হচ্ছিল। তাদের কারুর কারুর হাতে ছেলেবেলাকার টেডি ভালুক কিম্বা অন্য রকম পুতুল ছিল। ছেলেরা পাছে সিরিয়াস্ বলে পরিহাস করে সেই জন্যই যে তারা অতিরিক্ত ছেলেমানুষী কর্‌ছিল বাদল এক কোণে বসে এইরূপ গবেষণায় ব্যাপৃত ছিল। সেই সময় একটি ছেলে এসে তার সঙ্গে গল্প জমায়। ওয়েল্‌স্ থেকে এসেছে, জোন্স্ তার নাম। তার সঙ্গে যোগ দিতে এল তার বন্ধু দক্ষিণ আফ্রিকা আগত টম্‌লিন্‌সন্। মাঝে মাঝে একবার করে আস্‌তে বস্‌তে গল্প কর্‌তে ও পালাতে থাক্‌ল ভ্যান্ কোপেন। বাদল জিজ্ঞাসা করল, "ওলন্দাজ?" ভ্যান কোপেন বিরক্তি চেপে বল্ল, "না ইংরেজ, সুতরাং আমিও।" তাকে কেউ ওলন্দাজ বলে পর ভাববে এটা কি তার সহ্য হতে পারে। যাক্, ভ্যান কোপেন সৌখীন মানুষ। তার গোঁপ ছুঁচলো। পোষাক পরিপাটী। জোন্স টম্‌লিন্‌সন ও ভ্যান কোপেন তিনজনেই আইন পড়ছে। বাদলের সঙ্গে তিন মিনিটে ভাব হয়ে গেল।

জোন্স্ বল্ল, "ভ্যান কোপেন আজ বড় বেশী নাচছে।"

টম্‌লিনসন বল্ল, "কাউকে বাদ দিচ্ছে না। প্রত্যেকের সঙ্গে একবার করে।"

ভ্যান কোপেন গোঁপে চাড়া দিয়ে বল্ল, "তেমন খুবসুরৎ ত কাউকেও দেখছিনে। ঐ ছুঁড়িটা বকের মত ঠ্যাং ফেলে। ঐ ছুঁড়িটা পাউডার প্যাডের মত থপ্ থপ্ করে। ঐ ছুঁড়িটা ঘোড়ার মত গ্যালপ করে। কেউ নাচ্‌তে জানে না। আর কিই বা চেহারা। কলেজে পড়া মেয়েগুলোর মুখে লাবণ্য নেই। শুষ্কং কাষ্ঠং।"

জোন্স্ সশব্দে ও টমলিনসন নিঃশব্দে মতৈক্য জানাল। তখন ভ্যান কোপেন উঠে গিয়ে সেই বেড়াল-কোলে-করা মেয়ের সঙ্গে নাচতে সুরু করে দিল।

জোন্স বল্ল, "লোকটা কেমন জোগাড়ে।"

টমলিনসন বল্ল, "মেয়েদের মিষ্ট কথায় তুষ্ট কর্‌তে জানে।"

বাদলের মনটা তিক্ত হয়ে গেছ্‌ল। আজকালকার ছেলেরা মেয়েদের তেমন সম্মান করে না। মেয়েরাও সম্মান-প্রার্থী নয়। অবশ্য বাদল অবাধ মিশ্রণের পরম পক্ষপাতী। অর্থহীন ও কৃত্রিম ব্যবধান স্ত্রী-পুরুষের মনে পরস্পরের প্রতি মোহ রচনা করে। মোহ সত্যের শত্রু, বাদলের চক্ষুঃশূল। কিন্তু সম্মানের চেয়ে কাম্য কি থাক্‌তে পারে? পুরুষ যেমন পুরুষের সঙ্গে অব্যাহতভাবে মিশেও সম্মান দাবী করে ও পায় নারীও তেমনি পুরুষের সঙ্গে প্রাণ খুলে মিশুক ও সম্মানের প্রতি কপর্দক আদায় করে নিক্। ভিক্টোরীয় যুগে তাদের সম্মান ছিল, স্বাধীনতা ছিল না। আমাদের যুগে তাদের স্বাধীনতা আছে, বহিঃসম্মান আছে, কিন্তু আন্তরিক সম্মান নেই। বাদলের মর্ম্মে পীড়া লাগ্‌ছিল।

সেদিনকার গল্প কুইনীকে বলায় তিনি কৌতুকহাস্য কর্‌লেন। বল্লেন, "তোমার একটুও humour-জ্ঞান নেই। কোথায় কি প্রত্যাশা করতে হয় জান না। পড়ার সময় পড়া, খেলার সময় খেলা, উৎসবের সময় উৎসব, কাজে কাজ। এই আমাদের রীতি। আপিসের পোষাক পরে জলকেলি করিনে, জলকেলির পোষাক পরে টেনিস্ খেলিনে, টেনিসের পোষাক পরে থিয়েটারে যাইনে। যখন যেমন। তুমি চাও আমরা শবানুগামীর পোষাক পরে পেচকের মত গম্ভীর হয়ে জীবনের দিনগুলি কাটিয়ে দিই?"

বাদল বলে, "বা রে, তা কখন বল্লুম?"

কুইনী বলেন, "প্রকারান্তরে বল্লে। কিশোর ছেলে, কিশোরী মেয়ে। ওরা পরস্পরের সম্মান্ নিয়ে কি কর্‌বে শুনি? একেই ত দুঃখের জীবন ওদের সাম্‌নে। জীবন-সংগ্রামে কে কোথায় তলিয়ে যাবে তার ঠিক নেই। প্রথম যৌবনের এই ক'টা দিন ওদের যা খুশী কর্‌তে দাও, বার্ট।

তোমার মত মহাপুরুষ ত সকলে হবে না, হতে পারবে না, হতে চাইবে না।"

কিছুক্ষণ থেমে বল্লেন, "তোমার ভাই বোন না থাকায় তুমি একটা কিম্ভূত বালক হয়ে বেড়েছ। অল্পবয়সীরা ভাইবোনেরই মত কিলাকিলি চুলাচুলি করবে, তারপর হাসি-তামসায় দ্বেষ হিংসা ভুলে যাবে। তা নয় ত সকলে সব সময় ভালো ছেলে ভালো মেয়ে হয়ে এক মনে বড় বড় বিষয় ভাববে, এমন সৃষ্টিছাড়া কল্পনা তোমার মত ক্ষ্যাপাদের মগজে গজায়।"

বাদল এর উপর কথাটি কইল না। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল (এই নিয়ে চতুর্থ বার) কুইনীর সঙ্গে নেহাৎ দরকারী সাংসারিক বিষয়ে ছাড়া বাক্যালাপ করবে না।

কুইনী তার ভাবটা আঁচ্ তে পেরে বল্লেন, "অমনি রাগ হল ? আচ্ছা, নাও এই দুধটুকু লক্ষ্মী ছেলের মত খেয়ে ফেল ত আগে। গায়ে জোর না হলে রাগ করবে কি দিয়ে ?"

৭১

সব চেয়ে বড় পরিবর্ত্তন শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থার উন্নতি। বিশ বছর আগে পার্লামেন্টে শ্রমিক সদস্য ছিলেন নগণ্য-গণ্য। আজ লেবার পার্টি ইংলণ্ডের দ্বিতীয় সংখ্যাভূয়িষ্ঠ দল। ইতিমধ্যে ট্রেড্ ইউনিয়নস্ কাউন্সিল্ পার্লামেন্টের দোসর হয়ে উঠেছে। হয় ত এমন একদিন আসবে যে দিন ট্রেড্ ইউনিয়ন কাউন্সিল একচ্ছত্র হবে। বাদল ভারতবর্ষে থাকতে ইংলণ্ডের General Strike এর খবর পেয়েছিল। ইংলণ্ডে এসে ধনিকে শ্রমিকে পথে ঘাটে মারামারি দেখ্ তে পায়নি। তাদের মধ্যে সম্বন্ধ বিরোধ থাকতে পারে, কিন্তু ছুটকো বিরোধ ত চোখে পড়ে না। কেউ কারুর প্রতি অভদ্রাচরণ করে না। বরঞ্চ বড়লোকের বেশী মান। বাদলের পোষাক থেকে তাকে বড়লোকের মত মনে হয়। সেই জন্য হোক কি সে বিদেশী বলেই হোক বাদলকে বাস্ কণ্ডাক্টর, ট্রেনের টিকিট কলেক্টর, পোষ্টম্যান, দুধওয়ালা, রেস্তোরাঁর লোক, দোকানের লোক, ইত্যাদি সকলেই সম্বোধন করে "সার" বলে। ভিক্ষুকরা তার কাছে মন খোলে, ফুটপাথের গায়ে রঙিন চকখড়ি দিয়ে যে সব ঘোড়া বা কুঁজো ছবি আঁকে তারা বাদলের বাঁধা আলাপী।

এই সব বেকার মানুষের জন্য কি যে করা যায় সে সম্বন্ধে বাদল ভাবুকদের লেখা পড়ে, নিজেও ভাবে। কিছু দিন থেকে লিবারল্ পার্টির প্রস্তাব নিয়ে খুব সোরগোল পড়ে গেছে। লিবারলরা বলেন ধনী লোকের উপর ট্যাক্সের পরিমাণ বৃদ্ধি না করে সকল শ্রেণীর লোকের সঞ্চিত অর্থ খাটিয়ে আরো রাস্তা ও আরো খাল তৈরি করা হোক্, পতিত জমি আবাদ করা হোক, জঙ্গল রোপণ করা হোক্। দেশের ধনবৃদ্ধিও হবে, বেকার মানুষের কাজও জুটবে। লিবারলরা গবর্ণমেণ্টকে দিয়ে এসব করাতে চান না। ধনিকে শ্রমিকে নিজেরাই একমত ও স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এসব করুন। গবর্ণমেণ্ট কেবল বাধা না দিলেই হল। লিবারলদের নালিশ এই যে কন্‌সারভেটিভ গবর্ণমেণ্ট ছোট ছোট নিষেধের ডোরে দেশের লোকের হাত পা বেঁধে রেখেছেন। উক্ত গবর্ণমেণ্ট সাহায্যও করছেন না, পরামর্শও দিচ্ছেন না, নতুবা কয়লার খনিকদের সঙ্গে মালিকদের ও অপরাপর ব্যবসায়ের শ্রমিকদের সঙ্গে অপরাপর ধনিকদের এতদিনে একটা সন্ধি হয়ে যেত।

সার আলফ্রেড্ মণ্ড্-এর সঙ্গে শ্রমিক প্রতিভূদের কথা-বার্ত্তার বিবরণ বাদল মনোযোগ সহকারে পড় ছিল। কিন্তু অব্যাপারীর পক্ষে ওর পরিভাষায় দন্তস্ফুট করা দুর্ঘট। বাদলের বন্ধু কলিন্স অবশ্য দোভাষীর কাজ করে। তবু অর্থনীতির ভাষা বড় দুর্বোধ্য। বাদল যদি আজন্ম ইংলণ্ডে থাকত তা হলে মুখে মুখে সেই সব শব্দের সংজ্ঞা জেনে নিত যে সব শব্দ ইংরেজ সাধারণের পক্ষে সহজ এবং বাদলের পক্ষে দুরূহ। Safeguarding, derating প্রভৃতির উপর সবাই পাঁচ দশ মিনিট বক্তৃতা করতে পারে, একা বাদল কিছু বলতে ভয় পায়। তারপর Free Trade ও Protection—এ নিয়ে এখনো ইংলণ্ডের লোক ঠিক তেমনি উত্তেজিত রয়েছে যেমনটি ছিল সত্তর আশী বছর আগে কব্ডেন্-এর যুগে। লিবারলদের অধিকাংশই Free Trade চায়, কন্‌সারভেটিভ্রা অধিকাংশেই চায় Protection। লেবার পার্টির লোক কোনটা যে চায় ওরাই জানে কিম্বা ওরাও জানে না। ওদের এক কথা, সোশ্যালিজম্ চাই। ছোট ছেলের মুখে যেমন একটি মাত্র দাবী, "খাবো।" খাওয়া ছাড়া অন্য কিছু করা বোঝে না, দুনিয়ার সঙ্গে ওদের পরিচয় মুখগহ্বরের মধ্যস্থতায়।

ইংলণ্ডের পার্টি পলিটিক্স ইংলণ্ডের প্রধান জিনিষ। প্রায় 'আড়াই শ' বছর কোনো না কোনো আকারে ইংলণ্ডে পার্টি আছে। বংশানুক্রমে কোনো কোনো পরিবারের লোক টোরী কিম্বা হুইগ্। ভারতবর্ষের মানুষ যেমন ব্রাহ্মণ কিবা কায়স্থ হয়ে জন্মায় ইংলণ্ডে জন্মায় কন্‌সারভেটিভ কিম্বা লিবারল্ হয়ে। বাদল কোন পার্টির লোক ? গোড়ায় কন্‌সার-ভেটিভ্দের প্রতি তার টান ছিল। কিন্তু ওরা সাধারণত হাই চার্চের সভ্য। বাদল নাস্তিক। নাস্তিক, অজ্ঞেয়বাদী, Non-Conformist, ইহুদী ইত্যাদি বাধ্য হয়ে লিবারল দলের দিকে ঝোঁকে। তারপর Free Trade এর আদর্শ বাদলের মনের মত। পৃথিবীর যাবতীয় দেশে বাণিজ্য অবাধ হোক, কোথাও শুল্ক না লাগে। যার যা খুশী বেচুক,

যার যা খুসী কিনুক। বেচাকেনা অবাধ হলে এত মন-কষাকষিও থাকবে না। ইস, জ্বালাতন করে তুলেছে। মেছোহাটার মত ব্যাপার। ফ্রান্স ও আমেরিকা ত একেবারে নির্লজ্জ।

বাদল "টাইম্‌স্" বন্ধ করে "ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান" নিতে আরম্ভ করল কিন্তু সোজাসুজি নিজেকে লিবারল বলে ঘোষণা করলনা। পীল, প্যামারষ্টন, গ্লাড্‌ষ্টোন, রোসবেরীর নামের কুহক তাকে লিবারল্ দলের দিকে আকর্ষণ করছিল। কিন্তু যে দলের কেবল অতীত আছে, ভবিষ্যৎ নেই, সে দলে যোগ দিয়ে বাদল কার কি উপকার করবে? কিন্তু ভবিষ্যৎ যে নেই তাই বা কেমন করে বলা যায়। লিবারল গবর্ণমেণ্ট হয়ত অসম্ভাব্য, কিন্তু যত দূর মনে হয় ভাবীকালের ইংলণ্ডে দুই দলের বদলে তিন দল কায়েমী হবে। এক সময় মানুষের বিশ্বাস ছিল সত্য মিথ্যা বলে পরস্পরবিরোধী দুটি মাত্র দিক আছে, এখন আরো একটা দিক মানুষের চোখে পড়ছে। লিবারল্ দল দেশের লোকের তৃতীয় চোখ ফুটিয়ে দেবে।

৭২

বাদল ছিল হাড়ে হাড়ে ডেমক্রাট। তার ইউটোপিয়ায় সকলে স্বাধীন, সম্পূর্ণ স্বাধীন। তবে একজনের স্বাধীনতা যেন অপরের স্বাধীনতার সঙ্গে সংঘর্ষ না বাধায় এটুকু দেখতে হবে। এটুকু দেখার জন্য সকলের দ্বারা নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি-মণ্ডলী এবং প্রতিনিধিমণ্ডলীর নেতৃস্থানীয় জনকতক অভিজ্ঞ ব্যক্তি বা মন্ত্রী। রাষ্ট্র বলে নাম সেটা আর কিছু নয়, সেটা তোমার আমার স্বাধীনতার সীমা-নির্দ্দেশের জন্য তোমার আমার কাছে ক্ষমতাপ্রাপ্ত তোমার আমার হাতে তৈরি এক প্রকার যন্ত্র। যন্ত্রের যন্ত্রী তুমি আমি।

তাই ফাসিস্‌ম্ ও বোলশেভিসম্ বাদলের চোখের বিষ। আমি যন্ত্রী নই, আমি যন্ত্রের অঙ্গ কিম্বা অধীন, যন্ত্রই ভগবান আমি তার পূজারী—উঃ! বাদলের নাস্তিক মন যুদ্ধং দেহি বলে চীৎকার করে ওঠে। চাইনে শান্তি, চাইনে আরাম, অন্ন বস্ত্রের স্বাচ্ছল্য যাদের কাম্য তারা ব্যক্তির চেয়ে রাষ্ট্রকে বড় করুক। কিন্তু আমি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী, আমার প্রতিবেশীর খাতিরে আমার অধিকারে খানিকটা আমি ছাড়তে রাজী আছি, কিন্তু সবটা ত্যাগ করতে আমি কস্মিন্‌কালে পারব না।

ডেমক্রেসী রাজাদের সমাজ। আমরা সবাই রাজা। কেবল নিজ নিজ রাজ-অধিকারকে সংঘর্ষমুক্ত করবার জন্য আমাদেরি কতক অধিকার আমরা ডান হাত থেকে নিয়ে বাঁ হাতে রেখেছি, ঘর থেকে সরিয়ে সভায় ন্যস্ত করেছি। আর ফাসিসম্-বোলশেভিসমের সমাজ দাসের সমাজ। কিছু আর্থিক সুবিধার বিনিময়ে নিজেদের ক্ষমতা অস্বীকার করেছি, যা নিজেদেরি রচনা তার ক্ষমতার পরিমাণ নির্দ্ধারণ করে দিইনি, পরন্তু ভাবে গদ্‌গদ হয়ে বলছি, আহা, রাষ্ট্র! সে কি যে-সে জিনিষ! সে যদি হয় জগন্নাথের রথ; তবে আমরা সামান্য পোকা মাকড়? সে হচ্ছে অবাক্ত, অব্যয়, সর্ব্বক্ষম, পরম রহস্যময়। ভাগবত বিভূতি বিশিষ্ট অথবা অতিমানুষিক শক্তিসম্পন্ন। আমরা কেবল তাকে মান্য করতে পারি, তার সেবা করতে পারি, তার জন্য মরতে ও মারতে পারি।

ইংলণ্ডের প্রতি বাদলের পক্ষপাত প্রধানতঃ ইংরাজের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দরুণ। রাষ্ট্র যেদিন রাজার মধ্যে মূর্ত্ত ছিল সেদিন সে রাষ্ট্রের অধিকার সংকুচিত করেছে, প্রজার অধিকার প্রসারিত করেছে। Magna Cartaর অনুরূপ অন্য কোনো ইতিহাসে আছে কি? রাজাকেও ক্রমশঃ ডেমক্রাট করে আনা হয়েছে। নাম ছাড়া রাজা-প্রজার প্রভেদ বড় কিছু নেই। ফ্রান্স ও ডেমক্রেসীর দেশ। কিন্তু তার ডেমক্রেসী ভুঁইফোঁড়। ফরাসী বিপ্লব আমেরিকার স্বাধীনতা আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত এবং উক্ত আন্দোলন ইংলণ্ডত্যাগী ইংরেজেরই কীর্ত্তি (কিম্বা কুকীর্ত্তি। বাদলের মনে হয় আমেরিকা ইংলণ্ডের সংযুক্ত থাকলেই ভাল করত। অবশ্য অধীনের মত নয় সমানের মত।) ফরাসী যে লিবার্টী মন্ত্রের উপাসক সে বিষয়ে বাদলের সন্দেহ ছিল না, কিন্তু লিবার্টীর চেয়ে ইকুয়ালিটীর উপর ফরাসীর বেশী ঝোঁক। ফরাসী যদি সাম্য পায় তবে স্বাধীনতা ছাড়তে রাজী। কিন্তু ইংরেজ মোটের উপর উঁচু নীচু ভালবাসে, তার সমাজে অনেক ধাপ, কিন্তু বাক্যের ও কর্ম্মের স্বাধীনতা প্রত্যেকের আছে, তার চেয়ে যা দামী—চিন্তার স্বাধীনতা—তা ক্যাথলিক ফরাসীর নেই প্রোটেষ্টাণ্ট ইংরেজের আছে।

বাদল সাম্যের চেয়ে স্বাতন্ত্র্যকে কাম্য মনে করে। সে যেদিকে দু'চোখ যায় সে দিকে চলতে চায়, কেউ যদি তাকে ঠেকাতে আসে তবে তার বিরক্তির সীমা থাকে না। ইংলণ্ডে এসে অবধি সে প্রতি সন্ধ্যায় পায়ে হেঁটে বেড়িয়েছে, অন্ধকার গলির ভিতর ঘুরেছে, কেউ তাকে বাধা দেয়নি, সন্দেহ করে তার পিছু নেয় নি। ইংলণ্ডের পুলিশ ভদ্র। তার কারণ পুলিশের কাজই হল ব্যক্তির স্বার্থ সংরক্ষণ করা—প্রত্যেক ব্যক্তির। যখনি পুলিশের দ্বারা ব্যক্তির অমর্য্যাদা ঘটেছে তখনি তার প্রতীকারের জন্য লোকমত জাগ্রত হয়েছে। বাদলের ইংলণ্ডে আসার সমসাময়িক একটি ঘটনা বাদলের মনে পড়ে। হাইড পার্কে একজন স্বনামধন্য বিবাহিত পুরুষের সঙ্গে একটি শ্রমিক শ্রেণীর অনূঢ়া তরুণীকে কুরুচিকর অবস্থায় পুলিশে দেখতে পায় এবং ধরে নিয়ে

থানায় আটকে রেখে মেয়ে পুলিশের বিনা সতায়তায় তাকে প্রশ্ন বাণে জর্জ্জর করে। পার্লামেন্টে এ নিয়ে কথা উঠল, অনুসন্ধানের জন্য কমিশন বসল। ব্যক্তির স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ!

স্বাধীনতা যদি থাকে তবে সাম্যের কি যে প্রয়োজন বাদল বুঝতে পারে না। সে ত কারুর সঙ্গে সমান হতে চায় না? সে নিজেই একটা দিকপাল, একটা গৌরীশঙ্কর কি কাঞ্চনজঙ্ঘা। অপরে তার সমান হতে সাধনা করতে চায় ত করুক, কিন্তু বাদল বর্‌বে সাম্যের কামনা! তবে আইনের চোখে সবাই সমান হোক; যথা ডিউক অব ইয়র্ক তথা জন স্মিথ্ কয়লার খনির মজুর। পার্লামেন্টের নির্ব্বাচক হবার অধিকার সকলকে দেওয়া হোক। সকলের প্রাণের দাম সমান হোক, একটা বুড়ো ভিখারীকে খুন করলে যে অপরাধ একজন ধনকুবেরকে হত্যা করলে তার চেয়ে বেশী অপরাধ যেন না হয়। এগুলো সাম্যবাদের অঙ্গ নয়, এগুলো স্বাতন্ত্র্যবাদেরই সামিল। কাজেই বাদল সাম্যবাদের কামাতা দেখতে পায় না।

প্রত্যেকে নিজ নিজ অবস্থার উন্নতি করুক, অনবরত করতে থাকুক। প্রত্যেকে ক্রমাগত এগিয়ে যাক, ধনে মানে জ্ঞানে কর্ম্মে চিন্তায়। সমাজ ত একটা শোভাযাত্রার মত। পিছনে জায়গা পাওয়া লজ্জার কথা নয়, পেছিয়ে পড়াটাই লজ্জার। বাদল ত ক্লাসে সকলের শেষ সারিতে বসত ও বসে।

বাদলের মতবাদ অবিকল লিবারল দলের মতবাদ। কন্সারভেটিভরা পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যের শত্রু, সোশ্যালিষ্টরাও তাই। দু'পক্ষই রাষ্ট্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়ে ঐ ক্ষমতার দ্বারা ব্যক্তির উপর জবরদস্তি করতে কৃতসংকল্প। একপক্ষ গাঁথবে উঁচু tarrif দেয়াল। বিদেশী পণ্যের উপর চড়া শুল্কের হার উশুল করবে। অপর পক্ষ চায় বড় লোকের উপর বিপুল ট্যাক্স চাপিয়ে সেই টাকায় বেকারকে অলসকে অপটুকে পরম স্বাচ্ছন্দ্যের সহিত প্রতিপালন করতে। কেলেঙ্কারী! Dole-এর টাকায় ওরা বিয়ে করে, সন্তান সন্ততির জনক জননী হয়। ধনীর চাঁদায় চলতে-থাকা হাঁসপাতালে চিকিৎসা পায়, ধনীর চাঁদায় সমুদ্রকূলে হাওয়া বদলাতে যায়। ছিঃ ছিঃ ওদের আত্মসম্মান নেই!

৭৩

পলিটিক্স নিয়ে মিসেস্ উইল্‌স্ তর্ক করেন না। কিন্তু মিষ্টার উইল্‌স্ বাদলের সঙ্গে খুব ভদ্রভাবেই বাক্য বিনিময় করেন কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত মেজাজ ঠাণ্ডা রাখতে পারেন না। ভদ্রলোক খেটে খুটে অনেক দূর থেকে আসেন। পেট ভরে রোষ্ট বীফ খান, আর জন বুলের মত চেহারা। প্রথম যৌবনে নাকি বক্সার ছিলেন, এখনো তার পরিচয় দিয়ে থাকেন স্ত্রীর উপর রেগে টেবিলের উপর মুষ্ট্যাঘাত করে। (বাদল ক্রমশ জানতে পেরেছে যে তিনি স্ত্রীকে মুষ্ট্যাঘাত করতে একদা ভালবাসতেন, কিন্তু স্ত্রী যেদিন থেকে ভোট দেবার অধিকার পেয়েছেন সেদিন থেকে তিনিও স্ত্রীর প্রতি হঠাৎ সশ্রদ্ধ হয়েছেন।) তারপরে একে একে নানা ব্যবসায় লোকসান দিয়ে অবশেষে করছেন ডক্‌-এর ম্যানেজারী। অদ্যাপি তাঁর ভূতপূর্ব্ব দোকানের পুরান ছাপান কাগজপত্র বাড়ীতে পাওয়া যায়, গিন্নী তাতে বাজার-হিসাব লেখেন।

এ বাড়ীতে আসার পর থেকে মিষ্টারের সঙ্গে বাদলের তেমন বনছে না। মিষ্টার হচ্ছেন গোঁড়া সোশ্যালিষ্ট। সান্ধ্য সংবাদপত্রখানা হাতে করেই বাড়ী ফেরেন, বাদলের মত ট্রেণে কিম্বা বাস্‌-এ ফেলে আসেন না। এসেই গজ্‌ গজ্‌ করেন, কন্সারভেটিভ্‌রা arn't playing fair। কিম্বা থেকে থেকে একটু হি হি করেন, বাই-ইলেকশনগুলোতে লেবার পার্টির লোক জিতে চলেছে। এই বলে আওড়ে যান:—Darlingtion, Stockfort, East Ham, Hammersmith, Northampton না, না—Stourbridge, Northapmton, Hull, বাদলের দিকে চেয়ে বলেন, "Now what do you say to that?"

আগামীবার জেনারেল ইলেকশনে লেবার পার্টি যে পার্লামেন্টের সংখ্যাভূয়িষ্ঠ দল হবে এ বিষয়ে মিষ্টার উইল্‌সের সংশয় দিন দিন অপসৃত হচ্ছিল। কিন্তু তাঁর স্ত্রীর সংশয়াত্মক শ্লেষ তাঁকে ক্ষিপ্ত করে তোলে। স্ত্রী বলেন, "আর দেরি নেই, জর্জ। 'Jerusalem on England's green and pleasant isle'—এর আর দেরি নেই।"

বাদল বলে, "কিন্তু আমি আপনার সঙ্গে একমত মিষ্টার উইলস্। লেবার পার্টি এবার পার্লামেন্টে লাট বহর নিয়ে ঢুকবেই। বাদল কথাটা গম্ভীরভাবে বলে, তবু মিষ্টার উইল্‌সের বিশ্বাস হয় না যে বাদল ব্যঙ্গ করছে না। তিনি বাদলের দিকে কটমট করে তাকান।

বাদল যেন মস্ত রাজনীতিবিশারদ। বলে, "আমার ভবিষ্যদ্বাণী হচ্ছে এই যে লেবার যদিও কন্সারভেটিভ্‌দের থেকে সংখ্যায় গুরু হবে এবং লিবারলদের থেকে ত হবেই, তবু অন্য দুই দল যোগ দিলে হবে সংখ্যায় লঘু।"

মিষ্টার উইল্‌স্ চটে গিয়ে বল্লেন, "Damn the Liberals." তাঁর মনে ১৯২৪ সালের সেই Zinovieff letter-এর স্মৃতি হুল ফোটাতে থাকল।

বাদলও ক্ষেপে গেল। বল্ল, "আমি আপনাকে বলে রাখছি দু'পক্ষের কোনো পক্ষকেই এবার লিবারলরা সাহায্য করবে না। নেমকহারাম লেবার, চিরশত্রু কন্সারভেটিভ্‌,

কোনো পক্ষকে এবার মন্ত্রীত্ব করতে দেওয়া যাবে না। লিবারলরা নিজেরাই গবর্ণমেণ্ট চালাবে।"

উত্তেজনার মুখে বাদল একথা বল্ল বটে, কিন্তু পরে তার মনে হয়েছিল, সে কি সম্ভব? কোনো একটা বিল্ পাশ না হলেই ত পদত্যাগ করে লজ্জা পরিপাক করতে হয়।

সে মুখ তুলে দেখ্ল যে মিষ্টার ও মিসেস্ দু'জনে মুখ টিপে টিপে হাস্‌ছেন। হয় ত ভাব্‌ছেন, ছোকরা বদ্ধ পাগল।

অবশেষে মিষ্টার বল্লেন, "ভারতবর্ষে বুঝি তাই হয়?"

বাদল আহত বোধ করল। তর্কের মাঝখানে দেশ তুলে অপমান করা কেন? তা ছাড়া বাদলকে যে ভারতবর্ষের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, ভারতীয় মনে করে, তাকে বাদল ক্ষমা করে না। সেদিন মিসেস্ উইল্‌স্ জিজ্ঞাসা করছিলেন, "বাট, তোমাদের ভাষায় scissors-কে কি বলে?" বাদল বলেছিল, "কি জানি, কুইনী, আমি ও ভাষা ভুলে গেছি।" তিনি এমন ভাবে তার দিকে তাকিয়েছিলেন যেন সে একটা দ্রষ্টব্য বস্তু। আর সেও তাঁর উপর তেমনি রাগ করেছিল যেমন রাগ করেছিল কুম্ভকর্ণ, হঠাৎ তার ঘুম ভেঙে দেওয়ায়। মনে মনে একটা ভাব নিয়ে তার দিন কাটছিল, সে ইংলণ্ডে আছে, সে ইংরেজ, ইংলণ্ডের বাইরে তার অতীত ছিল না। হঠাৎ তার ধ্যানভঙ্গ করা হল।

তথাপি এ বাড়ী ছেড়ে অন্যত্র যাবার চিন্তা তার মনে উদিত হয় নি। হল, যখন মিষ্টার উইল্‌সের সঙ্গে তার ক্ষণস্থায়ী খণ্ডযুদ্ধ ঘটতে লাগ্‌ল। একদিন সে বল্‌ছিল, "আজ এক পাদ্রী এক মজার প্রবন্ধ লিখেছেন। তিনি বলেন জন্মনিয়ন্ত্রণ নিশ্চয়ই দরকার, কিন্তু রাস্তার কোণের nasty flapperরা যেভাবে করে সেভাবে, না, St Joseph, St Ethelreda ইত্যাদি যেভাবে করতেন সেভাবে?"

মিসেস উইল্‌স্ খিল খিল করে হেসে উঠ্‌লেন। বল্লেন, "পাদ্রীসাহেবের রসবোধ আছে।"

বাদল বল্‌তে লাগ্‌ল, "কিন্তু মজা সেখানে নয়, কুইনী। একটু পরেই পাদ্রী পুঙ্গব বল্‌ছেন, ক্যাথলিকদের সংখ্যা হু হু করে বাড়্‌ছে, নিগ্রোদের সংখ্যা লাফ দিয়ে বেড়ে চলেছে, আমরা যদি অস্বাভাবিক উপায়ে নিজের সংখ্যা কমাই ও বলবীর্য্য হারাই তবে আমাদের ভবিষ্যৎ থাকে না। পরিশেষে তিনি দ্বাদশ সন্তানের জনক কোন এক ব্যক্তিকে আদর্শ বলে রচনা শেষ করেছেন।

জর্জ এতক্ষণ গম্ভীরভাবে আহার করছিলেন। আহার্য্য অবশিষ্ট রেখে তিনি কথাবার্ত্তায় যোগ দেন না। পরিতৃপ্তির ভার সংবরণের জন্য তিনি ভাল করে ঠেস দিয়ে বস্‌লেন ও বিনাবাক্যব্যয়ে পাইপ ধরালেন। দাঁতের ভিতর দিয়ে কথা বেরিয়ে এল, "তোমরা আমাকে মাফ করবে কেমন?"

তিনি বাদলকে জেরা করলেন। "কেন? কি দরকার? জন্মনিয়ন্ত্রণের অভাবে সমাজে কি ক্ষতি ঘট্‌ছে?"

বাদল হতাশ হয়ে বল্ল, "আপনি নিজেই এর উত্তর দিন, মিষ্টার উইল্‌স্। কেননা আপনার দলের লোকই ভুক্তভোগী।"

মিসেস্ উইল্‌স্ কপট গাম্ভীর্য্যের সহিত বল্লেন, "বাটের কাণ্ডজ্ঞান নেই। কীটপতঙ্গের মত সন্তান বৃদ্ধি না করলে লেবার দলের ভোটার সংখ্যা বাড়্‌বে কি করে শুনি? তোমার অত সাধের ডেমক্রেসীর পরিচালন ভার ত সেই দলের হাতে যাদের পিছনে ভোট বেশী?"

মিষ্টার উইল্‌স্ যেন ধরা পড়ে গেলেন। স্ত্রীকে বক্র দৃষ্টিতে শাসন করলেন। বাদলকে বল্লেন, "ক্যাপিটালিষ্টদের হাতে আছে ধন। আমাদের হাতে আছে জন। আমরা যদি আমাদের অস্ত্র ত্যাগ করি তবে অনায়াসে হটে যাব। ওরা আগে ওদের অস্ত্র সমর্পণ করুক, তার পরে আমরাও আমাদের করব।"

৭৪

এমন বাড়ীতে টিঁকে থাকা বাদলের পক্ষে দুষ্কর হচ্ছিল। কুইনী সব কথাতেই সবাইকে ব্যঙ্গ করেন, কখনো জর্জকে কখনো বাদলকে কখনো আমন্ত্রিত অতিথিদের। তাঁর নিজস্ব মত বা যে কি তা বাদল বহু চেষ্টা সত্ত্বেও আবিষ্কার করতে পারল না। বাদলের ধারণা প্রত্যেকেরই একটা সুস্পষ্ট সুবোধগম্য মতবাদ থাকা আবশ্যক। যার নেই সে অমানুষ। তাই কুইনীর প্রতি সে বিমুখ হয়ে উঠ্‌ছিল। বাদলের যদি অন্তর্দৃষ্টি থাকত তবে সে এই তিন মাসে নিশ্চয়ই টের পেত যে কুইনীর প্রধান দুঃখ তিনি নিঃসন্তান। পলিটিক্স ইত্যাদিতে তাঁর মন নেই, তবে স্বামীর যখন ওতেই মন বেশী তখন ওবিষয়ে উৎসাহের ভাণ করতে হয়। বাদলকে তিনি সেদিন বল্‌ছিলেন, "রাম্‌সিম্যানরা স্বামীস্ত্রী পার্লামেণ্টের মেম্বার হলেন। তুমি দেখো, বাট, আমরাও একদিন ওঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করব—জর্জ ও আমি।"

জর্জের উপর বাদলের বিরূপ ভাব প্রথম থেকেই। তিনি কথায় কথায় ভারতবর্ষের মহারাজদের টেনে আনতেন, তাঁর বিশ্বাস বাদল রাজবংশীয় হবে। তিনি কোথায় শুনেছিলেন যে ব্রাহ্মণদের প্রভাব ওদেশের সর্ব্বত্র। কাজেই বাদলও ব্রাহ্মণবংশীয় হওয়া সম্ভব। তারপর বেনিয়াদের ধনের সংবাদ যে ইংলণ্ডে পৌঁছায়নি তা নয়। "The wicked bania"! অতএব বাদল বেনিয়াবংশীয়ও বটে। একাধারে ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণ-বৈশ্য। ভদ্রলোকের অমন বিশ্বাসের কারণ ছিল। বাদল খরচ করত রাজার ছেলের মত। তার নিজের লাইব্রেরীর পিছনেই মাসে চার পাঁচ পাউণ্ড বাঁধা খরচ। প্রতিদিন একে খাওয়ায় তাকে খাওয়ায় এবং বাড়ী

ফিরে এসে গল্প করে। ময়লা কাপড় বলে ফরসা কাপড়কেও সে ধোপার বস্তায় দেয়। রোজই কিছু না কিছু কিনে আনছে। কুইনীকে উপহার দিচ্ছে। একটা সুন্দর রিষ্ট-ওয়াচ, এক তাড়া গ্রামোফোনের রেকর্ড, হাত ব্যাগ, কাপড়ের ফুল।

জর্জের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় বাদল স্থির করল এবাড়ী ছেড়ে দেবে। কোনো বাড়ীতে তিন মাসের বেশী থাকবে না, এ সংকল্প তার মনে পড়ে গেল। তখন সে কুইনীকে না জানিয়ে অন্যত্র থাকবার জায়গা খুঁজল। কলিন্সকে বল্ল, "ওয়াই-এম-সি-এ'তে হবে ?" কলিন্স বল্ল, "উহুঁ। এক বছর আগে যারা আবেদন করেছে তারা এখনো পায় নি।" বাদল ক্ষুণ্ণ হল। তার ভারি ইচ্ছা ছিল যুবকদের সঙ্গে সর্বক্ষণ থেকে একটা নতুন স্বাদ পেতে। হৈ হৈ করবে, টো টো করবে, লণ্ডনের মধ্যস্থলীর হট্টগোল কেমন লাগে সেটার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবে। তার ফলে হয় ত এমন অনিদ্রায় ভুগবে যে হাঁসপাতালে ঢুকবে। সেও ভাল, হাঁসপাতালের অভিজ্ঞতাও তার দরকার। সেখানে রোগীদের নার্সদের সঙ্গে ডাক্তারদের সঙ্গে ভাব করবে। কি মজা!

ব্লুমস্‌বেরীতে দেদার ইণ্ডিয়ান। রাসেল স্কোয়ারেও ইণ্ডিয়ান দেখা যায়। ওদিকে নয়। হ্যাম্পষ্টেড তো ইণ্ডিয়ানদের পাড়া হয়ে উঠেছে। ওদিকে নয়। সিটিতে রাত্রে মানুষ থাকে না, ওদিকে নয়। সাবার্ব এ থাকলে লণ্ডনের জন-সংঘাতমদিরা পান করা যায় না। ওদিকে নয়। বাদল হাইড্ পার্ক ও কেনসিংটন পার্কের সংলগ্ন অঞ্চল পায়ে চষে বেড়াল। এবার তার খেয়াল হল হোটেলে ঘর নেবে। পাওয়া যায়, কিন্তু অনেক ভাড়া। এত ভাড়া দিলে বইপত্র কেনার জন্য বড় বেশী বাকী থাকে না। বাদল সপ্তাহে চার পাউণ্ড অবধি খাওয়া ও থাকার জন্য খরচ করতে ইচ্ছুক। কিন্তু অত সস্তায় ওসব অঞ্চলের হোটেলে জায়গা পাওয়া অসম্ভব। বেচারা বাদলকে ঐ সব অঞ্চলের মায়া কাটাতে হ'ল। সকাল বেলা পার্কে বেড়ান'র আশা রইল না। কত বড় ক্যাসানেবল্ জিনিষ সে হারাল। স্বয়ং বার্ণার্ড শ' সেখানে পায়ে হেঁটে বেড়ান। বাদলের অভিলাষ ঘোড়ায় চড়ে বেড়াবে। পার্কের বাতাস গায়ে লাগলে রাত্রে তার ভাল ঘুম হতে পারে। যাতে ঘুম ভাল হয় সে জন্য সে কত ওষুধ পথ্য খেয়েছে, কিছুতে কিছু হয় নি।

চেল্‌সীর এক রেসিডেন্সিয়াল হোটেলে বাদল আশ্রয় পেল। চেল্‌সীতে চিরদিন সাহিত্যিক ও শিল্পীরা বাস করে এসেছে। সুইফ্‌ট্‌, ষ্টীল্, স্মলেট, লি হান্ট, কারলাইল্, টার্ণার, হুইস্‌লার, রসেটী, এঁরা বাদলের পূর্বাধিবাসী। ম্যানেজার বাদলকে একটি খালি ঘর দেখাতেই বাদলের অমনি পছন্দ হয়ে গেল; বাদল কথা দিল এবং কথার সঙ্গে অগ্রিম টাকা দিল।

মিসেস্ উইল্‌স্ যখন সমস্ত শুনলেন তখন শুধু বল্লেন, "আচ্ছা।" তাঁর মন-কেমন করতে থাকল, কিন্তু মুখে তেমনি কৌতুক হাস্য। বাদল ভাবল, যাক্, তিনিও ছাড়া পেয়ে বাঁচলেন। আমি কি কম জ্বালিয়েছি তাঁকে। সাড়ে বারটা অবধি আমার কোকো তৈরি করে দেবার জন্যে বসে থাকা, এই কষ্ট স্বীকার করার কি মূল্য আমি তাঁকে দিতে পেরেছি। ডিয়ার ওল্ড্ কুইনী। বিদায়কালে তাঁকে সে কি উপহার দিয়ে যাবে ভাবল।

জর্জ প্রমাদ গণলেন। বাদলকে পেয়িং গেষ্ট রূপে পেয়ে তিনি ইতিমধ্যেই ব্যাঙ্কে কিছু জমাতে পেরেছিলেন। স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ওকে কিছু বলেছ টলেছ নাকি?" স্ত্রী উত্তর দিলেন, "ওটা একটা পাগল। বলে তিন মাসের বেশী কোথাও থাকবে না।" জর্জ লক্ষ্মীপেঁচার মত মুখ করে থাকলেন। কি ভাবলেন, হঠাৎ বল্লেন, "বার্ট শুনেছ? লিবারপুলবা ল্যাঙ্কাষ্টার বাই-ইলেকশনে দাঁড়িয়েছে? তোমাকে আমার অভিনন্দন করা উচিত।" কিন্তু ভবী ভোলে না। বাদল বলে, "ধন্যবাদ, মিষ্টার উইল্‌স্। আর একটা কথা শুনেছেন আমি চেল্‌সীতে উঠে যাচ্ছি? বেশী দূর নয়, মাঝে মাঝে দেখা হবে।"

বেগতিক দেখে জর্জ প্রস্তাব করলেন, বাদল যদি তার বন্ধুকে ঐ বাড়ীতে পেয়িং গেষ্ট করে দেয়! ইণ্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে ঐ বাড়ীতে কোনো প্রেজুডিস্ নেই! মিস্ নেয়ো যে কত বড় মিথ্যাবাদিনী সেটা ঐ বাড়ীর মানুষ যেমন বুঝেছে—বিশেষতঃ বাদলের সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য পেয়ে—তেমন আর কেউ এ দেশে বোঝেনি! বাড়ীর ছেলের মত থাকা একমাত্র ঐ বাড়ীতেই সম্ভব!

বাদল বল্ল, "কিন্তু আমার ইণ্ডিয়ান বন্ধু ত দুটি তিনটির বেশী নেই। তাঁরা যেখানে আছেন সেখান থেকে নড়বেন বলে ত মনে হয় না। আপনারা একবার বিজ্ঞাপন দিয়ে দেখুন। লণ্ডনে দু'হাজার ভারতীয় ছাত্র আছে, মিষ্টার উইল্‌স্।"

মিসেস্ উইল্‌স্ রঙ্গ করে বল্লেন কি সত্যি সত্যি বল্লেন বোঝা গেল না,—বল্লেন, "কিন্তু আর একটিও বার্ট নেই, মিষ্টার উইল্‌স্।"

পরদিন বাদল অতি সহজভাবে বিদায় নিল। যেন এক রাত্রির অতিথি। একবার পিছু ফিরে চাইল পর্যন্ত না। ফিরে চাইলে দেখতে পেত মিসেস্ উইল্‌স্ তার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে। তাঁর দৃষ্টি বাষ্পান্ধ। তবু তাঁর অধরে কৌতুকের আভা। (ক্রমশঃ)

শ্রীলীলাময় রায়



অহল্যা ঘাট—কাশী

[এচিং]

শিল্পী—শ্রীযুক্ত রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

রাত্রি, বাঁশ ঝাড়, আকাশে কয়টি তারা

শ্রীযুক্ত মনোজ বসু

বাঁশের আঁধার দোলে হাওয়াতে, মাথায় কয়টি তারা !……

যদি কেউ এসে বাঁশ বাগানের ঝোপের অন্ধকারে
—এমন হোতে ত পারে—
আমারে পলক দেখার আকুতি ভরে' নিয়ে দুই আঁখে
যদি কেউ এসে নিশুতি আঁধারে ওখানে দাঁড়ায়ে থাকে !—
আলো নাই ঘরে, আমারে দেখিতে দুর হ'তে পাবে না সে।
আমার বন্ধ বাতায়নখানি দোলায়ে দীর্ঘশ্বাসে
আমার বাগের সন্ধ্যামণির ফুলগুলো পায়ে দলি'
যাবে দূরে—দূরে—যেথা ওই বিলে ও আকাশে গলাগলি।
সখি, কাজ নাই—একটি প্রদীপ জ্বেলে দাও পইঠাতে
কি জানি, হয়ত মোর লাগি' কেন কাঁদে আঁধিয়ার রাতে !

বাঁশের ঝাড়ের মাথার উপরে তাকায় কয়টি তারা !…

তারাগুলি যদি কোন কিছু বলে শুনিতে ইচ্ছা হয়।

আমি জানি, নিশ্চয়
ওই যে দুইটি জলজ্বলে তারা বাঁশের আগার কাছে
ওরা আকাশেতে আগে ছিল না'ক—নূতন জন্মিয়াছে।
সেদিন যখন কাঁকন ভাঙিয়া সাঁঝের আঙিনে লুটি,—
বলি, "ওগো, জাগো—চোখ মেলো—"
আর টানি তার আঁখি দুটি,
বুকে মুখ ঝাঁপি, ছুটে পায় পড়ি, নয়নে অঘোর ঘোর—
আর কাঁদি—"ওগো, জাগো—জাগো—
তুমি ছাড়া কেহ নাই মোর—"
আঙিনে নয়ন-তারা খুলিল না ; দেখিনি অন্ধকারে
তা'র আঁখি দুটো জোড়া-তারা হ'য়ে উদিল আকাশ-পারে !
রোজ ঘরে ঘরে ওরা খিল দেয়, জাগিয়া থাকে না কেহ—
শুধু আমি একা কান পেতে থাকি ; মিটাইয়া সন্দেহ
ওই বাক্‌হারা তারকারা যদি কোন কথা কহে তাই !—
পহর কেটেছে কত, ওরা কিছু কোনদিন কহে নাই।
সখি, দেখ—দেখ—ওই বাঁশবনে আলো করে চিক্‌চিক্—
আমার তারকা,—হোতে পারে—
আজ আমারে খুঁজিছে…ঠিক !
হায়, সে অবোলা বেড়ায় বেথে কি শেষকালে যাবে ফিরে ?
সখি, কাজ নাই—আজ দোরগুলো খুলে রাখো এ কুটীরে।

শ্রীমনোজ বসু



নীড়

শ্রীযুক্ত ব্রতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জয়ন্ত চাটুর্য্যে জমিদার, তার উপর মস্ত বড় ব্যারিষ্টার; সুতরাং পয়সার অভাব নেই। তার একমাত্র অভাব সংসারে মানুষের। আপনার বলতে জগতে কেউ নেই বল্লেই হয়। বিয়ে করেনি, আর করবার আশাও নেই। বন্ধু বান্ধবে এই কথা নিয়ে চোখ টিপে হাসাহাসি করে, অর্থাৎ জয়ন্তর স্বভাব নাকি ভাল নয়। জয়ন্তও তাদের সঙ্গে হাসে।

বয়স তার ছত্রিশ পেরিয়ে গেছে; কিন্তু দেখে তাকে আরও বেশী বয়স্ক বলে মনে হয়। কানের দু'পাশের চুল এরই মধ্যে ধপ্ধপে সাদা হোয়ে গেছে; গায়ের রংটা এক কালে ছিল উগ্র রকমের সাদা, এখন দাঁড়িয়েছে তামাটে ভাব। শ্যামবাজারের প্রকাণ্ড পৈতৃক বাড়ীতে সে থাকে একলা।

সেবার পূজার ছুটিতে সে বেরলো পশ্চিম বেড়াতে; ইচ্ছে রইল আগ্রা যাবে। তাজ সে অনেকবার দেখেছে, তবু আশ মেটেনি।

সেদিন সকালে পশ্চিমের একটা কোন্ ছোট ষ্টেশনে তাদের গাড়ি গেল দাঁড়িয়ে। জয়ন্ত প্রথম শ্রেণীর যাত্রী অতএব গার্ড খাতির কোরে খবর দিয়ে গেল, যে সামনের লাইনে কোথায় মালগাড়ি উল্টে গিয়ে রাস্তা বন্ধ হোয়েছে সেইজন্যে এ গাড়ি ছাড়তে দু'এক ঘণ্টা দেরী হবে।

জয়ন্ত একখানা ইংরাজি মাসিক পত্র খুলে পড়তে বসলো।

হঠাৎ কখন তার কানে এল একটি মিষ্টি গলার আওয়াজ—কে বোলছে "ভজু ঐ দেখ আমার বাবা।" জয়ন্ত বই থেকে চোখ তুলে দেখলে, লাল কাঁকর বিছানো platform-এর উপর দাঁড়িয়ে তারই দিকে হাত বাড়িয়ে একটি আট নয় বছরের মেয়ে সঙ্গের চাকরকে দেখাচ্ছে।

জয়ন্তর বুকের মধ্যে তোলপাড় কোরতে লাগল। সকালের পরিপূর্ণ আলোর মাঝে মিষ্টি গলার মধুর ডাক "আমার বাবা!" এই ছোট্ট দুটি কথা তার চারিপাশে স্বপ্নের মোহন জাল বুনতে সুরু কোরলে। অপরিচিত গলার এই একান্ত আপন ডাক তাকে যেন কি মন্ত্র গুঞ্জনে আবিষ্ট কোরে ফেল্লে।

সে ঘোর কাটিয়ে, জয়ন্ত তাড়াতাড়ি উঠে কামরার দরজা খুলে হাত বাড়িয়ে মেয়েটিকে ডাকলে। সে অমনি চাকরের হাত ছাড়িয়ে সেইদিকে ছুটে এল।

জয়ন্ত তাকে ভিতরে তুলে নিয়ে নিজের কাছে বসালে। মেয়েটির একখানা হাত নিজের কঠিন মুঠোর মধ্যে ধরে জিজ্ঞাসা কোরলে "তোমার বাবার নাম কি?"

মেয়েটি হেসে গড়িয়ে পড়লো জয়ন্তর গায়ে, বল্লে "তুমি বুঝি জাননা আবার? আমার বাবার নাম শ্রীজয়ন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়; মস্ত বড় জমিদার, ওকালতি করে।" বোলে ঘাড় বাঁকিয়ে চোখের কোণ দিয়ে জয়ন্তর পানে চেয়ে রইল।

এযে সেই হাসি, সেই চাউনি; এমন কি ঠোঁটের কোণের বাঁকা রেখাটিও যেন তারই মুখ থেকে তুলে আনা। জয়ন্ত কোনও কথা বলতে পারলে না। তার মনের মধ্যে তখন যে ব্যাকুল স্মৃতির ঝড় উঠেছে তাকে সে সামলাতে পারছিল না। কোন এক সময় তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল "আমি কি তোমার বাবা?"

মেয়েটি অমনি ঘাড় নেড়ে বলে উঠলো "বা! তা নয়ত কি? এই দেখনা!" সে তার গলায় পরা সোনার সরু হারে গাঁথা একটা পদক কাপড়ের নীচে থেকে টেনে বার কোরলে। তারপর তার ঢাক্না খুলে দেখালে তার মধ্যে জয়ন্তর ২৬।২৭ বছর বয়সের একটি ছবি।

জয়ন্তর সমস্ত মুখ শাদা হোয়ে গেল। এ পদক সে পাঠিয়েছিল তার হৈমকে, বিলেত থেকে; এ ছবিও বিলেতে তোলা।

জয়ন্ত আর কোনও কথা না বলে মেয়েকে কোলে কোরে নেমে গেল গাড়ি থেকে। চাকরকে বলল তার সব জিনিষপত্র নামিয়ে নিতে।

ষ্টেশন প্ল্যাটফর্‌ম্ পার হোয়ে যে লাল রাস্তাটি চলে গেছে, তার তুদিকে ছোট ছোট বাড়ি বাগান দিয়ে ঘেরা। তারই একটা বাড়িতে জয়ন্ত আর মেয়েটি ঢুকলো।

বাগানের রাস্তার কাঁকরে তাদের পায়ের আওয়াজ পেয়ে হৈম ঘর থেকে বেরিয়ে এল। জয়ন্তকে দেখে চম্‌কে উঠে বল্লে "মাগো, কি চেহারাই হোয়েছে! এস ঘরে এস।"

হৈমর গলার স্বরে জয়ন্তর সমস্ত শরীর থর্ থর্ কোরে কাঁপছিল; সে হৈমর কাঁধে একটা হাত রেখে ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

জয়ন্ত যখন এম, এ, পাশ কোরে বাড়িতে বসে আছে, সেই সময় ওর সঙ্গে হৈমর দেখা হয়। হৈম সেই বৎসর আই, এ, পরীক্ষা দিয়ে কলকাতার একটা ছোট মেয়ে স্কুলে শিক্ষয়িত্রীর কাজ নিয়েছে। সেই স্কুলেরই কি একটা উৎসব উপলক্ষ্যে জয়ন্তর সঙ্গে হৈমর হোল দেখা। প্রথম সাক্ষাতেই ওদের তুজনের ভবিষ্যৎ মিলনের সূত্রপাত হোয়েছিল। তুজনে তুজনকে দেখে সঙ্কোচ অনুভব করেনি।

তারপর ওদের দেখা হয়েছে অনেকবার। হৈম কথা কয় অনর্গল, যেন পাখীর অবিশ্রাম কাকলি। জয়ন্তর মজা লাগে ওর কথা শুনতে। প্রতিদিনই ওদের মনে হোত আজ যেমন ভাবে পরস্পরকে পরিপূর্ণরূপে পেয়েছি এমন আর কোনও দিনই ঘটেনি। কিন্তু ছাড়াছাড়ি হবার সময় রোজই মনে হয়েছে যেন অনেক কিছু বাকি রোয়ে গেল।

এই পৃথিবীর মধ্যে তারা নিজেদের একটি জগৎ সৃষ্টি কোরে নিয়েছিল; তারই মধ্যে তুজনের ঘোট্‌তো দৈনন্দিন মিলন। একটি অম্লান আনন্দের জ্যোতিতে তুজনে পরস্পরকে জানতে পেরেছিল।

হৈম সে কুড়িয়ে পাওয়া মেয়ে। ছোট বয়স থেকেই খৃষ্টান অনাথ-আশ্রমে মানুষ হোয়েছে। মা বাপকে তার মনে পড়ে না। আর কোনও যে আত্মীয় স্বজন আছে একথাও সে জানে না।

তার বিশ বছরের শুষ্ক মন জয়ন্তর ভালবাসায় আর্দ্র হয়ে একটি অপরূপ শ্রী ধারণ কোরলে। এতদিনে সে যেন আশ্রয় পেলে। জয়ন্তকে সে তার মন দিয়ে সর্ব্ব দেহ দিয়ে সদাই বেষ্টন কোরে থাকতো। সে দিলে জয়ন্তর কপালে পরিয়ে তার ভালবাসার রাজটীকা, জয়ন্ত নিলে তাকে নিজের মনোরাজ্যে নব-বধূর বেশে বরণ কোরে।

জয়ন্ত চিরদিনই খাম-খেয়ালি, ছন্নছাড়া, একথা হৈম জেনেছিল, তাই বেচারার ভয়ের আর সীমা ছিলনা, কবে বুঝি কোন অঘটন ঘটে, বুঝি জয়ন্তর ভালবাসার জোয়ারে ভাঁটার টান দেখা দেয়। ভীরু পাখীর মত হৈম, জয়ন্তর বুকের মাঝে লুকিয়ে থাকতে চাইতো।

জয়ন্তর কাছে হৈম যেন নতুন খেলনা। সে তাকে রোজই নতুন নতুন সাজে সাজাতে চাইতো; উপহারের বন্যায় তাকে অস্থির কোরে তুলতো। হৈম যে-সব কথা কোনও দিন শোনেনি এমনি অভাবনীয় কথা কোয়ে তাকে লজ্জায় রাঙিয়ে দিত, কাঁদাতো, হাসাতো। জয়ন্তর ভালবাসা যেন কাল-বোশেখীর ঝড়, হৈমর সত্তা উড়িয়ে দিয়ে সে আপনার লীলাতেই আপনি মত্ত।

একটা রঙিন নেশার ঘোরের মধ্যে দিয়ে তাদের মিলনের প্রথম বছর কেটে গেল। জয়ন্ত অনেকবারই হৈমকে বিয়ে কোরতে চেয়েছে। হৈম ঘাড় নেড়ে বলেছে "তুমি আমার রূপ-কথার রাজপুত্তুর; তেমনিই থাক চিরদিন। ঘরের মানুষের মত তোমায় দেখতে পারব না। সংসারের হাজারো কাজের মধ্যে তোমায় পাবার আমার অবকাশ কোথায়?"

জয়ন্ত ওর কথায় হেসে বলে "চিরদিন আমি তোমার খেলার সাথী হোয়ে থাকি—তাই কি তুমি চাও?"

হৈম বলে "হ্যাঁ।"

ওদের জীবনে এখন ভালবাসার ঝড়ের বেগ কমে এসেছে; এখন যে ওদের মাঝে পরিপূর্ণ জানাজানির

দক্ষিণে হাওয়া। হৈম যেন নিশ্বাস ফেলবার সময় পেয়েছে। জয়ন্তর অনিশ্চিত জীবনটাকে সে এখন নিশ্চিতের পথে নিয়ে যাবার চেষ্টায় উঠে পড়ে লেগেছে; তাই যেদিন জয়ন্ত বিলেত গিয়ে ব্যারিষ্টার হোয়ে আসবার সঙ্কল্প জানালে, সেদিন হৈমর বুকের মধ্যে কান্নার অকূল সমুদ্র দুলে উঠলেও তার কালো চোখের তটে তার আভাষ পাওয়া যায় নি।

শরতের নীল আকাশে তখন পালে পালে সাদা মেঘের যাতায়াত সুরু হোয়েছে; হৈমর মন হোল উতলা। জয়ন্তও এই সময় বলে যাবার কথা। সে যেন জয়ন্তর চলার পথের শ্যামল ছায়া; ক্ষণিক বিশ্রামের পরেই কি পথের পথিক তাকে ছেড়ে যাবে? আর সেই থাকবে কেবল আপনার সুনিবিড় অন্ধকারে আপনি নিমগ্ন হোয়ে?

হৈম ব্যাকুল দুই হাত দিয়ে জয়ন্তর একটা হাত চেপে ধরে বল্লে "আমার একটা কথা রাখবে? যে কটা মাস আছে, আমায় কোথাও কলকাতার বাইরে নিয়ে চল।"

জয়ন্ত বল্লে "কিন্তু তোমার কাজ?"

হৈম বাধা দিয়ে বলে উঠলো "থাকগে আমার কাজ। এই কটা দিন তোমায় কাছে রাখতে চাই।"

তাই হোল; তারা গেল জসিডি। হৈম পাতলে সেখানে সংসার; জয়ন্তকে লাগিয়ে দিলে বাজার করার কাজে। অতএব ঘরে রোজই আসতে লাগলো দরকারের চেয়ে অনেক বেশী জিনিষ। তা'তে তাদের রোজই নব নব পাক-প্রণালীর আবিষ্কারের সুবিধেই হোল। এই অপচয়ের খেলায় জয়ন্তর ভারি উৎসাহ। কিন্তু এ খেলা হৈমর সইল না বেশী দিন।

এই যে পুতুল খেলার সংসার তারা পেতেছে এশুধু দুদিনের জন্যে, এই কথা যখন তার মনে হয় তখন সে অপরিসীম ব্যথায় ব্যাকুল হোয়ে ওঠে! জয়ন্ত এই কটা দিন সুধায় ভরে দিয়ে গেল; সেই সুধা হৈম পান কোরেছে আকণ্ঠ; জয়ন্ত যাবার সঙ্গে সঙ্গেই সেই সুধা তো বিষিয়ে উঠবে। হৈম তখন বাঁচবে কেমন কোরে?

হৈমর নিজেকে বড় দুর্ব্বল মনে হোতে লাগলো। সে ভবিষ্যৎ অন্ধকারের জন্যে তার জীবনে প্রদীপ খুঁজে বেড়াতে লাগলো। জয়ন্তর বিচ্ছেদে সে চায় তার দেহমন দিয়ে জড়িয়ে থাকতে এমন একটি অবলম্বনকে যা জয়ন্তর একান্ত আপন তার নিজেরও অতি আপনার। সে চায় এমন জিনিষ যা চিরদিনের; যার মধ্যে চিরকালের মত জয়ন্ত ধরা পড়ে থাকবে। পালিয়ে গিয়েও পালাতে পারবে না। হৈম দুর্ব্বল, সে শুধু স্মৃতি নিয়ে বেঁচে থাকতে পারবে না।

তাই ভীরু দুরু দুরু বুকে সকল বাধা সরিয়ে আপনিই ধরা দিলে জয়ন্তর কাছে।

এবার আবার তাদের হোল নতুন করে পরিচয়। বিচ্ছেদের যে কটা দিন বাকি, সেই কটা দিনকে তারা যেন নিষ্পেষিত কোরে আপনাদের মধ্যে বিন্দু বিন্দু মধু সঞ্চয় কোরে নিতে চায়। তাদের দিনগুলি দিয়ে যেন তারা আনন্দের মালা গেঁথে চল্ল, আসন্ন বিরহের গলায় পরাবে বলে।

জসিডি থেকে ফেরবার সময় হোয়ে এসেছে। সেদিন তারা গিয়েছিল মাঠের মধ্যে দিয়ে বেড়াতে, একটা আধ শুকনো নদীর ধারে।

মহুয়া গাছের তলায় শুকনো পাতার উপর শু'য়ে হৈম জয়ন্তর কোলের উপর একটা হাত রেখে বল্লে "এ জীবনে যা কখনও পাই নি, পাবার আশা ছিল না, তা তোমার কাছ থেকে পেয়েছি। এতদিন ছিলুম আমি অপূর্ণ, তুমি আমায় পূর্ণ কোরেছ। আমার এই বিশ বছরের ব্যথা তুমি এক মুহূর্ত্তে ভালবাসার রঙিন ফুলের মালা কোরে গেঁথেছ। আমার মনের গেরুয়া বসন ছাড়িয়ে, পরিয়েছ নব বধূর সাজ।"

হৈমর দুই সজল কালো চোখের পানে চেয়ে কান্নায় জয়ন্তর গলা ভারি হয়ে এসেছিল, সে বল্লে "জীবনের পান্থ-শালায় দুদিনের জন্যে দুজনের হোয়েছিল দেখা। ছেঁড়া কাঁথা গুটিয়ে আজ আবার চলতে হবে; কিন্তু অচিন ঘরের মেয়েকে আমার ঘরের বৌ করে নিতে সর্ব্বস্ব খোয়াতে রাজি ছিলুম, এই কথাটি মনে রেখ।"

হৈম মাথা নেড়ে বলেছিল "ভুলি নি, ভুলব না সে সে কথা। আমি তোমার পথের পাশের ছায়া; ক্লান্ত

হোলে এস আমার কাছে। আমার পথ চলা ফুরিয়ে এসেছে জানি ; যাকে পেয়েছি নিজের মাঝে, সেই আমাকে ঘর বাঁধার কাজে লাগাবে এবার।"

জয়ন্ত কোন কথা বলতে পারে নি, কেবল হৈমকে নিবিড় আলিঙ্গনে কাছে টেনে নিয়েছিল।

জয়ন্ত বিলেত চলে গেছে। সেখান থেকে লিখতো মস্ত বড় বড় চিঠি, হৈম দিত তার ছোট ছোট জবাব।

এক মেলে জয়ন্ত চিঠি পেলে, হৈম লিখেছে "তোমার খুকী অনেকটা আমারই মত হোয়েছে ; কিন্তু তার চোখ দুটিতে তোমার দুরন্তপনার আভাষ পাই। তার চোখের দিকে চাইলে তোমার কথা মনে পড়ে।"

জয়ন্ত চিঠি পড়ে একরাশ খেলনা কিনে পাঠিয়ে দিয়েছিল।

এরপর হৈমর তরফের চিঠি আসা ক্রমশঃই কমে এসে শেষে একেবারে বন্ধ হোয়ে গেল। জয়ন্ত দেশে ফিরে এসেও হৈমর সন্ধান করে তাকে খুঁজে পায় নি।

হৈমর সঙ্গে যে নীড় সে বাঁধতে চেয়েছিল তারই সন্ধানে, তাকে কোরলে ঘরছাড়া। সেযে ধরা দিয়েছিল একদিন, এই কথাটাই রোয়ে গেল ফাঁকি, আর এই যে তাদের দুজনের মধ্যে আড়াল পড়েছে এইটেই হোয়ে উঠলো সত্যি।

আজ সেই আড়ালের আবরণ ছিন্ন কোরে যে ছোট মেয়েটি, জয়ন্তর যৌবনের শেষ প্রহরে তাকে আপন বলে ডাক দিলে সে যেন ওর শুকতারা, সকল অন্ধকার ঘুচিয়ে উদয় হোয়েছে জীবনের আকাশে।

তারই আলোয় হৈম নিয়ে গেল জয়ন্তর হাত ধরে সেই ঘরে যে ঘর সে একদিন বাঁধতে চায়নি।

শ্রীব্রতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মায়ের হৃদয়

(ফরাসীর ছায়াবলম্বনে)

শ্রীযুক্ত কালীপদ মুখোপাধ্যায়, এম্-এ

"মা যাব", বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল খোকা,
তখন সকলে কাঁদিতেছে চারিদিকে :
দিদি তার ভাবে,—আচ্ছা যা হোক বোকা,
একটু বুদ্ধি নাই যে কিছুই শিখে!
মা কি আর বেঁচে র'য়েছে যে নেবে তোকে ?"
কিছু নাহি বুঝি' কাঁদিতেছে শিশু দুখে,
সে দৃশ্য আর দেখিতে না পারি' চোখে
পিতা তা'রে তুলি' দিল তার মা'র বুকে!
অভ্যাস মত বুকের বসন তুলি'
স্তনপান শিশু করে বিহ্বল হ'য়ে :
মাঝে মাঝে সুধু ছোট ছোট অঙ্গুলি
মা'র মুখে দেয় বুলাইয়া র'য়ে র'য়ে!
আর কি থাকিতে পারে প্রাণহীনা মাতা ?
স্বর্গ হইতে ফিরিল সে ধরণীতে :
সহসা সকলে হেরিল নড়িছে মাথা :
"বাবারে আমার!" বলি' মা হৃদয়টিতে
সযতনে চাপে বুকের বাছারে তা'র!
যাহারা হেরিল, মানে তারা বিস্ময়!
সুধু জননীরা হাসি' ভাবে বার বার,—
"মায়ের হৃদয় এমনই জানি হয়!"

কবি কিরণধন চট্টোপাধ্যায়

ব্রজানন্দ গুপ্ত

কবিকে চিনতুম না, যদিও অনেক কবিতা আগে পড়েছিলুম। মনে করতুম কবি বললে যে রকমটি হয় বুঝি তেমনি,—হয়ত' মাথায় লম্বা লম্বা চুল, সরু ঘাড়, ক্ষীণ তনুবল্লরী ললিতলতার মতো, চোখে সোনার pincenez, গায়ে গরদের পাঞ্জাবী—কিন্তু একি, কল্পনার সে চিত্রটির সঙ্গে মিল মোটেইত' নেই; সহজ সরল মানুষটি, আমাদেরই মতো প্রতিদিনকার জগতের মানুষ, কাব্য জগতের কোন বৈশিষ্ট্যইত' চেহারায় নেই?

আশ্চর্য্য হলুম,— এত বড় একটা বিচ্যুতির জন্য প্রস্তুত ছিলুম না—অবশ্য কল্পনার বিচ্যুতি। কিন্তু বাইরের পরিচয়টা ত' মানুষের অন্তরের পরিচয় নয়, দৈন্য যেখানে মানুষের প্রধান সম্বল সেখানে সে বাইরের সজ্জা দিয়ে আপনাকে ঢাকতে পারে না, বারে বারে তার আত্মপ্রকাশ ঘটবেই। আর অন্তরের ঐশ্বর্য্যে যে অপূর্ব্ব দীপ্তিমান্ তার পরিচয় আপনিই ফুটে উঠবে বুকের মাঝে লুকিয়ে রাখা পদ্মের গন্ধের মতো—যতই না ময়লা কাপড় ঢাকা দিয়েই তুমি রাখো। তাই আশ্চর্য্য হয়েছিলুম—কিন্তু দুঃখিত হইনি।

হাওড়া কলেজে সেই আমার প্রথম দেখা, দূর থেকেই আমি দেখলুম, পরিচয় সেদিন বিশেষ কিছু হ'লো না। তার পর তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ আলোক সঙ্ঘে। সেদিনই হ'লো পরিচয়—দেখলুম, সত্যিই কী চমৎকার, কবি'ত এমনই হওয়া চাই। মনের ভেতর এক সহজ বন্ধুতার বন্ধন যেন ধীরে ধীরে গড়ে উঠলো, যেন উনি আমাদের পরমাত্মীয়। কোন দ্বিধা নেই, সঙ্কোচ নেই, সতেজ আনন্দ রসে আমরা তাঁর সঙ্গে কথা কইলুম, তর্ক করলুম, হো হো করে হাসলুম—কোনো বাধাই অনুভব করলুম না। সেদিন

'প্রীতি দিয়ে গড়িলাম মোদের জগৎ'।

এমনি করে দিন দিন আমাদের আত্মীয়তা বেড়েই চললো। কিন্তু ব্যক্তিগত পরিচয়ের সুযোগ আমার চেয়ে নিবিড় ভাবে আরো অনেকেরই হয়েছে—সে পরিচয় তাঁরাই দেবেন। তারচেয়ে আমার বহুদিন আগের দেখা মানুষটির পরিচয় দেবার চেষ্টা আমি করব—সে মানুষটি আমার মনের মানুষ, তাঁর কাব্যের মানুষ। সেখানে তাঁকে আমি দু'চোখ ভরে দেখেছি, নিবিড় ভাবে চিনেছি, অতীন্দ্রিয়লোকের বিপুল আনন্দ বেদনা দু'জনেই সমভাবে উপভোগ করেছি—ভেবেছি কাছে পেলে কি কবিকে এত করে ভাল বাসতে পারতুম, না এমন করে আত্মবিনিময় করতে পারতুম?

রবীন্দ্রনাথের ভাস্বর প্রতিভার ছায়াতলে আধুনিক বাংলায় যেকটি কবি আত্মপ্রকাশ করেছে তার মাঝে কবি কিরণধনও একজন। তাঁর একটি নিজস্ব বিশেষত্ব আছে, সেখানে তিনি একান্ত একাকী, আপনার আকাশে আপনিই দ্যুতিমান্।

তখন সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ি—হঠাৎ একদিন 'ভারতীতে' 'বাহবা বেড়ে' পড়ে মুগ্ধ হয়ে গেলুম, শুধু তাই নয় অঙ্কের খাতাতে কবিতাটা সমস্ত না টুকে ক্ষান্ত হলুমনা। তখন কবিতাটা শুধু ভালো লেগেছিল, অন্তর্নিহিত ক্ষুরধার ব্যঙ্গোক্তিটি হয়ত ঠিক বুঝতে পারিনি; কিন্তু এখন বুঝি সত্যই কত গভীর মনোবেদনা থেকে এ কবিতার উৎপত্তি। স্বদেশের পরাধীনতার গ্লানি, তার মুক্তির অভিযানে প্রয়াসের শৈথিল্য কবিকে নিরতিশয় ব্যথিত করেছে, দাস-মনোবৃত্তির ফলে আমাদের আদর্শের কী হীনতা ঘটেছে, রাজনৈতিক দলাদলি আমাদের কোথায় দাঁড় করিয়েছে, তা' দেখে কবি ক্ষুব্ধ হয়েছেন। কিন্তু এসবের প্রকাশ হয়েছে সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবে, নয়নে হাসি আর হাতে

বিদ্রূপের কশা নিয়ে কবি তাঁর বাণীর তুরঙ্গ ছুটিয়েছেন দেশের মুহ্যমান চেতনার উপর দিয়ে,—তাদিয়ে তিনি করেছেন আঘাত যদিও বুক তাঁর ব্যথায় ভেঙে গেছে। তবু সোজা কথায় তিনি উপদেশ দেন নি—বোধকবি তীর্থ্যগ-পন্থায় তিনি ছিলেন আস্থাহীন।

"আপিসে চাকরী করিয়া এখন
সুখে শান্তিতে রয়েছি কেমন,
অন্তিমকালে আধা পেন্‌সন্
পাট দুই চাবি শত।
মিছে গোলমাল কর হৈ চৈ
সবুরে ফলবে মেওয়া নিশ্চয়ই,
এখন আমড়া আমড়াই সই
কামড়া কামড়ি ছেড়ে!"

(বাহবা বেড়ে—নতুন খাতা)

কাজের চেয়ে বক্তৃতা দেওয়াটা যে আমাদের বড়ধর্ম্ম এবং সেইটেই আমাদের সব চেয়ে বড় দেশের কাজ তা' কবির দৃষ্টি এড়ায়নি—

"স্বরাজ লাভের সবল পন্থা বাত্‌লে দিয়েছে গান্ধিজী,
তোরা শুধু তাই বক্তৃতা কর বাংলা এবং ইংরিজী।"

(বাংলায় খদ্দর—নতুন খাতা)

রোজকার জগতের ক্ষীণতম বস্তুর অস্তিত্ব থেকে কবির অনুভূতির আক্ষেপ ঘটেনি বলে current topics নিয়ে লেখা কবিতায় দেখি তাঁর অসামান্য control। কোন ছোট জিনিষটিও তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি—মধুর ভাবে তারা তাদের নিজেদের স্থানটুকু দখল করে বসে আছে।

"আলো জ্বেলে ঐ
বিন্দে বুড়ী
চাল ভাজা খৈ
ভাজচে মুড়ী।
ঝাঁট দেয় ঝুঁকে
ময়রা মাগী
তানপুরো বুকে
গায় বিরাগী।
বাজে প্রেয়সীর
চাবির রিং
সোনার চুড়ির
ঝিনিক্ ঝিন্।

(নিদ্রাহীনের স্বপ্ন—নতুন খাতা)

শিশু সাহিত্যে কিরণধন একটা অভিনব ধারার প্রবর্ত্তন করেছেন। তাঁর শিশু-কবিতা পড়লে মনে হয় আমারও সেই শিশু বয়সে ফিরে গেছি, তেমনি মনের আনন্দে হাসি ঠাট্টা, কোলাহল, মারামারি করছি,—

"ভোররাতে গাঁর পথে আধো আলো আঁধারে,
পিছে রেখে গোলাবাড়ী মন্দির বাঁ ধারে,
দলে দলে ছুটে চলে হেসে নেচে কাহারা?"

ছেলের দল ছুটে চলেছে—

"ভাইত'রে তাইতরে হো হো হো হুররে!"
সারা পাড়া জেগে ওঠে কী ভীষণ সুরে রে!
ভাঙে ডাল পাড়ে ফল লাফ মেরে ছেঁড়েফুল,
মরনিং ইস্‌কুল!

সকালে কে কেমন করে উঠেছে, তাই বলছে—

"আমি ভাই কেটে দিয়ে মশারির দড়িটা,
হুকে গু'জে রেখে ছিনু ঘুম ভাঙা ঘড়িটা!"
"জামা টেনে ছিঁড়ে দিলি রাস্‌কেল ড্যাম ফুল!"
মরনিং ইস্‌কুল!

(মরনিং ইস্‌কুল—মৌচাক ১৩৩২)

তার পর—

দুষ্টুর শিরোমণি ত্রিলোচন নন্দী
মাথায় খেলিত তার রকমারি ফন্দি,
টেবি কেটে এলো ক্লাসে জানুয়ারী চৌঠো
হাতে তার চটপটি বাজি চার কৌটো,
সেগুলো সে মেঝে ময় দিল সব ছড়িয়ে
বেঞ্চি চেয়ার টুল চারিদিকে নড়িয়ে,
হেন কালে পণ্ডিত আসিলেন যেমনি
চটিপায়ে কটাফট্; কটাফট অমনি
বাজি গুলো ফেটে করে চারিধারে নৃত্য!
পণ্ডিত একেবারে রেগে খুন্—ক্ষিপ্ত!

(পণ্ডিত মূর্খ—মৌচাক ১৩৩৫)

কত কবিতাই আর উদ্ধার করবো, এগুলো পড়লে মনে হয়, আবার যেন মর্নিং ইসকুল করতে ছুটে চলেছি, ত্রিলোচন নন্দীর মত পণ্ডিতকে ঠকাবার চেষ্টা আমিই যেন করছি। লেখার যে মাপকাটি সব চেয়ে বড়ো তা হচ্ছে এই যে লেখকের আর পাঠকের অনুভূতির তার-গুলো একই সুরে ঝঙ্কার তুলতে পারবে যে লেখা, সেই হবে শ্রেষ্ঠ লেখা। অর্থাৎ, লেখকের অনুভূতির ক্ষেত্রে আর পাঠকের অনুভূতির ক্ষেত্রে কোন পার্থক্যই তখন থাকবে না। ওপরের তোলা কবিতা গুলোর বেলায়ও এনিয়মের ব্যতিক্রম হয়নি।

অতি আধুনিক বাংলা কাব্য-সাহিত্যে বহু-পরিচর্য্যাই দেখি কাব্যের মূল বস্তু হয়ে উঠেছে, কিন্তু কিরণধনের কবিতায় দেখি তিনি একনিষ্ঠ প্রেমিক, কাব্যের যে মানসলক্ষ্মী তাঁর অন্তরে অন্তরে ফুল ফুটিয়েছে সে তাঁর এ জগতের প্রিয়া, নিত্য নব নব রূপে অপূর্ব্বশোভাময়ী। কখনো সে কৌতুকময়ী বালিকা বধূটির মতো হাস্তে উজ্জল হয়ে ভেঙে পড়েছে—

"জুই বেল চাইনা, চাঁপা এনে দাও;
আমি কিতা জানি, তুমি পাও কিনা পাও?

* * * * *

ভালোবাস কিনা বাস—ঠিক বলো না!
চাঁদ ঐ উঠ্ছে, ছাদে চলনা।

* * * * *

না বলে না কয়ে তুমি কেন চুমা খাও?
বলিনাকো যতকিছু আশকারা পাও!

* * * * *

আমি মরে গেলে তুমি খুব কাঁদবে?
তখন এ বাহুডোরে কারে বাঁধবে?
ওকি, ওকি, চোখ থেকে পড়ে কেন জল?
মরে কেন যাব আমি—মিছে করি ছল।

(আব্ দারে আধঘণ্টা—নতুন খাতা)

প্রেমের প্রশান্তির চেয়ে প্রেমের দ্বন্দ্বশীল মুহূর্ত্তগুলি আরো মধুরতর, প্রেম সেখানে আরো বেশী প্রগাঢ়। বিরহ মিলনের এই অপরূপ আলোছায়া তাঁর কাব্যের আকাশকে এক নতুন বর্ণচ্ছটায় বিভাময় করে তুলেছে।

তাই—দিয়েছে সে আড়ি করে—কথা কবেনা,
ফেলেদে মালতী চাঁপা, চামেলি হেনা,
একি সই হ'লো বল
ফুলে নেই পরিমল
চোখে খালি আসে জল
চোখে রবে না,
দিয়েছে সে আড়ি করে—কথা কবে না।

* * * * *

নিষ্ঠুর পায় সুখ বেদনা দিয়ে;
করে খেলা একি ক্রূর আমাকে নিয়ে।
মিছে ছলে বিনা দোষে
ঘা মারে আমারে ওসে,
কাঁদি অভিমানে রোষে
বিজনে গিয়ে,
নিষ্ঠুর পায় সুখ বেদনা দিয়ে।

* * * * *

যাদু জানে সে কুহকী যাদু জানে গো!
ঘা মেরে আমারে ফিরে বুকে টানে লো!

(ফুলের ঘা—উত্তরা ১৩৩৩)

মানুষের যা সব চেয়ে প্রিয় ভগবান্ তাকে ছিনিয়ে নিয়ে অনেক নিকরুণ খেলাই খেলেন যুগে যুগে, কালে কালে; তাই যৌবন যে সময় আপন উচ্ছলতা ভরে আপনি ছুটে চলেছে এমনি মুহূর্ত্তে কবির প্রিয়াকে তিনি এ ধূলার ধরা থেকে টেনে নিলেন। কবির শেষের কথা বলা হ'লো না। মানুষের দুঃখ হয় সব চেয়ে বড়ো যদি শেষের সময় মৃতপ্রিয়জনের দেখা না মেলে বা শেষ কথা বলা না হয়, যদিও শেষের কথা আজও অবধি কোনো মানুষ কোনো মানুষকে শোনাতে পারেনি, কারণ প্রত্যেক কথাটির পর আরেকটি কথা থেকে যায় যেটি হ'তো তার শেষ কথা—তবুও তিনি দুঃখ করেছেন—

সকল কথা সারা হোলো—শেষ কথাটি কানে কানে,
কইব তোমায় মনে ছিল—রইল গাঁথা প্রাণে প্রাণে;

চির জীবন রইল গোপন বুকের মাঝে প্রকাশ ব্যথা,
তারি রাঙা রক্ত-রেখা আঁকি আমার গানে গানে!

(ব্যথার ভুল—বিচিত্রা—১৩৩৫)

প্রিয়াকে হারিয়ে কবি কেঁদেচেন—যে বিরহ এতদিন মরলোকের ছিল তা'হলো আজ পরলোকের। এতদিন নিশ্চিত মিলনের সঙ্গে সঙ্গে পা ফেলে বিরহ চলেছিল বলে' তার উচ্ছ্বাস ছিল হাওয়ার খেলায় পুকুরের যে তরঙ্গ, তার মতো; কিন্তু আজ মিলনে সুদূরতায় তা' হলো সাগরের তরঙ্গের মতো' বিপুল উদ্বেল, চাঁদকে ধরবার জন্তে তার অসহ্য আকৃতি। পুরুরবা যেমন করে উর্ব্বশীর জন্তে কেঁদে কেঁদে বনে বনে ফিরেছিল তেমনি করে ফিরেছেন—মানুষকে নয়, প্রকৃতিকে তিনি বারে বারে শুধিয়েছেন—কোথা তাঁর প্রিয়া। এই বিরহলোক আবর্ত্তন করে কাব্যের যে ধ্বনি-মন্ত্র জেগেছে তাই হয়েছে এর শ্রেষ্ঠ সম্পদ—সেখানেই এই কবিতার সার্থকতা।

"কে পাঠালো উড়ো চিঠি বসন্তের এই রঙীন হাওয়ায়—
ও ফুলেরা জানিস্ তোরা কোনখানে সে কোন ঠিকানায়?
গোলাপ বলে—তার ঠিকানা
আমার ভালো আছে জানা
বকুল বলে—না না না না কাজ কি গোলাপ পরের কথায়?"

(উড়ো-চিঠি—নতুন খাতা)

যদি তিনি প্রিয়াকে না হারাতেন হয়ত এরূপ আমরা তাঁর কাব্যে দেখতুম না। হয়ত অন্যতররূপে তাঁর প্রতিভা বিকশিত হ'ত।

চণ্ডিদাস যে প্রেমের কথা তাঁর কবিতায় সুরু করেছিলেন, আধুনিক কালে তার নতুন করে প্রবর্ত্তন হচ্ছে,—কিন্তু পরকীয়াতেই প্রেমের আশ্রয় যে একান্ত একনিষ্ঠ একথার ধ্রুবত্বেরও কোনো মানে নেই—বড়ো কথা এই যে, যে-প্রেমের আমরা স্রষ্টা তা পাত্র-নির্ব্বিশেষে আসল কিনা। কবির কবিতাসমষ্টি খুব বেশী নয়, কিন্তু এই অল্পের মধ্যেই তাঁর কবিতা প্রেমের সমগ্রতা ও সত্যতা নিয়ে ফুটে উঠেছে। মনে হয়, আধুনিক কালে এগুলি প্রেমের কবিতার সত্য নিদর্শন বলে গ্রাহ্য হবে।

প্রেমের কবিতা ছাড়া অন্য কবিতাতেও তাঁর মনের বিপুল ব্যাপকতার যে পরিচয় পেয়েছি তাও অবহেলার নয়; বিশ্বমানুষের জন্তে তাঁর বুকে ছিল অসীম সহানুভূতি। তিনি ছিলেন একটী সতেজ মানবতার প্রতীক।*

শ্রীবজ্রানন্দ গুপ্ত

* বাজেশিবপুর আলোক সঙ্ঘে কবির শোক সভায় পঠিত।

প্রথম চুম্বন

শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন সেন এম্‌-এ, বি-এল

আমি তা'কে সত্য সত্যই প্রাণের সমান ভালবাস্‌তাম। বোধ হয় এ কথাটা বলাটাই বাহুল্য, বিবাহিতা পত্নীকে কে কোথা না ভালবাসে?

তবে এটা ঠিক যে এ সে ধরণের ভালবাসা নয়। দেহের সম্পর্কে যে ভালবাসা, বিবাহের মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে যে ভালবাসার উৎপত্তি, আর একজনের জীবনের সঙ্গে যা'র অবসান,—এ সে ভালবাসা নয়। মৃত্যুকে অতিক্রম করে' যে ভালবাসা দিন দিন, তিল তিল করে বেড়ে উঠে, -- এ তা'ই।

কিন্তু সে কথা বলেই বা কি হবে! যা'র জীবন-মরণ এই একটা কথার উপর নির্ভর করছিল, তাকেই যখন বলা হ'ল না, তখন জগৎ সুদ্ধ লোককে সে কথা শুনিয়ে আর লাভ কি?

তবু বলি। নিজের পাপ নিজের মুখে প্রচার না করে, কেবল আত্মগ্লানির তুষানলে পুড়ে ছাই হ'লেও, সে পাপের যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত হ'বে না। তাই আজ সব কথা খুলে বল্‌তে হ'ল। যে ভয়ে নিজের কলঙ্ক এতদিন গোপন করে রেখেছি, তাই আজ আমার একমাত্র ভরসা। জগতের পুঞ্জীভূত ঘৃণা ও ধিক্কারে আমার প্রায়শ্চিত্তের মাত্রা পূর্ণ হ'ক!

১

সাধারণ গৃহস্থ ঘরের ছেলে হয়েও, প্রধানতঃ নিজের বিদ্যাবুদ্ধির জোরে বেশ উচ্চ পদ ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলাম। ছাত্রজীবনেও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলি সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে ছাত্র-মহলে আমার বিলক্ষণ খ্যাতি প্রতিপত্তি হয়েছিল। যখন এম্‌-এ পড়ি সেই সময় থেকে আমার এই কাহিনী আরম্ভ।

সমপাঠীদের মধ্যে যা'র সঙ্গে আমার সব চেয়ে বেশী ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল তার নাম সনৎ। হাইকোর্টের একজন ব্যারিষ্টারের ছেলে সে, ভবানীপুরে বাড়ী। সনৎ ছেলেটি বেশ,—যেমন সুন্দর চেহারা, স্বভাবটিও তেমনি সুন্দর। বড়লোকের ছেলে বলে তা'র মোটেই অহঙ্কার ছিল না, বাবুগিরিরও বাড়াবাড়ি ছিল না। পড়াশুনাতেও মন্দ নয়,—তবে অবশ্য আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হ'বার আশা সে কোনদিন করে নি। বরং আমার সংসর্গে পড়াশুনার একটু উন্নতি হ'তে পারে, এই বিবেচনা করেই বোধ হয় আমার সঙ্গে বন্ধুত্বটা একটু ঘনিয়ে তুলেছিল। তা'র সুযোগও হয়েছিল এই জন্যে যে আমিও ভবানীপুরে এক আত্মীয়ের বাড়ীতে থাক্‌তাম; আর দুজনের পড়াশুনাও ছিল এক,—এম্‌, এ আর, ল'।

কিন্তু পরের বাড়ীতে বাস,—যদিও আমার ঘর পৃথক এবং বাইরের দিকে, এমন কি সিঁড়ি পর্য্যন্ত আলাদা,—তবু, সর্ব্বদা যেন সঙ্কুচিত হয়ে থাক্‌তে হ'ত। তা'ছাড়া সনৎ বল্‌তো, এই বদ্ধ ঘরের ভিতর বসে প্রাণ হাঁফাই-হাঁফাই করে। তাই, সনৎদের বাড়ীতেই আড্ডা হ'ল। সেখানে কিছুক্ষণ দু'জনে মিলে পড়াশুনা করে, আর তা'র চেয়ে ঢের বেশীক্ষণ গল্প আর উড়ো তর্ক করে সময় কাট্‌তো।

সনতের বাড়ীতে যতক্ষণ থাক্‌তাম, তা'র মধ্যে তা'র মা-বাপের দেখা পাওয়া বড় একটা ঘট্‌তো না। কিন্তু একজনের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে দেখা হ'ত। যেদিন তা'র সঙ্গে প্রথম পরিচয় হ'ল, সেদিনকার কথা এখনও বেশ স্পষ্ট মনে পড়ে। আমার জীবনের সেটা যে-একটা সন্ধিক্ষণ, সেদিন তা' জান্‌তে পারিনি, পরে বুঝ্‌লাম।

আমাদের পরস্পর পরিচয় করে দেবার জন্যে সনৎ প্রথমে আমার খানিকটা অযথা গুণ-কীর্ত্তন করে, শেষে আমার

দিকে ফিরে বল্‌লে,—ইনি আমার কনিষ্ঠা ভগ্নী,—নাম শোভনা। বাড়ীতে থেকে পড়াশুনা করেন। উপস্থিত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারস্থ,—প্রবেশ-অধিকার পা'বার জন্যে পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত হচ্ছেন্। এইবার সব পরিচয় দেওয়া হ'ল কেউ কারুর অচেনা রইল না ত ?

আমি বল্‌লাম, "সম্পূর্ণ পরিচয় কই হ'ল ? কনিষ্ঠা বল্‌লে কি বুঝ্‌বো ? বয়ঃ-কনিষ্ঠা তা' ত দেখ্‌তেই পাচ্ছি, কিন্তু ....."

সনৎ বাধা দিয়ে বল্‌লে,—"তবে বলি। আমার তিনটি বোন, তা'র মধ্যে একজন আমার চেয়ে বড়। এই তিন জনের মধ্যে, দু'জন আবার আমাদের মায়া কাটিয়ে, গোত্র-পরিবর্ত্তন করে ফেলেচেন। বাকি আছেন ইনি। কোনদিন ইনিও মায়া কাটাবেন আর কি !"

আমি বল্‌লাম,—"এ তোমার অন্যায় কথা। তোমরাই মেয়েদের পর করে দেবার জন্যে ব্যস্ত। বাঙালীর ঘরের মেয়ের মা-বাপ, ভাই-বোনকে, ছেড়ে অজানা অচেনা লোকজনের মাঝখানে গিয়ে থাক্‌তে মোটেই আগ্রহ হয় না।"

অবিবাহিতা বালিকার সুমুখে তা'র বিবাহের প্রসঙ্গ উঠ্‌লে লজ্জা হ'বারই কথা। শোভনার দিকে চেয়ে দেখি, তা'র মুখখানা লাল হয়ে উঠেছে, মাথাটা একখানা বইয়ের পাতার উপর অনেকখানি ঝুঁকে পড়েছে। তা'কে এই সঙ্কট থেকে উদ্ধার করবার জন্যে, তার পড়াশুনার প্রসঙ্গ তুলে কথাটা চাপা দিয়ে ফেলা গেল।

দেখ্‌লাম মোটের উপর মেয়েটি বেশ বুদ্ধিমতী। বাঙলা না নিয়ে সাহস করে সংস্কৃতই পড়চে দেখে, তা'র খুব প্রশংসা করলাম। কিন্তু দেখ্‌লাম, গণিত-শাস্ত্রে তা'র মাথা তেমন খেলে না,—বিশেষ করে জ্যামিতিতে।

সেদিন এই পর্য্যন্ত। কিন্তু সনতের বাড়ী থেকে বেরিয়ে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত শোভনার কথা আমার মনে ছিল। আর কিছু নয়,—তা'র নামটি আমার বড় ভাল লেগেছে।

আমার মনে হয়, এই অধঃপতিত বাঙালী জাতটা, অন্ততঃ একটা বিষয়েও জগতের সকল জাতকে হারিয়ে দিয়েছে। মানুষের জন্যে এত রকম নূতন নূতন নাম সৃষ্টি করতে, বোধ হয় আর কোন জাত পারে নি। এক এক দেশের বা ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের গোটা কতক বাঁধাধরা নাম আছে, অতি পুরাকাল থেকে তাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ব্যবহার হয়ে আসচে। কিন্তু বাংলা দেশের মা-বাপ ছেলেমেয়ের জন্যে আর কোন সংস্থান করতে পারুন বা নাই পারুন, শব্দসিন্ধু মন্থন করে নূতন, সৌখীন, দুর্লভ নাম সংগ্রহ করে দিতে খুব পটু ! তাই বাঙলার মাঠে-হাটে-বাটে কত 'কুমুদিনী কান্ত' 'রমণী-রঞ্জন', 'প্রভাতেন্দু-শেখরের' দেখা পাওয়া যায়।

গেজেটে যেবার পরীক্ষার ফল বা'র হয়, এই রকম বিচিত্র, অদ্ভুত, বিদ্‌ঘুটে, নানা রকম রাশি রাশি নামের একত্র সমাবেশ দেখে আত্মহারা হয়ে যেতে হয়। গেজেটের পাতাগুলি উল্‌টে গেলে মনে হয়, যেন এক নিবিড় বনের ভিতর দিয়ে চলেছি,—চারিদিকে কেবল গাছের পর গাছ,—ছোট, বড়, মাঝারি,—এক-একটি এক-এক রকমের, পরস্পর কোন সাদৃশ্য নাই, সামঞ্জস্য নাই। কেবল যেন উদ্‌ভ্রান্ত পথিকের চিত্ত-বিনোদনের জন্যে, মাঝে মাঝে গুটিকতক ফুল ফুটে আছে,—পরীক্ষোত্তীর্ণা ছাত্রীদের অর্থপূর্ণ মধুর, কোমল নাম।

খুঁজে খুঁজে ভাল ভাল নাম সংগ্রহ করা আমার যেন একটা বাতিক ছিল। যে ক'টা নাম আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছিল, তা'র মধ্যে একটি নাম এই শোভনা। কিন্তু বাস্তবিক এ নামটা যে কত সুন্দর, আগে তা'র ঠিক ধারণা ছিল না। উপযুক্ত আধারে পড়ে এই 'শোভনা' শব্দের সম্পূর্ণ অর্থ এবং সৌন্দর্য্য আজ সহসা বেশ পরিষ্কার হয়ে গেল।

শব্দ-মাত্রেরই একটা রূপ আছে,—যদিও সকলে সব সময়ে তা' ধরতে পারে না। ভারতীয় সঙ্গীত-শাস্ত্রে ছয় রাগ, ছত্রিশ রাগিণীর ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তির পরিকল্পনা আছে। তেমনি এই শোভনা তা'র নামেরই পূর্ণ, জীবন্ত মূর্ত্তি,—অন্য কোন নাম যেন তা'র পক্ষে নিতান্ত বে-মানান্ হ'ত। যিনি এর জন্যে শৈশবেই এমন সুশোভন নামটি আবিষ্কার করেছিলেন, তাঁ'র কল্পনা-শক্তি এবং সৌন্দর্য্য-জ্ঞানের কথা ভেবে বিস্মিত হয়ে গেলাম।

তাই বলে, তা'কে কিছু নিখুঁত সুন্দরী বল্‌চি না। গল্প বল্‌তে বসেছি বলে যে নায়িকার অলৌকিক সৌন্দর্য্যের বর্ণনা

করতে হ'বে, এমন কি কথা আছে? বাস্তবিক, শোভনার যেটুকু দৈহিক সৌন্দর্য্য দেখ্‌লাম, তা' মোটেই অসাধারণ নয়, কিন্তু অনির্ব্বচনীয়। তা'র চোখে মুখে, তা'র প্রতি অঙ্গে, যে-একটা কোমল শান্ত শোভা ছেয়েছিল, তা' রাশ--পূর্ণিমার জ্যোৎস্নার মতন স্থির, স্নিগ্ধ, শীতল,—বিদ্যুৎ-বিকাশের মতন দর্শকের চক্ষে চমক লাগিয়ে মুহূর্ত্ত মধ্যে ঘোরতর অন্ধকারে ফেলে দেয় না।

তা'রপর থেকে শোভনার সঙ্গে প্রায়ই দেখা হ'ত। কোনদিন দু'-চারটে বাজে মামুলি কথা হ'ত, কোনদিন বা জ্যামিতির প্রতিজ্ঞা বুঝিয়ে দিতাম কি অঙ্ক কষে দিতাম।

তোমরা বোধ হয় ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত করে নিয়েছ, যে প্রথম-দর্শনেই শোভনার প্রতি আমার প্রণয় সঞ্চার হয়েচে,—এখন কেবল ওথেলোর মতন, বঙ্গ-বীরের একমাত্র পৌরুষ—পুঁথিগত বিদ্যার পরিচয় দিয়ে চলেছি,—ডেস্‌ডিমনার হৃদয় জয় করবার জন্যে। মোটেই না। শোভনাকে দেখে মনে একটা আনন্দ অনুভব করতাম বটে, কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই। আকাশের চাঁদকে দেখে শিশুর মনে যে আকাঙ্খা জেগে উঠে, বয়স্ক লোকের তা' হয় না,—সে শুধু দেখেই সুখী। আমিও গোড়া থেকে শোভনাকে এক ভিন্ন জগতের জীব বলেই বুঝেছিলাম; তাই কোন অসম্ভব আশা বা কল্পনা যা'তে মুহূর্ত্তের জন্যেও মনে না স্থান পায়, সে বিষয়ে বিশেষ সতর্ক ছিলাম। ব্যাপার কিন্তু দাঁড়িয়েছিল অন্য রকম,—সে কথা পরে বল্‌ছি।

এই ভাবে প্রায় দুটো বছর কেটে গেল। তা'র মধ্যে শোভনা ম্যাট্রিক্‌ পাশ করে কলেজে ভর্ত্তি হয়েচে। আমরা দুজনেও এম্‌, এ, পাশ করেছি। বরাবর যে স্থানটি আমার অধিকার করা ছিল, এবারও তা' থেকে বেদখল হইনি। এদিকে ল-কলেজে যাওয়াও শেষ হয়েছে, এখন কেবল আইনের শেষ পরীক্ষাটি দেওয়া বাকী। সুতরাং, আমরা এখন যেন জেল-খালাসী কয়েদীর মতন পুলিশের নজর-বন্দিতে আছি,—নূতন স্বাধীনতাটুকু ষোল-আনা উপভোগ করতে পাচ্চি না।

সনৎদের বাড়ী তেমন নিয়মমত যাওয়া-আসা এখন আর হয় না। গেলেও সবদিন তা'র দেখা পাওয়া যায় না। দেখা হয় শোভনার সঙ্গে, আর একজন নূতন লোকের সঙ্গে,—শোভনার মেজদিদি অপর্ণা। শুন্‌লাম তাঁর স্বামী,—পশ্চিমাঞ্চলের কোন কলেজের প্রফেসর,—কি একটা নূতন বিদ্যা শিখ্‌বার জন্যে জর্ম্মনী যাত্রা করার সময়, স্ত্রী-রত্নটি শ্বশুরালয়ে গচ্ছিত রেখে গেছেন।

সনৎকে যেদিন বাড়ীতে পাওয়া যায়, সেদিন, বেশ মজলিস বসে। যেদিন সে না থাকে, শোভনাদের সঙ্গে দু-চারটে বাজে কথা কয়ে চলে আসি। যেদিন শোভনার সঙ্গেও দেখা না হয়, সেদিন কিন্তু কি-রকম একটা অস্বস্তি বোধ হয়,—সকালে উঠে চা না পেলে, কিম্বা চশমাখানা খুঁজে না পেলে যেমন হয়, অনেকটা সেই রকম।

একদিন কথায় কথায় শোভনার পড়াশুনার কথা উঠলো। সনৎ বল্‌লে,—"দেখ সঞ্জীব, শোভনার লেখাপড়ার তেমন উন্নতি হচ্ছে বলে ত মনে হয় না। একটু আধটু যা দেখেছি তা, তেমন আশাপ্রদ নয়। তা'র উপর লজিক্‌টা নাকি ও তেমন বুঝতে পারে না। কিন্তু আমি ত ও রসে বঞ্চিত; তুমি যদি একটু দেখ।"

আমি বল্‌লাম,—"বেশ, মাঝে মাঝে দরকার মত একটু আধটু বলে দেবো এখন। ও এমন কিছু শক্ত জিনিস ত নয়।"

তারপর মাঝে মাঝে একটু-আধটু লজিক্‌ পড়ানো চল্‌লো।

একদিন ভাবলাম একটু পরীক্ষা করে দেখি। সহজ দেখে দু'-চারটে প্রশ্ন করলাম, বল্‌তে পারলে না। শেষে নিজেই বোঝাতে আরম্ভ কর্‌লাম। শোভনা চুপ্‌টি করে শুনে গেল। কিন্তু মন দিয়া শুন্‌চে কি না জান্‌বার জন্যে, মাঝখানে হঠাৎ থেমে গেলাম। দেখি সে তখনও আমার মুখের পানে চেয়ে আছে। তারপর যখন বুঝ্‌লে, আমি চুপ করে আছি, তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে নিলে।

বুঝ্‌লাম তেমন মনযোগ দেয়নি। বেশ মন দিয়ে শুন্‌তে বলে, আবার সেই সব কথা বোঝা'তে আরম্ভ করলাম। এবার সে আর মুখ তুললে না, হেঁট হয়ে খাতার উপর পেন্সিল দিয়ে আঁক কাটতে লাগলো।

খানিক বলে, ছোট একটা প্রশ্ন করলাম। কিন্তু শোভনা কোন উত্তর দেয় না, একমনে আঁক কেটে যায়। বললাম,—কি, বলতে পার না? তখন তার চমক ভাঙলো; ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে বললে,—"আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করলেন?"

হাল ছেড়ে দিয়ে চেয়ারে এলিয়ে পড়লাম। সনৎও বসেছিল। সে হো হো করে হেসে বলে উঠলো,—"যাক্ সাতকাণ্ড রামায়ণ পড়ে,—"

সনৎকে এক ধমক দিয়ে বললাম,—"থাম,—তুমি আর বল'না। কলেজে লেক্‌চার শুনতে শুনতে তুমিও কি অন্যমনস্ক হ'তে না, গল্প করতে না?"

তারপর শোভনার দিকে ফিরে বললাম,—"তবে একটা কথা বলি। লজিকটা না হয় ছেড়েই দাও। ওটা নতুন জিনিস, হয়ত তেমন সুবিধা করতে পারবে না। তা'র চেয়ে সংস্কৃত নিলে হয়,—কতকটা ত পড়াই আছে—"

সনৎ বলে উঠলো,—"হ্যাঁ, আর কিছু না হয়, মুখস্ত করেও মেরে দেওয়া যায়।"

কিন্তু শোভনা কোন কথাই কানে তুললে না। তাড়াতাড়ি বইপত্র গুছিয়ে নিয়ে, মহা অভিমান-ভরে সেখানে থেকে চলে গেল। তা'র মেজ-দিদি তা'র পিছনে ছুটলেন,—সনৎ বসে মুখটিপে হাসতে লাগলো।

আমি কিন্তু ব্যাপারটাকে এত সহজে উড়িয়ে দিতে পারলাম না। বাসায় ফিরে এসে, একটু স্থির হয়ে কথাটা বুঝবার চেষ্টা করলাম। শোভনার হয়েচে কি? তা'র এ রকম আচরণের অর্থ কি? শুধু কি লজিক বুঝতে পারে না বলে, না আর কোন গূঢ় কারণ আছে? মনের মধ্যে একটা ঘোর সংশয় জমে উঠলো। তবে কি শোভনা আমার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে? কিন্তু আমি তা'র কোন সুযোগ দিইনি। আমাদের দু'জনের মধ্যে যে ব্যবধান তা' গোড়াতেই বুঝতে পেরেছিলাম, আর বরাবর সেই ব্যবধান ত বজায় রেখে এসেছি। কিন্তু আজ মনে হ'ল, আমারই একটা বিষম ভুল হয়েচে। আমি নিজেকেই বাঁচাবার উপায় করেছি, সেও আত্মরক্ষার কোন উপায় করেছে কি না, তা'ত দেখিনি। যে ব্যবধানকে আমি এত বড় করে দেখেছি, সেদিকে তা'র হয়ত নজরই পড়েনি। সরল-প্রাণা বালিকা সে, হয়ত তা'র হৃদয়-প্রবাহে নিশ্চিন্ত মনে গা' ভাসিয়ে দিয়ে এতক্ষণ অনেক দূরে গিয়ে পড়েছে!

এ অনুমান সত্য হ'লে, আমার মত যুবকের পক্ষে খুব একটা গর্ব্বের বিষয় হ'তে পারতো। কিন্তু সে ভাবটা আমার মনে এল না। বরং একটা তীব্র আত্মগ্লানিতে হৃদয় ভরে উঠলো। ভাবলাম, হয় ত এখনও উপায় আছে,—কিছুদিন সনৎদের বাড়ী যাওয়া বন্ধ করে দেখা যা'ক। পরীক্ষারও বেশী দেরী ছিল না, সুতরাং সঙ্কল্পটা কাজে পরিণত করা বেশ সহজ হয়ে গেল।

৩

পরীক্ষা হয়ে গেল। বিনা কাজে কলকাতায় বসে থাকবার কোন দরকার নাই ভেবে, একবার দেশে চলে গেলাম। ফেরবার কোন তাড়া ছিল না, সুতরাং সেবার প্রায় দেড় মাস বাড়ীতে কেটে গেল।

কলকাতায় ফিরে এসে একবার সনৎদের বাড়ী গেলাম, দেখা হ'ল না। লাইব্রেরী ঘরে অপর্ণা, শোভনা দুজনেই ছিল, তা'রা ডেকে বসা'লে। পরস্পর কুশল প্রশ্নের পর আর কোন কথা খুঁজে না পেয়ে, শোভনাকে জিজ্ঞাসা করলাম,—"লজিকটা একটু আয়ত্ত হ'ল, না ছেড়ে দেওয়াই স্থির?"

তা'কে আজ অনেক দিন পরে দেখে মনে হ'ল, তা'র চেহারার একটু পরিবর্ত্তন হয়েচে। রোগা হয়েচে কি না ঠিক বোঝা গেল না, তবে মুখখানা একটু বিষণ্ণ ম্লান মনে হ'ল। মুখ না তুলেই সে বললে,—"না, লজিকের আশা ত ছেড়েই দিয়েছি,—আমার দ্বারা আর কিছুই হ'বে না। পড়াশুনা একেবারেই ছেড়ে দিতে চাই, কিন্তু দাদা কিছুতেই শুনবে না। আপনি একবার দাদাকে বলবেন?"

বেদনাভরা চোখ দুটি তুলে এই প্রশ্ন করেই, যেন চোখ নামিয়ে নিলে, অপর্ণাও তা'র কথা সমর্থন করে বললেন,—"সত্যি, সঞ্জীব বাবু, এটা দাদার অন্যায় নয়? মেয়েছেলেকে ওষুধ গেলানোর মতন জবরদস্তি করে লেখাপড়া শেখানো কেন?"

আমি বললাম,—"হাঁ, তা' বটে। বেটাছেলের বেলায় সেটা দরকার হ'তে পারে, কারণ তা'কে করে খেতে হ'বে। মেয়েছেলের বেলায় ত তা' নয়। তা'র লেখাপড়া শেখা কেবল মানসিক উন্নতির জন্যে। আচ্ছা, আমি সনৎকে বুঝিয়ে বলবো।"

কিন্তু সনৎকে বুঝা'ব কি, সে উলটে আমাকে বললে,—"তুমি বোঝ না। মেয়েছেলেকে পরীক্ষা পাশ করতে হ'বে, এমন কোন কথা নেই বটে। কিন্তু পড়াশুনা বজায় রেখে যা'ক না, যতটুকু শিখতে পারে ততটুকুই লাভ। আর আমাদের বাঙালীর ঘরের ব্যাপার জানই ত। ছেলেমেয়ে যতদিন লেখাপড়া করে, মা-বাপ দিব্যি নিশ্চিন্ত হয়ে থাকেন। যাই পড়াশুনা ছাড়া, অমনি ছেলের বেলায় চাকরি, আর মেয়ের বেলায় বিয়ে! লেখাপড়া ছেড়ে বসে থাকলে, মা এখনি শোভনার বিয়ে দেবার জন্যে উঠে পড়ে লাগবেন,—তা আমি বেশ জানি। তা'র চেয়ে চলুক না,—হেসে খেলে যে কটা দিন যায় তাই লাভ।"

এ নিয়ে আর বেশী তর্ক করা গেল না, তবে সনৎকে অঙ্গীকার করিয়ে নিলাম, যে পড়াশুনার জন্যে বেশী পীড়াপীড়ি করবে না।

সনতের সঙ্গে আজকাল দেখাশুনা খুব কমই হয়। আইন পরীক্ষার পর থেকে, শিক্‌লি-কাটা পাখীর মতন, তা'র নূতন স্বাধীনতাটুকু সে পুরো মাত্রায় উপভোগ করচে। বাড়ীতে খুঁজলে তা'র দেখা পাওয়া যায় না, কিন্তু পথে-ঘাটে অপ্রত্যাশিত ভাবে যখন তখন দেখা হয়।

একদিন বৈকালে তার বাড়ীতে গিয়ে শুনলাম সে বেরিয়ে গিয়েছে। ফটকের কাছ থেকেই চলে আসছিলাম, এমন সময় ভিতর থেকে ডাক এল। দেখলাম অপর্ণা একাই বসে কি একখানা বই পড়চেন। তিনি তামাসা করে বললেন,—"চুপ চাপ্ পালাচ্ছিলেন যে বড়? সন্দেশ খাওয়াতে হ'বে, সেই ভয়ে বুঝি?"

তখন সবে মাত্র আইন পরীক্ষার পাশের খবর বেরিয়েছে। আমি হেসে বললাম,—"দুটো সন্দেশ খেয়েই যদি আপনারা সুখী হন, সে ত আমার পরম সৌভাগ্য! কিন্তু সে দাবী ত আমারও আছে। তবে, দাবী করি কার কাছে, আসামীর ত দেখা নেই।"

অপর্ণা বললেন,—"আসামী বোধহয় বাড়ীতেই আছে। আপনি বসুন, দেখি। সন্দেশটা বোধহয় দু'তরফাই জুটবে। আমাদের তাই লাভ, আমরা ত ইতরে জনাঃ।"

বইখানা যেখানে পড়ছিলেন, সেখানে একখানা চিঠি গুঁজে রেখে, টেবিলের উপর ফেলে, তিনি ছুটলেন বাড়ীর ভিতর।"

আমি একলাটি চুপ করে বসেই আছি; কেউ আসেও না, কোন সাড়া শব্দও নাই। টেবিলের উপর যে বইখানা পড়েছিল, তুলে নিয়ে পাতা উলটাতে উলটাতে চিঠিখানার উপর চোখ পড়লো। দেখেই চমকে উঠলাম। খামের উপর সনতের বাবা মুখার্জ্জি সাহেবের নাম-ঠিকানা লেখা, কিন্তু লেখাটা অবিকল আমার বাবার হাতের লেখার মতন! এ চিঠি কি তবে তা'রই লেখা? কিন্তু এঁদের যে পরস্পর আলাপ পরিচয় আছে তা' ত কখনও শুনিনি। কিম্বা এ আর কারুর লেখা? কিন্তু আমার অভিজ্ঞতায় যতটুকু জানি কোন দু'জন লোকের চেহারা যেমন এক রকমের হয় না, হাতের লেখাও তেমনি। কৌতুহল দমন করতে না পেরে, তাড়াতাড়ি খাম থেকে চিঠিখানা বা'র করে ফেললাম। ভাবলাম, তেমন কিছু গোপনীয় চিঠি হ'তে পারে না, তা'হলে বাপের চিঠি মেয়ের হাতে থাকবে কেন?

প্রথমেই চিঠির তলার দিকে নজর পড়লো। তাইতো বটে! নাম সই করা রয়েচে, শ্রীপরেশ নাথ রায়! কাজেই সবটা না পড়লে চলে না।

যতদূর মনে পড়ে বাবা লিখেছেন,—"আপনার কন্যার সঙ্গে আমার পুত্রের বিবাহ প্রস্তাব করে আমাকে সম্মানিত করেছেন। সজীব শিক্ষিত উপযুক্ত পুত্র, তার ইচ্ছার উপর আমি হস্তক্ষেপ করতে চাই না। তবে, যিনি আমাদের ভবিষ্যৎ বংশের জননী হ'বেন, তাঁকে একবার স্বচক্ষে দেখতে ইচ্ছা করি।"

দেহের সমস্ত রক্ত যেন মাথায় ভিতর ছুটে এসে তোলপাড় করতে লাগলো।

তাড়াতাড়ি চিঠিখানা যথাস্থানে রেখে একটু সহজ ভাবে বসবার চেষ্টা করচি, এমন সময়ে,—"এই যে মশায়, আপনার

আসামী হাজির!" বলে, অপর্ণা পর্দা সরিয়ে ভিতরে এলেন। পিছনে আর একজন কে ছিল, চোখ তুলে চেয়ে দেখতে পারলাম না, আন্দাজে বোধ হ'ল,—শোভনা।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে বাইরে থেকে সনৎও এসে পড়েছে। এক সঙ্গে দু'দিক থেকে আক্রমণ,—আমার অবস্থা তখন ওয়াটালুতে নেপোলিয়নের মতন! কি রকম যে হয়ে গেলাম, নিজেকে কিছুতেই আর সাম্‌লাতে পারি না,—পালাতে পারলে বাঁচি! কিন্তু সনৎ কিছুতেই ছাড়বে না।

এ সঙ্কট থেকে উদ্ধার করলেন শেষে অপর্ণা; বল্লেন, —"না দাদা ওঁকে ছেড়ে দাও। উনি চলেই যাচ্ছিলেন, আমি এতক্ষণ জোর করে বসিয়ে রেখেছিলাম।" তারপর আমার কাছে সরে এসে একটু চাপা গলায় বললেন,—"এখন যান, খোলা হাওয়ায় গিয়ে মাথাটা ঠাণ্ডা করুন। নেহাৎ কাঁচা চোর।"

বিনা মেঘে বজ্রাঘাত, চোখে না দেখলেও, ঢের শোনা গিয়েছে; কিন্তু এমন বিনামেঘে রামধনুর উদয় কেউ কখনও দেখেছ কি? সে দিনকার সেই সোণালী সন্ধ্যায়, আমার দেহে-প্রাণে, আকাশে-ভূতলে, রামধনুর বিচিত্র বর্ণ-সম্পদ দেখ্‌তে দেখ্‌তে বাসায় ফিরলাম।

৪

তারপর থেকে সনৎ এসে প্রায়ই আমাকে তা'দের বাড়ী ধরে নিয়ে যায়। সেখানে বসে খানিক গল্প-গুজব করে, চা খেয়ে, চলে আসি। কিন্তু আগেকার মতন আর তেমন সহজভাবে মিশ্‌তে পারি না। শোভনাও বড় একটা আসে না। তবে তা'র মেজদিদি মাঝে মাঝে তা'কে এক অদ্ভুত উপায়ে ধরে আনেন,—পর্দার ভিতর হাত বাড়িয়ে দিয়ে, যাদুকরের মতন তা'কে হাত ধরে টেনে এনে খাড়া করে দেন। সে একটু বসে দাঁড়িয়ে এক সময়ে অলক্ষিতে সরে পড়ে। আবার তেমনি করে হাত বাড়িয়ে টেনে আনা। এই রকম করে কিছুদিন যায়।

ইতিমধ্যে একদিন দেশ থেকে বাবা-মা দুজনেই এসে উপস্থিত। তাঁরা এখানে ওখানে কত জায়গায় ঘুরলেন, কোথাও বা আমাকে সঙ্গে নিয়ে যান, কোথাও বা নিজেরাই যান।

এম্, এ, পাশ করার পর থেকে ডেপুটি-গিরির জন্যে একটু চেষ্টা করা হচ্ছিল; এবার একটু ভাল করে লাগা গেল। যে দু'চার জন বড় বড় লোকের সঙ্গে বাবার একটু জানাশুনা ছিল, দু'জনে তাঁদের কাছে গিয়ে একটু উমেদারি করা গেল। গৃহস্থ ঘরের ছেলে, ওকালতিতে কিছু সুবিধা হ'বে বলে কেউ তেমন আশা দেন না! তাই একটা ভাল চাকরির জন্যেই বিশেষ চেষ্টা। কিন্তু বলা যায় না, শেষ পর্য্যন্ত যদি ওকালতিই করতে হয়, তাই একজন বড় উকীলের সঙ্গেও আলাপ-পরিচয় করে আসা গেল। এই রকম নানা কাজে ঘোরাঘুরি করে, তা'রা আবার দেশে ফিরে গেলেন।

আমার কিন্তু দিন দিন একটা উৎকণ্ঠা বেড়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। শোভনার কথা যখন মোটেই ভাব্‌তাম না, ভাব্‌তাম কেবল তা'র লজিকের কথা, তখন বেশ ছিলাম। কিন্তু সেই চুরি করে চিঠি পড়ার দিন থেকে, শোভনার চিন্তাই তিল তিল করে বাড়্‌তে লাগ্‌লো। তা'কে আজকাল ভিন্ন চক্ষে দেখ্‌তে আরম্ভ করেছি, ভিন্নরূপে ভাবতে আরম্ভ করেছি, কিন্তু এখন আর তা'কে কাছে পাই না। মরীচিকা বোধে এতদিন যা'কে সুমুখে দেখেও কাছে যেতে চাইনি, তা'কে যখন স্বচ্ছ শীতল সরোবর বলে জান্‌লাম, তখন থেকে সে মরীচিকার মতই ক্রমশঃ দূরে সরে যেতে লাগ্‌লো! শুধু তাই নয়,—যে কথা শোন্‌বার জন্যে সলজ্জ আগ্রহ নিয়ে সনৎদের বাড়ী যাই, সে সম্বন্ধে কেউ আর কোন উচ্চবাচ্য করে না। তবে কি কথাটা চাপা পড়ে গেল? না' আমাকে নিয়ে শুধু একটু নিষ্ঠুর কৌতুক করা হয়েছে?

এই রকম সংশয়ের মধ্যে দিয়ে দিন কাটছে, এমন সময় একদিন সনৎদের বাড়ী যাওয়া মাত্রেই অপর্ণা বল্লেন,—"আজ মশাই, আর এক প্রস্থ সন্দেশ খাওয়াতে হচ্ছে!" কথাটার অর্থ বুঝ্‌তে না পেরে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে আছি দেখে, অপর্ণা খিল্ খিল্ করে হেসে উঠ্‌লেন। তারপর আমার হাতে একখানা চিঠি দিয়ে বল্লেন,—"এটা পড়ে দেখুন, বুঝ্‌তে পার্‌বেন।"

দেখলাম বাবা লিখেছেন যে শোভনাকে দেখে তাঁদের বেশ ভাল লেগেছে, মেয়েটি বড় সুলক্ষণা, বিবাহে তাদের সম্পূর্ণ মত আছে।

চিঠিখানা ফিরিয়ে নিয়ে অপর্ণা কিছুক্ষণ মুখের পানে চেয়ে দেখে বললেন,—"কেমন? এইবার?······আচ্ছা, সন্দেশটা না হয় পরে হ'বে, এখন শাঁখটা বাজাই?"

উত্তরের অপেক্ষা না করেই তিনি ছুটলেন দেখে, আমি বারণ করতে গেলাম,—"না না, কি সব ছেলেমানুষি করেন!" সনৎ ধরে বসালে, বললে,—"তুমিও ত আচ্ছা পাগল দেখ্‌চি! বস।"

শাঁখটা সত্যসত্যই আর বাজলো না। অল্পক্ষণ পরে অপর্ণা ফিরে এলেন,—সঙ্গে তাঁ'র মা। তাঁকে ইতি পূর্ব্বে দু'চার বার দেখেচি বটে, কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই। আজ তিনি পরম আত্মীয়ের মতন কাছে এসে বসলেন, বললেন,—"কি বল বাবা? সবই ত জান, এখন তোমার কথার উপরই নির্ভর।"

আমি একটু ভেবে নিয়ে বললাম,—"যদি 'সকলের' তাই ইচ্ছা হয়, ত আমার কিছু বল্‌বার নেই।" শুনে তিনি যেন একটু সন্তুষ্ট হ'লেন, খুঁটিয়ে আমাদের ঘরের কথা অনেক জেনে নিলেন। তারপর, উঠে যাবার সময় বললেন,—"তা হ'লে ওঁকে বলি, তোমার বাবাকে লিখে একটা দিন স্থির করুন।"

আমি একটু বিনয় করে বললাম,—"দিন-কতক অপেক্ষা করলে ভাল হয় না? আমার একটা কাজকর্ম্মের কিছু ব্যবস্থা না হ'লে—"

সনৎও আমার কথায় সায় দিয়ে বললে,—"না না, তাড়াতাড়ির কোন দরকার নেই। সে আমরা ধীরে-সুস্থে সব ঠিক করে নেব এখন।"

মা চলে গেলে, অপর্ণাও উঠ্‌লেন, বললেন,—"এইবার তা'হলে আসামীকে তলব করতে হয়।" সনৎ ধমক দিয়ে বললে,—'দেখ্‌ অপর্ণা, বেশী বাড়াবাড়ি করিস্‌ ত চাঁটি খাবি!"

অপর্ণা তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললেন,—"আচ্ছা, সে দেখা যাবে! দাঁড়াও না, এবার তোমার পালা! আমি এই কালই ভুবন চাটুয্যের বাড়ী যাচ্ছি।" দাদাকে শাসিয়ে অপর্ণা চলে গেলেন।

শেষ কথাটার তাৎপর্য্য বুঝ্‌তে না পেরে, সনৎকে চেপে ধরতে, সে বললে,—"ও কিছু নয়। আইবুড়ো ছেলে-মেয়ে ঘরে থাক্‌লে মেয়েদের স্বভাবই হচ্ছে, একটা মনগড়া বিয়ের সম্বন্ধ দাঁড় করিয়ে, তাই নিয়ে ঘোঁট পাকানো।" কথাটা এই রকম করে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলেও, জেরার মুখে প্রকাশ হয়ে গেল যে ব্যাপারটা আরও বেশীদূর অগ্রসর হয়ে, পূর্ব্বরাগ পর্য্যন্ত গিয়ে পৌঁছেচে। আমার কাছে এতদিন এ-সব লুকিয়ে রেখেছিল বলে সনৎকে খুব খানিকটা ভৎর্সনা করলাম।

অপর্ণা শোভনাকে আন্‌তে গেলেন; কিন্তু আজ আর যাদুকরের মতন হাত বাড়িয়েই পর্দ্দার আড়াল থেকে টেনে বা'র করতে পারলেন না,—অনেকক্ষণ বিলম্ব হ'ল! যাই হোক, আসামীকে এনে হাজির করে বললেন,—"এই! নমস্কার কর্।······আরে গেল যা, কথা শোনে না। নমস্কার কর,—করতে হয়!" শাসনের চোটে শোভনা কলের পুতুলের মতন হাত দুটি জোর করে কপালে ঠেকালে।

তারপর আমার কাছে সরে এসে অপর্ণা বললেন,—"সঞ্জীববাবু, এবার আপনি আশীর্ব্বাদ করুন।······হ্যাঁ হ্যাঁ, করতে হয়!"

সনৎ ধমক দিয়ে উঠ্‌লো,—"ধ্যাৎ!" ওদিকে শোভনাও নিঃশব্দে সরে পড়্‌লো।

"এই রে! আসামী পালায়!" বলে অপর্ণাও ছুটলেন।

৫

হৃদয়ে গভীর আনন্দ নিয়ে বাসায় ফিরলাম।

ঘর খুলে আলো জালতেই, দেখি মেঝের উপর একখানা চিঠি পড়ে আছে। লম্বা-চৌড়া খাম দেখে বুঝ্‌লাম, সরকারী অফিসের চিঠি। খুলে পড়ে দেখলাম,—আমি ডেপুটী-গিরিতে বাহাল হয়েচি, সোমবার দিন অফিসে গিয়ে সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে হবে।

চিঠি পড়ে লাফিয়ে উঠ্‌লাম। এ হ'ল কি। একদিনের এইটুকু সময়ের মধ্যে এমন সব অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য এক সঙ্গে এসে পড়্‌লো! জানি না, এমন শুভদিন আর কারুর অদৃষ্টে কখনও ঘটেছে কি না। ভাবলাম আরও কোন শুভ-সংবাদ আসবার সম্ভাবনা আছে কি না। মনে পড়ে গেল, একখানা লটারির টিকিট কিনেছি। তা'তে কোন বাজী জেতার খবর আসে নিত? চিঠি কি টেলিগ্রাম?—ঘরের মেঝেটা আর একবার ভাল করে দেখ্‌লাম। কই না! তবে আর হ'ল না। তেমন কিছু হ'লে, ঠিক আজকের দিনেই তা'র খবর আস্‌তো। তা' যখন এল না, তখন আর আশা নাই। তা নাই থাক, আজ যা' পেয়েছি, লটারির দশ-বিশ লাখ তার কাছে তুচ্ছ! আজ আমার মতন ভাগ্যবান জগতে কে আছে?

সে রাত্রে কিছুতেই চক্ষে ঘুম এল না। একটার পর একটা করে, নানা চিন্তা এসে জুট্‌তে লাগলো। শেষে ভাবতে লাগলাম, আচ্ছা, এই যে দু' দুটো ঘটনা একসঙ্গেই ঘটে গেল, তা'র অর্থ কি—এটা কি শুধু দৈবযোগে, না মানুষেরও কিছু যোগ আছে? আগে তেমন খেয়াল হয়নি, কিন্তু এখন মনে পড়ে গেল, শোভনাদের বাড়ী আজ বাবার যে চিঠিখানা দেখলাম, তা'তে দশ-বারো দিন আগেকার তারিখ আছে। এতদিন পরে, ঠিক আজই এই চিঠিখানা দেখিয়ে, বিয়ের কথাটা পাকা করে নেবার কারণ কি? তবে কি এতদিন ওঁরা ভিতরে ভিতরে খবর রাখছিলেন,—আমার চাকরি জোটে কি না? তাই বুঝি পাকা খবরটা জেনে তবে আজ......? আর তা' না হলে কি বিয়ের কথাটা একেবারেই চাপা পড়ে যেত? তাই যদি হয়, তা' হ'লে সেটা কি নিতান্ত হীন দোকানদারী নয়?

আর শোভনা? এতদিন যা'কে অমূল্য রত্ন ভেবে আমার মতন দরিদ্রের আয়ত্তের বাইরে বলে মনে কর্‌তাম, সে সামান্য পণ্যদ্রব্যের মতন এত তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় হ'বার জন্যে অপেক্ষা কর্‌ছিল? তা'র বাপ-মা যাই করুন, তা'র নিজেরও কি কোন ইচ্ছা বা মতামত নেই? সে ত সাধারণ হিন্দু-ঘরের ছোট্ট মেয়েটি নয়, তবু আমার প্রতি তা'র মনের ভাব কি রকম—তা'ও কিছুই জান্‌তে দিলে না। এক সময়ে শোভনার আচরণ দেখে ভেবেছিলাম বটে, যে সে আমার অনুরাগিণী। কিন্তু হয় ত সেটা আমারই ভ্রম,—আমার আত্মাভিমানের একটা অলীক সৃষ্টি মাত্র। তা' যদি হ'বে তবে এত দিনের মধ্যে তা'র অনুরাগের কোন লক্ষণ দেখলাম না কেন? চোখের একটা ইঙ্গিতে, মুখের হাসিতে, প্রণয়ের দীর্ঘ ইতিহাস যে মুহূর্ত্তে প্রকাশ হয়ে যায়,—তা, কই?

তা'র চেয়ে ভাল ছিল,—হিন্দুর ঘরে সকলের যেমন হয়ে থাকে,—একজন সম্পূর্ণ অপরিচিতাকে বরণ করে নিয়ে, ধীরে ধীরে তা'র রহস্যের আবরণ খুলে, ক্রমে তা'র ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাওয়া; তারহীন বীণায় তার সংযোগ করে, নিজের হৃদয় সঙ্গীতের সঙ্গে মিলিয়ে সুর বেঁধে নেওয়া। কিন্তু এ ত তা নয়। যৌবনের পুলক-পরশে এ বীণায় যে কি একটা সুর বাঁধা হয়ে গেছে। সেটা শুন্‌তে পাচ্ছি না, হয় ত আমার সুরে সে সুর মিল্‌বে না, চিরকাল বে-সুরোই বাজতে থাক্‌বে!

এই রকম অসম্বদ্ধ বিক্ষিপ্ত চিন্তার মধ্য দিয়ে সারারাত কেটে গেল।

ভোরে বিছানা ছেড়ে উঠে, মাথায় খানিকটা জল ঢেলে, চলে গেলাম গড়ের মাঠে,—খোলা হাওয়ায় মাথাটা যদি ঠাণ্ডা হয়। মাঠে একটু বেড়িয়ে ক্লান্তিবোধ হ'ল, ইডেন গার্ডেনে একটু নির্জন স্থান দেখে বেঞ্চের উপর বস্‌লাম। বসে বসে কতকগুলো সিগারেট পুড়িয়ে, যখন উঠলাম, তখন অনেক বেলা হয়ে গেছে। ভাবলাম বাসায় ফিরে স্নানাহার করে, শরীরটা একটু স্নিগ্ধ হ'লে, একবার ঘুমের চেষ্টা কর্‌তে হবে।

গলির মোড়ে পানের দোকান দেখে মনে পড়্‌লো, সিগারেট ফুরিয়েছে, কিনতে হ'বে। একটা খোলার বাড়ীর একটা কোণে, খানকতক তক্তা লাগিয়ে, ছোট একটি কুঠরির মতন করে নিয়ে, তাইতে এই পানের দোকান হয়েছে। পানওয়ালাকে দোকানে দেখলাম না, বসে আছে একজন স্ত্রীলোক,—বোধ হয় তা'র স্ত্রী। দোকানে তা'কে অনেকবার বসে থাক্‌তে দেখেছি, আমাদের গলির ভিতরেও মাঝে মাঝে যাওয়া আসা কর্‌তে দেখেছি,—বোধ হয় ঐ গলিতেই তা'র বাসা। কিন্তু দোকানের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আজ তা'র যে মূর্তি

দেখলাম,—চক্ষু জুড়িয়ে গেল। সুন্দরী না হ'লেও, ভদ্র-ঘরের মেয়ের মতনই তার চেহারা। চওড়া লাল পাড় শাড়ীতে তা'র যৌবন-পুষ্ট দেহখানিকে বেশ করে ঢেকে রেখেছে, কিন্তু তা'তেও তা'র সৌন্দর্য্য ঢাকা পড়েনি। ভিজে চুলগুলি পিঠের উপর ছড়িয়ে আছে, সীমন্তে দীর্ঘ উজ্জ্বল সিন্দুর-রেখা।

প্রশংসমান দৃষ্টিতে তা'র দিকে চেয়ে যখন সিগারেট চাইলাম, তখন একটু সলজ্জ হাসি হেসে, এমন আগ্রহের সঙ্গে বল্লে,—"এই দি," মনে হ'ল তুচ্ছ এক প্যাকেট সিগারেট নয়, যেন তা'র যথাসর্ব্বস্ব নিঃশেষে উপহার দেবার জন্যে সে আগে থেকেই প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। সিগারেট নিয়ে একটা সিকি দিলাম, কিন্তু তা'র বাকী পয়সা কটা নিতে ভুলে গিয়ে তা'র মুখের পানে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। কতক্ষণ ছিলাম জানি না; সে চোখ তুলে আবার একটু হেসে, যখন বল্লে,—"পান চাই কি?"—তখন জ্ঞান হ'ল তাড়াতাড়ি পয়সা কটা তুলে নিয়ে ছুটলাম।

মনে পড়্‌লো শোভনার কথা। এই সামান্য পানওয়ালী রূপে, গুণে,—হয়ত চরিত্রেও,—তা'র চেয়ে কত হীন। কিন্তু এরও একটা আকর্ষণী শক্তি আছে। হায়, শোভনার কাছেও যদি এমনি একটু মধুর হাসি, একটা কোমল চাহনি পেতাম, প্রাণে কি যে এক আনন্দের সাড়া পড়ে যেত!

স্নানাহার করে শরীর স্নিগ্ধ হ'ল, কিন্তু ঘুম হল না। বরং আর একটা আতঙ্ক এসে দেখা দিল,—সনৎ কোন সময়ে বা এসে পড়ে। এ রকম মানসিক অবস্থায় তা'র সঙ্গে দেখা হওয়া, বা তা'র বাড়ীতে যাওয়া মোটেই বাঞ্ছনীয় বলে মনে হ'ল না। কাজেই বাসা ছেড়ে আবার রাস্তায় বেরিয়ে পড়্‌লাম। সারাদিন লক্ষ্যহীন ভাবে পথে পথে ঘুরে, সন্ধ্যার অনেক পরে বাসায় ফিরলাম।

গলির মোড়ে এসে পানের দোকানের দিকে একবার না চেয়ে থাকতে পার্‌লাম না। পথে ভীড় ছিল না, দোকানে খরিদ্দার ছিলনা, পানওয়ালী একা ম্লান মুখে আর এক দিকে চেয়ে চুপ করে বসে আছে। আমাকে দেখেই তা'র চোখে-মুখে সহসা যেন একটা ক্ষীণ জ্যোতি ফুটে উঠ্‌লো, তারপর ধীরে ধীরে সে চোখ নামিয়ে নিলে।

সে রাত্রে,—মাথাটা ক্রমে একটু ঠাণ্ডা হয়ে এসেছিল বলেই হ'বে, কি সারাদিনের হাঁটাহাঁটিতে শরীর ক্লান্ত ছিল বলেই হ'বে—বেশ ঘুম হয়েছিল। সকালে বিছানা থেকে উঠে মনে হ'ল দেহের ও মনের গ্লানি অনেকটা কেটে গিয়েছে,—যেন একটা দারুণ দুঃস্বপ্ন দেখে উঠ্‌লাম মাত্র।

সেদিন রবিবার। কাল অফিসে সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে যেতে হ'বে, এখন থেকে তা'র জন্যে প্রস্তুত হ'তে লাগ্‌লাম। দেখ্‌লাম একটা ভদ্র রকমের পোষাক না হ'লে ত চলে না। তাই আহারাদি সেরে চলে গেলাম চাঁদনী,—পোষাক কিনতে।

সেখানে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল বড়-মামার সঙ্গে। তিনি বর্দ্ধমানে ওকালতি করেন। কি একটা দরকারে কাল এসেছেন,—বৌবাজারে তাঁ'র এক সম্বন্ধীর বাসায় নেমেছেন। তিনি কিছুতেই ছাড়্‌লেন না; আমাকে সঙ্গে নিয়ে নানাস্থানে ঘুরে, একরাশ জিনিসপত্র কিনে ফিরলেন। তারপর সন্ধ্যার সময় তাঁকে মালপত্র সমেত ট্রেণে তুলে দিয়ে তবে আমার ছুটি।

বাসায় ফেরবার সময় দূর থেকেই মোড়ের সেই দোকানটির দিকে নজর পড়্‌লো। কিন্তু কাছাকাছি এসে আর সেদিকে চাইলাম না, বেশ জোরে জোরে পা ফেলে অতি গম্ভীর ভাবে চলে গেলাম। কিন্তু যা'কে এমন নির্ম্মম অবহেলা দেখিয়ে চলে এলাম সে কি ভাব্‌চে এ চিন্তাও মনে উদয় হ'ল।

দীর্ঘকাল পরে এবার শোভনাকেও মনে পড়্‌লো। কিন্তু তা'তে হৃদয়ের একটা বিস্মৃত বেদনা যেন নূতন হয়ে জেগে উঠ্‌লো। জোর করে মনটাকে অন্যদিকে নিয়ে গেলাম। শেষে কি আবার মাথা-খারাপ করে বস্‌বো।

৬

সোমবার। যথা সময়ে সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে তাঁ'র দর্শন-লাভ হ'ল। কথাবার্ত্তা করে সাহেব যেন একটু খুসী হ'লেন। চাকরিতে পাকা হয়ে বসবার জন্যে আমার কি কি করা দরকার, সব

বুঝিয়ে দিলেন। কিছু উপদেশও দিলেন। বল্‌লেন,—"বাবু, তোমার বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছি। কিন্তু তুমি একটু লাজুক আছ, আর বোধ হয় একটু ভীতু। সেটা আর কিছু নয়, নিজের শক্তির উপর তোমার আস্থা নেই, সাহস নেই। জোয়ান বয়স, এ সময়টা বেশ ফুর্ত্তিতে থাক্‌বে,—কিছু ভয় করবে না। সময়ে সময়ে হয়ত অনেক অন্যায় কাজও করতে হ'বে; তা'তে যদি ভয় পেয়ে যাও, তবেই গেলে! প্রাণে ফুর্ত্তি আন, সাহস আন!"

বেশ করে পিঠ ঠুকে দিয়ে আমার শরীরে ফুর্ত্তি ও সাহসের সঞ্চার করে, তিনি আমাকে বিদায় দিলেন। অফিস থেকে বেরিয়ে মনে হ'ল, বাস্তবিক আমি যেন আর সে মানুষ নই!

দেশে বাবার কাছে একখানা টেলিগ্রাম করে দিয়ে, তাড়াতাড়ি বাসার দিকে ছুটলাম। পোষাক ছেড়ে এখনি আবার বেরুতে হ'বে। কাল বৈকালে নাকি সনৎ আমাকে খুঁজতে এসেছিল, আজও যদি আসে! না, মনটা আর একটু স্থির না হ'লে তা'দের কাছে দেখা দেওয়া হবে না।

গলির মোড়ে পানের দোকানে পানওয়ালী সেই রকম চুপটি করে বসে আছে। যা'বার সময় একবার মাত্র তা'র দিকে চেয়েছিলাম। দেখ্‌লাম সে ফিক্ করে হেসে, মুখে আঁচল চাপা দিলে; কিন্তু কৌতূহল-পূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকেই চেয়ে রইল।

পোষাক ছেড়ে বাসা থেকে বেরিয়েই মনে পড়্‌লো, সিগারেট ফুরিয়েছে।……না এ দোকানে আর কিন্‌বো না, দোকান ত ঢের আছে। হঠাৎ সাহেবের উপদেশ মনে পড়ে গেল,—"প্রাণে ফুর্ত্তি আন, সাহস আন।" সমস্ত দ্বিধা-সঙ্কোচ ঠেলে ফেলে সেই দোকানেই সিগারেট কিন্‌লাম।

প্যাকেটটা হাতে দিয়ে পানওয়ালী ধীরে ধীরে বল্‌লে,—"আজ আবার সাহেব সেজেছিলেন যে?"

"একজন সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম, তাই।"

"ওতে বড় কাটখোট্টা মতন দেখায়। তা'র চেয়ে দেশী পোষাকে আপনাকে বড় সুন্দর মানায়।"

আমার সাহস এবং ফুর্ত্তি দুই তখন বেড়ে গেছে। বল্‌লাম,—"তাই বুঝি আমার কিম্ভূতকিমাকার চেহারা দেখে হেসেছিলে?"

একটু ইতস্ততঃ করে সে হেসে বল্‌লে,—"না, তা' নয়। ·· পান চাই কি?"

"না" বলে চলে আস্‌ছিলাম, ভাব্‌লাম কি সামান্য দু-এক পয়সার পান,—নিলেই বা! দোকানের পান আমি বড়-একটা খাই না বটে, কিন্তু যখন বল্‌চে···। ফিরে গিয়ে বল্‌লাম,—"আচ্ছা, দাও দু-পয়সার পান।"

ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে খুব যত্ন করে সে পান সাজতে লাগলো। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তা'র লজ্জাবনত মুখের পানে চেয়ে চেয়ে আমার যেন একটা নেশা ধরে এল। মাথা ঝিম্ ঝিম্ করতে লাগলো। অগ্র-পশ্চাৎ কিছু না ভেবেই ধাঁ করে বলে বসলাম,—"আমাদের ওখানে একবার আস্‌বে?"

সে কেবল ঈষৎ ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালে,—মাথাটা আর একটু ঝুঁকে গেল।

আমার তখন সাহসের মাত্রা চরমে পৌঁছেছে। বল্‌লাম,—"আমার বাসা চেন?—কোন ঘরে থাকি জান?—বাইরের দিকে সিঁড়ি আছে ঘরে যাবার?"

"হ্যাঁ'হলে আজই—সন্ধ্যার পর,—আমি ফিরে এলে।"

পানগুলি হাতে তুলে দিয়ে, হাসি-মাখানো একটা ছোট্ট চোখের ইঙ্গিতে সে তা'র শেষ সম্মতি জানালে।

সময় আর কাটে না! বসে, দাঁড়িয়ে, পথে পথে ঘুরে, সন্ধ্যা আর হয় না। ফাল্গুন মাসের বেলা কি এত বড় হয়? আগে ত জান্‌তাম না! সন্ধ্যা যখন হয়-হয়, তখন বাসায় ফেরবার জন্যে ছটফট্ করতে লাগলাম। এতক্ষণে সনৎ নিশ্চয়ই খুঁজতে এসে ফিরে গিয়েছে।

বাসায় ফির্‌লাম। পানের দোকানে কিন্তু দেখলাম পানওয়ালা নিজেই বসে আছে। তাই ত! কোথায় গেল সে?—বুকটা দমে গেল। অতি কষ্টে পা-দুটোকে টান্‌তে টান্‌তে উপরে উঠে, ঘরের দরজা খুল্‌লাম। বড় গরম বোধ হ'তে লাগলো, কোটটা খুলে রেখে জান্‌লার সুমুখে চেয়ার টেনে নিয়ে বস্‌লাম। তারপর উঠে আলো জ্বালতে দেখলাম মেঝের উপর একখানা চিঠি পড়ে আছে। খামখানা তুলে নিয়ে দেখি শোভনার হাতের লেখা!

বুক কেঁপে উঠ্‌লো। ভাব্‌লাম এ আর খুলে কাজ নেই, পড়ে থাক। না হয় ছিঁড়ে ফেলে দি'। কিন্তু শেষে খুল্‌তেই হ'ল। সে লিখেছে ;—

"সোমবার
সকাল আটটা

আপনাকে কি বলে সম্বোধন কর্ব্বো জানি না ; কিন্তু এ দুদিন একবারও এলেন না কেন ?

মেজ্‌দির কোন বুদ্ধি নেই, সেদিন আমাকে শুধু নমস্কার কর্ত্তে বল্লে, পায়ের ধুলো নিতে বল্লে না কেন ? তাহলে পা দুটিতে মাথা ঠেকিয়ে ধন্য হতুম। কিন্তু অমন সুযোগ বৃথা গেল। তার ওপর দুদিন ধরে আপনার দেখা পেলুম না। যদি আজও না আসেন, তাই চিঠি না লিখে আর পার্লুম না।

একবার আস্‌তে পার্বেন না ? দুমিনিটের জন্যে। যখন হোক। বেশী কিছু নয়, শুধু একবার আপনাকে দেখ্‌বো। আড়াল থেকে। মুখের দুটো কথা শুনবো। তাও আড়াল থেকে।

একবার আসবেন। একটিবার।

ইতি
শোভনা

পুঃ—পাগলের মত মেলা যা-তা লিখে ফেলচি। বড় লজ্জা কর্চ্চে। কিন্তু আর গুছিয়ে লেখ্‌বার সময় নেই। মেজ্‌দি হয়ত এখনি এসে পড়্‌বে। এ চিঠির কথা কারুকে বল্‌বেন না। পড়ে' ছিঁড়ে ফেল্‌বেন। কিন্তু আস্‌বেন একটিবার।"

সত্যি, শোভন ! তবে কি এ আমারই ভুল ? এতদিন কি তবে এমনি অলক্ষিতে তোমার ঐ অফুরন্ত ভালবাসা অজস্র-ধারে বর্ষণ করে এসেছ ? আমি অন্ধ, মূঢ়,—কিছু বুঝ্‌তে পারিনি ! চুরি করে ভালবাসা কি এতবড় অপরাধ !

এখন কি করি ?……যাই। এখনি যাচ্ছি, শোভনা,—এখনি ! হায়, এই মুহূর্ত্তেই যদি তোমার কাছে গিয়ে পড়্‌তে পার্‌তাম !

পিছনে দরজার কাছে একটা অস্পষ্ট শব্দ হ'ল। ফিরে চেয়ে দেখি,—আমারই ছায়ায় দাঁড়িয়ে—এক নারী মূর্ত্তি !

"এসেছ ? তবে নিজেই এসেছ, শোভনা ? এস !"—দু'হাত বাড়িয়ে ছুটে গেলাম।

"আমার নাম শোভনা নয়,—জোছনা" বলে আমার বুকের উপর কে ঝাঁপিয়ে পড়্‌লো। যখন চিন্‌লাম এ সেই পানওয়ালা, তখন মনে হ'ল যেন একটা জলন্ত লোহার চাপে আমার ঠোঁট দু'খানা একেবারে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে !

আতঙ্কে শিহরে উঠে তিন হাত পেছিয়ে পড়্‌লাম।

হায় ! এই আমার জীবনে প্রথম চুম্বন ! যুগ-যুগান্তর ধরে কত লক্ষ লক্ষ কবিতার ছন্দ এবং সঙ্গীতের মূর্চ্ছনার ভিতর দিয়েও যা'র মহিমা প্রকাশের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে,—অমৃতের আস্বাদের সঙ্গে পারিজাতের সুরভি মিশিয়ে, যা'তে স্বর্গ-সুখের প্রথম আভাস এনে দেয়,—এই কি সেই প্রণয়ের প্রথম চুম্বন ? এতে যে গরলের তিক্ত আস্বাদ,—আগুনের তীব্র জ্বালা !

শোভনার চিঠিখানা তখনও হাতে ছিল। ভাবলাম তা'র উপযুক্ত উত্তরই দেওয়া হচ্ছে বটে !

শোভনা, দেখে যাও, তোমার ঐ অসীম ভালবাসার কি অপূর্ব্ব প্রতিদান ! কৃপণের মতন যে ভালবাসা এতদিন জগতের কাছে লুকিয়ে রেখেছিলে, সেই অমূল্য রত্ন পাওয়া-মাত্রেই তার কেমন সদ্ব্যবহার হচ্ছে,—একবার দেখে যাও !

অতি কষ্টে নিজকে কতকটা সাম্‌লে নিয়ে, কর্কশ চাপা গলায় বলে উঠ্‌লাম,—"তুমি—তুমি—এখন যাও। আমাকে এখনি বাইরে যেতে হবে। ভয়ানক দরকার !"

কোটটাতে হাত চালিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আস্‌বার উপক্রম করতে, সেও সরে গিয়ে দরজার কাছে থমকে দাঁড়ালো। বল্‌লাম,—তুমি আগে, যাও,—একসঙ্গে যাওয়া হ'বে না।"

সে একটু ইতস্ততঃ করে ধীরে ধীরে দরজা ছেড়ে বারান্দায় নেমে দাঁড়ালো। বল্লে,—"আচ্ছা, যাই।" তারপর জোর করে মুখে একটু হাসি টেনে এনে বল্লে—

"তা'হ'লে, আজ আমাকে কিছু দেবেন? না, আর একদিন?"

তা'র হাসিতে, কথাতে যেন সারা দেহে বিষ ছড়িয়ে দিলে। হাঁপা'তে হাঁপা'তে বল্লাম,—"না, না,—এখনি দিচ্ছি,—নিয়ে যাও।"

পকেটে গোটা তিন-চার টাকা আর কিছু খুচরা ছিল, মুঠো করে তুলে দিলাম; আঁচল পেতে নিয়ে সে নিঃশব্দে চলে গেল।

হায় নারী, এ কি মূর্ত্তিতে আজ দেখা দিলে তুমি! নারীর রূপ, নারীর নারীত্ব, নারীর দেবীত্ব, তা'র স্নেহ, প্রেম, ভালবাসা,—আত্ম-বিসর্জ্জন যা'র নামান্তর মাত্র,—এই অতুল সম্পদ এত হীন মূল্যে বিক্রয় করতে এসেছিলে। আমার আর যাওয়া হ'ল না; বড় গা ঘিন্ ঘিন্ করতে লাগলো, স্নান করে এলাম। মুখে সাবান মেখে, ঠোঁট দু'খানা বেশ করে রগ্ড়ে বার বার করে ধুয়ে ফেল্লাম। কিন্তু জ্বালা কিছুতেই গেল না।

মাথা ঘুরতে লাগলো, শরীর আসন্ন হয়ে এল, আলো নিভিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়্লাম। কতক্ষণ পরে ছটফট্ করে, না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়েছি জানিনা,—শেষরাত্রে খুব শীত করে জ্বর এল।

পাপের শাস্তি সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ হ'ল। কিন্তু এই মোটে আরম্ভ-এখনও অনেক বাকী।

যে ক-দিন অসুখ হয়ে পড়েছিলাম, খবর পেয়ে সনৎ রোজ দেখ্তে আস্তো। মাঝে মাঝে অপর্ণাও আস্তেন, কত সেবা করতেন, শোভনার কথা বল্তেন। শুনে আমার চোখে জল আস্তো, কিছু বল্তে পারতাম না। অপর্ণা বোধ হয় সেটাকে ভালবাসার চিহ্ন মনে করে কত রকমে সান্ত্বনা দিয়ে যেতেন।

সেরে উঠ্তেই বিবাহের কথা আবার নতুন করে উঠ্লো। মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল। নিজের উপর দারুণ ক্রোধ এবং ঘৃণা হতে লাগ্লো। আমার পাপের শাস্তি আমাকে ত মাথা পেতে নিতেই হবে; কিন্তু এই নিরপরাধিনী বালিকাকেও ভুগ্তে হ'বে, এই চিন্তা বুকের মধ্যে শেলের মনে বিধ্তে লাগ্লো। অথচ তা'র কোন প্রতিকার খুঁজে পাই না। সে যেমন নিজেকে নিঃশেষ করে বিলিয়ে দিয়েছে, আর কি ফিরিয়ে নিতে পারবে? তা'ও সম্ভব বলে মনে হ'ল না।

তবু, বিবাহে আপত্তি জানালাম, আমি অতি অধম, নিম্মল পবিত্রতার প্রতিমূর্ত্তি শোভনা,—আমি তা'র সম্পূর্ণ অযোগ্য। এ ছাড়া আর কোন কারণ প্রকাশ না হওয়ায়, আমার আপত্তি গ্রাহ্য হ'ল না। পাজী থেকে শুভদিন খুঁজে বার করা হ'ল।

শুভদিন! অনন্ত আকাশে বিক্ষিপ্ত জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলী, যা'রা লক্ষ লক্ষ যোজন দূরে ঘুরে বেড়াচ্চে,—তা'দের গতি-বিধি, যোগাযোগ দেখে মানুষের শুভাশুভ গননা! রক্ত-মাংসের ক্ষণভঙ্গুর দেহ নিয়ে যারা এই সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে চলে-ফিরে বেড়ায়, ছোট ছোট সুখ-দুঃখে যাদের সৃষ্টি, স্থিতি, লয়,—তা'দের জীবনের গতি, তা'দের প্রাণের যোগাযোগ দেখে তা'দের শুভাশুভ নির্দ্ধারণের ব্যবস্থা কি কোন জ্যোতিষ-শাস্ত্রে নেই? তা' যদি হ'ত, তা'হ'লে এ বিবাহের জন্যে কোন শুভদিনই খুঁজে পাওয়া যেত না!

কিন্তু বিবাহ হয়ে গেল।

আমাকে পেয়ে শোভনা যে বিলক্ষণ সুখী হয়েছে, তা' বেশ সহজেই বুঝ্লাম,—বুঝে অনেকটা শান্তি লাভ করলাম। ভাব্লাম, তা'র পূর্ণ পরিতৃপ্ত ভালবাসা আমার হৃদয়ে সংক্রামিত হয়ে, মনের সকল গ্লানি মুছে ফেল্বে। এই সম্মিলিত প্রেমের অপ্রতিহত প্রবাহে আমার জীবনের ক্ষুদ্র কলঙ্কটুকু কোথায় ভেসে যা'বে,—আর তা'র কোন্ চিহ্ন থাক্বে না।

কিন্তু তা' হ'ল না। আমার কলঙ্কের স্মৃতি শত চেষ্টাতেও গেল না; বরং সতর্ক প্রহরীর মতন দু'জনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ঘনিষ্ঠ মিলনের পথে এক দুর্লঙ্ঘ্য অন্তরায় হয়ে রইল। তা'র কাছে যেন সর্ব্বদাই অপরাধী হয়ে রইলাম, তার প্রেমের দান নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করতে পারলাম না, উপযুক্ত প্রতিদান দিতে পারলাম না। যখনই তা'কে

একটু আদর যত্ন করতে গিয়েছি, একটা কুণ্ঠিত উদাসীনতার ভাব এসে তা'র অবাধ আত্ম-সমর্পণের চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়েছে। ঘনীভূত আলিঙ্গনের মধ্যে যখনই তা'র ঠোঁট দুখানি শিহরে উঠে তৃষিত পুষ্পের মতন স্নিগ্ধ বারিধারায় স্নান করবার জন্যে অগ্রসর হয়েচে, তখনই সেই স্ফীত উন্মত্ত অধরের ব্যগ্র আহ্বানকে অগ্রাহ্য করে ফিরিয়ে দিয়েছি। কেবলই মনে পড়েছে,—সেই গরলের তিক্ত আস্বাদ, আগুনের তীব্র জ্বালা!

৮

বিবাহের পর শোভনার মুখখানি পরিপূর্ণ সুখ ও সার্থকতার দীপ্তিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। দেহে যৌবনের পূর্ণ প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়ে, রূপ, লাবণ্য, স্বাস্থ্যের পরম পরিণতি লাভ হয়েছিল। কিন্তু ক্রমে তা'র শরীর শীর্ণ হয়ে আস্তে লাগ্‌লো, সলাজ-প্রফুল্ল বদন ম্লান নিষ্প্রভ হয়ে এলো, একটা গাম্ভীর্য্য ও বিষাদের ছায়া ঘনিয়ে উঠ্‌লো। আমি সেগুলোকে আসন্ন মাতৃত্বের লক্ষণ মনে করে একটা গর্ব্ব এবং আনন্দ অনুভব কর্‌লাম।

কিন্তু সেটা যে আমার ভুল, তা' জানা গেল বিবাহের ঠিক দু'বৎসর পরে,—যখন শোভনার একটি ছেলে হয়ে দশ-দিনের দিন মারা গেল, আর সে নিজেও রোগে পড়লো। শরীর তা'র আগে থেকেই খারাপ ছিল; জীবনের এই প্রথম শোকে একেবারে ভেঙ্গে গেল।

আমি তখন কিশোরগঞ্জে নতুন বদ্‌লি হয়েছি, কাজের খুব ভীড়, ছুটী পাওয়া দুর্ঘট। মাস দুই পরে এসে দেখি, শোভনাকে আর চেনা যায় না, এমন তার অবস্থা!

চিকিৎসা রীতিমতই চল্‌ছিল; তবু এবার একজন ভাল ডাক্তারকে এনে দেখানো গেল। তিনি দেখে-শুনে বাইরে এসে, দ্বিধা-কুণ্ঠিত স্বরে রোগের নাম সংক্ষেপে বল্‌লেন,—"টি—বি।" চব্বিশ-ঘণ্টা জন্ম-মৃত্যু নিয়ে কারবার, তবু তিনি সাহস করে সোজা কথায় বল্‌তে পার্‌লেন না,—যক্ষ্মা!

তখন গ্রীষ্মকাল। সকলের পরামর্শমত শোভনাকে দার্জ্জিলিং নিয়ে যাওয়া হ'ল। সেখানে কোন উপকার হ'বার আগেই বর্ষা নাম্‌লো। সেখান থেকে ফিরে এসে, দিনকতক কলকাতায় থেকে—পুরী।

পুরীতেও তা'র কোন উপকার ত হ'লই না বরং দিনদিন অবস্থা খারাপ হয়ে আস্‌তে লাগলো। স্থানান্তরে নিয়ে যাবারও উপায় রইল না! তখন সনৎ এল মা'কে নিয়ে। তাঁরা রোগিণীর পরিচর্য্যা করবার জন্যে ব্যগ্র হয়ে পড়লেন। কিন্তু তাঁদের বেশী কিছু কর্‌বার অবকাশ দিতাম না, যতক্ষণ পার্‌তাম নিজেই তা'র কাছে থাক্‌তাম।

তাকে একটু প্রফুল্ল রাখবার জন্যে, কাছে বসে কত গান, কবিতা, গল্প বল্‌তাম,—পেড়ে শোনাতাম। সে অপলক-নয়নে আমার মুখের পানে চেয়ে নীরবে শুনে যেতো। মনে পড়তো সেই আগেকার কথা,—লজিক্ বোঝাবার সময় তা'র সেই একাগ্র, তন্ময় দৃষ্টি! হায়, এতদিনের সঞ্চিত ক্রম-বর্দ্ধমান এই অসীম ভালবাসার পরিবর্ত্তে আমি কি দিয়াছি?—নৈরাশ্য রোগ, শোক,—পরিণামে হয়ত মৃত্যু!

আজকাল রোগে ভুগে যত তা'র মুখটি মলিন হয়ে আসছে, ততই তা'র চোখদুটিতে কি এক অপূর্ব্ব জ্যোতি ফুটে উঠতে দেখা গেল। সে দৃষ্টিতে গভীর বেদনার সঙ্গে যেন একটা সুখের আবেশ মিশে আছে। তা'র কি কষ্ট, কিসে তা' দূর হয়, মনে কি ইচ্ছা হয়, জিজ্ঞাসা কর্‌লে ম্লান হেসে কেবল বলে—"কিছু না।" চোখ বুজে আসে, শুষ্ক পাণ্ডুর ঠোঁট দু'খানি ঈষৎ কেঁপে উঠে।

সেইদিকে চেয়ে থাক্‌তে থাক্‌তে মনে হ'ত, এমন অমৃতের উন্মুক্ত ভাণ্ডার সম্মুখে পেয়েও এতদিন তা'র আস্বাদ নিলাম না! কি মূঢ় আমি!—এতে যে আমার সকল কলঙ্ক মুছে যেত, সকল গ্লানি মিটে যেত। কিন্তু আর বোধ হয় তা' হ'ল না; শোভনা আর আমাকে বেশী কাছে যেতে দেয় না,—তা'র বিষাক্ত নিশ্বাস থেকে আমাকে দূরে সরিয়ে রাখে।

একদিন সে অনেকক্ষণ আমার মুখের পানে চেয়ে চেয়ে, কি ভেবে, নিজেই ডেকে কাছে বসালে। আমার হাতের ভিতর একখানি শীর্ণ হাত রেখে ধীরে ধীরে বল্‌লে,—"দেখ, আমার ত দিন ফুরিয়ে এসেছে। তোমরা মিথ্যায়

না পেলেও আমি ত বুঝতে পাচ্ছি। কিন্তু আমি যাই, তা'তে দুঃখ নেই, কেবল তোমার জীবনটাকেও ব্যর্থ করে দিয়ে যা'ব,—এই বড় দুঃখ। হয়ত এখনও তুমি সুখী হ'তে পার। তাই বল্‌চি, আমি যা' বলি তা' শুনবে?"

তা'র হাতখানা সজোরে চেপে ধরে বল্‌লাম,—"যা' বল্‌বে তা' বুঝেছি,—কিন্তু তা হয় না। এখন তুমি সেরে উঠ্‌লে তবেই আমি সুখী হ'ব; না হ'লে—"

একটু ক্ষীণ হেসে শোভনা বল্‌লে,—"আমি জোর করে দিব্যি দিয়ে কিছু বল্‌চি না। শুধু এই বলি,—যদি আর কাউকে পেলে সুখী হও, যদি আর কাউকে সত্যিসত্যিই ভালবাসতে পার, তাহ'লে বৃথা আমার কথা ভেবে—"

তার কথায় বাধা দিয়ে, আবেগ-ভরে বল্‌লাম,—"তোমাকে কি ভালবাসি না, শোভনা? তোমার কি তাই বিশ্বাস?"

শোভনার মুখের উপর আবার তেমনি ঈষৎ হাসির হিল্লোল বয়ে গেল, ঠোঁট দু'খানি তেমনি কেঁপে উঠলো,—আমার মুখখানা আপনা হতেই অত্যন্ত ঝুঁকে পড়লো। অসহায়ের ক্ষীণ হাসি হেসে বল্‌লে,—"না না, আর হয় না। জান না কতবার সাবধান করে দিয়েছি,—আমার মুখে রোগের বীজ ছড়িয়ে আছে?"

"তুমি জান না, তা'র চাইতে ভীষণ বীজের আকর আমি! হয়ত ঐ বিষেই আমার বিষক্ষয় হ'বে!"

আর সে বাধা দিলে না, চোখ দুটি তা'র বুজে এলো বাঁ-হাতখানি আমার কাঁধের উপর তুলে দিয়ে, ধীরে ধীরে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেল্‌লে।

এই ত প্রণয়ের প্রথম চুম্বন! এতদিন তা জানিনি, কিন্তু আজ সারা দেহ কি এক অপূর্ব্ব পুলক-প্রবাহে অবসন্ন হয়ে এল,—গরলের তিক্ত আস্বাদ, আগুনের তীব্র জ্বালা—কোথায় সে সব আজ! এতদিনের পুরাতন অভিশপ্ত জীবনের অবসানে নূতন জীবন-সঞ্চারের আবেশে বিভোর হয়ে গেলাম!

কতক্ষণ এভাবে ছিলাম জানি না। তা'র শ্লথ বাহুবন্ধন থেকে ছাড়িয়ে উঠে, দেখি শোভনা তখনও তেমনি চোখ বুজে আছে, মুখে সেই ম্লান-মধুর হাসি ছড়িয়ে আছে। ধীরে ধীরে তা'র হাত ধরে ডাক্‌লাম,—"একবার চেয়ে দেখ শোভনা—কি ছিলাম কি হয়েচি। আজ সঞ্জীবনী-সুধা পান করে নবীন জীবন পেয়েছি। জীবনের ভ্রম ভেঙেছে,—এস এইবার সব ভুলে গিয়ে, প্রেমের নূতন খেলাঘর পেতে, নূতন খেলা আরম্ভ করি!"

কিন্তু এ কি! সে যে কোন সাড়া দেয় না; চোখ চায় না,—হাতখানা ঠাণ্ডা বরফ! হায়, অভাগিনীর জীবনের প্রথম প্রণয় চুম্বনই তার শেষ, প্রাণে মিলনের এই প্রথম সূচনাতেই তা'র অবসান!

আর্ত্তনাদ করে তা'র শীতল নিস্পন্দ বুকের উপর আছড়ে পড়লাম।

যখন জ্ঞান হ'ল, তখন সব শেষ হয়ে গেছে। তাকে একাকিনী কোথায় কোন অচেনা পথে পাঠিয়ে দিয়ে সকলে তখন ঘরে ফিরে এসেছে।

এই হ'ল আমার কথা!

এখন তোমরা বিচার করে বল,...না না, তোমরা কি বিচার করবে,—আমার প্রাণের কথা আমার চেয়ে কে বেশী বুঝবে? জগতের লোক যদি আমাকে না বোঝে কি ভুল বোঝে,—তা'তে আমার কিছু আসে যায় না। কিন্তু যার বোঝবার, বিচার করবার, অধিকার ছিল,—তা'কেই যে আমার গোপন কথা, আমার কলঙ্ক-কাহিনী শোনানো হ'ল না। সব কথা শুনে সে আমাকে ক্ষমা করে কিনা, জানা হ'ল না। আমার ভালবাসায় তার বিশ্বাস 'য়েচে কি না, তা'র ভালবাসার একটুও প্রতিদান পেয়েছে কি না, তাও জানা হ'ল না। তা'র যে শেষ মূর্ত্তি দেখলাম, তা' থেকে ত' কিছু বুঝলাম না। জীবনের অন্তিম মুহূর্ত্তে তা'র মুখে যে হাসিটুকু ফুটে উঠেছিল তা'র অর্থ কি?

এই সব কথার উত্তর কে দেবে? তোমরা ত তা' পার্‌বে না। বরং যদি পার ত বল,—কতদিন পরে এর উত্তর মিল্‌বে, কতদিনে এই দীর্ঘ বিরহের রজনী প্রভাত হবে!

তাও বল্‌তে পার না? কিন্তু আমি বল্‌তে পারি। সেই যে সঞ্জীবনী-সুধা পান করে নবীন জীবন লাভ করেছিলাম, তা'র সঙ্গে আরও পেয়েছিলাম—মৃত্যুর বীজ! এই অমৃত গরলের সম্মিলিত ক্রিয়া আমার দেহে-প্রাণে বেশ দেখা দিয়েছে, পলে পলে আমাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে, সেই পথে—ও-পারের সেই সুন্দরতর জগতের দিকে,—যেখানে মিলনের প্রথম চুম্বনে প্রাণে প্রাণ মিশে এক হয়ে যাবে, দুয়ের পৃথক সত্তা লোপ পেয়ে যাবে,—সৃষ্টি ধ্বংস হলেও সে মিলনে বিচ্ছেদের আশঙ্কা আর থাক্‌বে না!

এ-পারের অসমাপ্ত প্রথম চুম্বন যবে ও-পারে গিয়ে পূর্ণ পরিণতি এবং সার্থকতা লাভ করবে,—সেদিনের আর বেশী দেরী নেই!

শ্রীসত্যরঞ্জন সেন।

পথের পাঁচালী ও অপরাজিত *

শ্রীযুক্ত মহিমারঞ্জন ভট্টাচার্য্য বি-এ

আধুনিক বাঙ্গালাসাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্ন কি, একথা জিজ্ঞাসা করা মাত্রই বোধ হয় উত্তর দেওয়া যায় "পথের পাঁচালী" ও "অপরাজিত।" ভাব ও ভাষা যে কি অপূর্ব্ব সামগ্রী রচনা করিতে পারে তাহার পরিচয় পাই এই গ্রন্থ দুইখানিতে।

প্রথমে যাহা আমাদের মুগ্ধ করে তাহাই বোধ হয় পুস্তক দুইখানির শ্রেষ্ঠ বিশেষত্ব,—গ্রন্থকারের প্রকৃতির প্রতি আশ্চর্য্য ভালোবাসা। প্রকৃতির সহিত আপন ভাবে না মিশিলে, প্রকৃতিকে একান্তরূপে আপনার না করিয়া লইলে বোধ হয় ঐ অদ্ভুত সহানুভূতি জাগিতে পারেনা। নদী, মাঠ, বন, পাখীর সহিত অপু কতদিনের পরিচিত, সে যে প্রকৃতিরই আদরের দুলাল। তাহার ভাবুক মন প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে,—সে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ব্যতীত আর কিছুই বুঝিতে চাহে না, বুঝিতে পারে না। কর্ম্মব্যস্ত প্রতিদিনের রুটিন-বাঁধা জীবন তাহাকে ডাক দিতে পারে নাই, সে সৌন্দর্য্যের খোঁজে আত্মহারা। এই চোখেদেখা মাটির সৌন্দর্য্যের পরেও যে আর একটা অসীম সৌন্দর্য্য আছে সে তাহার সন্ধান পাইতে চায়। ভিজামাটির গন্ধ, বুনো ফুলের সৌরভ, গাছের পাতার কাঁপন, এ যেন সবই সেই ভিতরকার সৌন্দর্য্যের মায়া-যবনিকা,—অপু এই যবনিকা সরাইতে চায় ভিতরে প্রবেশ করিবে বলিয়া; সেই সরাইবার চেষ্টাই পরে অপুকে অস্থির, ভবঘুরে ও বিশ্রামহীন করিয়াছে। পথের পাঁচালীর অপু নিশ্চিন্দিপুরের সৌন্দর্য্যের মধ্যে সোনার কাঠির সন্ধান পাইয়াছিল, অপরাজিতের অপু সোনার কাঠি লইয়া রাজকন্যার ঘুম ভাঙ্গাইতে চলিয়াছে।

পথের পাঁচালীতে অপু শুধু নিশ্চিন্দিপুরকে লইয়াই তাহার মায়াজগৎ রচনা করিয়াছিল। সে ছিল সেখানকারই প্রকৃতির একটা অঙ্গ-বিশেষ, প্রকৃতিরই একটা সৌন্দর্য্য যেন অপুতে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছিল। তাহার ভিতর দিয়াই নিশ্চিন্দিপুরের প্রকৃত সৌন্দর্য্য জাগিয়া উঠে। ছেলেবেলায় সে নিশ্চিন্দিপুরের সবকটি জিনিষকেই প্রাণ দিয়া ভালবাসিত, শুধু সুন্দর বস্তুর সৌন্দর্য্যই তাহার চোখের কাছে ধরা পড়ে নাই—যাহা আমাদের চোখে অসুন্দর, ইটের দেওয়াল, কাঠের বাক্স, এ সকলেরই একটা বিশিষ্ট সৌন্দর্য্য একটা অবোধ্য রহস্য সে দেখিতে পাইত, উপভোগ করিত, তাহার ভিতর নিজেকে বিলাইয়া দিত। অপরাজিতে দেখিতে পাই তাহার মন বিস্তীর্ণতর হইয়াছে; যে মন শুধু নিশ্চিন্দিপুরের গণ্ডীর মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখিত, তাহা সমস্ত জগতের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সে শুধুই আর তাহার গ্রামের প্রকৃতিকেই প্রাণ ভরিয়া ভালোবাসে না, সমস্ত জগতের উপর তাহার ভালোবাসা ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তাহার দৃষ্টি দূরপ্রসারী ও ব্যাপক হইয়া উঠিয়াছে। নিশ্চিন্দিপুরের পাতা গাছ নদী মাঠ তাহার প্রাণের মধ্যে যে ভাব জাগায়, তাহার মনে হয় নাগপুরের অরণ্য কি অন্য এক স্থানের প্রকৃতি সেই একই ভাব জাগায়। এগুলি যেন আরও এক অসীম রহস্যময় সৌন্দর্য্যের দুয়ার, এই দুয়ারের চাবীকাঠির সন্ধানে সে ফেরে। তাই সে আর তেমন করিয়া নিশ্চিন্দিপুরকে ভালোবাসিতে পারে না যেমন করিয়া অবুঝ ভাবে শৈশবে সে ভালোবাসিত। অবশ্য সে ভালোবাসা আমরা আশাও করিতে পারি না; সে এখন দূরকে চিনিয়াছে, দূরকে আপন করিয়া ফেলিয়াছে। যখন সে দেখিল কাজলকে কলিকাতায় রাখিলে তাহার মন প্রসারতা লাভ করিতে

* পথের পাঁচালী গ্রন্থাকারে পূর্ব্বেই বাহির হইয়াছে; অপরাজিত যন্ত্রস্থ, প্রবাসীতে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল।

পারিবে না, তখন সে কাজলকে নিশ্চিন্দিপুরে রাখিয়া নিজে দূরের সৌন্দর্য্য—যাহা জগতে ছড়াইয়া পড়িয়া আছে—তাহার খোঁজে বাহির হইয়া গেল। নিশ্চিন্দিপুর যেন তাহার কাছে এই ছড়ান সৌন্দর্য্যের আয়নার প্রতিচ্ছবি হইয়াছিল।

কিন্তু এক জায়গায় তাহার সহানুভূতি সীমাবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। সে সহরের প্রতি বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন, সহরকে সে দু'চোখে দেখিতে পারে না। সে দূরের স্বপ্ন দেখে, বিলাতকে দেখে জুনিপারের বনে, পুরাণো নর্ম্মাণদুর্গে, কিন্তু সে ভাবে না, কুয়াসাঢাকা নগরগুলির কথা। সে প্রাচীন গ্রীসের কথা ভাবে—অলিভ ও মার্টল-কুঞ্জ, কিন্তু ভাবে না স্তম্ভরাশি শোভিত গৃহগুলি; সে ভাবে প্রাচীন মিশর—নলখাগড়ার বন, নীলনদ, কেবল সে দেখিতে পায় না ঐ নীলনদের বাঁকে প্রাচীন সহরের ক্রীতদাসগুলির আনাগোনা, রৌদ্রপক্ক ইষ্টক-নির্ম্মিত বাড়ীগুলির উপর পড়া ম্লানায়মান সূর্য্যকিরণের কথা। কোথাও সে সহরকে দেখিতে পারে না, দেখিতে চাহে না।

তাহার সহরের প্রতি এই সীমাবদ্ধ সহানুভূতি, আমার মনে হয়, আরও বেশী করিয়া ফুটিয়াছে তাহার কলিকাতার প্রতি আচরণে। কলিকাতাকে সে বরাবরই ঘৃণা করিয়া আসিয়াছে; কলিকাতার যে একটা সৌন্দর্য্য থাকিতে পারে তাহা তাহার আদৌ মনে হয় নাই। কলিকাতা বলিতেই তাহার মনে পড়িয়াছে বস্তী, আপেলের খোসা, আবর্জ্জনা ও শুটকী মাছের গন্ধ। বাস্তবিকই কি কলিকাতার কোনও সৌন্দর্য্য নাই? আমার মনে হয় কলিকাতা তথা সহরের একটা বিশিষ্ট সৌন্দর্য্য আছে। সে সৌন্দর্য্য গ্রাম্য প্রকৃতির সহিত একজাতীয় হইতে না পারে, কিন্তু তথাপি সেই সৌন্দর্য্যের আকর্ষণ আছে। আমি সহরের আকর্ষণ বলিতে ড্রয়িংরুম, চায়ের বাটী, টেনিসগ্রাউণ্ড অথবা সিনেমা থিয়েটার, বিজলীবাতীর আকর্ষণ বলিতেছি না, প্রকৃতির যে আকর্ষণ মানবকে মুগ্ধ করে, আমি সেই আকর্ষণের কথাই বলিতেছি। সহরের ইট, কাঠ, ট্রাম-মোটরের যাওয়া আসা, পথিকের চলাচল এ সবারি একটা মাদকতা আছে। মুক্ত প্রকৃতি মানবের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয়, প্রকৃতির সহিত পরিচয় না ঘটিলে মনের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না সত্য; কিন্তু তাই বলিয়া সহরকে ঘৃণা করা কি উচিত হইবে? ভাবুক মন অতি ব্যাপক, সে যেমন প্রকৃতির প্রতি আকৃষ্ট হয়, তেমনই সহরের প্রতিও ত' আকৃষ্ট হইতে পারে; উভয়েই উভয়ের Complementary, যে সত্যকার ভাবুক সে একটার প্রতি উদাসীন থাকিবে কেন?

প্রভাতে নানা প্রকার ফেরীওয়ালা হাঁকিয়া যায়, খবরের কাগজ-বিক্রেতারা নানা প্রকার কাগজ নানাপ্রকার সুরে নানা প্রকার মন্তব্যের সহিত বিক্রয় করিতে ছুটে। ক্রমে বেলা বাড়ে; আফিসের বাবুরা দ্রুত পাদচালনা করিতে থাকেন। স্কুল-কলেজের ছেলেরা হাস্য-পরিহাসে পথ সরগরম করিয়া তুলে। ট্রাম ও বাসগুলি বোঝাই হইয়া হাঁপাইয়া হাঁপাইয়া চলিতে থাকে। ধীরে ধীরে দ্বিপ্রহরের শান্ত নীরবতা নামিয়া আসে। নিস্তব্ধ-নির্জ্জনতার মধ্যে হঠাৎ একটা কাক কা কা করিয়া ডাকিয়া টিনের চালে ঝুপ্ করিয়া বসিয়া পড়ে। ওই পার্কের বড় মাঠটার উপর রৌদ্র চক্ চক্ করিতে থাকে; একটি রঙচঙে পোষাক পরা লোক ছাতামাথায় মাঠের উপর দিয়া গিয়া ঐধারের বড় বাড়ীটায় প্রবেশ করে। অদূরবর্ত্তী স্কুলগৃহে একবার গুঞ্জন-ধ্বনি উঠিয়া নীরব হইয়া যায়। পাশের গুদাম হইতে প্যাকিং বাক্স তৈয়ারীর ঘটাঘট শব্দ খুব জোরে কয়েকবার হইয়া থামিয়া যায়। একটি ফেরীওয়ালা সুধা হাঁকিয়া চলিয়া যায়, তাহার আওয়াজ ক্রমে ক্রমে মিলাইয়া যায়। ওই বড় বাড়ীটার বড় দালানে পায়রাগুলি করুণসুরে ডাকিতে থাকে। ক্রমে বেলা গড়াইয়া যায়, স্কুলকলেজ অফিস হইতে সকলে ফিরিতে থাকে। রাস্তার আলো জ্বলিয়া উঠে। তারপর অন্ধকার ঘনাইয়া আসে,—ওপাশের বাড়ী হইতে গানের সুর ভাসিয়া আসিতে থাকে। ক্রমে রাত বাড়ে। একটা রিক্স ঠুং ঠুং আওয়াজ করিয়া চলিয়া যায় দূরের গির্জ্জার ঘড়ির আওয়াজ কানে আসে। রাত্রির নীরবতাকে ভঙ্গ করিয়া দিয়া রাস্তার একটা কুকুর অকস্মাৎ চীৎকার করিয়া উঠে। গভীর সুষুপ্তির মধ্যে কালো আকাশে তারাগুলি বড় বড় বাড়ীর ফাঁক দিয়া এক নিমেষে চাহিয়া থাকে। খাঁটিদার পাহারাওয়ালা হাঁক দিয়া চলিয়া যায়। একটা ষ্টীমার ভোঁ দিয়া উঠে। এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া বহিয়া যায়। ক্রমেই অন্ধকার পাতলা হইয়া আসে,—ময়লা-

কেলা গাড়ীগুলি ঘড় ঘড় আওয়াজ করিয়া ছুটিতে থাকে। আবার ভোরের আলো ফুটিয়া উঠে। এই যে সহরের দৈনন্দিন জীবন ইহার ভিতর কি এমন কোনও সৌন্দর্য্য নাই, এমন কোনও রহস্য নাই যাহা অপুকে মুগ্ধ করিতে পারে? সে কেবল যেখানে গাছপালা দেখিয়াছে সেইখানেই মুগ্ধ হইয়া গিয়াছে, বাড়ীঘরের কৃত্রিমতা তাহাকে মুগ্ধ করে নাই; সে ভাবিয়াছে যাহা ভগবানের সৃষ্ট তাহাই সুন্দর; মানবের সৃষ্ট সৌন্দর্য্য তাহার মনে স্থান পায় নাই। এমন কি সহরের লোকগুলিও সহরের লোক হিসাবে তাহার মনে কোনও ভাব জাগায় না! রামধনবাবু বা তেওয়ারী বউ—ইহারা তাহার পরিচিত, কিন্তু সহরের লোক বলিয়া তাহারাও যেন তাহার নিকট কি রকম অনুকম্পা লাভ করে।

কাজল খুব অল্প সময়ের জন্য আমাদের সম্মুখে আসিয়াছিল, তাহার ভীরুতা ও লাজুকতার জন্য আমরা তাহার সহিত বেশী ভাব করিতে পারি নাই। যেটুকু সময়ের জন্য আমরা কাজলকে পাইয়াছি, তাহাতে তাহার কয়েকটি বিশেষত্ব বড় বেশী করিয়া চোখে পড়ে।

কাজল মামার বাড়ীতে মানুষ হইয়াছিল, কিন্তু মামার বাড়ীর পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনের মধ্যে নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারে নাই কেন? কাজল তাহার পিতার মত ভাবুক হইয়াছিল,—পিতার কল্পনা-প্রবণতা তাহাতেও বর্ত্তিয়াছিল; তথাপি সে মামার বাড়ীর চতুর্দ্দিকের অবস্থাকে নিজের মধ্যে ধরিয়া লইতে পারে নাই। গ্রন্থকার তাঁহার চরিত্রের ভিতর দিয়া শিশুমনেরই পরিণতি আঁকিয়াছেন। শিশুর মন তাহার পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়িয়া ধরে। তাহার প্রথম ভালোবাসা ওই আবেষ্টনের উপরই গিয়া পড়ে। কাজল জালার পাশে ভূত কল্পনা করে, নীল আকাশে রাজপুত্রের রথ দেখিতে পায়, আরব্যোপন্যাসের গল্প তাহার শিশুমনকে নাড়া দেয়; কিন্তু মামার বাড়ীর গাছপালা নদীর সহিত তাহার কোনও মনের যোগ নাই। হইতে পারে সেখানকার প্রকৃতি নিশ্চিন্দিপুরের মত সম্পদশালী নয়, কিন্তু শিশুমন ত' সৌন্দর্য্যের বাছ-বিচার করে না, যাহা পায় তাহাই একান্তভাবে আপনার করিয়া গ্রহণ করে। এমন কি, কাজল যখন কলিকাতায় আসিল, কলিকাতার প্রতিও তাহার চোখ পড়িল না।

অবশ্য আমি একথা কখনো বলিতে চাহি না, কলিকাতার রূপ প্রকৃতির শোভার কোন প্রকার substitute বা প্রতীক হইতে পারে; আমি শুধু বলিতে চাই যে, কলিকাতারও একটা বিশিষ্টরূপ আছে, এবং সে রূপ মনকে আকর্ষণ করিতে পারে। যে বয়সে পারিপার্শ্বিক আবেষ্টন হইতে মনের আনন্দ গ্রহণ করিবার ক্ষমতা জন্মে, সে বয়স ত' কাজলের হইয়াছিল, তথাপি কাজল গঙ্গানন্দকাটি ও কলিকাতা কোনটার সহিতই ভাব করিতে পারে নাই কেন?

একটা কথা মনে হয়, গ্রন্থকার কাজলকে বড় একলা রাখিয়াছিলেন। কি গঙ্গানন্দকাটি, কি কলিকাতা কোথাও তাহার তেমন সঙ্গী জুটে নাই। তাহার দিদিমা ও বাবা তাহার কাছে কিছুদিন ছিলেন বটে, কিন্তু আমি সে সঙ্গীর কথা বলিতেছি না। দুর্গা ও অপু যেমনটি ছিল, কাজল সে রকমটি পায় নাই। দুর্গা কবে মরিয়া গিয়াছে, কিন্তু অপু যেন এখনও তাহাকে কাছে পাইতেছে। নিশ্চিন্দিপুরের বন জঙ্গল হইতে সে দিদিকে পৃথক করিতে পারে না। সে এখনও রায়পাড়ার ঘাটের ওধারে ওই প্রাচীন ছাতিম গাছটার তলায় তাহার দিদিকে শুইয়া থাকিতে দেখিতে পায়। বাহিরের কল-কোলাহলের অন্তরালে তাহার শিশু-মন আবার জাগিয়া উঠে - সে তাহার শিশুপ্রাণের সাথীকে আবার খুঁজিয়া ফিরে,—তাহার জন্য নীরবে চোখের জল ফেলে,—আমরাও চোখের জল রাখিতে পারি না। কিন্তু কাজলের সেরূপ সাথী ছিল না; বোধ হয় সেই জন্যই সে এতটা ভীরু ও লাজুক, আর সেই জন্যই সে তেমন নিবিড় ভাবে গঙ্গানন্দকাটি বা কলিকাতার সহিত মিশিতে পারে নাই। বায়স্কোপের ছবির মত তাহারা কাজলের চোখের সম্মুখ দিয়া আসিয়াছে গিয়াছে, মনে কোনও ছাপ দিতে পারে নাই।

গ্রন্থকার কয়েকটি ছোট চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন, সেগুলিও মনকে অত্যন্ত নাড়া দেয়, কিন্তু পরে আর তাহাদের পাই না; তাহাদের বিরহ-ব্যথা মনকে পীড়া দেয়। পথের পাঁচালী ও অপরাজিত—ইহাদের প্রতি চরিত্র অত্যন্ত জীবন্ত; তাহারা যেন আমাদের সঙ্গে ঘুরিয়া

বেড়ায়, খেলিয়া বেড়ায়, তাহাদের সুখ দুঃখ আমাদেরও আনন্দ বা পীড়া দেয়। অপু তাহার সমস্ত জীবনে যে সকল লোকের সংস্পর্শে আসিয়াছিল, তাহাদের অনেককে আমরা পরে দেখিতে পাইয়াছি। সতুদা তামাকের দোকান খুলিয়াছে, তাহাতেই সে মনের আনন্দে আছে। দেবব্রত বিলাত ফেরৎ এঞ্জিনিয়র সতোন বাবু ওকালতী করিতেছেন, —সুরেশ্বর চাকরী করিতেছে, ইহারা সকলেই ভাবিতেছে বেশ আছি। লীলাদি, রাণীদি সকলকেই পরে পাইতেছি। কিন্তু পাইলাম না তাহাদের, যাহারা ঘন পল্লবের অন্তরালে জীবন অতিবাহিত করিতেছে, যাহাদের কথা আমরা কেবল গ্রন্থকারের সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি ও সহানুভূতির জন্যই জানিতে পাই। গুলকী—সেই ছোট্ট মেয়েটি, যে মার খাইত ও তরকারী চাহিয়া বেড়াইত,—দুঃখিনী গোকুলের বৌ,—বোষ্টম দাদু, ইহাদের কাহাকেও আর পরে পাইলাম না। বোষ্টম দাদুর কথা অপু আগে একবার পটুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। অপু শেষে নিশ্চিন্দিপুরে গিয়া সকলের খোঁজ লইল, কিন্তু ইহাদের খোঁজ করিল না কেন? গ্রন্থকার অবশ্য সকলকে পুনরায় আনিতে পারেন না; হরিহর রায়ের শিষ্যবাড়ীর ছেলেরা কি কাশীর নন্দবাবু—ইহাদের পুনর্বার দেখিতে পাইবার আশা করিতে পারি না, ইহারা আসে, চলিয়া যায়। সকলকে শেষে 'সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর সংসার' করিতে দেখিলে মনটা লুটাইয়া পড়ে, করুণ সুরটি বেসুরো হইয়া যায়। কিন্তু এই চরিত্রগুলি এমন গভীর ভাবে মনে দাগ কাটে, যে আর দেখিতে পাই আর না পাই, অন্ততঃ তাহাদের পরে কি হইল জানিতে ইচ্ছা করে। ইহাদের এত সহজে আমরা ভুলিয়া যাইতে পারি না।

আর একটা কথা। (বৰ্দ্ধমানের) লীলাকে কি আর অন্যভাবে আঁকা যাইতে পারিত না? প্রথম হইতেই তাহার অনন্যসাধারণ তেজস্বিতা ও দৃঢ়তা আমাদের মনকে স্পর্শ করে,—তাহার ঐরূপ পরিণতির জন্য শেষে বড় অনুকম্পা হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই চরিত্রগুলি এত জীবন্ত যে মনে হয় ইহাদের আমরা চোখের সামনে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিয়াছি, অনেকের সহিত হয়ত কথাও বলিয়াছি। বই দুইখানি পড়িতে পড়িতে তাহার সাদা কাগজ ও কাল অক্ষরগুলি মুছিয়া গিয়া নিশ্চিন্দিপুরের গ্রাম—যেখানে অপু ও দুর্গা ঘুরিয়া বেড়ায়—কলিকাতা, গঙ্গানন্দকাটি প্রভৃতি স্থানে তাহাদের সত্যকার লক্ষ শোভাপূর্ণ রূপ লইয়া ঝলমল্ করিয়া ফুটিয়া উঠে। লীলা এমনই একটি চরিত্র যাহাকে এমনই জীবন্ত ভাবে আমরা প্রত্যক্ষ করি। সেই লীলার যখন ঘর ছাড়িবার কথা পড়ি,—তখন মনটা সত্যই খারাপ হইয়া যায়; বুঝিতে পারি লীলার কোনও মন্দ উদ্দেশ্য ছিল না, কেবল দুৰ্দ্দমনীয় তেজের বশেই সে ঘর ছাড়িল; তথাপি আমাদের যেন কি রকম কি রকম ঠেকে। অপূর্ব্ব রায় ভবঘুরে লোক, ইহার পরও সে তাহার সহিত নিঃসঙ্কোচে আলাপ করিতে যায় বটে,—কিন্তু মহিমারঞ্জন ভট্টাচার্য্যেরা তাহার সহিত আর তেমন প্রাণ খুলিয়া আলাপ করিতে পারে না,—সমাজ তাহার উপর যে বড় কলঙ্কের ছাপ মারিয়া দিয়াছে! মহিমময়ী রাণীর মত তেজস্বিনী লীলার এমন শোচনীয় মরণ অপুর মত আমাদের হৃদয়কেও আকৃষ্ট করিয়া দেয়, করুণায় সমস্ত মন ভরিয়া উঠে।

'পথের পাঁচালীর' মায়া-স্বপ্ন আজও শেষ হয় নাই। রজনীগন্ধার গন্ধের মত তাহার রেশ আমাদের মাতাল করিয়া তুলিতেছে, তাহার শেষ দেখিবার জন্য আমরা আগ্রহ সহকারে প্রতীক্ষা করিতেছি। যে চিরন্তন স্বপ্ন চিরদিনের শিশু, ভাবুক ও কবিকে মুগ্ধ করিয়া আসিতেছে, গ্রন্থকার আপন মনে সেই স্বপ্নই আঁকিয়াছেন। চিরদিনের মামুলী জীবনের ভিতরেও তিনি সৌন্দর্য্য ও সুর খুঁজিয়া পাইয়াছেন। এই জন্যই গ্রন্থ দুইখানি অত্যন্ত মূল্যবান্। গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে ছড়াইয়া পড়া মণিমুক্তার মত তিনি জীবনের সুখ দুঃখের কাহিনী লইয়া অপরূপ মায়াজালের সৃষ্টি করিয়াছেন; বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহার দান অতুলনীয়।

শ্রীমহিমারঞ্জন ভট্টাচার্য্য

মণ্টু

শ্রীযুক্ত সারদারঞ্জন পণ্ডিত

এক

উঃ মণ্টুটা কি দুষ্টুই না হয়েছে! তার দাপাদাপিতে গ্রামশুদ্ধ লোক তটস্থ; বাড়ীর লোকদের ত আর কথাই নেই। দুপুর বেলা ত তার টিকিটি পর্য্যন্ত দেখবার জো নেই; ছুটে গেছে ঐ মহম্মদ বক্স-এর বাড়ীর লীচু চুরি করতে নয়ত বোসেদের বাগানের কাঁচা পাকা আম খেতে। গরমের ছুটিটা তার এই ভাবে কেটে যাচ্ছিল। পাড়ার লোকেদের নালিসের ঠেলায় ত তার পিতাঠাকুর মশায়ের প্রাণান্ত উপস্থিত।

এই ত সেদিন তার পিতা এই রাজসাহীতে বদ্‌লি হ'য়ে এসেছেন। কিন্তু এর মধ্যেই সারা গাঁয়ে দুষ্টু মণ্টু আপনার ক্ষুদ্র নামটি বিশেষভাবে প্রচার করে ফেলেছে। মণ্টু, তার দাদা নন্তু, আর গুরুজন তার বাপ মা, কারো কথাই আমল দিত না। বারো বছরের চশমাধারী দাদা নন্তু যখন তার ছ'বছরের ছোট ভাই মণ্টুকে দু' একটা সদুপদেশ দিতে যেত, তখন সে হয় হেসেই উড়িয়ে দিত, না-হয়ত দাদার চশমায় দিত একটান।

তখন তার দাদা বেচারী স্বীয় ক্ষুদ্র বারো বছর বয়সের গাম্ভীর্য্যটুকু বাঁচাবার জন্য সরে পড়ত।

নন্তু ছিল বড় ভাল মানুষ। সে কলকাতায় মাতুল-গৃহে থেকে চতুর্থ শ্রেণীতে অর্থাৎ মণ্টুর চেয়ে ঢের উঁচু ক্লাসে পড়ত, এইটাই ছিল তার গৌরব। প্রতি ছুটিতে সে পিতার নিকট আসত। সে বড় গম্ভীর প্রকৃতির ছিল। বড় একটা বেরুত না, মিশত না কারুর সঙ্গে বেশী; এইটাই ছিল তার চিরন্তন স্বভাব। আর বড় একটা দুষ্টু মণ্টু ছাড়া কেউ তার কাছে এগোতে সাহস করত না। কারণ সে যখন তার ক্ষুদ্র নাসিকার উপর বৃহৎ চশমাটি এঁটে গম্ভীর ভাবে তার পড়ার ঘরে বসে একাগ্রচিত্তে পড়াশুনা করত, তখন তার কাছে কেউ কিছু বলা দূরে থাক, অদূরেই একটা নমস্কার করে পালিয়ে যেত। মণ্টুর মা বাপ প্রায়ই দুঃখ করে বল্‌তেন—"মণ্টুটা একেবারে বয়ে গেল; বংশের যদি কেউ নাম রাখে ত এই বড় ছেলে নন্তু।"

মণ্টুকে লক্ষ্মী হ'তে বল্লে সে অবাক্ হ'য়ে তার কৌতূহলপূর্ণ চোখ তুলে জিজ্ঞেস করত—"মা, লক্ষ্মী কাকে বলে? কিরকম ক'রে লক্ষ্মী হয়?"

তার মা হেসে উত্তর দিতেন—"এই দুষ্টুমি না ক'রে, লক্ষ্মীছেলের মতন এই তোর দাদার মতন একমনে ঘরে বসে পড়াশুনা করলে সকলেই লক্ষ্মীছেলে বলে।"

মণ্টু বলত হেসে—"ওরে বাপরে ঐ দাদার মতন চোখে চশমা এঁটে ঘরে চুপ করে বসে পড়তে আমি পারব না, দাদা খালি চুপ করে পড়ে। খেলে না, বাইরে বেরুতে চায় না—আমি যদি ও রকম থাকি তা হ'লে মনিয়াকে খেতে দেবে কে?

তার মা আশ্চর্য্য হ'য়ে বল্লেন—"মনিয়া আবার কে?" মণ্টু উত্তর দেয়—"কেন, একটা পাখী, বন থেকে ধরেছি; কেমন সুন্দর খাঁচায় ওকে পুরে রেখেছি। রেখেছি ওই আম গাছতলায়।"

তার পরই সে তার মার আঁচল ধরে আর বলে ব্যাকুল ভাবে—"চল, চল, মা—দেখাব চল না।"

মণ্টুর মা সুষমা আটাশ বছরের হ'লেও, কর্ম্মভারে হ'য়ে পড়েছেন এক পাকা গিন্নী। তাঁর বিরাট চাবির গোছাই তার প্রধান প্রমাণ।

খাবার সময়ে মণ্টুকে পাওয়া যায় না। সবাইকার খাওয়া হ'য়ে যায়। "মণ্টু, মণ্টু ওরে কোথায় গেলি?" ডাকে কম্পমান আকাশ বিদীর্ণ হ'লেও মণ্টুর দেখা

নেই। কোথায় গেছে সে? তা কে বলতে পারে? হয়ত ছাদে আবার চুরি করে খাচ্ছেন। সুষমা যা ভাবেন, ঠিক তাই। সেন ছুটো চড় একটা কিল। অভিমানী বালক সরোষে—"খাবনা, দেখি কি করে" বলে অভিমান ভরে ঠোঁট ফুলিয়ে কেঁদে ওঠে। খায় না তখন—দাদা থাকলে চলে যয়ে তার পড়বার ঘরে, বাবাকে বলতে সাহস হয় না তাই। গোবর-গণেশ দাদাটিরই তখন শরণাপন্ন হ'য়ে মায়ের নামে নালিশ করে। কিন্তু দাদা ত আর অবিবেচক নন্; তিনি তাঁর বিরাট গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে তাঁর চশমার ফাঁক দিয়ে একটা বিচারকের দৃষ্টি হেনে অবশেষে রায় দেন—"বেশ হয়েছে,—চুরির সাজা।"

এইবার অভিমানী মণ্টু কেঁদে ফেলে দৌড়ে যায় মার কাছে—কিছু বলে না শুধু কাঁদে আর কাঁদে।

মায়ের প্রাণ। দুরন্ত মণ্টুকে বুকের কাছে নিয়ে বলেন আদর করে অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে—"চ খাবি চ।"

মণ্টু মাকে মারে আর বলে—"না খাব না, খাবনা, কিছুতেই খাবনা;—তারপর মরে যাব—বেশ হবে।"

সুষমার প্রাণ কেঁদে ওঠে সন্তানের অমঙ্গলের কথায়। চোখ মুছে চেয়ে দেখেন মণ্টু তখন নীচে গিয়ে শুয়ে পড়েছে। উদ্বেগে মায়ের বুকটা কেঁপে ওঠে, ডাকেন—"মণ্টু, মণ্টু।" সাড়া পাওয়া যায় না। নীচে নেমে এসে জোরে খুব জোরে কাণের কাছে মুখ রেখে ডেকে ওঠেন অশ্রুজড়িত কণ্ঠে—"মণ্টু—ও—মণ্টু।"

মণ্টু আর অভিনয় করতে পারে না। উঠে পড়ে ধড়মড়িয়ে বলে এক গাল হেসে—"একি মা, তুমি কাঁদছ?"

তারপর নীচে যায় খেতে। মা দেয় আদর করে ছেলেকে খাইয়ে। তারপর দুরন্ত শিশু তার মায়ের বুকে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ে। এরকম প্রায়ই হ'ত।

দুই

"দেখুন আপনার ছেলে আর কয়টি ছেলের সঙ্গে গিয়ে আমার আমগাছের সমস্ত কাঁচা পাকা আম প্রায় শেষ করে এসেছে।"

এই তীব্র নালিসটি যখন এক প্রতিবেশী এসে মণ্টুর বাপের কাছে করছিলেন, তখন সকাল, সবে মাত্র মণ্টুর বাপ চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছিলেন। ডাক পড়ল—"মণ্টু"।

সাড়া নেই। জিজ্ঞাসা করা হ'ল—"কোথায় গেছে সে?"

কেউ জানে না। অবিনাশবাবু প্রতিবেশীকে বল্লেন—"আচ্ছা আমি সে ছেলের শাসন করব।"

প্রতিবেশীটির অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে মণ্টু সেখানে হাজির হ'ল। অবিনাশবাবু সরোষে গর্জ্জন করে বল্লেন—"এদিকে আয়, হতভাগা, খালি দুষ্টুমী।"

মণ্টু ভাল ছেলেটির মতন বলে—"কি বাবা?"

অবিনাশবাবু উত্তর দেন—"আমার মাথা, গাধা কোথাকার।"

তারপর রেগে চীৎকার করে বলেন—"বোস্ বোসের আম ধরেছ আজকাল?"

মণ্টু সহজভাবে উত্তর দিল—"শুধু বোসেদের কেন, সব বাগানেরই আম পেড়ে খাই, চুরি করি না ত।"

অবিনাশবাবু সুরটাকে আরও এক পর্দ্দায় তুলে বল্লেন—"কে নিতে বলেছে? তুমি ত না বলে আম চুরি করেছ।"

মণ্টু বলে—"বল্‌ব কেন? গাছে আম হ'য়ে আছে সে ত খাবার জন্যেই, তাই খাই।"

অবিনাশবাবু রাগে কাঁপছিলেন। শেষে রাগ সামলাতে না পেরে দিলেন তার পিঠের ওপর বেশ জোরেই গোটা দুই চড়চাপড়।

বালক কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল দৌড়ে মায়ের কাছে, ঠোঁট ফুলিয়ে নালিস্ জানাল—"বাবা মেরেছে।"

সুষমা ঝাঁট দেওয়া রেখে জিজ্ঞাসা করলেন—"কেন, কি করিছিলি?"

আজ মাকে ঝাঁট দিতে দেখে আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল। আসল জিনিষ ভুলে গিয়ে সে জিজ্ঞাসা করল—"তুমি আজ ঝাঁট্ দিচ্ছ কেন মা?"

মা উত্তর দেন—"রাণীর আজ অসুখ।"

সুষমা ছেলেকে কান্না ভুলে যেতে দেখে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লেন—"ওমা, এই যে কান্না ভুলে গেছে।"

ভাইত। মণ্টু তখন আবার কাঁদবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু পারে না। অন্ধ হ'য়ে রেগে মার দিকে তীব্র দৃষ্টিপাত ক'রে বলে—"তুমি দুষ্টু, দুষ্টু, দুষ্টু।"

সুষমা ছেলের কাণ্ড দেখে হেসে উঠলেন। তারপর চেয়ে দেখলেন বড় বড় জলের ফোঁটা চোখের পাতার পাশে শুকিয়েছে। তাড়াতাড়ি সস্নেহে গামছা দিয়ে মুখটা মুছিয়ে দিয়ে বল্লেন—"মণ্টু, লক্ষ্মী বাপ আমার, একটু পড়াশুনা কর্। শেষে মুখ্যু হ'য়ে গরু চরাবি ?"

মণ্টু আনন্দে নেচে বলে—"হ্যাঁ মা, গরু চরাব। সে বেশ। জানলা দিয়ে চেয়ে দেখি কেমন রাখালেরা গরু চরাতে নিয়ে যায়। নদীর ধারের ঐ পড়ো জমিটার ওপর গরুগুলোকে ছেড়ে দিয়ে, গাছতলায় বসে গান গায়। আমি ওরকম গরু চরাব মা। তুমি আমার গামছায় একটু গুড় আর দুটো মুড়ি বেঁধে দেবে, আর আমি গরুর পাল নিয়ে যাব। গরুগুলোকে ছেড়ে দিয়ে মনের আনন্দে বাঁশী বাজিয়ে গান গাব। তারপর সূর্য্য মামা ডুবে গেলে ফিরে আসবো। বেশ হবে তা হ'লে নয় মা ?"

সুষমা ছেলের রকম দেখে না হেসে থাকতে পারলেন না। শেষে বল্লেন—"আয়, চা খাবি ত আয়।"

মাতাপুত্রে টোষ্ট আর চা খেতে খাবার ঘরে ঢুকে খাওয়ার পালা শেষ করে নিলেন। খানিকক্ষণ পরে মণ্টুর বন্ধু নরু ছুটতে ছুটতে এসে খবর জানল যে সে ডাব খেতে চায় কি না ?

মণ্টু জিজ্ঞাসা করল—"কোথায় ডাব পাবি রে ?"

নরু মাথা দুলিয়ে বলে—"আয়না"।

তারপরেই মণ্টু মায়ের হাত ছাড়িয়ে মায়ের কোনও কথা না শুনে দৌড়তে দৌড়তে নরুর অনুসরণ করল।

তিন

হঠাৎ মণ্টুর বাপ ডাকলেন—"মণ্টু, মণ্টু।"

তাড়াতাড়ি মণ্টু তা'র ভিজে সপ সপে গা নিয়ে এসে হাজির হ'ল, আর সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল—"বাবা, বাবা, আমি কেমন নরুর কাছ হতে সাঁতার শিখেছি। মণ্টুর বাপ অবিনাশ বাবু বকে উঠলেন—"ও বাঁদর, তাই এই সকাল বেলায় গা ভিজোন হ'য়েছে ? যা, যা, শিগগীর গা মুছে আয়—অসুখ করবে যে।"

মণ্টু গা মুছে এসে দাঁড়ালো পিতার সামনে চুপটী করে—যেন কত শান্ত ছেলে! অবিনাশ বাবু দূরে একটি ভদ্রলোকের দিকে আঙুল নির্দ্দেশ করে বল্লেন—'মণ্টু, ঐ তোমার মাষ্টার মশায়। উনি আজকাল তোমাকে সকালে কাস্তিরে পড়াবেন। বুঝলে ?"

মণ্টু ঘাড় নাড়লো, তারপর বল্ল—"আচ্ছা।" দূরে চেয়ে দেখলে ছেঁড়া সার্ট ও একটা ময়লা কাপড় পরা একটি শীর্ণকায় ভদ্রলোক বসে আছেন। মণ্টু বিপদ গণলে—তা হ'লে ফাঁকি দিলে চলবে না, পড়তে হ'বে। তার মাথা যেন ঘুরে উঠল। সামনে ও ত মাষ্টার নয় যেন সাক্ষাৎ যমদূত।

মণ্টু চলে যাচ্ছিল। অবিনাশ বাবু ধমক দিয়ে বল্লেন "যাচ্ছিস্ কোথা, পড়তে হ'বে না ?" মণ্টু আশ্চর্য্য হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলে—"এখন থেকেই ?"

অবিনাশ বাবু বল্লেন—"হ্যাঁ"

বাধ্য হয়েই মণ্টু পড়তে বসল। মাষ্টার মশাই আদর করে কাছে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"তোমার নাম কি ?"

সে বল্ল—"আমার নাম মণ্টু।" মাষ্টার মশাই আবার জিজ্ঞাসা করলেন—"তোমার ভাল নাম কি ?"

মণ্টু উত্তর দিল—"শ্রীমোহন চট্টোপাধ্যায়।"

মাষ্টার মশায় জিজ্ঞাসা করলেন—"কোনখানটা পড় ফাষ্টবুকের।"

মণ্টু বল্ল—"ঘোঁড়ার পাতা পর্য্যন্ত পড়েছি।"

তারপর মাষ্টার মশাই মণ্টুকে পড়া বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন, হঠাৎ মণ্টু লাফিয়ে উঠে বল্ল—"হ্যাঁ মাষ্টার মশাই এইবার যাই মনিয়াকে ছোলা খাইয়ে আসি।" মাষ্টার ত অবাক! জিজ্ঞাসা করলেন—"সে আবার কে ?"

মণ্টু বল্ল—"এই একটা পাখী, কেমন সুন্দর পাখী! দেখবেন আসুন না।" বলেই সে তার মাষ্টার মশাইকে টানতে টানতে আমগাছতলায় নিয়ে এল। মাষ্টার বেচারী

রোগা মানুষ। কি আর করবেন? টানাটানির চোটে অন্দরের সেই আমগাছতলায় এসে পৌছলেন।

সেখানে তখন সুষমা দাঁড়িয়ে মালীর কাছ হ'তে আম গুণে নিচ্ছিলেন। হঠাৎ সেখানে একজন অপরিচিত পুরুষের আগমনে একটু লজ্জিত হ'যে পড়লেন এবং সঙ্গে সঙ্গে খুব অবাকও হ'লেন। তাড়াতাড়ি সেখান হ'তে চলে গেলেন। মাষ্টার ত একেবারে হতভম্ব! তার পরেই রঙ্গস্থলে অবিনাশ বাবুর আগমন। তিনি অতিমাত্রায় আশ্চর্য্য হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"আপনি এখানে কেন?" মাষ্টার নিজের ভুল বুঝতে পেরে কুণ্ঠিত হ'য়ে বল্লেন—"মণ্টু আমাকে টান্‌তে টান্‌তে এখানে নিয়ে এসেছে।"

অবিনাশ বাবু বল্লেন—"তা', আপনি এখানে এলেন কেন? ওকে এখন পড়ান গে যান্। ছোট ছেলের কথায় আপনিও যদি নাচেন, তাহ'লে ত আর চলে না।"

মাষ্টার লজ্জিত হ'য়ে বলে উঠ্‌লেন—"মণ্টু চল।" বলে তাঁর গুণধর ছাত্রটিকে নিয়ে আবার বাইরের ঘরে পড়াতে বস্‌লেন।"

মণ্টু পড়তে বসে বিষণ্ণ ভাবে জিজ্ঞাসা করল—"মাষ্টার মশাই, কখন ছুটি দেবেন?" মাষ্টার মশাই বিস্মিত হয়ে বল্লেন—"এর মধ্যে কি, এইত মাত্র পড়তে বসলে।"

মণ্টু বল্ল—"তা জানি, কিন্তু আর কতক্ষণ পড়তে হ'বে?"

—"অন্ততঃ একঘণ্টাত পড়তেই হবে।"

"ও মোটে, আচ্ছা মাষ্টার মশাই জলটা খেয়ে আসি" বলে মণ্টু অন্তর্দ্ধান হ'য়ে গেল।

"মণ্টু, মণ্টু" আর দেখা নেই, সাড়া নেই।

অনেকক্ষণ পরে মণ্টু হেলতে দুলতে এসে হাজির হ'য়ে বল্লে—"মাষ্টার মশাই, এক ঘণ্টার আর কত বাকি?"

চার

সুষমার যে কী অসুখ করেছিল ডাক্তারে তা বহু চেষ্টা করেও সম্পূর্ণভাবে নির্ণয় করতে পারছিলেন না। চিকিৎসাও চলছিল অবিরাম। বড় ছেলে নন্দ তখন কলকাতায়—মামার বাড়ী। এবার সে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেবে। সে দিনটা ছিল মেঘলা। সুষমা দোতলার বড় ঘরে না শুয়ে পাশের একটা খুব খোলা ঘরে খাটের উপর শুয়ে দেখছিলেন—বাইরে প্রকৃতির অদ্ভুত খেয়ালী নৃত্য, আর শুনছিলেন আকাশের প্রাণখোলা মনভোলান ঝরঝরানি গান। আঠারটী বছর এই তাঁর বিবাহিত জীবন। কোনখান দিয়ে যে তা কেটে গেছে, তা নিজেই ভাল রকম জানেন না। রাণী তখন সুষমার সেবা করছিল, আর বর্ষার এই ঝলমলে দিনে তার দেশের কথাটাই বার বার ভাবছিল।

সুষমা শুয়ে ছিলেন চুপটি করে। ভাবছিলেন তাঁর ছোটবেলার ছোট ছোট টুক্‌রো টুক্‌রো স্মৃতিগুলি। সেই মায়ের বুক ঘেঁসে গল্প শোনার সুখ—সে কি আর এ জীবনে পাবেন?

সেই—বৃষ্টি থেমে গেলে রাত্রে রজনীগন্ধা তুলতে যাওয়া ফুলের বাগানে। ফুলের গন্ধে তন্ময় হ'য়ে ভিজে মাটির কথাই তাঁর মনে পড়ছিল। রাণী মাথা নীচু করে তাঁর পা টিপছে।

বাইরের ঘর হ'তে ভেসে আসছিল—মণ্টুর গলা, সে মাষ্টার মশাইয়ের কাছে পড়ছে "The earth moves round the sun", আর অনেকক্ষণ চুপ করে থাকছে। আবার মাষ্টার মশাইয়ের ধমকে চমক ভেঙ্গে আবার তার পুনরুক্তি করছে।

মাষ্টার মশাই চটে জিজ্ঞাসা করলেন—"বাইরে কি দেখছো? তোমার মনিয়া কি ভিজে যাচ্ছে?"

মণ্টু উত্তর দিল, সংক্ষিপ্ত—"না।"

মাষ্টার মশাই জিজ্ঞাসা করলেন—"সে কোথায়?"

মণ্টু বেশ সহজ ভাবে বল্ল—"ওই ঐখানে, ঐ বনে; তাকে ছেড়ে দিয়েছি কিনা।"

মাষ্টার মশাই অবাক হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"কেন, তাকে ছেড়ে দিয়েছ?" মণ্টু তার ঘন চুলের থোকাগুলি দুলিয়ে চোখ দু'টী তুলে বল্ল—"মা বল্লে বেচারীর কষ্ট হচ্ছিল।"

পড়ার ছুটি হ'লে মণ্টু দৌড়তে দৌড়তে ভিজে গায়ে মায়ের কাছে এসে বল্ল—"মা এইবার গল্পর বাকিটা বল, সেই

রাজপুত্তুর বনের পথ দিয়ে চলে যাচ্ছিল ঘোঁড়ায় চেপে—তারপর কী? তারপর? বল না মা, ওমা···।"

সুষমা চাইলেন পুত্রের পানে—পুত্রের আহ্বানে। তারপর মণ্টুকে ভিজে দেখে তিনি ভীত হ'য়ে বল্লেন—"বেশ মণ্টু, জামা কাপড় ভিজিয়ে এসেছো, যদি আমার মতন অসুখ করে।"

মণ্টু একগাল হেসে বল্ল—"তা হ'লে বেশ হয়; মাষ্টার মশাইয়ের কাছে তাহ'লে আর পড়তে যেতে হয় না। আজ কাল আবার বাবার কথায় বিকেলে পড়ান ধরেছে। মাগো! বেড়াতেও পাইনে।"

সুষমা বল্লেন—"আমার মতন অসুখ করলে পড়ে থাকতে হ'বে এই বিছানায়, তখন ত আর বেরুতে পাবিনা।"

—"চাইনা বেরুতে।" বলে মণ্টু গর্জ্জন করে আবার বলতে আরম্ভ করল—"মাষ্টার মশাই, তাহ'লে জব্দ হ'ন, আমাকে কেমন পড়াতে পার্ব্বেন না। এই তোমার কাছে শুয়ে শুয়ে খালি গল্প শুনব, তুমি বলবে যত রকম গল্প। বাবা ত আর তখন বারণ করতে পার্ব্বেন না।"

সুষমা হেসে বল্লেন—"যদি রাত্তিরে ঘুমিয়ে পড়ি?"

মণ্টু বল্ল—"তা হ'লে ঘড়ীর কাঁটা সরিয়ে দিয়ে তোমায় কাতুকুতু দিয়ে তুলে দিয়ে বলব—"মা গো, এই ত মা'ত্র সন্ধ্যে সাতটা, এরই মধ্যে কী ঘুম।" সুষমা ছেলের বুদ্ধিতে খুব হেসে উঠ্লেন। তাড়াতাড়ি রাণীকে দিয়ে মণ্টুর জামা কাপড় ছাড়িয়ে নিয়ে খাটের উপর তুলে নিলেন।

মণ্টু আবার বলতে আরম্ভ করল—"মাগো, তোমার জন্যে বড় মন কেমন করে, তাইত পড়তে চাইনা।"

সুষমা ভাব্লেন "তাঁর দিন শেষ হ'য়ে এসেছে।" তাই বড় আগ্রহে মণ্টুকে বুকের মাঝে আঁকড়ে ধরে একটা চুমু দিয়ে বললেন—

"মণ্টু-উ-মণ্টু।" মণ্টু মায়ের স্নেহে বিগলিত হ'য়ে উত্তর দিল—"কি মা?"

সুষমা বুকের মধ্যে বুকের ধনকে পেয়ে স্নেহ-বিজড়িত কণ্ঠে বল্লেন—"গল্প শুনবি?"

মণ্টু তার মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে বলে উঠ্ল—"হ্যাঁ মা বলনা।"

পাঁচ

কি জানি কদিন মণ্টুর খুব পরিবর্ত্তন আরম্ভ হয়েছে। সে আজকাল দুষ্টুমী করেনা। সারাদিন মায়ের কাছে থেকে মায়ের সেবা করে, রাত্তিরে গল্প শোনে। একদিন সুষমা বল্লেন—"মণ্টু, বিয়ে করবি?"

মণ্টু ঠাট্টা না বুঝে বলে উঠ্ল—"হ্যাঁমা, লক্ষীটী আমার বিয়ে দাও। হ্যাঁ, মা, সবাইকার বিয়ে হয়, কই তোমার ত বিয়ে হ'লনা। মা তোমার কবে বিয়ে হ'বে?"

সুষমা আর থাকতে পারলেন না। হেসে উঠলেন খুব জোরে। তারপর পুত্রের গালে একটা মৃদু চড় মেরে বল্লেন "দূর পাগল, কবে আমার বিয়ে হ'য়ে গেছে।"

মণ্টু অবাক নয়নে বল্ল—"কই তোমার বিয়েতে ত আমায় লুচি খাওয়ালে না।

সুষমা বল্লেন—"তুই কি তখন হয়েছিলি পাগল?"

মণ্টু ব'লে উঠল আগ্রহান্বিত হ'য়ে—"তখন আমি হইনি ত কোথায় ছিলুম?" সুষমা ছেলের গালে একটা চুমো দিয়ে বল্লেন—"এই অপর কারুর বাড়ী বুড়ো হ'য়ে।"

হঠাৎ খানিকক্ষণ চুপ করে মণ্টু ব'লে উঠল জোরে, একটু আব্দারের সুরে—"মা, মা, ওমা আমি একটা রাজকন্যা বিয়ে করব—সেই রাজপুত্তুরের মতন।"

সুষমা বল্লেন—"রাজকন্যা বিয়ে করতে হ'লে যে নিজের মাকে ছেড়ে পক্ষীরাজ ঘোঁড়ায় চেপে অনেক দূরে যেতে হয়, তা কি পারবি?"

মণ্টু হেসে বলে উঠল—"বাঃ, তা কেন? তোমাকে আর একটা ঘোঁড়ায় চাপিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে যাব।"

সুষমা উত্তর দিলেন—"আচ্ছা তা বড় হ'য়ে আমাকে নিয়ে যাস্। সুষমা একবার একটা শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবলেন—"জীবনে সেদিন কি আর আসবে যে তিনি তাঁর পুত্রবধূর মুখ দেখে সুখী হ'বেন? হায়রে!"

সুষমা এবার হঠাৎ একটু বুকে ব্যথা অনুভব করলেন—কথা কইতে পারলেন না। তাই শুধু মণ্টুর দিকে নীরব হ'য়ে চেয়ে রইলেন। হঠাৎ মাকে এতক্ষণ চুপ করে থাকতে দেখে মণ্টু সুষমার গাটা বেশ জোর করে নাড়া দিয়ে বল্ল—

"মা, মা, ওগো মা, তুমি কী জানিনা—হ্যাঁ কথা কওনা।" সুষমা একটু হেসে বুকের ব্যথা ইঙ্গিতে জানিয়ে আপনার অক্ষমতা জানিয়ে দিলেন। শুধু একটু একটু গাল টিপে আদর করে ছোট্ট একটা চুমো তার মুখে এঁকে দিলেন।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণপ্রায়। ঘরে ঘরে কুললক্ষীর ওষ্ঠস্পর্শে মঙ্গল-শঙ্খ বেজে উঠল। কেবল দূরে নদীর ওপারে অস্তরবির শেষ লালিমাটুকু তখনও ছিল। সুষমা চুপ করে শুয়ে দূরের দিকে তাকিয়েছিলেন। বুকের মধ্যে মণ্টুর মাথাটা জাপটে ধরে, চোখ দিয়ে ঝর-ঝর ক'রে অশ্রুধারা ঝ'রে পড়ছিল মণ্টুর মুখের উপর।

মণ্টু তাড়াতাড়ি উঠে মায়ের চোখ মুছিয়ে দিয়ে বলে উঠল -"মা তুমি কাঁদছ কেন?" তারপর আবার বল্ল মায়ের মুখে একটা চুমো খেয়ে—"লক্ষী-মা, মাণিক আমার কেঁদনা, মানি।"

মণ্টু ভাবলে যে বুঝি তার মাকে এবার তার গল্প বলা উচিত। তাই সে বল্ল—"মা! একটা গল্প শুনবে?"

সুষমা একটু মৃদু হেসে ঘাড় নাড়লেন।

মণ্টু তখন তার মাকে গল্প শোনাতে আরম্ভ করল—খানিকক্ষণ গল্প বলে ঘুমিয়ে পড়ল।

তাঁর কাছছাড়া হতে চায় না। আগে কি দস্যিই ছিল। আশ্চর্য্য।

কদিন সুষমার অনুরোধে মাষ্টারমশাই আর মণ্টুকে পড়াতে আসেন না। তাই মণ্টুও নিশ্চিন্ত হ'য়ে সর্ব্বক্ষণ মায়ের কাছে থাকে।

মণ্টু কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিল জানিনা। যখন সে ঘুম থেকে উঠল, দেখে যে সে একটা আলাদা খাটে শুয়ে। আর ঘরভর্ত্তি লোকজন। একজন ডাক্তার এসেছেন, ষ্টেথিস্কোপ দিয়ে সুষমার বুক পরীক্ষা করছেন। খাণিকক্ষণ পরে অবিনাশবাবু বলে উঠলেন—"কি রকম বুঝলেন ডাক্তারবাবু?"

ডাক্তারবাবু ষ্টেথিস্কোপটা তুলে নিয়ে চিন্তিত মুখে বলে উঠলেন—"Very serious"।

ডাক্তার চলে গেলেন পাশের ঘরে অপেক্ষা করতে।

অবিনাশবাবু ধীরে ধীরে এসে তাঁর প্রিয়তমা পত্নীর পাশে বসলেন। এই রকমই আর এক আষাঢ়ী পূর্ণিমার জ্যোৎস্না-প্লাবিত রাতে ফুলশয্যার সময় একদিন সুষমার পাশে বসে-ছিলেন। তারপর অনেক বৎসর পরে আজ আর এক আষাঢ়ী পূর্ণিমা।

ছয়

নদীর ধারে একটা চিতা দাউ দাউ করে জলছিল তখন ভোর পাঁচটা। ভোরের অস্ফুট আলোক আর চাঁদের শেষ ম্লান আলোর সঙ্গে একটা লুকোচুরী চলছিল। প্রিয়তমাকে চিরদিনের তরে বিদায় দিয়ে ধীরে ধীরে অবিনাশ বাবু লক্ষীহীনা ঘরে ফিরলেন। একটা ব্যাকুলতা জেগে উঠল—এই মা-হারা মণ্টুর কথা ভেবে। তাকে তার বন্ধুদের হেফাজতে রেখে আসা হ'য়েছে। আর নন্তু? সে তবু একটু বড় হয়েছে।

ঘরে এসে শুনলেন মণ্টু ব্যাকুল আর্ত্তনাদ করেছিল—তার মার কাছে যাবার জন্যে। তাঁরা অনেক করে ধরে রেখেছিলেন জোর করে। সে বলেছিল চেঁচিয়ে—"মা নদীতে যাচ্ছে, আমিও সঙ্গে যাব। আমি না গেলে মা যে জলে ডুবে যাবে।"

তিনি এসে দেখলেন মণ্টু ঘুমিয়ে পড়েছে শ্রান্ত হ'য়ে। তার থোকা থোকা চুলগুলি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। সমস্তদিন সে শুধু কেঁদেছে। বার বার চেষ্টা করেছে নদীর ধারে ছুটে যাবার জন্যে। কেঁদেছে খুব, মা-মা বলে। সমস্তক্ষণ ধরে সে মায়ের কাছে যাবার জন্য যুদ্ধ করেছে, পরে ক্লান্ত হ'য়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

সাত

দুঃখের দ্বিতীয় রাত্রি অবসান হ'ল পরদিন আষাঢ়ের বাদল প্রাতে অবিনাশবাবু শয্যা ত্যাগ করে দেখলেন শয্যায় মণ্টু নেই। কোথায় গেল সে? গৃহের সব কক্ষগুলো খুঁজলেন, মণ্টুর চিরপ্রিয় বাগানগুলিতে খুঁজলেন, চারি-

দিক তন্ন তন্ন করে খুঁজলেন, কিন্তু কোথাও তার সন্ধান পাওয়া গেল না। বার বার আকুল কণ্ঠে ডাকলেন—"ম-ণ্টু, ম-ণ্টু।"

কেউ সাড়া দিলে না, শুধু বৃষ্টির ঝম্-ঝম্ শব্দ আর কিছু নয়—যেন মা-হারা ছেলের তপ্ত অশ্রুজল।

অবিনাশবাবু ছুটতে ছুটতে নদীর ধারে গেলেন—হয়ত সেখানে তাকে পাওয়া যাবে। সে যে এখানে আসবার জন্তে কাল সারা দিন রাত কেঁদেছে। সে ত জানে না যে আর কোন নদীর ধারেই তার মাকে পাওয়া যাবে না।

নদীর ধারে এসে দেখলেন ঐ দূরে নদীর বুকে ছুষ্টু মণ্টুর শান্ত দেহটি নদীর ঢেউয়ের তালে তালে নাচছিল। ছুষ্টু তার হাত দু'খানি এগিয়ে দিয়েছিল তার পলাতকা মাকে ধরবার জন্তে। বাদলধারা তার সমস্ত দেহটিকে অশ্রুধারায় সিঞ্চিত করে দিচ্ছিল। ছুষ্টু মণ্টু শান্ত হ'য়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল নদীর বুকে নয়—তার চির প্রিয় মায়ের কোলে।

শ্রীসারদারঞ্জন পণ্ডিত



সাহিত্য-সমালোচনা ও শিষ্টাচার

শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ক

কোন লেখকের প্রতিভা বিচার করার সময় তাঁর লেখার ভুল-ভ্রান্তি বা অপকৃষ্ট অংশটুকু নিয়ে সমালোচনা ক'রে তাঁকে ছোট করা সাহিত্য-সমালোচকের কাজ নয়।

লিপি-নৈপুণ্যের যে-সকল ক্ষেত্রে ঐ-লেখক সর্বাপেক্ষা পারদর্শী,—তাঁর সেই সেই গুণাবলীর সম্যক আলোচনা ক'রে, সমালোচক সেই লেখকের প্রতিভার মূল্য নির্দ্ধারণ করবেন।

জীবনের অন্য ক্ষেত্রের মতো বুদ্ধির ক্ষেত্রেও ভুলভ্রান্তির বীজ এমন ক'রে উপ্ত থাকে যে, মানুষ সকল সময় তাকে এড়িয়ে চলতে পারে না। মানুষের স্বভাবের মধ্যেই স্খলন এবং ত্রুটি এমন অবিচ্ছেদ্য-ভাবে জড়িয়ে আছে যে, অতি-তীক্ষ্ণ-ধী লেখকও সকল সময় তাদের থেকে মুক্ত হ'তে পারেন না; এবং ঐ কারণেই জগতের শ্রেষ্ঠতম পণ্ডিতের রচনার মধ্যেও বড় বড় ভুলের পরিচয় পাওয়া যায়। এই সূত্রে Horace বলেছেন—Quandoque bomes dormitat Homerus (হোমারকেও কখনো কখনো নত হ'তে হয়।; অর্থাৎ হোমারও কখনো কখনো ভুল করেন।

সুতরাং লেখকের গুণ বিচার হবে কি দিয়ে? শোপেনহাওয়ার বলেন—উপযুক্ত ক্ষেত্র, অবসর ও সুযোগ পেলে এবং সঠিক মেজাজে (mood) থাকলে মনীষী লেখক সাধারণ লেখকদের ছাড়িয়ে কতখানি উঁচু-স্তরে উঠ্‌তে পারেন,—তাঁর এই ঊর্দ্ধ-বিচরণের সীমাই হবে তাঁর প্রতিভার মাপকাঠি।

খ

একই শ্রেণীর দুজন শক্তিমান শিল্পীকে তুলনা করা অত্যন্ত বিপজ্জনক।—যথা, দুজন বড় কবি, বা চিত্র-শিল্পী বা সঙ্গীত-বিশারদ! তা করতে গেলে, একজন-না-একজনের ওপর অবিচার এসে পড়বেই। কারণ, ঐ রকম সমালোচনায়, সমালোচক একজন শিল্পীর মধ্যে একটি বিশেষ গুণ আবিষ্কার করবেন এবং অন্যের মধ্যে সেই গুণটির অভাব দেখিয়ে তাঁকে নিকৃষ্ট প্রতিপন্ন করবেন। প্রতিপক্ষও তৎক্ষণাৎ তথা-কথিত নিকৃষ্ট শিল্পীর মধ্যে এমন-একটি বিশেষ গুণ লক্ষ্য করবেন যা অপরের মধ্যে নেই, সুতরাং অপর পক্ষকে নিতান্ত তুচ্ছ বলে অভিমত প্রদান করতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করবেন না।

এ-রকম সমালোচনার ফলে দুটি প্রতিভাই অযথা নিন্দিত এবং উপহসিত হন; এর দ্বারা তাঁদের সঠিক এবং উপযুক্ত বিচার কোন দিনই সম্ভবপর নয়।

ঔষধের মাত্রা যদি বেশী হ'য়ে যায় তাহলে তা যেমন কার্য্যকরী হয় না, সাহিত্যেও তেমনি বিরুদ্ধ সমালোচনা এবং দোষ-দর্শন যখন সুবিচারের গণ্ডী লঙ্ঘন করে তখন তার যথার্থ উদ্দেশ্য ব্যর্থ হ'য়ে যায়।

গ

যখন কোন সাঁচ্চা রচনা আত্মপ্রকাশ করে তখন তার পথের অন্তরায় হয় বাজারের রাশীকৃত মন্দ-রচনা, যেগুলিকে সাধারণে ভুল ক'রে ভালো ব'লে মেনে নিয়েছে। তারপর বহুদিনব্যাপী যুদ্ধের পর নবাগত যখন তার প্রতিষ্ঠা এবং সুনাম অর্জ্জন করতে সক্ষম হয় তখন আবার তাকে নূতন প্রতিবন্ধকের সম্মুখীন হ'তে হয়; এবারে হয় ত লোকে কোন-এক বিচার-বুদ্ধি-শূন্য অন্ধ অনুকরক-কে টেনে নিয়ে এসে সাহিত্য-লক্ষ্মীর বেদীর ওপর প্রতিভাবানের পাশেই তার আসন নির্দ্দিষ্ট ক'রে দেয়; তারা প্রতিভার সঙ্গে অনুকারকের

পার্থক্য বোঝে না, মনে করে, সেই-ক্ষেত্রে বুঝি আরও একটি শ্রেষ্ঠ-ব্যক্তির শুভাগমন হল। Yriarte তাই দুঃখ ক'রে বলেছেন—The ignorant rabble always sets equal value on the good and the bad,

সাধারণ সমালোচকের সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির একান্ত অভাবের আরও একটি প্রমাণ পাওয়া যায়, যখন দেখি যে, প্রত্যেক যুগের প্রাচীন রচনাগুলিকে প্রচুর সম্মান প্রদর্শন করা হচ্ছে কিন্তু বর্ত্তমানের সাহিত্য সৃষ্টির প্রতি তাদের বিমুখতার আর অন্ত নেই,—তাদের ভুল বুঝে অবহেলা করতে ঐ-সব সমালোচকের বাধে না মোটেই।

নিজেদের সমসাময়িকদিগের ভিতর থেকে যে-প্রতিভা ভাস্বর হ'য়ে ওঠে তাকে বিচার-বিশ্লেষণের দ্বারা ওই সব তথা-কথিত সমালোচকের দল উপযুক্ত সমাদরে বরণ ক'রে নিতে পরাঙ্মুখ হয়,—এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রাচীন কালের প্রতিভাকেও সত্যকার উপলব্ধি করবার মতো বোধশক্তি তাদের নেই, সাহিত্যের কর্ত্তৃপক্ষরা তাকে স্বীকার ক'রে নিয়েছে, এই জন্যেই শুধু তারা সেই প্রাচীন প্রতিভাকে সম্মান প্রদর্শন করে অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হ'য়ে নয়, বিদ্বজ্জনসমাজে মূর্খ প্রতিপন্ন হবার আশঙ্কায়।

দৃষ্টিশক্তি না থাকিলে সূর্য্য যেমন আলো বিকীর্ণ করতে পারে না, কিম্বা শ্রবণ-শক্তি না থাকিলে সঙ্গীত যেমন সুর সঞ্চার করতে সক্ষম হয় না—তেমনি প্রতিভাবান লেখকের রচনার মূল্য নির্ভর করে তার পাঠকের বোধ-শক্তি এবং গ্রহণ-ক্ষমতার ওপর ;—The value of all masterly works is conditioned by the kinship and capacity of the mind to which it speaks......

সাধারণ পাঠকের কাছে কোন অসাধারণ রচনা চাবী-বন্ধ রহস্য-কৌটার মতোই অর্থ-হীন ; সুতরাং কোন চারু-শিল্প-কার্য্যের সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করবার জন্য চাই একটি অনুভব-শক্তি-সম্পন্ন অন্তর ; কোন গভীর গবেষণা-মূলক রচনার গুণ-গ্রহণের জন্য চাই এমনি একটি চিন্তাশীল মন। কিন্তু জগতে এ যোগাযোগ অনেক সময়েই হয় না ; অনেক সময়ে দেখি, যে-লেখক কোন উৎকৃষ্ট গবেষণা জগতকে উপহার দিলেন, তাঁর অবস্থা হ'ল ঠিক সেই আতস-বাজী-প্রস্তুত-কারকের মতো, যিনি তাঁর বহু-যত্নে নির্ম্মিত বাজীগুলির চমকপ্রদ সৌন্দর্য্য প্রচুর উৎসাহে দর্শকমণ্ডলীর সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত ক'রে দিয়ে শেষে জানলেন—তাঁর দর্শকগণের প্রত্যেকেই অন্ধ-আশ্রমের অধিবাসী! অনেক বড়ো লেখকের সাহিত্যজীবনে এই রকম ট্র্যাজিডি ঘটতে দেখা গেছে।

লেখক যে-কথাটি বলতে চাইছেন, পাঠক-চিত্তও সেই কথাটির মর্ম্ম উপলব্ধি করবার জন্য সমুৎসুক ; লেখকের সহিত পাঠকের মনের একটি নিবিড় আত্মীয়তা,—পাঠকের সকল আনন্দ ও তৃপ্তির মূলে এই একাত্মবোধ নিহিত থাকে।

নিজের সকল জিনিষকেই যেমন সুন্দর দেখি, তেমনি যে-লেখকের সহিত আমার অন্তর এবং বোধশক্তির সর্ব্বাপেক্ষা বেশী মৈত্রী তাকেই আমার ভালো লাগবে সবার আগে। সমাজে মেলামেশার কালেও ঠিক এই স্বাভাবিক নিয়মই চলে। যাকে নিজের মতো দেখি তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয় সকলের বেশী। একজন অল্প-বিদ্য লোক পণ্ডিতমণ্ডলীর পাশ কাটিয়ে তারই মতো আর একটি মূর্খের সঙ্গেই আলাপ করবে অধিক। সাহিত্যের প্রাঙ্গণেও আবহমানকাল থেকে এই নিয়মই চলে আসচে।

স্থূল-বুদ্ধি, আড়ম্বর-প্রিয় এবং অন্তঃসার-শূন্য পাঠক সেই-সব লেখককেই সবার ওপরে আসন দেবে যারা তার মনের মতো ক'রে লিখতে সক্ষম হয়েছে ; কিন্তু সর্ব্বজনপ্রশংসিত প্রতিভাবান লেখককে সে মুখে প্রচুর সম্ভ্রম দেখাতে কার্পণ্য করবে না। তার কারণ, মনের সত্যকার মতামত প্রকাশ করবার মতো সাহস তার নেই। কোন অসাধারণ রচনা তাকে কোন আনন্দই দেয় না, বরং তার মনকে না-বোঝার ভারে তিক্ত ক'রে তোলে,—কিন্তু এ-কথা সে প্রাণ গেলেও কারুর কাছে স্বীকার করবে না ; কারণ তা করতে গেলে জনসমাজে তার প্রতিপত্তি হারাবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

প্রতিভাবান্ লেখকের কোন সুন্দর এবং উৎকৃষ্ট রচনা তারাই সম্যক উপলব্ধি করবে যাদের অন্তরে সৌন্দর্য্য-বোধ এবং চিন্তা-শক্তি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বিদ্যমান আছে।

ঘ

সাহিত্য-ক্ষেত্রে সাহিত্যিক পত্রিকাগুলির একটি বিশেষ মিসন্ আছে; অসংখ্য অর্ব্বাচীন লেখকের দল বাণীর মন্দির প্রাঙ্গণে প্রতিনিয়ত যে-আবর্জ্জনা স্তূপীকৃত করছেন, সেই সব অক্ষম এবং অযৌক্তিক রচনা-স্রোতের বিরুদ্ধে দুর্লঙ্ঘ্য বাঁধের মতো দাঁড়িয়ে তাদের রুদ্ধ করাই সাহিত্যিক পত্রিকার প্রথম এবং প্রধান কর্ত্তব্য হওয়া উচিত। তার মতামত এবং বিচার-নিষ্পত্তিও নিষ্কলুষ, ন্যায়নিষ্ঠ এবং কঠোর হওয়া প্রয়োজন; অযোগ্য লেখকের প্রত্যেক অপকৃষ্ট প্রচেষ্টা প্রাণহীন অনুকরণ এবং রচনা-চৌর্য্যকে নির্ম্মমভাবে সমালোচনার কশাঘাতে বিধ্বস্ত করার মধ্যেই তার যথাযোগ্য কর্ত্তব্য নিহিত আছে। মন্দ রচনার স্রোতকে নিবৃত্ত করাই হবে তার কাজ; অর্থ-লুব্ধ প্রকাশক এবং স্বার্থান্বেষী সমালোচকের মতো তাদের প্রশ্রয় দিয়ে পাঠকদের প্রতারিত করা তার কাজ নয়।

এমনি যদি একটি কর্ত্তব্য-পরায়ণ সাহিত্য-পত্রিকা থাকে তাহলে তার হাতের লাঞ্ছনার ভয়ে প্রত্যেক অযোগ্য লেখক, প্রত্যেক গ্রন্থ-তস্কর, প্রত্যেক মন্দ কবি তার লেখনী ধারণ করবার পূর্ব্বে বারবার ভীত ও দ্বিধান্বিত হবে; তার এই সভয় চিন্তা তার লেখনীকে অসাড় নিষ্ক্রিয় ক'রে দেবে,—ফলে, তার লেখা হয়ত আর কোন মাসিকের অঙ্গ-শোভা বর্দ্ধন করবে না, এবং সাহিত্য-লক্ষ্মীও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচবেন। প্রয়োজন-বিহীন আবর্জ্জনার ভারে সমাচ্ছন্ন বাণীর মন্দির-পথ এমনি ক'রেই অল্পে অল্পে সুগম এবং সুসংস্কৃত হবে।

সাহিত্যে যা মন্দ তা শুধু অপ্রয়োজনীয়ই নয়,—অহিতকর এবং সংক্রামকদোষ-দুষ্টও বটে।

লোক-সমাজে যে-সব মূর্খের দল ভিড় ক'রে আছে তাদের প্রতি যে সহনশীলতা দেখানো হয় সাহিত্য-সমাজে সেই প্রকারের পরমত-সহিষ্ণুতার প্রচলন করলে শুধু ভুল করা হবে না,—অন্যায় করা হবে। সামাজিক-ক্ষেত্রে শিষ্টাচার প্রয়োজনীয় কিন্তু সাহিত্য-ক্ষেত্রে তা অনাবশ্যক এবং অনেক সময় অনিষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়: কারণ এর বশবর্ত্তী হলে, মন্দ লেখাকে ভাল আখ্যা দিতে হবে, এবং তাতে ক'রে সাহিত্যের চরম উদ্দেশ্যেই ব্যর্থ হ'য়ে যাবে।

ঙ

সর্ব্বোপরি, সাহিত্য-ক্ষেত্র হ'তে আর একটি অখণ্ড অন্যায়ের বিলুপ্তি একান্ত আবশ্যক; সেটি হচ্ছে—ছদ্মনামকতা বা অনামকতা, সকল প্রকার সাহিত্যিক নীচতার আবরণ। সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত সমালোচককে লেখক এবং তার বন্ধু-বান্ধবদিগের ক্রোধ থেকে রক্ষা করবার জন্যই হয়ত ছদ্ম-নামের প্রচলন হ'য়েছিল; কিন্তু অধিকাংশস্থলেই দেখা যায়, দায়িত্ববিহীন সমালোচক ছদ্মনামের সুবিধা নিয়ে যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হয়। যে-লেখার নিন্দা বা প্রশংসা করলে স্বার্থ-সিদ্ধির সম্ভাবনা আছে তেমনি-তর রচনার নিন্দা বা স্তুতিকল্পেই কাপুরুষ সমালোচক ছদ্মনামের আশ্রয় গ্রহণ করে। এমনি ক'রে ছদ্মনামের আড়াল থেকে কোন উৎকৃষ্ট লেখার প্রতি যুক্তিহীন কটূক্তি নিক্ষেপ করা,—এর থেকে ইতরজনোচিত কাজ আর নেই। যে-লোক নিঃশঙ্ক-চিত্তে পথ দিয়ে হেঁটে চলেছে তাকে পিছন থেকে ছদ্মবেশে আক্রমণ করা,—এ হচ্ছে গুণ্ডার কাজ, ভদ্রলোকের নয়।

এ-বিষয়ে Riemer তাঁর Reminiscences of Goethe নামক গ্রন্থে যা বলেছেন তা প্রণিধান-যোগ্য। তিনি বলেন, যে তোমার প্রকাশ্য শত্রু, যে তোমার মুখোমুখী হ'য়ে দাঁড়ায় তার মর্য্যাদা-বোধ আছে, তার সঙ্গে হয়ত তুমি একদিন সম্মান-জনক সর্ত্তে সন্ধি-স্থাপন করতেও পারো; কিন্তু যে-শত্রু লুকিয়ে থেকে তোমার প্রতি বাণ নিক্ষেপ করে তার নীচাশয়তার তুলনা হয় না। প্রকাশ্যে নিজের মতামতগুলি সমর্থন করবার মতো সাহস তার নেই—এমনিই কাপুরুষ সে। তার নিজের অভিমতের যুক্তি থাক বা না থাক, তার জন্য সে কিছুই গ্রাহ্য

করে না; নিজে লুক্কায়িত থেকে, শাস্তি পাবার সম্ভাবনা এড়িয়ে তোমার ওপর কটূক্তি বর্ষণ ক'রে আনন্দ পাওয়াই তার একমাত্র উদ্দেশ্য।

ছদ্মনামকতা বা অনামকতা সকল প্রকার সাহিত্যিক এবং সংবাদ-পাত্রিক নষ্টামির আশ্রয়; এর প্রচলন বন্ধ হওয়া একান্ত কাম্য। মাসিক-সাপ্তাহিক-দৈনিকের সকল রচনার সঙ্গে রচয়িতার নাম থাকা আবশ্যক এবং সে-নামের যথার্থতা সম্বন্ধে সম্পাদক হবেন দায়ী;—সুতরাং সংবাদ পত্র মারফতে যে-ব্যক্তি তাঁর মতামত সাধারণে প্রকাশ করবেন তার জন্য প্রয়োজন হ'লে তাঁকে (লেখককে) জবাবদিহী করতে হবে, এবং তাঁর লেখার জন্ত তাঁর সম্মান এবং পদ-মর্য্যাদা (যদি কিছু থাকে) থাক্‌বে দায়ী। সাধারণের কাছে লেখকের সম্মান এবং মর্য্যাদা যদি কিছু না থাকে তাহলে তাঁর নামের দ্বারাই তাঁর রচনার গুরুত্ব ব্যর্থ হ'য়ে যাবে,—পাঠক সমাজ তাঁর কথার কোন মূল্যই প্রদান করবে না। এমনি ক'রে, সংবাদ-পত্রের অনেক অযথা মিথ্যা অপসারিত হবে, অনেক বিষাক্ত জিহ্বার স্পর্দ্ধিত গতি হবে রুদ্ধ।*

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

* গোপেনহাওয়ারের সাহিত্যিক মতবাদ অবলম্বনে রচিত।

ইরাণী

শ্রীযুক্ত গোপাললাল দে বি-এ

উত্তপ্ত মাধবী দিবা দিগন্তরে পুষ্ট শ্যামলিখা,
অঙ্গে অঙ্গে উচ্ছ্বসিয়া কামনার জ্বলে বহ্নিশিখা;
প্রভাত হইতে ফিরি, হেরি রূপমৃগতৃষা তার,
সরে যায় দূরে দূরে; হায়, জ্বালা কোথা জুড়াবার!

এমনি নিদাঘ বেলা সুনিভৃত পল্লীশ্যামাঞ্চলে,
একখানি ধ্যানপূত শান্ত শুভ্র কক্ষশিলা তলে,
বায়ু ঝুরে ঝিরি ঝিরি বনান্তের বহি সমাচার,
আরাত্রিক শঙ্খসম আসে পিক-কণ্ঠ-সুধাসার।

কূটজের গন্ধ পশে বাতায়ন মুক্ত পথ দিয়ে,
একটি ভ্রমর উড়ে কর্ণান্তিকে সুসংবাদ নিয়ে,
ধূপের ধোঁওয়ার মত প্রেয়সীর সুরভি নিশ্বাস,
হাওয়াখানি ছেয়ে আছে একখানি অনুরাগবাস।

নয়ন সম্মুখে হেরি কিশোরীর বয়োসন্ধিক্ষণ,
অন্তরে প্রেয়সীবক্ষে অকস্মাৎ মূরছিল মন।

শ্রীগোপাললাল দে

রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা

শ্রীযুক্ত প্রমোদরঞ্জন দাশ গুপ্ত, এম্-এ

এ কথা কেউই অস্বীকার কত্তে পারবেন না যে রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে প্রকৃতির কবি। প্রকৃতির রূপ তাঁকে যে ভাবে মুগ্ধ করেছে জগতের অন্য কোন কবিকে কোন দিন সে ভাবে মুগ্ধ করতে পেরেছে কিনা সন্দেহ। বাল্যকাল থেকেই প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয়। প্রকৃতির ক্রোড়েই তিনি একরূপ লালিতপালিত বর্দ্ধিত। প্রকৃতির কাছ থেকেই তিনি তাঁর সমস্ত শিক্ষা লাভ করেছেন। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য তাঁর জীবনকে, তাঁর কাব্যকে, তাঁর দর্শনকে আনন্দময় করেছে ;—আনন্দ থেকেই এই জগতের উৎপত্তি—উপনিষদের এই বাণীর সত্যতা কবি উপলব্ধি করেছেন প্রকৃতির সৌন্দর্য্য উপভোগের মধ্যে দিয়ে। জগৎময় ছড়ান এই অফুরন্ত সৌন্দর্য্য সেই অনন্ত আনন্দের বিকাশ রূপেই কবির চোখে প্রতিভাত হয়েছে।

প্রকৃতির অনন্তরূপ,—সেই অনন্ত রূপেই সে আমাদের কবিকে ভুলিয়েছে। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত, প্রভাত, মধ্যাহ্ন, সন্ধ্যা, রাত্রি—প্রকৃতির এমন কোন রূপ, এমন কোন অবস্থার নাম করা যেতে পারে না যা দেখে রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হন নি। তথাপি একথা নিঃসন্দেহ বলা যায় যে তিনি বিশেষ ভাবে বর্ষার কবি। প্রকৃতির বর্ষারূপই রবীন্দ্রনাথের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়। বর্ষার আগমনে তিনি একেবারে আত্মহারা হয়ে পড়েন, বর্ষার গানে তাঁর হৃদয়ে গান উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। তাই রবীন্দ্রনাথের বর্ষার সম্বন্ধীয় কবিতায় যত রস ফুটে ওঠে জগতের অন্য কোন কবি বর্ষার কবিতা লিখে অত রস ফুটিয়ে তুল্‌তে পারেন নি।

রবীন্দ্রনাথ বর্ষা সম্বন্ধে যত কবিতা লিখেছেন আমার মনে হয় তার মধ্যে "আষাঢ়" কবিতাটিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই আষাঢ় কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের তথা বিশ্বসাহিত্যের যে কোন শ্রেষ্ঠ কবিতার সঙ্গে সমান আসন পাবার যোগ্য। অথচ এ কবিতায় কোন উচ্চভাব নেই, ভাষা উপমা অনুপ্রাস প্রভৃতি অলঙ্কারহীন নিতান্ত সহজ সরল। এই নিরলঙ্কার সরল সহজ ভাষার মধ্যে দিয়ে পল্লিগ্রামের বর্ষা-সন্ধ্যার একটি ছবি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে,—আর সে ছবি কি অপরূপ রস-মূর্ত্তিতে আমাদের চোখের সম্মুখে ফুটে উঠেছে! এই আষাঢ় কবিতাটির মধ্যে বর্ষা-প্রকৃতির যেরূপ একটী সমগ্ররূপ আমরা দেখ্‌তে পাই রবীন্দ্রনাথের অন্য কোন বর্ষার কবিতায় সেরূপ একটি অখণ্ড রসরূপ আমাদের চোখে পড়ে না।

এমন অনেক সমালোচক আছেন ভাব ও রসের পার্থক্য সম্বন্ধে যাঁদের ধারণা পরিষ্কার নয়। তাঁরা মনে করেন উচ্চ ভাব না থাক্‌লে কবিতা কখনও উচ্চ অঙ্গের হতে পারে না। এ কথা তাঁরা ভুলে যান যে রসই কাব্যের প্রাণ, ভাব নয়। ভাব কাব্যের বিষয়বস্তু হয় তখনই যখন তা কবির অনুভূতির আগুনে গলে রস-রূপ ধারণ করে। শুধু ভাবই যদি কাব্যের বিষয়বস্তু হত তা হলে দার্শনিক ও কবির মধ্যে কোন পার্থক্য থাকত না। কিন্তু আমরা জানি দার্শনিক ও কবি দুই বিভিন্ন শ্রেণীর লোক। অলঙ্কারহীন নিতান্ত সহজ সরল ভাষার সাহায্যে কোন রকম উচ্চ ভাবহীন নিতান্ত সামান্য বিষয় নিয়ে কী গভীর রস ফুটিয়ে তোলা সম্ভব এই আষাঢ় কবিতাটিই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

লিখবার সময়কার কবির মানসিক অবস্থা অনুযায়ী কাব্যকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা যায়।—কতকগুলি কাব্য সচেতন অবস্থায়, সজ্ঞানে, ধীর শান্তভাবে লেখা; আর কতকগুলি আবেগের আতিশয্যে তন্ময় অবস্থায় লেখা। এই দুই শ্রেণীর কাব্যের মধ্যে কোন্ শ্রেণীর কাব্যের বিশেষত্ব কি, কোন্ শ্রেণীর কাব্য শ্রেষ্ঠ, উভয়ের মধ্যে পার্থক্য মূলত জাতিগত কি মাত্রাগত এ সমস্ত বিষয়ের আলোচনা আজ আমি করতে চাই না। আজ আমার বলবার কথা শুধু এই

যে আষাঢ় কবিতাটি উপরোক্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর কাব্যের অন্তর্গত। পড়লেই মনে হয় কবি বর্ষা-সন্ধ্যার রূপ ধ্যান করতে করতে একেবারে তন্ময় হয়ে গিয়েছিলেন,—সেই অবস্থায় স্বতঃই তাঁর মুখ থেকে এই কবিতাটি বেরিয়েছে, কলম ধরে লিখবার ক্ষমতাও বোধ হয় তখন তাঁর ছিল না।—

"এখনি আঁধার হবে, বেলাটুকু পোহালে।"—রবীন্দ্রনাথের মত কবির পক্ষেও সজ্ঞানে এরকম লাইন লেখা সম্ভব নয়।

আষাঢ় কবিতাটির প্রশংসা লিখতে গিয়ে আমার পক্ষে লেখনী সংযত করা শক্ত। কবিতাটির প্রতি ছত্রে, প্রতি শব্দে এত অফুরন্ত রস যে এর কোন একটা অংশ বেছে নিয়ে বিশেষ ভাবে তার প্রশংসা করা চলে না। তথাপি কবিতাটির থেকে খানিকটা অংশ উদ্ধৃত না করলে এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তাই কএকটি লাইন উদ্ধৃত কচ্ছি—

"ওই ডাকে শোন ধেনু ঘন ঘন
ধবলীরে আন গোহালে।
এখনি আঁধার হবে, বেলাটুকু
পোহালে।
দুয়ারে দাঁড়ায়ে ওগো দেখ দেখি
মাঠে গেছে যারা তারা ফিরেছে কি ?
রাখাল বালক কী জানি কোথায়
সারাদিন আজ খোয়ালে ;
এখনি আঁধার হবে, বেলাটুকু
পোহালে ॥
শোনো শোনো ওই পারে যাবে ব'লে
কে ডাকিছে বুঝি মাঝিরে ?
খেয়া পারাপার বন্ধ হয়েছে
আজি রে।
পুবে হাওয়া বয়, কূলে নেই কেউ,
দুকূল বাহিয়া উঠে পড়ে ঢেউ,
দর দর বেগে জলে পড়ি' জল
ছল ছল উঠে বাজি রে।
খেয়া-পারাপার বন্ধ হয়েছে
আজি রে ॥"

বিশ্বসাহিত্যে এর তুলনা কোথায় জানি না।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশ গুপ্ত



জামাইবাবু

শ্রীযুক্ত সতীনাথ ভাদুড়ী এম্‌-এ

মেজদির বিয়ে। বেশ মনে আছে; দিব্যি নাদুস নুদুস বর। মণিদি ব'ল্‌লো "বাব্‌বা! কি মোটা!" ছোট পিসিমা মেয়ের দোষ ঢেকে নিয়ে ব'ল্লেন, "জমিদার মানুষ, ক্ষীর দুধ খেয়ে মানুষ ···।"

ঢেঁপো ব'লে পাড়ায় একটা অখ্যাতি ছিল। তাই জন্যেই বোধহয় ঐ অল্পবয়সেও বুঝতে পেরেছিলাম যে জামাইবাবুর রুচি আর কথাবার্ত্তা বিশেষ মার্জ্জিত নয়। বড়দির সঙ্গে গল্প ক'রছিলেন "ব্রহ্মচারী থাকবো ব'লেই ঠিক ক'রে ছিলাম। আর লোকে যা মনে করে সবই যদি ক'রতে পারতো তা হ'লেতো কথাই ছিলনা·····।"

২

মেজদিকে শ্বশুর বাড়ী যেতে হ'লোনা। মা চব্বিশ ঘণ্টাই মেজদির উপর চ'টে আছেন। লজ্জায় তাঁর নাকি আর দশজনের কাছে মুখ দেখানোর জো নেই। মেজদিরও আবার রাগ্‌লে জ্ঞান থাকেনা বলেন "আমি তো আর স্বয়ম্বরা হ'তে যাইনি।"

ওবাড়ীর জ্যাঠাইমা ঠেস্‌ দিয়ে বলেন "আসছে পূজোয় বোধ হয় নিয়ে যাবে।"

মেজদি আমাদের কাছে শ্বশুর বাড়ীর কত গল্প করেন—বিয়ের প'রে গিয়ে এক সপ্তাহ শ্বশুরবাড়ী ছিলেন কিনা। বাবা খোঁজ ক'রে জান্‌লেন জামাইয়ের জমিদারীর আয় বছরে চুরাশি টাকা; আর সম্পত্তির মধ্যে আছে এক প্রকাণ্ড ভগ্নজীর্ণ বাড়ীর দুখানি ঘর।

৩

জামাইবাবু আমাদের বাড়ীতেই চ'লে এলেন—"শ্বশুর মশায়ের একটু ইয়ে influence আছে কিনা, যদি একটু চেষ্টা টেষ্টা করেন······

চাকরীও হ'লো।

কিছুদিন পরে চাকরকে ডেকে বলেন "আরে মঙ্গলু, আমার বিছানা আমি যে ঘরটায় শুই, তার পাশের ছোট খালি ঘরটায় ক'রে দিস্‌। আর দেখিস্‌ মাঝের দরজাটা বন্ধ ক'রে দিস্‌"। বড়দির কাছে বলেন "আমি আগেই ব'লেছিলাম বিয়ে করা ইচ্ছে ছিলনা"। পাড়ার বন্ধু নিলয় বাবুর কাছে বলেন "বৌটা কি ছিঁচকাঁদুনে, দাদা।" তবু পর পর তিনটী মেয়ে হয়।

মেজদার কাছে অযাচিত কৈফিয়ৎ দেন—"আমাদের দেশের মেয়েদের আর একটু শিক্ষা দীক্ষার দরকার; নইলে পুরুষ মানুষ নিজের যা ইচ্ছে তা ক'রতে পারেনা"।

গত কয় বছরের নিয়ম মত এবারেও মেজদির সময় এলো। লেডী ডাক্তার ব'ললেন "weak constitution, কি হয় বলা যায় না"।

হ'লোও তাই।

ও বাড়ীর জ্যাঠাইমা ব'ল্লেন "বেশ গিয়েছে; নোয়া সিঁদুর নিয়ে যাওয়া কজনের ভাগ্যে ঘটে। এই দেখোনা..." ব'লে লম্বা নামের ফর্দ আওড়িয়ে গেলেন। মা মেয়ে তিনটীকে দেখিয়ে বলেন "ম'রেও শান্তি দিলো না—হাড়ে দুব্বো গজিয়ে রেখে গ্যালো"। জামাইবাবু মেয়েদের বাঁশী কিনে দিলেন।

৫

আমার ছোটবোন টুলু ভাঁড়ার ঘরের মধ্যে ব'সে কাঁদচে আর মাকে কি সব যেন ব'লচে।

যেতেই মা বলেন "তোরা যানা, তোরা এখানে কি ক'চ্ছিস"? পরে শুনলাম টুলু বুড়ীকে কোলে ক'রে যখন কোণের ঘরে ব'সে আচার খাচ্ছিলো, তখন জামাইবাবু সেখানে গিয়ে কি সব "ছাই ভস্ম মাথা মুণ্ডু" ব'লেচেন। ও তাই ছুটে ভাঁড়ার ঘরে পালিয়ে এসেচে।

মা বলেন "কাউকে যেন ব'লিস না। তোদের আবার যা সব মুখ আল্‌গা কি যেন্না···"

৬

শুনলাম জামাইবাবু রেলে বড় চাকরী পেয়েছেন। পান চিবুতে চিবুতে রামকেষ্ট ঠাকুরের ছবিকে প্রণাম করেন। তারপর মা আর বাবার পায়ের ধুলো জিবে ঠেকিয়ে গাড়ীতে চ'ড়ে বসেন। বুড়ী, আর নেড়ী, বায়না ধরে বাবার সঙ্গে গাড়ীতে চ'ড়বে। বুলু বলে 'বাবা আমার জন্যে একটা এত্তো বড় পুতুল এনো"। মা তাড়া দেন এখন পেছু ডাকিস না।

৭

কিছুদিন পরে আবার জামাইবাবুকে বাজারে দেখি, দূর থেকে। আমাকে যেন দেখেও দেখেন না।

নিলয়বাবু বলেন "বেশ দিয়েচে থুয়েচে—চুয়োডাঙ্গায় বিয়ে ক'রে এলো কিনা। মেসে এসে উঠেচে"। রেলের চাকরীর কথা জিজ্ঞাসা ক'রতে আর সাহসে কুলোয় না।

মাকে এসে বলি।

মা বুড়ীকে বুকে চেপে ধরেন। নেড়ী বলে "বুলু বড় দুষ্টু, না দিদিমা? বাবা পুতুল আন্‌লে আর কাউকে দেবোনা—খালি খালি আমি-ই আর তুমি-ই,—না দিদিমা"? মায়েরচোখ জলে ভ'রে ওঠে। আজ আর মা ওদের উপর রাগ করেন না।

শ্রীসতী নাথ ভাদুড়ী

ভারতীয় নৃত্যের আদর্শ

শ্রীমতী ষ্টেলা ক্রাম্‌রিশ্‌ এম্‌-এ, পি-এচ্‌-ডি

নৃত্যকলা যে জানে না, সে না জানে সঙ্গীত, না জানে ভাস্কর্য্য, না জানে চিত্রাঙ্কন। প্রাচীন ভারতের পুঁথিতে এ কথা স্পষ্ট করে লেখা আছে,—যে, সব রকম সৌন্দর্য্য-বিকাশের মূলে হ'চ্ছে নৃত্যকলা। এই গভীর কথাটি মানুষ অনেক দিন ভুলেছিল, আর তারই ফলে ভারতীয় নৃত্যকলা হারিয়েছিল তার বিশেষত্ব ও মর্য্যাদা, এবং সমগ্রভাবে ভারতীয় শিল্পই মোটের উপর অর্থহীন ও প্রাণহীন হ'য়ে পড়ছিল।

আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টিলাভের উপায় ও যন্ত্র হিসাবে শরীরটাকে তৈরী করে নেবার একটা বিধিবদ্ধ-প্রণালী প্রাচীন ঋষিরা উদ্ভাবন করেছিলেন। সারা ভারতময় যোগীরা এই প্রণালীর প্রয়োগ আজও করে থাকেন। তেমনি, অপর পক্ষে,—যে আত্ম-প্রকাশের মূলে সৃষ্টির অনুপ্রেরণা, তারও উপায় ও যন্ত্রহিসাবে দেহটাকে তৈরী করে নেবার বিধিবদ্ধ প্রণালী প্রাচীনকালের জ্ঞানী-গুণীরা উদ্ভাবন করেছিলেন। তাঁরা বুঝেছিলেন যে দেহ-সৃষ্টি ও পরিচালনার যে মূলমন্ত্র, তা' দেহটাকে শিখিয়ে তৈরী করে নেবার সমস্ত চেষ্টার চেয়েই বাড়া; তাঁরা জানতেন যে নটরাজ শিবই সৃষ্টি থেকে প্রলয় পর্য্যন্ত তাঁর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রত্যেকটি চলনায় জীবনের প্রতিটি অনন্ত মুহূর্ত্ত সৃষ্টি করছেন, বিকাশ করছেন, আবার বিনাশ করছেন। এমন কি মানব-দেহের মধ্যেই বিকশিত যে নৃত্যকলা, তা-ও ক্ষেত্রের মধ্যে, আকাশের মধ্যে এবং দর্শকের হৃদয়ের মধ্যে সেই আদিম অঙ্গ-চালনার স্পন্দন জাগাতে পারে, যা' চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-তারাকে আপন আপন সুনির্দ্দিষ্ট পথে, এবং ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় জীবন্ত বস্তুকেই জন্ম-যৌবন-জরা-মৃত্যু ও পুনর্জন্মের সুনিয়ন্ত্রিত পরম্পরার মধ্যে বিধৃত করে রেখেছে।

রবীন্দ্রনাথ এ দেশে নৃত্যকলাকে পুনঃসঞ্জীবিত করছেন। ধ্বনি, বাক্য, রেখ-রঙের যা কিছু প্রকাশ-ধর্ম্ম সমস্তই সম্পূর্ণ আয়ত্ত করে তাঁর জয়যাত্রায় তিনি সৃষ্টি-পথের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত প্রদক্ষিণ করেছেন,—এখন আমাদের সকলকে দেখাচ্চেন, কোথায় সৃষ্টির সুরু। এ দেখায় অসীম আনন্দ: কেন-না সকল শিল্পের শিল্প যে নৃত্যকলা,—তা' প্রত্যেক মানুষকেই গভীরভাবে নাড়া দেয়, যদি না সে মানুষ মৃত অতীতের সংস্কারের চাপে অন্ধ হ'য়ে থাকে। শিল্প-কলার সুবিচার করা সহজ নয়,—নাট্য-কলা, স্থাপত্য-কলা প্রভৃতি জটিলতর কলার কথা ছেড়ে দিলেও, একটা সামান্য ছবিকে তার সকল দিক দিয়ে, কিম্বা একটা সঙ্গীতকে তার সূক্ষ্মতম ইঙ্গিতটুকু ধরে বিচার করতে তাঁরাই পারেন, যাঁরা অধিকারী। তবুও হাঁটতে শেখ্‌বার আগেই নৃত্য করতে সুরু করে এমন ছেলেও আছে। এবং যে সভ্যতা আশ্রয় করে মানুষ বেঁচে থাকে এবং যা' নিয়ে বেঁচে থাকে তা-ই প্রকাশ করে, সেই সভ্যতার মধ্যে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত জীবনের বড়ো বড়ো মুহূর্ত্তগুলির সাধনা ছন্দোবদ্ধ অঙ্গ-ভঙ্গিতেই তরজমা করা হ'য়ে থাকে। সকল সভ্যজাতির অগ্রণী এই ভারতবর্ষ শুধু যে নৃত্য-কলার মধ্যে আত্ম-প্রকাশ করেছিল এবং নৃত্য-চর্চ্চাকে একটা বিজ্ঞান করে তুলেছিল,—তা-ই নয়, অনেক দিন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ বিস্মৃত হয় নি,—যে মানব-দেহ ছাড়া আর যা-কিছু,—ধ্বনি, রঙ, ইত্যাদি,—সৃষ্টি ক্রিয়ার উপকরণ হ'তে পারে,—তাদের সকলকেই এই নৃত্য-কলার নিয়মই অবলম্বন করতে হয়।

কিন্তু এই কলিযুগে অন্তরাত্মার বাণীর প্রতি মানুষ বধির হ'য়ে গিয়েছে; মধ্য-ভিক্টোরিয় যুগের কৃত্রিম লজ্জাশীলতার

ভ্রান্ত ধারণা ভারতবর্ষেরও কিছু ক্ষতি করেছে; তাই নৃত্য যে কী নয়,—কোন্ জিনিষের প্রতি যে তার লক্ষ্য নেই,—সে সম্বন্ধে দু'একটা কথা আগে বলা প্রয়োজন; তবেই বোঝা যাবে ভারতীয় নৃত্যকলা কী,—এবং বর্ত্তমানে তার সম্ভাব্যতা কতদূর। শুধুই সুষ্ঠু গতি-কৌশল প্রদর্শন করাটা নৃত্যকলার উদ্দেশ্য নয়। একমাত্র গতিশীল দেহের প্রতিই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে নৃত্যকলা চায় না। পোষ্টকার্ডের চিত্র-সৌন্দর্য্যের সঙ্গে নৃত্যের কোনোই সম্পর্ক নেই। ব্যাধির মত যে-সব যৌন-বৃত্তি সমস্ত দৃশ্যবস্তুকে বিকৃত করে চোখের ওপর চেপে বসে তার নির্নিমেষ কলুষ দৃষ্টিকে বিহ্বল করে রাখে,—সেই সব কু-বৃত্তিগুলোকে দূর করে দিতে হ'বে,—তাদের নাগালের বাইরে যা' কিছু তাকে যেন তারা অপবিত্র করতে না পারে। হাত-পা কিম্বা দেহের কোনো বিশেষ অঙ্গ নাচের আশ্রয় নয়; সমস্ত শরীরটাই,—মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত, তার যন্ত্র। গ্রীবার ভঙ্গিমার মধ্যে যতখানি প্রকাশ-ধর্ম্ম আছে,—চোখের চাউনির মধ্যেও ততখানিই আছে, কিন্তু তাদের আলাদা করে দেখ্লে কারও বিচ্ছিন্ন বাণীরই আর কোনো মানে থাকে না। প্রত্যেকটি সুরের মধ্যে যেমন সমস্ত বীণাখানি ঝঙ্কৃত হ'য়ে ওঠে, তেমনি ছন্দোবদ্ধ গতির যন্ত্র হিসাবে সমস্ত দেহখানাই অন্তরাত্মার অন্তরতম স্পন্দনে সচকিত হ'য়ে সাড়া দেয়। অন্তরাত্মার এই যে স্পন্দন,—এর অন্য কোনো নাম দেওয়া যায় না। কেন না এ দুঃখের অতীত, সুখের অতীত, আনন্দের অতীত,—যে কোন আবেগেরই অতীত, যদিও তা' সকল আবেগেরই আধার,—অথবা সেই জন্যই সকল আবেগের অতীত। যে গান কানে শোনা যায় না অথচ কেউ কেউ শুনতে পান তারায় তারায় সঙ্গতির মধ্যে, অন্যেরা তাই শোনেন আপনারই অন্তরের মধ্যে;—আবার কেউ কেউ অন্তরের মধ্যে এই গান শুনতে শুনতে সেই সুরে তাঁ'দের সমস্ত দেহখানা সমর্পণ করে ফেলেন,—এঁ'রাই হ'লেন আজন্ম নৃত্য-শিল্পী।

ভারতবর্ষে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নমনীয়তা ও মর্ম্মস্পর্শী পরিচালনা প্রায়ই দেখা যায় যে কোনো গ্রামের পথে ঘাটে মাঠে। যন্ত্রটায় এখনো মরচে ধরেনি, কিন্তু তার সঙ্গীত তন্দ্রাচ্ছন্ন। কোনো কোনো জায়গায় বিশেষতঃ দক্ষিণ ভারতে অতীতের একটা বৃহৎ সংস্কারের প্রচলিত প্রথাগুলির পরিচয় এখনো পাওয়া যায় বহু নর্ত্তকের শরীরের মধ্যে। অথচ অঙ্গ-চালনার প্রকৃত মর্ম্ম যে কী, তার একটা সুস্পষ্ট জ্ঞান কারো মধ্যে বড়-একটা দেখা যায় না। সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত গীত-উৎসবের একজন দক্ষিণ-ভারতীয় নর্ত্তকের মধ্যে এই কথাটির প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। দেখা গেল উদার অঙ্গ-ভঙ্গিমা,—ভয়ঙ্কর মহিমায় মণ্ডিত—বংশ-পরম্পরায় বহু চর্চ্চা ও অভিজ্ঞতার ফল; সমস্তটা কিন্তু যেন একটা শূন্যতায়



অর্চ্চনা;—দেহ অসাধারণ সুগঠিত, গড়নের প্রত্যেকটি বাঁক একেবারে নিখুঁত, তবুও যেন অন্তঃসারশূন্য, অন্তত সার থাক্লেও এত কম যে দেহের সীমার মধ্যে দেহাতীতের আভাস ফুটে ওঠে না। তথাপি মনে হয় এইখান থেকেই ভারতীয় নৃত্যকলার পুনরুদ্বোধন সুরু হ'বে; দেহের এই সুরক্ষিত রূপের মধ্যে প্রাণ আবার জেগে উঠ্তে পারে যদি একবার এমন কেউ সেই রূপটাকে আয়ত্ত করতে পারেন, যাঁর হৃদয় অমর নটরাজের নৃত্যে স্পন্দমান। দেহের সঙ্গে প্রাণের, রূপের সঙ্গে অরূপের এই মিলনে বাংলাদেশেই ভারতীয় নৃত্যকলা নবজন্ম লাভ করবে। এই প্রসঙ্গে উদয় শঙ্করের নাম করা যেতে পারে, আর গীত-উৎসবের শিল্পীদের

মধ্যে একজন ছাত্রীর। নৃত্যের কলা-কৌশল শেখা এই সবে তার আরম্ভ কিন্তু তার প্রত্যেকটি অঙ্গভঙ্গি অন্তরাত্মার স্পর্শে প্রাণবান্।

অপরপক্ষে, একটা জিনিষ বিশেষ লক্ষ্য করবার—যে কত শীঘ্র ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে কেউ কেউ এরই মধ্যে অতীতের ভাষা আয়ত্ত করে ফেলেছে। কী আশ্চর্য্য শক্তি তাদের দেহের, যা' একটা প্রাচীন জাতির অতীত স্মৃতিকে এমনি ক'রে সঞ্জীবিত রাখ্‌তে পারে,—দেহ দিয়ে যা' প্রকাশ করা হয়, অপরিণত মনের মধ্যে তার কোনো সাড়া পাওয়া না গেলেও। দৃষ্টান্ত স্বরূপ একজন তরুণ ছাত্র মাত্র ছ' মাস শিক্ষার ফলে ছন্দের কাছে তার দেহটাকে সম্পূর্ণ বিলিয়ে দিতে পেরেছে,—যদিও তার মুখমণ্ডলের মধ্যে না আছে কোনো গতি, না আছে কোনো অর্থ। তার দেহের মধ্যে এই যে বাণী প্রতীক্ষা করে আছে,—তার মন একদিন তা' শুন্‌বে নিশ্চয়ই।

দেহটা যে আত্মপ্রকাশের এত সুন্দর উপায়, এ কথা মানুষ এতদিন ভুলেছিল; অনেক ভুল-বোঝা, ঈর্ষা-দ্বেষের বেড়াজাল ভেঙে এই কথাটি স্মরণ করিয়ে মানুষকে তার এমন অপরূপ দেহটাকে ফিরিয়ে দেওয়া,—এদেশে রবীন্দ্রনাথই একাজ করেছেন।

ভারতীয় নৃত্যকলার ওপর পাশ্চাত্য প্রভাবের কোনো অবসরই নেই। আপাতত অবশ্য বলা যেতে পারে যে পাশ্চাত্য শৃঙ্খলাটা প্রথম শেখার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। কিন্তু ভারতীয় নৃত্যকলার যে রূপ ও প্রাণ, পাশ্চাত্য শৃঙ্খলার সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই; তবে অঙ্গচালনা একেবারে অভ্রান্ত করতে এবং চিত্তের যে কোনো আবেগ তখনি তখনি ফুটিয়ে তুলতে অবশ্য তা' সহায়তা করে। শ্রেণীবদ্ধ নৃত্যের প্রবর্ত্তনাতে ভবিষ্যতের প্রতি ইঙ্গিত আছে। একজনে যা' ঠিক ফুটিয়ে তুল্‌তে পারেনা, শ্রেণীর বৃহত্তর ঐক্যের ভিতর নর্ত্তকে নর্ত্তকে সংক্রামিত হ'য়ে তা' ফুটে উঠ্‌তে পারে। ভারতীয় নৃত্যকলার যে প্রকৃতি ব্যক্তিকে অতিক্রম করতে চায় তার ঝোঁকটা এই দিকে। অতীতে এই চেষ্টা কখনো করা হয় নি, ভবিষ্যতে বিশুদ্ধ অবিমিশ্রিত সুর সঙ্গতের সঙ্গে মিলে যাবে।

গীতি-উৎসবে দেখানো হয়েছিলো,—নৃত্যের বিভিন্ন অঙ্গ,—প্রকাশ ও গতি, গতি ও রঙ, রঙ ও আলো,—আবার প্রকাশ ও ধ্বনি, বাক্য প্রকাশ ও গতি কেমন করে পরস্পর-সম্বদ্ধ হ'য়ে একে অপরকে টেনে আনে। এই রকম সব অনুষ্ঠানের যে শিক্ষা তা' গ্রহণ না করলে ভারতের বর্ত্তমান রঙ্গমঞ্চ ও অভিনয়ের ইতরতা থেকে মুক্তিলাভের আশা নেই। শুধুই রঙ্গমঞ্চের ভবিষ্যৎ নয়,—ভারতীয় জীবনের ভবিষ্যৎ এবং শিল্পের মধ্যে তার সার্থকতা নির্ভর করছে কত শীঘ্র দেশ রবীন্দ্রনাথের দেওয়া এই প্রেরণা অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করে তার আহ্বানে সাড়া দিতে পারে,—তারই উপর। *

* অমৃতবাজার পত্রিকার সৌজন্যে ইংরেজী হইতে অনূদিত।

বিবিধ সংগ্রহ

বাহাদুরীর মোহ—পাশ্চাত্য জাতির জীবনীশক্তি যে কতখানি প্রবল তার পরিচয় আমরা নিত্য নানা ভাবে পাই। এদের জীবনীশক্তি প্রচুর বলে তার প্রকাশ হয় নানা ভাবে আর তার ফলে নানা বিচিত্র ঘটনার এবং খবরেরও সৃষ্টি হয়। নীচে কয়েকটি খবর দেওয়া গেল—তাই থেকেই তার পরিচয় পাওয়া যাবে।

——

(ক) **ডান্‌পিটে**ঃ—মিঃ স্যাম্‌লী বলে একজন ভদ্রলোক হচ্ছেন বিলেতে ডানপিটের রাজা। ব্রিটিশ চলচ্চিত্রে যখন কোন রোমহর্ষক এবং বিপজ্জনক কাজের ছবি তোলার দরকার হয়, তখন ইনি ভারী কাজে লাগেন। মাত্র পাঁচ ছয় গিনি দক্ষিণা পেলেই ইনি এমন সব দুঃসাহসিক কাজ করেন যা' শুন্‌লে চম্‌কে যেতে হয়। চলন্ত ট্রেণ থেকে ওঠা নামা করা—খুব উঁচু জায়গা থেকে চলন্ত গাড়ীতে লাফিয়ে পড়া—খুব জোরে চল্‌ছে এমন দু'খানা গাড়ীর ওপর একটা থেকে আর একটায় লাফালাফি করা এসব তাঁর কাছে নেহাৎ ছেলেখেলা। তিনি আজ পর্য্যন্ত যত রকম দুঃসাহসিক কাজ করেছেন তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে ৯৮০ ফুট অর্থাৎ প্রায় ৮০ তালা উঁচু ঈফেল টাওয়ার থেকে লাফিয়ে পড়া।

মিঃ স্যাম্‌লী বলেন—ছেলেবেলা থেকে আমি এই রকম ডান্‌পিটেমী না করে পারি না। এর জন্যে আমায় ভুগতেও হয়েছে বিস্তর, এমনকি কয়েকবার পুলিশে ধরে নিয়ে গিয়ে জরিমানা পর্য্যন্ত করেছে। কিন্তু তবু স্বভাব আমার বদলায় নি।

মিঃ স্যামলীর মতন এই ধরণের দুঃসাহসিক কাজ করতে গিয়ে ওদেশের লোকরা যে বিপদে পড়ে না তা নয়। যেমন ধরুন—এরোপ্লেনের নানা রকম কসরৎ দেখানো। নোয়েল আর্থার আরাল্যাণ্ড, বলে একটি ২২ বছরের ছেলে ওখানকার একজন নামকরা Pilot Officer ছিলেন। কতকগুলি দর্শকের সামনে এরোপ্লেন শুদ্ধ শূন্যে ডিগবাজী খাওয়া দেখাতে গিয়ে ঘটনাচক্রে ভদ্রলোক সম্প্রতি প্রাণ হারিয়েছেন। ইনি একজন ওস্তাদ এরোপ্লেন চালক ছিলেন এবং এঁর খুব শীঘ্রই একখানি দ্রুতগামী এরোপ্লেন চালাবার আশা ছিল। কিন্তু তার আগেই এই দুর্ঘটনা হোল। শুধু এই একটি নয় এই বছরেই এই নিয়ে সবশুদ্ধ ৩২টী এই রকম শোচনীয় এরোপ্লেন-দুর্ঘটনা ঘটে গেছে এবং ২৫ জন বিখ্যাত বিমান-চালকের মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু এতেও ওখানকার লোকেরা নিরুৎসাহ হন না। এই সে দিনই Flight Lt. Stainforth এরোপ্লেনের কত রকম দুঃসাহসিক কসরৎ দেখিয়ে এবং ঘণ্টায় ৪১৫ মাইল বেগে এরোপ্লেন চালিয়ে সকলকে কি রকম বিস্মিত করে দিয়েছেন এবং নিজে মারা যেতে যেতে কি রকম ভাবে বেঁচে গেছলেন সে কথা সকলেই জানেন। সহস্র বিপদের আশঙ্কা সত্ত্বেও নিজেদের কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে বিশ্ববাসীকে স্তম্ভিত করে দেবার নেশায় পাশ্চাত্য জগতের লোকরা একেবারে মশগুল্‌।

সেই জন্যে ওদেশের সবাই যে কোন কৃতিত্বপূর্ণ কাজের রেকর্ড ভেঙ্গে নিজে নতুন রেকর্ড রাখবার জন্যে সর্ব্বদাই প্রাণান্ত চেষ্টা করছেন। বিখ্যাত Motor চালক Major Segrave মোটরকারের speed record রাখতে গিয়ে পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে কি রকম শোচনীয় ভাবে মারা যান সেকথা সকলে জানেন কিন্তু তারপরেও এ বিষয়ে উৎসাহী লোকের অভাব ঘটেনি

এই রকম চেষ্টার ফলে বর্ত্তমানে ব্রিটেনই প্রায় সর্ব্বরকমের speed record গুলি রেখে যথেষ্ট বাহাদুরী অর্জ্জন করেছে। বিভিন্ন বিভাগে Britainএর স্থাপিত speed recordএর পরিচয় এইবার দিচ্ছি। সম্প্রতি Flight Lt Stainforth গড়ে ঘণ্টায় ৪০৮ মাইল বেগে এরোপ্লেন

চালিয়ে জগতে দ্রুত এরোপ্লেন চালনার রেকর্ড রেখেছেন। ইনি কিছুক্ষণের জন্যে ঘণ্টায় ৪১৫'২ মাইল বেগেও এরোপ্লেন চালিয়েছেন। তারপর Sir Malcolm Campbell মোটরকার চালানোর রেকর্ড রেখেছেন ঘণ্টায় ১৪৬'৯ মাইল বেগে মোটর চালিয়ে।

মোটর বোট চালানোতে রেকর্ড রেখেছেন Mr. Kaye Don, গতি হচ্ছে ঘণ্টায় ১১০ মাইল। আর ঘণ্টায় ১৫০'৭ মাইল গতিতে মোটর সাইকেল চালিয়ে record রেখেছেন Mr. J. S. Wright. Mr. Wright তাঁর নিজের স্থাপিত রেকর্ড ভাঙবার জন্যে শীগ্‌গীর আবার মোটর সাইকেল চালাবেন। বিশেষ সুবিধে হবে বলে এবার তিনি তাঁর Motor cycleএর কতকগুলি অংশ তৈরী হবার সময় নিজে গাড়ীর ওপর বসে নিজের শরীরের চারিদিক ঘিরে গাড়ীটিকে সুবিধা জনক ভাবে তৈরী করিয়ে নিয়েছেন।

(খ) **৯ দিনে পৃথিবী ভ্রমণ**ঃ—ফরাসী ঔপন্যাসিক Jules Verne ৮০ দিনে পৃথিবী ভ্রমণের কল্পনা করেছিলেন। সম্প্রতি তাঁর সে কল্পনাকে পরাজিত করে ৯ দিনে পৃথিবী পরিভ্রমণ করেছেন দু'জন ভদ্রলোক উড়ো জাহাজে চড়ে। উড়োজাহাজ চালানোর বিপদ বেশী, মৃত্যুর আশঙ্কা পদে পদে, কিন্তু বর্ত্তমানে সমস্ত যানের শীর্ষস্থান অধিকার করেছে আকাশযানগুলি। আকাশযান চালনায় কৃতিত্ব দেখাবার জন্যে ইউরোপের সমস্ত জাত বর্ত্তমানে এক রকম ক্ষেপে উঠেছে বললেও অত্যুক্তি হয় না। এবং এই সমস্ত দেখে মনে হয় যে কিছুদিন পরে যদি আবার কোন যুদ্ধ অনিবার্য্য হয় তা হ'লে এবারের যুদ্ধ আকাশের ওপরেই চলবে, এবং মর্ত্তোর মানুষরা নিতান্ত অসহায় হোয়ে তাদের দুর্গের মধ্যে লুকিয়েও পরিত্রাণ পাবে না। উড়োজাহাজ চালাতে গেলে কষ্ট সহিষ্ণুতা, অদম্য সাহস ও ধৈর্য্যের প্রভূত প্রয়োজন। কিছুদিন পূর্ব্বে Winnie May ব'লে একখানি উড়োজাহাজে চ'ড়ে মিঃ Wiley Post এবং মিঃ Gatty, দু'জন এমেরিকান, সারা পৃথিবী ৮দিন, ১৫ ঘণ্টা, ৫১ মিনিটের মধ্যে ঘুরে এসেছেন। মিঃ পোষ্টের বয়েস ৩৫ বছর এবং তাঁর সহকারীর বয়স ৩০ বছর। যে উড়োজাহাজটি ক'রে তাঁরা যাত্রা করেছিলেন সেটি বহুবার এই রকম নানা বিজয় যাত্রায় বেরিয়ে অনেকের গলায় জয়মাল্য ছলিয়ে দিয়েছে। মিঃ Post এবং মিঃ Gatty, উভয়ে যে গতিতে এবং যে সময়ের মধ্যে উড়োজাহাজ চালিয়ে ফিরে এসেছেন সে রকম আর কেউ এ পর্য্যন্ত করতে পারেন নি। আটলান্টিক মহাসাগরে একবারও না থেমে তাঁরা একাদিক্রমে ঘণ্টায় ১৪৫ মাইল বেগে উড়োজাহাজ পরিচালনা করেন। জার্ম্মাণীর গ্রাফ্‌ জেপ্‌লিনও এর তুলনায় গতিতে পিছিয়ে গেছে। সবশুদ্ধ, তাঁরা ১৬,০০০ মাইল এই সময়ের মধ্যে ঘুরে এসেছেন। এ পর্য্যন্ত ৯ দিনের মধ্যে এতখানি পথ ঘণ্টায় ১৪৭ মাইল বেগে একাদিক্রমে উড়োজাহাজ চালিয়ে কোন লোকই এরূপ সাফল্য অর্জ্জন করেন নি।

(গ) SCHNIEDER TROPHY রেস :—বিলেতে উড়োজাহাজ কত জোরে কে চালাতে পারে এই নিয়ে সেদিন একটা আন্তর্জ্জাতিক প্রতিযোগিতা হ'য়ে গেল। Schieder Trophy Race-এ Lt J. N Boothman প্রথম হ'য়েছেন। তিনি ঘণ্টায় ৩৪২.৯ মাইল গতিতে উড়োজাহাজ চালিয়েছিলেন। এত জোরে চালিয়ে তিনি অনেকক্ষণ চোখে ভাল ক'রে দেখতে পান নি। এক মিনিটে ৬ মাইলও মাঝে মাঝে তার উড়োজাহাজ চলছিল। এর পরে Lt Stainforth ঘণ্টায় ৩৮৩ মাইলের কিছু ওপরে ভীষণ গতিতে এরোপ্লেন চালিয়ে সকলকে মুগ্ধ করেন। (এই ভদ্রলোকই ঘণ্টায় ৪১৫ মাইল গতিতে এরোপ্লেন চালিয়ে পৃথিবীতে সব চেয়ে দ্রুত এরোপ্লেন চালকের রেকর্ড রেখেছেন) এঁরা যখন এরোপ্লেন চালাচ্ছিলেন তখন এঁদের এরোপ্লেন ঠিক উল্কার গতিতে ছুটে চলেছিল এই রকম সকলের মনে হচ্ছিল। Lt Stainforth উড়োজাহাজ চালিয়ে পরে একটি সামুদ্রিক বিমানপোত চালাতে গিয়ে কিন্তু অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত হ'য়েছিলেন। হঠাৎ কল বিগ্‌ড়ে গিয়ে তার বিমানপোতটি কি রকম উল্টে যায়—ফলে কোন রকমে মৃত্যুর হাত থেকে তিনি বেঁচে গিয়েছিলেন। জীবন ও মৃত্যুকে এমনি তুচ্ছ যারা

করতে পারে তারাই জগতের মধ্যে প্রবলতম জাত হ'য়ে ওঠে। প্রতি বছরে এই এরোপ্লেন দৌড়ের প্রতিযোগিতার জন্মে ব্রিটেনের প্রতি বৎসর অনেক টাকা খরচ হয়। এই Schnieder Trophy প্রতিযোগিতা আরম্ভ হ'য়ে অবধি, ১৯২৩ সাল থেকে আজ পর্য্যন্ত, এই জন্মে ব্রিটেনের প্রায় ৫ লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ ৬৫ লক্ষ টাকা খরচ হ'য়ে গিয়েছে। বিলেতের টাইমস্ পত্রিকা বলেন যে এ টাকা খরচের সার্থকতা আছে, কারণ এতে ব্রিটীশ জাতের কদর সারা জগতে হয়, নতুন নতুন নানা ধরণের এরোপ্লেনের আবিষ্কার এই থেকেই সম্ভব, অভিজ্ঞতার সাহায্যে কলকজা আরও কার্য্যোপযোগী হয় এবং এর কৃতকার্য্যতার ফলে বাইরের লোকদের কাছে উড়োজাহাজ তৈরী করবার অর্ডারও খুব পাওয়া যায়—ফলে দেশের বাণিজ্যের অবশ্যম্ভাবী শ্রীবৃদ্ধি হ'য়ে থাকে।

(ঘ) **গিরি অভিযান** ঃ—সুদূর জার্ম্মাণী থেকে প্রতি গ্রীষ্মকালে হিমালয়ের গিরিশৃঙ্গে আরোহণ করবার জন্মে একদল লোক আসেন ভারতবর্ষে—এবারেও একদল এসেছিলেন। পর্ব্বত অভিযান করা অনেকের একটা সখ। আল্‌স্ পর্ব্বতের দুরারোহ ম্যাটারহর্ণ গিরিশৃঙ্গে ওঠার সংকল্প ক'রে বহুলোক প্রাণ হারিয়েছে, হিমালয়ের সু-উচ্চ শৃঙ্গে উঠ্‌তে গিয়ে কত বিদেশী তাদের মহামূল্য প্রাণ চির-তুষারের কবলে সমাধিত ক'রে যাচ্ছে; তা' সত্ত্বেও মানুষের দুর্জ্জয় প্রতিজ্ঞা যে অপরাজেয়কে পরাজিত করবে। আল্‌সের ম্যাটারহর্ণ গিরিশৃঙ্গ হিমালয়ের চেয়ে উঁচু না হ'লেও সে রকম খাড়া পাহাড় জগতে খুব কমই আছে। এটি গৌরীশঙ্কর শৃঙ্গের চেয়ে ১০০২ ফিট্ নীচু, তা'হলেও এর উচ্চতার পরিমাণ বড় কম নয়, এটি ২০,০০০ ফিট্ উঁচু। ২০,০০০ ফিট্ উঁচু থেকেই প্রবল ঝড়, বৃষ্টি ও তুষারপাতে অভিযানকারীদের প্রাণসংশয় হ'য়ে ওঠে। এবং আরও যত ও'পরে ওঠা যায় ততই কষ্ট বেড়ে ওঠে, সময় সময় শ্বাসরোধেও অনেকের মৃত্যু হয়। কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীযুত Edwin Whympereনামে একজন ইংরেজ ভদ্রলোক বহুকষ্টে কোনরকমে মৃত্যুকে এড়িয়ে এই ম্যাটারহর্ণ গিরিশৃঙ্গে উঠ্‌তে পেরেছিলেন। আজ পর্য্যন্ত আর কোন জাতির লোকই সেখানে পৌছুতে পারেন নি। কিছুদিন পূর্ব্বে ১১ জন লোক আল্‌সের গিরি অভিযান করতে যাত্রা করেন। তাঁরা যখন ম্যাটারহর্ণের শৃঙ্গের একটু নীচে মণ্ট ব্লাঁতে পৌছলেন সেই সময় এক ভীষণ ঝড় এল। ন' দিন পরে তাঁদের কোন খোজখবর না পাওয়াতে একজন উদ্ধারকারী তাঁদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলে কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সকলে মৃত্যুর তুহিনস্পর্শে সেই তুষাররাজ্যে তখন চিরনির্ব্বাণ লাভ করেছেন। একটি লোকের নোট বুক পাওয়া গেল মৃত্যুর পূর্ব্বে অসহ্য কষ্টের বর্ণনা তা'তে লেখা। ঠিক এই রকম ব্যাপার গৌরীশৃঙ্গ আরোহীদের দু'জনের ভাগ্যে ঘটেছে। ইতিমধ্যে আর একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার বলি। এক ১১ বছরের ইংরেজ বালিকা আল্‌স্ পর্ব্বতে ১৫,৭৮১ ফিট্ উঁচুতে উঠেছিল। দু'বার সে এইখানে যায়। গোড়ায় ২ বার ঝড়ের বেগে বাধ্য হয়ে সে নেমে আসে, তৃতীয় বার সে মণ্ট্ ব্লাঁতে ঠিক পৌছেছিল। মেয়েটির নাম পামেলা উইলকিন্‌সন্। এর পূর্ব্বে ১৮৮৯ সালে Charlie Stratton বলে আর একটি ছোট ছেলেও এখানে পৌছেছিল। তার বয়স ছিল ১১ বছর দু' মাস—মিস্ পামেলার চেয়ে সে ছিল মাত্র দু' মাসের বড়।

হিমালয়ের গিরিচূড়ায় আরোহণ ক'রে ফিরে আসতে অবশ্য আজ পর্য্যন্ত কেউই পারে নি। ১৯৩০ সালে যে অভিযানকারীরা জার্ম্মাণী থেকে আবার নতুন দল গঠন ক'রে এসেছিলেন তাঁরাই বর্ত্তমানে সকলের চেয়ে উঁচুতে উঠে-ছিলেন। ২৪,৪৭২ ফিট্ পর্য্যন্ত এঁরা উঠ্‌তে পেরেছিলেন। হিমালয়ের তুষারাবৃত গিরিশৃঙ্গ অতি ভয়ানক। এর নিকটে যাওয়া সকলের চেয়ে শক্ত। পৃথিবীর সুউচ্চ পর্ব্বতমালায় সাতশো গিরিশৃঙ্গে আরোহণ করেছেন জনৈক জার্ম্মাণ, ডাইরেন্‌ফার্থ (Dyrenfurth)। এবারে তাঁর পত্নী ফ্রাউ ডাইরেন্‌ফার্থ একদল উৎসাহী গিরিঅভিযানকারী নিয়ে হিমালয়ের দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বতশৃঙ্গে আরোহণ করবার জন্য যাত্রা করেন। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন Frank Smythe যিনি গতবারে গিয়েছিলেন। সঙ্গে বিশজন সাথী ছিল। Frank Smythe অবশ্য আরও উঁচুতে ২৫,৪০০ ফিট্ পর্য্যন্ত

উঠেছিলেন। এঁরা কিন্তু এবারে অতদূর উঠ্‌তে পারেন নি। এই হিমালয় অভিযানের সমস্ত বিবরণ তাঁরা যে শুধু বর্ণনা করেছেন তা' নয়—সঙ্গে সঙ্গে ছায়াচিত্রও তুলে এনেছেন। ৬০,০০০ ফিট্ নেগেটিভ্ ফিল্ম তাঁরা সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়েছিলেন। সঙ্গে চারটি ক্যামেরা ছিল, পঞ্চাশজন পাহাড়ী বেয়ারা মালপত্র নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে গিয়েছিল। দুর্ভাগ্য বশত স্থানীয় একটি পাহাড়ী বরফের চাঁইয়ের তলায় পড়ে প্রাণ হারায়। পর্ব্বতের চমৎকার দৃশ্য, পথের কষ্ট, গিরি-চূড়ার অভিনব সৌন্দর্য্য সবই ছায়াপটে উঠে গিয়েছে। বিলেতের Prince of Wales থিয়েটারে কতকগুলি বিশিষ্ট ও সম্ভ্রান্ত লোকের সম্মুখে সেদিন এক্‌সেল্‌সিয়র Excelsior বা উচ্চারোহী ব'লে এই ছবিটি দেখান হ'য়েছে। সকলে দেখে মুগ্ধ হ'য়েছেন। এর প্রত্যেক ঘটনা এত বিচিত্র ও সত্য যে দর্শক বা ছবিটি দেখ্‌তে দেখতে অভিভূত হ'য়ে পড়েন। অভিযানকারীদের মধ্যে জার্ম্মাণ, অষ্ট্রিয়ান, সুইজারলাণ্ডের অধিবাসী ও ব্রিটেনবাসী চার রকম জাতই ছিলেন। শ্রীমতী ফ্রাউ ডাইরেন্‌ফার্থ এই দলের গৃহকর্ত্রী স্বরূপ ছিলেন। একজন মহিলার পক্ষে এই অসমসাহসিকতার পরিচয় যে কতদূর প্রশংসনীয় তা' সকলেই অনুমান করতে পারেন! Excelsior ফিল্ম্‌টি প্রথমে বিলেতে খুব শিগ্‌গিরই সাধারণের সম্মুখে প্রকাশিত হবে। পরে ভারতবর্ষে প্রেরিত হবে।

ফ্যারাডে শত বার্ষিকী—মাইকেল ফ্যারাডের নাম শুধু বৈজ্ঞানিক জগতে সুপরিচিত নয় অবৈজ্ঞানিকেরাও প্রায় অধিকাংশই তাঁকে জানেন। ফ্যারাডে সাহেব ছিলেন কামারের ছেলে কিন্তু একশো বছর আগে এই কর্ম্মকার-পুত্র বিদ্যুতের অপূর্ব্ব আবিষ্কার ক'রে বিশ্ব-জগতের এক মহাকল্যাণের পথ আবিষ্কৃত ক'রে গেছেন। বিজ্ঞান শাস্ত্রে তাঁর দান অমূল্য এবং তাঁরই মহাদানের ফলে আমরা আজ হাফ্‌টোন ছবি তুলতে পারছি, বৈদ্যুতিক বহুজিনিষ নিয়ে নানা কার্য্যে লাগাচ্ছি। ফ্যারাডে সাহেবের মহান্ আবিষ্কারের জন্যই আজ মার্কনির পক্ষে বেতারকে আবিষ্কার করা ও কার্য্যোপযোগী ক'রে তোলা সম্ভবপর হয়েছে। কেন্‌সিংটনের Royal Albert Hallএ ফ্যারাডে সাহেবের একটি প্রকাণ্ড মূর্ত্তি স্থাপিত ক'রে বৈদ্যুতিক আলোক-সম্পাতে সেটিকে আলোকিত করা হয়েছিল। হলটির মধ্যে লোকচক্ষুর আড়ালে প্রায় দু'শো বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালান হ'য়েছিল। প্রত্যেক বাতিটি ১০০০ এক হাজার বাতির সমান আলোক দেয়। সারা দিবারাত্র বাড়ীটির ভিতর বাইরের সূর্য্যালোক যাতে না প্রবেশ করে সে জন্য সবিশেষ বন্দোবস্ত করা হয়। সমস্ত হলটি ঠিক দিনের আলোকের মতই উজ্জল হ'য়ে উঠেছিল। ফ্যারাডের প্রতিমূর্ত্তির কাছে তাঁর ব্যবহৃত পুরোণো coil (জড়ান তার) রেখে দেওয়া হয়েছিল। আর একপাশে ব্রিটিশ বেতার কোম্পানির (Transmitter) নতুন একটি বেতার প্রেরক যন্ত্র সাজিয়ে রাখা হ'য়েছিল। তা'ছাড়া গ্রীড্ systemএ বৈদ্যুতিক সঞ্চালন যে রকম হয় (যার প্রথম উদ্ভাবনকর্ত্তা ফ্যারাডে সাহেব) সেটির সমস্ত যন্ত্র পাতি, কলকব্জা সেখানে প্রদর্শনীর জন্য ছিল।—এই বিশ্ব-বিশ্রুত বৈজ্ঞানিকের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে দেশ এবং বিদেশ থেকে বহু মনীষি এলবার্ট হলে উপস্থিত ছিলেন। ১লা অক্টোবর ফ্যারাডে-স্মৃতি-প্রদর্শনী শেষ হ'য়ে গিয়েছে। এই প্রদর্শনী উপলক্ষে এলবার্ট হলে প্রত্যহ প্রায় গড়ে ৪০০০ হাজার লোকের সমাগম হত। এই প্রদর্শনী দেখতে শুধু স্কুলের ছেলেই এসেছিলেন সবশুদ্ধ প্রায় ১৯০০০। একজিবিশন-সাব-কমিটীর চেয়ারম্যানের হিসাবে প্রকাশ যে একজিবিশনের কর্ত্তাদের পপুলার সায়েন্স সম্বন্ধে অন্ততঃপক্ষে দেড়লক্ষ প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়েছিল। এতেই বোঝা যায় ও সব দেশের লোকের জানবার আগ্রহ কতখানি।

পরলোকে মহাত্মা এডিশন:—বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কর্ত্তা আমেরিকার বিজ্ঞানবিৎ এডিশন কিছুদিন আগে মারা গেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল চুরাশী বছর। মৃত্যুর কিছুদিন আগে থেকেই তিনি দেহে শক্তির অভাব বোধ কর্চ্ছিলেন বলে কর্ম্ম-জগৎ থেকে অবসর গ্রহণ করেছিলেন। তার পরেই তিনি অসুখে

পড়েন এবং কয়েক দিন মাত্র রোগ ভোগের পরই তাঁর মৃত্যু হয়। বর্ত্তমান সভ্য জগতের মানুষ যে সব সম্পদের অধিকারী তার অধিকাংশই তাঁর দান, সুতরাং তাঁর মৃত্যুতে সারা সভ্য জগৎ আপনাকে ক্ষতিগ্রস্ত মনে কচ্ছে। বর্ত্তমানে তাঁর স্থান পূরণ করবার মত দ্বিতীয় কেউ জগতে নেই।

অক্লান্তকর্ম্মা এডিশন ছিলেন জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী। তাঁর সুদীর্ঘ আশী বৎসরের জীবনে তিনি কত বিচিত্র ঘটনাপরম্পরার মধ্যে দিয়ে সহস্র বাধা অতিক্রম করতে করতে কেমন করে মানুষকে একটি একটি করে অসংখ্য অতুলনীয় সম্পদে বিভূষিত করেছেন তা ভাবলে শ্রদ্ধায় ও বিস্ময়ে নির্ব্বাক হয়ে যেতে হয়।

তিনি সবশুদ্ধ এক হাজারটিরও বেশী—তাঁর নতুন আবিষ্কৃত জিনিষ patent করিয়ে নিয়েছেন, পৃথিবীর আর কোন লোকই যা আজ পর্য্যন্ত পারে নি। প্রথম জীবনে তিনি একখানি Train এ সামান্য News Boy ছিলেন। কিন্তু তখন থেকেই তাঁর মধ্যে উচ্চাভিলাষ এবং চেষ্টা ছিল অসাধারণ। সেই ট্রেণের সংলগ্ন একখানি কামরায় তাঁর এক ল্যাবরেটারী বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার ছিল। সেখানে আবার তিনি একটী Press স্থাপন করেন। সেই Press থেকে Weekly Herald বলে একখানি কাগজ তিনি বার করতেন। এই কাগজের সংবাদসংগ্রহ থেকে আরম্ভ করে—তা ছেপে বিক্রী করা পর্য্যন্ত সমস্ত কাজ তিনি একা করতেন। তারপর তিনি নিজের চেষ্টায় ক্রমশঃ উন্নতি করেন। তাঁর ল্যাবোরেটারীতে বসেই তিনি Automatic Telegraph, Remington Typewriter প্রভৃতির সৃষ্টি করেন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ আজ থেকে ঠিক ৫৪ বছর আগে তিনি গ্রামোফোন আবিষ্কার করেন।

বিদ্যুতের শক্তিকে সর্ব্ব রকমে কাজে খাটানোর উপায় আবিষ্কার করে তিনি মানুষের মস্ত উপকার করেছেন। Incandescent Bulb আবিষ্কার করে তিনি ইলেক্ট্রিক লাইট জ্বালানো সম্ভবপর করে তুলেছেন। তাছাড়া current তৈরী, ইলেক্ট্রিক ব্যাটারী তৈরী প্রভৃতি কতরকমের আবিষ্কার যে তিনি করেছেন তার আর সংখ্যা নেই। গত মহাযুদ্ধের সময় তিনি এক torpedo আবিষ্কার করেন। তাছাড়া যুদ্ধ-জাহাজ, সাবমেরীন প্রভৃতিরও যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন। মৃত্যুর কিছু পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি নানা জনহিতকর ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিলেন। পরিশ্রম করতেন তিনি অসাধারণ। কাজের মধ্যেই ছিল তাঁর একমাত্র আনন্দ। পরিশ্রমের ওপর তার এতখানি বিশ্বাস ছিল যে তিনি বলতেন "প্রতিভা জিনিষটা আর কিছুই নয়, শতকরা একভাগ প্রেরণা আর ৯৯ ভাগ স্বেদ জলের সংমিশ্রণ যেখানেই হয়েছে সেখানেই পাওয়া যাবে প্রতিভার সন্ধান।"

চিত্রগুপ্ত

—

পুস্তক-পরিচয়

সন্ধানঃ—শ্রীবীরেন্দ্রকুমার দত্ত এম্‌-এ, বি এল্‌ প্রণীত। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

লেখক যে চিন্তাশীল পাঠক তাঁর এ বই পড়তে গিয়ে বারে বারে মনে জেগেছে। তাঁর গভীর জ্ঞানতৃষ্ণা দেখে আমাদের মনে আনন্দ সঞ্চার হয়। এবং এই জন্যে তাঁর লেখা আমাদের খুব ভাল লেগেছে।

একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হ'বে এই ধরণের বইয়ের পাঠকের সংখ্যা নেহায়েতই মুষ্টিমেয়। Amiel's Journals খুব বেশী লোকে পড়ে না তাতে দুঃখ করবার কিছুই নেই।

বর্ত্তমান আলোচ্য বইও অমিয়েলের বইএর মত, মনে হয় তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণে এ গ্রন্থ রচিত। সন্ধানের সঙ্গে জার্নালের পার্থক্য এই যে শ্রদ্ধেয় বীরেন্দ্রকুমার একটু উগ্র ও রুক্ষভাষায় তাঁর সমাজ ও ধর্ম্মের মূঢ়তাকে আক্রমণ করেছেন,—বহুদিনকার পচা সামাজিক বিধি বিধানের প্রতি রুদ্র দণ্ড নিক্ষেপ করেছেন। নারীর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি তাঁর লেখার অনেক জায়গায় স্ফূর্তিলাভ করেছে।

অনেক জায়গায় অনেক বিষয়ে সকলে গ্রন্থকারের সঙ্গে একমত হ'তে পারবেন না তবুও তাঁর মতামত অকুণ্ঠিত

চিত্তে শুনতে কোনই দ্বিধা করতে মন চাইবে না।
তাঁর বইখানা পড়ে পাঠক বিমল আনন্দলাভ করবেন।

গ্রন্থখানি বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করবে।

জরীন কলম

'কৃষ্ণকান্তের উইল'এ বঙ্কিমচন্দ্র—

মৌলভী একরামদ্দিন

সমালোচনার বই। ভূমিকায় লেখক জানাইয়াছেন, বহুদিন পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথের কবিতার সমালোচনা লিখিবা "অর্থলাভ না হইলেও খ্যাতিলাভ যথেষ্ট হইয়াছিল।" লেখকের নিজের যখন ধারণা তিনি যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করিয়াছেন তখন আমরা না হয় স্বীকার করিয়া লইলাম। "কৃষ্ণকান্তের উইল বি, এ পরীক্ষার পাঠ্য নির্দ্দিষ্ট হওয়ায়" আলোচ্য বইখানি লেখা হইয়াছে। সেবারের অলব্ধ বস্তুটি যদি ইহাতে লাভ হয় তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই, আপত্তি কেবল তাঁহার অনেকগুলি অযৌক্তিক কথায়—

"রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রপন্থী কোন কোন লেখক গদ্যসাহিত্যে শুধু কথ্যভাষা প্রচলিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন।" রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রপন্থীরা যে শুধুই কথ্যভাষা চালাইতে চান ইহা সত্য নহে।

"বিদ্যাসাগর মহাশয় ছিলেন পুরাতনপন্থী এবং বঙ্কিমচন্দ্র তখনকার নব্যপন্থী। উভয়ের মধ্যবর্ত্তী ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত।" ইহা স্বীকার্য্য নহে। বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার উভয়েই পুরাতনপন্থী, উভয়ের ভাষাই সংস্কৃতের অনুসরণ করিয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে বড় জোর এই পার্থক্য নিরূপণ করা যাইতে পারে যে অক্ষয়ের রচনারীতি অত্যন্ত logical কিন্তু বিদ্যাসাগরের কিঞ্চিৎ কাব্যগন্ধা। বঙ্কিমচন্দ্র সাধু ভাষার সহিত কথ্যভাষার সংমিশ্রণ করিয়া ভাষার প্রাঞ্জলতা সম্পাদন করেন। আলালী ভাষা এবং বিদ্যাসাগর-অক্ষয়ের ভাষার মধ্যগা বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা।

লেখকের অভিমত দেখিতেছি, বঙ্কিমের সৃষ্ট চরিত্রের তুলনায় "বর্ত্তমান ঔপন্যাসিকগণের চরিত্র তুচ্ছ ও নগণ্য।" কিন্তু অতিভক্তির আবেগে অবান্তর বিষয়ে ফাঁপাইয়া লিখিলে তাহাকে আর যাই হোক সমালোচনা বলা চলে না।

অন্যবিধ ভুলেরও অসদ্ভাব নাই। Wordsworthএর ৫ লাইন তুলিতে গিয়া অন্ততঃ ৫টা ভুল হইয়াছে এবং এমন দাঁড়াইয়াছে যে মানে হয় না।

কিন্তু এই সূচনা অংশ বাদ দিয়া কৃষ্ণকান্তের উইলের চরিত্র-বিশ্লেষণে লেখকের কৃতিত্বের পরিচয় পাইলাম এবং তাহাতে "পাঠার্থীদের উপকার হইবে" বলিয়া বিশ্বাস করি।

শ্রীমনোজ বসু

শয়তানের সুমতি—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় এম্-এ প্রণীত। মূল্য বারো আনা। প্রকাশক—আশুতোষ লাইব্রেরী, ৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

এই শিশুপাঠ্য ক্ষুদ্র উপন্যাসটি শিশু-চিত্তকে মুগ্ধ করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। শিশু-সাহিত্য যখন শিশুগণকে আনন্দ দান করিবার সহিত তাহাদের কল্পনা-বৃত্তিকেও প্রবুদ্ধ করে তখনই বুঝিতে হইবে তাহা সর্ব্বতোভাবে সার্থক হইয়াছে। শিশুদিগকে জ্ঞানদান করিবার প্রধান উপায় হইতেছে তাহাদের মনে কৌতূহলপরায়ণতা, সহানুভূতি, চিন্তাশীলতা প্রভৃতি বৃত্তিগুলি জাগাইয়া তোলা। শিশু-চিত্তের সেই বাতায়নগুলি উন্মুক্ত হইলে জ্ঞানের রশ্মি সহজেই প্রবেশ-পথ পায়। জ্ঞানেন্দ্রবাবুর রচনায় সেই গুণটি আছে—ইহা আমরা পূর্ব্বেও লক্ষ্য করিয়াছি।

উপন্যাসখানি সচিত্র,—সুতরাং সে দিক দিয়াও শিশু-চিত্তকে আকৃষ্ট করিবে।

স্নেহের-দাবী—শ্রীনিধিরাজ হালদার প্রণীত। মূল্য এক টাকা চার আনা। প্রকাশক—বিপুল সাহিত্য ভবন; ১০।এ, ফকির হালদার লেন, কালীঘাট, কলিকাতা।

এখানি একটি উপন্যাসের বই। গ্রন্থ-সূচনায় প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত জলধর সেন বলিয়াছেন, "আমি এই উপন্যাসখানি পাঠ করিয়া নবীন লেখকের প্রশংসা করিতেছি এবং আমার মনে হয় পাঠক-পাঠিকাগণও আমার সহিত একমত হইবেন।"

সাহিত্যক্ষেত্রে গ্রন্থকার যে নবীন তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা যতদূর অবগত আছি, এই উপন্যাসখানিই তাঁহার প্রথম উপন্যাস, সুতরাং টেক্‌নিকের দিক দিয়া উপন্যাসখানিতে কয়েকটি ত্রুটি-বিচ্যুতি চোখে পড়ে। নবীন লেখকেরা যদি তাঁহাদের রচনাগুলিকে কিছুদিন ফেলিয়া রাখিয়া পরে পরিশোধনে প্রবৃত্ত হন তাহা হইলে এই ধরণের ত্রুটিগুলা তাঁহারা নিজেরাই লক্ষ্য করিয়া সংশোধিত করিয়া লইতে পারেন। নিবিড়তর সাধনার দ্বারা নিধিরাজবাবু যে ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করিবেন—এ আশা আমরা করি।

বইখানির কাগজ ও বাঁধাই ভালো।

নানা কথা

সাময়িক সাহিত্য-আলোচনা

সাময়িক সাহিত্যের-আলোচনা করার প্রবৃত্তি সকল দেশেই আছে। সেটা যে ভালোই সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। মাসিক, ত্রৈমাসিক, সাপ্তাহিক কিম্বা পাক্ষিক পত্রিকাগুলির পাতায় পাতায় অবিশ্রান্ত যে সব সাহিত্য রস বিতরণ করা হয়, তার মধ্যে কোন্‌গুলি গ্রহণীয়, কোন্‌গুলি বর্জ্জনীয়,—তার নিরপেক্ষ আলোচনা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন। কোনো বিশেষ যুগে দেশের আব্‌হাওয়ার মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভাবনাগুলো কাব্যে ও কথা শিল্পে রূপ গ্রহণ করবার জন্য যে প্রতিভাকে আশ্রয় করে,—দু' একজন অসাধারণ প্রতিভাবান শিল্পীর কথা বাদ দিলে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেই প্রতিভা বিকশিত ও পরিপুষ্ট হ'য়ে নিজের পথটি ঠিক বেছে নেবার জন্য এই সমস্ত আলোচনার আলোক-সম্পাত ও রস-সিঞ্চনের অপেক্ষা রাখে।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের দেশে আজকাল এই সাময়িক সাহিত্যের আলোচনাটা যে ধরণে ও যে ধারায় করা হয়,—তাতে করে সেটা তার এই মহৎ উদ্দেশ্য-সাধনের পক্ষে একেবারেই নিরর্থক হ'য়ে যায়। সেটা যেন নিতান্তই আমরা যাকে অবজ্ঞাভরে বলি "পরচর্চ্চা,"—তাইতে এসে দাঁড়িয়েছে। "পরচর্চ্চা" জিনিষটা কিন্তু আসলে খারাপ নয়; পরের 'চর্চ্চার' ভিতর দিয়েই আমরা 'আপনা'র বাইরে এসে পরের মধ্যে নিজেরই বৃহত্তর ঐক্যের অনুসন্ধান করি। কিন্তু এই 'পরচর্চ্চা' প্রবৃত্তির অপব্যবহার করলে সেটা মানুষের যে কতখানি নিন্দনীয় অভিব্যক্তিতে পরিণত হ'তে পারে,—তা' আমাদের সকলেরই জানা আছে, বিশদ ক'রে দেখানোর প্রয়োজন নেই। এই পরচর্চ্চার ব্যবসায়ে বিশেষ করে ধরা পড়েছেন অন্তঃপুর-বাসিনী মেয়েরা; কিন্তু সাহিত্যের নাম দিয়ে মুদ্রাযন্ত্র সহযোগে সাধারণতঃ যে আলোচনা হ'য়ে থাকে, সেটা অন্তঃপুরের নিঃশব্দ নথ-নাড়া ও চুড়ির কিঙ্কিনী সহযোগে আলোচনার চেয়ে কম নিন্দনীয় নয়। দুটিই একজাতীয়,—দু'য়েতেই আছে,—বেঁচে থাকার একটা অভিব্যক্তি,—দু'য়ের মধ্যেই আছে সেই বেঁচে-থাকাটাকে সুন্দর ও আনন্দময় করে তোলবার শক্তির অভাব। এই শক্তির যখন অভাব পড়ে, তখন বেঁচে থাকার স্ফুরণ হয় গ্লানি জনক পরচর্চ্চার মধ্যে, এবং ঔদ্ধত্যের আবরণে দৈন্যকে হয় ঢাকা।

কিন্তু এজন্য দুঃখ করে লাভ নেই। জীবন যতদিন আছে, ততদিন জীবনে শুধুই সম্ভোগ নয়, গ্লানিও থাক্‌বে, শুধু প্রাচুর্য্য নয় অভাবও থাক্‌বে,—শুধুই তৃপ্তি নয়, অতৃপ্তিও থাক্‌বে। জীবনে আমরা ভালোও বাসি, মন্দও বাসি, ক্ষমাও করি, সাজাও দিই, ঝগড়াও করি, ভাবও করি; সর্ব্বত্রই বিরুদ্ধ বৃত্তির দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে জীবনের বিকাশ। এই সমস্ত বিরুদ্ধ বৃত্তির দ্বারা প্রণোদিত হ'য়েই তার সমস্ত কর্ম্ম-প্রচেষ্টার দ্বারা মানুষ যুগে যুগে যা' গড়ে তুল্‌ছে,—তারই নাম সভ্যতা (civilisation)। আর যুগে যুগে মানুষের সাহিত্য ও শিল্পই তার এই সভ্যতাকে অমরতা দান করে। সাহিত্যে মানুষ তার গোপনতম সত্তাটিকে অনুসন্ধান করে বাইরে ফুটিয়ে তুল্‌তে চায়; এইখানে তার জীবনের একদিকের বিকাশ আনন্দে অন্যদিকের বিকাশ বেদনায়। এই আনন্দ-বেদনার দোলায় সে হ'য়ে ওঠে সৃষ্টি-কর্ত্তা,—তার ক্ষুদ্রত্বকে অতিক্রম করে মহীয়ানের স্পর্শলাভ করে। তাই সমালোচনার মুখোস প'রে এই সাহিত্যকে যখন টেনে আনা হয় জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে, জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃত্তিগুলির চরিতার্থতার জন্য, তখনই সেটা ক্ষোভের কারণ হ'য়ে ওঠে।

আজকাল আমাদের দেশে, কোথা থেকে রস পেয়ে জানি না,—বন্য আগাছার মত নিত্যই এক একটা সাময়িক-

পত্রিকা গজিয়ে উঠে সাময়িক সাহিত্যের যে-সব আলোচনা করে থাকে সে-সব আলোচনা আর যা-ই হোক্ না কেন,—সাহিত্য-আলোচনা নয়। কিন্তু তাতে কারো কোনো ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই; তার কারণ, সেই সব পত্রিকার পাঠক-সংখ্যা তাদের লেখক-সংখ্যার মতই পরিমিত; তাদের পরিসর অন্তঃপুরের পরিসরের চেয়ে প্রশস্ততর নয়। তাই তাদের অসার আলোচনাগুলোকে সাধারণ জীবনেরই অন্যতম অভিব্যক্তি বলে ধরা যেতে পারে; জীবনে মহীয়ানের স্পর্শ লাভ করবার জন্য সাহিত্য-ক্ষেত্রে মানুষের যে চেষ্টা, তার মধ্যে সেগুলো পড়ে না।

কিন্তু যাঁদের মধ্যে উচ্চ অঙ্গের সাহিত্য-আলোচনার ক্ষমতা আছে তাঁরা যখন সমালোচনার উচ্চ আদর্শ থেকে নেমে আসেন, তখন একটু প্রতিবাদ করার প্রয়োজন হ'য়ে পড়ে। 'শনিবারের চিঠি'র লেখকদের মধ্যে শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়; কিন্তু সেই শক্তির অপব্যবহার করলে কোনো লাভ হয় না, এ কথা বলাই বাহুল্য। বৃথা আন্দোলনের ফলে কেবল গ্লা'নরই সৃষ্টি হয়, সেই গ্লানিতে মানুষের স্বচ্ছ দৃষ্টি ব্যাহত হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আশ্বিনের 'বিচিত্রা'য় শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী যে 'রবীন্দ্র-জয়ন্তী' লিখেছিলেন,—তা' পড়ে, দেখ্লাম, 'শনিবারের চিঠি' ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠেছেন। প্রমথ বাবু লিখেছিলেন, "বাংলায় যদি রবীন্দ্রনাথ আবির্ভূত না হ'তেন ত আজকের দিনে বাংলায় সাহিত্য বলে কোনো জিনিষ থাক্‌ত না, যেমন ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশে নেই"। এ উক্তির যে অর্থ,—তার প্রতি, উক্তিটির শেষের দিকে বেশ স্পষ্টই ইঙ্গিত আছে,—**"যেমন ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশে নেই"**। অর্থাৎ বাংলার যে-সাহিত্য আজ বিশ্ব-সাহিত্যের আসরে তার আসনটি সগৌরবে দাবী করছে, রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব না হ'লে সে-সাহিত্যের সৃষ্টি এত শীঘ্র সম্ভব হ'ত না,—যেমন ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশে সম্ভব হয় নি। এ কথা কে অস্বীকার করতে পারে? এর মধ্যে বঙ্কিম মাইকেল প্রভৃতি সাহিত্য-রথীগণের প্রতি অশ্রদ্ধার ক্ষীণতম ইঙ্গিতটুকুও ত পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথই বাংলা-সাহিত্যের আদি-পুরুষ, প্রমথবাবু নাকি বড় গলায় এই কথা ঘোষণা করেছেন। এমন কোনো ঘোষণা আমাদের কানে ত পৌঁছল না। এ ঘোষণা প্রমথবাবু কবে কোথায় করলেন? বিংশ শতাব্দীতে কেউ কোনো সভ্যজাতির সাহিত্যের আদি পুরুষ হ'তে পারেন কি? যে-কথা প্রমথবাবু কখনো বলেন নি বা বল্‌তে চান্ নি, সেই কথা তাঁর মুখে বিনা কারণে আরোপ করে কটূক্তি করাটা নিতান্তই গায়ে পড়ে ঝগড়া করা নয় কি? কোনো রচনার প্রতিপাদ্য সারবস্তুটির প্রতি লক্ষ্য না রেখে, তার spiritটিকে সম্পূর্ণ অবহেলা করে, তার প্রতি কথাটির ইচ্ছামত অভিধানগত অর্থ করে নিতে চান যে সব সমালোচক, তাঁদের কটূক্তি থেকে বোধ হয় কোনো লেখকই নিষ্কৃতি পেতে পারেন না, তাঁদের কৃপাদৃষ্টির ওপর ভরসা না করে। এ ধরণের আলোচনার সাহিত্য-জগতে কোনো মূল্যই নেই।

'শনিবারের চিঠি'র সমস্ত আলোচনাই যে এই রকম তা' আমরা বল্‌তে চাই না। আমাদের বক্তব্য এই যে এই রকম গায়ে পড়ে ঝগড়া করার প্রবৃত্তিটা যদি 'শনিবারের চিঠি' জয় করতে পারেন, তবেই সাহিত্য-জগতে তার আলোচনার মূল্য থাকবে।

* * *

এ কথা স্বীকার করি আমাদের বর্তমান সাহিত্যের ক্ষেত্রে সমালোচনার কাজটা তেমন প্রীতিকর হ'তেই পারে না। এমন সমস্ত জিনিষ সরবরাহ হ'চ্ছে, যার প্রতি তীব্র কশাঘাত না করে উপায় নেই। কিন্তু ঠিক সেইজন্যই আমাদের সমালোচনার আদর্শটা অতি উচ্চ স্তরে রাখা প্রয়োজন। বিরুদ্ধ সমালোচনা করতে হ'লেও যদি কোনো লেখার কোনো একটা গুণও থাকে, ত তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত; সেই একটা গুণের চর্চ্চাতেই সহস্র দোষের নিবারণ সম্ভব হ'তে পারে। তাছাড়া বিরুদ্ধ সমালোচনা করতে হ'লেই যে অশিষ্ট ও রূঢ় ভাষা ব্যবহার করতে হ'বে, তারও কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। কোনো কোনো সময়ে ব্যঙ্গ করাটা বিরুদ্ধ সমালোচনার একটা প্রকৃষ্ট উপায় বটে, কিন্তু সেই ব্যঙ্গের মধ্যে প্রচ্ছন্ন দরদ ও বেদনা থাকা চাই,—যেমন ছিল দ্বিজেন্দ্রলালের 'হাসির গানে'।

প্রশংসা করে কোনো বইয়ের সমালোচনা করা সহজ। নিন্দা করে সমালোচনা করতে হ'লেই মুস্কিল। কোনো লেখক যদি এমন কোনো বই লেখেন সাহিত্যে যার স্থান হ'তে পারে না, তবে সাহিত্যিক হিসাবে তাঁর যতই অপরাধ হো'ক না কেন, মানুষ হিসাবে তাঁর কোনোই অপরাধ হয় নি। তাঁর লেখার বিরুদ্ধ-সমালোচনার মধ্যে মানুষের সঙ্গে মানুষের সহজ সম্বন্ধটা যদি বাধাপ্রাপ্ত হয় তবে সেটা সমালোচকের অক্ষমতাই বলতে হ'বে। সমালোচনার একমাত্র উদ্দেশ্য হ'চ্ছে,—সাহিত্যে যা-কিছু শ্রেষ্ঠ ও যা-কিছু নিকৃষ্ট তারই একটা সহজ-বোধ সাধারণ পাঠকের মনে জাগিয়ে তোলা; একটা সাহিত্যিক মূল্য-বোধ এমন ভাবে গড়ে তোলা, যাতে করে, যা-কিছু নিকৃষ্ট, সাহিত্যে তার কোনো স্থান হওয়া অসম্ভব হ'য়ে পড়ে।

বিরুদ্ধ সমালোচনা-পদ্ধতির একটা আদর্শ পেলাম, কার্ত্তিক সংখ্যা 'পরিচয়ে' শ্রীযুক্ত জগদীশ গুপ্তের 'লঘু-গুরু' বই খানির রবীন্দ্রনাথ যে-সমালোচনা করেছেন তারই মধ্যে। 'লঘু-গুরু' বই খানি আমরা পড়ি নি,—কিন্তু সমালোচনাটা পড়ে বইখানির যে পরিচয় পেলাম, সেইটুকুই যথেষ্ট,—ও-বই পড়বার আর প্রয়োজনও নেই। তাই বলে লেখকের রচনা-নৈপুণ্য যে আছে সেকথা রবীন্দ্রনাথ অস্বীকার করেন নি। শুধু বলেছেন, "রিয়ালিজ্‌মের পালা সস্তায় জমাবার প্রলোভন" তাঁকে ত্যাগ করতে হ'বে। এ-সমালোচনায়, বইখানি ভালো নয়,—এই টুকুই যে শুধু বুঝ্‌লাম তা নয়, সাহিত্যে কোন্‌টা ভালো ও কোন্‌টা মন্দ তারও একটা ধারণা মনের মধ্যে আকার গ্রহণ করল। একটা কথাতেই বুঝ্‌তে পারলাম যে সাহিত্যে idealistic ও realistic এই দুটি শ্রেণীর পার্থক্য নিয়ে যে মারামারি করা হয়, একের নিয়ম অন্যে খাটে না, ইত্যাদি যে অসংখ্য বাদানুবাদ করা হয়,—তা একেবারেই নিরর্থক, কেবলই সমালোচনার স্বচ্ছ দৃষ্টিকে আড়াল করে রাখে। "কোনটারই জাতিগত বিশেষ মর্য্যাদা নেই। সাহিত্যে সম্মানের অধিকার বহি-র্নির্দ্দিষ্ট শ্রেণী নিয়ে নয়, অন্তর্নিহিত চরিত্র নিয়ে।… চন্দনের তিলক যখন চল্‌তি ছিল তখন অধিকাংশ লেখা চন্দনেরি তিলকধারী হ'য়ে সাহিত্যে মান পেতে চাইত। পঙ্কের তিলকই যদি সাহিত্যসমাজে চল্‌তি হ'য়ে ওঠে তাহ'লে পঙ্কের বাজারও দেখ্‌তে দেখ্‌তে চড়ে যায়। বঙ্গবিভাগের সময় দেশী চিনির চাহিদা বেড়ে উঠ্‌ল। ব্যবসায়ীরা বুঝে নিলে বিদেশী চিনিকে মাটি মিশিয়ে দেশী করা সহজ।… সাহিত্যেও মাটি মেশালেই রিয়ালিজ্‌মের রং ধরবে, এই সহজ কৌশল বুঝে নিতে বিলম্ব হয় নি।" রিয়ালিজ্‌মের দোহাই দিয়ে কল্পনাকে অলস রেখে শস্তা সাহিত্যের ব্যবসা চালালে সাহিত্যের প্রকৃত ক্ষতি হ'বে—এই কথাটিই রবীন্দ্রনাথ পরিষ্কার করে এই সমালোচনাটিতে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

* * *

সাহিত্য-প্রতিভাকে যে-দিকে পরিচালনা করবার ইঙ্গিত এই সমালোচনাটিতে আছে,—আমাদের তরুণ লেখকেরা তাঁদের প্রতিভাকে সেই দিকে চালনা করবেন কি? অরিজিন্যালিটির স্পৃহা, চমক লাগাবার মোহ,—বাইরে থেকে এই সমস্ত জিনিষের আমদানি করলে সাহিত্যের প্রকৃত ক্ষতি করা হ'বে। অরিজিন্যালিটি যদি থাকে, সেটা ফোটাবার জন্য কোনো প্রয়াসের প্রয়োজন হয় না; বরং সচেতন ভাবে এই দিকে কোনো চেষ্টা করলেই যেটা ফুটে ওঠে, সেটা আর যাই হো'ক না কেন, অরিজিন্যালিটি নয়। কল্পনার অবাধ বিস্তার,—সাহিত্য-প্রতিভা যাঁর আছে,—তাঁর এইটেরই চর্চ্চা করা প্রয়োজন। সৃষ্টি-শক্তির স্ফুরণ হয় সুন্দরকে ফুটিয়ে তোলার কাজে, কুৎসিৎকে নয়। জীবনে অনেক কিছু কদর্য্যতা চারদিকেই ছড়ানো আছে; সেই গুলোকে কুড়িয়ে আন্‌লেই সাহিত্য হয় না। কুৎসিৎকে যদি সাহিত্যের উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করতে হয়, তবে বেদনা দিয়ে তাকে সুন্দরের পটভূমিতে তুলে ধরতে হবে; আঘাত দিয়ে আমাদের সৌন্দর্য্যের উপলব্ধিকে সুস্পষ্ট করা,—এ ছাড়া কুৎসিতের অস্তিত্বের অন্য কোনো সার্থকতা নেই।

* * * *

এই সব কথা ভাবলে যে-সত্যটাকে ঠেকানো যায় না সেটা হ'চ্ছে এই যে য়ুরোপের সাহিত্য বাংলার তরুণ মনকে যে খাদ্য জুগিয়েছে, সে খাদ্য বোধ হয় এখনো

ভালো রকম পরিপাক হয় নি। তাই সে মন এখন যে-সাহিত্যে আত্ম-প্রকাশ করছে, তার মধ্যে সৃষ্টির সহজ আনন্দের চেয়ে উগ্রতা ও মাদকতাই বেশী করে চোখে পড়ে। মনে পড়ে সবুজ-পত্রের সেই প্রথম যুগের কথা,—যখন রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণায় প্রমথ চৌধুরীর নেতৃত্বে বাংলার তরুণ মন আত্মপ্রকাশের জন্য একটা নতুন ও সহজ পথ আবিষ্কার করেছিল। বাংলা ভাষার সেই নতুন ভঙ্গির প্রবর্ত্তনায় বাঙালী প্রতিভার যে স্ফুরণ হ'য়েছিল তা যেমনি সতেজ তেমনি তাজা। সেই "প্রামথী" ভাষা বাংলা সাহিত্যে আসন গেড়ে বসবার জন্যই এসেছে,—নড়বার নামটি করে না,—তার বিরুদ্ধে যতই আন্দোলন করা হোক না কেন। ভাব-প্রকাশের জন্য এমন জড়তা-বিহীন, সহজ, সতেজ, স্ফূর্ত্তিবান মিডিয়ম বাঙালী এ যুগে আর কোথায় পাবে? আজকালকার তরুণ-সাহিত্যিকেরা, রিয়ালিজমের ধূঁয়া ছেড়ে দিয়ে, অবিজিন্যালিটি চমক-লাগানো প্রভৃতির মোহ-পাশ কাটিয়ে উঠে, সকল রকম গ্লানি ও মাদকতা থেকে মনকে মুক্ত করে নিয়ে,—এই সহজ, সতেজ ভাষার আশ্রয় নিয়ে আত্ম প্রকাশ করবার চেষ্টা করবেন কি? নতুন ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'পরিচয়' মুনফার দিকে কোনো লক্ষ্য না রেখে শুধুই সৎ-সাহিত্য-প্রচারের জন্য যখন সাহিত্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ'ল তখন এই দিকে আমাদের মনে কিছু আশার সঞ্চার হ'য়েছিল। কার্ত্তিক সংখ্যা 'পরিচয়ে' গৌরবের বস্তু আছেও কিছু,—কিন্তু সে সবটুকুর জন্যেই সবুজ-পত্রের সেই লেখকদের নিকট ঋণ স্বীকার না করে উপায় নেই।

শ্রীযুক্ত ভবানী ভট্টাচার্য্য

বিচিত্রার পাঠকবর্গের নিকট শ্রীযুক্ত ভবানী ভট্টাচার্য্যের নাম অপরিচিত নয়। তাঁর অনেকগুলি প্রবন্ধ বিচিত্রায় মাঝে মাঝে প্রকাশিত হয়েছে।

ভবানীবাবু একজন প্রতিভাবান লেখক,—কিন্তু সে শুধু বাঙলা ভাষাতেই নয়, ইংরাজি ভাষাতেও। তাঁর লিখিত ইংরাজী প্রবন্ধ বিলাতের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ মাসিক পত্রে উচ্চ প্রশংসিত হয়েছে। Empire Review-এ তাঁর লিখিত গল্পের, Manchester Guardian-এ শব্দ-চিত্রের, Spectator-এ আলোচনার যথেষ্ট খ্যাতি হয়েছে। বিলাতের কোন সুবিখ্যাত প্রকাশক কর্তৃক ভবানীবাবুর ইংরাজিতে অনূদিত রবীন্দ্রনাথের "লিপিকা" শীঘ্রই প্রকাশিত হবে।



শ্রীযুক্ত ভবানী ভট্টাচার্য্য

বাঙলা দেশে ইংরাজি শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হবার পর কিছুদিন পর্য্যন্ত দেশের উচ্চ শিক্ষিত লোকদের মধ্যে ইংরাজি ভাষায় গ্রন্থ রচনার রীতি প্রচলিত ছিল। উদাহরণ স্বরূপ রসিককৃষ্ণ মল্লিক, গোবিন্দচন্দ্র দত্ত, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, রাজনারায়ণ দত্ত, শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শশীচন্দ্র দত্ত, নবকৃষ্ণ ঘোষ, মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। পরবর্ত্তী যুগে এ রীতি ক্রমশঃ কমে এলেও তরু দত্ত, অরু দত্ত, মনোমোহন ঘোষ প্রভৃতি কয়েক জনের নাম উল্লেখ করা চলে। বর্ত্তমানকালে ইংরাজি ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টির দ্বারা যাঁরা খ্যাতি অর্জ্জন করেছেন তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ শীর্ষস্থানীয়

—তৎপরে সরোজনী নাইডু, হরীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকজন আছেন। সম্ভবতঃ বাঙলা ভাষার সম্পদ এবং শক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাঙলা ভাষা অনুশীলনের দিকে দেশের শিক্ষিত লোকের মন ফিরেছে এবং সেই কারণেই ইংরাজি ভাষায় সাহিত্য সেবার আগ্রহ কমে গেছে। তা ছাড়া অভিজ্ঞতায় এটাও বোধ হয় দেখা গিয়েছিল যে, ইংরাজি ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টির দ্বারা ইংরাজি সাহিত্যে স্থায়ী স্থান পাওয়া বাঙ্গালীর পক্ষে সুকঠিন ব্যাপার, সুতরাং ইংরাজি ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টির বিশেষ কোনো সার্থকতা নেই। কথাটা অনেকাংশে সত্য হলেও—বাঙ্গালীর পক্ষে ইংরাজি সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভের কোনো সম্ভাবনাই যে নেই, এবং সে দিকে সাধনা অসমীচীন, একথা বলা চলে না। ভবানীবাবু সেই দিকে মনোনিবেশ করেছেন এবং আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হয়েছি যে তাঁর রচিত একটি ইংরাজী উপন্যাস বিলাতের খ্যাতনামা সাহিত্যিকগণ কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত হয়েছে। উপন্যাসখানি লণ্ডনের কোনো প্রসিদ্ধ প্রকাশকের দ্বারা শীঘ্রই প্রকাশিত হবে। ভবানীবাবুর ইংরাজী সাহিত্য সৃষ্টির সাধনা সিদ্ধি লাভ করলে আমরা আনন্দিত হব।

ভবানীবাবুর বয়স মাত্র ২৪ বৎসর। তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স গ্র্যাজুয়েট—ইতিহাসে। কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি দেশে ফিরেছিলেন—পুনরায় বিলাত গিয়েছেন, সেখান থেকে Doctor of Philosophy হ'য়ে দেশে প্রত্যাগমন করবেন।

আমরা ভবানীবাবুর মঙ্গল কামনা করি।

শ্রীযুক্ত নবগোপাল দাশ

বর্ত্তমান বৎসরে লণ্ডনের ইণ্ডিয়ান্ সিভিল সার্ভিস্ পরীক্ষায় শ্রীযুক্ত নবগোপাল দাশ ভারতীয় পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। শ্রীযুক্ত নবগোপাল কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রতিভাবান ছাত্র। ১৯২৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় তিনি প্রথম হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই, এস্-সি পরীক্ষায় তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন এবং বি এ পরীক্ষায় ইকনমিক্সের অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান লাভ করেন। All India Essay Competition for the Viceroy's Medals পরীক্ষায় নবগোপাল Best



শ্রীযুক্ত নবগোপাল দাশ

man's Prize লাভ করেছেন। এ বিষয়ে বাঙ্গালী ছাত্রদের মধ্যে তিনিই প্রথম এবং এ পর্যান্ত অদ্বিতীয়। The League of Nations বিষয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনা লিখে,

তিনি ১৯২৯-৩০ সালের আরউইন্ সুবর্ণ পদক লাভ করেন।

শ্রীযুক্ত নবগোপাল দাশ সাহা সমাজের লোক। জাতি অথবা সমাজ যে উচ্চশিক্ষা লাভ বিষয়ের নিরূপক নয়—তিনি তার প্রমাণ। জন্মজাত বাধা অথবা সুযোগের কোনো কথা যদি না থাকে তা হ'লে তথাকথিত ব্রাহ্মণ এবং শূদ্রের পক্ষে জ্ঞানের পথ যে একই মাত্রায় সুগম অথবা দুর্গম সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

আমরা শ্রীযুক্ত নবগোপালের সমুজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি।

* * *

প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন

প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের পরিচালক সমিতি ও অভ্যর্থনা সমিতির কার্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র সিংহ সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি বিচিত্রায় প্রকাশার্থে পাঠিয়েচেন।

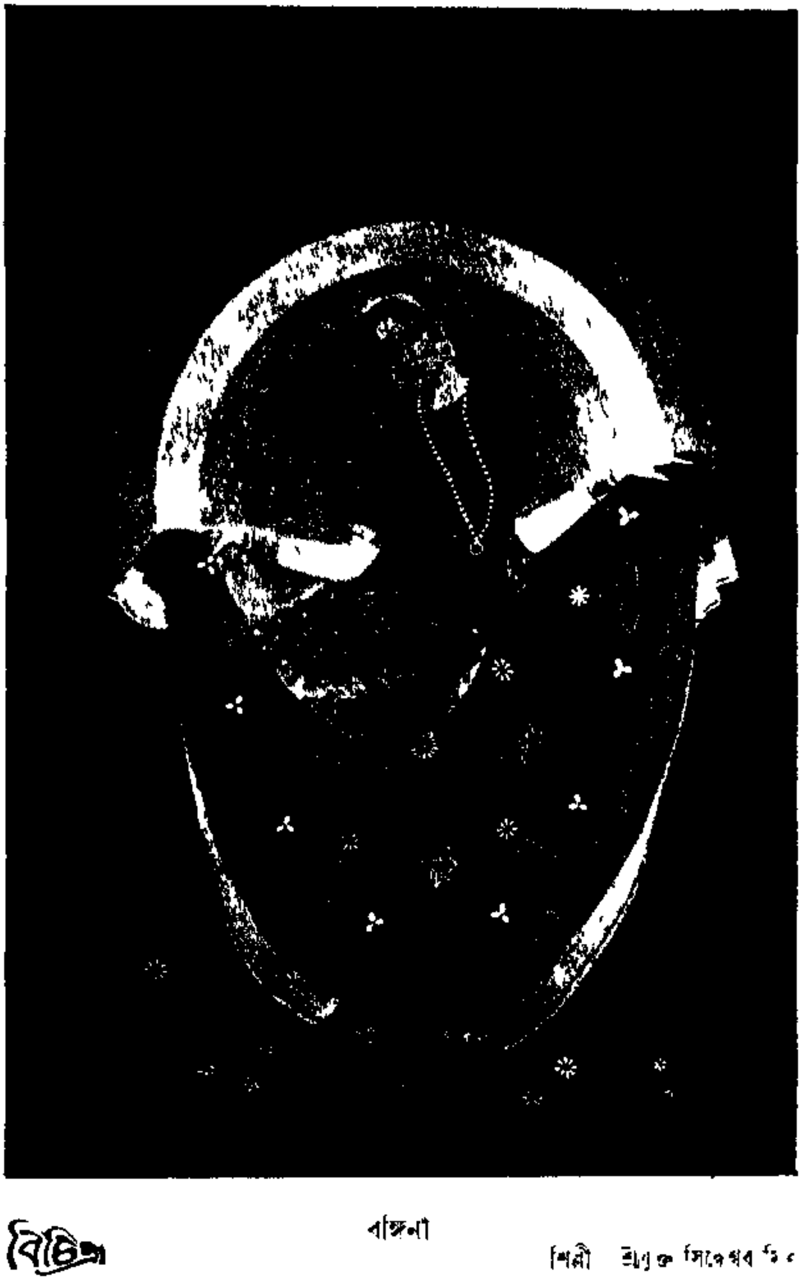
"প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের দশম অধিবেশন এই বৎসর বড়দিনের অবকাশে প্রয়াগে হইবে। মাননীয় বিচারপতি শ্রীলালগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।"

ত্রুটি স্বীকার

(১) কার্ত্তিক-সংখ্যায় যে শীত-উৎসবের ছবিগুলি প্রকাশিত হ'য়েছিল, সেগুলি শ্রীযুক্ত জে, কে স্যানিয়ালের সৌজন্যে পাওয়া গিয়েছিল,—এই কথাটির উল্লেখ করতে ভুল হ'য়ে গিয়েছিল।

(২) কার্ত্তিক-সংখ্যায় "আগুন নিয়ে খেলা" বইখানির যে-সমালোচনা বেরিয়েছিল, তা'তে প্রকাশকের নাম ভুল ছাপা হ'য়েছিল। ঐ বইখানির প্রকাশক D. M. Library,—M. C. Sarkar & Sons নয়।

Edited by Srijut Upendranath Ganguli. Printed by Srijut Sarat Chandra Mukherji at the Sreekrishna Printing Works 259, Upper Chitpur Road, Calcutta and published by the same from 149, Raja Dinendra Street, Calcutta.



বাঙ্গনা

শিল্পী শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর মিত্র

বিচিত্রা

পঞ্চম বর্ষ, ১ম খণ্ড	পৌষ, ১৩৩৮	৬ষ্ঠ সংখ্যা

নির্ভীক

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নবজাগরণ-চঞ্চল তব পাখা
নিভৃত নীড়ের কোণে সে কি র'বে ঢাকা ?
নিয়ে যাবে তা'র ওড়ার আবেগ সে যে,
বাতাসে উঠিবে হুঙ্কার তা'র বেজে,
দিবে সে ঝলকি' প্রভাত রবির তেজে
পালখে পালখে যে বর্ণ তা'র আঁকা ॥

উদ্দেশহীন দুর্গম কোনখানে
উড়াবে তোমারে দুঃসাহসের টানে ;
দিল আহ্বান অলস-নিদ্রানাশা
উষরকূলের শৈলমূলের বাসা,
[illegible] আলোকের ভাষা
[illegible] তোমার অন্তর আঘাত গানে ॥

সুনীল সলিলে ফেনিল ঊর্ম্মিরাশি,
উত্তাল বেগে উঠিবে সমুচ্ছ্বাসি।
পথিক ঝটিকা রুদ্রের অভিসারে
উধাও ছুটিবে সীমাসমুদ্রপারে,
উল্লোল কলগর্জ্জিত পারাবারে
পাখায় তোমার ধ্বনিবে অট্টহাসি॥

আপনি আপন নিত্য নিবিড় কারা,
তুমি উদ্দাম সেই বন্ধনহারা।
কোনো শঙ্কার কার্ম্মুক টঙ্কারে,
প্যারেনি তোমায় বিহ্বল করিবারে,
মৃত্যুর ছায়া ভেদিয়া তিমির পারে
নির্ভয়ে ধাও যেথা জ্বলে ধ্রুবতারা॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



বাংলা ছন্দ

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এতদিন নিরুদ্বেগে যারা আপন মনে ছন্দ গেঁথে চলেছিল আজ তাদের জবাবদিহির সময় এল। হঠাৎ দেখি বাংলা কবিতার ছন্দ নিয়ে তর্ক উঠেচে।

এই রকমই ঘটে থাকে। প্রথমে একদল আসে যারা নিজের গরজে রচনা ক'রে চলে, কিছুদিন বাদে তাদের রাস্তা বেয়ে আসে আর এক দল, তারা নিয়ম বের করতে লেগে যায়।

আজ সেই দিন এসেছে। অগ্রহায়ণের বিচিত্রা পত্রিকায় তারই লক্ষণ দেখা গেল। বাংলা কবিতায় ছন্দের স্বরূপ নির্ণয় উপলক্ষ্যে একজন অধুনাতন ছান্দসিক আধুনিক বাঙালী কবিদের কিছু ভর্ৎসনা করেচেন। তাঁর নালিশ ঠিক স্পষ্ট বুঝতে পারিনি। আইনের জটিল ভাষায় আসামীকে যখন অভিযুক্ত করা হয় তখন ভাবগতিক দেখে হতভাগার মুখ শুকিয়ে যায় কিন্তু বুঝতে পারে না নালিশের বিষয়টি কি। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্রের প্রবন্ধটি প'ড়ে আমার সেই রকম ধাঁধা লেগেচে।

ধাঁধা লাগবার কারণ আছে। আমার নিজের বিশ্বাস যে, আমরা ছন্দ রচনা করি স্বতই কানের ওজন রেখে, বাজারে প্রচলিত কোনো বাইরের মানদণ্ডের দ্বারা মেপে মেপে এ কাজ করি নে, অন্তত সজ্ঞানে নয়। অথচ উলটিয়ে প্রবোধচন্দ্র এই ব'লে আমাদের দোষ দিয়েছেন যে, আমরা একটা কৃত্রিম মানদণ্ড দিয়ে পাঠকের কানকে ফাঁকি দিয়ে তার চোখ ভুলিয়ে এসেছি আমরা ধ্বনি চুরি ক'রে থাকি অক্ষরের আড়ালে।

ছান্দোবিৎ কী বলচেন ভালো ক'রে বোঝবার চেষ্টা করা যাক। তাঁর প্রবন্ধে আমার লেখা থেকে কিছু লাইন তুলে চিহ্নিত ক'রে দৃষ্টান্ত স্বরূপে ব্যবহার করেচেন। যথা

উদয় দিগন্তে ঐ শুভ্র শঙ্খ বাজে।

মোর চিত্ত মাঝে,

চির-নূতনেরে দিল ডাক

পঁচিশে বৈশাখ।

তিনি বলেন, "এখানে দণ্ডচিহ্নিত যুগ্মধ্বনিগুলিকে এক ব'লে ধরা হয়েছে কারণ এগুলি শব্দের মধ্যে অবস্থিত, আর যোগচিহ্নিত যুগ্মধ্বনিগুলিকে দুই ব'লে ধরা হয়েচে, যেহেতু ঐগুলি শব্দের অন্তে অবস্থিত।" অর্থাৎ উদয়-এর অয় হয়েচে দুই মাত্রা অথচ দিগন্ত-এর অন্ হয়েচে একমাত্রা,—এইজন্যে

উদয় শব্দকেও তিন মাত্রা এবং দিগন্ত শব্দকেও তিন মাত্রা গণনা করা হয়েচে। "যুগ্মধ্বনি" শব্দটার পরিবর্ত্তে ইংরেজি সিলেব্‌ল শব্দ ব্যবহার করলে অনেকের পক্ষে সহজ হবে। আমি তাই করব।

বহুকাল পূর্ব্বে একদিন বাংলার শব্দ-তত্ত্ব আলোচনা করেছিলুম। সেই প্রসঙ্গে ধ্বনি-তত্ত্বের কথাও মনে উঠেছিল। তখন দেখেছিলুম বাংলায় স্বরবর্ণ যদিও সংস্কৃত বানানের হ্রস্বদীর্ঘতা মানে না তবু এ সম্বন্ধে তার নিজের একটি স্বকীয় নিয়ম আছে। সে হচ্চে বাংলায় হসন্ত শব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী স্বর দীর্ঘ হয়। যেমন জল, চাঁদ। এ দুটি শব্দের উচ্চারণে জ-এর অ এবং চাঁ-এর আ আমরা দীর্ঘ ক'রে টেনে পরবর্ত্তী হসন্তের ক্ষতিপূরণ ক'রে থাকি। জল এবং জলা, চাঁদ এবং চাঁদা শব্দের তুলনা করলে এ কথা ধরা পড়বে। এ সম্বন্ধে বাংলার বিখ্যাত ধ্বনিতত্ত্ববিৎ সুনীতিকুমারের বিধান নিলে নিশ্চয়ই তিনি আমার সমর্থন করবেন। বাংলায় ধ্বনির এই নিয়ম স্বাভাবিক ব'লেই আধুনিক বাঙালী কবি ও ততোধিক আধুনিক বাঙালী ছন্দোবিৎ জন্মাবার বহু পূর্ব্বেই বাংলা ছন্দে প্রাক্‌হসন্ত স্বরকে দুই মাত্রার পদবী দেওয়া হয়েচে। আজ পর্য্যন্ত কোনো বাঙালীর কানে ঠেকেনি—এই প্রথম দেখা গেল নিয়মের ধাঁধায় প'ড়ে বাঙালী পাঠক কানকে অবিশ্বাস করলেন। কবিতা লেখা সুরু করবার বহু-পূর্ব্বে সবে যখন দাঁত উঠেচে তখন পড়েচি "জল পড়ে, পাতা নড়ে।" এখানে "জল" যে "পাতার" চেয়ে মাত্রা-কৌলীন্যে কোনো অংশে কম এমন সংশয় কোনো বাঙালী শিশু বা তার পিতামাতার কানে বা মনেও উদয় হয়নি। এইজন্যে ঐ দুটো কথা অনায়াসে এক পংক্তিতে ব'সে গেচে, আইনের ঠেলা খায়নি। ইংরেজি মতে "জল" সর্ব্বত্রই এক সিলেব্‌ল, "পাতা" তার ডবল্ ভারী। কিন্তু জল শব্দটা ইংরেজি নয়। কাশীরাম নামের কাশী এবং রাম যে একই ওজনের এ কথাটা কাশীরামের স্বজাতীয় সকলকেই মানতেই হয়েচে। "উদয় দিগন্তে ঐ শুভ্র শঙ্খ বাজে" এই লাইনটা নিয়ে আজ পর্য্যন্ত প্রবোধচন্দ্র ছাড়া আর কোনো পাঠকের কিছুমাত্র খটকা লেগেছে ব'লে আমি জানিনে—কেননা তারা সবাই কান পেতে পড়েছে নিয়ম পেতে নয়। যদি কর্ত্তব্যবোধে নিতান্তই খটকা লাগা উচিত হয় তাহলে সমস্ত বাংলা কাব্যের পনেরো আনা লাইনের এখনি প্রুফ সংশোধন করতে বসতে হবে।

লেখক আমার একটা মস্ত ফাঁকি ধরেছেন। তিনি বলেন আমি ইচ্ছামত কোথাও "ঐ" লিখি কোথাও লিখি "ওই"—এই উপায়ে পাঠকের চোখ ভুলিয়ে অক্ষরের বাটখারার চাতুরীতে একই উচ্চারণকে জায়গা বুঝে দুই রকমের মূল্য দিয়েচি।

তাহলে গোড়াকার ইতিহাসটা বলি। তখনকার দিনে বাংলা কবিতায় এক একটি অক্ষর এক সিলেব্‌ল্ ব'লেই চলত। অথচ সেদিন কোনো কোনো ছন্দে যুগ্মধ্বনিকে দ্বৈমাত্রিক ব'লে গণ্য করার দরকার আছে ব'লে অনুভব করেছিলুম।

আকাশের ওই আলোর কাঁপন
নয়নেতে এই লাগে,
সেই মিলনের তড়িত তপন
নিখিলের রূপে জাগে।

আজকের দিনে এমন কথা অতি অর্ব্বাচীনকেও বলা অনাবশ্যক যে ঐ ত্রৈমাত্রিক ভূমিকার ছন্দকে নিচের মতো রূপান্তরিত করা অপরাধ,—

ঐ যে তপনের রশ্মির কম্পন
এই মস্তিষ্কেতে লাগে,
সেই সম্মিলনে বিদ্যুৎ ঝম্পন
বিশ্বমূর্ত্তি হয়ে জাগে।

অথচ সেদিন বৃত্রসংহারে এই জাতীয় ছন্দে হেমচন্দ্র ঐন্দ্রিলার রূপবর্ণনায় অসঙ্কোচে লিখতে পেরেছিলেন "বদনমণ্ডলে ভাসিছে ব্রীড়া"।

বেশ মনে আছে সেদিন স্থানবিশেষে "ঐ" শব্দের বানান নিয়ে আমাকে ভাবতে হয়েছিল। প্রবোধচন্দ্র নিশ্চয় বলবেন "ভেবে যা হয় একটা স্থির ক'রে ফেলাই ভালো ছিল। কোথাও বা "ঐ" কোথাও বা "ওই" বানান কেন ?" তার উত্তর এই, বাংলার স্বরের হ্রস্বদীর্ঘতা সংস্কৃতের মতো বাঁধা নিয়ম মানে না—ওর মধ্যে অতি সহজেই বিকল্প চলে। "ও—ই দেখ, খোকা ফাউণ্টেন পেন মুখে পুরেছে" এখানে দীর্ঘ ওকারে কেউ দোষ ধরবে না। আবার যদি বলি, "ঐ দেখ, ফাউণ্টেন পেন্‌টা খেয়ে ফেল্‌লে বুঝি" তখন হ্রস্ব ঐকার নিয়ে বচসা করবার লোক মিলবে না। বাংলা উচ্চারণে স্বরের ধ্বনিকে টান দিয়ে অতি সহজেই বাড়ানো কমানো যায় ব'লেই ছন্দে তার গৌরব বা লাঘব নিয়ে আজ পর্য্যন্ত দলাদলি হয়নি।

এ সব কথা দৃষ্টান্ত না দিলে স্পষ্ট হয় না, তাই দৃষ্টান্ত তৈরি করতে হোলো।

মনে পড়ে দুইজনে জুঁই তুলে বালো
নিরালায় বনছায় গেঁথেছিনু মালো।
দোঁহার তরুণ প্রাণ বেঁধে দিল গন্ধে
আলোয় আঁধারে মেশা নিভৃত আনন্দে।

এখানে "দুই" "জুঁই" আপন আপন উকারকে দীর্ঘ ক'রে দুই সিলেব্‌লের টিকিট পেয়েছে, কান তাদের সাধুতায় সন্দেহ করলে না, দ্বার ছেড়ে দিলে। উল্টো দৃষ্টান্ত দেখাই :—

এই যে এল সেই আমারি স্বপ্নে-দেখা রূপ,
কই দেউলে দেউটি দিলি, কই জ্বালালি ধূপ।
যায় যদিরে যাক্ না ফিরে চাইনে তারে রাখি
সব গেলেও হায়রে তবু স্বপ্ন রবে বাকি।

এখানে এই সেই কই যায় হায় প্রভৃতি শব্দ এক সিলেব্‌লের বেশি মান দাবী করলে না। বাঙালী পাঠক সেটাকে অন্যায় না মনে ক'রে সহজ ভাবেই নিলে।

কাঁধে মই, বলে, "কই ভুঁই চাঁপা গাছ।"
দই-ভাঁড়ে ছিপ ছাড়ে, খোঁজে কই মাছ।
ঘুঁটে ছাই মেখে লাউ রাঁধে ঝাউ পাতা,
কী খেতাব দেব তায় ঘুরে যায় মাথা॥

এখানে "মই" "কই" "ভুঁই" "দই" "ছাই" "লাউ" প্রভৃতি সকলেরই সমান দৈর্ঘ্য—যেন গ্র্যানেডিয়ারের সৈন্যদল। যে-পাঠক এটা প'ড়ে দুঃখ পান নি সেই পাঠককেই অনুরোধ করি, তিনি প'ড়ে দেখুন :—

দুইজনে জুঁই তুলতে যখন
গেলেম বনের ধারে,
সন্ধ্যা-আলোর মেঘের ঝালর
ঢাকল অন্ধকারে।
কুঞ্জে গোপন গন্ধ বাজায়
নিরুদ্দেশের বাঁশি,
দোঁহার নয়ন খুঁজে বেড়ায়
দোঁহার মুখের হাসি॥

এখানে যুগ্মধ্বনিগুলো এক সিলেব্‌লের চাকার গাড়িতে অনায়াসে ধেয়ে চলেচে। চণ্ডীদাসের গানে রাধিকা বলেচেন "কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো"—বাঁশিধ্বনির এই তো ঠিক পথ, নিয়মের ভিতর দিয়ে প্রবেশ করলে মরমে পৌঁছত না। কবিরাও সেই কান লক্ষ্য ক'রে চলেন, নিয়ম যদি চৌমাথার পাহারাওয়ালার মতো সিগ্‌ন্যাল তোলে তবু তাঁদের রুখতে পারে না।

আমার দুঃখ এই, তথাচ আইনবিৎ বল্‌চেন যে, লিপিপদ্ধতির দোষে "অক্ষর গুণে ছন্দ রচনার অন্ধ অভ্যাস" আমাদের পেয়ে বসেচে। আমার বক্তব্য এই যে, ছন্দ রচনার অভ্যাসটাই অন্ধ অভ্যাস। অন্ধের কান খুব সজাগ, ধ্বনির সঙ্কেতে সে চল্‌তে পারে,—কবিরও সেই দশা। তা যদি না হ'ত তা হলেই পায়ে পায়ে কবিকে চোখে চষমা এঁটে অক্ষর গণে গণে চলতে হ'ত।

"বৎসর" "উৎসব" প্রভৃতি খণ্ড ৎ-ওয়ালা কথাগুলোকে, আমরা ছন্দের মাপে বাড়াই কমাই,—এ রকম চাতুরী সম্ভব হয় যে-হেতু খণ্ড ৎকে কখনো আমরা চোখে দেখার সাক্ষ্যে এক অক্ষর ধরি আবার কখনো কানে শোনার দোহাই দিয়ে তাকে আধ অক্ষর ব'লে চালাই, প্রবন্ধলেখক এই অপবাদ দিয়েচেন। অভিযোগকারীর বোঝা উচিত এটা একেবারেই অসম্ভব, কেননা ছন্দের কাজ চোখ ভোলানো নয়, কানকে খুসি করা, সেই কানের জিনিষে ইঞ্চিগজের মাপ চলেই না। বৎসর প্রভৃতি শব্দ গেঞ্জি জামার মতো, মধুপুরের স্বাস্থ্যকর হাওয়ায় দেহ এক আধ ইঞ্চি বাড়লেও চলে আবার সহরে এসে এক আধ ইঞ্চি কমলেও সহজে খাপ খেয়ে যায়। কান যদি সম্মতি না দিত তা হলে কোনো কবির সাধ্য ছিল না ছন্দ নিয়ে যা খুসি তাই করতে পারে।

বৎসরে বৎসরে হাঁকে কালের গোমায়ু
যায় আয়ু, যায় আয়ু, যায় যায় আয়ু।

এখানে বৎসর তিনমাত্রা। কিন্তু সেতারে মীড় লাগাবার মতো অল্প একটু টান্‌লে বেসুর লাগে না। যথা—

সখাসনে উৎসবে বৎসর যায়
শেষে মরি বিরহের ক্ষুৎপিপাসায়।
ফাগুনের দিন শেষে মউমাছি ও যে
মধুহীন বনে বৃথা মাধবীরে খোঁজে॥

টান কমিয়ে দেওয়া যাক্,

উৎসবের রাত্রিশেষে মৃৎপ্রদীপ হায়
তারকার মৈত্রী ছেড়ে মৃত্তিকারে চায়।

দেখা যাচ্চে এটুকু কমি-বেশীতে মামলা চলে না, বাংলা ভাষার স্বভাবের মধ্যেই যথেষ্ট প্রশ্রয় আছে। যদি লেখা যেত

সখাসনে মহোৎসবে বৎসর যায় —

তা'হলে নিয়ম বাঁচত; কারণ পূর্ব্ববর্ত্তী ওকারের সঙ্গে খণ্ড ৎ মিলে একমাত্রা, কিন্তু কর্ণধার বলচে ঐখানটায় তরণী যেন একটু কাৎ হয়ে পড়ল। আমি এক জায়গায় লিখেছি "উদয়-দিক্‌প্রান্ততলে।"—ওটাকে বদ্‌লে "উদয়ের দিক্‌প্রান্ততলে" লিখলে কানে খারাপ শোনাত না একথা প্রবন্ধলেখক বলেচেন, শালিসির জন্যে কবিদের উপর বরাৎ দিলুম।

অপর পক্ষে দেখা যাক চোখ ভুলিয়ে ছন্দের দাবীতে ফাঁকি চালানো যায় কি না।

এখনই আসিলাম দ্বারে
অমনই ফিরে চলিলাম,
চোখও দেখেনি কভু তারে
কানই শুনিল তার নাম।

"তোমারি" "যখনি" শব্দগুলির ইকারকে বাংলা বানানে অনেক সময় বিচ্ছিন্ন ক'রে লেখা হয়, সেই সুযোগ অবলম্বন ক'রে কোনো অলস কবি ওগুলোকে চার মাত্রার কোঠায় বসিয়ে ছন্দ ভরাট করেচেন কি না জানিনে, যদি ক'রে থাকেন বাঙালী পাঠক তাঁকে শিরোপা দেবে না। ওদের উকিল তখন বৎসর উৎসব দিক্‌প্রান্ত প্রভৃতি শব্দগুলির নজির দেখিয়ে তর্ক করবে। তার একমাত্র উত্তর এই যে, কান যেটাকে মেনে

নিয়েচে কিম্বা মেনে নেয়নি চোখের সাক্ষ্য নিয়ে কিম্বা বাঁধা নিয়মের দোহাই দিয়ে সেখানে তর্ক তোলা অগ্রাহ্য। যে-কোন কবি উপরের ছড়াটাকে অনায়াসে বদল ক'রে লিখ্‌তে পারে,—

এখনি আসিনু তার দ্বারে
অমনি ফিরিয়া চলিলাম।
চোখেও দেখিনি কভু তারে
কানেই শুনেছি তার নাম।

বৎসর উৎসব প্রভৃতি শব্দ যদি তিন মাত্রার কোঠা পেরোতে গেলেই স্বভাবতই খুঁড়িয়ে পড়ত তা হলে তার স্বাভাবিক ওজন বাঁচিয়ে ছন্দ চালানো এতই দুঃসাধ্য হত না যে, ধ্বনিকে এড়িয়ে অক্ষর গণনার আশ্রয়ে শেষে মান বাঁচানো আবশ্যক হোতো। ওটা চলে ব'লেই চালানো হয়েছে, দায়ে পড়ে না। কেবল অক্ষর সাজিয়ে অচল রীতিকে ছন্দে চালানো যদি সম্ভব হোত তা হলে খোকাবাবুকে কেবল লম্বা টুপি পরিয়ে দাদামশায় ব'লে চালানো অসাধ্য হত না।

প্রবোধচন্দ্র আধুনিক বাঙালী কবিদের আর একটা চাতুরী ধরেচেন। তিনি বলেন, "আজকাল কবিরা 'হইতে' 'লইয়া' 'যাইবে' প্রভৃতি সাধুশব্দের যুগ্মধ্বনিটাকে বর্জন করার অভিপ্রায়ে হ'তে ল'য়ে যাবে প্রভৃতি সংক্ষিপ্ত চলতি রূপের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করে থাকেন।" যাঁরা আজকালকার কবি নন্ তাঁদের লেখা পরখ ক'রে দেখা যাক্—

"এ জনার মুখ আর দেখিতে না হবে।"
"দেশে না রব মুঞি যাব বারাইয়া।"
- চণ্ডীদাসের পদ।
"কে যাবে মথুরা দিকে যাব তার সনে।"
যদুনাথ দাস।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন।

হিয়ার মাঝারে থুই জুড়াব পরাণী।
নরোত্তম দাস।

অসম্ভব নয় যে, ঐ সব হবে, রব, যাব, নিতে, জুড়াব শব্দগুলি কীর্ত্তনীয়াদের মুখে মুখে ক্ষয় পেয়ে এসেচে—গোড়ায় ছিল, হৈবে, রৈব, যাইব, লইতে, জুড়াইব। কিন্তু এই পরিবর্ত্তন ষড়যন্ত্রমূলক নয়, ভাষার পরিণতিতে আপনি ঘটেচে। কবিরা যুগ্ম অযুগ্ম কোনো ধ্বনিকেই ভয় করেন না, সকলকে নিয়েই তাঁদের কারবার। অথচ সব আধুনিক কবিই যদি ভাষার কোনো বিশেষ ভঙ্গীকে পক্ষপাত দেখিয়ে থাকেন তা হলে মনে করা চলবে না যে তাঁরা সকলেই কোনো ফাঁকি চালাবার বা সঙ্কট এড়াবার মৎলবে এই উপায় ধের

করেচেন, ধ'রে নিতেই হবে, কানের কোনো জরুরি হুকুম অথবা ভাষার কোনো স্বতঃপরিণত ইঙ্গিত এর মধ্যে আছেই। প্রাচীন পদে একদা দেখেছি ভাঙ্গইতে গঢ়ইতে শব্দ, তারপরে দেখলুম ভাঙ্গিতে গড়িতে।

গড়ন ভাঙ্গিতে সখি আছে কত খল,
ভাঙ্গিয়া গঢ়িতে পারে সে বড় বিরল।

এটা যুগ্মধ্বনির তাড়া খেয়ে নয়। ভাষার অন্তর্নিহিত প্রবর্ত্তনা থেকেই এই ভাঙা গড়া ঘটল। আজো ঘটচে।

অব্যবসায়ী যদি এমন সন্দেহ করেন যে মাছের ব্যবসায়ী জলে নামবার ভয়েই ডাঙায় ব'সে ছিপ ফেলে চিতল মাছ ধরে, তবে তাঁকে বুঝিয়ে দেওয়া চাই এ ক্ষেত্রে ডাঙা থেকে মাছ ধরা সম্ভব ব'লেই এই নিয়মও সম্ভব হয়েচে। অব্যবসায়ী উত্তরে যদি বলেন, আচ্ছা তাই যদি হয় তবে ও লোকটা কেন কাদায় নেমে চিংড়ি মাছ ধরে?—কখনো জলে কখনো স্থলে এ তার কি রকম বিচার? তখন আবার বোঝাতে হবে ছিপ ফেলে চিংড়ি মাছ ধরার চেষ্টা না ক'রে জলে নামা সুবিধে ব'লেই জেলে জলে নামতে ভয় করে না। নইলে তার লোকসান হোত। যুগ্ম অযুগ্ম ধ্বনি নিয়েই কবিদের ব্যবসা, তাদের নিয়ে যখন যে ব্যবস্থাটা খাপ খায় কবিরা সেইটের দিকেই লক্ষ্য রাখেন নইলে তাঁদের ছন্দে লোকসান হয়।

লেখক আধুনিক কবিদের লক্ষ্য ক'রে বলেন "শব্দের মধ্যবর্ত্তী অসংযুক্ত হসন্ত বর্ণকে পরিহার করার চেষ্টায় তাঁরা করব করত প্রভৃতি চলতি রূপের পরিবর্ত্তে করিব ধরিব ইত্যাদি সাধুরূপেরই ব্যবহার করেন।"

লেখক আমার কথা বিশ্বাস না করতে পারেন কিন্তু আমি সমস্ত আধুনিক বাঙালী কবিকে সাক্ষী মেনে বলতে পারি যে কোনো বিশেষ চেষ্টা ক'রে আমরা এ কাজ করিনি। সাধুরূপের ছন্দে সাধুরূপের শব্দ ব্যবহার ওটা আমাদের পড়ে-পাওয়া সম্পত্তি। হতে লয়ে যাবে হবে এগুলোও পূর্ব্ব কবিদের সম্মত সাধুভাষার কবিতায় চ'লে গেছে, কোন্ শতাব্দী থেকে সে কথা পুরাতত্ত্ববিদগণ আলোচনা করবেন; কিন্তু আমি জানি আমারও জন্মের অনেক পূর্ব্ব থেকে। অর্থাৎ এক শতাব্দী তো হবেই। অতএব আধুনিক কবিরা আলিবাই' প্রমাণ দিতে পারেন। কর্‌ব, কর্‌ত, ধরব প্রভৃতি ক্রিয়াপদের নাম পূর্ব্ব প্রথানুসারে সাধুশব্দের তালিকায় ওঠেনি। সেই জন্যেই উভয় পর্য্যায়ের শব্দ পৃথক অধিকার ভুক্ত হয়ে পড়েচে। স্বীকার করি আমাদের সাহস নেই মেঘনাদবধের সংস্কার সাধনের উদ্দেশ্যে লিখি

সম্মুখ লড়াইয়ে পড়ে' বীরের সেরা বীর
বীরবাহু চলে যখন গেলেন যমের বাড়ী।

এ রকম ভাষায় কোনো দোষ নেই, কিন্তু যথাস্থানে। সাধুভাষার ঠাটের মধ্যে এটা চালানো যায় না।

স্নানের ঘাট থেকে উঠে বধূ এলোচুল পিঠে ছড়িয়ে রোদ পোহায়। সন্ধ্যাবেলায় নিমন্ত্রণে যাবার সময় সেই চুলই খোঁপা ক'রে বাঁধে। একই চুল নিয়ে দুরকম বিপরীত ব্যবহার। এটা সম্ভবই হোত না যদি সর্ব্বসাধারণে এই রকম প্রত্যাশা না করত। সংস্কৃত বাংলার ছন্দে "করিব", "ধরিব" লিখি, প্রাকৃত বাংলায় লিখি "কর্‌ব" "ধর্‌ব"—তা না করলে পাঠকদের হাতে লেখাগুলোর অপঘাত মৃত্যুর আশঙ্কা থাকত।

তা হ'লে তর্কটা একেবারে গোড়ায় গিয়ে ঠেকে—সাধুভাষা রাখা কেন। হয় তো একদিন থাক্‌বে না, কিন্তু যতদিন আছে, ওকে বেশ ভালোমতো কাজে লাগানো চলচে। মেয়েদের সাজসজ্জা অন্তত আমাদের দেশে পুরুষের থেকে তফাৎ। পুরুষরা সেটা যদি স্বভাবতই পছন্দ না করত তাহলে সেই তফাৎটুকু আপনিই ঘুচে যেত। কিন্তু তাই ব'লে হঠাৎ সাড়ির উপর চাপকান পরানো চলবে না। মেয়েরা আপত্তি করবে, তার চেয়ে আপত্তি করবে পুরুষেরা। চলতি ভাষার কবিতা চলতি ভাষার নিয়মে এখন খুবই চলেচে—গম্ভীর বিষয়েও তার অনধিকার নেই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অচল্‌তি ভাষাটাও অন্তত কাব্যের এলাকা ত্যাগ করবার কোনো লক্ষণ দেখাচ্চে না। তার একমাত্র কারণ বাঙালীর হৃদয়ের মধ্যে ওর স্বাভাবিক অধিকার এখনো অটুট আছে। যতক্ষণ আছে ততক্ষণ ওর সাজসজ্জারও বিশেষত্ব থাকবে, যুগ্মধ্বনি বা অযুগ্মধ্বনির নিয়মে খাতিরে নয় বাঙালীর আনন্দপিপাসু অন্তরের চিরাভ্যস্ত ফরমাসে—যে ফরমাসে বাঙালীর মেয়ে আজো খোঁপা বাঁধে, কাঁকন পরে এবং আচকান প'রে বিবাহ করতে যায় না। প্রবোধচন্দ্র বারবার বলেচেন যে, বাংলায় লিপিপদ্ধতি যদি ইংরিজির মতো বা আর কিছুর মতো হত তা হলে "অক্ষরগোণা ছন্দের যে কি রূপ হত তা সহজেই অনুমেয়।" কবিদের তরফে আমাকে এ কথা বারবারই প্রতিবাদ ক'রে বলতে হবে, যে, যতক্ষণ বাংলা ভাষার ধ্বনি-প্রকৃতি ইংরেজি বা আরবী বা চীনভাষার তাড়নায় সম্পূর্ণ বদল হয়ে না যাবে ততক্ষণ যে অক্ষর যেমন ভাবেই সাজাই না কেন বাংলাছন্দের ধারা আজও যেমন ভাবে চল্‌চে কালও তেমনি ভাবে চল্‌বে। নূতন নূতন ছন্দ উদ্ভাবিত হ'তে পারবে কিন্তু নাড়ী ছাড়ার আগে ছন্দের ধাত বদল হবে না।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



সাইকো-এনালিসিস্

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ   শান্তিনিকেতন।

কল্যাণীয়েষু,

অমিয়কে যে চিঠি লিখেচ দেখলুম। সাইকো-এনালিসিস ক্ষেত্রে অনধিকার প্রবেশ করতে চাইনে। এই বিজ্ঞানের সূচনাটি এখনো অপরিণত আকারে আছে তাই আপন ইচ্ছামত যা তা বলবার মতো এমন উপলক্ষ্য আর নেই। বিশেষতঃ নিজের মনের গ্লানিকে বিজ্ঞানের ছাপ মেরে কুৎসা আকারে চালান কর্‌বার এমন সুযোগ আর পাওয়া যাবে না। এই তথাকথিত বিজ্ঞানবিভাগে বৈজ্ঞানিকের তক্‌মা যে-কেউ ধারণ করতে পারে, অধিকারী নির্ব্বাচনের কোনো কঠোর পরীক্ষার ভিতর দিয়ে যাবার দরকার হয় না। বাংলা দেশে ব্যক্তিগত অসম্মানের আর একটি দ্বার মুক্ত হল, এ রসের রসিক যাঁরা তাঁরা পুলকিত হবেন।

কথা প্রসঙ্গে যা বলি, তার ঠিকমত অনুবাচন প্রায় হয় না। তুমি যে 'ইণ্টারভিয়ুর' অংশ উদ্ধৃত করেচ তা আমার মনে পড়চে না। তাই আমার কাছেও ওটা স্পষ্ট নয়। মিষ্টিক্ উপলব্ধি সম্বন্ধে সুনির্দ্দিষ্ট ক'রে কিছু বলা চলে না। ইন্দ্রিয়-বোধের মতোই সেটা অনির্ব্বচনীয়। ব্যোমতরঙ্গকে চোখ কেন আলোকরূপে দেখে তা নিয়ে তর্ক ক'রে লাভ নেই—দেখে ব'লেই দেখে এইটে হোলো চরম কথা।

চৈতন্যের নানা দিক আছে, এক আলো থেকেই নানারঙের বোধ যেমন এও তেমনি। কেউ বা লাল রং দেখ্‌তে পায় না, কেউ বা নীল, কেউ বা এটা বেশি দেখে কেউ বা ওটা। আমি আজকাল ছবি আঁকি, সেই ছবিতে বর্ণ সংযোজনের বিশেষত্ব আছে। এই বিশেষত্বের কারণ আমার চৈতন্যে রঙের বিশেষ ধারণার মধ্যে। আমি সব রংকে সমান ভাবে দেখি নে, পক্ষপাত আছে, কেন আছে, কে বলবে? গাছের পাতা কেন সবুজ রংকে প্রক্ষিপ্ত করে? গাছের ফুল কেন করে লালকে? মিষ্টিক উপলব্ধিও এক রকমের নয়, নিশ্চয় তার বৈচিত্র্য আছে। সে বৈচিত্র্য ঠিক বর্ণনা করা যায় না, কেননা সে তো চোখে দেখ্‌বার জিনিষ নয়। কবিদের উপলব্ধিকে যদি মিষ্টিক বল তবে সেই উপলব্ধি-প্রকাশের ভাষা তাদের আছে এইখানেই কবিত্ব। কবীর প্রভৃতি প্রাচীন সাধকরা ভাষাবান ছিলেন। তবু সে ভাষা সম্পূর্ণ বুঝতে গেলে কিছু পরিমাণে তাদের মতো চিত্ত থাকা চাই। উপলব্ধি ও ভাষা এই দুইয়ের যোগে জিনিয়স্। ভাষা মানে কেবল শব্দের ভাষা নয়, সঙ্কেতের ভাষা, যুক্তির ভাষা, রেখার ভাষা, কর্ম্মের ভাষা, চরিত্রের ভাষা এমন কত কি। ইতি ২৪ আশ্বিন ১৩৩৮

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ডাক্তার সরসীলাল সরকারকে লিখিত।

রবীন্দ্রনাথের "শেষের কবিতা"

শ্রীযুক্ত কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়

"যোগাযোগ"এ গোড়ার কথা বুঝতে হয় শেষের কথা দিয়ে। "শেষের-কবিতা"য় শেষের কথাটি বুঝ্‌তে হয় গোড়ার কথা দিয়ে। অবিনাশ ঘোষালের জন্মদিনের অবতারণা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয় যখন আসে সন্তান-সম্ভবা কুমুর শ্বশুর-বাড়ী যাবার ইতিহাস। "শেষের-কবিতা'য় কিন্তু ঠিক তার বিপরীত। শেষ অধ্যায়ে আখ্যান-বস্তুর মূল সত্যটুকু বুঝতে হয় গোড়ার অধ্যায় দিয়ে যেখানে কবি অমিতর চরিত্র বিশ্লেষণ করেচেন নানা বিচিত্র ঘটনার বর্ণনায়।

রবীন্দ্রনাথ এখানে যে দুটী নায়ক-নায়িকা এনেচেন, তাদের চরিত্র যেমন অতি-সূক্ষ্ম ও অতি-আধুনিক তেমনি অতি দুর্ব্বোধ। মানুষের অন্তরের এত সূক্ষ্ম স্তর নিয়ে বাংলা উপন্যাস এর আগে লেখা হয়েচে কিনা সন্দেহ। এদের চরিত্রের মূলতত্ত্বগুলি ধর্‌তে না পার্‌লে আখ্যান-ভাগ হ'য়ে পড়্‌বে বেসুরো। তাই কবি আখ্যায়িকা ঠিক-ঠিক আরম্ভ হবার আগেই নায়কের চরিত্র প্রস্ফুট ক'রে তুল্‌তে বিশেষ ভাবে চেষ্টা করেচেন।

অমিতর অন্তরে সবচেয়ে বিকশিত হ'য়েছিল প্রবল স্বাতন্ত্র্যবোধ। এই স্বাতন্ত্র্য ওকে করে তুলেছিল গতানুগতিকতার—চল্‌তি fashionএর পরে বিরূপ। নিজেকে অপরূপ কর্‌বার সখ ওর নেই কিন্তু ফ্যাসানকে বিদ্রূপ কর্‌বার কৌতুক ওর অপর্য্যাপ্ত।* অমিত দেশী কাপড় প্রায়ই পর্‌তো কারণ ওর সমাজের লোক সেটা কেউই পার্‌তো না। "পাঁচজনের মধ্যে ও যে কোনো একজনমাত্র নয়, ও হলো একেবারে পঞ্চম।" তাই ও রুচির জুলুম মোটেই সহ্য করতে পার্‌ত না। ষ্টাইল বল্‌তে অমিত বুঝতো এই স্বাভাবিক স্বাতন্ত্র্য-বোধ। ও আপন রুচির মাপকাঠিতে সবই বিচার করতো, সাহিত্যও। তাই নামজাদা লেখকদেরও নগণ্য ব'লে প্রমাণ কর্‌তো অবাধেই ;—আবার অতি অজানা লেখককে প্রশংসায় করে তুলতো অদ্বিতীয়

ওর এই স্বাতন্ত্র্য-বোধ প্রবল ছিল বটে কিন্তু গভীর ছিল না মোটেই। তাই চিত্তটা ছিল হাল্‌কা। জীবনের সকল বিষয়কেই ও হেসে হাল্‌কা করে রাখতো। নিজেই একদিন লাবণ্যকে বলেছিলো, "আমার গভীর কথাতেও গাম্ভীর্য্য রাখ্‌তে পারি নে। ওটা আমার মুদ্রাদোষ। আমার জন্মলগ্নে আছে চাঁদ, ঐ গ্রহটী কৃষ্ণচতুর্দ্দশীর সর্ব্বনাশা রাত্রেও একটু মুচ্‌কে না হেসে মর্‌তে জানে না।" এই হাল্‌কা ভাবের জন্যেই অমিতর মনটা যেন 'আলেয়ার আলো, মাটে ঘাটে ধাঁধাঁ লাগাতেই আছে। ঘরের মধ্যে তাকে ধরে আনবার জো নেই।' জীবনের দীর্ঘপথে ও যেন চিরন্তন পথিক, পথ চলে আপন রুচির খেয়ালেই। পান্থশালায় যাদের সঙ্গে দেখা হয়, তাদের সকলের কাছ থেকেই যতটুকু পারে প্রজাপতির মত জীবনের মধু লুটে নেয়, কিন্তু ওর চিত্তে তাদের কোন স্থায়ী দাগ থাকে না। তাই আপন সমাজের মেয়েদের সঙ্গে উৎসাহের সহিত মিশ্‌লেও কারো প'রে ওর আসক্তি জন্মে না। ওর চিত্ত কৌতুকে সদাই চপল ; জীবনপ্রবাহে নিরন্তর ভেসে যাওয়াই যেন ওর কায,—কোথাও কোন কিছুতে স্থির হবার মত ওর চিত্তে যেন একটুও ভার নেই।

প্রকৃতি অমিতকে দিয়েছিলো যথেষ্ট বুদ্ধি—যা' প্রতিভার পর্য্যায়ভুক্ত, কিন্তু তা'কে ও পরিশ্রমের দ্বারা তীক্ষ্ণ করে নি, এর জন্যে দায়ী ওর মনের হাল্‌কাভাব। ওর প্রতিভায় সহজ

* 'কৌতুক' কথা দিয়ে কবি ইঙ্গিত করেচেন যে অমিতর চল্‌তি fashionএর পরে এই বিরুদ্ধতা মনের কোন serious principle থেকে আসেনি—বরং মনের হাল্‌কা ভাব থেকেই এসেচে। ওর প্রবল স্বাতন্ত্র্য অথচ হাল্‌কা মন এই বিরুদ্ধতায় মধ্যে শুধু কৌতুক পায়।

বিকাশ সাহিত্যক্ষেত্রে। ও শুধু কবিতা লেখে তা' নয়,—নিপুণ রসলিপ্সু ও। অমিত গুণী ও কবি দুই-ই।…

অমিত ও লাবণ্যের দেখা হোল সংঘাতের মধ্যে,—নির্জ্জন পাহাড়ের আঁকা-বাঁকা সরুপথের একটা বাঁকের মুখে তাদের গাড়ীতে গাড়ীতে লাগ্‌লো আঘাত। সে আঘাত গিয়ে পৌঁছল দুজনের মনে। দুর্লভ অবসরে অমিত ওকে দেখেছিলো। "ড্রয়িংরুমে এ-মেয়ে অন্য পাঁচজনের মাঝখানে পরিপূর্ণ আত্মস্বরূপে দেখা দিতো না।" ‡ এ ব্যাপারকে অনেকে হয় ত বলবেন—love at first sight, কিন্তু সত্য কি তাই? সমাজে অত উৎসাহের সহিত মেয়েদের সঙ্গে মিশেও কখনো কারো জন্যে যার অন্তরে এমন কি সামান্য আগ্রহও জমে নি, সে আজ লাবণ্যের মধ্যে এমন পরমাশ্চর্য্য কি দেখ্‌লে যা'তে ও একেবারে প্রেমে পড়ে গেল! মেয়েদের সম্পর্কে অমিত অত যে sentimental নয়—এ ক্ষেত্রে সে যে একেবারে হিসেবী, তা' কবি আগেই পরিচয় দিয়েচেন। তা' হ'লে এদিকে লাবণ্যের ব্যবহারও গভীর প্রেম ব'লে ব্যাখ্যা করা যায়। অমিত যখন তার সাম্‌নে এসে দাঁড়ালো—যেন একটা পাওনা শাস্তির অপেক্ষায় 'তাই দেখে মেয়েটীর বুঝি দয়া (pity) হ'ল একটু কৌতুকও বোধ করলে।' Dryden বলেচেন, দয়ার পরবর্ত্তী ধাপই প্রেম, "For pity melts the mind to love." কিন্তু লাবণ্যের চিত্ত ত' এত শিথিল এবং হাল্‌কা নয়। কবি দেখিয়েচেন, পাণ্ডিত্যের স্পর্শে তার কঠোর চিত্তের এদিক্‌টা একেবারে পাষাণের মত হ'য়ে পড়েছিলো। সে শোভনলালের প্রেমকে উপেক্ষা করেছিলো অনায়াসেই এবং প্রেমিক পিতাকে বর্জ্জন ক'রে অনিশ্চিতের মধ্যে জীবনসংগ্রাম সুরু করতেও দ্বিধা করে নি। তাই মনে সহজেই সংশয় আসে, আজ এই প্রথম সাক্ষাতেই লাবণ্য একেবারে গভীর প্রেমে পড়ে গেল কেমন ক'রে! ব্যাপারটা এত মামুলি নয়। মনে হয় নির্জ্জন পাহাড়ে সেই আশাতীত আকস্মিকের দরুণ দুজনের চৈতন্যের মাঝখানটিতে পড়ে গেছ্‌লো একটা গভীর ছাপ। যে অদৃশ্য, অজানা শক্তি—"“Life force”*—নরনারীর মধ্যে সৃষ্টি করেচে আকর্ষণের সম্বন্ধ—এ তারই এক খেয়াল। এই আকর্ষণই ক্রমে দক্ষিণা হাওয়া পেয়ে প্রেমে পরিণত হ'য়েছিল, কিন্তু এ আকর্ষণই প্রেম নয়।

এখন দেখা যাক্, লাবণ্যের চরিত্রে কি কি বৈশিষ্ট্য রয়েচে। অমিতর "দুর্লভ যুবকত্ব নির্জ্জলা যৌবনের জোরেই একেবারে বেহিসেবী উড়নচণ্ডী, বান ডেকে ছুটে চলেচে বাইরের দিকে, সমস্ত নিয়ে চলেচে ভাসিয়ে হাতে কিছুই রাখে না।" কিন্তু লাবণ্যের বিবেচনা-শক্তি খুব গভীর। তাই ওর অন্তরের নারী বড় হিসেবী, শান্ত, গম্ভীর। ওর চিত্তে যে স্বাতন্ত্র্যবোধ আছে, তা' যেম্‌নি গভীর, তেম্‌নি উদ্ধত, একগুঁয়ে। তা'কে মেয়ে ক'রে গড়্‌বার সময় বিধাতা তার মধ্যে পুরুষের একটা ভাগ মিশিয়ে দিয়েচেন। মানুষের চরিত্র বিশ্লেষণে তার আছে খুব সূক্ষ্ম দৃষ্টি। লাবণ্যের জীবনও প্রতিভার আলোকে উদ্ভাসিত। ও বিদ্যার একনিষ্ঠ সাধক। ইংরাজি সাহিত্যে এম-এ পরীক্ষায় ওর ছিল সর্ব্বোচ্চ স্থান। কিন্তু বিদ্যার মধ্যে দিয়ে আরো কিছু সে পেয়েছিল। বোনের প্রশ্নে অমিত একদিন ব'লেছিল, "কমল হীরের পাথরটাকেই বলে বিদ্যে আর ওর থেকে যে আলো ঠিক্‌রে পড়ে, তাকেই বলে কাল্‌চার। পাথরের ভার আছে, আলোর আছে দীপ্তি।" লাবণ্যের মধ্যে ছিল সেই দীপ্তি। পাণ্ডিত্যের মধ্যে দিয়ে ওর সেই cultural self সুবিকশিত হ'য়ে উঠেছিল। পরে আমরা দেখবো, লাবণ্যের এই দিকটাই অমিতকে পাগল ক'রে তুলেছিল। কবিও এই কথাই বলেচেন, "লাবণ্যের সৌন্দর্য্য সকাল বেলার মতো, তাতে অস্পষ্টতার মোহ নেই, তার সমস্তটা বুদ্ধিতে

‡ তা' ছাড়া আরো একটা কারণ থাকতে পারে। অনেক দিন আগে কবি তাঁর "সমাপ্তি" নামক গল্পে লিখেছিলেন, "পৃথিবীতে অনেক মুখ চোখে পড়ে কিন্তু এক একটি মুখ বলা কহা নাই একেবারে মনের মধ্যে গিয়া উত্তীর্ণ হয়। সে কেবল সৌন্দর্য্যের জন্য নহে, আর একটা কি গুণ আছে। সে গুণটি বোধ করি স্বচ্ছতা। অধিকাংশ মুখের মধ্যেই মনুষ্য প্রকৃতিটি আপনাকে পরিস্ফুটরূপে প্রকাশ করিতে পারে না, যে মুখে সেই অন্তরগুহাবাসী রহস্যময় লোকটি অবাধে বাহির হইয়া দেখা দেয়, সে মুখ সহস্রের মধ্যে চোখে পড়ে এবং এক পলকে মনে মুদ্রিত হইয়া যায়।" মনে হয়, লাবণ্যের মুখে তার অন্তরের যে স্বতন্ত্র মানুষটির ছবি প্রকাশিত হয়েছিল, তারই স্বচ্ছতা অমিতর চিত্তকে চঞ্চল ক'রে তুলেছিল।

* Bernard Shaw-এর "Man & Superman" দ্রষ্টব্য।

পরিব্যাপ্ত।* * * তাকে দেখলেই বোঝা যায় তার মধ্যে কেবল বেদনার শক্তি নয় সেই সঙ্গে আছে মনের শক্তি। এইটেতেই অমিতকে এতো করে আকর্ষণ করেছে।***"…

* * * *

লাবণ্যের পড়বার ঘরে প্রথম দিন এসেই অমিতর চোখে প'ড়্‌ল তার প্রিয় কবি ডন্‌ এর কাব্য-সংগ্রহ। "এইখানেই এই কাব্যের উপর হঠাৎ দুজনের মন এক জায়গায় এসে পরস্পরকে স্পর্শ করলো।" কবি এখানেও বলেচেন 'দৈবাৎ' যেমন ওদের গাড়ীর আঘাতের সময় বলেছিলেন 'আকস্মিক।' অমিতর মনে মেয়েদের 'পরে যে সাধারণ তাচ্ছিল্য ছিল, তার কুয়াসা ভেদ ক'রে অনুরাগের রবি ক্রমশঃ উদয় হচ্ছে এই unexpectedness, suddennessএর স্পর্শে। অমিতর চরিত্রের খুব সূক্ষ্ম বিশ্লেষণই কবি এর মধ্যে দেখাচ্চেন। যা'হোক, কাল ওদের প্রাণে যে সাড়া জেগেছিল, রুচির মিল হওয়ার মধ্যে দিয়ে অমিতর মনে আজ তার পরিণতি হ'ল পূর্ব্বানুরাগে। তারপর দিনের পর দিন সাহিত্য-আলোচনার অবসরে সেটা গাঢ়তর হ'য়ে উঠ্‌লো পূর্ণ প্রেমে।

ওর চঞ্চল মন এখন মাঝে মাঝে হ'য়ে পড়ে উদাস। ও যেন একটা নূতন গ্রহে এসে পৌঁছেচে। প্রজাপতি জেগে উঠেচেন ওর অন্তরে এক নূতন সৃষ্টিতে। এতদিন ব্যর্থ প্রত্যাশায় অমিত যে অসম্ভবের স্বপ্ন দেখে এসেচে, আজ তার সন্ধান পেলে লাবণ্যের অন্তরে। ও চাইত এমন এক পাত্রী—"আপন পরিচয়েই যার পরিচয়, জগতে যে অদ্বিতীয়।" আজ লাবণ্যর মধ্যে ও তাকেই—সেই অনন্যা নারীকেই দেখ্‌লে,

"হে মোর বন্যা, তুমি অনন্যা,
আপন স্বরূপে আপনি ধন্যা।"

কিন্তু বাধা এল সেই অনন্যা নারীর তরফ থেকেই। লাবণ্য বিবাহ করতে রাজি হ'ল না। এর কারণ তার অন্তরে প্রেমের অভাব নয়। লাবণ্য আত্মহারা হ'য়েই ভালোবেসেছিল। যোগমায়ার প্রশ্নে একদিন সেকথা সে নিজেই ব'লেছিলো, "আমার ভালোবাসার কথা জিজ্ঞাসা করচো কর্ত্তামা? আমি তো ভেবে পাইনি আমার চেয়ে ভালোবাসতে পারে এমন কেউ আছে। ভালোবাসায় আমি যে মরতে পারি। এতোদিন যা'ছিলুম সব-যে আমার লুপ্ত হ'য়ে গেচে। এখন থেকে আমার আর এক আরম্ভ, এ আরম্ভের শেষ নেই। আমার মধ্যে এ যে কতো আশ্চর্য্য সে আমি কাউকে কেমন ক'রে জানাবো? আর কেউ কি এমন ক'রে জেনেচে?" কিন্তু লাবণ্য ছিল স্থির, তাই এই দুঃসহ আবেগ নিজের মধ্যে চেপে রাখ্‌তে পেরেছিল। তার অন্তরে স্বাতন্ত্র্য-বোধ ছিল প্রবল, অনেক পড়ে অনেক ভেবে তার মন হ'য়ে গেছ্‌লো খুব সূক্ষ্ম। সে বুঝ্‌লে,—অমিতর ত' এ ঠিক ভালোবাসা নয়, ওর রুচির ভালোলাগা-মাত্র। লাবণ্যর সবটুকুকে ত' ও ভালোবাসেনি—তার মধ্যে যে higher self,—যে cultural self রয়েচে, তার সঙ্গে অমিতর মনের হয়েচে রুচির মিল। কিন্তু এই cultural selfই ত লাবণ্যের সবটুকু নয়! অমিতর অন্তরের কবি লাবণ্যকে নিজের কল্পনা দিয়ে idealise করচে,—আপন রুচির মত ক'রে ওর কল্প-মূর্ত্তি সৃষ্টি কর্‌চে। লাবণ্য যথার্থ যা'—ওর যা' সত্য পরিচয়, তার স্থান সেখানে অতি অল্প, কারণ cultural self ছাড়া সেখানে লাবণ্যের সাধারণ সত্ত্বার কোনো স্থান নেই। ওর এই কল্প-মূর্ত্তির ছায়ার সঙ্গে ওর সত্য পরিচয়ের যে-পার্থক্য, বিবাহ হ'লে একদিন তা' অমিতর কাছে প্রকাশ হ'য়ে পড়্‌বে। সেদিন অমিত আর ভালোবাস্‌তে পারবে না, কারণ আজ অমিত ভালোবেসেচে ওর সেই নিজের-রচা লাবণ্যের কল্পমূর্ত্তিকেই। তাই লাবণ্য যোগমায়াকে বল্‌লে, "উনি তো আমাকে চান না। যে-আমি সাধারণ মানুষ, ঘরের মেয়ে, তাকে উনি দেখ্‌তে পেয়েচেন ব'লে মনেই করিনে। আমি যেই ওঁর মনকে স্পর্শ করেচি, অমনি ওঁর মন অবিরাম ও অজস্র কথা ক'য়ে উঠেচে। সেই কথা দিয়ে উনি কেবলি আমাকে গড়ে তুল্‌চেন। ওঁর মন যদি ক্লান্ত হয়, কথা যদি ফুরোয়, তবে সেই নিঃশব্দের ভিতরে ধরা পড়্‌বে এই নিতান্ত সাধারণ মেয়ে, যে-মেয়ে ওঁর নিজের সৃষ্টি নয়।…" লাবণ্য সব জিনিষ শান্তভা'বে বিচার ক'রে নিতে চায়। তাই এসে পড়েচে ওর মনে হারাবার অনিবার্য্য ভয়। ও ভাব্‌লে, অমিত সংসার ফাঁদবার মানুষ নয়, ও রুচির তৃষ্ণা মেটাবার

জন্তেই কেরে। তাই সাহিত্যে-সাহিত্যে ওর বিহার। সাহিত্য-জগতের প্রজাপতি লাবণ্যের কাছে এসেচে সেই রুচির তৃষ্ণা মেটাতেই। কিন্তু যেদিন ওর সেই cultural self প্রজাপতির আকাঙ্ক্ষিত মধু যথেষ্টভাবে দিতে পারবে না, সেদিন অমিতর চঞ্চল দুরন্ত মনে দেনা-পাওনার মধ্যে জাগবে বিরোধ, আসবে কার্পণ্য। বিয়ে হ'লে, সেই ব্যথার দিনে ব্যথা সহ্য করেই দুজনকে থাকতে হ'বে—মুক্তির সম্ভাবনা থাকবে না। সেদিন নিষ্প্রাণ ছায়ার বোঝা দুজনকে বইতে হবে, একদিন তারা প্রেমের কায়াকে পেয়েছলো ব'লে। তাই ও অমিতকে খুলেই বললে, "মিতা, তোমার রুচি, তোমার বুদ্ধি আমার অনেক উপরে। তোমার সঙ্গে একত্রে পথ চলতে গিয়ে একদিন তোমার থেকে বহুদূরে পিছিয়ে পড়বো, তখন আর তুমি আমাকে ফিরে ডাকবে না। * * * মিনতি ক'রে বলচি, আমাকে বিয়ে করতে চেয়োনা। বিয়ে ক'রে তখন গ্রন্থি খুলতে গেলে তা'তে আরো জট পড়ে যাবে। ..."

অমিতর চরিত্রের সত্যরূপটি লাবণ্যের সূক্ষ্ম বুদ্ধি অনেকটা ঠিক ধরেছিল। ওদের দুজনের চাওয়ার মধ্যে যথেষ্ট গরমিল রয়েচে। একজন চায় সংসারের মধ্যে থেকে জীবনের নানাবর্ণগন্ধময় মধুপাত্র নিঃশেষে পান করতে। আর একজনের চাওয়ার মধ্যে সংসারের কোন চিন্তাই ওঠে না। বিবাহের জন্তে যে ক'রছিলো সবচেয়ে পীড়াপীড়ি, —বিবাহের সত্যরূপ আর তার দায়িত্ব সবচেয়ে তারই মনে আবছায়া হ'য়েছিলো। ওদের নামকরণে তা' বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। অমিত লাবণ্যের নাম দিলে 'বন্যা'। ওর প্রেম চায় বন্যা—গতির আবেগ নয়। ও যেন ব্রহ্মপুত্র, প্রেমের বন্যা বুকে নিয়ে আবেগে দুকূল ভাসিয়ে নিরন্তর ছুটে যেতে চায়, জীবনক্ষেত্রে কোথাও স্থিতির কল্পনা ওর নেই। তাই অমিত লেখে, "আমরা দুজন চলতি হাওয়ার পন্থী।" কিন্তু লাবণ্যের প্রেম চায়—মিতা, জীবনের সঙ্গী,—সুখদুঃখ জয়-পরাজয় দুয়েরেই ভাগী। অমিতর চাওয়া সম্পূর্ণ বিপরীত। নিবারণ চক্রবর্ত্তীর কথা দিয়ে সে তার নিজের অন্তরের সত্য কথাটিই ব্যক্ত করেছিলো, "ডাকবার মানুষকে ডাকি যখন জীবনের পেয়ালা উছলে পড়ে, তাকে তৃষ্ণার সরিক হ'তে ডাকিনে।

পুষ্প-উদার চৈত্রবনে
বক্ষে ধরিস্ নিত্য-ধনে,
লক্ষ শিখায় জ্বলবে যখন
দীপ্ত প্রদীপ অন্ধকারে।"

অমিত যা' চাইচে, ওর মন যার ইঙ্গিত দিচ্চে, সেখানে ত' স্ত্রীর স্থান নয়, জীবনের সুখেও যে সঙ্গী, দুঃখেও যে সরিক। অমিত ত' বধূকে চায় না। ও চায় চিরকালের জন্তে 'নববধূকে';—এক নারীকে যে তার প্রতিভার নিত্য-নূতনরূপ দিয়ে ওর চিত্তকে ক'রে তুলবে বিভ্রান্ত। কিন্তু নববধূ ত' চিরদিন নববধূ থাকে না। একদিন আসে যেদিন সংসার তা'কে ডাক্ দেয়—সেই কল্পলোকের প্রাঙ্গন থেকে নেমে আসতে। লাবণ্য বুঝলে সেদিন ট্র্যাজেডি অনিবার্য্য। বিয়ে করলে সেদিন এদের মুক্তির পথ খোলা থাকবে না। লাবণ্য যা' চায় তা' সে একদিন স্পষ্ট ক'রেই বলেছিলো, "মিতা, ত্বমসি মম জীবনং, ত্বমসি মম ভূষণং, ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নং।" অমিত যেখানে কল্পনার স্বপ্ন দিয়ে ভরিয়ে রাখতো, লাবণ্য সেখানে চাইত বাস্তব। রমণীর অন্তরের ক্ষুধা প্রধানতঃ বাস্তব-বিলাসী। H. G. Wells তাঁর 'The World of William Clissold'-এ এ'কথা স্বীকার করেচেন, "A woman must see and touch, *women are more immediate. What they want is a tangible reality.* For them images are a necessity." অমিতর জীবনদীপ চাইত জগতে শুধু উৎসব সভা সাজাতে। লাবণ্যের জীবনদীপ জীবনের কাযের জন্তেই। "অন্তরাত্মার গভীর উপলব্ধি বাইরে প্রকাশ করতেই হয়; কেউ-বা করে জীবনে, কেউ-বা রচনায়, জীবনকে ছুঁতে ছুঁতে, অথচ তার থেকে সরতে সরতে চলে, তেমনি।" অমিত কেবলি রচনার স্রোত নিয়ে জীবন থেকে সরে সরে যেতে চায়। লাবণ্য চায় অন্যটা। কবি ইঙ্গিত দিয়েচেন, "এই খানেই কি মেয়ে পুরুষের ভেদ? পুরুষ তার সমস্ত শক্তিকে সার্থক করে সৃষ্টি করতে,

সেই সৃষ্টি আপনাকে এগিয়ে দেবার জন্তেই আপনাকে পদে পদে ভোলে। মেয়ে তার সমস্ত শক্তিকে খাটায় রক্ষা করতে, পুরোনোকে রক্ষা করবার জন্তেই নতুন সৃষ্টিকে সে বাধা দেয়। রক্ষার প্রতি সৃষ্টি নিষ্ঠুর, সৃষ্টির প্রতি রক্ষা বিঘ্ন। * * * এক জায়গায় এরা পরস্পরকে আঘাত করবেই।" আদি-পুরুষ ও নারীর চাওয়ার মধ্যে যে অনাদি কালের বৈষম্য তাই-ই আজ দেখা দিয়েচে এদের চাওয়ার মধ্যে।

এই চাওয়ার পার্থক্য থেকে লাবণ্য বুঝ্‌লে—ওরা দুজনে দুটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মানুষ। ওখানে মনের মত মানুষকে সৃষ্টি করবার চেষ্টা করলে আসবে অপরিহার্য্য ট্রাজেডি। ওর কথাতেই বলি, "ভালোবাসার ট্রাজেডি ঘটে সেই-খানেই যেখানে পরস্পরকে স্বতন্ত্র জেনে মানুষ সন্তুষ্ট থাকতে পারেনি; নিজের ইচ্ছেকে অন্যের ইচ্ছে করবার জন্তে যেখানে জুলুম, যেখানে মনে করি আপন মনের মতো করে বদলিয়ে অন্যকে সৃষ্টি করবো।" যোগমায়া এর উত্তরে খুব সত্যকথাই বলেছিলেন, "তা' মা, দুজনকে নিয়ে সংসার পাত্‌তে গেলে পরস্পর পরস্পরকে খানিকটা সৃষ্টি না ক'রে নিলে চলেই না। ভালোবাসা যেখানে আছে সেখানে সেই সৃষ্টি সহজ,—যেখানে নেই সেখানে হাতুড়িপিটোতে গিয়ে তুমি যাকে ট্রাজেডি বলো, তাই ঘটে।" কিন্তু যোগমায়ার একথা সত্য শুধু সংসারের সাধারণ মানুষের পক্ষে, যাদের স্বাতন্ত্র্য খুব নিকৃষ্ট। কিন্তু যাদের স্বাতন্ত্র খুব বিকশিত, সংসারে যারা "মাটির মানুষ" একেবারেই নয়, তারা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য কিছুতেই সহজে ছাড়তে পারে না। তাই যা' অসম্ভব, তাকে পাবার জন্তে লাবণ্য বৃথা চেষ্টা করলে না। তাই অমিতকে বিয়ে করে অকৃপণ প্রেমের বন্যা দিয়ে অমিতর অন্তরের যা' কিছু অসাংসারিকতার মলামাটী তা' ধুয়ে নিয়ে বিবাহকে সার্থক ক'রে তোলবার চেষ্টা সে করলে না।......

ওদের দুজনের মধ্যে যে সম্বন্ধটা যথার্থ এবং যা' উপভোগ করা সম্ভব লাবণ্য তা'কেই গ্রহণ করলে। মনে মনে স্থির করলে, যতোদিন পারা যায় অমিতর 'কথার সঙ্গে, ওর মনের খেলার সঙ্গে যুক্ত হ'য়েই থাকবে'। লাবণ্য intellectual friendship দিয়েই ওর চাওয়াকে তৃপ্ত করবে—যতোদিন অমিতর রুচি এই পরিতৃপ্তি চাইবে।

কিন্তু মনে প্রশ্ন জাগে, অমিতর কাছে লাবণ্য না-হয় 'ক্ষণকালের মায়া-রূপে'ই রইল, কিন্তু অমিত ত' ওর কাছে মায়া নয়। ওর চিত্তের সেই বিশেষরূপ অমিতর শুধু intellectual friendship চেয়েই ত' তৃপ্ত হয়নি। ওর চিত্ত যে অমিতর সবটুকুই চাইছিলো। সেই মন-প্রাণ দিয়ে চাওয়ার ব্যথাই ত' ওকে দুপুররাতেও কাঁদিয়েচে। তবে আজ বিবাহে অস্বীকার ক'রে অমিতর শুধু intellectual friendship নিয়ে ওর দিন যাবে কি ক'রে! না-পাওয়ার তীব্র ব্যথায় ওর জীবন কি দুর্ব্বিষহ হ'য়ে উঠবে না? কবি বেশ স্পষ্ট করেই সে কথার উত্তর দিয়েচেন। যোগমায়া বল্‌লেন, "তোমাকে দেখে অনেকবার মনে হয়েচে, অনেক পড়ে, অনেক ভেবে তোমাদের মন বেশি সূক্ষ্ম হ'য়ে গেচে; তোমরা ভিতরে ভিতরে যে-সব ভাব গড়ে তুলচো আমাদের সংসারটা তার উপযুক্ত নয়। আমাদের সময়ে মনের যে-সব আলো অদৃশ্য ছিলো, তোমরা আজ যেন সেগুলোকেও ছাড়ান দিতে চাও না। তারা দেহের মোটা আবরণটাকে ভেদ ক'রে দেহটাকে যেন অগোচর ক'রে দিচ্চে। আমাদের আমলে মনের মোটা মোটা ভাবগুলো নিয়ে সংসারের সুখদুঃখ যথেষ্ট ছিলো—সমস্যা কিছু কম ছিলো না। আজ তোমরা এতই বাড়িয়ে তুলচো, কিছুই আর সহজ রাখ্‌লে না।" লাবণ্য হেসে উত্তর দিলে, "কর্ত্তা মা, কালের গতিকে মানুষের মন যতোই স্পষ্ট ক'রে সব কথা বুঝতে পারবে, ততোই শক্ত ক'রে তার ধাক্কা সইতেও পারবে। অন্ধকারের দুঃখ অসহ্য, কেননা সেটা অস্পষ্ট।"...

কিন্তু "Life-force"এর কাছে ওর উদ্ধত স্বাতন্ত্র্য-বোধের একদিন পরাজয় ঘটলো। যা'কে দমন ক'রে রাখবে ব'লে ও ভেবেছিলো, একদিন সে মরিয়া হ'য়ে উঠলো। বর্ষণ-মুখর এক মধ্যাহ্নে ওর অন্তরের তৃষিত নারীকে চঞ্চল ক'রে তুললে,

> "বিদ্যাপতি কহে, কৈসে গোঙায়বি
> হরিবিনে দিন রাতিয়া।"

বৃষ্টির শব্দে ও ক্ষণে-ক্ষণে শুন্‌তে পেলে অমিতর পায়ের ধ্বনি। ওর মধ্যে একটা কামনা অশান্ত হ'য়ে উঠ্‌লো,—"ধাক্ সব বাধা ভেঙ্গে, সব দ্বিধা উড়ে, অমিতর দুইহাত চেপে ধরে বলে উঠি জন্ম-জন্মান্তরে আমি তোমার।" ঠিক এই সময়ে আরো একটা কারণ এসে ওর এই অশান্ত ক্ষুধায় ইন্ধন যোগালে।···

মানুষের চরিত্র জিনিষটা সচল। আগে অমিতর মন ছিল তুরন্ত, নিত্য নূতনের আকাঙ্ক্ষী। কিন্তু শিলঙে এসে আকস্মিকের ঘাতপ্রতিঘাতে তার চরিত্রটা একটু বদ্‌লে গেছে। প্রেমের স্পর্শে তার অশান্ত মনে ইপ্সিতকে সাধনার দ্বারা লাভ করবার ধৈর্য্য নেমে এসেছিলো। আগে যে শুধু চল্‌তেই জান্‌তো, আজ সে বস্‌তে শিখেচে। আজ অমিতর অন্তরে জলে উঠেচে আগুনের শিখা—যে আগুন জলে ওঠে দুই নক্ষত্রের মিলনে, যখন হঠাৎ মরণের ধাক্কা লেগে তাদের দুজনের স্বাতন্ত্র্য-দীপ দুটি নিবে যায়। ও যা'কে পায়নি, আজ কৃচ্ছ্রসাধনে ও তার চিত্ত জয় করতে চায়। একদিন ওর অন্তরের নিবারণ কল্পনায় যা' ব'লেছিলো,

"তোর সাথে চেনা
সহজে হবে না
কানে কানে মৃদুকণ্ঠে নয়
ক'রে নেবো জয়
সংশয়-কুণ্ঠিত তোর বাণী :
দৃপ্ত ব'লে লবো টানি
শঙ্কা হ'তে, লজ্জা হ'তে দ্বিধা দ্বন্দ্ব হ'তে
নির্দ্দয় আলোতে।"

অমিতর জীবনে আজ সত্যই সেদিন উপস্থিত হ'লো। কৃচ্ছ্রসাধন ক'রে ও লাবণ্যের সংশয়-শঙ্কা দূর করবে—এই হোলো এখন ওর চেষ্টা। এই সাধনার সাফল্য একদিন সত্য-সত্যই মিল্‌লো। যেদিন প্রিয়তমের সংসর্গের কামনায় লাবণ্যের মন ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছিলো, ঠিক সেইদিন ঘটনাপরম্পরা ওকে নিয়ে এল অমিতর এই কৃচ্ছ্রসাধনার মাঝে। লাবণ্যের সংশয় হ'ল দূর, অমিতর সাধনায় হ'ল সিদ্ধি। যোগমায়ার সাম্‌নে বিবাহের ঠিক হ'য়ে গেল।

* * *

কিন্তু কিছুদিন পরে লাবণ্য বুঝতে পার্‌লে, অমিতর চাওয়ার মধ্যে বিশেষ কিছু বদলায় নি—ওর মন এখনও লাবণ্যের মধ্যে খুঁজচে রুচির তৃষ্ণা মেটাবার জন্তে প্রিয়াকে,—জীবনের অৰ্দ্ধাঙ্গিনীকে নয়। পুরুষ বড় স্বার্থপর,—বিশেষতঃ ভালোবাসার রাজ্যে। অমিতর দৃষ্টি কেবল নিজের দিকেই—সে যা' চাচ্ছিল তা' পায়নি, তাই সে কৃচ্ছ্রসাধন করেচে। কিন্তু এদিকে লাবণ্য কি চাইচে, সেদিকে তার মোটেই দৃষ্টি নেই।* লাবণ্যের দিক থেকে কিছু না-পাওয়ার অভিযোগ আছে কিনা অমিত একবারও ভাবেনি। তাই তাদের মিলনপথের দুর্জ্জয় বাধার সত্যরূপটি সে দেখতে পেলে না। আজও অমিতর অবচেতন মন বিবাহের মধ্যে যা' চায় তা শুধু intellectual friendship; ওর কথবার্ত্তা, দাম্পত্যজীবনযাপনের উদ্ভট-কল্পনা

* অমিতর চাওয়ার মধ্যে যে বিশেষ কোনো পরিবর্ত্তন ঘটেনি—এটা খুব স্বাভাবিক। কবি এখানে পুরুষচরিত্রের এক অতি বড় সত্যের পরিচয় দিয়েচেন। অমিতর চিত্তের স্বাতন্ত্র্যবোধ অত্যন্ত সুবিকশিত, তাই তার অহংবোধও সেই পরিমাণে উগ্র। পুরুষ তার অহংবোধকে কিছুতেই ত্যাগ করতে পারে না। এ পুরুষ-মনস্তত্ত্বের চিরন্তন সত্য, অমিত আপন অহংকে খর্ব্ব করতে পারেনি—তাই তার দৃষ্টি কেবল স্বার্থের দিকে,—নিজের দিকে। কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্যেও তার দুর্নিবার অহংবোধের ছাপ সুস্পষ্ট। কৃচ্ছ্রসাধন ক'রে সে নিজের চাওয়াকে লাবণ্যের সত্যকার চাওয়ার সঙ্গে মিলিয়ে দিতে চায় না,—সে চায়, নিজের অহংকে ত্যাগস্বীকারের দ্বারা আরো মহিমান্বিত করতে, যাতে লাবণ্যের চিত্ত আকৃষ্ট না হ'য়ে থাকতে পারে না। H. G. Wells একথা বেশ স্পষ্ট করে বলেচেন, "Man is and will remain incurably egotist. To cease to be an egotist is to cease in that measure to be an individual. Even when he devotes himself wholly to the service of the species, it is that he seeks to realise his individual difference to the full in order to add it to the undying experience of his kind." নারীর চিত্ত এত egotist নয়, তাই সহজেই সে আপনাকে অপরের মধ্যে মিলিয়ে দিতে পারে। নারীচিত্তের এই আদিম কোমলতার জন্তেই লাবণ্য নিশ্চিত বিচ্ছেদের কথা জেনেও এতদিন অমিতকে ত্যাগ করতে পারেনি,—আজও পারতো না। কিন্তু তার চরিত্রের এক অংশে 'পুরুষভাব'টাই প্রবল ছিল। পরে আমরা দেখ্‌ব, এই পুরুষসুলভ egotism-ই শেষে লাবণ্যকে উদ্বুদ্ধ করেছিল অমিতকে চিরদিনের জন্তে পরিত্যাগ করার শেষ সঙ্কল্পে।

শুনে লাবণ্য তা' বেশ স্পষ্ট ক'রে বুঝতে পারলে কিন্তু আজ ওর উদ্ধত স্বাতন্ত্র্যকে ও খর্ব্ব করেচে। ওর মনে আজ সংশয়ের দ্বন্দ্ব নেই। অমিত নিজেই স্বীকার করেচে, আজো লাবণ্যের ঐশ্বর্য্যের মাঝেই ওকে পেতে চায়,

> "তোমার ঐশ্বর্য্য মাঝে
> সিংহাসন যেথায় বিরাজে,
> করিও আহ্বান,
> সেথা এ প্রণতি মোর পায় যেন স্থান।"

কিন্তু নিজের দেনা-পাওনার কথা আলাদা ক'রে না ভেবে আজ লাবণ্য অমিতর মধ্যেই আপনার স্বাতন্ত্র্যকে বিলিয়ে দিতে চাইলে। সেই কথাটাই ফুটে উঠেচে তার শেষ আবৃত্তিতে,

> "তোমারে দিইনি সুখ, মুক্তির নৈবেদ্য গেনু রাখি'
> রজনীর শুভ্র অবসানে। কিছু আর নাই বাকি
> নাইকো প্রার্থনা, নাই প্রতি মুহূর্ত্তের দৈন্য-রাশি,
> নাই অভিমান, নাই দীন কান্না, নাই গর্ব্ব হাসি,
> নাই পিছু ফিরে দেখা। শুধু সে মুক্তির ডালিখানি
> ভরিয়া দিলাম আজি আমার মহৎ মৃত্যু আনি'।"

এতে আত্মতৃপ্তির ভৈরবীর সুর নেই আছে আত্মাহুতির বেহাগ সুর। ওর নিজের ইচ্ছা, নিজের চাওয়া, নিজের স্বাতন্ত্র্যকে আজ মেরে ফেলতে চায়। কিন্তু তা'ও সম্ভব হ'ল না। আত্মবিসর্জ্জনের গরিমায় ওর মত সূক্ষ্ম ও গভীর মনের স্বাতন্ত্র্যকে লুপ্ত করা কঠিন। একদিন সে আবার পার্ব্বত্য নির্ঝরের মত জেগে উঠেছিলো। সেদিন আত্মোৎসর্গের মধ্যে অমিতর শুধু ছায়া নিয়ে নিজেকে জোর ক'রে ভুলিয়ে রাখা ওর পক্ষে হ'য়ে পড়লো অসহ। এখানে প্রশ্ন উঠ্‌তে পারে, অমিতর প্রেম যে অগভীর নয়, ক্ষণিক আবেগের উচ্ছলতা নয়, তা' ওর কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের পর লাবণ্য বুঝ্‌তে পেরেছিলো। তবু দুজনে দুজনকে এমন নিবিড় ক'রে ভালোবাসলেও এই সামান্য একটু না-পাওয়ার জন্যে লাবণ্য প্রিয়তমকে একেবারে ত্যাগ করবার সঙ্কল্প করলে কেন? রবীন্দ্রনাথ এখানে নারীচরিত্রের খুব সূক্ষ্ম স্তরের পরিচয় দিয়েছেন। সবটুকু নিঃশেষে না পেলে নারীর চিত্ত তৃপ্ত হ'তে পারে না। খানিকটা পেয়ে পুরুষ নিজের প্রাণপ্রাচুর্য্য দিয়ে তাকে কল্পনায় পরিপূর্ণ ক'রে তুলতে পারে—জীবনের এই মোহে সে আপনাকে ভোলাতে পারে। কিন্তু আত্মবিস্মৃতির এই মায়া-মরীচিকা সবল নারীচিত্তকে ভোলাতে পারে না। অল্পে তার তৃপ্তি নেই। যেটা পেয়েচে তার আনন্দ ওর মনে যে-টুকু না-পাওয়া তার ব্যথায় সঙ্কুচিত হ'য়ে পড়ে। যেমন পুরুষের অন্তঃকরণ পুরুষের অন্তরিন্দ্রিয় কয়েকটি বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সমষ্টি,—তেমনি নারীরও। কিন্তু পুরুষের চিত্ত কোন একটা প্রবল অন্তরিন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তির অজস্রতায় মত্ত হ'য়ে থাক্‌তে পারে—যেমন অমিতর অন্তর হ'য়েছিল intellectual passion নিয়ে। কিন্তু সবল নারীচিত্ত চায় সবকটি ইন্দ্রিয়ের একসঙ্গে পরিতৃপ্তি। তাই লাবণ্যের কাছ থেকে যেটুকু নিয়ে অমিতর অন্তঃকরণ তৃপ্ত হ'তে পেরেছিল, লাবণ্য অমিতর সেইটুকু নিয়ে সন্তুষ্ট হ'তে পারে নি। সে অমিতর কাছে সবকটি অন্তরিন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি চাইছিল। নারীচিত্তের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে Madame Arnaud, Christopherকে ঠিক এই কথাই ব'লেছিল :—"........ Women are not very happy. It is difficult to be a woman. Much more difficult than to be a man. You men never realise that enough. You can be absorbed in an intellectual passion or some out-side activity. You multilate yourselves, but you are the happier for it. A healthy woman can not do that without suffering for it. It is inhuman to stifle a part of yourself. When we are happy in one way, we regret that we are not happy in another We have several souls. You men have but one, a more vigorous soul, which is often brutal and even monstrous. * * *..." (Jhon Christopher, Vol. 4 p. 153-54.)

* * * *

কিন্তু সবচেয়ে বড় বাধা এল কেতকীর কাছ থেকে। ধূমকেতুর মত সে হঠাৎ একদিন তা'দের জীবনের মধ্যে এসে দাঁড়াল—আপন অন্তরের রূঢ়তা, অসঙ্কোচ ও প্রসাধনের

প্রলেপ নিয়ে। কিন্তু শেষে তা'র সেই রূঢ়তা ভেদ ক'রে ফুটে উঠ্‌লো—অন্তরের দুঃসহ ব্যথা। একদিন অমিত কেতকীর হাতে যে আঙটিটা পরিয়ে দিয়েছিল, তা' আজ ফিরিয়ে দেবার ছলে ওর হৃদয়ের মূক, ব্যর্থ প্রেম অমিতকে তিরস্কার ক'রে উঠ্‌লো,—'অমিট্‌, তা' এমন অদ্ভুত করেই যদি হারাবে সেদিন এতো আদরে আঙটি দিয়েছিলে কেন? সে-দেওয়ার মধ্যে কি কোনো বাঁধন ছিল না? এই দেওয়ার মধ্যে কি কথা ছিল না যে আমার অপমান কোনো দিন তুমি ঘট্‌তে দেবে না? অমিত সত্যই কেতকীকে ভালোবাস্‌ত না। সেদিন আঙটিটা দিয়েছিলো—সম্পূর্ণ রুচির খেয়ালেই। কিন্তু লাবণ্য ওকে ভুল বুঝ্‌লে। তাই অমিতর সঙ্গে দাম্পত্যজীবনে যে ট্রাজেডির ভয় ও আগে ক'রেছিল, আজ তার স্পষ্ট প্রকাশ দেখ্‌তে পেলে কেতকী-সম্পর্কিত ব্যাপারে। ওর প্রশ্নের উত্তরে অমিত যখন বল্‌লে, "তোমাকে সব কথা বোঝাবো কেমন ক'রে বন্যা। সেদিন যা'কে আঙটি পরিয়েছিলুম, আর যে আজ সেটা খুলে দিলে তারা দুজনে কি একই মানুষ?" তখন আগেকার সংশয় তার মনে দৃঢ় হয়ে গেল। ও ভাব্‌লে, অমিতর চরিত্র ত' নিত্য-নূতনের সন্ধানী। সে ত' সংসার ফাঁদবার মানুষ নয়। —সে যে রুচির সন্ধানেই ফেরে। তাই একদিন কেতকীকে ভালোবাস্‌লেও ওর রুচির সঙ্গে কেতকীর রুচির যেদিন পার্থক্য ধরা পড়্‌লো সেদিন অতি সহজেই ও তাকে অন্তর থেকে বিদায় দিলে। লাবণ্যের প্রবল স্বাতন্ত্র্য তাই আবার জেগে উঠ্‌লো। দাম্পত্যজীবনে ভবিষ্যতের অপমানকর দৃশ্য কল্পনা ক'রে ও সাবধান হ'য়ে গেল।

এর আগে আরো একটা অতি স্থূল সংশয় লাবণ্যের মনকে বিষিয়ে তুলেছিলো। অমিতর সমাজ থেকে ওর নিজের সমাজ যে কত বিভিন্ন, তা হঠাৎ ওর কাছে সেদিন স্পষ্ট হ'য়ে গেছলো। তা'ছাড়া, বোনেদের আসা-সম্বন্ধে অমিতর উদ্বেগের আতিশয্যে লাবণ্য ভুল ক'রে ভেবেছিলো, অমিত ওকে নিয়ে আত্মীয়দের কাছে লজ্জিত। এখানে আরো একটা কথা আছে। লাবণ্য অমিতকে মনপ্রাণ দিয়েই ভালোবেসেছিল। তাই যখন সে দেখ্‌লে তাদের দুজনের মধ্যে বিবাহ হ'লে, সে বিবাহ সুখের হবে না, অথচ কেতকীকে নিয়ে দৈনন্দিন জীবনে সুখী হওয়া অমিতর পক্ষে খুবই সম্ভব—কেন না, ওর মত সাধারণ, un-intellectual মেয়ের কাছ থেকে বাধা আস্‌বে খুব কম এবং অতি সাধারণ ধরণের—তখন লাবণ্যের চিত্তে অতি সহজেই জেগে উঠ্‌লো, প্রিয়তমের পথ পরিষ্কার করার জন্যে নিজেকে বিসর্জ্জন দেবার মহৎ সঙ্কল্প। এ আত্মাহুতির আকাঙ্ক্ষায় ছিল না কোনও গ্লানি, কিংবা প্রেমের কার্পণ্য। বরং, অকৃপণ প্রেমের অজস্রতার জন্যেই লাবণ্যের পক্ষে এ কায সম্ভব হ'য়ে উঠেছিলো। Jhon Christopherএ Graziaর কথা মনে পড়ে। অন্য নারীর সঙ্গে বিবাহ করার অনুরোধ ক'র্‌লে Christopher যখন অভিযোগ জানালে যে Grazia তাকে ভালোবাসে না, তখন তার ব্যাকুল কণ্ঠ থেকে ঠিক এই কথাই বেরিয়েছিল, "On the contrary, it is because I love you that I should be happy to do anything which could make you happy." (Vol. 4. P. 400).

এই সব ব্যাঘাত, সংশয় ও আত্মত্যাগের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে আরো একটা আকস্মিক ঘটনা এসে ওর শেষ সঙ্কল্প দৃঢ় ক'রে তুল্‌লো। সেটা শোভনলালের মিনতি-ব্যাকুল চিঠি। আজ অতীতের স্মৃতি ওর মনকে চঞ্চল ক'রে তুল্‌লো। এখন আর আগেকার সেই বিদ্যার গর্ব্ব নেই, স্বাতন্ত্র্য-বোধের উগ্রতা নেই। প্রেমের স্পর্শমণির আলোকে তার আত্মার ক্ষেত্র হ'য়েচে উদার, প্রশস্ত। সে আজ দরদী। ব্যথিত চিত্তে সে আজ নিজেকেই নিজে শুধালে,—সেদিনের সেই প্রত্যাখাত প্রেম এতোদিন কোন অমৃতে বেঁচে রয়েচে! উপেক্ষিত প্রেমের ব্যথা কি তীব্র সে আজ তা' বোঝে। বিশেষতঃ, অতৃপ্তপ্রেমের ব্যথায় লাবণ্যের অন্তরও দগ্ধ হ'চ্ছিল। তাই আজ অতি সহজেই তার দরদী চিত্ত থেকে নেমে এল শোভনলালের প'রে বিগলিত করুণা। শোভন-লালের সেই সর্ব্বংসহা প্রেম আজ সে নিঃসংশয়ে উপেক্ষা করতে পার্‌লে না। তাই অমিতর সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে বদ্ধ হ'য়ে এ ব্যাপারের একটা চরম মীমাংসা ক'রে শোভনলালকে চিরদিনের জন্যে দুঃসহ ব্যথা দিতে তার মনে আজ জাগ্‌লো দ্বিধা, এলো সঙ্কোচ।·········একদিন যেমন অকস্মাৎ

ওদের দেখা হ'য়েছিলো, আজ তেমনি অকস্মাৎ সন্ধানের কোন চিহ্ন না রেখে লাবণ্য অমিতর জীবন থেকে বিদায় নিলে।

শেষের কবিতার শেষ প্রশ্ন হচ্ছে, দুই বিবাহব্যাপারের সঙ্গতি কোথায়? – লাবণ্য বা অমিতর পক্ষে দুজনকে একসঙ্গে ভালবাসা কি সম্ভব? বিরহের গোড়ার ব্যথা যখন মিবে এল, অমিত তখন লাবণ্যের সত্যরূপটী বুঝ্‌তে পার্‌লে। একদিন ওর অন্তরের কবি ব'লেছিলো, "না-চেনা জগতে বন্দী হ'য়েচি, চিনে নিয়ে তবে খালাস পাবো, একেই বলে মুক্তিতত্ত্ব"। ওদের মধ্যে যে সত্যসম্বন্ধ তাকে জোর ক'রে স্থায়ী কর্‌বার জন্তে বিবাহ করা যে একান্ত ভুল—একথাটা যখন কিছুদিন পরে অমিত বুঝ্‌তে পার্‌লে, তখন এই বিচ্ছেদের জন্তে ওর মনে আর কোনো গ্লানি রইল না। ওর মন আজ খালাস পেলে। কিন্তু অমিতর প্রাণের স্পর্শে লাবণ্য যেমন শিখেছিলো ভালোবাস্‌তে, লাবণ্যের প্রেমের স্পর্শে অমিতর অন্তর থেকে তেমনি অনেকটা দূর হ'য়ে গেছ্‌লো স্বপ্নের ঘোর। ও চাইতে শিখেছিলো জীবনে বাস্তবতা। প্রেমের ধর্ম্মই এই। একে অন্যের চিত্তকে পূর্ণতর ক'রে তোলে।···

ওদের বিচ্ছেদ যখন ঘট্‌লো, কেতকীর জীবনে এল সুযোগ। তাই এবার তার দিক থেকেই চেষ্টা হ'ল প্রবল। সে তার প্রেম দিয়ে অমিতর বেদনার দিনে ওর চিত্তের শূন্যতাকে ভরে দেবার চেষ্টা ক'রলো। ধরিত্রীর সহিষ্ণুতা নিয়ে সে আপনাকে গড়্‌তে লাগলো অমিতর রুচির মত ক'রে। এই একাগ্র সাধনায় একদিন সিদ্ধি মিল্‌লো। অমিতর বিমুখ চিত্তকে সে একদিন জয় ক'র্‌লে। কিন্তু কেতকীর প্রেম শুধু দিতে পার্‌ত—এই বাস্তবতা—সাংসারিক তৃপ্তি। অমিতর 'মানসভোজে'র ক্ষুধা মেটাবার স্থান এতে ছিল না। তাই অমিত কেতকীর অর্ঘ্যকে গ্রহণ ক'রে তার সেই নব-প্রবুদ্ধ বাস্তবতার তৃষ্ণা মেটালো। ও দুজনকেই ভালোবাসত, আর সে ভালোবাসা আপন আপন সীমার মধ্যে ছিল সম্পূর্ণ। এতে কোন ফাঁকি ছিল না। লাবণ্যের সঙ্গে ছিল ওর intellectual friendship ওর অন্তরের নিবারণ চক্রবর্ত্তী ছিল লাবণ্যের প্রিয়তম। ওর মধ্যে বাকি আর যা' কিছু,—তার প্রিয়া কেতকী। কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হবে যে অমিতর মত গুণী, প্রতিভাবান্ পুরুষের কাছে নিবারণ চক্রবর্ত্তী তার অন্তরের সবচেয়ে ভালো এবং সবচেয়ে বেশী জায়গা অধিকার ক'রেছিল। লাবণ্যের কাছ থেকে অমিতর মিল্‌লো জীবনের সঙ্গ। কিন্তু লাবণ্য যা দিতে পার্‌লে না—তা নিঃশেষে এনে দিলে কেতকীর প্রেম। তা'তে আছে জীবনের আসঙ্গ।··· ··

এদিকে অমিতর চিত্তজয় কর্‌বার জন্তে যেমন চেষ্টা এসেছিলো কেতকীর কাছ থেকে, লাবণ্যের অন্তর জয় কর্‌বার জন্যও ওদিকে তেম্‌নি চেষ্টা ক'রছিলো শোভনলাল। এরা দুজনেই আপন আপন প্রেমাস্পদের বিমুখ চিত্ত জয় করেচে নিজেদের প্রেমের একাগ্রতা এবং অজস্রতা দিয়ে। লাবণ্য কেন তার প্রেমকে প্রত্যাখান ক'রেছিলো—সে কথা জান্‌বার জন্ত শোভনলাল যে চিঠি লিখ্‌লে, এর মধ্যে রয়েচে সেই চেষ্টার প্রকাশ, যদিও সে তখনো লাবণ্য ও অমিতর সম্বন্ধের কথা জান্‌ত না। যে একজনকে ভালোবাসতে শিখেচে, আর একজনকে ভালোবাসা তার পক্ষেই সম্ভব। যে ভালোবাসতে জানে না, সে কাউকেই ভালোবাস্‌তে পারে না। পূর্ব্বেই বলা হ'য়েচে, একদিন সুদূর জীবন-প্রভাতে প্রেমের যে নবাঙ্কুরটীকে লাবণ্যের দম্ভ ও অভিমান জোর ক'রে মেরে ফেলেছিল, আজ হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে চিঠি পাবার পর তা' বেশ জোর করেই আত্মপ্রকাশ করলে। বিশেষতঃ, এতদিন যত জোরের সহিত শোভনলালের প্রেমকে প্রত্যাখান করা হ'চ্ছিল, আজ তত জোরেই তার আবেগ লাবণ্যের চিত্তকে চঞ্চল ক'রে তুল্‌লে। Action and Reaction এর নীতি জীবনের সকলক্ষেত্রেই রয়েচে।

অনেকের ধারণা, প্রেমমাত্রই একান্ত এবং চিরন্তন। কিন্তু প্রেমতত্ত্বের- এ ধারণা অতিস্থূল। প্রেমের মধ্যে সূক্ষ্ম স্তর রয়েচে। এমন কি সত্যকার প্রেমও সবক্ষেত্রে একান্ত নয়। বিশেষতঃ, সূক্ষ্মচিত্তের জটিলরচনার মধ্যে

প্রেমের স্থান যে খুব সম্ভব ও স্বাভাবিক—তা' আজকালকার ঔপন্যাসিকদের সূক্ষ্ম দৃষ্টি ধরে ফেলেচে। এমন কি Romain Rollandও তার John Christophor উপন্যাসে এর যথেষ্ট পরিচয় দিয়েচেন। শরৎচন্দ্রের কমলের মত সবল, নিরাসক্ত চিত্তেও ("পুরুষের ভোগের বস্তু যারা,—আমি তাদের জাত নই"।) অজিতকে ভালোবাসা সম্ভবপর হ'য়েছিলো অথচ সে শিবনাথকে কিছু কম ভালোবাসতো না। লাবণ্যের চরিত্র বিশ্লেষণে আমরা "অশীতিপর" রবীন্দ্রনাথের খুব আধুনিক মনের পরিচয় পাই।

অমিত ও কেতকীর বিবাহের সংবাদ যখন এলো, তখন লাবণ্যও তার ভবিষ্যতের একটা চরম মীমাংসা করে ফেল্‌লে। শোভনলালের 'পরে তার যে ভালোবাসার সম্বন্ধ ছিল শুধু সে কারণেই নয়—এখানে আরো একটা কারণ আছে। বিচ্ছেদের পর সেই ব্যাকুল দিনে তার প্রাণ খুঁজছিলো ছোট্ট একটা নীড়, যেখানে মিল্‌বে শান্তি, মিলবে আলো, মিল্‌বে বিশ্রাম;—যেখানে এই বুক ভরা ব্যথা, এই না-পাওয়ার অশান্তি দূর হ'য়ে যাবে জীবনের পরিপূর্ণতায়। শোভনলালের কাছে মিল্‌লো সেই ছোট্ট নীড়। যখন সে পিতৃগৃহে সৌভাগ্যের উচ্চশিখরে,—তার জীবনের সেই শুক্ল পক্ষ হ'তে বারবার প্রত্যাখ্যান পেয়েও আজ এই নিরাশ্রয়, চাকরীজীবি, অমিতর উপেক্ষিত নারীকে শোভনলালের যে মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেম কামনা করছিলো, তার অন্তরের ভালো-মন্দ, সাধারণ অসাধারণ সবটুকু স্থান নির্বিচারে গ্রহণ করতে চাইছিলো,—আজ সেখানেই সে আশ্রয় নিলে। ওর কথাতেই বলি,

"শুক্লপক্ষ হ'তে আনি'
রজনী গন্ধার বৃন্তখানি
যে পারে সাজাতে
অর্ঘ্যথালা কৃষ্ণ পক্ষ রাতে,
যে আমারে দেখিবারে পায়
অসীম ক্ষমায়
ভালোমন্দ মিলায়ে সকলি,
এবার পূজায় তারি আপনারে
দিতেচাই বলি।"

শেষের কবিতার যা' মূলতত্ত্ব তা' চরিত্রের মধ্যে দিয়ে ফোটাতে গিয়ে শিল্পী বাস্তবতার সংস্পর্শ হারান নি। তাই উপন্যাসের গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত চরিত্রগুলি পূর্ণাবয়ব ও সুসঙ্গত। চরিত্রগুলির যে বৈশিষ্ট্য নিয়ে গ্রন্থের আরম্ভ হয়েছিল, শেষ অধ্যায়ে দেখি তাদের পরিণতি খুব স্বাভাবিক। বিবাহ না হওয়ার দরুণ অমিতর মনে কোনো গ্লানি ছিল না। কারণ ওর পাওয়ার মধ্যে কোনো ফাঁক নেই। ও আজ বুঝেচে, ওর মনের higher self এর জন্যে লাবণ্যের যে intellectual friendship চেয়েছিলো, তা' ও নিঃশেষে পেয়েচে। তাই এই বিচ্ছেদে ওর বিশেষ ক্ষতি হয়নি। লাবণ্যও তাই বলেছিল, "তোমার হয়নি কোনও ক্ষতি।" কিন্তু লাবণ্য ত' অমিতর মধ্যে কেবল ভাবরসের সম্ভোগ খোঁজেনি, সে আরো বেশী কিছু বাস্তব চেয়েছিলো। তাই এই বিচ্ছেদকে ও নির্বিকার চিত্তে গ্রহণ করতে পারেনি। বিচ্ছেদের পরে ওর মনের গোপন কোণে লুকিয়েছিল বেশ একটু গ্লানি। তাই ওর শেষ-কবিতার মধ্যে রয়েচে বেশ একটু বিষাদের সুর। ও ওর অজ্ঞাতেই বল্‌চে, "যা মোর ধূলির ধন! যা মোর চক্ষের জলে ভিজে!"

তাই প্রথমে ও বিবাহ করতে পারেনি। বিবাহ করেছিলো আগে অমিত। ওর মনে কোন গ্লানি ছিল না। তাই অমিতর শেষ-কবিতায় কোনো ব্যথার রেশ নেই। ও-যেন পরিতৃপ্ত অন্তরে বিধিলিপিকে গ্রহণ করেচে। ওর চরিত্রের এই ভেদ মেয়ে পুরুষের চিরন্তন বৈশিষ্ট্য। পুরুষ সবচেয়ে আগে ভুলতে পারে। কবির কথাতেই বলি, "পুরুষ তার সমস্ত শক্তিকে সার্থক করে সৃষ্টি করতে, সেই সৃষ্টি আপনাকে এগিয়ে দেবার জন্যেই আপনাকে পদে পদে ভোলে। মেয়ে তার সমস্ত শক্তিকে খাটায় রক্ষা করতে, পুরোনোকে রক্ষা করবার জন্যেই নতুন সৃষ্টিকে সে বাধা দেয়।"....

শেষের কবিতার মূল কথা হচ্ছে, বিবাহে যদি মানুষের higher self ও lower self—চিত্তের এই দুই স্তরেরই সঙ্গী পাওয়া যায়;—বিবাহে যদি জীবনের সঙ্গ ও আসঙ্গ একত্রেই মেলে, তবে সেটা জীবনের পরিপূর্ণতার পক্ষে খুবই সৌভাগ্যের পরিচয়। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে যদি তা' না মেলে, তবে দুঃখের বিষয় কিছু নেই। যেটা না-পাওয়া বিবাহ সম্বন্ধের মধ্যে সেটাকে জোর ক'রে পরিতৃপ্তি করতে গিয়ে ট্রাজেডি সৃষ্টি করবার আবশ্যক নেই। জীবনের আকাঙ্ক্ষিত এই সঙ্গ ও আসঙ্গ পৃথক-পৃথক পাত্র-পাত্রীর মধ্যে দিয়েও নির্বিরোধে ভোগ করা যেতে পারে;—একে জীবনের যে পরিপূর্ণতা মেলা অসম্ভব, নির্দিষ্ট সীমাকে লঙ্ঘন না ক'রলে দুয়ে তা' সম্ভোগ করা খুবই সম্ভব হ'তে পারে। কিন্তু সকলের পক্ষে সে আশা করা দুরাশা। কবি অমিতর মুখ দিয়ে সে সতর্ক-বাণী শোনাতে ভোলেন নি। চিত্ত যার সূক্ষ্ম এবং সংযত আর যার জীবনপ্রাঙ্গণে সেই একত্রে পাবার দুর্লভ সুযোগ ঘটেচে, তার পক্ষেই এ সম্ভব,—তার পক্ষেই এ শোভন।

শ্রীকাননবিহারী মুখোপাধ্যায়

ডায়েরী

শ্রীযুক্ত নবেন্দু বসু এল্-এল-বি

এ জীবনে যতগুলি প্রতিজ্ঞা করেছি, আর করে' ভঙ্গ করেছি, ডায়েরী লেখা তার মধ্যে একটি। আমার জীবনের ডায়েরী লিখে রাখবো এ ধারণা মাথায় প্রবেশ করেছে যেদিন থেকে "এক শৃগাল এক দ্রাক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশ করিল" বলে' হাতের লেখা মক্স করতে সুরু করেছি। তারপর হাতের লেখা ভালো হয়ে আবার খারাপ হয়ে গেল কিন্তু আজ পর্যান্ত ডায়েরীতে সে হাতের লেখা এক ছত্রও স্থান পেলে না। ফলে, ডায়েরী লেখার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করার দরুণ আমার জীবনের অন্যান্য প্রতিজ্ঞাচ্যুতির ইতিহাস জগত জানতে পারলে না। কিন্তু এখন ভাবছি যে তাতে জগতের লাভ বা ক্ষতি কতটাই হয়েছে? কারণ এমন কোন প্রতিজ্ঞাই আমার মনে পড়ে না যেটা রাখতে পেরে বিশেষ লাভবান হয়েছি বা যেটা ভঙ্গ করে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি। কাযেই তার ইতিহাস থেকে শিশুদের নীতিপাঠও সংকলিত হ'তে পারতো না আর আমার সাফল্য আর নিষ্ফলতার কাহিনী থেকে বয়োবৃদ্ধদের হিংসা আনন্দের উপকারণও সংগৃহীত হ'ত না।

ডায়েরী লেখার চেষ্টায় চিরদিন যে বাধা অনুভব করেছি সেটা ঐ উপরোক্ত ধরণের। অর্থাৎ কি উদ্দেশ্যে ডায়েরী লিখবো? যদি কুড়ি বছর অন্তর নিজের পড়বার জন্যেই সে হয় তাহ'লে সে ডায়েরী লেখবার প্রয়োজন কি? কাগজে যে ইতিহাসটা লেখা থাকবে তার চেয়ে তো আমার স্মৃতিফলকে খোদা কথাগুলো অনেক বেশী উজ্জ্বল। অবশ্য কাগজে এমন অনেক কথা হয় ত স্থান পেত' যা আজ স্মৃতির কোন অন্ধকার কক্ষে ধূলিম্লান অবস্থায় পড়ে আছে, আর তাকে খুঁজে বার করবার উপায় নেই, কিম্বা কোন ফাঁকে হয় ত একেবারেই উধাও হয়ে মহাব্যোমে মিশিয়ে গেছে। কিন্তু যা হারিয়ে গেছে সেটাতে নিশ্চয় আমার তেমন মায়া ছিল না, আর যা চলে' গেছে তা নিশ্চয় লঘু প্রকৃতিরই ছিল নইলে উড়ে যেতে পারবে কেমন করে'? আর যদি সেগুলো অত অনিত্যই হয় তাহ'লে সেগুলোকে অনর্থক ধরে' রেখে স্থান জোড়া ক'রে লাভ কি হত? অনেক খাঁটি জিনিষ হয় ত তার আড়ালে চাপা পড়ে' যেতে পারতো। দ্বিতীয়তঃ আমার স্থায়ী স্মৃতি যেগুলি সেগুলি হারাবার তো কোন ভয় নেই, কেন না তারা এখন আমার অংশভূত হয়ে গেছে; যতদিন আমি আছি ততদিন সেগুলিও আমার আমিত্বের ভিত্তিগত হয়ে আছে। বৎসর আগে সকালবেলা কি দিয়ে ভাত খেয়েছি সে কথা আমার মনে নেই, কিন্তু বহুদিন পূর্ব্বে একদিন এক স্বচ্ছ দুপুরে নীল আকাশের কোলে একটা চীলের ওড়া বিশেষ করে' আমার মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল সে কথা আমার আজও মনে আছে—কেন তা জানি না—সেটার প্রতি চেয়েছিলুম যতক্ষণ না ক্রমশঃ বিন্দুবৎ হয়ে সেটা একেবারেই আমার দৃষ্টির বাইরে চলে' গেল। কিন্তু সেদিনের সেই অকারণ চেয়ে থাকার মোহ আজও কাটাতে পারি নি। সে সুনীলের মায়া কেন জানি না আজও চোখে লেগে আছে। আজ প্রতিদিন সে উপলব্ধির পুনরাবৃত্তি হচ্ছে, তবু প্রতি সকালবেলাই আকাশের সে নীল নতুন করে' দেখি। আজকে এই শেষ শরতের সকালবেলা দেখে মনে হয় যে সে রঙে আজ পর্য্যন্ত ধুলো পড়ে নি। বোধ হয় প্রতি রাত্রেই আকাশ-বধূ একখানা নতুন নীলাম্বরী বদলে পরে। আজ মাটীর উপর, ঘরে, বাইরে নীল রং দেখলে সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় আকাশের মতন নীল নয়। এ কথাটা ডায়েরীতে লেখা থাকলে, আমার উপলব্ধি কি আরো বেশী হ'ত? আর লেখা ছিল না বলে কি আজ লিখিতে আটকালো? ভাত খাবার কথাটাই যদি বা লিখতুম তাতে কি হ'ত? আজকের চেয়ে যদি খারাপই খেয়ে থাকি তো সেটা মনে করে' অতীতের দুঃখটাকে

বর্ত্তমানের তৃপ্তির মধ্যে টেনে এনে আজকের অনুভূতিকে বিবাদঘন করে' তুলি কেন? আর সেদিনের দৈন্যের স্তব্ধ বিরাট গাম্ভীর্য্য আর ত্যাগমহিমাকে আজকের উল্লাসের কলরব মিশিয়ে তরল করে' ফেলি কেন? এক যদি লিখে রাখতুম যে সেদিন চালের দর এত ছিল তাহ'লে হয় ত আজকের অর্থনীতিকের সাহায্য হ'তে পারতো—কিন্তু সেও সে তথ্যের জন্যে লাইব্রেরীতে সরকারী গেজেটই ঘাঁটতো, আমার কথায় বিশ্বাস ক'রত না কখনই।

ডায়েরী কি তাহ'লে পরের জন্য লিখি? কেন না দেখতে পাই যে বাজারে ডায়েরী শ্রেণীর লেখার অল্প স্বল্প চাহিদা আছে; যদিও এর পেছনে পরের ঘরের খবর জানবার আদিম কৌতূহল ছাড়া আর বেশী কিছু দেখতে পাই না। কিন্তু আমার অন্তরের আপত্তিকার এইখানে বলে যে পরে পড়ে বলে' ডায়েরী লিখি না, ডায়েরী লিখি বলেই পরে পড়ে। অর্থাৎ অন্য রচনা বা সৃষ্টির মতন ডায়েরীও কারো মুখ চেয়ে লেখা হয় না—নিজেরও নয়, পরেরও নয়। যে কোন শিল্পসৃষ্টির মতন ডায়েরী রচনাও মোটের ওপর উদ্দেশ্যমূলক নয়, আর সাংসারিক ভালোমন্দর দিক থেকে নিরর্থক। আমি বলি রুসোর স্বীকারোক্তি তাহ'লে সমাজের ওপর কোন প্রভাব রেখে যায় নি কি? আপত্তিকার অন্যমনস্ক হয়ে বলে—হবে, কিন্তু সেটা কি মুখ্যতঃ না গৌণ? সে বলে যে ডায়েরী রচনার ভিত্তিও মানুষের স্বাভাবিক নিঃস্বার্থ সৃষ্টি প্রেরণার ওপর, উপলব্ধির আনন্দকে লিখে ছড়িয়ে সকলের সঙ্গে ভাগ করে' নিয়ে ভোগ করবার প্রবণতার ওপর, নিজের কল্পনাকে বস্তুগত রূপ দান করে অন্যের চোখে দেখবার প্রেরণার ওপর।

নানাকারণে তাহ'লে মেনেই নিতে হয় যে ডায়েরী লেখায় কোন অন্যায় নেই, আর ডায়েরী লেখবার জন্যে যদি প্রকৃতই আমার কলম নাচে, তাহ'লে তাকে আটকানো যাবে না। কিন্তু যতক্ষণ তা না হয় ততক্ষণ এ বিষয়ে আরো ভাবি যে ডায়েরী লিখলে কি ভাবে লিখবো? ডায়েরী দু'রকমে লেখা যায়—Evelyn's diary আর Pepys' diary—"আমার জীবন" বা "জীবন স্মৃতি।" একটা হ'ল জীবন, অন্যটা হ'ল স্মৃতি—অর্থাৎ একটা হ'ল আমার জীবন সম্বন্ধে সমস্ত ঐতিহাসিক তথ্যের আকর, জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক, সাধারণ এবং অসাধারণ সব। অন্যটা হ'ল কেবল আমার কল্পনার চোখে দেখা আমার চরিত্র আর মনোভাবের ছবি। কাযেই আমার সাধারণ জীবনের যে ঘটনাগুলো আমার অসাধারণ জীবনের ওপর কোন ছাপ রাখে নি সেগুলো তা থেকে বাদ পড়ে' যায়। "আমার জীবন"-এ তাই সত্যের অনুরোধে আমার পরকীয়া প্রীতির কথাও খুলে লিখতে হয় আর "জীবনস্মৃতি"তে সত্যের অনুরোধেই নিজের স্ত্রীর উল্লেখ না করলেও চলতে পারে। একটা হ'ল আমার হাঁড়ীর খবর, অন্যটা একেবারেই আমার নাড়ীর গূঢ় সংবাদ। একটাতে বলতে চাই—বৎসর আগে আমি কি দিয়ে ভাত খেয়েছি, অন্যটাতে লিখে ভাবি কেমন করে' আমার রক্তের নীল ধারার সঙ্গে আকাশের নীলা মিশিয়ে গেল।

আমার সম্বন্ধে "আমার জীবন" লেখবার কোন উদ্দেশ্য আমার নেই। অন্ততঃ এখন পর্য্যন্ত নেই। কেন নেই খুলে বলতে গেলে কতক পরিমাণে আমার জীবনের কথাই অবতারণা করতে হয় কাজেই সে ফাঁদে আমি পা দেব না। মোটের ওপর বলতে পারি যে তাতে আমার নিজের প্রয়োজন নেই, অপরের প্রয়োজন নেই, প্রেরণা নেই আর সাহসও নেই। ঘরে ঘরণীর সঙ্গে জীবনব্যাপী সখ্য আর প্রীতির সম্বন্ধ অটুট রাখবার দুঃসাহসিক চেষ্টায় ব্যাপৃত আছি; সে সাধনায় নিজের দোষে বাধা উৎপাদন করতে চাই না। আর আমার এমন কোন স্থান নেই যেখানে গিয়ে নিরালায় ডায়েরী লিখতে পারি অথচ আমার স্কন্ধের ওপর থেকে কারো দৃষ্টি তার ওপর পড়বে না। আমায় ছেড়ে আমার ছায়া কোথায় থাকে? ঘর ছেড়ে দূরে জনবিরল মাঠে বসে' লিখতে গেলে দুর্দান্ত আকাশ আর আলো, আমায় বলে যার স্থান ঘরের ঘেরা দেয়ালের মধ্যে করতে পারোনি সে সংকীর্ণতার স্থান এ মুক্তির মধ্যে হবে না।

তবে কি "জীবন-স্মৃতি" লিখবো? কিন্তু সেটা তো তবেই হবে যখন জীবনের সব স্মৃতি সঞ্চয় করা হয়ে গেছে। ভগবানের আশীর্ব্বাদে বা অভিশাপে এখনও আমার চোখে আমার স্মৃতি সঞ্চয় করবার দিন ফুরিয়ে যায় নি। এখনও

এক মাসে পাঁচ গাছির বেশী কটা চুল মাথায় পাওয়া যায় না। সঞ্চিত স্মৃতিগুলি এখনও প্রতিক্ষণে ভোল বদলায়। আজ এক রকমের অর্থ দিচ্ছে, কাল বিনাকারণেই কিম্বা অন্য স্মৃতির সংস্পর্শে অন্যরকম। কাযেই এখন "জীবন-স্মৃতি" লিখলে সেটা ঠিক জীবন-স্মৃতি হবে না, হবে, জীবন-স্বপ্ন। পরে তার বিশুদ্ধ সংস্করণ বা'র করবার প্রয়োজন হবে। "জীবন-স্মৃতি" তবেই লিখতে পারবো যবে আজকের বাষ্পগুলো জমে' পাথর হয়ে যাবে, আর এদিকে দৃষ্টিও এত নিষ্প্রভ হয়ে আসবে যে সে রন্ধ্রপথে কোন নূতন আলো প্রবেশ করে' সে পাথরকে রূপান্তরিত করতে পারবে না। কিন্তু ভয় হয় যে আজ এই ঘন নীল উজ্জ্বল দিনে আমার সমুখে এলানো মাঠের ওপর ঐ জলাটার ধারে যে কাশফুলগুলো দুলছে, সেদিনে, সেই ভবিষ্যতের দিনে, সে দোলাটুকুর সংবাদ দিতে গিয়ে তার অন্তর্গত লীলাটুকুর কথা বলবার প্রবৃত্তি থাকবে কি না। কেন না তখন হয় ত মন হয়ে পড়বে গুমরে-মরা —ভাববে বুড়ো বয়সে ঐ ছেলে বয়সের আহ্লাদের কথা অন্যকে বলে' লাভ কি—সেটা তো বুড়োবয়সের বাতুলতার মধ্যেই ধর্ত্তব্য। কিন্তু সেদিন আমি যেন এটা ভুলে না যাই যে বুড়োবয়সের মধ্যে ছেলেবয়স চিরদিনই ধরা আছে, আর অন্তে যেন একথা আবারো আমাকে মনে করিয়ে দেয় যে ডায়েরী লেখবার জন্যেই লেখা, পড়ে' কে কি বলবে সে জন্যে নয়। এ যদি না হয় তাহ'লে স্মৃতির সূতায় গাঁথা আমার জীবনের সকল দিনগুলি যেগুলি প্রতি বসন্তের প্রভাতে দুলে ওঠে, গ্রীষ্মের তপ্তবাতাসে ঘোরে-ফেরে, শরতের সূর্য্যাস্তে সোণা মাখায়, আর শ্রাবণের রাতে নূপুর বাজায়—স্মৃতিফুলে গাঁথা আমার সেই মনোহর মালা মরণদূতীর গলায় ঝুলিয়ে দিয়েই তার হাত ধরে' বা'র হয়ে যেতে হবে, মনে এই আশা নিয়ে যে সে-ই সেগুলিকে চিরসৌরভে সঞ্জীবিত করে' রাখবে।

আমার ডায়েরী লেখা তাই ভবিষ্যতের হাতে, অপরের হাতে। বর্ত্তমানে, যুক্তির বলে আমার সিদ্ধান্ত এই যে আমি ডায়েরী লিখবো না। খেয়ালের বশে আমার প্রতিজ্ঞাও তাই। আর আমি আশা করি যে ডায়েরী লেখবার প্রতিজ্ঞার মতন ডায়েরী না লেখবার প্রতিজ্ঞা আমার ভঙ্গ হবে না। কৈফিয়ৎ উপলক্ষে ডায়েরী-সূচক যে সকল কথাগুলো বলে' ফেলেছি সেগুলোর জন্যে পাঠকের কাছে ক্ষমা চাই।

শ্রীনবেন্দু বসু



চিত্র-শিল্পী শ্রীযুক্ত ব্রতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বর্ত্তমান সংখ্যার চিত্রশালায় সুনিপুণ শিল্পী শ্রীযুক্ত ব্রতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাতখানি রঙিন ছবির প্রতিকৃতি প্রকাশিত হইল। রঙিন ছবির এক রঙা প্রতিকৃতি দেখিয়া মূল বস্তুর পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যের উপলব্ধি করা সম্ভবপর নয়,—প্রতিকৃতিতে মূল চিত্রের বর্ণ বিন্যাসের কোনো চিহ্ন থাকে না বলিয়াই শুধু নয়, রঙিন ছবি হইতে এক রঙা ব্লক করিলে বস্তুধর্ম্মের প্রভাবে প্রতিকৃতিতে মূল চিত্রের ছায়ালোক ঠিক অনুরূপ ক্রমে প্রতিফলিত হয় না, যেমন Black and White ছবির বেলায় হয়। তথাপি, এই সাতখানি চিত্রের বিরচন (Composition) ও অঙ্কনের (Drawing) নৈপুণ্য দেখিয়া চিত্র-রস রসিকগণ যে আনন্দলাভ করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

ব্রতীন্দ্রনাথ বাংলা দেশের প্রতিভাদীপ্ত সুবিখ্যাত ঠাকুর পরিবারের সন্তান। ইনি দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রপৌত্র শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র। ইঁহার বয়ক্রম মাত্র ২৬ বৎসর, কিন্তু এই অল্প বয়সেই ইনি চিত্রবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন।

৫।৬ বৎসর বয়স হইতে ব্রতীন্দ্রনাথ ছবি আঁকা আরম্ভ করেন। প্রথমে অবশ্য, সাধারণতঃ যেমন হইয়া থাকে, কাহারো নিকট নিয়মিত শিক্ষা পান নাই। কিন্তু বাড়িতে তখন অনেকেই ছবি আঁকিতে ব্যস্ত। শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথের ছাত্রবৃন্দও তখন নিয়ত ছবি আঁকিতে আসিতেন। তাঁহাদের নিকট বসিয়া বালক ব্রতীন্দ্রনাথ ছবি আঁকা দেখিতেন এবং শিল্পী হইবার জন্য আগ্রহান্বিত হইতেন। সেই সময়ে জাপানের বিখ্যাত চিত্রশিল্পী টাইকোয়ান হিসিডা, থাটস্টা উঁহাদের বাড়ীতে আসিয়া থাকেন। তাঁহাদের মস্ত বড় বড় ছবি আঁকা দেখিতে ব্রতীন্দ্রনাথ খুব ভালবাসিতেন।

ইহার পরেই বিখ্যাত শিল্পী শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর নিকট ব্রতীন্দ্রনাথ নিয়মিত ছবি আঁকা শিখিতে আরম্ভ করেন। মাঝে একজন ইটালীয় শিল্পীর নিকট model drawing, black and white আঁকা অভ্যাস করেন। তখনো নন্দলালের নিকট শিক্ষা চলিতেছে। ইহার পর রবীন্দ্রনাথের সহিত জাপান হইতে শিল্পী আরাই সান কলিকাতায় আসেন। তাঁহার কাছে ব্রতীন্দ্রনাথ তিন বৎসর জাপানী পদ্ধতিতে রেসমের উপর অঙ্কন, brush drawing ইত্যাদি শিক্ষা করেন। ইহার কিছু দিন পরে শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু শান্তি-নিকেতন চলিয়া যান। তাহার পর নিজের অধ্যবসায় ও অবনীন্দ্রনাথের সাহায্যে ব্রতীন্দ্রনাথ ছবি আঁকার পথে অগ্রসর হন। এখনও তিনি অবনীন্দ্রনাথের নিকট হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাইতেছেন।

ব্রতীন্দ্রনাথ তাঁহার গৃহে একটি শিল্পী বন্ধুমণ্ডলী গড়িয়া তুলিয়াছেন। প্রত্যহ সেই বন্ধুগণের সহিত তিনি একযোগে কাজ করেন ও সকলে মিলিয়া অবনীন্দ্রনাথের নিকট উপদেশ গ্রহণ করেন।

জার্ম্মানীর বার্লিন সহরে Crown Princeএর প্রাসাদে যে চিত্রপ্রদর্শনী হয় তাহাতে ব্রতীন্দ্রনাথের কয়েকখানি ছবি বিশেষভাবে প্রশংসিত হইয়াছিল।

ব্রতীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠতাত শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং খুল্লতাত শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর—উভয়েই সুবিখ্যাত চিত্র শিল্পী। তাঁহার পিতা সমরেন্দ্রনাথ এক সময়ে অনেক ছবি আঁকিয়াছিলেন—কিন্তু তিনি সেই শ্রেণীর মানুষ যাঁহারা নিজেদের শক্তির বিষয়ে অচেতন এবং লোকচক্ষুর অন্তরালে লুকাইয়া থাকিবার কৌশল যাঁহারা বিশেষরূপে অবগত। সুতরাং জনসাধারণের মধ্যে সমরেন্দ্রনাথের বিশেষ কোনও পরিচয় নাই। কিন্তু পুত্রের মধ্যে নিজ শক্তিকে তাঁহার দান করিতে হইয়াছে। শিল্প সাধনার এই অনুকূল পরিমণ্ডলীর মধ্যে ব্রতীন্দ্রনাথ নিজের শক্তিকে উন্নীত করিবার বিশেষ সুযোগ পাইয়াছেন।

ব্রতীন্দ্রনাথ শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুকে গুরু বলিয়া জ্ঞান করেন এবং এই বহুমানাস্পদ গুরুর প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা এবং প্রীতি অপরিমেয়।

আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই তরুণ শক্তিমান শিল্পীর সমুজ্জল ভবিষ্যৎ কামনা করি।

সম্পাদক

বিচিত্রা-চিত্রশালা

শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের

চিত্রাবলী



কমল-বন



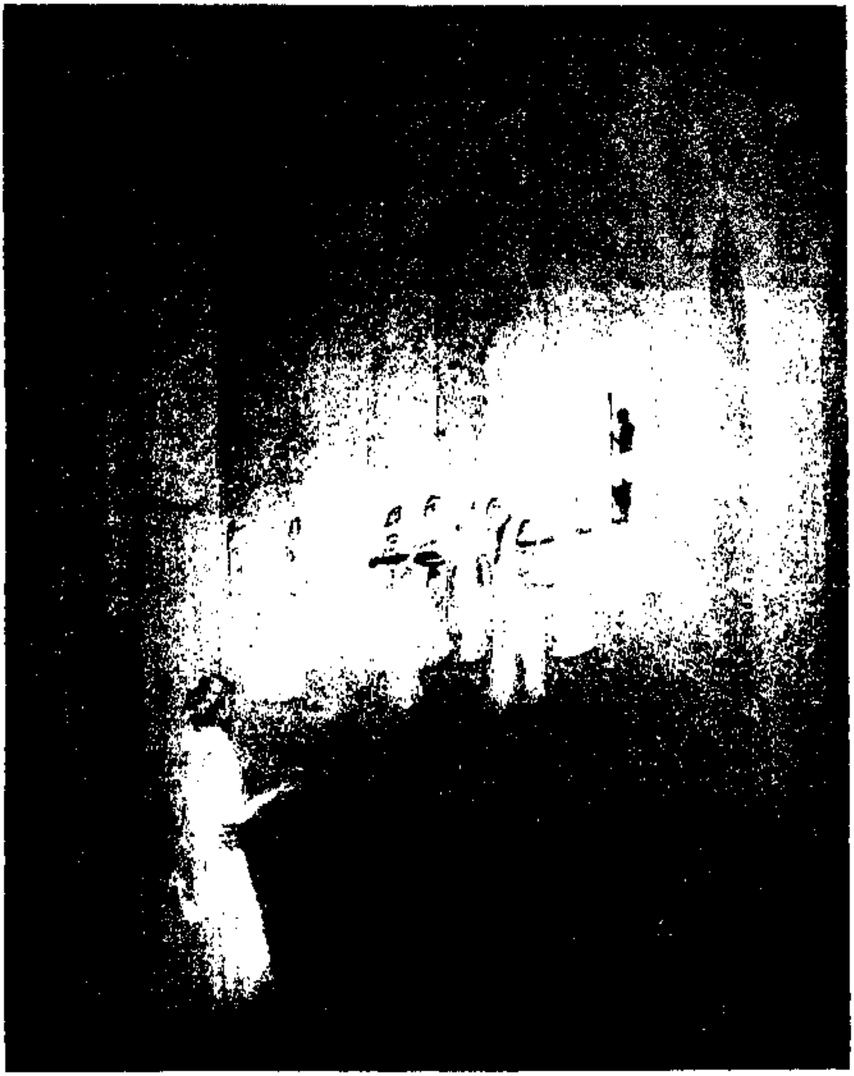
নৃত্য



ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী



নির্ঝরের পূজা



অধীনতার অবসান



উমার শিবকে অর্ঘ্যদান



গোপাল

বাংলা ছন্দে ধ্বনিতরঙ্গ

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন এম্-এ

বাংলা ছন্দের মূল প্রবাহ হচ্ছে তিনটি—অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত। তার মধ্যে অক্ষরবৃত্তে অনেকটা আড়ষ্টতা আছে; এর গতি স্বচ্ছন্দ নয়। এ ছন্দকে কেটে ছেঁটে, এর সঙ্গে সংযোগ-বিয়োগ ক'রে এর বাইরের রূপে অনেকটা পরিবর্ত্তন করা যায়। কিন্তু এর ভিতরের গঠনে বিশেষ বৈচিত্র্যসাধন করা যায় না।

কিন্তু মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত ছন্দে সংযোগ-বিয়োগের দ্বারা বাহ্য আকৃতিতে যেমন অনেক পরিবর্ত্তন সাধন করা যায় তেম্‌নি একটু চেষ্টা ক'রলেই এদের অন্তঃপ্রকৃতিতেও অনেক বৈচিত্র্য ঘটানো যায়। এদের গতিতে স্বচ্ছন্দতা ও এদের প্রকৃতিতে লীলাবৈচিত্র্য আছে। এস্থলে সে সম্বন্ধেই কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন।

অন্ততঃ ভারতচন্দ্রের যুগ থেকেই বাংলার কবিরা অনুভব করে আস্‌ছেন যে বাংলা ছন্দ জিনিষটা বড়ই একঘেয়ে, ওকে কেটে ছেঁটে বাড়িয়ে কমিয়ে, ঘন-ঘন মিল দিয়ে কিংবা খুব ঘটা ক'রে অনুপ্রাসের অলঙ্কার দিয়ে যে ভাবেই রচনা করা যাক্ না কেন কিছুতেই ওর একঘেয়ে ধ্বনিতে বৈচিত্র্য দেখা দেয় না। দিগক্ষরা, পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী সকলেরই মূল ধ্বনিটা এক, বৈচিত্র্যহীন। বাংলা ছন্দের এই মৌলিক ত্রুটির অবসান ঘটাবার অভিপ্রায়েই প্রায় দু'শো বছর যাবৎ বাংলায় সংস্কৃতের ধ্বনিতরঙ্গ (rhythm) প্রবর্ত্তনের অবিরাম চেষ্টা চ'লে আস্‌ছে। পরম ছন্দোবিৎ ভারতচন্দ্রই এ প্রচেষ্টার প্রথম প্রবর্ত্তক। কিন্তু বহুকাল যাবৎ বাঙালী কবিদের এই চেষ্টা সফল হয় নি। তার কারণ তাঁর ব্যবহৃত ছন্দটা ছিল অক্ষরবৃত্ত, ছন্দরচনার পদ্ধতিটা ছিল অক্ষর-গোণা, আর ভাষাটা ছিল সাধুভাষা। আর সাধুভাষায় যে বাংলার যথার্থ প্রকৃতি, অর্থাৎ খাঁটি বাংলার শক্তি, লীলা ও মাধুর্য্য নেই তা আজকাল কারও অজানা নয়। কাযেই ওই সব কবিদের সব চেষ্টাই যে ব্যর্থ হয়েছে তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই।

বাংলায় সংস্কৃত ছন্দ অর্থাৎ সংস্কৃত ধ্বনিতরঙ্গ প্রবর্ত্তনের ইতিহাস খুবই বিস্ময়কর। কিন্তু এস্থলে আমরা সে আলোচনা করব না; কারণ বাংলা ছন্দের ইতিহাস আলোচনা এ প্রসঙ্গের উদ্দেশ্য নয়। প্রাচীন বাংলা ছন্দের আলোচনা করাও এ প্রসঙ্গের উদ্দেশ্য নয়। এ প্রসঙ্গে আমরা শুধু আধুনিক অর্থাৎ রাবীন্দ্রিক যুগের ছন্দের বিষয়ই আলোচনা করব; বিশেষ ভাবে "মানসী"র (১২৯৪ সাল) সময় থেকে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত বাংলা কাব্য সাহিত্যে যে ছন্দ প্রচলিত আছে শুধু তাই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

যা হোক্, যে সময় থেকে রবীন্দ্রনাথ বাংলা কাব্যে মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত ছন্দের প্রবর্ত্তন ক'রলেন সে সময় থেকেই বাংলা ছন্দের ধ্বনিতরঙ্গ (rhythm) উৎপন্ন করা সম্ভব হ'য়েছে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও বাংলা ছন্দে ধ্বনিতরঙ্গ উৎপাদনের অনেক চেষ্টা ক'রেছেন। যথা—

(১)
অন্ধকারে সূর্য্যালোতে
সন্তরিয়া মৃত্যুস্রোতে
নৃত্যময় চিত্ত হতে
মত্ত হাসি টুটে।
বিশ্ব মাঝে মহান্ যাহা
সঙ্গী পরাণের
ঝঞ্ঝামাঝে ধায় সে প্রাণ
সিন্ধু মাঝে লুটে।
—দুরন্ত আশা, মানসী, রবীন্দ্রনাথ

(২)
তখন তারা দৃপ্তবেগের বিজয় রথে
ছুটেছিল বীর মত্ত অধীর, রক্তধূলির পথ বিপথে।

তখন তাদের চতুর্দ্দিকেই রাত্রিবেলার প্রহর যত
স্বপ্নে চলার পথিক-মতো
মন্দ-গমন ছন্দে লুটায় মন্থর কোন্ ক্লান্ত বায়ে ;
বিহঙ্গগান শান্ত তখন অন্ধরাতের পক্ষ ছায়ে।

—বিজয়ী, পুরবী, রবীন্দ্রনাথ

উদ্ধৃত দৃষ্টান্ত দুটিতেই ধ্বনিতরঙ্গের লীলা খুবই সুস্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্ববর্ত্তী বাঙালী কবিরা শত শত বৎসর চেষ্টা ক'রেও যা ক'রতে পারেন নি, রবীন্দ্রনাথ অনায়াসেই তা পারলেন। কারণ আজ পর্য্যন্ত এ দেশে যত কবি আবির্ভূত হ'য়েছেন তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথই হচ্ছেন একমাত্র ছন্দদ্রষ্টা ঋষি। তাঁর অঙ্গুলিস্পর্শে বাংলার ছন্দ-সরস্বতীর বীণার তারে যে কত বিচিত্র সুর-তালের ধ্বনি-তরঙ্গের উৎপত্তি হয়েছে তার সংখ্যা নেই। লক্ষ্য করার বিষয়, উপরে যে ধ্বনি তরঙ্গের নিদর্শন দেওয়া হ'ল তার কোনটিই অক্ষর-বৃত্ত ছন্দ নয় ; প্রথমটি পঞ্চমাত্রিক মাত্রাবৃত্ত, দ্বিতীয়টি চতুঃস্বর স্বরবৃত্ত ছন্দ। রবীন্দ্রনাথই প্রথম দেখলেন যে সংখ্যা-গোণা অক্ষরবৃত্ত ছন্দ এবং সাধুভাষার মধ্যে ছন্দের বিদ্যুৎ-চমক সৃষ্টি করার ক্ষমতাটি মারা পড়েছে। তাই তিনি মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত ছন্দ এবং খাঁটি বা চলতি বাংলা ভাষার যোগে ঐ বিচিত্র ধ্বনিতরঙ্গ সৃষ্টি ক'রতে পেরেছেন।

রবীন্দ্রনাথের পন্থা অনুসরণ ক'রেই সত্যেন্দ্রনাথ ছন্দ-জিজ্ঞাসার পথে আরও কতকটা অগ্রসর হ'য়েছেন। তিনিই অতি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের দ্বারা বাংলা ধ্বনিতত্ত্বের মূল কথাটি আবিষ্কার ক'রেছেন, যার ফলে এখন বাংলায় নব নব ও বিচিত্র উপায়ে স্বরতরঙ্গের সৃষ্টি করা সম্ভবপর হ'য়েছে। কিন্তু মনে রাখা উচিত যে সত্যেন্দ্রনাথ আসলে রবীন্দ্রনাথের আবিষ্কৃত ছন্দতত্ত্বের উপরই কারুকার্য্য ক'রেছেন মাত্র, রাবীন্দ্রিক ছন্দের এলাকা তিনি সম্পূর্ণ অতিক্রম ক'রে যেতে পারেন নি। তথাপি তিনি বাংলার কাব্যসরস্বতীর বীণায় যে তারটি যোজনা ক'রে গেছেন তার মূল্য কম নয় ; তাঁর এ দান আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে চিরকাল অক্ষয় হ'য়ে বিরাজ ক'রবে।

বাংলা ছন্দে কিরূপে স্বরতরঙ্গের সৃষ্টি করা যায় এখন আমরা তাই আলোচনা ক'রব। বাংলায় দীর্ঘস্বর কার্য্যত না থাকলেও বাংলার সমস্ত মূল ধ্বনিগুলিকে ছন্দের তরফ থেকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়—(১) লঘুস্বর, এবং লঘুস্বরান্ত ব্যঞ্জন, যথা অ, আ, ই, ঈ, ক, কা, কি, কী, ইত্যাদি। এগুলি সবই অযুগ্ম ব'লে, এদের অযুগ্ম স্বরও বলা যায়। (২) যুগ্মস্বর বা যুগ্মস্বরান্ত ব্যঞ্জন, যথা অই (ঐ), অউ (ঔ), আই, উই, এউ, খৈ, বৌ, ভাই, ছুই, ঢেউ ইত্যাদি। এ যুগ্মস্বরগুলি সবই স্বরান্তিক। (৩) ব্যঞ্জনান্তিক যুগ্মধ্বনি, যথা—অন্, ইন্, অব্, উর্, উথ্, মন্, দিন্, ঘব্, দুর্, সুখ্ ইত্যাদি। প্রথম শ্রেণীর অযুগ্ম ধ্বনিগুলি লঘু অর্থাৎ একমাত্রিক, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণীর যুগ্মধ্বনিগুলি গুরু অতএব দ্বিমাত্রিক।

বাংলায় দীর্ঘস্বর না থাকলেও এই একমাত্রিক ও দ্বিমাত্রিক ধ্বনিগুলির পর্য্যায়বিন্যাসের দ্বারা বাংলা ভাষায় যে বহুরকমের স্বরতরঙ্গ উৎপন্ন করা সম্ভবপর তা সহজেই অনুমান করা যায়। বাংলায় স্বরতরঙ্গ সৃষ্টির মোটামুটি তিনটি উপায় আছে বলা যেতে পারে। প্রথম উপায় হ'চ্ছে প্রচলিত মাত্রাবৃত্ত ছন্দে স্বরের সংখ্যা যথাসম্ভব কমিয়ে দেওয়া ; তাতেই নির্দ্দিষ্ট মাত্রা স্থির রাখার জন্যে যুগ্ম বা দ্বিমাত্রিক ধ্বনির প্রয়োগ বেশি হয়, ফলে ছন্দ তরঙ্গিত হ'য়ে ওঠে। উপরের প্রথম দৃষ্টান্তটিতেই এই উপায় প্রযুক্ত হয়েছে। আরও দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

(১) কলস-ঘায়ে ঊর্ম্মি টুটে
রশ্মি রাশি চূর্ণি উঠে,
শ্রান্ত বায়ু প্রান্ত-নীর
চুম্বি যায় কভু।

—অপেক্ষা, মানসী, রবীন্দ্রনাথ

এটা পঞ্চমাত্রিক ছন্দ। কিন্তু এর কোনো পর্ব্বেই পাচটি স্বর নেই ; চার কিম্বা তিন স্বরের সাহায্যেই পাঁচ মাত্রার পরিমাণ রক্ষা ক'রতে হ'য়েছে। তাই যুগ্ম ধ্বনির ঘায়ে ছন্দের স্থির জলে ঊর্ম্মি জেগে উঠেছে, আরেকটা দৃষ্টান্ত—

(২) এ নহে মুখর বন-মর্ম্মর গুঞ্জিত,
এযে অজাগর গরজে সাগর ফুলিছে ;
এ নহে কুঞ্জ কুন্দ-কুসুম-রঞ্জিত,
ফেন-হিল্লোল কল-কল্লোলে দুলিছে।
—দুঃসময়, কল্পনা, রবীন্দ্রনাথ

এটা বণ্মাত্রিক ছন্দ, অথচ কোনো পর্ব্বেই দু'টি লঘুমাত্রা নেই। তাই যুগ্মধ্বনির সংখ্যাও বেড়েছে, ছন্দও হিল্লোলিত হ'য়ে উঠেছে। যুগ্মধ্বনির সংখ্যাবৃদ্ধি না হ'লে অনুপ্রাসের প্রাচুর্য্যেও এ ছন্দে কিছুতেই তরঙ্গ দেখা দিত না।

ছন্দতরঙ্গ উৎপাদনের দ্বিতীয় উপায় হচ্ছে প্রচলিত স্বরবৃত্ত ছন্দে মাত্রা-পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়া। তাতেও যুগ্মধ্বনির সংখ্যা বেশি হয় এবং ছন্দ লাস্যলীলায় দুলতে সুরু করে। পূরবীর "বিজয়ী" কবিতাটি ছন্দতরঙ্গের এই প্রণালীর একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। এখানে আরেকটি উদাহরণ দিচ্ছি।—

(৩) বেণুশাখার অন্তরালের অস্তপারের রবি
আঁকবে মেঘে মুছবে আবার শেষ বিদায়ের ছবি।
* * * *
ঝিল্লি যেমন শালের বনে নিদ্রানীরব রাতে
অন্ধকারের জপের মালায় একটানা সুর গাঁথে।
—অন্যমনা, পূরবী, রবীন্দ্রনাথ

এটা চতুঃস্বর ছন্দ। অথচ প্রতিপর্ব্বেই চারের বেশি মাত্রা আছে ; এ ভাবে যুগ্মধ্বনির পরিমাণ বেশি হওয়াতে ছন্দকে বাধ্য হ'য়ে তরঙ্গায়িত হ'তে হ'য়েছে।

এ দু'টি পন্থাই হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের আবিষ্কৃত। এই দু'টি উপায়েই তিনি ছন্দে অসংখ্য রকমের তরঙ্গভঙ্গী দেখিয়েছেন। তৃতীয় উপায়টি সত্যেন্দ্রনাথের অবলম্বিত। এ উপায়টি হচ্ছে লঘু এবং গুরু, যুগ্ম এবং অযুগ্মধ্বনিকে কোনো নির্দ্দিষ্ট পর্য্যায়ক্রমে ছন্দের সর্ব্বত্র বিন্যস্ত করা। কোনো সুনির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে ধ্বনিমাত্রার এরূপ পর্য্যায় বিন্যাস ক'রতে হ'লে বাংলা ছন্দের অন্তর-প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকা চাই।

বাংলা ছন্দের অন্তরের গঠন-প্রণালী সম্বন্ধে এ স্থলে সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন ; নতুবা কিরূপে বাংলা ছন্দের ধ্বনিতে উত্থান পতনের তরঙ্গলীলা দেখা দেয় তা বোঝা যাবে না। এ তরঙ্গলীলা নির্ভর করে প্রধানত তিনটি তত্ত্বের উপর—(১) বাংলা ছন্দপর্ব্বের দৈর্ঘ্য অর্থাৎ তার ধ্বনিসংখ্যা ও মাত্রাপরিমাণ ; (২) বাংলা ছন্দের উচ্চারণ পদ্ধতি, ধ্বনির গতি-ক্রম ও বিরতি, ছন্দের ঝোঁক বা অ্যাক্‌সেণ্ট এবং যতি ; (৩) লঘু ও গুরুমাত্রিক ধ্বনির পর্য্যায়-সন্নিবেশ। এই তিনটি তত্ত্বের মধ্যে প্রথম দু'টি পরস্পরের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্বদ্ধ ; প্রকৃতপক্ষে এরা দু'টি পৃথক তত্ত্ব নয়, একই তত্ত্বের দু'টি দিক মাত্র।

বাংলার উচ্চারণ পদ্ধতির প্রতি লক্ষ্য ক'রলে দেখা যায়, আমরা এক ঝোঁকেই অনেকগুলি কথা উচ্চারণ ক'রে ফেলি ; তারপর ওই ঝোঁকের মুখে ধ্বনির যে গতি সুরু হয় সে গতির অবসান হ'লেই আরেক ঝোঁকে আরেকটা গতির সৃষ্টি হয়। এভাবে একেকটি ঝোঁকের দ্বারাই আমাদের উচ্চারণ পদ্ধতি অর্থাৎ উচ্চারিত ধ্বনির গতি ও বিরতি নিয়ন্ত্রিত হয়। গতির যেখানে আরম্ভ সেইখানেই পড়ে ঝোঁক, আর যেখানে সেই গতির অবসান ঘটে সেখানটাকেই বলি যতি। আবার ধ্বনির এই গতি ও বিরতি অর্থাৎ ছন্দের এই ঝোঁক ও যতির দ্বারাই ছন্দ-পর্ব্বের দৈর্ঘ্য নির্দ্দিষ্ট হয়। প্রতিপর্ব্বের স্বরসংখ্যা বা ধ্বনিমাত্রার ওজনের দ্বারাই ওই পর্ব্বের দৈর্ঘ্য পরিমিত [illegible]

সখি 'প্রতিদিন হায় | 'এসে ফিরে যায় | 'কে !
তারে 'আমার মাথার | 'একটি কুসুম | 'দে।
যদি 'শুধায় কে দিল | 'কোন ফুল-কান | -'নে,
তোর 'শপথ, আমার | 'নামটি বলিস্ | 'নে।
—সকরুণা, কল্পনা, রবীন্দ্রনাথ

এই পংক্তিগুলি পড়লেই বোঝা যাবে যে প্রতি পংক্তিতে তিনটি ক'রে ঝোঁক আছে। ঝোঁকগুলিকে রেফ-চিহ্নের দ্বারা নির্দ্দেশ করা হয়েছে। একেক ঝোঁকেই কয়েকটি কথা একসঙ্গে সমান গতিতে উচ্চারিত হ'য়ে যাচ্ছে। তারপর যেখানে ওই গতি শেষ হয়েছে সেখানেই যতি ; ছেদ-চিহ্ন

দ্বারা যতি-নির্দ্দেশ করা হ'ল। ঝোঁক ও যতির মধ্যবর্ত্তী যে অংশ তাকেই বলছি **ছন্দ-পর্ব্ব**। উদ্ধৃত দৃষ্টান্তের প্রত্যেক পংক্তিতে তিনটি ক'রে পর্ব্ব আছে, তাই এ ছন্দকে ব'লব ত্রিপর্ব্বিক। কিন্তু এ হ'ল এ ছন্দের বাহ্য আকৃতির কথা। এর অন্তঃপ্রকৃতি নির্ভর ক'রছে একেকটি পর্ব্বের গঠন-প্রণালীর উপর। দেখ্‌তে পাচ্ছি এই দৃষ্টান্তের পর্ব্বগুলিতে ধ্বনিসংখ্যার স্থিরতা নেই; কোথাও চার, কোথাও পাঁচ। আসলেও এ ছন্দ ধ্বনি বা স্বরের সংখ্যার ভিত্তির উপর রচিত নয়; তাই এ ছন্দের তত্ত্ব হচ্ছে ধ্বনিমাত্রার সাম্য। এখানে প্রতিপর্ব্বে ছ'টি ক'রে ধ্বনি-মাত্রা আছে; তাই এ ছন্দকে ব'লব ষণ্মাত্রিক ছন্দ; এইটেই হ'ল এ ছন্দের অন্তর-প্রকৃতির পরিচয়। এখানে প্রথম দু'পর্ব্বে ছ'টি ক'রেই মাত্রা আছে বটে; তৃতীয় পর্ব্বে মাত্রা শুধু একটি। কিন্তু একটি মাত্রা হ'লেও যেহেতু এর উপর ঝোঁক রয়েছে সেজন্ত একেও একটি স্বতন্ত্র পর্ব্ব ব'লে গণ্য ক'রব। অবশ্য এ পর্ব্বে ছ'টির স্থানে একটি মাত্রা হওয়াতে একে অপূর্ণ পর্ব্ব বলা প্রয়োজন। প্রয়োজন মতে এ পর্ব্বেও মাত্রাসংখ্যা বাড়িয়ে একে পূর্ণপর্ব্বে পরিণত করা যায়। যাহোক বর্ত্তমান ছন্দটিকে ষণ্মাত্রিক অপূর্ণ ত্রিপর্ব্বিক বললেই এর পূর্ণ পরিচয় দেওয়া হয়।

লক্ষ্য করার বিষয়, এখানে প্রত্যেক পংক্তিতেই প্রথম পর্ব্বের পূর্ব্বে দু'টি ক'রে মাত্রা স্থাপিত হয়েছে। এ দু'টি মাত্রার উপর কোনো ঝোঁক বা অ্যাক্‌সেণ্ট নেই; অতি মৃদুভাবে এদের উচ্চারণ ক'রতে হয়। যে মাত্রাসমষ্টি একটি ঝোঁকের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তাকেই পর্ব্ব বলেছি। অথচ এ দু'টি মাত্রা কোনো ঝোঁকের এলাকায় আসছেনা; আর ও দু'টি মাত্রাকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে পড়লেও এ ছন্দের কোনো ব্যাঘাত ঘটে না। তাই এ দু'টি মাত্রাকে ব'লব **অতি-পর্ব্বিক মাত্রা**। কিন্তু এই অতি-পর্ব্বিক মাত্রাকে মূল ছন্দের সম্পূর্ণ বহির্ভূত মনে ক'রলে ভুল করা হবে; কারণ এ দু'টি সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে ছন্দপাঠে কোনো বিঘ্ন না হ'লেও আসল কবিতার অর্থসঙ্গতি রক্ষিত হবে না। আসলে অতি-পর্ব্বিক মাত্রা মূল ছন্দের অঙ্গীভূত না হ'লেও তার অঙ্গশোভন অলঙ্কার তো বটে। মাত্রা-বৃত্তের ন্যায় স্বরবৃত্ত ছন্দেও অতি-পর্ব্বিক শব্দ যোজনার ব্যবস্থা করা যায়। স্বরবৃত্ত ছন্দের অতি-পর্ব্বিক শব্দকে মাত্রা না ব'লে অতি-পর্ব্বিক স্বর বলাই সঙ্গত; কেননা ওই ছন্দে স্বরসংখ্যাই রচনার ভিত্তি, ধ্বনিমাত্রা নয়। অতি-পর্ব্বিক মাত্রা কিংবা স্বর কোনো ছন্দেই দু'টির বেশি ব্যবহার না করাই রীতি। অক্ষরবৃত্ত ছন্দে অতি-পর্ব্বিক শব্দ যোজনার ব্যবস্থা নেই। রবীন্দ্রনাথই অতিপর্ব্বিক মাত্রা ও স্বর ব্যবহারের প্রবর্ত্তন ক'রেছেন। দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

দূরে অশথ-তলায়
পুঁতির কণ্ঠিখানি গলায়
বাউল দাঁড়িয়ে কেন আছো?
সাম্‌নে আঙিনাতে
তোমার একতারাটি হাতে
তুমি সুর লাগিয়ে নাচো।

—বাউল, শিশু ভোলানাথ, রবীন্দ্রনাথ

এটি স্বরবৃত্ত ছন্দ। এর দ্বিতীয় ও তৃতীয় পদের পূর্ব্বে দু'টি করে অতি-পর্ব্বিক স্বর যোজনা করা হ'য়েছে। প্রথম পদের পূর্ব্বেও ওরকম দু'টি স্বর অনায়াসেই বসানো যেতে পারত। এবার মাত্রাবৃত্ত ছন্দে অতি-পর্ব্বিক মাত্রার দিচ্ছি।—

অত চুপি চুপি কেন | কথা কও
ওগো মরণ, হে মোর | মরণ!
অতি ধীরে এসে কেন | চেয়ে রও,
ওগো একি প্রণয়েরি | ধরণ?

—মরণ, উৎসর্গ, রবীন্দ্রনাথ

এটি ষণ্মাত্রিক অপূর্ণ দ্বিপর্ব্বিক ছন্দ। প্রথম ও তৃতীয় পংক্তির শেষ পর্ব্বে চার মাত্রা; দ্বিতীয় ও চতুর্থ পংক্তির শেষ পর্ব্বে তিন মাত্রা। প্রতি পংক্তির পূর্ব্বেই দু'টি ক'রে অতি-পর্ব্বিক মাত্রা স্থাপিত হ'য়েছে।

ঝোঁক ও যতি স্থাপনের বৈচিত্র্য

আমরা দেখেছি পর্ব্বসংখ্যার দ্বারা ছন্দের বাইরের আকৃতি মাত্র নিয়মিত হয়। কিন্তু ছন্দের অন্তরের গঠন

নির্ভর করে ওই পর্বের নির্মাণ-প্রণালীর উপর। পর্বের নির্মাণ-প্রণালী আবার নির্ভর করে দুটি জিনিষের উপর।— (১) ঝোঁক এবং যতি,—এই দু'জিনিষের দ্বারা প্রত্যেক পর্বের অন্তর্গত ধ্বনির আয়তন নিয়ন্ত্রিত হয়। যদি ঝোঁক ও যতি ঘন ঘন স্থাপিত হয় তবে পর্বের আয়তন হ্রস্ব ও ধ্বনির গতি দ্রুত হয়; আর ঝোঁক ও যতি যদি ঘন ঘন স্থাপিত না হয় তবে পর্বের আয়তন দীর্ঘ এবং ধ্বনির গতি বিলম্বিত হয়। এই ঝোঁক ও যতি স্থাপনকেই অন্য কথায় তাল বলা হয় এবং ধ্বনির গতিক্রমকেই লয় বলা হয়। ঘন ঘন তালে লয় দ্রুত এবং বিরল তালে লয় বিলম্বিত হয়। (২) দ্বিতীয়ত' পর্বের নির্মাণ-প্রণালী ধ্বনিবিন্যাসের প্রকারভেদের দ্বারাও নিয়ন্ত্রিত হয়। যদি শুধু ধ্বনি বা স্বরের সংখ্যার উপর নির্ভর ক'রে ছন্দ রচিত হয় তবে সে ছন্দকে ব'লব স্বরবৃত্ত; যদি শুধু ধ্বনির মাত্রাপরিমাণের উপর ছন্দকে দাঁড় করানো যায় তবে সে ছন্দ মাত্রাবৃত্ত। যদি একাধারে ধ্বনিসংখ্যা ও ধ্বনিমাত্রা স্থির রাখা হয় তবে তার নাম দেওয়া যায় **স্বর-মাত্রিক ছন্দ**। আর যদি বিশেষ উপায়ে স্বরসংখ্যা ও ধ্বনি-মাত্রার মিশ্রণ ক'রে তথাকথিত 'অক্ষর' সংখ্যা ঠিক রেখে ছন্দ রচিত হয় তবে তাকে অক্ষরবৃত্ত সংজ্ঞা দেওয়া যায়। এ স্থলে ঝোঁক ও যতি-স্থাপনের বৈচিত্র্যের দ্বারা ছন্দের আভ্যন্তরীণ প্রকৃতি কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় তাই দেখাব।

অতি চুপি চুপি কেন কথা কও

অতি ধীরে এসে কেন চেয়ে রও

এখানে উভয় পংক্তিতেই দু'টি অতি-পর্ব্বিক মাত্রা আছে। তার পরেই উচ্চারণের ঝোঁক পড়েছে 'চুপি' এবং 'ধীরে', এ দু'টি শব্দের উপর। এখানেই ধ্বনির যাত্রা সুরু হ'ল এবং ছ'টি মাত্রা অতিক্রম ক'রে উভয়ত্রই 'কেন' শব্দের পরে সে গতি থেমেছে; এইখানেই যতি। তার পরেই আবার ঝোঁক এবং গতি; চারমাত্রার পরই গতির অবসান অর্থাৎ ধ্বনি-বিরতি বা বিশ্রাম। সুতরাং এটা ছয় এবং চার মাত্রার অপূর্ণ দ্বিপর্ব্বিক ছন্দ। ঝোঁক এবং যতির পরিবর্ত্তনের দ্বারা এ দুটি পংক্তিতে কত পরিবর্ত্তন আনা যায় এবার তাই দেখা যাক্

অত চুপি চুপি কেন | কথা কও
এটা ষণ্মাত্রিক অপূর্ণ দ্বিপর্ব্বিক ছন্দ।

অত চুপি চুপি | কেন কথা | কও
এবার তিনটি ঝোঁক ও তিনটি যতি; চার মাত্রার পরেই ধ্বনিগতির অবসান। এ ছন্দ আর ষণ্মাত্রিক রইল না। এটা হ'ল চতুর্মাত্রিক অপূর্ণ ত্রিপর্ব্বিক ছন্দ

অত চুপি চুপি | কেন কথা কও
আবার ছন্দ বদলে গেল। এটা ষণ্মাত্রিক পূর্ণ দ্বিপর্ব্বিক ছন্দ।

ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে
এটা কি ছন্দ? শুধু দেখে বলার জো নেই। যে ভাবে উচ্চারণ করা হবে অর্থাৎ যে ভাবে ঝোঁক ও যতি স্থাপন করা হবে তার উপরই ছন্দ সম্পূর্ণ নির্ভর ক'রছে।

ঐ আসে ঐ | অতি ভৈরব | হরষে
যদি এ ভাবে পড়া হয় তবে এ ছন্দ হবে ষণ্মাত্রিক অপূর্ণ ত্রিপর্ব্বিক। কিন্তু যদি ঝোঁক ও যতি আরও ঘন ঘন স্থাপন করা যায়;—

ঐ আসে | ঐ অতি- | ভৈরব | হরষে
যদি এ ভাবে ঝোঁক ও যতি দিয়ে উচ্চারণ করা যায় তবে শুনতে আরেক রকম লাগে। কিন্তু ছন্দের প্রকৃতি বদলে গেল; ষণ্মাত্রিকের বদলে এ ছন্দ এখন হ'ল চতুর্মাত্রিক অপূর্ণ চৌপর্ব্বিক। একটা পর্ব্বই বেড়ে গেছে এখানে।

ভুবন মিলায়ে | মোর অঞ্চল | খানিতে,
বিশ্ব নীরব | মোর কণ্ঠের | বাণীতে,
—প্রণয়-প্রশ্ন, কল্পনা, রবীন্দ্রনাথ

এভাবে পড়লে একে ষণ্মাত্রিক অপূর্ণ ত্রিপর্ব্বিক ছন্দ ব'লব। কিন্তু একে চতুর্মাত্রিক ছন্দের ভঙ্গীতেও পড়া যায়। যথা—

ভুবন মি- | লায় মোর | অঞ্চল | খানিতে
বিশ্ব নী- | রব মোর | কণ্ঠের | বাণীতে

এটা চতুর্মাত্রিক ছন্দ এবং এখানে তিন পর্ব্বের স্থানে চার পর্ব্ব রয়েছে।

অনেক সময় একেকটা সমগ্র কবিতাকেও দু'রকম ছন্দে পড়া যায়। রবীন্দ্রনাথের "নটরাজ"-এর "মনের মানুষ" কবিতাটি এর একটি সুন্দর নিদর্শন। একটু নমুনা দেখাচ্ছি।—

আজ এক | হয়ে তারা
মোরে করে | মাতোয়ারা,
এক বীণা- | রূপ ধরি'
এক গানে | ফেলে ছায়া।

এ ভঙ্গীতে পড়লে এ হ'ল চতুর্মাত্রিক ছন্দ; দ্বিপর্ব্বিক পূর্ণ চৌপদী। প্রতি পদে দু'টি করে পুরো পর্ব্ব আছে। আবার এ-কে ষণ্মাত্রিক ছন্দেও পড়া যায়।—

আজ এক হয়ে | তা'রা
মোরে করে মাতো- | য়ারা,
এক বীণা-রূপ | ধরি'
এক গানে ফেলে | ছায়া

এভাবে পড়লে এর ধ্বনি সম্পূর্ণ বদলে যায়। এখানে প্রতি পদে দু'টি ক'রে পর্ব্ব আছে; কিন্তু একটি পর্ব্ব পূর্ণ (ছ' মাত্রা) আরেকটি অপূর্ণ (দু'মাত্রা)। সুতরাং একে ছ'মাত্রার অপূর্ণ দ্বি-পর্ব্বিক চৌপদী ছন্দ বলা যায়।

গীতাঞ্জলির "জীবনে যা চিরদিন" প্রভৃতি রচনাটিও আগাগোড়া দু' ছন্দে পড়া যায়। একটু নমুনা দিচ্ছি।—

জীবনের শেষ | দানে
জীবনের শেষ | গানে,
হে দেবতা, তাই | আজি
দিব তব সকা- | শে,
প্রভাতের আলো- | কে যা
ফোটে নাই প্রকা- | শে।

এ হচ্ছে ছ'মাত্রার ভঙ্গী। চার মাত্রার ভঙ্গীতে পড়তে গেলেই এর ঝোঁক ও যতি স্থাপনের কায়দা বদলে যাবে। যথা—

জীবনের | শেষ দানে
জীবনের | শেষ গানে
হে দেবতা, | তাই আজি
দিব তব | সকাশে,
প্রভাতের | আলোকে যা
ফোটে নাই | প্রকাশে।

আশা করি এখন এ কথা স্পষ্ট হ'য়েছে যে ঝোঁক এবং যতির দ্বারা ছন্দের অন্তঃপ্রকৃতি অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত হয়। এস্থলে এটি লক্ষ্য করার বিষয় যে ঝোঁক এবং যতির দ্বারাও ছন্দে এক প্রকার তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। এ তরঙ্গকে বলতে পারি **পর্ব্বিক তরঙ্গ**, কারণ সমগ্র পর্ব্বটিকে আশ্রয় করেই এ তরঙ্গের উদ্ভব হয়। ঝোঁক ও যতি যত ঘন সন্নিবিষ্ট হবে ছন্দের পর্ব্ব-তরঙ্গও ততই লীলায়িত হ'য়ে উঠ্‌বে; আর ঝোঁক ও যতির সন্নিবেশ যত দূরবর্ত্তী হবে পর্ব্বতরঙ্গ ততই দীর্ঘায়ত ও তার লীলা মৃদুতর হবে। দৃষ্টান্তের সাহায্যে একথাটা স্পষ্টতর হবে। যথা—

মৌন | নৃত্যে | মগ্ন | খঞ্জন,
মোন্‌স-মুদ্রে চল্‌ছে মন্থন!
দগ্ধ দৃষ্টি বিশ্ব-সৃষ্টির
মুগ্ধ নেত্রে স্নিগ্ধ অঞ্জন।

—ছন্দ-হিল্লোল, বেলা শেষের গান, সত্যেন্দ্রনাথ

এখানে ঝোঁক ও যতি খুব অল্প-ব্যবহিত এবং পর্ব্বগুলি খুব ছোট ছোট। কাজেই ছন্দের তরঙ্গলীলা খুব দ্রুত ও স্পষ্ট। এবার একটা দীর্ঘপর্ব্বিক ছন্দতরঙ্গের দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

দেখো নাকি, হায়, | বেলা চলে যায় |
সারা হ'য়ে এল | দিন।
বাজে পূরবীর | ছন্দে রবির |
শেষ রাগিণীর | বীণ্।

—লীলাসঙ্গিনী, পূরবী, রবীন্দ্রনাথ

এটা হ'ল ষণ্মাত্রিক পর্ব্বের ছন্দ, অর্থাৎ সুদীর্ঘ ছ'মাত্রার পর একবার ক'রে ঝোঁক আসছে। একেকটা পর্ব্ব অত্যন্ত দীর্ঘ ব'লে তা'র তরঙ্গও খুব আয়ত। তাই তরঙ্গের লীলাও খুব মন্থর, এমন কি সতর্ক না থাক্‌লে এর অস্তিত্বই ধরা পড়ে না। কিন্তু স্বরসংখ্যা সংক্ষিপ্ত অর্থাৎ দ্বিমাত্রিক যুগ্মধ্বনির সংখ্যা বর্দ্ধিত ক'রে কেমন ক'রে ষণ্মাত্রিক পর্ব্বেও ঢেউ তোলা যায় তা আমরা পূর্ব্বেই দেখেছি। উদ্ধৃত দৃষ্টান্তটির সঙ্গে নিম্নলিখিত পংক্তিগুলির তুলনা ক'রলেই এ কথার তাৎপর্য্য বোঝা যাবে।—

পৌষ প্রখর | শীতে জর্জ্জর, | ঝিল্লি-মুখর | রাতি :
নিদ্রিত পুরী, | নির্জ্জন ঘর, | নির্ব্বাণ দীপ- | বাতি।
—সিন্ধুপারে, চিত্রা, রবীন্দ্রনাথ

চতুর্মাত্রিক ছন্দের পর্ব্বগুলি ছোট ছোট ব'লে তার তরঙ্গলীলাও ঘনবিন্যস্ত। যথা—

এস তুব্‌- | পার দেশে | এস কল | হাস্তে—
গিরি-দরী- | বিহারিণী | হারিণীর | লাস্তে,
ধূসরের | ঊষরের | কর তুমি | অন্ত,
শ্যামলিমা | ও-পরশে | করগো শ্রী- | মন্ত।
—ঝর্ণা, বিদায়-আরতি, সত্যেন্দ্রনাথ

চার তিন এবং দুই স্বরের স্বরবৃত্ত ছন্দের পর্ব্বগুলিও ছোট ব'লে স্বরবৃত্ত ছন্দের পর্ব্বতরঙ্গও খুব খরগতি। যথা—

(১) দুঃখ সহার | তপস্যাতেই | হোক্ বাঙালীর | জয়,
ভয়কে যারা | মানে তারাই | জাগিয়ে রাখে | ভয়।
মৃত্যুকে যে | এড়িয়ে চলে | মৃত্যু তারেই | টানে,
মৃত্যু যারা | বুক পেতে লয় | বাচ্‌তে তারাই | জানে!
—চিঠি, পূরবী, রবীন্দ্রনাথ

এটা চতুঃস্বরপর্ব্বিক ছন্দ। এবার ত্রিস্বর পর্ব্বিকের দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

(২) ওর তরে | মন্থরে | নদ হেথা | চল্‌ছে,
জলপিপি | ওর মৃদু | বোল্ বুঝি | বোল্‌ছে।
দুই তীরে | গ্রামগুলি | ওর জয়ই | গাইছে,
গঞ্জে যে | নৌকো সে | ওর মুখই | চাইছে।
—দূরের পাল্লা, বিদায়-আরতি, সত্যেন্দ্রনাথ

এখানে প্রতিপর্ব্বে তিনটি ক'রে স্বর। তাই এর পর্ব্বতরঙ্গ চতুঃস্বরের পর্ব্বতরঙ্গের চেয়ে বেশি লীলায়িত। দুই স্বরের পর্ব্বতরঙ্গ আরও বেগবান্। যথা—

(৩) চুপ্ চুপ্ | -ওই ডুব | দ্যাখ পান্- | কৌটি,
দ্যায় ডুব | টুপ টুপ্ ঘোম্‌টার বউটি।
ঝক্‌ঝক্ | কল্‌সীর | বক্ বক্ | শোন্ গো,
ঘোমটার | ফাঁক বয় | মন উন্- | মন গো।
—ঐ

অক্ষরবৃত্ত ছন্দের পর্ব্বতরঙ্গ অত্যন্ত ঢিমে তেতালা গোছের, প্রায় নেই বল্লেই হয়। কারণ এর পদগুলি অত্যন্ত আড়ষ্ট; পর্ব্ববিভাগগুলি অস্পষ্ট; যতিও খুব নিয়মিত নয়; এর ঝোঁকগুলিও তীব্র নয়। বাস্তবিকপক্ষে এ ছন্দ প্রায়ই যুগ্মপর্ব্বের তালে চলে। একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

দেবতার স্তবগীতে | দেবেরে মানব করি' আনে,
তুলিব দেবতা করি' | মানুষেরে মোর ছন্দে গানে।
ভাষা ও ছন্দ, কাহিনী, রবীন্দ্রনাথ

এটা আট ও দশ অক্ষরের দ্বিপদী ছন্দ। এখানে এক ঝোঁকে আট ও দশ অক্ষরের একেকটা বড় বড় পদ অতিক্রম ক'রতে হয় ব'লে এ ছন্দের পর্ব্বিকতরঙ্গ এমন নিস্তেজ।

আমরা দেখ্‌লুম যে অক্ষরবৃত্তে পর্ব্বতরঙ্গ প্রায় নেই; কিন্তু মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত ছন্দে পর্ব্বতরঙ্গ আছে এবং তার বৈচিত্র্যও আছে। মাত্রাবৃত্তে পর্ব্বতরঙ্গ হ'তে পারে তিন রকম—চতুর্মাত্রিক, পঞ্চমাত্রিক এবং ষণ্মাত্রিক। স্বরবৃত্তের পর্ব্বতরঙ্গও তিন রকম—দ্বিস্বরপর্ব্বিক, ত্রিস্বরপর্ব্বিক ও চতুঃস্বরপর্ব্বিক। কিন্তু এক বিষয়ে এই সব রকম তরঙ্গই সমধর্ম্মী; কারণ এই সব তরঙ্গেই উচ্চারণের ঝোঁকটা থাকে গোড়ার দিকে। এইটে বাংলা ভাষারই একটা বিশেষ লক্ষণ। বাংলায় যখন আমরা কথা বলি তখনও আমরা প্রথমেই একটা ঝোঁক বা অ্যাক্‌সেন্ট দিয়ে কথা আরম্ভ করি এবং এক ঝোঁকেই এক সঙ্গে কয়েকটি কথা ব'লে ফেলি; তার পর আরেক ঝোঁকে আরও কতকগুলি কথা বলি; এইটেই বাংলার উচ্চারণ-পদ্ধতি। আমাদের কথিত এবং পঠিত বাংলার উচ্চারণের প্রতি লক্ষ্য ক'রলেই এ কথার সত্যতা

উপলব্ধি হবে। কথা বলার সময় আমরা যে ঝোঁক দেই সেটা অবশ্য অনিয়মিত অর্থাৎ ক'টা শব্দের পর আবার ঝোঁক হবে তার কিছু নিয়ম নেই ; ভাব-প্রকাশের প্রয়োজন অনুসারেই ঘন বা বিরল ভাবে ঝোঁক পড়ে। কিন্তু আমাদের নিত্যকথিত বাংলার উচ্চারণের প্রতি লক্ষ্য ক'রলে দেখা যাবে যে সচরাচর দু'টি ঝোঁকের মধ্যে চার পাঁচটির বেশি স্বরধ্বনি অথবা ছ'-সাতটির বেশি ধ্বনিমাত্রা থাকে না। একটা দৃষ্টান্ত দেখাচ্ছি।—

"কোল্‌রিজ ব'লে গেচেন,—সমুদ্রে জল সর্ব্বত্রই, কিন্তু এক ফোঁটা জল নেই যে পান করি। সময়ের সমুদ্রে আছি, কিন্তু এক মুহূর্ত্ত সময় নেই।"

– যাত্রী (পৃঃ ৩১১), রবীন্দ্রনাথ

এখানে রেফ চিহ্নিত শব্দগুলির আদিতে ঝোঁক পড়েছে। আমাদের লক্ষ্য করার বিষয় এই যে এক ঝোঁকে চার-পাঁচটার বেশি স্বরধ্বনি উচ্চারিত হচ্ছে না, কোনো কোনো জায়গায় এক ঝোঁকে তিনটি এবং এক জায়গায় দু'টি স্বরধ্বনি উচ্চারিত হচ্ছে। মাত্রা হিসাবে দু'টি ঝোঁকের মধ্যে কোথাও চারটি কোথাও পাঁচটি এবং কোথাও ছ'টি মাত্রা ; কেবল এক জায়গায় আটটি মাত্রা আছে, তাও সন্দেহের বিষয়। যা হোক্, বাংলা গদ্যের এই ঝোঁকের তত্ত্বই বাংলা পদ্যের গোড়ার কথা। ঝোঁক যখন অর্থের বাহন হিসেবে অনিয়মিত ভাবে স্থাপিত হয় তখনই ভাষা হয় গদ্য, আর ঝোঁক যখন নিয়মিত ভাবে স্থাপিত হয় তখনই ভাষা পদ্য হ'য়ে ওঠে। ঝোঁককে নিয়মিত করার মানে হচ্ছে দুটি ঝোঁকের মধ্যবর্ত্তী ধ্বনিসংখ্যা বা মাত্রাপরিমাণ নির্দ্দিষ্ট ক'রে দেওয়া। ঝোঁক যদি চার স্বরের পর-পর আস্‌তে থাকে তবেই সে ছন্দ হয় চতুঃস্বরপর্ব্বিক, আর যদি ছ'মাত্রার পর পর আসতে থাকে তবে সে ছন্দ হবে ষণ্মাত্রিক। বেছে বেছে শব্দ প্রয়োগ ক'রে এ ভাবেই দ্বিস্বর, ত্রিস্বর এবং চতুর্মাত্রিক ও পঞ্চমাত্রিক ছন্দ রচিত হ'য়ে থাকে। অক্ষরবৃত্ত ছন্দের মূলেও এ কথাই র'য়েছে তা যথাস্থানে দেখাতে চেষ্টা ক'রব।

এস্থলে বাংলা ছন্দের সঙ্গে ইংরেজি ছন্দের তুলনা করা প্রয়োজন ; কারণ ইংরাজি ছন্দের মূলেও এই ঝোঁকের তত্ত্বই র'য়েছে। ওই ঝোঁক এবং যতির যোগেই ইংরেজি ছন্দে তরঙ্গের সৃষ্টি হ'য়ে থাকে। কিন্তু ইংরেজি ছন্দের সঙ্গে বাংলা ছন্দের সাদৃশ্যের চেয়ে পার্থক্যই বেশি এবং ওই পার্থক্য কোথায় তা বুঝ্‌লেই বাংলা ছন্দের স্বরূপ পরিস্ফুট হবে।

প্রথমেই দেখতে পাই যে অধিকাংশ ইংরেজি শব্দেরই একটা নিজস্ব ঝোঁক আছে, আর ওই ঝোঁক কোনো শব্দের আদিতে, কোনো শব্দের মধ্যে এবং কোনো শব্দের অন্তে থাকে। তা ছাড়া ইংরেজিতে অনেকগুলি একস্বর শব্দ আছে যার কোনো নিজস্ব ঝোঁক নেই। একাধিক স্বর (অর্থাৎ সিলেবল্‌-) বিশিষ্ট সব শব্দেরই আদি, মধ্য, অন্ত কোথাও না কোথাও ঝোঁক থাক্‌বেই। শব্দের এই স্বভাবগত ঝোঁককে পর্য্যায়ক্রমে সাজিয়েই ইংরেজি ছন্দের সৃষ্টি। ঝোঁকহীন একস্বর শব্দ এবং ঝোঁকওয়ালা বহুস্বর শব্দের সাহায্যে নির্দ্দিষ্ট পর্য্যায় রচনা করা ইংরেজিতে খুবই সহজসাধ্য ব্যাপার। ইংরেজির আরেকটা বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে ও ভাষায় স্বরান্তবর্ণ খুবই কম, হসন্তবর্ণ খুব বেশি। ইংরেজিতে হসন্তবর্ণের সংখ্যা চল্‌তি বাংলার হসন্তবর্ণের দ্বিগুণ কিংবা আরও কিছু বেশি, এ বিষয়ে ইংরেজির সঙ্গে সাধু বাংলার তুলনাই করা যায় না। যাহোক্, শব্দের এই স্বাভাবিক ঝোঁক এবং হসন্ত বাহুল্যের সাহায্যে ইংরেজিতে পাঁচ রকম ছন্দ রচিত হ'য়ে থাকে ;—দু'রকম দ্বিস্বরপর্ব্বিক ছন্দ এবং তিন রকম ত্রিস্বরপর্ব্বিক ছন্দ। দ্বিস্বরপর্ব্বিক ছন্দে উচ্চারণের ঝোঁকটা প্রথম স্বরের উপরেও থাক্‌তে পারে (trochee), দ্বিতীয় স্বরের উপরেও থাক্‌তে পারে (iambus)। ত্রিস্বর-পর্ব্বিক ছন্দেও তেম্‌নি ঝোঁকটা প্রতি পর্ব্বের আদিতে (dactyl), মধ্যে (amphibrach) এবং অন্তে (anapaest) স্থাপিত হ'তে পারে।

বাংলায় কিন্তু কোনো শব্দেরই প্রকৃতিগত ঝোঁকপ্রবণতা নেই। সব শব্দই স্বভাবত' সমান নিস্তরঙ্গ। বাংলায় যে ঝোঁকের কথা পূর্ব্বে বলেছি সে কোনো শব্দেরই প্রকৃতিগত নয়, সে ঝোঁক আমাদের উচ্চারণগত। ভাবপ্রকাশের সুবিধার জন্যই আমরা আমাদের প্রয়োজন অনুসারে ঝোঁক

দিয়ে কথা বলি; এক সময় যে কথার উপর ঝোঁক দিয়ে আবার সময় সে-কথার উপর ঝোঁক না-ও দিতে পারি। ইংরেজিতে কিন্তু এরূপ হবার জো নেই; সে ভাষায় যে শব্দের যে স্বরের উপর ঝোঁক নির্দিষ্ট আছে সব সময়ই ওই স্বরের উপরই ঝোঁক থাকবে, এর ব্যতিক্রম হবার উপায় নেই। এর ফলে ইংরেজি গদ্যে এবং পদ্যে এমন একটা বন্ধুরতা ও তীক্ষ্ণতা আছে যা বক্তা ও শ্রোতার চিত্ত ও শ্রুতিকে কখনও অলস হবার প্রশ্রয় দেয় না। একঘেয়ে হওয়া ইংরেজি ভাষার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। বাংলার উচ্চারণ-ঝোঁকের আর একটি বিশেষত্ব এই যে ওই ঝোঁক সর্ব্বদাই শব্দের আদিতে স্থাপিত হয়, কখনও অন্যত্র স্থাপিত হয় না। তার ফল এই হয় যে বাংলা পদ্যে ওই ঝোঁকটাই একঘেয়ে হ'য়ে পড়ে; কারণ পদ্যছন্দে সেটা নিয়মিত ব্যবধানের পর সব সময়ই শব্দের আদিস্বরে স্থাপিত হয়। বাংলা গদ্যে কিন্তু ওই ঝোঁকের দ্বারা একঘেয়েমির সৃষ্টি হয় না; কারণ গদ্যে ঝোঁকের ব্যবধান নিয়মিত নয়; তা ছাড়া ওই ঝোঁক অর্থকেই অনুসরণ করে ব'লে এবং শ্রোতার নিকট অর্থই একমাত্র লক্ষ্য ব'লে অনেক সময় ওই ঝোঁকের অস্তিত্বই অনুভূত হয় না। ইংরেজির ওই শাব্দিক ঝোঁক (অনেক সময় শব্দার্থের অনুসরণ ক'রলেও) বাক্যের অর্থের উপর মোটেই নির্ভর করে না। বাক্যার্থের প্রতি শ্রোতার মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য সময় সময় যে ঝোঁকের ব্যবহার হয় তা এই শাব্দিক ঝোঁক বা অ্যাক্‌সেণ্ট থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জিনিষ (emphasis); এর সঙ্গে ছন্দের কোনো সম্বন্ধ নেই।

স্বরসংখ্যা হিসাবে ইংরেজি ছন্দ দু'রকম—দ্বিস্বরের ছন্দ ও ত্রিস্বরের ছন্দ। তার মধ্যেও দ্বিস্বর ছন্দের ব্যবহারই বেশি; ত্রিস্বর ছন্দের ব্যবহার অপেক্ষাকৃত কম। বাংলায় কিন্তু চতুঃস্বরের ছন্দের প্রয়োগই সব চেয়ে বেশি; তবে খুব নিপুণ ভাবে শব্দ প্রয়োগ ক'রে দ্বিস্বর ও ত্রিস্বরের ছন্দও বাংলায় বেশ রচনা করা যায় এবং তার ছন্দ-সৌন্দর্য্যও কম হয় না। পূর্ব্বেই ব'লেছি হসন্তবর্ণ এবং যুগ্মস্বরের সংখ্যা ইংরেজিতে বাংলার দ্বিগুণ; কাজেই ইংরেজির সর্ব্বদা প্রচলিত ছন্দ দ্বিস্বরপর্ব্বিক এবং বাংলার বহুপ্রযুক্ত ছন্দটি চতুঃস্বর-পর্ব্বিক, এরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। এস্থলে একথা মনে রাখা দরকার যে, সমস্ত ইংরেজি ছন্দই আমাদের স্বরবৃত্ত ছন্দের স্বধর্ম্মী। বাংলা মাত্রাবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্তের অনুরূপ কোনো ছন্দ ইংরেজিতে নেই।

যাহোক্, ইংরেজিতে সচরাচর দ্বিস্বর-পর্ব্বিক ছন্দই ব্যবহৃত হয় আর বাংলায় নিত্য প্রচলিত ছন্দ চতুঃস্বর-পর্ব্বিক, এইটাই ইংরেজি ছন্দের সঙ্গে বাংলা ছন্দের প্রধান পার্থক্য নয়। ইংরেজির সঙ্গে বাংলা ছন্দের প্রধান পার্থক্য এই যে ইংরেজিতে শাব্দিক ঝোঁক বা অ্যাক্‌সেণ্ট পর্ব্বের আদি, মধ্য বা অন্ত যে কোনো জায়গায় স্থাপিত হ'তে পারে এবং ওই ঝোঁকগুলি শব্দেরই প্রকৃতিগত। কিন্তু বাংলায় স্বরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত বা অক্ষরবৃত্ত সমস্ত ছন্দেই উচ্চারণ-ঝোঁকটি প্রতি পর্ব্বের আদি স্বরের উপর স্থাপিত এবং ওই ঝোঁক শব্দের প্রকৃতিগত নয়, বাংলার উচ্চারণপদ্ধতি-জাত। ইংরেজি ছন্দে পর্ব্ববিভাগের পরিবর্ত্তন ক'রে ওই শাব্দিক ঝোঁককে পর্ব্বের আদি, মধ্য ও অন্তে স্থানান্তরিত করা যায়। কিন্তু এ পরিবর্ত্তনের দ্বারা শাব্দিক ঝোঁকের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় না; সে ঝোঁক পূর্ব্বে যেখানে ছিল ঠিক্ সেইখানেই স্থির থাক্‌বে। একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

So faithful | in lové, and |
So daúntless | in wár,
There never | was knight like |
The young Lo- | chin-vár.
—Scott.

এটা হচ্ছে ত্রিস্বর অপূর্ণ চৌপর্ব্বিক ছন্দ। শব্দের ঝোঁক সর্ব্বত্রই পর্ব্বের মধ্যে রয়েছে। এর ইংরেজি নাম হচ্ছে Amphibrachic tetrameter catalectic অর্থাৎ মধ্যগুরু অপূর্ণ চৌপর্ব্বিক। কিন্তু পংক্তিগুলির পর্ব্ববিভাগ অন্যভাবেও করা যেতে পারে। যথা—

So faith-´ | ful in lové, |
and so daunt-´ | less in wár,
There né- | ver was knight´ |
like the young´ | Lo-chin-vár.

এখানে কিন্তু শব্দের ঝোঁক প্রতিপর্ব্বেই অন্ত্যস্বরের উপর পড়ছে। প্রথম দুটি অন্ত্যগুরু দ্বিস্বর পর্ব্ব অর্থাৎ Iambus; বাকি সবগুলিই অন্ত্যগুরু ত্রিস্বর পর্ব্ব অর্থাৎ Anapaest। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে যে-ভাবেই পর্ব্ববিভাগ করা হোক্ না কেন, শব্দের উপরকার ঝোঁক পূর্ব্বে যেখানে ছিল পরেও সেখানেই আছে।

বাংলায় কিন্তু পর্ব্ববিভাগের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে শব্দের উপরকার ঝোঁকও স'রে যায়; কারণ ওই ঝোঁক উচ্চারণের উপরই নির্ভর করে, শব্দের উপরে নয়। যথা—

এত বলি | গৃহ কোণে
বসিলাম | দৃঢ় মনে
লেখকের | যোগাসনে
পাশে ল'য়ে | মসীপাত্র।

—শীতে ও বসন্তে, চিত্রা, রবীন্দ্রনাথ

এটা হ'ল চার মাত্রার দ্বিপর্ব্বিক চৌপদী ছন্দ; প্রতি পদে দু'টি করে পর্ব্ব এবং প্রতিপর্ব্বের আদি স্বরের উপর ঝোঁক। পর্ব্ববিভাগের পরিবর্ত্তন ক'রে দেখা যাক কি হয়।—

এত বলি গৃহ- | কোণে
বসিলাম দৃঢ় | মনে
লেখকের যোগা- | সনে,
পাশে লয়ে মসী | পাত্র।

এটা ছ'মাত্রার ছন্দ; প্রতি পদে একটি পূর্ণ পর্ব্ব (ছ'মাত্রা) এবং একটি অপূর্ণ পর্ব্ব (দু'মাত্রা) রয়েছে। কাজেই এটা হ'ল ছ'মাত্রার অপূর্ণ দ্বিপর্ব্বিক চৌপদী ছন্দ। যাহোক্, এখানে দেখ্‌তে পাচ্ছি প্রত্যেক পদেই প্রথম পর্ব্বের আদি স্বরের ঝোঁকটি ঠিক্ থাক্‌লেও দ্বিতীয় পর্ব্বের ঝোঁকগুলি দু'মাত্রা স'রে গেছে। আরেকটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

যবে ফিরে আসে গোঠে | গাভীদল
সারা দিনমান মাঠে | ভ্রমিয়া

—মরণ, উৎসর্গ, রবীন্দ্রনাথ

এটা ছ'মাত্রার অপূর্ণ দ্বিপর্ব্বিক ছন্দ। প্রত্যেক পংক্তির আগে দু'টি ক'রে অতি-পর্ব্বিক মাত্রা আছে। পর্ব্ববিভাগ পরিবর্ত্তন করা যাক্।—

যবে ফিরে আসে | গোঠে গাভীদল
সারা দিন মান | মাঠে ভ্রমিয়া—

এখানে অতি-পর্ব্বিক মাত্রা দু'টিকেও পর্ব্বের অন্তর্ভুক্ত ক'রে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রতিপর্ব্বের ঝোঁকগুলি কিরূপে দু'মাত্রা করে বাঁ দিকে স'রে গেছে তা-ই লক্ষ্য করার বিষয়। কিন্তু পর্ব্ববিভাগে যতই পরিবর্ত্তন করা যাক্‌না কেন, বাংলায় প্রতিপর্ব্বের আদিস্বরের উপর ঝোঁক থাক্‌বেই; কিন্তু ইংরেজিতে তা হবার জো নেই।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন

টুক্‌রি

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত রায় চৌধুরী

পূর্ণিমায়

"দখিণ হাওয়ায়
খেয়া দেবো, ওগো মেয়ে,
পারে যদি কোনো কাজ থাকে তবে চলো।
কাজ নেই ?
তবে অকারণে চলো ভেসে,
যোর গাঙে আজ কোটালের বান
ফাগুন পূর্ণিমায়।"

আলো ছায়া

আমি ভালোবাসি তোমারে এবং তোমারে,
ওগো সুন্দরী দুটি,
তোম্‌রা দুজনে এসো ;
এস কালো মায়া-কাজলমাধুরী,
এস গো গৌরী এসো,
এস আলো ছায়া পথে পথে মোর
কল্পনাজাল গাঁথো,
আল্পনা আঁকো শালবীথিকার ধূলার পরে।

দান

ফুল ফোটে সেত ঝোরবে বোলেই ফোটে,
ভুলে যাবে তারে
সে ভয় তো তার নেই।
এক বেলাকার পূর্ণতা তার অসীম কালের দান।

কবিতা

খুঁজেছিলেম কল্পলোকের
চন্দ্রতারায় ;
খুঁজেছিলেম পাতাল জলের
মুক্তামণি ;
এখন দেখি শিশির মাখা
সবুজ ঘাসে
মাটির বক্ষ আঁক্‌ড়ে আছে
আমার কবিতাটি।

চঞ্চলা

বিদায় বেলায় বোলেছিলেম, ভুল্‌বেনাতো মোরে।
বল্‌লে তুমি, রাখ্‌বো মনে চিরদিনের মত।
ফিরে এলেম, দেখি, তুমি
তেম্‌নি তো চঞ্চলা,
আপন সাথে খেলায় অন্যমনা।
তোমার ভোলা মনকে তখন নতুন কোরে পাই
নতুন সাধনায়।

দুপুর খেলা

শিরীষের ডালে রোদে ঝিল্‌মিল্ পাতার খেলা,
পিঠে ল্যাজ তুলে মহুয়ার গাছে খেলায় কাঠবিড়ালী ;
অশ্বথ-তলে তিন্‌টে কুকুর
ছুটোছুটি কোরে খেলে।
পুকুরের ঘাটে জলে পা ডুবিয়ে
চুপ কোরে মোর খেলা।

কেতকী

আমি বাদলের ব্যথার দেবতা
বিদ্যুৎকাঁটা গেঁথে
বক্ষে পরেছে মালা,
কেতকীর মুখে লাগালো কাঁটার হাসি।

ফড়িং

পুকুর ভরা জলে ঝরে
টুপুর-টাপুর জল,
সবুজ পাতার পাতায় নাচে,
সবুজ ফড়িংটি।
মনে আমার উঠ্‌লো জমে
হাল্কা লয়ের নাচ
বাদ্‌লা-বেলার চঞ্চলতার তালে।

অকারণ

শালবীথিকার পথে যেতে
দুই সখি সেই দিন
দুপুরবেলায় মোরে দেখে
হাস্‌লো অকারণে।
সেই হাসি কি টান্‌লো আমায়
কিম্বা সরিয়ে দিল,
সেই কথাটাই ভাবি।

দোয়েল

সুর ভরা ঐ সভার মাঝে বসন্ত উৎসবে
লাগ্‌লো ভালো কালো মেঘের গান,
সে যেন ঐ বকুলবীথির দোয়েল পাখীর মতো।

বেলিফুলের মালা

ওকি তোমার মেঘের বুকে বকের পাঁতি।
ওকি তোমর কাজলা-নদীর শাদাবালির বাঁক।
ওগো, তোমার খোঁপার চুলে
বেলিফুলের মালা
যতই দোলে—দোলায় মনে
নতুন উপমা।

হঠাৎ হাওয়ায়

হঠাৎ কখন ঝড়ের হাওয়ায় ওড়ে
ছিঁড়ে-পড়া নতুন অশোক পাতা।
তারি সাথে এই যে উড়ে এলো
কার সে চুলের ফিতে।

জঙ্গল

বন্ধু বলেন তোমার কাব্য
ও যেন জঙ্গল।
আমি বলি জঙ্গলে সেই
বসন্ত দেয় ধরা॥

মনের সুর

মণি বোসে বোসে
গান করে আর বলে—
গলায় মেলাতে পারিনে তোমার গান।
আমি বলি—মণি, ও গানের সুর
মিলেছে তোমার মনে,
গলা তাই আর নাগাল না পায় তারে।

সকালের গান

শিরীষ ফুল, শিশির জল, পাখীর ঝাঁক,
সোনার রঙ মেঘের গায়।
বন্ধু ভাই, তোমার গান থাক্‌না আজ।

বাতাস

যে বাতাসে চপল নাচে
কাশবনে দেয় দোল,
সেই বাতাসেই দোলায় আমার না-বলা সব কথা।

ভগ্নখাসর

ঘরের কোণে ভাঙা চুড়ী,
মেঝের উপর শুক্‌নো ফুল।

স্মৃতি

দেয়ালেতে ছবির পরে ধূলো,
টবের গোলাপ শুকিয়ে হলো কাঠি ;
সেই সাড়ী আর সেই আলোয়ান নিয়ে
পাট কোরে আর গুছিয়ে রাখা কেন ?

বেরসিক

বন্ধু আমার কবিতার খাতা ছিনিয়ে নিয়ে
ফেলে দিল টান মেরে—
আমি ভাবি, ওটা ভারি বেরসিক লোক।

হাত ধোরে মোরে নিল জানালার কাছে
দেখি, বাগানেতে ভুরে সাড়ী পরা মেয়ে
ফল্‌সা গাছের ডাল ধোরে দেয় নাড়া।

একটি কথা

মোর কেদাবার হাতার পরে চ'ড়ে বোসে
নিতাই বলে, কিছুই ভালো্ লাগ্‌চে না আজ।
অনেক কথা বল্‌লে সে যে অনেক বেলা,
একটি কথা বলার সময় বোয়ে গেল।

ঋণগ্রস্ত

চোখের কোণে দিয়ে গেল হাসি,
গানের সুরে শুধ্‌চি তারই ঋণ।

ধুত্‌রো ফুল

আজ কিছুখন হাতুড়ি পেটানো রেখে
গুন্ গুন্ গায় যদুনন্দন কর্ম্মকার।

অঙ্গনে তার ছাই গাদাটার পাশে
ধুত্‌রো গাছে ফুল ধরেছে মেলা।

নাগর দোলা

দোলে বুড়োবুড়ী যুবকযুবতী
সখাসখী আর খোকা ও খুকি ;
ঠোকা ঠুকি লাগে মাথায় মাথায়
কেহ ভয় পায়, কেহবা হাসে।

কুলের কাঁটা

কাঠকুড়োণীর কাপড়ে জড়ালো
কুলের কাঁটা,
রাখাল ছেলেটা ছাড়াতে সে কাঁটা
লাগালো অনেকক্ষণ।

সান্ত্বনা

ঘুম ভেঙে চায় খোকা,
মা নেই দেখে কাঁদে,
ভুলো কুকুর ল্যাজ নেড়ে তার
হাত চেটে দেয় এসে।

বটফল

বটের গাছে সবুজ পাতা,
ছোট ছোট সিঁদুরে ফুল।
টিয়াপাখী মিলায় তাতে
রাঙা ঠোঁটের রঙ্।
দেওয়া নেওয়া সমান রঙে
উঠ্‌লো রঙীন হ'য়ে।

জন্মদিন

সকাল বেলার আলো নাচে
কোঁক্‌ড়া কালো চুলে,
খুকীর মুখে উব্‌ছে পড়ে হাসি।
আমি বলি—ও খুকী, তোর কিসের খুসী অত।
খুকী বলে—আজ্‌কে আমার জন্মদিনের খুসী।

নিরাশ্রয়

ঝড়ে উড়ে গেছে বাসা,
শ্রাবণের ধারা ঝরে,
উস্কো খুস্কো পাখা,
ডানা দুটো জড়-সড়—,
বেগুন গাছের পাতার আড়ালে
ভিজে মরে দাঁড়কাক।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনিশিকান্ত রায়চৌধুরী

রবীন্দ্র-জয়ন্তী

[আমাদের আশ্বিন-সংখ্যার রবীন্দ্র-জয়ন্তীর জন্য যে রচনাগুলি
বিলম্বে আসার জন্য প্রকাশ করা সম্ভব হয় নাই, সেইগুলি
এই সংখ্যায় প্রকাশিত হইল—বিঃ সঃ]

১

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কিছু লিখতে অনুরুদ্ধ হ'লে সে অনুরোধ — শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর ভাষায়—"প্রত্যাখ্যান করাও অসম্ভব, অথচ কি যে লিখব তা ভেবে পাইনে।"

আচার্য্য সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত রবীন্দ্রনাথের সহিত প্রথম পরিচয় সূত্রে একটা ঘটনার উল্লেখ ক'রে কবিগুরুর চরিত্রের মাধুর্য্যের দিকটা উদ্ঘাটিত ক'রে দেখিয়েছেন। তাঁর "রবীন্দ্রানুস্মৃতি"র অনুসরণ ক'রে আমিও একটী ঘটনার উল্লেখ ক'রতে সাহসী হ'য়েছি—যাতে ক'রে রবীন্দ্র-চরিতের আর একটা দিকের আভাষ পাওয়া যাবে।

এ আভাষ আমি পাই রবীন্দ্রনাথের সহিত প্রথম পরিচয়-সূত্রে। সাহিত্য-গুরু শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীরই অনুগ্রহে আমি তাঁর সহিত পরিচিত হই। সেদিন অপরাহ্ণে আমাকে দর্শন দেবার কিছু পূর্ব্বেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিশ্বআলোড়নকারী উপাধিত্যাগ-পত্র ডাকে দিয়েছিলেন। তাঁকে এ কার্য্য থেকে নিরস্ত করবার জন্যে চেষ্টার অভাব হয় নি—বিপদ ও লাঞ্ছনার ভয় দেখিয়ে। এ সব কথা আমি পরে শুনেছিলুম।

তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবার সময় আমি এ সব কথা কিছুই জানতুম না এবং প্রমথ বাবুও জানতেন না। তিনি আমার ওমরখৈয়ামের প্রুফ-শিটগুলি আগাগোড়া প'ড়লেন, জায়গায় জায়গায় সংশোধন করলেন এবং কতকগুলি বিশেষ উপদেশ দিলেন। আর যা' যা' কথা হ'ল, তা' নিতান্ত ব্যক্তিগত ব'লে উল্লেখ ক'রলুম না। এ সমস্তের মধ্য দিয়ে তাঁর সৌজন্য এবং এক অখ্যাতনামা লেখকের প্রতি অনুগ্রহ আমাকে অভিভূত ক'রেছিল।

তার পরের দিন বুঝলুম রবীন্দ্রনাথ কি ধাতুতে গঠিত। খবরের কাগজে তাঁর চিঠি প'ড়লুম এবং চিঠি সম্পর্কে পূর্ব্বোল্লিখিত ইতিহাস শুনলুম। তিনি রাজসরকারের হস্তে লাঞ্ছিত হবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন এবং প্রতি মুহূর্ত্তে তার জন্য প্রতীক্ষা ক'রছিলেন। অথচ এই অনাহূত অতিথিকে সৌজন্য এবং অনুগ্রহ বর্ষণ থেকে বঞ্চিত ক'রে তাঁর মনশ্চাঞ্চল্যের এতটুকু আভাষ দেন নি। সম্পূর্ণ অবিচলিত ভাবে তার সহিত সাধারণ বিষয়ে কথাবার্ত্তা ক'রেছেন—আসন্ন বিপদ মাথায় নিয়ে।

সেই দিনই বুঝলুম রবীন্দ্রনাথ শুধু বড় কবি নন্, বড় লোকও বটেন—সত্যিকারের আ্যরিষ্টোক্র্যাট্।

শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ

২

কবি-প্রণতি

ধূলায় ধূসর রুক্ষ বোশেখ পিঙ্গল জটাজাল,
লোলুপ শিখায় লেহিয়া দহিছে বিগত বরষকাল,
হেনকালে শুনি মন্ত্রবচন ছড়ায় বিশ্বপরে,
ছুটি ঘুঘু গায় অশথশাখায়, কপোত করুণস্বরে।
দগ্ধ দুপুরে সেই জ্যৈষ্ঠের সফল আম্রবন,
নিভৃত ছায়ায় বালকের মেলা পাঠশালা পলায়ন;
গেরুয়া-আঁচল-বিছানো নিদাঘ মনে পড়ে বার বার,
এ সবারে ভালো বাসালে হে কবি, তোমারে নমস্কার।

নীলনবঘনে আষাঢ় গগনে তিল ঠাঁই আর নাহি,
জনপদ-বধূ পথিক-ললনা অনুরাগে পথ চাহি,



রবীন্দ্রনাথ

দার্জিলিঙে গৃহীত ফটোগ্রাফ

৩ নভেম্বর ১৯৩১

যূথী পরিমল আসিছে সমীরে দাদুরী তমালবনে,
ঝরকে ঝরকে ঝরিছে বকুল কেতকীপরাগ সনে ;
আবার একদা ঝর ঝর ঝরে শ্রাবণের বারিধারা,
মেঘমল্লারে ভূর্জ্জ পাতায় নবগীত হোল সারা,
তোমার সে সুর মুখে চোখে ঝরে শ্রাবণের ধারাসার,
নব অনুরাগে জাগালে হে কবি, তোমারে নমস্কার।

নদীভরা কূলে ক্ষেতে ভরা ধান কেতকী জলের ধারে,
কদম্ব বাসে কামিনী উদাসে ঝরিতেছে বারে বারে ;
ভোর থেকে যবে মেঘ চলে যায় রোদ পড়ে
ভিজে পাতে,
ঘাটে পইঠায় বসি বালিকারা স্বপনের মালা গাঁথে :
শরতে সোনার মধুচাক ভেঙ্গে ঝরে গো লক্ষ ধার,
কাননে দোয়েল শেফালীমাল্য নূতন ধান্যভার,
আলোকে শিশিরে কুসুমে ধান্যে চিনাইলে আরবার,
ভরা ভাদরের আশিনের কবি, তোমারে নমস্কার।

শিশির ছিটায় বনকুয়াসায় ক্ষীণ প্রভাতের আলো,
হিমসন্ধ্যায় নিশিগন্ধায় কত যে লাগিল ভালো,
মাঠে পাকা ধান বনে লোধ ফুল আগুনে কৃষ্ণকলি,
মধুমঞ্জরী মালতীর কানে মন্ত্র পড়িছে অলি ;
মাঘেতে আমের জামের বউল আমলকী হরতকী,
এত যে সুষমা বহিয়া ঝরিত আমরা কভু না লখি ;
শীত হেমন্ত আদিকাল হ'তে আসে যায় বারেবার,
তোমার মাঝে তা নূতন হেরিনু, হে কবি, নমস্কার।

শিমূল পলাশ অশোক ও বকে করবী ফুটায়ে কোণে
কাঞ্চনে মেলি সোঁদালি দোলায়ে ফাগুন লাগিল বনে,
মনে বনে ফুল জ্যোৎস্না আকুল উতল চৈত্ররাতি,
পিক-কুহরিত অভিসার-পথে কবি একা তুমি সাথী ;
তোমার মাঝারে না-বোঝা প্রাণের অর্থ বুঝেছি কিছু,
অনাদির স্মৃতি জাগিয়াছে গেছি দূর ভবিতব্য পিছু,
নিখিলেতে কভু যে ছিল যে আছে যে হবে পুনর্ব্বার,
সকল কালের সবাকার কবি, তোমারে নমস্কার।

শ্রীগোপাললাল দে

৩

কবি প্রণতি

এ চঞ্চলা প্রকৃতিরে বাসিয়াছ ভালো,
অচঞ্চল নিষ্ঠা দিয়ে, এর ছায়া, আলো
আসিয়াছে বিচিত্রের ছন্দের স্বরূপে
তোমার প্রাণের প্রান্তে। অধরার রূপে,
উদ্বেল করেছে প্রাণ অকারণ প্রেমে।
বরষার যে সঙ্গীত এসেছিল নেমে
পাহাড়ের সানুদেশে, তাহারি ঝঙ্কার
অন্তরের তারে তব বাজে বারে বার।
দূর শৃঙ্গদেশে যবে মেঘ ওঠে ভেসে
মেতেছে তোমার মন নৃত্যের উল্লাসে
নৃত্যপরা ময়ূরীর মতো। ওগো কবি,
আঁকিয়াছ বারিদের বরণীয় ছবি
করুণ তুলিকা দিয়ে ; বিরহ আষাঢ়ে
পাঠালে বারতা তুমি পথিক পিয়ারে
কবিতায়।
চিরশুভ্র শারদীয় প্রাতে
অমলিন শেফালির মরণের সাথে
বেজেছে বাঁশরী তব বিদায়ের সুরে।
লঘু মেঘ বাতাসেতে যবে যায় উড়ে
কাশবন দুলে উঠে অকারণ সুখে
যবে আলো শিশিরের জলভরা বুকে
আপনা নেহারে ; তখনি তোমার প্রাণ
গাহিয়াছে অশ্রুহাসি বিদায়ের গান।
নবান্নের উৎসবেতে শরৎরাণীরে
বন্দনা করেছ তুমি অবনত শিরে
ছন্দে বাঁধা গানের মন্ত্রণে ?
কবিবর !
ফসলের শেষ হয় চাষী যায় ঘর
দিনান্তের ম্লান অন্ধকারে। দীপালিকা
ধীরে ধীরে ওঠে জ্বলে ম্লান তার শিখা

জোনাকী আলোর মতো। হেমন্ত বধূর
চক্ষুলাজে অবনত ; কুণ্ঠা নহে দূর,
ছন্দের প্রদীপ লয়ে দেখালে তাহার
ছায়া ঢাকা দীপ্তি ওই আঁখি তারকার !
গাঢ়তর হয়ে যায় কুহেলিকা, বনে
বনে ঝরে জীর্ণপাতা ; শুধু ক্ষণে ক্ষণে
কাঁপে আমলকী ডাল। রিক্ত নিস্তহীন
প্রকৃতির সুরে বাঁধিয়াছ ভাঙা বীণ
মরণের তানে ; শীতের দারুণ তপে
বসন্তের আবাহনে সুন্দরের রূপে
মিলায়েছ কণ্ঠ তব। ফাল্গুনের দিনে
বাসন্তী প্রেয়সী আসে নূপুর নিক্কণে
ফুলে ভরি আঁচল তাহার। দিকে দিকে
ফুলে, ফলে কিশলয়ে পত্র দেয় লিখে
প্রথম প্রেমের। বিনিময়ে, তুমি কবি
আঁক দাও অনুপম রূপ প্রতিচ্ছবি
নিপুণ তুলিকা দিয়ে, সবুজ আখরে।
আনন্দ উল্লাসলাস্যে সারা প্রাণ ভরে
গেয়েছ মিলন গীতি !

তবু চলে যায় :
বসন্তেরে তবু হায় দিয়াছ বিদায় —
বিচ্ছেদের গানে। কাল-বৈশাখীর সনে,
ঝটিকার বেগ নামে পাগল মাতনে
চারিদিক তোলপাড় করি। তারি সাথে
ডম্বরুর তালে তালে নটরাজ মাতে,
রুদ্রের প্রলয় বেগে ধরণী শিহরে,
জাগে প্রাণ নির্জীবের শুষ্ক কলেবরে !
তুমি কবি ভৈরবের পূজার আগুণে
গাহিয়াছ রুদ্রসুরে আপনার মনে
বাউলের একতারা লয়ে। দ্বিপ্রহরে
রবির বন্দনাগীতি ধীরোদাত্ত স্বরে
গাহিয়াছ। মরণের অসাড়তা টুটি'
বিকচ কমল প্রায় উঠিয়াছে ফুটি
জীবনের গান তব।

তোমার কবিতা
কহে যেন :

তুমি কবি সবিতার মিতা,
বিচিত্র চিত্রের শিল্পী বন্ধু আলোকের
সীমার মাঝারে স্বপ্ন দেখো অসীমের।
যত কিছু রস আছে বর্ণে, গন্ধে, গানে,
দৃশ্যে, রূপে ধরিয়াছ ছন্দের বন্ধনে
তারে। ওগো কবি, তুমি লয়েছ বাঁশরী
বিচিত্রের ; বন্ধ বন্ধ উঠিয়াছে ভরি'
মধুর গানের সুরে মৃদু ফুৎকারে ;
প্রকৃতির প্রিয় তুমি তাই বারে বারে
নমস্কার করি তোমা। ওগো রবি।
শ্রদ্ধা মোর লহ তুমি সুন্দরের কবি।

শ্রীক্ষিতীশ রায়

৪
শান্তিনিকেতন

'যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্।'

ভারত, তোমার নব শান্তিনিকেতনে
তোমার মন্ত্রের শান্তি বাঁধিয়াছে নীড় :
সে নীড়ে মিলিবে বিশ্ব সখ্যের বন্ধনে,—
সেথা জগতের প্রেম হবে সুনিবিড়।
শান্তিহারা জগতের আত্মা গৃহহারা
সেথায় লভিবে ফিরি' পরম আশ্রয়,
লুপ্ত শান্তি পাবে খুঁজি', ভাঙি মোহকারা
জ্ঞানের আলোক নেহারিবে সুনিশ্চয়।
আবার উঠিছে ধ্বনি সেথা সামগান
প্রথম প্রভাতে যথা অরণ্যের তলে :
সন্ধ্যাউষা স্তোত্র মাঝে লভে নবপ্রাণ
প্রণব সেথায় গীতিসহস্রার দলে।
হে ভারত, মগ্ন সেথা হ'য়েছ আবার
সত্য শিব সুন্দরের আনন্দ-মাঝার !

শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায়

চতুরঙ্গ

ডাক্তার সরসীলাল সরকার এম্‌-এ

"চতুরঙ্গ" কবি সম্রাট রবীন্দ্রনাথের একটি অপূর্ব্ব কথা সাহিত্য। ইহার রচনা কিছু নূতন ধরণের,—গল্পের মধ্যে চারিটি প্রধান চরিত্র আছে, জ্যাঠামশায়, শচীশ, দামিনী ও শ্রীবিলাস. এই চারিটি চরিত্র লইয়া চারিটি অধ্যায়ে পুস্তকখানি সম্পূর্ণ হইয়াছে। এই পুস্তক লেখার ভঙ্গী দেখিয়া বোঝা যায় বিভিন্ন চরিত্রে মনোবৃত্তির ঘাতপ্রতিঘাতে চরিত্র কি ভাবে পরিস্ফুরিত হইয়াছে।

এই পুস্তকের মধ্যে শচীশই সর্ব্বপ্রধান চরিত্র। প্রথম অধ্যায়ে অর্থাৎ 'জ্যাঠামহাশয়'-এ শচীশের তরুণ জীবনে মনের মধ্যে কিরূপ ঘাতপ্রতিঘাত হইয়াছিল, তাহারই ছবি আমাদের চোখের সম্মুখে ধরা হইয়াছে; পরে শচীশের জীবন যে পথে বিকশিত হইয়াছিল তাহার মধ্যেও তার এই প্রথম জীবনের ঘাতপ্রতিঘাতের ক্রিয়া প্রচ্ছন্ন ভাবে চলিয়াছে। আমাদের গভীরতম মনের মনোবৃত্তির ক্রিয়াগুলি এত প্রচ্ছন্ন ভাবে সম্পন্ন হয় যে সাধারণ দৃষ্টিতে তাহা ধরা যায় না। আমরা মানুষের জীবনের যে সমস্ত পরিবর্ত্তন চোখের উপর সর্ব্বদা দেখিতে পাই, তাহাতে এক এক ব্যক্তির জীবনের পরিবর্ত্তন দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া যাই, কিন্তু তাহাদের জীবনের এত পরিবর্ত্তনের মধ্যেও বাল্যকাল হইতে একটা যোগসূত্র থাকে।

শচীশের চরিত্রেও তাহার জীবন-কাহিনীতে আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখানো হইয়াছে। শচীশকে যখন আমরা প্রথম দেখি, তখন তাহাকে নাস্তিক জ্যাঠামহাশয়ের একনিষ্ঠ চেলারূপে দেখি। জ্যাঠামহাশয়ই তাহার পিতা, শিক্ষক ও আদর্শ সবই একাধারে ছিলেন, এবং তাঁহার উপর তাহার যে শ্রদ্ধা তার কোনখানেই কোন ফাঁক ছিল না।

তাহার পর জ্যাঠামহাশয়ের মৃত্যুর পর সে কোথায় চলিয়া গেল, দুই বৎসর তাহার কোন ঠিকানা পাওয়া গেল না। কিছু দিন পরে শোনা গেল চাটগাঁয়ের কোন এক জায়গায় শচীশ লীলানন্দ স্বামীকে গুরুরূপে বরণ করিয়া তাঁহার সহিত কীর্ত্তনে মাতিয়া করতাল বাজাইয়া পাড়া অস্থির করিয়া নাচিয়া বেড়াইতেছে।

অনেক দিন এইরূপ মাতামাতিতে কাটিল। তারপর একদিন জানা গেল আবার শচীশের মতের বদল হইয়াছে। একদিন অতি উচ্চৈঃস্বরে সে না মানিত জাত না মানিত ধর্ম্ম; তারপর আর একদিন অতি উচ্চৈঃস্বরে সে খাওয়া ছোঁওয়া, স্নান তর্পণ যোগ যাগ কিছুই মানিতে বাকি রাখিল না; তারপর আর একদিন এই সমস্তই মানিয়া লওয়ার ঝুড়ি ঝুড়ি বোঝা ফেলিয়া দিয়া সে নীরবে শান্ত হইয়া বসিল, কি মানিল আর কি না মানিল তাহা বোঝা গেল না। কেবল ইহাই দেখা গেল যে আগেকার মত সে আবার কাজে লাগিয়া গেছে, কিন্তু তার মধ্যে ঝগড়া বিবাদের ঝাঁজ কিছুই নাই।

শচীশের এইরূপ বিচিত্র মত-পরিবর্ত্তনের হেতু সম্বন্ধে গ্রন্থকার স্পষ্টভাবে কিছুই বলেন নাই; তবুও গল্পটি এমন ভাবে লেখা হইয়াছে যে গল্প পড়িতে গিয়া পাঠকের রসভঙ্গ হয় না, খাপছাড়া রকম কথা কিছু পড়িতেছি, গল্পে কোন অসামঞ্জস্য আছে এমন কথা পাঠকের মনে উদয় হয় না। একটা সরল অনুভূতির মধ্য দিয়া "জিনিসটা বেশ ঠিকই হইতেছে' এই রকম ভাবই পাঠকের মনে আসে। অর্থাৎ এই গল্পের ভাবের সঙ্গে বিশ্বমানবের যে রসবোধ তাহার সহিত সংযোগ আছে, পাঠকের পরিতৃপ্তিতে তাহাই বুঝায়।

গল্পের শেষাশেষি শচীশ তাহার নিজের জীবনবিকাশের ঘাতপ্রতিঘাতে যে একটা নিজস্ব philosophy লাভ করিয়াছে সে সম্বন্ধে সে এইরূপ বলিয়াছে :—

শচীশ বলিল, "আজ আমি স্পষ্ট বুঝিয়াছি, স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ কথাটার অর্থ কি। আর সব

জিনিস পরের হাত হইতে লওয়া যায় কিন্তু ধর্ম্ম যদি নিজের না হয় তবে তাহা মারে, বাঁচায় না। আমার ভগবান অন্যের হাতের মুষ্টিভিক্ষা নহেন, যদি তাঁকে পাই ত আমিই তাঁকে পাইব, নহিলে নিধনং শ্রেয়ঃ।"

আর একস্থানে শচীশ ভগবানের সম্বন্ধে বলিয়াছে,—"তিনি রূপ ভালবাসেন, তাই কেবলি রূপের দিকে নামিয়া আসিতেছেন। আমরা তো শুধু রূপ লইয়া বাঁচি না, তাই অরূপের দিকে ছুটিতে হয়।"

রূপের ভিতর দিয়া অরূপের উপলব্ধি এই যে একটা দার্শনিক তত্ত্ব, ইহা বঙ্গদেশে নানাভাবে প্রচলিত আছে। চণ্ডীদাসের কবিতায়, বাউল সম্প্রদায়ের সাধন রহস্যে এই তত্ত্বের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। দার্শনিক কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সকল রচনার মধ্যেই এই তত্ত্বটি বিশেষ ভাবে ফুটাইতে চাহিয়াছেন। নব মনোবিজ্ঞান, অবচেতন মনের ক্রিয়াই যাহার আলোচনার বিষয়,—সেই আলোচনায় দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছে যে রূপের মধ্যে এই অপরূপের উপলব্ধি ইহা আমাদের গভীরতম মনের একটি স্বাভাবিক ক্রিয়া। এই গল্পটির মধ্যেও গভীর মনের এই ক্রিয়ার অভাব অনেক স্থলেই আছে।

'চতুরঙ্গ' পুস্তকখানি নানাভাবে আলোচনা করা যায়, আমরা কেবল মনস্তত্ত্বের দিক দিয়াই আমাদের আলোচনার সীমা নিবদ্ধ রাখিব। আলোচনার পূর্ব্বে কবিবর mystic উপলব্ধি সম্বন্ধে যে পত্রখানি আমাকে লিখিয়াছিলেন তাহার কিছু উদ্ধৃত করিলাম:—

"মিষ্টিক উপলব্ধি সম্বন্ধে সুনির্দ্দিষ্ট করে কিছু বলা চলে না। ইন্দ্রিয় বোধের মতই সেটা অনির্ব্বচনীয়। ব্যোম-তরঙ্গকে চোখ কেন আলোকরূপে দেখে তা নিয়ে তর্ক করে লাভ নেই—দেখে বলেই দেখে এইটিই হোল চরম কথা। চৈতন্যের নানা দিক আছে, এক আলো থেকেই নানা রঙের বোধ যেমন এও তেমনি। কেউ বা লাল রং দেখতে পায় না কেউ বা নীল, কেউ বা এটা বেশী দেখে কেউ বা ওটা। আমি আজকাল ছবি আঁকি, সেই ছবিতে বর্ণ সংঘটনের বিশেষত্ব আছে। এই বিশেষত্বের কারণ আমার চৈতন্যে রঙের বিশেষ ধারণার মধ্যে। আমি সব রঙকে সমান ভাবে দেখি না, পক্ষপাত আছে, কেন আছে কে বলবে? গাছের পাতা কেন সবুজ রংকে প্রক্ষিপ্ত করে? গাছের ফুল কেন করে লালকে? মিষ্টিক উপলব্ধিও একরকম নয়, নিশ্চয়ই তার বৈচিত্র্য আছে। সে বৈচিত্র্য ঠিক বর্ণনা করা যায় না, কেননা সে তো চোখে দেখবার জিনিস নয়। কবিদের উপলব্ধিকে যদি মিষ্টিক বল তবে সেই উপলব্ধি প্রকাশের ভাষা তাঁদের আছে এইখানেই কবিত্ব। কবীর প্রভৃতি প্রাচীন সাধকেরা ভাষাবান ছিলেন। তবে সে ভাষা সম্পূর্ণ বুঝতে গেলে কিছু পরিমাণে তাঁদের মতো চিত্ত থাকা চাই। উপলব্ধি ও ভাষা এই দুইএর যোগে জিনিয়াস্। ভাষা মানে কেবল শব্দের ভাষা নয়, সঙ্কেতের ভাষা, যুক্তির ভাষা, রেখার ভাষা, ছন্দের ভাষা, চরিত্রের ভাষা, এমন কত কি।"

কবিবর তাঁহার পত্রে বলিয়াছেন, মানব-জীবনে ইন্দ্রিয়-বোধের ন্যায় মিষ্টিক উপলব্ধিও সকলের মধ্যেই আছে। ইন্দ্রিয়-বোধের ন্যায় ইহাও অনির্ব্বচনীয়, কেবল কবিরাই এই উপলব্ধিকে রূপদান করিতে পারেন এবং ভাষায় প্রকাশ করিতে পারেন। আমরা সেই মিষ্টিক উপলব্ধির দিক দিয়া এই এই গ্রন্থে বর্ণিত চরিত্র সমূহের ভাব বুঝিবার চেষ্টা করিতে পারি।

কবিবর এই পত্রে যে মিষ্টিক উপলব্ধির উল্লেখ করিয়াছেন এই পুস্তকে সেই উপলব্ধিকে ভাষাবান করিয়া তিনি চরিত্রের ঘাতপ্রতিঘাত আঁকিয়াছেন। যেমন এই পুস্তকের প্রথমেই আছে,—"শচীশকে দেখিলে মনে হয় যেন একটা জ্যোতিষ্ক—তার চোখ জ্বলিতেছে। তার লম্বা সরু আঙুলগুলি যেন আগুনের শিখা; তার গায়ের রং যেন রং নহে, তাহা আভা। শচীশকে যখন দেখিলাম অমনি যেন তা'র অন্তরাত্মাকে দেখিতে পাইলাম,—তাই এক মুহূর্ত্তে তাহাকে ভালবাসিলাম।"

আবার অন্যত্র আছে—"এমনি করিয়া জ্যাঠামহাশয়ের ভিতর দিয়াই শচীশ আপনার যাহা কিছু পাইয়াছে, এবং তাঁর মধ্য দিয়াই সে আপনার যাহা কিছু দিয়াছে।"

এই পুস্তকে একটি গান আছে। রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য গানের ন্যায় এটিও একটি মিষ্টিক উপলব্ধি প্রকাশের চেষ্টা।

পথে যেতে তোমার সাথে
মিলন হ'ল দিনের শেষে।
দেখতে গিয়ে, সাঁঝের আলো
মিলিয়ে গেল এক নিমেষে।

* * * *

দেখা তোমার হোক বা না হোক্
তাহার লাগি করব না শোক,
ক্ষণেক তুমি দাঁড়াও, তোমার
চরণ ঢাকি এলোকেশে।*

এই পুস্তকের প্রথম চরিত্র 'জ্যাঠামহাশয়' জগমোহন। ইঁহার চরিত্রে সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্ব যে ইনি নাস্তিক। এই নাস্তিকতা সম্বন্ধে গ্রন্থকার বলিয়াছেন :—"তিনি ঈশ্বরে অবিশ্বাস করিতেন বলিলে কম বলা হয়—তিনি না-ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতেন। যুদ্ধ জাহাজের কাপ্তেনের যেমন জাহাজ চালানোর চেয়ে জাহাজ ডোবানোই বড় ব্যবসা, তেমনি যেখানে সুবিধা সেইখানেই আস্তিক্য ধর্ম্মকে ডুবাইয়া দেওয়াই জগমোহনের ধর্ম্ম ছিল।"

এই কথাগুলির দ্বারা বোঝা যায় জগমোহনের যে "ধর্ম্ম" একেবারেই ছিল না তাহা নয়। তাঁহার একটা নিজস্ব ধর্ম্ম ছিল এবং সেটি খুব প্রবল ভাবেই ছিল। তিনি তাঁর নিজের সেই ধর্ম্মমতকে এইরূপভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন :—

"ঈশ্বর যদি থাকেন তবে আমার বুদ্ধি তাঁরই দেওয়া ;—

সেই বুদ্ধি বলিতেছে যে ঈশ্বর নাই, অথচ তোমরা তাঁর মুখের উপর জবাব দিয়া বলিতেছ যে ঈশ্বর আছেন। এই পাপের শাস্তি স্বরূপ তেত্রিশ কোটী দেবতা তোমাদের দুই কান ধরিয়া জরিমানা আদায় করিতেছে।"

এখানে জগমোহন "তোমরা" কথাটিতে তাঁহার ভাই হরিমোহনকে ও তাঁহার দলের লোককে বুঝাইতেছেন।

তাঁহার ভাই হরিমোহনের—(শচীশের পিতা) সম্বন্ধে গ্রন্থকার এইরূপ বর্ণনা দিয়াছেন :—

"হরিমোহন শিশুকালে অসুস্থ ছিলেন। তাগাতাবিজ, শান্তি স্বস্ত্যয়ন, সন্ন্যাসীর জটা নিংড়ানো জল, বিশেষ বিশেষ পীঠস্থানের ধূলা, অনেক জাগ্রত ঠাকুরের প্রসাদ ও চরণামৃত, গুরু পুরোহিতের অনেক টাকার আশীর্ব্বাদ তাঁকে যেন সকল অকল্যাণ হইতে গড়বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছিল। * * * বিশেষতঃ তাঁর পিতার অল্প বয়সে মৃত্যুর নজীরের জোরে মা-মাসির সেবা যত্ন তিনি নিজের দিকে টানিয়া লইলেন। কেবল মা-মাসির নয়, তিনি যেন তিন ভুবনের সমস্ত ঠাকুর দেবতার বিশেষ জিম্মায় এ তিনি কখনো ভুলিতেন না। কেবল ঠাকুর দেবতা নয়, সংসারে যেখানে যার কাছে যে পরিমাণ সুবিধা পাওয়া যায় তাকে তিনি সেই পরিমাণই মানিয়া চলিতেন—থানার দারোগা, ধনী প্রতিবেশী, উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ, খবরের কাগজের সম্পাদক, সকলকেই যথোচিত ভয় ভক্তি করিতেন,—গো ব্রাহ্মণের তো কথাই নাই।"

এইরূপ ধর্ম্মে আস্তিকতা কম বেশী বহু স্থলেই দেখা যায় এবং জগমোহন তাঁহার ভাইএর প্রকৃতিতে ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তাঁহার ভাই বাস্তবিক

* অর্থাৎ তোমার সঙ্গে আমার পূর্ব্বপরিচয় ছিল এমন নয়, জীবনের পথে হঠাৎ তোমার সঙ্গে দেখা হ'ল, আর সে সাক্ষাৎ যে হ'ল তাহাও দিনের শেষে—অর্থাৎ যখন জীবন যাত্রার আমি নিজের মত চলেই আমার জীবনটা একরকম শেষ করেছি।

দেখতে গিয়ে, সাঁঝের আলো
মিলিয়ে গেল এক নিমেষে।

দেখা যে হ'ল তাও স্পষ্ট দিবালোকে নয়,—সন্ধ্যার আলোয়, তাও এত শীঘ্র মিলিয়ে গেল যে ভালো করে দেখা হ'ল না। দিনের আলোয় নয়,—অর্থাৎ সাংসারিক ভাবের মধ্য দিয়ে নয়, যেন এক নূতন রহস্যময় অস্পষ্ট ভাবের মধ্য দিয়া দেখা হ'ল। আর সে দেখাও এত ক্ষণিক যে, যে আলোতে তোমাকে দেখেছিলাম তাও এক নিমেষেই মিলিয়ে গেল।

দেখা তোমার হোক্ বা না হোক
তাহার লাগি করব না শোক,

দিবালোকে তোমার দেখা পেলাম না সেজন্য আমার শোক করবার কিছু নাই, কেননা সেই নিমেষের দেখাতেই আমার জীবনের কর্ত্তব্য নিরূপণ হয়ে গিয়েছে।

এখন,—

ক্ষণেক তুমি দাঁড়াও, তোমার
চরণ ঢাকি এলোকেশে।

তুমি এখন অন্ধকারেই একটু দাঁড়াও আমি আমার মাথার এলোকেশ দিয়ে তোমার চরণ ঢেকে দেব এতেই আমি পূর্ণকাম হব। অর্থাৎ আমার জীবনের যা কিছু সব চেয়ে সার্থকতা তাই দিয়ে তোমার পা ঢেকে দেব। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা যে মিষ্টিক অনুভূতির ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেছেন তাহাও এইরূপ ভাবের দিক দিয়াই।

পক্ষে কিরূপ চরিত্রহীন নীচ স্বার্থপর ছিলেন এবং সেইটি ধর্ম্মের আবরণে ঢাকিয়া কিরূপ ভাবে সাধু সাজিতেন এটিও তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়ায় নাই। তাহার ফলে তাঁহার মনের মধ্যে একটি প্রতিক্রিয়া হইল এবং বিদ্রোহী মনের গতি ঠিক উল্টো দিকে গেল। তাঁহার সম্বন্ধে গ্রন্থকার বলিয়াছেন,

"জগমোহনের ভয় ছিল ঠিক উল্টা দিকে। কারো কাছে তিনি লেশ মাত্র সুবিধা প্রত্যাশা করেন এমন সন্দেহমাত্র পাছে কারো মনে আসে এই ভয়ে ক্ষমতাশালী লোকদিগকে তিনি দূরে রাখিয়া চলিতেন। তিনি যে দেবতা মানিতেন না তা'র মধ্যে তাঁর ঐ ভাবটা ছিল। লৌকিক বা অলৌকিক কোন শক্তির কাছে তিনি হাত জোড় করিতে নারাজ।"

এই থেকে আমরা বুঝিতে পারি যে জগমোহন তাহার ভাই হরিমোহনের আস্তিকতার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাহার জন্ম তাঁহার মনের মধ্যে একটি প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয়। ইহার ফলে তাঁহার নাস্তিকতা গঠন হয়।

কবি-সম্রাট মিষ্টিক রহস্য সম্বন্ধে তাঁর পত্রে লিখিয়াছেন, পৃথিবীতে রং সম্বন্ধে লোকের পক্ষপাত থাকে, সকলে এক রঙের পক্ষপাতী হয় না: এস্থলে সেই রকমই ঘটিল। হরিমোহনের বড় ছেলে পুরন্দর তার পিতার রঙের পক্ষপাতী হইল। কিন্তু অন্য ছেলে শচীশ সে-রঙের ধার দিয়াও ঘেঁসিল না; সে তাহার উল্টা রং অর্থাৎ জ্যাঠামহাশয়ের রঙেরই একান্ত পক্ষপাতী হইল; অর্থাৎ পুরন্দর তাহার পিতার আদর্শ গ্রহণ করিয়া ধার্ম্মিক হইল এবং শচীশ তাহার নাস্তিক জ্যাঠামহাশয়ের আদর্শ গ্রহণ করিয়া নাস্তিক হইয়া গেল।

তাহার পরের ঘটনা এই:—এই ধার্ম্মিক পুরন্দর ননীবালা নামে একটি পিতৃমাতৃহীনা বিধবা বালিকাকে তাহার মাতুল গৃহ হইতে ভুলাইয়া বাহির করিয়া লইয়া গেল; কিন্তু কিছুদিন পরে আবার তাহাকে অপমানের একশেষ করিয়া নিজের আশ্রয় হইতে তাড়াইয়া দিল, মেয়েটি তখন সন্তান-সম্ভাবিতা। নাস্তিক শচীশ এই ঘটনা জানিতে পারিয়া মেয়েটিকে উদ্ধার করিয়া জ্যাঠামহাশয়ের আশ্রয়ে রাখিয়া আসিল।

ইহার পর পুরন্দরের নানারূপ উৎপাত আরম্ভ হইল। ননীবালার দুশ্চরিত্র মামাতো ভাই পুরন্দরের বন্ধু ছিল। পুরন্দর তাহাকে অভিভাবক খাড়া করিয়া জ্যাঠামহাশয়ের নিকট হইতে ননীবালাকে কাড়িয়া আনিবার চেষ্টা করিল এবং সেই ভাই এর মুখ দিয়া প্রমাণ করিতে চাহিল যে শচীশই ননীর পতনের কারণ।

তখন পর্য্যন্ত ননীর সঙ্গে শচীশের উদ্ধার করা ছাড়া আর দেখা শুনা হয় নাই। ননী শচীশ সম্বন্ধীয় অযথা অপবাদ শুনিয়া মনে মনে বলিতে লাগিল "ধরণী দ্বিধা হও।"

শচীশ তার জ্যাঠামহাশয়কে বলিল "ননীকে এই সব উৎপাত থেকে বাঁচাবার একটা উপায় আছে, সেটা এই যে, আমি ননীকে বিবাহ করিব।"

জগমোহন ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া মত দিলেন।

কিছুদিন পরে এইসব ব্যাপারের উপসংহার হইল ননীর আত্মহত্যায়। মৃত্যুর সময় তাহার হাতে একখানি চিঠি ছিল, তাহাতে লেখা ছিল,—"বাবা পারিলাম না, আমাকে মাপ কর। তোমার কথা ভাবিয়া এতদিন আমি প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছি—কিন্তু তাঁকে আজও ভুলিতে পারি নাই।

তোমার শ্রীচরণে শতকোটী প্রণাম।

পাপিষ্ঠা ননীবালা।

নব্য মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া বিচার করিলে এই ঘটনার মধ্যে একটি অর্থ পাওয়া যায় যেটা আমাদের সাধারণ বুদ্ধির দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় না।

বিবাহ সম্বন্ধে শচীশ তাহার পিতাকে বলিয়াছিল "কুলের কলঙ্ক মুছিবার জন্যই আমার এই চেষ্টা, নহিলে বিবাহ করিবার সখ আমার নাই।" এই কথার মধ্যে শচীশ বিবাহ সম্বন্ধে তাহার যে মনের ভাব প্রকাশ করিয়াছিল, সেটি সত্য। কিন্তু তাহার মনের ভিতর, এই ব্যাপার লইয়া যে ক্রিয়া চলিতেছিল তাহার সবটা সে প্রকাশ করিতে পারে নাই। কারণ তাহার এই ক্রিয়ার কতকটা তাহার অবচেতন মনের মধ্যে ঘটিতেছিল যেটা তাহার চেতন মনে পৌঁছিতেছিল না,

যদিও তাহার এই অজ্ঞাত অনুভূতি ভাবের মধ্যে দিয়া তাহাকে অভিভূত করিতেছিল।

শচীশের ননীবালাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাবের মধ্যে যে মহত্ত্বের ভাব আছে, তাহা আমরা কেবল যুক্তির দিক দিয়া বুঝিতে গেলে ধরিতে পারি না। মনোবিজ্ঞান-শাস্ত্রের গবেষণায় একটা কথা প্রমাণ করার চেষ্টা আছে, যে যখন কেহ কোন একটি পতিতা রমণীকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করে, তখন তাহার মনের মধ্যে অনেক প্রকার ভাবের সমষ্টি থাকে। প্রথমতঃ সে মনের মধ্যে স্বীকার করিয়া লয় যে এই রমণীটি তাহার স্খলনের জন্য নিজে দোষী নয়, সে অত্যাচারিতা, অতএব করুণার পাত্রী। দ্বিতীয়তঃ তার উপর যে অত্যাচার করা হইয়াছে তাহার জন্য কাহারও শাস্তিভোগ করা দরকার; আর সেই শাস্তির ভাগ যে বিবাহ করিতেছে সে যেন নিজের ঘাড়ে লইতেছে।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে যে আর একজনের অপরাধের শাস্তি সে নিজের স্কন্ধে লয় কেন? মনোবিজ্ঞান গবেষণার দ্বারা, এরূপ স্থলে একটা হেতু নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছে, যেটি প্রণিধান করিয়া দেখিবার বিষয়। মনোবিজ্ঞানের মতে এরূপস্থলে নারীর প্রতি পুরুষের এই অত্যাচার মনের গভীরতম স্তরে এইভাবে প্রতিফলিত হয় যে—"আমার বাবা আমার মার উপর অত্যাচার করিয়াছেন। আমার মা নিরীহ কিন্তু বিশেষ ভাবে অত্যাচারিতা।" মায়ের উপর বাবা দারুণ অত্যাচার করিয়াছেন এরূপভাব, কোন কারণে মনের মধ্যে পূর্ব্ব হইতেই থাকে। যেখানে পতিতার সহিত বিবাহের প্রস্তাব আন্তরিক ভাবে উপস্থিত হয়, মনোবিজ্ঞান বলে সেই স্থানে ঐ পতিতার মধ্যে প্রস্তাবকর্ত্তার জননীর ভাবের একটা মিষ্টিক উপলব্ধি হয়। অত্যাচারিতা এরূপ স্থলে মায়ের প্রতীক, আর অত্যাচারকর্ত্তা তাহার পিতা, পিতার সহিত সন্তানের যে সংযোগ, সেই সংযোগানুসারে সেও পিতার কৃত অত্যাচারের জন্য দায়ী এবং তদনুসারে তাহারও এই অন্যায়ের প্রতীকার করা উচিৎ, এরূপ উপলব্ধির ছাপও তাহার মনের গভীরতম প্রদেশে থাকে, কিন্তু এই উপলব্ধি বাহিরের দিক দিয়া সে নিজেও বুঝে না এবং অন্য লোকও বুঝেনা।

এই কাহিনীতে শচীশের মায়ের উপর পিতার অত্যাচার সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই, কিন্তু তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পুরন্দর—যে পিতার প্রতীক—তাহার দ্বারা তাহার ভ্রাতৃজায়ার উপর অত্যাচার হইতেছিল এবং পিতা হরিমোহনও তাহার সমর্থক ছিলেন এ সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। সুতরাং মাতৃস্থানীয়ার প্রতি অত্যাচার হইতেছে এরূপ অনুভূতির হেতুর এখানে অভাব নাই।

শচীশ যে ভাবে "কুলের কলঙ্ক" মুছিবার চেষ্টার কথা বলিয়াছিল তাহার ভাবার্থ এইরূপই হয়। আর কথাটা তাহার পিতাকে বলিয়াছিল, এই কুলের কলঙ্কের মধ্যে যাহার বিশেষ হাত আছে।

ননীবালার আত্মহত্যা ও চিঠির মধ্যেও শচীশের এই প্রস্তাবের একটা উত্তর খুঁজিয়া পাওয়া যায়। ননীবালা শচীশ সম্বন্ধীয় অপবাদ শুনিয়া যখন মনে মনে বলিয়াছিল "ধরণী দ্বিধা হও", শচীশের উপর তাহার মনের ভিতর একটা যে বিশেষ শ্রদ্ধা আছে ইহা সেই কথাতে বুঝা যায়। ননীবালাকে গ্রন্থকার এই ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, নিতান্ত কচিমুখ, অল্প বয়স, সে মুখে কলঙ্কের কোন চিহ্ন পড়ে নাই। ফুলের উপর ধুলা লাগিলেও যেমন তা'র আন্তরিক শুচিতা দূর হয় না, তেমনি শিরীষ ফুলের মত মেয়েটির ভিতরের লাবণ্যও ঘোচে নাই।

* * * *

ননীবালা তাহার পত্রে লিখিয়াছিল, "বাবা পারিলাম না তাঁহাকে যে আজিও ভুলিতে পারি নাই।" এই কথায় আমরা বুঝিতে পারি যে যদিও সে শিরীষ ফুলের মত পবিত্র ছিল কিন্তু উপরে যে ধুলা লাগিয়াছিল তাহা সে বুঝিয়াছিল এবং ভুলিতে পারিল না, সেই জন্য সে শচীশকে আত্ম-সমর্পণ করিতে পারিল না। তদপেক্ষা আত্মহত্যা করাই শ্রেয় মনে করিল। এই জন্যই সে চিঠিতে নিজের নামের পূর্ব্বে 'পাপিষ্ঠা' এই কথা লিখিয়াছিল।

শচীশ যখন বিবাহের প্রস্তাব করে, তখন তাহার মনের মধ্যে মা'য়ের যে মিষ্টিক অনুভূতি জাগ্রত হইয়াছিল, ননীবালার পত্রের ব্যবহারে অর্থাৎ তাহার সেই পত্রে ও

আত্মহত্যার সে শচীশের মনের অবচেতনে সেই "মা"ই রহিয়া গেল। ননীবালার সেই আত্মত্যাগ শচীশের মনের মধ্যে যে একটা ভাব দাগিয়া রাখিয়া গেল তাহা শচীশের ডায়েরীর একস্থানে এইরূপ ভাবে লিপিবদ্ধ আছে,—

"ননীবালার মধ্যে আমি নারীর এক বিশ্বরূপ দেখিয়াছি—অপবিত্রের কলঙ্ক যে নারী আপনাতে গ্রহণ করিয়াছে, পাপিষ্ঠের জন্য যে নারী জীবন দিয়া ফেলিল, যে নারী মরিয়া জীবনের সুধাপাত্র পূর্ণতর করিল।"

নারী সম্বন্ধে এইরূপ মিষ্টিক উপলব্ধি নারীর জননীরূপ লইয়াই সম্ভব। যাহাকে পৃথিবীতে দাম্পত্য প্রেম বলা হয়, এই মনোভাব তাহা হইতে বিভিন্ন প্রকারের, অর্থাৎ মনটি তখন দাম্পত্য প্রেমের স্তর,—যাহাতে দেহের আকর্ষণ থাকে ভোগের ইচ্ছা থাকে তাহা হইতে যেন একটি উচ্চস্তরে উঠিয়া গিয়াছে। দাম্পত্য প্রেম উপলব্ধি করিতে হইলে মনকে এই অবস্থা হইতে টানিয়া নামাইতে হয়। যাহাদের জীবনের মধ্যে একবার মা'য়ের এই মিষ্টিক উপলব্ধি প্রতিষ্ঠিত হয় তাহারা পরে আর দাম্পত্য প্রেমের জীবন অবলম্বন করিতে পারে না। শচীশের জীবনের পরের ঘটনায় দেখা যায় যে শচীশের বেলাও তাহাই ঘটিয়াছিল।

পূর্ব্বে আমরা জ্যাঠামহাশয়ের নাস্তিকতা আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি, যে জ্যাঠামহাশয়ের নাস্তিকতা তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাসের ভিত্তির উপর সংস্থাপিত ছিল না। এইটির ভিত্তি ছিল নিছক্ একটা বিদ্রোহের ভাব। এই বিদ্রোহের ভাবটি শচীশ আহরণ করিয়াছিল। আবার এই বিদ্রোহের ভাবটি শচীশ একদিক দিয়া জ্যাঠামহাশয়ের উপরই প্রয়োগ করিয়াছিল। ব্যাপারটি এইরূপে ঘটিয়াছিল।

এই 'বিদ্রোহকে' পূর্ণ সজাগ রাখিবার জন্য জ্যাঠা-মহাশয় কোন অস্তিভাব মনের মধ্যে আসিতে দেন নাই। জ্যাঠামহাশয়ের নীতি ছিল "প্রচুরতম মানুষের প্রভূততম সুখ সাধন"। তিনি সর্ব্বদা এই নীতি মানিয়া চলিতেন। শচীশকে যখন তিনি স্বেচ্ছায় বিদায় দিলেন, তখন তিনি দরজা বন্ধ করিয়া ঘরের মধ্যে মেঝের উপর শুইয়া পড়িলেন।

গল্পের কথক শ্রীবিলাস এখানে বলিতেছেন, "হায়রে প্রচুরতম মানুষের প্রভূততম সুখ সাধন! মানুষের সম্বন্ধে বিজ্ঞানের পরিমাপ যে খাটেনা। মাথা গণনায় যে মানুষটি কেবল এক হৃদয়ের মধ্যে সে যে সকল গণনার অতীত। শচীশকে কি এক দুই তিনের কোঠায় ফেলা যায়? সে যে জগমোহনের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া সমস্ত জগৎকে অসীমতায় ছাইয়া ফেলিল।"

জগমোহন 'আস্তিক্য' কে এড়াইতে গিয়া এই ভাবে সেই সকল অনুভূতিকে নিরোধ করিতে চেষ্টা করিতেন যেগুলি মানব-ধর্ম্মের ভিত্তি স্বরূপ। কিন্তু এই নিরোধের চেষ্টা সকল সময়ে সফল হইত না, কখনও কখনও এই ভাবের অনুভূতি তাঁহার নাস্তিকতাকে অতিক্রম করিয়া যাইত। যেমন:—

"ননী তাঁর হাত ধরিয়া বলিল—বাবা তুমি আজ আমাকে আশীর্ব্বাদ কর।

"মা, আমি স্পষ্টই দেখিতেছি, বুড়াবয়সে তুমি এই নাস্তিককে আস্তিক করিয়া তুলিবে। আমি আশীর্ব্বাদে সিকি-পয়সা বিশ্বাস করিনা, কিন্তু তোমার ঐ মুখখানি দেখিলে আমার আশীর্ব্বাদ করিতে ইচ্ছা করে।"

জ্যাঠামহাশয়ের মৃত্যু বিবরণ বলিতে গিয়া বক্তা বলিতেছেন, "শচীশ তার জ্যাঠা মহাশয়কে প্রণাম ক'রে নাই, মৃত্যুর পর আজ প্রথম ও শেষবারের মত তাঁহার পায়ের ধুলা লইল।"

ইহার দ্বারা বুঝা যায় যে জ্যাঠা মহাশয়ের এইরূপ বিদ্রোহ শচীশকে পীড়া দিত। জ্যাঠামহাশয়ের মৃত্যুর পর,—

"অসহ্য যন্ত্রণার দায়ে শচীশ কেবল বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছিল যে, শূন্য এত শূন্য কখনই হইতে পারে না। সত্য নাই এমন ভয়ঙ্কর ফাঁকা কোথায়ও নাই। একভাবে যাহা "না" আর একভাবে তাহা যদি "হাঁ" না হয়, তবে সেই ছিদ্র দিয়া সমস্ত জগৎ যে গলিয়া ফুরাইয়া যাইবে।"

এই জন্য বিদ্রোহের ভাব লইয়া জ্যাঠামহাশয়ের মৃত্যুর পর সে এমন একটি লোককে গুরুরূপে বরণ করিল যিনি জ্যাঠামহাশয়ের ঠিক উল্টা প্রকৃতির এবং সেই উল্টা প্রকৃতির গুরুবরণে যেন সে জ্যাঠামহাশয়ের শিক্ষাই মানিয়া চলিল, কেননা জ্যাঠামহাশয়ও উল্টাপথে কি চলেন নাই?

জ্যাঠামহাশয়ের অভাবে শচীশের মনে, একটি "সত্যবস্তু" অর্থাৎ positive জিনিসের অভাবের অনুভূতি হইতেছিল, এবং সেইজন্য তাহার মনের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব চলিতেছিল।

রাত্রে শচীশকে নিরালা পাইয়া শ্রীবিলাস শচীশকে জিজ্ঞাসা করিল,—

"শচীশ, জন্মকাল হইতে তুমি মুক্তির মধ্যে মানুষ, আজ তুমি একি বন্ধনে নিজেকে জড়াইলে? জ্যাঠামহাশয়ের মৃত্যু কি এত বড় মৃত্যু?"

শচীশ বলিল,—"জ্যাঠামহাশয় যখন বাঁচিয়া ছিলেন, তখন তিনি আমাকে জীবনের কাজের ক্ষেত্রে মুক্তি দিয়াছিলেন, ছোট ছেলে যেমন মুক্তি পায় খেলার আঙিনায়; জ্যাঠামহাশয়ের মৃত্যুর পর তিনি আমাকে মুক্তি দিয়াছেন রসের সমুদ্রে, ছোটো ছেলে যেমন মুক্তি পায় মায়ের কোলে।"

শচীশের এই উক্তিতে এই অনুমান হয় যে সে মায়ের কোলে ছোট ছেলের মতন মুক্তি পাইবার ইচ্ছায় লীলানন্দ স্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছে। আমরা যুক্তি তর্ক দ্বারা এই ইচ্ছার কোনও সার্থকতা বা কারণ বুঝিতে পারি না। শচীশও কোন যুক্তি তর্কের দিক দিয়া একথা বলে নাই। গল্পের বক্তা শ্রীবিলাস বলিতেছেন "বুঝিলাম শচীশ এমন একটা জগতে আছে আমি যেখানে একেবারেই নাই।" অর্থাৎ সে বাস্তব জগতে নাই সে একটা আইডিয়ার জগতে আছে।

শ্রীবিলাস বলিতেছেন "এই ধরণের আইডিয়া জিনিসটা মদের মত—নেশার বিহ্বলতায় মাতাল থাকে-তা'কে বুকে ধরিয়া অশ্রু বর্ষণ করিতে পারে, তখন আমিই কি আর অন্যই কি!"

এই সমস্ত কথায় বোঝা যায় শচীশ লীলানন্দ স্বামীর শিষ্যত্ব লইয়াছিল একটা আইডিয়ার ঝোঁকে—সে আইডিয়া এই যে "আমি মায়ের কোলের রসাস্বাদনের মুক্তি চাই।" আর এই আইডিয়ার আবেগেই সে লীলানন্দ স্বামীর তামাক সাজা ও পা টেপা হইতে আরম্ভ করিয়া জপ তপ কীর্ত্তন নৃত্য প্রভৃতি সমস্তই করিত। মনের ভিতর এরূপ ভাবের আবির্ভাব অবচেতন মনের ক্রিয়ারই ফল, মনস্তত্ত্ব-বিজ্ঞান এইরূপ নিদ্ধারণ করিয়াছে। অবচেতন মনের ক্রিয়ার দ্বারা উৎপন্ন এই ভাবের শক্তি অতি প্রবল, তাহা সজ্ঞান মনের বিচার বুদ্ধি যুক্তি প্রভৃতিকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। রবীন্দ্রনাথের কথায় ইহা একটা মিষ্টিক উপলব্ধি।

ভক্তজীবনের অনুভূতির মধ্যে ইহার অনুরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যেমন বোলপুরের প্রসিদ্ধ উকিল হরিদাস বসু বিখ্যাত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্য ছিলেন। যতদূর স্মরণ হয় তিনি তাঁহার গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে যেদিন তিনি শ্রীশ্রীজগন্নাথের প্রসাদ ভক্ষণ করিয়াছিলেন সেদিন সারারাত্রি ধরিয়া স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যে রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তির আবির্ভাব হইল। এই দুই মূর্ত্তি মিলিয়া গিয়া এক মূর্ত্তি হইল আবার পৃথক হইয়া গিয়া দুই মূর্ত্তি হইল। এইরূপ সারারাত্রি চলিল। এই জগন্নাথের প্রসাদের মধ্যে দিয়া শ্রীরাধার প্রতীকের দ্বারা তাঁহার মায়ের একটা মিষ্টিক উপলব্ধি হইয়াছিল। এরূপ স্থলে লীলানন্দ স্বামীর কীর্ত্তনের মধ্যে মায়ের মিষ্টিক উপলব্ধি আশা করা বিশেষ একটা অসম্ভব ব্যাপার নহে। দেশ-প্রেমিকেরা দেশের জন্য সর্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়া থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ দেশকে Father land বা পিতৃভূমি বলিয়া মনে করেন আবার কেহ কেহ দেশকে দেশমাতা বা Mother land বলিয়া উপলব্ধি করেন। হৃদয়ের অন্তরস্থ ভাব লইয়া দেশকে পিতা বা মাতা বা একসঙ্গে উভয়ভাবে গ্রহণ করা যায়।

এই বাহিরের রূপের জগতের ঘাতপ্রতিঘাতেই এই অরূপভাব সৃষ্টি হয়—যাহা নিজেকে নানারূপের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিবার চেষ্টা করে। এই মিষ্টিক উপলব্ধিরও ক্রম বিকাশ আছে। জীবনের মধ্যে আবার একটা নূতন মিষ্টিক উপলব্ধি আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে—যাহা পূর্ব্বের উপলব্ধিতে নিজের রং মিশাইয়া তাহাকে আবার এক অভিনব রঙে রঞ্জিত করিতে পারে। শচীশের বেলায় এইরূপই হইয়াছিল।

শচীশের "মায়ের কোলে মুক্তির" ইচ্ছা ননীবালার ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া উদয় হইয়াছিল একথা আমরা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। সম্ভবতঃ এই নূতন ইচ্ছার

অনুভূতির সহিত একটা বেদনার অনুভূতিও ছিল, রসাস্বাদনের আনন্দে সেই বেদনাদাহকে সে শীতল করিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু তাহার বাস্তবিক অভিজ্ঞতা অন্যরূপ হইল।

একদিন শচীশ কল্পনার খোলা ভাঁটিতে পূর্ব্ব ও পশ্চিমের, অতীতের ও বর্ত্তমানের সমস্ত দর্শন ও বিজ্ঞান, রস ও তত্ত্ব একত্র মিশাইয়া একটা অপূর্ব্ব আরক বানাইতেছিল, এমন সময় যে ঘটনা তাহার মনে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আঘাত করিয়াছিল—অর্থাৎ ননীবালার আত্মহত্যা—সেইরূপ একটি আত্মহত্যা লীলানন্দের ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে দেখিতে পাইলেন। নবীনের স্ত্রী স্বামীপ্রেমে বঞ্চিতা হইয়া, নিজেই তাহার স্বামীর প্রেমিকার সঙ্গে বিবাহ দিয়া বিষ খাইয়া আত্মহত্যা করিল। গুরুজির কাছে অনেক জটিল, শিষ্য তাহারা তাকে কীর্ত্তন শুনাইতে লাগিল—তিনি কীর্ত্তনে যোগ দিয়া নাচিতে লাগিলেন।

এই সময় দামিনী নামক লীলানন্দের এক শিষ্যপত্নী শচীশের মনের মিষ্টিক রাজ্যের মধ্যে একরূপ উপলব্ধির প্রভাব বিস্তার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল যাহা কবিসম্রাট অতি নিপুণ তুলিকায় আঁকিয়াছেন। দামিনীর মনে শচীশের প্রতি প্রথমে একটা দাম্পত্য প্রেমের ভাব ছিল, কিন্তু শচীশের মনে সেভাবের উপর একটা বিতৃষ্ণা ছিল। সেই বিতৃষ্ণা কবিসম্রাট শচীশের গুহার মধ্যের একটা স্বপ্নময় অনুভূতির ভিতর দিয়া এমন পরিস্ফুট ভাবে আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন, যে আমরা মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়া এরূপ অবস্থায় যেরূপ স্বপ্ন সম্ভব তাহার সহিত আশ্চর্য্য মিল দেখিতে পাই। এই ঘটনা লইয়া দামিনী ও শচীশের যে পরস্পরের মনোভাবের পরিবর্ত্তন দেখান হইয়াছে তাহা রবীন্দ্রনাথের কথায় মিষ্টিক উপলব্ধির মধ্যে নূতন রং এর অনুভূতি হইল এরূপ বলা যাইতে পাবে, আবার মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়া মনোভাবের Sublimation হইল তাহাও বলা যাইতে পারে। পুস্তকে এইরূপ বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

দামিনী শচীশকে কহিল, আমি তোমার গুরুর কাছ হইতে কিছুই পাই নাই। তিনি আমার উতলা মনকে এক মুহূর্ত্ত শান্ত করিতে পারেন নাই। আগুন দিয়া আগুন নেবানো যায় না। তোমার গুরু যে পথে সবাইকে চালাইতেছেন সে পথে ধৈর্য্য নাই, বীর্য্য নাই, শান্তি নাই। ঐ যে মেয়েটা মরিল, রসের পথে রসের রাক্ষসীই তো তা'র বুকের রক্ত খাইয়া তা'কে মারিল। কি তা'র কুৎসিত চেহারা সে ত দেখিলে? প্রভু, জোড় হাত করিয়া বলি ঐ রাক্ষসীর কাছে আমাকে বলি দিও না। আমাকে বাঁচাও। যদি কেউ আমাকে বাঁচাইতে পারে ত সে তুমি।

শচীশ বলিল, বল আমি তোমার কি করিতে পারি?

দামিনী বলিল, তুমিই আমার গুরু হও। আমি আর কাহাকেও মানিব না। তুমি আমাকে এমন কিছু মন্ত্র দাও যা এ সমস্তের চেয়ে অনেক উপরের জিনিষ—যাহাতে আমি বাঁচিয়া যাইতে পারি। আমার দেবতাকেও তুমি আমার সঙ্গে মজাইয়ো না।

শচীশ স্তব্ধ হইয়া দাড়াইয়া কহিল, তাই হইবে।

দামিনী শচীশের পায়ের কাছে মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রণাম করিল। গুণ গুণ করিয়া বলিতে লাগিল, তুমি আমার গুরু, তুমি আমার গুরু, আমাকে সকল অপরাধ হইতে বাঁচাও, বাঁচাও।

এইরূপে দু'জনের মধ্যে পিতা ও কন্যা বা গুরু-শিষ্যার সম্বন্ধ স্থাপিত হইল।

শচীশ যে "ছোট ছেলের মায়ের কোলে মুক্তি" চাহিয়াছিল তাহার জন্য আর লীলানন্দ স্বামীর শিষ্যত্ব করিতে হইল না, দামিনীর স্নেহ ও সেবা যত্নের মধ্যে তাহা পরিস্ফুরিত হইয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথ যে মিষ্টিক উপলব্ধির কথা বলিয়াছেন, এই গল্পের মধ্য দিয়া সেই মিষ্টিক উপলব্ধির স্বরূপ বুঝিবার চেষ্টা করাই আমাদের এই আলোচনার উদ্দেশ্য। শচীশ যে বলিয়াছে,—"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ" এই কথার সত্যতাও আমরা মিষ্টিক উপলব্ধির দিক দিয়া বুঝিতে পারি। কারণ যথার্থ ধর্ম্মবোধের বিকাশ মিষ্টিক উপলব্ধির পথেই হয়। প্রত্যেকেই নিজের মিষ্টিক উপলব্ধির দ্বারাই নিজের ধর্ম্ম সৃজন করে এবং নিজের মধ্যে তাহা অনুভব করে, সেই জন্যই আর সব জিনিস পরের হাত হইতে দানস্বরূপ লওয়া যায়, কিন্তু ধর্ম্ম কখনও লওয়া যায় না।

আর শচীশ বলিয়াছে—"আমরা তো শুধু রূপ লইয়া বাঁচি না, আমাদের তাই অরূপের দিকে ছুটিতে হয়" এ কথাটির অর্থও মিষ্টিক উপলব্ধির দিক দিয়া আমরা বুঝিতে পারি। কারণ ভগবান তাঁর সৃষ্টির ভিতর দিয়া হয় তো তাঁর নিজের মিষ্টিক উপলব্ধিটাই প্রকাশ করিতেছেন। আমাদের দিক হইতে সেই সৃষ্টির রূপের মধ্যে যতটা অরূপ মিষ্টিক উপলব্ধি অনুভূতিতে ধরিতে পারি ততটাই বিকাশের পথে অগ্রসর হই। এই গল্পের অনেকগুলি চরিত্রের দৃষ্টান্ত হইতেই আমরা একথা বুঝাইতে পারি। যেমন হরিমোহন ও তাহার ছেলে পুরন্দরের একেবারেই মিষ্টিক উপলব্ধি হয় নাই.—তাহারা মনুষ্যাকারে পশুই রহিয়া গিয়াছে। শচীশের জ্যাঠামহাশয় এই পশুত্বের কদর্য্যতা সম্বন্ধে একটা তীব্র অনুভূতি লাভ করিয়াছিলেন এবং তাহা একান্তভাবে পরিহার করিবার মনোভাবের দিক দিয়া নিজের জীবনের বিকাশ করিয়াছিলেন। সাধারণ ভাবে এইরূপ মনে হইলেও তাঁর নাস্তিকতার মধ্যে নিশ্চয়ই বিশ্বপ্রেম বা মানবপ্রেম অথবা ঐ ভাবের কোনও "অস্তি" বস্তু ছিল, তাঁহার অত্যুগ্র অহঙ্কার সেই 'অস্তি'কে আবৃত করিয়া রাখিতে সর্ব্বদাই সচেষ্ট থাকিত।

শ্রীবিলাস ও দামিনী, শচীশের মধ্যে একটা অপার্থিবতা উপলব্ধি করিয়া সেই উপলব্ধির সহায়ে নিজ নিজ জীবন বিকাশ করিয়াছিল।

শচীশের মিষ্টিক উপলব্ধির ভিন্ন ভিন্ন স্তর গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন, এবং তাহার চরিত্র গঠনের ভঙ্গীতে মনে হয় যে নিষ্কামকর্ম্মী ও ইন্দ্রিয়জয়ী শচীশ এখনও নব নব উপলব্ধির পথে চলিয়া নূতনভাবে নিজেকে গড়িয়া লইতে পারে গ্রন্থকার তাহার সম্বন্ধে এই অসমাপ্তির ইঙ্গিতটি রাখিয়া দিয়াছেন।

নব মনস্তত্ত্বে Super-egoর কথা বলা হইয়াছে; এই Super-egoর formation অর্থাৎ কি ভাবে ইহা গঠিত হয় বলিতে গিয়া একভাবে রবীন্দ্রনাথ মিষ্টিক উপলব্ধির কথা যাহা বলিয়াছেন তাহাই বলা হইয়াছে।

ডাঃ ফ্রয়েড তাঁহার মনস্তত্ত্বের গবেষণায় স্থির করিয়াছেন যে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে অহং-বোধ থাকে তাহার এক অংশ ব্যক্তিগত বিকাশের সঙ্গে যেন পরিবর্দ্ধিত হইয়া Super-ego বা শ্রেষ্ঠ অহং স্বরূপ পৃথক সত্ত্বা লাভ করে। আমরা যাহাকে বিবেক বলি তাহা ইহারই ক্রিয়া। এই শ্রেষ্ঠ অহং যেন অহংএর রক্ষক স্বরূপ, যেমন পিতামাতা সন্তানের রক্ষক। এই শ্রেষ্ঠ অহং, অহংএর প্রত্যেক কার্য্যের ও উদ্দেশ্যের দিকে দৃষ্টি রাখে, প্রয়োজন হইলে অহংএর উদ্দেশ্য প্রকাশ হইতে দেয় না। আমরা যে দোষ করিয়াছি এই ভাব, অন্যায়ের জন্য অনুতাপ অর্থাৎ বিবেকলব্ধ শাস্তি ইহা হইতেই উৎপন্ন হয়। নিম্নে ডাঃ ফ্রয়েডের কথাগুলি উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল :—

The Super-ego is an agency or institution in the mind whose existence we have inferred; consceince is a function we ascribe among others to the Super-ego; it consists in watching over and judging the actions and inetntions of the ego, excercising the function of a censor. The sense of guilt, the severity of super-ego is therefore the same thing as the rigour of conscience.

(Civilization and its discontents p 127).

ইহার পর ডাঃ ফ্রয়েড আরও একটি আশ্চর্য্য নূতন কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, শ্রেষ্ঠ অহং যেমন ব্যক্তির মধ্যে বিকশিত হয়, সেইরূপ ব্যক্তি-সমষ্টি সমাজের মধ্যেও বিকশিত হয়, তাহারই প্রভাবে সমাজে কৃষ্টির (Culture)বিকাশ হইতে থাকে।

ফ্রয়েডের মতে সমাজে শ্রেষ্ঠ অহংএর বিকাশ এই ভাবে হয়;—সমাজের মধ্যে বিশেষভাবে ব্যক্তিত্বের শক্তি লইয়া অনেকে জন্মগ্রহণ করেন, কিম্বা এমন কোনও অসাধারণ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন যাঁহার মধ্যে কোনও গুণ অসাধারণ প্রবল ও পবিত্রভাবে প্রকাশ পায়। অনেক স্থলে (অবশ্য সকল স্থলে নহে) এই সমস্ত অসাধারণ ব্যক্তি জনসাধারণের নিকট বিদ্রূপ অথবা মন্দ ব্যবহার পান, কোনও কোনও স্থানে নিষ্ঠুর ভাবে নিহত হন। কিন্তু নিহত হইলেও এই সমস্ত মহান পুরুষগণ পৃথিবীর জন্য যে ভাব রাশি রাখিয়া যান তাহাই সমাজের পক্ষে শ্রেষ্ঠ অহংএর কাষ করে। তাঁহারা জগতের সম্মুখে যে আদর্শ স্থাপন করিয়া যান তাহা পালন না করিলে মনের মধ্যে বিবেকের তাড়নার ন্যায় একটা গ্লানির

যাহা অনুভব হয়। নিম্নে ডাঃ ফ্রয়েডের কথা উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

"It can be maintained that the community, too, developes a super-ego, under whose influence cultural evolution proceeds.

*　　*　　*　　*

The super-ego of any given epoch of civilization originates in the same way as that of an individual; it is based on the impression left behind them by great leading personalities, men of astounding force of mind or men in whom some one human tendency has developed in unusual strength and purity, and often for that reason very disproportionately. In many instances analogy goes still further in that during their lives—often enough even if not always such persons are ridiculed by others, ill used or even cruelly done to death.

ডাঃ ফ্রয়েড যাহা বলিয়াছেন সেগুলি ঘটে কিরূপ করিয়া তাহা বুঝিতে হইলে রবীন্দ্রনাথ যেমন বলিয়াছেন সেইরূপ মিষ্টিক উপলব্ধির মতন কিছু একটা ধরিয়া লইতে হয়।

আমাদের জীবনের যাহা যথার্থ বিকাশ তাহা এই মিষ্টিক উপলব্ধির ভিতর দিয়া। যথার্থ আর্ট এই মিষ্টিক উপলব্ধিকে যথাযথ প্রকাশ করে। আমরা এইরূপ আর্টের সন্ধান রবীন্দ্রনাথের পুস্তকের মধ্যে পাইয়া থাকি।

শ্রীসরসীলাল সরকার

বিদায় ভিক্ষা

শ্রী রামেন্দু দত্ত

বিদায় লগন আজিকে এখন এসেছি দুয়ারে তব,
আঁখি ভ'রে শুধু বারেক তোমায় নেহারি' বিদায় লব!
নয়নের কোণে এনো না কো জল, এনো না বিষাদ ছায়া,
আজি একবার নেহারি তোমার সুষমা-মধুর কায়া!
আজি একবার নেহারি তোমার চটুল নয়ন দু'টি
সেই সুমধুর হাসিটি বারেক অধরে উঠুক ফুটি'!
বিদায় বেলায় আজি
সুন্দরী, তুমি সুমুখে দাঁড়াও সুন্দর বেশে সাজি'।

জল-ছলছল্ প্রকৃতি সজল, সেদিন বাদল বেলা—
আঁখিজল মাঝে ভেঙে গেল তাই মোদের মিলন মেলা!
কালো মেঘ বড় ভালোবাসে এই ধূলাভরা ধরণীরে
তাই সে গগনে থাকে না, গলিয়া নামে শ্রাবণের নীরে!
সে কেমনে আজ হয়ে শুকতার পশেছে হৃদয় তলে
সেথায় রহিয়া কপোল বহিয়া গলিছে নয়ন-জলে!
মোছ আঁখি মোছ ত্বরা,
বিদায়ের আগে ভুবন-মোহন ভঙ্গিতে দাও ধরা!

কত শত রূপে, প্রকাশ্যে, চুপে, হেরেছি তোমারে বালা,
রূপের প্রদীপে হৃদয় দেউলে দীপালী হয়েছে জ্বালা,
আজি ম্লানমুখে এসোনা সুমুখে, এসো না দীনের মত:
এসো সেই বেশে যে বেশে আসিতে যদি এ বাসর হ'ত।
এসো নববধূ লজ্জা-ললিতা কুসুম কলিকা সমা
মঞ্জুল বেশে এসো হেসে হেসে এসো মোর মনোরমা!
যাবার বেলায় প্রিয়া
জনমের মত পান করি রূপ এ দু'টি নয়ন দিয়া!

বেশী কিছু আমি চাহিতে আসিনি বিদায় বেলার মোর
নয়নের দেখা শুধু একবার! ফেলিস্ না আঁখি-লোর!
তোর চোখে জল দেখিয়া কেমনে চলিয়া যাইব বল্?
এখনি আমার নয়নে আঁধার হইবে অবনীতল!
সে তিমির মাঝে শুকতারা সম হাসে যদি তোর মুখ,
জীবনের যত দুঃখের বোঝা হইয়া উঠিবে সুখ!
সেই মুখখানি তোর
দেখিতে আজিকে অভাগা এসেছে, ফেলিস্ না আঁখিলোর!

আফ্রিকার অরণ্য ও নগর

বিচিত্রার লেখক শ্রীযুক্ত ভবেশ দাশগুপ্ত কিছুদিন হইল আফ্রিকায় গিয়াছেন। সেখানে গিয়া অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি বহু পর্ব্বত অরণ্য হ্রদ জলপ্রপাত প্রভৃতি দেখিয়া তাহাদের ফটোগ্রাফ্‌ লইয়াছেন। সেখানকার আদিম অধিবাসীদের বিষয়ে তিনি একটি বই লিখিবেন, সেজন্য তাহাদের ভাষা 'সোহিলী' শিখিতেছেন।

ভবেশবাবু তাঁহার পত্র মধ্যে এক স্থানে লিখিয়াছেন—

* * এদেশে এসে যেন বসুন্ধরার কুমারীরূপ দেখচি—চারিদিকে শুধু পাহাড়, বন,—তারি মাঝে মানুষ এসে অনধিকার প্রবেশ কোরেচে! আর যেখানেই মানুষ—অবশ্য সভ্যমানুষ—এসেছে, সেখানেই কদর্য্যতা ফুটে উঠেছে! শহর বসেচে, রেল বসেচে, Strand হয়েচে, কিন্তু সবই যেন লক্ষীছাড়া! না শহর, না জংলা দেশ! * *

এই দুঃখের কথা পড়িয়া মনে পড়ে কবি Wordsworth এর লাইন্‌—What man has made of man!

ভবেশবাবু তাঁহার নিজের তোলা ছবি হইতে কয়েকখানি ছবি বিচিত্রার পাঠক-পাঠিকার জন্য উপহার পাঠাইয়াছেন। আমরা নিম্নে সেগুলি প্রকাশিত করিলাম।



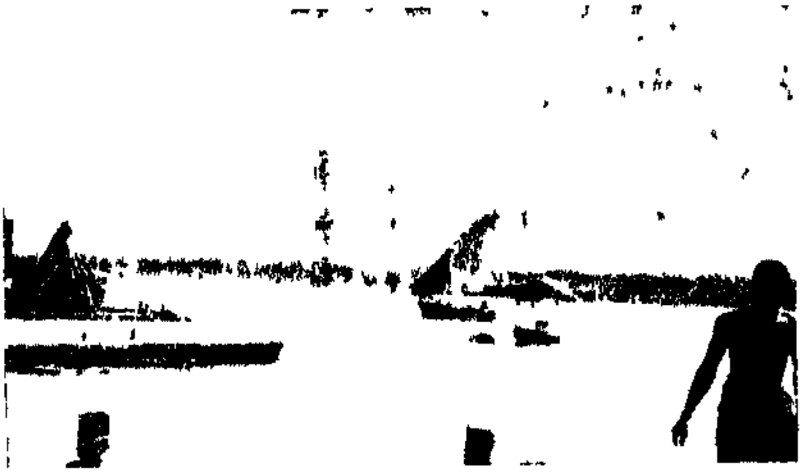
—থিকা ফল্‌স্‌—

দীর্ঘ পথের শত মাইল ক্ষীণ জলধারা বয়ে এসে থিকা নদী এই প্রপাত সৃষ্টি করেছে। আফ্রিকায় যে এরকম কত প্রপাত আছে তার সংখ্যা নেই।



—নীল নদের উৎস রিপন ফল্‌স্‌—

ভিক্টোরিয়া নায়েনজা হইতে বাহির হইয়াছে।



- মোম্বাসা সমুদ্রতীরের দৃশ্য। পরপারে অন্তহীন বনরাজি—

(মোম্বাসা ইষ্ট আফ্রিকার প্রধান ও একমাত্র বন্দর।)



—মোম্বাসা উপকূলের দৃশ্য—

ইষ্ট আফ্রিকার 'মেনল্যান্ড' সমুদ্রে প্রবেশ করিয়াছে। সম্মুখে অন্তহীন জলরাশি।



—কাফ্রী পরিবার—



—শ্রেষ্ঠ সজ্জায় সজ্জিতা কাফ্রী রমণী—



—নৃত্য সজ্জায় সজ্জিত কাফ্রী যুবক—



—কাম্পালা—দুইটি প্রধান রাস্তার সংযোগ-স্থল—

(কাম্পালা উগাণ্ডা রাজ্যের প্রধান নগর)



—কাম্প্যালা পার্ক ও ওয়ার মেমোরিয়াল—

(কাম্পালা—উগাণ্ডা)

আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ও প্রমোদকুমার

বিচিত্রা সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

আপনাদের শ্রাবণ সংখ্যায় কতকগুলি ছবির সঙ্গে পরিচয় প্রসঙ্গে আমার সম্বন্ধে যে কিছু লেখা হয়েছে তার মধ্যে আমাকে অবনীন্দ্রনাথের শিষ্য বোলেই লেখা হয়েছে। সেইটিই আমার একশ্রেণীর বন্ধুগণের মধ্যে একটু অসন্তোষের সৃষ্টি করেছে। তাঁরা এই ভাবে আমাকে দোষী করতে চান,—অবনীন্দ্রনাথের শিষ্য না হোয়েও জোর করে যেন আমি তাঁর শিষ্যত্বের দাবী করছি। সুতরাং, বাস্তবিকই অবনীন্দ্রনাথের শিষ্যত্বের গৌরবে আমার কোন অধিকার নেই, যেটুকু অধিকার সেটা আমার কর্ম্মক্ষেত্রের সহায়তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ, এইটেই বিশেষ ভাবে বলবার জন্যই আপনার পত্রিকার কলেবরের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করতে হোয়েছে।

আমি জানিনা আপনি কোন সূত্রে ঐরূপ সিদ্ধান্ত করেছেন, তবে যে সূত্রেই হোকনা কেন সাধারণ ভাবে বিচার করলে এতে আপনাকে দোষ দেওয়া যায় না। তার কারণ হোলো এই যে, আধুনিক ভারতীয় শিল্পের অভ্যুত্থান, বর্ত্তমান আকারে যে আজ শিল্প-জগতের মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে তার প্রবর্ত্তক যিনি, তিনি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কাজেই তাঁর পশ্চাতে যাঁরা আধুনিক ভারতীয় চিত্র-শিল্প-পদ্ধতির অনুগামী হয়েছেন, স্বভাবতই অবনীন্দ্রনাথ তাঁদের গুরু স্থানীয় হোয়েই আছেন। হাতে কলমে তাঁর কাছে থেকে তাঁরা কিছু শিক্ষা করুন বা না করুন, তাঁর শিল্প-আদর্শের অথবা পদ্ধতির সঙ্গে তাদের মিল থাক বা নাই থাক, তাঁর গুরুত্ব এক্ষেত্রে অস্বীকার করা চলে না। আশা করি এই ভেবেই আপনি ওটা লিখে থাকবেন, অথবা যে সূত্রে পেয়েছেন তারও মূল এই খানে।

তার পর, তাঁর সঙ্গে আমার যে সম্বন্ধ সেটা গুরু শিষ্য সম্বন্ধের মতই বিবেচনা করলেও সাধারণের কোন দোষ হয় না, বরং সেটা ধারণা করাই স্বাভাবিক, যদিও সত্য সত্যই সুক্ষ্ম বিচারে তা ঠিক প্রতিপন্ন হয়না।

১৯০৯ সালে আমি আর্টস্কুলে প্রবেশ করি। তখন অবনীন্দ্রনাথ অস্থায়ী অধ্যক্ষ কারণ অধ্যক্ষ হ্যাভেল সাহেব অবসর প্রাপ্ত, স্থায়ী অধ্যক্ষ রূপে তখনও কাহাকেও নিযুক্ত করা হয় নি। তখন Oriental Art Section খোলা হয়েছে, অবনীন্দ্রনাথের অধ্যক্ষতায়; নন্দলাল ও ৺সুরেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি দুই তিন জন ছাত্র হয়েছেন। আমার ছিল পাশ্চাত্য পদ্ধতিতেই শিক্ষার ঝোঁক এবং তাইতেই ব্রতী ছিলাম অথচ নবীন ভারতীয় চিত্র কলাবিভাগের ছাত্রদের সঙ্গে আলাপ ব্যবহার বা বন্ধুত্বের কোনো বাধা ছিল না। কিন্তু এদুই শিল্পের মলে আদর্শের যে পার্থক্য, সেই পার্থক্যের মধ্যে কঠিন সমালোচনার অবসরও বড় কম ছিলনা। ক্রমে ক্রমে আমরা যখন advanced student হয়েছি তখন অবনীন্দ্রনাথের School-এর ছবি গুলির কঠিন সমালোচনা আমাদের মধ্যে খুবই চলতো। কেবল একজনের ছবির উপর আমরা খুব সদয় ছিলাম, সে নন্দলাল। কারণ তার ছবিতে anatomyর দোষ মোটেই দেখা যেতোনা। শঙ্ক কাঁকাল, লিকলিকে হাত পা, সরু কাটির মত আঙুল, বিকৃত ভঙ্গিমা, ঠিক যেন ভগবানের সৃষ্টিতে সরল সুকুমার দৃঢ় শরীরের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। যা স্বাভাবিক সুন্দর অঙ্গ সৌষ্ঠব বোলে আমাদের ধারণা তাকে বিকৃত করে দেখানো, আর পাশ্চাত্য শিল্পে বাস্তব ভাবের উপর প্রতিশোধ নেবার ভীষণ প্রবৃত্তি,—এই যদি Indian Art হয় কাজ নাই আমাদের অমন artএ, আমাদের European artই ভাল—এই ছিল আমাদের তখনকার মনোভাব। তবে অবনীন্দ্রনাথের Colouring আমরা সকলেই শ্রদ্ধার চক্ষে দেখতাম। বলা বাহুল্য এ সকল কথা অবনীন্দ্রনাথের অগোচর ছিলনা। আমি ১৯১৮ সাল অবধি পাশ্চাত্য

পদ্ধতির অনুগমন করেছি ; তাইতেই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহও হয়েছে ; ক্রমে শেষের দিকে Oil Colour ও Water Colour Portraitএ কিছু প্রতিষ্ঠার মুখও দেখতে পেয়েছিলাম। কিন্তু আমায় যিনি কর্ম্মজগতে পাঠিয়েছেন সেই নিয়ন্তার ইচ্ছা অন্যরূপ।

আমার পর্য্যটন-স্পৃহার কথা আমার বন্ধু বান্ধবেরা সকলেই জানেন, একাদিক্রমে বারোটি মাস আমি কখনও কলিকাতায় থাকি নি। আর যতটা বেশী বাইরে থাকতাম ততটাই যেন ভালো থাকতাম। অনেক দিন পরে যখন কলিকাতায় প্রবেশ করতাম, মনে হোতো যেন যমালয়েই প্রবেশ করছি। এই ভাবে একবার এক দীর্ঘ ভ্রমণের পর আমি কলিকাতায় ফিরে এলাম, সেটা ১৯১৯ সালের কথা। প্রসঙ্গক্রমে একথা কৈলাস ও মানসসরোবর ভ্রমণ প্রসঙ্গে আমি পূর্ব্বেই বোলেছি যে তিব্বতের মঠগুলির মধ্যে ভারতীয় শিল্পের যে বিশাল ঐশ্বর্য্য, প্রাচীন ভারতীয় মূর্ত্তি শিল্পের অপূর্ব্ব বিকাশ দেখেছিলাম তাইতেই আমাকে ভারতীয় প্রভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। আর একথাও সত্য যে, তাইতেই আমাকে পাশ্চাত্য পদ্ধতি ত্যাগ করে ভারতীয় শিল্প পদ্ধতি গ্রহণ করতে প্রবুদ্ধও করেছিল। আসল কথা এই যে, এতদিন পরে শিল্প-জীবনে আমি একটি নূতন আদর্শের আলো পেয়েছিলাম। ফিরে এসে আমি নূতন ভাবেই কাজ করতে আরম্ভ করি। সে কী তীব্র উৎসাহ, কি দুর্দ্দমনীয় কর্ম্মস্পৃহাই জীবনে তখন অনুভব করেছিলাম!

আমার অসুবিধাও কম ছিল না। আমাদের বাসস্থানটি খুব ছোট, তারি মধ্যে আমাদের বড় সংসারটি বড়ই জোর করে মানিয়ে নেওয়া হয়েছিল, সুতরাং আমার কাজ করবার জায়গা মোটেই ছিল না। এতটা স্থানাভাব হোয়েছিল যে, বাধ্য হয়ে পরিচিত বন্ধুস্থানীয়, বোধ হয় সকলকার দ্বারেই, 'নিরিবিলি বসে কাজ করবার জন্য একটু স্থান' ভিক্ষা করেছি। সেই সময় পরিচিত একজন সতীর্থের কাছে খবর পেলাম, সরকারের সাহায্যে Indian Society of Oriental Art প্রতিষ্ঠানের শিল্প বিভাগ খোলা হয়েছে সমবায় বিল্ডিং এর মধ্যে। সেখানে একত্রে বহু শিল্পী কাজ করতে পারে একটি বিস্তৃত হলে। আর অবনীন্দ্রনাথের কাছে গেলেই স্থান পাওয়া যাবে ; যেহেতু তাঁরা দুই ভাইই তখন সেখানকার কর্ম্মবিধাতা।

এই নির্দেশ পেয়েই ছুটলাম অবনীন্দ্রনাথের কাছে একটু আশ্রয়ের জন্য, সঙ্গে দুখানি কাজও নিয়ে গেলাম। সর্ব্বজন পরিচিত দক্ষিণের বারান্দায় তাঁর জায়গাটিতে তিনি কাজ করছিলেন।

আমি এখন ভারতীয় শিল্প-পদ্ধতি অবলম্বন করেছি, আমার কাজ দেখে খুসি হলেন বটে, কিন্তু যখন আমি স্থানাভাবের কথা বোলে Societyর হলে কাজ করবার অনুমতি প্রার্থনা করলাম তখন তিনি বল্লেন,—যে-সে গিয়ে কাজ করবে বোলে আমরা Society করেছি নাকি? শুনেইত আমি একেবারেই দমে গেলাম।

অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে শিষ্যস্থানীয় যাঁদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে তাঁরা অনেকেই জানেন যে, প্রথম চোটেই তাঁর স্নেহের পরিচয় পাওয়া যায় না। প্রথম মুখে তাঁর ব্যবহার অনেকটাই বিরুদ্ধ মনে হয়। পরে ক্রমশঃ তাঁর স্নেহ প্রকাশ পায়। এক্ষেত্রে আমারও সেই রকমই হয়েছিল। আমি খুবই আশা করে গিয়েছিলাম, কাজেই তাঁর ঐ ভাবের উত্তর শুনে এতটা ভগ্নোদ্যম হয়েছিলাম যে এই কথা মনে করছিলাম, তাহোলে ভগবানের দয়া বোলে কি কিছু নেই, তাঁর এই বিশাল রাজত্বে আমার জন্য কি একটুও স্থান নেই, এতই কি আমি তাঁর কাছে অপরাধী? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঐ সব তোলাপাড়া করছি, আর তিনি কাজই করে চলেছেন। শেষে বিফল হয়ে ফিরে আসবার আগে বড়ই কাতর হয়ে সাহস করে আর একবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, তাহোলে কি আমি ওখানে একটু স্থান পাবোনা? তখন তিনি বোললেন, যারা আমাদের student, তারাই এখানে কাজ করবে, যাকে তাকে আমরা কাজ করতে দেবো কেন? তুমি যদি as a student কাজ করতে চাও তাহোলে দরখাস্ত করতে পার। একথা শুনে আমার যে কি আনন্দ হোলো, বলতে পারি না ; যতটা দমে গিয়েছিলাম উৎসাহে আবার ততটাই লাফিয়ে উঠলাম। Student হিসাবে কাজ করতে পাওয়া ত মহা ভাগ্যের কথা, যদি কেউ কতটা সময়ের জন্য চাকরের কাজ করিয়ে নিয়ে তার বদলে আমার কাজ করবার

স্থান দিত তাইতেই রাজী হতাম। কর্ম্মস্থানের এতটাই দুরবস্থা তখন। যাই হোক দরখাস্ত মঞ্জুর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমি কাজ আরম্ভ করে দিলাম। আমার কর্ম্মজীবনে অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে এই সাক্ষাৎ পরিচয় এবং সম্বন্ধ,—অথবা, সহায়তা লাভের প্রারম্ভ বলা যেতে পারে। তখন আমার বয়স ৩৪ বৎসর, আর পোষাক পরিচ্ছদ এমনই ছিল যে তখনকার বাজারে তাতে শ্রদ্ধা পাওয়া ত দূরের কথা কারো কারো অশ্রদ্ধার উদ্রেক করতো তার আভাসও পেয়েছিলাম। কাপড়ের উপর একখানি চাদর, মাথায় কানঢাকা টুপী, পায়ে চটী। সে এক অদ্ভুত মূর্ত্তি!

সোসাইটির মধ্যে কিছু দিন কাজ করবার পর আমার ভ্রমণ বৃত্তান্তের কথা শুনে তাঁরা পাণ্ডুলিপি দেখতে ঔৎসুক্য প্রকাশ করেন। তখন আমি মধ্যে মধ্যে তিন ভাইয়ের কাছে তাদের ইচ্ছামত ওটা পড়ে শুনাতাম। এ বিষয়ে তাঁদের উৎসাহ দেখে আমিও খুব উৎসাহ ও আনন্দ পেতাম। তখন অবনীন্দ্রনাথ আমার নাম দিয়েছিলেন 'লামা,' ঐ নামেই ডাকতেন। এই ভাবে ক্রমে ক্রমে আমি তাঁদের বিশেষ স্নেহভাজন হয়েছিলাম। মনে আছে ১৯২১ সালের মে মাসে আমি সোসাইটিতে কাজ আরম্ভ করি, আর তখন থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে অর্থাৎ ওখানকার বাৎসরিক প্রদর্শনী আরম্ভ হবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে আমি ১৪ খানি ছবি সম্পূর্ণ করতে পেরেছিলাম। তার মধ্যে ১২ খানি আমাদের সোসাইটির প্রদর্শনীতে আর ২ খানি আমেদাবাদ প্রদর্শনীতে পাঠাবার জন্ত নির্ব্বাচিত হয়েছিল। তখন ছবি নির্ব্বাচন অবনীন্দ্রনাথই করতেন। তাঁর কঠিন বিচারের মধ্যে খাতিরের জায়গা ছিল না। তখনকার selection একটা গৌরবের জিনিষ ছিল।

আমার বেশ মনে আছে যে, প্রথম থেকেই তিনি আমার কাজগুলি দেখতেন কিন্তু কখনও কোনও প্রকার মন্তব্য প্রকাশ অথবা সমালোচনা করেন নি। আমার সকল কাজেই নিজের বিশিষ্টতা অবাধে ফুটতে দিয়েছেন। আমার কর্ম্মের উপর আমার স্বাধীনতা, প্রত্যেক Design খানির প্রথম Drawing থেকে আরম্ভ করে Compositionটি finish অবধি কোনও অবস্থায় কোনও প্রকারে হস্তক্ষেপ করেন নি। প্রদর্শনীর মধ্যে সে বৎসর যে সকল ছবি ছিল তার মধ্যে অনেকগুলি ছবির কথা সমালোচনার হিসাবে 'প্রিয়দর্শিকা' নামে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকার মধ্যে তিনি প্রকাশ করেছিলেন। তার মধ্যেও আমার ছবির সম্বন্ধে কোন মন্তব্য প্রকাশ করেন নি। সুতরাং আশ্রয় দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর এই যে পক্ষপাতশূন্য উদার ব্যবহার, যা অনেক গুরুর মধ্যেই পাওয়া যায় না, তার জন্ত আমার শিল্প জীবনে তাঁর একটি বিশেষ স্থান আছে যা চিরকাল আমি কৃতজ্ঞতাপূর্ণ চিত্তে স্মরণ করব।

ভগবানের দয়ায় সে বৎসরে প্রদর্শনীতে আমার কাজগুলি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, আর প্রায় সকলগুলি বিক্রীও হয়েছিল। এবং বাইরে এই প্রতিষ্ঠাই পরে আমার দুঃখের কারণও হয়েছিল।

পর বৎসর, ১৯২২ সালে অন্ধ্রজাতীয় কলাশালায় ভারতীয় শিল্প প্রবর্ত্তনের জন্ত একজন শিল্পীর প্রয়োজন হয়, তাঁরা অবনীন্দ্রনাথকে জানান। তাঁদের দক্ষিণাটা কম ছিল, আর উপস্থিত ওরকম কাজে পাঠাবার মত বোধ হয় কেহ ছিল না বলেই তখন তিনি তাঁদের কোনও প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন নি।

প্রথম বৎসরেই আমার ঐ ভাবের সাফল্যের পর, অবনীন্দ্রনাথের স্নেহ বা সহায়তা পেলেও ওখানকার আবহাওয়ার মধ্যে নানা কারণেই তখন আমি উত্যক্ত এবং অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলাম। যে সকল কারণে—সে সকল বিবরণ এখানে প্রকাশ না করাই ভালো। তখন আমি অন্তরাত্মার কাছে প্রবাসের কোনও আশ্রয়ের কামনাই করছিলাম। কোনও রকমে যদি ওখান হতে বাইরে আসিতে পারি এই আশায় অন্ধ্রদেশের কাজটির কথা অবনীন্দ্রনাথের কাছে পাড়লাম, আর যতই কম দক্ষিণা হোক আমি তাইতেই রাজী সে কথাও জানালাম। আমার নির্ব্বন্ধাতিশয্যেই তিনি আমাকে সুযোগ দিলেন। ভগবানের কৃপা এই ভাবে আমি জীবনে সকল সময়েই প্রত্যক্ষ করেছি। এটা বিদ্বান পণ্ডিত লোকের কানে যতই sentimental শোনাক্, তাতে আমার ভয় ডর নেই।

আমার প্রবাসের কাজে অবনীন্দ্রনাথ কতটা সন্তুষ্ট

ছিলেন সেটা তাঁর পত্র-ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছিল। কর্ম্মজীবনে এটি হোলো অবনীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় সহায়তা যার জন্য আমি তাঁকে কখনও ভুলব না। অনুগত জনের প্রতি তাঁর স্নেহ প্রত্যক্ষ গুরুশিষ্য সম্বন্ধের ব্যতিক্রমের বাধা যে অতিক্রম করে আমিই তার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত। জানিনা আর কেহ এ রকম আছেন কিনা।

যাঁরা অবনীন্দ্রনাথের কাছে তাঁর ছাত্র বা শিষ্য কে কে, এই বিশিষ্ট প্রশ্নটি করেছেন তাঁদের দুজনের কথা আমার জানা আছে। তার মধ্যে একজন বলেন যে, অবনীন্দ্রনাথ একমাত্র নন্দলাল ছাড়া আর কাকেও শিষ্য বোলে স্বীকার করেন না। দ্বিতীয় ব্যক্তি যে উত্তর পেয়েছেন তার মধ্যে নন্দলাল, ৺সুরেন্দ্র গঙ্গোঃ, অসিত কুমার হালদার ও ক্ষিতীন্দ্র নাথ মজুমদার ছাড়া আর কারো নাম তিনি করেন নি। অথচ আমি জানি এখনকার লব্ধপ্রতিষ্ঠ অনেক শিল্পী, যাঁদের নাম করার এখানে প্রয়োজন নাই, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ গুরুশিষ্য সম্পর্কের দাবী করেন আর অবনীন্দ্রনাথ সেটা অস্বীকার করলে তাঁরা ব্যথা পান।

সর্ব্ব বিদ্যাধিকারে অতি প্রাচীনকাল থেকেই গুরুর নামেই শিষ্যের পরিচয়ের রীতি আছে। এই যে গুরু-পরম্পরায় বিদ্যার অধিকার এটা তখনকার দিনে যতটা সত্য, মুখর এবং গৌরবের বস্তু ছিল এখনকার দিনে বিদ্যা প্রচারের পদ্ধতির পরিবর্ত্তন হওয়াতে ততটা না থাকলেও অনেকাংশে যে নিশ্চয়ই আছে তাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। কিন্তু উভয় কালেই এর ব্যতিক্রম দেখতে পাওয়া যায়। সকল বিদ্যার ক্ষেত্রেই এমন অনেকেই ছিলেন বা আছেন যাঁরা প্রত্যেকেই কোনও একজন গুরুর শিষ্যত্বের গৌরবে বঞ্চিত। কোনও গুরু তাঁদের যথার্থ শিষ্য বোলে দাবী করতে পারেন না আর সে ব্যক্তিও কোনও একজনকে যথার্থ গুরু বোলে প্রাণের মধ্যে মেনে নিতে পারেন না। এ ক্ষেত্রে দেখা যায় প্রচলিত আবহাওয়ার মধ্যে থেকেই তাঁরা ঐকান্তিক মনোযোগের সাহায্যে বিদ্যা আয়ত্ত বা নিজ মার্গ আবিষ্কার করেছেন।

প্রকৃতিই হোক বা ভগবানই হোক আসলে সেই সর্ব্ব-স্রষ্টার নিয়ন্ত্রণেই জীবের মধ্যে সৃষ্টি করবার প্রেরণা আসে; আর সেই প্রেরণা যাঁরা অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করে নিজ নিজ ভাবানুযায়ী প্রকাশ করেন তাঁরাই শিল্পী। আর যে বিশিষ্ট শক্তির দ্বারা প্রকাশ করেন সেইটিই হোলো প্রতিভা।

তাহোলে এটা আমরা বুঝতে পারি মানুষের মধ্যে যে প্রতিভা, সেটা ভগবানেরই দান; সেটি যার আছে সে যে-কোন অবস্থার মধ্যে নিজের লক্ষ্য ঠিক করে নিজের পথ আবিষ্কার করে নেয় আর বাইরের শত শত বাধাও অতিক্রম করে; সাক্ষাৎ কোনও মহৎ গুরুর শিষ্যত্বে বঞ্চিত হোলেও একটা পাথরকে গুরু করেও জীবনের উদ্দেশ্য সফল করে। আর যদি কেউ সে প্রতিভা থেকেই বঞ্চিত হয় তাহোলে মহা গুরুর দোহাই দিলেও আসলে তার গতি চিরকালই নিম্নগামী থাকবে—কোনও প্রকারেই তার ব্যতিক্রম ঘটবে না।

শেষে এইটুকু বলা বোধ হয় দোষের হবে না,—যদি আমি হাতে কলমে বা প্রত্যক্ষ বা সাক্ষাৎ বা বাস্তবিকই অবনীন্দ্রনাথের শিষ্যত্বের গৌরবে বঞ্চিত হয়েই থাকি তাতে আমার ক্ষুণ্ণ হবার কোনও কারণ নেই। কারণ এটা আমি ভাল রকমই জানি যে আমার ব্যক্তিগত শিল্পজীবনের যে দায়িত্ব এবং বিশিষ্টতা সেটি একজন মহৎ গুরুর সাক্ষাৎ শিষ্যত্বের দাবীর জোরে প্রতিষ্ঠিত হবে না যদি আমি পরমাত্মার যে দান, সেই দানের সদ্ব্যবহার না করতে পেরে থাকি। একটি মিথ্যাকে সত্য বোলে চালাবার যে বুদ্ধি লোকে তাকে দুর্ব্বুদ্ধিই বোলে থাকে। আশা করি এ দুর্ব্বুদ্ধি আমার কখনও হয় নি।

তবে অবনীন্দ্রনাথের যাঁরা যথার্থ শিষ্য তাঁদের কারো চেয়ে অবনীন্দ্রনাথের প্রতি আমার শ্রদ্ধা যে কোনও অংশে কম নয় (অবশ্য নন্দলালের কথা স্বতন্ত্র, কারণ তাঁর গুরুভক্তি অনন্যসাধারণ) এ কথার সত্যতা যিনি আমার অন্তর্য্যামী তাঁর অগোচর নেই,— আর নেই স্বয়ং অবনীন্দ্রনাথের।

শ্রীপ্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়

ভারত কি সভ্য? *

শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায়

[শ্রীঅরবিন্দের ইংরাজী রচনা হইতে অনূদিত]

২

যে প্রশ্ন হইতে এই বৃহত্তর বিচার্য্য বিষয়টি উঠিয়াছে, এইটি দেখা দিবামাত্র সে প্রশ্নটি আর তাহার সঙ্কীর্ণ অর্থে সীমাবদ্ধ থাকে না; সেটি একটা আরও অনেক বড় সমস্যার অন্তর্গত হইয়া পড়ে। যৌক্তিক বুদ্ধি (Reason) এবং বিজ্ঞানের (Science) উপর প্রতিষ্ঠিত কালচারেই কি মানবজাতির ভবিষ্যৎ নিহিত? যে মানবীয় মন, যে ধারাবাহিক সমষ্টিগত মন ক্ষণজীবি ব্যক্তিগণের চিরপরিবর্ত্তনশীল সমষ্টিদ্বারা গঠিত, যাহা এক অচেতন জড়জগতের অন্ধকার হইতে আবির্ভূত হইয়াছে, এবং বহুকাল ধরিয়া ইহার মধ্যে কোনও একটা স্পষ্ট আলোকের জন্য, ইহার বাধা বিঘ্ন সমস্যা সকলের মধ্যে কোনও নিশ্চিত আশ্রয়ের জন্য বিভ্রান্ত হইতেছে, সেই মনের চেষ্টায় গঠিত কৃষ্টির উপরেই কি মানবের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে? সেই আলোক ও আশ্রয়ের সন্ধান সে-মন করিবে যুক্তিসঙ্গত জ্ঞান ও জীবনের মধ্যে, জড়প্রকৃতির শক্তি ও সম্ভাবনা সকলের সুসম্বদ্ধ জ্ঞানের মধ্যে, দেহ মনে সীমাবদ্ধ মানবের মনস্তত্ত্ব বিষয়ে সুসম্বদ্ধ জ্ঞানের মধ্যে; এবং সেই জ্ঞানের সুশৃঙ্খল প্রয়োগে ক্রমোন্নতিশীল সমাজের দক্ষতা ও কল্যাণসাধন হইবে, যাহাতে মানুষের ক্ষণস্থায়ী জীবন আরও সহনীয়, আরও সুখময়, আরামপ্রদ হয়, যেন তাহা মন, প্রাণ, দেহের ভোগে আরও প্রচুরভাবে সমৃদ্ধ হইয়া উঠে,—ইহাই কি সভ্যতার ধারা? আমাদের সমস্ত দর্শন, ধর্ম্ম (যদি ধর্ম্মকে এখন বাদ দিবারই সময় না আসিয়া থাকে) আমাদের সমস্ত সায়েন্স, চিন্তা, আর্ট, সামাজিক সংগঠন আইন, অনুষ্ঠান কি জীবন সম্বন্ধে এইরূপ ধারণার ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে এবং এই লক্ষ্য সাধনেই নিযুক্ত করিতে হইবে? আমাদের জীবনের এইটিই যদি সমগ্র সত্য হয়, তাহা হইলে এইরূপ করাই যুক্তিসঙ্গত হইবে। ইউরোপীয় সভ্যতা এই আদর্শই গ্রহণ করিয়াছে, এবং ইহাকে কোনরকমে সাফল্য দিবার জন্য এখন পর্য্যন্ত বহুল আয়াস করিতেছে। এইটি হইতেছে যৌক্তিক (rational) এবং বুদ্ধিদ্বারা যন্ত্রবৎ গঠিত সভ্যতার সূত্র। অন্যপক্ষে, ইহাই কি আমাদের জীবনের সত্য যে, প্রকৃতিতে আবির্ভূত আত্মা নিজেকে জানিতে চাহিতেছে, পাইতে চাহিতেছে, নিজের চেতনাকে প্রসারিত করিতে চাহিতেছে, আধ্যাত্মিকতায় অগ্রসর হইতে পূর্ণ আত্মজ্ঞানের জ্যোতিতে গড়িয়া উঠিতে, এবং কোনরূপ দিব্য সিদ্ধি ও পূর্ণতা লাভ করিতে চাহিতেছে? ধর্ম্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, চিন্তা, আর্ট, সমাজ, সমগ্র জীবনটিই কি এইরূপ বিকাশের সহায়মাত্র, আত্মার যন্ত্রমাত্র, তাহারই প্রয়োজনে প্রযুক্ত হইবে, অন্ততঃ এই অধ্যাত্মলক্ষ্য সিদ্ধিই তাহাদের সর্ব্বপ্রধান কার্য্য হইবে? প্রাচীন ভারত সে-দিন পর্য্যন্ত মানবজীবন সম্বন্ধে এই প্রাচীন ধারণাকে (তাহার মতে, এই জ্ঞানকে) ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল, এবং আজও তাহার প্রকৃতিতে সব চেয়ে স্থায়ী ও শক্তিমান যাহা কিছু সেই সব লইয়া এইটিকে ধরিয়া থাকিবার চেষ্টা করিতেছে।— এইটি হইতেছে আধ্যাত্মিক সভ্যতার সূত্র।

অতএব, মানবজাতির ভবিষ্যৎ যৌক্তিক ও বুদ্ধির সাহায্যে যন্ত্রবৎ গঠিত সভ্যতা ও কালচারের মধ্যে নিহিত—না,

* পূর্ব্বাংশ "বিচিত্রায়" (কার্ত্তিক, ১৩৩৭) প্রকাশিত হইয়াছে।

আধ্যাত্মিক, সাক্ষাৎবোধ মূলক (intuitive), ধার্ম্মিক (ধর্ম্ম শব্দটিকে ব্যাপক অর্থে লইয়া) সভ্যতা ও কালচারের মধ্যে নিহিত, এইটিই প্রধান প্রশ্ন। যুক্তিপন্থী সমালোচক যখন বলেন যে ভারত সভ্য নহে বা কোনদিনই সভ্য ছিল না, যখন তিনি উপনিষদ্, বেদান্ত, বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্ম, প্রাচীন ভারতীয় আর্ট ও কাব্যকে বর্ব্বরতার স্তূপ বলিয়া চিরবর্ব্বর মনের অসার সৃষ্টি বলিয়া ঘোষণা করেন, তখন তাহার কথার অর্থ শুধু এই দাঁড়ায় যে, সভ্যতা ও যুক্তিপন্থী জড়বাদ একই কথা, যাহা কিছু এই আদর্শের নীচে পড়ে বা উপরে যায় তাহাকে আর কাল্চার নামে, সভ্যতা নামে অভিহিত করা চলে না। যে দর্শনশাস্ত্র অতি বেশী মাত্রায় দার্শনিক, (metaphysical) যে ধর্ম্ম অতি বেশী মাত্রায় ধার্ম্মিক, যে চিন্তা ও আর্ট অতি বেশী মাত্রায় idealistic আদর্শতান্ত্রিক এবং গূঢ়ার্থসূচক ;—জড় জগতের আলোচনায় প্রবৃত্ত যৌক্তিক বুদ্ধির সীমাবদ্ধ দৃষ্টিকে যাহা কিছু ছাড়াইয়া যায়, সূক্ষ্মতরভাবে দর্শন করিতে চায় এবং সেইজন্যই উহার নিকটে অদ্ভুত, অতি-সূক্ষ্ম, অসঙ্গত, দুর্ব্বোধ্য বলিয়া প্রতীত হয় ; যাহা কিছু অনন্তের উপলব্ধি দ্বারা অনুপ্রাণিত, যাহা কিছু অসীমের পরিকল্পনায় প্রভাবিত, এবং যে সমাজ এই সব জিনিষ হইতে উদ্ভূত চিন্তা ও আদর্শের দ্বারা অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত, কেবল যৌক্তিক বুদ্ধির স্বচ্ছতা এবং জড়বাদমূলক বিকাশ ও দক্ষতার আদর্শের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নহে,—সে-সব এক অর্ব্বাচীন চাতুর্য্যপূর্ণ বর্ব্বরতারই সৃষ্টি। কিন্তু এটা স্পষ্টতই একটা অতিশয়োক্তি, মানবজাতির অতীত মহত্ত্বের অনেকখানিই এই দোষারোপের মধ্যে আসিয়া পড়ে ; এমন কি প্রাচীন গ্রীক্ সভ্যতাও পরিত্রাণ পায় না ; আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতারও অনেক চিন্তা ও আর্টকে তাহা হইলে অন্ততঃ অৰ্দ্ধ-বর্ব্বর বলিয়া নিন্দা করিতে হইবে। ইহা খুবই স্পষ্ট যে, আমরা যদি বর্ব্বর শব্দটির অর্থকে এইভাবে সঙ্কীর্ণ করিয়া লই এবং মানবজাতির অতীত প্রচেষ্টা সকলের মূল্য এইরূপ খর্ব্ব করিয়া দিই সেটা আমাদের পক্ষে অতিশয় বাড়াবাড়ি ও মূঢ়তাই হইবে। ভারতীয় সভ্যতা বস্তুতপক্ষে গ্রীকোরোমান সভ্যতা, খৃষ্টান, ইস্লামিক্ এবং পরবর্ত্তী ইউরোপীয় রেণেশাঁস (Renaissance) সভ্যতার ন্যায়ই মহান্ তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

কিন্তু তথাপি মূল প্রশ্নটির সমাধান হয় না। কোনও অধিকতর সংযত ও স্পষ্টদর্শী যুক্তিপন্থী সমালোচক ভারতের প্রাচীন কীর্ত্তির মূল্য স্বীকার করিতে পারেন, বৌদ্ধধর্ম্ম, বেদান্ত এবং সমস্ত ভারতীয় আর্ট, দর্শন এবং সামাজিক চিন্তাধারাকে বর্ব্বর বলিয়া ধিক্কার দিতে না পারেন, তথাপি তিনি বলিবেন যে, উহাতে মানবজাতির ভবিষ্যৎ কল্যাণ আর কিছুই নাই, তাহা আছে ইউরোপীয় আধুনিকতায়, বিজ্ঞানের মহান্ কীর্ত্তিকলাপে, মানবজাতির মহান্ আধুনিকতার অভিযানে। সে প্রচেষ্টা কেবল আন্দাজ ও কল্পনার উপর নহে পরন্তু সুনির্দ্ধারিত ও সুস্পষ্ট বৈজ্ঞানিক সত্যের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত, সকল আয়াসে গঠিত বৈজ্ঞানিক অর্গানিজেশনের (organisation) সুদৃঢ় ও সুনিশ্চিত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু অন্যপক্ষে নিজ আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাবান ভারতবাসী বলিবেন যে, মানবজীবনে যৌক্তিক বুদ্ধি, এবং বিজ্ঞান এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক জিনিষের উপযোগিতা থাকিলেও, প্রকৃত যে সত্য তাহা এই সকলের উপরে ; আমাদের চরম সিদ্ধি ও পূর্ণতার নিগূঢ়তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে আরও গভীরভাবে ভিতরে যাইতে হইবে। অধ্যাত্ম আত্ম-জ্ঞান ও আত্মবিকাশের মধ্যে এবং সমস্ত জীবনকে সেই আত্ম-জ্ঞানের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার মধ্যেই সে রহস্য নিহিত রহিয়াছে।

বিচার্য্য বিষয়টি এইভাবে উপাপন করিলে, আমরা তৎক্ষণাৎ দেখিতে পাই যে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে ব্যবধান, ভারত ও ইউরোপের মধ্যে ব্যবধান ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে যেমন গভীর ও দুরতিক্রম্য ছিল এখন তাহা অপেক্ষা অনেক কম হইয়াছে। সত্য বটে যে, মূল প্রভেদটি এখনও যেমনকার তেমনিই রহিয়াছে ; পাশ্চাত্যের জীবনধারা এখনও প্রধানতঃ যুক্তিবাদ ও জড়বাদের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু চিন্তার উচ্চতম স্তরে, এক মহান পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে, এবং তাহা আর্ট, কাব্য, সঙ্গীত, এবং সাধারণ সাহিত্যের ভিতর দিয়া নিম্নদিকেও ক্রমশঃ বেশী বেশী ও নিশ্চিতভাবে সঞ্চারিত হইতেছে। গভীরতর জিনিষ-

সকলের দিকে দৃষ্টি যাইতেছে, যে-সব অনুসন্ধান নির্ব্বাসিত হইয়াছিল আবার তাহারা ফিরিয়া আসিতেছে, মহত্তর নূতন অনুভূতি ও উপলব্ধির জন্য প্রেরণা দেখা যাইতেছে, পাশ্চাত্য মনের সহিত বহুদিন অপরিচিত ভাব ও চিন্তাসকল আবার স্বীকৃত হইতেছে। এই ধারাকে সাহায্য করিয়া এবং ইহার দ্বারা সাহায্য পাইয়া ভারতীয় ও প্রাচ্য ভাব সকলের কতকটা সঞ্চারণ হইয়াছে, এমন কি এখানে সেখানে প্রাচীন অধ্যাত্ম আদর্শের উচ্চ মূল্য ও শ্রেষ্ঠ মহত্ত্বও কতকটা স্বীকৃত হইয়াছে। এই সঞ্চারণ-ক্রিয়া আরম্ভ হয় সুদূর প্রাচ্যের সহিত ইউরোপের নিকট-সংস্পর্শের প্রথম অবস্থাতেই; ইংরাজ কর্ত্তৃক ভারত অধিকারে এই সংস্পর্শের সুযোগ হইয়াছিল। কিন্তু প্রথম প্রথম ইহা ছিল খুবই স্বল্প বাহ্যিক অথবা কয়েকটি শ্রেষ্ঠ মনের উপর একটা মানসিক প্রভাবরূপে; পণ্ডিত ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ বেদান্ত, সাংখ্য, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হন, ভারতীয় দার্শনিক ভাববাদের (idealism) সূক্ষ্মতা ও উদারতা প্রশংসার উদ্রেক করে, সোপেনহায়ার ও ইমার্সনের ন্যায় উচ্চ মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তিগণের এবং অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী হইলেও সমসাময়িক প্রভাব-সম্পন্ন কতকগুলি ব্যক্তির মনের উপর গীতা ও উপনিষদ্ একটা গভীর ছাপ রাখিয়া যায়। এই প্রভাব বেশী দূর অগ্রসর হয় নাই, এবং ইহার দ্বারা যে ফলটুকু হইতে পারিত তাহাও বৈজ্ঞানিক জড়বাদের প্রবল বন্যার দ্বারা সাময়িকভাবে নিরুদ্ধ ও বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা হইয়াছিল; সেই জড়বাদের বন্যা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের সমগ্র জীবন-আদর্শকেই নিমজ্জিত করিয়া দিয়াছিল।

কিন্তু ইতিমধ্যে অন্যান্য আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে দার্শনিক চিন্তাধারা যুক্তিতন্ত্র জড়বাদ হইতে সুস্পষ্টভাবে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়াছে। একদিকে বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে অধিকতর প্রশস্ত চিন্তা ও দৃষ্টির সন্ধানে ভারতীয় অদ্বৈতবাদ (Monism) অনেকেরই মনের উপর সূক্ষ্ম কিন্তু শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, যদিও তাহা অনেক স্থলেই অদ্ভুতভাবে প্রচ্ছন্ন। অন্যদিকে নূতন দর্শন সকলের আবির্ভাব হইয়াছে; সেগুলি অবশ্য সাক্ষাৎভাবে অধ্যাত্মবাদী অপেক্ষা বেশী প্রাণবাদী (Vitalistic) ও ব্যবহারবাদী (Pragmatic), তথাপি তাহাদের অধিকতর অন্তর্মুখীনতার জন্য সেগুলি ইতি-মধ্যেই ভারতীয় চিন্তাধারার নিকটতর হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার প্রাচীন গণ্ডীসকল ভাঙ্গিয়া পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে, নানা প্রকারের সাইকিক্ অনুসন্ধান (Psychic research) এবং মনোবিজ্ঞানের নূতন ধারা এমন কি সাই-কিজিম্ অকাল্টিজিমের প্রতি আগ্রহও ক্রমশঃ বেশী বেশী দেখা যাইতেছে, যদিও এসব এখনও গোঁড়া ধর্ম্ম ও গোঁড়া সায়েন্স্ উভয়ের দ্বারাই অনেক পরিমাণে বাধা পাইতেছে। থিওজফি (Theosophy) তাহার ব্যাপক সমন্বয় এবং প্রাচীন আধ্যাত্মিক ও সাইকিক্ তত্ত্ব সকলের প্রতি নিষ্ঠা লইয়া সর্ব্বত্রই যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহা থিওজফিষ্ট্ বলিয়া পরিচিত ব্যক্তিগণের গণ্ডী ছাড়াইয়া বহুদূর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। বহুকাল উপহাস ও কুৎসার দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইলেও উহা কর্ম্মফল, পুনর্জন্ম, সৃষ্টির বিভিন্ন স্তর (Planes of Exisience), দেহধারী জীবের বুদ্ধি ও চেতনার ভিতর দিয়া আধ্যাত্মিকতায় ক্রমবিকাশ,—এই সকল তত্ত্বে বিশ্বাস প্রচার করিতে বিশেষ সাহায্য করিয়াছে; আর এ-সব হইতেছে এমন তত্ত্ব, যাহা একবার স্বীকৃত হইলে জীবন সম্বন্ধে সমগ্র ধারণার আমূল পরিবর্ত্তন হইতে বাধ্য এমন কি সায়েন্স্ নিজেই পুনঃ পুনঃ এমন সব উপনীত হইতেছে যাহা, জড়জগতের স্তরে এবং ইহারই উপযোগী ভাষায়, কেবল সেই সব সত্যের পুনরাবৃত্তি, যাহা প্রাচীন ভারত ইতিপূর্ব্বেই অধ্যাত্মজ্ঞানের দিক্ হইতে এবং বেদ বেদান্তের ভাষায় প্রচার করিয়াছে। এই সব অগ্রগামী প্রচেষ্টার প্রত্যেকটিই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মনকে পরস্পরের নিকটবর্ত্তী করিয়া তুলিতেছে, এবং ঠিক ততখানিই ভারতীয় চিন্তাধারা ও আদর্শ সকলকে ভালরকম বুঝিবার পথ করিয়া দিতেছে।

মনোভাবের এই পরিবর্ত্তন কোন কোন দিকে অনেক-দূরই অগ্রসর হইয়াছে; আর ইহা অনবরত বাড়িয়া চলিয়াছে বলিয়াই মনে হয়। স্যার জন্ উড্‌রোফ্ একজন মিশনারীর কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি "বিস্মিত হইয়াছেন যে, হিন্দু সর্ব্বেশ্বরবাদ (Pantheism) জর্ম্মাণী, আমেরিকা,

এমন কি ইংলণ্ডেরও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ধ্যানধারণা সকলের মধ্যে এত অধিক পরিমাণে প্রবেশ লাভ করিতে আরম্ভ করিয়াছে", এবং তিনি আশঙ্কা করেন যে, ইহার ক্রমশঃ বর্দ্ধনশীল প্রভাব পরবর্ত্তী বংশধরগণের পক্ষে একটা আসন্ন "বিপদ"। স্যার্ জন উড্রোফ্ আর একজন লেখকের উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি এতদূর পর্য্যন্ত বলেন যে, ইউরোপের যত শ্রেষ্ঠ দার্শনিক চিন্তাসম্পদ সবই পূর্ব্ববর্ত্তী ব্রাহ্মণগণের চিন্তা হইতেই গৃহীত, এমন কি তিনি বলেন, মানুষ বুদ্ধির সাহায্যে আধুনিক যুগে যে-সব সমস্যার সমাধান করিতেছে, প্রাচ্যে ইতিপূর্ব্বে সে-সব সমাধানই হইয়া গিয়াছে। জনৈক বিখ্যাত ফরাসী মনস্তত্ত্ববিদ্ সম্প্রতি একজন ভারতীয় অভ্যাগতের নিকট বলিয়াছেন যে, যথার্থ মনোবিজ্ঞানের মূলধারা ও প্রধান প্রধান সত্য গুলি সবই ভারত ইতিপূর্ব্বে আবিষ্কার করিয়া রাখিয়াছে, একটা প্রশস্ত কাঠামো প্রস্তুত করিয়া দিয়াছে, এখন সেইটিকে খুঁটিনাটি বিষয়ে সঠিক বর্ণনা দিয়া এবং বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাদির প্রয়োগ করিয়া পূর্ণাঙ্গ করিয়া তোলা,—ইউরোপ কেবল এইটুকুই করিতে পারে। এই সব উক্তি এক ক্রমবর্দ্ধনশীল পরিবর্ত্তনের চরম নিদর্শন, তাহার গতি কোন্ দিকে তাহা অতি সুস্পষ্ট। এই পরিবর্ত্তন শুধুই যে দর্শনশাস্ত্র ও উচ্চ-চিন্তা ধারাতেই পরিলক্ষিত হইতেছে তাহা নহে। ইউরোপীয় আর্ট কোন কোনও বিষয়ে তাহার পুরাতন প্রতিষ্ঠাভূমি হইতে সরিয়া যাইতেছে, তাহার নূতন দৃষ্টি খুলিতেছে, এবং সে নিজের ভাবে এমন সব প্রেরণা গ্রহণ করিতেছে যাহা এতদিন কেবল প্রাচ্যেই সম্মানিত হইত। প্রাচ্য আর্টও সর্ব্বত্র আদর লাভ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কবিতা কিছুকাল হইতেই অনিশ্চিতভাবে এক নূতন ভাষায় কথা কহিতে আরম্ভ করিয়াছিল, এবং যখন রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠা জগদ্ব্যাপী হইল [ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বেও এরূপ প্রতিষ্ঠালাভ কল্পনার অতীত ছিল], তাহার পর হইতে প্রায়ই দেখা যাইতেছে যে, সাধারণ লেখকদের রচনাও এমন সব চিন্তা ও ভাবে পূর্ণ যাহা পূর্ব্বে ভারতীয়, বৌদ্ধ, ও সুফী সাহিত্যের বাহিরে কচিৎ কোথাও দেখিতে পাওয়া যাইত কিনা সন্দেহ। এমন কি সাধারণ সাহিত্যেও এইরূপ ঘটনার প্রাথমিক চিহ্ন কিছু কিছু দেখা যাইতেছে। নূতন সত্যের অনুসন্ধানকারী অনেকে আজকাল ভারতেই তাহাদের আধ্যাত্মিক আবাসভূমি পাইতেছেন, অথবা তাহাদের প্রেরণার অনেকখানিই ভারত হইতে লাভ করিতেছেন। এই পরিবর্ত্তনের গতি যদি আপনার বেগ বৰ্দ্ধিত করিতে থাকে (আর, ইহার বিপরীত হইবার কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না), তাহা হইলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে ব্যবধান যদিও না সম্পূর্ণভাবে দূর হইয়া যায়, অন্ততঃ উভয়ের মধ্যে মিলনের সেতু নির্ম্মিত হইবে, এবং তখন ভারতীয় কাল্চার ও আদর্শের পক্ষ সমর্থন করার ভিত্তি আরও দৃঢ়তর হইবে।

কিন্তু যদি এইরূপ একটা মিলন ও বোঝাপড়ার নিশ্চয়তা থাকেই তাহা হইলে আর ভারতীয় কাল্চারের আক্রমণ-মূলক পক্ষসমর্থনের প্রয়োজন কি? কোনরূপ পক্ষ সমর্থনেরই বা প্রয়োজন কি? বস্তুতঃ ভবিষ্যতে একটা বিশিষ্ট ভারতীয় কাল্চার বজায় রাখিবারই বা সার্থকতা কি? প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দুইটি বিপরীত দিক হইতে আসিয়া পরস্পরের মধ্যে নিমজ্জিত হইবে, সম্মিলিত মানবজাতির জন্য এক সাধারণ world-culture বা বিশ্ব-সভ্যতার সৃষ্টি করিবে; তাহার মধ্যেই সকল পূর্ব্ববর্ত্তী কাল্চার মিশিয়া যাইবে এবং এইরূপেই তাহারা সার্থকতা লাভ করিবে। কিন্তু সমস্যাটি এত সহজ নহে, এমন সুচারুভাবে সরল নহে। প্রথমতঃ, এখনও আমরা এরূপ কোনও নিশ্চিত ও সন্তোষজনক পরিণতি হইতে অনেক দূরে—যদিও ধরিয়া লওয়া যায় যে এক সম্মিলিত বিশ্ব-সভ্যতার মধ্যে প্রবল বৈশিষ্ট্যসূচক বৈচিত্র্যের কোনও আধ্যাত্মিক প্রয়োজন বা প্রাণিক উপযোগিতা থাকিবে না। সকল অপেক্ষাকৃত অগ্রগামী আধুনিক চিন্তাধারার অন্তর্মুখী ও আধ্যাত্মিক ভাব এখনও অল্প-সংখ্যক লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রহিয়াছে, ইউরোপের সাধারণ-বুদ্ধিকে তাহা এ পর্য্যন্ত কেবল খুব ভাসাভাসি ভাবেই অনুরঞ্জিত করিয়াছে। তাহা ছাড়া ইহা এখনও কেবল চিন্তার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ; জীবনের ক্ষেত্রে ইউরোপীয় সভ্যতার উচ্চ প্রেরণাগুলি যেমন যেমন ছিল এখনও তেমনিই রহিয়াছে, কেবল মানবসমাজকে পুনর্গঠিত করিবার চেষ্টায় কতকগুলি আদর্শের প্রভাব বেশি করিয়া অনুভূত হইতেছে। ঠিক এই সন্ধিক্ষণে এবং এইরূপ অবস্থাপরম্পরায় সমগ্র মানবজগৎ (ভারতও তাহার

অন্তর্গত) এক দ্রুত ব্যাপক রূপান্তর ক্রিয়ার তীব্র চাপ ও বেদনার আবর্ত্তে নিক্ষিপ্ত হইতে চলিতেছে। এখন বিপদ হইতেছে এই যে, ইউরোপের প্রভাবশালী চিন্তা ও প্রেরণা সকলের সম্পীড়ণ, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সাময়িক প্রয়োজন সিদ্ধির প্রলোভন, দ্রুত অবশ্যম্ভাবী পরিবর্ত্তনের এমন তীব্র-বেগ যাহা গভীর চিন্তা ও আধ্যাত্মিক বিচার বিকাশের অবসর দেয় না, এইসব অতি সাংঘাতিক ভাবেই ভারতের প্রাচীন কাল্‌চার ও সমাজ-ব্যবস্থাকে বিক্ষুব্ধ করিতে পারে, —সে কাল্‌চার ও সমাজের এখন আর এমন সামর্থ্য নাই যে সে জাতীয় ও পারিপার্শ্বিক প্রয়োজন সকল মিটাইতে পারে; ভারতের পক্ষে সম্যক অবস্থাটি ভাল করিয়া বুঝিয়া লইতে এবং তাহার নিজেরই সত্তা ও আদর্শের অনুসরণে দ্রুত বিকাশ ও প্রগতির দৃঢ়ভিত্তির স্থাপন করিতে যে সময়ের প্রয়োজন, তাহার পূর্ব্বেই হয়ত এইরূপে তাহার প্রাচীন সভ্যতা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। সেরূপ ঘটিলে সেই বিপ্লবের মধ্য হইতে এক যুক্তিবাদী পাশ্চাত্যভাবাপন্ন ভারতের আবির্ভাব হইতে পারে, তখন তাহার প্রাচীন চিন্তাধারার কোন কোন অংশের প্রভাব অবশিষ্ট থাকিলেও, তাহা আর তাহার সমগ্র জীবনকে গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত করিবে না। অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতও পাশ্চাত্য আধুনিকতার ছাঁচে গড়িয়া উঠিবে; প্রাচীন ভারতের মৃত্যু হইবে।

এমন কেহ কেহ আছেন যাঁহারা এরূপ ঘটনাকে অশুভ বলিয়া মনে করেন না, বরং এইরূপ পরিণামই তাঁহাদের মতে বাঞ্ছনীয়। তাঁহাদের মতে এইরূপ ঘটার অর্থ হইবে এই যে, ভারত তাহার আধ্যাত্মিক স্বাতন্ত্র্য বর্জ্জন করিয়াছে, একটা অত্যাবশ্যকীয় পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া জগৎ-সভায় স্থান করিয়া লইয়াছে। আর যদি প্রাচীন ভারতের মৃত্যুর কথাই তোলা যায়, সেই নূতন জগৎ-সমাজে আধ্যাত্মিকতা ও অন্তর্মুখীনতা ক্রমশঃ বেশী বেশী প্রবেশ লাভ করিবে, হয়ত ভারতের নিজেরই ধর্ম্ম ও দার্শনিক চিন্তাধারার অনেকাংশ সেই নূতন কাল্‌চার কর্ত্তৃক গৃহীত হইবে, অতএব সেটা সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিজনক হইবে না; প্রাচীন গ্রীসের ন্যায় প্রাচীন ভারতও গত হইবে, এক নূতন ও অধিকতর ব্যাপকভাবে উন্নতিশীল মানবজাতির জন্য নিজের কিছু অবদান রাখিয়া যাইবে। কিন্তু গ্রীকো-রোমান্ কাল্‌চারও যে পরবর্ত্তী ইউরোপীয় সমাজ কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছিল, তাহাতে তাহা অনেকাংশেই গুরুতরভাবে ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল (যদিও তাহার উপাদানগুলি এক বৃহত্তর ও প্রশস্ততর সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত হইয়া টিকিয়া আছে), এবং তাহার উচ্চ ও স্বচ্ছ বুদ্ধিমত্তা এবং সৌন্দর্য্য-চর্চ্চা নষ্ট হইয়া গিয়াছিল; বহু শতাব্দী পরে আজিও বস্তুতঃ তাহাদের পুনরুদ্ধার হইল না। এক স্বতন্ত্র সভ্যতা রূপে ভারতীয় সভ্যতার অস্তিত্ব যদি না থাকে তাহা হইলে তাহা আরও অনেক বেশী পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইয়া যাইবে, কারণ ইউরোপীয় আধুনিকতার সহিত তাহার আদর্শের প্রভেদ আরও অনেক বেশী গভীর।

সাধারণ পাশ্চাত্য মনের গতি হইতেছে, নীচে হইতে উপরের দিকে জীবনের বিকাশ করা, প্রাণ ও জড়সত্তাকেই তাহার সমগ্র ভিত্তি বলিয়া গ্রহণ করা, এবং ঊর্দ্ধের শক্তি সকলকে কেবল এইজন্য আহ্বান করা যে তাহারা এই প্রাকৃত পার্থিব জীবনকেই সংশোধিত ও কতকটা উন্নত করিয়া দিবে। ভারতের অবিরত প্রয়াস হইয়াছে ঊর্দ্ধের অধ্যাত্ম সত্যের উপরেই জীবনের প্রতিষ্ঠা করা, এবং ভিতরে আত্মাকে ধরিয়া জীবনের বাহ্য বিকাশ করা, বৈদিক ঋষিগণ যেমন বলিয়াছেন,—"নীচীনাঃ স্থুরুপরি বুধ্ন এষাম্, অস্মে অন্তর্নিহিতাঃ কেতবঃ স্যুঃ"—"আমাদের দিব্য প্রতিষ্ঠা ঊর্দ্ধে, তাহার কিরণসকল নিম্নাভিমুখে আসিতেছে, আমাদের অভ্যন্তরীণ সত্তার ভিতর দিয়া। এখন এই যে প্রভেদ, এটা কেবল একটা নিরর্থক সূক্ষ্মতা নহে, পরন্তু ইহার ফল কার্য্যতঃ গভীর ও গুরুতর,—খ্রীষ্টধর্ম্মকে লইয়া য়ুরোপ কিরূপ ব্যবহার করিয়াছে তাহা হইতেই আমরা ইহার প্রমাণ পাই; এই ধর্ম্মকে কখনই সে তাহার জীবনের নীতি বলিয়া গ্রহণ করে নাই, সেটিকে সে স্বীকার করিয়াছে এবং ব্যবহার করিয়াছে শুধু এইজন্য যেন তাহা টিউটন্‌জাতিসুলভ সতেজ প্রাণ-শক্তিকে এবং লাতিন (Latin) জাতির মানসিক স্বচ্ছতা এবং ইন্দ্রিয়ভোগাত্মক সভ্যতাকে কতকটা সংশোধিত ও আধ্যাত্মিক ভাবে অনুরঞ্জিত করিয়া দেয়। খুব সম্ভব কোনও নবোত্থিত আধ্যাত্মিকতাকে গ্রহণ করিলেও সে এইভাবে এবং এইরূপ উদ্দেশ্যেই তাহাকে ব্যবহার করিবে,

যদি এই নিম্নতর আদর্শের ত্রুটি জোরের সহিত দেখাইয়া দিবার মত জগতে অন্য কোনও দৃঢ়নিষ্ঠ জীবন্ত কাল্‌চার বিদ্যমান না থাকে। সম্ভবতঃ মানব সমাজের সমগ্র পূর্ণতার জন্য দুই প্রকার প্রবৃত্তিই প্রয়োজনীয়। কিন্তু যদি অধ্যাত্ম আদর্শের অনুসরণই মানব সমাজের ঐক্যে ও সুসামঞ্জস্যে পৌঁছিবার প্রকৃত চরম পন্থা হয়, তাহা হইলে ভারতের পক্ষে ইহা অতীব আবশ্যকীয় যেন সত্যটিকে সে হারাইয়া না ফেলে, শ্রেষ্ঠজ্ঞান যাহা সে লাভ করিয়াছে যেন তাহা বর্জন না করে, এবং তাহার বিনিময়ে তাহার সত্যও চিরন্তন প্রকৃতির বিরোধী নিম্নতর আদর্শ,-পরধর্ম্ম, অপেক্ষাকৃত সহজ সাধ্য হইলেও গ্রহণ না করে। মানবজাতির পক্ষেও ইহা বিশেষ প্রয়োজনীয় যে, এই উচ্চতম আদর্শকে বাস্তবে পরিণত করিবার এক মহান্ সমষ্টিগত সাধনা, এতদিন তাহা যতই অসম্পূর্ণভাবে হইয়া থাকুক, সাময়িক ভাবে তাহা যতই ভ্রান্তি ও গ্লানির মধ্যে পতিত হউক,—যেন একেবারে বন্ধ না হইয়া যায়, পরন্তু সর্ব্বদা তাহার শক্তিকে পুনরুদ্ধার করিয়া লইয়া এবং তাহার প্রকাশকে প্রসারিত করিয়া অগ্রসর হইতে থাকে। প্রাচীন ভারতীয় স্বধর্ম্মেরই নূতনতর রূপ সৃষ্টি করা, কোনও পাশ্চাত্য আদর্শে রূপান্তরিত হইয়া যাওয়া নহে,—সমগ্র মানবজাতির প্রগতিতে সাহায্যকল্পে ইহাই আমাদের পক্ষে প্রকৃষ্ট পন্থা। *

অতএব, আমরা আত্মরক্ষণনীতির, সমর্থ আক্রমণশীল আত্মরক্ষণনীতির প্রয়োজনে ফিরিয়া আসিতেছি। কারণ আমি ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি, বর্ত্তমান বিরোধের যেরূপ অবস্থা তাহাতে কেবল আক্রমণশীল আত্মরক্ষণনীতিই কার্য্যকরী হইতে পারে। কিন্তু এখানে আবার আমরা এক সম্পূর্ণ বিপরীত মনোভাবের সম্মুখীন হইতেছি, তাহা একটি কঠিন প্রতিবন্ধক। কারণ এখনও বহু ভারতীয় আছেন, তাঁহারা দৃঢ়তার সহিত স্থিতিশীল আত্মরক্ষণেরই পক্ষপাতী; তাঁহারা যেটুকু আক্রমণশীলতা ইহার মধ্যে আনিতে চান, তাহা হইয়েছে অশিষ্ট ও চিন্তাহীন উৎকট স্বজাতিপ্রীতি, স্বধর্ম্মপ্রীতি; তাঁহাদের মতে, যাহা আছে তাহাই ভাল কারণ তাহা ভারতীয়, এমন কি যাহা কিছু ভারতে আছে তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট কারণ তাহা ঋষিদের সৃষ্টি,—যেন পরে যে-সব পরিণতি হইয়াছে সে-সবই আমাদের সভ্যতার মহান্ প্রতিষ্ঠাতা সেই ঋষিগণ ঠিক করিয়া দিয়াছিলেন! এই ঋষিগণকে লইয়া এপর্য্যন্ত অনেক অপব্যবহার অপপ্রয়োগ, এমনকি জাল পর্য্যন্ত করা হইয়াছে। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে এই যে, স্থিতিমূলক আত্মরক্ষণনীতি কোন কাজের কি না? আমি বলি, ইহার কোন মূল্যই নাই, কারণ ইহা বাস্তব সত্যের বিরোধী এবং ইহার ব্যর্থতা অবশ্যম্ভাবী। প্রকৃতপক্ষে ইহা হইতেছে অচল অটলভাবে বসিয়া থাকিবার দৃঢ়সঙ্কল্পযুক্ত প্রয়াস, যখন জগতের শক্তি, শুধু জগতের কেন্ ভারতেরও শক্তি, দ্রুত অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। ইহা হইতেছে কাল্‌চার বিষয়ে আমাদের প্রাচীন মূলধনকে ভাঙ্গিয়া খাইবার সঙ্কল্প, আমাদের অক্ষম ও অপচয়কারী হস্তে পড়িয়া তাহা ক্ষুদ্র হইয়া পড়িলেও সেইটিরই শেষ পয়সাটি পর্য্যন্ত খরচ করিয়া চালাইবার ব্যবস্থা। কিন্তু, আমাদের মূলধন ভাঙ্গাইয়া খাওয়ার অর্থ শেষ পর্য্যন্ত দেউলিয়া ও নিঃস্ব হইয়া পড়া। অতীতকে সর্ব্বদা ব্যবহার করিতে হইবে চল্‌তি মূলধন রূপে আরও বেশী লাভের জন্য, উপার্জ্জনের জন্য, প্রসারের জন্য এবং লাভ করিতে হইলে, আমাদিগকে খরচও করিতে হইবে। অধিকতর সমৃদ্ধ হইয়া জীবন যাপন করিতে হইলে, আমাদিগকে কিছু ছাড়িয়া দিতেই হইবে, ইহাই আমাদের জীবনের সাধারণ নীতি। নতুবা আভ্যন্তরীণ জীবন স্রোতহীন হইয়া বিনষ্ট হইবে। আবার ইহা অক্ষমতারও মিথ্যা স্বীকারোক্তি; ইহাতে মানিয়া লওয়া হয় যে, ভারতের সৃষ্টিশক্তি ধর্ম্ম ও দার্শনিকতার ক্ষেত্রে শঙ্কর, রামানুজ, মাধ্ব ও চৈতন্যের সহিত শেষ হইয়া গিয়াছে,

* ইংরাজ সমালোচকগণের প্রতিধ্বনি করিয়া কোন কোন ভারতীয় রাজনীতিজ্ঞ ও সমাজসংস্কারক যেমন আমাদিগকে ইংরাজের মত (Anglicised) হইতে পরামর্শ দেন, তেমনই আজকাল দেখা যাইতেছে কেহ কেহ আমেরিকানদের গুণে মুগ্ধ হইয়াছেন, তাঁহারা শুধু চান আমরা যেন আমেরিকানদের মত হই (Americanisation),—একটা স্পষ্ট সৃজনাত্মক ভারতীয় আদর্শের অভাবে আমরা এমনই পরমুখাপেক্ষী হইয়া পড়িয়াছি। যদি তাহাই করিতে হয়, তবে আমাদিগকে Japanise করিতে আপত্তিটা কি?

সমাজগঠনের ক্ষেত্রে বিদ্যারণ্য ও রঘুনন্দনের সঙ্গে শেষ হইয়া গিয়াছে ; শিল্পকলা ও কাব্যের ক্ষেত্রে আশাহীন ও সৃষ্টিহীন শূন্যতার মধ্যে বিরামলাভ করিতে হয়, অথবা সুন্দর কিন্তু লুপ্তশক্তি আদর্শ ও পদ্ধতি সকলের অসার ও প্রাণহীন পুনরাবৃত্তি করিতে হয়।

কোনও ব্যাপক পরিবর্ত্তনের বিরুদ্ধে (আর ব্যাপক ও সাহসিক পরিবর্ত্তনই এখন আবশ্যক, সামান্য একটু আদটুতে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না) যে আপত্তি তুলিতে পারা যায় তাহার সর্ব্বাপেক্ষা সমীচীন রূপ হইতেছে এই যে, কোনও কাল্‌চারের বাহ্যিকরূপ ও অনুষ্ঠান সকল তাহার আভ্যন্তরীণ আত্মারই উপযোগী ছন্দ, এই ছন্দকে ভাঙ্গিয়া দিলে আমরা হয়ত সেই আত্মাকেই বিদূরিত করিয়া দিব, এবং সমুদয় সঙ্গতিটিই নষ্ট করিয়া ফেলিব। হাঁ, কিন্তু, যদিও আত্মা তাহার মূল সত্তায় শাশ্বত সনাতন, এবং তাহার সুসঙ্গতির মূলনীতিগুলি অপরিবর্ত্তনীয়, তথাপি কার্য্যতঃ বাহ্যরূপে তাহার আত্মপ্রকাশের ছন্দ নিত্য পরিবর্ত্তনশীল ; মূল সত্তায় এবং সত্তার শক্তিসকলে অক্ষয়, অপরিবর্ত্তনীয়, কিন্তু জীবনলীলায় সমৃদ্ধভাবে পরিবর্ত্তনশীল, —ইহাই আত্মার জগৎমাঝে প্রকাশের প্রকৃত স্বরূপ। তাহা ছাড়া ইহাও আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে, বর্ত্তমানে যে ছন্দটি রহিয়াছে তাহা এখনও বাস্তবিক পক্ষে সুসঙ্গত আছে,—না,—অক্ষম ও অজ্ঞান হস্তে পতিত হইয়া তাহা বৈষম্যে পরিণত হইয়াছে, সেই প্রাচীন আত্মাকে ঠিকভাবে বা যথেষ্টভাবে আর প্রকাশ করিতেছে না। ত্রুটী স্বীকার করার অর্থ হতাশা ডাকিয়া আনা নহে, অথবা অন্তর্নিহিত আত্মাকে অস্বীকার করা নহে ; ভবিষ্যৎ সিদ্ধির মহত্তর সমৃদ্ধির দিকে অগ্রসর হইবার জন্যই ইহা প্রয়োজন। আমরা সেই মহত্তর অভিব্যক্তি ও ছন্দ পাইব কিনা তাহা নির্ভর করিতেছে আমাদের নিজেদের উপর, অনন্ত শক্তি ও জ্ঞানের প্রেরণায় আমাদের সাড়া দিবার সামর্থ্যের উপর, আমাদের মধ্যে শক্তির প্রকাশের উপর ; যে সত্য সনাতন আত্মাকে আমরা আমাদের সীমার মধ্যে প্রকট করিতেছি তাহার সহিত যোগ হইতে লব্ধ কর্ম্মকুশলতার উপর, যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্।

ভারতীয় কাল্‌চারের দিক হইতে এইটিই যথার্থ দৃষ্টি ; কিন্তু আমাদের উপরে কালধর্ম্মের যে প্রভাব সেই দিক দিয়াও দেখিবার রহিয়াছে। সেইটিও মানবজাতির উপরে বিশ্ব-শক্তির ক্রিয়া, এবং সেটিকে অবহেলা করা চলে না, দূরে রাখা চলে না, তাহার প্রবেশ নিষেধ করা চলে না। এখানেও নবসৃষ্টির নীতিটি আসিয়া পড়িতেছে ; যদিই বা আমাদের সুরক্ষিত তোরণের পশ্চাতে নিশ্চল ও আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া থাকা বাঞ্ছনীয় হয়, তবুও তাহা আর সম্ভব নহে। মানবজাতির মধ্যে একটি স্বতন্ত্র স্থান লইয়া, পরিত্যক্ত সমুদ্রের মধ্যে একক দ্বীপের ন্যায় বিচ্ছিন্ন হইয়া, কোনদিকে বাহিরে না যাইয়া, কাহাকেও ভিতরে আসিতে না দিয়া আর আমরা থাকিতে পারি না, বস্তুতঃ পক্ষে এরকম যদি আমরা কখনও করিয়া থাকি, এখন আর তাহা সম্ভব নহে। ভালই হউক আর মন্দই হউক জগৎ আমাদের কাছে আসিয়াছে, আধুনিক ভাব ও শক্তিসকলের বন্যা অজস্রভাবে আমাদের মধ্যে আসিয়া পড়িতেছে, তাহারা বারণ মানিবে না। দুইভাবে আমরা তাহাদের সম্মুখীন হইতে পারি, হয় তাহাদিগকে বাধা দিবার নিরাশাময় ও ব্যর্থ চেষ্টা করা, নতুবা তাহাদিগকে ধরিয়া লইয়া বশীভূত করা। যদি আমরা কেবল নিষ্ক্রিয়ভাবে বাধা দিই, তাহা হইলে তাহারা আমাদের দুর্গপ্রাকারকে যেখানে সবচেয়ে দুর্ব্বল পাইবে সেইখানে ভাঙ্গিয়া আমাদের উপরে আসিয়া পড়িবে, যেখানে তাহা কঠিনতর সেখানে তাহার ভিত্তিক্ষয় করিয়া আসিবে, আর যেখানে তাহাও পারিবে না সেখানে মাটির নীচে সুড়ঙ্গ কাটিয়া আমাদের অজ্ঞাতসারেই আসিয়া পড়িবে। অ-সমীকৃত অবস্থায় প্রবেশ করিয়া তাহারা আমাদের মধ্যে ধ্বংসের শক্তিরূপে আবির্ভূত হইবে, এবং কেবল কতকটা বাহির হইতে আক্রমণে কিন্তু বেশীর ভাগই ভিতর হইতে বিদীর্ণ হইয়া এই পুরাতন ভারতীয় সভ্যতা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। বিপজ্জনক স্ফুলিঙ্গ সকল ইতিমধ্যেই চারিদিকে ছুটিতে আরম্ভ করিয়াছে, সে-সব নির্ব্বাপের উপায় কাহারও বিদিত নহে, আর যদিই বা আমরা সে-সমুদয় নির্ব্বাপিত করিতে পারি, তাহা হইলেও আমাদের অবস্থা নিরাপদ হইবে না, কারণ তখনও আমাদিগকে

তাহাদের উৎপত্তিস্থলের সন্ধান করিতে হইবে। অতীতের দোহাই দিয়া বর্ত্তমান অবস্থার সমর্থন করিতে যাঁহাদের দৃঢ়তম নিষ্ঠা, তাঁহারা যে নূতন চিন্তাধারার দ্বারা কতবেশী প্রভাবান্বিত হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেক কথায় তাহা প্রকাশ পাইতেছে। বিশেষতঃ, অধিকাংশ না হইলেও অনেকেই তীব্র আবেগের সহিত এবং অপরিহার্য্য ভাবেই কোন কোন ক্ষেত্রে এমন সব পরিবর্ত্তন চাহিতেছেন, যে-সবের অন্তর্নিহিত ভাব ও প্রণালী ইউরোপীয়, তাঁহারা বুঝিতেছেন না যে, সম্পূর্ণভাবে সমীকৃত ও ভারতীয় ভাবাপন্ন না করিয়া এই-সবকে একবার যদি প্রবেশাধিকার দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাঁহারা যে সমাজগঠনকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেছেন, সেইটিকে তাহারা শেষ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করিয়া দিবে। এইরূপ যে হইতেছে তাহার কারণ চিন্তার অস্পষ্টতা ও শক্তির অক্ষমতা ; এই সকল ক্ষেত্রে আমরা নিজেরা মৌলিক চিন্তা করিতে পারিনা, সেইজন্যই অপরের নিকট হইতে অসমীকৃত অবস্থায় ধার করিতে বাধ্য হই, অথবা সমীকরণের একটা মিথ্যা ভাণ করি মাত্র। আমরা কি যে করিতেছি, তাহার সমগ্র অর্থ টি এক উচ্চ আভ্যন্তরীণ ও সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি লইয়া দেখিতে পারি না, সেই জন্যই আমরা একটা কল্যাণকর সামঞ্জস্য সাধন না করিয়া অ-সম জিনিষ সকলকে একত্র করিতে ব্যস্ত হইয়াছি, অগ্ন্যুৎপাত ও বিস্ফোরণে আমাদের সকল চেষ্টার পরিণতি হওয়ার সম্ভাবনা।

আক্রমণশীল আত্মরক্ষণনীতির জন্য চাই এইরূপ অভ্যন্তরীণ ও ব্যাপক দৃষ্টি লইয়া নূতন সৃজন, আমাদের যাহা আছে তাহাকে অধিকতর শক্তিশালী রূপ দিতে হইবে, আবার কিছু আমাদের নব জীবনের জন্য প্রয়োজন এবং আমাদের সত্তার সহিত সুসঙ্গত করিয়া লওয়া যাইতে পারে, সে-সবকেও যথার্থ ভাবে অঙ্গীভূত করিয়া লইতে হইবে। যুদ্ধ, আঘাত, দ্বন্দ্ব হইলেই যে তাহা বৃথা ধ্বংসকাণ্ড হইবে এমন কোন কথা নাই, এই সব উপদ্রবের অন্তরালে কালের পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। যে বিজেতা খুবই কৃতকার্য্য হইয়াছে সেও বিজিতের নিকট হইতে অনেক কিছু গ্রহণ করে, কখনও সে বিজিতকে অধিকার করিয়া লয়, আবার কখনও নিজেই তৎকর্ত্তৃক বন্দী হইয়া পড়ে। পাশ্চাত্য হইতে যে আক্রমণ আসিয়াছে তাহা কেবল প্রাচ্যের কৃষ্টিমূলক অনুষ্ঠানগুলিকে ভাঙ্গিয়া দেওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে। সেই সঙ্গেই প্রাচ্য কৃষ্টিতে সারবান মূল্যবান যাহা কিছু আছে তাহার অনেকখানিই ব্যাপক ও সূক্ষ্ম ভাবে নীরবে গৃহীত হইয়া পাশ্চাত্য কাল্‌চারকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। অতএব আমাদের অতীতের গৌরবময় সম্পদ সকল আনিয়া ইউরোপ ও আমেরিকা যত লইতে পারে তাহাদের মধ্যে ছড়াইয়া দিলে তাহা আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না ; তাহাতে তাহাদেরই শক্তি ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইবে। আমাদের পক্ষে তাহা কেবল মাত্র অধিকতর আত্মপ্রত্যয় আনিয়া দিবে : কিন্তু সেটা বৃথা, এমন কি প্রমাদজনকই হইবে, যদি তাহা মহত্তর সৃষ্টির জন্য ইচ্ছাশক্তিতে পরিণত না হয়। আমাদিগকে যাহা করিতে হইবে তাহা এই—প্রথমতঃ, এমন সব নূতন শক্তিশালী সৃষ্টি লইয়া আক্রমণটির সম্মুখীন হইতে হইবে যাহা শুধুই তাহাকে প্রতিহত করিবে না, পরন্তু যেখানে সম্ভব এবং মানবজাতির পক্ষে সাহায্যপ্রদ সেখানে আক্রমণকারীদের দেশের মধ্যেই অভিযান লইয়া যাইবে ; দ্বিতীয়তঃ, যাহা কিছু আমাদের প্রয়োজনের উপযোগী এবং ভারতীয় আদর্শের অনুযায়ী হইবে সে সবকেই গ্রহণ করিতে হইবে, কিন্তু ভারতীয়ভাবে সমর্থ সৃষ্টিমূলক সাঙ্গীকরণের দ্বারা,—যথা, সায়েন্সের সদ্ব্যবহার করা অথবা স্বাধীনতা ও সাম্যের আদর্শ দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে প্রয়োগ করা। কোন কোন দিকে (এ পর্য্যন্ত তাহা অত্যন্তই অল্প) আমরা এই দুই প্রকার ক্রিয়াই আরম্ভ করিয়াছি ; অন্যত্র আমরা কেবল নিরর্থক মিশ্রণের সৃষ্টি করিতেছি, অথবা হঠকারিতায় কৃত অসংস্কৃত ও অজীর্ণ অনুকরণ সকল গ্রহণ করিতেছি। কেবল আক্রমণকারীর যন্ত্র ও প্রণালী সকল অনুকরণ করা সাময়িকভাবে সুবিধাজনক হইতে পারে, কিন্তু কেবল এইটুকু করিলে তাহা আর এক প্রকারের পরাজয় ভিন্ন আর কিছুই নহে। শুধু গ্রহণ করাই যথেষ্ট নহে, ভারতীয় আদর্শের সহিত ঠিকমত সমীকৃত করিয়া লওয়া আবশ্যক। সমস্যাটি অতিশয় কঠিন ও বিরাটাকার, আর আমরাও প্রকৃত জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি লইয়া তাহার সম্মুখীন হইতেছি না। সেইজন্যই আরও সঙ্গীন প্রয়োজন হইতেছে অবস্থাটি সম্বন্ধে জাগ্রত হওয়া, এবং মৌলিক চিন্তা ও নিশ্চিত কর্ম্মধারা লইয়া তাহার সমাধানে প্রবৃত্ত হওয়া।

শ্রীঅনিলবরণ রায়

জুনিয়ার উকীল

শ্রীযুক্ত সুশীল কৃষ্ণ মিত্র এম্-এস্-সি, বি-এল্

১

শেষ পর্য্যন্ত সুষমা রাজি হইল। স্কুলমাষ্টারীর সঙ্কীর্ণ গণ্ডীটা ত্যাগ করিয়া ভাগ্যলক্ষ্মীর আকুল আহ্বানে ওকালতির বিশাল কর্ম্মক্ষেত্রে আত্মসমর্পণ করিলাম। প্রথমটা সুষমাব মত ছিলনা, নজীব দেখাইয়া কহিল—নরেশদার দু'বছর ওকালতী করার ফলে তাঁর পরিবারের গায়ে আজ আর এক টুক্‌রো সোনাও দেখ্‌তে পাওয়া যায় না।

নরেশকে চিনিতাম, সুষমার মামাতো ভাই। মনটা কেমন যেন একটু দমিয়া গেল, ভাবিয়া দেখিলাম ইহা ক্ষণিক দুর্ব্বলতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। এক মুহূর্ত্তে হতভাগ্য নরেশের দুঃখদারিদ্র্যপীড়িত বিষণ্ণ করুণ মুখখানি জোর করিয়া মন হইতে মুছিয়া ফেলিয়া সুষমার চোখের সুমুখে আরও বড় বড় নজীব খাড়া করিলাম। রাসবিহারী, চিত্তরঞ্জনের প্রথম জীবনের দুঃখ দৈন্য এবং দারিদ্র্যের নগ্নতা, তাঁহাদের ভবিষ্যৎ জীবনের বিপুল বিত্তের অতিরঞ্জিত বর্ণনায় ঢাকিয়া দিলাম। সুষমার মনটা যেন একটু নরম হইল, মধুর হাসিয়া কহিল—ওকালতীর আরম্ভটা বুঝি আমার ওপর দিয়েই শোধ হ'ল?

নিজের অপূর্ব্ব কৃতিত্বে মনেমনে পুলকিত হইয়া ভাবিলাম ভাগ্যদেবীর প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতে বুঝি এম্‌নি করিয়াই অলক্ষ্যে মানুষের অন্তরে শক্তি সঞ্চার করে।

শিক্ষক-জীবনের ক্ষুদ্র সঞ্চয়টাকে অবলম্বন করিয়া সহরের উকীল-পল্লীতে ছোট একটি বাসা লইয়া কোন এক শুভ দিনে আমার নূতন সংসারে নাট্যের যবনিকা উত্তোলন করিলাম।

বাসার পাশেই সহরের বড় উকীল শরৎ বাবুর বিরাট অট্টালিকা। সুমুখে বড় রাস্তা, রাস্তার ওপারে সারি সারি কতকগুলি সুপারি গাছ, তাহারই পিছনে একজন অখ্যাতনামা উকীলের গোলপাতার ঘর। সম্মুখের সর্ব্বাপেক্ষা বড় গাছটিতে টাঙান টিনের সাইনবোর্ডখানি এই অরণ্যবাসী উকীলটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দান করিতেছে—শ্রীরাধাগোবিন্দ বিশ্বাস, বি-এল, উকীল জজকোর্ট। সাইন বোর্ডের প্রাচীনত্ব দেখিয়া বুঝিলাম কয়েক বৎসর ধরিয়া এই ক্ষুদ্র সহরের বুকে আত্মপ্রতিষ্ঠার ব্যর্থ চেষ্টায় অপরিচিত উকীলটির অক্লান্ত পরিশ্রম চলিয়াছে। রাধাগোবিন্দর দৈন্য মনটাকে কেমন যেন একটু অসাড় করিয়া দিল, পরক্ষণেই ভাবিলাম একদিন হয়ত রাধাগোবিন্দর অমর কীর্ত্তিকে অবলম্বন করিয়া লোকচক্ষুর অন্তরালে তাহার এই ক্ষুদ্র নগণ্য কুটীরখানি জগতের বিস্ময় উৎপাদন করিবে।

প্রথম পরিচয়েই রাধাগোবিন্দর সহিত যেন একটু সূক্ষ্ম মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইল। আমার এই নবীন উদ্যমে সে এতটুকুও সহানুভূতি দেখাইল না, নিজের দুরবস্থার উল্লেখ করিয়া কহিল—দেখ্‌ছেন ত এই সাম্‌নের তামাদিতে দু' বছর পুরে যাবে এখনও সেই hand to mouth দিন আনি দিন খাই।

জোর করিয়া মুখে হাসি টানিয়া আনিয়া কহিলাম—আরও দু' বছরে যে অন্যরকম হবে না কে বল্‌তে পারে? এ ব্যবসায়ে যে unlimited prospect 'অফুরন্ত আশা' সে কথা ত কেউ আর অস্বীকার কর্‌তে পার্‌বে না। রাধাগোবিন্দর মুখখানা সহসা যেন উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, মৃদু হাসিয়া কহিল ঐ আশা নিয়েই ত বেঁচে আছি

মনেমনে উৎসাহিত হইয়া কহিলাম—যে কোন বস্তুই হোক না কেন নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ হ'লে যেমন তার স্বাভাবিক গতিটা নষ্ট হয়ে যায়, তেমনি তার পূর্ণতা লাভের শক্তিটাও লোপ পায়; মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা দিয়েই এই সত্যটা সবচেয়ে বেশী উপলব্ধি করা যায়।

রাধাগোবিন্দর মুখে ক্ষীণ হাসি ফুটিয়া উঠিল, ঈষৎ মস্তক সঞ্চালন করিয়া কহিল—নতুন নতুন সবাই এম্‌নি ক'রে আশা আকাঙ্ক্ষা দিয়ে আকাশকুসুম রচনা করে, দু দিন না যেতেই ঠিক তাসের ঘরের মত আবার তা ভূমিসাৎ হয়।

মনে হইল কথাগুলি যেন আমার আজন্মপালিত উচ্চাভিলাষকে তীব্রভাবে ব্যঙ্গ করিল। যুক্তিতর্ক দিয়া সেদিন হয়ত এই নিষ্ঠুর বিদ্রূপের সঠিক উত্তর দিতে পারিতাম, কিন্তু প্রবৃত্তি হইল না; আজ বুঝিতেছি না দিয়া ভালই করিয়াছিলাম।

বাসায় ফিরিতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল। সুষমা হাতকলে বসিয়া খোকনের জামা সেলাই করিতেছিল, চোখ তুলিয়াই কহিল—ভাব্‌ছিলাম পাড়াগাঁয়ের লোক নতুন সহরে এসে বুঝি পথ হারিয়ে গেলে। বলিয়া, মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল। সুষমা মামার বাড়ীতে মানুষ হইয়াছিল। মামা নৈহাটী চটকলের বড় বাবু। ছোটবেলায় সহরে বাস করিয়া সুষমার স্বভাবটা বেশ একটু সৌখীন হইয়া উঠিয়াছিল, বেশবিন্যাসে আমার সামান্য ত্রুটি দেখিলেই সে তাহার সহরবাসের ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতার সুযোগ লইয়া আমাকে উপহাস করিয়া বলিত, পাড়াগাঁয়ের ভূত। আমি হাসিয়া বলিতাম—নৈহাটী আবার সহর আরসুলা আবার পাখী। সুষমা রাগ করিত, বড় বড় চোখ দুটি বিস্ফারিত করিয়া বলিত—চটকল দেখেছ? আচ্ছা বলত কত বড়? মেমের ছেলে দেখেছ? বলত কি রকম দেখ্‌তে? সে আর বল্‌তে হয় না!·· পরাজয় স্বীকার করিয়া বলিতে হইত—সত্যি, ওসব আমি কিছু দেখিনি।

গর্ব্বে, আনন্দে সুষমার কচিবুকখানা ফুলিয়া উঠিত; ঘাড় বাঁকাইয়া বলিত—তবে! বলিয়া, মধুর হাসিয়া চিরুণী দিয়া আমার অগোছাল চুলগুলি সমান করিতে করিতে চটকলের আয়তনটা আমাদের বাড়ী অপেক্ষা কত গুণ বড়, ছোট সাহেবের মেমের ছেলেটা ও পাড়ার রাণীপিসির কুটুকুটে সুন্দর ছেলেটা অপেক্ষা কত বেশী মোটা এবং কতখানি সাদা তাহার একটা আনুমানিক হিসাব দিয়া আমার কল্পনা শক্তিকে সাহায্য করিয়া অনর্গল বকিয়া যাইত। কতক শুনিতাম, কতক শুনিতাম না। আমার ধৈর্য্য পরীক্ষার জন্য সুষমা মধ্যে মধ্যে বলিত—সব শুন্‌ছ ত?

শুন্‌ছি না ত কি ঘুমুচ্ছি?

সুষমা তবুও বিশ্বাস করিত না, মুখের দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিত—আচ্ছা বলত এক নম্বর কলে কতগুলো তাঁত আছে?

কেন—এক শ পঁচিশটে।

সুষমা রাগ করিয়া চিরুণী ছুঁড়িয়া ফেলিয়া অভিমানভরে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া ভারী গলায় বলিত—ছাই শুনছ, না-ই যদি শুন্‌বে তবে আমাকে মিছি মিছি বকালে কেন?

তাহার অভিমানক্ষুব্ধ মুখখানি আমার বড় ভাল লাগিত। আজও সুষমার ক্ষুদ্র পরিহাস টুকুর উত্তরে কিশোর বয়সের সেই মধুর স্মৃতির অনুকরণ করিয়া কহিলাম—নৈহাটী আবার সহর আরসুলা আবার পাখী!

সুষমা রাগ করিল না। আমার মুখের দিকে চাহিয়া তেমনি মৃদু হাসিয়া কহিল—ঠিক ভাব্‌ছিলাম এখনও ভোলোনি, সত্যি, তোমার মুখে ওই কথাগুলো শুন্‌তে ভারী মিষ্টি লাগে।

সহসা মনের কোণে কেমন যেন একটু বেদনা অনুভব করিলাম। বুঝিলাম, যৌবনের গাম্ভীর্য্য আজ সুষমার কৈশোরের তারল্যকে ঘনীভূত করিয়াছে, এম্‌নি অলক্ষ্যেই একদিন আবার বার্দ্ধক্য আসিয়া তাহার নারীত্বের মাধুর্য্যকে ম্লান করিয়া ফেলিবে!

আমাকে নীরব দেখিয়া সুষমা অন্যকথা পাড়িল, বলিল খোকন তোমার আজ কী কাণ্ডখানা করলে জান? কৌতূহল-দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিতেই সুষমার চোখে মুখে কৌতুকের চাপা হাসি ফুটিয়া উঠিল, কহিল—সে ভারী মজা, ও বাড়ীর উকীলবাবুর মেয়ে রেখাকে দেখে, 'পিতি' 'পিতি' ব'লে ঝাঁপিয়ে গিয়ে তার কোলে পড়্‌ল, ভাব্‌লে বুঝি দক্ষিণকোঠার মাধু ঠাকুর ঝি, রেখা ত হেসেই খুন। একটু পরে যখন নিজের ভুল বুঝ্‌তে পার্‌ল তখন একেবারে ভ্যাক্‌ করে কেঁদে ফেল্লে, বিস্কুট নিয়ে, খেলনা

নিয়ে, রেখা কত সাধাসাধি করলে কিছু নিলে না, মুখ ফিরিয়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল; সোনা এসে বাইরে বেড়াতে নিয়ে গেল তবে ছেলে ঠাণ্ডা হ'ল! অতটুকু ছেলের একবার বুদ্ধি দেখ, আমরা যে ওর ভুল দেখে হাসি তামাসা করেছি তা কেমন বুঝলে!

হাসিয়া কহিলাম—বুদ্ধি হবে না, কার ছেলে জানত? সুষমা ঘাড় নাড়িয়া প্রতিবাদের স্বরে কহিল—ছেলে ত আমার?

—আর আমার নয়?

সুষমা লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিয়া কহিল, যাও!

আলোচনার স্রোতটা অন্যদিকে ফিরাইয়া লইয়া কহিলাম—রেখা বুঝি শরৎ বাবুর মেয়ে?

—হুঁ। বেশ নামটি, না?

রেখা সরল হ'লেই বেশ, বক্র হ'লে কিন্তু বিপদ আছে। সুষমা প্রতিবাদ করিয়া বলিয়া উঠিল—না গো না, তুমি যা ভাবছ তা নয়, বড় লোকের মেয়ে ব'লে মোটে বোঝাই যায় না, ভারী সাদাসিদে, নইলে কি আর আমার কাছে সেলাই-এর কাজ শিখতে চায়, খোকনকে অমন ক'রে আদর করে!

মুহূর্ত্তকাল মৌন থাকিয়া পুনরায় কহিল, এখনও বিয়ে হয় নি, এই ত সে দিন সবে বড় বোনের বিয়ে হল, বয়েসই বা এমন কি, বাড়ীতে মাষ্টারে পড়ায়, ভাইটি আর বছর মারা গেছে। আহা, অত টাকা পয়সা, ছেলে নেই কেই বা ভোগ করবে!

সেই ভাবনায় তোমার আর ঘুম হচ্চে না দেখছি। সুষমা একটু লজ্জিত হইয়া কহিল যাও তোমার যেমন কথা, আচ্ছা তুমি যে বড় বল, আয়ু থাকতেও মানুষ মরে, এই ছেলেটির কি আয়ু ছিল? কখখনও না; এত ডাক্তার বদ্যি, লোকজন, টাকা কড়ি, তবে মরল কেন? দেখলে আমার কথা খাটল ত, ভাব বুঝি মেয়েমানুষ পেয়ে যা তা বুঝিয়ে দিলেই হ'ল, কেমন? বলিয়া মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল। বুঝিলাম, তরুণী ভার্য্যার আয়ত আঁখির দীপ্ত কটাক্ষের সুমুখে মানুষের যুক্তিতর্ক সমস্তই ম্লান হইয়া যায়। সংক্ষেপে উত্তর করিলাম—সে ত তোমাকে সাবধান হবার জন্তে বলেছিলাম।

সুষমা গ্রীবা হেলাইয়া তেমনি মধুর হাসিয়া কহিল, সে বুঝি গো মশাই, বুঝি!

পরক্ষণেই পূর্ব্ব আলোচনার সূত্র ধরিয়া স্বরটা একটু খাট করিয়া কহিল, গিন্নির এখনও কিন্তু হবার বয়েস যায় নি, কর্ত্তার দুই বিয়ে কি না, যত কিছু বল দৌলত, সুখ-শান্তি, সবই কিন্তু এঁর কপালে হ'য়েছে।

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া সহসা কেমন যেন একটু গম্ভীর হইয়া সুষমা পুনরায় বলিয়া উঠিল, আচ্ছা সত্যিকথা বলত, আমি ম'লে তুমি ত আবার বিয়ে করবে?

প্রশ্নটা শুনিয়া বিপদে পড়িলাম। সহজ হাস্য পরিহাসের মধ্য দিয়া টানিতে টানিতে সুষমা আমাকে মাঝে মাঝে এমন সঙ্কটাপন্ন স্থানে আনিয়া ছাড়িয়া দেয় যে, সেখান হইতে মুক্তি পাওয়া আমার পক্ষে একান্ত অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। আজও তাহাই হইল। অপ্রীতিকর আলোচনাটা চাপা দেবার শেষ চেষ্টা করিয়া ভর্ৎসনার মুখে বলিলাম, ছিঃ ও কথা বলতে নেই।

সুষমা কথাটা কানে তুলিল না, সহসা হাসিয়া বলিয়া উঠিল, খোকনকে ছেড়ে যে মরতে ইচ্ছে হয় না—নইলে ঠিক একবার ম'রে গিয়ে মজা দেখতুম তুমি কি কর।

যুবতী নারীর হৃদয়টা ঠিক শরতের আকাশের মতই দুর্ব্বোধ্য। ভাবিলাম মেঘ বুঝি কাটিয়া গেল। কাটিলও বটে, কিন্তু তাহা ক্ষণিকের জন্য, পরক্ষণেই সুষমার মুখের হাসি মিলাইয়া গেল, ব্যথিত স্বরে কহিল, ধর যদি সত্যিই মরি, খোকনকে ত অযত্ন করবে না?

মনটা সহসা যেন ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল, জোর করিয়া মুখে হাসি টানিয়া আনিয়া কহিলাম, না।

মুহূর্ত্তকাল পরে পুনরায় কহিলাম, সত্যিই ত তুমি আর মরছ না। সুষমার বক্ষভেদ করিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসিল, মনে হইল তাহার বুকের উপর হইতে এইমাত্র যেন দুশ্চিন্তার একটা পাষাণ বোঝা নামিয়া গেল। ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া একটু হাসিয়া কহিল, ম'রেও কিন্তু মানুষ তার আপনার জনের কাছে কাছে ঘুরে বেড়ায়, সব দেখতে পায়। হাসছ যে বড়, ভূত প্রেত, দত্যি দানবের কথায় অবিশ্বাস ক'রতে নেই, কি আছে কার মনে কে

আনে। এই পর্য্যন্ত বলিয়া সুষমা দুই কর জোড় করিয়া কপালে ঠেকাইয়া পুনরায় বলিতে লাগিল, মাসীমা মশার পর মেশো মশায় যখন ফিরে বিয়ে করতে যান তখন এমন একটা কাণ্ড —।

কথাটা শেষ হইতে পারিল না। সনাতন নিদ্রিত খোকনকে কোলে করিয়া ঘরে ঢুকিল। আমি যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

৩

সুযোগ সুবিধার ব্যর্থ আশায়, দেখিতে দেখিতে ছয়টা মাস কাটিয়া গেল। একদিকে আমার শিক্ষকজীবনের ক্ষুদ্র সঞ্চয়টা যেমন ক্ষুদ্রতর হইতে ক্ষুদ্রতম আকার ধারণ করিতে লাগিল, অন্যদিকে নিজের সুদৃঢ় আত্মবিশ্বাসটাও তেমনি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর এবং ক্রমান্বয়ে সূক্ষ্মতম হইয়া মনের মধ্যে অত্যন্ত অস্পষ্ট হইয়া দেখা দিতে লাগিল।

মাছ ধরিতে বসিয়া মানুষ যেমন লুব্ধ প্রতীক্ষায় একাগ্র দৃষ্টিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপূর্ব্ব ধৈর্য্যসহকারে ছিপের দিকে তাকাইয়া বসিয়া থাকে, আমিও তেমনি প্রতিদিন সকাল বেলায় বৈঠকখানায় বসিয়া সম্মুখে একখানা আইনের পুস্তক তুলিয়া রাখিয়া লুব্ধ আশ্বাসে সুমুখের রাস্তার প্রত্যেকটি পথিকের গতিবিধি লক্ষ্য করিতাম। দূরে নথিপত্র হাতে কোন ব্যক্তিকে আসিতে দেখিলে, আশার তীব্র আলোক, ক্ষণিক বিদ্যুতস্ফুরণের ন্যায় মুহূর্ত্তের জন্য আমার অসাড় মনের নিবিড় অন্ধকারকে চিরিয়া চিরিয়া দিয়া পরক্ষণেই কোথায় যেন অদৃশ্য হইয়া যাইত। বাসার সম্মুখে আসিয়া লোকটি বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে আমার নূতন চকচকে সাইনবোর্ড খানার দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া অনুচ্চস্বরে লেখাগুলি আবৃত্তি করিত। পুস্তকের পাতায় চোখ রাখিয়া গভীর মনোযোগের ভাণ করিয়া রুদ্ধ নিশ্বাসে বক্রদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিতাম, চাহিয়া, বুকের ভিতর কেমন যেন একটা মৃদু স্পন্দন অনুভব করিতাম। পাঠ শেষ করিয়া লোকটি আমার মুখের দিকে কৌতূহল দৃষ্টিতে একবার চাহিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া যাইত। গভীর নিরাশায় আমার বক্ষভেদ করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইয়া আসিত। এক নিমেষে নিজেকে সম্বরণ করিয়া লইয়া পুনরায় অদূরে রাস্তার উপর লুব্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতাম।

সেদিনও এমনি করিয়া মক্কেলের আশাপথ চাহিয়া বৈঠকখানায় অপেক্ষা করিতেছিলাম। সহসা অদূরে সিঙ্গার কোম্পানীর কর্ম্মচারীকে দেখিয়া ভয়ে ভাবনায় আমার বুকের রক্ত যেন শুকাইয়া গেল। সুষমার কলটির জন্য তিনমাসের টাকা বাকী পড়িয়াছে। সসম্ভ্রমে লোকটিকে সুমুখে বসাইয়া কহিলাম—পরের মাসে সবশুদ্ধ একেবারে শোধ —।

কথার মাঝখানেই লোকটা তিক্তস্বরে বলিয়া উঠিল—এই জন্যেই জুনিয়র উকিলের কাছে আমরা বেচ্‌তে চাই না।

লজ্জায়, ধিক্কারে, অপমানে আমার সর্ব্বশরীর জ্বলিতে লাগিল। কোনমতে নিজেকে সংযত রাখিয়া একটী টাকা তাহার হাতে গুঁজিয়া দিতে গেলাম। উদ্ধতভাবে টাকাটী সশব্দে মেঝের উপর ফেলিয়া দিয়া বিকৃত মুখভঙ্গী করিয়া লোকটী কহিল—দরকার নেই, কলটা ফিরিয়ে দিন।

কি একটা কড়া উত্তর দিতে গিয়া আমার ঠোঁট দুটী রুদ্ধ আক্রোশে কাঁপিয়া উঠিল, মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না, সহসা ভিতরের দিকের দরজার শিকলটা ঝন্ ঝন্ শব্দ করিয়া উঠিল। টলিতে টলিতে বাড়ীর ভিতর গিয়া দেখিলাম, সুষমা কলটি দরজার সুমুখে আনিয়া রাখিয়াছে। আমাকে দেখিতে পাইয়া বলিয়া উঠিল—ফিরিয়ে দিয়ে এক্ষুনি ওকে বিদেয় ক'রে দাও, লোকে শুনলে কি বল্‌বে। আমার আত্মাভিমানে যেন আরও বেশী করিয়া আঘাত লাগিল। হাতে বিবাহের মূল্যবান আংটীটির কথা সহসা মনে পড়িয়া গেল। সেটিকে খুলিতে-খুলিতে কহিলাম—কল তুলে রাখ, টাকা আমি শোধ ক'রে দিচ্ছি।

সুষমা তাড়াতাড়ি আমার হাত চাপিয়া ধরিয়া ব্যথিত স্বরে বলিয়া উঠিল—ছিঃ, আমি বেঁচে থাক্‌তে কখ্‌খনও পারবে না।

শেষ পর্য্যন্ত সুষমা জয়ী হইল। কোম্পানীর লোক কলটী তুলিয়া লইয়া শরৎবাবুর বৈঠকখানায় প্রবেশ করিল। নিঃশব্দে জানালায় দাঁড়াইয়া লক্ষ্য করিলাম,

লোকটীকে দেখিয়া শরৎবাবু মুখ টিপিয়া একটু হাসিলেন। পরক্ষণেই সে শূন্য হস্তে বাহির হইয়া আসিয়া দ্রুত প্রস্থান করিল। দুঃখে, ক্ষোভে, লজ্জায় আমার দুই চোখ ফাটিয়া জল আসিবার উপক্রম হইল।

পুনরায় সশব্দে শিকলটি নড়িয়া উঠিল। ভিতরে গিয়া দেখিলাম, সুষমা তেলের বাটি হাতে করিয়া অপেক্ষা করিতেছে, এ কার্য্যের ভার সনাতনের উপর ন্যস্ত ছিল, আজ সে নিজেই আনিয়াছে। চোখ তুলিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিতে পারিলাম না, কেমনই যেন বাধ বাধ ঠেকিতে লাগিল, সুষমার বড় সাধের কল! আমার পায়ের গোড়ায় তেলের বাটি রাখিয়া সুষমা কহিল, কাছারীর বেলা হ'ল স্নান ক'র্‌তে যাবে না?

এতক্ষণে যেন কথা খুঁজিয়া পাইলাম, কহিলাম, শরীরটা ভাল নেই, আজ আর -।

সুষমা বাধা দিয়া মাথা নাড়িয়া দৃঢ়স্বরে বলিয়া উঠিল—সে হবে না,—ও বাড়ীর গিন্নি বলেন, কাজ থাক আর না থাক নতুন উকীলের কাছারী কামাই করতে নেই।

মুহূর্ত্তকাল মৌন থাকিয়া ফস করিয়া আমার একখানি হাত চাপিয়া ধরিয়া রুদ্ধস্বরে বলিয়া উঠিল—লক্ষ্মীটি, কথা শোন, অমন ক'রে ভেব না, টাকা যখন হবে, তখন আবার কিনে দিও। বলিয়া, আঁচলে চোখ মুছিয়া উদ্গত অশ্রু দমন করিল।

মনটা ভাল ছিল না, একটু রাত্রি করিয়াই বাসায় ফিরিলাম। সুষমা খোকনকে ঘুম পাড়াইতেছিল, চোখে মুখে তাহার কেমন যেন একটা অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য লক্ষ্য করিলাম। মনে মনে শঙ্কিত হইয়া জোর করিয়া মুখে হাসি টানিয়া আনিয়া কহিলাম, ভয় করছিল নাকি?

কথাটা নিজের কানেই অবান্তর বলিয়া ঠেকিল। সুষমা নিঃশব্দে চোখ তুলিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া গম্ভীর স্বরে কহিল—এমন ক'রে আমাকে অপমান করার কি দরকার ছিল বলত? মুহূর্ত্তকাল পরে, পুনরায় কহিল—অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের নজরও কি খাট হয় প্রবৃত্তিও কি ছোট হ'য়ে যায়?…ও বাড়ীতে কলটা ফিরিয়ে আনার কথা বলতে মুখে কি তোমার একটু বাধলও না? কেন, গরীব হ'য়েছি ব'লে কি মানসম্ভ্রমও জলাঞ্জলি দিতে হবে?

চুরি করিয়া ধরা পড়িলে, মানুষের মনের অবস্থা যেরূপ হয় আমারও ঠিক সেইরূপ হইল।

টাকাটা ধীরে ধীরে পরিশোধ করিয়া দিবার অঙ্গীকারে কলটা ফিরাইয়া দিতে শরৎ বাবুকে রাজী করিয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম সুষমার নিকট আসল কথাটা গোপন রাখিয়া নিজের অক্ষমতার গ্লানি কিঞ্চিৎ লাঘব করিব। তখন কল্পনাও করিতে পারি নাই এমনি অপ্রত্যাশিত ভাবে কথাটা এত শীঘ্র প্রকাশ হইয়া পড়িবে। তুচ্ছ একটা ঘটনা অবলম্বন করিয়া সমস্তদিন ভিতরে বাহিরে ক্রমাগত লাঞ্ছনা এবং অপমান ভোগ করিয়া মনটা আমার সহসা বিরূপ হইয়া উঠিল, তিক্তস্বরে কহিলাম—টাকা দিয়ে আমার নিজের জিনিষটাই ফিরিয়ে আন্‌তে চেয়েছি—কি এমন দোষ করেছি শুনি? সুষমার দুই চোখ দিয়া সহসা যেন আগুন ঠিক্‌রাইয়া পড়িল—ছেলেমানুষ কিছু বোঝ না, না? সকালে উঠে আমাকেই প্রথমে ওদের কাছে মুখ দেখাতে হয়, লজ্জায় ঘেন্নায় আমারই মাথা কাটা যায়, সে হুঁস থাক্‌লে ওদের কাছে আর ভিক্ষে কর্‌তে যেতে না বুঝ্‌লে?

সুষমার এরূপ দীপ্ত কণ্ঠ এবং জ্বলন্ত দৃষ্টি আমি বিলক্ষণ চিনিতাম, ভয়াবহ ফলটাও জানিতাম। মুহূর্ত্তের মধ্যে আমার কণ্ঠ শুকাইয়া একেবারে কাঠ হইয়া গেল, মুখ দিয়া আর কোন কথা বাহির হইল না।

গভীর রাত্রে বুকের কাছে কিসের একটা স্পর্শ অনুভব করিয়া সহসা ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, বুঝিলাম সুষমা। আরও কাছে সরিয়া আসিয়া কহিল—একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছি।

খোকনের জন্মের পর সুষমা আমাকে এমন করিয়া নিবিড় ভাবে কোন দিন আকর্ষণ করে নাই।

আমাকে নিরুত্তর দেখিয়া পুনরায় ভারী গলায় কহিল—রাগ হ'লে সত্যি সত্যি আমার আর জ্ঞান থাকে না।

—সে জানি।

—জান্‌লে বুঝি ঘুমুতে পার্‌তে।

তাহার চোখের জলে আমার বাহুটা ভিজিয়া গেল। কোঁচার খুঁটে চোখ মুছাইয়া দিয়া কহিলাম—ছিঃ, কাঁদতে

নেই। সুষমা বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল—কেন নেই? আমার ওপর রাগ করলে কেন?

কোন সদুত্তর, আমার মুখে যোগাইল না। অভিমান-ক্ষুব্ধ স্ত্রীর নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে হইল।

সহসা নিশীথ রাতের নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ করিয়া শরৎবাবুর কণ্ঠস্বর কানে আসিয়া ঠেকিল; নৈশ বিহার শেষ করিয়া বাড়ী ফিরিয়া চাকরকে ডাকিতেছিলেন। সুষমা আমার বুকের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া ধীরে ধীরে কহিল—ও বাড়ীর গিন্নি বল্‌ছিলেন কাঁচা পয়সা হাতে পড়্‌লে মানুষের মতি গতি ঠিক থাকে না—খুব সত্যিকথা, তাই না?

অন্যমনস্ক ভাবে বলিয়া ফেলিলাম—হুঁ।

সুষমা মুখ না তুলিয়াই চাপা গলায় কহিল—কি হবে আমাদের বেশী পয়সা দিয়ে, চল আমরা আবার গ্রামে ফিরে যাই।

তাহার চুলের মধ্যে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে করিতে কহিলাম—ছিঃ, ছেলে মানুষী করে না।

মুহূর্ত্তের মধ্যে সুষমা তাহার দুই বাহু দিয়া নিবিড়ভাবে আমার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া মুখের উপর মুখ রাখিয়া কহিল—ও সব কথা কানে শুন্‌লে, সত্যি বল্‌ছি, তারপর কিন্তু আমি আর একটি দিনও বাঁচ্‌ব না।

কথার শেষের দিকটায় গলার স্বর তাহার জড়াইয়া আসিল। বুঝিলাম অন্তরের সমস্ত স্নেহ, সমস্ত শক্তি দিয়া বক্ষের শিশুটীর মত সুষমা তাহার এই কল্পিত অসহায় স্বামীটিকে জ্ঞাত অজ্ঞাত সমস্ত অমঙ্গলের বিরুদ্ধে অহর্নিশি আগ্‌লাইয়া রাখিতে চাহে। দুই হাতে বক্ষের উপর তাহার মস্তকটি চাপিয়া ধরিয়া কহিলাম—তার আগে আমারও যেন মৃত্যু হয় সু।

৪

সেদিন একটা আপীলের মোকদ্দমার তদ্বির করিয়া কিছু টাকা পাইয়াছিলাম। মনটা স্বভাবতঃ বেশ প্রফুল্লই ছিল। কাছারী হইতে বাসায় ফিরিতেই সুষমা তাহার সমস্ত মুখখানা হাসিতে ভরিয়া কহিল—আজ প্রাপ্তিযোগ ঘটেছে। ঠিক কিনা বল।

হাসিয়া কহিলাম—কি করে জান্‌লে?

সুষমা গম্ভীর হইয়া বিজ্ঞের মত মাথা নাড়িয়া কহিল—মুখ দেখ্‌লেই তোমার মনের কথা সব বুঝ্‌তে পারি, তুমি ভাব বুঝি কিছু টের পাইনে, তাই যদি না পার্‌ব, তবে—।

—পরিহাসের সুরে কহিলাম—পার বৈ কি, তুমি যে আমার অন্তরের অন্তর্যামী।

সুষমা লজ্জারক্তমুখে কহিল—যাও!

পরক্ষণেই আমার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল—ক'টাকা বল্‌ব? বলিয়া, ঠোঁট দুটা নাড়িয়া, কর গণিয়া, হিসাব করিবার ভঙ্গীতে কহিল—ঠিক্ চার টাকা।

বলিয়াই ফস্ করিয়া পকেটে হাত পুরিয়া টাকাগুলি বাহির করিয়া গণিয়া দেখিল, তাহার হিসাবের একেবারে দ্বিগুণ। হর্ষে পুলকে নিমেষের মধ্যে তাহার সমস্ত মুখখানি মধুর হাসিতে ভরিয়া উঠিল। পুলকিত স্বরে কহিল—ঠিক্ হ'য়েছে, খোকনকে একটা জরির টুপি কিনে দিতে হবে। ও বাড়ীর গোপাল মোক্তারের ছেলের মাথায় টুপি দেখে সেদিন ভারী কান্নাকাটি কর্‌ছিল্। একমুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া সহসা বলিয়া উঠিল—ওঃ তোমাকে খাবার দেবার কথা যে একেবারে ভুলেই গেলাম—মা গো, দিন দিন কী একচোখো হ'য়ে যাচ্ছি আমি। বলিয়া মুখ টিপিয়া একটু হাসিয়া উঠিয়া গেল।

ক্ষণকাল পরে ফিরিয়া আসিয়া খাবারের রেকাবীটা আমার হাতে দিয়া কহিল—খোকন তোমার ভারী দুষ্টু হয়েছে।

শান্ত এবং ধীর বলিয়া খোকন পাড়ায় বেশ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিল; সহসা তাহার বিরুদ্ধে এরূপ অভিযোগ শুনিয়া বিস্মিত স্বরে প্রশ্ন করিলাম—কেন, গোপাল মোক্তারের ছেলের সঙ্গে মারামারি করেছিল বুঝি?

—দূর তা হবে কেন—বল্‌ছিলাম যে, ভারী নেমকহারাম হ'য়েছে, এত করে করি, তবু ওর মন পাইনে—সোনাকে দেখ্‌লে আমার কোল থেকে ঝাঁপিয়ে গিয়ে তার কোলে পড়্‌বে, নিতে গেলে সোনার গলাটা জড়িয়ে ধরে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। আমি যেন ওকে দাগা দিয়ে থাকি, জোর ক'রে দুধ খাওয়াই কিনা, তাই অত রাগ।

সুষমায় মনটা খুসি থাকিলে খোকনের আলোচনায় একেবারে পঞ্চমুখ হইয়া উঠিত, তাহাতে যোগ দিতে না পারিলে এক নিমেষে তাহার হাস্যোজ্জ্বল মুখখানি, বর্ষণোন্মুখ মেঘের মত ভারী হইয়া উঠিত। হাসিয়া কহিলাম—একটু বুদ্ধি হ'লে, বুঝতে শিখ্‌লে, আর অমন করবে না।—সুষমা ঘাড় নাড়িয়া প্রতিবাদ করিয়া বলিয়া উঠিল—না ক'রবে না বৈ কি—পেটে ধরা থেকে আরম্ভ ক'রে মায়ের দুঃখু কষ্ট কোন দিনই ঘোচে না। দক্ষিণ পাড়ার হরিদাস মল্লিকের মাকে বৌ'তে ধ'রে মারে পর্য্যন্ত, ছেলের মুখ চেয়েই না সহ্য করে, অন্য কেউ হ'লে পারত ?

বুঝিলাম, সুষমা তাহার ক্ষুদ্র সংসারটীকে ত্যাগ করিয়া অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। বর্ষীয়সী স্নেহময়ী জননী হৃদয়ের ক্ষমা এবং সহিষ্ণুতা বুকে করিয়া পুত্র পৌত্র পরিবেষ্টিত একটি সুবৃহৎ সংসারের মাঝখানটিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

পূর্ব্ব আলোচনার সূত্র ধরিয়া সুষমা সহসা বলিয়া উঠিল—যাই বল না কেন, পরের অত গা-কোলা হওয়া, ভাল না। ধর, আজ বাদে কাল সোনা যদি চলেই যায়, দুর্ভোগে পড়ে একটা শক্ত অসুখ বিসুখও ত হ'তে পারে।

উত্তর দিবার পূর্ব্বেই রাস্তা হইতে শরৎবাবুর আহ্বান শুনিতে পাইলাম। তাড়াতাড়ি আলনা হইতে ছড়ি গাছটা হাতে লইয়া উঠিবার উদ্যোগ করিতেই, সুষমা সহসা পথ রোধ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া আমার ডান হাত খানি তাহার ললাটে চাপিয়া ধরিয়া কহিল—এই দেখ সত্যি আজ আমার অসুখ ক'রেছে, সকাল সকাল ফিরবে বল।

বুঝিলাম, অসুখ তাহার দেহে নয়, মনে।

পথে চলিতে চলিতে শরৎ বাবু তাঁহারই সমকক্ষ একজন উকীলের আলোচনা করিতেছিলেন। ঘুরিতে ঘুরিতে আমরা জেলখানার সুমুখে নদীর ধারে আসিয়া বসিলাম। শরৎ বাবু কথার জের টানিয়া কহিলেন—আর, বিজয়ের ঐ যে প্রকাণ্ড বাড়ী খানা দেখে থাকেন, ভাব্‌বেন না যে, ওটা ওর ওকালতীর পয়সায় করা। বিধবা বোনকে ফাঁকি দিয়ে ক'রেছে, সবাই জানে, শুনেছেনও বোধ হয় ?—সংক্ষেপে কহিলাম, হুঁ।

শরৎ বাবু উৎসাহিত হইয়া বলিতে লাগিলেন—এতটুকু ধর্ম্মজ্ঞান যদি ওর থাকে—দু পক্ষের টাকা খাওয়া ত আছেই, স্বভাব চরিত্রের কথা শুনলেও কানে অঙ্গুল দিতে হয়—বৌ মরে যাবার পর মামাত ভাই-বৌকে নিয়ে কত কেলেঙ্কারী, সহরময় ঢি ঢি পড়ে গেল, রাজেন ডাক্তার এখনও মরেনি—।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছিল, সঙ্গে সঙ্গে সুষমার করুণ চোখ দুটী থাকিয়া থাকিয়া যেন মনের মধ্যে খোঁচা দিতে লাগিল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলাম—শরীরটা ভাল নেই, এখন তবে যাই।

বলিয়া দ্রুতপদে রাস্তায় আসিয়া পড়িলাম। অগ্রসর হইয়া পুনরায় শরৎবাবুর কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়া পিছন ফিরিয়া থম্‌কিয়া দাঁড়াইলাম। হাঁপাইতে হাঁপাইতে শরৎ বাবু কাছে আসিয়া কহিলেন দেখুন,—কথা গুলো কেন যে বল্লুম, বাড়ী গিয়ে একটু ভেবে দেখ্‌বেন।

পরক্ষণেই মুচ্‌কী হাসিয়া ঈষৎ মস্তক সঞ্চালন করিয়া কহিলেন—এ ব্যবসায়ের মূল সূত্র হচ্ছে লোক চরিত্র চেনা, নইলে পদে পদে ঠক্‌তে হবে।

৫

কয়েক দিন পরের কথা। আহারে বসিয়া আহার্য্য বস্তু গুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেই চোখ দুটী আমার ছল ছল করিয়া উঠিল। ডালের স্বরূপ দেখিয়া মনে হইল, ইহা রাম ঠাকুরের হোটেলকেও হার মানাইয়াছে; দেহকে ছলনা করিয়া মনকে সান্ত্বনা দেওয়ার মধ্যেই যেন ইহার চরম সার্থকতা। ডিম সুষমা নিজে খায় না, আমার প্রিয় খাদ্য বলিয়া এইরূপ অভাবের সংসারেও সকলের এই দুর্ম্মূল্য এবং দুষ্প্রাপ্য বস্তুটিকে নিত্য নিয়মিত সংগ্রহ করিয়া রাখিত, আজও রাখিয়াছিল। নীরবে আহার শেষ করিয়া উঠিবার সময় একটু সঙ্কোচের সহিত ডালের বাটিটার দিকে লক্ষ্য করিয়া কহিলাম—তোমার বুঝি এর বেশী আর কিছু জোটে না ?

সুষমা একটু যেন অপ্রতিভ হইয়া কহিল—তাই বুঝি, আজ ডাল বাড়ন্ত ছিল, তাই একটু পাতলা হ'য়েছে।

আমার মুখ দিয়া আর কোন কথা বাহির হইল না। চোখ তুলিয়া সুষমার মুখের দিকে চাইতে, সহসা যেন চমকাইয়া উঠিলাম—দেহের সে লাবণ্য তাহার আর নাই, মুখের সে শ্রীও যেন কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে, চোখ দুটী বসিয়া গিয়াছে, শরীর যেন একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছে। এত কাছে থাকিয়াও এত দিন যেন কিছুই লক্ষ্য করি নাই। ব্যথায়, বেদনায় আমার সমস্ত অন্তরটা টন্ টন করিয়া উঠিল।

কাছারী যাইবার সময় পোষ্টাফিসের পাস-বই খানা চুপি চুপি সঙ্গে লইয়া গেলাম। ফিরিবার পথে বড় দেখিয়া একটী ইলিসমাছ কিনিয়া আনিলাম। সুষমা ইলিসমাছ ভালবাসিত। মাছ দেখিয়া সুষমা একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিয়া ভৎর্সনার সুরে কহিল—এত দাম দিয়ে মাছ নেবার কি দরকার ছিল, বলত? সঙ্কুচিত হইয়া কহিলাম—মাত্র বার আনা নিয়েছে, এমন কি বেশী হ'ল।

সুষমা দৃঢ়স্বরে প্রতিবাদ করিয়া উঠিল—কখ্খনও না, কাল ও বাড়ীতে এর চেয়েও ছোট একটা পাচসিকে দিয়ে এনেছে, কত নিয়েছে যে সোনা?

সনাতন অসহায় দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিল। উত্তরটা আমিই দিলাম—যাই নিক্ না, তুমি ভালবাস তাই আন্লুম।

সুষমা যেন একটু লজ্জিত হইল, মৃদু হাসিয়া কহিল—এখন আর ভাল লাগে না, ঘেন্না ধরে গেছে।

বুঝিলাম ইহা তাহার ছলনা। মনে মনে একটু আহত হইয়া কহিলাম—ক'দিন আর খেলে বল, যে, এর মধ্যে—। সুষমা বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল— চিরকাল মানুষের বুঝি একটা জিনিষের ওপরই লোভ থাকে? বলিয়া মুখ টিপিয়া একটু হাসিয়া উঠিয়া গেল। ক্ষণকাল পরে ফিরিয়া আসিয়া খাবারের পাত্রটা আমার সুমুখে রাখিয়া কহিল—চিরটা কাল তোমায় একভাবেই কাটল, অভাবের সংসারে এত অবুঝ হ'লে কখনও চলে, বিদেশ বিভুঁই, আপদ আছে, বিপদ আছে, ঘর ব'লে কিছু না রাখ্লে, অসময়ে কে আমাদের সাহায্য ক'রবে, বলত?"

ইহা দূরদর্শী অভিজ্ঞ গৃহিণীর কথা, সুষমার মুখে অশোভন হইলেও প্রতিবাদ করিবার মত কিছুই খুঁজিয়া পাইলাম না, চেষ্টাও করিলাম না।

আমাকে নিরুত্তর দেখিয়া সুষমা পুনরায় আরম্ভ করিল—যা হ'লে, মানুষের নিজের খাওয়া-পরার সাধ আহ্লাদ বুঝি থাকে—টাকা দুটো থাক্লে খোকনের জন্যে একটু বেশী করে দুধ যোগান করা যেত, গরীবের ঘরে জন্মে ওর রুচি হ'য়েছে যেন ঠিক বড় মানুষের ছেলের মত—এক ঝিনুক বার্লি দুধের সঙ্গে মিশিয়েছি, না অমনি থু ক'রে ফেলে দিয়েছে, মাথায় যেন ভূত আছে, সব জান্তে পারে। কথার শেষের দিকটায় তাহার গলার স্বর ভারী হইয়া উঠিল।

সন্ধ্যার পর বাসায় ফিরিয়া দেখিলাম আমার বড় ভায়রা পুলিনবাবু সপরিবারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। মনটা কেমন যেন দমিয়া গেল। পুলিনবাবু বিলাত ফেরত ডাক্তার, কলিকাতার যাইবার পথে আমার বাসায় রাত্রি যাপনের সংকল্প করিয়াছেন।

অনেক দিন পরে সুষমার ভগ্নী অণিমাকে দেখিয়া বিস্ময়ে একেবারে যেন হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম। বয়সে সুষমার অনেক বড়—অটুট স্বাস্থ্য, নিটোল দেহ, অপূর্ব্ব লাবণ্যময়ী, অনন্ত-যৌবনা সুন্দরী। মনের কোণে কেমন যেন একটু বেদনা অনুভব করিলাম। নিজেকে আজ একান্ত অপরাধী বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

দুঃখ দৈন্যের ক্ষুদ্র সংসারটীর মাঝখানে ধনী কৃতী অভ্যাগত আত্মীয়দের সম্বর্দ্ধনা করিতে গিয়া অক্ষমতার গ্লানি আমার আত্মাভিমানকে পদে পদে যেন ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিল। সুষমার সুমুখে আত্মপ্রকাশ করিতে, কেমনই যেন বাধ বাধ ঠেকিতে লাগিল, একান্ত বিমুক্তের মত বৈঠকখানার এক কোণে আসিয়া চুপটি করিয়া বসিলাম।

খোকন তাহার নূতন ভেলভেটের পোষাক পরিয়া, মাথায় জরীর টুপি দিয়া, সগর্ব্বে জুতার খট্খট্ শব্দ করিতে করিতে আমার কোলের কাছে আসিয়া মধুর হাসিয়া কহিল—বাবা আমার টুপি, আমি সোনার কাছে যাব না—মাসীর কাছে যাব।—

আমি অপলক দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিলাম;

চাহিয়া যেন একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলাম। মূল্যবান পরিচ্ছদের বিচিত্র বর্ণচ্ছটা, তাহার শুভ্র নবনীত কুসুমকোমল দেহটীকে ঘেরিয়া এক অপরূপ সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। ব্যগ্র বাহুপাশে খোকনকে বাঁধিয়া ফেলিয়া তাহার কচি বুকখানি নিজের বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিলাম, মুহূর্ত্তের মধ্যে মনের সমস্ত গ্লানি কোথায় যেন অন্তর্হিত হইয়া গেল।

খোকনকে কোলে করিয়া বাড়ীর ভিতর পা দিতেই সুষমা থামের আড়াল হইতে অনুচ্চস্বরে বলিয়া উঠিল—ঠিক যেন রাজপুত্তুর।—

বলিয়া, আমার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিতে লাগিল। খোকন কহিল—মাতীর কাছে যাব বাবা। সুষমা কপট-রোষকটাক্ষে খোকনের অকৃতজ্ঞতার শাস্তিস্বরূপ হাত উঠাইয়া তাহাকে প্রহারের ইঙ্গিত করিল।

খোকন নালিশ জানাইল—বাবা ঐ ছাখো।

হাসিয়া কহিলাম—ও ভারী দুষ্টু।

খোকন সুষমার দিকে চোখ পাকাইয়া ধমক দিবার ভঙ্গীতে বলিয়া উঠিল—ওরে দুত্তু খেলে।

সুষমা হাসিতে হাসিতে কাছে আসিয়া সস্নেহে খোকনের কচি কচি গাল দুটী টিপিয়া দিয়া কহিল—তুই দুষ্টু ছেলে। মাতাপুত্রের এই অভিনব ক্রীড়া কৌতুকে আমার চোখ দুটী যেন জুড়াইয়া গেল।

রাত্রে আহারাদির পর অণিমা আমাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন—দেখ, সু'র স্বাস্থ্যটা একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে, দিনকতক আমাদের সঙ্গে চেঞ্জে ঘুরে এলে ভাল হ'ত, তোমার মত হ'লেই হয়; সু'র বোধ হয় অমত হবে না। কথার শেষের দিকটা তীক্ষ্ণধার ছুরির মত আমার অন্তরে গিয়া আঘাত করিল; বুকের ভিতর সহসা যেন হু হু করিয়া উঠিল।

উত্তরটা পুলিনবাবু দিলেন—অসুখ এমন বিশেষ কিছু নয়, give her rest and treat her well। উপযুক্ত বিশ্রাম আর মনের স্ফূর্ত্তি, বাস্। এতে কখনও অমত ক'রতে পারে? Responsible getleman ত, ভদ্রলোকের একটা দায়িত্ব জ্ঞান আছে ত।

আমি নত মস্তকে নিঃশব্দে বসিয়া রহিলাম।

শয়ন করিতে আসিয়া সুষমা কহিল—আমি কিন্তু কখ্খনও যাব না।

বিস্মিত দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিলাম—কেন, তুমি ত মত ক'রেছ, দিনকতক ঘুরে এস না, শরীরটা বেশ সেরে যাবে। এদিকে সোনাই চালিয়ে নিতে পারবে, আমার কোন অসুবিধে হবে না।

সুষমা ক্ষণকাল গুম্ হইয়া বসিয়া থাকিয়া অভিমান ক্ষুব্ধস্বরে কহিল—বেশ সুবিধেই হবে বোধ হয়, তাই না?

মনে মনে আহত হইয়া কহিলাম—সে কথা ত বলি নি।

আর কি ক'রে বলে শুনি?—

আমি আর কোন কথা কহিলাম না। ক্ষণকাল পরে, সুষমা আমার আরও কাছে সরিয়া আসিয়া বুকের উপর মাথা রাখিয়া মুখের কাছে মুখ আনিয়া চুপি চুপি কহিল—তোমার সুখ সুবিধে আর কেউ বুঝতে পারে না, তুমিও না। বুঝ্লে?—

তাহার ভগ্নস্বাস্থ্যের উল্লেখ করিয়া ক্ষীণ প্রতিবাদ করিয়া কহিলাম—তোমার শরীরটা—।

সুষমা তাড়াতাড়ি হাত দিয়া মুখ চাপিয়া ধরিয়া কহিল—সেখানে কখ্খনও শরীর সারবে না, কখ্খনও আমি যাব না।—রুদ্ধ গ্লানি কাটিয়া গিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে মনটা আমার মেঘমুক্ত আকাশের ন্যায়, নির্ম্মল উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

৬

আরও কয়েক মাস কাটিয়া গেল। একদিন প্রাতর্ভ্রমণ শেষ করিয়া, বাসায় ফিরিয়া দেখিলাম—খোকন চিৎকার করিয়া চারি হাত পা মাটিতে আছড়াইয়া সমস্ত পাড়াটা একেবারে মাথায় করিয়া তুলিয়াছে। সুষমা মুখখানি ভারী করিয়া তাহারই পাশে বসিয়া আছে, আমাকে দেখিতে পাইয়া চোখ দুটী বিস্ফারিত করিয়া কহিল—সোনা পালিয়ে গেছে।

আমার মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, অন্যমনস্ক ভাবে বলিয়া ফেলিলাম—কেন?—

সুষমা জ্বলিয়া উঠিয়া তিক্তস্বরে কহিল—কেন, জান না? তিন মাসের মাহিনা বাকী ফেলে শহর বাজারে কে কবে ঝি-চাকর রাখ্তে পারে শুনি?—

মনে মনে বিরক্ত হইয়া খোকনকে কোলে তুলিয়া রাস্তায় আসিয়া বিস্কুট কিনিয়া দিয়া কোনমতে শান্ত করিলাম। ফিরিবার পথে দেখিলাম, শরৎবাবুর বাড়ীর সুমুখ দিয়া সনাতন ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, আমাকে দেখিবা মাত্র গা ঢাকা দিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে খোকন পুনরায় হাত পা ছুঁড়িয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—সোনাল কাছে যাব।—

নিজেকে আর সংযত রাখিতে পারিলাম না,—ঠাস্ করিয়া খোকনের গণ্ডদেশে একটি চড় বসাইয়া দিয়া ক্রুদ্ধস্বরে কহিলাম—চুপ্ কর, পাজী ছেলে।

খোকন চুপ করিল না, আরও বাড়িয়া উঠিল। ত্যক্ত বিরক্ত হইয়া দ্রুতপদে বাসায় ফিরিয়া সুষমার কোলের কাছে তাহাকে ধপ করিয়া বসাইয়া দিয়া বৈঠকখানায় আসিয়া যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

কাছারী গিয়া মনে মনে অত্যন্ত আশ্বস্তি ভোগ করিতে লাগিলাম। সকাল করিয়া বাসায় ফিরিলাম। সুষমা খোকনকে বুকে করিয়া আদর করিতেছিল, আমাকে দেখিবা মাত্র তাহার মুখখানি যেন সহসা ভারী হইয়া উঠিল।

আমি একটু কাছে সরিয়া আসিয়া বিস্কুটের ঠোঙ্গাটা বাহির করিয়া খোকনকে উদ্দেশ করিয়া সস্নেহে কহিলাম—এই নাও খোকন –।

সুষমা কস্ করিয়া আমার হাত হইতে ঠোঙ্গাটা লইয়া দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া বলিয়া উঠিল—আর আদর দেখাতে হবে না, চায় না, তোমার বিস্কুট।—

মুহূর্ত্তকাল মৌন থাকিয়া কাঁদ কাঁদ স্বরে কহিল—একেবারে গলাটিপে মেরে ফেল্লেই হ'ত, আর কখ্খনও জ্বালাতন ক'র্‌ত না।

বলিতে বলিতে তাহার চোখ দুটী ছল ছল করিয়া উঠিল। আমি অত্যন্ত অপ্রস্তুত হইয়া ধীরে ধীরে বাহিরে আসিয়া বসিলাম। সমস্ত দিন আর সুষমার সহিত দেখা করিলাম না। সন্ধ্যার পর একাকী নির্জ্জন বৈঠকখানায় বসিয়া সংসারের অসারতা এবং অনিত্যতা সম্বন্ধে চিন্তা করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম। ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখিলাম। দেখিলাম যেন, নিশীথ রাত্রে গোপনে সংসার পরিত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি—যেন জন্মের মত শেষবার সুপ্ত স্ত্রী এবং শিশুপুত্রের মুখের দিকে চাহিলাম, দৃষ্টি যেন কোনমতে ফিরাইতে পারিলাম না—ভাবিলাম দুটী নিষ্পাপ জীবনের সমস্ত সুখ স্বচ্ছন্দ নিঃশেষে শোষণ করিয়া দুঃখ দৈন্যের পাষাণ বোঝা মস্তকে চাপাইয়া দিয়া আজ আমি কোন্ অনির্দ্দেশের সন্ধানে যাত্রার আয়োজন করিতেছি? আমার সমস্ত অন্তর মন সহসা যেন হাহাকার করিয়া উঠিল, দুই চোখ ছাপাইয়া অজস্র ধারায় জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল, যেন তাহারই ক্ষীণ শব্দে সুষমা জাগিয়া উঠিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে আমাকে তাহার বাহুপাশে নিবিড় ভাবে বন্ধন করিল।

জাগিয়া দেখিলাম, সুষমা আমার বুকের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া নীরবে অশ্রু মোচন করিতেছে। সস্নেহে তাহার চোখ মুছাইয়া দিয়া কহিলাম—কি হ'য়েছে, সু?

কোনমতে উদ্গত অশ্রু দমন করিয়া অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে সুষমা কহিল—খোকনের গায়ে হাত তুল্‌লে আমি যে কিছুতেই সহ্য কর্‌তে পারিনে।

বলিয়া আমার বুকের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া পুনরায় কাঁদিয়া উঠিল।

ভাবিলাম, মানব জীবনে ইহাই বোধকরি শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এই সম্পদ বুকে করিয়া হাসিমুখে মানুষ তাহার লক্ষ জীবনের সঞ্চিত দুঃখকে অতিক্রম করিয়া গন্তব্যপথে অগ্রসর হইতে পারে।

সকাল বেলায় খোকনের সামান্য একটু জ্বর দেখা দিল। সুষমার মুখখানা বর্ষণোন্মুখ মেঘের মত ভারী হইয়া উঠিল। সান্ত্বনা দিয়া কহিলাম—সামান্য অসুখ, কিছু ভেব না।

সুষমার চোখ ফাটিয়া টস্ টস্ করিয়া কয়েক ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল।

আহারাদির পর বিছানায় শুইয়া অন্যমনস্ক ভাবে একখানা বইয়ের পাতা উল্টাইতেছিলাম। সুষমা ছেলে কোলে করিয়া জানালার ধারে বসিয়া ছিল। সহসা খোকনের ব্যগ্রস্বর কানে আসিয়া ঠেকিল—ঐ যে সোনা, মা সোনাল কাছে যাব।

মনটা কেমন যেন ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। সুষমা তাড়াতাড়ি তাহাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া ভারী গলায় কহিল—ওর কাছে যায় না বাবা, তুমি আমার কাছে থাক।

খোকন মায়ের কথার প্রতিধ্বনি করিয়া কহিল—ওল কাছে যায় না। একটু পরে সুষমা খোকনকে কোলে করিয়া ধীরে ধীরে আমার শয্যার পার্শ্বে আসিয়া কহিল—শোনা যে ঐ বাড়ী চাকরি নিয়েছে। যতদিন চোখের সামনে থাকবে খোকন ওকে কিছুতেই ভুলতে পারবে না।

মুহূর্ত্তকাল ইতস্ততঃ করিয়া পুনরায় কহিল—আচ্ছা, বাসাটা বদলান যায় না?

তিন মাসের বাড়ী ভাড়া বাকি, মীমাংসার কোন সহজ পথই চোখে পড়িল না। ক্ষণকাল ভাবিয়া লইয়া কহিলাম—সোনাকে ডেকে আনলে কেমন হয় সু?

সুষমা সহসা যেন উত্তেজিত হইয়া উঠিল—কখ্খনও না। আমার কপালে যা আছে, কেউ তা খণ্ডাতে পারবে না। ওর মুখ দেখলেও পাপ হয়।

সে দিন নদীর ঘাটে আমাদের বাবসার মূলসূত্র সম্বন্ধে শরৎবাবুর উপদেশটা মনে পড়িয়া গেল, সহসা যেন আমার সমস্ত মনটা তিক্ত হইয়া উঠিল। সুষমার কথার প্রতিবাদ করিয়া কহিলাম—সোনার এতে কোন দোষ নেই, সু।

লোক চরিত্র অনভিজ্ঞা সুষমা বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে আমার মুখের দিকে চাহিল, কথাটা যেন কোনমতে বিশ্বাস করিতে পারিল না।

বিকালের দিকে দেখিতে দেখিতে হু হু করিয়া খোকনের জ্বরটা প্রবল বেগে বাড়িয়া চলিল। জ্বরের ঘোরে মাঝে মাঝে প্রলাপ বকিতে লাগিল—ঐ যে সোনা।

সুষমা উদ্গত অশ্রু দমন করিয়া কহিল—সোনা ত নেই, বাবা।

খোকন মায়ের মুখের দিকে তাহার রোগ-কাতর করুণ চোখ দুটী তুলিয়া কহিল—ওল কাছে যায় না।

সুষমা শিয়রে বসিয়া নীরবে অশ্রু মোচন করিতে লাগিল। ধীরে ধীরে বাহিরে আসিয়া বসিলাম। পুত্রের পীড়া, স্ত্রীর ব্যাকুলতা, নিজের কপর্দ্দক শূন্য অবস্থা, মাথাটা যেন ঝিম ঝিম করিতে লাগিল। ভাবিতে ভাবিতে সহসা মাথায় একটা বুদ্ধি খেলিয়া গেল—চট্ করিয়া উঠিয়া গিয়া বৃদ্ধ নরেন কম্পাউণ্ডারকে ডাকিয়া আনিলাম।

ঘণ্টা-খানেক পরে ঔষধ লইয়া বাসায় ফিরিলে, সুষমা ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল—ঐ বুঝি তোমার ডাক্তার?

তীক্ষ্ণ ছুরির মত কথাটা আমার অন্তরে গিয়া আঘাত করিল—হাতের শিশি হাতেই থাকিয়া গেল। কোনমতে নিজকে সংযত করিয়া ক্ষীণ প্রতিবাদের সুরে কহিলাম—ডাক্তার না ত কি? পাশ করা না—।

সহসা সুষমার দুই চোখ দিয়া যেন অগ্নি বর্ষণ হইল,—ও বাড়ীর গিন্নি বুঝি তবে মিথ্যে কথা বলে গেলেন আমাকে? এমনি করে ফাঁকি দিয়ে তোমার কি লাভটা হ'ল, শুনি?

মুহূর্ত্তকাল মৌন থাকিয়া পুনরায় কহিল—সংসারে আজ আমার আপন ব'লবার আর কেউ রইল না! তুমিও আজ আমার খোকনকে ত্যাগ ক'রলে—কী পাষাণ গো তুমি।

সুষমা ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

দুর্য্যোগ রাত্রের নিবিড় অন্ধকারে পথ ভ্রান্ত পথিকের মনের অবস্থা যেরূপ হয়, আমারও ঠিক সেইরূপ হইল। ধীরে ধীরে আমার সমস্ত অঙ্গ যেন শিথিল হইয়া আসিল। শিশিটি হস্তচ্যুত হইয়া মাটিতে গড়াইয়া পড়িল। কোনমতে টলিতে টলিতে একেবারে রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইলাম। চন্দ্রের ক্ষীণ আলোকে হাতের আংটীটি চোখের সুমুখে জল জল করিয়া উঠিল। সহসা যেন পথ খুঁজিয়া পাইলাম। আমি আর এক মুহূর্ত্তও স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারিলাম না, ছুটিয়া গিয়া সহরের বড় ডাক্তার নগেনবাবুকে ডাকিয়া আনিলাম।

ভোরের দিকে খোকনের জ্বরটা ছাড়িয়া গেল। শ্রান্ত দেহ মন লইয়া শয্যায় আসিয়া শয়ন করিলাম। সুষমা ধীরে ধীরে পাশে আসিয়া বসিল। মুখ-খানা তাহার বর্ষণ-ধৌত, মেঘমুক্ত আকাশের ন্যায় নির্ম্মল উজ্জ্বল। সহসা, নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিয়া উঠিল, তুমি রাগ করলে, কি ক'রে বাঁচি বলত? চোখ দুটী তাহার ছল ছল করিয়া উঠিল, কণ্ঠস্বর গাঢ় হইয়া আসিল।

জোর করিয়া মুখে হাসি টানিয়া আনিয়া সবিস্ময়ে কহিলাম—কে বল্লে, রাগ ক'রেছি?

সুষমা দন্তে অধর দংশন করিয়া উদ্গত অশ্রু দমন করিতে করিতে কহিল—ছেলের অসুখ হ'লে আমার কিছু ঠিক থাকে না, মা হওয়া বড় জ্বালা।

বলিয়া কাঁদিয়া আমার বুকের উপর লুটাইয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিয়া চোখ মুছিয়া উঠিয়া বসিয়া, কোলের উপর আমার একখানা হাত টানিয়া লইয়া ধীরে ধীরে টিপিতে লাগিল। নিষেধ করিলাম না—এমনি করিয়া অযাচিত সেবা যত্নে সুষমা তাহার মনের গ্লানি দূর করিত। ক্ষণকাল পরে কহিলাম—সুরেন মাষ্টারের বাসাটা খালি আছে, খোকনের অসুখ সারলে এটা ছেড়ে দেব ভাব্ছি।—

—তার আর দরকার করবে না, সোনাকে ওরা ছেড়ে দিয়েছে, গিন্নি বড় ভাল মানুষ।—

মিনিট কয়েক নীরব থাকিয়া পুনরায় কহিল, গিন্নিকে দেখ্লে ভারী কষ্ট হয়—মনে যেন শান্তি নেই। মেয়েমানুষ সব সহ্য ক'রতে পারে, পারে না কেবল স্বামীর কলঙ্ক নিয়ে ঘর করতে।—হোল ও ঠিক তাই—এত টাকা পয়সা তবুও কপালে সুখ হ'ল না, বল্ছিলেন রেখার বিয়েটা দিতে পার্লেই কাশীবাসী হব—আহা, একটা ছেলেও যদি থাকত—।

সহসা আমার অঙ্গুরীহীন অঙ্গুলিস্পর্শে সুষমা যেন চম্কাইয়া উঠিল। নিমেষের মধ্যে তাহার মুখখানা নিষ্প্রভ ম্লান হইয়া গেল। ক্ষণকাল আমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিল—সন্তানের মুখ চেয়ে মানুষ সব ক'র্তে পারে। তাহার দুই চোখ ভরিয়া সকাতর কৃতজ্ঞতা যেন ছাপাইয়া উঠিল।

দিন দিন সুষমার শরীরটা যেন আরও ভাঙিয়া পড়িতে লাগিল। মুখের মধুর হাসিটি মিলাইয়া গিয়াছে, চোখের দৃষ্টি যেন ম্লান হইয়াছে। চোখ তুলিয়া মুখের দিকে চাহিতে পারি না, অক্ষমতার বেদনায় বুক যেন ফাটিয়া যায়। মাঝে মাঝে খোকনের প্রসঙ্গ তুলিয়া তাহাকে একটু প্রফুল্ল রাখিবার চেষ্টা করি।

খোকনকে সঙ্গে করিয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলাম, বাসায় ফিরিয়া দেখিলাম সুষমা জানালার ধারে চুপটি করিয়া বসিয়া আছে। চোখে মুখে হাসি ভরিয়া অত্যন্ত উৎসাহ ভরে কহিলাম—খুব বড় একজন সাধু এসেছে, খোকনকে দেখে কি বল্লে, জান?—

সুষমা চোখ দুটী বড় বড় করিয়া জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিল।

—বল্লে, এ ছেলে ক্ষণজন্মা পুরুষ হবে, ধন-মান জ্ঞান, সব দিক দিয়েই সকলকে ছাড়িয়ে উঠ্বে।

সুষমার পাণ্ডুর মুখখানা সহসা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। খোকনকে কোলের কাছে টানিয়া আনিয়া, তাহার সুমুখের চুলগুলি সরাইয়া দিয়া, প্রশস্ত ললাটখানি তুলিয়া ধরিয়া কহিল—এত বড় কপাল কখনও মিথ্যে হয়।

প্রশংসমান দৃষ্টিতে ক্ষণকাল পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে কহিল—আচ্ছা ফাড়া টাঁড়ার কথা কিছু বল্লে না?

—সে অনেক বয়সে, এই ধর গিয়ে বত্রিশ তেত্রিশের কাছাকাছি গিয়ে, ফাঁড়া ঠিক না, কিছুদিন ভোগ আছে, এই বল্লেন। তার জন্য একটা কবচ দেবেন, ব'লেছেন।

মিনিট কয়েক নীরব থাকিয়া সুষমা একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল—তোমার কথা কিছু বল্লেন?

—হুঁ, বছর খানেকের মধ্যে নাকি ব্যবসায়ে খুব উন্নতি হবে?—

সুষমা ব্যগ্রস্বরে বলিয়া উঠিল—আর কিছু বল্লেন না?—বলিয়া সতৃষ্ণ নয়নে উত্তরের অপেক্ষায় আমার মুখের দিকে চাহিল। মনে মনে বড় বিব্রত হইয়া পড়িলাম, ক্ষণকাল ভাবিয়া লইয়া কহিলাম—আজ আর সময় পেলেন কোথায়, দলে দলে লোক এসে জুটল, আর একদিন যেতে বল্লেন।

নিমেষের মধ্যে তাহার আশাহত ব্যথাতুর চোখদুটী একেবারে ম্লান হইয়া গেল।

মাস খানেক পরের কথা। ভাগ্যক্রমে একটা সুযোগ জুটিয়া গেল, একটা বড় মোকদ্দমা হাতে পাইলাম। বিপক্ষের উকীল শরৎ বাবু। আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া প্রাণপণ

শক্তিতে নিজেকে প্রস্তুত করিতে লাগিলাম—ইহারই উপর আমার সমস্ত ভবিষ্যতটা নির্ভর করিতেছে। বিচারের দিন যতই ঘনাইয়া আসিতে লাগিল, আমার উৎসাহ এবং উত্তেজনা যেন ততই বাড়িয়া চলিল।

সন্ধ্যার পর বৈঠকখানায় বসিয়া কাগজ দেখিতেছিলাম, ঝি আসিয়া সংবাদ দিল—মা ঠাক্রুণ যে বড় কথার অবাধ্যি বাপু।

কথাটা কাণে বড় বিশ্রী ঠেকিল, মনটা সহসা চঞ্চল হইয়া উঠিল। সক্রোধে ধমক দিবার উদ্দেশ্যে মুখ তুলিতেই, পুনরায় শুনিতে পাইলাম—সারাদিন খাওয়া নেই, জ্বর গায়ে এখন আবার রান্নাঘরে গেলেন। কথা শোনার পাত্তর কি? মাথা খুঁড়লেও না।—বুকের ভিতর কেমন যেন ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল, নথিপত্র ফেলিয়া ছুটিয়া আসিলাম। আমাকে দেখিয়া সুষমা বিরক্তিভরে বলিয়া উঠিল—পোড়ারমুখী আবার তোমাকে জ্বালাতে গিয়েছিল বুঝি?—আরও কি বলিতে যাইতেছিল। আমার চোখে মুখে অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য লক্ষ্য করিয়া থামিয়া গেল।

আমি হাত ধরিয়া সুষমাকে বিছানায় আনিয়া শোয়াইয়া দিলাম। অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া কহিল—সামান্য অসুখ বিসুখ, গায়ে মাখ্‌তে গেলে কখনও সংসার করা চলে?

—চলে। বলিয়া শিয়রে বসিয়া পাখাটা তুলিয়া লইলাম। ধীরে ধীরে আমার ভাবী জীবনের মধুর ছবিগুলি একে একে চোখের সুমুখে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। ভবিষ্যতের সুখ স্বপ্ন, নেশার মত আমাকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল—ভালোয় ভালোয়, এ কটা দিন কাটিলে হয়। টাকাগুলি হাতে পাইলে, আর একটি দিনও বিলম্ব করা চলিবে না, স্বাস্থ্যকর জল বায়ুর সংস্পর্শে সুষমার ভগ্ন স্বাস্থ্য, নষ্ট শ্রী, দু-দিনেই ফেরিয়া আসিবে; স্নিগ্ধ মধুর হাসিতে মুখখানি আবার ভরিয়া উঠিবে; দেখিতে দেখিতে সুপ্ত রূপ-যৌবনের, লুপ্ত মাধুর্য্য তাহাকে একেবারে অপূর্ব্ব লাবণ্যময়ী করিয়া তুলিবে। রেশমের হাতের, ঢেউ খোলান চুড়িগুলি সুষমার সুশ্রী নিটোল হাত দুখানি বোধ করি আরও বেশী সুশ্রী করিয়া তুলিবে, অণিমার মুক্তার হার ছড়া, সুষমার গলায় এক অপরূপ সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিবে।

বছরখানেক পরে জলকলের সুমুখে বড় রাস্তার ধারে পোড়ো জমিটার উপর ছবির মত সুন্দর, নিখুঁত, একখানা দ্বিতল গৃহের অস্তিত্ব দেখা দিবে,—তাহারই পিছনে, ছোট একটি ফুলবাগান; বকুল গাছটার চারিপাশ ঘেরিয়া শ্বেত পাথরের বেদী। দিনের শেষে সেখানে আসিয়া কর্ম্মক্লান্ত দেহটাকে এলাইয়া দিলে, সুষমা ছেলে কোলে করিয়া পাশে আসিয়া বসিবে; আমাকে নিরিবিলিতে পাইয়া সুখ দুঃখের কথা বলিবে। মাঝে মাঝে খোকন তাহার কচি কচি হাত দুখানি তুলিয়া খেলার ছলে মায়ের মুখ চাপিয়া ধরিবে, সুষমা তাহাকে সস্নেহে বক্ষে চাপিয়া সলজ্জ হাসিতে মুখখানা রাঙা করিয়া বলিবে—এই দেখ তোমার খোকনের কিন্তু সহ্য হচ্ছে না?—

খোকন সুষমার কবল হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া ছুটিয়া গিয়া একটা গাছের আড়ালে মুখ লুকাইয়া মায়ের সহিত লুকোচুরি খেলিবে। সুষমা কপট বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিবে—ওমা তাইত খোকন গেল কোথা, তারে ত খুঁজে পাচ্ছিনে!—খোকন, অমনি তাহার হাসি হাসি মুখখানা তুলিয়া মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিবে,—এই যে খোকন।—

বলিয়া, ছুটিয়া আসিয়া কোলের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবে। বৈঠকখানার মক্কেলের কণ্ঠস্বর শুনিয়া উঠিবার উদ্যোগ করিলে, সুষমা তাড়াতাড়ি একখানা হাত চাপিয়া ধরিয়া অনুযোগের সুরে বলিবে—টাকা টাকা করে তোমার গায়ের রক্ত যে একেবারে জল হ'য়ে গেল, কি হবে এত টাকা দিয়ে, দিনান্তে তোমাকে একটু নিরিবিলিতে পাবারও উপায় নেই⋯ ⋯।

সুষমার ক্ষীণ-কণ্ঠস্বরে সহসা আমার চিন্তাস্রোতে বাধা পড়িল—আচ্ছা, ছোট বেলার কথা মানুষের মনে থাকে?

—থাকে বৈকি, তখন আমার বয়েস চার কি পাঁচ, মায়ের সঙ্গে পূজো দেখ্‌তে গিয়ে একদিন হারিয়ে গিয়েছিলুম, কাউকে দেখ্‌তে না পেয়ে চৌধুরীদের দীঘির পাড়ে ব'সে খুব কাঁদ্‌ছিলুম, বেশ স্পষ্ট মনে পড়ে।

—কি ক'রে তোমাকে খুঁজে পেলে?

—তার পর কি যে হ'ল, কিছু মনে নেই।

সুষমা একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিল—ভাগ্যিস্ পা স'রে দীঘিতে পড়ে যাওনি—তাই আমি খোকনকে সব সময় চোখে চোখে রাখি, নইলে যে অস্থির ছেলে, কবে যে হারিয়ে যেত। সে ত তবু পাড়াগাঁ, তাই খুঁজে পেলে, সহর হ'লে আর দেখ্‌তে হ'ত না, ততক্ষণে গাড়ী ঘোড়া চাপা পড়ে একটা কিছু বিশ্রী—মাগো? বলিয়া, সুষমা শিহরিয়া উঠিল।

মিনিট খানেক নীরব থাকিয়া পূর্ব্ব আলোচনার সূত্র ধরিয়া পুনরায় কহিল—তখন ত তোমার বেশ জ্ঞান হ'য়েছে, তার আগের কথা আর কিছু মনে নেই, না?

—খু-উ-উব ভাসা ভাসা একটু যেন মনে হয়, তখন বোধ হয় খোকনের মত হব—।

সহসা সুষমা চোখদুটী বিস্ফারিত করিয়া রুদ্ধ নিশ্বাসে আমার মুখের দিকে চাহিল।

—সে গিয়ে দিদির বিয়ের কথা, শুধু এইটুকু মনে আছে, আমাদের সমস্ত উঠোনটা একেবারে দিনের মত আলো হ'য়েছিল। সুষমা ব্যগ্রস্বরে বলিয়া উঠিল—আর কিছু মনে নেই?

মৃদু মস্তক সঞ্চালন করিয়া জানাইলাম—না।

সুষমার পাণ্ডুর মুখের ক্ষীণ উজ্জ্বলতা সহসা যেন নিভিয়া গেল, তাহার বক্ষ ভেদ করিয়া একটী তপ্ত দীর্ঘ নিশ্বাস বাহির হইয়া আসিল। ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া, ব্যথিত স্বরে বলিয়া উঠিল ধর, আমি যদি এখন মরি, বড় হ'লে আমার কথা খোকনের কিছু মনে থাক্‌বে না, তাই—না?

নিমিষের মধ্যে, আমার কল্পনার স্বপ্নসৌধ একেবারে যেন ভূমিসাৎ হইয়া গেল। ব্যথায়, বেদনায় আমার সমস্ত অন্তরটা ভাঙ্গিয়া পড়িল।

মাঝে মাত্র দুইটি দিন অবশিষ্ট ছিল। নিবিষ্ট চিত্তে, কাগজপত্র দেখিতে দেখিতে অনেক রাত্রি হইয়াছিল। সুষমা নিঃশব্দে পা টিপিয়া ঘরে ঢুকিয়া কহিল—শোবে চল। টং টং করিয়া ঘড়ীতে দুইটা বাজিল। কাজ বন্ধ করিয়া মুখ তুলিয়া বিস্মিত স্বরে কহিলাম—তুমি এখনও ঘুমোও নি?—

—না। বলিয়া সুষমা হাসিয়া ফেলিল।

সুষমার ক্ষীণ হাসিটুকু সহসা আমার মনের গোড়ায় একটা নাড়া দিয়া গেল, কহিলাম—আর দুটো দিন সু, তার পর একেবারে go to bed at nine—ঠিক ন'টায় শোয়া চাই।—সুষমা মৃদু হাসিয়া কহিল—এখনও ভোল নি দেখ্‌ছি।

আমাদের প্রথম দাম্পত্য জীবনের মধুর পরিহাস। সুষমার 'ফাষ্ট বুকের' বিদ্যা ইহার বেশী অগ্রসর হয় নাই। তখন সবে মাত্র বিবাহ হইয়াছে। রাত্রে ঘরের পাশে সুষমার পদশব্দ শুনিতে পাইলে আমি গম্ভীর মনোযোগের ভান করিয়া তাড়াতাড়ি একখানা বই খুলিয়া বসিতাম। সুষমা আমার ধূর্ত্তামি বুঝিতে পারিয়া ধীরে ধীরে কাছে আসিয়া ফস্ করিয়া বইখানি কাড়িয়া লইয়া, চোখে মুখে কৌতুকের হাসি ভরিয়া বলিত—এখন গো টু বেড এট্ নাইন। বলিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া আমার কোলের উপর লুটাইয়া পড়িত। কিশোরী পল্লীবধূর অনভ্যস্ত মুখে কথাগুলি বড়ই মধুর শুনাইত। সংসারের শত দুঃখ দৈন্যের মাঝখানে দাঁড়াইয়া কিশোর বয়সের সেই ক্ষুদ্র পরিহাসটুকু সত্যই আজ ভুলিতে পারি নাই।

দেখিতে দেখিতে সে দুটি দিনও কাটিয়া গেল। ভয়ে ভাবনায়, আশায় আনন্দে বুকটা আমার থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। পাঁচ দিন ধরিয়া নিঃশেষে নিজের সমস্ত শক্তি সামর্থ্য শেষ করিয়া অপরাজেয় প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত লড়িতে হইবে।

বাসায় ফিরিয়া দেখিলাম সুষমা জ্বরে শয্যাগত। কয়দিনের মধ্যে তাহাকে ভাল করিয়া দেখিবার অবসরটুকু পর্য্যন্ত পাই নাই। মনে মনে বড়ই লজ্জিত হইয়া পড়িলাম।

শিয়রে বসিয়া তাহার চুলের মধ্যে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে করিতে বলিলাম—আজ সবে ছুটি পেলাম সু।

সুষমার মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল। ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া ক্ষীণ স্বরে কহিল—শেষরাত্রে, স্বপ্ন দেখ্‌ছিলাম, তোমার যেন খুব পসার জমে উঠেছে, নিঃশ্বেস ফেলার সময়টুকু পর্য্যন্ত নেই।

হর্ষে পুলকে আমার সমস্ত বুকখানা দুলিয়া উঠিল। ধীরে ধীরে সুষমার মুখের ওপর মুখ রাখিয়া কহিলাম—তাই যেন হয় সু! সুষমা তাহার দুর্ব্বল বাহুবেষ্টনে আমার

কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিয়া কহিল—ঠিক হবে, ভোরের স্বপ্ন কখনও মিথ্যে হয় ?—মিনিট করেক পরে পুনরায় দ্বিধা-জড়িত কণ্ঠে কহিল—এখান থেকে বেরুবার আগে জ্বরটা যে বন্ধ করা দরকার, রাস্তাঘাটে যদি বেশী হ'য়ে পড়ে, একবার ডাক্তার ডেকে দেখালে কেমন হয় ?

সবিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিলাম। সহস্র সাধ্য সাধনা করিয়া যাহাকে কোনদিন ঔষধ খাওয়াইতে পারি নাই, আজ সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ডাক্তার ডাকিতে বলিতেছে !

পরদিন সকাল বেলায় সহরের বড় ডাক্তার নগেনবাবুকে ডাকিয়া আনিলাম। সুষমাকে পরীক্ষা করিয়া নগেনবাবু আমাকে নিভৃতে ডাকিয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন —বেশী দেরী না ক'রে চেন্‌জে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন, শক্ত অসুখ দাঁড়িয়েছে—রক্তটক্ত ওঠে কি ?

থামের আড়াল হইতে ঝি মৃদুস্বরে বলিয়া উঠিল—দু'-বার উঠ্‌তে দেখেছি বাবু—কাল এই এত বড় বড় দু'-দলা উঠেছিল, তার আগে আর একদিন—।

সহসা আমার মাথাটা যেন ঝিম্ ঝিম্ করিয়া উঠিল, পা-দুটি ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তাড়াতাড়ি দুই হাতে চৌকাট-টা আশ্রয় করিয়া দাঁড়াইলাম।

ঔষধ লইয়া বাসায় ফিরিলে, সুষমা সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল—কি বল্লেন ডাক্তারবাবু ?

আমার চোখ ফাটিয়া জল পড়িবার উপক্রম করিল, তাড়াতাড়ি, অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া সুমুখের টেবিলটা ঝাড়িতে ঝাড়িতে কহিলাম—বিশেষ কিছু না, চেন্‌জে গেলেই সব সেরে যাবে, আপাততঃ একেবারে নড়া-চড়া বন্ধ, পার্‌বে ত ? সুষমা যেন কতকটা আশ্বস্ত হইয়া কহিল—না পার্‌লে চল্‌বে কেন ? ডাক্তারের কথা না শুন্‌লে অসুখ সার্‌বে কি ক'রে ?

মিনিট কয়েক পরে সুষমার পাশে বসিয়া ধীরে ধীরে তাহার মাথাটা টিপিয়া দিতে দিতে অনুযোগের স্বরে কহিলাম—মুখ দিয়ে রক্ত উঠেছে, এতদিন বলনি কেন সু ?

সুষমা ম্লান হাসিয়া সহজ স্বরেই কহিল—ও কিছু না, গলা চিরে কবে এক ফোঁটা রক্ত পড়েছে, তার আর বল্‌ব কি ?

ক্ষণকাল পরে পুনরায় কহিল—সেখানে গিয়ে এখন তাড়াতাড়ি সেরে উঠ্‌তে পার্‌লে হয়—ফিরে এসে কারপেটের ওপর বোনার ভাই-এর ছবিটা তুলে দিতে হবে। আহা, একটি মাত্র ভাই কোলে পিঠে ক'রে মানুষ করেছে, তার কথা বল্‌তে গিয়ে চোখের জল যেন আর ধরে রাখ্‌তে পারে না।

বলিতে বলিতে তাহার চোখ দুটী ছল ছল করিয়া উঠিল। আঁচলে চোখ মুছিয়া কহিল—খাসা মেয়ে, এমন সাদাসিদে—সে দিন খোকনকে কোলে নিয়ে তার দু-গালে চুমু দিয়ে বল্লে—এমন সোনার চাঁদ ছেলে, ইচ্ছে করে একে আমি কেড়ে নিয়ে যাই। হেসে বল্লুম—আমি মর্‌লে নিস্।—বলিয়া সুষমা তীব্র দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিল।

আমি ভর্ৎসনার স্বরে কহিলাম—ছিঃ, বল্‌তে নেই। কথা বল্‌তে কষ্ট হ'চ্ছে, এখন চুপ ক'রে একটু ঘুমোও। সুষমা আর কোন কথা না বলিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল।

দিন চারেক পরে ভোরের দিকে সুষমার জ্বরটা ছাড়িয়া গেল। সকাল বেলায় বিছানায় উঠিয়া বসিয়া কহিল—শরীরটা বেশ হালকা মনে হ'চ্ছে, আজ তোমার মামলার রায় বেরুবে ভাল দিনেই জ্বরটা ছেড়েছে। ভগবানের কেমন দয়া দেখ।—বলিয়া হাসিয়া ফেলিল।

মুহূর্ত্তকাল বিশ্রাম লইয়া পুনরায় কহিল—সকালে সকাল চারটি খেয়ে কাছারী যাও। তোমাদের খাওয়া দাওয়ার এত কষ্ট, চোখের সুমুখে আর দেখতে পারি না—এখন, ভালোয় ভালোয় সেরে উঠ্‌তে পার্‌লে হয়।

সান্ত্বনা দিয়া কহিলাম—ভগবান তাই করুন সু, তুমি সেরে ওঠ। আশায় আনন্দে, সুষমার রোগমলিন পাণ্ডুর মুখ-খানি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

অবিশ্রাম বর্ষণের পর মেঘমুক্ত নির্ম্মল আকাশে সূর্য্যের আলোক দেখিলে মানুষের মনে যেমন আনন্দের সঞ্চার হয়, দীর্ঘ রোগ ভোগের পর সুষমাকে সুস্থ দেখিয়া আমার

সমস্ত অন্তর মন ছাপাইয়া ঠিক্ তেমনি করিয়াই আনন্দের স্রোত বহিতে লাগিল।

আহারাদি শেষ করিয়া পুলকিত মনে ধীরে ধীরে কাছারী আসিয়া বসিলাম। ঘণ্টা দুই পরে মোকদ্দমার রায় শুনিতে পাইলাম আমার দিকেই সম্পূর্ণ ডিক্রী হইয়াছে। আনন্দের আতিশয্যে সহসা যেন আমার মাথাটা ঘুরিয়া গেল। এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া রাস্তায় আসিয়া তাড়াতাড়ি একখানি গাড়ী করিয়া বাসায় ফিরিলাম। অধীর আগ্রহে সুষমার ঘরের দিকে অগ্রসর হইতেই ঝি হাত তুলিয়া বাধা দিয়া কহিল—রক্ত বমি ক'রে বড় কাহিল হ'য়ে পড়েছিলেন এখন একটু সুস্থির হ'য়ে ঘুমিয়েছেন।

সহসা মনটা কেমন যেন ছঁ্যাৎ করিয়া উঠিল। অতি-সন্তর্পণে পা টিপিয়া ঘরে আসিয়া দেখিলাম, সুষমা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া পড়িয়া আছে। ধীরে ধীরে কাছে আসিয়া ব্যগ্রস্বরে ডাকিলাম সু—সুষ—সুষমা। কোন উত্তর আসিল না। তাড়াতাড়ি বুকে হাত দিয়া দেখিলাম—কোন স্পন্দন অনুভব করিতে পারিলাম না, নাকের গোড়ায় আঙ্গুল রাখিয়া বুঝিলাম, শ্বাসও বন্ধ হইয়াছে।

আমি পাগলের মত উর্দ্ধশ্বাসে ঘর হইতে ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া—ডাক্তার ডাক্তার—বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলাম।

শ্রীসুশীলকৃষ্ণ মিত্র।



পরিচয়

শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কি নাম তাহার —
বন্ধু মোরে শুধায়ো না আর।
জীবনের পূর্ব্বপ্রান্তে উদয় অচলে
প্রথম প্রকাশ তার, জানি না কাহার মন্ত্র বলে।
প্রভাতের সূর্য্যসম প্রাণ ভরি' দীপ্তি দিল আনি,'
আর কোনো' পরিচয়, ওগো বন্ধু, আজো নাহি জানি।
হৃদয়ের পুষ্প বনে বনে
ফুটিল পূজার ফুল সে দিনের সেই শুভক্ষণে।
বর্ণে বর্ণে রূপে রসে চিত্ত মোর নিত্য দিল ভরি'
সে পরম লগ্নটিরে আজিকেও স্তব্ধমনে স্মরি।

এ জীবন ক্ষুদ্র হতে পারে,
তবুও কেমনে নিজে তুচ্ছ বলি, মিথ্যা বলি তারে?
এরি তলে ফল্গু সম প্রাণের অমৃতধারা বহে;
কী বেদনা, কী আনন্দ কত ছন্দে এরে ঘিরি রহে;
জীবনের দিনগুলি মম
কালের মালিকা হতে সম্ভচ্যুত পুষ্পরাশি সম
একে একে ঝরে যায়, কোথা নাহি জানি,
মনে তবু এ কথাটি সত্য বলি মানি—
প্রাণের শোণিতে যাহা, প্রেমে যাহা পূর্ণ করে দিনু,
বিপুল বেদনা রসে সিক্ত করি নিজ হাতে নিঃশেষে অর্পিনু,
চির মৃত্যু তার তরে নহে;
মহান কালের বক্ষে লেখার অতীত রূপে নিত্য হ'যে রহে।

ফাল্গুনের কুঞ্জবনে, আজিকার প্রাতে
যে পুষ্প পথের প্রান্তে ঝরিয়া মিশিল ধূলি সাথে,
বর্ষ পরে তারি' রসে সঞ্জীবিত হয়ে
জীবনের বার্ত্তা আনে নবাঙ্কুর নবপ্রাণ ল'য়ে।
এ নহিলে ব্যর্থ হত সুন্দরের লীলা;
শুকায়ে মরুভূ'হ'ত ধরিত্রীর স্রোত অন্তঃশীলা।

চলেছি জীবন পথে কভু মন্দ গতি,
কখনো' প্রবল বেগে ছুটে চলি; নাহিক বিরতি।
শারদ প্রভাতে হেরি ধান্যক্ষেত্রে শ্যামলের মায়া;
ঝঞ্ঝাময়ী বর্ষারাতে ঘন মেঘে ঢাকে কালো ছায়া
কভু ফিরি দূরে দূরান্তরে,
কখনো' ঘুরিয়া মরি নগরীর রাজ পথ পরে।
বিচিত্র এ ভুবনের গূঢ় অন্তরালে
আমার প্রাণের দেবী কী আদরে আপনার দীপশিখা জ্বালে।
তাহারি পরশে জাগি নূতন চেতনে,
নিষ্ফলে ঘুরিয়া মরা সাঙ্গ হয় সেই শুভক্ষণে।
চিত্তলোকে কী উৎসব চলে,
মহলে মহলে তার শত দীপ মালা হয়ে জ্বলে।
কে কবে কি নাম দিল, না শুধাই তা'রে
আলোক-রূপিণী নারী, তাহারে রাখিনু বাঁধি সঙ্গীতের হারে।
অন্তরের দীপ্ত শিখা একমাত্র পরিচয় যার—
হে বন্ধু, আরতি তারি' নিত্য চলে এ বক্ষে আমার॥

"গুজব"

শ্রীরাইমোহন সামন্ত এম্‌-এ

বন্ধু বলিলেন, একটি সাহিত্যিক মজলিসের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, আমাকেও যাহা হউক একটা কিছু লিখিয়া আনিতে হইবে। আমি নাকি আপনার অজান্তে কখন লেখক হইয়া উঠিয়াছি, তাই সারস্বত সভায় তিনি আমায় নিমন্ত্রণ করিলেন। আমন্ত্রণ গৌরবের তাহাতে সন্দেহ নাই, আমন্ত্রণ শুনিয়া আপনার অস্তিত্ব সম্বন্ধে বেশ একটু সজাগ হইয়া উঠিলাম না বলিলে সত্য গোপন করা হইবে—কিন্তু ইহা ত আর উদরপূর্ত্তির নিমন্ত্রণ নয়, (এক পেয়ালা শুষ্ক (?) চা অবশ্য ধর্ত্তব্য নয়) যে দুটা হজমিগুলি খাইয়া প্রস্তুত হইয়া থাকিব! বেশ একটু মুস্কিলেই পড়িলাম, মাথামুড় খুঁড়িয়া একটা উপযুক্ত বিষয় হাতড়াইতে লাগিলাম, রবীন্দ্রনাথের মত প্রতিভা নাই যে লিখিতে লিখিতেই বিষয় গজাইয়া উঠিবে। হঠাৎ কেন জানিনা মনের উপর "গুজব" কথাটি ভাসিয়া গেল: এই অপরূপ বিষয়টির এইরূপ সহসা আবির্ভাব কেন হইল ডাক্তার বসু হয়ত মনোবিশ্লেষণ দ্বারা তাহার একটা সমীচীন কারণ দর্শাইতে পারেন, আমার নিকট ইহা কিন্তু একেবারে গড্‌সেণ্ট্‌ বা ভগবৎপ্রেরিত বলিয়া মনে হইল। প্রথম প্রথম বিষয়ের লঘুত্বে বা অসারত্বে যেন বেশ ভরসা পাইতেছিলাম না, কিন্তু 'সাহিত্যে বিষয় বস্তু গৌণ, লিখন-ভঙ্গিই মুখ্য ব্যাপার' ইত্যাকার সাহিত্যিক ধুয়া স্মরণ করিয়া বক্ষের ঘন স্পন্দন যেন একটু কমিল, নিমজ্জমান ব্যক্তির ন্যায় এই গুজবরূপ কুটাটিকে ধরিয়াই আমি এই সাহিত্যিক দায় হইতে উদ্ধার পাইবার মনস্থ করিলাম। এমন অন্তঃপ্রেরণা-লব্ধ বিষয়টিকে পরিত্যাগ করি কোন সাহসে!

এখন, প্রবন্ধ লিখিতে হইলে পূর্ব্বগামী খ্যাতনামা সাহিত্যিকদিগের পরিচিত অপরিচিত লেখা হইতে কোটেশন [illegible]া করিতে পারিলে বিষয় এবং লেখক, উভয়েরই গাম্ভীর্য্য রক্ষা হয় না। সে দিক দিয়া আমার অবস্থা ভালই বলিতে হইবে কারণ, জগতের শ্রেষ্ঠ নটকবি শেক্সপীর হইতে আমি কোটেশন দিতে সক্ষম। তবে হাতের কাছে পুস্তক না থাকায় স্থান বাৎলাইয়া দিয়াই ক্ষান্ত হইতে হইল। তাঁহার "হেনরি দি ফোর্থ" দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথমেই গুজব স্বয়ং সাজিয়া গুজিয়া রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত এবং সমবেত জনমণ্ডলীর নিকট আপনার বহু exploits জলন্ত ভাষায় জ্ঞাপন করিলেন। জ্যান্ত মানুষকে মারিয়া ফেলিতে তিনি কিরূপ অদ্বিতীয়, দশ-কে হাজার করিতে আবার হাজারকে দশ করিতে তিনি কেমন সিদ্ধহস্ত, একের জয় অপরের মস্তকে, একের দোষ অন্যের স্কন্ধে,—এক কথায় "উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে" চাপাইতে তিনি কিরূপ সক্ষম, তাহার তালিকা পড়িলে সত্যই বলিতে হয় গুজব অঘটন-পটীয়সী। শেক্সপীরের পর ইংরাজী সাহিত্যে আর গুজবকে সশরীরে আমি দেখি নাই, তবে নানাস্থানে তাঁহার কীর্ত্তিকলাপের পরিচয় পাই বটে। তাই মনে হয় বুঝি তাহার ঐ আত্ম-শ্লাঘারূপ পাপের জন্য তাহার অপমৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু এই বিংশ শতাব্দীতে আত্মশ্লাঘা আর অপমৃত্যুর কারণ নয়; —self-advertisement বা আপনার জয়ঢাক আপনি পেটা আজ সিদ্ধি, ঋদ্ধি, বৃদ্ধির একেবারে keynote বা open sesame। বহু সমালোচকের মতে আজিকার জগৎপ্রসিদ্ধ নাট্যকার G.B.S. ঐ গুণ দ্বারাই নাকি এত বড় হইতে পারিয়াছেন। যাক্‌ সে কথা, পরের কুৎসা করিয়া আর লেখনী কলঙ্কিত করিব না। তবে প্রবন্ধের নামের গুণে সব কিছুই মানাইয়া যাইতে পারে, এই যা রক্ষা।

আপনারা মনে মনে হয়ত বিরক্ত হইয়া উঠিতেছেন, ভাবিতেছেন কোথাকার 'গুজব' লইয়া মেলা বকিতে আরম্ভ

করিয়াছি। কিন্তু আমি আপনাদের সতর্ক করিয়া দিতেছি, কাহারও সম্যক পরিচয় না জানিয়া কাহারও উপর অবজ্ঞা-সূচক কোন মন্তব্য প্রকাশ করা কদাচ উচিত নহে। আপনারা সুধীব্যক্তি,—"অজ্ঞাতী ভাবমজ্ঞাত্বা কথং সামর্থ্য নির্ণয়" এ নীতিবাক্য অবশ্য জানেন ও মানেন। আপনারা অনেকেই সাহিত্যসেবী কিন্তু হয়ত ভুলিয়া যাইতেছেন আপনাদের অবজ্ঞার পাত্র এই গুজব আপনাদের আরাধ্যা দেবী ভারতীর স্বজাতি, নিকট আত্মীয়, মাত্র ছদ্মবেশে আপনার পরিচয় লুকাইয়া রাখিয়াছে। সাহিত্যে বহু অসম্পূর্ণ সংজ্ঞার মধ্যে 'Liferature is the art of lying' বা মিথ্যার মায়াসৃষ্টিই সাহিত্য, এ সজ্ঞাও আপনারা একেবারে উড়াইয়া দিতে পারেন না। ইংরাজ লেখক Defoeর নাম আপনাদের স্মরণে আছে নিশ্চয়,—তিনি এই মিথ্যা কথনে একেবারে ওস্তাদ ছিলেন। রবিন্সন ক্রুসোর নিঃসঙ্গ দ্বীপজীবনের প্রত্যেক খুঁটিনাটি কেমন অপূর্ব্ব কৌশলে তিনি বানাইয়া লিখিয়াছেন, প্রত্যক্ষ সত্য বলিয়া বিশ্বাস না করিয়া যেন পারা যায় না; অথচ সবই কল্পনা-প্রসূত। মিথ্যা জানি বলিয়াই বার বার পড়ি, যেন পুরাণো হইতে চাহে না। তাঁর "Journal of Plague year" এ ইংলণ্ডের প্লেগের এরূপ বর্ণনা আছে যে বহুদিন যাবৎ লোকে তাহা প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণিত ইতিহাস বলিয়া বিশ্বাস করিত, এমন কি পার্লামেণ্টের বড় বড় বক্তারাও উহাকে প্রামাণিক গ্রন্থ বিবেচনা করিয়া ঐ পুস্তক হইতে উদ্ধৃত অংশদ্বারা নিজ নিজ মতামতের সমর্থন করিত। কিন্তু প্লেগ সম্বন্ধে Defoeর জ্ঞান খবরের কাগজের দু একটা report-এই সীমাবদ্ধ ছিল, অধিকাংশই তাঁহার কল্পনা-প্রসূত। Defoeর সম্বন্ধে যাহা সত্য অল্পবিস্তর সকল-সাহিত্যিকের সম্বন্ধেই তাহা সমভাবে প্রযোজ্য। কথাই আছে, all art is simulation, সমস্ত সত্যকার শিল্প সত্যের ভান করে। রবীন্দ্রনাথের প্রত্যেক ছোট গল্প, শরৎচন্দ্রের প্রত্যেক কাহিনী আমাদিগের মনে হর্ষ-বিষাদ ভয় ও আশার তুফান তুলে, পড়িবার সময় ভুলিয়া যাই যে তাঁহাদিগের ঘটনার সমাবেশ সব ঝুটা হায়,—কেবল মিথ্যা ফাঁকি, তাঁহাদিগের চিত্রিত নরনারী সত্যকার নরনারী নহে, লেখকের উর্ব্বর মস্তিষ্কের বানানো কথা, একেবারে নেহেক গুজব। অথচ সেই মিথ্যা নায়ক নায়িকার মরা বাঁচায় আমরা মরি বাঁচি, তাহাদিগের সুখে দুঃখে, আনন্দে বেদনায়, আশায় নৈরাশ্যে আমরাও যেন সমভাবে আলোড়িত হই, তাহাদিগের অস্তিত্বের সহিত আমাদের অস্তিত্ব যেন বিলুপ্ত হইয়া যায়, ক্ষণকালের জন্যও আমরা মায়ার ফাঁদে পড়ি। গুজবকে ভালোভাবে সাজসজ্জা দিলেও সাহিত্য!

গুজব এবং সাহিত্য, ইহাদের উভয়কে একটু বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলেই দুয়ের গোড়ায় কতখানি মিল তাহা বুঝিতে পারা যায়। সকলেরই জানা আছে, সত্য মিথ্যা, দুই লইয়া গুজব রচিত হয়। কথায় বলে 'যা রটে তা কতক বটে'। একেবারে নিছক গুজব যাহা, তাহাতেও একটা সত্যের রেশ থাকিতে হইবে, তাহা না হইলে তাহা লোকের মনে বিশ্বাসের আবহাওয়া সৃষ্টি করিতে পারিবে না, কেহই সে কথায় কান দিবে না। ব্যক্তি বিশেষে সত্যমিথ্যার শতকরা হারের অবশ্য তারতম্য হইতে পারে, কিন্তু শেক্সপীয়রের অমরসৃষ্টি Falstaff এর মত এমন resourceful ব্যক্তিও নিছক কল্পনার উপর দাঁড়াইতে পারিত না, একশত ডাকাতের গুজব রটাইতে অন্ততঃ লোকেরও তাহার প্রয়োজন হইয়াছিল। আর সাহিত্য,—উহাও কি সত্য ও কল্পনা, এই দুয়ের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ নহে, এবং স্থান-কাল-পাত্র ভেদে এই সত্যমিথ্যার percentage এর কম বেশ হয় না? একদিকে ঐতিহাসিক সাহিত্য যাহাতে সত্যের ভাগ বেশি, অথচ কল্পনাও চাই, না হইলে নির্জ্জলা ইতিহাস হইয়া যায়, রসের উদ্ঘাটন হয় না। সোনার বাজারে খাঁটি সোনার মূল্য বেশি, কিন্তু যখন গৃহিণীর সন্তোষ বিধানের জন্য সৌখীন অলঙ্কারের প্রয়োজন তখন খাঁটি সোনায় কাজ হয় না, কিছু খাদ মিশাইতে হয়। সাহিত্য লক্ষীর প্রসন্ন দৃষ্টি যদি কাহারও ঈপ্সিত থাকে, তবে সত্যের একান্ত অনুরক্ত হইলে চলিবে না। বঙ্কিমের দুর্গেশনন্দিনী, আনন্দমঠ, রাজসিংহ, দেবী চৌধুরাণী ইত্যাদিতে যাহা কিছু সত্য আছে, কীটদষ্ট পুরাতন পুঁথিপত্র ঘাঁটিলে তাহা পাওয়া যাইবে কিন্তু তাহাদের পাঠক মিলা ভার, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের পাঠকের অভাব

হয় না। কেন, তাহার সেই মিথ্যার ভেজাল টুকুর জন্যই ত!

সাহিত্যের আর একসীমায় রহিয়াছে আরব্যোপন্যাস, ঠাকুরদাদার গল্প, বা কোলরিজের Ancient Mariner, যেখানে জীবনের পরিচিত সত্য একটি ক্ষীণ সূত্রের মত অবস্থায় আছে, টাকায় আট সের দুধে যেমন দুধ থাকে সেইরূপ, কেবল রঙেই চেনা যায় যে দুধ। নির্জ্জলা দুগ্ধ বিক্রয়ে গোয়ালাদের শাস্ত্রে না কি বাধে, নির্জ্জলা সত্য পরিবেষণেও রসশাস্ত্রে বাধে, এ কথা গোঁড়া বস্তুতান্ত্রিকগণও মানিয়া লইবেন। বাক্যং রসাত্মকং কাব্যং, বাক্যে রস সংযোগ করিলেই তবে তাহা সাহিত্য পদবাচ্য হয় এবং আমাদের ব্যবহারিক জগতের সত্যের সহিত সে রসের কোন সম্বন্ধ নাই। ব্যবহারিক জীবনে যাহা মিথ্যা, কল্পনা, সাহিত্যে তাহারই নাম রস। ইংরাজিতে যাহাকে Verisimilitude বলে, সেই সত্যবুদ্ধি লইয়া খবরের কাগজের জন্য report লেখা যাইতে পারে, সুসাহিত্য রচনার পক্ষে তাহা বিশেষ অনুকূল নহে। সাহিত্যে অপ্রাকৃত জগতের আভাষ দিতে হইবে, স্বপ্নরাজ্যের সৃষ্টি করিতে হইবে, তবেই তাহা হইবে সৎসাহিত্য, সাহিত্য সৃষ্টির জন্য একটু উর্ব্বর মস্তিষ্কের প্রয়োজন, যাহাতে মাঝে মাঝে দুএকটি গুজব লিখিতে পারা যায়। সর্ব্বজন-আদৃত শকুন্তলা, টেম্‌পেষ্ট, প্যারাডাইস্ লষ্ট, সত্যের কষ্টিপাথরে যাচাই করিলে ইহাদের কতখানি করিয়া উৎরাইয়া যাইবে, তাহা সুধীজন-বিচার্য্য।

যে মিথ্যা সাহিত্যকে অলঙ্কৃত করে, ইতিহাসকে সেই মিথ্যাই আবার কলঙ্কিত করে। সত্যই ইতিহাসের প্রাণবস্তু, historic veracity বা ঐতিহাসিক সত্য একরকম প্রবাদ বাক্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে, অতি ক্ষুদ্র কোন ঐতিহাসিক তথ্যের জন্য কিরূপে কত লোক জীবনপাত করিতেছেন তাহা কাহারও অবিদিত নাই। অথচ এই ইতিহাসকে লক্ষ্য করিয়াই আমাদের কবিগুরু কি বলিয়াছেন তাহা আমরা সকলেই জানি। ইতিবৃত্ত কথাকে মিথ্যাময়ী বলিয়া সম্বোধন করিতে অপর কোন দেশের কবিরাই হয়ত বলিতেন, কিন্তু আমাদিগের ইতিহাস প্রকৃতপক্ষেই মিথ্যাময়ী, ইহার পনের আনাই গুজব। জার্ম্মাণরাজ ফ্রেড্‌রিক দি গ্রেটের ইতিহাস সঙ্কলনে কার্লাইলের অমানুষী ধৈর্য্য ও অক্লান্ত পরিশ্রম চিরকাল ঐতিহাসিকদিগের পক্ষে ধ্রুবতারার মতই পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবে। তবে আমাদিগের দেশটা নাকি উল্টাপাল্টার দেশ, তাই আমাদিগের ইতিহাসও গুজবের হাত এড়াইতে পারে নাই। এ দিক দিয়া ভারতবর্ষের একটা মোহিনী শক্তি আছে বলিতে হইবে। ইউরোপীয়ানেরা সাধারণতঃ দশরথ-তনয়ের মতই সত্যসন্ধ, কিন্তু ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁহারা যখন লেখনী ধারণ করেন তখনই তাঁহাদের সেই সত্যসন্ধিৎসা হারাইয়া ফেলেন এবং ইতিহাস লিখিতে গিয়া উপন্যাস লিখিয়া বসেন। আমাদিগের প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা সম্বন্ধে ইউরোপীয় মহামহাপণ্ডিত বহুবর্ষব্যাপী রিসার্চ করিয়া কত কি আজগুবি তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন তাহার আর ইয়ত্তা হয় না। কৃষ্ণচরিত্র লিখিবার সময় বঙ্কিমচন্দ্র তাহার কিছু কিছু ইঙ্গিতে জানাইয়াছেন। তাঁহারা আর সবই জানেন কেবল জানেন না আমাদের সভ্যতার আদিম ভাষা সংস্কৃত, এবং আমাদিগের জাতিগত বৈশিষ্ট যাহা কিছু তাও ঐতিহ্য! তাই তাঁহারা অমন অবাধে অমন মনোরম ইতিহাস রচনা করিতে পারিয়াছেন। দেবদূতগণের অনধিগম্য স্থানে কোন এক শ্রেণীর জীব নাকি অনায়াসে গমন করিতে পারে। তাহাদিগের দলভুক্ত কোন ব্যক্তি যদি সত্যই বহু গবেষণার পর বাহির করিতেন রামায়ণ রামা যবন কর্ত্তৃক প্রথম বাংলায় লিখিত হইয়া পরে সংস্কৃতে ভাষান্তরিত হইয়াছে,—তাহা হইলেও আমাদিগের কিছু বলিবার থাকিত না। এইরূপ, বা ইহা অপেক্ষা আরও সুন্দর কত গুজব আমাদের ইতিহাসে পাকা পোক্ত স্থান পাইয়াছে তাহা কে বলিবে? অক্ষয় মৈত্র মহাশয় জীবনব্যাপী চেষ্টা সত্ত্বেও অন্ধকূপহত্যার মত অতবড় গুজবটা ভারত.ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে সরাইতে পারিলেন না। ইংরাজ ঐতিহাসিকদের গুণে সিরাজদ্দৌলা নরহন্তা আর ক্লাইভ হইল সাধু। লক্ষণ সেনের খিড়কিপথের পলায়নের গল্প কবে কে রচনা করিয়াছিলেন কে জানে, কিন্তু বাংলার মাটিতে তাহা বেশ লাগিয়া গিয়াছে। সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাসের মধ্যে

কত গুজব যে ছদ্মবেশে আছে তাহার খবর কে রাখে। কয়েক বৎসর হইল E. J. Thomson তাঁর "পদকের অপর পৃষ্ঠ" The Other side of the Medal, পুস্তকে সেই সকল গুজবের কতক কতক বিদুবিত করিয়াছেন। এই সম্পর্কে স্মরণ রাখিবেন এই E. J. Thomsonই আবার রবীন্দ্রনাথের কাব্য বিচার করিতে গিয়া বহু সুন্দর সুন্দর গুজবের সৃষ্টি করিয়াছেন। এ যেন ঠিক পদ্মার স্রোতধারা, একদিক ভাঙিয়া আর একদিক গড়িতেছে। গুজব সম্বন্ধে লিখিতে বসিয়া মেকলে, কীপ্লিং ও মিস্ মেয়োর নাম না করিলে উঁহাদিগের প্রতি অবিচার করা হইবে। মেকলে তাঁর সমস্ত প্রতিভা এবং অমৃতনিস্যন্দী ভাষার দ্বারা সারা জীবন কেবল গুজব রচনা করিয়া গিয়াছেন, আজও তাহা শত শত নরনারী আদরে পাঠ করিতেছে, তবে অবশ্য ইতিহাস না উপন্যাস ভাবিয়া কে জানে। মেকলে চতুর লোক, তিনি বুঝিতেন খাঁটি সত্য খাঁটি দুধের মতই হজম করা শক্ত, লাইব্রেরির তাক সাজাইয়া থাকিবার জন্যই তাহাদিগের সৃষ্টি। কার্লাইলের ফ্রেডরিক দি গ্রেট সত্যপ্রিয়তার জন্য প্রসিদ্ধ কিন্তু কই মেকলের ওয়ারেন হেষ্টিংস বা ক্লাইভের মত ত কেহই তাদের আদর করিয়া পড়ে না। কীপলিং তাঁর কাব্যে গল্পে উপন্যাসে ইউরোপ আমেরিকায় ভারতকে জানাইলেন এমন ভাবে যে, পাশ্চাত্য জগৎ ধরিয়া রাখিল ভারতে মানুষের চাইতে বাঘ ভালুক সাপ সহজপ্রাপ্য। The light that never was on sea or land, এই মহাজনবাক্য অনুসরণ করিয়া শুষ্ক কঙ্কালসার সত্যকে ত্যাগ করিয়া ভারতীয় সমাজজীবনে যে তথ্যের কোন আভাষই পাইলেন না, সেই সকল চমকদার বিবরণ ভারতের সম্পর্কে প্রচার করিয়া ভারতবর্ষকে সত্যের অত্যুজ্জ্বল আলোক হইতে আলোর আঁধারে স্থাপিত করিয়া খাঁটি রোমান্সের সৃষ্টি করিলেন, পশ্চিম বাহবা বাহবা করিয়া উঠিল, কীপ্লিং নোবেল প্রাইজের অধিকারী হইলেন। তারপর মিস মেয়োর "জননী ভারত" বা সাইমন সপ্তকের অপূর্ব্ব আবিষ্কার, ইহারা বড়ই নিকটের বস্তু, ইহাদের সম্বন্ধে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন—ইহারা মূর্তিমান গুজব।

সুতরাং আমরা দেখিলাম গুজব সামান্য নহে। আমাদিগের জীবনের বহু বিভাগে ইহার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ একচ্ছত্র আধিপত্য। ইহাকে এড়াইয়া আমরা একপা'ও চলিতে পারিনা। কবি কীট্‌স আক্ষেপ করিয়াছিলেন যে, বিজ্ঞান পৃথিবী হইতে রোমান্সকে নির্ব্বাসিত করিতে বসিয়াছে, চন্দ্রকে মনুষ্যবাসের অযোগ্য শুষ্ক গহ্বরসঙ্কুল প্রস্তরপিণ্ড বলিয়া দেখাইয়াছে, রামধনুর সাতরঙা সৌন্দর্য্যকে সূর্য্যরশ্মির ক্ষণিক সঙ্কলমায়া বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছে। আজ জীবন হইতে গুজব বিতাড়িত হইলে মানুষ আর পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিতেই চাহিবে না। পল্লীগ্রামের বৈকালিক নারীসমিতি উঠিয়া যাইবে এবং বাংলার বেকার যুবকবৃন্দ সত্যই সেদিন unemployed হইবে।*

শ্রীরাইমোহন সামন্ত

* কোনও সাহিত্যিক বৈঠকে পঠিত।



রূপকথা

শ্রীযুক্ত কর্ম্মযোগী রায়

বোশেখের আকাশ !...

পশ্চিম কোণ থেকে একটা কালো মিশ্ মিশে বুভুক্ষু মেঘ আকাশটাকে গ্রাস করবার জন্যে তেড়ে আসছে।... গাছের মাথায় মাথায় বাতাসের একটু ছোটাছুটি।...ঝাউ বনের মাঝে পড়ে থাকা সরু পথটা দিয়ে রমেশ আর বিমল হন্ হন্ করে চলেছে—নদীর ধারটায়। ঝুঁকে পড়া ঝাউ-গাছের রুদ্ধ পথটীতে দুজনের নিশ্বাস আটকে আসবার যোগাড় হয়েছে। ক্লান্ত ভাবে রমেশ বললে,—বিমল দা, বরাবর কি এই রকম পথ দিয়ে যেতে হবে ? বিমল হেসে বললে,—কখন তো পাড়াগাঁয়ে আসিস নি, সেইজন্যে তোর এত কষ্ট হচ্ছে, আর খানিকটা চললেই চওড়া রাস্তায় এসে পড়বি। ভীরু চোখ দুটো থম্ থমে বনের এদিক ওদিক ফেলে একবার আকাশের দিকে চেয়ে বিমর্ষভাবে রমেশ বললে,—বিমল দা, আকাশের যা গতি নদী পেরুব কি করে, দাদুকে আর শেষ দেখা দেখতে পাব না। চোখ দুটী তার আর্দ্র হয়ে এল। মিনিট পাঁচ গেল, তারা দুজনে এসে পড়ল মেঘে ঢাকা খোলাটে চওড়া রাস্তার উপরে। · প্রকৃতির বুক জুড়ে তখন দুর্য্যোগের ক্রন্দন সুরু হয়েছে, ঠিক যেন পতিহারা বিধবার চোখফাটা জল। দিনের আলো নিবু নিবু প্রায়, দুজনে নদীর ধারে এসে পৌঁছল। মাথার উপর গাছ পালার মট্ মট্ করে ভেঙে পড়ার শব্দ,...সামনে নদীর উপরে বিশ্বগ্রাসিণী ভীমা মূর্ত্তির পরিচয়।...উপায়হীন চোখ দুটো নদীর দিকে নিবদ্ধ রেখে দুজনে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। বট ঝোঁপের মধ্যে দিয়ে একটা ক্ষীণ আলোকরশ্মি রমেশের চোখে পড়ল। ব্যগ্রভাবে রমেশ বললে,—বিমলদা, ঐ যে আলো দেখা যাচ্ছে,...চল ঐখানে আশ্রয় নেয়া যাক্। দুপাশের বন ভেঙে ছুটল দুজনে।...

নদীর ভিতরে নেমে যাওয়া শেওলা পড়া ঘাটটার একটু দূরে একটা গোল পাতার ঘর। মাটী-লেপা জীর্ণ দেওয়ালের ফাঁকে ফাঁকে মনে হয় যেন কত যুগ ধরে কত কাহিনী কত অশ্রু জমাট বেঁধে রয়েছে। বুকে করে নিয়ে প্রাচীন ঘরখানা তবু কোনমতে দাঁড়িয়ে আছে। ছোট্ট ঘুলঘুলি দিয়ে আলোকরশ্মি টুকু আসছিল। দরজায় ধাক্কা দিতেই কুপিত ভাবে কে বলে উঠল, কে ! · তারপর তাদের সামনে এসে দাঁড়াল একটা কদাকার বুড়ো, রূপকথার দৈত্যের মত মুখখানা তার কুৎসিত ; বার্দ্ধক্যে ঝুঁকে পড়া দেহটা লাঠির ভরে সোজা করে, · ঝুলে পড়া শাদা ভুরুর তলায় মিট্ মিটে চোখদুটো দিয়ে দুজনের দিকে হাঁ করে চেয়ে আপ্যায়িত অভ্যর্থনা করে ঘরের ভিতরে নিয়ে গেল। ভাঙা চৌকির উপর বসে দুজনকে বসতে দিয়ে বুড়ো বিকট শব্দ করে হাসতে লাগল। রমেশ রোমাঞ্চিত হয়ে খানিকটা তফাতে এসে বসল, বুকের ভিতর তখন তার দুরদুর করছে। বিমলের সাহসটা কিছু বেশী ছিল, সে জিজ্ঞেস করলে, আপনি হাসছেন কেন ? বুড়ো আর একবার হেসে নিয়ে কর্কশ ধরা গলায় বলে যেতে লাগল, তোমাদের সাহস দেখে, ·· আমায় গ্রামের লোক ভাবে আমি একটা ভূত—তাই এ ত্রিসীমানায় কেউ আসে না ! কিন্তু আমি তোমাদেরি মত মানুষ। তোমাদেরি মত আমার বাড়ী ঘর ছিল,...তবু আমি ছন্ন ছাড়া,...ভূতই বটে·· বিকট শব্দ করে সে হাসতে লাগল।. দুজনে ভয়ে শিউরে উঠল। বুড়ো বললে,—আমার রূপকথা শুনবে ? সাহসভরে বিমল বল্লে,—হাঁ ! আর একবার হেসে নিয়ে বুড়ো আরম্ভ করলে,··আসবার সময় পথের বাঁকটায় পাকুড় ঝোপের পাশে ঐ মস্ত বাড়ীখানা দেখেছ বোধ হয় ? · না-না আমারি ভুল হয়েছে, পোড় ইঁটের স্তূপ দেখেছ ? বিমল মাথা নেড়ে বললে, হাঁ।...ঐটে আমার বাড়ী, ··হাঁ, সে আজ ষাট বছর আগে তখন আমার

বয়েস বাইশ বছর ছিল, সামান্ত একটু লেখাপড়া শিখে-ছিলাম। হঠাৎ বাবা গেলেন মরে, সম্পত্তির অধিকারী হলাম আমি। বুঝতেই ত পার'ছ ঐ বয়সে সম্পত্তি পেলে লোকের যা হয়,···নেশা ভাঙে সিদ্ধ হলাম, জুয়াখেলাতেও বড় কমতি গেলাম না। দূর সম্পর্কের এক খুড়া ছিলেন, মা তার অনেক দিন আগেই মারা গেছলেন, তিনি ধরলেন বিয়ে করতে ;···কিন্তু রঙিন মন একটা ধরা বাঁধা গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকতে চাইল না।···সেদিন ফাল্গুনের কি তিথি ছিল মনে নেই···আবার সেই বুক ফাটা হাসি। তারপর আবার চালাল,··নদীর ঘাটে নাইতে যাচ্ছিলাম,··কাছ বরাবর আসতেই থমকে দাঁড়ালাম,···চৌধুরী বাড়ীর মলিনা ···ফুটফুটে কচি চেহারা, মাথায় এক ঝাঁকড়া কোঁকড়া চুল, দুধে আলতা রং···ভোরের রাঙা আকাশ···ফিকে বসন্তি রঙের কাপড়খানা পরাতে রূপের জৌলস আরো দ্বিগুণ হয়েছে,··· আমি তাকে ভালবেসে ফেললাম ;···ঘরখানা কাঁপিয়ে আবার হাসির লহরী। তারপর থেকে নিত্য সকাল সন্ধ্যায় নদীর ঘাটটায় চলে-আসা ঝাউবনের মাঝ দিয়ে আঁকা বাঁকা লাল পথটায় তাকে দেখি।···সেদিন সন্ধ্যের ঝোঁকে থিয়াটারে রিহার্সাল দিয়ে নদী ধরে ফিরছিলাম, ঘাটের কাছে মলিনাকে দেখে সাহস করে সামনে এসে বললাম,··· আমি তোমায় ভালবাসি।····· দূরে ভাঙা ঘাটটার দিকে বুড়ো ফাল ফাল করে চেয়ে রইল। দুজনে দেখল বুড়োর কদাকার মুখখানাতে বিচিত্র ভাবের সমারোহ। বিমল বললে, তারপর কি হ'ল?··হ্যাঁ, সে বললে, তুমি বড় কুৎসিত,···তারপর ঠোঁটের কোলে মুচ্‌কি হেসে পালিয়ে গেল। মনটা আমার আনন্দে ভরে উঠ্‌ল।······মলিনাকে পাস এর চেয়ে সুখের কি আছে। পরদিন থিয়াটারের দলবল নিয়ে অনেক দূরে প্লে করতে গেলাম, ফিরতে চার পাঁচ দিন হ'ল ··চৌধুরীদের বাড়ীর কাছে আসতেই প্রাণটা কেমন করে উঠ্‌ল,···কেঁপে কেঁপে পূরবী সুরে ভেসে এল সানাইয়ের আওয়াজ,···শুনলাম মলিনার বিয়ে। বাড়ী ফিরে জিনিষ পত্তর গুছিয়ে বেরিয়ে পড়লাম,—সে আজ আটাশ বছর আগে। তারপর সোজা গিয়ে উপস্থিত হলাম ব্রহ্মদেশে,·· ·· বন্ধু বান্ধব জুটে গেল হাতের অর্থ নিঃশেষ হ'ল।···অর্থের পথ অবরুদ্ধ দেখে কয়জন মিলে জাল জুয়াচুরী আরম্ভ করলাম,...বছর দশেক বেশ কেটে গেল, ···হঠাৎ বিমল বলে উঠ্‌ল,—তখনও কি বিয়ে করেন নি? এবার তার মুখে আর বিকট হাসি নেই, শাদা ভুরুর নিচে আর্দ্র চোখদুটী বিমলের দিকে ফেলে বললে,···না,···তারপর পুলিশের হাতে ধরা পড়লাম ;·· দীর্ঘ বারটা বছর হাজত বাস করে ফিরে এলাম নিজের দেশে ;···বসত বাড়ীটা তখন বিরাট ভগ্নস্তূপ হয়ে অস্তিত্বের সাক্ষ্য দিচ্ছে,···এইখানে বাসা বাঁধলাম,·· এটাই আমার জীবনের পুণ্যতীর্থ।···ঐ ঘাটে দুটী বেলা মলিনাকে দেখতে পাই,···আমার মত তার দেহটা নুয়ে পড়েছে,—মাথায় সাদা রঙের পোঁচ পড়েছে, পরণে থান, নাতনীদের নিয়ে নাইতে আসে,·:·এখনও তাকে ভালবাসি, · আমরা দুজনেই পর পারের খেয়ার অপেক্ষা করছি,···এক সঙ্গেই যাব।··· ··

·· বাইরে পূবের আকাশে চাঁদের মেলা। পশ্চিমে প্রেতপুরীর অন্ধকার। বুড়োর কোঁচকান গালের উপরে জমাট বাঁধা অশ্রু।*········ ·····

* (রুশ গল্প অবলম্বনে—)



তুমি যদি ভুলে থাকো

শ্রীঅমিয়জীবন মুখোপাধ্যায়

"আমারে গিয়াছ ভুলি ?" সহসা এ বিদায়ের ক্ষণে
নিভৃতে আহ্বান করি' মোরে তুমি গোপনে গোপনে
শুধাইলে, বক্ষ পাশে দুটি মোর কর টানি' ল'য়ে—
"মোরে চিনিলে না ?"
প্রিয়, আজি আমি যাই তবে ক'য়ে—
বহুক্ষণ চিনিয়াছি। সেদিনের সেই সন্ধ্যা খানি
আমার অন্তর ভরি' যে মুহূর্ত্ত দিয়াছিল আনি'
ওই আকাশের তলে শান্ত স্থির ধ্রুবতারা সম
সেই পুণ্য মুহূর্ত্তটি রহিয়াছে এ জীবনে মম
নিঃশব্দে অঙ্কিত হ'য়ে—চিরদিন সুন্দর অক্ষয়
নিস্পন্দ নিশ্চল। শুধু মোর মনে জাগে আজি ভয়
তুমি যদি ভুলে থাকো। নদী তীরে সেই বহু-দূর
কুটীরের পাশে মোর সে দিনের বেদনা-বিধুর
সন্ধ্যার করুণ হাসি দিগন্তের বিস্মৃতির ছায়ে
কেমনে মুছিয়া গেল নিখিলের নয়নে বুলায়ে
আরক্ত-মিনতি-টুকু—হে আমার প্রিয়, মোর কাছে
আজিকার সন্ধ্যা-সম এখনো তা' সত্য হ'য়ে আছে
মর্ম্মের গোপন তলে। মনে পড়ে সেই নদী তীরে
তুমি এসে একদিন বালুকার পরে ধীরে ধীরে
নীরবে বসিয়াছিলে, তোমার বিষণ্ন আঁখি দুটি
কি যেন বেদনা-ভরে অদূরে পড়িয়াছিল লুটি'
আপন অতৃপ্তি ল'য়ে যেথা শ্রান্ত ক্রন্দনের স্বরে
দুলিয়া উঠিতেছিল তরঙ্গের অস্ফুট মর্ম্মরে
তটিনীর ক্ষুব্ধ-বক্ষ-খানি। সহসা পশ্চিম হ'তে—
ডম্বরু-গর্জ্জন-তালে জটাচ্ছন্ন অন্ধকার পথে
আঁখির বিদ্যুৎ-বহ্নি চমকিল প্রলয়-নিশ্বাসে
মহাকাল ভৈরবের ; ধূসরিত প্রান্তরের পাশে
সুদূরের সীমা-রেখা নিমেষেতে গেল লুপ্ত হ'য়ে
আর্ত্ত-কোলাহল মাঝে।
সচকিত বিপুল বিস্ময়ে
মোর ক্ষুদ্র কুটীরের বাতায়ন পথে সেই বেলা
হেরিতেছিলাম বসি' বাহিরের সে গম্ভীর খেলা
একাকিনী শঙ্কিত-পরাণে। তুমি ক্ষণকাল পরে
নিকট আশ্রয় খুঁজি' মোরি আয়োজন-হীন ঘরে
দাঁড়ালে ত্বরিত পদে! ক্ষণিকের হে পান্থ, হে প্রিয়,
সেই দিন গৃহ-তলে যে আলোকে হ'ল রমণীয়
আমার প্রদীপ-শিখা, আজো মোর নিশীথ-শয়নে
শিহরি' শিহরি' উঠি'—মুগ্ধ দুটি নয়নে নয়নে
কোন্ স্বপ্ন-পথ বাহি' নিত্য তাহা পলকে পলকে
মোরে নিয়ে যায় চলি' কোন্ সুদূরের কল্প-লোকে
নিঃশঙ্ক-রোমাঞ্চ সুখে।
অবশেষে সে যে কোন্ ক্ষণ
সম্বরি' নিলেন রুদ্র আপনার তাণ্ডব-নর্ত্তন,
নভ-সায়রের নীলে চন্দ্রমার আলিঙ্গন-তলে
জ্যোস্না-তরঙ্গের বুকে নক্ষত্র-অপ্সরী দলে দলে
মেঘের বসন ফেলি' আরম্ভিলা নগ্ন জল-কেলি—
তা'ও পড়ে মনে। তুমি প্রশান্ত সুন্দর আঁখি মেলি'
চাহিলে আমার পানে—মাগিয়া বিদায়। আন্‌মনা
সহসা হেরিলে বুঝি কি ব্যাকুল-পিপাসার কণা
জাগিয়া উঠেছে মোর অধরের শুষ্ক-রেখা পরে
কুণ্ঠিত সরমে। হ'লে বিস্ময়-বিহ্বল ক্ষণ-তরে –
তার পরে ধীরে ধীরে মোর নত মুখটিরে টানি'
লাজরক্ত চুম্বনের পরিপূর্ণ সুধাপাত্র খানি
নিঃশব্দে ঢালিয়া দিলে। কবে প্রিয় সেই নদী তীরে
ক্ষণিক আশ্রয় লভি' মোর গুপ্ত-বেদনার নীড়ে,
আজো স্মরি—ফিরে মোরে গেলে সেই বিদায়ের বেলা
কি সে কামনার ধন!
তার পরে একেলা একেলা

কতদিন হেরিয়াছি— মর্ম্মরিয়া দূর ছায়া-ই
সন্ধ্যা আসিয়াছে ল'য়ে কণ্ঠ-ভরা বন্দনার গীতি
প্রেম-আরাধনা লাগি' নিখিলের চরণের তলে।
সাজায়ে রেখেছে অর্ঘ্য ঝরি'-পড়া ম্লান ফুল-দলে,
অঙ্গ নীলাঞ্চলে ঢাকি' চলিয়াছে লুব্ধ অভিসারে
আপনারে স'পি' দিতে। কতদিন সেই নদী-পারে
কাহারা ব'সেছে এসে, আবার গিয়াছে চ'লে ফিরে—
আমার অন্তর খানি তারি মাঝে নয়নের নীরে
খুঁজিয়াছে একখানি পুরাতন পরিচিত মুখ
কতবার ব্যগ্র অনুমান লয়ে! আকাশের বুক
গুরু-সুগম্ভীর রবে দুলিয়া উঠেছে মেঘ-ভারে
বিপন্ন তরণী হ'তে কতদিন আর্ত্ত-হাহাকারে
শঙ্কিত কাণ্ডারী সেই প্রান্তরের দূর সীমা-শেষে
হারায়ে ফেলেছে কণ্ঠ ; তারি সাথে বিষণ্ণ-আবেশে
নিরুদ্ধ-নিশ্বাস মোর লুটায়ে প'ড়েছে গৃহ-কোণে
ব্যথিত-প্রাঙ্গণ-পরে। কতবার শুধু অকারণে,
নিরর্থ ইঙ্গিতে তা'র কাছে যেতে নিয়ত 'আহ্বানি'
কুটীরের পাশে মোর বারেবারে-চাওয়া পথ খানি
ছলনা ক'রেছে মোরে! বক্ষ মোর গেছে লাজে ভ'রে—
তবু প্রিয়, কতদিন পুনরায় ভুল ক'রে ক'রে
মোর চেনা পথটীরে শুধায়েছি অতি চুপে চুপে—
"সে কি এসেছিল?"
শেষে একদিন সে যে কোনরূপে
বাহিরে দাঁড়ানু আসি—সাথী-হারা কুটীরের প্রতি
নীরবে জানায়ে মোর জীবনের বিদায়-প্রণতি
অঞ্চলের প্রান্ত তুলি' শুষ্ক-বারি মুছি' দু'নয়ানে—
তাই শুধু গেছি ভুলে। তার পরে অজানার পানে
যাত্রা সুরু হ'ল মোর।—চ'লে গেছে কত দীর্ঘ দিন
যে আশা ফুটেছে প্রাতে—হইয়া এসেছে ম্লান, ক্ষীণ—
অবসন্ন-অপরাহ্নে। কভু মোর এলানো অলকে
লাগিয়াছে কপোলের ক্লান্তি-স্বেদ। রক্ত-অলক্তকে
রঞ্জিত চরণ দুটি বারে বারে আসিয়াছে থেমে
বন্ধুর পথের পরে। শ্রান্ত রবি ফিরে গেছে নেমে
নিশীথ-শয়ান লাগি' নিরালায় অস্তাচল পানে।
আমি শুধু চলিয়াছি নিরুদ্দেশ তোমার সন্ধানে
প্রত্যহের মরীচিকা ভেদি'—। ওগো প্রিয়, আজিকার
সুন্দর প্রভাত বহি'—আনিয়াছে মোর তরে তার
শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ খানি। আজিকার প্রসন্ন প্রভাত
আমার বেদনা পরে করেছে করুণ আঁখিপাত
শুনিয়াছে অন্তরের বহু দিবসের মৌন বাণী
আমারে এসেছে ল'য়ে—ধরি' মোর কম্প্র বাহু-খানি
তোমার প্রাসাদ-দ্বারে! উৎসবের আনন্দ-পতাকা
উড়িছে তোরণ-পথে, গৃহ তল নানা-বর্ণে ঢাকা
মর্ম্মর-সোপান ঘেরি' আলোক-উজ্জ্বল স্তম্ভ পরে
চন্দ্রাতপ শিহরিত গুণীর বিচিত্র বংশী-স্বরে,
—অমরার ইন্দ্রপুরী! তোমারে হেরেছি তা'র মাঝে
অগুরু-চন্দন-গন্ধ রতন-খচিত দীপ্ত সাজে—
সেই মোর পরিচিত আঁখি দুটি! সারা দিনমান
কত জনে এসে এসে ফিরে গেল ল'য়ে তব দান—
আমি শুধু চাহি নাই। যা'র লাগি হে প্রিয় আমার,
এসেছিনু দ্বারে তব তুচ্ছ করি' কলঙ্কের ভার
তাই যদি মাগি'—আর যদি না তোমার মনে পড়ে
কবে পথ ভুলে যাওয়া নদী তীরে মোর দীন ঘরে
নিমেষের পরিচয় ; লাজ-রচা-কাঙালিনী বেশে
তুমি যদি হের ঘৃণা-ভরে ; প্রিয়, তাই দিন-শেষে,
তপ্ত-দীর্ঘ-শ্বাস ল'য়ে আমি চ'লে যেতেছিনু ফিরি'।

তারি স্মৃতি আজো মোরে রাখিয়াছে স্বপ্ন-লোকে ঘিরি',
—তুমি যদি ভুলে থাকো—জাগে ভয়, সেই সন্ধ্যাটিরে,
তুমি যদি ভুলে থাকো সেই সে কুটীর-নদী তীরে!

পদ্ম-পত্র

শ্রীযুক্ত জ্যোৎস্নানাথ চন্দ বি-এ

এক

দিনের দীপ্তি নিবন্ত-প্রায় !

জানালা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া বসিয়া ছিলাম। সন্ধ্যার ম্লানিমা মনটাকে ঘোলাটে করিয়া তুলিয়াছিল।

—মিটার, এই সন্ধ্যাবেলা প্যাঁচার মতন মুখ করে আকাশের দিকে চেয়ে কি ভাব্‌চো বল দিকিন্? বেগুকা—বৌদির কথা, নয়? ঠিক্ ধরেচি আমি!

চাহিয়া দেখি প্রাণীটি আর কেহই নহেন ঝুন্নী। ধুবড়ীতে আসা অবধি এই মেয়েটি সময়ে-অসময়ে ঢেরবার খোঁজ-খবর করিয়াছে, উপদ্রবও কিছু কম করে নাই কিন্তু তথাপি মনটাকে কি করিয়া যে খুসী রাখিতে হয় তাহার ঔষধ বাতলাইয়া দিতে ইহার সমকক্ষ মেলা ভার।

হাসিয়া বলিলাম—কিন্তু তোমার ব্যাপারখানা কি বলতো? আজ বুঝি 'স্কিপিং'এ মন বসেনি, না ওই পাড়ার সেই কুঁচুলী কিরিঙ্গি মেয়েটার সঙ্গে ঝগড়া করে এসেচো?

—ঝগড়া করাটা আমার স্বভাব নাকি?

ঝগড়া করার কথাটা যাঁহাতক্ বলিয়াছি অমনি দেখি ঝুন্নীর মুখ-চোখ কালো হইয়া গেছে। অভিমান হইলে মুখ-চোখ কালো করা ঝুন্নীর ধরণ।

মৃদু পিঠ চাপড়াইয়া বলিলাম—কী silly তুমি ঝুন্নী, একটু ঠাট্টা করলুম্ আর তুমি স্রেফ্ চটে গেলে! আচ্ছা, এই আমি নিজের কাণ নিজে মলছি আর বল্‌ছি যে ঝুন্নী কখ্‌খনো ঝগ্‌ড়া করে না, সে অতি ভালো মেয়ে……

ঝুন্নীর মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। হাত দিয়া আমার মুখটা চাপিয়া ধরিয়া বলিল—রাখ তোমার কাজলেমি। এখন চলো তো মলের দিকে; কাল্‌কে একটা পার্টি আছে কিনা সেইজন্তে ভাল একজোড়া মোজা কিন্‌তে হবে। মোজাটা কি রকম হবে জান? একেবারে স্নো-হোয়াইট!

ঝুন্নী হয়তো পুরো দশমিনিট ধরিয়া তার মোজাটা কেমন হওয়া উচিত তাহারই ব্যাখ্যা করিতে লাগিয়া যাইত অথচ কিনিবে কিন্তু সে নিজেই। তাহার ঔচিত্যের ব্যাখ্যাটাকে ছোট্ট করিয়া কাটিয়া দিবার ফন্দী আঁটিয়া বলিলাম ঝুন্নী, মোজা যখন কিনবে তখন কিন্‌বে এখন যদি টাফি খাবার লোভ থাকে তো এই নাও! এই বলিয়া ক্লাবট্রিব এক প্যাকেট টাফি অগ্রসর করিয়া দিলাম।

ঝুন্নী হঠাৎ মুখ গম্ভীর করিয়া গোটা কয়েক টাফি-কেক্ একসঙ্গে মুখে পুরিয়া চোখ বন্ধ করিল এবং তারপর বলিতে সুরু করিল—মিটার অতি ভালো ছেলে। মিটার আমার জন্তু টফি রাখে, মিটার নিয়মিত পড়া করে এবং ক্লাশে ফার্ষ্ট হয়…

তারপর ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিল। চোখ খুলিয়া কহিল—মিটার, তুমি এই ক্লাবট্রিকে একটা সার্টিফিকেট দিতে পারো না? চমৎকার কিন্তু এর টাফিগুলো! গ্যাখো, তুমি ওকে একটা চিঠি আলবাৎ লিখো তাতে কিন্তু আমার নামও থাক্‌বে; ধর এই রকম… I've pleasure to say that I'm a regular purchaser of your toffee for my sister Nancy who is just very fond of it……

টাইটা বদ্‌লাইয়া ঠিক্‌ঠাক করিয়া গায়ে একটা কোট চড়াইয়া বলিলাম—আচ্ছা সুবিধে মতো একটা সার্টিফিকেট দেওয়া যাবে এবং তাতে নিশ্চয়ই তোমার নাম থাক্‌বে in Capital letters তোমার মোজা কিন্‌তে ইচ্ছে থাকলে এক্ষুণি চলো।

পথে বাহির হইয়া পড়িলাম। মনের কোণে যে জঞ্জালগুলা জমা হইয়া উঠিয়াছিল এই মেয়েটার পাল্লায়

পড়িয়া সেগুলি অকস্মাৎ যেন কোন ফাঁকে অলক্ষিতে পালাইয়া গিয়াছিল। বাহিরে জ্যোৎস্নার আলো প্রকৃতির চারিভিতে কাঁচা সোনার রঙ ধরাইয়া দিয়াছে। মৃত্যু-বিলাসী কীট্‌সের কথা মনে হইল; এমনি আলো-আকুল রজনীতে বুঝি মৰ্ডলিনের মাধুর্য্যে তাহার সকল চিত্ত ভরিয়া উঠিয়াছিল। On the Eve of St. Agnes এর জগতে যেন আপনাকে মুহূর্ত্তের মর্চ্ছনায় পাইয়া বসিলাম। সহসা এ স্বপ্ন ভাঙিল।

রুন্সী ঠিক্ পথের মাঝখান দিয়া চলিতেছিল। দেখিলাম একটা মোটর বিশ্রী রকম স্পীড্ দিয়া আসিতেছে; রুন্সীকে তাড়াতাড়ি এক রকম টানিয়াই পথের একপাশে আনিলাম। একখানি অষ্টিন ক্রস করিয়া চলিয়া গেল।

রুন্সী ভয়ানক চটিয়া বলিল—মিটার, আমাকে টান্‌লে কেন? যে স্পীডে ড্রাইভ করছে দেখিয়ে দিতুম্ হতচ্ছাড়া সোফারকে। রুন্সীকে চাপা দিয়া গেলে সে কি করিত না করিত ইহাই হইল রুন্সীর মহা সমস্যা!

বলিলাম—কিন্তু ওরা তো জানে না, রুন্সী, যে তোমার বাবাই হচ্ছেন ডেপুটী কমিশনার এবং তাঁর একটি মাত্র আদুরে মেয়েকেই ওরা চাপা দিতে গিয়েছিল।

কথা বলিতে বলিতে মার্কেটের পাশে আসিয়া পড়িয়াছিলাম।

একটা দোকানে ঢুকিয়া অনেক সাধ্য-সাধনার পর একজোড়া মোজা কিনিয়া টাকাটা ফেলিয়া দিলাম। পড়া-শুনাটা সেদিন কিছু বেশী রকমেই করিয়াছিলাম। মাথাটা বেশ একটু গরম বোধ হইতেছিল। কাজেই একটা কোল্ড ড্রিঙ্ক্‌এর দোকান দেখিয়া ঢুকিয়া পড়িলাম এবং দুইটা আইস্‌ক্রিম্ অর্ডার দিলাম।

ফিরিবার পথে রুন্সীদের বাড়ীর গেটে যখন পৌছিলাম তখন ন'টা বাজিতে মিনিট কয়েক মাত্র বাকী ছিল। রুন্সীকে বলিলাম—তুমি এখন বাড়ী যাও; আমি আমাদের কুটীর দিকে চলি।

রুন্সী মুখে মৃদু হাসি লইয়া কহিল—বাঃ! বেশ মজা তো; গেট্ অবধি এলে আর বাবার সঙ্গে দেখাটা পর্য্যন্ত করে যাবে না? মাও বাড়ী আছেন দেখ্‌চি···দেখচোনা তাঁকে —ওই যে হল-ঘরের মধ্যে, পিয়ানোটার পাশে······

—কিন্তু বড্ড রাত হয়ে গেছে যে রুন্সী; ভেতরে গেলে আরও দেরী হবে। গুড্ নাইট, রুন্সী!

—গুড্ নাইট মিটার · Cheerio!

বাবাকে যখন ধুবড়ীর অফিসিয়েটিং ডি, এস্, পি করিয়া বদলী করিল তখন মনটা সহসা বড় প্রসন্ন হইয়া উঠিয়াছিল যে, সোসাইটী পাইয়া বেশ একটু সুখেই আসাম-দেশে গোটা কয়েক দিন কাটানো যাইবে। কিন্তু আসিয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে বড়ই ক্ষুণ্ণ হইলাম। এখানকার বাঙালী কলোনীটার মধ্যে হিংসা-দ্বেষের বহর দেখিয়া রীতিমত ভড়্‌কাইয়া গেলাম, সামাজিক জীবনের ক্ষীণ রশ্মিটুকুন্‌ও চোখে পড়িল না। আর তা ছাড়া একটু লাজুক বলিয়াও দশজনের সঙ্গে পরিচয়ের পালা জমাইতে পারিলাম না। নিজেই নিজেকে Jerome K. Jerome'র ভাষায় সান্ত্বনা দিলাম "all great literary men are shy!" একটু আধটু সাহিত্য-চর্চ্চা করিতাম বলিয়াই হয়তো এই টানিয়া-আনা-যুক্তিটাকে বাহির করিয়া মনে বেশ খুশী আসিল। কতগুলা জানাশুনা মিথ্যাকে লইয়া খেলিবার বিলাসিতা আমাদের যেন সময় সময় পাইয়া বসে। আমিও এই মিথ্যাটার মধ্যে নিজেকে ছাড়িয়া দিয়া মনে মনে কিছুটা শান্তি পাইলাম। লাভের মধ্যে দাঁড়াইল এই যে আমি ধুবড়ীতে পুলিশ সাহেবের বাঙলোয় নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিতে লাগিলাম। সুতরাং বাধ্য হইয়া পুঁথির পাতা আমার পরম বন্ধু হইয়া দাঁড়াইল। এই নিঃসঙ্গতার মাঝখান হইতে যে প্রাণীটি আমাকে উদ্ধার করিল সে হইতেছে রুন্সী।

বিকালের দিকে একটা আর্দালিকে সঙ্গে করিয়া পথে বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলাম। পথে এই মেয়েটির সঙ্গে দেখা—কথা নাই বার্ত্তা নাই সোজাসুজি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল—মিটার, তোমাকে তো আর কখ্‌খনো ধুবড়ীতে দেখিনি। নামটি জিজ্ঞেস্ করতে পারি কি?

না হাসিয়া থাকিতে পারিলাম না। বারো তেরো

বছরের এই য়ুরোপীয়ান মেয়েটী গোটা ধুবড়ীর সবক'টী বাসিন্দাকেই চেনে নাকি! আমি কিছু জবাব দিবার পূর্ব্বেই আর্দ্দালী সমঝাইয়া দিল যে এটী ডি, সি, ষ্টার্লিং সাহাব্‌কো লেড়কী।

কহিলাম—মিস্ ষ্টার্লিং, তোমার তো সাহস দেখচি খুব। তুমি কি সহরশুদ্ধ সব্বাইকেই চেন নাকি?

—সহরের সবাইকেই জানি আর না জানি তুমি যে নতুন আদ্‌মী এটা তো ঠিক্ ঠাউরেচি। তা নামটা বললে বিশেষ কিছু ক্ষতি হত কি?

গলার বেশ খানিকটা ঝাঁঝ লইয়া মেয়েটী কথা কয়টি কহিল; বুঝিলাম বেশ খানিকটা চটিয়াছে। এই সাহসী, সপ্রতিভ মেয়েটীর সঙ্গে ভাব করিয়া লইতে সাধ গেল।

—আমার নাম মিটার, মিস্ ষ্টার্লিং। পুলিশ সুপারিন্‌টেনডেণ্ট মিঃ মিটার আমার ফাদার। তা তুমি আজ থেকে আমার বন্ধু হলে, কেমন রাজী আছ তো?

—আমার বয়ে গেছে তোমার বন্ধু হতে; আমার দায় পড়েচে তোমার সঙ্গে ভাব করতে। পথের চেনা বৈ-তো নয়।

সে যেমন ভাবে গোড়ার আলাপ সুরু করিয়াছিল তেমনি সহজ, সচ্ছন্দ ভাবে লম্বা লম্বা পা ফেলিতে ফেলিতে চলিয়া গেল। ভাবটা এমন যেন কিছুই হয় নাই।

ন্যান্সীর সঙ্গে আমার আলাপের ইতিহাস এইটুকুনই।

দু'

সেদিন সকালে আইভর ব্রাউনের ইংলিশ পলিটিক্যাল্ থিয়োরী বইখানার আনাচে কানাচে চোখ মিলাইয়া ফিরিতে-ছিলাম।

—গুড্ মর্ণিং মিষ্টার মিটার!

চাহিয়া দেখি সেদিনকার চেনা সেই মেয়েটী একটা প্রকাণ্ড ব্লাড-হাউণ্ড লইয়া আসিয়া হাজির।

হাসিয়া কহিলাম গুড্‌মর্ণিং টু ইউ মিস্ ষ্টার্লিং, আজ ভোরে আপনাকে আমাদের কুঠিতে পাবার সৌভাগ্য কি করে হল জানতে পারি কি?···

আমার কথা যে সে কিছু গ্রাহ্য করিল এমন তো মনে হইল না। গম্ভীরভাবে কুকুরটার 'কলার'-টা ধরিয়া টানিয়া ঘরে ঢুকাইয়া সামনের ইজি চেয়ারটাতে পা তুলিয়া দিয়া সে বসিয়া পড়িল। একবার আমার 'ষ্টাডি'-টার সমস্তটা ভালো করিয়া দেখিয়া লইল, তারপর একটু মৃদু হাসিয়া বলিল—মনে মনে খুব চটেছেন মিষ্টার মিটার না? যে মেয়েটা কী দুষ্টু, কী অসভ্য! তা আমার দোষটাই বা কি বলুন? আপনিই তো প্রথম দোস্তীর দরখাস্ত পেশ করেচেন···আমিও তেম্‌নি লিবার্টি নিচ্ছি! আর দেখুন, আমার নাম হচ্ছে ন্যান্সী তাই বলেই ডাকবেন। And from now and on am no Miss Sterling: just the naughty, little Nancy.

এম্‌নি সময় মা আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন। ন্যান্সী তাড়াতাড়ি চেয়ার হইতে উঠিয়া মার পায়ে মাথা ঠেকাইয়া শ্রেফ্ মস্ত এক প্রণাম। তারপর হাসিয়া কহিল—মাসীমা, দেখুন্ এবারে আমার প্রণাম করার মধ্যে এতটুকুন্ ভুল হয়নি খাঁটী ইণ্ডিয়ান্ 'প্রোণাম্'। বলুন্ না ঠিক্ হয়েচে কিনা?

এই বলিয়া মা'র আঁচলটা টানিয়া ধরিল। পাঁচ বছরের মেয়ের মতনই তাহার আব্দারের ধরণ! তখনকার মতন ব্রাউনের বইখানি মুড়িয়া রাখিয়া হাসিয়া বলিলাম—That's wonderful, Nancy! Passed with honours. ন্যান্সী মহা খুসী! এম্‌নি করিয়া পথের বন্ধুত্বকে ন্যান্সী বাড়ীতে আসিয়া চিরকালের জন্য পাকাপাকি করিয়া গেল। আমার ধুবড়ী-প্রবাসের মধ্যে মাঝে মাঝে যে দু'চারকণা আনন্দের রশ্মি স্বর্গলোকের বাতায়ন হইতে ছিটকাইয়া আমার অদৃষ্টে পড়িত সে ওই মেয়েটীর মমতা-স্নিগ্ধ মনটীর জন্যই। ছেলেবেলায় যখন মেজমামার সঙ্গে লণ্ডনের গোল্ডার্স-গ্রীন পাড়ায় থাকিতাম তখন ন্যান্সীর মতনই একটী মেয়ের সঙ্গে আমার ভয়ানক ভাব হইয়া গিয়াছিল। গোল্ডার্স-গ্রীন ছাড়িয়া যখন আমার ব্লুমস্‌বারীতে একটা ফ্ল্যাট্ লইলাম তখন সেই মেয়েটী পুরো দুটী রাত নাকি ঘুমায় নাই। সে আজ বছর আটেকের কথা; পুরোণোদিনের স্মৃতির খাতায় একটা পরিচয়ের পলক মাত্র। ফাদার গুড্‌ডাফের Scotch brogueও আজ আমাকে হজম করিতে হয়না বা ল্যাটিন কনজুগেশানের ভীতিও আজ আর আমার চারিপাশে ত্রাসের

সঞ্চার করিতে পারেনা। ভারতের মাটীতে স্থলীকে দেখিয়া আজ আবার আমার গোল্ডার্স-গ্রীনের স্নিগ্ধির কথা মনে পড়িয়া গেল; কেন জানিনা অকারণে চক্ষু দুইটা সজলও হইয়া উঠিল।

মানুষের জীবনে কয়েক্‌টী মুহূর্ত্ত আসিয়া পৌছায় যখন তাহার পিছনের দিকে তাকাইবার এতটুকুন্ সময় থাকেনা; অবকাশের আকাশ উবিয়া যায়। আমি যখন ধুবড়ীর রাঙা সুরকির পথ ছাড়াইয়া আবার কলিকাতার কোলে গিয়া পড়িলাম তখন আমার সেই অবস্থাই হইয়া দাঁড়াইল। সেই হিষ্ট্রী অফ্ লিটেরেচার, সেই ফিলোলজী, সেই সেক্সপীয়ার ইহার কোনটার পাতায়ই স্থলীর নাম নাই। ভুলিয়া গেলাম ধুবড়ীর সযত্নে ব্যবহৃত কয়েক্‌টী সোনার দিন। ভুলিয়া গেলাম সেখানকার সেই আব্দারে মেয়েটার লক্ষ-কোটী ফুট্-ফর্‌মাইসের ইতিহাস। মাঝে মাঝে যখন হষ্টেলের পাশের বাড়ীর শাসন-ভীরু ডেপুটী বাবুর চঞ্চল ছোট্ট মেয়েটীকে দেখিতাম তখন ধুবড়ীর সেই য়ুরোপীয় মেয়েটী বিস্মৃতির সকল শিকল ডিঙাইয়া অবলীলায় আসিয়া মনোলোকে ঘা মারিত। আবার ভাবিতে বসিয়া যাইতাম যে পাঁচটা বাজিতে না বাজিতেই আমাকে গিয়া টেনিস্-লনে হাজিরা দিতে হইবে, খানিক্‌টা বকুনী শুনিতে হইবে, খানিক্‌টা আব্দার সহিতে হইবে আর সঙ্গে সঙ্গে খানিক্‌টা সহজ অশ্রুজল দেখিতে হইবে। রবীন্দ্রনাথের "কাবুলীওয়ালা" পড়িয়া ভাবিয়াছিলাম যে আফ্‌গানীস্থানের অগুন্তি আঙ্গুরের রসেই টলোমলো ছিল কাবুলীওয়ালার চওড়া বুকটা তাই অতো সহজেই সে মিনিকে ভালোবাসিয়া ফেলিতে পারিয়াছিল—তাহার বুভুক্ষু পিতৃ-হৃদয়ের স্নেহ-কাতরতাকেও সুপ্রচুর তারিফ্ করিয়াছিলাম। স্থলীর পাল্লায় পড়িয়া বুঝিলাম যে দুনিয়ায় মিনিদের জন্যই মানুষের কাছে মাঝে মাঝে অমৃত-লোকের দ্বার খুলিয়া যায়; অমরায় ঐশ্বর্য্য সহসা অতি অনায়াসে খসিয়া আমাদের চোখেমুখে ঝরিয়া পড়ে।

ঘড়ির বেয়াদব্ কাঁটাগুলি যমদূতের মতন মনে করাইয়া দেয় যে স্বপ্ন দেখিবার সময় তোমার ঢের জুটিবে, এখন কাজের হাজিরা দাও। কল্পনার কুহেলিকে টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলি।

টমাস্‌কুকের দোকান, লয়েড্ ত্রিস্‌তিনোর অফিস, য়্যামেরিক্যান্ এক্সপ্রেস্ কোম্পানীর বড় সাহেবের বাড়ী, পাশ্‌পোর্টব্যুরো বিলাত যাওয়া সম্পর্কে এম্‌নি যত জায়গা আছে সব জায়গায় ঢুঁ মারিয়া শেষাশেষি একদিন পি য়্যণ্ড্ ও'র জাহাজ কাইজার-ই-হিন্দে প্যাসেজ্ বুক করিয়া ফেলিলাম। এতদিন নানান্ গোলমালের ভীড়ে দিন্‌গুলির যেন পাখা গজাইয়া গিয়াছিল; কেমন করিয়া যে এক রবিবারের পর আরেক্ রবিবার আসিয়া পৌছিত তাহা ঠাওরাইয়াই উঠিতে পারিতাম না। সব ঠিক্‌ঠাক্ করিয়া অপ্রত্যাশিতভাবে আবার একদিন গিয়া ধুবড়ীর মাটীতে পা দিলাম।

—গুড্ মর্ণিং মিটার! How, naughty you've grown!

স্থলী সেই স্থলীই, কোনখানে তার এতটুকু পরিবর্ত্তন পাইলাম না। হাসিয়া গালটা একটু টিপিয়া দিলাম। মুহূর্ত্তের মধ্যে আবার আমার মরা মন স্মৃতির সমুদ্রের অতল-তলে হারাণো মাণিক্ স্থলীকে ফিরিয়া পাইল। কুলীগুলাকে আর আর্ডার্‌লী দুইটাকে ধম্‌কাইয়া গালাগালি করিয়া স্থলী বেডিংগুলা গাড়ীতে তোলাইয়া দিল। সাত বুড়ীর এক বুড়ী হইয়াই যেন এই একরত্তি মেয়েটা আমার তত্ত্বাবধান করিতেছিল! আমি সস্মিতমুখে মৃদু হাসিতে লাগিলাম।

বাড়ীর দিকে ড্রাইভ্ করিবার পথে স্থলীকে কহিলাম—স্থলী, আমি তো দিন দশেকের ভেতরই সাগর পাড়ি দিচ্ছি!

স্থলী তার নীল দুটী আঁখিতে অপার বিস্ময় ভরিয়া—বলিল—তার মানে?

—মানে যা তাই! একটা কিছু করে তো খেতে হবে তাই সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিতে যাব লণ্ডনে, বুঝ্‌লে দুষ্টু মেয়ে।

—লণ্ডনে? হাউ লাভ্‌লী! চলো তুমি আর আমি দু'জনাই একসঙ্গে যাব। ডারওয়েণ্ট্-অন্-ওয়াটারে আমার

বড় মামা থাকেন, তাঁর সঙ্গে একবার মোলাকাৎ করে আসব।

স্ক্লী কথা বলিতে বলিতে অস্থির হইয়া উঠিল, যেন সে এখনই জাহাজে উঠিবে আর কি! মৃদু হাসিয়া বলিলাম—স্ক্লী, যখন যাবে তখন যেয়ো। এখন চঞ্চলতা কর কেন?

—আমি বুঝি চঞ্চল .... বল বল্‌ছি, নইলে আমি রক্ষে রাখ্‌বোনা। তুমি লোকের কাছে অবধি আমার নিন্দে কর—

স্ক্লীর চোখে দুইফোঁটা জল টলমল্‌ করিতেছিল। কোলের কাছে টানিয়া লইয়া চুমু খাইয়া বলিলাম—কী silly তুমি, স্ক্লী। একটু ঠাট্টা করেছি আর বোকা মেয়ে কেঁদেই খুন্‌।

গাড়ী আসিয়া কুঠীর গেটে দাঁড়াইল।

* * * *

বাঙ্‌লার মাটী, ভারতবর্ষের মাটী যেন আমারই অজ্ঞাতে সহসা বড় মিঠে হইয়া উঠিল। এতদিন যখন বিলাত যাওয়া লইয়া কথা-বার্তা কহিতাম উৎসাহে বুক দশহাত হইয়া উঠিত। আজ সে সাহস যে কোথায় গিয়া উধাও হইল তাহার ঠিকানা করিতে পারিলাম না। চারিদিক্ হইতে দৌর্ব্বল্যের দূতেরা আসিয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইল—অসহায়, বড় অসহায় বোধ করিতেছিলাম। হঠাৎ দেখি তাহার ভুটীয়া পণিটার পিঠে চড়িয়া স্ক্লী আসিয়া হাজির। ম্লান হাসি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—কি খবর, মিস্‌ষ্টার্লিং? . ...

মানুষ যেখানে কান্না গোপন করিতে গিয়া হাসে সেখানে সে হাসি কান্নার চাইতেও করুণতর হইয়া উঠে। চঞ্চল, চটুল স্ক্লীর কাছেও তাই আমার হাসিটা যেন নিতান্তই বে-আক্কেলে হইয়া কান্নায় গিয়া পরিসমাপ্ত হইল। স্ক্লীর চোখের দিকে চাহিলাম, সে চোখে যেন আকাশের অসীমতা বাসা বাঁধিয়াছে! অতি সঙ্গোপনে সে একটী প্যাকেট বাহির করিল; তাহার মধ্যে একটী মখ্‌মলের বাক্সে স্ক্লীর একটা ছবি ছিল। গেল বছর "ক্রস্‌মাসে" কলিকাতায় গিয়া বোর্ণ এণ্ড সেপার্ড'এর দোকানে স্ক্লী এই ফটোখানি তুলিয়াছিল।

মুখে মৃত্যুর ম্লানিমা মাখাইয়া কহিলাম—ছবিটার নীচে কিছু লিখে দাও। স্ক্লী একটা কথা কহিল না। ছবিখানি তুলিয়া লইয়া নীরবে লিখিল। "To my loving brother, Alak Mitter, one who liked me and loved me,—Nancy Sterling".

স্ক্লীর হাত কাঁপিতেছিল।

হাসিলাম! ভাবিলাম বিদেশীর এই মেয়েটী কেমন করিয়া দূরত্বের বন্ধনকে নিঃসঙ্কোচে ডিঙাইয়া আমার এতখানি কাছে আসিয়া পৌঁছিল!

লেখা শেষ করিয়া ক্ষণ-কাল স্ক্লী আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। হিমালয়ের হোম বুঝি—সে দৃষ্টিতে ভাঙ্গিয়া চুর চুর হইয়া পড়ে! মৃদু-কণ্ঠে যেন মুখস্থ-করা পুঁথির লেখার মত কহিল—মিটার, আমি কিন্তু তোমার যাবার সময় ষ্টেশনে যাবনা rather যেতে পাব্‌ব না, কিছু মনে করোনা। তোমার সঙ্গে আমার এই শেষ দেখা! .. .

স্ক্লীকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া চুমো দিলাম। খানিকক্ষণ সে আমার বুকের মধ্যে নিঃসাড় হইয়া পড়িয়া রহিল, তারপর একছুট্ দিয়া বাহিরে গিয়া সে তার ঘোড়াটার পিঠে উঠিয়া বসিয়া হাঁকাইতে সুরু করিয়া দিল। আমি হত-বাক্ হইয়া চলন্ত ঘোড়াটার পানে চাহিয়া রহিলাম; স্ক্লী তাহার হাণ্টারটা যথেচ্ছভাবে নিরীহ প্রাণীটার উপর চালাইতেছিল—বুঝিলাম ভিতরের দুরন্ত ঝড়ের এ বাহিরের একটা ব্যর্থ-বিলাস মাত্র!

তিন

পাঁচ-পাঁচটা বছর দেখিতে দেখিতে হাওয়ার আগে নিঃশেষিত হইয়া গেছে। যারা অতি কাছে ছিল তারা হয়তো এখন বিস্মৃতির বুকে তলাইয়া গিয়াছে আর যাদের সঙ্গে এই সেদিনের পরিচয় তাদেরকে যেন বড্ড বেশী নিকটেই আনিয়া ফেলিয়াছি। যে য়ুরোপকে আমরা ভারতবর্ষে থাকিয়া দেখি সে য়ুরোপ বইয়ের পাতার একটা আইডিয়াল য়ুরোপ মাত্র; দোষে-গুণে, ভালোয়-মন্দে, দয়ায় দাক্ষিণ্যে, মায়া মমতায় পূর্ণ যে সত্যকার য়ুরোপ তাহাকে দেখিতে

হইলে য়ুরোপে যাইতে হয়। ভারতবর্ষের মাটীতে সিভিলিয়ান্ হইয়া ফিরিয়া আসিয়া এ সত্যটা যেন বড় বেশী করিয়াই চোখে পড়িতেছে। ভারতবর্ষের মাটীতে সুর আছে কিন্তু সুরার উগ্রতা নাই।

আরও কয়েক বছর পরের কথা বলিতেছি।

কোর্টে গিয়া দেখিলাম ফাইলে বেশী কিছু নাই; গোটা তিনেক্ কেস্ মাত্র। খুসী হইলাম; দিনটাকে পাত্‌লা মনে হইল—টেনিসের র‍্যাকেটটাও আজ শীগ্‌গির হাতে উঠিবে। দস্তখতের পালা শেষ করিয়া এজ্‌লাসে বসিয়া প্রথম মোকদ্দমাটা লইলাম। অপরাধ—নিজের গর্ভজাত কন্যাকে খুন্ করা। নাম পড়িলাম—জুলী টার্লিং।

জুলী টার্লিং?……

হ্যাঁ, সেই মুখ, সেই চোখ, সেই জু'খানি টানা-টানা ভ্রূ! তবে? তবে উজ্জ্বল তার দুইটী আঁখির নীচে কালো দাগ পড়িয়া গিয়াছে আর সস্তা স্কার্টটা কোনরকমে যেন লজ্জা নিবারণ করিতেছে। মুখে তার লাবণ্য বা শ্রীর চিহ্ন-টুকু পর্য্যন্ত নাই। পূর্ব্ব-জীবনটাকে যেন সে নিঃশেষে ধুইয়া মুছিয়া ফেলিয়াছে। মুহূর্ত্তের মধ্যে মনে পড়িয়া গেল আমার ধুবড়ীর জুলীর কথা। আজ আমার আঁখির আগে এ কোন্ নারী দাঁড়াইয়া! সেই কৌতুক-উজ্জ্বলা, চির-চঞ্চলা জুলী মরিয়া গিয়া কি এই নিজ কন্যার রক্ত-পিপাসু রমণীকে জন্ম দিয়াছে! ফাইলটাকে বন্ধ করিয়া তৎক্ষণাৎ অর্ডার লিখিলাম "Case transferred to the file of Mr Adhikari, Deputy Magistrate. Trial to take place as early as possible."

ইচ্ছা হইতেছিল কাগজগুলি খুলিয়া দেখি কেমন করিয়া ধুবড়ীর সেই মেয়েটী এমনি করিয়া আপনার জীবনটাকে স্বেচ্ছাচারের চাকার নীচে গুঁড়িয়া দিল কিন্তু তবু খুলিলাম না। ভয় হইল পাছে এমন কিছু বাহির হইয়া পড়ে যে তাহাতে ধুবড়ীর জুলীর বিরুদ্ধে স্নেহ-ভীরু মনটাকে আমার কঠিন করিয়া বসি।

যাহাদের মনে করি যে স্মৃতির দপ্তরখানা হইতে ছাঁটাইয়া নিঃশেষে বিদায় করিয়া দিয়াছি তাহাদের মধ্যে এক এক জনা অকস্মাৎ বিনা নিমন্ত্রণে আসিয়া হাজির হয়—হইয়া সব কিছু ওলট্-পালট্ করিয়া দেয়; তারপর আবার যেমনি আচম্‌কা আসিয়াছিল তেমনি তাড়াতাড়ি চলিয়া যায়।

জুলীর কি বিচার হইল সে খোঁজ লইবার মতন সাহস সঞ্চয় করিতে পারি নাই। অপ্রত্যাশিতভাবে একদিন দেখা দিয়া সে আর কিছু করিল কিনা জানিনা, তবে এটুকুন্ বুঝিলাম যে মানুষকে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা করিবার যে পথ সেটাকে সে বেমালুম্ বন্ধ করিয়া দিয়া গেল।

* * * *

কোর্ট হইতে বাড়ী ফিরিতে ফিরিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। অকারণ গোটা কয়েক্ বাজে কাজ লইয়া সেদিন বহুক্ষণ ডুবিয়া ছিলাম। আকাশে অগণিত তারার মেলা বসিয়াছিল। উহারই মধ্যে একটী তারার চোখে যেন নত-নয়না জুলীর চাউনি দেখিলাম!

শ্রীজ্যোৎস্নানাথ চন্দ

ঘৃতে ভেজাল

শ্রীপ্রমোদগোবিন্দ মহালানবিশ বি-এস সি ; ডিপ্‌-টেক্‌

(আর, এন সোপ এণ্ড কেমিকেল ওয়ার্কস্‌)

ব্যষ্টি অথবা সমষ্টি, সমাজ অথবা জাতির পুষ্টি সাধনের জন্য মানুষের দৈনন্দিন আহার্য্য তালিকায় প্রচুর পরিমাণে স্নেহ জাতীয় পদার্থ থাকা একান্ত প্রয়োজনীয় এবং অপরিহার্য্য। আহারের উদ্দেশ্য প্রধানতঃ শরীরের পুষ্টিসাধন, শক্তি উৎপাদন, শরীরের উত্তাপ রক্ষা, ক্ষুধা নিবৃত্তি এবং দেহের অপচয় নিবারণ। সাধারণতঃ এই পাঁচটি উদ্দেশ্য সাধনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া আমাদের খাদ্য নির্ব্বাচন করা কর্ত্তব্য।

ভারতবর্ষের অনেক প্রদেশেই নিরামিষ আহারের ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। নিরামিষাশীর দৈহিক পুষ্টি সাধনের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে ঘি খাওয়ার প্রথাও অনেক কাল হইতেই এ দেশে চলিয়া আসিতেছে। ঋণ করিয়া ঘৃত পান করিবার উপদেশ এ দেশেরই মহামুনিমুখ-নিসৃত। শ্বেতসার (Carbohydrates), এল্‌বুমিনয়ডস্‌ (Albuminoids), ও স্নেহ জাতীয় খাদ্য (Fats) মানুষের দৈহিক উন্নতি সাধনের জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়। শ্বেতসার (Carbohydrates) ও এল্‌বুমিনয়ডস্‌ (Albuminoids) জাতীয় অনেক প্রকার খাদ্যই আমাদের আহার্য্য পর্য্যায়ভুক্ত আছে; কিন্তু একমাত্র বিশুদ্ধ ঘৃত অথবা বিশুদ্ধ উদ্ভিজ্জ তৈল ভিন্ন অন্য কোন স্নেহ জাতীয় খাদ্যের ব্যবহার নাই।

সম্প্রতি আমাদের দুঃখ, দুর্দ্দশা, এবং দুর্ভাবনার কারণ বাড়াইয়া দিয়া ঘৃতে প্রচুর পরিমাণে ভেজাল ব্যবহৃত হইতেছে। বাজারে খাঁটী ঘি পাওয়া এক কষ্টসাধ্য ব্যপার। ঘি'র রাসায়নিক বিশ্লেষণের জটিলতা এবং ভেজাল নিরূপণের কোন সহজ উপায় না থাকায় ব্যবসায়িগণ নির্ভয়ে যদৃচ্ছা ভেজাল ব্যবহার করিতে পারিতেছেন। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে ভেজালের পরিমাণ শতকরা ৫ ভাগ হইতে ১০০ শত ভাগ পর্য্যন্ত। অর্থাৎ, ঘৃতেতর জিনিষই নির্ব্বিবাদে ঘি নামে বাজারে চলিয়া যাইতেছে, আর আমরা নিরুপায় হইয়া আমাদের কষ্টোপার্জ্জিত ধন ব্যয় করিয়া এই সমস্ত জিনিষ আহার করিয়া আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষা ও দেহের পুষ্টিসাধন (?) করিতেছি। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আরও উন্নততর প্রণালীতে ভেজাল মিশ্রিত হইতেছে। এমন কোন সাধারণ উপায়ের কথা জানা নাই যাহাতে সর্ব্ব সাধারণে ঘরে বসিয়া অল্প খরচে ভেজাল নিরূপণ করিতে পারেন। বাধ্য হইয়া, ঘি মনে করিয়া কত অখাদ্য খাইয়া আমরা দিন দিন স্বাস্থ্যহীন হইয়া পড়িতেছি তাহার খোঁজ কত জনে রাখেন? সর্ব্ব সাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষা কল্পে গ্রামে গ্রামে উন্নততর বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ঘৃতে ভেজাল স্থির করিবার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। আর মিউনিসিপালিটি এবং সরকার হইতে আইন প্রণয়ন করিয়া এই সমস্ত দুবৃত্ত ব্যবসায়িগণকে—যাহারা ঘৃতে ইচ্ছানুরূপ ভেজাল মিশ্রিত করিয়া জনসাধারণের স্বাস্থ্যহানি করিতেছেন—দণ্ডিত করা অচিরে কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে সরকারে অমনযোগ শঙ্কাজনক। বার্লিনে এই জাতীয় অপরাধ নির্দ্ধারণ করিয়া অপরাধীকে আইনে দণ্ডিত করিবার জন্য সরকারী রসায়নাগারের ব্যবস্থা আছে। বিশেষজ্ঞগণ উক্ত পরীক্ষাগারে গবেষণা দ্বারা উন্নত প্রণালীতে ভেজাল স্থির করিবার উপায় নির্দ্ধারণে ব্যস্ত আছেন। বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের সহিত উক্ত সরকারী রসায়নাগারের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ থাকায় জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণও এ বিষয়ে গবেষণা করিবার যথেষ্ট সাহায্য পাইয়া থাকেন। খাদ্য আইনের যথেষ্ট সদ্ব্যবহারে ইংলণ্ডে সম্প্রতি এক এক পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে যে পরীক্ষার্থে সংগৃহীত ১৫,১২৪টি বিভিন্ন

নমুনার মাখনের মধ্যে মাত্র ৮৬৭টি নমুনা অর্থাৎ শতকরা প্রায় ৫টি মাত্র ভেজাল মিশ্রিত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। উক্ত ভেজাল মিশ্রিত নমুনা গুলিতেও শতকরা ১৫ ভাগের (অর্থাৎ ৮৫ ভাগ খাঁটী মাখন ও ১৫ ভাগ ভেজাল) বেশী ভেজাল নাই। পক্ষান্তরে, ভারতবর্ষে কোন প্রকার খাদ্য আইনের প্রচলন না থাকায় ঘৃতেতর জিনিষও ঘৃত নামে অবাধে চলিয়া যাইতেছে। এমন কি উদ্ভিজ্জ ঘিও খাঁটী ঘৃত বলিয়া প্রচুর পরিমাণে বিক্রয় হইতেছে।

দেহের উৎপাদিকা এবং পুষ্টি-সাধিকা শক্তির কথা বাদ দিলেও প্রত্যেক ক্রেতার জানা উচিত ঘৃত মনে করিয়া এবং ঘৃতের উপযুক্ত মূল্য দিয়া কি জিনিস তিনি ক্রয় করিতেছেন এবং নিঃসন্দেহে তাহাই আহার করিয়া দিনে দিনে হৃতস্বাস্থ্য হইয়া পড়িতেছেন। ফলে সমস্ত জাতি ধ্বংসের পথে ধাপে ধাপে অগ্রসর হইতেছে। নিরোধ করিবার জন্য কাহারো দৃষ্টি পর্যান্ত এদিকে পড়ে না। জনসাধারণকে তথা সমস্ত জাতিকে এই মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিতে ন্যায়তঃ এবং ধর্ম্মত দায়ী সরকার। অনতিবিলম্বে এ দেশে খাদ্য আইন প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা ঘৃতে ভেজাল নির্দ্ধারণ করিবার কোন স্পষ্ট উপায়ের কথা জানা না থাকায় বিশ্লেষকগণকেও অনেক অসুবিধায় পড়িতে হয়। য়ুরোপ ও আমেরিকা প্রভৃতি মহাদেশে ঘৃতের ব্যবহার নাই। তথায় রন্ধন ও আহারের কার্য্যে মাখন, শোধিত চর্ব্বি, অথবা মার্গারিণ (Margarine) ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ঐ সময়ে শীত প্রধান দেশে মাখন অনেক দিন পর্য্যন্ত রাখিয়া দিলেও নষ্ট হয় না। সুতরাং উক্ত দেশবাসিগণকে আহারের জন্য মাখন গলাইয়া ঘি করিয়া রাখিতে হয় না। য়ুরোপ এবং আমেরিকায় মাখন বিশ্লেষণ করিবার জন্য যে সমস্ত পন্থা অনুসরণ করা হয় তাহা ভিন্ন ঘৃত বিশ্লেষণ করিবার অন্য কোন পন্থা আমাদের জানা নাই; এবং এ সম্বন্ধে বিশেষ কোন পুস্তকাদিও নাই। কিন্তু ঘৃতে ভেজাল নির্দ্ধারণ করিবার পক্ষে ঐ সমস্ত উপায়ই যথেষ্ট নয়।

ঘৃত কি ?

সাধারণতঃ গরু ও মহিষের দুগ্ধ হইতে জল, ছানা, লবণ, ও অন্যান্য বাহ্য পদার্থ শূন্য যে স্নেহ জাতীয় পদার্থ পাওয়া যায় তাহাকেই বৈজ্ঞানিক মতে খাঁটী ঘৃত বলা হয়। দুগ্ধে এই স্নেহ জাতীয় পদার্থের পরিমাণ গো-মহিষাদির জাতি, খাদ্য, এবং দেশকাল ভেদে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। জল, স্নেহ জাতীয় পদার্থ, ছানা, দুগ্ধ শর্করা এবং লবণ এইগুলিই দুগ্ধের মূল উপাদান। গরু ও মহিষের দুগ্ধে উক্ত উপাদান সমূহ শতকরা গড়পড়তা কত ভাগে বর্ত্তমান আছে নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া গেল।

	ন্যূনতম পরিমাণ	সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ	গড়পড়তা পরিমাণ
আপেক্ষিক গুরুত্ব (Sp.gr)	১.০২৬৪	১.০৩৭০	১.০৩১৬
স্নেহ জাতীয় পদার্থ (Fat)	১.৬৭%	৬.৪৭%	৩.৫৯%
ছানা (Casein)	১.৭৯%	৬.২৯%	৩.০২%
দুগ্ধ শর্করা (Milk Sugar)	২.১১%	৬.১১%	৪.৭৮%
লবণ (Salt)	০.৩৫%	১.২১%	০.৭১%
জল (Water)	৮০.৩২%	৯০.৬৯%	৮৭.৪%

খর্ব্বাকৃতি পাহাড়ী গাভীর দুগ্ধে সমতল ভূমির প্রকাণ্ড-কায়া গাভীর দুগ্ধ হইতেও বেশী পরিমাণে মাখন পাওয়া যায়; যদিও সমতল ভূমির গরু পাহাড়ী গরু হইতে দুধ দেয় অনেক বেশী পরিমাণে। এলবুমিনয়ড্‌স্ (Albuminoids) জাতীয় খাদ্য, যথা খৈল ইত্যাদি খাইলে গরুর দুগ্ধ যত ঘন হয় অন্ন বা জলীয় খাদ্য খাইলে তত ঘন হয় না। দোহনের প্রথম ভাগের দুগ্ধে শেষ ভাগের দুগ্ধ হইতে স্নেহ জাতীয় পদার্থের পরিমাণ কম থাকে। এমন কি, পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, সকাল বেলার দুধ সন্ধ্যাবেলার দুধ হইতে স্নেহ পদার্থের পরিমাণে হীন। এই জন্যই বোধ হয় ভাল দধি, ছানা, মাখন ইত্যাদি পাইতে হইলে সন্ধ্যাবেলার

দোহন করিয়া যে দুধ পাওয়া যায় তাহাই বেশী ব্যবহৃত হয়।

ভেজালের প্রকৃতি

সাধারণতঃ যে সমস্ত জিনিষ ঘি'র সহিত ভেজাল স্বরূপ মিশ্রিত হয় নিম্নে তাহার এক তালিকা দেওয়া গেল।

১। গো, মহিষ, শূকর, সর্প ইত্যাদি জন্তুর চর্ব্বি। অর্থের লোভে সময়ে সময়ে ব্যবসায়িগণ নানা প্রকার রোগাক্রান্ত জন্তুর চর্ব্বিও ব্যবহার করিতে বিরত হন না।

২। নারিকেল, তুলার বীচি, তিল, বাদাম, মহুয়া, সোয়াবিন, কুসুমফুল ইত্যাদি নানা প্রকার উদ্ভিজ্জ তৈল।

৩। উদ্ভিজ্জ ঘি।

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে সমস্ত স্নেহ জাতীয় পদার্থ মানুষের সাধারণ শারীরিক উত্তাপ হইতেও কম উত্তাপে দ্রব হইয়া যায়। তাহাদের শতকরা ৯৭।৯৮ ভাগ পাকস্থলীতে অনায়াসে জীর্ণ হয় এবং দেহের পুষ্টিসাধনে সাহায্য করে। পক্ষান্তরে যে সমস্ত স্নেহ পদার্থ আরও অধিক উত্তাপ ভিন্ন দ্রব হয় না (যথা জান্তব চর্ব্বি বা উদ্ভিজ্জ ঘি) তাহাদের শতকরা ৯ ভাগ হইতে ১৪ ভাগ মাত্র পাকস্থলীতে জীর্ণ হইয়া দৈহিক পুষ্টি সাধন ও উত্তাপরক্ষার কার্য্যে সহায়তা করে। অবশিষ্ট ৯১ ভাগ হইতে ৮৬ ভাগ পাকস্থলী বোঝাই করা ভিন্ন অন্য বিশেষ কোন ব্যবহারে আসে না। সুতরাং পরিপাচক কিংবা পুষ্টিসাধক হিসাবে উদ্ভিজ্জ ঘি বা অন্যান্য জান্তব চর্ব্বি সাধারণ উদ্ভিজ্জ তৈল হইতে নিম্নস্থান অধিকার করে। নিম্নলিখিত ধারাবাহিক প্রণালীতে তাহাদের যথাযথ স্থান নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

(১) ঘি বা মাখন

(২) নারিকেল তৈল

(৩) **Oleic-Glyceride** বহুল অন্যান্য তৈল যথা—তিল, কুসুমফুল ইত্যাদি।

(৪) উদ্ভিজ্জ ঘি, উদ্জান বাষ্পসংযোগে ঘনীকৃত তৈল বা জান্তব চর্ব্বি।

আজকাল প্রায় সকলেই দৈনন্দিন আহার্য্য তালিকায় খাদ্যপ্রাণের (vitamine) প্রাচুর্য্য পছন্দ করেন। স্নেহ জাতীয় পদার্থে খাদ্যপ্রাণ ক এবং ঘ প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান আছে। যে সমস্ত স্নেহ পদার্থ মানুষের আহারের কার্য্যে ব্যবহৃত হয় তন্মধ্যে ঘি বা মাখন খাদ্যপ্রাণের পরিমাণ হিসাবেও নিঃসন্দেহে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করে। পুষ্টি-সাধক এবং পরিপাচক হিসাবে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইলেও ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশেই ঘি'র পরিবর্ত্তে সাধারণ কার্য্যে কোন কোন বিশেষ প্রকার উদ্ভিজ্জ তৈলের ব্যবহার দেখা যায়। অবশ্য ইহার প্রধান কারণ ঘি'র মহার্ঘতা, তদ্ভিন্ন যে প্রদেশে যাহা প্রধানতঃ উৎপন্ন হয় তাহাই সেই-সেই দেশে সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ব্যবহারের ফলে কোন কোন জিনিষের প্রতি মানুষের পক্ষপাত জন্মে। এই জন্যই বোধ হয় নারিকেল তৈল বা অন্য কোন তৈলপক্ক অন্ন ব্যঞ্জনের প্রতি বাঙ্গালীর বিশেষ লোভ নাই। এদিকে রন্ধনের কার্য্যে সরিষার তৈল ব্যবহারের কথা মাদ্রাজীর নিকট ভয়াবহ।

সাধারণ বিশ্লেষণ বিধি

পাশ্চাত্য দেশ সমূহে রাসায়নিক উপায়ে মাখন বিশ্লেষণ করিবার জন্য যে সমস্ত পন্থা অনুসরণ করা হয় আমরা এখানে তাহারই কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়ার চেষ্টা করিব। বিশ্লেষণ করিয়া যে সমস্ত প্রধান এবং প্রয়োজনীয় তথ্য জানা যায় সেই গুলির কথা মাত্র উল্লেখ করিয়া দেখাইব ঘৃত বিশ্লেষণে এবং ঘৃতে ভেজাল নিরূপণে সেই গুলি খুব প্রয়োজনে আসে না।

(১) সাবানকারী সংখ্যা (**Saponification value**) :—কোন জাতীয় এক গ্রাম্ (gram) স্নেহ

পদার্থকে সাবানে পরিণত করিবার জন্য যে মিলিগ্রাম্ (Milligram) সংখ্যক তীব্র-ক্ষারের (Caustic Potash) প্রয়োজন হয় সেই সংখ্যাকে সেই জাতীয় স্নেহ পদার্থের সাবানকারী সংখ্যা বলে (Saponification value)। স্নেহ পদার্থের জাতি বা প্রকার ভেদে এই সংখ্যারও পরিবর্ত্তন হয়। ঘৃতের গড় সাবানকারী সংখ্যা ২২৭ ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। সর্ব্বনিম্ন সংখ্যা ২২৫ এবং সর্ব্বোচ্চ সংখ্যা ২৩৪ পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। কিন্তু মাত্র এই সংখ্যার উপর নির্ভর করিয়া ঘৃত খাঁটি কি ভেজাল মিশ্রিত তাহা বলা সুকঠিন। শতকরা ৫০ ভাগ খাঁটি ঘৃতের সঙ্গে ২৫ ভাগ চর্ব্বি এবং ২৫ ভাগ নারিকেল তৈল মিশ্রিত করিলে উক্ত মিশ্র পদার্থের সাবানকারী সংখ্যা ২২৭ বা তন্নিকটবর্ত্তী হয়।

চর্ব্বির গড় সাবানকারী সংখ্যা ২০০ এবং নারিকেল তৈলের ২৫৫। সুতরাং উপরোক্ত পরিমাণে ঘৃত, নারিকেল তৈল এবং চর্ব্বি মিশ্রিত করিয়া দিলে রাসায়নিকের পক্ষেও কোনটি খাঁটি এবং কোনটি ভেজাল তাহা বলা কঠিন হইয়া উঠে।

(২) আপেক্ষিক গুরুত্ব (Specific Gravity) :—

শতকরা ৩০ ভাগের ঊর্দ্ধে ভেজাল মিশ্রিত করিলে আপেক্ষিক গুরুত্ব দ্বারা ঘৃতের ভেজাল নির্দ্ধারণ করা যায় না। ঘৃতের আপেক্ষিক গুরুত্ব ০.৯৩৫৪—০.৯৪৪৩। অল্প পরিমাণে নারিকেল তৈল মিশ্রিত করিলে আপেক্ষিক গুরুত্বের কোন পরিবর্ত্তন হয় না। গরু অথবা ভেড়ার চর্ব্বি এবং ঘৃতের আপেক্ষিক গুরুত্ব প্রায় এক সমান।

(৩) আইওডিন ভেল্যু (Iodine value) :—

স্নেহ পদার্থ সমূহের প্রধান উপাদান *Fatty acid*। এই Fatty acid অপরিপূর্ণ অবস্থায় বর্ত্তমান থাকে। দেখা গিয়াছে আইওডিন (Iodine) অথবা ব্রোমিন (Bromine) অতি সহজেই ইহাদের সহিত যুক্ত হইয়া ইহাদিগকে পরিপূর্ণ করিতে পারে। প্রতি একশত ভাগ স্নেহ পদার্থে বর্ত্তমান অপরিপূর্ণ অম্লরসকে পরিপূর্ণ করিতে যত ভাগ আইয়োডিন যোগ করিবার প্রয়োজন হয় তাহাকে উক্ত স্নেহ পদার্থের আইয়োডিন ভেল্যু বলে। ইহা দ্বারা তৈলের এক প্রকার শ্রেণী বিভাগ করা যাইতে পারে। ঘৃতের আইয়োডিন ভেল্যু'র প্রসার বা সীমা অত্যন্ত ব্যাপক। উল্‌নি ও ভন্ রিজু (Wollny & Von Riju) সর্ব্বনিম্ন ভেল্যু ২৫.৭% এবং সর্ব্বোচ্চ ভেল্যু ৫০.৩% পাইয়াছেন। এই ব্যাপকতা হইতে সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে আইয়োডিন ভেল্যু দ্বারা ঘৃতের ভেজাল নির্দ্ধারণ করা সহজসাধ্য নয়।

(৪) হেনার ভেল্যু (Hener value) :—

ইহা দ্বারা তৈলের প্রতি একশত ভাগে কত ভাগ অদ্রবণীয় মেদ জাতীয় অম্লরস বর্ত্তমান আছে তাহাই নির্দ্ধারণ করা হয়। তৈল বা চর্ব্বি হইতে এই অদ্রবণীয় অম্লরস অতি সহজেই ভিন্ন করিয়া লওয়া যাইতে পারে। ঘৃত, মাখন, নারিকেল তৈল প্রভৃতি স্নেহ পদার্থে উদ্বায়ী দ্রবণশীল মেদ জাতীয় অম্লরসের পরিমাণ বেশী থাকায় তাহাদের হেনার ভেল্যু অধিক নহে। উপরন্তু ইহাদের হেনার ভেল্যু সন্নিকটবর্ত্তী হওয়ায় ইহা দ্বারা ভেজালের স্বরূপ, এমন কি কখনও কখনও ভেজালের চিহ্ন পর্য্যন্ত প্রমাণিত হয় না।

(৫) রাইকার্ট মিশ্‌ল ও রাইকার্ট পোলান্সকি ভেল্যু (Reichert Meissl & Reichert Polenske values) :—

ইহাদিগকে সাধারণতঃ R. M. ও R. P. ভেল্যু বলা হয়। কোন প্রকার স্নেহ পদার্থের নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে কতখানি বাষ্পোদ্বায়ী এবং জলে দ্রবণীয় মেদজাতীয় অম্লরস বর্ত্তমান আছে রাইকার্ট মিশ্‌ল্ ভেল্যু (Reichert Meissl value) তাহাই নির্দ্ধারণ করে। এই ভেল্যু নির্দ্ধারণ করিবার এক বিশেষ বিস্তৃত উপায় আছে। এই ভেল্যু নির্দ্ধারণ কালে উক্ত বিশেষ উপায়ের সর্ত্তগুলি যথা সম্ভব অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালনীয়—এমন কি প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদির আয়তন পর্য্যন্ত উল্লিখিত বিশেষ উপায়ের পরিমাপ মত হওয়া আবশ্যকীয়। অপ্রয়োজনীয় বিধায় ইহার বিস্তৃত বিবরণ এখানে উল্লেখ করিলাম না। রাইকার্ট পোলান্সকি ভেল্যু (Reichert

Polenske value) দ্বারা বাষ্পোদ্বায়ী অথচ জলে অবিগলনীয় মেদজাতীয় অম্লরসের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করা হয়। ঘৃতের তুলনায় অন্যান্য স্নেহ পদার্থের রাইকার্ট মিশ্‌ল্ ভেলু অত্যন্ত কম। আমরা নিম্নে ঘৃত এবং তৎসহ যে সমস্ত স্নেহ পদার্থ সাধারণতঃ মিশ্রিত করা হয় তাহাদের R. M. value উল্লেখ করিলাম।

নম্বর	স্নেহ পদার্থ	রাইকার্ট মিশ্‌ল্ ভেলু
১	ঘৃত	২৩—৩৩ (C.C)
২	তিল	০'৩৫—০.৭
৩	নারিকেল তৈল	৬'৬—৮.৫
৪	তুলার বীচি	০'৫৫—০'৭
৫	শূকর চর্ব্বি	০'৪৬
৬	গো চর্ব্বি	০'৫
৭	ভেড়ার চর্ব্বি	০'৫

উপরোক্ত তালিকা হইতে সহজেই অনুমান করা যাইবে যে খাঁটি ঘৃতের সঙ্গে কিয়ৎ পরিমাণে যে কোন প্রকার ভেজাল মিশ্রিত করিলেও ঘৃতের রাইকার্ট মিশ্‌ল্ ভেলু খুব কমিয়া যাইবে না। তবে অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিলে ভেজাল সহজেই প্রতীয়মান হইবে। কিন্তু ব্যবসায়ীগণ বহুল পরিমাণে ভেজাল মিশ্রিত ঘৃতের রাইকার্ট মিশ্‌ল্ ভেলু বৃদ্ধি করিবার উপায় স্থির করিয়াছেন। দেখা গিয়াছে ভেজালের সঙ্গে কিয়ৎ পরিমাণে Acetin অথবা Amylacetate ব্যবহার করিলে রাইকার্ট মিশ্‌ল্ ভেলু যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পায়।

উপরোক্ত বিধি সমূহই মাখনের রাসায়নিক বিশ্লেষণের প্রধান উপায়। এইগুলি পাঠ করিয়া সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, ইহাদের যে-কোন একটির দ্বারা এমন কি সমস্ত গুলি দ্বারাও ঘৃত খাঁটি কি ভেজাল মিশ্রিত তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। আর বিশেষতঃ এই দীর্ঘ ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার পরিসমাপ্তি সময়সাপেক্ষ। এতগুলি প্রক্রিয়া উত্তমরূপে সমাধা করিয়া তাহাদের ফলাফল দেখিয়া বিচার করিতে গেলে পরীক্ষকের ধৈর্য্যহানি হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকিতে পারে। এইবার আমরা একটি সহজ এবং স্থির উপায়ের কথা বলিব। যে উপায়ের কথা আমরা উল্লেখ করিতে যাইতেছি তাহা নূতন নহে। ঘৃত বা মাখন বিশ্লেষণের কাজে অনেক কাল হইতেই ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। সম্প্রতি কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাক্তার এন, এন, গড্‌বোলে (Dr. N. N. Godbole) ইহার কিছু পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া যে নূতন পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা দ্বারা ঘৃত খাঁটি কি ভেজাল মিশ্রিত তাহা সুনিশ্চিত করিয়া বলা যায়। আমরা তাঁহার কথা উল্লেখ করিয়াই বর্ত্তমান প্রবন্ধ শেষ করিব।

ঘৃতের বিবর্ত্তন-পরিমাণ (Refrective Index)

ঘৃত-বিবর্ত্তণ-বীক্ষণ (Butyro refractometer) নামক যন্ত্র সাহায্যে ঘৃতের ভিতর দিয়া চলিবার সময় আলোক রশ্মির পথ যে পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হয় তাহাই নির্দ্ধারণ করা হয়। কোন পদার্থ হইতে অসমঘন পদার্থে প্রবেশ কালে আলোকরশ্মির পথ পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয়। কোন নির্দ্দিষ্ট পদার্থে প্রবেশকালে আলোকরশ্মির পথ যে পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হয়, পদার্থান্তরে প্রবেশকালে তাহার পরিমাণ সমান থাকে না। প্রত্যেক বিভিন্ন পদার্থের আলোকপথ পরিবর্ত্তনের পরিমাণ চিরনির্দ্দিষ্ট আছে। ৪০° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় খাঁটি ঘৃতের বিবর্ত্তণ পরিমাণ ৪০°—৪৩° ডিগ্রি। এই স্বল্প ব্যাপকতায়ও কিয়ৎ পরিমাণে ভেজাল অনির্দ্ধারিত অবস্থায় চালাইয়া দেওয়া যায়। এমন কি কোন কোন তৈল ও চর্ব্বির সহযোগে এমন পদার্থ তৈয়ার করা যায় যাহার বিবর্ত্তন পরিমাণ খাঁটি ঘৃতের সমান। বিবর্ত্তন-বীক্ষণও সেই ক্ষেত্রে অকেজো হইয়া পড়ে। সম্প্রতি ডাঃ গড্‌বোলে (Dr. N. N. Godbole) লক্ষ্য করিয়াছেন যে

বিবর্ত্তন পরিমাণ স্থির করিবার সময় বিবর্ত্তন-বীক্ষণস্থ স্নেহ বিন্দুর চতুর্দ্দিকে এক প্রকার রঙ্গিন জ্যোতির্ম্মণ্ডল পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন প্রকার স্নেহ পদার্থের জন্য বিভিন্ন বর্ণের জ্যোতির্ম্মণ্ডলের সৃষ্টি হয়। এই ফলাফল কেবল মাত্র দৃষ্টিভ্রম জন্য নহে—স্নেহ পদার্থ সমূহের স্বাভাবিক প্রকৃতি বা ধর্ম্মই উক্ত জ্যোতির্ম্মণ্ডলের কারণ। খাঁটি ঘৃতের সঙ্গে বিভিন্ন পরিমাণে বিভিন্ন প্রকারের ভেজাল মিশ্রিত করিয়া দেখা গিয়াছে বিবর্ত্তন-বীক্ষণ যন্ত্রে ভেজালের পরিমাণ এবং প্রকৃতি অনুযায়ী বর্ণের জ্যোতির্ম্মণ্ডলের সৃষ্টি হইয়াছে। খাঁটি ঘৃত এবং অন্যান্য স্নেহ পদার্থের কি কি বর্ণের জ্যোতির্ম্মণ্ডলের সৃষ্টি হয় নিম্নে তাহার এক তালিকা দেওয়া গেল।

নম্বর	নাম	৪০°ডিগ্রি উষ্ণতায় বিবর্ত্তন পরিমাণ	রঙ্গিন জ্যোতির্ম্মণ্ডলের স্বরূপ
১	খাঁটি ঘৃত	৪২·২০° ডিগ্রি	ফিকা ভায়লেট (Light violet)
২	ককোজেন (cocogeni)	৩৪·২০° ,,	ঘন কমলা রং
৩	নারিকেল তৈল	৩৫·২৫° ,,	,,
৪	বাদাম তৈল	৫৫·৬৫° ,,	আনীল সবুজ
৫	তিল তৈল	৬০·০° ,,	,,
৬	মহুয়া তৈল	৬৩·০° ,,	,,
৭	ভেড়ার চর্ব্বি	৪৫·৫০° ,,	আহরিৎনীল (GreenishBlue)
৮	গো চর্ব্বি	৪৯·০° ,,	,,
৯	শূকর চর্ব্বি	৫০·০°-৫১·২° ,,	,,
১০	উদ্ভিজ্জ ঘি	৫৫·০° ,,	নীল
১১	মার্গারিণ Margarine)	৫০·৩°-৫৮·৬° ,,	,,

একণে খাঁটি ঘৃতের সঙ্গে অন্যান্য ভেজাল মিশ্রিত করিলে তাহাদের বিবর্ত্তন পরিমাণ এবং রঞ্জিন আলোক-রশ্মির কিরূপ পরিবর্ত্তন হয় নিম্নে তাহাই প্রদর্শিত হইল।

১। খাঁটি ঘৃত ও নারিকেল তৈলের মিশ্রণ

নম্বর	নারিকেল তৈলের শতকরা ভাগ	বিবর্ত্তন পরিমাণ	রঙ্গিন আলোক-রশ্মির স্বরূপ
১	০৫%	৪২·১৫	ফিকা কমলা রং
২	১·০	৪২·০৫	,,
৩	৫%	৪১·০০	কমলা রং
৪	১০%	৪০·৫০	,,
৫	২০%	৪০·১৫	ঘন কমলা রং
৬	৩০%	৪০·১০	,,
৭	৪০%	৩৯·৩০	,,
৮	৫০%	৩৮·৭৫	,,
ক	খাঁটি ঘি	৪২·২০	ফিকা বেগুনী
খ	নারিকেল তৈল	৩৫·৪০	ঘন কমলা

২। খাঁটি ঘৃত ও উদ্ভিজ্জ ঘৃতের মিশ্রণ

নম্বর	উদ্ভিজ্জ ঘৃতের শতকরা ভাগ	বিবর্ত্তন পরিমাণ	রঙ্গিন আলোক রশ্মির স্বরূপ
১	০·৫%	৪২·৬০	ফিকা নীল
২	১·০%	৪২·৭২	,,
৩	৫%	৪৩·০৫	নীল
৪	১০%	৪৩·১৫	,,
৫	২০%	৪৪·০০	,,
৬	৩০%	৪৫·০০	ঘন নীল
৭	৪০%	৪৫·৭০	,,
৮	৫০%	৪৬·৭৫	,,
ক	খাঁটি ঘৃত	৪২·২০	ফিকা বেগুনী
খ	উদ্ভিজ্জ ঘি	৫২·৫০	নীল

৩। খাঁটি ঘৃত ও চর্ব্বির মিশ্রণ

ম্বর	চর্ব্বির শতকরা ভাগ	বিবর্ত্তণ পরিমাণ	রঙ্গিন আলোক রশ্মির স্বরূপ
১	০'৫%	৪২ ১০	ফিকা নীল
২	১'০%	৪২'১৫	,,
৩	৫%	৪২'৪৫	আনীল সবুজ
৪	১০%	৪২'৫০	,,
৫	২০%	৪২'৭০	,,
৬	৩০%	৪৩'১০	নীল
৭	৪০%	৪৩'৬০	,,
৮	৫০%	৪৪'০০	,,
ক	খাঁটি ঘৃত	৪২'২০	ফিকা বেগুনী
খ	চর্ব্বি	৪৫ ৫০	আহরিৎ নীল

উপরোক্ত তালিকাগুলি মনোযোগ সহকারে পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যাইবে খাঁটি ঘৃতের সঙ্গে যে কোন প্রকারের উদ্‌ভিজ্জ তৈল, জান্তব চর্ব্বি, উদ্‌ভিজ্জ ঘি বা ঘনীকৃত তৈল ইত্যাদি জাতীয় ভেজাল সামান্য পরিমাণে মিশ্রিত করিলেও অতি অল্প সময়ে এবং অনায়াসে বিবর্ত্তনবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে তাহা নির্দ্ধারণ করা সম্ভব।

কলিকাতার মত বড় সহরে স্থানে স্থানে কতগুলি বিবর্ত্তনবীক্ষণ যন্ত্র এবং কয়েকজন বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত করিয়া কর্ত্তৃপক্ষ এই দুর্নীতি প্রশমিত করিয়া জনসাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষাকল্পে সাহায্য করিতে পারেন।

নীতিকার বলিয়াছেন—"বুভুক্ষিতঃ কিং ন করোতি পাপম্।" কিন্তু এদেশ এমন ছিল না। গৃহস্থের ঘরে ঘরে গোয়ালভরা গরু ছিল। প্রচুর পরিমাণে দুধ ঘি হইত। খাঁটি জিনিষ খাইয়া আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা স্বাস্থ্যরক্ষা করিয়া দীর্ঘজীবী হইয়া গিয়াছেন। ভেজাল মিশাইবার তখন প্রয়োজন হইত না। আজ কেন এমন হইল? এই ধর্ম্ম-ভীরু জাতির ধর্ম্মজ্ঞানকেও আজ বিসর্জ্জন দিতে হইল কেন? এ প্রশ্নের জবাব পাইব কোথায়? কাহার কাছে?

শ্রীপ্রমোদগোবিন্দ মহলানবিশ



রায়বাহাদুর

শ্রীযুক্ত সমরেশচন্দ্র রুদ্র

পাত্র পাত্রীগণ

ভূপেনবাবু

ঐ পত্নী

মতিলাল ঐ প্রতিবেশী

ম্যাজিষ্ট্রেট

প্রথম দৃশ্য

[ভূপেনবাবুর বাড়ীর উপরের একটা ঘরে তাঁর স্ত্রী এটা ওটা নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতেছেন, এমন সময় ভূপেনবাবু প্রবেশ করিলেন]

ভূপেনবাবু। হাঁগো, একটা খবর শুনেছ?

স্ত্রী। কিসের খবর? কি হয়েছে?

ভূ। আমি এবার রায়সাহেব হয়েছি, এইমাত্র খবর পেলুম।

স্ত্রী। সত্যি নাকি?

ভূ। সত্যি নয়ত কি মিথ্যে বলছি?

স্ত্রী। এর আগেও ত তুমি তিন চারবার বলেছিলে, 'রায়সাহেব হয়েছি' আবার পরে বলেছ 'হইনি'।

ভূ। না, না, এবার আর তা নয়, এই দেখ টেলিগ্রাম।

স্ত্রী। (দেখিয়া) তাহলে আর ভয় নেই। এবার আমায় কি দেবে বল?

ভূ। রায়সাহেব হতে না হতেই কি দেবে? বেশ কথা বটে!

স্ত্রী। কেন, তুমি ত বলেছিলে যে—

ভূ। তা বলেছিলুম বটে; কিন্তু মেয়েমানুষ তোমরা, বুদ্ধিশুদ্ধি কম, এই রায়-সাহেব-পত্নী কথাটাই যে তোমার মস্ত বড় অলঙ্কার!

স্ত্রী। হাঁ তা—

ভূ। এর ভিতর ত হাঁ তা করবার কিছু নেই। রায়-সাহেব জিনিষটা কি সোজা! গভর্ণমেণ্ট যে কালা আদমীকে সাহেব বলে ডাকবে, এটা কি সোজা সৌভাগ্য! তাই কি শুধু সাহেব, রা-য়-সা-হে-ব! কেমন চমৎকার শোনায় বল দেখি?

স্ত্রী। তা বটে। তবে তুমি বলেছিলে যে রায়সাহেব হলে একখানা ভাল গয়না করিয়ে দেবে, সেই কথাই বলছি।

ভূ। সে কথা আমার মনে আছে, তবে দিনকতক সবুর করতে হবে। কেননা এইসব দশজন বন্ধুবান্ধবদের খাওয়াতে হবে ত, তারা ত ছাড়বে না, তাছাড়া ম্যাজিষ্ট্রেটকে দুটো ডালি আর গোটা দশেক ভাল স্তাম্পেন পাঠাতে হবে।

স্ত্রী। তা যা ভাল হয় কর, তবে—

ভূ। সেজন্যে তোমার কোন ভাবনা। এই সব কাজ শেষ হয়ে গেলেই কলকাতা থেকে আজকালকার ফ্যাশানের ভাল হার একটা কিনে এনে দেব। হাঁ দেখ, আর একটা কথা। এই সব চাকরবাকরগুলোকে বলে দিও, যখনই তারা আমার নাম করবে তখনই যেন রায়সাহেব বলে; আর তোমার বাপের বাড়ীর সম্পর্কে যে সব আত্মীয় আছে, তাদিগে লিখে দাও যে এ বাড়ীর পত্রের ঠিকানায় তারা যেন এবার থেকে রায়সাহেব কথাটার উল্লেখ করে। একবার তুমি পাড়ার মেয়েদের এ খবরটা দিয়ে এসনা।

স্ত্রী। (হাসিয়া) এই যে যাই রায়সাহেব মশায়।

ভূ। একটু তাড়াতাড়ি যাও।

[এই সময় বাহির হইতে কে 'ভূপেনবাবু' বলিয়া ডাকিল]

ভূ। কে? মতি নাকি? আরে এস, এস, উপরে এস, (স্ত্রীর প্রতি) তুমি যাও তাহলে। (স্ত্রীর প্রস্থান)

ভূ। মতি!

মতি। আজ্ঞে।

ভূ। একটা খবর শুনেছ?

মতি। আজ্ঞে হাঁ, সেই শুনেই ত আসছি আপনার কাছে।

ভূ। তা বেশ করেছ, এ'ত সকলেরই আনন্দের কথা কিনা, কি বল?

মতি। সে ত নিশ্চয়ই, সে বিষয়ে কি আর কথা আছে!

ভূ। সকলই তাঁর দয়া! আমি ত ম্যাজিষ্ট্রেটকে অনেকবারই বলেছিলুম যে সামান্য লোক আমি, আমাকে অনর্থক আর এসব কেন? আমার চেয়ে অনেক ভাল লোক আছেন, তাঁদিগে দিলেই ভাল হবে। তাতে ম্যাজিষ্ট্রেট বল্লেন কি জান? বল্লেন, না, না, এ উপাধি আপনাকে নিতেই হবে; আমি জানি, আপনার চেয়ে ভাল লোক এ জেলায় আর নাই; কি আর করি, বাধ্য হবে নিতে হল।

মতি। তা ভালই করেছেন, না হলে ম্যাজিষ্ট্রেট হয়ত দুঃখ করতেন।

ভূ। নিশ্চয়ই। সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আর ম্যাজিষ্ট্রেট আমাকে কি খাতিরটাই না করেন! গেলেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান, সেক্‌হ্যাণ্ড করে চেয়ারে বসান, বেয়ারাকে পাখা করতে বলেন, এই সব!

মতি। ম্যাজিষ্ট্রেট ঠিক লোকই চিনেছেন, আপনি আপনাকে সামান্যই বা বল্লেন।

ভূ। সে কথা ঠিক, সাদা চামড়ার গুণই আলাদা, না হলে কি আর এত বড় রাজত্ব চালাতে পারে? কি ব্যবহার, কি কথা! আহা-হা!

মতি। আচ্ছা ভূপেনবাবু, এখন আসি তা'হলে।

ভূ। এর মধ্যেই?

মতি। একটু কাজ আছে, তাড়াতাড়ি যেতে হবে।

ভূ। আচ্ছা এস; তবে দেখ, তোমার সব এখানের বা অন্য যায়গার বন্ধুবান্ধবদের এ খবরটা দিও। খাম বা পোষ্টকার্ডের যা দাম লাগবে আমি দিয়ে দেব।

মতি। তার জন্যে আপনি চিন্তা করবেন না।

ভূ। না, না, আমার কাছ থেকেই নিও। চল, তোমাকে সদর পর্য্যন্ত দিয়ে আসি।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

[বিলাতী-কায়দায় সজ্জিত এক কক্ষে বসিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব কি লিখিতেছেন, এমন সময় ভূপেনবাবু প্রবেশ করিলেন; সাহেবের সম্মুখীন হইয়া প্রায় ভূমি পর্য্যন্ত মাথা নামাইয়া সেলাম ঠুকিয়া দাঁড়াইলেন।]

সাহেব। (কিছুক্ষণ নীরবে লিখিয়া) ভূপেনবাবু, আপনি তো রায়সাহেব হয়েছেন?

ভূ। আজ্ঞে হুজুর, সে ত আপনারই কৃপায়, হুজুর দয়ার অবতার!

সা। কিন্তু দেখুন, এবার আপনার responsibility আরও বেড়ে গেল।

ভূ। হুজুর আমাকে যখন যা বলবেন, তৎক্ষণাৎ তাই করে দেবো। আপনার কাজ করতে পাওয়া, হুজুর, আমার পরম সৌভাগ্য।

স। আপনাদের ওখানে একটা Student Association হয়েছে বলে শুনছিলুম?

ভূ। আজ্ঞে এই দিনকতক হোল হয়েছে।

[সাহেব হুঁ বলিয়া একটা চুরুট ধরাইলেন]

ভূ। আজ্ঞে, এই আপনার কাছ থেকে যেয়েই তার ব্যবস্থা করতে লাগব। আগে স্কুলের মাষ্টারদের সঙ্গে দেখা করব, তারপর ছাত্রদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে তাদের গার্জেনদিগে বলব। দিনকতকের মধ্যেই আমি সব ঠিক করে দেব

সা। Many thanks ভূপেনবাবু! আপনার কথা আমি কমিশনারের কাছে বলব, যাতে তিনি আপনাকে আরও কিছু বড় title দেওয়াতে পারেন।

ভূ। হুজুর করুণাবতার। হুজুর যে আমাকে এত কৃপার চক্ষে দেখেন, এ আমার অনেক সুকৃতির ফল।

সা। You are very humble I see. একি, ভূপেনবাবু, আপনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন! আমি ত লক্ষ্য করিনি। বসুন, বসুন, এই চেয়ারে বসুন।

ভূ। না হুজুর, থাক্। আপনার কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে কিছু আমার কষ্ট নেই।

সা। না, না, বসুন।

ভূ। (চেয়ারে বসিয়া) হুজুরের অসীম দয়া, দেখুন হুজুর, আমার wife আমি রায়সাহেব হয়েছি শুনে আজ বলছিলেন—

সা। (হাসিয়া) কি বলছিলেন?

ভূ। (একগাল হাসিয়া) বলছিলেন, তুমি হুজুরকে বলে রেখো যেন তিনি এখান থেকে চলে যাবার আগে তোমাকে রায়বাহাদুর করে দিয়ে যান।

সা। রায়বাহাদুর ভূপতিবাবু! All right, কিন্তু আপনাকে ভাল করে এই সব কাজ করতে হবে। আর সে কথাটা মনে আছে ত?

ভূ। খুব মনে আছে হুজুর।

সা। No fear then, Raishahib আমি আপনাকে 'রায়বাহাদুর ভূপতিবাবু' করে দেব। হো হো হো।

ভূ। হুজুর দয়া করে চরণে রাখেন বলেই বেঁচে আছি।

যবনিকা

শ্রীসমরেশচন্দ্র রুদ্র

মোটরে রাঁচী-অভিমুখে

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী এম্ এ, বি-এল্, বি, সি, এস্

প্রবন্ধের শিরোনামটি যেরূপভাবে মুদ্রিত হইয়াছে তাহার বিশেষত্ব চক্ষুষ্মান্ পাঠকমাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। কেন এরূপ করা হইল, প্রবন্ধটি পাঠ করিলেই তাহার অর্থ বুঝিতে আর কষ্ট হইবে না। আপাততঃ এইটুকু মনে রাখিতে সকলকেই অনুরোধ করি যে, ছাপাখানায় এক সাইজের টাইপের অপ্রাচুর্য্য এই লিপি বৈষম্যের কারণ নহে। লেখকের নির্দ্দেশমতোই ঐ ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রবন্ধের অমন গালভরা নাম—মোটরে রাঁচি, ইহার লোভ সাম্‌লানো শক্ত, অথচ একটু মোচড় না দিলে ঐ নামে সত্যরক্ষা কঠিন। তাই এই সামঞ্জস্য-বিধান। বিজ্ঞান বলে, পারিপার্শ্বিকের সহিত সামঞ্জস্য-স্থাপনই জীবনের রহস্য।

স্বপক্ষে নজীরও আছে।

"ভীমচন্দ্র নাগ

তস্যভ্রাতুষ্পুত্র 'অমুক'চন্দ্র নাগের

জগদ্বিখ্যাত সন্দেশ"

ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট হইতে বৌবাজারের মোড়ে আসিতে আসিতে কে-না উক্ত আইন-সঙ্গত, সুচিন্তিত এবং বিজ্ঞান-সম্মত সাইন বোর্ডটি লক্ষ্য করিয়াছেন? এতদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর মহাভারতীয় নজীরও দুষ্প্রাপ্য নহে। স্বয়ং ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের "অশ্বত্থামা হতঃ—ইতি গজঃ।" তিনি অবশ্য কথাটা বলিয়াছিলেন মুখে, ছাপাইয়া দেন নাই। মুদ্রাযন্ত্রের তখনো সৃষ্টি হয় নাই। আধুনিক যুগে বর্ত্তমান থাকিলে এবং ঐরূপ জটিল রাজনৈতিক সমস্যার আশু সমাধান অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িলে, আমরা অনুমান করিতে পারি, তিনিও প্রয়োজনীয় এবং অপ্রয়োজনীয় কথাগুলি ঐরূপ বিভিন্ন টাইপে মুদ্রিত করিয়াই বিবৃতি প্রচার করিতেন। "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।" সুতরাং এক্ষেত্রে লেখক মহাজনেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন! আশা করি, তাহাতে তাঁহার কোনো প্রত্যবায় হইবে না, এবং হইলেও যুধিষ্ঠিরের নরকদর্শনাপেক্ষা গুরুতর দণ্ডার্হ বলিয়া তিনি সাহিত্যিক সমাজে বিবেচিত হইবেন না।

সান্ধ্য-বৈঠকে ডাক্তার আসিয়া যখন বলিলেন, "ওহে, একখানা চমৎকার মোটরের যোগাড় হয়েচে" তখন বন্ধু-মহলে একটা সাড়া পড়িয়া গেল—"উৎসাহের শিহরণ বহিয়া গেল" বলিলেই বোধ হয় কথাটা বেশ মানান সই হইত! কয়েকদিন পূর্ব্বে মোটরে সদলবলে অনতিদূরবর্ত্তী বগড়ীর কৃষ্ণরায় দেখিতে গিয়া মোটরে রাঁচী পর্য্যন্ত যৌথভ্রমণের পরিকল্পনাটি অঙ্কুরিত হইয়া উঠিয়াছিল এবং পৌনঃপুনিক আলোচনার রসসিঞ্চনে তাহা ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছিল। এমন সময়ে ডাক্তারের এই "হিতং মনোহারি চ" বচনামৃত যেন যাদুকরের মায়াদণ্ড-স্পর্শে উহাকে সদ্য পল্লবিত ও মুকুলিত করিয়া তুলিল।

ডাক্তার সমগ্র ভারতবর্ষ ঘুরিয়াছেন। আকুমারী হিমাচল, দ্বারকা-চট্টল, বায়ুকোণের উত্তুঙ্গ ভূ-স্বর্গ কাশ্মীর কিংবা অগ্নিকোণের নিম্নতম Sea-level গঙ্গা-সাগর-সঙ্গম, সবই তিনি যদৃচ্ছাক্রমে বিচরণ করিয়াছেন। ভ্রমণের নেশায় তিনি নিজে মসগুল্ এবং অপরকে মাতাইয়া তুলিতেও সিদ্ধবাক্।

এ হেন ব্যক্তি যখন বাহনেরও সুবিধা করিয়া আনিলেন তখন গ্রীষ্মের দুঃসহদহনও অসহনীয় হইবে বলিয়া আর মনে হইল না। সুযোগ ইন্দ্রধনুর মতো, ক্ষণস্থায়ী এবং সর্ব্বদা আসে না। অতএব অবিলম্বে তাহার সদ্ব্যবহার করাই সঙ্গত, এই যুক্তি সকলের নিকটেই সমীচীন বোধ হইল। সর্ব্বসম্মতিক্রমে নির্দ্ধারিত হইয়া গেল, ভারতসম্রাটের জন্ম-দিনের আসন্ন বন্ধোপলক্ষে বাহির হইয়া পড়িতে হইবে।

বন্ধ শনিবারে। সঙ্গে রবিবারও রহিয়াছে। কিন্তু আরো দুইটা দিন না হইলে ভূগু-বাসরে যাত্রা করিয়াও রাঁচী গমন-দর্শন এবং প্রত্যাবর্ত্তন সম্ভব হয় না। অথচ দলের মধ্যে তিনটি শাসনবিভাগীয় হাকিম। একসঙ্গে এতগুলি হাকিমকে একই জেলার সদর ষ্টেশন হইতে ছাড়িয়া দিলে তথায় বৃটিশরাজত্ব ইতিমধ্যে টলটলায়মান হইয়া উঠিবে কিনা, সমস্যা উপস্থিত হইল। অবশেষে বহু চেষ্টাচরিত্রের ফলে 'সতর্ক বিবেচনা'র পর "গুরুতর রাজকার্যো অতি-শ্রমক্লিষ্ট এই তিনটি প্রাণীর দণ্ডপর্য্যটন ও মুক্তবায়ুসেবনে স্বাস্থ্যোন্নতির সবিশেষ সম্ভাবনা" এই সুমহৎ যুক্তিতে প্রার্থিত অনুমতি মিলিল। এই ব্যাপারে কর্ত্তৃপক্ষের মনের উপর Darjeeling Exodus এর অনুকূল প্রভাব পরোক্ষে কার্য্য করিয়াছিল কিনা, আমরা অবগত নই।

জ্যৈষ্ঠ শেষের এক অত্যুত্তপ্ত অপরাহ্নে (বেলা ২ টায়) যখন ফারেনহীটের তাপমান যন্ত্র পারদের উদ্ধগতি ১১০° ডিগ্রির কোঠায় পৌঁছিয়াছে যখন মেদিনীপুরবাসী দোর-জানালা প্রভৃতি বায়ু প্রবেশের পথমাত্র বন্ধ করিয়া বর্গীর আমলের দুর্গবৎ গর্ভগৃহের অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়া নিদ্রা যাইবার বৃথা চেষ্টা করিতেছে তখন এই দুঃসাহসী দলটি বিনা দ্বিধায় "দুর্গা" বলিয়া যাত্রা করিল।

দেখা গেল, দল দানা বাঁধিয়া পূর্ব্ব হিসাবকে অতিক্রম করতঃ পুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ডাক্তারের অপর এক ডাক্তার-বন্ধু এবং D A O—বসাকও জুটিয়াছে। উৎসাহ জিনিষটা সংক্রামক এবং কখনো কখনো মারাত্মক। অপর ডাক্তার বাবুটিকে সঙ্গী করায় একটু স্বার্থ ছিল। রাঁচীতে তাঁহার আত্মীয়বর্গ রহিয়াছেন—সেখানে আস্তানার সুবিধা হইবে। D.A.O. পাত্‌লা ছিপ্‌ছিপে লোক—নেহাত্‌ই হাল্‌কা, জায়গা জুড়িবে সামান্যই। শিক্ষানবিশ হাকিম কু—ও ছেলেমানুষ, ওজনই বা কত! ('কু—' দেখিয়া আপনারা কিন্তু কু ভাবিবেন না। কুসুম, কুমুদ, কুট্মল, কুবলয়ের কু কি খারাপ? সে বাস্তবিকপক্ষে অতিশয় সু। সুনীল, সুবোধ, সুশান্ত—যাই মনে করুন, একটাও তাহার পক্ষে বেমানানো কি অত্যুক্তি হইবে না।) ডাক্তার নং ২ মাঝারি। ইহাদের বাবরতা অপর তিন জনের গুরুত্বে পোষাইয়া উঠিয়া বরঞ্চ কিছু বেশী হইয়াছে। শোফেয়ার দুই জন। ছয়জনের তল্পিতল্পা, শয্যাদ্রব্যাদি, আহার্য্য ও পানীয় (যদিও খুব বেশী নহে)—সর্ব্বসমেত পনেরো ষোলো মণের বেশী হইবে না। তা' ডাক্তার নং ১ আশ্বাস দিয়াছেন, গাড়ী খুব ভালো, নূতন, বৃহৎ,—আমেরিকান মেক্ 'নেশ'। আমরা বেদবাক্যের মতো তাহাতে আস্থাবান্। একদিকে যেন একটু কাৎ হইয়া পড়িয়াছে। ও কিছু নয়, বেডিংগুলো ঐ ধারে বাঁধা হইয়াছে কিনা তাই। মা ভৈঃ। "দুর্গা, দুর্গা"—মোটরের হর্ণ বাজিল—ভস ভস্ করিয়া গাড়ী পুণ্যকীর্ত্তি অহল্যাবাই বিনির্ম্মিত জগন্নাথ রোডে সোৎসাহে ছুটিল।

ডাক্তার আমাদের পাণ্ডা—মাথায় পাগ্‌ড়ী বাঁধিয়া সারথি-যুগলের পার্শ্বে যথাযোগ্য স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। সামনের বেবি সীট্ দুইটির একটি ন্যায়তঃ বেবি-হাকিমেরই প্রাপ্য এবং কার্য্যতঃও তাহাই হইয়াছে, অপরটিকে বসাক—বয়সে বেবি না হইলেও আকারে তাহাই। সুতরাং আপত্তির যো কি? পশ্চাতের সম্মানিত আসন বোধহয় বয়োজ্যেষ্ঠ কিংবা গুরুশ্রেষ্ঠ (গুরু=ভারী, not as opposed to শিষ্য) বলিয়াই অবশিষ্ট ত্রয়ীকে সৌজন্যপূর্ব্বক ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। বেবি-সীট্-অধিকারীদ্বয় বেশ সুখাসীন হইয়াছিলেন, একথা হলফ করিয়া বলা কঠিন।

যাত্রারম্ভের উদ্যোগে এবং চলার পথে আমরা কেবলই শুভ লক্ষণ দেখিতেছি। যখন দেখিলাম প্রাতঃকালেই অভাবিতরূপে ডাক্তার তাঁহার কোনও বন্ধুর নিকট হইতে হাইদ্রাবাদের তৈরী, অশেষ কারুশিল্পমণ্ডিত, স্ফীতোদর অথচ খর্ব্বকায় একটি নয়নাভিরাম মৃৎকুম্ভ এবং তাহার নির্ম্মিত এককালীন আবরণ ও আধার সংগ্রহ করিয়া পানীয় জল সংরক্ষণের সুবন্দোবস্ত করিয়াছেন তখনই যাত্রার শুভ-পরিণাম সম্বন্ধে আর সন্দেহ রহিল না। যখন দেখিলাম, পথিপার্শ্বে শুভ্রকায় গো-বৎস স্নেহময়ী গাভী জননীর স্তন্যপানে তৎপর—ধেনুর্বৎস প্রযুক্তা—তখন যাত্রায় সংশয়াকুল হইবে, এমন মূঢ় হিন্দু-সন্তান কে আছে? যখন দেখিলাম, কচিৎ কোথাও কলসী কক্ষে কতিপয় নারী দুঃসহ রৌদ্র-অগ্রাহ্য করিয়া জলাশয়াভিমুখে অগ্রসর হইতেছে তখনি

আমরা সমস্বরে আওড়াইলাম, "তরা হ'তে শূন্য ভাল যদি ভরতে যায়", এবং এই মাঙ্গলিক অভিজ্ঞানদর্শনে অতিমাত্রায় নিশ্চিন্ত হইয়া পরমানন্দে পথ অতিবাহন করিয়া চলিলাম।

উদ্দাম এবং উচ্ছৃঙ্খল পবন তৃণলেশশূন্য কঙ্করাকীর্ণ গৈরিক মালভূমির উত্তপ্ত চত্বরে প্রতিহত হইয়া এক একবার আমাদের মুখের উপর অগ্নিঝলক বর্ষণ করিয়া যাইতেছে। কিন্তু তাহাতে আমাদেব ভ্রূক্ষেপ নাই। আমরা উৎসাহে টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিতেছি এবং মাঝে মাঝে বি—কর্তৃক বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক সংগৃহীত সুপুষ্ট ঘনকৃষ্ণ জম্বুফলের রসপ্রলেপে শুষ্ক অধরোষ্ঠকে সরস করিতেছি।

একবার একটা ঘূর্ণীবাত্যার "ক্ষণিকা" আমাদের মুখে চোখে ধূলার আবির ছিটাইয়া ঘণ্টায় পঁচিশ মাইল বেগে ছুটন্ত গাড়ীখানাকে বেশ একটু ঝাঁকুনি দিয়া গেল। সেই ঝাঁকুনির চোটে সহসা আমাদের ক্রোড়দেশে ছিট্‌কাইয়া পড়িল—ধ্রুবতারা। আপনারা চমকাইয়া উঠিবেন না। ইহা আকাশের ধ্রুবতারা নহে—আর রৌদ্রদগ্ধ দুপুর দুইটায় ধ্রুবতারা দৃষ্টিগোচর হইবার সম্ভাবনাই বা কি? উহা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ "ধ্রুবতারা" উপন্যাস বহিখানা, মোটরের হুডের আড়ালে রক্ষিত ছিল, আকস্মিক কম্পনে আশ্রয়চ্যুত হইয়া মাধ্যাকর্ষণের অস্তিত্ব ও প্রভাব প্রতিপন্ন করিল মাত্র। মোটর ড্রাইভারের সাহিত্যচর্চ্চা আইনে বা অর্ডিনান্সে নিষিদ্ধ নহে। অবসর বিনোদনের এমন সহজ উপায় আর আছে কি? তবু ভালো, বইখানা "সাহিত্যে স্বাস্থ্যরক্ষার" জন্য ধৃতব্রত, স্থিরধী লেখকেরই লেখনীপ্রসূত—অতি-তরুণগণের আমদানী কন্টিনেন্টেল কামায়নের অজীর্ণোদ্গার নহে।

ধ্রুবতারার পতনকে দুর্নিমিত্ত মনে করিয়া হয়ত আমাদের সতর্ক হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু উদ্ধত চিত্তবৃত্তি হিতোপদেশ গ্রাহ্য করে কি? শালবনানীর শাল-জঙ্গল ছাড়াইয়া, তরঙ্গায়িত রাজপথের আরোহ-অবরোহ অনুসরণক্রমে আমরা বেলা ৩টায় চন্দ্রকোণারোড্‌ বাজারে উপনীত হইলাম। ডাক্তার নং ২ এর আত্মীয়বর্গ ঘোলের সরবতে আপ্যায়িত করিলেন। "কালো জাম ঠাণ্ডা অর্ডি নাই কোনো জঞ্জাল"—সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছে। অর্দ্ধঘণ্টা বিশ্রামের পর আর একটানে গড়বেতায় পৌঁছানো গেল। টেলিগ্রাফ অফিস হইতে রাঁচীতে তড়িৎ-বার্ত্তা প্রেরিত হইল—"আমরা আসিতেছি।" সম্মুখেই শীলাবতী—শৈল সরিৎ। পাহাড় হইতে ঢল নামিলে দুই কূল ছাপাইয়া মাঠঘাট গ্রাম জনপদ ভাসাইয়া দেয়, এখন সৈকতশয্যায় শীর্ণকায়া এবং অগভীর। গাড়ী ঠেলিয়া পার করিতে হইবে। গড়বেতার চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে (সার্কেল অফিসারকে) পূর্ব্বাহ্নেই সাহায্যের জন্য অনুরোধ করা হইয়াছিল। তিনি কর্ম্মকুশল এবং সমজদার ব্যক্তি। আমরা ইতিপূর্ব্বেই সে পরিচয় লাভ করিয়াছি। নদীকূলে পৌঁছামাত্র দেখা গেল, দফাদার লোকজনসহ একেবারে এ-টেন্‌-শান্‌। মোটর অবিলম্বেই উত্তীর্ণ হইয়া গেল। হাঁটিয়া পার হইতে হইবে বলিয়া আমরা পূর্ব্বেই পাদুকা পরিহার করিয়াছিলাম, কিন্তু বালুময় বেলাভূমিতে তখন পা' পাতে কার সাধ্য? ফোস্কা পড়িবার উপক্রম। দৌড়াইয়া যাইয়া নদীর জলে পা ডুবাইয়া তবে শান্তি। "দীপ্ত সূর্য্য সহ্য হয় তপ্ত বালি চেয়ে" কবিবচনের সত্যতা সশরীরে প্রত্যক্ষ করিলাম। আর কৌমুদীস্নাত নদীসৈকত এবং রৌদ্রতপ্ত বালু-তট যে কাব্যের সমানবিষয়ীভূত হইতে পারে না তাহাও হাতে-নাতে ('পায় পায়' বলিলেই ঠিক হইত) বুঝিয়া লইলাম।

এই যে অতি সহজে স-মোটর নদী উত্তরণ, এটাকেও একটা বিশেষ শুভলক্ষণ মনে করিয়া আমরা যাত্রার সুসিদ্ধি এবং সার্থকতা সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হইলাম।

ওপারে পৌঁছিয়া আমাদের কী উল্লাস! তপনতাপ তখন মন্দীভূত। অস্তগমনোন্মুখ সহস্ররশ্মির ম্লানদীপ্তি সহনীয় হইয়া আসিয়াছে। আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যে বিষ্ণুপুর উপস্থিত হইয়া মহকুমা-ম্যাজিষ্ট্রেটের ভবনে চা-পানের ভরসা রাখি। চাই কি, বিষ্ণুপুরের দ্রষ্টব্য বাঁধ-মন্দিরাদিও ইতিমধ্যে যথাসম্ভব দেখিয়া লইতে পারি।

তারপরের প্রোগ্রামও আলোচিত হইয়া স্থিরীকৃত হইল। যেহেতু এই দারুণ-গ্রীষ্মে নৈশ অভিযানই অধিকতর আরামদায়ক হইবে অতএব বাঁকুড়াতে না থামিয়া আগ্রা হইয়া একেবারে পুরুলিয়া চলিয়া যাওয়াই সাব্যস্ত হইল। তারপর, আবার ভোরের দিকে যাত্রা করিয়া প্রাতে ৯টা

১০টার মধ্যে রাঁচীতে পৌছান যাইবে। স্নিগ্ধ ঊষালোকে রমণীয় পার্ব্বত্য দৃশ্য উপভোগ করিতে করিতে অগ্রসর হওয়ায় রঙীন কল্পনায় আমাদের উন্মুখ চিত্ত বাড়িয়া উঠিল। আহার্য্য কিছু সঙ্গে ছিল; না হয় পুরুলিয়াতে রেলওয়ে রিফ্রেশমেণ্ট রুমের শরণাপন্ন হওয়া যাইবে। অতএব ভাবনা নাই। কথা রহিল, ফিরিবার পথে বাঁকুড়ায় বন্ধুবর N. G B'র আবাসে মধ্যাহ্নকৃত্য সমাপন করতঃ সহর পরিদর্শনপূর্ব্বক বিকালের দিকে মেদিনীপুর অভিমুখে প্রত্যাভিযান করিলেই চলিবে।

হায়, অদূরদর্শী, অক্ষম মানুষের 'আকাশে দুর্গ নির্ম্মাণ'। অদৃশ্য বিধাতাপুরুষের নিঃশব্দ হাস্য (যদি নিরাকারের পক্ষে তাহা সম্ভব হয়) নিশ্চয়ই তখন নিখিল ব্যোম পরিপ্লাবিত করিয়া ছড়াইয়া পড়িতেছিল।

ঋজু, বঙ্কিম রাস্তায় দোপাত করিতে করিতে হাওয়া গাড়ী তখন হাওয়ারই মতো ছুটিয়াছে। পার্শ্বের তরুশ্রেণীর অন্তরালে সুদূরপ্রসারী অবারিত মাঠ সান্ধ্য সান্ধ্যসূর্য্যের স্বর্ণালোকে আনন্দোজ্জ্বল। মীটারে ৪২ মাইল উঠিয়াছে—বিষ্ণুপুর বেশীদূরে নহে। আসন্ন চা পানের সুমধুর সম্ভাবনায় সকলেই পুলকচঞ্চল। সহসা বোমা ফাটার মতো শব্দে আমরা চমকিত হইয়া চাহিলাম। রথ তখন অচল হইয়া আসিয়াছে।

নামিয়া দেখিলাম, পশ্চাৎ চক্রদ্বয়ের একটির টিউব বিদীর্ণ হইয়াছে এবং দুষ্ট চক্রের কেন্দ্রস্থল হইতে ধূমজ্যোতি নির্গত হইতেছে। ভাগ্যক্রমে অদূরেই সরকারী কৃষিক্ষেত্রে (তুঁতের আবাদ) বাঁধানো কূপ দৃষ্টিগোচর হইল। তথা হইতে যথাসম্ভব জল আনয়নপূর্ব্বক সূচনাতেই খাণ্ডবদাহের পরিনির্ব্বাণ ক্রিয়া সমাপ্ত করা গেল। তারপর মেরামতের পালা। সারথিযুগল তাহাতে মনোনিবেশ করিল, সহকারী হইলেন ডাক্তার, যিনি এই মনোহর অতিপ্রশংসিত পুষ্পকের সংঘটন-কর্ত্তা।

বলা বাহুল্য, মূর্ত্তিমান্ কৃষিবিভাগ সঙ্গে থাকাতে রথভঙ্গের সুযোগে (?) অদূরসংস্থ রেশমী আবাদ অপরিদর্শিত রহিল না। অর্থনীতিতে লব্ধোপাধিক বপুষ্মান্ বি—যুবজনোচিত উৎসাহে রসাকের অনুগামী হইলেন। শিক্ষানবীশের সব বিষয়েই জ্ঞানলাভ অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব কু—ও না গিয়া পারিল না। আর আমার মতো

"তীরেও নয়, পারেও নয় যে জন আছে মাঝখানে"

তাহাকে রাস্তার মাঝে দাঁড়াইয়া চারিদিক পর্য্যবেক্ষণ করিয়াই কাটাইতে হইল। বলিতে বাধা নাই, কল্পনার চার ভিন্ন আর কোন চারই এ পঙ্ককে প্রলুব্ধ করে না।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে বিপুল কর্ম্ম সমাপ্ত হইল। এই দুর্ঘটনায় আমরা একটুও দমি নাই। দীর্ঘপথে সঙ্কটসঙ্কুল যাত্রায় এমন একটু আধটু হেরফের হইবেই তো। তা নইলে এ্যাডভেঞ্চারই বা কি হইল? আর মনে করিয়াছিলাম, আমাদের মাতলি-সারথি অবশ্যই অভিজ্ঞ পাকালোক—এরূপ দুর্নিমিত্তের জন্য সে সর্ব্বদাই প্রস্তুত, নতুবা রাঁচী গমনে সাহসী হইবে কেন? কিন্তু মাঝে মাঝে সে দুই একবার অতর্কিতভাবে মোটরখানিকে যেরূপ সঙ্কট-সীমায় (Danger line) লইয়া যাইতেছিল তাহাতে মাতলি মাতাল কি না এই সন্দেহ আমাদের মনে কখনো কখনো উঁকি মারিতেছিল। আর, ফাটা টিউব মেরামতের সময়ে সে টিন গায়ে একাধিক পটিলাগানো দেখিয়া গাড়ীখানার নূতনত্বে আস্থা স্থাপন কঠিন হইয়া উঠিল। যাহা হোক্, অনতিস্তিমিত উৎসাহে আমরা আবার রথারূঢ় হইয়া বসিলাম। শান্ত, বিচরণশীল গো-মেষ মহিষ যূথকে চমকিত করিয়া মোটরের ভেঁপু—'বাজিয়া' বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়—চীৎকার করিয়া উঠিল এবং গাড়ী গন্তব্যপথে অগ্রসর হইল।

গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিলে রসাক বলিলেন, "একটা ভুল হইল। সঙ্গে ক্যামেরা ছিল, এই অবস্থায় একটা ছবি লইলে হইত। এতক্ষণ এখানে ছিলাম!" কে বলিয়া উঠিল, "তার আর কি, next opportunityতে লইলেই হইবে!" কখনো কখনো অতর্কিতে মুখ হইতে এমন কথা বাহির হইয়া যায়, যাহা পরে দৈববাণীর মতো সফল হইয়া উঠে। কথাটা শুনিয়া আমরা প্রথমে হাসিয়া উঠিলেও পরক্ষণেই তাহার প্রচ্ছন্ন মর্ম্মার্থ অনুধাবন করিয়া শিহরিয়া উঠিলাম।

বিষ্ণুপুরে চা-পানের আশা পরিত্যাগ করিতে হইল, অনেকটা সময় নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে

যৌবনের অনেক আশাই এইরূপে "পথপ্রান্তে ফেলে যেতে হয়।" কেন না "নাই, নাই, নাই যে সময়।" বিষ্ণুপুরের রাস্তা ডাহিনে রাখিয়া আমরা আগাইয়া চলিলাম। অদূরে সহরটির দিকে চাহিয়া একটি ছোটখাট দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়াই আপাততঃ তাহার নিকট বিদায় লইতে হইল। ভবিষ্যতে আর দেখা হইবে কি?

এখন লক্ষ্য বাঁকুড়া। সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় সেখানে পৌঁছিয়া N. G. B. কে একটু জানাইয়া যাইতে হইবে যে, প্রত্যাবর্তনের পথে আতিথ্যের সুযোগ দিয়া তাহাকে আমরা কৃতার্থ করিব। অতএব তাহার ক্ষুণ্ণ হইবার কোনো কারণ নাই। বলা বাহুল্য, বেচারাকে পূর্ব্বাহ্ণে কোনো সংবাদই দেওয়া হয় নাই। আকস্মিক এবং অতর্কিত আগমনের ধাক্কায় বন্ধুবর্গের কে কিরূপ পুলকিত হইয়া উঠে, তাহাই পরীক্ষা করিব, এমন কোনো কুমতলব আমাদের ছিল না। আসল কথা, অভিযানের সিদ্ধান্তই আকস্মিক—তার উপর, ছুটির অনুমতি মিলিল একেবারে একাদশ ঘটিকায় অর্থাৎ Eleventh hourএ (অনুবাদ সম্পূর্ণ মূলানুগত হইয়াছে, আশা করি)। তাইতে কাহাকেও ওয়ার্ণিং দেওয়া সম্ভব হয় নাই।

প্রদোষের অস্তরাগে আকাশ বিচিত্র; বাতাস স্নিগ্ধ, সুখসেব্য। অদূরে তালীবন সমাচ্ছন্ন পুকুরের উঁচু পাহাড়—তাহার আলিঙ্গন-ধৃত শীতল-সলিলের একটি ছায়াপ্রলেপ কখনো কখনো চোখে মাখাইয়া দেয়। পাখীর ঝাঁক সার বাঁধিয়া উড়িয়া চলিয়াছে। মনে পড়িল,—

"শ্রেণীবন্ধাদ্বিতন্বদ্ভিরস্তম্ভাং তোরণস্রজম্
সারসৈ র্কলনির্হ্রাদৈ র্ক্কচিদুন্নমিতাননৌ ;"

কিন্তু 'রথনেমিস্বনোন্মুখ' কোনো 'মৃগদ্বন্দ্বে' পরস্পরের অক্ষিসাদৃশ্য দেখিবার সুযোগ আমাদের ঘটে নাই। যাহারা উন্মুখ হইয়া ভীতচকিত নেত্রে সময় সময় আমাদের দিকে চাহিয়াছিল তাঁহারা গো, মেষ কিংবা মহিষ জাতীয়, কাব্যের কমনীয় পংক্তিতে তাহাদের স্থান নাই।

উনপঞ্চাশৎ মাইল অতিক্রমানন্তর রামসাগর নামক সুপ্রসিদ্ধ পল্লীগ্রামের প্রান্তবর্ত্তী পথিমধ্যে গোধূলিলগ্নে, বোমা-বিদারণ শব্দে আরোহীগণকে সচকিত করিয়া প্রশংসিত স্যন্দনখানি দ্বিতীয়বার নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইল।

পুনরায় টিউব ফাটিয়াছে। এবার পুরোভাগের দক্ষিণেতর চক্রের। অনুসন্ধানে জানা গেল, বুদ্ধিমান শোফেয়ার অতিরিক্ত নূতন টিউব সঙ্গে একটিও আনে নাই, বিনা সম্বলেই এই সুদীর্ঘ অভিযানে বেপরোয়াভাবে বাহির হইয়াছে। 'ধ্রুবতারা' পাঠকারী এই শিক্ষিত শোফেয়ার নিশ্চয়ই শিশু শিক্ষা দ্বিতীয়ভাগে পাঠ করিয়াছিল—"বিনা সম্বলে পথ চলিও না।" কিন্তু "শাস্ত্রাণ্যধীত্যাপি ভবন্তি মূর্খাঃ।" অথবা এই বে-পরোয়া বাহিনীর ছোঁয়াচ তাহাকেও লাগিয়াছিল কি? বিচক্ষণ ডাক্তারের উপর যানবাহনের বরাত ছিল বলিয়া আমরা ওদিকে দৃক্‌পাতই করি নাই। উপর্য্যুপরি বাতিপাতে আমরা একটু উষ্ণ হইয়া যুগপৎ স্যন্দন ও সারথির নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হইলাম। তাহার কতকটা হয়তো পরোক্ষভাবে ডাক্তারকেও স্পর্শ করিতেছিল—কিন্তু ডাক্তার নির্ব্বিকার, এবং বাগ্‌বিন্যাস-কুশল। মাঝে মাঝে অপরাধীর পক্ষসমর্থনের চেষ্টা পাইতেছিলেন।

যাহা হোক্, পুনরায় রিপু কর্ম্ম আরম্ভ হইল। কিন্তু দেখা গেল, একটা ফাটা মেরামত করিয়া পাম্প্ করা মাত্র মুক্তিকামী রুদ্ধ বায়ু অন্য দিকে ছিদ্র করিয়া বাহির হইয়া পড়ে। এককথায়, টিউবগুলি অতিশয় জীর্ণ। গাড়ীখানার তথাকথিত নূতনত্বের সঙ্গে এটার সামঞ্জস্য হয় না। ক্রমে জানা গেল গাড়ীটি সেকেণ্ড্ হ্যাণ্ডে নহে, পরন্তু থার্ড হ্যাণ্ডে ক্রীত হইয়াছে এবং কিছুকাল অব্যবহারে ছিল!

ডাক্তার বলিলেন, বিষ্ণুপুর হইতে এক জোড়া নূতন টিউব কিনিয়া লইতে হইবে। রাস্তায় যাহাকে পাওয়া গেল তাহাকেই থামাইয়া ডাক্তার তাহার সহিত আত্মীয়তা স্থাপনের চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। অস্বীকার করিতে পারি না যে, অনেকের সঙ্গেই পরোক্ষভাবে ডাক্তারের যোগসূত্র আবিষ্কৃত হইল কিন্তু তাহাতেও কোনো সুবিধা হইল না। অবশেষে তাঁহার চেষ্টার ফল ফলিল। বিষ্ণুপুরগামী একটি ভদ্রলোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। ডাক্তার আলাপ জুড়িয়া দিলেন। ক্রমে জানা গেল, উক্ত ভদ্রলোকের ভ্রাতা ডাক্তার বাবুর বিশেষ বন্ধু এবং তাঁহার পরিবারবর্গ, আত্মীয়স্বজন ডাক্তারবাবুর সুপরিচিত। আমাদের দুরবস্থা উপলব্ধি করিয়া তিনি আশ্বাস দিলেন যে, বিষ্ণুপুরের কোথাও, কাহারও

নিকট যদি টিউব পাওয়া যায় তবে নিশ্চয়ই তিনি তাহা সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দিবেন এবং আমাদের একটা উপায় না করিয়া তিনি নিরস্ত হইবেন না। তাঁহার সদাশয়তায় আমরা মুগ্ধ হইলাম। টাকা দিয়া একজন শোফেয়ারকে তাঁহার সঙ্গে বিষ্ণুপুরে প্রেরণ করা হইল (বিষ্ণুলোকে নহে)। ওদিকে ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে মেরামত কার্য্য চলিতে লাগিল।

তখন সাড়ে ছয়টা।

বিষ্ণুপুর সেখান হইতে ৩ মাইল। সুতরাং অন্ততঃ আড়াই ঘণ্টাকাল যে আমাদের তদবস্থায় কাটাইতে হইবে, ইহা অবধারিত। বসাক বলিলেন, চায়ের আয়োজন করা যাক্‌ অতিশয় সাধু প্রস্তাব। দ্বৈমত্যের কোন সম্ভাবনা ছিল না। চায়ের সংস্থান বসাকই সব আনিয়াছিলেন। মুক্ত আকাশতলে কঙ্করময় রাজপথের একপার্শ্বে প্রজ্বলিত প্রাইমাস্ ষ্টোভের শ্রীতিকর ধ্বনি উত্থিত হইল। কেট্‌লি চড়িল। বসাক লাগিয়া গেলেন।

ততক্ষণ বি—র সহিত আমার কাব্যচর্চ্চা চলিতেছিল, কেননা আমরা উভয়েই বেকার। "কাব্যশাস্ত্র বিনোদেন কালোগচ্ছতি ধীমতাম্"—একথা নাই বা বলিলাম। বি—সংস্কৃতে সুপণ্ডিত, কালিদাস ও উদ্ভট শ্লোকে সমান অধীয়ান্; রবীন্দ্র-কাব্য তাহার কণ্ঠস্থ। পায়চারির সঙ্গে সঙ্গে কবিতার পর কবিতা এবং শ্লোকের পর শ্লোকের আবৃত্তিতে মাঠ মুখর হইয়া উঠিল।

বসাকের গৃহিণীপণায় বিস্মিত হইলাম। চা তৈরী হইবে এবং কোনো রকমে তাহা গলাধঃকরণ করা যাইবে, ইহাই ভাবিয়াছিলাম। কিন্তু কার্য্যটি যে এমন সুচারুরূপে সম্পাদিত হইবে তাহা মনে করি নাই। ঘটিতে চায়ের পাতা সিদ্ধ করিয়া এলুমিনিয়মের গেলাসে ঢালিয়া চা খাইতেও লোককে দেখিয়াছি—এটা তাহা নহে। ক্ষুদ্র এটাসিকেসের ভিতর হইতে ক্রমে ক্রমে অর্দ্ধ ডজন পিরিজ ও পেয়ালা বাহির হইয়া "ভাঙা পথের রাঙা ধূলোয়" সজ্জিত হইল। রাস্তা মেরামতের জন্য পথপার্শ্বে স্তূপীকৃত খোয়ার উপরে মোটরের গদী পাতিয়া উপবেশনের ব্যবস্থা হইল। পাউরুটি, মাখন এবং ডাক্তারের আলয় হইতে আনীত ডালপুরি পিরিজের উপর জনে জনে পরিবেশিত হইল। জম্বুফল ইতিপূর্ব্বেই নিঃশেষিত হইয়াছে। পরিতোষ সহকারে চা-পর্ব্ব সমাধা হইল।

রাত যখন প্রায় আটটা, দেখা গেল, বিষ্ণুপুরের দিক হইতে একখানা মটর আসিতেছে। হতাশ প্রাণে আশার সঞ্চার হইল। সেই অহৈতুকী-পরার্থপরতা-প্রণোদিত, পথের-দেখা ভদ্রলোকটি চলচ্ছক্তি-রহিত কলের গাড়ীর বৈকল্য বিদূরণের উপায় সংগ্রহ করিয়া আসিতেছেন, ইহাই মনে হইল। ক্রমে মোটরখানি নিকটবর্ত্তী হইল, কিন্তু পাশ কাটাইয়া চলিয়া যায় দেখিয়া ডাক্তার ইঙ্গিত করিয়া গাড়ীখানিকে থামাইলেন। আরোহী—বিষ্ণুপুরের মহকুমা হাকিম স্বয়ং উ—বাবু, যাঁহার ওখানে বৈকালিক চা-পানের বাসনা আমাদের মনে ছিল, কিন্তু কার্য্যতঃ ঘটিয়া উঠে নাই। আমাদের তদবস্থায় দেখিয়া তিনি তো অবাক্। সংক্ষেপে ব্যাপারটি বুঝানো হইল। তিনিও অতিশয় ব্যস্ত। তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা অতিশয় পীড়িত, খবর আসাতে তিনি বাঁকুড়ায় যাইতেছেন, কালেক্টরের নিকট হইতে কয়দিনের ছুটি লইবার জন্য। দশটার মধ্যে তথা হইতে ফিরিয়া রাত সাড়ে এগারোটার ট্রেণে কলিকাতা যাইবেন। তাঁহার কুঠিতে যাইয়া বিশ্রাম করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কিন্তু অবস্থা যাহা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে উক্ত নিমন্ত্রণ ধন্যবাদের সহিত প্রত্যাখ্যান করা ভিন্ন উপায়ান্তর ছিল না। তাঁহার নিকট আবার কিছু টাকা দেওয়া হইল, তিনি যদি বাঁকুড়া হইতে আমাদের জন্য এক জোড়া টিউব সংগ্রহ করিয়া আনিতে পারেন। মানসিক উদ্বেগের মধ্যেও তিনি আগ্রহসহকারে আমাদের এই সাহায্যটুকু করিতে সম্মত হইলেন।

"What cannot be cured must be endured." অপেক্ষা না করিয়া আর উপায় কি? মেরামত সমভাবে চলিতেছে। তাহার আর শেষ নাই। "ছিদ্রেষ্বনর্থাঃ বহুলী ভবন্তি"—ঠিকই, একটি ছিদ্র সারিতে না সারিতে "তাবদ্বিতীয়ং সমুপস্থিতম্"—টিউবের "নূতনত্ব" প্রতিপদেই প্রমাণিত হইতে লাগিল! কিন্তু সমগ্র "চয়নিকার" কবিতাসম্ভার আবৃত্তি অন্তেও যখন দুর্গ্রহ শান্তির আশু-সম্ভাবনা দেখা গেল না তখন পাদচারণাক্লান্ত পথিকবর্গের ধৈর্য্যের বাঁধ

তাড়িয়া যাইবার উপক্রম হইল। কৃষ্ণাপঞ্চমীর পাণ্ডুর চাঁদ রাস্তার উপরে এতগুলি শর্ট-পরিহিত লোকের জটলা দেখিয়া দিগন্তের বৃক্ষান্তরাল হইতে এতক্ষণ লজ্জায় উঁকি ঝুঁকি মারিতেছিল এবং বাহির হইয়া পড়িবে কিনা ইতস্ততঃ করিতেছিল। কিন্তু যখন দেখিল ইহাদের পথ ছাড়িয়া দিবার কোনো লক্ষণই নাই, তখন অগত্যা লজ্জা-বিসর্জ্জন পূর্ব্বক নীলাকাশের অসীম সায়রে সাঁতার কাটিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

দলে দলে স্ত্রীপুরুষ রাস্তা দিয়া বিষ্ণুপুর অভিমুখে চলিয়াছে। কোথায় বোধ হয় যাত্রাগান হইতেছে। দলের কেহ আওড়াইলেন,—"যাত্রা শোন সারারাত

যদি না থাকে বিছানা।"

শেষটায় আমাদেরও কি আজ তাই করিতে হইবে? জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল, যাত্রা নয়, লাল বাঁধের ওধারে কোথায় "অষ্টপ্রহর" না "চব্বিশ প্রহর" (কীর্ত্তন) হইতেছে। বিষ্ণুপুর মহা বৈষ্ণব তাহা কে না জানে?

আবার বিষ্ণুপুরের দিক হইতে দ্রুত আগমনশীল একখানা মোটরের হেড্‌লাইট দৃষ্ট হইল। আবার আশা। "ধন্য আশা কুহকিনী।"

এবার একটি বাস্ আসিয়া আমাদের নিকটে থামিল। সেই ভদ্রলোকটি আমাদের অন্যতম সারথিসহ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। সঙ্গে আরও ২।৩ জন। ইহা বিষ্ণুপুর-বাঁকুড়া লাইনের একটি বাস্; আমাদিগকে বাঁকুড়ায় পৌঁছাইয়া দিতে পারে। টিউব মেলে নাই। আমাদের গাড়ীর চাকার সাইজ একটু বেয়াড়া রকমের; সচরাচর প্রচলিত মোটরচক্রের তিনি সপিণ্ডসগোত্র নহেন। হায়, আমেরিকান মেক নেশ! কি কুক্ষণেই আজ আমরা তোমাকে অবলম্বন করিয়াছিলাম! মার্কিণ মুলুকের উপরই আমরা চটিয়া গেলাম। এমন কি, "আমেরিকার স্বাধীনতা-সমরের ইতিহাস" পর্য্যন্ত তখন আমাদের নিকট বিষবৎ বোধ হইতেছিল।

বাঁকুড়ায় গিয়া কি হইবে? অথর্ব্ব রথখানিকে এখানে ফেলিয়া বাঁকুড়ায় চলিয়া গেলে, তাহাতে রাঁচীগমন সমস্যার সমাধান হয় না। এখানাকে বাস্ সাহায্যে টানিয়া নেওয়ার কথা উঠিল, কিন্তু সেটা সম্ভব হইল না। আর, বাঁকুড়াতেও এই উদ্ভট সাইজের টিউব মিলিবে না—তাহা সঠিকই জানা গেল। এই বাসের সত্বাধিকারীদেরই সেখানে টায়ার টিউব প্রভৃতি মোটর-সরঞ্জামের কারবার।

এদিকে "দুর্গম গিরিকান্তার মরু" ইত্যাদি এবং তাহা "লঙ্ঘিতে হইবে রাত্রি নিশীথে"। সুতরাং যাত্রীদিগকে "হুঁসিয়ার"ই হইতে হইল। প্রস্তাব করিলাম, এখান হইতে ট্রেণে রাঁচী চলিয়া যাওয়া যাক্। তাহার সময় এখনো আছে। বন্ধুগণের বিদ্রূপ-বাণ বর্ষণের খোঁচা হইতে তবু রক্ষা পাওয়া যাইবে। আর, "সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ," একথা শাস্ত্রেও বলে। কিন্তু আমার প্রস্তাব দ্বিতীয়িতও হইল না, তা ভোটে উঠিবে কি!

ইতিহাস-বিশ্রুত "দশ সহস্রের প্রত্যাবর্ত্তন"ই তখন আমাদের অভীপ্সিত আদর্শ হইয়া উঠিল। প্রত্যাবর্ত্তনও অগৌরবের নহে যদি তাহা নিয়ম ও শৃঙ্খলার সহিত সম্পাদিত হয়। এ বিষয়ে রজনীর জনবিরলতা আমাদের অনুকূল। কর্ম্মহীন ব্যস্তবাগীশগণের অনাবশ্যক কৌতূহলী দৃষ্টিতে উপদ্রুত হইতে হইবে না। মুক্ত প্রান্তরে, অনাবৃত আকাশতলে ঘণ্টাচারেক বৈচিত্র্যহীন বিচরণে এবং ক্রমাগত বিশুদ্ধ বায়ু সেবনে মন যে পর্দায় নামিয়া আসিয়াছিল তাহাতে প্রত্যাবর্ত্তনই, শ্রেয় না হইলেও, প্রেয় বলিয়া বোধ হইবে, তাহা স্বাভাবিক।

পঙ্গু পুষ্পক-রথখানিকে পথপার্শ্বে পরিত্যাগ করিয়া বস্তুপিণ্ড সমভিব্যাহারে আমরা বাসে চড়িয়া বসিলাম এবং অচিরেই অনতিদূরবর্ত্তী বিষ্ণুপুর রেলওয়ে ষ্টেশনে নীত হইয়া মেদিনীপুর গামী ১১টা ২৭ মিনিটের ডাউন্ পুরুলিয়া-হাওড়া ফাষ্ট্ প্যাসেঞ্জারের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে S. D. O. ও আসিয়া পৌঁছলেন। বলা বাহুল্য, বাঁকুড়ায় টিউব মেলে নাই। N. G. B কে তিনি আমাদের খবর দিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু বৃথা।

যথাসময়ে অর্থাৎ রাত (ইংরাজীমতে-ভোর) ২টায় আমরা সশরীরে এবং সজ্ঞানে স্ব স্ব নীড়ে প্রত্যাবৃত্ত হইলাম।

রাঁচী অভিমুখে এই পর্য্যটন এবং সাময়িক পথ-প্রবাসের পর প্রত্যাবর্ত্তন ঠিক "nine days' wonder" না হইলেও

অন্ততঃ ২।৩ দিন যে আমাদের সীমাবদ্ধ সমাজে আলোচ্য বিষয় হইয়া রহিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। মফঃস্বল টাউনের একঘেয়ে জীবনপ্রবাহে একটু আন্দোলন উপস্থিত করিয়া আমরা যে প্রবাসীগণের নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদের পরিমাণ অন্ততঃ কণামাত্রও বর্দ্ধিত করিতে পারিয়াছি তাহাতেই আমাদের প্রচেষ্টাকে সার্থক বলা যায়। অতএব আমাদের পক্ষে আত্মপ্রসাদ সম্ভোগের বাধা দেখিতেছি না।

ইংরাজরা বলিয়া থাকেন—"A thing well begun is half done." আমাদের আরম্ভটি বেশ সুষ্ঠুই হইয়াছিল, অতএব কার্য্যটি আমাদের অর্দ্ধসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে বলিলেই হয়। বারান্তরের চেষ্টায় বাকী অর্দ্ধেক সম্পন্ন করার বাসনা রহিল। নিরাশ হইবার কারণ নাই। "আজিকে বিফল হ'ল হ'তে পারে কাল"—তবে-এক এক বারের চেষ্টায় এরূপ পঞ্চাশৎ মাইল হিসাবে অগ্রসর হইলে পঞ্চম প্রচেষ্টার পূর্ব্বে সিদ্ধির সম্ভাবনা দেখা যায় না। আর একটা কথা চুপে চুপে বলি। আমাদের মধ্যে যাহারা মন্দমতি তাহারা পরোক্ষে মন্তব্য করে যে, অতঃপর ডাক্তারের উপর যানবাহনাদি নির্ব্বাচনের ভারপ্রদানরূপ অবিমৃষ্যকারিতার পরিচয় তাহারা নাকি আর দিবে না। অগোচরে রাজ-মাতাকেও লোকে ডাইনী বলিতে কুণ্ঠিত হয় না। আশা করি, ডাক্তার এসব কথায় কখনই কান দিবেন না।

জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ, আমাদের এই মোটর-অভিযান জয়-যাত্রা না হইলেও ট্র্যাজিডিতে পরিণত হয় নাই, প্রহসনেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। আর, ভাবুকের দিব্যদৃষ্টিতে গতিই জীবন, সমাপ্তি নহে; আশাতেই সুখ, প্রাপ্তিতে নহে। গন্তব্যস্থানে না—ই পৌছিলাম, adventureটা তো হইল। "Yarrow unvisited" এর মতো "Ranchi visited" অপেক্ষা "Ranchi unvisited" ই আমাদের কল্পনার চিত্রপটে উজ্জ্বলতর বর্ণবিন্যাসের সহায়ক হইবে।

শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী

গরমিল

শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মণ্ডল

বিবাহ করিয়া রবি যেদিন বধূ লইয়া গৃহে ফিরিল,—তপ্ত কাঞ্চনবর্ণা পঞ্চদশী বধূর রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া সকলেই একবাক্যে বলিল, 'আহা! বউ নয়ত' সাক্ষাৎ লক্ষ্মী-প্রতিমা!

পুরাঙ্গনারা বলিল,—দুটীতে এম্‌নি মানিয়েচে! ভগবান যেন দু'টিকে পাশাপাশি গ'ড়েছিলেন।

একজন রসিকা নিম্নস্বরে বলিল,—এদের মনের মিলও এম্‌নি হবে, দেখে নিও।···

রবির মা ছিল না। বৌদিই সংসারের গৃহিণী।

বৌদি হাসিয়া বলিলেন,—ঠাকুরপো ছোটগিন্নির আঁচল ছাড়্‌বে না। তা না ছাড়ুক—তোমরা আশীর্বাদ করো—ও সুখী হোক্, এতটুকু বেলা থেকে ওকে আমি কোলে কোরে মানুষ করেচি।······

রবির প্রাণটী ছিল কাব্যে ভরা। কলেজে পড়িবার সময় অনেক বন্ধুর বিবাহেই যোগ দিয়াছে—তাহাদের নব-বধূ দেখিয়াছে। কিন্তু নিজের বধূর সম্বন্ধে তাহার একটা খুব উচ্চ ধারণা ছিল,—এবং তাহার একটা কাল্পনিক রূপও মনের মধ্যে গড়িয়া রাখিয়াছিল বিবাহের বহুদিন পূর্ব্বে।··· বিবাহের পূর্ব্বে তাহার বৌদির আগ্রহাতিশয্যে বন্ধুবান্ধব লইয়া তাহার ভাবী বধূকে দেখিতে গেল।—তাহার চোখ দুইটী আনন্দাশ্রুতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল,—বধূর রূপদর্শনে।···এ যে তাহার কল্পলোকের মানসী!—এতদিন নির্জ্জনে যে এই রূপই সে ধ্যান করিয়াছিল, একাগ্র মনে। বধূর দেহের প্রতি অঙ্গটি, মাথার পর্য্যাপ্ত ঘনশ্যাম কেশসম্ভার, কালো ডাগর চোখের চাউনিটি পর্য্যন্ত যেন তাহার কল্পনা দিয়া গড়া!··· তার উপর দেহ ঘেরিয়া যৌবনের জাগরণ সবেমাত্র সুরু হইয়াছে।

রবি মুগ্ধের মত তন্দ্রালস চোখে এই উদ্ভিন্ন-যৌবনা কিশোরীকে তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের চির-সঙ্গিনী করিয়া তাহার অনাগত দিনগুলিকে কল্পনায় রঙীন করিয়া তোলে। সে সগৌরবে বন্ধুদের কাছে ভাবী বধূকে কেমন করিয়া আদর্শ পত্নী করিয়া গড়িয়া তুলিবে তাহারই বর্ণনা করে।—সে যেন একখানি খণ্ড কাব্য।

বিবাহ হইয়া গেলে নববধূকে তাহার স্বপ্নেগড়া প্রেমের রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহাকে নিজের আদর্শানুযায়ী করিয়া তুলিতে রবি সোৎসাহে উঠিয়া পড়িয়া লাগিল।···

নববধূ নীলিমার সুখের জন্য সদাই সে উন্মুখ হইয়া থাকিত। আত্মীয়-স্বজনহীন অপরিচিত স্থানে বালিকার মনে পাছে এতটুকু অসন্তোষের ছায়া পড়ে তাই রবি গল্পে, গানে, হাসিতে তাহাকে ঘিরিয়া রাখিত। কতরকম আনন্দ উৎসবের আয়োজন করিয়া তাহাকে ভুলাইয়া রাখিতে প্রয়াস পাইত।···নীলিমা হাসিলে রবির আনন্দাপ্লুত বুকখানি সার্থকতায় ভরিয়া উঠিত—নীলিমার মুখ ভারী দেখিলে একটা অজানা আতঙ্কে তাহার বুকের পাঁজরগুলো টন্ টন্ করিতে থাকিত।····

রবি তাহার বুকভরা ভালবাসা ঢালিয়া দিয়া নীলিমার যৌবন-মালঞ্চে ফুল ফুটাইতে চাহে, কিন্তু নীলিমার অন্তরে যেন তার হিল্লোলটুকু পর্য্যন্ত পৌঁছয় না। তার পত্রশ্যাম যৌবন-নিকুঞ্জের কচি কিশলয়গুলিকে রবির প্রেমের মলয় একটু দোল্ দিতেও সমর্থ হয় না,—দীর্ঘশ্বাসে বুক ভরিয়া প্রত্যাহত হইয়া ফিরিয়া আসে।

প্রথম প্রথম রবি ভাবিত—হয়ত' এ লজ্জা। নববধূর লজ্জা, ভারী পাথরের মত তার বুক চাপিয়া ধরে—প্রাণের সাড়া দিতে দেয় না।

* * * *

রবি বলে,—বায়স্কোপে যাবে নীলিমা?

নীলিমা মুখ ফিরাইয়া লইয়া বলে—ও আমি ক'লকাতায় বাপের বাড়ী থাক্‌তে অনেক দেখেছি। এখানকার আবার বায়োস্কোপ!

রবি বলে, বেশ ত'। কিন্তু আমার সঙ্গে তো দেখনি। চলো কেমন দু'জনে যাবো।—আমি বুঝিয়ে দেব।

নীলিমা বক্রদৃষ্টি সঙ্কুচিত করিয়া বলে, এই পাড়াগাঁয়ের অসভ্য পুরুষদের মাঝে ব'সে আমায় বায়স্কোপ দেখ্‌তে হবে?—মাথায় থাক্‌ আমার অমন সখ।

রবি উদ্গত দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া শুষ্ক দৃষ্টিতে তার মুখের পানে চাহিয়া থাকে।

রবি রাত্রে নীলমাকে একান্তে পাইয়া কত কথাই যে বলিতে চাহে—বুকের মাঝে ফেনিল মদিরের মত আশা-আকাঙ্ক্ষা কাণায় কাণায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। নীলিমা বিরক্ত হইয়া বলে, এত রাত অবধি জেগে থাকা আমার অভ্যাস নেই। আমি সেখানে ন'টার সময় ঘুমিয়ে প'ড়্‌তুম।— তোমার ঘুম পায় না?

রবি তাহাকে ব্যগ্র আলিঙ্গনে বাঁধিয়া স্নেহ-সজল-কণ্ঠে বলে,—তোমাকে কাছে পেলে যে আমার ঘুম চোখ থেকে উড়ে যায় নীলু!·ঘুম চিরদিনের। সারাজীবনে ঘুমবার অনেক সময় পাব—কিন্তু—

রবি চুপ করে। নীলিমা জিজ্ঞাসা করে—কি?

রবি তার কানের কাছে মুখটি লইয়া গিয়া নীচু গলায় বলে,—কিন্তু আমাদের এই যে এখনকার দিন, এ কি আর আমরা ফিরে পাব?

নীলিমার মুখে চোখে একটা তাচ্ছিল্যের হাসি ফুটিয়া উঠে, সে বলে, বেশ, তবে তুমি জেগে থাক। আমার প্রাণে অত কাব্যি নেই। আমার ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসচে। সারারাত জেগে আমি তোমার গজ্‌গজানি শুন্‌তে পার্‌বো না।

রবির বুকটা জ্বালা করিতে থাকে। সে মূক হইয়া শুইয়া থাকে। নীলিমা পাশ ফিরিয়া শোয়—সঙ্গে সঙ্গে অকাতরে ঘুমাইয়া পড়ে।

রবি বালিশে মুখ গুঁজিয়া উদ্গত অশ্রু রোধ করে।··· চোখে ঘুম আসে না,—বুকের মধ্যে জাগিয়া থাকে উদ্দাম কামনা—ঘরের স্তব্ধতা তার বুকের মাঝে নির্ম্মম হইয়া বাজিয়া উঠে!·তারই পাশে ঘুমে অচেতন, যৌবনে হিল্লোলিত ঐ পুষ্পিত তনু,—স্ফুরিত কুসুম-পেলব অধর দুখানি প্রবালের মত রাঙা!···রবির অন্তরতলে কামনা উদগ্র হইয়া মাতামাতি সুরু করে। সে অসহিষ্ণু হইয়া শয্যা হইতে নামিয়া মেঝের উপর চঞ্চলপদে পদচারণ করিতে থাকে। কুঞ্চিত ললাটে দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া বুকের অব্যক্ত যাতনা নিরোধ করে।

···এমনি ভাবে দিনের পর দিন তাহার অতৃপ্ত কামনাকে নীলিমা দলিয়া পিষিয়া মারিতে লাগিল।

রবির সহিষ্ণু মন কিন্তু হতাশ হইল' না—আশায় বুক বাঁধিয়া নীলিমার ছিঁড়ে-ফেলা মালাটি সে সযত্নে কুড়াইয়া লইয়া ছিন্নসূত্রে গ্রন্থি দিয়া আবার সে উন্মত্ত অধীর হাত দু'খানি প্রসারিত করিয়া সে মালা নীলিমার কণ্ঠে পরাইতে চায়।·· নীলিমার নির্ম্মম উপেক্ষা কঠোর হইয়া রবির তরুণ বুকে বাজে।

ক্রমে তাহার হৃদয়তটে ভাঙন ধরিতে সুরু করিল। তাহার মনে হইত তাহার বিবাহিত জীবনের মূলে যেন একটা বিরাট মিথ্যার মেঘ জমিয়া উঠিতেছে। তাহাদের জীবনের আসল জায়গাটিতেই যেন গরমিল—বুঝিবা আর ইহজীবনে মিল হইবার সম্ভাবনা নাই। তাহার অন্তরের অতলতলে যে সাগর-প্রমাণ আশা-আকাঙ্ক্ষা জমা হইয়া আছে বুঝিবা এমনি পিষিয়া পিষিয়া তিলে তিলে তাহাদের মারিতে হইবে। কামনার দীপ্ত-শিখায় এমনি পুড়িয়া পুড়িয়া নিজেকে ক্ষয় হইতে হইবে।···

এতদিন নীলিমার যৌবনলীলায়িত যে রূপ উদ্ভাসিত হইয়া রবির অতৃপ্ত চোখ দুটিকে মুগ্ধ করিয়া রাখিত এখন যেন সে রূপ, তাহার চোখের সামনে ক্রমশঃ ম্লান হইয়া যাইতে লাগিল। রূপই আছে, প্রাণ কই? চোখের সে কটাক্ষ কোথায়, যাহা পুরুষের মনকে চঞ্চল করিয়া তোলে? সে বিহ্বলতা কৈ যাহা পুরুষের বুকে মোহের মদির স্রোত প্রবাহিত করে—তরল অগ্নিস্রোতের মত!

রবির মনে হইত নীলিমাও তো রক্তে-মাংসে গড়া নারী! কিন্তু সে নারীদেহের তলে না আছে রূপ-রস না আছে

বর্ণ-গন্ধ-জ্ঞান।—রক্তমাংসের একটা বুভুক্ষা আছে; সে যেন শুধু ঐ পশুর ক্ষুধার মতই প্রাণহীন!

দিন যায়। নীলিমার উগ্রতাও দিন দিন বাড়িয়াই উঠে। কতকগুলো ফুল আছে যাদের গন্ধ উগ্র—কিন্তু সে উগ্রতার মাঝেও একটা এমন মাধুরিমা জড়িত আছে যা নরনারীকে আকুল করিয়া তুলে। রবি নীলিমার অন্তরের অন্তঃপুরের অলিগলি খুঁজিয়াও তেমনি একটু মধুর সন্ধান পাইত না। তার মাঝের উগ্রতাটুকুই সব, মধু এতটুকু নাই!...

নীলিমা নিজের দাবীর ষোল আনা কড়ায় গণ্ডায় আদায় করিতে চায়,—কিন্তু দিতে সে এক ক্রান্তিও চায় না। তার জন্য সংসারের সকলেই ত্রস্ত হইয়া থাকিবে, কিন্তু সে কাহারও জন্য মাথা ঘামাইবে না।

নীলিমার প্রাণে সখ যথেষ্ট ছিল,—সে সাজগোজ করিত নিজের তৃপ্তির জন্য—সখটুকু মিটাইবার জন্য মাত্র। তাহার প্রসাধিত সৌন্দর্য্য যে অপর কাহারও মনে তৃপ্তি আনিতে পারে সে খেয়াল তাহার ছিল না কিংবা খেয়াল থাকিলেও সে বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিত। সে প্রসাধন করিত নিজের মনমত করিয়া;—সে বিষয়ে রবির কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার ছিল না। একদিন রবি কেশ প্রসাধন সম্বন্ধে কি একটা সামান্য ইঙ্গিত করে, তাহাতে নীলিমা উত্তর দেয় যে তাহার নির্দ্দেশ মত ফিটফাট হইয়া থাকিবার কোনো কথা নাই।—সেই অবধি রবি আর সে সম্বন্ধে কোনদিন কোন কথা উত্থাপন করে নাই। তবে তাহার সখের উপাদানগুলি রবিকে সবই আহরণ করিতে হইত। তাহার এতটুকু ব্যতিক্রম হইবার উপায় ছিল না।

রবি সেইদিন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল, যেদিন সে নীলিমাকে তাহার বউদির সঙ্গে মুখোমুখি ঝগড়া করিতে শুনিল। রবি গিয়া সামনে দাঁড়াইল, নীলিমা গ্রাহ্যও করিল না। উত্তেজনায় তাহার মনেও পড়িল না যে তাহার মাথার কাপড়টা খসিয়া পড়িয়াছে। সে সমানভাবে বৌদির সঙ্গে ঝগড়া করিয়া গেল এবং তাঁহাকে সহস্র অপমান করিল। রবি পাথর হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। রবির মূর্ত্তি দেখিয়া বৌদি উদগত অশ্রু আঁচলে মুছিয়া সমস্ত নীরবে সহ্য করিল।

রবি নীলিমাকে বলিল, এখানে পাড়াগাঁয়ে তোমার শরীর ভাল থাকবে না—চল আমরা কলকাতার বাড়ীতে যাই।

নীলিমা বলিল,—তা হ'লে বড় গিন্নী চারহাত দিয়ে কোরে সব লুটে খাবে।

রবির ধৈর্য্যের বাঁধ বুঝিবা ভাঙ্গিবার উপক্রম হইল। কিন্তু সাধ করিয়া কে অশান্তির আগুনে পুড়িতে চায়? সে নীরবে সহ্য করিল এবং মনে মনে 'অন্তর্যামীর চরণে নত হইয়া বলিল, কী সহনশীলই মানুষকে ক'রে দেয় এই বিয়ের অনুষ্ঠানটি! একবার কোন রকমে ঘাড়ে চাপ্‌লে আর ত নামাবার উপায় নেই!

...শেষ পর্য্যন্ত নীলিমাকে রাজী করিয়া রবি কলিকাতা আসিল। মানুষ আশা ছাড়িতে পারে না। আশায় বুক বাঁধিয়া রবি কলিকাতায় নূতন করিয়া সংসার পাতিল। নীলিমা এখন সংসারের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী। বৌদিকে অশান্তির হাত হইতে নিষ্কৃতি দিয়াছে ভাবিয়া রবি হাঁফ ছাড়িল।

এতদিন নীলিমা যে বিষ উদ্গীরণ করিয়া রবির সহিত সংসারের আর পাঁচজনকে বিব্রত করিয়া তুলিত সেই তীব্র বিষের সবটুকু এখন রবিকে অকুণ্ঠিত চিত্তে পান করিতে হয়।... এম্‌নি আশাহত জীবনটাকে যখন রবি ভারবাহী নৌকার মত কোন রকমে টানিয়া লইয়া যাইতেছিল সেই সময় রবির ভাগ্যবিধাতা তাহাদের সংসারে একটি নবাগত অতিথির আগমন সংবাদ দিলেন। রবি সে সংবাদ কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছিল তাহার অন্তর্যামীই জানেন, তবে তার জীবনের আঁধার গহ্বর তলে একটা আশার ক্ষীণ শিখা জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, হয়ত' নীলিমা এইবার বুঝিতে পারিবে, এখন সে তার সন্তানের জননী, হয়ত' এই নূতন অতিথিটি তাহাদের অন্তরের ব্যবধান পথে সেতুর মত শূন্য স্থানটি পূর্ণ করিয়া দিবে।

অন্তরে এই আশার দীপটি জ্বালিয়া রবি দিনের পর দিন গুণিতে থাকে। রবি নীলিমাকে লইয়া মাঠে বেড়াইতে যায়, সিনেমায় যায়—সহস্র আনন্দের মাঝে ডুবাইয়া তাহার মনটিকে হাল্‌কা করিয়া তুলিতে প্রয়াস পায়।...

রবির বৌদির আনন্দ ধরে না। কলিকাতা আসিবে বলিয়া রবিকে সংবাদ দিল। রবি আসন্নপ্রসবা নীলিমাকে পিত্রালয়ে পৌঁছিয়া দিয়া বৌদির কাছে ফিরিল।.

* * * *

নীলিমা পুত্র প্রসব করিল। সন্তান ক্রোড়ে নীলিমা কলিকাতার বাড়ীতে ফিরিল। বৌদিও কলিকাতায় আসিল।

···নীলিমার কোন পরিবর্ত্তনই দেখা গেল না। পূর্ব্বের উগ্রতা, মর্ম্মভেদী বাক্যবাণ, যেন পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ মাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়া চারিদিক আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। এখন সে সন্তানের জননী—সংসারে তাহার আধিপত্য এখন অক্ষয়, অটুট!

রবি প্রেমের ভাণ্ডার উজাড় করিয়া তাহাকে বিলাইয়া দিতে চায়—সে এম্‌নি অহঙ্কারমত্ত এবং গর্ব্বান্ধ যে সে দিকে ভ্রূক্ষেপও করে না। রবির যে বুকের গোপন দেশে একটা বাসনা অনশনে তিলে তিলে শুকাইয়া মরিতেছে,—আর সে ক্ষুধার খোরাক জোগাইতে এবং তাহাকে সজীব করিয়া তুলিতে শুধু সেই পারে সে কথা ভাবিবার যেন তার প্রয়োজনও নাই, অবকাশও নাই।·· রবির বুকের আশার শিখাটি তৈলহীন সলিতার মতই তাহার বুকখানা পোড়াইয়া নিবিয়া গেল।

ক্রমশঃ এম্‌নি দাঁড়াইল, রবির মন নীলিমার প্রতি ঘৃণায়, বিদ্বেষে ভরিয়া গেল। সে যেন আর সহস্র চেষ্টা করিয়াও তালি দিয়া ভাঙা মনকে জোড়া দিতে পারে না।

·· মাসের মধ্যে অন্ততঃ পঁচিশ দিন তাদের বাক্যালাপ বন্ধ থাকে। রবি বন্ধুবান্ধবের কাছ হইতে গভীর রাত্রে ঘরে ফিরিয়া স্বতন্ত্র শয্যায় বিশ্রাম করে। নীলিমা তখন অঘোরে নিদ্রায় মগ্ন।

নীলিমা সময়ে-অসময়ে কারণে-অকারণে রবির সহিত ঝগড়া করে। গভীর রাত্রে বাড়ী ফেরার কৈফিয়ৎ তলব-করে,—রবির নির্ব্বাক নির্লিপ্ততা তাহাকে ক্ষিপ্ত করিয়া তুলে।···

ক্রমে তাহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। সে ভাবে, এ বন্ধন যেমন করিয়া হোক্ তাহাকে ছিন্ন করিতে হইবে—নতুবা সে বাঁচিবে না। যৌবনের প্রারম্ভ হইতে সে একটী দিনের জন্যও নীলিমাকে লইয়া সুখী হইতে পারে নাই। ভালোবাসা দূরের কথা, এতটুকু সেবাযত্ন পর্য্যন্ত সে কোন দিন পায় নাই নীলিমার কাছে। বরং সেই এতদিন প্রাণ ঢালিয়া তার সেবা করিয়াছে—যত্ন করিয়াছে। আর সে পারিবে না! সে মুক্তি চায়! এ মিথ্যা অভিনয় আর সে করিতে পারিবে না এর মূলে যখন এতটুকু সত্য নাই, সেই বিবাহের অনুষ্ঠান ও গোটা কতক মন্ত্রোচ্চারণ ছাড়া! যখন আসল জায়গাটায় তাদের একটিদিনের জন্যও মিল হইল না, তখন এ অভিনয় নয়তো কি?

ভাঙা মন আঘাত খাইয়া খাইয়া নির্জ্জীব হইয়া পড়ে। দেহও যেন আর এই ভাঙা মন বহিয়া বেড়াইতে পারে না। রবির শরীরও ভাঙিয়া পড়িল। ডাক্তার বায়ু পরিবর্ত্তনের উপদেশ দিল। নীলিমা বাহিরে যাইবার ব্যবস্থা করিতে লাগিল। রবি অন্তরে শিহরিয়া উঠিল—নীলিমাকে সঙ্গে লইয়া যদি তাহাকে বাহিরে যাইতে হয় তাহা হইলে সে আর বাঁচিবে না। সে প্রথমে মনে করিয়াছিল, বৌদিকে সঙ্গে লইয়া কোথাও গিয়া দিন কতক হাঁফ্ ছাড়িবে। কিন্তু সে ভরসাও নিবিয়া গেল। নীলিমা যখন যাইতে চায়, তখন তাহাকে না লইয়া বৌদিকে লইয়া গেলে কুরুক্ষেত্র বাধিবে। ·· কিন্তু সে নীলিমাকে সঙ্গে লইবে না—মরিতে হয় মরিবে!···

নীলিমা বাপের বাড়ী গিয়াছিল। সেই সুযোগে রবি সামান্য কিছু আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সঙ্গে লইয়া অশ্রু সজল চোখে বাড়ীর বাহির হইয়া গেল একাকী।

* * * *

বিবাহিত জীবনের এইখানে এক পর্ব্ব শেষ। বছর দুই রবির আর কোনো উদ্দেশ পাওয়া গেল না।

দ্বিতীয় পর্ব্বের আরম্ভ কোথায় জানা যায় না; জানিবার প্রয়োজনও নাই; কেন-না শঙ্খ-হুলুধ্বনিতে, আলোয়, গানে, আর কোনো বাসর-রাত্রি মুখরিত হয় নাই। সামাজিক অনুষ্ঠানের আড়ম্বর ও উৎসবের কোলাহলের উপর রবির জীবনের যে কঠিন সত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহার আঘাতে তাহার প্রথম-যৌবনের স্বপ্ন-গড়া প্রাসাদ চুরমার হইয়া

গেল। কিন্তু ধরিত্রীর এক নিভৃত কোণে লোক-সমাজের অন্তরালে, পাপের পঙ্কিলতার মধ্যেও, জীবনের অনন্ত মিলন-রাগিণী কখনো কখনো শোনা যায়; রবিও শুনিয়াছিল। তাহার জীবনের তখন শেষ অবস্থা, অস্থি-সার দেহ; তাই জীবনের সঞ্জীবনী সুধার আস্বাদ পাইয়াও জীবনটাকে গড়িয়া তুলিবার আর কোনো অবকাশ তাহার মিলিল না। শেষ পটটি উত্তোলন করা যাক্।

টেলিগ্রাম পাইয়া বৌদিদি ও নীলিমা আল্‌মোরার একটা ছোট বাংলায় আসিয়া উত্তীর্ণ হইল। দেখিল,—একটা ঘরে একখানা খাটের উপর রবি শুইয়া আছে,—শিয়রে একটি মেয়ে তাহার মাথায় বরফ দিতেছে। রবিকে দেখিলে চেনা যায় না, দেহ শীর্ণ, কোটরগত চোখ দুটির চারিপাশ ঘেরিয়া একটা কাজল-কালো রেখা! গালের উপরের হাড় দু'খানা মাথা তুলিয়া উঠিয়াছে। হাত দু'খানা বাঁখারির মত সরু।

মেয়েটির ছিপ্‌ছিপে পাতলা গড়ন। রং কালো, উজ্জ্বল চোখ দুটি প্রাণময়, করুণা-ব্যঞ্জক। মুখখানি অপূর্ব্ব কমনীয়তায় ভরা। তাহার যৌবন-তরঙ্গায়িত দেহখানি এমন একটা মাধুরিমায় ভরা যে একবার দেখিলে চোখ ফেরানো যায় না।

রবি একবার চোখ মেলিয়া ফ্যাল্ ফ্যাল্ দৃষ্টিতে বৌদিদির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তার পর অস্ফুট স্বরে কহিল,—বৌদি। তুমি এখানে কেমন করে এলে?

বৌদিদি কহিল,—আগে একটু খবর দিতে নেই?

রবি জবাব দিল না,—ডাকিল,—মিনতি!

মিনতি শিয়র হইতে উঠিয়া রবির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল,—সাড়া দিল না।

রবি বলিল,—"বৌদি,—এই মিনতি। এই আমার প্রাণের শূন্যতা ভরিয়ে দিয়েছে সেবা দিয়ে, যত্ন দিয়ে, ভালোবাসা দিয়ে। তবু তোমরা একে ঘৃণা করবে? বা রে সমাজ। বা রে সংস্কার!

বৌদিদি বাধা দিয়া বলিল,—থাক থাক্ এখন ঘুমোও। বলিয়া মিনতির পরিত্যক্ত স্থানটি অধিকার করিয়া মাথায় বরফ দিতে আরম্ভ করিল। মিনতি সেই ভাবে খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। নীলিমা তীব্র কটাক্ষে একবার মিনতির দিকে চাহিল,—মুখে একটাও কথা সরিল না। রবির স্বাস্থ্যোজ্জ্বল মুখের উপর যে মুখরা নারী একদিন অবিশ্রান্ত বিষ বর্ষণ করিতে ছাড়ে নাই,—আজ তাহারই মৃত্যু-পাণ্ডুর মুখের জ্যোতির সম্মুখে সে সঙ্কুচিত হইয়া একেবারে নীরব হইয়া গেল।

রবি আবার বকিতে আরম্ভ করিল,—"মিনতি টেলিগ্রাফ করেছিল বুঝি? তা' ভালোই করেছিল,—একবার তবু তোমায় দেখ্‌তে পেলুম। মিনতি যে আমার জীবনে—

বৌদিদি আবার বাধা দিয়া বলিল,—ঠাকুরপো,—এখন ঘুমোও। পরে তোমার কথা শুন্‌ব।

রবি চোখ বুজিল,—মিনতি নিঃশব্দে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে রবি আবার চোখ চাহিয়া দেখিল মিনতি নাই। ডাকিয়া উঠিল,—মিনতি! মিনতি!

বৌদিদি বলিল,—সে ও ঘরে আছে। তুমি ঘুমোও।

—না, কোথায় গেল সে? মিনতি! মিনতি! রবি অস্থির হইয়া উঠিল।

তখন মিনতির সন্ধান পড়িল। কিন্তু সে-বাড়ীতে তাহাকে আর খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।

শ্রীরাসবিহারী মণ্ডল



"ভাইফোঁটা"

শ্রীমতী অনিন্দিতা দেবী

শ্রীমতী শান্তিসুধা ঘোষ কিছুদিন হইতে "জয়শ্রী"তে দেশের বর্ত্তমান চিন্তার মধ্যে যে সকল বিষয় আসিতেছে, গল্পাকারে তাহার আলোচনা আমাদের উপহার দিতেছেন। তাঁহার লেখায় নিজস্ব বিশেষত্ব এবং শক্তির পরিচয় পাইয়া বাঙ্গলা সাহিত্যে একটী নূতন (তিনি আর কোথাও পূর্ব্বে লিখিয়াছেন কিনা জানা নাই) শক্তিশালী সাধিকার আবির্ভাব হইল মনে করিয়া খুবই আনন্দ হইয়াছে। আর সেইজন্যই তাঁহার লেখা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা আবশ্যক বোধ হইল। প্রথমেই বলা ভাল, যে, তাঁহার গল্পের সাহিত্যিক সমালোচনা ইহার উদ্দেশ্য নয়। তাঁহার গল্প সাহিত্যপ্রধান নয়ও। তাই এই সমস্তালোচনা সম্পর্কে উহাতে যে মতামত ব্যক্ত হইয়াছে তাহার আলোচনাই উদ্দেশ্য। সামাজিক বিষয় সম্বন্ধে তাঁহার প্রথম গল্পটীতে কিছুই বলিবার নাই। তাহার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ এইমাত্র বলিতে পারি। কিন্তু তাহার পরের রাজনৈতিক বিষয়ের গল্প "সামঞ্জস্যে" সময়বিশেষে হিংসা, অহিংসা দুইই অবলম্বনীয় এই ইঙ্গিতই হয়ত উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু তাহার ধারণা পরিষ্কার হইয়াছে বলিয়া মনে পড়ে না। যাহাহউক তাঁহার "ভাইফোঁটা" গল্পটীই এখানে আলোচ্য।

গল্পটীতে প্রথমেই এই প্রশ্ন আসে, মনে সদ্ভাব থাকিলে আর প্রাণ দিলেই কোন কাজ সমর্থন বা প্রশংসা পাইতে পারে কিনা? হত্যা কোন সময়েই সমর্থনযোগ্য ("justifiable") কিনা স্বতন্ত্র কথা, কিন্তু তাহার দায়িত্ব আছে ইহা ত ঠিকই। কাজেই কোনরকম "ভুল হতে পারে" আদর্শ লইয়া অপ্রস্তুত বা দায়িত্বশূন্যভাবে তাহাতে হাত দেওয়া যায় না। লক্ষ্য সাধু হইলেই যেমন তাহার যে কোন উপায়ই সাধু হইয়া যায় না, তেমনি লক্ষ্যশূন্য বা অস্পষ্ট-লক্ষ্য কিম্বা বিচারবুদ্ধিতে যাহাতে অজ্ঞাতে বহু হানি ঘটিবার সম্ভাবনা, এমন কাজও মনের সদ্ভাবের দ্বারাই সমর্থিত হইতে পারে না। কাজ যত গুরুতর, তাহার জন্য জবাবদিহিও ততই বেশী।* আপনার প্রাণও মানুষের এমন কিছু নিজস্ব সম্পত্তি নয় যে, যাহাতে তাহাতে তাহা দিলেই হইল। সেও কেন দিতেছ, তাহার ভালরকম যুক্তিযুক্ত কারণ চাই, নতুবা অমন অমূল্য জিনিষের অপচয়ের জন্য দায়ী তোমাকে বিষমরকমই হইতে হইবে। আপনার সম্পত্তি গঙ্গাজলে বিসর্জন দিয়া আমাদের দেশেই বাহবা মিলিতে পারে, নতুবা সেই অপচায়কের কঠিন শাস্তি হওয়াই উচিত। এবিষয়ে আমাদের প্রাচ্য মন ও আদর্শের বিশেষ দুর্ব্বলতা আছে। আদর্শের দোহাই পাড়িয়া সবরকম কুকার্য্য, অক্ষমতা, নির্ব্বুদ্ধিতাকেই আমরা ঢাকা দিতে চাই। কালীর একটী খুব সূক্ষ্ম গভীরার্থ ব্যাখ্যা দিতে পারিলেই তাহার নামে যে সব নিষ্ঠুরতা, কদর্য্যতা নিত্য অনুষ্ঠিত হইতেছে ও সর্ব্বসাধারণকে গ্রাস করিয়া রহিয়াছে, আমাদের মহা মহা জ্ঞানী, গুণীর কাছেও তাহা সমর্থন পাইয়া যায়। সতীদাহের একটী আদর্শ খাড়া ছিল, অমনিই উহার অকথ্য অন্যায়, নিষ্ঠুরতা, অযৌক্তিকতার সম্বন্ধে সাড় একেবারেই লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। কাজ যত খারাপই হউক, একটী কল্পনা, আদর্শ গড়িয়া রাখিতে পারিলেই সবই অবাধে ধর্ম্ম বলিয়াই চলিয়া যায়। এই ভাব যে আমাদের কেমন পাইয়া বসিয়াছে, গল্পটী পড়িয়া তাহাই মনে আসিল, চেহারা তাহার যতই নব্য হউক।

কাজটীর আবশ্যকতা ও লক্ষ্য যখন তোমার কাছেই অস্পষ্ট, তখন আরও যাহারা উহার চাকচিক্য দেখিয়া পতঙ্গের মত ছুটিবে, তাহাদের প্রাণের দায়িত্বও তোমারি উপরই পড়িবে। কারণ বীরত্ব ও যশাকাঙ্খা কম উত্তেজক বস্তু নয়, বালক ও যুবকদের কাছে ত বিশেষরূপেই। উহার জন্য জীবন বিসর্জ্জনেও মাদকতা আছে; বিশেষতঃ একজনকে

খুন করিতে পাইলে। তারপর তাহা দ্বারা অন্যায়ের প্রতিরোধ না হইয়া বৃদ্ধিই ঘটিলে তাহার দায়ও তোমাতেই স্পর্শে। প্রাণদানে সাহসের পরিচয় থাকিলেও "গুপ্তহত্যা" জিনিষটা কি খুব বীরত্বেরও? অহিংসানীতিতে অনেকেরই অবিশ্বাস এবং যুদ্ধ ব্যতীত কোন দেশ স্বাধীন হয় নাই ইহা খুবই শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এইরকম ব্যক্তিগত গুপ্তহত্যা কি যুদ্ধ? ইহা দ্বারা কয়টা দেশই বা এপর্য্যন্ত স্বাধীন হইয়াছে? বাঙ্গালীর এত বুদ্ধি, অসংযম ও ভাবালুতার পঙ্কেই কি চিরকাল গড়াগড়ি খাইবে? অনুভূতির সূক্ষ্মতা, কল্পনাশক্তি ভালজিনিষ, কিন্তু বিচারবুদ্ধিহীন ভাবালুতা কি তাহার সহিত এক বস্তু?

. রতনের মত বালকের কাছে এত বিবেচনা অবশ্য আশা করা যায় না। তাহার উপর মায়াও নিশ্চয়ই হইবে। তাহার দুর্ভাগ্য দিদিকেও বলিবার কিছুই নাই। আপনার উপর ঘনাইয়া পড়িলে যাহাই হউক না, তাহার মধ্যেই ভাল দেখা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু বিনয়ের মত উত্তেজকদের দায়িত্বই অনেক বেশী। তাহাদের মত কিশোরদের আবার যাঁহারা উত্তেজিত করেন, তাঁহাদের দায়িত্ব সর্ব্বাধিক।

"পথিকের সত্যনিষ্ঠা ও দৃঢ়তা" দামী জিনিষ বলিয়াই "পথের কথা ভুলে গিয়ে" তাহাকে "নমস্কার" না করিয়া তাহার অপচয়, অপপ্রয়োগ আরও দৃঢ়তার সহিতই নিন্দা করিতে হয়। "তাজা প্রাণ", "বীরত্ব", খাঁটি স্বদেশপ্রেম ও এই "সত্যনিষ্ঠা ও দৃঢ়তা" দেশে এমন কিছু সুলভ নয় যে, এইভাবে তাহা লইয়া ছিনিমিনি খেলা চলিতে পারে। গান্ধীও অনেকটা এইভাবের কথাই বলিয়াছেন।

গান্ধীজীকে লাঘব করা সহজ। অবশ্য তাঁহার বিশেষ বিশেষ মতবাদ বা কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে মতভেদ যথেষ্ট থাকিতে পারে। কিন্তু তাঁহার যুদ্ধেই দেশ বিদেশে সাড়া পড়িয়াছিল। স্বাধীনতাও আর কিছুতেই উহাপেক্ষা বেশী অগ্রসর হইতে ত কই দেখা যায় নাই। এই "বীরত্ব" ও "তাজা রক্তের" লীলা তাহার আগে পরে ত বরাবরই চলিতেছে। বাঙলাদেশের এই বিশেষত্বে দেশের নৈতিক হাওয়ারও ত এমন কিছু পরিশুদ্ধি দৃষ্ট হইতেছে না। বস্তুগত স্থূল সুখস্বাচ্ছন্দ্যের কথা না হয় ছাড়িয়াই দেওয়া গেল। কিন্তু আরও কি এইরকমে ছাড়িয়া দেওয়া যায়? "তাজা-প্রাণ"গুলাকে উত্থান ত দূরের কথা। বাঙ্গালী যে মরিতেই বসিয়াছে।

ইহারই পিঠে পিঠে "রাজনৈতিক ডাকাতি" নামধেয় যে পদার্থটাও বড়ই জলজ্যান্ত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাই বা কি শ্রেণীর বস্তু?

নিজেকে বলি দেওয়াপেক্ষা স্বামীপুত্রদের বলি দেওয়া আরও শক্ত কাজই। তাহার মর্ম্ম বিনয় কি বুঝিবে। এখন নিজেরা আসিতে পাইলে মেয়েদেরও এসবে উৎসাহ বাড়িতে পারে। তাই অনেক যুগলক্ষ্মী, আদ্যাশক্তির আবির্ভাবের কথা কানে আসে। দেশের অনন্ত অভাব, দুঃখ, যন্ত্রণার প্রতিকারের আহ্বানে কিন্তু লক্ষ্মীরা দুরারাধ্যা।

স্থলবিশেষে, সময়বিশেষে মানিলেই কি হত্যা করিলেই হইল? না, যুদ্ধ বাধাইলেই হইল? যুদ্ধে যে পরাজয়ও আছে, আর তাহা যে কি জিনিষ, সত্য যুদ্ধই বা সত্যই যে কি পদার্থ, বিশেষতঃ আমাদের মত অধীন, নিরস্ত্র জাতির পক্ষে, তাহা কি তেমনটা ভাবিয়া দেখা হয়? না, সত্যই ধারণায় আসে? প্রতিপক্ষের তুলনায় আমাদের সংখ্যার কথা মনে করিয়া আশ্বস্তিরও কারণ নাই। বাঙলার মধ্যেও মধ্যবিত্ত শিক্ষিত, ভদ্র বাঙ্গালী যুবকই আমাদের সম্বল। তাহারা বাঙ্গালীরই বা কতটুকু অংশ? আজকালকার machine gun, armoured car, aeroplane ইত্যাদির উহাদের সম্পূর্ণ বিনাশ করিতেই বা কতক্ষণ? (চোরাই আমদানী তাহার সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিবে ত?) তাহারাও তাই ছুতা খুঁজিয়া থাকে। ইহাতে সেই ছুতাই বেশ জুটাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু সর্ব্বনাশ আমাদেরই। এতদিনও যাহা হইয়াছে, তাহাতেই বা সত্য ক্ষতি কাহার হইয়াছে? বিপক্ষকে এতটুকু কাবু করিতে, আমাদের স্বাধীনতা এক পদ অগ্রসর হইতে বা বিশ্বের দরবারে বাঙ্গালীর মানমর্য্যাদা বাড়াইতে ইহাতে সাহায্য করিয়াছে কি? শিক্ষিত তরুণের দল হত, আহত, বদ্ধ হইয়া ইতিমধ্যেই ত বাঙ্গালীর শক্তিহীনতার চিহ্ন প্রকাশ পাইয়া যাইতেছে। বাঙ্গালার চারিদিক ইতিমধ্যেই ঘনাইয়া আসিয়াছে। জগতের কাছে সমর্থন, মর্য্যাদারও এখন

দাম আছে। জার্মানী তাহাতে মিত্রপক্ষের সহিত পারিয়া না উঠাও তাহার পরাজয়ের একটা কারণ। গান্ধী যাহা করিতেছেন, কি বরদৌলিতে যাহা হইয়াছে কষ্ট, দুঃখ থাকিলেও তাহাতে জগতে আমাদের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে স্বীকার করিতেই হয়। এমন কি কর্তৃপক্ষকেও তাহাতেই কি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী কাবু হইতে দেখা যায় নাই? প্রকৃতিভেদে মানুষের পন্থাভেদ থাকিতে পারে। কিন্তু এযে অপরটীর ঠিক পরিপন্থী ও বিঘ্নকারক। আতঙ্কগ্রস্ততা দূর করিয়া আত্মপ্রত্যয় জন্মাইবার জন্য কেবল সাহসিকতা দেখাইবারই যদি কখনও দরকার হইয়াও থাকে, এখন তাহাও আর নাই। একেই ত আমাদের বল কম, সংহতি কম;—তাহাতে এত কষ্টে কংগ্রেসই যখন দেশে সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী হইয়া সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠা পাইয়াছে, তখন তাহার পতাকাতলেই যতদূর হয় সকলে সমবেত হইয়া উহার শক্তিবৃদ্ধি করাই কি সমীচীন নয়? কংগ্রেস বাঙ্গালীকে অগ্রাহ্য তুচ্ছ করে বলিয়া আমরা খেদ করি, কিন্তু সত্যই কি বাঙ্গালী কংগ্রেসকে তেমন প্রাণমন দিয়া বরণ করিয়াছে? কংগ্রেসপন্থী বলিয়া অভিহিতদের মধ্যেই বাঙ্গালী দুইদলে বিচ্ছিন্ন (সম্প্রতি যে যোড়া লাগিয়াছে তাহা ত আর খুবই সম্পূর্ণ বা আন্তরিক বলা যায় না)। তাহার মধ্যে ভ্রষ্টতাও কম প্রকাশ পায় নাই। দলের সকলেরই কংগ্রেসের প্রতি কতটা প্রাণের টান তাহাও সন্দেহজনক। এমন অবস্থায় ভারতের অন্য প্রদেশকে বাঙ্গলার প্রতি সহানুভূতিহীনতার জন্য আমরা বেশী দোষ দিতে পারি কি? একদিকে শত্রু হাসাইয়া ব্যক্তিগত রক্তারক্তির এই লজ্জাকর ও শোচনীয় নির্বুদ্ধিতা, অন্যদিকে আবার প্রকাশ্য রাষ্ট্রনীতিতে বাঙ্গলারই ঘরের গাঁর দলের কীর্ত্তিকলাপ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী উদগ্র। তাই কি কংগ্রেসপন্থী কি উদারপন্থী জাতীয় রাষ্ট্রনীতির উভয় দলেই বাঙ্গালীর স্থান ও দান পশ্চাতেই পড়িয়া যাইতেছে। বাঙ্গালী চরিত্রের কি পরিচয়ই বা ইহাতে জগতের সমক্ষে প্রকাশ পাইতেছে?

মেয়েরা এখন স্বাধীন মতামতের দাবী করিতেছেন। এখনও কি দেবী, লক্ষ্মী বনিবার লোভে বা ভাবাদর্শের মোহে গড়াইয়া চলিবার সময় আছে? কষ্ট সহিলেই শুধু হয় না, বিচারবুদ্ধির দ্বারা সমস্তই পরখ করিয়া যাচাই করিয়া লওয়া দরকার। তারপর জীবনের তাঁহারাই প্রধান রক্ষয়িত্রী (custodian), এইরকম নির্ব্বুদ্ধিতা, দুর্ব্বুদ্ধিতার জীবন লইতে দিতে বা দিতে তাঁহারা কিছুতেই পারেন না। দরকার বুঝিলে স্বামীপুত্রের পাশে দাঁড়াইয়া বুঝিয়া মরিবার যোগ্যতা, সাহস থাকা ভাল। কিন্তু সেই দরকার তাঁহাদের আপনাদের স্থিতপ্রজ্ঞতার দ্বারাই মাত্র নির্ণয় করিতে হইবে। কোনরকম স্তব, স্তুতি, রঙীন আদর্শের উৎকোচের বশীভূত হইয়া নয়।

রাষ্ট্রনীতিপ্রসঙ্গে হস্তক্ষেপের কিছুমাত্র ইচ্ছা না থাকিলেও বড় দুঃখেই এই অপ্রিয় কথাগুলি বলিতেই হইল।

শ্রীঅনিন্দিতা দেবী



পুস্তক-পরিচয়

"আমরা ও তাঁহারা" *

বঙ্কিমচন্দ্র বল্‌তেন আমাদের দেশে যা'রা পড়েন তাঁরা লেখেন না, যাঁরা লেখেন তাঁরা পড়েন না। ধূর্জটিপ্রসাদ অসম্ভব পড়েন, দারুণ চিন্তা করেন ও সার কথা লেখেন। তাঁর প্রত্যেকটি বাক্য গুরুপাক, ধীরে ধীরে আস্বাদন কর্‌তে হয়, এককালীন দু'চার প্যারাগ্রাফের বেশী না পড়াই ভালো। কিন্তু তাঁর রচনারীতির গুণে তাঁর বক্তব্যের গতি ধাবমান, ওর সঙ্গে পাল্লা দেবার লোভ সংবরণ করা যায় না, ফলে হোঁচট খেয়ে তাঁকে দোষ দিতে চাওয়া অনিবার্য্য।

এই গ্রন্থে ছয় দফা কথাবার্ত্তা আছে। যাঁদের মধ্যে কথাবার্ত্তা তাঁদের একপক্ষ "আমরা" এবং অপর পক্ষ "তাঁহারা"। "আমরা" শিক্ষাভিমানী বুদ্ধিজীবী, "তাঁহারা" সর্ব্বসাধারণ। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতিভেদের মতন হয়ে বিরোধের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। শিক্ষাভিমানী বুদ্ধিজীবীর আত্মপ্রাধান্য, স্বার্থপরতা ও তথাকথিত নেতৃত্ব দেশের পক্ষে অকল্যাণকর, দেশের মেরুদণ্ড তো এঁরা নন্। সর্ব্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রচলন না হলে মিলনের আশা নেই। "অথচ শিক্ষার মানে সাহিত্যের অনার্স নয়। সর্ব্বসাধারণের মধ্যে বৈজ্ঞানিক শিক্ষার প্রচারে এবং শিক্ষিতের মধ্যে বৈজ্ঞানিক মনোভাবের প্রসারের দ্বারা বিরোধের আংশিক অবসান হবে আশা করি। কারণ, সৃষ্টির প্রধান কথা জ্ঞান, ভাবের আবেগ নয়; এবং সে জ্ঞান যত ইহজগতের হয় ততই ইহজগতের মঙ্গল। বিজ্ঞানই ইহজগতের জ্ঞানের মধ্যে একমাত্র পদ্ধতি যাকে বিশ্বাস ও নির্ভর করা যায়। বিস্তর দোষ থাকা সত্ত্বেও এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিরই সাহায্যে কুসংস্কার ও স্বার্থপরতা দূর হয়, অজ্ঞায়ের বোঝা কমে, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয় ও বহুদূর পর্য্যন্ত চলে।" এতটা বলে ধূর্জটিপ্রসাদ উজান বয়ে মূল বক্তব্যে ফিরে গেলেন। লিখ্‌লেন, "বিরোধের সম্পূর্ণ অবসান বাঞ্ছনীয় কি না জানি না, সম্ভব কি না জানি না, যদি বাঞ্ছনীয় ও সম্ভব হয় তা হলে হয় ত অন্য উপায় আছে। কিন্তু সে উপায় উদ্ভাবন করা আমার ধর্ম্ম নয়।"

বিরোধ যে ঘটেছে তার সন্দেহ নেই। এবং বিরোধ যাতে ঘোচে তার চেষ্টাও চলেছে। মহাত্মাজীর কটিবাস ও চরখা শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীর দিক থেকে সর্ব্বসাধারণের প্রতি একটা gesture ছাড়া আর কি? তবু ওতে চিঁড়ে ভিজ্‌বে না। প্রাগ্ ব্রিটিশযুগে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ পোষাকে পরিচ্ছদে চাষার মতো ছিলেন এবং অর্থ সম্পদে কোনো কোনো স্থলে অস্পৃশ্যের থেকে সচ্ছল ছিলেন না। আত্মপ্রাধান্য ও স্বার্থপরতা কি কিছু কম ছিল তাঁদের? ব্যাধির বাহ্যলক্ষণ না থাক্‌লেও শুড় ছিল না কি? দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ আজ বিরোধী হয়েছে সেই আদিম কারণে। কটিবাসে তার অবসান হবে না। শিক্ষায় তার আংশিক অবসান হবে, একথা যথার্থ।

কিন্তু বৈজ্ঞানিক শিক্ষা বল্‌তে যা বুঝি, অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মনন এবং ব্যবহারিক জীবন যাপন, সে জিনিষ কি কোনোদিন সর্ব্বসাধারণগম্য হতে পার্‌বে? খাস বৈজ্ঞানিক মহলে কি আমরা এর অন্যথাচরণ দেখ্‌ছিনে? দ্বিতীয়তঃ সহস্র প্রকার মারণ শাস্ত্রের কারা উদ্ভাবক? বর্ত্তমান জগতের অর্দ্ধেক দুর্গতির জন্য কারা দায়ী? বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক যিনি, তিনি নিজের সত্যানুসন্ধিৎসায় ব্যাপৃত + অবসরকালে যদি বা তিনি মানব সংসারের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করেন তবে তাঁর কথায় কেউ ভ্রূক্ষেপ করে না। Einsteinদের অনুরোধে যুযুৎসুরা কি থাম্‌ছে?

সমাজের আভ্যন্তরিক বিরোধ খণ্ডনের জন্য একদিন রামায়ণ মহাভারত রচিত হয়েছিল। উক্ত দুই গ্রন্থে তাৎকালীন যাবতীয় জ্ঞান বিজ্ঞান, ব্যবহারিক জীবনে ওর প্রয়োগকলা, ওর সামাজিক উদ্দেশ্য, আদর্শস্থানীয় মানবের

---

* শ্রীধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। ছাপা-কাগজ সম্পূর্ণ সুন্দর।

চারিত্রিক আধারে ওকে ধারণ সেকালের মিলনকামী ব্রাহ্মণের দ্বারা গ্রথিত হয়েছিল। ব্রাহ্মণের নিজের জন্ম উপনিষদ্ ছিল, দর্শন ছিল, কিন্তু ব্রাহ্মণ ও সর্ব্বসাধারণের সমান শিক্ষার জন্ম ছিল রামায়ণ মহাভারত এবং বহুতর পুরাণ। আধুনিক ব্রাহ্মণ তাঁর নিজের জন্ম বিজ্ঞান রাখুন, সর্ব্বসাধারণের সঙ্গে ভাগ করে নিন্ নবতন রামায়ণ মহাভারত, এমন কোনো জিনিষ যার মধ্যে বিজ্ঞানও থাকবে, কিন্তু অখণ্ড প্যান নাশিটার অঙ্গীভূত হবার জন্ম। ফরাসী বিপ্লবের পূর্ব্বাহ্নে Encyclopaedistরা নূতন মহাভারত নির্ম্মাণ করেছিলেন, সে এক অপূর্ব্ব ভাব স্থাপত্যের নিদর্শন। তারপরে এনসাইক্লোপীডিয়া হয়েছে অসংখ্য, কিন্তু ওগুলি শুধু জ্ঞানের কুতব মিনার, প্রতিদিনের আবাসযোগ্য নয়।

ব্রাহ্মণ চিরদিন থাকবে, ব্রাহ্মণেতর সর্ব্বসাধারণও চিরদিন থাকবে। একাকার-করণের নাম একীকরণ নয়। ব্রাহ্মণ যদি থাকে তবে ব্রাহ্মণের নিজস্ব শিক্ষাও থাকতে বাধ্য। বিজ্ঞান হোক সেই শিক্ষণীয়। কিন্তু সর্ব্বসাধারণের জন্ম নিরামিষ ভোজনের ব্যবস্থা দেওয়া যায় না। তাঁরা নিরামিষ খাবেন, আমিষও খাবেন, দুধ এবং তামাক। খাওয়ার উদ্দেশ্য সব রকমে মানুষ হয়ে ওঠা। এবং খাদ্যটা এমন হবে যার উপর দন্ত জিহ্বা পাকস্থলী ও হৃৎপিণ্ড স্বচ্ছন্দে ও সাগ্রহে কাজ করতে পারবে। বলা বাহুল্য উক্ত আহার্য্যের পাচক হবেন ব্রাহ্মণ। সেই সূত্রে মিলন ঘটবে। শিক্ষাভিমান এক পক্ষের থেকে যাবে, কিন্তু ওর বিষ থাকবে না। ইংলণ্ডে যেমন আভিজাত্য-অভিমান আছে, কিন্তু অভিজাতরা অতি অসহায়।

এ হলো আমার মীমাংসা। ধূর্জ্জটী প্রসাদের এতে খুব আপত্তি হবে না। আমরা এক সঙ্গে অর্দ্ধেক পথ চলতে প্রস্তুত। কিন্তু মুস্কিল এই যে রাশিয়ানরা আরো সোজা পথ দেখিয়ে দিয়েছে। ভারতবর্ষের লোক সহজকে ছেড়ে কঠিনকে বেছে নেবে কি? যদি না নেয় তবে ব্রাহ্মণের মাথা কাটবে কিম্বা মাথার চেয়ে যা মূল্যবান তাই—পৈতে—ছাঁটবে।

আমার এই সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় ধূর্জ্জটীপ্রসাদের একটি ক্ষমতার উল্লেখ করে শেষ করি। তিনি ওস্তাদ dialectician, কথোপকথনেই তাঁর স্ফূর্ত্তি। প্রবন্ধ লিখিয়ে হিসাবে তিনি রাশভারি, কিন্তু কথোপকথনকার হিসাবে অতি সুরসিক।

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

বিস্মৃতি—শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র প্রণীত

লেখক 'শকুন্তলা' নাটকের চতুর্থ সর্গটি সরল সুমিষ্ট বাংলা কবিতায় রূপান্তরিত করিয়া এই নামকরণ করিয়াছেন। অনুবাদে মূলের সাথে মিলত আছেই কিন্তু বেশী ঝোঁক দেওয়া হইয়াছে—কাব্য জমাইয়া তুলিতে। ইহাতে পাঠকের পক্ষে বিষয়টি অধিকতর উপভোগ্য হইয়াছে। যাঁহারা সংস্কৃত বোঝেন না—তাঁহারা ইহার সাহায্যে কালিদাসের কবিত্ব রসের কিঞ্চিৎ আস্বাদ পাইবেন। স্থানে স্থানে লেখকের মৌলিকতার পরিচয় আছে।

শ্রীমনোজ বসু

অসমাপিকা—শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়
বিবাহের চেয়েবড়ো—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
অকর্ম্মণ্য—শ্রীবুদ্ধদেব বসু

তিনখানাই উপন্যাস এবং আজকার বাঙ্গালা সাহিত্যের পরিচিত লেখক এই উপন্যাসগুলোর রচয়িতা।

অন্নদাশঙ্কর ইতিমধ্যে তাঁর বলবার ভঙ্গী ও বিষয়বস্তুর প্রাপ্তবয়স্ক ভাবের জোরে নিজের একটা স্থান সাহিত্য মহলে দখল করে ফেলেছেন। তিনি যা বুঝেন তা তাঁর তীক্ষ্ণ-বুদ্ধির প্রয়োগে সম্পূর্ণরূপেই বুঝেন এবং যা বলেন তা ভালরূপে ভেবেই বলেন। এজন্ম তাঁর লেখায় আন্তরিকতা ফুটে ওঠে।

বর্ত্তমান উপন্যাসখানিতে লেখক একটী পুরুষ ও একটী নারীকে কেন্দ্র করে একটা মোহময় আবেষ্টনীর সৃষ্টি করেছেন। নারী এবং পুরুষের মধ্যে যে চিরন্তন সম্বন্ধ বর্ত্তমান তা তিনি সম্পূর্ণ একটী নতুন দৃষ্টি-কোণ হ'তে দেখতে প্রয়াস পেয়েছেন।

উপন্যাসের বিষয়বস্তুতে বাহিরের দিক থেকে বিচার করলে একটা অমার্জিত অশ্লীলতার ছবির সাক্ষাৎ পাওয়া যায় বলে মনে হয়। কিন্তু সেই আপাতদৃষ্টিতে দৃষ্ট অশ্লীলতা ছাড়িয়ে লেখক যে করুণাত্মক ছবি এঁকে আমাদের সামনে ধরেছেন তা সত্যই চোখে জল আনে। এবং এইখানে গ্রন্থকারের অসমাপিকা সার্থকতা লাভ করেছে।

'বিবাহের চেয়ে বড়' নরনারীর যৌনমিলন মূলক রচনা। লেখকের বলবার ভঙ্গী মনোরম, ভাষা ঝরঝরে এবং তর্ক বিতর্ক কৌতুহলোদ্দীপক, কিন্তু ঘটনা বস্তুর নিতান্তই অভাব।

লেখক যা বলতে চান তা তাঁর গুরুগম্ভীর এবং অশ্রান্ত তর্কের চাপে একেবারেই ইঁদুর-মরা হয়েছে। গ্রন্থকারের কাছ থেকে এর চাইতে ভাল কিছু আশা করেছিলুম।

'অকর্মণ্য' আমাদের ভাল লেগেছে। একটা নতুন ঢঙে তাঁর উপন্যাসখানা লিখেছেন। বুদ্ধদেবের অশ্লীল লেখক বলে একটা বদনাম আছে, কিন্তু এই বইখানার সে ভয় নেই। আত্মীয় আত্মীয়া সকলের হাতে অকর্মণ্য দিতে লজ্জা পেতে হয় না।

'রিনি'র চরিত্র বেশ সুন্দর হ'য়েছে, তবে মনে হয় একটু যেন গোরার লীলার চরিত্রের ছাপ ওতে লেগেছে। লেখকের ভাষা প্রশংসনীয়।

জরীন কলম

আশান্বিত

শ্রীঅজিতকুমার মিত্র

এখনো আমার কয়টি কুসুম
শুকাতে রয়েছে বাকী,
মলিন তাহারা হয়নি এখনো
পথধূলা গায়ে মাখি।
কয়টি প্রদীপ আজো নিভে নাই
অন্তর মাঝে জলিছে সদাই,
হৃদয়-কুঞ্জে আজো ডাকিতেছে
একটি দুইটি পাখী।

যাহা বাকী আছে তাই লয়ে আমি
রচিব অর্ঘ্য-থালি,
তোমারি চরণে সে মোর অর্ঘ্য
যতনে দিবকে ঢালি,
তব চরণের ধূলি কণা নিয়া
জীবনের আশা যাইবে মিটিয়া,
সেই কথা ভাবি যা আছে তাহারে
যতনে জিয়ায়ে রাখি!

বিবিধ সংগ্রহ

চিত্রগুপ্ত

সভ্যতার জনক

সকলের এতদিন পর্যন্ত ধারণা ছিল যে ইজিপ্টের অধিবাসীরাই সভ্যতার জনক। কিন্তু বর্তমানে দুটি বৈজ্ঞানিক শ্রীমতী কসলি (Cowsley) বার্ট্ এবং ডাক্তার Irvine Baird আমাদের এই ভারতবর্ষে এসে, হিমালয় থেকে এক লুপ্ত জাতির সন্ধান পেয়ে, একদম অন্য কথা বলছেন। তাঁরা বলেন chaldean (ক্যাল্‌ডিয়ান্) ব'লে এক জাত হিমালয়ের শিখরে এককালে বাস করতো এবং তাদের বংশধরেরা এখন কেউ কেউ হিমালয়ে বাস করে—সেই ক্যাল্‌ডিয়ান জাতই সভ্যতার প্রথম স্রষ্টা। ন' বছর আগে শ্রীমতী কসলি বার্ট্, এই জাতির খোঁজ করবার জন্যে ভারতবর্ষে আসেন এবং দু'এক জনের খোঁজও পান; তারপর প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাঃ বেয়ার্ড সাহেবকে নিয়ে এই বছরের গোড়ায় তিনি আবার হিমালয়ে অভিযান সুরু করেন। এঁরা বলছেন যে এই ক্যাল্‌ডিয়ান্ জাতি সমস্ত প্রদেশ থেকে এখন বিচ্ছিন্ন হ'যে নির্জনে বাস করছে। অনেক দিন পর্য্যন্ত এরা বাঁচে, তাঁরা চারিটি লোককে দেখেছেন যাদের বয়স ১০৮ বছর ক'রে। তাদের রোগ খুব কমই হয়। এই জাতি পর্ব্বতের গুহায় বাস করে এবং তারা খুব উচ্চাঙ্গের সভ্যতার পরিচয় দেয়। তাদের কতকগুলি খুব চমৎকার পুঁথিপত্র, ছবি প্রভৃতি দেখে বেয়ার্ড সাহেব খুব খুসী হ'য়েছেন।। তিনি তাদের একটি পুরোণো ছবি সঙ্গে করে এনেছেন—ছবিটি ৭৫০ বছর আগে আঁকা এখনও নতুনের মত রয়েছে। ছাগলের চামড়ার ওপর গাছপালার রং দিয়ে সে সব আঁকা। লোকগুলি জানে কি ক'রে বেশী দিন বাঁচতে হয় এবং সেই জন্যে বর্ত্তমান যুগের সকলের চেয়ে তারা বেশীদিন বাঁচে। তাদের ন' মাসে এক বছর হয়। তারা শুধু নিরামিষ খেয়ে থাকে। ক্যাল্‌ডেন জাতির লোকসংখ্যা ৬০০ থেকে ৮০০র মধ্যে। তারা পাহাড়ের ১৭,০০০ ফিট্ ঊর্দ্ধে বাস করে। প্রায় তিব্বতের কাছাকাছি একটা বিচ্ছিন্ন অংশে তারা থাকে। তিনি বলেন যে ব্রিটিশ মেডিক্যেল এসোসিয়েনে এই বিষয় নিয়ে খুব শিগ্‌গিরই একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ তিনি পড়বেন, তার থেকে সভ্যতার উৎপত্তি যে সর্ব্বপ্রথম কোথায় হ'য়েছিল এবং পশ্চিমের বহুরোগের উৎপত্তি কেন হয় সে বিষয়ে অনেক কিছু লোকে জানতে পারবেন। শ্রীমতী কস্‌লি ও ডাঃ বেয়ার্ড যখন পাহাড়ের ওপর দিয়ে ১৬০০ মাইল দার্জ্জিলিং থেকে হেঁটে যাচ্ছিলেন সেই সময়ে পথে একটা দারুণ বিপদ ঘটে। স্থানীয় এক পাহাড়ী জংলী তাঁদের ছুরি দিয়ে হঠাৎ আক্রমণ করে। তার ফলে ডাঃ বেয়ার্ডের কব্জির একটা শির ছিঁড়ে যায়। চার ঘণ্টা তাঁকে অসহায় হ'য়ে সেইখানে পড়ে থাকতে হয় পরে একটি স্ত্রীলোক তাঁকে ঐ অবস্থায় দেখে দয়া করে একটা সাধারণ ছুঁচ দিয়ে পনেরটা সেলাই ক'রে দেয়। এর ফলে তাঁর হাতের বুড়ো আঙ্গুলটি জন্মের মত বিকল হ'য়ে গিয়েছে। জংলী পাহাড়ীটি শ্রীমতী কস্‌লিকেও ছাড়েনি। তাঁর মুখে একটি প্রকাণ্ড চপেটাঘাত ক'রে। তবুও তাঁরা মানুষের অগম্য পথে, মাত্র জ্ঞানের জন্য যাত্রা করতে দ্বিধা বোধ করেন নি।

বিশ্বের কলের খেয়াল

দুনিয়ার খবরের বাজার মশগুল করে রেখেছে পাশ্চাত্য-জগৎ। নিত্য কত চমকপ্রদ ব্যাপারই যে সেখানে ঘটছে তার আর সংখ্যা নেই।

কিছুদিন আগে আমেরিকাতে যে ধরণের একটা বিয়ে হ'য়ে গেছে তাতে বিবাহ ব্যাপারেও ওদের আগ্রহ এবং উৎসাহের পরিমাণ যে কতখানি প্রবল তার পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হ'তে হয়।

ব্যাপারটি হচ্ছে এই। বিবাহের নির্দ্দিষ্ট সময় পাছে অতিক্রান্ত হয়ে যায়, এই আশঙ্কায় বিবাহবেশে সজ্জিতা একটি ক'নে নিউইয়র্কের পথ দিয়ে খুব জোরে মোটর হাঁকিয়ে গির্জ্জার অভিমুখে যাচ্ছিলেন। এমন সময় অপর দিকে থেকেও ঠিক এই সময়েই লগ্নভ্রষ্ট হ'বার অনুরূপ আশঙ্কাতে আর একটি বিয়ের ক'নেও প্রাণপণে মোটর হাঁকিয়ে আস্‌ছিলেন। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস! বিপরীত-মুখী দু'খানি গাড়ীই নিজেদের প্রবলবেগ সামলাতে না পেরে ভীষণভাবে পরস্পরের ওপর এসে পড়্‌লো। এই ভীষণ মোটর সংঘর্ষের ফল হল এই যে—বিবাহ-বেশে সুসজ্জিতা ক'নে দুটিকে চার্চ্চের বদলে হাঁসপাতালে যেতে হোল।

ক'নে দুটি কিন্তু এতেও দমবার পাত্রী ছিলেন না, সাংঘাতিক আঘাতের ফলে তাঁরা হাঁসপাতালে গেছলেন বটে কিন্তু বিয়ের কথা ভোলেন নি। সুতরাং তাঁদের একান্ত তাগিদের ফলে শেষে তাঁদের বর দুটিকে সেখানে এনে এবং বিবাহের অপরাপর আয়োজন করে সেই হাঁসপাতালের অপারেটিং রুমের মধ্যেই তাঁদের শুভোদ্বাহ কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে নির্ব্বাহিত করা হোল।

আরও একটা বিবাহের খবর এর চেয়ে কম কৌতুককর নয়। এটাও ঘটেছিল আমেরিকায়, এই ধরণের ঘটনাগুলো আবার বিশেষ করে আমেরিকাতেই বেশী করে ঘটে কিনা! —আমেরিকাতে আজ পর্য্যন্ত যে কত রকমের অদ্ভুতভাবে একমাত্র এই বিবাহক্রিয়া জিনিষটিই সম্পন্ন হ'য়েছে তার আর ইয়ত্তা নেই। আমেরিকাবাসীদের অনেকের মধ্যেই আজকাল বিবাহব্যাপারে একটা নূতন কিছু ঘটিয়ে বিবাহক্রিয়াটিকে একটা বিশেষ গৌরব দেবার প্রবল ঝোঁক দেখা দিয়েছে। এই নূতনত্বের ঝোঁকে তাঁরা কেউ সাঁতারের পোষাক পরে জলের মধ্যে সাঁতার কাটতে কাটতে কেউ উড়ন্ত এরোপ্লেনের ছাতে উঠে, কেউ পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে, কেউ সমুদ্রের ওপর নৌকো ভাসিয়ে, কেউ বা এরোপ্লেন থেকে প্যারাসুট ধরে নাম্‌বার পথে, পুরোহিতের সাহায্যে রীতিমত মন্ত্র পড়িয়ে বিবাহ কার্য্য সমাধা করেন। কেউ কেউ আবার এতেও সন্তুষ্ট না হয়ে—আরও দুঃসাহসিক কোন উপায়ের সাহায্য নেন। এই দলীয় অনেকে এইজন্তে সিংহের খাঁচার মধ্যে ঢুকেও বিয়ে করতে পশ্চাৎপদ হন নি।

কিন্তু সম্প্রতি ইনেজ্ ক্যাষ্টোন্ (Inez Castone) নামে একটি তরুণী তাঁর ভাবী পতির কাছে এই আবদার ধরলেন যে তাঁদের বিবাহ এমনভাবে ঘটাতে হবে, যাতে সবাই বলে যে—হাঁা, অনেক রকমের বিয়ে দেখলুম বটে, কিন্তু এমনটি আর কখনো দেখিনি। সেই অনুসারেই তিনি প্রস্তাব করলেন যে তাঁদের বিবাহের সময় সেইখানে কতকগুলি বিষধর সাপকে এনে ছেড়ে দেওয়া হবে এবং তার মাঝখানে তাঁরা উভয়ে যথারীতি বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হবেন। বর বেচারী আর কি করেন, ভাবী স্ত্রীর কাছে মান রাখবার জন্তে তাতেই স্বীকৃত হলেন; ফলে আমাদের দেশের একজন হিন্দু সাপুড়েকে ডেকে তার সাহায্যে সাপ খেলিয়ে তার মধ্যেই দাঁড়িয়ে ভয়ে ভয়ে কোন রকমে বিয়ে সেরে তিনি ক'নের মনোরঞ্জন করলেন।

ফ্রান্সে কিন্তু এই বিবাহ নিয়ে সম্পূর্ণ অন্য ধরণের একটি ঘটনা ঘটে গেছে। প্যারিসের একটি স্বাধীনা সুন্দরী তরুণী কিছুদিন পূর্ব্বে এক যুবককে বিবাহ করতে স্বীকৃতা হয়ে এক চুক্তি করেন। বিবাহের সমস্তই ঠিকঠাক—ক'নেকে সঙ্গে করে বর গির্জ্জার বেদীর দিকে অগ্রসর হবেন—মিতবরের জন্তে অপেক্ষা কর্চ্ছেন, এমন সময় খবর পেলেন যে কোন অনিবার্য্য কারণবশতঃ তাঁর যে বন্ধুটি তাঁর মিতবর হ'তে স্বীকৃত হয়েছিলেন তিনি কিছুতেই সেই বিবাহে যোগ দিতে পারবেন না। মহামুস্কিল। এদিকে মিতবর না হলে বিবাহ কার্য্য অচল! তখনি আর একজন মিতবর মনোনীত করা দরকার। অথচ এমন কোন বন্ধু বান্ধব কাছে নেই যিনি মিতবর হ'তে পারেন। তখন বরের হঠাৎ মনে পড়্‌লো যে তিনি যে দোকান থেকে তাঁর বিবাহের পরে মধুচন্দ্রিকা যাপন করবার জন্তে দরকারী জিনিষ কিনেছিলেন—সেই দোকানের মালিকের সহকারী ভদ্রলোকটি সর্ব্বরকমে তাঁর বিবাহ

মিতবর হবার পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী। তদনুসারে তিনি তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে তাঁর মিতবর হ'তে অনুরোধ করলেন। সে ভদ্রলোক স্বীকৃত হলেন। কিন্তু তাঁকে মনোনীত করবার জন্যে যখন ক'নের কাছে তাঁকে হাজির করা গেল তখন ক'নে নতুন মিতবরের রূপগুণে আকৃষ্ট হয়ে শুধু যে তাঁকে মনোনীত করলেন, তা নয় একেবার তাঁকেই বিবাহ করতে সংকল্প করলেন। বর দেখলেন, এতো ভালো বিপত্তি উপস্থিত হোল। যাই হোক কনের ওপর তিনি তাঁর প্রাপ্য দাবী ছাড়তে রাজী নন, তাই তিনি মিতবরের কাঁধে কনের মনচুরির দায় চাপিয়ে—তাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করলেন। মিতবর কিন্তু হাসিমুখে বল্লেন, অত হাঙ্গামে কাজ কি? ক'নে যাকে পতিত্বে বরণ করবেন সেই তাকে লাভ করবে। তদনুসারে ক'নের মত জিজ্ঞাসা করা হোল. ক'নে কিন্তু দৃঢ়ভাবে মত প্রকাশ কর্ল্লেন যে মিতবরকেই তিনি বিবাহ কর্ব্বেন।

দেহের সৌন্দর্য্য বিধানের চেষ্টা করা পাপ

অবশ্য সর্ব্বত্র নয়,—কেবল বেলগ্রেডে। ব্যাপারটি হচ্ছে এই। "সম্প্রতি সার্ব্বিয়ান অর্থোডক্স্ চার্চ্চের (Serbian Orthodox Church) পুরোহিতবর্গ মেয়ে বিলাসিতা ও অশোভন পোষাকের বিরুদ্ধে এক তীব্র আন্দোলন উপস্থিত করেছেন। তাঁদের মত হচ্ছে যে শরীরের যে সকল স্থান অনাবৃত রাখা উচিত নয়, আধুনিক কালের ফ্যাসানের নাকি লক্ষ্যই হচ্ছে, শরীরের সেই সব স্থান অনাবৃত করে লোকের সামনে ধরা। তাঁরা বলেন যে এটি সাংঘাতিক রকমের পাপ, সুতরাং তাঁরা দাবী করছেন যে এই ধরণের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে আইন প্রস্তুত করে' এগুলি বন্ধ করে দেওয়া উচিত। তাঁরা বলেন যে বেলগ্রেডের আধুনিক তরুণীরা তাঁদের দেহের অধিকাংশ স্থল অনাবৃত রেখে সমাজের মধ্যে আভ্যন্তরিক বিপ্লবের সৃষ্টি করেন। এটা সাধারণের নৈতিক চরিত্রের পক্ষেও ক্ষতিকর এবং মেয়েদের স্বাভাবিক লজ্জাশীলতারও পরিপন্থী।

দৈহিক সৌন্দর্য্য বিধানের জন্যে অঙ্গরাগ সমূহের ব্যবহারের বিরুদ্ধেও তাঁরা তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মতে দৈহিক সৌন্দর্য্যসাধনের সমস্ত রকম প্রচেষ্টার মানেই হচ্ছে "খোদার ওপর খোদকারী করতে যাওয়া—" সুতরাং ধর্ম্মত তা' করা পাপ। বিশেষত বিবাহিতা মেয়েদের তো তাঁদের দৈহিক সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে চিন্তা করবার কোন কারণ একেবারেই থাকতে পারে না।

কিন্তু এটা আশা বা আশঙ্কা করা যাচ্ছে যে তাঁদের এই মতের বিরুদ্ধে স্থানীয় অঙ্গরাগ সামগ্রীর বিক্রেতারা অচিরেই প্রবল আন্দোলন উপস্থিত করবেন, কারণ বেলগ্রেডের মতন এমন প্রভূত পরিমাণে লিপ্‌ষ্টিক্ এবং বস্তা বস্তা পাউডার মধ্য-ইউরোপের আর কোন স্থানেই বিক্রী হয় না।

পাশ্চাত্য লেখকদের আয়

আমাদের দেশের কবি বড় দুঃখে গেয়েছিলেন:—

হায় মা ভারতি, চিরদিন তোর এই কুখ্যাতি র'বে
যে জন সেবিবে ও পদ-যুগল সেই সে দরিদ্র হবে।"

বাস্তবিক আমাদের দেশের সাহিত্যিক-জীবন কঠোর দারিদ্র্যের পীড়নে এমন দুর্ব্বিষহ হয়ে ওঠে—যে আমরা সে ক্ষেত্রে দেবী বীণাপাণির ওপর সমস্ত দোষ চাপাতে ইতস্তত করি না। অতি শৈশব থেকেই আমরা শুনে আসছি যে দেবী ভারতীর সঙ্গে মা কমলার চিরবিবাদ! বর্ত্তমানে সাহিত্যিক জীবনের ব্যর্থতার সম্বন্ধে এ দেশের লোকের ধারণা এমনই বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে কোন ছোট ছেলেকে একটু সাহিত্য-চর্চ্চা করতে দেখলেই তার আত্মীয়স্বজন প্রভৃতি শুভার্থীরা সত্যসত্যই শঙ্কিত হয়ে পড়েন। তাঁরা ছেলের ভালোর জন্যে তাকে প্রাণপণে সাহিত্য-সাধনা থেকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করেন। কারণ ছেলে যদি সাহিত্যিক হয় তা'হলে যে তাকে চিরজীবন দুঃখ দারিদ্র্যের অত্যাচার সহ্য করতে হ'বে তা' তাঁরা অনেক নামজাদা সাহিত্যিকের জীবন দেখেই বুঝে নিয়েছেন।

বিলেতের সাহিত্যিকদের অবস্থা কিন্তু আমাদের মত এরকম করুণ মোটেই নয়।

ওদেশের সাহিত্যিকদের আয়ের কথা শুনলে আমরা দেখতে পাই যে দেবী বাণীর ওপর আমাদের কবি যে দোষারোপ

করে গেছেন তা' ওদেশ বেলায় খাটে না। ওখানকার জনকতক সাহিত্যিকের আয়ের হিসেব দিলাম।

Arnold Bennett—ইনি মাসকতক আগে মারা গেছেন—এঁর আয় ছিল বছরে ষোল হাজার পাউণ্ড অর্থাৎ বছরে দু'লক্ষ আট হাজার টাকা। তা'হ'লে মাসে হোল প্রায় সাড়ে সতেরো হাজার টাকা।

কিন্তু সেখানকার জনপ্রিয় নাট্যকারদের আয়ের তুলনায় এ টাকা অতি সামান্য। ২৭ বছর বয়সের সময় Noel Cowardএর আয় ছিল বছরে ৫০,০০০ হাজার পাউণ্ড তার মানে এখনকার হিসেবে সাড়ে ৬ (ছয়) লক্ষ টাকা মাসে প্রায় ৫৪ হাজার টাকারও বেশী।

Freeddie Lonsdale—ইনি যথাক্রমে সৈনিক, নাবিক, ডেক ষ্টুয়ার্ড, এবং কৃষিজীবির জীবন যাপন করেছিলেন এবং বর্ত্তমানে রঙ্গমঞ্চ ত্যাগ করে বায়োস্কোপে যোগদান করেছেন। তাঁর আয়ও Noel Coward এর নীচেই।

বার্ণার্ড শ'এর আয়ও অনেক দিন ধরে বছরে বিশ হাজার পাউণ্ড বা মাসে সাড়ে একুশ হাজার টাকা ছিলো।

Somerset Maugham—বিখ্যাত ভ্রমণকারী। পূর্ব্বে ইনি কিছুদিন চিকিৎসা-ব্যবসাও করেছিলেন—এঁর আয়ও প্রায় বার্ণার্ড শ'রই সমান।

H. G. Wells এবং Hall Caine—এঁদের আধা ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বইগুলি লক্ষ লক্ষ কপি বিক্রী হয়েছে। এঁদেরও আয় ঐ বছরে ২০,০০০ পাউণ্ড।

Sir James Barrie, John Galsworthy এবং মাইকেল Arlen এর আয় Arnold Bennett এর পরেই অর্থাৎ মাসে সতেরো হাজার টাকার কাছাকাছি।

তা'হ'লে দেখা যাচ্ছে ওদেশের সাহিত্যিকদের আমাদের মতন লক্ষ্মীর কোপদৃষ্টিতে পড়্‌তে হয় না।

কিন্তু এটা মনে রাখ্‌তে হ'বে যে তাঁরাও একদিনেই অতখানি টাকা উপার্জ্জন কর্ব্বার যোগ্য হ'য়ে ওঠেন নি। তাঁদেরও অনেককেই বছরের পর বছর ধরে—সহস্র বাধা বিঘ্ন ও অনাদরকে অতিক্রম করে কঠোর সাধনা করতে হয়েছে—তবে একদিন তাঁদের যোগ্যতার মূল্য তাঁরা পেয়েছেন!

বিশ্বব্যাপী শান্তি-প্রচেষ্টা

মানব সভ্যতার ইতিহাসে লেখা সুদীর্ঘ কালের অভিজ্ঞতা এবং বিশেষ করে গত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের ভীষণ ক্ষতির পরিমাণ দেখে বর্ত্তমানে সারা জগতের লোক মানবজাতির সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণের কথা নিয়ে ভাবতে আরম্ভ করেছে। এর আগে সারা পৃথিবীর লোককে এমন করে একসঙ্গে সমস্ত মানব জাতির কল্যাণ এবং অকল্যাণের কথা নিয়ে চিন্তা করতে দেখা যায় নি। অসংখ্য ইতিহাস-প্রসিদ্ধ যুদ্ধের ফলে মানুষের সভ্যতা এবং উন্নতির ভাণ্ডারে যে বারে বারে কেবল ক্ষতির পরিমাণটাই প্রচুরভাবে জমে উঠেছে লাভ যে তাতে কিছুই হয়নি, এই সত্যটা বর্ত্তমান যুগের মানুষ যেন অনেকখানি বুঝ্‌তে পেরেছে। তাই দেখ্‌তে পাই আজ প্রায় প্রত্যেক দেশেই অন্ততঃ জনকতক করেও লোক মানুষের অকল্যাণকর সর্ব্বরকম যুদ্ধবিগ্রহের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে।

ডেনমার্কে প্রায় শতাধিক মন্ত্রীতে মিলে "যুদ্ধ-বিরোধী পুরোহিত মণ্ডলীর" এক বৃহৎ সমিতি গঠন করেছেন। এই সমিতির সভারা সংকল্প করেছেন যে তাঁরা যুদ্ধ-সংক্রান্ত কোন রকম উদ্‌যোগ আয়োজনে তো যোগদান করবেনই না বরং তার পরিবর্ত্তে যুদ্ধ বিরোধী সর্ব্বরকমের আন্দোলনকে প্রাণপণে সমর্থন করবেন।

সুইডেনেও তিন হাজার যুবক এই মর্ম্মে এক ঘোষণাপত্রে সই করেছেন যে "এতদ্বারা আমি ঘোষণা কর্চ্ছি যে আমি কি আন্তর্জ্জাতিক আর কি ঘরোয়া সর্ব্ব রকমের যুদ্ধ-সংক্রান্ত প্রচেষ্টায় অংশ গ্রহণ করা বা সমর্থন করা থেকে সম্পূর্ণভাবে বিরত থাক্‌বো তো বটেই, অধিকন্তু পৃথিবী থেকে যুদ্ধ বিগ্রহের ব্যাপার একেবারে দূরীভূত হয়ে গিয়ে তাঁর স্থলে যাতে এক অভিনব সামাজিক এবং আন্তর্জ্জাতিক শৃঙ্খলা রক্ষিত হয় তার চেষ্টা করব,—যার মূলে থাক্‌বে সমষ্টিগত ভাবে সমগ্র জগতের কল্যাণের জন্যে বিহিত, শান্তি-সংস্থাপনের কল্পনা।"
এই রকম আমেরিকা ফ্রান্স প্রভৃতি দেশেরও সকলে নানা ভাবে মুখে বলে এবং কাগজে লিখে যুদ্ধ-বিদ্রোহের বিরুদ্ধে এবং বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠার স্বপক্ষে মত প্রকাশ করেছেন।

ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠান সমূহের নিরুপদ্রব নীড়ের মধ্যে অবস্থিত আধ্যাত্মিক উন্নতির সাধনায় আত্মসমাহিত পুরোহিতরাও আজ উন্নতির পরিপন্থী যুদ্ধরূপী এই সনাতন মহা-ভুলটির উচ্ছেদ সাধন করতে বদ্ধপরিকর হয়ে দাঁড়িয়েছেন। এমন কি যাঁরা নিজেরা অসাধারণ যুদ্ধ-লিপ্সা ও বিক্রমের সাহায্যে অসংখ্য যুদ্ধ জয় করেছেন তেমন যোদ্ধা বীরপুরুষরা পর্য্যন্ত বর্ত্তমানে ক্রমে যুদ্ধবিগ্রহের বিরোধী হয়ে পড়ছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে Field Marshall Viscount Allenby তাঁর সত্তর বার্ষিক জন্মোৎসবের দিন বলছিলেন যে যদি আবার যুদ্ধ বাধে তা'হলে বুঝতে হবে যে জগতে সভ্যতার সমাপ্তি পূর্ণভাবে ঘটতে আর বেশী দেরী নেই। এই সমস্ত উদাহরণের দ্বারা এই বোঝা যায় যে, যে-সমস্ত সমস্যা বহুদিন ধরে ধীরে ধীরে মানুষের সমাজে গড়ে উঠেছে এবং আজ মানুষের সভ্যতার উন্নতিতে পর্য্যন্ত বাধা দিতে উদ্যত হয়েছে তার বিরুদ্ধে সকলেই আজ প্রবল উৎসাহে সংগ্রাম ঘোষণা করতে মেতে উঠেছে।

তাই বর্ত্তমানকালে সংবাদ জগতের যে খবরটির সঙ্গে সকলেই অল্প বিস্তর সংশ্লিষ্ট, সেটি হচ্ছে রাজনীতি এবং অর্থনীতি সম্বন্ধীয় যতদূর সম্ভব জটিল সমস্যা।

জগতের ইতিহাসে ঠিক এমন ব্যাপারটি আর কখনো ঘটেনি এবং একই সমস্যা নিয়ে সারা জগতকে একসঙ্গে এমন করে আর কখনো ভাবতেও হয় নি। সুতরাং বর্ত্তমানের এই খবরটির ঐতিহাসিক মূল্য বড় কম নয়।

যখন দেখি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমগ্র ভূখণ্ডের প্রান্তিক প্রান্তভাগে যে কোন প্রতিভাবান্ ব্যক্তিই বর্ত্তমান আছেন তিনিই তাঁর সমস্ত কল্যাণ-চিন্তাকে পৃথিবীর সমস্ত মানুষের এককালীন এই সঙ্কটকালে যথাসাধ্য নিয়োজিত করতে চেষ্টা করছেন তখন বাস্তবিকই মনে হয়, সভ্যতার ইতিহাসে আমরা একসঙ্গে অনেকগুলো পৃষ্ঠা এগিয়ে গেছি। তখন বিশ্বমানবের সর্ব্বাঙ্গীন সুখ সুবিধার কথা একসঙ্গে আমাদের মনের মধ্যে জেগে উঠে আমাদের জানিয়ে দেয় যে ঔদার্য্যের দিক দিয়ে আমরা অর্থাৎ বর্ত্তমান জগতের সমস্ত মানুষ অনেকখানি বড় হয়ে গেছি।

নানা কথা

পরলোকগত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

বাংলা সাহিত্যে ও সাহিত্য-পরিষদে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যে স্থান অধিকার করেছিলেন, তা আর পূরণ করা যাবে না। এই কারণে এই সব মনীষিদের যত বয়সেই মৃত্যু হোক না কেন, অকাল মৃত্যুর শোকের মতই তা আমাদের প্রাণে বাজে। শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রতি আমাদের যে গভীর শ্রদ্ধা তা' নিবেদন করবার মত ভাষা আমাদের নেই। গত ৬ই ডিসেম্বর সাহিত্য-পরিষদের বিরাট শোক-সভায় রবীন্দ্রনাথ যে চিঠিখানি পাঠিয়েছিলেন, আমাদের শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ সেই চিঠিখানি এইখানে উদ্ধৃত করে দিলাম :—

"আমাদের বাল্যকালে আমরা একটি নূতন যুগের অবতারণা দেখেছি। প্রাচীন পাণ্ডিত্যের সঙ্গে য়ুরোপীয় বিচার-পদ্ধতির সম্মিলনে এই যুগের আবির্ভাব। অক্ষয়কুমার দত্তের মধ্যে তার প্রথম সূত্রপাত দেখা দিয়েছিল। তারপরে তার পরিণতি দেখেছি রাজেন্দ্রলাল মিত্রে। সেদিন এসিয়াটিক সোসাইটির প্রযত্নে প্রাচীন কাল থেকে আহরিত সাহিত্য এবং পুরাবৃত্তের উপকরণ অনেক জমে উঠেছিল। সেই সকল অসংশ্লিষ্ট উপাদানের মধ্যে বিক্ষিপ্ত সত্যকে উদ্ধার করবার কাজে রাজেন্দ্রলাল অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। প্রধানতঃ ইংরেজী ভাষায় ও য়ুরোপীয় বিজ্ঞানে তাঁর মন মানুষ হয়েছিল; পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর রচনা ইংরেজী ভাষাতেই প্রকাশ হোত। কিন্তু আধুনিক কালের বিদ্যাধারার জন্যে বাংলা ভাষার মধ্যে খাত খনন করার কাজে তিনি প্রধান

অগ্রণী ছিলেন, তাঁর দ্বারা প্রকাশিত বিবিধার্থ সংগ্রহ তার প্রমাণ। তাঁর লিখিত বাংলা ছিল স্বচ্ছ প্রাঞ্জল নিরলঙ্কার।

সে অনেক দিনের কথা—সেদিন একদা পূজনীয় অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে রাজেন্দ্রলালের মাণিকতলার বাড়ীতে কী উপলক্ষ্যে গিয়েছিলুম সেটা উল্লেখযোগ্য। বাংলায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা বেঁধে দেবার উদ্দেশে তখনকার দিনের প্রধান লেখকদের নিয়ে একটি সমিতি স্থাপনের সঙ্কল্প মনে ছিল। তাতে বঙ্কিমচন্দ্রকেও টেনেছিলুম। বিদ্যাসাগরের কাছেও সাহস করে যাওয়া গেল। তিনি বল্লেন, তোমাদের উদ্দেশ্য ভালো সন্দেহ নেই, কিন্তু যদি সাধন করতে চাও, তাহলে আমাদের মতো "হোম্‌রাচোমরা"দের কখনই নিয়োনা, আমরা কিছুতেই মিলতে পারিনে। তাঁর কথা কতক অংশে খাটল, হোম্‌রা-চোম্‌রার দল কেউ কিছু করেন নি। শুরুর সঙ্গে কাজ আরম্ভ করেছিলেন একমাত্র রাজেন্দ্রলাল। সমিতির প্রত্যেকের কাছে ফেরি করিয়ে নেবার জন্য তিনি ভৌগোলিক পরিভাষার একটি খসড়া লিখে দিলেন। অনেক চেষ্টা করলুম সকলকে জোট করতে, মিলিয়ে কাজ করতে, তখনকার দিনের লেখকদের নিয়ে সাহিত্য-পরিষদ খাড়া করে তুলতে—পারিনি, হয়তো নিজেরই অক্ষমতাবশতঃ। তখন বয়স এত অল্প ছিল যে, অনেক চেষ্টায় যাঁদের টেনেও ছিলুম, তাঁদের কাজে লাগাতে পারলুম না।

আজ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদের মৃত্যু উপলক্ষ্যে শোক-সভায় রাজেন্দ্রলালের উল্লেখ করবার কারণ এই যে, আমার মনে এই দুজনের চরিত্রচিত্র মিলিত হয়ে আছে। হরপ্রসাদ রাজেন্দ্রলালের সঙ্গে একত্রে কাজ করেছিলেন। আমি তাঁদের উভয়ের মধ্যে একটি গভীর সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছি। উভয়েরই অনাবিল বুদ্ধির উজ্জ্বলতা একই শ্রেণীর। উভয়েরই পাণ্ডিত্যের সঙ্গে ছিল পারদর্শিতা,—যে-কোনো বিষয়ই তাঁদের আলোচ্য ছিল, তার জটিল গ্রন্থিগুলি অনায়াসেই মোচন করে দিতেন। জ্ঞানের গভীর ব্যাপকতার সঙ্গে বিচারশক্তির স্বাভাবিক তীক্ষ্ণতার যোগে এটা সম্ভবপর হয়েছে। তাঁদের বিদ্যায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাধন-প্রণালী সম্মিলিত হয়ে উৎকর্ষ লাভ করেছিল। অনেক পণ্ডিত আছেন, তাঁরা কেবল সংগ্রহ করতেই জানেন, কিন্তু আয়ত্ত করতে পারেন না। তাঁরা খনি থেকে তোলা ধাতুপিণ্ডটার সোনা এবং খাদ অংশটাকে পৃথক করতে শেখেন নি বলেই উভয়কেই সমান মূল্য দিয়ে কেবল বোঝা ভারী করেন। হরপ্রসাদ যে যুগে জ্ঞানের তপস্যায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, সে যুগে বৈজ্ঞানিক বিচার-বুদ্ধির প্রভাবে সংস্কার-মুক্ত চিত্ত জ্ঞানের উপাদানগুলি শোধন করে নিতে শিখেছিল। তাই মূল পাণ্ডিত্য নিয়ে বাঁধা মত আবৃত্তি করা তাঁর পক্ষে কোনোদিন সম্ভবপর ছিল না। সূক্ষ্মদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে এই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এবং সেই সঙ্গে স্বচ্ছ ভাষায় প্রকাশের শক্তি আজ আমাদের দেশে বিরল। বুদ্ধি আছে কিন্তু সাধনা নেই, এইটেই আমাদের দেশে সাধারণতঃ দেখতে পাই, অধিকাংশ স্থলেই আমরা সে শিক্ষায় বেশী মার্ক পাওয়ার অভিলাষী। কিন্তু হরপ্রসাদ ছিলেন সাধকের দলে এবং তাঁর ছিল দর্শনশক্তি।

আমাদের সৌভাগ্যক্রমে সাহিত্য-পরিষদে হরপ্রসাদ অনেকদিন ধরে আপন বহুদর্শী শক্তির প্রভাব প্রয়োগ করবার উপযুক্ত ক্ষেত্র পেয়েছিলেন। রাজেন্দ্রলালের সহযোগিতায় এসিয়াটিক সোসাইটির বিদ্যাভাণ্ডারে নিজের বংশগত পাণ্ডিত্যের অধিকার নিয়ে তরুণ বয়সে তিনি যে অক্লান্ত তপস্যা করেছিলেন, সাহিত্য-পরিষদ্‌কে তারই পরিণত ফল দিয়ে এতকাল সতেজ করে রেখেছিলেন। এমন সর্বাঙ্গীন সুযোগ পরিষদ্ আর কি কখনো পাবে? যাদের কাছ থেকে দুর্লভ দান আমরা পেয়ে থাকি, কোনোমতে মনে করতে পারিনে যে, বিধাতার দাক্ষিণ্যবাহী তাঁদের বাহুকে মৃত্যু কোনোদিন নিশ্চেষ্ট করতে পারে। সেইজন্যে যে বয়সেই তাঁদের মৃত্যু হোক, দেশ অকালমৃত্যুর শোক পায়, তার কারণ আলোক-নির্বাণের মুহূর্ত্তে পরবর্ত্তীদের মধ্যে তাঁদের জীবনের অনুবৃত্তি দেখতে পাওয়া যায় না। তবু বেদনার মধ্যেও মনে আশা রাখতে হবে যে, আজ যাঁর স্থান শূন্য, একদা যে আসন তিনি অধিকার করেছিলেন, সেই আসনেরই মধ্যে তিনি শক্তি সঞ্চার করে গেছেন এবং অতীতকালকে যিনি ধন্য করেছেন, ভাবীকালকেও তিনি অলক্ষ্যভাবে চরিতার্থ করবেন।"

—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,
১৫ই অগ্রহায়ণ ১৩৩৮।

রবীন্দ্র-জয়ন্তী

বড়দিনের ছুটির সময় কল্‌কাতায় রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসবের বিরাট আয়োজন চল্‌ছে। আশা করি, সকলেই এই উৎসবে যোগদান ক'রে কবির প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন। যে-সব আয়োজন হ'চ্ছে, আমাদের পাঠকবর্গের অবগতির জন্য তার একটা তালিকা দিলাম -

(ক) **সাহিত্য-সম্মিলন**— ২৫শে ডিসেম্বর অপরাহ্নে টাউনহলে যথাযোগ্য অনুষ্ঠানের দ্বারা রবীন্দ্র-সপ্তাহের উদ্বোধন; পরে সাহিত্য-সম্মিলনে বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের দান সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ। কবির উদ্দেশে রচিত কয়েকটি কবিতাও পাঠ করা হ'বে। এই সম্মিলনের সভাপতি শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

(খ) **সাধারণ সম্মিলন**— ২৬শে ডিসেম্বর অপরাহ্নে দর্শন, ধর্ম্ম, ললিতকলা, শিক্ষা, রাষ্ট্রনীতি, জাতি সংগঠন, পল্লীসংগঠন ইত্যাদি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের ইংরেজিতে রচিত গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে এবং বিশ্বভারতীর আদর্শ ও কর্ম্ম সম্বন্ধে ইংরেজীতে প্রবন্ধ পাঠ। সভাপতি সার সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্।

(গ) **গীত-উৎসব**—২৫শে ও ২৬শে ডিসেম্বর সন্ধ্যায় কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটুট গৃহে, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত। সত্তরটি গান এমন ভাবে নির্ব্বাচিত করা হ'য়েছে, যে তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সুররচনার অপূর্ব্ব কৌশলের একটা সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাবে।

(ঘ) **অভিনয়** কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটুট গৃহে ২৮শে, ২৯ ও ৩০শে ডিসেম্বর রবীন্দ্রনাথের "নটীর পূজা"র অভিনয়।

(ঙ) **কবিসম্বর্দ্ধনা** - ২৭শে ডিসেম্বর অপরাহ্নে টাউন হলের সম্মুখে কবির সম্বর্দ্ধনা।

(চ) **মেলা**—২৫শে ডিসেম্বর থেকে ৭ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত টাউন হলের প্রাঙ্গনে মেলা ও প্রদর্শনী। এই মেলায় প্রদর্শিত হ'বে—(১) রবীন্দ্রনাথের অঙ্কিত চিত্র (২) তাঁর গ্রন্থাবলীর প্রথম পাণ্ডুলিপি, যা' পাওয়া যায়,—(৩) তাঁর গ্রন্থাবলীর ভিন্ন ভিন্ন এবং বিরল সংস্করণ, (৪) জগতের যাবতীয় ভাষায় অনূদিত তাঁর গ্রন্থাবলী, (৫) রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে জগতের যাবতীয় ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলী; (৬) কবির বিভিন্ন বয়সের ফটোগ্রাফ ও প্রতিকৃতি (৭) জগতের ভিন্ন ভিন্ন দেশ থেকে কবিকে দেওয়া উপহারবলী; (৮) কলা-ভবন শ্রী-ভবন ও শ্রী-নিকেতনের ছাত্রছাত্রীদের শিল্পকার্য্য; (৯) বাংলার কুটির-শিল্প-জাত দ্রব্য সমূহ, (১০) বাংলার ও ভারতের আধুনিক ও পুরাতন চিত্রসমূহ।

(ছ) **আমোদ-প্রমোদ** কোনো পার্কে, কথকথা, যাত্রা, কীর্ত্তন, বাউল, ময়নামতীর গান, গম্ভীরার গান, ঝাবি গান, লোক নৃত্য ইত্যাদির ব্যবস্থাও করা হ'তে পারে, কিন্তু এসম্বন্ধে নির্দ্দিষ্ট কোনো ব্যবস্থা এখনো করা হয় নি।

শনিবারের চিঠি

অগ্রহায়ণের 'বিচিত্রা'য় 'সাময়িক সাহিত্য আলোচনায়' প্রসঙ্গে আমরা 'শনিবারের চিঠির' উল্লেখ করেছিলাম। মাসিক পত্রিকাগুলির মধ্যে একমাত্র 'শনিবারের চিঠি' নিয়মিতভাবে মাসের পর মাস সাময়িক সাহিত্য আলোচনা করে থাকেন। কাজটা ভালোই, এবং যথাযথভাবে [illegible] হ'লে আমাদের জাতীয় সাহিত্যের ধারাটা ঠিক পথে পরিচালিত হ'তে পারে বলে আমাদের বিশ্বাস। সেই জন্যই এ সম্বন্ধে আমাদের কিছু মতামত অগ্রহায়ণের 'বিচিত্রা'য় ব্যক্ত করেছিলাম।

অবশ্য 'শনিবারের চিঠি'র ওপর বেশি আশা-ভরসা আমরা কোনোদিনই রাখিনি,—কেন-না তার সমালোচনার পদ্ধতিটার মধ্যে শুধুই যে সাহিত্যিক প্রবঞ্চনা আছে,—এমন মনে হয়, মনে হয় এমন অনেক জিনিষ 'শনিবারের চিঠি'র আলোচনাগুলির ওপর রঙ ফলায়, যা' সাহিত্য-রাজ্যের বাইরে। তাই সাহিত্য-সমালোচনার প্রধানগুণ যে নিরপেক্ষতা,—'শনিবারের চিঠি'র সমালোচনার মধ্যে সেটা পাওয়া যায় না।

কিন্তু এইটুকু বললেই সবটা বলা হয় না। সাহিত্য-আলোচনার মধ্যে যদি বাইরের কোনো প্ররোচনা এসে পড়ে,—এই যেমন ব্যক্তিগত প্রসন্নতা বা অপ্রসন্নতা,—কিম্বা আর কিছু,—তাহ'লে সেই আলোচনাটা যে কতখানি কদর্য্য হ'য়ে পড়তে পারে তা' 'শনিবারের চিঠি' যাঁরা পড়েন,—তাঁরাই দেখতে পাবেন। 'শনিবারের চিঠি'

তাঁরা করেছেন যে আধুনিক বাংলা সাহিত্য থেকে আবর্জনা দূর করবার জন্যে "সম্ভবামি যুগে যুগে"। কিন্তু মাসের পর মাস তাঁরা যে-গ্লানির সৃষ্টি করছেন,—সাহিত্য-জগতে তার চেয়ে কুৎসিৎ আবর্জনা আর কি থাকতে পারে, আমাদের জানা নেই।

এবার স্থানাভাবে আমরা বেশি কিছু বললাম না। মাসান্তরে স্থান থাকলেও যে আর বেশি কিছু বলব তা নয়, কেন-না অগ্রহায়ণ সংখ্যায় 'শনিবারের চিঠি' যে আলোচনার নমুনা দেখিয়েছেন,- উপেক্ষাই তার একমাত্র সমুচিত বিধান। তবুও প্রসঙ্গটা যখন তুললামই,—(এবং তোলবার বোধ বোধ করি প্রয়োজন ছিল), তখন এই অল্প পরিসরের মধ্যেই আমাদের বক্তব্যটা অন্তত একটা দৃষ্টান্ত দিয়েও পরিস্ফুট করবার চেষ্টা করব।

অগ্রহায়ণের 'বিচিত্রায়' রবীন্দ্রনাথের নাতবৌ কবিতাটি 'শনিবারের' চিঠি'র সমালোচকের ভালো লাগে নি। [illegible] অবশ্য কারো কিছু বলবার থাকত না, যদি না তিনি কবিতাটি সমালোচনা করতে গিয়ে তাঁর রসগ্রাহিতার একটু পরিচয় দিতেন। এমন একটা সহজ সরল কবিতা, মনের একটা হালকা অথচ নিবিড় অনুভূতির এমন সরস সর্বাঙ্গসুন্দর প্রকাশ যাঁর অন্তরকে রস সঞ্চিত না করে, তিনি যে 'নাত-বৌ' এর সঙ্গে 'উর্বশী'র তুলনা করতে যাবেন, তা' আর বিচিত্র কি। দুটো কবিতার রূপ ও প্রাণ এবং বিষয়-বস্তুর মধ্যে যে কতখানি প্রভেদ, তা' উপলব্ধি করবার ক্ষমতা যাঁর নেই, তারা সমালোচনার অধিকার দাবী করলে তিনি উপহাস ছাড়া আর কিছুই পেতে পারেন না। কারো এই ধরণের অদ্ভুত কৃতি নিয়ে 'শনিবারের চিঠি' এবার রবীন্দ্র-সাহিত্যের যে-আলোচনায় প্রবৃত্ত হ'য়েছেন, তার সম্বন্ধে যত কম বলা যায় ততই ভালো।

ত্রুটি স্বীকার

অগ্রহায়ণের 'বিচিত্রা'র গুণী সুরেন্দ্রনাথ প্রবন্ধে কয়েকটি ছাপার ভুল রয়ে গিয়েছে। পাঠকেরা অনুগ্রহ করে নিম্নলিখিত সংশোধনগুলি করে নেবেন।

৬০৪ পৃষ্ঠা	২য় স্তম্ভ	২৩ লাইন	অবচেতনার	স্থলে	অবচেতনায়
৬০৫ ,,	১ম ,,	৩২ ,,	হেমবিশ্বের	,,	হেমবিন্দের
৬০৬ ,,	১ম ,,	২৭ ,,	তাল	,,	তান
,, ,,	২য় ,,	ফুটনোট ৪র্থ লাইন	ধ্রুপদ ও খেয়াল	,,	ধ্রুপদ ও রামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের খেয়াল
৬০৭ ,,	১ম ,,	১৪ ,,	বাহবাস্ফোট	,,	বাহ্বাস্ফোট
৬০৯ ,,	১ম ,,	১১ ,,	নসতের	,,	বসান্তর
৬১২ ,,	২য় ,,	২২ ,,	ফাঁক ও মানের	,,	ফাক ও সমের
৬১৭ ,,	২য় ,,	৬ ,,	জাগল নাকো ফুল	,,	জাগল লাখো ফুল

Edited by Srijut Upendranath Ganguli Printed by Srijut Sarat Chandra Mukherji at the Sreekrishna Printing Works 259, Upper Chitpur Road, Calcutta and published by the same from 149, Raja Dinendra Street, Calcutta.